পরাজয়' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, প্রবাদ, প্রাচীনকালে দ্বারী নামে এক জন ধনী স্ত্রীলোক রাজমহলের নবাবের নিকট রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়া যান। উক্ত অর্থে রাজমহলের নবাব তাঁহার নামে এই রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

বর্ত্তমান সময় ইহার যে অংশ পূর্ব্বোক্ত ছত্রভোগ হইতে কাশীনগর, বড়াশী প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিকে গঙ্গার বাদার উপর খাড়ী আবাদ অবস্থিত। উহা এক্ষণে ৯৩ নম্বর তৌজীর অন্তর্গত এবং খাড়ী, গজমুড়ী প্রভৃতি নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীরূপে পরিচিত। উহার উত্তরপশ্চিমাংশে উক্ত গঙ্গার বাদার অনতিদূরে জঙ্গলাবৃত অবস্থায় একটি প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ দেখা যায়। প্রবাদ আছে, সেখানে প্রাচীনকালে জয়নগর ও দুর্গাপুর গ্রামে এক্ষণে রাধাবল্লভ ও শ্যামসুন্দর নামে যে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন, তাঁহাদের মন্দির ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে তথাকার ভগ্ন মন্দির হইতে বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য উক্ত বিগ্রহগুলি স্থানান্তরিত করাইয়া জয়নগর ও দুর্গাপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অরণ্য হাসিলের পর খাড়ীর নানা অংশে বহুসংখ্যক মজা পুষ্করিণী দেখা গিয়াছিল ও অনেকগুলি গৃহের ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পুরাতন Revenue Survey Report এ উল্লিখিত আছে যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দেও উহার দক্ষিণে অরণ্যমধ্যে ঐরূপ কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও জঙ্গলে পূর্ণ দুইটি প্রকাণ্ড মজা দীর্ঘিকা বিদ্যমান ছিল। ঐ দীর্ঘিকা দুইটির চতুর্দ্দিকে তখনও প্রায় ৩৫।৪০ ফুট উচ্চ মাটীর বাঁধ ছিল।*

খাড়ী প্রায় এক শত বৎসর হইল হাসিল হইয়াছে। প্রবাদ, তথাকার অরণ্য কাটাইতে হয় নাই, দাবাগ্নিতে পুড়িয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান সময় ইহার দক্ষিণাংশে গজমুড়ী পল্লীতে যদুনাথ ঠাকুর নামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটি প্রায় ৩ ফুট উচ্চ কাল প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। উহা সেখানে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। উহার দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে পদ্ম, বামোর্দ্ধ হস্তে গদা, বামাধঃ হস্তে চক্র ও দক্ষিণাধঃ হস্তে শঙ্খ আছে। অগ্নিপুরাণ অনুসারে উহার নাম নারায়ণ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক প্রবন্ধে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে এই স্থানের দক্ষিণে কপিল মুনি নামে একটি তীর্থক্ষেত্র ছিল এবং সেখানেও পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলার সমকালে কপিল মুনির পূজা ও তদুপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র মেলা হইত। লোক তখন সেখানে নানারূপ মানসিক করিত ও ঢিল বাঁধিত।* অধুনা এই স্থানের নামানুসারে বর্ত্তমান খাড়ী পরগণা প্রসিদ্ধ। ২২ নম্বর লাট বকুলতলায় মহারাজা লক্ষ্মণসেন দেবের যে পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অধীনে এতদঞ্চল যে খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, তাহারও নামকরণ এই স্থানেরই নামানুসারে হইয়াছিল। ঢাকার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের মতে এই প্রাচীন মণ্ডল বিভাগই মুসলমান আমলে পরগণায় পরিণত হইয়াছিল। † বঙ্গদেশের



গজমুড়ী গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি

* Hunters Statistical Account of Bengal, Vol. I. pp. 235.

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের বিজ্ঞানশাখায় পঠিত প্রবন্ধ।

† ঢাকার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড।

নানাস্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলির পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, হিন্দুরাজত্বকালের প্রাদেশিক বিভাগানুসারে উক্ত মণ্ডলবিভাগগুলি ভুক্তির অন্তর্গত ছিল এবং উহার দ্বারা বর্ত্তমান কালের জিলার ন্যায় এক একটি প্রাদেশিক বিভাগকে বুঝাইত। তৎকালে উহাদের শাসনকর্ত্তৃগণ ভুক্তীশ্বরের অধীনস্থ ছিলেন এবং "মণ্ডলেশ", "মণ্ডলাধিপতি", "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। কামন্দকীয় নীতিসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মণ্ডলাধিপতি দুর্গস্থ থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন এবং তাঁহার কোষ, দণ্ড, মন্ত্রী ও অমাত্যাদি সহায় থাকিত।

যথা—

"উপেতঃ কোষদণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থশ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উল্লিখিত আছে যে, চারিশত যোজন পর্য্যন্ত ভূমি মণ্ডলেশ্বরের অধিকারে থাকিত এবং তাঁহারাও রাজপদবাচ্য ছিলেন।

"চতুর্যোজনপর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ॥"

প্রাচীন বিবরণাদিতে দেখা যায় যে, সে কালের শাসনব্যবস্থায় রাজাধিরাজ পরম ভট্টারক ছিলেন। তাঁহার পরে ভুক্তির শাসনকর্ত্তৃগণের ও তাঁহাদের অধীনে মণ্ডলেশ্বরগণের সামন্তরাজরূপে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানে সেন-রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশান্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে খাড়ী মণ্ডলের সদরস্থানরূপে অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি বারুইপুরের সন্নিকটে গোবিন্দপুর নামক গ্রামে লক্ষ্মণসেন দেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। নৈহাটীর চতুর্দ্দশ সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণীতে উহার আলোকচিত্র ও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। এইখানি ও বকুলতলায় প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনখানি পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীনকালে পূর্ব্বোল্লিখিত ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরস্থ জনপদসমূহ বর্দ্ধমানভুক্তির ও পূর্ব্বতীরস্থ লোকালয়সকল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরাতন বিবরণাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীর হইতে বিক্রমপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ উক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি বহু প্রাচীন। গুপ্তরাজগণের তাম্রলিপিতেও ইহার উল্লেখ আছে। দিনাজপুর জিলায় প্রাপ্ত একখানি তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, ২২৪ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪৪৩ খৃষ্টাব্দে পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে চিরাদত্ত নামক এক জন উপরিক ইহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। * উক্ত খাড়ী আবাদের উত্তরে নালুয়া গাঙের উপর ৩৬০ ও ১০৬৪ নম্বর তৌজীর মধ্যে নালুয়া নামে একটি গ্রাম আছে। যশোহর খুলনার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই স্থানেরই সন্নিকটে সুন্দরবনের প্রাচীন নগরী নলদী অবস্থিত ছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, "সুন্দরবনের পাঁচটি বিনষ্ট সহরের মধ্যে নলদী একটি। বর্ত্তমান চব্বিশপরগণার দক্ষিণাংশে নালুয়া নদীতীরে যে নালুয়া নামক স্থান আছে, উহাকেই আমরা নলদী বলিয়া অনুমান করিয়াছি। ঠিক সেই স্থানটিই নলদী না হইতে পারে, কিন্তু উহার সন্নিকটে সুন্দরবনের সেই অংশে যে প্রাচীন সহর নলদী ছিল, তাহার সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে খুলনার সুপণ্ডিত রেনী ফরাসী পণ্ডিত বাসবার্ডের নিকট হইতে তিনখানি প্রাচীন মানচিত্রের প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে সসন (N. Sauson) কর্ত্তৃক ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত মানচিত্রখানি তিনি বাঙ্গালার প্রাচীন বিনষ্ট নগরীর বিবরণ দিবার জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের "মুখার্জ্জির ম্যাগাজিন" নামক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। উক্ত মানচিত্রে নলদীর অবস্থান রহিয়াছে। নলদীর উত্তরে বিস্তীর্ণ বুড়ন পরগণাও আছে।" † এই নালুয়া নামক স্থানের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে নালুয়া গাঙের উপর বাইশহাট্টা আবাদের মধ্যে ঘোষের চক নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই স্থানটি এক্ষণে জয়নগর থানার অধীন ও ৩০।৩২।৩৩ নম্বর লাটের অন্তর্গত। এখানে নালুয়া গাঙের উত্তরদিকে প্রকাণ্ড

* বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০।৬১।

† যশোহর খুলনার ইতিহাস ১ম খণ্ড।

দুইটি ইষ্টকস্তূপ দেখা যায়। উহাদের মধ্যে বৃহত্তর স্তূপটি আকারে প্রায় ৪৫।৪৬ ফুট উচ্চ ও ৭।৮ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মজিলপুরনিবাসী শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উহার পশ্চিমপার্শ্বস্থ ছোট স্তূপটির একাংশ খনন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ঐ সময় উহার মধ্য হইতে ২।৩টি ছোট ছোট প্রস্তরমূর্ত্তি, কয়েকটি প্রস্তরনির্ম্মিত চৌকাঠের অংশ ও একটি ক্ষোদিত লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছিল। মেজর রেনেল-কৃত অষ্টাদশ শতাব্দীর গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানচিত্রে নালুয়া গাঙের উত্তরে উহা Pagoda বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, Rennelএর জরিপ কালে উহা বর্ত্তমান সময়ের মত একবারে ভূমিসাৎ না হইয়া তখনও অরণ্যমধ্যে মন্দিরাকারে



মঠবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, বাংশহাটা

ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই জন্য Pagoda বলিয়া উক্ত মানচিত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই প্রদেশে উক্ত স্তূপ দুইটিও মঠবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। কি কারণে উহা ঐ নামে অভিহিত, তাহা জানা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, উহা কোন উত্তুঙ্গ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। উহার অনতিদূরে একটি পুষ্করিণীমধ্যে একটি কূয়ার চিহ্ন আজিও বিদ্যমান আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মণিরটাটের গড় ও নলগোঁড়ার মঠবাড়ী

এই মঠবাড়ী হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ...ন করিলে ২৮ নং লাট মণিরটাটে ক্রোশব্যাপী একটি গড় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইদানীং এই গড়ের কতকাংশ ২৮ নং লাটের মধ্যে ও কতকাংশ খাড়ী আবাদের পূর্ব্বদিক্‌স্থ ২৭নং লাট রাধাকান্তপুরের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। আজিও উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় ১ শত ৫০ ফুট ও উচ্চতায় ৩০।৩৫ ফুট হইবে। পূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলাবৃত হইয়া অরণ্যমধ্যে বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে যে, অরণ্য হাসিলের পর উহার দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে পুরাতন বট, অশ্বত্থ ও হরীতকী প্রভৃতি বৃক্ষের সারি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এখনও উহাদের ২।১টি স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান আছে। ইদানীং উহার দুই ধারে বহু লোকের বসতি হইয়াছে ও উহাকে ধসভাঙ্গা নামক স্থানে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মণি নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিলেও বেশ বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে সেখানে মণি নদীর অস্তিত্ব ছিল না এবং পরবর্ত্তী কালে কোনরূপ নৈসর্গিক বিপ্লবে উহার সৃষ্টি হইয়াছিল। অধুনা উক্ত গড় স্থানীয় লোকের নিকট 'জয়নারাণ হাতীর গড়' নামে প্রসিদ্ধ। উহার কয়েক মাইল দক্ষিণে কঙ্কণ দীঘির প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ ও জটার দেউল অবস্থিত। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত যশোহর-খুলনার ইতিহাসে উহা প্রতাপাদিত্যের সময় নির্ম্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং কল্পনাবলে উক্ত ২৮ নম্বর লাটের নাম মণির ভট বা মণির টাট হইতে মণি দুর্গ নাম দিয়াছেন। এই গড়ের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে ইহা কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। ইহার দক্ষিণদিকে ২৯ নম্বর লাটের অন্তর্গত নলগোঁড়া গ্রাম। এখানেও মঠবাড়ী নামে পূর্ব্বোক্ত বাইশহাট্টার মঠবাড়ীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ আছে। প্রবাদ, উহার মধ্য হইতে কেহ কেহ অর্থ পাইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে উহার উপরিভাগ খননকালে কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও একটি অষ্টধাতু-নির্ম্মিত জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। এখন উহার উপরে বাগান হইয়াছে।

জটার দেউল

নলগোঁড়া গ্রামের প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ১১৬ নম্বর লাট অবস্থিত। এ পর্য্যন্ত সমগ্র সুন্দরবনে যে সকল প্রাচীন জনপদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই লাটে আবিষ্কৃত জটার দেউল নামক উত্তুঙ্গ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ইদানীং ইহা ১৬৬নং লাটের উত্তরাংশে একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর দণ্ডায়মান আছে। সে কারণ বহুদূর হইতে ইহা লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রবাদ, ঐ লাটে অরণ্যময় একটি ব্যাঘ্রের মস্তকে জটা ছিল বলিয়া উক্ত স্থান জটানামে প্রসিদ্ধ হয় এবং সেই জন্য তথায় আবিষ্কৃত উক্ত দেউলও জটার দেউল নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে Smith নামক এক জন য়ুরোপীয় উক্ত লাটের উত্তরাংশ হাসিল করিয়া তথায় আবাদ পত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; শুনা যায় যে, তিনিই নাকি গুপ্তধনের আশায় উহার চূড়াটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, সে কারণ উহা ঠিক কত উচ্চ ছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইদানীং উহার উচ্চতা প্রায় ১ শত ফুট হইবে। কয়েক বৎসর হইল, Ancient Monuments Actএর বিধানানুসারে উহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে উহার যে চূড়াটি দেখা যায়, উহা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি আট কোণা ও পূর্ব্বদ্বারী। প্রবেশপথটি প্রায় ৯॥ ফুট বিস্তৃত। উহার অভ্যন্তরভাগ প্রায় ৬।৭ ফুট নিম্নে অবস্থিত। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তন্মধ্যে যাইতে হয়। সমগ্র দেউলটিই এক প্রকার কাল সিমেণ্ট দ্বারা পাতলা ইটে গাঁথা ও সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত ছিল। এক্ষণে নানা স্থানে ইট খসিয়া গিয়া ঐ সকল কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহা এতদ্দেশের সাধারণ মন্দিরাদির ন্যায় সনাতন পর্ণশালার অনুকরণে

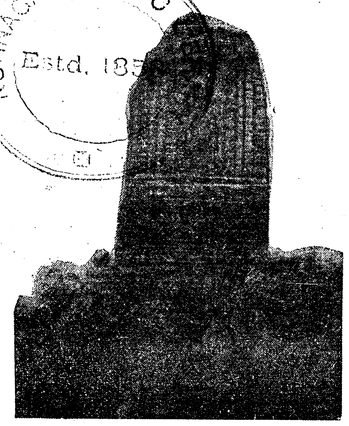

জটার দেউল
(১১৬ নং লাটের অরণ্যমধ্যে ভগ্নাবস্থায়)

গঠিত নহে। ইহার গঠনপ্রণালীও সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। অরণ্য হাসিলকালে উহার মধ্য হইতে দুইখানি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। একটির উপরে লতাপাতার ন্যায় কারুকার্য্য ও কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। এখনও উহাতে দুইটিই স্ত্রীলোকের মূর্ত্তির কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এত দিন উহা তথাকার জমীদারের কাছারীবাটীর মধ্যে একটি বৃক্ষতলে রক্ষিত ছিল। স্থানীয় লোক সেখানে গিয়া ভক্তিভরে উহার পূজা করিত। গত বৎসর ২৪ পরগণা Settlement officer Mr Burge উহার একখানি প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। উক্ত দেউলের উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্বে একটি বড় কূয়ার চিহ্ন ও উত্তরাংশে বহুসংখ্যক পুরাতন ইষ্টকরাশি স্তূপাকারে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে সেখানে মাটীর নিম্নে একটি ঘর ছিল। উহা এক্ষণে এতদ্দেশে হিন্দু মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু হাণ্টার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহা বৌদ্ধ মঠ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহার সন্নিকটস্থ ভূমি-খননকালে তথাকার তৎকালীন ভূম্যধিকারী বাবু দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় সংস্কৃত অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হন। উহা হইতে জানা গিয়াছে যে, জয়ন্তচন্দ্র নামে জনৈক রাজা কর্ত্তৃক ৮৯৭ শকাব্দে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত তাম্রশাসনখানির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক্ষণে কিছুই জানা যায় না। List of Anicent Monuments in the Presidency Division নামক পুস্তকে উহার উল্লেখ দেখা যায়।

বাঙ্গালার ইতিহাসে এই রাজা জয়ন্তচন্দ্রের নাম নূতন। ইতঃপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বা ক্ষোদিত লিপিতে ইঁহার নাম পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই জয়ন্তচন্দ্র কে, তাহা এক্ষণে জানিবার কোনরূপ উপায় নাই। প্রাচীন বিবরণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সময় সমগ্র

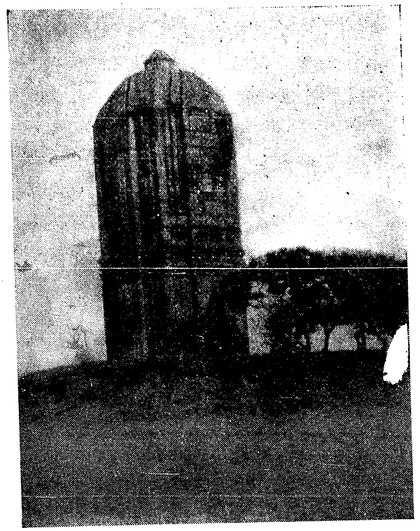

জটার দেউল

(গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত ও সংস্কৃত হইবার পর)

পশ্চিম-বঙ্গ পাল সম্রাটগণের অধীন ছিল এবং তাঁহাদের অধীনস্থ বহু ভূঁইয়ার দ্বারা শাসিত হইত। আমাদের বোধ হয়, তিনি পাল সম্রাটগণের অধীনস্থ ঐরূপ এক জন ভূঁইয়া ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তৎকালে তাঁহার দ্বারাই এতদ্দেশের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত।

দেলবাড়ী, মাধবপুর ও মৈপিঠ

এই লাটের উত্তরপূর্ব্বদিকে ১২২ নম্বর লাটের দক্ষিণে দেলবাড়ী নামক স্থানেও দুইটিই বড় বড় ভগ্ন মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থান সম্প্রতি হাসিল হইয়াছে, এখনও এখানে ভালরূপ বসতি হয় নাই। মন্দির দুইটি উচ্চে প্রায় ৫০।৫৫ ফুট হইবে। ইহাদের সন্নিকটে একটি মজা পুষ্করিণীতে পাকা ঘাটের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। ইহার ৩।৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে মাধবপুর গ্রাম। সেখানেও ঠাকুরাণী নদীর উপর একটি বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। উহার মধ্য হইতে একটি প্রস্তরের জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ১৬৬ নং লাটের দক্ষিণে দমকল নামক স্থানের পূর্ব্বদিকে ১১৭ নম্বর লাট মৈপিঠেও ঠাকুরাণী নদীর উপর ঐরূপ একটি বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে বিদ্যমান আছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস দত্ত।

সন্ধান

বনের পরে বন চলেছে—ক্ষেতের পরে ক্ষেতঃ
বাঁকে বাঁকে হারিয়ে গেছে রূপটি নদীর শ্বেত।
মাঠে মাঠে চরছে গরু—বাছুরগুলি নাচে ;
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী ঝাপ্‌সা গাঁয়ের কাছে !

ওই যে ধূ ধূ উদাস করা অনন্ত আকাশ,—
ধরার বুকে ধরা দিয়ে করছে মিলন-রাস।
সেথায় গিয়ে যায় মিলিয়ে জলের কলতান
আভাস শুধু পাঠায় মোরে বুনো পাখীর গান।
আকাশ-গাঙ্গের ওই সীমানায় ঝিলিমিলির পথে,
চন্দ্র রবি সাঁঝ-সকালে আগুন রাঙ্গা রথে,—

কোন্ সে প্রিয়ার উদ্দেশে ধায় কোন্ অজানার দেশে,
নিত্য পাগল প্রেমোন্মাদী পাগ্‌লা ভোলার বেশে ?

* * * *

বল্‌তে পার পথিক তুমি তার পরে কোন্ দেশ ?
কেমন তাহার রাজা প্রজা কেমন তাঁদের বেশ ?
বল্‌তে পার দ্বারী তাঁদের কখন্ খোলে দ্বার ?
খেয়াঘাটের পাট্‌নী করে কখন্ পারাপার ?
ঘর ছেড়েছি কোন্ সকালে, পথ যে মনে নাই !
একলা বিজন নদীর কূলে ভাবছি ব'সে তাই ॥
ডুবছে পূবের জীবন-রবি অস্ত-মরণ-পারে !
আমায় কে আজ পৌঁছে দেবে দিগন্তের ঐ দ্বারে ?

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

গীতায় কর্ম্মবাদ

কলিগভীর রাত্রে সংসার-বিরাগী
"গৃহ ছেড়াগির আজি ইষ্টদেব লাগি'
কে আমারে ভুলা য়া ডেকেছে এখানে।"
দেবতা কহিলা "আমি!"—শুনিল না কানে।

* * * * *

দেবতা কহিল—"ফির!" শুনিল না বাণী
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন—"হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায় ॥"

রবীন্দ্রনাথ—'বৈরাগ্য।"

আজকাল একটা ঢঙ্ উঠিয়াছে—সন্ন্যাসগ্রহণ।—যেন গেরুয়া পরিধান করিলেই চতুর্ব্বর্গসিদ্ধি হাতে হাতে লাভ করা যায়। এই বুদ্ধিতে অনেক যুবক, কেহ বা বিবাহ না করিয়াই বয়োবৃদ্ধ পিতামাতাকে শোকে নিমজ্জিত করিয়া, কেহ বা বিবাহ করিবার পর নিরীহ বালিকাবধূকে বিপন্ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি এক জন পরিচিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি প্রথমে 'বিবাহ করিব না—করিব না' করিয়া পরিশেষে ত্রিংশদ্বর্ষবয়সে একটি মাতৃহীনা বালিকার পাণিপীড়ন করিয়া এক বৎসর যাইতে না যাইতে সন্ন্যাস লইয়া বালিকাটিকে চিরজীবনের মত মজাইয়া উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বালিকাটির মাতা নাই, কিন্তু পিতৃগৃহে বিমাতাদেবী সশরীরে দীপ্যমানা। বিমাতার নিকট সপত্নী-কন্যার কিরূপ আদর, তাহা সহজেই অনুমেয়। কত বুকভরা আশা লইয়া সে বিবাহবাসরে ঐ যুবকের সহিত মিলিত হইয়াছিল,—ভাবিয়াছিল, বুঝি তাহার দুঃখের নিশা পোহাইল। কিন্তু তাহার সকল আশা দলিত—মথিত করিয়া ঐ ব্যক্তি ব্রহ্ম সন্ধানে—মোক্ষের অন্বেষণে বাহির হইয়া গেল। এই সকল কলির সিদ্ধার্থের যথেচ্ছাচারিতা—শাস্ত্রজ্ঞানহীন বিকৃতবুদ্ধিরই পরিণাম সন্দেহ নাই। এই সকল ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলনের জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা করিলাম।

সন্ন্যাস সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিবার জন্য গীতা হইতে শ্রীভগবানের কর্ম্ম ও সন্ন্যাসবিষয়ক অভিমত এই অধ্যায়ে আলোচিত হইল।

—"Arise therefore and be doing,
and the Lord be with thee."

1 Chronicles XXII'

—"কর্ম্ম কুরু মা গ্লাসীঃ কর্ম্মণা ভব দংশিতঃ।"

—দ্রৌপদী (বন পঃ ১১ অঃ ৯ শ্লো)

কর্ম্ম—মনুষ্যজীবনের পরম সঙ্গী। কর্ম্ম ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব। তাই অর্জ্জুন যখন চাপিয়া ধরিলেন—"ঠাকুর, ঠিক করিয়া বলুন,—কর্ম্মযোগ না জ্ঞানযোগ অবলম্বনীয়? আর ধাঁধায় রাখিবেন না"—তখন শ্রীভগবান্ প্রাণপ্রিয় সখার সংশয়নিরসনের জন্য বলিতেছেন—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥"

(৩ অঃ ৮ শ্লোঃ)

তুমি নিত্য কর্ম্ম করিয়া চল, যেহেতু, কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ কল্প। কেন না, কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অসম্ভব।

তিনি আরও কহিলেন—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥"

কি জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসী, কি অজ্ঞানী সংসারী কেহই কোন অবস্থাতেই ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু, সকলেই স্বভাবনিয়মে আবদ্ধ থাকিয়া প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহার ফলস্বরূপ রাগদ্বেষাদি-পরতন্ত্র হইয়া কোন না কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

'জ্ঞান'যোগ ও 'কর্ম্ম'যোগ—এই দুইটি মার্গের কথা শুনা যায়। আচার্য্য শঙ্কর নিজে জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া উপনিষদের ভাষ্যে এক স্থানে তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ঐ দুইটি পরস্পর বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। এ বিষয়ে শঙ্করের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম—"জ্ঞানকর্ম্মণোরন্তরং পর্ব্বতবদকল্প্যং কিং ন পশ্যতি ভবান্?" আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞান ও কর্ম্ম এইরূপ পরস্পর বিরোধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এই দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ নহে এবং পৃথক্‌রূপে পুরুষার্থের বা মোক্ষের সাধন বলিয়া গণ্য হইতে

পারে না। পরন্তু কর্ম্মযোগ চিত্তশুদ্ধির সাধন এবং জ্ঞান-ভূমিতে আরোহণের সোপানস্বরূপ। এই হেতু এই দুইটি পরস্পরের মুখাপেক্ষী ও অধীন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি—যজ্ঞেন,—দানেন,—তপসাঽনাশকেন।"

অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসকগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে। এই শ্রুতির তাৎপর্য্য দ্বারা কর্ম্মযোগ যে জ্ঞাননিষ্ঠার উপায়—ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ও কহিয়াছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে "নৈষ্কর্ম্ম্য" অর্থাৎ সন্ন্যাস বা জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারে না। আবার কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল সন্ন্যাসমাত্র দ্বারা সিদ্ধি বা মোক্ষলাভ করা যায় না। শ্রীভগবান্ এই বাক্যে কর্ম্মকে জ্ঞানোৎপত্তির হেতু বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছেন।

তবে যে "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসই জ্ঞান-নিষ্ঠার কারণ বলা হইয়াছে, ইহার সহিত ত শ্রীভগবানের বাক্যের বিরোধ ঘটিতেছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। ভগবান্ বলিতেছেন,—"চিত্তশুদ্ধি না হইলে সন্ন্যাস অসম্ভব, আবার এই চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান প্রয়োজন। অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি ব্যতীত কেবল নামে ও বেশে মাত্র সন্ন্যাসী হইলে মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায় না।" তবেই শ্রুতিবাক্যের সহিত শ্রীভগবদ্বাক্যের সঙ্গতি করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, জ্ঞান-ভূমিতে অধিরোহণের প্রথম সোপান কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হইবার পর দ্বিতীয় সোপান হইল সন্ন্যাস।

ভাষ্যকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"কর্ম্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠাবত্ত্বেন যদ্দ্বৈবিধ্যমুক্তং, তৎ খলু পূর্ব্বোত্তরদশাভেদাদেব, ন তু বস্তুতো মোক্ষং প্রত্যধিকারিদ্বৈধম্। তেন কর্ম্মিণো জ্ঞানিন ইতি নামমাত্রেণৈব দ্বৈবিধ্যম্। বস্তুতস্তু কর্ম্মিণ এব কর্ম্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনো ভবন্তি।"

অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই যে দ্বিবিধ পথের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ মোক্ষের প্রতি পৃথক্ সাধন নহে, পরন্তু দুইটিই অভিন্ন; একটি পূর্ব্বাবস্থা, অপরটি তাহারই পরিণতাবস্থা। অতএব কর্ম্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে নামমাত্র ভেদ বিদ্যমান। বস্তুতঃ কর্ম্মিগণই কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়া থাকেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবও কহিয়াছেন,—

"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব!
যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্।
অসাধ্যঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ো জগতীতলে।
প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥"

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ যে চিত্তনাশ, তাহার নিমিত্ত যোগ ও জ্ঞানরূপ দুইটি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ কর্ম্মের নাম যোগ, আর তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অপর নাম জ্ঞান। ভগবান্ শিব এই দ্বিবিধ প্রকার কহিয়াছেন। চিত্ত বিনষ্ট হইলে জগতীতলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার কাহার অসাধ্য? তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠা এই উভয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ। মধুসূদন সরস্বতীও জ্ঞান ও কর্ম্মের উল্লেখ-প্রসঙ্গে কহিতেছেন,—

"এতৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন দ্বিপ্রকারা ন তু দ্বে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে।" মার্গদ্বয় একই; কর্ম্ম হইল—সাধন, জ্ঞান—সাধ্য। এই দুইটি অবস্থাভেদে দুই প্রকার পরিলক্ষিত হয় বটে, পরন্তু এই দুইটি স্বতন্ত্র নহে, যেহেতু, কর্ম্মনিষ্ঠাই জ্ঞান-ভূমিতে আরোহণের উপায় বা সোপান।

শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—

"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"

(৫ অঃ, ৫ শ্লোঃ গীতা)

প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট 'সাংখ্য' অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা এবং 'যোগ' বা কর্ম্মনিষ্ঠা উভয়ই এক। মূঢ়গণই এই দুইটিকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে,—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।"

(৫ অঃ, ৪ শ্লোক)

আত্মজ্ঞানের উপদেশকারিণী শ্রুতিও জ্ঞানের সহযোগিরূপে অতি বিশদভাবেই কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন,—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।"

ঈশঃ ২ মন্ত্র।

মানুষের বেদসম্মত পূর্ণ পরমায়ু শতবর্ষ। এই পূর্ণ আয়ুষ্কাল ধরিয়া অবশ্যই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—কখনই কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে চলিবে না। এইরূপ সারাজীবন ধরিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা ছাড়া আর এমন কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা বিকর্ম্ম বা অকর্ম্মরূপ অশুভকর্ম্মের প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক, কর্ম্ম কি? বস্তুতঃ কি যে কর্ম্ম, আর কি যে অকর্ম্ম, তাহা বুঝা দায়, "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" (৪ অঃ ১৬ শ্লোঃ গীতা)। তুমি আমি ত কোন্ ছার, ভগবান্ বলিয়াছেন,—মেধাবী জ্ঞানীজনরাও গহন কর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে অক্ষম। শ্রীভগবান্ এই প্রসঙ্গে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্মপর্য্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। "ক্রিয়তে যৎ" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা দ্বারা কৃত ব্যাপারকে সাধারণতঃ কর্ম্ম বলা হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কর্ম্মপদবাচ্য নহে। শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদিই 'কর্ম্ম'; শাস্ত্রবিরোধী নিষিদ্ধাচরণই 'বিকর্ম্ম' এবং তূষ্ণীম্ভাব বা হাত-পা গুটাইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া বসিয়া থাকা অর্থাৎ কিছুমাত্র কর্ম্ম না করার নাম "অকর্ম্ম।" শাস্ত্রবিহিত 'কর্ম্ম' মোক্ষের হেতু। শাস্ত্রবিরুদ্ধ 'বিকর্ম্ম' পাপ ও দুর্গতির সাধক। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপ 'অকর্ম্ম' অবলম্বনে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করাও সুকঠিন। অতএব 'বিকর্ম্ম' ও 'অকর্ম্ম'কে বাদ দিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের সতত অনুষ্ঠান করিবেন। নিজের কেবল সুখসাধক ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ারামদায়ক কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বোক্ত বিকর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইলে কর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব জাত্যুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং শ্রীভগবৎ-প্রীতিসাধক পূজা-আরাধনাদি বা নিখিল প্রাণিহিতকর ত্যাগাত্মক যজ্ঞীয় কর্ম্ম বা সমাজ ও লোকহিতকর কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। যেহেতু, এবংবিধ কর্ম্ম ভিন্ন অপর কর্ম্মমাত্রই লোকের বন্ধনকারণ। ইহাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"

(৩ অঃ, ৯ শ্লোক)

স্মৃতিতে "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" এই বাক্য দ্বারা কর্ম্মসাধারণই জীবের বন্ধনের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও শ্রীভগবৎ-প্রীতিকামনায় সাধারণের ও সমাজের হিতার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় কামনামূলক কর্ম্ম লোকের বন্ধনের কারণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

আবার এই কর্ম্ম কিরূপে জগৎরক্ষার মূল, তাহা স্পষ্ট করিয়া শ্রীভগবান্ কহিতেছেন,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

(৩ অঃ, ১৪।১৫ শ্লোক)

এই জীবসঙ্ঘসহ ঘূর্ণ্যমাণ জগচ্চক্রের মূলকেন্দ্ররূপে কর্ম্ম কিরূপ কার্য্য করিতেছে, এ স্থানে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। এই যে অন্নাদি—যাহা দ্বারা নিখিল বিরাজ পালিত হইয়া থাকে, তাহা বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি আবার যজ্ঞের ফলস্বরূপ, কেন না, আগ্নিতে উদ্দেশ্যে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহার ফলে আদিত্য হয়। বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং তাহা হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। সুতরাং যজ্ঞ যে বৃষ্টির কারণ, তাহা পাওয়া গেল। আবার যজ্ঞ কর্ম্মেরই একটা প্রকার। ঋত্বিক্ ও যজমানের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই যজ্ঞ। অতএব পরম্পরাসূত্রে কর্ম্ম প্রাণিজগতের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইল। আবার কর্ম্ম বেদ দ্বারা প্রতিপাদিত; যেহেতু, ঋত্বিক্ ও যজমানাদি-সাধ্য কর্ম্মকাণ্ড বেদ দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত। এই বেদ আবার যে সে জিনিস নহে—সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত। অতএব ইহা ভ্রমপ্রমাদাদিবর্জ্জিত। সেই অপৌরুষেয় বেদ যে কর্ম্মের প্রাধান্য উদ্ঘোষিত করিয়াছেন, সেই কর্ম্মকে জগচ্চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ জানিয়াও যে ব্যক্তি ইহার অনুবর্ত্তন করে না, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, সে ব্যক্তি যাহা কিছু করে, সে সমস্তই নিজের ইন্দ্রিয়ারামের জন্যই করিয়া থাকে। নিজে কিসে সুখে থাকিবে, নিজের স্ত্রী-পুত্র কিসে ভাল খাইবে, ভাল পরিবে—এই দিকেই তাহার দৃষ্টি। পূজা-পার্ব্বণ, বৃক্ষ-জলাশয়-কূপ-দেবালয়-প্রতিষ্ঠাদি শাস্ত্রবিহিত সদনুষ্ঠান উঠাইয়া দিয়া, কোথায় শিমুলতলা, গিরিডি, দার্জ্জিলিং ইত্যাদি শৈলাবাসে

স্বাস্থ্যের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে। ইহাদের সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর প্রাচীন শ্লোক আছে,—

"কালঃ শরীরগোপ্তারং ভূভর্ত্তারং বসুন্ধরা।
অসতীব হসত্যেনং স্বামিনং সুতবৎসলম্ ॥"

অসতী রমণী যেমন তাহার স্বামীকে জারজ পুত্রের আদরে বিহ্বল দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকে, সেইরূপ বসুন্ধরা দেবী, যে যখন রাজা হয়, তাহার প্রভাবপ্রতিপত্তি দেখিয়া ঐ ভাবেই উপহাসের হাসি হাসিয়া থাকেন এবং যে সকল ব্যক্তি শিশ্নোদর-পরায়ণ, তাহাদের প্রতি কালও বিদ্রূপ-সহকারে হাস্য করিয়া থাকেন। ঐ হাস্যের ভাব এই যে, আরে মূঢ়! ইহলোক ও পরলোকের সুখসাধক ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 'স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য' 'শরীর শরীর' করিয়া কি-ই বা লাভ করিতেছ, এমন মূর্খ কি আর হয়?

শ্রীভগবান্‌ও এই সকল শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে বিরত চিত্তশুদ্ধি বা [illegible] ইন্দ্রিয়ারামপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে করা যায় [illegible]

[illegible] মো মোঘং পার্থ! স জীবতি।"
(৩ অঃ, ১৬ শ্লোক)

[illegible]র্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া যে সকল ব্যক্তি [illegible]ন্দ্রিয় উপভোগেই আরামবোধ করে, সেইরূপ বিকর্ম্মস্থ ব্যক্তির জীবন পাপময়, সুতরাং তাহাদের জীবন বৃথা। কিন্তু [illegible]ড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সমাজে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, আজ কর্ম্মভূমি ভারতে দারুণ বিকর্ম্মের স্রোত খরবেগে প্রবাহিত।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের এই প্রাধান্যের কথা কেবল গীতায় মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; যেখানেই সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই কর্ম্মের প্রশংসা শতমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের দৌত্যে পাণ্ডব-শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদানে পঞ্চমুখ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে কর্ম্মযোগের স্বপক্ষে তাঁহার স্বাভাবিকী ওজস্বিনী ভাষায় যে অমূল্য বাণী কহিয়াছিলেন, তাহা গীতার কর্ম্মবাদের সমর্থনে এ স্থলে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ বিষয়ে ধর্ম্মের বিধি যথাবৎ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাতে পণ্ডিতগণের নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়।" (উদ্যোগপর্ব্ব ২৯ অঃ ৫-১৬ শ্লোঃ)

"কর্ম্মণাহুঃ সিদ্ধিমেকে পরত্র হিত্বা কর্ম্ম বিদ্যয়া সিদ্ধিমেকে।" কেহ কেহ বলেন, কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি বা মোক্ষলাভ হয়, আবার অপর দিকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত এই যে, "ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া, ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন, ধনার্জ্জন ইত্যাদি কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ ঘটে না, পরন্তু ত্যাগ বা সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক বিদ্যা বা জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারাই মাত্র মোক্ষ সম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক দিকে গার্হস্থ্যাশ্রমে কুটুম্বগণ পরিবৃত হইয়া কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভের কথা যেমন শাস্ত্র কহিতেছেন, অপর দিকে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বনের কথাও তুল্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় কোন্ পথ ধরা যায়? এই সংশয়ের উত্তরে শ্রীভগবান্ কহিতেছেন, "কর্ম্ম ব্যতীত এক দণ্ডও থাকিবার উপায় নাই, কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষেও পান-ভোজনাদি কর্ম্ম না করিলে দেহধারণ অসম্ভব।"

"নাভুঞ্জানো ভক্ষ্যভোজ্যস্য তৃপ্যেদ্
বিদ্বানপীহ বিদিতং ব্রাহ্মণানাম্।"

অর্থাৎ বিদ্বান্ বা কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানমার্গীরও শরীররক্ষার্থ ভক্ষ্যভোজ্যাদিভোগরূপ কর্ম্ম অর্থাৎ পান-ভোজন অবশ্য প্রয়োজন। এই সকল ভোজনাদি ব্যাপার ছাড়িলে কখনই তৃপ্তি হইতে পারে না, ইহা সকলেরই বিদিত।

গীতায়ও অনুরূপ উক্তি দেখুন,—

"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।"
(১৮ অঃ, ১১ শ্লোক)

রক্ত-মাংসগঠিত স্থূলশরীরধারী জীবমাত্রের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা চলে না। কেন না, ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণার্থ খাদ্যাদি আহরণরূপ কর্ম্ম না করিলে শরীররক্ষা হইবে কিরূপে?

সঞ্জয়কে উপলক্ষ করিয়া সন্ন্যাসবাদিগণের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ আরও কহিতেছেন,—

"যা বৈ বিদ্যাঃ সাধয়ন্তীহ কর্ম্ম
তাসাং ফলং বিদ্যতে নেতরেষাম্।"
(উদ্যোগপর্ব্ব ২৯ অঃ, ৭ শ্লোক)

অর্থাৎ যে সকল বিদ্যা বা জ্ঞান ইহলোকের সাধিকা, তাহাদিগেরই ফল আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যার ফল নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি প্রাণমভিসংবিশন্তি
প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তে।"

অর্থাৎ নিখিল প্রাণিবর্গের প্রাণের সহিত সংযোগ, আবার প্রাণ হইতে বিয়োগ—এই প্রাণঘটিত কার্য্যপরম্পরার পরম সাধক হইল জ্ঞান। শ্রীভগবান্ কহিতেছেন,—"এইরূপ কর্ম্মসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের প্রাণধারণের (practical life) উপযোগী বা সহায়ক, সেই জ্ঞানেরই ফল আছে, আর কর্ম্মের সহিত যে জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই—যাহা কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, এমন শুদ্ধ জ্ঞানের কোনই ফল নাই। কর্ম্মান্বিত জ্ঞানের যতটা সার্থকতা, শুদ্ধ জ্ঞানের ততটা নহে। টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরী ইহার ভাবার্থ একটু বিশদ করিয়া দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—"কর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের উপাসক গৃহস্থ কর্ম্মলব্ধ পুণ্য দ্বারা নিজেকে এবং পিত্রাদি অপর সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ এবং ভিক্ষাবৃত্তি সন্ন্যাসিগণকেও প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মহীন শুদ্ধ জ্ঞানের অবলম্বনকারী যতি—কেবল নিজের মোক্ষসাধনে মাত্র সমর্থ; পিত্রাদির উদ্ধার ও অপরের পোষণ ত দূরের কথা, নিজের উদরান্নের জন্যও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা গৃহস্থের মুখাপেক্ষী। এই জন্যই শুদ্ধ জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মান্বিত জ্ঞানই শ্রেয়ান্। আবার কর্ম্মের ফল যে প্রত্যক্ষ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

"তত্রেহ বৈ দৃষ্টফলন্তু কর্ম্ম পীত্বোদকং শাম্যতি তৃষ্ণয়ার্ত্তঃ।"
(৭ শ্লোঃ পূর্ব্বার্দ্ধ)

দেখ, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলপান করিলেই তাহার পিপাসা তৎক্ষণেই উপশমিত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, কর্ম্মের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথাই কহিয়াছেন,—

"ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।"
(৪।১২ শ্লোঃ।

কর্ম্মজনিত ফলসিদ্ধি অতি শীঘ্রই সংঘটিত হইয়া থাকে। এক্ষণে সঞ্জয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতেই কর্ম্মের প্রাধান্য জানিতে পারা যাইবে—

"সোঽয়ং বিধির্বিহিতঃ কর্ম্মণৈব—তদ্বর্ত্ততে সঞ্জয়! তত্র কর্ম্ম যোঽন্যৎ কর্ম্মণঃ সাধু মন্যেৎ মোঘং তস্যাপলপিতং দুর্ব্বলস্য।"
(ঐ ৮ শ্লোঃ)

ফলতঃ শাস্ত্রে কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়াই জ্ঞানের বিধি বিহিত হইয়াছে; অতএব সকল কর্ম্মচ্ছেদরূপ সিদ্ধি বা মোক্ষের প্রতি কর্ম্ম-সমবেত জ্ঞানই হেতু। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্মের প্রতি অনাদর করিয়া সন্ন্যাস বা শুদ্ধজ্ঞানমাত্রেরই প্রশংসা করেন, তাঁহার কেবল বৃথা অপলাপ বা বাগাড়ম্বরমাত্র প্রকাশ পায় এবং তিনি জ্ঞানের স্বপক্ষে স্বমতপোষণার্থ যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করুন, তাহা অতি দুর্ব্বল ও অসাররূপে প্রতিপন্ন হয়। দেখ—

"কর্ম্মণামী ভান্তি দেবাঃ পরত্র কর্ম্মণৈবেহ প্লবতে [illegible]রিশ্বা।
অহোরাত্রে বিদধৎ কর্ম্মণৈব অতন্দ্রিতঃ শশ্বদুদে[illegible] সূর্য্যঃ ॥
(৯—১৬ শ্লোঃ)

কর্ম্ম দ্বারাই পরলোকে—এই সকল [illegible] প্রদীপ্তভাবে বিরাজ করিতেছেন,—কর্ম্ম দ্বারাই ইহ[illegible]ক পবনদেব অহোরাত্র প্রবাহিত হইতেছেন ভুবনোদ্ভ[illegible] সূর্য্য কর্ম্ম দ্বারাই দিবসযামিনী বিভাগ করত নিরলসভা[illegible] নিত্য প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

"মাসার্দ্ধমাসানথ ন[illegible]-যোগানতন্দ্রিতশ্চন্দ্রমাশ্চাভ্যুপৈতি।
অতন্দ্রিতো দহ[illegible] জাতবেদাঃ সমিধ্যমানঃ
কর্ম্ম কুর্ব্বন্ প্রজাভ্যঃ (ঐ ১০)

[illegible]ও নিরলস হইয়া মাস, পক্ষ ও নক্ষত্রগণের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হন; অগ্নিও নিখিল প্রাণিবর্গের হিতার্থ নিয়ত প্রজ্বলিত হইয়া দহনকার্য্যে ব্যাপৃত।

"অতন্দ্রিতা ভারমিমং মহান্তং বিভর্ত্তি দেবী পৃথিবী বলেন।
অতন্দ্রিতাঃ শীঘ্রমপো বহন্তি সন্তর্পয়ন্ত্যঃ সর্ব্বভূতানি নদ্যঃ॥(ঐ১১)

ধরিত্রী দেবীও অতন্দ্রিত হইয়া গুরুভার বহন করিতেছেন এবং নদীগণ সতত নিরলসভাবে সর্ব্বপ্রাণীর তৃপ্তিবিধান পূর্ব্বক ক্ষিপ্রগতিতে জলসমূহ বহন করিতেছেন। প্রকৃতির যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে।

"অতন্দ্রিতো বর্ষতি ভূরিতেজাঃ সন্নাদয়ন্নন্তরীক্ষং দিশশ্চ।
অতন্দ্রিতো ব্রহ্মচর্য্যং চচার শ্রেষ্ঠত্বমিচ্ছন্ বলভিদ্দেবতানাম্(ঐ১

আবার পর্জ্জন্য মেঘগর্জ্জন দ্বারা দিক্‌সমূহ ও অন্তরী প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এব[illegible]

দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার ইচ্ছায় নিরলসভাবে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছিলেন।

"হিত্বা সুখং মনসশ্চ প্রিয়াণি দেহঃ শক্রঃ কর্ম্মণা শ্রৈষ্ঠ্যমাপ।
সত্যং ধর্ম্মং পালয়ন্নপ্রমত্তো দমং তিতিক্ষাং সমতাং প্রিয়ঞ্চ ॥(ঐ ১৩)
এতানি সর্ব্বাণ্যুপসেবমানঃ স দেবরাজ্যং মঘবান্ প্রাপ মুখ্যম্।

সমুদয় মানসিক ও শারীরিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া অপ্রমত্তভাবে নিয়ত সত্য, ধর্ম্ম, দম ও তিতিক্ষাদি পালন পূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারাই দেবসমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বৃহস্পতির্ব্রহ্মচর্য্যং চচার সমাহিতঃ সংশিতাত্মা যথাবৎ।
হিত্বা সুখং প্রতিরুধ্যেন্দ্রিয়াণি তেন দেবানামগমৎ গৌরবং সঃ ॥
বৃহস্পতিও ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই দেবগণের গুরু হইয়াছিলেন।

"তথা নক্ষত্রা কর্ম্মণামুত্র ভান্তি রুদ্রাদিত্যা বসবোঽথাপি বিশ্বে।
যমো রাজা বৈশ্রবণঃ বরো গন্ধর্ব্বযক্ষাপ্সরসশ্চ সূত!
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মচর্য্যং ক্রিয়া নিষেবমাণা ঋষয়োঽমুত্র
ভান্তি ॥ (১৫-১৬)

আর এই যে নক্ষত্র, রুদ্র, আদিত্য বসুগণ এবং বিশ্বেদেবগণ, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা কলেই কর্ম্ম দ্বারা প্রোজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ঋষিগণও ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্যরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছেন।

এ হেন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির আশায় যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহারা মূঢ়মাত্র। পরন্তু কর্ম্মসহকৃতজ্ঞানই আশ্রয়ণীয়। গীতোক্ত কর্ম্মবাদের ইহাই যথার্থ স্বরূপ।

এক্ষণে এই কর্ম্মমার্গে প্রণোদিত করিবার জন্য ভগবান্ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক কহিতেছেন—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥"

দেখ, জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মমার্গের অনুসরণ দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব তুমিও সাধারণ লোকের নিকট আদর্শ-রক্ষার্থ তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কর্ম্ম ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। কেন না—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

সমাজের যাঁহারা মাথা, এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কার্য্য করেন, অপর সাধারণ ব্যক্তিসমূহ তাহারই অনুসরণ করেন; তিনি যেমন আদর্শ প্রদর্শন করেন, সাধারণ ব্যক্তিগণও তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অতঃপর নিজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—"দেখ, এই ত্রিজগতে আমার পক্ষে অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য বস্তু কিছুই নাই, তথাপি আমি গদীয়ান হইয়া না বসিয়া থাকিয়া, সৃজন, পালন ও সংহারকর্ম্মে নিজেকে সতত নিয়োজিত করিয়া কর্ম্মের প্রাধান্যই প্রখ্যাপিত করিতেছি।" তিনি আরও কহিলেন—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥"

আমি যদি নিরলস হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে সমস্ত মনুষ্যও আমার পথ অনুসরণ করিত। তাহার ফলে—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্"—এই নিখিল লোক নিষ্কর্ম্মা ও অলস হইয়া উৎসন্ন যাইত। সকলেই সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইত, তাহাতে প্রজাসৃষ্টি বিলুপ্ত হইত।

শ্রীভগবানের এই বাক্যেরই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বনবাসী মুনিবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে প্রণোদিত করিবার জন্য কহিতেছেন—

"উৎসীদেরন্ প্রজাঃ সর্ব্বা ন কুর্য্যুঃ কর্ম্ম চেদ্‌ভুবি। *
আ হ্যেতা ন বর্দ্ধেরন্ কর্ম্ম চেদফলং ভবেৎ ॥ ১০ ॥
যো হি দিষ্টমুপাসীত নির্ব্বিচেষ্টঃ সুখং স্বপন্।
অবসীদে স দুর্ব্বুদ্ধিরামো ঘট ইবাম্ভসি ॥ ১৩।
যশ্চ দিষ্ট-পথে লোকে যশ্চাপি হঠবাদিকঃ।
উভৌ অপসদৌ অন্তৌ কর্ম্মবুদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥ ১৪।
তথৈব হঠবুদ্ধির্যঃ শক্ত কর্ম্মণ্যকর্ম্মকৃৎ।
আসীত ন চিরং জীবেদনল ইব দুর্ব্বলঃ ॥ ১৫ ॥"

(বনপর্ব্ব ৩১ অঃ ১০ ও ১৩—১৫ শ্লো)

* শ্রীভগবানের "উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ" এই বাক্যের সহিত "দ্রৌপদীর"—উৎসীদেরন্ প্রজাঃ সর্ব্বা ন কুর্য্যুঃ কর্ম্ম চেদ্‌ভুবি" এই বাক্যের সাদৃশ্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি অবশ্যই পর্য্যালোচনা করিবেন।

পৃথিবীতে যদি কেহই কর্ম্ম না করিত,—তবে সকল প্রজাই উৎসন্ন যাইত এবং কর্ম্ম করিয়া যদি ফল না পাইত, এই সকল প্রজার বৃদ্ধিই হইত না। ১০। যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সুখে শয়ন করত ভাগ্যের উপাসনায় নিবিষ্ট থাকে, সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি সলিলস্থ আমঘটের মত অবসন্ন হয়। ১৩। সংসারে যে ব্যক্তি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে (Fatalist) ও যে ব্যক্তি হঠবাদী (Accidentalist)—ইহারা উভয়েই অধম, পরন্তু যে ব্যক্তি ইষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত, সেই ব্যক্তিই প্রশংসার পাত্র। ১৪। এইরূপ যে ব্যক্তি হঠনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্ম সমর্থ হইয়াও হঠাৎ তাহার ভাগ্যোদয় হইবে—হঠাৎ কড়িকাঠ ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া টাকা পড়িয়া—অথবা পথে হাঁটিতে হাঁটিতে মোহরের থলিয়া পাইয়া সে বড়মানুষ হইয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে, সেই ব্যক্তি সামর্থ্যহীন অনাথ ব্যক্তির ন্যায় অধিক দিন টিকিতে পারে না। ১৫।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"—শ্রীভগবানের এই উক্তির অনুরূপ দ্রৌপদী কহিলেন—

"কর্ম্ম খল্বিহ কর্ত্তব্যং জানতাহমিত্রকর্ষণ!
অকর্ম্মণো হি জীবন্তি স্থাবরা নেতরে জনাঃ ॥"

হে অমিত্রকর্ষণ! (শত্রুনিসূদন!)—জীবের ইহলোকে কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, কেন না, স্থাবর ভিন্ন কোন জীব কর্ম্মরহিত হইয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। দেখ, হস্তমুখসঞ্চালনাদি-নিষ্পন্ন আহার এবং মলমূত্রত্যাগাদি শরীরচেষ্টা দ্বারাই জীবনধারণ হইয়া থাকে; নতুবা প্রাণধারণ অসম্ভব। এহেন দৃষ্টফল কর্ম্ম কখনই ত্যাগ করিলে চলে না। দ্রৌপদী আরও কহিলেন—

"অকর্ম্মণাং বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্ন হি কাচন।
তদেবাভিপ্রপদ্যেত ন বিহন্যাৎ যদাচন ॥
স কর্ম্ম কুরু মা গ্লাসীঃ কর্ম্মণা ভব দংশিতঃ। (দংশিতঃ সন্নদ্ধঃ)
কৃতং হি যোঽভিজানাতি সহস্রে সোঽস্তি নাস্তি চ ॥
(৮৯ শ্লোঃ)

জীবগণ কর্ম্মহীন হইলে তাহাদিগের কোন জীবিকাই সম্ভবে না; অতএব কর্ম্মেই সতত প্রবৃত্ত হইবে, কখনই কর্ম্মত্যাগ করিবে না। ৮। সুতরাং আপনি কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, কর্ম্মত্যাগ করিয়া গ্লানিভাজন হইবেন না। কর্ম্মরূপ বর্ম্মে সতত সন্নদ্ধ হউন।—প্রকৃত কর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্রের মধ্যে এক জনও আছেন কি নাই। ৯।

কর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত শুনিলেন এবং তাহারই অনুবাদরূপ তাঁহার সখী ও শিষ্যা কৃষ্ণা দেবীরও অভিপ্রায় শুনিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের বাণী হৃদয়ে ধারণ করত "সতত কর্ম্মরূপ বর্ম্মে সন্নদ্ধ" হইয়া নিজেরা অশেষ কল্যাণের ভাজন হউন এবং দেশকে কল্যাণের পথে উন্নীত করুন। জড় হইয়া বসিয়া থাকিবার জন্য অথবা কর্ম্মের ভয়ে—সংসারে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের ঝঞ্ঝাটের ভয়ে সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকিবার জন্য মনুষ্যজীবনলাভ ঘটে নাই। আর যাঁহারা বিভবশালী, যাঁহাদের কোন কিছুরই অভাব নাই, তাঁহারা যে গদীয়ান হইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া মাংবপি ওর মত আরামে 'আই-ঢাই' করিয়া দিন কাটাইবেন, ইহা ভগবানের অভিপ্রায় নহে। ঐশ্বর্য্যের বড়াই করা কি? যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময়, যাঁহার ত্রিভুবনে অপ্রাপ্য কিছুই নাই, সেই পরমপুরুষও স্বয়ং অতন্দ্রিতভাবে কর্ম্মে সদাই ব্যাপৃত। "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। অনবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি" (৩।২২ শ্লোক)। সুতরাং কি ধনী, কি নির্ধন, কাহারও পক্ষে অলসতা করিয়া সময়ক্ষেপ করিবার জন্য জীবনধারণ নহে। "অলসতা জীবনে মরণ" এই কথাটি বালক, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে। আজ কর্ম্মের বলে পাশ্চাত্যবাসিগণ কত আগুয়ান। বৈরাগী সাজিয়া, কর্ম্মবিমুখ থাকিয়া, পরাধীনতার বহর আর বাড়াইলে চলিবে না। তবে কথা হইতেছে, পাশ্চাত্যগণের সকল কর্ম্মেই ত ইন্দ্রিয়ভোগের বিরাট আয়োজন; অতএব উহা ত বিকর্ম্মপদবাচ্য। ইহা সত্য। কিন্তু এমন কখন কখন শুনা যায়, এক এক জন কোটিপতি বা নিযুতপতি তাঁহার কর্ম্মার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তি জনহিতকর কার্য্যে দান করিয়া গেলেন। তিনি জীবনে যতই ভোগসুখ করুন, তাঁহার এই উদার দানে বিকর্ম্মের সকল মলামাটী ধুইয়া মুছিয়া গেল। এই সকল জনহিতকর কর্ম্মের সাহায্যে অর্পিত দানকে শ্রীভগবান্-কথিত "যজ্ঞার্থ কর্ম্মের" আভাস বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে যাহা দাঁড়াইয়াছে, আমাদের চাকুরী-বাকুরী বা অর্জ্জনের মূল উদ্দেশ্য হইয়াছে—নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির ভোগসুখ; কিসে নিজেরা ভাল খাইব, ভাল পরিব, দেশ সমাজ উড়িয়া যাউক, পুড়িয়া যাউক,

এই ভাবনাটাই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-সুখ বাদ দিলে আমাদের কায়কর্ম্মের উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়াই দায়। পশুগণের কর্ম্ম হইতে বর্ত্তমানে আমাদের কর্ম্মের পার্থক্য কোথায়? এই জন্যই এইগুলি বিকর্ম্মপদবাচ্য। চাকুরী প্রভৃতি বৃত্তি শাস্ত্রানুসারে হেয়—গর্হিত হইতে পারে, কিন্তু পরিজন-পোষণের জন্য এক্ষণে এই সকল বৃত্তি অঙ্গীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব বৃত্তি হিসাবে আপদ্ধর্ম্মরূপে ইহাতে এখন দোষ দেখিলে আর চলিবে না। তবে চাকুরীই বলুন অথবা শাস্ত্রসম্মত অন্য যে কোনও বৃত্তিই হউক, উহাদের উদ্দেশ্য যদি কেবল নিজের ভোগ ও ভোজন হয়, তাহা অবশ্যই দূষণীয়। কিন্তু এইগুলিকে ধর্ম্মোন্মুখ করিতে পারিলে, অর্থাৎ যদি আমাদের অর্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল নিজের ভোগ না হইয়া দানাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মমূলক করিতে পারা যায়, তবেই আমাদের বিকর্ম্মগুলি খাঁটী কর্ম্মরূপে পরিণত হইতে পারে। অগ্নিতে স্বর্ণের শোধনের মত ধর্ম্মপ্রবণতাই কর্ম্মশোধনের প্রধান উপায়। শাস্ত্রে কথিত আছে, "দত্তভুক্তফলং ধনম্," দান ও ভোগই অর্জ্জনের প্রধান উদ্দেশ্য। উদার শাস্ত্র এমন কথা কখন বলেন না যে, আত্মভোগসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া অর্জ্জিত ধন কেবল দু' হাতে দান করিয়া ফতুর হও। পরন্তু বলিয়াছেন, 'ভোগও যেমন প্রয়োজন, ধর্ম্মার্থ ব্যয় ও দানও তেমনই প্রয়োজন।' ন্যায্যপরিমাণে দান ও ভোগ দ্বারা অর্জ্জিত ধনকে সার্থক করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ। অর্থ ও ভোগের সহিত ধর্ম্ম ও দানাদির মিশ্রণের উদাহরণ যুধিষ্ঠির-চরিত্রে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। পাণ্ডবগণের কাম্যক-বনে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসাচ্ছলে কহিতেছেন,—

"ন চার্থলোভাৎ প্রজহাসি ধর্ম্মং
তস্মাৎ প্রভাবাদসি ধর্ম্মরাজঃ ॥ ১৮ ॥
দানঞ্চ সত্যঞ্চ তপশ্চ রাজন্!
শ্রদ্ধা চ বুদ্ধিশ্চ ক্ষমা ধৃতিশ্চ।
অবাপ্য রাষ্ট্রাণি বসূনি ভোগান্
এষা পরা পার্থ সদা রতিস্তে ॥ ১৯ ॥"

(বনপর্ব্ব ১৮৩ অঃ ১৮-১৯ শ্লোক)

আপনি অর্থলোভে কখনই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, এই প্রভাব হেতুই আপনি ধর্ম্মরাজ হইয়াছেন। ১৮। আপনার রাজ্য, ধন ও ভোগ সত্ত্বেও দান, সত্য, তপস্যা ইত্যাদি ধর্ম্মবিষয়ে সততই আপনার পরম অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৯। অর্থাৎ ভোগ ও ধর্ম্মের ইহাই প্রকৃত সংমিশ্রণ।

ইহাই আমাদের প্রাচীন আদর্শ। যাঁহার কিছু সঙ্গতি থাকিত, তিনি সতত ইষ্টাপূর্ত্তাদি সৎকর্ম্মে ধন ব্যয় করিতে উৎসুক থাকিতেন। এই হেতু নিত্য নূতন দেবালয়-জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, পূজা-পার্ব্বণে ব্রাহ্মণ-সজ্জন-দরিদ্রভোজন প্রায়ই হইত। নিঃস্ব ব্যক্তিও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজহিতকর সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু আজকাল জোর 'পশ্চিমা হাওয়ায়' আমাদের এই আদর্শ উঠিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় দেশের সেবাশ্রম বা দুঃস্থ সাহায্যভাণ্ডার সমূহের কার্য্যাবলী সর্ব্বতোভাবে প্রণংসার্হ। এই সকল সমিতি উপায়ক্ষমগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদারূপে কিছু কিছু লইয়া দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যে দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইরূপভাবে চাঁদা টানিয়া হিঁচড়াইয়া না আদায় করিলে হয় ত উহা বাজে ভোগেই ব্যয় হইয়া যাইত—পান-সিগারেটেই উড়িয়া যাইত। ঘোর বিকর্ম্মের মধ্যে তবু কর্ম্মের মত কর্ম্ম কিছু হইতেছে। গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমিতি-প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান পশুচিত আত্মভোগের মধ্যেও দান ও সদনুষ্ঠানের প্রবণতা এইভাবে জন্মাইতে পারে এবং দুঃস্থ নিরন্নগণের সাহায্য হেতু তাহাদের হৃদয় হইতে নির্ম্মল কৃতজ্ঞ আশিসের শান্ত নিশ্বাস উত্থিত হইয়া সমাজকে পুণ্যময় করিতে পারে।

উপসংহারে শান্তিশতক-প্রণেতা ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিব,—

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥"

দেবগণ আমাদিগের আরাধ্য, বিধাতা দেবগণের আরাধ্য; যেহেতু, তাঁহারা বিধিনির্দ্দেশেই পরিচালিত। কিন্তু আবার দেবগণ ও বিধাতা উভয়েই কর্ম্মের অধীন; এই হেতু সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মকেই সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি।

শ্রীভবভূতি বিদ্যাভূষণ।



বিষাদে প্রসাদ

(উপন্যাস)

১

যতীন্দ্র সান্যাল হাইকোর্টের এক জন বড় এটর্ণী, পূজার অবকাশে তিনি এলাহাবাদে চেঞ্জে আসিয়াছেন, সঙ্গে পত্নী সুরবালা আর বেথুন কলেজ হইতে সদ্যঃ বি, এ অনারের সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে সমুত্তীর্ণা তরুণী কন্যা কমলা। তা ছাড়া চাকর, খানসামা, দাসী ও আরদালী প্রভৃতির দলও যে পুষ্ট ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সান্যাল বাবু এক বিচিত্র প্রকৃতির লোক। তিনি গোঁড়া হিন্দু না হইলেও, গোঁড়ামীর প্রতি বিদ্বেষপর নহেন। একবারে পূবাপুরি সাহেবীয়ানা তাঁহার না থাকিলেও সাহেবী চালচলনের প্রতি ঝোঁক যে বিলক্ষণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবারও যো নাই; বাহিরে হ্যাট-কোট ব্যবহারও করেন, আবার খেয়ালমত ধুতি, চাদর, পিরাণ পরিয়া সামাজিক ব্যাপারে যোগ দিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। মাথায় টিকী স্পষ্ট না থাকিলেও প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় কোশাকুশি লইয়া ঠক্ ঠক্‌ও তিনি আবশ্যকমত করিয়া থাকেন; প্রত্যহ ভগবদ্গীতার একটি বা দুইটি বা ততোধিক অধ্যায় অবসরমত নিত্য পাঠও করিয়া থাকেন। ইংরাজীতে তাঁহার যেমন প্রগাঢ় দখল ছিল, সংস্কৃতে ততটা না থাকিলেও মোটামুটিভাবে তিনি যে বেশ সংস্কৃত বুঝিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আহার-বিষয়ে তাঁহার সংযমও কিছু যে না ছিল, তাহাও বলিবার যো নাই। কারণ, তিনি কখনও গো-মাংস স্পর্শ করেন নাই; কিন্তু মুরগীর আণ্ডা বা মাংসে তাঁহার আপত্তি ছিল না। বাটীতে মুসলমান বাবুর্চ্চি কখনও নিযুক্ত না হইলেও "ক্লাবে" বন্ধুবান্ধবের বাটীতে বা পার্টিতে মুসলমান বাবুর্চ্চির হস্তে রাঁধা মুরগীর মাংসে তাঁহার আপত্তির কোন বিশেষ হেতুও ছিল না। বাটীতে পাঁউরুটী, বিস্কুট প্রভৃতির অবাধ প্রবেশ থাকিলেও, রন্ধনগৃহে কখনও ব্রাহ্মণ ঠাকুর ছাড়া, আর কাহারও রন্ধনের অধিকার ছিল না। এ হেন বিচিত্র প্রকৃতির প্রকৃত ধনী এটর্ণী যতীন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় এলাহাবাদে গঙ্গাতীরে দারাগঞ্জে এক প্রকাণ্ড সুসজ্জিত প্রাসাদে আসিয়া বাস করিবার শুভ মুহূর্ত্ত হইতে সেখানকার শিক্ষিত বাঙ্গালী-মহলে বেশ একটু ঔৎসুক্যরঞ্জিত চাঞ্চল্যের আভাসও দেখিতে পাওয়া গেল। সান্যাল মহাশয় মিষ্টালাপী হইলেও একটু গম্ভীরপ্রকৃতি, কিন্তু তাঁহার পত্নী সুরবালা দেবী এবং বিদুষী কন্যা কমলার সৌজন্য ও বিনয়মাখা সরল ব্যবহারে সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন, সুতরাং প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় টী পার্টিতে বহু নব্য-শিক্ষিত যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধগণের সমাগমে তাঁহার বাসভবন কলকলে মুখরিত হইতে আরম্ভ করিল।

২

আজ রাসপূর্ণিমা,—কমলার জন্মতিথি। তাই, সান্যাল মহাশয়ের 'সৌন্দর্য্য-নিবাসে' সন্ধ্যাসময়ে বন্ধুজনের সান্ধ্য-মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাতঃকালে প্রাচীন হিন্দুমতে পূজাপাঠ ও হোমের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান এক জন পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া করিয়া গিয়াছেন; জন কয়েক পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নকালে পৃথক্‌ভাবে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে প্রস্তুত পূরী, কচুরী, দধি ও রাবড়ী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জঠরসাৎ করিয়া নগদ এক এক রজতমুদ্রা দক্ষিণাপ্রাপ্তিতে বিলক্ষণ পরিতোষ লাভও করিয়াছেন এবং সৌভাগ্যযুক্ত দীর্ঘজীবনলাভের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদসূচক দীর্ঘ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া, কমলাকে বিস্মিত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে অণুমাত্রও ত্রুটি বোধ করেন নাই। সায়ংকালে আরক্তমণ্ডল নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের সমুজ্জ্বল শান্ত জ্যোৎস্নায় দীপমালিকা-বিরাজিত যতীন্দ্র বাবুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী সৌন্দর্য্যনিবাসটি যথার্থই সৌন্দর্য্য-নিবাসে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। আলোকমালাঝলসিত চেয়ারটেবল-সোফা-সুশোভিত, সুগন্ধি পুষ্পসম্ভারসুরভিত, বৃহৎ বৈঠকখানার মধ্যে নিমন্ত্রিত সুবেশধারী তরুণ ও তরুণীবর্গে

অব্যক্ত মধুর কল-কাকলীর সমাবেশ যেন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-ময় মিলনের শ্রুতিসুখাবহ জয়ধ্বনির সূচনা করিতেছে। বহু-মূল্য বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত বিরাটাকার টেবলের চারিধারে একই আকারের সুগঠিত চেয়াররাজি, সম্মুখের তিনখানি কৌচের মাঝখানে যতীন্দ্র বাবু, বামে শুভ্র রেশমী-পরিচ্ছদ-বিভূষিতা পত্নী সুরবালা, দক্ষিণে বেগুনে রঙ্গের পশমী পোষাকের আলোকপ্রতিফলিত মনোহর দ্যুতিকে আরও অপূর্ব্ব দ্যুতি-মণ্ডিত করিয়া গৌরাঙ্গী কমলার সহজ-সুন্দর সুকোমল লাবণ্যপ্রভা ঝলমল করিতেছে; চারি পার্শ্বের আসনে উপবিষ্ট উকীল, ব্যারিষ্টার, প্রোফেসার ও হাকিম এবং তাঁহাদের পত্নী, ভগিনী ও কন্যা প্রভৃতির বিচিত্র মণ্ডলীর ঔৎসুক্যদীপ্ত দৃষ্টি-ধারা প্রতিক্ষণ চারিদিকে নীলোৎপলমালা বর্ষণ করিতেছে; টেবলের উপর একটি ভাল হারমোনিয়মও আসিয়া জুটিয়াছে। কমলার মধুর গান শুনিবার শুভ অবসর-প্রতীক্ষায় নিমন্ত্রিত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। কমলার গলা বড় মিষ্ট, তাহার রাগ-রাগিণী ও তান-লয়ের ধারা যে একবার অনুভব করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে, সে এ জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারে না—ইহাই হইল না কি তাহার অযত্নলব্ধ সার্টিফিকেট। এ সার্টিফিকেট কমলারও অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু সে ছিল একটু লাজুক প্রকৃতির, তাহার দ্বারা সহজে গান গাওয়ান নিতান্ত সহজ ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত ছিল না।

কমলার গান শুনিবার জন্য এতগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, যতীন্দ্র বাবুও উৎফুল্ল স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া নিজেই হারমোনিয়মটি টানিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন। গান গাহিবার জন্য অনুরোধ বা আদেশ করিতে তিনি প্রস্তুতও হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল। বাধা পড়িবার কারণ—গৃহমধ্যে দুইজন লোকের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। তাহাদের মধ্যে হ্যাট-কোট পরা, দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ একটি সুশ্রী যুবা পুরুষ, অপরটি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি যুবা, তাহার পরিধানে গৈরিক বসন ও গৈরিক উত্তরীয়। হ্যাট-কোট-পরা নিমন্ত্রিত যুবকটিকে সকলেই চিনিত। তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া গত তিন বৎসর হইল, এখানকার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন; অল্পকালের মধ্যেই প্রসার-প্রতিপত্তি বেশ জমিয়া গিয়াছে। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই অমায়িক অথচ সুরসিক। তাহার উপর তাঁহার ন্যায় সুকণ্ঠ ও সুগায়ক এই উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে আর এক জনও নাই বলিয়া নব্য দলে তাঁহার বিপুল খ্যাতি। তিনি চরিত্রবান্ বলিয়াই সর্ব্বসাধারণে সুপরিচিত, অথচ এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহা করেন নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কিন্তু সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটই অপরিচিত, এই একভাবাবিষ্ট সভার মধ্যে এরূপ অপরিচিত, তায় আবার সন্ন্যাসীর বেশধারী বুঝার আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই নয়নে যেন কেমন বিরক্তি-মিশ্রিত চাঞ্চল্যের ছায়া দেখা দিল। নবাগত ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র সভার সুপ্রকট চাঞ্চল্যের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি যতীন্দ্র বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সার! ক্ষমা করিবেন—আমার নির্দ্দিষ্ট সময়ে না আসিয়া পৌঁছানরূপ গুরুতর অপ-রাধটা। তাহা ছাড়া আপনাদের অপরিচিত অনি-মন্ত্রিত এই আমার বন্ধু ব্রহ্মচারী করুণানন্দকে আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই এখানে লইয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ এই অবৈধ অনধিকারপ্রবেশের সাহায্য করিয়া আমি যে আরও গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, সেটার জন্যও আমি আপনার নিকটে—বিশেষতঃ উপস্থিত ভদ্রমহিলাগণের নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি। আমার এ বিষয়ে একমাত্র ডিফেন্স এই যে, আমার প্রিয় বন্ধু করুণানন্দ ব্রহ্মচারী সংস্কৃত বিদ্যায় অগাধ পণ্ডিত হইয়াও ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মন্ ভাষায় বেশ সুপণ্ডিত। তার পর এমন একটা গুণ ইঁহার আছে, তাহার জন্য আজিকার এই আনন্দ-সভায় ইঁহার এই আক-স্মিক উপস্থিতি আপনাদের সকলেরই বিশেষ আনন্দের হেতু হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না-ই হয়, তবু ইঁহার অনেষ্টার প্রতি করুণা-দৃষ্টি করিয়া, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেনই, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

তাড়াতাড়ি আসন পরিত্যাগ করিয়া, যতীন্দ্র বাবু, সুর-বালা ও কমলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহাস্যবদনে ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথের ও করুণানন্দের হস্তপীড়ন করিয়া হাসিতে হাসিতে যতীন্দ্র বাবু বলিলেন, "প্রিয় শৈলেন্দ্রনাথ! বিচারা-লয়ের বাহিরেও যে আপনার বৈধ বাগ্মিতা বিনা ফিতে ব্যয়িত হইয়া থাকে, ইহা বড়ই পরিতোষের কারণ। বিলম্বও হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, আপনি যে আপনার এমন প্রিয়দর্শন শিক্ষিত ভদ্র বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিতে পারিয়াছেন, সে জন্য আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

যতীন্দ্র বাবুর এই কথায় সভাস্থ সকলেরই মুখে সভ্যজনোচিত মৃদু হাস্যের একটি ক্ষুদ্র লহরী ভাসিয়া উঠিল। কমলার দক্ষিণে উপবিষ্টা শৈলেন্দ্র বাবুর প্রতি-বেশিনী বিমলাদেবী কিন্তু মৃদু হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অভিমত সকলেরই শিরোধার্য্য। কিন্তু সভার পক্ষ হইতে আমার বিনীত প্রস্তাব এই যে, যে পর্য্যন্ত আমরা থামিতে না বলি, তাহার পূর্ব্বেই যদি শৈলেন্দ্র বাবু গান বন্ধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ কিছুতেই এই সভার ক্ষমণীয় হইতে পারে না।" বিমলার এই অসমসাহসিক প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, সুরবালাও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি।" আবার সকলে হাসিতে হাসিতে করতালি দিল, তখন স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে ঈষৎ হাসিয়া যতীন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ প্রস্তাব আমার মনে হয় সর্ব্বসম্মতভাবে পরিগৃহীত হইল।" ইহার পর সংক্ষেপে সুসভ্যরীতিতে যতীন্দ্র বাবু পত্নী সুরবালা ও কন্যা কমলার সহিত শৈলেন্দ্র বাবুর ও করুণানন্দ ব্রহ্মচারীর পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং সমাদরের সহিত সম্মুখস্থিত দুইটি কৌচের উপরে হাত ধরিয়া শৈলেন্দ্র বাবু ও ব্রহ্মচারীকে বসাইয়া দিলেন।

৩

নবাগত অতিথির অর্থাৎ করুণানন্দ ব্রহ্মচারীর আগমনে কিন্তু সেই আনন্দোল্লাসময়ী সভার ভাবতরঙ্গ যেন একটু স্তিমিত ভাব ধারণ করিল। নবাগত নবীন ব্রহ্মচারীর অনিন্দ্য-সুন্দর কনকগৌর কান্তি, মধুর শান্তভাবসমুজ্জ্বল প্রসন্ন-মুখমণ্ডল, অষ্টমীর চাঁদের ন্যায় সুগঠিত ললাটের নিম্নে ঘনকৃষ্ণ ধনুরাকার ভ্রূদ্বয়ের অধোভাগে বিশাল জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগল যেন প্রসন্নতা ও গম্ভীরতার সহিত মিশিয়া স্বাবলম্বনের দৃঢ়তা প্রতি দৃষ্টিপাতে সে নয়নযুগল হইতে উছলিয়া উঠিতেছে। সে দৃষ্টিতে অহমিকার গন্ধবর্জ্জিত ঔদাসীন্য সর্ব্বদা ফুটিয়া আছে। তাঁহার দেহ সমুন্নত, সুগঠিত, অথচ স্থূল নহে। হেন সুন্দর আকৃতির তরুণবয়স্ক গৈরিকধারী পুরুষের

প্রতি সভার প্রত্যেক নরনারীর দৃষ্টি স্বতই আকৃষ্ট হইল। কমলার বিস্ময়বিস্ফারিত দীর্ঘ নয়নযুগলও সেই অপূর্ব্ব সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপনিই নত হইয়া পড়িল, আবার দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু লজ্জায় সে আর দেখিতে সাহস করিল না, সে নত দৃষ্টিতেই গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। কমলার এ ভাবান্তর অপর কেহই লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল না, কারণ, সকলেই সেই অপরিচিতের দিকে প্রায় একদৃষ্টিতেই চাহিয়া ছিল, কিন্তু শৈলেন্দ্রের অনুসন্ধিৎসু নয়নদ্বয় হইতে কি জানি কেন কমলার এই ভাববিহ্বল জড়তার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য এড়াইতে পারিল না, কেমন একখানা অতৃপ্তির কালিমেঘ ক্ষণকালের জন্য তাহার চির-স্ফূর্ত্তিময় হৃদয়ের এক প্রান্তকে যেন অন্ধকার করিয়া তুলিল। সে তখন স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যের বলে আপনাকে সামলাইয়া লইল এবং ধীরভাবে হাসিয়া সভার সেই আকস্মিক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমেই কথা কহিল ও বলিল, "বাঃ, নন্দ নহে—এ দেখছি, নির্ব্বিকল্প সমাধির অনাহত ধ্বনিময় সভা হইয়া উঠিল! আমার বন্ধুবরটি কি চিড়িয়াখানার কোন অদ্ভুত প্রাণী! এমন করিয়া ওঁরই দিকে সকলে নয়ন-বাণের তীব্র সন্ধান করিলে, বেচারী অক্ষত-দেহে বাসায় ফিরিবে কি ক'রে? দাও দেখি হারমোনিয়মটা—একটা রসান্তরের সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

শৈলেন্দ্রের কথায় সভাস্থ সকলেরই চমক ভাঙ্গিল। সকলেই যথাসম্ভব আত্মসংবরণ করিল। বিমলা বলিল, "এই ত উচিত, এই ঔচিত্যের বশবর্ত্তিতা কিন্তু এতক্ষণ শৈলেন্দ্র বাবুর কেন যে ছিল না, সে কথা তুলিয়া আর কথা বাড়া-ইতে চাহি না। এখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটা গান ধরিলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা যায়।" বিমলা এই বলিয়া হারমোনিয়ম্ আগাইয়া দিল, তখন একবার চারিদিকে দেখিয়া কমলার মুখের দিকে সভয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আর একবার চাহিয়া শৈলেন্দ্রনাথ হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিল—

"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।
তব নন্দন-গন্ধমোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু, সাজে যেন সদা সাজে গো।

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী—হৃদয়ে বাহিরে, তব সঙ্গীতচ্ছন্দে,
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব, লাজে যেন সদা লাজে গো ॥"

শৈলেন্দ্রের কণ্ঠস্বর যেমন উচ্চ, তেমনই মধুর, গাহিবার আদব-কায়দাও তেমনই সুন্দর। হারমোনিয়মের প্রাণমাতানো সুরের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার উপরে পরিস্ফুটরূপে মধুরভাবে আত্মবিকাশ করিয়া শৈলেন্দ্র বাবুর কম্পিত কণ্ঠস্বরে অভিব্যক্ত ভাবাবেশময় দিব্য সিংহাসনের উপর যেন বসিয়া, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই প্রাণমাতানো গীতিকা—সভাস্থ বিস্মিত সকল ব্যক্তির কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্বপ্নময় স্বর্গবাসের জীবন্ত চিত্র ফুটাইয়া তুলিল, প্রশংসার মর্ম্মর স্বরে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল, সুরবালা, কমলা ও বিমলা প্রভৃতি মহিলাবৃন্দের বিস্ময়মুগ্ধ মুখের দিকে একবার সমুৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয়নম্রভাবে শৈলেন্দ্রনাথ হারমোনিয়মটি আস্তে আস্তে সরাইয়া গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিল। অনেকেই তাহাকে তখন আর একটি গান গাহিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। সে বলিল, "আমরা আসিয়াছি আজ গান শুনিতে, গাহিতে নহে, আরম্ভটা মাত্র নেহাত না করিলে চলে না, তাই গাহিলাম। এখন আমি আর গাহিতে প্রস্তুত নহি।" তখন অগত্যা সকলের দৃষ্টি ফিরিয়া কমলার দিকে পতিত হইল।

কমলার সে উৎসবের সভায় গান গাহিতে প্রবৃত্তি যে একবারেই ছিল না, তাহা বলা যায় না। বিশেষ শৈলেন্দ্র বাবুর গানের ধারাবাহিক প্রশংসা-ধ্বনিতে তাহার একটু ঈর্ষ্যাও যে মনটাকে তাতায় নাই, তাই বা কে বলিবে? কিন্তু তবুও কি জানি কেন, ঐ নব আগন্তুক গৈরিকবসনধারী বিচিত্র যুবার সন্নিধানটা যেন তাহার সকল উৎসাহকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছিল; তথাপি সে শিক্ষিতা স্বাধীনা, এমন অন্যায় লজ্জাশীলতার প্রশ্রয় দেওয়া তাহার কিছুতেই উচিত নহে। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় তাহার মনটা আলোড়িত হইতেছিল, এমন সময় তাহার পিতৃদেবের আদেশবাণী 'কমলা, সকালে যে গানটি গাহিয়াছিলে, সেইটিই আর একবার গাহিলে মন্দ হয় না'—তাহার বিবদমান হৃদয়ের অবসাদ হঠাইয়া দিল, লজ্জাকম্পিত হস্তে হারমোনিয়মে সুর দিতে দিতে সে তখন রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাহিতে আরম্ভ করিল—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই ॥
পুরান আবাস ছেড়ে যাই কবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা ভুলিয়া যাই ॥
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চির-জনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।
তোমার জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে জাগিতেছ তুমি, দেখা যেন সদা পাই ॥"

কমলার গান শেষ হইল, কিন্তু তাহার মধুর ঝঙ্কার সকলেরই প্রাণের ভিতর অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "এমন সুন্দর—এমন মধুর—এমন প্রাণস্পর্শী সুরলয়তান তাহারা কেহই পূর্ব্বে আর শুনে নাই। গর্ব্বমিশ্রিত লজ্জার আরক্তিম প্রভায় তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল তখন আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল, বারবার বাহবার ধ্বনিতে কিন্তু সে নিতান্তই আপনাকে ব্যতিব্যস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।

৪

শৈলেন্দ্র বাবু ও কমলা এই দুইএর মধ্যে কাহার গলা বেশী মিষ্ট, বা কাহার আদবকায়দা উচ্চতর, তুলনামূলক এরূপ সমালোচনা সভাস্থ নরনারীবৃন্দের মনে উঠিবার অবসর না দিয়াই তখন শৈলেন্দ্র স্মিতপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতে সেই নবাগত ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া বলিয়া বসিল, "এবার ভাই তোমাকে গাহিতে হইবে।" শৈলেন্দ্রের এ কথায় সভাস্থ সকলেই একটু বিস্মিত হইল। গৈরিকধারী সংসারবিরাগী এই সভায় এমন সুন্দর দুইটি গানের পর আবার কি গাহিবে! এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার প্রশ্ন করিয়া শৈলেন্দ্র কেন এমন বেহায়াপনা দেখাইতেছে; এরূপ ভাবনাও যে কাহারও মনে উঠে নাই, তাহাও শপথ করিয়া বলিতে পারা যায় না।

এই ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত সভাস্থ ব্যক্তিদিগের বিস্ময় কিন্তু আরও বাড়িয়া উঠিল—যখন তাহারা দেখিল, শৈলেন্দ্রের হাস্যসমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলের প্রতি হাসিমাখা দৃষ্টিপাত করিয়া করুণানন্দ ব্রহ্মচারী অসমসাহসিক বীরের ন্যায় অবলীলাক্রমে হারমোনিয়মটি কাছে আনাইয়া তাহাতে সুরের ঝঙ্কার সুরু করিয়া দিল। তার পরেই সে গান ধরিল। এ কি সুর গো! এ যেন নিশীথমুদিত কমলগুচ্ছের প্রথমোন্মেষক্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে নির্গমনোন্মুখ ভ্রমরকুলের মিলিত বিশ্ববিমোহন ঝঙ্কার! সভার এক নূতন ভাবান্তর হইল, বিরক্তির পরিবর্ত্তে বিস্ময় ও ঔৎসুক্য সকলের বিস্ফারিত নয়নে খেলিতে লাগিল। স্থিরগম্ভীরভাবে বসিয়া হারমোনিয়মের পর্দ্দাগুলির উপর কৌশলময় ক্ষিপ্র অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে—কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া অথবা সকলের চক্ষুর উপর প্রতিফলিত দ্রবোন্মুখ মানসচ্ছবিগুলির উপর স্বীয় অন্তঃপ্রবেশশীল উজ্জ্বল দৃষ্টিপাতের মহিমময় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিতে করিতে করুণানন্দ গান ধরিল—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে, মলিন-মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর মোহ-আঁধার ঘুচায়ে॥
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন্, ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল-পাথারে॥
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা এসে দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোরে, মত্ত বাসনা নিভায়ে॥
আছ অনলে অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর সলিলে গহনে।
আছ বিটপি-লতায় জলদেরি গায়, শশি-তারকায় তপনে॥
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥"

গাহিবার সময়ে করুণানন্দের নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত বারিধারা বহিতেছিল, মনোহর মুখমণ্ডলে অপার্থিব দীনতার প্রাণস্পর্শিনী ছায়া যেন আকুলপ্রাণে ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। মানুষে কি এমন গান গাহিতে পারে? বিস্ময়ে, ভক্তিতে, গৌরবে, সকলের হৃদয়সাগর যেন উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল; নির্বিশেষে সকলের নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, করুণানন্দের লোকোত্তর কমনীয় কণ্ঠস্বরে কান্তকবির এই প্রাণের গীতটি আত্মমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সত্য সত্যই সেই পার্থিবানন্দের মিলন-সভাকে সত্যলোকের ব্রহ্মসংসদে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল।

কখন্ সে মনমাতানো প্রাণগলানো গান থামিয়া গেল, কেহ তাহা বুঝিতেই পারে নাই। যখন বুঝিল, সকলেই বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—করুণানন্দ ব্রহ্মচারীর আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে! কি বিস্ময়াবহ ব্যাপার! ইহার মধ্যে গান কখন্ শেষ করিয়া—সভাস্থ সকল নরনারীর প্রাণমন ও উল্লাস করায়ত্ত করিয়া ব্রহ্মচারী করুণানন্দ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তখন সকলেই দুঃখে হায় হায় করিতে লাগিল। সকলেই ভাবিল, এই ঘটনার সহিত কোন একটা দৈব রহস্য যেন জড়িত আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বাঁশীর ডাক

ডাক দিয়ে হায় বাঁশী আমায় আন্‌লে পথে যখন,
গগন ছেয়ে বাদর আঁধার নিবিড়-ঘন তখন;
রাত নিশুতি গহন গহীর,
কর্‌লে বাঁশী ঘরের বাহির,
ভয়ের সাথে ভাব না এল,—পথ কে দেখায় এখন?

আর যারা সেই ঘর-ছাড়া ডাক শুনে বাঁশীর কানে
বেরিয়েছিল আপন আপন দোর খুলে' উঠানে,
আমি তাদের শুধাই ডেকে,—
পথ দেখাবে আমারে কে?
তারা তখন বল্‌লে আমার চেয়ে মুখের পানে,—

"পথের কথা পুছিস্‌নে তুই, ভয় ত কিছু নাই,
সুর শুনে চল্ একলা সোজা আঁধার পথ বাই';
অন্ধকারের পারে থাকি'
ডাক্‌ছে তোরে, শুনিস্ না কি,
স্বামী যে তোর? তাকাস্‌নে আর পিছন পানে ভাই!"

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ঝিন্সী

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আমি মুসুরীতে যাই। তাহার পূর্ব্বে কখনও ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে যাই নাই। ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে মানুষ কি রকম করিয়া থাকে, তাহা জানিতাম না। মুসুরী ঠিক ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে নয়। সেখানে আইন-কানুন ইংরাজেরই চলে। আদালত কাছারীও ইংরাজের। কেবল ইংরাজ মুসুরী ও ল্যাণ্ডোরে যত একর জমী দখল করেন, তাহার প্রত্যেক একরে গাড়োয়ালের রাজাকে এক আনা করিয়া খাজনা দেন। জমী দখল করিবার সময় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন কি না, জানি না; তবে কয়েক বৎসর অন্তর এক একবার উভয় পক্ষ থাকিয়া, ইংরাজ কত জমী দখল করিয়াছেন, তাহা জরীপ করা হয় এবং সেই জরীপের উপর জমাবন্দী হয়। রাজা মুসুরীতে কোন বাড়ী, ঘরদুয়ার নূতন করিয়া কিনিতে পারেন না। তাঁহার যে পুরান বাড়ীঘর আছে, তাহার হাতায় গাছপালাও কাটিতে পারেন না। সুতরাং মুসুরী ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে নহে।

আমি যখন বাজারের কোলে পরিষ্কার কামরাটিতে বসিয়া জানালা খুলিয়া পূবের দিকে দেখিতাম, আমার ইচ্ছা হইত, একবার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে যাই। শুনিলাম,অতি নিকটেই ঝিন্সী বলিয়া একটি গ্রাম আছে। বাঙ্গালী বাবুদের দুধ সেই গ্রাম হইতে আইসে; তরিতরকারীও অনেক আইসে; চাকরবাকরও আইসে। আমার বন্ধুবান্ধবরা ঝিন্সীর অনেককেই চিনেন; কিন্তু কখন ঝিন্সী যান নাই। তাঁহারা অনেকেই আমার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন। দুপুরের পর সব এক একগাছি লোহার ছুঁচওয়ালা লাঠী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। বাজারের উত্তর অংশে আমরা থাকি, উহার দক্ষিণ অংশে নামিবার পথ। পথে খাড়াই বড় বেশী। পাশ দিয়া নালা চলিয়া গিয়াছে। সেই নালাই অনেক নীচে গিয়া নদী হইয়া গিয়াছে। একে ত খাড়াই রাস্তা, পাশেই নালা, তাহার পর আমরা নামিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাইবার ভয়। লাঠীতে কিন্তু আমাদের খুব সাহায্য করিতেছে। ছোট নালাটি যে কতবার পার হইতে হইল,বলিতে পারি না। কিন্তু নালার মাঝখানে লাঠীর মুখটি পুতিয়া দিয়া তাহার উপর ভর দিয়া আমরা লাফাইয়া নালা পার হইতেছি। যেখানে বড় গোড়েন—পা পিছলাইয়া যায়, সেখানেও লাঠী আমাদের সহায়। অনেক যায়গায় পাকডাণ্ডীতে নামিতে হইতেছে। ৪০ ফুট নামিতে চার পাঁচবার পাক খাইয়া প্রায় আড়াই শত তিন শত ফুট হাঁটিতে হইতেছে। পাঁচ সাতশ ফুট নামিয়া আমরা একটু গোলপানা সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঠিক সমতল নয়, খুব খাড়াইও নয়, সহজ গোড়েন যায়গা। এই যায়গাকেই সংস্কৃতে সানু অথবা নিতম্ব বলে। সেখানে দেখি, একরকম ছোট ছোট গাছ, তাহাতে বিস্তর ছোট ছোট ফল ধরিয়াছে। ফলগুলি ক্ষুদে লঙ্কার মত। সকলে বলিল, ব্ল্যাকবেরী এবং সকলেই ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। ফল অম্ল-মধুর। সকলেই ২।৪ মুঠা খাইল। তাহার পর আবার নামিতে লাগিলাম। এবার গোড়েন তত বেশী নয়, আর পড়িয়া যাইবার ভয় নাই; লাঠী ব্যবহারও তত হইল না। অনেক নীচে এবং দূরে একটা ঘর দেখা গেল। পাথরের গাথনী, শ্লেট পাথরের ছাওয়া। চার-চালা ঘর। আর নামিয়া আসিয়া দেখা গেল, একটি স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। রং খুব ফরসা, তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ মুখে পড়িয়াছে, ঠিক যেন একখানি জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা বলিয়া মনে হইল। আরও খানিক নামিয়া দেখি, আমাদের পথ সেই ঘরের পাশ দিয়া। ঘরে কতকগুলি গরু আছে। মেয়েটি সেই গরুগুলি চরাইতেছে। বুঝিলাম, এই সব গোয়াল হইতেই আমাদের দুধ যায়। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এখান হইতে ঝিন্সী কত দূর? সে বলিল, চল, আমিও ঝিন্সী যাইতেছি। সে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। দেখিলাম, তাহার রং ফরসা হইলেও তাহার নাকটি খাঁদা। গায়ে ইংরাজের ছাড়া মখমলের জামা, অত্যন্ত ময়লা। পরা একটি ঘাগ্‌রা, সে-ও বড় ময়লা। মাথায় একটি খোঁপা আছে। খোঁপা যে সৌখীন করিয়া বাঁধা, তাহা নহে, কিন্তু সে খোঁপাতেও ২।৪টি করিয়া ফুল গোঁজা আছে।

আমরা যে রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম, তাহা পায়ে চলা রাস্তা। খানিকটা নামিতেছি—আবার খানিকটা সমতলের উপর দিয়া যাইতেছি। আবার নামিতেছি, আবার খানিক সমতলের উপর দিয়া যাইতেছি। এইরূপ ভাবে অনেক নামিয়া, অনেক ঘুরিয়া ঝিন্সীর কাছে

আসিলাম। উপর হইতে দেখিতে পাইলাম, নীচে ঐ ঝিন্সী। আরও নামিলাম, আরও উঠিলাম, কিন্তু সে পথ অত্যন্ত ময়লা। মাঝে চাষবাসও আছে। ঐ যে ঢালু জমী, উহার মাঝে মাঝে খুঁড়িয়া পাথর বাহির করিয়া এক হাত দেড় হাত উঁচু প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। সে প্রাচীরের ভিতর দিকের জমী বিশ পঁচিশ হাত চাটাল আয়নার মত করিয়া সমান করা হইয়াছে ও তাহাতে নানা রকম ফসল হইয়াছে। প্রাচীরের বাহিরের ঢালও আবার ঐরূপ সমান করিয়াছে ও তাহার সামনে প্রাচীর দিয়াছে। এইরূপ প্রাচীর দেওয়া ও সমতল করা ২০।২৫টা ক্ষেত নামিয়া আমরা ঝিন্সীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মেয়েটি অগ্রদূতী হইয়া গাঁয়ে খবর দিতে গেল যে, বাবুরা আসিতেছে।

গাঁয়ের চারি পাশে দেখিলাম—ময়লাই বেশী। ২।৫টা গাছপালাও আছে, যায়গায় যায়গায় একটু বাগান করার চেষ্টাও হইয়াছে। গাছের মধ্যে আক্‌রোট, আলুবোখরা, নাস্পাতি এবং আর আর শীতের দেশের ফলের গাছ।

মুসুরী থেকে বাবুরা এসেছে শুনে গাঁয়ের লোক সব এসে জমা হ'ল। ছেলে, মেয়ে, বুড়া, যুবা, বুড়ী. আধাবয়সী সব এলো। কারও কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। বুঝিলাম, ইহারা জানানার ধার ধারে না।

গ্রামে দেখিলাম, দুইখানি ঘর, মাঝখানে একটি উঠান। ঘর বলিলাম, তাহাতে বোধ, হয় গ্রামের অবস্থা বুঝিতে পারা গেল না। ঘর দুইটি খুব লম্বা ২।৩ শত ফুট হইবে; চাটাল প্রায় ৩০ ফুট। লম্বায় তিনটি প্রাচীর আছে;—পাশের ২টি প্রায় ২০ ফুট উচ্চ হইবে; মাঝেরটি আরও ৫।৭ ফুট বেশী। বাতি শালের রোয়া, তাহার উপর শ্লেট-পাথরের ছাউনী। আড়ে দুই ধারের দুইটি প্রাচীর বাহির হইতে দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে অনেক প্রাচীর আছে। এক একটা ঘরে ২০।৩০টা করিয়া কামরা এবং সকল ঘরই দোতলা। ঘরগুলি খুব অন্ধকার। বাহির দিকে একটি করিয়া দুয়ার, জানালা নাই। উপরের ঘরে কিন্তু জানালা আছে। নীচে যেখানে দরজা, উপরে সেখানে জানালা; কিন্তু জানালা বড় ছোট। বুঝিলাম, ইহারা ঘরে বড় একটা থাকে না। শীতের রাত্রিতে ঘরে শোয় আর সব সময় বাহিরে থাকে। ঘরে আপনাদের জিনিষপত্তর রাখে।

উপরে বলিয়াছি যে, গ্রামে দুইটি বই ঘর নাই; কিন্তু এই দুইটি ঘরে অন্ততঃ এক শতটি পরিবার বাস করে। দূরে দেখিলাম, একটি ঘরট্ট রহিয়াছে। ঝরণার জলের তোড়ে জাঁতা ঘুরিতেছে। যাহার যখন ইচ্ছা গম পিষিয়া লয়। শুনিলাম, আরও নীচে ও দূরে একটি দেবীর মন্দির আছে। দুইটি ঘরের মাঝে যে উঠানটি আছে, সেটি গ্রামের শ্রী। উঠানটি পাথরের; উহার দুইটি ধাপ;—দুইটিই যত্ন করিয়া পাথর কাটিয়া সমতল করা হইয়াছে। এইখানেই তাহারা ফসল আনিয়া ঝাড়ে, বাছে, আর এইখানেই তাহারা সমস্ত দিন থাকে।

গাঁয়ের লোক উপরের উঠানে একখানি পুরাতন গুন্‌চট্ আনিয়া বিছাইয়া দিল এবং আদর করিয়া আমাদিগকে তাহার উপর বসিতে বলিল। বাবুরা ২।১ জন নাক সিঁটকাইলেন। কারণ, একে গুন্‌চট্, তার উপর ময়লা; কিন্তু সকলেই বসিলেন। কেন না, সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুক্ষণ শিষ্টাচারের পর ছেলেরা নাচিতে আরম্ভ করিল। সাহেবদের ও বাবুদের ছেলেদের ছেঁড়া পাণ্টুলন, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া টুপী—এই সকল পরিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন দলে দলে আসিল, আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। ছেলেগুলির রং খুব ফরসা, কালো খুব কমই আছে। এমন কি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও কম। সকলেই যেন ফুট্ গৌরবর্ণ। তাহার পর জামা যাহা গায়ে দিয়া আসিয়াছে, ছেঁড়া হউক, কিন্তু তাহার একটা রং আছে। সে রঙ্গে উহাদের গায়ের রং আরও বেশী খোলতাই হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। ছেলেদের মধ্যে একটিও রোগা বা শুষ্ক নাই; উহাদের স্বাস্থ্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। এক বুড়া ঢোলক বাজাইতে লাগিল ও ছেলেরা নাচিতে লাগিল। তাহারা বেশ স্ফুর্ত্তি করিয়া নাচিতে লাগিল; বাজনার সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে কেহ বিরক্ত হইল না। আমরা মাঝে মাঝে হাততালি দিতে লাগিলাম; তাহাতে তাহাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে তাহারা কখনও আগু বাড়াইয়া আসিতেছে, কখনও পিছু হটিতেছে, কখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, কখনও কখনও জোড়-পায়ে নাচিতেছে। কিন্তু সকলেই এক ভাবে নাচিতেছে, কোন যায়গায় কাহারও তাল কাটিতেছে না। আমরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছি। আধ ঘণ্টা তিন কোয়াটারের পর দেখিলাম, সেই শীতের দেশেও

ছেলেদের কপাল দিয়া দর-দর করিয়া ঘাম পড়িতেছে। তখন আমি তাহাদিগকে থামিতে বলিলাম। আমার এক বন্ধু বলিলেন, "তোমরা কিছু খাও।" এই বলিয়া আমাদের যে খাবার ভাণ্ডার ছিল, তাই তিনি খুলিয়া বসিলেন। ছেলেরা অনেকে নাচ ছাড়িয়া খাইবার জন্য ব্যস্ত। এই সময় ছেলেদের মা'রা আসিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইল। তাহারাও নাচিতে লাগিল। পুরুষরাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। উঠানময় নাচ আরম্ভ হইয়া গেল। ছেলেরাও কিছু জল খাইয়া আবার নাচিতে লাগিল। নাচের সঙ্গে ক্রমে পাহাড়িয়া রাগের ২।১টা গানও বাহির হইল। আমরা গানের কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু পাহাড়ে আসিয়া অবধি ঐ একই রাগ শুনিতেছি; তাহাতে বুঝিলাম যে, পাহাড়িয়ারা এই রাগ ছাড়া অন্য রাগ জানে না।

যাহা হৌক, ২।৩টি গানের পর নাচ থামিয়া গেল। কারণ, আমাদিগকে সন্ধ্যার আগে মুসুরী ফিরিতে হইবে; নহিলে রাস্তায় অন্ধকার হইয়া যাইবে। হয় ত এক আধ পস্‌লা বৃষ্টিও হইতে পারে। তাহা হইলে আরও মুস্কিল। তাই আমাদের খাবার ভাণ্ডার খালি করিয়া পকেট হইতে কিছু পয়সাকড়ি দিয়া নাচগান থামাইয়া দিলাম ও ঝিল্লী হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিলাম। উঠানটি আমাদের বেশ পছন্দ হইয়াছিল। সেই উঠানে দাঁড়াইয়া কোন্ পথে যাইব, সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম। বাবুরা বলিলেন, 'যে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই যাইব।' আমি বলিলাম, 'সে হতেই পারে না। কারণ, পথ বড় সরু, বড় খাড়াই, বড় পাথর, তার উপর আবার পাশে একটি নালা আছে। যদি বৃষ্টি হয়, একেবারেই সর্ব্বনাশ। পারতপক্ষে ও পথে যাওয়া হবে না।' আমি শুনিয়াছিলাম যে, আমরা যে লেভেলে আছি, সেই লেভেলে মাইলখানেক তফাতে কোম্পানীর বাগান আছে, তাহার নাম হুরুরি। আমরা যদি সেখানে সন্ধ্যার আগে পৌঁছিতে পারি, তা হইলে নিশ্চয়ই ভাল রাস্তা পাইব; কারণ, কোম্পানীর বাগান হইতে মুসুরী যাইবার নিশ্চয়ই একটি ভাল রাস্তা আছে। গ্রামের লোকও সেই কথা বলিল। সকলেরই হুরুরি যাওয়ার মত হইল। আমরা পায়ে চলা পথে চলিতে লাগিলাম; চড়াই উতরাইয়ের কোন কথাই রহিল না। চারটি মেয়ে আমাদের সঙ্গ নিল। অল্প দূরে আমাদের পিছনে পিছনে তাহারা আসিতে লাগিল। পুরুষরা সব ফিরিয়া গেল। জমীটি ধনুকের আকার। যেমন একটা ধনুক শেষ হইল অমনই একটি ঝরণা। যেমন ঝরণাটা পার হইলাম, আবার একটি ধনুক। মাঝে মাঝে এক একটা পাথরের ঘর—শ্লেট-পাথরে ছাওয়া। গরুবাছুর অনেক সময় সেখানে আশ্রয় লয়। কিন্তু মানুষও অনেক সময় সেখানে আশ্রয় লইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এইগুলিই মেঘদূতের শিলাবেশ্ম। পাঁচ সাতটা ধনুক পার হইয়া একটি বড় ঝরণার কাছে আসিয়া পড়িলাম। ইঞ্চিখানেক পুরু জল ২৫।২০ ফুট চাটাল হইয়া ক্রমাগত পড়িতেছে। নীচে শেওলা হইয়াছে, অত্যন্ত পিছল হইয়াছে। পার হওয়া যায় কেমন করিয়া? এক জন চাকর পার হইয়া গেল। তাহার পাহাড়ী পা, পায়ের জোর আছে, পার হইয়া গেল। আমরা পার হই কি করিয়া? এক জন বলিলেন, হামাগুড়ি দেও। জলের উপর হামাগুড়ি—সে আবার কেমন! কাহারও পছন্দ হইল না।

জল পাইলেই গাছপালা হয়। এ ঝরণার ধারেও গাছপালা হইয়াছিল যথেষ্ট। মাঝখানে ত গাছপালা নাই। আছে কেবল পুদিনার গাছ, এক মানুষ দু'মানুষ উঁচু। কিন্তু তাহা ধরিয়া ত ঝরণা পার হওয়া যায় না—যদি উপড়াইয়া যায়? শেষে ঝরণার পাশের গাছ ধরিয়া ধরিয়া খানিক উপরে উঠিলাম। যেখানে ঝরণা সরু হইয়া গিয়াছে, তাহার এ পাশের গাছের ডাল ধরিয়া খানিক আগাইয়া গেলাম এবং ওপারের গাছের ডাল ধরিয়া পার হইয়া পড়িলাম। বিপদ যদিও পদে পদে ছিল, ভাগ্যে ভাগ্যে কোন রকমে উদ্ধার হইলাম।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঝরণা পার হইয়া দেখি, ধনুকের উপর দিয়া পুল বাঁধিয়া দিয়াছে এবং সেই পুল দিয়া জল হুরুরি বাগানে যাইতেছে। আমরা হুরুরির বাগানে আসিয়া দেখিলাম, অনেক আলুবোখরার গাছ, অনেক নাসপাতির গাছ, অনেক বিলাতী শাকশব্জ র গাছ। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, সকলেই ২।১টি ভাল আলুবোখরা ছিঁড়িয়া খাইলাম। সে অম্লমধুর স্বাদে ক্লান্তি ও তৃষ্ণা একেবারে দূর হইল। পাকা আলুবোখরার চেয়ে ডাঁসা আলুবোখরার স্বাদ অনেক ভাল। খানিকক্ষণ একখানা পাথরে চাপিয়া বসিয়া হাঁপ ছাড়িলাম। পরে বাগান হইতে যে রাস্তা মুসুরী গিয়াছে, সেই রাস্তা

ধরিলাম। রাস্তা বেশী খাড়াই নহে, বেশ আস্তে আস্তে উঁচু হইতেছে, যাইতে বেশী কষ্ট হইতেছে না। খানিক উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এ অঞ্চলে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, বরফের পাহাড় দেখা যাইতেছে; কিন্তু সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, বরফের পাহাড়ের সে জলুস আর নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই বেশী করিয়া ম্লান হইয়া যাইতেছে। বরফের পাহাড়ের দিকে চক্ষু রাখিয়া মুসুরীর রাস্তা বহিয়া ক্রমে বাসায় আসিয়াও জানালা খুলিয়া বরফের পাহাড় দেখিতে দেখিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয়, ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুর আসিয়া খাইতে ডাকিল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়)।

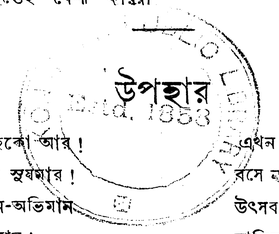

উপহার

পারুল ঝরিয়া গেছে, বসন্ত নাহিকো আর!
মিলায়েছে চারুরেখা যৌবনের সুষমার!
আর নাহি হাসি গান, নাহি মান-অভিমান,
নাহি সেই মধুপ্রাণ মধুময় সুকুমার।
পারুল ঝরিয়া গেছে বসন্ত নাহিকো আর!

আজ শুধু ঘিরিয়াছে শ্রাবণের মেঘভার।
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে বিরহের হাহাকার!
আজ শুধু অবিরল ঝর ঝর আঁখিজল,
আঁধারের ছায়াতল স্মৃতিভরা বেদনার!
আজ শুধু ঘিরিয়াছে শ্রাবণের মেঘভার!

তখন জীবন ছিল যৌবনের সাধনার।
নাহি ছিল এ কাঁদন এই বোঝা বেদনার!
প্রেমের পেয়ালা ভরা, ছিল রে মাতাল করা।
মদিরা সে দুখহরা—শোক-তাপ-গ্লানিভার!
তখন জীবন ছিল যৌবনের সাধনার!

প্রথম যৌবনে সেই জীবনের পারাপার;—
ভরা ছিল উচ্ছ্বসিত রূপ-রস-পারাবার!
সে তরঙ্গে অবিরাম ভাসিলাম, ডুবিলাম—
আজ শুধু মরিলাম লভিয়া দুখের ধার!
প্রথম জীবন ছিল রূপ-রস-পারাবার!

এখন বীণায় আর বাজে না সোনার তার!
বসে না সুখের মেলা—ভাঙ্গা এ কুটীর-দ্বার!
উৎসব-শেষে আজ পরিয়া মলিন সাজ
ঢাকিবারে চাই লাজ—এ দীনতা অনিবার!
এখন বীণায় আর বাজে না সোনার তার!

শ্রাবণ নিশীথে আজ নাই আশা-অভিসার!
মরণের দূতী বুঝি ডাকিতেছে বার বার!
সেই ভালো, সেই ভালো, জ্বালিও না কেহ আলো,
ঘনীভূত ওগো কালো, লও এ নয়নাসার!
শ্রাবণ নিশীথে আজ নাই আশা-অভিসার!

সেই মোর ফুলরাণী হাসিমুখ ছিল যার;—
সে-ই যদি গেল ঝরি' তবে কেন হাসি আর!
সখা, কেহ হাসিও না, ভাল কেহ বাসিও না—
মুখপানে চাহিও না নিয়ে আঁখি করুণার!
ফুলরাণী ঝ'রে গেছে হাসিমুখ ছিল যার!

পারুল ঝরিল যদি, শুকাইল দল তার;—
তবে আর এ কাননে আসিলাম আশে কার?
আয় রে চলিয়া আয়, পথের ভিখারী প্রায়
ধূলীভরা এ ধরায় নে রে ধূলি উপহার!
পারুল ঝরিয়া গেছে বসন্ত নাহিকো আর!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আলিপুর জেলে

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে এক দিন শুনা গেল, নরেন গোঁসাইর সঙ্গে প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা ধ'রে সপার্ষদ পুলিস সাহেবের আর তার (নরেনের) বাবার দরজা বন্ধ ক'রে গোপনে কি পরামর্শ চলেছে। তখন আর আমাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, নরেন আমাদের বিরুদ্ধে রাজার সাক্ষী অর্থাৎ approver হ'তে যাচ্ছে। আমাদের যত রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা সবই গিয়ে পড়ল নরেন, তার বড়লোক বাবা আর গুরু গোঁসাইদের ওপর।

নরেন কেন এমন কুকায করল, এর কারণ অনুসন্ধান জন্য গবেষণা-প্রবৃত্তি, আমাদের মধ্যে ছোট বড় সকলের মনে জেগেছিল বটে, কিন্তু আসল কথাটাই তখন আমাদের কারও মনে আসেনি, অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা বা স্বপক্ষ-দ্রোহিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের—জাতীয়তার পরিপন্থী অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে বিশেষ একটা, সে জ্ঞান আমাদের ত ছিল না, নেতারা কতকটা জেনেও তা স্বীকার করতেন না (এখনও করেন না)।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের এবং লোকমতের দোষগুণ সম্বন্ধে জনসাধারণের ত কথাই নাই, তথাকথিত সর্ব্বজ্ঞ নেতারা জেনে শুনে যে অজ্ঞতার শুধু ভাণ করেই ক্ষান্ত থাকেন, তা নয়, অধিকন্তু সাধারণকে সে বিষয়ে অন্ধ ক'রে রাখেন ; আর সেই অন্ধদের বলেন—তারা সব পদ্মলোচন। তাতে ক'রে তাঁদের খাতির জমে, পূজাও বাড়ে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে এইখানে আমাদের পার্থক্য। তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে, আর তার প্রতীকারেরও চেষ্টা করে। আমরা আমাদের দোষ স্বীকার না ক'রে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চোটে দোষকে গুণ ব'লে বোকা বোঝাতে চেষ্টা করি।

মহাত্মা ক্লাইবের যারা দোসর হয়েছিল, অথবা যে সকল বাঙ্গালী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল, তারা যে সবাই আমাদেরই স্বজাতি, আর আমাদের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় বলতে যা বুঝায়, তারা যে সেই ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তা যদি কর্ত্তারা বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির পত্তনের সময় স্বীকার করতেন, তা হ'লে তথাকথিত বৈপ্লবিক action (terrorism) সুরু না ক'রে, আগে বিপ্লবের উপযোগী ক'রে আমাদের চরিত্র শোধন ও sound লোকমত গঠনের কাযে মন দেওয়া উচিত ব'লে মনে করতেন ; তা হলেই হ'ত বিপ্লববাদের প্রচার ; আর তা ছাড়া কোন দেশে বিপ্লবচেষ্টা সার্থক হয়েছে ব'লে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

ঐ সময়ের কয়েক মাস আগে যখন তথাকথিত "action" বন্ধ রেখে, য়ুরোপীয় প্রণালীতে সত্যকার গুপ্ত সমিতি নতুন ক'রে গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তখন কর্ত্তারা এই ব'লে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, এ হচ্ছে ধর্ম্মের দেশ ; ওসব এখানে আবশ্যক নাই ; চলবেও না। অথচ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-সম্বন্ধীয় এই আধুনিক প্রগতির যা কিছু, সবটাই যে পাশ্চাত্য আদর্শের শুধু খোলসটার নিছক অনুকরণ, তা নিত্য প্রত্যক্ষ ; তার প্রমাণের জন্য বেগ পেতে হয় না। কিন্তু আমরা তবু বলি, আমাদের সবই আধ্যাত্মিক ; রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সবই নাকি ভারতীয় সনাতনভাবে হচ্ছে ও হবে।

যা হোক, এ কথা বলা যেতে পারে, নরেনের এই দুষ্কর্ম্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নেতারা, আর আমাদের ঠাকুরমা-বিনিন্দিত জরাগীর্ণ লোকমত। কারণ, স্বপক্ষদ্রোহিতা যে কত বড় অপরাধ, সে ধারণা যে লোকমতের নাই, তা পূর্ব্বেও দেখিয়েছি। নরেনকে হত্যা না করলে লোকমতে স্বপক্ষ-দ্রোহী ব'লে যে সে নিন্দিত হ'ত না, তার প্রমাণ তার মৃত্যুর পর এক সপ্তাহের ভেতর আমাদের মধ্যে একে একে অনেকেই স্বইচ্ছায় দ্বিধাশূন্য হয়ে informer হয়েছে, আর আমাদের পরেও কত approver, informer হয়েছে, তার সংখ্যা নাই। তাদের অনেককে গুপ্ত সমিতির তরফ থেকে নির্য্যাতন বা দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে সত্য, কিন্তু নরেনের মত কেউ লোকমতে অত নিন্দিত হয় নি। এমন কি, লোক তাদের এ হেন কাযের খোঁজ নেওয়াও অন্যায় ব'লে মনে করে, তা নিন্দা ত দূরের কথা। নরেন যখন approver হয়ে বার্লী 'সাহেবের' কোর্টে সপ্তাহ খানেক ধ'রে কত কথাই বৈপ্লবিক সমিতির বিরুদ্ধে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছিল, তখন দেশে তেমন হৈ-চৈ হয় নি। যেহেতু, ফৌজদারী কোর্টে হামেষা ত কত approver নিত্য হচ্ছে, শিক্ষিত লোকদের কাছেও এটা মামুলী ঘটনা ব'লে গণ্য হয়েছিল। তখন যারা ধরা পড়েনি, এমন বৈপ্লবিকদের কাছেও তাকে হত্যা করা অকারণ কষ্ট ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। অথচ কোন ভীরুস্বভাববিশিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের হাত থেকে যদি অতর্কিতে কোন স্ত্রীলোককে কেউ বলপূর্ব্বক কেড়ে নিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে ফিরিয়েও পাওয়া যায়, তবে সেই নির্দ্দোষ স্ত্রীলোকটির এই অপরাধের আর সে জন্য তার ওপর সামাজিক নির্য্যাতনের সঙ্গে, যে কোন স্বপক্ষ-দ্রোহীর অপরাধ ও সে জন্য তার প্রতি সামাজিক তিতিক্ষার তুলনা করলে দ্বিধাশূন্য হয়ে বলা যেতে পারে, নরেনের approver হওয়ার জন্যই এত হৈ-চৈ পড়েনি, পড়েছিল ওরকম নভেলী ধরণে, অতবড় শক্তিশালী সরকারের সুদৃঢ় লৌহ-কারার মধ্যে হত্যার একটা বাহাদুরী ছিল ব'লে, আর অত বড় শক্তিমান সরকারকে ঠকিয়ে এমন প্রতিশোধ দিতে পেরেছিল ব'লে। বেঁচে থাকলে আজ approver নরেন গোঁসাই স্বদর্পে সমাজের বুকের ওপর বিচরণ করত।

বাঙ্গালার বৈপ্লবিক ব্যাপারে নরেন প্রথম স্বপক্ষদ্রোহী ব'লে বিবেচিত হয় ত না-ও হ'তে পারে, কিন্তু সে যে প্রথম approver, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তার approver হওয়ার পক্ষে যে সকল inducement ছিল, তার পরে যারা approver বা informer হয়েছে, তাদের সে রকম বিশেষ কিছুই ছিল না। নরেন দণ্ড হ'তে অব্যাহতির রাজকীয় প্রতিশ্রুতি ত পেয়েই ছিল, অধিকন্তু বিলাতে সপরিবারে রাজার হালে থাকবার আশাও নাকি পেয়েছিল। সে বলত, বারীন তাকে এবং অন্য অনেককে ঈর্ষ্যা বশতঃ ধরিয়ে দিয়েছে, তার প্রতিশোধ দিতেই সে approver হয়েছে। approver হওয়ার অন্ততঃ এ একটা ছুতো সে পেয়েছিল। পরবর্ত্তী approverদের এত সব সুযোগ ছিল না। এখনও নাই। উপরন্তু তাদের সাম্‌নে নরেনের ভীষণ দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবু approver, informer, agent provocateur আদির এত ভীড় দেখে কখনও কখনও মনে হয়, দুটি অমূল্য রত্ন—সত্যেন ও কানাই বৃথা ও রকম ভীষণ নরহত্যা ক'রে অকারণে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিল। এটা দিয়েছিল নিশ্চয়ই তারা নিজেদের মতই অন্য স্বপক্ষ হিতৈষীদিগকেও এত মহৎ মনে করত ব'লে। আমাদের জাতীয় চরিত্র যে অত কলুষিত, তা বোঝবার অবসর তাদের হয়নি। একটা কথা এখন মনে জাগছে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই রকম সব ব্যাধির প্রতীকার, লৌকিক উপায়ে অসাধ্য দেখেই কি একে একে অনেকে অলৌকিক শক্তি-সাধনায় মাথা বথাচ্ছেন, না এও একটা প্রাচ্য সনাতন ব্যাধি !

একটা কথা আছে—"বজ্র আঁটুনির ফস্কা গিরে।" শুধু জেলখানা নয়, যে কোন ব্যাপারে সতর্কতার যত বাড়াবাড়ি হোক্ না কেন, চেষ্টার মত চেষ্টা করতে পারলে সে সতর্কতার বিরুদ্ধে অনেক কিছু কায করা যে যায়, এ সত্য জগতে অনেক বার প্রমাণিত হয়েছে। এত কড়াকড়ি পাহারা সত্ত্বেও আমরা কাগজ-পেন্সিল পেতাম। জেলখানার ভিতর এবং বাইরে আমাদের আবশ্যকমত যে কোন লোকের সঙ্গে দরকার হ'লে চিঠির আদান-প্রদান করতে পারতুম। পুরস্কারের প্রত্যাশা না ক'রেও অনেক কয়েদী, বিপজ্জনক বিশেষ দণ্ডনীয় কায-করা-জনিত বাহাদুরীর গৌরব অনুভব করত। এক জন বাতিওলা বলছিল—"কাগজ পেন্সিল চাই—কত ?"

"আপাততঃ এক তা, আর পেন্সিলের সিস্ একটু।"

"আচ্ছা বাবু, এনে দেব, একটু সাবধানে রেখো।"

"অমুককে চিঠি দিতে পারবে ?"

"দিন। সন্ধ্যেবেলা, নয় কাল উত্তর পাবেন।"

পুরস্কারস্বরূপ কিছু দিলে নিত, না দিলে চাইত না। এইরূপে আমরা ক্রমেই জেলের ভিতরে বাইরে খবর পেতে ও দিতে সুরু করলাম। আমাদের দু'তিন রকম কোড্ ছিল।

এই সময় সত্যেন্দ্রকুমার বসু, মেদিনীপুরের আদালতে, বিনা পাশে তার দাদার বন্দুক ব্যবহার করার অপরাধে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে, আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মোকর্দ্দমায় লিপ্ত থাকার অপরাধে, বিচার জন্য, আলিপুর জেলে আনীত হয়েছিল। কখনও dysentery, কখনও হাঁপানি রোগে পীড়িত ব'লে প্রথম থেকেই হাঁসপাতালে স্থান পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তখন বিশেষ কোন রোগের লক্ষণ তার ছিল না। জেলখানায় দু'চার পয়সা দিলেই অনেক রোগের প্রমাণ সংগ্রহ করা যেত।

সত্যেন আলিপুর জেলে গিয়ে নরেনের ব্যাপার জেনে, জেলের অন্যত্র রক্ষিত এক জন বৈপ্লবিককে, সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ার আগেই যে তিনখানি চিঠি লিখেছিল, যত দূর মনে পড়ে, তার আসল মর্ম্ম এই ছিল যে, সে জানতে চেয়েছিল, আমাদের মধ্যে নরেনের মত আর কেউ ছিল কি না; আর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারা যায়, এমন কে কে ছিল। নরেন যে সকল খবর পুলিসকে দিচ্ছে, তা বাইরে আমাদের লোককে জানিয়ে সাবধান করা নিতান্ত আবশ্যক। খবর জানবার অন্য উপায় না থাকলে, নরেনের জুড়ীদার approver অর্থাৎ corroborator হওয়ার ভাণ ক'রে নরেনের সঙ্গে ভাব করা উচিত কি না; আর নরেনকে হত্যার উপায় কি হ'তে পারে।

অনেক গবেষণার পর প্রথমে স্থির হয়েছিল, নরেনকে হত্যা করার ভার—বাইরে যে কয় দল আমাদের বৈপ্লবিক বন্ধু ছিল, তাদের ওপর দেওয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকেও বারীন ঐ ব্যবস্থাই করেছিল। চার-পাঁচ দল পৃথক্‌ভাবে চেষ্টা করলে যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে, সে আশা তখনও ছিল। জেলে আমাদের মধ্যে নরেনের মত দুর্ব্বল-প্রকৃতির কেউ ছিল ব'লে তখন তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। আর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ব'লে যে কয় জনকে মনে করেছিল, তাদের অধিকাংশই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে-ছোক্‌রা, আর বাকী নেহাৎ ভাল মানুষ বললে যা বুঝায়, তাই।

খুব বিশ্বাসী, কৌশলী, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি এবং স্মরণশক্তিসম্পন্ন অন্য ব্যক্তির অভাবে সত্যেনই গোঁসাইর corroboratorএর পালা অভিনয়ের ভার নিয়েছিল। তার যে অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল, তা পূর্ব্বে বলেছি। এই দুরূহ কায করতে গেলে যে শেষ অবধি তার মহৎ উদ্দেশ্য লোক অজানিত থেকে যেতে পারে, আর নরেনের মত সে-ও স্বপক্ষদ্রোহী ব'লে চিরদিন লোকমতে ঘৃণিত হয়ে থাকবে, তা বুঝে সুঝেই অকুণ্ঠিতভাবে এতে রাজী হয়েছিল। তাকেই যে নরেনের ঘাতুক হ'তে হবে, তা সে তখনও ভাবেনি।

সত্যেনের সঙ্গে যার এই পরামর্শ স্থির হয়েছিল, সে নিজে কিন্তু সব বাজে কাযের ভার নিয়েছিল। যেমন জনকতক চতুর বিশ্বাসী ছেলে-ছোকরার দ্বারা একটা গোয়েন্দা বিভাগ গ'ড়ে, কার মতি-গতি কখন্ কি হচ্ছে না হচ্ছে, খোঁজ রাখা এবং সত্যেনকে তা জানান; আর সকলে মনে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাব জাগিয়ে রাখা।

নরেনকে কেউ মেরে ফেলুক, অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত বাবু প্রভৃতি কয়েক জন ছাড়া প্রায় অধিকাংশের মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাঙ্গালাদেশে যে ক'টি বৈপ্লবিক গুপ্তদল ছিল, বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার প্রায় সকল দলের ওপর নরেনকে হত্যার ভার দেওয়া হ'ল। তিন চারটি দল প্রায় একই ধরণের উত্তর দিয়েছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের দলও ছিল। তার মর্ম্মটা ছিল—'গোঁসাই হত্যার চাইতে তাদের হাতে বিস্তর গুরুতর কায ছিল, গোঁসাইর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।' অর্থাৎ তার দল ভেঙ্গে দিয়ে দুর্গানাম জপ করছিল। বাকী যে দু'একটি দল কোন উত্তর দেয়নি, তারা চেষ্টা করলেও করতে পারে আশা ক'রে, কোথায় কি ভাবে চেষ্টা করবে, তার একটা লম্বা প্ল্যানও দেওয়া হয়েছিল।

ইতোমধ্যে হঠাৎ এক দিন জেলে আমাদের যে যেখানে ছিল, সকলকে নিয়ে ছ'ডিগ্রী নামক একটা সঙ্কীর্ণ যায়গায় রাখা হ'ল। উদ্দেশ্য—একসঙ্গে থাকলে, নরেন, আমাদের মধ্যে যার কাছে যত গুপ্ত তথ্য আছে, তা সংগ্রহ ক'রে পুলিসকে দিতে পারবে। নরেন তখন জানত না যে, আমরা তাকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তা বুঝে ছিল। কাযেই পুলিসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। আর নরেনকে আমরা মেরে ফেলতেও পারি, এ সন্দেহও সম্ভবতঃ হয়েছিল।

আমাদের মধ্যে দু এক জন বালক, বিশেষ ক'রে সুশীল তাকে গলাটিপে কিংবা যে ইট দিয়ে আমাদের অস্থায়ী পায়খানা তৈরী হয়েছিল, তার একখানা তার মাথায় ঠুকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। নির্দ্দোষ অরবিন্দ বাবুকে তাতে জড়িয়ে ফেলবার ভয়ে বারীন আদি বয়োবৃদ্ধরা তাতে অসম্মতি জানান। তাদের এক জন প্রাণের কথা খুলে বলেছিল, 'চোখের ওপর একটা জ্যান্ত মানুষ খুন হবে, ওঃ বাবা রে, দেখব কেমন ক'রে!' দুষ্টু ছেলেরা কিন্তু নরেনের প্রতি এমন একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করত যে, নিজে সত্ত্বেও সামান্য ঝগড়ার মুখে তাকে মেরে ফেলতেও পারে ব'লে তখন মনে হয়েছিল! বালক কৃষ্ণজীবন কিন্তু নি ঝগড়া বাধিয়ে তাকে লাথিও মেরেছিল। এর দু এ

দিন পরেই হাঁসপাতালের কাছে দু জন য়ুরেশীয়ান কয়েদীকে নরেনের শরীররক্ষক নিযুক্ত ক'রে তাকে পৃথক্‌ভাবে আরামে রাখা হয়েছিল। আর আমাদের বাকী সকলকে ২৩নং ওয়ার্ডে একসঙ্গে রাখা হ'ল। এটা একটা প্রকাণ্ড ঘর ছিল।

যে কদিন গোঁসাই আমাদের সঙ্গে ছিল, বারীন ও দেবব্রত বাবু তার প্রতি বিশেষ বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়েছিলেন ও সে প্রায় সর্ব্বদা তাঁদের সঙ্গে থাকত। শুনেছিলাম, দেবব্রত বাবু will force প্রয়োগ ক'রে, আর বারীন প্রেমের দ্বারা নাকি তাকে জয় করতে চেষ্টা করেছিল।

যাই হোক্, আগেই বলেছি, সত্যেন হাঁসপাতালে থাকত, নরেনকে নিকটে পেয়ে তার সঙ্গে পূর্ব্ব-পরামর্শমত আলাপ সুরু ক'রে দিয়েছিল। ক্রমেই আমাদের মধ্যে প্রচার হ'ল, সত্যেন নরেনের corroborator হ'তে যাচ্ছে। এ খবর কোর্টে উকীল বাবুদের মারফৎ বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল।

এ দিকে সত্যেন যেন ভীষণ দণ্ডের ভয়ে অস্থির হয়ে একটা গতি ক'রে দেওয়ার জন্য কেঁদে-কেটে নরেনকে ধ'রেছিল। নরেন সে কথা পুলিসের কর্ত্তাকে জানাল। তিনি অনেক দিন ধ'রে সত্যেনকে নাড়াচাড়া দিয়ে,অবশেষে খুসী হয়ে সত্যেনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন; আর তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার জন্য নরেনকে উপদেশ দিলেন। সত্যেন নরেনের প্রদত্ত খবর যথাস্থানে পাঠাতে লাগল। তিন মাস এইভাবে চলেছিল।

এ দিকে আমরা ২৩ নং ওয়ার্ডে ৩৫ কি ৩৬ জন মিলে নরক গুলজার ক'রে তুলেছিলাম। সকলের মন ফুর্ত্তিতে রাখবার জন্য নিত্য নতুন রকম আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার উদ্ভাবিত হ'তে লাগল। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু' তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমোবার উপায় ছিল না।

এই ফুর্ত্তিবিধান জন্য সেখানে সুরুচি-কুরুচি, শোভন-অশোভন, সঙ্গত-অসঙ্গত কোন বিচারই ছিল না। ঋষিতুল্য অরবিন্দ বাবুকে কখন কখন নলচে আড়াল দেওয়ার চেষ্টা-মাত্র হ'ত; কিন্তু অনেক সময়ে তাঁকেও টেনে আনা হ'ত। তার পর ভোজনের যে রকম বিরাট ব্যাপার হ'ত, তার বর্ণনা দেওয়ার স্থান এখানে হবে না। বাঙ্গালার তাণ্ডবলীলার সংক্রামকতার প্রভাবে বম্বেতে যখন ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল, বাঙ্গালা তখন কায়মনোবাক্যে পেয়-বর্জ্জিত চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য আদি ষোড়শ উপচারে আমাদের মত বীরগুলির পূজা ক'রে বীর-পূজার সাধ মিটাচ্ছিল। এই ত গেল এক দিক।

অন্য দিকে ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, দলাদলি, গালাগালি, আবার কোলাকুলি, ঢলাঢলিরও অভাব ছিল না। তার ওপর ধর্ম্মপ্রচার, সাধন, ভজন, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, শিক্ষা, দীক্ষা, ভগবদ্দর্শন, উপলব্ধি, সমাধি ইত্যাদিও ছিল। এহেন সদনুষ্ঠানেরও বিঘ্নস্বরূপ ছিল দু' এক জন পাষণ্ড, নাস্তিক, যারা ধ্যানভঙ্গ ক'রে দিত, ব্যাখ্যা, শিক্ষা-দীক্ষার কদর্থ ক'রে ছড়া আর গান বাঁধত, নকল করত, ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকত, আর মেটিরিয়ালিজমের গৌরব ঘোষণা করত। ধর্ম্মগ্রন্থ চুরি ক'রে লুকিয়ে রাখত, আরও কত কি করত। কার গীতা ছুড়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল কানাই। বিজয় ভট্টাচার্য্য ধ্যানস্থ এক জনের ঘাড়ে চেপে বসেছিল; সে চোখ খুলে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এ কি?"

"আমি এসেছি।"

"তার মানে?"

"তুমি ডেকেছিলে যে!"

"তোমাকে?"

"হাঁ, গো হাঁ, আমাকে নয় ত কি, আমার মধ্যে যিনি আছেন, তাঁকে?"

"তুমি কি senseএ এ কথা বলছ?"

"আমি যে ভাই nonsense?"

জেলখানার মধ্যেই ক'জন অবতার হ'তে হ'তে পাষণ্ডদের দৌরাত্ম্যে তখন থেকে গেছলেন। নানারূপে "তিনি" ভক্তদের জন্য জেলখানায় আসতেন। কেউ ধ্যান ভেঙ্গে গেলে বাস্তব নাকে পদ্ম-গন্ধ, কখনও বা অন্য কিছুর গন্ধ পেতেন; বাস্তব কানে শুনতেন কাঁকণের কন্‌কন্, মলের ঝিনিরিনি, নূপুরের শিন্‌জিনি, আরও কত কি ক্রমে নাকি মিলিয়ে যেত। কেবল অরবিন্দ বাবুর ও সব কোন কিছু ছিল ব'লে শুনিনি। এত হট্টগোলের মাঝেও তাঁর ধ্যান-ধারণার কোন বিঘ্ন হ'ত ব'লে তখন মনে হয়নি।

আমাদের মধ্যে ভক্ত ছিল অনেকগুলি। ভক্তি নিবেদন করতেই ইহলোকে তাদের আবির্ভাব; সে জন্য তাদের একটি ভক্তবৎসল গুরু (keeper of conscience) না হ'লে চলত না। তাঁকে সেবা ক'রে, তাঁর ইঙ্গিতে কায়-মনোবাক্যে সব কিছু ক'রে, তাঁর ভাল-মন্দ সব কিছুতে

সমভাবে মুগ্ধ হ'ত। তাঁর আদর-অনাদর, স্নেহ-বিরক্তি, কৃপা-বিদ্রূপ সমভাবে গ্রহণ ক'রে কৃতকৃতার্থ হওয়াই তাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব ছিল।

আর ক'জন ছিলেন, ঐ রকম কতকগুলি ভক্ত না হ'লে তাঁদের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠত; তাঁরা ভক্ত সংগ্রহের জন্য নিয়ত লালায়িত হতেন। মুর্গা যেমন বাচ্চাগুলিকে চোখে চোখে কাছে কাছে রাখে, আর চিলের ছায়ামাত্র দেখলে অবিলম্বে ডানার মধ্যে তাদের ঢেকে ফেলে, এই ভক্তবৎসলরাও ঠিক সেই রকম শিষ্যদের চোখের আড়ালে যেতে দিতেন না, পাছে অন্য কেউ ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়। এই গুরুরা আপন আপন ভক্তদের কাছে মূর্ত্তিমান্ স্বদেশ। এই স্বদেশ-প্রতিম গুরুদের প্রতি ভক্তিই তাদের কাছে স্বদেশ-ভক্তি। এই গুরু-দ্রোহিতাই তাদের কাছে স্বদেশ-দ্রোহিতা। অন্য কোন রকম স্বদেশ-দ্রোহিতার ধারণা তাদের ছিল না। গুরু স্বদেশ-দ্রোহিতার কায করলে সেই দ্রোহিতাকে স্বদেশ-প্রেম ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে তারা ধন্য হ'ত। আমাদের মধ্যে এক জন গুরুকে, শিষ্য সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, ভারতবর্ষ আর তাঁর নিজের মধ্যে কোন প্রভেদ তিনি বুঝতে পারেন না। তখন ভাবে ভক্তদের চোখের জলে বুক ভেসে গেছল।

এই ভক্তসংগ্রহের প্রবৃত্তি জেলের ভেতরেও এত উৎকট হয়ে উঠেছিল কেন, তার একটা কারণ কেউ কেউ নাকি অনুমান করত যে, যারা আদালতের বিচারে দণ্ডের যত অধিক গুরুত্ব আশঙ্কা করত, তারাই খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এমন ভক্ত সংগ্রহের আবশ্যকতা তত অধিক উপলব্ধি করেছিল। কারণ, তারা জানত, ভক্তরা দিন কয়েক পরে খালাস হয়েই লোকসমাজে গুরুদের মন্দটাকে মহৎ ব'লে ব্যাখ্যা, আর ভালকে শতগুণ অতিরঞ্জিত ক'রে, বিশেষতঃ তাঁকে অতি বড় ধার্ম্মিক দেশ-হিতৈষী ব'লে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশানক্রমে কীর্ত্তন করিতে থাকিবেক।

তার পর বার্লী সাহেবের এজলাসে নরেনের এজাহার সুরু হ'লে পূর্ব্ব-কথিত দুষ্ট বালকরা খুব উত্তেজিত হয়ে যা পরামর্শ স্থির করেছিল, তার মর্ম্ম এই;—

আমাদের গ্রেপ্তারের সময়, খানাতল্লাসীতে প্রাপ্ত সমস্ত বামাল, সামান্য কেরোসিন বাক্সে দু'তিন আনা দামের তালা বন্ধ ক'রে আদালতে রাখা হয়েছিল। তারই ওপর আমরা সকলে বসতাম। ছেলেদের ধারণা, তাতে অনেক কিছু অস্ত্র-শস্ত্র নাকি ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সকল বাক্স ভেঙ্গে, অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে একই সময়ে দু' জন সার্জ্জেণ্টের রিভলবার কেড়ে নিয়ে, দরকার হ'লে বার্লী 'সাহেবের' কাঠ-গড়ার রেলিং ভেঙ্গে, নবেনকে মেরে ফেলে, গরাদে-শূন্য জানালা টপকে আর সিঁড়ি দিয়ে যে দিকে পারে পালাবে। পূর্ব্বোক্ত কারণের উল্লেখ ক'রে তাদের এ দুষ্প্রবৃত্তিতেও বারীন বাধা দিয়েছিল। কিন্তু অরবিন্দ বাবুকে জড়াবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও জেল ভেঙ্গে পালাবার মতলব বারীনেরই মাথায় ঢুকেছিল। কারণ, সে বুঝেছিল, রামসদয় বাবুর প্রতিশ্রুত পূর্ব্বোক্ত নিষ্কৃতির আশা তখন সুদূরপরাহত। আমাদের অধিকাংশই অর্থাৎ ছ' সাত জন ছাড়া সবাই ছিল তার ভক্ত। দু'চার জন যাঁরা পালাবার মতলবে রাজী ছিলেন না বা যাঁরা মতলবটার কিছু হের-ফের করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কথা তাই গ্রাহ্য হয়নি। বাইরের দু এক দলও নাকি এই পালাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজী ছিল। মনোহর একটা প্ল্যান অনেক ভৌগোলিক জ্ঞান খাটিয়ে, আর উর্ব্বর মস্তিষ্ক ঘামিয়ে প্রস্তুত হ'ল। এমন কি, বাঙ্গালার পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলের পথ ধ'রে, বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের ঠিক মাঝ দিয়ে, একদম সোজা কাবুল হয়ে পার্‌সিয়াতে পৌছি-বার পথে আমাদের কি কি চিজ আবশ্যক, তারও সুদীর্ঘ তালিকা বাইরের সাহায্যকারীদের কাছে পাঠান হয়েছিল। তালিকাতে কিঞ্চিৎ আফিং ও দড়ী-কলসীর কথাও লেখা ছিল। হলফ ক'রে বলছি, এ আমি নিজ চোখে দেখেছি।

পালাতে হ'লে নাকি দৌড়তেই হয়; একটু আধটু নয়, আবার পার্‌সিয়া তক। তাই সেই ওয়ার্ডের মধ্যে ঘুরে-ফিরে দৌড়ের রিহার্শেল দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত দৌড়েছিল। অনেকের পায়ে কুঁচকি, সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ ব্যথা, কারও কারও ১শ ৬ ডিগ্রী জ্বরও হয়েছিল, এতে আমিও বাদ পড়িনি।

জেল ভেঙ্গে পালাবার জন্য জেলের ভিতর পনেরটা রিভলবার পাঠিয়ে দিতে বাইরের দলকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। ক্রমে নরেনকে হত্যা করবার মতলব চাপা প'ড়ে গেছল। বাইরে যাদের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল, তারাও তা ভুলে গেল।

সত্যেন এই সকল বন্দোবস্তের কথা শুনে জেলের মধ্যে আমাদের কাছে প্রথম রিভলবারটা এলেই তা চুরি ক'রে অন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে, নিজেই নরেনকে মারবে ব'লে স্থির ক'রে ফেল্‌ল। কারণ, সে জানত, কর্ত্তারা টের পেলে নিশ্চয় বাধা দেবেন।

সুশীলও নরেনকে হত্যা করবার জন্য যে কি রকম অস্থির হয়েছিল, তা সত্যেন জানত; এ সব কাযে ছেলেছোকরাদের পাঠিয়ে, লিডারদের safe distanceএ থাকা যে আমা-দের গুপ্তসমিতির রীতি, তা সে অনেকবার হৃদয়ঙ্গম করে-ছিল। সেই সময়ের আগের বছরে মেদিনীপুরে স্মরণীয় তাণ্ডব কনফারেন্সে সে-ই প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিল এবং তাতে গরম দল না কি তারই কর্ম্মকুশলতায় জয়যুক্ত হয়েছিলেন, তার পরে বিখ্যাত সুরাট কংগ্রেসে তার প্রত্যুৎপন্নমতিতে ও সৎসাহসে বাঙ্গালী গরম দলের স্পর্দ্ধা রক্ষিত হয়েছিল, আর সে মেদিনীপুর বৈপ্লবিক গুপ্তকেন্দ্রের কর্ণধার ছিল, কাযেই সে যে এক জন শক্তিমান বৈপ্লবিক লিডার, তা বিলক্ষণ জেনেও তবু কেন নিজে এই হত্যার ভার নিজের ঘাড়ে নিয়ে, লিডারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল, তা বোঝা যায় না।

জেলের ভিতর বাইরে থেকে রিভলবার আনা তখন খুবই সহজ ছিল। কারণ, তখন এখনকার মত কড়াকড়ি একবারে ছিল না। এত সোজা ব্যাপার ছিল বলেই, কি ক'রে রিভলবারটা এসেছিল, তা জানবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে অনেকের হয়নি; আমারও হয়নি। কিন্তু তখন বাইরে বৈপ্লবিক দলের পক্ষে পনেরটা রিভলবার জোগাড় করা মুস্কিল ছিল, তাই প্রথমে সেকেলে মরচে-ধরা প্রকাণ্ড বড় একটা মাত্র এসে পড়ল। সেটা সাবধানে রাখবার ভার পড়ল সত্যেনের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর ওপর। আমাদের মধ্যে সেটার অস্তিত্ব যখন সকলে ক্রমে ভুলে গেছল, তখন সে এক দিন সকলের অজ্ঞাতে হাঁসপাতালে সেটা নিয়ে গিয়ে সত্যেনকে দিয়েছিল। তার টিগারটা এত শক্ত ছিল যে, তার পক্ষেও রিভলবার ব্যবহার সহজ হবে না ব'লে বুঝে-ছিল। অগত্যা আর একটা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

মেদিনীপুরে সত্যেনের সন্ধানে যে সকল রিভলবার ছিল, তা আনাবার চেষ্টা ক'রে জেনেছিল, সেখানকার সমস্ত বিপ্লবী কর্ম্ম অবতারে পরিণত হয়েছে। কারণ, ঐ সময় সরকারের ধারণা হয়েছিল, মেদিনীপুরেই বিপ্লবীদের একটা ভীষণ আড্ডা আছে এবং তারা অত্যন্ত practical, তাই মেদিনীপুরবাসীকে একবারে দমিয়ে দেওয়ার জন্য মেদিনী-পুরের শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে বোধ হয় যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে যে ৩০।৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের নাম প'ড়ে বুঝেছিলাম, যিনি গ্রেপ্তারের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তিনি এক জন প্রকৃত রসি-কতার অবতার ছিলেন। মেদিনীপুরের ব্যাপারে কিন্তু সরকার বাহাদুর যে অক্ষয় কলঙ্ক অর্জ্জন করেছেন, তা অন্যত্র বলবার ইচ্ছা রইল।

সত্যেনের উক্ত বন্ধু হাঁসপাতালে সে দিন বিনা অনু-মতিতে ছিল ব'লে বিতাড়িত হয় এবং তার হাঁসপাতালে যাওয়া আবার বিশেষ ক'রে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

এ দিকে প্রায় প্রতিদিনই হাঁসপাতালে এসে সত্যেনের সঙ্গে নরেন দেখা করত। নরেনের প্রদত্ত সমস্ত এজাহার ঠিকমত মনে থাকছে না ব'লে ভাণ ক'রে কথাগুলা সব উল্টে-পাল্টে নরেনকে সে শুনাত; আর নরেন নিজের এজাহার তাকে পড়াত। যাতে খেলাপ এজাহার না হয়, সে জন্য বুঝিয়ে পড়িয়ে সাবধান ক'রে দিত। অবশেষে আরও সময় নেওয়ার জন্য পুলিস সাহেবকে সত্যেন বলেছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন মুখে এজাহার দিতে গেলে, গোলমাল হয়ে যাবে ব'লে তার ভয় হয়, তাই লিখে নিয়ে গিয়ে এজলাসে প'ড়ে দেওয়ার অনুমতি পেলে তার পক্ষে সুবিধা হয়। পুলিস সাহেব সন্তোষের সহিত হুকুম দিয়ে-ছিলেন। তাই কয়েক দিন ধ'রে হাঁসপাতালে ডিস্‌পেন-সারীতে দিন একটু একটু ক'রে নরেনের সামনে ব'সে লিখতে সুরু করেছিল। যে দিন কোর্টে যেত, সে দিন সকালে এই লেখার ব্যাপার চলত। অন্যথা বিকালেও চলত।

দেবব্রত বাবু, ইন্দ্রনাথ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের পরে ধৃত আট জনের তখনও বার্লি সাহেবের কোর্টে মোকর্দ্দমা চলছিল, আমরা এর আগেই সেসন-সোপর্দ্দ হয়ে গেছলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

সংস্কৃত সাহিত্য

২

কালিদাসের দুই জন পাটরাণী

ইচ্ছা হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান কতিপয় চরিত্রের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি, কিন্তু এ পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ ও পিচ্ছিল, পদে পদে স্খলনের সম্ভাবনা।

মহাকবি কালিদাসের কবিত্ব-সৌন্দর্য্যের যতই আলোচনা করি, ততই আনন্দ ও বিস্ময়ে হৃদয় ভরিয়া যায়, কবির উদ্দেশে মস্তক আপনিই নত হইয়া আসে। আজ কবির অক্ষয়-আলেখ্য দুই জন পাটরাণীর কথা বলিব। ইঁহাদের এক জনের নাম ধারিণী, অপরটির নাম ঔশীনরী। প্রথমটি মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের ও দ্বিতীয়াটি বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের প্রতিনায়িকা।

ধারিণী বিদিশার সম্রাট মহারাজ অগ্নিমিত্রের মহিষী, আর ঔশীনরী প্রতিষ্ঠানপতি রাজা পুরূরবার প্রধান মহারাণী। এই দুই রাণী ই,—অথবা শুধু ইঁহাদের কেন, দুর্ভাগ্য—ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিকাংশ রাজামহারাজ এবং লক্ষ্মীর আদরের দুলালগণের সহধর্ম্মিণীদের ন্যায়, এই দুই রাণীরই প্রাণাধিক—রাজা অগ্নিমিত্র ও পুরূরবা একনিষ্ঠ পত্নীব্রত ছিলেন না।

ধারিণী

মহারাজ অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে ইরাবতী নামে একটি পরমা রূপসী পরিচারিকা ছিল, বড় বংশের মেয়ে না হইলেও সৌন্দর্য্য ও নৈপুণ্যের প্রভায় তাহার আর সমস্তই ঢাকা পড়িয়াছিল। অগ্নিমিত্রের শ্যেন-দৃষ্টি ইরাবতীর উপর পড়িল, কল্যকার পরিচারিকা আজ ছোটরাণী হইলেন। মনে মনে যে যাহাই ভাবুক, মুখে সবাই রাজার এই কায মানিয়া লইল। পাটরাণী ধারিণী প্রৌঢ়ত্বে উপনীতপ্রায়। পুত্র বসুমিত্র যুবরাজ, মস্ত বীর, আর ধারিণী স্বয়ং বিরাট রাজসংসারের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সকলেই তাঁহাকে দেবীর মত দেখে। ধারিণী দেখিলেন, আজকাল রাজার যেন তাঁহার উপর খাতিরটা একটু বাড়িয়া যাইতেছে। সুশীল অগ্নিমিত্র পাটরাণীর কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাযই করেন না। রাণীই যেন রাজার সব। চতুরা পাটরাণীর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। ক্রমে বাঁধ ভাঙ্গিল। আবরণ খুলিল। ইরাবতী আসিয়া বড়রাণীর পাশে দাঁড়াইলেন। এক কথায় সুয়োরাণী হইয়া বসিলেন। ধারিণী কিন্তু একবারে উদাসীন। যেন কিছুই হয় নাই। বরঞ্চ ইরাবতীর নৃত্য-গীত, ইরাবতীর আমোদ-আহ্লাদ, রহস্য-কৌতুক যেন ক্রমে ধারিণীর সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। ইরাবতীকে পাটরাণী ধারিণী একবারে উচ্চাসনে উঠাইয়া দিলেন। ঘুড়ির সুতা যতটা পারেন, নাটাই হইতে ছাড়িয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ইরাবতী রাজবাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সরল হৃদয়, অকপট ব্যবহার ও বিনয়-মধুর আলাপ-আপ্যায়নে সারা রাজসংসার বিমুগ্ধ হইল। প্রবীণা পাটরাণী পূজা-পার্ব্বণ লইয়াই ব্যস্ত। রাজা ইরাবতীর অতুল প্রণয়ে পরম পরিতৃপ্ত জানিয়া ধারিণীর যেন আর আনন্দ ধরে না। রাজা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

একটা ঘোর অন্তর্বিপ্লবে বিদর্ভের রাজসংসার ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই রাজসংসারের এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা আসিয়া পাটরাণী ধারিণীর কাছে পৌঁছিল। দস্যুগণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে অগ্নিমিত্রের সীমান্ত-দুর্গের রক্ষাকর্ত্তা তাহাকে উদ্ধার করিয়া পাটরাণীকে উপহার পাঠাইয়া দিলেন। অমন নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে পাইলে পাটরাণীর আনন্দের সীমা থাকিবে না, ভাবিয়া রাজকর্ম্মচারী রাণীর ভ্রাতা দুর্গরক্ষক তাহাকে পাঠাইল। মেয়েটি সত্যই খুব বুদ্ধিমতী। সে যে রাজার কন্যা, এ কথাটা সে গোপন করিল। নিতান্ত গরীবের মেয়ের মত সে পাটরাণীর নিকট রহিল। নাম তার মালবিকা। ধারিণী মেয়েটিকে পাইয়া দেখিলেন, রূপে এও বড় কম নয়, যৌবনে রূপগর্ব্বিতা ইরাবতীকেও ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। তবে নৃত্যগীত ও অন্যান্য শিল্পে ইরাবতীর অন্ততঃ সমকক্ষ করিতে পারিলেই এই শাণিত অস্ত্রের দ্বারা ইরাবতীর সুখের

পারিজাতবৃক্ষ ছেদন করা যাইবে। রাজার যখন বাসনা প্রবল হইয়াছে, তখন আর একটি পাইলেই ইরাবতীর মোহজাল ছিন্ন হইবে। তাই রাণী ইহাকে নিজের সঙ্গীত-শিক্ষকের বাটীতে রাখিয়া গোপনে নৃত্য-গীত শিখাইতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, একবারে ষোল কলায় পূর্ণ করিয়া তবে এই মালবিকারূপী পূর্ণিমার শশী রাজার গলায় দুলাইয়া দিবেন, ইরাবতীর সুখের স্বপ্ন কুজ্ঝটিকার ন্যায় কোথায় মিলাইয়া যাইবে। নিজের পদোচিত মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহারাণী ধারিণী ধীরে ধীরে এইরূপে ইরাবতীর সৌভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনাইয়া আনিতে লাগিলেন। ইরাবতী রাজার যতই অনুগ্রহের পাত্রী হউন না কেন, ধারিণী কিন্তু জানিতেন যে, রাজ্যের মধ্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে, ভারত-সিংহাসনের তিনি কোন্ স্থানের অধিকারিণী। রাজা অগ্নিমিত্র শত দোষ করিলেও তাঁহার স্বামী, ইহপরকালের দেবতা, সুতরাং ক্ষমার্হ,—এ কথা ধারিণী নিয়তই মনে রাখিতেন। ধারিণী জানিতেন যে, যাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, তাঁহার অত্যাচার, অবিনয় আমি ছাড়া আর কে সহ্য করিবে? তাই রাণী রাজার সকল ব্যবহারই অবনত মস্তকে মানিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি যতই সহিষ্ণু হউন না কেন, তিনি নারী—মানবী, দেবী নহে। তাই তাঁহাতে মানব ধর্ম্মের—নারী-স্বভাবের সহজ স্ফুরণ হইবেই হইবে। তাই প্রগল্‌ভা ইরাবতীর প্রতি ধারিণীর হৃদয়ে অজ্ঞাত-সারে যেন কেমন একটা প্রতিকূল ভাব আসিয়া উদিত হইল। সে ভাব হিংসা বা ঈর্ষ্যা নহে। সে ভাব প্রতিবিধানেচ্ছা বা ঘৃণা নহে, সতী রমণীর হৃদয়ে যেন কেমন একটা ব্যথার ভাব—বেদনার ভাব—আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বগুণসম্পন্না দুঃখিনী মালবিকাকে অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্গীতাচার্য্যের সাহায্যে ধারিণী নৃত্য-গীতাদিতে পরম নিপুণা করিয়া তুলিলেন; মেধাবিনী মালবিকার অনুকূল বয়ঃক্রম ও ক্রমে তাহাকে রাজরাণীর উপকরণে সাজাইয়া তুলিল। ধারিণী অতি সতর্কতার সহিত মালবিকাকে উদারপ্রাণ অগ্নিমিত্রের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতেন। রাণীর সঙ্কল্প ছিল যে, যখন তিনি বুঝিবেন—মালবিকা সর্ব্ববিষয়ে বিদিশার অধীশ্বরী হইবার যোগ্যা হইয়াছে, তখনই রাজার সমক্ষে তাহাকে হাজির করিবেন, তৎপূর্ব্বে নহে। ধারিণী বীরপুত্রের জননী, দিগ্‌বিজয়ী পুত্রের গর্ভধারিণী, সুতরাং বীরপ্রসবিনীসুলভ গর্ব্বে সততই তাঁহার বক্ষ স্ফীত, গৌরবান্বিত। প্রৌঢ়া মহারাণী জানিতেন যে, মালবিকার সহিত রাজার প্রণয় বা পরিণয় হইলে প্রকৃতপক্ষে তরুণী মালবিকাই বিদিশার অধীশ্বরী হইবেন, অগ্নিমিত্রের হৃদয়ের অধিদেবতা হইবেন। তবুও তিনি যেমন বুঝিলেন যে, ইরাবতী-বিমুগ্ধ রাজা ক্রমে সীমালঙ্ঘন করিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র বসুমিত্রের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল করিতেছেন, অমনই মাতৃত্বময়ী ধারিণী আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, হাসিতে হাসিতে মালবিকাকে ধরিয়া রাজার হাতে তুলিয়া দিলেন। রাজকন্যা মালবিকার জ্বলন্ত প্রভায় ক্ষুদ্র ইরাবতী-পতঙ্গ ঝলসিয়া গেল। ধারিণী নিজে পাটরাণী, আর তাঁহার শ্বশুর, যিনি অগ্নিমিত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তিনি এখনও জীবিত, পুত্র দিগ্‌বিজয়ী বীর, আভিজাত্যবতী জননীর উপযুক্ত সন্তান, সুতরাং ধারিণীকে যে রাজা অগ্নিমিত্র এক কথায় ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এ তত্ত্ব ধারিণী বেশ বুঝিতেন। কিন্তু তথাপি তিনি স্বামীর সুখের অন্তরায় হন নাই। বরং প্রথম প্রথম, যখন যতটুকু পারিয়াছেন, ইরাবতীহৃদয়কে—হৃদয়েশ্বরের অভিপ্রেত-সিদ্ধির সহায়তায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

ধারিণী ইরাবতীকে এক সময়ে বড় ভালবাসিতেন। পরিচারিকা ইরাবতী রাজার কৃপায় যখন অন্যতরা মহিষী হইলেন, ধারিণী তখনও কিছু বলেন নাই। প্রত্যুত সোদরার ন্যায় ইরাবতীকে আদর-যত্ন করিয়াছেন। ধারিণী নিজে পাটরাণীর হিরন্ময় কিরীট মস্তকে পরিতেন বটে, কিন্তু অগ্নিমিত্রের প্রণয়রত্নে দিন দিন বঞ্চিত হইতেছিলেন। ইহাতেও তিনি দৃক্‌পাত করেন নাই। পরে যখন দেখিলেন, রাজার ঐরাবত-উন্মাদ ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে, আর দুই দিন পূর্ব্বের পরিচারিকা ইরাবতীও ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইতেছে, তখন রাণীর আসন টলিল। রাণী যখন বুঝিলেন যে, ইহাতে রাজ্যের ঘোর অমঙ্গলের সম্ভাবনা, আর দুই দিন পরে তাঁহার পুত্র বসুমিত্র যে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন, সে সিংহাসনের মর্য্যাদা-ক্ষতির সম্ভাবনা, তখন বীরজননী, বীরপত্নী ধারিণী প্রতীকার-পরায়ণা হইলেন। রাণী জানিতেন যে, তাঁহার হৃদয়েশ্বর অগ্নিমিত্রের হৃদয়ের কোন্ অংশ সবল, কোন্ অংশই বা দুর্ব্বল! তিনি আরও জানিতেন,—অভিমানিনী ইরাবতীর হৃদয়ই বা কতটা বলিষ্ঠ, তাই যখন বুঝিলেন—আর কালক্ষেপ করা উচিত নহে, এক্ষণে ফিরাইতে না পারিলে, আর তাঁহার পতিদেবতার পতিত হৃদয়ের

উদ্ধার করিতে পারিবেন না, তখন ধীরে ধীরে মালবিকারূপ তীব্র ও অমোঘ ঔষধের,—যে ঔষধ সেবনের লালসায় তাঁহার স্বামী স্বতই অভিলাষী, সেই শক্তিশালী ঔষধের প্রয়োগ করিলেন। ইরাবতী সত্যই ধারিণীর অতিশয় প্রিয় ছিলেন, কিন্তু রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ছিলেন, তাই প্রিয়তমের হিতার্থে, নিদিশার ভবিষ্য সম্রাটপুত্র বসুমিত্রের হিতার্থে চিরদিনের মত আত্মসুখের, তথা ইরাবতীর প্রিয় বিসর্জ্জন দিলেন। রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিয়া অবিবাহিতা "ছোটরাণী" ইরাবতীর দুর্ভাগ্য যবনিকার অন্তরালে নিজে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মানিনী ইরাবতী—আত্মবিস্মৃত ইরাবতী রাজাকে পাটরাণীর পরিচারিকা মালবিকায় অনুরক্ত দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ও অভিমানভরে পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছেন; ইরাবতীর মনে ছিল না যে, অল্পদিন পূর্ব্বে তিনিও এক অতি নগণ্য পরিচারিকা ছিলেন। মালবিকার বিবাহ-সভায় আবার পাটরাণী ধারিণী দাসীর দ্বারা ইরাবতীকে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। হতভাগিনীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে লবণ নিক্ষেপ করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। কবিকেশরী কালিদাস ধারিণী-চিত্রে একাধারে নানা গুণের সন্নিবেশ করিয়াছেন। ভারতেশ্বরীর যেরূপ হওয়া উচিত, ততোধিক গুণ-গরিমায় ধারিণীকে বিমণ্ডিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইরাবতী-হত্যায় তাঁহাকে লিপ্ত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছেন। অবশ্য ধারিণীকে কবি আদর্শ-নারী গঠনে কখনই প্রয়াস পান নাই, পাইলে হয় ত নাটকীয় বস্তু ভিন্ন প্রকার হইত। ধারিণীর সমস্তই যে প্রকৃত রাজরাজেশ্বরীর অনুরূপ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন তিনি শুনিলেন, পুত্র বসুমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞের তুরঙ্গরক্ষায় ব্যাপৃত ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে ব্যস্ত, তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আপনারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করুন, আপনাদের মাসিক ৮ শত সুবর্ণমুদ্রা বৃত্তি বরাদ্দ হইল।' কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, নিজেই যেন তিনি রাজ্যের সর্ব্বময়ী। যখন ছোটরাণী ইরাবতী আসিয়া তাঁহার নিকটে মালবিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন, তখন পাটরাণী অবিচারিত হৃদয়ে মালবিকাকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যেন তাঁহার কোনরূপ পক্ষপাত নাই, তিনিই যেন রাজ্যের—তথা রাজা অগ্নিমিত্রের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্রী। রাজ্যের মঙ্গল কামনাতেই হউক, আর পুত্র বসুমিত্রের ভবিষ্যৎ সিংহাসনের হিতৈষণাতেই হউক, অথবা স্বীয় নারী-হৃদয়ের নিগূঢ় ক্ষতের তাড়নাতেই হউক, পাটরাণী ধারিণী যে ইরাবতীর সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবার নিমিত্ত একটা বিরাট ষড়্‌যন্ত্র করিয়া মালবিকাকে স্বামীর লোলুপদৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নারী-হৃদয়ের প্রবৃত্তি সহজ এবং অবশ্যম্ভাবী হইলেও ইহা যে প্রশংসনীয় নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এখন দেখা যাউক, বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের প্রতিনায়িকা মহারাণী ঔশীনরীর চরিত্র-সৃষ্টিতে নারী-চরিত্রের আদর্শ কতটা রক্ষিত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠান-নগরের রাজা পুরূরবা স্বর্গের ইন্দ্রেরও পরম সম্মানের পাত্র, অতুল-বিক্রম বীর ও দেবতাদের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। তিনি পুষ্পকরথে আকাশ-পথে যখন যেখানে ইচ্ছা গমনাগমন করেন। দৈত্য-দানবের উৎপীড়নে দেবরাজ যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তখন এই প্রতিষ্ঠান-পতি গিয়া সব থামাইয়া দেন। দানব-কুল তাঁহাকে যমের মত দেখে। স্বর্গের ইন্দ্র এ জন্য মর্ত্ত্যের রাজা পুরূরবার নিকট সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ।

প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানে "বেণীঘাটের" পরপারে "যোষীমঠ" এবং "পুরূরবার গড়" নামক স্থান তাহারই লুপ্তাবশিষ্ট চিহ্নরূপে পর্য্যটকের চক্ষুতে জল আনিয়া দেয়।

ঔশীনরী

এই পুরূরবার পাটরাণীর নাম ছিল ঔশীনরী। ইনি কাশীরাজের দুহিতা। সুতরাং পতিকুল পিতৃকুল উভয়ই তাঁহার শ্লাঘার বস্তু ছিল। পিতা ভারতের চিরস্পৃহণীয় অবিমুক্তক্ষেত্রের অধিপতি, হিন্দু যে স্থানে মরিতে পারিলে স্বর্গও চাহে না, সেই শঙ্কর-পাদপূত জগতের আদিতম নগরের রাজা, আর পতি পুরূরবার ত কথাই নাই। স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও বিপদের সময়ে ইঁহার শরণাপন্ন হন, সর্ব্বদা ইঁহাকে তোষামোদ করিয়া চলেন। এক কথায় ইঁহারই কৃপায় দেবরাজ নিরাপদে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। তার পর যে নগরের ইনি রাজা, তাহা আবার গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে অধিষ্ঠিত। হিন্দুর পরম কামনার বস্তু

প্রয়াগের পবিত্র ত্রিবেণী প্রকৃতই বেণীর ন্যায় এই নগরের শোভাবর্দ্ধন করে। এই স্থানেই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী মিশিয়া গিয়া "যুক্তবেণী"রূপে চলিতে চলিতে সুদূর বঙ্গে আবার বিযুক্ত হইয়া "মুক্তবেণী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, পিতৃকুল পতিকুল উভয়ের গর্ব্বেই পাটরাণীর বুক ভরপুর। রাজ্যের সকলেই জানিত, তাহাদের পাটরাণী "দেবী ঔশীনরী" যথার্থই দেবতা, রাজ্যের প্রকৃত লক্ষ্মী। ঔশীনরীর জপ-তপ, পূজাপার্ব্বণ সমস্তই ছিলেন রাজা পুরূরবা। পুরূরবা ছাড়া তাঁহার যেন পৃথক্ অস্তিত্বই ছিল না। রাজাও দেবী বলিতে অজ্ঞান হইতেন। সুখের সংসার, সুখের পৃথিবী, ঔশীনরীর চক্ষুতে জগতের সমস্তই সুখময়, সৌন্দর্য্যময়। অভাবের মধ্যে ছিল পুত্রের। রাজ-সংসারের ভবিষ্যৎ কুলপ্রদীপ ছিল না।

এইভাবে পরমসুখে যখন দিন কাটিতেছে, তখন এক বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রাজা পুরূরবা আকাশপথে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে এক দানব কর্ত্তৃক অপহ্রীয়মাণা মূর্চ্ছিতা উর্ব্বশী নামক প্রসিদ্ধ অপ্সরাকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী ছিলেন স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভার প্রধান অলঙ্কার। দানবকবল হইতে উদ্ধারের পর মূর্চ্ছিতা উর্ব্বশীর যখন জ্ঞান হইল, সে ভয়ে ভয়ে চক্ষু মেলিল। তখন দেখিল, সম্মুখে অনিন্দ্যসুন্দর রাজা পুরূরবা সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া। সে মনে মনে ভাবিল, ভাগ্যে দানবের হাতে পড়িয়াছিলাম, নতুবা ত এ রূপ দেখিতে পাইতাম না। উর্ব্বশী স্বর্গের রাজসভার চিরভাস্বর বিদ্যুৎ। সে অনেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে। এক কথায় অপ্সরাদিগের মধ্যে সে প্রধান ওস্তাদ। সুতরাং দুই দশ মুহূর্ত্তের মধ্যেই মর্ত্ত্যের রাজাকে সে "সুবোধ গোপালটির" মত করিয়া লইল। পাকা খেলোয়াড়ের হাতে পড়িয়া পুরূরবা বেচারী নাস্তানাবুদ হইতে লাগিলেন।

নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে দুই জনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উর্ব্বশী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বর্গে যাইতে বাধ্য হইয়াছে, আর পুরূরবা একটি কিম্ভূতকিমাকার জড়হৃদয়ের মত রাজধানীতে ফিরিয়াছেন। রাজার যে কি বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও কাছে বলিবার যো নাই। রাজার দিন-রাত ঐ চিন্তা, ঐ ধ্যান—কি দেখিলাম, আর কি দেখিব? ঢাকের বাঁয়ার মত রাজারাজড়াদের বরাবরই এক একটা বিদূষক থাকিত। এমন কি, এখনকার যাঁহারা "রাজা", তাঁহাদেরও একটি নহে, অমন দুই দশটি আছে। পেট ফাঁসিয়া যায়—দেখিয়া পুরূরবা বিদূষককে আমূল খুলিয়া বলিলেন ও ফাঁক পাইলেই নির্জ্জনে বসিয়া দুই জনে বিড় বিড় করিয়া ঐ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

দিন কাটিতেছে। কিন্তু রাজার দিন আর কাটে না। মাঝে মাঝে উর্ব্বশী বিদ্যুদ্‌বিলাসের মত আসিয়া চকিতে রাজাকে দেখা দিয়া যায়। চিরপুরাতন স্বর্গ আর সেই এক-ঘেয়ে ইন্দ্র কত দিন ভাল লাগে? তাহাতে আবার উর্ব্বশী আজন্ম-কবি স্বর্গীয় বার-যুবতী। উর্ব্বশীও রাজার উপর তাহার হৃদয়ের সবটুকু অনুরাগ ঢালিয়া দিয়া রিক্তচিত্ত হইয়াছে। সে স্বর্গে থাকে, আর কায করিতে হয়, তাই পালামত দেবরাজের কায করে, কিন্তু তাহার সত্যই—

"নয়ান-জলে বয়ান ভাসে
হল্‌দি ছেঁচতে ছেঁচে আঙ্গুল।"

আর রাজা পুরূরবা একবারে যথার্থই আয়ুর্ব্বেদসম্মত, কফাশ্রিত বায়ুগ্রস্তবৎ যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন। এক কথায় তিনি ঠিক যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "পুত্তলিকা" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—

"চক্ষু আছে দেখিতে পায় না,
কর্ণ আছে শুনিতে পায় না।"

প্রাণের টান বড় টান। তাহার কাছে দূর অদূর, সাধ্য অসাধ্য, সম্ভব অসম্ভব কিছুই নাই। উর্ব্বশী মাঝে মাঝে স্বর্গ হইতে সুদূর মর্ত্ত্যে আসিয়া অবসন্ন-কায়, অবসন্ন-হৃদয় পুরূরবাকে "ষড়্‌গুণ-বলিজারিত সিদ্ধমকরধ্বজ" খাওয়াইয়া সজীব করিয়া যায়। পুরূরবা সেই পাথেয় সম্বল করিয়া বিরহ-দীর্ঘ জীবনের দুস্তর পথ অতিক্রম করেন। কখনও বা তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অদৃশ্যভাবে রাজার পাশে দাঁড়াইয়া উর্ব্বশী বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় রাজার কাতরতা দেখিয়া জীবন ধন্য মনে করে, কখনও বা বনলতার পত্রে গিরিমাটীর দ্বারা কিংবা ভূর্জ্জপত্রে কজ্জলের দ্বারা প্রণয়পত্র লিখিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দেয়, আর সেই চিঠি উড়িতে উড়িতে রাজার সম্মুখে আসিয়া পড়ে। রাজা পাইয়া পিপাসা-কাতরকণ্ঠে সেই লেখামৃত পান করেন, পরে ইষ্টকবচের মত সযত্নে তাহা রক্ষা করিবার জন্য সদা-সহচর বিদূষকের হস্তে

গচ্ছিত রাখেন। অবসর পাইলেই উর্ব্বশী মর্ত্ত্যে ছুটিয়া আসে, আবার তখনই ইন্দ্র পাছে জানিতে পান, এই ভয়ে স্বর্গে ছুটিয়া যায়। এইভাবে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ছুটাছুটি করিতেই উর্ব্বশীর অবিনাশী প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। উর্ব্বশীর বিরহে রাজা কৃশ হইয়াছেন, তাঁহার সোনার কান্তি পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে দেখিয়া উর্ব্বশীর আর আনন্দ ধরে না। সে আহ্লাদে আটখানা হয়।

রাজার বিলক্ষণ ভাবান্তর ঘটিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে পড়িলে যেমন যেমন হয়, সে সমস্তই হইয়াছে। রাজবাড়ীর আর কেহ বড় তত একটা ধরিতে পারে নাই, লক্ষ্যই করে নাই, কিন্তু পাটরাণী ঔশীনরীর দৃষ্টি তাহা এড়াইতে পারে নাই। হৃদয়েশ্বরের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে নিঃসন্তান, নিঃসম্বল মহারাণীর বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। হঠাৎ এ কি হইল? ভাবিতে ভাবিতে তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন। বিদূষকের নিকট হইতে কৌশলপূর্ব্বক ব্যাপারটা জানিয়া কোনও এক চতুর পরিচারিকা অতি সন্তর্পণে দেবীকে বলিতে গিয়াছিল; কিন্তু দাসীর মুখে স্বামীর সমালোচনা শুনিতে রাণী আদৌ চাহেন নাই, পরন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। রাণীর মনে ঘুণ ধরিয়াছে; রাজার শারীরিক ও মানসিক দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাণীর দিন কাটিতেছে। সতত পতির বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া রাণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ভাবে হউক. ইহার প্রতীকার করিবেন, দরকার হয়, এ জন্য রাণী নিজের হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিবেন।

এক দিন অন্তঃপুরের উদ্যানে—এক মনোহর কুঞ্জে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইয়া রাণী পরিচারিকা-মুখে রাজাকে সংবাদ প্রেরণ করেন, রাজাও নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হন। উর্ব্বশীও ঐ দিন তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অদৃশ্যভাবে স্বর্গ হইতে রাজ-সন্নিধানে অভিসারে আসে। সহসা সম্মুখে না আসিয়া একখানা ভূর্জ্জত্বকে দুই ছত্র প্রেমপত্র লিখিয়া বিরহ-কাতর রাজার সম্মুখে উড়াইয়া দেয়। রাণীর আসিতে এখন একটু বিলম্ব আছে, তাই উর্ব্বশী-বল্লভ পুরূরবা ঐ অপ্সরার প্রেমলিপিখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শতবার পড়িতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাণী আসিয়া হাজির। পত্রখানা লুকাইতে শত চেষ্টা করিয়াও রাজা কৃতকার্য্য হন নাই। ইহা মহারাণীর হাতে পড়িল। কিন্তু রাণী উহা পড়িলেন না,—নীরবে মাত্র দাসীর হাতে ধরিয়া দিলেন ও বলিলেন—"ছাখ ত, যদি আমার সোনার মত হয়,—পড়িয়া শুনাইবি, নচেৎ নহে।" শেষে পরিচারিকার মুখে পত্রের সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া রাণী বেদনা-জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন—"আর্য্যপুত্র, এর পর যে ঘোর অনুতাপে তুমি কষ্ট পাইবে, তাহা ভাবিতেও আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে।" বলিয়াই প্রণাম করিয়া অভিমান-ভরে ছলছল-চোখে রাণী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। ফিরাইবার জন্য রাজা অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। কেন রাজাকে ডাকিয়াছিলেন, কি জন্যই বা নিজে আসিয়াছিলেন,—কেহ কিছুই জানিল না। রাণীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বিলম্বকাতরা উর্ব্বশীও মায়ার অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক রাজার সহিত ঐ কুঞ্জে মিলিত হইল।

কিয়ৎকাল এই ভাবে কাটিল। রাজা ও দেবীতে সাক্ষাৎ নাই। অভিমানী রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেবীর সহিত সাক্ষাৎকার বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। পতিব্রতা ঔশীনরীর প্রাণে ইহাতে বড়ই বেদনা লাগিল। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে এই ২য়। রাজার অন্য অবলম্বন ছিল, অন্য চিন্তা ছিল, কিন্তু রাজময়-জীবিতা ঔশীনরীর ত আর অন্য ধ্যেয় ছিল না, তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। দেবী এত দিনে বুঝিলেন যে, অভিমান বৃথা। যাঁহার উপর অভিমান, তিনি ত আর এখন সে তিনি নাই। তবে আর এ অভিমানে লাভ? যাহার মান ভাঙ্গিবার কেহ নাই, তাহার আবার মান কেন? তাহার পক্ষে অভিমান, অভিমানের অপমান মাত্র। তাই সাধ্বী মহারাণী আপন অভিমানের শিরে আপনিই পদাঘাত করিয়া স্থির করিলেন, রাজার সহিত নিজে উপযাচিকা হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। সে দিন রাজার অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করেন নাই, স্বামীর প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়াছেন,—ঘোর অন্যায় কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন, সেই অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। এ প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত যতই গুরু হউক না কেন, কিন্তু তাহা অসাধ্য নহে। আর এ কবির প্রায়শ্চিত্ত অন্যের পক্ষে অসাধ্য। মাত্র ঔশীনরীর ন্যায় আদর্শ

দেবী রমণীর পক্ষে সাধ্য। ইহার দণ্ড—চিরদিনের মত আত্মসুখের বিসর্জ্জন! রাণী চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন পূর্ব্বক রাজ-মহিষী-সমুচিত বেশভূষা জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া সংযমিনী ব্রহ্মচারিণীর পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তিনি একটি ব্রত গ্রহণ করিবেন। সে ব্রতের নাম 'প্রিয়-প্রসাদন।" উদ্দেশ্য—প্রিয়তম প্রাণাধিকের প্রসন্নতা-বিধান। যে ভাবে হউক, রাণী তাহা করিবেনই।

প্রাচীন রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদ-পরিসরে অনেক জিনিষ থাকিত। নানাপ্রকার সৌধের সমবায়ে রাজপ্রাসাদ শোভা পাইত; তাহার কোনটা হয় ত মরকত-শিলায় মণ্ডিত, কোনটা বা নীলকান্তমণির প্রভায় সতত সমুজ্জ্বল, কোনটা আবার কষ্টিপাথরের ঘনকৃষ্ণ স্তরে বা ফলকে আবৃত। তাহার এক একটার আবার উদ্দেশ্যও ছিল—পৃথক্ পৃথক্। কোনটায় বিবাহের পর নবদম্পতি কিছুকাল বাস করিতেন,—কোনটায় যুবরাজ বা রাজা নব-পরিণীতা রাণীকে আদর-আপ্যায়ন করিতেন, আবার কোনটায় বা রাণী অভিমান করিয়া দোর বন্ধ করিয়া বসিতেন। সে ঘরে ঢুকিলে বুঝা গেল—রাণীর 'দুর্জ্জয়-মান' হইয়াছে। এখনও গিয়া দেখ, জয়পুরের পূর্ব্বরাজধানী প্রাচীন অম্বরপ্রাসাদে "সুহাগ-মন্দির", "যশ-মন্দির", "শিঙার-মন্দির", "অভিষেক মন্দির" নামে কত মনোহর হর্ম্ম্যকক্ষ বিরাজ করিতেছে। ঠাকুরমার গল্পে—কে না শুনিয়াছেন—"তার পর রাণী গিয়া গোঁসা-ঘরে কবাট বন্ধ করিলেন!"

পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠানেও ঐরূপ নানাপ্রকার উপভোগ-মন্দির ছিল। তাহার একটির নাম ছিল "মণিহর্ম্ম্য।" সেই মণিময় প্রাসাদেই স্বয়ংবরের পর ঔশীনরীকে লইয়া পুরূরবা প্রথম প্রবেশ করেন। সেই প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষই রাজ-দম্পতির জীবনের প্রথম প্রণয়-যাগের অরুণ আভায় আলোকিত হয়। সুতরাং সেই হর্ম্ম্যটি রাজারাণীর বড়ই আদরের বস্তু। জীবনের নানা সুখস্মৃতিতে তাহার প্রতি অণু-পরমাণু বিজড়িত। দেবী ঔশীনরী স্থির করিয়াছেন, যে ঘরে জীবনের সুখসূর্য্যের প্রথম উন্মেষ, প্রণয়-প্রতিমার প্রথম অধিবাস বা উদ্বোধন হইয়াছিল, সেই ঘরেই ঐ প্রতিমার বিসর্জ্জন দিবেন। তাই দেবী—পরিচারিকা নিপুণিকার মুখে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি এক ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। তাহার উদ্‌যাপন বা সমাপন-কাল নিকটবর্ত্তী, একটিমাত্র দিনের জন্য আমি মহারাজের চরণদর্শন করিতে চাই।' অভিমান-গর্ব্বিত মহারাজ পুরূরবা এ কথার কোনই উত্তর দিলেন না। কয়েক দিন কাটিয়া গেল। মহিষী আবার বৃদ্ধ কঞ্চুকীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে, ব্রত সমাপনের নিমিত্ত আজ মহিষী সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর মণিহর্ম্ম্যপ্রাসাদে রাজার নিকটে যাইবেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মহারাজ যেন কৃপাপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত থাকেন।

প্রথমতঃ পরিচারিকার মুখে দেবীর সাক্ষাৎকারের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিলেও, কুল-বৃদ্ধ কঞ্চুকীর সংবাদে রাজার অনেকটা স্বস্তি হইল। অপ্সরার ব্যাপারটা দেবী জানিয়াছেন ভাবিয়া রাজা বড়ই উদ্বেগে ছিলেন। মালসহ ধৃত তস্করের মত রাজার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। আজ দেবীর আহ্বানে রাজা ভাবিলেন,—হয় ত দেবী ততটা বিরূপ হয়েন নাই। সে দিন উর্ব্বশীর পত্র পড়িয়া ক্রোধোদ্ধত-চরণে দেবী চলিয়া গিয়াছিলেন, রাজ-রাজেশ্বরের সম্মুখে ঘোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, এই কয় দিনে দেবীর চৈতন্যোদয় হইয়া থাকিবে, তিনি বুঝিয়াছেন যে, রাজারাজড়াদের ও রকম একটু আধটু এদিক ওদিকে বড় বেশী কিছু আসে যায় না, বরঞ্চ দেবীর ঐ ঔদ্ধত্য প্রকাশ, নারী হইয়া স্বামীর সম্মুখে ঐরূপ করাটা ঘোর অন্যায় হইয়াছে,তাই দেবী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া, আর বোধ হয়, আত্মকৃত অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য রাজাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এইরূপ নানা অনুকূল চিন্তায় মস্‌গুল হইয়া উর্ব্বশী-বল্লভ পুরূরবা সবিদূষক মণিহর্ম্ম্যপ্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন আবার ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। রোহিণীনক্ষত্রের সহিত শশধরের সেই রাকারজনীতে মিলন হইবে। অতিশয় পুণ্যমুহূর্ত্ত।

ঐ রাণী আসিতেছেন, সঙ্গে কতিপয় পরিচারিকা। তাহাদের কাহারও হস্তে পুষ্পপাত্র—নানা মনোহর কুসুমে সুসজ্জিত। কাহারও হস্তে ফুলের মালা, কেহ বা ঘৃতের প্রদীপ লইয়া অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত। পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া কোন পরিচারিকা দেবীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী। কেহ বা নৈবেদ্যের থালা লইয়া ধীরচরণে দেবীর অগ্রগামিনী। কাহারও মুখে শব্দমাত্র নাই। সে একটা দেখিবার বস্তু। সকলেই

অভিষেকপূত ও ক্ষৌমবসনে অলঙ্কৃত। একটা যেন পবিত্রতার,—গাম্ভীর্য্যের,—শান্তির শোভাযাত্রা। আর শোভাযাত্রার ঠিক কেন্দ্রস্থলে ভুবনমোহিনী রাজ-রাজেশ্বরীর ন্যায় কাশী-রাজ-পুত্রী দেবী ঔশীনরী,—প্রতিষ্ঠান-রাজ্যের সাক্ষাৎ রাজ-লক্ষ্মী বিরাজমানা।

প্রাসাদে প্রবেশ-কালে দেবী একবার নীলগগনের বিমল শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রোহিণীর সহিত সম্মিলিত হওয়ায় সে দিন সুধাকরের শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তারাপতির সেই মিলনের ছবি দেখিতে দেখিতে বিয়োগিনী মহিষী বলিলেন—'আহা! রোহিণী-যোগে অমৃত-রশ্মির আজ কি অপূর্ব্ব শোভাই না দেখা যাইতেছে!' অমনই তাঁহার এক প্রগল্‌ভা পরিচারিকা প্রত্যুত্তরে বলিল,—'দেবীর সহযোগে আজ মহারাজেরও ঐরূপ শোভাই জন্মিবে।' রাণী পরিচারিকার এ উক্তি শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। কেবল অলক্ষ্যে তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। দেবী যখন প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখন পুরূরবা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন,—দেখিলেন—আজ দেবীর আর সেই মনোমোহিনী মহিষী-মূর্ত্তি নাই। আজ দেবী—

"সিতাংশুকা মঙ্গল-মাত্র-ভূষণা,
বিচিত্র-দূর্ব্বাঙ্কুর-লাঞ্ছিতালকা ॥"

দেখিলেন, আজ দেবীর পরিধানে ধবল বসন, কলেবর চন্দন-চর্চ্চিত, অলকদাম বিচিত্রদূর্ব্বাঙ্কুরে সমলঙ্কৃত। দেখিলেন,—আজ দেবীর মুখে এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা, অপূর্ব্ব দীপ্তি। তাহাতে যেন পার্থিব বাসনার কোনও লেশ নাই, একটা কেমন যেন স্বর্গীয় নির্ম্মলতায়—পবিত্রতায় সে মুখ, সে চোখ, সে ললাট উদ্ভাসিত। সে দিব্য মাধুরী দর্শন করিয়া নিমিষের জন্য রাজা শিহরিয়া উঠিলেন ও তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া মহারাণীকে নিজের আসনার্দ্ধে বসাইলেন। ঔশীনরী কালবিলম্ব না করিয়া রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে ও কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন—'আর্য্যপুত্র, আজ আপনাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার একটি ব্রত সম্পাদন করিতে হইবে। ক্ষণকালের জন্য আমার এই উপরোধটুকু রক্ষা করুন।' রাজা ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্রত?"

দেবী নীরব। তিনি রাজার কথার কোনই উত্তর দিলেন না, দিতে পারিলেন না। মাত্র অবসন্ননেত্রে নিপুণিকা-নাম্নী এক পরিচারিকার দিকে চাহিলেন। অমনই নিপুণিকা কহিল, "মহারাজ, দেবীর এ ব্রতের নাম 'প্রিয়-প্রসাদন'।" পরে দেবীর ইঙ্গিতক্রমে কুমারী পরিচারিকাগণ পূজোপহার আনয়ন করিল। দেবী তদ্দ্বারা প্রথমে জগদানন্দ চন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করিলেন, পরে কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, এইবার আসুন।"

রাজা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ—ভূতাবিষ্ট জড়বুদ্ধিবৎ নীরবে আসিয়া আসনে বসিলেন। তখন দেবী পতির পাদপূজাপূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতে করিতে বাষ্পস্খলিত কণ্ঠে কহিলেন, "ঐ নির্ম্মল গগনে সম্মিলিত রোহিণী-মৃগলাঞ্ছনকে সাক্ষী রাখিয়া, আজ আর্য্যপুত্রের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আর্য্যপুত্র যে কামনাই করুন না কেন, আমি তাহা পূরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আজ হইতে যে রমণীই আমার স্বামীর সমাগম-প্রণয়িনী হইবেন, আমি তাঁহার সহিত নির্ব্বিরোধে বাস করিব। আর্য্যপুত্রের সুখের পথে আমি কণ্টক হইব না।"

ধূর্ত্ত বিদূষক দেবীর এই ব্রতব্যাপারে একটু উপহাস করিল; বলিল, "দেবি! আপনি ত ব্রত করিতেছেন, কিন্তু আমার সখা যে একেবারে উদাসীন, ব্যাপার কি?"

দেবী অমনই দলিত ফণিনীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিলেন, "মূঢ়, আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিলাম, ইহাতেই আমার সুখ; ইহার অধিক আর কিছুই আমার ইহলোকে প্রার্থনীয় নাই। আর কিছুই আমি দেখিতে চাই না।"

রাজা এতক্ষণে বুঝিলেন যে, দেবীর ব্রতের উদ্দেশ্য কি? ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মোহাচ্ছন্ন হৃদয়েও বিবেক-ধারা উদিত হইল। তিনি দেবীকে সঙ্কল্পিত পথ হইতে ফিরাইবার প্রয়াস করিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা। প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছে, আর তাহার উত্তোলনের প্রয়াস কেন? দেবী গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "পরিচারিকাগণ, আমার 'প্রিয়-প্রসাদন-ব্রত' সম্পন্ন হইয়াছে, চল, গৃহে যাই।" মাত্র সেই রাত্রিটি "মণিহর্ম্ম্য-প্রাসাদে" অবস্থান করিবার জন্য রাজা দেবীকে অনুরোধ করিলেন। দেবী যুক্ত-করে ও বাষ্প-দিগ্ধ-নেত্রে বলিলেন,—"আর্য্যপুত্র, আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি সংযমিনা, ক্ষমা করুন।"—এই বলিয়া দেবী ঔশীনরী

চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের সুখতারা অস্তমিত হইল। রাজা পুরূরবা তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্যত্র চিত্ত-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি প্রতিকূলা থাকিলে পদে পদে উভয়ের—পতি-পত্নীর নানা বিড়ম্বনা ঘটিবে। তাঁহার প্রিয়তমের প্রাণে আঘাত লাগিবে। কায কি এ সব বিড়ম্বনায়? যাহা যাইবার, তাহা ত চিরদিনের মত গিয়াছে। শত ঔশীনরীর বিনিময়েও আর সে রাজ-হৃদয় ফিরিয়া আসিবে না। তবে আর কেন? সরিয়া দাঁড়ানই ভাল। দুই জনেই বেদনা ভোগ করা অপেক্ষা এক জন ভোগ করিলে যদি অপরের মুক্তি হয়, তবে তাহাই ত বিধেয়। বিশেষতঃ স্বামী,—এক দিন যিনি আদর করিয়া ভারতের অধীশ্বরীর পদে বসাইয়াছিলেন, জগতে সুখের, মোহের, আবেশের চিত্র দেখাইয়াছিলেন, আজ তাঁহারই প্রীতির জন্য যদি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিতে না পারিলাম, তবে আর আমার হৃদয়ের সামর্থ্য কি? যাঁহাকে ভালবাসি, প্রাণ দিয়াও যাঁহার তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, সেই প্রাণাধিকের প্রীতির জন্য জীবনের কতিপয় পরিমিত দিনের সুখও যদি ত্যাগ করিতে না পারি, তবে আর আমার ভালবাসার মূল্য কি? দেবী বুঝিয়াছিলেন যে, প্রণয় একটি প্রধান যজ্ঞ, এ মহাযজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, দক্ষিণা অভিমান। তাই আজ তিনি সেই মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া, বাত্যাবিকম্পিত বিশীর্ণ লতিকার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে স্বীয় শূন্য কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ইহার পর আর কেহ কখনও তাঁহার মুখ দেখিতে পায় নাই। সতী-ললনা-হৃদয় যে কত কোমল, কত সুন্দর, কত বলিষ্ঠ, সতীর চিত্তে পতির জন্য যে কত আকুলতা, ঔশীনরী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে দেশের রমণী পতির প্রজ্বলিত চিতায় হাসিতে হাসিতে আরোহণ করিতেন, ইহা সেই দেশের সতীর চিত্র। যে দেশের রমণী—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা,
মৃতে ম্রিয়েত—পত্যৌ"———

ইহা সেই দেশের সতীর চিত্র। যে দেশের সাহিত্যে এতাদৃশী দেবীর প্রতিমা অঙ্কিত, সেই দেশ, সে সাহিত্য, তথা সেই প্রতিমার যিনি ভাস্কর, তিনি সকলেরই পূজার্হ। সংস্কৃত সাহিত্যে সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি কতিপয় চিত্র ব্যতিরেকে এতাদৃশী মূর্ত্তি অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এতক্ষণে দুই জন পাটরাণীর কথা সমাপ্ত হইল। ইঁহাদের একটি ধারিণী মর্ত্ত্যের, সংসারের নারী, আর অপরটি ঔশীনরী স্বর্গের দেবী, নন্দনকাননের স্থিরপ্রভ অম্লান কুসুম।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মীরাবাই

কে অই তরুণী হিরণবরণী নেচে নেচে গেয়ে যায় চলে'
আলুথালু কেশ ধূলিমাখা বেশ জল ঝরে দুই আঁখি গলে'
'জয় গিরধর লাল' বলে'?

পথের পাথরে কাঁটায় কাঁকরে রুধিরের ধারা পায় ঝরে,
শ্যাম-পীরিতির রাঙা স্মিরিতির বিজয়চিহ্ন পথ'পরে
এঁকে যায় তায় অকাতরে।

তার মুকুতার কণ্ঠের হার পথকুত্তার গলে দোলে,
ভিখারীরে ছুড়ি দেয় অঙ্গুরী অনাথ ছেলেরে তোলে কোলে,
'মেরা সামলিয়া ধন', ব'লে।

নবনী-কায়ায় লাবণি গড়ায় অবনীর গায় বেয়ে বেয়ে,
হের পথখেদে তনু ভরে স্বেদে, কার বধূ—ও সে কার মেয়ে?
নেচে নেচে চলে গান গেয়ে?

সোনার স্বপন কাহার এমন ঘরছাড়া কোন্ মনোরথে?
আপনার জেনে সাথে লয় টেনে যত মুসাফীর ভিক্ষুকে,
হরিনাম-সুধা দেয় মুখে।

পিছে যারা যায় কেন না ফেরায়? কেঁদে কেঁদে ধায় সাথে সাথে,
ভরা তনু-মন রূপ-যৌবন প'ড়ে যাবে কোন্ পাপ-হাতে—
কোন্ পিশাচের লালসাতে।

* * * *

এ কি কথা শুনি, দেওয়ানা তরুণী চিতোরের রাণী পথে ফিরে?
জানিব কি ক'রে? কে আছে চিতোরে হেরেছে ও রাজমহিষীরে?
অরুণও যাহারে হেরেনি রে।

এ কি অপরূপ, চিতোরের ভূপ যার দাপে কাঁপে সারা দেশ,
ত্যজি রাজধানী তার মহারাণী পথে পথে আলুথালু বেশ,
কেশরী কি আজ হলো মেষ

কি বলিছ ? "যার দীন দুনিয়ার মালিকের ডাক পশে কানে
নরের ক্ষমতা ঘরের মমতা রাজার ভ্রূকুটী সে কি মানে ?
রাজার রাজা যে তারে টানে।

"পতিত-পাবনে যেবা পতি গণে নরপতি-পতি হায় তারে
দিয়ে কোন্ ধন ভুলাবে হিরণ-শৃঙ্খলে ইহসংসারে,
লালসা-বিলাস-কারাগারে ?

"দুনিয়ার রাজা দিবে কোন্ সাজা সঁপেছে যে প্রাণ হরিপদে,
হরিশরণার কে করে বিচার কেবা আছে রাজ-পরিষদে—
কে হেন দানব মোহমদে ?

"সেই একবার অনলে সীতার শুদ্ধি রটিল চরাচরে,
নদীমাঝে পশি এ সতী তাপসী—বারিপরীক্ষা উত্তরে,
সীতা বুঝি মীরারূপ ধরে !

"শ্যাম জলধরে যেবা লীলা করে সে তড়িতে কেবা রোধে ঘরে ?
গঙ্গাধারারে গজরাজ পারে রুধিতে কি ভীম কলেবরে ?
পাথারে কে বালুবাঁধ গড়ে ?

"যাহারে অমৃত করেছে তৃষিত সে কি তিরপিত সীধুপানে ?
যে পথে ছুটিলে সে অমৃত মিলে মৈত্রেয়ী সন্ধান জানে,
সেই পথই তারে সদা টানে।

"জপজল্পনে, তিলক লিখনে হরিনামে যার তনু ভরা
বিলোল পিপাসা সম্ভোগ-আশা মিটাবারে সে ত নহে গড়া,
সে যে ব্রজরাজ-মনোহরা।

"পাষাণ-প্রাচীর পরিখা গভীর কোন্ সে গণ্ডী তারে বাঁধে ?
বাঁশরীর রব ভাঙি বাধা সব পথ রচি তারে নিতি সাধে,
'এস মধুবনে এস রাধে।'

"দাদুরীর রূপে সে কি রহে কূপে যারে ডাকে প্রেম-পারাবার,
মাধুরী-তুফান তটিনী-নিপান গোষ্পদে করে একাকার,
ভাঙ্গে অন্দর ঘর বা'র।

"বিপদ-বারণ যাহার শরণ বিপদই তাহারে করে ভয়,
লজ্জাবারণে ভক্ততারণে দয়াময় কাছে কাছে রয়,
দুঃশাসনের কোথা জয় ?

"ভজনের গানে পাষাণেরো প্রাণে প্রেমমধু-মঞ্জরী জাগে,
সংযমহারা কামপশু যারা মাতৃমমতা ভিখ্ মাগে,
ভীরু বল পায়,—ভূত ভাগে।

"কুম্ভরাজের কুম্ভের মাঝে কেমনে র'বে সে চিরতরে ?
বাষ্পীয়রূপে সে যে চুপে চুপে মিলিবে শ্যামল-নীরধরে,—
প্রেম-অভিসারে কারে ডরে ?"

* * * *

"শ্লথবেশবাসে কভু আশে পাশে নাহি চেয়ে কেবা যায় চ'লে,
কায়ার বাঁধন মায়ার কাঁদন কুললাজ ধন পায় দ'লে,
'জয় কাহ্নাইয়ালাল' ব'লে।

রাজসেনাগণ যত পুরজন দাঁড়ায় দুধারে জোড় হাতে,
'ফির গো মা' বলি' প্রজামণ্ডলী কেঁদে কেঁদে চলে সাথে সাথে
পথ ভাসে প্রেম-দরিয়াতে।

প্রেমের পাথার মেবার পাহাড় মরু মারবার ডুবাল রে,
শিলা পড়ে ধ্বসে ডুবে লীলারসে, মীন হয়ে তায় খেলা করে
রণবীরগণ প্রেমভরে।

ভাঙি তরবাল গড়ি করতাল মেবারীরা মাতে নামগানে,
জয়ঢক্কারে রণডঙ্কারে করি মৃদঙ্গ কর হানে,
তাণ্ডব তারা খুবই জানে।

* * * *

অঙ্গারে হীরা,—হে জননী মীরা ! বঙ্গের কবি গাহে জয়,
বঙ্গভূমির কেউ নও তুমি এ কথা ত মনে নাহি লয়—
চিনি-চিনি তোমা মনে হয়।

পদ্মাবতীর ভক্ত পতির পীরিতি কি তুমি স্ত্রী-আকারে,
রাধাগোবিন্দ-পদারবিন্দে 'রাগগোবিন্দ' গাহিবারে—
কবিদম্পতি-একাধারে ?

তুমি জানো 'বিনা প্রেমসে মিলে না নন্দদুলাল'-পদতরী,
তনু-ধনজনে বিদ্যাবচনে মিলে না প্রেমের খেয়া-কড়ি,—
তাই কি মা করো মাধুকরী ?

ওগো ঠাকুরাণী কার চাকরাণী হতে রাণী-সুখ তেয়াগিলে ?
কার ভাবে মজি 'চাকর রাখোজী' বলি উমেদারা ব্রত নিলে ?
বলো কোন্ পথে তারে মিলে ?

শ্যামগতপ্রাণা শ্যামলায়মানা শ্যামের চরণ প্রাণে আঁকা,
'রঙ্গোর' পায় হেমবোদকায় প্রেম-মঞ্জরী-রেণুমাখা
কুম্ভের বুকে চূতশাখা।

জবাবন-ছায় তুলসীর প্রায় মুকুলিত হরি-উপাসনা,
কঠোর দারুর বীণায় মধুর তুমি হরিনাম মুরছনা,
মরু বালুকায় হেমকণা।

মিছা কলঙ্ক কুযশপঙ্ক ধরিয়াছ দেবি শিরে'পরে,
পতির পীরিতি রাজকুলনীতি লাজ-মান-রীতি অনাদরে
ত্যজিয়াছ সাব অকাতরে,—

কানু কানু ব'লে পাগলিনী হ'লে বাধা-বন্ধন মানো নাই,
ব্রজরাধিকাতে হে মীরা, তোমাতে কোন ভেদ খুঁজে নাহি পাই
মীরাবাই—তুমি মীরা-রাই !

শ্রীকালিদাস রায়।

পাদটীকা। কুম্ভ—চিতোরের রাণা, কুম্ভের মহিষী মীরা। রঙ্গোর—বোধ হয় 'রণশূর'—মীরার প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমূর্ত্তি। রাগগোবিন্দ—গীত গোবিন্দের অনুসরণে মীরার রচিত পদাবলী। পদ্মাবতী—জয়দেবের সহধর্ম্মিণী। বারি-পরীক্ষা—মীরার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিলে কুম্ভ মীরাকে জলে ডুবিয়া মরিতে আদেশ করেন, মীরা জলে ঝাঁপ দেন, কিন্তু মরেন না। মরুনারবার—মীরা মাড়োয়ারের রাঠোরনন্দিনী।

জয়পুর

১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৮টায় আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে উঠিয়া শেষ রাত্রিতে প্রায় ৪টার সময় জয়পুর পৌঁছিলাম। তখনও বেশ অন্ধকার আছে। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ জয়পুর কলেজের অধ্যাপক। তাহাকেই জয়পুর যাত্রার কাণ্ডারী করিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে এক অশ্ব-শকটে সহরের দিকে রওনা হইলাম। মিনিটখানেক পরেই গাড়ী থামিল। শুনিলাম, এখানে শুল্ক আদায়ের আফিস। ইংরাজ-রাজত্ব ছাড়িয়া যে 'নেটিভ ষ্টেটে' আসিয়াছি, তাহা এইবারে হৃদয়ঙ্গম হইল। দেখিলাম, সেই অন্ধকার রাত্রিশেষে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ পোঁটলা-পুঁটলী লইয়া আফিসের সম্মুখে বসিয়া আছে। তাহাদের মালপত্র পরীক্ষা করিয়া শুল্ক আদায় করিবার পর তাহারা অব্যাহতি পাইবে। আমাদের দেশের কর্ম্মচারিবর্গের মানসিক গতির যে পরিচয় আমরা অহরহঃ পাইতেছি, তাহাতে এই সমুদয় নিরক্ষর গ্রাম্য নর-নারী যে সহজে এবং বিনা ক্লেশে কেবলমাত্র ন্যায্য শুল্ক দিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, এরূপ সম্ভাবনা কিছুতেই মনের মধ্যে স্থান পাইল না। আমাদের অবস্থা কি হইত, বলিতে পারি না ; কিন্তু শ্রীমান্ জিতেন্দ্রের বুদ্ধিকৌশলে ও চেষ্টায় আমরা এই শুল্ক-ব্যূহ হইতে অগোণে মুক্তিলাভ করিলাম। আমাদের জিনিষপত্র কেহ স্পর্শও করিল না।

ষ্টেশন হইতে গন্তব্য স্থান অনেকটা দূরে। পথে চলিতে চলিতে জয়পুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেল। শুনিলাম, সহরটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা, মাঝে মাঝে ফটক আছে, কিন্তু রাত্রি ১১টার সময় সেগুলি বন্ধ হয় আর প্রাতঃকালে খোলা হয়। এই সময়ের মধ্যে কেহ সহরে প্রবেশ করিতে পারে না বা তথা হইতে বাহিরে আসিতে পারে না। পরদিন এগুলি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইল। দেখিলাম, প্রত্যেক ফটকে পাহারা। অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই আমরা "এডওয়ার্ড-মেমোরিয়াল হোটেলে" উপস্থিত হইলাম। এটি দেশীয় লোকের পরিচালিত। মাঝখানে বিস্তৃত অঙ্গন ও ফুলের বাগান, চারিদিকে দ্বিতল গৃহের শ্রেণী। এখানে আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও মোটামুটি ভাল এবং বেশ সস্তা। রাজপুতানায় যত যায়গায় ঘুরিয়াছি, এরূপ অল্প খরচে সুবন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই। এই হোটেলটি প্রাচীরের বাহিরে, সুতরাং ফটক খোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না।

জয়পুর সহরটি খুব প্রাচীন নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা জয়সিংহ এই নগরীর পত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল অম্বর। অম্বর বর্ত্তমান জয়পুর হইতে মাত্র ৪।৫ মাইল দূরে। যাঁহারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া রাজপুতানা দেখিতে উৎসুক, তাঁহাদিগের প্রথমে অম্বর দেখিয়া পরে জয়পুর দেখা উচিত। মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে ব্যবধান কি, তাহা এই দুইটি রাজধানী দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

'অম্বর' মধ্যযুগের গিরি-দুর্গের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জয়পুর হইতে মোটর করিয়া রওনা হইলাম। প্রথমে কিছু দূর সমতলভূমি পার হইয়া ক্রমে পাহাড়ের পাশ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। এক যায়গায় দুই দিক্ হইতে দুইটি পাহাড় আসিয়া প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, মাঝখানে সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তা।

এইখানে প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন দেখিলাম। বেশ বুঝা গেল, ইহা অম্বর-দুর্গের প্রথম ঘাঁটি। শত্রু-সৈন্যকে বাধা দিবার ইহাই প্রকৃষ্ট স্থান। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া এখানে বহুগুণ শত্রু-সৈন্যের প্রতিরোধ করা যায়।

এই ঘাঁটি পার হইয়া অসমতল পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া ক্রমে আমরা অম্বর-দুর্গের পাদদেশে উপনীত হইলাম। বাঙ্গালীর চক্ষুতে সে এক অভিনব দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল "অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপর" আর মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত অপরিসর উপত্যকাভূমি। ইহারই মধ্যে একটি উচ্চ গিরিশীর্ষে অম্বর-দুর্গ এবং তাহারই একটু নীচে একটি সমান্তরাল পর্ব্বত-শিখরে বিস্তৃত রাজপ্রাসাদ ছবির মত শোভা পাইতেছে। আর এই পর্ব্বতের পাদমূলস্থ একটি নাতিবৃহৎ হ্রদ ইহাদের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। আশেপাশে যে সমুদয় পাহাড়, তাহাদের শীর্ষদেশে দুর্গের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। এইরূপ দুর্গ-শীর্ষ গিরিমালা-পরিবেষ্টিত অম্বর-প্রাসাদ পরিচারিকা-পরিবৃত রাজরাণীর ন্যায় শোভা

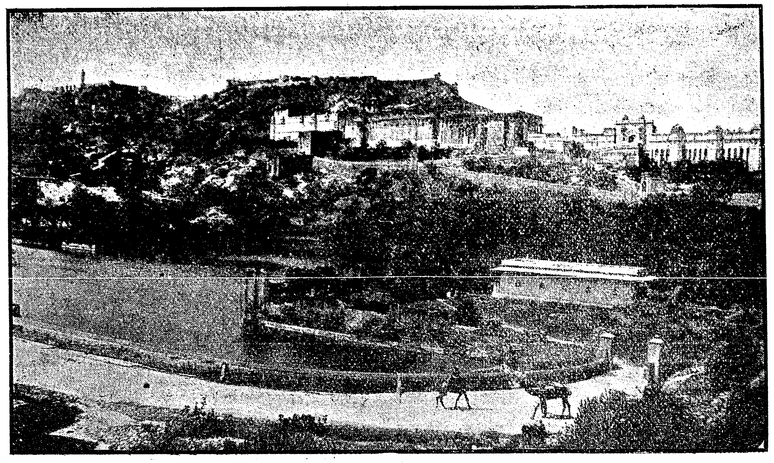

অম্বর প্রাসাদ—জয়পুর

করিয়া আছে। হ্রদের পার্শ্ব দিয়া পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ী ছাড়িয়া আমরা পদব্রজে তাহার সাহায্যে উপরে উঠিতে লাগিলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে আক্রমণকারী শত্রু-সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও আছে। এই সমুদয় দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমে এক সুবৃহৎ দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। এই দরজাটি এত উচ্চ যে, ইহার মধ্য দিয়া বৃহৎকায় হস্তীও আরোহী সহ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। তৎকালে হস্তীই ছিল রাজবাহন, সেই জন্য প্রাচীরদ্বার খুব উঁচু করিয়া নির্ম্মিত হইত।

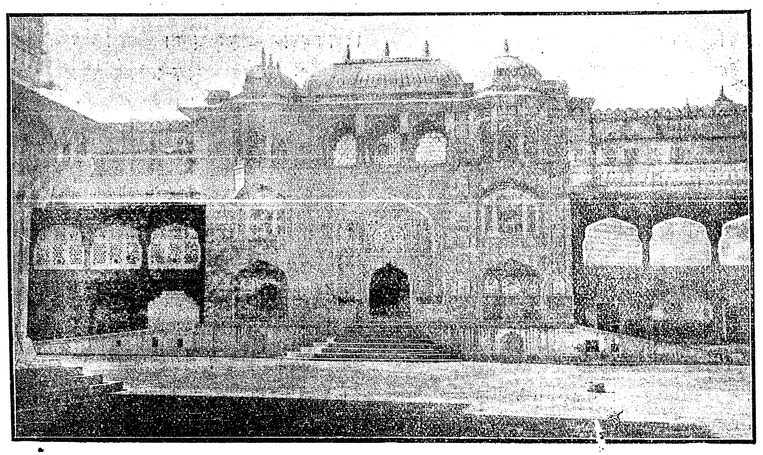

অম্বরের গণেশ দরওয়াজা

দ্বারদেশে পাশ বা ছাড়পত্র দেখাইয়া আমরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। পর্ব্বতের শীর্ষদেশ যতদূর সম্ভব সমতল করিয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাসাদটি আকারে খুব বড় না হইলেও ইহার কক্ষগুলির সাজসজ্জা খুবই মূল্যবান্। মোগল বাদশাহদের অনুকরণে এখানেও দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, শীশমহল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিল্লীর রাজপ্রাসাদে যেমন নানা বর্ণের প্রস্তরের সাহায্যে পশু পক্ষী, লতা পাতা প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ দেখিলাম। বরং এখানকার কারুকার্য্য দিল্লীর রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে হইল। রাজপুত জাতি যে মোগলের অনুকরণে কতদূর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং কারুশিল্পের উন্নতিও যে রাজপুতানায় কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, অম্বরের রাজপ্রাসাদ দেখিলে তাহা বুঝা যায়। এ সমুদয় বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা স্বয়ং দেখিবার সুযোগ না পাইবেন, তাঁহারা চিত্রাদির সাহায্যে কতক ধারণা করিতে পারিবেন।

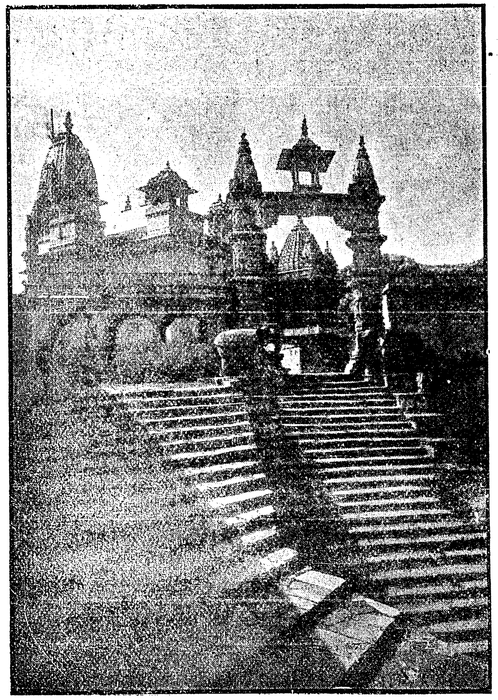

অম্বরের জগৎশিরোমণি মন্দির

রাজপ্রাসাদ এখন জনশূন্য, কোন কক্ষেই মানুষের বসতি চিহ্ন দেখিলাম না। কিন্তু শুনিলাম, বিবাহ, রাজ্যাভিষেকাদি অনুষ্ঠানের সময় রাজারা এখানে আসেন। বাদশাহী অনুকরণে বেগম-মহল, মানাগার, অন্তঃপুরের উদ্যান প্রভৃতি সবই আছে। সবগুলই ছোট-খাট, কিন্তু বেশ পরিপাটী। পর্ব্বতশীর্ষে স্থানের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, তাই সকলই ছোট-খাট। অর্থকল্পনা বা ইচ্ছার অসদ্ভাববশতঃ নহে। ইতিহাসে রাজপুত জাতির একটা দিক্‌ই আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের চরিত্রের কোমল দিক্‌টা এই সমুদয় স্থানে আসিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অবশ্য ইহার কতটা রাজপুতের আদিম চরিত্র আর কতটা মোগলদের অনুকরণের ফল, তাহা বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য।

প্রাসাদের মধ্যে একটি মন্দির আছে। সেখানে এখনও রীতিমত পূজা-অর্চ্চনা হয়। কয়েক জন পূজারীও সেখানে থাকে। প্রবাদ এইরূপ যে, রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার যশোরেশ্বরী-মূর্ত্তি কাড়িয়া আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন—সঙ্গে সঙ্গে যশোরেশ্বরীর বাঙ্গালী পুরোহিতগণও এখানে আসেন এবং তাঁহাদের বংশধররাই এখানকার পুরোহিত। আমরা যখন মন্দিরে গেলাম, তখন সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে। আরতির পরে পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বাঙ্গালা দেশের লোক কি না, সে বলিল, তাহার পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছে। পরে কিন্তু জয়পুরের অধিবাসী কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা যশোরেশ্বরী লুণ্ঠনের প্রবাদ একবারেই বিশ্বাস করেন না।

মন্দিরের বাহিরে প্রশস্ত অঙ্গন। এখানে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে গিরিশীর্ষে অম্বর-দুর্গ

শোভা পাইতেছে। রাজপ্রাসাদ হইতে এখানে যাইবার বেশ পথ আছে, কিন্তু এক রাজা ব্যতীত আর কাহারও না কি যাইবার হুকুম নাই। সুতরাং আমাদের আর দুর্গে প্রবেশ করা হইল না। যত দূর বুঝিতে পারিলাম, দুর্গের প্রাচীর প্রভৃতি বেশ সুরক্ষিত আছে। শুনিলাম, এখানে অনেক অস্ত্র-শস্ত্রও না কি আছে।

অম্বরে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ তাকাইলেই বুঝা যায়, সেকালে রাজপুত জাতি কিরূপ দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালার মাঝে রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করিত। ইহা মধ্যযুগের একটি বিশেষত্ব।

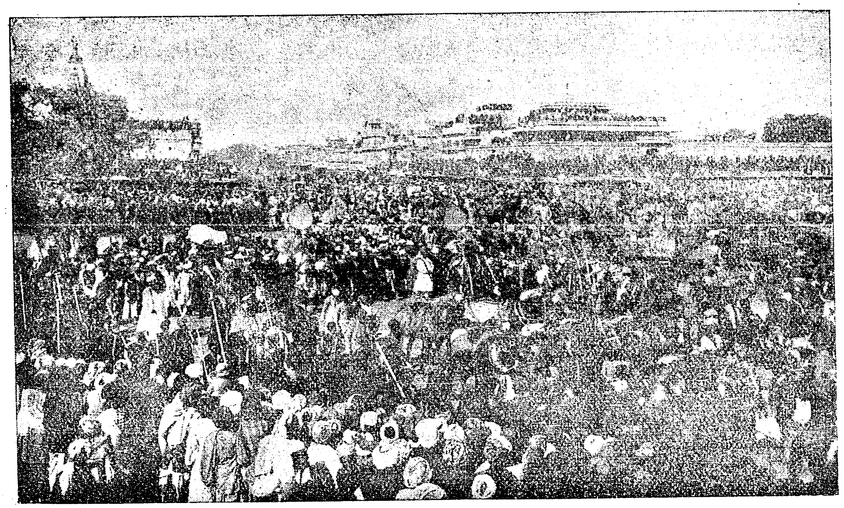

মহারাজার শোভাযাত্রা—জয়পুর

বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুর সমতল ভূমিতে অবস্থিত। মধ্যযুগে এই সমুদয় শৈলদুর্গ ও গিরিমালা আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য অস্ত্রস্বরূপ ছিল, এই সমুদয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক ব্যবধান ছিল বলিয়াই দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা রাজপুত জাতির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। রাজপুতানার সর্ব্বত্রই এইরূপ গিরিদুর্গ ও গিরিসঙ্কট দেখিয়া একটি কথা পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতি চিরদুর্ব্বল ও রাজপুত জাতি বীর ও সাহসী বলিয়া পরিচিত। জাতীয়-চরিত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই কি ইহার একমাত্র কারণ? দেশের প্রাকৃতিক সংস্থান কি ইহার জন্য অনেকাং দায়ী নহে? রাজমহলের নিকটবর্ত্তী সিকরাগলি গিরিসঙ্ পার হইলে যে কোন শত্রুসৈন্য অনায়াসে বাঙ্গালাদেশের এ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে- বাঙ্গালী আত্মগোপন বা আত্মরক্ষা করিতে পারে, এ একটি উচ্চ টিলা পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু উদয়পুরের দাবা গিরিসঙ্কট দেখিয়া মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছি যে, যদি বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য রাজপুতানায় এবং রা প্রতাপসিংহ বাঙ্গালাদেশে আকবরের বিরুদ্ধে লড়িতে

তবে ইতিহাসে বাঙ্গালীর কলঙ্ক ও রাজপুতের বীরত্বগরি এ উভয়ই অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইত কি না। জয়প উদয়পুর প্রভৃতি রাজপুতরাজ্য যে মুসলমানযুগে অপেক্ষা স্বাধীন ছিল, রাজপুত-বীরত্বই তাহার একমাত্র কারণ কি সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেহ যে না মনে করেন যে, আমি রাজপুত-বীরত্বের অমর্য্যাদা করি চাই। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এরূপ অলৌকিক বী সত্ত্বেও রাজপুতজাতি সম্ভবতঃ স্বীয় প্রাধান্য বজায় রাখি পারিত না—যদি প্রকৃতি স্বয়ং তাহার সহায় না হইতে অপর পক্ষে বাঙ্গালী প্রভৃতি যে সকল জাতি অপেক্ষা



জহুরী বাজারের পথ—জয়পুর

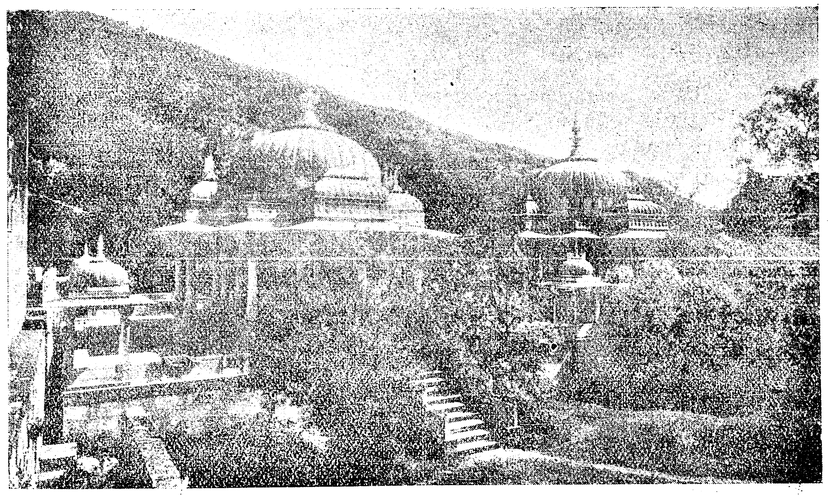

সোনাটোপ ছত্রি—জয়পুর

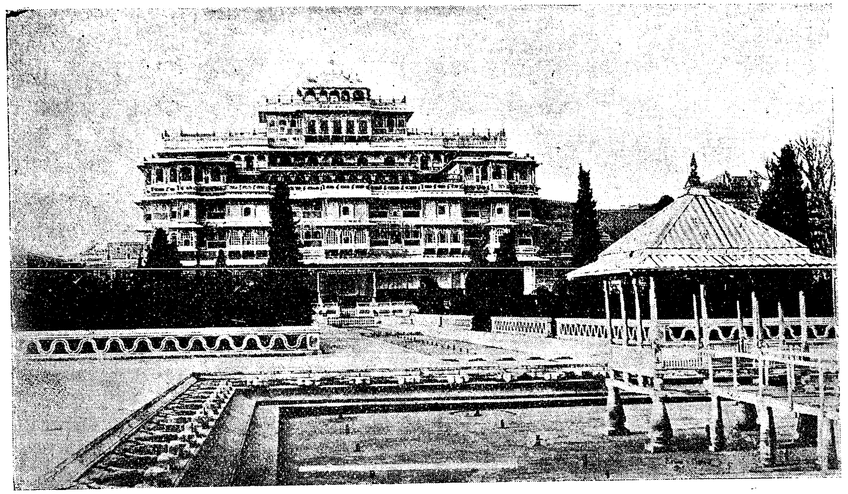

চন্দ্রমহল প্রাসাদ—জয়পুর

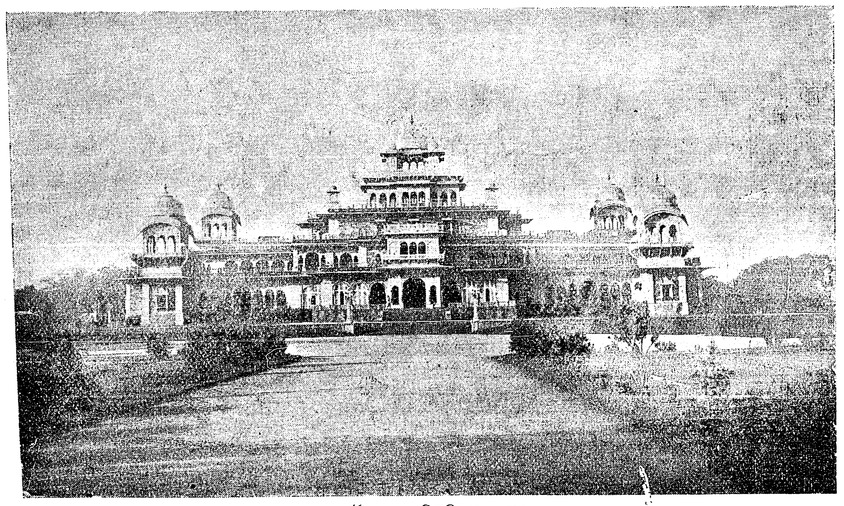

এলবার্ট হল ও মিউজিয়ম—জয়পুর

সহজে মুসলমানের পদানত হইয়াছিল, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতাই তাহার একমাত্র কারণ না হইতেও পারে। কেবলমাত্র মুসলমানের সহিত যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়াই রাজপুত ও বাঙ্গালীর চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করা যায় না। আত্মরক্ষা করিবার প্রকৃতিদত্ত সুযোগ ও সুবিধার বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার।

রাজা জয়সিংহ অম্বর পরিত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে নূতন রাজধানী পত্তন করিলেন কেন, তাহার সঠিক কারণ জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্রাচীন অম্বরে লোকসংখ্যার আধিক্যই ইহার প্রধান কারণ। গিরিমালা-বেষ্টিত অম্বরে বহু লোকের স্থান-সংকুলান করা দুরূহ, বিশেষতঃ জলের অভাব, বোধ হয়, সেই জন্যই জয়সিংহ সুবিস্তৃত সমতল-ভূমিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অম্বরের রাজপ্রাসাদে বসিয়াই অদূরবর্ত্তী সমতলভূমিতে নূতন রাজধানী করিবার কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় এবং বিদ্যাধর নামক এক জন বাঙ্গালী এই নগরের নক্সা প্রস্তুত করেন। এই নগরটি সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের। সরল, সুপ্রশস্ত, সমান্তরাল রাজবর্ত্ম-সমূহ নগরটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ইহাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। মধ্যযুগের ময়লা, আবর্জ্জনাবহুল অপ্রশস্ত, আঁকাবাঁকা গলির পরিবর্ত্তে এই সমুদয় বিস্তৃত রাজপথের কল্পনা যাহার মাথায় আসিয়াছিল, তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে কোথাও এরূপ নগরীর কল্পনা হইয়াছে বলিয়া জানি না। ইহা একজন বাঙ্গালীর কীর্ত্তি, ইহা ভাবিলেও আনন্দ হয়। বস্তুতঃই জয়পুর নগরী সমুদয় রাজস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে বড় বড় বাড়ী—সবই ফিকে সোনালী রঙ্গে রঞ্জিত—ঠিক যেন ছবির মত মনে হয়। নগরীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ প্রায় সারা সহরের চতুর্থাংশ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নগরীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। কিন্তু এখন প্রাচীরের বাহিরেও সহরের বিস্তৃতি আরম্ভ হইয়াছে।

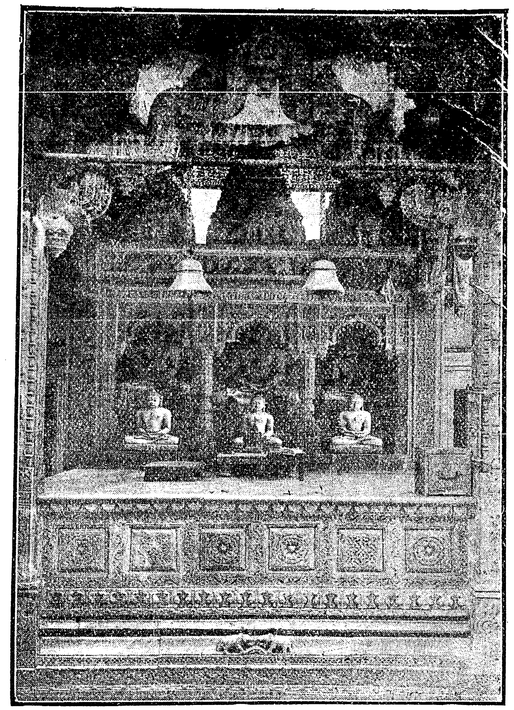

সাঙ্গেনীয়ারের জৈন-মন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তি

রাজপ্রাসাদ এক বিরাট ব্যাপার। ইহার কতকাংশমাত্র সাধারণের অধিগম্য। এক ধারে আফিস কাছারী। এখনও আফিসের কাগজপত্র উর্দ্দুতে লেখা হয়—অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ফরাসে বসিয়া সাবেকী কেতায় কাণফোঁড়া খাতায় উর্দ্দু জবান লিখিয়া যাইতেছে, মনে হয়, যেন মুসলমানের যুগে ফিরিয়া আসিয়াছি। কান্তি বাবু ও সংসার বাবু এই দুই জন বাঙ্গালী মন্ত্রী বহুকাল এই রাজসরকারে অপ্রতিহতপ্রভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে এখানে কয়েক জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এখনও দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রভাব এখন একবারে নাই বলিলেই হয়। রাজা নাবালক, রাজপ্রতিনিধি, সভার সদস্য কেহই বাঙ্গালী নাই। যে বাঙ্গালী একদিন জয়পুরের রাজদরবারে অতুল ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের প্রভাব

কেন অন্তর্হিত হইল ? এখন সার গোপীনাথ পুরোহিতই এই সভার সর্ব্বেসর্ব্বা।

রাজপ্রাসাদে অনেক বৃহৎ বাড়ী আছে। ইহার মধ্যে হাওয়া মহলের কারুকার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা রাণীদের বায়ু সেবনের স্থান। রাজপ্রাসাদে দুইটি জিনিষ দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, পুথিখানা ও শিলিখানা "(অস্ত্রাগার)" কিন্তু শুনিলাম, সাধারণতঃ "সাহেব" ব্যতীত কাহাকেও ঐ দুই স্থানে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় না। ওখানকার অধিবাসী বাঙ্গালীরাও অনেকে উহা দেখিতে পান নাই। রাজসরকারে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা করিলাম, তাঁহারা

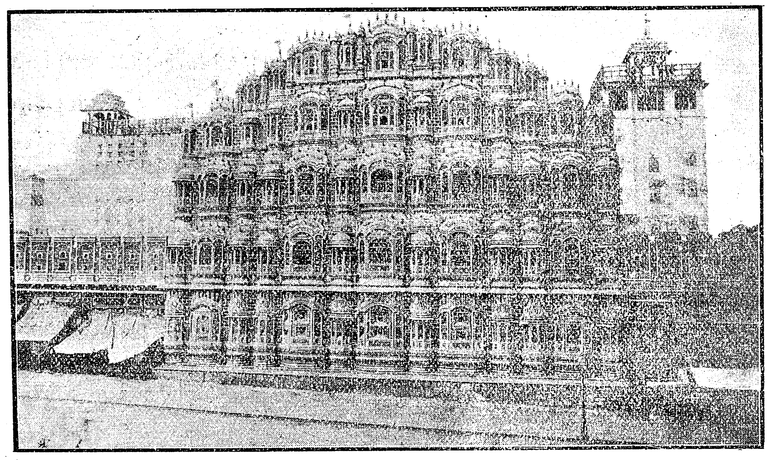

হাওয়া মহল—জয়পুর

অনুমতিপত্র যোগাড় বিষয়ে কোনই ভরসা দিলেন না। তখন অগত্যা সোজা সার গোপীনাথ পুরোহিতের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পুরোহিতজী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো আমলের এম, এ, এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন ; কিন্তু চালচলন একবারে সাদাসিধা ধরণের ; বসনভূষণের কোন বাহুল্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুদীর্ঘ আলাপ জুড়িয়া দিলাম। বর্ত্তমানে জয়পুর রাজ্যের অশেষবিধ উন্নতিসাধনের মূলে এক জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ, ইহাতে যে আমরা কিরূপ গৌরব বোধ করি, তাহাও তাঁহাকে জানাইলাম। অবশেষে পুথিখানা ও শিলিখানা দেখিবার অনুমতি ত পাইলামই, আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন জানিয়া তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন যে, জয়পুরে অবস্থানকালীন রাজসরকারের একখানি মোটরগাড়ীও আমার প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করিতে পারি। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহার এই অযাচিত দানের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং সরকারী মোটরেই অম্বর ও অন্যান্য স্থান দেখিয়াছিলাম।

ছাড়পত্র লইয়া পরদিন পুথিখানা ও শিলিখানা দেখিতে গেলাম। পুথিখানার প্রধান সম্পদ বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক চিত্র। পুথিখানার অধ্যক্ষ কেন জানি না, প্রথম হইতেই আমার প্রতি বিরূপ ভাব ধারণ করিলেন, পুরোহিতজীর পত্র দেখিয়া অবশ্য কোন বাধা দিলেন না ; কিন্তু সমস্ত ছবি খুব ভালরকম ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার কোন রকম আগ্রহ তাঁহার দেখিলাম না। তবে ইহা অজ্ঞতা না অসৌজন্যের পরিচায়ক ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একখানি ছবিতে আকবরের মহিষী যোধাবাইয়ের মূর্ত্তি ছিল। দুর্বুদ্ধির বশে আমি মন্তব্য করিলাম যে, ইনি জয়পুরের রাজকন্যা, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি এইখানে দেখা যাইবার সম্ভাবনা। পণ্ডিতজী ইহা শুনিয়া একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার স্বদেশী ভাষায় আমার প্রতি অনেক মন্তব্য করিলেন, এ মন্তব্যগুলি যে আমার পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর নহে, তাঁহার মুখভঙ্গী

দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, ভাষা দুর্ব্বোধ্য ছিল বলিয়া ইহাতে কোন মনস্তাপের উদয় হইল না। অনেক কষ্টে অর্দ্ধ-হিন্দীতে আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে, "যোধাবাই কখনও জয়পুরের কন্যা হইতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে মুসলমানদের সহিত তাঁহার বিবাহ কিরূপে সম্ভবপর হয় ?" এরূপ অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আমি সভয়ে নিবেদন করিলাম যে, আমার কোন কসুর নাই, ম্লেচ্ছ টড্ এইরূপ লিখিয়াছে এবং তাহাতেই আমার মনে এইরূপ ভুল ধারণা হইয়াছে। পণ্ডিতজী বলিলেন যে, উদয়পুর জয়পুরের চিরশত্রু, সুতরাং উদয়পুরের লোকরা জয়পুরের রাজবংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবার জন্য টডের নিকট এই মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। শত্রুতাসাধনের জন্য যাহারা এইরূপ নীচকার্য্য করিতে পারে, উদয়পুরের সেই নরাধমদিগকে যথেষ্ট গালিগালাজ করিয়া পণ্ডিতজী আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জয়পুরের রাজবংশে, সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান রাজা পর্য্যন্ত, কোন দিন কোন ম্লেচ্ছসংস্পর্শ ঘটে নাই। আমি উত্তর করিলাম যে, পবিত্র হিন্দুরাজকুলের, বিশেষতঃ জয়পুর রাজবংশের কোন কন্যা মুসলমানের গৃহলক্ষ্মী হয় নাই জানিয়া আমার বুকের উপর হইতে একটি বিষম বোঝা নামিয়া গেল। অতঃপর আমি এই নূতন তথ্য সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিব। যদি এই লেখা পণ্ডিতজীর চোখে পড়ে, তিনি দেখিবেন, আমি প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছি।

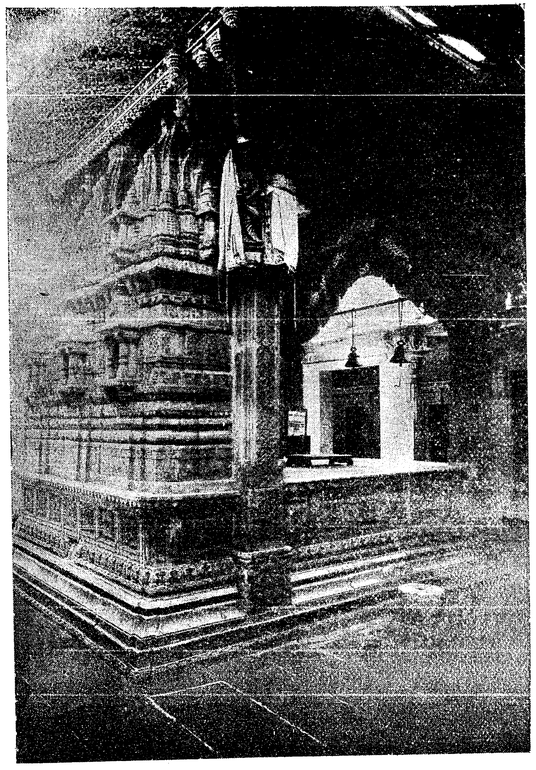

সাঙ্গেনীয়ারের প্রাচীন জৈন-মন্দির—জয়পুর

পুথিখানায় বাস্তবিকই অনেকগুলি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক চিত্র আছে। আওরংজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান, জয়সিংহের শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি—খুব সম্ভবতঃ সমসাময়িক চিত্র ঐতিহাসিকের কাযে লাগিতে পারে। বাঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দ্দীর সহিত মারহাট্টাদের যুদ্ধবিষয়ক একখানি ছবিও আছে। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর বাদশাহ, বেগম ও জয়পুরের রাজা ও রাজমহিষীদের প্রতিকৃতি ও অনেক কাল্পনিক নীতি-উপদেশপূর্ণ ছবিও আছে। কতকগুলি রাজদরবারের বৃহৎ ছবি চিত্রকলা হিসাবে খুবই মূল্যবান্। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমার ভাল লাগিল ফৈজী কর্ত্তৃক পারস্যভাষায় অনূদিত সচিত্র রামায়ণ ও মহাভারত। পণ্ডিতজী বলিলেন, ইহা ফৈজীর স্বহস্তলিখিত, ইহা কতদূর সত্য, বলিতে পারি না, কিন্তু এই দুই গ্রন্থের পাতায় পাতায় সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাগুলি যেরূপ সুন্দর চিত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা

বাস্তবিকই উপভোগ্য। এই চিত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের গোচরে আনিলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা এবং জয়পুর কলা-ভবনের সুযোগ্য অধ্যক্ষ হিরন্ময় বাবু সেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। মোটের উপর জয়পুর পুথিখানায় চিত্রকলামোদীর শিক্ষার ও উপভোগের অনেক বিষয় আছে।

পুতিখানার পরে শিলিখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে পুরান আমলের অস্ত্রশস্ত্র সুরক্ষিত আছে। তীর, ধনুক, ঢাল, তরোয়াল, কুঠার, বল্লম, খড়্গ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, রিভল-বার, বন্দুক প্রভৃতি সকল অস্ত্রই এখানে বেশ সুবিন্যস্তভাবে রক্ষিত হইয়াছে। মধ্যযুগের যুদ্ধপ্রণালী বুঝিতে হইলে এগুলির

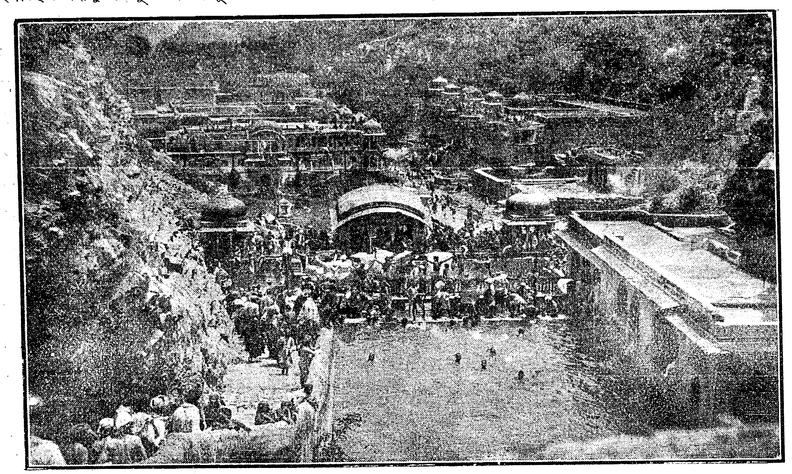

গল্‌তা জলাশয়—জয়পুর

সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ আবশ্যক। ধনুকগুলি ঈষৎ বক্র কাষ্ঠখণ্ডের মত দেখায়, জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, ইহাতে বেশ জোর লাগে। তীরগুলির মাথায় লোহার ফলা। শুনিলাম, ইহাতে বিষমাখান থাকিত; শত্রুর দেহে বিদ্ধ হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য ভাল অস্ত্রগুলি বেশ ভাল ইস্পাতের তৈয়ারী, পরিষ্কার ঝক্‌ঝক করিতেছে। এগুলি যে রকম ভারী, তাহাতে মনে হয় যে, সে কালের রাজপুতদের শারীরিক শক্তি অনেক বেশী ছিল। রিভলভার ও বন্দুকগুলি এ দেশেই তৈয়ারী হইত, ইহার গঠনকার্য্যে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি রিভলবারের সহিত সুকৌশলে একখানি ছোরা সংলগ্ন আছে। যদি রিভলবারের গুলী ব্যর্থ হয় এবং শত্রু নিকটবর্ত্তী হয়, তখন এই ছোরা আত্মরক্ষার শেষ অবলম্বনস্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ মধ্যযুগে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্রগঠনপ্রণালীর কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, এই শিলি-খানা দেখিবার পূর্ব্বে আমি তাহা ঠিক ধারণা করিতে পারি নাই।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে বেশ বড় একটি বাগান আছে, তাহার পরেই গোবিন্দজীর মন্দির। গোবিন্দজী প্রথমে মথুরায় ছিলেন, পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেশের দেবতা লুঠ করিতে জয়পুর-রাজারা বেশ পটু ছিলেন এ সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি ছড়াও লোকমুখে শুনিয়াছি। গোবিন্দজীর মন্দিরটি খুবই সাদাসিধা; কিন্তু ইহা অতিশয় বিরল। রাণী মাঝে মাঝে প্রসিদ্ধি এ অঞ্চলে খুবই বেশী। আমরা সকালবেলা ঠাকুর দর্শন করিতে যাইয়া দেখি, মন্দিরের চত্বর ও অঙ্গন নর-নারী পরিপূর্ণ। তখনও ঠাকুরের সম্মুখে একটি যবনিকার আচ্ছাদ ছিল। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ যবনিকাটি সরিয়া গেল এ ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখা গেল। তখন সেই সমবেত জনমণ্ডলী স্বরে কৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পদগু

ভাল বুঝিতে পারিলাম না. কিন্তু সেই অসংখ্য জনতার ভক্তি-গদ্‌গদ ভাব ও মিলিত কণ্ঠস্বরে সমস্ত মন্দির ও উপবন যেন একটি সুমধুর পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের অনেক হিন্দু মন্দির দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও এরূপ জীবন্ত ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা দেখি নাই। সমস্তই বেশ সুশৃঙ্খল ও সুনিয়-ন্ত্রিত। পাণ্ডাদের অত্যাচার নাই, যাত্রীরাও নিরতিশয় ভদ্র, স্ত্রীলোক দেখিলে নিজেরা সরিয়া পথ করিয়া দেয়, ঠেলাঠেলি মারামারি নাই। সে দিন প্রভাতে গোবিন্দজীর মন্দিরে যে পুণ্য ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা আমার মনে গভীর-ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদ এখন অনেকটা নিষ্প্রভ, কারণ, রাজা এখানে থাকেন না। তিনি নাবালক, বয়স ১৭।১৮ বৎসর, আজমীর রাজকুমার-কলেজে পড়েন। মাঝে মাঝে জয়পুরে যখন আসেন, তখনও প্রাসাদে থাকেন না। সহরের প্রান্তে আর একটি বাড়ী তিনি ও তাঁহার ইংরাজ গৃহশিক্ষকের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এই গৃহশিক্ষক খাস বিলাতের আমদানী; প্রায় হাজার তিনেক টাকা বেতন। বলিতে গেলে তিনিই এখন রাজার সর্ব্বময় প্রভু। রাজার বিবাহ হইয়াছে। রাণীর বয়স প্রায় ৩০ বৎসর, ইহা অনেকটা রাজ-নৈতিক বিবাহ। শুনিলাম, সাহেব গৃহশিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত রাজা তাঁহার মাতা অথবা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না, এবং এরূপ সাক্ষাৎ অতিশয় বিরল। রাণী মাঝে মাঝে জয়পুরে আসেন, কিন্তু তিনিও প্রাসা-দের বাহিরে ভিন্ন বাড়ীতে থাকেন। রাজারাজড়ার মতিগতি সত্য সত্যই বিচিত্র।

রাজপ্রাসাদের বাহিরে জয়পুরের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান রাম-বাগ, আর্টস্কুল ও মিউজিয়ম। রামবাগ একটি সুন্দর ও সুবৃহৎ উদ্যান, এখানে চিড়িয়াখানায় অল্পসংখ্যক পশুপক্ষী ও আছে। জয়পুরের মিউজিয়মটিও খুব সুন্দর। এখানে অনেক কারুকার্য্য ও শিল্পের নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ও কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তিও দেখিলাম। মিউজিয়মের বাড়ীটিও অতি সুন্দর। ইহার উপরে উঠিলে সমস্ত জয়পুরের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। আর্ট-স্কুলে অনেক কারুকার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। জয়পুরের নয়া ঘাট ও পুরানা ঘাটও প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে উপভোগ্য।

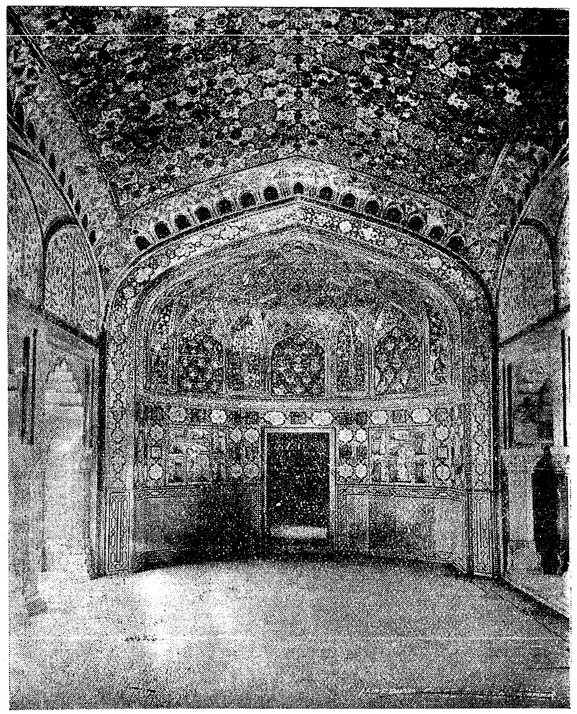

অম্বর রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত শীসমহলের অভ্যন্তর

নয়া ঘাটে অনেক গাছপালায় ঘেরা একটি ঝিলের মধ্যে অসংখ্য পদ্ম ফুটিয়া আছে। পুরানা ঘাটে একটি সুন্দর জৈন মন্দির আছে। আমরা যখন যাই, তখন ৪।৫ জন লোক বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুমধুর স্তোত্র পাঠ করিতেছিল।

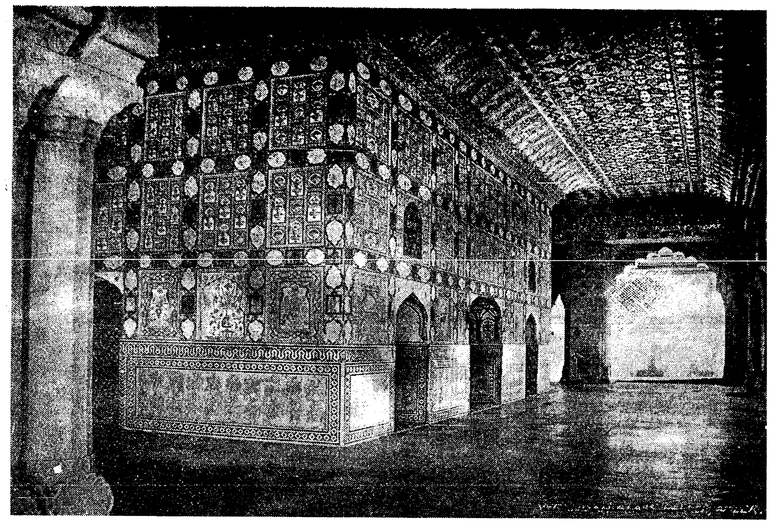

অম্বর রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত শীসমহলের বহির্ভাগ

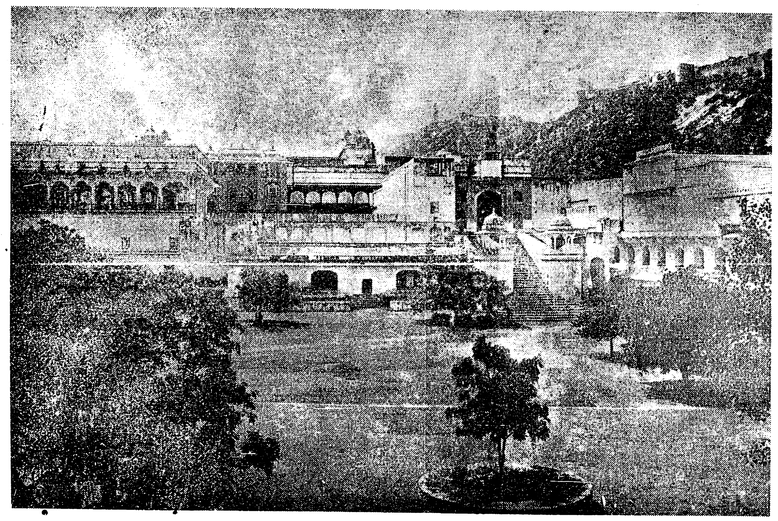

অম্বর রাজপ্রাসাদ—দূরে গিরিদুর্গ

মন্দিরটিতে জৈন শেঠগণের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পওয়া যায়। বেশ নির্জ্জন যায়গা ও মন্দিরটির মধ্যে একটি শান্ত সমাহিত ভাব বিরাজমান।

জয়পুরের অনতিদূরে গালতা পাহাড়ও একটি দেখিবার মত যায়গা। প্রবাদ এই যে, এখানে গালব মুনির আশ্রম ছিল। গালব মুনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু স্থানটি যে মুনি-ঋষির আশ্রমের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েক গজ মাত্র ব্যবধানে দুই দিকে দুইটি উচ্চ



জয়পুর নয়া ঘাট



জয়পুর রাজপ্রাসাদ ও সহরের একাংশ

পর্ব্বত সেতুর মত ইহাদের যোগসাধন করিয়াছে এবং তাহারই গাত্র বহিয়া একটি পার্ব্বত্য ঝরণা আসিয়া নীচে পড়িয়াছে। পাহাড়ে ঘেরা এই ছায়াশীতল যায়গাটি নির্জ্জন ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ অনুকূল।

জয়পুরের অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনায় নিরস্ত হইলাম। যাঁহাদের যত্নে ও আতিথ্যে আমাদের জয়পুরবাস সুখকর হইয়াছিল, সেই জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বাবু, আর্য্যস্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হিরন্ময় বাবু ও শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (অধ্যাপক এম, এ, পি-এইচ, ডি)



দাম্পত্য-কলহে চৈব

১

হেমন্ত 'ল' পাশ করিয়া আলিপুরে সদ্য ওকালতি সুরু করিয়াছে। টোপ বিস্তর ফেলিতেছে, তবে মক্কেল-রূপ মাছ এখনও গাঁথিতে পারে নাই। খিদিরপুরের কাছে ছোট একখানি বাংলো খরিদ করিয়া হাল ফ্যাশনে তাকে সাজাইয়াও তুলিতেছে। তরুণী বধূ শান্তি আসিয়া সে বাংলোয় উঠিয়াছে—আজ তিন মাস। ওকালতিতে যা হইবার হইবে, তবে দু'জনে মিলিয়া যখন জীবনের নানা কল্পনাকে তরুণ-মনের রঙীন আলোয় বিচিত্র করিয়া তুলিতে বিভোর, এমন সময় সহসা এক দিন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কি একটা তুচ্ছ বিষয় লইয়া প্রবল মান-অভিমানের পালা জাগিল, তার ফলে নির্ব্বাক্ হেমন্ত বেলা এগারোটায় চাপ-কান আঁটিয়া কোর্টে বাহির হইয়া গেল; এবং তার বাহির হইবার এক ঘণ্টা পরে আহারাদি সমাপন করিয়া শান্তিও বাড়ীর পুরানো ভৃত্য বংশীকে সঙ্গে লইয়া ট্যাক্সি ডাকাইয়া কাশীপুরে মাতামহ গোবিন্দচরণের গৃহে গিয়া উঠিল। শান্তিকে কাশীপুরে পৌঁছাইয়া বংশী আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল।

শান্তি মা-বাপ-মরা মেয়ে। মাতামহ গোবিন্দচরণের সে ভিন্ন সম্বলও আর কেহ নাই। তাই অতিরিক্ত আদরে শান্তির মেজাজটুকু খুব শান্ত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে নাই! তার গোঁ ছিল দুর্জ্জয় এবং সে গোঁ তিলমাত্র বিরুদ্ধ আঘাত পাইলে অচিরে বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা জাগাইয়া তোলে বিলক্ষণ, তবে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এ অভিমানের উদয় আজ এই প্রথম। কাজেই তরুণ হেমন্ত অভিমানে মৌনী হইয়া যখন মক্কেলের সন্ধানে কাছারি ছুটিল, তখন গৃহাভ্যন্তরে এতখানি বিপ্লবের কল্পনা তার মনেও স্থান পায় নাই!

বৈকালে গৃহে ফিরিয়া, গৃহের অবস্থা দেখিয়া এবং বংশীর কাছে রিপোর্ট শুনিয়া হেমন্ত রাগে গুম হইয়া রহিল; তার পর চা পান করিয়া বন্ধু-মজলিসে বাহির হইয়া গেল; ফিরিল রাত দশটার পরে। সে ভাবিয়াছিল, শান্তি এতক্ষণে নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে নিশ্চয়। কিন্তু ফিরিয়া যখন সে দেখিল, শান্তি ফিরিয়া আসে নাই, তখন ক্ষুব্ধ অভিমান তীব্র রোষের প্রদীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল এবং সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এত স্পর্দ্ধা! কি এমন বলিয়াছি যে, শান্তি···থাক্ সে সেখানে, বুড়া মাতামহের আদরে নিশ্চিন্ত আরামে! আমার কি আর, ইত্যাদি!

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যত দুর্জ্জয় হউক, মন যে তার আড়ালে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে চায় না! বাংলো খরিদ করিয়া তাকে সাজাইবার কল্পনা যে দিন শান্তির সহানুভূতির পরশ পাইয়া বিচিত্র রঙে রঙীন হইয়া উঠিল, সে দিন সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, তার জীবনের আকাশে এমন আঁধার ঘনাইতে পারে! এই শান্তি—ক্ষুদ্র একটু কথার আঘাত এমন বড় হইল যে, এতখানি ভালবাসা তার কাছে আমোল পাইল না! হায় রে, জীবনের সব কাঁটা রঙীন ফুল হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া উঠিয়াছে— ভাবিয়া সে ফুল বুকে তুলিতে যেমন উদ্যত হইল, অমনই কোথায় মিলাইয়া গেল ফুলের সে কোমল রঙীন দল··· কাঁটার আঘাতে বুক তার ছিঁড়িয়া যাইবার যো·····

বাহিরে এক আকাশ জ্যোৎস্না···সারা পৃথিবী তার পরশে বিভোর বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে।···এ জ্যোৎস্না কি তার এমনই বেদনায় কাটাইবার কথা! কিন্তু···তার সমস্ত অন্তরাত্মা নিষ্ফলতার ব্যথায় আকুল দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

পরের দিন। কোনও কাজে মন লাগে না! সারা দুনিয়া যেন একটা রাত্রির মধ্যে জড় পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে! ঐ গাছের ফুল, ঐ সবুজ ফার্ণ, খাঁচার মধ্যে ঐ ক্যানারি পাখী—ও-গুলা যেন শোলার তৈয়ারী, প্রাণ-হীন, নেহাৎ কৃত্রিম! বংশী চা'য়ের পেয়ালা দিয়া গেল; র উপর খপরের কাগজখানা পড়িয়া রহিয়াছে। চায়ের পেয়ালা আর খপরের কাগজের মধ্যে কত-ব্য ঝরিয়া পড়ে, আজ ওখানা শুধু রাজ্যের বাজে রা একটা নির্জ্জীব কাগজমাত্র, আর ঐ চায়ের ···ও চায়ে না আছে রস, না আছে স্বাদ!

সাধনার ধন এক মক্কেলকে লইয়া মুহুরী আসিয়া দেখা ল। হেমন্ত কহিল,—কাল এসো, শরীর আজ ভাল ।

মুহুরী সবিনয়ে জানাইল, কাল অবধি অপেক্ষা করিতে গেলে ইহাকে কি ফিরাইয়া আনা যাইবে? আশেপাশে সংখ্যাহীন তৃষিত বাহুর উদ্যত আহ্বান···

হেমন্ত কহিল,—নিরুপায়!

মুহুরীও নিরুপায়তার নিশ্বাস ফেলিয়া মক্কেলকে লইয়া বিদায় লইল।

বংশী আসিয়া কহিল,—বৌমা নেই, বাজারের পয়সা···

হেমন্ত কহিল,—যা খুশী আন্ গে, পয়সা পরে নিস্।···

সরস বিশ্ব একেবারেই বিরস, তিক্ত! কোথায় এর মোহ, কি-বা আকর্ষণ!···বেদনার ফাট ধরিয়া মনটা দু' ভাগ হইয়া দু'দিকে সরিয়া গিয়াছে। একটা দিক কাতর নিশ্বাসে ডাকিতেছে, 'প্রিয়া' 'প্রিয়া', অপর দিক আক্রোশে জ্বলিয়া হুঙ্কার তুলিতেছে—খবর্দ্দার, খবর্দ্দার!

বেলা বাড়িতে লাগিল। বংশী আসিয়া তাগিদ দিয়া গেল—দশটা বাজে···

বাজুক! কা'র কি আসিয়া যায়! অন্য দিন এমন সময় সে খাওয়া সারিয়া কাছারির পোষাক পরিবার উদ্যোগ করে, তার মধ্যে বিশ্বের কি আরাম! শান্তির চুড়িগুলায় কি রাগিণীই বাজিতে থাকে···তার সে কি যত্ন, কি আদর!

আজ···সে সব যেন স্বপ্ন!

বারোটার সময় হঠাৎ কি খেয়াল মনে জাগিল। কাছারির পোষাক আঁটিয়া হেমন্ত বাহির হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে যেন কোথা হইতে একটা চেতনা জাগিল—মক্কেল! মক্কেল!

মুহুরী আসিয়া জানাইল,—সে মক্কেলটাকে রাখতে পারলুম না—কেশব বাবুর কাছে গেল! দালালের দল, জানেন তো···

হেমন্ত কহিল,—যাক্, কুছপরোয়া নেই!

ভালো লাগে না, কিছুই যে ভালো লাগে না! শান্তি—সব শান্তি সে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে!···তার বিস্ময় লাগিতেছিল যে, দু' দিন আগে কোথায় ছিল শান্তি···আর দু'দিন আসিয়া এমন দোর্দ্দণ্ড অমোঘ প্রভাবে হেমন্তকে এমন করিয়া দিয়াছে যে, আজ তার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মনকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। সাজ-সজ্জা করিয়া হেমন্তকে ছুটিতে হইল—সেই অকরুণ প্রিয়ার উদ্দেশে।

হা রে, দুর্ব্বল ভীরু···মিনতির পাত্র লইয়া···

মন আবার বলিল, না, তার স্পর্দ্ধার একবার বোঝা-পড়া করা প্রয়োজন।

সমস্ত বাংলো-বাড়ীখানা পিছনে বিদ্রূপে ফাটিয়া যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল! হেমন্ত সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না!

২

কাশীপুরের বাড়ীতে মাতামহ বিস্মিত হইয়া নাতিনীকে প্রশ্ন করিলেন,—তুই যে চলে এলি রে হঠাৎ—হেম পাঠালে?

শান্তি কহিল, পাঠায়নি, আমি নিজেই চ'লে এলুম।

গোবিন্দচরণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দুই দিন পূর্ব্বে ও-বাড়ীর গৃহিণীর কি একটা ব্রত উপলক্ষে দু'জন ব্রাহ্মণভোজনের ব্যাপারে মাতামহ খিদিরপুরে গিয়াছিলেন—নাতনীটিকে এক রাত্রির জন্য আনিতে। তাঁদের একান্ত পীড়াপীড়ি, তা শান্তি আসে নাই। বলিয়াছিল, যাবার উপায় নেই দাদু···নতুন ঘরদোর, লোকজনগুলো সঙ, সব গোলমাল ক'রে দেবে! আর আজ সেই শান্তি দুম্ করিয়া নিজে হইতে আসিয়া হাজির···বাড়ীর নূতনত্ব বা লোকজনের বুদ্ধিশুদ্ধিও এ দু'দিনে ত ঘুচে নাই।

শান্তি কহিল,—সংসার কি বিশ্রী, দাদু···তার চেয়ে বেশ আছেন, ঐ রামকৃষ্ণ মিশনের মেয়েরা! কেমন রোগীর সেবা, পরোপকার, ব্রত ধর্ম্ম নিয়ে···বিয়ে না দিয়ে আমায় যদি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যেতে দিতে···

গোবিন্দচরণের বিস্ময়ের মাত্রা সীমা ছাপিয়া উঠিল। বোঝা বৃদ্ধ! হালের বাঙ্গলা উপন্যাস তো তিনি পড়েন না! কাজেই কি করিয়া বুঝিবেন—শান্তির কথাগুলা সেই স উপন্যাসের শেষের পরিচ্ছেদ হইতে ধার করা।

তিনি কহিলেন,—হেমের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

চহি

বৃদ্ধ হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—তা ঘর কর্‌তে গেলে স্বামি-স্ত্রীতে অমন মান-অভিমান কত হয়! আমাদেরই কি হতো না?

বৃদ্ধের চোখের সামনে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কত দৃশ্য যে চকিতে জাগিয়া উঠিল···প্রাণটা অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র হইয়া আসিল। চল্লিশ বৎসর পরে আজও তরুণ-তরুণীর প্রাণ ঠিক তেমনই আছে! মান-অভিমানের তেমনই দোলায় দুলিয়া শিশুর মত প্রেম-অনুরাগ মায়া-প্রীতি তেমনই ক্রমে বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু হেমন্ত তো ভারী শান্ত ছেলে! শান্তির গোঁ···ঠিক তিনি তো জানেন, তাঁর নাতিনীটির মেজাজ কেমন!

শান্তি কহিল,—হাঁ, হাঁসপাতালে নার্শের কাজ করবো আমি দাদু, সংসার করা আমার পোষাবে না। পরের এস্তাজারি···

বৃদ্ধ আবার হাসিলেন; হাসিলেও বুকের মধ্যে একটা আশঙ্কার উদ্বেগ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। এ-সব বলে কি শান্তি! ভদ্র ঘরের মেয়েও নাকি আবার হাঁসপাতালে কখনও—

তিনি কহিলেন, ভাবিস্‌নে দিদি,—ছাখ না, হেম ও-বেলায় এসে সেধে কেঁদে আবার তোকে মাথায় করে নিয়ে যাবে'খন।

শান্তি কহিল,—সাধলে কাঁদলেই আমি অমনই যাচ্ছি কি না! বয়ে গেছে আমার যেতে!

না, এ প্রসঙ্গ ঠিক নয়!

বৃদ্ধ কহিলেন,—গঙ্গার ধারে আমাদের সেই বাগান কেমন হয়েছে, দেখিনি ত? চ' এক দিন সেখানে গিয়ে বন-ভোজন ক'রে আসি সব—সামনের রবিবারে হেমেরও কাছারি নেই, বেশ হবে।

শান্তি কহিল,—আমি যাব না।

বলিয়া সে উঠিয়া গেল। অন্দরের উঠানে বামুনদির সঙ্গে দেখা। শান্তি কহিল,—আমায় একটু জলপাইয়ের আচার দাও না ভাই বামুনদি, হাতে কাজ নেই, ওপরের ঘরে ব'সে ব'সে আচার খাই গে—

বামুনদি কহিল, শুধু আচার! দু'খানা লুচি ভেজে দিই না?

—না, শুধু আচারই খাবো।

—দি দিদি···

—ওপরে এসে দিয়ে যাও ভাই লক্ষ্মীটি···বলিয়া শা দোতলায় চলিয়া গেল।

খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটা বস্তীর অভ্য দেখা যাইতেছিল। একটি বধূ দাওয়ায় ঝাঁট-পাট দিতে মাথায় ঘোমটা। ঝাঁটপাট শেষ হইলে বাঁশে-দোলা একখানা ময়লা ধুতি টানিয়া পাড়িয়া দাওয়ায় উঠি সেখানা সে কোঁচাইতে লাগিল। ওর স্বামীর ধু নিশ্চয়! স্বামী? কাজে বাহির হইয়াছে, বধূ ঘ কাজ-কর্ম্ম সারিতেছে। শান্তির বুকের এক কোণে ছে একটু বেদনার ঘা বাজিল। ঐ তুচ্ছ কাজটুকুর মধ্যে তার প্রাণ যেন ঢালিয়া দিয়াছে, নিঃশেষে! উহা মধ্যে মান-অভিমানের বালাই বুঝি ঘটে না! কেন ঘটিবে ছোট্ট গণ্ডী, কাজেই তর্কও কম। তর্ক হইতেই না মনের গোল! আর এ তর্কের মূলে বিদ্যা-বুদ্ধির বড়াই আর আত্ম লন! অভিমান কেন না হইবে? না হয় একটু তর্ক তুলি সে সরিয়াই গিয়াছিল, তা বলিয়া কথা বন্ধ করিয়া কাছা চলিয়া গেলে! খাইতে গেলে, তা একবার ডাকিতেও পারি না? রাগ! তার যদি তেমন রাগ হইবে তো তাড়াড়া পাণ সাজিয়া তাহাতে এসেন্সের খোসবু মিশাইয়া দি যাইবে কেন? একটু অভিমান! তোমার দম্ভ এত হইল যে, ফিরিয়া ছোট একটু ডাক, তাও ডাকি পারিলে না। পোষাক আঁটিয়া গম্ভীর মৌনভাবে কাছা বাহির হইয়া গেলে! এ বয়সে স্বামীর কাছে অভিম করিয়া একটু সোহাগ যদি না পাইল তো কাজ কি ত সেখানে পড়িয়া হেনস্থা সহা!—এখনও জীবনের সব ক বয়স পড়িয়া আছে। যখন খুব পুরানো হইয়া যাইবে? এ অভিমানে হয় তো তখন বজ্রপাত ঘটিয়া যাইবে! কাজ তবে···মানে মানে তাই সে এখানে সরিয়া আসিয়াছে একলা ওই দুর্জ্জয় মান লইয়া কত দিন থাকিতে পারে থাকো!

মনের কোণে কোন্ গোপন গহনের মাঝ হইতে এক ছোট পাখী কেবলই তবু গাহিতেছিল—আজই, আজই গে আজই! দিনের আলো যখন নিবিয়া আসিবে, তখন—তখ ওগো তরুণী বধূ, তোমার জয়ের উল্লাসে আকাশ, বাত মাতিয়া উঠিবে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! এ যদি না হয়, তবে বৃ

তোমার যৌবনের তুলিতে আঁকা অঙ্গে অঙ্গে ওই লাবণ্যের বাহার!

সন্ধ্যায় ক্ষণে ক্ষণে শান্তির বুক দুলিয়া উঠিতেছিল—ওই বুঝি বাহিরে সেই পরিচিত স্বর! ওই না একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল! ওই বুঝি দাদু মহা-উল্লাসে ডাক দিয়া বলেন,—ওরে কে এসেছে, দ্যাখ। কিন্তু কোথায় কি! সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রির কোলে আপনাকে নিক্ষেপ করিল, তবু সে পরিচিত স্বর ভাসিল না তো—কেহ আসিল না!···

পরের দিনটা—সারাদিন কি দুর্গ্রহের ভোগ ভুগিয়াই যে কাটিল! এমন করিয়া নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়া থাকাও যায় না তো! উপায় কি? অথচ নিজে সাধিয়া অত-বড় পরাজয়ও মাথা পাতিয়া লইতে পারে না! বুক যদি ভাঙ্গিয়া যায়, যাক্! মুখকে তা বলিয়া কিছুতেই সে ফুটিতে দিবে না!···

বেদনায় ফুলিয়া অভিমান শেষে রোষের বহ্নিদাহে জ্বলিয়া উঠিল। শান্তি গিয়া সন্ধ্যার সময় বামুনদির কাছে হাজির। সে নিজে আজ দাদুর জন্য তাঁর তরকারী রাঁধিয়া দিবে। বামুনদি কহিল—এমন পাগলও দেখিনি। এ যে তোমার অনাসৃষ্টি আবদার, দিদিমণি। আগুন-তাতে—

শান্তি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, বলিল,—ননীর শরীর, গলে যাবে! না?

গোবিন্দচরণ আসিয়া কহিলেন,—শান্তি, কি অশান্তির সৃষ্টি করছিস্ দিদি? হেম এসেছে।···

শান্তির সমস্ত বুকখানা জয়ের উল্লাসে যেন ফাটিয়া পড়িবে, এমনি···সে জোর করিয়া বুকের সে উল্লাস দাবিয়া রাখিয়া ডাকিল,—দাদু!—ডাকিয়াই সে বাহিরে আসিল।

দাদু কহিলেন,—নাতজামাই এসেছে যে রে—বাইরে বসে আছে।

শান্তি কহিল,—কেন? তার স্বর শান্ত, উত্তেজনার চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই!

গোবিন্দচরণ দ্বিধা-ভরে নাতিনীর পানে চাহিলেন। শান্তি কহিল,—বাড়ী যেতে বলো। আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি বিধু মামার বাড়ী যাচ্ছি।

শান্তি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। গোবিন্দচরণ কহিলেন—শোন্ দিদি—

শান্তি কহিল—শোন্‌বার কিছু নেই। নাত-জামাই নিয়ে যদি আমোদ করা তোমার ইচ্ছা থাকে তো করতে পারো। আমি আজ বিধু মামার বাড়ীতেই রাত্তিরে থাকবো—মামীমার কাছে খাবো—মামীমা বেশ চাটনি রাঁধেন।

গোবিন্দচরণ বিপদে পড়িলেন। ও দিকে নাতজামাই, এ দিকে নাতনীর ভালো-করিয়া-জানা দুর্জ্জয় গোঁ! মারীচ-কুরঙ্গ বেচারাও বুঝি সে রামায়ণের যুগে এমন বিপদে পড়ে নাই!

শান্তি দাঁড়াইল না। গোবিন্দচরণ অগত্যা বাহিরের ঘরে আসিয়া নাতজামাইয়ের খাতিরে মনোযোগ দিলেন।

হেমন্ত বলিল—ট্যাক্সিটা রেখেছি···আমি, মানে, শান্তিকে এখনি নিয়ে যাবো।

গোবিন্দচরণ কহিলেন—সে কি হয় দাদা? এসেছো, কত আদরের জিনিষ তুমি—আজ থাকো। থেকে কাল সকালে খাওয়া-দাওয়া করে যেয়ো।

হেমন্ত বলিল—আজ্ঞে না, কাল কাছারি আছে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন—এখান থেকেই কাছারি করো। সকাল সকাল পাঠিয়ে দেবো।

হেমন্ত কহিল—মাপ করুন, দাদামশায়, সে আর এক দিন এসে থাকবো। মানে, বাড়ী তেমন বন্ধ করে আসিনি··· নতুন জায়গা! আমি শান্তির সঙ্গে দেখা করে তাকে বলি, চট্‌পট গুছিয়ে নিতে।

আশঙ্কায় গোবিন্দচরণের গায়ে কাঁটা দিল! কে জানে, যে মেয়ে! শান্তি হয় তো এতক্ষণে বিধুর ওখানে না গিয়া··· থাকিলে, সাক্ষাৎটা যদি—

হঠাৎ তাঁর মাথায় বুদ্ধি জাগিল। তিনি কহিলেন—শান্তি বিধুর ওখানে গেছে। রাত্রে তারা খাবার নেমন্তন্ন করেছে কি না···

হেমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এ কথার পর কি করিবে ভাবিতেছিল, হঠাৎ অন্দরের দিক হইতে পরিচিত স্বর শুনিল—আমি বিধু মামার বাড়ী চল্‌লুম, বামুনদি। তোমাদের বাড়ীর ঝামেলা কাটলে খপর দিয়ো, আসবো। দাদুকে বলো, ভাই—

হেমন্ত অবাক্! গোবিন্দচরণ ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়! জামাই মানুষ,—তাই তো! মেয়েটা এই গোঁয়ের জন্য নিজের কি সর্ব্বনাশই যে করিয়া বসিবে···

হেমন্ত তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া পরক্ষণে কহিল—দাদামশায়!

সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখিয়া গোবিন্দচরণ ডাকিলেন—দাদু!

হেমন্ত কহিল—শান্তি আমার সঙ্গে দেখা করবে না, বুঝি?

গোবিন্দচরণ কহিলেন—ভারী একগুঁয়ে মেয়ে, দাদা—তাই তো বল্‌ছিলুম, আজ রাত্তিরটা থাকো। আমি সব ঠিক করে দেবো।

পুরুষত্বের অভিমান তাহাকে যেন চাবুক মারিল। হেমন্ত কহিল—কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, দাদামশায়!—তার চোখ ছলছলিয়া উঠিল।

গোবিন্দচরণ কহিল—বড্ড আদর পেয়ে এসেছে—ছেলেমানুষ—ক্রমেই শুধরে যাবে, দাদা।

গোবিন্দচরণ হেমন্তর পাশে বসিলেন। দু' জনেই চুপ। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা শুধু কাঠের ছোট কুঠরীর দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া একঘেয়ে আর্ত্তনাদ তুলিতে লাগিল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে গোবিন্দচরণ ডাকিলেন—সত্য!

ভৃত্য সত্য সে আহ্বানে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গোবিন্দচরণ কহিলেন,—দিদিমণি বাড়ী আছে কি না, দেখে আয় তো।

সত্য চলিয়া গেল এবং পাঁচ মিনিট পরে আসিয়া খবর দিল, দিদিমণি একটু পূর্ব্বে ও-বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন—কাদি ঝি সঙ্গে গিয়াছে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন—আচ্ছা, তুই যা—মোদ্দা বাড়ীতে বল্ গে যা, জামাইবাবু এসেছেন।

সত্য চলিয়া গেল। তার পরে আবার সেই নিস্তব্ধতা!

৩

হেমন্তকে বিস্তর মিনতিতে বুঝাইয়া পড়াইয়া গোবিন্দচরণ অন্দরে আসিয়াছিলেন। হেমন্ত ইতোমধ্যে প্রায় সাতবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছে—তা হলে আজ চল্‌লুম,—আর গোবিন্দচরণ বার বার তার হাত ধরিয়া—কি করছো,—ছি! বলিয়া তাকে বসাইয়াছেন। প্রতিপদে আজ তাঁর স্বর্গগতা গৃহিণীর কথা মনে পড়িতেছিল। এ সব কোমল বৃত্তির ব্যাধি, এর চিকিৎসা করা কি তাঁর কাজ! গৃহিণী যদি আজ থাকিতেন!

শান্তি রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া ছিল; বিধু মামার বাড়ীতে ভালো লাগিল না। এখানে এত বড় হৃদয়-নাটকের অভিনয়—এ ছাড়িয়া দূরে থাকিবার তার সাধ্য ছিল না!

গোবিন্দচরণ তাকে দেখিয়া ডাকিয়া বাহিরে আনিলেন, লোকজন যেন মান-অভিমানের এ ব্যাপারটা জানিতে না পারে! একটু খুসী মনে তিনি কহিলেন,—তা হলে সুবুদ্ধি হয়েছে দিদি!

শান্তি ঝাঁকিয়া উঠিল,—সুবুদ্ধিও নয়, কুবুদ্ধিও নয়! মামীমার শরীর ভালো নয়, তার ওপর কে কুটুম এসেছে—তাই চলে এলুম।

বৃদ্ধ হাসিলেন,—মৃদু হাসি! হায় রে, যৌবনের আড়ালে বসিয়া তোরা ভাবিস্, বুড়া কিছু বোঝে না! কিন্তু বুড়োদেরো এক দিন যৌবন ছিল, এই কথাটা তোরা খেয়াল করিস্ না!

বৃদ্ধ কহিলেন,—লক্ষ্মী দিদিমণিটি, রাগ করিস্ নে—আমার মাথা কাটা যাবে—বুড়োর খাতিরে অন্ততঃ···

শান্তি কহিল,—তোমার বে-খাতির তো করছি না। বলো না, কি চাই?

বৃদ্ধ কহিলেন,—হেমকে ডেকে আনি, উপরে যা—মিটিয়ে ফ্যাল্।

শান্তি কহিল,—কি? হয়েছে কি যে, তা মেটাতে হবে!

বৃদ্ধ কহিলেন—তোদের যে মানের পালা চলেছে।

শান্তি কহিল—মান আবার কিসের! কিছুই হয় নি, আমার কারো সঙ্গ ভালো লাগে না, আমি একলা থাকতে চাই।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—এই তো ছলনা করছো দিদি! তা, বোধ হয়, সে থাকবে না, একবার দেখাটি করবে। সত্যি, ও এই বুড়ো দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে খিদিরপুর থেকে কাশীপুর—এতটা পথ ট্যাক্সি ভাড়া করে আসেনি···বৃদ্ধ সস্নেহে শান্তির দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন।

শান্তি কহিল, আমি দেখা করতে পারবো না—আমার মাথা ধরেছে বড্ড। ছাড়ো।

বৃদ্ধ কহিলেন,—একবারটি দেখা কর, দিদি!

শান্তি কহিল,—দেখা করতে আমি পারবো না, আমার ইচ্ছে নেই! ফের যদি দেখা করার জন্য পেড়াপেড়ি করো, তা হলে কাপড়ে কেরোসিন জেলে এখনি আমি পুড়ে মরবো।

সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন! শান্তি এ বলে কি! তিনি যেন আর নাই, এমনি ভাব! এতখানি বয়স হইয়াছে, পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, অনেক সহিয়াছেনও—কিন্তু এমন বিপদ? নাঃ!

তিনি বিরক্ত হইলেন, কহিলেন—কি যে নেই-আঁকড়ে গোঁ তোর দিদি! আমি কিছু ভালো বুঝছি না, এর ফলে কি যে হবে! নিজের মনে বকিতে বকিতে তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আসিবামাত্র হেমন্ত তাঁর মুখের পানে চাহিল। তিনি কহিলেন,—তার ভারি মাথা ধরেছে, তাই তো, তা দাদা,···

হেমন্ত বুঝিল, বুঝিয়া তার রাগও ধরিল। এত অভিমান, ···কেন, কেন, কেন? বাড়ী বহিয়া সাধিতে আসিয়াছি, তা একবার দেখা করারও···তবু সে স্বামী! বাহিরের সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যে, সে-ও যে এ কথায় একবার দেখা করিত···না, কিসের মায়া, কিসের মমতা, কিসেরই বা প্রেম? এ প্রেম সে দুই পায়ে চাপিয়া মাড়াইয়া গুঁড়া করিয়া দিবে! সে উঠিল, বলিল,—তা হলে আমি আসি দাদামশায়, রাত হয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দচরণ আবেগে তার দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন, নিরুপায় আর্দ্র কণ্ঠে কহিলেন,—রাগ করো না দাদা—ছেলেমানুষ, বড় বেশী আদর পেয়েছে কি না,···তা, কাল আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজে তাকে তোমার ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসবো! মেয়েমানুষের এ অভিমান যে সর্ব্বনেশে, তা, দাদা,—

—না—না রাগ কিসের। রাগ মোটেই নয়! বলিয়া হেমন্ত জোর করিয়া মুখে হাসি আনিল। এ যেন অক্ষম অভিনেতার শিক্ষকের তাড়নায় একটা কৃত্রিম হাসির চেষ্টা মাত্র!

হাসিয়া হেমন্ত চটপট বিদায় লইয়া ট্যাক্সিতে গিয়া চাপিল। ট্যাক্সিওয়ালাটা তখনও পর্য্যন্ত আকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল—বাবু যদি ফেরেন! ড্রাইভার হিন্দু, হরির লুট মানে নাই তো? নহিলে এমন জ্যোৎস্না রাতে এ বয়সে হেমন্তর কি এখান হইতে ফিরিবার কথা! অদৃষ্ট!

বেদনা-শোক সহিয়া সহিয়া গোবিন্দচরণের বুকটা পাথর

হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু তাই যদি, তবে বুক এখনো এমন কাঁপে কেন? তিনি হতভম্বের মত কাছের সোফাখানায় বসিয়া পড়িলেন। যেন এখনি কি একটা মহাপ্রলয় বাধিয়া পৃথিবীটাকে চৌচির করিয়া ফেলিবে, এমনি আশঙ্কা তাঁর মনে হইতেছিল।

শান্তি আসিয়া ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকিল, এবং সতেজে কহিল,—বাবু নবাব! বুড়ো মানুষকে অপমান করে চলে যাওয়া হলো! কেন, আমার সঙ্গে দেখা হলো না তো তাতে কি···তুমি বুঝি কেউ নও! তোমারো ঠিক হয়েছে—নাতজামাই নাতজামাই করে যেমন সাধতে গিয়েছিলে, তেমনি···

গোবিন্দচরণ অবাক্! চোখদুটাকে তিনি বিস্ফারিত করিয়া শান্তির পানে চাহিয়া রহিলেন।

শান্তি কহিল,—এসো দাদু···নাতজামাই, নাতজামাই··· জানো না তো নাতজামাইয়ের মেজাজ! পুরুষ মানুষ বলে তেজ ছাখো না···

গোবিন্দচরণ এবার কথা কহিলেন। কাসিয়া জোর করিয়া গলাটাকে সাফ করিয়া তিনি কহিলেন—কেন, তেজ আবার তার কোন্‌খানটায়! তেজ তোরি। তুই একবার দেখা করতে পারলি না? ছি দিদি!···তিনি চুপ করিলেন।

শান্তি কোন জবাব দিল না, সে তক্তাপোষে বসিয়া ভাবিতেছিল, তাই তো, এত শীঘ্র চলিয়া গেল! অভিমানের তীব্র একরাশ তীর নিক্ষেপ করিয়া সে যে হেমন্তকে আরো কাবু করিয়া দিবে, ভাবিয়াছিল! তা···

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—যা-ই বলিস দিদি, ভালো করলি না···রাগ করে যদি আর না আসে? যদি আর একটা বিয়ে করে বসে রাগের মাথায়? পুরুষমানুষ, বাধাও তো কিছু নেই···

এ কথায় শান্তি জলিয়া উঠিল, কহিল—পুরুষমানুষ তো মাথা কিনেছেন! ওঃ, বিয়ে করবেন! করুন না! কে বারণ করেছে! আমার তো বয়ে গেল! অত গোরা মেজাজ আমার সহ্য হবে না, তা বাপু, আমি বলে রাখছি!

গোবিন্দচরণ উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন,—যদি বিয়েই করে? এমন তো ঘটেও···

শান্তি কহিল,—কেন ভাবছো দাদু! করুক না বিয়ে—আমি হাঁসপাতালে নার্শগিরী করবো···রোগীর সেবা, পরের

উপকার, তা ছাড়া চরকা কিনে সুতো কাটা—দেশের কাজ, খদ্দর বেচা···ভাবনা ? হুঁঃ !

গোবিন্দচরণ ভাবিলেন, তিনি বুঝি পাগল হইয়া যাইবেন ! একে তো এই দুর্ভাবনা, তার উপর হতভাগা বোকা মেয়েটা অকুতোভয়ে এ বলে কি ! চরকা, খদ্দর··· নাঃ, এর আর আশা নাই !

শান্তি কহিল,—তুমি তো কাগজপত্র কিছু পড়ো না দাদু···ওই যে মাসিকপত্র আছে একটা—কচি ও কাঁচা, নাম, তাতে একটা গল্প পড়েছিলুম কিছু দিন আগে,—বেশ গল্পটি, কাঙ্গালীচরণ কোঙারের লেখা। কোঙার এখন মস্ত বড় লেখক, দাদু···তা গল্পটায় লিখেছে, এক স্বামি-স্ত্রী ছিল, তাদের বনিবনা হতো না—স্ত্রী তাই স্বামীর ঘর ছেড়ে নানা বিপদ-আপদ কাটিয়ে এক সেবাশ্রমে কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে গেল···

গোবিন্দচরণ কহিলেন—আর স্বামী ?

শান্তি কহিল—জব্দ হলো···রোগে পড়ে কাৎরাতে লাগলো···

গোবিন্দচরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—বলিস কি রে ? এ পাগলের গল্পও মানুষ লিখে ছাপিয়েছে, আর সেই লেখাও তোরা পড়িস !

শান্তি কহিল—কেন পড়বো না ? এই তো নতুন যুগের বাণী···তুমি আমায় দ্যাখো যদি তো আমিও তোমাকে দেখবো···না হলে বিয়ে করেছো বলে তোমার আস্ফালন সইবে স্ত্রী—তা চলছে না ! স্বামীর দল জব্দ হবে···

গোবিন্দচরণ কহিলেন—থাম্, থাম্, এমন কথা বলিস নে···সকলে গোঁয়ার হয়ে এই নীতি ধরে যদি, তা হলে তো আবার সেই আদিম বর্ব্বর যুগের মারামারি কাটাকাটি সুরু হবে ! সকলকে সব-রকম ঘা বরদাস্ত করে, সইয়ে নিতে হবে আত্মীয়-স্বজনকে। না হলে যে বর্ব্বরতার সীমা থাকবে না রে···ও সব পাগলামি মনের কোণেও ঠাঁই দিস নে ! হাঁসপাতাল, সেবাশ্রম ?···বলে, আত্মীয়-বন্ধুর সেবা করবার বেলায় হাত ওঠে না, আর হাঁসপাতালে যাবে ঝণ্টু, ম্যাথরের বমি সাফ করতে আর সেথ হবিবের ঘা ধুতে—তবেই আর কি মস্ত কর্ত্তব্য করে চতুর্ভুজ হবে সব ! খপরের কাগজে ছাপালেই advertising সেবা হয়, ওতে কোন ফল নেই···তা ছাড়া ইংরাজীতে কথা আছে—charity begins at home ভারী খাঁটি কথা এটা। দেখছিস্ না, আজ পঞ্চাশ বছর ধরে 'ভারতমাতা' বেরিয়েছেন, তাঁর সেবার নাম ক'রে ওস্তাদ-ধুরন্ধররা কি পয়সাটাই কামিয়ে নিচ্ছে, বোকার-দলের চোখে ধুলো দিয়ে···নিজের মাতার মাথায় তেল নেই ! বেশ তো, করো পরের সেবা—তা বলে আত্মীয়-বন্ধুকে ভাসিয়ে দিয়ে নয়··· তাদের সেবার সঙ্গে সঙ্গে···যাক, ও সব বাজে কথা, আমি কি ঠাওরেছি, শোন···

শান্তি সকৌতূহল দৃষ্টিতে গোবিন্দচরণের পানে চাহিল।

গোবিন্দচরণ কহিলেন—কাল সকালেই আমি হেমন্তর কাছে যাই, তাকে নেমন্তন্ন করে আনি। তুই দেখা কর, দেখা হলেই সব মিটমাট হয়ে যাবে···এই অবধি বলিয়া তিনি হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—আমাদেরও এক দিন তোদের বয়স ছিল রে ক্ষেপি···এমনি বুড়ো চিরদিন নই— বা তা নিয়ে কত মান, কত অভিমান ! মনে হতো, জীবনে বুঝি আর মুখদর্শন ঘটবে না···তার পর তেমনি বাজে ছুতো ধরেই আবার কত মিল ! এই যে রাগ করেছিস—এ রাগের মধ্যেও কি মনে হচ্ছে না···কখন্ সে আস্বে ? কেন সে চলে গেল ! বল্ না, বলতেই হবে···

রসিক বুড়া গোবিন্দচরণ নাতিনীর হাতখানি মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন, ধরিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—মুখ ঢাকছিস যে···হতেই হবে···সে চলে গেছে বলে তোর রাগ আরো বাড়ছে···

শান্তি কহিল—বয়ে গেছে···তবে হাঁ, মিছে বলবো না···

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—কি মিছে বলবি না, তাই বল···

শান্তি কহিল—এতখানি পথ, এই রাত্রি—না চলে গেলেও বাবুর মান খোয়া যেত না···

গোবিন্দচরণ কহিলেন—কিন্তু এখানে কার কাছে থাকতো ? তুই যে আমোল দিলি না মোটে !

শান্তি কহিল—কেন, আর কেউ ছিল না তার আপন জন এখানে ! তুমি··· ?

গোবিন্দচরণ কহিলেন—আমি ! হাঃ হাঃ হাঃ—এই রাত্রিটা কি বুড়োর সঙ্গে কাটাবার জন্যেই জোৎস্না দিয়ে তৈরী হয়েছিল রে পাগলী।

৪

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সকলে নিদ্রায় অভিভূত। সত্য আসিয়া গোবিন্দচরণের ঘুম ভাঙ্গাইল, তিনি ধড়মড়িয়া উঠিলেন, কহিলেন,—কি রে ? উদ্বেগে তাঁর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

সত্য কহিল,—জামাইবাবু···

—হেমন্ত ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় রে ? কি হয়েছে ?

সত্য কহিল, এসেছেন, নীচে বসে আছেন, আমায় বল্লেন খপর দিতে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—ওপরে নিয়ে এলিনে কেন সঙ্গে করে ?

সত্য কহিল,—এলেন না।

বৃদ্ধ মহা উদ্বেগ বক্ষে বহিয়া শশব্যস্তে নীচে নামিয়া আসিলেন।

হেমন্ত কহিল,—এত রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করলুম, কিন্তু উপায় ছিল না, দাদামশায়···

গোবিন্দচরণ সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন, —কি হয়েছে দাদা, বলো তো···আমার মহা ভাবনা···

বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া হেমন্ত কহিল,—হয়নি এমন কিছু, তবে···

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—কি তবে ?

হেমন্ত খামে-আঁটা একখানি চিঠি গোবিন্দচরণের হাতে দিয়া কহিল,—এই চিঠিখানা তাকে দেবেন, আমার যা কিছু বক্তব্য, এতেই লেখা আছে, মানে···

গোবিন্দচরণ কলের পুতুলের মত হাত বাড়াইয়া পত্র লইলেন, কহিলেন,—শান্তির চিঠি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু, এর কি দরকার, দাদা ? তুমি এসো আমার সঙ্গে। কি সব ছেলেমানষি যে কর তোমরা···

—না, দাদামশায়, ওই চিঠিটা দয়া ক'রে তাকে দেবেন। আমি চল্লুম।

বৃদ্ধ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, এ তো ভাল হেঁয়ালির পালা চলিয়াছে আজ ! না, এ একটা দুঃস্বপ্ন ? তাঁরই সেই দুর্ভাবনার রাশি জড়ো হইয়া এগুলার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বা কি করিয়া হয় ! এই ত চোখের সামনে হেমন্ত,···আর তার কথার সঙ্গে তেমনি মিল রাখিয়া তাঁর নিজের হাতে এই চিঠি··· !

তিনি কহিলেন,—যেতে পাবে না দাদা। আমি যেতে দেবো না। বুড়োর কথা ঠেলে কেমন যাও দিকিন।

হেমন্ত তাঁর পদধূলি লইয়া ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইল এবং গদগদ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—আপনি ক্ষমা করুন দাদামশায়, আমার মনের অবস্থা এখন···মানে, রাত্রে আমি এখনও কিছু খাইনি।

—খাওনি, তা হলে তো—ওরে সত্য···

আর সত্য ! হেমন্ত তখন ঝড়ের বেগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে !

বৃদ্ধ শশব্যস্তে ডাকিলেন, ওরে সত্য, আঃ, কোথায় গেলি ! কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হইয়া ভাবিলেন, এত রাত্রে চীৎকার ও চেঁচামেচি করিয়া কি একটা—তা ছাড়া, এরাই বা ভাবিবে কি ! জামাইবাবু এত রাত্রে আসিয়া চোরের মত সহসা ছুটিয়া পলাইলেন কেন, ছি !

কিন্তু এমন বিপদেও তিনি কখনও পড়েন নাই। স্বর্গগতা গৃহিণীর উপর রাগ ধরিল···এই পাগল মেয়েটাকে তাঁর ঘাড়ে চাপাইয়া চলিয়া গেলেন বেশ ! গিয়া মজা দেখিতেছেন ! তাঁর কি এ বয়সে···অদৃষ্টের ভোগ !

এই রাত্রে শান্তিকে ডাকিয়া চিঠিটা দিবেন কি ? না, তার মানে তো এই রাত্রে তার সঙ্গে আবার খানিক তর্ক তোলা ! যা হয় কাল সকালেই—ছেলেটাও তিড়বিড় করিয়া চলিয়া গেল,—ও দুই সমান মেজাজ !·····

ভোরেই গোবিন্দচরণের ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া সোজা নীচে নামিয়া বাড়ীর বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন, মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তাগুলা আবার একে একে আসিয়া জড়ো হইতেছিল, হঠাৎ পিছনে কে ডাকিল,—দাদামশায় !

চমকিয়া ফিরিয়া তিনি দেখেন, হেমন্ত। তার চোখ দুটা লাল, ফুলিয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ, বিশ্রী মূর্ত্তি !

হেমন্ত কহিল, চিঠিটা তাকে দেছেন, দাদামশায় ?

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—চিঠি ? না,—মানে, অর্থাৎ সে তখন ঘুমুচ্ছিল যে !

হেমন্ত কহিল,—ভালোই হয়েছে ! সে চিঠি আর দিতে হবে না। সেটা দয়া করে আমায় যদি ফিরিয়ে দেন···

হেমন্তর মুখের পানে গোবিন্দ চাহিলেন, এরা একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে! বদ্ধ পাগল!

হেমন্ত কহিল,—মানে, আমার মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে, অর্থাৎ সে চিঠি দেবার প্রয়োজন নেই।

বৃদ্ধ ভাবিলেন, না, এরা বড্ডই বাড়াবাড়ি করিতেছে, আর বাড়িতে দেওয়া ঠিক নয়! হইয়াছে কি? অত বড় জর্ম্মান যুদ্ধের সূচনাও যে এমন নিবিড় হইয়া দেখা দেয় নাই! আর এ··· ?

তিনি কহিলেন,—আচ্ছা, চিঠি-চাপাটির কথা পরে হবে'খন। এখন এসো দিকি, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বুড়োর দুটো উপদেশ শুনবে এসো—বুড়ো হলেও 'ফুল' এখনও হতে পারিনি, তবে তোমরা কাল থেকে যে পাগ্‌লামির সার দিতে সুরু করেছ, পরে কি হবে বল্‌তে পারি না।

বৃদ্ধ জোর করিয়াই হেমন্তর হাত ধরিলেন; হেমন্ত দৌরাত্ম্য করিল না। বৃদ্ধ তার হাত ধরিয়া তাকে আনিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন, কহিলেন,—কাল রাত্রে কি গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েছ, না বাড়ী গেছলে?

হেমন্ত হাসিল, হাসিয়া কহিল,—বাড়ী গেছলুম বৈ কি!

বৃদ্ধ কহিলেন,—নিদ্রার সঙ্গে আলাপ হয়নি মোটে?

হেমন্ত সলজ্জভাবে মাথা নামাইল, কোনও কথা কহিল না।

বৃদ্ধ কহিলেন,—আচ্ছা, বসো, এক পেয়ালা চা' খাও, তার আগে একবার বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসো দিকিন। ভয় নেই, শান্তিকে খপর দেব না, আমি চুপি চুপি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। একটু ঠাণ্ডা হও, তার পর আমার পরামর্শ শোনো—মানভঞ্জন করার বিদ্যা খুব তো জানো, খালি মনটাকে জ্বালাচ্ছ, লেখাপড়া শিখেছ ছাই! তোমাদের এক ধুয়ো হয়েছে আজকাল, শুনি, মনস্তত্ত্ব, সে তত্ত্বের কিছুই জানো না! যাক, আমি আস্‌ছি, তুমি মুখখানা ধুয়ে এসো—ওঠো দিকিন লক্ষ্মী দাদা আমার···

দাদা নিরাপত্তিতে উঠিয়া বাথরুমে গিয়া ঢুকিল। গোবিন্দচরণ ছুটিলেন সত্যর সন্ধানে। সত্য পাকা খানসামা। তাকে টোষ্ট রুটী ও চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া তিনি ফিরিলেন। হেমন্ত তখন মুখ-চোখ ধুইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। গোবিন্দচরণ কহিল, কাপড়টা ছাড়বে?

হেমন্ত কহিল,—থাক গে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—বেশ, তা চা আসছে, খা দু'টুক্‌রো রুটী খাও, আর আমার বুদ্ধি শোনো···এ সব মা অভিমান করে মনকে কখনও জ্বালাতে আছে! ছি! তা ওর মজাটুকু পাওয়া যায় না যে···বুঝলে ভায়া, আমাদে মান-অভিমান হতো প্রচুর, আর সে মানভঞ্জনের পালা কি মধুর হতো—শোনো তবে, এক দিনের কথা বলি।

বৃদ্ধের প্রাণে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার দিনগুলা ঝক্‌ম করিয়া জ্বলিয়া জাগিয়া উঠিল। যেন হীরার অসংখ্য কুচি সবই গিয়াছে। এ স্মৃতিগুলা প্রাণ হইতে ভাগ্যে কেহ কাড়ি লয় নাই, নহিলে কি সম্বল লইয়াই যে জীবনের এ নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলা কাটাইতেন! বৃদ্ধ সেই সব কাহিনী বলিয়া চলি লেন—জীবনের অতি-তুচ্ছ পরিচ্ছেদের ক'টা ছিন্ন অংশ··· তবু কি কবিত্ব, কি রস যে সেই সব ছিন্ন অংশে···

চা' আসিল, সঙ্গে সঙ্গে টোষ্ট-রুটী। হেমন্ত কহিল,— আমি আজ বেড়াতে যাবো, ভাবছি।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—কাছারি?

হেমন্ত কহিল,—কোথায়? গেলেও যা, না গেলেও তাই। কোন মক্কেল কাতর হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে না।

—তবে কোথায় যাবে?

হেমন্ত কহিল,—গিরিডি, কি মধুপুর, নয় তো দার্জ্জিলিং

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—অর্থাৎ কলম্বো কি নেপাল হতে পারে! মানে, স্থির করনি তো?

হেমন্ত কহিল,—ঠিক এখনই করে ফেল্‌ব।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—ছানুর ওপর রাগ হয়েছে বুঝ তো? তাতে আরাম পাবে না দাদা, দু'জনের কেউ না তুমি কাল দেখা কর্‌তে না পেয়ে যেমন রাগ করেছ, সে দেখা না দিয়ে তেমনই রাগ করেছে, তবে তোমার রা তার উপর, আর তার রাগ তার নিজের ওপর।

হেমন্ত বিস্ময় বোধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু খুসী হইল। গোবিন্দচরণ কহিলেন,—মাথা ধরলে বাতের ওষু লাগালে কখনও মাথা-ধরা ছাড়ে? যে রোগের যা দাওয়াই তরুণী পত্নীর মান-এর দাওয়াই আমি বাৎলে দিচ্ছি, স্থাথে দিকিন, অব্যর্থ হয় কি না!

বৃদ্ধ সতর্কভাবে চারিধারে চাহিলেন, কেহ নাই তো! না! তিনি চুপি চুপি কি কতকগুলা বকিয়া চলিলেন···মহ অভিসন্ধি! হেমন্তর মুখের ঘোরালো ভাব সে কথায় কাটি

লাগিল, শেষে মেঘমুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল মুখ! হাসির ছটাও সে মুখে দেখা দিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, ছানু বোধ হয় উঠেছে, তাকে খবরটা দিয়ে আসি, কিন্তু অভিনয় ঠিক করে যেয়ো, ভয় নেই, আমি সেই বাগানের ওধারে সরে যাবো'খন—আড়ি পাতবো না, ভায়া।

হেমন্ত হাসি চাপিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ কহিলেন,—আমি ছানুকে খপরটা দিই গে, তা হলে। আর তোমার সে চিঠিখানাও নিয়ে আস্‌ছি।

৫

দ্বারের বাহিরে পায়ের মৃদু শব্দ। হেমন্ত গম্ভীর হইয়া বসিল। শান্তি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। হেমন্ত খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাসের শব্দ যেন শান্তি শুনিতে পায়, এত বড় নিশ্বাস!

শান্তি কহিল,—দাদু নেহাৎ বল্‌লে,···সে থামিল।

হেমন্ত ঠোঁট বাঁকাইয়া গম্ভীর মুখে শান্তির পানে চাহিল। শান্তির মুখ শুষ্ক, চোখ দুইটাও লাল, সেও তাহা হইলে রাত্রে ঘুমায় নাই নাকি? হেমন্তর মনে হইল, দূর হোক্, এ কৃত্রিম অভিনয়! কিন্তু না···

শান্তি টেবলের উপর একটা আঙুল ঘষিতে ঘষিতে কহিল, সেই খবর দিতে আজ বুঝি···

হেমন্ত কহিল,—মানে, অর্থাৎ তা জানানো আমার কর্ত্তব্য, তাই···

শান্তি কহিল,—অসীম অনুগ্রহ! তা এ অনুগ্রহ না করলেও চল্‌তো। (একটু চুপ; তার পর একটা নিশ্বাস চাপিয়া) জানবার জন্য ব্যস্তও ছিলুম না মোটে। এখনও সেই অভিমানের ছিটা! হেমন্ত কহিল,—না থাক-লেও আইন-ঘটিত সমস্যা আছে, এর মধ্যে তাই। অর্থাৎ—

শান্তি কহিল, এ ভাগ্যবতী সুন্দরীটি কে?

হেমন্ত কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিল,—ভাগ্যবতী কি না, তা বল্‌তে পারি না, তবে সুন্দরী বটে! আর বিদুষী—

নিশ্বাস চাপা গেল না, সে জন্য শান্তি একটু অস্বস্তিও বোধ করিল। কহিল,—ভালোই তো, আমার মত একটা লক্ষ্মীছাড়া মুখ্যু প্যাঁচা বৌ গিয়ে তার বদলে সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী হচ্ছে, খুবই সুখের কথা এ!

হেমন্ত কহিল,—আশীর্ব্বাদ করো, সেই সুখই হোক্,··· দুঃখে বেদনায় প্রাণ আমার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শান্তি কহিল,—বিয়ে কবে, শুনতে পাই কি?

হেমন্ত কহিল,—তারিখ শুনে লাভ! বিয়ে করছি, খপর এটুকুই ত তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

শান্তি কহিল,—তবু···না হয় আশীর্ব্বাদ করে আসব। ভয় নেই। সতীন বলে হিংসা করবো না। শান্তির আর একটা নিশ্বাস পড়িল। আর বুকের মধ্যে যা হইতেছিল, তা অন্তর্য্যামীই জানেন!

হেমন্ত কহিল,—এই শনিবারে বিয়ে—মানে রবিবারেও কাছারিও নেই···

শান্তি কহিল,—কনেটি কে, জানতে পারি? ভয় নেই, ভাংচি দিতে যাবো না।

হেমন্ত কহিল,—বিশ্বাস?

শান্তি কহিল,—এমন নীচ আমি নই। দুষ্টু, পাজী,··· অবাধ্য হতে পারি, তা বলে অত ছোট মন—

হেমন্ত কহিল,—ধন্যবাদ! তবে তুমি তাঁকে চেনো।

সে চেনে? শান্তির চোখের সামনে এক ঝাঁক পরিচিতা তরুণী নিমেষে দল বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা, পারুল, পরী, জ্যোতি, রাণী,···কে? দুই চোখে আকুল প্রশ্ন ভরিয়া সে হেমন্তর পানে চাহিল; কোনমতে প্রশ্ন তুলিল,—বুঝেছি, পারুল?

হেমন্ত কহিল—না।

শান্তি কহিল—নিশ্চয়। তার সুখ্যাতি মুখে যে ধরে না!

হেমন্ত কহিল—না, পারুল নয়—নামটা থাক তবে—কেমন গান গায়, কি সুন্দর ইংরাজী কবিতা পড়ে। একটা মুস্কিল হয়েছে, আর···তাই সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু কথা কওয়া দরকার।

শান্তির বুক ঠেলিয়া অশ্রুর ঝর্ণা ছুটিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। তার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

হেমন্ত কহিল—মানে, কাল এখান থেকে গিয়ে তাদের ওখানেই উঠেছিলুম। সব শুনে তাঁরা সহানুভূতি জানালেন, আর তিনি বললেন,—

শান্তি বলিয়া উঠিল,—নিজের মুখে মা গো, কি বেহায়া! এই অবধি বলিয়া সে জিভ কাটিল। কহিল,—মাপ করো, তোমার বিদুষী সুন্দরী নববধূকে বেহায়া বলে ফেলেছি।

হেমন্ত কহিল—যা বলেছো, বলেছো, খবর্দ্দার! আর কখনো কিন্তু বলো না।

শান্তি জ্বলিয়া উঠিল। এত দরদ! সে কহিল,—সে

কথা বলা না বলা আমার খেয়াল, কারো হুকুম মানতে হবে কেন, শুনি ?

হেমন্ত কহিল,—যাক, শেষ বিদায়ের সময় তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না···সেই কথাটি এখন শোনো, মানে, তিনি জানিয়েছেন, ঘরে পর্দ্দা তুমি যা-সব খাটিয়েছ, তার রং গোলাপী না ? তিনি বলেন, ও রং তাঁর চোখে বিশ্রী ঠেকে, ও পর্দ্দা চলবে না ! ও পর্দ্দা বদলে সবুজ পর্দ্দা দিতে হবে। আর তুমি যে ছবি খাটিয়েছ, সে ছবি তাঁর পছন্দ নয়, তিনি বলেন, ও ইণ্ডিয়ান-আর্টের ছবি তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, সেগুলোকে বিদায় দিতে হবে। আর তুমি যে ভালো আল্‌মারীটায় ভাঁড়ারের জিনিষ রাখছিলে, সেটায় তিনি যত বাঙ্গলা মাসিক পত্রগুলো ঠেসে রাখতে চান,···তা এ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?···তাই···

শান্তি সবেগে জবাব দিল,—তোমাদের ঘরকর্ণা ! তোমরা যা খুশী, তাই করবে। আমাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই তো !

হেমন্ত কহিল,—এ বেশ কথা,···তা, হ্যাঁ, বিবাহ তো করবো, এর পরে তুমি কোনো দিন দুম্ করে গিয়ে হাজির হবে না তো ? তা গেলেই না মুস্কিল ! দুই স্ত্রী নিয়ে, শেষ কালে সেই রবিবাবুর দড়ী-কলসীর দায়ে ঠেকবো কি ! এ সম্বন্ধে একটা আশা যদি দাও···তা ছাড়া তোমার দীর্ঘ জীবন একটা ভুলের জন্য ব্যর্থ হয়ে যাবে···?

শান্তি বলিল,—ভয় নেই, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই গো ! আমিও 'মধুযামিনী' উপন্যাস পড়েছি, মিনতির মত আমার মনের জোর আছে। যে ঘরে আমার ঠাঁই হলো না, সেখানে আমি,···না, না, না···বলিতে বলিতে সে বায়ুবেগে একখানা মেঘের মত অশ্রুর বন্যায় ফাটিয়া পড়িল ; কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল,—রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে রোগীর সেবা করে আমার দিন বেশ কেটে যাবে, আমার জন্য কাকেও ভাবতে হবে না।···

এ দৃশ্যে পাষাণ গলিয়া যায়, তায় হেমন্ত তরুণ, এবং স্বামী ! আবেগে শান্তির দুই হাত ধরিয়া টানিয়া সে তাকে পাশে বসাইল, বসাইয়া তার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে কহিল,—শান্তি, শান্তি, আমায় মাপ করো···তুমি পাগল হয়েছ···আবার আমি বিয়ে করবো, এও কি সম্ভব ? আমার অবস্থা দেখে তোমার মন ফিরে পাবার জন্য দাদামশায় এ মতলব বাৎলে দেছেন···তুমি অভিমান করে চলে এ আর আমার আহার নেই, নিদ্রা নেই ! এইখানেই কাল বেড়িয়েছি সারা রাত···ট্যাক্সিওয়ালাটা পাছে পাগল ভা এই ভয়ে তাকে রাত বারোটার পর এই বাড়ীর দোরেই বি করেছি। সে গাড়ী নিয়ে চলে গেলে ওই রোয়াকে প ছিলুম, তার পর যখন রাত চারটে···তখন গিয়ে গঙ্গার ধা জেটীতে বসেছিলুম···ভোর হতেই আবার আসি···একটি তুমি দেখা দাওনি !···নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর,···কি আমি করে কি এমন অপরাধ···যার মার্জ্জনা নেই ? কাল রাত বারোটা কি চিঠি লিখে এনেছিলুম, পড়ে যদি দেখতে···

খামখানা ছিঁড়িয়া হেমন্ত চিঠি বাহির করিয়া শা সামনে ধরিল। তাহাতে লেখা আছে,—প্রিয়া ! প্রি বিদায়···জন্মের মত বিদায়···

শান্তি সেটা কাড়িয়া সরোষ ভঙ্গীতে স্বামীর পা চাহিল, কহিল,—দুষ্টু···এমন চিঠি লেখে···

হেমন্ত শান্তির হাত চাপিয়া ধরিল, হঠাৎ এমন শ বাহিরে জুতার শব্দ···

শান্তি কহিল,—দাদু···বলিয়াই ঠিক আগুনলাগা বাড়ি মত সে ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া গেল। গোবিন্দচরণ ঘ ঢুকিলেন, কহিলেন,—তা হলে তোমার কলম্বো যাওয়া স্থির তো হে ভায়া···আজই ?

ভায়া চুপ ! শান্তি বলিল—তা আর হলো কৈ ! শনিবারে তোমার নাতজামাই যে আবার বিয়ে করছে সে বৌকে বরণ করে তুলতে হবে···আজই আমার যিনি পুর যাওয়া চাই, না হলে গোছগাছ হয়ে উঠবে কেন ? ও তুমি···ঘটক-ঠাকুরমশাই, শনিবারে যেয়ো—ঘটক-বি যা পাবে, তা উত্তম-মধ্যম···বুঝলে···

গোবিন্দচরণ হাসিয়া কহিলেন,—তা তো পাবোই রে আমি এমনি নরাধম যে, উত্তম-মধ্যম আমার বেলাতে আর ঐ নরোত্তমের বেলায়···বলিয়া তিনি মৃদু হাসিতে হাসিয়া কহিলেন,—ঘেঁষাঘেঁষি বসেছিলেন, এখন আ তড়াক করে সরে যাচ্ছেন, দু'জনে দু'দিকে ! ওরে, বুড়ো চোখে ধুলো দেওয়া যত সহজ ভাবিস তোরা, তত স তা নয়···আর বুদ্ধি···দেখছিস তো, ভায়ার মুখে এই হাসি, এই কার বুদ্ধির ফলে, এ্যাঁ !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপন

শাসনযন্ত্রের তিনটি বিভাগ বিদ্যমান। প্রথম শাসনবিভাগ, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপনবিভাগ, তৃতীয় বিচারবিভাগ। ইতঃপূর্ব্বে আমি শাসনবিভাগ সম্বন্ধে স্থূলতঃ দুই চারিটি কথা বলিয়াছি। রাজা বা রাজার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিই শাসনবিভাগের কর্ত্তা বা প্রধান ব্যক্তি। মন্ত্রিমণ্ডলী, সভাসদ্ এবং রাজপুরুষগণই শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহক। ফলে ইঁহাদের সকলকে, মায় পুলিসকে লইয়াই শাসনবিভাগ গঠিত। ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতে রাজগণ লোকমতেরই অনুবর্ত্তী ছিলেন ; তাঁহারা লোকমতকে লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। বৈদিক যুগ হইতে শাসনকার্য্যে লোকমত প্রতিবিম্বিত করিবার জন্য সভা-সমিতি, সঙ্গতি, বিদথ এবং পরিষদ ছিল। এই সকল বিভিন্ন নামধেয় জনসম্মেলনীর মধ্যে পার্থক্য কি ছিল, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানা তর্কের আবির্ভাব হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে সংসদ শব্দও শাসনকার্য্য পরিচালনের সভাবিশেষকে বুঝাইত। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক আলোচনা করিব না। সে আলোচনা নিতান্ত নীরস হইবে, অধিকন্তু ঐ সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে জিম্মার (Zimmer), লাডউইগ (Ludwig), হুইট্‌নে (Whitney), রথ (Roth), হিল্লেব্রাণ্ট (Hillebrandt) প্রভৃতি এই সম্বন্ধে এত তর্ক তুলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

শাসনযন্ত্র-পরিচালনে ব্যবস্থাপন কার্য্য অর্থাৎ আইন প্রভৃতির প্রণয়ন কার্য্য যে অতীব প্রয়োজনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ব্যাপার। কারণ, চক্রবর্ত্তী রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই বিধি বা আইন অনুসারে চলিতে বাধ্য। অতি প্রাচীনকালে ভারতে শাসনযন্ত্রপরিচালনকল্পে সেই ব্যবস্থাপন অর্থাৎ বিধিপ্রণয়ন কার্য্য কিরূপভাবে সম্পাদিত হইত, তাহা না জানিলে সেই সময়ের শাসনযন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হইবে না।

প্রথমে বিধি বা আইন বলিতে কি বুঝায়, তাহাই স্থির করা আবশ্যক। ইংরাজী ভাষায় ল (Law) শব্দটি বিশেষ ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় বিধান বা আইন শব্দ সেরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে মনুষ্যকৃত বিধানের অর্থাৎ আইনের কথাই বলিব। সমাজের এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের হিতার্থ সমাজের নিয়ন্তা বা নিয়ন্তৃবর্গ কর্ত্তৃক বিবেচনাপূর্ব্বক পরিকল্পিত বিধি এবং নিষেধাত্মক যে আদেশ, তাহাই বিধান বা আইন নামে অভিহিত। তবে আইনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করিলেই দণ্ডিত হইতে হয়। যাঁহারা বিধি-প্রণেতা বা আইন-রচয়িতা, তাঁহাদের আইনভঙ্গকারী অপরাধীকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে শাস্তিদানের অধিকার ও ক্ষমতা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

সভ্যসমাজে আইন নানাবিধ ভাগে বিভক্ত। যথা—

(১) ধর্ম্মসম্পর্কিত আইন বা শাস্ত্রীয় অনুশাসন। ইহা ধর্ম্মবিধান নামে অভিহিত। ভগবান্ বা ভগবানের প্রেরিত ব্যক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তিশালী মহাত্মগণই ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত ও পরিজ্ঞাত।

(২) রাজা বা রাজশক্তিপরিচালক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক রচিত বিধি বা আইন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে রাজ-বিধি বা আইন নামে অভিহিত। রাজ্যশাসন বা রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনের উদ্দেশ্যে এবং সৌকর্য্যার্থ এই সকল রাজ-বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই আইনভঙ্গকারী অপরাধীকে রাজা বা রাজা কর্ত্তৃক বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত কর্ম্মচারিবর্গ বিচার পূর্ব্বক শাস্তি দিয়া থাকেন।

(৩) সামাজিক আইন বা সমাজবিধি। সুশৃঙ্খলে সমাজের কার্য্য পরিচালনের এবং সামাজিকবর্গের উন্নতি-সাধনের মানসে সমাজনিয়ন্তৃবর্গ কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত নিয়মই সমাজবিধি নামে অভিহিত। এই আইন ভঙ্গ করিলে সমাজনিয়ন্তারা বা সমাজপতিগণ অপরাধীকে সামাজিক দণ্ড দিয়া থাকেন।

(৪) নাগরিক বিধি। ইহা পৌরবিধি ও জানপদবিধি নামে অভিহিত। মিউনিসিপ্যালবিধি প্রভৃতি স্থানীয় উন্নতিকর সমস্ত ব্যবস্থাই এই শ্রেণীর আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই আইনগুলি আধুনিক সভ্যসমাজে স্থানীয় লোক দ্বারা

প্রণীত হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতেও ঠিক তাহাই হইত। লোক স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া ঐরূপ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহার যে কোন আইন লঙ্ঘন করিলেই অপরাধীকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন লঙ্ঘন করে, তাহাকে সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তাদি করিতে হয়। যে ব্যক্তি রাজনীতিক অপরাধ করে, তাহাকে রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। সামাজিক অপরাধীকে সামাজিক দণ্ড (যথা একঘরিয়া করা, বর্জ্জন করা) দেওয়া হইয়া থাকে।

আধুনিক রাজনীতিক এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞগণ বিচারপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শাসন-বিভাগের লোকের হস্ত হইতে ব্যবস্থাপন বিভাগ স্বতন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শাসকগণের স্বেচ্ছাচারী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ, তাঁহারা আত্মশক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য নীচ স্বার্থবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আইন রচনা করিতে পারেন। সাধারণের পক্ষে বা সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে সে আইনগুলি কল্যাণপ্রদ না হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রশাসিত ভারতে ঠিক ঐ মত অনুসারেই কার্য্য করা হইত। রাজা কার্য্যতঃ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধার্থ কতকগুলি বিভাগীয় নিয়ম করিতেন সত্য, কিন্তু লোকশাসনের জন্য যে সকল বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা প্রণয়নে রাজার কোন অধিকার ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারাই সেই সকল বিধিনিষেধ নির্দ্দিষ্ট হইত। সামাজিক ব্যবস্থা সমাজ-মুখ্যগণই ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ধার্য্য করিতেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতে শাসন-বিভাগ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে, জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের জননায়কদিগের সহিত বর্ত্তমান যুগের জননায়কদিগের মতভেদ বিদ্যমান। সে মতভেদ অত্যন্ত তীব্র। প্রাচীন হিন্দুরা আধ্যাত্মিক মঙ্গল বা পারলৌকিক কল্যাণকেই মানবজাতির সর্ব্বপ্রধান কাম্য মনে করিতেন, পক্ষান্তরে, আধুনিক পাশ্চাত্যজাতিগণ ইহলৌকিক সুবিধাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। কাযেই এখনকার সমস্ত আইন ব্যবস্থা বা বিধি ঐহিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রণীত হয়, তখনকার আইন আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রণীত হইত। অতএব তখন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, অন্য সকল বিধিই তাহার সহিত সঙ্গত করিয়া প্রণয়ন করিতে হইত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজা বা রাজসভা অথবা প্রজাবর্গের কোন সভাই বিধিপ্রণয়ন করিতেন না। সমাজস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কাহারও বিধিপ্রণয়নে অধিকার ছিল না। বিধিপ্রণয়নের অধিকারী ছিলেন মুনি ঋষিরা। আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই যে, ভগবান্ মনু একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহর্ষিগণ তাঁহাকে ধর্ম্মবিধিসম্বন্ধে উপদেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অত্রিসংহিতাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহর্ষি অত্রি অগ্নিহোত্র সমাপনান্তে নিশ্চিন্তমনে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ঋষিগণ যাহা করিলে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক সুখে থাকিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হারীতসংহিতায় দেখা যায় যে, রাজা অম্বরীষ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-সমীপে উপস্থিত হইয়া সমাজস্থিতিকারক বিধানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদনুসারে মহর্ষি হারীত ঋষিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যে বিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় তাহাই বলিয়াছিলেন। সামশ্রবা প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়াই যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সংহিতা ও বিধানগুলি বলিয়াছিলেন। শৌনকাদি ঋষিগণের প্রার্থনা অনুসারে ভৃগুবংশীয় উশনার পুত্র ঔশন তদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, পরাশর, ব্যাস, বৃহস্পতি এবং বশিষ্ঠ এই দশখানি সংহিতাতেই ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার্থ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হওয়াতে ঋষিগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তৎকর্ত্তৃক বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, এই কথাই স্পষ্টতঃ বিবৃত রহিয়াছে। অন্যান্য সংহিতাগুলির অধিকাংশই খণ্ডিত। বাত্যায়নসংহিতাতে মহর্ষি কাত্যায়ন এই বলিয়াছেন, অনন্তর (অথ) মহর্ষি গোভিল যে সমস্ত কর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহার অস্পষ্টাংশ সকল এবং তদ্ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মের কথা আমি সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ বিশদভাবে বলিব। এই অথ শব্দ হইতে ইহার পূর্ব্বে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। অথবা তিনি পূর্ব্বে কতকগুলি কথা বলিয়া শেষে ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশে

প্রয়োজন বা মহর্ষি গোভিলের উক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত না হইলে গোভিলের পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন ঐ সকল কথা বলিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। বিষ্ণুসংহিতা ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক কথিত বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। এই সংহিতাখানি ক্ষুদ্র নহে, বরং বৃহৎ বলা যাইতে পারে। ইহাতে ব্যবহারিক জীবনের অনেক ব্যবস্থাই বিহিত আছে। এই সংহিতাখানির শেষাংশ পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, বসুমতী অর্থাৎ সর্ব্বসমাজের লোক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু উক্ত সংহিতোক্ত বিধিগুলির কথা বলিয়াছিলেন।

এ কথা সত্য যে, বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহা যে আদি পুস্তক নহে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমান-প্রচলিত মনুসংহিতা মনুপ্রণীত আসল গ্রন্থ নহে; আসল মানব ধর্ম্মসূত্র সূত্রাকারে লিখিত, উহা এখনও পাওয়া যায় নাই। মনুপ্রণীত গৃহ্যসূত্র ইদানীং হলণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।* এইরূপ যেমন পরাশর-সংহিতা ও গৌতম-সংহিতা আছে, সেইরূপ বৃদ্ধ পরাশর ও বৃদ্ধ গৌতম-সংহিতাও পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই খণ্ডিত। সুতরাং তাহা হইতে কিরূপ অবস্থায় এবং কিরূপ ভাবে ঐ সকল বিধি প্রণীত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে বুঝা কঠিন। সেই জন্য সকল স্মৃতিগ্রন্থ হইতে কিরূপ অবস্থায় কাহাদিগের জিজ্ঞাসায় বা আবেদনে বা অনুরোধে ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও অধিকাংশ স্মৃতির ভণিতা দেখিয়াই বেশ বুঝা যায় যে, বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে পৃচ্ছা উপস্থিত না হইলে মুনি-ঋষিরা বিধি-পুস্তক বা সংহিতা প্রণয়ন করিয়া দিতেন না। যখন এতগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র আছে এবং বহু ধর্ম্মশাস্ত্র সত্ত্বেও আবার জনসমাজে বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে নূতন পৃচ্ছা উপস্থিত হইয়াছে, তখন ঋষিগণের আমলেও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত বিধি-নিষেধেরও পরিবর্ত্তনসাধন করা হইত। উহার মূল নীতি এক হইলেও অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ হইতই। তাহা না হইলে সমাজ চলিতেই পারে না। আজকালকার নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে সকলে তাহা বুঝেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

* শুনা যাইতেছে, আসল মানব ধর্ম্মসূত্র ইদানীং পাওয়া গিয়াছে। ইহা আসল কি নকল বলা কঠিন।

আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃকই মানবজীবনের সমস্ত কার্য্যই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যই উহাতে বাদ পড়ে নাই। কিরূপ দাঁতন-কাঠি ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া মায় কিরূপ ভাবে দলিল লিখিতে হইবে, কিরূপ লোককে সাক্ষী নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের উপর কিরূপ ভাবে শুল্ক ধার্য্য করিতে হইবে, ক্রয়-বিক্রয়ে কিরূপ ওজন ব্যবহার করিতে হইবে ইত্যাদি সকল আবশ্যক বিষয়ের নিয়ম এবং সেই নিয়মভঙ্গের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে করা হইয়াছে। সুতরাং রাজার পক্ষে আইন করিবার অবকাশ অতি অল্পই ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া রাজা যে কোন আইন করিতেন না বা কোন অপরাধী রাজদণ্ড পাইত না, তাহা নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রেই কোন কোন বিষয়ে অপরাধীকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা আছে। তদ্ভিন্ন মন্ত্রিমণ্ডলীর পারিষদবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া রাজা আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন! কিন্তু রাজ-আইনের আদর্শ ছিল শাস্ত্রীয় বিধান। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী রাজ-আইন সমাজে গৃহীত হইত না। সুতরাং ভারতের ব্যবস্থাপন কার্য্য আলোচনা করিতে হইলে ধর্ম্মসংহিতাগুলি কিরূপ ভাবে প্রণীত হইত, সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বিংশতিসংখ্যক স্মৃতিগ্রন্থই যে কেবল ভারতের বিধি-পুস্তক, তাহা নহে। এই বিশাল ভারতে যে কত প্রকার ধর্ম্মবিধি প্রণীত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।* সেই সকল বিধি-পুস্তক বা ধর্ম্ম-সংহিতার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুই একখানি ইদানীং খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত এবং দেশভেদে ধর্ম্মব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইত। কিন্তু সমাজস্থ চারি বর্ণের কোন লোকই সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। যখন অবস্থাভেদে উহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত, তখন মুনি-ঋষিরা এক জন

* কতকগুলি সংহিতাকারের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—কাশ্যপ, গর্গ, গোপালিত, উমামহেশ্বর, কুমার, ধূম্রবর্ণ, বৈখানস; সমন্ত, পুলস্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য, মৌদ্গল্য, তুলহায়ন, বিভাণ্ডক, নারদ, কপোত, ভৃগু, মাতঙ্গ, সৌভ, লিঙ্গধর্ম্ম, ঔথনেয়, বিষ্ণপ, ধন, মাগধ, বহুপালিত ইত্যাদি।

শ্রেষ্ঠ এবং প্রামাণিক মহর্ষির নিকট যাইয়া ধর্ম্মবিধি প্রণয়ন করিয়া লইতেন। সেই ধর্ম্মবিধিই মুকুটধারী রাজা হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই মান্য করিয়া লইতেন। সেই ধর্ম্মবিধিই রাজবিধির বনিয়াদ হইত।

আমরা দেখিতে পাই যে, ঋষিরা কখনই একাকী বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন না। কতকগুলি প্রসিদ্ধ মুনি-ঋষি সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্য করিতেন। প্রচলিত সংহিতাগুলিতে দেখা যায় যে, সেই মুনি-ঋষির পরিষদে যিনি প্রধান, তিনিই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া যাইতেছেন আর সকলে তাহাই অব্যাজে গ্রহণ করিতেছেন। রাজা এবং জনসমাজও তাহা মানিয়া লইতেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, যখন ঋষি-সংসদে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিগুলি নির্দ্ধারিত হইত, তখন সেই সম্বন্ধে সেই মুনি-ঋষিসমাজে তাহার আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কও হইত। সেই আলোচনার ও তর্ক-বিতর্কের ফলে যে সিদ্ধান্ত হইত, তাহাই প্রধান ঋষি বিধি বলিয়া প্রকাশিত করিতেন। সেই তর্ক-বিতর্কের কথা অবশ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত নাই। তবে কোথাও কোথাও তাহার সামান্য একটু আভাস পাওয়া যায়। যথা হারীত-সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন,—

"অত্রাহং কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমনুত্তমম্।
ঋষিভিঃ সহ সংবাদং হারীতস্য মহাত্মনঃ॥" ১।৩

অর্থাৎ "আমি এই স্থলে পূর্ব্বকালে ঋষিগণের সহিত মহাত্মা হারীতের যে অত্যুত্তম সংবাদ হইয়াছিল, তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি।" "সহ" অর্থে সহায়তা বা সাহায্যকারিতা বুঝায়। সুতরাং সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, হারীত তাহাই বিবৃত করিয়াছিলেন। এইরূপ উক্তি আরও দুই এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় যে, যখনই ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন-সাধন করিবার প্রয়োজন হইত, তখনই বহু মুনি-ঋষি সম্মিলিত হইয়া যাঁহাকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, তাঁহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহার পর সকলে সম্মিলিত হইয়া যে আলোচনা করিতেন, তাহা হইতে সিদ্ধান্তগুলি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষিই বিবৃত করিতেন। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে সভা-সমিতিতে এক একটি প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তর্ক-বিতর্কের পর যেরূপ ভোট দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, পুরাকালে ঋষিসভায় তাহা হইত বলিয়া মনে হয় না। যাঁহাকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করা হইতেছে, তিনি উহা শুনিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেন, তাহাই তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইত। সেই জন্য সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিকেই ধর্ম্মশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করা হইত।

এখন জিজ্ঞাস্য, মুনি এবং ঋষি কাহারা? গীতায় মুনির লক্ষণ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে;—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

দুঃখ পাইলে যাঁহার মন বিচলিত হয় না, যিনি সুখের প্রতি আসক্তিশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ কিছুই নাই, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি মুনি বলিয়া কথিত হয়েন। অথবা সেই মুনিই স্থিতধী বলিয়া অভিহিত।

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, "মুনিগণ সকল বাসনা বর্জ্জন করিয়া একমাত্র ভগবানের তুষ্টিসাধনেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মগতপ্রাণ হইয়া জীবনযাপন করিয়া থাকেন।" ইহাতে বুঝা যায় যে, যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং ধর্ম্মগতপ্রাণ, তাঁহারাই মুনি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সাংসারিক লোকদিগের বাসভূমি হইতে অতি দূরে বসবাস করিতেন।

ঋষি কাহাকে বলে? ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, যিনি জ্ঞান দ্বারা সংসারের পরপারে গমন করিয়াছেন। ঋষ ধাতু গমনার্থক। "মন্ত্রদ্রষ্টারো হি ঋষয়ঃ।" মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেই ঋষি হওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, মন্ত্র কাহাকে বলে? "মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।" মনন বা বিষয়চিন্তা হইতে যাহা মানুষকে ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। বিষয়চিন্তা অর্থে মুখ্যতঃ স্বার্থ চিন্তা। জ্ঞান জন্মিলে মানুষ আর বিষয়চিন্তা করে না, স্বার্থ লইয়া মারামারি করে না। যাঁহার সেই জ্ঞান হইয়াছে তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বা ঋষি। কেহ কেহ বলেন যে, যিনি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে পরোক্ষকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে সমর্থ তিনিই ঋষি। আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মানুষ পরোক্ষকে অর্থাৎ যদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সেই উপায়কে প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় উপলব্ধি করিতে পারে। যাঁহারা তাহা পারেন তাঁহারাই ঋষিপদবাচ্য।

কেবল ব্রাহ্মণরাই যে মুনি হইতেন, তাহা নহে। অনেক ক্ষত্রিয়ও শেষবয়সে মুনিব্রত ধারণ করিয়া মুনি হইতেন

মুনি এবং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতেন, তাঁহারাই ঋষি হইতেন। ঋষিদিগের মধ্যে আবার সাতটি শ্রেণী ছিল। এই ঋষিরাই শাস্ত্রপ্রণেতা বা বিধান-প্রণেতা ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপক বিভাগ এবং শাসনবিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্ ও প্রভিন্ন ছিল। শাসকরা ব্যবস্থাপন কার্য্য বা আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। এমন কি, যখন কলিযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবফলে মুনি-ঋষি-শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখনও বুধগণ ও মনীষিগণ ব্যবস্থাপূর্ব্বক যাহা বিধান করিতেন, তাহাই সকলে আইন বলিয়া গণ্য করিতেন।* রাজা তাঁহাদেরই প্রণীত বিধান আইন বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইতে বাধ্য ছিলেন। সুতরাং তখন রাজার স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন বিধান করিবার ক্ষমতা ছিল না। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে রাজা কতকগুলি নিয়ম করিতেন। সেই নিয়মগুলি রাজবিধি বলিয়া গণ্য ছিল, ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অবিরোধী হইয়া রাজাকে সেই বিধি প্রণয়ন করিতে হইত। সেই জন্য রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বাধ্য ছিলেন। শাস্ত্র সেই জন্য বলিয়াছে,—

"অন্ধো হি রাজা ভবতি যস্ত শাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
অন্ধঃ পশ্যতি চারেণ শাস্ত্রহীনো ন পশ্যতি॥"

ইহার অর্থ এই যে, যে রাজার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, সে রাজা অন্ধ, তাহার কিছুই দেখিবার বা করিবার শক্তি নাই, তিনি যদি সত্য সত্যই দুই চক্ষুহীন হয়েন, তাহা হইলে বরং চরমুখে অনেক বিষয় জানিতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি শাস্ত্রজ্ঞানহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারেন না। ইহা বলিবার অর্থ এই যে, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহার্থ রাজাকে কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত করিতেই হইত। সেই বিধিনিষেধগুলি যাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসারী হয়, তাহা করিতে হইলে রাজার ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। সত্য বটে, তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া সেই বিধিনিষেধগুলি প্রবর্ত্তিত করিতেন; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যদি শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কুমন্ত্রী কর্ত্তৃক ভ্রান্ত পথে চালিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। সেই জন্যই রাজার শাস্ত্রজ্ঞান একান্ত আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সকলেই জানেন যে, শাসনবিভাগ (Executive) হইতে ব্যবস্থাপন বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণই বর্ত্তমান যুগে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে। কারণ, শাসকদিগের হস্তে যদি ব্যবস্থাপন কার্য্য বা আইন রচনার ভার থাকে, তাহা হইলে শাসকগণ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির বা ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য জনসমাজের পীড়াদায়ক আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। শাসকগণ যে সকল সময় আপনাদের স্বার্থের সহিত জনসাধারণের স্বার্থ সমঞ্জসীভূত করিতে চাহেন, তাহা নহে। সেই জন্য শাসকদিগের হস্তে বিধিপ্রণয়নের ভার থাকা উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ শাসনকার্য্য এবং বিধিপ্রণয়ন কার্য্য এক ধরণের নহে। দক্ষ শাসক হইলেই যে লোক বিচক্ষণ ব্যবস্থাপক হইবে, ইহা মনে করাই ভুল। এই দুই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে স্বতন্ত্র দুই শ্রেণীর জ্ঞানের প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য কিল শৌনক।
সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কুত্রচিৎ॥"

"হে শৌনক! এক ব্যক্তিতে কখনই সকল জ্ঞানের সমাবেশ হয় না। কারণ, সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারে না। কোথাও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি নাই।" সেই জন্য বিভিন্ন ভাবের দুইটি পৃথক্ কার্য্য একই লোকের বা এক সম্প্রদায়ের লোকের হস্তে রাখিতে নাই, ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় রাজনীতিবিশারদগণও স্বীকার করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, মুনি-ঋষিরা কি আইন করিবার পক্ষে উপযুক্ত লোক? যাঁহারা পার্থিব স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী বলিয়াই যাঁহারা মুনি নামে খ্যাত হইতেন, যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের বিষয় চিন্তা এবং তৎসম্বন্ধে সাধনা করিতেন, তাঁহারাই যে এই কার্য্যসাধনের যোগ্য লোক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ কথা সত্য যে,

* হেমাদ্রি, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি আদিত্যপুরাণের এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

অপিচ আদিপুরাণে;—"এতান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুঃ মনীষিণঃ" উভয়স্থলেই এই দেখা যায় যে, মহু প্রভৃতি বুধগণ কর্ত্তৃক বা মনীষিগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কতকগুলি কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে আর সমাজ সেই নিষেধ মানিয়া লইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে এক সম্প্রদায়ের স্বার্থশূন্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তিশালী লোক গঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যাঁহারা কৌলিক শক্তিতে, সাধনায় এবং লোকব্যবহারে স্বার্থশূন্যতার এবং ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন এবং যাঁহারা সাংসারিক আসক্তি, বিলাস এবং অর্থের মোহ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বনে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, যাঁহারা স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূলে উদরপূর্ত্তি করিয়াই সমাজের হিত-চিন্তা এবং আপনাদের পারলৌকিক চিন্তা করিতেন, তাঁহারাই যে বিধিপ্রণয়ের যোগ্যতম লোক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হইতে পারে, কোন ধার্ম্মিকতার যশঃপ্রার্থী ব্যক্তি আপনার মনের কলুষ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মুনিব্রত অবলম্বন করিতেন, কিন্তু মুনি-সমাজের এরূপ লোক সহজেই ধরা পড়িত। দ্বিতীয়তঃ এক জন মুনি যে স্বৈরাচারপূর্ব্বক সম্প্রদায়বিশেষের অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহা নহে। কারণ, যাঁহাকে বিধি নির্দ্দেশ করিতে বলা হইত, তিনি সাধারণতঃ মহর্ষিই হইতেন। স্বতঃই ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনপথে অত্যন্ত অধিক দূর অগ্রসর না হইলে কেহ মহর্ষিপদবাচ্য হইতেন না। তাহার উপর তাঁহারা মুনিঋষিদিগের সংসদেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিতেন। তাহাতে যে তর্কবিতর্ক চলিত এবং পরামর্শ হইত, এরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। উহার প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট লিখিত প্রমাণ না থাকিলেও, কতকটা আভাস পাওয়া যায়। এ সিদ্ধান্ত অবশ্য অনুমানমূলক। যদি ঐরূপ অনুমান না-ও করা যায়, তাহা হইলেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সামশ্রবা, ব্যাস প্রভৃতির ন্যায় বহু ব্যক্তির সমক্ষে ধর্ম্মপ্রবক্তা ঋষি স্বৈরাচারপূর্ব্বক কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না, করিলেও তাহা গ্রাহ্য না হইবার সম্ভাবনাই ছিল। সুতরাং এই ব্যবস্থাতে আইনের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সাধিত হইত।

আজকাল য়ুরোপে সকল সম্প্রদায়ের লোকরাই আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইয়া থাকেন। ইহার ফলে ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বার্থে স্বার্থবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিকূল স্বার্থ লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া যায়। তথায় তর্কবিতর্ক যথেষ্ট হয় সত্য, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যে সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা মনে হয় না। যে পক্ষে অধিক ভোট হয়, সেই পক্ষই জয়লাভ করে। ইহার ফলে যে সম্প্রদায়স্থ লোকের সংখ্যা অল্প, অথবা যাহাদের নির্ব্বাচিত সদস্যসংখ্যা অল্প, তাহাদের স্বার্থই অনেক সময় নির্ম্মমভাবে পদদলিত হইয়া থাকে। কারণ, আধুনিক পাশ্চাত্য খণ্ডের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে ন্যায়ের যুক্তির জয় হয় না, ভোটেরই জয় হইয়া থাকে। স্বার্থ লইয়া মারামারি করিতে যাইয়া লোক এতই অন্ধ হইয়া পড়ে যে, তাহারা ন্যায়ের কথা, যুক্তির কথা শুনিতে চাহে না, বুঝি বা বুঝিতেও পারে না। ফলে তথায় ধনীর সহিত শ্রমিকের বিবাদ, সাম্রাজ্যবাদীদিগের সহিত সমাজতন্ত্রবাদীদিগের বিবাদ, উদারনীতিকদিগের সহিত সঙ্কীর্ণনীতিকদিগের বিবাদ, শান্তিপ্রিয় লোকদিগের সহিত বিবাদপ্রিয় লোকদিগের মতভেদ এবং তজ্জনিত বিবাদই কার্য্যকালে অনেক সময় প্রবল হইয়া লোককে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। য়ুরোপে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিগত যুদ্ধের সময় ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তথায় অনেকে ডিমোক্রেসী বা জনতন্ত্রবাদের উপর আস্থাহীন হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং এ ব্যবস্থা যে নির্দ্দোষ, তাহা বলা যায় না।

প্রাচীন ভারতে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা যে অনেকটা নির্দ্দোষ, তাহা বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রাচীন ভারতে এক দল স্বার্থলেশশূন্য (selfless) লোক গঠিত করিয়া তাঁহাদের হস্তে ব্যবস্থাপনভার অর্পিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোক যে সকল পক্ষের অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক সুবিচার করিতেন, এরূপ আশা করা যাইত। কিন্তু এ কথা সত্য যে, আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁহাদের অনেক কার্যই আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত বিসদৃশ এবং পক্ষপাতপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তাহার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ, তদানীন্তন সামাজিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, দ্বিতীয় কারণ, ভিন্নমুখী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বিচারবুদ্ধির বৈকল্য। তৃতীয় কারণ, বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যে সময়ে ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, সেই সময়ে উহা রক্ষার জন্য কতকগুলি কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই কঠোর বিধানগুলি ঋষিপ্রণীত, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য উহা আর্ষ বিধিপুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে ঐ সকল কঠোর

বিধান প্রবর্ত্তিত করিবার কতদূর প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তখন সামাজিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং ঐ সকল বিধান দেখিয়া ঋষিগণের উপর দোষারোপ করা সঙ্গত নহে।

অনেকে মনে করেন যে, পূর্ব্বকালে জনসাধারণের সমবেত হইয়া রাজনীতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এ ধারণা সত্য নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে মেলা হইত। সর্ব্বশ্রেণীর লোকই সেই মেলায় যোগ দিতেন। তথায় লোক বহুদিন ধরিয়া অবস্থিতি করিত। সেই সময়ে তথায় ধর্ম্মকথা, সমাজকথা, রাজনীতিক কথা, সকল কথারই আলোচনা হইত। আজকাল হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতে ৪টি কুম্ভমেলা হয়। যথা—

"গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ ধারা গোদাবরীতটে।
কলসাখ্যো হি যোগোঽয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ গঙ্গাদ্বারে বা হরিদ্বারে, প্রয়াগে, উজ্জয়িনীতে এবং গোদাবরীতীরস্থ নাসিকে এই চারি স্থানে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি কুম্ভরাশিস্থ হইলে চৈত্র-সংক্রান্তির সময় হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়। (২) বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং চন্দ্রসূর্য্য মকররাশিতে থাকিলে মাঘমাসের অমাবস্যায় প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয়। (৩) বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে গমন করিলে এবং সূর্য্যও সিংহরাশিতে আসিলে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে গোদাবরীতটে নাসিকে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। (৪) বৃহস্পতি সিংহরাশিতে থাকিলে যখন সূর্য্য মেষরাশিতে উপস্থিত, তখনই উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্থানে বারো বৎসর অন্তরই কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। নিখিল ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর এবং সর্ব্বজাতির লোকদিগের সম্মিলনসাধনকল্পে এই মেলাগুলির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সকল মেলা হইয়া আসিতেছে। এই সকল স্থানের মহৎ জনসম্মিলনে সর্ব্বশ্রেণীর লোক সম্মিলিত হইয়া জনসমাজ হইতে যে প্রকার প্রয়োজন বিজ্ঞাপিত করিত, সাধুসন্ন্যাসিগণ তাহাই পূর্ব্বকালে ঋষিদিগকে জ্ঞাপন করিতেন। সমাজে কোন প্রকার সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থিক অসুবিধা ঘটিলে সেই বিশাল জনসমুদ্রে সকল শ্রেণীর লোকের সেই কথা লইয়া আলোচনা হইত। এই সকল মেলায় লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইত। সুতরাং তথায় সাধু শ্রেণীর লোক যেরূপ ভাবে উপস্থিত হইত, পৃথিবীর কোন দেশের পার্লামেণ্টে তাহা হয় না। সুতরাং জনমত প্রকাশের এমন স্থান আর ছিল না। তদনুসারে বিধিবিধানেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইত।

সন্ন্যাসীরা বলিয়া থাকেন যে, শঙ্করাচার্য্যই কুম্ভমেলার প্রবর্ত্তন করিয়া যায়েন। কিন্তু পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ চারি স্থানে অমৃতকলস হইতে অমৃত পতিত হইয়াছিল বলিয়া তথায় কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। পুরাণের উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, বলিতে হয় যে, স্মরণাতীত কাল হইতেই এই সকল মেলা হইয়া আসিতেছে। গোদাবরী-তীরস্থ নাসিকে সূর্পনখার নাসাচ্ছেদ হইতেই প্রতিবর্ষে একটি করিয়া মেলা হইয়া আসিতেছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। সেই বার্ষিক মেলাই দ্বাদশ বর্ষান্তে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। সেই কুম্ভমেলায় সম্মিলিত সাধু-সজ্জনগণ সমাজহিতকর কার্য্য করিবার এবং ত্রিতাপতাপিত জীবের জীবনে শান্তিবারিসেচনের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতে আত্মনিয়োগ করিতেন। সূত যখন নৈমিষারণ্যে ব্যাস-প্রণীত সংহিতার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন নৈমিষারণ্যে বহু সহস্র ঋষি তাহা শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল কে? তখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ঋষিসংগ্রহ করা হইত না। এই সকল মেলাতেই সেই সংবাদ প্রচার করা হইলেই ফিরিবার পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা পরবর্ত্তী কুম্ভে যাইবার সময় তাঁহারা এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। বৃহস্পতি এক এক রাশিতে প্রায় ১ বৎসর থাকেন। সুতরাং হরিদ্বারের কুম্ভমেলার প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পরে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয়; প্রয়াগে কুম্ভমেলার প্রায় তিন চারি বৎসর পরে নাসিকে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। নাসিকের ১ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলার সময়। ইহাতে অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, দণ্ডকারণ্যস্থ নাসিকের কুম্ভমেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায় যাইবার পূর্ব্বে ঋষিরা নৈমিষারণ্যে সমবেত হইয়া সৌতিকথিত পুরাণকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নৈমিষারণ্যে উহা শেষ ঋষিসঙ্ঘ।

তৎপরে কলির প্রাদুর্ভাবে মুনিঋষিসম্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান যে দেশকাল অনুসারে প্রয়োজন-বোধে পরিবর্ত্তিত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। বৃদ্ধ গৌতমসংহিতায় প্রায় ৫৮ জন ধর্ম্মসংহিতাকার ঋষির নাম পাওয়া যায়। পরাশরসংহিতায় দেখা যায় যে, ব্যাস পরাশরকে কহিতেছেন যে, "আমি আপনার কাছে মনু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণের কথিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র শুনিয়াছি এবং তাহা স্মরণ রাখিয়াছি; কিন্তু কলিযুগে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতে সেই বিধান আর প্রতিপালন করা যাইতেছে না। অতএব আপনি কলিযুগের ধর্ম্ম বলুন।" তদনুসারে পরাশর ব্যাসপুরঃসর সেই সম্মিলিত ঋষিমণ্ডলীর নিকট কলিযুগের ধর্ম্মকথা বলিতে থাকেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদই করা হইত। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে ভারতে শতাধিক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণীত হইত না। উহার অনেকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল বিধান-পুস্তক যে ছিল, তাহা অস্বী-কার করিবার উপায় নাই। ঐ সকল বিধি-প্রবর্ত্তকদিগের নাম অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস স্পষ্টভাবে লিখিত না থাকায়, অনেক কথা অনুমান করিয়া লইতে হয়। সে অনুমান করি-বার হেতুও থাকা চাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়াতে সকল স্থানে সেই হেতু বিশদভাবে প্রদত্ত হইল না। তবে মোটের উপর বুঝা গেল, প্রাচীন ভারতে (১) শাসন এবং ব্যবস্থাপন বিভাগ স্বতন্ত্র ছিল। (২) ব্যবস্থাপক নিঃস্বার্থভাবে ব্যবস্থা করিতেন এবং (৩) অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন করা হইত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্মী

সে আমার মহামিত্র
নিন্দা করে যে আমার,
সাবধানে চলি বলি
শুধু নিন্দাভয়ে তা'র!

আমার মঙ্গলশ্রীতে
যদি কা'র হিংসা হয়,
বুঝিব সম্পদে মোর
নাহি আর সে বিনয়!

আমারি উদ্দেশ করি'
যে বলিবে কটু যত,
ভাবিব, ঘটেছে মোর
দোষ ত্রুটি শত শত!

যদি বা বঞ্চিত হই
আমার এ পোড়া ভালে,
সে পাপ, বুঝিব আমি
করিয়াছি কোনো কালে!

রোগ শোক দারিদ্র্যেতে
যদি ঝরে আঁখি-জল,
মেনে ল'ব সে কেবল
আমারি করমফল!

অত্যাচার, অবিচার
হয় হ'ক মোর 'পরে
ব্যথা অনুভব আর
করিব না তা'র তরে!

ভাল মন্দ বিচারের
নাহি মোর অধিকার,
কর্ম্ম শুধু লক্ষ্য মোর
বহি তাই কর্ম্মভার।

শ্রীমণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।



অমরনাথ

১৯

কয়েক দিন পরে একদা প্রভাতে কৃষ্ণনাথ চন্দননগরে তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া অমরের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, এমন সময় রেবার দাদা শরৎ বাবুর মোটর আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিলেন এবং অমরনাথের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। বিনয় কাহাকে বলে, শরৎ বাবু তাহা জানিতেন না; তিনি মনে করিতেন, বিশ্ব তাঁহারই উপভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আর বিশ্ববাসী তাঁহাকে সম্মান দিতে জন্ম লইয়াছে। তিনি জাহাজে মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন—বেশ লাভের কায; দুই চার লাখ টাকা ইতো-মধ্যে জমাইয়াছেন। অমরনাথের সহিত পরিচিত হইবামাত্র শরৎ বাবু হাত বাড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিতে উদ্যত হইলেন, অমর যুক্তকরে নমস্কার করিলেন। শরৎ অপ্রতিভ হইয়া হাত গুটাইয়া লইলেন—নমস্কারটাও করি-লেন না। অমর একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাথ সম্বন্ধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক বাটী চা এনে দি?"

শরৎ। না, আমাকে এখুনি যেতে হবে, (বাম প্রকোষ্ঠে বাঁধা ঘড়ির পানে চাহিয়া) ওঃ, এত বেলা হয়ে গেছে—এখুনি আমাকে কোলকাতা যেতে হবে।

কৃষ্ণ। বহুকাল পরে যখন এলেন, তখন একটু কিছু খেয়ে যান।

শরৎ। আমার সময় নেই—আমি না গেলে জাহাজ ছাড়তে পারবে না—চারিদিক থেকে এখুনি 'তার' আসবে—হয় ত লাট সাহেব—

কৃষ্ণ। দুটো আম আর সন্দেশ।

শরৎ। ছি ছি! ওগুলো আবার খাদ্য!

কৃষ্ণ। তবে চা ডিম?

শরৎ। তা'তে রাজি আছি, কিন্তু চট্ ক'রে! আমার আস্‌তে যে দেরী হয়ে গেল। মিনার্ভা কারগুলো কিছু না, এবার একটা রোলস রইস কিনব মনে করছি! তা হ'লে পাঁচ সাত মিনিটে কোলকাতা যাতায়াত করতে পারব। তোমার গাড়ীখানা কি হে? ফোর্ড টোর্ড হবে, বোধ হয়—

কৃষ্ণ। ওই রকম একটা।

শরৎ। যাক্, এখন যা' বলতে এসেছি, শোন। তোমা-দের কাল আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন—সকাল সকাল যাবে; হাঁা, তোমার স্ত্রী—কি নাম তা'র? কিরণ—কিরণকে নিয়ে যাবে; আর কে একটি ছোট মেয়ে আছে, তা'কেও নিয়ে যাবে। এখন আমি আসি—চা আজ থাক্—

বলিয়া তিনি উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া কহিলেন, "হাঁা, তোমাদের নামে দু'খানা চিঠি আছে, বাবা দিয়েছেন—এই নেও। আমার কি এ সব ছোট কথা মনে থাকে, আমার হাজার কায, চালাও—"

গাড়ী চলিয়া গেল। কৃষ্ণনাথ ফটক হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমরনাথকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলে?"

অমর। মন্দ কি? নূতন ত কিছু দেখা গেল।

কৃষ্ণ। এখন নিমন্ত্রণে যাবে?

অমর। না।

কৃষ্ণ। কর্ত্তা আবার চিঠি দিয়েছেন—এই নেও।

অমর। আমি এঁকে চিনি না, যাবও না।

কৃষ্ণ। তবে ফোণ ক'রে দি, কি বল?

অমর। তোমার ইচ্ছে।

কৃষ্ণনাথ পাশের এক বাড়ীতে গিয়া কোন্নগরে রেবার পিতাকে ফোণ করিলেন। ফোণেতে উত্তর আসিল,—আমরা যাচ্ছি।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কর্ত্তা গণেশ বাবু ও কর্ত্রী সর্ব্বাণী মোটরে চড়িয়া আসিলেন। কৃষ্ণনাথ তাঁহাদের প্রণামাদি করিয়া অন্দরমহলে লইয়া গেলেন। গণেশ মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অমরনাথের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবা আসে নি ?"

গণেশ। না ; তাকে সকল যায়গা পাঠাই না।

অমর। আপনাদের সঙ্গে তার বোনের বাড়ীতে—

গণেশ। তা' ঠিক, কিন্তু এই কি জান—

চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও আছে কি না। কৃষ্ণ তখন অন্দরে।

গণেশ বাবু কহিলেন, "এই কি জান, মেয়ে এখন বড় হয়েছে, স্বামী পছন্দ ক'রে নেবার বয়েস হয়েছে। তা' ভেতরের কথা না জেনে শুনে যাকে তাকে পছন্দ ক'রে ফেলে শেষকালে কি একটা গোল বাধিয়ে বসবে। আমার কাছে দেশের লোক পরামর্শ নিতে আসে, আর আমারই বাড়ীতে —সে সব হবে না—আমি বেঁচে থাকতে ও সব হবে না। বুঝেছ কি না—এই দেখ না কেন—ছেলে মেয়ে দুটিকে কেমন মানুষ করেছি—দুটি রত্ন। লাট সাহেবও আমার ছেলেকে খাতির করেন ; আর রেবাকে বিয়ে করবার জন্যে—ওর নাম কি—কত রাজা মহারাজা যে আমার দোরে ভিড় লাগিয়েছিল—তাই বলছিলাম, আমার ঘরের বউ বা জামাই হওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। যাক্ এখন ও সব কথা—কি যে তোমাকে বলতে এসেছিলাম—হাঁ মনে হয়েছে—ওর নাম কি—তোমাকে কাল সকালে আমাদের ওখানে যেতে হবে ; দিন কয়েক থাকতেও হবে।"

অমর। মাপ করবেন, আমাকে পরশু দিল্লী যেতে হবে।

গণেশ। কেন ?

অমর। দরকার আছে।

গণেশ। এর পরে এক দিন যেও।

অমর। তা' হ'তে পারে না।

গণেশ। এখন কাল ত চল।

গণেশ বাবু স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, অমর তাঁহার জামাতা হইয়া গিয়াছে ; তিনি সম্মতি দান করিলেই বিবাহ হইয়া যাইবে। অমরের সম্মতির কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। থালায় অন্ন লইয়া কুকুরকে ডাকিলে কুকুর ছুটিয়া আসিবেই ; এখন কুকুর এমন সুখাদ্যের যোগ্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। তাই নিমন্ত্রণ। গণেশ বাবুর মনের ভাব অমরনাথ যে একবারেই বুঝেন নাই, এমন নহে। তবে তিনি অপ্রিয় কথা বলিয়া কাহারও মনঃপীড়া দিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কষ্ট দিলে কষ্ট পাইতে হয়। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া হাস্যমুখে উত্তর করিলেন, "ক্ষমা করবেন, আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলুম না।"

সর্ব্বাণী এমন সময় ঘরে আসিয়া অমরকে কহিলেন, "তোমাকে যেতেই হবে, বাবা।"

"ক্ষমা করবেন।"

"তুমি যদি না যাও, আমার মন বড় কষ্ট হবে। তুমি আমাদের প্রাণ দিয়ে পরে যদি কষ্ট দেও—"

"তবে যাব, আর কিছু বলতে হবে না। কিন্তু কালকেই ফিরব।"

"তা' পরে বোঝা যাবে।" পরে কৃষ্ণের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "হিরণকে নিয়ে যেতে ভুলো না কৃষ্ণ—নরলতাকে নিয়ে যাবে—আর জ্যোতিকেও পার যদি নিয়ে যাবে—আমি এখন যাই তবে, আমার মোটেই অবসর নেই—ফিরে গিয়ে ছেলেদের খাওয়াব।"

বলিয়া সর্ব্বাণী স্বামিসহ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মোটর উপর তাঁহারা দণ্ডখানেক ছিলেন। মোটর অদৃশ্য হইলে কৃষ্ণনাথ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা' হ'লে তুমি যাচ্ছ, অমর ?"

অমর। হাঁ ; তুমিও বোধ হয় যাচ্ছ ?

কৃষ্ণ। আমাকে ত যেতেই হবে—তোমাকে ত অত বড় ভদ্র লোকের বাড়ীতে একা ছেড়ে দিতে পারি নে।

অমর। বউদি যাচ্ছেন ?

কৃষ্ণ। সেটা এখনও ঠিক হয় নি। লতা যাবে ?

অমর। না—নরুও না।

কৃষ্ণ। কেন ?

অমর। জ্যোতি বাড়ীতে একা থাকবে ?

কৃষ্ণ। দেখ অমর, তুমি আমার কাছে লুকিও না—

অমর। ও সব কথা ছেড়ে দেও। তা হ'লে কাল সকালে অর্থাৎ বেলা এগারটায় তুমি আর আমি যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। এত বেলায় ?

অমর। হ্যাঁ, ঠিক খাবার আগে।

২০

গণেশ বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ; রায় বাহাদুর উপাধি লইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মেজাজটা আজও হাকিমের মত আছে। সুন্দরবনে কিছু পতিত জমী লইয়া নিজেকে এক্ষণে জমীদার বলিয়া পরিচয় দেন। ফটকের গায়, দ্বারবানের চাপরাশে, গাড়ীর দ্বারে, চিঠির কাগজের মাথায় সর্ব্বত্র লিখিত ছিল, রায় বাহাদুর ও জমীদার। তাঁহার উচ্চপদ লোক বিস্মৃত না হয়, সে জন্য তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন। গরীবদের চরণে দলিত করিতেন, আর বড়লোক বা সাহেবদের চরণে লুটাইয়া পড়িতে তিনি কখন অবহেলা করিতেন না।

তাঁহার বাসগৃহ পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ছিল ; ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে। বাড়ীখানি দেখিলেই মনে হয়, কেবল ভুঁইফোঁড়ের বাড়ী—বনিয়াদী ঘরের সন্তানের বাড়ী নয়। অট্টালিকাটি বড় রাস্তার উপর—তবে ট্রাঙ্ক রোডের উপর নয়। বাড়ীর সম্মুখে একটুখানি বাগান ; বাগানের মধ্যে একটা প্রস্তরনির্ম্মিত নগ্ন রমণীমূর্ত্তি। তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত, বাম হস্ত পুষ্পগুচ্ছ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই দক্ষিণ হস্তের করতল ভেদ করিয়া জলের ফোয়ারা ঊর্দ্ধে ছুটিতেছে। প্রস্তরমূর্ত্তির চারিদিক বেষ্টন করিয়া প্রশস্ত বেদী ; বেদীর উপর নানা রকমের ফুলগাছ টবে বসান। এই বেদী বেষ্টন করিয়া গাড়ীর রাস্তা।

অমর ও কৃষ্ণ যখন বেলা সাড়ে এগারটার সময় মোটর হাঁকাইয়া গণেশ বাবুর ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন দ্বিতলের জানালায় রেবা দাঁড়াইয়া ছিল। অমরনাথ তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার মুখখানি আনন্দে হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণনাথ বেদী বেষ্টন করিয়া দ্বারসমীপে গাড়ী থামাইলেন।

অভ্যর্থনা করিতে দ্বারে কেহই ছিলেন না। তাঁহারা এ-দিক ও-দিক চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানদের নিকট হইতেও তাঁহারা কোনরূপ সম্মান বা অভ্যর্থনা পাইলেন না। কৃষ্ণনাথ অগ্রসর হইয়া অমরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। একটা বড় ঘরের দ্বারসমীপে আসিয়া কৃষ্ণনাথ দাঁড়াইলেন ; চুপি চুপি অমরকে কহিলেন, "বাড়ীটার এত বদল হয়ে গেছে যে, আমিই এখন চিন্‌তে পারছি নে। চাকরগুলো ত কথাই কয় না, বাবুদের কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। এই ঘরটায় ঢুকে সন্ধান নেওয়া যাক্।"

এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া কহিল, "মা আপনাদের উপরে ডাকছেন—আসুন।"

কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "একেবারে উপরে যেতে ভরসা হয় না, আগে বাবুদের সঙ্গে দেখা করি।"

বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। শরৎ বাবু একখানা কৌচে বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। কৃষ্ণনাথকে দেখিয়া কহিলেন, "কে, কেষ্ট যে ! এস। তোমার সঙ্গে সে বাবুটি আসেন নি ?"

"হাঁ, এসেছেন।"

"তোমরা ভেতরে এস।"

উভয়ে অগ্রসর হইয়া দুইখানা চেয়ারে বসিলেন, ঘরটির মেঝে মাদুরে মোড়া ; মাদুরের উপর সতরঞ্চ। তার উপর চেয়ার, টেবল, কৌচ, সোফা, হোয়াটনট, আলমারি ইত্যাদি। ঘরে এত আসবাব-পত্র যে, চলা-ফিরা করা কঠিন ! অমরনাথ আসবাব-পত্র দেখিয়া বুঝিলেন, এঁরা বেশী দিন ধনশালী হয়েন নাই। আলমারির কেতাব দেখিয়া বুঝিলেন, মালিকের লেখাপড়ার দৌড় বড় বেশী দূর নয়। বেশভূষা দেখিয়া বুঝিলেন, শরতের আড়ম্বরটা বেশী—কি পরিলে কি করিলে লোক তাঁহাকে বড় লোক বলিবে, এই চেষ্টা তাঁহার পক্ষ হইতে অবিরাম চলিতেছে। গ্রীষ্মে কাতর হইয়া পড়িলেও তিনি সাহেবদের অনুকরণে সাজসজ্জা করিতেন। মধ্যাহ্ন হইতে চলিল, তবু তিনি রেশমের গাউন ছাড়েন নাই। অন্যদিন এত বেলা পর্য্যন্ত পরিয়া থাকেন না, আজ অমর আসিবেন—তাঁহাকে এ নূতন বেশটা না দেখাইয়া ছাড়িতে পারেন না। অন্য দিন কাগজ পড়েন না, উপন্যাস পড়েন। আজ টেবলের উপর কতকগুলি বিলাতী ও দেশী কাগজ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালা কাগজ একখানিও তাঁহার ঘরে নাই। ঘরের জিনিষপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইয়া অমরনাথ কক্ষস্বামীর পানে ফিরিলেন ; তাঁহার মনে হইল, শরৎ বাবুকে তিনি বেশ চিনিয়াছেন।

শরৎ। তার পর ইন্দ্রবাবু, আপনাদের এত দেরী হ'ল কেন ?

কৃষ্ণ। এঁর নাম ইন্দ্র নয়—অমর।

শরৎ। মাপ করবেন অমর বাবু, আমার অনেক কায, অনেক জিনিষ মনে রাখতে হয়—নামটামগুলো বড় মনে থাকে না। সেবারে সিমলে পাহাড়ে গেছলুম। চারিদিক থেকে নেমন্তন্ন—আজ এখানে চা, কাল ওখানে ডিনার, পরশু সেখানে নাচ—একেবারে আমাকে অস্থির ক'রে তুল্লে; কি ক'রে যে সাহেব-মেমেরা টের পেলে আমি পাহাড়ে যাচ্ছি! বোধ হয়, কাগজে দেখে থাকবে। যাই হোক, আমি এক দিন বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম। এক বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন। সেখানে আমি ডিনার-সুটে সন্ধ্যের পর গিয়ে হাজির। একদম অপ্রতিভ! কি করব, এত পার্টি যে, কোথায় কোন্ সময়ের নেমন্তন্ন. তা আমার স্মরণ থাকত না। আর একবার—

গণেশ চীৎকার করিতে করিতে আসিলেন, "কই, কেষ্ট কই? এঁরা সব গেলেন কোথা? এই যে অমর এসেছ। বেশ, বড় খুসী হ'লাম। ওর নাম কি—বড় দেরী হয়ে গেছে—এস উপরে—"

শরৎ। ইন্দ্র বাবু এখন উপরে যেতে পারবেন না, আমার কাছে সিমলে পাহাড়ের গল্প শুন্‌ছেন।

গণেশ। তোমার সেই দার্জ্জিলিংয়ের গল্পটা বলেছ?

শরৎ। বল্‌ব আর কখন? এই ত মোটে সুরু করছি। আপনি এখন উপরে যান।

গণেশ। আমার কাশ্মীর-ভ্রমণের কথা বলব মনে করেছিলুম, সে বড় মজার কথা—

শরৎ। সে সব ইন্দ্র বাবুর ভাল লাগবে না, আপনি এখন উপরে যান—

অমর। আমার নাম অমর।

শরৎ। হাঁ, হাঁ, ভুলে গিছলুম, মাপ করবেন। হ্যাঁ, তার পর আর এক দিন সিমলে পাহাড়ে—

গণেশ। পাহাড় যদি দেখতে চাও অমর, তা হ'লে একবার কাশ্মীর বেড়িয়ে এস। কি সুন্দর দৃশ্য—

শরৎ। সিমলের কাছে কেউ লাগে না। খুব ভাল বলেই ত বড়লাট সিমলে থাকেন।

গণেশ। সিমলে, দার্জ্জিলিং এ সব অতি তুচ্ছ কাশ্মীরের তুলনায়। কাশ্মীরকে লোকে ওর নাম কি—ভূস্বর্গ বলে।

শরৎ। যারা সিমলে দেখেনি, তারাই বলে। আপনি এখন উপরে যান। তার পর ইন্দ্র বাবু—

জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, ঠাঁই হয়েছে, মাঠাকরুণ সকলকে ডাকছেন। শরৎ কহিলেন, "এর মধ্যে খাবার হ'ল? আচ্ছা, আপনারা উপরে যান ইন্দ্র বাবু, বিকেলে আপনাকে সিমলে দার্জ্জিলিংএর গল্প শোনাব।"

গণেশ। তুমিও চল না কেন শরৎ।

শরৎ। আমার এখনও দেরী আছে, চান-টান হয়নি।

কর্ত্তা, কৃষ্ণ ও অমরকে লইয়া উপরে আসিলেন। সিঁড়ির মাথায় একটা ঘরে তাঁহাদের আহারের স্থান হইয়াছিল। সর্ব্বাণী তথায় রেবাকে লইয়া আহার্য্য গুছাইয়া দিতেছিলেন। অমরকে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন, "লতাকে আনলে না?"

অমর। সে আসতে চাইলে না।

সর্ব্বাণী। হ্যাঁ, কেষ্ট, হিরণ যে বড় এলো না?

কৃষ্ণ। তা'র শরীরটা ভাল নয়।

সর্ব্বাণী। আচ্ছা, তোমরা বোসো। রেবা, বাতাস কর্, পোলাওতে যেন মাছি না ব'সে।

গণেশ কহিলেন, "তোমার এরা খুবই সুখ্যাতি করে, অমর। সে দিন নাকি ঘোড়াটা ওর নাম কি—একটু দুষ্টুমি করেছিল, তুমি তাকে সায়েস্তা ক'রে দিয়েছিলে। তোমার ঘোড়া-টোড়া আছে নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

আহার করিতে করিতে গণেশ বলিলেন,—"তবে তুমি ঘোড়া চালাতে শিখলে কেমন ক'রে?"

অমর। পরের ঘোড়া হাঁকিয়ে—যেমন মোটর চালাতে শিখেছি।

গণেশ। হুঁ, তোমার জমীদারী-টমিদারী কিছু আছে?

অমর। আজ্ঞে না।

গণেশ। বাড়ী-ঘর কি রকম?

অমর। সামান্য একটুকু।

গণেশ। আমার এ বাড়ীটা করতে পঞ্চাশ হাজার পড়েছে।

অমর। তা হবে।

গণেশ। তা হ'লে তোমার জমীদারী নেই, বাড়ী-ঘরও সামান্য একটুকু। তোমার চলে কি ক'রে?

অমর। কষ্টে-সৃষ্টে।

এক জন ভিখারী ফটকের গোড়ায় ডাকিল, "বাবা, দু'টি খেতে দেও না।"

দেউড়ীতে দরওয়ান হাঁকিল—"হিঁয়াসে ভাগো।"

ভিখারী। (ফটকসমীপে) বাবা, দু'টি খেতে দেও—তোমাদের পাতের-নাতের যা' হো'ক দুটো দেও।

দরওয়ান। দিক্ মাৎ করো—ভাগো।

ভিখারী। আজ ক'দিন আমি খাইনি বাবা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

উপরে অমরের কানে সকল কথা স্পষ্টরূপে আসিতে লাগিল। ভিখারীর শেষ কথা শুনিবামাত্র অমর হাত গুটাইয়া বসিলেন—মুখে আর অন্ন দিতে পারিলেন না।

দরওয়ান। (ভিখারীর প্রতি) আরে সড়ক পর বহুৎ ইট্টা গর্দ্দা হ্যায়, উঠায়কে খা লেও।

ভিখারী। কারুর কি দয়া হবে না, বাবা? যে বাড়ীতে যাই, সেই বাড়ী হ'তেই শুধু মুখে ফিরতে হয়। তোমাদের অভাব কি, বাবা! দুটো নুণ-ভাত দেও দয়া ক'রে।

সর্ব্বাণী। (অমরের প্রতি) তোমার পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চাড্ডি গরম দি।

অমর। না, আর খেতে পারছি না।

সর্ব্বাণী। এখন ত কিছুই খাওনি।

ভিখারী সম্ভবতঃ দুই এক পা অগ্রসর হইয়া থাকিবে, নতুবা দরওয়ান কেন তাঁহার তূণ হইতে বাছা বাছা শর নিক্ষেপ করিবেন? 'শ্বশুরা' 'শালে' প্রভৃতি সুমধুর সম্ভাষণের পরও যখন ভিখারী সরিল না, তখন দরওয়ান তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভিখারী কহিল, "দু'টো ভাত না খেয়ে আমি নড়ব না।"

উপরে সকলেই কথাগুলো শুনিতে পাইতেছিলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "ভিখিরীগুলোর অত্যাচার দেখছ? বলে, না খেয়ে নড়ব না। এ কি তোমার জমীদারী? কেষ্ট বোধ হয় শুনে থাকবে—মুখুয্যেদের একটা জমীদারী আমি পত্তুনি নিয়েছি।"

কেহ কোন সাড়া দিল না। কৃষ্ণনাথ বুঝিয়াছিলেন, অমর কেন হাত গুটাইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, অমরের ভিতর কি একটা প্রবল ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। তিনি অপাঙ্গদৃষ্টিতে অমরকে দেখিতেছেন, আর নীরবে খাইয়া যাইতেছেন।

ভিখারী। দয়া কর না, মা। আমার ব্যামো হয়েছিল, তাই কায করতে পারি নি—বড় ভাই তাড়িয়ে দিয়েছে—পথে পথে আজ ক' দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ খেতে দেয় নি। আমারই মত এক গরীব দুটো মুড়ি দিয়েছিল—

নীচে শরৎ বাবু গোছলখানা হইতে বাহির হইয়া ক্রোধ-ভরে হাঁকিলেন, "দরওয়ান!"

"হুজুর।"

"তোমলোক কেয়া করতা হ্যায়? একঠো চোট্টা আধা ঘড়ি হিঁয়া হাল্লা লাগায় দিয়া; আউর তোমলোগ চুপচাপ বৈঠা হ্যায়।"

"কেয়া করে হুজুর, শালে নেহি যাতে হেঁ।"

"থাপ্পড় লাগাও, কান পাকাড়কে বাহার কর্ দেও।"

দুই জন দরওয়ান দেউড়ি হইতে নামিল। অমরনাথ তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। তাঁহার সমস্ত দেহের শিরা লাফাইয়া উঠিল। ভিখারী কহিল, "মেরো না বাবা, যাচ্ছি। পথের উপর রোদে দাঁড়াতে না পেরে এই গাছের আড়ালে একটু দাঁড়িয়েছি। যাচ্ছি বাবা, উঠবার শক্তি নেই—"

দরওয়ানের চপেটাঘাতের শব্দ শুনা গেল; ভিখারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অমরনাথ জ্ঞানশূন্য হইলেন; তিনি বিদ্যুদ্বেগে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিলেন। নগ্ন-পদে সিঁড়ির কয়টা ধাপ মুহূর্ত্তমধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া নীচে আসিলেন। উদ্যান-সমীপে আসিয়া দেখিলেন, এক জন দরওয়ান ভিখারীকে চপেটাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়াছে, দ্বিতীয় দরওয়ান পদাঘাতে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে—তাহার উদ্দেশ্য, ভিখারীর ধূলিকর্দ্দম-লিপ্ত অঙ্গ হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া নাগরামণ্ডিত পদ দ্বারা তাহাকে ঠেলিয়া সাধারণ রাস্তায় নিক্ষেপ করা। অমরনাথ চকিতমধ্যে তাহাদের মধ্যে পড়িয়া দুই দরওয়ানকে দুই দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং ভিখারীর অচৈতন্য-প্রায় দেহটাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া মোটরে উঠিলেন। অবিলম্বে মোটর ফটক পার হইল। তখন দ্বিতলের গবাক্ষে অনেকেই দণ্ডায়মান ছিলেন।

২৩

কৃষ্ণনাথ রেলযোগে বাড়ীতে ফিরিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় একটা মাদুরের উপর ভিখারী শয়ান রহিয়াছে। তাহার পরিধানে একখানি শুভ্র বস্ত্র; পার্শ্বে বসিয়া জ্যোতি তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছে;

অপর পার্শ্বে বসিয়া লতা গরম জলে টোয়ালে ভিজাইয়া ভিখারীর সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিতেছে ; আর অমরনাথ তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে চুণ-হলুদ গরম করিয়া লাগাইয়া দিতেছেন, অদূরে হিরণ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দণ্ডায়মান। ভিখারীর গণ্ড বহিয়া জলধারা গড়াইতেছে। কৃষ্ণনাথ সমস্ত দেখিয়া লইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন ?"

অমর। বউদির সাহায্য দরকার হয় নি।

কৃষ্ণ। (স্ত্রীর প্রতি) জ্যোতি যা' করছে, তুমি তাই কর—মনের ময়লা অনেক কেটে যাবে—অমরের বউদি ব'লে পরিচয় দিতে পারবে।

হিরণ প্রস্থান করিল।

কৃষ্ণ। (ভিখারীর প্রতি) আর কান্না কেন ? যখন অমরের হাতে পড়েছ, তখন তোমার কান্নার দিন অবসান। সে খেতে পেলে তোমাকেও খাওয়াবে—এখন নিশ্চিন্ত হও।

ভিখারীর কান্না বাড়িয়া গেল, কিন্তু সে কথাটিও কহিল না। লতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বড়দা ?"

"এর পরে শুনিস।"

"আমার যে এখন শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে।"

"আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, কাপড়-চোপড় ছাড়ি।"

দুধ বেশী খাওয়াইতে নিষেধ করিয়া অমর উঠিলেন। হাত-মুখ ধুইয়া কাদামাখা কাপড় বদলাইলেন। কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জুতো এনেছ, না তাদের দান ক'রে এসেছ ?"

"আমি কি তোর চাকর যে, তোর জুতো বয়ে বেড়াব ?"

"বন্ধু, বন্ধুর সখা, পিতা, স্ত্রী, ভৃত্য।"

"এই নে তোর জুতো। তোর জুতো বইতে পারি, কিন্তু তোর বক্তৃতা সহ্য করতে পারি নে।"

বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কৃষ্ণনাথ কাগজমোড়া জুতা বাহির করিয়া দিলেন। জুতা পায়ে দিয়া অমর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "দেখলি, তুই আমার চাকর কি না।"

কৃষ্ণ। তোমার জুতো যে কেন তোমার চাকরের পিঠে পড়েনি, তাই সে সমস্ত রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে।

অম। কেন, কি হয়েছিল ?

কৃষ্ণ। বলছি। তুই দু'টো ভাত খাবি ? সেখানে ত কিছু খাস নি।

অম। সন্ধ্যের পর, এখন কিছু না। এ লোকটার আগে কিছু খাওয়াই।

কৃষ্ণ। ওকে এখন সরিয়ে মালীর ঘরে দিতে চাই, তোমার কোন আপত্তি নেই ত ?

অম। তোর ব্যবস্থায় আমার কোন আপত্তি কখন হয়েছে!

কৃষ্ণনাথ তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লতা কহিল, "বল না বড়দা, কি হয়েছিল ? তুমি কেবল বাজে কথাই কইছ।"

কৃষ্ণনাথ সহাস্যে লতার পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তোর সঙ্গে কথা কওয়াটা বুঝি কাযের হবে ? আচ্ছা, কাযটাই আগে সেরে নি। কি বলতে হবে ?"

লতা। সব কথা—তোমরা সেখানে কি করলে ?

কৃষ্ণ। পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা খেলুম।

লতা। তুমি বড় দুষ্টু, আমি ত তোমাকে আর জিজ্ঞেস করব না।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমি বাজে কথা বলি ?

লতা। বল গে, আমি চ'লে যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। না, না, যেতে হবে না—বলছি। এই গিয়ে আমি ত খুব খেলাম, কিন্তু তোমার দাদা কিছু খেলে না।

লতা। কেন ?

কৃষ্ণ। আমরা মোটে খেতে বসেছি, আর এই লোকটা ফটকের গোড়ায় হাঁকলে, 'আমি আজ ক'দিন খাই নি, আমাকে খেতে দেও।' তোমার গুণধর দাদা অমনি হাত গুটিয়ে বসলেন—আর খেলেন না।

লতা। তা'কে কেউ ভাত দিলে না ?

কৃষ্ণ। ভাত দেয় নি, গাল দিয়েছে।

লতা। ও মা, সে কি! তা, দাদা কেন তাঁর ভাতের থালা ধ'রে দিলেন না ?

কৃষ্ণ। তুই হ'লে দিতিস ?

লতা। নিশ্চয় দিতাম।

কৃষ্ণ। তোমার দেবার ত কোন অধিকার নেই। তুমি নিমন্ত্রিত, তোমাকে তারা খেতে দিয়েছে, ভিখিরীকে দেয় না ; তুমি তখন তাদের অন্ন ভিখারীকে দেবার কে ?

লতা। আমি অতশত বুঝি নে, মন যা চাইত, তাই করতাম। তার পর কি হ'ল ?

কৃষ্ণ। তার পর যখন দরওয়ানরা একে মারতে লাগল—

লতা। মেরেছে ? দু'টো ভাত চেয়েছিল ব'লে মেরেছে ? আহা, তাই গায়ে এত দাগ! আমি মনে করেছিলাম, প'ড়ে গেছে।

বলিতে বলিতে লতা কাঁদিয়া ফেলিল। প্রহৃত যুবকও কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কেঁদো না—মা, আর আমার কোন দুঃখু নেই।"

কৃষ্ণ। তার পর, তোমার দাদা ত খাওয়া ছেড়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন। আমি ভাবছি, পাগলা কি একটা ফ্যাসাদ বাধায়। এ দিকে নীচে যেমন চড়ের শব্দ হয়েছে, অমনই অমর তিন লাফে সিঁড়ি পার হয়ে ফটকের পারে। শুনলাম দরওয়ানদের মার-পিট ক'রে শুধু পায় মোটরযোগে পলায়ন—

অমর। আমি ত মারি নি, তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে একে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম।

কৃষ্ণ। তোমার ঠেলা কি ওরা সইতে পারে ? এক জন কোমর বেঁকিয়েছেন, আর এক জন মাথা ফাটিয়েছেন।

অমর। আমার তখন হাত-পা ঠিক ছিল না। তার পর ?

কৃষ্ণ। তার পর আর কি ? তোমার উপর ছোট বাবুর গালিবর্ষণ। বড় বাবু বল্লেন, তুমি অসভ্য বর্ব্বর—গোড়া হ'তে সেটা না কি তিনি জানতেন। ছোট বাবু বল্লেন, তুমি একটি ছদ্মবেশী ডাকাত, রবার্ট ম্যাকেয়ার, না কাকে একটা নাম করলেন—তোমার চেহারা দেখে পূর্ব্ব হ'তেই তিনি না কি সেটা বুঝেছিলেন। আমিও রেহাই পাই নি, তোমার বন্ধু ব'লে। তোমার নামে ছোট বাবু মোকর্দ্দমা আনবেন, বড় বাবু তা' শুনে পেনাল কোড দেখতে বসলেন। আমি সেই সুযোগে পগার পার।

অমর। একটা লাভ হ'ল এই যে, সেখানে আমাদের আর নেমন্তন্ন হবে না।

কৃষ্ণ। আরও একটা লাভ হয়েছে ভাই, পাহাড়ের তলে আমাদের চাপা পড়তে হবে না। ছেলের কথা শুনি, বা বাপের কথা শুনি। এক জন বলেন, সিমলের মত স্থান আর নেই, আর এক জন বলেন, কাশ্মীর—

অমর। এই রকম একটা বিপদের আশঙ্কা ক'রে আমরা দেরীতে গিছলাম। অন্তরাত্মা আগে হ'তে ব'লে দেয়। যা'ক, এ সব কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আমাদের প্রবাস-যাত্রার আয়োজন কর।

লতা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাবে দাদা ?"

"কাল ?"

"কবে ফিরবে ?"

"ঠিক নেই, তবে বেশী দেরী হবে না।"

"তা হ'লে আমি বেশ থাকতে পারব। জ্যোতি দিদিকে পেলে আমার কোন কষ্ট হবে না।"

"তাঁকে পাবে কি না, তা' আমি ঠিক বলতে পারি না। কাল সকালবেলা জলটল খেয়ে বেলা দশটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ব। উত্তরপাড়ায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করব আর তোমার জ্যোতি দিদির এখানে থাকা না থাকা স্থির করব।"

"আজ আমাদের গান শেখাবে ?"

"শেখাব। সন্ধ্যের পর তোমাদের নিয়ে বসব—আজ নরুকেও ছাড়ব না। তার স্কুল বুঝি আজ খুলেছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি নে।"

"সে বাড়ী থাকলে আমাকে ছেড়ে কি এতক্ষণ থাকত।"

"নরু বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসে ?"

"খুব বাসে—বউদির চেয়েও সে আমাকে ভালবাসে। তার পাতে ভাল জিনিষটা থাকলে আমার পাতে তুলে দেয়। আমি লিচু খেতে ভালবাসি ব'লে সে লিচু খায় না, আমাকে সব তুলে দেয়, বলে, তার ভাল লাগে না। সে জন্যে কত বকুনি খায়।"

দুই বন্ধুতে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন। জ্যোতির পানে চাহিয়া অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লতাকে ভাল লাগে ?"

"ওকে কার না ভাল লাগে ?"

"আচ্ছা। এখন এই ছেলেটিকে যে ভাত খাওয়াতে হবে ; পারবে ?"

"পারব।"

"ও যদি ছোট জাত হয় ?"

"ও যে এখন রুগী ?"

"ঠিক বলেছ, রোগীর জাত দেখবার দরকার নেই।"

রুগ্ন ভিখারী কহিল, "বাবা, আমি ভাল জাত—মাহিষ্য—আমার নাম রাম, রামু ব'লে লোকে ডাকে। আমি নিজে খেতে পারব, খাওয়াতে হবে না।"

বাগানের মালী আসিয়া সংবাদ দিল, তাহার ঘরের পাশের কুঠরী পরিষ্কার করা হইয়াছে। অতঃপর রাম তাহার কাঁধে ভর দিয়া বাগানে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



কাশীর ইতিহাস

৩

বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের বহু স্থানে কাশী রাজ্যের উল্লেখ আছে, কাশী, কোশলান্ ইত্যাদি পদোল্লেখ দ্বারা কাশী রাজ্য কোশল রাজ্যের সংযুক্ত ছিল, ইহাও বুঝা যায়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪৮শ অধ্যায়ে রাম রাজ্যাভিষেকের কিছু দিন পরে শ্বশুর জনক ও মাতুল কেকয়রাজকে বিদায় দিয়া নিভাক প্রিয় বয়স্য কাশীরাজ প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যথেষ্ট প্রীতি ও সৌহার্দ্দ দেখাইয়াছ এবং ভরতের সহিত (অভিষেকব্যাপারে) অনেক উদ্যোগ-যত্ন করিয়াছ। হে কাশীরাজ, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত রমণীয় বারাণসীপুরে গমন কর।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাম সিংহাসন হইতে উঠিয়া বারাণসীরাজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ও বিদায় দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নিভাক কাশীরাজ অতি শীঘ্র বারাণসীতে গমন করিয়াছিলেন। (১) অধ্যাত্মরামায়ণে ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও কাশীর কথা আছে।

মহাভারতের বহু স্থানে বহুরূপে কাশীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আদিপর্ব্বে কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ম্বরে ভীষ্ম উপনীত হইয়াছিলেন এবং ভীষ্ম বৃদ্ধ বলিয়া কন্যাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তিনি ঐ কন্যাগণকে বলপূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইয়া এবং যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়-সমাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন ও পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। (২) সভাপর্ব্বে দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে ভীম কাশীরাজ সুবাহুকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কাশীশ্বরের তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। নীলকণ্ঠও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। (১) বনপর্ব্বে ৪৮ অধ্যায়ে অবিমুক্তের নাম, ফলশ্রুতি এবং বিশ্বেশ্বরদর্শনে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট হয় এবং অবিমুক্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মুক্ত হয় বলা হইয়াছে। (২) স্কন্দপুরাণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত দেবগণের প্রার্থনায় অগস্ত্যের কাশী ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন বৃত্তান্ত অতি মনোহর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে ও বন পর্ব্বের ১০৪ অধ্যায়ে এই ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অগস্ত্যের আশ্রম যে কাশীতেই ছিল, এমন কোন কথা নাই। তবে অগস্ত্য যে সপত্নীক উত্তরদিক্‌স্থিত নিজ আশ্রম হইতে দক্ষিণে গমন করিয়া বিন্ধ্যশৈলে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে বিন্ধ্য! আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি আমাকে দক্ষিণদেশে যাইবার জন্য পথ প্রদান কর এবং যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তাবৎকাল এইভাবে আমার প্রতীক্ষা করিবে; আমি ফিরিয়া আসিলে তুমি ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বিন্ধ্যকে আবদ্ধ করিয়া অগস্ত্য দক্ষিণদিকে গমন করেন, পরন্তু অদ্যাবধি তিনি দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। (৩)

উদ্যোগপর্ব্বে গালবচরিতে যযাতিকে 'যযাতিঃ সর্ব্বকাশীশঃ' বলা হইয়াছে এবং পরক্ষণেই দিবোদাসকে কাশীরাজ বলায় ইঁহারা বিভিন্ন সময়ে কাশীর রাজা ছিলেন অথবা যযাতি সম্রাট্, দিবোদাস তাঁহার অধীন রাজামাত্র ছিলেন, এইরূপ মনে হয়। রথাতিরথসংখ্যানপর্ব্বে ভীষ্ম কাশীরাজকে শ্রেষ্ঠ রথী বলিয়াছেন। অম্বোপাখ্যানপর্ব্বে কাশীরাজের কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে।

অশ্বমেধপর্ব্বে সম্বর্ত্ত-মরুত্তীয় উপাখ্যানে দেখা যায়, বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্বর্ত্ত উন্মত্তবেশে কাশীর সর্ব্বত্র সর্ব্বদা মহাদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পরিক্রমণ করিতেন, কিন্তু তিনি যদি কখন পথিমধ্যে কোন শব দর্শন করিতেন, তবে বিশ্বনাথ দর্শন না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। (৭)

অনুশাসনপর্ব্বে ১২০-১২২ পর্য্যন্ত ৩ অধ্যায়ে মৈত্রেয়-ভিক্ষা বলিয়া একটি দানমাহাত্ম্য-কথা বলা হইয়াছে। উহার প্রথমে আছে, এক দিন বেদব্যাস অজ্ঞাতভাবে বারাণসীতে মৈত্রেয়ের নিকট উপস্থিত হইলে মৈত্রেয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে তৃষিত ও বুভুক্ষু জানিয়া উত্তমরূপ পানাহার করাইয়াছিলেন, ঠিক ইহারই অনুরূপ ঘটনা কাশীখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম ব্যাসভিক্ষা; তথায়ও বুভুক্ষিত ব্যাসকে বিশ্বেশ্বরের আদেশে ভবানী আহার করাইয়াছিলেন। (৮)

অনুশাসনপর্ব্বের ৩০ অধ্যায়ে কাশীরাজ সুদেব ও দিবোদাসের কথা আছে, উহা পরে বিবৃত হইবে।

অনেকের ধারণা, রামায়ণে বা মহাভারতে কাশীর কথা নাই। উল্লিখিত স্থানসমূহে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, কত স্থানে কতভাবে কাশীর কথা বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতে ও হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের (বরেন্দ্রীর) রাজা বাসুদেবের পরমমিত্র ছিলেন কাশীরাজ সুবাহু। তিনি পৌণ্ড্র বাসুদেবের পক্ষ হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন এবং তৎপুত্র সুদক্ষিণ অভিচার দ্বারা কৃষ্ণকে মারিবার উদ্দেশ্যে অবিমুক্তেশ্বর শঙ্করের আরাধনা করিয়া যে অভিচার করেন, তৎফলে তিনি নিজেই নিহত হয়েন ও বারাণসী দগ্ধ হইয়াছিল।

দেবী-ভাগবতে কাশীরাজ সুবাহুর কন্যা শশিকলার সহিত অযোধ্যার রাজা ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনের বিবাহ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ রঘুবংশেও এতদ্বনুরূপই আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে অগ্নিবর্ণের পুত্র পদ্মবর্ণাদির কথা আছে।

হরিবংশান্তর্গত ভবিষ্যপর্ব্বের প্রথম হইতে জনমেজয়ের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থানে দেখা যায়, কাশীরাজ-কুমারী বপুষ্টমা জনমেজয়ের প্রধানা মহিষী এবং তিনিই অশ্বমেধযজ্ঞের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিচিত্রবীর্য্য হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত ষটপুরুষমধ্যে বিচিত্রবীর্য্য, ভীম ও জনমেজয় এই তিন জন কাশীরাজগণের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পর ভারত-যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কাশীরাজ সুবাহু ও তৎপুত্র সুদক্ষিণ নিহত হয়েন। এই দুই জন রাজার নাম ভিন্ন অন্য রাজার নাম পাওয়া যায় না। দেবী-ভাগবতোক্ত কাশীরাজ সুবাহু ভারতোক্ত সুবাহুর ৯।১০ জন রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কারণ, সুবাহু-জামাতা সুদর্শনের অধস্তন নবম সংখ্যক রাজা বৃহদ্বল ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু-হস্তে নিহত হয়েন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মহাভারতাদিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কোচবোধ করিলেও তাম্রশাসন বা শিলালিপিকে প্রমাণ বলিতে দ্বিধাবোধ করেন না। রাজগণের বৃত্তিপুষ্ট কবিগণের কল্পনায় যাহা পূর্ণ, অতিশয়োক্তি যাহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহারই এক একটি পদ হইতে নব ইতিহাসের নূতন অধ্যায় সকল রচিত হইতেছে। ক্ষুদ্র জমীদারকেও 'সসাগরাধীশ্বর' বলিতে এবং ভীরু যোদ্ধৃগুণহীনকেও দিগ্বিজয়ী মহাবীর বলিতে তথাকথিত কবিগণ বিরত হয়েন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ অভ্রান্ত মিথ্যাকে সত্য বলিতে যাহারা অকুণ্ঠিত, তাহারাই ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ রাজগণের দোষ-গুণ-সমালোচনাপূর্ণ মহাভারতকে প্রমাণ বলিতে চাহেন না। বাঙ্গালার ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ২৬শ পৃষ্ঠায় আছে, "মহাভারত ও রামায়ণের ঐতিহাসিকতা এখনও তর্কের বিষয়, এতদ্ব্যতীত যে অংশে বাসুদেব প্রমুখ রাজগণের নাম আছে, সেই অংশের বয়স কত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই সকল কারণে এই গ্রন্থে মহাভারত বা রামায়ণের প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত বোধ করি নাই।"

অপর স্থলে মহীপালের কর্ণাটরাজবিজয়-কথা ও লক্ষ্মণসেনের বারাণসী, প্রয়াগ, পুরী ও দ্বারকায় জয়স্তম্ভ স্থাপনের কথা আছে। কিন্তু এই গৌড়রাজদ্বয়ের রাজত্বসময়েই গৌড়ের অধঃপতন ঘটিয়াছে, ইহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন। অথচ ইঁহাদের বৃত্তিপুষ্ট কবিগণ ইঁহাদিগকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে বহু কথাই বলা যায়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের উক্তিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিলেও তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরুগণ ঐ সকল গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাঁহারা ঐ সকলের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া কেহ কেহ পুস্তক প্রণয়নও করিয়াছেন। তন্মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পুরাণ-সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ পড়িলে, তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে পারিবেন।

আর এক দল সমালোচক বলিয়া থাকেন যে, কাশী পূর্ব্বে মুক্তি-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল না, সাধারণ একটি রাজ্যমাত্রই ছিল। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরে শঙ্করাচার্য্য ইহাকে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রচার করেন। তদবধি ইহা পুণ্যক্ষেত্র মুক্তিধামরূপে পরিচিত হইয়াছে, নতুবা এই স্থান যদি পূর্ব্বাবধি মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত থাকিত, তবে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কাশীবাস না করিয়া হরিদ্বারে গেলেন কেন? ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে শাস্ত্রোক্ত যুক্তি দ্বারা ইহা বলা যায় যে, দেবগণের যেমন কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে কর্ম্ম দ্বারা পদোৎকর্ষ বা কাশীমরণ দ্বারা মুক্তিলাভ সেই সেই পদভোগকালমধ্যে সম্ভব হয় না, সেইরূপ রামচন্দ্র, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদির মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহারা পৃথ্বীর ভারাপনয়নের জন্যই মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকলেরই যে মুক্তির ইচ্ছা হইবে, স্বর্গের বাসনা হইবে না, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। মুক্তির ইচ্ছা হওয়াও বহু তপস্যার ফল। সুতরাং পূর্ব্বতনগণের স্বর্গবাসনাই বলবতী ছিল, মুক্তির ইচ্ছা ছিল না বলিলেও ঐ কথার উত্তর হয়। ব্যক্তিবিশেষকে কটাক্ষ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে আজ সকলেই সকল বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ না করায় এই সকল কু-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি শুনিতে হইয়াছে এবং এই অপ্রিয় আলোচনা করিতে হইল। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা অনুবাদ ভিন্ন স্বাধীনভাবে রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠের অধিকারীও নহেন, তাঁহারাই তাহার সমালোচক, ইহা যেমন হাস্যকর, তেমন পরিতাপপ্রদ।

হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও বায়ুপুরাণানুসারে কাশীরাজগণের নাম

৩০। বৃহৎক্ষত্র, বৃদ্ধক্ষেত্র বা বৃহৎশর্ম্মা—ক্ষত্রবৃদ্ধ।
৩১। সুহোত্র বা সুনহোত্র।

১।	কাশ (শল) (গুৎসমদ) আর্টিসেন।	৪।	ধন্ব।
২।	কাশীরাজ। কাশ্য।	৫।	ধন্বন্তরি।
৩।	দীর্ঘতমা (দীর্ঘতপাঃ)।	৬।	কেতুমান্ (হর্য্যশ্ব)।

(১) .....বয়স্যমকুতোভয়ম্।
প্রতর্দ্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥
দর্শিতা ভবতা প্রীতির্দর্শিতং সৌহৃদং পরম্।
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভ্রাতেন কৃতঃ সহ ॥
তদ্ভবানদ্য কাশেয় পুরীং বারাণসীং ব্রজ।
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্ ॥
এতাবদুক্ত্বা চোত্থায় কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ।
পর্য্যষ্বজত ধর্ম্মজ্ঞো নিরন্তরমুরোগতম্ ॥
বিসর্জ্জয়ামাস তদা কৌশল্যাপ্রীতিবর্দ্ধনঃ।
রাঘবেণ কৃতানুজ্ঞঃ কাশেয়ো হ্যকুতোভয়ঃ ॥
বারাণস্যাং যযৌ তূর্ণং রাঘবেণ বিসর্জ্জিতঃ ॥
উত্তরকাণ্ডে—৪৮শঃ সর্গঃ।

(২) অথ কাশীপতেস্তীষ্মঃ কন্যাস্তিস্রোঽপ্সরোপমাঃ..... ৩—ইত্যাদি
অম্বিকাম্বালিকে ভার্য্যে প্রাদাদ্‌ভ্রাত্রে যবীয়সে। ৬৫—আদিপর্ব্ব।

(৩) স কাশীশ্বরজং সমরে সুবাহুমনিবর্ত্তিনম্।
বশে চক্রে মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ সভা—৩০ অ।

(১) কাশীশ্বরস্য তীর্থেষু স্নাত্বা ভরতসত্তমাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। বন—৮৩ অ।
কাশীশ্বরস্য তীর্থেষু মণিকর্ণ্যাদিষু স্নানমাত্রাদ্ ব্রহ্মলোকে ক্রমমুক্তিস্থানে মহীয়তে পূজ্যতে ইতি ॥—নীলকণ্ঠ।

(২) ততো বারাণসীং গত্বা অর্চ্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ ॥
দর্শনাদ্দেবদেবস্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
প্রাণানুৎসৃজ্য তত্রৈব মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ বন—৮৪ অ।

(৩) সোঽভিগম্যাব্রবীদ্বিদ্বাংস্তদারূঢ় সমুপস্থিতঃ।
মার্গমিচ্ছাম্যহং দত্তং ভবতা পর্ব্বতোত্তম ॥
দক্ষিণামভিগন্তাস্মি দিশং কার্য্যেণ কেনচিৎ।
যাবদাগমনং মহ্যং তাবদ্বং প্রতিপালয় ॥
নিবৃত্তে ময়ি শৈলেন্দ্র ততো বর্দ্ধস্ব কামতঃ।
এবং স সময়ং কৃত্বা বিন্ধ্যেনামিত্রকর্ষণ ॥
অদ্যাপি দক্ষিণাদ্দেশাদ্বারুণিং নিবর্ত্ততে ॥ বন—১০৪ অ।

(৭) উন্মত্তবেশং বিভ্রৎ স চরত্যুর্ব্যাং যথাসুখম্।
বারাণস্যাং মহারাজ দর্শনেপ্সুর্মহেশ্বরম্ ॥—কুর্ণপং কচিৎ।
তং দৃষ্ট্বা যো নিবর্ত্তেত সম্বর্ত্তঃ স মহীপতে।
অশ্বমেধপর্ব্ব—৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৮) কৃষ্ণদ্বৈপায়নো রাজন্নজ্ঞাতচরিতং চরন্।
বারাণস্যামুপাতিষ্ঠন্মৈত্রেয়ং স্বৈরিণীকুলে ॥ ইত্যাদি
অনুশাসনপর্ব্ব—১২০ অধ্যায়।

৭। সুদেব (ভীমসেন) (ভীমরথ)
৮। দিবোদাস।
৯। প্রতর্দ্দন (শত্রুজিৎ) (রিপুঞ্জয়)।
১০। বৎস (ঋতধ্বজ) (কুবলয়াশ্ব)।
১১। অলর্ক।
১২। সন্নতি।
১৩। সুনীথ।
১৪। ক্ষেম (ক্ষেম্য) কেতুমান।
১৫। সুকেতু।
১৬। ধর্ম্মকেতু।
১৭। সত্যকেতু।
১৮। বিভু।
১৯। সুবিভু।
২০। সুকুমার।
২১। ধৃষ্টকেতু।
২২। বেণুহোত্র।
২৩। ভর্গ (ভার্গ)।
২৪। ভর্গভূমি (ভার্গভূমি)।

কাশীরাজগণের বিবরণ

ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়ুর বংশধর সুহোত্রপুত্র কাশই কাশীতে প্রথম রাজা হয়েন। ইঁহার পুত্রের নাম কাশীরাজ বা কাশ্য, সম্ভবতঃ এই কাশীরাজের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, মৃৎস্যাদি দেশের ন্যায় তদীয় রাজ্য কাশী নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কাশীরাজের পুত্র দীর্ঘতমা বা (দীর্ঘতপাঃ)র পুত্র ধন্ব বহুকাল তপস্যা করিয়া বিষ্ণুর অংশাবতার ধন্বন্তরিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। কাশীরাজপুত্র ধন্বন্তরি মহর্ষি ভরদ্বাজের শিষ্য, ইনিই আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন এবং তজ্জন্য বৌদ্ধরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন। ইনি সকল জন্মেই অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ধন্বন্তরির দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ত্যধর্ম্ম ছিল না। ইনি পূর্ব্বজন্মে নারায়ণের নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন যে,'তুমি কাশীরাজগোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিবে ও যজ্ঞভাক্ হইবে।' (৯)

গরুড়পুরাণে জানা যায়, বিংশ মন্বন্তরে ধন্বন্তরি বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন। (১০)

সাধারণের বিশ্বাস, ধন্বন্তরির নামোচ্চারণেও ব্যাধি নাশ হয়, তাই 'ধন্বন্তরি দিবোদাস এই ঔষধে ব্যাধিনাশ' এইরূপ একটি প্রবচন ঔষধ-পানকালে বৃদ্ধ-পরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া আসিতেছে।

ইঁহার পুত্র কেতুমান্ বা হর্য্যশ্বের রাজত্বকালে বারাণসীতে রাজধানী স্থাপিত হয়, হৈহয়গণের সহিত কাশীরাজ হর্য্যশ্বের ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং ঐ যুদ্ধে গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে (এলাহাবাদ-ত্রিবেণীতে) হর্য্যশ্ব হৈহয়রাজ বীতিহোত্র কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।

হর্য্যশ্বের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুদেব কাশীর রাজা হয়েন। ইঁহার ভীমসেন ও ভীমরথ নামেরও উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তখনও বিবাদের অবসান হয় নাই। সুদেব দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে কাশী পালন করিতেন। হৈহয়গণ কাশী আক্রমণপূর্ব্বক সুদেবকে নিহত করিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে সুদেব পুত্র প্রখ্যাতকীর্ত্তি দিবোদাস কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। তিনি হৈহয়গণের বিক্রম পরিজ্ঞাত ছিলেন, এই জন্য তিনি বারাণসী হইতে রাজধানী উঠাইয়া গঙ্গাগোমতী-সঙ্গমে স্থাপন করেন এবং শত্রুভয়ে উহা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। সেই অভিনব রাজধানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণে পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ বিপণিশ্রেণীতে ভূষিত ছিল। সেই বহু দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ রাজধানী গঙ্গার উত্তরতীরে ও গোমতীর দক্ষিণ কূলে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইত। (১১)

দিবোদাসের পিতা ও পিতামহ হৈহয়গণের হস্তে নিহত হইয়া নিজের রাজধানী প্রবল শত্রুর কবল হইতে রক্ষার জন্য দিবোদাস কোন রূপ উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নাই। বর্ত্তমানে সেই প্রাচীন রাজবাড়ী রাজওয়ারী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাশী হইতে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিব পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বি, এন্ রেলে মার্কণ্ডেয়েশ্বরে যাইতে হইলে রাজবাড়ীর রাজওয়ারী ষ্টেশনে নামিতে হয়, হিন্দুস্থানীগণ রাজবাড়ীকে রাজওয়ারী বলে।

হৈহয়গণ দিবোদাসকে সেই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে আসিয়া আক্রমণ করে এবং দিবোদাস তাহাদের সহিত ৩ মাস ১০ দিন যুদ্ধ করিয়া সৈন্য,বাহন ও ধনহীন হওয়ায় পরিশেষে পলায়নপূর্ব্বক প্রয়াগস্থিত মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ রাজার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা তাহার পরাজয়-বৃত্তান্ত বলিয়া নিজের দুঃখ ও হৈহয়গণের অত্যাচারকাহিনী বিবৃত করেন। পরদুঃখকাতর ঋষি রাজার দুঃখমোচনার্থ একটি যজ্ঞ করেন, উহার ফলে রাজার প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র হয় ও অত্যল্পকালমধ্যে ঋষির তেজঃপ্রভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঐ বালক যুদ্ধ করিবার উপযোগী হইয়া বংশের শত্রু আততায়ী হৈহয়গণকে যুদ্ধে নিহত করেন। একমাত্র বীতিহব্য পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে, সে মহর্ষি ভৃগুর শরণাগত হইয়াছিল। পশ্চাদনুসরণপরায়ণ প্রতর্দ্দন তথায় উপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "হে মহর্ষে, বীতিহব্য আমার পিতৃপিতামহগণের প্রধান শত্রু, সে আপনার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে, আপনার অনুমতি হইলে আমি আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সেই বংশের শত্রুকে বধ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট অঋণী হইতে পারি।" এই বাক্য শুনিয়া শরণাগত পালক মহর্ষি ভৃগু বলিলেন, 'রাজপুত্র! আমার আশ্রমে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় কেহ নাই, সুতরাং তুমি এ স্থান হইতে গমন করিতে পার।' মহর্ষির কথা শুনিয়া প্রতর্দ্দন মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক সহাস্যে বলিলেন, 'হে মহর্ষে! আপনি বীতিহব্যকে ব্রাহ্মণ করিলেন, ইহাতেও আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইল, কারণ, আমি ইহাকে জাতিত্যাগ করাইতে সমর্থ হইয়াছি।' এই বলিয়া প্রতর্দ্দন পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। পরে বীতিহব্য ভৃগুর বাক্যে মহর্ষিত্ব লাভ করেন। তাঁহার পুত্র গৃৎসমদ ঋগ্বেদে গৃৎসমদ সম্বন্ধে শ্রুতি আছে। (১২)

গৃৎসমদের দ্বাদশ পুরুষ পরে শুনক জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পুত্র শৌনক, এইরূপে ইঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (১৩)

পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে ঋগ্বেদীয় সমাজদ্বারগণ ও কোটালীপাড়ার শুনকগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বোধ হয় ইঁহাদের গোত্রনামভাক্। পরন্তু সমাজদ্বারগণ নিজগোত্র 'সৌনক' বলিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু কোন পুরাণে বা অন্য কোন স্থানে দন্তাসকারাদি সৌনক গোত্র বা তন্নামীয় ঋষির কথা জানিতে পারি নাই। অনেকের বিশ্বাস, সমাজদ্বারগণ ভ্রমের বশীভূত হইয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, সকল ঋষির কথা পুরাণে নাই, তজ্জন্য একটি গোত্রকে লক্ষ্য করিয়া ওরূপ বলাও সঙ্গত নহে।

হরিবংশ পাঠে জানা যায়, হৈহয়বংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন। দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্য ও তৎপুত্রগণকে নিহত করিয়া বারাণসী অধিকার করিলে নিকুম্ভের অভিসম্পাতানুসারে ক্ষেমক নামক রুদ্রানুচর বারাণসীকে জনশূন্য করিয়াছিলেন। তখন দিবোদাস গোমতীতীরে অতিশয় মনোহারিণী এক নগরী নির্ম্মাণ করেন। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দমকে বালক বলিয়া দিবোদাস প্রাণে মারেন নাই, পরে সেই বালকের নিকটেই পরাজিত হইয়া কাশীরাজ দিবোদাসকে নূতন রাজধানীও পরিত্যাগ করিতে হয়। পলায়নপর রাজা দিবোদাসের দৃষদ্বতী নগরে এক পুত্র হয়, তাহার নাম প্রতর্দ্দন। এই প্রতর্দ্দনই দুর্দ্দমাপহৃত রাজ্য উদ্ধার করেন, পরে তৎপৌত্র অলর্ক ক্ষেমককে বিনাশ করিয়া বারাণসীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। (১৪)

কাশীখণ্ড পাঠেও জানা যায় যে, দিবোদাস যখন কাশীতে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, তৎপূর্ব্বে তিনি বারাণসী হইতে নির্গত হইয়া রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক পুত্র সমরঞ্জয়কে অভিষিক্ত করিয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। (১৫)

প্রতর্দ্দনের সমরঞ্জয় নাম পিতৃশত্রু হৈহয়রাজকে জয় করিয়া হইয়াছিল। কৌষীতকী উপনিষদে, বাল্মীকি রামায়ণে ও মহাভারতে প্রতর্দ্দনের বহু প্রশংসা আছে।

প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস। ইনি ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন। পরম বিদুষী তত্ত্বদর্শিনী মদালসা ইঁহারই পত্নী। মদালসার গর্ভে বৎসের অলর্ক নামে পুত্র হয়, এই অলর্কের সময়ে কাশী অতি বিস্তৃত রাজ্য ছিল। এই মহাত্মাই ক্ষেমক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বারাণসীর পুনঃ সংস্কারসাধন করেন ও পরম রমণীয় বেশে সজ্জিত করেন।

অলর্কের পুত্রপরম্পরায় সন্নতি, সুনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু, (১৬) বেণুহোত্র, ভর্গ, ভর্গভূমি ইঁহারা কাশীতে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ অতঃপর এই বংশের অবসান ঘটিয়াছিল বা প্রভাব নষ্ট হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণেও এই ২৪ জন রাজারই উল্লেখ আছে। (১৭)

দিবোদাস কাশীখণ্ডে নিজের মূল পুরুষরূপে সূর্য্যকে উল্লেখ করিয়াছেন। (১৮) অথচ ইনি চন্দ্রবংশীয় বৃহৎক্ষত্রের বংশধর। তবে সূর্য্যবংশীয় ইনা ইঁহাদের মূল কারণ বলিয়া যদি সূর্য্যকে মূলভূত বলিয়া থাকেন, তবে কোন গোলই ঘটে না।

কাশীখণ্ডের বর্ণনায় (১৯) জানা যায় যে, এই দিবোদাসের অপর নাম রিপুঞ্জয়, ইনি ব্রহ্মার প্রার্থনায় কাশীর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইঁহার রাজত্বকালে ইঁহারই প্রার্থনায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কাশী হইতে দেবগণ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; এমন কি, ব্রহ্মা কাশীনাথ ত্রিপুরারিকেও অনুরোধ করিয়া মন্দরাচলে প্রেরণ করেন। পরে দেবাদিদেব কাশী পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল মন্দরাচলে থাকিতে না পারায় যোগিনী,সূর্য্য, প্রমথগণ, ব্রহ্মা, গণেশ ও বিষ্ণুকে ক্রমশঃ কাশীতে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যোগিনীগণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কেহই শিবকে কাশীতে আনিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না, পরে গণেশ ও বিষ্ণুর চেষ্টায় শিব নিজ রাজধানী বারাণসীর সংস্কারসাধন করাইয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। দিবোদাসের মোক্ষের পূর্ব্বে কাশীতে বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এই কথা কাশীখণ্ডে অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুণ্যকীর্ত্তি নামে এক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হইয়া স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীকে পরিব্রাজিকা-বেশে সঙ্গে লইয়া ও তদীয় বাহন গরুড়কে বিনয়কীর্ত্তি নামক শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া কাশীর উপকণ্ঠে মৃগদাবে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। উহার সংক্ষিপ্ত ধর্ম্মমত এইরূপ ;—

পুণ্যকীর্ত্তি বিনয়কীর্ত্তিকে বলিলেন, "হে বিনয়কীর্ত্তে! তুমি সনাতনধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করিলে, আমি সবিস্তারে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ত্তাকর্ম্মবর্জ্জিত অনাদি সিদ্ধ পরিদৃশ্যমান এই সংসারে জীব আপনা হইতে প্রাদুর্ভূত ও বিলীন হয়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যত দেহী আছেন, তাঁহাদের আত্মাই ঈশ্বর, তদতিরিক্ত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। আমাদের এই দেহ যেমন কালবশে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত সকলেরই দেহ স্ব স্ব কালানুসারে বিলীন হইয়া যায়। বিচার করিয়া দেখিলে জীবগণমধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কারণ, সর্ব্বদেহেই আহার, নিদ্রা, ভয় সমভাবেই আছে। ভোজনে তৃপ্তি এবং নিদ্রাবিহারাদিতে সুখ সকলেরই এক প্রকার, সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সকল প্রাণীই এক; সুতরাং যাহাতে কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা না হয়, তাহাই করা উচিত। অহিংসাই পরমধর্ম্ম, এই কারণ যাহাদের নরকভয় আছে, তাহারা কখনও প্রাণিহিংসা করিবে না, হিংসাকারী ভীষণ নরকে যায়, আর অহিংসক ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে। দয়ার তুল্য দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই এবং হিংসার তুল্য পাপ নাই। ঋষিগণ বিচার করিয়া চারি প্রকার দানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যথা—ভীত

---

(৯) বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ, ৮ অধ্যায়। (১০) গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড, ১৪৫ অধ্যায়।

(১১) কাশিষ্বপি নৃপো রাজন্ দিবোদাসপিতামহঃ।
হর্য্যশ্ব ইতি বিখ্যাতো বভূব জয়তাং বরঃ॥
স বীতিহোত্রদায়াদৈরাগত্য পুরুষর্ষভ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে সংগ্রামে বিনিপাতিতঃ॥
হর্য্যশ্বস্য চ দায়াদঃ কাশীরাজোঽভ্যষিচ্যত।
সুদেবো দেবসঙ্কাশঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্ম ইবাপর॥
তৈর্বীতিহোত্রদায়াদৈরাগত্য যুধি নির্জ্জিতঃ।
সৌদেবস্ত্বথ কাশীশো দিবোদাসোঽভ্যষিচ্যত॥
দিবোদাসস্তু বিজ্ঞায় বীর্য্যং তেষাং মহাত্মনাম্।
বারাণসীং মহাতেজা নির্ম্মমে শত্রুশাসনাৎ॥
গঙ্গায়া উত্তরে কূলে বপ্রান্তে রাজসত্তম।
গোমত্যা দক্ষিণে কূলে শত্রুস্যেবামরাবতীম্॥ ১০-১৮
মহাভারত ৩০ অধ্যায় অনুশাসনপর্ব্ব

(১২) তদু গার্ৎসমদমেতেন বৈ গৃৎসমদ
ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপাগচ্ছদিতি শ্রুতিঃ॥

(১৩) ঋগ্বেদে বর্ত্ততে চাগ্র্যা শ্রুতির্যস্য মহাত্মনঃ।
যত্র গৃৎসমদো রাজন্ ব্রাহ্মণৈঃ স মহীয়তে॥
শুনকো নাম বিপ্রর্ষির্যস্য পুত্রোঽথ শৌনকঃ, এবং বিপ্রত্বমগমৎ
মহাভারত—অনুশাসনপর্ব্ব ৩০শ অধ্যায়

(১৪) হরিবংশ—হরিবংশ পর্ব্বাধ্যায়ের ৩০শ অধ্যায়।

(১৫) স্বয়ং রাজগৃহে নীত্বা কুমারং সমরঞ্জয়ম্।
অভিষিচ্য মহাবুদ্ধিঃ পৌরান্ জানপদানপি॥
প্রসাদীকৃত্য পুণ্যাত্মা পুনঃ কাশীমগান্নৃপঃ।
আগত্য কাশীং মেধাবী স ভূপালো রিপুঞ্জয়ঃ॥
প্রাসাদং কারয়ামাস স্বর্ধুন্যাঃ পশ্চিমে তটে॥—কাশীখণ্ড।

(১৬) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'কাশী-পরিক্রমা' পুস্তকের মধ্যে বলিয়াছেন, ধৃষ্টকেতু কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা ভ্রমাত্মক। গীতোক্ত ধৃষ্টকেতু কাশীরাজ নহেন, তিনি চেদিরাজ শিশুপালপুত্র,"চেদীনামৃষভো বলী ধৃষ্টকেতুরুপাগচ্ছৎ"এইরূপ মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে ১৯শ অধ্যায় ৭ শ্লোকে আছে। মহাভারতে তৎকালীন কাশীরাজের নাম নাই। রাজসূয়ের সময়ে কাশীরাজ সুবাহু ও তৎপুত্র সুদক্ষিণের উল্লেখ আছে। কাশ্যরাজবংশ ভারত যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছিল।

(১৭) কাশীপরিক্রমার শেষে বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "মৎস্যপুরাণমতে তৎপরে হৈহয়বংশীয় ২৮ জন রাজত্ব করেন" ২৩২ পৃষ্ঠা। কাশেয়াস্তু চতুর্ব্বিংশদষ্টাবিংশত্তু হৈহয়াঃ। কলিঙ্গাশ্চৈব দ্বাত্রিংশদশ্মকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ…এতে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি এককালং মহীক্ষিতঃ। এইরূপ শ্লোক মৎস্যপুরাণে আছে, ইহা দ্বারা কাশ্যবংশীয় ২৪ জনের পর হৈহয়বংশীয় ২৮ জন রাজা কাশীতে হইয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ সংস্কৃতভাষাবিজ্ঞমাত্রেই করিতে পারেন না, উক্ত বসুজ মহাশয় বহু স্থলেই এইরূপ ভ্রম করিয়াছেন।

(১৮) অস্মৎ কুলে মূলভূতো ভাস্করো মান্যশ্রবণঃ। স তিষ্ঠতু সুখেনাত্র…
কাশীখণ্ড ৪২।১১০।

(১৯) বসুজ মহাশয় কাশীখণ্ডের ঘটনাটিকে একটি রূপকাখ্যান বলিয়া মনে করেন এবং বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারের সমসাময়িক এই ঘটনা বলিয়া তাঁহার ধারণা। এই সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন, ইহা তিনিও ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

ব্যক্তিকে অভয়দান, রোগীকে ঔষধদান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান ও ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান।

হে বিনয়কীর্ত্তে! মণি, মন্ত্র এবং ঔষধের প্রভাব বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সর্ব্বতোভাবে তাহা অভ্যাস করা উচিত। বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে দ্বাদশায়তনের পূজা করাই জীবনের সার ব্রত, তদতিরিক্ত ত্রিজগতে পূজনীয় আর কি আছে? পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশটিই দ্বাদশায়তন। এই স্থানেই স্বর্গ ও এই স্থানেই নরক বিরাজমান। সুখের নাম স্বর্গ এবং দুঃখের নাম নরক, সংসারে সুখভোগ করিয়া যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহারই নাম মোক্ষ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মোক্ষ নাই।

বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের (২০) সমুচ্ছেদ হইলে বিজ্ঞানের নামই মোক্ষ। সমস্ত ভূতগণকে হিংসা করিবে না, হিংসামূলক কোন শ্রুতিই প্রমাণ নহে, জীবহিংসামূলক অগ্নিষ্টোমাদি যাগ কেবল নির্ব্বোধগণের ভ্রান্তির কার্য্য, জ্ঞানিগণের পক্ষে তাহা প্রমাণযোগ্য নহে। কি আশ্চর্য্য, বৃক্ষচ্ছেদন ও পশুহত্যা করিয়া এবং বহ্নিতে তিল ও ঘৃতের আহুতি দিয়া লোক স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করে?

পরিব্রাজিকা বিজ্ঞানকৌমুদী নাম্নী বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মীও পুরবাসিনীগণের নিকট বলিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিপ্লব না ঘটে, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানভ্রংশকারিণী জরা দেহকে আক্রমণ না করে, সেই পর্য্যন্ত সুখসাধনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। দেহ পীড়িত হইলে ইন্দ্রিয় বিকল হইলে এবং জরা আক্রমণ করিলে তখন সুখের আশা কোথায় থাকে? অতএব সুখাভিলাষিগণকে আত্মদেহ দান করিয়াও সুখী করা উচিত। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, সঞ্চয় ও ক্ষয়শীল, জ্ঞানিগণ ইহা অবগত হইয়া সময় থাকিতে সুখের সেবায় নিরত হয়েন। জীবনান্তে এই দেহ কাক, কুক্কুর ও ক্রিমিতে ভক্ষণ করিবে, অথবা শ্মশানে ভস্ম-শেষ হইয়া যাইবে।

ইহলোকে নানাবিধ জাতি কল্পিত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মনুষ্যমাত্র সকলেই সমান, তাহার মধ্যে উত্তম মধ্যম ভেদ করা অসঙ্গত। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? এক জনের পুত্রগণ বিভিন্ন জাতি হইতে পারে না, সুতরাং জাতিভেদ কল্পনা অস্বাভাবিক ও অন্যায় ইত্যাদি। কাশীখণ্ড ৫৮ অধ্যায়।

এই বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, চার্ব্বাক মত ও আংশিক বৌদ্ধমত তৎকালে কাশীতে প্রচার করিয়া লোক সকলকে আকৃষ্ট করা হইয়াছিল। এই মতের মূল ভিত্তি "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ নাস্তিক মত বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বেও ছিল এবং তাহা সমাজে কেহ কেহ প্রচারও করিয়াছেন; যেমন রামায়ণে রাম বনে গমন করিলে জাবালির উক্তি—"হে রাম, মানুষমাত্রেই মরে, ইহা তাহার স্বভাব; সুতরাং তজ্জন্য শোক করা বৃথা। প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থসাধক অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া যে আস্তিকগণ ধর্ম্মার্জ্জন করেন, আমি তাঁহাদের জন্য অনুশোচনা করি; কারণ, ধর্ম্মফলভোক্তা নাই। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা অন্নাদির কেবল বিনাশই করা হয়, তাহা দ্বারা মৃতের কোন উপকার হয় না; যদি এক জনের তৃপ্তির জন্য অপর কেহ এই স্থানে আহার করিলে অন্যত্রস্থিত সেই ব্যক্তির দেহে ভুক্ত অন্ন গমন করে, তবে প্রবাসী ব্যক্তির পাথেয় ব্যবস্থা না করিয়া তদুদ্দেশ্যে গৃহে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেই চলিতে পারে। শ্রাদ্ধ, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির গ্রন্থ সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজেদের জীবিকার জন্য রচনা করিয়াছেন, অতএব দান কর, যজ্ঞ কর ইত্যাদি প্ররোচক বাক্যের কোন প্রামাণ্য নাই, যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহাই প্রমাণ, তাহাই অবলম্বন কর। পরোক্ষ অর্থাৎ শাস্ত্র বা আনুমানিক কথা পরিত্যাগ কর ইত্যাদি। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮ অধ্যায়।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে ভৃগু-ভরদ্বাজসংবাদরূপ ১৮৬ অধ্যায়েও চার্ব্বাক ও দিগম্বরদর্শনের মত দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের জন্মিবার পূর্ব্বে ঐ মত ছিল না এবং যে যে গ্রন্থে ঐরূপ মতবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে, কারণ, বুদ্ধের জন্মিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ঐ মত এই দেশে প্রচলিত ছিল, উহা বেদের নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মাবলম্বনে গঠিত। প্রবৃত্তিমূলক হিংসা প্রধান যাগাদির তৎকালে বহুল প্রচার থাকায় ঐ যজ্ঞ বন্ধ করিতে গিয়া বুদ্ধদেব নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি যাহা বুদ্ধের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত, তন্মধ্যেও ঐ মতবাদ দৃষ্টে ইহা বুঝিতে পারা যায়—যেমন অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের আবিষ্কার নহে, তিনি উহার প্রচারকমাত্র, সেইরূপ বুদ্ধদেবও পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক মতের আবিষ্কর্ত্তা নহেন, প্রচারকমাত্র। বুদ্ধদেবের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ঐরূপ মত জৈনগণও প্রচার করিয়াছেন। কাশীখণ্ডোক্ত বেদব্যাসের অ ভিক্ষা ও মহাভারতে বর্ণিত ব্যাসের অন্নভিক্ষার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দিবোদাস বিষ্ণুপদেশে কাশীতে শিবস্থাপন করিবার সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রতর্দ্দনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ও নিজে মুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতর্দ্দন যযাতি-কন্যা মাধবীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া উদ্যোগ-পর্ব্বে গালব-চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও গরুড়পুরাণে প্রতর্দ্দনের নাম 'শত্রুজিৎ' দেখা যায়। প্রতর্দ্দন-পুত্র ঋতধ্বজ মদালসাকে বিবাহ করেন; তাঁহার পুত্র ৪টি পুত্র হয়, তন্মধ্যে ৩টি গৃহত্যাগী হইলে ৪র্থ পুত্র অলর্ক রাজা হয়েন। ইঁহাদের রাজধানীও রাজওয়ারীতে ছিল, ইহা ঐ পুরাণ পাঠে জানা যায়। অলর্ক ও কার্ত্তবীর্য্য উভয়েই দত্তাত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। প্রথমে জ্ঞান ও যোগের, দ্বিতীয়টি ক্ষাত্রধর্ম্মের। অলর্ক কার্ত্তবীর্য্যের পরবর্ত্তী ছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায়, তৎকালে কাশীরাজ অপর কেহ ছিলেন। অলর্ক রাজ্যাসক্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবাহু কাশীরাজের শরণাগত হইয়া তিনি অলর্কের রাজ্যপ্রার্থী, এই কথা জানাইলে, পরে কাশীরাজ অলর্কের রাজধানী অবরোধ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিলে অলর্ক হতবল হইয়া দত্তাত্রেয়ের শরণাগত হয়েন, তিনি অলর্ককে জ্ঞান ও যোগ শিক্ষাদান করেন। জাতবৈরাগ্য অলর্ক কাশীরাজকে রাজ্য অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়া যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে অলর্কের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবাহু কৃতকৃত্য হইয়া নিজের তপস্যাস্থানে গমন করেন এবং কাশীরাজও অলর্ককে তাঁহার রাজ্য দিয়া নিজ স্থানে গমন করেন। অলর্ক তাঁহার পুত্র সন্নতিকে রাজ্য দিয়া গৃহ ত্যাগ করেন ও মুক্ত হয়েন।

গরুড়পুরাণে কাশীরাজবংশের কথা এইরূপ আছে,—

কাশ্যকাশ-গৃৎসমদাঃ সুহোত্রাদভবংস্তথঃ।
গৃৎসমদাৎ শৌনকোঽভূৎ কাশ্যাদ্দীর্ঘতমাস্ততথা॥
বৈন্যো ধন্বন্তরিস্তস্মাৎ কেতুমাংশ্চ তদাত্মজঃ।
প্রতর্দ্দনো দিবোদাসাচ্ছত্রুজিৎ সোঽত্র বিশ্রুতঃ॥
ঋতধ্বজস্তস্য পুত্রো হ্যলর্কশ্চ ঋতধ্বজাৎ।
অলর্কাৎ সন্নতির্জজ্ঞে সুনীতঃ সন্নতেঃ সুতঃ॥
সত্যকেতুঃ সুনীতস্য সত্যকেতোর্বিভুঃ সুতঃ।
বিভোশ্চ সুবিভুঃ পুত্রঃ সুবিভোঃ সুকুমারকঃ॥
সুকুমারাদৃষ্টকেতুর্বীতিহোত্রস্তদাত্মজঃ।
বীতিহোত্রস্য ভার্গোঽভূদ্ভার্গভূমিস্ততোঽভবৎ॥
বৈদ্যবাঃ স্মার্ম্মভার্গান ইত্যেতে কাশ্যেয়া নৃপাঃ॥ ৪২ অধ্যায়।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন

(২০) অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ। অনিত্যাদিতে নিত্যাদি বুদ্ধি অবিদ্যা, আমি ইত্যাকারক বোধ অস্মিতা, সুখে আসক্তি রাগ, দুঃখের পরীহারবিষয়ক তাচ্ছীল্যই দ্বেষ এবং মরণভীতিই অভিনিবেশ।—পাতঞ্জলদর্শন।

পুরাণ-প্রসঙ্গ

ওঁ নমো ভগবতে বেদব্যাসায়।

শাস্ত্রই আমাদিগকে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় সৃষ্টিকাল হইতে সদসদ্‌বিচার পূর্ব্বক চালিত করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং শাস্ত্রই আমাদের জীবন-স্বরূপ। শাস্ত্রসার অপৌরুষেয় বেদ সকল শাস্ত্রেরই মূল। অধিক কি, যাঁহাতে জগতের প্রতিষ্ঠা, যিনি বিশ্বসংসারকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই সনাতনধর্ম্ম বেদকে আশ্রয় করাতেই বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন।

বেদ অতি বিশাল বলিয়া সকলের বোধগম্য হইতেছিল না দেখিয়া এবং ক্রমে কালবশে জীবের শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল বুঝিয়া অন্যান্য শাস্ত্রের বিকাশ হইল। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,—

"শ্রুতিস্মৃতিবিহিতো ধর্ম্মস্তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।"

অর্থাৎ বেদে ও সংহিতায় যাহা বিহিত আছে, তাহাই ধর্ম্ম; এই দুইটিতে না পাইলে শিষ্টজনের আচারকে প্রমাণ করিবে।

ইহার পর ঐ ব্রহ্মর্ষিরই বাক্য, যাহা মৈথিল সংগ্রহকর্ত্তা চণ্ডেশ্বর ঠাকুর কর্ত্তৃক কৃত্যরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"অতঃ স পরমো ধর্ম্মো যো বেদাদবগম্যতে।
অপরঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যঃ পুরাণাদিষু স্থিতঃ॥"

অর্থাৎ যাহা বেদ হইতে বুঝা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর যাহার পুরাণাদিতে কীর্ত্তন আছে, তাহাও অন্যতম ধর্ম্ম। সুতরাং পুরাণে আমাদের ধর্ম্মাচারবিধি নিহিত আছে। পুরাণ শাস্ত্র যে আমাদের ধর্ম্মস্থান, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে,—

"পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥"

অর্থাৎ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ শাস্ত্রের সহিত চারি বেদ এই চতুর্দ্দশ প্রকার শাস্ত্র জ্ঞানের ও ধর্ম্মের স্থান জানিবে।

এই সঙ্গে কোন কোন মনীষী গীত, নীতি, চিকিৎসা ও যুদ্ধবিষয়ক দৃষ্টফলক চারিটি শাস্ত্র মিশাইয়া শাস্ত্র সংখ্যায় আঠার প্রকার বলিয়াছেন। পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি পুরাণেই আছে। পুরা পূর্ব্বং অণতি গচ্ছতি—যাহা পূর্ব্বতনকে আশ্রয় করিয়াছে। এই ব্যাখ্যার মূল মাধবাচার্য্যধৃত পুরাণবচন পাইতেছি—

"যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

এক্ষণে দেখিতে হইবে, পুরাণপদপ্রতিপাদ্য পুরাতন কথাময় পুরাণশাস্ত্র আমরা প্রথমে কোথায় পাইতেছি।

অপৌরুষেয় বেদের মন্ত্রভাগের প্রয়োগবিধিরূপ যে ব্রাহ্মণভাগ, তাহাতেই আমরা পুরাণের কথা প্রথম পাইতেছি,—

"অধ্বর্য্যুস্তাক্ষ্যো বৈপশ্যতো রাজেত্যাহ—
পুরাণং বেদঃ। সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত॥"

শতপথব্রাহ্মণ—১৩।৪।৩।১০।

অর্থাৎ যাগব্যাপৃত তার্ক্ষ্যবংশীয় রাজা বৈপশ্যত বলিলেন, পুরাণ বেদ ভিন্ন নহে, এই বলিয়া তিনি নিজে কিছু পুরাণ কীর্ত্তন করিলেন।

ঐ ব্রাহ্মণেরই ১৪।৬।১০।৬ স্থানে আবার বলা আছে,—"ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ।" অর্থাৎ এখানেও ঋগ্বেদের ন্যায় পুরাণকেও বিদ্যা বলিলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ১ম প্রপাঠকে—

"স হোবাচ ঋগ্বেদং ভবতোঽধ্যেমি.....পুরাণং পঞ্চমম্।"

আবার বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১৪।৫।৭।১০ বলা হইল।

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।

এই সকল প্রমাণে পুরাণ নিত্যবৎ প্রমাণ। যেমন শিক্ষা কল্প প্রভৃতি ৬ ছয়টি বেদের অন্তরঙ্গ, তেমনই পুরাণ প্রমাণক্ষেত্রে বেদের সমানাসন অধিকার করায় সহজেই বুঝাইতেছে যে, পুরাণও বেদের বহিরঙ্গ। বিশেষতঃ আচার্য্য সায়ন বেদশব্দের ভাষ্যকালে বলিয়াছেন,—

"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ।"

এই যৌগিক ব্যাখ্যাতে পুরাণ শাস্ত্রও, ইষ্টলাভ ও অনিষ্টবর্জ্জনের সদুপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন বলিয়া বেদ শব্দের লক্ষ্য হইতেছে।

ইতিহাস—দেবতাদের ও রাজাদের চরিত্রবর্ণন।
পুরাণ—সৃষ্টিপ্রকরণঘটিত কথাময় নিত্যবস্তু।
গাথা—পিতৃগণ ও দেবগণ উদ্দেশে গীত বাক্যচয়।
কল্প—শ্রাদ্ধবিধি নিরূপণ।
আখ্যান—নিজের প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়বর্ণন।
উপাখ্যান—শ্রুতবিষয়ের কথন।
নারাশংসী—মনুষ্যকৃত বৃত্তান্তবর্ণন।

এই সকল বেদ সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে নিবিষ্ট আছে।

কালে জীবের বিদ্যাবুদ্ধি ও আয়ুর হ্রাস হইতে থাকায় ত্রিতাপতপ্ত জীব সংসারপথে পরিশ্রান্ত হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ সলিলের আশায় থাকিয়াও দুর্জ্ঞেয় বেদরূপ গভীর বিশাল জলাশয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছে এবং বেদের নানা স্থানে অক্রমিক অবস্থিত পুরাণেতিহাসাদির তাৎপর্য্য বহু আয়াসেও হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া এবং লুপ্ত শাখা সকল ক্রমেই সম্প্রদায়াভাবে দুর্লভ হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ বাদরায়ণি পুরাণ-সংহিতারূপ প্রপা কল্পনা করত মনুষ্যকে কৃতার্থ, পরিতৃপ্ত ও শান্তিপুর্ণ করিয়াছেন।

প্রমাণ—

"কালেন মীলিতদৃশামবমৃষ্যমূণাং
স্তোকায়ুষাং স্ববিগমো বত দূরপারঃ।
আবির্ভবং স্তনুমৃগং স হি সত্যবত্যাং
বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম॥

অর্থাৎ—কালবশে প্রজ্ঞাচক্ষুর্বিহীন অল্পায়ু মানবদিগের বেদোক্তজ্ঞানফল লাভ করা অতি দুরস্থিত দেখিয়া সেই নারায়ণ প্রতি দ্বাপরে সত্যবতীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া বেদরূপ পাদপকে নানা পল্লবে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

আর পরাশরপুরাণেও এই কথা আছে,—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সুতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥"

অর্থাৎ বেদনিবিষ্ট পুরাণতাৎপর্য্যের তথ্যবিদ্ ব্যাস মহাশয় বেদশাখা হইতে নানা আখ্যান-উপাখ্যান-গাথা ও কল্পব্যাখ্যান পুরাণ ইতিহাস লইয়া পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন এবং সেই মহামুনি নিজের প্রিয় শিষ্য দ্বিজাতি লোমহর্ষণ সূতকে সেই সংহিতা অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

আরও সূতসংহিতায় আছে,—

"দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া॥
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেঽসৌ যুগে যুগে।"

অর্থাৎ প্রতি দ্বাপরে ভগবান্ বিষ্ণু ব্যাসরূপে আসিয়া লোকের হিতার্থে বেদের বিভাগ ও পবিত্র পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন।

কেহ কেহ বলেন, আমাদের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মরূপ পাদপে পৌরাণিক ধর্ম্মরূপ প্রবল বৃক্ষরুহা বদ্ধমূল হওয়ায় ঐ মহাবৃক্ষ নিস্তেজ হইয়াছে। এ কথার সারবত্তা বা সত্যতা দেখি না, কারণ, পুরাণের কথা

পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যানের মত দৃষ্টান্ত-বিধায় উল্লিখিত হয় নাই বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার যোগ্য নহে। বেদমূলক আখ্যান উপাখ্যানাদি পুরাণে পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র। যেমন—বেদের ব্রাহ্মণভাগে—"হরিশ্চন্দ্রো হ বৈ ঐক্ষ্বাকো রাজা বভূব" এই বাক্য অনুধাবন করিয়া নিজের তপঃশক্তি-সন্নিবেশে কল্পভেদঘটিত ঐ রাজার তাবৎ বৃত্তান্ত করামলকবৎ প্রতীতি করত ব্যাসমুনি পুরাণ রচনা করিলেন।

পুরাণশাস্ত্র বিশাল সংসার-জলধিবক্ষে প্লবমান বর্ণাশ্রমীদের ব্রহ্ম্যাভিমুখে পরিচালনা করিবার সুগম সহজবোধ্য উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। আমার বিবেচনা হয়, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বরূপের প্রেম অঙ্কুরিত, উপনিষদে পল্লবিত, পুরাণশাস্ত্রে তাহা ফলিত হইয়াছে।

তাই পুরাণবিশেষে বলা আছে,—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসম্মিতম্।"

অর্থাৎ বেদরূপ কল্পবৃক্ষ হইতে গলিত অমৃতপিণ্ডের সমান এই পুরাণরূপ ফল শুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, প্রেমিকরা ইহা আস্বাদন করুন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দ্বৈপায়ন কি রচনা করিলেন।

সে বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে পাই,—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ সংহিতা-কর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
লৌমহর্ষণিকশ্চাথ তিস্রণাং মূলসংহিতাঃ॥"

অর্থাৎ পুরাণবদ্ বাদরায়ণি বেদ হইতে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য প্রখ্যাত লোমহর্ষণ-সূতকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি এই ছয় জন পুরাণবিষয়ে সূতের শিষ্য হন এবং কাশ্যপ, সাবর্ণি, শাংশপায়ন ও লোমহর্ষণি সূত, এই তিন জন তিনখানি মূলসংহিতা প্রণয়ন করেন।

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে পাইতেছি,—

"এষ্যারুণিঃ কাশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড়্‌বৈ পৌরাণিকা ইমে॥
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্॥
কাশ্যপোঽহঞ্চ সাবর্ণী রামঃ শিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ॥"

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিলেন,—"প্রথমং ব্যাসঃ ষট্‌সংহিতাং কৃত্বা মৎপিত্রে লোমহর্ষণায় প্রাদাৎ অন্য চ মুখাদেতে ত্রয্যারুণ্যাদয়ঃ একৈকাং সংহিতামধীয়ন্ত এতেষাং ষণ্ণাং শিষ্যোঽহং তাঃ সর্ব্বাঃ সমধীতবান্ রামঃশিষ্যেঽকৃতব্রণ এবং চত্বারো বয়ম্। মূলসংহিতামিত্যনেন ততঃ সংহিতাবাহুল্যং সূচিতম্॥"

এই মূল ও ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, ব্যাস ৬ খানি মূলসংহিতা রচনা করিয়া আমার পিতা লোমহর্ষণকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ত্রয্যারুণি প্রভৃতি ছয় জন এক একখানি সংহিতা পড়িলেন, আমি লোমহর্ষণ-তনয় সকলগুলিই পড়িয়াছি। আবার বলিতেছেন, আমরা ৪ জন ব্যাস-শিষ্য মূলসংহিতা পড়িয়াছি। ইহাতে সংহিতার বাহুল্য বুঝা যায়। এক্ষণে ভাগবতে বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা সুব্যক্ত থাকিলেও উভয় সাংঘাতে ইহাই স্থির হয় যে, ব্যাসমুনি ৬খানি অপেক্ষা অধিক সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, পরে শিষ্যোপশিষ্যরা ব্যাসকৃত মূল সংহিতার অনুসরণ করত মর্ম্ম সকল লিপি দ্বারা পল্লবিত করিয়া মহাপুরাণরূপ গ্রন্থাকারে পরিণমিত করিয়াছেন।

মূল ব্যাসসংহিতাই যে অষ্টাদশ মহাপুরাণরূপে পরিণমিত, তাহার প্রমাণ—সকল মহাপুরাণের শেষেই ইতি বৈয়াসিকানাং সংহিতায়াং বলিয়া লেখা ছিল, ক্রমে লিপিকররা শ্রমলাঘবতানিবন্ধনায় ব্যাসকৃত মাত্র লিখিতে থাকিলেন। অতি প্রাচীন হস্তলিখিত মৎস্যপুরাণের শেষভাগে বৈয়াসিকী সংহিতায়াং লেখা দেখিতেছি এবং এখনও ভাগবতের অধ্যায়-শেষে বৈয়াসিকানাং সংহিতায়াং লেখা চলিয়া আসিতেছে। ভাগবতেই আছে,—

"দশ সপ্ত পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
নাপ্তবান্ মনসো তোষং ভারতেনাপি ভামিনি॥
চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্॥"

অর্থাৎ ব্যাস ১৭খানি পুরাণ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াও সন্তোষ না পাইয়া এই ভাগবত রূপ সংহিতা করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্যাসের কৃত মূল সংহিতার অন্যতর, তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব। এক্ষণে স্থির হইল যে, বেদব্যাস যে ৬ খানি মূল পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন, পরবর্ত্তী কালে মনীষীরা উহার মর্ম্মানুসরণে নিজ নিজ স্মরণ ও রুচি অনুসারে অধীত সংহিতাকেই গ্রন্থন করিয়া অনেকগুলি মহাপুরাণ সঙ্কলন করত সম্প্রদায় করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মূল ব্যাসসংহিতাই ১৮খানি মহাপুরাণ আকারে পরিণত হইয়াছে।

মহাপুরাণনিচয়ে যে একই বৃত্তান্ত ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখা যাইতেছে আছে এবং কোনখানিতে পৃথক্ সংবাদও রহিয়াছে, বিকৃত ঘটনার জাজ্বল্যমান, ইহার উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, সংহিতা-প্রণয়ন-কালে যে সকল লুপ্ত বেদশাখায় নিবিষ্ট ব্যাখ্যানাদি সংহিতাকারের অগোচর ছিল, পরে পুরাণাকারে রচনাকারী শিষ্যোপশিষ্যদের তাহা গোচর হয়। সেই জন্যই মহাপুরাণ সকলে অধিকাংশ একই বর্ণনীয় বিষয়ের ও পৃথক্ পৃথক্ আখ্যানেরও সমাবেশ হইয়াছে। ক্রমে বহু পরে মহাপুরাণে অধ্যয়নকারীদের রুচি ও প্রেম অনুসারে সংহিতার অনুমোদিত বিষয়েরও যে সমাবেশ হয় নাই, ইহাও কেহ কেহ বলেন তবে ইহাই স্থির হইল যে, অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেদব্যাসের পুরাণ সংহিতার অবয়ব। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ অপ্রমাদী বুঝিবার আর একটি দৃঢ়ভিত্তি রহিয়াছে ষট্‌সম্বাদের অবতারণা ব্যাসবক্তা সূত শ্রোতা সূত বক্তা, শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রোতা। পরে বৈশম্পায়ন প্রভৃতি বক্তা জন্মেজয় প্রভৃতি শ্রোতা। এই তিন জোড়া বক্তা শ্রোতা না থাকিলে পুরাণ হয় নাই, সুতরাং এই পুরাণ বহু শত বর্ষ ধরিয়া অপ্রমাদী হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই মানবের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছে।

এই মহাপুরাণ সম্বন্ধে একটি কথা উঠে যে, ব্যাস যদি পুরাণ করিলেন তবে গ্রন্থ নিজের কৃত বলিয়া লেখা তাঁহার কিরূপে সঙ্গত হয়। ইহার উত্তরে পরাশর-সংহিতার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য বলিলেন, ভারত পুরাণাদিতে ব্যাস বৃত্তান্ত সংবলিত শ্লোক ব্যাসেরই কৃত। কারণ, আপ্ত জনেরা নিজ গ্রন্থকে পরকৃতের মত প্রকটিত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মহাপুরাণ নামের কারণ কি, কোন্ লক্ষ ধরিয়া মহাপুরাণ হইয়াছে? এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বলা আছে,—

"পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষিভিরুদাহৃতম্।
শৃণুষ্ব বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাস্ত্রানুসারতঃ॥
সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তীরক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভিঃ লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥"

অর্থাৎ—ব্রহ্মর্ষিরা পুরাণের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, যাহাতে আদিসৃষ্টি, প্রজাপতিগণকৃত সৃষ্টি, জীবিকানিরূপণ, অবতারকৃত সৃষ্টিরক্ষা, মন্বাদিবংশবর্ণনা, তত্তদ্বংশীয় প্রধান পুরুষাদি চরিত্র ব্যাখ্যান, প্রলয়বার্ত্তা, সৃষ্টিরক্ষার উপায় ও জীবের মুক্তির কথা, এই দশটি থাকিবে, তাহাকেই মহাপুরাণ বলে এবং যাহাতে পাঁচটি মাত্র আছে, তাহাকে উপপুরাণ বলে। এই বিষয়ে মৎস্যপুরাণে মনু বলিয়াছেন,—

"ৎপত্তিঃ প্রলয়শ্চাপি বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতঞ্চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্॥
দানধর্ম্মবিধিশ্চৈব শ্রাদ্ধকল্পশ্চ শাশ্বতম্।
বর্ণাশ্রমবিভাগশ্চ তথেষ্টাপূর্ত্তসংজ্ঞিতম্॥
দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যজ্ঞানাঞ্চৈব বিস্তরম্ ভুবি।
তৎসর্ব্বং বিস্তরেণাত্র ধর্ম্মমাখ্যাতুমর্হসি॥"

এখানে সংখ্যায় একাদশ হইতেছে সত্য, কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্তের মধ্যে দেবতাপ্রতিষ্ঠার প্রবেশ থাকিলেও সেই সেই প্রতিষ্ঠার প্রয়োগপদ্ধতি পর্য্যন্ত বেদানুসারে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পৃথক্ প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে এবং তাহাতেই একাদশ সংখ্যা হওয়ায় কোনই বিসম্বাদ নাই।

এই প্রকার শব্দকল্পদ্রুমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ১৩২ অধ্যায় হইতে মহাপুরাণের যে লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্।
কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ।
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্।
উৎকীর্ত্তনং হরের্বাপি দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
দশাধিকৈর্লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

ইহাতেও একাদশ সংখ্যা দেখা যায়, ইহার একটি দেবতাবর্ণন মধ্যে বিষ্ণুকীর্ত্তনে নিবিষ্ট হইলে অসামঞ্জস্য থাকে না।

এই সমুদয় পুরাণলক্ষণান্বর্গত বিষয়বিবরণ দৃষ্টে পুরাণের বেদমূলকতাই নির্ণীত হয়, কারণ, বেদেই প্রথম আদিসৃষ্টি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—ঋতঞ্চ সত্যাঞ্চাভিদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ইত্যাদি।

এ ক্ষেত্রে অমরসিংহ,—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
রাজ্ঞাঞ্চ চরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, দেখিয়াই ইহাতে হিন্দুশাস্ত্রের অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে কোন কোন সংস্কৃতানুশীলী মনীষী অমরসিংহের পর মহাপুরাণ রচনা হইয়াছে বলেন; কিন্তু অমরসিংহের লক্ষণ মহাপুরাণ উভয় সাধারণ বলিলে কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। মহাপুরাণে আরও পাঁচটি বিষয় অধিক থাকিলেও তিনি তাহা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ অমরসিংহ মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ প্রমাণ করিলে খৃঃ পূর্ব্ব ৬৫ বর্ষ অমরসিংহের কাল। কালিদাসের কুমার-সম্ভব অনেক স্থলে শিবপুরাণকে অবিকল আদর্শ রাখিয়া লেখা হইয়াছে; সুতরাং মহাপুরাণ রচনা অমরসিংহের পূর্ব্বে হয় নাই বা আচার্য্য শঙ্করের পরে পুরাণ রচনা হইয়াছে, এ সকল কথা ভিত্তিহীন বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যমধ্যেও পুরাণ-প্রসঙ্গ দেখা যায়।

অনাদি বৈদিকধর্ম্মে যেমন অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারিভেদে ইষ্টাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের উপাসনা নিরূপিত আছে, যেমন—

যজান্ দেবান্ জ্যায়সঃ। ঋগ্বেদ—১।২৭।১৩, যাস্ক।

ইহার যাস্ককৃত ব্যাখ্যা,—

একস্যাত্মনোঽন্যে দেবতাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।

অর্থাৎ এক পরমাত্মার অন্য সকল দেবতা প্রত্যঙ্গরূপেই আছেন। ইহার অনুসরণে আগুষ্ঠঋষিগণ পুরাণকে সগুণোপাসনার ভিত্তি করিয়া ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতি দেবতাদিগকে ব্রহ্মেরই শক্তিরূপে উপাস্য বলিয়াছেন।

মহাপুরাণ ব্যাসের রচিত; ইহার মূলানুভব অবশ্য কর্ত্তব্য প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণচতুষ্টয়ের ন্যায় ঐতিহ্য একটি প্রমাণ পৌরাণিকরা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ ঐতিহ্য প্রমাণেও মহাপুরাণ ব্যাসকৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। তবে প্রবল ভিন্নধর্ম্মীর আক্রমণে কোন কোন মূল সংহিতা নষ্ট হইলে তাহার স্মৃতিতে বর্ত্তমান মহাপুরাণ আকারে রচিত হইয়া থাকিবে, তাই কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাস ১৭ খানি পুরাণ প্রস্তুত করিয়া শেষ ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে জানিতে হইবে, ঐগুলি কি?—এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণের অনুক্রমণিকাতে দেখিতে পাই,

"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গঞ্চ গারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্॥"

বিষ্ণুপুরাণেও ভাগবতের সমানই সূচী দেখা যায়, যাহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তবে মৎস্যপুরাণের মতে বরাহ স্থানে বায়ুপুরাণের নাম আছে, আর ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অনুক্রমণিকাতেও ঠিক এই কথাটিরই উল্লেখ আছে। তবে যদি কোন স্থানে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় লিপিকরের রুচি ও বুদ্ধির বৈলক্ষণ্যে তাদৃশ অবধারণামতে সূচিতে পৃথক নামের সমাবেশ দেখা যায়।

বায়ুপুরাণকে উপপুরাণের মধ্যে যাহা দেখি, তাহা সনৎকুমারকৃত উল্লেখ বলিয়া পৃথক্ আছে।

এ সম্বন্ধে বহুবাদিসম্মত একটি সাঙ্কেতিক তালিকা দেবী-ভাগবতের টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্ট উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এইরূপ—

"মদ্বয়ং ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্।
অনাপলিঙ্গকূস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্॥"

অর্থাৎ দুখানি মকারাদি—মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

দুখানি ভকারাদি—ভাগবত, ভবিষ্য।

তিনখানি ব্রকারাদি—ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

৪ খানি বকারাদি—বায়ু, বিষ্ণু, বরাহ, বামন।

অকারাদি—অগ্নি। নকারাদি—নারদ। পকারাদি—পদ্ম।

লিকারাদি—লিঙ্গ। গকারাদি—গরুড়।

কুকারাদি—কূর্ম্ম। স্কারাদি—স্কন্দ।

ভাগবতের বা বিষ্ণুপুরাণের সূচীর সঙ্গে যে কিছু পার্থক্য, তাহার সমাধান পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই কয় মহাপুরাণের সমষ্টির শ্লোকসংখ্যা চারি লক্ষ আর মহাভারতে এক লক্ষ।

এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ।
লক্ষশ্লোকাত্মকং শাস্ত্রং ভারতং পরিকীর্ত্তিতম্॥
পঞ্চলক্ষমিদং রাজন্ কথিতং ব্রহ্ম কেবলম্।
বেদঃ পঞ্চমনামৈষ নিস্তারয়তু পাপ্মানঃ॥
ব্যাসরূপেণ কৃতবান্ পুরাণানি মহীতলে।
পঠনাৎ শ্রবণাত্তেষাং নৃণাং পাপক্ষয়ো ভবেৎ॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ এই পাঁচ লক্ষ শ্লোকে পঞ্চম বেদ। ভগবান্ ব্যাসরূপে আসিয়া ইহার রচনা করেন। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানবের পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

এই সকল পুরাণই আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে তিন প্রকার অবধারিত আছে। সে কথা বিষ্ণুপুরাণে এইরূপে পাওয়া যায়:—

"সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।"

১৮ খানির মধ্যে কোন্‌খানিতে কোন্ দেবতার মাহাত্ম্য অধিক, তাহা এইরূপ বলা আছে—

"চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ।
অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ শিবঃ॥"

প্রভাসখণ্ডে এই কথাই বলা আছে; কেবল রবি স্থানে অগ্নি পদ আছে। বোধ করি, লেখকপ্রমাদ বশতঃ তথায় রবি স্থানে অগ্নি বসিয়াছে, যথা—

"কথ্যতে দশভির্বিপ্রাঃ পুরাণৈঃ পরমেশ্বরঃ।
চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ॥
একেনাগ্নিস্তথৈকেন ভগবান্ চন্দ্রশেখরঃ॥"

এক্ষণে মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণসংহিতা ও মহাভারতের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রে প্রস্তুত করেন, তাহার নিদর্শন দেবীভাগবতে এই প্রকার পাইতেছি,—

"অষ্টাদশপুরাণানাং কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহণম্॥"

অর্থাৎ ১৮ খানি মহাপুরাণের সংহিতা প্রণয়নের পর মহাভারত প্রণয়ন করিলেন; কিন্তু পদ্মপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট লেখা আছে যে,—

"দশ সপ্ত পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
নাপ্তবান্ মনসা তোষং ভারতেনাপি ভামিনি॥
চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্।"

অর্থাৎ ব্যাস ১৭ খানি মহাপুরাণের মূলসংহিতা প্রণয়নের পর মহাভারত প্রস্তুত করেন ও সর্ব্বশেষে ভাগবত রচনা করিলেন। ইহাই সঙ্গত। কারণ, শেষের বাক্য ভাবশুদ্ধ ও প্রেমময় হইয়াছে। তবে দেবী-ভাগবতের বচনটিতে কর্ত্তাপদ স্থানে কৃত্বা লিপিপ্রমাদ ঘটিয়াছে, সহজে বুঝা যায়। মহাভারতরচয়িতার বিশেষণরূপে পুরাণকর্ত্তা বলিয়া ব্যাসের পরিচয় ভিন্ন ক্রমবোধক হইতে পারে না—এ বিষয়ের সাধক প্রমাণ প্রথম নারদপুরাণে ঐ বচনের পাঠ আছে—অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ, এবং ঐ দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ইহারই সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

"বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতং তথা।
কৃত্বা সম্মোহসম্পূঢ়োঽভবদ্ব্যাসো মনস্যপি।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং কৃতবান্ মুনিঃ॥"

অর্থাৎ বেদশাখা সমুদয়, পুরাণ সকল, বেদান্তশাস্ত্র ও মহাভারত ক্রমিক প্রস্তুত করিবার পর অন্তরের মোহ বিদূরিত না হওয়ায় মুনিবর শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ রচনা করিলেন।

এক্ষণে পৌর্ব্বাপর্য্যের বিসম্বাদ বিদূরিত হইল।

উপপুরাণগুলির সম্বন্ধে দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট পরাশর-পুরাণের যে কয়টি বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা জানা যায় যে, উপপুরাণ কয়খানি অন্যান্য ঋষিরা রচনা করিয়াছেন।

বক্তা মহাদেব——শ্রোত্রী পার্ব্বতী।
"শ্রুত্বা সত্যবতীসূনোর্লোকানাং হিতকাম্যয়া।
অন্যান্যুপপুরাণানি যথেষ্টং ব্যমাস্তিকাঃ॥
কুরুধ্বং সংগ্রহৈরেব মমাজ্ঞাবশতাং গতাঃ।
এবমাজ্ঞাপিতাস্তেন শিবেন মুনয়ঃ পুরা॥
শ্রুত্বা সত্যবতীসূনোঃ পুরাণং সকলং মুদা।
অন্যান্যুপপুরাণানি চক্রুরুষ্য সংহিতাঃ॥"

অর্থাৎ মহাদেব বলিলেন,—হে আস্তিক ঋষিগণ! তোমরা লোক-হিতার্থ আমার আজ্ঞাবহ হইয়া ব্যাসের নিকট সার তথ্য শ্রবণ পূর্ব্বক উপপুরাণ প্রস্তুত কর। এইরূপে শিব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মুনিগণ ব্যাসের উদ্দেশানুসারে সংহিতা আকর্ষণ করিয়া অন্যান্য উপপুরাণ রচনা করিলেন।

কূর্ম্মপুরাণ-লিখিত উপপুরাণানুক্রমণী মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহং ততঃ পরম্।
তৃতীয়ং বায়বীয়ঞ্চ কুমারেণাভিভাষিতম্॥
চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষান্নন্দীশভাষিতম্।
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃ পরম্॥
নন্দিকেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ তথৈবোশনসেরিতম্।
বারুণং কাপিলং শাম্বং কালিকাহ্বয়মেব চ॥
মাহেশ্বরং মহাপাদ্মং দৈবং সর্ব্বার্থসাধকম্।
সারাসারোক্তমপরং মারীচং ভাস্করাহ্বয়ম্॥"

অর্থাৎ—১ম সনৎকুমারকথিত পুরাণ, ২য় নারসিংহ পুরাণ, ৩য় বায়ু, ৪র্থ শিবধর্ম্ম, ৫ম দুর্ব্বাসা পুরাণ, ৬ষ্ঠ নারদীয়, ৭।৮ম নন্দি কেশ্বরপুরাণ, ৯ম বরুণপুরাণ, ১০ম কপিলপুরাণ, ১১শ শাম্বপুরাণ, ১২শ কালিকাপুরাণ, ১৩শ মহেশ্বরপুরাণ, ১৪শ মহাপাদ্মপুরাণ, ১৫শ দৈব পুরাণ, ১৬শ পরাশরপুরাণ, ১৭শ সূর্য্য পুরাণ, ১৮শ মরীচিপুরাণ।

এই ১৮ খানি প্রচলিত উপপুরাণ দেখা যায়—

এই উপপুরাণের সূচীতে পদ্ম ও নারদীয়ের পরিচয় পাইতেছি; সুতরাং এই দুইখানি মহাপুরাণ যেমন আছে, উপপুরাণও এই দুইখানি আছে, পৃথক্ লক্ষণসমন্বিত করিলে মহাপুরাণ ও উপপুরাণ বুঝা যায়।

যেমন অবাঙ্মনস ঈশ্বরের নির্ব্বচন করা যায় না, সেইরূপ সনাতন পুরাণ শাস্ত্রের সম্যক্ তথ্যনিরূপণ অসম্ভব।

পুরাণ নিত্যবস্তু। প্রতি দ্বাপরে বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ পুরাণ সঙ্কলন করেন। যেমন শীত প্রভৃতি ঋতুতে স্ব স্ব ঋতুর ফল পুষ্প ও নানা ফলাদির উদ্গম, তেমনই যুগবশে শাস্ত্রাদির বিকাশ বেদব্যাস উপলক্ষ্য মাত্র।

পুরাণশাস্ত্র যে কত প্রাচীন, তাহা পৃথিবীর কোন জাতির কল্পনাতেই আসিতে পারে না। তবে বর্ত্তমান আকারের গ্রন্থ সকল শত শত বর্ষ ধরিয়া লোকের হাতে পড়িয়া কতক বিকৃত, কতক পরিবর্ত্তিত, কতক পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকিতে পারে; ইহা অস্বীকার করি না। মহাপুরাণের মূল তথ্যে বিসম্বাদ নাই। পুরাণশাস্ত্র রোগ-শোক-জরাজীর্ণ জীবের শান্তিবিধায়ক।

এই জন্যই আপ্তজনেরা বলিয়াছেন,—

"যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ বেদজ্ঞ হইয়াও পুরাণ না জানিলে পণ্ডিত হয় না।

সময়ে পুরাণ বিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (মহামহোপাধ্যায়)।

বিন্তি খেলা



১

পূজার ছুটীতে প্রফুল্লের বাটী যাইবার আনন্দ ধরে না। এবার তাহার ফুলনবাড়ীর চা য়ুরোপে খুব বিক্রয় হইতেছে। বহু দিন পরে বহু পরিশ্রম, বহু বুদ্ধি ও বহু বিজ্ঞাপনের অর্থ খরচ করিয়া সে এবার বাজারে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। তাই সে মনের আনন্দে ভাবিতেছিল, কাল আফিস বন্ধ করিয়া যখন বাড়ী যাইবার জন্য হাওড়ার ষ্টেশনে দৌড়াইবে, তখন তাহার সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। আজ দুই মাসের উপর সে একবারও বাড়ী যায় নাই, ভূতের মত খাটিয়া আফিসটাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ভগবান্ তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। বাড়ীতে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী নলিনী ও ননীর পুতলী শিশুপুত্র গোপাল তাহারই প্রতীক্ষায় কত আশায় কত আনন্দে পথ চাহিয়া রহিয়াছে!

প্রফুল্ল জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত, এমন সময়ে ডাক-পিয়ন আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল। পত্রের ঠিকানা পড়িয়া প্রফুল্লের মনের ও দেহের মধ্য দিয়া একটা আনন্দ-শিহরণ বহিয়া গেল,—এ যে তাহারই প্রিয়তমার স্বহস্ত-লিখিত ঠিকানা! তাড়াতাড়ি খামখানি খুলিয়া পত্র পাঠ করিতে করিতে কিন্তু প্রফুল্লের আনন্দালোকিত মুখখানা মেঘে ভরা আকাশের মত কালো আঁধার হইয়া গেল—জগতে সে যাহাকে সকলের অপেক্ষা ভয় করে, তাহাই তাহার জন্য তাহারই গৃহে অপেক্ষা করিতেছে, এমনই অদৃষ্ট তাহার! কত আনন্দে কত দারুণ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সে প্রস্তুত হইতেছে আপনার জনের কাছে যাইতে—কপোত-কপোতীর মত তাহারা স্ত্রীপুরুষ নীড়ে বসিয়া কত সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া ছুটীর কয় দিন স্বপ্নরাজ্যে কাটাইয়া দিবে,—তা নয়, কোথা হইতে এই অযাত্রা এই সুখের সময়ে আসিয়া তাহাতে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল!

নলিনী পূজার বাজারের চার্জ্জ পাঁচ দফা ফর্দ্দের কথা সাঙ্গ করিয়া শেষ লিখিতেছে,—"তুমি বোধ হয় শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে, গতকল্য মা এখানে আসিয়াছেন। অনেক দিন আমাদের দেখেন নাই, তাই পূজাটা এইখানেই কাটাইয়া যাইবেন। আমরা ছাড়া তাঁহার ত আর কেহ নাই সংসারে। তা শ্বশুরের ভিটায় সন্ধ্যা দিবার কেহ নাই বলিয়া সেখানে পড়িয়া থাকেন। আমি মনে করিতেছি, মাকে বলিয়া কহিয়া এবার হইতে যাহাতে আমাদের এখানে বারো মাস থাকেন, তাহা করিয়া লই। তুমিও তাহাতে সন্তোষ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। খোকাকে দেখিবার শুনিবার জন্য তাহা হইলে কোন ভাবনা হইবে না।

"আরও একটা সুখের খবর, অনেক কষ্টে এইবার একটা রাঁত-দিনের ঝি পাইয়াছি। নন্দিনী আগে গোবরচোনার রাজবাড়ীতে রাণীমার ঝি ছিল। রাণীমা মারা যাওয়ায় কায ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। দৈবক্রমে আমাদের গাঁয়ে তাহার এক বোন্‌ঝি থাকে, তাহারই কাছে আসিয়াছিল। আমাদের বরাতে এমন ঝি তাই জুটিয়া গেল। আর তাও বলি, মা'র পরেই এমন ঝি পাওয়া গেল। মা-ও এখানে আসিবেন লিখেছেন, আর নন্দিনীও চাকুরী করিতে আসিল।" ইত্যাদি।

সুখবরটি পাইবামাত্র প্রফুল্লের গোছগাছ করা থামিয়া গেল। এই শ্বশ্রূ ঠাকুরুণটি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াই থাকেন, নরলোকের সহিত বড় একটা সম্ভাষণ করেন না। শুচিবায়ুগ্রস্ততা হেতু জগতের কাহারও সহিত তাঁহার মিলন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহার উপর তিনি সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত। প্রফুল্লের মনে আছে, একবার বিবাহের পর সে সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গেলে তিনি তাহাকে মাঘের শীতেও দরদালানে জামাজুতা ছাড়াইয়া গামছা পরাইয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন এবং যে কয় দিন সে সেখানে ছিল, তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর

একবার তিনি তাহার বাড়ীতে আসিয়া কয় দিন বাস করিয়া কন্যা নলিনীর মন এমন ভারী করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রায় চির-মনান্তর হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেবার বহুকষ্টে এই রত্নকে বহিষ্কৃত করিয়া প্রফুল্ল আবার গৃহের সুখশান্তি ফিরাইয়া পাইয়াছিল। এমন লোককে গলায় পাথর বাঁধিয়া যদি গঙ্গায় ডুবাইয়া মারিলে ফাঁসীকাঠে চড়িবার বা পুলিপোলাও চালান হইবার ভয় না থাকিত, তাহা হইলে প্রফুল্ল অনায়াসে তাহা করিতে পারিত। সেই লোক চিরদিনের জন্য তাহার বাড়ীতে,—সর্ব্বনাশ! প্রফুল্লের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। গোদের উপরে বিষফোড়া, গরীবের বাড়ীতে আবার রাজদাসী! প্রফুল্লর এত সাধের পূজার আনন্দের তরণী কাহার অভিসম্পাতে ঘাটের কাছে আসিয়া এমন 'ভরাডুবি' হইতে চলিল!

২

বাড়ীতে প্রথম পদার্পণেই ভীষণ বাধা। দেউড়ীতে পা ফেলিতেই প্রফুল্ল দেখিল, তাহার শ্বশ্রূমাতা দেউড়ীর কড়ি-বরগায় জল ছিটাইতেছেন, হাতে গঙ্গাজল, পদতলে গোবরের হাঁড়ী, আর কোমরে মাত্র একখানি গামছা! প্রফুল্ল এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, চরণ আর চলিতে চাহিল না। শাশুড়ীঠাকুরুণ জামাতার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র মাথায় একখানা হাত উঠাইয়া (থানের অভাবে) এক হাত পরিমাণ রসনা কর্ত্তন করিয়া 'ও মা' বলিয়া অন্দরের অঙ্গনে অদৃশ্য হইলেন।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া দালানে উঠিতেই নলিনী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর হস্ত হইতে সওদাগুলি নামাইয়া লইতে গেল, অমনই তাহার জননী ঝড়ের মত উড়িয়া আসিয়া 'হাঁ হাঁ' করিয়া পড়িলেন,—"মা গো! ছিষ্টি নেরেকার করে দেখ! তুমি বাছা ম্লেচ্ছের ছেলে ব'লে কি আমার মেয়েটাকে শুদ্ধ ম্লেচ্ছ ক'রে তুলবে? ছাড় ঐখেনে জুতো কাপড়—যা মা নলি! থপ ক'রে গঙ্গাজলের—"

প্রফুল্লের পিত্ত চটিয়া উঠিল। কোথাকার আপদ আসিয়া জুটিল! "তুমি বাপু তোমার নির্মিষ দিক নিয়েই থাক না, আমাদের এ দিকে কেন?"—পরম বিরক্তিভরে কথাটা বলিয়া প্রফুল্ল গায়ের খোলস ছাড়িতে লাগিল। ছেলে বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, কত দিন পরে দেখা,—কিন্তু স্পর্শ করিবার যো নাই, তাহার মা অমনই ধমক দিয়া বলিল, "দাঁড়া খোকা! ছোঁওয়া-ছুঁয়ি করিস্‌নি, দিদিমা বকবে।" খোকা থমকিয়া বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া গেল, তাহার চোখে পাতা ভিজিয়া আসিবার উপক্রম হইল।

প্রফুল্ল আর থাকিতে পারিল না। জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে মুখচোখ আগুন করিয়া বলিল, "দুত্তোরকি কিছু করেছে! আয়, গুপলু, আমরা বাইরে চ'লে যাই, ওরা ওদের ঘর-দোর নিয়ে থাকুক।"

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নাই। প্রফুল্ল ভাবিয়াছিল, তাহার রাগ দেখিয়া অন্দরের লোক সামলাইয়া যাইবে, বিশেষতঃ অনেক দিন পরে খোকাকে বুকে চাপিয়া একবার চটকাইবার ইচ্ছাটাও তাহার প্রবল হইয়াছিল, তাই বাহিরের বৈঠকখানায় নিশ্চিন্তে খোকাকে লইয়া যেমন সে আদর করিবে, চুম্বন করিবে, অমনই অন্দর হইতে নাকি সুরে আওয়াজ আসিল, "ও মা গো, কোথা যাব গো! এমন অনাছিষ্টি হিঁদুর বাড়ী! থু থু! আজ আর এ বাড়ীতে জলস্পর্শ না! জলস্পর্শ না!"

আবার কি হইল? এ ত তাহার শাশুড়ীর গলার চাঁচাছোলা কাংস্যধ্বনি নহে, এ ত কোন এক অপরিচিত হংসের কলধ্বনি! কে এ?

গৃহিণী নলিনী বাহিরের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিলেন, "ও মা, তোমার জ্বালায় কি করবো, আমি কি মাথামুড় খুঁড়ে মরব না কি?"

প্রফুল্ল বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। কি বলে নলিনী! এত দিনের পর বাড়ী আসা—এ কি সম্ভাষণ প্রিয়তমার? কোথায় কত হা-হুতাশ, কবিতোচ্ছ্বাস, তা নয় জ্বালায় জ্বালাতন! প্রফুল্ল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "কেন, কি করলুম আবার? তুমিও কি মা'র দলে যোগ দিয়েছ না কি? বল্‌লেই পারতে, বাড়ী আসতুম না।"

"ও মা গো, কি আমার সাধু পুরুষ গো! উনি আনবেন, টিনের বাক্সোয় ক'রে খরগোস ইঁদুর, আর হিঁদুর বাড়ী তা ঘরে তুলে রাখবে। কি আবদার গো!"

প্রফুল্লের চক্ষু কপালে উঠিল, সত্যই ত সে খোকার খেলার জন্য সাদা ইঁদুর ও খরগোস আনিয়াছে কলিকাতা হইতে। কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে?

"নাও, এখনই ওগুলো বিদেয় ক'রে দাও—যে মুটে ষ্টেশন থেকে এনেছে, তার ঘাড়ে দিয়েই যেখানে খুসী পাঠিয়ে দাও, এখেনে ওদের যায়গা হবে না—"

মুখখানি নিতান্ত কাঁচুমাচু করিয়া প্রফুল্ল হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "লক্ষীটি নলি, ও বাক্সগুলো ঐ ওপাশে এক কোণে রেখে দোব'খন, তোমাদের কোন হেঁপা পোয়াতে হবে না—এতগুলো টাকা খরচ ক'রে গুপলুর জন্যে—"

"ছাই কিনেছেন! জিনিষ কিনেছেন! ওর চেয়ে যদি মটোরমালা একছড়া আনতে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এবার ঠিক আনবো, নলি। নাও, যেদোকে হাতমুখ ধোবার জলটল আনতে বল—বেটা গেল কোথায়? এই যেদো! এই কেষ্টা! নাঃ, এক বেটাও নেই।"

"বা রে, তারা যে ষ্টিসিশনে গেছে আবার জিনিষপত্র আনতে, একসঙ্গে ত সব আনবার মুটে নেই।"

"ওহো, তাও ঠিক বটে। তা, তোমার ঝিকেই না হয়—"

"হ্যাঁ, ভাল কথা। নন্দিনী বলছিল, রাজবাড়ীতে কখনও সে সাদা ইঁদুর আনতে দেখে নি—ও সব ছোট-লোকরা আনে।"

প্রফুল্ল মৃদুস্বরে বলিল, "এটা ত রাজবাড়ী না।"

ঠিক সেই সময়ে নন্দিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার পরণে দামী সাড়ী, হাতে সোনার তাগা, গলায় সোনার হার। সে মুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "হাঁ বাবু, ও পাপ আজই বিদেয় কর, নইলে কেউ আমরা জল ছোঁব না বাড়ীতে। রাণী-মা ও সব কথ্‌খনো বরদাস্ত করতেন না।"

দালান হইতে শাশুড়ী ঠাকরুণ আহ্নিকে বসিয়া মাথা নাড়িয়া কুঁড়োজালী সমেত হাতখানি তুলিয়া ইসারায় বলিলেন, "হুঁ হুঁ হুঁ—"

চারিদিক হইতে হাউইটজার, বোমা, টরপেডোর ঠেলা খাইয়া বেচারা প্রফুল্ল একবারে ঘায়েল হইয়া পড়িল। তথাপি মরিবার পূর্ব্বে একবার শেষ ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—"কখ্‌খোনো না,—আমি কিছুতেই খরগোস ছাড়বো না, ইঁদুর ছাড়বো না। যারা না সইতে পারবে—বাড়ীর কর্ত্তা আমি।"

নলিনী চটিয়া আগুন। গরম হইয়া বলিল, "বটে! তোমার বাড়ী? আয় ত গুপলু, আমরা এখনই মা'র সঙ্গে মামার বাড়ী চলে যাই।" কথাটা বলিয়া নলিনী সত্য-সত্যই খোকাকে টানিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল।

প্রফুল্ল প্রমাদ গণিল। তাড়াতাড়ি পথ আগুলিয়া মিনতির সুরে বলিল, "ঘাট হয়েছে নলি, এখনই ও আপদগুলোকে সত্যদের বাগানবাড়ীতে রেখে আসছি। দোহাই নলি, রাগ করো না—দোহাই তোমার—"

প্রফুল্ল জানিত, নলিনীর কোপ অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে, বিশেষতঃ বাপের বাড়ী যাওয়াটা ভয়প্রদর্শন মাত্র, কেন না, তথায় থাকিবার স্থান নাই। তথাপি প্রফুল্ল সংসারে অশান্তি একবারে দেখিতে পারিত না—পরন্তু নলিনীকে সে যথার্থই প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। তাই তাহার মন যোগাই-বার জন্য এবং ঘরে সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য বলিল, "তোমার কথাই রইল নলি—তুমিই ত মালিক,—আমি কে?"

৩

ওয়াটারলুর পর সন্ধি হইল বটে; কিন্তু সংসারের নিত্য কাযে খুঁটিনাটি বাধিয়াই রহিল। এমন দিন যায় না, যে দিন, হয় শাশুড়ীর সহিত, না হয়, রাজবাড়ীর মার্কা দেওয়া দাসীর সহিত প্রফুল্লের কোন না কোন উপলক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ হয় না। মজা এই, প্রফুল্ল ক্লান্ত হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু অপর পক্ষে ক্লান্তি বা বিরাম কখনও দেখা যাইত না।

ইহার উপর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটার মত আর এক উপসর্গ জুটিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে এবং সন্ধ্যার পর প্রফুল্ল সত্যদের বাগানবাড়ীতে মুক্তিমণ্ডপে গিয়া 'ছতিন নয়', 'কচে বারোর' আমোদে অজ্ঞান উন্মত্ত হইয়া থাকিত। রাজবাড়ীর দাসীর আর অর্দ্ধাঙ্গিনীর জননীর শুষ্ক কঠোর বাক্য-সাগরের ধূ ধূ বালির মধ্যে সত্যদের আড্ডাটা ওয়েশিসের মত তাহার প্রাণে যাহা কিছু রস-সঞ্চার করিত, তাহাও বুঝি লোপ পাইতে বসিল! এক দিন আহারে বসিলে পর নলিনী তাহাকে বলিল, "দেখ, দু'দিনের জন্যে বাড়ী এসেছ, তা বাইরে বাইরেই কাটালে---আজ থেকে দুপুরে সন্ধ্যেয় বেরুতে পারবে না ব'লে দিচ্ছি।"

প্রফুল্লের প্রাণ উড়িয়া গেল। এই কি পূজার আনন্দ!

এ পরামর্শের অন্তরালে কাহার ইঙ্গিত লুক্কায়িত ছিল, তাহা তাহার জানিতে বাকী রহিল না। সে বলিল, "তবে কি করতে হবে, শুনি ?"

"ঘরে থাকবে। হলো, একবার দু' পাঁচ মিনিটের জন্যে ও-পাড়ায় গেলে, না হয় পুজো-বাড়ীতে খোকাকে কোলে নিয়ে ঠাকুর দেখতে গেলে, না, রাত-দিন পোয়া বারো, কচে বারো। লক্ষ্মীছাড়া মিন্সেগুলোর ত চোখে ঘুম নেই! আজ থেকে দু'জনে তাস খেলবো, কি বল ? কেমন একটা নূতন খেলা শিখিছি, বিস্তির চেয়ে ঢের ভাল।"

প্রফুল্লের চক্ষু কপালে উঠিল। বিস্তি ? কি সর্ব্বনাশ! বিবাহের পর বউ ঘর করিতে আসিলে প্রথম দুই এক বৎসর তাহার সহিত বিস্তি খেলা মন্দ লাগে নাই, কিন্তু খোকা হইবার পর সে পাপ ত চুকিয়াছে, নলিনী নিজেই ত বিরক্ত হইয়া খেলা ছাড়িয়াছে। তবে ?

নলিনী বলিয়া যাইতে লাগিল, "ভাবছ বুঝি, ভুলে গেছি ? এমন মা'র মেয়ে নই আমি, খুব মনে আছে, আরও কত কি—ঐ ব্রিজ না কি, তাও শিখিছি। পাণটি খেয়ে যাও, এখন খোকাকে নিয়ে একটু হাত-পা ছড়াও গে, তার পর, বুঝেছো ?"

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল, বিলক্ষণ বুঝিয়াছে! না, ছুটীতে বাড়ী থাকা হইল না দেখিতেছি।

নলিনী বলিল, "গুম হয়ে রইলে যে ? গরীবের কথাটা মিষ্টি লাগলো না বুঝি ? মা গেছেন ঘাটে—তাই কথাটা পাড়লুম। দেখ, একটা সু-খবর আছে—"

"কি, কি, মা কাল বাড়ী যাচ্ছেন না কি ?" অত্যন্ত আগ্রহভরে প্রফুল্ল কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিল।

নলিনী বলিল, "বল্লুম, সু'খবর! মা চ'লে যাবেন কেন, তিনি এখানে একবারে থাকবার কথাই বলছিলেন। আঃ, তা হ'লে খোকাকে তাঁর কোলে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হই।"

কেহ যদি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইয়াছে, আশা করিয়া পর-ক্ষণেই শুনে যে, পাশের লিষ্টে তাহার নাম সাদা হরফে ছাপা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, প্রফুল্লেরও তাহাই হইল। মা একবারে কায়েম-মোকায়েম হইতেছেন, এই শুভ সংবাদে প্রফুল্লের বুকের হাড়ের উপর দিয়া কে যেন একখানা আগুনে টকটকে লাল করাত টানিয়া লইয়া গেল।

এই দুঃখ-দৈন্যের দিনে মানুষ যখন জীবনের বিয়োগান্ত ব্যাপার লইয়াই মসগুল, তখন নবীন লেখকরা কেন যে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের তাস-খেলার কাব্য লিখিয়া মনের অন্ধকার দূর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করেন না, বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কি তোপ্সা হাতসাফাই, কি চমৎকার গোপন সঙ্কেত, কি পিঠ হইতে বিদ্যুদ্গতিতে খেলা তাস উঠাইয়া লওয়া, কি সুন্দর ইচ্ছা করিয়া ভেস্তাইয়া দেওয়া, কি 'কেউচেঁমী' কি 'নেইআকড়ামী', এ সবের বর্ণনায় যে রামায়ণ, মহাভারত গড়িয়া উঠে! আমাদের প্রফুল্ল বেচারী এই কাব্যসায়রে ডুব দিয়া এক দিনেই হাঁপাইয়া উঠিল। দুই দিনে তাহার প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িল। কিন্তু বাঙ্গালী স্বামীর ধরিত্রীর মত পিঠ নহে, তিন দিনের পর প্রফুল্লের ধৈর্য্য আর সীমাবদ্ধ হইতে চাহিল না। সদা উড়ু উড়ু, সদা সত্যদের আড্ডার 'ছ তিন নয়' প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিতে থাকিলেও কোন মতে নাক টিপিয়া জোলাপ লইবার মত তিন দিন সে অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত একান্তে তাস খেলিল, কিন্তু চার দিনের দিন মন তাহার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

আহার কালে সে একখানা লাল খামে মোড়া চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল, বলিল, "আজ হ'তে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি আনন্দ উপভোগ করবার অবসর বোধ হয় আর ঘটে উঠল না। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে দু'দণ্ড আমোদ-আহ্লাদ [illegible] তাও সইল না!"

প্রফুল্ল প্রকাণ্ড এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

নলিনী বলিল, "কেন, হ'ল কি ? ওখানা কি, ওত তার দেখছি না ?"

"হাঁ, পিওন এসে দিয়ে গেল। ম্যানেজার লিখেছে, দিন তিনেক রোজ দুপুরে বেরোতেই হবে—নইলে কাজ হাতছাড়া হ'য়ে যায়।"

"এ্যাঁ, এই যে বল্লে ছুটী ?"

প্রফুল্ল বিজ্ঞের মত গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিল, "হাঁ, ছুটী ত বটেই, আর ছুটিই বা দেবে কে, নিজের আপিস ; তবে কি জান, কেরাণীদের চেয়েও আমরা বড় চাকর। তাদের এক জন মনিব, আমাদের হাজার হাজার। একটা অড়া

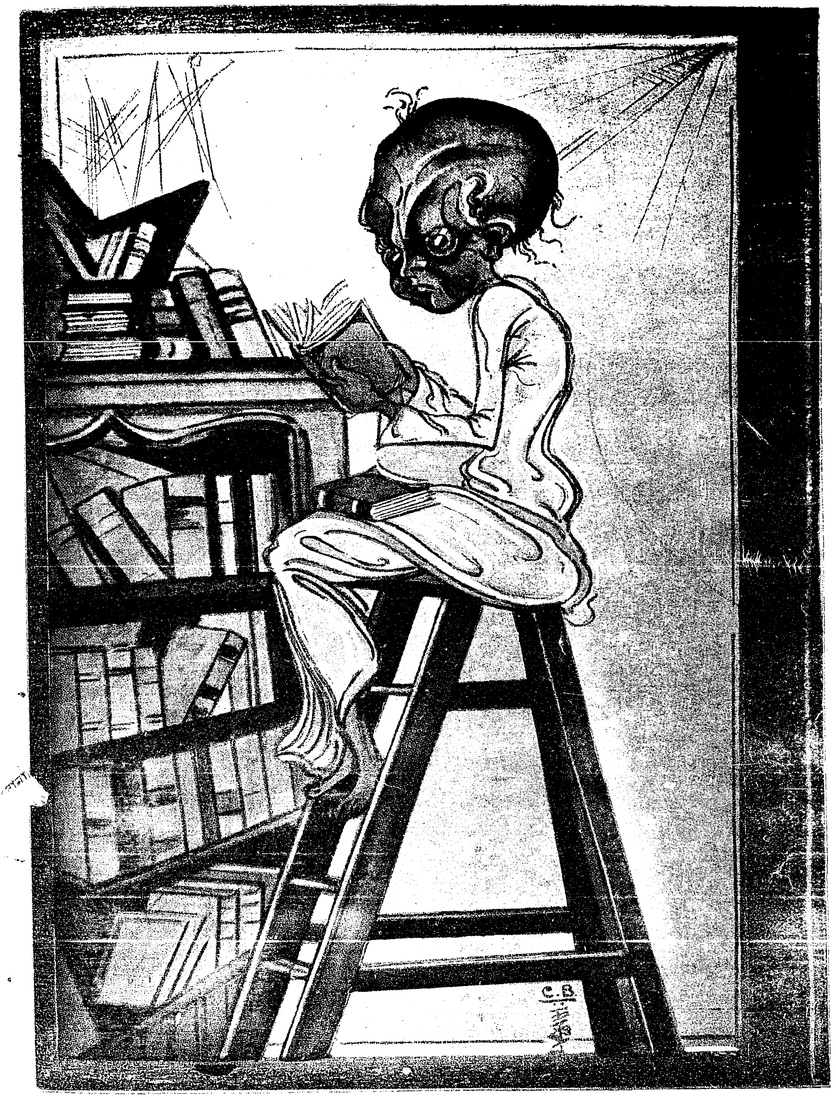

COLOUR ILLUSTRATION

মত কায আদায় দিতে না পারলেই বাস্! বোধ হয় হনলুলু থেকেই অর্ডারটা এসেছে, আসবার কথাও ছিল।"

"কোত্থেকে?"

"এই যে বল্‌লুম, মাডাগাস্কার থেকে?"

"মরুকগে। কখন ফিরবে?"

"তা কি বল্‌তে পারি? হয় ত রাতও হ'তে পারে। ছুটীতে ত আপিসে কেউ বেরোয় না। কেবল ম্যানেজার বাবু আর আমি। কায তুলতে হবে ত?"

"তা হ'লে আটটার গাড়ী ধরবে ত?"

"হাঁ, তাই হবে হয় ত। চাই কি লাষ্ট ট্রেণ—"

"সাড়ে দশটার? না, তা হবে না কিন্তু ব'লে রাখছি।"

"দেখি চেষ্টা ক'রে।"

হঠাৎ কাঁসির আওয়াজে স্বামি-স্ত্রীর আলাপে বাধা পড়িল,—"চা'য়ের অর্ডার এলো পূজোর বন্ধোয়?"

শাশুড়ী-জামায়ে দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। সে প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে স্বয়ং জার্ম্মাণ কাইজারও বোধ হয় মাথা তুলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, ভেতো বাঙ্গালী প্রফুল্ল ত কোন্ ছার! সে মাথাটা নীচু করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, না, হাঁ, তা ও রকম দু'টো একটা আসে কখনও কচিৎ।"

শাশুড়ী বলিলেন, "হুঁ!"

প্রফুল্লের মনে হইল, এই নারীর এই সময়ে হঠাৎ হার্ট-ফেল্ হওয়ার কত প্রয়োজনই না ছিল! বিধাতা কি [illegible]চক!

হা বারাণসী! এত বুড়ীকে অঙ্কে আশ্রয় দিয়াছ, আর এই একটির জন্য তোমার স্থান হয় না?

আহারান্তে প্রফুল্ল সহরের উদ্দেশে যাত্রা করিলে পর মা মেয়ের দিকে না তাকাইয়া হাঁড়ীর মধ্যে কাটা তেঁতুল বোঝাই করিতে করিতে আপনার মনেই বলিলেন,—"কেমন কেমন যেন ঠেকছে, বাপু!"

নলিনীর প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে স্বামীর পাতে আপনার জন্য অন্নাদি পরিবেষণ করিতে করিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা, কি কেমন কেমন ঠেকছে?"

"জামায়ের ব্যাওরাটা।"

"হাঁ, কি?"

"যখন আপিসের কথা বলছিল, তখন ভাল ক'রে তার মুখচোখের ভাব দেখেছিলি, বাছা?"

"না, কেন বল দিকি?"

"ওর চোখ দুটো এ-ধার ও-ধার করছিল, নাকের ডগা কাঁপছিল, গলাটাও ভিজে ভিজে বোধ হচ্ছিল—ওর সব কথা মিথ্যে। যার নাকের ডগা কাঁপে, সে মানুষকে কখনও বিশ্বেস ক'র না মা, এই তোমায় ব'লে দিলুম। ও অনেক দেখেছি।"

"না, না, আমার কাছে মিছে কথা বল্‌বে না।"

"তবুও কি জানিস্ বাছা, পুরুষমানুষ। তোর বিশ্বেস হয়, জামাই আফিসের ডাকে গেছে?"

নলিনীর বুক গুরুগুরু করিয়া উঠিল, সে প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, "আপিসে যায়নি, ত' কোথায় গেছে? তুমি কি বল্‌তে চাও—"

"আমি কিছু বল্‌তে চাই নে, বাপু। তোদের ঘরসংসার, তোরা তোদের ভাল জানিস্, আমি কি বলব? তবে—তবে—কথাটা যেন—"

সারাদিন নলিনীর মনটা খারাপ হইয়া রহিল। রাত্রি ৮টার পর যখন প্রফুল্ল ঘরে ফিরিল, তখন নলিনীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর—যেন বর্ষার বারিভরা মেঘ। প্রফুল্লের প্রাণ উড়িয়া গেল। জানিতে পারিয়াছে না কি ইহারা? সারাদিন সত্যদের আড্ডায় দোরে খিল দিয়া হাড় চালিয়া সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরিবার কথা কি লোকজানাজানি হইয়া গেল!

নলিনী রন্ধনকার্য্যেই ব্যাপৃত রহিল অথবা সেই অছিলায় স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল না, তাহা তাহার স্বামী ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণী সুদ সমেত পুষাইয়া দিলেন,—"সারাদিন মেহনতে খুবই ছেরম হয়েছে বাবা, না?" তাঁহার অধরকোণে কি ক্রূর হাসির রেখা খেলিয়া গেল?

ভয়ে প্রফুল্লের মুখ শুষ্ক হইল। তথাপি কোনমতে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "হাঁ, একটু হয়েছে বৈ কি। তা, ও কিছু না, অমন অভ্যেস আছে! হাঁ বলছিলুম কি, হাঁগো, ওগো, শোন না একবার, আমার ছাড়বার কাপড়খানা? বলি শুনছ?"

নলিনী কোন জবাব দিল না। সে নিঃশব্দে আলনার উপর হইতে কোঁচান কাপড়খানা পাড়িয়া দিয়া আবার

নিঃশব্দে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। প্রফুল্ল অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ইহা হইতে যে তাসখেলা সহস্রগুণে ভাল ছিল! সে রসুইঘরের দ্বারে গিয়া আবার ডাকিল, "নলি, আমার ডান কাঁধে ব্যথা ছিল মনে আছে? ওঃ আজ যেন সেটা কুকুরে চিবুচ্ছে! তুমি বল হাড় চেলে চেলে। শেষ বাজীতে হারুদা চকের একটা আড়ি—"

বলিয়াই প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইয়া নীরব হইল। কি সর্ব্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! সুশীল সুবোধ স্বামিমাত্রেই তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা, হাসি-কান্নার কথা, সম্পদ-বিপদের কথা আগে পত্নীর কাছে বলিয়া মন খালাস করিয়া থাকে। প্রফুল্লও তাহাই করিত। আজ তাই শেষ বাজী জিতিবার আনন্দের ভাগ সে মনের আনন্দে পত্নীকে দিতে যাইয়া মাঝপথে হঠাৎ আফিসের কথাটা স্মরণ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

এইবার তাহার কি শাস্তি বিহিত হইবে—ফাঁসী না পুলিপোলাও?

নলিনী সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "শেষ বাজীতে চকের আড়ি? সে কি? আফিসেও হাড় চলে না কি?"

প্রফুল্ল প্রথমে ঘামিয়া উঠিলেও কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। প্রথমে খুব খানিকটা হো হো হাসিয়া লইল—এত হাসি যে, চোখ বহিয়া জল ঝরিল। প্রফুল্ল কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া শেষে বলিল, "ওঃ, সে ভারী মজা! শেষ বাজীতে চকের আড়ি মেরে বাজীটা জিতলুমই বটে। হারুদা প্রথম মুখে অর্ডার পায়নি বটে, কিন্তু শেষ মুখে মস্ত অর্ডারটা বাগিয়েছে। তাই ম্যানেজার বাবুর সামনে বলাবলি হচ্ছিল যে, ওঃ, জবর আড়ি মারা গেছে—চকের আড়ি জবর আড়ি কি না! ওরা আমার পাশাখেলার কথা জানে কি না!"

"এই যে বল্‌লে হারুদা আড়ি মেরেছে?"

প্রফুল্লের চক্ষু দুটি ছানাবড়ার আকার ধারণ করিল। একটা মিথ্যা কথা বলিয়া দোষ ঢাকিতে গেলে যে পাঁচটা মিথ্যা বলিতে হয়, তাহা এবার সে হাড়ে হাড়ে বুঝিল, তাড়াতাড়ি বলিল,—"হাঃ হাঃ হাঃ! তা তোমরা জান্‌বে কি ক'রে! আফিসের দালালের নাম যে হারাণ বাবু—আমরা বুড়ো ব'লে হারুদা হারুদা করি।"

প্রফুল্ল মিথ্যাটা সদ্যসদ্য বানাইল বটে, কিন্তু মনে মনে দুর্গানাম জপিতেছিল.—"হে মা! যেন সত্যদের আড্ডায় পেশুড়ে হারুদার নাম এরা কখনও শুনতে না পায়!"

যাহা হউক, বিপদ কাটিয়া গেল। আর জেরা চলিল না। তবে আর এক বিপদ অন্যদিক্ হইতে উপস্থিত হইল। শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এইবার অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আফিসের কায ক'রে এলে, বাছা?"

"হাঁ, এলুম ত।"

"ক'রে এলে তা হ'লে।"

"হাঁ হাঁ, কতবার বলবো?"

"ওঃ!" কথাটা বলিয়া প্রসারিত গলাটি আবার সঙ্কুচিত করিয়া শ্বশ্রূমাতা স্বকার্য্যে গমন করিলেন।

৪

এইভাবেই দুই চারি দিন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে লুকোচুরি চলিল। কিন্তু চিরদিন কভু সমান না যায়! একদিন নলিনী বলিল, "তোমার ছুটীতেও এত খাটতে হয়?"

"কায পড়লেই হয়।"

নিকটেই শ্বশ্রূমাতা বোধ হয় আড়ি পাতিয়া শুনিতেছিলেন; অগ্রসর হইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ও!"

প্রফুল্ল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও? ও-কি?"

শাশুড়ী বলিলেন, "ও—ও! ও আবার কি—ও! ও বল্‌তে বোধ হয় কোন বাধা নেই কারো?"

"না, পাঁচশ' বার বলুন না---ও! তবে আমার [illegible] পিঠে—"

নলিনী মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল, স্বামীকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

ইহার পর এক দিন প্রফুল্ল কেবল দিনের নহে, রাত্রিরও ছুটী চাহিল। সে দিন আফিস খুলিবে—লাকি ডে, লক্ষ্মী বার,—সত্যই কোজাগর পূর্ণিমা। সে দিন রাত্রিকালে আফিসে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ; সুতরাং আফিসের কর্ত্তাকেও থাকিতে হইবে।

আফিসের কায, সুতরাং মা চক্ষুর অনেক ইঙ্গিত করিলেও নলিনী স্বামীকে বাধা দিতে পারিল না। প্রফুল্ল সে দিন সকাল সকাল খাইয়া সহরে চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, তাহার পরদিন প্রভাতে বাড়ী ফিরিবে।

প্রফুল্ল পর দিন যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার মন বড়ই প্রফুল্ল—কারণ, কাল সমস্ত দিন তাহার স্ত্রীর সহিত তাস খেলিতে হয় নাই। সে বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে 'রাজবাড়ীর' পরিচারিকা নন্দিনীর সাক্ষাৎ পাইল। সে সানন্দে বলিল, "হাঁ গা বাছা, তুমি কত মাইনে পাও।"

নন্দিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বাবু, তুমি জান নি? রাজবাড়ীতে পেতাম ১২৲ বারো টাকা, খোরপোষ বাদে।"

প্রফুল্ল বলিল, "বটে! আচ্ছা, এখানে তুমি ১৪৲ চোদ্দ টাকা ক'রে পাবে।"

নন্দিনী একগাল হাসিয়া বলিল, "তা তোমরাই ত দেবে বাবা। রাণীমা কত দিতো-থুতো বাছা। তা বলি, হেথাকে তেমন পাওনা-থোওনা—"

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বলিল, "পাবে, পাবে, একটু বুদ্ধি খাটালেই পাবে বাছা; রাজবাড়ীর লোক—সেটা এদ্দিনে বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছ।"

প্রফুল্ল আর অপেক্ষা না করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। তখন মায়ে-ঝিয়ে কি গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। দেখিয়াই প্রফুল্লের সদাপ্রফুল্ল মুখ হঠাৎ শুকাইয়া উঠিল।

নলিনী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিল, "এই এলে? তা, কেমন আমোদ-আহ্লাদ হ'ল?"

"ওঃ—খুব। সে আর কি বলবো!"

"আফিসের বাবুরা সব এসেছিল?"

"আসে নি? সব, সব,—কেউ বাদ যায় নি।"

"ম্যানেজার বাবু, দালাল বাবু?—"

"সব। ম্যানেজার বাবুই ত খাওয়ানো-দাওয়ানোর বন্দোবস্ত করলেন, গান-বাজনার ব্যবস্থার ভারটা ছিল দালাল বাবুর হাতে।"

এই সময়ে শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দালাল বাবুটা কে?"

"ঐ যে নিতাই বাবু। সে দিন বলেছিলুম শোনেন নি?

শাশুড়ী চোখের কোণে ক্রূর হাসি টানিয়া বলিলেন, "সে যে বল্‌লে হারুদা?"

"এঃ, তাই না কি? আরে সে যে বড় দালাল, নিতাই তার এসিষ্টেণ্ট—ছোক্‌রা কি না, গান-বাজনার বন্দোবস্তের ভার তার ওপর ছিল।" প্রফুল্ল ঘামিয়া উঠিল।

নলিনী এতক্ষণ রুদ্ধ ক্রোধ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, এইবার ফোঁস করিয়া গজরাইয়া উঠিল, "মিথ্যেবাদী! জোচ্চোর! আপিসে খাওয়ানো-দাওয়ানো হচ্ছিল? জোচ্চুরীর আর যায়গা পেলে না? চল মা, এ জোচ্চোরের বাড়ী থেকে চ'লে যাই।"

বেচারা প্রফুল্লের তখন কি অবস্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়, সে যে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল উহাই আশ্চর্য্য! সে একরূপ মাতালের মত টলিতে টলিতে পত্নীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, উদ্বেগ-কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি অপরাধ করলুম, নলি! তাও বলবে না?"

শাশুড়ী ততক্ষণ ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

"অপরাধ? না করেছ কি? আফিসে লক্ষ্মীবার, খাওয়া-দাওয়া, গানবাজনা!—জোচ্চোর, তোমার সব মিথ্যে?"

"এঁ্যা, এঁ্যা, তা যে হয় নি—তা ত—"

"থাম মিথ্যেবাদী! তা হ'লে এর আগেও আফিসের কায মিথ্যে?"

প্রফুল্ল কাতরস্বরে বলিল, "কি মিথ্যে, নলি?"

নলিনী বলিল, "এই চিঠিখানা পড় দেখি।"

সর্ব্বনাশ! এ যে ম্যানেজার বাবুর স্বহস্ত-লিখিত পত্র, তিনি দেশ হইতে লিখিতেছেন, লক্ষ্মীবারের পরদিনে আফিস খোলার বন্দোবস্ত হইলে যেন ভাল হয়। তিনি ঐদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন।

নলিনীর অভিমান হৃদয় বহিয়া চক্ষু দিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। প্রফুল্ল অপরাধী আসামীর মত তাহার অনুসরণ করিল।

সে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "নলি, আমায় ক্ষমা কর। আমি সবই খুলে বলছি।" তখন সে একে একে সকল ঘটনাই বিবৃত করিল। তখন নলিনীর মুখে হাসি ফুটিল। সে বলিল, "ওমা, এর ভেতরে এত কাণ্ড? তাস খেলবার ভয়ে এই জুচ্চুরি! আমি বলি, আর কিছু! তা হ'লে ত মা'র কথা আর শুনবো না। ছিঃ ছিঃ, এত ছোট মন!"

প্রফুল্ল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি মনে করেছিলে, আমার স্বভাব বিগড়ে গেছে? হাঃ হাঃ!

তা, কাল থেকে আবার দু'জনে কিছুক্ষণ বিস্তিই খেলবো, কি বল ?"

নলিনী বলিল, "না, আর তাস খেলবো না, ঐ থেকেই ত ঝগড়ার সুরু। ও ছাই আর ছোঁবো না।"

"হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন হ'ল যে ?"

"হঠাৎ নয়, নন্দিনী আমার তাস খেলার মোহ ছাড়িয়েছে।"

"কে, রাজবাড়ীর ঝি ?"

"হাঁ গো। সে-ই ত বল্‌লে, রাণীমা বলতেন, তাস খেলা ছোটলোকের কায, মেয়েমানুষ পুরুষের সঙ্গে তাস খেলে, ছিঃ !"

"বটে ! তবে ত নন্দিনী ভাল।"

* * *

বাহিরে—বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র নন্দিনীর গলার তীব্র ঝঙ্কার শুনিয়া প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আবার কি হইল ?

সে দেখিল, নন্দিনী গর্‌গর্ করিতে করিতে দ্রুতপদে আসিতেছে, তাহার শ্বশ্রূমাতাও বস্ত্রাঞ্চল সংযত করিতে করিতে তাঁহার ঘরের দিকে যাইতেছেন। বৃদ্ধার আননে ভ্রূকুটী-চিহ্ন।

নন্দিনী কাছে আসিতেই প্রফুল্ল বলিয়া উঠিল, "কি হ'য়েছে ঝি ?"

"না বাবু, এখানে আমার পোষাবে নি। মা'র যদি এখানে থাক্‌লে আমি থাক্‌বো নি। রাজবাড়ীতে এমন কক্ষণো দেখি নি, বাবু !"

প্রফুল্লের আনন সহসা আনন্দালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল বল না, বাছা ?"

"বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে গিন্নীমার ঝগড়া বাধান—ওমা ছিঃ ছিঃ।"

"নন্দিনী, তোমার এক হাতে তাগা, আর এক হাতে আর এক গাছা হ'লে কেমন মানায় ?"

"কেন গো বাবু, তুমি দেবে না কি ?"

"হাঁ গো হাঁ, কালই বাঁশী সেকরাকে ডেকে মাপ দোবো।"

"তা দিও, কিন্তু মা'র মাকে বাড়ী পাঠাতে হবে, না হ'লে আমি ত থাকছি না, বাবু। আজই মাকে বোলছি গিয়ে।"

ঠিক সেই সময়ে নলিনী সেখানে দেখা দিল, বলিল "মা'র যাবার কথা বলছ, নন্দিনী ? তোমায় বল্‌তে হ'ল না, আমিই কাল পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সুখের সংসারে সোয়াস্তি ভাল !"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উন্মেষে

ফুটিয়া উঠিল ধীরে,
মানস-সরসী-নীরে,
কুসুমের কলি।

সুবাসে মাতিল প্রাণ,
করিবারে মধুপান,
ধায় চিত্ত-অলি॥

উঠে প্রেম উথলিয়া,
আবেশে অবশ হিয়া,
সে সুখ-পরশে।

তড়িত প্রবাহ ছুটে,
বিরহ বেদনা টুটে,
মধুর হরষে॥

পুলকে আপন-হারা,
বিভোর পাগল-পারা,
মদির স্বপনে।

সার্থক জীবন আজ—
বাঁচি আর কিবা কায,
বরিব মরণে॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস

চয়ন



সমুদ্রচারী ত্রিচক্রযান

নিউইয়র্কের জনৈক বৈজ্ঞানিক যুবক সমুদ্রে গমনাগমনের উদ্দেশ্যে এক অভিনব ত্রিচক্রযান নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই



সমুদ্রচারী ত্রিচক্রযান

ত্রিচক্রযান এমনভাবে নির্ম্মিত যে, জলের উপর আপনা হইতেই ভাসিয়া থাকে, কোন দিকে হেলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এই যানে যে মোটর সন্নিবিষ্ট আছে, তাহার সাহায্যে ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে ত্রিচক্রযান সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিতে পারে। পোতাদির সাহায্য ব্যতীত সমুদ্র-ভ্রমণের সখ মিটাইবার জন্যই বৈজ্ঞানিক এই নূতন ত্রিচক্রযান সৃষ্টি করিয়াছে।

সর্পাকৃতি বাদ্যযন্ত্র

বর্ত্তমান যুগে বিচিত্র-দর্শন কোনও প্রকার বাদ্যযন্ত্র সচল নহে। সর্পাকৃতি বাদ্যযন্ত্র ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সামরিক



সর্পাকৃতি বাদ্যযন্ত্র

বিভাগে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালের সৌন্দর্য্যানুরাগ এরূপ বাদ্যযন্ত্রকে অসুন্দর বলিয়া নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিবে। তথাপি বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এই যন্ত্র হইতে অতি সুমিষ্ট ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে। ইহা দারুনির্ম্মিত।

চতুষ্কোণ বাঁশী

সাধারণতঃ সকলপ্রকার বাঁশী গোলাকার, কিন্তু সম্প্রতি চতুষ্কোণ বাঁশী নির্ম্মিত হইতেছে। উদ্ভাবনকারী বলেন যে,



চতুষ্কোণ বাঁশী

গোলাকার বাঁশী অপেক্ষা চতুষ্কোণ বাঁশী হইতে অধিক ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে। শব্দ-পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা দুই শ্রেণীর বাঁশীর শব্দ পরিমাপ করিয়া স্থির হইয়াছে যে, চতুষ্কোণ বাঁশী হইতেই অধিকতর ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে।

বিচিত্র বস্ত্রাবাস

সম্প্রতি মার্কিণ দেশে এক প্রকার বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার কোনও আশ্রয়দণ্ড নাই। চারি মিনিটের

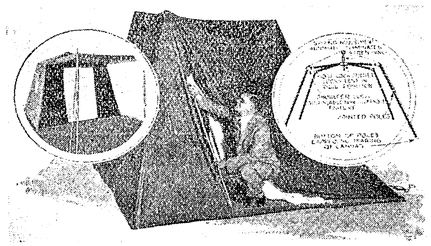

বস্ত্রাবাস ব্যবহারের প্রণালী

মধ্যে এই বস্ত্রাবাসকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া যায়। শুধু সম্মুখভাগে মাত্র দুইটি দণ্ড থাকে। বস্ত্রাবাসের ফ্রেম ও বস্ত্রভাগ স্বতন্ত্র আধারে রক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে কাপড়ের অংশ নষ্ট হয় না।

মূল্যবান্ সিংহাসন

তুরস্ক সরকারের একটি মূল্যবান্ সিংহাসন আছে। বহু যত্নে এই সিংহাসন সুরক্ষিত। পারস্যের শাহগণ এই

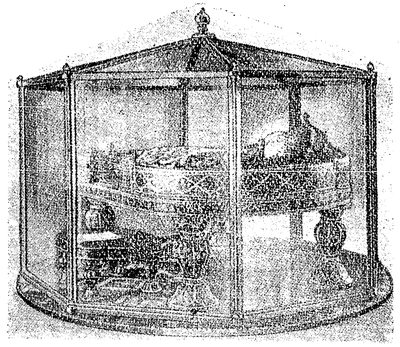

মূল্যবান্ সিংহাসন

সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেন। উহার মূল্য প্রায় সাড়ে চারি কোটি টাকা। নানাবিধ মূল্যবান্ হীরা, পান্না, চুণি প্রভৃতির দ্বারা সিংহাসনখানি শোভাগারে রক্ষিত হইয়াছে।

কাচ-পরিষ্কারক ঝাড়ন

মার্কিণের বাজারে অধুনা রাসায়নিক দ্রব্য-মিশ্রিত এক প্রকার



রাসায়নিক ঝাড়ন

ঝাড়ন বিক্রীত হইতেছে। এই ঝাড়নের দ্বারা কাচমাত্রই অতি চমৎকাররূপে পরিষ্কার করা যায়। বাতায়নের শার্শি

মোটর গাড়ীর কাচের আবরণ, দর্পণ প্রভৃতির উপর ঘর্ষণ করিলে স্বল্পায়াসেই সমস্ত ময়লা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সাবান, এমোনিয়া, সোডা প্রভৃতির সাহায্যে কাচ পরিষ্কার করিলে যে ফল পাওয়া যায়, ইহা ব্যবহারে তদপেক্ষা ভাল ফল দৃষ্ট হয়।

জলের মধ্যে রেডিও সঙ্গীত শ্রবণ

জল সন্তরণকালেও রেডিও সঙ্গীত শ্রবণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্তরণকারীর কর্ণদেশে—রবার-নির্ম্মিত পরিচ্ছদের উপর



সন্তরণকারীর বেশসংলগ্ন রেডিও যন্ত্র

'ইয়ার ফোন্' সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সন্তরণকারীরা শব্দগ্রহণকারী যন্ত্রের সহিত কাণের সহিত লগ্ন যন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিলেই সন্তরণকালেও দূরবর্ত্তী স্থানের সঙ্গীত শ্রুত হইবে। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এক বিমানপোতে যখন রেডিও সঙ্গীত চলিতেছিল, সেই সময় জনৈক সন্তরণকারী ঐরূপ ভাবে সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়াছিল।

যষ্টিমধ্যস্থ আগ্নেয়াস্ত্র

জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেতের যষ্টির মধ্যে এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যষ্টির মুখ কয়েক ইঞ্চ টানিয়া লইয়া উহার মধ্যস্থ আগ্নেয়াস্ত্রে গুলী ভরিবার ব্যবস্থা আছে। যষ্টির গাত্রসংলগ্ন একটা গোলাকার পদার্থ ঘুরাইয়া লইলে বন্দুকের কোঁড়া দৃষ্ট হইবে। এই আগ্নেয়াস্ত্রের

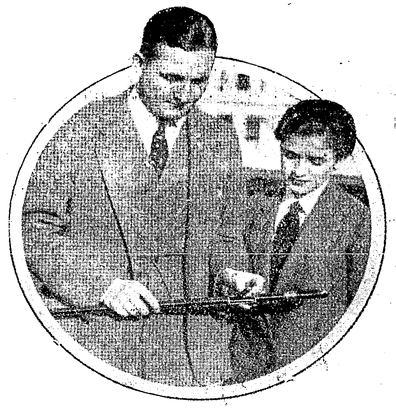

যষ্টিমধ্যস্থ আগ্নেয়াস্ত্র

সাহায্যে দস্যুদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করা যায়। সাধারণ ভ্রমণ-যষ্টি অপেক্ষা ইহার ভার অধিক নহে। ফরাসীদেশে এইরূপ আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল প্রচলন হইতেছে।

গাছের গুঁড়ির মধ্যে মোটর



বৃক্ষ-কোটরে মোটরের আস্তানা

কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত এক স্থানে বহু শত বৎসরের এক বিরাট বৃক্ষ ভূপতিত হইয়াছে। এই বৃক্ষের পরিসর এমন বৃহৎ যে, উহার ফাঁপা অভ্যন্তরভাগে দুইখানি মোটরগাড়ী অনায়াসে রাখিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে ঝড়বৃষ্টির সময় মোটরগাড়ী ইহার মধ্যে রাখা হইতেছে।

ঔষধপ্রয়োগে বৃক্ষ-পরিচর্য্যা

ব্যাধিপীড়িত বৃক্ষকে রোগমুক্ত করিবার জন্য এত দিন প্রতীচ্যদেশে নানাবিধ ঔষধ বৃক্ষের তলদেশে সেচন করার ব্যবস্থা ছিল। অধুনা জার্ম্মাণীর জনৈক উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ বৃক্ষের গাত্র ভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ১২ শত বৃক্ষে এই উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিস্ময়জনক সুফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে বৃক্ষের সর্ব্বদেহে ঔষধ শীঘ্র সঞ্চারিত হইয়া প্রভূত উপকার সাধিত হয়।



বৃক্ষদেহে ঔষধপ্রয়োগ

সঙ্গীত-মন্দির

আমেরিকার এক প্রদর্শনীক্ষেত্রে এক বিচিত্রদর্শন সঙ্গীত-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের উচ্চতা ২ শত ফুট এবং প্রায় ২০ হাজার হীরকবৎ সমুজ্জ্বল কাচের সমাবেশ ইহাতে আছে। রাত্রিকালে ৮০ লক্ষ বাতির শক্তিবিশিষ্ট উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকধারা মন্দির-চূড়া হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি কারুকার্য্যখচিত আধারের মধ্যে ছয়টি ফনোগ্রাফ যন্ত্র সংরক্ষিত। এই ফনোগ্রাফ যন্ত্রগুলি বিশেষভাবে নির্ম্মিত। বৈদ্যুতিক

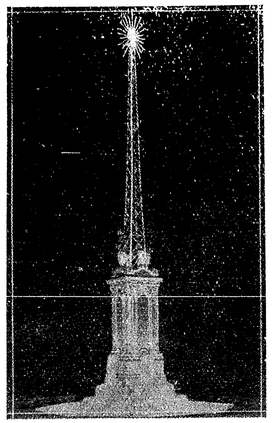

রত্নখচিত সঙ্গীত-মন্দির

কোম্পানী যন্ত্রগুলির শব্দ বর্দ্ধিত করিবার জন্য আনুষঙ্গিক বিশেষ ব্যবস্থাও করিয়াছেন—উহাদের সংলগ্ন ধ্বনি-বিস্তারকারী কলগুলি হইতে বহু দূরে সঙ্গীত-ধ্বনি প্রসৃত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ-মাইল দূর হইতে যন্ত্রোত্থিত সঙ্গীতধ্বনি সুস্পষ্ট কর্ণগোচর হয়। মন্দিরে যে জলাধারগুলি রক্ষিত আছে, তাহা হইতে বাষ্পধারা সমুত্থিত হইবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও রহিয়াছে। ঐ বাষ্পধারা যখন ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হয়, তখন নানা বর্ণের আলোক-সম্পাতে উহা অতি মনোরম দেখায়। কাচের রত্নগুলি আকারে দুই ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট।

কাগজনির্ম্মিত জলনিবারক অঙ্গাবরণ

জল নিবারক কাগজের সাহায্যে এক প্রকার অঙ্গাবরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য কাপড়ের ন্যায় অঙ্গে আঁটিয়া থাকে না, তাহাতে শরীর স্নিগ্ধ থাকে। কাগজের এই অঙ্গাবরণ অতি লঘু



কাগজের জলনিবারক অঙ্গাবরণ

ভার এবং সহজে ভাঁজ করিয়া রাখা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলনিবারক কাগজের এত উন্নতি ঘটিয়াছে যে, তদ্দ্বারা সন্তরণের উপযোগী পোষাকও নির্ম্মিত হইতেছে।

বিচিত্র যাদুঘর

কালিফোর্ণিয়ার কোনও সহরে ভারতীয় দুর্লভ পদার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি যাদুঘর আছে। এই নাতিবৃহৎ অট্টালিকা একটি প্রকাণ্ড পাথরের উপর নির্ম্মিত। পাথরটি এমন কৌশলে অবস্থিত যে, উহাকে যে কোনও ব্যক্তি হাত দিয়া এ-দিক ও-দিক সরাইয়া দিতে পারে।

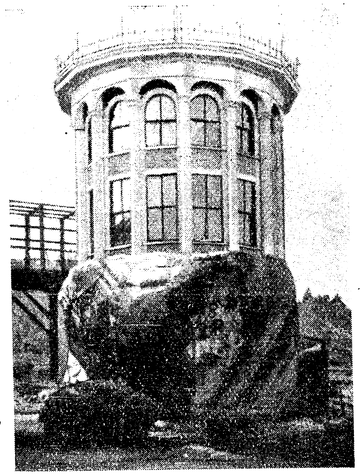

বিচিত্র যাদুঘর

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

আমেরিকার জনৈক শিল্পী বিভিন্ন মোটরগাড়ী ও এঞ্জিনের পরিত্যক্ত অংশের সাহায্যে এক বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২২টি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র একত্র সন্নিবিষ্ট—সঙ্গীত-শিল্পী একাকী একই সময়ে মুখ, হাত, পা, জানুর সাহায্যে উহা হইতে অপূর্ব্ব স্বরলহরীর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বেহালা, বাঁশী প্রভৃতি নানাবিধ তারের সঙ্গীত-যন্ত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। উদ্ভাবনকারী ব্যতীত অন্য কেহ এই যন্ত্র সাহায্যে সুর সৃষ্টি করিতে পারেন না।

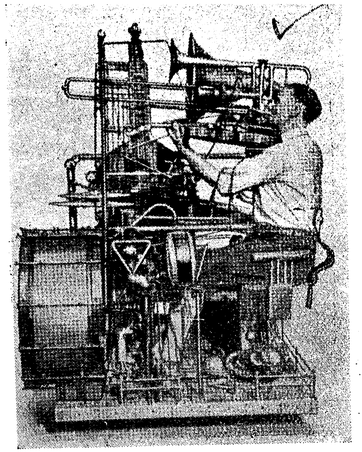

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

শৃঙ্গী ছাগ

হিমারণ্যের উত্তুঙ্গ শৈলে এক প্রকার আরণ্য ছাগ দৃষ্ট হয়, ইহাদের শৃঙ্গ অতি বিচিত্র। স্ক্রুপের পেঁচের আকারে ছাগশৃঙ্গ ঠিক ইংরাজী 'ভি' (V) অক্ষরের ন্যায় দেখিতে। এই শৃঙ্গগুলি প্রায় তিন ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই জাতীয় পার্ব্বত্য ছাগ যেখানে বিচরণ করে, তাহা দুরধিগম্য। এই জাতীয় ছাগ অত্যন্ত দুর্লভ।



শৃঙ্গী ছাগ

রূপসজ্জাহীন মুখভাব



'তাই তো'—(ভাব)



'আজ্ঞে—তা—তা—তা'—(পেটাতে)



'বা'—(আনন্দ)



'অ্যাঁ?'—(ভয়)



'ইস্‌স্'—(যন্ত্রণা)

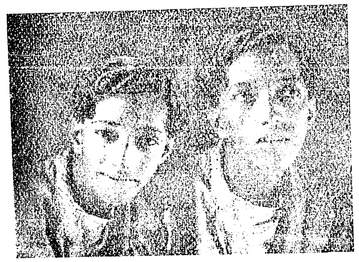

'কি বাবা'—(গোলাপী নেশা) 'ভগবান্'—(হতাশ)

ভাব-প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু।
আলোক-চিত্রকর—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



লুৎফ-উন্নিসা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নূতন নূরবাঈ

রাত্রির তৃতীয় প্রহর শেষ হইবার অল্প পরেই নূরবাঈয়ের এক জন ভৃত্য ব্যস্ত হইয়া দিল্লীর দরওয়াজার পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিল। তখন মজলিস্ শেষ হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলে প্রাসাদের বাহিরে আসেন নাই। দিল্লীর প্রাসাদের উভয় ফটকে তখনও অসংখ্য পাল্কী ও তঞ্জাম অপেক্ষা করিতেছিল। ফুলাদ খাঁর দস্তক ও হুকুমনামা দেখিয়া প্রহরীরা ভৃত্যকে পথ ছাড়িয়া দিল। পথে মুবারক-মঞ্জীলের সম্মুখে এক জন খোজা তাহাকে বলিয়া দিল যে, নর্ত্তকীরা লাহোর ফটকের সম্মুখে যায়গা পাইয়াছে।

সে সময়ে ভীমমূর্ত্তি লাহোর ফটকের সম্মুখে ভীষণদর্শন নকারাখানার পার্শ্বে অনেকগুলি রক্ত-প্রস্তরের প্রাসাদ ছিল, সিপাহীবিদ্রোহের পরে সেগুলি ভাঙ্গিয়া ইংরাজের সেনা-নিবাস তৈয়ারী হইয়াছে। মজলিস ভাঙ্গিবার পরে বাদশাহের বাদশাহ নাদির শাহের হুকুম শুনিয়া হতভাগিনী নূরবাঈ একটি প্রাসাদের ছাদে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তখনও মুজরার পোষাক ছাড়ে নাই, শত শত আমীর-ওমরাহের প্রদত্ত বহুমূল্য রত্নালঙ্কার তখনও তাহার অঙ্গে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝক ঝক করিতেছিল,দূর হইতে তাহা দেখিয়া তাহার ভৃত্য সেই দিকে চলিল। সে প্রাসাদের নীচে দাঁড়াইয়া নূরবাঈয়ের পরিচারিকাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, পরিচারিকা নামিয়া আসিলে ভৃত্য তাহাকে বলিল যে, সে বাড়া হইতে আসিয়াছে, বিশেষ জরুরী খবর আছে। পরিচারিকা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, তখন ভৃত্য তাহাকে হিন্দীতে বলিল, "গিয়ে বল, আমি বাঙ্গালী রাজা, চাকর সেজে এসেছি।" পরিচারিকা প্রথমে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু নীচের তলার অন্ধকারে ইরাণী প্রহরী তাহা দেখিতে পাইল না।

ছাদের উপরে গিয়া পরিচারিকা যখন নূরবাঈকে বলিল যে, বাড়ী হইতে এক জন চাকর আসিয়াছে, তখন নূরবাঈ হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে বে-আদবী হারামজাদী, চাবুক মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব!" নূরবাঈ তখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে বন্দিনী। কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বাঁদী তাহার মনিবের নিকটে গিয়া কানে কানে বলিল, "বাঙ্গালী রাজা।"

তৎক্ষণাৎ নূরবাঈ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, সে যে আত্মত্রাণের জন্য নিজে আহ্বান করিয়া আনন্দরামকে সিংহের গহ্বরে আনিয়াছে, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। বাঁদী তাহার অবস্থা দেখিয়া নিম্নতল হইতে পরিচারকবেশী আনন্দরামকে ছাদে ডাকিয়া আনিল। তাহাকে দেখিয়া নূরবাঈ চীৎকার করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আনন্দরাম তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "চুপ" এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার ফারসী ভাষায় বাঈ সাহেবের মুন্সী, হরকরা, গোলাম ও বাঁদীদিগের পলায়ন-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। ইরাণী প্রহরী একতলার দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই আনন্দরাম মাঝে মাঝে দুই একটা বাঙ্গালা বলিতে আরম্ভ করিল। কারণ, সে জানিত যে, গোলাপী নূরবাঈকে দুই একটা বাঙ্গালা কথা শিখাইয়াছিল।

ফারসীতে আক্রম জমান খাঁর আকণ্ঠ মদ্যপানে গোলাপীর দুর্দ্দশা, চাচীর পলায়নে বাঙ্গালার উকীল সরকার এনায়েৎ উল্লা খাঁর দুরবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ অনাবশ্যক কথা বলিতে বলিতে আনন্দরাম নূরবাঈকে পরিষ্কার বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিল যে, তাহার পরিচারকের পোষাকের নীচে সে নূরবাঈয়ের মজলিসী মুজরার একটা পেশোয়াজ পরিয়া আছে। নূরবাঈকে নীচে গিয়া পরিচারকের পায়জামা চাপকান, চোগা ও পাগড়ী পরিতে হইবে, অলঙ্কার আনন্দরাম পরিবে, তাহার পরে আনন্দরাম নূরব

ও নূরবাঈকে পরিচারক সাজিয়া ফুলাদ খাঁর দস্তক দেখাইয়া লাহোর ফটক দিয়া বাহিরে যাইতে হইবে। ফটকের বাহিরে পাল্কী আছে। তাহার পরে গোলাপী যাহা বলিবে, তাহাই করিতে হইবে। নূরবাঈ শুনিয়া গেল, কিছু বলিল না।

বাঁদী যখন তাহার হাত ধরিয়া দ্বিতলের অন্ধকার কক্ষে আনিল, তখন নূরবাঈ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। সে কিছুতেই পলায়ন করিতে রাজী নহে, সে নিজের তুচ্ছ জীবনের জন্য বাঙ্গালী রাজার জীবন নষ্ট করিবে না। সূর্য্যোদয় হইলেই ইরাণী প্রহরী তাহার ছিন্ন মুণ্ড শাহানশাহের দরবারে উপস্থিত করিবে। সে ভুল করিয়া ভয় পাইয়া বাঙ্গালী রাজাকে এখানে আনিয়াছিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, আনন্দরাম নূরবাঈয়ের কোন কথার জবাব দিল না, জোর করিয়া তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইল এবং নিজের পুরুষের পোষাক খুলিয়া দিয়া বাঁদীকে পরাইয়া দিতে বলিল। নূরবাঈ প্রথমে আপত্তি করিল, কিন্তু বাঁদী জোর করায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাহিরে ইরাণী প্রহরীর তন্দ্রা আসিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, নাচনেওয়ালীর কি হইয়াছে? বাঁদী তাঁহাকে গিয়া বুঝাইয়া আসিল যে, আটক পড়িয়া বিবি সাহেবের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

এক দণ্ড পরে আনন্দরাম স্বয়ং পরিচারকবেশী নূরবাঈকে ঠেলিয়া দুয়ার হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহাকে পরিচারক মনে করিয়া ইরাণী প্রহরী বা দিল্লীর বাদশাহী প্রহরীরা কিছুই বলিল না। লাহোর ফটকের বাহিরে আনন্দরামের পাল্কী ছিল, সে তাহাতে চড়িয়া নিজের গৃহে চলিয়া গেল। সে দিন তরকারি আনিতে আনন্দরামের অংশীদার বণিয়ার যাইবার কথা। বড় বড় বেগুনের বাজার ভিতরে বসিয়া সাহেবজাদা আক্রাম জমান খাঁ, গোলাপী ও নূরবাঈ দিল্লী শহর হইতে বাহির হইয়া গেল। গাড়ীগুলি যখন পুরাতন দিল্লীর সীমানায় পৌছিল, তখন এক জন ইরাণী সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া ফটকের নিকটে আসিয়া সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই পথে কি তরকারি আনিতে মহিষের গাড়ী গিয়াছে?" সর্দ্দার বলিল যে, "তাহারা এতক্ষণ নিজাম উদ্দীন পৌছিয়াছে।" সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাত্রিতে বদন সিংহের জাঠ সৈন্য পুরাতন দিল্লী লুঠিতে আসিয়াছিল, তাহারা ফিরোজ শাহের কোটলার নিকট সওয়ারকে একা পাইয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। তরকারির বাজরা মাল সমেত ওখ্‌লায় পৌছিয়া গেল।

নূরবাঈ লাহোর ফটক ছাড়াইয়া গেল কি না, দেখিবার জন্য আনন্দরাম অল্পক্ষণ পরে বাঁদীকে পাঠাইয়া দিল, বাঁদী যখন সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন কাক ডাকিতেছে ও জ্যোৎস্না ম্লান হইয়াছে। নূরবাঈয়ের সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া আনন্দরাম বাঁদীর সঙ্গে ছাদের উপরে গিয়া দাঁড়াইল, তখন ইরাণী প্রহরী একবার চোখ মুছিয়া চারিদিকে চাহিল, তাহার মনে হইল যে, দিল্লীর নাচনেওয়ালী তখনও সেই ভাবে ছাদে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। আনন্দরাম তখন পেশোয়াজ, আঙ্গরাখা বা ওড়না ও অলঙ্কার দ্বিতলের একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিয়া তাহার উপরে বালিস দিয়া একখানা চাদর চাপা দিল। নূরবাঈয়ের দুই জন বাঁদী প্রভুভক্ত, তাহারা মনিবের জন্য মরিতে প্রস্তুত ছিল, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে কিজিলবাশের পোষাক বাহির করিয়া পরিয়া আনন্দরাম যখন বাহিরে চলিয়া গেল, তখন ইরাণী প্রহরী তাহাকে চিনিতে পারিল না।

তখন পূর্ব্বদিকে আলো দেখা দিয়াছে, হিন্দুস্থানী ইরাণী সমস্ত প্রহরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেবল দুই জন দাঁড়াইয়া আছে। আনন্দরাম তাহাদিগের নিকটে গিয়া কাপড়ের মধ্য হইতে দুইটি চামড়ার বোতল বাহির করিয়া এবং তাহাদের বলিল যে, হিন্দুস্থানের বাদশাহ এই তাহার আরক তাহাদের উপহার দিয়াছেন। আনন্দরাম তাহাদের সঙ্গে এমন দ্রুতবেগে তাজা মাল টানিতে আরম্ভ করিল যে শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবার ভয়ে তাহারাও মাত্রা বাড়াইতে বাধ্য হইল। চারিদিক্ যখন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, তখন তিন জনেই মাতাল। চারিদিক নিস্তব্ধ, পথে লোকজন নাই, মজলিসে নিমন্ত্রিত আমীর-ওমরাহ চলিয়া গিয়াছে, আনন্দরাম অবশিষ্ট আরক প্রহরীদের হাতে দিয়া দিল্লী ফটক হইতে বাহির হইয়া পড়িল, কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

তখনও তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন। সে ফকির লুৎফ-উল্লার বাড়ীর গলির মোড়ে গিয়া দেখিল যে, ইরাণী ও তাতার সৈন্যে গলি ভরিয়া গিয়াছে, আফিমের নেশায় অচেতন লুৎফ-উল্লাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া লোক তাহার মাথায় ঢালিতেছে। আনন্দরাম দূর হইতে সরিয়া পড়িল। কিন্তু কালে খাঁর জন্য তাহার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাক্ষসী

যথাসময়ে প্রেমাস্পদের পশ্চাৎ চাচী ঘোড়ায় চড়িয়া ওখ্‌লা হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবে। রাত্রিতে সে এক মস্‌জেদে অন্ধকারে লুকাইয়া রহিল, কিন্তু প্রভাতে তাহার প্রেমাস্পদের বস্ত্র ধারণ করিয়া বসিল। কিজিলবাশ যুবা যে হিন্দু রমণীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, সে বেচারা কদাকার ও মধ্যবয়সী; সুতরাং সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হইল না। অল্পক্ষণ পরে যখন দিল্লী শহরময় গোল উঠিল যে, নর্ত্তকী নূরবাঈকে কে দিল্লীর বাদশাহের প্রাসাদ হইতে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন চাচী কিজিলবাশকে বুঝাইয়া দিল যে, আনন্দরাম বহুরূপী সাজে, সেই নূরবাঈকে বাদশাহের মহল হইতে ছদ্মবেশে লইয়া গিয়া ওখ্‌লায় রাখিয়া আসিয়াছে, তখন নির্ব্বোধ কিজিলবাশের চক্ষু হঠাৎ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে চাচীকে লইয়া কোতোয়ালীতে ফুলাদ খাঁর নিকট গেল। চাচী, ফুলাদ খাঁ ও তহমাস্প খাঁকে আনন্দরামের দুগ্ধ বিতরণ ও তরকারির ব্যবসার কথা খুলিয়া বলিল। নূরবাঈয়ের পলায়ন শুনিয়া নাদির শাহ ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংবাদ শুনিয়া তহমাস্প খাঁ তাঁহাকে জানাইতে প্রাসাদে চলিয়া গেলেন, চাচী ও তাঁহার প্রাণকান্ত ফুলাদ খাঁর নজরবন্দী রহিল। চাচীর কথা শহরময় রটিয়া গেল, কোতোয়ালীর দারোগা ফকির লুৎফ-উল্লা শাহকে গ্রেপ্তার করিতে ছুটিল, আনন্দরাম আজমীর ফটক দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে নূরবাঈ, গোলাপী ও আক্রাম জমান্ খাঁ ওখ্‌লার সরাইতে পৌছিলেন। পূর্ব্বের রাত্রির উৎপাতে ওখ্‌লা-নিবাসী গুজররা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, তাহাদের মণ্ডল বা চৌধুরী রমণীদিগকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী গ্রামে সরাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল, কিন্তু আনন্দরামের অনুমতি ব্যতীত পদ্মিনী ও তাহার পিতামহী কোনমতেই ওখলা ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অনেক কষ্টে চৌধুরী অন্য সকল রমণীকে উটের গাড়ী করিয়া এবং সঙ্গে জাঠ সওয়ার দিয়া ফরিদাবাদের দিকে রওনা করাইয়া দিল। লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহার পিতামহী রহিয়া গেল।

চাচীর বৃত্তান্ত নাদির শাহের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি আনন্দরামকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। বুদ্ধিমতী চাচী স্থির করিয়াছিল যে, পদ্মিনীকে ধরাইয়া দিলে এক তীরে দুই পাখী মারা যাইবে; প্রথম, তাহার পথের কণ্টক সরিবে এবং দ্বিতীয়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরাম ধরা পড়িলে সে পুরস্কার পাইবে। নির্ব্বোধ কিজিলবাশ তাহার মতলব বুঝিল না, সে মহানন্দে ওখ্‌লা লুঠিতে যাইবার দলে মিশিয়া পড়িল। চাচী তাহাকে একা ছাড়িল না, সে তাহার পরিণীতা পত্নী সাজিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ওখ্‌লা চলিল। গুজর ও জাঠদের উপদ্রবে অনেক ইরাণী মরিয়াছিল, নাদির শাহের হুকুমে দশ হাজার সওয়ার লইয়া আবদুল বাকী খাঁ ওখ্‌লা লুঠিতে চলিল। এ সংবাদ প্রচার হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না, পাহাড়গঞ্জে থাকিয়া আনন্দরাম সমস্তই শুনিল। সে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পাহাড়গঞ্জ হইতে ঘোড়া লইয়া খোলা মাঠ ও পুরাতন দিল্লীর ভিতর দিয়া নিজাম-উদ্দীনের দিকে ছুটিল, কিন্তু মুসলমান সাধু নিজাম-উদ্দীনের সমাধিতে পৌছিবার পূর্ব্বে অদূরে আগ্রার রাজপথে ধূলার মেঘ দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিল যে, ইরাণী সওয়ারদিগের পূর্ব্বে তাহার ওখ্‌লা পৌছিবার আশা বৃথা। সে অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া তোগলকাবাদের সম্মুখ দিয়া যখন ওখ্‌লার নিকটে পৌছিল, তখন দূর হইতে গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিতে পারিল যে, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে।

গুজররা রাজপথের নিকটের গ্রাম ছাড়িয়া আশে-পাশে বনে লুকাইয়া ছিল। দুই চারি জন আনন্দরামকে ঘোড়া হইতে নামিতে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিল। আনন্দরাম তাহাদিগের মুখে শুনিতে পাইল যে, গ্রামের চৌধুরী দুই তিনটি স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলকেই ইরাণী সওয়ার আসিবার পূর্ব্বে লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল, সে মনে করিল যে, হয় ত পদ্মিনী ও লক্ষ্মী বাঁচিয়া গিয়াছে। সে দুই চারি ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া ফরিদাবাদের দিকে চলিল এবং দুই দিন ধরিয়া ফরিদাবাদ হইতে বল্লমগড় পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রামে পদ্মিনী ও লক্ষ্মীর সন্ধান করিয়া বেড়াইল। গুজরদের কথা শুনিয়া সে ক্রমে

বুঝিতে পারিল যে, পদ্মিনী, লক্ষ্মী ও তাহাদের পিতামহী তাহার অনুমতি ব্যতীত ওখলার সরাই পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া ইরাণীরা কেবল তাহাদিগকেই দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আনন্দরাম হতাশ্বাস না হইয়া দিল্লীর দিকে ফিরিল।

চাচীর প্রাণকান্ত পদ্মিনীকে দেখিতে পাইয়া চাচীর বিপুল প্রেম একবারে ভুলিয়া গেল, সুতরাং চাচী পাগল হইয়া উঠিল। ওখ্‌লায় আনন্দরাম বা নূরবাঈকে ধরিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিজিলবাশ সর্দ্দাররা অসহায়া রমণী তিনটিকে হত্যা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধিমান্ আবদুল বাকী খাঁ তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেন নাই। চাচীর কিজিলবাশ পদ্মিনীকে কবিলারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবও আবদুল বাকী খাঁর মনঃপূত হয় নাই। সকলেই দিল্লীর দিকে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে প্রাণকান্তের পদ্মিনীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে চাচী এক বিষম বিপদ বাধাইয়া বসিল। সে মাথার কাপড় খুলিয়া সর্দ্দার আবদুল বাকী খাঁর সম্মুখে গিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়া উঠিল যে, কাফের রমণী তাহার ধর্ম্মপতিকে যাদু করিয়াছে, অতএব তাহাকে রজ্জু-বদ্ধ করিয়া পথিপার্শ্বের বৃক্ষশাখা হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হউক। বিচক্ষণ সর্দ্দার চাচীকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই কাফের রমণী পদ্মিনী আনন্দ-রামের স্ত্রী অথবা উপপত্নী। তিনি চাচীর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পদ্মিনীর ডুলীর চারিদিকে দুই শ্রেণী সওয়ার পাহারা লাগাইয়া দিলেন। তথাপি তাহার প্রাণকান্ত তাহার দিকে চাহে না দেখিয়া চাচী পাগল হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় চাচী তাহার প্রাণকান্তের দিকে এবং তাহার কিজিলবাশ প্রাণকান্ত পদ্মিনীর ডুলীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে চাহিতে দ্বিপ্রহর রাত্রির সময়ে নূতন দিল্লী শহরের দিল্লী ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোতোয়াল ফুলাদ খাঁর হুকুমে পদ্মিনী, লক্ষ্মী ও তাহা-দের পিতামহী কোতোয়ালীর সম্মুখে রৌশন-উদ্দৌলার মস্-জেদে বন্দী রহিল। প্রভাতে সংবাদ পাইয়া শাহানশাহ নাদির শাহ হুকুম দিলেন যে, নূরবাঈ অথবা আনন্দরাম আত্মসমর্পণ না করিলে তৃতীয় দিনে চাঁদনী চৌকের সম্মুখে পদ্মিনীকে, অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে। আনন্দরাম এই আনন্দ-সংবাদ পদ্মিনী দিল্লী পৌঁছিবার দুই দিন পরে নিজাম উদ্দীনের সমাধি-প্রান্তে শুনিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হিন্দুস্থানী বিশ্বাসঘাতক সাদৎ খাঁর পরামর্শে নাদির শাহ লুণ্ঠনমানসে দিল্লী আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই সাদৎ খাঁ ইরাণীর অসহ্য অত্যাচারে বিষপান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। অনেকে মরিয়াও পরিত্রাণ পায় নাই, তাহাদের স্ত্রী-পুত্র বন্দী হইয়া পারস্য দেশে যাইবার আদেশ পাইল। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা তখনও ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, আমাদের স্বজাতি ও স্বধর্ম্মী মারাঠা তখনও শস্যশ্যামল গৌড় দেশের ধনরত্নের সন্ধান পায় নাই; সুতরাং বাঙ্গালার উকীল-সরকার, তহমাস্প খাঁর নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ পাইলেন। এনায়েৎ-উল্লা খাঁ বাহাদুরের অবস্থা তখন সত্য সত্যই শোচনীয়, বৃদ্ধবয়সে তরুণী ভার্য্যার পলায়নে তাঁহার মন এত দূর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইলেও তিনি কিছুই রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। পথ হইতে ইরাণী প্রহরী যখন ইরাণের রাজমন্ত্রীর নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল, তখন পাঁচ লক্ষ টাকা দিবার হুকুম শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু তখনও তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নাজিমের উকীল, সুতরাং তহমাস্প খাঁ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না, শাহানশাহের দরবারে হাজির করিবার জন্য এনায়েৎ-উল্লা খাঁ বাহাদুরকে নজরবন্দী রাখা হইল। এনায়েৎ-উল্লা কারাগারে জলস্পর্শ করিল না, নমাজে আজান শুনিয়া উঠিল না, তাহা দেখিয়া সকলে স্থির করিল যে, বৃদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে।

তাহার পরদিন পদ্মিনীর কয়েদের তৃতীয় দিন। শাহানশাহ নাদির শাহ হুকুম দিয়াছেন যে, জুম্মার নমাজের পূর্ব্বে আনন্দরাম বা নূরবাঈ হাজির না হইলে পদ্মিনীকে দগ্ধ করা হইবে। সকালবেলায় দেওয়ান-ই-আমে শাহানশাহ নাদির শাহ ও হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহম্মদ শাহ বসিয়াছেন। দিল্লীর যে সমস্ত নাগরিক ইরাণী উজিরের হুকুমমত টাকা যোগাইতে পারে নাই, তাহাদিগের বিচার হইতেছে। সকলের সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাঙ্গালার উকীল

সরকার—এনায়েৎ-উল্লা খাঁ বাহাদুর দণ্ডায়মান। সহসা দরবার-গৃহের সম্মুখে এক রমণী "ফরিয়াদ, ফরিয়াদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ইরাণী নসকচী ও হিন্দুস্থানী আহদীরা তাঁহাকে থামাইতে পারিল না; অবগুণ্ঠন-শূন্যা এক যুবতী সুবর্ণের গুলালবারের সম্মুখে দাঁড়াইল। নাদির শাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি হইয়াছে? রমণী অমিশ্র ফারসীতে উত্তর দিল, তাহার স্বামীকে এক কাফের রমণী যাদু করিয়াছে, সুতরাং তাহার স্বামী আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, বাদশাহের বাদশাহ বিচার না করিলে সে দরবারে আত্মহত্যা করিবে। নাদির শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার স্বামী কোথায়? এক জন নসকচী চাচীর কিজিলবাশ প্রাণকান্তকে আনিয়া শাহানশাহের সম্মুখে হাজির করিল। তখন সহসা শুষ্ক-কণ্ঠোত্থিত উন্মত্তের উৎকট অট্টহাস্যে সেই প্রাচীন ধর্ম্মাধিকরণ কম্পিত হইয়া উঠিল। চাচী তাহা শুনিয়া একবার শিহরিল, তাহার পরে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ এনায়েৎ-উল্লা খাঁ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; পত্নীকে দেখিয়া বৃদ্ধের শুষ্কনেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়াছিল। কিন্তু নসকচী যখন তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নীর উপপতিকে গুলালবারের সম্মুখে আনিল, তখন বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে হিন্দুর ঈশ্বর বা মুসলমানের খোদা বৃদ্ধের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন। নাদির শাহ হাস্যের শব্দ শুনিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, এক জন ইরাণী নসকচী তাহাকে প্রহার করিতে আসিল। বৃদ্ধ তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিল্লীর বাদশাহী দরবারের রীতি অনুসারে উভয় বাদশাহকে তিনবার করিয়া কুর্ণীশ করিয়া বিশুদ্ধ ফারসীতে বলিতে লাগিল, "শাহানশাহ, মেহেরবান্, আমি ধন আর যুবতী স্ত্রীর শোকে পাগল হয়েছিলাম। আপনার ইরাণী সৈন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গিয়েছে ব'লে আপনার হুকুমে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে পারিনি। সেই অপরাধের জন্য আমার বিচার হবে। কিন্তু শাহানশাহ, আপনার মাথার উপরে—দুনিয়ার হাজার বাদশাহের উপরে আর এক জন শাহানশাহ বাদশাহ আছেন, আমার বিচারের ভার এখন তিনি নিয়েছেন। জনাব, আমি সুবা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নাজিমের উকীল, আমার বয়স ষাট বৎসরের উপর। বাল্যকালে বড় গরীব ছিলাম ব'লে আজীবন অর্থ-সঞ্চয় করেছি। প্রথম জীবনে বড় কষ্ট পেয়েছি ব'লে বৃদ্ধবয়সে সুখ কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল, সেই জন্য আজীবনের সঙ্গিনী বৃদ্ধা স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে দিল্লীতে ঐ যুবতীকে বিবাহ করেছিলাম। শাহানশাহ, খোদার আদালতে আমার বিচার আরম্ভ হয়েছে। তোমার লোক আমার যে অর্থ লুঠে নিয়ে গিয়েছে, তা তোমাকে দিতে পারিনি ব'লে তুমি আমার বিচার করতে চাও; পতিপ্রাণা সাধ্বীকে পরিত্যাগ ক'রে যে কসবীকে বিবাহ করেছিলাম, তার উপপতি তাকে গ্রহণ করছে না ব'লে সে তোমার কাছে বিচার চায়, তা-ও আবার আমার সম্মুখে! তোমার সাধ্য কি, তহমাস্প-কুলীন, যে আমাদের বিচার কর? এক দিন যেখানে তোমার নৃশংস অত্যাচার আর অসংখ্য মুসলমান-হত্যার বিচার হবে, সেইখানে আমার বিচার হচ্ছে। তোমার মাথার উপরে চেয়ে দেখ, ইরাণের শাহানশাহ, খোদার চোখ থেকে আগুনের সমুদ্র তোমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।"

নাদির শাহ সভয়ে দেওয়ান-ই-আমের রত্নখচিত ছাদের দিকে চাহিলেন। সেই মুহূর্ত্তে বৃদ্ধ এনায়েৎ-উল্লা খাঁন বাহাদুর শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে এক নসকচীর তলোয়ার লইয়া চাচীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং বস্ত্র-মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিয়া বিষ পান করিল। নসকচীরা ধরিবামাত্র বৃদ্ধের মৃতদেহ দরবার-গৃহের আচ্ছাদনের উপরে পড়িয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে শব দুইটি অপসারিত ও রক্ত ধৌত হইলে নাদির শাহ চাচীর প্রাণকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য বল, মৃত রমণী তোমার কে? তুমি কি একে বিবাহ করেছিলে?" কিজিলবাশ যুবা সভয়ে বলিল, "না জনাব, আমি একে বিবাহ করিনি।"

এই সময়ে সম্ভ্রান্ত আমীর-বেশধারী এক জন হিন্দু আসিয়া দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখে দাঁড়াইল; আরজবেগী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "ফরিয়াদ, খাস শাহানশাহের ফরিয়াদ।" তাহার পরে সে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শাহানশাহ, মেহেরবান্, হিন্দুরমণী তিনটি অনাথা, নিরপরাধ। আমি আনন্দরাম, আমি নূরবাঈয়ের পলায়নের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছি। বাদশাহ, অবলা রমণী বধ ক'রে নিজের নাম কলঙ্কিত করবেন না, পদ্মিনীর বদলে আমাকে কতল কর্‌বার হুকুম হ'ক।" [ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার দাদামহাশয়

প্রথম দেখা

যাঁরা আমার মন্ত্রশক্তি পড়িয়াছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আমার সেই গ্রন্থখানি আমি এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নামে উৎসর্গ করিয়াছি। সেই উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ—

"যাঁহার নিকট
বেদমন্ত্রের সৃষ্টি-স্থিতি-বিধায়িনী মহাশক্তির বিষয়
জ্ঞাত হইয়াছি,
যাঁহার
মন্ত্রশক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব নিজেও কতবার অনুভব করিয়াছি,
সেই
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিতুল্য
আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার
দাদামহাশয়ের
শ্রীচরণকমলে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ
ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে
অর্পণ করিলাম।"

আজ আমি যাঁকে হারাইয়াছি—আজ এই শোকবিদগ্ধ চিত্তে অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাঁর পবিত্র স্মৃতিপূত চরিত্র-কথার দু'চারিটি মাত্র লিখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীকে ধন্য করিতে—পবিত্র করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, সেই তিনিই আমার এই আরাধ্যতম, পূজ্যতম দাদামহাশয়;—আমার প্রাণদাতা পিতা, আমার শিক্ষাদাতা গুরু, আমার দুর্দ্দিনের বন্ধু, আমার স্নেহময় আত্মীয়।

তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়—আমাদের বড় স্নেহের ও বড় আশার সেজ ভাইটির কঠিন রোগের একবারে শেষ ভাগে। দেড় বৎসর ধরিয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বিখ্যাত ডাক্তারের দল—লিউকিস্, ক্যালভার্ট, ডি এন্ রায়, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতি এবং কাশীনরেশের কবিরাজ গণেশ দত্ত, উমাচরণ, অবশেষে অবধূতমতে চিকিৎসা এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, দেশের পর দেশে বায়ু-পরিবর্ত্তনে কোন ফল না পাইয়া পুরী হইতে রোগ যখন বর্দ্ধিতাকার ধরিয়া উঠিল, তখন ভবানীপুরে ফিরিয়া সহসা আমরা এত দিন পরে আমাদের প্রাণাধিকে জীবনের সম্বন্ধে যেন হতাশ হইবার উপক্রম করিলাম। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে কখনও পুরা সংসারী হইতে পারি নাই, ঈশ্বরে এবং মানুষে তখনও সমান বিশ্বাস। চিরদি আমরা যে শিক্ষায় মানুষ হইয়াছি, আমাদের রক্তের মধ্যে যে গভীর শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তার বীজ নিহিত ছিল, তাহা আমাদের ক'জনকে ঠিক অদৃষ্টবাদী হইতে দেয় নাই। আমা পিতামহদেব অতি শৈশবে অর্থ সহিত শিখাইয়াছিলে "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" পিতৃদেবে কাছেও এই উপদেশই সর্ব্বদা পাইতাম। দৈবকে দূ করিয়া আত্মশক্তিতেই প্রত্যয়শীল হইয়াছিলাম। আমাদে ক'ভাই-বোনের মা-বাপের এবং আমাদের বংশের গু স্নেহ ও কৃপাপরায়ণ যথার্থ সাধু ও সুধী ব্যক্তিবর্গের এ চেষ্টা, যত্ন ও ঐকান্তিক প্রার্থনায় এতটুকু একটি ছে প্রাণ যে রক্ষিত হইতে পারে না, বেদান্তশাস্ত্র পড়া থা লেও সে দিনে এমন বিশ্বাস আমার বা আমাদের কাহা ছিল না।

হঠাৎ যে দিন জানা গেল, রোগ এবার আর 'কন্ট্র সনে'ই আবদ্ধ নাই, 'লাংস'কে দখল করিয়া ফেলিতে তখন মাথায় যেন বাজ পড়িল।

এত চেষ্টায় কিছুই হইল না। রোগী তখন পূজ্য শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামীর হাতে। স্বামীজী এ রোগ আ করিয়াছেন, প্রমাণ পাইয়াই তাঁর শরণ লওয়া হইয়াছি তাঁর মন্ত্রশিষ্য, ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের স্থাপনকর্ত্তা, আমা পিতৃবন্ধু পূজ্যপাদ জ্ঞানানন্দ স্বামীজীর অনুরোধে তি সোমের চিকিৎসার ভার লইয়া তার পুরীধামের সঙ্গী হই ছিলেন।

ভবানীপুরে ফিরিবার পর ডাক্তারের মত শুনিয়া কাঁ তেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "প্রথম থেকেই ত আ বল্‌ছি, রোগ অসাধ্য, মিথ্যা শোক ক'রে কি হবে, যথাসা চেষ্টা ত সকলেই করছো, আমরাও করছি, এর বেশী মা ষের করবার ত কিছু নেই। আর কে বল্‌তে পারে যে, তু যার জন্য আজ কাঁদছো, সেই তোমার জন্য কাঁদবে না?"

আমি অবিশ্বাসে হাসিলাম। আমারও তখন অবশ্য অসুখ। টিউমারের চিকিৎসা কয়েক বৎসর হইতেই চলিতেছে। তখন 'ফাইনাল' ব্যবস্থায় আছি—ডাক্তার দাসের অধীনে। আমার মাসতুতো ভাই যতীন সেই বৎসর ডাক্তার হইয়াছে। দিদিমা'র বাড়ীতে আমরাও আছি, তারাও। সে এক দিন আমায় বলিল, "দেখুন ছোটদি, আজ ডাক্তার সুরেশ সর্ব্বাধিকারী বল্লেন, 'তোমার ভায়ের যে অসুখ, তাতে আর ত কোনই উপায় নেই, তবে যদি একটা উপায় তোমরা করতে পার, দেখ না। কাশীতে সোনারপুরায় এক জন আছেন। আগে বরাহনগরে থাকতেন, তাঁর হাতে এ রকম রোগ আরাম হ'তে আমি দেখেছি। এমন কি, আমার এক ভগ্নীপতির টাকার মত মাপের 'ক্যান্সিটী' হওয়ার পরেও তিনি বাঁচিয়েছিলেন। এখন সহজে কারুর চিকিৎসা করতে চান না, তবে বড় দয়ালু, তোমার মেসোমশাই গিয়ে ধরলে হয় ত ছাড়াতে পারবেন না।"



আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকার শশিভূষণ সান্যাল

সেইদিনই বাঁকিপুরে বাবাকে খবর দিলাম। বাবা তখন সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট, তা ছাড়া সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটও ছুটীতে গিয়াছেন। আমার সেজ ভাইকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। দেখা কেহ সহজে পায় না। সর্ব্বদা পূজা-পাঠ, লেখা ও যোগাদিতে নিমগ্ন থাকেন। তা' সত্ত্বেও অসংখ্য রোগী ও জ্ঞানপিপাসুর ভিড় লাগিয়া থাকে, সুযোগ পাইলেই ঢুকিয়া পড়ে। অবশ্য দ্বার রুদ্ধ বেশীর ভাগই থাকে এবং পাহারাও খুব কড়া। দেখা পাইল। সব শুনিয়া বলিলেন, "অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন আর আমি নিতে পারি না, তবে যদি ছেলেটি এখানেই থাকতো, তা' হ'লে একবার না হয় দেখতাম।"

কুমার বলিল, "আপনি দেখেন ত আমরা তাকে আনি।" তাহাতে মত করিলেন না। বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে, তার নবমে শনি, রন্ধ্রগত, বৃহস্পতিও অত্যন্ত দুর্ব্বল, জীবনের আশা নেই। মিথ্যা তাকে এত দূরে টেনে এনো না।"

সংবাদ পাইয়া এবং তাঁর শক্তি সম্বন্ধে আরও উপকৃত কয়েক জনের নিকট শুনিয়া আমরা কাশী যাত্রা করিলাম।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হইয়া গিয়াছে, বৃষ্টি একবারে নামে নাই, দুরন্ত গরম! অসির বাড়ীতে পৌঁছিয়া বেলা তিনটা আন্দাজ হইবে, কুমার, দিদিমা এবং আমি তাঁর কাছে চলিলাম। মন তখনও গভীর নৈরাশ্যে ভরা, জ্যোতিষশাস্ত্র যত দূর ঘাঁটা যায়, তা হইয়া গিয়াছে, নবগ্রহের যাগ, দান মহাসমারোহেই সম্পন্ন হইয়াছে, গ্রহদের ও তাঁদের ইষ্টদের সুবর্ণ, রজত, লৌহ, তাম্রমূর্ত্তি, বিচিত্র কৌষেয়, হীরক-মুক্তাদি রত্ন, সবৎসা গাভী, মহিষ আরও কত কি! শ্মশান-

কালীমন্দিরে লক্ষ লক্ষ জপ, চণ্ডীপাঠ, উজ্জয়িনীর মহাকালে, জগন্নাথের বিমলা মন্দিরে, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনীতে, কালীঘাটের কালীমন্দিরে, আমাদের বাড়ীর অন্নপূর্ণার কাছে, কাশীধামে তিন চ'ার স্থানে আরোগ্য-কামনায় স্বস্ত্যয়ন চলিতেছে। আর তদ্ভিন্ন আমাদের মনে মনে প্রতি শ্বাসে শ্বাসেই এই একমাত্র কামনা!

ইঁহার সম্বন্ধে যে সকল পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে এঁর যে ছবিখানি আমার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা একটি অত্যন্ত প্রবীণ, গম্ভীরপ্রকৃতি ডাক্তারের মূর্ত্তিই আমি পাইয়াছিলাম। গায়ে তাঁর হাত-কাটা সাদা বেনিয়ান, থানধুতী পরা, পাঁচটি প্রশ্নের পর একটি হুঁ বলেন, এই রকমের এক জন কেহ।

সেইমাত্র আহারাদির পর বসিয়াছেন, কাছে আছে বড় ছেলে কেবল, আর একটি শিষ্য-কন্যা বালিকা ইন্দিরা। এর বাপকেও তিনি থাইসিস্ হইতে ভাল করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় মারা গিয়াছে।

প্রথম দর্শনেই চমকিত হইলাম। এ কি দেখিলাম! এ কাকে দেখিলাম! এই কি পুরাতন ডাক্তারী-করা অধুনা কাশীবাসী, বেনিয়ান-পরা প্রাচীন লোকটি! যাঁর মুখে একটি বাক্য নাই, সর্ব্বদাই গম্ভীর হইয়া আছেন! হায় রে কল্পনা! সৌম্য, উদার, সুন্দর, মধুর—এ কি অপরূপ মূর্ত্তি! সূর্য্যের মত তেজঃপুঞ্জ, আবার শারদ-জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ এ মূর্ত্তি যে আমার বহু দিনের হারানো—আমার নর-রূপী দেবতারই···আমার পিতামহদেবের স্মৃতি ফিরাইয়া আনে! মুগ্ধ চোখে দেখিতেছি, দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন, "তোমরা কি তাকে এখানে এনেছ?"

সেই হাসিটুকু যেন চিরপরিচয়ের। একই ক্ষণে সমস্ত কুণ্ঠা এবং ভিতরের সকল অহংভাবই যেন সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ হাসির বাতাসে ঝরিয়া পড়িল। মাথা তাঁহার পদপ্রান্তে স্বতঃই নামিয়া আসিল।

উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। কুমারকে বলিলেন, "কেন নিয়ে এলে? আমি ত তোমায় বলেছিলাম, এত দেরীতে আমার আর কিছু কর্‌বার অবসর হবে না। যে সব ওষুধের দরকার, সে সব ক'রে তোলবার জন্য সময় চাই। কঠিন রোগের কঠোর বিধান, সে-ও দু'দিনের কায নয়। তার পর গ্রহের বিরুদ্ধেও দীর্ঘ অনুষ্ঠান করা দরকার। এঞ্জিন যখন ফুল ফোর্সে ছুটে বেরুচ্ছে, তখন কি তাকে টেনে ফেরানো যায়? সময় যে মোটে নেই। কে মিথ্যে আমায় কষ্ট দেবে? আমি যার ভার নিই, অমনি থেকেই নিই। বাঁচাতে না পারলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

আমরা নাছোড়বান্দা। কিন্তু কিছুতেই মত হইল না। কথায় কথায় বলিলেন, "তোমাদের আমি খুব ভালবাসি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার ভাই ভাল হোক। মানুষ মৃত্যুর দ্বার হ'তেও ফিরতে পারে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আর বেদমন্ত্রেই এই মৃতসঞ্জীবনীর শক্তি আছে, এ-ও আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি। আমার অবশ্য সে ক্ষমতা নেই, তবে আমি একান্তভাবেই প্রার্থনা করবো, তোমার পিতামহকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতেম, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। আর তোমাদের বাড়ীর একটি মেয়ের উত্তরপাড়ায় বিয়ে হয়েছে। সেই ছেলেটিকে যদিও আমি কখন দেখিনি, তবু মনে মনে ভালবাসি। বালিতে আমার বাড়ী, সেখান থেকে সে পাশ করেছিল, খুব ভাল ছেলে।"

আমারই স্বামীর নাম করিলেন।

দিদিমা বলিলেন, "শিখরের সঙ্গে ওরই বিয়ে হয়েছে।"

হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত তুমি আমার আপনার লোক গো! দেশের ভাল ছেলে ব'লে আমি তার খবর—নিবারণ চক্রবর্ত্তী, রাজন সান্যাল, তার বন্ধুদের কাছে বরাবরই নিই থাকি। সে হয় ত জানেও না।"

এমনই করিয়াই এই অদেখা স্নেহপাত্রের সম্বন্ধ দিয়া আমি স্নেহের ফাঁস দেই প্রথম দেখাতেই গলায় পরাইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় দিনে লোকের ভীড় অত্যন্ত বেশী। অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক। কিছুই মানিলাম না, গিয়া উপস্থিত হইলাম। তবে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইল না।

তৃতীয় দিন সবজজ বিপিন বাবুর মায়ের মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত দেখা দিতে আসিয়াছেন, সংবাদ লইয়া সেইখানে রাস্তায় গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। তিনি বাহির আসিলেই রাস্তার উপরেই পায়ে পড়িলাম। "আজ একবার যেতেই হবে, একবার তাকে দেখুন, ইচ্ছা না হয়, নেবেন না।" হাত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন, "মা! তুমি ভুলে বাবুর পৌত্রী, আমার মত সামান্য লোকের জন্য এত আগ্রহ করছো, আমি কি না গিয়ে থাকতে পারি? চল কোথা নিয়ে যাবে।"

আমার ভাই সোম তার নামেরই অনুরূপ, রূপের তার অন্ত ছিল না, আর গুণ! তা' না থাকিলে এতটাই কি আমরা পারিতাম? দেড় বৎসর ঘর-সংসার ছাড়িয়া তাহার সঙ্গী হইয়াছিলাম। নিজের জীবন পণ করিয়াছিলাম—সে কি শুধু শুধু পারা যায়!

বয়স তার আঠারো পূর্ণ হইয়াছে মাত্র। 'এলে' পাশ করিয়া সংস্কৃতে 'ডবল অনার' লইয়া পাটনা কলেজে পড়িতেছিল, সংস্কৃতে আদ্যমধ্য পরীক্ষা পাশ করিয়াছিল। আর ডাক্তারী হইতে কাব্য, সাহিত্য,দর্শন, বিজ্ঞান,ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃতে তার সঙ্গে তুলনা করিবার লোক কমই আছে। 'বাপপিতামহর নাম রাখিবে' এই কথাই সকলে বলিতেন। সেই ছেলে আমাদের চোখের উপরে তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া সে দিনে কলাবশেষ দাঁড়াইয়াছে। তবু তার কি অম্লান জ্যোতিঃ! রোগ-রাহু তার চাঁদের মত মূর্ত্তিকে এতটুকুও ঢাকা দিতে পারে নাই।

সে বলিল, "আমি আপনাকেই খুঁজছিলেম! মনে হচ্ছে, এত দিন যেন আপনারই সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

তিনি মা'র দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! এই আপনার ছেলে! এ ত একটি মহাপুরুষ! এর জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করবো।"

তাহাই হইল। এক জন ডাক্তার মধ্যস্থ হইয়া রোগীর শরীর পরীক্ষা ও ডাক্তারের অবশ্য করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়; ঔষধ, পথ্য, মালিশ আরও অনেক কিছু বিধান তিনিই দেন। আমি রোজই যাই। যতই যাই, ততই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া আসি। কি গভীর গবেষণা, কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য! এ কি মানুষের সম্ভবে? যে ঘরে বসেন, ঘরভরা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী, দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-শাস্ত্র, বেদবেদান্ত, সমস্ত—শিক্ষিত জগতের সকল ভাষার সমস্ত সংগ্রহই রহিয়াছে। ডাক্তারীতে য়ুরোপ, আমেরিকার একবারে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থ, জর্ণাল, যন্ত্র, ঔষধ, তাঁর কাছে। দু'তিন জন ডাক্তার ভক্ত বাড়ীতে বা বাড়ীর কাছেই থাকে। কত ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা জমীদার দুরারোগ্য রোগের জ্বালায় দ্বারে হত্যা দিতেছে। ছাড়াইতে পারেন না, ছাড়েও না। বেশীর ভাগকেই সুস্থ হইতে দেখিয়াছি। অবশ্য নিদান-রোগীর আয়ু দেওয়া সহজ নয়, তবে থাইসিসের নিদান-রোগী ছাড়া অন্য যে কোন কঠিন রোগ ভাল হইতে দেখিয়াছি, অবশ্য যাঁরা দু'দিনেই সব মিটাইয়া সরিয়া না পড়িয়াছেন।

অত যে বই, যখন যেখানার দরকার, একবারে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অমুক যায়গায় আছে বলিয়া চাহিয়া লইতেন। যে পৃষ্ঠার যে পংক্তিতে আছে, একবারেই তাহা খুলিতেন, পাতা উল্টাইয়া খুঁজিতে কখন দেখি নাই। অথচ এই চোখে অন্ততঃ এক হাজার বারও এই কায এই আমারই জন্য করিতে দেখিয়াছি। এতই আমায় স্নেহ করিতেন!

এক দিন বলিলাম, "আচ্ছা, শুনা যায়, কেহ যদি খুব মনের সঙ্গে নিজের জীবন বিনিময় করতে চায়, তা হ'লে অল্পায়ুর সঙ্গে দীর্ঘায়ুর আয়ুপরিবর্ত্তন করা যায়; তা' কি হয়?"

তিনি একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাই করতে চাও না কি?" নতমুখে কহিলাম, "চাই।" পরে বলিলাম, "আজ প্রায় তিন মাস থেকে আমি সমস্ত রাত জেগে স্থিরাসনে ব'সে একান্তমনে ভগবানের কাছে ঐ কামনাই করি। দিনের বেলাও সর্ব্বদা ঐ কামনা আমার মনে থাকে! আমার এ জীবনে আর কতটুকু কায হবে, সোম বাঁচলে আমাদের বংশের উপকার।"

মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "তোমার এই আত্মত্যাগের মূল্যেই তোমার ভাই ভাল হবে, মা! ভগবান্ ভাবগ্রাহী। কিন্তু তুমি নিজের উপর কঠোরতা আর করো না, ওতে তোমারও হয় ত অনর্থক একটা কঠিন রোগ আসতে পারে।"

বাবা আসিয়া দেখা করিয়া নূতন আশায় বুক বাঁধিলেন। বলিলেন, "দুঃখ হচ্ছে, আমার বাবা এঁকে দেখলেন না। এত জ্ঞান, এত বিদ্যা, বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় এত বড় পণ্ডিত, আবার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমন অসাধারণ শক্তি, এ যেন আশ্চর্য্য! আমার সোম এবার নিশ্চয় ভাল হবে।"

আমার সম্বন্ধে দু'জনে কথা হইল। বাবার চোখে আমার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। তিনি বলিলেন, "আমার এই মেয়েটি আর বড় মেয়েটিকে আমার বাবা গ'ড়ে তুলছিলেন। আমি ওর উপর ছেলের মত নির্ভর করি।"

তিনি বলিলেন—কি সব বলিলেন, মনে নাই। সেই আয়ু-বদল করার কথাটাও যে বলিয়াছিলেন, তা'ই মনে আছে।

বাবার চোখে জল পড়িল, বলিলেন, "আমার ছুটিই যেন থাকে।"

সোমের অনেকখানিই উপশম বোধ হইল। সেই যে প্রথম দিনেই সে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "দেখুন, আর এই রুগ্ন দেহ আমার সহ্য হয় না, এর চেয়ে সুস্থ থেকে চণ্ডালের দেহও যেন প্রার্থিত মনে হয়।"

ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "কেন বাবা! ও সব কথা মনে করছো কেন? তার চেয়ে এ জন্মেই এই দেহেই সকল রোগ-যন্ত্রণা-মুক্ত হয়ে সকল রোগ-শোকের অতীত তাঁর আনন্দময় সত্তায় সম্মিলিত যাতে হ'তে পারো, তাই মনে করো না।"

চকিত হইয়া বালক কহিল, "তাই দিন, তাই শিখিয়ে দিন, আমি তারই জন্য সাধনা করি।"

সেই দিন কি মন্ত্র—কি উপদেশ তিনি তাহাকে দিয়াছিলেন, জানি না, সেই হইতে চিরসহিষ্ণু সোমের শেষ রোগ-যাতনাটুকুও চলিয়া গিয়াছিল। তার স্নিগ্ধ হাসিতে ভরা উজ্জ্বল চোখে, অতি সূক্ষ্ম গোলাপী ওষ্ঠে প্রশান্ত হাসিটুকু একটি-ক্ষণের জন্যও ম্লান হইত না। সে বড় সুস্থ হইল। দু'জনে তাঁর কথাই হইত। সোম বলিত, "যদি বাঁচি ত ওঁরই কাছে শিক্ষা করবো, কি করলে যে অমন হওয়া যায়!"

আমি রাগ করিয়া বলিতাম, "যদি বাঁচি কি!"

সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিত, "না না, বাঁচবো বই কি! বাঁচতেই হবে। এমন সঙ্গ পাবার উপায় থাকতেও যদি মরতে হয়, সে যে বড্ড লোকসান।"

হঠাৎ এক দিন করালমূর্ত্তিতে কলেরা আসিয়া আমায় ধরিল। সে কি ভীষণ আক্রমণ! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতের চুড়িগুলা খুলিয়া গেল, এমনই শীর্ণ করিয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া হাতের কোথাও নাড়ী খুঁজিয়া পায় না। অথচ আমার কোনই দৃক্‌পাত ছিল না। মা নিজে গেলেন, সন্ধ্যায় অবস্থা তখন খুবই ভয়ানক, ডাক্তার তিন জন নিরুপায় বোধ করিতেছে।

তিনি আসিলেন। (মহারাজা কাশ্মীরের জন্য যা হয় না, আমার ও আমাদের জন্য বারেবারেই তাহা হইয়াছে!) বলিলেন, "ভয় করছে, মা?"

আমি বলিলাম, "না, ভয় ত করে নি। আচ্ছা, আমি যে আপনাকে বলেছিলেম, আমার আয়ু আমি সোমকে দিতে চাই, এ কি তারই জন্যে হয়েছে? তা যদি হয়, তবে এর চেয়ে সুখের তো আমার আর কিছু নেই।"

সোমও না কি তাঁকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল। "ছোটদি যেন বেঁচে উঠেন, না হ'লে আমি বাঁচতে পারবো না। আমার জন্যই তিনি যেতে বসেছেন।"

সেই ঘোর দুর্দ্দিনে দু'দিকে দুই আসন্নমৃত্যু রোগী লইয়া আমার মা যখন যমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁর স্নেহসজাগ নেত্র ও গভীর সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় দিনরাত্রি দেবতার মতই জাগিয়াছিল। তাঁরই প্রেরিত ডাক্তার সংবাদ বহন করিয়া তাঁর উপদেশমত চিকিৎসা করিয়া কঠিন অবস্থা আসিলেই তিনি নিজে আসিয়াছেন।

চৌদ্দ দিনের পর প্রাণের আশা দেখা দিয়া পুনঃ 'কোলাপ্সের' মত হইল। তার পর দারুণ দৌর্ব্বল্যে পক্ষাঘাতের মত সমস্ত অসাড় হইয়া গেল, জ্ঞানের উন্মেষমাত্র বাকী রহিল, আর সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি অচল হইয়া গেল, শব্দ-স্পর্শ কিছুই রহিল না। সে অবস্থার পর হঠাৎ দুই দিকের কর্ণমূল পাকিতে আরম্ভ হইল এবং যন্ত্রণার শেষ রহিল না। ডাক্তার বলিলেন, অপারেশন ভিন্ন উপায় নাই, অথচ অপারেশনেরও অবস্থা নয়। আহার ও ঔষধ ভিতরে না গিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, অথচ সেই চেষ্টাতেও কি অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা! বাক্‌শক্তি রুদ্ধ, ইঙ্গিতেও বাধা দিবার কোন সামর্থ্য নাই। স্বপ্নের মতই মনে জাগে, কি শীতল প্রলেপ সেই অগ্নিদগ্ধ-ক্ষত-জ্বালার মতই জ্বলন্ত অঙ্গকে স্পর্শ করিল! অভয় মন্ত্রে শব্দ-প্রবেশহীন কর্ণরন্ধ্রে ডাক্তার উঠিল—"ভয় কি মা! ভাল হয়ে যাবে।"

তার পর? বেশী কিছু বলিব না। এই উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গভূমে পাছে কেহ অবিশ্বাসের বক্রহাসি হাসিয়া তাঁর মর্য্যাদার হানি করে, তাই এত দিন ত বাহিরে আমার এ দেবতাকে প্রকাশ করিতে চাহি নাই। কিন্তু আজ? আজ যে আমার শূন্যময় অন্তরের হাহাকারে ভরা সহস্র পূজার সম্ভার তাদের সেই মূর্ত্ত দেবতার পূত-চরণ-পূত হইয়া পড়িয়া আছে।

আমায় কাঁদাইয়া জাগ্রত দেবতা আজ তাঁর চিরপ্রার্থিত অমৃতলোকে—আনন্দলোকে চিরানন্দময় মূর্ত্তিতে বিরাজিত হইয়াছেন। তাই আমার এই চিরকৃতজ্ঞ সন্তপ্ত হৃদয়ে অজস্র অশ্রুরাশি আমারই মত তাঁহার সহস্র শোকাকুল ভক্তগণের সহিত বিনিময় করিবার জন্য এই রিক্ত-চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এই আমার তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা। তার পর এ সুদীর্ঘ কালের কত দিনের কত সহস্র স্মৃতিসম্ভারে তাঁর কথা এই প্রাণের মধ্যে মিলিয়া রহিয়াছে, কোন দিন তার কি হিসাব রাখিবার কথা ভাবিয়াছিলাম! এমন করিয়া এত শীঘ্র যে হারাইব, এ কথা ত কোন দিন ভাবি নাই!

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন্

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা দেশে নারীর শিক্ষা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাহা বাঙ্গালার কল্পনারও অগোচর ছিল। স্ত্রী-শিক্ষার ক্রমোন্নতি ও বিস্তার-বিষয়ে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের যত্ন ও আগ্রহ উপেক্ষণীয় নহে। বিগত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'ভারত-সংস্কারক ফণ্ড' নামক এক ধনভাণ্ডার গঠিত করেন। উল্লিখিত 'ভারত-সংস্কারক' ধনভাণ্ডার সমিতির সদস্যগণ ৫টি বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। সুলভ-সাহিত্য, কারীগরী কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। নারী-বিদ্যালয় বিভাগ হইতে বয়স্থা মহিলাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'ফিমেল্ নর্ম্মাল্ স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ই পরবর্ত্তী কালে 'ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন'এ পরিণত হইয়াছিল।

উল্লিখিত নারী-বিদ্যালয়টি প্রথমতঃ ৪০টি মহিলা লইয়া গঠিত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে জনসভা হইয়াছিল, উহা হইতেই কেশব-

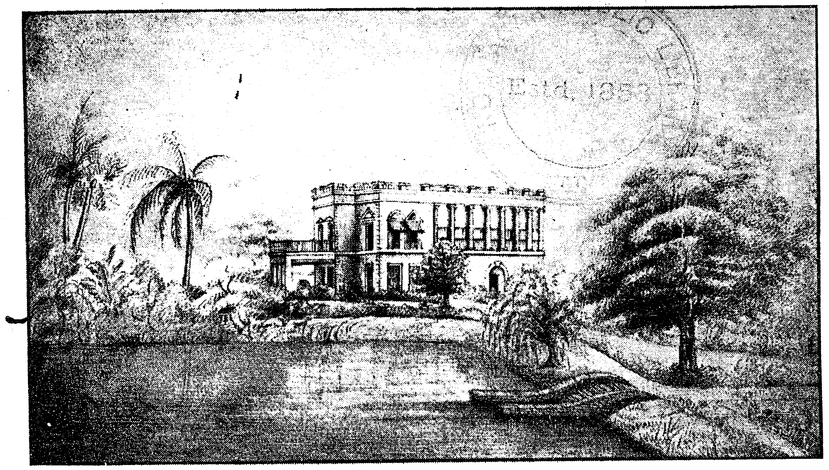

কমল-কুটীর

দাতব্য, শ্রমজীবিদিগের শিক্ষা, নারী-বিদ্যালয় ও মদ্যপান-নিবারণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ধনভাণ্ডার হইতে অর্থ-সাহায্য প্রদত্ত হইত। সুলভ সাহিত্য-প্রচার বিভাগ হইতেই এ দেশে সর্ব্বপ্রথম 'সুলভ-সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের এক-খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র চলিতে পারে, এ ধারণা এ দেশের লোকের ছিল না। শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের সহিত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগকে সূত্রধরের কার্য্য, ঘড়ী মেরামত, কাষ্ঠ ক্ষোদাই প্রভৃতি নানাবিধ চন্দ্রের মনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গকে লইয়া প্রকাশ্য স্থানে সামাজিকভাবে সম্মিলিত করিবার বাসনা জন্মে। এই উদ্দেশ্যে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ৩০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান এলবার্ট হলের স্থানে, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদিগকে পড়াইবার জন্য যে একটি গৃহ ছিল, তাহা ক্রয় করেন। ঐ গৃহ সুসংস্কৃত করিয়া কেশবচন্দ্র সেই বিস্তৃত হলঘরটি বাঙ্গালী সাধারণের সম্মেলনের জন্য দান করেন।

'ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল' প্রথম হইতে শ্রমগৃহেই পরিচালিত

হইত। এই বিদ্যালয় উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম প্রতীচ্য সভ্যতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, পক্ষান্তরে কেশবচন্দ্র সময়য়ের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ, কন্যাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষদিগের সমকক্ষ হইবার শিক্ষা দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র নারীর পুরুষোচিত আবরণ ও পুরুষের উপযোগী বিদ্যার্জ্জনের বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে আধুনিক প্রণালীতে উচ্চশিক্ষা দেন নাই। এমন কি, মহারাণী সুনীতি দেবীও



কুচবিহারের মহারাণী

আধুনিক হিসাবে পুরুষোচিত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রতীচ্য-প্রভাবমুগ্ধ ব্রাহ্মগণ অবশেষে তাঁহাদের কন্যা প্রভৃতিকে কেশবচন্দ্রের বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইয়া মিস্ ক্রয়েডের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে পরিণামে সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে লইয়া বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

কেশবচন্দ্র পরে 'কমল-কুটীর' ক্রয় করিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারী-বিদ্যালয় ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে কিছু দিন তথায় পরিচালিত হইয়াছিল। এই ভিক্টোরিয়া কলে পরে শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখবর্ত্তী একটি বাড়ীতে উঠি আইসে। কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে এ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করা হইত। যাহাতে নারীগণ আদর্শ জননী, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ রমণী হই পারেন, কেশবচন্দ্র সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষাদানে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে জন্য এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগ রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিবার বন্দোবস্ত ছি শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের মধ্যে যাহাতে মধুর ও পবি স্নেহের সম্বন্ধ পরিপুষ্ট হয়, এজন্য শিক্ষয়িত্রীদিগকে 'গুরু-মা পরিবর্ত্তে ছাত্রীরা 'মাসী-মা' বলিয়া সম্বোধন করিত। ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁ দের অনেকের কন্যা ও দৌহিত্রীরা ক্রমান্বয়ে এই বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া পূর্ব্ব সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন।

কেশবচন্দ্রের পরলোকগমনের পর এই বিদ্যাল অবস্থা কিছু দিন হীন হইয়া পড়িয়াছিল। পরে মহা সুনীতি দেবী ও ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দে

পৃষ্ঠ-পোষকতায় আবার উহার পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়া আইসে। বর্ত্তমানে বহুবাজার ষ্ট্রীটের ভবনে কিছু কাল হইতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইদানীং ছাত্রীদিগের অভিভাবকবর্গের ইচ্ছানুসারে উক্ত বিদ্যালয় হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' নামের পরিবর্ত্তে বিদ্যালয়টি অধুনা 'ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন' নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় কিছু দিন হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছিল। সম্প্রতি মহারাণী সুনীতি দেবী কেশবচন্দ্রের 'কমল-কুটীরের' স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে উক্ত গৃহ ক্রয় করিয়া ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের জন্য দান করিয়াছেন। এই গৃহের সংলগ্ন ভূখণ্ডে কেশবচন্দ্রের চিতাভস্ম রক্ষিত করিয়া একটি স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে অনেকেই কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই স্মৃতি-মন্দির দর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। মহারাণী সুনীতি দেবী একটি 'ট্রাষ্ট-ডিড্' বা



সুনীতি দেবী

দলিল সম্পাদিত করিয়া গৃহটি সমিতির পরিচালকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিদ্যালয় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মযজ্ঞকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবে, এ আশা দুরাশা নহে।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।



সতীর পতি

(উপন্যাস)

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরালালের কার্য্যতৎপরতা

বিপিন বাবু প্রস্থান করিবার পর দুই সপ্তাহকাল হীরালাল পূর্ব্ব-পরামর্শমত আহিরীটোলায় নিজ মেসের বাসায় স্থির হইয়া রহিল। যে ছোট ঘরটি সে পাইয়াছিল,তাহা দুই সীটের ঘর, কিন্তু আপাততঃ আর কেহ না থাকাতে সে একাই সে ঘরটি দখল করিতেছে। থিয়েটরের অভিনয়ে বা রিহার্সালে যথানিয়মে সে হাজিরা দেয়, কাযটুকু শেষ হইয়া গেলেই ভাল ছেলেটির মত নিজ বাসায় ফিরিয়া আসে। অভিনয়-রজনীতে তাহার ফিরিতে রাত্রি অধিক হয়, দরজা খোলাইতে অত রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া চাকরকে উঠাইতে হয় বলিয়া হীরালাল তাহাকে মাসিক ॥০ আট আনা বকশিস কবুল করিয়াছে। থিয়েটরে রেবতীর সঙ্গে প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলায় তাহার অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু বিপিন বাবু যে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছেন—নিভৃত সাক্ষাৎ হয় না। ইতোমধ্যে হীরালাল বিপিন বাবুর নিকট হইতে তাঁহার পৌছান সংবাদ এবং স্ত্রী সুরবালার একখানি পত্রও পাইয়াছে। পত্রোত্তরে পত্নী ও বিপিন বাবু উভয়কেই সে লিখিয়াছে, শীঘ্রই দুই দিনের জন্য বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিবে।

ডায়মণ্ড থিয়েটরে শনি, রবি ও বুধবার, এই তিন দিন অভিনয় হইয়া থাকে। সোমবারটা ছুটী। সপ্তাহের বাকী তিন দিন রিহার্সাল থাকে। আগামী রবিবারে যে নাটক অভিনীত হইবে, তাহাতে হীরালালের কোন পার্ট নাই। সুতরাং হীরালাল স্থির করিল, ঐদিন প্রাতের ট্রেণে সে দেশে যাইবে। আবার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় ফিরিয়া রিহার্সালে হাজিরা দিবে। বাড়ীতে এবং বিপিন বাবুকে পত্র লিখিয়া হীরালাল এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মাসকাবার হইয়া গিয়াছে, শুক্রবারে বেতনও পাওয়া যাইবে।

বৃহস্পতিবার রাত্রিতে রেবতী থিয়েটরে রিহার্সাল করিতে গেল,—কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় রিহার্সালে আসিল না। সংবাদ আসিল, তাহার খুব জ্বর—বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছে না। যে অভিনেত্রী রেবতীর আওয়াজী (বাঙ্গালায় 'ডুপ্লিকেট') ছিল, সেই রেবতীর হইয়া রিহার্সালে যোগ দিল।

হীরালাল এই সংবাদ শুনিয়া ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "রেবতী কোনও চিঠি লিখেছে না কি ?"

"না ; যে গাড়ী ফিমেলদের আনতে গিয়েছিল, তার সহিসের মুখে ব'লে পাঠিয়েছে যে, ম্যানেজার বাবুকে বোলে আমার খুব জ্বর, আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিনে। আপনি না হয়, যাবার সময় তাকে একবার দেখে যাবেন।"—বলিয়া ম্যানেজার বাবু হীরালালের অলক্ষ্যে টিপিয়া একটু হাসিলেন।

হীরালাল বলিল, "দেখি, যদি পারি।"

"খুব জ্বর" শুনিয়া হীরালালের মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। আহা, অসহায়া রমণী—মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বোন্ নাই—কেউ নাই। সম্বলের মধ্যে দুই জন দাসী এবং একটা খোট্টা দ্বারবান্। জ্বর কখন্ হইতে হইয়াছে কে জানে ? কত ডিগ্রী, তাই বা কে জানে ? কোন ডাক্তারও বোধ হয় ডাকা হয় নাই। কেহ না হুকুম করিলে ছাতুখোর দ্বারবান্ কি আর নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিবে? রেবতী বেচারী হয়ত এতক্ষণ জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। রিহার্সালে কোনও রকমে দিনটা পাপক্ষয় করিয়া হীরালাল জয় মিত্রের গলির দিকে ছুটিল।

রাত্রি তখন ১০টা। রেবতীর গৃহে পৌছিয়া, দ্বার নাড়িতে হরি সিং দ্বার খুলিয়া দিল। হীরালাল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা হরি সিং, ক্যা খবর ?"

হরি সিং বলিল, "মাইজীকা তো বহুৎ বোখার, বাবু। উপর যাইয়ে, দেখিয়ে।"

হীরালাল বলিল, "কোই ডাংদার ওংদার বোলায়া থা ?"

"নেহি বাবু। মাইজীকো হাম পুছাথা তো কহিন্ আভি নেহি।"

হীরালাল ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেল। রেবতীর শয়ন-কক্ষে পর্দ্দা ফেলা ছিল, ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া হীরালাল অনুচ্চ স্বরে ডাকিল—"সদু আছ ভিতরে ?"

ভিতরে ক্ষীণ পদশব্দ হইল,—ঝি সৌদামিনী পর্দ্দা সরাইয়া হীরালালকে দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "ওঃ, আপনি ? আসুন, ভিতরে আসুন।"

হীরালাল ঘরে প্রবেশ করিয়াই ওডিকলোনের গন্ধ পাইল। সম্মুখে দেখিল, রেবতী পালঙ্কে শয়ানা, তাহার চক্ষু মুদ্রিত, মাথায় জলপটি। গায়ে একখানা লেপ, তাহার উপর একখানা পুরু র‍্যাগ চাপানো। হীরালাল রেবতীর উভয় গণ্ডে হাত দিয়া দেখিল, গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে, সেই গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লাল টক্‌টক্ করিতেছে। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে। লেপের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া একখানি হাত ধরিল, উহা আরও গরম। হাত বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ থেকে জ্বর হয়েছে সদু ?"

"কাল রাত থেকেই এক রকম বলতে গেলে। রাত এগারোটার পর থিয়েটর থেকে ফিরে এসে বল্লেন, 'সদু, শীগ্‌গির আমায় এক পেয়ালা চা ক'রে দে, আমার কেমন শীত-শীত করছে।' 'শরীর ভাল আছে ত মা ?' ব'লে গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম, গা যেন একটু গরম। শুধু সেই এক পেয়ালা চা খেয়ে শুয়ে পড়লেন, লুচি-টুচি কিচ্ছু খেলেন না। সকালে যখন উঠলেন, তখনও গা গরম, বল্লেন,'মাথাটা বড্ড ধরেছে।' মুখ-হাত ধুয়ে আবার চা খেলেন, খেয়ে শুয়ে রইলেন। নিজেই ওডিকলম বের ক'রে ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে কপালে বসালেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। কায-কর্ম্মের ফাঁকে মাঝে মাঝে এসে আমি দেখে দেখে যাচ্ছি। বেলা দশটার পর এসে দেখি, ঘুম ভেঙ্গেছে, বিছানার চাদরটা টেনে গায়ে দিয়েছেন, বল্লেন, 'বড্ড শীত করছে, লেপ পেড়ে দে।' গা তখন বেশ গরম। লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমতে লাগলেন। বেলা তিনটের পর থেকে জ্বরটা আরও বেড়েছে, মাথার যন্ত্রণাও বেড়েছে। একখানা র‍্যাগ বের ক'রে লেপের উপর চাপিয়ে দিতে বল্লেন। ওডিকলম জলে গুলে মাথায় পটি দিতে বল্লেন। সন্ধ্যার সময় যখন থিয়েটরের গাড়ী এল, তখনও কথাবার্ত্তা কইছেন। থিয়েটরের গাড়ী এলে বল্লেন, 'সহিসকে ব'লে দে, আমার বড্ড জ্বর, উঠতে পারছিনে।' সন্ধ্যার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাক্তার আনতে পাঠাব কি ?' বল্লেন, 'না, এখন দরকার নেই।' তার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'হীরু বাবুর কাছে দারোয়ান পাঠাব কি ?' বল্লেন, 'না, এখনকার মত।' তার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। তা, আপনি এসেছেন হীরু বাবু, বড় ভাল হয়েছে ; এখন যা করতে হয় করুন—আমার ত ভয়েই প্রাণ শুকিয়ে গেছে।"

হীরালাল বলিল, "এর অনেক আগেই ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল, সদু। ওঃ, কি ঘুম, একবারে জ্বরে বেহুঁস হয়ে রয়েছেন। তুমি যেমন জলপটি দিচ্ছিলে, দাও, আমি চল্লাম ডাক্তার আনতে।"—বলিয়া হীরালাল দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ডাক্তার সঙ্গে করিয়া তাহার ফিরিতে আধঘণ্টা হইয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া থার্ম্মমিটর দিলেন, নাড়ী দেখিলেন, বুকে ষ্টেথেস্কোপ বসাইলেন ; অবশেষে বলিলেন, ১০৬ উঠেছে, ম্যালেরিয়া জ্বর, তবে ভয়ের কোনও কারণ নাই ; যতক্ষণ জ্বরটা ১০২ ডিগ্রীতে না নামে, মাথায় আইস্-ব্যাগ দিতে হইবে, কাল প্রাতে আবার আসিয়া দেখিবেন, দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরে আইস-ব্যাগ আছে কি ?

সদু বলিল, "মাথায় বরফ দেবার সেই রবারের থলি ত ? সে ত ঘরে নেই।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমার ডিস্পেন্সারিতে আছে—সঙ্গে লোক দিন, পাঠিয়ে দিচ্ছি। আইস-ব্যাগের দাম ৭৲ আমার ভিজিট ৮৲—দিনের বেলায় ৪৲ টাকাই নিই।"

হীরালালের পকেটে তাহার বেতনের সমস্ত টাকাটাই মজুদ ছিল। পকেট হইতে পনেরোটি টাকা বাহির করিয়া সে ডাক্তার বাবুর হাতে দিল। বরফ কিনিবার টাকা দিয়া হরি সিংকে ডাক্তার বাবুর সহিত পাঠাইয়া দিল।

আবার উপরে আসিয়া, পালঙ্কের নিকট চেয়ারে হীরালাল বসিল। সদু বিছানার উপরে বসিয়া, জলপটি শুকাইয়াছে কি না, মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া উহা ভিজাইয়া দিতে লাগিল।

হীরালাল চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ সদু, এঁর কি আগে থেকেই ম্যালেরিয়া ছিল না কি?"

"না বাবু, আগে ত ছিল না। গেল বছর জগদ্ধাত্রী-পুজোয় সেই যে ঝিনিদায় গিয়েছিলেন 'পেলে' করতে, সেই থেকেই 'মালোয়ারি' ধরেছে। সেই থেকে, এবার নিয়ে এই চার বার না পাঁচ বার হ'ল।"

হরি সিং যথাসময়ে আইস-ব্যাগ ও বরফ লইয়া ফিরিয়া আসিল। হীরালাল আইস-ব্যাগ দিবার প্রক্রিয়া ঝিকে বুঝাইয়া দিল। আইস-ব্যাগ দেওয়া হইতে লাগিল।

এইরূপে রাত্রি ক্রমে ১২টা বাজিল। সদু বসিয়া ঢুলিতেছিল; হীরালাল বলিল, "সদু, তুমি এইবার যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গে। নিস্তারিণীকে পাঠিয়ে দাও। সে কি করছে?"

"ঘুমুচ্চে বোধ হয়।"

"আচ্ছা, আমি ততক্ষণ আইস-ব্যাগ ধরছি। তুমি বরং আমার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরী ক'রে তার হাতে পাঠিয়ে দিও।"

"আচ্ছা" বলিয়া সৌদামিনী হীরালালের হাতে আইস্-ব্যাগ দিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নিভৃতের বিপদ

রাত্রি একটা হইতে অল্পে অল্পে রেবতীর দেহোত্তাপ কমিয়া আসিতে লাগিল। ঘণ্টা দুই পরে ১০২-এর নিম্নে থার্ম্মমিটার নামিয়াছে দেখিয়া হীরালাল আইস্-ব্যাগ দেওয়া বন্ধ করিয়া, নিদ্রাতুরা নিস্তারিণীকে ছুটী দিল; অল্পক্ষণ মধ্যে সে নিজেও চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

হীরালাল কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, তাহা তাহার জ্ঞান নাই —দেহে কাহার করস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চোখ খুলিয়া দেখিল, রেবতী বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম—হাঁটুতে হাত দিয়া ডাকিতেছে—"ওগো!"

হীরালাল চক্ষু খুলিয়া, রেবতীকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল, "ঘুম ভেঙ্গেছে তোমার? কেমন আছ রেবতী?"

"এখন একটু ভাল। তুমি কখন্ এলে ভাই স্রোতের ফুল?"

"আমি রিহার্সালের পর, রাত ১০টার পর এসেছি। তোমার খুব জ্বর, সেখানেই আমি ম্যানেজার বাবুর কাছে খবর পেলাম। এসে দেখি, জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে, তুমি একেবারে বেহুঁস। ডাক্তার নিয়ে এলাম, মাথায় তোমার আইস-ব্যাগ দেওয়া হ'তে লাগলো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি তোমার উত্তাপ পরীক্ষা করতে লাগলাম—রাত তিনটে বাজলে,তার পর জ্বরটা নরম পড়লো——তখন আইস-ব্যাগ বন্ধ ক'রে আমিও একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার এমন জ্বর, তুমি আমায় খবর দাও নি কেন, স্রোতের ফুল?"—বলিয়া হীরালাল ঘড়ির দিকে চাহিল। চারিটা প্রায় বাজে।

রেবতী বলিল, "খবর? ভাবলাম, খবর দিয়ে আর কি হবে? তুমি হয় ত আসবেই না,—এখন ত আর আসো না। সে যাই হোক,—সারাটা রাত তুমি ঠায় এই চেয়ারে ব'সে কাটালে? ঝিদের কাউকে বসিয়ে, তুমি ঘুমুতে গেলে না কেন? তোমার ঘরে তোমার বিছানাপত্র সবই ত ঠিক ছিল।"

হীরালাল বলিল, "তোমার এত জ্বর—তুমি বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছ—আমার ঘুম হবে কেন?"

"কেন, আমি তোমার কে? আমি বাঁচলেই বা তোমার কি? মরলেই বা তোমার কি?"—শেষের কথা-গুলি ভারি হইয়া আসিয়াছিল, রেবতীর চক্ষু হইতে জল বুঝি পড়ে পড়ে!

হীরালাল হেঁটমুখে কি চিন্তা করিয়া, তার পর বলিল, "তুমি আমার পরম হিতৈষিণী বন্ধু!"

"আর কিছুই ত নই?"

হীরালাল কোমলকণ্ঠে একটু আদরের স্বরে বলিল, "আর, তুমি আমার স্রোতের ফুল।"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ—স্রোতেরই ফুল। স্রোতে ভেসে এসে তোমার পায়ে ঠেকেছি—আবার স্রোতে ভেসে চ'লে যাচ্ছি! যাচ্ছি কেন—গিয়েছি।"

হীরালাল কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। রজনীর এই অন্তিম অখণ্ড নীরবতা—সারা বিশ্বের মাঝে যেন দুইটি মাত্র প্রাণী মুখোমুখি বসিয়া। রেবতীর মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া হীরালালের হৃদয় যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিল।

রেবতীও কিয়ৎক্ষণ নতমুখে বসিয়া রহিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় কিছু খেতে-টেতে দিয়েছিল এরা?"

প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনে হীরালাল স্বস্তি অনুভব করিয়া বলিল, "চা খেয়েছি।"

"রিহার্সালে যাবার আগে বাসায় তুমি কি কিছু খেয়ে গিয়েছিলে?"

"হাঁ, জলখাবার খেয়েছিলাম।"

"বাসায় গিয়ে তুমি রাত্রের খাবার খেতে ত? সারাটা রাত তোমার উপবাসে কাটলো! ঝিগুলোর যদি একটুখানি বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে।"

হীরালাল বলিল, "তার জন্যে আর কি হয়েছে! তুমিও কাল সকালে এক পেয়ালা চা খেয়েছিলে, তার পর সারাদিন সারারাত আর কিছুই খাওয়া হ'ল না।"

"আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি হলাম রোগী—আমার অবস্থা আর তোমার অবস্থা সমান? আচ্ছা, যখন আমার জ্বরটা খুব বেড়েছিল, তখন কত ডিগ্রী উঠেছিল?"

"রাত একটা পর্য্যন্ত ১০৬ ছিল।"

রেবতী বলিল, "উঃ, মস্ত একটা সুযোগ হারালাম আমি।"

কথাটার ভাবটা বুঝিতে না পারিয়া, হীরালাল বলিল, "কেন, কিসের সুযোগ?"

"আরও যদি বাড়তো, ১০৭, ১০৮—তা হ'লে, ডাক্তারী শাস্ত্রে কি বলে জানিনে—বোধ হয়, আমি হার্ট-ফেল হয়ে মারা যেতাম! মরবার ঠিক আগে, মানুষের নাকি একটু একটু জ্ঞান হয়—আমি তখন তোমায় বলতাম, আমায় তোমার পায়ের ধুলো দাও—আমি তোমার মুখখানি দেখতে দেখতে মরি!"—বলিতে বলিতে রেবতীর চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

হীরালাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ছি ছি, ও সব কথা তুমি কেন বলছ, রেবি?"—বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচে নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, সাদরে সযত্ন রেবতীর চক্ষুজল মুছাইয়া দিল। তার পর বলিল, "এবার তুমি শোও—আর খানিক ঘুমাও। তোমার মাথার যন্ত্রণাটা আর নেই ত?"

"আছে এখনও একটু একটু।"

"আচ্ছা, শোও তবে লক্ষ্মীটি, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।"

রেবতী বলিল, "তোমার যে সারা রাত ঘুম হ'ল না। তুমি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও গে না কেন?"

"আর, রাত ত প্রায় পুইয়ে এল। তুমি যদি ভাল থাক, আমি সকালে মুখ-হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে শোব এখন একটু। এখন তোমায় ঘুম পাড়াই এস। শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।"

রেবতী বলিল, "তা দেবে, দাও। এ লোভ আমি সম্বরণ করি, এমন ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু অত দূর থেকে নয়—চেয়ারে ব'সে নয়। তুমি আমার কাছে, এই বিছানায় এসে ব'স।"—বলিয়া রেবতী বালিসে মাথা দিয়া, হীরালালের দিকে মুখ ফিরিয়া শয়ন করিল।

হীরালাল পালঙ্কে উঠিয়া বসিয়া, ধীরে ধীরে রেবতীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রেবতী আরামে চক্ষু মুদিয়া রহিল, অল্পক্ষণমধ্যেই নিদ্রাগত হইল।

প্রথমতঃ হীরালাল বেশ খাড়া হইয়া বসিয়াই রেবতীর মাথায় হাত বুলাইতেছিল; তার পর সে একটু কাত হইল; তারপর সারারাত্রির গভীর ক্লান্তি কখন্ যে তাহার নিদ্রাবসন্ন দেহকে রেবতীর শয্যাপার্শ্বে লুটাইয়া দিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।



রয়্যাল কমিশন

পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে,—এত দিন যাবৎ ভারতের শাসন-সংস্কারের সম্পর্কে যে রয়্যাল কমিশন বা সরকারী তদন্ত কমিশন বসিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, বড় লাট লর্ড আরউইন উহার সম্বন্ধে সরকারের অর্থাৎ বলডুইন গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কি ভাবে কিরূপ উপাদান লইয়া কমিশন গঠিত হইতেছে এবং কি ভাবে কমিশন কার্য্য করিবেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, —সেই পরিচয়ে ভারতবাসী বুঝিয়াছেন যে, অন্যান্য অনেক সরকারী কমিশন যেমন অশুভিষ্ব প্রসব করিয়াছে, এই কমিশনও ততোধিক কিছুই করিবে না। যে সকল ভারত-বাসী সাগরপারের শ্বেত জাতিকে ভারতের ভাগ্য-পুরুষ অথবা বিধাতৃ-পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এক পরমকারুণিক ভগবান্ সেই জাতিকে বাছিয়া আমাদের মত নাবালক জাতির অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে প্রাণে অনুভব করেন,তাঁহারাও সেই বিধাতৃ-পুরুষের আশ্বাস-বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া এত দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমাদের সুবিবেচক উদারহৃদয় অভিভাবক এইবার কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে হয় ত আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবেন, অন্ততঃ রয়্যাল কমিশন বসাইয়া ইংরাজ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনের নির্দ্দিষ্ট অধিকারের সৌধের আর এক ধাপ আমাদিগকে উঠাইয়া দিবেন,—এমন বিশ্বাস যে তাঁহা-দের ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব,—বড়-লাটের ঘোষণায় তাঁহারাও আশায় নিরাশ হইয়াছেন, অন্য পরে কা কথা!

নিরাশ হইবার কারণ যথেষ্ট। যে ভারতবাসীর ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য কমিশন বসিতেছে, সেই ভারতবাসীদের মধ্যে এমন এক জনকেও বলডুইনের টোরী সরকার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই যে, তাঁহাকে কমিশনে বসাইতে পারেন। অবশ্য যাঁহারা পরের দয়াদত্ত দানের উপর আপনাদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করেন না, যাঁহারা ইংরাজের শাসন-সংস্কারের সহিত এ যাবৎ কোনও সংস্রব রক্ষা করে নাই অথবা উহার উচ্ছেদসাধনে ক্রমাগত বাধাপ্রদাননীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ধাপে ধাপে ভারতে স্বরাজলাভের কথায় আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা চিরদিনই জানেন, মানুষ বা জাতি নিজের চেষ্টায় স্বাবলম্বন-বৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা নিজের আত্মসম্মানের অনুরূপ মুক্তির নির্ণয় করিয়া লইতে পারে, অন্যথা পরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, পরের নিকট ভিক্ষা করিয়া কখনও কাহারও ভাগ্যে স্বরাজলাভ ঘটিতে পারে না। এই শ্রেণীর স্বাবলম্বনে বিশ্বাসী আত্মনির্ভরশীল ভারতবাসীর ধারণা, কমিশন কমি-টীতে ভারতের স্বরাজলাভ সম্ভবপর নহে, উহাতে দুই চারি জন ভারতবাসীর নিয়োগেও ভারতবাসী মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে না। হয় ত তাহাতে দুই চারিটা বড় বড় সরকারী চাকুরী বা হয় ত তাহাতে দুই চারিটা ভূয়া অধিকার ভারত-বাসীর লাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি করায়ত্ত হইবে না। প্রকৃত মুক্তির একই পথ, তাহার দুই পথ নাই। জাতি স্বাবলম্বন দ্বারা যখন অপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, জাতি যখন শক্তিসঞ্চয় দ্বারা অপরের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে, তখনই তাহার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়, অন্যথা শত রয়্যাল কমিশন ও শত ভারতীয় সদস্যনিয়োগেও সে পথ করায়ত্ত হয় না। যাঁহারা এই ভাবের ভাবুক, তাঁহারা কমিশনের স্বরূপ জানিবার জন্য কখনও উদ্‌গ্রীব হয়েন নাই, তাঁহারা পূর্ব্বাপর উহার সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিতে সকলকেই পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাদের বাদ দিলে এমন অনেক ভারতবাসী আছেন, যাঁহারা সত্যই অন্তরে বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীনতা-প্রিয় ইংরাজ জাতি যখন একবার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনরূপ মুক্তির প্রতিশ্রুতি পালনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছেন, তখন তাঁহারা তাহার উপর তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কোঠা-বালাখানা গড়িয়া তুলিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইবেন না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভিত্তির উপর সৌধের 'কড়ে-থামাল' গাঁথিয়া তুলি-হইবে, ইংরাজ এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাই রয়্যাল কমি-শনের সৃষ্টি। ইংরাজ এতই সুবিবেচক ও উদারহৃদয় যে, যথাসময়ের পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। তাই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেই কমিশনের বসিবার জল্পনা-কল্পনা এবং উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে। তাঁহারা চাহেন, ভারতীয়ের নিকট সহযোগ ও সহানুভূতি; তাহা দিলেই তাঁহারা ভারতীয়দিগকে হাতে হাতে ফল দিবেন! যাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এত দিন আকাশ-কুসুমের কল্পনায় বিভোর হইয়া ছিলেন, তাঁহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে!

বড় লাট লর্ড আরউইন যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ:—"ভারতের অবস্থা এরূপ দাঁড়াই-য়াছে যে, এ সময়ে শাসন-সংস্কারের আর এক দফা অধিকার ভারতবাসীকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না, তাহাতে অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য নানাপ্রকার মত-বিরোধ ও সংঘর্ষ এমন অবস্থা আনয়ন করিয়াছে যে, এ সময়ে অতিরিক্ত অধিকার দেওয়া দেশের ও জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা গেল যে, রয়্যাল কমিশনের নিয়োগ ও রিপোর্টের ফলে এ দেশকে কি অধিকার দেওয়া হইবে, এই আশায় এ দেশের লোক অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ জন্য পরস্পর বিরোধ ও সংঘর্ষের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তখন স্থির করা হইল যে, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। উৎকট আশায় অধিককাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই সম্ভব। উহা হইতে যদি কমিশন শীঘ্র বসাইয়া ভারতের প্রায়োজনানুরূপ শাসন-সংস্কারের একটা ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে সকলেই জানিতে পারে, তাহারা কতটুকু কি পাইতে পারে এবং তাহারা তদনুসারে আপন আপন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে দেশ ও জাতিগঠনমূলক কার্য্য করিয়া যাইতে পারে। তখন আর পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-বিবাদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

"এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এখনই কমিশন গঠন করা স্থির হইয়াছে। সার জন সাইমন এই কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন। তিনি উদারনীতিক দলের অন্যতম নেতা, প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। তাঁহার নিকট ভারতবাসী উদার ব্যবহারের এবং নিরপেক্ষতার প্রত্যাশা অবশ্যই করিতে পারে। তাঁহার সহিত আর যে কয় জন সদস্য কমিশনে থাকিবেন, তাঁহাদের মধ্যে উদারনীতিক দলীয় লোকও আছেন, শ্রমিক দলীয়ও আছেন, এবং রক্ষণশীল দলীয়ও আছেন। মোট কথা, ইঁহারা সকলেই পার্লামেণ্টের সদস্য। পার্লামেণ্টই যখন ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকারী, তখন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে পার্লামেণ্ট হইতেই বাছিয়া নিয়োগ করা হইয়াছে; এই জন্য ইহার নাম পার্লামেণ্টারী কমিশন হইল। ইহাতে সুবিধা অনেক। প্রথম সুবিধা এই যে, ইঁহাদের সকলেরই ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সম্পর্ক বা সম্বন্ধ নাই, ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বে অর্জ্জিত কোনও সংস্কার লইয়া ভারতে তদন্ত করিতে আসিতেছেন না। সুতরাং ইঁহা-দের নিকট ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের আশা করিতে পারে। অপর দিকে যদি ভারতবাসীকে এই কমিশনে নিযুক্ত করা হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে নানাভাবের ভাবুক রাজনীতিককে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইত, কেন না, এক জনকে লইয়া অপরকে বাদ দিলে দ্বেষ-হিংসা ও কলহ-বিরোধ উপস্থিত হইত। অথচ এইরূপ নানা পরস্পর-বিরোধী রাজনীতিককে কমিশনে গ্রহণ করিলে রিপোর্ট লিখিবার কালে তুমুল মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত, হয় ত তাহার ফলে পরস্পর বিরোধী মেজরিটি ও মাইনরিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইত, হয় ত বা তাহাদের স্ব স্ব স্বাধীন মতামতও বিবৃত হইত। ইহার ফলে কোন কার্য্যই হইত না, উহাতে ভারতের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই সাধিত হইত।

"কিন্তু কমিশনে ভারতবাসী সদস্য গ্রহণ করা হইল না বলিয়া ভারতবাসীর মতামত অগ্রাহ্য করা হইবে না। ভারতের ব্যবস্থা পরিষদের মধ্য হইতে সদস্যরা কয়েকজনকে বাছাই করিয়া জয়েণ্ট কমিটী নিযুক্ত করিবেন, তাঁহারা কমিশনকে তাঁহাদের মতামত লিখিয়া জানাইবেন। এই টুকু কায করিয়াই যে জয়েণ্ট কমিটীর কর্ত্তব্যের অবসান হইবে, তাহা নহে। কমিশন যত দিন কায করিবেন, তত দিন প্রয়োজন হইলে জয়েণ্ট কমিটীর সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এমন কি, বিলাতের পার্লামেণ্টে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল হইলে পর যে পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট কমিটী রিপোর্ট সম্বন্ধে

শেষ আলোচনা করিবেন, তখনও হয় ত জয়েণ্ট কমিটীর বিলাতে উপস্থিতি ও সাহায্যদান প্রয়োজন হইবে। ভারত সরকার ও বলডুইন সরকার কমিশনের রিপোর্ট বিচার করিবার কালে ভারতের জয়েণ্ট কমিটীর বা অন্য সূত্রের মতামত অগ্রাহ্য করিবেন না। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহের মতামতও অগ্রাহ্য হইবে না। ফল কথা, সকল বিষয়েই ভারতীয়ের মতামত লইয়া কমিশনের রিপোর্ট বিবেচিত হইবে।"

মোটামুটি এইটুকুই বড় লাটের ভারতীয় গ্রহণ না করার কৈফিয়ৎ। বড় লাট স্বয়ং উদারহৃদয় ভদ্রলোক, সে জন্য বলডুইনের টোরী সরকার তাঁহাকে যে সমস্যায় ফেলিয়াছেন, সেই সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি অন্তরে বলডুইন সরকারের এই অন্যায় অবিচারে দুঃখিত ও লজ্জিত, তাই যতদূর সম্ভব, ভারতের অপমানের বিষ-বড়ীটি চিনির মোড়কে মুড়িয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে জন্য তিনি মহাত্মা গন্ধীপ্রমুখ বিভিন্ন মতাবলম্বী ভারতীয় নেতৃবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া কমিশনের উপকারিতা ও সারবত্তা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কায হয় নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। সকল শ্রেণীর ভারতীয় নেতাই বলডুইন সরকারের ও বার্কেনহেডের এই ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে অমঙ্গলকর ও অপমানকর বলিয়া বুঝিয়াছেন।

অন্য পরে কা কথা, তেজবাহাদুর সপরুপ্রমুখ বিশিষ্ট মডারেট নেতা এবং 'লীডারের' মত শক্তিশালী মডারেট-পত্র এই কমিশনের সহিত সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজের সুবিচারে আস্থাবান্, যাঁহারা সে জন্য এত দিন মণ্টেগু-সংস্কার আইনের সহিত সহযোগ করিয়া আসিয়াছেন, ঐ সংস্কার অপ্রচুর ও ভারতের আশানুরূপ নহে বলিয়া জানিয়াও উহা সফল করিবার জন্য দেশবাসীর বিরাগভাজন হইয়াও সরকারের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকেও বার্কেনহেড ও বলডুইন বিশ্বাস করিয়া কমিশনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, ইহা কি তাঁহাদের পক্ষে লজ্জা, ক্ষোভ ও অপমানকর নহে?

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মুক্তকণ্ঠে দেশবাসীকে কমিশনের সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুসভার অন্যতম নেতা লালা লাজপৎ রায় এই কমিশনকে ভারতের পক্ষে অপমানকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মুসলমানপক্ষে সার মহম্মদ সফি, মিঃ জিনা, সার আবদর রহিম কমিশনের বিরুদ্ধে গিয়াছেন। সার তেজবাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"It means a complete want of confidence in the judgment and capacity of Indians to serve on a Commission which is to determine the future Government of their own country,—অর্থাৎ ভারতীয়দিগের স্বদেশের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী কিরূপ হইবে, রয়াল কমিশন তাহার বিচারে বসিতেছেন, অথচ ভারতীয়ের সেই বিচারের ক্ষমতা বা সামর্থ্য নাই বলিয়াই যেন তাহাদিগকে কমিশন হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কি ভারতীয়ের ন্যায়বিচারে ও সামর্থ্যে অবিশ্বাসই অনুসূচিত হইতেছে না?" সার আবদর রহিম বলিয়াছেন,—"ভারতীয়দিগের নিজের দেশের উপযোগী শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজের সহিত ভারতীয়রা সহযোগ করিয়া বিচারের দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করিতে পারিল না, ইহা কেমন কথা?" বস্তুতঃ, ইহাতে কি গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের উদ্দেশ্য বিফল করা হইতেছে না? অথচ এই এ্যাক্ট অনুসারেই কমিশন নিযুক্ত হইতেছে। কেমন সুন্দর ব্যবস্থা! ইহাই কি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের (Self-determination) অধিকারের প্রকৃষ্ট নমুনা? ইহারই জন্য কি ভারতবাসী ফ্রান্সের ও বেলজিয়ামের মিশরের ও ইরাকের রণক্ষেত্রে হৃদয়ের শোণিত দান করিয়াছিল? ফল কথা, ভারতের কোন সম্প্রদায়ই (অবশ্য য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ব্যতীত) ইহার পক্ষে নাই। য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'পাইওনিয়ার', 'ইংলিশম্যান' ও 'সিভিল মিলিটারী গেজেট' প্রমুখ শক্তিশালী পত্রও কমিশনের সদস্যনিয়োগে সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

অবশ্য জয়চাঁদ মিরজাফরের দেশে জনকতক রাজা-রাজড়া, আমীর নবাব বা সার, রায়বাহাদুর যে কমিশনে সাক্ষ্য দিতে যাইবেন বা কমিশনকে অন্যরূপে সাহায্যদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহাদের মতামত এ দেশে মান্য হয়, যাঁহারা দেশের শীর্ষস্থানীয়, সেই সকল মনীষী রাজনীতিকের মধ্যে কমিশনের সম্বন্ধে মতভেদ নাই। তাঁহারা যে শ্রেণীর ভাবুকই হউন, যে নীতির

অনুসরণ করুন, কমিশনকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর। এমন কি, কংগ্রেস, মসলেম লীগ, হিন্দু-সভা, ন্যাশানাল লিবারাল ফেডারেশান ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কমিটী—এই কয়টি প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে একযোগে কমিশনকে বর্জ্জন করিবার প্রস্তাবও হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদীরা উট পক্ষীর মত বালুকারাশির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সাইমুমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত হউন, ক্ষতি নাই, জগতের নিরপেক্ষ জাতিমাত্রই বুঝিবেন, ভারতবাসী বলডুইন গভর্ণমেণ্টের দয়াদত্ত মরজি-মত কমিশন কামনা করে না।

অমঙ্গলেও মঙ্গল দেখা দিয়া থাকে। আজ আত্মম্ভরী সাম্রাজ্যগর্ব্বী টোরী গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাকৃত অবিচারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভারতে আবার যেন একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রচেষ্টার আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে—যেন সুদূর প্রাচ্যাকাশে নবউষার ক্ষীণ রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া ভারতে আবার নবযুগের উদয় হউক, ভারতবাসী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আপনার মুক্তির পথ চিনিয়া লউক, ইহাই কামনা।

দেশ বড়, না সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বড়?

বর্ত্তমানে দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে যে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মনের দুঃখে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এ অভাগা দেশ চিরদিনই পরপদানত থাকুক, হিন্দু-মুসলমানে মিলন হইয়া কায নাই, যে যাহার স্বার্থ লইয়া পরস্পর আপন আপন কোট বজায় করিয়া আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করুক। বস্তুতঃ একটির পর একটি হিন্দু আর্য্যসমাজী নেতা পিশাচপ্রকৃতির ভাড়াটিয়া গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমান ঘাতুকের ছোরা বা পিস্তলে নিহত বা সাংঘাতিক আহত হইতেছেন, আর সমগ্র হিন্দুসমাজের হৃদয়ে ক্রোধ ও ক্ষোভের দাবানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই গুণ্ডামী, এই নরহত্যার পেশা যাহারা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, তাহাদের সমাজে মাত্র হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আনসারি ব্যতীত আর কাহারও মুখে এ যাবৎ এই ভাবের জঘন্য কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ-মন্তব্য প্রকাশিত হইতে শুনা যায় নাই। এই দুই জন মুসলমান নেতা যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাও মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে করা হইয়াছে। যেন মনে হয়, মুসলমান নেতারা এ সকল হত্যাকাণ্ডে আনন্দ ও গর্ব্বই অনুভব করিতেছিলেন অথবা স্বসমাজে অপদস্থ হইবার বা গুপ্ত ঘাতুকের ছোরার আঘাতে নিহত হইবার আশঙ্কায় প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয়েন নাই। ডাক্তার আনসারি ও হাকিম আজমল খাঁর নৈতিক মনোবল অবশ্যই প্রশংসনীয়।

ডাক্তার আনসারি এবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথার মূল্য আছে। অন্ততঃ হিন্দুর নিকট যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আজকাল মুসলমানরা যে ভাবে কংগ্রেস বর্জ্জন করিতেছেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে কূর্ম্মের মত রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্র গুটাইয়া লইতেছেন, তাহাতে তাঁহার কথার মূল্য মুসলমানদের মধ্যে কতটুকু আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি মুসলমান হইয়াও মুসলমান দ্বারা সাম্প্রদায়িক হিন্দু-হত্যা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর হত্যাকারী ও তাহাদের পশ্চাতে ষড়যন্ত্রকারী উত্তেজক দলের অস্তিত্বের পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় না। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিব্যক্তির ফলে লোক বিনা উত্তেজনায় নরহত্যা করিতেছে,—ইহাতে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছেন।

ডাক্তার আনসারির এই কথার মধ্যে 'লোক' স্থলে 'মুসলমান' এবং 'নর'-হত্যা স্থলে 'হিন্দু'-হত্যা বুঝিলেই কথাটা খোলসা হইয়া যাইবে।

ডাক্তার আনসারি এই ব্যাপারে অপমানিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি দেখিয়াছেন, ইহার ফলে দেশ উৎসন্নের পথে যাইতেছে, জাতীয়তাগঠনের এবং মুক্তিলাভের আশা সুদূরপরাহত হইতেছে। তাই তিনি ধীরগম্ভীর উদাত্তস্বরে তাঁহার সমাজের নেতৃবর্গকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—"পঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে মুসলমানরা এই প্রকৃতির জঘন্য কার্য্যের সহিত সংস্রবশূন্য থাকিবেন এবং যখনই এইরূপ ব্যাপার ঘটিবে, তখনই অপরাধীকে জানাইয়া

দিবেন—তাহার স্বধর্ম্মীরা তাহার কার্য্যের সমর্থন করেন না।"

ডাক্তার আনসারি সাম্প্রদায়িক বিরোধের অথবা গুপ্ত-হত্যার অপকারিতা বুঝিয়াছেন, কারণ, তিনি সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষা দেশকে—জাতীয়তাকে বড় বলিয়া জানেন। এই সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান থাকিতে দেশের মুক্তি যে অসম্ভব, এ কথা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার এবং হাকিম আজমল খাঁর ন্যায় আরও দুই চারি জন উদার-প্রকৃতির মুসলমান এই ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু তাঁহারা কয় জন? আজ তাঁহারা যদি মুষ্টিমেয় না হইতেন, যদি তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প বলিয়া অধিকাংশের ভয়ে নীরব না থাকিতেন, তাহা হইলে দেশে এমন ব্যাপার সম্ভবপর হইত না। অধিকাংশ মুসলমান নেতা সাম্প্রদায়িতার প্রভাবে অন্ধ না হইলে—হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য না হইলে দেশে আজ এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না। তাঁহাদের এই অন্ধতা ও সংকীর্ণতার ফলে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উপশমিত হইবার কোন আশাই দেখা যাইতেছে না। হয় ত তাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই শ্রেণীর বিরোধ বদ্ধমূল করিয়া রাখিবার জন্য অন্যায় উত্তেজনা জাগাইয়া রাখিতেছেন। স্বসমাজের অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধগণকে সদুপদেশ দ্বারা অন্যায় নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলার পরিবর্ত্তে তাঁহারা যেন বরং সেই ধর্ম্মান্ধতাকে জাগাইয়া রাখিবার অনুকূল বক্তৃতা ও রচনা প্রকাশ করিতেছেন।

কেহ বলিতেছেন,—দশ হাজার মুসলমান ভলাণ্টিয়ার তৈয়ার হইলেই লালার দল নতজানু হইয়া মুসলমানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। কেহ 'কাফের'দিগের বিপক্ষে মুসলমানের ন্যায়যুদ্ধের উৎকর্ষের সূক্ষ্মমর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। কেহ বা বলিলেন, সকল মানুষই মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে (যদিও মুসলমানের ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ অনেক মানুষ জন্মিবার পরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন); সুতরাং সকল মানুষের মুসলমান হওয়া স্বাভাবিক; পরন্তু মহাত্মা গন্ধী কবে মুসলমান হইবেন, সেই শুভমুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে বহু মুসলমাননেতা সাম্প্রদায়িক বিরোধের বহ্নি প্রকাশ্যে বিসর্পিত করিতেছেন। ইহার আরম্ভ আলিগড়ে—পরিণাত কোথায়, ভারতের ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন। আলিগড়ের বক্তৃতার নায়ক হিন্দুর শুদ্ধি ও সংগঠনের চেষ্টা একবারে ক্ষেপিয়া গিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, উহা ইসলামের পক্ষে বিপজ্জনক—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও লালা লাজপৎ রায়প্রমুখ হিন্দুদিগের নেতৃবর্গের দ্বারা পরিচালিত এই সকল অনুষ্ঠান ইসলামের পক্ষে ঘোর বিপজ্জনক। এই বক্তৃতার পর মুসলমানের মনোভাব কি হইতে পারে, তাহারা শুদ্ধি ও সংগঠনের পরিচালক হিন্দু নেতৃবর্গকে কি দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হয়? ইহার পর যদি রসীদের মত লোকের উদ্ভব হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মুসলমান-স্বার্থে অন্ধ নেতার বক্তৃতায় কি অমনুষ্যকারিতার পরিচয় পরিস্ফুট নহে—উহাই কি সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল নহে?

এই বিরোধ হইতে ক্রমে কুলকাঠির আবদার বড় লাটের শাসন-পরিষদে (সার মহম্মদ হবিবুল্লার পদে অস্থায়িভাবে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বীকে না লইবার আবদার, মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ রাখিবার আবদার—কত আবদার ও বাহানাই না দেখা দিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের কয়েক জন মুসলমান সদস্য হিন্দু নেতাদিগের সহিত একটা রফার বন্দোবস্তের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস-নেতারা তাহাতে কতক সম্মত হইয়াছিলেন। সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও বাঙ্গালায় হিন্দুদিগকে অনেক স্থান বিসর্জ্জন দিতে হইত; কিন্তু ইহাতেও অধিকাংশ মুসলমান সম্মত হইলেন না, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবস্থাপরিষদে নেতাদের কথা মানিয়া লইতে চাহিলেন না। পঞ্জাবে মুসলমানরা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন,—হিন্দুর সহিত তাঁহাদের রফা হইতে পারে না, তাঁহারা রফা চাহেন না। বিহারে মুসলমান সভা ঘোষণা করিলেন, তাঁহারা রফা মানিতে চাহেন না। মুসলমানদের এক ডেপুটেশান বিলাতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা বিলাতে গিয়া বুঝাইলেন (রয়াল কমিশন আসিবার পূর্ব্বে) মুসলমানরা হিন্দুর সহিত কোন রফায় প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও অধিকার চাহেন।

রাজপালের 'রঙ্গিলা রসুলের' সূত্র ধরিয়া বিরোধ আগুন আরও ভীষণরূপে জ্বালাইয়া তুলা হইল। নানা স্থানে দাঙ্গা হইল, সীমান্তে হিন্দু নির্য্যাতিত হইল,

হইতে হিন্দু বিতাড়িত হইল, একখানা সীমান্ত মুসলমান-পত্র মহাত্মা গন্ধীকে ভয় দেখাইল, কত কি হইল। তাহার পর রাজপালকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইল, লালা মাণিকচাঁদ ও স্বামী সত্যানন্দকেও হত্যা করিবার চেষ্টা হইল; স্বামী বাঁচিয়া গেলেন, মাণিকচাঁদ মুসলমানের ছোরার ঘায় ইহলোক ত্যাগ করিল। রাজপালের উপর আক্রমণের কারণ বুঝা যায়, কেন না, সে 'রঙ্গিলা রসুলে'র প্রকাশক; কিন্তু মাণিকচাঁদ ও স্বামী সত্যানন্দের কি অপরাধ হইয়াছিল, জানা যায় নাই। এই দুই হত্যার চেষ্টা যে মুসলমান নেতৃগণের হিন্দুর বিপক্ষে 'জেহাদ' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার প্রচারের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনও জানা গিয়াছে যে, কাঠমোল্লারা গুপ্তভাবে উপদেশ দিয়া বেড়াইয়াছে যে, কাফের হত্যা করিলে বেহেস্তের পথ উন্মুক্ত হইবে। ভাই পরমানন্দ প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে,—মুসলমান-নেতা ও মৌলভীরা ধর্ম্মান্ধ মুসলমানকে হিন্দুহত্যার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। অবশ্য তিনি কোথায় ইহার ভিত্তি পাইলেন, তিনিই বলিতে পারেন। তবে আমরা জানি, কুলকাঠির মৌলভী সাহাবুদ্দীনের হিন্দু কাফেরের বিপক্ষে মুসলমানকে উত্তেজিত করার জন্য রাজার বিচারে কারাদণ্ড হইয়াছে। অন্যত্র আর এক মৌলভীও এই অপরাধে ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কাগজের ও বিজ্ঞাপনের মারফতে কাফের-বিদ্বেষ প্রচারিত হইয়াছে—স্বদেশী যুগের লাল ইস্তাহারের মত হ্যাণ্ডবিল বিতরিত হইয়াছে বলিয়াও শুনা যায়।

খেলাফতের চতুর 'মওলানা' সারা জগৎকে মুসলমান দেখিতে চাহেন—তিনি খোলাখুলি Pan Islamist. তিনি প্রকাশ্যে হিন্দুর মুখের উপর বলিয়াছেন,—I am a Moslem first and Indian afterwards, আমি প্রথমে মুসলমান, তাহার পর ভারতবাসী। অন্যান্য মুসলমানরাও ডেপুটেশান করিয়া বিলাতে দরবার করিতে গিয়াছেন, যাহাতে প্রত্যেক কার্য্যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও চাকুরী বজায় থাকে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দুরা কিন্তু এখনও মুসলমানের সহিত একযোগে ভারতের মুক্তি কামনা করিয়া থাকেন! প্রচার ও উত্তেজনার ফলে মুসলমানের ধর্ম্মান্ধতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দুই চারিটি ধর্ম্মবিশ্বাসী সত্যসন্ধ ন্যায়পরায়ণ মুসলমান বলিয়াছেন যে, মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্যে উপাসনার ব্যাঘাত হয় না, ইহা মুসলমান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু জিদ এবং অন্ধ-বিশ্বাস এমনই চিজ যে, উহা কোন মুসলমান মানিতে চাহে না। বিশেষতঃ প্রচার দ্বারা জিনিষটিকে এমন ঘোরাল করিয়া তুলা হইয়াছে যে, গীতবাদ্যের নাম শুনিলে মুসলমান ক্ষেপিয়া উঠে। এখন কেবল মসজেদের সম্মুখে নহে, হিন্দু গৃহস্থের গৃহে সত্যনারায়ণের পূজার শঙ্খঘণ্টা বাজিলে মুসলমান বাধা দেয়, শ্মশানে শবদাহে হরিবোল দিলে মুসলমান লাঠি-সোঁটা লইয়া হাজির হয়—যেন মুসলমান নিজে গীতবাদ্য বা আমোদপ্রমোদ কখনও করে নাই! মধ্যপ্রদেশের বিগওয়ারা সহরে মুসলমানরা এক হিন্দু শোভাযাত্রাকে তাহাদের মসজেদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যাদিহীন হইয়াও যাইতে দেয় নাই। তাহারা কারণ দেখায় যে, ইস্‌লামের সরিয়ৎ অনুসারে অ-মুসলমানমাত্রেই মসজেদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, সুতরাং হিন্দুরা শোভাযাত্রায় গীতবাদ্য লইয়া যাউক বা না যাউক, হিন্দুর শোভাযাত্রা-মাত্রেরই পক্ষে মসজেদের পথ সদা-সর্ব্বক্ষণ নিষিদ্ধ। অথচ মজা এই, যখন সরকারের গোরা বা কালা পল্টন ব্যাণ্ড বাজাইয়া মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাত্রা করে, তখন মুসলমান আপত্তিকারীর সন্ধান পাওয়া যায় না। জেমসেদপুরে কিছু দিন পূর্ব্বে এইরূপ একটি ব্যাণ্ডের শোভাযাত্রায় আপত্তি উঠিয়াছিল বলিয়া ব্যাণ্ড আরও জোর কদমে শোভাযাত্রা করিয়াছিল। অমনই আপত্তি নিমিষে অন্তর্ধান করিয়াছিল। শুনা গিয়াছে, ফরিদপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের (মুসলমান) কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সারাদিন ব্যাণ্ড বাজিয়াছিল, অথচ মাত্র কয় হস্ত দূরে একটি মসজেদ ছিল। এ সব ক্ষেত্রে ব্যাণ্ড যাঁহারা বাজাইয়াছিলেন, তাঁহারা 'হিন্দু' নহেন; বোধ হয়, এই জন্য তাঁহাদের সাত খুন মাপ ছিল!

এই যে কৃত্রিম উপায়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহাতে মঙ্গল কাহার? হিন্দুর ত নহেই, হিন্দু সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। হিন্দু দেশকে ভালবাসে, দেশের মুক্তির জন্য সে অনেক অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সরকারের পক্ষেও মঙ্গলকর নহে, তাহা এত দিনে সরকার বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে, নতুবা বড় লাট লর্ড আরউইন সাম্প্রদায়িক বিরোধ অবসান করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেন না, আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। নতুবা

পঞ্জাবের সরকারও গুপ্ত-হত্যার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া ষড়যন্ত্রের মূল ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না। এত দিন তাঁহারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অনেক কায হইত,—এ কথা বলিয়া এখন আর ফল নাই।

এক কথা,—মুসলমানদের মঙ্গল হইবে কি না। যথার্থ দেশপ্রেমিক, সমাজ-হিতৈষী মুসলমান যে এই বিরোধকে অমঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল কাঠ-মোল্লা-মৌলভী এই অমঙ্গলে নিজেদের মঙ্গলের সন্ধান পাইয়াছে, তাহাদের একবার আফগানিস্থানের অথবা তুর্কীর দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। তাহাদের দৃষ্টি ত ভারতের বাহিরে ইরাণ-তুরাণের দিকে আছেই—তাহারা স্বদেশ বলিতে ভারতকে বুঝে না, মুসলমান জগৎকে বুঝে। কিন্তু সেখানে তাহাদের কত খাতির, তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। মৌলবী-মওলানারা হজে গিয়া সে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় নিশ্চয় করিয়া আসিয়াছে। যে তুর্কী তাহাদের আদর্শ, সেই তুর্কীর দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা গাজী মোস্তফা কামাল পাশা এবার তুর্কীর জাতীয় পরিষদে বহুক্ষণব্যাপী বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহারা শুনিয়াছে কি? কামাল পাশা বহুদিন হইতেই শাসন ও ধর্ম্মকে পৃথক করিয়াছেন,—শেখ-উল্-ইস্‌লামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, খেলাফতের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন, সুলতানের ইলদিজ প্রাসাদ সরকারী কার্য্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন, বোরখা ও ঘোমটা ঘুচাইয়াছেন, ফেজ তাড়াইয়াছেন,—এ কথা সকলেই শুনিয়াছিল। কিন্তু কামাল পাশা এবার তাঁহার মনের কথা যখন জাতীয় পরিষদে খুলিয়া বলেন,—যখন প্রাণোন্মাদকর বক্তৃতায় তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দেশজননীর সেবায় দেশবাসীকে প্রাণ উৎসর্গ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন সমগ্র সভা সমস্বরে মুহুর্মুহুঃ তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়াছিল, মুসলমান তুর্কী তাঁহাকে সমাজ-সংহারক বলিয়া বর্জ্জন করে নাই, দেশের সুসন্তান বলিয়া বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। অথচ এই তুর্কী জাতি কিরূপ ধর্ম্মান্ধ ও প্রাচীনপন্থী না ছিল! দেশপ্রেমের, স্বজাতির গৌরবের এমনই প্রাণোন্মাদকর প্রভাব!

আর আমরা মওলানা-মৌলভীদিগকে একবার আফগানিস্থানের "আমান-ই-আফগান" নামক পত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আফগানিস্থানের স্বাধীনতার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই পত্র পরাধীন ভারতের ভ্রাতৃবিরোধ সম্পর্কে যে দুঃখ, যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া করিয়াও যদি তাঁহাদের চৈতন্য হয়, লজ্জা হয়, 'তাহা হইলে তাহাও আমরা শুভ বলিয়া মনে করিব।

'আমান-ই-আফগান' লিখিয়াছেন,—"স্বাধীনতাই জাতির প্রাণ (আত্মা), উহা মনুষ্যমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। যাহারা ইহা অস্বীকার করে, তাহারা অতীব হতভাগ্য, অতীব মন্দ এবং জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দয়। স্বাধীনতা জাতির ধর্ম্ম রক্ষা করে। বর্ত্তমানে ভারতের হৃদয়বিদারক অবস্থা এবং শোচনীয় দুর্ঘটনা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়, চক্ষু হইতে শোণিতের অশ্রু নিঃসৃত হয়। ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ খৃষ্টানের অভ্যুদয় দেখিয়া কত কষ্ট হয়! যদি ভারত স্বাধীন হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী তাহার পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিত না, তাহার জাতীয় মহত্ত্ব হারাইত না, দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইত না। স্বাধীনতা জাতির ন্যায়সঙ্গত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ। ইহা যদি হইত, তাহা হইলে চীনদেশের সাহসী ও তেজস্বী তরুণগণ এই স্বাধীনতার জন্য ৯ বৎসর পূর্ব্বে শরীরের রক্তদান করিত না। আফগান-স্বাধীনতার শক্তিশালী হস্তার যখন আফগানিস্থানের বুকে তাহার নখদন্ত বসাইয়াছিল, তখন সাহসী ও তেজস্বী আফগান তরুণদল বিদেশীর আশ্রয়ের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার জন্য তাহাদের রক্তদান করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল;—জগৎ তাহাদের বীর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। এই স্বাধীনতা সূর্য্যোদয়ের দিন হইতে আফগানিস্থানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

কথাগুলি পাঠ করিলে মন কত উন্নত হয়, স্বাধীন শূরবীর আফগান জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় অন্তর কিরূপ ভরিয়া যায়! স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজও এই কথার পূর্ণ সমর্থন করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের নিকট "সাম্প্রদায়িকতা আগে, দেশ ও স্বাধীনতা পরে" বলিয়াই মনে হয়। নতুবা তাঁহারা হিন্দু-হত্যা নীরব সমর্থন করিয়া জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠায় পদে পদে বাধা দিতেছেন কেন? 'আমান-ই-আফগান' শেষে বলিতেছেন,—"পাইওনিয়ার পত্র বলিয়াছে, ভারতকে শত্রু (বলশেভিক) আক্রমণ হইতে রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু নিমজ্জিত নৌকাকে জলতল হইতে উদ্ধার করার সার্থকতা কি?" অর্থাৎ আফগান পত্র বলিতে চাহেন, ভারত বিদেশীর আক্রমণ হইতে কি রক্ষা করিবে? যে পরাধীন ও পরের দাস, তাহার রক্ষা করিবার মত কি আছে?

এই উপদেশ কি এ দেশের লোক গ্রহণ করিবে? মনে ত হয় না। যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, দেশ ও জাতি উৎসন্ন বা রসাতলে যাউক, ক্ষতি নাই, আপনার কোলে বেশী ঝোল টানিতে পারিলেই হইল,—এই ভাবই এক্ষণে বলবৎ হইয়াছে। ইহা ভারতের দুর্ভাগ্য ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে?

স্বাবলম্বন

প্রতীচ্যের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে রাজনীতিক দলাদলির খাতিরে বড় বড় রাজনীতিকের মুখে প্রয়োজনকালে এমন অনেক বড় কথা শুনা যায়, যাহা প্রয়োজন ফুরাইলে স্বপ্নকথা বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশেও প্রতীচ্যের রাজনীতির অনুকরণে এই ভাবের মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে। মহাত্মা গন্ধী আমাদিগকে রাজনীতির (diplomacy) প্রভাব হইতে দূরে থাকিতে আভাসে ইঙ্গিতে অনেক সময় উপদেশ দিয়াছেন। বিলাতের রাজনীতিক কার্য্যোদ্ধারকালে ভারতবাসীকে অনেক আশার বাণী শুনাইয়া থাকেন। তখন সে কথা শুনিলে মনে হয়, ইংরাজের মত উদারনীতিক, স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি আর ভূভারতে নাই। কিন্তু সেই রাজনীতিক যখন 'পাটে বসেন' অর্থাৎ স্বয়ং শাসন-কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করেন, তখন তাঁহার মুখে একবারে বিপরীত ভাবের কথাই শুনা যায়। আমাদের দেশের অনেকে শ্রমিক দলের বড় আশা করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শ্রমিক দলের দয়াদত্ত দানের ফলে ভারতের অধীনতা-বৈতরিণী পার হইবেন। কিন্তু এ জগতে কোন জাতি অন্য জাতির দয়ায় স্বাধীনতা-ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই! মহাত্মা গন্ধী এই হেতু অনেক ভূয়োদর্শনের পর অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উহার প্রথম ও প্রধান সোপান স্বাবলম্বন। সেই স্বাবলম্বনে আমরা যত দিন অভ্যস্ত হইতে না শিখিব, তত দিন শত শ্রমিক সরকার আমাদিগকে মুক্তিধন দিতে পারিবেন না।

একবার ইহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে, শ্রমিক দল তখন শাসন-পাটে বসিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা 'ব্রজের কথা' ভুলিয়াছিলেন, কেন না, মথুরায় রাজা হইয়াছিলেন। মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড সে সময়ে প্রধান মন্ত্রী, তাঁহারই আমলে বাঙ্গালায় বিধিবজ্র পাশ হইয়াছিল, বিনা বিচারে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল। অথচ এই রামজে ম্যাকডোনাল্ডই যখন পাটে বসেন নাই, তখন ভারতকে স্বাধীনতার তান বাঁশীর গানে শুনাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি বিলাতে সাধারণ নির্ব্বাচনের পালা আসিতেছে। তাই এখন হইতেই যে যাহার দলের গান মহলা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁহার শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রে ভারত-প্রীতির উচ্ছ্বাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটির নাম হইয়াছে—"জাতীয়তা।" কেমন, চমৎকার চিত্তাকর্ষক নাম নহে কি? সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের ও তথা স্বাধীনতাপ্রিয় সাম্রাজ্যিকতা-বিরোধী বৃটনের ভোট কুড়াইবার উদ্দেশে তিনি তান ধরিয়াছেন—

"আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক অধীন জাতি আছে। এ সকল জাতিকে আমাদের অধীনে রাখিবার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে,—আমরা তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষিত করিতেছি, ইহাই তাহাদিগকে আমাদের অধীনে রাখার উদ্দেশ্য। আমরা এই কৈফিয়ৎই এ যাবৎ দিয়া আসিয়াছি। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের অনেকে এখনও ভারতকে আরও অনেক দিন শিক্ষানবীশ অবস্থায় রাখিবার অসংখ্য অজুহৎ দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এখন ঐ ভাবের যুক্তি-তর্কের দিন আর নাই, এখন সহজ বুদ্ধিবশে কায করিয়া যাওয়াই সঙ্গত। ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হইয়াছে,—এমন সময় কখন্ আসিবে, আমাদের আর বলিয়া উঠা ঘটিবে না, সে সময় কখনও আসিবে না, যদি আমরা সহজবুদ্ধিতে কায না করিয়া—কূটতর্কজাল বিস্তার করি। স্বাধীনতা প্রদান করিলে ভারতের অমঙ্গল হইবে, এমন কথা কেহ কল্পনা করিতে পারেন না। ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করা হউক। আমাদের অভিভাবকতায় থাকিয়া

ভারতের আর কোন উপকারলাভের আশা নাই। তৎপরিবর্ত্তে ভারত আমাদের মেরুদণ্ডস্বরূপ অন্যান্য স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশের মত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইবে। হয় ত ভারতের শিখিবার এখনও অনেক আছে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই তাহাকে স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। সেই ব্যবস্থা করিবার সময় আসিয়াছে।"

কেমন, কথাগুলি চমৎকার নহে কি? যেন শ্রমিক দলপতি একবারে দাতাকর্ণ হইয়া ভারতকে স্বাধীনতা বিলাইয়া দিতে অগ্রসর! অথচ এই ভারতপ্রেমের ভাণ যে অভিনয়, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না; কারণ, এই মিঃ ম্যাকডোনাল্ডই প্রধান মন্ত্রিরূপে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—

"ভারতের উন্নতি স্থায়ী করিতে হইলে উহা রাজনীতিক নিয়মানুগ পন্থায় বিহিত করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, অনেক বিপ্লব প্রথমে সাফল্যলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, নানা দুঃখ-বিপদের পর বিপ্লবে অসাফল্য দেখা দিয়াছে, বিপ্লবের উদ্যম ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, বিপ্লববাদী পূর্ব্বে যে সকল নীতি পরিহার করিয়াছিল, পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে যদি নিয়মানুগ পন্থা ও বিপ্লব-পন্থার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ভারতের কোন আশা (মুক্তির) থাকিবে না। হিংসার বিভীষিকা প্রদর্শনে অথবা শাসনযন্ত্র বিকল করিবার ভয় প্রদর্শনে বিলাতের কোন রাজনীতিক দলই ভীত হইবে না। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায়ের সে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ঘটনার প্রবাহ তাহাদের সে বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবে—তাহাদিগের আশা চূর্ণ করিবে সন্দেহ নাই। আমি ভারতবাসীকে আমাদের সহিত সহযোগ করিয়া যুক্তি ও প্রীতির পথ গ্রহণ করিতে বলি।"

এই উক্তিতে অসহযোগ আন্দোলনের এবং কাউন্সিলে বাধা-প্রদান নীতির প্রতি কটাক্ষপাত ছিল, পরন্তু ভারতবাসী যদি ইংরাজের কৃপাভিখারী হইয়া তাঁহাদের সহিত সহযোগ করে, তাহা হইলে তাহাদের আশা কখনও না কখনও সফল হইতে পারে,—এইরূপ ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু ২ শত বৎসরের সহযোগদান ও কৃপাভিক্ষার ফলে ভারতবাসী কি ফললাভ করিয়াছে? কেবল 'বচন!' আর 'বচন!' আর কিছুই নহে। মহাত্মা গন্ধী চিরদিন ইংরাজ-রাজের অকৃত্রিম বন্ধু ও মঙ্গলকামী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় ধন-প্রাণ দিয়া ইংরাজের সহিত সহযোগ কে করিয়াছে? দক্ষিণ-আফ্রিকায়ই কি, আর ভারতেই কি, তিনি চিরদিন ইংরাজের নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার অভিমত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি পরে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিতে ছিলেন কেন, তাহা কি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড জানিতেন না? আজন্ম ভোগৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চিরদিনই ইংরাজ-শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি কি জন্য কাউন্সিলে বাধা-প্রদান নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাও কি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের অবিদিত ছিল? তবে?

এ সব কথার মার-পেঁচে এখন আর লোক ভুলানো যায় না! এখন সকলে কায চাহে। এ কথাটা এখন বৃটিশ রাজনীতিকরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়। আর দেশের লোকও এ সব diplomacyর ভৈরবীচক্র অতিক্রম করিয়া স্বাবলম্বনের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে শিখিলে কায হইবে, অন্যথা কেবল 'বচনে' মুক্তিধন আপনি হস্তগত হইবে না।

কৃষি-কমিশন

বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড আরউইন স্বয়ং কৃষিবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শী, তাই শুনিতে পাওয়া যায়, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া বড় লাটের পদে তাঁহার নিয়োগ সম্ভবপর হইয়াছে। নতুবা জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিয়োগ হইয়াছে,—এ কথা বিলাতের ভাগ্য-বিধাতারাও বলিতে সাহসী হয়েন না।

বড়লাটরা যখনই এ দেশে আসেন, তখন ভারতের একটা না একটা মঙ্গল করিবেন, এইরূপ ঘোষণা করিয়া স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন এবং বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করেন। লর্ড আরউইনও প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতের কৃষির ও কৃষিজীবীর উন্নতিসাধনের কথা ছিল। তাহারই ফল,—কৃষি কমিশন নিয়োগ।

এ যাবৎ এই কৃষি-কমিশন কি কার্য্য করিয়াছেন, কোথায় কোথায় ঘুরিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং

জন্য কত অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা লিখিতেই একখানা সাতকাণ্ড রামায়ণ রচিত হইতে পারে। অথচ এই কমিশনে কতটুকু কায হইতে পারে—ইহার দ্বারা ভারতের কি উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহার আভাসমাত্রও ভারতবাসী পায় নাই। যাঁহাদের ইচ্ছায় কর্ম্ম, তাঁহারাই সে কথা বলিতে পারেন। লিনলিথগো কমিশন (কৃষি-কমিশন) সম্প্রতি তাঁহাদের দ্বারা ভারতে গৃহীত সাক্ষ্যের সমবায়ে ৯ খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। যতটুকু প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতের আসল যেখানে ব্যথা, সেখানে হাত পড়িতেছে না। তাই আশঙ্কা হয়, অন্যান্য কমিশন কমিটীতেও যে ফল হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই হওয়া সম্ভব।

কৃষিক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য,—(১) ভূমির উৎপাদনশক্তি ও ফসল উৎপাদন, এবং (২) কৃষিজাত পণ্যের উন্নতির প্রসারসাধন। কিন্তু পণ্যের কাটতির জন্য জগতে বাজার খুঁজিবার পূর্ব্বে যে প্রথমে ফসল উৎপাদনের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, ফসলই যদি উত্তম ও প্রচুররূপে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহার বিক্রয়ের জন্য বাজার খুঁজিবার প্রয়োজন কি? ঘোড়া খাঁকিলে চাবুকের অভাব হয় না। এখন দেখিতে হইবে, এ যাবৎ কমিশন যে ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে এই দুই বিষয়ে কি পরিমাণ ঝোঁক দিয়াছেন। ভারতের যে সাক্ষ্য ৯ খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সরকারপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, উহাতে গ্রাম্য জীবনের সকল দিক্ আলোচিত হইয়াছে। এই হেঁয়ালির অর্থ কি? গ্রাম্যজীবনের সকল দিক্ সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করায় কি ফল হইয়াছে? কমিশন ত ভারতের গ্রাম্য জীবন-সংস্কারের পরামর্শ দিতে আইসেন নাই, তাঁহারা আসিয়াছেন তদন্ত করিতে ভারতের কিরূপে কৃষির উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং ভারতের ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা কি উপায়ে বৃদ্ধি হয়, তাহারই সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাক্ষ্য লওয়াই ত তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণে সার্থকতা কোথায়? ইংলণ্ডে যে সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে, তাহাতেও জানা যায়, কমিশন ফসল উৎপাদনের বিষয়ে তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, করিয়াছেন কৃষিজীবীদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা আনয়ন করিবার বিষয়ে। বরং কমিশন মাল (কৃষিজাত পণ্য) কাটতি করিবার দিকে অধিক ঝোঁক দিয়াছেন বলিতে পারা যায়। কিন্তু শস্য উৎপাদন করাই যে অধিক সমস্যার কথা—একটা ধান্যবীজকে কিরূপে দুইটিতে পরিণত করা যায়, একটা আম্রফলকে কিরূপে আকারে দ্বিগুণ করা যায়,—ইহাই হইল কৃষির বিষয়ে বড় সমস্যা। আধুনিক সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক চাষের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবেও সেচের ব্যবস্থা কিরূপে করা যায়, কলম করিয়া, সার দিয়া, বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া, কৃষিক্ষেত্রগুলিকে চটকস্থ মাংসে পরিণত না করিয়া, কৃষির উন্নতির পথে কাঁটা না দিয়া, কৃষির সেবায় গো-মেষ আদির চরিবার মাঠ ও খাইবার দানাপানির সম্বন্ধে আধুনিক প্রথায় উন্নত ব্যবস্থা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে,—এ বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত ছিল। এ দেশের কৃষকের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কথা মনে রাখিয়া কিরূপে তাহাদিগকে কৃষির উন্নতিসাধনে সমর্থ করিতে পারা যায়, সে সমস্যার অনুকূল সাক্ষ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা কমিশনের কর্ত্তব্য ছিল। যদি এই ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া না দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে কমিশনের কোনও সার্থকতা নাই, এ কথা আমরা বলিতে বাধ্য।

তাহার পর যদি জাতিগঠনমূলক কার্য্যে প্রয়োজনমত ব্যয়ের ক্ষমতা হস্তান্তরিত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষকে অর্পণ করা না হয়, তাহা হইলে কমিশনের পরামর্শ লইয়াই বা কি ফল হইবে? আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষির উন্নতিসাধন বহুব্যয়সাপেক্ষ। সরকার সেই ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছেন কি? যদি তাঁহাদের মামুলী শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাব্যপদেশে রাজস্বের বারো আনা অংশ ব্যয় করা এখনও মূলনীতি বলিয়া ধার্য্য হয়, তাহা হইলে এ কমিশন বসাইয়া কি লাভ হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। ধরিয়া লওয়া গেল, কমিশন নানারূপ ব্যয়বহুল উন্নতির পরামর্শ দিলেন। অথচ সরকার উহার অনুযায়ী ব্যয় সমর্থন করিলেন না। তখন? স্থানীন কমিটীও অনেক পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার মূল নীতির মুখ রক্ষা করিতে গিয়া সে পরামর্শ অনুসারে কায করিতে পারিলেন না।

আরও একটি আশঙ্কার কথা আছে। কৃষিজ পণ্যের কাটতির জন্য কোথায় কিরূপ বাজার পাওয়া যাইবে, তাহার সম্বন্ধে যেরূপ আগ্রহভরে কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে স্বতঃই আশঙ্কা জাগিবার কথা। ভারতের কাঁচা মালের দিকে বিলাতের কারখানাওয়ালা মহাজনরা ভর্জ্জিত মৎস্যের প্রতি মার্জ্জারের মত লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, এ কথা সকলেরই বিদিত। এই ব্যবসাদার মহাজনদিগের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতে কৃষিজাত পণ্যের বাজার অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগে নাই ত? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টে "পেঁয়াজ পয়জার" দুই-ই আছে। প্রথম,—ভারতের টাকায় কমিশন বসিয়াছে, দ্বিতীয়,—বিলাতী ব্যবসাদার মহাজনকে ভারতের কাঁচা মাল খরিদ করিবার সুযোগ করিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে।

এইরূপ নানা কারণে কমিশনের উপকারিতা বা সার্থকতা সম্বন্ধে এখন কৃতনিশ্চয় হওয়া যায় না। ভবিষ্যতে তাঁহাদের মন্তব্য কিরূপ হইবে, তাহাও এখন জানিবার উপায় নাই। সুতরাং আমাদিগকে অন্ধকারে থাকিয়াই ভাগ্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাচ্যদেশ-ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সংবাদ-সংগ্রাহকদিগের মারফতে যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, প্রাচ্যের চীন, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগের দ্বারা তিনি সাদরে অভ্যর্থিত ও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, পরন্তু কবীন্দ্র এই সকল প্রাচ্য জাতির সহিত ভারতের লুপ্ত সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত করিবার সূত্রপাত করিয়া আসিয়াছেন। ইহা ভারতের পক্ষে কম লাভের কথা নহে। বহু প্রাচীনকালে এই সকল দেশের সহিত ভারতের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল! তখনকার কালে ভারত হইতে কত নাবিক ও অর্ণবপোত প্রাচ্যদেশে যাতায়াত করিত, ভারতীয় পর্য্যটক, বণিক ও ঔপনিবেশিক ঐ সমস্ত দেশে ভারতীয় পণ্যের সহিত ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম, শিল্প-বাণিজ্য লইয়া যাইত, তাহাতে সে দেশের লোক কিরূপ অনুপ্রাণিত হইত! পক্ষান্তরে, সে সকল দেশের লোক ভারতে জ্ঞান লাভ করিতে, তীর্থ করিতে এবং বাণিজ্য করিতে আসিত। তখন ভারতে ও প্রাচ্যে কি সুন্দর ভাবের আদান-প্রদান হইত! এখন বাল তাহার স্মৃতি পালন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, শ্যামদেশবাসীরা এখনও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভারতের সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাহাদের ঋণের কথা স্বীকার করে বটে, কিন্তু যবদ্বীপ বলি দ্বীপের অধিবাসীরা প্রায় ভারতকে ভুলিয়া গিয়াছে। বলির লোক এখন বলে যে, রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা তাহাদের দেশেই সম্পন্ন হইয়াছিল। বলি ও যবদ্বীপবাসীরা রামায়ণ-মহাভারত বিলক্ষণ অবগত আছে, কিন্তু ভারতবাসীকে জানে না। এখন ভারতকে ক্রমে তাহাদিগের সহিত নষ্ট সম্পর্ক পুনরায় জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

মলয় উপদ্বীপের চীনাদিগের সহিত রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। ভারতীয়রা—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে ভারতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনা প্রেরণে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া চীনবাসীরা ভারতের ও তথা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার বিশ্বভারতীতে চীন ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপে প্রাচ্যের মহৎ জাতিদিগের সহিত ভারতীয়ের ভাবের আদান-প্রদানের চেষ্টা ক্রমশঃ ফলবতী করিতে হইবে। ইহাতে উভয়েরই মঙ্গল।

আবকারীর আয়

বাঙ্গালার শাসন বিভাগের ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের আবকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, সরকার আবকারীর আয় বাবদে ঐ বৎসরে মোট ২ কোটি ৯ লক্ষ টাকার উপর লাভ করিয়াছেন। ঐ বৎসরে তাড়ি ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৬ শত ৯২ গ্যালন, গাঁজা ১ হাজার ৬ শত ৯১ মণ, ভাঙ্গ সিদ্ধি ৪ শত ৭ মণ এবং অহিফেণ প্রায় ৯ শত ৯৫ মণ এ দেশের লোক সেবন করিয়াছে। এই যে হাজার হাজার মণ মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া দেশের দরিদ্র লোক সরকারকে এক বৎসরে ২ কোটির উপর টাকা যোগাইয়াছে, এগুলা কি ফল দিয়াছে? দরিদ্র দিন-মজুর অথবা চাষী ও কারিগর পেটের অন্ন মারিয়া—স্ত্রী-পুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া কি এই অর্থ যোগান দেয় নাই? ইহার ফলে কি পাপের ও অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই? দরিদ্র প্রজার 'মা-বাপ' সরকার কি বলেন?

ভেজাল-বিষ

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্ট পাঠ করিয়া জানা যায়, সহরে ভেজালের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বেরি-বেরি, অজীর্ণ, অর্শ প্রভৃতি রোগও হু হু বাড়িতেছে। অথচ প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার ভেজাল-আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। এই আইন কি কায করে? ঝুড়ি ঝুড়ি ইন্‌স্পেক্টর আছে, তাহাদের বেতনও গণিতে হয় দেশের লোককে, অথচ জুয়াচোর গলাকাটা ব্যবসাদাররা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না কেন? আইনে যদি না কুলায়, নূতন আইনই বা বানান হয় না কেন? কোন্ সভ্যদেশে দেশের লোককে জুয়াচোর অর্থপিশাচ ব্যবসাদার খাদ্য বলিয়া বিষ খাওয়াইয়া পার পায়? ব্যাপারটা একবার বুঝুন। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যতগুলি খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ ভেজাল-মিশ্রিত বলিয়া ধরা পড়িয়াছিল,—১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যতগুলি খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ হাজার ৩১ রকম খাদ্যদ্রব্য শতকরা ১৯·৭ ভাগ হিসাবে ভেজাল-মিশ্রিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে! ৭ শত ১৭ রকম সর্ষপ-তৈল পরীক্ষিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৬৯টা ভেজাল মিশ্রিত বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। তৎপূর্ব্ব-বৎসরে (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে) ৮ শত ৮০ রকমের মধ্যে শতকরা ৫২টা ভেজাল-মিশ্রিত ছিল।

ভেজালের মামলার সংখ্যা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ২ হাজারে উঠিয়াছিল। ঐ বৎসরে ২ হাজার ৫ শত ২৮ মণ খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ৫ হাজারের উপর টিন, ৯ শত ২৬টা সংরক্ষিত খাদ্যের টিন এবং ৫ শত ৫১ বোতল পানীয় দ্রব্য ধ্বংস করা হইয়াছিল। তবে দুগ্ধের ভেজাল কিছু কমিয়াছে, এইটুকু সুলক্ষণ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভেজাল দুগ্ধের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৬২, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ২৯·১। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভেজাল দুগ্ধ বলিয়া নষ্ট করা হইয়াছে প্রায় ৭ শত ৩৯ মণ। মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্যেও ভেজালের পরিমাণ বিভীষিকাপ্রদ;—৮ শত ৩০ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ১ শত ৭৮ রকম ভেজাল-মিশ্রিত ছিল।

এ অবস্থায় মানুষ বাঁচে কি করিয়া? যে সকল নর-রাক্ষস কেবল পয়সার লোভে বিষ খাওয়াইয়া মানুষ খুন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, সমাজ মানে না, ধর্ম্ম মানে না, আইন মানে না, তাহাদিগকে কেবল অর্থদণ্ড করিলে কোন ফল হইবে না। তাহারা তাহাদের অধর্ম্মের ব্যবসায়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপায় করে। তাহাদিগের জেলের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রাচীনকাল হইলে তাহাদের শূলের ব্যবস্থা হইত, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কর্ত্তা ডাক্তার বেণ্টলীর হৃদয়বান্ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাতি আছে। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার এলবার্ট হলে বাঙ্গালী ছাত্রগণের সম্মুখে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বাঙ্গালীকে 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়াছেন যে,—"গড়-পড়তায় বাঙ্গালীর জীবন এক জন মার্কিণবাসীর জীবন অপেক্ষা আড়াই গুণ কম। এই হারে বাঙ্গালীর জীবন ইংরাজের জীবন অপেক্ষাও আড়াই গুণ কম, জাপানীর জীবন অপেক্ষা দুই গুণ কম, অথচ জাপানীরাও বাঙ্গালীর মত ভাত-মাছ খায়। এক জন মার্কিণ ৫০ বৎসর, ইংরাজ ৫০ বৎসর, ফরাসী ৪৮ বৎসর, ইটালিয়ান ও জার্ম্মাণ ৪৭ বৎসর, জাপানী ৪৬ বৎসর গড়-পড়তায় বাঁচিয়া থাকে। আর বাঙ্গালী গড় পড়তায় মাত্র ২৩ বৎসর বাঁচিয়া থাকে!" বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কি উজ্জ্বল নহে?

ডাক্তার বেণ্টলী আরও বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালায় যত শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তন্মধ্যে শতকরা ৫টি জন্মমাত্রই মৃত হয়, শতকরা ১০টি মাত্র ১ মাস বাঁচিয়া থাকে, আর শতকরা ৪টি ১ বৎসরবয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়। গড়-পড়তায় বাঙ্গালার যত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহার একার্দ্ধ ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং এক-চতুর্থাংশ ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।"

কি চমৎকার অবস্থা! এইভাবে চলিলে কালে যে আমরা মাডাগস্কার দ্বীপের ডোডো পাখীর মত ইতিহাসে কথার কথাই হইয়া থাকিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের অসম্ভব দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতাই কি এই সর্ব্বনাশের কারণ নহে? কিন্তু কে এ দিকে দৃষ্টিপাত করে? ইহা হইতে 'রয়্যাল কমিশন', 'কাউন্সিল নির্ব্বাচন', 'মন্ত্রিমণ্ডল' প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথার আলোচনা করিলে যে আমরা চতুর্ব্বর্গ ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইব!



চীনের জাতীয় দলের জয়যাত্রা

বহুকাল যাবৎ চীনে জাতীয় দল কি করিতেছেন, কি অবস্থায় আছেন, সংবাদ পাওয়া যায় নাই। দেখা যায়, যখন তাঁহারা শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মুক্তিযুদ্ধের পথে ভীমবিক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন য়ুরোপীয় (বিশেষতঃ বৃটিশ) সংবাদদাতাদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া যান। রয়টার এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য, তিনি ভুলিয়াও জাতীয় দলের জয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করেন না। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ মার্কিণ বা জাপান হইতে আসিয়া থাকে। আর যখন চীনের ঘরোয়া যুদ্ধ পাকিয়া উঠে এবং চাংসোলিনের দুর্দ্ধর্ষ বল প্রবল হয়, তখন রয়টার চীনের খবরে ভারত ভরাইয়া ফেলেন! ইহা বিলাতী সাম্রাজ্যবাদীর প্রচারকার্য্যের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংখ্যায় বলিয়াছিলাম যে, চীনে যতই গৃহ-বিবাদ হউক, জাতীয় দল তাঁহাদের মুক্তিযুদ্ধের জয়যাত্রায় কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না, উপযুক্ত সময়ে তাঁহারা আবার রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবেন। শরৎকাল সকল দেশেই রণযাত্রার উৎকৃষ্ট সময়। আমরা বলিয়াছিলাম, শরতেই আবার জাতীয় দলের রণভেরীর আরাব শুনা যাইবে।

তাহাই হইয়াছে, মার্কিণ দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জাতীয় দল এইবার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্রুতগতি পিকিংএর দিকে ধাবিত হইয়াছেন। কুওমিনটাংএ ঘুণ ধরিল, চাং কাংসেক, ইউজিন চেন, বোরোডিন,—সবাই কুওমিনটাংকে ত্যাগ করিলেন, উত্তরের ডাকাত সর্দ্দার চাংসোলিন ও সানচুয়ান ফেং প্রবল হইয়া হাংকো ও নানকিং দখল করিতে ছুটিলেন, কুওমিনটাংএর নবনিযুক্ত সেনাপতি গ্রীষ্টান জেনারল ফেং উ-সিয়াং পরাজিত হইয়া মঙ্গোলিয়ায় পলায়ন করিলেন,—রয়টার আহ্লাদে আটখানা হইয়া সাম্রাজ্যবাদীর মুখরোচক কত খবর বিলাইলেন! জগতের সকল দুর্ব্বল জাতির মুক্তিকামী লোক নিরানন্দ হইয়া ভাবিলেন, প্রাচ্যের মুক্তির যাহা কিছু আশা কুওমিনটাংএর পরাজয়ের সহিত বুঝি চিরতরে লুপ্ত হইল।

কিন্তু ধর্ম্ম যে দিকে, জয়ও সে দিকে, এ কথা মিথ্যা হইবার নহে। রয়টারের তারের কারচুপির অন্তরাল হইতে সত্যসূর্য্যের আলোক প্রকাশ হইয়া পড়িল। মার্কিণ দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কুওমিনটাং যেমন প্রবল ছিলেন, তেমনই প্রবল আছেন। এত দিন তাঁহারা নীরবে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন, পিকিং আক্রমণে সৈন্যসমাবেশ করিতেছিলেন। প্রকাশ, সেনসি-প্রদেশের টুচুন বা শাসনকর্ত্তা (War-Lord) জেনারল ইয়েন সিসেন কুওমিনটাং দলে পাকাপাকি যোগদান করিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে চাংসোলিনের দক্ষিণহস্ত ছিলেন, এমন কি, সান-চুয়ান-ফেংও বোধ হয় তাঁহার মত চাংসোলিনের গুণমুগ্ধ ছিলেন না। কিন্তু এত দিন পরে কুওমিনটাংএর মুক্তির বাণী-প্রচারে সাফল্য দেখা দিয়াছে। জেনারল ইয়েন কুওমিনটাংএর স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির এবং স্বাধীনতার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন এবং স্বয়ং দেশের মুক্তিসাধনমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এইবার তিনি সসৈন্যে কুওমিনটাংএর সেনাপতি জেনারল ফেং-উসিয়াংএর সহিত যোগদান করিয়াছেন। তিনি কালগানের দিক ধরিয়া একদিক হইতে এবং জেনারল ফেং পিকিং হ্যাংকো রেলওয়ে ধরিয়া অন্য দিক হইতে পিকিং আক্রমণ করিতে ধাবিত হইয়াছেন।

যেমন চীনের স্বাধীনতাকামী জাতীয় দল এই জয়যাত্রায় অগ্রসর হইয়াছেন, অমনই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সংবাদপত্রের দল হাউমাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে,—গেল, গেল, মস্কৌয়ের বলশেভিক্‌রা চীনে অরাজকতা আনয়ন করিল, চাংসোলিন বুঝি আর চীনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারেন না। "ডেলি মেল" পত্র এ বিষয়ে গান গায়েন। তাঁহার সাংহাই সহরস্থ বিশেষ সংবাদদাতা সার পার্সিভাল ফিলিপস তারে সংবাদ পাঠাইতেছেন,—"নাঃ, আর রক্ষা হইল না, বহুকষ্টে চীনে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবার সূচনা হইতেছিল, তাহা চাংসোলিন ক্রমে চীনদেশে এক সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের নমুনা দেখাইয়া প্রতীচ্যের বণিক ও শাসকদিগের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোথা হইতে 'অনামুখো' মস্কৌয়ের বলশেভিকরা আবার ছুটিয়া আসিয়া চীনে অরাজকতা আনয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এ যে চাংসোলিনের ঘর ভাঙ্গাইয়া সেনসির টুচুন জেনারল ইয়েন ফেং-উসিয়াংয়ের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার মূলে মস্কৌয়ের চক্রান্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মাইকেল বোরোডিন যখন হ্যাংকো হইতে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গায় পলায়ন করেন তখন ঐ স্থানে থাকিয়াই চক্রান্ত আঁটিতে থাকে। সে পূর্ব্বে হ্যাংকো ও ক্যাণ্টনের কুওমিনটাং দলের পরামর্শদাতা ছিল। সে যে রাশিয়ার বলশেভিকদিগের দূত, এ কথাও সকলে জানে। তাহারই জন্য যত অনর্থ ঘটিয়াছে, চীনারা য়ুরোপীয় বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে (যেন য়ুরোপীয়রা এ বিষয়ে কিছুই অপরাধ করেন নাই!)। উর্গায় সাইবেরিয়ায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে বোরোডিন কিছু দিন মঙ্গোলিয়ায় ছিল এবং সেখানে থাকিবার কালে ফেং ও ইয়েনের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দিয়া উভয়কে চাংয়ের বিরুদ্ধে পিকিং আক্রমণের পথ বাতলাইয়া দিয়াছিল। চাং এখন বলশেভিকদের প্রধান শত্রু। কাযেই বোরোডিন কি এই সুযোগ ছাড়িতে পারে?"

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, মহাচীনে জাতীয় দলের জয়যাত্রায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্ধ প্রতীচ্য জাতিদিগের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। হইবারই কথা। কেন না, আজ যদি চীনের জাতীয়দলের জয় হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতীচ্যের ভাড়াটিয়া দস্যুসর্দ্দার চাংয়ের পতন হয়, তাহা হইলে প্রাচ্যে য়ুরোপের প্রভুত্বের পাট উঠিবে। তাহা নহে ত চীনে তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের পাট উঠিয়াছে। কুওমিনটাংয়ের এক বাহু চীনের ছাত্রসম্প্রদায় এবং অপর বাহু শ্রমিক ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়। এই দুই শ্রেণীর দেশপ্রেমিকের সঙ্ঘবদ্ধতা ও ত্যাগের ফলে প্রতীচ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ছাই পড়িয়াছে। এই খাস কুওমিনটাংয়ের বাহুবলে চীনের শোষক অত্যাচারী দস্যুসর্দ্দার উচ্ছেদ হইলেই পিকিংয়ে চীনের জাতীয় পতাকা গর্ব্বভরে উড্ডীন হইবে। এ আশঙ্কা কি সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কম আশঙ্কা!

প্রতীচ্যের নারী

সার এডমণ্ড গস্ প্রায় অশীতিবর্ষবয়স্ক মনীষী ইংরাজ। তিনি জীবনে অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন। তিনি ভিক্টোরিয়া যুগও দেখিয়াছেন, আবার আধুনিক 'উন্নত' যুগও দেখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সমাজ-সম্বন্ধে উক্তির মূলে যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন, "আমার যৌবনকালে আমি যে সব যুবক-যুবতী দেখিয়াছি, এখনকার যুবক-যুবতী তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখনকার ২১ বৎসর বয়সের যুবতী পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে স্বাধীন, সে পূর্ব্বের ঐ বয়সের যুবতী অপেক্ষা বহুগুণে 'আত্ম-নির্ভরশীলা', সংসার-অভিজ্ঞা, কর্ম্মপরায়ণা,—সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইতে পারে। আমার যৌবনে আমি যে সব যুবতী দেখিয়াছি, তাহাদের অপেক্ষা এখনকার যুবতীর অনেক অধিক গুণ আছে দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা হইলেও এ কথা আমি বলিতে বাধ্য যে, এখনকার যুবতী নিজের স্বাধীনতা রক্ষায় সর্ব্বদা সজাগ থাকে বলিয়া নারীসুলভ কোমলতা, শালীনতা, শোভা ও নম্রতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তাহারা তাহাদের মাতামহীদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত ও ভাল বটে, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তাহারা একটু কম boisterous হয়।" Boisterous কথাটার বাঙ্গালা অর্থ ঠিক করা যায় না, তবে গণ্ডগোলকারী বলিলে কতকটা উহার ভাব বুঝা যায়। এখনকার নারীরা পূর্ব্ববর্ত্তিনী নারী হইতে অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছেন, ইহা নিশ্চিতই আনন্দের কথা। নারীর উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, কেন না, তাঁহারা জাতির জননী। তাঁহারা সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়া যোগ্য সংধর্ম্মিণী, ভগিনী ও কন্যা হউন, তাহাতে দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল। কিন্তু সার এডমণ্ড য়ুরোপে যে আশঙ্কা করিতেছেন, আমরাও এ দেশে সেই আশঙ্কা করি। তবে আমাদের এইটুকু আনন্দের কারণ যে, আমাদের দেশের নারী যতই উন্নত হউন, তাঁহারা স্বভাবতঃ শালীনতা, লজ্জাশীলতা, কোমলতা, নম্রতা প্রভৃতি (অর্থাৎ এক কথায় ইংরাজীতে যাহাকে grace এবং বাঙ্গালায় নারীসুলভ-শোভা বলে) গুণে বিভূষিতা। আমাদের দেশের নারী এইরূপই থাকুন, তাঁহারা চিরদিনই আমাদের গৃহলক্ষ্মীরূপে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন, ইহা কে না কামনা করে? তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও কলা-কুশলতায়,—সকল গুণে সম্পন্ন হইয়া প্রকৃত আর্য্যকুললক্ষ্মী হউন, সুসন্তানের জননী হইয়া নারীত্বের সার মাতৃত্বের মহিমময় গর্ব্বে মণ্ডিতা হউন, আমাদের সংসার উজ্জ্বল হইবে।

কিন্তু সার এডমণ্ড য়ুরোপের East setএর নারীর সম্বন্ধে যে boisterousnessএর আশঙ্কা করিতেছেন, আমাদের ভয় হয়, পাছে আমাদের দেশের নারীর মধ্যে সংক্রামক রোগরূপে উহা দেখা দেয়। এখনও আমাদের নারী ঐ রোগ হইতে দূরে আছেন, এইটুকুই মঙ্গল। তবে ক্রমে এই অনুকরণের যুগে হাওয়া ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কাও আছে। স্বাধীনতার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার অতিরিক্ত চেষ্টা সর্ব্বনাশের বীজ বপন করে। ইহার ফলে য়ুরোপ ও মার্কিণে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের সহিত বিলাতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, সুতরাং বিলাতের কথাই বলি। সেখানে সরকার আইন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অতঃপর সংবাদপত্রাদিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ মামলা দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, লোক এখন আর ঐ মামলা আদালতে আনিতে বাধাবিঘ্ন বা লজ্জানুভব করে না। যাহারা পূর্ব্বে ঘরের কুৎসিত কথা প্রকাশ পাইবার ভয়ে আদালতে যাইত না, সেই সকল নারী এখন আদালতে গিয়া প্রকাশ্যে ঘরের কুৎসিত কথা হাটে-বাজারে রাষ্ট্র করিয়া বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে। এবারকার দায়রায় ৫ শতেরও অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হইয়াছে। এই বৎসর মোটের উপর ৩ হাজার ৫ শত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার শুনানী হইবার কথা! অথচ ২০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে বৎসরে গড়ে ৫ শতের অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা দায়ের হইত না। ১৯২২ হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরে বিলাতে প্রতি বৎসর গড়ে ২ হাজার ৭ শতেরও অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে এ সংখ্যাও ছাপাইয়া মামলা সাড়ে ৩ হাজারে উঠিবার সম্ভাবনা! ভাবুন দেখি, কি সর্ব্বনাশের কথা! নারীর অতিরিক্ত স্বাধীনতা কামনার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই কি ইহার হেতু নহে?

দেশের অবস্থা দেখিয়া তথাকার চিন্তাশীল লোকমাত্রেই বিচলিত হইয়াছেন। কোনও কোনও ধর্ম্মযাজক পাদরী বলিতেছেন,—বিবাহ-বন্ধন সম্বন্ধে পবিত্র ভাব পোষণের উপরেই সমাজে খ্রীষ্টানধর্ম্মের অস্তিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে। যদি সেই পবিত্র ভাব এইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যদি বিবাহ আইনানুমোদিত বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে মানবসমাজ কোথায় থাকিবে—মানুষের ধর্ম্মভাব কোথায় থাকিবে?

বিলাতেরও যখন এই অবস্থা, তখন বিলাত হইতে 'স্বাধীনতা'র স্তরে আরও 'উন্নত' নবীন মার্কিণ জাতির কি অবস্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেখানকার বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক পাদরী ডাক্তার ষ্টেটসন মার্কিণের আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার প্রবল আধিক্য দেখিয়া আশঙ্কা করিতেছেন যে, তথায় আর পারিবারিক সুখ-শান্তি বলিয়া পবিত্র জিনিষের অস্তিত্ব থাকিবে না।

আবার বিলাতের বিখ্যাত পাদরী ডিন ইঞ্জে লণ্ডনের "ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রে দেশের বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার আধিক্যে বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধের পর হইতে আমরা মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু পারিবারিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিতই হইতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা একবারে আশাহত হই নাই। খ্রীষ্টান বিবাহে প্রেমজ ও কামজ বিবাহের পার্থক্য অবলম্বন করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে যে 'পরীক্ষাধীন' বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, উহাই সর্ব্বনাশের মূল। (এই বিবাহে নরনারী কিছু কাল চুক্তি করিয়া বিবাহিত জীবন-যাপন করেন; ঐ সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে বনিবনাও হইলে বিবাহ স্থায়ী হয়, নতুবা বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়)। আমার মতে এই প্রকৃতির বিবাহ কামজ বিবাহ। এই প্রকৃতির কেবল সাময়িক আকর্ষণের বিবাহ গির্জ্জার বাহিরে রেজেষ্ট্রী আফিসে সম্পন্ন হওয়া উচিত। আর প্রকৃত ধর্ম্মমূলক বিবাহ গির্জ্জায় নির্ব্বাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবের পার্থক্য রাখিলে সমাজ যাহাকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া ছাপ দিয়া দিবে, সেই বিবাহে ক্রমে লোকের অশ্রদ্ধা উৎপাদিত হইবে।"

কথাটা ভাবিয়া দেখিবার। আমাদের দেশে বিবাহ এই হেতু ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত, দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। স্বেচ্ছাবিবাহে অনেক সময়ে যৌনমিলন কামজাত হইয়া থাকে, তাহার ফল সর্ব্বনাশকর! যাহাতে সংযম নাই, সমাজের শাসনের ভয় নাই, পিতামাতার অনুমতি নাই, অভিভাবকের মতামতের প্রয়োজন নাই, সেই মিলনে অনেক সময়ে নির্ব্বাচনে অভিজ্ঞতার অভাব ঘটিতে পারে। উহার ফলে স্বাধীনতাকামী নরনারী পরস্পরের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ যখন তখন অন্বেষণ করিতে পারে। আমাদের ভাগ্যদেবতা আমাদিগকে এই উৎকট স্বাধীনতা হইতে দূরে রাখুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

একটা কথা। মেয়ো-পিলচার কোম্পানী নিজের

সব সংস্কারের বিষয় থাকিতে এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আসে কেন, বুঝিয়া উঠা যায় না। নিতান্ত হায়াহীন না হইলে এমন প্রবৃত্তি হইবে কেন?

চীনের অপরাধ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ভারত হইতে চীনদেশের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রতিবাদ কিরূপে অতিরঞ্জিত হইয়া মলয় উপদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহাকে স্থানীয় বৃটিশ-সম্পাদিত পত্রসমূহে কিরূপ বর্ব্বরের মত আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংখ্যায় প্রদান করিয়াছি। যখন শক্তিমান পুরুষ একটা অন্যায় আচরণ করে, তখন সেই আচরণের বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ করিলে সে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ন্যায় অন্যায় বুঝিতে চাহে না, নিজের নির্ব্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, নিজের অন্যায় ঢাকিবার জন্য আক্রমণকারীকে যুক্তিতর্কহীন আক্রমণ করিয়া থাকে। চীনদেশে প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ যে অন্যায় আচরণ করিতেছেন, তাহা তাঁহাদেরই দেশের কোন কোন নির্ভীক স্পষ্টবাদী লেখকই স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এ সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মত পরাধীন বৃটিশ প্রজার বিরুদ্ধ সমালোচনা ত একবারে সহিষ্ণুতার সীমার বাহিরে!

রবীন্দ্রনাথের অপরাধ,—তিনি গান-বোটনীতিকে মনুষ্যত্বের অবমাননাকর বিশ্বমানবতার বিস্তারক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা কি নিতান্তই ভিত্তিহীন অলীক অভিযোগ? চীনদেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুবিধা পাইয়া বিদেশীয় প্রতীচ্যশক্তিরা তথায় কি এ যাবৎ গান-বোটনীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন না? চীনাকে অহিফেন গিলাইবার নিমিত্ত এত দিন কি বন্দুক বেয়নেট ব্যবহার করা হয় নাই? Opium War পদার্থটা কি? আমরা পূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে এই যুদ্ধের ইতিহাস প্রদান করিয়াছি। তাহাতে কি জানা যায় না, কেন চীনে অহিফেন-যুদ্ধ হইয়াছিল? বক্সার-বিদ্রোহের উৎপত্তি হইয়াছিল কেন? বক্সার-বিদ্রোহের প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছিল কিরূপে? তাহার জন্য চীনকে এখনও পর্য্যন্ত কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে?

অধিক কথা কি, সাংহাই বন্দরের এক ভ্রমণের উদ্যানে বিদেশীয় কর্ত্তারা কি নোটিশ ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। নোটিশে ছিল,—"Dogs and Chinese are not allowed," কুকুর ও চীনাদের এই বাগানে প্রবেশ নিষেধ। স্পর্দ্ধা দেখুন একবার! চীনাদের নিজের দেশে তাহারিগকে কুকুরের সহিত সমান আসনে বসাইয়া দম্ভভরে এই নিষেধাজ্ঞা লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে! জাতি হিসাবে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের তারতম্য বজায় রাখিবার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ যেন স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা হইতেছে, প্রতীচ্যবাসীরা দেবতার জাতি, আর চীনারা তাহাদের নিজের দেশেও অস্পৃশ্য অন্ত্যজ কুকুরের জাতি!

স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষের মধ্যে এই বিজাতীয় তারতম্য, এই ব্যবধান, এই বেড়া-গণ্ডী চমৎকার নহে কি? শ্বেতাঙ্গমাত্রেই স্রষ্টার মনোনীত উৎকৃষ্ট জীব, আর অশ্বেত জাতিমাত্রই নিকৃষ্ট—সাম্রাজ্য-গর্ব্বী প্রতীচ্য-জাতির এই ধারণাই কি জগতের যত অশান্তির মূল নহে? ইহাতেই কি চীনদেশে শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে পীত জাতির অভ্যুত্থান আত্মপ্রকাশ করে নাই? ইতঃপূর্ব্বে আমরা মহাচীনে সার্ব্বজনীন নাবিক ধর্ম্মঘটের পরিচয় দিয়াছিলাম। উহা হইতেও দেখা যায় যে, চীনা কুলী লস্করদিগের উপর শ্বেতাঙ্গ কাপ্তেন ও অন্যান্য মনিবের অমানুষিক ব্যবহারই পীত নাবিকের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। যাহারা নিজের ব্যবহারে চীনকে আজ শত্রুরূপে পরিণত করিয়াছে, তাহাদের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ঘোর অপরাধী হইয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি এ বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন in good company. তাঁহার অভিযোগ,—প্রতীচ্যের সাম্রাজ্য-গর্ব্বী জাতি বিশ্বমানবতার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছে, কিন্তু প্রতীচ্যেরই এক মহাসম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা আরও বহুগুণ অধিক গুরু অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন,—তিনি সিনর লিটি, ইটালী দেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। তিনি স্বয়ং প্রতীচ্যের শ্বেতজাতি হইতে উদ্ভূত, এক সময়ে একটি শক্তিশালী শ্বেত জাতির ভাগ্যনিয়ন্তৃত্ব করিয়াছিলেন। এই শ্বেতজাতিও সম্প্রতি মাকিনির কল্যাণে সাম্রাজ্যগর্ব্বী প্রাচীন সিজার-শাসিত রোমক জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। অথচ এহেন ব্যক্তিও চীনদেশের এই প্রতীচ্যের সাম্রাজ্য-গর্ব্বী শক্তিগণের অত্যাচার আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থে দুঃখের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী এই রচনার কতকাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম আমরা এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বলশেভিক রাসিয়ার প্রতিনিধিরা চীনদেশে চীনাদিগকে বিদ্রোহ বিপ্লবে উত্তেজিত করিয়াছে, এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও চীনে য়ুরোপীয়দিগের সয়তানি (Wickedness) কি চীনাদিগের চরম শত্রুতার উদ্রেক করে নাই? এই সয়তানির ফলেই কি পরে ঘোর যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই? চীনাদের ঝোঁক জাতীয়তা ও কম্যুনিজমের দিকে। কেন এমন হইল? য়ুরোপীয়দিগের বিশ্বাস ঘাতকতা, দস্যুতা ও নিষ্ঠুরতা চীনাদিগকে জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে অভ্যস্ত করিয়াছে। য়ুরোপীয়রা চীনদেশে হস্তক্ষেত্রে—বিশেষতঃ বক্সার-বিদ্রোহকালে অমানুষিক অত্যাচার ও পাপ (horrible crime) আচরণ করিয়াছে। মানুষের জ্ঞানে ধনবান্ সাম্রাজ্যবাদী জাতির দ্বারা অপরের দেশে যত ভীষণ শোষণনীতি চালান যাইতে পারে, য়ুরোপীয়রা চীনদেশে সেই নীতি অনুসরণ করিয়াছে। তাহারই ফলে চীনারা বিদ্রোহী হইয়া সেই অত্যাচার ও শোষণ-নীতির প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে।

"জগতে চীনারা সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় সহিষ্ণু জাতি—তাহারা সহজে হিংসার পথ গ্রহণ করে না। কনফুসাস ও মেনসিয়াসের শিক্ষা চীনারা অনুপ্রাণিত—এই দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা মানুষকে স্বতঃই শান্তির পথে পরিচালিত করে। (লেখক এই সঙ্গে বুদ্ধের শিক্ষার কথাও উল্লেখ করিতে পারিতেন। বঃ সঃ)। যদি য়ুরোপীয় শক্তিরা চীনদেশে অন্যায় অধিকার উপভোগ করিবার উদ্দেশে ষড়যন্ত্র ও ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া চীনাদের উপর অসংখ্য অত্যাচার অনাচার আচরণ না করিতেন, তাহা হইলে আজ চীন য়ুরোপীয়ের বাণিজ্যে কোন বাধা প্রদান করিত না।

"য়ুরোপীয় ধনী মহাজনদিগের স্বার্থরক্ষার্থ চীনে যত চীনার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, একটা বড় যুদ্ধে তত প্রাণ নষ্ট হয় কি না সন্দেহ। কেবল যে বয়ঃপ্রাপ্ত চীনা নরনারীকে ধনী মহাজনের কুলীগিরিতে অন্যায়পূর্ব্বক নিযুক্ত করা হয়, তাহা নহে, বালকবালিকাগণকেও নির্লজ্জ-নির্দ্দয়ভাবে দিনে ১৬।১৭ ঘণ্টা খাটাইয়া লওয়া হয়। তাহারা একটা ছুটীছাটাও পায় না। তাহাদের বেতন দুর্ভিক্ষকালে পুর্ত্তবিভাগে যে হারে বেতন দেওয়া হয়, সেই হারে দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে প্রথম যে সময়ে বাণিজ্য-ব্যবসার হৃদয়হীনতা দেখা দেয়, সেই সময়ে শ্রমিকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য এক কমিটী বসিয়াছিল; সেই কমিটী সে সময়ে ধনী মহাজনদের পাশব অত্যাচারের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, চীনা কুলীদের উপর য়ুরোপীয়ের ধনী মহাজনদের অত্যাচার তাহা অপেক্ষা বহু গুণ অধিক ভীষণ।

"যে সকল য়ুরোপীয় ধনী মহাজন চীনদেশে টাকা খাটাইয়া ডিভিডেণ্ড ও লাভ পাইয়া পেট মোটা করিতেছে, তাহারাই রটাইতেছে যে, চীনারা বলশেভিকদের দুই মন্ত্র পাইয়া দুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এটা ত বিবেচনা করে না যে, উপযুক্ত উর্ব্বর ক্ষেত্র না পাইলে দুষ্ট লোক তাহাদের দুষ্ট মন্ত্রের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইত কি প্রকারে! তাহারা ইহা দেখে না যে, তাহাদের 'কাড়ি কাড়ি' লাভের টাকা হইতে শ্রমিকের রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে!

"চীনদেশে য়ুরোপীয়ের কুকার্য্যের কীর্ত্তির ইতিহাস আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করিয়াছে।—ইহা ধারাবাহিক দস্যুতা ও পাপের ইতিহাস।

"পীতাতঙ্ক বলিয়া একটা হাস্যকর কথা উঠিয়াছে। এই পীতাতঙ্কটি কি? ইহা য়ুরোপীয় দস্যুতা ও লণ্ঠনের বিরুদ্ধে চীনের বাধাপ্রদান ব্যতীত আর কিছুই নহে। পীতাতঙ্কটা মিথ্যা কথা, উহার অস্তিত্ব নাই। বরং প্রাচীন সুসভ্য পীতজাতির লক্ষ লক্ষ লোক মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে,—'শ্বেতাতঙ্ক'।

"য়ুরোপীয়রা চীনদেশে তাহাদের অত্যন্ত মন্দ দিকটা লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছে। মহা সম্মানার্হ শক্তিশালী য়ুরোপীয় জাতিরাও চীনারা যখন অহিফেন লইতে চাহে নাই, তখন চীনাদের বন্দর জাহাজের গোলায় চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল! যত দিন য়ুরোপীয়রা চীনে অত্যাচার করে নাই, তত দিন চীনারা কোনও বিপদের বা দুঃখের সম্মুখীন হয় নাই। যে য়ুরোপীয় ধনী মহাজনরা খ্রীষ্টান বলিয়া গর্ব্বানুভব করে, তাহারা চীনে শোষণের উদ্দেশে যে ভীষণ অত্যাচার (বিশেষতঃ বালক-বালিকার প্রতি) করে, সে সম্বন্ধে যখনই আমি কোনও রচনা পাঠ করি, তখনই আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি।"

ইহার উপর বোধ হয় কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। সিনর লিটি স্বয়ং য়ুরোপীয় শ্বেতজাতির দশ জনের এক জন হইয়াও আজ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নৈতিক সাহস, মনোবল ও ন্যায়পরায়ণতার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যগর্ব্বী ধনী মহাজন যতই বলশেভিক আতঙ্কের দোহাই দিয়া চীনের জাতীয় দলকে জগতের দরবারে অপরাধী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করুন, সিনর লিটির এই গ্রন্থ (Bolchevismer Fascisme Et Democratic by Signor Nitti, Translated by M. Green, 1927) প্রচারের পর তাঁহাদের কুকীর্ত্তি ছাপা থাকিবে না। জগতের লোক জানিবে,—চীনের জাতীয়দল ন্যায়ের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অবতরণ করিয়াছেন।

পরাধীন কোরিয়া

দুর্ভাগ্য কোরিয়াবাসী আমাদেরই মত পরাধীন জাতি। আমরা যেমন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকের অধীন জাতি, কোরিয়াবাসীও তেমনই প্রাচ্যের ইংরাজ, সাম্রাজ্যবাদী জাপ শাসকের অধীন জাতি। অধীন উভয়েই। তবে উভয়ের অধীনতায় বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম প্রভেদ এই যে, আমাদের অধীনতা দুই শত বৎসরের পুরাতন, কোরিয়া এ পথের নবীন পথিক। দ্বিতীয় প্রভেদ, উভয় দেশের শাসক জাতির শাসন-প্রথার মধ্যে। প্রভেদের কথাটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি।

আমরা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া থাকি যে, ২ শত বৎসরের ইংরাজ শাসনের পর আমরা ধ্বংসোন্মুখ জাতিতে পরিণত হইতেছি। আধিব্যাধি আমাদিগকে ঘিরিয়াছে। আমাদের নিত্য অভাব, নিত্য দৈন্য, নিত্য দুর্ভিক্ষ, নিত্য হাহাকার। বাহিরে আমাদের চাকচিক্য বাড়িতেছে বটে, কিন্তু ভিতরে ঘুণ ধরিয়াছে। দেশে রেল, ডাক, তার, হাসপাতাল, ঔষধালয়, বিদ্যালয়, পথঘাট, সহর, জনপদ বাড়িতেছে, লোকের আয় বাড়িতেছে, লোকের ঘরে আধুনিক সভ্যতার অনুযায়ী সাজসরঞ্জাম বাড়িতেছে, আইন-আদালত, ব্যবস্থাপক সভা, ব্যবস্থাপরিষদ বাড়িতেছে,—অথচ ধ্বংসের কাল ছায়া যেন আমাদিগকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এত বড় শক্তিশালী সুসভ্য স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতি আমাদের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা, অথচ আমরা জগতের সর্ব্বত্র 'পারিয়া' বা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত। আমরা যেখানে যাই, সেখানেই 'দূর দূর' তাড়া খাই। এমন কি, খাস বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও আমাদের সম্মানে বসবাসের স্থান নাই। আমাদের প্রভু আমাদের—অথবা তাঁহাদের রাজারক্ষার নিমিত্ত—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করেন, আমাদের মাথার উপর শাসক রাখিবার নিমিত্ত মোটা মোটা মাহিনা দিয়া স্বদেশ হইতে চাকুরিয়া আমদানী করেন বটে, কিন্তু আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলা আমাদিগকে কান্নাকাটি করিতে হয়।

কিন্তু জাপ জাতি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছে, মাত্র ১০।১৫ বৎসর শাসনের ফলে তাহারা কোরিয়ার যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছে। কোরিয়া তাহাদের অধীন, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহারা শাসক ও শাসিত জাতির মধ্যে ন্যায়বিচারের বা শাসন-ব্যবস্থার কোনও পার্থক্য অবলম্বন করে নাই।

কথাটা বুঝাইবার নিমিত্ত জাপ কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

(১) কোরিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। পূর্ব্বে নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে রাজবংশকে বিব্রত হইতে হইত, এখন সে সকল কথার কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন জাপানের রাজবংশের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, কোরিয়ার রাজবংশকেও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এখন তাঁহাদিগকে বাৎসরিক ১৮ লক্ষ ইয়েন (৯ লক্ষ ডলার, ১ ডলার=৩ টাকা ৵০ আনা) মুদ্রা ভাতা দেওয়া হয়।

(২) সাধারণ প্রজার প্রতিও সহৃদয় ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়। কোরিয়া কৃষি-প্রধান দেশ, কারণ, ঐ দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবী। এই হেতু জাপ সরকার বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ দেশের নানা স্থানে আদর্শ কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র, আদর্শ কৃষিশালা (Farms), কৃষি-বিদ্যালয় এবং কৃষিশিক্ষা কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উন্নত শ্রেণীর বীজ এবং উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত কৃষির উপযোগী যন্ত্রাদি কৃষিজীবিগণকে বিতরণ করা হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র সেচের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পতিত জমীর উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে কোরিয়ায় অসম্ভব কৃষির উন্নতি হইয়াছে এবং অধিক মাত্রায় কৃষিজ পণ্য পাওয়া যাইতেছে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চাউল ৮০ লক্ষ ককু (জাপানী ১ ককু=ইংরাজী ৫ বুসেল) উৎপন্ন হইত; ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে উহা ১ কোটি ৫০ লক্ষ ককুতে উঠিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে ও সানুদেশে বৃক্ষ-রোপণাদি ক্রিয়াও দ্রুতগতি চলিয়াছে। পূর্ব্বে কোরিয়াবাসীরা বিচার-বিবেচনা না করিয়া কেবল গাছ কাটিয়া ফেলিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই এক বৎসরে ১৫ কোটিরও উপরে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।

(৩) কৃষির পর শিক্ষা। জাপ জাতি কোরিয়ায় প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কোরিয়ার গৃহস্থ-গৃহে এক জন শিক্ষক কয়েকটি ছাত্রকে প্রধানতঃ কনফুসাসের উপদেশ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেন। এই প্রণালীর শিক্ষাকে 'কুয়েলস্যাঙ্গ' বলিত। এই শিক্ষা দ্বারা ছাত্রকে বিজ্ঞান বা ইতিহাস ভূগোল আদি বিদ্যা সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে দেওয়া হইত না। তখন সারাদেশে এইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র মাত্র ২ হাজারের অধিক ছিল না। ঐ সকল কেন্দ্রে কনফুসাসের ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীত চীন সাহিত্য সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—ঐ শিক্ষায় জগতের জ্ঞান-গবেষণা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছাত্রদের হইত না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জাপান এ যাবৎ বৎসরে ১ শত ২০টা করিয়া আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কোরিয়ায়

প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৮ শত ৭০টি। এই সকল স্কুলে ছেলেরা ৬ বৎসরকাল কোরিয়ান, জাপানী ও চীনা-ভাষা, পাটী-গণিত, বীজগণিত, অঙ্কনবিদ্যা, সঙ্গীত, নীতিবিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, ইতি-হাস, ভূগোল, (বালিকাদের পক্ষে) সীবন, সূচিকার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে প্রত্যেক ৩টি গ্রামের জন্য ১টি করিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! আর ভারত? সে কথা না তুলাই ভাল।

প্রাথমিক স্কুলের পর মাধ্যমিক (Higher Common School) স্কুল সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এই শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা হইয়াছে ২১টি—ছেলেদের জন্য ১৪টি, অবশিষ্ট মেয়েদের জন্য। এই শ্রেণীর স্কুল বড় বড় সহরে অবস্থিত। এই সকল স্কুলে ছাত্রগণকে ৪ বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল স্কুলে অন্যান্য পাঠ্যের সঙ্গে ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ইচ্ছাধীন পাঠ্য; ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরাজী বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিছু আইন আর কিছু অর্থনীতি শিক্ষাও এ সব স্কুলে দেওয়া হইতেছে। এই জন্য এই সমস্ত উচ্চাঙ্গের স্কুল হইতে পাশ করিয়া কোরিয়াবাসী ছাত্ররা জাপানের এবং অন্যান্য সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রবেশাধিকার লাভ করি-বার সুবিধা প্রাপ্ত হইতেছে।

একটা জনরব রটিত হইয়াছে যে, জাপানীরা কোরিয়ায় জাপ ভাষা বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিণত করিয়া কোরিয়ান ভাষার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ কথা একবারে ভিত্তিহীন। বৎসরে কোরিয়ান ভাষায় প্রায় ৭০ লক্ষখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত ও পঠিত হই-তেছে; প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সপ্তাহে অন্যূন ৬ ঘণ্টা করিয়া কোরি-য়ান ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা শিক্ষার বাহন।

বস্তুতঃ জাপানের ব্যবস্থায় এখন কোরিয়ানরা যে শিক্ষা লাভ করি-তেছে, তাহা স্বাধীন অবস্থায় অথবা চীনের অধীন অবস্থায় করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টান মিশনারীরা কোরিয়ায় যে সকল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সে সকল স্কুলেও এমন শিক্ষার সুযোগ নাই। কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, জাপানীদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুলও আছে। কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী, কেন না, উভয় জাতির মধ্যে ভাষার স্বাতন্ত্র্যই ইহার কারণ। অন্যান্য স্কুলে জাপ ও কোরিয়ানরা শিক্ষার সাম্যহেতু প্রভাবে ক্রমে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইতেছে—এক হইয়া যাইতেছে।

ইহা হইল এক দিকের চিত্র। অন্য দিকে স্বতন্ত্র চিত্রও আছে। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, বগলস সোণারই হউক বা লোহারই হউক, বগলস বগলসই, সকল বগলসই গলায় দাগ কাটিয়া বসে। ইসপের গল্পের গৃহপালিত কুক্কুর ও হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যে কথোপকথনে ইহার মর্ম্ম অনুভব করা যায়। জাপানীরা যতই উন্নতির চেষ্টা করুক, তথাপি তাহারা বিদেশীয়, এ জন্য তাহাদের দেওয়া বগলস সোণার হইলেও বহু কোরিয়ানের গলদেশে উহা লোহার অপেক্ষাও অধিক বাজিতেছে। কোরিয়ায় এ জন্য গুপ্ত স্বাধীনতার আন্দোলন আছে। আর জাপান সে জন্য অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মত নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে সেই আন্দো-লন দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিভীষিকাবাদী কোরিয়ান বিপ্লব-পন্থী দলের নেতা কিম ও-সেনের সে দিন দীর্ঘ সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল। আরও অনেক বিপ্লবপন্থী কোরিয়ান, জাপানের লৌহ-পাদুকা তলে দলিত পিষ্ট হইতেছে।

তবু কোরিয়ানদের এইটুকু সুখ যে, তাহারা বলিতে পায়, তাহা-দের বগলস সোণা দিয়া মোড়া—তাহাদের দেশের কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্রমোন্নতি দেখিয়া এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

চির-রাস

ওহে রাসেশ্বর,

সে কোন্ অতীত কালে, কোন্ বৃন্দাবনে,
কি খেলা খেলেছ, আজি কেহ নাহি জানে!
কে সে ভাগ্যবতী রাধা, তব শ্রীচরণ
সার ভাবি' সঁপেছিল জীবন-যৌবন?
অতীত মিশা'য়ে গেছে অতীতের কোলে,
এ হৃদয়-রাস-মঞ্চ তবু আজি দোলে!

নাই সে যমুনা, নাই সে কদম্বতল,
ললিতা-বিশখা নাই সুদাম-সুবল!
শ্যামলী-ধবলী নাই, নাহি ডাকে পিক,
না নাচে ময়ূর, আজি শূন্য চারিদিক!
তবুও, তবুও কেন আজি এই কালে
হৃদি-রাসমঞ্চ কা'রে ডাকে "এস" বলে?
হৃদয় দুলা'লে যদি, করিলে মুখর
চির-রাসে এস হেথা, হে শ্যামসুন্দর!

শ্রীকুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ)।

দ্রষ্টব্য—বর্ত্তমান সংখ্যায় 'গীতায় কর্ম্মবাদ'-শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত ভবিভূতি বিদ্যাভূষণ—ভবভূতি বিদ্যাভূষণ ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে —মাঃ বঃ

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

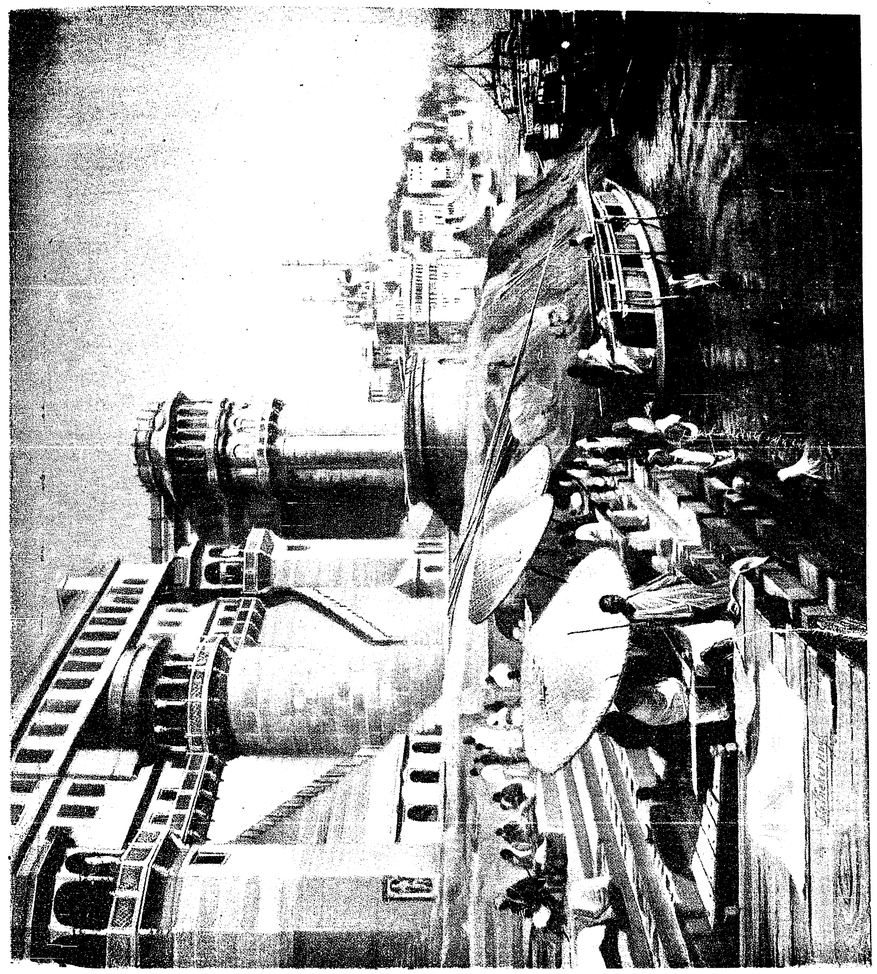

ঘাটের দৃশ্য—কাশী [শিল্পী এন, জে, ঠাকুর সিং

Gava Art Press, Calcutta.

COLOUR ILLUSTRATION



৬ষ্ঠ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ [২য় সংখ্যা

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

কীর্ত্তন সম্বন্ধে যে কথা বল্‌বার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে দুই একটি কথা কৈফিয়ৎ স্বরূপে বল্‌তে চাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি এক কীর্ত্তন-প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়ে পরিশেষে কিছু বল্‌বার জন্য আহূত হয়েছিলাম। সে দিন যে গান হয়েছিল, তাকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করে' আমি বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, কীর্ত্তন প্রণালীমত শিক্ষা করতে হলে সময়ের দরকার। আমি উপস্থিত আসরে কি বলেছিলাম, ভাল মনে নেই। হয় ত আমার কোনও কোনও যুবক বন্ধু আমার সে কথায় সে দিন তত সন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু আমি তাঁদের গানের কোনও প্রতিকূল সমালোচনা করি নি। তাঁদের মিষ্ট গলায় যা সে দিন তাঁরা গান করেছিলেন, তা যে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। আমার বিনামূল্যের উপদেশ শুন্‌লে বরং তাঁদের সে মিষ্টত্ব থাক্‌বে না; কারণ, এমনই বিধাতার বিড়ম্বনা যে, গান শিখ্‌লে, গান তেমন মিষ্ট আর থাকে না। একটি ধাধা অনেকের মুখে মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়:—

"চালালে চলে না, না চালালে চলে,
এই কথা কালিদাস পথে ব'সে বলে।"

এইটিকে আমরা একটু পরিবর্ত্তন করে' বল্‌তে পারি,—

শিখ্‌লে শোনে না লোকে, না শিখ্‌লে শোনে,
এই কথায় কালিদাস প্রমাদ গণে মনে।

যাই হোক্, সে দিনকার ব্যাপারে বোধ হয় আমার স্নেহ-পরায়ণ বন্ধুদের মনে এ সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে ঔৎসুক্য হয়েছিল। তারই জন্যে আজ আমাকে সকলের সাম্‌নে কীর্ত্তনীয়ার বেশে উপস্থিত হ'তে হয়েছে। একটি কথা আমার বলা আবশ্যক, কীর্ত্তনসম্বন্ধে কিছু বল্‌তে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমার সম্বন্ধে আপনাদের কোনও ভুল ধারণা না হয়, সেইটি আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি সঙ্গীত-ব্যবসায়ী নহি, ওস্তাদ বা বিশেষজ্ঞ ব'লে আমার কোনও দিন কোনও খ্যাতির বিড়ম্বনাও নেই। আমার কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে

কলিকাতা ইউনির্ভাসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতার মর্ম্ম।

যে দু'-চারটি মুহূর্ত্ত নিরালা পাই, তা বৃথা আমোদে না কাটিয়ে বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করি। এতে যে আনন্দ পাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, তারই একটু অংশ আপনাদিগকে দেবার জন্য আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। বস্তুতঃ আমি সঙ্গীতসম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সুধীজনসমাজে সঙ্গীতের সম্বন্ধে গম্ভীর ভাবে মতামত ব্যক্ত করতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। এটা আমি রীত্যনুসারী বিনয়ের জন্য বল্‌ছি না। আমার শক্তি বা সাধনা কত অল্প, তা আমি জানি এবং জানি বলেই সেই দীনতা মনে মনে অনুভব করে' লজ্জা পাবার বাধা হয় না।

আর একটি কথা, আমি সংস্কারক নই। আপনাদের সৌজন্যের সুযোগ গ্রহণ করে' আমি সংস্কারের লম্বা-চওড়া কথা আওড়াতে প্রবৃত্ত হব না, এ অভয় দিয়ে রাখছি। কীর্ত্তন গানের কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নেই,—কোনও গানেরই নেই। সঙ্গীতকে আমরা যতই ধরা-বাঁধার বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করতে যাই, সে ততই চারিদিকে আপনাকে ছড়িয়ে দেয়। চাঁদের কিরণ কি কেউ খাঁচার মধ্যে পূরে' ফেল্‌তে পারে? ফুরফুরে হাওয়াকে কেউ কখনও Thermoseএ পূরে নিয়ে যেতে পারে? সঙ্গীত বাধা মানে না; ঝরণার জলধারার মত নানা দিকে আপনার পথ খুঁজে বেড়ায়। বঙ্গদেশে সেই জন্য নানা সময়ে সঙ্গীত নানা মূর্ত্তি ধারণ করেছে। পাঁচালী, ঢপ, চৈতন্য-মঙ্গল, সারি, সখীসংবাদ, রামপ্রসাদী প্রভৃতি বঙ্গদেশেরই সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ। তেমনই কীর্ত্তনেও নানা রীতি, নানা ঢঙের গান শুন্‌তে পাওয়া যায়। সেগুলির কোনওটি কম নয়—কি মিষ্টত্বে, কি মৌলিকতায়। বৈঠকী গানেও আমার বোধ হয় সেইরূপ নানা ঢঙের গানের উদ্ভব হয়েছে, যদিও এ কথা কালোয়াতরা সব সময়ে স্বীকার করতে চান না। ঠুংরি, গজল, সরিমিঞার টপ্পা, নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি সঙ্গীতের উদ্ভাবনী শক্তিই সূচিত করছে। কানে সেগুলি সবই মিষ্ট, সবই প্রাণের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে। সুতরাং এর কোনওটিকে আশ্রয় করে' অপরগুলিকে নিন্দা করলে শুধু খামখেয়ালীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। বড় জোর বলা চলে, এই রীতি আমার ভাল লাগে না। সুতরাং কোনও সঙ্গীতকে খাটো করে' বা কোনও গায়কের প্রতি কটাক্ষ করে' আমি আমার বক্তব্য বিষয়ের মর্য্যাদা-হা করতে চাইনে।

এখন আমার বক্তব্য বিষয় কীর্ত্তনসম্বন্ধে কি বলবার পূর্ব্বে তাঁর নাম করা উচিত, যিনি সংকীর্ত্তনে পিতা বা জনয়িতা ব'লে উল্লিখিত হয়ে থাকেন। গৌ চন্দ্রকে স্মরণ না করে' কীর্ত্তন হয় না। সেই জন্য গৌ স্মরণাত্মক পদ বা গীতগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা বলে। থেকে এখন আমরা গৌরচন্দ্রিকা বল্‌তে বুঝি কো বিষয়ের ভূমিকা। কীর্ত্তনের মধ্যে যে সকল রস বা আছে, তার অবতারণা করতে হলেই সর্ব্বাগ্রে 'তদুচি গৌরচন্দ্র চাই। তদুচিত অর্থাৎ সেই ভাবের উচিত উপযুক্ত গৌরচন্দ্র। অর্থাৎ মান গানের গৌরচন্দ্রিকায় এ গৌরচন্দ্রের বর্ণনা করতে হবে, যেন তিনি মানে মগ্ন আছেন। তাঁর অরুণ নয়নে দরবিগলিত ধারা বইছে, তি 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' ব'লে অনুক্ষণ রোদন করছেন, প্রাপ্তকৃষ্ণ অভিমানে উপেক্ষা করলাম, আমার এখন কি হবে, এমন সুহৃদ্ আছে যে, আমায় কৃষ্ণ মিলাইয়া দিবে! মান বা কলহান্তরিতার গৌরচন্দ্র। রূপের গৌরচন্দ্র যথা- আমার প্রভুর বিমল হেম জিনিয়া অনুপম তনু, আ তাঁর গলায় এমন সুন্দর ফুলের মালা কে পরাইয়া গো! মরি মরি, এমন কদম্ব-কেশর জিনিয়া পুলক-সঞ্চার আর তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম—এমন সুন্দর কখ দেখি নি।

এইরূপ ভাবে যে রস গায়িতে হবে, তার উপ গৌরচন্দ্র আছে। মহাজনরা মহাপ্রভুকে তেমনই নিরীক্ষণ করে' ব্রজলীলা আস্বাদন করেছেন। গৌর যে ভাবে আস্বাদন করেছিলেন, আমরাও সেই ভাবে রস আস্বাদন করব, এই অঙ্গীকার করে' তবে কীর্ত্তন ধরতে হয়। যদি কেহ তা না করেন, তবে রসজ্ঞরা স্থান পরিত্যাগ করেন। এমন যে রাধাকৃষ্ণলীলা,— তাঁরা শোনেন না, যদি তদ্ভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রকে স্মরণ করা হয়। এ কেবল একটি অর্থশূন্য রীতিমাত্র নহে, গ এ একটি অবশ্যকর্ত্তব্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। এ না শুধু যে কিঞ্চিৎ প্রত্যবায় ঘটে, তা নয়; সমস্ত জিনিষ ব্যর্থ হয়ে যায়। এ কথাটি বলবার তাৎপর্য্য এই অনেকে গৌরচন্দ্রের অর্থ ঠিক জানেন না এবং সেই কা

মনে করেন যে, এ একটি অনাবশ্যক আড়ম্বর মাত্র। সেই জন্য ঢপ কীর্ত্তন যারা গান করে, তারা অতি সংক্ষেপে এক লাইন বা দু'লাইন গৌরচন্দ্রিকা নেপথ্যে সেরে দেয়। 'নেপথ্যে' বল্‌লাম এই জন্য যে, গায়িকা সে গানে প্রায়ই যোগদান করে না। একখানি 'পদাবলী' আছে, নাম করব না, হয় ত আপনারা কেহ কেহ দেখেছেন সেখানি, তাতে বহু বৈষ্ণবপদ আছে রাধাকৃষ্ণের লীলাসংক্রান্ত, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে তার উদ্বোধন হয় নি। আমার যেন মনে হয় যে, গৌরচন্দ্রিকা যথাস্থানে না দেওয়াতে পুস্তকখানির অসম্পূর্ণতা-দোষ ঘটেছে।

রাধাকৃষ্ণলালা-বিষয়ক পদ পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ছিল। জয়দেবের পদ, বিদ্যাপতির পদ, চণ্ডীদাসের পদ পূর্ব্বে ছিল, এ আমরা জানি। কিন্তু তখন গৌরচন্দ্রিকা ছিল না। তখনও কীর্ত্তনের পালা গান করবার রীতি ছিল, এ আমরা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন থেকেই বুঝতে পারি। তার পর কীর্ত্তন-গানে যে বান ডাক্‌ল, সেটা মহাপ্রভুর প্রভাবে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম। নদীয়ার সুরধুনী বৃন্দাবনের কালিন্দীজলকল্লোলে গিয়ে মিশল। এই-ই বাঙ্গালার ভক্তি-সাহিত্যে অপূর্ব্ব ভাব-সম্মিলন। নদীয়ার গৌরতত্ত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল, অথচ কোনওটি তার নিজস্ব পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল না। গৌর ছিলেন ব্যক্তি, কিন্তু তত্ত্বে পরিণত হলেন। তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর; তাঁর স্বর্ণ-পঞ্চালিকার পশ্চাতে চিক্কণ কালো রূপের লহরী খেলে; তিনি কলধৌত অর্থাৎ কাঞ্চনবর্ণ কলেবর, কিন্তু নবীন নিবিড় শ্যাম নিকষের মত তাঁর অন্তরে বিরাজ করে। তিনি ভগবদ্রূপে কাঁদান এবং ভক্তরূপে কাঁদেন। পতিত অধম দুর্গত কলিহত জীবকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি হরিনাম-মন্ত্র প্রচার করলেন, আর নিজে সেই 'হরি হরি বোলাইয়া আচণ্ডালে ধরি দেই কোল।'

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর থেকেই কীর্ত্তনের পরিপুষ্টি হ'তে লাগল। বাঙ্গালার সঙ্গীতে, বাঙ্গালাভাষায় যে কি মধুরতা আছে, কি মন গলাবার শক্তি আছে, তা তিনিই বুঝিয়ে দিলেন। তখন থেকে কত নতুন গানের সৃষ্টি হ'ল, কত নতুন রাগ-রাগিণীর জন্ম হ'ল, আপামর সাধারণ মেতে উঠলো গানে। বাঙ্গালাদেশের Cultural history যদি কখনও লেখা হয়, তা হ'লে দেখা যাবে যে, সে Historyতে সঙ্গীত কতখানি স্থান অধিকার করে' রয়েছে! আপামর সাধারণ যদি কোনও সঙ্গীতে মজে থাকে, তবে তা' কীর্ত্তনে। এই হিসাবে কীর্ত্তনের মূল্য অপরিমেয়। জাতীয় জীবনে সঙ্গীত-রস উপভোগ করবার ক্ষমতা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারা যে কি অসাম প্রতিভার পরিচায়ক, তা কীর্ত্তনের জন্ম-কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। কীর্ত্তন-গানে যেমন করে' আমাদের এই দেশটাকে culture হিসাবে হঠাৎ উঁচু করে' দিয়েছিল, তার তুলনা জগতে আছে কি না সন্দেহ। এই যে সঙ্গীত আমাদের জীবনটাকে অনেকগুলি স্তর উর্দ্ধে তুলে দিয়েছিল, তার মূল প্রস্রবণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁর পর থেকেই এই সঙ্গীতের নানা দিকে উন্নতি হ'তে লাগল। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি জমী তৈরী করেই রেখেছিলেন। যন্ত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল, মহাপ্রভু তাতে নতুন করে' সুর বাঁধলেন। যে মূল্যবান্ যন্ত্র একদিন আসবাবের মত কেবল বৈঠকখানার শোভাবর্দ্ধন করত, আজ তা নতুন সুরের ঝঙ্কারে মধু বর্ষণ করলে। মহাপ্রভুর কয়েক বৎসর পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর এলেন। তিনি—

"নবতাল মান কীর্ত্তন সৃজন প্রচারণ ক্ষিতিমাঝ,
অতুল ঐশ্বর্য্য লোষ্ট্রের সমান ত্যজনে না সহে ব্যাজ।"

এই নরোত্তম দাস ঠাকুরই গরাণহাটী কীর্ত্তনের স্রষ্টা। কীর্ত্তনের যে কয়েকটি শাখা আছে, তন্মধ্যে গরাণহাটী প্রথাই অধিক পুরাতন ব'লে মনে হয়।

আমি সঙ্গীতের এই সকল খুঁটি-নাটীর মধ্যে প্রবেশ করে' আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই নে। কিন্তু কীর্ত্তনের আলোচনা করতে গেলে মোটামুটি যে দুই একটি বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, আমি তার সম্বন্ধে কিছু বল্‌বো। কীর্ত্তন এক অপূর্ব্ব জিনিষ। এর মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব, কাব্য ও সঙ্গীত, এই ত্রিধারা সঙ্গত হয়ে এক ত্রিবেণীর সৃষ্টি করেছে। ধর্ম্মের পতিতপাবনী গঙ্গা, কাব্যের স্বচ্ছসলিলা নীল যমুনা এবং সঙ্গীতের কলনিনাদিনী সরস্বতী, এই তিনটি ধারা কীর্ত্তনে মিশে কীর্ত্তনকে এক অপূর্ব্ব ভাবসম্পদে অলঙ্কৃত করেছে। আমাদের দেশে ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রধানতঃ সাধন করেছে। এইটি লক্ষ্য করবার বিষয়। বৈষ্ণবদের ভক্তিতত্ত্ব সকলেই পছন্দ করেন। কিন্তু অনেকে উহার আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মতত্ত্বে গিয়ে হোঁচোট খান। কেহ

কেহ মনে করেন যে, খৃষ্টানদের থেকে বৈষ্ণবরা তাদের ভক্তিবাদ ধার করেছেন। যেখান থেকেই সে ভক্তিবাদ আসুক না, এ কথা ধ্রুব যে, আমাদের সমস্ত ধর্ম্মনীতি বৈষ্ণবের ভক্তিবাদে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ভক্তিশূন্য কোনও ধর্ম্মবাদ পৃথিবীতে আর এখন চল্‌তে পারে না!

বৈষ্ণবদের কাব্যপ্রতিভা সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈষ্ণব-পদাবলীর মত ললিতমধুর, কান্তকোমল, উন্নতোজ্জ্বল রস-সুবলিত কবিতা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির কাব্য-সুধা চিরদিন বাঙ্গালীর প্রাণ রসসিক্ত করে' রাখবে। কীর্ত্তনের মধ্যে যে সঙ্গীত আছে, তা'ও গৌরব করবার জিনিষ; কেন না, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর শত-বন্ধনের থেকে মুক্ত হয়ে এ সঙ্গীত স্বাধীনতার পতাকা গগনে তুলে ধরেছিল: এটা কম বিস্ময়ের বিষয় কি! কীর্ত্তনের সঙ্গীত যে প্রচলিত সঙ্গীত থেকে কিছু স্বতন্ত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনও একটা সুর শুন্‌লেই তাকে কীর্ত্তন ব'লে বুঝ্‌তে দেরী হয় না। এই সুরের বৈশিষ্ট্য কি? এক কথায় তা বুঝানো যায় না। গান করে' সহজেই সেটা বুঝিয়ে দিতে পারা যায়, এই জন্যই আজ গানের বন্দোবস্ত।

মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে, বৈঠকীগানে যে সকল রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়, কীর্ত্তনে ত সেগুলি ব্যবহার করা যেতেই পারে। উপরন্তু রাগিণীগুলিকে ভেঙ্গে-চুরে এঁরা নতুন নতুন সুরের সৃষ্টি করেছিলেন। মায়ুর, ধানশী, করুণ বরাড়ী প্রভৃতি কীর্ত্তনের নিজস্ব সম্পত্তি। তালেও তেমনই; ধড়া, দশকুশী, ডাঁসপাহিড়া, দুঠুকী প্রভৃতি তাল কেবল কীর্ত্তনেই দেখতে পাই। কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্যে আলাপচারী করবার প্রথা ছিল। যাঁরা কীর্ত্তনের ওস্তাদ হতেন, তাঁরা স্বরগ্রাম সাধনা করে' গান অভ্যাস করতেন, এ সকল সংবাদ আমরা প্রাচীন গ্রন্থে পাই। কিন্তু আজকাল কীর্ত্তনের সে উন্নতির স্রোত মন্দীভূত হয়ে গেছে। আমাদের প্রাণ নীরস হয়ে উঠছে, অর্থচিন্তা, কলহদ্বেষ প্রভৃতিতে আমাদের চিত্ত মরু হয়ে উঠছে, কাযেই সেই আনন্দের ধারা মরু-পথে লুপ্ত হ'তে চলেছে। এখন কীর্ত্তনে আর তেমন আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তনের প্রকৃত ওস্তাদও সংখ্যায় কমে আসছেন। রসিকদাস, প্রেমদাসের গান আমরা শুনেছি। আর তেমন হয়ে উঠ্‌ছে না কেন? পণ্ডিত বাবাজি গণেশ, অবধূত এঁরা প্রাচীন হয়েছেন—এঁদের স্থ নেবার মত আর কেউ এগিয়ে আসছেন না কেন? এ দেখে ভয় হয়, কীর্ত্তনের ধারাটি হয় ত বা বেশীদিন থাকবে না। আজ সেই কথাটি আপনাদের নিকটে আমা বিশেষ ভাবে নিবেদন করবার বিষয়।

কীর্ত্তনের কতকগুলি শাখা-প্রশাখা আছে। তার কিছু প্রসার দেখা যায়। সাধারণতঃ, স্ত্রীলোকরাই কীর্ত্তন গান করে। আদ্যশ্রাদ্ধে ইহাদের গান শুনা পাওয়া যায়। একে ইহাদের গলা মিষ্ট, তাতে আ তরল তালে গানের এমন দ্রুত লঘুগতি থাকে যে, শ্রোতার মন সহজেই মুগ্ধ করে' ফেলে। কিন্তু গান হলেই যে তা উৎকৃষ্ট হলো, এমন নয়। গানের উৎকর্ষ কর্ষ বিচার করতে হ'লে কয়েকটি সাধারণ হিসাব রাখলেই চল্‌তে পারে। সঙ্গীতের চারটে আছে; কণ্ঠ, সুর, তাল-লয়, ভাব। কণ্ঠ মানুষ ঈশ্বরদত্ত সম্পদ্। কারও গলা মিষ্ট, কারও গলা কারও গলা উঁচু, কারও গলা নীচু। এ সকল নৈস ক্ষমতা। ইহা অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তনসাধ্য হলেও এর সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। সুর—যন্ত্রকে বেঁধে সুর বা'র করা যায়, কণ্ঠকেও তেমনই সাধনা সুর লাভ করা যায়; কণ্ঠ একটি যন্ত্র বই ত নয়। এ বালকের কণ্ঠ খুব মিষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু সে কণ্ঠে থাম্বাজ বা গৌড়সারঙ্গকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়, তবে শিক্ষা করতে হবে। সুর—অভ্যাস-লভ্য; কণ্ঠ থাক্‌ অনায়াসে সুর হ'তে পারে, কিন্তু কণ্ঠ না থাক্‌লে হওয়া কঠিন। তাল-লয়—ইহাও সাধনা-সাপেক্ষ। কাব্যে যেমন ছন্দ ও যতি, গানের তেমনই তাল-লয়। তাল-লয়ে মধ্যে বাঁধা না পড়লে সঙ্গীতের সঙ্গীতত্ব থাকে না। অনে মনে করেন, তাল-লয় একটা অনাবশ্যক ও পরিহার্য্য জঞ্জাল কিন্তু তা নয়। কথাকে মাত্রা ও ছন্দের মালায় সাজি যেমন কবিতা করে' তোলা যায়, সুরকে তেমনই তাল-ল গেঁথে তাকে সঙ্গীত করে' তোলা যায়। কেউ কেউ ম করেন যে, তাল-লয়ের মিছা কোলাহল থেকে ছুটী দিতে লেই হয় সঙ্গীতের মুক্তি। কিন্তু সে মুক্তিই নয়; স্বে চারের নাম স্বাধীনতা নয়। যন্ত্র যেমন বেঁধে নিলে,

থেকে সুর ছাড়া যায়, তেমনই তাল-লয়ের মধ্যে ধরা দিয়েই সঙ্গীত আপনাকে আবিষ্কার করতে পারে। গানের শেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—ভাব। ভাবে গান ও কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। হাজার সুর-তাল থাকলেও যদি গানে ভাব না থাকে, তবে তা প্রাণহীন কসরৎ ব'লে বোধ হবে। গান মাত্রেরই উদ্দেশ্য ভাবকে অভিব্যক্ত করা। কথা এবং সুর এই ভাবকে ধরবার জন্যই ব্যস্ত। কখনও কথায়, কখনও সুরে ভাবের লহরীলীলা ধরতে চেষ্টা করা হয়।

কীর্ত্তন ভাবপ্রধান সঙ্গীত। অন্য সঙ্গীত অন্য যে নামেই অভিহিত হোক, 'কীর্ত্তন' নামের অধিকারী নয়। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য মানবের যে উদ্বেগ, তাকে ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাব বলা হয়। নববিধা ভক্তির লক্ষণের মধ্যে 'কীর্ত্তন' একটি। সুতরাং যে গান এমন একটা প্রকাণ্ড দাবী নিয়ে এসেছে, তার সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হয়ে চিন্তা করবার দরকার আছে। ইহ-পরকালের মধ্যে যে গানে একটি সোনার শৃঙ্খল গড়িয়ে যোগস্থাপন করে, তা আমাদের যে বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। এইখানেই ভাব, কাব্য ও সঙ্গীতের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখ্‌তে পাই। কাব্য সঙ্গীতকে সাহায্য করেছে, সঙ্গীত কাব্যকে সাহায্য করেছে। উভয়ে উভয়ের সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়ে ভাবরাজ্যকে অধিকার করে' ফেলেছে। পৃথিবীর যে কোনও কাব্য-সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্যের তুলনা করা যেতে পারে, তাতে বৈষ্ণব-কাব্য মলিন ব'লে প্রতিভাত হবে না। পৃথিবীতে যত সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে কাব্যরসে উপভোগ্য, ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ সঙ্গীত-সাহিত্য বৈষ্ণব সঙ্গীতের মত আর কোথায়ও নাই। তার ফলে এই হয়েছিল যে, আমাদের জীবনের সঙ্গে এই কাব্য ও সঙ্গীত গাঁথা হয়ে গেছে। তোমার বাড়ীর দরজায় যে ভিখারী গান করছে, একটু মনোযোগ করে' শোনো, সে কীর্ত্তন গাইছে। আমোদে উৎসবে, সভায় মজলিসে, আরামে বিরামে সর্ব্বত্র কীর্ত্তন গান শুন্‌তে পাওয়া যায়। এমন করে' জাতীয় জীবন আঁকড়ে ধরে' আর কোনও সঙ্গীত আছে কি না, বল্‌তে পারিনে। বাঙ্গালীর জীবনের উপর কীর্ত্তনের প্রভাব যে কতখানি, তা অন্য দিক্ দিয়েও বুঝতে পারা যায়। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রিসীমানায় অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ পৌঁছুতে পারে না। কিন্তু কীর্ত্তন সেখানে অনেক বড় আসন পেয়েছে। উপাসনায় কীর্ত্তনের সুর, ভঙ্গী, আঁখর সব নেওয়া হয়েছে। নির্ব্বাসিত করা হয়েছে শুধু কীর্ত্তনের ঠাকুর অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে। তবুও ব্রাহ্মদের গানে সময়ে সময়ে বৈষ্ণব-ভাব যথেষ্ট দেখতে পাই। শুনলেই মনে হয়, বোধ হয়, কোনও ভক্ত বৈষ্ণব পদকর্ত্তার চরণ উদ্ধার করছি।

মনে করুন ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি পদ:—

কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।
(কবে) হব পূর্ণকাম, বলব হরিনাম,
নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার॥

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ-মন,
কবে যাব আমি প্রেম-নিকেতন,
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার।

কবে পরশমণি করি পরশন,
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন,
লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার॥

কবে যাবে অসার ধরম-করম
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম
পরিহরি অভিমান লোকাচার॥

ইত্যাদি।

এই গানটিতে যদি 'প্রেম-নিকেতনের' স্থলে 'প্রেম-বৃন্দাবন' পাঠ করা যায় এবং 'অসার ধরম করমের' স্থলে 'আমার ধরম করম' পাঠ করা যায়, তা হ'লে এ গানটি একটি সুন্দর কীর্ত্তনের পদ ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। যত দূর জানি, তাতে ঐরূপই পাঠ পূর্ব্বে ছিল এবং এটি এক জন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের রচিত পদ। কিন্তু উল্লিখিত কথা কয়টিকে এবং ভনিতা বাদ দেওয়ায় এ গানটি ব্রহ্ম-সঙ্গীতে প্রবেশ লাভ কর্‌তে পেরেছে।

রবিবাবুর কবিতায়ও পড়েছি।

'বঁধু হে ফিরে এস, আমার সজল-জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!' 'সজল-জলদ, স্নিগ্ধকান্ত' বল্‌তে শুধু এক জনকেই মনে পড়ে। আমাদের খৃষ্টান-বন্ধুরাও

পশ্চাৎপদ্ হবার ন'ন। তাঁরাও এক সময়ে বুঝেছিলেন যে, বাঙ্গালীর প্রাণ কীর্ত্তনের মধ্যে প'ড়ে আছে। তাই তাঁরা কীর্ত্তনের সুরে পদাবলীর মত গান বেঁধে বাঙ্গালীর মনের গুপ্ত দরজাটি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার একটা নমুনা দি :—

'কারও পাটে ডুগডা খিটা, কারও পাটে কচুসিদ্ধা,
জেমসা বোলে, ভূমণ্ডোলে, এম্‌নি বেপার হ'য়ে ঠাকে।'

অর্থাৎ 'কারও পাতে দুগ্ধ ঘৃত, কারও পাতে কচুসিদ্ধ, জেমস্ বলে ভূমণ্ডলে এম্‌নি ব্যাপার হয়ে থাকে।' খৃষ্টানদের রচিত অনেক ভাল ভাল কীর্ত্তনের গানও আছে।

কাব্যের সঙ্গে ধর্ম্মের খুব নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। হয় ত এ কথা বললে একটু বেশী বলা হবে যে, ধর্ম্ম ও কাব্য মানব-মনের একই প্রেরণা থেকে জন্মলাভ করেছে। আমরা যাকে Faith বলি, সেটা জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু। কাব্যও জ্ঞানের অতিরিক্ত—কল্পনার প্রস্ফুটিত কমল। কাব্যের বিষয় প্রেম ; ধর্ম্মের বিষয়ও প্রেম। কাব্য এবং ধর্ম্মকে পৃথক্ করে' দেখা এই জন্য মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়েও খুব শক্ত। প্রেমের যে কবিতা, তাহা ভগবানে সহজেই আরোপিত হয়। রবিবাবুর যে কবিতাটি আমি এইমাত্র তুলেছি, সেটা অনেকে হয় ত শুধু কাব্য বলেই মনে করবেন। কিন্তু সমস্ত কবিতাটির মধ্যে প্রবেশ করলে বুঝা যায় যে, এ শুধু প্রেমের কবিতা না-ও হ'তে পারে। বৈষ্ণব কবিরা যে কাব্য আর ধর্ম্মকে এক করে' নিতে পেরেছেন, তার একটু কারণ আছে। তাঁদের কাব্য আর ধর্ম্ম যেন একটি ফুলের দুইটি দিক্। কাব্য হ'ল পাপড়ি, ধর্ম্ম হ'ল তার সুগন্ধটুকু। কাব্যের মধ্যে তার ঐ সৌরভ লাভ করা যায়। এই হ'ল বৈষ্ণবদের Mysticism ; এই যে কাব্য ও ধর্ম্মকে একই রসের পাকে ফেলে তাঁরা পরমান্ন প্রস্তুত করতে পারলেন, তার প্রধান কারণ, তাঁদের অনন্যসাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব। কবি যেমন নিরঙ্কুশ, ধর্ম্মটিতেও তাঁদের তেমনই স্বাধীনতা। ভগবান্‌কে আপনাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নিকট আত্মীয় করে' তাঁরা তাঁকে সর্ব্ববিষয়ে কাব্যের যোগ্য করে' তুললেন! তাঁরা ভগবান্‌কে ঠাকুর-ঘরের এক কোণে সিংহাসনে বসিয়ে রাখেন নি। নিত্য ব্যাপারের মধ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে এসে এঁরা তাঁকে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্য থেকে একরূপ অবসর দিলেন। তখন তাঁকে কোলে-কাঁখে করাও চলে, তাঁর কাঁধে চড়া, তাঁকে উচ্ছিষ্ট খাওয়ানোও চলে, আর তাঁকে দিয়ে তেমন তেমন ক্ষেত্রে পায়ে ধরানোও চলে। এমন করে' যাঁরা ধর্ম্মকে ভেঙ্গে কাব্যে দাঁড় করাতে পারেন, কাব্যকে গলিয়ে ধর্ম্মে পরিণত করতে পারেন, তাঁদের অসাধ্য কি আছে? রসের চোখে ভগবান্ মানব। তাই মানবের মত তাঁর লীলা —

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নব কৈশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ॥"

বেদান্ত বলেন,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

কাব্য রসের ভাষায় বল্‌লেন,—

"যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম।"

উপনিষৎ বল্‌লেন,—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

কাব্য বল্‌লেন,—

"তোমারি গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমারি রূপে!"

বেদান্ত বল্‌লেন,—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্।"

কাব্য বল্‌লেন,—"প্রতি তনু পিরীতি পসার!"

এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্র গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথায় যা বলেছেন, কাব্য তাই রসের ভাষায় ব্যক্ত করেছে। এই রসের ভাষা না হ'লে কাব্য হয় না। হিন্দুরা সেটা ভাল বুঝেছিলেন।

এমন কি গঙ্গাস্তবেও দেখ্‌তে পাই, "সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-বধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং···ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্।" সেকালে আমাদের মনে কোনও বিকার আসত না। কিন্তু এখন আসে। সুতরাং কীর্ত্তনকে শুধু কাব্য ও সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে ; তা'তেও আমার আপত্তি নেই।

ভাবের সঙ্গতি রক্ষা করা বড়ই কঠিন, সুরের দিক্ দিয়ে এবং কথার দিক্ দিয়ে। গম্ভীরভাবে হাল্‌কা সুর অথবা তরলভাবে গম্ভীর সুর—ভাবরক্ষার অন্তরায়।

ঢপকীর্ত্তনে সুর অনেক সময় মিষ্ট লাগলেও ভাবের অনুযায়ী হয় না বলে সন্দেহ হয়।

ভাবটি যেমন, সুর তেমন না হ'লে যেমন উপভোগ্য হয় না, তেমনই রস বিশুদ্ধ না হলেও গানে আনন্দ হয় না। রসের বিশুদ্ধি রক্ষা করে' গান গাওয়া বড়ই কঠিন। রস কি এবং তার পর্য্যায়, ক্রম, আলম্বন, বিভাব, সঞ্চারী ভাব প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রে ধরে'-বেঁধে' দেওয়া হয়েছে। ভাষার নিয়ামক যেমন ব্যাকরণ, যুক্তি-তর্কের নিয়ামক যেমন ন্যায়-শাস্ত্র, রসের বা কাব্যের নিয়ামক তেমনই অলঙ্কার-শাস্ত্র। সুতরাং এখানে স্বেচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতা চলে না। কীর্ত্তন-গায়ক হতে হ'লে শুধু গলা ভাল হলেই হ'ল না, তাল-মানে পরিপক্ক হ'লেও হয় না ; অলঙ্কারশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। তা না হ'লে যে স্বাধীনতা কীর্ত্তনে আছে অক্ষর বা অলঙ্কার যোজনা করবার, তা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়ে বিকট হয়ে উঠ্‌তে পারে। মনে করুন, কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে বসা গেছে। নানাপ্রকার সুখাদ্য ও সুপেয় দ্রব্য পরিবেষিত হচ্ছে, গৃহস্বামী পুনঃ পুনঃ খাবার জন্য অনুরোধ করছেন। নানাবিধ রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যের আস্বাদে সকলেই ভরপুর। কিন্তু আপনি আপনার নতুন জুতা যোড়াটির জন্য সর্ব্বদা সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করছেন বাহিরের দিকে। আপনার প্রতিবেশীকে পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়ের প্রশ্নে বিব্রত করে' তুলছেন। এটা যেমন একটা প্রকাণ্ড রসাভাস, তেমনই রসাভাস কীর্ত্তনে ঘটবার আশঙ্কা আছে। যথা—

দুকূলে বহিছে বা কাঁপিছে রাধার গা
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয় ভর দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥

এখানে কাব্যরস-সৃষ্টিই পদকর্ত্তার একমাত্র অভিপ্রেত। কিন্তু এখানে কোনও গায়ক যদি ভবনদী পার হ'বার কথা তুলে' শেষের সে দিন স্মরণ করিয়ে দেন, তা হ'লে সমস্ত রসটা রসাতলে যায় না কি?

যখন কীর্ত্তনের প্রসার ছিল, তখন আমাদের দেশের মেয়েরাও এই রসাভাস ধরতে পারতেন। এমন গল্প শোনা যায় যে, তাঁরা পরদার আড়াল থেকে 'অলঙ্কার' ধরিয়ে দিতেন। গায়ক ভুল অলঙ্কার দিলে তাঁরা সেটা সংশোধন করে' দিতে পারতেন। এখন আর সে দিন নাই। সুর-তালের ত কথাই নাই, রাগরাগিণীর ত কথাই নাই, কীর্ত্তনের নামে এমন অনেক জিনিষ চলে, যা সুধী-সমাজে অচল হওয়া উচিত ছিল।

কীর্ত্তনে রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় না ব'লে অনেকে আক্ষেপ করেন। কিন্তু সঙ্গীতের যে প্রণালীর সহিত কীর্ত্তনে আমরা পরিচয় লাভ করি, সে প্রণালীতে রাগ-রাগিণীর পূর্ণ প্রভাব বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল। আমরা গল্প শুন্‌তে পাই, কাশিমবাজারের রাজবাটীতে বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তনীয়া সে দিনও রাগ-রাগিণীর স্বরগ্রাম দেখিয়ে ওস্তাদদিগকে স্তম্ভিত করে' গিয়েছেন। এমনই ত হওয়া চাই। যেমন বেদ-বেদান্তের আলোচনার পর হরিলীলা কীর্ত্তনে অধিকার জন্মে, তেমনই স্বর-সাধনা ও রাগ-রাগিণীর সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে তার পরে কীর্ত্তন-গান অভ্যাস করা উচিত। তাই করলেই তবে কীর্ত্তনের ধারাটি মর্ত্ত্যে থাকতে পারে। নতুবা সুরধুনীর মত খাঁটি কীর্ত্তনের সুর হয় ত কোনও কল্যাব্দে মর্ত্ত্য থেকে প্রস্থান করবেন!

অদ্যকার সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজ পরম বৈষ্ণব, বদান্যবর, কীর্ত্তনের মহিমার অদ্বিতীয় স্তম্ভস্বরূপ। অনেকে হয় ত জানেন না যে, কীর্ত্তন মহারাজের প্রাণের বস্তু ; অনেকে জানেন না, মহারাজ কীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। মহাপ্রভুর সম্পত্তি কীর্ত্তন রক্ষা করবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেছেন, তার জন্যে তিনি বৈষ্ণব-সমাজের কেন, সমগ্র বঙ্গদেশের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি হাল্‌কা কীর্ত্তন শোনেন না। কীর্ত্তনের যাতে উৎকর্ষ হয়, সেটা তাঁর যেমন আকাঙ্ক্ষার বিষয়, আর কারও তেমন নয়। আমি তাঁর মত সভাপতি এবং অন্য অনেক গণ্য-মান্য সাহিত্যিকের নিকট এই কথাগুলি বল্‌বার সুযোগ পেয়ে গৌরব বোধ করছি।

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ ;
(রায়বাহাদুর)।



ত্রিবেণী

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শরতের উজ্জ্বল আকাশকে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্য ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণধারায় করতোয়ার জল এবং তাহার পারপারবর্ত্তী নদীতীরের বৃক্ষশীর্ষ ঝলমল করিতেছিল। এমন সময়ে নগরী হইতে দূরে রাজাধিরাজের বিলাস-ভবনের দ্বিতলস্থিত একটি প্রশস্ত কক্ষের ক্ষুদ্র বাতায়ন-রন্ধ্রপথে দাঁড়াইয়া একটি সুন্দরী রমণী চুপ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু সেই অপলক চক্ষু দুইটির পানে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যাইত যে, মানুষ শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিলেই কিছু দেখিতে পায় না, যদি না তাহার সঙ্গে সে তাহার মনকেও সেই দিকে প্রেরণ করে। এই মেয়েটি যে ওই রকম করিয়া এই শান্ত অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ আলোকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এর উদ্দেশ্য ত ওই নদীতীরের তরঙ্গভঙ্গী অথবা স্নিগ্ধকিরণোজ্জ্বল তীর-তরুদলের আনন্দ-নর্ত্তন দেখা নয়, সমস্ত দেখা-শোনার সাধে ইতি দিয়া সে শুধু এখন তাহার ঝটিকা-পূর্ব্বের স্তব্ধ আকাশের মত থমথমে হৃদয়-মন লইয়া ওই রকম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মেঘাচ্ছন্ন চিত্তের সম্মুখে সমস্ত জগৎটাই একটা বিরাট ছায়াবাজির মতই মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল।

এমনই করিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহারই সেই দৃষ্টিশূন্য চক্ষুর উপর দিয়া বাহিরে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া নদীপারের এক প্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত জমাট-বাঁধা কালো অন্ধকার গাছের গায়ে জোনাকির ঝিকিমিকি এই মৌন-স্তব্ধ নারীর দৃষ্টির সম্মুখে স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল। বিকট স্বরে কতকগুলা শৃগাল বাতায়নের ঠিক নীচেই নদীসৈকতে আসিয়া তারস্বরে ডাকিতে লাগিল, তথাপি উজ্জ্বলার অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন চিত্তদ্বার মুক্ত হইল না। এই বন্দিনী নারী উজ্জ্বলা।

ঘরের একটি মাত্র প্রবেশদ্বার বাহিরের দিক্ হইতে বোধ করি বন্ধ ছিল, খটাস্ ঝনাৎ করিয়া ভারী শিক্ল খোলার শব্দ হইল। তথাপি এই শব্দের প্রতিধ্বনি ও নিথর নারীমূর্ত্তির বক্ষে ধ্বনিত হইল না, সে যথাপূর্ব্ব সেই একই ভাবে রহিল।

দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল দুই জন দাসী। তাহাদের মধ্যে একের হস্তে প্রদীপ আর এক জনের হস্তে স্বর্ণপাত্রে বিবিধ প্রকার আহার্য্য। তাহারা আসিয়াই সকল বস্তু যথাস্থানে স্থাপন করিতে গিয়া বিস্ময়ধ্বনি করিয়া উঠিল—

"আই মা! যেথায় জিনিস সেথায় পড়ো, একটুকু তো ব্যাতে দ্যাওনি মা!"

তাহার পর কাছে আসিয়া গায়ের উপর হাত দিয়া বলিল, "এমন ধারা করলে যে মারা যাবে। দু'দি দু'রাত্তির উৎরে গ্যাছে, জলরত্তি গলায় গলাওনি, ই কি করচো মা?"

এতক্ষণে ইহার এই মাতৃ-সম্বোধনে সহসা সেই প্রেতভূতা নারীর হারানো সম্বিৎ যেন ফিরিয়া আসিল। সে সেই অন্ধকারের জগৎ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক যেন ঈষৎ বিস্ময়ভরেই ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কোন কথা কহিল না।

তাহার এই নিরুদ্যোগ নীরবতা ইহাদের পাষাণ চিত্তে কেও বোধ করি একটুখানি বিচলিত করিয়াছিল, তাই এই শ্রেণীর লোকের মত কাঠিন্য প্রকাশ না করিয়া পুনশ্চ সে সহানুভূতির কোমলকণ্ঠে কহিল—

"বুকের মধ্যে ফাঁক হয়ে গ্যাচে কি না, ঘর দুয়োর সোয়ামী হারিয়ে এস্‌তে হয়েচে! তা' কি করবে মা বরাতের ল্যাকোন তোমার এই রকমই ছ্যালো যখন তকন শুকিয়ে ম'রে আর নাব কি? আর ত তা তোমায় ঘরে নেবেই না, তকন একুল ওকুল দুকুল খুয়ে কি করবে? মহাপ্রাণীকে নষ্ট করতে নেই বাছা! ব্যাঁতে একটু কিছু দ্যাও দিকি।"

রমণী মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল; এবারও সে কোন উত্তর দিল না।

তখন অপরা একটু রাগ করিয়া বলিল, "সেই ত সবই হবে বাছা, তবে অনর্থক আমাদের দুঃখ দ্যাও কেন? নাও, খেয়ে নাও, ওই দেখ, গা-ভরা গয়না এনেছি, গায়ে দাও; পাটের সাড়ী এনেছি, পরো; আমাদের সঙ্গে এসো, পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ তোমার কাছে আজ আসবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন। এসে যেন তাঁকে—"

এই কথা কয়টা যেন জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার কানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং এ কথা শোনার পর কি এক প্রকার অর্দ্ধ-চেতন অর্দ্ধ-অচেতন কাঠের মত হইয়া সে বসিয়া রহিল। কখন ও কেমন করিয়া এই বিলাস-কাননের দাসীরা তাহার মলিন বস্ত্র ছাড়াইয়া তাহাকে বিচিত্র চীনাংশুক পরাইয়া দিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ মণিমাণিক্যে খচিত করিয়া দিয়াছে, তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই। খাবারও হয় ত মুখে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে যে শুধু বাহ্য প্রয়োগের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধির পথ নাই, তাই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

এই নারীদ্বয় তাহাদের অভ্যস্তভাবে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে এই দরিদ্র বধূর দুই শব্দপ্রবেশ-শূন্য কানের কাছে তাহার ভাবী সুখ-সৌভাগ্যের কত স্বপ্ন-জালই না রচনা করিতেছিল! সুখের বিষয়, সেগুলা ইহার আড়ষ্ট, অভিভূত ও একান্ত বিকল বিহ্বল চিত্তদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশপথ পায় নাই। তাই সে তাহার এই সকল চরম লজ্জার কথায় স্তব্ধ থাকিয়াই যাইতেছিল, কিন্তু ইহারা মনে করিল, এই লক্ষ সুবর্ণ মূল্যের অলঙ্কাররাশি এবং তাহাদের অমূল্য উপদেশে এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রা কৈবর্ত্তবধূ একবারে পরমভট্টারক, পরমসৌগত মহারাজাধিরাজের শ্রীচরণের দাসী হইয়া গিয়াছে।

সেই ক্ষুদ্রতম কারাগৃহের পার্শ্বেই সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত রাজকীয় শয়নকক্ষে দাসীদ্বয় দ্বারা বাহিত হইয়া আনীত হইবার পর সহসা ইহার তীব্র আলোকচ্ছটায় অথবা কিরূপে বলা যায় না—তাহার বিহ্বলতা একবারের জন্য কাটিয়া গেল। সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত ও অজ্ঞাত এই সকল বিলাস-উপকরণের সর্ব্বোত্তম সজ্জায় সুসজ্জিত বস্তুজাত-সজ্জিত সুবৃহৎ কক্ষটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল। অসংখ্য সুবর্ণ-দীপে গৃহ আলোকোজ্জ্বল, সেই আলোকে রজতময় সুবৃহৎ পর্য্যঙ্কে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। সুবর্ণময় জলাধার, পানপাত্র, বসিবার আসন ইতস্ততঃ সজ্জিত। পুষ্পমাল্য-পুষ্পগুচ্ছে সর্ব্বত্র সজ্জিত, সুগন্ধে কক্ষ আমোদিত। উজ্জ্বলার বোধ হইল, সে যেন স্বপ্নযোগে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়াছে! মর্ত্ত্য-বাসীদের জন্য এত ভোগ—এত ঐশ্বর্য্য যে থাকা সম্ভব, এ ধারণাও তাহার মনের মধ্যে ছিল না। এ কোথায় সে আসিল! তাহার পর ত্বরিতে একটা দারুণ সন্দেহ তাহার মনে দেখা দিল। এখানে সে আসিলই বা কি করিয়া? সে ত একটা সিন্দুকের মত ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বন্দিনী ছিল! গভীর আশঙ্কায় তাহার বক্ষের ভিতরটা দুলিতে লাগিল। তাহার পর আচমকা নিজের গায়ের দিকে চোখ পড়িতেই তাহার বিস্ময় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ উথলিয়া পড়া প্রচুরতর লজ্জা ও ভয়ের মিশ্রণে এই সকল ভাব অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য-রাশির প্রকৃত ইতিহাসটাকে তাহার বিহ্বল মনের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিল। এই সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বলার সমুদয় কৌতূহল ও বিস্ময়কে অপসৃত করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন একসঙ্গেই যেন একটা অচেতন পদার্থের মত কঠিন ও ভারী হইয়া উঠিল, আর ঠিক এমনই সময়েই তাহার এক পূর্ব্বপরিচিতের রূপ ধরিয়া এক সুন্দর সুপরিচ্ছদধারী তরুণ পুরুষ হাস্যরঞ্জিত মুখে তাহার দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ডাকিয়া উঠিলেন, "উজ্জ্বলা! প্রেয়সি! এত দিনে আমাদের মিলন হ'ল!"—উজ্জ্বলার বোধ হইল, সেই সে দিনের স্নিগ্ধ মধুর কোমল কণ্ঠে আজ যেন একটা প্রলয়ঙ্কর আবেগের ভীম ঝঞ্ঝা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে যেন বিশ্বের সমুদয় আর্ত্তনাদ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং শ্মশান-শিবা-দলের ঘোর কর্কশরব উহার মধ্য দিয়াই শ্রুত হইতেছিল। এক মুহূর্ত্তমধ্যেই সে "রাজাধিরাজ! সত্যিই তুমি এই!" বলিয়াই সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যহারা হইয়া উহারই পায়ের কাছে ঠিকরাইয়া পড়িয়া গেল।

রাজাদেশে মহল্লিকাদ্বয় ত্রস্তে আসিয়া অপহৃত-চেতনা উজ্জ্বলাকে বহন করিয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মহীপালের জীবনের উপর উপর্য্যুপরি এমন কতকগুলি ঘটনার সঙ্ঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল, যদি মহীপালের চিরাভ্যস্ত বিলাস-ব্যসনের ঘোর কাটাইয়া একটুখানি চক্ষু চাহিয়া নিজের অবস্থাটা দেখিয়া লইবার অবসরমাত্র থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সে দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন এবং হয় ত বা সবিশেষ চেষ্টা করিলে এখনও নিজেকে কথঞ্চিদ্‌রূপে রক্ষা করিতেও সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য করায় উহার পালন বা শাসন ত তাঁহার আদর্শ ছিল না, রাজ্যভোগই তাঁর আজন্মের আদর্শ। উপলক্ষ যখন লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন ছোটর বড় হওয়ার মতই দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। রাজার অবস্থা এখন সেই রকমই। নিশ্চিত বিপদের মধ্যে মাথা গলাইতেছেন জানিয়াও চিরাভ্যস্তভাবে আজও প্রবৃত্তি-দমনের বিন্দুমাত্র স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান লইতে পারে নাই। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে সকল মানুষই বাধ্য, যে তা' করে না, প্রবৃত্তির হস্তে অসহায় শিশুর মতই আপনাকে সঁপিয়া দিয়া, আপনাকে সে অতি সহজেই হারাইয়া বসিয়া থাকে। মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবের অবস্থাও আজ এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল। দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া তিনি যে ক্রমশঃ পাথারের দিকেই তলাইয়া চলিয়াছেন, জানিতে পারিয়াও তাহা হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিবার শক্তি বা প্রবৃত্তিও তাঁহার হইল না ; স্রোতের মুখে ভাসিয়াই চলিলেন।

গতরাত্রিতে চিরসঙ্গিনী বিদ্যুতের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষিত বহুদিনের ঈপ্সিত উজ্জ্বলার কাছে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। মনের মধ্যে সে জন্য উৎপ্রেক্ষার অভাব ছিল না। মন-প্রাণ প্রতিক্ষণেই সাগ্রহে নদীপারের সেই বিজন বিলাসকুঞ্জে ক্ষণে-ক্ষণেই ছুটিয়া চলিতেছিল। কত দিন অবসরকালে যে ক্ষণদৃষ্ট নিরাড়ম্বর রূপরাশির ধ্যানে তন্ময় হইয়া কাটিয়াছে, সে আজ আয়ত্তাগত হইলেও আত্মগত হইল না, এ কি প্রাণে সহ্য হয়! অথচ, কি কুগ্রহেরই কাল পড়িয়াছে যে, কোনমতেই আর একটুখানি অবসর পাওয়া যাইতেছে না।

বিশ্রাম-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া মহীপাল নিমীলিত-নেত্রে সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যরাশির কথাই ভাবিতেছিলেন। চন্দ্রকলার পর এত রূপ আর দেখি নাই! পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পট্টমহিষী হইবার যোগ্য প্রতিমা! উজ্জ্বলা! বাস্তবিক নামযোগ্য রূপ বটে! সামান্য গৃহস্থ-বধূ ঘাটে জল লইতে আসে, গৃহকার্য্য করিয়া দিন কাটায়, তাহাতেই এই রূপ আমার হাতে পড়িলে না জানি কতগুণই বাড়িয়া যাইত! সে দিন পট্টবস্ত্রে অলঙ্কারে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল! কিন্তু চোখ ভ'রে একটু দেখতেও পাই নাই! হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে গেল কেন? হয় ত অত্যন্ত আনন্দে! ভিন্ন আর কি? ভীম-কৈবর্ত্তের স্ত্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপতির অঙ্কলক্ষ্মী হবে, এ কি কখনও সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি সেই তীব্র আনন্দ সহ্য করতে পারে নি, নিশ্চয় ঐ সে বারে আনন্দভট্টের পুত্রবধূ এই রকমই আমায় প্রথম দে মূর্চ্ছিতা হয়, তার পর—ওঃ, কিছুতেই আর তার হাত থে নিজেকে ছাড়াতে পারি না। এখনও মাসান্তে—দুই মা একবার তাকে দেখা না দিলে ছাড়ে না, এতই আ অনুরক্তা। তা' উজ্জ্বলাও সেই রকমই হবে। আমি এ ওদের মত অত শীঘ্র ত্যাগ করবো না। হয় ত, বরাবর মতই ওকে ভালবেসে ফেলেছি।—কি সংবাদ?

প্রতীহার জানাইল, ভূতপূর্ব্ব মহারাজাধিরাজের শরীররক্ষী সৈন্যদলের এক জন বিশেষ গুরু কার্য্যে মহারাজাধিরাজের দর্শনপ্রার্থী। নাম জানাইতে বলিলে, বলিল, নামের এ জন নাই, গুরু গোপনকার্য্য, এই কথাই জানাইবে।

"গুরু গোপনকার্য্য! আচ্ছা বেশ, তাকে এইখা নিয়ে এস," বলিয়াই রাজাধিরাজ নিজের আসনে বসিলেন।

ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল পুরাতন রাজ-ভৃত্যের পরিচ্ছদ ও তাহার আনুষঙ্গিক অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত বৃদ্ধ দিব্যোক। উহার দিকে চাহিয়াই রাজা তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

দিব্যোক আসিয়া সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধাভরে রাজাধিরাজকে প্রণাম করিয়া বিনীত নতমুখে দাঁড়াইল। সবিনয়ে কহিল, "বড় প্রয়োজনে এসেছি প্রভু! অধীনজনের এ ধৃষ্টতা করতে আজ্ঞা হোক। বড় প্রাণের জ্বালায় আমি দ্বারে ছুটে এসেছি। আর ত আমার এ জানাবার অপর কোন যায়গা নেই। তাই আপনা জানাতে এসেছি—।"

এ বৃদ্ধের প্রাণের জ্বালা ত মহীপালের অজ্ঞাত নহে, কাযেই ইহার প্রত্যেকটি বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজাধিরাজের চিত্ত অসহিষ্ণু-উদ্বেগে ভরিয়া উঠিতেছিল। তথাপি ইহার সহিত আত্মসংযত থাকিয়া সুব্যবহার করাই সমীচান বোধে তিনি নিজেকে শান্ত রাখিয়াই কহিলেন, "কি জানাতে চাও, বলো, আমিও যথাসাধ্য তোমায় সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকবো।"

"আপনার আমার পরে' যথেষ্ট মায়া-দয়া আছে, আমি জানতাম; সেই জন্য ছেলেদের ঘোর আপত্তিসত্ত্বেও আমি তাদের লুকিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে একটু মনোযোগী হোন, আমার সমস্ত কথাই একে একে আপনাকে শুন্‌তে হবে।"

ভাল করিয়া আসন গ্রহণপূর্ব্বক অন্তরের মধ্যে একান্ত অসহিষ্ণু রাজা কহিলেন, "বলো, আমি শুন্‌ছি।"

"মহারাজাধিরাজের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজের পিতামহদেব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ নরপালদেবের শেষ রাজত্বসময়ে চেদিরাজ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে এক সময় সমস্ত বরেন্দ্রভূমি টলমল করছিল। রাজকোষ শূন্য, রাজসৈন্যমধ্যে ভীষণ অসন্তোষ, সর্ব্বত্র ভয়ানক খাদ্যাভাব, দ্বারে শত্রু সমাগত, বরেন্দ্রীর সে এক ভীষণ দুর্দ্দিনের কাহিনী ভট্টারক-প্রধান হয় ত কবিগাথায় অথবা পণ্ডিতগণের মুখে শুনে থাকবেন?"

রাজাধিরাজ ঔদাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "শুনেছি বই কি। আমার পিতামহ সে বার আমার মাতামহের কাছে সর্ব্বত্রই প্রায় পরাভূত হয়েছিলেন।"

দিব্যোক প্রোৎসাহিত মুখে কহিতে লাগিল, "হ্যাঁ, সে কথা অস্বীকার করা চলে না, চেদির হাতে বাস্তবিকই আমাদের পরাভব ঘটে গেছলো। অতটা হয় ত হতো না, খাদ্যের অভাবটাই আমাদের এ রকম শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নগর-তোরণের বাহিরেই শত্রু এসে পৌঁছুতে আর বেশী দেরী নেই, ঠিক এম্‌নি সময়ে কতকগুলি নগরবাসী তাদের ধন-জন-প্রাণ সমস্তই রাজার হাতে সঁপে দিয়ে অর্দ্ধাহারে—অনাহারে সেই ভীষণ যুদ্ধ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে সে যাত্রা পাল-সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করেছিল, সে সংবাদ কি মহারাজাধিরাজের জানা আছে?"

মহারাজাধিরাজ শুষ্কভাবে কহিলেন, "আছে বই কি।"

দিব্যোক বলিতে লাগিল, "তার পর যা ঘটেছিল, সে সব আমার বক্তব্যের ভিতরের কথা নয়। সেই চেদিরাজের পুনরাক্রমণের ফলে এবার বরেন্দ্রীরই বিজয়লাভ, ফলে মহারাজাধিরাজের উৎপত্তি, সে সব কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। সে কথার পুনরুল্লেখ ক'রে মহারাজাধিরাজের অমূল্য সময়ের অপব্যয় করবো না। আমার বলবার এই যে, সাম্রাজ্যের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে সম্রাটের যে সকল ভক্ত প্রজা তাদের সর্ব্বস্ব প্রদান ক'রে তাঁর দক্ষিণ পাশে স্থান নিয়েছিল, নূতন বলে বলীয়ান্ হয়ে অসাধ্যসাধন ক'রে তুলেছিল, তাদের সঙ্গে এ সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ কি সেই—দুর্দ্দিনের অন্তে শেষ হয়ে গেছে অথবা তা' চিরদিনের মতই দৃঢ় হয়ে আছে?"

ধৈর্য্য রাখা কঠিন হইয়া উঠিতে থাকিলেও রাজা জোর করিয়া সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতেছিলেন; কহিলেন, "তা' কি যায়!"

দিব্যোক সাগ্রহকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মহারাজাধিরাজ এটাও জানেন যে, সেই দেশের জন্য—রাজার জন্য সর্ব্বত্যাগীদের মধ্যে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব পুণ্যোকও এক জন ছিলেন।"

রাজা ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া নড়িয়া বসিয়া কহিলেন, "জানি।"

"আমি কিছু দিন আপনার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজের দেহরক্ষীদের মধ্যে প্রধান হয়েছিলেম, কিন্তু শেষকালে একটা কঠিন রোগে প'ড়ে কায ছেড়ে দিয়ে যৎসামান্য জমী-জমা যা' আমার স্ত্রী তার বাপের ঘর হ'তে পেয়েছিল, তারই সামান্য উদ্‌বৃত্ত থেকে দীনভাবে দিন কাটিয়ে গেছি, তবু কোন দিনই পূর্ব্ব-উপকারের দাবী দিয়ে রাজাধিরাজদের বিরক্ত করিতে আসিনি। কায ক'রে তার দাম চাওয়া, এ বড় ছোট কায, কৈবর্ত্তদের এ স্বভাব নয় যে, তারা কৃতকার্য্যের পুরস্কারের জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াবে—"

রাজা এবার অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, বাধা দিয়া কহিলেন, "তোমারও হয় ত স্মরণ থাকতে পারে যে, সে পুরস্কার তোমাদের রাজা স্বেচ্ছায় সন্ধান ক'রে অযাচিতভাবেই তোমার দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে।"

দিব্যোক যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিল,—"সে কথা ভুলে যাবে দিব্যোক? রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! আপনি জানেন না, এই রাজবংশকে আমি কত বড় শ্রদ্ধা ক'রে

থাকি! আপনাকে আমি জন্মাতে দেখেছি, শুধু শ্রদ্ধা নয়, বৃদ্ধ আমি, কি গভীর স্নেহে আমার এ জীর্ণ বুক ভরা, সে ত দেখাবার নয়! রাজা আমার! আমি রাজাকে মানুষের চোখ দিয়ে দেখিনে ত, আমার কাছে আপনি স্বয়ং সর্ব্বদেবতার প্রতিমূর্ত্তি, লোকপাল! তাই আমি আমার এই এত বড় দুর্দ্দিনে আপনারই পায়ের তলায় ছুটে এসেছি। কারু কোন কথা কানে তুলিনি। আমি বিচার চাইতে এসেছি, রাজা! যেন যথার্থ ন্যায়বিচার পাই,—যেন অবিচারিত হয়ে এই মর্ম্মাহত শোকাকুল বুড়োকে মাথা হেঁট ক'রে ফিরে যেতে না হয়।"

মহীপাল মনে মনে দারুণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া স্বগত কহিলেন, "এইবার নিশ্চয়ই সেই কথা!" প্রকাশ্যে কহিলেন, —"কিসের বিচার চাও, বলো।"

"আমার ঘরের বউকে যে নরাধম চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, আমি তার সমুচিত শাস্তি চাইতে এসেছি। নির্ব্বিচারে তাই দেওয়া হোক।"

রাজা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন!

"রাজাধিরাজ! আমার পুত্রবধূ উজ্জ্বলা মা আমার, আমার গরীবের সংসার আলো ক'রে, কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলোর মতন আমার ঘর-দ্বার আলো ক'রে বসেছিলেন, ধনীর ঘরে কিসের অভাব! কিসের দুঃখে ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত পিশাচ এসে দরিদ্রের ধন চুরি ক'রে নিলে বলুন ত? আপনি সুবিচার করুন, সে যত বড় লোকই হোক, এর সমুচিত ফল পাওয়া চাই। বলুন পাবে?"

রাজা সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন। দিব্যোক উত্তেজিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "ভীম আমার উজ্জ্বলা-অন্ত প্রাণ, ছেলের সমস্ত সুখ তার সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মত চ'লে গেছে। আমি তাকে আমার প্রাণ দিয়ে জানি, সে-ও যে সে লোকের মত নয়। রামচন্দ্রের মতন সে এক জন মাত্রকেই নিজের করেছে। আমায় ফিরিয়ে দিন, রাজাধিরাজ! আমার ঘরের লক্ষ্মীকে চোরের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমায় ফিরিয়ে দিন, না হ'লে আমার ছেলে বাঁচবে না!"

বৃদ্ধ কৈবর্ত্ত-নায়কের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রাজাধিরাজ এ অবস্থায় থাকিয়া রীতিমতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, অথচ উপায়ও ত কিছু দেখা যায় না। এই রাজভক্ত বৃদ্ধকে চটাইয়া দিতেও ভরসা হয় না। রাজা যেন ফাঁপরে পড়িলেন, তাঁহাকে নির্ব্বাক্ উদাসীন দেখিয়া দিব্যোকের সহসা উচ্ছলিত শোকোচ্ছ্বাস আপনা হইতেই মন্দীভূত হইয়া আসিল। হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া নিজের এই দুর্ব্বলতায় ঈষৎ যেন লজ্জা পাইয়া এবার একটু সংযতভাবেই পুনশ্চ কথা কহিল, "আপনি হয় ত বিস্মিত হচ্ছেন, না, আমি সোজা ভাবেই সব কথা বলছি। যে দিন মেলার উৎসবে মল্লক্রীড়া দেখান হয়, সেই দিন দুপুরবেলা আমার বাড়ীর মেয়ে-পুরুষের অনুপস্থিতিতে মহাপ্রতীহারের পাল্কী ও দূতী গিয়ে আমার পুত্রবধূ উজ্জ্বলাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে। আমি এর প্রতীকার চাই।"

মহীপাল এবার স্পষ্টই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "মহাপ্রতীহারের লোকেই যে তোমার বউ চুরি করেছে, তার প্রমাণ?"

দিব্যোক কহিল, "তার সাক্ষী আছে, আদেশ করুন ডাকতে পারি।"

রাজা কহিলেন,—"কিন্তু দূতী ও পাল্কী পাঠিয়ে কেউ চুরি ক'রে না। তবে এ হতে পারে, পূর্ব্ব হ'তে তাদের মধ্যে সঙ্কেত ছিল, তাই দূতী ও পাল্কী পাঠিয়ে দিতেই উজ্জ্বলা স্বেচ্ছায় সেখানে চ'লে গেছে।" রাজার কণ্ঠ প্রত্যাঘাতের কুটিল অভিসন্ধিতে ভরা।

এ আঘাতে বৃদ্ধ ক্ষণকাল বাক্‌শক্তিহারা হইয়া রহিল, ক্ষণপরে আত্মসম্বিৎ লাভ করিয়া ঈষৎ অনুযোগ ঈষৎ বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে দিব্যোক উচ্চারণ করিল, "আমার মা চরিত্র সে রকম নয়। মা আমার সাক্ষাৎ সতী-রাণী!"

রাজা কুটিল কটাক্ষ আহত বৃদ্ধের বিষাদিত মুখের প্র নিক্ষেপ করিয়া শ্লেষ-প্রচ্ছাদিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তি তিনি সতী-রাণীই হবেন, তা হ'লে অনায়াসে পরপুরুষ পাঠানো পাল্কী চ'ড়ে দূতীর সঙ্গে চ'লে গেলেন কেমন ক'রে এ ত সাবিত্রীর লক্ষণ নয়! তাই বলি কি, একটা অসতী স্ত্রীর জন্য বৃথা শোকে আচ্ছন্ন থেকে পৌরুষ নষ্ট না ক'রে ভীমকে বরং একটা কায নিয়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাবার পরামর্শ দাও গে যাও, তার পরে একটি সুন্দরী দেখে মে এনে বিয়ে দিয়ে দাও, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপাত মগধে কৌশিকী-কচ্ছে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করতে হ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি মগধে দণ্ডোপাসিকের পদ প্র

ক'রে পাঠাতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, কৌশিকী-কচ্ছের মহাপ্রতীহারের পদ দেওয়াতেও আমার আপত্তি নেই।"

দিব্যোক এই অপ্রত্যাশিত রাজানুগ্রহে বিস্ময়-শ্রদ্ধায় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন না হ'লে রাজা! ভীমের সে দিনের বীর্য্যবত্তায় প্রীত হইয়াই তাহার জন্য এতখানি করিতে চাহিতেছেন। আহা, তাই যদি ঘটিত! কিন্তু এ প্রস্তাবে ভীম যে কিছুতেই সম্মত হইবে না, তাহা জানিয়াই বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িয়া প্রকাশ্যে কহিল, "আপনার দয়ার সীমা নেই, রাজাধিরাজ! এ বৃদ্ধ সেবকের পরে' এই রকমই কৃপা যেন চিরদিন ধ'রে বর্ষিত হয়। কিন্তু ক্ষমা করবেন, ভীম আপাততঃ আমি বল্লেও যে প্রস্তাবে মত করবে, এমন আশা হয় না। আপনি যদি দয়া করতে চান, এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করুন।"

মহীপাল বৃদ্ধের এই পুনঃ পুনঃ জিদ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, উঠিয়া বসিয়া সবেগে কহিলেন, "গৃহত্যাগিনী কুলবধূকে তোমার কুলে কি তুমি ফিরিয়ে নেবে, বলতে পারো? এত যদি তার পরে মায়া ত তাকে পথে-ঘাটে কলসী নিয়ে জল আনতে পাঠাতে কেন? দুঃখে, কষ্টে, লাঞ্ছনায় ডুবিয়ে রেখেছিলে কেন?"

ব্যথিত হইয়া দিব্যোক কহিল, "রাজাধিরাজ! কেন বারে-বারেই ঐ কথাটা উল্লেখ ক'রে ব্যথা দিচ্ছেন! সে কুলত্যাগিনী নয়, সতী-লক্ষ্মী। আমি কোনমতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারবো না। যদি তাকে পাই, তাকে নিয়ে একঘরে হয়ে থাকবো। আর কষ্ট দেওয়া, তা' সে সব ঘরেই আছে। কেউ স্বামীর কাছে, কেউ শাশুড়ীর কাছে লাঞ্ছনা পায়, সয়েও নেয় তা', তার জন্যে ঘর ছাড়ে না।"

রাজার মাথা এই কথাটায় আপনা হইতেই হেঁট হইয়া আসিল। দিব্যোক কিছু ভাবিয়াই নির্দ্দোষভাবে বলিলেও ইহার মধ্যে তাঁহার নিজের ঘরের গ্লানি উদ্ঘাটিত হইয়া তাঁহার মনকে সমধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। এবার আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই তিনি সরোষে কহিয়া উঠিলেন, "বিনা প্রমাণে অনর্থক আমি এইটুকুর জন্য আমার সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ এক জন সম্ভ্রান্ত রাজভক্ত লোককে অপমানিত করতে পারি না। আমার প্রস্তাব যখন তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন আমি নিরুপায়। অতএব এ সম্বন্ধে আমার কর্‌বার কিছুই নেই।"

"রাজাধিরাজ! এই কি পাল-সম্রাটের ন্যায়বিচার? যার উপর এত বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত?"

"দিব্যোক! তোমার মত এক জনের উপর যথেষ্ট সময় খরচ করা হয়ে গেছে, এর চেয়ে বেশী নষ্ট কর্‌বার মত অবসর রাজার থাকে না।"

এই কথাতেই বিদায় লওয়ার পূর্ণ আদেশ প্রদত্ত হইলেও দিব্যোক উঠিল না। সে যথাপূর্ব্ব চাপিয়া বসিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "যতক্ষণ না আমায় সন্তুষ্ট ক'রে বিদায় দিতে পারবেন, ততক্ষণ আমি বিদায় হবো না। আমার পুত্রবধূ ভাল হোক, মন্দ হোক, আমায় তাকে ফিরিয়ে দিবার আদেশ হোক, গৃহস্থের পবিত্র কুল ভঙ্গ ক'রে যে নরাধম নরপশু গৃহবধূর পরে' হস্তক্ষেপ করতে ভরসা করে, তার সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা হোক, তার পর আমি ফিরে যাব, এ ভিন্ন আমায় আপনি এক-পাও নড়াতে পারবেন না।"

রাজাধিরাজ উঠিয়া বসিলেন, "দিব্যোক! কার সঙ্গে কথা কইছো, স্মরণ আছে কি?"

"আছে রাজাধিরাজ! অতি দুঃখের আঘাত পেয়ে আমি আমার রাজার কাছে ছুটে এসেছিলুম, তাঁর অবিচারে আমার এই ভাঙ্গা বুক ফেটে গেছে, এ কি এক মুহূর্ত্তেও ভোলা যায়?"

রাজা নীরব রহিলেন।

"এখনও ইতস্ততঃ করছেন, রাজাধিরাজ! দুষ্টের দণ্ড-প্রদানে এ কুণ্ঠা কেন?"

কঠিন কণ্ঠে রাজা কহিলেন, "ইতস্ততঃ কিসের? আমি বলেই দিয়েছি যে, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই করতে প্রস্তুত নই এবং তা' করবোও না। তবে ভীম যদি কৌশিকী-কচ্ছের মহাপ্রতীহারত্ব নিতে প্রস্তুত থাকে, তা' দিতে আমিও প্রস্তুত আছি। তোমার অন্য পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রদের রাজসৈনিকের মধ্যে স্থান দিতে, যদি ইচ্ছুক থাকো, তা-ও পাবে। তোমায় আরও একটা বিষয়ের মধ্য হ'তে কিছু সম্পত্তি প্রদান করতে আমার অনিচ্ছা নেই। একটা তুচ্ছ নারীর বিনিময়ে এতগুলা সুযোগ কি কোন বুদ্ধিমান লোক ত্যাগ করতে পারে? অবশ্য আমার কোন অনুরোধ নেই, এই বিষয়ে তুমি স্বাধীন।"

দিব্যোক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সেই লোলচর্ম্মাবৃত অর্দ্ধাবনত বার্দ্ধক্যকম্পিত দেহ সহসা যেন

নবযৌবনের আকস্মিক দীপ্ততেজে সতেজ হইয়া উঠিল। কোটরাবস্থিত নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয় ভিতর হইতে একটা অনৈসর্গিক দীপ্তিলাভে সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, স্থিরগম্ভীর অথচ দৃপ্তকণ্ঠে বরেন্দ্রীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন রাজভক্ত সেবক আজ তাহার রাজার মুখের উপরেই বলিল,—

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! বুঝেছি! লোকে যে কথা নিয়ে আন্দোলন করছে, তা হ'লে সেটা মিথ্যে নয়! মহাপ্রতীহার আপনার আজ্ঞাবাহক মাত্র। এই ঘৃণিত, নারকীয় অভিনয়ের অভিনেতা মহারাজ্যেশ্বর স্বয়ং! তাই এই কার্য্যের কদর্য্য অভিসন্ধি মনের মধ্যে ভ'রে রেখে, আমার দীর্ঘ দীর্ঘ কালের দান-করা সম্পত্তি অযাচিত কৃপার ভাণ দেখিয়ে আমায় ফিরে দিয়েছিলেন! মল্লক্রীড়ায় উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা ক'রে আমার বীরপুত্রকে ঘরছাড়া ক'রে, সেই অবসরে অতি ক্ষুদ্রাশয় চোরের মতন আমার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরছাড়া ক'রে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তার অবমানিত স্বামীকে উচ্চপদ প্রদান করে নিজের অত বড় অকার্য্যের দাম দিতে চাইছেন! রাজাধিরাজ! ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্ম নিয়ে, আজন্ম তারই মধ্যে ডুবে রয়েছেন, ভোগবিলাসকেই জীবনের সার্থকতা বোধ করেছেন, তাই সেই চোখে সমস্ত সংসারকেই দেখেন; কিন্তু জেনে রাখবেন, এমন অনেক লোক আছে, তাদের কাছে, এ সকলের দান একটা কপর্দ্দকের চাইতেও বেশী নয়, তার প্রমাণ এক দিন আপনার পিতৃপিতামহ পেয়েছিলেন, আবার আপনিও পাবেন। এই ফিরে নিন—আমি এই পরিণাম আশঙ্কা ক'রে সঙ্গেই এনেছি—আপনার দেওয়া তাম্রশাসন, ঘরের বৌ-বেচা ধনের একটা কাণাকড়িও আমি ছুঁই না, তা হোক, সে আমারই পৈতৃক ধন। আর এই আমার গায়ের রাজভৃত্যের পোষাক, এই রাজার দেওয়া তরোয়াল, আজীবন বড় যত্নে এদের রক্ষা ক'রে এসেছি, এ-ও আজ আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি! আমার কাছে আজ থেকে এর কোনই দাম নেই। শুধু ছেঁড়া জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড!"—এই বলিয়া দিব্যোক দৃঢ়হস্তে নিজের অঙ্গ হইতে অঙ্গাবরণ মোচন পূর্ব্বক উহা দুই হস্তে দলিত করিয়া রাজার পায়ের তলায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অসিকোষ হইতে মুক্ত কৃপাণ টানিয়া লইয়া তাহা নিজের পায়ের চাপে দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া রাজার পায়ের তলায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর এই আকস্মিক কাণ্ডের অভিঘাতে বিস্ময়স্তম্ভিত রাজার কোনমতে নিঃসারিত "চ'লে যাও" আদেশের প্রতিবাদে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিয়া ঘনকম্পিত শ্বাসে, রোষাশ্রুবাষ্পাকুল গাঢ় স্বরে বৃদ্ধ নায়ক তাঁহাকে সম্বোধন করিল, "যাবো, শুধু এইটুকু ব'লে যাবো—কিন্তু এ-ও জেনে রাখবেন মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব! আজ থেকে চিরদিনের জন্যে আপনার সিংহাসন তার অনেকগুলি বিশ্বস্ত ভৃত্য থেকে বঞ্চিত হলো। হয় ত এক দিন এ ক্ষতিকে খুব সামান্য ব'লে মনে করতে পারবেন না, হয় ত এক দিন এর জন্যে অনুতাপও করতে হবে।—আজ থেকে তুমি আমার, আমি তোমার মহা শত্রু!"

ক্রোধাতিশয্যে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই রাজা দেখিলেন, সেই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ এক জন তরুণ পুরুষের মতই বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রহরীকে ডাকিয়া উহাকে বন্দী করার কথা একবার মনে হইল; আবার ভাবিলেন, কোথাকার কয়েকটা ক্ষুদ্র নাগরিক, এত বড় প্রবলপ্রতাপ একটা রাজার বিরুদ্ধে ওদের কি করিবার আছে? যাক্, একটা আপদের শান্তি হইল। এখন, উজ্জ্বলা! তোমায় একবার আমার করিতে পারিলেই সকল চেষ্টা সার্থক হয়! আর কেনই বা তা হবে না? আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য,—আর কি আছে ভীমের?

দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব-দেবতার অনন্ত আরতির বাদ্য তাঁহার অসীম পূজার দেউলে অনাদি কাল ধরিয়াই বাদিত হইতেছে। কোন দিন কোন কারণেই ইহার অখণ্ড ধ্বনি নিমেষের জন্যও বাধিত হয় না। কিন্তু মানুষের না কি অবসরও কম এবং আগ্রহও বেশী নয়,তাই সে অহোরাত্র নন্দিত বিশ্ববরেণ্যের সেই বন্দনা-গীতি শুনিয়া তাহারই সাথে কণ্ঠ মিলাইতে সকল সময় পারিয়া উঠে না। কদাচিৎ একটা শুভলগ্নে এ ধ্বনি তাহার হৃদয়কে হয় ত স্পর্শ করে।

সে দিন ফাল্গুনের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথি। এই চতুর্দ্দশী শিব-চতুর্দ্দশী নামে চিরপ্রসিদ্ধ। প্রভাতকৃত্যাদি ও সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে পট্টমহাদেবী করতোয়াস্নানান্তে তাঁহার

ইষ্টদেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ পূজার সর্ব্বপ্রকার উপহার-সম্ভার বহন করিয়া লাটদেশজ ব্রাহ্মণত্রয় তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া যথাযথ পূজোপকরণ সজ্জিত করিয়া দিয়া গেল। আকন্দ, ধুতুরা, কুন্দপুষ্পের স্তূপ, সরক্তরাগযুক্ত নবজাত বিল্বদল, পক্ক বিল্ব, স্বর্ণপাত্রে সুপ্রচুর ফল-মিষ্টান্নাদি-সংযুক্ত ধবলাগিরিনিন্দিত উচ্চচূড় নৈবেদ্য-শ্রেণী, সুবৃহৎ কাংস্যপাত্রে অসংখ্য ভোজ্যাদি সকলই সুসজ্জিত হইল। ইহার উপর সুবর্ণ-দক্ষিণারও অপ্রতুলতা ছিল না। দেউলগৃহ ধূপ-ধূনা-চন্দনচূর্ণ-ধূমে ও পুষ্প-সুরভিতে দেবতার গৃহেরই উপযোগী হইয়া উঠিল। দেবসেবক ব্রাহ্মণগণ মন্দিরদ্বারে উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক দ্বারের উপর পুষ্পস্তবক ও আম্রপত্র দ্বারা গ্রথিত মাল্য দোলাইয়া দিল।

পট্টমহাদেবী কল-ধৌত পট্টাম্বরে তাঁহার উন্নত দেহ আবৃত করিয়া, বসনাঞ্চল কণ্ঠে বেষ্টিত করিয়া ভক্তিভরে দেব-প্রণাম করিলেন। তাহার পর পূজার আসনে বসিয়া যেমন সুবর্ণময় কোশা হইতে পবিত্র গঙ্গোদক লইয়া আচমন-মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন, অমনই তাঁহার মনে হইল, মন্দিরের বাহিরে কে যেন তাঁহার নাম লইল।

"পট্টমহাদেবী কোথায়?"

কাহার কণ্ঠ এ? মহাদেবীর শান্ত হৃদয়-শোণিতে একটি মুহূর্ত্তেরই একটা রুদ্ধ আবেগ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াই পুনঃ শান্ত হইয়া গেল। এই কণ্ঠ তাঁহার স্বামীরই বটে! আজ কত দিনের পরে এই আহ্বান! রাজাধিরাজ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"এখনও যে .ভূত-পূজোটুজোগুলো চালাচ্ছো দেখছি!—"

মহাদেবী আচমনার্থ গৃহীত গঙ্গোদক হস্তচ্যুত করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, মনের মধ্যে তাঁহার ঈষৎ একটা উদ্বেগের আশঙ্কা মৃদু ছায়াপাত করিল।

রাজাধিরাজ দ্বারের নিকটে আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, "আমি কি ভিতরে যেতে পারি? আপত্তি আছে কিছু?"

মহাদেবী তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দৃঢ়পদে দ্বার-সমীপস্থ হইলেন; শান্ত অথচ স্থিরস্বরে কহিলেন—"কোন কথা আছে কি?"

রাজাধিরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। মন্দিরমধ্যে যে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ, তাহা তাঁহার জানা ছিল। পরে কহিলেন—"হ্যাঁ, আছে একটু। কিন্তু এইখানেই কি আমায় এই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সব কথা বলতে হবে? তোমার মহল্লিকারা দেখলে কি ভাববে এবং তাতে কিছু সময়ও লাগতে পারে।"

পট্টমহাদেবীর শান্ত ও দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অতি ক্ষীণ একটুখানি মৃদু হাস্য-রেখা অতিশয় সন্তর্পণে ফুটিয়াই মুহূর্ত্তে আবার মিলাইয়া গেল। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু-গম্ভীর অথচ কোমল কণ্ঠেই কহিলেন—"তা হ'লে আসুন, আমরা প্রাসাদে যাই। এখানে বস্‌বার ত সে রকম কোন ব্যবস্থা করা নেই।"

"তাই এস।"—বলিয়া রাজাধিরাজ প্রথমেই অগ্রসর হইলেন। মহাদেবী তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে ফিরিয়া করপুটে মন্দির-দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁহার নীরব প্রণাম-নিবেদনটুকু সকরুণভাবে জানাইলেন। তাঁহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া স্বতঃই একটি দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া আসিল। তাহার পর মন্দির-দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার চিরাভ্যস্ত সংযত শান্ত চরণে স্বামীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

পট্টমহাদেবীর বিশ্রাম-কক্ষ—যে কক্ষে তাঁর দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম অবসরে মহাকুমার রামপালদেব তাঁহাকে ছল করিয়া মহোদয়ে যুদ্ধযাত্রার কথা বলিয়া বিনিময়ে সন্ধ্যার ঈপ্সিত সঙ্গলাভে চরিতার্থ হইয়াছিলেন,—এ সেই কক্ষ! ভিত্তিগাত্রে সেই রামায়ণের সুচিত্রিত বিখ্যাত চিত্রাবলী, চিক্কণ রক্তপ্রস্তরের হর্ম্ম্যতলে আজও সেই রাঙ্গা মাদুর বিছানো, মধ্যস্থলে পট্টমহিষীর মর্য্যাদার উপযোগী সুকোমল শয্যা আস্তৃত, আর কোনখানে বড় কিছুই নাই। রাজাধিরাজ বিস্মিত কৌতূহলে একবার শূন্যগৃহের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। বহুকাল এ কক্ষের মধ্যে তিনি পদার্পণও করেন নাই। মনে পড়িল, তাঁহার মাতার জীবিতকালে এই কক্ষ কত প্রকার ভোগ্য-ঐশ্বর্য্যের সমাবেশে সুসজ্জিত ছিল। মানসিক অবস্থা যদিও আজ তাঁহার একবারেই ভাল থাকিবার কথাও নহে এবং ভাল ছিলও না, তথাপি আজ বহু—বহু দিন পরে জীবনের এক জটিলতাময় সঙ্কটের ক্ষণেই তাঁহার নিজেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সহসা কেমন করিয়াই তাঁহার চির-বিমুখ চিত্ত তাঁহার এই চির-অনাদৃতা জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া বসিল!

অতিশয় বিস্ময়ের সহিত সহসা তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন ইহাকে ঠিক ভাল করিয়া কোন দিনই দেখেন নাই। এই চির-পুরাতন, যেন আজ তাঁহার কাছে একান্তই নূতন বলিয়া মনে হইল। তাই চারিদিকের সমুদয় বিপত্তির দুশ্চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাঁহার কৌতূহলী চিত্ত সহসা কোমলভাবে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"এ ঘরের সে সব জিনিষ-পত্রগুলো কোথায় গেল, লজ্জা ?"

এই 'লজ্জা' সম্বোধন, এ যে কত যুগ-যুগান্তরের পর, এর কি কিছু হিসাব আছে ? আর এই স্নেহ-বিদ্বেষহীন কোমল কণ্ঠ ? মহাদেবী ইহাতে এতই বিস্মিতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মত সংযত-স্বভাবা নারীর পক্ষেও প্রশ্নোত্তর দিতে কিছু অধিক বিলম্ব ঘটিল, এবং স্বামীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি ঈষৎ বিস্ময়ভরে একবার তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া তাহার পর কথা কহিলেন, "অন্য ঘরে আছে রাজাধিরাজ !"

মহারাজাধিরাজ লজ্জাদেবীর সেই চকিত দৃষ্টিটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন, নিজের এই আকস্মিক দুর্ব্বলতায় তাঁহার মনে মনে ঈষৎ লজ্জার উদয় হইল। মুহূর্ত্তে গাম্ভীর্য্যা-বলম্বন করিয়া ফেলিয়া তিনি সংযতভাবেই এবার কথা কহিলেন, "তোমার কাছে কেন এসেছি, তুমি হয় ত তার কিছু কিছু বুঝতে পেরেও থাকবে। শুনেছ বোধ হয় যে, অর্থাভাবে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, আজই—এখনই যথেষ্ট অর্থ না পেলে অধিকাংশ রাজসৈন্য আমাদের বিপক্ষপক্ষে যোগদান করবে, এ-রকমও সম্ভাবনা জানা গিয়েছে।"

রাজাধিরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটুখানি নীরব হইলেন। হয় ত তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মহাদেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা নিজেই পূর্ণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়টা মুখ ফুটিয়া বলিবার হীনতা হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু একটুক্ষণ প্রতীক্ষিতভাবে থাকিয়া দেখিলেন যে, তাহা হইল না। মহাদেবী যথাপূর্ব্ব সেইরূপ শান্ত-ঔদাস্যের সহিত যেমন এক দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই রকমই রহিলেন, রাজ্যের এত বড় বিপত্তির আশঙ্কাতেও তাঁহার কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। যেন এ সকল সম্বাদ তাঁহার কাছে একবারেই নূতন নহে। মহাদেবীর এই নির্লিপ্তভাবে মনটা তাঁহার ঈষদুত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবার তাই একটু জোরের সহিতই বলিয়া ফেলিলেন, "শুধু এই নয়, কতক-গুলা নিষ্কর্ম্মা গোঁয়ার জুটিয়ে কৈবর্ত্তরা একটা বিদ্রোহ উপ-স্থিত করেছে, সেই জন্যই আরও সৈন্যদের সন্তুষ্ট রাখা দর-কার। অথচ আমাদের রাজকোষ শূন্য, তাই তোমার অলঙ্কারগুলা এ সময়টায় না পেলে কোনমতেই আর সুবিধা করা যাবে না। তোমার ও রামপালের স্ত্রীর সমুদয় অল-ঙ্কার এখনই দিলে তবে যদি কোনমতে কোন সুবিধা হয়, চেষ্টা ক'রে দেখি।"

রাজাধিরাজ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কথা শেষ করা হইল না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার শ্রোত্রী তাঁহাকে সে অবসরটুকু না দিয়াই উঠিয়া যাইতেছে। পাশের একটা ছোট কুঠারীর দ্বার খুলিয়া মহাদেবী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাজাধিরাজ মনে করিলেন, হয় ত তিনি তাঁহার অলঙ্কার না দিবার ইচ্ছাতেই পলাইতেছেন। এই ভয় করিতেই দুশ্চিন্তা ও ক্রোধ তাঁহাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল। তিনিও দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিয়া এক-বারেই সেই ছোট ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, কিন্তু দ্বার প্রবেশ করিতেই যে দৃশ্যটি তাঁহার চোখে পড়িল, তাহা একবারেই তাঁহার অপ্রত্যাশিত !

তিনি দেখিলেন, এই ঘরটিকে পট্টদেবীর ভাণ্ডার বলা যায়। ইহার ইতস্ততঃ কাঠের এবং লোহার বড় বড় সিন্দুকসকল শ্রেণীবদ্ধভাবেই সাজান রহিয়াছে। মহাদেবী ঘরে ঢুকিয়াই ইহারই একটির কাছে দাঁড়াইয়াছেন, খুব সম্ভব যে, উহারই মধ্যে তাঁহার অলঙ্কার-পেটিকা রক্ষিত। রাজাধিরাজ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন।

সহসা গৃহ-প্রান্তবর্ত্তী আর একটি দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই অন্যের অপ্রবেশ্য ক্ষুদ্র গৃহপ্রান্তের এক নিভৃত কোণে একখানি অতি সুদৃশ্য স্বর্ণখচিত চন্দনকাষ্ঠের চৌকির উপরে কুন্দপুষ্পের মাল্য-বিজড়িত চন্দনকাষ্ঠের কাহার দুইটি পুরাতন কাষ্ঠ-পাদুকা স্থাপিত রহিয়া, ইহার সঙ্গোপন নিত্যপূজার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ! ফুল চন্দন বাসি হইয়া গেলেও তাহাদের স্বভাবজ সুরভি করা হইতে এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। ইহার সহিত গৃহের রুদ্ধ বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত ধূপ-ধূনা-গুগ্‌গু সুগন্ধও সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হইতেছিল। মহারাজাধি-

সাগ্রহ কৌতূহলে সেই দিকে নেত্রপাত করিয়াই সবিস্ময়ে চিনিতে পারিলেন, এই সযত্নে সশ্রদ্ধায় সংপূজিত উপানহ দুইখানি তাঁহারই পূর্ব্ব-ব্যবহৃত ও বহু দিনের পরিত্যক্ত !

একটা অননুভূত বিষম লজ্জা ও অনুতাপের প্রচণ্ড তরঙ্গ সবেগে তাঁহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। এ কি দেখিলেন ? যাহাকে জীবনের অরুণ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই জীবন-মধ্যাহ্নে কোন দিনই কথন এক বিন্দু স্নেহ দিয়া—প্রেম দিয়া, এমন কি, এতটুকু শ্রদ্ধা দিয়াও অভিনন্দিত করা হয় নাই, যাহার সমস্ত জীবনের সর্ব্বস্ব উপহার অনায়াসে গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে একটা কপর্দ্দক ফেলিয়া দিবারও অবসর ঘটে নাই, যাহাকে চিরদিন তাহার ন্যায়নিষ্ঠা কর্ত্তব্যের প্রচুরতায় স্নেহহীন, নির্লিপ্ত বিচারকমাত্রই মনে করিয়া সযত্নে যাহার সান্নিধ্য হইতে নিজেকে অতি সুদূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন এবং যাহার দাম্পত্যের সমস্ত দাবীকেই নির্দ্দয় ও নির্হৃদয়ভাবেই হঠাইয়া দিয়া পাপ-পঙ্কিল অপবিত্রতার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলাকে নিশ্চিন্তে কাটাইয়া দিলেন, কোন দিন চোখের কোণেও যাহার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না, সেই চির-অনাদৃতা রাজাধিরাজ-পত্নী—চির-অবমানিতা রাজরাজেশ্বর-দুহিতা তাঁহার সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুর স্বামীর চরণ-পূজার অবসর না পাইয়া, তাঁহার, তাঁহারই মত পরিত্যক্ত একটি পাদু-কার এই সভক্তি-সহিষ্ণু নিত্যপূজা এমন নীরবে এমন গোপনে কিসের শ্রদ্ধায় সম্পন্ন করিতেছেন ? পূজিত বস্তুর অবস্থান-ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, এ পূজার সাক্ষী হয় ত আজ সর্ব্বপ্রথম তিনিই—একমাত্র তিনি—যাহার উদ্দেশ্যে এই পূজার নিবেদন—তিনিই হইলেন। মহারাজাধিরাজের সমস্ত বক্ষ মথিত আলোড়িত করিয়া তুলিয়া একটা বিস্ময়ার্ত্ত অস্ফুট ধ্বনি তাঁহার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ঠেলিয়া আসিল, "মহা-দেবি ! লজ্জা ! লজ্জা !—"

তিনি এক প্রকার ছুটিয়াই মহাদেবীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন, কিন্তু মধ্যপথেই তাঁহার সে প্রবল উচ্ছ্বাস সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল।

এই যে অতি গোপনীয় দৃশ্য আজ রাজাধিরাজের চোখে ধরা পড়িল, এর যে কত বড় প্রচণ্ড লজ্জা, তাহা যাহার এ লজ্জা, সে-ই শুধু জানে ! তাঁহার এই যে পূজা অতি গোপনে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত, ইহা তিনি সকলেরই কাছে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন কি, সন্ধ্যাদেবীও তাঁহার এ পূজার পূজ্য কে, তাহা জানিতেন না। বাহিরের কোন লোকের কাছে নিজের শূন্যময় অন্তরের এতটুকু দৈন্য প্রকাশ, এ তাঁহার স্বভাবের একবারেই বহির্ভূত। তাঁহার বিদলিত বিপর্য্যস্ত জীবনের চির-হাহাকার তাই তিনি অতি-শয় সাবধানেই সর্ব্বত্র হইতেই গোপনে রাখিয়া শান্ত সংযত সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতার সহিত অটল মূর্ত্তিতে চলিয়া যাইতেন। ভিতরটায় যে তাঁহার কি অভাবের মহা-শূন্যতা বিশাল শুষ্ক মহামরুর মতই ধূ ধূ করিতেছে, তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণ, কার্য্যরত, স্নেহ-প্রবণ বাহ্যমূর্ত্তি হইতে কে-ই বা তাহা অনুমান করিবে ! স্বামি-প্রেমের জন্য তাঁহার চিত্তে যে বিন্দুমাত্র লোভ বা মোহের স্থান আছে, সে কথা হয় ত কোন দিনই কেহ সন্দেহ করিবার অবসর পায় নাই। তিনি কাহাকেও, এমন কি, তাঁহার স্বামীকেও সে সুযোগ পাইতে দেন নাই। আর আজই তাঁহার অতি নিভৃত জীব-নের সকল গোপন-রহস্যই এ কাহার নিকটে প্রকাশ হইয়া পড়িল ? না হয় ত সে তাঁহার এই দুর্ব্বলতাকে কঠোর নির্ম্মম উপহাসের সহিত—তাচ্ছীল্যের সহিত আর হয় ত বড় জোর এতটুকু একটু কৃপার সহিতই চাহিয়া দেখিবে !

হায়, এত দিনের সযত্নরুদ্ধ হৃদয়-গুহানিহিত সকল গোপনতারই কি এই এত বড় অকরুণ পরিণাম ঘটিয়া গেল ! ছি ছি ছি ! এ কি ঘৃণা ! এ কি লজ্জা !

কোনমতে এই সুগভীর লজ্জাজ্বালাকে দমনে রাখিয়া মহাদেবী ঈষৎ কম্পিত হস্তে সিন্দুকের ডালা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি সুবৃহৎ সুবর্ণ-পেটিকা বাহির করিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে তখন উত্তাল শোণিত-স্রোত এতই উদ্দামভাবে নৃত্য করিতেছিল যে, তাহারই গতিবেগে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম করিতেছিল। তাঁহার ভয় হইল যে, বুকের শব্দ বাহিরেও হয় ত বা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। হয় ত উনিও তাহা শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আরও কত কি ভাবিতেছেন, তাই বা কে জানে ? তাঁহার এই চঞ্চিষ্ণুতাকে অলঙ্কারদানের অনিচ্ছাও ত মনে করিয়া লওয়া অসম্ভব নয় ! সত্য সত্যই ত তিনি তাঁহাকে ভাল করিয়া জানেনও না।

"মহাদেবি !—লজ্জা ! লজ্জা !"—ব্যাকুল উন্মাদনাময় স্বরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এই নামোচ্চারণ করিয়াই রাজাধিরাজ মহাদেবীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

ততক্ষণে রত্ন-মঞ্জুষা উন্মোচন করিয়া ধরিয়া প্রাণপণে আত্মসংযত হইবার চেষ্টার সহিত ধীরকণ্ঠে মহাদেবী কহিতেছিলেন :—"এই নিন, রাজাধিরাজ! এরই মধ্যে আমার সমস্ত অলঙ্কার আছে।"

তাঁহাদের দুইজনকার মাঝখানে এই বহুমূল্য মণিরত্ন-সুবর্ণাধার স্বর্ণ-পেটিকা দুর্লঙ্ঘ্য বাধাস্বরূপেই যেন মহাদেবীর হস্তে সেইক্ষণে উঠিয়া আসিল। বাধাহত হইয়া ঈষৎ সলজ্জভাবে মহারাজাধিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, তাহার পর আবরণমুক্ত রত্নসম্ভারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উৎফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিলেন,—"এদের মূল্য নিতান্ত অল্প হবে না। এই প্রকাণ্ড মরকত-মাল্য, এ ত এর পূর্ব্বে দেখিনি, এ কবে কিনেছ? ঐ সুগোল মুক্তার সাতনলী, এ-ও অতি সুন্দর! ঐ মুকুট কি আমার মায়ের ছিল না?"

মহাদেবীর মনের ভিতরকার প্রবল আলোড়ন তখনও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় নাই। ইহারই উত্তেজনায় তাঁহার শুভ্র মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই রহিয়াছিল। রাজার প্রশ্নে তাহা আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু কথা তিনি তাঁহার চির-সংযত স্বরেই কহিলেন—"এগুলি কল্যাণের। ঠাকুরাণীর অলঙ্কার আপনার অনুজ্ঞামতই বহুপূর্ব্বাবধি রাজ-কোষাগারে রক্ষিত ছিল এবং—"

পট্টমহাদেবী "এবং" বলিয়াই তাঁহার বক্তব্যটাকে অসমাপ্তই রাখিয়া দিলেন। "এবং তাহা হয় ত এত দিনে আপনি নিজেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন"—এ কথাটা আর তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। যেহেতু, সেটা বলাও একটু কঠিন এবং বলিলেও ত কোন লাভ নাই। বৃথা বাক্যব্যয় তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ।

ঐ "এবং"এর পরের কথাগুলা রাজাধিরাজেরও স্মরণ হইয়া গেল। তাঁহার জননী মহাদেবীর ও পট্টমহাদেবীর সমুদয় মহামূল্য এবং প্রায় অমূল্য অলঙ্কাররাশি মহীপালদেব লজ্জাদেবীর হাতে না রাখিয়া নিজের কাছেই রাখিয়াছিলেন এবং বাস্তবিকই তাহার সমুদয় সারাংশই তাঁহারই খেয়ালের খেলায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব যে কৌস্তভতুল্য মহামণি তাঁহার শিরোভূষণ-স্বরূপে ব্যবহার করিতেন, এমন কি, সেই জগৎবন্দিত অমূল্য রত্নও তিনি গণিকার কণ্ঠভূষার্থ স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছেন। নর্ত্তকী বিদ্যুৎমালা ঐ মণি ব্যতীত পালবংশীয় পট্টমহাদেবীগণের উত্তরাধিকারিত্বে অবশ্যপ্রাপ্য গজমতিহারও তাহার অযোগ্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া অহঙ্কৃতা হইয়াছে। আর সব কথাই রাজাধিরাজের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিমনা ও ম্লান করিয়া দিল। এত বড় দুঃসময়ে সেই সম্ভার গৃহে থাকিলে কতই না উপকার পাওয়া যাইত! তার পর তাঁহার চকিতের মত স্মরণে আসিল, আর এক জনকে যে তাহার সমস্তই তাঁহারই অধিকারে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার দেওয়া দণ্ড লইয়া চিরাপসৃত হইয়াছে।

ক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া তিনি মহাদেবীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতেই কি তোমার রামপালের স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার আছে? এ ত খুব বেশী নয়! এতে কি হবে?"

পট্টমহাদেবী অলঙ্কার-পেটিকা বন্ধ করিয়া রাজাধিরাজের পায়ের কাছে উহা নামাইয়া রাখিয়া উত্তর করিলেন,—"এই আমার সমস্ত সঞ্চয়, এ ছাড়া আর এই আছে"—এ বলিতে বলিতে নিজের উভয় হস্তে দুইখানি শঙ্খবলয় বাকি রাখিয়া দিয়া সুবর্ণ-কঙ্কণ, বাজুবন্ধ, গলার মোতির মালা, কটির মেখলা সমস্তই একে একে খুলিয়া সেই পেটিকার মধ্যে স্থাপন করিলেন। বাম হস্তের অনামিকা হইতে পদ্মরত্নসমন্বিত অঙ্গুরীটি পর্য্যন্ত খুলিয়া লইতে বাকি রাখিলেন না। তাহার পর রাজার পায়ের গোড়ায় একটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আমার যা কিছু ছিল, সবই দিয়েছি, তবে সন্ধ্যার অলঙ্কার আমি আপনাকে দিতে পারবো না, সেগুলি আপনার নেওয়াও সঙ্গত হবে না, তাই দিই নি। সেগুলি আপনি দিতে বল্‌বেন না।"

রাজাধিরাজ লজ্জাদেবীর ব্যবহারে প্রীত, বিস্মিত, আর তাঁহার এই কথায় কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তথাপি রকম অবস্থায় যথাসাধ্য বিরক্ত ভাবটাকে দমনে রাখিয়া উত্তর করিলেন—"ধরো, যদি ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লবই ঘটে তখন সন্ধ্যার অলঙ্কার ব'লে কি বিদ্রোহীরা সেগুলি ছেড়ে যাবে? তার চেয়ে যাতে সেটা না ঘটে, তার ব্যবস্থা করা কি সঙ্গত নয়?"

মহাদেবী ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিলেন, তার পর ঈষৎ একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া গিয়া কক্ষেরই একটা কুলুঙ্গী হইতে লেখ্যদ্রব্য লইয়া আসিলেন

রাজার সম্মুখে উহা স্থাপন করিয়া কহিলেন, "তবে আপনি লিখে দিন যে, আপনার অবশ্য-প্রয়োজনীয় অর্থের আবশ্যকতায় ঐ অলঙ্কার ঋণ-স্বরূপ লওয়া হইতেছে। যত শীঘ্র সম্ভব, উহা অথবা ঐ পরিমাণ অর্থ আপনি তাহাকে পরিশোধ করিবেন।"

রাজাধিরাজের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি হাত দিয়া লেখ্যদ্রব্য ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "লেখার কি দরকার! তুমি যেরূপ বল্‌ছো, সেই রকমই করা হবে।"

মহাদেবী ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "লেখাতেই বা আপত্তি কি, রাজাধিরাজ?"

মহারাজাধিরাজের মুখ এবার অপমানে রাঙ্গা হইয়া উঠিল,—"তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করছো? আমি যখন ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তখন সামান্য ব্যক্তির মত লেখালেখি করাতে চাও কেন? আমার স্ত্রীর কাছে কি আমার এতটুকু সম্মানও নেই?"

মহাদেবীর শান্তমুখে এ তিরস্কার এতটুকুও চাঞ্চল্যের রেখাপাত করিতে পারিল না। তিনি মৌন-নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া রাজাধিরাজের এতক্ষণকার নম্রচিত্ত উত্তেজনায় উত্তপ্ততর হইয়া উঠিতে লাগিল,—"মহাদেবি! জ্যান্ত মানুষকে তুচ্ছ ক'রে শুধু খড়মের পূজা করলেই পতিব্রতা হওয়া যায় না! তোমার স্বামীকে তুমি এতটুকু পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর না, এই তোমার পতিভক্তি!—"

মহাদেবী এ সব কথার যে সব সহজ প্রত্যুত্তর ছিল, সে সকলের মধ্যের কোনটারই উল্লেখ করিলেন না। শুধু তাঁহার দৃঢ়তার রেখাপাতে ঈষৎ কঠিন অথচ ম্লান ও সংযত স্থিরদৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখে তাহা সুধীরে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বেরই সেই অটল স্বরে এবার ঈষৎ মিনতি ভরিয়া কহিলেন, "লিখিত স্বীকার ব্যতিরেকে আমার গচ্ছিত ধন আমি দিতে পারি না।"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও নিরতিশয় অবমানিত বোধ করিয়াও অগত্যাই মহারাজাধিরাজ সন্ধ্যার কাছে ঋণ-স্বীকার ও তাহা শীঘ্র পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াই তাহার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে বাধ্য হইলেন। মনে মনে নিরতিশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন, "রেখে দাও তোমার লিখিত ঋণ! না যদি আমি ঋণ শোধ করি, তোমরা কি ঐ কাগজটুকু নিয়েই আমায় তা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে পারো?"

মহাদেবী মহল্লিকা সিদ্ধাকে ডাকিয়া পেটিকা দুইটি রাজাধিরাজের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর মহারাজাধিরাজ যাইবার কালে তাঁহাকে একটা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়াই, একবার তাঁহার দিকে না চাহিয়াই নীরব গাম্ভীর্য্যের সহিত উদ্ধতভাবে প্রস্থান করিলে, ক্ষণকাল অনিমেষে ও অনির্দ্দেশ্য দৃষ্টিতে তাঁহার যাত্রাপথের দিকে স্তব্ধ বক্ষে চাহিয়া থাকিয়া মহারাণী একটা বুকফাটা যন্ত্রণার্ত্ত দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক শুষ্ক রুক্ষ জ্বালাময় নেত্র ফিরাইয়া লইলেন! সহসা সেই নির্জ্জন হৃত-সর্ব্বস্ব ক্ষুদ্র কক্ষের মৃত্তিকাতলে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া এই সর্ব্বহারা নারী আজ আর্ত্তকাতরতার সহিত ঊর্দ্ধস্বরে মর্ম্মের মধ্য হইতে সভয়ে উচ্চারণ করিলেন,—"দেবাদিদেব! জানি না, এ অভাগীর কি ভাগ্যফল! না জানি, কি দুর্দ্দিনই আমাদের মধ্যে তুমি প্রেরণ করছো! তাই কি আজ এ হতভাগীর হাতের পূজো নিলে না, বিঘ্ন ঘটিয়ে আসন থেকে উঠিয়ে দিলে? হে বিশ্বনাথ! আমি না পাই, না-ই বা পেলেম! শুধু তাঁকে ভাল রাখো,—সুখে রাখো! সকল অমঙ্গল—সর্ব্ব আপদ তাঁর শান্তি ক'রে দাও। মা গো! ভবরাণি! আমার বুক চিরে সমস্ত রক্তধারা তোমার রাঙ্গা পায়ে ঢেলে দেব। এ বিপদ থেকে ওঁকে মুক্ত ক'রে দাও, মা! দাও মা! দাও মা! মা গো!—" [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রথম যুগ ও গোবিন্দদাস

বঙ্গসাহিত্য হইতে বৈষ্ণব পদাবলী বাদ দেওয়া কোনমতেই চলে না। বলিতে গেলে পদাবলী-সাহিত্য হইতেই বঙ্গসাহিত্য প্রাচীনতার ও সংরক্ষণশীলতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মানুষের শক্তি ও মনুষ্যত্বকে দেবতার শক্তি-মত্তার ও অলৌকিকতার পদতলে বলিদান করিয়া কতকগুলি স্তুতিবাদ রচিত হইয়াছিল মাত্র। এই স্তুতিগীতি বাদ দিলে অনুবাদ ও অনুকরণ ছাড়া কবির কবিত্ব স্বাধীন পথ খুঁজিয়া পাইত না। প্রাচীন শাস্ত্র-পুথি হইতে ঘটনা টানিয়া আনিয়া কবিত্বের রং ফলানই তখনকার কবির একটানা রীতি। এই অনুকরণপ্রিয়তার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রেম এবং কোমলতা তখনও সাহিত্যে স্থান পাইবার আশামাত্র করে নাই। মানবের চিত্ত ও জীবন যে সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে, এমন কল্পনা পর্য্যন্ত কোনও কবি করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী সাহিত্যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে বৈষ্ণব যুগ হইতে। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া এই প্রেমবিকাশ লাভ করিয়া আরাধনাক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতম পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সাহিত্যেও এই প্রেম, কোমলতা এবং কমনীয়তা কবিত্বের শ্রেষ্ঠতম উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৈষ্ণব যুগের পূর্ব্বের সাহিত্য তাহার ক্ষীণতার মধ্যেও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল—ধর্ম্মকলহ এবং সংস্কৃত হইতে অনুবাদের মধ্য দিয়া। শৈবধর্ম্মীর শিবায়নে শিবের সংসারযাত্রার ও কৃষিকার্য্য প্রভৃতির খবর ছাড়া শৈব-সাহিত্যের কোন বিশেষ প্রতিভা-চিহ্ন দুষ্প্রাপ্য। শৈবধর্ম্ম কেবল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকে ক্ষান্ত করিয়াই বিরত। সাহিত্য বৌদ্ধ যুগের ছায়ায় বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ না করিলেও সেই যুগের কবিরা সংস্কৃত সাহিত্যের দেবতা-নায়কের আদর্শ ছাড়িয়া মানুষের মহত্ত্ব স্বীকার করিতে শিখাইয়াছে, কিন্তু এই শিক্ষা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। আবার শক্তি-পূজারীর অর্ঘ্যপত্রেও দেবীর অভিনব লীলা এবং পূজারীর প্রতি অযাচিত করুণাদানের ইতিহাসই পাওয়া যায়। একই বিষয়ে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন আকার দান করিয়াছেন মাত্র। এক কথায় বলিতে গেলে কবিরা স্ব স্ব পূজোর ভজনা, সাধনা ও তাঁহাদের লীলা-ইতিহাস ছাড়া মানব-অন্তরের ভাব, অবস্থা বা আকুলতা অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য প্রণয়ন করেন নাই। শাক্ত লেখকের বিশেষত্বের মধ্যে তাঁহারা পৌরাণিক চিত্র লইয়া 'নাড়াচাড়া' করিয়াছেন, ভক্তের মনোরঞ্জনার্থ ঘটনার অলৌকিকতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস, কাব্যক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি নহে। বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যের মত ভাষার ক্ষেত্রে উহারাও প্রথম সংস্কৃত প্রভাবের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পরে, বিশেষতঃ মুকুন্দরাম হইতে সেই আত্মরক্ষা অক্ষুণ্ণ রহে নাই। মানুষ সমাজ-সঙ্কীর্ণতার ও নীতিধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আনন্দ ও আন্তরিকতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চরমোৎকর্ষ লাভ করিলেই কবিত্বের উপাদান গঠিত হয়। আবার বলিতে হয় যে, বাঙ্গালী চিরকাল প্রেমতত্ত্বের সাধক, বাঙ্গালী প্রেম ভিন্ন কিছু জানে না। ধর্ম্মে-কর্ম্মে, জীবনে-মরণে এই প্রেমের রঞ্জনে বাঙ্গালীর অন্তর রঞ্জিত। এই অন্তর্নিহিত প্রেমের আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রথম অবতারণা বৈষ্ণব গীতি-কবিতায়। ইহা বাঙ্গালীর প্রেমতত্ত্বের উপনিষদ, তাই বাঙ্গালীর কোমল প্রাণের প্রেমের কথা রাশি রাশি সংস্কৃতের ক্রোড় ত্যাগ করিয়া "মনের কথা জাগানে" ভাষাতেই বৈষ্ণব-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইখানে স্বাধীন বায়ুর লীলা।

কবির মন্ত্র প্রেমের মধ্যে। বাঙ্গালী কবি প্রাণ পাইয়াছে, প্রেম-প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে,—বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে। ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম। বঙ্কিম, হেম, নবীন, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ সকলের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবের অত্যধিক প্রভাব। শৈবধর্ম্ম দার্শনিকের, শাক্তধর্ম্ম বীরের, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম কবির। নবীনচন্দ্র শাক্ত হইয়াও কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের প্রেম মানব-মনের কোমলবৃত্তির শেষ পরিণতি। উহাই কবিত্ব। ইহাই রাস্কিণের Infinite tenderness বা জুয়েলের Delicacy. কবিত্বের উপাদানের বিশ্লেষণ করিতে গেলে বলিতে হইবে যে, মধুর সরলতা, সান্তর আকুলতা এবং সত্যরসগ্রাহী নমনীয়তা কাব্যের মনস্তত্ত্ব। বৈষ্ণবী প্রথার অন্তস্তত্ত্বেও এই ঋজুতা, আকুলতা, কোমলতাই বিশেষভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এই জন্যই কবি বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাবুক।

বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমোদিত রাধাকৃষ্ণের প্রতিনিয়ত রাসলীলা ভাব আদিদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। অবসানহীন লীলার জন্যই রাগ-মিলন-বিরহ প্রভৃতির কল্পনা; এই বৈষ্ণব গীতি-কবিতা মনুষ্যজাতির চিরদিনের হৃদয়-কবিতা। যেখানে সমাজ-কালের শাসন নাই, নীতিশাস্ত্রের অকারণ দোহাই; দেবতার রোষ বা অনুগ্রহের গন্ধ নাই, স্বপ্নাদেশের প্রয়োজন নাই; মুক্ত অন্তরের আকুলতা, আনন্দোচ্ছ্বাস বা বেদনা হৃদয়-বীণার সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। এই প্রেম-সঙ্গীত নীতি-কবিতার ভেরী অর্গ্যান নহে, ইহা বীণা,—বৈষ্ণব-বীণা। এই বীণার তারে গান বাজে, সচ্চিদানন্দের স্রোত বহায়।

এখন আমরা দেখিতেছি যে, ধর্ম্মযুগের ভিতর দিয়া বিকাশের পথে পা বাড়াইয়াছে, বস্তুতঃ ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রভাব ব্যতীত কোন সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না এবং ধর্ম্মকল্পনা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য অনুকরণপ্রিয়তার দরুণ কল্পনাক্ষেত্রে সাহিত্য বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। পৌরাণিক উপাখ্যান বাদ দিয়া কল্পনার লীলা তরঙ্গায়িত হইয়াছে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে। এক রাধাকৃষ্ণ লীলার মধ্য দিয়া সেই যুগের কবিগণ বিচিত্র কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন।

পদাবলীর প্রেম সাধারণ মানবীয় প্রেমের আকার ধারণ করিয়া তাহার মূলতত্ত্বটুকু ঠিক বিপরীত। মানব-চিত্তের বৈকম্পনকে সুরে গাঁথিয়া রাধার দ্বারা নিবেদন করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মে শ্রীরাধা সমস্ত বৈষ্ণবসমাজের ধর্ম্মমুখীন আত্মার প্রতিনিধি। বৈষ্ণব নারী, তাহাদের স্বামী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবসমাজের সমস্ত ভক্তিই পদাবলীর প্রেমকাহিনী; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিই রাধা 'মিলন'। হৃদয়াকাশে মেঘ আসিয়া আরাধ্যকে দেখিতে না 'বিরহ'। 'বৃন্দাবন' ভক্তের চিত্তমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মথুরায় গেলে কাযেই 'বিরহ'। এই অধ্যাত্মভাবটুকু বুঝিয়া না পারিলে বৈষ্ণবীয় প্রেমের মহিমা সহজে ধরা পড়িবার ইহা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেম। এই বৈষ্ণবীয় প্রেম আরাধনায় পর্য্যবসিত নহে, শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যে পর্য্যন্ত এই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, শ্রীকৃষ্ণকে আপনার দেহে বদ্ধ করিতে পারে নাই। এই প্রেম মাধুর্য্য-রসে পরিণতি করিয়াছে; তাই বৈষ্ণবসমাজের সবই নারী, আর ভগবান্ই পুরুষ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মাধুর্য্যভাবই পদাবলী সাহিত্যের এই প্রেমকে বহু ভাগে বিভক্ত করিলেও তাহাদের ভক্তি-পদ্ধতি

ভাগে বিভক্ত করিয়া 'পঞ্চরসের' সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রেমপন্থার অসংখ্য বিভাগের মধ্যে এত 'চুল-চেরা' পার্থক্য যে, তাহা বুঝিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। এই কল্পিত প্রেমের প্রতিকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হওয়াতে তাঁহার পরবর্ত্তী কবিদিগের প্রেমচিত্র সজীব হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেম ও আকুল নিবেদন প্রথমে শুধু গানের মধ্যেই ছিল, কিন্তু রাধার সেই আকুলতার অভিনয় স্বয়ং রাধা অর্থাৎ বৈষ্ণবসমাজের প্রতিনিধি, তাই শ্রীচৈতন্য প্রেমের অবতার। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতির প্রারম্ভ কোন্‌খানে?

অন্তরের যে পবিত্রতা ও আকুলতা আমরা এই পদাবলী-সাহিত্যে পাইতেছি, তাহা পূর্ব্ব-যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে ছিল না। সাধারণ, এমন কি, এই স্থানবিশেষে বিকৃত রুচিসম্পন্ন গ্রামে গীত মানবীয় প্রেম-সঙ্গীতকে পরবর্ত্তী কবিরা পবিত্রতার সংস্পর্শে প্রেমভক্তিসঙ্গীতের আদি সুর করিয়া তুলিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ মানবীয় ভালবাসার সঙ্গীতের মধ্যে কিঞ্চিৎ শিষ্টতা ও ভদ্রতা রক্ষা করিয়া ভদ্রসমাজে আত্মরক্ষা করিয়াছিল "শুকুল ধামালী"। এই সঙ্গীতের ভাবের সহিত গীতগোবিন্দের ভক্তিসঙ্গীতের সামঞ্জস্য মাঝে মাঝে অতি সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই গীতি-কবিতার আদি প্রবর্ত্তক উমাপতি ধর বলিয়া অভিজ্ঞরা বিবেচনা করেন। উমাপতি ধরের কথা বাদ দিলেও জয়দেবের এবং ঐ "শুকুল ধামালীর" মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেবতত্ত্বের বিশেষ আভাস মিলে না, বলিতে গেলে উহা যেন মানবীয় প্রেমের কবিত্বময় বর্ণনা। এই মানবীয় প্রেমের সুরকেই চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি স্বর্গের সৌরভ ও পবিত্রতা দান করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে পদাবলীর নূতনভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

চণ্ডিদাস মানবীয় প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে, এমন কি, মানবীয় প্রেমের ডুবারী হইয়াও স্বর্গীয় প্রেমের ধারার সঠিক খবর দিয়াছেন; তখন তাঁহার প্রেম-সাধনা ভগবদ্ভক্তির মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সেই প্রেমের ভিতর শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মাধুর্য্য সব বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেখানে প্রিয়তমা হইতে "পিতৃমাতৃ" বা "দেবগায়ত্রীর" কোন পার্থক্য নাই। প্রেম-সাধনায় যিনি এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন, "সেই সে চিনয়ে তবে।" চণ্ডিদাস কথা শিখিয়া কল্পনার সাহায্যে 'গীতি' লিখেন নাই, অলঙ্কারের সাহায্যে ভাষা ও ছন্দ তৈয়ার করেন নাই। তাঁহার গান আপন হৃদয়ের ও জীবনের আকুলতার ইতিহাস। আরাধ্যকে পাইবার জন্য যাঁহার তীব্র ব্যাকুলতা, যাঁহার কাছে বিচ্ছেদের কল্পনা পর্য্যন্ত অসহনীয়, যাঁহার প্রিয়তমা "বেদগায়ত্রী", তাঁহার রাধা-বিরহ স্বর্গের সৃষ্টি করিবে না কেন?—রাধার প্রথম জন্ম "ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে" আর কতিপয় তৎসময়ের সংস্কৃত গ্রন্থে, তাহার পরের সাহিত্যে রাধা উপেক্ষিতা ছিলেন। সেই নগ্নসৌন্দর্য্যকে ধুইয়া মুছিয়া আদর করিয়া পুনরায় আশ্রয় দিয়াছিল প্রথমে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়।" এইখান হইতেই রাধা-কৃষ্ণলীলার "রাগানুরাগ প্রভৃতির" সৃষ্টি, কিন্তু এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের চরম সীমা তাঁহাদের মিলিত আত্মায়। যেখানে রাধা নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছেন, সেইখানেই সাধনার শেষ। রাধা যেখানে মানবীয় আত্মা পরিহার করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, সেইখানেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনের কথা সহজেই মনে পড়ে। তিনি যখন অন্তরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সত্তা অনুভব করিয়াছেন, তখনই উন্মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়াছেন; তখন—

"মুঞি সেই মুঞি সেই কহি কহি হাসে,"

ভক্তির চরম শীর্ষস্থানের পরিচয় চৈতন্যদেবের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার বহুপূর্ব্বে ভাগবতের মধ্যেও গোপীগণ কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া 'আমিই এই কৃষ্ণ' ভাবিয়া তদ্গত হইয়াছিলেন। সাধকের এই শ্রেষ্ঠ অবস্থাকে জয়দেবও ভুলিতে পারেন নাই। যেমন—

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥"

আরাধ্য ও আরাধকের পার্থক্যহীনতার পরিচয় বিদ্যাপতিতেও আছে, যেমন—

"অখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী মাধাই ভেল।"

ভালবাসার এই পদ্ধতির অনুসরণই বৈষ্ণবীয় নীতির শেষ পন্থা।

বলিতে গেলে ভালবাসা-শাস্ত্রের আদি পুরোহিত চণ্ডিদাস। চণ্ডিদাসের প্রেম উপাসনা নহে, আরাধনা নহে, তাহা সাধনা। এই সাধনার ক্ষেত্র হইতেই পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি। চণ্ডিদাসের প্রেম দেবপূজা নহে, প্রিয়তমকে আত্মস্থ করিয়া সচ্চিদানন্দভোগই এই বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবির পন্থা। এইখানে ভক্ত ও দেবতার স্থান একই আসনে। বিভিন্ন আসনের অধিকারীর প্রেম হয় না, এবং তাহা সাধনার ফলও নহে; তাই চণ্ডিদাস বুঝিয়াছিলেন—

"কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।"

তিনি আকুলতার কবি। মিলনের মধ্যেও তাঁহার আকুলতার অবসান নাই, সেখানেও "হারাই হারাই সদা ভয় হয়।" বিরহে উন্মত্ততা স্বাভাবিক বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও আশঙ্কা বশতঃ উদ্বেগ ও অস্বস্তি তাঁহার চিত্তে জাগ্রত রহিয়াছে; যেমন,—

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
কি জানি কানুর প্রেম তিলে নাকি টুটে॥"

এমন করিয়া রাধার চিত্ত বিচিত্র অবস্থার মধ্যেও চিরদিন দুঃখকে বরণ করিয়া প্রেম-সাধনা করিয়াছেন। মিলনের মধ্যেও বিরহের করুণ সুর! চণ্ডিদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বল্পকথায় ভাবপ্রকাশের মধ্যে। কবি হৃদয়ের কথা হৃদয়ের শোণিত দিয়া লিখিয়াছেন, এবং সেই কবিত্ব ও ভাব বুঝিতে হইবেও হৃদয় দিয়া। কবি শুধু কাঁদিয়াছেন, মিলনবিরহের বিশেষ পার্থক্য নাই; কেবল দুঃখের সৃষ্টি এবং সেই অপরিমেয় দুঃখের মধ্যেও কবির আনন্দ। কবি নিজের হৃদয়ের ইতিহাস দিয়াছেন, গান লিখিবেন বলিয়া রাধাকৃষ্ণের কল্পিত প্রেমের ইতিহাস লিখেন নাই, তাই অলঙ্কার শাস্ত্রেরও প্রয়োজন হয় নাই।

বিদ্যাপতি শুধু কবি নহেন, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্যও দেখাইয়াছেন। তাঁহার কবিতা পড়িতে পাঠকের হৃদয়ের অভাব ঘটিলেও টীকার সাহায্যে ভাব হৃদয়গত হইতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রের আধিপত্য থাকিলেও বিদ্যাপতির মত চিত্রশিল্পী কবির মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি জীবন্ত ছবি। বিচিত্র উপমার সাহায্যে সৌন্দর্য্যের ছবি পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে আঁকিয়া দিতে তিনি বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত।

বিদ্যাপতির প্রেমতত্ত্বের সাধারণ বিশেষত্ব এই যে, নায়ক-নায়িকা এইখানে মিলনের আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে এবং বিরহের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। এই ধরণের আনন্দোচ্ছ্বাস এবং বিরহ-কাতরতা সাধারণ মানবেরও প্রকৃতিজাত ধর্ম্ম। চণ্ডিদাসের মত মিলনের মধ্যেও দুঃখকাতরতা ও বিয়োগাশঙ্কার হুতাশ নাই। অধিকন্তু বিদ্যাপতির রাগানুরাগ প্রভৃতি গীতির মধ্যে বিশেষভাবে সম্ভোগের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, 'বিরহ' হইতে আরম্ভ করিয়া "ভাবসম্মিলন" পর্য্যন্ত কবি পৃথিবীর দৃশ্যমান মাটী ছাড়াইয়া স্বর্গের নন্দন-কাননের সৌরভ ছড়াইয়া দিয়াছেন। প্রেমের শেষ স্তরে আবার পূজা ও পূজারী ভাবের মধ্য দিয়া একাত্ম হইয়া পড়িয়াছেন, যেমন—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

দেহকে ছাড়িয়া দিয়া আত্মার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের যে অনুভূতি, তাহাই প্রকৃত মিলন; এখানেই 'অদ্বৈতবাদ'। রাধার হৃদয়-মন্দিরে যখন

শ্রীকৃষ্ণ আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, তখন কোকিল লক্ষ ডাক ডাকিলেও, লক্ষ চাঁদ উদিত হইলেও, এমন কি, মদনের পঞ্চশর নিক্ষিপ্ত হইলেও রাধা শঙ্কিতা নহেন; তখন তাঁহার সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি ঘটিয়াছে,—তখন তিনি পরিষ্কারভাবেই বলিতেছেন—

"তব মঝু যবহুঁ পিয়াসঙ্গ হোয়ত তবহি মানব নিজ দেহা।"

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির কবিত্বের আলোচনা ও তুলনা করিবার প্রয়োজন এখন নাই। রবি বাবু, দীনেশ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক লেখক তাঁহাদের কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি এবং তাঁহারাই এই হাসিকান্নামিশ্রিত পদাবলী-সাহিত্যের আদি পুরোহিত। কবি কল্পনার চোখে ভবিষ্যতের ছবি দেখিতে পারেন, তাই তাঁহারা রাধার চিত্র আঁকিতে আঁকিতে চৈতন্যদেবের বাস্তব জীবনের ইতিহাসও দিয়া ফেলিয়াছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই এই সত্যতা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কবিদের কল্পনার সাহায্য বিশেষ গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাঁহারা শ্রীরাধার আকুলতা প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবে দর্শন করিয়াছেন, যিনি ভীতিসঙ্কুল হৃদে কৃষ্ণ আছেন শুনিয়া উন্মত্তভাবে ঝম্পদান করিতে পারিতেন, যিনি কাল তমালবৃক্ষের বর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সামঞ্জস্য দেখিয়া তমালকে কৃষ্ণজ্ঞানে দিনরাত্রি আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে পারিতেন, তাঁহার জীবনের জ্বলন্ত উদাহরণ কবিদিগকে রাধাচিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ করিয়া তুলিবে না কেন? চণ্ডিদাসের রাধার আকুলতা যেমন চৈতন্যদেবের দুইটি সজল নয়নকে স্মরণ করাইয়া স্বর্গীয় প্রেমের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে, তেমনই রাধাচরিত্রের কথা ভাবিতেই কবিরা চৈতন্যদেবের জীবনচিত্র স্মরণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ স্বর্গীয় প্রেমের সংবাদ দিতেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর জীবনকে আদর্শ রাখিয়া হৃদয়াবেগের ধারা নিঃসৃত করিয়াছেন এবং সেই প্রস্রবণ-ধারার জন্মস্থান বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাসের মধ্যে। কল্পনাক্ষেত্রে ও কবিত্বের ক্ষেত্রে তাঁহারা উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বিষয়-নির্ব্বাচনে কোন নূতন পদ্ধতি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হয় নাই, এমন কি, প্রেমতত্ত্বের গবেষণায়ও তাঁহাদের মস্তিষ্ককে অতিরিক্ত পীড়িত করিতে হয় নাই।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসই শ্রেষ্ঠ। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্থানবিশেষে ও বিষয়বিশেষে গোবিন্দদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, এমন কবিও আছেন, তবে মূলতঃ গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রচনাক্ষেত্রে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন; বিশেষতঃ সৌন্দর্য্য ও অনুরাগ চিত্রের অবতারণায় গোবিন্দদাস প্রায় বিদ্যাপতির মত কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পদরচনায় বিদ্যাপতির অনুকরণ করিতে যাইয়া গোবিন্দদাস একবারে মৈথিল কবি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মৈথিল শব্দের বাহুল্য এবং বিদ্যাপতি ঢংয়ের প্রতিবিম্ব হেতু গোবিন্দদাসের পদগুলিকে মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের ঘাড়ে চাপাইয়া তাঁহারই কবিত্বের উচ্চাসন দান করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিতে পারিবার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম—গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত অনেক পদ আছে, এই রকম গোবিন্দের সংখ্যাও আট জনের কম নহে। দ্বিতীয়—মিথিলায়ও গোবিন্দনামধারী এক কবি ছিলেন; এবং তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ তিনি দ্বারবঙ্গাধিপের বংশীয়। রাজবংশের প্রাচীন গৌরব উজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী কবির কবিত্বকে মিথিলায় টানিবার চেষ্টা। তৃতীয়—বাঙ্গালী গোবিন্দদাস মৈথিল বিদ্যাপতিকে মাঝে মাঝে এত নিখুঁতভাবে অনুকরণ করিয়াছেন যে, (এমন কি, স্থানবিশেষে অধিকতর কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন) অন্ততঃ ভাষা পদের দিক দিয়া হইলেও তাঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়া ভ্রম হয়। চতুর্থ—বিদ্যাপতির পদাবলী যেমন বঙ্গদেশে লোকায়ত্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অনেক বাঙ্গালা শব্দ তাঁহার পদাবলীতে সুলভ, তেমনই গোবিন্দদাসের কয়েকটি পদাবলী মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের খাতিরে মিথিলায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এবংবিধ কারণে নানা গোবিন্দদাসের ভিড় হইতে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে গোবিন্দদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যেক বৈষ্ণব-গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে (যেমন—ভক্তমাল, নরোত্তমচরিত, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি)। এই গোবিন্দদাসের সমকক্ষ পদকর্ত্তা যদি মিথিলায়ও থাকিতেন, তবে তাঁহার "শতমুখে প্রশংসা" প্রতি বৈষ্ণব গ্রন্থেই মিলিত, অধিকন্তু মৈথিল ভাষার পদের সহিত খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগে ও মাঝে মাঝে নির্ভুল বাঙ্গালা ছন্দের অবতারণায় তাঁহার বাঙ্গালীত্ব সূচিত হইতেছে। উল্লিখিত কারণ হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালী গোবিন্দদাসের সহিত মৈথিল গোবিন্দের তুলনা ন্যায়-সূচক নহে। গোবিন্দ প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, তাই তাঁহার পদাবলীতে 'পশুপতি', 'চণ্ডী', 'গৌরী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শাক্ত লক্ষ হইতেও গোবিন্দদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হয়, কারণ, বাঙ্গালী গোবিন্দ যে প্রথমে শাক্ত ছিলেন, ইহা জানা কথা। ঐতিহাসিক প্রমাণ দিবার উদ্দেশ্য আমাদের নহে, গোবিন্দদাসের কবিত্ব অনুভব ও উপভোগ করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিবার জন্যই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। তাঁহার কবিত্বের আলোচনা করিবার আগে বৈষ্ণবযুগের গীতিভাষার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে পদাবলী সাহিত্যের বিশেষত্ব সহজে ধরা পড়িবে না।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'সুভাষিত সংগ্রহ,' 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' বা 'শূন্যপুরাণের' ভাষাকে আধুনিক সাহিত্যের পাঠকরা সহজে বাঙ্গালা বলিয়া মানিয়া লইতে পারিবেন না; তাহা বর্ত্তমান যুগে অনেকটা দুর্ব্বোধ্য; কিন্তু সেই প্রাচীন ভাষাই নানা পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার তথা বাঙ্গালা কাব্যের ইতিহাসে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কবিকঙ্কণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন কবি তাঁহাদের হৃদয়-কথাকে সুদৃঢ় করিবার মানসে সংস্কৃতের ঝুড়ি হইতে অলঙ্কার ও শব্দ ধার করেন নাই। প্রাকৃতজ শব্দই বাঙ্গালাভাষার কোমলতার প্রাণ, পণ্ডিত কৃত্তিবাস সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও সংস্কৃতের ঋণ গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালায় বৈষ্ণবগীতির আদি পুরোহিত চণ্ডিদাসও কৃত্রিম ভাষার কোন সংস্রব না রাখিয়া বাঙ্গালীর জন্য খাঁটি বাঙ্গালা প্রেমগীতির উৎস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং যেখানে সংস্কৃত কাব্যের শ্লোকবিশেষের অনুবাদ করিতে গিয়াছেন, সেইখানে কথায় কথায় অনুবাদ করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার ও ছন্দের ঐশ্বর্য্য নিখুঁত রাখিয়াছেন; উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহার—"নিন্দয়ে চান্দ চন্দন রাধা সব বলে" প্রভৃতির সহিত জয়দেবের "নিন্দতি চন্দন-মিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্" প্রভৃতির তুলনা করা যাইতে পারে।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমরা চণ্ডিদাসের বর্ত্তমানে প্রচলিত ও লোকায়ত পদাবলীর ভাষার কথা বলিতেছি না। চণ্ডিদাসের আসল ভাষার নিদর্শন "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" মধ্যে। সুধীসমাজ ইহা মানিয়া লইয়াছে যে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" ছাড়া চণ্ডিদাসের কোন পদাবলীই তাঁহার আপন ভাষা বহন করিতে পারে নাই। এই কারণে ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিতেই সেই যুগের ভাষার আদর্শ "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কেই" মানিয়া লইতে হইবে। চণ্ডিদাসের ভাষা শূন্যপুরাণ প্রভৃতি হইতে পরিবর্ত্তিত হইলেও সংস্কৃতসম্বন্ধবিহীন, শব্দগুলি প্রায়ই প্রাকৃত বা প্রাকৃতজ, বিদ্যাপতির ভাষা চণ্ডিদাসের ভাষা হইতে অনেক পৃথক। মিথিলার ভাষা সংস্কৃতের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব অথচ

প্রতি-মধুর ভাষা বিদ্যাপতির সৃষ্টি; ইহাই মৈথিল-বঙ্গভাষা। বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন পাঠ মিথিলায়ও দেখা যায়। আবার চৈতন্যদেবের পর হইতে বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের প্রধান কেন্দ্র হওয়ায়, বিশেষতঃ চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৃন্দাবনে রচিত হওয়ায় বৃন্দাবনী ভাষা বৈষ্ণব-সাহিত্যে আধিপত্য লাভ করে। বৃন্দাবনী ভাষার ছড়াছড়ি তখনকার সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। এই বৃন্দাবনী ভাষা পদাবলী-সাহিত্যে উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং তদীয় ভক্ত লেখকগণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বৃন্দাবনী ভাষা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী মৈথিল-বঙ্গভাষার গতি অন্যরূপ। বিদ্যাপতির ব্রজবুলির চরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন গোবিন্দদাস, তাই গোবিন্দদাসের পদাবলীতে ভাব-আহরণের চেষ্টায় গেলে ভাষার ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যই মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। বাহিরের সৌন্দর্য্যের আধিক্য ও আধিপত্য এত বেশী যে, ভিতরকার সৌন্দর্য্য সেইখানে মগ্নাবস্থায় রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের কবিদিগের প্রধান সম্পত্তি "গৌর-চন্দ্রিকা।" রাধাকৃষ্ণপ্রেমের প্রত্যেক লীলাকে ভগবৎ-প্রেমের নির্দ্দেশক প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা। চৈতন্য-জীবনের প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ঘটনা রাধাকৃষ্ণলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া দেখান হইয়াছে যে, বৈষ্ণব-প্রেম মানবের দেহগত মিলনের আকাঙ্ক্ষা নহে। যদি হঠাৎ প্রেম-লীলার অন্ধকার দিকটা পাঠককে আবৃত করিতে চেষ্টা করে, তখন চৈতন্যের জীবনকথা গৌরচন্দ্রিকার ভিতর দিয়া পাঠকের চিত্তকে ভক্তিপ্লুত করিয়া দিবে; এই কারণে পদাবলীর প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকিবার সম্ভাবনা। কবি গোবিন্দদাসও এই পবিত্রতা-রক্ষণে উদাসীন নহেন। সেই গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ রাধার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নদীয়ায় শচীনন্দন হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন—

"পুরবে কালিয়া ছিল গোপী-প্রেমে ভরা।
ভাবিয়া রাধার প্রেম এবে হৈল গোরা॥"

রাধার ভাব ও আকুলতা চৈতন্য-জীবনে অভিনীত হইয়াছে, কাযেই শ্রীচৈতন্য অবতার। এই মাধুর্য্যরসে অবিশ্বাস করিলে তাহার চিত্তের চিত্র কিরূপ হইবে?

"মলিন মুকুরে নাহি বিন্দু বিকাশ॥"

ইহা শুধু তুলনামূলক কবিত্বের বিকাশ নহে, ভক্তের চিত্ত দেবতাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া প্রভূত বলসঞ্চয় করিতেছেন এবং সেই চৈতন্য শুধু "ত্রিভুবনের" পূজা লইতে ব্যস্ত নহেন, তিনি—

"প্রেমভরে গর গর, না চিনে আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোল॥"

ইহা ঐতিহাসিক সত্য। যাঁহারা চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সত্যতাবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন, এমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের কতকগুলি ঘটনা পরিমিত "গৌরচন্দ্রিকার" মধ্যে বিবৃত করা হইয়াছে। এইখানে বলা বাহুল্য যে, ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্যের প্রতি গোবিন্দদাসের দৃষ্টি সর্ব্বত্র জাগ্রত। শুধু সৌন্দর্য্যের বর্ণনা এবং বিরহ-কাহিনীর মধ্যে নহে, সর্ব্বত্রই ছন্দ এবং ভাষার অপরিমিত লীলা। অক্ষর লইয়া অপূর্ব্ব নীলায়ও ভারতচন্দ্র ছাড়া অন্য কোন কবি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন কি না সন্দেহ। এক 'ন'কে আদি করিয়া তিনি কেমন কবিত্ব দেখাইতেছেন, তাহা উপভোগ্য। যেমন—

"নীরদ নীল নয়ন নীরজ-নিন্দিত
বক্ষ নেহারনি ছন্দ
নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনী নিচোল
নিকশত নীবি নীবিবন্ধ
নাচত নন্দনন্দন নটরাজ"

আবার 'খ' লইয়াও সেই খেলা। যেমন—

"বহন বাদির বরণ বন্ধুর
বিজুরী বিলাসিত বাস।
বিকচ বান্ধুলী বলিত বারিজ
বদন-বিম্ব বিকাশ॥
বিহরিত বৃন্দাবনে বনমালী ইত্যাদি"

এই রকম অনুপ্রাসের অপূর্ব্ব ঘটা দেখাইতে গিয়াও তিনি তাঁহার বর্ণনার বা কবিত্বের ত্রুটি করেন নাই। ভাবকে আয়ত্ত করিয়া তিনি শব্দের মালা গাঁথিয়াছেন। বিরহ-বিধুরা রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি "স" বা "শ" লইয়া যেন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন—

"শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরী
সে হেন সুরত সন্দেশে।
স্মরশর সম শর শশিকর-শীকর
সহই সো তনু শেষে॥
* * *
শুধু সম্বাদে কি সুমুখি সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত॥
শীতল সুরভিত সরস সমীরণে
সতত সন্তাপই গাত,
স্বপন সমাগম সাধে সুধামুখী
শুতই সরসিজ পাত।"

অক্ষরের অবাধ লীলার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াও কবি কবিত্বের সহিত রাধার সঠিক খবর দিয়াছেন। অনুপ্রাসের বেলা শব্দের শেষের দিকের মিলেও কবি খুব সিদ্ধহস্ত, যেমন,—

"কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী অঙ্গ তুরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নদ নব রঙ্গিণী রে॥
* * *
কুঞ্জরগামিনী মোতিম দামিনী
দামিনী-চমক নেহারিণী রে।
আভরণধারিণী অখিল সোহাগিনী
পথম রাগিণী মোহিনী রে॥"

ভাষা ও ছন্দের সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্য খুঁজিতে গেলে এমন অসংখ্য পদ মিলিবে। ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইতে গেলে প্রায় সমস্ত পদাবলীই উদ্ধৃত করিতে হইবে। উপমার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির মত কৃতী না হইলেও গোবিন্দদাসের স্থান অন্যান্য কবি হইতে উচ্চে ছাড়া নীচে নহে।

বিদ্যাপতির রাধার প্রথম চিত্র এবং গোবিন্দদাসের রাধার চিত্রে একটু পার্থক্য আছে। বিদ্যাপতি কৈশোর এবং যৌবনের মধ্যখানে দৃশ্যপট তুলিয়া দিয়া রাধার সৌন্দর্য্যের 'ফটো' তুলিয়াছেন। সেই বয়ঃসন্ধির মধ্যে কৈশোরের সরলতা এবং প্রথম যৌবনের চঞ্চলতার সামঞ্জস্যে এক মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমতী রাধার চঞ্চলাবস্থা-বর্ণনার মধ্যে তাঁহার নগ্ন সৌন্দর্য্যের সহিত জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের তুলনা; সেই চিত্রাঙ্কনের মধ্যে রাধার অন্তর পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়াছে। গোবিন্দদাসের রাধার প্রথম চিত্র কিছু ভিন্ন রকমের, শ্রীমতীর তখন যৌবনের পরিচয় থাকিলেও যৌবনের উদ্দামতা বা অতিরিক্ত চাঞ্চল্যকে ঢাকা দিয়া কবি শুধু নায়িকার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়াছেন, কবি যৌবনের খবর দিয়াছেন; প্রসাধনে কবি কৌশলে বলিয়াছেন—

"নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা"

আবার একটু পরে—"নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া"

কবি উপমাহীন সৌন্দর্য্যবর্ণনায় সিদ্ধহস্ত এবং তাহা অনুপ্রাসের অট্টহাস্যে আরও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। উপমার পর উপমা দিতে অনেক স্থলেই গোবিন্দদাস অভ্রান্ত; কিন্তু মাঝে মাঝে উপমার গন্ধহীন করিয়াও বিদ্যাপতিকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছেন। সেই বর্ণনার ভাষা অন্তরের, বাঙ্গালীর ঘরের; তাহা বুঝাইতে উপমার আবশ্যক হয় না,—যেমন,

"ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়।"

তাঁহার "রাধা" কিন্তু অনুরাগ-রঞ্জিতা হইয়া আত্ম-বিস্মৃতা হইয়াও আত্মসম্বৃতা। অন্তরের চঞ্চল আকুলতা এবং বেদনাকে তাহা শোভন-তার আবরণ দিয়া ঢাকিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সংযমের আবরণকে ছিন্ন করিয়া উহা হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাপতির তুলনায় গোবিন্দদাসের অনুভবতার হ্রাস থাকিতে পারে, কিন্তু সংযম-হেতু পবিত্রতায় কবির কৃতিত্ব বস্তুতঃ অতুল। মনের কথা গোপন করিবার প্রবল প্রয়াস সত্ত্বেও যে "মরমক বেদন বদনে সব কহই" এই উদ্দামতাবিহীন ও সংক্ষিপ্ত আক্ষোচ্ছ্বাস বাহিরের উন্মাদনায় পর্য্যবসিত নহে; কেবল উচ্ছ্বসিত স্মৃতিই অন্তরের মধ্যে এবং বাহিরের নির্জ্জনতায় উন্মাদনা প্রকাশ করিতেছে। রাধার "জলদ নেহারি নয়নে ঝর লোর" আর তিনি "বিজনে আলিঙ্গই তরুণ-তমাল"। অন্তরের জ্বালা যখন প্রকাশের পথ না পাইয়া তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, তখন ব্যাকুলতা বাক্যের মধ্যে ধরা না দিয়া শেষে কার্য্যকলাপে আত্মসমর্পণ করিতেছে—

"ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরীভার হার তেয়াগল
তাপিত ভূষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধরণী
সুরসুতা স্রবে নয়নে।
* * *
মা বোলই ধনী ধরণী-তলে মুরছই
প্রাণ প্রবোধ না মানে॥"

রাধার অন্তরের আকুলতা ভগবানের স্বভাবনম্র চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর শৃঙ্খলিত হইয়া গিয়াছে। ভক্তের আত্মনিবেদন শুধু অন্তর্যামীর জ্ঞাতসারেই তাঁহার ভূষণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন ভক্তের জন্য দেবতাও আকুল। এই আকুলতা সেবকের জন্য স্নেহ বা অনুগ্রহ নহে, ইহা অন্তরতমের জন্য 'মাধুর্য্যরস'। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তা রাধাকে আপন অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহেন। এইখানে ইচ্ছামাত্র সম্বল নহে, আকুলতা দিয়া গ্রহণের চেষ্টাই "শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতী।" ভক্তের করুণ ক্রন্দনে আরাধ্য বিচলিত, তাই "রাই রাই করি, সঘনে জপয়ে হরি, তুয়া ভাবে তরু দেই কোর।" এই আকুলতা নিষ্কাম প্রেম, তাই নায়কের "নিঝর ঝরে দুনয়ান।" শুধু তাহা নহে, প্রেমাকুলতায় তাঁহার চিত্ত এত দ্রবীভূত যে—

"রা কহি ধা পঁহু কহই না পারিয়ে
ধারা ধরি বহে লোর।"

অপ্রাপ্তের জন্য এই প্রেমে এবং আকুলতায় দুর্গন্ধ বাহির করিবার উপায় নাই, ইহা পবিত্র। কিন্তু এই হৃদয়দহনের মধ্যে কবির কবিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে,—হৃদয়তাপ অসহনীয়, তাই "তনু চন্দনচর্চ্চিত" করিতে হইয়াছে, উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে মেঘ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতেছে, শুধু নামের গুণেই হৃদয় পুলকিত হইয়াছে।

উভয়ের হৃদয়কে মদন-বাণে আহত করুক আর নাই বা করুক, কিন্তু দুই হৃদয় এক তারে বাঁধা পড়িয়াছে। মদন-বাণের রূপক কবির কাব্যে থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তচিত্তে তাহা পবিত্র মাধুর্য্যরস।

সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া "রাই উন্মাদিনী" সাধনার পথে চলিয়াছে, নিজে একাকিনী, পথ অপরিচিত ও বিপৎসঙ্কুল; ভরসা অন্তরের ভক্তি ও সাহস, পথ কে দেখাইবে?

"এ হরি অতএ দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গৌরী একান্ত॥"

বাঙ্গালী গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, তাই তিনি "গঙ্গা-পতি গৌরীকে" ভুলিতে পারেন নাই।

এ দিকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও "পৌরুষ লাজ" পরিহার করিয়াছেন, আরাধ্যা-ক্ষিতার জন্য উন্মুখ হৃদয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছেন, কারণ—

"কাজর গরলহি ভরল নয়নশর
হানলি অন্তর চিতে।"

এই শরের দরুণই জগতের আহৃত সৌন্দর্য্যরাশি যেন রাধার ইঙ্গিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং কামবাণের রূপক গোবিন্দ-দাসের নিজের সৃষ্টি নহে, ভক্তকবি গোবিন্দ ধামালী-গীতির রূপক অক্ষুণ্ণ রাখিলেও তাহার ভক্তচিত্তকে কলুষিত করিবার আশঙ্কা নাই।

অভিসারের চিত্রাঙ্কনে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়। কেমন ভীতিসঙ্কুল ও দুরপনেয় দুঃখের ভিতর দিয়া নিতান্ত অসময়ে ভক্তচিত্ত 'রাধার' অভিসারে যাত্রা করিতে হইয়াছে, এবং কেমন চতুরতা ও যত্নের তার সাহায্যে তাঁহাকে ভগবানের পথে চলিতে হইয়াছে, তাহার কবিত্ব-ময় চিত্রে কবি অসাধারণ কল্পনা দেখাইয়াছেন। এইখানে রাধা সরলা কিন্তু বুদ্ধিহীনা নহেন। যখন "ঘন ঘন ঝন ঝন বজ্রর নিপাতে" তখন "পথ পিছল" ও "সঙ্কটক বাটে" "ঘন আঁধিয়ার" রজনীতে রাধা শতবার পদস্খলিতা হইয়াও "প্রেমক পরিচয়" দিতে আরাধ্যের পথে চলিয়াছে। এই দুঃখ-বরণ "শ্যাম-অনুরাগে তনু" ত্যাগ করিবার অনুরূপ। পরে কল্পনাতীত দুঃখকে বরণ করিবার শক্তিলাভের জন্য প্রথমেই অভ্যাস যোগ, যত্নশীলতা এবং সম্ভাবিত বাধা অতিক্রম করিবার উপায় নির্দ্ধারণ; যথা—

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
* * *
দূরতর পন্থ গমনে ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
মণি কঙ্কণ পণ ফণীমুখ বন্ধন
শিরই ভুজগ গুরুপাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।"

প্রিয়তমের দর্শন-লাভের আশা পথের বিপদ তাঁহাকে জানিতে দেয় নাই। এই অভিসার-কাহিনীর ভিতর দিয়া কবি নিজের কবিত্ব এবং রাধার সাধক পরিচয় দিয়াছেন। ভগবৎ-প্রেমের বাহিরে প্রকাশ বৃথা আড়ম্বর মাত্র, অন্তরের মধ্যেই তাহাকে জাগ্রত রাখিতে হয়; তার জন্যই "কানুক প্রেম রতন পুন গোপবি, বেকত করবি কুলটায়।" এইখানে বলা বাহুল্য যে, কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া অন্তর-প্রকাশের মধ্যে 'উপমা' ছড়াইবার জন্য কবি মোটেই ব্যস্ত নহেন।

'মিলনের' মধ্যে সম্ভোগের কাহিনীকে বৈষ্ণবের ধর্ম্মদর্শনের রূপক ধরিয়া লইলে সব ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিভাব দূরীভূত হইবে, মাধুর্য্য আকৃষ্ট আরাধক ও আরাধ্য মুক্ত এবং সরল, তাঁহাদের অন্তরও

লীলাশীল, রাধাকৃষ্ণের আত্মা ও ভাবধারা এমন বিমল স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে যে—

"দুহুঁক চপল চরিত নাহি সমুঝিয়ে
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি।"

আবার তিনি উপমায়ও অনেকটা বিদ্যাপতির মত, যেমন,—

"শ্যাম বয়ান পর বয়ান বিরাজই
উরপর কুচযুগ সাজে।
কনক-কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন মহোদধি মাঝে॥" ইত্যাদি

কিন্তু এই শ্রেণীর উপমায় বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। "কনক-কুম্ভ" ছাড়াও বিদ্যাপতি একই শ্রেণীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যসম্ভার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস ভাব হইতে ভাষা ও ছন্দের সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য অনেক স্থলে চেষ্টিত থাকায় বিদ্যাপতির মত অনুভবের গাঢ়তা এবং রসপূর্ণ উচ্ছ্বাস লাভ করিতে পারেন নাই।

রাধার দুর্জ্জয় অভিমানের প্রারম্ভে তাঁহার উন্মাদনা ও আকুলতা সংযত। রাধা কিন্তু অভিমান করিয়াও নিতান্ত সঙ্কুচিতা ও বিনীতা; কৃষ্ণের প্রেমে নিজকে অনুগৃহীতা মনে করিয়া কৃষ্ণত্যক্তা হইয়াও গৌরবান্বিতা। তিনি বুঝেন যে, তিনি কৃষ্ণপ্রেমের যোগ্যা নহেন, কাযেই এই প্রেম কৃষ্ণের অনুগ্রহমিশ্রিত। এই বিনয়-প্রকাশের মধ্যেই রাধার আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণের এই প্রেমকে অকারণ করুণা বোধে রাধা আত্মবিস্মৃতা হইয়া বলিতেছেন—

"রসিক মুকুটমণি, নায়ক হইয়া কেনে
এতেক আদর মোরে করে॥
আউলাঞা কবরীভার বেশ করে বার বার
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে॥"

ইহা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের করুণা নহে, ইহা অন্তরের অকৃত্রিম আকর্ষণ। এই আকর্ষণ-শৃঙ্খলের টানেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার গভীরতা স্মরণে পুলকিতা হইয়া রাধাই বলিতেছেন—

"সিনান দুপুর সময় জানি।
তপত পথেতে ঢালে সে পানি॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্নতলে লুটে কাহাই॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয় কান।
তা' দেখি আমার আকুল পরাণ॥"

এই সুখস্মৃতি বিরহাতুরার কাছে একটা বেদনামিশ্রিত আনন্দ দান করে, যাহা তাঁহার একমাত্র সম্পদ, ভক্তের জন্য ব্যাকুলতা ও সহৃদয়তা কৃষ্ণের চিত্তে অহরহঃ বিদ্যমান। মরমে বেদনা-বৃদ্ধির ভয়ে হয় ত অভিমানিনী রাধা "বদনে না লয় আর নাম", কিন্তু তাঁহার "নাসিকা সে মন্দের সৌরভে উনমত, তিনি "নীল গগন হেরি" "মাগই পাখ।" প্রিয়তমের স্মৃতিতে আত্মহারা নায়িকা তখন "কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি" চণ্ডিদাসের রাধার মত "কলঙ্কের হার" পরিয়া "নিজকুল-ভূষণ ভূষণ" মানিয়াছেন। অভিমান-পালার বিচ্ছিন্নার নীরব নিবেদন এত গাঢ় ও মর্ম্মস্পর্শী যে, স্বয়ং ভগবান্‌ই "পদতলে ধরণী লোটই" এবং "তবহুঁ রহত মুখ চাই।" পরে যখন উভয়েই অভিমানকে সম্বল করিয়াছেন, তখন উদ্দীপ্তপ্রেম হইলেও তাহা নির্ব্বাক্, মান ভাঙ্গাইবে কে? "দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম।" কেহ কাহাকেও সম্ভাষণ করিলেন না, সহচরীকে মাত্র ডাকিলেন, তবুও "সহচরী বোধে দুহুঁ দুহুঁ করু কোর", তখন একাত্মা হইয়াও তৃপ্তি নাই; চণ্ডিদাসের রাধা যেমন বক্ষঃস্থিত হারকে পর্য্যন্ত মিলনের অন্তরায় ভাবিয়াছিলেন, তেমনই গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণও "কোরে রহিতে দুহুঁ মানহ দূর।" কবি কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্য ও তদ্ধেতু ভালবাসার বরাবর নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের "ভাবী বিরহের" চিত্র চণ্ডিদাসের মিলনের মধ্যেও অকারণ বিরহাশঙ্কার অনুরূপ নহে। তাঁহার রাধা অক্রূর-সংবাদে জানিয়াছেন যে, রজনীর অবসানে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিবেন, তাই দিগ্বিদিক্‌হারা বিরহাশঙ্কাতুরা রাধা নবীন স্নেহ ভুলিয়া কেমন করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন, তাহার চিন্তায় তাঁহার—"লোরে ভর লোচন।" শ্রীকৃষ্ণবিহীন কুঞ্জ, যমুনা, কদম্বতল, এমন কি, বৃন্দাবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহাকে অসীম পীড়া দিয়া চিত্ত কলঙ্কিত করিবে! এখন যে তাঁহার নয়ন-লোর বাধা মানিতেছে না, কিন্তু—

গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥"

হয় ত শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মমতার জন্য রাধার প্রেমাশা চিরতরে বিসর্জ্জিতা হইবে, এমন কি, তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভাবিত, কিন্তু প্রিয়ের যেন কোন অমঙ্গল ঘটিতে না পারে। এমন স্বার্থহীনতার চিত্রাঙ্কনই গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব। এইখানে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। পবিত্রতায় ও ধর্ম্মপ্রাণতায় বঙ্গকবি মৈথিল কবি হইতে নিম্নে কি?

বিরহিণী রাধার আকুলতার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। জীবনবিসর্জ্জন প্রভৃতি কল্পনার কথা ছাড়া তাঁহার বিরহদগ্ধ জীবনের এক সুদীর্ঘ বারমাসী-বর্ণনা আছে, প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের যে অংশ মিলনকে শুভাশিসে উৎফুল্ল ও কল্যাণময় করিয়া দেয়, তাহার দৃশ্যও রাধার বিরহকে গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। বেদনাতুর হৃদয় যখন নিরাশার আঘাতে আহত হইয়া মৃত্যুর শরণ লইতে উদ্যত, তখন কৃষ্ণের সংশ্লিষ্ট জীবনবিহীন পদার্থে পর্য্যন্ত বিরহশঙ্কিণী রাধার মৃত্যু নিশ্চিত, তখন রাধার দেহের পরিণতির কল্পনা কিরূপ?

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত॥
যো দরপণে পহু নিজ মুখে চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোই বীজনে বহু বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদুবাত॥
যাঁহা পহু ভখমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥"

এ চিত্র অতি সুন্দর, ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এখানে দেহগত মিলনের আভাস মাত্র নাই, প্রেমের আবিলতা নাই বা চঞ্চল লীলা নাই, কিন্তু প্রেমের তীব্রতা আছে, যাহা চণ্ডিদাসের প্রেমের মত ভক্তির ও মাধুর্য্য-রসের অসাধারণ উচ্ছ্বাস, এখানে আত্মার মিলন। সমস্ত বৃন্দাবন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু রাধা-যশোদা-গোপী নহে "শারী-শুক-পিক-ময়ূরীও" এই বিরহে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু শেষে "ভাবসম্মিলনে" আলোর সন্ধান পাইয়াছে, নিজের মান-অভিমান ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরাত্মায় অভিষিক্ত করিয়া গান ধরিয়াছে—

তুহুঁ যদি লাখ গোপীসনে বিলসহ
তাহে মুঞি পাই আনন্দ।
সো মঝু অন্তরে কোটী সুখ হোয়ত
যৈছে নাহিক কিছু মন্দ॥"

গোবিন্দদাসের নিজের জীবনেও এই আনন্দ ফলিয়াছে। পবিত্রতা, স্বার্থহীনতা, কবিত্ব ও ভাষা-ছন্দের ক্ষেত্রে গোবিন্দকবি চৈতন্যযুগে অতুলনীয় নহেন কি?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, (এম, এ)



মেঘ মুক্তি

২

কিছুদিন পরে মনীষার বন্ধু অমিয়া আসিয়া আমাদিগের সভায় যোগ দিলেন। নরেশ বাবুদের ঠিক পাশের বাড়ী-খানীয় সম্প্রতি তাঁহারা উঠিয়া আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটির প্রকৃতি অদ্ভুত! ইঁহাদের সমাজের বাঁধাধরা শিষ্টাচার ও সংযত ভদ্রতার কোন ছাপ যেন তাঁহার গায়ে লাগিত না। তাঁহার লীলাচঞ্চল উদ্দাম ঝরণার মত প্রকৃতি অবাধ আনন্দ ও চাপল্যে ভরা—যেন নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর!

প্রথম সাক্ষাতের দিন মনীষা তাঁহাকে আমার পরিচয় দিয়া আমায় বলিলেন, "ইনি আমার বন্ধু—অমিয়া! আপনি এঁকে আগেই দেখেছেন, অজিত বাবু? তবে তখন অবশ্য ইনি 'ট্যাবলোর' অভিনয়ে শকুন্তলার সাজে ছিলেন।"

আমি মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

মনীষা বলিলেন, "সে দিন তোর অভিনয় অজিত বাবুর বড় ভাল লেগেছিল, বুঝলি অমিয়া? আমাদের কাছে উনি শকুন্তলার খুব সুখ্যাতি করছিলেন।"

অমিয়া হাসি ও কৌতুকে ভরা তাঁহার চঞ্চল নেত্রযুগল আমার দিকে ফিরাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই না কি? কিন্তু আপনি ত কই সে কথা আমায় কিছু বল্লেন না? এই প্রথম আলাপ-পরিচয় হলো, এখন দু পাঁচ বার আমার গুণের কথাটা একটু সাজিয়ে গুজিয়ে বলুন, তবে ত শীঘ্রই বন্ধুত্ব জমে উঠবে? জানেন ত—মেয়েরা নিজের প্রশংসা শুন্‌লে সহজেই কি রকম উৎফুল্ল হয়ে ওঠে?"

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নরেশ বাবু বলিলেন,—"ঐখানটায় তোমার একটু ভুল হলো, অমিয়া? স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে অজিত বাবুর বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কারণ উনি ডাক্তার মানুষ—ওঁর যা কিছু কারবার—সে সব শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিয়ে।"

অমিয়ার চোখে মুখে যেন আতঙ্কের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তা হলে ত ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমার ধাতে পোষাবে না দেখছি! আপনি কিছু মনে করবেন না, অজিত বাবু। সত্যই বলছি—পণ্ডিত লোকদের আমি বড়ই ভয় করি!"

আমি সবিনয়ে বলিলাম,—"নরেশ বাবুর কথা শুনে প্রথম আলাপে আমায় একবারে বয়কট করে দিলেন। এটা কিন্তু আমার উপর বড়ই অবিচার করা হলো। দুদিন পরীক্ষা করেই দেখুন না—হয় ত যতটা ভয়ানক ভাবছেন-ততো নাও হতে পারি।"

ক্ষুব্ধ হাসির বেগে অমিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা সে দেখাই যাক্—পরীক্ষার ফল কি দাঁড়ায়? কি বলেন আপনারা?"

ঊষা ও মনীষার আননে হাস্যের বন্যা বহিতেছিল। নরেশ বাবু বলিলেন, "সেই কথাই ভাল। ও বেচারা আরজী মঞ্জুর করে দেখ দিনকতক, তোমার কাছাকা থাকলে কালে হয় তো ওঁর মতিগতি ফিরতেও পারে। শাস্ত্র বলছেন,—'অঙ্গার যদি অগ্নির কাছে থাকে—তবে তার স্পর্শে নিজের মলিনতা ত্যাগ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠে' এ ক্ষেত্রে—"

মনীষা বাধা দিয়া বলিলেন, "এ ক্ষেত্রে অজিত বাবু হলেন তা হলে অঙ্গার! আপনার সম্বন্ধে আপনার ধারণটা কি—সেটা দেখছেন ত অজিত বাবু?"

আমি বলিলাম, "উনি ঠিক কথাই বলেছেন—কারণ—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নরেশ বাবু বলিয়া উঠিলেন "কারণ, এ কথার প্রতিবাদ করবার অজিত বাবুর উপ নেই। শাস্ত্র সেখানেও বলে রেখেছেন—মহৎ জনরা কখ আত্মপ্রশংসা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন না। দীনতা ও বিনয়ই মহতের লক্ষণ। কাযেই এ ক্ষেত্রে একটা অশাস্ত্রীয় কায করে উনি নিজের মহত্ত্ব খণ্ডন করতে পারবেন না।"

ঊষা বলিলেন, "কিল খেয়ে কিল চুরি কর্ত্তে হবে? এই ত?"

একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। অমিয়া তখন বলিলেন, "দেখুন—অজিত বাবু! অভিনয় সকলের খুব ভাল লাগলো—টাকাও উঠলো যথেষ্ট। সাহায্য-ভাণ্ডারে দানের পরিমাণটাও বেশ মোটা রকম হলো; কিন্তু আমার 'ডিসাপয়েন্টমেণ্ট'টা যে কি রকম মারাত্মক হয়ে উঠলো—সে খবরটা কেউ রাখলে না? সে কথাটা আজ সকলের কাছে বলেই ফেলি। অভিনয় যাতে ভাল হয়—তার জন্য ত প্রাণপাত পরিশ্রম করে রিহার্শাল দিতে দিতে আহার-নিদ্রা ত্যাগ হবার উপক্রম! এতে আমাদের আশা কি? না—পাঁচ জনে দেখে ভাল বলবে—প্রশংসা করবে—এইটুকু ত? ফলটা শেষ দাঁড়াল—সকলের মুখেই এক কথা—'বেদগানটা যা চমৎকার হয়েছিল'? বুঝুন একবার ব্যাপারটা! এতে মনের অবস্থা কি রকম হয় একবার বলুন ত?"

মনীষা হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "তুই কিন্তু বড় হিংসুটে মেয়ে, অমিয়া? লোকে তোদের প্রশংসা করে নি? সকলেই ত অভিনয় খুব ভাল হয়েছে বল্‌লে—কাগজে পর্য্যন্ত তোদের নাম উঠে গেল—তবু তোর আর মন ওঠে না।"

অমিয়া ঊষার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"সে তো পরে! আগে শুধু ঊষারই জয় জয়কার! অথচ ও গানটার জন্যে ওকে কিছুই খাটতে হয় নি। আমরা খেটেও মরলুম—আর প্রশংসা যা পেলুম—সেও নেহাৎ হতশ্রদ্ধায়! বেদগানের অত সুখ্যাতি করে শেষে অভিনয়ের কথা কিছু না বল্লে ভাল দেখায় না—তাই হেলায় ফেলায় যা হোক্ কিছু একটা বলে দিলে! উঃ! ঊষির উপর সেদিন কি আমার রুম রাগ ও হিংসে হয়েছিল?"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "কিন্তু অমিয়া দেবি! এ ক্ষেত্রে আমাকে আপনি ও অপবাদটা দিতে পারবেন না। আপনি এঁদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন—আমি আগে অভিনয়ের প্রশংসা করে, তবে বেদগানের কথা বলেছিলুম।"

অমিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"তাই না কি মনীষা দি? যা হোক, কথাটা শুনে মনের ক্ষোভ অনেকটা মিটলো এবং প্রমাণ হয়ে গেল যে, নরেশ বাবুর অভিযোগ অসঙ্গত, আর অজিত বাবুই একমাত্র রসজ্ঞ ও সুধী ব্যক্তি। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া অন্য সরস বস্তুর রস উপভোগ করবার ক্ষমতা ওঁর আছে।"

ঊষা এতক্ষণ একখানা স্বরলিপির খাতার পাতা উল্টাইতেছিলেন,—তিনি এখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু অমিয়াদি? অজিত বাবুর কথা শুনে ত তোমার উপর আমার হিংসে হয় নি?"

অমিয়া ঊষার এলো খোঁপাটি নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার হিংসে হবে কি ক'রে? তুমি যে আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের জীব—সাধারণ মানবধর্ম্ম কি তোমায় স্পর্শ করতে পারে? আমি ত এখনও তোমার মত নিষ্কামব্রতী হ'তে পারি নি। তাই সাধারণ মানুষের দোষ-গুণ সবই আমার ভিতর বর্ত্তমান রয়েছে। কি বলেন—অজিত বাবু?"

ঊষার শান্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "সে ত ঠিক কথা—অমিয়া দেবি! সাধারণ মানুষের মধ্যে যতক্ষণ এ সব প্রবৃত্তি জেগে থাকবে, ততক্ষণ ত তাকে তার মধ্য দিয়েই চল্‌তে হবে। তবে কি না, মানুষ ত শুধু এইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাই তাকে এ সব ছোট জিনিষকে দমন ক'রে সত্য ও সুন্দরকে জানবার সন্ধানে ছুটতে হয়।"

অমিয়া এবার একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমার দ্বারা যে কোন দিন ও সব চেষ্টা সম্ভব হবে, তার আশা নেই। অন্ততঃ এ জন্মে ত নয়। ও সব বড় বড় কথা মনে হলেই আমার ভয় হয় যে, অনবরত উচ্চ চিন্তা করতে করতে আমার এ হাসির উৎস হয় ত শুকিয়ে যাবে—আমিও বুঝি তখন গুরুগম্ভীর দার্শনিক হয়ে উঠবো! উঃ! সে কি ভয়ানক অবস্থা!"

নরেশ বাবু বলিলেন, "তোমার ও সব কথা ভেবে ভয় পাবার কোনও দরকার নেই, অমিয়া! কারণ, প্রমাণ হয়ে গেছে যে, যার যা আছে, সে তাই হয়, আর যার যা নেই, সে তা হয় না। তবেই বোঝো—এ ক্ষেত্রে তুমি তোমার স্বতঃসিদ্ধ আনন্দ ছেড়ে কোন দিনই দার্শনিক প্রকৃতির হ'তে পারবে না। অতএব—অনাগত ভবিষ্যৎচিন্তা ছেড়ে দি[illegible]

অজিত বাবুকে তোমার দু একটা গান শুনিয়ে দাও। উনি গান শুন্‌তে বড় ভালবাসেন।"

অমিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে ত ভাল কথা! কিন্তু আমি এখন রবিবাবুর পুরানো গানগুলি অভ্যাস করছি। সেই সব গানই এখন ভাল রকম অভ্যস্ত আছে। পুরোনো গান কি আপনার ভাল লাগবে?"

আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। রবিবাবুর নূতন বা পুরাতন কোন গান সম্বন্ধেই আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না।

মনীষা আমার অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "তুই যা গাইবি —তাই ওঁর ভাল লাগবে। গান মাত্রেই ওঁর প্রিয়— তাতে ওনার কোন ইতর-বিশেষ নেই।"

অমিয়া আর কিছু না বলিয়া অর্গানের কাছে গিয়া বসিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে সেই অচেতন যন্ত্র প্রাণময় হইয়া এক বিচিত্র উন্মাদনাময় সুরে বাজিয়া উঠিল। উল্লাস ও পুলকের উচ্ছ্বাসে চঞ্চল—অপূর্ব্ব সে সুর। তিনি গাহিলেন,—

"সুখে আছি—সুখে আছি—সখা, আপন মনে—
কিছু চেয়ো না—দূরে যেও না—
শুধু চেয়ে থাক—শুধু ঘিরে থাক—কাছাকাছি—
সুখে আছি—সুখে আছি!"

গানের সুরে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

"সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম—নীরবে দেবে প্রাণ
রচিয়া ললিত মধুর বাণী, আড়ালে গাবে গান,
আর,গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালা গাছি!
সুখে আছি—সুখে আছি!"

ছন্দ ও সুর যেন নৃত্যের তালে তালে ঢেউ তুলিয়া বহিতেছিল। গানের ভিতরে গায়িকা আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। আমি অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলাম, গানের ছন্দে ছন্দে যেন তাঁহার প্রতি অঙ্গে রাগরঙ্গময়ী চটুলা কিশোরীর নব যৌবনের অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। আবেশ-চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে কি তরল মাদকতা উচ্ছ্বসিত—আনন্দে ও কৌতুকে ঢল ঢল!

"মধুর যামিনী, মধুর চাঁদিনী, মধুর মলয় বায়
এই মাধুরীর ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়
শুধু আমি আপনার মাঝে আপনি হারা—আপন সৌরভে মাত
যেন আপনার মন—আপনার প্রাণ—আপনারে সঁপিয়াছি
সুখে আছি—সুখে আছি!"

গান শেষ হইল। বোধ হইল—যেন একটা সুরে মালা আকাশ-পথে উঠিতে উঠিতে হঠাৎ ছিঁড়িয়া গি কাঁপিতে কাঁপিতে বায়ু-তরঙ্গে মিলাইয়া গেল!

আমরা সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। নরেশ বাবু বলিলেন, "গান কেমন হলো, সে বিষয় কি না বলাই ভালো—অমিয়া;—কারণ—"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "কারণ শুধু 'চমৎকার গেয়েছেন' বল্লে কিছুই বলা হয় না? চেয়ে কিছু না বলাই ভালো। কিন্তু একটা গান শুনি থামলে চলবে না, অমিয়া দেবি! এতে আমাদের হ'ল না। শুধু শোন্‌বার পিপাসা আরো বেড়ে গেল।"

অমিয়া প্রসন্ন, মধুর ভাবে হাসিয়া আবার অর্গানে দিলেন। গানের পর গান শুনিয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন রাত এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

অমিয়া আসিবার পর হইতে আমাদের সভার বাঁধা নিয়ম সমস্তই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। উদ্দাম বাতাস যেমন তাহার চারিদিকে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি অমিয়াও তেমনই নিজের কাছাকাছি এমন একটা হাওয়া সৃষ্টি করিতেন—যেখানে শুধু হাসি, গান, গল্প আর কিছু জমিতেই পারিত না। ফলে আমাদের জনে মুখোমুখি করিয়া চা পান করিতে করিতে নানা তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা বা কোন নূতন বিষয়ের একবারে বন্ধ হইয়া গেল। অমিয়ার উন্মুক্ত প্রাণের সংস্পর্শে আসিয়া সহসা আমরাও যেন অত্যন্ত ও প্রাণময় হইয়া উঠিলাম। বৈকালে ঘরের মধ্যে বন্ধ অমিয়ার ভাল লাগিত না। ক্রমে সেটা আমাদেরও রুচিবিরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

"কি যে তোমরা ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে গুজগুজ আমার একটুও ভাল লাগে না। এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা কেবল ঘরের কোণে ব'সে কাটাবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল আজ আর বাড়ীতে চা খাওয়া হবে না, মনীষাদি। চল আজ গঙ্গার ধারে আউটরাম ঘাটে গিয়ে চা খাওয়া যাক!

অমিয়ার এই প্রস্তাবে আমরা সকলে সেই মুহূর্ত্তে

হইলাম। সে দিন বাড়ীর চা বন্ধ রাখিয়া যথাসময়ে সাজ-সজ্জা করিয়া পাঁচ জনে আউটরাম ঘাটের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম।

সেই মাত্র সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। পশ্চিম আকাশে তখনও বিচিত্র বর্ণের লীলা-বিলাস চলিতেছিল, আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আভায় চারিদিক ক্রমেই সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। ওপারের কলের চিমনীগুলি অস্পষ্ট ছায়ার মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গঙ্গার জলে দুই একখানা বড় জাহাজ নোঙ্গর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একখানা ষ্টীমার তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একখানা পাল্‌সী জলে ভাসিতেছে।

নরেশ বাবু খানসামাকে ডাকিয়া চায়ের অর্ডার দিলেন। আমরা সকলে সম্মুখের বারান্দায় চৌকি টানিয়া বসিলাম। অমিয়া সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন,—

"তুমি, সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা
মম হৃদয়-গগন-বিহারী।
আমি, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, তোমারে করেছি রচনা
তুমি আমারি—তুমি আমারি।"

হঠাৎ তিনি গান বন্ধ করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কোন্‌টা আপনাদের ভাল লাগছে? এখানটা —না সেই ঘরের কোণটা!"

উষা ও মনীষা মুগ্ধ নেত্রে সন্ধ্যার শোভা দেখিতেছিলেন। নরেশ বাবু অমিয়ার গানের সুরে ও ভাবমাধুর্য্যে তন্ময়—আমিও দৃশ্যটা বেশ মন দিয়াই উপভোগ করিতেছিলাম; মনে হইতেছিল, বাড়ী-ঘরের বাঁধন ছিঁড়িয়া এ একটা স্বতন্ত্র বিরাট জগতে আসিয়া পড়িয়াছি। কাযেই আজিকার সন্ধ্যা যে অত্যন্ত সুন্দর লাগিতেছে, এ কথা এক-বাক্যে স্বীকার করা হইল।

এখন হইতে প্রতিদিনই সন্ধ্যাটা আমরা বাড়ীর বাহিরেই যাপন করিতে লাগিলাম। চা কোন দিন বাড়ীতে —কোন দিন বা বাহিরে খাওয়া হইত। তাহার পর দুই তিন ঘণ্টা কোন দিন বায়স্কোপে—কোন দিন ঈডেন উদ্যানে—কোন দিন বা ষ্টীমারে বেড়াইয়া বাড়ী ফেরা হইত। তাহার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত গান-গল্প চলিত।

পরদিনের 'প্রোগ্রাম' প্রায় সেই সময়ই স্থির হইয়া যাইত। এ বিষয়ে অমিয়াই ছিলেন অগ্রণী। তিনি যাহা স্থির করিতেন—নরেশ বাবু তাহাতে আপত্তি না করিয়া সেই ব্যবস্থাই মানিয়া লইতেন। মনীষার সর্ব্ববিষয়েই নরেশ বাবুর মতের উপর নির্ভর; কাযেই অমিয়া তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই প্রস্তাবটা নরেশ বাবুকে দিয়াই পাশ করাইয়া লইতেন। আমার বা উষার ইহাতে কিছু বক্তব্য থাকিত না। তবে এক এক সময় আমার মনে হইত, যেন মনীষার স্নিগ্ধ হাস্যময় নয়নে ক্লান্তি ও অস্পষ্ট বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

অমিয়া আসার পর হইতে আমাদের কথা বলা প্রায়ই কমিয়া গিয়াছিল। কারণ, তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ অন্য কেহ কথা বলিবার প্রায় অবসর পাইত না। তাঁহার কথা, হাসি, গল্পে আসর জমিয়া উঠিত। নরেশ বাবু আর আমি মাঝে মাঝে তাঁহার কথার দুই একটা উত্তর দিতাম। মনীষা প্রায়ই গল্পের মধ্যে যোগ দিতেন না। উষা ত একবারেই নীরব।

কিছু দিন এই ভাবেই চলিতে লাগিল। আমার নিজের কাযকর্ম্ম এ বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কমিয়া গিয়াছিল।

সকালে উঠিয়া কায-কর্ম্ম সারিয়া ডিস্পেন্সারীতে আসা ও রোগী দেখা সারিয়া বাড়ী ফেরা—ইহাতেই প্রায় বেলা একটা দেড়টা বাজিয়া যায়। তার পর স্নানাহার সারিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালের দিকে বেড়াইতে যাওয়া হইত। আমার নিজের যা কিছু লেখাপড়ার কায—সে সবই ইতঃপূর্ব্বে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত চলিত।

এখন কোন রকমে সকালের কাযগুলি শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়াই মনে পড়ে—বেলা পাঁচটা বাজিলেই ও বাড়ীতে যাইতে হইবে! বৈকালের প্রতীক্ষায় প্রতিদিনই প্রাণ যেন আকুল হইয়া থাকিত। এ কি অদ্ভুত নেশায় আমায় পাইয়া বসিয়াছিল! কত দিন মনে করিয়াছি, বড় বেশী বাড়াবাড়ি হইতেছে। মাঝে মাঝে দুই এক দিন বাদ দিয়া যাওয়া ভাল! কিন্তু সে কিছুতেই ঘটিয়া উঠিত না। ঘড়ীতে চারিটা বাজিলেই আর স্থির থাকিতে পারিতাম না। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। তার পর বাড়ী ফিরিতে রাত্রি এগারোটা! তখন শরীর মন দুই-ই অবসন্ন। আহারের

পর শয্যার আশ্রয় লইতাম। কায কর্ম্ম করিবার অবসর কাযেই ঘটিয়া উঠিত না।

আমার কিন্তু এ জন্য কোন ভাবনা বা উদ্বেগ ছিল না! তখন এক অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র অনুভূতিতে মন আমার কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এত দিন যে সব চিন্তা—যে সব জ্ঞানের চর্চ্চায় অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন সে সব নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইত। চির-দিনের সেই পুরাতন ধরণী এখন যেন নিত্য নব নব সৌন্দর্য্যে ভরা—প্রতিদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অপূর্ব্ব পুলকের স্পন্দনে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। মনে হইত—আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র সেই পুলকের স্পন্দন ছড়া-ইয়া পড়িয়াছে। আর মনে হইত—পুষ্পিত লাবণ্যে ভরা উষার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ। সেই মুখের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াই যেন পৃথিবীর সমস্ত শোভা—সমস্ত হাসি আলো সার্থক হইয়া ঝলমল করিয়া উঠিত। আর আমার সুখাবেগে অধীর চঞ্চল অন্তর হইতে কেবল একটা কথাই যেন নিশ্বা-সের তালে তালে ধ্বনিত হইয়া উঠিত—আমি ভালবাসি! আমি ভালবাসি!

উষার ব্যবহারেও ধীরে ধীরে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আগে তিনি যেমন সর্ব্বদাই একটা স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া আমার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, আজ কাল যেন তাহা ধীরে ধীরে অন্তাহৃত হইতেছিল। অমিয়া যখন তাঁহার নিজের হাসি ও গল্পে সকলকে তন্ময় করিয়া রাখিতেন, উষা তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলিতেন। বাহিরে কোথাও বেড়াইতে গেলে আজ কাল অনেক সময় তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার পার্শ্বের আসনে বসিয়া পড়িতেন। আমাদের মধ্যে এত দিনের দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছিল। জানি না কেন, আমার যেন মনে হইত, আমি এখন তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আমার অত্যন্ত নিকটে পাইয়াছি। আমার হৃদয়ের তন্ত্রে অহরহ যে সুর বাজিতেছে—এত দিন পরে তাঁহার অন্তরও কি সেই সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে?

সে দিন বৈকালে একটু বৃষ্টি হইয়াছিল; সুতরাং আমরা কোথাও না গিয়া ঘরের মধ্যেই চা পানের আড্ডা জমাইয়া তুলিলাম। অমিয়ার বোধ হয় মনটা ভাল ছিল না, তাই গল্পও ঠিক জমিয়া উঠিতেছিল না। তবে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকাও তাঁহার ধাতুতে পোষায় না। চা পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "যুথিকার সঙ্গে এবার অনেক দিন আমাদের দেখা হয় নি, তার খবর কি জান—মনীষা-দি?"

মনীষা আমাদের পেয়ালায় চা ঢালিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "যুথী তো সেই ট্যাবলোর দিনে আমার সঙ্গে সেতার বাজিয়ে ছিল—তার পর এ দিকে মাসখানেক আমাদের বাড়ী আসে নি। কেন? কি হয়েছে তার?"

অমিয়া বলিলেন, "কাল বালিগঞ্জ থেকে মাসিমা এসে ছিলেন—তাঁর কাছে শুনলুম—যুথিকা আজ কাল কোথাও বেরোয় না—কারু সঙ্গে দেখা করে না—ভারি মন খারাপ—নিশীথ-দা না কি আজ কাল তার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করে না। দীপ্তির সঙ্গে আজ কাল তার বড় বন্ধুত্ব।"

মনীষা কথাটা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এ তো নিশীথ বাবুর বড় অন্যায়। সেবার দার্জ্জিলিং বেড়াতে গিয়ে যুথিকাকে দেখে তাঁর এত ভাল লাগলো যে, এক মাসের মধ্যে তাকে বিয়ে করে আনলেন। তার পর এর মধ্যেই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার!"

নরেশ বাবু পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন, "বাপ্! একেবারে একতরফা ডিক্রী মঞ্জুর হয়ে গেল! নারী জাতি স্বভাবই এই—তাঁরা কখনো কথাটা সব দিক্ দিয়ে বিচার করে দেখ্‌বেন না। আগে ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ যে ব্যাপারটা কি ঘটেছে, তবে ত তার ন্যায়-অন্যায় বিচার হবে? হয় ত কিছুই হয় নি। নিশীথ দীপ্তির সঙ্গে বন্ধুভাবেই মেশামেশি করে, যুথিকা তাই থেকে একটা গল্প সৃষ্টি করে নিয়ে মিছে কষ্টভোগ করছে।"

মনীষা বলিলেন, "বন্ধুভাবেই হোক্ বা যেভাবেই হোক্ মেয়ে পুরুষে মেশবার যে একটা সীমা আছে, সেটা অতিক্রম না করলে কারুর চোখেই মেলামেশা করাটা অন্যায় বলে মনে হয় না। যুথিকা যখন তার স্বামীর সম্বন্ধে এতবড় একটা কথা ভাব্‌তে পেরেছে, তখন নিশ্চয় নিশীথবাবু তাকে সে কথা মনে কর্‌বার অবসর ও সুযোগ দিয়েছেন। এ কথা ত স্বীকার করতে হবে?"

বহুদিন পরে আবার একটা আলোচনার সভা জমিয়া উঠিল! এ রকম কোন একটা কথা উঠিলে নরেশ বাবুর উৎসাহ ও আগ্রহ যেন শতগুণ বাড়িয়া যাইত।

তিনি বলিলেন, "নিশীথ যে অবশ্য দীপ্তির সঙ্গে কি ভাবে মিশছে, সে কথা আমরা ঠিক জানি না; কাযেই জোর করে কোন কথা বলা যায় না। তবে তর্কের স্থলে আমি এই কথা বল্‌তে চাই মনীষা, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যে রকম অবাধ অকৃত্রিম বন্ধুতা হ'তে পারে, মেয়ের সঙ্গে পুরুষেরও ঠিক সেই রকম বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব। যেখানে সত্যই কোন মেয়ের সঙ্গে পুরুষের এ রকম মনের সম্বন্ধ ঘটে যায়, সেখানে যদি তারা সমাজের বাঁধাধরা নিয়মে দু'চারটে কথা বলে তৃপ্তি না পায়, তা হলে তাদের দোষ দেওয়া চলে না। সামাজিক নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে না থেকে তারা যে অবাধ অসঙ্কোচে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেশে, তার জন্য সমাজ তাদের নিন্দা করে, আত্মীয় স্বজন হয় ত ক্ষুণ্ণ হয়; কিন্তু সত্যি হয় তো তার মধ্যে কোন গ্লানি থাকে না।"

অমিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমিও ঠিক ঐ কথা ভাবি, নরেশ বাবু! যেখানে সত্যি কোন মনের যোগ ঘটে, সেখানে অত ভেবে চিন্তে নিয়ম-কানুন বজায় রেখে আমি চল্‌তে পারি না। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু যে রকম ভাবে মিশে তৃপ্তি পায়, তাকে তেমনি খোলাখুলি ভাবেই মিশতে দেওয়া উচিত, মেয়ে পুরুষের নানা বাচ-বিচার নিয়ে মানুষ কেন তাদের বাধা দেবে?"

মনীষার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তোমার এ কথাটা ঠিক নয়, অমিয়া! উনি অনেক উন্নত দিক থেকে কথাটা বিচার করছেন, কিন্তু এমন অনেক উচ্চ অঙ্গের কথা আছে, যা শুধু থিওরি পর্য্যন্তই চলে ও ভাল লাগে, ব্যবহারিক জগতে সে সব চালাতে গেলেই অনর্থ বাধে। কারণ, এ পর্য্যন্ত মানুষ চিন্তার রাজ্যে যতটা উন্নত হতে পেরেছে, বাস্তব-জগতে সে রকম হতে পারে নি। সেখানে সে বাসনা, কামনা ইত্যাদি প্রবৃত্তিকে একবারে অতিক্রম করতে অক্ষম। যাক্, মাসি-মা যুথিকার কথা আর কি বল্লেন?"

অমিয়া বলিলেন, "মাসি মা ত ঠিক ওদের পাশের বাড়ীতেই থাকেন। যাওয়া আসা রোজই চলে। তিনি ওদের সব খবরই রাখেন। শুনলুম, কিছুদিন আগে থেকেই ওদের মধ্যে আর তেমন সদ্ভাব ছিল না। নিশীথ-দা একটু তফাৎ তফাৎ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ সব নিশীথ-দার দিক থেকেই—যুথিকা এখনো তাকে আগের মতই ভাল-বাসে। দীপ্তির সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে নিশীথ-দা নাকি তাকে নিয়েই এখন সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, যুথিকার কথা ভাব্‌বার তার সময় নেই। কাযেই যুথিকা এখন একলা ঘরে কেঁদে মরছে।"

আমার কাছে যুথিকা বা নিশীথ উভয়েই সমান অপরি-চিত। তবু ইহাঁদের কথাবার্ত্তার মধ্যে সেই ব্যথিতা নারীর অন্তর-বেদনার আভাস জানিয়া আমার মন করুণায় ভরিয়া উঠিল। মেয়েরাও এই করুণ কাহিনী শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মনীষা গম্ভীর বিষণ্ণমুখে কি ভাবিতেছিলেন।

ঊষা বলিলেন, "আপনি যাই বলুন, নরেশ-দা! আমরা কিন্তু একমত হয়ে বোলবো, নিশীথ বাবু অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। তিনি আধুনিক যুগের শিক্ষিত ভদ্রলোক, বিবাহিত জীবনের সকল মর্য্যাদা রক্ষা করে পবিত্রভাবে তিনি চলবেন, এইটাই সকলে তাঁর কাছে আশা করে। তিনি সে সব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশে চলে স্ত্রীকে অযথা এ রকম কষ্ট দিচ্ছেন, এটা কি তাঁর উচিত হচ্ছে?"

নরেশ বাবুর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "হয় ত উচিত হচ্ছে না। কিন্তু এই উচিত-অনুচিত বিচার করবার মাপকাঠিও ত সব সময় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মত হ'তে পারে না? তাতেও মত-ভেদ আছে যে! যাক্-গে সে কথা, এখন তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঊষা! জীবনে বিবাহ-বন্ধনটাই কি সব চেয়ে বড়?"

ঊষা এ প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কেন? সে বিষয়েও আপনার কোন সংশয় আছে না কি?"

নরেশ বাবু বলিলেন, "আমার কথা না হয় পরেই বলব—আপাততঃ আমি তোমাদের সকলকেই এ কথা জিজ্ঞাসা করছি। অজিত বাবু! আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?"

আমরা সকলেই একবাক্যে বিবাহ-বন্ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলাম। তখন নরেশ বাবু বলিলেন, "এখন দেখা যাক্, কেন আমরা এই জিনিষটাকে এত শ্রেয় ও পবিত্র ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। সৃষ্টির আদি যুগে অসভ্য মানুষে

মধ্যে এ নিয়ম ছিল না। মানুষ যখন ক্রমে সভ্য হ'ল, যখন সে ঘর বেঁধে সমবায় ও শান্তি-সুখে পূর্ণ গৃহের প্রয়োজনীয়তা ও আরাম বুঝল, সন্তান প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব ও নিজ নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার কথা ভাবতে শিখল—তখন থেকেই সমাজ গঠিত হ'ল ও এই সব নানারূপ সামাজিক নিয়মের উৎপত্তি হ'ল। এর বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই। কারণ, আমিও সামাজিক মানুষ—সমাজের সকল নিয়ম পালন করেই চলে থাকি। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই—এ সব বিধি-নিষেধ মানুষ নিজের সুখ-সুবিধা বজায় রাখবার জন্য নিজেই সৃষ্টি করেছে, তার হৃদয়টা কিন্তু এ গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ করতে পারে নি; কারণ, সে জিনিষটা মানুষের সৃষ্ট-নিয়মের অনেক উর্দ্ধে—তাকে এমন একটা বন্ধনের মধ্যে বাঁধতে পারা যায় না। এখন যদি কোন মানুষের মন এই বিধিবদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত কোন কায করে বা করতে বাধ্য হয়—তবে সে কি অপরাধী হবে?"

মনীষা বলিলেন, "তোমার এ যুক্তি অনুসারে কায হ'লে ত সমাজে কোন শৃঙ্খলা বা নিয়ম থাকবে না। নিশীথ বাবুর হৃদয় এক দিন যূথিকাকে লাভ করতে চেয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে—সেটা ভুল। তিনি দীপ্তির মধ্যেই তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। বছর খানেক পরে তাঁর হৃদয় যে অন্য এক জনের জন্য আবদার ধরবে না—তাই বা কে বলতে পারে? তুমি যে কেমন ক'রে এই অসংযত অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন করছো—আমি ত তা বুঝতে পারছি না।"

নরেশ বাবুর প্রসন্ন ললাটে চিন্তার ছায়া পড়িল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "তুমি আমায় এমন করে ভুল বুঝো না, মনীষা! আমি উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোন দিন সমর্থন করি নি এবং নিতান্ত মতিচ্ছন্ন না ধরলে কোন দিন করবো না বলেই আশা রাখি। আমি শুধু তোমাদের বলছিলুম, কথাটা যখন উঠেছে—তখন এর স্বপক্ষে কি কি যুক্তি আছে, বিচার ক'রে দেখা যাক্। আমার মত এই যে, বিবাহবন্ধনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চলা সকল সামাজিক লোকেরই উচিত—কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি—তর্কস্থলে না হয় এখন নিশীথের নামটাই ধরা যাক্—এখন নিশীথ যদি তার স্ত্রীর প্রতি মনের কোন আকর্ষণ বা ভালবাসা অনুভব না করে—এ বন্ধনটা তাদের পরস্পরের যা সার্থক হয়েছে ব'লে যদি তার না মনে হয়, তবে এ ক্ষে সে কি করবে? তোমরাই বল, তার কর্ত্তব্য কি?"

ঊষা ও মনীষা উভয়েই নীরবে ভাবিতে লাগিলে অমিয়া নিজে কিছু না বলিয়া মনীষার উত্তর শুনিবার প্রতী করিতে লাগিলেন। আমি জানিতাম, ইহার পর প্র আমার উপরেও আসিবে, সুতরাং আমিও মনে মনে ব টার যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে মনীষা বলিলেন, "আমার মনে হয়, এ ক্ষে নিশীথ বাবুর নিজের মন সংযত ক'রে ভদ্র ও সৎ ভা চলবার চেষ্টা করাই উচিত। চেষ্টা করলে মনের যে গ ফেরানো যায় না, এ আমার বিশ্বাস হয় না। মানু জীবনে নানা দিকে নানা পথ খোলা আছে, এক দি বাধা পড়লে অন্য দিকে মন ফিরিয়ে সুখী হওয়া যায়। ব'লে অনুরাগিণী স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে অন্যত্র সেই সুখের সন্ধা ছুটে বেড়ান কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। সে শুধু অসংযত প্রবৃত্তির নামান্তর মাত্র। ভদ্র নাম ও যু দিয়ে ঢাকলেও তার কদর্য্যতা লুকানো থাকবে না।"

ঊষা বলিলেন, "দিদি যা বল্লেন, আমারও সেই মনে হয়।"

নরেশ বাবু অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তো কি মনে হয়, অমিয়া?"

অমিয়া এই সব নীরস বিষয়ের আলোচনায় হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ছাই পাঁশ ভেবে ভেবে মাথা বকাতে পারি না। আ কি স্থির করলেন, বলুন, চোক কাণ বুজে শুনে যাই।"

তখন নরেশ বাবু বলিলেন, "অজিত বাবুও বোধ মনীষার মতেই মত দেবেন! কারণ যে কোন ভদ্র ও উ চিন্ত লোকের মনে প্রথমে এই কথাই আসে। দেখুন, পর একত্র থাকতে গেলেই মাঝে মাঝে খুঁটিনাটি বিষয় নি মনোমালিন্য বা অশান্তি হয়েই থাকে। সব সংসারে রকম হয়, আবার মিটেও যায়। এ নিয়ে বেশী মাথা ঘ বার কেউ প্রয়োজনবোধ করে না। যদি ব্যাপার এর আরো বেশী গুরুতর হয়ে ওঠে, তা হলেও আমি মনী মতে সায় দিয়ে বলি, যতদূর সম্ভব পরস্পরের মধ্যে মিটি করে শান্তিতে থাকবার চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু আ

বলেছি, একটা বিশেষ কোন মাপকাঠি দিয়ে সর্ব্বকালে সব মানুষের বিচার করা যায় না। কাযেই যে ক্ষেত্রে এ ভাবে থাকবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়, সেখানে মানুষ কি করবে? অবশ্য যারা অসংযত প্রবৃত্তির বশে আজ এখান—কাল ওখান ক'রে বেড়ায়, তাদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। সংসারে ও-শ্রেণীর লোক চিরদিন আছে ও চিরদিন থাকবে। তাদের বাদ দিয়ে আমি এ যুগের ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের কথাই বলছি—যেমন, নিশীথ যদি আজ সত্যই অনুভব করে যে, যূথিকার সঙ্গে তার আর মনের কোন যোগ নেই, যদি চেষ্টা করেও যথাসম্ভব শান্তিতে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, সে স্থলে একসঙ্গে থাকলে দুজনেরই জীবন অশান্তিময় ও ব্যর্থ হয়ে যাবে না কি? স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যে প্রেম, যে ভালবাসা তাদের দাম্পত্য-জীবনকে মধুময় ক'রে তোলে, সেই প্রেমেরই যেখানে অস্তিত্ব নেই, সেখানে এ বন্ধন ত শুধু নিগড় হয়েই উঠবে? এ ক্ষেত্রে কথা উঠতে পারে, তবে দুদিন আগেই বা তার যূথিকাকে ভাল লেগেছিল কি ক'রে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। কারণ, মানুষের মন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, চঞ্চল-মনের গতি-স্থিতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা, অনেক চিন্তা হয়ে গেছে এবং আজও হচ্ছে, তবু এখনও এর কোন নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় নি। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক সময়ে কোন একটা জিনিষ ভাল লাগলে চিরদিনই তার প্রতি সে আসক্তি স্থায়ী হয় না। নিশীথ ও যূথিকার অল্পদিনের পরিচয়ে হয় ত যূথিকার চরিত্রের যে অংশ তার কাছে অপ্রকাশ ছিল, এখন সেইখানেই নিশীথের আটকাচ্ছে, এও হ'তে পারে। হয় ত তাদের ভালবাসাটা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র, মনের কোন সম্বন্ধ তাদের ঘটে নি, তারা সে সময় সেটা ঠিক বুঝতেও পারে নি। আমার মতে এ সব ক্ষেত্রে স্বামি-স্ত্রীর তফাৎ হয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, একত্র থাকার ফলে শুধু যে তারা অসুখী হবে, তা নয়, আরও অনর্থ ঘটাও সম্ভব। যদি মনের কোন প্রবল প্রবৃত্তিকে জোর ক'রে চাপা যায়, তবে সেই চাপের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক কত রকম অনর্থ ঘটতে পারে, আপনি বোধ হয় সেটা বুঝতে পারবেন, অজিত বাবু? অর্থাৎ জোর ক'রে চাপলেই ত সে চাপা থাকবে না। নানা দিক থেকে নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং তার ফল হয় ত শুধু তাকে দিয়েই মিটবে না, তার সন্তান-সন্ততির উপর দিয়েও যেতে পারে। এখন তোমরা কি বল? আপনারই বা এ সম্বন্ধে কি মত, অজিত বাবু?"

আমি আমাদের সামাজিক কোন বিধি-বিধান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া এভাবে বিচার করিয়া দেখি নাই। নরেশ বাবুর কথা শুনিতে শুনিতে কেবলই মনে হইতেছিল, এ সব বিষয় আমাদের আরও কত ভাল-ভাবে জানা উচিত। কারণ সর্ব্বসাধারণকে এ সব তত্ত্ব শিক্ষা দিবার ও প্রচার করিবার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আমাদেরই, অথচ আমরাই এ বিষয়ে কি দারুণ অনভিজ্ঞ!

নরেশ বাবুর কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "আপনার কথা আমার অস্বীকার করবার উপায় নেই, নরেশ বাবু? আমি এতদিন এ সব গভীর তত্ত্ব এমন করে ভাবি নি এবং আপনি যেদিক্ দিয়ে বিচার করে দেখলেন, সেদিক্ দিয়ে দেখবার কোন চেষ্টা করি নি বলে আজ আমার লজ্জা হচ্ছে!"

নরেশ বাবু বলিলেন, "সে কথা ভেবে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। এখন আপনার ত এই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা ও চর্চ্চা চলছে, আমি না বললেও এটা আপনার দৃষ্টিতে এক সময় পড়ে যেত নিশ্চয়ই। যাক্, তুমি তখন বলছিলে, মনীষা, অনুরাগিণী স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া অনুচিত, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু যদি অনাসক্ত স্বামী বাধ্য হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র থাকে, তবে সে তার অনাসক্তি কতদিন গোপন করে রাখতে পারে? মুখোস পরে সর্ব্বক্ষণ আত্ম-গোপন করে থাকা ত সম্ভব নয়? স্ত্রীর কাছে সে কথা লুকানো থাকবে না, তখন সে স্থলে সেই বিমুখ স্বামীর সাহচর্য্য কি স্ত্রীর পক্ষেই বাঞ্ছনীয় মনে হবে? এই অশান্তি ও অসদ্ভাব সত্ত্বেও দুটো লোক সারা জীবন এক সঙ্গে থেকে পরস্পর পরস্পরের জীবন দুর্ব্বহ করে তুলবে! প্রেম ও ভালবাসাই সংসারে দুজনকে একসূত্রে বাঁধতে পারে।"

মনীষা অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। নরেশ বাবুর কথাগুলিই বোধ হয় তাঁহার মনকে অত্যন্ত নাড়া দিয়াছিল। ঊষার মুখেও সেই মত চিন্তাকুল ভাব! অমিয়া মনে মনে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল চিত্তে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করাতেও তাঁহার মনের ভাব বুঝা যাইতেছিল।

শেষে মনীষা বলিলেন, "এটা ত তুমি শুধু নিশীথ বাবুর দিক্ থেকে বল্লে—যূথিকার কথাটাও ভেবে দেখ! সে ত তার স্বামীকে ছাড়তে চায় না? সে এখনও তাকে আগের মতই ভালবাসে!"

নরেশ বাবুর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তার উচিত, এ সব দুর্ব্বলতা ত্যাগ ক'রে নিশীথকে মুক্তি দেওয়া। যে স্বামী তাকে চায় না, তার প্রতি যার কোন অনুরাগ নেই, সেই অনাসক্ত বিমুখ স্বামীর জন্যই তাকে চির-জীবন কেঁদে মরতে হবে, এ যে তার নারীত্বের বিষম অপ-মানের কথা, মনীষা? তুমিই না বলছিলে, জীবনের নানা দিকে নানা পথ মুক্ত রয়েছে, এক দিক রুদ্ধ হলেও অন্য দিকে মানুষ শান্তি পেতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধেও ত সে কথা বলা যায়। যূথিকা কোন দিকে না গিয়ে শুধু এক জনের জন্যই হা-হুতাশ করতে যাবে কেন? আর যদি সে একমাত্র ঐ চিন্তাই ধ'রে থাকে, মন যদি ফেরাতে না পারে, তবে তার সে দুর্ব্বলতা, সে বেদনা তার অন্তরের মধ্যেই থাক্, বাইরে নিশীথকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকবার কোন দরকার নেই।"

নরেশ বাবুর এই সতেজ কথাগুলিই যেন সকলের মনে ঘা দিয়া জোরে বাজিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আমরা সকলেই একবারে চুপচাপ!

অবশেষে ঘরের সে নিস্তব্ধ ভাব ভঙ্গ করিয়া অমিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! কি কুক্ষণেই যূথিকার ক আজ তুলেছিলুম! ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা ধ'রে লেক্‌চার! এ কি মানুষ সহ্য করতে পারে? বা মাথা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করছে? এর চেয়ে আমার মাথায় লাঠি মারলেও সহ্য করা যেত!"

তিনি উঠিয়া পড়িলেন দেখিয়া মনীষা বলিলেন, কি? উঠলি যে?"

অমিয়া বলিলেন, "বাড়ী চল্‌লুম ভাই! আজ এখানে কোন কথা জমতে পারবে না। এখানকার হা ভারী হয়ে গেছে!"

অমিয়ার রাগ দেখিয়া নরেশ হাসিতে লাগিলে বলিলেন, "অমিয়া আজ বড় চটে গেছে। তর্কের চো মাথাটা গোলমাল হয়ে যাওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটলে তুমি বসো অমিয়া! এবার থেকে ও সব কথা ছেড়ে খুব মোলায়েম বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।"

অমিয়া বলিলেন, "আজ আর নয়। রাত হয়ে গে কাল পূর্ণিমা, যদি বৃষ্টি না হয়, তা হ'লে কাল বিয়ে ষ্টীমারে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসা যাবে। কেমন মনীষা-দি?"

মনীষা বলিলেন, "বেশ ত।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী

অদৃষ্ট

অবিচ্ছেদে চলিয়াছে স্রোত—কাল-কল্লোলিনী।
আদিহীন অন্তহীন জীবযুদ্ধে বিরাট বাহিনী—
মৃত্যু কাঁদে, জন্ম হাসে, অনির্দ্দিষ্ট সৃষ্টি বহমান—
কি উদ্দেশ্যে? ভবিষ্যের কে জানে সে অজানা সন্ধান?

রৌদ্র-বৃষ্টি, আলো-ছায়া, শীতাতপ ঋতুচক্র'পরে
এ কি ঘাত-প্রতিঘাত শ্রান্তিহীন জীবনে ও জড়ে!
জলবায়ু, তেজদীপ্তি, চিরন্তন হ্রাস-বৃদ্ধিহীন
নামান্তরে স্থানান্তরে সে যে শুধু বিকল্প-বিলীন।

এত ভাঙ্গাগড়া, তবু অদৃষ্ট কি সূক্ষ্ম সূত্রপাতে—
অক্ষয় অব্যয় সৃষ্টি! ব্যষ্টি বাঁধি সমষ্টির সাথে।
হে অদৃষ্ট! হে দুর্ব্বোধ! হে চিরনবীন নিরাকার!
জগতের সুখ-দুঃখ যত অন্ধকারে রচনা তোমার।

পরাজিত বিশ্বসৃষ্টি নিরন্তর কাঁদে আর্ত্ত স্বরে—
তুমি শুধু ব্যবধান, হে অদৃষ্ট! নশ্বরে ঈশ্বরে।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত-সাহিত্য

২

কাব্যের অপেক্ষিতা

সংস্কৃত কাব্যসমূহে নিবিষ্টভাবে দৃষ্টি করিলে আপাততঃ মনে হয়, তাহার অনেক সৃষ্টি,—কবিকল্পিত বহু চরিত্র বুঝি কবির ততটা সহানুভূতি পায় নাই, তাহারা অনেকটা উপে-ক্ষিত হইয়াছে। সেইরূপ মনে হওয়ায়, কোনও কোনও প্রেমিক পাঠক, সহৃদয় দর্শক ঐ সকল "উপেক্ষিতা" কবি-সৃষ্টির উদ্দেশে নীরবে সহানুভূতির অশ্রুতে তর্পণ করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণের সমবেদনার বিমল অঞ্জলিদানে তথাকথিত "উপেক্ষিতা"-সৃষ্টিকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন।

অনার্য্য কবিকুলের কাহারও কাহারও কাব্যে পাঠক বা দর্শকের ঐ প্রকার সহানুভূতি প্রকাশের অবকাশ হয় ত থাকিতে পারে, কিন্তু কালিদাসের কাব্যে যে তাহা আদৌ নাই, তাঁহার কোনও সৃষ্টিই "উপেক্ষিতা" হয় নাই, কোনও চরিত্রই কবির পূর্ণ সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হয় নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। চরিত্র ত দূরের কথা, মনে হয়, কালিদাসের কাব্যাবলীতে এমন কোনও শব্দ বা পদ নাই, যাহা পাঠক স্বেচ্ছায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। এক কথায়, —কালিদাসের কাব্যাবলীর শব্দরাশি পদরাশি "পরিবৃত্তি-সহ" নহে। সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার কোনটার অদল-বদল করিতে প্রয়াস করা শুধু ভুল নহে, অত্যন্ত দুঃসাহসের কায। তাই কালিদাসের নিপুণ ব্যাখ্যাকর্ত্তা মল্লিনাথ, কুমার-সম্ভবের "ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ" এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যামুখে উপেক্ষাব্যঞ্জক স্বরে বলিয়াছেন, "অত্র (ত্রিয়ম্বক-মিত্যত্র) কেচিৎ সাহসিকাঃ ত্রিলোচনমিতি পেঠুঃ।" অর্থাৎ ত্রিয়ম্বক এই পদকে অশুদ্ধ মনে করিয়া ইহার স্থলে কোনও কোনও সাহসিক ব্যক্তি "ত্রিলোচন" এই পরিশুদ্ধ পদ কল্পিত করিয়া থাকেন। মাত্র "সাহসিকাঃ" এই একটি বিশেষণের দ্বারা "সুরি" মল্লিনাথ তত্তৎ পদকর্ত্তাদের ওজন দেখাইয়া দিয়াছেন, আর "কেচিৎ" এই ঔদাসীন্যসূচক পদের দ্বারা তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব খ্যাপন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ শকুন্তলার কথাই ধরা যাউক। একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাই, কালিদাস মহাভারতের এক শকুন্তলাকে ভাঙ্গিয়া, সৌন্দর্য্যের অনুরোধে তিনটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যথা—শকুন্তলা, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা। আবার যে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে বা নাটকীয় উপ-যোগিতা অব্যাহত রাখিবার জন্য অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে ছাড়িতে হইয়াছে, তথায় দুইটি ঋষিশিষ্য ও পিসী গৌতমীকে "ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে" রাখিয়া শকুন্তলা-প্রতিমা অঙ্কন করিয়াছেন। কুত্রাপি ব্যাসের ন্যায় শকুন্তলাকে একাকিনী উপস্থাপিত করেন নাই। সুতরাং অনসূয়া বা প্রিয়ংবদা কেহই "উপেক্ষিতা" নহে, পরন্তু কাব্যের অত্যন্ত "অপেক্ষিতা।"

মহাভারতের শকুন্তলা বড়ই মুখরা, বড়ই প্রগল্‌ভা, যেন পরিণত-বয়স্কা কর্ত্তৃত্বাভিমানিনী পাকা গৃহিণী। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের দৃষ্টিতে তদীয় সর্ব্বোত্তম নাটকের প্রধান নায়িকার এ মূর্ত্তি বড়ই বিসদৃশ এবং অসুন্দর বোধ হইল। পৌরাণিক শকুন্তলার ন্যায় কালিদাসের শকুন্তলাও যে নিজেই রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবে, নিজেই দূতী সাজিয়া অভিসারে যাইবে, ইহা কালিদাসের সুন্দর বোধ হইল না। অথচ ঐ সকল ঘটনার অধিকাংশ অবলম্বন করিয়াই কালিদাসকে অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটক রচনা করিতে হইবে। উহা বাদ দিলে অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক না হইয়া একখানি ধর্ম্মসংহিতা হইয়া দাঁড়ায়। তাই তাঁহাকে মহাভারতের শকুন্তলা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, ছাঁটিয়া-ছুটিয়া, স্বকীয় অনুপম কবিত্বের উপযোগিনা করিয়া, এক নূতন সম্পূর্ণ অভিনব শকুন্তলা অঙ্কিত করিতে হইয়াছে এবং সেই চিত্রের পূর্ণতা-বিধানের নিমিত্ত তাহার চারিদিকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, গৌতমী-শার্ঙ্গরব-শারদ্বত প্রভৃতি একান্ত অপেক্ষিত কতিপয় মনোহর আলেখ্য অঙ্কন করিতে হইয়াছে। সুতরাং অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কেহই ত শকুন্তলা-কাব্যের "উপেক্ষিতা" নহে। পক্ষান্তরে দেখিতেছি, নিতান্তই অপেক্ষিতা।

মহাভারতে দেখি, জনহীন কণ্বাশ্রমে যুবতী শকুন্তলা কামার্ত্ত রাজা দুষ্মন্তের সম্মুখে নিজের জন্মবৃত্তান্তের রহস্য অবাধে নিজেই বলিয়া যাইতেছে। ঋষি বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে, ইন্দ্র মেনকাকে বিশ্বামিত্রের নিকটে পাঠাইয়াছেন, ঋষি বেচারী ধ্যানমগ্ন;

এ দিকে দুষ্ট বাতাস মেনকার পরিধানের বসনখানি উড়াইয়া লইল, বিবস্ত্রা মেনকা লজ্জানিবারণের জন্য "কি করি, কোথাই যাই"—করিতে লাগিল। মুখে মৃদু মৃদু হাসি, নয়নে বাসনার বিদ্যুৎ, আর আপাদ-মস্তক দেহে দিব্য যৌবনের লীলা-মধুর তরঙ্গ,—ঋষি দেখিলেন।—এইভাবে শকুন্তলা বলিয়া যাইতেছে,—আর তৃষ্ণার্ত্ত দুষ্মন্ত চোখ, মুখ, নাক, কান দিয়া সেই শ্রুতিমধুর ইতিহাস শুনিতেছেন। শকুন্তলা বলিতেছে—

"বিশ্বামিত্রস্ততস্তান্তু বিষমস্থামনিন্দিতাম্।
গৃধ্নাং বাসসি সম্ভ্রান্তাং মেনকাং মুনিসত্তমঃ।
অনির্দ্দেশ্য-বয়ো-রূপামপশ্যদ্‌বিবৃতাং তদা॥
তস্যা রূপগুণান্ দৃষ্ট্বা স তু বিপ্রর্ষভস্তদা।
চকার ভাবং সংসর্গাৎ তয়া কামবশং গতঃ।
ন্যমন্ত্রয়ত চাপ্যেনাং সা চাপ্যৈচ্ছদনিন্দিতা।
তৌ তত্র সুচিরং কালমুভৌ ব্যহরতাং তদা॥
রমমাণৌ যথাকামং যথৈকদিবসং তথা।
জনয়ামাস স মুনির্মেনকায়াং শকুন্তলাম্।
প্রস্থে হিমবতো রম্যে মালিনীমভিতো নদীম্।
জাতমুৎসৃজ্য তং গর্ভং মেনকা মালিনীমনু।
কৃতকার্য্যা ততস্তূর্ণমগচ্ছৎ শক্রসংসদম্॥"

মহাভারত; আদি—সম্ভব, ৭২ অঃ।

(অত্র টীকাকারো নীলকণ্ঠঃ—"গৃধ্নাং—সক্তাম্।" "বিবৃতাং—অনাচ্ছাদিতাম্" "ভাবং সংসর্গাৎ—সন্দর্শনাৎ তস্যাং মনশ্চকার।" "ব্যহরতাং—বিহারং চক্রতুঃ।")

এই ভাবে আত্ম-জন্মের পুরাতত্ত্ব সবিস্তর বর্ণন করিয়া শকুন্তলা কহিল,—

"সুতাং কণ্বস্য মামেবং বিদ্ধি ত্বং মনুজাধিপ!
কণ্বং হি পিতরং মন্যে পিতরং স্বমজানতী॥"

মহাভারত; আদি—সম্ভব, ৭২ অঃ।

তখন রাজা দুষ্মন্ত আর সময় নষ্ট না করিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—

"সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বং যথা কল্যাণি! ভাষসে।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি! ব্রূহি কিং করবাণি তে॥
* * * * *
সর্ব্বং রাজ্যং তবাস্তাস্তু ভার্য্যা মে ভব শোভনে!"

মহাভারত; আদি—সম্ভব, ৭৩ অঃ।

মুগ্ধা তাপসবালা পিতার অসাক্ষাতে রাজার কথা নারাজ। কিন্তু রাজা নাছোড়বান্দা। শেষে রাজার যুক্তি তর্ক-প্রলোভনের কাছে কণ্ব-দুহিতার পরাজয় ঘটিল। তখন শকুন্তলা রাজাকে দিয়া একটি অঙ্গীকার করাইয়া লইয়া বলিল,—"তোমার কথানুসারে সত্যই যদি আমি আমার নিজের প্রভু হই, তবে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে একটি কথা করিতে হইবে। তার পর ও সব কথা;—

—শৃণু মে সময়ং প্রভো!

সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ॥
ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
যজ্যেতদেবং দুষ্মন্ত! অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া॥"

মহাভারত; আদি—সম্ভব, ৭৩ অঃ

বলিয়াই শকুন্তলা হাল ছাড়িয়া দিল, আর অমনি রাজাও "নিশ্চয়, নিশ্চয়" বলিতে বলিতে শকুন্তলা-সায়ুজ্য অধিকার করিলেন। একবার রাজা বিচারও করিলেন না যে, এত বড় শপথটা করি কি—না করি। কেননা আরও ত পাঁচটা রাণী আছে।

"এবমস্ত্বিতি তাং রাজা প্রত্যুবাচাবিচারয়ন্।"

মহাভারত। আদি—সম্ভব, ৭৩ অঃ, ১৮ শ্লোক

জন-হীন তপোবনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার এই উক্তি-প্রত্যুক্তি আলাপ-আপ্যায়ন, শকুন্তলার চুক্তি পূর্ব্বক দেহ-সমর্পণ—সর্ব্বলোক-মোহন মহাভারতের উপযোগী হইলেও, সৌন্দর্য্য-স্রষ্টা কালিদাসের দৃষ্টিতে ইহা বিষম অসঙ্গত, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়া মনে হইল। "অভিরূপ"—শিক্ষিত, অশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ-(expert)দিগের সমক্ষে এরূপ ঘটনা কখনই উপস্থাপ্য নহে,—বুঝিয়া কালিদাস সখী সৃষ্টি করিয়া এ তাহাদের মুখ দিয়া, শকুন্তলার যাহা বলা উচিত নয় বলিলে সৌন্দর্য্যের হানি ঘটে,—তাহা বলাইয়া চমৎকার তার চরম করিলেন। সুতরাং সেই অপরিহার্য্য সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদা "কাব্যের উপেক্ষিতা" নহে, বরঞ্চ অবিচ্ছেদ্য ভাবে কাব্যের অপেক্ষিতা।

যদি ধরিয়া লই যে, সখীরা কেহ নাই, আর শকুন্তলা একাকিনী সেই জনহীন নিবিড় তপোবনে রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে, সেই প্রথম শুভক্ষণে মঙ্গল মুহূর্ত্তে আপনিই আপন পরিচয় প্রদান করিতেছে

সেই বসন্তকাল 'সংবৃত্ত বিবস্ত্র-মেনকা-বিশ্বামিত্র-সঙ্গীত' নিজেই রাজাকে গাহিয়া শুনাইতেছে, তাহা হইলে সে গান স্বাভাবিক হইত কি? মিষ্ট লাগিত কি? সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অনুকূল হইত কি? যদি না হয়, তবে অন্য কাহারও দ্বারা সে কায করাইতে হইবেই, তা' সখীই বল, না হয় দূতীই বল, বা অন্য যে কেহ হউক। তাই কবি শকুন্তলা প্রতিমার চাল-চিত্রে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা প্রভৃতির অঙ্কন করিয়া আলেখ্যখানি সম্পূর্ণ নিরবদ্য করিয়াছেন। কুমারসম্ভবেও দেখিয়াছি, কালিদাস চন্দ্রশেখরের সম্মুখে পার্ব্বতীর এক সখীর দ্বারাই পার্ব্বতীর অনেক কথা, যাহা পার্ব্বতী স্বয়ং বলিলে চমৎকারিতার হানি ঘটিত, তাহা বলাইয়াছেন। পার্ব্বতীকে বেশী কথা কহিতে দেন নাই। অনেক স্থলে কথা বলা অপেক্ষা না বলায় যে অনেক বেশী কায হয়, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়, এ রহস্য কালিদাসের সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে; এইরূপে যত অগ্রসর হওয়া যায়, শকুন্তলা-নাটকের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে ততই আত্মহারা হইতে হয়। যখন আসন্নসত্ত্বা শকুন্তলা পিত্রালয় হইতে পতিগৃহে—দুষ্মন্তের রাজধানীতে যাত্রা করিয়াছেন, তখন দেখি, সঙ্গে তাঁহার তিন জন লোক;—দুইটি পুরুষ আর একটি বর্ষীয়সী তপস্বিনী। রাজবাড়ীতে গিয়া অনেক কাণ্ড, অনেক ব্যাপার শকুন্তলাকে করিতে এবং দেখিতে হইবে। সে সমুদয় একা শকুন্তলার দ্বারা সম্পন্ন করানো সৌন্দর্য্যের ঘোর বিরোধী। মহাভারতে কিন্তু শকুন্তলা একাই রাজবাড়ীতে গিয়া হাজির হইয়াছেন, সঙ্গে মাত্র তাঁহার গর্ভজাত দুষ্মন্তের ঔরসজাত এক নাবালক পুত্র। পথে কণ্বের শিষ্যসেবকের সঙ্গে থাকার উল্লেখ থাকিলেও রাজ-সভায় তাহাদের আর কোনই পাত্তা পাওয়া যায় না! ছেলের হাত ধরিয়া শকুন্তলা হাজির হইলে রাজা দেখিয়াই চিনিলেন, কিন্তু সভার মধ্যে 'হাতে নাতে' ধরা পড়ার ভয়ে নরপতি মহাশয় এক দম সমস্ত অস্বীকার করিলেন!

শকুন্তলা ছাড়িবার মেয়ে নহে। রাজাও তথৈবচ। শেষে দুই জনে—ঘোর যুদ্ধ। শকুন্তলা বলে—'তুমি আমায় গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়াছ, এই তোমার পুত্র, আমায় চেন বা না চেন, তোমার পুত্র রহিল, ইহাকে স্থান দিতে এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে তুমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এখন চালাকি? মনে নাই তখনকার প্রতিজ্ঞাটা?'

রাজার তখন অবস্থা শোচনীয়, মহা মুস্‌কিল। এ শঙ্খ-বণিকের করাতের হাতে এখন তিনি নিস্তার পান কি করিয়া? কিন্তু রাজ-বুদ্ধি, কিছুতেই দমিবার নহে। তখন—

"সোঽথ শ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তস্য রাজা স্মরন্নপি।
অব্রবীন্ ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্ট-তাপসি?
ধর্ম্মকামার্থ-সম্বন্ধং ন স্মরামি ত্বয়া সহ।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যদ্বাপীচ্ছসি তৎ কুরু॥"

মহাভারত। আদি—সম্ভব, ১৯-২০ অঃ।

রাজার এই সুমধুর বচনে শকুন্তলার প্রাণ একবারে ঠাণ্ডা হইল! তখন তাহার চোখ, মুখ, কান যেন আর্যতেজে লাল হইয়া উঠিল। শকুন্তলার তখনকার সে ছবি যথার্থই দেখিবার জিনিষ। তখন কণ্ব-দুহিতা—

"সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষী স্ফুরমাণৌষ্ঠ-সম্পুটা।
কটাক্ষৈর্নিদহন্তীব তির্য্যগ্ রাজানমৈক্ষত॥ ২২
* * * *
ভর্ত্তারমভিসম্প্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধা বচনমব্রবীৎ॥ ২৪
জানন্নপি মহারাজ! কস্মাদেবং প্রভাষসে।
ন জানামীতি নিঃশঙ্কং যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ? ২৫
* * * *
যদি মে যাচমানায়া বচনং ন করিষ্যসি।
দুষ্মন্ত! শতধা মূর্দ্ধা ততস্তেঽদ্য স্ফুটিষ্যতি॥ ৩৬
* * * *
কামং ত্বয়া পরিত্যক্তা গমিষ্যামি স্বমাশ্রমম্।
ইমন্তু বালং সংত্যক্তুং নার্হস্যাত্মজমাত্মনঃ॥ ৭২

বলিয়াই ছেলেটিকে রাজার দিকে ঠেলিয়া দিয়া দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় শকুন্তলা যখন প্রস্থানোদ্যত, তখন ভারতসম্রাট্ দুষ্মন্ত আরও উচ্চতর স্বরে বলিলেন,—

"ন পুত্রমভিজানামি ত্বয়ি জাতং শকুন্তলা!
অসত্যবচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ॥ ৭৩
* * * * *
* * * কস্মাৎ ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে? ৭৬
অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে?
বিশেষতো মৎসকাশে? দুষ্টতাপসি! গম্যতাম্॥ ৭৭
* * * *
সর্ব্বমেতৎ পরোক্ষং মে যৎ ত্বং বদসি তাপসি।
নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া॥ ৮১

রাজার এই সব কটূক্তিতে শকুন্তলা চটিয়া আগুন হইল এবং রীতিমত লড়াই সুরু করিয়া দিল। কহিল—"বটে!

রাজন্! সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি?" ৮২

আরও কহিল, "তুমি ভেবেছ কি? তুমি বেড়াও মাটীতে, আর আমি বেড়াই আকাশে! এই দেখ, তোমাকে জব্দ করিতেছি। আমি মহেন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ—এই সব দেবতার কাছে গিয়া তোমার কীর্ত্তির কথা সব প্রকাশ করিতেছি।" ৮৪-৮৫

এইরূপে যখন সভামধ্যে দুই জনে—দুষ্মন্ত-শকুন্তলায় ঘোর কলহ চলিতেছে, ছেলে ফেলিয়া শকুন্তলা একাকিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত, তখন হঠাৎ এক দৈববাণী বলিয়া দিল, "কর কি রাজা, শকুন্তলা তোমার ধর্ম্মপত্নী, আর এই ছেলে সর্ব্বদমন তোমারই ঔরসপুত্র, ইহাদিগকে গ্রহণ কর।" বাস্! এক আকাশবাণীতে সব গোল মিটিয়া গেল। শকুন্তলা ও সর্ব্বদমনকে রাজা ঘরে তুলিলেন। কথায় কথায় শেষে রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, "হঠাৎ কি তোমাকে লইতে পারি? দেখিলে ত, কেমন সব দিক্ বজায় রহিল। আর তুমি যে আমায় কটুবাক্য বলিয়াছ, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম।" ১২১-১২৪

ব্যাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার রাজসভামধ্যে এই সকল ব্যাপার ইতিহাসরূপী ভারত-সংহিতার উপযোগী হইলেও সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইল। তাই তিনি দুষ্মন্ত-সমক্ষে দুইটি কণ্বশিষ্য ও কণ্বের ভগিনী বৃদ্ধা গৌতমীকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি ব্যাসের সবিস্তার বর্ণনের সহিত প্রতিযোগিতায় না গিয়া যখন যেমন, যেখানে যেমন আবশ্যক এবং যাহার মুখে যে কথা শোভা পায়, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির সহায়তা করে, তাহাই বলাইয়াছেন; আর মধ্যে মধ্যে শকুন্তলাকে দিয়া দুই একটি কথা বলাইয়া সুন্দর শকুন্তলা-চিত্রখানির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন! ক্রমে যেন তাহা সুন্দরতর—সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছেন! ইহাতে ব্যাসের বিবাদিনী ঋষিদুহিতার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, সর্ব্বোপরি নারী-চরিত্রের কোমলতা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ন্যায় দেখিতেছি, শাঙ্গরব-শারদ্বত-গৌতমীও কাব্যের নিতান্ত অপেক্ষিত, ইঁহাদের কাহাকেও বদাচ "উপেক্ষিতা" বলা চলে না।

যদি কালিদাস বঙ্কিমচন্দ্রের গিরিজায়ার ন্যায় অনসূয়া প্রিয়ংবদারও বিবাহ দিতেন, গিরিজায়ার ন্যায় তাহাদিগকে দুইটি ছোট ছোট নায়িকা সাজাইতেন, তাহা হইলেই কি ভাল হইত? তাহাদের "উপেক্ষিতা"-পরিবাদ নিরাকৃত হইত? এরূপ করিলে কবিরও প্রমাদ, সামাজিকেরও প্রমাদ; কেন না, "সামাজিকে রসোৎপত্তি" হইল কাব্যের সার্থকতার চূড়ান্ত।

মহাভারতের শকুন্তলা প্রগল্‌ভা, কটুভাষিণী, অপত্রপা, বহুজল্পিনী। ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ হওয়াতেই কবির [illegible] কালিদাসকে ঐ দুইটি সখী, শিষ্যদ্বয় ও গৌতমীর [illegible] করিতে হইয়াছে। মহাভারতে যাহা নাই, তাহা [illegible] মহাভারতের কবি যে চরিত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলে [illegible] শকুন্তলার কবি তাহা সুসম্পূর্ণ করিয়া এক অতি অপূর্ব্ব সমাজহিতকর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছে [illegible] রাজার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে দুইটি সখী এ[illegible] রাজধানীতে উপস্থিতির সময়ে দুইটি ব্রহ্মচারী ও এক[illegible] বৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীর কল্পনা করিয়া কবি শকুন্তলা-চরি[illegible] সর্ব্বাংশে পরিমার্জ্জিত ও নিরবদ্য করিয়া লইয়াছে[illegible] শকুন্তলা-চিত্র এই প্রকারে নির্দ্দোষ করিয়া তুলি[illegible] "উপেক্ষিতা" নহে, সম্পূর্ণ অপেক্ষিতা সখী প্রভৃতির [illegible] অনসূয়া-প্রিয়ংবদা-শার্ঙ্গরব-শারদ্বত-গৌতমীরূপী স্তম্ভ-[illegible] কের উপর যেন নানা কারুকার্য্যখচিত কল্পনার ময়ূর-[illegible] সন পাতিয়া কালিদাস তদুপরি তাঁহার শকুন্তলারূপ[illegible] "ষোড়শী ভুবনেশ্বরী" প্রতিমা বসাইয়াছেন! সে শকুন্ত[illegible] আদ্যন্ত—সমানভাবে মঞ্জুভাষিণী, মুগ্ধ-হৃদয়া ও সারল্যম[illegible] ব্যাসের শকুন্তলার যেমন কলহ, অমনই প্রণয়; যেমন প্র[illegible] খ্যান, অমনই স্বীকার। আর কালিদাসের শকুন্ত[illegible] প্রণয়ের পর কলহে এবং প্রত্যাখ্যানের পর স্বীকারে ব্যা[illegible] অনেক, বৈচিত্র্য অনেক। মহাভারতে চমৎকারিতার [illegible] অংশে ন্যূনতা, কালিদাসের তথায় চমৎকারিতা অধি[illegible] কালিদাসের শকুন্তলার এই অসীনত্বের মূল কারণই হই[illegible] অনসূয়া, প্রিয়ংবদা প্রভৃতি। এই জন্যই বলিতে ইচ্ছা [illegible] কালিদাসের শকুন্তলা-সৃষ্টি অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা প্রভৃ[illegible] সমবায়ে এমনই নিখুঁত হইয়াছে যে, ইহা ঋষি-সৃষ্টি [illegible] অতিশায়িনী।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষ[illegible]

অমর নাথ



২২

পরদিন প্রভাতে বেলা সাড়ে নয়টার মধ্যে জলযোগ সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধুতে মোটরে উঠিলেন। সঙ্গে ছেলে-মেয়েরাও চলিল। তাহারা উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত যাইবে। জিনিষ-পত্র লইয়া এক জন ভৃত্য রেলপথে হাওড়ায় যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

কৃষ্ণনাগের চুণার পর্য্যন্ত যাইবার কথা ছিল. কিন্তু সে দিন তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর বড় সাহেব তাঁহাকে একটা কাযের কন্‌ট্রাক্ট দিবেন বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। দুই মাইল রেলরাস্তায় পাথর-ভাঙ্গা দিতে হইবে। এত বড় কাযটা কৃষ্ণ ছাড়িতে পারিলেন না; সাহেবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া হুকুম লইয়া দু' পাঁচ দিন পরে চুণারে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। অমর আর সময় নষ্ট না করিয়া একাই বাহির হইয়া পড়িলেন।

উত্তরপাড়ায় হরনাথ বাবুর বাড়ীতে তাঁহারা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় পরিবারবর্গ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কোন্নগরের ব্যাপার শোভা ও পার্ব্বতী দেবীর কর্ণগোচর হইয়াছিল; তবে সঠিক বৃত্তান্ত তাঁহারা শুনেন নাই। সেই দিন প্রভাতে অর্থাৎ অমরনাথ প্রভৃতি উত্তরপাড়ায় পদার্পণ করিবার কিছু পূর্ব্বে কোন হিতৈষিণী আসিয়া চুপি চুপি পার্ব্বতীকে সংবাদ দিলেন, অমরনাথ এক জন বিখ্যাত দস্যু—ছদ্মবেশে ভদ্রসমাজে বিচরণ করিতেছে; পূর্ব্বদিন সে দস্যুতা পূর্ব্বক গণেশ বাবুর কন্যা রেবাকে হরণ পূর্ব্বক মোটরযোগে পলায়ন করিয়াছে! দ্বারবানরা বাধা দিয়াছিল, কিন্তু অমর তাহাদের মারপিঠ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এমন কি, ইহাও এই হিতার্থিনী জানাইলেন যে, গণেশ বাবু পুলিস লইয়া অমরকে ধরিতে ছুটিয়াছেন। শ্রবণান্তে শোভা ও পার্ব্বতী স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের যে শুধু আশা চূর্ণ হইল, তাহা নহে, তাঁহাদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। অমর সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্ব্বতী দেবী কথাটা বিশ্বাস করিতে চান নাই, কিন্তু সংবাদদাতা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না—অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি আনিয়া পার্ব্বতীর দুর্ব্বল মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। শোভা যে ঘটনাটি একবারে বিশ্বাস করিল, এমন বলা যায় না। তাহার মনের ভিতর সন্দেহ মাথা তুলিয়া রহিল।

এ দিকে সদরমহলে হরনাথ বাবুর কাছে সদু খুড়ো বসিয়া যখন এই রকম একটা গল্প করিলেন, তখন তিনি 'রাম' 'রাম' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন। সদু খুড়ো উপবীতস্পর্শ করিয়া কহিলেন, এ সকল ব্যাপার তাঁহার চক্ষুর উপর সংঘটিত হইয়াছিল। হরনাথ তথাপি কথাটা বিশ্বাস না করিয়া ঘৃণার সহিত যখন মাথা নাড়িলেন, তখন উপবীতধারী মহাশয় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, কর্ত্তাকে তাঁহার প্রত্যক্ষ ঘটনা বিশ্বাস করাইবেন। তিনি কহিলেন, হরণের সময় আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম, রেবার কাপড় উড়ে আমার গায়ে লেগেছিল; রেবা চীৎকার ক'রে সাহায্য-প্রার্থনায় 'সদু খুড়ো' ব'লে ডাকতে লাগল। আমি সেই গুণ্ডার সামনে কি করব? তবু লাঠি তুলেছিলাম, কিন্তু মোটর বোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল।

এই সকল অকাট্য প্রমাণ দাখিল করত সদু খুড়ো অমরনাথের দস্যুতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হরনাথকে অনুরোধ করিলেন। হরনাথ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সদুকে কহিলেন, "সকাল হ'তে না হতেই পরনিন্দা আরম্ভ করেছ। বোধ হয়, এই ব্রত নিয়েই সকাল সকাল কোন্নগর হ'তে বেরিয়েছ; এই গল্প নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরা দেখছি তোমার উদ্দেশ্য। তোমাকে একটা গল্প বলি, শোন।"

"আজ্ঞে করুন।"

হরনাথ।—গল্পটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থে আছে—শাস্ত্রের বাছা বাছা উপদেশ নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত—অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। এখন শোন,—এক রাজা ছিলেন; তিনি উৎকট কুষ্ঠব্যাধি হ'তে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন। বহু চিকিৎসাতেও যখন ফল হ'ল না, তখন তিনি রাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন; যাবার সময় মন্ত্রীকে ব'লে গেলেন, যদি কখন তিনি ব্যাধিমুক্ত হন, তবেই তিনি দেশে ফিরবেন।

রাজা গভীর জঙ্গলমধ্যে একদা এক সাধুর দর্শন লাভ করলেন। সাধুর চরণে প্রণাম ক'রে যুক্তকরে দাঁড়ালে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও?" রাজা রোগমুক্তি প্রার্থনা করলেন। সাধু প্রসন্নচিত্তে বললেন, "এক বৎসর পরে তোমাকে আমি ওষুধ দেব; কিন্তু ইতোমধ্যে আমার উপদেশমত তোমাকে কায করতে হবে। তুমি রাজ্যে ফিরে যাও। তোমার প্রাসাদের গায় বাসোপযোগী দুটি ঘর তৈরী কর। একটি ঘরে তুমি থাকবে, আর একটি ঘরে তোমার বিধবা যুবতী কন্যা থাকবে। সে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করবে—আর কেউ সেখানে থাকবে না। এই নূতন বাড়ীর একটিমাত্র প্রবেশদ্বার থাক্‌বে, তাহাও আবার তোমাদের প্রবেশের পর গেঁথে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। প্রাচীরের গায় একটা ছোট জানালা থাক্‌বে, সেই পথে তোমাদের আহার্য্য-পানীয় সরবরাহ হবে। বৎসরান্তে আমি ওষুধ দিয়ে আসব।"

রাজা প্রফুল্ল চিত্তে রাজ্যে ফিরলেন। সত্বর গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে কন্যাসহ নূতন বাড়ীতে এলেন। তৃতীয় ব্যক্তি তথায় ছিল না। কন্যা একাই পিতার সেবা করতে লাগল। এই-রূপে তিন চার মাস অতীত হ'ল। রাণীর মনে সহসা এক দিন সন্দেহ হ'ল—বিধবা যুবতী কন্যার সহিত নির্জ্জনবাস! ক্রমে পুরমহিলারাও রাজার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। নিন্দা বিস্তার লাভ করল,—রাজপুরী ও রাজধানীতে সকলেই বলাবলি করতে লাগল, রাজা অতি দুশ্চরিত্র। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যত যেতে লাগল, রাজার নিন্দা তত বাড়তে লাগল। এ দিকে রাজাও উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন। একাদশ মাসে রাজা সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে উঠলে কন্যা বললেন, 'বাবা, আপনি ত বেশ সেরে গেছেন, চলুন না, প্রাসাদে যাই।' রাজা উত্তর করিলেন, 'না মা, এখন যাব না—দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হোক—সাধু আসুন—'

দ্বাদশ মাস পূর্ণ হ'ল। সাধু রাজবাটীতে এসে মন্ত্রীর নিকট রাজার সন্ধান নিলেন। মন্ত্রী বললেন, 'রাজা অতি পাপিষ্ঠ, দুশ্চরিত্র, তার নাম করবেন না।' সাধু হেসে বললেন, 'আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল।' তখন সাধু আদেশে দ্বারপথ মুক্ত হ'ল। সাধু নূতন গৃহে দর্শন দিয়ে রাজা প্রণাম করত ঔষধ যাচ্ঞা করলেন।

সাধু বললেন, 'তুমি ত এখন রোগমুক্ত, ওষুধের আর প্রয়োজন কি?'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিনা ওষুধে আমার রোগ কিরূপে গেল?'

সাধু উত্তর করলেন, 'যে পাপ হ'তে তোমার এই রোগ উৎপন্ন, সেই পাপ তোমার নিন্দকরা বণ্টন ক'রে নিয়েছে। তুমি এখন পাপমুক্ত—প্রাসাদে চল, সে ভাল ক'রে বুঝাব।'

গল্প শেষ করিয়া হরনাথ কহিলেন, "দেখ সদু, স্তুতিতে পুণ্যক্ষয় হয়, আর নিন্দায় পাপক্ষয় হয়। তুমি অমরের নিন্দা করছ, তা'তে তার পাপক্ষয় হচ্ছে, তুমি তার নিন্দা ক'রে সেই পাপ গ্রহণ করছ। মহাপাপ করলে মহাব্যাধি হয় না; রাজার মহাপাপ তাঁহার নিন্দকরা বণ্টন ক'রে নিয়ে রাজাকে ব্যাধিমুক্ত করলেন। তুমি অমরের নিন্দা করবে, ততই তাঁর পাপ গ্রহণ করবে। তুমি তাঁর পাপ নিতে প্রস্তুত আছ?"

"না, মাপ করবেন; আমি আর কখন পরের কথা আলোচনা করব না। পাপ নিতে হবে? এ অতি ভীষণ কথা।"

"ভীষণ হ'লেও তোমার স্বভাব তুমি সহজে ছাড়তে পারবে না।"

"আজ্ঞে, আমি স্বয়ং যা দেখিছি, তাই আপনার কাছে বলেছি।"

"তুমি কিচ্ছু দেখ নি, সদু।"

"আজ্ঞে, যে দেখেছে, সে আমাকে বলেছে।"

"কেউ তোমাকে এমন কথা বলে নি।"

"আজ্ঞে, কানাই আমাকে বল্লে, অমর কা'কে মেরে ক'রে—"

সদুর কথা শেষ হইতে না হইতে কৃষ্ণনাথ প্রভৃতি আসিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে-মেয়েরা অন্দরের দিকে গেল। কৃষ্ণ অমরকে লইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন এবং কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিলেন। কর্ত্তা তাঁহাদিগকে দেখিয়া মহা পুলকিত হইয়া কহিলেন, "এই যে কৃষ্ণ, অমর, এস বাবা, বসো। এমন সময় হঠাৎ যে?"

অমর। আজ আমি দিল্লী যাব।

হর। দিল্লী? আজই যেতে হবে? আজ রাতটা—

অম। আপনি যেমন অনুমতি করবেন, তেমনই হবে।

হর। বেশ বাবা, বেশ। এখনও তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হচ্ছে। ওরে কৈলেস—

সদু খুড়ো পূর্ব্বে কখন অমরকে দেখেন নাই; এক্ষণে বুঝিলেন, এই ব্যক্তিই সেই দুরন্ত দস্যু অমর। তিনি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। হর-নাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বসো সদু, মধ্যাহ্ন আহারটা সেরে যাবে।" পরে কৃষ্ণনাথের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্নগরে কি হয়েছিল, কৃষ্ণ?"

কৃষ্ণনাথ ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। হরনাথ শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া অমরকে কহিলেন, "আহা, গণেশ বড় দুঃখী, তা'র উপর রাগ করো না, বাবা।"

"আমি ত তাঁর উপর একটুও রাগ করিনি। তিনি ত আমার নিকট কোন অপরাধ করেন নি—অপরাধ তিনি যদি ক'রে থাকেন, তা হ'লে সেটা ধর্ম্মের নিকটে।"

"তিনি ধর্ম্মের দ্বারেই অপরাধ করেছেন। আমিও সেই ভেবে তাঁকে দুঃখী বল্‌ছিলাম।"

সদু। গণেশ বাবুকে দুঃখী ব'লে একেবারেই মনে হয় না। মস্ত বাড়ী, গাড়া-ঘোড়া, মোটর, জমীদারী, উপযুক্ত পুত্র, সবই তাঁর আছে, দুঃখু ত তাঁর একটুও দেখতে পাই নে।

হর। দুঃখ কা'কে বলে, তুমি জান না, সদু। মানুষের ছয়টি মহাদুঃখ—

সদু। কি, কি?

হর। দুগ্ধহীন গাভী, অসতী স্ত্রী, অবাধ্য সন্তান, বিদ্রোহী প্রজা, কৃষ্ণহীন বাক্য বা চিন্তা, অর্থ থাকিতেও দানে অপ্রবৃত্তি।

সদু মনে মনে কথাগুলি টুকিয়া রাখিতেছিল, কেন না, সেগুলি আবার কোন্নগরে ঘরে ঘরে বলিয়া বেড়াইতে হইবে। তবে ঠিক সেই কথাগুলিই যে বলিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। একটু আধটু পরিবর্ত্তন তাহাকে করিতেই হইবে। যথা, হরনাথ বলিয়াছেন—গণেশ বাবুর স্ত্রী অসতী, পুত্র চরিত্রহীন, গণেশ বাবু স্বয়ং অধার্ম্মিক ইত্যাদি। তিনি বোঝা আনিয়াছিলেন উত্তরপাড়ায় ফেলিতে, আবার বোঝা লইয়া চলিলেন কোন্নগরে রাখিতে। বোঝাটা যাহাতে ভারি হয়, সংবাদ যাহাতে চমকপ্রদ হয়, এইরূপ চেষ্টা সংবাদপত্র-সম্পাদক হইতে সদু খুড়ো পর্য্যন্ত সকলেই করিয়া থাকেন। যখন সদু দেখিল, হরনাথ আর কিছু বলেন না, তখন সে কহিল, "গণেশ বাবুর কথা যে বলছেন আপনারা, তাঁর চেয়ে তাঁর ছেলে শরৎ আরও ভয়ানক।"

হর। যাক্, সে সব কথার আলোচনা দরকার নেই।

সদু। একটু দরকার আছে বই কি—

হর। দেখ সদু, পরচর্চ্চা আমার এখানে ব'সে কখন করো না। তোমাকে একটা উপদেশ দিলাম, দেখছি, সেটা বৃথা হ'ল। স্বভাব সহজে কেহ ছাড়তে পারে না। সাপকে দুধ খাওয়ালেও সে বিষ দেয়, আর গরুকে ঘাস খাওয়ালেও সে দুধ দেয়।

সদু। আজ্ঞে, আজ এখন উঠি, আর এক দিন প্রসাদ পাব।

হর। এস তবে।

সদু খুড়ো রাগে গর্ গর্ করিয়া ছাতা-লাঠিসহ প্রস্থান করিলেন। হরনাথ তখন অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিল্লী হ'তে ফিরতে কত দিন বিলম্ব হবে?"

অম। তা' ঠিক বলতে পারি না। এক মাসের মধ্যে ফিরতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে।

হর। এবার এসে আমার এখানে উঠতে হবে।

অম। আমাকে এবার বহু স্থানে ঘুরতে হবে, হয় ত একবার রাজমহলে যেতে হবে।

হর। পশুপতির ওখানে বুঝি?

অম। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

হর। আমি তার কথা ভুলেই গিছলাম। আজ মেয়ে-দের বলতে হবে, তুমি তাদের জীবন রক্ষে করেছ। গিন্নীর শুনে বড় আনন্দ হবে।

অম। ও-সব কথা আর তুল্‌বেন না।

হর। বাবা, মনে যে ওঠে। তুমি যে ত্যাগস্বীকার করেছ, যে মহত্ত্ব দেখিয়েছ, তা' ত সচরাচর দেখা যায় না। উঠো না অমর, আমি আর এ সব কথা তোমার সামনে তুলব না। কৃষ্ণ, উপরে যাচ্ছ? আচ্ছা যাও, অমরকে নিয়ে যাও—স্নান আহার কর গে, কিন্তু আজ বাবা, তোমাদের থাক্‌তে হবে।

২৩

এ দিকে নরু প্রভৃতি উপরে আসিয়া মহা গোলযোগ বাধাইল। তাহারা হঠাৎ আসিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারিয়াছে, ইহাতে তাহারা মহা আনন্দ লাভ করিল। পার্ব্বতী দেবী বিশেষ কোন অশুভ ঘটনা আশঙ্কা করিয়া গম্ভীর বদনে কন্যা জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে?"

জ্যো। কি আবার হবে?

পা। তুই না বল্‌লেও আমরা সব শুনেছি।

জ্যো। কি শুনেছ, মা?

পা। তোরা এখন এলি কেন বল্‌ দেখি?

জ্যো। অমর বাবু দিল্লী যাচ্ছেন, আমরা তাঁকে এগিয়ে দিতে এসেছি।

পা। তা হ'লে ঠিকই শুনিছি, অমর পালাচ্ছে।

জ্যো। ও-মা! তিনি পালাবেন কেন?

পা। রেবার বাপেরা যে পুলিস নিয়ে তাকে ধর্‌তে আসছে। তা' বাপু, আমাদের এর ভিতর জড়ান কেন? আর কারুর বাড়ীতে লুকুতে পারতে ত।

অমরনাথ সম্বন্ধে পার্ব্বতীর মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি জ্যোতিকে উপেক্ষা করিয়া দুশ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, সে আর পার্ব্বতীর শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। তাহার হাতে কন্যা দেওয়া দূরে থাক্‌, তাহাকে গৃহে আর স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি ভাবে ও কথায় অমরনাথের প্রতি এমন অবজ্ঞা দেখাইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন যে, জ্যোতি প্রভৃতি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া শোভা ছুটিয়া আসিল; ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে নরু, তোরা কখন্‌ এলি?"

নরু। এই আসছি।

শোভা। তোদের মুখ এমন শুক্‌ন কেন? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্‌ যে?

জ্যোতি। হ্যাঁ মেজ্‌দি, মেসোমশাই না কি পুলিস নিয়ে অমর বাবুকে ধরতে বেরিয়েছেন?

শোভা। আমরা শুনছি ত তাই।

জ্যোতি। কেন, তাঁর অপরাধ?

শোভা। তিনি যে রেবাকে নিয়ে পালিয়েছেন, তোরা বুঝি তা জানিস্‌ নে?

কথাটা এমন করিয়া বলিতে শোভার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার অন্তরের বিশ্বাস সংবাদদাত্রীর যুক্তি-প্রমাণের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেই যুক্তি-প্রমাণকে নিরস্ত্র ও সংহার করিবার অভিপ্রায়ে স্পষ্টাস্পষ্টি শোভা উক্ত রূপ উত্তর করিল। সে এমনই আশা করিয়াছিল, জ্যোতি এখনই বলিবে সংবাদটা মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত। তাঁহার অন্তরের বিশ্বাসটা যাহাতে জ্যোতির উত্তরে নষ্ট না হয়, সে জন্য অতি ব্যগ্রভাবে শোভা জ্যোতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। জ্যোতি কিন্তু কিছু বলিল না। লতা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল,—"তোমরা বড় মিছে কথা বল।" লতা অভিযোগের মর্ম্মটা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও পুলিস, ধর-পাকড়, এই সব কথা হইতে বুঝিয়াছিল, তাহার দাদা একটা অন্যায় কাজ করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইতেছে।

নরু আরও কিছু বেশী বুঝিয়াছিল; সে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, "তোমরা আমার কাকার নামে এমনই ক'রে মিছে বল! তোমাদের বাড়ীতে আর আস্‌ব না—চ'লে আয় লতা।"

বলিয়া নরু লতার হাত ধরিল। জ্যোতি নরুকে কহিল, "তুই ছেলেমানুষ, রাগছিস্‌ কেন? থাম্‌, কথাটা আগে ভাল ক'রে জেনে নি।"

নরু দাঁড়াইল। শোভা কহিল, "জান্‌বি আর কি? আমি যা শুনিছি, তাই তোকে বলছি।"

জ্যোতি। কি শুনেছ, তোমরা?

শোভা। রেবাকে চুরি ক'রে তোমাদের অমর বাবু মোটর হাঁকিয়ে পালিয়েছেন। রেবা না কি খুব চেঁচিয়েছিল, তা' চেঁচালে কি হবে? দরোয়ানদের মারপিট ক'রে তিনি রেবাকে নিয়ে—

জ্যোতি। ভুল শুনেছ, মেজদি। অমর বাবু নীচে রয়েছেন, কৃষ্ণ দাদাও এসেছেন। তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস কর না।

শোভা স্বস্তি অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "রেবা কোথা?"

জ্যোতি। কেন, কোন্নগরে—তাদের বাড়ীতে।

শোভার অন্তরের বিশ্বাসটা মাথা ঠেলিয়া উঠিল; কিন্তু সন্দেহ তখনও অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান। তাহাকে কিরূপে নিরস্ত্র করা যায়, শোভা চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তান্তে কহিল, "তোরা বোস, আমি আসছি। যতক্ষণ না ফিরি, তোরা যাবি নি।"

বলিয়া শোভা প্রস্থান করিল। নীচে আসিয়া শঙ্করকে কহিল, "মেজদা, তুমি মোটর হাঁকাতে পার?"

"খুব পারি।"

"এরা বলছিল, তুমি পার না।"

"মিথ্যে বলেছে; আমার মত ক'টা লোক হাঁকাতে পারে?"

"আচ্ছা, আমাকে কোন্নগরে নিয়ে চল দেখি।"

"চল্‌, এখুনি চল্‌। আজ আফিস বন্ধ, সুবিধে হয়েছে।"

উভয়ে প্রস্থান করিল।

এ দিকে কৃষ্ণ ও অমর হাসিতে হাসিতে অন্দরে আসিলেন। উপরে উঠিতে যাইতেছেন, সিঁড়ির মাথায় পার্ব্বতীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। অমরকে দেখিয়াই পার্ব্বতী জ্বলিয়া উঠিলেন; রূঢ় ও কর্কশ কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার বাবু, এখানে আসা উচিত হয় নি, আর কোথাও গেলে হ'ত।"

অমর ও কৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কথা-কয়টি বলিয়াই পার্ব্বতী বেগভরে প্রস্থান করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে অমর কহিলেন, "লতাকে ডেকে নেও, আমি গাড়ী ঠিক করি গে।"

কৃষ্ণ। শুধু লতা কেন, নরুও যাবে।

অম। নরু এখন থাক্‌, তাকে ফের্‌বার সময় নিয়ে যেও।

কৃষ্ণ। না, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে নরু, লতা, জ্যোতি আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ কহিলেন, "লতা, নরু, আয়।"

জ্যোতি। ওদের নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন না কি?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

জ্যোতি। ওরা যে এখনও খায় নি।

কৃষ্ণ। এ বাড়ীতে আর খেতে হবে না।

জ্যোতি। মাকে একবার ব'লে যান।

কৃষ্ণ। তোমার মা আমাদের তাড়িয়েছেন—

জ্যোতি স্তম্ভিত হইল। সহসা একটা ধাক্কা লাগিলে মানুষ যেমন চমকিয়া দাঁড়ায়, জ্যোতিও তেমনই চমকিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন, কিন্তু জ্যোতি একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরপরাধ মহাপ্রাণ অমরনাথকে কুৎসিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিতাড়িত করায় জ্যোতির মনঃপ্রাণ অমরনাথের উদ্দেশে ছুটিল। তাঁহার সেই বিষণ্ণ অভিমানভরা মুখখানি মনে করিতে জ্যোতির প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার হৃদয়মধ্যে কে যেন একটা তীক্ষ্ণ শল্য বিদ্ধ করিয়া সহানুভূতি ও অনুরাগের প্রস্রবণ ছুটাইল। যে সুপ্ত-গুপ্ত ছিল, তাহাকে জাগাইয়া টানিয়া কে বাহিরে আনিল। বাহিরে সে তাহার অনুরূপ রূপ জ্যোতিকে দেখাইল; জ্যোতি তখন অপরিচিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া কাঁপিতে লাগিল,—সমস্ত চিত্ত লুটাইয়া দিয়া অপরিচিতকে বরণ করিয়া লইল। এই নব অনুরাগ জ্যোতিকে মাতাইয়া তুলিল।

তার পর শোভা কোন্নগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "অমর বাবু দেবতা, আর আমাদের মত মানুষ তাঁর বিচার করতে বসেছে! ছি, ছি! মা'র যেমন কাণ্ড, যার তার কথায় বিশ্বাস ক'রে বসেন!" জ্যোতি জানিত, অমর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র প্রেমময়, কিন্তু জানিত না যে, তিনি তাহার হৃদয়ের রাজরাজেশ্বর। এই মুহূর্ত্তে সে তাহা জানিল।

ক্ষণপরে হরনাথ আসিয়া কহিলেন, "অমর রাজমহলে কি করেছে, শুনেছ তোমরা? শোন, বলি।"

পার্ব্বতী একে একে সব শুনিলেন—কন্যা শোভার কথা শুনিলেন, স্বামীর কথাও শুনিলেন। তখন তিনি দুঃখে, ক্ষোভে, অনুতাপে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শত বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। আত্মহত্যা করিয়া এ তীব্র যন্ত্রণার অবসান করিতে তাঁহার বাসনা হইল। তার আগে—তার আগে একবার অমরের দেখা পাওয়া যায় না? তার চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করা যায় না? অমর কোথায়?

২৪

অমর তখন কলিকাতায় কোন বন্ধুর গৃহে জলযোগ সমাপন করিয়া সদলে হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, কাতর। ভাবী বিচ্ছেদ যে সকলকে অবসন্ন করিয়াছিল, তা' মনে হয় না; উত্তরপাড়ার ঘটনা তাঁহাদের সকল আনন্দ হরণ করিয়াছিল। ষ্টেশনে আসিয়া অমর তাঁহার বসিবার আসন গাড়ীতে গাড়ীতে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ফোন করিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহার আসন প্রার্থনামত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নামের লেবেল যে গাড়ীর দ্বারে লটকান আছে, সেই গাড়ীতে অমর উঠিতে গিয়া দেখিলেন, আরোহীদের মধ্যে একটা গোল বাধিয়াছে। গোল দুই জনের মধ্যে; এক পক্ষে এক জন সাহেব, অপর পক্ষে জনৈক বাঙ্গালী। বাঙ্গালী হইলেও তিনি সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত, অমরনাথ ও কৃষ্ণ মুহূর্ত্তে চিনিলেন, এই বাঙ্গালীটি কোন্নগরের শরৎ বাবু।

ঝগড়াটা বাধিয়াছিল বোধ হয় সাহেবের দোষে। তাঁহার মেম সঙ্গে ছিল। তাঁহারা আসন রিজার্ভ করেন নাই; অথচ দুই জনে দুইখানা বেঞ্চ যুড়িয়া বসিয়াছিলেন। তৃতীয় আসন অমরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং শরৎ লেবেলমারা আসনে না বসিয়া মেমের পাশে বসিয়াছিলেন। ইহাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া শরৎকে উঠিয়া যাইতে হুকুম করেন। শরচ্চন্দ্র স্থানত্যাগে অসম্মত হইলে সাহেব বীরনীতি অবলম্বন করিলেন। সে নীতিটা শরৎ বাবু একেবারেই পছন্দ করিতেন না.—অঙ্গে ঘুসি পড়িতে না পড়িতে তিনি বেঞ্চের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সাহেবের দুইটা ঘুসি অঙ্গে যেমন পড়িয়াছে, অমনই শরৎ বাবু কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমা চাওয়াতে সাহেবের নাসিকা ঘৃণায় কুঞ্চিত হইল। তিনি ঘুসি মারিবেন না লাথি মারিবেন, এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অমর তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। সাহেব বেত্রাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া আক্রমণকারীর পানে ফিরিলেন। আক্রমণকারী এক জন ধুতিপরা বাঙ্গালী; তদ্দৃষ্টে সাহেবের ক্রোধ ও গর্জ্জন আরও বাড়িল। ইংরাজীতে একটা গালি দিয়া সাহেব অমরকে আক্রমণ করিলেন। অমরনাথ সাহেবকে ইংরাজীতে কহিলেন, "সাহেব, চুপ ক'রে বসো—গোলমাল করো না।"

সাহেব সে উপদেশ কানে না তুলিয়া এক প্রচণ্ড মুষ্টি উঠাইলেন! মুষ্টি দেহের উপর পড়িবার আগেই অমরনাথ তাহা দক্ষিণহস্তে ধরিয়া ফেলিলেন—সাহেবের হাত আর ছাড়িলেন না, সজোরে ধরিয়া রাখিলেন। সাহেব টানাটানি করিয়াও যখন হাত ছাড়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি পা উঠাইলেন। বুটের আস্বাদন অমরনাথকে দান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সাহেবের এই মহৎ উদ্যম অমরকে একটু উত্তেজিত করিল। তিনি সাহেবের হাত এমন একটা মোচড় দিলেন যে, সাহেবকে মেঝের উপর শুইয়া পড়িতে হইল। এই সুযোগে শরৎ বাবু উঠিয়া বাঁ দ্বারা সাহেবকে দুই এক ঘা মারিবার উদ্যোগ করিতে অমরনাথ বাম হাতে যষ্টি কাড়িয়া লইয়া পায়ের নীচে চাপিয়া ধরিলেন, এবং সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন "উঠ সাহেব।" সাহেব উঠিয়া কহিলেন, "বাবু, তুমি ভদ্র লোক, গায়েও অসীম শক্তি, তোমার করমর্দ্দন করিতে পারিলে আমি সুখী হইব।"

অমর হাত বাড়াইয়া দিয়া সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিলেন, শরৎ বাবু তাঁহার মূল্যবান্ ছড়িটি উঠাইয়া লইয়া অমরকে কহিলেন, "আমিও আপনার সঙ্গে করমর্দ্দন করতে পারলে সুখী হব, ইন্দ্র বাবু!" অমর তাঁহার প্রসারিত হাত গ্রহণ না করিয়া সাহেবের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। শরৎ তখন অন্য দিকে ফিরিয়া অপমানটা ঢাকিতে যত্নবান্ হইলেন। সহসা কৃষ্ণনাথকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন "এই যে কেষ্ট, তুমিও এসেছ দেখছি—বেশ, এবার আমরা দলে ভারী। এ ছেলে-মেয়ে দুটি কে? তোমার বুঝি বেশ, মেয়েটি বেশ দেখতে।"

লতার চক্ষু তখনও সজল। সাহেব তাহার দাদাকে মারিতে হাত উঠাইয়াছিল দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর তার দাদাকে যুদ্ধে জয়ী হইতে দেখিয়া আনন্দে গর্ব্বে আর একবার সে কাঁদিল। নরুর হাতে একটা ছোট বেত ছিল, তদ্দ্বারা সে লড়াইয়ের সময় সাহেবকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল; কৃষ্ণ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিয়াছিলেন, "তোর কাকাকে কেউ মারতে পারবে না, তুই ঠিক ক'রে দেখ্।" দেখিল যখন কাকার জয়, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া লতাকে কহিল, "আমার কাকাকে কার সাধ্য মারে! তুই কাঁদিস নে।"

যুদ্ধ-অবসানে করমর্দ্দনের সময় লতার আশঙ্কা হইয়াছিল বুঝি বা আবার বাধে। কিন্তু না বাধিয়া যখন যোদ্ধদ্বয়ের মধ্যে হাস্যালাপ চলিল, তখন সে পুলকিত হইয়া দাদার কাছে সরিয়া আসিল। সাহেব তাঁহার মেমের সঙ্গে অমরের পরিচয় করিয়া দিলেন। মেম সহাস্যে হাত বাড়াইয়া দিয়া অমরের সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। শরতের পানে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

শরৎ তখন কৃষ্ণকে বলিতেছিলেন, "আমি মনে করলে সাহেবকে মেরে ফেলতে পারতাম; কিন্তু কি জান, মারধর করতে আমার ইচ্ছে হয় না। তবে রাগ হ'লে—"

কৃষ্ণ। আপনার যদি একটু রাগ থাকত, তেজ থাকত, তা হ'লে আপনি চুপ ক'রে প'ড়ে মার খেতেন না। এক ঘাও যদি মারতেন, তা' হলেও বুঝতাম, আপনার তেজ আছে, মনুষ্যত্ব আছে। ছিঃ!

শরৎ। মারব ভাবছিলাম, তা' লাঠিটা হাতের গোড়ায় পেলাম না।

কৃষ্ণ। সাহেব কি আপনাকে লাঠি দিয়ে মেরেছিল যে, আপনি লাঠি খুঁজেছিলেন? লজ্জা হয় না সাহেবী পোষাক পরতে? সরম লাগে না মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে? আপনাদের ন্যায় মানুষের খোলস-পরা অমানুষের সঙ্গে কোন ভদ্র ব্যক্তি বাক্যালাপ করে না, তার হস্তও স্পর্শ করে না।

বলিয়া কৃষ্ণনাথ পিছন ফিরিলেন। সাহেব এ বাক্যালাপের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তিনি অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কি তোমার বন্ধু?"

"আমার বিশেষ বন্ধু।"

"আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেও।"

উভয়ে পরিচিত হইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ও লোকটাকে কি বল্‌ছিলে, বাবু?"

"তোমাকে মারে নি ব'লে ওকে আমি গাধা বল্‌ছিলাম।"

"ঠিক বলেছ বাবু। ও যদি আমাকে এক ঘাও মারতো, তা' হ'লেও ওটাকে আমি মানুষ মনে করতে পারতাম। মার খেয়ে শুয়ে প'ড়ে আমার কাছে মাপ চাইতে লাগল। এ রকম জানোয়ার—না, জানোয়ারও নয়, তারাও আক্রমণকারীকে আঁচড়ায় কামড়ায়; সাপ, বিছে, পিঁপড়ে সকলেই সাধ্যমত তার লাঞ্ছনাকারীকে আক্রমণ করে; কিন্তু এ রকম জীব বাঙ্গালার মাটী ভিন্ন আর কোথাও দেখি নি।"

লতা নরু, এ সব কথা বুঝিল না। তাহাদের বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল। লতা তৃষ্ণা দমন করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল, "বড়দা, আমি জল খাব।"

মেম সাহেব অনেকক্ষণ হইতে লতাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কি বলছে?"

কৃষ্ণ। জল চাইছে।

মেম তাড়াতাড়ি সরাই বাহির করিয়া লতাকে জল খাওয়াইলেন। জল খাইয়া লতা মেমের পানে চাহিয়া একটু হাসিল। মেম তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি তোমার বোন্?"

"হাঁ; আপনি কি ক'রে বুঝলেন?"

"তোমাদের মুখের ভাব একই রকমের—এ রকম মুখশ্রী ক্লিওপেট্রা-জাতীয়, এ দেশে বড় একটা দেখিনি। আমি মেয়েটিকে দু' একখানা ছবি দিতে ইচ্ছে করি, আপনার তাহাতে বোধ হয় কোন আপত্তি নেই?"

বলিয়া মেম তাঁহার বাক্স হইতে দুইখানি বই বাহির করিয়া লতার হাতে দিলেন। লতা খুলিয়া দেখিল, তাহাদের পাতায় পাতায় ছবি। কয়লার খনিতে কি প্রকারে কায চলিতেছে, তাহা চিত্রে চিত্রে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক মহীশূরের সুবর্ণ-খনিসম্বন্ধীয়। ছবিগুলির আশে-পাশে উপদেশ। ছবিগুলির পানে সহসা অমরনাথের দৃষ্টি পড়ায় তিনি চমকিত হইলেন। একখানি বই লতার নিকট হইতে লইয়া অমর মেম-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জাতীয় বই আমি আজ বাজারে খুঁজেছি, কোথাও পাইনি; আপনি কোথা পেলেন?"

মেম। আমার বাবা আফ্রিকার খনিতে, আর কাকা মাইসোরের খনিতে কায করেন; তাঁরাই আমাকে এই রকম বই কয়েকখানা পাঠিয়েছেন। আমার স্বামী ঝরিয়ার রামগড় খনির এঞ্জিনিয়ার।

অমর। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমি বড় সুখী হয়েছি, (সাহেবের প্রতি)—আপনার নিকট শেখবার আমার কিছু আছে।

সাহেব। আমি আনন্দের সহিত আপনাকে তা' শেখাব।

অমর। আপনি মাইকা খনির কায কিছু জানেন ?

সাহেব। আমি আগে কোডার্মা মাইকা খনিতে ছিলাম ; পরে বেশী মাইনেতে এখানে চ'লে এসেছি।

অমর। আমি আপনার খনির কায দেখতে ও শিখতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

সাহেব। কোন অসুবিধা হবে না, বাবু।

বলিয়া তাঁহার নাম-ঠিকানা-লেখা কার্ড বাহির করিয়া দিলেন। মেম-সাহেব বলিলেন, "আপনি আপনার বোন্‌টিকে নিয়ে আমাদের বাংলাতে উঠবেন, একটুও ইতস্ততঃ কর্‌বেন না।"

অম। লতা যাবে না, এখানে থাকবে।

মেম। তুমি একাই যেও তবে।

অম। আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ।

পয়লা ঘণ্টা পড়িল। কৃষ্ণনাথ বালক-বালিকার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকা হাত ছাড়াইয়া লইয়া যুক্তকরে মেম-সাহেবকে নমস্কার করিল। মেম আর থাকিতে পারিলেন না,—লতাকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন ; কহিলেন, "তোমাতে আমাতে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।" সাহেব লতাকে কহিলেন, "টুমি হামার কাছে একবাড় হাসিবে না ?"

"না, যাব না।"

"কেনো, লোতা ?"

"তুমি আমার দাদাকে মেরেছ।"

"আর মারিবে না, টুমি এসো।"

লতা আসিল। সাহেব তাহাকে আদর করিয়া কি চকোলেট লজেঞ্চুস দিলেন ; নরুকেও দিলেন। লতা দাদার মুখপানে চাহিল; দাদা অনুমতি দিলে সে তাহা গ্রহণ করিল এবং সাহেবকে নমস্কার করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। নির্লজ্জ শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি সে কেষ্ট, তোমরা যাবে না ?"

"না। আপনি কোথা যাবেন ?"

"ধানবাদে—ফির্‌তে সাত আট দিন হবে। তুমি চল না কেন, তোমার ভাড়া আমি দেব।"

কৃষ্ণনাথ সে কথার কোন উত্তর না করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অমরকে কহিলেন, "রোজ চিঠি দিও।"

"তা ঘ'টে উঠবে না। (লতার প্রতি)—তুমি একখানা বই আমাকে দেবে, লতা ?"

লতা হাসিয়া দু'খানা বই দাদার সম্মুখে ধরিল। তিনি একখানা বাছিয়া লইয়া অপরখানা ফেরত দিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আলিঙ্গন

ঘুমায় ফুলের শেজে, রাজেন্দ্র-নন্দন,
মৃত্যু-সুপ্ত কাদম্বরী-হৃদয়-বল্লভ,—
মঞ্জুল মুকুলমৌলি রসাল পল্লব
হাতে নিয়ে রাজ-পুত্রী করিছে বীজন।

নয়নে বিদ্যুৎদ্যুতি অরুণ আভাস,
অঞ্চল মাণিকে আঁকা মরাল-মিথুন,
ফুলধনু ধনুকেতে ঝুড়িয়াছে গুণ,
অসম্বর পঞ্চশরে বিভ্রম-বিলাস।

প্রাণেশের মুখচন্দ্রে ফুটিছে কি প্রভা ?
কি যেন আনন্দ-স্বপ্ন উঠিল ফুটিয়া !
অরুণ অমৃতরাগ, দুরু দুরু হিয়া—
বাহিরে পঞ্চম সুরে স্তব্ধ বনসভা।

আত্ম-ধ্যান প্রতিবিম্ব মধুর মূরতি
পুষ্প-শরাহত বক্ষে ধরিল যুবতী।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মহীরাবণের দেশ

রামায়ণে পাতালে মহীরাবণের রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমেরিকাকেই আমরা প্রাচীন পৃথিবীর (এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার) লোক পাতাল আখ্যা দিয়া থাকি। প্রতীচ্যের লোক ঠিক ইহাকে পাতাল না বলিলেও 'নূতন পৃথিবী' এবং 'প্রাচীন পৃথিবীর পদতল' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। আমরা প্রাচ্যের অধিবাসী যে ইহাকে মহীরাবণের দেশ বলি, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে ; কেন না, এখনও এই মহাদেশের মেক্সিকো, ব্রাজিল, পেরু প্রভৃতি দেশে 'লোহিত ভারতীয়' (Red Indians) নামধেয় আদিম অধিবাসীদিগের নগর, মন্দির ও দেবতাদির যে সকল ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে প্রাচীন

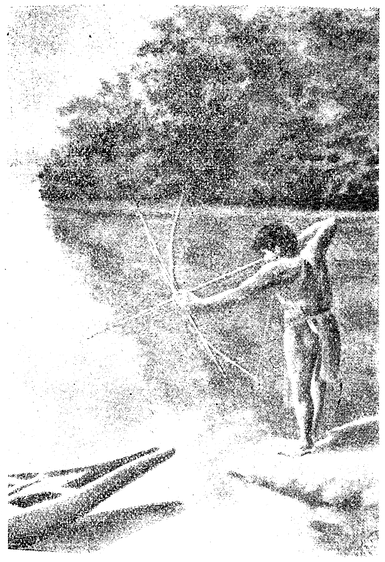

বৃটিশ গায়ানার আকাওয়াইয়া-জাতীয় শিকারী

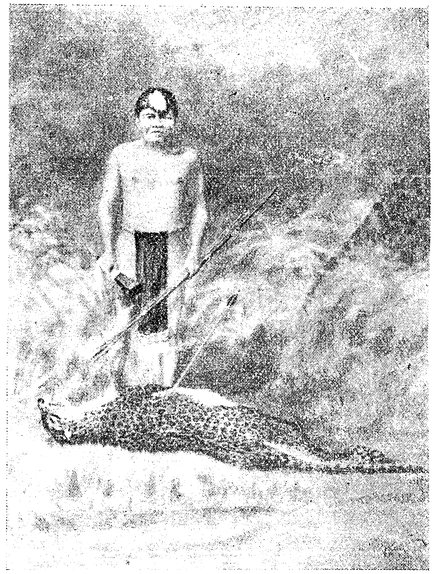

বৃটিশ গায়ানার করিব-জাতীয় শিকারী

ভারতের আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। 'ইনকা' ও 'আজটেক' জাতিদিগের অনেক আচার-ব্যবহার ও শিল্প-সাহিত্যের সহিত ভারতের প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়াও শুনা যায়। সুতরাং প্রাচীন যুগে মহীরাবণ যে এই পাতালে গিয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা একবারে গুলীর আড্ডার গল্প বলিয়া উড়াইয়া না দিলেও চলে।

এই আদিম জাতি ক্রমশঃ সংখ্যায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। পররাজ্যলোলুপ য়ুরোপীয়রা কলম্বসের আবিষ্কারের পর হইতে দলে দলে আসিয়া এই মহাদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া বসবাস করিয়াছে। মেক্সিকো প্রদেশে স্পেনীয় সেনাপতি কর্টেজের অমানুষিক অত্যাচারের কথা, আদিম জাতির রাজা মণ্টেজুমার প্রতি স্পেনীয়দিগের বিশ্বাসঘাতকতাচরণের কথা, আদিম জাতিদের শিক্ষা-সভ্যতার কথা ইতিহাসপ্রথিত হইয়া গিয়াছে। এখন সেই জাতি কোথায়? সামান্য মুষ্টিমেয় কয় জন ইনকা ও আজটেক মেক্সিকো ও অন্যান্য প্রদেশের নিবিড় পর্ব্বতে অরণ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। যাহারা য়ুরোপীয় 'সভ্যতা' প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আন্তর্জাতিক বিবাহ দ্বারা এখন নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে ইংরাজ "প্রিলগ্রিম ফাদাররা" উত্তর-আমেরিকার প্রাচীন আদিম অধিবাসীদিগকে ক্রমশঃ ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়া নূতন য়ুরোপীয় সাম্রাজ্য আটলাণ্টিকের পরপারে গড়িয়া তুলিয়াছে, দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজরা আদিম অধিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া সেখানে নানা প্রদেশে আপনাদের উপনিবেশ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

ইংরাজীতে কথায় বলে (Survival of the fittest)

'যোগ্যতমের শেষ স্থিতি' এই কথাটার ঠিক তর্জ্জমা ; ইহার অর্থ এই যে, জগতে যাহারা যোগ্যতম (অর্থাৎ প্রবল), তাহারা দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই নীতি অনুসারে প্রবল য়ুরোপীয়রা আমেরিকার অধিকাংশ আদিম নিবাসীকে পরপারে পাঠাইয়া তাহাদের জমী ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। যে কয় জন প্রকৃত আদিম নিবাসী এখনও আছে, তাহারা লোকালয়ে বাস করে না, গভীর অরণ্যে অথবা দুরারোহ পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া কোনমতে জীবন ধারণ করে। তাহারা প্রাণান্তে সভ্যতার আওতায় আসিতে চাহে না, য়ুরোপীয়কে বিষবৎ বর্জ্জন



পানামার চোকোই-জাতীয় যুবতী

করিয়া আপনাদের পাহাড়ে জঙ্গলে বন্যপশুর মত ইতস্তত: বিচরণ করে। অষ্ট্রেলিয়ার মাওরী জাতির ইতিহাসও কতকটা এইরূপ। য়ুরোপের মহাপুরুষদের শুভ হস্তস্পর্শ যেখানেই অনুভূত হইয়াছে, প্রায় সেই স্থানেই এই অবস্থা। তবে ভারত ও আফ্রিকার পোড়া 'নেটিভগুলা' সংখ্যায় বড় বেশী বলিয়া এখনও কোনরূপে টিকিয়া আছে।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন কোন 'রক্তবর্ণ ভারতীয়' (Red. Indians) জাতি উত্তর-আমেরিকার "রক্তবর্ণ ভারতীয়" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথমোক্ত ভারতীয়রা দ্বিতীয়োক্তের মত লোকালয়ে অথবা য়ুরোপীয়দিগের সংস্রবে বা সান্নিধ্যে কখনও করে না ; বস্তুতঃ কদাচিৎ কোনও য়ুরোপীয় পর্য্যটক তাহাদিগকে নিবিড় অরণ্যমধ্যে বাস করিতে দেখিয়াছে। সহর বা গ্রাম য়ুরোপীয়রা 'প্রকৃত ভারতীয়কে' দেখিবার ভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে কি না সন্দেহ। ইহাদের আলোকচিত্র লওয়াও দুষ্কর, কেন না, লইতে গেলেই ইহারা পলাইয়া যায়। তবে যাঁহারা বহু কষ্টে প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেই সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতে কিয়দংশ এই স্থলে প্রদত্ত হইল। এ বর্ণনা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই ; কেন না, জগৎ হইতে লুপ্ত



পাটামোনা-জাতীয় যুবতী ইক্ষুপেষণ করিতেছে

এই জঙ্গলের মানুষের রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের কথা জানিতে সকলেরই আগ্রহ সঞ্জাত হইবার কথা।

আলোকচিত্রের সম্বন্ধে ইহারা অত্যন্ত ভয় করে। ইহা বিশ্বাস, উহা যাদুবিদ্যার বা ডাকিনী-মন্ত্রতন্ত্রের কল। ক্যামেরাকে উহারা 'ডাইনীর চোখের দৃষ্টি' বলিয়া মনে করে। মন্ত্রস্থ প্রেত বা প্রেতিনী তাহাদের মনের সকল কথা জানিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে দর্শকের সর্ব্বনাশ হয়, এই তাহাদের বদ্ধমূল। এই হেতু ক্যামেরার কাচ দেখিলেই ইহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে।

পানামার 'প্রতিভূ'

পানামার (এখন খাল, পূর্ব্বে উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার যোজক ছিল) উভয় তটস্থ প্রদেশে কুনা, তেগুয়ালা প্রভৃতি কয়েক জাতি রক্তবর্ণ ভারতীয় বাস করে। তাহাদের মধ্যে যাহারা রোগের চিকিৎসা করে, তাহারা রোগীর পার্শ্বে একটি করিয়া কাঠের মূর্ত্তি রাখিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, তাহারা যখন অহোরাত্র রোগীর পার্শ্বে থাকিতে পারিবে না, তখন এক জন প্রতিভূ রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক, নতুবা রোগ নিরাময় হইবে না। চিকিৎসক যদি দ্বিতীয়বার রোগীকে দেখিতে আসিয়া দেখে যে, রোগের উপশম হয় নাই, তাহা হইলে প্রথম 'প্রতিভূকে' (কাষ্ঠ-মূর্ত্তি) বিসর্জ্জন দিয়া নূতন প্রতিভূ আনিয়া দেয়। এইরূপে একটা রোগীর চারিদিকে অনেক কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিভূ দেখা যায়।

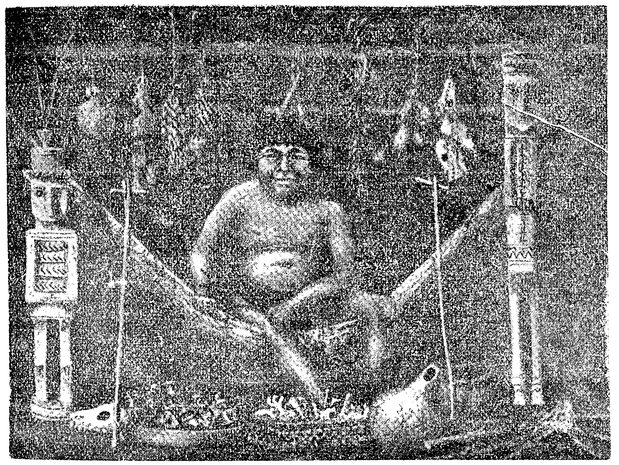

পানামার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী

গুয়েমিস্ নামধেয় জাতির মধ্যে প্রতিভূর ক্ষমতা আরও অধিক। তাহারা যখন সপরিবারে শিকারে বা অন্য উদ্দেশ্যে দূর-যাত্রা করে, তখন ঘরের দ্বার-গবাক্ষ বন্ধ করিয়া রাখে না, তৎপরিবর্ত্তে একটি দারুময় প্রতিভূ গৃহে রাখিয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস, তাহার অনুপস্থিতিকালে ঐ প্রতিভূর মধ্যস্থ প্রেত বা প্রেতিনী গৃহ রক্ষা করিবে। আর এই জাতির প্রতিভূকে এমনই ভয় যে, যথার্থই খোলা বাড়ীতে কদাচিৎ চুরি-ডাকাতী হয়। ইহা ছাড়া দুরযাত্রীদের বিশ্বাস, যদি কোন দুষ্টলোক অসদভিপ্রায়ে গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রতিভূ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে এবং চোরকে জানাইয়া দিবে। এই বিশ্বাসের কারণ এই যে, প্রতিভূর মধ্যে গৃহ-স্বামীর আত্মা অথবা আত্মার অংশ বাস করে, ঐ বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ।

এই হেতু এই সরলবিশ্বাসী আদিমনিবাসীরা মনে করে যে, ক্যামেরার মধ্যে ক্যামেরার মালিকের অংশ বিরাজ করে! সেই শ্বেতাঙ্গের আত্মার সম্মুখে—তাহার চক্ষুর (Lense) জ্বলন্ত দৃষ্টির সম্মুখে তাহারা আপনাদের ফটোগ্রাফ তুলাইতে চাহে না। আরও একটা কথা এই যে, তাহারা মনে করে, য়ুরোপীয় ফটোগ্রাফার তাহার প্রেত-যন্ত্রের মধ্যে পুরিয়া তাহাদের আত্মার কিয়দংশ বিদেশে লইয়া যাইবে! এ অবস্থায় তাহারা ফটোগ্রাফ তুলাইবে কিরূপে? তবে যদি এক কাপি ফটোগ্রাফ তাহাদিগকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা মনে করে, তাহাদের আত্মা পূর্ণমাত্রায় ঐ ফটোগ্রাফে রহিয়া গেল। তখন আর তাহাদের ফটোগ্রাফ তুলাইতে আপত্তি থাকে না।

চিত্রের মর্ম্ম গ্রহণ

কোনও কোনও জাতি কোন চিত্র সোজাভাবে ধরিয়া চিত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা চিত্রের মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া নিবিষ্টচিত্তে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে এবং আপনাদের কাহারও সহিত চিত্রিত মূর্ত্তির সাদৃশ্য থাকিলে হাসিয়া কুটিপাটি হয়।

ফটো চিত্র তুলিবার পক্ষে অনেক বিপদ আছে। একে ত বুড়াবুড়ীরা 'আত্মা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে' বলিয়া বাধা দিবে, তাহার উপর যুবক-যুবতীরা ফটো তুলিবার সময়ে হাসিয়া লুটোপাটি খাইবে, কাযেই যাহার চিত্র তুলা হইবে, সে লজ্জায় ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

কয়েকটি চিত্র

যাহা হউক, নানা উপায়ে এই জঙ্গলের আদিম অসভ্যদিগের যে সকল ফটো তুলা হইয়াছে, তাহা হইতে উহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ও আচার-ব্যবহারের কতক আভাস পাওয়া যায়। প্রথমেই দেখা যায়, ইহাদের বসন-ভূষণের বর্ণের ছটা ও ঘটা। এমন বুঝি জগতে কোন জাতিরই নাই। ইহাদের পক্ষিপুচ্ছের শিরস্ত্রাণ অতীব সুন্দর। ব্রাজিল ও গায়েনার 'ইণ্ডিয়ানদের' শিরস্ত্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা চাক্‌চিক্যময়। ইহার পালকগুলি তোতা, হীরামন, লালবক প্রভৃতি পক্ষীর পুচ্ছ হইতে প্রস্তুত হয়। পালকগুলি এক গোলাকার চুবড়ীর অঙ্গে বসান। লাল, নীল, হরিদ্রা, কমলা প্রভৃতি নানাবর্ণ শিরস্ত্রাণের বাহার শতগুণে বৃদ্ধি করে। ইহাদের পৃষ্ঠদেশেও পালকের এক বিচিত্র 'পিঠবস্ত্র' দোদুল্যমান হয়। ইহাদের অঙ্গরাখাও নানাবর্ণের পালকে শোভিত। অনেকে মনে করেন যে, (Red Indians), বা রক্তবর্ণ ভারতীয় বলিতেই ইহাদের সকল জাতিকেই বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে—বিশেষতঃ মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকার 'ইণ্ডিয়ানদের' মধ্যে—অধিকাংশই তাম্রবর্ণ নহে ; বরং

ইহাদের মধ্যে অনেকে পীত, পীতাভ অথবা শ্বেতবর্ণের। এমনও দেখা যায় যে, ইহাদের শিরস্ত্রাণাদি খুলিয়া লইয়া যদি ইহাদিগকে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে ভূষিত করা যায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে য়ুরোপীয় বলিয়া ভ্রম হয়। আবার অনেকের বিশ্বাস, লোহিত ইণ্ডিয়ানদের মঙ্গোলীয় জাতির মত উচ্চ কপোল, ক্ষুদ্র চক্ষু ও চেপ্টা নাক। কিন্তু উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের বর্ণ তাম্রবর্ণ, গণ্ডদ্বয় উচ্চ, চক্ষু কোটরগত হইলেও হইতে পারে; দক্ষিণ-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা কিন্তু আদৌ সেরূপ নহে। উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মত তাহাদের তিলফুলের ন্যায় নাসা না হইলেও তাহারা বস্তুতঃই শ্বেতকায়, তাহাদের চক্ষু প্রশস্ত, গণ্ডদ্বয় গোল, তবে নাসিকা চ্যাপ্টা বটে। ইহারা যে উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি, তাহা ইহাদের ফটোচিত্র দেখিলেই অনুমান করা যায়। প্রাচীন ইনকাদিগের সত্যই তিলফুলের মত নাসার বর্ণনা ইতিহাসে পাঠ করা যায়। এখনও পেরু দেশের ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে 'ইনকা' নাসিকা দৃষ্ট হয়। চিলি প্রদেশের মাপুচে জাতির সহিত ককেশীয় আর্য্যজাতির আকৃতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ গায়েনার ও পানামার ইণ্ডিয়ান জাতিদিগের কতকগুলি ফটোচিত্র তুলা হইয়াছিল, ঐগুলি মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে। এক এক জাতির এক একটা আদর্শের নমুনা,—তাহাদের ঘরকন্না, আমোদ-প্রমোদ, আচার-ব্যবহার,—সকল বিষয়েই ফটো লওয়া হইয়াছে। গত বৎসর পানামার অবশিষ্ট কয়টি জাতির এবং পেরু ও চিলির ইণ্ডিয়ানদের এইরূপ চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। এ বৎসর পেরু ও চিলির অবশিষ্ট জাতিসমূহের এবং বোলিভিয়ার ইণ্ডিয়ান জাতির চিত্র লওয়া হইতেছে।

ইণ্ডিয়ানদের স্বভাব

অনেকে মনে করেন, প্রাচীন উপন্যাসে বর্ণিত ইণ্ডিয়ানরা এখনও বুঝি লোকের মাথা কাটিয়া লইবার উদ্দেশে (Scalp-hunting) ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপে অপরিচিত বিদেশী দেখিলেই হত্যা করে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিস্তর পর্য্যটক এ সকল দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; তাঁহারা বলেন, ইণ্ডিয়ানকে পূর্ব্বে আক্রমণ না করিলে কখনও তাহারা বিদেশী শ্বেতাঙ্গকে আক্রমণ করে না। বহু য়ুরোপীয় ও দক্ষিণ-আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ বা সঙ্করজাতি স্বর্ণ বা অন্য মূল্যবান্ ধাতু-অন্বেষী, রবার-অন্বেষী অথবা ভাগ্যান্বেষিরূপে ঐ সকল দেশে আবির্ভূত হইয়া ইণ্ডিয়ানদের উপর নানা অত্যাচার করিয়া থাকে; এ জন্য হয় ত ইণ্ডিয়ানরা সকল বিদেশীকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যায়, জঙ্গলী অসভ্য নর-রাক্ষস রেড ইণ্ডিয়ানের চরিত্র-চিত্র যে সকল য়ুরোপীয় অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় উপন্যাস বিক্রয়ের লোভে, না হয় কোন য়ুরোপীয় শক্তি প্রচারকরূপে (যেমন ক্যাথারিণ মেয়ো) এই সাধুকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, সাধারণতঃ ইণ্ডিয়ানরা স্ববিবেচক। তাহারা অপরিচিতের ব্যবহারের অনুযায়ী তাহার প্রতি ব্যবহার করে। ইহারা অতিথিপরায়ণ, বন্ধুবৎসল এবং আমোদপ্রিয় জাতি। ইহাদের সহিত যাহারা ভাল ব্যবহার করে, তাহাদের ইহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করে। এক জন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, যত দিন ইহারা 'প্রতীচ্যের সভ্যতার' ছায়া হইতে দূরে থাকে এবং শ্বেতজাতির পাপ ও অধর্ম্মাচরণে শিক্ষা লাভ না করে, তত দিন ইহাদের মঙ্গল, তত দিন ইহারা সরল আমোদপ্রিয় জাতিরূপেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।



মাচুসি-জাতীয় যুবতী সাগুদানা বাছিতেছে

'করিব' জাতির ধর্ম্ম-নৃত্য

গায়েনার 'করিব' জাতির বন্ধুত্ব যে একবার লাভ করিয়াছে, তাহা জীবনে ভুলিবে না। ইহারা যেমন শিষ্টের পালক, তেমনই দুষ্টের দণ্ডবিধাতা। একবার এক ভ্রমের ফলে এক য়ুরোপীয় পর্য্যটকের প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। পর্য্যটক ডোঙ্গায় চড়িয়া বহুদূর হইতে আসিয়া পূর্ব্বপরিচিত এক করিব সর্দ্দারের গ্রামে উপস্থিত হয়েন। এবার কিন্তু করিবরা তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় অভ্যর্থনা বা আদর-আপ্যায়ন করিল না। বরং সর্দ্দার মুখখানা কালো আঁধার করিয়া ক্রমাগত একটা হাড় দিয়া ঢাক পিটিতে লাগিল। অমনই বিস্তর করিব চারিদিক হইতে লাঠি-সোটা, তীর-ধনু ইত্যাদি লইয়া পর্য্যটককে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। পর্য্যটকের দাঁড়ী-মাঝি ও কুলীরাও সব করিব, কেবল একটি কাফ্রি বালক ছিল। সে ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিল, করিব চাকর-বাকররাও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ পর্য্যটকের এক পরিচিত করিব যুবক তাঁহার আড্ডা হইতে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যাপার দেখিয়া সর্দ্দারের সহিত যখন গোপনে কথা কহিল—ব্যাপার বুঝাইয়া দিল, তখন সর্দ্দারের মুখখানি মেঘমুক্ত চাঁদের মত হাসিয়া উঠিল, পর্য্যটক পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। ঘটনাটা এইরূপ;—পূর্ব্বে গ্রামের এক যুবক সর্দ্দারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীকে লইয়া পলাইয়া যায়। সেই যুবক ও তাহার প্রণয়িনী পর্য্যটকের চাকরী লইয়াছিল এবং সর্দ্দার তাহাদিগকে পর্য্যটকের চাকর দেখিলে কিছু বলিতে সাহস করিবে না, এই ভরসায় গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সর্দ্দার মনে করিল, পর্য্যটক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে বুক ফুলাইয়া গ্রামে লইয়া আসিয়াছে। তাই এই ক্রোধ! পর্য্যটক সমস্ত কথা শুনিয়া তখনই সেই যুবক আর তাহার প্রণয়িনীকে দূর করিয়া দিলেন।

করিবরা ধর্ম্মভীরু। তাহাদের ধর্ম্মের নাচ দেখিবার জিনিষ। এই নাচের নাম "পরাশর।" এই 'পরাশর' কথাটি শুনিলে কি উহাদের ভাষার সহিত আমাদের সংস্কৃতের সম্বন্ধের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয় না? যেমন শ্যামদেশের রাজা চড়ালঙ্করণের নাম শুনিলেই শ্যামের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতার কথা মনে উদয় হয়, তেমনই এই ইণ্ডিয়ানদের 'পরাশর' নাচের নাম শুনিলেই মহীরাবণের দেশের কথা মনে পড়ে। তালপত্র ও তন্তুর সাহায্যে এই ধর্ম্ম-নাচের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়। এই ধর্ম্ম-নৃত্য অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মাত্র নৃত্যকালে এই পরিচ্ছদ পরিধানযোগ্য, অন্য সময়ে উহা বৃক্ষশাখায় বা নদীর উপর আলনা

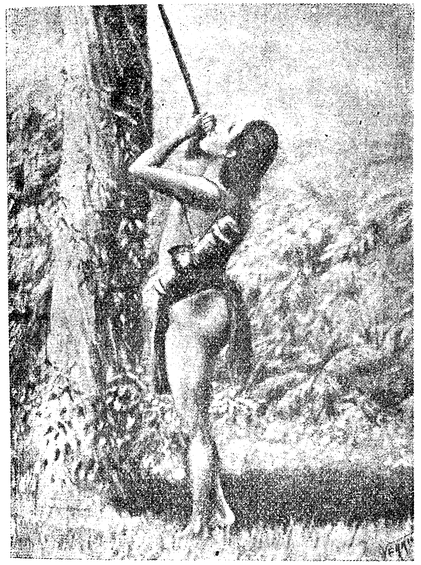

ব্রাজিলের আরেকুলা-জাতীয় পুরুষ দেশীয় বন্দুক ছুড়িতেছে

খাটাইয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। উহার প্রভাবে দুষ্ট প্রেত-প্রেতিনীরা গ্রামের ত্রিসীমায় আসিতে পারে না।

নৃত্যের পর এক উৎসব হয়, উহার নাম "বিমিতি (Bimitti) দৌড়।" দৌড়ের পরেই মহাপান আরম্ভ হয়। এই মহাপান দ্বারকায় মদোন্মত্ত ছাপ্পান্ন কোটি যদুকুলের মহাপানেরই অনুরূপ বলিলেই হয়। সে সময়ে করিব ও পাটামোনা জাতি জ্ঞানশূন্য হইয়া উদ্দাম নৃত্য-গীতে রত হয়।

পেয়াইমান

ইহাদের চিকিৎসককে (Medicine-man) ইহাদের ভাষায়



বৃটিশ গায়ানার ওয়াইওই-জাতীয় নর্ত্তক

পেয়াইমান বলে। এই পেয়াইমানদের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। পেয়াইমান কেবল চিকিৎসক নহে, সে মন্ত্রতন্ত্রেরও মালিক, পরন্তু সর্দ্দারের পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী। গ্রামে কোন বিপদ-আপদ বা সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীরা পেয়াইমানদের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

গুয়েমিস

পানামার গুয়েমিস জাতি নিবিড় অরণ্যে বাস করে। তাহারাও পাটামোনা ও করিবদের মত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু করিব ও পাটামোনাদের মত তাহারা অপরিচিত বিদেশীর প্রতি সন্তুষ্ট নহে, তাহারা বিদেশীকে তাহাদের গ্রামে আসিতে দেখিলেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা অতিথিপরায়ণও নহে।

একবার এক য়ুরোপীয় পর্য্যটক একটা কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিয়া এক গ্রামের গুয়েমিস সর্দ্দারকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, এমন কি, শেষে তিনি সর্দ্দারের পরমপ্রিয় বন্ধুরূপে তাঁহার গ্রামে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গে কতকগুলি অত্যাবশ্যক এলোপ্যাথিক ঔষধ লইয়া গিয়াছিলেন। কাহারও কঠিন পীড়া হইলে তিনি সর্দ্দারের অনুরোধে ঔষধ-প্রয়োগে নিরাময় করিতেন। ইহাতে তিনি সেই গ্রামে 'পেয়াইমান' বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং গ্রামবাসীরা য়ুরোপীয়ের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সেই সুযোগে তিনি নানারূপে নানা অবস্থায় তাহাদের ফটোচিত্র লইতে লাগিলেন। এ যাবৎ কিন্তু এই জাতির কেহ ফটোগ্রাফ তুলিতে সমর্থ হয় নাই। বেশ দিন কাটিতে লাগিল, হঠাৎ এক দিন সর্ব্বনাশ হইল।



করিব যুবতী সুতা কাটিতেছে

দূরের এক গ্রাম হইতে এক দিন কয়েক জন গুয়েমিস জাতীয় লোক আসিল। য়ুরোপীয় পর্য্যটকের অনুরোধে সর্দ্দার তাহাদিগকেও ফটোগ্রাফ তুলাইতে বাধ্য করিল। অবশ্য তাহারা যে এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্দ্দারের আদেশ পালিত হইল, তাহাদের ফটোগ্রাফ তুলা হইল। সেই দিন সন্ধ্যার পর পর্য্যটকের তাম্বুর ভিতরে তিনি তাঁহার দোলায় শয্যায় শুইয়া চুরুট টানিতেছেন এবং প্রায় ২২।২৩ জন পালক-পরা চিত্রকরা গুয়েমিস জাতীয় লোকের সহিত কথাবার্ত্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে একটি যুবক ধীরে ধীরে তাম্বুর মধ্যে আসিয়া এক কোণে বসিল। তাহাকে দেখিয়া পর্য্যটক বুঝিলেন, সে নূতন লোক—যাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ ফটোগ্রাফ তুলা হইয়াছে, তাহাদেরই এক জন। গল্পগুজব চলিতেছে, এমন সময় সেই লোকটা হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া গোঙাইতে লাগিল, হাত-পা কসিতে লাগিল, তাহার মুখ দিয়া ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতে লাগিল। পর্য্যটক ভাবিলেন, তাহার মৃগীরোগ চাগাইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত জনগণ যে অন্যরূপ মনে করিল, তাহা তাহাদের আচরণেই প্রকাশ পাইল। তাহার বন্ধুবর্গও সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। তখন গ্রামের গুয়েমিসদিগের সহিত তাহাদের ফিস্ ফিস্ গুপ্ত পরামর্শ চলিল। ততক্ষণ পর্য্যটক ও সর্দ্দার লোকটার চৈতন্য উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, লোকটার যেন ক্রমে নাড়ী ছাড়িয়া আসিতে লাগিল। তখন উপস্থিত জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া হিংসা-কষায়িতলোচনে শ্বেতাঙ্গ পর্য্যটকের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে ক্রমে ঘিরিয়া ফেলিয়া হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইল। সেই ঘোর বিপৎকালে সর্দ্দার একমাত্র বন্ধু। সর্দ্দার তাহার প্রজাগণকে কত কাকুতি-মিনতি করিয়া বুঝাইতে লাগিল, বলিল, "এই পেয়াইমান মৃতকেও ফিরাইয়া আনিতে পারে। লোকটাকে ভূত আশ্রয় করিয়াছে, পেয়াইমান সে ভূতকেও তাড়াইতে পারে। তোমরা ভাবিতেছ, ইহার বিরুদ্ধে উহার ফটো তুলিয়াছে বলিয়া লোকটা মরিয়াছে —পেয়াইমান ফটো তুলিয়া উহার আত্মাটাকে বাহির করিয়া লইয়াছে?—উহা সত্য নয়। আর তোমাদেরও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফটো তুলা হইয়াছে বলিয়া তোমাদেরও ঐ দশা হওয়া উচিত ছিল। কৈ, তাহা ত হয় নাই। তবে ভয় পাইতেছ কেন? উহাকে দুষ্ট ভূত আশ্রয় করিয়াছে, পেয়াইমান এখনই ভূত ছাড়াইয়া দিবে।"

সর্দ্দারের বক্তৃতায় আপাতঃ কায হইল, লোকগুলার ভাব দূর হইল, তাহারা সরিয়া গিয়া দূরে বসিয়া পর্য্যটকের কার্য্যকলাপ অবলোকন করিতে লাগিল। পর্য্যটক যত রকম উত্তেজক ঔষধ ছিল, নানা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, লোকটা ক্রমেই যেন শিবনেত্র হইয়া আসিতে লাগিল। তখন আর গুয়েমিসদিগের মুখচক্ষুর ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পর্য্যটক প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। রোগীর একটু বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল, ধীরে নিশ্বাস বহিতে লাগিল, চক্ষু সামান্য নড়িতে লাগিল; উপস্থিত জনগণ অবাক্ বিস্ময়ে পেয়াইমানের এই অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পেয়াইমান বুঝিলেন, লোকটার মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া থাকার যে শক্তির মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আর গুয়েমিসরা বুঝিল, তাহাদের মধ্যে এক অসাধারণ পেয়াইমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

য়ুরোপে ভারতীয় রাসায়নিক

য়ুরোপে মার্সেলস্ বা নেপল্‌স্‌এ পদার্পণ করিলে প্রথমেই দেখা যায়, সে দেশের লোকের অটুট স্বাস্থ্য। মুটে অনায়াসে গুরুভার বাক্স, সুটকেশ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়েদের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বাস্থ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ছোট ছোট মেয়েরা (১৬ বৎসর অবধি) কি স্ফূর্ত্তির সহিতই না স্কুলে চলিয়াছে! বোধ হয়, ওজনে ইহারা আমাদের বাঙ্গালাদেশের মেয়েদের আড়াই গুণ হইবে। ইহারাই ত জাতির ভবিষ্যৎ জননী। আমাদের ক্ষীণকায়া, রক্তহীনা, লাবণ্যহীনা বালিকাদিগের সন্তান-সন্ততি কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এমন কি, ইহাদের অশ্বগুলিও কত বৃহৎ—কত তেজস্বী!

আমাদের দেশের একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, ইংলণ্ড কেবল সহরময়, অর্থাৎ হর্ম্ম্য-ইমারতে পরিপূর্ণ জনপদের সমষ্টিমাত্র; কিন্তু ডোভার হইতে লণ্ডন এবং লণ্ডন হইতে উত্তরে এডিনবরা বা এবার্ডীন অবধি (মিডল্যাণ্ড বা নর্থ ইষ্টার্ণ যে কোনও রেলে) ভ্রমণ করিলে তৃণ-শষ্প-শ্যামল মাঠের পর মাঠ নয়নগোচর হয়। মাঝে মাঝে ফলের বাগান বা শাকশব্জীর ক্ষেত্র। বাড়ী-ঘরের মত মাঠ ও বাগানগুলি মনোহর। এই সমস্ত বৃহৎ মাঠে গ্রামবাসীরা গ্রীষ্মের কয় মাস ঘাসের আবাদ করিয়া ৩।৪ কিস্তি ঘাস কাটিয়া শুকাইয়া গৃহপালিত পশুর শীতের খোরাক জোগাড় করিয়া রাখে। আবার তাহারা এই ঘাসের মাঠের মাঝে মাঝে যব, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতির চাষ করে। এতদ্ব্যতীত আপেল, কুল, চেরি, পিয়ার প্রভৃতিরও চাষ হয়। এই সব দেশজাত ফল ব্যতীত বিদেশ হইতে প্রচুর আপেল, আঙ্গুর, কলা প্রভৃতি আমদানী হয়। লণ্ডন ও অন্যান্য সহরে ফলের বিস্তর দোকান আছে।

গো, মেষ, কুক্কুট, শূকর-পালনও ইহারা নিয়মিতরূপে করিয়া থাকে। এমন কি, পশুপালন চাষের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণিত হয়। পশুর 'চাষে' নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বিত হয়। ফলে ক্রমশঃ গো-মহিষ আদির বংশ উন্নত হইতেছে। এই প্রকার পুষ্টদেহ মেষ ও গাভীকে চারণের জন্য বড় বড় মাঠে তাজা ঘাস খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। শীতকালে যখন তৃণ দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন পশুদিগকে শালগম, গাজর প্রভৃতি খাদ্য সরবরাহ করা হয়। ফলে বৃটেনে দুগ্ধ যেমন প্রচুর, তেমনই খাঁটি এবং কলিকাতার অপেক্ষা স্বল্পমূল্য। গব্য মাখন, ক্রীম, পনীরও মহার্ঘ্য নহে। আর আমাদের সুজলা সুফলা বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামেও এখন দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। টাকায় আড়াই সের খাঁটি দুগ্ধ সহরে পাওয়া ভার। বাঙ্গালার শিশু আজ দুগ্ধ অভাবে রুগ্ন ও শীর্ণ। দুগ্ধই শিশুদের অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের প্রধান উপকরণ। সুতরাং এই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালীজাতি যে কি প্রকার হীনবল হইয়া পড়িতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইংরাজ জাতির কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শৃঙ্খলাবদ্ধতা, চরিত্রবল, উদ্যম, উৎসাহ অনুকরণীয়। এই জাতি যে কেন পৃথিবীর উপর আধিপত্য করে, তাহা ইহাদের দেশে আসিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। দুই চারিটা বিষয় নিয়ে আলোচিত হইল।

শৃঙ্খলাবদ্ধতা

শৃঙ্খলাবদ্ধতার কথায় প্রথমেই মনে পড়ে লণ্ডন পুলিসের কর্ত্তব্যপালন। ইহারা এক একটা ৫।৬ মাথা রাস্তার মোড়ে অবলীলাক্রমে মানুষের ও গাড়ীর স্রোত চালনা করিয়া থাকে। একটি হস্তের ইঙ্গিতে এই সুবৃহৎ যানবাহনের স্রোতের এক অংশ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং অপর অংশ চলিতে থাকে। আমাদের এক বন্ধু একটি ঘটনা দেখিয়া আমাদের কাছে এই গল্পটি করিয়াছিলেন। এক ভদ্রলোক একটি রোলস্ রইস মোটরকার চালাইয়া এক কনষ্টেবলের হস্তের গণ্ডীর অতিরিক্ত এক ফুট আন্দাজ যাওয়ায় তাঁহাকে তখনই বলিতে হয়,—"দেখ, আমি এই অতিরিক্ত পথ অতিক্রমের জন্য দুঃখিত, তোমার হাত আমি দেখিতে পাই নাই।" পাহারাওয়ালা সেবারের মত তাঁহার গাড়ীর নম্বর না লইয়া বলিল, "কিন্তু আপনার দেখা উচিত ছিল, মহাশয়।"

রাস্তার মোড়ে এই প্রকার আয়াসসাধ্য কাযে যখন কনষ্টেবল গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে, তখনও কোন পথিকের প্রশ্নের উত্তরে সে অতি যত্নের সহিত অজানা পথের বা বাড়ীর ঠিকানায় পৌঁছিবার বিষয় বলিয়া দেয়। পোষ্ট-অফিস, থিয়েটার বা রেলের ষ্টেশন প্রভৃতি স্থানে টিকিট কিনিবার জন্য লোকের জনতা হইলে জনতা আপনা হইতেই পর পর শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া যায়। ধস্তাধস্তি, ঠেলাঠেলি, মেয়েছেলেদের পশ্চাতে রাখিয়া নিজে অগ্রসর হওয়া এ সব নাই। এমন কি, এক একটা ক্রীড়া বা উৎসবে ১২।১৪ ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া দর্শক টিকিট প্রাপ্ত হয়।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা

বাড়ীর দাসদাসীদিগকে দিনের কাযের ফর্দ্দ একবার বুঝাইয়া দিলে প্রত্যহ ঘড়ীর কাঁটার মত সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে। এমনও দেখা গিয়াছে, যেখানে গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ ভার পরিচারিকাদিগের উপর দেওয়া হইয়াছে, তাহারা এমন শৃঙ্খলার সহিত সেই সমস্ত সম্পাদন করে যে, গৃহকর্ত্রীকে কখনও কোন কাযের জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। কদাচিৎ 'পান হইতে চূণ খসে।' বাড়ীর ভিতর-বাহির সর্ব্বদা ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করে, যেন পরিচ্ছন্নতার একখানি ছবি। আবার সময়ে সময়ে গৃহকর্ত্রীও ইহাদের সাহায্য করেন। ফলে পরিচারিকারা সপ্তাহে দুই এক দিন অনেকটা সময় ছুটী পায়। গৃহকর্ত্রী বা পরিচারিকার মধ্যে

বচসা কদাচিৎ হয়। একটি মাঝারী রকমের গৃহস্থের বাড়ীর দৈনন্দিন কার্য্যের এইরূপ তালিকা ;—

ভোরে উনানে আগুন দেওয়া, হাত-মুখ ধুইবার জল গরম করা ও গরম জল ঘরে ঘরে সরবরাহ এবং জুতা পরিষ্কার করা। পরে প্রাতরাশের আয়োজন (রন্ধন বাদে) এবং তাহার পর বাসন পরিষ্কার, বিছানা তৈয়ারী, ঘর ও বারান্দা প্রভৃতি পরিষ্কার (ইহার মধ্যে বাথরুম পরিষ্কারও পড়ে)। তাহার পর ২।১ ঘণ্টা বিশ্রামের পর মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজন করা ও বাসন মাজা। পরে বৈকালিক চা'য়ের আয়োজন ও বাসন মাজা। তাহার পর ২।৩ ঘণ্টা বিশ্রামের পর সান্ধ্যভোজনের ব্যবস্থা ও বাসন পরিষ্কার। মধ্যে মধ্যে এই বিশ্রামের সময়টুকু তাহারা আলস্যে কাটায় না, নিজের বা গৃহকর্ত্রীর সীবনকার্য্যাদিতে অতিবাহিত করে। ঘর-দুয়ার সাধারণভাবে পরিষ্কার করা ভিন্ন, সপ্তাহে ২।৩ দিন প্রত্যেক পিতলের হ্যাণ্ডেল, কব্জা প্রভৃতি পালিশ করিয়া চক্‌চকে করা প্রভৃতি কত যে খুটিনাটি পরিশ্রমের কাযই আছে, তার ঠিকানা নাই। অধিকাংশ স্থলে ছোট ছোট মেয়েরা এই অত্যন্ত আয়াসসাধ্য কায সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। ইহা ভিন্ন সপ্তাহে 'ধোলাইয়ের দিনে' পরিচারিকা, গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার মেয়েরা এক সঙ্গে গৃহব্যবহারের জন্য তোয়ালে, বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, টেবল ক্লথ, কিছু কিছু জামা, কাপড় প্রভৃতি কাচিয়া শুকাইয়া রাখে।

সাধারণ যে কোন লোককে কোন ভার অর্পিত হইলে, সে যে সেটি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবে, এ বিষয়ে বড় একটা সন্দেহ থাকে না। এমন কি, ট্রাম বা 'বাস'এর কণ্ডাক্টরকে গন্তব্য স্থানের কথা বলিয়া দিলে সে ঠিক স্মরণ করাইয়া দেয়।

চরিত্রবল

ছোটখাট ছিচ্‌কে চুরি বড় একটা দেখা যায় না। বাড়ীর ভিতর টেবলের উপর টাকাকড়ি পড়িয়া থাকে। গৃহস্থের খিড়কীর দরজার পাশে রাস্তার ধারে দুধের খালি বোতল পড়িয়া থাকে। বার্লিংটন হাউসে কেমিক্যাল সোসাইটীর নিকট এক স্থানে এই প্রকার দুধের বোতলের পার্শ্বে কতকগুলি পয়সা (দুগ্ধের মূল্য) পথে প্রত্যহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। যথাকালে দুগ্ধবিক্রেত্রী ঐ পয়সা লইয়া যাইত। একবার আমাদের এক বন্ধুর একটি চামড়ার সুটকেস লণ্ডন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারে পাঠাইবার সময় ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু মালবাহী কোম্পানী দড়ি-বাঁধা সেই ভাঙ্গা বাক্স বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার পর দেখা যায়, একটিও দ্রব্য অপহৃত বা নষ্ট হয় নাই। এই প্রকার সামান্য দৃষ্টান্তে উহাদের নৈতিক স্বাস্থ্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা

ইহাদের দেশের নানা অনুষ্ঠানে বা ঘরোয়া কাযে উক্ত গুণটি সহজেই চোখে পড়ে। ছোট ছেলেমেয়েদের এক দিকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধতার শিক্ষা দেওয়া হয়, অপর দিকে তেমনই সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ছেলেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও বাপ-মা বা শিক্ষকরা তাঁহাদের আওতায় তাহাদের মানুষ করেন না। স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হইয়া তাহারা চালচলনে বা মনে মনে স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠে এবং নিজেরাও যেমন স্বাধীনতা চায়, অপরের স্বাধীনতারও তেমনই মর্য্যাদা রাখে। ইহার তুলনায় আমাদের ছেলেরা অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল এবং তাহাদের উদ্যমহীনতার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহারা শিশুকাল হইতে নির্দ্ধারিত পথে ভিন্ন চলিতে বা চিন্তা করিতে জানে না।

শ্রমের মর্য্যাদা

টিউব রেল প্রভৃতিতে ক্রোরপতি ও মুটে-মজুর পর্য্যন্ত পাশাপাশি ঘেঁসাঘেসি বসিয়া যায় এবং আধ মণ ত্রিশ সের ভারী ব্যাগ নিজেরা বহন করিয়া যাতায়াত করে। অনেকখানি পথ পদব্রজে অতিক্রম করা অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও আদৌ লজ্জার বিষয় নহে। পাঁচ সেরের উর্দ্ধ হইলেই সে দ্রব্যের জন্য আমাদের "বাবু"দের মুটে চাই এবং গাড়ী না হইলে ভদ্রস্থানে যাওয়াই চলিবে না। একসঙ্গে যাহারা বসে, দাঁড়ায়, আবশ্যক হইলে তোমার জুতা ঝাড়া কিংবা তদপেক্ষা (তথাকথিত) নীচ কায অসঙ্কোচে করিতে পারে। কোন কাযকে যে ইহারা নীচ বা ছোট বলিয়া মনে করে না, ইহার দৃষ্টান্ত ইহাদের সাধারণ জীবনে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

নীরবকর্ম্মিতা

কাযের অনুপাতে ইহাদের কলরব খুব কম। এমন কি, এক ঝাঁক মুটে-মজুরকেও ষ্টেশনে বা ডকে হৈ-চৈ করিতে দেখা যায় না।

কর্ম্মকুশলতা

ষ্টেশন, ডক, বাজার, দোকান, রাস্তা, মাঠ, গৃহস্থের বাড়ী—কোন স্থানেই কাহাকেও নিশ্চেষ্ট দেখা যায় না। আমাদের পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপের জটলা হইতে সহরের তামাক ও তাসপাশার আড্ডার অকর্ম্মার নিরুদ্যম অলস ছবির পার্শ্বে ইহাদের অক্লান্ত সজীব ও স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

মোট কথা, আলস্যকে ইহারা মৃত্যু এবং কর্ম্মকেই জীবন বলিয়া বিশ্বাস করে। আর এই জীবনের ভিত্তি যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সে কথা ইহাদের নিতান্ত নাবালকও জানে। লণ্ডন, এডিন্‌বরা, গ্লাসগো প্রভৃতির পার্কসমূহে বা ব্যারো, এবার্ডীনএর মত স্থানে সমুদ্রকূলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটি পাইলেই আসিয়া রৌদ্র ও মুক্তবায়ু সেবন করে। কত প্রকার ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদির চর্চ্চাও হয়। জীবনের আস্বাদ কি করিয়া পাইতে হয়, ইহারা তাহা বেশ জানে। এই যে ইহারা আনন্দ শরীর-মনের সহিত মাখাইয়া লয়, ইহাতে ইহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মের জীবনকে কত লঘু করিয়া দেয়, তাহা আমরা কবে বুঝি? আনন্দবিহীন জীবনে আমাদের যেমন উদ্যমও নাই, কর্ম্মও তেমনই সহজসাধ্য হয় না।

জাতীয় উৎসব ও আমোদপ্রমোদ

কোন একটা জাতীয় উৎসবে যে সকল আমোদপ্রমোদ হয়, মূলতঃ ঐগুলির সহিত আমাদের দেশের উৎসবের সাদৃশ্য আছে

'হুইট মনডে" পর্ব্বে হ্যাম্পস্‌টেড হীথএ দেখিতে পাওয়া যায়, সারি সারি নাগরদোলা এবং ঐ জাতীয় ক্রীড়ার সরঞ্জাম, অস্থায়ী দোকান, ফেরিওয়ালা, লটারী, কত কি। এমন কি, চীনাবাদাম পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ছেলেমেয়েরা খেলনা ও কুল্পী বরফ কিনিতেছে। আবার তামাসা করিয়া পরস্পরের (অপরিচিত হইলেও) অঙ্গে একটা সীসার শিশি (collapsible tube) হইতে জল বা গন্ধদ্রব্য ছিটাইয়া দিতেছে। ইহাদের আমোদের সহিত আমাদের দেশের মহরম বা চড়কের লোকসমাগম ও সেই সম্পর্কীয় সাধারণ আমোদপ্রমোদের খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না।

ব্যবসায় এবং বাণিজ্য

ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে ইহারা পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। মলয়, কঙ্গো ও দক্ষিণ-আমেরিকার রবারের চাষ প্রায় সবই ইহাদের হস্তগত এবং কাঁচা রবার হইতে রবারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানাও ইহাদের একচেটিয়া বলিলেও হয়। বড় বড় লোহার কারখানা, কাপড়ের কল, কাগজের কল, পাটের কল, পশমের কারখানা, কয়লার খনি, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা (যথা সাবান), লিভার ব্রাদার্স, ক্রনারমণ্ড ইত্যাদি কত শত জাহাজ (tonnage) ইহাদের হস্তে রহিয়াছে। কত দিনের কত অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফলে এবং কত ব্যর্থতার পরে এই বিশাল শাখাপ্রশাখাযুক্ত বাণিজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কয় জন আমরা ভাবিয়া দেখি? শুনা যায়, এক জন ইংরাজের গড়ে ৬ টাকা ১২ আনা, আর এক জন ভারতবাসীর গড়ে ২ আনা মাত্র দৈনিক আয়।

বিলাতের জলহাওয়া অবশ্য অধিক পরিশ্রমের অনুকূল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের এটা ভুলিলেও চলিবে না যে, চিরদিনই ও দেশের সকল স্থানের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং আমাদের দেশের স্বাস্থ্যও চিরদিন মন্দ ছিল না এবং এখনও ভাল করা সম্ভব। কিন্তু এদের লক্ষ্য করিবার প্রধান বিষয় হইতেছে, কি করিয়া শিশুর পরিচর্য্যা হইতে বৃদ্ধের পরিপোষণ (old age pension) পর্য্যন্ত ব্যষ্টিকে, তথা সমষ্টিকে (জাতিকে), পুষ্ট ও পরিস্ফুট করিবার জন্য সমগ্র দেশবাসী কত চিন্তা, শক্তি, সামর্থ্য ও ত্যাগের দ্বারা পথের নিরাকরণে সর্ব্বদা চেষ্টিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পূর্ব্বে বিলাতে যক্ষ্মার প্রচুর প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন অনেক চেষ্টার ফলে তাহাকে এক রকম নির্ম্মূল করিবার সূত্রপাত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রাজযক্ষ্মা এক সময় অতি বিরল ছিল, এখন ইহার প্রকোপ ভীষণভাবে বাড়িতে চলিয়াছে।

কি করিলে প্রসূতি সুস্থ এবং সবল থাকিবে, তাহার সুপ্রসব হইবে, স্বাস্থ্যকর আঁতুড়-ঘর পাইবে, সন্তান ও তাহার মাতা পুষ্টিকর খাদ্য (অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ) পাইবে, তাহার পর সেই সন্তান কি উপায়ে ক্রীড়া, ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্যের সাহায্যে শারীরিক উন্নতিসাধন করিবে এবং নিম্নশিক্ষার কৈশোর পার হইয়া যৌবনে কি করিয়া মধ্য ও উচ্চশিক্ষা পাইবে, তাহার পর কেমন করিয়া তাহার বিকাশের জন্য নিজের উপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে ও গৃহস্থালী করিবে এবং কি উপায়ে ইহারাই আবার সুস্থ সবল সন্তানের জনক হইবে, এই সমস্ত বিষয় মনীষীরা সতত চিন্তা করিতেছেন এবং এই সকলে ভাব ও আদর্শ কি করিয়া কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহার উপায় সন্ধান করিতেছেন। বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন প্রকারের নানা কায পরস্পরকে সাহায্য করিয়া জাতিকে অগ্রসর করিতেছে। ইহাদের সমাজ যেন অনেক কল-কব্জাওয়ালা একটি ঘড়ি—কলগুলি এমন সাজানো, যাহাতে ঘড়িটি ভাল চলিতেছে। (আমাদের ঘড়ির কল-কব্জা সব ছড়ানো—হয় ত সব কলই নাই)। এই শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা এবং এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমাদের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। অবশ্য বিলাতেও দলাদলি ও নীচতা আছে, কিন্তু ইহাদের সমস্ত দেশটার কথা ভাবিলে জমার হিসাবে যে শ্রেষ্ঠতা দাঁড়ায়, সেই শক্তিতে আজও ইহারা পৃথিবীর মধ্যে একটি উচ্চ ক্রমোন্নতিশীল জাতি। আমাদের দেশে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আজও ভালরূপে স্থাপিত হয় নাই। অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এখন উন্নতির জন্য দেশবাসীর অনেক দিকে অনেক প্রকার কাযের চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই বিভিন্নমুখী—সমমুখী হইয়া আমাদের তেমন শক্তি দিতেছে না। আমাদের অবশ্য অবস্থার অন্তরায়ও অনেক আছে, কিন্তু তবু যতটা সম্ভব আমরা কায করি কি? জার্ম্মাণী ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশ—বিলাত ভিন্ন ইতালী, ফ্রান্স, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, জেকো-শ্লোভাকিয়া ও জার্ম্মাণী অল্পবিস্তর দেখিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছিল। অবশ্য ইহারা সকলেই সমান তালে চলিতেছে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানে আমাদের দেশের অপেক্ষা ইহারা অনেক অধিক অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল দেশে অন্ততঃ ১৪ বৎসর অবধি ছেলে-মেয়েরা বাধ্যতামূলক শিক্ষা পায়। জার্ম্মাণীতে কতকগুলি জার্ম্মাণ ও জার্ম্মাণ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ইংরাজদের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ইহাদের পক্ষেও খাটে। শৃঙ্খলাবদ্ধতায় এখন ইহাদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর কেহ আছে কি না সন্দেহ। এই জ্ঞান ইহাদের এত মজ্জাগত যে, সাধারণ লোক এক এক সময় সামান্য কাযেও নিজেদের সহজবুদ্ধি খাটায় না। কার্য্যপদ্ধতির উপর এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ইহাদের অদ্ভুত কার্য্যকুশলতার একটি প্রধান কারণ। উত্তর জার্ম্মাণীতে জমী বালুকাময়, এ জন্য ভাল চাষ হয় না, কিন্তু দক্ষিণে ইহারা ভাল চাষ করে এবং ইহাদের অনেক বনানীও আছে। এক জার্ম্মাণ পল্লীতে এক সাধারণ কৃষকের বাড়ী আমরা যাই। গো, মেষ, অশ্ব, কুক্কুট, শূকর, হাঁস প্রভৃতিও পালিত হয় এবং ইহাদের থাকিবার জন্য পাকা বন্দোবস্ত আছে। একটি জলচালিত ছোট কলে একটি ময়দার কল, কৃষকের নিজের থাকিবার একটি ছোট পাকা বাড়ী বেশ পরিপাটী করিয়া সাজান আছে। আমরা যখন যাই, লোকটি নিজের ক্ষেতে কায করিতেছিল এবং তাহার অপরিচ্ছন্ন 'কাযের পোষাক' পরিধান করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিল না। স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিলেও ইহার অবস্থা বেশ ভাল এবং চাষের জন্য খনন, বীজ বপন ইত্যাদির জন্য যন্ত্রাদি এবং চড়িবার ও মালবহনের গাড়ী, স্লেজ প্রভৃতি আছে।

আবার সেই ক্ষুদ্র নদীর জলে যে কলের চক্র ঘূর্ণিত হয়, তাহা হইতে বিদ্যুৎ সঞ্জাত হয় এবং আলোক জ্বালিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জার্ম্মাণদের যে কত প্রকার ছোট বড় কারখানা আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যন্ত্রবিদ্যায় যে ইহারা কত অধিক উন্নত, তাহা বলা বাহুল্য। লৌহের, রং প্রস্তুতের, ঔষধের, জমীর, সারের এবং কাগজের কতকগুলি বিরাট কারখানা আছে। রেলগাড়ীগুলি বজ্রের মত মজবুত এবং দক্ষিণা দিলে আরামের আয়োজনও প্রচুর। রেলে বসিয়া রেডিও বা তারহীন বার্ত্তাতে গান, বক্তৃতা, কন্সার্ট প্রভৃতি শুনা যায়। বার্লিন, লাইপটিগ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শ্রেণীগুলি পুরুষ ও স্ত্রী ছাত্রে পূর্ণ। ছাত্ররা পরিশ্রমও খুব করে। লাইপটিগএ জানিলাম যে, রাসায়নিক ল্যাবরেটরীতে মাঝে মাঝে ছাত্ররা সারারাত্রি কায করে। যুদ্ধের পর "মার্ক"এর (জার্ম্মাণীর টাকার) দামের অপরিমিত হ্রাস হওয়ায় জার্ম্মাণীর প্রায় সকল লোকই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নূতন জীবন গঠন করিবার পণ করিয়া এই কয় বৎসরেই ইহারা অবস্থার অনেক উন্নতি করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য এখনও ইহাদের সাধারণ লোক অত্যন্ত দরিদ্র। তাহার উপর খাজনাও অত্যন্ত অধিক এবং বেকার সমস্যা ইংলণ্ড অপেক্ষাও জটিল। তথাপি অক্লান্ত পরিশ্রম, অদ্ভুত অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার ফলে ইহারা দ্রুত উন্নতিসাধন করিয়াছে। কেহ কেহ আমাদের এমনও বলিয়াছে যে, উহারা উপার্জ্জনের কিয়দংশ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া তবে অন্য খরচ করে। বার্লিন, ড্রেসডেন বা লাইপটিগএর মত বড় বড় সহরেও জার্ম্মাণদের 'বাবুয়ানার' পরিচয় বেশী পাওয়া যায় না। যে বিলাসিতা এ সব স্থলে দেখা যায়, তাহার পৃষ্ঠপোষক অনেক বিদেশী, বিশেষতঃ আমেরিক্যান পর্য্যটকরা। লণ্ডনে যে অবস্থায় লোকের দ্বিপ্রহরে একটি রেস্তোরাঁতে লঞ্চ না খাইলে চলে না, বার্লিনে সেই অবস্থার মধ্যবিত্ত লোক সাধারণতঃ কাগজের ঠোঙ্গা হইতে দুটো "স্যাণ্ডউইচ" ও একটা ফল কর্ম্মস্থলেই আহার করিয়া থাকে। ফলে ইহার মধ্যেই ইহাদের সেভিংস্ ব্যাঙ্কএ বেশ 'মোটা টাকা' জমিয়াছে। এই প্রকার উদ্যমশীল জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল। ইহাদের পল্লীবাসীর জীবনযাত্রা আমাদের দেশের পল্লীবাসীর জীবনযাত্রা হইতে অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে; তথাপি সরলতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি কতকগুলি মূল গুণে এ দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের অনেক ঐক্য আছে। স্কুলে বালকবালিকাকে নির্ব্বিচারে বাধ্যতামূলক ব্যায়ামাদি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং স্কুল ছাড়িবার পরে অনেক বালিকা গৃহস্থ নিয়মিত ব্যায়াম করে। বার্লিনে দেখিয়াছি, প্রত্যূষে "রেডিও" বা তারহীন বার্ত্তার দ্বারা ব্যায়াম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রেরণ করা হয় এবং ব্যায়ামকারিণীরা সেই অনুসারে ব্যায়াম করে। এক স্থান হইতে হস্তপদ-চালনার আদেশ আসে এবং শত শত বাড়ীর লোক সেই অনুসারে ব্যায়াম করিতে পারে। ফরাসী বা ইংরাজী, বা কোথাও এই দুই ভাষাই স্কুলে ছেলে-মেয়েদের অবশ্য পঠিতব্য বিষয় এবং এই ভাষাদ্বয়ে অনেক জার্ম্মাণ (বিশেষতঃ স্ত্রীলোক) কথা কহিতে পারে। বিলাতের মত ইহারাও কোন একটা জাতীয় উৎসবে অনেকটা তাহাদেরই মত আমোদপ্রমোদ করে এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুল হইতে নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ যেমন আনন্দদায়ক, তেমনই শিক্ষার সহায়ক। বাণিজ্য ইহাদের প্রচুর প্রসার। ইহাদের পণ্য-বিক্রয়ের স্থান পৃথিবী ব্যাপী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ইহার একটি প্রধান ক্ষেত্র।

অবশ্য য়ুরোপীয়দের সামাজিক ও নৈতিক জীবন যে এত দোষশূন্য, এ কথা বলা বা সে বিষয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহাদের যে গুণগুলি প্রথমে চোখে পড়ে, যাহা আমাদের মতে ইহাদের মনুষ্যত্ববিকাশের প্রচুর সহায় সেইগুলি তরুণ দেশবাসীদের জানাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এম্পায়ার ইউনিভার্সিটী কন্‌গ্রেসের সময় যখন লণ্ডনে ছিলেন, সন্ধ্যার সময় হ্যাম্পষ্টেড হীথের তৃণক্ষেত্রের উপর বসিয়া তাঁহার সহিত আমাদের এই সব কথার আলোচনা প্রায়ই হইত। একে ত তাঁহার কোমল দেশবাসীর দুর্দ্দশায় সতত পীড়িত, তাহার উপর বর্ত্তমান কত বিজ্ঞান, কলা, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠ এই য়ুরোপীয়দের ভবনে বসিয়া আমাদের অবস্থার আলোচনায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। কেবলই এই হতাশ প্রশ্ন উঠিত, কিসে আমরা যুবকরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিবে, কিসে দেশবাসী আরও শিক্ষিত হইবে। প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে "মডার্ণ রিভিউ" যাঁর "ডাক্তারদের ডাক্তার" বলিয়াছিলেন, সেই প্রফুল্লচন্দ্রের সে কাযে কি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা! ইনি বৈজ্ঞানিক, গ্রন্থকার (হিন্দু রসায়নের ইতিহাস-লেখক হিসাবে) সাহিত্যিক, সংস্কারক, ব্যবসায়ী (বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্মদাতা হিসাবে) কলাস্থাপয়িতৃরূপে কত বিষয়ে দেশের সেবা করিতেছেন। "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজে অতি স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে কি আজ পার্কিন ভিন্ন আর কেহই এই বৃদ্ধবয়সে রাসায়নিক গ যথায় মগ্ন হইয়া আছেন কি না সন্দেহ।

তাঁহার রসায়নাগারে প্লাটিনাম ও স্বর্ণ হইতে উদ্ভূত ক্যাপটাইডস্ ও সালফাইডস্ প্রভৃতি প্রায় ১ সহস্র যৌগিক প্রস্তুত হইতেছে এবং বিখ্যাত রাসায়নিক ভেয়ার্ণারের পাণ্ডের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি, রসায়ন একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইতেছে। আরহেনি বোডেষ্টাইন প্রভৃতি পাশ্চাত্য রসায়নাচার্য্যের নিকট রায়ের ছাত্র ও সহকর্ম্মী বলিয়া আমাদের এক জন যখন দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্য রায় ভারতের নব্য রসায়ন সূত্রপাত করিয়াছেন, এ কথা উত্থাপিত হইলে তাঁহার সুইডিশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ খুলিয়া দেখাইলেন যে স্থানে তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। মেলার রচিত রসায়নশাস্ত্রের বিশ্বকোষেও আচার্য্য রায়ের নাম পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহকর্ম্মীরাও পৃথিবীর রাসায়নিক সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত
শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ



বড়বাবু

১

এঞ্জিনিয়ারিং অফিসের বড়বাবু অন্তরে যেমনই হউন, বাহিরে কিন্তু সর্ব্বক্ষণই তিনি তাঁহার সুন্দর সুগৌর মুখখানা একটা অটুট গাম্ভীর্য্যে ভীষণ করিয়া রাখিতেন। অফিসে কাহারও সহিত বেশী কথাবার্ত্তাও কহিতেন না। এক মনে নিজে যেমন কায করিতেন, নিম্নস্থ কেরাণীদের দ্বারাও তিনি তেমনই কায করাইতে চাহিতেন।

কেরাণীর দল কোম্পানীর স্বার্থ হিসাব করিয়া চলে না। নিজগত পাপক্ষয় করিয়া কোনমতে মাস কাবার করিতে পারিলেই হয়।

'রেকর্ডস্' রাখিবার বিরাট সেল্‌ফের পশ্চাতে ছিল কেরাণীদের আড্ডা। দ্বিপ্রহরে অবসর সময়টা যে যাহার সুখ-দুঃখের কথার সঙ্গে প্রত্যহই বড়বাবু অমন, বড়বাবু তেমন, বলিয়া আসর গরম রাখিত।

বড়বাবু সেখানেও—কেরাণীদের ভরাট তর্ক, খোস্ গল্প, নিন্দা-চর্চ্চা প্রভৃতির মাঝখানে সময়ে সময়ে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইয়া থাকেন!

"ছিঃ, কি অপমান! আমরা কি এখনও স্কুলের পড়ুয়া না কি? কায আমরা করছি না ত, করছে কে? ভুল? ভুল ধরারই হয়।"

আসর গরম করিয়া রাখিতে সকলের অগ্রগামী ছিল ঘনশ্যাম বাবু। বড়বাবুই না কি তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন, নহিলে ঘনশ্যাম স্পষ্টই বলিত, সে যে রকম কায-কর্ম্ম করে, এত দিনে বড়বাবুকে ডিঙ্গাইয়া বড় সাহেবের অফিসের বড়বাবু হইতে পারিত। বড়বাবুই একমাত্র তাহার পদোন্নতির অন্তরায়। ঘনশ্যাম লোকটা ছিল মুখর। বড়বাবুর ন্যায় গম্ভীর হইয়া সে থাকিতে পারিত না—মুখে যাহা তাহাই বলিয়া ফেলিত; কোন কার্য্যেই হটিত না, কোন কথাই তাহার মুখে বাধিত না। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাহার মুখে চুরুটিকা দেখা যাইত, আর সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধূমজালের মতই অসার কথার স্রোতো-ধারা নির্গত হইত।

কোম্পানীর প্রদত্ত বসবাসের বাড়ীর একটিতে ঘনশ্যাম পরিবারে বাস করিত। সে বড়বাবুর প্রতিবেশী। সদাসর্ব্বদা ঘনশ্যামের চালচলন দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া, বড়বাবু তাহাকে ভালরূপেই চিনিয়াছিলেন। কাযেই ঘনশ্যামের কথা অনেক সময় তিনি কানেই তুলিতেন না। ঘনশ্যাম বলিত, "কথা বলি কানেই তোলেন না। মেজাজ কত বড়!"

ছোট কেরাণী কেহ কহিত, 'হয় ত শোনেন নি'। কেহ বা ঘনশ্যামের পক্ষাবলম্বন করিয়া কহিত, "বড়বাবুর বড় চাল! আপনার মত কোন অফিসের মেজবাবুই ছোট কেরাণীদের সঙ্গে এমন মন খুলে মেশে না। কাযের গুমরেই ভারীক্কে হ'য়ে থাকে। নইলে লোকে ছ্যাবলা বলে যদি!"

ঘনশ্যাম সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়া কহিত, "ওহে জানি, জানি, আমরাও ভীম ভারীক্কে হ'তে জানি। কেন? দরকার কি? পেটের দায়ে সবাই কায করতে এসেছে। এত ছোট বড় হিসেব-নিকেশ কেন? মিলে-মিশে থাক, হাসি-গল্প কর—কায চলুক। তা নয়! দশটা থেকে পাঁচটা—মুখে রা-টি নেই। কেবল কাগজ আর কলম। অমন চাকরী আমি করিনে। বলি, মুক্তেশ মুখোর্জ্জি আজই না হয় বড়বাবু হয়েছেন, এক দিন তিনিও ছোট হ'য়ে ঢুকেছিলেন। বরাতের জোর, সাহেবকে পটিয়ে ফেঁপে উঠেছেন—নইলে কায ত আমরাই করছি।"

নিরপেক্ষ এক এক জন কহিত, "না, ঘোষমশাই, বড়বাবু কায-কর্ম্ম বোঝেন খুব। সাহেবও তাই বড়বাবু বৈ জানেন না।"

ঘনশ্যাম মুখ বাঁকাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিত, "রেখে দাও। সবাই বোঝে, সবাই পারে। বড়বাবু ছুটীতে গেলে কায চালাই না? বন্ধ থাকে?"

কথায় কেহই ঘনশ্যামের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। তাহার উপর বড়বাবু অবসর গ্রহণ করিলে ঘনশ্যামই 'বড়বাবু' হইবে—কাযেই কেরাণীরা তাহাকে খাতির করিয়াই চলিত। বড়বাবুর গম্ভীর ভাব দেখিয়া, নিয়তই কাযের তাড়া শুনিয়া, একটু ভুলেই ধমক-ধামক খাইয়া কেরাণীরা কেহই বড় সন্তুষ্টও ছিল না, সুতরাং সকলেই ঘনশ্যামকেই তাহাদের একমাত্র মুরুব্বী বলিয়া মানিত। মনের কথা তাহার নিকটই কহিত, রেকর্ড সেল্‌ফের পশ্চাতে সকলেই সুবিধামত ঘনশ্যামের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিত।

অধিকাংশ আসন শূন্য দেখিলেই বড়বাবু হঠাৎ সেস্থানে উপস্থিত হইয়া আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিতেন। কিংবা ডাকিয়া কহিতেন, "ওহে, এটা অফিস—কায কর, কায কর।"

ঘনশ্যাম ঘাড় বাঁকাইয়া কহিত, "শোন, কোম্পানীর পোষ্য-পুত্র আর কি? ওই ক'রেই ত সাহেবকে মুঠোর মধ্যে রেখেছে। ডেকে-হেঁকে সাহেবকে শোনান হয় যেন কত কাযের লোক।"

২

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে প্রত্যেক কোম্পানীই লাভ-লোকসানের নাগরদোলায় দুলিতেছিল। সাহেব কাহাকেও তেমন 'ইন্‌ক্রি-মেণ্ট' দিলেন না। বড় সাহেব মাত্র ৫০টি টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন বড়বাবুর জন্য। সাহেবকে বলিয়া কহিয়া বড়বাবু তাহাই কেরাণীদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কেরাণীরা সকলেই অসন্তুষ্ট হওয়ায় বড়বাবু কহিয়াছিলেন, "সাহেব আর

দিলেন না—আমি কি করব! এবার ত এই পেলে, আসছে বছর দেখা যাবে।"

ভালয়-মন্দয় সুখে-দুঃখে আগামী বৎসর আসিল। ধান্য চাউলের মরশুমের মত কেরাণীদের মাহিনা বৃদ্ধির সময় আসিল। কেরাণীরা ঘনশ্যামবাবুকে ধরিল, "আপনি তাড়াতাড়ি রোল্ তৈরী করুন। এবার যেমন ক'রে হোক্ আমাদের কিছু পাইয়ে দিন। গেল বার ত সাহেব দুটি একটি টাকা দিয়েই বিদেয় করেছেন। এই মাইনেতে আর চল্‌ছে না, মশাই।"

ঘনশ্যাম কহিল, "আমার আর ব'লে কি হ'বে। আমি ত গেল বছরও রোল্ তৈরী ক'রেছিলুম। বড়বাবুই কিছু করলেন না। বড়বাবু যদি না পারেন, বল্‌লেই হয় আমি না হয় সাহেবকে বলি। তবু যা হোক্ সাহেব আমার লেখার জোরে দু'চার টাকা দিয়ে মান রেখেছিলেন।"

"সে যা হ'বার হ'য়ে গেছে। বড়বাবু বলেছিলেন, এবার দেখবেন। আপনি রোল্ ক'রে দিন, তার পর আমাদের বরাত।"

ঘনশ্যাম রোল তৈয়ারী করিয়া দিল। প্রত্যেককেই সে ইন্‌ক্রিমেণ্ট পাইতে সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া মন্তব্য লিখিল। বড়-বাবু তালিকা দেখিয়াই কহিলেন, "ঘনশ্যামবাবু, এ রোল দেওয়া বৃথা। সাহেব ব্যয়সংক্ষেপ করতে বল্‌ছেন। তার পর বেতন-বৃদ্ধির রোল নিয়ে গেলে চটে লাল হ'য়ে যাবেন। সব কেটে দিন, গেল বছর যা'রা পায়নি, তারাও পাবে না, তবে অন্ততঃ তাদের নাম পাঠাতে পারেন।"

ঘনশ্যাম কহিল, "গেল বছর পাননি আপনি। আমরা যা পেয়েছি, তাও না পেলেও চলত।"

বড়বাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তবে আর এবার রোল পাঠিয়েই কায নেই।"

কেরাণীরা নিরুপায় দেখিয়া "হা হতোঽস্মি" ভাবে মনে মনে বড়বাবুর উপর বিষম চটিয়া গেল। "বড়বাবু পাঠান না কেন? সাহেব দেন দেবেন, না দেন না দেবেন।"

আড্ডাস্থলে ঘনশ্যাম সিগারেট টানিয়া কহিল, "দেখলে ত? তোমরা তবু অনেক সময়ে আমাকেই দোষ দাও, আমি ওকে মেনে চলিনে। কে মানবে বল? আমার জন্য আমি ভাবিনে—আমার ছেলে নেই, মেয়ে নেই,—পুষ্যি নেই। আমার দিন চ'লে যাবে। আমি তোমাদের জন্যই ভেবে মরি।"

ব্যথার ব্যথী পাইয়া কেরাণীরা ঘনশ্যামকেই বড় মনে করিয়া মনে মনে বড়বাবুকে অনেক ছোট করিয়া ফেলিল, কিন্তু কি করিবে,—কথা কহিবার যো নাই। অল্প বেতনের কেরাণী—চিরকাল মুখ বুজিয়াই থাকে, মুখ বুজিয়াই সহ্য করে।

বড়বাবুও নিতান্ত গম্ভীর। কেহ যে তাঁহার কাছে যাইয়া একবার ধরিয়া পড়িয়া দেখিবে, তাহাও অসম্ভব। তিনি কি যে করেন, কি যে ভাবেন, কাহাকেও বলেন না। সাহেব কি করিবে, কেহই জানেও না—জানিতে পারেও না।

৩

দ্বিপ্রহরে বাবুরা অফিসে বাহির হইয়া যাইবার পর আহারাদি করিয়া পাশাপাশি বাড়ীর গিন্নীরা অনেকেই বড়গিন্নীর গৃহে আসিয়া সমবেত হইতেন। বড়গিন্নী সকলকেই আদর-আপ্যায়ন করিয়া খোঁজ-খবর লইতেন। যথাসময়ে সেই দিনও সকলে বাবুর মাহিনা না বাড়িবার জন্য খারাপ মন লইয়াও বড়গিন্নীর কাছেই আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা সমস্তই তিনি শুনিতেন। প্রবাসে আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া থাকিয়া গিন্নীরা সকলেই বড় গিন্নীকে মাতৃবৎ ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। বড়গিন্নীও মাতৃস্নেহ দানে একটুও কার্পণ্য করিতেন না। গিন্নীরা অনেকেই তাঁহাকে কেহ 'মাসীমা' কেহ 'পিসীমা' বলিয়া ডাকিত।

কথায় কথায় ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রী ক্ষণপ্রভা কহিল, হ্যাঁ মাসীমা, বড়বাবুকে একবার জিজ্ঞেস করো ত,কেন তিনি বাবুদের মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন না। সংসার চলে কেমন ক'রে আমারই না হয় খেতে পরতে কেউ নেই। সকলেরই ত যেমন পোড়া অদৃষ্ট নয়।" ক্ষণপ্রভার কথায় সকল গিন্নীর প্রাণে একটা আগ্রহের সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই আজ এই কথা বলিয়া বড়গিন্নীর কাছে কাঁদিতে আসিয়াছে; ক্ষণপ্রভা তাহার মনের কথাটাই বলিয়াছে। সকলেই ক্ষণপ্রভার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাইল। বড়গিন্নী বিস্মিতভাবে কহিলেন, "বড়বাবু মাইনে বাড়িয়ে দেবেন না, তার মানে?"

প্রভা কহিল, "শুন্‌ছি ত তিনিই না কি সাহেবের কাছে সুপারিশ-টিশ করলেন না, তাই হ'ল না। একবার জিজ্ঞেস করো দেখি।"

বিরজার স্বামী অল্প মাহিনা পাইত। সেই ছিল সব চেয়ে বেশী দুর্দ্দশাপন্ন। বড়গিন্নীকে বিরজা মা বলিয়া ডাকিত, বড়গিন্নীও সময়ে অসময়ে এটা-ওটা দিয়া বিরজার যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

বিরজা কহিল, "সত্যিই মা, একবার বলো না!—আর পারিনে। এত অনাটনে ক'দিন চালানো যায়?"

বড়গিন্নী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি এর কোনই অর্থ ই বুঝতে পারছি না। আমি যতদূর জানি বাবু সকলকেই স্নেহ করেন। বাবুদের কথা অনেক সময় আমার কাছেও বলেন। তবে তিনি কি করেন না করেন তিনিই জানেন।"

নূতন এক বাবুর অল্পবয়স্কা পত্নী কহিল, "আমাদের বাবু বল্‌ছিলেন, তিনি কারুর সঙ্গে কথাও কন না। মাথা হেঁট ক'রে ব'সে থাকেন।"

বড়গিন্নী কহিলেন, "তবে। কিন্তু মা লক্ষ্মীরা, আমি এ অফিসের কথা বলতে কইতে পারব না। বড্ড রেগে যান বলেন, ঘর-গেরস্থালী করছ,—তাই কর। অফিসের কথা কেন।"

প্রভা কহিল, "সে-ও বা কেমন? ভাল-মন্দ বল্‌তে নেই?"

বড়গিন্নী কহিলেন, "জানিস্ ত না মা প্রভা, ওঁকে আমি এক দিনেই চিনে নিয়েছি। গেল বছর আমার ভাইঝির বিয়ের সময় ভাই বল্‌লে ক'খানা পাস্ দাও। আমিও তা ছিলুম দাও। বাড়ী আসতে যেতে নৈলে কতগুলো টাকা খরচ কিছুতেই দেবেন না। বার বার বল্‌তে, চটে আমায় বল্লেন 'অফিস কি আমার শ্বশুরবাড়ী? পাস দাও! কি ক'রে ওরা কোন্ সম্পর্কে পাস্ পাবে?' আমি বল্‌লুম 'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক না হ'লেও তুমি বড়বাবু, সাহেবকে বল্‌লেই ত হয়।'

বাবু আরও চটে বল্‌লেন, 'আমি বড়বাবু ব'লেই পারিনে।' আরও বল্‌লেন, দু'চার দিন আগে কোন্ কেরাণী বাবু পাস্ নিয়ে অপর লোক নিয়ে গেছলেন, সাহেব জেনে তাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অনেক ব'লে ক'য়ে অনেক 'নজির নথি' দেখিয়ে তবে তার চাকরিটি বজায় রেখেছেন। ছোট কেরাণীদের জন্য তিনি দু'কথা বল্‌তে পারেন, কিন্তু নিজেই দোষী হ'লে ওঁর জন্য কে বল্‌বে? সেই দিন থেকে আমি আর কখনও ভাল-মন্দ কিছুই বলিনে।"

বড়গিন্নী পাণের ডিবাটা সকলের সম্মুখে আগাইয়া দিয়া কহিলেন, "এস, পাণ খাও।"

অনেক বলিলেও বড়গিন্নী কিছুতেই বড়বাবুকে অফিস-সংক্রান্ত কোন বিষয় বলিতে পারিবেন না বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। চারিটার পূর্ব্বেই গিন্নীরা উঠিয়া যাইতে যাইতে মনে মনে দুই একবার বলিয়া ফেলিল, "বড়গিন্নী, বড়বাবুরই গিন্নী। আমাদের জন্য কেনই বা বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবেন?"

অফিসের ছুটী হইবারও অনেক পরে প্রায় সন্ধ্যার সময় মুক্তেশ বাবু গৃহে ফিরিতেন। সারাদিনের কায-কর্ম্মের হিসাব-নিকাশ করিয়া আগামী দিবসের কায-কর্ম্ম গুছাইয়া রাখিয়া—অফিস ছাড়িতে প্রত্যহই তাঁহার বিলম্ব হইয়া যাইত। বড়গিন্নী মাঝে মাঝে কহিতেন, "সব বাবুরা কখন এসে—খেলতে বেড়াতে বেরিয়ে যায়, তোমার কায কি ফুরোয় না?"

বড়বাবু হাসিয়া কহিতেন, "আমি যে বড়বাবু।"

অন্য গৃহে ফিরিয়া জলখাবার খাইয়া সুস্থভাবে বসিলে পর, বড়গিন্নী পাণের ডিবাটি সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন, "দু'টো কথা বল্‌ব?"

মুক্তেশবাবু গোটা দুই পাণের খিলি মুখে পুরিয়া কহিলেন, 'কবে না বল?"

"রাগ করবে না ত?"

"গিন্নীরা সব এসেছিল বুঝি?"

"এসেছিল।"

"নিশ্চয়ই ব'লে গেছে, মাইনে বাড়ল না—বড়বাবুর দোষ!"

"না, তা হ্যাঁ, ওরা হয় ত সেই রকমই শুনেছে।"

"আমি কি বল্‌ছি, দেখে এসেছে। শুনেছে-ই ত।"

"সত্যি?"

"কারও মাইনে কি আমার পকেট থেকে দিচ্ছি?"

"আমিও ত তাই ভাবছি।"

"কোম্পানীর যে রকম সময় পড়েছে, ক'জনের চাকরী থাকে, তার ঠিক নেই।"

"সর্ব্বনাশ! বল কি গো? কায নেই মাইনে বেড়ে, যা আছে, তাই থাক। চাকরী গেলে অনেকেই উপোস্ ক'রে মরবে যে? সাহেবের দয়া হ'বে না?"

"সাহেবের দয়া! শুনতেই ভাল। গেল বছর আমি আমার জন্য মঞ্জুর করা ৫০টা টাকা ওদের ভাগ ক'রে দিতে বল্‌লুম। সাহেব রেগেই অস্থির। তার পর অনেক বুঝিয়ে, দেওয়া গেল।"

"তোমার টাকা কি রকম?"

"বড় সাহেব আমার কাযে সন্তুষ্ট হ'য়ে আমার মাইনে ৫০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন।"

"তুমি না নিয়ে ওদের দিয়েছো বুঝি!"

"কি আর করি? সবাই দেখলুম চায়, ভেবে দেখলুম, অভাবও বটে। তাই দিলুম।"

"তবুও বাবুরা তোমার দোষ দিচ্ছে!"

"কেউ তা জানে না, সবাই জানে কোম্পানীই দিয়েছে—তুমিও কারও কাছে ব'ল না। কথায় কথা বেড়ে কোন রকমে সাহেবের কানে গেলে মহা মুস্কিল হ'বে।"

"কিসের মুস্কিল?"

"দেওয়ার কথা বল্‌তেই সাহেব বলেছিলেন, "মুখোর্জ্জি, তুমি নিজেই বড় হ'তে চাও না কি? আমরা দেব না, তুমি দেওয়ার কে?"

"মলো যা! বলে কি? আমার টাকায় আমি পরকে সাহায্য করব, তা তোমার কি এল গেল।"

"বাড়ী ব'সে কর। সে রকম সাহায্য করা নয় ত। অফিস থেকে মাইনে বাড়িয়ে সাহেব না দিলে আমি কি পারি? শেষে অনেক ব'লে ক'য়ে, কখনও এ কথা প্রকাশ করব না স্বীকার করায় তবে রাজি করানো গিয়েছিল। এবার তাই আগেই ব'লে রেখেছেন, "খবরদার, মাইনে-টাইনের কথা নিয়ে আবার এবার কোন গোল তুলো না। তোমায় আমরা চাই, কিন্তু তা ব'লে সকলকেই চাইনে। যা'র এ মাইনেতে পোষা'বে না, অনায়াসেই সে যেতে পারে।"

"তবে আর তুমি কি করবে?"

"তুমিই বল ত, করি কি? ওরা বোঝে না, আমি দপ্তর-খানায় ওদের বড়বাবু হ'লেও সাহেবের কামরায় ওদের মতই এক জন কেরাণী—চাকর। ওদের চেয়েও আমার অবস্থা মন্দ। ওদের হ'য়ে আমি দু'কথা বল্‌তে পারি, দু'দিন লড়তে পারি। কিন্তু আমার হ'য়ে কে বল্‌বে বল ত? কাযেই আমাকে খুব বেশী হুঁসিয়ার হ'য়েই থাকতে হয়। এত কাল কায ক'রে, সাহেব-চরিত্র আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। চাকরীর খাতিরে তাই সাহেবের মনোমত চলাতে আমি বাবুদের মনের মত হ'তে পারছিনে, কিন্তু কি করব!"

"কি জানি বাবু! অফিসের কথা উঠলে দেখি তোমারও মন খারাপ হ'য়ে যায়, আমিও ওদের ভালোর ভাবনায় বল্‌তে গিয়ে মন খারাপ ক'রে ফেলি।"

মুক্তেশবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "কেরাণীর আবার ভাল-মন্দ। চাকরের আবার মন খারাপ।"

বড়গিন্নী অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "সমস্ত দিন খেটে-খুটে এলে,—আমিই তোমার মন খারাপ ক'রে দিলুম।"

"না না, তুমি না বললেও, ওদের চিন্তায় আমি সারাদিন ডুবে থাকি। সব সময় অফিসের কায করতে করতে ওদের কথাই ভাবি। বল্‌তে গেলে শুধু অনেক কথাই বল্‌তে হয়, উপায় কিছুই হ'বে না। তাই আমি কখনও কিছুই বলিনে।"

"তা তুমি সমস্ত দিন অফিসে শুনছি মুখ ভার ক'রে থাক, কেন? সব সময়ই কি তোমার মন খারাপ থাকে?"

"গিন্নী, সব সময়। এক মুহূর্ত্তও শান্তি পাইনে। বড়বাবু না

হ'য়ে যদি আমিও ওদের মত ছোট কেরাণী হতেম, হয় ত ভাল থাকতেম। ওরা ওদের নিত্য অভাব, নিত্য দীনতা জানিয়ে বড়বাবুর মুখ চেয়ে ব'সে আছে, আমি বড়বাবু কিছুই করতে পারিনে, ওরা আমার ভরসায় বুক বেঁধে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে, ভবিষ্যতের আশায়। আমার বুকখানা দিবারাত্রিই তাই ভেঙ্গে যাচ্ছে; ভাবছি—কি আশা ভবিষ্যতে, আজও যেমন কালও তেমনই। হয় ত দু'দশ টাকা মাইনে বাড়বে, কিন্তু তা বাড়বার আগেই যে তিনগুণ খরচও বেড়ে যাবে। কাযেই যে অভাব, সেই অভাব। আমাদের জন্মাগত অধিকার শুধুই পরাধীনতা। শুধুই অভাব সয়ে, আর অভিযোগ শুনে শুনে সমস্ত জীবনটাই কেঁদে কাটানো—কোন শান্তি নেই।"

বড়গিন্নী মুখখানি ম্লান করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। মুক্তেশবাবু হুঁকার নলে একরাশ ধূম টানিয়া সনিশ্বাসে ছাড়িয়া দিয়া লক্ষ্যহীনভাবে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

৪

অভাব-অনাটনপূর্ণ বৎসরান্তে পূজার ছুটী আসন্ন। আর এক সপ্তাহ পরেই দীর্ঘ ১২ দিনের ছুটী মিলিবে। বড়বাবু নোট দিয়াছেন—"সাহেব বলেছেন, পূজোর ছুটীর পূর্ব্বেই যার যার সমস্ত বাকী কায শেষ করতে হবে।"

কেরাণী বাবুরা সকলেই উঠিয়া পড়িয়া হাতের জমা কাযগুলি তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়াছে।

আড্ডাস্থলে ঘনশ্যাম সিগারেট ধরাইয়া কহিল, "ওহে, পূজোর ছুটী ত এলো, এবার মাইনে ত বাড়ালোই না, পূজোর বোনাস্‌টা দেবে ত? না, তা-ও নয়?"

কেরাণীরা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বলেন কি ঘোষ মশাই, বোনাস্ না পেলে চল্‌বে কেমন ক'রে। মাসের মাইনে খেতেই কুলোয় না, তা থেকে কি ছেলেপুলেদের পূজোর জামা-কাপড় দেওয়া চলে? ও সর্ব্বনেশে কথা বল্‌বেন না, আপনি শীগ্‌গির রোল্ তৈরী করুন।"

ঘনশ্যাম কহিল, "আমার পালা আমি গেয়ে যাব, যিনি সমজদার, তিনি শুনে দেনেওয়ালার কাছে বলেন তবে ত?"

কেরাণীরা কহিল, "না, না, এত নিষ্ঠুর তিনি কখনও হবেন না। আমরা সারা বছর খেটে-খুটে পূজোর বোনাস্ পাবো প্রত্যাশায় বেঁচে আছি। আপনি আগেই মেরে ফেল্‌বেন না।"

এক জন কহিল, বোনাস্ একটি মাসের মাইনে পাব, তা দিয়ে কি করব, কি কিনবো, গিন্নী যে তারও ফর্দ্দ ক'রে ফেলেছেন। ফর্দ্দ বজায় রাখতেই হ'বে। কোথায় পাব তা হ'লে?"

অপর এক জন কহিল, "আমি ত মশাই বোনাসের আশায় অর্ডার পর্য্যন্ত দিয়ে ফেলেছি, ২।৩ তারিখই হয় ত ভিঃ পিঃ এসে পড়বে।"

ঘনশ্যাম ঘন ঘন সিগারেট টানিয়া কহিল, "পাও কি না পাও তার ঠিক নেই, আগেই অর্ডার দিয়ে ফেলেছ?"

"সে কি মশাই? প্রতি বচ্ছর পেয়ে আস্‌ছি। এবার পাব না কেন? এক দিন তা হ'লে আপনারা বল্‌তে পারেন যে, এ মাসে মাইনেও পাবে না?"

বিরজার স্বামী নবীন কেরাণী, আক্ষেপের ভঙ্গী করিয়া কহি[illegible] "যে ধরণ ধরেছে, সে দিনও কাছিয়েছে। মাগছেলে [illegible] শুকিয়ে মরবার দিন আর বেশী দূরে নয়।"

ঘনশ্যাম কহিল, "সাহেবের তা হ'লে ঘুম আস্‌ছে না, [illegible] বাবুরও হজম হবে না দেখছি।"

নবীন কেরাণীটি অতি দুঃখেও রাগিয়া গিয়া কহিল, "আপ[illegible] কি মশাই, এক শ' টাকা মাইনে পাচ্ছেন, খেতে-পরতে দু'[illegible] বুঝতেন যদি আমার অবস্থায় পড়তেন। মাইনে দিচ্ছেন [illegible] টাকা, মনে করছেন, এই ত ঢের। আমার সংসারে সা[illegible] পেট ৪০ টাকায় যে এক বেলাও পেট ভরে খেতে পাচ্ছিনে, [illegible] তার খবর রাখেন! কারও খোসামোদ করতে গেলে আ[illegible] নিজের দীনতার কথা আমার মনে জমাট হ'য়ে আসে। আ[illegible] কথাবার্ত্তা সব গুলিয়ে যায়, তাই কারও কাছে যাইনে, কা[illegible] কিছু বলিনে; আছি ভগবান্ ভরসা ক'রে। মারেন মর[illegible] বাঁচান, বাঁচবো।"

ঘনশ্যাম কহিল, "উপায়ান্তর না থাকলে লোকে ওই কথা চিরকাল ব'লে আসছে।"

কেরাণীরা কহিল, "যাক্‌গে ও সব কথা। আপনি বোনা[illegible] ব্যবস্থা করুন। দু'এক দিন পরে বলব ভেবেছিলুম, আর [illegible] নয়, আপনি আজই তালিকা ক'রে ফেলুন।"

দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্যালোক নিস্তেজ করিয়া এক খণ্ড [illegible] মেঘ আকাশটা ছাইয়া ফেলিয়াছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। অফিসের বৈদ্যুতিক পাখাগুলি ভন্ ভন্ শ[illegible] ঘুরিতেছিল। ঘনশ্যাম বেনাসের রোল তৈয়ার করিয়া, মা[illegible] উপরের পাখাটার দিকে চাহিয়া 'হাঁ' করিয়া একটা আরা[illegible] নিঃশ্বাস ছাড়িল। "এক মাসের মাইনে বেশী পাওয়া যা[illegible] মনে মনে একবার কহিল, 'যদি না দেয়?' আবার ভাবিল, [illegible] দেবে কি? ফি বার দিচ্ছে। এ ত মাসের মাইনের [illegible] আমাদের দাবী।"

কেরাণীরা একবার ঘনশ্যামের টেবলের কাছে আসিয়া কহি[illegible] "হ'ল?—হ্যাঁ—দিয়ে দিন, এই চাপরাশি, নিয়ে যা। বড়বা[illegible] হাতে দিবি। বাস্কেটে ফেলে রাখিস নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাতে দি[illegible] নইলে দু দিন বাস্কেটেই পড়ে থাক্‌বে।"

রোল্ হাতে লইয়া বড়বাবু একবার মোট টাকার সংখ্যা[illegible] উপর চোখ ফেলিয়াই কহিলেন, "এবার দিলে হয়! মা[illegible] চালানোই দায়—তার উপর একমাসের মাইনে সকলের [illegible] ৪ শত ৫০ টাকা।"

সাহেবের কামরায় ক্রিং করিয়া কলিং বেল বাজি[illegible] শ্যামের বাঁশী শুনিয়া গোপিগণ কি ভাবে ছুটিয়া যাইতেন [illegible] জানি! কিন্তু সাহেবের কলিং বেল শুনিয়া "ডাক্‌ছে" ব[illegible] বড়বাবু ছুটিলেন।

বড়বাবু সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাহেব যেন দুশ্চি[illegible] বেদনা সহিতে না পারিয়া টেবলের উপর মাথা গু[illegible] ছিলেন। মাথা তুলিয়া কহিলেন, "মিঃ মুখার্জ্জি, এই [illegible] বলিয়াই মুখার্জ্জির হস্তে একখানি পত্র দিলেন।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বড়বাবুর চোখের দৃষ্টি যেন নি[illegible] যাইতেছিল। বড় সাহেব লিখিয়াছেন, "আশা করি, তো[illegible]



"এই তো সে দিন সাঁঝের বেলা, পেয়ালা হাতে গোপন পায়,
ঘর্ম-পুতী এল সে মোর মুক্ত-দুয়ার পানশালায়;
ব'লে মোরে—পাত্র-সুধায় চুমুক দে' নাও একটি বার—
দেখনু চেয়ে—আর কিছু' নয়, সেই পুরাতন দ্রাক্ষাসার!"—ওমর-খৈয়াম।

[শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার।

COLOUR ILLUSTRATION

আফিসের কায-কর্ম্মের বর্ত্তমানে কোন চাপ নেই। যেমন করিয়া হউক, আমাদিগের ব্যয়-সংক্ষেপ না করিলে চলিতেছে না। বৎসরান্তে একটা লোকসানের হিসাব বিলাতে পাঠাইবে কি? অতি সত্বর এই মাসের মধ্যেই তোমার অফিসের ব্যয় কর্ত্তন করিয়া ৪ শত ৫০ টাকা হইতে ২ শত ৫০ টাকায় নামাও। ২ শত ৫০ টাকার বেশী তোমার অফিসের দপ্তরখানার বাবদ মঞ্জুর করা যাইবে না। আর এবার হিন্দুদের পূজার আমরা কোনই বোনাস্ দিতে পারিব না।

"গত বৎসর ইন্‌ক্রিমেণ্টের ৫০ টাকা নিম্নস্থ কেরাণীদিগকেই দেওয়া হইয়াছে। বড়বাবুর এই ত্যাগ প্রশংসনীয়, কিন্তু ইহাতে আমাদের অফিসিয়াল মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় স্মরণ রাখিও। কখনও যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ অন্যায় আচরণ করা না হয়। একমাত্র বড়বাবুর ত্যাগের মর্য্যাদা রাখিয়াই আমরা পূজার বোনাস্ বাবদ বড়বাবুকে এ বৎসর অর্দ্ধেক বোনাস্ এক শত টাকা মঞ্জুর করিলাম।

"অক্টোবর মাস হইতে তোমার অফিস্-ষ্টাফের জন্য ২ শত ৫০ টাকা ও তোমার বাবদ ১ হাজার ২ শত টাকার বেশী যেন কিছুতেই ব্যয় না হয়।

"আশা করি, তোমার এ মাসের রিটার্ণের সঙ্গেই আমি লোক কমাইবার তালিকা পাইব। ইতি—"

সাহেব কহিলেন "পড়লে, মুখার্জ্জি?"

বড়বাবু মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "আপনি কি হুকুম করেন।"

সাহেব পাইপের মুখে জলন্ত দিয়াশলাই ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিলেন, "আমার হুকুম-টুকুম নেই। বড় সাহেব যখন লিখেছেন, আমি অন্য কোন কথাই শুনতে পারিনে। পত্রে যে রকম লেখা আছে, অক্ষরে অক্ষরে তাই মেনে চল্‌তে হ'বে।"

বড়বাবু মৃদুস্বরে কহিলেন, "তাই হ'বে।"

সাহেব কহিলেন, "অল্ রাইট, তুমি দু'এক দিনের মধ্যেই একটা রিডাকশনের তালিকা ক'রে ফেল। ২ শত টাকা কমানো চাই-ই। ঘনশ্যামকে না হ'লেও চল্‌বে, তুমিই ওর কাযটা চালিয়ে নিও, আর বাকি এক শ কমাতে নীচের দিকের ২।৩ জন কেরাণী তুলে দাও। ব্যস্! সকলের নীচের তিন জনে কত এল?"

বড়বাবু গাঢ়স্বরে কহিলেন, "পঞ্চাশ আর চল্লিশ, আর পঁয়ত্রিশ—এক শ পঁচিশ।

সাহেব টেবলের উপর একখানি স্লিপ কাগজে লিখিলেন, "১ শত ২৫ আর ঘোষের ১ শত—২ শত ২৫"—বলিলেন,"ব্যস্। হাই হ'বে। বড়সাহেব লিখেছেন ২ শত; ২৫ বেশী হচ্ছে, তা হোক, যত কমে ততই ভাল। কায-কর্ম্ম তেমন নেই, এখন তোমরাই চালিয়ে নেবে। সুদিনের সময় লোক নিতে কতক্ষণ?"

একটি মুহূর্ত্তও আশ্রিত কেরাণীদের কথা চিন্তা না করিয়া সাহেব দুই মুহূর্ত্তে চারি জন কেরাণীর অন্নবস্ত্রের একমাত্র অবলম্বন ঘুচাইয়া ফেলিলেন, "তাই হবে মুখার্জ্জি, তুমি নোট দিয়ে যাও। আসছে মাসের ৭ তারিখে বড় সাহেবের কাছে এখানকার রিটার্ণ যাবার সময়, এ সংবাদ দিয়েও তাঁকে খুসী রাখতে হবে—যাও।"

চশমাটা খুলিয়া মুছিতে মুছিতে বড়বাবু স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্তিভরে বসিয়া পড়িলেন। ঘনশ্যাম একবার কটাক্ষে চাহিয়া মনে মনে কহিল, "সাহেবের সঙ্গে আজ এক পালা হয়ে গেছে না কি?"

চাপরাশিকে জল আনিতে বলিয়া বড়বাবু টেবলের উপর বোনাসের রোলটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাপরাশি জল আনিল। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জল পান করিয়া মুক্তেশবাবু যেন নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলেন, প্রকৃতই যেন তাঁহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। এতক্ষণে সহজভাবে শ্বাস ফেলিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া বড়বাবু চোখ বুজিয়া এক মনে টানিতে লাগিলেন। সিগারেট নিঃশেষ হইয়া গেল। বড়বাবুর চিন্তা শেষ হইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া সাহেবের কামরায় যাইয়া কহিলেন, "সার!"

সাহেব সেক্রেটারীয়েট চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া কহিলেন, "ইয়েস্ মুখার্জ্জি!"

"তালিকা তৈয়ার করতে আমায় অনুগ্রহ ক'রে দু'চার দিন সময় দিন। আজকে থাক। আমি একটু ভেবে দেখি।"

"আবার ভাববে কি মুখার্জ্জি, রিডাক্‌শনএ তুমিও যাবে না, আমিও যাব না। নীচের দিক থেকেই ছাটতে কাটতে হবে। আর ঘোষের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব নেই আমি জানি। তুমি ছুটীতে গেলে, তোমার বিরুদ্ধে সে অনেক কথাই আমাকে বলে। তোমরা দু'জন এক স্থানে বেশী দিন আর কায করতে পারবে না। আমি যা বল্লুম, তাই করা হবে, তবে তুমি এই অফিসে আমার ডান হাত; বলছ যখন, আচ্ছা, দু'চার দিন ভাবো। মোদ্দা আসছে মাসের ৭ তারিখের আগেই ওটা চাই। আজ এ মাসের ২৮শে আর ৮ দিন সময়।"

মুক্তেশবাবু কহিলেন, "৮ দিনের মধ্যেই আমি যা হয় স্থির করে ফেলব। পূজোর বোনাস্ তা হ'লে—"

"ও কথা ছেড়ে দাও, তুমি একশ টাকা পাবে। বড় সাহেব যা লিখেছেন—বড় সাহেবের কথা মানতেই হবে।" বলিয়া সাহেব স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

বড়বাবু আবার স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া আর একটি সিগারেট ধরাইয়া নিবিষ্টচিত্তে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু বড়বাবু বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষুতে তিনি অন্ধকার দেখিলেন, তাড়াতাড়ি আত্মভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে কাগজ-পত্র টানিয়া লইয়া উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে তিনি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

নবীন কেরাণী একবার বড়বাবুর টেবলের অনতি নিকটে যাইয়া সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, "বড়বাবু, আমাদের পূজোর বোনাস্‌টা এবার—"

বড়বাবু চোখ না তুলিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "হবে, হবে, ব্যস্ত হয়ো না। এখন যাও, কায করগে।"

নিশ্চিত জানিয়াও তিনি কিছুতেই 'হবে না' বলিতে পারিলেন না।

অন্য দিনের তুলনায় সে দিন বাড়ী ফিরিতে তাঁহার আরও বিলম্ব হইয়া গেল। বড়গিন্নী মুখের ভাব দেখিয়া সাহস করিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

আহারাদির পর শয়নকক্ষে কোলের ছেলেটিকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে বড়গিন্নী কহিলেন, "ওগো, এবার পূজোর ছুটীতে চল না একবার দেশে যাই। অনেক দিন দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়ে আছি। পূজোর ছুটীর সঙ্গে না হয় দু' এক মাসের ছুটী নাও। সে দিন না বল্‌ছিলে, তোমার অনেক দিন ছুটী পাওনা হয়েছে। এবার চল না, এখানে এসে অবধি সকলের 'মা' 'মা' ডাক শুনে শুনে আমার একবার আমার মাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছা হচ্ছে। দু' দুটো ছেলে জন্মে অবধি আজও দেশের মাটীতে পা দিলে না।"

বড় বাবু কোন প্রত্যুত্তর দিতেছিলেন না। অন্যমনস্ক ভাবেই হউক, কিংবা সমনস্কভাবেই হউক, গৃহিণীও কোলের ছেলেটির দিকেই চাহিয়া ছিলেন। বড়গিন্নী ভাবিলেন, "হয় ত ওঁরও যাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কাযেই একটু থামিয়া কহিলেন, "অমত করো না, আমি ভারী খুসী হব—যদি যাও, বাপ-মাকে দেখতে আমার বড্ড সাধ হচ্ছে,—আরও পূজোর সময়—জান ত, মায়ের মন তখন সন্তানের হাসি মুখখানি দেখতে সর্ব্বস্ব পণ করতে পারে।"

বড়বাবু এবার সহসা কহিলেন, "আর বাপ ? বাপ কি করে গিন্নী ?"

বড়গিন্নী একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বাপ ? বাপ করে না ? সারা বছরের রোজগার ঢেলে সন্তানের সর্ব্বাঙ্গ সাজিয়ে হাসি মুখখানি তুলে ধ'রে চুমো খায়। সারাটা বছর অক্লান্ত ভাবে খাটে, পূজোর তিনটে দিন সুখী হ'তে, সন্তানের সকল সাধ পূর্ণ করতে বাপ তার জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে।"

মুক্তেশবাবু সত্য সত্যই শিহরিয়া উঠিলেন, "সত্য ?"

বড়গিন্নী মুক্তেশবাবুর দিকে লক্ষ্য না করিয়াই কহিলেন, "সহরে আর কি দেখবে, পূজোর আমোদ দেখতে হয় ত দেশে চল, দেশের মাঠে, ঘাটে, হাটে, পথে দেখবে পূজোর আনন্দ ঢেউ খেলে যাচ্ছে। দেশে গেলেই দেখবে, রঙ্গ-বেরঙ্গের নতুন সাজে না সেজে ছেলেরা যে পূজো দেখতেই যাবে না। হাতে না থাকলে ধার ক'রেও বাপ-মা তখন ছেলেমেয়েকে নতুন কাপড়-জামা দেবেই দেবে। যেমন ক'রেই হোক। দেখছ না, আমি যে বয়েস হয়ে বুড়ী হতে চলেছি, এখনও মা কি বছর পূজোর সময় রেল-পার্শেলে কত কি পাঠান।"

বড় বাবু ক্ষুদ্র একটি "হুঁ" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

৫

সে দিন পয়লা। ত্রিশ তারিখ পর্য্যন্তও বড়বাবু, বোনাসের রোল পাঠাইলেন না দেখিয়া কেরাণীরা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ক্রমশঃ অস্থির হইয়া পড়িল। বড়বাবুর মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর। সাহস করিয়া তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা যায় না। নবীন সে দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "হবে হবে। ব্যস্ত হয়ো না।" শুধু ঐ কথা দুইটির উপর সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে। বড়বাবুর কথার নড়চড় হয় না। কেরাণীরা জানিত, বড়বাবু যা বলিবেন, তাহা করিবেন-ই। তাই তাহারা নৈরাশ্যে ডুবিয়া যায় নাই।

পয়লা তারিখ নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই সকলে অফিসে হাজির —বোনাসের রোল তখনও বড়বাবুর বাক্সেটেই পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কহিল, "ভুলে গেছে না কি ?"

অপর এক জন কহিল, "বরাত ভাই, বরাত! এ পূজোটা দেখছি মাটী হ'ল।"

নবীন হৃদয়াবেগে কাঁদিয়া ফেলিল, "কাচ্ছা-বাচ্ছা নি আমি কি করব মশাই। বোনাস্ পাই নি, ছেলেরা ত দেয় শুনবে না।"

যথাসময়ে সে দিন সকলেই মাসের মাহিনা ও বো পাইল। কেরাণীর দল আড্ডাস্থলে পূজার বাড়ীতে ছেলে মতই মাতিয়া গেল। কেহ বলিল, "কেমন, আমি বলি পাব-ই। এ ত আমাদের দাবী।"

নবীনই ছিল সকলের চেয়ে গরীব। নবীন কৃতজ্ঞ বার বার বড়বাবুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কহিল, "কে যাই বল, বড়বাবুর প্রাণ আছে। সাহেবের পিয়ন বর্ষ সাহেব বড়বাবুকে বলেছিলেন, এবার বোনাস্ দেবে না। বড়বাবু ব'লে-কয়ে দেওয়ালেন ত ? আচ্ছা বাপের বেটা।"

ঘনশ্যাম সিগারেটের ধোঁয়ায় আড্ডাঘরটা রীতিমত করিয়া ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাচ্ছা, বল্‌লে দেবে না, আর দু'দিনেই মত বদ্‌লালো!"

ঘনশ্যামের কথায় বাধা দিয়া নবীন কহিল, "আপনার কখনও বড়বাবুর প্রশংসা নেই। এত করছেন, তবুও তাঁর নিন্দে বৈ সুখ্যাতি করবেন না।"

ঘনশ্যাম কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া কহিল, "কি এমন লেন, পাওনা টাকা দিলেন, তাও নিজের ঘর থেকে নয়। নিজেরও নিতে হবে ত ? আমাদের বোনাস্ না দিলে দেওয়া হ'ত না। ওতে এমন কোনই বাহাদুরী নেই। কলমের জোরে খাচ্ছি, সাহেব-সুবোর ধার ধারিনে, না ছেড়ে যাব।"

কেরাণীদের মনটা আজ অনেকখানি শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়া আজ আর তাহারা ঘনশ্যামের কথায় না নাচিয়া নিজেদের কহিল, "এক এক জন লোক অমন থাকে। কিছুতেই সুখ্যাতি করবে না, পরনিন্দে ক'রেই মস্ত সুখ।"

অফিসের কায-কর্ম্ম সারিতে সে দিন বড়বাবুর অনেক হইয়া গেল। প্রায় ৪টার সময় সাহেবের কামরা হইতে বড়বাবু পুরাতন কাগজপত্র নাড়িয়া অনেক কায করিতেছে কেরাণীরা বাড়ী যাইবার পথে বলাবলি করিতে "লোকটা কাযও করে, কোম্পানীর ভালতে যেন রক্ত মেশানো। তাই না সাহেব এত ভালবাসেন।"

নবীন মাথা নাড়িয়া কহিল, "তোমরা যাই গোপাল, বড়বাবুকে আজ বাপ-মা ব'লে পা জড়িয়ে ইচ্ছে হচ্ছে। বোনাস্‌টা না পেলে আমি আজ আর ফিরতুম না। অফিস থেকেই বিদেয় হতুম। আমার এলে দেখবে, ছেলেমেয়েগুলো সব হাঁ ক'রে আমার পথ তাকিয়ে আছে। গিন্নী জানালার পাশে ব'সে মনে মনে কাপড়ের ফর্দ্দ করছেন।"

অনেকেই হাসিয়া উঠিল। নবীন কহিল, "মুখে

বটে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে আমিই কেবল নই, এমন অনেক আছে, যাদের ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে, অথচ মাসকাবারে জন-প্রতি একটি টাকাও ভাগে পড়ে না।"

* * * * *

বাসায় ফিরিয়া গৃহিণীর হস্তে মাত্র ৫০টি টাকা দিয়া মুক্তেশবাবু কহিলেন, "এ মাসে এই পর্য্যন্ত।"

গৃহিণী মাস মাস দুই হাত পাতিয়া দুই শত টাকা গণিয়া লন, তাহাতেই খরচ কুলাইতে চাহে না। পঞ্চাশ টাকায় কি হইবে!

বিস্মিতা হইয়া তিনি কহিলেন, "পঞ্চাশ টাকা কি গো ? এ মাসে যে চার শ দেবে। মাইনে দু'শ, পূজোর পরবী দু'শ। ৫০ টাকা কি দিচ্ছ ?"

"এখন ত এই নাও। বাকিটা এ মাসে ব্যাঙ্ক থেকেই তুলতে হবে। অফিস থেকে আর ঘরে এল না দেখছি।"

"বলছ কি তুমি। হয়েছে কি ? বলই না ভেঙ্গেচুরে!"

"ভেঙ্গে-চুরে আর কি বলব। পূজোর পরবী এবার অর্দ্ধেক পেয়েছিলাম। মাইনে দু'শ আর পরবী এক শ—তিন শ ত ?"

"হ'লই বা, পঞ্চাশ কি দিচ্ছ ? আর আড়াই শ কি হ'ল ?"

"উবে গেল, অফিস থেকে কাকেও পরবী দিলে না। দেখ-লুম, ওদের চোখগুলো যেন জলে ডুবে গিয়েও আমারই মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। কারণ, আমি বড়বাবু।"

"তা অফিস থেকে না দিলে তুমি আর কি করবে ?"

"আমার পকেট থেকেই দিতে হ'ল। পরবী দিতেই আমার আড়াই শ বেরিয়ে গেছে।"

বড়গিন্নী অবাক বিস্ময়ে স্বামীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "অফিস থেকে না দিলে, তুমি দিলে কেন ?"

মুক্তেশবাবু জুতার ফিতাটা খুলিতে খুলিতে কহিলেন, "আমি যে বড়বাবু। পূজোয় তা হ'লে এবার—পূজোয় এর চেয়েও বেশী আনন্দ আর কি হতে পারে, গিন্নী! জামা-কাপড় পরে কি এর চেয়েও বেশী স্ফূর্ত্তি হ'ত ?"

বড়গিন্নীও আনন্দে অধীরা হইয়া স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া কহিলেন, "কক্ষনো না, তুমি দিয়েছ—তাতে আমার বুকটা গৌরবে ফুলে উঠছে। আনন্দে আমার গলা ছেড়ে বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—এ পূজোয় দশমী নেই, এ আনন্দে বিজয়া নেই। ও গো, এমন নতুন জামা কখনও পুরানো হবে না, ময়লাও হবে না।"

মুক্তেশবাবু পকেট হইতে আরও কয়েকখানি শ'তি নোট বাহির করিয়া গৃহিণীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই নাও, এ মানটা একটু টেনেই চল্‌তে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছি। জিনিষ-পত্তর সব গোছগাছ ক'রে নাও। পূজোর ছুটীতে বাড়ী যাবে বলছিলে না ? চল, দেশেই ফিরে যাই।"

আনন্দের উপর আরও আনন্দ! গৃহিণী মুক্তেশবাবুর হাত ধরিয়া কহিলেন, "সত্যি যাবে ?"

"হ্যাঁ।"

বড়বাবু শয্যার উপর বসিয়া শিশু ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া কহিলেন, "সব গিন্নী—সব গুছোতে হবে, দু'দিনেরই ভিতর। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে একেবারেই দেশে যাচ্ছি, বড়বাবুগিরি আমার আর পোষাল না।"

গৃহিণী বসিয়াছিলেন, উঠিয়া কহিলেন, "সে কি ? চাকরী ছাড়বে কেন ? ছুটী নাও না ? দু'শ টাকার চাকরী শীগগির কি আর একটা জুটবে ?"

"জুটুক না জুটুক আমায় ছাড়তেই হ'ল। বড়সাহেব লিখেছেন, আসছে মাস থেকে অফিসের ব্যয় অন্ততঃ দু'শ টাকা কমিয়ে ফেল্‌তে হবেই। সাহেব বল্‌লেন, নীচের দিকের কেরাণী তিন জন, আর ঘনশ্যামকে তুলে দাও।"

"কি সর্ব্বনাশ! ওরা তা হ'লে খাবে কি ? পরবে কি ? আহা, হা হা—এক কাপড়ে রাস্তায় পড়ে, উপোসে মরতে হবে যে! ওরা শুনেছে ?"

"না, কাকেও বলি নি। বল্‌তেও আমার বুক ভরে বেদনা চেঁচিয়ে উঠল। সাহেবকে আজ বলেছি, দেশে আমার হঠাৎ খুব দরকার পড়েছে। আমি পরশু থেকেই চ'লে যাব। ঘনশ্যামই আমার জায়গায় কায করবে। কালকের ভিতর তাকে কায-কর্ম্ম বুঝিয়ে দেব, তার পূর্ব্বে তুমি এ সব কোন কথাই কাকেও বলো না, পরবীর কথাও নয়। আপাততঃ বিনা মাইনেতে ৬ মাসের ছুটী নিয়েছি। আমায় দু'শ টাকা না দিতে হলেই কোম্পানীর দু শ টাকা খরচ কমে গেল। চার ছ' মাস পরে কোম্পানীর সময় ফেরে, আবার আসবো। সাহেবকেও ভেঙ্গে কিছুই বলি নি। কাকেও বলো না গিন্নী, এতকাল রোজগার ক'রে যা জমেছে, আমাদের দিন চলে যাবে।" বড়বাবু আবার ছেলেটিকে কোলে টানিয়া আবেগে মুখচুম্বন করিলেন।

বড়গিন্নী কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় আত্মবিস্মৃত থাকিয়া সহসা কহিলেন, "আনন্দে তুমি আজ আমাকেও পাগল না ক'রে ছাড়বে না দেখছি। ছেলে কোলে নিয়ে বসেছ—" বলিয়াই স্বামীর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আমাকেও ছুঁয়ে বল, যা বল্‌লে সত্য ? সত্য ?"

মুক্তেশবাবু সহাস্যে কহিলেন, "সত্য গিন্নী, সত্য। জান ত, কোন দিনই আমি বেশী কথা কই না। যা পারি না, তা কখনও বলি না।"

বড়গিন্নী সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া কহিলেন, "বেশ করেছ। তোমার যা কিছু আছে, তা ত আছেই। বাবার সম্পত্তি লাখ দু'লাখ যাই হোক আমিই পাব। আমাদের কোন অভাব হবে না। আমাদের যা গেল, তাতে এমন কিছুই এসে যাবে না, কিন্তু তোমার জন্য গরীবের ছেলেদের যা রইল, তাতে তাদের প্রাণ রক্ষা হবে। সত্যি তুমি বড়বাবু!"

মুক্তেশবাবু সাদরে পত্নীর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আর তুমিও তা হ'লে, তুমিও ত বড়গিন্নী!"

গৃহিণী সগর্ব্বে মস্তক তুলিয়া কহিলেন, "এক শ বার!"

শ্রীঅতুলানন্দ রায়।

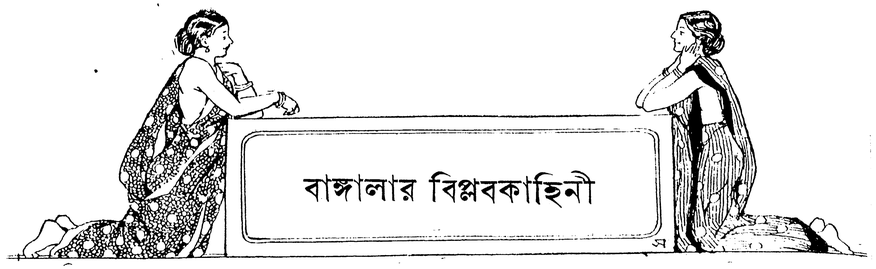

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আলিপুর জেলে

১লা সেপ্টেম্বর সোমবার উক্ত আটজনের বিরুদ্ধে নরেন গোঁসাইর জবানবন্দী সুরু হবার কথা ছিল, সত্যেন জেনেছিল। এই জবানবন্দীতে অনেকের নাম নূতন করে প্রকাশ হবে, তার ফলে আবার অনেকে ধৃত হবে; বিশেষ ক'রে প্রায় বিশজন বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তির গ্রেপ্তারের কথা ছিল। তাই সত্যেনের চেষ্টা হ'য়েছিল, উক্ত সোমবার সকালেই নরেনকে মার্‌তে হবে; তার বন্ধুকে এই খবর পাঠাল। বিকেল ৫টার সময় খাওয়া হয়, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও কখনও নরেন হাঁসপাতালে থাকে। কাযেই ৫টার পরে সত্যেনের উক্ত বন্ধু পূর্ব্বোক্ত কারণে নিজে যেতে না পেরে আমাদের ওয়ার্ড থেকে কানাইকে দিয়ে এমন ভাবে ন্যাকড়া জড়িয়ে পাঠিয়েছিল, রিভলবার ব'লে কানাই বুঝতে পারে নি।

অন্য দু'এক জনকেও না কি ব'লেছিল, তারা আসল ব্যাপারটা জানত না ব'লে অনর্থক হাঁসপাতালে যেতে রাজী হয় নি। পরে কিন্তু এই সুযোগ দেওয়া হয়নি ব'লে সুশীল কেঁদে আকুল হ'য়েছিল। পেটব্যথার ভান ক'রে, কানাই হাঁসপাতালে গিয়ে সত্যেনকে সেটা দিতে রাজী হ'য়েছিল। সত্যেন সেটা পেয়ে যখন তার বদলে তাকে বড় রিভলভারটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব'লেছিল, তখন কানাই সেটা রিভলবার ব'লে বুঝতে পেরে সত্যেনকে জিজ্ঞেস ক'রে না কি ব্যাপারটা সবই জেনেছিল। তাই সেও বড় রিভলবারটা নিয়ে সত্যেনের সাহায্য ক'রতে চাইল। সত্যেন না কি প্রথমে তার বন্ধুর বিনা মতে কানাইএর প্রস্তাবে রাজী হয়নি। তাই কানাই উক্ত বন্ধুর মতের জন্য একখানা অনেক যুক্তি-তর্ক-পূর্ণ চিঠি হাঁসপাতালের এক জন কয়েদী খিৎমদ্‌গারকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। সেই বন্ধু না কি কানাইএর এক বন্ধু মতামতের জন্য সেই চিঠিখানা তাকে দেখায়। চিঠিখানা পড়ে সে এমন হতভম্ব হ'য়ে গেল যে, হাঁ কি না কিছু ব'লতে চাইল না। অগত্যা সত্যেনের বন্ধু না কি মত দিয়ে পাঠিয়েছিল। মত পেয়ে তারা স্থির করেছিল, আগে সত্যেন চেষ্টা করবে। যদি ফস্কে যায়, তবে কানাই আক্রমণ করবে। কানাই না থাক্‌লে কিন্তু গোঁসাই বেচারা যে মেরে যেত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীররক্ষক দু'জন য়ুরেশিয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাঁসপাতালের দোতালার ওপর সিঁড়ির পাশে ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলবারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, সে জন্য না কি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভিতর থেকেই না কি নরেনকে তাক করে মারে। খট্ ক'রে শব্দ হ'ল, কিন্তু কার্ত্তুস আগুন দিল না। সত্যেন পরমুহূর্ত্তে জামার ভেতর থেকে রিভলবার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিমে বোথান নামক পূর্ব্বোক্ত এক জন য়ুরেশিয়ান ওয়ার্ডার রিভলবারটা ধরে টানাটানি করতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়, কাযেই রিভলবার ছেড়ে দেয়। ইতি বসরে গোঁসাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলী চালায়। কানাই দাঁতমাজার ভান ক'রে ডিসপেন্সারির পাশে সিঁড়ির সামনে পায়চারী ক'রছিল। যাই হোক গুলী সামান্য ভাবে পায়ের কোন স্থানে লেগেছিল। তা কষ্টে সিঁড়ি নেবে হাঁসপাতালের ফটক পার হ'য়ে—দু'পাশে দেওয়াল, এমন একটা লম্বা সরু গলির ভেতর গিয়ে প'ড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া ক'রেছিল।

সত্যেন ডিসপেন্সারী থেকে বেরিয়ে সামনে এক কয়েদীকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, নরেন কোথায় গেল। আঙ্গুল দিয়ে ইসারায় সে দেখিয়ে দিলে সত্যেন ছুটে গিয়ে কানাইর সঙ্গে যোগ দেয়। দু'জনেই গুলী চালাতে থাকে। সত্যেনের একটা গুলীতে কানাইর গায়ের চামড়া ছোলা হয়ে গেছল; এ থেকে বোঝা যায়, সত্যেন যখন সেখানে যায়, তখনও নরেন জমী ধরে নি। নরেন না কি দুএকবার প'ড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল।

তার পর যথারীতি পাগলাঘণ্টি, ভোম্বা, কর্ম্মচারীদের ছুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, সত্যেন ও কানাইকে গ্রেপ্তার, সব ওয়ার্ডে তালা-বন্ধ, খানাতল্লাসী ইত্যাদি যথারীতি সবই হয়েছিল।

খুনের তদন্ত, বিচার, দণ্ড ইত্যাদিও কায়দা-মাফিক হয়ে গেল। কানাই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, কারও নাম করে নি, আর পিস্তল কোথা থেকে পেয়েছিল, তাও বলে নি। সত্যেন সমস্ত অস্বীকার করেছিল।

সত্যেনের সঙ্গে বারীনের ঝগড়া আরম্ভ হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দের গুপ্তসমিতির গোড়াতে, সারকিউলার রোডের প্রথম আড্ডা থেকে। এ কথা আগে লিখেছি। এ সময় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির সভ্যদের পক্ষে স্বীকারোক্তি বৈধ কি অবৈধ, সেই নিয়ে জেলে আমাদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে দুটো দল গ'ড়ে উঠেছিল। এক দলের মোড়ল বারীন, অন্য দলের সত্যেন। বারীনকে তারা দোষারোপ করত। তার পর এই দোষারোপের মাত্রাটা আরও বেড়ে উঠেছিল, যখন উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সকলে বারীনকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার ক'র্‌তে পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও তা করলে না। সত্যেন তার প্রতিবাদস্বরূপই নরেনের হত্যার স্বীকারোক্তি দেয়নি এবং দেবে না ব'লে আগে থেকেই স্থির ক'রে রেখেছিল। বারীন অবশেষে সেসন কোর্টে ব্যারিষ্টারদের তাড়ায় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছিল; তাতে কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। কারণ, শুধু প্রত্যাহারে স্বীকারোক্তির বিষয় যে মিথ্যা, তা প্রমাণ হয় না।

যাই হোক, এই দলাদলির ফলে বারীনের ওপর অনেকের ভক্তি চটে গেছল। তারা বারীনের নেতৃত্বকে বড় একটা আমল দিত না। এতে তার সমস্ত বিদ্বেষটা গিয়ে পড়েছিল সত্যেনের ওপর। বারীন এই নেতৃত্বের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য দুএকবার তুমুল বাগ্‌যুদ্ধও করেছিল। তার পর তাকে কিছুমাত্র জান্‌তে না দিয়ে, এত বড় একটা কাণ্ড সত্যেন করল, এতে বারীনের নেতৃত্বের অভিমানে এমনই আঘাত লেগেছিল যে, নরেনের হত্যার পর সেই দিনই আমাদের ২৩ নং ওয়ার্ডে, দস্তুর-মাফিক এক মিটিংএ ব'সে সত্যেনের ওপর দোষারোপের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে সদ্য গায়ের জ্বালা কতকটা জুড়িয়েছিল। আর তাকে সাম্‌নে না আনতে পেরে, তার উক্ত বন্ধুকে দোষ-স্বীকার করিয়ে, ক্ষমা-ভিক্ষা চাইয়ে, আর কখনও এমন কায সে করবে না, এ কথা বলিয়ে তবে ছেড়েছিল। আর সত্যেনের ওপর শোধ নিয়েছিল সে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়বার পর।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে কিন্তু অতিরিক্ত দেরী হচ্ছে ব'লে নরেনকে এজাহারের পর জেরা কর্‌তে হাকিম দেন নি। তাতে আমাদের পক্ষের এক জন উকীল অনেক সাধ্য-সাধনায় এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু, সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না, সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যাবৎ সে আবার না যথারীতি সেসন আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরীটি না নিলে গোঁসাইকে মারা প্রায় বৃথা হ'ত আর অরবিন্দ বাবুর মুক্তিও অসম্ভব হ'ত। তখন বার্লী সাহেবের কোর্টে কোন উকীলই এর আবশ্যকতা বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি, তাই রাজী হন নি। এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত ও তারই চেষ্টায় হয়েছিল।

যাই হোক, দু'জনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কানাই আপীল কর্‌তে রাজী ছিল না। তাই আগে কানাইর ফাঁসি হ'ল। (১০ই নভেম্বর)।

সত্যেনও জান্‌ত, আপীলের ফল কিছুই হবে না, তার মা বিশেষ ক'রে বলা সত্ত্বেও প্রথমে রাজী হয়নি, তার পর আমিই তাকে বৈপ্লবিক নিয়মরক্ষার দোহাই দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। সে জন্য যে সত্যেনকে লোকমতে নিন্দিত হ'তে হবে, তা ভাবতে পারিনি। বরং তখন মনে করেছিলাম, দেশে সত্যকার গুপ্তসমিতি কখনও হ'লে তারা সত্যেনকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে আশা বৃথা হয়েছে। নরেনকে হত্যার দিন পাঁচ ছয় পরে আমরাও, সত্যেন কানাই যেখানে আবদ্ধ ছিল, সেই ৪৪ ডিগ্রী নামক জেলখানার মধ্যকার দৃঢ়তর জেলে অর্থাৎ অন্দরমহলে রক্ষিত হয়েছিলাম।

বিশেষ কড়াকড়ি পাহারা সত্ত্বেও 'কোডে' মেথরকে দিয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত। প্রথমে চেয়ে সেই মেথরের হাতে একটু জল খেয়েছিলাম।

গোঁসাইর মৃত্যুতে সত্যেন কত আশাই করেছিল, কত কথাই সে বলেছিল। কাব্যবিশারদের একটি গানের ভাব নিয়ে লিখেছিল, * অচিরে ভারতের নিশ্চয় "বন্ধন-মোচন" হবে, এই বন্ধনমোচনের কাযে সে "নিজ দেহ-প্রাণ বিসর্জ্জন" ক'রে "মাতৃঋণ প্রতিদান" করছে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি।

কানাইর ফাঁসির পর বিপুল সমারোহে তার দেহ সৎকার করা হয়েছিল। কলকাতা সহরময় একটা তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সেই জন্য সত্যেনের ফাঁসির ধার্য্য দিন (২৩শে নভেম্বর) সাধারণকে জানতে দেওয়া হয়নি। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি আত্মীয়স্বজনকে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকবার ও তার মৃত দেহের সৎকার সেইখানেই করবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডাররা ফাঁসির সময় কানাইর নির্ভীকতার কথা আমাদের কাছে বলেছিল। কোর্টে আমাদের কাছ থেকে শুনে সংবাদদাতারা সংবাদপত্রে খুব লিখেছিলেন। সরকার বাহাদুরের পক্ষে তা মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। সেই জন্য জেল-ওয়ার্ডারদিগকে যথেষ্ট বকুনিও খেতে হয়েছিল। আর সত্যেনের বেলায় যাতে তার ফাঁসির সময়কার কোন কথা প্রকাশ না হয়, সে জন্য বিশেষ সাবধান করা হয়েছিল। কাযেই ফাঁসির সময়কার সত্যেনের সঠিক খবর অনেক দিন যাবৎ অনেক চেষ্টা ক'রেও আমরা পাইনি। কিন্তু কোন কোন গোরা ওয়ার্ডার, আমাদের জানবার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে, কর্ত্তৃপক্ষের মনের মত ক'রে, বিদ্রূপচ্ছলে একটা আধটা কথা যা বলেছিল, তা বিদ্রূপ ব'লে বুঝতে কারও বাকী ছিল না। পূর্ব্বেই বলেছি, এ সব খবর সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা কোর্টে আমাদের মুখ থেকেই সংগ্রহ করতেন। সত্যেনের বিপক্ষদল এই সুযোগে সত্যেনের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ক'রে তার উপর সাধ মিটিয়ে শোধ নিয়েছিল। তার মাত্রা এত দূর বেড়েছিল যে, অনেক পরে শুনেছিলাম, সত্যেনকে না কি মূর্চ্ছিত (বা মৃত) অবস্থায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাই সত্যেনের ফাঁসির সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অনেকের নিকট ব্যাপারটার প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য অনুসন্ধান করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে এক জন হচ্ছেন বিখ্যাত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সত্যেনের ফাঁসির দিন তিনিও জেলখানায় গেছলেন। নিজ হৃদয়হীন ব'লে ফাঁসির ব্যাপারটা নিজে দেখেন নি, কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের ও জেল-কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁদের মুখে সত্যেনের ভূয়সী প্রশংসাই শুনেছিলেন। অথচ পরে কোন সংবাদপত্রে তার বিরুদ্ধে অন্যরকম মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল দেখে বিশেষ অনুসন্ধান করেছিলেন, আর জেনেছিলেন, আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের দলাদলি ছিল। তার ফলেই সত্যেনের বিপক্ষ দলের দ্বারা এই রকম মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এমন আর এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"২৭ নং সমবায় ম্যানসন,
কলিকাতা।
২রা জুলাই, ১৯২৪।

"প্রিয় হেম বাবু,

কোন বন্ধু ও আত্মীয়-প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, আপনি সত্যেন্দ্রের ফাঁসির উপলক্ষে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যাহাতে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম, ঐগুলি সম্বন্ধে আমার একটি লিখিত উক্তি চান। শুনিলাম, তজ্জন্য আপনি কলিকাতায় আসিবেন। তাড়াতাড়ি ঐ উক্তি প্রস্তুত করিলে পাছে কোন ঘটনা অবিবৃত থাকে, সেই জন্য আগে হইতেই উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। লেখাটা বড় তাড়াতাড়ি হইতেছে। কেবল ভয় হইতেছে, এই বুঝি আপনি আসিয়া পড়েন।

"আমার সন তারিখ মনে নাই। সত্যেন্দ্রের মা (এক্ষণে স্বর্গীয়া) আমার কুণ্ডু লেনস্থিত বাসায় আসিয়া বলিলেন যে, সত্যেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান বাবু কঠিন রোগে শয্যাগত। সত্যেন্দ্রের সৎকারের জন্য আর কাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না। অতএব আমাকে ঐ গুরুতর

* "প্রকৃত সন্তান হবে সেই জন, নিজ দেহ-প্রাণ করি বিসর্জ্জন,
যে করিবে মা'র বন্ধন-মোচন হবে তার মাতৃঋণ-প্রতিদান।"

যুদ্ধে লইতে হইবে। নানা কারণে গুরু। সি, আই, ডি, ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি, লোকজন জুটান। তখনকার কালে এত সত্যাগ্রহীর ধুম হয় নাই। তখন সবই 'গোপন', সবই 'চুপ চুপ'। আমি তথাস্তু বলিয়া কোন দেশমান্য সম্পাদকের শরণাপন্ন হইলাম। তথায় কোন আশা না পাইয়া নব স্বদেশ-প্রেমিক এবং এ দেশে ধর্ম্মঘটের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম নায়ক ও আমার পরম সুহৃদ্, শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমতোষ বসু মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কর্ম্মচারীদিগের প্রথম ধর্ম্মঘটের ইনিই উদ্‌যোক্তা, হোতা ও নেতা। ইনি পরে বিলাতে কেয়ার হার্ডির প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন ও তথায় পরলোকগমন করেন। প্রেমতোষ বাবু দাহের নিমিত্ত লোক-জন সংগ্রহ করিয়া দিলেন ও অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। সত্যেন্দ্রের খুল্লতাত-পুত্রগণও সাহসী হইয়া অগ্রসর হইলেন। পরে আমি ভীষণ লালমুখো, অতীব গম্ভীর, স্বল্পভাষী আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট রেমণ্ডাসের (?) নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি কয়েকটা সর্ত্তে দাহ করিবার অনুমতি দিলেন। ইহা বোধ হয়, প্রাণদণ্ডের পূর্ব্ব-দিবস।

প্রথম সর্ত্ত—জেলের বাহিরে দাহ নিষেধ।
দ্বিতীয় "—কোন আড়ম্বর ও আন্দোলন নিষেধ।
তৃতীয় "—কোন স্মৃতি-চিহ্ন লইয়া যাওয়া নিষেধ।
চতুর্থ "—জেলের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে দাহ করিতে হইবে।
পঞ্চম " লোকসংখ্যা ১৪।১৫ জনের অধিক হইবে না।

"ইহার পূর্ব্বে কানাইর মৃতদেহ লইয়া কালীঘাট শ্মশানে খুব রাজনৈতিক উৎসব হইয়াছিল। তাহার পুনরাবৃত্তি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত ছিল না। এই জন্য এই সব সর্ত্ত। বাধ্য হইয়া রাজি হইতে হইল।

"ফাঁসির দিন অতি প্রত্যূষে আমরা আলিপুর জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ঐ নির্দ্দয় ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে এক জন চর্ম্ম-বর্ম্ম-পরিহিত শ্বেত-পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—'You, can go now. The thing is over, Satyendra died bravely, Kanai was brave, but it seems Satyendra was braver,' তদণ্ডেই এক জন সার্জ্জেণ্ট বলিতে লাগিল, 'When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake, when I said 'Satyendra, be ready, He answered 'Well, I am quite ready' and smiled. He walked steadily to the gallows, He mounted it bravely and bore it all cheerfully. A brave lad.'

"মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি ও আমার পত্নী দুই দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। খুব সহাস্য বদনে দুই দিনই সে আমাদের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া স্বদেশী কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু উক্তি আমার মনে আছে। সে বলিয়াছিল, 'আমার বা কানাইর মৃত্যু কি ছার। আমাদের মত সহস্র সহস্র মরিলে তবে দেশ উদ্ধার হইবে। তবে দেশে জাগরণ আসিবে।'

"আমিই তাকে ফাঁসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিবার প্রবৃত্তি দিই। সে কিছুতেই রাজী হয় নাই। তাহার মাতার ইচ্ছা বারংবার বুঝাইলে তখন সে বলে, 'ভাবিয়া দেখিব', পরে জেল হইতে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করে।

"মাতার সাক্ষাৎ ইচ্ছা জানাইলে বলিয়াছিল, 'যদি তিনি এখানে আসিয়া না কাঁদেন, তবেই আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি, নচেৎ নয়।' তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ়া জননী এক ফোঁটাও অশ্রু পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার জন্য আমিই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ঠিক করিয়া দিই। উক্ত দিবস বাবু রজনীনাথ সমাদ্দার তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

"নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যায় তাহার অংশ ছিল কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে ইসারায় জানাইয়াছিল, 'হাঁ'।

"তখনকার বালকবালিকারা নানা স্থানে কানাই ও সত্যেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়াছিল। এই সংবাদ আমি কারাগারে সত্যেন্দ্রকে দিয়াছিলাম। শুনিয়া তাহার মুখ খুব উৎফুল্ল হইয়াছিল।

"তাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছিল। সেলটি বাঘের পিঁজরার মত। এক দিকে রেল। দিকে অন্য দেওয়াল। পরিমাপ ৪ হাত আন্দাজ লম্বা ও ততটি চওড়া। শীতকাল, সত্যেন্দ্রের পরিধানে কম্বল ও তাহাতেই শয়ন। ঘরের এক কোণে মাটী দিয়া আচ্ছাদিত একটা বাঁশের চুবড়ী। তাহাই

কমোডের কার্য্য করিত ও ঐ ঘরেই খাইতে হইত। উক্ত কমোডটি বিছানার এক হাত কি জোর দেড় হাত দূরে অবস্থিত।

"কড়া পাহারার মধ্যে থাকিয়া কথা কহিতে হইত। পুলিস ছাড়া জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমার্শন উপস্থিত থাকিতেন। দাহকালে ইনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা কেদারায় বসিয়া ঐ মহৎ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা কোনই স্মৃতি-চিহ্ন আনিতে পারি নাই।

"তখনকার 'এম্পায়ার' পত্রিকায় যে বিকৃত সংবাদ বাহির হইয়াছিল, উক্ত পত্রিকায় আমি তাহার প্রতিবাদ ছাপাইয়াছিলাম।

"প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের জন্য প্রেমতোষ বাবুর উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আনন্দমোহন পাল মহাশয়ের সহায়তায় পোস্তার বাজারে প্রায় ৪ শত টা সংগৃহীত হইয়াছিল। আলু ও আম্র-ব্যবসায়ীরা ১০৲ এইরূপ চাঁদা দিয়াছিলেন। একটি গন্ধ-বণিকের দোকানে ২৫ টাকা বিনা বাক্যব্যয়ে পাওয়া গিয়াছি দোকানের অধিকারী একটা মোড়কে টাকা ঠিক করি রাখিয়াছিল। আমরা যাইবামাত্র উহা প্রদান করিয়া হস্তে নিবেদন করিল, "আপীল চলিলে আরও দিব।" আ কিন্তু চলিল না। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা মহা দার্শনি রচয়িতা লর্ড মরলে তারযোগে জানাইলেন যে, 'আপী জন্য ফাঁসি স্থগিত থাকিতে পারে না।'

এ, সি, রায়।

[ক্রমশঃ

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো।

দাবী

১

তুর্কী কি টাস্‌খাণ্ড, ট্রিনিডাড মাস্কো
কেনাডা কি কেন্‌টাকী যেথা হক্ বাস গো।
হক্ দেশ হক্ বেশ আহারাদি ভিন্ন,
একেবারে মুছে যাক স্বজাতির চিহ্ন,
যে ভাষায় কথা কয় যেখানেই রয় সে,
হিন্দু সে হিন্দু, আর কিছু নয় সে।

২

অমৃতের অধিকার জন্মের সঙ্গে
সূর্য্যের রশ্মি সে বিম্বিত রঙ্গে।
চরণে কি শিরে র'ক হক সে বিবর্ণ
সনাতন ছাপমারা খাদ-হীন স্বর্ণ।
জন্মের অধিকার জোরে পুন লয় সে,
হিন্দু সে হিন্দু, আর কিছু নয় সে।

৩

প্রলোভনে ভয়ে যদি ত্যজে নিজ ধর্ম্ম,
অনুতাপ পরে যদি বিঁধে তার মর্ম্ম।
অনাচার করি যদি পরে হয় ক্ষুণ্ণ,
পুন ফিরে আসা যদি ভাবে মনে পুণ্য।
করে হরিনাম-গানে সব পাপ ক্ষয় সে,
হিন্দু সে হিন্দু, আর কিছু নয় সে।

৪

যে ডোবায় ডুব দিক সে যে রাজহংস.
শুভ্রতা কোন মতে হবে নাক ধ্বংস।
চৌদিকে ছুটে যায় বর্ষার জল গো,
গঙ্গার বুকে এসে সেই সুবিমল গো।
অভয়ের বাণী স্মরি সব ব্যথা সয় সে,
হিন্দু সে হিন্দু, আর কিছু নয় সে।

৫

যে বনেই থাক আর যে নামেই ডাকবে,
চন্দন চিরদিন চন্দন থাকবে।
কুর্ত্তা কামিজ কোটে খেদ নাই বিন্দু
যে বাসেই ঢাকা থাক, বুক তার হিন্দু।
ডাক-নামে ডাকিলেই হয় তন্ময় সে,
হিন্দু সে হিন্দু, আর কিছু নয় সে।

৬

শ্মশানেতে শ্যামা তার, গৃহে তার লক্ষ্মী,
আপদে বিপদে তার নারায়ণ রক্ষী।
বাণী তার জিহ্বায়, বুকে তার স্বর্গ,
প্রাণ কাঁদে এ সবারে করিতে যে পর গো।
শিরে তার সুরধুনী, মৃত্যুঞ্জয় সে,
হিন্দু সে হিন্দু, আর কিছু নয় সে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রাজা রামমোহন রায়

ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে তাঁহার মহাশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মহাপুরুষগণ যুগে যুগে লোক-শিক্ষার জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ১ শত ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে এই-রূপ এক জন অসাধারণ প্রতিভাশালী ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ লোকশিক্ষার জন্য বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্ম, নীতি, লৌকিক আচার-ব্যবহার, সমাজ-নীতি, শিক্ষা, বিচারপদ্ধতি, নারীজাতির অধিকার, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অভাবনীয় সংস্কারসাধন করিয়া ইতিহাসে Raja Rammohon Ray, the great Indian Reformer নামে জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী-জাতি পবিত্র, গৌরবান্বিত ও ধন্য হইয়াছে।

৯৪ বৎসর পূর্ব্বে সেই মহা-পুরুষ স্বদেশ-সেবা উপলক্ষে ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে, ব্রিষ্টল নগরে দেহরক্ষা করিয়া অমর-ধামে গমন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার স্মৃতিপূজার জন্য বাঙ্গালার শিক্ষিতসম্প্রদায় না না স্থা নে মিলিত হইতেছেন। আমরাও তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য রাঁচি সহ-রের এই ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে সমবেত হইয়াছি।

রাজা রামমোহন রায় চির-দিনই কেবল ভারতবর্ষে নহে, জগতের সমস্ত সভ্যজাতি কর্ত্তৃক এক জন আদর্শ মানব বলিয়া পূজিত হইবেন। বাস্তবিক ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের এরূপ মধুর মিলন, এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয়, এরূপ নিখুঁত আদর্শ পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন জাতির ইতিহাসে দুর্ল্লভ। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ আজি পর্য্যন্ত এই মহান্ আদর্শের প্রকৃত মর্ম্ম ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপ্রাণতা, সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানানুরাগ, উদ্যম, উদ্যোগ, অধ্যবসায়, সৎসাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি শত সহস্র গুণের মধ্যে একটি গুণও বাঙ্গালী তাহার জাতীয় জীবনে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য যে, এরূপ উজ্জ্বল রত্ন বাঙ্গালার মাটীতে উৎপন্ন হইয়াছে, এমন উন্নত আদর্শ নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া তাহার গৌরব করিবার দাবী জন্মিয়াছে। মূর্খতা, আলস্য বা ঔদাসীন্য বশতঃ আমরা যদি সেই গৃহ-দেবতার পূজায় অবহেলা করিয়া তাঁহার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে আমাদের অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগা আর কে আছে?

গত ১ শত বৎসর মধ্যে আমরা পরাধীন জাতি হইলেও, স্বায়ত্তশাসন, জাতীয়তা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনজাতির স্বাভাবিক উচ্চ অধিকারলাভ সম্বন্ধে যাহা কিছু সামান্য সাফল্য-লাভ করিয়াছি, তাহার মূলে রাজা রামমোহন রায়ের আজীবন-ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্যোগ, চেষ্টা ও অধ্যবসায় বিদ্যমান রহিয়াছে, এ কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তিনি অভিজ্ঞ কৃষকের ন্যায় উর্ব্বর ভূমি প্রস্তুত করিয়া যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে বহুল-শাখা-প্রশাখা-পুষ্প-পত্র-শোভিত সুন্দর মহীরুহে পরিণত হইয়া সুফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ চিরদিন বংশানুক্রমে তাঁহার অশেষ কল্যাণপ্রদ কার্য্যের ফল আনন্দের সহিত ভোগ করিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের ভগবদ্ভক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা হিমালয়ের ন্যায় অচল, অটল ও দুর্ভেদ্য হইলেও, তিনি পুরুষকারের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস এবং তাঁহার পুরুষকার সকল কর্ম্মেই তাঁহাকে জয়ী করিয়াছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপ-দেশচ্ছলে বলিয়াছেন যে, দৈব ও পুরুষকার, এই উভয় শক্তির উপর মানুষের সকল কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করিলেও তিনি দৈব অপেক্ষা পুরুষকারকেই অধিকতর উচ্চস্থান প্রদান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় পুরুষকার-সম্পন্ন মনুষ্যের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যে কোন কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে হইলেও তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের শেষ না দেখিয়া কখন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। এই সকল কার্য্য



রাজা রামমোহন রায়

রাঁচি সহরে চতুর্নবতিতম বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

করিতে যাইয়া তাঁহাকে যতই শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিতে হউক না কেন, তিনি একবার সংকল্প করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, শত বাধা-বিপত্তি, শত নির্য্যাতন, এমন কি, প্রাণের আশঙ্কা সত্ত্বেও কখনও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। এইখানেই তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালী জাতির অধ্যবসায় ও সংকল্পের দৃঢ়তা শিক্ষা করিবার অভাবনীয় সুযোগ ও সুবিধা রহিয়াছে।

বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যে বাঙ্গালীর যে উৎসাহ, উদ্যম, উদ্যোগ ও চেষ্টা আছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমাদের সেই চেষ্টা, কেবল চেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হয়। আমরা কার্য্য আরম্ভ করি খুব উৎসাহের সহিত, কিন্তু অধ্যবসায়ের অভাব হেতু আমরা কোন কার্য্যই বেশী দিন ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হই না। আমাদের উদ্যম ও চেষ্টা অনেকটা খড়ের আগুনের মত সহজেই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহা নিবিয়া একবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি যে কোন কার্য্যে রাজা রামমোহন রায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে তিনি কখন পশ্চাৎপদ হয়েন নাই এবং অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি সকল কার্য্যেই সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহার চরিত্র হইতে এই একটি গুণ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে ধন্য হইয়া যাইবে।

আজকাল "স্বাদেশিকতার" তৌল-দাঁড়িতে মাপ করিয়া কোন এক জন লোক ভাল কি মন্দ, তাহা স্থির করা হয়। এই মাপ-কাঠী দিয়া লোকের কৃতিত্ব নিরূপণ করা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, যাহার মধ্যে স্বদেশ-প্রেম নাই, অন্য শত গুণ তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও, এই এক গুণের অভাবে তাহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারা যায় না। তবে স্বাদেশিকতার লৌকিক-ব্যবহার দেখিয়া উহাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল স্বদেশী আছেন, যাঁহাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রেম এতই প্রবল যে, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাবের উচ্ছ্বাসে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে তাঁহাদের বিচার-শক্তি অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এরূপ "স্বদেশী ভাবকে" অন্ধ স্বাদেশিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত কা্য হইবে না। ইহাদের কাছে স্বদেশের যাহা কিছু, তাহাই পবিত্র ও অবশ্য-রক্ষণীয় এবং যাহা কিছু বিদেশী, তাহাই দূষণীয়, অতএব বর্জ্জনীয়। আমি এরূপ স্বাদেশিকতার পক্ষপাতী নহি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, এরূপ স্বাদেশিকতা গ্রহণ করিলে দেশের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবারও সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এরূপ স্বদেশপ্রেম হিংসা ও দ্বেষপ্রসূত; সুতরাং ইহা কখনই কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে না। আর এক দল স্বদেশী আছেন, যাঁহারা যাহা কিছু স্বদেশী, তাহাই ভাল ও রক্ষণীয় এবং যাহা কিছু বিদেশী, তাহা মন্দ ও পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা স্বদেশের সমস্ত ভাল জিনিষ বজায় রাখিয়া বিদেশের যাহা কিছু ভাল, উন্নতিমূলক এবং কল্যাণপ্রদ, তাহা মধুমক্ষিকার পুষ্পমধু সংগ্রহের ন্যায় অতি যত্নের সহিত আহরণ করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সর্ব্বপ্রকার দুঃ মোচন ও সম্পদ্-বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এবং নিজের দে নিজের জাতির মধ্যে যাহা কিছু মন্দ জিনিষ আছে, স্বদেশী হইলেও, সর্পদষ্ট আঙ্গুলের ন্যায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শাণিতাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পরিবর্জ্জন করিতে যত্নবান্ হ আমি এইরূপ স্বদেশপ্রেমিকতাকেই "প্রকৃত স্বদেশী" প্রদান করিয়া থাকি। রাজা রামমোহন রায় এইরূপ এক প্রকৃত "স্বদেশী" ছিলেন। আজকাল "স্বদেশী" অর্থে আমরা বুঝি, রাজা রামমোহন রায়ের যুগে ঐরূপ স্বদেশী ভাব কা মস্তিষ্কে তখন প্রবেশলাভ করে নাই। কিন্তু সেই যুগেও রামমোহন রায়ের স্বদেশপ্রেমের যে প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা হই, তাহাতে আমাদের হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হ যায়। তিনি স্বদেশী ধর্ম্ম, স্বদেশী ভাব, স্বদেশী ধারা রাখিয়া, স্বদেশের যাহা কিছু ভাল, তাহা কুপণের ধনের রক্ষা করিয়া, বিদেশ হইতে যাহা লইলে স্বদেশের বর্ত্তমান ভাবী মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, সেই সমস্ত পদার্থ বিনা উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রকৃত স্বদেশ-প্রীতির প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অদ্য সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

কি পোষাক-পরিচ্ছদ, কি লৌকিক আচার-ব্যবহার, বিষয়েই তিনি বিদেশীর অনুকরণ করিতে প্রয়াস পান নাই এই সকল বিষয়ে তিনি দেশীয় ভাব, দেশীয় ধারা ভাবে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদেশীর নীতি, সমাজনীতি, বিচারপদ্ধতি, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতির যাহা কিছু ভাল, তাহাদিগের ইতিহাস, তাহাদিগের তাহাদিগের কাব্য, তাহাদিগের সাহিত্য, তাহাদিগের তাহাদিগের অর্থনীতি এবং আত্মনির্ভরতা, সংকল্পের কার্য্যতৎপরতা, বিপদে স্থৈর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ও স্বদেশ-প্রীতি প্রভৃতি যে সকল গুণ দ্বারা তাহারা প্রভুত্বলাভের অধিকারী হইয়াছে, বিদেশীর জ্ঞান এবং চরিত্রগত এই সকল গুণকে তিনি চিরদিন স্বজাতির বিস্তৃতভাবে অনুশীলিত এবং চরিত্রভুক্ত করিবার চেষ্টা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ না করিয়া প্রকৃত স্বদেশীর কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। অদ্য তাঁহার মহৎ কার্য্যাবলীর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া, তিনি কিরূপ "খাঁটী স্বদেশী" ছিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার-চেষ্টা তাঁহার স্বাদেশিকতার প্রথম ও প্র পরিচয়। তাঁহার জীবিতকালে, তাঁহার সমকালিক সমধর্ম্মা স্বদেশবাসিগণ কর্ত্তৃক তিনি বিধর্ম্মী, নাস্তিক, পাষণ্ড প্র বিবিধ অপমানসূচক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই বাদ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং দ্বেষ-হিংসা-প্রসূত, তাহা শিক্ষিত মাত্রেই এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। তিনি বক্তৃতায় এবং তাঁহার প্রচারিত সংবাদপত্র ও পুস্তকাবলীর সুবিচারপূর্ণ, অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা এই অপবাদের অলীকত্ব অসারত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভ্রান্ত স্বদেশবাসীর নিকট উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন,

ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পত্তি। ভারতের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা যে দুর্লভ সত্যের সন্ধান পাইয়া নিখিল জগতের মঙ্গলের জন্য উহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই সত্যের আলোক তাহাদিগের জন্মভূমি হইতেই পরিস্ফুট হইয়া এক সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। যখন প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিসর, ব্যাবিলন প্রভৃতি পৃথিবীর তৎকালীন সভ্যদেশসমূহ একেশ্বরবাদরূপ মহাসত্যের সন্ধানলাভে বঞ্চিত ছিল, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আর্য্যাবর্ত্তের নিভৃত পুণ্য তপোবনমধ্যে সেই অমৃত পদার্থের সন্ধান পাইয়া ভারতের ও জগতের অধিবাসিগণকে সেই অমৃত আস্বাদন করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। বহুকালব্যাপী অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, অবহেলা ও কুশিক্ষার প্রভাবে সেই জ্যোতি ম্লান হইয়া গিয়াছিল, নানাপ্রকার মলিনতা ও আবর্জ্জনা দ্বারা আবৃত হইয়া সেই সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছিল; রাজা রামমোহন রায় বহু যত্ন, বহু চেষ্টা এবং দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা দ্বারা সেই পঙ্কিলতা ও আবর্জ্জনা দূর করিয়া তাহার মলিন অস্বচ্ছ আবরণ উন্মুক্ত করিয়া, সেই প্রাচীন সত্যের আলোক, সেই অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানের প্রদীপ তাহাদের সমক্ষে পুনরায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। একেশ্বরবাদ বিদেশী জিনিষ নহে, বিদেশ হইতে তিনি উহার আমদানী করেন নাই। ইহা খাঁটী "স্বদেশী", ইহা ভারতবাসী হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি, ইহা ভয়াবহ পরধর্ম্ম নহে। অজ্ঞানতা বশতঃ ভ্রম উপস্থিত হইয়া ভারতবাসী তাহার আপনার ধনকে পর-ধন মনে করিয়া তাহার প্রতি এবং যে ব্যক্তি সেই নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া তাহারা কেবল তাহাদিগের নিজের সঙ্কীর্ণতা ও অনুপযুক্ততা প্রমাণ করিয়াছিল মাত্র।

ভারতের চিরন্তন মহাবাণী একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া রাজা রামমোহন রায় লুপ্ত রত্নের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র এবং ইহা দ্বারা তিনি যে এক জন প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ স্বদেশী ছিলেন, তাহা নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয়। তিনি মানুষ ও প্রতিমাপূজার একান্ত বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরের সাকার-কল্পনা ভ্রান্তিমূলক ও অজ্ঞানতাপ্রসূত। এই মত পোষণ ও প্রচার করিয়া তিনি তত্ত্বজ্ঞানী প্রাচীন ঋষিগণের বাক্য ও মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। যে পরব্রহ্মকে ঋষিগণ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার সাকার-কল্পনা করা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মানব-সমাজে সাকার উপাসনার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাহা বলিয়া সাকার উপাসনা যে ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট উপাসনাপদ্ধতি নহে, এ কথা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন যে, বিভিন্ন ঈশ্বরোপাসনা-প্রণালীর মধ্যে অব্যক্ত ও অচিন্ত্য নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। তবে এরূপ উপাসনা সাধারণ মানবের পক্ষে সহজ নহে, সেই জন্য তাহারা সাকার উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অন্তর্য্যামী ঈশ্বর তাহাদিগের আন্তরিকতা ও ভক্তির পরিচয় পাইয়া ঐরূপ-ভাবে উপাসিত হইয়াও ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। হিন্দু-ধর্ম্মের মত সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। যে যে-ভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক না কেন; হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ভক্তিমণ্ডিত পূজা হইলে, সে পূজা কখনও ব্যর্থ হয় না। সাকার ও নিরাকারবাদী উভয়কেই হিন্দুধর্ম্ম স্নেহময়ী জননীর ন্যায় নিজক্রোড়ে স্থান দিতে কখনও অস্বীকার করেন নাই। তবে অধিকারভেদে উপাসনা-পদ্ধতির ভেদ এবং উহার শ্রেষ্ঠতা বা হীনতা নিরূপিত হইয়াছে এবং বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী মানবের পক্ষে যে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত ও শ্রেয়ঃ। সেই জন্য রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট শ্রেষ্ঠ উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ এবং নিকৃষ্ট প্রণালীর পরিহার প্রচার করিয়া সত্যনিষ্ঠা, প্রকৃত জ্ঞান ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসী যখন তাঁহার জীবনের মহাব্রতের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, তখন তাহারা তাঁহাকে দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি উপহার দ্বারা তাঁহার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিবে।

তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় মহৎকার্য্য—শিক্ষা-সংস্কার। পরাধীন জাতির দৌর্ব্বল্য, অসহায়তা, কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, ভীরুতা, নীচতা প্রভৃতি দোষ তিনি স্বজাতির মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখিয়াছিলেন এবং জেতা ও জিতদিগের মধ্যে যে বিষম পার্থক্য অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা নিজে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জেতার সহিত সমকক্ষ হইতে হইলে জেতৃজাতি যে জ্ঞান ও কৌশল দ্বারা বাহ্য-জগতের উপর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, যে কোন উপায়েই হউক, তাহা অর্জ্জন করিতেই হইবে, ইহা ব্যতীত বিদেশী রাজপুরুষগণের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করা এবং দেশের শাসনকার্য্যে তাহাদিগের সমকক্ষ হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইবে না। তিনি বহু চিন্তার পর স্থির করিয়াছিলেন যে, শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন ভারতবাসীর শাসনতন্ত্রে উচ্চাধিকারলাভ, কুসংস্কার পরিবর্জ্জন, সামাজিক উৎপীড়ন নিবারণ এবং অর্থে ও সামর্থ্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা নিতান্ত দুরাশামাত্র। দেশে যে গতানুগতিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল, ধর্ম্ম বা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা, বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, শৌচাশৌচ বিচার, দেশাচার ও লোকাচারের অবিচ্ছিন্ন একাধিপত্যরক্ষণ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাহার কার্য্য অধিকাংশ সময়েই সীমাবদ্ধ থাকিত। উন্নতিশীল ব্যবহারিক জীবনে তাহার কার্য্যকারিতা অতি সামান্যমাত্রই লক্ষিত হইত। দেশের শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, রাজস্ববিভাগভুক্ত যে কোন উচ্চ কার্য্যে ভারতবাসীর তখন কোন স্থান বা অধিকার ছিল না। ভবিষ্যদ্দর্শী রাজা রামমোহন রায় গভীর চিন্তার পর স্থির করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর এই সকল বিভাগে অধিকার আয়ত্ত করিতে হইলে তাহার শিক্ষা ভিন্নপথবর্ত্তিনী হওয়া একান্ত আবশ্যক। পুনশ্চ তিনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যদি কখন ভারতবাসী বর্ত্তমান যুগে তাহার নিজ

দেশে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেবল সংস্কৃত বা ফার্সি ভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, অর্থ-নীতি, রাষ্ট্রনীতি, শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি কার্য্যকরী বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পাশ্চাত্যপ্রণালীমতে দেশের লোকের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ যে এক-রারেই আশাপ্রদ নহে, ইহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া-ছিলেন। সেই জন্য যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশে সামান্য কিছু অর্থ-ব্যয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন কি ভাবে, কি প্রণালীতে, কি বিষয়ে, কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া তৎকালিক সমাজনেতৃগণের মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। অধিকাংশ লোক সংস্কৃত এবং ফার্সি ও আরবী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ উন্নতিশীল বিষয়সমূহ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া যাহাতে এ দেশে অধীত ও অধ্যাপিত হয়, তাহার জন্য এক অকাট্য যুক্তিপূর্ণ গভীর চিন্তাপ্রসূত মন্তব্য গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ডেভিড হেয়ার প্রমুখ কয়েক জন মহামনা ইংরাজ ও বাঙ্গালী তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এ দেশে পাশ্চাত্য প্রণালীমতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষার সূত্রপাত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া তৎকালোচিত দেশপ্রচলিত শিক্ষারও সুব্যবস্থা হইল।

যাঁহারা স্থির ও ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন, তাঁহা-দিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, রাজা রামমোহন রায়ের উৎসাহ, চেষ্টা ও উদ্যোগে বঙ্গদেশে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সুফল আজ আমরা কতক পরিমাণে ভোগ করিতেছি এবং আমরা আশা করি যে, আমাদের ভবিষ্যদ্-বংশাবলী উত্তরোত্তর স্বরাজলাভ করিয়া তাঁহার রোপিত বৃক্ষের সুফল পূর্ণভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

আমরা সামাজিক ও লৌকিক যে সমস্ত কুসংস্কারের দাসত্ব হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করিয়াছি, তাহা যে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, এ কথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কেহই সঙ্কোচবোধ করিবেন না। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজে যে অমঙ্গল একবারে ঘটেই নাই, তাহা বলা যায় না ; কিন্তু সেই সকল অমঙ্গলের জন্য শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দায়ী করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না. তাহার জন্য আমরাই বেশী পরিমাণে দায়ী। আমরা যদি পূর্ব্ব হইতে বিচারপূর্ব্বক দোষগুণ বাছিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিতাম, যদি আমরা মরালের ন্যায় নীরটুকু পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার কেবলমাত্র ক্ষীরাংশ গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমা-দের কোন উদ্বেগ, অমঙ্গল বা অশান্তির কারণ থাকিত না। সে যাহা হউক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী এ দেশে প্রচলনের সহায়তা করিয়া প্রকৃত স্বদেশভক্তের কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের আর একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা রাজনৈতিক যে কোন রূপ অত্যাচার, অনাচার বা উৎপীড়নের তিনি প্রবল শত্রু ছিলেন এবং প্রাণপণে তাহার নিবারণের এবং উচ্ছেদসাধনের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার অদম্য উৎসাহ, ঐকান্তিক ও অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অসমসাহসিকতার বিষয় চিন্তা করিলে মন যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়ে। সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া এক সময়ে তাঁহার জীবননাশের আশঙ্কা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল ; কিন্তু সত্যব্রতী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামমোহন রায় সকল প্রকার অপমান ও নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে এক মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাৎপদ হন নাই এবং বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম, সত্য ও ন্যায়ের অধিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বহুবিধ সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেও একমাত্র সতীদাহনিবারণে তিনি সহৃদয়তা, সৎসাহস ও মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। নারীজাতির প্রতি সমাজের এই অমানুষিক অত্যাচার তাঁহার বিবেকচালিত ও দয়াপ্রবণ হৃদয়কে সবিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মান্ধ, আচারসর্ব্বস্ব বা কুসংস্কারপূর্ণ (রামমোহন রায়ের) যুগে শাস্ত্রবিশেষানুমোদিত চিরপ্রচলিত দোষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যে কিরূপ অসমসাহসিকতা ও বিপৎসঙ্কুল ব্যাপার ছিল, তাহা বর্ত্তমান জ্ঞান ও বিজ্ঞানালোকে যুগের মনুষ্যদিগের পক্ষে সম্যক্ উপলব্ধি করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহমরণপ্রথা উচ্চস্তরের মনুষ্যের পরিচায়ক না হইলেও উহা যে নারীজাতির পতিপ্রাণতা ও স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সে বিষয়ে কোন বিবেচক ব্যক্তি কখন সন্দেহ করিবেন না। কিন্তু এরূপ স্থলেও মানবজীবনের উদ্দেশ্যের প্রকৃত মর্ম্মের অনুভূতির অভাবই যে আত্মঘাতীগণের অনুষ্ঠিত এই অস্বাভাবিক কার্য্যের মূল কারণ, তাহা চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন এবং রাজা রামমোহন অত্যাচার ও উৎপীড়নের উচ্ছেদসাধন ব্যতীত এই শ্রেয়ঃ মনের প্রেরণায় যে এই সংস্কারসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অধিকাংশ স্থলেই ছলে-কৌশলে সদ্যোবিধবার ধর্ম্মান্ধ আত্মীয়স্বজন ও সমাজের বলদর্পী তাহাকে এই মর্ম্মভেদী কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইত এবং অসম্মত বলপ্রয়োগ দ্বারা এই নৃশংস কার্য্য সম্পন্ন করিবার দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। এ সম্বন্ধে বহুবিধ প্রকৃত ঘটনা তৎকাল প্রচলিত পুস্তকাদিতে ও সরকারী বিবরণে বিশদরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে মানুষ, ধর্ম্মান্ধতা ও অজ্ঞতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কিরূপ পাশবিকতা ও নৃশংসতার পরিচয় দিতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্রতীচ্যের মধ্যযুগের ধর্ম্মোন্মত্ততা ঘটনাবলীর সহিত প্রাচ্যের মনস্তত্ত্ব ও তৎপ্রণোদিত কার্য্যকলাপের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

বহু বৎসরব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার পর রাজা রামমোহন রায় এই অমানুষিক সামাজিক উৎপীড়নের হস্ত হইতে হিন্দুনারীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে অনেকানেক মিশনারী ইংরাজ, এমন কি, বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত দিনেমার উপনিবেশ-সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রথার উচ্ছেদসাধনের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ধর্ম্ম বা সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করিলে দেশে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিষেধক আইন বিধিবদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন নাই। লর্ড হেষ্টিংসের রাজ্য-শাসনকালে রাজা রামমোহন রায়ের মহতী চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। যখন লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক শাসনকর্ত্তৃরূপে ভারতে আগমন করিলেন, তখন রাজা রামমোহন রায় নূতন উদ্যমের সহিত আইন দ্বারা যাহাতে এই নৃশংস প্রথা নিবারিত হয়, তাহার জন্য পুনরায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিবেকানুমোদিত ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ আবেদন লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল এবং শাসনতন্ত্রের অনেক কর্ম্ম-চারীর বিরুদ্ধমত সত্ত্বেও তিনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-নিবারক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। সত্য, ন্যায় ও বিবেকের জয় হইল, দেশের মধ্যে অধর্ম্ম, অত্যাচার ও কুসংস্কারের একাধিপত্য একটা বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। এই প্রথা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেশের লোকের যে সকল অযুক্তিকর আপত্তি ও অমূলক আশঙ্কা ছিল, গত এক শত বৎসরের মধ্যে সেই সকল আপত্তি বা আশঙ্কার কোন একটিরও আবির্ভাব এ পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায় নাই। সমাজসংস্কার কার্য্যে আইন বিধি-বদ্ধ হওয়া সর্ব্বথা সঙ্গত নহে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অনেক স্থলেই সমাজসংস্কার কার্য্য মানুষের জ্ঞানোন্মেষণ ও বিবেকবুদ্ধির জাগরণের উপর নির্ভর করিলে অধিকতর সুফললাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু মহানিষ্টপ্রদ পাপসঙ্কুল অনেক সামাজিক দুর্নীতি (যেমন সহমরণপ্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, দাসপ্রথা প্রভৃতি) আইনের সাহায্য ব্যতীত শীঘ্র দূরীভূত হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে। এরূপ স্থলে আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ও সঙ্গত।

সহমরণ-প্রথা স্বদেশজাত হইলেও উহা অধর্ম্মমূলক ও অমঙ্গল-প্রদ বলিয়া রাজা রামমোহন রায় উহার বর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবৎসলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

এতক্ষণ আমরা স্বাদেশিকতার মাপকাঠীতে রাজা রামমোহন রায়কে মাপিয়া দেখিলাম যে, বর্ত্তমান যুগেও তাঁহার মত খাঁটী "স্বদেশী" কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। কিন্তু তাঁহাকে কেবল এই স্বাদেশিকতার মাপকাঠী দিয়া মাপিলে তাঁহার প্রতি অতিশয় অবিচার করা হইবে। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবৎসলতা তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়ঃ এমন আর একটি পদার্থ তাঁহার মধ্যে ছিল, যাহার জন্য তিনি পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির নিকট চিরদিন পূজার্হ হইয়া থাকিবেন। সেই অমূল্য সামগ্রীটি তাঁহার বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রীতি। তিনি সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন জাতির জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, যে কোন বিষয়ে সামান্যমাত্র উন্নতিলাভ ঘটিলেও তাঁহার হৃদয় উৎসাহ, গর্ব্ব ও অনাবিল আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিত এবং এতদুপলক্ষে উৎসব ও নানাবিধ বাহ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার হৃদয়গত উচ্ছ্বাস ও উল্লাস জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া সাতিশয় তৃপ্তি বোধ করিতেন। অদ্য আমি এই বিশ্বপ্রেমিক, সমগ্র মানব-জাতির অকৃত্রিম বন্ধু, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, যুগপ্রবর্ত্তক, মনীষীর চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া আমার এই অকিঞ্চিৎকর অভি-ভাষণের উপসংহার করিলাম।

শ্রীচুণিলাল বসু (রায় বাহাদুর)।

পথিক

ধরণী-পথের পথিক চলেছি
রৌদ্র-কাদায়-জলে ;
শুধু চলা নয়—সরণি চলিতে
পদে পদে পা-ও টলে।

বনের গন্ধ, দিনের বাঁশরী
তুলে নাই শুধু অঞ্চল ভরি'
আছাড়ি' পড়েছি আঁধার রাতের
বেদনা-বাদল-তলে।

মেখেছি পরাগ-পঙ্কের সাথে
পঙ্কের মাটী-মলা,—
আমি ঘোলা-জল বর্ষার নদী,
দুর্দ্দিনে মোর চলা।

পূজা-শেষ ফুল শুধু নাহি লই,
বিশ্বের গ্লানি তারি সাথে বই ;
চলেছি লবণ-সিন্ধুর পানে—
জলে যার তৃষা জলে !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

নব্যভারতে রসায়নচর্চ্চা

২

য়ুরোপে রসায়নের বিকাশ

রবার্ট বয়েল প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রসায়ন-চর্চ্চার প্রবর্ত্তন করিলেও বহুপূর্ব্বে মিশর, আরব ও ভারতবর্ষে রসতন্ত্রের (Alchemy) আলোচনা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। রসতন্ত্রের চর্চ্চা * সম্ভবতঃ প্রাচীন মিশরেই প্রথম আরম্ভ হয়; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় রসতন্ত্র-সাধনার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই ইহার প্রসারের অন্যতম কারণ; ষোড়শ শতাব্দী অবধি রসতান্ত্রিক প্রচেষ্টা এই প্রকার মৃগ-তৃষ্ণিকাতেই শুধু পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই সময়ে প্যারাসেল্‌সাস্ (Paracelsus) সর্ব্বপ্রথম রসায়নী বিদ্যাকে ভেষজশাস্ত্রে আরোপ করিয়া নবযুগের সূচনা করেন।

প্রাচীন রসশাস্ত্রের ইতিহাসকে তিনটি সুস্পষ্ট যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অন্ধকারময় আদিম যুগ, ষোড়শ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ এবং রবার্ট বয়েলের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ। প্রথম যুগে রসতন্ত্রের চর্চ্চা শুধু ধর্ম্মান্ধ কুসংস্কারের মধ্য দিয়াই বিকশিত হইয়াছিল, এই যুগের রস-তান্ত্রিকগণের প্রধানতঃ তিনটি কাম্য বস্তু ছিল। স্বল্পমূল্যের ধাতুকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যে পরিণত করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা ভিন্ন সার্ব্বজনীন দ্রাবক ও মৃত্যুঞ্জয়ী সুধার অন্বেষণ ছিল গৌণ লক্ষ্য। মন্ত্রতন্ত্র ও নানাপ্রকার উদ্ভট প্রক্রিয়া এই শাস্ত্রের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও, আদিম যুগে কয়েক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল।

প্রাচীন মিশরীয় রসতন্ত্রের লিখিত নিদর্শন একরূপ লোপ পাইয়াছে; প্রাচীন মিশরের রসতন্ত্রের বিকাশ আরবীয়গণের তথাকথিত অত্যাচারের ন্যায় শুধু কিংবদন্তীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু আরবগণের অত্যাচারের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল গ্রন্থাগারের বিলোপ সংশ্লিষ্ট না করিয়াও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বিজয়ী আরবগণ বিজিত মিশরীয়গণের নিকট এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া উৎসাহের সহিত রসতন্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ করে। রসায়নের ইংরাজী প্রতিশব্দ Chemistry আরবীয় 'কিমিয়া' হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস।

আরব রসতান্ত্রিকগণের মধ্যে জেবারের (Geber) নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। জেবারই প্রথম রসায়নী-বিদ্যার অনেক প্রাথমিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন, স্বরণ (distillation) ঊর্দ্ধপাতন (sublimation) প্রভৃতির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা ইহাদিগের মধ্যে জেবারের গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়। রসায়নের সূচনাও তাঁহার সময়েই হইয়াছিল। সকল ধা জেবারের মতে পারদ ও গন্ধকের সমন্বয়ে গঠিত; সুতরাং ধাতুগুলিতে গন্ধকের ও বহুমূল্য ধাতুতে পারদের অং থাকে, সুতরাং হীন ধাতু হইতে কোন প্রকারে গন্ধক নিষ্ক করিতে পারিলেই ইহা বহুমূল্য ধাতুতে পরিণত হইবে, ই ছিল জেবারের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, জেবারের ব্যক্তি জীবিতকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান; কাহারও কা মতে জেবার গ্রীসের অধিবাসী, আরবদেশ হইতে শিক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া আরবীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্র পক্ষে জেবারের লিখিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হই তাহা একাধিক ব্যক্তির রচনা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জেবারের সময় হইতেই রসতন্ত্রের চর্চ্চা য়ুরোপের অন্যত দেশে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। রসতান্ত্রিক মতসমূ সময়ে য়ুরোপে এরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, র বেকনের ন্যায় তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিত পর্য্যন্ত 'পরশ পাথরের' অ বিশ্বাস করিতেন।

স্পেনদেশে মুরদিগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপে জন রসতান্ত্রিকের আবির্ভাব হয়। মধ্যযুগে স্পেন জ্ঞা শিক্ষা বিস্তারের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ক (Cordova), সেভিল্ (Seville) প্রভৃতি স্পেনীয় বিদ্যালয়ে ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড হইতে শিক্ষার্থী সম্মিলিত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেমণ্ড (Raymond Lully) স্পেন দেশে রসশাস্ত্র-চর্চ্চার একটি কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন, ইহার রচনাতে জেবারের প্র সুস্পষ্ট। প্রথম যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন ক বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে সংসার ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কর উদ্দেশ্যে লাল্লী আফ্রিকায় গমন করেন; সেখানে ক্রূর প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার জীবন সাঙ্গ করে।

প্রাথমিক যুগের রসতান্ত্রিকগণের মধ্যে জেবারের পরই ভ্যালেণ্টাইনের (Basil Valentine) নাম উল্লেখ উপযুক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। রাসায়নিক প্রতিভা আধুনিক কালেও আমাদের বিস্ময় করে। ধাতুসমূহের প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনা ভ্যালেণ্টা রচনাতেই পাওয়া যায়। অ্যাণ্টিমনি, বিস্মাথ, পারদ প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাসণের উপায় ভ্যালেণ্টাইনই প্রথম করেন, ধাতব ঔষধের ব্যবহারও তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন ক শুধু অ্যাণ্টিমনি ধাতুর উপর "অ্যাণ্টিমনির বিজ (Triumphal Car of Antimony) নামক সুবৃহ রচনা করেন। ভ্যালেণ্টাইন্ দুঃখ করিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের জীবন এত ক্ষণস্থায়ী যে, তাহার মধ্যে শুধু অ্যাণ্টিমনির আলো-চনাই শেষ হয় না, অন্য সকল ধাতুর কথা ত স্বতন্ত্র। গন্ধকাম্ল, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি অম্লপদার্থও তিনি প্রস্তুত করেন, প্রকৃতপক্ষে রসায়নশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ভ্যালেণ্টাইনের কীর্ত্তিকলাপ সুবৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভ্যালেণ্টাইনের সময় হইতেই রাসায়নিক আলোচনা সনাতন পন্থা ছাড়িয়া নূতন পথে ধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্যারাসেল্‌সাস্ই প্রথম রসায়নশাস্ত্রকে আদিম যুগের কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া শিল্প ও ভেষজশাস্ত্রে প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পান। এই যুগের রাসায়নিকগণ প্রায় সকলেই চিকিৎ-সক ছিলেন এবং ইহাদের গবেষণা মুখ্যতঃ চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। এই জন্য এই দ্বিতীয় যুগকে ভৈষজ-রসায়ন যুগ বলা হয়। প্যারাসেলসাস্, এগ্রিকোলা ও ভান্-হেলমণ্ট এই তিন জন রাসায়নিক এই যুগে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; চিকিৎসক হইলেও ইহারা ফলিত রসায়ন সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া গিয়াছেন।

সম্ভবতঃ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে প্যারাসেল্‌সাস্ সুইটজারলাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় ও মঠসমূহে রসায়ন শিক্ষা করিবার পর প্রচলিত শাস্ত্রের উপর তিনি আস্থাহীন হয়েন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, প্রাকৃতিক তথ্যের পরিচয়লাভ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পারে না, উন্মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে না আসিয়া শুধু পুস্তকপাঠে এই জাতীয় জ্ঞানলাভ দুরাশা মাত্র। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া তিনি টিরোলের খনিসমূহে কয়েক বৎসর যাপন করেন এবং খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। খনিকর্ম্মগণের ব্যাধাবিপত্তি ও রোগ-শোক সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত অনুসন্ধান করেন। খনিজ পদার্থের প্রকৃতি ও অবস্থান এবং তাহাদের স্বভাবধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হয়েন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন জাতির রোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হয়েন এবং দেশে ফিরিয়া চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। প্যারা-সেল্‌সাসই প্রথম মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রবর্ত্তন করেন, ফলে ল্যাটিন ও গ্রীক্‌পন্থিগণ তাঁহার শত্রুতা আরম্ভ করেন। প্রতিপক্ষীয়গণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন যে হিপক্রিটাস্, গ্যালেন, এরিষ্টটল প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁহার পুস্তকের তলভাগেরও সমকক্ষ নহেন। স্বাধীন মত পোষণের জন্য তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হয়।

জীবিতকালে প্যারাসেল্‌সাস চৌদ্দখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিন শত বৎসর ধরিয়া প্রায় আড়াই শত পুস্তক তাঁহার লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ পুস্তকই প্রাচীন ভেষজশাস্ত্রকে আক্রমণ করিয়া নূতন রসায়নশাস্ত্রের স্বপক্ষে লিখিত হইয়াছিল।

প্যারাসেলসাসের প্রধান কীর্ত্তি পুরাতন চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কার-বর্জ্জিত করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে গঠিত করিবার প্রচেষ্টা। তাঁহার মতে মানুষের জীবন বাহ্যপ্রকৃতির ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, প্রকৃতি যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, মানব-জীবনও তাহারই অনুগমন করে। ব্যাধি জীবনের অবস্থা-ভেদমাত্র। প্রাণিদেহে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণশক্তি অব্যাহত থাকে, সুতরাং চিকিৎসাশাস্ত্রে রাসায়নিক নীতির প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সেই আদিম যুগে প্যারাসেল্‌সাস্ কিরূপে এরূপ বহুমূল্য সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্যারাসেল্‌সাসের বিভিন্নমুখী প্রতিভা এক সময়ে য়ুরোপের বিদ্বৎসমাজকে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল, ব্রাউনিংএর কবিতা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এই যুগের রাসায়নিকগণের মধ্যে যাঁহারা রসায়নশাস্ত্রকে শিল্পসম্বন্ধীয় ব্যাপারে আরোপ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে এগ্রিকোলা (Agricola) অন্যতম। এই জার্ম্মাণ পণ্ডিতকে খনিজশাস্ত্রের জন্মদাতা বলা হয়। এগ্রিকোলা প্যারা-সেলসাসের সমসাময়িক হইলেও ইঁহার জীবনে প্যারাসেলসাসের প্রভাব দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ, ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে এগ্রিকোলা স্যাক্সনীতে জন্মগ্রহণ করেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই তাঁহার প্রতিভা স্ফুরিত হয়; মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্ ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। কয়েক বৎসর পরে তিনি লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইটালীর একটি বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্রের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে এইখানেই এগ্রিকোলা খনিজবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরিয়া সেমিনজ্ নামক খনিবহুল সহরে বাস করিতে থাকেন। সেমিনজে অবস্থানকালে এগ্রিকোলা ধাতু ও খনিজ প্রস্তর সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এগ্রি-কোলার গ্রন্থেই বৈজ্ঞানিক ভূতত্ত্বের প্রথম সূচনা হয়। ধাতু সম্বন্ধে তাঁহার De re Metallica নামক গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইত। বহুসংখ্যক চিত্রসংবলিত এই পুস্তকে ল্যাটিন্ বৈজ্ঞানিক শব্দের জার্ম্মাণ পরিভাষা প্রদত্ত হইয়াছিল। এগ্রিকোলা মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, লুথারের নূতন মত তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সুতরাং তাঁহাকে প্রোটেষ্টাণ্টগণের বিদ্রূপ ও তাচ্ছীল্য সহ্য করিয়া শেষ-জীবন কাটাইতে হইয়াছিল।

এগ্রিকোলাই প্রথম জার্ম্মাণীর সৌভাগ্যোদয় (Prosperity of Germany) নামক গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মাণীর ভবিষ্য সমৃদ্ধি খনিজসম্পদে লুক্কায়িত আছে।" তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের আর এক জন রাসায়নিক (গ্লবার) জাতির পরমুখাপেক্ষিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া কার্য্যকর রসায়নশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ খেদোক্তি করিয়াছিলেন। এই যুগের তিন জন রাসায়নিক বিশেষ করিয়া ফলিত রসায়নের উন্নতিসাধন করেন। ধাতুনিষ্কাশন প্রভৃতি ব্যাপারে এগ্রি-কোলা, মৃন্ময়-শিল্পে বার্ণার্ড প্লিসি এবং রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুত ব্যবসায়ে গ্লবার এই দ্বিতীয় যুগে খ্যাতি লাভ করেন।

ভেষজ-রসায়নযুগের আর এক জন প্রতিভাশালী রাসায়নিক ভান্ হেল্‌মণ্ট (Van Helmont)। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে এই বেলজীয়ন পণ্ডিত ব্রাসেল্‌স্ নগরে অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ক্রমান্বয়ে নানাপ্রকার শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া হেল্‌মণ্ট অবশেষে চিকিৎসাশাস্ত্রে মনোনিবেশ

* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" নামক বহুমূল্য গ্রন্থে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আরবীয়গণ রসায়নচর্চ্চা বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদিগের নিকট ঋণী ছিল। বৌদ্ধ-যুগে ভারতবর্ষে তির্য্যক-পাতন, ঊর্দ্ধপাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমাণ, "তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধনাগার্জ্জুনাদিভিঃ" ইতি রসেন্দ্র-চিন্তামণিঃ।

করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক গবেষণা করিতে থাকেন। হেলমণ্টের চরিত্রে পরস্পর-বিদ্বেষী প্রভাবের আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে এক দিকে যেমন তাঁহার তীক্ষ্ণ, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য দিকে ধাতুর পরিবর্ত্তনশীলতায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস মধ্যযুগের কুসংস্কারান্ধ মনের পরিচায়ক। বায়বীয় পদার্থের সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আরব্ধ করিয়া হেলমণ্ট যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বে লোক অঙ্গারাম্ল, গন্ধকাম্ল প্রভৃতি বাষ্প ও সাধারণ বায়ুতে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া জানিত না। হেলমণ্টই প্রথম বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থের সত্তা প্রমাণ করেন এবং তাহার "গ্যাস" নামকরণ করেন। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, জ্বলন্ত অঙ্গার, পচনশীল বস্তু এবং প্রাণীর প্রশ্বাসের সঙ্গে একই বায়ু বহির্গত হয় এবং ইহারই ফলে গুহাবিশেষের বায়ু প্রাণীর শ্বাসগ্রহণের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। অবশ্য এই বাষ্পের আধুনিক নাম কারবণিক এসিড অথবা অঙ্গারাম্ল বায়ু। হেলমণ্টের মতে জল ও বায়ু এই দুই পদার্থের সংযোগে জড়জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।



রবার্ট বয়েল

রসায়নের ইতিহাসের তৃতীয় যুগ ফ্লজিষ্টনবাদ নামক (Phlogiston Theory) মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত। রবার্ট বয়েল এই যুগের প্রথম বৈজ্ঞানিক, ইহার প্রতিভার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই যুগের প্রধান স্বতঃসিদ্ধ ফ্লজিষ্টনবাদ বৈজ্ঞানিকগণ ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। দাহ্য বস্তু কেন অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠে, ইহার ব্যাখ্যা এখন নিতান্ত সরল বলিয়া বোধ হয়। দহনক্রিয়া বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেনের সহিত দাহ্য বস্তুর রাসায়নিক সম্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে যে শক্তির বিকিরণ হয়, তাহাই উত্তাপ ও আলোকরূপে প্রকাশ পায়,—ইহাই হইল দহনক্রিয়ার আধুনিক ব্যাখ্যা। কিন্তু অক্সিজেনের সত্তা যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন দহনক্রিয়া এরূপভাবে ব্যাখ্যাত হইত না। তখনকার বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস ছিল যে, দাহ্যবস্তুমাত্রেই ভস্ম ও ফ্লজিষ্টন নামক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত; দহনের ফলে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়। ধাতুভস্ম বাহিরে পড়িয়া থাকে। আলোক বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে তৈল, মোম প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ অদৃশ্য হয় দেখিয়া তাঁহারা মনে করিতেন যে, বস্তুর বিনাশ হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা অঙ্গার ও হাইড্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ,—অক্সিজেনের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে অদৃশ্য বায়বীয় অঙ্গারাম্ল (কারবণিক এসিড বায়ু) ও জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি হয়। দহনসঞ্জাত পদার্থ বায়বীয় বলি উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে মিলাইয়া যায়; বাহির হই দেখিলে মনে হয় যে, তৈল অথবা মোম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ব্যাপারে তখনও সূক্ষ্ম তুলাদ প্রবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং এক খণ্ড তাম্র অথবা ম্যাগনীসিয়ে করিলে যে ভস্ম পড়িয়া থাকে, তাহার ওজন ধাতু অপেক্ষা কি কম, এ সম্বন্ধে কোন গবেষণা সম্ভবপর হয় নাই। যে দিন লাবোয়াসিয়ে প্রমাণ করিলেন যে, ধাতুভস্ম ধাতু অ ভারী, সে দিন ফ্লজিষ্টনবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইল। হউক, ফ্লজিষ্টন যুগের একাধিক বৈজ্ঞানিক আধুনিক র শাস্ত্রের অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

বয়েলের পরই লেমারীর (Lemery) নাম উল্লেখযো লেমারী নিজে বিশেষ কোন মূল্যবান্ আবিষ্ক্রিয়া করিতে নাই, কিন্তু রাসায়নিক তত্ত্ব প্রচারক হিসাবে রসায়ন-জ চিরস্থায়ী আসন লাভ ক ছেন। লেমারীর রচিত "র পাঠ" Cour de Chimi বহুকাল যাবৎ একমাত্র প্রা ণিক রাসায়নিক গ্রন্থ ব বিবেচিত হইত।

জর্জ্জ আর্ণষ্ট ষ্টাল ফ্লজি বাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। ১ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ ক জীবিকার জন্য ইনি চিকিৎ বৃত্তি অবলম্বন করেন। ষ্ট সর্ব্বপ্রথম দহনক্রিয়া ব্যা করিবার জন্য ফ্লজিষ্টনের য শ্যকতা প্রচার করেন। তাঁ মতে যে বস্তু যত অধিক দা শীল, তাহাতে তত অধিক মাণে ফ্লজিষ্টন বর্ত্তমান; হিসাবে অঙ্গারকে পূর্ণ ফ্লজি বলা চলিতে পারে। প্র কাল হইতে ধাতুভস্ম অঙ্গা সহিত উত্তপ্ত করিয়া ধাতুকে নিষ্কাষিত করা হয়। ষ্টালে ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ধাতুমাত্রে ধাতুভস্ম ও ফ্লজি যৌগিক পদার্থ, বাহির হইতে ধাতুভস্মে ফ্লজিষ্টন আরোপ ক ধাতু পুনরুজ্জীবিত হয়।

ষ্টালের প্রতিষ্ঠিত মত অল্পদিনের মধ্যেই জর্ম্মাণীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল; বার্লিন সহর এই মতাবলম্বী রাসা দিগের একটি বিশেষ কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ষ্টালের শিষ্যগণের মধ্যে মার্গ্রাফ্ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সকের সামান্য সহকারী হইতে ইনি ক্রমে ক্রমে এক জন বৈজ্ঞানিকে পরিণত হয়েন। ফস্ফরিক এসিড সম্বন্ধে মূল্যবান্ গবেষণা করেন এবং বীট্ হইতে নিষ্কাশিত মধ্যে শর্করার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। রাসায়নিক অণুবীক্ষণের ব্যবহার মার্গ্রাফই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যদিও মার্গ্রাফ দেখাইয়াছিলেন যে, ফস্ফরাস দগ্ধ করিলে যে শ্বেত ভস্মের উদ্ভব হয়, তাহার ওজন ফস্ফরাস অপেক্ষা অধিক, তথাপি তিনি ফ্লজিষ্টনবাদের এক জন প্রসিদ্ধ সমর্থক ছিলেন।

বিলাতে ফ্লজিষ্টনবাদ প্রথমে জোসেফ ব্ল্যাক (Joseph Black) নামক পণ্ডিতের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছিল; মৃদু ও তীক্ষ্ণ ক্ষার সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ব্ল্যাক বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। * ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ব্ল্যাক জন্মগ্রহণ করেন; তিনি গ্লাসগো ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। পদার্থ-বিদ্যার উত্তাপ-সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান্ তথ্য ব্ল্যাক আবিষ্কার করেন; তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে, মার্ব্বেল

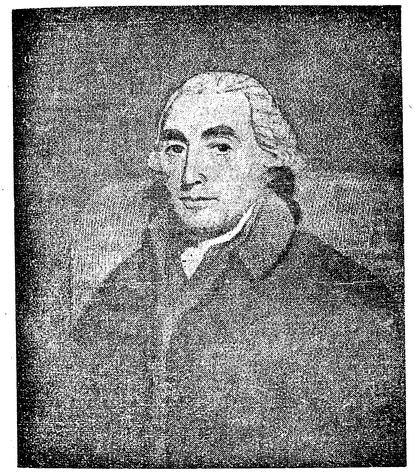

জোসেফ ব্ল্যাক

পাথর তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে ইহা চূণে পরিবর্ত্তিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বাষ্প বিতাড়িত হয়, যাহা হেলমণ্টের গ্যাস সিলভেষ্টার (কারবণিক এসিড বায়ু) ভিন্ন আর কিছুই নহে। সোডা প্রভৃতি মৃদুক্ষারে এই বাষ্প তীক্ষ্ণ ক্ষারের সহিত সম্মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে; এই জন্য ব্ল্যাক ইহার "আবদ্ধ বাষ্প" (Fixed air) নামকরণ করেন। ব্ল্যাক প্রথমে ফ্লজিষ্টনবাদের উক্ত ছিলেন, কিন্তু অক্সিজেন আবিষ্কারের পর যখন লাবোয়াসিয়ে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন।

* যাঁহারা এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "নব্য-রসায়নী-বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" নামক পুস্তক পাঠ করিবেন।

সহকারী হিসাবে ব্ল্যাক এক জন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন; হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিস্ (Henry Cavendish) রসায়ন ও পদার্থশাস্ত্রে তুল্য ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং উভয়শাস্ত্রের অনেকগুলি বহুমূল্য তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ক্যাভেণ্ডিসই প্রথম হাইড্রোজেন বাষ্পের আবিষ্কার করেন; অঙ্গারাম্ল সম্বন্ধেও অনেক নূতন কথা প্রকাশ করেন। জল যে দাহ্য বাষ্প হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত এবং বাতাস মুখ্যতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক বাষ্পদ্বয়ের সংমিশ্রণ, তাহাও ক্যাভেণ্ডিসের আবিষ্কার। ক্যাভেণ্ডিস স্বয়ং ফ্লজিষ্টনবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারই আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদ সাধিত হয়। দাহ্য বাষ্প হাইড্রোজেনকেই ক্যাভেণ্ডিস ফ্লজিষ্টন বলিয়া মনে করিতেন।

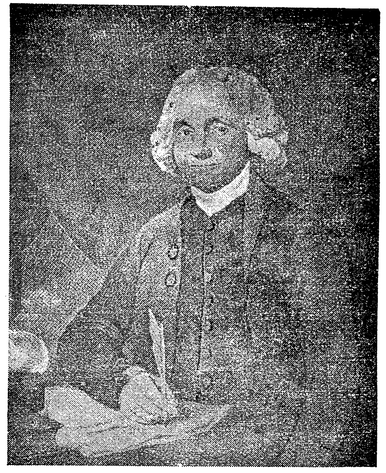

জোসেফ প্রিষ্টলী

ফ্লজিষ্টনবাদের সমর্থকগণের মধ্যে জোসেফ প্রিষ্টলী (Joseph Priestley) সর্ব্বপ্রধান; ক্যাভেণ্ডিসের ন্যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ফ্লজিষ্টনবাদের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহারই পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সাহায্যে প্রতিপক্ষীয়গণ ফ্লজিষ্টনবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। একাগ্রচিত্তে সকল সময়ে বিজ্ঞানসাধনা করিবার সুযোগ প্রিষ্টলী প্রাপ্ত হয়েন নাই; দারিদ্র্যের কৃপায় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে যাজক ও শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, শুধু অবসরসময়ে তিনি রাসায়নিক গবেষণা করিতে পারিতেন। পারদভস্ম উত্তপ্ত করিয়া তিনিই প্রথম অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন সত্তা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি মূল্যবান্ পরীক্ষা সম্পন্ন করিলেও প্রিষ্টলী

কোনটিরই প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই, কারণ, তিনি ষ্টালের ফ্লজিষ্টনবাদের এক জন অন্ধ উপাসক ছিলেন।

এই সময়ে সুইডেনে এক অসামান্য প্রতিভাশালী যুবক ঔষধালয়ের ক্ষুদ্র এক অংশে সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক জগৎ চমৎকৃত হইতেছিল। নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কার্ল ভিল্‌হেলম সিলেকে (Carl Wilhelm Scheele) জীবন যাপন করিতে হইত, চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার দেহান্ত হয়। কিন্তু নব্য রসায়নশাস্ত্রের অতি অল্প বিষয়ই আছে, যাহা লইয়া সিলে আলোচনা করেন নাই। থর্পের মতে * "চিকিৎসকের এক সামান্য সহকারী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার হ্রদ-প্রদেশের এক ক্ষুদ্র সহরের অধিবাসী। "আজীবন দারিদ্র্যের ভারে নিষ্পেষিত ও ঋণের ভয়ে শঙ্কিত, মানসিক ব্যাধির কৃপায় প্রায় সকল সময়ে বিমর্ষ,—সিলে শুধু অলৌকিক প্রতিভার কৃপায় ও অদম্য উৎসাহের বশে নৈরাশ্যকে তুচ্ছ করিয়া একটি শাস্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তনসাধন করিয়া গিয়াছেন।" জীবনে খ্যাতি-প্রতিপত্তি তিনি যথেষ্টই লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অদৃষ্টে স্বচ্ছলতা লেখা ছিল না। দেশবিদেশ হইতে সিলে সম্মান ও অর্থের প্রলোভন পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থের মায়ায় জীবনে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। সিলের আবিষ্কারের পরিচয় দিতে হইলে জৈব ও অজৈব রসায়নের বিস্তৃত তালিকা উল্লেখ করিতে হয়।

ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া নব্য রসায়নীবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন, ফরাসী রাসায়নিক আঁতোয়ান্ লোরাঁ লাবোয়াসিয়ে (Antoine Laurent Lavoisier)। সিলের জন্মের এক বৎসর পরে, ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লাবোয়াসিয়ে জন্মগ্রহণ করেন; ধনীর পুত্র লাবোয়াসিয়ে বাল্যকাল হইতেই ফরাসী দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং অল্পবয়সেই রাসায়নিক গবেষণা করিয়া কৃতিত্ব লাভ করেন। তেইশ বৎসর বয়সে তিনি ফরাসী একাডেমীর সম্মানিত সভ্যপদে বৃত হয়েন। লাবোয়াসিয়ের প্রথম গবেষণা বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত মতের অসারতা প্রতিপন্ন করে। কাচপাত্রে বহুক্ষণ ধরিয়া জল ফুটাইবার পর সমস্ত জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেলে এক প্রকার সূক্ষ্ম গুঁড়া পড়িয়া থাকে, ইহাকেই লোকে জলের ধূলিকণায় পরিণতি মনে করিত। পরীক্ষার পূর্ব্বে এবং পরে কাচপাত্রের এবং পরীক্ষালব্ধ গুঁড়ার ওজন নির্ভুলভাবে নির্ণয় করিয়া লাবোয়াসিয়ে দেখাইলেন যে, ফুটাইবার ফলে কাচপাত্রের ভার কমিয়া যায় এবং এই হ্রাস-বিশ্লিষ্ট গুঁড়ার ভারের সমান। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পাত্র হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কাচ জলে দ্রবীভূত হয়, জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেলে দানার আকারে পড়িয়া থাকে। এই গবেষণা হইতেই লাবোয়াসিয়ে রাসায়নিক অনুসন্ধান ব্যাপারে সূক্ষ্ম-তুলাদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

ইহার পর লাবোয়াসিয়ে দহনক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রকার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বঙ্গ, পারদ, সীসক প্রভৃতি ধাতুর প্রাথমিক ভার নির্ভুলভাবে বাহির করিয়া ধাতুভস্মে পরিণত করেন এবং ভস্মের ওজন নির্ণয় করেন। অবরুদ্ধ বায়ুতে ধাতু দগ্ধ করিয়া তিনি বায়ুর আয়তনের হ্রাস ও অবশিষ্ট বায়ু শ্বাস গ্রহণ ও দহনকার্য্যের অনুপযোগিতা লক্ষ্য করেন। ইহা হইতে লাবোয়াসিয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, বাতাসে দুই প্রকার বায়বীয় পদার্থ বর্ত্তমান, বায়ুর এক অংশ প্রাণীর জীবনধারণ পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ও সকল প্রকার দহনকার্য্যের সহায়, অবশিষ্ট অংশ উভয়েরই অনুপযোগী। এই প্রকার পরীক্ষা সাহায্যে লাবোয়াসিয়ে বাতাসে অক্সিজেনের সত্তা প্রমাণ করেন, নূতন বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্লজিষ্টনবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। বলা বাহুল্য, অক্সিজেন আবিষ্কার



লাবোয়াসিয়ে

কৃতিত্ব লাবোয়াসিয়ে ও প্রিষ্টলীর মধ্যে কাহার প্রাপ্য, এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। * বস্তুর নিত্যতা নিয়ম (Conservation of Matter) আবিষ্কার লাবোয়াসিয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি; এ বিশ্বসংসারের কণামাত্র বস্তুর সৃষ্টি অথবা বিনাশ হয় না। সৃষ্টির আদিমকালে কোন অব্যক্ত মহাশক্তিপ্রভাবে যে পরিমাণ বস্তু জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া তাহার পরিমাণ নিত্য রহিবে, রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র, ইহাই হইল বস্তুর নিত্যতা নিয়ম

* Essays in Historical Chemistry by E. Thorpe.

* যাঁহারা এ বিষয়ে বিশদরূপে জানিতে চান, তাঁহারা ১৩৩৪ সালের "প্রকৃতি"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "অক্সিজেন আবিষ্কার" শীর্ষক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

প্রতিপাদ্য। মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যতটুকু আসিতে পারে, অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপারে লাবোয়াসিয়ে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে, পরিবর্ত্তনের ফলে পরীক্ষা-সংক্রান্ত বস্তুসমূহের ভারের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, রসায়নশাস্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন-কারী, লাবোয়াসিয়ে ফরাসী রাষ্ট্রতন্ত্রের সমক্ষে সামান্য বিদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হয়েন এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে ফরাসী স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিচারে নব্য রসায়নী বিদ্যার জন্মদাতা গিলটিনের আঘাতে জীবন সাঙ্গ করেন। "ফরাসী সাধারণতন্ত্রে গণ্ডিতের প্রয়োজন নাই", * মৃত্যুর আদেশ দিবার সময় বিচারকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন। লাবোয়াসিয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে যথার্থ কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই; অনেকের মতে তাঁহার অকাল-মৃত্যু বৈজ্ঞানিক প্রতিপক্ষীয়গণের চক্রান্তের ফল।

লাবোয়াসিয়ের মৃত্যুর পর য়ুরোপে সকল দেশেই রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চ্চা অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পায়। শুধু ফরাসী দেশেই প্রাউষ্ট, ভোক্‌লীন, সেভরেল, দুমা, গেলুসাক, বার্থলো প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক রসায়নশাস্ত্রের অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। সুইডেনে বর্জ্জিলিয়স জীবিতকালে রসায়ন সাম্রাজ্যের "মুকুটহীন রাজা" বলিয়া গণ্য হইতেন; জর্ম্মাণীতে লিবিগ্, হ্বোলার, বুনসেন, ইংলণ্ডে ডেভী, ফ্যারাডে, ড্যালটন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উনবিংশ শতাব্দীর রসায়নশাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন।

জন্ ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ, ইটালীয় বৈজ্ঞানিক আভোগেড্রো ক্যানিজারোর আণবিক সংখ্যা সম্বন্ধে নূতন মত, অঙ্গারের পরমাণু সম্বন্ধে কেকুলের সিদ্ধান্ত,—আধুনিক রসায়নের বিকাশের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কোন শাস্ত্রই সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষামুখী হইলে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেকুলের মত উল্লেখ করা যাইতে পারে। অঙ্গারের পরমাণুগুলি যখন রাসায়নিক সম্মিলনের ফলে জটিল যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সরল রেখাক্রমে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, কেকুলের এই মতের সাহায্যেই জৈব রসায়নের অসংখ্য নূতন পদার্থের আবিষ্কার ও এক সুবৃহৎ নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণোয়াল প্রদেশে ডেভীর জন্ম হয়। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া ডেভীকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝিতে হয় এবং শুধু স্বচেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের ফলে বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। আজীবন রুগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানসাধনা করিতে হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই তাঁহার জীবন-পরিসমাপ্তি হয়; কিন্তু এই স্বল্পায়তন জীবনের মধ্যে ডেভী রাসায়নিক হিসাবে যথেষ্ট যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সোডিয়ম্, পোটাসিয়ম্ প্রভৃতি ক্ষার-ধাতু ডেভীই প্রথম আবিষ্কার করেন, তীক্ষ্ণ-ক্ষারকে উত্তাপে গলাইয়া বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া ডেভী ধাতুকে বিশ্লিষ্ট করেন। ক্লোরিণ নামক বিষাক্ত বায়ুর স্বভাবধর্ম্ম

* "La Republique n'a pas besoion de savants."

ও মৌলিকতা সম্বন্ধেও ডেভী যথেষ্ট মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছিলেন। ডেভীই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে সহজবোধ্য বক্তৃতার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে জানিবার ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলেন। রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধিবেশনে ডেভীর সরস ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা শুনিবার জন্য অভিজাতবংশীয়গণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

ডেভীর বৈজ্ঞানিক জীবনের সঙ্গে আর এক জন মনীষীর নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বংশ অথবা অর্থের আভিজাত্য-গর্ব্ব করিবার মাইকেল ফ্যারাডের কিছুই ছিল না, দরিদ্রতম কর্ম্মকারের পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। সামান্য প্রাথমিক শিক্ষার পর বালক ফ্যারাডে ক্রমান্বয়ে সংবাদপত্রবাহক ও "দপ্তরীর" শিক্ষানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। অল্পবয়সেই তাঁহার মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা এত বলবতী হইয়াছিল যে, বাঁধাইবার জন্য যে সকল পুস্তক তাঁহার নিকট আসিত, তাহা তিনি রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া ফেলিতেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ডেভীর খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে ডেভীর বক্তৃতায় অসম্ভব জনতা। বালক ফ্যারাডে কর্ম্মের অবসানে সন্ধ্যাকালে ডেভীর বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি টুকিয়া লইতেন। ডেভীর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া "অশিক্ষিত" ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ দপ্তরী, শিক্ষানবীশ যুবক ফ্যারাডে এক দিন সাহস করিয়া সহকারী হইবার প্রার্থনা ডেভীকে জানাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডেভীর বক্তৃতার সারাংশ পেশ করিলেন। নিজের বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বক্তৃতার এমন সুন্দর চুম্বক এক জন অশিক্ষিত যুবক করিয়াছে দেখিয়া ডেভী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু এ অদ্ভুত খেয়ালে প্রথমে ডেভী রাজী হইলেন না; যুবকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ফ্যারাডেকে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের পরিচারকপদে নিযুক্ত করিতে হইল। এই বিজ্ঞান সমিতির সহিত সামান্য পরিচারকরূপে সে দিন মাইকেল ফ্যারাডের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহা অটুট ছিল। শুধু পরিচারক হইতে সহকারী ও সহকারী হইতে অধ্যাপক-পদ লাভ করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। দেশবিদেশ হইতে অযাচিত সম্মান তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। শুধু বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সভা রয়েল সোসাইটীর সভ্যনির্ব্বাচনে সামান্য বিঘ্ন কিছু উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা ডেভীর তরফ হইতেই আসিয়াছিল। প্রিয় সহকারী ও ছাত্র যে সহসা তাঁহার প্রতিভাকে অতিক্রম করিবে, এ ভাবনা ডেভীর মোটেই মনঃপূত হয় নাই। তাই যখন রয়াল সোসাইটীর অন্যান্য সভ্য একযোগে ফ্যারাডেকে সভ্যপদে উন্নীত করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন ডেভীই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহাকেই লোকলোচনে হেয় হইতে হইয়াছিল। ফ্যারাডে এই নীচাশয়তার জন্য গুরুর প্রতি বিন্দুমাত্র রুষ্ট হয়েন নাই।

তড়িৎসম্বন্ধে গবেষণা ফ্যারাডের জীবনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। আজ যে তড়িৎশক্তির সাহায্যে বিশ্ব-সংসার চলিতেছে, তাহাও ফ্যারাডের অনুসন্ধানের ফল। ফ্যারাডেই প্রথম রসায়নশাস্ত্রে পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ করেন। বায়বীয় পদার্থকে শৈত্য ও চাপের সাহায্যে তরল করেন, বেনজীন নামক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া

এক বিশাল ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা-প্রকার আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-পদবী লাভের অধিকার অর্জ্জন করেন।

এই সময়ে সুইডেনে আর এক জন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক অনন্য-অধ্যবসায় সহকারে ড্যাল্টনের আণবিক মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বার্জ্জিলিয়স্ (Berzelius) জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি চিকিৎসকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রসায়নশাস্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে এক অনতিপ্রসর কক্ষে, বার্জ্জিলিয়স্ যে সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের রাসায়নিকের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ও ভিয়ানার হোনিগস্মিড ইন্দ্রপুরী সদৃশ বিংশ শতাব্দীর রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উপকরণ ও উপাদানের বাহুল্যের মধ্যে বার্জ্জিলিয়সের পরীক্ষাগুলি একে একে সম্পন্ন করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহার পরীক্ষাসংক্রান্ত সূক্ষ্মতাকে অতিক্রম করা শুধু কদাচিৎ সম্ভবপর। বার্জ্জিলিয়সের জীবিতাবস্থায় তাঁহার ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার দেশবিদেশের রাসায়নিকগণের "মক্কাতীর্থে" (the Mecca of Chemists) পরিণত হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাসায়নিকগণের মধ্যে লিবিগ ও হ্বেলারের যুগ্ম নাম রসায়নের ইতিহাসে একত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; বন্ধুত্বে যেমন উভয়ে ছিলেন হরিহর আত্মা, রাসায়নিক গবেষণাতেও সেইরূপ এক জনের প্রভাব অন্যে সুস্পষ্ট। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ডার্মষ্টাড সহরে লিবিগ জন্মগ্রহণ করেন। রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিসে উপস্থিত হয়েন; ফরাসী দেশ তখন রসায়নচর্চ্চার প্রধানতম কেন্দ্র। লাবোয়াসিয়ের শিষ্যবর্গ গেলুসাক্, থেনার, দুলো, সেভরেল, ভোক্লীন প্রভৃতি পূর্ণ উদ্যমে তখন রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে-ছিলেন। লিবিগ গেলুসাকের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং অল্প-দিনের মধ্যে পারদের বিস্ফোরক এক যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে মূল্যবান্ গবেষণা প্রকাশ করেন। ইহার ফলেই তিনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে গাইসেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন।

শিক্ষক হিসাবে লিবিগ ছিলেন অতুলনীয়। বার্জ্জিলিয়স্ অভিজ্ঞ রাসায়নিককেই নিজের শিষ্যত্বে স্বীকার করিতেন। কিন্তু লিবিগ অনভিজ্ঞ ছাত্রকে লইয়া তাহার মধ্যে গবেষণার উৎসাহ সঞ্চারিত করিতেন; সুতরাং লিবিগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন সংখ্যায় অনেক। লিবিগ শুধু গতানুগতিক রাসায়নিক গবেষণা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। শারীরবিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতি শাস্ত্রে রসায়নের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

হ্বেলার ছিলেন বার্জ্জিলিয়সের ছাত্র। জৈব রসায়নের একটি বহুমূল্য আবিষ্কারের সঙ্গে হ্বেলারের নাম জড়িত হইয়া আছে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ্দেহের কোন বস্তু যেমন শর্করা, স্নেহজাতীয় বস্তু প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত হইতে পারে না, মানুষের পরীক্ষাগারে এ সকল পদার্থের জন্ম অসম্ভব। হ্বেলারই প্রথম দেখাইলেন যে, ইউরিয়া নামক দেহসম্ভূত পদার্থ (যাহা নর-মূত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান) কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে প্রস্তুত হইতে পারে। এই আ[illegible]ষ্কারের ফলেই জৈব ও অজৈব (Organic and Inorgan[illegible] রসায়নের কৃত্রিম আবেষ্টন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এ[illegible] রাসায়নিকের বিশ্বাস যে, জড় বস্তুমাত্রেই রসায়নাগারে প্র[illegible] হইতে পারে। লিবিগ ও হ্বেলারের যুগ্ম গবেষণার ফ[illegible] জৈব-রসায়ন এত শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রা[illegible] রাসায়নিক আবিষ্ক্রিয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের ন্যায় অ[illegible] সাধন করিতেছে। সামান্য আবিষ্কারের উপর নির্ভর ক[illegible] অসামান্য অধ্যবসায়ের ফলে কেমন করিয়া জাতি আন্তর্জা[illegible] অর্থনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করিতেছে, তাহার আখ্যায়িকা উপ[illegible] হইতেও বিস্ময়জনক। রাসায়নিকের একনিষ্ঠ সাধনার [illegible] অনেক পুরাতন ব্যবসায়ের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। * জা[illegible] রঞ্জন-শিল্প, ভারতের নীল ও মঞ্জিষ্ঠার চাষ বিনষ্ট করিয়া[illegible] পাস্তুরের মহান্ আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন খাদ্যসম্ভার জীবা[illegible] পাত্রে সংরক্ষিত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হইতে[illegible] অসংখ্য রোগ ও যন্ত্রণানাশক ঔষধ রসায়নাগারে প্রস্তুত হ[illegible] রোগক্লিষ্ট মানবের কল্যাণসাধন করিতেছে। লৌহ প্রস্ত[illegible] অতিকায় চুল্লী দানবের মত ধরিত্রীর বুকে দাঁড়াইয়া জড় সভ্য[illegible] মহিমা প্রচার করিতেছে। যুদ্ধ আর এখন সৈনিকের ব্যক্তি[illegible] শৌর্য্য ও সাহস প্রদর্শনের স্থান নহে, রণস্থলী হইতে দূরে ব[illegible] সাধারণের অলক্ষ্যে রাসায়নিকই এখন যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচা[illegible] করেন। কি শান্তির সময়ে, কি যুদ্ধের মধ্যে, সকল সম[illegible] রাসায়নিকের সাহায্য জাতির পক্ষে অপরিহার্য্য হ[illegible] দাঁড়াইয়াছে।

জ্ঞানের চর্চ্চা কোন ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের নিজস্ব স[illegible] নহে। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। প্রাচীন [illegible] দেশেও কন্‌ফিউসিয়াস (Confucius) মেন্‌সীয়স্ (Menci[illegible] লায়োটসী (Laotse) প্রভৃতি নীতিজ্ঞ ও দার্শনিক [illegible] খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন চীনদে[illegible] দিগ্দর্শন ও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে [illegible] দেশে যত একনিষ্ঠ সাধক জন্মিয়াছেন সেই দেশেই জ্ঞা[illegible] বিস্তৃতি তত অধিক হইয়াছে। অধিক দিনের কথা নহে, [illegible] আশী বৎসর পূর্ব্বে এক জন ফরাসী রাসায়নিক (উর্জ্জ) রস[illegible] শাস্ত্রকে স্বদেশীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্দ্ধ শত[illegible] মধ্যে জার্ম্মাণী ফরাসীর এ অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। সু[illegible] আজ যে য়ুরোপ ও আমেরিকা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চায় জ[illegible] শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহারা যে চিরকালই এরূপ ব[illegible] তাহার কোন অর্থ নাই। অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ অধ্যব[illegible] ও অলৌকিক স্বার্থত্যাগের বলে পাশ্চাত্য মনীষিগণ তিলে [illegible] বিজ্ঞানের এ অসম্ভব উন্নতি সাধিত করিয়াছেন। অ[illegible] কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পরপদানত ভারতবর্ষ যে এক দিনেই বি[illegible] জগতে দশের মধ্যে এক বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা [illegible] মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যেই মৌলিক বিজ্ঞানালোচনার [illegible]

* ১৩৩৪ সালের "বার্ষিক বসুমতীতে প্রকাশিত আচার্য্য [illegible] চন্দ্রের "রাসায়নিক গবেষণায় জার্ম্মাণীর সৌভাগ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে, বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী রাসায়নিক আর এখন অপাংক্তেয় নহেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে রসায়নশাস্ত্রের যে চর্চ্চা হইয়াছে, তাহারই বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী প্রবন্ধ-সমূহে বিবৃত হইবে; এ প্রবন্ধদ্বয়ে তাহার সূচনা হইল মাত্র। *

[ক্রমশঃ।

অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার (এম্, এস্-সি, ।)

* এই দুই প্রবন্ধে গত আড়াই শত বৎসরের য়ুরোপীয় রসায়নচর্চ্চার মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইল। অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও ইহা সত্য যে, য়ুরোপীয় রসায়নের ইতিহাসের ধারণা না থাকিলে ভারতবর্ষের রসায়নচর্চ্চার বিবৃতি সাধারণ পাঠকের নিকট শুষ্ক বৈজ্ঞানিক তথ্যের দুর্ব্বোধ্য তালিকায় পরিণত হইবে।

বিধবা বালিকা

বঙ্গ-বিধবা বালিকা,
ভারত-কাননে পারিজাত তুমি, অমরার দেব-মালিকা।
বিমল পুণ্য-সৌরভে তব ভারত-দেউল ভরা
তোমার চরণ করিয়া স্পর্শ ধন্য আজিকে ধরা
মলিন বসন-কিশলয় মাঝে নীরবে কুসুম রাণী
গৃহ-তপোবন করিছ মোদিত বিমল সুষমা দানি'।

তোমার তুলনা তুমি মা,
অভিধানে তব নাই বিশেষণ, বিশ্বে তোমার উপমা।
আভরণ-হীনা তুমি চিরদীনা—রুক্ষ লুলিত কুন্তল
জনম-যোগিনী জগৎ-জননি! করিছ বিশ্ব-মঙ্গল।
তোমার সাধনা হেরি ম্রিয়মাণ তপোধন সাধু যোগী,
মহিমা তোমার শতগুণ ভবে,—নহ ত মা তুমি ভোগী!

ভুলোনি আপন জনে,
নিজসুখ আশে যাও নাই তুমি নীরব গভীর বিজনে।
শত কোলাহলে স্বজনে বেষ্টিত আপনার গৃহমাঝে
সুখে দুখে শত আপনার মত জাগিছ সতত কাযে;
লালসা-আহবে করি জয়লাভ লভেছ বিমল দীপ্তি,
আর্ত্তের প্রাণে বিতরি শান্তি লভ গো তাহাতে তৃপ্তি!

ভুলোনি আপন লক্ষ্যে,
নিজ দেবতায় রেখেছ লুকায়ে নীরব হৃদয়-কক্ষে।
সাধু ঋষি মত হওনি নীরস ভাবনা জগৎ নর
সাজায়ে রেখেছ আপনার হৃদে স্নেহমায়া থরে থর;
স্বজনের তরে কাঁদ কত দিন তাহাদের সুখে হাস
বিশ্বে বিলায়ে স্নেহ প্রীতি দয়া সব জনে ভালবাস।

চাহ না আপনা সুখ,
বিশ্বের সুখে সুখ পাও দেবি! তা'দের দুখেতে দুখ!
ঐহিক সুখে নাহিক কামনা, লালসা নাহিক ভোগে
কোথা সাধু জন তোমার মতন জানিতে বিশ্ব-ত্যাগে?
তাহারা বিশ্ব করে না-ও ত্যাগ, তাহারা বিশ্ব-ত্যক্ত
এক তুমি দেবি! ত্যাগের মন্ত্রে সকলে করেছ ভক্ত।

মুনি ঋষি-যোগানন্দ,
জ্যোতির্ম্ময়ী তব সাধনা প্রভায় স্তিমিত মলিন মন্দ।
নির্জ্জনে থাকি কত সাধু জন প্রলোভন নিয়ে চিত্তে
ভুলে যায় নিজ কৃচ্ছ-লব্ধ অসীম সাধনা-বিত্তে।
ধন্য তোমার সাধনা-প্রভাব তুলনা নাহি তা সাথে
এত প্রলোভনে রেখেছ অটল হৃদয়ে হৃদয়-নাথে।

—কোন্ সে স্বজন-মাঝে?
কোন্ সে স্মৃতির যবনিকা-তলে পেয়েছিল হৃদিরাজে!
মনে নাই সেই মধুর মিলন সে নব বাসর-ঘর,
জানাতে ক্ষণেক মরমের কথা পাও নাই অবসর,
দেবতা-চরণ লক্ষ্য করিতে হৃদয় হয়েছে স্পন্দিত,
প্রণয়-মধুর-সলাজ-পুলকে করেছ প্রাণেশ নন্দিত।

দেবতা ব্রহ্মচারিণি!
শ্মশান-আলোকে দেখেছ জীবনে দেবতা-আননখানি!
চিতাসনে রাখি প্রাণের দয়িত করিলে প্রথম আরতি,
আপনার যত ছিল অভিলাষ তাঁ'র সনে দিলে আহুতি!
সেই মুখখানি এখনো ভুলোনি সে যে তব চির-সুন্দর
প্রণয়-প্রতিভা-মহিমোজ্জ্বল শাশ্বত অবিনশ্বর।

কেমনে তোমারে বন্দি?
স্বার্থ-বিহীনা, জনম-যোগিনী, দরশ—পাবনস্যন্দী।

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।



হানা-বাড়ী



৫৭

আমি বলিলাম, "হানা-বাড়ীতে নন্দন সাহেবের অভ্যুদয় ত হ'লো। ও দিকে আসল ঘোষজা মশায়ের কি হলো ?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "তাঁকে তার পরেই কান সাহেব প্রমোদার বাড়ীতে এনে হাজির করলে ; আর তাঁর সম্বন্ধে ওদের যে রকম পরামর্শ স্থির হয়েছিল, ঠিক সেই রকমই সব কায হ'তে লাগলো। তাঁর শরীর ও মাথার অবস্থা তখন এত দুর্ব্বল ছিল যে, প্রথমটায় তাঁকে বাগ মানিয়ে, উমাপতিরূপে ধ'রে আটকে রাখা প্রমোদার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর বা দুঃসাধ্য হয়নি। মাঝে মাঝে গোলযোগ করতেন বটে, কিন্তু বেশী গুরুতর-গোছ কিছু হয়নি। পাড়ার লোক দূরে থাক, বাড়ীর ঝিটাও কিছু সন্দেহ করতে পারেনি। সেই জন্যই ক্রমে ঘোষজা মশায়ের সম্বন্ধে প্রমোদার সতর্কতা অনেক ক'মে গিয়েছিল। তার ফলে ঘোষজা মশায় দুই একবার বাড়ীর বার হয়ে গিয়েছিলেন। আবার তাঁকে খুঁজে বার ক'রে ফিরিয়ে আনতে ওদের খুব বেগ পেতে হয়েছিল। তার পরে তাঁকে ঘরে চাবিবন্ধ ক'রে রাখা হতো ; কিন্তু তাতে গোলযোগ বেড়ে যেতে লাগলো। ঘরের ভিতর থেকে তাঁর করুণ আর্ত্তনাদ সময়ে সময়ে এত বেশী হতো যে, রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেতো। দুই একবার এমন হয়েছিল যে, "ঘাঁটীর পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল। তাকে অনেক 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে' তার হাত থেকে ওরা অব্যাহতি পেয়েছিল। কাযেই ও-রকম ক'রে ঘোষজা মশায়কে আটকে রাখা ক্রমে ওদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ায়, ওরা পরামর্শ ক'রে, শেষে কান সাহেবের সাহায্যে ডাক্তার ভাদুড়ীর আশ্রমে ভর্ত্তি করেছিল।—তার পরে যা' যা' ঘটেছিল, সে সবই ত আপনি জানেন।"

"হাঁ, ঘোষজা মশায়ের সম্বন্ধে সব কথাই ত জানা গেল। কিন্তু উমাপতি ওরফে নন্দন সাহেবের খুনটা ত সেই পূর্ব্বেরই মত রহস্যময় হয়ে রইলো। ওদের তিন জনের মধ্যে কে কি জন্য তাকে খুন করলে, তা ত কিছুই জানা গেল না ?"

"না, খুনের বিষয়ে প্রমোদার কাছে কোন খবরই পাওয়া গেল না, তা ত প্রথমেই আপনাকে বলেছি। নানারকমে জেরা করেও সে সম্বন্ধে ও যে কিছু জানে না, বোধ হলো না। যে রাত্রে খুন হয়েছিল, সে রাত্রে, ৯টার সময় প্রমোদা কান সাহেবের সঙ্গে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ী থেকে সেই যে চ'লে এসেছিল, তার পর থেকে ও আর কখনও সেখানে যায়নি। খুনের পরদিন, স্মৃতিরত্ন আর কান সাহেব ওর সঙ্গে দেখা ক'রে ওকে খুনের সংবাদ দিয়ে বলেছিল যে, কে যে খুন করেছে, তা ওরা দু'জনেই কিছু ঠিক করতে পারছে না। প্রমোদা সে কথা তখন বিশ্বাসও করেছিল ; কারণ, উমাপতির মৃত্যুতে কারও কিছু লাভ হওয়া দূরে থাক, বরং সকলেরই সমূহ ক্ষতি হলো। তাদের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল। তার পরে পুলিস এই খুনের অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে, প্রমোদাকে সে কথা জানিয়ে ওরা তাকে বলেছিল যে, ওদের ষড়যন্ত্রের বিষয় বা হানা-বাড়ীর নন্দন সাহেবের সঙ্গে ওদের সম্পর্কের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হ'লে তিন জনেরই সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে ; সেই জন্য ওকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল যে, কোন দ্বারা কখনও কোন কথা যেন প্রকাশ না পায়। এমন কি প্রকাশ হ'লে স্মৃতিরত্ন ওকে খুন করবে ব'লে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল।"

"কিন্তু অতঃপর প্রমোদার ভরণপোষণের ব্যবস্থা ওরা কি করলে না ?"

"হাঁ, তা করেছিল বটে, কিন্তু ব্যবস্থার মত শেষ পর্য্যন্ত কায করেনি। স্মৃতিরত্ন ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে, ইডেন বা ডাফরীণ হাসপাতালে ধাত্রী-বিদ্যা শিখতে রাজী করিয়েছিল। যত দিন না পাস ক'রে বেশ রীতিমত উপার্জ্জন করতে পারে, ততদিন স্মৃতিরত্নই ওর সমস্ত খরচ-পত্রের ভার নেবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করা ছিল। তা' ছাড়া প্রমোদার বাড়ীওয়ালার কাছে যে সব ভাড়া বাকী পড়েছিল, আরও এদিকে-ওদিকে যে সব খুচরা দেনা ছিল, সে সমস্তই স্মৃতিরত্ন শোধ ক'রে দেবার ভার নিয়েছিল।"

"তার পর বুঝি ও সব কিছুই করে নি ?"

"কিছু যে করেনি, তা নয়। ডফারীণে ভর্ত্তি করিয়েছিল মাস কয়েক সব খরচ-পত্রও যুগিয়েছিল ; তার পরে হঠাৎ গোটালে। কাযেই বেচারাকে হাঁসপাতাল ছাড়তে হলো। তার পরে, ঐখানেরই পাস-করা এক দাইয়ের আশ্রয়ে এসে ঘর ভাড়া ক'রে নিয়ে এ পর্য্যন্ত কাটাচ্ছিল। তার সাহায্যে কিছু কিছু রোজগারও না কি হচ্ছিল।"

"আচ্ছা, নন্দন সাহেব বা উমাপতি যখন ঐ হানা-বাড়ীতে থাকতো, তখন পর্দ্দার উপর যে স্ত্রী-ভূতের ছায়া সময়ে সময়ে দেখা যেতো, সে ভূতটা যে প্রমোদা, তা ত এখন বেশ বুঝা যাচ্ছে ; কিন্তু আমি যে দিন পর্দ্দার উপর ছায়া দেখেছিলাম, সে দিন একটা পুরুষ ঐ মাগীটার গলা টিপে ফেলে দিয়েছিল। ঘটনার হেতু কি, তা এখন কিছু বুঝতে পেরেছেন কি ?"

"হাঁ, কথাটা স্পষ্টই তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি যে, ঘটনাটা একটু চোয়াড়ে গোছের হ'লেও, ওটা উমাপতির একটা 'প্রেমের দ্বন্দ্ব' বৈ আর কিছু নয়। ইদানীং ওদের প্রেমের বিকাশ ক্রমে নাকি ঐ ভাবেই দাঁড়িয়েছিল। বিশেষতঃ কান সাহেব আর স্মৃতিরত্নের সঙ্গে প্রমোদার ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়ছিল, উমাপতিরও সেই পরিমাণে ওদের উপর একটা সন্দেহ জন্মাচ্ছিল। কিন্তু কান সাহেব ও স্মৃতিরত্ন সেটা জানতে পারলে পাছে তাদের সঙ্গে মনান্তর হয়ে সমস্ত অভিসন্ধিটা নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে উমাপতি তাদের কাছে মনের ভাব গোপন ক'রে, সুযো

পেলে ঐ মাগীটার উপরেই ঝাল ঝাড়তো। যে দিন আপনি সেই ছায়া দেখেছিলেন, সে দিন না কি ঐ রকম সুবিধাও একটু হয়েছিল। প্রথমে কান সাহেব প্রমোদাকে নিয়ে গুপ্তপথ দিয়ে হানা-বাড়ীতে গিয়েছিল ; তার পর খরচের টাকা সম্বন্ধে কানের সঙ্গে উমাপতির একটু বচসা হওয়ায় কান শীঘ্রই প্রস্থান করে। তখন কানের সঙ্গে প্রমোদার ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে উমাপতি নিজের মন্তব্য বেশ রীতিমত প্রকাশ করতে থাকে এবং সেটা যখন বীররসে পরিণত হবার উপক্রম হয়, তখন প্রমোদা শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে পালিয়ে যায়। কিন্তু উমাপতি তাতেও নিরস্ত না হওয়ায় ব্যাপারটা শেষে যখন ঐ রকম 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হলো, তখন রাস্তা থেকে আপনার কড়া-নাড়ার শব্দ পেয়ে, ওদের জ্ঞানসঞ্চার হলো। তার পর তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিয়ে প্রমোদা গুপ্তপথে চম্পট দিলে। যাবার সময় ব্যস্ততার অসাবধানতায় সেই গাছ-সিন্দুকের মাথায় ওর কাপড় সেমিজ আটকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। এ দিকে উমাপতিও সন্তর্পণে রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, খুব শীঘ্র ঐ গুপ্তপথে কানাই মল্লিক লেনের ভিতর দিয়ে আবার হানা-বাড়ীর সদরের দিকে যখন যাচ্ছিল, তখন আপনার সঙ্গে রামপাল লেনের মুখে ওর দেখা হয়।"

"তা হ'লে সদরে তালা বন্ধ ক'রে রেখেছিল কে ?"

"উমাপতিই করেছিল। ওদের কার্য্যপদ্ধতির নিয়ম অনুসারে যখনই দলের কেউ ঐ গুপ্তপথে হানা-বাড়ীতে আসতো, তখনই উমাপতি বাড়ীর সদরে তালা বন্ধ ক'রে, রামপাল লেন দিয়ে ঘুরে কানাই মল্লিক লেনে গিয়ে, ঐ গুপ্তপথে আবার হানা-বাড়ীতে ফিরে আসতো। সে দিনও তাই করেছিল।"

৫৮

গাঙ্গুলী মহাশয় প্রমোদার নিকট যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, সে সমস্ত শুনিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের কার্য্যকলাপ সব জানিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে খুনের নিরাকরণ কিছুই হইল না দেখিয়া আমি বলিলাম, "এখন খুনের বিষয়ে কি করবেন, কিছু স্থির করেছেন কি ?"

"ও সম্বন্ধে প্রমোদার কাছে যখন কিছু জানা গেল না, তখন এইবার ওদের দলের বাকী দুজনকে 'পাকড়াও' করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।"

"বাকী দুজনের মধ্যে শুধু কান সাহেবেরই ঠিকানা জানা আছে ; কিন্তু স্মৃতিরত্নের উপায় কি করবেন ?"

"ওঃ! একটা কথা আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি। স্মৃতিরত্ন যদিও প্রমোদাকে আপনার ঠিকানা কখনও বলেনি বটে, কিন্তু ওকে 'ডফারীণে' ভর্ত্তি করবার সময় বলেছিল যে, যদি কখনও হঠাৎ কোন কারণে স্মৃতিরত্নের সঙ্গে ওর দেখা করবার আবশ্যক হয় ত শুধু 'পোষ্ট-বক্স নং—' এই ঠিকানায় চিঠি লিখলে সে চিঠি তার কাছে পৌঁছুবে এবং সে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রমোদা যখন টাকার অভাবে হাঁসপাতাল ছাড়তে বাধ্য হয়, তখন দুইবার ঐ ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল, কিন্তু কোন উত্তরও পায়নি, স্মৃতিরত্ন দেখাও করেনি।"

"তা হ'লে নিশ্চয়ই ওটা একটা বাজে ঠিকানা। বোধ হয়, প্রমোদাকে ফাঁকি দেবার মতলবেই ঐ রকম একটা মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে রেখেছিল।"

"তা হ'তে পারে ; কিন্তু মাগীকে দিয়ে ঐ ঠিকানায় আর একখানা চিঠি লিখিয়ে দেখতে হানি কি ? চিঠিখানা অবশ্য আমরাই প্রস্তুত ক'রে দেবো। একটু ভয় দেখিয়ে লিখলে হয় ত আসতেও পারে।"

"এ পরামর্শ মন্দ নয় বটে ; কিন্তু যদি তা'তেও কোন ফল না হয়, তখন কি করবেন ?"

"সে তখন দেখা যাবে ; 'ক্ষেত্রে কর্ম্মং বিধীয়তে'। এখন থেকে সে জন্যে উতলা হবার দরকার কি ?"

আপাততঃ যখন এই উপায়ই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল, তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া প্রমোদার 'জবানী' একখানা চিঠির এইরূপ খসড়া প্রস্তুত করাও হইল—

'সমূহ বিপদ উপস্থিত। আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আগামী কাল (সোমবার) রাত্রি ১১টার সময় হানা-বাড়ীর শয়নকক্ষে আমি একাকী অপেক্ষা করিব। পূর্ব্বের ন্যায় গোপনে আসিয়া ঐ সময়ে অতি অবশ্য আমার সহিত দেখা করিবেন। অন্যথায় বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিবেন।'

খসড়া প্রস্তুত হইলে আমি বলিলাম, "তার পর কান সাহেবের এখন কি করবেন ?"

"সে বন্দোবস্ত আমি এক রকম ঠিক ক'রেই রেখেছি। আপনার সঙ্গে সে দিন দেখা হবার পরে 'হেড-আফিসে' পরামর্শ ক'রে কান সাহেব আর যমুনা ঘোষকে 'নজরবন্দী'তে রাখবার জন্যে লোক নিযুক্ত করা গেছে। কিন্তু শুধু তাতেই হবে না। কানের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করাও দরকার ; এ কয় দিন যারা ওর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছে, তাদের কাছে জেনেছি যে, বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে দেখা হবার বেশ সুবিধা। আজই ঐ সময় ওর বাসায় যাব স্থির করেছি। আপনাকেও সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করি। কি বলেন ?"

বলা বাহুল্য, আমি এ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্মত হইলাম। তৎপরে গাঙ্গুলী মহাশয় বেলা ২টার সময় আবার আমার নিকট আসিবেন ও এখান হইতে উভয়ে কান সাহেবের বাড়ী যাইব, স্থির করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। কথায় কথায় বেলাও যথেষ্ট হইয়াছিল ; সেই জন্য আমি অবিলম্বে স্নানাহার সারিয়া লইলাম।

আহারান্তে বিশ্রাম করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় যোগীন বাবু সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত একত্র ডাঃ ভাদুড়ীর আশ্রমে যে দিন গিয়াছিলাম, তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। সেই জন্য তাঁহাদের লইয়া পিসীমার নিকট উপস্থিত হইবার পর সে দিন যোগীন বাবু পুনরায় সপরিবারে ঘোষজা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া সেখানে তাঁহার মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলেন বা কোন নূতন সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, তাহা জানিতে চাহিলাম। উত্তরে যোগীন বাবু বলিলেন যে, ঘোষজা মহাশয়ের মানসিক অবস্থা আপাততঃ বেশ ভালই চলিতেছে। শুধু সে দিন নহে, তাহার পর এ কয়

দিনই যোগীন বাবু কাকলীকে লইয়া সেখানে যাতায়াত করিতেছিলেন। সংবাদের মধ্যে কাকলীর সঙ্গে তাঁহার কথা-বার্ত্তার এইটুকু জানা গিয়াছে যে, বর্দ্ধমানের বাড়ীতে তাঁহার শরীর ও মন অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রথমে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে কিছু কাল থাকিয়া, শরীর ও মন আরও খারাপ হওয়ায়, তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু আসিবার সময় পথে তাঁহার শরীরের, বিশেষতঃ মাথার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি যে কি করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা কান সাহেবের হাতে পড়িয়া, অবশেষে উমাপতির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার কোনই সুসঙ্গত বিবরণ দিতে পারেন না। শেষে যোগীন বাবু বলিলেন, "সে যাই হোক, আপাততঃ তাঁকে যে আপক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে পাওয়া গেছে, এইটুকুই সৌভাগ্য। তবে তাঁকে দেখে সহজেই বেশ বুঝা যায়,—আর, ডাক্তার ভাদুড়ীর সঙ্গে গোপনে কথা কয়েও জেনেছি যে, ঘোষজা মশায়ের এ রকম ভাল অবস্থার যে ক্রমে আরও উন্নতি হবে বা এই রকমটাও নিয়ত চলবে, সে আশা খুবই কম। বরং ডাক্তারের মতে অবস্থা আবার খারাপ হওয়ারই যথেষ্ট আশঙ্কা আছে; আর তা হ'লে হয় পক্ষাঘাত, নয় মৃত্যুই হবার সম্ভাবনা। সেইজন্য ডাক্তারের মতে ঘোষজা মশায়কে এখন তাঁর প্রিয়জনদের কাছে রাখাই মঙ্গল। আমরা তাই স্থির ক'রে গতকল্য তাঁকে আমার বাড়ীতে এনেছি। এসে অবধি তিনি বেশ প্রফুল্লভাবেই রয়েছেন।"

তৎপরে প্রমোদা ওরফে উমাপতির স্ত্রী ও তাহার দলের সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সাহায্যে জানা গিয়াছে, সে সমস্তই আমি বলিলাম। সব কথা শেষ হইলে, যোগীন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এখন, যখন ঘোষজা মশায়কে আমরা ফিরে পেয়েছি, তখন আমাদের আর তোমার ঐ নন্দন সাহেবের বা উমাপতির খুনের অনুসন্ধান নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ কোন কারণ দেখ্‌ছি না। তার চেয়ে বরং যে বিষয়ে আমাদের স্বার্থ বেশী আছে, সেই বিষয়েই উঠে প'ড়ে লাগা দরকার হয়েছে। সময়ও ত আর বেশী নেই, শ্রাবণ মাস যে এসে পড়লো!"

আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, দেখিয়া তিনি বলিলেন, "অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে? আমি কি বল্‌ছি, তা' বুঝতে পারনি না কি?" পরে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বাপু, আজ তোমার ঐ হানা-বাড়ীর খুনের কথা নিয়ে মাথা বকাতে আসিনি; আমরা আজ বুড়ীর বিয়ের দিন স্থির করতে এসেছি। বুঝলে এখন?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। আমার মনের ভাব মুখে কিরূপ ব্যক্ত হইয়াছিল জানি না, কিন্তু যোগীন বাবু আমার দিকে একবার চাহিয়া, স্ত্রীকে বলিলেন, "তা ও বেচারাকে আর আমাদের এ সব কথা ব'লে অপ্রতিভ করবার দরকার কি?" বলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চহাস্যে ঘরটা মুখরিত করিয়া দিলেন।

পিসীমাও হাসিয়া তাঁহাদের দলস্থ হইলেন। বলিলেন, "হাঁ, তাই ভাল। তুমি বাবা ততক্ষণ তোমার ঐ গাঙ্গুলী-ফাঙ্গুলীর সঙ্গে একটু ঘুরে এসো না হয়।"

আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে, তাহাদের নিকট হইতে চম্পট দি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এ দিকে গাঙ্গুলী মহাশয়ও অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হ লেন এবং কাযেই আমিও তাঁহার সহিত কান সাহেবের বা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

৫৯

পথে যাইতে যাইতে গাঙ্গুলী মহাশয় প্রথমেই খবর দিলেন সকালে আমরা যে চিঠির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তদনুরূপ একখানা চিঠি প্রমোদার দ্বারা লেখানো এবং "বক্স নং" ঠিকানায় পাঠানো হইয়াছে। তৎপরে বলিলেন প্রমোদাকে পুলিসের তত্ত্বাবধানে হাজতে রাখা হইয়াছে যত দিন না হানা-বাড়ীর খুন ও ইন্‌সিওরেন্স আফিসের আত্মসাৎ করা, এই দুই ব্যাপারের শেষ-নিষ্পত্তি হয়, তত প্রমোদাকে এই ভাবেই রাখিতে হইবে। কিন্তু সে যে সব বলিয়াছে, তাহা যদি পরে প্রত্যাখ্যান না করিয়া সরকার পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তাহার এই ষড়যন্ত্র লিপ্ত থাকার অপরাধ মার্জ্জনা করা হইবে, তাহাকে সে আশ্ব দেওয়া হইয়াছে।

শেষে গাঙ্গুলী মহাশয় আরও বলিলেন যে, বর্দ্ধমানের বিখ্যা ঘোষ জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এই মি উক্তির দ্বারা আদালতকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার উইলে 'প্রোবেট' হাসিল করা এবং সেইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা ইন্‌সিওর আফিস হইতে টাকা আদায় করা, এই দুই অপরাধে ঘো পত্নীকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করিবার আয়োজন হইতেছে। তাঁ পিতাও তাহাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিল বলি সেন সাহেবকেও বোধ হয় বাদ দেওয়া হইবে না। তবে ষড়যন্ত্রের সহিত সেন সাহেবও লিপ্ত ছিল কি না, তাহা য'য় নাই বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কান ও সুমি যখন প্রধান কর্ম্মী বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন তাহাদি ধরিবার পূর্ব্বেই যদি ঘোষ-পত্নীকে ধরা যায়, তাহা হ তাহারা উভয়েই সতর্ক হইয়া পড়িবে। সেইজন্য আজ সাহেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের ফলাফল এবং কাল প্রমোদার চিঠির পরিণাম কি হয়, তাহা না দেখিয়া ঘোষ-প গ্রেপ্তার করা হইবে না।

নলিনী বাবু এই সংবাদগুলা আমাকে দিলেন বটে, কি এগুলা যে আপাততঃ নিতান্ত গোপনীয়, তাহাও বিশেষরূপে ক করিতে ভুলিলেন না। তাহার পরে কান সাহেবের বা পৌঁছিলে, আমাদের কার্য্যপদ্ধতি কিরূপে নিয়মিত হইবে, উভয়ে সেই পরামর্শ করিতে করিতে ক্রমে তথায় হওয়া গেল।

গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা যখন কান সাহেবের বাস গলির মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন এক জন ফেরিওয়ালা ডালা-খোলা টিনের বাক্সে কতকগুলা বিড়ী, সিগারেট ও শলাই লইয়া তারস্বরে "সিগারেট বিড়ী চাই" হাঁকিতে নলিনী বাবুর পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়

মহিত নলিনী বাবুর কি একটা বাক্যালাপ হইয়া গেল, অস্পষ্ট-ভাবে শুনিতে পাইলাম। লোকটা চলিয়া যাইবার পর তিনি বলিলেন, "ও আমাদের গোয়েন্দা পুলিসের লোক। কান সাহেবের উপর নজর রাখবার জন্য ওকে, আর ওর সাহায্যের জন্য অপর এক জনকে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ও এখন খবর দিয়ে গেল যে, সাহেব বাড়ীতেই আছে।"

কিন্তু আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে কান সাহেবের ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তাহার দ্বারে তালা বন্ধ এবং অদূরে একটা ভৃত্য মেঝের উপর শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে। তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, সাহেব বেলা আন্দাজ ১১টার সময় বাহিরে গিয়াছে এবং ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে বলিয়া গিয়াছে। এ সংবাদটা গোয়েন্দা প্রদত্ত সংবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে হওয়ায় আমরা বড়ই বিস্মিত হইলাম। অথচ সম্মুখেই রুদ্ধদ্বারে তালা বন্ধ দেখিয়া উহা একেবারে অবিশ্বাস করিতেও পারা গেল না। তখন নলিনী বাবু 'পুলিসী' চালে লোকটাকে ঘরের দ্বার খুলিয়া দিতে হুকুম করিলেন। শুধুই হুকুমে কিছু ফল ফলিত কি না বলা যায় না, কেন না, লোকটা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, পরে নলিনী বাবুর দিকে একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল এবং তাঁহার আপাদমস্তক 'পুলিসী' পোষাকে মণ্ডিত দেখিয়া সেই পোষাকের প্রভাবটা বোধ হয় অবজ্ঞা করিতে না পারায় শেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত সেই বসিবার ঘর এবং তাহার পশ্চাতের শয়ন-ঘরটাও পর্য্যবেক্ষণ করা গেল, কিন্তু সাহেবের সেখানে অনুপস্থিতি ব্যতীত আর কোন আবশ্যক তথ্য আবিষ্কার করা গেল না।

পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐ বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে একটা খোলার বস্তী আছে ও তাহার অধিবাসিগণের যাতায়াতের একটা সঙ্কীর্ণ পথ, ঐ বাড়ীর পশ্চাতের প্রাচীর-সংলগ্ন খিড়কীর দ্বার হইতে আরম্ভ হইয়া বস্তী ভেদ করিয়া তাহার পরবর্ত্তী অপর একটা গলিতে গিয়া মিশিয়াছে। সে গলি দিয়া এক দিকে বহুবাজার ষ্ট্রীটে ও অপর দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া চুণাগলিতে যাওয়া যায়। কান সাহেবের এবং ঐ বাড়ীতে আরও দুই এক জন ভাড়াটিয়ার খাদ্য-সরবরাহকারী এক জন খানসামা ঐ বস্তীতে বাস করে। কান সাহেব নিজের আহার্য্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ আদেশ দিবার আবশ্যক হইলে কখনও কখনও ঐ বস্তীতে খানসামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে সেই পথ দিয়াই অন্যত্র যাইত। তাহার ভৃত্যের নিকট জানা গেল যে, সাহেব আজও ঐ পথেই বাহিরে গিয়াছে। গাঙ্গুলী মহাশয়ের গোয়েন্দা ও পথটার বিষয় কিছুই জানিত না। সে সাহেবকে সকালে বাড়ীতেই দেখিয়াছে এবং সম্মুখের সাধারণ রাস্তা দিয়া তাহাকে একবারও বাহিরে যাইতে দেখে নাই, সেই জন্যই তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সাহেব বাড়ীতেই আছে।

যাহা হউক, আমরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া সেখান হইতে ফিরিলাম। বাহিরে আসিয়া নলিনী বাবু তাঁহার গোয়েন্দার সহিত নিভৃতে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করিলেন ও তৎপর আমাকে বলিলেন, "আমার বেশ বোধ হচ্ছে যে, কান সাহেব কোন রকমে জানতে পেরেছে যে, তার পেছনে পুলিস লেগেছে। তাই বোধ হয়, সে গোয়েন্দার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে। যা হোক, তাকে আবার ধরবার চেষ্টায় আমাকে এখন ব্যস্ত থাকতে হবে। তা আপনি আর মিথ্যা কষ্টভোগ করবেন কেন? এখন বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন, আমি আপাততঃ লালবাজারে চল্লুম।" বলিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। আমিও গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

৬০

সোমবার বৈকাল পর্য্যন্ত নলিনী বাবুর নিকট হইতে আর কোন সংবাদ পাইলাম না। কোর্ট হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে নীচের মক্কেল-ঘরে বসিলাম। আমার মক্কেল-ঘরের আজকাল আর সে দিন নাই। মক্কেলরা নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া দুই বেলাই ঘরটিকে 'গুলজার' করিয়া রাখিতেন। আজও মক্কেল মহাশয়গণ রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আসর জমাইয়া যখন বিদায় হইলেন, তখন ভৃত্যের নিকট সংবাদ পাইলাম যে, যোগীন বাবু ইতঃপূর্ব্বেই আসিয়া উপরে পিসীমার নিকট বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু নলিনী বাবুর তখনও কোন চিহ্নই দেখিতে না পাইয়া মনটা কিছু অস্বচ্ছন্দ হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, তাঁহার অপেক্ষায় আর কালক্ষেপ না করিয়া আমি উপরে গিয়া যোগীন বাবুর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিলাম। তাঁহার নিকট শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, এখন তাঁহাদের সকলেরই, বিশেষতঃ কাকলীর, হানা-বাড়ীর খুনের অনুসন্ধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর তাঁহাদের কাহারই ইচ্ছা নাই যে, আমি আর এ বিষয়ে লিপ্ত থাকি। কারণ, ঘোষজা মহাশয় যখন জীবিত আছেন এবং যে লোকটা খুন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আমাদের যখন কোনই সম্পর্ক নাই, তখন এ বিষয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যক নাই। বরং ইন্‌সিওরেন্সের টাকা জুয়াচুরির দ্বারা হস্তগত করার অপরাধে ষড়যন্ত্রকারীদের যে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে ঘোষ-পত্নীকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবার জন্য কাকলী বড়ই উৎসুক হইয়াছে। সেই জন্য তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে, পুলিস হইতে এখন যে সব 'ধর-পাকড়ের' আয়োজন হইতেছে, তাহাতে আমার কোন সাহায্য করা দূরে থাক, বরং যাহাতে ঘোষ-পত্নী উহাদের কবল হইতে রক্ষা পায়, আমাকে এখন হইতে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের বিবেচনায় এ ব্যাপার আদালতে উপস্থিত হইলে, খবরের কাগজে যে রকম ভীষণ আন্দোলন চলিবে, তাহাতে ঘোষজা মহাশয়ের সমস্ত পারিবারিক ঘটনাবলি সাধারণের আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িবে। ফলে এই হইবে যে, ষড়যন্ত্রকারীদের যেরূপ শাস্তিই হউক না কেন, ঘোষজা মহাশয় নিজে সাধারণের দৃষ্টিতে বড়ই হেয় হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাতে যে বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিবেন, তাহা বোধ হয় না।

যুক্তিগুলা অপ্রীতিকর হইলেও অবহেলা করিতে পারা গেল না। অথচ আজ রাত্রিতে স্মৃতিরত্নকে ধরিবার ব্যাপারে আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিবার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেও আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। তবে

আমার উপস্থিতি কেবল দর্শকস্বরূপই হইবে বলিয়া যোগীন বাবু তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন না। বরং আজ রাত্রির কার্য্যকলাপের কি ফল হয়, তাহা জানিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, তিনি এইখানেই আহার করিয়া, হানা-বাড়ী হইতে আমার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত নীচের ঘরে বিশ্রাম করিবেন।

তৎপরে উভয়ে আহারান্তে নীচে আসিবার অল্পক্ষণ পরেই এক জন পাহারাওয়ালা একখানা চিঠি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। চিঠিখানা নলিনী বাবুর এবং বলা বাহুল্য, ইংরাজীতে লেখা। বাঙ্গালায় তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"বিহারী ঘোষের সম্বন্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,তাহা কান সাহেব গত শনিবার বৈকালে জানিতে পারিয়াছে। পুলিসের লোক তাহার উপর নজর রাখিতেছে, তাহাও জানিয়াছে। সেই জন্য সে নিজে রবিবার হইতে গা-ঢাকা দিয়াছে ত বটেই, অধিকন্তু দলস্থ অপর লোকদিগকেও গোপনে সতর্ক করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, বলা যায় না। হয় ত স্মৃতিরত্নকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। তাহা হইলে আজ রাত্রিতে হানা-বাড়ীতে স্মৃতিরত্ন আসিবে কি না, সন্দেহস্থল। তজ্জন্য আমি আজ ওদিকে যাইব না। এ বিষয়ে অপর বন্দোবস্ত করিয়া আমি স্বয়ং অন্যত্র চলিলাম। সেখানে কানকে ধরিতে পারিব, তাহা একরূপ নিশ্চিত। যাহা হউক, আপনি যথাসম্ভব গোপনে হানা-বাড়ীতে যাইবেন, সেখানে গেলেই সব জানিতে পারিবেন।"

চিঠি পড়া হইলে পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সম্মুখের একতলা বাড়ীতে, সাদা পোষাকে এক জন সব-ইন্‌স্পেক্টর ও একটা কন্‌ষ্টেবল আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহাদের সঙ্গে একটি স্ত্রীলোকও আছে। বাড়ীর সদরের কপাট শুধু ভেজানোই আছে, ঠেলিলেই খুলিয়া যাইবে। তৎপরে পাহারাওয়ালাকে বিদায় দিয়া আমি হানা-বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম এবং সাধ্যমত সতর্কভাবে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সদরের কপাট পুনরায় সন্তর্পণে ভেজাইয়া দিলাম। ভিতরে এত অন্ধকার ও চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে, বাড়ীতে কোন লোক আছে বলিয়া বোধ হইল না। ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ বসিবার ঘর অতিক্রম করিয়া শয়ন-ঘরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সব ইন্‌স্পেক্টর বাবু কোথায় আছেন?" তখন সহসা একটা তীব্র আলোকরশ্মি আমার সম্মুখভাগটা আলোকিত করিয়া দিল এবং তাহার সাহায্যে দেখিলাম, হিন্দুস্থানী পোষাক-পরা একটি দীর্ঘকায় লোক, একটা 'চোরা-লণ্ঠন' হস্তে আমার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটি আমাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিল এবং আমিও তাহার অনুসরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে এক জন সাহেবী-বেশধারী পুরুষ ও একটি রমণী দুইটা ভাঙ্গা বাক্সের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে পূর্ব্বের আসবাব আদি কিছুই ছিল না।

আমি শয়নঘরে প্রবেশ করিবার পর সাহেবী-বেশধারী বাবুটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হিন্দুস্থানী লোকটিকে রাস্তার ধারের বসিবার ঘরে পাঠাইয়া দিয়া আমার সহিত মৃদুস্বরে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার কথায় জানিলাম যে, তিনি পুলিসের সব ইন্‌স্পে এবং অপর লোকটি কন্‌ষ্টেবল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্মৃতিরত্নকে এখানে ধরিবার চেষ্টায় আসিয়াছেন বটে, স্মৃতিরত্ন আসিবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। কারণ, কান সাহেব সম্ভবতঃ তাহাকে সাবধান দিয়াছে। যে দুই জন গোয়েন্দাকে ঘোষ-পত্নীর গতি উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার এক জন ঘোষ-পত্নীর বেহারার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন লইয়াছিল এবং সেই বেহারা সম্প্রতি ছুটী লইয়া দেশে সময় উহাকে নিজের স্থানে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিল। রবিবার সকালবেলা প্রায় ১১টার সময় কান সাহেব পত্নীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু তখন তিনি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কান তাঁহার জন্য অপেক্ষা না সেই বেহারারূপী গোয়েন্দার হাতে ঘোষ-পত্নীর জন্য এ চিঠি দিয়া প্রস্থান করে। চিঠিখানা বিশেষ 'জরুরী' ও এবং অবিলম্বেই উহা তাঁহার নিজের হাতে যেন দেওয়া এইরূপ আদেশ দিয়া যায়। তাহাতেই গোয়েন্দার মনে হওয়ায় সে চিঠিখানা 'গাপ' করিয়া নিজের কাছেই রাখি এবং ঘোষ-পত্নীকে কান সাহেবের আগমন বা ঐ চিঠি কোন কথাই সে জানায় নাই। তবে অবসরমত সে 'হেড আফিসে' লইয়া যায়। চিঠি হইতে খুনের কোন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু কান ও স্মৃতিরত্নের ষড়যন্ত্রে ঘোষজা মহাশয়কে মৃত সাব্যস্ত করাইয়া তাঁহার ইন্‌সিওর টাকা হাসিল করা হইয়াছে, সে কথা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইয়া অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চিঠি হইতে ইহাও নিঃসন্দে জানা গিয়াছে যে, ঐ ষড়যন্ত্রের বিষয় ঘোষপত্নীকে উহারা কিছু জানিতে দেয় নাই। ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহাকে নিজ গুপ্ত অভিসন্ধির কথা না জানাইয়াও তাহার দ্বারা টাকা আদা কার্যগুলা সবই করাইয়াছে এবং তিনিও হানা-বাড়ীর হত ব্যক্তি যে বাস্তবিক বিহারী ঘোষ, এই সত্য বিশ্বাসেই সব কার্য ছেন। এখন তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা এবং বিহারী ঘো বাস্তবিক মারা যায় নাই, এখন জীবিত আছে, তাহাও জানিতে পারিয়া তাহাদের উপর নজর রাখিতেছে ও শীঘ্রই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে, কান সাহেব সেই পাইয়া পুলিস হয় ত ঘোষপত্নীও এ বিষয়ে লিপ্ত তাহাকেও গ্রেপ্তার করিবে, এই আশঙ্কায় তাহাকে করিবার জন্য এই চিঠিতে ষড়যন্ত্রের সব কথা জানাইয়ে হইয়াছে। এখন গোপনে পলায়ন ছাড়া এই আস হইতে নিস্তার পাইবার অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া নিজের বাসা ছাড়িয়া পলাইয়াছে এবং ঘোষপত্নীকেও সহিত পলাইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করি তাহার পরে চিঠিতে আরও লিখিয়াছে যে, সঙ্গে যথেষ্ট টা না লইলে চলিবে না। কিন্তু সে দিন রবিবার, ব্যাঙ্ক হইতে বাহির করা সম্ভব নয় বলিয়া, কান বাধ্য হইয়া সোমবার ঘোষপত্নীর জন্য অপেক্ষা করিবে। গোপনে পলাইবার সে ইতোমধ্যে সব স্থির করিয়া রাখিবে। সোমবার সন্ধ্যা সে ঘোষপত্নীর ভবানীপুরস্থ পঞ্জাবী বন্ধুর বাড়ীর পশ্চাতের

দুয়ারে একখানা গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিবে। দীর্ঘ দাড়ী ও গোঁফযুক্ত কৃষ্ণকায় পঞ্জাবী ভদ্রলোকের বেশে সে ঐ গলির মুখে বিচরণ করিবে। ঘোষপত্নী তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করিতে গিয়া সাড়ে ৭টা নাগাত তাহাদের বাগানের দরজা দিয়া বাহির হইলেই ঐরূপ বেশধারী কানের সহিত দেখা হইবে এবং তখন উভয়ে একত্র প্রস্থান করিতে পারিবে।

৬৭

কান সাহেবের চিঠির বিবরণ শুনিয়া আমি সব-ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে বলিলাম, "গাঙ্গুলী মশাই গতকল্য আমাকে নিয়ে বেলা ৪টার পর কান সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার বাড়ীতে যখন গিয়েছিলেন, তখন বোধ হয়, তিনি এ সব কথা কিছু জানতেন না?"

"না, তিনি বিকালে ৩টার পর হেড আফিসে এসে সব শুনলেন। চিঠিখানা প'ড়ে আজ কানকে ধরবার সব আয়োজন করেছেন। আজ সন্ধ্যার আগেই তিনি ঐ কাযে ভবানীপুরে গেছেন। আমার উপর এ দিকের কাযের ভার দিয়েছেন। আপনাকেও আমার সঙ্গে রাখতে বলেছেন।"

"তা হ'লে কান ধরা পড়েছে কি না, সে খবর আপনি এখানে আসবার আগে বোধ হয় জেনে আসতে পারেন নি?"

"না, আমি এ দিকের সব আয়োজন করবার জন্য আফিস থেকে অনেকক্ষণ হলো বেরিয়েছি। হাজত থেকে প্রমোদাকে নিয়ে এ দিকের থানায় এসেছিলুম। তার পর আহারাদি সেরে প্রমোদা আর ঐ কন্‌ষ্টেবলকে নিয়ে সতর্ক হয়ে বাড়ীর তালা খুলিয়ে, ক্রমে একে একে এখানে ঢুকতে প্রায় পৌনে ১০টা বেজে গেল। তার আগেই 'বিটের' পাহারাওয়ালার হাতে গাঙ্গুলী মশায়ের চিঠিখানা আপনাকে দেবার ভার দিয়ে এসেছিলুম।"

আমি তাঁহার অদূরে উপবিষ্টা রমণীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনিই কি প্রমোদা?"

"হাঁ, উনি এখন সম্পূর্ণ আমারই জিম্মায় আছেন। কাযেই আমাকে সর্ব্বদা ওঁর উপর নজর রাখতে হচ্ছে।"

"তা হ'লে স্মৃতিরত্নকে ধরবার জন্য কেবল ঐ একটিমাত্র কন্‌ষ্টেবল কি যথেষ্ট হবে?"

"ওঃ! তা খুব হবে। কিন্তু সে আসবেই কি না—"

ঠিক সেই সময়ে দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী কপাটে করাঘাতের শব্দ হইল এবং তৎক্ষণাৎ সব-ইন্‌স্পেক্টার বাবুও চুপ করিলেন। পর পার্শ্বের ঘর হইতে কন্‌ষ্টেবলটা আমাদের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "পাকা গোঁফ-দাড়ীওয়ালা একটা লোক এই বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে চ'লে গেল, তার পর পোড়ো জমীটার চারি দিকের রাস্তা ঘুরে, এখন ঐ জমীতেই ঢুকে, এই বাড়ীর দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখছে। বোধ হয়, ঐ লোকটাই আমাদের আসামী।"

তখন সব-ইন্‌স্পেক্টার বাবুর আদেশে প্রমোদা ঐ শয়ন-ঘরের খোলা জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল এবং আমরা কয় জনে বাহিরে আসিয়া এক একটা স্বতন্ত্র স্থানে লুকাইয়া রহিলাম। আমার স্থান হইল সেই বসিবার ঘরের খোলা কপাটের অন্তরালে।

প্রায় ৫।৭ মিনিট এই ভাবে অপেক্ষা করার পর, ধীরে ধীরে সদরের কপাট খোলার এবং পরক্ষণে তাহা আবার ঐরূপে বন্ধ হওয়ার শব্দ পাইলাম। আবার কিয়ৎক্ষণ সব নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর, সেই দিক হইতেই একটা দিয়াশলাই জ্বালার শব্দ হইল ও সেই সঙ্গে একটা আলোর আভা বসিবার ঘরের দেওয়ালের উপর দেখা গেল। সে আলোটা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে আবার বেশ উজ্জ্বল হইল। মোম-বাতির একটা গন্ধও পাইলাম। বোধ হইল, দিয়াশলাইয়ের সাহায্যে মোমবাতি জ্বালা হইল। যাহা হউক, আলোটা ক্রমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া অল্পক্ষণ স্থির রহিল; পরে আবার অগ্রসর হইয়া, ক্রমে আমি যে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা পার হইয়া শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় আমি অতি সন্তর্পণে সামান্যমাত্র মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, দীর্ঘ সাদা গোঁফদাড়ী ও কেশযুক্ত একটা লোক, বামহস্তে একটা প্রজ্বলিত বাতি লইয়া শয়ন-ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ-দিক ও-দিক দেখিতেছে। তৎপরে দ্বারের আরও নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে আছে?" তখন ঘরের ভিতর হইতে সেইরূপ মৃদুস্বরে নারীকণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি প্রমোদা। ভিতরে আসুন না!"

লোকটা কিন্তু ভিতরে গেল না। সেই খোলা জানালার সম্মুখ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া হাতের বাতিটা একটু উঠাইয়া ধরিল। পরে বোধ হয়, ঘরের ভিতরের লোকটি যে বাস্তবিকই প্রমোদা, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বাতিটা বাহিরেই মেঝের উপর রাখিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার পরে, কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে বাক্যালাপের শব্দ পাইতে লাগিলাম, কিন্তু কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ পুরুষটার এক ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ও সেই সঙ্গে রমণীর সামান্য একটু আর্ত্তনাদ হইবামাত্র দেখিলাম, কনষ্টেবল ও সব-ইন্‌স্পেক্টার বাবু উভয়েই তাহাদের প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে বাহির হইয়া ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। আমিও কপাটের অন্তরাল হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কন্‌ষ্টেবলটা বেগে ঘরে ঢুকিবার সময় চৌকাঠে ঠোকর খাইয়া ঘরের ভিতর-দিকে পড়িয়া গেল এবং সেই সঙ্গে আগন্তুক লোকটা এক লম্ফে তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল ও সম্মুখেই সব-ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে দেখিয়া তাহার মুখে প্রচণ্ডবেগে এক ঘুষী প্রয়োগ করিবামাত্র তিনিও ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি লোকটাকে ধরিবার চেষ্টায় এক হস্তে তাহার মাথার চুলের কিয়দংশ ও অপর হস্তে তাহার দীর্ঘ দাড়ীটামাত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং পরক্ষণে ঐরূপে ধরাশায়ী হওয়ার ফল এই হইল যে, লোকটার মুণ্ড হইতে তাহার সেই কেশ, দাড়ী ও গোঁফ সমস্তই অপসৃত হইয়া সব ইন্‌স্পেক্টার বাবুর হাতেই রহিয়া গেল এবং লোকটা আমাকে তাহার দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আর মুহূর্ত্তমাত্র কালক্ষয় না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু সেই ক্ষণমাত্র সময়েই আমি তাহার কৃত্রিম কেশ ও দাড়ী-গোঁফ-শূন্য মুখমণ্ডল উজ্জ্বল বাতির আলোতে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলাম এবং তাহার ফলে আমি ক্ষণেকের জন্য একটু বিচলিত হইয়া পড়ায়, সেই সামান্যমাত্র অবকাশে সে বসিবার ঘর অতিক্রম করিয়া গেল। ইতোমধ্যে কন্‌ষ্টেবল ও

সব ইন্‌স্পেক্টার বাবু উভয়েই ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া লোকটাকে পলাইতে দেখিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। যাইবার সময় সব ইন্‌স্পেক্টার বাবু আমাকে অনুগমন করিতে নিষেধ করিয়া প্রমোদার উপর নজর রাখিতে বলিয়া গেলেন।

ঘটনাটা বিবৃত করিতে যতক্ষণ সময় লাগিল, ঘটিতে বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশও সময় লাগে নাই। বস্তুতঃ, তাহা যেন চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। লোকটাকে চিনিতে পারিয়া অবধি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে বা পুলিসের দ্বারা তাহার গ্রেপ্তারসাধন করাইতে আমার স্পৃহা ছিল না। কেন না, লোকটা আর কেহই নহে,—ঘোষ-পত্নীর পিতা, সেন সাহেব। যোগীন বাবুর পরামর্শ অনুসারে স্থির করিলাম যে, পুলিসের ঐ দুই জন কর্ম্মচারী যদি পলাতককে না ধরিতে পারে, ও যদি তাহার কৃত্রিম দাড়ী-গোঁফবর্জ্জিত মুখখানা স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া থাকে বা দেখিলেও তাহারা সেন সাহেবকে পূর্ব্বে না দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে পলাতক লোকটা যে সেন সাহেব, তাহা আমি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব না। কিন্তু প্রমোদার এ বিষয়ে জ্ঞান কত দূর, তাহাও জানা আবশ্যক মনে করিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ঐ পলাতক লোকটাকেই সে স্মৃতিরত্ন বলিয়া জানিত এবং উহার দাড়ী-গোঁফ ও কেশ যে কৃত্রিম, তাহা সে পূর্ব্বে কখনও জানিত না।

যাহা হউক, প্রায় আধ ঘণ্টা কাল প্রমোদার সঙ্গে বাক্যা কাটাইবার পর কনষ্টেবল ও সব ইনস্পেক্টার বাবু উভয়েই আসিয়া জানাইল যে, পলাতক লোকটাকে তাহারা পারিল না। তাহারা রামপাল লেনে পৌঁছিবার লোকটা তাহাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা নানা দিকে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার আর পাইল না। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম লোকটার আসল মুখখানা কনষ্টেবলটা মোটেই দেখে নাই সব ইনস্পেক্টার বাবুও ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। সেখানে আর বৃথা অপেক্ষা করিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া আমি তাহাদের নিকট বিদায় লইলাম। সব ইন্‌স্পেক্টার বাবু প্রমোদাকে লইয়া যাইবার জন্য কনষ্টেবলকে একখানা গাড়ী আনিতে পাঠাইলেন।

গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম যে, যোগীন বাবু তখনও অপেক্ষায় উৎসুকভাবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে হানা ঘটনাবলী আনুপূর্ব্বিক সব বলিলাম এবং সেন সাহেবই যে রত্ন, তাহাও বলিলাম। সে কথা পুলিস কর্ম্মচারিদ্বয় জানে এবং আমিও তাহাদিগকে জানাই নাই, তাহা শুনিয়া তিনি হইলেন। তৎপরে তিনিও সে রাত্রির মত বিদায় লইয়া করিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)

চঞ্চল প্রিয়তমে

চপল তুমি শিশুর মত
হাসির হাওয়া মেলি,
আসিও নিতি আমারি পাশে
দুয়ারখানি ঠেলি !

চুমিয়া ঠোঁটে ব্যথার কালী
মুছায়ে দিও মম।
বুকেতে ধরি প্রীতির দীপে
নাশিও ঘন তম।

মধুর নাচে নাচিয়া প্রিয়
নাচায়ো জড় প্রাণ।
ধ্বনিয়া হৃদে অমৃত-গীতি
মৃতেরে করো ত্রাণ।

তোমারি ভাবে তোমারি সুরে
মাতিয়া যেত নিতি,
বিপুল বেগে চলিতে পারি
দলিয়া ভয়-ভীতি।

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী, বি,



রাসায়নিক শিল্প

আজকাল ভারতের নানা স্থানে রাসায়নিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বঙ্গদেশে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রাসায়নিক কারখানার (Chemical works) ত ছড়াছড়ি। কিন্তু দুই একটি কারখানা ব্যতীত অন্যগুলি কত দূর রাসায়নিক কারখানা নাম গ্রহণ করিবার উপযোগী, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবুও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের মধ্যে রাসায়নিক শিল্প সংগঠনের একটা উদ্দীপনা আসিয়াছে। তাহাও দেশের পক্ষে মঙ্গল বলিতে হইবে।

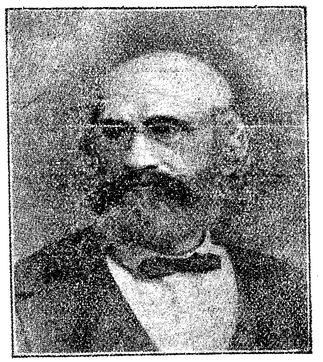

ডাঃ ডি ওয়াল্ডি

প্রথম পথিপ্রদর্শক

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন যে, ভারতে রাসায়নিক শিল্প-স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রথমতঃ এক জন স্কটলণ্ডবাসী দ্বারা হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় রাসায়নিক শিল্পের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল বিজড়িত হইয়া থাকিবে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহারই জীবনচরিত সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করিতেছি। উক্ত স্কটলণ্ডবাসীর নাম—ডাক্তার ডি, ওয়াল্ডি। ওয়াল্ডি এডিনবরার সন্নিহিত লিনলিথগাও সহরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে এডিনবরা সহরে ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া স্বসহরে ডাক্তারী করিতে আরম্ভ করেন। লিনলিথগাও সহরে ডাক্তার ওয়াল্ডির ঔষধাগার এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে,—যদিও বর্ত্তমান সময়ে উহা ওয়াল্ডি-পরিবার ব্যতীত অন্য লোক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ওয়াল্ডি ডাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও তাঁহার প্রকৃত আন্তরিক টান ছিল রাসায়নিক গবেষণার উপর। যখনই তিনি কার্য্যে অবসর পাইতেন, তখনই নানারূপ পরীক্ষাদিতে মনঃসংযোগ করিতেন।

ক্লোরোফর্ম্ম আবিষ্কার

এইরূপ গবেষণার ফলে ওয়াল্ডি তদানীন্তন সময়ের একটি আশ্চর্য্য দ্রব্য পাইয়াছিলেন, তাহা ক্লোরোফর্‌ম। এখন ইহা কাহারও নিকট অপরিচিত নহে এবং অস্ত্রোপচারে ইহার ব্যবহার নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্ডি যখন উহা প্রথম আবিষ্কার করেন, তখন কেহই উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতেন না। সে সময়ের বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক সার জেমস্ সিম্‌সন্ ওয়াল্ডির পরীক্ষাদির বিষয় অবগত ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এডিনবরা হইতে গিয়া ওয়াল্ডির পরীক্ষা কত দূর সফল হইল, তাহা দেখিতেন। ওয়াল্ডি ক্লোরোফর্‌ম আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসার্থ উহা প্রয়োগের ভার সার জেমস্ সিম্‌সনের উপর দিয়া নিজে সরিয়া দাঁড়ান। ইহা তাঁহার আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত; তিনি যশোলাভের জন্য কোন কার্য্য করিতেন না। সে যাহা হউক, সার জেমস্ সিম্‌সন্ ক্লোরোফরমের বহুল প্রচারের জন্য সমধিক চেষ্টা করেন। তৎপূর্ব্বে Sulphuric Ether দ্বারা অস্ত্রোপচারকালে সংজ্ঞালোপের কার্য্য হইত; কিন্তু ক্লোরোফরমের ন্যায় উহার সংজ্ঞালোপ করিবার শক্তি নাই। ক্লোরোফরম অল্পদিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করিল। সংসারে নূতন জিনিষ আবিষ্কার

করার ফল—নিন্দা ও অপমান,—যাহা অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, সার জেমস্ সিম্‌সন্‌ও তাহাতে বঞ্চিত হন নাই। এমন কি, ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যন্তও সিম্‌সনের উপর গালি-বর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই।

ভারতে আগমন

ক্লোরোফরম আবিষ্কারের কিছু দিবস পরে ওয়াল্ডি ডাক্তারী ছাড়িয়া দিয়া Liverpool Apothecaries Companyর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইহাও বেশী দিন তাঁহার ভাল লাগে নাই। পরে তিনি মনস্থ করেন যে, ভারতে আসিবেন এবং তদনুসারে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লিভারপুল ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া উপনীত হন। এতদ্দেশে পদার্পণ করিবার অল্পদিবস পরেই ওয়াল্ডি কলিকাতার সন্নিহিত কাশীপুরে একটি রাসায়নিক কারখানা স্থাপন করেন। উহাই পরে কোন্নগরে স্থানান্তরিত করা হয়। উক্ত কারখানাই বর্ত্তমানে সুপরিচিত ডি, ওয়াল্ডি কোম্পানীর কারখানা। কোন্নগরে বিস্তৃতভাবে কারখানা স্থাপন করিবার জন্য ওয়াল্ডিকে যে কি পরিমাণ অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Heavy chemical) সুরা, নানা প্রকারের আরক ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী পরিচালকগণ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

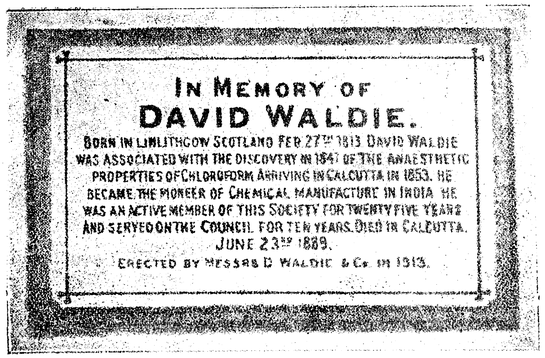

এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল হলে ডাঃ ওয়াল্ডির স্মৃতি-ফলক

বৈজ্ঞানিক গবেষণা

এক দিকে রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াল্ডি যেরূপ অসাধারণ শ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও তেমনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। ভারতে আগমন অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার সুবিখ্যাত Asiatic Society of Bengalএর সভ্য মনোনীত হয়েন। জীবনান্ত পর্য্যন্ত উক্ত সোসাইটীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সহকারী সভাপতির কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে Asiatic Societyর সভাপতি যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—"He published several papers in the Journals and proceedings, most of which were connected with the Water Supply of Calcutta and the effective filtration of the Hoogly water during the rainy season which has always been a difficulty. A man of retiring and unassuming ways we had few opportunities of knowing the full extent of his Scientific works but as an analytical chemist and chemical manufacturer he undoubtedly did much to promote the Chemical Science in this country. অর্থাৎ কলিকাতার পানীয় জল সরবরাহ ও বর্ষাকালে জলসংশোধনের প্রকৃষ্ট উপায়—যাহা এখনও পর্য্যন্ত কঠিন কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ সোসাইটীর পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করেন। নিরীহ সাধাসিদে ও সাধারণের মিলনে অনিচ্ছুক লোক ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই নাই। কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে, রাসায়নিক দ্রব্যাদি

প্রস্তুতকারক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের সুদক্ষ ব্যক্তিরূপে তিনি এতদ্দেশের প্রভূত উপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃত স্বভাব

অনেক ব্যক্তির প্রকৃত স্বভাব তাঁহার কৃত কার্য্য হইতে অনুমান করা যায় না। ওয়াল্ডি বাহ্যতঃ স্নেহ-মমতা-বিবর্জ্জিত কঠিন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকই কঠিন হৃদয় হইতে দয়ার নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইত। তিনি আপনার আত্মীয়গণকে খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু আমাদিগের হিসাবে তাঁহার প্রধান গুণ ছিল, ভারতের উপর প্রীতি। যে সময় হইতে তিনি ভারতে আগমন করেন ও যে সময় হইতে তিনি চিরনিদ্রায় সুপ্ত হয়েন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই তাঁহার বসতিস্থল ছিল। আজ কাল যে কোন শ্বেতাঙ্গ সামান্য গরম পড়িলেই গিরিক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবতুল্য সিভিল্ সার্ভিসের লোকের ত' কথাই নাই। কিন্তু কঠিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকারী ওয়াল্ডির কোন দিন কলিকাতা ও কোন্নগর ছাড়িয়া দার্জ্জিলিং অথবা সিমলা যাইবার আবশ্যক হয় নাই। তিনি বাঙ্গালার জল ও বাঙ্গালার মাটী প্রকৃতই ভালবাসিতেন। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ ক্লার্ক, কিং ও রক্স-বর্গও সমপ্রকৃতির লোক ছিলেন। ওয়াল্ডি রাসায়নিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, গঙ্গার জলের মত এমন নির্ম্মল জল আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। সে সময়ে উক্ত উক্তি সন্দেহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল; এখন কিন্তু অনেকেই বিদিত আছেন যে, গঙ্গার জল সর্ব্বতোভাবে পানীয় জলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য বড় বড় সহরের সম্মুখস্থ গঙ্গার অংশবিশেষসমূহে এ কথা প্রযুজ্য নহে।

ভারতের কৃতজ্ঞতা

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইংরাজ-শাসনের আমল হইতে এতদ্দেশে বহুবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরাজ অথবা বিদেশীই প্রথম পথিপ্রদর্শক হইয়াছেন। হিন্দু সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প ও কলা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় ইঁহারা নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই সকল প্রচেষ্টায় আমাদের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল হইয়াছে, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে কতকগুলি বিষয়ে বিদেশীয়গণ যে ভারতকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে রাসায়নিক শিল্প যে এতদ্দেশে আগে ছিল না, তাহা নহে। যে কোন পাঠক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্বকালের রসায়ন শিল্পের সহিত বর্ত্তমান সময়ের রসায়ন শিল্পের অনেক প্রভেদ আছে। অতীত যুগের ভারতে নিত্য-নৈমিত্তিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য রসায়ন বিদ্যার প্রয়োজন কম হইত। এখন কিন্তু অনেক নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে প্রস্তুত—যেমন সাবান, বাতি, রং, চামড়া ব্যবহারোপযোগী করা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকার শিল্পের জন্য যে সকল মূল রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Chemicals) আবশ্যক হয়, সেগুলিও প্রচুর পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ইহা না হইলে ভারত কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

ফলতঃ ভারতে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের বিপুল সুযোগ রহিয়াছে। অপর দেশে যে কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে রাসায়নিক শিল্প বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এতদ্দেশেও আজকাল এ বিষয়ে জাগরণের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী উদ্যম ও অর্থব্যয় না করিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতে যে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয় না। কালক্রমে অবশ্য ভারতে রাসায়নিক শিল্পেরও মাথা তুলিয়া দাঁড়ান সম্ভবপর। কিন্তু সেরূপ একনিষ্ঠ কর্ম্মীও দরকার। ওয়াল্ডি সেইরূপ কর্ম্মীই ছিলেন। রাসায়নিক শিল্পের অগ্রণী ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তিনি চিরকালই ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ থাকিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এক Asiatic Societyর স্মৃতিফলক ব্যতীত এতদ্দেশে অন্য কোথাও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

প্রিন্সেস পেটীকোট

এই জামা সচরাচর মেয়েদের সায়ার ন্যায় ভিতরকার (under wear) জামারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জামা পরিয়া ব্লাউজ জ্যাকেট পরিতে হয়।

সরঞ্জাম :—(Material) কাপড় যদি চিকণদার হয়, ঘেরের অনুপাতে লইতে হয়। এই মাপের পেটীকোটের জন্য লম্বা মাপের ৩৬" বা ৩৭" ইঞ্চি বহরের কাপড় লইলে চলিতে পারে। না হয় উপরকার অংশে

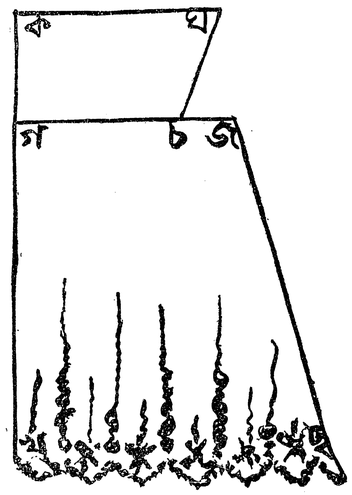

১ম চিত্র

ঠিক সেই জাতীয় কাপড় জুড়িতে হইবে। আর লংক্লথ-জাতীয় কাপড় হইলে ২ গজ ৬" ইঞ্চি কাপড় লাগিবে। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার, সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য লংক্লথ-জাতীয় কাপড় দ্বারা তৈয়ার হয়। আর চিকণদার এক রকম কাপড় পাওয়া যায়, তাহাতে বেশ সুন্দর ফ্যাসনের প্রিন্সেস পেটীকোট তৈয়ারী হইয়া থাকে।

প্রিন্সেস পেটীকোট মাপ :—লম্বা ৪৫", ছাতি—৩২", কোমর—২৮", সেম্ভ—১৫"।

প্রিন্সেস্ পেটীকোট কাটিবার প্রণালী :—এই পেটীকোট কাটিবার সময় ছাতির যে যেখান হইতে লওয়া হইবে, তাহার ১" ইঞ্চি উপর হইতে মাপ ধরিয়া কাপড় কাটিতে হয়। চিকণদার কাপড় হইলে অতিরিক্ত কাপড় দরকার নাই। লংক্লথ-জাতীয় কাপড় হইলে লম্বা মাপের ৭" ইঞ্চি কাপড় বাদ দিয়া ৩" ইঞ্চি কাপড় বেশী লইয়া এড়োয় ডবল ভাঁজ করিয়া লম্বা দিকে ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। ইহা হইল লংক্লথ-জাতীয় কাপড়ের কথা। এক্ষণে চিকণদার কাপড়ের কথা উল্লেখ

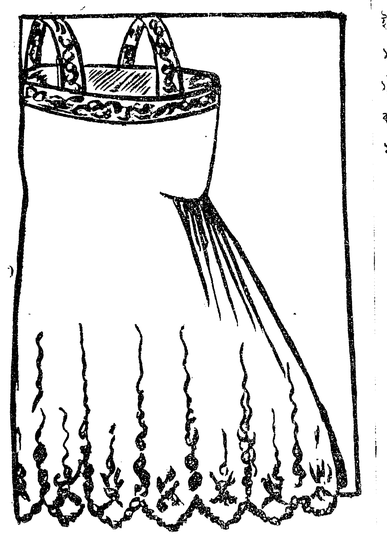

২য় চিত্র

করিব। ছাতির $\frac{1}{8}$ অংশ ৮" − ১" = ৭" ইঞ্চি স্থানে অর্থাৎ লম্বা ৪৫" ইঞ্চি হইতে ৭" ইঞ্চি বাদ দিয়া ক বিন্দু চিহ্নিত করিয়া লম্বা মাপ ধরিতে হইবে। মনে করুন, ৪৫" − ৭" = ৩৮" লম্বা মাপ ক, খ। সেম্ভ ১৫" ইঞ্চি হইতে ৭" বাদ দিয়া ৮" ইঞ্চি স্থানে গ চিহ্ন করিয়া ক হইতে ছাতির অংশ ৮" + ২" = ১০" ইঞ্চি স্থানে ঘ চিহ্ন করিয়া গ হইতে কোমরের $\frac{1}{8}$ অংশ ৭" + ২" − ৯" স্থানে চ চিহ্ন করিয়া ঘ সংযোগ করিয়া চ হইতে জ ৩" ইঞ্চি কাপড় কুচির বেশী রাখিয়া খ বিন্দু হইতে ছ বিন্দু পর্য্যন্ত ছাতির মাপ অর্দ্ধেক ১৬" ইঞ্চি স্থানে চিহ্নিত করিয়া জ, ছ চিত্রানুযায়ী

সংযোগ করিয়া দাগিতে হইবে। যদি চিকণদার কাপড় হয়, ছ বিন্দু স্থানে ১ ইঞ্চি উপরে দাগিতে হইবে না। লংক্লথ হইলে ছ বিন্দু স্থানে ১ ইঞ্চি উপরে দাগিতে হইবে। নীচের অংশে ২½ ইঞ্চি কাপড় মুড়িতে হইবে। দাগের কায় হইয়া যাইলে ক, ঘ, চ, জ, ছ ও খ বিন্দুর দাগে কাটিয়া লইলে প্রিন্সেস পেটীকোট কাটা শেষ হইল।

প্রিন্সেস পেটীকোট সেলাইয়ের নিয়ম :—ছাতির লাইনে (ক, ঘ লাইনে) ইন্‌সেসন্ বসাইয়া ঘ ও চ লাইন সংযোগে সেলাই করিয়া চ বিন্দুর স্থানে ১½ ইঞ্চি কাপড়কে কাটিয়া জ, ছ সংযোগে সেলাই করিয়া ১½ ইঞ্চি কাটা কাপড় স্থানে চ, জ যে ৩ ইঞ্চি অতিরিক্ত কাপড় রাখা হইয়াছে, তাহাকে কুচি দিয়া চ বিন্দু স্থানে যে ১½ ইঞ্চি কাপড় কাটা হইয়াছে, তৎস্থানে জুড়িয়া দিতে হইবে। উপরকার যে ৭ ইঞ্চি কাপড় অতিরিক্ত বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ১৫ ইঞ্চি পরিমিত দুইখানি ইন্‌সেসন্ টেইপ তৈয়ার করিয়া বুকের উপরকার অংশে ৫ ইঞ্চি ব্যবধানে সম্মুখের ও পিছনকার অংশে জুড়িয়া দিতে হইবে। এখন লংক্লথ-জাতীয় যদি সাদাসিধা কাপড়ের হয়, তখন টেইপের ৭ ইঞ্চিসহ ধরিয়া ৪৫ ইঞ্চি ঠিক রাখিয়া অবশিষ্ট যে কাপড় রহিয়াছে, তাহাকে ভিতরকার অংশে জুড়িয়া লইতে হইবে। আর যদি চিকণদার কাপড়ের প্রিন্সেস পেটীকোট হয়, নীচের অংশ ঠিক রাখিয়া উপরকার টেইপ জুড়িবার সময় ৪৫ ইঞ্চি ঠিক রাখিয়া অবশিষ্ট পিছনকার অংশে জুড়িয়া লইলে "প্রিন্সেস্ পেটীকোট" তৈয়ারী শেষ হইল।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সঙ্গি-হারা

যখন আঙিনা মাঝে—
স্থল-কমলের সুষমা নিরখি'
শেফালিকা ঝরে লাজে,
পাতায় পাতায় দোলা দিয়ে যায়
স্নিগ্ধ-মধুর প্রভাতের বায়—
দূরের বাঁশীটি নিত্য উষায়
যখন মধুর বাজে,
ভোরের বাতাস ডাকে মোরে যবে
নিত্য তাহার কাছে।

খুলিছে যখন দ্বার—
উদয়াচলের কনক মাখানো
তোরণ চমৎকার!
তারি মাঝে সাজে দেউল উজল
দেবতা অরুণ প্রকাশে উতল
আধখানি চাঁদ সরম-বিভল
লুকায় মেঘের পার
কুমুদী যখন না পারে সহিতে
বিয়োগ-ব্যথার ভার!

মুখর পাখীর গানে,—
পল্লীবালিকা কলরোলে যবে
সাজিটি তাদের আনে;
পূর্ণ করিতে শূন্য সে সাজি
কুড়ায় যখন শেফালিকারাজি
এলানো তাদের চিকুরে যখন
পবন পরশ হানে,
ফোটা শেফালির গন্ধে যখন
মাদকতা জাগে প্রাণে।

তখন শাখার 'পরে—
একটি কপোতী প্রতি এ লগনে
করুণ কূজন করে;
সে কি হারায়েছে সঙ্গীরে তার
তাই প্রাণে তার এত ব্যথা-ভার?
ছোট ওই বুকে ওঠে হাহাকার
গুমরিয়া শুধু মরে?
করুণ কাকলী প্রতি প্রত্যূষে
তাই কি প্রিয়ের তরে?

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়।

বুদ্ধগয়া

বৌদ্ধগণের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান বুদ্ধগয়া হিন্দুদিগেরও তীর্থস্থান বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে যে ঐ স্থানেও হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের পুস্তকেও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই স্থান উরুবিল্ব নামে প্রখ্যাত ছিল। বীল বলেন, জটিল সম্প্রদায়ভুক্ত কাশ্যপ নামক অগ্নি-উপাসক নিজ সম্প্রদায়সহ উরুবিল্বেই অবস্থান করিতেন। (১) রকহীল্‌ও বীলের উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন (২)। বুদ্ধ এই স্থানে সম্বোধিলাভ করিয়া স্থান-মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেন, কিন্তু নির্ব্বাণের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস পাওয়া যায় না। নৃপতিশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোকই সম্ভবতঃ প্রথম এই স্থানের উন্নতিসাধন করেন। সম্রাট্ অশোক বোধিবৃক্ষটিকে ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন এবং যদিও তিনি এই স্থানে একটি 'বিহার' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথাপি অধিকাংশ সময় তিনি বোধিবৃক্ষটির তলে কালক্ষেপণ করিতেন। এমন কি, কথিত হয় যে, এই জন্যই রাণী তিষ্যরক্ষিতা বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া এই বৃক্ষটিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞীর ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই, বৃক্ষটি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। কেম্ব্রিজ ইতিহাসের মতে বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসন ব্যতীত অশোক-সম্বন্ধীয় আর কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (৩) প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ব্লক তাহাও স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে এই স্থানে অশোক-যুগের কোনই নিদর্শন নাই। (৪)



শ্রীননীগোপাল সমাদ্দার

(১) Beal's Records of the Buddhist World ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
(২) Rockhill's Life of Buddha, ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৩) Cambridge Indian Hisiory Vol, I দ্রষ্টব্য।
(৪) Archaeological Survey Report 1908-1909 দ্রষ্টব্য।

মৌর্য্য-যুগের পরে শুঙ্গযুগে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য পুনঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শুঙ্গাধিপতি পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব পুনঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। নরপতি পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের উপর অত্যন্ত খড়্গহস্ত ছিলেন এবং মগধ হইতে জলন্ধর পর্য্যন্ত সমস্ত বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিবৃন্দও তাঁহার কোপানল হইতে রক্ষা পায় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে বঙ্গাধিপতি শশাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন নৃপতি বোধ হয় এতাদৃশ চেষ্টা করেন নাই। বুদ্ধগয়াও যে এই নৃশংস হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, ব্রাহ্মণ দেবাদিদেব মহাদেবের দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে নির্ম্মাণ করেন। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াং বলেন "ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক ঠিক কোন সময়ে যে মন্দির এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ পর নহে।" ডাক্তার ব্লক মন্তব্যসম্বন্ধে বলেন যে, হিউয়েন সিয়াংয়ের উক্তি ঐতিহাসিক হিসাবে যে কত দূর সত্য, তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইলেও বুদ্ধগয়ায় যে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বুদ্ধগয়ার খনন-কার্য্যের সময় বজ্রাসনের নিম্নে রাজের একটি মুদ্রার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় কেহ এই মন্দির হবিষ্ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল অনুমান করেন, কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া না—কারণ হবিষ্কের সময়ের আর কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হই না। এবং সামান্য একটি মুদ্রার প্রতি

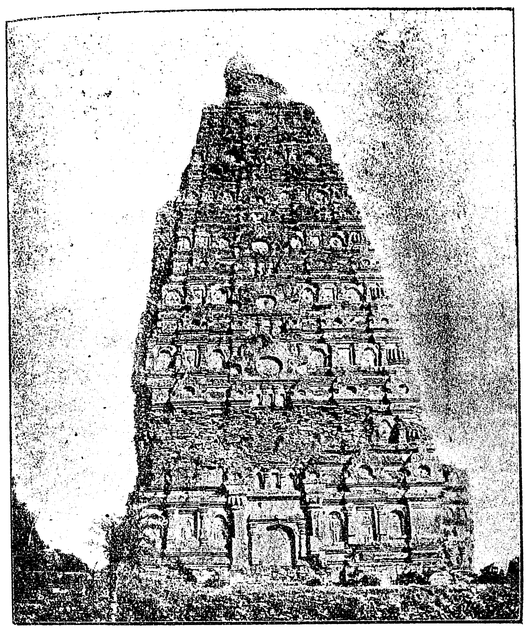

বুদ্ধগয়ার মন্দির (সংস্কারের পূর্ব্বে)

সহিত মন্দির-নির্ম্মাণের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক মনে হয় না।

সিংহলাধিপতি মেঘবর্ণ প্রেরিত প্রথম যে দুই জন পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের নিকট হইতে প্রথমে কোন অনুগ্রহই প্রাপ্ত হন নাই। তজ্জন্য মেঘবর্ণ "ভারতীয় নেপোলিয়ানের" নিকট পুনর্ব্বার বহু মূল্যবান্ উপঢৌকনের সহিত দূত প্রেরণ করায় মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাকে বোধি বৃক্ষের নিকটে সিংহলী বৌদ্ধগণের বাসোপযোগী একটি মঠ প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। (১)

চীনদেশীয় অন্যতম ভ্রমণকারী ফাইয়ান যখন মগধ দেশে আগমন করেন (৪০৫-৪১১ খৃষ্টাব্দ), তখন তিনি এই স্থানে বৃক্ষটি ও বজ্রাসন ব্যতীত আর কোনই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ছয় শত শতাব্দীতে শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গাধিপতি শশাঙ্ক এই বোধি বৃক্ষ উৎপাটিত ও ভস্মীভূত করেন এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের উপর অত্যন্ত নির্য্যাতন করেন। হিউয়েন সিয়াং বলেন, যে, বঙ্গাধিপতি ঐ সময়ে মন্দিরস্থ মূর্ত্তিরও ধ্বংসসাধন করিয়া একটি শিবলিঙ্গকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর পরে তৎকালীন মগধাধিপতি অশোকের বংশধর পূর্ণবর্ম্মা ঐ বৃক্ষটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থানটি পুনরায় যে শৈব-হিন্দুগণের অধীনে আইসে, তাহা ৭২৫ খৃষ্টাব্দে একটি মণ্ডের উপরের লিখিত লিপিতেই (এই মণ্ডটি কলিকাতা যাদুঘরে আছে) প্রতীয়মান হয়; কারণ মণ্ড হিন্দুদিগেরই চিহ্ন। এতদ্ব্যতীত পালবংশের দ্বিতীয় বৌদ্ধ-নরপতি ধর্ম্মপালের ২৬ বৎসর রাজত্বকালে কেশব নামক এক ভাস্কর বুদ্ধগয়ায় যে একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব মূর্ত্তি ও ব্রাহ্মণদের নিমিত্ত যে একটি পুষ্করিণী খনন করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময় এই স্থানে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ডাক্তার ব্লকের মতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিল্‌জী বিহার, উদন্তপুরী, নালন্দা প্রভৃতির মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধগয়া তাঁহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি এই স্থান ও মন্দির শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী গিরি সন্ন্যাসীদের অধিকারে আছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঘামণ্ডীগির নামক জনৈক শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এই স্থানে উপনীত হন। চতুর্দ্দিকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি এই স্থানে অবস্থিতি করেন। তৎকালে বুদ্ধগয়ার মন্দির একবারে ভগ্নাবস্থায় থাকিলেও তিনিই

(১) V. A. Smith's Early History of India, 4th Edition—৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথমে তন্মধ্যে বাস করেন। (১) ঘামণ্ডী গির তথায় একটি ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ঘামণ্ডীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্য চৈতন্য গিরি এই মঠের মোহান্ত পদ প্রাপ্ত হন। চৈতন্য গিরির স্বর্গারোহণের পর তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মহাদেব গিরি মঠাধিকার প্রাপ্ত হন। মহাদেব গিরি অত্যন্ত অন্নপূর্ণা ভক্ত ছিলেন। তাঁহার তপস্যায় প্রীতা হইয়া দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহাকে একটি তাম্র-নির্ম্মিত পাত্র প্রদান করিয়া প্রত্যাদেশ করেন যে, যত দিন মঠে সদাব্রত প্রচলিত থাকিবে ও অন্নপূর্ণা-প্রদত্ত তাম্রপাত্র সহযোগে খাদ্যাদি বিতরিত হইবে, তত দিন মঠের সৌভাগ্য অপ্রতিহত রহিবে। এখনও পর্য্যন্ত ঐ পাত্রে আহার্য্য দ্রব্য বিতরণ করা হয়। মহাদেব গিরি এই স্থানে একটি বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার যে মঠ দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশ মহাদেব গিরি কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহাদেব গিরি স্বর্গারোহণ করিলে লাল গিরি মোহান্ত হন। তদানীন্তন দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। লাল গিরির পরবর্ত্তী মোহান্ত কেশব গিরিকে সম্রাট ফারুকশিয়ার কয়েকটি মূল্যবান্ তালুক প্রদান করেন। এই সব ফর্ম্মান এখনও বুদ্ধগয়ার মঠে বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল গিরির নিকটে আছে। কেশব গিরির মৃত্যুর পর মোহান্ত রামহিত গির গদী প্রাপ্ত হন।

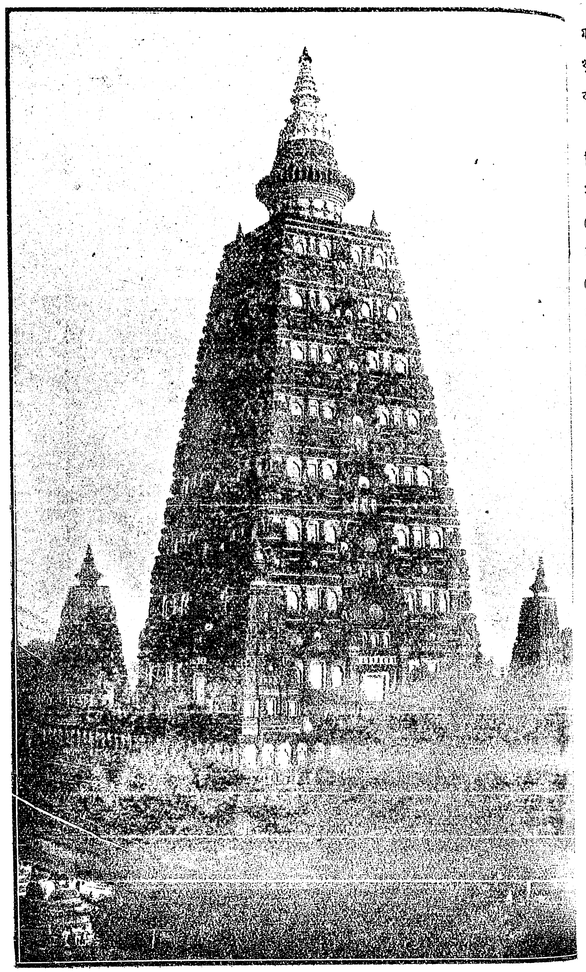

বুদ্ধগয়ার মন্দির (সংস্কারের পরে)

(১) Proceedings of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland —১৮৩০ দ্রষ্টব্য

টিকারী ও ইদুকের মহারাজাদের নিকট হইতে অনেক প্রাপ্ত হন ইহার পর বালক গিরি ও তৎপরে শিব মঠাধিকার প্রাপ্ত হন। শিব গিরিকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বুদ্ধগয়ার মোহান্ত বলিয়া স্বীকার করেন।

ইহার পরবর্ত্তী মোহান্ত ভাইপত গিরি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেন। ভাইপত গিরির পরে হেমনারায়ণ গিরি মোহান্ত-পদে অভিষিক্ত হন। ইনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরে বুভুক্ষের, ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রগণের দুঃখ-বিমোচনে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার সদাশয়তায় প্রীত হইয়া ইঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। হেমনারায়ণ গিরির কাশীধামে মৃত্যু হইলে বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল গিরি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গদী প্রাপ্ত হন।

বুদ্ধগয়ার মোহান্তদিগকে কৌমার্য্যব্রত পালন করিতে হয় এবং এক জন মোহান্তের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান পঞ্চশিষ্য সমস্ত গিরি সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে

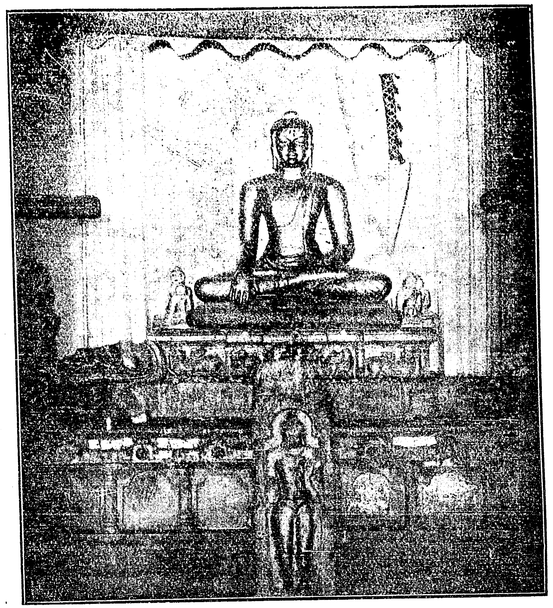

বুদ্ধগয়া মন্দির মধ্যস্থ মূর্ত্তি

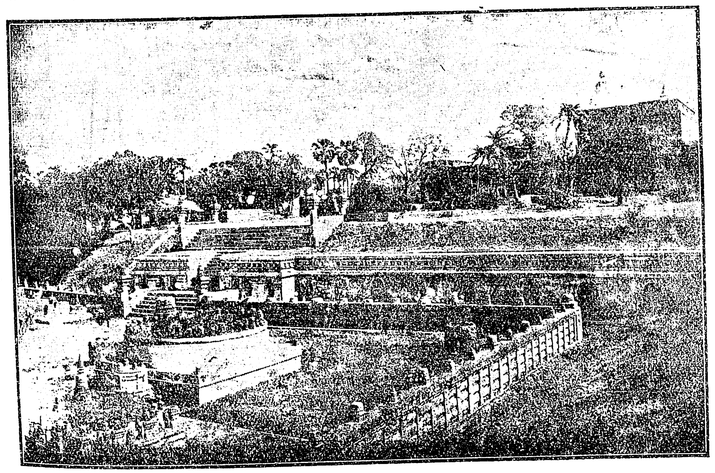

বুদ্ধগয়া—মন্দিরপ্রাঙ্গণ

মঠাধিকার প্রদান করেন।

সার কানিংহাম কর্ত্তৃক মন্দির সুনির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই মন্দিরের সিংহাসনে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। কিন্তু মন্দির সংস্কার-কার্য্যের জন্য ঐ মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হওয়ায় তৎকালীন সংস্কার-কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী মিষ্টার বেগলার

মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অন্য একটি মূর্ত্তির সন্ধান করেন এবং তিনিই বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মঠের এক কোণে অপরিষ্কার অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন মোহান্ত-জীর অনুমতি লইয়া বেদীতে স্থাপন করেন। (১)

(১) Vide Mr. Beglar's letter to the Mahatma of Bodh Gaya dated 14th May, 1895.

বর্ত্তমানে হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সকলেই মূর্ত্তিকে পূজা করেন। মন্দিরে সকলেরই অপ্রতিহত এবং সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পূজা করিতে গভর্ণমেণ্ট মন্দিররক্ষার্থ এক জন কর্ম্মচারী (Custodi নিযুক্ত করিয়াছেন। মন্দির ও মন্দিরের বহির্দ্দেশ সংরক্ষণের জন্য ইনিই দায়ী।

শ্রীননীগোপাল সমাদ্দার (বি-এ

বিসুবিয়াসের চেতনা

নগরবাসীরা দেখ দেখ আজি জাগিয়াছি আমি জড়!
শিরায় শিরায় বহিছে আমার বিষ চেতনা-ঝড়!
যুগ যুগ ধরি এ গুহার তলে
আগুনের শিখা ধক্ ধক্ জ্বলে
জগতের লোকে না জানিয়া বলে—আমি নাকি মর-মর!
নগরবাসীরা দেখ দেখ আজি জাগিয়াছি আমি জড়!

মনে করেছিলে পাষাণের গিরি শুধুই জড়তা-ভরা!
কাহারে কখনো আঘাত করে না কাযেই জীবনে মরা!
হে শোষণকারী রাক্ষস নর,
আমার বক্ষে শাসনের ঘর
বেঁধেছিলে তাই পেয়ে অবসর—দেহ নাই আমি ধরা!
মৌন সাধনে লভিয়াছি আজ শক্তি প্রলয়-করা।

মূর্খ মানব, ভেবেছিলে বুঝি ধূলি কঙ্কর চুমি',
আমি চিরদিন রহিব নীরবে লংয়া পাষাণ-ভূমি?
যুগে যুগে এই প্রাণের ভিতরে
কত উপাদান বেদনার ভরে
সঞ্চিত হ'ল তিল তিল ক'রে জান নাকি হায় তুমি!
আর কত কাল থাকিব নীরবে শুধু কঙ্কর চুমি'?

তরল-তপ্ত-অনলের স্রোত প্রলয়ধারার মত
লাভার প্রবাহে বাহিরিতে চায় গর্জ্জিয়া অবিরত!
ভয়াল-ভীষণ মহামেঘ প্রায়
উঠিয়াছে ধূম আকাশের গায়—
নভোমণ্ডল পুড়াবারে চায় বিস্তারি' শিখা শত!
লেলিহান আজি আগুনের লোভ-স্পর্শ ভীষণ কত!

জমাট বাঁধান মাটীর নীচেতে তরঙ্গ নাচে আজ।
চরণের তলে কাঁপিছে মেদিনী আপন ঘরের মাঝ!
কে কোথায় সুখে আছ ঘুমঘোরে
মরণ হাঁকিছে, জাগ জাগ ওরে,
শমন এসেছে স্বপন-শিয়রে মাথার উপরে বাজ!—
অদ্রি-শিখরে বিদ্রোহী জাগে বিপ্লবী এলো আজ!

শিলায় শিলায় বাঁধিয়াছে রণ পাষাণের ফাঁকে ফাঁকে;—
আগুনের রেখা ঝলকি ঝলকি রক্ত নয়নে ডাকে!
দারুণ-শুষ্ক-পাষাণ-গহ্বরে
মহাকাল বুঝি পিপাসায় মরে
বক্ষ বিদারি' চীৎকার ক'রে কপালে ভস্ম মাখে।
তরাসের ভরে কাঁদিছে ত্রিলোক আজি কে তাহারে রাখে!

যে সুখের নীড় বেঁধেছিলে তুমি, সেই বিলাসের ঘর!—
তা'রে আজি হায় কেমনে বাঁচাবে ক্ষমতাদর্পী নর?
নিমেষে দেখিবে সে নগর নাই
প'ড়ে আছে শুধু ভস্ম ও ছাই,
পাতালপুরীতে হবে তা'র ঠাঁই, নয় রে ধরার 'পর!
লাঞ্ছনাকারী, ভয়ে তুমি তাই কাঁপিতেছ থর থর!

হাড়ে হাড়ে তোর জেগেছিল যেই বলের অহঙ্কার!
ধূলির অঙ্কে কঙ্কালরূপে কলঙ্ক র'বে তার!
ঘোষিবে জগতে এই ইতিহাস
শোষণের যত কঠিন প্রয়াস—
ব্যথিতের রোষে হবে তা'র নাশ নিয়ে লাঞ্ছনা-ভার!—
চিরকাল কেহ সহে না নীরবে বলীর অত্যাচার!

আজি মনে হয় এই জগতেরে আমার মুঠির তলে;—
চূর্ণ করিয়া ফেলিবারে পারি হেলায় খেলার ছলে!
মনে হয় যেন গ্রহ-তারা-শশী
আমার উদর-গহ্বরে পশি'
নব রূপরসে উঠিবে বিকশি' নূতন সৃষ্টি বলে!
নূতন জগৎ পাইবে প্রকাশ মোর চেতনার ফলে!

এত দিন পরে গোপন সাধনা সফল হইল মোর!
জয়-উল্লাসে যশোগৌরবে ঘুচিল ঘুমের ঘোর!
দিকে দিকে তাই ধ্বনিতেছে জয়—
নাই নাই আর মরণের ভয়!
আমার চেতনা এ জগৎময় ছড়ায় নবীন ভোর!
এ জীবন জাগে, যৌবন জাগে, জাগে রে হৃদয় মোর!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়



নোটা আর সোঁটা মাত্র সম্বল করমচাঁদ সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এই আজব্ সহর কলিকাতার হাটে পিপুল বেচিয়া বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু টাকায় ত যৌবনকে ধরিয়া রাখা যায় না। করমচাঁদ দেখিলেন, এক দিন যে অনাহূত আগন্তুক জোয়ারের জলের মত আসিয়া তাঁহার সুচিকণ শ্যাম অঙ্গখানিকে কানায়-কানায় ভরিয়া দিয়াছিল; আজ সে নিরপরাধে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এখন ভাঁটার টান, তা-ও সারাণি ভাঁটা। নদীতটের রমণীয় সৌন্দর্য্য জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়, কেবল তাহার কুৎসিত কদর্য্যতা মাত্র পড়িয়া থাকে। করমচাঁদেরও এখন সেই দুর্গতি। টাকায় কামড় দিতে দিতে তাঁহার প্রায় দু'পাটি দাঁতই নড়িয়া গেছে, আর কোন্ নিষ্ঠুর কৌতুকী তাঁর গালপাট্টা-গোঁফে চুণকাম করিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু চুলগুলিতে এখনও হাত দেয় নাই। উপায় কি? এ সম্বন্ধে করমচাঁদ কার্ণানির অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় বিনেচাঁদ ধামারিয়া (বোধ করি, ধামার-সঙ্গতে বা ধামা-ধরিতে সিদ্ধহস্ত) ও ছিনেচাঁদ টেরেটক্কার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। বিনেচাঁদ বলিল, মুণ্ডন। কিন্তু কার্ণানির কাণ্ডারী শম্ভুনিধি বলিলেন, কলপ্-মুণ্ডন দুই-ই। গোঁফে কলপ্, গাল-পাট্টা একবারে বরতরফ্।

করমচাঁদ জিজ্ঞাসিলেন, আস্সা সম্বন্ধী বাবু (কার্ণানি শম্ভুনিধিকে ঐরূপে সম্বোধন করিতেন), হামার গোঁফসে গাল-পাট্টা যাস্তি পাকিয়েসে কেন?

সম্বন্ধী বলিলেন, বড় শক্ত সমস্যা! অমাবস্যা পূর্ণিমার ভিতর কোন্টা কখন্ বাড়ে কমে, তা স্বয়ং সূর্য্যসিদ্ধান্তর পিতামহ রামকান্তও বল্‌তে পারেন না।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বোপদেবের ভায়রাভাই—'পরোপকৃতয়ে ময়া' যাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। অর্থভার-প্রপীড়িতের বোঝা হাল্‌কা করিয়া দিবার নিমিত্ত যাঁহারা বদ্ধপরিকর, শম্ভুনিধি সেই দলভুক্ত। ইনি স্বতঃ-প্রেরিত হইয়া কার্ণানির কর্ণধার হইয়াছেন—কানে পাক্ দিয়া ঘুরাইতেছেন।

শম্ভুনিধির আগমনে ধামারিয়া ও টেরেটক্কা বড় শঙ্কিত হইয়াছিল। লোকটা একে বাঙ্গালী তার উপর একের নম্বর। খট্‌খট্ চলে, চট্‌পট্ বলে, কট্‌মট্ চায়, চপ্-কাটলেট্ খায়। এর অসাধ্য কি!

কার্ণানির সহিত পরিচিত হইবার জন্য শম্ভুনিধি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। পরলোকগত অক্ষয়কীর্ত্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি আয়েন্-গরের শোক-সভায় দৈব-সংযোজন হইল। করমচাঁদ চাঁদা দিয়াছেন, সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে চিনে না। সুতরাং জোয়ারের জলে আবর্জ্জনার মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময় শম্ভুনিধি আসিয়া একবারে প্রবলবেগে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, এই যে মিষ্টার করদানি! আসুন, আসুন!

করমচাঁদ বিস্মিত-নেত্রে শম্ভুনিধির পানে চাহিয়া কহিলেন, আমি মশা'কে চিনি না!

কে এক জন পশ্চাৎ হইতে বলিল, কামড়ালেই চিন্‌বেন।

শম্ভুনিধি চির সপ্রতিভ, বলিলেন, আপনি ঠিক্ বলেছেন! বাঃ! কেমন ক'রে চিন্‌বেন? আমাকে ত আপনি আগে কখন দেখেন্ নি! তবে হতাশ হবেন না। চিন্‌বেন, চিন্‌বেন, ক্রমে চিন্‌বেন! সে সব পরে হবে। এখন বক্তৃতা দিচ্ছেন ত?

বক্তৃতা! আমি!

আজ্ঞে হাঁ, আপনি! নইলে আর কে? ঐ বিনেও ছিনে?

আমি ত বক্তৃতা পারি না।

আরে মশাই, পেট থেকে পড়েই কি পারে! সে ভার আমার। থিয়েটার দেখেছেন্ ত?

হাঁ, বঁড়শী নাটক।

কি রকম দেখলেন ?

ওঃ, সে খালি কেঁচোর টোপ গাঁথছে, ছিপ্ ফেল্‌ছে, আর পুঁটি মাছ তুল্‌ছে !

তবে আর কি ! এ-ও একরকম থিয়েটার ! আমি আপনার পিছন্ থেকে বলে বলে দেব। আপনি বল্‌বেন। তা পারবেন ত ?

প্রলোভন দুরন্ত শত্রু।

করমচাঁদ বলিলেন, তা পারব।

তবে আসুন, ঐ চেয়ারে বসুন।

কার্‌দানি স্থান গ্রহণ করিলেন। শম্ভুনিধি বসিলেন ঠিক তাঁর পশ্চাতে। কয়েকজনের বক্তৃতা শেষ হইবার পর শম্ভু সভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমাদের রাজধানীর বিখ্যাত ধনী, বাগ্মী, সদাশয় কার্‌দানি মহাশয় কিছু বলিবেন। কম্পমান করমচাঁদকে ধরিয়া পাশে দাঁড় করাইয়া শম্ভু বলিলেন, বলুন, ভদ্রমহাশয়গণ—

কার্ণানি।—বলুন ভদ্রমশাগণ—

শম্ভু।—আমরা আজ কৃষ্ণমূর্ত্তি আয়েন্‌গরের—

ক।—আমরা আজ মিষ্টভর্ত্তি জয়নগরের—

শ।—জন্য রোদন করিতে আসিয়াছি—

ক।—জনার্দ্দন করিতে আসিয়াছি—

শ।—যখন কাঁদিতে আসিয়াছি—

ক।—যখন কাঁদিতে বসিয়াছি—

শ।—তখন হাসিব না, নিশ্চয় কাঁদিব—

ক।—হাসিব না, নিশ্চয় কাঁদিব—

শ।—সকলে এক সাথে বসিয়া—

ক।—সকলে এক পাতে বসিয়া—

শ।—মাথা হেঁট করিয়া—

ক।—পেট ভরিয়া—

শ।—অনন্ত অশ্রুরাশিতে ভাসিব—

ক।—দন্ত বিকাশি হাসিব—

শ।—আমরা স্বদেশ-ভক্ত আয়েনগরের—

ক।—আমরা সন্দেশ-ভক্ত জয়নগরের—

শ।—জন্য কাঁদিব—

ক।—জন্য কাঁদিব—

শ।—কেন না আমাদের আছে—

ক।—কেন না আমাদের আছে—

শ।—একমাত্র শোকাশ্রুপাত সম্বল—

ক।—এক পাত্র শাক-ভাত অম্বল—

অনভ্যাস বশতঃ করমচাঁদের কণ্ঠ ঝিম্ হইয়া আসিতেছিল। শম্ভু পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, চেঁচান্, চেঁচান্!

করমচাঁদ চেঁচাইয়া উঠিলেন, আঁচান্, আঁচান্!

শ।—এই গভীর গুরুগম্ভীর কান্নার সুর—

ক।—এই গরমাগরম্ চানাচুর—

শ।—যিনি চান্ না—

ক।—যিনি খান্ না—

শ।—তিনি উঠিয়া যান্—

ক।—তিনি মিঠাই খান—

শ্রোতৃবৃন্দ 'আহা-আহা' করিয়া উঠিল এবং তাহাদের চক্ষু ও জিহ্বা উভয়-দ্বার দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

শ।—যিনি দেশভক্ত—

ক।—যিনি মেষভক্ত—

শ।—তিনি সেই মহাভাগের—

ক।—তিনি সেই মহাছাগের—

শ।—মহীয়সী প্রশংসা গান্!

ক।—মাংস খান—

এই সময় শম্ভু উৎসাহ দিলেন, বাঃ বাঃ, বেড়ে বাহাদুর! বেড়ে বাহাদুর!

করমচাঁদও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, বেঁড়ে বাঁদর, বেঁড়ে বাঁদর!

শ।—তিনি ছিলেন ভারত-ভূমির—

ক।—তিনি ছিলেন বৃহৎ কুমীর—

শ।—অমায়িক প্রেমিক—

ক।—ইকমিক্—

শ।—দেশমাতৃকার—

ক।—দেশি মোটারকার—

শ।—বিজয়ী সন্তান—

ক।—বেজায় সস্তা—

শ।—মিউনিসিপালিটীর জন্য—

ক।—মংকোল ফলটির জন্য—

শ।—যেরূপ ভোট্ ভোট্ ক'রে—

ক।—যেরূপ ছুবকোট্ ক'রে—

শ।—তিনি বেড়িয়েছেন—

ক।—তিনি ধেড়িয়েছেন—

শ।—প্রাণপণ করে ঘুরেছেন—

ক।—বন্ বন্ করে ঘুরেছেন—

শ।—তাতেই বোঝা যায়—

ক।—তাতেই বোঝা যায়—

শ।—তিনি ছিলেন আমাদের বিশেষ আপন···

ক।—তিনি ছিলেন আমাদের বিজ্ঞাপন—

শ।—দেশভক্তের জাত নাই—

ক।—মেষ ভক্তের দাঁত নাই—

শ।—সে সকলের ভাই—

ক।—সে গোয়ালের গাই—

শ।—তাই মোটে মরে না—

ক।—তাই গোঠে চরে না—

শ।—এখানে ছিল তাঁর দুদিনের বাস—

ক।—এখানে ছিল তাঁর ধানের চাষ—

শ।—স্বর্গে গিয়াছেন মাটী বদ্‌লাইতে—

ক।—স্বর্গে গিয়াছেন মাটী কোদ্‌লাইতে—

শ।—তাঁর স্বর্গের বাসস্থল আনন্দময় হ'ক!

ক।—তাঁর স্বর্গের ঘাস-জল বন্ধ হয় হ'ক!

ইতোমধ্যে এক বদ্‌মাস্ কার্ণানির বসিবার চেয়ারখানি



সরাইয়া রাখিয়াছিল। কার্‌দানি বসিতে গিয়া ধপাস্! শম্ভু অমনি হাঁকিলেন, বাতাস বাতাস!

তখনি পাখা আসিল, জল আসিল। সকলে বলিয়া উঠিল, ভাবের জোরে বা জোয়ারে মূর্চ্ছা হয়েছে!

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকল সংবাদপত্রই শম্ভুনিধির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লিখিল, ধন্য শম্ভো! তুমি খনির অন্ধকার গর্ভ হইতে কোহিনুর অপেক্ষা কোটিগুণ সমুজ্জ্বল মণি আবিষ্কার করিয়াছ। বক্তৃতার প্রবল স্রোতে কোন রিপোর্টারই তাহা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। শম্ভু লিখিয়া দিলেন। বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কিন্তু একটা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এক দল বলিল, বক্তৃতায় হাসির ভিতর দিয়া করুণ রস ফুটিয়াছে। অপর দল বলিল, দূর মূর্খ! করুণের ভিতর দিয়া হাস্যরস ফুটিয়াছে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণ বলিলেন, ফুটিয়াছে বটে! তবে কি ফুটিয়াছে তা মা দুর্গাই জানেন! সে যা-ই হ'ক, সমগ্র রাজধানীর ভিতর কার্‌দানি এখন প্রসিদ্ধ বক্তা এবং সিদ্ধ স্বদেশী। বিদেশী নামে তাঁহার প্রাচীন ভৃত্যকে পর্য্যন্ত জবাব দিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে এখন চৌদ্দখানা চরকা চলে। বিনেচাঁদ এবং ছিনেচাঁদ পর্য্যন্ত চরকা কাটেন। উপায় কি! যে ঐ বাঙ্গালী শম্ভোর পরামর্শে বিদেশীকে বরখাস্ত করিল, আকৈশোর বর্দ্ধমান শ্মশ্রুকে বিসর্জ্জন দিল, পাকা মোচে কালি মাখাইল, সে কি না করিতে পারে!

কিন্তু এততেও কার্‌দানির মন উঠিতেছে না। তাঁহার আন্তরিক কামনা, পুরাদস্তর 'কল্‌কাতাই' হইবেন। বিশুদ্ধ বাংলা বুলি বলিবেন, তার মাঝে মাঝে ইংরাজীর বুকনি দিবেন। এ সকল বিষয়ে শম্ভু স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন।

শম্ভু বলিলেন, দেখুন মিষ্টার কার্‌দানি! কাযটা পুরাদমে এগুচ্ছে না। এক-পক্ষ পাখী কি উড়্‌তে পারে? আপনার দ্বিতীয় পক্ষ চাই। তার উপর আর এক কথা। আপনার যোগ্য অর্দ্ধাঙ্গিনী না হ'লে আধা-আধি রকম উন্নতিই থেকে যাবে।

কিন্তু সম্বন্ধি বাবু, হামি যে বুঢ়া হইয়েসি!

কিসের বুড়ো? যাজ্ঞবল্ক্য বুড়ো হ'ন নি? তিনি কি বলেন জানেন?

"বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং অথবা ডিম্ব-ভোজনম্।

অথবা যুবতী ভার্য্যা—"

কার্‌দানি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বলেন কি সম্বন্ধীবাবু! শাস্ত্র এ কথা লিখিয়েসে!

লিখেছে বৈ কি! এমন অবস্থা নাই, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা

যার ব্যবস্থা করেন নি। আপনাকে ডিমও খেতে হবে আর দ্বিতীয় পক্ষও গজাতে হবে। আপনি বল্‌ছেন্ বুড়ো! কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবস্থাই হচ্ছে—

"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্!"

সম্বন্ধী বাবু, আপনার বেজায় বিদ্যা। সংস্কৃৎ খুব পড়িয়েসেন!

শম্ভু হাসিয়া বলিলেন, যখন সংস্কৃতে এম্, এ দি, পরীক্ষক বলিলেন, তোমাকে কত দেব ঠিক কর্‌তে পারছি নি। আমি তোমাকে শূন্য দিলুম, তুমি ওর বাঁয়ে যা-খুসি বসিয়ে নিয়ো।

তাজ্জব! একটু পায়ের ধূলা দিন, মশা!

ও কি, মিষ্টার কার্‌দানি, সভ্য ক'রে বলুন!

সে কি!

পায়ের ধূল' কি! বলুন—Leg-dust,

পরদিন বিবাহের দিন ধার্য্য করিতে জনৈক স্মার্ত্ত-পণ্ডিতের টোলে গিয়া কার্‌দানি ভক্তিভরে বলিলেন,

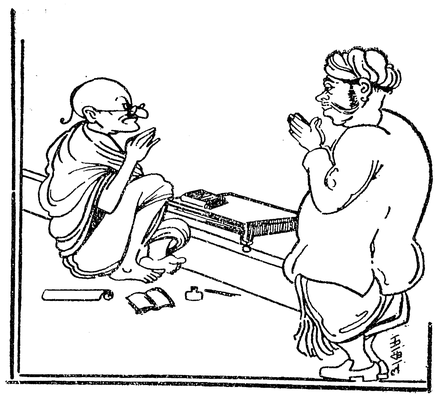

ঠাকুর মশা, আগে একটু leg-roast দিন!

স্মার্ত্ত ইদানীং বাবুদের মুখে এ কথাটা প্রায়ই শুনেন এবং অর্থও বুঝেন, বলিলেন, কি বেটা, আমি বাগম্-বাগীশের বেটা, সিংহ-শাবক! আমার টোল-বাড়ীতে লেগ্-রোষ্টো!

কিন্তু স্মার্ত্ত যাহাই বলুন, যতই চটুন্, দিনও ধার্য্য হইল এবং শুভলগ্নে শুভ বিবাহও সম্পন্ন হইয়া গেল। যিনি মিষ্টার কার্‌দানির অর্দ্ধাঙ্গিনী হইলেন, তাঁহার পি ছিলেন মিষ্টার কান্‌কাটারাম কেলেঙ্কার, মাতা—গোঃ গাম্বামিনী।

কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন—মিস্ সাহানা সোফিয়া গু বাহার গাঙ্গুলী, ডাক নাম, গেঁড়ি-গুগ্‌লী। তন্মধ্যে য বাহিনীর কৃপায় গুল্‌বাহার নামটিই সার্থক।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই শম্ভু বলিলেন, কিন্তু, মিষ্টি কার্‌দানি, মনে করবেন না, কদাচ না, যে এইখানে আপনার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে।

করমচাঁদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আবার কি কর্‌ হবে?

আপনার অর্দ্ধাঙ্গকে সভা-সমিতির যোগ্য কর্‌তে হবে তাঁকে আলোক দিতে হবে।

হাঁ হাঁ সে ত হবে—বলিয়া সেই দিন হইতেই কার্য্য তাঁহার শয়নকক্ষে পাঁচ বাতির শক্তিসম্পন্ন ইলেক্‌ট্রি আলোকের পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ বাতির শক্তি বাড়াইয়া দিলে যে যে স্থলে একটা হারিকেন জ্বলিত, সেই সেই স্থ চারিটা হারিকেন জ্বালাইবার ব্যবস্থা হইল!

শম্ভু বলিলেন, এত হ'ল বাইরের আলো, অবশ্য আবশ্যক, কিন্তু মিসেস্ কার্‌দানির ভিতরটাও ত আলোকি কর্‌তে হবে?

হবে বৈ কি? শরীরের ভিতর বিজলি জ্বাল্‌বার বন্দ্‌বস্ত্ হয়েছে না কি?

হয়েছে বৈ কি! একজনা আলোকপ্রাপ্তা আর্য্য মহিলা নিযুক্তা করুন।

তাহাই হইল। গুল্‌বাহার—গেঁড়ি-গুগ্‌লি—একবা বম্বে মেলের বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগি যার হয়, তার এমনিই হয়। শিক্ষয়িত্রী তাঁহার ছাত্রী বুঝাইলেন যে, এই অভাগা দেশের রীতি, নীতি, গীতি, গ গতি, সতী, পতি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, নর্ম্ম, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, এমন কি ম পর্য্যন্ত প্রয়োজন মত বদ্‌লাইতে না পারিলে উন্নতির আশাই নাই। শ্রুতি-স্মৃতি বিশ্বাসযোগ্য নয়। বে বেদান্ত সব ভ্রান্ত। কেন? হাতে লেখা ব'লে। ছা অক্ষরে যাহা বাহির হইবে, তাহাই পরম সত্য, অপিচ অ জানিবে। শিক্ষয়িত্রী একটি বীজ বপন করেন, ছা উর্ব্বর মস্তিষ্কে দশগুণ ফসল হয়। মাষ্টারণি দেখিলে

এরূপ দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে তাঁহার চাকরী বেশী দিন টিঁকিবে না।

শম্ভুর উপদেশানুসারে তিনি ছাত্রীকে বুঝাইলেন যে, স্বামী ধর্ম্মমাচরেৎ। জুড়ির একটা ঘোড়া জলদ্, একটা ঢিমা চালে চলিলে যেমন গাড়া চলে না, তেমনি স্বামি-স্ত্রীকে একব্রতে ব্রতী না হইলে উন্নতির রথও অচল হয়। তোমাকেও দৈনিকে মাসিকে গদ্য-পদ্য প্রবন্ধ লিখিতে হইবে আর সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া ত চাই-ই। জেনে রেখো, সংসারে স্বামি-স্ত্রীর সমান অধিকার, তুমি মিষ্টেস্ উনি মাষ্টার। তুমি তরোয়াল উনি খাপ, তুমি ওঁর বেটার হাফ্ (better half)।

গুলবাহার করমচাঁদকে বলিলেন, তুমি আমাকে আর মাডাম (madam) ব'লে ডেক না।

তবে কি ব'লে ডাকব?

কেন, আমি যা, তাই বল্‌বে।

কি বল্‌ব?

বল্‌বে মিষ্ট্রেস (mistress)।

আরে সেটা সে বড় খারাপ, আমি শাস্ত্রমত তোমার পাণিগ্রহণ করিয়েসি—

করিয়েস ত কার মাথা কিনেছ? মাষ্টারণি বলে যে, পাণিগ্রহণ করলে বাণীগ্রহণও করতে হয়।

তবে কি মিষ্ট্রেস্ বল্‌ব?

না বল্‌লে মজা টের পাবে।

মিষ্টার কার্ণানি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে অল্প দিনেই চিনিয়া লইয়াছিলেন। বরং বুনো মোষকে বাগে আনা যায়, কিন্তু ঐ দীর্ঘে প্রস্থে চৌকোস্ নারীটি একবার গোঁ ধরিলে কার সাধ্য ফেরায়! সুতরাং পারিবারিক শান্তি রাখিতে গেলে মিষ্ট্রেস্ বলিতেই হইবে।

মিষ্টার করমচাঁদ সম্প্রতি সস্ত্রীক কাশীতে একটি মহিলা-সমিতির মিটিংএ যোগদান করিতে গিয়াছেন। গুল্‌বাহার সে সভায় সভাপত্নী। সভা বসিতে এখনও বিলম্ব আছে। কার্ণানি গোঁফে কলপ্ দিতেছেন। ওদিকে তাঁহার মিষ্ট্রেস্‌ও যথাসাধ্য প্রসাধন সম্পাদন করিয়া ভাবিতেছেন, এই পথিভ্রষ্ট প্রদেশে, হিঁদুয়ানির দুর্ভেদ্য দুর্গে, অতি প্রাচীন স্থানে নূতনের আদর্শ না দিলে বৃথাই আমাদের আগমন! বিশ্বেশ্বরের নাটমন্দিরে সভা, খালি পায় যাইতে হইবে। চট্ করিয়া গুল্‌বাহারের মাথায় একটা মৎলব আসিল। মোজা পরিল হাতে, পায় দিল দস্তানা। করমচাঁদ তখনও ধীরে ধীরে গোঁফে কলপ্ মাখাইতেছেন। এক দিকে বেশ রং ধরিয়াছে—মীশ্ কালো, কিন্তু অপরভাগ তুষার-শুভ্র। মাখাইবার জন্য সবেমাত্র কলপ্ হাতে লইয়াছেন, এমন



সময় গুল্‌বাহার ঝড়ের মত ঘরে আসিয়া কহিল, চল, চল, শীগ্‌গির্ ওঠ!

পত্নীর বেশ দেখিয়া করমচাঁদের হাতের কলপ্ আর গোঁফে উঠিল না। তিনি অ্যাক্ করিয়া বিস্মিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। কলপের সমস্ত সরঞ্জাম ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গুল্‌বাহার পতির হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, তুমি একায় ব'স গে, আমি আস্‌ছি। গোঁফের একদিকে পূর্ণিমা অপর দিকে অমাবস্যা! কার্ণানি একবারমাত্র ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, গোঁফের আর একদিকে কলপ্‌টা দিলে হ'ত না?

আরে না না! এও একটা নূতন রকম হবে। এ অসভ্য দেশে তুমি আমি না নূতন আদর্শ দিলে দেবে কে?

দ্বারে একা প্রস্তুত। করমচাঁদ একাওয়ালাকে প্রশ্ন করিলেন, কি রে! তোর ঘোড়া ভালমানুষ ত?

একাওয়ালা বলিল, কে? ছট্টু? কথা কয়, হুজুর, কথা কয়!

কার্ণানি মনে মনে বলিলেন, কথা কয়! সত্য! একার নিকটীবর্ত্তী হইতেই বাজীবর চিঁহি করিয়া বলিল—বাহবা!

কার্ণানি তাড়াতাড়ি গোঁফে রুমাল চাপা দিয়া এক্কায় উঠিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ঘোড়া কথা কয়! আশ্চর্য্য কি! বোবার বোল ফোটে, আর ঘোড়া কথা কহিতে পারে না! কিন্তু কি লাঞ্ছনা!

তার পর গুল্‌বাহার এক্কার কাছে আসিতেই ছোট্টু গ্রীবাভঙ্গে তাহার আপাদমস্তক ব্যাপিয়া একমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—হে রাম! সঙ্গে সঙ্গে তড়্ বড়্ ক'রে জোড়া জোড়া পা ফেলে ছট্টু দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল!

আরে রোখো, রোখো! সড়কমে আওরৎ খাড়া! কিন্তু এক্কাওয়ালা প্রাণপণ শক্তিতেও ছট্টুকে রুখিতে পারিল না। বাজীবর করমচাঁদকে লইয়া বরুণা-অসি-বেষ্টিত বারাণসী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, শিব, শিব, শিব! ইয়ে পয়লা নম্বর, দুস্‌রা সড়কপর খাড়া! দেখো তামাসা! ঘণ্টা কয়েক ঘুরিয়া অশ্বরাজ আস্তানায় প্রবেশ করিল। কিন্তু অশেষ অনুনয়-বিনয়েও সে রাত্রিতে সে আর দানা-পানি গ্রহণ করিল না। বোধ হয়, মাথা নীচু করিয়া ভাবিতেছিল, বিশ্বনাথের মুল্লুকে এতকাল সোয়ারি দিচ্ছি, এ সব বালাই দেখি নি! কোথায় এমন চিজ্ পয়দা হয়! চিঁ-হিঁ-হিঁ!

কার্ণানি ইতঃপূর্ব্বেই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের মন যোগাইতে তাঁহার শরীরে অতি ত্বরা জরার সূত্রপাত হইল। তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, যদি ছোট্টুর মত একেও রোখা না যায়! গুল্‌বাহার ভাবিতে লাগিল, এই বুড়ো স্বামীটার হাত ধরিয়া সভা-সমিতিতে যাইতে এবং সহরময় বেড়াইতে হইবে! ছিঃ!

আধুনিক সাইকো-অ্যানালিসিস্ (Psycho-Analysis) চিকিৎসা-মতে কোনরূপ উৎকট বাসনা সফল না হইলে দেহে ব্যাধিরূপে প্রকট হয়। জরাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের ঐকান্তিক কামনা হঠাৎ এক দিন করমচাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে আঙ্গুল-হাড়ারূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দিন-রাত ঘুম নাই, তার উপর যন্ত্রণার দুঃসহ কাৎরাণি! কিন্তু কার্ণানির অপেক্ষা তাঁহার মিষ্ট্রেস্ অধিকতর অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ঘুম ত হয়ই না, অধিকন্তু মধ্যরাত্রিতে স্বামীর রকম্-বেরকম্ পৈশাচিক চীৎকারে তাহার ভয় হয়। কানে আঙ্গুল দিয়া আর কতক্ষণ 'রাম-রাম' করা যায়! এ পোড়া রোগের কি ঔষধ নেই?

এমন সময় দৈবাৎ এক দিন এক কবিরাজের বিজ্ঞাপন দেখিল, পাঁচ মিনিটে আঙ্গুল-হাড়ার সব যন্ত্রণার অবসান এক মোড়ক চূর্ণ গরম জলে ফেলিয়া দিবামাত্র যেমন ফুলে উঠিবে, অমনি ইত্যাদি-ইত্যাদি—

তৎক্ষণাৎ ঔষধ আনাইয়া কেট্‌লীতে গরম জল গুল্‌বাহার স্বামিসকাশে উপস্থিত—নাও, ওঠ, আর চেঁচাও হবে না!

করমচাঁদের তখন অল্প অল্প তন্দ্রা আসিতেছিল। সেই তন্দ্রার ভিতরেই মৃদুস্বরে উ—আ করিতেছিলেন।

গুল্‌বাহার অধীর হইয়া বলিল, ওঠ না গো! জল জুড়িয়ে যায়! আর কেন উ-আ! পাঁচ মিনিটে আ করে দিচ্ছি!

মৃত-সঞ্জীবনী আশা! করমচাঁদ উঠিয়া বসিলেন।

গুল্‌বাহার একটা গামলায় গরম জল ঢালিল। তায় মোড়কপূর্ণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিতেই ফুটিয়া উঠিল। বলি এস, এস, লাঙ্গুল ডুবিয়ে বোস!

আঙ্গুল-হাড়ার উৎকট যন্ত্রণা ভুলিয়া করমচাঁদ অপরি বিস্ময়ে পত্নীর মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলে

ওগো, আমার মুখপানে চেয়ে আছ কি! নেমে এ এই গামলায় লাঙ্গুল ডুবিয়ে বোস।

করমচাঁদ বলিলেন, লাঙ্গুল! লাঙ্গুল কোথায় পাব!

একগুঁয়ে স্ত্রী! বিরক্তির স্বরে বলিল, যো পাবে? যেখান থেকে পাও, নিয়েস! আমি ছাড়ছি সাত দিন সাত রাত চোখের পাতা বুজি নি! এখন যো পাব? চালাকি?

রোগ-যন্ত্রণায় হাজার প্রিয়পাত্রেরও পরিহাস অসহ্য হয়। করমচাঁদ বলিলেন, কি ঠাট্টা কর! কে তোমায় ওষুধ বলেছে? তুমি কি বল্‌তে কি শুনেছ!

আমি কচি খুকি! কি বল্‌তে কি শুনেছি! দেখ!

গুল্‌বাহার স্বামীর কোলের উপর বিজ্ঞাপন ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল!

করমচাঁদ বিজ্ঞাপনটি দুই তিন বার বেশ করিয়া বুঝিলেন, হায় মুদ্রাকরের প্রেতগণ! সময় অসময় অনর্থই বাধাও! বলিলেন, এ ভুল করেছে। ছাপতে লাঙ্গুল ছেপেছে।

পত্নী বলিল, তুমি গণ্ডমূর্খ কি না! ছাপার কাগজে ভুল?

আরে হাঁ-হাঁ! কম্পোজিটর এমন ভুল করে! তোমার ম্যাটরণি জানে।

হাঁ হাঁ জানে।

কি জানে?

জানে তুমি বদ্‌মাস, মূর্খ! তুমি লাঙ্গুল ডোবাবে কি না বল?

আরে এ ত বড় বিপদ হ'ল দেখছি! লাঙ্গুল এখন কোথা পাই!

না পাও নেই-নেই! কিন্তু চেঁচাও যদি গলায় ছুরি দেব!

গুল্‌বাহার রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে গামলাশুদ্ধ গরম জল করমচাঁদের হাতের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

করমচাঁদ হাতে ফোস্‌কা লইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কাল সকল আপদেরই প্রতীকার করে। করমচাঁদের আঙ্গুল হাড়াও সারিল, তাঁহার মিষ্ট্রেসেরও রাগ পড়িয়া গেল। কিন্তু করমচাঁদ সেই অবধি আঙ্গুল-হাড়া পীড়াকে লাঙ্গুল-হাড়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জরার দ্রুত আক্রমণে তিনি নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে চুল বকপক্ষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহাতে কলপ্ মাখাইতে হইতেছে। কিন্তু নিয়তি যেন তাঁহাকে নিষ্ঠুর পরিহাস করিতেছে। তিনি আজ এখানে কলপ্ দেন, কাল ওখান পাকিয়া উঠে! করমচাঁদ একান্ত অন্যমনা ও খিট্‌খিটে হইয়া উঠিলেন। এমন যে দ্বিতীয় পক্ষের প্রিয়তমা, তাহাতেও তাঁহার তেমন আর প্রীতি, সে সোহাগ নাই। ধামারিয়া বা টেরেটক্কা তাঁহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষিতে পারে না। কার্ণানির যা কিছু পরামর্শ বা কথা কেবল শত্রুর সহিত। গুল্‌বাহার অতিশয় ভাবনায় পড়িল। সে প্রীতি, সে সোহাগ আর কি ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই? এই যে! এই যে! আছে বৈ কি! যদি কেহ দেশের প্রকৃত উপকারসাধনে ব্রতী থাকে ত সে সংবাদপত্র। এই যে ললনামোহাগ হারিকেন্ তৈল—সৌরভে ভরপুর, গৌরবে প্রাণ-মন চুর! সধবার স্বামি-সোহাগ বর্দ্ধনে, বৈধব্যের সংযম উন্মাদনে অদ্বিতীয়। ব্যবহারে শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

দ্বিতীয় পক্ষ হারিকেন্ হইতে কেরোসিন্ লইয়া কেশে মাখিতে আরম্ভ করিল।

কার্ণানি জিজ্ঞাসিলেন, আরে এ কি মেখেছ?

হুঁ-হুঁউ! কি বল দিকি?

এ কি পেট্রল্ না কেরোসিন্?

দ্বিতীয় পক্ষ ভাবিল, স্বামী মুগ্ধ হইয়াছে। নাকের কাছে ধরিলে একবারে ক্ষেপিয়া যাইবে। গুল্‌বাহার মাথা নোঁয়াইয়া স্বামীর নাসিকার অতি নিকটে ধরিল। ক্ষেপিবার উপক্রম হইল বটে, কিন্তু বলিবার ত যো' নাই!

মিষ্ট্রেস্ প্রশ্ন করিল, কেমন গন্ধ বল দিকি?

কার্ণানি বলিলেন, একি গন্ধ! এ একেবারে কবিতার ছন্দ!

তোমার পছন্দ? একটু মাখ্‌বে?

করমচাঁদ শিহরিয়া বলিলেন, না, না, আমার আজ মাথা ধরেছে।

মাথা ধরেছে? এতক্ষণ বলনি কেন? দ্বিতীয় পক্ষ ছুটিয়া গিয়া সেই বিজ্ঞাপন ও একটা তেলভরা হারিকেন্ লইয়া আসিল। স্বামীকে বিজ্ঞাপন পড়িতে দিয়া বলিল, এই দেখ।

করমচাঁদ আগাগোড়া বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া বুঝিলেন, ছাপার ভুলে নারিকেল তৈল হারিকেন্ তৈল হইয়াছে। কিন্তু সে কথা বলেই বা কে আর বিশ্বাস করেই বা কে! তথাপি তিনি একবার নিরুপায় ভাবে পত্নীর মুখের প্রতি চাহিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষ এক হারিকেন্ ভর্ত্তি কেরোসিন্ তৈল তাঁহার মাথার উপর উজাড় করিয়া দিল।

ইহার পর আর কখন করমচাঁদের মাথা ধরে নাই। কিন্তু জরার উপায় কি? উপায় আবিষ্কৃত হইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

দ্বিতীয় পক্ষ নিত্যই বিজ্ঞাপন পাঠ করে। এক দিন দেখিল—'বিষম জরান্তক লৌহকড়ি, মধুর সহিত ব্যবহার্য্য।

কার্ণানি হঠাৎ একদিন দেখিলেন, তাঁহার বারাণ্ডায় প্রকাণ্ড একখানা লোহার কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। মিষ্ট্রেসের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন, একি?

দ্বিতীয় পক্ষ মনোমোহিনী হাসি হাসিয়া কহিল, হুঁ-হুঁ উঁ! এই আসনে বোস!

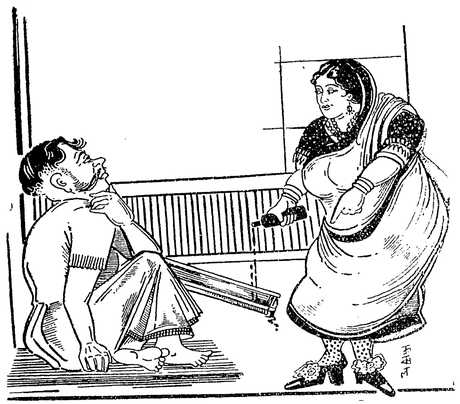

যো হুকুম! মিষ্ট্রেস্ কড়ির এক প্রান্তে এক বোতল মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, চোষ!

কি সর্ব্বনাশ! ঐ কড়ি চুষিতে হইবে! জিজ্ঞাসিলেন, এও কি কাগজে লিখেছে?

নৈলে কি আমি বাপের বাড়ী থেকে ব্যবস্থা এনেছি! এই দেখ! তুমি ভারি অবিশ্বাসী!

করমচাঁদ পড়িয়া বুঝিলেন, এও ছাপার ভুল। লৌহ-বড়ির পরিবর্ত্তে কড়ি হইয়াছে! জিজ্ঞাসিলেন, কতক্ষণ চুষতে হবে?

যতক্ষণ না ওটা সাবাড় হয়।

বাপ!

আমি কড়িটা কামড়ে কামড়ে খেতে বলছিনি! চুষে চুষে খাবে! ছেলেরা যেমন ক'রে লজনচুষ খায়! যাচ্ছ কেন?

আস্‌ছি বলিয়া করমচাঁদ দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

বহির্বাটীতে আসিয়াই কার্ণানি দেখিলেন, একখানি সংবাদপত্র হাতে শম্ভু হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে হাসি দেখিয়া করমচাঁদের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। বলিলেন, সম্বন্ধিবাবু, সব সময় হাসি ভাল লাগে না!

শম্ভু বলিলেন, ঠিক্ ঠিক্! হোমিয়োপ্যাথি শাস্ত্রে ঐ কথাই বলে!

কার্ণানি আরও চটিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি বলে?

বলে জরার লক্ষণই ঐ। অন্তরে বাহিরে জরার ইতর হ'লে মধুও বিষবৎ বোধ হয়, হাসি ত দূরের কথা।

কার্ণানি ভাবিলেন, দ্বিতীয়পক্ষকে এই জুটাইয়াছে মধু-মাখানো লোহার কড়িও বোধ হয় ইহারই কল্পনা। তিনি অধিকতর চড়া সুরে বলিলেন, হুঁ! মধু বিষ! আর মধু মাখা লোহার কড়ির কথা কিছু বলে নি?

কৈ তা' ত কিছু বলে নি!

না ব'লে থাকে, বল্‌তে বলুন্‌গে।

কেন?

কেন কি! আপনি ত মধু ভালবাসেন?

বাসি বৈ কি!

তবে যান, আমার বারাণ্ডায় লোহার কড়িতে মধু মাখানো আছে, ব'সে ব'সে চুষুণ্‌ গে!

বলিয়াই কার্ণানি মুখ ধুইতে গেলেন। শম্ভু অন্দরে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারও চক্ষু স্থির হইল। লোহার কড়ির ব্যাপার বুঝিয়া চাপা হাসিতে তাঁহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বাহিরে আসিয়া কহিলেন, মিষ্টার কার্‌দানি, আর আপনাকে লোহার কড়ি চুষতে হবে না। কড়ি কি! বরগা হুক্ পেরেক্, হাতা বেড়ি মায় চাটু-খুন্তি পর্য্যন্ত নয়!

কেন বলুন দিকি? আমার কি সখ যে লোহার কড়ি চুষি?

শম্ভু বলিলেন, হ'লই বা সখ! তার জন্য অপ্রস্তুত হবেন কেন? যাক্! দেখুন, এই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

করমচাঁদ শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তা আমায় কি!

শম্ভু বলিলেন, আরে মশাই, আগে শুনুন, তার পর বল্‌বেন, আমার কি! আপনার জন্যেই ত বিজ্ঞাপন শুনুন্! নূতন সংবাদ! পৃথিবী ওলোট্-পালোট্!

'জরাসুর-নাশিনী, যৌবন-সঞ্জীবনী চিকিৎসা! কবি চাষ! কপির চাষ!'

কার্ণানি জিজ্ঞাসিলেন, ভাল ক'রে দেখুন, কবি ছাপা কপি ছাপেনি ত?

শম্ভু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, না। কপি জানেন না?

কেন জান্‌ব না? ফুল-বাঁধা-ওল্ কপি সবই জানি।

তবে? এমন কথা আপনার মুখে শুন্‌ব, আশা করিনি!

আরে, সম্বন্ধি বাবু, আশা কি কেউ পেট থেকে পড়েই করে? আমিই কি ভেবেছিলুম যে, বড়ি কড়ি হয়ে আমার 'ঘাড়ে' পড়্‌বে? তবে? এর পর কবে শুন্‌বেন, আমার লাঙ্গুল গজিয়েছে!

শম্ভু কার্ণানিকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, না, মিষ্টার কার্‌দানি, এ সে কপি নয়! এ এক জাতীয় নর-বানর (Anthropoid Ape)।

নর-বানর? তার লাঙ্গুল আছে?

আছে। আঙ্গুল চারেক!

কার্ণানি শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বেশ! থাকে নুণ-জলে ডুবিয়ে বস্‌তে বলুন!

কি বল্‌ছেন আপনি!

সৎপরামর্শ! যদি গায় ফোসকা তুল্‌তে না চান্! এ বাড়ীতে ও কথায় কায নেই! মাপ করবেন!

কেন?

কেন? দ্বিতীয় পক্ষ। আর কেন! নর-বানরের নজির দেখিয়ে আমাকে ল্যাজ গজাতে বল্‌বে।

তখনই মনে হয়েছিল বটে, কেলেঙ্কারের কন্যা! তা যাক্! এতে কোন ভয় নেই। আপনি আপনার যৌবন ফের ফিরে পাবেন।

কোথায় জমা আছে যে ফিরে পাব, সম্বন্ধি বাবু! ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকাই লোপাট্ হয়! লাখ-লাখ টাকার মেন গাখা গজালো!

ল্যাজ গজায় নি ত? তবে আর ভয় কি? শুনুন! ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ডক্টর্ ভোরোনাফ্ (Doctor Voronoff) এক প্রকার নর-বানরের চাষ করিতেছেন—

কার্ণানি কারবারী লোক। তাঁহার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। জিজ্ঞাসিলেন, একটা বানর পুতলে ক'টা বানর ফলে?

তার ঠিক্ নাই। তবে যা লিখছে, শুনুন! ডক্টর ভোরোনফ্ পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, এই নররূপী বানরের গলগণ্ড, (বৈজ্ঞানিক ঘোরালো ভাষায় লেখিকা গ্রন্থি—Thyroid gland) অস্ত্রোপচার দ্বারা জরাগ্রস্তের দেহে প্রবেশ করাইলে যৌবন ফিরিয়া আসে।

আরে সম্বন্ধিবাবু, বুড়ো হয়েছি, এখন আর যৌবনের কি দরকার?

যৌবনের দরকার ত বুড়ো বয়সেই হয়, মিষ্টার কার্‌দানি! কালো চুলে কে আর কলপ্ মাখে বলুন!

চুলও কালো হবে না কি?

শুধু চুল কালো হবে? দাঁত গজাবে!

ল্যাজও গজাবে না ত?

বোধ ত হয় না। আর যদিই বা গজায় ত সে ইজেরের ভিতর থাক্‌বে, কেউ দেখতে পাবে না।

না, সম্বন্ধিবাবু! ভালো ক'রে খোঁজ নিন! ও ল্যাজওলা যৌবন আমি চাইনি।

শম্ভু করমচাঁদকে আশ্বস্ত করিলেন, বেশ, তাই হবে।

কেমন ক'রে?

আরে মশাই, আমেরিকা কি না করছে! আম-জাম-লিচু পেয়ারা ফলাচ্ছে, তার আঁটি নাই। গাছ তৈরি করছে মানুষের আকার। দু'দিন পরে কথা কইবে।

আপনি হাসালেন, সম্বন্ধিবাবু!

ঠিক্ বলেছেন! লোক হাসাবার জন্যই ত আমেরিকার চেষ্টা! ওরা লোক হাসাবার জন্য পয়সা খরচ ক'রে বই ছাপায়!

তা ব'লে গাছ কথা কবে?

নিশ্চয়! ঐ যে আপনার গ্রামোফোন্ যন্ত্রটা, ওর না আছে মুখ, না আছে ঠোঁট, না আছে জিব, কথা কয় কি ক'রে? আপনি দেখবেন মিষ্টার কার্‌দানি, আমেরিকা থেকে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ভারতে এসে লাট-আবাসে ডিনার খাবে আর সহরে সহরে বক্তৃতা দেবে! বিশ্বাস হচ্ছে না? কামরূপ কামাখ্যার ব্যাপারটা একবার স্মরণ করুন দিকি! সেই ডাকিনীদের গাছে চ'ড়ে চেলে আসা!

করমচাঁদ কহিলেন, সে ত বটেই!

কেমন বিশ্বাস হ'ল ত? ও ত তুচ্ছ কথা, মিষ্টার কার্‌দানি! আপনি শীঘ্রই দেখবেন, আমেরিকান্ মহিলাদের দাড়ী গোঁফ উঠবে!

সে কি?

আজ্ঞে হাঁ! তারা সে জন্য ক্ষেপেছে! যাক্! তা হ'লে ডক্টর ভোরোনফকে তার করি আপনার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করবার জন্য।

তা লিখুন, কিন্তু ল্যাজ না গজায়!

শম্ভু তার করিলেন।

বাস্তবিক, সে সময় আমেরিকায় বাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার লইয়া। ঘরে ঘরে সমিতি গঠন, পল্লীতে পল্লীতে মহাসভার অধিবেশন চলিতেছিল! এক কথা—কিসে নরজাতি নারীজাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মনস্তত্ত্বের আলোচনার পর এক সভায় এক রসিক বক্তা উঠিয়া বলিলেন, এও কি আবার বল্‌তে হয়! নরনারীর যদি সমান অধিকার হইত, তা হ'লে নারী জাতিরও দাড়ী গোঁফ গজাইত!

এইখানে বক্তা সগর্ব্বে আপনার মোচে মোচড় দিয়া ও দাড়ী আস্ফালন করিয়া বলিলেন, একটু প্রণিধান ক'রে বুঝুন দিকি। বাঘ বাঘিনী হইতে শ্রেষ্ঠ নয়। কেন না, উভয়েরই গোঁফ আছে। তেমনি বিড়াল।

মহিলাগণের মাথায় বাজ পড়িল।

এক মহিলা বলিলেন, এটা বাজে ওজর! যা কখন হয় নি, হবে না, তার আলোচনা কেবল ফাঁকি দিবার জন্য।

এই সময় একটি মহিলা সভাপত্নীর কানে কানে কি বলিলেন। সভাপত্নী তৎক্ষণাৎ সভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সভ্যা ও সভ্যগণ, ইনি মিস্ ডেয়ো। ভারতে বহু দিন বাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাই আপনাদের নিবেদন করতে চান্। ভারত সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকার এঁর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী! কেন না, এই ডেয়ো-বংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের। বেশী দিনের কথা নয়, মেসোজোয়িক্ (Mesozoic) যুগের একটি প্রকাণ্ড অশ্বডিম্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৈবাৎ তাহা ফাটিয়া যাওয়ায় দেখা গেল, এই ডেয়ো-বংশের আদি পুরুষ ধ্যান-নিমগ্ন রহিয়াছেন! তবে তিনি ঐ অণ্ডের জননী কি ঐ অণ্ড তাঁহার জনক, তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই! বিবর্ত্তন-বাদে সকল জীবেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন জীবের ল্যাজ খসিয়াছে, কোন জীবের গজাইয়াছে। এমনি নখ-দণ্ড-লোম প্রভৃতি সম্বন্ধেও জানিবেন। কিন্তু এই ডেয়ো-বংশের কোনরূপ আবর্ত্তন-উদ্বর্ত্তন-বিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহারা যেমন ষট্‌পদ, মীশ কালো ছিল, তেমনিই আছে। বোধ করি, সেই জন্যই ইনি মিস্ ডেয়ো! যাই হ'ক্, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বিপুলকায় ছিল, এখন ছোট হইয়াছে। আর এক কথা। ইঁহাদের কামড় খুব প্রচণ্ড, বিষ নাই, কিন্তু জ্বলে। আর জানিবেন, এই ডেয়ো-বংশ অমর। সকলে মিস্ ডেয়োর অভিজ্ঞতা অবহিত চিত্তে অবধান করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।



করতালির তুমুল ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মিস্ ডেয়ো উঠিলেন—অপূর্ব্ব নির্মোচ, শ্মশ্রুল মহিলা!

সভ্যা ও সভ্যগণ, ভারতে আমি বহুকাল বাস করেছি। আমি ভারতবাসিনী। আমি যাহা বলিব, তাহা নিন্দা নয়, সত্য। আপনার মাতা-ভগ্নীর যে নিন্দা করে, সে নিশ্চয় বিজাতীয়া, জন্ম-দুষ্টা। ভারতীয়রা এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবকেই বিজাতক বা স্ত্রীলিঙ্গে বিজাতিকা কহে। আপনাদের একটি ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য আমি দণ্ডায়মানা। কে বলে নারীজাতির দাড়ী-গোঁফ উঠে না? আপনারা ভারতে যান, ভারত-মহিলাদের দেখুন দেখিবেন, সকলেরই মুখে মোচা চিংড়ির মত মোচ! আর দাড়ী? কি বলিয়া, কি উপমা দিয়া সে দাড়ীর তুলনা দিব! সে বরেণ্য, শরণ্য, মহামান্য, অগণ্য, ধন্য, দণ্ডকারণ্য সদৃশ দাড্যারণ্য—কখন অল্প, কখন আগুল্‌ফ; কখন শ্বেত, কখন কৃষ্ণ; কখন টক, কখন মিষ্ট; কখন দুষ্ট, কখন শিষ্ট; কখন নীল, কখন লাল, কখন কসা, কখন ঝাল, কখন হরিদ্রাক্ত, কখন লবণাক্ত; কখন বৈষ্ণব, কখন শাক্ত; কখন ভক্ত, কখন ভাক্ত; কখন জরদা, কখন

ফরদা; কখন বিষ, কখন সুধা; কখন অগ্নিমান্দ্য, কখন ক্ষুধা; কখন আলোক, কখন অন্ধকার; কখন সাকার, কখন নিরাকার; সেই আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং (আমি ভারতে অবস্থান কালে এক গোয়ানিজ ভট্টাচার্য্যের নিকট তিন চার দিন সংস্কৃত পড়িয়া থিসিস্ (Thesis) লিখিয়াছি, তাই সংস্কৃতে বলিতেছি) সেই আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং সেই গো-অশ্ব-গজ-কচ্ছপ-মহিষ-মহিষাণাং মৎসদৃশ বিদুষী-বিধ্বংসী, মহাপুণ্য, বন্য দাড্যারণ্য কিসের সহিত উত্তোলিত করিব? সভা সভ্যগণ, তাহার তুলনা নাই! আপনারা আকাশে মেঘের ঘটা দেখিয়াছেন, শিবের জটা দেখিয়াছেন—(সভা-মধ্যে 'না-না' শব্দ, সে অশ্লীল উলঙ্গ শিবের জটা!)

মিস্ ডেয়ো বলিলেন, আপনারা ভারত সম্বন্ধে অতি অজ্ঞ, তাই এমন কথা বলিলেন। শিব অথবা মহাদেব ঘরে উলঙ্গ, দেব-সভা-সমিতিতে বাঘছাল পরিয়া বাহির হ'ন। সে যাই হ'ক্, আমি মহাদেবের জটা দেখিয়াছি। এক ছিলিম গঞ্জিকা অথবা ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা (Cannabis Indica) সেবন করিলে যে ধূম ওঠে, তাহাতেই রুদ্রজটা প্রত্যক্ষ হয়। সেই মেঘের ঘটা, রুদ্রজটা ভারত মহিলার শ্মশ্রুগুম্ফের কাছে কি ছার! যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ জুড়িয়া আছে, সেই মহাদেশ তাহার সীমান্তপ্রান্তে অনায়াসে বাদুড়-ঝোলার মত ঝুলিতে পারে। কুরুক্ষেত্রের একবিংশতি অক্ষৌহিণী ঐ দাড়ী হইতে প্রসূত হইয়াছিল, ঐখানেই তারা লালিত-পালিত, শিক্ষিত এবং ঐখানেই সমরে সমাহিত! ঐ দাড়ী মশার আবাস, কাযেই ম্যালেরিয়ার কুরুক্ষেত্র! প্রত্যেক ভারতবাসী ঐ দাড়ীর কয়েক গাছি চুল মাদুলীতে পূরিয়া, কেহ মস্তকে, কেহ বক্ষে, কেহ বাহুতে ধারণ করে! কিন্তু কি জন্য, কি হেতু, কি কারণ, কি নিমিত্ত ভারতে মহিলা-দাড়ীর এত প্রকোপ? জানেন কি?

(সভামধ্যে না-না)।

তবে শুনুন! ভারতীয় মহিলামাত্রেই সেই অসভ্য, অশ্লীল উলঙ্গ ছাগের রক্ত পান করে! দেব-দেবীর নিকট পাঁঠা বলি দিয়া তার উষ্ণ রক্ত খায়, তৈলবৎ মর্দ্দন করে গায়, আর তাইতেই তাদের দাড়ী গজায়। যে হেতু এই ছাগকুল স্ত্রী-পুরুষে শ্মশ্রুল। আমার যে দাড়ী গজাইয়াছে দেখিতেছেন, তাহা সেই ভারতীয় ছাগের ছোঁয়াচ লাগিয়া। ব্যাসিলির প্রভাব। আমার মনে হয়, মহিলাদের দাড়ী গজাইবার এই প্রকৃষ্ট প্রণালী, কি না নর্দ্দামা!

করতালির চোটে সেই প্রকাণ্ড দালানের ছাদ্‌টা একবারে উবিয়া গেল। বক্তৃতা অনতিবিলম্বে পুস্তক আকারে ছাপা হইলে এক ঘণ্টায় চারিটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইল।

পরদিন জনৈকা বৈজ্ঞানিকা মহিলা সংবাদপত্রে লিখিলেন, এই বিজ্ঞানের যুগে ঘোর অজ্ঞতামসে আচ্ছন্ন, মরণাপন্ন ভারতবাসীর আদর্শ গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। যখন ছাগ-ব্যাসিলিসঞ্চারে মিস্ ডেয়োর দাড়ী গজাইয়াছে, তখন তাঁহারই শ্মশ্রু-কোষ হইতে ব্যাসিলি সংগ্রহ এবং কাল্‌চার (culture) অর্থাৎ চাষ করিয়া আমি ইন্‌জেক্‌সন-প্রভাবে দাড়ী গজাইয়া দিব। আমায় এক মাস সময় দিন। হাটে-বাজারে তখন দাড়ী পণ্যের মত ক্রীত-বিক্রীত হইবে।

মাষ্টারণির প্রসাদাৎ মিষ্ট্রেস্ এই দাড়ী-তত্ত্ব অবগত হইয়া কহিল, সত্য! পুরুষমানুষের কিসের এত দম্ভ! ঐ দাড়ী না? আচ্ছা, আগে বাজারে বিক্রীর জন্য আসুক! তখন বুঝা যাবে, লোহার কড়ি চোষে কি না!

এ দিকে ভোরোনফ সংক্ষেপে তার করিলেন, জনৈক ভারতীয়, বানরী-চিকিৎসায় পারদর্শী, বানর সহ যাইতেছেন। ইনি আমার দ্বারা সুশিক্ষিত, বিশ্বাস করিবেন।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে কার্ণানিকে দুই দিন হবিষ্য করিয়া সংযম করিতে হইল।

আজ অস্ত্রোপচারের দিন। কিন্তু প্রভাতেই এক বিঘ্ন। দ্বিতীয় পক্ষ ঝড়ের মত কক্ষে আসিয়া কহিল, ওগো, দেখ দেখ।

করমচাঁদ পড়িলেন—'প্রমাণ এগার হাতী বেনারসী দাড়ী। মহিলা-মনমোহিনী—মূল্য একশত টাকা।'

কার্ণানির চক্ষু কপালে উঠিল। বলিলেন, ফ্যান্ খুলে দাও। চশমাখানা মুছিয়া চোখে লাগাইয়া আবার পড়িলেন।

কি গো, অক্ষর-পরিচয় হয় নি না কি?

হয়েছে। কিন্তু তোমার মত নয়। বুঝতে পারছ না, যারা বড়িকে কড়ি, নারিকেলকে হারিকেন, আঙ্গুলকে লাঙ্গুল করেছিল, এ সেই ছাপাখানার ভূতরাই সাড়ীকে দাড়ী করেছে?

তুমিও বুঝতে পারছ না যে, তোমারও লাঙ্গুল বেরুব বেরুব হয়েছে!

বলিয়া যেমন ঝড়ের মত আসিয়াছিল, তেমনি ঝড়ের বেগে দ্বিতীয় পক্ষ বাহির হইয়া গেল।

পরক্ষণেই নর-বানরের হাত ধরিয়া ডাক্তার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। সময়টা বৈশাখ মাস। ফলে, ফুলে, মুকুলে প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে নব-যৌবন যেন উছলিয়া উঠিতেছে। ঐ বৃদ্ধ জাম, ঐ অতিবৃদ্ধ আম, সাম্‌নের ঐ জঘন্য পেয়ারা গাছটাও নব-পল্লব-ভূষণে যৌবন-গরিমায় উচ্ছ্বসিত। এমন ত হয়! প্রকৃতির সকল রহস্যই ত মানুষ বুদ্ধিবলে আয়ত্ত করিয়াছে। কার্ণানি আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত চিত্তে অস্ত্র করিবার টেবলে শয়ন করিলেন। অস্ত্রোপচার হইল।

তিন দিন অন্ধকার বদ্ধগৃহে বাস করিবার পর কার্ণানি বাহির হইবার নিমিত্ত চঞ্চল হইয়াছেন। একে তাঁহার উগ্র প্রকৃতি। তার উপর অস্ত্র-চিকিৎসার উপদ্রব।

পাচক বলিল, আমি ও-ঘরে বাবুর খানা নিয়ে যেতে পারব না। বাবু দাঁত কিড়মিড় ক'রে কামড়াতে আসে।

ডাক্তার আসিয়া কার্ণানির বাঁধন খুলিতে খুলি বলিলেন, চিকিৎসার অপূর্ব্ব সাফল্য। এইবার অবিশ্বা মুখে চুণ-কালি! বল—হিপ-হিপ-হুরে!

বিনে ছিনে প্রভৃতি প্রচণ্ড চীৎকার তুলিল—টিপ-ফুরে!

কিন্তু ডাক্তার কার্ণানির হাত ধরিয়া বাহিরে আনি —লম্ফত্যাগ! করমচাঁদ অবলীলাক্রমে সাম্‌নের পেয়ারা গাছটায় গিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষ দেখিতেছিল। ছুটিয়া গিয়া এক কলা আনিয়া দেখাইতে দেখাইতে বলিল, ওগো নাও, নেমে এস, আমার দাড়ীর কথা দেওয়ানজী বলে যাও।

করমচাঁদ কোন উত্তর করিলেন না। মাঝে মাঝে খিচাইতে খিচাইতে পরম তৃপ্তির সহিত কষ্‌টে পিয়ার কচি পাতা চিবাইতে লাগিলেন।

সার্থক কপির চাষ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

সাধনা

১

চ'লে গেছে সুখ? স্বার্থের বোধনে
ফিরাইতে তায় সাধিব না।
আসিয়াছে দুঃখ? ব্যর্থ এ রোদনে
বুকে টেনে তায় বাঁধিব না।
নারীর ধর্ম্ম নহেক শুদ্ধ মর্ম্ম-বেদনে মরা;
প্রীতির ধর্ম্ম নহেক ক্ষুদ্র কারাগারে গড়া ধরা।

২

প্রীতি ও বিরহ করুক উজল
হৃদয়ে লগ্ন মলিনতা;
করুক জীবন সবল, সচল,
মুছায়ে স্বপ্ন অলীকতা।
নারীর ধর্ম্ম নহে ত কেবল আপনা লইয়া থাকা;
এ নহে পুণ্য প্রীতির ছলেতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ঢাকা।

৩

ক্ষিপ্ত পিয়াস যাহার জীবনে
বধে সে বিরহে আপনায়;
অধীর বিলাপ, বাসনা-দীপনে
জেগে উঠে ঘোর যাতনায়।
নারীর জীবন বিধাতার দান, তাঁহার আদেশ পালি;
প্রীতির প্রসার অনন্ত অসীম, পর তরে তায় ঢালি।

৪

পুণ্যের নামে যেই অভাগিনী,—
পুষি' দুখ, প্রাণ-মাঝে তার,
গৃহ-কোণে বসি কাঁদে অনাথিনী,
উড়ে যাব আমি কাছে তার।
বুঝাব, প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা;
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা।

মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দে
—ত্রিপুরা।

দাদামশাই

২

আমি পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠলেম বটে, কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন, এত আত্মত্যাগ—এই দেড় বৎসর কালের এতই অশ্রান্ত চেষ্টায় সে আর উঠলো না। সেই সৌম্য সুন্দর মধুর-প্রকৃতির উন্নতমনা বিদ্যাবুদ্ধিতে অতুলনীয় উচ্চাদর্শ আমাদের প্রাণাধিক মা-বাপের বড় আশার বড় ভরসার ধন তরুণ কন্দর্পটি নীরবেই ঝ'রে গেল। রোগ-যন্ত্রণা নাই, রোগের বৃদ্ধি নাই, নিশ্চিত বিদায়ের এতটুকু ব্যাকুলতাও চিত্তে নাই, মহাজ্ঞানী মহাপুরুষেরই মত শান্ত ধীর স্থিরভাবে সে কি আশ্চর্য্য মহাপ্রস্থান! দিনে দিনে তার সমস্ত শরীর যেন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠলো। স্বভাবসুন্দর রূপ যেন কোন দিব্যতেজে উদ্ভাসিত হয়ে ফেটে পড়তে লাগলো। গৌরোজ্জ্বল শুভ্রমূর্ত্তি, সমুজ্জ্বল বিশাল নেত্র, অতি সূক্ষ্ম আরক্ত অধর, প্রশস্ত মসৃণ ললাট, এ মূর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবে যে, এই আমাদের আশাহীন রোগের রোগী!—যার জন্য প্রাণ আমাদের আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। জ্বর ১০০'র উপর প্রায় কখনও উঠে নাই, যাওও না। কাসি সকালের দিকে এক আধবার মাত্র শুনা যায়। কোন দিনই বেশী ছিল না, শেষেও না। রাত্রিতে সুনিদ্রা সমানেই হয়ে এসেছে। এ'যে কি রোগ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না! শুধু দুর্ব্বলতা, তাও মোটে সে তিনটি দিনের ছয় বিছানা নিয়েছিল।



সোমদেব মুখোপাধ্যায়

সে দিন ১১ই আগষ্ট; ১৩১৭ সালের শ্রাবণের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি, সোমবার। গতরাত্রিতে বাবা এবং আমার স্বামী দুজনেই আমাদের দুজনকে অনেকটা সুস্থ দেখে স্বস্থানে ফিরে গিয়েছেন। আমি সে দিন সোমের কাছে এসে বসেছি, আমার রোগের সে দিন বাইশ দিন। গতপূর্ব্ব দিন হ'তেই কিছুক্ষণ ক'রে ব'সে থাকতে পারছি। স্নান করাও এক দিন হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও দুর্ব্বলতার জন্য হাঁটতে পারি না।

সকালে মা'র পায়ের ধূলো নিয়ে সোমদেব মাকে বল্লে, "কি কুপুত্রই এসেছিলুম মা! তোমার কিছুই করতে পারলুম না।"

ভোরে একবার পেটে ব্যথা ধরেছিল, তাঁকে খবর দেওয়া হয় বেলা যখন প্রায় এগারোটা। মোহিত বাবু ডাক্তারের সঙ্গে তিনি নিজেই এসে ঘরে ঢুকলেন। সে দিন সকালেই সোম মোহিত বাবুকে বলছিল যে, "তাঁকে বলবেন, যত দিন না ভাল হচ্ছি, মধ্যে মধ্যে যেন তাঁকে আমি দেখতে পাই।"

সেই মুহূর্ত্তেই সে বলছিল, "পেটে আবার কি রকম ব্যথা ধরলো মা!" মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর মাথা কোলে নিয়ে মূর্ত্তিমান অভয়েরই মত এসে বিছানার উপরেই বসলেন। সর্ব্বশরীরে তাঁর শীতল কোমল পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ, বাবা আমার?"

সুস্থ হয়ে সে হাসিমুখে মুখ তুললে।—"ভাল ছিলুম না, এখন ভাল হলুম। সব কষ্ট ভাল হয়ে গেল! এই জন্যেই ত আপনাকে দেখতে চাই! আপনি জানেন না, আপনাকে দেখলেই রোগ কোথায় যেন পালিয়ে যায়! যতক্ষণ কাছে থাকেন, কোন কষ্ট জান্‌তেই পারা যায় না।"

তার পর আরও কত কথা হলো। শেষে সে বল্লে, "আমার মাকে দেখবেন।" তার পর তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মধুর হাসির সঙ্গে বল্লে, "আমার কত সৌভাগ্য! আমার মত বাপ কারুর নেই, অমন মা, বোন্, ভাই কারুর হয় না। যাঁকে কেউ চোখে দেখতে পায় না, তিনিও আমার জন্য এত করলেন! এত ভালবাসলেন! আঃ!"

পরম পরিতৃপ্ত চিত্তে সুস্থ শান্ত মনে সেই মহাযোগীর কোলের উপরেই আমাদের পূর্ণিমার চাঁদ অস্তে চ'লে গেল! মহাদেবের ললাট-ভূষণের মতই, তাতে সে শোভিত হয়ে রইলো! তার রাঙ্গা ঠোঁটের সে স্নিগ্ধ হাসির আলো একটুখানিও আর ম্লান হলো না। যেমন তেমনই রয়ে গেল।

সেই অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীরে অত বড় প্রচণ্ড আঘাত সইতে পারি নি। অনেক কিছু করেই নাকি আবার বেঁচে উঠেছিলাম। বাঁকিপুরে যখন ফিরে যাওয়া হয়, আমার তখন সম্পূর্ণ অচেতনাবস্থা।

পূজার ছুটীতে আবার আমরা কাশীধামে ফিরে আসি।

ইতোমধ্যে এমন ঘটনা ঘটে গেল, যাকে উপলক্ষ ক'রেই তাঁর সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র এমন দৃঢ়তর হয়ে উঠবার সুযোগ লাভ করতে পেলে। এ না হ'লে হয় ত বা সেই দিনেই আমাদের সঙ্গে তাঁর সামান্য কয় দিনের দেখা ও শুনা শেষ হয়েই সব চুকে যেত। আমার মনের তখন এমন অবস্থা নয় যে, আমার জীবনদাতার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা খুবই প্রগাঢ় হ'তে পেরেছিল। সোমকে হারিয়ে সেই আঘাতে আমরা বাস্তবিকই যেন জীবন্মৃতই হয়ে রয়েছিলাম। সমস্ত সংসার আমাদের কাছে অন্ধকার ও শূন্যময় হয়ে গিয়েছিল।

আমার শরীর তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, শরীরটা যেন একবারে

প'ড়ে যাবার মত হয়েছে। বাবার ঘরের ঢালা বিছানাতে সর্ব্বদাই শুয়ে প'ড়ে থাকি। নষ্ট স্মৃতি ফিরে এসে শুধু অসহ্য শোকে দগ্ধ করছিল। দেড় বৎসর অনন্যমনা হয়ে ঐ একটিমাত্র ব্রত গ্রহণ করেছিলেম। দৃঢ় ঐকান্তিকতার সহিত দিনরাত সর্ব্বক্ষম-শক্তির যে অংশ আমাতে নিহিত আছে, তাকেই জাগ্রত করতে চেয়েছি। মনে গভীর বিশ্বাস যে, যাঁর কাছে সাধক মুক্তি চেয়ে তপস্যা করলে তা-ও পায়, তাঁর কাছ থেকে একটা বালকের প্রাণ ভিক্ষা কি পাবো না! সেই সুদীর্ঘ দিনের অভ্যাসে কত সময় অন্যমনা হয়ে গিয়ে ঐ ভাবনাতেই তন্ময় হয়ে ডুবে যাই, সহসা চমকে উঠি, আর হাহাকারে প্রাণ ভ'রে উঠে।

আমার বাবার সন্তান-স্নেহের তুলনা ছিল না। ছেলে-মেয়েরা, ভাইপোরা তাঁর প্রাণ ছিল। কিন্তু কি অসীম সহ্য দিয়েই তিনি বাইরের লোকের কাছে নিজেকে যে ঢেকে রাখতেন! সবই ক'রে যাচ্ছেন, অফিসের কায, এডুকেশন গেজেট চালানোর সাহায্য, আমাদের রোগের ব্যবস্থা,যত্ন, যা কিছু নিত্য-নৈমিত্তিক কায, কিছুই তাঁর বাদ পড়ছে না, কেবল বাকি থাকে শুধু রাত্তের ঘুম! সারারাত তাঁর ঘরের পিছনদিককার লম্বা বারান্দাটায় পায়চারী ক'রে বেড়ান। আর ঘরের মধ্যে জেগে প'ড়ে প'ড়ে আমি তাঁর আগুনের ঝড়ের মতন সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই।

মাকে এক দিন বলেছিলেন, "তোমার ত মনের শান্তি—চোখের আনন্দ—বুকের বল হারালো। আর আমার যে সব গেল। আমার ভবিষ্যতের আশা, আমার পিতৃবংশের গৌরব, আমার চিরদিনের আদর্শ—সবযে আমি তারই উপর নির্ভর ক'রে রেখেছিলুম, সে আমায় রিক্ত ক'রে দিয়ে চ'লে গেছে!"

এই সময়ে আমার সেজ বোন্ তার শ্বশুরবাড়ী থেকে বাঁকিপুরের বাড়ীতে এলো, সম্প্রতিমাত্র সে খবর পেয়েছে, আগে তাকে তাঁরা জানতে দেন নি।

যে দিন এলো, তার পরদিন জ্বর হয়ে তার অসুখ তিন দিনের দিন থেকেই টাইফয়েডে দাঁড়িয়ে গেল। বিপদ যখন আসে, অল্পে ত আর সে যেতে চায় না।

বাবা একে একে এবং একসঙ্গেই বাঁকিপুরের ছয় জন জানা-শুনা ডাক্তারকে ডাকিয়ে এনে বল্লেন, যাতে বেশী না বাড়ে, এখন থেকে তোমরা যতদূর যে যা পার, তার জন্য যত্ন নাও। আমাদের এই ভাঙ্গা বুকে আর একটুও সইবার মত বল নেই!"

কিন্তু রোগ ত আর বাস্তবিকই ডাক্তারের বাধ্য ছাত্র নয়! সে তা' শুন্‌বে কেন? দশ দিনের দিন থেকে অসুখ এত বেড়ে উঠলো যে, সে আর দিনরাত কাটে না। বারো দিনের দিন—সে দিন অমাবস্যা তিথি। এই ক'দিন সমানে জ্বর প্রায় ১০৪ ডিগ্রীতেই আবদ্ধ হয়ে আছে, খানিকক্ষণের জন্যও কমে না, সে দিন ডাক্তাররা হার্টফেলের ভয় করতে লাগলেন। সর্ব্বক্ষণ মিসেস্ কলোনী স্পঞ্জ ক'রে দিতে লাগলেন। আর যা কিছু নিয়ম আছে, সবই চলতে লাগলো।

আমি এই নূতন বিপদের আতঙ্কে কোন্ সময়ে যে নিজের সেই অসহ্য শোক ও রোগকে ভুলে গিয়ে ওর রোগশয্যার পাশে ব'সে পড়েছিলুম, তা' জানতে পারি নি। অথচ, তখনও নিজের পায়ে চলতে পারি না।

বাবা বল্লেন, "এটাও বোধ হয় চল্লো! আশা ত দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তাঁকে একখানা টেলিগ্রাম করা যদি ভাললোকের আশীর্ব্বাদেও একটু ফল হয়। সোম বটে, কিন্তু তোমায় ত তিনি বাঁচিয়েছেন!"

ভোরের দিকে জ্বর কমতে আরম্ভ হ'ল। সকালে ডাক্তার বললেন, নাড়ীর অবস্থা যথেষ্ট ভাল, জ্বরও প্রায় দু' ডিগ্রীর কম পাওয়া গেল।

কয়দিন রোগী মোটে কথা কয়নি। সে দিন সে হঠাৎ যে, "আমার গায়ের গরম কাপড়গুলো খুলে দাও।"

আমার ন' বোন্ সেগুলো একসঙ্গে তুলে নিতেই "উঁহুঁ! ও কি করলে! উনি যে বলছেন, একটা একটা খুলে নিতে বলো, হঠাৎ নিলে খিল্ লেগে যাবে।"

আমরা কথাটায় কান দিলাম না। আমার ন'বোন্ ছেলেমানুষী কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলে, "কে বল্‌ছেন?"

রোগী উত্তর দিল, "কেন, কাল রাত থেকে যিনি আ কাছে আসছেন, তিনিই ত বল্লেন। তিনি কি বল্‌ছেন জা আমার জন্যে ওষুধ পাঠিয়েছেন, খেলেই আমি সেরে বাবা নিয়ে আসবেন।"

আমার ন'বোন্ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "সেজদি, হয়ে দিব্য চক্ষু পেয়েছে!" রোগী রাগিয়া গেল, ঝাঁঝিয়া "আমি কি মিথ্যে ক'রে বল্‌ছি না কি? তিনি যে বল্লেন

সে বল্‌লে, "আচ্ছা, তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো?"

রোগী কহিল, "পাচ্ছি না ত কি!"

তখন কথাটা মা'র কানে গেল, মা এসে জিজ্ঞাসা লেন, "হ্যাঁ রে, তুই কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিস্? কি দেখতে বল্ ত?"

রোগী ক্ষণকাল নীরবে রইল। চোখ বরাবর মুদিতই আমরা ভাবলাম, ডিলিরিয়মটা বন্ধ হয়ে অবসাদের আবার এসেছে। কিন্তু ক্ষণপরেই সে ধীরে ধীরে কথা "বেশী লম্বা নয়, বেশ ফরসা রং, মাথায় জটা ঠিক নয়, লম্বা লম্বা চুল, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—(এই শুনিয়াই আমরা চমকিয়া উঠিয়া অবহিত হইলাম) প'রে গেরুয়া নয়, হল্‌দে ধরণের ফিঁকে রঙ্গের রেশমী কাপড়—"

মা ও আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত-প্রায় হয়ে দু'জনের দিকে দু'জনেই চেয়ে দেখলাম, এ মূর্ত্তি যে তাঁরই! তাঁকে জীবনে কখন দেখেও নাই, বৈদ্যনাথে ছিল, সঙ্গেই অসুখে পড়েছে। আর আলোচনাই বা কার বিষয়ে করবে সে! মা, বাবা, আমি ও কুমার এই ক'জন তাঁকে দেখেছি। ইদানীং তাঁর কথা তেমন ক'রে মনেও না। আমাদের সমস্ত মন ভ'রে শুধু সোমের কথাই ছিল। তিন জনে কথা যদি কইতাম ত তাঁরই কথা! তা না হ'লে টানাপাখার হাওয়ায় চুপটি ক'রে ঘণ্টার পর ধরেই নিঃশব্দে প'ড়ে থাকা। ভাষাও আমরা শোকের প্লাবনে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

এই পর্য্যন্ত শুনেই ধৈর্য্যহারা হয়ে মা ব'লে উঠলেন, ওঁকে জিজ্ঞেস্ কর্ না রে, এত যখন তাঁর শক্তি রয়েছে, তবে আমার 'তাকে' বাঁচাতে পারলেন না?"

রোগীর মুখে এই প্রশ্ন এবং তার উত্তর শোনা গেল, "তাকে বাঁচাবার শক্তি কার ছিল, মা? যেখানে যাবার জন্য আমাদের মত কত লোক চিরজন্ম সাধন করছে, সে যে সেইখানে চ'লে গেল! যার পুনর্জন্ম থাকে, সঞ্চিত কর্ম্ম থাকে,—আমি না পারলেও কোন কোন শক্তিমান্ যোগী পুরুষ তার সেই কর্ম্মকে এই জন্মের সঙ্গে যোগ ক'রে হয় ত মৃত্যুমুখ থেকেও তাকে টেনে আনতে সমর্থ হ'ন, এ আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কর্ম্ম যার শেষ হয়ে গেছে, জন্ম যার শুধু স্বল্পমাত্র কর্ম্মক্ষয়ের জন্যই, সেই যোগ-ভ্রষ্ট মহাপুরুষকে কি কেউ তার মোক্ষলাভ থেকে বঞ্চিত ক'রে এই মৃত্যুলোকে ধ'রে রাখতে পারে? তার মৃতদৃশ্য থেকেই কি দেখ নি মা, ঐ যে নির্ভীক, প্রশান্তভাবে তার সেই মহা-প্রস্থান, তার মধ্যে মৃত্যুর স্থান বা অধিকার কোথায়? সে যে মহা-মৃত্যুকে জয় ক'রে নিয়ে অমৃতলোকে বিজয়-যাত্রা।"

আরও কত কথাই সে ব'লে গেল! এ সব কি তার মুখের কথা! কতই বা বয়স তার! তা' ছাড়া সোমের মৃত্যুকে এ দিক্ দিয়ে আমরা একবারও ভেবে দেখি নি! তার হাল হয়েছে, এমন কথা আমরা ভাবতেও পারি নি। আমাদের এ কি হলোই ভেবেছি।

রোগী খুব দ্রুতবেগেই রোগমুক্তির দিকে ফিরে চলল। এমন প্রায় টাইফয়েডের রোগীর হয় না। এ রোগ বাড়ে শীঘ্র, কমে আস্তে। জ্বর ও সকল উপসর্গই ক'মে এলো, কিন্তু সেই নিঝুম-ভাবে থেকে ডিলিরিয়ম বা আর কিছু—সেইটাই কয়েক দিন রয়ে গেল।

এই অবস্থায় সে পরিশুদ্ধ মার্জ্জিত ভাষায় সকল প্রশ্নোত্তরে কত বেদ-বেদান্ত যুক্তি-নীতি শুনাতো। কথা কইতে বারণ করা হলেও নিজে নিজেই প্রশ্ন ক'রে উত্তর বলতো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের অনেক যুক্তি, যা' আমরাও তখন জানতুম না এবং পরে তাঁরই কাছে শুনেছি। এক দিন আমাদের রোগী বল্লে, "আজ তাঁর বাড়ী দেখলুম।"

জিজ্ঞাসায় যে বর্ণনা দিল, সে সত্যই সেই সোনারপুরার বাড়ীর। আপন মনেই বল্লে, লম্বা একটা বড় ঘর, তার চারি-দিকেই বই। কি বইএরই রাশি! সংস্কৃত, ইংরেজী, আরও কত কি ভাষার! বইএর সেল্‌ফেই ঘরটা ভরা। মাঝখানে হরিণের উপর বাঘছাল বিছানো—তাতে ব'সে রয়েছেন! আচ্ছা, আপনাকে কি ব'লে ডাকবো? আমার মা'র আপনি ছেলে? ও, তা হ'লে দাদাই বলি? ঠাকুরঘর? আচ্ছা, দেখে আসি?"

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "কি দেখ্‌লি?"

সে উত্তর দিল, "কেন, ঠাকুর দেখলেম! রামসীতা, নারায়ণ।"

সত্যই সে বাড়ীর ঠাকুরঘরে ওঁরাই ছিলেন। আমিও তা' দেখেছি।

এখানে লিখতে ভুলে গেছি, সেই প্রথম দিনেই বাবা এসে বলেছিলেন যে, কাশী থেকে টেলিগ্রামে ওষুধের কথা লিখেছেন, ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ওই ওষুধটাই দেওয়া যাক এবং তাই করা হচ্ছিল।

এই উপলক্ষে মোহিত বাবু ডাক্তারকে চিঠিপত্র লেখা হয় এবং তিনিও শেষ পত্রে লেখেন, "পূজ্যপাদ বাবা আপনাকে লিখতে বলিলেন যে, যদি অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এই ছুটীতে আপনার স্ত্রীকে লইয়া এখানে আসিলে তিনি সুখী হয়েন। অল্পদিনের সংস্রবেই তিনি আপনাদের অত্যন্ত স্নেহচক্ষে দেখেছেন। বলেন, এমন নিরহঙ্কার সরল উচ্চ-শিক্ষিত এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী কম লোকই দেখা যায়। এখানে এলে আপনার স্ত্রী কিছু শান্তি পাবেন, আশা হয়। আপনার মধ্যমা কন্যার শরীর এখনও অসুস্থ জেনে দুঃখিত হ'লেন, তিনি এলেও তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'তে পারে।"

এই আমার দ্বিতীয়বারের দেখা।

সেই শূন্যময় পুরে যেখানে দেড় বৎসর ঘুরে ফিরে সোমকে নিয়েই আসা-যাওয়া চলেছিল, যেখানে তাকে চিরদিনের জন্যই বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে চ'লে যাওয়া হয়েছিল, সেখানের সেই কঠোর শূন্যতা আমাদের পক্ষে যেন সহনাতীত হয়ে উঠ্‌লো। মা'র সহ্য তাঁর নামের সঙ্গেই তুলনীয় ব'লে সবাই দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শোকে তিনি নিস্পন্দ হয়ে যান, বিদ্রোহী হন না। এ কিন্তু তাঁরও সই-ছিল না।

সে দিন পূজার ষষ্ঠী! সারাদিন উপবাস ত তাঁর বার মাসই প্রায় ব্যবস্থা ছিল, চণ্ডীপাঠ নিজেই করছিলেন। কানে ঢুকতেই প্রাণ বিমোহিত হয়ে গেল! এ কি মানুষের গলার স্বর! অনেক বড় বড় ওস্তাদের হাতের বাজনা শুনেছি, গানও শুনেছি; এ ত সে সব জাতীয় নয়! এর তুলনা কার সঙ্গে দেবো? যে শুনে নি, সে বুঝতেই পারবে না! সব ভুলে তন্ময় হয়ে ব'সে শুনছিলাম। কখন্ পাঠ শেষ হয়ে গেছে, উঠে এসেছেন। মা'র কাছে ব'সে তার মাথায় হাত দিয়ে কি গভীর স্নেহ-স্বরেই বলছেন, "মা আমার! বড় দুঃখ পেয়েছ মা! আহা! ভগবান্ তোমার মনে শান্তি দান করুন, মা আমার!"

মা মুহূর্ত্তে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন, "বাবা! আপনি বেদজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, আপনি আমার সোমকে কেন ফিরিয়ে আনতে পারলেন না? আমি যে আপনাকে দেখে বড় আশা করে-ছিলেম!"

মা'র মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কথাই বল্লেন, যে সব কথা টাইফয়েড-রোগী বলেছিল, সেই সব, আরও কত মিষ্ট-মধুর ক'রে সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে কত যুক্তি দিয়ে মনের মধ্যে যেন একটা ছাপ বসিয়ে দিলেন। সেই দিনই প্রথম মনে হলো, আমাদের স্নেহপাশ কেটে গিয়ে সে এর চেয়ে ঢের ভাল আছে, এখানে যতই যা হ'তো, তার চেয়ে ঢের বড় হয়েছে; তার সুখে আমাদের সুখী হবার চেষ্টা করা উচিত! আমাদের স্বার্থই ত সত্য সব নয়। যাকে ভাল করতে চেয়ে অত চেষ্টা করা গেছলো, তার যথার্থ যা ভাল, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বজনের প্রার্থিত সেই ভালই যদি তার হয়ে থাকে, তার চেয়ে ভাল আর কি হ'তে পারে? তার পর এ-ও বুঝিয়ে দিলেন, আবার দেখা হবে। সে দেখা আর দেশে-কালে পরিচ্ছিন্ন নয়। জন্ম-জরা-ব্যাধিতে বাধিত নয়, সে মিলন চিরদিনের জন্যই চিরানন্দের মধ্যে! তা' ভিন্ন এখনই বা তাকে তোমরা হারিয়েছ মনে করছো কেন? সে কি নেই? যা সত্য, তা' অবিনশ্বর, তার ত কোন দিনই বিনাশ নেই। যা ছিল, তা থাকে, শুধু রূপান্তর প্রাপ্ত হয় ব'লে আমরা মনে করি—তাকে হারিয়েছি, কিন্তু বস্তুতঃ আর কোন কিছুরই ধ্বংস নেই! এ

ক্ষেত্রে তোমাদের স্নেহাস্পদ যদি জন্ম-মরণের বহির্ভূত পরমপদ-প্রাপ্তই হয়ে থাকে, তা হ'লে তার রূপান্তরপ্রাপ্তিও ত ঘটতে পারে না! সে একমাত্র তোমাদেরই আছে এবং নিকটের চেয়ে নিকটতম হয়ে, অহোরাত্র তোমাদের কাছে কাছেই আছে। মনে করলেই তাকে তোমরা দেখতে পাবে। এমন কি, স্মরণ করলে তার কাছ থেকেও একটা প্রেরণা আসবে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুতে পরমাণুতেই তার অক্ষয় সত্তা আজ পরিপূর্ণ হয়ে আছে, পরমানন্দময় শিব সত্য সুন্দরের অনবদ্যরূপে সে আজ স্বারূপ্য লাভ করেছে, তিনি কি এক মুহূর্ত্ত তোমাদের ছেড়ে আছেন যে, সে থাকতে পারবে? কত কথা, কত যুক্তি কতই শাস্ত্রতত্ত্ব দিয়ে আর তার সঙ্গে কি গভীর সহানুভূতি ও অপরিসীম করুণা ঢেলে দিয়ে পুত্রহারা জনক-জননীকে এ সান্ত্বনা দান, এ তাঁর কাছে যারাই পেয়েছে, তারাই জানে, এ কি! শাস্ত্র আমাদেরও কিছু কিছু পড়া ছিল, আমাদের বাড়ীতে শাস্ত্রতত্ত্ব ও সাধু-সঙ্গের অভাব কোন দিনই ছিল না। গীতা আমাদের শৈশব পার হ'তে না হতেই প্রায় কণ্ঠস্থ। শিশু-শয্যা থেকেই আমরা ঘুমপাড়ানী গানের বদলে সংস্কৃত শ্লোকের গানে ঘুম গিয়েছি, কথা যখন অস্ফুট, তখন থেকেই দেব-দেবীর প্রণামমন্ত্র আবৃত্তি শিখেছি। দাদাবাবুর কাছে দেশের বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিত্য সভা বসেছে, তাঁর কাছেই সর্ব্বদা থাকতুম, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-বেদান্তের মোটামুটি কথা সেই বয়েসেই এক রকম জানা হয়ে গেছলো। তার পর গুরুদেবের কাছে বেদান্তের আলোচনা—তা-ও সুযোগ পেলেই হতো। বিশেষতঃ আমার ন'বোন্ তার বিয়ের বছরেই বিধবা হবার পর থেকে আমাদের মধ্যে ইহ'র চেয়ে পরলোক, ভোগের চেয়ে মোক্ষর পথটারই সঙ্গে চেনা-শোনার চেষ্টাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই যে তাঁর সুখের কথা, এ যেন প্রাণবন্ত! এ যেন বাস্তবিকই কোন অমরলোকনিবাসী দেবতারই বাণী! এ শুধু আশ্বাস দিয়েই যেন ক্ষান্ত হয় না, অবিশ্বাসীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করায়। অপহৃত বস্তু যা' হ'তে চিরভবিষ্যতের জন্যই বঞ্চিত হয়েছি বোধ হয়েছিল, তাকে যেন আরও নিবিড় ক'রে বুকের মধ্যে এনে দিলে। পুলকে গা শিউরে উঠ্‌লো। হতাশায় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়া মনপ্রাণ নূতন আশার আশ্বাসে শীতাপগমে নবপল্লবিত গাছপালার মতই তাজা ও নতুন হয়ে গেল। মনে হলো, অনুভব করলেম, সত্যই সে যায় নি—সে আছে!

এই সময়কার লেখা কবিতা দুটি দেখলেই আমার মনের অবস্থা অনেকটাই বুঝা যাবে। কল্পনা ত আছেই, তবে সেই কল্পনার মূলে একটা বিশ্বাসের অনুভূতি না লেগে থাকলে নিছক কল্পনা কখনও দাঁড়াতে পারে কি? অন্ধ যে চাঁদ দেখেনি, সে কি চন্দ্রমার স্বরূপ পরকে বোঝাতে পারে?

আছে

কে বলে সে চ'লে গেছে কে বলে সে নাই?
সে আছে এ বিশ্ব-মাঝে, শত দিকে শত কাযে,
আমি যে সতত তারে দেখিবারে পাই।
কে বলে সে চ'লে গেছে এ জগতে নাই?
কে বলে সে চ'লে গেছে এ জগতে নাই?
অনলে অনিলে জলে, অনন্ত অম্বর-তলে
চন্দ্র-সূর্য্য-তারাদলে আছে সর্ব্ব-ঠাঁই।
কে বলে সে চ'লে গেছে এ জগতে নাই?

কে বলে সে চ'লে গেছে কে বলে সে নাই?
আছে সে এ চিত্ত-মাঝে, পূত ব্রহ্মচারি-সাজে,
হৃদয় ভরিয়া সে যে আছে সর্ব্বদাই
কে বলে সে চ'লে গেছে এ জগতে নাই?

কে বলে সে চ'লে গেছে কে বলে সে নাই?
নীরব নিঝুম রাতে, শান্ত সুপবিত্র চিতে,
ধ্যান-নেত্রে তার পানে চেয়ে থাকি তাই
মিশে আছে মনে-প্রাণে, কে বলে সে নাই?

সোমদেব

কত জন্ম পুণ্যবলে ক'টি বৎসরের তরে,
দেখাতে আদর্শ-চিত্র বুঝি এসেছিলে ঘরে?
জ্ঞান-বুদ্ধি ভালবাসা ভক্তি-প্রীতি মমতার,
ধৈর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি লাবণ্যের পারাবার।
বুঝি কোন যোগভ্রষ্ট যোগী কোন ঋষিরাজ,
এসেছিলে সমাপিতে প্রারব্ধের বাকী কায।
মৃত্যুঞ্জয়ে আরাধিয়া মহামৃত্যু করি জয়,
লভিলে অমৃত চিরবিবর্জ্জিত ব্যাধি-ভয়।
অসীম শান্তিতে মগ্ন থাক সেথা চিরদিন,
অনন্ত কালের তরে রহ অনাদিতে লীন।

বোম্বাইএর ভাইশঙ্করের ব্যাপারটাতেও কেমন যেন এ 'মিষ্ট্রী' রয়েছে! এ রকম অনেকবারই ঘটেছে। এর ম ঘটনা দু'একটা শুনেছি, পরের কয়টাই দেখেছি। অধিকাংশ ধনী ব্যক্তির মতই অপুত্রক। পীড়িতা স্ত্রীকে ভারত-প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। স্ত্রীর ইচ্ছা দীক্ষা নে কিন্তু গুরু পছন্দ হয় না, স্বপ্নে দেখে এক জনকে মনে ম স্বীকার করেছেন, তাকে পেতেই হ'বে। কাশী যখন এ তখন তাঁর নিদান অবস্থা। এখানে অনন্তাশ্রমের দণ্ডী স্ব সঙ্গে তাঁদের জানাশুনা ছিল, দণ্ডী স্বামী আবার এ চিনতেন। (আমাদেরই পাশে তখন তাঁর আশ্রম ছিল, সেটা আমাদের কেনা হয়েছে।) তিনিই ভাইশঙ্করকে ক'রে এনে দেখা করিয়ে দেন। স্ত্রীও এক দিন বিস্তর ক'রে মত করিয়ে পাল্কী ক'রে আসেন। দেখেই তিনি উঠে বলেন, "এ কি! এই যে আমার সেই গুরুদেব!" পর থেকে তিনি একবারে অন্নজল ছেড়ে প'ড়ে থেকে দীক্ষা দিতে সম্মত করিয়ে দীক্ষা নেন। (সহজে ক তিনি ত মন্ত্রদীক্ষা দিতেন না। জীবনে বড় জোর জন ক যদি তাঁর দীক্ষিত শিষ্য থাকে ত ঢের। তিনি বলতেন, দিলে শিষ্যের সমস্ত ইহ-পরলোকের ভারই গুরুকে বহন ক হয়। শুধু কানে মন্ত্র ফুঁকে দিলেই হয় না।) দীক্ষা বলেন, "সেই স্বপ্নের মন্ত্রই আমায় দিয়েছেন?"

অল্পদিনের মধ্যেই এঁর সেই রোগজর্জ্জরিত ভগ্ন শরীরের অন্ত হয়ে যায়, কিন্তু ভাইশঙ্কর যত দিন বেঁচে ছিলেন, মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করতে বোম্বাই থেকে আসতেন। মৃত্যুকালে এঁর ছেলেদের ক'জনকে হাজার কুড়ি টাকা দিয়ে যান।

এ রকম ঘটনা আমার জানা লোকের মধ্যেও দু'একটি ঘটেছে, আমি দেখেছি। এটিও অবশ্য আমাদের সাক্ষাতেই ঘটেছিল। মনকে বাঁধতে চাইলেও শরীর যেন বাধা মানছিল না। মা ও আমি খুব জ্বরে প'ড়ে গেলুম। কথা হ'ল, বাবার ছুটী ফুরালে তিনি বাঁকিপুরে ফিরে যাবেন, আমরা ওখানে কিছু দিন থাকব। তিনিই আমাদের চিকিৎসার ভার নিলেন। অবশ্য বাড়ীতে তিনি সেই সোমের জন্য দু'দিন ও আমার অসুখে দু'দিন মাত্র সেই এসেছিলেন। মোহিত বাবু প্রত্যহ এসে সব ব্যবস্থা করেন ও অবস্থা জানিয়ে ব্যবস্থা নেন। আমরা সেরে উঠে প্রত্যহই সোনারপুরার বাড়ীতে যেতে লাগলুম। ক্রমে দুপুর-বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরেই যেতুম, আর রাত এগারটা প্রায়ই ফিরে আসতে হ'ত। দেখতে দেখতে বাইরের ভয়-ভক্তির সম্বন্ধটা সে এক অকৃত্রিম অচ্ছেদ্য নিবিড় আত্মীয়তার ঘনপাশে জড়িয়ে পড়ল, সে যেন কত জন্মজন্মান্তরেরই চির-আত্মীয়তা! অত বড় বিদ্বান্, যার চেয়ে বিদ্যা আর কোন মানুষের পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় এক-মাত্র এত বড় পাণ্ডিত্য জগতে আর কোথাও কেউ কল্পনাও করতেই পারে না। তার পর চিকিৎসায় সকল মতের ঐ অদ্ভুত জ্ঞান, যোগবল প্রভৃতি বাদ দিয়েই দিচ্ছি, এমনইতেই এতগুলা বিষয় শিখতে একটা জন্মেই কি মানুষের কুলিয়ে ওঠে! দর্শন, বিজ্ঞান, ম্যাথামেটিক্স্, সাইকোলজী, ফিজিওলজী, ইতি-হাস, কাব্য, সাহিত্য যে যেমন লোক, যার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা, তাঁকে তাই নিয়েই অনর্গল আলোচনা ক'রে যাচ্ছেন।

আর চিকিৎসা, তা যতই দেখব না বলুন, ছাড়ান্ ত কোন দিনই দেখলুম না। নৌকার মাঝি থেকে, আর জমীদার, রাজা, প্লেণ্টী-মুন্সেফ, সব জজ, জজ কেউই বাদ দেন না। যত দুরারোগ্য ব্যারাম জবাব দেওয়া নিদান রোগী। ভালই বেশীর ভাগ হয়ে গেছে, তবে থাইসিসের নিদান রোগী, কথায় যাকে বলে শিবের অসাধ্য! তাঁকে শিবই না হয় বল্‌তে পারি, তার চেয়ে বড় আখ্যা ত আর দিতে পারি না। কিন্তু মধ্যাবস্থার থাইসিস-রোগীকেও বাঁচাতে দেখেছি। নিমোনিয়াজাত থাইসিস সারাও দেখা গেছে। ডাক্তার সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, ভাগলপুরের নিমাই বাবু ডাক্তার, রামপুরের মহেন্দ্র বাবু ডাক্তার, কটকের দেবেন্দ্র বাবু ডাক্তার, এঁদেরই অনেক নামজাদা ডাক্তারের সর্ব্বদাই নিজ পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য তাঁর বাড়ীতে বাস করতে ও আসা-যাওয়া করতে বৎসরের পর বৎসর ধরেই দেখেছি। এই সব বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে সেইখানেই আলাপ-পরিচয়। ক্রমে কারু কারু সঙ্গে সৌহার্দ্দ-স্থাপন ও পরে কুটুম্বিতাও ঘটেছিল। আরও কত অসংখ্য ছোট-বড় নানাশ্রেণীর লোকের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ক্রমে জমে হয়েছে! শুধু বাঙ্গালীই নয়, মহারাজা কাশ্মীর, বুন্দির রাজা, বোম্বাইএর ধনপতি ভাইশঙ্কর, আরও কত গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, শিক্ষিত ধনী লোক, কাশীর ধনকুবের রাজা মতিচাঁদ, মনোহর দাসের বংশধর, বাবু রাধাচরণ, যাঁরই রোগ-শোক অপুত্রকতার অভাব ঘটেছে, সন্ধান ক'রে ঐ দরজাতেই পৌঁছে-ছেন। এত যে উঁচুমাথা, সেই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে এই চোখেই নিত্য দেখেছি। আরও দেখেছি, দেশ-বিদেশের এত শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের চাইতে এই সামান্য এক জন ক্ষুদ্র ভক্তের স্থান তাঁর কাছে কত বেশী নিকটে ছিল! অর্থ-সামর্থ্যে কিছু ত তফাৎ হবার সে যায়গা ছিল না। যেহেতু, সেই জিনিষটাকে বদলে নিয়ে তিনি কোন দিন ত আর উপকার বেচেন নি।

সে বছরের ভাইফোঁটা বড় নিরানন্দ মূর্ত্তি ধরেই আমায় দেখা দিলে। সোম নেই। ছোট থেকে বরাবরই আমাদের ভাইফোঁটার উৎসবটা খুবই আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হতো। দাদাবাবু নিজে মাঝখানে বসতেন, দুপাশে আমার পিসীমার সকল সম্পর্কের ভাইরা, আমাদের ভাইরা, বাড়ীর জামাইরা, (তাদের শ্যালীদের ভাই হয়ে) আর বাড়ীর আশ্রিত অনাথ-প্রতিপালিত ছেলের দল, (বরাবরই এ বাড়ী চার পাঁচ জন থাকতোই) পুরনো সরকার-গোমস্তা, রাঁধুনী-বামুন, দাদাবাবুর সেবা করবার জন্য যে বামুনের ছেলেদের রাখা হতো, সেই সব্বাই-ই পর পর আসন পেতে ব'সে ফোঁটা নিত। প্রণাম, আশীর্ব্বাদ যথাযোগ্য পেতো ও দিত, দাদাবাবুকে ফোঁটা দেওয়ার জন্য আমরাও বোনফোঁটায় পেতুম নূতন সাড়ী, তাই প'রে ভোরে উঠে ধান-দুর্ব্বা-চন্দনের যোগাড় ক'রে ফোঁটা দেবার জন্য সে কি ঔৎসুক্য! আর কি আনন্দ! বাবার আমলেও যথা-সম্ভব সেটা বরাবরই রাখা হয়ে এসেছে। বাঁকিপুরে তাঁর অধী-নস্থ ওয়ার্ডদের, তাদের গার্জ্জেন-টিউটরদের শুদ্ধ এই ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ হতো। কারণ, তারা ছিল আমার ছোট ভাই ভাস্করের "নাবালো"-ভাইয়া, আর সাবালো-ভাইয়া—এই নাবালক ও সাবালক ভাইয়ারা এই সূত্রে আমাদের ভাইয়ের দলপুষ্টি করে-ছিলেন। গঙ্গা বংশী বিলাস হরিবাবু এ সবই আমাদের ফোটা পাবার সভার শোভাবর্দ্ধন করতো। আর আমাদের সাত ভাই ছিল তাদের মাঝখানে সপ্তর্ষির মতই উজ্জ্বল হয়ে! এবার তার মধ্যের একটি তারা খসে পড়েছে। আর কেহই কাছে নেই। জীবনে এই প্রথমবারই একসঙ্গে এ দুটো আঘাত বুকে এসে পড়লো!

সে দিন সকালে ভাইফোঁটার ফুলচন্দন ধান-দূর্ব্বো সাজিয়ে নিয়ে দূরস্থ ভাইদের কল্যাণ-কামনা এবং আর একটিকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে অনেক আশীর্ব্বাদ করলুম। এবার তাকে কাপড়-জামার ভাইফোঁটা ত দিতে পারলুম না। তাই একটা ছোট পদ্য লিখে তার উদ্দেশ্যে মনে মনেই ফোঁটা দিলুম। সেটা কোথাও লেখা নেই দেখছি। সবটা মনেও পড়ে না, একটুখানি যা' মনে আছে, তা' এই,—

ভাইফোঁটা

"অসীম ব্রহ্মাণ্ড যার ক্ষুদ্র ললাটের ছবি,
ভালের তিলক যার শতকোটি শশী-রবি,
অখণ্ডৈক একরস চিদানন্দময় যেই;—
অমৃত-স্বরূপে মিশে শোকতাপগ্লানি নেই।
সুখ-দুঃখ-ব্যাধি-জ্বালা মৃত্যুময় ধরণীর,—
পরশ করে না যারে, চিরানন্দ চিরস্থির!

মৃত্যুঞ্জয়ে আরাধিয়া মহামৃত্যু করে জয়,—
জীবন যে লভিয়াছে বিবর্জ্জিত রোগ-ভয়।
* * আজি শুভ ভাইফোঁটা—চন্দন তিলক সাথ,—
দিদির হৃদয়ভরা স্নেহরাশি—আশীর্ব্বাদ
সে আমার প্রিয়তম, স্নেহাধার ভাইটিরে,
গভীর স্নেহের সহ পরশুক ক্ষণতরে।"

তার পর গরদের জোড় ও ফল-ফুল-চন্দন নিয়ে তাঁর কাছেই ছুটে গেলুম, যাঁকে পেয়ে সোমের শোককেও আমরা সয়ে রয়েছি। একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "না না, এ সব কেন এনেছ ?"

বল্লেম,—"আজ যে ভাইফোঁটা, দাদামশাই ! সোমের বদলে আপনাকেই ত এ নিতে হবে। তা' না হ'লে মন ত আজকের দিনে কিছুতেই স্থির হ'তে চাচ্ছে না।"

দুই হাতে কাছে টেনে নিয়ে আমার বহুদিনের হা সেই স্নেহময় দাদাবাবুর মতই গভীর স্নেহে আশীর্ব্বাদ কর

সেই দিন থেকেই তিনি আমার দাদামশাই। দাদাব আর সোমেতে মিশিয়ে শেষে সেই এক জনের মধ্যেই সব হারানোর সকল ক্ষতিকে মিটিয়ে নেবার জন্যেই সম্পর্কটি পাতিয়েছিলুম। আর সে আশা আমার অপূর্ণ ছিল না। কতই না আমি পেয়েছিলুম ! আর আজ সঙ্গে সবই হারাল ! [ক্রম

শ্রীমতী অনুরূপা দে

মাটীর জাগরণ

ও মা মাটী—বক্ষে তব অমৃতের কূপ
অনন্ত অক্ষয়
সেই সুধা পিয়ে পিয়ে নিখিল ধরণী
তরু শ্যামময়।

নাহি জানি কবে জড়-বাঁধনের মায়া
সহসা টুটিয়া
বিচিত্র রূপের চিত্র দিকে দিকে আঁকি
উঠেছে ফুটিয়া।

নিগূঢ় তোমার প্রেম রঞ্জিলে সে দিন
গোলাপের দলে
শ্যামল মানস-তৃপ্তি হ'ল দিশাহারা
প্রান্তরে ফসলে।

পল্লবে পল্লবে এ কি হর্ষ শিহরণ
ব্যাকুল বাতাসে।
রক্ত-অধরের রুদ্ধ হাস্য-রেখা রাঙে
মেঘ পাশে পাশে।

তোমার মধুর মায়া শ্রাবণের মেঘে
দিগন্তে উজ্জ্বল
নবস্ফুট কদম্বের গন্ধের আনন্দে
পুলকে চঞ্চল।

সৃষ্টি-সাধনায় ছিলে সুদূর অতীতে
চেতনাবিহীন
আপন অসীম মাঝে আপনি যে হারা
দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন।

প্রকাশ লভিতে কবে বিপুল বেদনা
জেগেছিল প্রাণে
অনন্ত শোভায় দিল টুটায়ে ফুটায়ে
বিশ্বে সবখানে।

মুক্তি দিয়াছিলে তুমি—উৎসারি কি বুক
প্রথম মানবে
সৃষ্টির অনাদি শুভ্র অনন্ত উষায় !
না জানি সে কবে।

ক্ষীণ যোগসূত্রটকু আজও টুটে নাই
ছিন্ন দুটি প্রাণে
কি কথা কহিতে চাহে অবিশ্রান্ত তার
ছন্দে গন্ধে গানে।

বনচ্ছায়ে পল্লীপথে তরুর মর্ম্মরে
শুনি সেই কথা
মনে হয় এ যে মোর পরিচিত বাণী
জাগে আকুলতা।

মনে হয় ছিনু জড় ছন্দ গন্ধে হারা
ওরি মাঝে লয়
বিপুল প্রাণের বেগে উঠেছি জাগিয়া
নব প্রাণময় !

মা ব'লে মানুষ তাই গাহিয়াছে তব
মহিমার গান
জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার পরে
দেছে তব স্থান।

মধুর মায়ায় তব মুগ্ধ চিত্ত তার
গাহে তব জয়।
চাহে সে অনন্ত তব শ্যাম-বক্ষপুটে—
পাইবারে লয়।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব

উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সৃষ্টি অর্থে আমরা কি বুঝি, তাহা দেখা প্রয়োজন। সৃষ্টি বলিলে কার্য্য ও কারণের কথা আসিয়া পড়ে। সৃষ্টির অপর নাম কার্য্য। উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, এই কার্য্য বা সৃষ্টির কর্ত্তা বা কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই বিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যে বা সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছেন।

বিজ্ঞান এখনও বলিতে পারে নাই, কিরূপে জড়ে চৈতন্যশক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। ক্রমবিকাশবাদের দার্শনিক ভিত্তি নাই। জড়-পদার্থে জৈবশক্তি আগন্তুকভাবে উপস্থিত হইয়া ক্রমে বিকাশলাভ করিয়াছে। ইহাই ক্রমবিকাশবাদের গোড়ার কথা। জৈবশক্তি উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ প্রাণীর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রাণশক্তি কোথা হইতে আসিল ? ক্রমবিকাশবাদ ইহার সদুত্তর দিতে পারে নাই, বিজ্ঞান ইহার যথাযথ কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই। উপনিষদের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টি সাহায্যে এই সংসার সন্তোষজনক সমাধান করিয়াছেন। উপনিষদের মতে আনন্দ আদি ও অন্ত—আনন্দ কারণ ও কার্য—আনন্দই মূল ও তূল। তস্য "ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তাঁহার দীপ্তিতে সমস্ত জগৎ দীপ্তিমান্। "এই আনন্দ আকাশে বর্ত্তমান না থাকিলে কে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইত ? কে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিত ?" আত্মা বা ব্রহ্ম এক মাত্র চৈতন্যসত্তা। বিশ্ব-জগতের সমস্ত বস্তু এই চৈতন্যসত্তার বিভাগ। জড়ে বিকাশ আরম্ভ হয়, কিন্তু জড়পদার্থ একটা স্বাধীন সত্তা নহে। জাগতিক বস্তুনিবহ বিকাশের বিভিন্নস্তরে বর্ত্তমান। দেবতার ঈক্ষণে জড়ে চৈতন্যশক্তির উদ্ভব হইল। এই দেবতা প্রজ্ঞা বা অনন্তশক্তিশালী স্বয়ং জ্যোতিঃসম্পন্ন পুরুষ। এই প্রজ্ঞা বা পুরুষ সমস্ত পরিবর্ত্তনের জনক। এক সর্ব্বশালী কর্ত্তা পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান জড়কে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, উপনিষদ্ এই মতবাদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। ঈশ্বরকে জড়-ব্যতিরিক্ত ধরিয়া লইলে, দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। যেহেতু, ঈশ্বর ও জড় পদার্থরূপ ইতরেতর বিবিক্ত এবং দুই ধর্ম্মাবলম্বী বস্তু কল্পনা করিতে হয়। আত্মিস্তত্বের দর্শন এই দ্বৈতভাব প্রপঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু উপনিষদের মতে পদার্থ ও রূপ ক্রিয়াশীল ও প্রজ্ঞা ও নিষ্ক্রিয় জড় অদ্বৈতসত্তার দুই বিভাগ। জড়ই দেবতা। অগ্নি, জল ও পৃথিবীরূপ জড়বস্তুর প্রথম বিকারসমূহ এক চৈতন্যসত্তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। উপনিষদ্ সাংখ্যের দ্বৈতভাব গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মই জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র ভিত্তিভূমি। ব্রহ্ম অন্তস্তত্ত্ব—মহাসাগর। জগৎ-প্রপঞ্চের বিকার ও পরিবর্ত্তন বীচিবিক্ষোভিত মহাসাগরের বক্ষের স্ফীতি। জগৎপ্রপঞ্চের বিভিন্নবস্তু—বিকাশরূপ সূত্রের গ্রন্থিবিশেষ, ইহার আরম্ভ জড়ে ও সমাপ্তি আনন্দে।

তিনি নিজেকে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং তৎপরে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। প্রজাপতি নির্জ্জনতায় বিরক্ত হইয়া "যদিদং কিঞ্চ", যাহা কিছু বর্ত্তমান, সেই সমস্ত প্রসব করিলেন। লবণ যেরূপ জলে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ আত্মা জগৎ-প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ, উর্ণনাভ হইতে তন্তু, বাদ্যযন্ত্র হইতে স্বর নিঃসৃত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া সূর্য্য উত্তাপ দান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার উত্তাপ হ্রাস হয় নাই। (যদিও বৈজ্ঞানিকদের মতে এমন এক দিন আসিবে, যখন সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে এবং সূর্য্য শীতল হইয়া যাইবে।) সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইলেও তাঁহার শক্তি অব্যাহত ও অফুরন্ত রহিয়াছে। কার্য্য ও কারণের অবিচ্ছিন্ন তাদাত্ম্যসম্বন্ধ জ্ঞাপন ব্যপদেশে উপনিষদ্ বহুবিধ অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন উর্ণনাভ তন্তুবিস্তার করে, মাতা সন্তান প্রসব করেন, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রপঞ্চ জন্মলাভ করিয়াছে। ব্রহ্ম ও জগৎপ্রপঞ্চ দুই বিভিন্ন বস্তু নহে। জগতের এই নানাত্ব, এই বহুত্ব অবশেষে এক ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসিত হয়। যাহা কিছু জীবনধারণ করে, ব্রহ্মই তাহার একমাত্র উৎসস্বরূপ—ইহারা যেন "সূত্রে মণিগণা ইব"—এক সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায়।

ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ আমাদের অপরিজ্ঞাত। এই সম্বন্ধই মায়া। ইহা অনির্ব্বচনীয় ও অপরিজ্ঞেয়। কিরূপে সম্বন্ধহীন ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চের সহিত সম্পর্কিত, তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। তবে আমরা এইটুকুমাত্র জানি যে, জগৎপ্রপঞ্চ বর্ত্তমান। উহা কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না। জগৎপ্রপঞ্চ ধ্বংস হইলেও ব্রহ্ম অব্যাহত থাকেন—তাঁহার পূর্ণতার হ্রাস হয় না। ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চে বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি জগৎপ্রপঞ্চ নহেন। ব্রহ্মের পূর্ণতা অবিসংবাদিরূপে সত্য। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। এই বিশ্বজগৎ—এই নানাত্ব—সমস্ত বস্তুর বিকাশ বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ—সমস্তই ব্রহ্মে বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি স্বাধীন সত্তা। অতএব জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের সৃষ্টি নহে, ইহা সেই সর্ব্বশক্তিমানের আত্মপ্রসারণ।

ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে আমরা বুঝি যে, এমন এক সময় ছিল, যখন তিনি একাকী ছিলেন এবং তাঁহার জীবন-ইতিহাসের কোন এক নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে তিনি জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন। অতএব কারণরূপী ঈশ্বর কার্য্যরূপ জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা বলিলে ব্রহ্মকাল, স্থান ও কারণরূপ ত্রিবস্তুর অধীন হইয়া পড়েন। ইহাতে তাঁহার পূর্ণতার হ্রাস হয়। উপনিষদ্ এই মত গ্রহণ করিতে নারাজ। উপনিষদ্ বলেন, জগৎপ্রপঞ্চ চৈতন্যসত্তার বিকাশ। আত্মবিকাশ ব্রহ্মের স্বভাব। লুতাকীট অপর কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সৃষ্টি করে। পৃথিবী হইতে অপৃথগ্‌ভাবাপন্ন ব্রীহি-যবাদি ও ওষধিসমূহ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, দেহ হইতে তদ্বিলক্ষণ কেশলোম সম্ভূত হয়। এইরূপে সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত-নিরপেক্ষ অক্ষয় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শক্তি বা মায়া সত্তায় নিহিত। উপনিষদের বালক-স্বভাবাপন্ন সংলমতি ঋষিগণ জীবনকে স্বপ্ন বলেন নাই, তাঁহাদের নিকট

পৃথিবী ঊষর মরুভূমি বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। বিশ্ব-জগতের আনন্দ-প্রবাহ তাঁহাদের উদার হৃদয়ে মোহন ঝঙ্কার তুলিত। আকাশ-জল-তৃণ-তরু প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমে তাঁহারা শ্রীভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া অনাবিল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিতেন। জগৎ ও পার্থিব জীবন তাঁহাদের নিকট স্বপ্নের ন্যায় শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই।

সান্ত মানবমন স্থান, সময় ও কারণ লইয়া বিচার করে, কিন্তু যাহা এই ত্রিবস্তুর অতীত, তাহার সন্ধান পায় না। এই জন্য পরবর্ত্তী কালে জগৎ ও ব্রহ্মের সম্পর্ক বুঝাইবার নিমিত্ত বেদান্ত ইহাকে মায়া আখ্যা দিয়াছেন। এমন কি, শঙ্কর বলিয়াছেন, যাহা চরম সত্য, তাহা অদ্বৈত এবং ইহা বস্তুতন্ত্রতাহীন।

আত্মা একমাত্র সত্য। আত্মবিজ্ঞানে সকল বস্তু বিজ্ঞাত হয়। আত্মা ব্যতিরিক্ত নানাত্ব নাই, পরিবর্ত্তন নাই, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু আত্মার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন নাই, নানাত্ব নাই, ইহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। উপনিষদ্ কোথাও বলেন নাই যে, অনন্ত সান্তকে বাদ দিতে হইবে। যেখানে উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব সত্তা, তথায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উহা আংশিকরূপে সত্য। সান্ত অনন্তের মধ্যে। আত্মাই সমস্ত বিশ্ব। ইহা প্রাণ, ইহা বাক্য, ইহা মন, ইহাই বিশ্বজগতের সমস্ত। ব্রহ্ম মৃত্তিকার স্তম্ভে ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুতে বর্ত্তমান। ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বলিলে যাহা তাঁহার উপর প্রতিষ্ঠিত বা অন্তর্গত, তাহাও আপেক্ষিক সত্য সন্দেহ নাই। পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে। ইঁহা হইতে সমুদ্র, পর্ব্বত, নদীসমূহ, ওষধি, রস ও অন্তরাত্মা প্রসূত হইয়াছে। এই নানাত্মক বিকারবস্তুসমূহ থাকিলেও পুরুষই একমাত্র সত্য। "ন বিশ্বং নাম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদস্তি", পুরুষ হইতে পৃথক্ বিশ্ব নামে কিছুই নাই। বিশ্বও ব্রহ্মের কার্য্য। সুতরাং পরামৃতস্বরূপ ব্রহ্মই সমস্ত। অতএব ব্রহ্ম অবিসংবাদী সত্য হইলেও নানাত্মক বিকার-বস্তুসমূহের আপেক্ষিক সত্যতা আছে।

ব্রহ্মের বিকাশই সৃষ্টি। যেখানে যত বিকাশ, সেখানে তত আবরণ। বিকাশ ও আবরণের মধ্যে তিনি লুক্কায়িত রহিয়াছেন। জগতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিকশিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নিরঙ্কুশ প্রকৃতি আবরিত থাকে। সত্য বা প্রকৃত বস্তু জাগরিত নানাত্ব ও বহুত্বের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সান্ত মানব ভাবে যে, সে পৃথক্ সত্তা ও আত্ম-পোষণে নিযুক্ত। সে ভুলিয়া যায় যে, সে সেই এক পরম বস্তু হইতে জন্মলাভ করিয়া জীবিত আছে। তাহার এই ভুলই মায়া। মহা-মহীরুহের ব্যষ্টি পত্রপল্লব ভাবিতে পারে যে, তাহারা বৃক্ষ হইতে পৃথক্। তাহারা সূর্য্যকিরণে ও বায়ুহিল্লোলে পরিবর্দ্ধিত ও জীবিত থাকে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহারা এক বৃক্ষের অঙ্গীভূত, এক কাণ্ডের রসে পরিবর্দ্ধিত ও সজীব। কিন্তু একটি পত্রের জীবনীশক্তি সমস্ত বৃক্ষের জীবনীশক্তির সহিত একাঙ্গীভূত, এক-প্রাণ শাখাপ্রশাখা-পত্র-পল্লব-সমন্বিত মহীরুহে ওতপ্রোত। এক একটি তরঙ্গের নিম্নে বিশাল বিপুল জলধির উদ্বেল বক্ষের গভীরতম প্রদেশে এক বিপুল অমৃতভাণ্ড বর্ত্তমান। উপরিস্থিত বীচিমালা সুধারসের দূর আস্বাদনে আনন্দে নৃত্য করে। বস্তুনিবহের পৃথক্ত্ব ও স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিয়া আমরা তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্যের উপর যবনিকা টানিয়া দেই। সান্ত বস্তুর মিথ্যা কাল্পনিক সত্তা স্বপ্নীয় দীপ্তিকে ঘন মেঘাবরণে আচ্ছন্ন করে। অদৃষ্ট কারণের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া সত্য বস্তুর সন্ধান লাভ করিলে, অজ্ঞানের যবনিকা সরিয়া যায়, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় দূরীভূত হয়, সকল কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। আমরা বহির্বস্তু লইয়া ব্যস্ত, বাহ্য আকারের উপাসক, বিশ্ব-জগতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে একত্ব দর্শন করিবার শক্তি আমাদের নাই।

সত্য দুই প্রকার,—খাঁটী ও আপেক্ষিক, আমরা খাঁটী সত্য তাহাকে বলি—যাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যাহা স্বতই নিজ প্রভাব বিস্তার করে। যাহার আকার আছে এবং যাহা আমাদের ই উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই আপেক্ষিক সত্য। পণ্ডিতগণ যে ছেন,—"সত্যত্বং বাধরাহিত্যং"—যাহার কখনও বাধা হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহা খাঁটী সত্য। আমরা জগতের বস্তু উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু অহংভাবকে, আমিত্বকে, নিজের বাদ দিতে পারি না। অতএব আমিত্ব বা নিজসত্তাই খাঁটী আত্মসত্তাই ব্রহ্ম। এই সত্তা নিরঙ্কুশ। ইহাতে আপেক্ষিকতার নাই, ইহা স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবর্জ্জিত। ইহা অতএব প্রশান্ত, আত্মন্তবিহীন ও অক্রিয়। ইহা জ্ঞানময়, ইহার আত্মসত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান। যাহার অংজ্ঞান তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না। উপলখণ্ডের আত্মজ্ঞান অতএব ইহা খাঁটী সত্য বস্তু নহে, কিন্তু ইহা আপেক্ষিক সত্য, ইহা দ্রষ্টার নিকট সত্য বস্তু। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির পূর্ণজ্ঞান ততক্ষণ সে পূর্ণ সত্য নহে। সুতরাং দ্রষ্টার নিকট জগৎ আপে সত্য, কিন্তু খাঁটী সত্য বা ব্রহ্মের তুলনায় ইহা বাস্তব নহে। বান্ বস্তুর স্থিরতা বা স্থায়িত্ব না থাকিলেও আমরা ইহাকে মিথ্যা বলিতে পারি না। পূর্ণ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মভাবের সহিত জগৎপ্রপঞ্চের স্থায়িত্ব নাই বটে, কিন্তু এই জন্য আমরা ইহাকে একে মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না।

ব্রহ্ম দৃশ্যমান জগৎ হইতে ব্যতিরিক্ত, অথচ সমস্তই তাঁহার অন্ত পূর্ণজ্ঞানে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু থাকিবার অবসর নাই। সর্ব্ব অবস্থায় দ্রষ্টৃবা, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না। বহুত্ব, স্ব পারস্পর্য্য, স্থানে অবস্থিতি, কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ, দ্রষ্টা ও দৃশ্য দ্বন্দ্বভাব সত্য না হইলেও, একবারে মিথ্যাও নহে. যেহেতু, আত্মা পর্য্যন্ত আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান. বাষ্টি সমষ্টির মধ্যে। পূর্ণ সত্যের তুল জগৎপ্রপঞ্চের নানাত্ব আপেক্ষিক সত্য, এই মহান্ আদর্শের তুলনা করিলে উহার সত্যত্বের অভাব পরিস্ফুট হয়। অতএব নিষদের মতে জগৎপ্রপঞ্চই ব্রহ্ম এবং ইহা মিথ্যা নহে। ইহা না হইলেও, আপেক্ষিক সত্য।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্যাবিনো

ইংলণ্ডে নারী-জাগরণ

২

ভাগ্যহীনা মেরী ওলষ্টোনক্রেফ্‌ট

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এক মাতাল পিতার ঔরসে মেরী ওলষ্টোনক্রেফ্‌ট জন্ম করিয়া তাঁহার অধিকতর দুর্ভাগা ভগিনীদিগকে সাহায্য করিবার প্রথমে শিক্ষয়িত্রীরূপে এবং পরে অনুবাদিকা ও লেখিকারূপে অর্জ্জন করিতেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নারীর প্রকাশিত হয়। ইহাতে নারীর প্রতি পুরুষের অবজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয়তা (দাবী?) সমাজচিত্র ও যুক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে হইয়াছে। পুস্তকখানি বাহির হইবার কিছু দিন পরে প্রত্যক্ষ লাভের জন্য তিনি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। তথায় গিল্‌বার্ট জনৈক আমেরিকাবাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একাধারে পরিব্রাজক, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিখ্যাত যোদ্ধা এবং তথাকার এক জন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। ও মেরী কোন চুক্তিবদ্ধ না হইয়া স্বামি-স্ত্রীরূপে কিছুদিন বাস বৎসরকাল মধ্যে তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মিল। তাহার নাম হইল ফ্যানী। মেরীর অতিরিক্ত আদর-বস্তুকে গিলবার্ট

ক্রমে ক্রমে সে সরিয়া যাইয়া অন্যত্র বিবাহের যোগাড় করিল। মেরী কিন্তু সত্যই তাহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিতেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন গিল্‌বার্টকে ফিরাইয়া আনা গেল না, তখন এক দিন মেরী টেমস নদীতে ডুবিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈব-ক্রমে সংবাদ পাইয়া বন্ধুরা জল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন এবং যথোচিত সেবাশুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। তখন হইতে লেখা দ্বারা শুধু যে তিনি শিক্ষিত সমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মৌলিকতা, প্রতিভা, তেজস্বিতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ঔদার্য্য, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, স্নেহপ্রবণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহেরও যথেষ্ট পরিচয় দিতে লাগিলেন।

গিলবার্টের সহিত এই শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইবার কয়েক বৎসর পর গডউইন মেরীর সহিত মিলিত হইলেন। অবশ্য ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে গডউইনের সঙ্গে মেরীর ইতঃপূর্ব্বে একবার পরিচয় হইয়াছিল। মেরী প্রগল্‌ভা বলিয়াই তখন গডউইনের ধারণা ছিল। মেরীর জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনী সবেমাত্র তখন বাহির হইয়াছে (Letters from Norway, 1796)। গডউইনের ইহা খুব ভাল লাগিয়াছিল। মেরীর গুণাবলীর মূল্য বুঝিবার মত ক্ষমতা গিল্‌বার্টের ছিলই না, কিন্তু গডউইন মেরীর উপযুক্তই ছিলেন। মেরীও গড্‌উইনকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসার সম্বন্ধে গড্‌উইন এক যায়গায় লিখিয়াছেন,—

"The partiality we conceived for each other was in that mode which I have always considered as the purest and most refined style of love. It grew with equal advances in the mind of each. It would have been impossible for the most minute observer to have said who was before and who was after. One sex did not take the priority which long-established custom has awarded it, nor the other overstep that delicacy which is so severely imposed. I am not conscious that either party can assume to have been the agent or the patient, the toil spreader or the prey in the affair. When in the course of things, the disclosure came, there was nothing in a manner for either party to disclose to the other. . . . There was no period of throes and resolute explanation attendant on the tale. It was friendship melting into love."

গড্‌উইনের লিখিত 'পলিটিকেল জাষ্টিশ' এর (Political Justice) সম্বন্ধকল্পে প্রথমতঃ গড্‌উইন ও মেরী প্রচলিত রীতি অনুসারে বিবাহিত না হইয়াই 'সমারস্ টাউন'এর নিকটবর্ত্তী 'পলীগণ' পল্লীতে কিছু দিন বাস করিতে থাকেন। বন্ধুবান্ধবের দল দুই জনেরই পৃথক্ ছিল। অবশেষে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে 'ওল্ড ষ্ট্রীট পামকারস্ চার্চ্চে' তাঁহাদের যথারীতি বিবাহ হয়। দুইজনের মনের মিল বড় একটা ছিল না, তথাপি কোন কোন বিশেষ গুণের জন্য তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। গড্‌উইনের উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, তিনি নারীর সম্বন্ধে মেরীর মত-ই পোষণ করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী একটা প্রবন্ধে (On Friendship in Thoughts on Man) দেখা যায়, তিনি মেরীর মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন না। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহায্যার্থে তিনি কখনও লেখনী ব্যবহার করেন নাই।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে মেরী পুনরায় এক কন্যা-সন্তান প্রসব করেন। এই মেয়েকেই প্রসিদ্ধ কবি শেলী (Shelly) বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতামাতার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি কন্যার চরিত্রেও স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এই কন্যা প্রসবের ১০ দিন পরেই মেরীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে গড্‌উইনের যাহা কিছু উৎসাহ, উচ্চভাব ও আদর্শ ছিল, তাহাও এককালে বিনষ্ট হইল। অবশ্য গড্‌উইন লিখিত Memoir of Mary Wollstone Craft (মেরী ওলষ্টোনক্রেফ্‌ট-স্মৃতি) একটি উল্লেখযোগ্য রচনা সন্দেহ নাই।

মেরীর বিশেষত্ব

নারীজাতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক মেরীর পূর্ব্বেও ২।৪ জন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রচনার কাছে তিনি খুব অল্পই ঋণী। মেরীর মনটাকে গঠন করার পক্ষেও পর্য্যাপ্ত উপাদান তাহাতে ছিল না বলিলেই হয়—যদি তিনি স্বয়ং তাহা পূরণ করিয়া না লইতেন। মানসিক দাসত্ব হইতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের নিকট হইতে তিনি উৎসাহ ও দৃঢ়তা সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র। ফরাসী-বিপ্লব হইতে তিনি সাহস ও উন্নত ভাবধারা লাভ করিয়াছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতাই সে সব ভাব-প্রবাহে সজীবতা আনিয়াছিল। তাঁহার সময়ে মধ্যশ্রেণীর মেয়েরা সাধারণতঃ যেরূপ লেখাপড়ার সুযোগ পাইত, তিনি তাহাও পান নাই। এই সামান্য বিদ্যা লইয়া তিনি যে শুধু জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্বোপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা একটা হতভাগ্য পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হইত। তাঁহার পিতা মদ্যপায়ী, ঘোর অনাচারী, মাতাল, অকর্ম্মণ্য, অক্ষম, অমিতব্যয়ী, কোপনস্বভাব—এক কথায় পূর্ণ অমানুষ ছিলেন। কন্যারূপে মেরী অতি সাবধানে মাতাকে পিতার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেন। মেরীর এক ভগিনীকে অন্য এক লম্পটের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। স্বামীর নানা প্রকার অত্যাচার-নির্য্যাতনে যখন ভগিনীর সাময়িকভাবে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল, তখন মেরীই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া স্বগৃহে আশ্রয় দিলেন। সহরতলীর কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে মেরী তখন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে কোন প্রকাশক দয়া করিয়া শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মেরীর মৌলিক গ্রন্থ ও অনুবাদগুলি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অর্থাভাব তখন খুবই ছিল। দৈন্যগ্রস্ত হইয়া মেরী ও তাঁহার ভগিনীরা স্বভাবতঃই খুব মিতব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐ কারণে মিতব্যয়িতা বা অর্থের সদ্ব্যবহারে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তাঁহার লেখার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। অমিতব্যয়িতা বিশেষভাবে তখনকার মেয়েদের লজ্জাগত দোষ বলিয়া গণ্য হইত। সে যুগে মেরীর ব্যক্তিত্ব মিতব্যয়িতার সর্ব্বপ্রথম আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত সব দুঃখ-দৈন্যে এবং অনাচার-অবিচারও মেরীর ধৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই। গিল্‌বার্টের কৃতঘ্নতায় মেরীর মনে সাময়িক উত্তেজনা আসিয়াছিল মাত্র। লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে মিঃ ওপাইর অঙ্কিত মেরীর একখানা চিত্র সংরক্ষিত আছে। মেরীর লেখার সঙ্গে তাঁহার চেহারার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মেরীর সম্বন্ধে গড্‌উইন লিখিয়াছেন,—

"That smile of bewitching tenderness. . . which won, both heart and soul, the affection of almost every one that beheld it. She was in the best and most engaging sense, feminine in her manners."

সত্যই মেরীর লেখা হইতে তাঁহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এক দিকে যেমন সৎসাহসী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন, তেমনই অন্যদিকে সর্ব্বদা দেহ ও মনের সজীবতা উপভোগ করিতেন। পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইত। কারণ, তাঁহার ভালবাসায় বা কার্য্য-কলাপে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। সর্ব্বত্রই তাঁহার আচার

ব্যবহার স্বাভাবিক। তিনি একাধারে দয়াবতী ভগিনী, কর্ত্তব্যপরায়ণা কন্যা, অনুরক্তা প্রেয়সী, স্নেহময়ী সখী এবং বাৎসল্য-রসাপ্লুতা কোমল-হৃদয়া জননী।

নারীজনোচিত দয়া-মায়া-স্নেহের অভাব মেরীর হৃদয়ে কখনও ছিল না। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"Few have had much affection for mankind, who did not first love their parents, their brothers, sisters and even the domestic brutes whom they first played with."

পশুপক্ষী পর্য্যন্ত তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হয় নাই। গৃহপালিত পশুর প্রতি কর্ত্তব্যটা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে তাঁহার ভুল হয় নাই; ইহাতে তাঁহার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। গডউইন সত্যই লিখিয়াছেন,—"She was a worshipper of domestic life"—বস্তুতঃই ইনি পরিবারের পূজারিণী ছিলেন। স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য যেমন তাঁহার জীবনের কাম্য বস্তু ছিল, তেমনই ভ্রমক্রমে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেন না। কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলাকে তিনি মূর্ত্তিমান্ পাপের মত ঘৃণা করিতেন। কথায় ও কাযে বৈষম্য ছিল না বলিয়াই তাঁহার ব্যক্তিত্ব (নেতৃত্ব?) একটা সমগ্র দেশের ভাবধারার পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে মেরীর মত গডউইন অতি সুন্দর ভাষায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"She set a great value on a mutual affection between persons of an opposite sex, and regarded it as the principal solace of human life".

মাতৃহৃদয়ের কোমলতা-মিশ্রিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। এই কারণে শিক্ষয়িত্রীরূপে ছেলেমেয়েদের অকৃত্রিম ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিশুদিগকে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে ও সহজ উপায়ে সুশিক্ষা দিবার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। "নারীর অধিকারে" স্ত্রীজাতির স্কন্ধে সন্তানের সুশিক্ষার দায়িত্ব চাপাইবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরাধীনতারও দাবী করা হইয়াছে। শিশুকন্যা ফ্যানীর শিক্ষা-পদ্ধতি তিনি তাঁহার 'Lessons for Little Fanny' নামক পুস্তিকায় সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নারীর অধিকার

"নারীর অধিকার" লিখিয়াই মেরী অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে ইহার কিঞ্চিৎ সমালোচনা না করিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিবে। মেরীর "নারীর অধিকার"এর পুস্তক হিসাবে সহস্র দোষ থাকা সত্ত্বেও ইহা একটি অমূল্য গ্রন্থ সন্দেহ নাই। এই পুস্তকখানি ৬ সপ্তাহে অতি তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছিল। বক্তব্য বিষয়টি মোটেই শৃঙ্খলার সহিত সাজানো হয় নাই। পুনরাবৃত্তি দোষ বহু আছে; অপ্রাসঙ্গিক কথাও যথেষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ভাষার দোষের ত অন্তই নাই—কোন সময় আলঙ্কারিক শব্দের ঝঙ্কার খুব দেখানো হইয়াছে, আর কোন সময় বা অনাবৃত ঘরোয়া কথারই অবাধ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু এত সব দোষ সত্ত্বেও ইহাতে মৌলিক অনেক জিনিষ আমরা দেখিতে পাই! জানিবার, বুঝিবার ও ভাবিবার মত অসংখ্য নির্ভীকবাণী তাহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। মাঝে মাঝে কতকগুলি অধ্যায় পাওয়া যায়, যাহা পাঠ করিলে মেরীর অকাট্য যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিই তাঁহার রচনাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা সম্পাদনে অন্যের অপেক্ষা তিনি কখনই রাখিতেন না। তাঁহার লেখাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অন্যে তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিবে কি না, এরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়া মনের ভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত [illegible] সংস্করণে তাঁহার "নারীর অধিকার" বিক্রীত হইবার ইহাই অন্য কারণ বলা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাই সর্ব্বপ্রধান মৌলিক [illegible] বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

'নারীর অধিকারে' তিনি অতি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন পুরুষের স্ত্রীজাতির প্রতি এবং স্ত্রীজাতির তাঁহাদের নিজের প্রতি মনোভাব পরিবর্ত্তনের উপর নারীজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এ কথাটা এমন জোর দিয়া অন্য কেহ বলেন নাই। 'হুলব্রেক' এ কনডোরসেট্ হইতে 'মিল্' পর্য্যন্ত সামান্য কয়েক জন এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তাহাও দার্শনিক ভাষায়; সাধারণ লোক তাঁহাদের লেখার মূল্য বুঝিত না। মেরী দর্শনবাদের আবরণ অনাবৃত করিয়া সোজা ভাষায় সোজাসুজি স্ত্রীজাতির সমান অধিকার দাবী করিলেন। মেয়েদের শিক্ষা, বিবাহ-সংস্কার, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে সুযুক্তিপূর্ণ নূতন নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজনীতিতে মেয়েদের অধিকার দাবী করিয়া প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন—

"I may excite laughter, by dropping a hint, which I mean to pursue, some future time, for, I really think that women ought to have representatives, instead of being arbitrarily governed without having any direct share allowed them in the deliberations of Government".

তখনকার দিনে এমন সোজা ভাষায় শাসন-সংস্কারে মেয়েদের অধিকার দাবী করা কম সাহসের পরিচায়ক নহে। তাঁহার নির্ম্মম সমালোচনা দিগকে একবার তিনি অতি সুন্দর যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিয়াছিলেন—

"All tyrants want to crush reason, from the weak king to the weak father. . . Strengthen the female mind by enlarging it and there will be an end to blind obedience; but as blind obedience is ever sought for by power, tyrants and sensualists are in the right when they endeavour to keep women in the dark, because the power only wants slaves and the latter a plaything".

ইহা অতি সত্য কথা যে, অন্ধবিশ্বাসী শিষ্যসেবক না থাকিলে অন্ধ ভণ্ড গুরুর অবাধ ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ হয় না। স্ত্রীজাতির মনুষ্যোচিত শিক্ষা-দীক্ষা দিলে পুরুষের যথেচ্ছাচার অবাধগতিতে আর চলিতে পারিবে না, সে আশঙ্কা ত আছেই। ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি এবং নিত্যনৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারে পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধার্থে স্থলবিশেষে নারীদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে মাত্র। পুরুষকে হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে কোন কায করিবার ক্ষমতা বা অধিকার যেন স্ত্রীজাতির নাই।

তাঁহার রচনায় সমাজ এবং মানবজীবনের সম্বন্ধে কতকগুলি [illegible] খাঁটি কথা নির্ভীকভাবে বলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মেয়েরা আজ কিঞ্চিৎপরিমাণে পুরুষের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ না করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সংসাহসের কায আশা করা যায় না। [illegible] নারীর কর্ত্তব্য স্থানবিশেষে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা [illegible] মনুষ্যোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যত দিন পত্নী পতির প্রকৃত সহধর্ম্মিণী না হইয়া কেবলমাত্র গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী বা আজ্ঞাবহ দাসীরূপে থাকিবেন, তত দিন বিবাহকে পবিত্র মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এক জন পুরুষ অপর পুরুষ হইতে যেমন স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তেমনই নারী যে পর্য্যন্ত পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ করিয়া স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে, তত দিন পর্য্যন্ত নারী যোগ্য নাগরিক হইয়া পুরুষের প্রকৃত সহকর্ম্মিরূপে কায করিতে পারিবে না।

এই সকল অতি সরল সত্য কথা। ইহা বুঝাইবার জন্য আর বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে মেরী ইহাও বলিয়াছেন যে, পিতামাতা সমভাবে শিক্ষিত, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। শিশুসন্তানের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মাতার উপরেই ন্যস্ত থাকা উচিত। যে শিক্ষা নারীজাতিকে মাতার কর্ত্তব্য হইতে তিলমাত্রও বিচ্যুত করে, সে শিক্ষা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। যে আদর্শ মাতৃত্বের গৌরব নষ্ট করে, যাহা মাতৃত্বের প্রতি অনাদর জন্মায়, তাহা কখনই মাতৃজাতির অনুকরণীয় হইতে পারে না। তিনি এ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এমন সুন্দর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যে, আমি তাহা যথাযথ প্রকাশ করিতে না পারিয়া পাঠকবর্গের উপভোগের জন্য তাঁহার নিজের কথাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Whatever tends to incapacitate the maternal character takes woman out of her sphere".

বস্তুতঃ এই ক্ষুদ্র ছত্রটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। আমাদের শিক্ষিতা জননী ভগিনীরা নিশ্চয়ই এই ছত্রটিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিবেন।

সাধারণ বিদ্যালয়ে বালকবালিকার একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা মেরী ভাল মনে করিতেন। ইহাতে এক দিকে শিক্ষা বিভাগের ব্যয় হ্রাস পাইবে, অন্য দিকে ছেলেমেয়েদের পরস্পরের মধ্যে অস্বাভাবিক পৃথক্ ভাবটা ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। স্ত্রীপুরুষভেদে নৈতিক চরিত্রের কোন বৈষম্য তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। স্ত্রীজনোচিত স্বতন্ত্র ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বনের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার আগ্রহ ছিল। ব্যক্তিত্বের সম্মান সযত্নে রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদনে কখনও তাঁহার উদাসীন্য ছিল না। ব্রেনস্‌ফোর্ড মেরীর সমালোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন;—

"For her the duty always underlies the right, and the development of the self-reliant individual is a preparation for the life fellowship."

এই উক্তি মেরীর জীবনব্যাপী সাধনার আংশিক উপলব্ধিমাত্র বলা যাইতে পারে।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপে নারীসমাজ যেরূপ হেয় ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, আজ বিংশশতাব্দীর প্রথমপাদেও আমাদের দেশে (বিশেষতঃ বাঙ্গালায়) নারীজাতির মূল্য তদপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ভাল মনে করিবার কোন কারণ নাই।

"সাধারণতন্ত্র বা সাম্যবাদ সমস্ত কৃত্রিম অসামঞ্জস্য দূর করিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু প্রকৃতিজাত অসামঞ্জস্যে ইহার কোন অধিকার নাই। স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহা মানুষের গড়া নহে; ইহা প্রকৃতির দান"—এরূপ বালকোচিত যুক্তি আজকালও অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মুখে শুনা যায়। এ কথা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। যে সব বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের বৈষম্য প্রকৃতিগত, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করাও বৃথা এবং তাহা করিবার আবশ্যকতাও দেখা যাইতেছে না। কিন্তু পুরুষ-জাতির হাত-গড়া যে সব নিগড় মেয়েদের পায়ে পরানো হইয়াছে; তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবার সময় এখন আসিয়াছে—এই সাধারণতন্ত্রের যুগে সাম্যবাদীদের নিকট ইহা আশা করা যায়। কৃত্রিম শৃঙ্খলের কয়েকটি মাত্র নমুনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে; যথা—

১। গৃহস্থালী বিষয়েও স্ত্রী সর্ব্বত্রই স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবে।

২। স্ত্রীশিক্ষা একটা অস্বাভাবিক সীমাবিশিষ্ট গণ্ডীর ভিতর থাকিবে।

৩। স্ত্রীজাতির জন্য নীতিজ্ঞানের একটা বিশেষ সংজ্ঞা থাকিবে।

৪। সংস্কারসম্ভূত সামাজিক আচার-ব্যবহারের আইনকানুন শুধু স্ত্রীজাতিকেই মানিয়া চলিতে হইবে।

৫। আর্থিক অধীনতায় স্ত্রীলোকের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিবে।

৬। কালোপযোগী উচ্চ ভাব ও স্বাধীন চিন্তার প্রভাব হইতে নারীজাতিকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

৭। পশুপ্রকৃতি পুরুষের হাতে কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা অতর্কিতে আক্রান্ত হইলেও যদি তিনি অবলাজনোচিত সহিষ্ণুতা ত্যাগ করিয়া আততায়ীর সমুচিত শাস্তিবিধান, করেন, তবে তিনি নারীত্বের অপমান করিয়াছেন বলিয়া সমাজ-নায়কদের খাতায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকিবে ইত্যাদি।

এই সব সর্ত্ত কি কখনও প্রকৃতির দান হইতে পারে? ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, পুরুষজাতির সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেটুকু আবশ্যক, সেইটুকুর জন্যই যেন স্ত্রীজাতিকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যথা স্ত্রীজাতিকে মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্ত না করিয়া যেন পশুপক্ষী প্রভৃতির দলভুক্ত করা হইত। আমার লিখিতমত সাজানো নিয়মাবলী কোন সমাজে প্রচলিত না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধটা নগ্নভাবে দেখিতে গেলে এরূপই দাঁড়ায়—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে ভালমন্দজ্ঞান, যে বিচারশক্তি, যে বিবেক এবং সর্ব্বোপরি যে ভগবৎজ্ঞানের জন্য মানবসমাজকে পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতরপ্রাণীর পর্য্যায় হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহাতে নারীজাতির যেন প্রবেশাধিকার নাই।

নারী কি উক্ত সব বিষয়ে বিরাট মানবসমাজে আপনার সংখ্যানুপাতে ও যোগ্যতানুসারে যথোপযুক্ত স্থানলাভের দাবী করিতে পারে না? এক্ষণে সংখ্যাতীতবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুযোগ পাইলে স্ত্রী-জাতিও মানবসমাজের কল্যাণার্থ আপনার অর্দ্ধেক দায়িত্ব বহন করিতে পারে। প্রকৃতি তাহাদিগকে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। যে সব তথাকথিত নেতা আজ দেশের মুক্তি, অন্ত্যজ জাতির মুক্তি, জাতির মুক্তি প্রভৃতির দাবী করিতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ জননী, ভগিনী, পত্নী, কন্যার কথাও একটু ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। সংস্কারকদেরও এটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, একটা জাতির অর্দ্ধেকসংখ্যক সভ্য যদি পূর্ণমাত্রায় কুসংস্কারান্ধ ও অক্ষম থাকে, তবে অপরার্দ্ধ যতই অগ্রসর হউক না কেন, তাহাদিগকেও এক দিন না এক দিন পিছন ফিরিয়া আসিতে হইবেই হইবে। সামান্য একটা ক্রীতদাসেরও স্বোপার্জ্জিত বিত্তে অধিকার থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকের তাহাও নাই। স্ত্রীলোকমাত্রেই শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর কার্য্যাকার্য্যের যন্ত্র মাত্র। স্বার্থান্বেষী পুরুষসমাজের মাপকাঠীতে এই ত নারীর মূল্য! শিক্ষিতা মহিলারা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীজাতির স্বভাবসুলভ (?) পরনির্ভরশীলতার দরুণ কেবল যে পুরুষ ও নারীজাতির সম্বন্ধটাই বিসদৃশ হইয়াছে, তাহা নহে, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের ইচ্ছা এবং প্রকৃতির নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা করা হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালার তথা ভারতের এই ঘোর নারী-সমস্যার দিনে বাঙ্গালার 'ব্রাহ্মণ মহামণ্ডল' যে উদারতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা সত্যই আশাপ্রদ। সংবাদপত্রসেবিসঙ্ঘও নারীজাতির উন্নতিকল্পে প্রবল জনমত গঠনে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সোনার বাঙ্গালার উর্ব্বরা-ভূমিতে উপযুক্ত বীজ বপন করিলে উপযুক্ত ফলের আশা সর্ব্বদাই করা যায়। এই অনুকূল জনমতান্দোলিত বঙ্গদেশে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত নারী-সঙ্ঘ যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে কৃতকার্য্যতার খুবই আশা করা যায়। এরূপ সঙ্ঘকে সুপরিচালিত করিবার জন্য মেরীর মত শিক্ষিতা ও তেজস্বিনী মহিলার অভাব এ দেশে হইবে না।

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনসেবা *

সর্ব্বপ্রধান যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সেবা। মানুষের জন্য মানুষের ইহার অপেক্ষা বড় ধর্ম্ম, তাঁহাদের জন্য করিবার ইহার অপেক্ষা বড় কর্ম্ম আর কি হইতে পারে, তাহা জানি না। ত্যাগই ইহার মূল, আর এই ত্যাগের তৃপ্তির কাছে ভোগের সুখ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই সেবাধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানটি এক সেবাপরায়ণা পরমদানশীলা মহীয়সী নারীর পুত নামে সংযুক্ত হইয়া সত্যই বড় শোভন হইয়াছে।

এ দেশে পূর্ব্বকালে এরূপ সভাসমিতির দ্বারা জনসেবার ব্যবস্থা ছিল কি না, জানি না, তবে তখন প্রার্থী বা অভাবগ্রস্তের প্রার্থনা পুরণের জন্য এরূপ সভাসমিতির মুখ চাহিবার প্রয়োজন হইত না। তখন গৃহস্থের যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তাঁহারা তদনুরূপ সাহায্য করিয়া আতুরদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দরিদ্রসেবা, অতিথি অভ্যাগতদের সেবা তখন গৃহস্থের কর্ত্তব্যধ্যে পরিগণিত ছিল। সামান্য গৃহস্থও কখন মুষ্টিভিক্ষা না দিয়া অভ্যাগত ভিক্ষুককে ফিরাইতেন না। আর আজ যখন সে দিন ক্রমে অতীতের গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে, যখন পরের দুঃখ পরের অভাব দেখিবার অবসর ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, যখন ভিক্ষুকের কাতরক্রন্দন কর্ণকুহরে অসহ্য হওয়ায়, তাহাদিগকে থামাইবার জন্য দেশে নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে, তখন দেশের যুবকেরা এমন উদারের জন্য লালায়িত, বাঙ্গালা দরিদ্রের জন্য অপরের দ্বারে দ্বারে যাইয়া মুষ্টিভিক্ষা করিয়া আনিয়া উহাদের মুখে অন্নদানের ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা মহত্তর কায কি হইতে পারে, জানি না। আজকাল যখন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকাংশ ক্ষমতাপন্ন লোককেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাউন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গ্রাম্য পঞ্চায়তের সভ্য হইয়া দেশের কায করিবার জন্য ব্যস্ত, এই ত্যাগের মন্ত্র লইবার জন্য যখন লোক উন্মত্ত, এমন কি, এই পথ ধরিয়া দেশসেবা করিবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়েও কুণ্ঠিত নন, তখন ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে হাসিমুখে যাঁহারা এই উন্মাদনাহীন দীনসেবায়, দরিদ্রনারায়ণের পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন, জানি না, মনুষ্যসমাজের বন্ধু তাঁহাদের অপেক্ষা আর কে আছেন? ইহাই প্রকৃত দেশসেবা, ইহাই সেবাধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কায। দেশসেবার বৃত্তি যাঁহারা লইতে চাহেন, ইহাই তাঁহাদের প্রথম সোপান। দেশসেবকের গৌরবময় নামের অধিকারী যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহারাই। যিনি অন্তরে-বাহিরে এই পুণ্যময় কাযে দেহ-মন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য। তিনি যুবক হউন, বালক হউন, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

ক্ষুধাতুরের অন্ন, রোগাতুরের সেবা, শোকাতুরের সান্ত্বনার জন্য যাঁহারা ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইয়াছেন, আত্মীয়বন্ধুজন শ্মশানে বিপন্ন জনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে আর মহত্তর কার্য্য কিছু নাই।

এই সব কার্য্যের জন্য যে যে শক্তির প্রয়োজন, তন্মধ্যে অর্থশক্তি কম নহে। এই সঙ্ঘের সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই যুবক, তাঁহাদের অনেকেই হয় অল্পদিনমাত্র পঠদ্দশা ত্যাগ করিয়াছেন, নয় এখনও ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের অর্থস্বাচ্ছল্য থাকা সম্ভবপর নহে। এ জন্য স্থানীয় সকল সম্পন্ন ব্যক্তির সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্য আবশ্যক। যে সব মহানুভব ব্যক্তির নামের সহিত ইহা বিজড়িত, তাহাতে সে অভাব না হইবারই কথা। আর যদি এই সমিতি এখনও সকলের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ না হইয়া থাকে, ইহার কার্য্যের দ্বারা অচিরে তাহা লাভ করিতে পারিবে; এ কথা মনে রাখিতে হইবে, প্রথমে উপযুক্ত অর্থবলের অভাব থাকিলে নিরাশ হইবার কারণ নাই। অর্থই সর্ব্বপ্রধান নহে। যদি হৃদয়ে আসক্তি থাকে, হৃদয়ে ঐকান্তিকতার অভাব না হয়, তবে হয় স্বচ্ছলতা না থাকিলেও অনেক কিছু করিতে পারা যায়। আর ভিন্ন নিজেদের কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকিলে, সমাজের যথার্থ চিত্র যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিলে অর্থাভাবে সেবা কখন পড়িয়া থাকে না। এ জন্য চাই কর্ম্ম, চাই একতা, চাই শক্তি। এই শক্তিতে যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহাদের অসাধ্য এমন কি আছে বলিয়া জানি না, যাহা মানুষের পক্ষে সাধ্য। এই শক্তির মূল হইতেছে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থকে তুলিয়া যাওয়া। দেশের দশের কাযে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই সেই কাযের যে স্বার্থ, তদ্ভিন্ন কাযের সংস্রবে স্বতন্ত্র স্বার্থের স্থান থাকা চলিতে না। এই স্বার্থের সংঘর্ষে কত ভাল ভাল প্রতিষ্ঠান যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। মানুষের সেবা, সমাজের দেশের সেবা যদি আপনাদের অন্তরের কাম্য হয়, তবে আমার বিশ্বাস, আপনাদের কাছে কোন সঙ্কীর্ণতা—দুর্ব্বলতার স্থান হইবে

আমি যতদূর জানি, এই প্রকার সভাসমিতির প্রাণ অধিকাংশ সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানগণ। এখানকার কথা আমার জানা যদি এখানকার অবস্থাও এইরূপই হয়, তাহা হইলেও সামান্য সংগ্রহীন হউন, প্রতীকারের চেষ্টা আপনাদেরই করিতে হইবে সকলে মিলিয়া সে কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে ভগবানের সাফল্যলাভ হইবেই। বাঙ্গালার বুকে যে নিত্য শ্মশান বিস্তারিত হইতেছে, ইহা রোধ করিতে যদি কেহ পারে ত সে ছেলেরাই পারিবে। ইংরাজী প্রবচন—"God helps those helps themselves" ইহা আমি বিশ্বাস করি। অর্থাভাবে কায করা যায় না, ইহা সত্য, কিন্তু উপযুক্ত মানুষ থাকিলে কাযের জন্য অর্থসংগ্রহে বাধে না। আমি মনে করি, অর্থ নহে, মানুষ আগে। ইহা বুঝাইবার জন্য বেশী কথা বলি আবশ্যক হইবে না। মাড়বার, বিকানির প্রভৃতি দেশের সামান্য বা অশিক্ষিত লোকরা অনেকে রিক্তহস্তে বাঙ্গালায় আসিয়া অল্প বৎসরের মধ্যে কিরূপ প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেছে, তাহা আমরা না দেখিতেছি। অবশ্য পরহিতব্রত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানব সর্ব্বত্র নহে। কোন সমিতিতেই এমন মানুষ অনেক থাকে না। যে উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়, কায করেন এক বা দুই জন; সহানুভূতিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাদের অনুসরণ—অন্ততঃ অনুমোদন করিয়া থাকেন। পাঁচ জনে কায করিতে হইলে অথবা পাঁচ জনের কায করিতে হইলে এ সহানুভূতি কিন্তু চাইই। ইহার অভাব যেখানে সেখানে বিশিষ্ট কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রতিভাও ম্লান হইয়া অবশেষে প্রতিষ্ঠানকে শিথিলমূল করিয়া ফেলে। সুতরাং কার্য্যকরী শক্তি সকলের মধ্যে থাকিলেও একতাই বহু সমস্যাসমাধানের মূলমন্ত্র। অবশ্য এ বলিতে কখন ইহা মনে করিতে পারা যায় না যে, প্রত্যেক লোক সকলে একমনে একমতে সকল কায করিতে পারিবেন। এ অল্প, কোন ক্ষেত্রে কোথাও কোন প্রতিষ্ঠানেই তাহা হয় না। অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি মধ্যে পার্থক্য না থাকে। মন যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে জন কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রেরণায় কোন কাযই প্রায় দুঃসাধ্য থাকে। সমবায়ের নীতিতে তখন দেশের মধ্যে সুশিক্ষার ব্যবস্থা, দীনদুঃখী চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা, এমন কি, অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা, কথঞ্চিৎ সুলভ করিয়া আনা যায়। আজ আমরা মিউচুয়াল বেনিফিটের উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছি, আর আমাদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ সামাজিক কার্য্যে লৌকিকতা, আদান-প্রদান তুলিয়া দিয়া সমাজসংস্কারের চূড়ান্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, অথচ ইহাও একটা সমবায়-নীতির উদাহরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমবায় নীতি বৈদেশিক হইতে পারে, কিন্তু এ নীতি আমাদেরও। ইহার মধ্যে জাতীয় ভাবধারার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। সুবল ব্যক্তিসমষ্টিও অনেক বড় কায করিতে পারেন, অনেক অভাব দূরীকরণ করিতে সমর্থ হন।

সাহায্য-সমিতি দ্বারা জনসেবা-প্রসঙ্গে একটা কথা এখানেও বলিতে ইচ্ছা করি। এ সব প্রতিষ্ঠান কতকটা পাশ্চাত্য অনুকরণেই ক্রমে ক্রমে এ দেশে প্রচলিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। ইহার দ্বারা বহু লোকের বহু উপকার সাধিত হইতেছে, ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু ইহার কার্য্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য। আমাদের দেশে গোপন দানই শাস্ত্রসম্মত এবং দেশের লোকের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী উহাই উপযোগী। সভাসমিতির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে হওয়া অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না, কিন্তু গৃহীতা ও গ্রহীতার দিক দিয়া ইহা যে অনেক সময় বিশেষ হীনতার কারণ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দাতার কাছে গ্রহীতা ও গৃহীতা যে সকল সময় নিরূপদস্থ, তাহা সত্য এবং সকলেই জানেন; কিন্তু এই প্রকার দানগ্রহীতা শুধু দাতার কাছে নহে, অনেকের কাছে তাহাদের সাহায্য গ্রহণের কথা প্রচারিত হওয়ায় ফলে তাহাদিগকে সঙ্কুচিত ও পীড়িত হইতে হয়।

অভাবপীড়িতদিগের উপকারের জন্যই যখন এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যাহাদের উপকারের জন্য এই সকল প্রচেষ্টা, কেবলমাত্র তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করা উচিত। যে দানপ্রাপ্তির ফলে গৃহীতা ও গ্রহীতার মন সঙ্কুচিত না হয় বা তাহাদের এ জন্য হীনতার ব্যথায় ব্যথিত না হইতে হয়, যত দূর সম্ভব এমন দানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ভাল হয়। উহাই শ্রেষ্ঠ দান। প্রার্থিগণ দান বা সাহায্য গ্রহণজনিত বেদনা অনুভব না করিয়া অসঙ্কোচে প্রফুল্ল মনে যাহাতে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত সমিতি ও ভাণ্ডারের সাহায্য লইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা চিন্তা করিয়া উহা কার্য্যকরী করাই সঙ্গত। এ জন্য আমার মনে হয়, একমাত্র উপায়—সাহায্য গ্রহীতা বা গৃহীতা যাহাতে তাহার গৃহীত দানের প্রতিদানে দাতাকে কোন আকারে কিছু দিতে পারেন, তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া। এমন কিছু যদি করিতে পারা যায়, যাহাতে তাহারা আপনাদের মনকে ঋণে করিতে পারেন, এ দান নয়, সাহায্য নয়, তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ ন্যায্য উপার্জ্জন; তবেই ঠিক হয়।

নিতান্ত আতুর ও হীনবল লোকের কথা ছাড়িয়া দিলে অর্থহীন নিরুদ্যম নরনারীর কাছেও এমন কিছু থাকিতে পারে, পৃথিবীতে যাহার মূল্য আছে। উহা তাহাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি। যাহার যেমন শক্তি, তাহাকে তদুপযোগী কায দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পারিশ্রমিক মনে করিয়া ভাণ্ডারের অর্থগ্রহণের সুযোগ করিয়া দিন। এ জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী কার্য্য আমার মনে হয়, চেষ্টা করিয়া কতকগুলি ছোট ছোট গৃহশিল্পের প্রবর্ত্তন করা। যাহাদের জন্য আপনাদের এই স্বার্থহীন প্রচেষ্টা, ইহার দ্বারা তাহাদের লাভ, আপনাদের লাভ এবং দেশের লাভ। দেশের দুর্দ্দিনে ভিখারীকে ভিক্ষা দ্বারা তাহাদের অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া অপেক্ষা যাহাতে তাহারা একটু উন্নতভাবে জীবনযাপন করিতে পারে, দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক হইয়া নিজেদের জীবনের একটুও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে, তাহার জন্য দেশহিতৈষিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে শুধু সেই ভিক্ষার্থী দলের উপকার করা নহে, দেশেরও যথেষ্ট উপকার করা হয়। সমগ্র দেশের এই বেকার ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের সহজলভ্য শক্তিসমবায়ে কর্ম্মী দেশবাসীর চেষ্টায় দেশের একটা সমস্যা দূর হওয়ার সহিত অনেক কিছু কাযের সূচনা হইতে পারে।

আজ বাঙ্গালায় আর সে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই বলিলেই হয়। তখন এক জনের অসুখ হইলে তাহাকে দেখিবার—শুশ্রূষা করিবার লোকের অভাব হইত না। এখন পরিবার বলিতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাই মোটামোটি বুঝায়, সুতরাং সংসারের এক জন রোগগ্রস্ত হইলে তাহার শুশ্রূষা করা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দিকে লোকের অভাব, অন্য দিকে রোগি-পরিচর্য্যা বিষয়ে অজ্ঞতা, অথচ নিত্য নূতন ব্যাধির আবির্ভাব। এ সময় সত্য দেশে এরূপ এক দল লোকের দরকার হইয়াছে, যাঁহারা এ সমস্যা দূর করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। আপনারা সেই ব্রতই গ্রহণ করিয়াছেন। বিসূচিকা ও বসন্ত হইতাদি সংক্রামক ব্যাধিতে অনেকে অনেক সময় এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পায় না, সেবা ত দূরের কথা—এ ব্যাধিকে মানুষ এমনই ভয় করে, আর আপনারা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে তাহাদের সেবার ভার লইয়া ভাল করিয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আজ যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য, কাল তাহাই অনাত্মীয়ের প্রতি প্রীতিরূপে দেখা দিবে এবং অদূর-ভবিষ্যতে দেশ প্রীতির স্বরূপ হইয়া নানা কল্যাণের আকর হইবে।

আপনারা কবিতা আবৃত্তি, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা, চরকা ব্যায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্থানীয় যুবকদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। ইহা আপনাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে আমার বলিবার কথা শুধু, আপনাদের সমিতিতে যে সকল বিষয় অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সবই হিতকর। তাস, পাশা, দাবাখেলার একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থাকেও আমি পল্লীর পক্ষে কল্যাণকরই মনে করি। এরূপ খেলার ব্যবস্থা থাকিলে যুবকদিগকে অনেক সময় অনেক অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিতে সহায় হয়। কিন্তু একটা বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি, ছোট ছোট ছেলে বা ছাত্রদের পক্ষে যাহা অবাঞ্ছনীয়, এমন যে সব বিষয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহাতে যেন তাহারা যোগ দিতে না পারে। ছাত্ররা খেলাধুলা অবশ্য করিবে, কিন্তু ওরূপ কোন কিছুতে মাতিয়া উঠা ভাল নহে। এমন কি, পড়াশুনায় ও কোন একটি বিষয়ে বিশেষ অত্যধিক ঝোঁক থাকিলে অনেক ছেলের অপর বিষয়ে ক্ষতি হইতে দেখা গিয়া থাকে।

আর একটি কথা, আপনারা আপনাদের স্থানীয় অভাব ও প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া কেবল তৎপ্রতীকারেই যত্নবান্ হইবেন। সে জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা গড়িয়া তুলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন; কিন্তু অন্য কোথায় কি সান্ধ্য সমিতি আছে, কোথায় ক্লাব আছে, এখানে তাহা নাই, সুতরাং তাহা আপনাদেরও করিতে হইবে, এভাবে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল। আবশ্যক হয়া থাকে, তাহা করিতেই হইবে, কিন্তু কাহারও দেখাদেখি অনুকরণে লিপ্ত হইয়া বা যুবাজনের সাময়িক উত্তেজনায় অথবা হুজুগে পড়িয়া কিছু গড়িতে যাওয়ায় কোন লাভও নাই, বরং কার্য্যহানি ঘটিয়া লোকের অনাস্থা আনয়ন করে। আজকাল উক্তরূপ কারণ হইতে উদ্ভূত অনেক অনুষ্ঠানের নিত্য উদ্ভব ও বিলয় দেখিয়াই এ কথা বলিতেছি। যাহার ভিতর প্রাণের সাড়া না থাকে, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না।

ব্যায়ামের দিকে আপনাদের লক্ষ্য আছে, ইহা খুবই ভাল কথা, কিন্তু ঠিক এ বিষয় আপনাদের ব্যবস্থা কিরূপ জানি না। আমার মনে হয়, এই দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হওয়া দরকার। ব্যায়াম আবশ্যক, সুতরাং একটি ব্যায়ামক্ষেত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া চলিবে না, উহা বিধিমত হওয়াই দরকার। ছেলেদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাহা কিছু আপনাদের আয়াসসাধ্য, বিশিষ্ট জনের পরামর্শমত তাহা করা উচিত। বিষয়টির উপকারের তুলনায় ব্যয় এমন কিছু অধিক নহে। অর্থ ভিন্ন অনেক কিছু ভাল কায সুনির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন, এ কথা যেমন অস্বীকার করা যায় না, চেষ্টা ও উদ্যম থাকিলে অর্থব্যয় ব্যতিরেকেও তেমনই অনেক আবশ্যকীয় কায করা যাইতে

* বহরমপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী এসোসিয়েশনের অষ্টবার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

পারে। আপনারা অনেকগুলি বিষয় একসঙ্গে হাতে লইয়াছেন, আপনাদের সামর্থ্য, অবসর ও সুযোগের আভ্যন্তরীণ পরিচয় আমি সম্যক্ অবগত নহি। সে কারণ একটু সঙ্কোচ হয়, নচেৎ বলিতে ইচ্ছা হয়, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা বা দরিদ্র ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা ভিন্ন লোকশিক্ষার জন্য আপনারা আরও একটু মনোযোগী হইলে ভাল হয়। সামাজিক মিলন সহযোগে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয় বক্তৃতা দ্বারা লোকশিক্ষা বা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা কারিকর বা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার চেষ্টা করিলে প্রভূত উপকার হয়। সভ্যদের মধ্য হইতে কয়েক জন কৃতবিদ্য উৎসাহী যুবক এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া পরিশ্রম করিলে তাহা কার্য্যকরী করা অসম্ভব নহে। ইহাতেও উপকারের তুলনায় ব্যয় অতি সামান্য। শিশু ছেলেমেয়েদের ভালরূপ প্রাগমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠশালার অভাব অনেক সহরেও দেখা যায়। জানি না, এখানে সে অভাব আছে কি না। যদি থাকে, তবে এই সমিতির চেষ্টায় অনায়াসেই তাহা দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ সবই আবশ্যক বিষয় এবং দেশের লোক মনোযোগী না হইলে কোন দিনই এ সব কায অপরে করিয়া দিবে না।

কর্ম্মের পথে বাধা অনেক, কিন্তু একান্তিক চেষ্টা থাকিলে এ সবের কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা খাঁটি, যাহা সত্য, তাহাকে বাধা দিতে পারেন, এমন কেহ নাই। আপনারা অনেকেই বোধ হয় সেই নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর ওয়াসিংটন্ ব্রুকারের কথা জানেন। তিনি নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়বলে কি অসাধ্যসাধনই না করিয়াছিলেন। সমষ্টিগতভাবে চেষ্টায় এই সমিতি হইতে অনেক বিরাট্ কায হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে।

সমিতির সেবা-বিভাগ যেমন সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক এক জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে থাকায় সুপরিচালিত হইয়া নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তেমনই লোকশিক্ষা, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও আপনাদের মধ্যে কোন বিশেষজ্ঞের অধীনে একটী সমিতির দ্বারা পরিচালিত করিলে সফলতালাভ হইতে পারে। এ সব স্থানে যেখানে রাজধানী বা বড় বড় সহরের ন্যায় শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষালয়, পাঠাগার, পুস্তকাগার, জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিজ্ঞানসভা, ধর্ম্ম বা রাজনীতি বিষয় আলোচনার জন্য বা রাজনৈতিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সভা নাই, সেখানে এমনই সমিতি কেন্দ্র করিয়া দেশের আবশ্যক শিক্ষাসংস্কার, সামাজিক কুপ্রচার ও দুর্নীতির অপসারণ প্রভৃতি কার্য্যে ক্রমে ক্রমে হস্তক্ষেপ হইতে হইবে।

আমি আবার বলি, সমিতি এখনও যদি স্থানীয় শিক্ষিতগণ মহোদয়গণের মধ্যে সকলের পূর্ণ সহযোগিতা বা সহানুভূতি লাভে সমর্থ না হইয়া থাকেন, আমার খুবই বিশ্বাস, ইহা কর্ম্মের পথে একটু অগ্রসর হইলে তখন আর তাঁহারা ইহার সংস্রবচ্যুত হইয়া থাকিতে পারিবেন না। স্থানীয় প্রধানগণের অভিভাবকরূপে এই সব প্রতিষ্ঠান সংযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। তাঁহাদের শুধু উৎসাহবাক্য শিশু সমিতির কাছে আশীর্ব্বচন সদৃশ; কিন্তু তদভাবে নিরুৎসাহ দিবেন না। আপনাদের প্রচেষ্টায় এই কয় বৎসরে সমিতির কার্য্যে যতটা প্রসার হইয়াছে, বিষয়ের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে বটে, প্রারম্ভ সকলেরই ছোট, সে জন্য নৈরাশ্যের কথা কিছু আসিতে না। ছোটর ভিতর যে আদর্শ নিহিত আছে, তাহা ছোট নহে। আদর্শ ধরিয়া আপনারা ভগবানের কৃপায় সফলকাম হইয়া বসেন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীহরিহর শেঠ

নির্ব্বাণ

১

আমায় ঢেকে দাও আমায় মুছে দাও,
আমায় ফিরে লও স্বামি!
আমারে কর লয় সমূলে কৃপাময়!—
আসুক্ মোর চিরযামি'—

২

লুকাই চিরঘুমে মরণ-মধু চুমে
মাটীর বুকে যাই মিশি';
পাষাণ হয়ে যাই— আঁধার! এসো ভাই,
লুকাও মোরে চিরনিশি।

৩

আমার ব্যথা-লাজ বিলোপ হ'ক আজ,
মুছিয়া যাক্ মোর স্মৃতি,
সকল দুখ-ভয় আজিকে হ'ক লয়
—আমার আশা-সাধ-প্রীতি;

৪

অসীমে যাই মিশে পাথারে ডুবে শেষে
ধরণী হ'তে হই হারা,—
আমারে নাশ আজ হে দেব, মহারাজ!
ভাঙিয়া দাও মোর কারা;

৫

আড়াল কর মোরে হে প্রিয়! কৃপা ক'রে
লও হে লও মোরে ডাকি',
অতলে ডুবে যাই সুদূরে ছুটে যাই
দাও হে দাও মোরে ঢাকি'।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য



COLOUR ILLUSTRATION

বিষাদে প্রসাদ



(উপন্যাস)

৫

করুণানন্দের বিস্ময়াবহ অন্তর্দ্ধানের পর সকলের দৃষ্টি পড়িল শৈলেন্দ্রের উপর। তাহার অপরাধ এই যে—করুণানন্দকে সে-ই সেখানে আনিয়াছে, সুতরাং কেন করুণানন্দ চলিয়া গেল, কেমন করিয়া চলিয়া গেল, কোথায় চলিয়া গেল, তাহার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের ইতিহাস কি ইত্যাদি রাশি রাশি প্রশ্নের আক্রমণে সে আপনাকে নিতান্ত বিব্রত বলিয়া বোধ করিতে লাগিল, অবশেষে সে নিতান্ত অপ্রস্তুতের ন্যায় বিনীতভাবে জানাইল, "আপনাদের সকলের এতগুলি প্রশ্নের উত্তর যত দূর সংক্ষেপে দিতে পারা যায়, তাহা আমি দিতেছি, আপনারা স্থির হইয়া শুনিলে ভাল হয়। মোট কথা এই যে, করুণানন্দ কে, তাহা এখনও আমি ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই, তাহার সহিত আমার আলাপ বড় বেশী দিনের নয়, মসুরী পাহাড়ে আমি যখন বেড়াইতে যাই, সেই সময় এক হোটেলে আমার এক দিন প্রবল বেগে জ্বর হয়, সেই জ্বরে আমি অচৈতন্য হইয়া দুই দিন পড়িয়া থাকি; তৃতীয় দিবসে যখন আমার প্রথম চৈতন্যের উদয় হয়, তখন দেখি, করুণানন্দের উরুদেশে আমার মাথা রহিয়াছে, করুণানন্দ আমার মাথায় বরফের থলি ধরিয়া একদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া স্থির-ভাবে বসিয়া আছে। কথা কহিবার শক্তি তখন আমার ছিল না। কোথায় আছি, কি হইয়াছে, ইহাও তখন ভাল করিয়া বুঝিতে সামর্থ্যও ছিল না, আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সেই বিশাল জ্যোতির্ম্ময় স্নিগ্ধনয়নের হাসি-মাখা দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া সেই প্রথম আমাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিয়াছিল, সে প্রাণস্পর্শী স্নেহের ডাক আমি জীবনে আর কখনও কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই ত হইল তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাতের ইতিহাস।

"তাহার পর তাহার শুশ্রূষার ও চিকিৎসার প্রভাবে আমি শীঘ্রই সেই কঠিন রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই। যে কয় দিন আমি তাহার শুশ্রূষার অধীনে ছিলাম, তাহার মধ্যে কয়েক বার তাহার পরিচয় পাইবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়া-ছিলাম; কিন্তু পরিচয়ের কথা উঠিলে করুণানন্দ বলিত, 'ভাই শৈলেন, পরিচয়ের বাড়াবাড়িটা আমার একবারেই পছন্দ হয় না; তোমাকে আমি ভালবাসি, হয় ত তুমিও আমাকে ভালবাস, এ ভালবাসার আদান-প্রদানে পিতা-মাতার নাম বা জাতিবর্ণের উল্লেখ না হইলেও কোন ক্ষতি নাই; সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে সে সব কথার আলোচনা না হওয়াই ভাল, তাহা ছাড়া পীড়িতের—অসহায়ের সেবা আমার জীবনের প্রধান ব্রত, ইহার সহিত স্বার্থের সম্বন্ধ না হওয়াই উচিত। আমার পরিচয় পাইলে হয় ত তুমি আমার এই তুচ্ছ সেবার প্রতিদানের জন্য সময়ে সময়ে আমাকে উত্ত্যক্ত করিতে পার, এই জন্য আমার মনে হয়, তোমার নিকট আপাততঃ আমার আত্ম-পরিচয় না দেওয়াই ভাল; 'এইমাত্র জানিও, আমার নাম করুণানন্দ ব্রহ্মচারী।'

"করুণানন্দ যেরূপ গম্ভীরভাবে এই কয়টি কথা বলিয়া-ছিল, তাহা শুনিবার পর আর তাহাকে পরিচয় দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে আমার সাহসও হয় নাই—প্রবৃত্তিও হয় নাই। আমাকে সেই রোগের সময় উৎফুল্ল করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সে গান গাহিত, তাহার সেই গান শুনিয়া আমি আত্মহারা হইয়া যাইতাম, মনে হইত, চিরদিন তাহার সঙ্গে থাকিয়া সেই গান শুনিব। তাহার পর আমি সুস্থ হইলে অকস্মাৎ এক

দিন সে আমাকে কিছুই না বলিয়া কোথায় চ'লয়া গেল। তাহার সেই চলিয়া যাওয়ার পর এ পর্য্যন্ত আর তাহার কোন খবরই আমি পাই নাই; আজ আপনাদিগের এই উৎসব-সভায় যোগ দিবার জন্য যখন বাড়ী হইতে যাত্রা করিতেছি, সেই সময় দেখি, পথে করুণানন্দ এক জন বৃদ্ধ জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে। তাহাকে দেখিবা-মাত্রই আমি চিনিতে পারিলাম, তাড়াতাড়ি আমার মোটর থামাইয়া নামিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম; আমাকে তাহার নিকটে দাঁড়াইতে দেখিয়া সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় করুণা-নন্দকে বলিলেন,—'করুণানন্দ! আমি 'ঝুঁসি'তে চলিলাম' তুমি আজ রাত্রিতে সেখানে যাইও।' উত্তরের কোন অপেক্ষা না করিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। তখন করুণা-নন্দ আমাকে অকস্মাৎ সেখানে দেখিতে পাইয়া বড়ই আন-ন্দিত হইল, জোরে আমাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, 'ভাই শৈলেন! আজ তোমাকে এখানে দেখিয়া কি আনন্দ যে লাভ করিলাম, তাহা বলিবার নহে।' তাহার পর আমারই অনুরোধে আমার মোটরে চড়িয়া সে এখানে আসিয়াছিল, ইহাই হইল আপনাদিগের করুণানন্দ বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর। ইহার অপেক্ষা অধিক আমার কিছু বলিবারও নাই, আমি কিছু জানিও না।"

৬

কমলার জন্মতিথির উৎসব-সভা যে ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া-ছিল, তাহাতে অপরের মনে কি হইল, তাহা না বলিলেও চলে; কিন্তু সেই বিস্ময়াবহ ঘটনাবলী কমলার মনে কেমন একটা ছাপ দিয়া গেল। সেই অবধি সেই হাস্যোৎফুল্লনয়না প্রসাদ-ময়ী কমলা যেন সে কমলা আর রহিল না, পূর্ব্বের ন্যায় তাহার স্ফূর্ত্তি নাই, বই পড়িতে ভাল লাগে না, গান গাহিতে প্রবৃত্তি হয় না, একলা থাকিতেই ভালবাসে; কেন যে তাহার এই ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে নিজেই তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। সুতরাং অপরকে সে কি করিয়া তাহা বুঝাইবে? একাকিনী অবসর পাইলেই সে গঙ্গার দিকে বারান্দার উপরে একখানি ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে, কেবলই ভাবে—কেন তাহার কিছু ভাল লাগে না, সকল ভাবনার সঙ্গে সেই সে দিনকার ঘটনা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া থাকে, সেই গান আর কি কখনও সে শুনিতে পাইবে? সে গান যে গাহিয়াছিল, সে কে? কেন তাহাকে দেখিতে চাহে? নাই বা দেখিলাম, তাহাতে বা ক্ষতি কি? দূর ছাই, আর তাহার কথা ভাবিব না ভাবিয়া লাভ কি? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তাহার এই আ স্মিক ভাবান্তর দেখিয়া তাহার জননী সুরবালা ও পি যতীন্দ্রনাথ নিতান্ত ব্যথিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, না প্রকারে তাহার মনের ভাব-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল কমলা দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল, সময়ে নাই, স্নান নাই, বেশবিন্যাস নাই, পরিচিত স্ত্রী বা পুরু সহিত আলাপেও প্রবৃত্তি নাই। ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্র এ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য বি চেষ্টা করিত, যতীন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাহারা যাতা করিত, শৈলেন্দ্র বাবু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আদ বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার সহিত বয় বেশ একটু প্রীতিমধুর ঘনিষ্ঠতাও যে না জন্মিয়াছিল—ত নহে, শৈলেন অবসর পাইলেই পূর্ব্বের ন্যায় কমলার নি আসিত, পূর্ব্বের ন্যায় তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য ন প্রকার সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ের ত তারণা করিত। কমলা কিন্তু সে সকল কথায় পূর্ব্বের আকৃষ্ট হইত না, কোনরূপে ভদ্রতার খাতিরে পূর্ব্বা মিষ্ট কথায় প্রসঙ্গ সমাপ্তি করিবার জন্য চেষ্টা করিত, কখনও বা তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া শূন্যমনে বিষাদ দৃষ্টিতে শৈলেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কাতরভাবে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত।

এই ভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। শৈলেন্দ্র প্র হই পূর্ব্বের ন্যায় একবার করিয়া সন্ধ্যার সময় যতীন্দ্র বা বাটীতে আসিয়া থাকে, কমলার সহিত দুই একটি কথা য়াও থাকে এবং প্রতিদিনই বিষাদভরা বুকে দীর্ঘ নি সহ বিদায় গ্রহণ করিয়া শূন্যমনে নিজের শূন্য বা ফিরিয়া যায়।

সুরবালা ও যতীন্দ্রনাথ এ সকলই বুঝেন, বুঝিয়াও কি করিবেন? কি করিলে কমলার পূর্ব্ব-প্রকৃতি আ ফিরিয়া আসে, তাহার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা ক

ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁহাদের ব্যাকুলতা ও চিন্তা বাড়িয়াই যাইতেছে, প্রতীকারের কোন পথই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

সন্ধ্যার সময় বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া কমলা বসিয়া তন্ময়ভাবে কি ভাবিতেছে, এমন সময় বিমলা আসিয়া পিছনদিক্ হইতে দুই হাত দিয়া তাহার দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ এমন করিয়া আর কেহ কমলার চক্ষু পূর্ব্বে চাপিয়া ধরে নাই। সুতরাং এই অভিনব আকস্মিক ঘটনায় কমলার একটানা ভাবনার স্রোতে বাধা পড়িল, সে বড়ই বিরক্তিবোধ করিতে লাগিল। এ হস্তের স্পর্শও তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত নহে; কিন্তু এ স্পর্শের প্রকৃতিসুলভ কোমলতা তাহাকে বলিয়া দিল যে, ইহা নিশ্চয়ই কোন রমণীর কোমল-করের স্পর্শই হইবে। দুই হাতে সেই হাত দুইটি ধরিয়া জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা কমলা যতই করে, সে হস্তের দৃঢ়তা যেন আরও দৃঢ়তর হইতেছে। কে তুমি! ছাড়, এমন কোমল-করের চাপ এত কঠিন কেন গো? হাত না সরাইয়াই বিমলা বলিল,—আমি ছাড়িতেছি না, তখনই ছাড়িব, যখন 'আমি কে' তাহা বলিতে পারিবে। কমলার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ বিমলারই কণ্ঠস্বর। সে বলিল—"বিমলা! তুমি যে এত দুষ্টু, তা'ত আগে জানিতাম না।" হাত সরাইয়া তখন বিমলা কমলার সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। কমল-কোরকের ন্যায় দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ ভাই কমলা, আমার একটা গান মনে পড়িতেছে, কিছু মনে করিও না, সেইটা শুনাই।" এই বলিয়া কীর্ত্তন সুরে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বিমলা গাহিল—

"কেন রাই একলা ব'সে,
তোর বদন ভাসে নয়ন-নীরে।
ভেবে কি শেষে পাগল হবি—
কাঁদলে কি শ্যাম আসবে ফিরে॥"

কমলার মুখে একটু হাসি দেখা দিল, অনেক কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া বিমলার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে সে কহিল—"বিমলা; থামো ভাই, কে তোমারে বলিল যে, 'কমলা শ্যামের সন্ধানে পাগল হইয়াছে'।" বিমলা বলিল—"পাগল হইবার আর বাকি কি? তুমি ভাব, বিমলা বুঝি এখনও কচি খুকী আছে, আজ কয় দিন ধরিয়া যে খেলা খেলিতেছ, শ্যামের সন্ধান না পাইলে ইহা কি সম্ভবপর হয়! লক্ষ্মী দি'দ! আমায় কিছু গোপন করিও না, গোপনে লাভ নাই, বরঞ্চ মনের জ্বালা বাড়িয়াই যাইবে। তাই বলি, স্পষ্ট করিয়া বল, কেন তোমার এ অবস্থা, এ কি করুণানন্দের গান শোনার ফল?"

বিমলার এই কথা শুনিয়াই কমলার মুখখানি আরও বিবর্ণ হইয়া গেল, কেমন একটা বিষাদের, নৈরাশ্যের ছায়া তাহার বিশাল নয়নদ্বয়ে যেন ভাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "ভাই বিমলা, করুণানন্দকে ভালবাসিবার আমি অধি-কারিণী নহি, তিনি যে কেন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া-ছিলেন আর কেনই বা অমন করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা জানিবার জন্য মনের ভিতর একটা আকাঙ্ক্ষামাত্র জাগিয়াছে, এ কথা সত্য, তাই বলিয়া আমি তাঁহার জন্য যে পাগল হইয়াছি, এ কথা তোমার মনে কেন আসিল?"

হাসিতে হাসিতে বিমলা কহিল, "কমলা! এ সব দৈব-ঘটনা, তোমার বা আমার এতে কোন হাত নাই, ইহা আমি বেশ বুঝি, ভালবাসিয়াছ কি না, তাহা তুমি এখনও না বুঝিতে পার, আমার কিন্তু মনে হয়, তুমি সত্য সত্যই ভালবাসিয়া বসিয়াছ।"

বিমলার কথা শুনিয়া কমলা যেন আরও জড়ীভূত হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, শেষে বড় জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বিমলা, তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা নহে, আমি আর একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সুখী হইব। কারণ, তাঁহার ন্যায় এক জন মহানুভব ব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, আমরা কিন্তু তাঁহার প্রতি যেমন সম্মান করা উচিত, তাহা করিতে পারি নাই, করিবার অবসরও তিনি দেন নাই। তাই মনে হয়, তাঁহার দেখা আর একবার যদি পাই, তাহা হইলে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া আপশোষ মিটাইব, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়?"

বিমলা একটু হাসিল ও বলিল, "ভাই কমলা, ভাল-বাসার স্বভাবই এই যে, যে ভালবাসে, সে বুঝিতে পারে না যে, ভালবাসিয়াছি। যাহাই হউক, আমার কিন্তু মনে হয়, তিনি আবার তোমাদের বাড়ীতে আসিবেন—"

চকিত হইয়া মুগ্ধ হরিণীর ন্যায় কাতরভাবে চঞ্চলনয়নে

বিমলার দিকে চাহিয়া কমলা বলিল—"কেন বিমলা! তিনি আবার এখানে আসিবেন ?"

"সে কথা আজ বলিব না, তবে একটা কথা বলি, শৈলেন বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি এখনও এলাহাবাদে আছেন এবং শৈলেন বাবুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, এ কথা শৈলেন বাবু তোমার নিকট বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাই তাড়াতাড়ি আমি আসিয়া তোমাকে একটু বিরক্ত করিলাম। সে জন্য কিছু ভাই মনে করিও না, তোমার চেয়ে বয়সে আমি ছোট হইলেও একটা অনুরোধ করিব, যদি রক্ষা কর, বড়ই সুখী হইব। সে অনুরোধটি এই—তুমি আজ হইতে তোমার এই যে বিষণ্ণ-তার ভাব, তাহা যেমন করিয়া পার, বাহিরে যাহাতে প্রকাশ না হয়, সে বিষয়ে একটু ভাল করিয়া চেষ্টা কর। যে ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহা আমার মনে হয় ভালবাসাই নহে, মানসিক দুর্ব্বলতা মাত্র; ভালবাসা স্বর্গের জিনিষ, দুর্ব্বলতার সহিত ইহাকে মিশাইয়া নোংরা করিও না, নারীজীবনের ভালবাসা বিধাতার অমূল্য দান। সত্য ভালবাসা বিরহের চিন্তা আসিতে পারে না, যদি সত্যই ভালবাসি থাক, তবে ব্যাকুলতা কিসের জন্য ?" এই কয়টি কথা অ গম্ভীরভাবে বলিয়া বিমলা কমলার উত্তরের অপেক্ষা করিয়াই তাড়াতাড়ি তাহার নিকট হইতে বিদায়গ্র করিল। বিমলা চলিয়া যাইবার পর সেইখানে বসি কমলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনী আসিল, অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারময় রজনীর নিস্ত আকাশে বড় বড় তারাগুলি ঝক্‌মক্ করিয়া জলিতে লাগি কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখে সে বিষাদের মা আর দেখা গেল না, দৃঢ়সঙ্কল্পের গাম্ভীর্য্যময় ছবি যেন তা দৃষ্টিতে আবার খেলিতে লাগিল, অস্ফুটস্বরে সে বলি— "বিমলা! তোমার কথাই সত্য, তোমার উপদেশানুযা আজ হইতে কমলা চলিবে।"

এই বলিয়া সে সে স্নান পরিত্যাগ করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূ

স্বভাব-ধর্ম্ম

প্রকট করেছ ব্রহ্ম, আপনারে এই বিশ্বলোকে
নিত্যকাল, চিরদিন রসলীলা বৈষ্ণবের চোখে
ভূমায় বিস্তার তব,—'সৃষ্টি' কহে সংহিতা-পুরাণ,
মায়াবাদী কহে, 'মায়া'—উর্ণনাভ-তন্তুর সমান।
যা'ই হোক এই বিশ্ব,—পণ্ডিতেরা করুক বিবাদ,
—লীলা হোক্,—সৃষ্টি হোক্—হোক্ শূন্য অবিদ্যা-প্রমাদ
পরব্রহ্ম! ছিলে তুমি প্রতীক্ষায় যুগ যুগ ধরি'
বৈদিক আর্য্যের তরে, চিদানন্দ অন্তরে সংহরি'
সত্তা-অনুভূতি ক্রমে জাগাইতে অভিব্যক্তিমাঝে,
এ কথা হয় না মনে।

কোন দিন অপূর্ণতা রাজে
হে পূর্ণ, তোমার ভাবে—কোন ত্রুটি কোন অঙ্গহানি
আছিল সত্তায় তব, কারো বাক্যে আমি নাহি মানি।
মহাকাল তব বিশ্ব-বিকাশের ক্ষুদ্র দলসম,
তারে অনুসরি' তুমি বিদারিয়া ক্রমে রজস্তমঃ,
পূর্ণতা লভিলে ধীরে, জাগাইলে শাশ্বত বিভূতি ?
এ বিশ্ব কি মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞান তার পূর্ণাহুতি ?

তোমার মানস-লোকে জীবাত্মার উদ্ভব-বিলয়
কল্প ব্যবধান মাঝে এ কি সত্য ? মনে নাহি লয়!
আদি যদি থাকে তবে আদি হ'তে ভূমার বিস্তারে
নানা ছলে, নানা রূপে জানায়েছ তুমি আপনারে
প্রতি অভিব্যক্তি-বিম্ব পাইয়াছে তোমার সন্ধান,
পালিয়াছে তব ধর্ম্ম আপনারে করিয়া প্রতান
বিম্বিত সত্তায় নিজ।

মহাব্যোম সেই আদি হ'তে
সহস্র জ্যোতিষ্ক গ্রহ রবি-সোম আলোকের স্রোতে,
মেঘবজ্রে শব্দে-রসে তোমারেই করেছে প্রকাশ।
অনিল প্রকটে সত্তা গতি-গীত নিশ্বাস-প্রশ্বাস
ঝঞ্ঝারঙ্গে। তেজোদীপ্তি সঞ্চারিয়া কোটি কোটি প্রাণে
অভিব্যক্ত হলো বহ্নি আদি হ'তে ভূমারই সন্তানে।
বারি-ব্রহ্ম ঘনীভূত মেঘজালে তুষারমণ্ডলে,
বিগলিত সত্তা তার সিন্ধুনদী তড়াগ পল্বলে।
চিন্ময়ী, মৃন্ময়ী ধরা লতাগুল্মে কোটি কোটি জীবে
আদি হ'তে ঋতুচক্রে, সুখে-দুঃখে, শিবে ও অশিবে

তোমারি প্রথায় সবে করে পুনঃ সর্ব্বসংহরণ
আপনারি মাঝে, তাই যুগে যুগে আপাত মরণ।
পেলেছে তোমারি ধর্ম্ম সুরাসুর কিন্নর-দানব
আদি হ'তে যক্ষ রক্ষ নাগ ঋভু গন্ধর্ব্ব মানব
তোমারে জেনেছে আর তোমারে খুঁজেছে অবিরত
তোমাতে ফিরিয়া যেতে কচ্ছপের প্রত্যঙ্গের মত।

আমমাংসে দেহ পুষি গুহাশায়ী বনচারী নর
শ্মশ্রুলোমারণ্য তনু, ভাষাহীন উলঙ্গ বর্ব্বর
অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির বিরাট চত্বরে,
সীমাহীন অবসরে নিশিদিন কিবা চিন্তা করে ?
সভ্য মানবের যাহা অনুমেয়, চির-অগোচর
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব—সবি তার নিত্য সহচর।

বিস্ময়ে রহস্যে ভয়ে মুহুর্মুহুঃ চমকি' চমকি',
ঊর্দ্ধে অধে চারি পাশে মুগ্ধ দৃষ্টি থমকি থমকি,
রুদ্রতা, প্রশান্তি, সৌম্য, প্রসন্নতা, বিশাল বিস্তার
বিচিত্র বিবর্ত্তলীলা, অজস্রতা, মহিমা-সম্ভার
বন্যা, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বজ্র, উদয়াস্ত, কুহু, পৌর্ণমাসী,
ক্ষুব্ধ সিন্ধু, দাবদহ্নি, গিরীন্দ্রের হিম অট্টহাসি,
সবার মাঝারে তারা খুঁজেনি কি আপন নিদানে ?
বিশ্বাতীতে খুঁজেনি কি এ বিশ্বের বিচিত্র বিধানে ?
ঝঞ্ঝাবজ্র সিংহ সর্প ব্যাধি-মৃত্যু হ'তে আপনায়
বাঁচাতে আরণ্য নর খুঁজেনি কি শরণ্য সহায় ?

মদ, হ্রদ, দারু, শিলা, তরুগিরি ভূচরে-খেচরে
রহস্যমণ্ডিত করি পূজেনি কি আধ ভক্তি-ডরে
আমমাংসে, চর্ম্মে-লোমে শুক্তি-শঙ্খে পত্র-পুষ্প-ফলে ?
পর্ব্বতে গুহায় বনে সিন্ধুতটে কিংবা তরুতলে
বংশী-শৃঙ্গ নিনাদিয়া করেনি কি তোমার বোধন ?
তাদের সর্ব্বস্ব তুচ্ছ, তাই দিয়ে করিতে আপন
চাহেনি কি সুখে-দুঃখে ? জানায়নি আর্ত্তি আকুলতা
অর্থহীন বাক্যাঙ্কুরে হৃদয়ের ক্রুত-জ্বার ব্যথা ?

অনুসরি' একই মনোবৃত্তিধারা একই সে প্রেরণা,
মানুষ আজিও চাহে করিবারে তোমার ধারণা,—
দারুশিলা বিবর্ত্তিত রক্তমাংসে, অনলে-অরুণে,
খুঁজে এরা গ্রন্থে, তন্ত্রে, স্বর্গে, শূন্যে, গুণে বা নির্গুণে,
নরত্বে উন্নীত আজি জীব, তরু, জড়ত্ব আশ্রয়,
মৃন্ময় বান্ধব ছিলে আজি তুমি বিদেহ চিন্ময়,
মন্দির মসৃজিদ গীর্জ্জা রূপ ধরে গুহাতরুতল,
অর্ঘ্য আজি দম্ভভরা আত্মভোগ্য ঐশ্বর্য্যের ফল।
নানা সুরে—নানা যন্ত্রে আজি তব মন্দিরে বোধন,
ভাষায় ঝঙ্কৃত ছন্দে স্তবস্তুতি পূজা আবেদন।
সূক্ত শ্লোকবদ্ধ বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ
প্রথম তোমার বার্ত্তা জানে বলি করে অভিমান।
বর্ব্বরের নখদন্ত, তরুশাখা, প্রস্তর-মুদ্গর
লৌহ অগ্নি বিষ বজ্রে—শতাব্দীতে লভি' রূপান্তর
সভ্য মানবের আজি ধর্ম্মযুদ্ধে হয়েছে সহায়,
তোমার সন্ধান-পথে তবু সেই বর্ব্বরেরি প্রায়।

বেশভূষা শয্যাসন বাসগৃহ আহার-বিহার,
রূপান্তরে বিবর্ত্তিত—সে ত সবি বাহ্য উপচার,
অন্তরে বর্ব্বরে সভ্যে খুঁজে নাহি পাই কোন ভেদ,
নগ্নেরে করেছে মগ্ন মন্ত্রভারে তন্ত্র-স্মৃতি-বেদ।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভয়-নিদ্রা লোভ-ক্ষোভ স্নেহ-ভালবাসা,
রিরংসা, জিগীষা, ঈর্ষ্যা, রাগরোষ রুধির-পিপাসা
নৃত্য গীত ক্রীড়া তৃষ্ণা—সর্ব্বতৃষ্ণা লালসা-বাসনা
সমানই বর্ব্বরে সভ্যে মেলিতেছে লেলিহ রসনা,
"কেবল সাধনালভ্য ব্রহ্মতৃষা সুসভ্যের মনে,—"
আমার বর্ব্বর চিত্ত এ প্রলাপ মানিবে কেমনে ?
শিশু যথা পিতা চিনে সভ্যে চিনে তোমারে তেমনি
বর্ব্বর চিনিল যথা শিশু চিনে আপন জননী।
তোমারে পাইতে হ'লে পূর্ণরূপে, কহে জ্ঞানিগণ
চাই দ্বিধা-ক্লেদশূন্য অকপট বর্ব্বরের মন।
তোমার সন্ধানে ভক্ত সভ্যতার সর্ব্বসমারোহ
তেয়াগি—বিচ্ছিন্ন করি ভোগসুখধনজনমোহ,
চীরবাসে ফিরে হয় গুহাগর্ভে আবার বর্ব্বর,
হে ব্রহ্ম, কেমনে কই তারে তুমি কর অনাদর ?

শবর চণ্ডাল ম্লেচ্ছ যাযাবর কিরাত চামার,
প্রকৃতি দুলাল কত লভি ঋজু সন্ধান তোমার
ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরিয়া যুগে যুগে কাননে-পর্ব্বতে,
মোদের অজ্ঞাতে চ'লে গেছে মহাপ্রস্থানের পথে
অলিখিত সে বারতা। সভ্য নর আর্য্য-অভিমানে
রসহীন গ্রন্থে রত বৃথা রসময়ের সন্ধানে।

বর্ব্বরের ব্রহ্মতৃষা—ব্রহ্মে কর্ম্মফলের বিরতি
গহন দণ্ডকারণ্যে শবরীতে হয়ে মূর্ত্তিমতী
একাগ্র করিয়া চিত্ত উগ্রতম ব্যগ্র তিতিক্ষায়
রামব্রহ্ম লাগি' রয় পথ চাহি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
শৈশব কৈশোর দশা একে একে চ'লে যায় ক্রমে
যৌবনের ধূপদহে মৃগমদে ভরি' সে আশ্রমে,
জরা এসে হ'রে লয় শীর্ণপদে প্রতীক্ষার বল,
ধবল পক্ষ্মের তলে ক্ষীণদৃষ্টি নেত্র ছল ছল,
পাণিতে শাণিত করি' দৃষ্টি তার হানে প্রাণপণে
পৃথ্বী, 'পরে পদনখে রেখা টানি দিনগুলি গণে।
বর্ব্বরের ব্রহ্মতৃষ্ণা তবু নাহি লভিবে বিরাম
পুনর্জ্জন্ম ভরসায় যাত্রাপথে চাহে না বিশ্রাম।
রাম নামে শক্তি হরি বহমান রেখেছে নিশ্বাস,
মিথ্যা হবে ? এ আকুতি এ অটল অখল বিশ্বাস ?
এ কি শুধু ত্রেতাযুগে ? আদিকাল হ'তে এই ধারা
বহমান গিরি-বনে—মরুতেও হয়নিক হারা।
তোমাকে সুলভে পেতে সভ্য খোঁজে সদা ফন্দী ফাকি
সারাটি জীবন ধরি' চেয়ে থাকে বর্ব্বরের আঁখি।

শ্রীকালিদাস রায়।

জগতের সভ্যতায় ভারতীয় প্রভাব

১

রাজনৈতিক জগতে আজ হিন্দুর স্থান নাই। হিন্দু আজ পরাধীন পদদলিত। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় উৎকর্ষের অবসান হইয়াছে। আত্মরক্ষাই হিন্দুর প্রধান সমস্যা। আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু শক্তির পরিচালনা প্রয়োজন হয়, আজ হিন্দুর তাহাও নাই। বিদেশী বণিক্ হেলায় মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে আর নিজের দেশের মধ্যে হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়া, সমাজ লইয়া, প্রতিনিয়তই শত্রুর দল অশান্তি উৎপাদন করিতেছে। আজ জীবন-সমস্যাই হিন্দুর প্রধান সমস্যা।

জাতিমাত্রেরই উন্নতি ও অবনতি আছে। আজ যাহার সমৃদ্ধি, কাল আবার তাহার সৌভাগ্যের অবসান। আজ যাহার হীনাবস্থা, কালই হয় ত তাহার সমৃদ্ধির সূচনা হইতে পারে। বিপদে মানুষ অতীতের কথা স্মরণ করে। অতীতের গৌরব বা সমৃদ্ধি বিপদে ধৈর্য্য লইয়া আসে। অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। তবে যে আবার জানিতে চাহে, যে আবার মানুষ হইতে চাহে, যে আবার প্রাচীন সমৃদ্ধি ফিরাইতে চাহে, তাহারই শক্তি উদ্দীপিত করে।

বর্ত্তমানের কথা ভাবিলে হিন্দুকে অন্ধকার দেখিতে হয়। আশা-ভরসা সমস্তই নৈরাশ্যের গর্ভে মিলাইয়া যায়। মনে হয়, নিত্যই যেন আমরা অবসানের পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি। অতীতের দিকে চাহিলে ইহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে।

আমরা বর্ত্তমানের দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য-পীড়ন ভুলিয়া যাই। স্মৃতি আবার প্রাচীন সমৃদ্ধির কথা মনে করাইয়া দেয়। মনে হয়, আমরাও মানুষ। আমরা এককালে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। শক্তির অপচয়ে দুর্নীতির উপচয়ে আমাদের এই দশা ঘটিয়াছে। আমরা জাগিলে অতীতের সমৃদ্ধি আবার জাগিতে পারে, শক্তি আবার ফিরিতে পারে, আমরা আবার মাথা তুলিতে পারি। আমাদের অধিকার আবার বজায় করিতে পারি।

আজ হিন্দু নিজের ঘরে পরের দাস। যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন হিন্দুর নিজের দেশে প্রাধান্য বজায় ছিল। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু দেশ-বিদেশে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। সুদূর সাগরপারে দেশের পণ্য লইয়া যাইত। বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিত। নানা দেশের লোককে নিজের অধীনতায় আনিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচার করিত। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইত। জীবনে উৎকর্ষ ও মরণে শান্তি উভয় বিষয়েই শিক্ষা দিত।

দুর্নীতির ফলে ও নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের জন্যই আজ আমাদের এই দশা। ধর্ম্ম লইয়া, আচার লইয়া, জাতি লইয়া, ভাষা লইয়া বিরোধ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানেও উহা চলিতেছে। মানুষের স্পর্শে মানুষের অশুচিতা আসে। খাদ্যের পার্থক্যে ঘৃণা আসে, আবার বাসভেদে ও আচার-ভেদে চির-বৈরিতা ঘটিতেছে। যুগে যুগে কত মহাপুরুষ দেশকে শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। লোক কেবল তাঁহার নামের শরণ লইয়াছে। তাঁহার মূর্ত্তির পূজা করিয়াছে। তাঁহার শিক্ষা হৃদয়ে গ্রহণ করে নাই। তাঁহার মতের অনুসরণ করে নাই।

অন্তর্বিবাদে দেশ ক্রমে হীনবল হয়। বিদেশী শত্রুর ষড়যন্ত্র মণে, দেশীয় কৃতঘ্নের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশ শত্রুর করতলগত হয়। স্বাধীনতা-লোপের সঙ্গে সঙ্গে সমাজশক্তিও রাজশক্তি লোপের সঙ্গে হীনবল হয়। আত্মরক্ষাকল্পে সমাজবন্ধন ক্রমে দৃঢ়তর হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলিতে থাকে, ক্রমে দেশের মধ্যে এই ভাব, তখন শক্তি উৎসাহও ক্রমে বিলুপ্ত হয়। সমুদ্রযাত্রা, বিদেশগমন সমস্তই পাপের কার্য্য বলিয়া লোকে দেখিতে থাকে। এইরূপে ভারতের দুর্দ্দশা ক্রমে অধিক হইতে বর্ত্তমানের অবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

হিন্দুর অবনতির কারণ প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। আজ কেবল অতীতের সমৃদ্ধির কথা ও ভারতের অতীত প্রভাবের কথা বলিব। বিদেশী শাসনে আমাদের ক্ষতি অনেক হইয়াছে, তবে এই বিদেশী রাজার কল্যাণেই আমাদের প্রাচীন গৌরবের কথা অনেক জানিতে পারিয়াছি।

যে অতীত যুগের কথা বলিতেছি, তখন ভারতবাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মোহান্ধ ছিল না। তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। উৎসাহ ও বলে তাঁহারা হীন নাই। তাহারই ফলে দেশের মধ্যে স্বাধীনতা ছিল, ব্যবসা বাণিজ্য, উপনিবেশ ও রাজ্যবিস্তারের উৎসাহে জগতে তাঁহার প্রভাব অব্যাহত ছিল।

বিদেশে গমন বা বিদেশ হইতে ধনরত্ন সমাহরণ করা ভারতের উৎসাহ ও শক্তির পরিচায়ক। মানুষ সাহসী হইলেই বিশ্বে সম্মুখীন হইতে পারে। আর কাপুরুষ হইলেই দেশত্যাগ করিতে বা সমুদ্র পার হইতে ভীত হয়। শক্তির অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উৎসাহ বিলুপ্ত হয় এবং অভ্যুদয়ের চেষ্টা অন্তর্হিত হয়। কর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে প্রবৃত্তি বহির্মুখীন করিতে হয়। মুমুক্ষুর ইহার বিপরীত।

জগতের ইতিহাসে ভারতের প্রভাবের কথা লিখিতে হইলে উহার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা আবশ্যক—

(১) ভারতের সহিত প্রাচীন জাতিসমূহের বাণিজ্যসম্বন্ধ।

(২) ভারতবাসী কর্ত্তৃক উপনিবেশস্থাপন ও নানা দেশে রাজ্যবিস্তার—

(৩) ভারতীয় প্রচারক কর্ত্তৃক হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার এবং তৎসূত্রে সভ্যতার বিস্তার।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের কথাই প্রথমে আলোচনা করিব। অতি প্রাচীন যুগ হইতে এমন কি, যাহাকে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের শেষ ভাগ বলা যায়, তখন হইতেই এই বাণিজ্য আরম্ভ হয়। জলপথে ও স্থলপথে এই বাণিজ্য চলিত। আর্য্যজাতির সনা স্থানে ভ্রমণ ও উহার এক শাখার ভারতে আধিপত্য-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় এই বাণিজ্যের সূচনা। আর্য্য-দিগের বহু শাখা যে পশ্চিম-এসিয়ায় বিস্তৃত ছিল, তাহার সম্বন্ধে নূতন নূতন উপদেশ সংগৃহীত হইতেছে। বাবিলোনীয় ও আসীরিয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্যেই আমরা উহা জানিতে পারিয়াছি। অবশ্য উহার ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। আবার যেটুকু যে উহা সংগৃহীত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। ঐ যুগের জাতিগুলির মধ্যে অনেকেই বিলুপ্ত। উহাদের সভ্যতাও জগতের পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তবে ঐ যুগের তাম্রলিপি, ভগ্ন সৌধপ্রাসাদাদি, ভাস্কর্য্য, মূর্ত্তি, শিলাখণ্ড বা মৃন্ময়-লিপি অতীতের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

ঐ সকল হইতে জানা যায় যে, সুদূর অতীত অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ১৭।১৮ শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতির এক শাখা বাবিলো-নিয়ায় রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা কাশাইট (Kassite) নামে অভিহিত ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে সূর্য্য, বরুণ ও নাসত্যদ্বয়ের পূজা প্রচলিত ছিল। প্রায় ছয় শত বৎসর ইহারা দক্ষিণ-ইরাকে রাজত্ব করেন এবং প্রায় ঐ সময়েই আর এক শাখা উত্তরসীমায় মিটানি রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্র ও অন্য দুই একটি দেবতার পূজা চলিত ছিল। ইহাদের নামগুলি আর্য্য নাম। উহার সহিত অনেক সংস্কৃত নামের সাদৃশ্য আছে। আবার ঐ যুগেরই হিটাইট, (Hittite) লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রাচ্যদেশীয় আর্য্য বণিকরা অশ্ববিক্রয়ার্থ ঐ দেশে যাইতেন। ঐ একটি লিপিতে এক, দ্বি, ত্রি, পঞ্চ ও সপ্ত ইত্যাদি সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

এই সমস্ত ভিন্ন ভারতীয় আর্য্যের মিশর (Egypt) দেশের সহিত সম্বন্ধ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমানের প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, মিশরদেশীয় মমিগুলির আবরণ-বস্ত্র নীল রঙ্গ রঞ্জিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নীলের চাষ ও ব্যবহার ভারত ভিন্ন অতি প্রাচীন যুগে আর কোথাও ছিল না, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারত ইহার একমাত্র উৎপত্তিস্থান বলিয়াই নীলের Indicum বা ইণ্ডিগো নাম প্রচলিত হয়। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রাচীন আসীরিয়দিগের ভাষায় সিন্ধু শব্দ প্রচলিত ছিল এবং সিন্ধু শব্দে ভারতের কার্পাস-বস্ত্র বুঝাইত।

এই সুদূর প্রাচীন যুগ হইতে আমরা যতই অগ্রসর হই, ততই ভারতীয় বণিকের বাণিজ্যসূত্রে আদান-প্রদানের কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বাইবেলের রাজবংশের ইতিহাসে (Book of Kings) সলোমনের যে ওফির (Ophir) দেশ হইতে দ্রব্যাদি আনয়নের কথা আছে, তাহা সিন্ধু-উপকূলস্থ প্রদেশ বা দক্ষিণ-ভারতের প্রদেশবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাদের মতে হিব্রু ভাষায় যে বানর, ময়ূর ও হস্তিদন্তের প্রতিশব্দ গৃহীত হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত কপি (হিব্রুকফ্) তোকে (সংস্কৃত শিখী বা মালবেলাম তোকেই) ও হস্তিদন্ত হইতে উদ্ভাবিত। আবার কেহ বলেন যে, মিশরীয় রাণী হাটসেপসিটু তাঁহার নাবিকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত যে 'সোফীর'এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত চন্দন শব্দের রূপান্তরমাত্র।

এ যুগের পর বাণিজ্য-সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠে। বাণিজ্যসূত্রে ভারতবাসী বিদেশে যাইতেন এবং আরবীয় নাবিক-দিগের সহিত তাঁহাদের যে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত, তাহা অনেকেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সফ্ (Schoft) বলেন যে, ভারতীয় নাবিকরা প্রায় ১০০০ খৃঃ পূঃ সময়ে আফ্রিকার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় পণ্য তাহারা সাকাত্রা দ্বীপে লইয়া যাইত। আরব-বণিকরা নিজেদের নৌকায় তাহা প্রতীচ্য জগতে রপ্তানী করিত। এই আরব-বণিকরা অতীব হিংস্রস্বভাব ছিল এবং নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিলে শত্রুতাবশতঃ আক্রমণ করিয়া ভারতীয়গণকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিত।

এ যুগের নিদর্শন নমুনা আজ কিছুই নাই। তবে বিদেশী সমাজে এই বাণিজ্যের ফলে বহু ভারতীয় পণ্য প্রচারিত হইয়াছে এবং ঐগুলির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বহু ভারতীয় শব্দ ঐ সকল দেশের ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেই আসিরীয় ভাষায় সিন্ধু কথার উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাদিগের ভাষায় বানর ও ময়ূর বুঝাইতে সংস্কৃতমূলক শব্দের কথা বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বুঝাইবার শব্দে প্রায় সমস্ত প্রাচীন ভাষাই গৃহীত হইয়াছে। এই সকল পণ্য বা দ্রব্য বোধ হয় ভারত হইতেই বিদেশে প্রচারিত হয় এবং ঐ সকল বস্তু না থাকায় তাহারা ভারতীয় শব্দ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ভারতের এই পণ্যগুলির মধ্যে কার্পাস উল্লেখযোগ্য। আজকাল ভারত-বাসী বস্ত্রের জন্য বিদেশীয়ের মুখাপেক্ষী। বিলাত হইতে এ দেশী তূলা বস্ত্রাকারে প্রেরিত না হইলে বোধ হয়, আমাদের আর লজ্জানিবারণের উপায় হইবে না। সে যুগের ব্যবস্থা ইহার বিপরীত ছিল। তখন প্রতীচ্যের লোক তূলার ব্যবহার জানিত না। গ্রীকরা ভারতবর্ষের পণ্যের উল্লেখ করিয়া তূলার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এই অনুমানই গ্রাহ্য হয়। হেরোডোটাস্ লিখিয়াছেন যে, পারসীক সম্রাটের ভারতীয় সৈনিকরা একরূপ গাছের ফলের আঁশ হইতে নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। উত্তরকালে তূলার ব্যবহার প্রতীচ্য দেশসমূহে প্রচারিত হইলে সংস্কৃত কার্পাস শব্দ হিব্রু, গ্রীক ও লাটিন ভাষায় কাপাস, কার্পাস ও কার্ব্বেসার বলিয়া পরিগৃহীত হয়। ঐরূপ সংস্কৃত কস্তির শব্দ যাহাতে টিন ধাতু বুঝায়, তাহাও হোমারের গ্রীক ভাষায় আমরা পাই। উহা রূপান্তরিত হইয়া কাসিটেরাস (Kasiterus) আকার ধারণ করে।

কার্পাসের ব্যবহার যেমন বিদেশে ভারত হইতে প্রচারিত হইয়াছে, ঐরূপ শর্করা বা ইক্ষুরসের সারের ব্যবহারও প্রাচীন জগতে ভারত হইতেই প্রচলিত হয়। ইংরাজী Sugar শব্দ শর্করা শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা সকলেরই মত। বোধ হয়, শর্করা শব্দ আরবদিগের হস্তে শাকার শব্দে রূপান্তরিত হয়। ঐ শাকার হইতেই লাটিনের Sucre ও ইংরাজী Sugar বা চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। তূলা ও (কার্পাস) চিনির ব্যবহারের ন্যায় নীলের ব্যবহারও ভারত হইতে বিদেশে প্রচলিত হয়। গ্রীক ও রোমানরা রংএর জন্য ও ঔষধার্থ নীলের আদর করিতেন। উহা প্রাচীন যুগে বহুমূল্য পণ্য ছিল। ভারতই উহার একমাত্র উৎপত্তিস্থল ছিল এবং এই নিমিত্তই উহাকে প্রাচীনরা Indicum বা

'ভারতীয়' বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবং এই Indicum শব্দ হইতেই Indig শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নীল ও তুলা ভিন্ন এমন আরও কতকগুলি ভারতীয় পণ্যের বা উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে—যেগুলির ব্যবহারও য়ুরোপ-বাসী ভারতবর্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে ও সেগুলি নিত্য-ব্যবহার্য্য। কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব, যেমন লঙ্কা ও আর্দ্রক।

ইংরাজীতে লঙ্কা বুঝাইতে Pepper বুঝায়। ইহা ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের মতে সংস্কৃত পিপ্পলী হইতে উৎপন্ন। আবার আর্দ্রক বুঝাইতে ইংরাজরা Zinger ব্যবহার করেন, ইহাও সংস্কৃত-মূলক শব্দ ও সংস্কৃত সৃষ্টিবের শব্দ হইতে উৎপন্ন। এক সময়ে এই দুই দ্রব্যের ব্যবহার য়ুরোপীয়দিগের অজ্ঞাত ছিল। ভারত-সংসর্গে ইঁহারা এই দ্রব্যের ব্যবহার শিখিয়াছেন।

ভারতীয় পণ্যের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বণিকরা পৃথিবীর নানাস্থানে গমন করিতেন এবং ভারতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানী করিতেন। সে যুগের ইতিহাস একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। থাকিলেও উহাতে বাণিজ্য জগতের কথা কিছু নাই। রাজা-দিগের কথা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা—এই লইয়াই প্রাচীন ঐতিহাসিকের অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন, তবে ইতিহাসের মূকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই যুগের পণ্য বা বাণিজ্যদ্রব্যাদি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া ভারতীয় বণিকের উৎসাহের পরিচয় দিতেছে। তাহাদের অন্যান্য নিদর্শনও দুই একটি অতীত ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে ভারতীয় বাণিজ্যের আরম্ভ-বিস্তার হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই সকল বণিক দ্রাবিড়জাতীয়। কিন্তু এই মত একবারে ভিত্তিহীন; কেন না, আমরা পণ্যাদির নামে সংস্কৃত বা সংস্কৃত ভাষারই নিদর্শন পাই। দ্রাবিড় ভাষার কথা খুব কমই পাওয়া যায়। আবার সে যুগে আর্য্যদিগের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা যে বহুল প্রচলিত ছিল, তাহা অবিসংবাদিত। কেন না, বোধায়ন ধর্ম্মসূত্রকার উত্তরাপথের ব্রাহ্মণদিগের নিন্দিত আচারগুলির কথা লিখিতে গিয়া উহাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রার প্রচলনের কথা উল্লেখ করিয়া-ছেন। পালি সাহিত্যে যে সকল জনবাদ বা কিংবদন্তী লইয়া জাতকগুলি রচিত হইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রপারে নানা-দেশে গমনের কথা আছে। বাবিলন ও আসীরিয়ার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধের কথা, ভারতীয় সেগুণকাষ্ঠের প্রচলন ও অন্যান্য পণ্য হইতে নিরূপণ করা যায়। মধ্যভারতে কীলক-লিখিত মৃৎলিপি আবিষ্কার হইতে আসিরীয় বাণিজ্য সম্বন্ধ নিরূপিত হয়।

বভেরুজাতক পড়িলে বোধ হয় যে, বভেরু বাবিলনের রূপান্তরমাত্র। ঐরূপ অন্যান্য জাতক হইতে সুবর্ণ-ভূমি (বা পেগু ও আরাকান) তাম্রপর্ণী বা সিংহল দ্বীপ ও অন্যান্য নানা স্থানে গমনের কথা উল্লিখিত আছে বুঝা যায়। জাতক ও জাতক অপেক্ষা প্রাচীনতর বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে নাবিকদিগের সমুদ্রে বিপদের কথা জানা যায়। নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় ও দিক্‌ভ্রমে "দিশাকাকের" ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, এগুলি কেবল উপকূল বহিয়া সমুদ্রযাত্রা করার নিদর্শন নহে। বিশাল মধ্যসমুদ্রের বিপদের কথাই এগুলিতে সূচিত হইয়াছে।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য-বিজয় ও ভারতবর্ষ হইতে আবার এক নূতন যুগের উৎপত্তি হয়। গ্রীসের ও ... সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অনেকে ভ্রান্ত ধারণা এই যে, উহার পূর্ব্বে গ্রীক ও ভারতের সম্বন্ধ ছিল না; উহা অমূলক। কেন না, সে যুগে যে স্থলপথে ... বাসী পশ্চিম-এসিয়ায় যাইত, তাহার বহু প্রমাণ আছে। অধ্যা... ব্যুলার (Buhler) ভারতীয় বর্ণমালার ইতিবৃত্ত আলো... করিতে গিয়া উহা স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রাচীন ... বর্ণমালার কয়েকটি চিহ্নের সহিত পশ্চিম-এসিয়ার ... লিপির সাদৃশ্য দেখাইয়া ভারতীয় বর্ণমালা যে পশ্চিমে... সিমাইটদিগের নিকট হইতে গৃহীত, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ... মত যে ভ্রান্ত, তাহা অবশ্য শীঘ্রই প্রমাণিত হইবে। তবে ... উপাদানগুলি হইতে পশ্চিম-এসিয়ার সহিত ভারতীয় সম্বন্ধ ... রূপে প্রমাণিত হয়। আবার চিকিৎসক টিসিয়াস্ (Ktesias) ... ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ... হইতে ভারতবাসীর উক্ত দেশাদিতে গমন বুঝা যায়। আ... ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সমসাম... গ্রীক সমাজ ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই জ্ঞাত ছিল।

আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ... জগতের সহিত ভারতের আদান-প্রদান ঘটিতে থাকে। ... সীমান্তে গ্রীকদিগের রাজ্য স্থাপিত হয়। আলেকজান্দ্রি... নগরও স্থাপিত হয়, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য বিশেষ... চলিতে থাকে।

প্রায় এক শত বৎসর পরে গ্রীক জগতের অবসাদ ... ইজিপ্ট, পশ্চিম-এসিয়া ও নানা স্থানে গ্রীক রাজ্য স্থাপিত ... পরে এগুলি আবার রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ... তের বাণিজ্যের বিশেষ বিস্তার ঘটে এবং খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী... হিপলাস (Hippalus) নামক গ্রীক নাবিক মৌসুম ... গতি ও প্রবহনকাল এবং উহার সাহায্যে ভারত হইতে ... ও আফ্রিকায় গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমনের কাল ... পিত করেন। ঐ সময় হইতে ভারতীয় পণ্য প্রভূততর ... মাণে রপ্তানী হইতে থাকে এবং উহার পাশ্চাত্য জগতে ... আদরও হয়। রোমক ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে অনে... উহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবার দুই এক জন ... বা ভৌগোলিক ভারতীয় বাণিজ্যের সম্বন্ধে অনেক অবশ্যজ্ঞা... কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক... বিলুপ্ত হইলেও প্লিনীর ইতিহাস, টলেমীর ভূগোলবৃত্ত... (Ptolemy) এবং Periplus গ্রন্থ আজিও বর্ত্তমান রহিয়া... এবং ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যের সম্বন্ধে বিশদ সাক্ষ্য দিতেছে। ... আগামী প্রবন্ধে উক্ত যুগ ও তৎপরবর্ত্তী যুগের বাণিজ্য ... বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম্-এ



যুবক-জীবন

১

অধ্যবসায় সম্বন্ধে আমি যদি একটা জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ লিখতে বস্‌তুম, তা হ'লে ঐ শক্তির আধারের উজ্জ্বল আদর্শস্বরূপ শান্তিপুরের শ্যামাপদর নাম করতুম। উপর্য্যু-পরি চার বার I. Sc. পরীক্ষায় ফেল হয়ে-ও যার উদ্যমের অগ্নি কিছুমাত্র হীনতেজ হয় না, তার অধ্যবসায় গণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে পদ্মের পদ্মবনে প্রবেশ করে, এ কথা কে না স্বীকার করবে? কিন্তু পিতা উমাপদ লাহিড়ী মহা-শয় মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চোদ্দ দিনের দিন প্রাণত্যাগ করায় শ্যামা-পদকে আর পঞ্চম কিস্তির "ফি" য়ুনিভার্সিটীর খাজনাখানায় জমা দিতে হ'ল না।

শ্যামাপদর বার বার ফেল হওয়ার কারণ তার বুদ্ধির দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হানতা, সংযম বা পরিশ্রমের অভাব নহে। কৃষ্ণনগর কলেজের দু'একটি ছাত্র বর্ষের পর বর্ষ কলিকাতার য়ুনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে আবৃত্তিতে কৃতিত্ব প্রকাশ দ্বারা নিজেদের কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করে, এ দেখে শ্যামাপদর মনে-ও এক জন বড় রকম 'রিসাইটার' হবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে গেল। কত লোকের মনে কত আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, তাতে কার-ও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; কিন্তু শ্যামা-পদ ক-ত-জ-নে-র ভিতর সে এ-ক-জ-নে-র মত ছোকরা ছিল না, শৈশব হতে-ই মানবশক্তির একটা বিশিষ্টতা তার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। সত্য-ই শ্যামাপদ ভাল রকম আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে; কেবল ভাল নহে, যেমন এক ওস্তাদের কাছে অনেকে কুস্তি করতে শিখে, কিন্তু দু'একটি সাকরেদ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এমন দু'চারটে নতুন প্যাঁচ বার ক'রে ফেলে, যাতে তাদের শিক্ষাদাতা বীর-বিজয়ী পালোয়ান-ও সেই সাকরেদের সঙ্গে প্রকাশ্য আখড়ায় লড়তে ইতস্ততঃ করে; তেমন-ই শ্যামাপদ পুরাপ্রচলিত পথানুসরণ না ক'রে আবৃত্তিকালে বাক্যাবলীর দ্রুতবিলম্বিত গতির লয়ে বা বিরামে, স্বরগ্রামের তীব্র কোমল-ভাষণ-কৌশলে এমন একটু নূতন নিপুণতা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে যে, তিন বার 'অর্দ্ধেন্দু মেডেল' পাওয়া ফোর্থ ইয়ারের বিজয়-ও যেন একটু মনে মনে থমকে গেল।

চেহারাখানি ছিল ভাল, সুগঠিত দেহ, ব্যায়ামে পুষ্ট, পাদবিক্ষেপে ব্রজন-সৌন্দর্য্য, চক্ষে ভাষা, মুখে প্রাণ, কণ্ঠে শিবের ডমরু, বাণীর বীণা, শ্যামের বাঁশরী, এর উপর স্মৃতি নিদ্রাবিহীন। প্রথম প্রবেশে আনন্দোচ্ছ্বাসের করতালি-ধ্বনিতে সহস্রাধিক শ্রোতা এই অষ্টাদশবর্ষীয় সন্ধ্যার তারাকে স্নেহের স্নিগ্ধধারায় স্নান করিয়ে দিলে। যশ—যশ —যশ! স্মৃতি, উচ্চারণ, বাগ্মিতা, অভিব্যক্তি, বিমোহন-শক্তি গুণনিচয়ের পরিচয় পূর্ণমাত্রায় জয়লাভ। নির্ব্বাচনে সে বার ছিল ইংরাজীতে বায়রণের 'ওশান', বাঙ্গালায় রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস।'

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা এক জন প্রিয় প্রফেসরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন ক'রে শ্যামাপদকে প্রেম-চন্দন-রসসিক্ত কুসুমহারে বিভূষিত করলে। সভার প্রধান উদ্যোগী, অভিভাষণের লেখক ও পাঠক কলেজের পরাজিত চ্যাম্পিয়ন মহামনা বিজয়। একটা কথা ব'লে যাই বিজয়! তুমি হেরে জিতলে—হেরে জিতলে! এই নূতন জয়-পতাকা ওড়াতে আমরা যেন তোমার কাছে শিখি। কিন্তু এই মেডেল, এই ফুলের হার-ই শ্যামাপদর বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রসর হবার পথের মাঝে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াল। সে পাঠাভ্যাসে যাকে অবহেলা বলে, ঠিক তা করত না বটে, কিন্তু কৈশোরের সীমান্তে পৌঁছেই যশের রসাস্বাদন ক'রে তার প্রলুব্ধ তরুণ মন আর মাটীতে হাঁটি হাঁটি ক'রে চলতে যেন রাজী হ'ল না। এর উপর তার আকাশে উড়ে ভেসে বেড়াবার আশাকে বেশী ক'রে বাড়িয়ে তুললে সহরের "হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাব!"

২

হরমোহন দত্ত ছিল জাতিতে গন্ধবণিক্, সহরে-ই তার একখানি মশলার দোকান ছিল; তার পুত্র রাধামোহন এল, এ, পাশ ক'রে ঐখানকার একটি মাইনার স্কুলে ৩৫ টাকা মাইনের হেড মাষ্টার হয়। চাকরীটি করত রাধামোহন সভ্য সমাজে সম্মানের জন্য, সংসারের জন্য পৈতৃক দোকানখানিতে নিজে বসত সকাল-সন্ধ্যে, কিন্তু কায চালাবার সমস্ত ভার নিয়েছিল এক পিস্‌তুত ভাই সিকি বখরাদার হয়ে। রাধামোহনের পুত্র ব্রজমোহন বি, এল, পাশ ক'রে কৃষ্ণনগরের আদালতেই ওকালতী আরম্ভ করে। আর বাড়ী ঢোকবার দরজার ডান ধারে দেওয়ালে "বি,এম, ডাট,—বি,এল, প্লীডার" ক্ষোদা একখানি সাদা পাথর-ও বসিয়ে দেয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাক্‌শক্তি ও সামাজিক শিষ্টতার গুণে আশাতিরিক্ত অল্পসময়ের মধ্যেই ব্রজমোহনের বেশ পসার হয়ে যায়। ব্রজমোহনের পিতামহ হরমোহন দত্তের "খোড়ে" লাভ হয়েছে সে আজ প্রায় ৩০ বৎসরের কথা, নব্য দত্তের ভূমিষ্ঠ হবার বছরখানেক পূর্ব্বে। এত দিন বুড়োর নামগন্ধ কেউ করেনি; রাধামোহন যে বছর বছর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটা করত, তার প্রমাণও বাহিরের লোকে কেউ কখন-ও পায়নি; কতকগুলি মানের বই, ট্রানশ্লেশান কম্পোজিসনের বই, 'অভিধান বধ' ব'লে একখানি স্কুলপাঠ্য নাটক লিখে রাধামোহনের মাসিক আয় বিশেষ বর্দ্ধিত হওয়ায় দোকানখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব নামমাত্র ৫ শত টাকা পণে পিস্‌তুত ভাইকে লিখে দেয়; সুতরাং 'মোহন দত্তের দোকান' ব'লে নামটা-ও এখন বাজার-চলন নাই; হলুদ, জীরে, মরিচ প্রভৃতি কিনতে হ'লে লোকে এখন তনু পালের দোকানে-ই যায়।

কে মশাই আপনি জিগ্‌গেস কর্‌ছেন 'অভিধান বধ' নাটক আবার কি? এটা ত অতি সহজ কথা, সুকুমার বালকগণকে আর ডিক্সনারি ঘাঁটার কষ্ট স্বীকার ক'রে সময় নষ্ট কর্‌তে হবে না, বার আনা পয়সা খরচ করলেই এগ্‌জামিনে নম্বর পাবার উপযুক্ত রেডিমেড ব্যাখ্যা তাদের চক্ষুর সামনে প্রত্যক্ষ হবে; মাতা-পুত্রে কথোপকথনচ্ছলে লেখা হয়েছে ব'লে পুস্তকখানি নাটক উপাধিতে ভূষিত হয়েছে, নাটকে 'ফিমেল ক্যারেক্টার' থাকা চাই, তাই মাতার অবতারণা। এই নাটকের মাষ্টারকবি সংস্কৃতের সম্মান রেখে নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতিকে তাঁর কাব্যের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন; তবে প্রাচীন প্রথার অনুসরণ ক'রে নান্দীপাঠে হরপার্ব্বতী আদি দেবদেবীর স্তোত্র না দিয়ে একটি 'ইন্‌সপেক্টর-স্তোত্র' দিয়েছিলেন, আর সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনচ্ছলে ছাত্রদলকে বুঝিয়াছিলেন যে, টেক্সট বুক কমিটীর মেম্বাররাই বর্ত্তমান যুগে দিগম্বর ও পয়গম্বর; কাযে-ই সহজে বইখানি পাঠ্যপুস্তক ব'লে পাস হয়ে যায়।

যাক্ ও কথা। যখন ব্রজমোহনের ওকালতীর আয় মাসিক তিন শত টাকার কিছু উপর দাঁড়াল, তখন উপেক্ষিত পিতামহের জন্য তার প্রাণে আকুলতা উপস্থিত হ'ল। সে দেখে, যেখানে সেখানে যার-তার জন্য আজকাল শোকসভা হয়, অথচ তার পিতামহের নাম চিরস্মরণীয় করবার জন্য এ পর্য্যন্ত সে কিছুই করেনি; পিতা-ও এ বিষয়ে কখন-ও কোনরূপ মনোযোগ দেননি, এ আচরণটা-ও তার প্রাণে আঘাত দিলে। বাটীর প্রবেশদ্বারে বাম দিকের দেওয়ালটা খালি ছিল, "হরমোহন-মন্দির" লেখা একখানা পাথর ব্রজমোহন প্রথমেই সেখানে বসিয়ে দিলে। এই হ'ল তার প্রথম কার্য্য; দ্বিতীয় কার্য্য এক গার্ডেন পার্টি; বাগান না থাকায় শোবার ঘরের দোতালার ছাদের উপর টব সাজিয়েই গার্ডেন পার্টি হ'ল; কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে সহরের সেরা সেরা উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, প্রফেসার, মাষ্টার, বিশেষ সংবাদদাতা প্রভৃতি মহাশয়রা এসে পরিতোষে চা চিঁড়ে নারিকেল বিস্কুট কেক স্যাণ্ডুইচ শিঙ্গাড়া নিম্‌কি সরভাজা রসগোল্লা খেয়ে ব্রাদার ব্রজমোহনকে লায়নাইজ ক'রে চোখের জলে ভাসিয়ে গেলেন।

এ সুখের চোখের জল মোছাবার নয়, তাই ভিজে ভিজে পল্লবে ধূলোপায়েই ব্রজমোহন তাঁর তৃতীয় কার্য্য পিতামহের স্মৃতিরক্ষার্থ শোকসভারূপ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। এখন-ও বড় বড় লোকেদের পেটে চিঁড়ে চপ্ প্রভৃতি ভাল ক'রে হজম হয়নি, সুতরাং "বলি বলি বলা হ'ল না", পোড়া লজ্জা এসে কর্‌লে মানা, তাই আর কেউ স্পষ্ট বল্‌তে পারলে না যে, কে এক জন মশলা-বেচা হরমোহন মরেছে—সে কোন্ কালে, এখন তার শোক-সভা দু'জন বিশেষ সংবাদদাতা সেকেণ্ড ক্লাশ রেলের ভাড়া, আর আনুসঙ্গিক খরচের জন্য ব্রজমোহনের কাছ থেকে গোটা আশী নব্বুই টাকা নিয়ে কলকাতা থেকে তিন জন ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশ শোকসভা-বক্তাকে কৃষ্ণনগরে ধ'রে নিয়ে এল। মাইনর স্কুলের দুইটি ছাত্র স্ব স্ব রচিত দু'টি শোকোচ্ছ্বাস কবিতা প্রথমে আবৃত্তি করেছিল; স্থানীয় বক্তা অনেকে-ই হরমোহনের নাম স্মরণ ক'রে তাঁর স্মৃতিরক্ষা যে প্রত্যেক নর-নারীর কর্ত্তব্য, তা ঘোষণা করলেন; সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্যাথেটিক হয়েছিল কলিকাতা হইতে আগত হারাণ পরামাণিকের বুদ্ধদেবের সহিত হরমোহনের তুলনা ক'রে বক্তৃতাটি। হরমোহন ছিল কর্ত্তাভজা, প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর হরমোহনের বাড়ীতে ঐ দলের লোক মিলে গান ও বাতাসা বিতরণ হ'ত, দু'চারটি দেহ-তত্ত্বের গান-ও হরমোহনের নিজের রচনা, কাযে-ই হরমোহন যে ছিলেন এক জন ধর্ম্মগুরু, স্বভাব কবি ও দাতা, এটা প্রকাশ্য বিরাট সভায় 'রেজোলিউশনিত' ও অনুমোদিত হয়ে গেল। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্যামাপদর মুখে হ্যামলেটের I am thy father's ghost রেশিটেশন শুনে উপস্থিত সকলে-ই মুগ্ধ হয়ে গেল, যাঁরা চাঁদার খাতায় সহি করবার ভয়ে একটু আগে-ই প'য়ে আকার দিয়েছিলেন, তাঁদের শেষটা হায় হায় করতে হয়েছিল; কেন না, লোকচরিত্র-বিজ্ঞানবিদ্ উদীয়মান উকীল ব্রজমোহন জানত যে, সহি করলে টাকা বড় কেউ দেবে না, তাই চতুর্থ প্রস্তাবটা এজেণ্ডা থেকে আগেই উঠিয়ে দিয়েছিল।

৩

দানীং ব্রজমোহনের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর যে চায়ের মজলিস বসতে আরম্ভ হয়েছে, তাতে আমোদ-প্রমোদের জন্য 'ব্রীজ' 'টয়েন্টিনাইন' 'ক্যারাম' 'লুডো' প্রভৃতি খেলা-ই হ'ত। এক দিন বিজয় প্রস্তাব করলে, "কি তাস পিটে আর ঘুঁটি ঠিক্‌রে সময় বাজে নষ্ট করা যায়, তার চেয়ে একখানা ভাল নাটক রিহার্শাল দিয়ে প্লে করলে একটা ভাল কায হয়।" ব্রজমোহন বললে, "তোমাদের এখানে ত ক'বার ক'টা দল হ'ল, তাদের যা অভিনয় দেখেছি, তাতে থিয়েটারের উপর, এক্টারের উপর এক রকম ঘেন্নাই জন্মে গেছে।"

বিজয় উত্তর করলে, "আপনার মত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কখন-ই Acting as an artকে condemn করতে অর্থাৎ অভিনয়-কলাটার একেবারে নিন্দা করতে পারেন না; তবে যাদের অভিনয় দেখেছেন, তারা কি শ্রেণীর লোক, লেখাপড়াই বা কতটা করেছে, চরিত্র-ই বা কেমন, আর তার উপর তাদের মধ্যে ক'জন কলকাতায় গিয়ে ভাল ভাল বাঙ্গালা ইংরাজী থিয়েটারের অভিনয় দেখেছে কি বায়স্কোপে গিয়ে এ্যাক্সন-ট্যাক্সনই ষ্টাডি করেছে—সেটা বিবেচনা ক'রে দেখবেন। এই সব কারণেই বলছি, একটা রীতিমত ড্রামাটিক ক্লাব স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। I speak for the honour of an ancient town; এই কৃষ্ণনগরই এক দিন বঙ্গদেশের কবিদের কৃতিত্বের, চারুশিল্পের উন্নতির পবিত্র তীর্থ ব'লে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। আমি আবার প্রস্তাব করছি, যদি ব্রজমোহন বাবুর কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাব' নাম দিয়ে একটা ইন্‌সটিটিউসন কৃষ্ণনগরে খোলা হোক।"

"যদি আমার নাম দিয়ে ক্লাবটা খোলবার প্রস্তাব করতেন, তা হ'লে কখনই আমি এতে সম্মত হতুম না নিশ্চয় জানবেন; তবে আপনাদের এই শুভানুষ্ঠানের সঙ্গে যখন এক জন মহাপুরুষের নাম সংশ্লিষ্ট করতে চাইছেন, তাতে বাধা দেবার আমার কোন অধিকার আছে, তা আমি মনে করি না। হরমোহন দত্ত এখন আর আমার পিতামহ নহেন, তিনি Public property,—দেশের সম্পত্তি। সুতরাং বিজয় বাবুর প্রস্তাব আমি সানন্দে অনুমোদন করছি।"

ইংরাজীতে 'College and camp plays' ব'লে স্ত্রীচরিত্র-বর্জ্জিত অথবা সৌখীন-সঙ্ঘের উপযোগী দু'একটি স্ত্রীচরিত্র-সংবলিত হাল্‌কা হাল্‌কা ছোট ছোট নাটক আছে, বাঙ্গালা ভাষায় আজ-ও সে রকম শ্রেণীর নাটকের সৃষ্টি এক রকম হয় নি বললে-ই চলে; সুতরাং আণ্ডারগ্রাজুয়েট প্রভৃতির অভিনয় করবার স্বাভাবিক পিপাসা-পরিতৃপ্তির জন্য তাঁরা এক প্রকার অগত্যা সাধারণ নাট্যশালায় যে সকল গুরুগম্ভীর নাটকের অভিনয় হয়, তার-ই কোন একখানি আপনাদের কাযের জন্য নির্ব্বাচিত ক'রে নিতে বাধ্য হন। 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাবের' জন্য নাটক নির্ব্বাচনের কথা উঠিলে বিজয় বললে, "বঙ্গের সমস্ত খ্যাতনামা নাট্যকারদের সসম্ভ্রমে প্রণাম ক'রে বলছি যে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক থাকতে অন্ততঃ কৃষ্ণনগরে আর কারও নাটক নিয়ে অভিনয়-কলার শুভ উদ্বোধন হ'তে পাবে না।" "Righto" ব'লে কোরাসকণ্ঠ ব্রজমোহনের বৈঠকখানার ভিতর যেন এক সেকেণ্ডের জন্য একটা দমকা বাতাস বইয়ে দিলে।

চাণক্যের পাঠ ও শিক্ষা দেওয়ার ভার বিজয়ের। রিহার্শাল অনেকটা এগিয়েছে, এমন সময় সেই শোকসভার অধিবেশন আর শ্যামাপদর "I am thy father's spirit" রিসাইটেশন। মিটিংএর পর-ই বিজয় শ্যামাপদকে রিহার্শাল ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

বিজয়। তোমাকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে-ই হবে।

শ্যামা। আজ্ঞে, একটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে, এবার এগজামিনটা—

বিজয়। সেই রাণাঘেটে অটোমেটামটাকে পাশ ক'রে যে এগজামিন শ্যামাপদ লাহিড়ীর মতন budding geniusকে pluck ক'রে দেয়, সে পরীক্ষার এক এক ক'রে চতুষ্পদে নমস্কার! ফিজিক্সে গেছ ত, আমি M-Scটা পড়ব কি না, এখন-ও ঠিক করি নি; দেখি একবার তোমায় নিয়ে প'ড়ে, ফিরে বার কি হয়। চাণক্যটা তোমার নিতে-ই হচ্ছে; রিহার্শাল মাষ্টারী আর অত বড় একটা পার্ট একসঙ্গে আমার উপর কিছু অত্যাচার।"

শ্যামাপদ যেন চম্‌কে উঠল,—"সে কি মশাই, আপনি থাকতে আমি চাণক্য নিয়ে বেরুলে লোকে বলবে কি!"

বিজয় উত্তর করলে, "বলবে—অন্ততঃ হনুমান্ ব'লে জীবের একটা আলাদা 'কলোনী' থাকায় কৃষ্ণনগরের লোকের বুদ্ধির ভিতর মনুষ্যত্ব আছে; 'জ্যেষ্ঠ হ'লেই শ্রেষ্ঠ হয় না' ডি, এল, রায়ের এই রায়ের বিরুদ্ধে তাই তারা আপীল করে নি।"

আধঘণ্টা ধ'রে তর্কাতর্কি এ মত—ও মত—অবশেষে স্থির হ'ল, বিজয় যেমন চাণক্য আছে, তেমন-ই থাকবে—শ্যামাপদকে দেওয়া হ'ক সেলুকাসটা।

কয়েক মাস পরে বড় দিনের বন্ধর সময় যখন মহা সমারোহে চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় হয়ে গেল, তখন কৃষ্ণনগরের লোকদের মধ্যে দুটো আলাদা ওপিনিয়ন দাঁড়িয়েছে দেখা গেল; চাণক্য ও সেলুকাস দুই-ই যে উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হয়েছে, এটা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু কতকগুলি লোক বলতে লাগল যে, সেলুকাস চাণক্যকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বিজয় নিজে বলেছিল যে, "ভালই করি—মন্দই করি, আমি চাণক্যের যে একেবারে অনুকরণটা ত্যাগ করেছি, তা বল্‌তে পারি না। কিন্তু শ্যামাপদর সেলুকাস তার নিজের সৃষ্টি।"

কলিকাতার 'রঙ্গ-রহস্যরা'তে পর সপ্তাহে প্রকাশিত হ'ল, "আমরা সানুনয়ে নিমন্ত্রিত হওয়ায়, আফিস হইতে রেলভাড়া দিয়া 'হরমোহন ড্রামাটিক ক্লাবের' অভিনয় দর্শনার্থ স্বয়ং সশরীরে কৃষ্ণনগরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। বিস্তৃত সমালোচনা আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ * * * * * থিয়েটারের পেশাদারী অভিনয়ে * * * * কে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি যে, তিনি একবার কষ্ট করিয়া কৃষ্ণনগরে গিয়া কিরূপে দেবুয়া চরিত্র অভিনয় করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আসুন। দ্বিতীয় অভিনয় সম্ভবতঃ প্রথমবার অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেন না, কলাক্রাট সমালোধন সম্বন্ধে আমাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবেন, সে ধৃষ্টতা কৃষ্ণনগরের নাই।"

কৃষ্ণমাসে এই যশোলাভ, কিন্তু শ্যামাপদর মন তাতে কানে কানে বলিতে লাগিল,—Bewere of the ides of March, কিন্তু "গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যার" জুনের গেজেটে দেখা গেল যে, পরীক্ষার্থীদিগের উত্তরপত্র খাদ কষিবার কনট্রাক্ট যে ডিগ্রীধারীরা দেন, তাঁদের মধ্যে এক জন শ্যামাপদর কলাজ্ঞানের প্রতি দৃক্‌পাত না করে বেচারাকে কেমেষ্ট্রীতে ফেল করেছেন।

গেল বার ফিজিক্স, এবার কেমেষ্ট্রী; শ্যামাপদর দৌর্ব্বল্যটুকু যে কোন্‌খানে, তা সে নিজে-ও বুঝতে পারে না, অধ্যাপকরা-ও বুঝতে পাচ্ছেন না। অভিনয়-গৌরবের সৌরভ-ও বেচারীর এই নৈরাশ্যজনিত অবসাদ-আচ্ছন্ন প্রাণকে জাগরিত করতে সমর্থ হ'ত না, যদি না রঙিন পাখা মেলিয়া প্রজাপতি ঠিক এই সময়ে মহিম মৈত্রের কিশোরী কন্যা বিভার কুসুমোপম অঙ্গস্পর্শ ক'রে শ্যামাপদর গায়ে উড়ে এসে না বসত। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

শাসন-সংস্কার কমিশন

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষীয় শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে সেই আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, কতকগুলি বিভাগের কার্য্যপরিচালনার ভার ভারতবাসীদিগের হস্তে অর্পিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের মন্ত্রীরা সেই বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ হইতে গবর্ণর মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিবেন। গবর্ণর বিশেষ প্রয়োজন বোধ বা ক্ষতির সম্ভাবনা শঙ্কা না করিলে মন্ত্রিগণের কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই ব্যবস্থার দ্বারা দৃশ্যতঃ ভারতীয় জনসাধারণের হস্তে কতকটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে ঐ আইনে এইরূপ একটি সর্ত্ত সংযোজিত করা হইয়াছিল যে, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার (ঐ নামেই ঐ শাসন-সংস্কার অভিহিত হইয়া থাকে) পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে উহার ফল কি হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ১০ বৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর বিলাতের পার্লামেণ্ট ঐ সংস্কৃত শাসন-পদ্ধতির কার্য্যফল কিরূপ হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধানকল্পে এক রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত করিবেন। সেই রয়্যাল কমিশন যদি অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, নবাবলম্বিত শাসনপদ্ধতি শুভ ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট কমিটীর নিকট তাহা রিপোর্ট করিবেন। পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী, অর্থাৎ লর্ড এবং কমন্স সভার কয়েক জন নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত কমিটী, পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত রয়্যাল কমিশনের সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও রিপোর্ট আলোচনা করিয়া যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তদনুসারে ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনলাভের পথে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিবেন। আর যদি পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিশন মনে করেন যে, এই শাসনপদ্ধতির দ্বারা সুফললাভ হয় নাই, বরং কুফলই ফলিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে যেটুকু স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিয়াছেন, তাহারও সঙ্কোচ-সাধন করিতে পারিবেন।

যে সময় এই মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সময়ে অসহযোগব্রত অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাচন-ব্যাপারে যোগদান করেন নাই, এবং সদস্যপদেরও প্রার্থী হয়েন নাই। তাহা হইলেও কোথাও নির্ব্বাচন রহিত হয় নাই; সকল নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতেই সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছু কাল এই শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিবার পরই অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সংস্কৃত শাসনপদ্ধতি একটা দর্শনধারী ব্যাপারমাত্র,—উহাতে প্রকৃতপক্ষে কোথাও ভারতের স্বৈরাচারী বুরোক্রেশীর হস্তন্যস্ত কোন ক্ষমতা বা অধিকারই ভারতবাসীর—অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ মন্ত্রিমণ্ডলীর—হস্তে প্রদত্ত হয় নাই। সেই জন্য ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই এই শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে পরিব্যক্ত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষ হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে শাসন-সংস্কার সাধনার্থ আইন মতে আবশ্যক রয়্যাল কমিশন বসাইয়া এই গুণহীন ও দর্শনধারী শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-সাধনকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার সংস্কৃত শাসন-পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে কি অসুবিধা ঘটে, তাহার অনুসন্ধান ও প্রতীকারের উপায়নির্দ্ধারণকল্পে এক কমিটী নিযুক্ত করেন। ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রসচিব অনারেবল সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান সেই কমিটীর চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। সেই কমিশনের রিপোর্টে দুই পক্ষ দুই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কমিশনের সদস্যদিগের ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন ভিন্নমত হইয়া স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। যে ৫ জন মেজরিটী রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনারেবল ডাক্তার সার মহম্মদ সফি পরে বলিয়াছিলেন যে, সরকারী সদস্য বলিয়াই মেজরিটী রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার মাইনরিটী রিপোর্টের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজও মেজরিটী রিপোর্টের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। তিনি দ্বৈতশাসনের বিশেষ

DOUBLE COLOUR PAGE

প্রশংসাও করেন নাই অথবা বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের কতকগুলি বিশেষ দোষ অস্বীকার করেন নাই। মন্ত্রীদিগের কার্য্যকরী শক্তি যে অনাবশ্যকভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল, এরূপ ধারণা যে তাঁহার জন্মিয়াছিল, এ কথা তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র মন্তব্যে কতকটা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই কমিশনের কার্য্যতঃ তিন জন ইংরাজ সদস্যই সম্পূর্ণ একমত হইয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাই মেজরিটী রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উহাই মাইনরিটী রিপোর্ট। যাঁহারা ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহারা চারি জনেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌-ফোর্ড শাসনপদ্ধতির "যথেষ্ট দোষ আছে, ভবিষ্যতেও ইহার দ্বারা সুফললাভের আশা নাই।" সেই রিপোর্ট লইয়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষভাবে আলোচনা উপস্থিত করা হইয়াছিল। এখানকার এবং বিলাতের সরকার তখন নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে ভাবে এই শাসনযন্ত্রের সংস্কারসাধন করা হইয়াছে, তাহা কোনমতেই ভারতবাসীর রুচিকর হইতে পারে না। উহাতে মন্ত্রীদিগকে শিখণ্ডিরূপে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বুরোক্রেশীর পক্ষে পশ্চাৎ হইতে কার্য্য পরিচালিত করিবার যথেষ্ট সুবিধা জন্মিয়াছে। উহা ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনলাভের পথে অগ্রসর করিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নহে।

এই ক্ষেত্রে একটা পূর্ব্বকথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে স্বরাজপন্থী দল সর্ব্বত্রই অন্যদল অপেক্ষা অধিকসংখ্যায় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশলাভ করেন। হয় শাসনপদ্ধতির সংস্কার বা উহার সংহারসাধনই এই দলের মূলমন্ত্র। তদনুসারে ইঁহারা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীদিগের বেতন নামঞ্জুর করিয়া শাসনযন্ত্র অচল করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। বাঙ্গালায় এবং মধ্যপ্রদেশে তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল; কিন্তু শাসনকার্য্য অচল হয় নাই। এই সময়ে স্বরাজলাভের চিন্তা ভারতবাসীর চিত্তে খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল। অনেকে খোলসাভাবেই শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জনৈক উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী যুবক মিষ্টার ডে নামক জনৈক নিরীহ য়ুরোপীয় ভদ্রলোককে অন্য লোক মনে করিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া হত্যা করে। প্রকাশ, মিষ্টার ক্রস নামধেয় আর এক জন য়ুরোপীয়কে ঐ ভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কলিকাতায় এক বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়, এবং ফরিদপুরেও একটি বোমার কারখানার অস্তিত্ব ছিল শুনা যায়। যে ভাবে কলিকাতায় মাণিকতলায় এই বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ ব্যাপারই সন্দেহজনক ও প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইয়াছিল। এ দিকে স্বরাজপন্থীরা ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্য অকুণ্ঠভাবে প্রচলিত শাসনপদ্ধতির সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালায় বুরোক্রেশী এই ব্যাপারে বিশেষ ফাঁপরে পড়েন। অতঃপর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গীয় সরকার তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রেডিংএর সম্মতি লইয়া এক অর্ডিনান্স বা স্বৈরাচারমূলক ধরপাকড়ের আদেশ জারি এবং একসঙ্গে বেড়াজালে বাঙ্গালায় ৬৩ জন যুবককে ঐ আইন অনুসারে এবং ১৯ জনকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ নং রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই সময়ে অপ্রত্যাশিত খানা তল্লাসেও বিপ্লববাদপ্রচারের সমর্থক কোন গুপ্ত অস্ত্রাগার বা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সরকারী বেড়াজালে যত লোক গ্রেপ্তার এবং অবিচারে বন্দী হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণ বিস্ময় মানিয়াছিল। অনেকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, দেশে যদি এমন ব্যাপকভাবে রাজনীতিক ষড়যন্ত্র বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে এ দেশের সাধারণ লোক যে তাহার একটু আভাসও পাইত, ইহা হইতেই পারে না। সরকার যাঁহাদিগকে এই ভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্ততঃ লোকের নিকট বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা কথা বলিতেন। যাঁহাদিগকে পুলিস প্রথমেই গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্বরাজপন্থীদলের তিন জন অগ্রণী এবং কয়েক জন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। সেই জন্য কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, সরকার পুলিসের সাহায্যে স্বরাজ্যদল দলনের জন্যই অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন; কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে, স্বরাজ্যদলের কোন ব্যক্তির সহিত হয় ত বিপ্লবপন্থীদিগের যোগ ছিল; আবার কোন কোন ব্যক্তি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে গোয়েন্দা বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচের জন্য জনসাধারণে

প্রতিনিধিরা চেষ্টা করিতেছেন, সেই হেতু গোয়েন্দা বিভাগ আপনাদের প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণের জন্য বিপ্লববাদমূলক ষড়যন্ত্রের কথা কল্পনা করিয়া কতকগুলি নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়াছে। ফল কথা, সরকারের এই কার্য্যে নানা জনে নানা ভাবেই মত প্রকাশ করিয়াছিল। আসল কথা, ইহাদের মধ্যে সকলেই নির্দ্দোষ না হইলেও অধিকাংশ লোক যে নির্দ্দোষ, এরূপ ধারণা সকল লোকের মনেই জন্মিয়াছিল এবং এ দেশের লোক সরকারের এই স্বৈরিতামূলক কার্য্যে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

এ দিকে স্বরাজ্যপন্থীদলের প্রতিকূলতার ফলে সরকার পক্ষের শাসনযন্ত্র পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও শাসনযন্ত্র কুত্রাপি অচল হয় নাই। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ্যদলের অন্যতম নায়ক মিষ্টার সি, আর, দাশ বলেন যে, সরকার যদি একটা রফা বন্দোবস্ত করিবার মত মনোভাব ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিরোধনীতি পরিহার করিতে প্রস্তুত আছেন। সেইরূপ মনোভাব প্রকটিত করিতে হইলে সরকারকে বিনা বিচারে আটক আসামীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে এবং এই শূন্যগর্ভ এবং দর্শনধারী শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য একটি পরামর্শ বৈঠক বসাইতে হইবে এবং সেই বৈঠকে যাহা ন্যায্য হইবে, বিলাতের পার্লামেণ্টকে তাহাই আইনে পরিণত করিতে হইবে। ফরিদপুরের কনফারেন্সে মিষ্টার দাশ ঐরূপ মতই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সরকার সেই কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে লর্ড বার্কেণহেডের আহ্বানের উত্তরে মিষ্টার দাশ এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলেন যে, সরকার যদি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তিনি সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে দার্জ্জিলিং শৈলে মিঃ দাশের দেহান্ত হয়। এ পর্য্যন্ত লর্ড বার্কেণহেড মিঃ দাশের উক্তির উত্তরে কোন কথাই বলেন নাই।

এই সময়ে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, সরকার ভারতীয় নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার মনোভাব প্রকটিত করিবেন। জুলাই মাসের ৭ই তারিখে বিলাতের লর্ড সভায় লর্ড অলিভিয়ারের প্রশ্নের উত্তরে লর্ড বার্কেণহেড এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, "ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনে রয়্যাল কমিশন নিয়োগের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ভারতীয় শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তনসাধন যে আবশ্যক, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ফল দেখিয়াই দ্বৈতশাসনের সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতার অবধারণ করা হইবে। দ্বৈতশাসন নির্দ্দোষ নহে। স্বরাজ্যদলের প্রতিরোধ-নীতি উন্নতিলাভের পথ নহে। যদি ভারতীয় জননায়কগণ একযোগে সরকারের সহিত সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বেই শাসনযন্ত্রের সংস্কার-সাধন করা হইবে।" কিন্তু লর্ড বার্কেণহেডপ্রমুখ ইংরাজ রাজনীতিকবর্গের ভারতে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির মত মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা শাসন-সংস্কার-সম্পর্কিত ব্যাপার অনুসন্ধানকল্পে যে রয়্যাল কমিশন বসাইবেন, তাহা যে পার্লামেণ্টারী কমিশন হইবে, এমন কথাও তখন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, লর্ড বার্কেণহেড যখন লর্ড রেডিংকে পরামর্শের জন্য বিলাতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখনও তিনি লর্ড রেডিংকে সে কথা বলেন নাই, ইহাও সম্প্রতি লর্ড সভায় লর্ড রেডিংএর বক্তৃতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

যে সময়ে লোকের মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সরকার ভারতীয় লোকনায়কদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবাসীকে অধিকমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিবেন, তাহার অল্পদিন পরেই ভারতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আলিগড়ে মুস্লিম লীগের যে অধিবেশন হইয়াছিল, সার আব্দার রহিম তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই এক শ্রেণীর মুসলমানদিগের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে বুঝা গিয়াছিল যে, এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং যোগ্যতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া বিশেষ অধিকারলাভ দ্বারা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভের প্রয়াসী, ইহাই প্রকাশ পায়। সার আব্দার রহিম মুসলমান সমাজের এক জন শিক্ষিত লোক; তিনি কেবল বঙ্গীয় লাটের শাসন-পরিষদ ছাড়িয়াই আলিগড়ে ঐ বক্তৃতা করেন। তখনও লাট সভার আবহাওয়া তাঁহার মনোবৃত্তির উপর ক্রিয়া

করিতেছিল, ইহাই লোক আশা করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখে এইরূপ বক্তৃতা শুনিবার আশা কেহই করে নাই। অনেকে উহা সাম্প্রদায়িক বিবাদের উত্তেজক মনে করিয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে হিন্দু-মুসলমানে কিছু মনোমালিন্য ছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোহাটে মুসলমানগণ আগন্তিতে উত্তেজিত হইয়া হিন্দুদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করে। এই হাঙ্গামায় প্রায় ১ শত ৫৫ জন লোক হতাহত এবং অন্ততঃ ৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিবাদ যে অনধিককালমধ্যে আসমুদ্র হিমাচল ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে, তাহা কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সার আব্দারের বক্তৃতার অতি অল্পদিন পরেই এই সুদূর বঙ্গদেশেও হিন্দুবিদ্বেষ-প্রচারক অনেক মুসলমান প্রচারক দেখা দেয়, ইহা সংবাদপত্রেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখে কলিকাতায় অতি তুচ্ছ কারণে আর্য্যসমাজী এবং মুসলমানে দাঙ্গা বাধে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কেহই প্রতিমা-পূজক বা উহার সমর্থক না হইলেও যেন প্রতিমাপূজক হিন্দুদিগকে এই বিবাদে টানিয়া লইবার জন্যই মুসলমান গুণ্ডার দল মন্দির ষ্ট্রীটের শিবমন্দির লুণ্ঠন এবং উহার অভ্যন্তরস্থিত শিবলিঙ্গটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ফলে সনাতনী দল এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজপথে সনাতনী হিন্দু ও শিখদিগকে আক্রমণ দ্বারা এই বিবাদের প্রসার অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, ক্রমে এই বিবাদের অনল বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার এবং বোম্বাই প্রদেশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনলে পুড়িয়া ছারখার হইতে থাকে। প্রয়াগের দাদকাণ্ডো মিছিল, রামলীলা মিছিল এবং অন্যান্য স্থানে অনেক প্রতিমার নিরঞ্জনব্যাপার বন্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডে পশ্চিম-ভারতে এই বিবাদ গুপ্তহত্যার আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মধ্যভাগ হইতে অক্টোবর মাসের প্রথম পর্য্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ অত্যন্ত প্রবলভাব ধারণ করে।

ভারতে যখন সাম্প্রদায়িক বিবাদ অত্যন্ত তীব্রভাব ধারণ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেড ভারতে শাসন-সংস্কার কমিশন বসাইবার ব্যবস্থা করেন। ইতঃপূর্ব্বে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে তিনি তেতের লর্ড সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "যদি শুক হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আইনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূ ঐ রয়্যাল কমিশন বসাইবেন এবং সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবা যদি একমত হইয়া কোন শাসনযন্ত্রের পরিকল্পনা ক তাহা হইলে কমিশন তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা দেখিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসীর সাহচর্য্য করা আবশ্যক হইবে।" বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসীই সরকারের সহিত সহযোগিতা সম্মত হয়েন নাই। অধিকন্তু এই সময়ে ভারতের সা সাম্প্রদায়িক বিবাদ চরম সীমায় উন্নীত হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ কিছু দিন ধরিয়া শুনা যাইতেছিল যে, শী শীঘ্রই শাসনসংস্কার কমিশন বসাইবেন। ১৯২৯ বিলাতের সাধারণ নির্ব্বাচন হইবার সম্ভাবনা। নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়েন সন্দেহ। সেই হেতু মিষ্টার বলডুইন প্রমুখ বিলাতী রাজনী গণ তৎপূর্ব্বেই ভারতের শাসনসংস্কার করিবার একটা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ভিন্ন আর কোন কথাই শুনা যায় নাই।

ইতোমধ্যে আর একটা ব্যাপার সংঘটিত হইয়া ব্যাপারটা তুচ্ছ হইলেও এই ঘটনা সম্পর্কে তাহার নিতান্ত অল্প নহে। মিস্ ক্যাথারাইন মেয়ো নাম্নী এ মার্কিণী মহিলা এ দেশে কিছু দিন ভ্রমণান্তে স্বদেশে যাইয়া একখানি গ্রন্থ লিখেন। সেই গ্রন্থখানির "মাদার ইণ্ডিয়া।" গ্রন্থখানিতে ভারতবাসীদিগের কুৎসা এবং ভারতীয় ব্যুরোক্রেশীর অযথা প্রশংসা করা উহাতে ভারতবাসীদিগকে অত্যন্ত হীন এবং বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ঐ পুস্তকখানি বিলাতের পার্লামেণ্টের সদস্যদিগকে বিনা প্রদান করা হইয়াছিল। মার্কিণেও উহা অত্যন্ত সংখ্যায় বিকাইয়াছিল। বিলাতেও উহা নিতান্ত অল্প নাই। এই মিথ্যাবাদপূর্ণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মার্কিণের জনসাধারণের মনে এখন একটা ধারণা জ যে, ভারতবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য এবং বর্ব্বর

স্বায়ত্তশাসনলাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতএব উহাদের এখন ইংরাজ ব্যুরোক্রেশীর সম্পূর্ণ অধীনে থাকাই আবশ্যক। জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় এই জঘন্য পুস্তকখানি অনুবাদ করিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে শুনিতেছি।

এক দিকে সাম্প্রদায়িক বিবাদে ভারত ছিন্ন-ভিন্ন, অন্য দিকে মিস্ মেয়োর গ্রন্থপাঠে মার্কিণের ও বিলাতের জনসাধারণ ভারতবাসীর উপর বীতশ্রদ্ধ, এই অশুভক্ষণে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় শাসনপদ্ধতির সংস্কার বা সঙ্কোচসাধনকল্পে এক পার্লামেণ্টারী কমিশন বসাইলেন। পার্লামেণ্টারী কমিশন অর্থে কেবল বিলাতের লর্ড এবং কমন্স সভার সদস্যগণকে লইয়া গঠিত কমিশন। এই কমিশনে কোন ভারতবাসীকেও গ্রহণ করা হয় নাই। সর্ব্বসাকল্যে ৭ জন কমিশনার লইয়া এই কমিশন গঠিত হইয়াছে। যথা—



সার জন সাইমন

(১) সার জন সাইমন (চেয়ারম্যান)

(২) ভাইকাউণ্ট বার্ণহাম।

(৩) লর্ড ষ্ট্রাথকোণা।

(৪) অনারেবল এডোয়ার্ড কডোগান।

(৫) দি রাইট অনারেবল ষ্টীফেন ওয়াল্‌স। তৎস্থানে মিষ্টার হার্টশর্ণ।

(৬) দি রাইট অনারেবল জর্জ্জ লেন ফক্স।

(৭) মেজর সি, আর এট্‌লী।

এই সদস্যসপ্তকের মধ্যে কেবল সার জন সাইমনের নাম রাজনীতিক সমাজে বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত। ব্যবহারশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। উদারনীতিক মিষ্টার আস্কুইথের আমলে ইনি বিলাতের 'সালসিটার জেনারল' এবং 'এটর্ণি জেনারলের' পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজনীতিক হিসাবে ইনি এক জন আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) এবং দার্শনিক দৃষ্টিতে রাজনীতিক ব্যাপার দেখিতে অভ্যস্ত। তাঁহার চিন্তার ধারা দার্শনিক পণ্ডিতের বা অধ্যাপকের চিন্তার ধারার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট খাতেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। এক কথায় তিনি অনেকটা আদর্শবাদী। মতবাদের হিসাবে তিনি সুপণ্ডিত হইলেও ভারতীয় শাসন-সংস্কার-সম্পর্কিত জটিল তত্ত্বের সমাধানে তিনি কত দূর সমর্থ হইবেন, তাহা বলাই কঠিন। তিনি ইহুদী। ধনী সম্প্রদায়ের ও সাম্রাজ্যবাদীদিগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি কত অধিক, তাহা বলা কঠিন। বিলাতে যখন কয়লার খনির মজুরদিগের সহিত সহানুভূতি করিয়া সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট করা হইয়াছিল, তখন ইনি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট করা বে-আইনী বলিয়াছিলেন বলিয়া কতকগুলি লোক ইঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন। ইহা অবশ্য প্রণীত আইন সম্পর্কে মতামতের কথা। ভারত সম্বন্ধে ইনি যে কখনও বিশেষ টানের কথা বলিয়াছেন বা কোন বিজিত জাতির স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। লর্ড বার্কেণহেড বলিয়াছেন যে, ভারত সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনরূপ পূর্ব্ব-গঠিত সংস্কার আছে বা পূর্ব্বে যাঁহারা ভারত সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ধারণা করিয়া লইয়াছেন, এই কমিশনে সেইরূপ লোক গ্রহণ করা হয় নাই; সুতরাং লর্ড বার্কেণহেডের এবং মিষ্টার বলডুইন প্রমুখ বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীর বিবেচনায় ইনিই যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

এই সার জন সাইমন ভিন্ন এই রয়্যাল কমিশনে আর যে ৬ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন খ্যাতনামা বা প্রতিভাশালী লোক আছেন বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ রাজনীতিক্ষেত্রে কেহই এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন পরিচয় দিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে বর্ত্তমান ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেড বলিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে যাঁহাদের বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ (best brains), তাঁহাদিগকে লইয়াই ভারতের শাসনসংস্কার-সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশন গঠন করা হইবে। এ ক্ষেত্রে তাঁহার সেই

প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। ইহাও ভারতবাসীর পক্ষে এই কমিশন নিয়োগে অসন্তুষ্ট হইবার অন্যতম প্রবল কারণ। আমরা নিম্নে একে একে সকল কমিশনারের পরিচয় প্রদান করিলাম।

(২) লর্ড বার্ণহাম দ্বিতীয় কমিশনার। ইনি ইউ-নিয়নিষ্ট। রাজনীতিক্ষেত্রে ইঁহার প্রভাব বা কৃতিত্ব কিছুই আছে বলিয়া আমাদের মনে পড়িতেছে না। ইনি বিলা-তের "ডেলী টেলিগ্রাফ" নামক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী। এই "ডেলী টেলিগ্রাফে" ভারতের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ-সাধনের প্রতিকূল মতই অনেক সময় প্রকাশিত

Canadian) বংশোদ্ভব অভিজাত। ইঁহার পিতা এক ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং মোটের উপর ভাল মানুষ ছিলে অল্পদিন পূর্ব্বে ইঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে ইনি পিতৃপদবী পিতৃধনের এবং লর্ড সভায় পিতার আসনের অধিকা হইয়াছেন। ইনি পিতৃধনের ও পিতৃপদবীর অধিকারে সহিত পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছেন কি না, তাহা কোন বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি রক্ষণশী দলের এক জন যোগাড়দার। ইঁহার পিতামহ কানাডা যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন এবং সেই অর্থবলেই বিলা আভিজাত্য লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি



লর্ড বার্ণহাম্ অনারেবল এডোওয়ার্ড কডোগান মেজর সি, আর, এট্‌লি

হইয়া থাকে। ইনি ইঁহার নিজ কাগজখানি নিশ্চয়ই পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহা হইতে ইনি নিশ্চিতই ভারত সম্বন্ধে নিজ মত কতকটা গঠিত করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ভারত সম্বন্ধে ইঁহার যে কোন পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার বা ধারণা নাই, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং কমিশনার নিয়োগে লর্ড বার্কেণহেড যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ ভারত সম্বন্ধে যাঁহাদের পূর্ব্ব গঠিত একটা সংস্কার আছে, কমিশনে তাহা-দিগকে বর্জ্জন করা হইয়াছে,—ইঁহার নিয়োগে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

(৩) লর্ড ষ্ট্রাথকোনা। ইনি স্কচ ক্যানেডীয় (Scotch

কমন্স সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সে তিনি যে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, মনে হয় না। তবে ইনি বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মি বলডুইনের জামাতার ভ্রাতা। ইহাই যদি ইঁহার কমি স্থানলাভ করিবার যোগ্যতা মনে হয়, তাহা হইলে না

(৪) দি অনারেবল এডোয়ার্ড সিসিল জর্জ্জ কডোগা বড় লোকের পুত্র বলিয়া ইনি অনারেবল। ইঁহার পি আর্ল কডোগান এখন জীবিত আছেন। ইঁহার জ্যে ভ্রাতাই পিতৃপদবীর অধিকারী। মধ্যবিধ ব্যক্তিদিগের ম ইঁহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইঁহার প্রণীত 'ম্যাটার্ড মডার্ণ হিষ্ট্রী' এবং 'কাভুরের (Cavour) জীবনকথা' উ যোগ্য গ্রন্থ। কি প্রকারে ইটালীর বিভিন্ন প্রদেশে



রাইট অনারেবল ষ্টীফেন ওয়ালস্ লর্ড ষ্ট্রাথকোনা রাইট অনারেবল জর্জ্জ লেনফক্স

জাতির সমীকরণ সাধিত হইয়াছিল, এবং ইটালীর প্রিন্স কাভুরের নীতি কিরূপ ফলোপধায়ী হইয়াছিল, ইহা ইনি নিশ্চিতই আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের শাসন-সংস্কার কমিশনে তাঁহার সে জ্ঞান যে ফলোপধায়ী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে তিনি যেন সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে সকল বিষয় বিচার করিতে অভ্যস্ত। ইনি রক্ষণশীল।

(৫) রাইট অনারেবল ষ্টিফেন ওয়ালস্ এই কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ইনি সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এক জন দূরদর্শী লোক। সামান্য শ্রমিকের কার্য্য হইতে অধ্যবসায়ের প্রভাবে ইনি উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার স্থানে শ্রমিক-গণ মিষ্টার হার্টশর্ণকে নিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন। মিষ্টার হার্টশর্ণ শ্রমিক সরকারের আমলে বিলাতে পোষ্ট-মাষ্টার জেনরালের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহাকে মিষ্টার ওয়ালসের স্থানে সদস্য নিয়োগ করিবার সময় এই কমি-শনের গঠন-কথা লইয়া পার্লামেণ্টের কমন্স ও লর্ড সভায় বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। ইঁহার স্থানে মিষ্টার হার্টশর্ণই কমিশনার হইয়াছেন।

(৬) রাইট অনারেবল জর্জ্জ রিচার্ড লেন ফক্স। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রিভী কাউন্সিলের সদস্য হইয়া-ছেন। ইনি খনি বিভাগের সেক্রেটারীর কায করিয়াছেন। ইনি লর্ড আরউইনের ভগিনীপতি; সুতরাং ইঁহার কমিশনের সদস্য পদ পাইবার দাবী অপ্রতিহত। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইনি আহত হইয়াছিলেন। ইনি গোঁড়া রক্ষণশীল।

(৭) মেজর ক্লেমেণ্ট রিচার্ড এট্‌লি। ইনি শ্রমিক ও ব্যারিষ্টার। ইনি ষ্টেপনীর মেয়র ছিলেন। ইনি শ্রম-জীবীদিগের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ভারতে আসিয়া-ছিলেন। ইনি কিছু দিন সমর-বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারীর কায়ও করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত দুই খানি পুস্তক আছে। একখানির নাম "দি সোস্যাল ওয়ার্কারস্"; আর একখানির নাম "দি টাউন কাউন্সিলার।" সমাজবিন্যাস

সম্বন্ধে ইঁহার যেরূপ পূর্ব্ব-গঠিত ধারণা আছে, তাহাতে ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল ধারণা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইহাই কমিশনের সদস্যদিগের পরিচয়। চেয়ার-ম্যান ভিন্ন কোন রাজনীতিক দলের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিই কমিশনে গৃহীত হয়েন নাই। ইঁহারা কোন বিষয়ে অসাধারণত্ব প্রকটিত করিতে পারেন নাই। মিস্ মেয়োর গ্রন্থ পাঠে ভারত সম্বন্ধে ইঁহাদের অনেকের মনে একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে। এক দিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফলে ঐকমত্য স্থাপন অসম্ভব, অন্য দিকে মিস্ মেয়োর গ্রন্থ পাঠে পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের মধ্যে ভারতসম্বন্ধে একটা

জঘন্য ধারণার ফলে কমিশনের কার্য্য যে ভারতবাসীর পক্ষে অনুকূল হইবে, তাহা মনে হয় না।

অনেকেই মনে মনে প্রশ্ন করিতেছেন, লর্ড বার্কেণহেড সাম্রাজ্যের প্রধানতম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা এই কমিশন গঠন করিবার প্রতিশ্রুতি করিয়া এইরূপ লোক দ্বারা এই কমিশন রচনা করিলেন কেন? কেহই ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কতকগুলি লোক মনে করিতেছেন যে, যখন মিস্ মেয়োর গ্রন্থখানি পার্লামেণ্টের সদস্যদিগকে বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছে, তখন ইহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক,



ডাক্তার বেসাণ্ট

তাঁহারা ঐ পুস্তকে অনেক অতিরঞ্জিত এবং কাল্পনিক কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিবেন। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মনে বিদেশী লোক ও ভিন্ন-সভ্যতা-সম্পন্ন লোক সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা স্বাভাবিক। তাহার উপর তাঁহারা যদি কোন বিদেশীয় গ্লানিপ্রচারক পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই বিদেশীদিগের সম্বন্ধে কুসংস্কার অত্যন্ত বদ্ধমূল হইয়া উঠে। সেই জন্য লর্ড বার্কেণহেড অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক লইয়া এই কমিশন গঠিত করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আগামী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কমন্স সভার সদস্যনির্ব্বাচন হইবে। সেই জন্য কমন্স সভার কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মুখ্য ব্যক্তি এই দূরদেশে কমিশনে কার্য্য করিবার জন্য আসিতে সম্মত হয়েন নাই। ইহার কোন্ কথা সত্য, তাহা বলা বড় কঠিন।

ভারতীয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই এইরূপ পার্লামেণ্টারী কমিটী নিয়োগে ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, কেবল পার্লামেণ্টের সদস্যদিগকে লইয়া এই কমিশন গঠন করাতে ভারতবাসীদিগকে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করা হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা এই কমিশনকে বর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ডাক্তার বেসাণ্ট বলিয়াছেন,—'পার্লামেণ্ট যখন আমাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছেন, তখন আমরাও কমিশনকে বর্জ্জন করিব।" সার তেজ বাহাদুর সপ্রু বলিয়াছেন যে, "কমিশনে ভারতবাসী বর্জ্জন



হাকিম আজ্‌মল খাঁ

সরকারের স্বৈরিতা, অন্যায়াচরণ এবং অসঙ্গত ব্যবহার প্রশ্রয় পাইয়াছে। আমাদের শাসনযন্ত্র গঠনে আমাদের যে অধিকার আছে, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন। এই পক্ষে আমি বলিতে পারি যে, আমি এই কমিশনে দিব না। আমি উহাতে সাক্ষ্য দিব না বা হইলেও উহাতে যোগ দিব না।" সার আমি ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির মারফতে প্রকাশ যে, "কমিশনে ভারতবাসীদিগকে বর্জ্জন করাতে সাম্রাজ্যবাদেরই দৃঢ়ভাবে সমর্থন এবং সাম্রাজ্যে দিগের অংশীদারত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে।

পর্য্যন্ত এই অপমান প্রকাশিত না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত সকল ভারতবাসীর পক্ষে সম্মিলিতভাবে ইহাকে বর্জ্জন করাই ইহার যোগ্য প্রত্যুত্তর।" সার পি এস শিবস্বামী বলিয়াছেন, —"কমিশনে ভারতবাসীদিগকে বর্জ্জন করাতে ভারতবাসীদিগকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করা হইয়াছে। ভারতবাসীকে



শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

জাতিসঙ্ঘেই গ্রহণ করা হউক আর সাম্রাজ্য সমিতিতেই আহ্বান করা হউক, তাহারা যে বৃটিশ জাতির দ্বারস্থ ভিখারী, তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইবার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আত্মসম্মান-রক্ষার্থ আমি এই কমিশন-বর্জ্জনেরই পক্ষপাতী। যদি অধিকাংশ ভারতবাসী এই কমিশন বর্জ্জন করে, তাহা হইলেও আমাদের সম্মান কতকটা রক্ষিত হইবে।" ডাক্তার আন্সারী বলিয়াছেন যে, "এক পক্ষে ভারতসরকার ও বিলাতী সরকার অন্য পক্ষে ভারতের বিভিন্ন মতাবলম্বী জনসাধারণ এই দুই পক্ষের মধ্যে মতভেদ এত অধিক যে, সেই জন্য এই কমিশন হইতে সকলের দূরে থাকা কর্ত্তব্য।" সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বলিয়াছেন যে, "কমিশনের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী পাওয়া কঠিন হইবে।" হাকিম আজমল খাঁ বলিয়াছেন,— "এই কমিশন দ্বারা ভারতবাসীদিগের দাবীকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করা হইয়াছে; আমাদের সেই আহ্বান গ্রহণ পূর্ব্বক সকল বিবাদ ভুলিয়া কমিশনকে বর্জ্জন করা বিধেয়।" মিঃ এস শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সকলকে সম্মিলিত হইয়া কমিশন বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। সার আব্দার রহিম বলিয়াছেন যে, "বিষম ভুল করা হইয়াছে। ভারতবাসীদিগের পক্ষে কিরূপ শাসন-পদ্ধতি উপযুক্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে ভারতবাসীদিগকে বৃটিশ পদ্ধতির সহিত একত্র দায়িত্বগ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বিলাতের বিভিন্ন রাজনীতিক দল ভারতবাসীর সহিত যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, কমিশনে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ব্যবহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়।"

ভারতবাসী এই কমিশন বর্জ্জনের পক্ষে মত প্রকাশ করাতে বিলাতে লর্ড বার্কেণহেড প্রমুখ রাজনীতিকগণ যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠেন। ভারতবাসীদিগকে উপেক্ষা করিয়া এইরূপ কমিশন গঠন যে ভারতবাসীর পক্ষে অপ্রীতিকর হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই

জন্য এই কমিশনের কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লর্ড আরউইন কয়েক জন বিশিষ্ট ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়া এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। সে কথাবার্ত্তা বা পরামর্শের ফল লোক জানিতে পারে নাই। যখন কমিশন বর্জ্জনের কথা উঠিয়াছিল, তখন লর্ড বার্কেণহেড প্রমুখ বিলাতের কয়েক জন ব্যক্তির মনের ভাব এবং কথার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, "ভারতবাসীরা নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিবাদে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এ সময়ে তাহারা কোনমতেই এই কমিশন বর্জ্জন করিতে পারিবে না,—আর যদিই বা তাহারা কমিশনকে বর্জ্জন করে, তাহা হইলে তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন।" এরূপ মনোভাব তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কথার আভাসেও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।



স্যর আবদার রহিম

কিন্তু যে হিন্দু-মুসলমানে ঘোর বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল, সেই হিন্দু-মুসলমান অনেকেই একযোগে কমিশন বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করাতে বিলাতের রাজনীতিকগণ কেন এই কমিশনে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্য যখন এই পার্লামেণ্টারী কমিশনের সদস্যনির্ব্বাচন-প্রস্তাব পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়, তখন লর্ড সভায় লর্ড বার্কেণহেড, লর্ড রেডিং, লর্ড অলিভিয়ার প্রভৃতি এবং কমন্স সভায় আর্ল উইণ্টার্টন, মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড, মিষ্টার বল্‌ডুইন, কর্ণেল ওয়েজউড প্রভৃতি বহু বৃটিশ রাজনীতিক একবাক্যে বলেন যে, ভারতবাসীকে অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কমিশনে বর্জ্জন করা হয় নাই। অন্য অপরিহার্য্য কারণে তাহাদিগকে বর্জ্জন করা হইয়াছে। মিষ্টার বল্‌ডুইন ভগবানের নাম লইয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, "ভারতবাসীকে হীন মনে করিয়া কমিশনে স্থান দেওয়া হয় নাই,—ইহা সত্য নহে। ভারতবাসীর হীনতাবিষয়ক ধারণা মন দূর করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু কি কারণে এই কমিশন ভারতবাসীদিগকে বর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহার কোন সন্তোষজনক হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রত্যেক প্রায় ভিন্ন ভিন্ন হেতু দেখাইয়াছেন। তাহার এক বিচারসহ নহে; এই প্রবন্ধে সেগুলির আলো করা অসম্ভব। তাঁহাদের একটা কথা এই যে, কমিশনে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করা হইত, তাহা তাহাদের সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক এক জন করিয়া প্রতিনিধি লইতে হইত। করিতে হইলে কমিশনে ১৮ হইতে ২০ জন ভারতীয় নিদি হইত। ফলে কমিশনের একমত হইয়া কার্য্য করা হইত না।" কিন্তু এ কথাও যে, ভারতে যত অধিক ধর্ম্মাবাক্তি ও জাতি থাকুক না ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের যতই থাকুক না কেন, রাজনীব্যাপারে তাহাদের মধ্যে প্রায় নাই বলিলেই হয়। লর্ড রেডিং এক প্রকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "কমিটীর রিপোর্ট বাহির হইবার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এসেম্‌ব্লিতে শাসন-পদ্ধতি লইয়া যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের ভিন্ন রণের প্রতিনিধিরা একমত হইয়া একটা শাসননির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।" সুতরাং বার্কেণহেড প্রভৃতি যুক্তি ন্যায়সঙ্গত ও তথ্যসঙ্গত নহে।

তবে ভারতবাসীকে এই কমিশনে গ্রহণ করা কেন? আমাদের ধারণা, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের শাসনকর্ত্তাদিগের খাস পরিষদে ভারতবাসীদিগকে করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবাসীদিগকে কমিশনে গ্রহণ করিতে করিয়াছেন। নতুবা কমিশনে কয়েক জন ভারতীয় গ্রহণ করিলেই যে কমিশনের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইত, নহে। আগামী বারে ঐ কথা এবং ভারতীয় ব্যবস্থা সভার কমিটীর কথা আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপা

সতীর পতি



(উপন্যাস)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আশা কুহকিনী

বিপিন বাবু যে হীরালালকে গৃহযাত্রার পূর্ব্বদিন তাঁহার নামে একখানি টেলিগ্রাম করিতে বলিয়া আসিয়াছেন, সে টেলিগ্রাম পাইলে তিনি যে পরদিন হীরালালের জন্য ষ্টেশনে গরুর গাড়ী পাঠাইবেন, এ সব কোনও কথাই বিপিন বাবু তাহার বাড়ীতে জানান নাই। হীরালালের পত্র পাইয়া, বিপিন বাবু আশা করিয়াছিলেন, শনিবার বিকাল নাগাদ হীরালালের নিকট হইতে তার আসিবে। অপরাহ্ণকাল হইতে তিনি তারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন, কিন্তু কোনও তারই আসিল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তথাপি কোনও তার আসিল না। তখন বিপিন বাবু ভাবিলেন, হয়ত হীরালাল সময়মত তার রওয়ানা করে নাই, রাত্রিতে আসিয়া পড়িয়া থাকিবে, কল্য রবিবার বেলা ৮টা ৯টা ভিন্ন উহা আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং রবিবার দিন ষ্টেশনে গাড়ী পাঠানো সম্বন্ধে তিনি ইতস্ততঃ করিলেন।

সুরবালা স্বামীর প্রবাসযাত্রার পর হইতে তাহার ছোট খুড়ীমার সহিত এক ঘরে শয়ন করিত। ঘরটির দুই দিকে দুইখানি তক্তপোষ, একখানিতে ছোটগিন্নী তাঁহার পুত্রসহ, অপরখানিতে সুরবালা তাহার শিশু কন্যাকে লইয়া শয়ন করিত। ছোটগিন্নী এগারো বছরের ছেলের মা হইলেও, তাঁহার বয়স সুরবালার অপেক্ষা খুব বেশী নহে—অল্পবয়সেই তাঁহার পুত্রটি জন্মিয়াছিল। সুতরাং সম্পর্কে তিনি সুরবালার গুরুজন হইলেও, উভয়ের মধ্যে অনেকটা সখীভাবই ছিল। বউমার সহিত তিনি একটু আধটু ঠাট্টা-তামাসা করিতেও ছাড়িতেন না।

শনিবার রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া, শ্বাশুড়ী-বউয়ে কিছুক্ষণ ধরিয়া হীরালালের আগমন প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। ছোটগিন্নী বলিলেন, "আজ সারাটা দিন আকাশটা মেঘলা মেঘলা গেল, কাল আবার ঝড়-বৃষ্টি না নামলে বাঁচি।"

সুরবালা বলিল, "যে গরমটা যাচ্ছে ক'দিন, একটু বৃষ্টি হ'লে ত বাঁচা যায়।"

"সত্যিই কি এটা তোমার মনের কথা, বউমা?"

"কেন?—এর আবার মনের কথা আর মুখের কথা কি?"

"কাল যদি বৃষ্টি-বাদল দুর্যোগ হয়, ইষ্টিশান থেকে ছেলে তা হ'লে আস্‌বে কি ক'রে?"

সুরবালা বলিল, "সে তোমাদের ছেলে জানে। একটু ঠাণ্ডা হ'লে রাতে ঘুমিয়ে ত বাঁচবো!"

খুড়ীমা বলিলেন, "ওঃ, রাতটার জন্যে তুমি ঠাণ্ডা খুঁজছ? তা, সে মন্দ নয়। যদি সারাদিন মেঘ ক'রে থাকে, রাত ৯টা কি ১০টার পর বৃষ্টি নামে, তাতে কোনও আপত্তি নেই বোধ হয়, কি বল, আঁ?"

সুরবালা এ রহস্যের ইঙ্গিত বুঝিয়া, লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ছোটগিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, ঘুমুলে না কি?"

"না, জেগেই আছি।"

"কি ভাবছ?"

"কৈ, কিচ্ছু না ত!"

ছোটগিন্নী অন্ধকারে মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার সধবা অবস্থায়, স্বামী প্রবাসে গেলে, যে দিন ফিরিবেন, তার পূর্ব্ব-রাত্রি প্রায় তাঁহার অনিদ্রায় কাটিত। কত সুখের স্মৃতি মনে উদিত হইল। আজ সাত বৎসর হইল, তিনি বিধবা হইয়াছেন। তাঁর বুক কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ছোটগিন্নী হীরুর মাতাকে বলিলেন, "দিদি, সন্ধ্যেবেলা হীরু আসবে, এ বেলা কিছু মাছ আনিয়ে রাখলে হ'ত না ?"

বড়গিন্নী বলিলেন, "হ্যাঁ, সে ত আনাতেই হবে। চুণিকে একবার পাঠাও না জেলেবাড়ী। পাকা রুই মাছ যদি পায়, তবে পোয়াটেক নিয়ে আসুক।"

"একটা মুড়ো আনালে হয় না ? মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল খেতে হীরু ভালবাসে।"

"সে তখন কাল করা যাবে দিনের বেলায়। চুণি বরং মাছ এনে রেখে, একবার বাজারে যাক। হাঁসের ডিম কিনে আনুক, ডিমের কালিয়া খেতে সে ভালবাসে। আর, পয়সা দুইয়ের কিছু চুনো-চানা মাছ—অম্বল করা যাবে।"

"রাত্রে কি তার জন্যে ভাত রাঁধবে, না লুচি ? যদি লুচি কর, তা হ'লে ঘি-ও কিছু আনাতে হবে, ঘি ফুরিয়েছে।"

মা বলিলেন, "আজ রাত্রে আর লুচি ক'রে কায নেই। দু'টি ভাতই রেঁধে দিও এখন। কলকাতায় ৯টার সময় গাড়ী চড়বে, ভাত-টাত কি খেতে পাবে অত সকালে ? বোধ হয়, কিছু জল-টল খেয়ে গাড়ীতে উঠবে। সারাদিন পথের কষ্টের পর, রাত্রে কি লুচি তার ভাল লাগবে ?"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "হ্যাঁ, তা ঠিক বটে। গোটা-কতক আমও পাড়িয়ে রাখতে হবে। কাল ঘাটে যাবার সময় আমি দেখেছি, পেটকাটা গাছটায় অনেকগুলো আম ডাঁসিয়েছে। কাল পাড়িয়ে রাখলেই ঠিক হ'ত, মজতো। চুণি জেলেবাড়ী যাক তা হ'লে।"—বলিয়া তিনি পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন।

চুণি জেলেবাড়ী গিয়া, মাছ লইয়া আসিল। ভাল মাছ পাওয়া গিয়াছে—আঁষগুলা বেশ বড় বড়। মাছ রাখিয়া চুণি হাত ধুইতেছিল, বড়গিন্নী বলিলেন, "বাবা, একবার বাজারে যেতে হবে।"

"আবার বাজারে কেন ?"

"দুটো হাঁসের ডিম আনবি, দু' পয়সার চুনো মাছ, আর একটা বাটী নিয়ে যা, কেষ্টো ময়রার দোকান থেকে এক পোয়া রসগোল্লা নিবি।"

চুণি বলিল, "বাবা! এ যে যজ্ঞির ব্যাপার!"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "আজ রাত্রে যে তোর [illegible] আস্‌বে, জানিস্‌নে ?"

"জানি। ঘরের ছেলে ঘরে আসছে, তার জন্যে আ[illegible] এত ধুমধাম কেন শুনি ? দাদা ত আর জামাই নয়!"

ছোটগিন্নী হাসিয়া বলিলেন, "দূর হতভাগা ছেলে, [illegible] কথা কি বল্‌তে আছে, যা যা, আর ওজর করিস্‌নে। [illegible] তোর জন্যে কি আনবে, তা দেখিস্‌!"

চুণি মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "হুঁঃ—কচু আনবে আ[illegible] জন্যে। বিপিন বাবুর হাতে নিজের খুকীর জন্যে [illegible] পাঠানো হ'ল, ল্যাবেঞ্চুষ পাঠানো হ'ল—আমার জন্যে [illegible] পাঠালে ? ভাবা ত উচিত যে, বাড়ীতে ছোট ভা[illegible] রয়েছে, তার জন্যে একটা ফুটবল পাঠাই, কি একখা[illegible] দু'মুখো ছুরি, কি বেশী পয়সা না থাকে মরুক্‌ গে না [illegible] একটা লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে যাই!"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "হাঁ রে নেমোখারাম! [illegible] ল্যাবেঞ্চুষ যা এসেছিল, তা কি খুকী একলাই খেয়েছে [illegible] তুইও কি খাস্‌নি ?"

চুণি পরম গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমরা হাতে [illegible] দিয়েছিলে, তাই খেয়েছি দু'চারটে। তাও দয়া ক'রে [illegible] নইলে আমি কি কচি খোকা যে, বিস্কুট-ল্যাবেঞ্চুষ খাব!"

বড়গিন্নী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোর দাদা আসু[illegible] তোর যা যা দরকার, তা তাকে বলিস্‌ না বাপু!—[illegible] যখন বাড়ী আস্‌বে, তখন কিনে নিয়ে আনবে। এখন [illegible] বাজারে যা, মিছে তর্ক করিসনে।"

চুণি অপ্রসন্নভাবে বলিল, "তা দাও পয়সা, [illegible] যখন হবে, তখন যাই। সারা হপ্তাটা হাড়[illegible] খাটুনির পর রবিবারটা যে একটু বিশ্রাম করবো, [illegible] যো নেই ছাই!"

বিকালে ছোটগিন্নী সুগন্ধি তৈল সহযোগে [illegible] করিয়া বউমার চুল বাঁধিয়া দিলেন। সুরবালা গলায় [illegible] দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। "জন্ম-এয়োস্ত্রী হও [illegible] —বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, মুখখানি গামছা দিয়া ভাল ক[illegible] মুছাইয়া, তার চিবুকে হাত দিয়া চুমো খাইলেন। নিজের [illegible] ধন সম্পদ হইলে সুরবালা তার খুকীর প্রসাধনে যত্নবতী [illegible] খুকী আজ দশবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "বাবা কখন [illegible]

মা ?" এখন বলিল, "বাবা আমার জন্যে বিকু আনবে, আর কি আনবে মা ?" "আরও কত জিনিষ আনবেন তোমার জন্যে।" খুকী বলিল, "আমার জন্যে নেঙ্কু আনবে না মা ?"—"হ্যাঁ ল্যাবেঞ্চুষও বোধ হয় আনবেন।"—বলিয়া সুরবালা কন্যাকে চুম্বন করিল।

বাড়ীতে ঘড়ি নাই, সন্ধ্যার পর সুরবালা ছটফট করিতে লাগিল, ক'টা বাজিল, কে জানে! ছোটগিন্নী আজ আর বউকে রান্নাঘরে যাইতে দেন নাই; রান্না-বান্না নিজেই করিতেছেন। বড়গিন্নী নিকটে বসিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন। সুরবালা নিজ শয়ন-ঘরে বসিয়া খুকীকে দুধ খাওয়াইয়া, তাহাকে কাজল পরাইয়া, তাহাকে খেলা দিতেছিল। তাহার ইচ্ছা, খুকীর পিতা আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিবেন, চুমো খাইবেন, তার পর সে ঘুমাইবে। দুধ খাইয়া খুকীর চক্ষু দুটি ঘুমে ঢুলিয়া আসিতে লাগিল। সুরবালা তাহাকে বলিতে লাগিল, "খোকন রাণি, এখন ঘুমিও না মা! একটুখানি জেগে থাক সোনা আমার! আর বেশী দেরী নেই, এখনই তিনি আসবেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না, মাণিক ?"

খুকীর চক্ষু কিন্তু ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল। সুরবালা মেয়েকে নাড়া দিয়া বলিল, "ও খুকু! চল আমরা রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, কি সব রান্না হচ্ছে তাঁর জন্যে।"—বলিয়া মেয়েকে কোলে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সুরবালা উঠানে নামিল।

খুকী সজাগ হইয়া বলিল, "কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে মা ?"

সুরবালা চুপি চুপি বলিল, "হাঁসের ডিমের কালিয়া রান্না হচ্ছে। তুমি খাবে একটু ?"

"হাঁ খাব। বাবা খাবে, আমি খাব।"

"বেশ, তা হ'লে জেগে থাক। রান্না হোক, তাঁর সঙ্গে ব'সে তুমিও খাবে।"

"আমি বাবার কোলে ব'সে খাব মা!"

"খাবে বৈ কি যাদু!"

সুরবালা মেয়ে লইয়া রান্না-ঘরের রোয়াকে গিয়া বসিল। বড়গিন্নী বলিলেন, "খুকী এখনও জেগে আছিস না কি ?"

সুরবালা বলিল, "ও হাঁসের ডিমের কালিয়া খাবে।"

বাহিরে রাস্তায় গোরুর গাড়ীর শব্দ হইল। বড়গিন্নী বলিলেন, "ঐ এল বুঝি!"—বলিয়া তিনি ছুটিয়া সদর দরজায় গেলেন। সুরবালার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল। বড়গিন্নী খিল খুলিয়া কবাট একটু ফাঁক করিয়া রহিলেন। গাড়ীর শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল; ক্রমে দ্বারের সম্মুখে আসিল, কিন্তু পোড়া গাড়ী দাঁড়াইল না—দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বড়গিন্নী তখন খিল আবার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "না, ও অন্য গাড়ী!"

আর সব রান্না-বান্না শেষ হইয়াছে। হীরালাল আসিয়া পৌঁছিলে তখন ভাত চড়ানো হইবে, এইরূপ পরামর্শ ছিল।

মালা-জপ শেষ করিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, "তাই ত! এখনও এল না কেন ? রাত ৮টা ৯টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছবে লিখেছিল, ৯টা কি এখনও বাজে নি ?"

চুণি আসিয়া ভাতের জন্য হাঙ্গামা করিতে লাগিল। দুই-বার তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া তৃতীয়বারে বড়গিন্নী বলিলেন, "ও বেলাকার ভাতে জল দেওয়া আছে, তাই দাও ওকে। ও ছেলেমানুষ, কতক্ষণ আর না খেয়ে থাকবে ?"

চুণি খাইতে বসিল। ডিমের কালিয়াতে আধখানামাত্র ডিম দেখিয়া বলিল, "বাঃ, এ মন্দ নয়। যে এল চ'ষে, সে রইল ব'সে। কত কষ্ট ক'রে বাজারে গিয়ে আমি ডিম কিনে আনলাম, আমার পাতে আধখানা।"

তার মা বলিলেন, "দু'টো ডিমে চার টুকরো ত মোটে হয়েছে বাবা! তোর আধখানা, খুকীর আধখানা, তোর দাদার জন্যে দু'আধখানা রেখে দিয়েছি।"

সুরবালা বলিল, "আর আধখানাও ওকে দাও ছোট খুড়ী। খুকী ঘুমিয়ে পড়েছে—ও আর খাবে না।"

চুণি খাইয়া উঠিয়া আঁচাইতেছিল, এমন সময় সদর দরজার কড়া খটাখট নড়িয়া উঠিল! ছোটগিন্নী বলিলেন, "এইবার বোধ হয় এসেছে, হেঁটে এল না কি ? কৈ, গাড়ীর শব্দ ত পেলাম না।"

বড়গিন্নী ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিলেন। ছেলে নয়, জমীদার-বাড়ীর এক জন নগদী রামচরণ। সে প্রণাম করিয়া বলিল, "ছোটবাবু পাঠিয়ে দিলেন, হীরুবাবু কি বাড়ী এসেছেন, মা ঠাকরুণ ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, এখনও ত আসে নি। এখন ক'টা বেজেছে বলতে পার রামচরণ ?"

রামচরণ বলিল, "দশটা বেজে গেছে।"

"দশটা বেজে গেছে ? কৈ, এখনও ত এল না।"

রামচরণ বিজ্ঞভাবে বলিল, "টিরেণ ফেল করেছেন বোধ হয় তা হ'লে।"—বলিয়া সে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

হীরালালের আসা সম্বন্ধে এখন সকলেই প্রায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। বড়গিন্নী বলিলেন, "এইবার ভাত চড়িয়ে দাও, আর ব'সে থেকে কি হবে ? শুধু বৌমার মত চাল নাও।"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "ছেলে যদি এসে পড়ে ? রেল-গাড়ী সব দিনই কি আর ঠিক সময়ে এসে পৌছয় ? লেটও ত হয়।"

"তবে দু'জনের চালই নাও। যদি না আসে, ভাতে জল দিয়ে রেখে দিও।"

ভাত হইল। ছোটগিন্নী সুরবালার ভাত বাড়িলেন। বড়গিন্নী বলিলেন, "ও মা, ঐ ক'টা ভাতে বৌমার পেট ভরবে ?"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "খেতে পারে, আবার দেবো এখন, ব'স বৌমা, ব'স।"—সুরবালার মনের অবস্থা বুঝিয়া, তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভাত কম দিয়াছিলেন।

সুরবালা খাইতে বসিল। কিন্তু খাইবে কি, তাহার যে বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছে! এ দিকে আবার ভাত ফেলিয়া উঠিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তাই কোনও ক্রমে ভাতগুলি সে নিঃশেষ করিল। গৃহিণীরাও জলযোগ করিতে বসিলেন।

বড়গিন্নী বলিলেন, "তাই ত! কি হ'ল, কেন এল না, কিছুই ত বুঝতে পারছিনে। শরীরগতিক ভাল আছে কি না, হরি জানেন!"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "রামচরণ যা বলে গেল, তাই বোধ হয় ঘটেছে। সেখানে বোধ হয় গাড়ী ধরতে পারে নি। পরের গাড়ীতে আসবে হয় ত!"

বড়গিন্নী বলিলেন, "সে গাড়ী যে কখন্ আসে, তাও ত কিছু জানিনে। হে হরি, বাছাকে আমার ভালয় ভালয় বাড়ী এনে দাও, আমি তোমায় হরিলুট দেবো।"

অনেক রাত্রিতে খুকীর ঘুম ভাঙ্গিলে সে মাকে ঠেলিয়া ডাকিল, "মা—ও মা! ঘুমিচ্ছিস ?"

সুরবালা জাগিয়াই ছিল। বলিল, "কেন মা ?"

"আমার বাবা কৈ ?"

এবার সুরবালা আর চোখের জল রাখিতে পারিল না বলিল, "আজ ত তিনি আসেন নি, মা!"

"কেন এল না মা ?"

"তোমার জন্যে বোধ হয় বিকুটিকু কিনতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই গাড়ী ধরতে পারেন নি।"

খুকী বলিল, "ওঃ! তা মা, বাবাকে বিকুটিকু কিন্তে বারণ ক'রে দিস্, আমি বিকু চাইনে, নেঞ্চু চাইনে, কিচ্ছু চাইনে। বাবাকে শীগি শীগি আস্তে বলিস্ মা!"—বলিতে খুকী ঘুমাইয়া পড়িল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উত্থান ও পতন

হীরালালের অক্লান্ত শুশ্রূষায় এক সপ্তাহ পরে রেবতী আরোগ্যলাভ করিল।

রেবতী উঠিয়াছে, কিন্তু হীরালালের পতন ঘটিয়াছে। এই এক সপ্তাহে হীরালাল—আর সে হীরালাল নাই। বিপিন বাবু যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে। কি করিয়া দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ইহা ঘটিল, "আর্ট"মূলক সে বর্ণনা করা আমাদের সাধ্য নহে।

শনিবার দিন হীরালাল বাড়ীতে একখানি এবং বিপিন বাবুকে একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। লিখিয়াছিল, বিশেষ কার্য্যে আটকাইয়া পড়াতে রবিবার দিন সে রওনা হইতে পারিবে না। সে পত্র রবিবার বিকালে পাইয়া তাহার মা, স্ত্রী প্রভৃতির মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন আসিয়াছিল। সোমবারে সে বিপিন বাবুর নামে মণিঅর্ডারে ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া দিল—অনুরোধ করিল, বিপিন বাবু যেন শোধ হিসাবে ১০৲ টাকা রাখিয়া, বাকী ৪০৲ টাকা তাহার জননীকে পাঠাইয়া দেন।

গতকল্য রেবতীর জ্বর আসে নাই—আজ এখন সেও চারিটা—আজিও সে ভাল আছে। প্রভাতে ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, আর জ্বর হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু ম্যালেরিয়ার বিষ দেহে প্রবেশ করিয়াছে, দেহ হইতে বিষটা নিষ্কাশিত করিতে হইলে, পশ্চিমে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কিছুকাল বাস করা আবশ্যক।

আজ বিকালে চা খাইতে খাইতে হীরালাল ও রেবতীর মধ্যে সেই বিষয়েই আলোচনা হইতেছিল।

রেবতী বলিল, "কেই বা আমায় নিয়ে যাবে ? এই ত আমার শরীরের অবস্থা! ঝি-চাকরের ভরসায় কোথায় বিদেশ বিভূঁয়ে গিয়ে প্রাণটা খোয়াব! তার চেয়ে এখানেই প'ড়ে থাকি, মর্‌লে তবু গঙ্গাটা পাব।"

হীরালাল বলিল, "সে কি হয় ? বাইরে তোমায় যেতেই হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"যাবে তুমি ? আমাকে ছুটী বোধ হয় দেবে। পুরো মাইনে না হোক, অর্দ্ধেক মাইনেও দিতে পারে, কিন্তু তোমার নতুন চাকরী—তোমায় ছুটী দেবে কি ?"

"না যদি দেয়, কি আর করা যাবে। তোমার প্রাণটা আগে, না আমার চাকরী আগে ? ফিরে এসে তখন আর কোথাও কিছু একটা জুটিয়ে নিতে হবে।"

"তা হ'লে সত্যি কথা তোমায় খুলে বলি। আমি যে বিদেশ যেতে চাচ্ছিলাম না, অসহায়া অবলা রমণী, পাছে বিদেশে প্রাণ হারাই, সে ভয়ে নয়। তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না ব'লেই যেতে আপত্তি করছিলাম।"

হীরালাল নতমুখে বলিল, "আমিই কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারতাম ?"

কোথায় যাওয়া যায়, এই লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। হীরালাল বলিল, "দার্জ্জিলিঙ মন্দ কি ? কাছে-পিঠেও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে।"

রেবতী বলিল, "দার্জ্জিলিঙ কি সুবিধে হবে ? যেখানেই যাই, স্বামি-স্ত্রী পরিচয়েই আমাদের থাকতে হবে ত! দার্জ্জিলিঙে কলকাতার লোক হামেশা যাতায়াত করছে—পথে-ঘাটে কত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে। আমার আর তাতে কি যাবে আসবে ? কিচ্ছু না! কিন্তু তোমার একটু মুস্কিল হবে না ?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, তা ত হবেই। কিন্তু কোনও চেনালোকের সঙ্গে দেখা হবে না, এমন প্রসাদপুর এখন কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় ?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "কিন্তু প্রসাদপুর একটা যদি আবিষ্কারই করা যায়, সেখানে এক দিন তুমি আমার ঘাড়টা ধ'রে বলবে না ত—তোমার যম!"—বলিয়া রেবতী, রোহিণীর সেইখানকার পার্টটুকু এক্ট করিয়া লইল।

হীরালাল হাসিতে লাগিল। কিন্তু সুরবালার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার বুকে ব্যথাও লাগিল।

সিমলা, দেরাদুন, মসুরীর কথাও পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত হইল। শেষে স্থির হইল, আলমোরা অথবা নৈনিতাল। পাহাড়ও বটে, বাঙ্গালীর গতিবিধিও তেমন নাই।

সন্ধ্যার পর হীরালালকে রিহার্শালে যাইতে হইল। রেবতী বলিল, "দেখ, ম্যানেজার বাবুকে বোলো, যদি সময় পান, কাল যেন এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন।—তুমি কিন্তু আমাদের পাহাড়ে যাবার কথা, ছুটী-টুটীর কথা, কিচ্ছু তাঁকে বোলো না।"

রাত্রিতে ফিরিয়া হীরালাল বলিল, "কাল বেলা ৮টার পর ম্যানেজার বাবু আসবেন বলেছেন।"

রেবতী বলিল, "দেখ, সেই সময় তুমি কিন্তু বাড়ী থেক না। চা'-টা খেয়েই, কোথাও বেড়াতে বেরিও। যদি ইডেনগার্ডেনের দিকে যাও, এক কাযে দু'কাযই হ'তে পারে; বাথগেটের বাড়ী থেকে আমার ওষুধটাও অমনই নিয়ে আসতে পার, হরিসিংকে আর পাঠাব না তা হ'লে। তোমার ছুটীর কথা, তোমার সামনে আমি ম্যানেজারকে বল্‌তে পারব না—তাই তোমায় সরাতে চাচ্ছি।"

হীরালাল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা বেশ, আমি বেরুব এখন। কিন্তু কেন বল দেখি ? ম্যানেজার বেচারীকে তুমি নয়ন-বাণে বিদ্ধ ক'রে ছুটী আদায় ক'রে নেবে না কি ?"

রেবতী বলিল, "সে পাকা ঝুনো, নয়ন-বাণে বিদ্ধ হবার ছেলেই নয় সে!"

পরদিন ম্যানেজার বাবু যথাসময়ে আসিলেন। রেবতীর পীড়ার মধ্যেও দুই দিন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চা' খাইতে খাইতে সকল কথা তিনি ধীরভাবে শুনিলেন। শেষে বলিলেন, "ভারি মুস্কিল! ছ'মাস গিয়ে চুণারে রইলে, আবার বলছ বিদেশে যাবে—থিয়েটর চালাই কি ক'রে বল দেখি ?"

রেবতী বলিল, "কিন্তু উপায় কি বলুন! এখানে থেকে রোগে ভুগে যদি আমি মারা যাই, তা হ'লেও ত আপনি আমার শোকে থিয়েটর তুলে দেবেন না!"

কিঞ্চিৎ তর্ক-বিতর্কের পর ম্যানেজার বাবু অবশেষে বলিলেন, "ডাক্তারদের কথা ছেড়ে দাও। ছ'মাস বলেছে

ব'লে সত্যিই কি আর ছ'মাস লাগবে ভাল হ'তে? ওরা ও-রকম ব'লে থাকে। আচ্ছা, তিন মাসের ছুটী তোমায় দিচ্ছি না হয়। পুজোর আগে তোমায় এসে নতুন বইয়ের রিহার্শাল দিতে হবে।"

রেবতী বলিল, "মাইনেটা আমায় পুরোই দেবেন ত? বিদেশে গেলে খরচ ত কম হবে না,—এখানকার ডবল খরচ হয়ে যাবে।"

গাঁইগুঁই করিয়া অবশেষে ম্যানেজার বাবু ইহাতেও সম্মত হইলেন। তার পর রেবতী হীরালালের ছুটীর কথা পাড়িল।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "সে কি ক'রে হয়? মোটে এক মাস ত ও কায করছে। এরই মধ্যে ছুটী চায়-ই বা ও কোন্ মুখে?"

রেবতী বলিল, "আমি কি তবে বিদেশে বিভূঁয়ে একলাটি গিয়ে প্রাণ হারাব?"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "ওকে না হ'লে তোমার যদি না-ই চলে, ওকেও ছুটী দিচ্ছি, কিন্তু মাইনে দিতে পারবো না।"

রেবতী বলিল, "এ তিন মাস ও বেচারী তা হ'লে খাবে কি?"

ম্যানেজার বলিলেন, "কেন, বিদেশে গিয়ে তোমরা দু'জনে কি ভিন্ন ভিন্ন হাঁড়ি কাড়বে না কি?"

"তা অবশ্য কাড়বো না, কিন্তু ওর ত স্ত্রী-পরিবার আছে। সে যাক্,—আপনি এক কায করুন ম্যানেজার বাবু। ওর আমার দু'জনেরই হাফ পে ছুটী মঞ্জুর ক'রে দিন।"

ম্যানেজার বাবু সত্যই ঝুনা লোক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, হীরালালের আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখিবার জন্যই রেবতী নিজে এই ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাহাতে থিয়েটরের লাভ বৈ লোকসান নাই—কারণ, রেবতীর বেতন হীরালালের বেতনের চতুর্গুণ। বলিলেন, "আচ্ছা, তাই। কবে যেতে চাও তোমরা? কোথায় যাবে?"

"কোথায় যাব, তা এখনও কিছু ঠিক করিনি। যেখানেই যাই, হপ্তাখানেকের ভিতরেই আমাদের রওয়ানা হ[ইতে] হবে।—আর এক পেয়ালা চা' আপনাকে দিই, ম্যানেজার বাবু!"

"আবার চা খাব? তা দিতে বল। কৈ, হীরুকে দেখছি নে?"

"তিনি বাথগেটের বাড়ী থেকে আমার জন্যে [ওষুধ] আনতে গেছেন।"

ম্যানেজার বাবু দ্বিতীয় পেয়ালা চা শেষ করিয়া, [ঘড়ির] দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওঃ, ৯টা যে বেজে গেছে দেখি! তুমি আজ ছুটি ভাত খাবে ত?—সকালে সকালে [যেও] নাও।"—বলিয়া পাণ মুখে দিয়া, সিগারেট ধরাইয়া [বিদায়] বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দশটার সময় হীরালাল ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসি[য়া] বলিল, "কি হ'ল গো? তোমার নয়ন-বাণ ত ব্যর্থ হয় নি, ম্যানেজার-মৃগকে বধ করতে পেরেছে?"

রেবতী বলিল, "পুরো বধ করতে পারি নি। অর্ধ[মৃত] হয়েছে বটে।"

"কি রকম? তোমায় ছুটী দিয়েছে, আমায় দিয়েছে বুঝি?"

"না, দিয়েছে দু'জনকেই। তবে তোমারও হা[ফ] পে, আমার হাপ পে।"

হীরালাল বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল। ওষুধ এক [দাগ] খেয়ে নাও দেখি।"

"দাও। দিয়ে তুমি স্নান ক'রে ফেল। আমার [ছুটি] পেয়েছে। কোথায় কোথায় বেড়ালে?"

"প্রেসক্রপসনখানা বাথগেটের বাড়ী দিয়ে, [সেই] গার্ডেনে খানিকক্ষণ বেড়ালাম। তার পর জেটিতে [গিয়ে] ষ্টীমারে লোকজনের নামা-ওঠা দেখতে লাগলাম। সময় আর কাটে! সাড়ে ৯টা বেজে গেলে, তার পর বাথগেট বাড়ী থেকে ওষুধটা নিয়ে, ট্রামে উঠলাম।"

রেবতীকে ঔষধ সেবন করাইয়া হীরালাল স্নান করিতে গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



বিষাক্ত বাষ্প-প্রতিরোধক মুখোস

লণ্ডনের কোনও পরীক্ষাগারে বিষাক্ত বাষ্প-প্রতিরোধকারী মুখোসের শক্তি পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। বিষাক্ত বাষ্পপূর্ণ কক্ষ হইতে যখন বাষ্প নির্গত হয়, তখন মুখোসধারীরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। এই পরীক্ষা যে অত্যন্ত প্রমাদ-



বিষাক্ত বাষ্প-প্রতিরোধকারী মুখোস

সঙ্কুল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জনৈক বিশেষজ্ঞ এই সময় প্রত্যেক মুখোসধারীর ভাব-বৈলক্ষণ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। যদি কাহারও দেহে সামান্য বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয়, তখনই তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থাও হয়।

প্রাচীন যুগের খেলানা

সম্প্রতি মেক্সিকো অঞ্চলের একটি সমাধিভূমি খননকালে বহু শত বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন অনেকগুলি পুত্তলিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি যোদ্ধার মূর্ত্তি আছে। অভিজ্ঞগণ এই



প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত যোদ্ধার মূর্ত্তি

আবিষ্ক্রিয়ার পর মত প্রকাশিত করিয়াছেন যে, সেই প্রাচীন যুগেও সৈনিক-পুত্তলিকার বহুল প্রচলন এবং সমাদর ছিল। ছোট ছোট কুকুরের মূর্ত্তিও সমাধিক্ষেত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে।

আন্দোলিত শয্যা

সার আলফ্রেড ইয়ারো নৌ-বিভাগের জনৈক এঞ্জিনীয়ার। তিনি চলমান ট্রেণে সুনিদ্রা উপভোগ করেন। স্থির অচঞ্চল শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার তেমন সুনিদ্রা হয় না। এ জন্য বৈদ্যুতিক

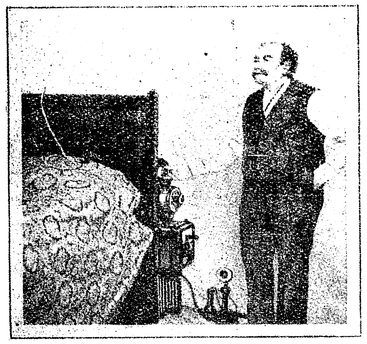

কৃত্রিম উপায়ে আন্দোলিত শয্যা

শক্তির সাহায্যে তিনি গৃহের শয্যাকে এমনভাবে চঞ্চল ও স্পন্দিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ট্রেণের শয্যার ন্যায় উহা আন্দোলিত ও স্পন্দিত হইয়া থাকে।

কুকুরের মুখোসে সন্তরণকারী

কুকুরের মুখোস পরিয়া সন্তরণের বৈচিত্র্য ও আনন্দ উপভোগের জন্য কতিপয় ইংরাজ তাঁহাদের সন্তরণক্রীড়ার প্রতিষ্ঠানে উহা প্রচলিত করিয়াছেন। প্রত্যেক সন্তরণকারী মুখোস পরিয়া

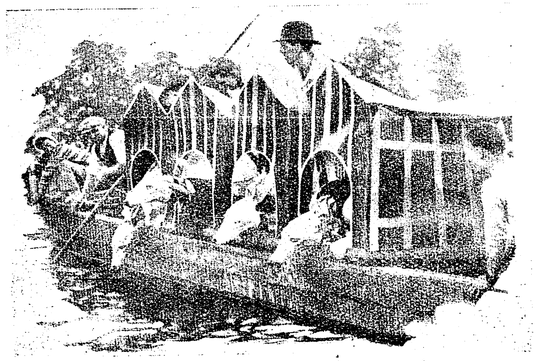

কুকুরের মুখোসধারী সন্তরণকারী

ছিদ্রপথে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মুখোসগুলি এমনভাবে শরীরে সংলগ্ন থাকে যে, তাহাতে সন্তরণকারীরা কোনও অসুবিধা বোধ করে না।

মোটরচালিত যানে ভ্রমণ-শিবির

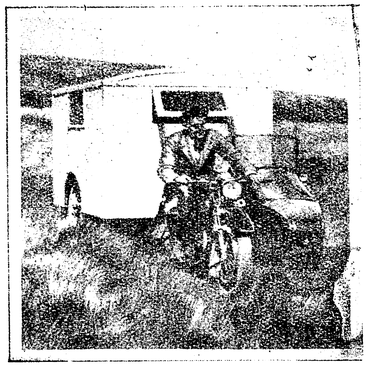

মোটরচালিত যানে বস্ত্রাবাস

জনৈক ইংরাজ মোটর দ্বিচক্র যান-চালক তাঁহার বিচক্র যানে ভ্রমণ শিবির বহন করিবার অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে সুবিধা এই যে, যে পথে মোটর গাড়ী চলিতে পারে না, এই বিচক্র যান অনায়াসে তথায় উপনীত হইতে পারে। এইরূপ দুর্গম স্থানে বস্ত্রাবাস সন্নিবিষ্ট করিয়া ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত ইংরাজ দ্বিচক্র যান-চালক তাঁহার যানে বস্ত্রাবাস লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে ব্যয়ও সংক্ষেপ করা চলে এবং দুরধিগম্য স্থানে আমোদপ্রমোদ করাও বিশেষ সুবিধাজনক।

কাল তাস

অধুনা কাল রঙ্গের তাস ক্রীড়ার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ভিতর পৃষ্ঠা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার উপর হরতন রক্তবর্ণ, ইসকাবন সবুজ, রুহিতন শ্বেতবর্ণ এবং চিড়িতন পীতাভাবিশিষ্ট। এই প্রকার অভিনব তাস লইয়া ক্রীড়া করিলে চক্ষুপীড়া হয় না এবং বাছিয়া লওয়াও অত্যন্ত সহজ প্রতীচ্য জগতে এইরূপ তাসের প্রচার বাড়িতেছে।

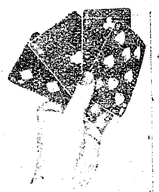

কাল তাস

ভ্রাম্যমাণ পুস্তকাগার

সিন্‌সিনিটী, ওহিও প্রভৃতির সন্নিহিত সাধারণ গ্রামবাসিগণ যাহাতে অবাধে গ্রন্থপাঠে অবসর যাপন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ পুস্তকাগারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ একটি পুস্তকালয় একটি মোটর-চালিত গাড়ীর উপর



ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী

স্থাপিত। সুদূর পল্লী অঞ্চলে এইরূপ লাইব্রেরী হইতে পুস্তক বিতরিত হইয়া থাকে। উক্ত গাড়ীর উভয় পার্শ্বে এমন স্থান আছে যে, পাঠকগণ সুসজ্জিত পুস্তকগুলি পরিদর্শন করিয়া পাঠের উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচিত করিতে পারে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে পুস্তকাদির হিসাব রাখিবার জন্য এক জন লোক থাকে।

বৈজ্ঞানিক কৌশল

বার্লিনের কোনও বৈদ্যুতিক গবেষণাগারে বিশেষজ্ঞগণ কৃত্রিম উপায়ে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎদীপ্তির সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন—ঝটিকার সময় বিদ্যুদ্দীপ্তির কিরূপভাবে স্ফুরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে। গবেষণাগারে বিদ্যুদ্দীপ্তির মুহুর্মুহুঃ বিকাশকালে বজ্রনাদের বন্দোবস্তও আছে। আবহ বিভাগ, ইহার ফলে ভবিষ্যতে উপকৃত হইবার সম্ভব।

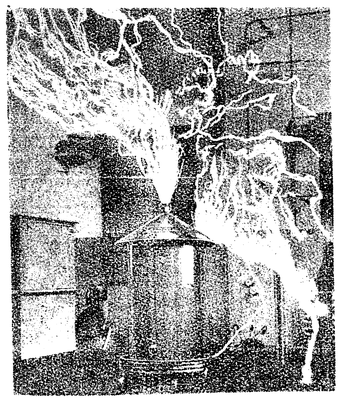

পরীক্ষাগারে বজ্রনাদ ও বিদ্যুদ্দীপ্তির পরীক্ষা হইতেছে

কেশের বর্ণ-পরীক্ষার অভিনব উপায়

চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীদিগের কেশরাজির বর্ণের উপর অভিনয়ের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে বলিয়া অভিজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন। এ জন্য অভিনেত্রীর কেশের বর্ণ সম্বন্ধে চলচ্চিত্রের পরিচালকগণ বিশেষ অবহিত হইয়া থাকেন। কাহার মস্তকের কেশ কোন্

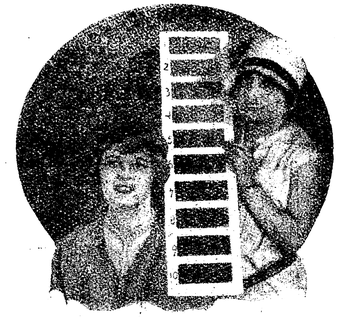

কেশ-পরীক্ষার বর্ণ-চিত্র

বর্ণের অনুরূপ, তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এক প্রকার বর্ণ-চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটিতে এক দুই করিয়া সংখ্যা নির্দ্দেশ করা আছে। উহার সাহায্যে অভিনেত্রীর কেশের বর্ণ নির্ণীত হয়।

বিচিত্র হাতকড়ি

পশ্চিম-আমেরিকার জনৈক শিল্পী এক প্রকার হাতকড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই হাতকড়ি অপরাধীর হাতে লাগাইয়া দিলে



বিচিত্র হাতকড়ি

সেই ব্যক্তি কোনওরূপে কোন প্রকার অস্ত্রধারণ করিতে পারে না। এই হাতকড়ি নির্ম্মিত হওয়ায় অপরাধীরা অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেও, ঐ প্রকার হাতকড়ির জন্য কোনও অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ক্ষুদ্রতম মোটর-গাড়ী

ফ্রান্সে সম্প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মোটর-গাড়ী কোনও প্রদর্শনীক্ষেত্রে আনীত হইয়াছিল। বড় গাড়ীর আদর্শে এই ক্ষুদ্রতম গাড়ী নির্ম্মিত। প্রত্যেক খুঁটিনাটি কলকব্জা পর্য্যন্ত এই মোটর-গাড়ীতে



ক্ষুদ্রতম মোটর-গাড়ী

পরিত্যক্ত হয় নাই। এই গাড়ীর গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ মাইল। একটি ক্ষুদ্র বালক এই গাড়ীর মধ্যে বসিয়া গাড়ী চালাইতে পারে, এমন স্থান গাড়ীর মধ্যে আছে।

মল্লযুদ্ধ শিখিবার যন্ত্র

পশ্চিম-আমেরিকার এক জন মল্লবীর এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শিক্ষার্থী মল্লযুদ্ধের কৌশল শিখিতে পারে এবং বাহু, স্কন্ধদেশ, ঘাড় ও পৃষ্ঠের পেশী অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়। এই যন্ত্রের দুইটি হাতল আছে। উক্ত হাতল এমন কৌশলে অবস্থিত যে, মল্লযুদ্ধ-শিক্ষার্থী তদ্দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়।



মল্লযুদ্ধ শিখিবার যন্ত্র

অভিনব দ্বিচক্র যান

সম্প্রতি মোটর-চালিত এক প্রকার দ্বিচক্র যান নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার উভয় পার্শ্বে দুইটি শিশুকে বহন করিবার দুইখানি গাড়ী

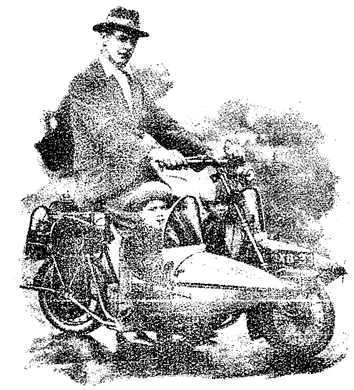

অভিনব মোটরচালিত দ্বিচক্রযান

সংযুক্ত থাকে। এই গাড়ীর মালিক জনৈক ইংরাজ স্বীয় পুত্র ও কন্যাকে উল্লিখিত উভয় পার্শ্বস্থ আসনে ব প্রত্যহ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন।

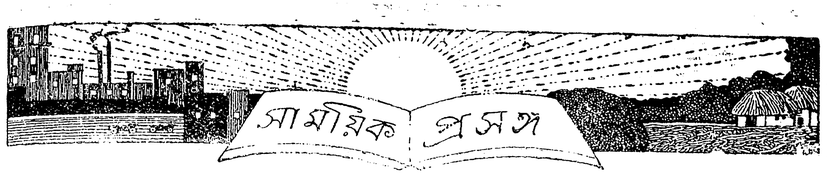

প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের মর্য্যাদা ও গণতন্ত্র

আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে সাদরে আহূত হইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও জ্ঞানপিপাসুকে অন্তরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে বলি। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা স্বজাতির মহত্ত্ব বা গৌরবের কথা সহ্য করিতে পারেন না, যাহা কিছু প্রাচীন তাহা অসার বলিয়া বর্জ্জন করিয়া নূতনের সন্ধানে বিদেশের নিকটে কর্জ্জ করিতে দৌড়াইয়া থাকেন। জ্ঞান সকল দেশ, সকল সময়, সকল পাত্র হইতে আহরণীয়,এ কথা সত্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া নিজের দেশে কিছুই শিখিবার নাই বলিয়া অতীতকে বর্জ্জন করাও সঙ্গত নহে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বিদেশের নিকট হইতে অনেক জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি দেশের নিকট ঋণের কথা কখনও অস্বীকার করেন নাই। যে মানুষের জাতীয়তার গৌরব নাই, যে মানুষ আপনার জাতিকে ছোট বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হয়, সে পরম পণ্ডিত হইলেও কৃপার পাত্র। আচার্য্য মহীশূরের বক্তৃতায় স্বদেশের ও স্বজাতির অতীত গৌরবের কথা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার এই কথা যে সময়োপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা ইহা হইতে পরম উপকার প্রাপ্ত হইবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত নহে।

আচার্য্য মুখবন্ধেই ছাত্রবর্গকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—স্বদেশের কল্যাণসাধন আপনাদের জীবনের ব্রত হওয়া প্রয়োজন। সে বিষয়ে আপনারা আপনাদের যুব-জনোচিত সামর্থ্য প্রয়োগ করিবেন, দেশ ইহাই আপনাদের নিকট আশা করে। আপনারা সত্যানুসন্ধান-পথের যাত্রী। এই সত্যাবিষ্কার কার্য্যে সাফল্যের জন্য কিরূপ নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন ?—মনে রাখিবেন, আপনারা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই এই সত্যাবিষ্কার কার্য্যে আপনাদের প্রধান সহায়।

যিনি ব্যবহারিক জগতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সেই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রকারান্তরে আমাদের ভবিষ্য-বংশধরগণকে উপদেশ দিতেছেন,—যে বিদ্যা অর্জ্জন কর যে আর পথেই চল,কখনও বুড়ী ছাড়িও না,বুড়ী ছুঁইয়া থাকিও। অর্থাৎ ভারতের ভাবধারা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের জ্ঞানী ঋষি-তপস্বীরা তোমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছেন, সেই পরম সত্য হইতে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হইও না। সেই ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার পর যাহা করিতে হয় করিও, শিখিতে হয় শিখিও। তোমরা রাজার ছেলে, উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইয়াছ, তাহা অমূল্য, তাহা হেলায় হারাইও না, ইহার উপর কিছু পাও, অধিকন্তু ন দোষায়।

এই 'শুষ্ক নীরস' বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে আজ যাহা ভারতবাসী শুনিল, বোধ হয়, কেহ তাহাদিগকে এমন করিয়া এ কথা শুনায় নাই। আচার্য্য বলেন,—অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, ভারতের পুরাকালীন মনীষিগণ আধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে জগতের নিকট ভারতের যে কিছু আদর, সে কেবল তাহারই জন্য। ভারতের সেই গৌরবের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, উহা আর ফিরিয়া আসিবে না। জীবনযাত্রায় প্রথম অগ্রসর হইবার সময় তাঁহাদের এই সকল নৈরাশ্যজনক কথা শুনিয়া আমি যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু বাধা পাইয়া আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, অতীতের স্মৃতিই আমাকে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। আমার বিশ্বাস,—যে সভ্যতা আমাদের সহজাত অর্থাৎ জাতীয় ভাবধারার অনুকূল নহে, জাতীয়তার প্রকৃত পুনরুজ্জীবনে তাহা আমাদের সহায় হইতে পারে না।

খাঁটি সত্য কথা। এই কথা কয়টি আমরা পুনঃ পুনঃ আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদিগকে মনের মধ্যে আবৃত্তি করিতে বলি। দেশের জ্ঞানবৃদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য আজ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় যে ফললাভের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কি জলন্ত বর্ত্তিকার মত তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামে পথিপ্রদর্শন করিবে না ?

তাহার পর জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন,—ভারতের বিরুদ্ধ সমালোচকরা বলেন যে, জ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধি এবং নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের প্রচারবিষয়ে ভারতবাসীর কোনও যোগ্যতা নাই, প্রকৃত গণতন্ত্রের ভাব তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। তাহারা দার্শনিক ভাবাপন্ন বলিয়া ব্যবহারিক জ্ঞানার্জ্জনে তাহাদের আসক্তিও নাই, যোগ্যতাও নাই। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রকৃত জন্মভূমি—পাশ্চাত্য দেশসমূহ, ভারতবর্ষ উহার উৎপাদনের অনুকূল ক্ষেত্র নহে। আমি বলি, এ সকল কথা নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত, উহার কোনও ভিত্তি নাই। প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রের ভাব যেরূপ সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, জগতে কখনও কোন দেশে কোন রাজ্যে তাদৃশ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। সেই প্রাচীন ভারতে রাজা এবং সামান্য প্রজা গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে সমানভাবে সারল্যময় জীবন-যাপনে উপদিষ্ট হইত। তিন হাজারেরও অধিক বৎসর পূর্ব্বে হস্তিনানগরে সূতপুত্র কর্ণ রাজপুত্র অর্জ্জুনকে অস্ত্রশিক্ষা-পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিলে অর্জ্জুন অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি অভিজাতকুলোদ্ভব নহে, রাজপুত্র তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না।" কর্ণ তাহার উত্তরে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম।" গণতন্ত্রবাদের এমন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আর আছে কি না সন্দেহ।

জ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির এবং নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার-বিষয়েও প্রাচীন ভারতে ভৌগোলিক কোন বাধাই ছিল না। কোন বাধাই উহাকে পরাহত করিতে পারিত না। এক দিন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্য হইতে সুদূর হিমালয় পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র জ্ঞানপ্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এক দিন বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ কয়েকখানি তালপত্রমাত্র সম্বল করিয়া তিব্বতে, চীনে ও অন্যান্য সুদূর প্রাচ্য রাজ্যে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। অর্জ্জিত জ্ঞান তখন ভারতে সীমাবদ্ধ থাকিত না।

তবে এই স্বদেশের প্রাচীন গৌরবের সহিত আধুনিক কালেরও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই উপদেশও দিয়াছেন। তিনি বলেন,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহারা জ্ঞানের প্রসার যতদূর বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা প্রসারিত করা অসম্ভব, এরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ভাল হইতে পারে না, ইহা ভ্রান্ত দেশ-প্রেমিকের উক্তি, ইহাতে সত্যানুসন্ধানের ব্যাঘাত হয়।

অর্থাৎ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উপদেশ দিতেছেন যে, ভারতের জাতীয় ভাবধারাকে আদর্শ রাখিয়া ভারতের অতীত যুগের মনীষী ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া নিত্য নূতন জ্ঞানাহরণ করা আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের কর্ত্তব্য। নিজের জাতির অতীতকে অবজ্ঞা করিতে নাই। পরের দেশের যাহা কিছু আপাত উজ্জ্বল, তাহার আলোকধারায় আকৃষ্ট হইয়া তাহারই অন্ধ অনুকরণ করা জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রসারের বা জাতির উন্নতির সহায়ক হইতে পারে না। উহাতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক পতঙ্গই পুড়িয়া মরে—অনেকে অন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল অতীত গৌরব আঁকড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, উহাতে জাতির চিন্তার ধারা রুদ্ধ হইয়া যাইবে, জাতি পঙ্গু হইয়া যাইবে। পরের যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু মঙ্গলকর, তাহা আহরণ করিতে হইবে। এইরূপে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে হইবে।

গ্রহণ বা বর্জ্জন?

বলডুইনের টোরী গভর্ণমেণ্ট ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ভারত-শাসন-সংস্কার সম্পর্কে যে রয়্যাল কমিশন (সাইমন কমিশন) বসাইতেছেন, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যাহা বলিবার, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কমিশনের গঠন-প্রণালীর কথা বিঘোষিত হইবার পরেই ভারতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পরিচয়ও পাঠক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অসহযোগকামী কাউন্সিল বর্জ্জনকারী অথবা স্বরাজীদিগের ত কথাই নাই, সার শিবস্বামী আয়ার, সার তেজবাহাদুর সপ্রু, সার আলি ইমাম, মিঃ জিন্না এবং মামুদাবাদের রাজা প্রমুখ সহযোগকামী মডারেট দলপতি এবং লালা লজপৎ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ হিন্দুসভার নেতা ও মিঃ মহম্মদ আলি, মিষ্টার আক্রাম খাঁ প্রমুখ মুসলমান খিলাফৎ কমিটীর নেতা,—সকলেই একবাক্যে কমিশন বর্জ্জন করিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জাবের এক শ্রেণীর কয়েক জন মুসলমান যেমন কমিশন সমর্থন করিয়াছেন, তেমনই পঞ্জাবের খিলাফৎ কমিটী কমিশন বর্জ্জন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাঙ্গালা, বিহার, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশের খিলাফৎ কমিটী ও হিন্দুসভা কমিশনের সহিত কোনও সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মাদ্রাজের জাষ্টিস পার্টির কয়েক জন অনুন্নত শ্রেণীর নেতা কমিশন সমর্থন করিবেন বলিয়াছেন বটে, কিন্তু গোটা ভারতের মধ্যে বোধ হয় কেবল তাঁহারাই পঞ্জাবের মুষ্টিমেয় কয় জন মুসলমানের সহিত কমিশনের পক্ষে রহিয়া গেলেন। পঞ্জাবের যে কয় জন মুসলমান কমিশনের পক্ষে, তাঁহাদের দলপতি সার মহম্মদ সফির মুসলমান-সমাজে কিরূপ প্রতিপত্তি ও প্রভাব, তাহা তাঁহার মুসলিম লীগে সভাপতি নির্ব্বাচনের বিপক্ষে চারিদিকের মুসলমান-সমাজের তীব্র প্রতিবাদ দেখিয়াই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। ফল কথা, মাত্র জন কয়েক লোককে বাদ দিলে দেখা যায়, গোটা ভারতের অধিবাসী শিক্ষিত গণ্যমান্য জনসাধারণ কমিশন-বর্জ্জনের পক্ষপাতী; কারণ, তাঁহারা কমিশনের গঠনভঙ্গী দেখিয়া স্থির জানিয়াছেন যে, উহা ভারতের আত্মমর্য্যাদার অবমাননাকর, উহা দ্বারা ভারতের নিকৃষ্টত্ব প্রচার করা হইতেছে ও এক বিদেশী জাতির ভারতের অভিভাবক ও ভাগ্যবিধাতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে, পরন্তু ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ভারতের জন্মগত অধিকার অমান্য করা হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতে মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, অমঙ্গলে মঙ্গল দেখা দিয়াছে। বার্কেণ্হেড ও বলডুইন এই রয়্যাল কমিশন বসাইয়া ভারতে মঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, যাহা শত একতা-বৈঠকে করিতে পারে নাই, তাহা করিয়াছেন,—হিন্দু-মুসলমানে মিলন ঘটাইয়াছেন। বস্তুতঃ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ যুগের পর এমন একতা ভারতে দেখা যায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতবাসীর একতাবদ্ধ হওয়ার আরও কারণ আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনে (India Act of 1919) নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ ১০ বৎসর পূর্ব্বে রয়্যাল ষ্ট্যাটুটারী কমিশন বসান হইবে না। সুতরাং হঠাৎ বলডুইন সরকার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে—১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২ বৎসর পূর্ব্বে কমিশন বসাইতেছেন কেন? ভারতের প্রতি তাঁহাদের দয়ার আতিশয্যবশতঃ কি? যে বলডুইন সরকার এবং তাঁহাদের বিপক্ষ লেবার ও লিবারল দল একযোগে বলিতেছেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মুখবন্ধের (Preamble) বর্ণ নড়চড় করা যাইতে পারে না—পার্লামেণ্টের ভারতের হস্ত নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র অধিকার হস্তচ্যুত করা যাইতে পারে না, সে বলডুইন সরকার সেই ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ২ বৎসর পূর্ব্বে কমিশন বসাইতেছেন কেন? ইহার গূঢ় রহস্য কি? ভারতবাসী বুঝিতেছে, শীঘ্রই ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। সেই নির্ব্বাচনে টোরীদিগের পরাজয়ের এবং লেবার দলের জয়ের সম্ভাবনা সমধিক। সুতরাং পাটে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই ভারতের সম্বন্ধে হেস্তনেস্ত করিয়া না গেলে লেবারের আমলে হয় ত অনর্থপাত হইতে পারে; এই হেতু তাঁহারা তাড়াতাড়ি কমিশন বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতবাসীর ধারণা, এই কারণে এই কমিশন

স্বথনও ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল হইবে না। তাই তাহারা কমিশন বর্জ্জন করিতেছে।

কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। আমাদের দেশের বহু কৃতবিদ্য মনীষী রাজনীতিকের বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, লেবার ও লিবারল দল ভারতের স্বার্থের বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বন করেন। এ ধারণা তাঁহাদের কিসে হইয়াছে, জানা যায় না;—সম্ভবতঃ লর্ড রিপণ প্রমুখ লিবারল-দলীয়রা পূর্ব্বে ভারতবাসীর দিকে টানিয়া অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া। এখনও লেবার দলে অনেক সময়ে (যখন প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, তখন নহে) ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্মগত অধিকার এবং ভারতকে পূর্ণ উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি নামক শাখা ব্ল্যাকপুলের গত বৈঠকে এ কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লেবার দলপতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যখন এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন রেঙ্গুণে ভারত ও ব্রহ্মবাসীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমাদের দেশ তোমাদের, তোমাদের গভর্ণমেণ্ট তোমাদেরই, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই।" আর মিঃ ল্যান্সবারি, কর্ণেল ওয়েজউড, মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে, মিঃ বেণ স্পুর, কমাণ্ডার কেনওয়ার্দি প্রমুখ বহু লেবার সদস্য ভারতের স্বপক্ষে তাঁহাদের দেশে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন, কাগজে অনেক লিখিয়াছেন, পার্লামেণ্টে অনেক প্রশ্নোত্তর ও তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। কাযেই লেবার দল যে, ভারতের স্বার্থের বিশেষ অনুরাগী ও ভারতবাসীর হিতাকাঙ্ক্ষী, এমন ধারণা হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু কথা আছে, 'ফলেন পরিচীয়তে', ফল দ্বারা কার্য্যের স্বরূপ প্রকাশ পায়। লেবার পার্টি যখন স্বল্পকালের জন্য ইংলণ্ডের শাসন-পাটে বসিয়াছিলেন, তখন দলপতি মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড স্পষ্টই বলেন, যাহা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভবপর এমন রাজনীতিই গ্রাহ্য, সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী গ্রাহ্য হইতেই পারে না। তাঁহার আমলে সে দাবী আংশিকভাবেও গৃহীত হয় নাই। পরন্তু তাঁহার 'লেফটানেণ্ট' লর্ড অলিভিয়ার ভারতসচিবরূপে ভারতের শৃঙ্খল আরও কঠিন করিয়া গড়িয়াছিলেন, বিনা বিচারে ভারতীয়ের স্বাধীনতা-হরণের বিধিবজ্র ভারতীয়ের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছিল যে, লেবার দলের ভোটে জয় সামান্য, তাঁহাদের শাসনপাটে অবস্থিতির স্থিরতা নাই, সুতরাং লেবার দল ভারতের স্বার্থরক্ষারূপ অত বড় জনসাধারণের অপ্রীতিকর দায়িত্ব স্কন্ধে ধারণ করিতে পারেন না। কিন্তু এবার তাহা বলা যায় না। এবার শুনিতেছি, লেবার দলই প্রবল, তাঁহারা এবার জোরের সহিত পাটে বসিবেন। তবে এবার তাঁহারা টোরীদিগের গণ্ডায় এণ্ডা দিলেন কেন? ইহাতে কি ভারতবাসী ভাবিতে পারে না যে, তাঁহাদের পাটে বসিবার সময় আসিতেছে বলিয়া পাছে ভারতবাসীরা তাহাদের আমলে তাঁহাদের সকাশে তাহাদের জন্মগত অধিকারের দাবী করে, সেই ভয়ে তাঁহারা বিনা আপত্তিতে টোরী গভর্ণমেণ্টকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যা হয় একটা বন্দোবস্ত করিতে ছিলেন? এ সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে রফা করিয়া লইয়া কি তাঁহারা বলডুইন সরকারের কমিশনে ভারতীয় বর্জ্জনের রায়ে সায় দিলেন? এই ত গেল লেবার দলের কথা। লিবারল দলের ত কথাই নাই তাঁহাদের রেডিং প্রমুখ নেতারা ত টোরী সরকারের ব্যবস্থায় সায় দিয়াই আছেন, কমিশনের চেয়ারম্যান স্বয়ং সার জন সাইমন ত লিবারল।

এ অবস্থায় ভারতবাসী কি করিতে পারে? তাহারা কি কমিশনের সহিত সহযোগ করিয়া জগৎকে জানাইয়া দিবে যে, তাহারা ইংরাজ পার্লামেণ্টকে তাহাদের ভাগ্যবিধাতা এবং নিজেকে নিকৃষ্ট দয়াপ্রার্থী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে—তাহাদের নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্মগত অধিকার তাহারা স্বেচ্ছায় অপরকে ছাড়িয়া দিতেছে? কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্ট জাতি তাহা করিতে পারে না, করিলে উহা নৈতিক আত্মহত্যা বলিয়া জগতে ঘোষিত হইবে। তাই ভারতবাসী কমিশন বর্জ্জন করিতেছে।

ফলে ইংরাজ মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। তাই আজ টোরী, লিবারল, লেবার,—সবাই মিলিয়া ভারতকে বুঝাইতেছেন,—"বাপু হে, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করিতেছি, হেলায় এ সুযোগ হারাইও না।" বলডুইন ও রেডিং বলিতেছেন,—"ইহাতে তোমাদের কোনও অপমান করা হয় নাই, ভারতের আত্মসম্মানে আঘাত করা হয় নাই।"

রেডিং আরও একটু উদারতা দেখাইয়া বলিতেছেন,—"আমরা তোমাদিগকে বন্ধু, সমান অংশীদার ও আমাদেরই মত প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে করি বলিয়াই তোমাদের সহযোগে কমিশন সফল করিতে চাহিতেছি।" বার্কেণ্হেড বুঝাইলেন, "তোমরাই সত্বর কমিশন চাহিয়াছ, তাই নির্দ্দিষ্টকালের ২ বৎসর পূর্ব্বে কমিশন দেওয়া হইল। কমিশন নিরপেক্ষ এবং পূর্ব্ব-সংস্কার-বর্জ্জিত হইবে বলিয়া ভারতের কোনও দলের, সরকারী বে-সরকারী, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, শিখ, খৃষ্টান—কোনও দলের কোন লোককে কমিশনে লওয়া হইল না, লইলেই একটা জগা খিচুড়ী হইত, একটা প্রকাণ্ড কমিশন গড়িতে হইত; কেহ বলিত, হিন্দু প্রতিনিধি ঠিক হয় নাই; কেহ বা বলিত, মুসলমান প্রতিনিধি মুসলমানের মনঃপূত হয় নাই; সেইরূপ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ও সরকারী বে-সরকারী, সকল দলের লোকনিয়োগেই নানা আপত্তি উঠিত। পুনশ্চ সিদ্ধান্তের পর মন্তব্য প্রকাশকালে নানা মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত, মেজরিটি মাইনরিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইত। ফলে কোন কায না হইয়া একটা ঝগড়ার পথ উন্মুক্ত হইত। ইহা হইতে কেবল পার্লামেণ্টের মাত্র ৭ জন সদস্যকে লইয়া কমিশন গঠিত হইল। ইহাদের মধ্যে টোরী, লিবারল, লেবার তিন দলেরই লোক থাকিবেন। অধিকন্তু সার জন সাইমনের মত উদারনীতিক লিবারল চেয়ারম্যান হইবেন। ভারতের সম্বন্ধে ইহাদের কোন ধারণা পূর্ব্বে হইতেই বদ্ধমূল হইয়া নাই। ইহারা সকল পক্ষের সাক্ষ্য লইয়া, ঘটনাস্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, স্বয়ং সকল দিক্ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন এবং সেই সিদ্ধান্তের ফল পার্লামেণ্টে নিবেদন করিবেন। তাঁহাদের উপর উপকরণ-সংগ্রহের ভার থাকিবে; বিচারের বা রায়ের ভার থাকিবে না। সে ভার পার্লামেণ্টের। আর ব্যবস্থা-পরিষদের যে জয়েণ্ট কমিটী ভারতবাসী সদস্যরা নিজে নির্ব্বাচন করিবেন, তাঁহাদেরও নিজের

মতামত কমিশনকে জানাইবার পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। এমন কি, কমিশন ভাঙ্গিয়া গেলেও বিলাতের পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী যখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিচারে বসিবেন, তখনও ব্যবস্থা-পরিষদের জয়েণ্ট কমিটীর অস্তিত্ব থাকিবে এবং তাঁহাদের ডেপুটেশান বিলাতে আসিয়া বিলাতের জয়েণ্ট কমিটীর সকাশে তাঁহাদের কথা জানাইতে পারিবেন। সুতরাং ভারতকে অপমান করা হইতেছে, এ কথার কোনও ভিত্তি নাই। প্রতিপদেই ভারতের সহিত পরামর্শ করা হইবে।"

সকলেই সব কথা বলিলেন, ভারতবাসীকে সহযোগকামী করিবার জন্য—বিশেষতঃ মডারেটদিগকে rally করিবার জন্য কত বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু ভবী ভুলিল না; অবুঝ কিছুতেই বুঝিল না। তখন তাঁহারা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, Et tu Brute এঁ্যা, তোমরাও? আজ যদি তাঁহারা এ দেশে আসিয়া এ দেশের লোকের মনের ভাব জানিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে কি হইত? যে মডারেটকে rally করিতে এত চেষ্টা, যাহাদের অভিমত গণ্য বলিয়া (whose opinions count) তাঁহারা মনে করেন, সেই মডারেটদের মুখপত্র "লীডার" যে অসহযোগকামীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, তাহা কি তাঁহারা জানেন? "লীডার" ভেরী-নির্ঘোষে দেশের লোককে ডাকিয়া দৃঢ়স্বরে কমিশন বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন,—"আমরা ভারত-সচিবের, ভূতপূর্ব্ব লেবার গভর্ণমেণ্টের ভারত-সচিব লর্ড অলি-ভিয়ারের, লর্ড চেমসফোর্ড এবং লর্ড রেডিংএর পূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি। আমরা তাঁহাদের উপদেশ-সুধা পান করিয়াছি। আমাদের উত্তর,—আমরা এই চারি জন লর্ডের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেছি। আমরা কমিশনের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে চাহি না। এই কমিশনের বিপক্ষে আমরা আমাদের সাধ্যমত আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিব। ফলাফল ভগবানের হস্তে।" হায়! এত উপদেশ, এত হিতাকাঙ্ক্ষা, এত ঘর-ভাঙ্গাভাঙ্গির চেষ্টা (Rallying the Moderates)—সবই বিফল হইল!

অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং "ডেলী হেরাল্ড" পত্রের সম্পাদক উদারমনা মিঃ ল্যান্সবারীও উপদেশ দিয়াছেন,—"লেবার দল যখন পার্লামেণ্টারী কমিশন সমর্থন করিয়াছেন, তখন বর্জ্জন-নীতি গ্রহণ করায় ভারতবাসীরা কোনও ফললাভ করিবেন না, বরং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের মনের মত শাসন-প্রথার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দাখিল করুন এবং উহার অনুযায়ী দাবী পূর্ণ করাইবার জন্য রীতিমত আন্দোলন করুন, তাহা হইলেই কায হইবে।"

দেখুন, মিঃ ল্যান্সবারীর মত যথার্থ ভারত-হিতৈষীর উপ-দেশেও ভারতের আত্মসম্মানহানিকর কথা আছে। তিনি সকল বিষয়েই ভারতের দাবী দাখিল করিবার উপদেশ দিতেছেন, অথচ কোথাও বলিতেছেন না যে, ভারত তাহার জন্মগত অধি-কার নিশ্চিতই ভোগ করিবে,—আপনার ভাগ্য আপনি নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইবে। হইতে পারে, ইংরাজ যথার্থই ভারতের স্বার্থ-চেষ্টা করিতেছেন, কমিশন বসাইয়া ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দৃঢ় করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু। তাঁহারা আমা-দিগকে সমান দেখেন, নিকৃষ্ট দেখেন না; বন্ধু ভাবেন, নেটিভ ভাবেন না (যদিও মিঃ বলডুইনের বক্তৃতায় দুই এক স্থানে 'নেটিভ' কথাটা ফুটিয়া উঠিয়াছে); এই কমিশন গঠন করিয়া আমাদের কোন অসম্মান করেন নাই। হইতে পারে, এ সকল কথাই সত্য। কিন্তু পার্লামেণ্ট যে আমাদের ঈশ্বরদত্ত ভাগ্য-বিধাতা ও অভিভাবক, এ কথা ত কেহই ছাড়িতেছেন না গোল ত এখানেই। ইংরাজ বলিতেছেন, পার্লামেণ্ট আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবার প্রভু; আমরা বলিতেছি, আমরা আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রভু! এ সমস্যার মীমাংসা ত কমিশনে হইবে না। তবে?

যে ইণ্ডিয়ান কমিটীর (ব্যবস্থাপরিষদের জয়েণ্ট কমিটী) বার বার দোহাই দিয়া বলা হইতেছে, আমাদিগকে কোনও অপমান করা হয় নাই, বরং সমানরূপে, বন্ধুরূপে ব্যবহার করা হইতেছে, উহার দৌড় কতটুকু, তাহাও একবার আলোচনা করা যাউক। বলা হইতেছে, কমিশন ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে ইণ্ডি-য়ান কমিটী পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটীর সহিত একযোগে কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। ইহার অর্থ কি? যদি বুঝা যায়, কমিশন যে রিপোর্ট পার্লামেণ্টের ঐ জয়েণ্ট কমিটীতে দাখিল করিবেন, সেই রিপোর্ট কি ইণ্ডিয়ান কমিটী ও পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটীর—এতদুভয়ের যুক্ত নামে প্রেরিত হইবে? তাহা কখনই হইবে না, কেবল পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটীর নামেই পাঠান হইবে। তাহা হইলে ইণ্ডিয়ান কমিটীর সার্থকতা কি? ঐ কমিটী কি কেবল পার্লামেণ্টের কমিটীকে পরামর্শ (advice gratis) দিবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বিলাতযাত্রা করিবেন? এত পয়সা খরচ করিয়া সময় ও শক্তি নষ্ট না করিয়া সে কায ত এখান হইতে লেখালেখির দ্বারাও করা যায়।

তবেই দেখা যাইতেছে, ইণ্ডিয়ান কমিটীকে সকল সময়ে নিকৃষ্ট পদ প্রদান করা হইতেছে, তাহার কেবল পরামর্শ দিবার ক্ষমতা থাকিবে, তবে সেই পরামর্শ কতটা গ্রাহ্য হইবে না হইবে তাহা আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তারা স্থির করিয়া দিবেন। ভারত যখন কমিশন বসিবে, তখনও ইণ্ডিয়ান কমিটী তাঁহাদের সহিত সকল সময়ে বসিতে পাইবেন না, বসিলেও পরামর্শ ব্যতীত কিছুই দিতে পারিবেন না। কমিশন যখন প্রদেশসমূহে ঘুরিবে তখন ইণ্ডিয়ান কমিটী সেই সঙ্গে থাকিবেন কি না, তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে এই কমিটীর প্রহসনের কি প্রয়োজন আছে, জানা যায় না। ইহাতেই কি বন্ধুত্ব ও সমান পরিস্ফুট হইতেছে?

আবদুল রসিদের ফাঁসী

শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী কাপুরুষ আবদুল রসিদ ব্রিটিশ কাউন্সিলের আপীলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া শেষকালে বড়লাটের নিকট জীবন ভিক্ষা করিয়াছিল। বড়লাট তাহার সেই আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। তাহাকে কোন্ স্থানে ফাঁসী দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া একটা গোল উপস্থিত হইয়াছিল। দিল্লী হইতে এই হতভাগ্যকে পঞ্চনদের কোন সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাইয়া ফাঁসী দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রস্তাবে পঞ্চনদ-সরকার সম্মত হয়েন নাই। তাহারা বলেন যে, পঞ্চনদে সাম্প্রদায়িক

বিরোধ যেরূপ প্রবল, তাহাতে তথায় এই নরহন্তাকে ফাঁসী দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে ঐ অঞ্চলে আবার একটা হাঙ্গামা উপস্থিত হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সর্ব্বত্র মুসলমানসমাজে আবদুল রসিদের এই কাপুরুষোচিত কার্য্যের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন মুসলমানের সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক এবং ইহার অন্তরালে যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র বিরাজ করিতেছিল, ইহা সরকার অবগত ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, সরকার তাঁহাদের গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে এই ষড়-যন্ত্রের উচ্ছেদ করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। আবদুল রসিদের জীবনরক্ষার জন্য বহু মসজেদে প্রার্থনা করা হইয়াছিল,—আবদুল রসিদ যখন ফাঁসীর প্রতীক্ষায় হাজতে ছিল, তখন বহু মৌলভী ও মৌলানা নামধেয় ব্যক্তি তথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, ইহাতে এইরূপ পাপানুষ্ঠানের উপর মুসলমানসমাজের, অন্ততঃ অত্যন্ত অধিকসংখ্যক মুসলমানের, সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের বিশ্বাস, সরকার যদি এই সময়ে এই ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করি-তেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদিগকে সে চেষ্টায় নিষ্ফল হইতে হইত না।

বিগত ১৪ই নবেম্বর দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলে এই কাপুরুষ নরঘাতুকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। যে দিন এই পাপাত্মার ফাঁসী হইয়াছিল, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে বহু মুসলমান সেণ্ট্রাল জেলে যাইয়া একটা হাঙ্গামা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যেদিন তাহার ফাঁসী হইয়াছিল, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই দিল্লীতে এবং অন্যান্য স্থানে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলের সম্মুখে সকল মুসলমানকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। সরকার আবদুল রসিদের আত্মীয়-দিগকে তাহার মৃতদেহ দিতে চাহিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা এইরূপ সর্ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাহাকে সেণ্ট্রাল জেলের সন্নিহিত গোরস্থানে কবর দিতে হইবে এবং তাহার মৃতদেহ লইয়া কোনরূপ শোভাযাত্রা করা হইবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ মুসলমানগণ সে সর্ত্ত রক্ষা করে নাই। ফাঁসীর দিন সেণ্ট্রাল জেলের সান্নিধ্যে প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, গুণ্ডা ও ভদ্রলোক সকল শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিল। আনুমানিক ৪০ হইতে ৫০ খানি মোটর গাড়ীও তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, ধনি-সম্প্রদায়ও এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পুলিস যে এই ব্যাপারে কতকটা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পুলি-সের বন্দোবস্ত যে পর্য্যাপ্ত হয় নাই, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা হইতেই বুঝা যায়। পূর্ব্ব হইতে কৃতসঙ্কল্প জনতা আবদুল রসিদের মৃতদেহ ছিনাইয়া লয় এবং পুলিসের বেষ্টনী ভেদ করিয়া সেই মৃতদেহ লইয়া জুম্মা মসজেদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পুলিস ও সামরিক ব্যক্তিরা সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিশেষভাবে বাধা দিতে পারে নাই। তখন তাহারা সেই মৃতদেহ লইয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সহরের হিন্দুরা সেই সংবাদ পাইয়া দোকানপাট বন্ধ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহা হইলেও সেই মুসলমান জনতা স্থানীয় হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহারা অপ্রতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া এক জন বৃদ্ধ হিন্দু রজককে নিহত এবং প্রায় ৫০ জনকে আহত করিয়াছিল। তন্মধ্যে ১ জন মাত্র মুসলমান ছিল।

মৃতদেহ যখন জুম্মা মসজেদে নীত হইয়াছিল, তখন উহার সহিত ৪ হাজারের অধিক মুসলমান ছিল। অবশেষে কুতুব সেতুর নিকট গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ময়থান ঐ মৃতদেহ কাড়িয়া লইয়া যায়েন এবং যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উহাকে কবর দিবার জন্য উহার আত্মীয়দিগের হস্তে প্রদান করেন। এই হাঙ্গামার জন্য সহরে ১৪৪ ধারা জারী এবং ১ শত ২০ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে আর্য্য কংগ্রেসের কর্ত্তৃ-পক্ষ তাহাদের প্রেসিডেণ্টকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইলে স্থানীয় সরকার ঐ শোভাযাত্রা করিবার অনু-মতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু ঐ ব্যাপারে যে কোন হাঙ্গামা হইত না, তাহার পরবর্ত্তী ব্যাপার হইতে বুঝা যায়। কিন্তু যে ব্যাপারে হাঙ্গামা হইবার যোল আনা সম্ভাবনা ছিল, সে ব্যাপারে তাঁহারা আবশ্যক সতর্কতা কেন অবলম্বন করিলেন না এবং সেই অনবধানতার জন্য এতগুলি হিন্দুকে কেন আহত হইতে দিলেন, সে রহস্যের উদ্ভেদ করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই।

আফগানিস্থানের স্বাধীন নৃপতি আমীর আমানুল্লা খাঁ

স্বাধীন আফগানিস্থানের নৃপতি মহামান্য আমীর আমানুল্লা খাঁ আগামী ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে য়ুরোপ যাত্রা করিতেছেন। এ যাবৎ কোনও আমীর য়ুরোপ যাত্রা করেন নাই। কোন কোন আমীর ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। আমীর আমানুল্লার পিতা আমীর হবিবুল্লা খাঁ ভারতে আসিয়া যে উদারতা দেখাইয়াছিলেন, আজিও তাহা ভারতবাসী হিন্দু বিস্মৃত হয় নাই। তিনি সেই সময়ে দিল্লীর মুসলমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতে হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশিরূপে বসবাস করে; সুতরাং যদি দিল্লীর মুসলমানগণ বকর-ঈদ পর্ব্বে হিন্দুর মনে ব্যথা দিয়া গো-কোরবাণি করেন, তাহা হইলে তিনি দিল্লীর বকর-ঈদ উৎসবে যোগদান করিবেন না। আমীর আমানুল্লাও পিতার ন্যায় উদারহৃদয় প্রজা-রঞ্জক নৃপতি। তিনি তাঁহার রাজ্যে নানারূপ শাসন-সংস্কার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রজার উন্নতির জন্য তিনি সদাই উদ্যোগী। এতদর্থে তিনি জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহা-দিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারে আফগানরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আফগানিস্থানে নারীর শিক্ষার ব্যবস্থাও হইতেছে। এ জন্য আমীর বাহাদুর রাজবংশীয়া মহিলাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে আফগান নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আফগান প্রজাগণকে আধুনিক সমর-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করা হইতেছে এবং আধুনিক সভ্যতার অনুযায়ী আফগানিস্থানে নানারূপ অনুষ্ঠান করা হইতেছে। আমীর আমানুল্লার রাজ্যে হিন্দুর প্রতি যথেষ্ট উদার ব্যবহার করা

হয়। সেখানে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা নাই। ভারতে আসিয়া করাচী বন্দরে আমীর আমানুল্লা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা তাহার সারাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"আমি জনসাধারণের দীন সেবক মাত্র। আমার রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সমান অধিকার বিদ্যমান। অজ্ঞ মোল্লাগণ বিষম অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করে। ইহারা ভাল করিবার পরিবর্ত্তে জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়। এই সব মোল্লারা ভারতীয় ফকীরের ন্যায়। এই প্রকৃতির লোক মাতৃভূমির কলঙ্ক ও বোঝা-মাত্র। ইহারা আপনাদের উদর পূরণ ও ব্যক্তিগত



আমীর আমানুল্লা খাঁ

শোক-সংবাদ

পরলোকে চণ্ডীচরণ—

"মাসিক বসুমতীর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী একাউণ্টাণ্টজেনারেল গোপাললাল রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণ রায়, ২৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় নিমতলা ঘাটে গঙ্গাস্নান করিবার সময় জলমগ্ন হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। ভগিনীপতি রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, রুগ্না পত্নীকে দেওঘরে রাখিয়া, চারি দিনের জন্য চণ্ডীচরণ কলিকাতায় কর্ত্তব্যপালন করিতে আসিয়াছিল। নিয়তি তাহাকে তাহার পরমাত্মীয়গণের স্নেহবন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া পরপারে লইয়া গিয়াছে।

পাঠ্যাবস্থা হইতেই শারীরিক বলে এবং মনের উদার্য্যে সে তাহার সতীর্থগণের অগ্রণী ছিল। বিপন্নকে রক্ষা করা তাহার জীবনের ধর্ম্ম এবং লক্ষ্য ছিল। বিগত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় শক্তিশালী, ব্যায়ামপু চণ্ডীচরণ ঠনঠনিয়া কালী মন্দির-রক্ষার জন্য লাঠিহস্তে সর্ব্বাগ্রে দেবমন্দিরে সমবেত হইয়াছিল। আততায়ীর অনাচার হইতে দেবমন্দিরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন বরণ করিয়া চণ্ডীচরণ আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল। শুধু একবার নহে, যত দিন এবং যতক্ষণ মন্দির আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল, সে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর, হিন্দুর পুণ্য পীঠস্থান অন্যান্য সহকর্ম্মীদিগের মহি রক্ষা করিয়াছিল। স্নেহময় সহোদরের সনির্ব্বন্ধ অনুরো আত্মীয়গণের উৎকণ্ঠা উপেক্ষা করিয়া, ধনীর সন্তান, শক্তিশা চণ্ডীচরণ অকুণ্ঠিত মনে দেবতার মর্য্যাদা—বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষা আত্মনিয়োগ করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও ইতস্ততঃ করে নাই।

তাহার সেবাপরায়ণ হৃদয়, দেওঘরে অবস্থানকালেও কা ব্যাধির দুরন্ত আক্রমণের আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া রোগীর শু চর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। সহায়হীন, বিসূচিকা-পীড়ি ব্রাহ্মণ সন্তানের মল-মূত্র পরিষ্কার করিয়া, নিদ্রাহীন নেত্রে রোগী পরিচর্য্যা করিয়া শুধু সে ব্রাহ্মণ-পরিবারের আশীর্ব্বাদ লাভ ক নাই—পল্লীবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল।

তাহার পুণ্য সেবাব্রত এবং সবলের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বলে রক্ষা করিবার শত শত ঘটনা তাহার স্বল্পপরিসর জীবনলীলা ইতিহাসে রহিয়া গিয়াছে। নীরব-কর্ম্মী চণ্ডীচরণ অকালে তাহা পরমাত্মীয়গণকে শোকার্ত্ত করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহাদিগকে সান্ত্ব দিবার কোনও ভাষা নাই। জ্যেষ্ঠ এটর্ণি শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ রা গর্ব্বে আত্মহারা ছিলেন। তাঁহাকে এবং কল্যাণীয়া, শ্রীযুক্ত সুরে বাবুর কিশোরী কন্যাকে পরম করুণাময় ভগবান্ এই অসহনী শোকে সান্ত্বনাদান করুন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতেছি

স্বার্থরক্ষার জন্য এই সব উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার নিন্দনীয়।

বেগম সাহেবাও আমীরে অনুগমন করিতেছেন। রাজ অতিথিরা ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপ যাত্রা করিবেন বলি তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিপু আয়োজন করা হইতেছে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহ দের জন্য দুইখানি অত্যুৎকৃ গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা চামান হইতে রে যোগে করাচী বন্দর এবং হইতে জলপথে বোম্বা পৌঁছিয়াছেন। বোম্বাই গ্ল লাট রাজ-অতিথিকে সাদ অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

য়ুরোপের আধুনিক উন্ন রাজ্যসমূহের শাসন, শি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ সঞ্চয় করাই এই ভ্রমণের উদ্দে

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী—

বিগত ২৭শে কার্ত্তিক রবিবার সুকবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জমসেরপুর। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন। এম্, এ, পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর তিনি কিছু কাল এটর্ণী হইয়াছিলেন। সাহিত্য রচনার প্রতি তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকায় তিনি অবহিত-চিত্তে এটর্ণীর কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না। কবিতা-রচনায় তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি থাকায় তাঁহার হৃদয়-বাণীর চরণ-সরোজে মত্ত মধুকরের মত অধিকাংশ সময় গুঞ্জন করিয়া ফিরিত। কিছু কালের পরে তিনি এটর্ণীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কয়লার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। বাগচী পরিবারের একটি কয়লার খাদ ছিল। সেই খাদ লইয়া কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তিনি কয়লার ব্যবসায়ের বিস্তার-সাধন করেন।



দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্য হইতে কতিপয় কবিতা সংগৃহীত হইয়া তাঁহার 'একতারা' কাব্যখানি জনের পরিতৃপ্তিসাধন করিয়াছে। গদ্য ও পদ্যরচনায় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের সমান অধিকার ছিল। মহাত্মা গন্ধীর তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। এ জন্য তিনি কবিবর রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্ত হইয়াও কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক মতবাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ভীক, সদানন্দ এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন।

মনে প্রাণে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ কবি ছিলেন। অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ ও কবি-প্রতিভার তুলনায় রচনার সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে। তথাপি এ কথা স্বীকার্য্য যে, তাঁহার অধিকাংশ রচনা সুপাঠ্য এবং সুন্দর।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ দেশভক্ত ছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলকামনা তাঁহার অনেক প্রবন্ধে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে তিনি খদ্দর ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার মিষ্ট অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন। যাহা তিনি অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ নির্ভীকভাবে সে কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

স্বগ্রাম হইতে পূজার পর ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার দেহে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ প্রকাশ পায়। সেই রোগের আক্রমণে তিনি ৫৪ বৎসর বয়সে ইহলোকের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালা ভাষার এক জন একনিষ্ঠ সেবক, তীক্ষ্ণধী সমালোচক এবং মধুরপ্রাণ কবির তিরোভাব ঘটিল। তাঁহার বিধবা পত্নী, পুত্র ও কন্যাগণ প্রিয়জনবিয়োগের আকস্মিক মর্ম্মন্তুদ শোকের বেদনায় কাতর। এ শোকে সান্ত্বনা নাই। সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবান্ তাহাদিগকে শোকশেলাঘাতের বেদনা সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার চরণে আমাদের নিবেদন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় রমণীমোহন—

রায় বাহাদুর রমণীমোহন ঘোষ বি, এল্, ভারতবর্ষীয় ডাক ও তার বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার-জেনারলের পদে উন্নীত হইয়া মাত্র গত জুলাই মাসে দিল্লীতে বদলী হইয়াছিলেন। তখন কে জানিত যে, সেই যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রার সূচনা! কলিকাতার ডাক বিভাগের ছোট বড় সব কর্ম্মচারী তাঁহার পদোন্নতিতে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে একাধিক দিন বিদায়-ভোজ দিয়াছিলেন; তাঁহার আনন্দ নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লইয়া, তাঁহার গৌরবে গর্ব্ব অনুভব করিয়া, তাঁহার পদোন্নতিকে জাতীয় শ্লাঘার বিষয় ভাবিয়া—কত উৎসবই না সে দিন সংঘটিত হইয়াছিল। আনন্দের পৌর্ণমাসী-জ্যোৎস্নাধারায়, রমণীমোহনের আসন্ন বিরহ-দুঃখও ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানবের ক্ষুদ্র ব্যাপারটি বিধাতার সহিল না—তিনি অলক্ষ্যে শুধু একটু হাসিয়াছিলেন। গত ১লা ডিসেম্বর বেলা প্রায় ৯টার সময় স্নানাগারের ভিতর অপস্মার রোগে রমণীমোহন অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—না রোগ, না ভোগ, বাড়ীর লোকও কেহ কিছুই জানিতে পারিল না পর্য্যন্ত। যখন জানিল, তখন রমণীমোহন মৃত্যুর

শীতলকরস্পর্শে তুষারের মত সুশীতল, শিলার মত নিশ্চল, জড়ের মত প্রাণহীন!

সাবধানী মানুষ সকলকে কিছু নিজ গৃহে প্রবেশাধিকার দেয় না, তাই বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, দুয়ার রাখে, আগল দেয়—কিন্তু মৃত্যুর জন্য তাহার দুয়ার চিরদিনই খোলা। রমণীমোহনও মৃত্যুর অতীত ছিলেন না—তাঁহাকে হারাইতামই; তবে এত শীঘ্র, এত অকস্মাৎ, এত অসময়ে যে হইবে, তাহা ভাবি নাই বলিয়াই আজ আমরা বেদনার সমুদ্রে এমন হাবুডুবু খাইতেছি।

রমণীমোহন ছিলেন এক দিকে যেমন সহজ সরল কবি, অন্য দিকে তেমনই বিনয়ী, নিরহঙ্কার, সরলতাপূর্ণ, মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল, গুণগ্রাহী, শান্তশিষ্ট, সুপণ্ডিত, মধুরপ্রকৃতি, প্রিয়দর্শন, ভদ্রলোক—এক কথায় তাঁহার মত ভদ্রলোক এ কালে বড় দুর্ল্লভ।

তাঁহার সহিত আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়, এই কলিকাতাতেই—প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে। তাহার আগে দুই একবার আমার তাঁহার সঙ্গে পত্র বিনিময়মাত্র হইয়াছিল। তখন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ "আর্য্যাবর্ত্ত" নামে একখানি মাসিক-পত্র সম্পাদন করিতেন; উক্ত পত্রে প্রকাশিত আমার একটি গদ্যরচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি উপন্যাসের স্থানবিশেষ সম্বন্ধে কিছু প্রতিকূল মন্তব্য ছিল, রমণীমোহনের তাহা সহ্য হয় নাই, তাই তিনি বিনয়পূর্ণ অথচ ওজস্বিনী ভাষায় আমায় পত্র লিখিয়া আমার মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; পরে আমার পত্রে প্রত্যুত্তর পাইয়া নিজ ত্রুটি স্বীকার করিয়া অবিলম্বে পত্র লিখেন ও তাঁহার "মুকুর" নামক প্রথম কাব্যগ্রন্থ আমায় উপহার দেন। ইহাই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পত্র ব্যবহার। ঐ সময় তিনি নদীয়া ডিভিশনের পোষ্ট্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে রাণাঘাটে অবস্থান করিতেন।

ইহার বহুদিন পরে "মানসী"তে আমার "প্রিয়ার পত্র" কবিতা যে দিন প্রকাশিত হয়, সেই দিন আফিসে বসিয়াই তিনি আমায় যে পত্রখানি লিখেন,তাহাতে আমার চতুঃপৃষ্ঠাব্যাপী প্রশংসাবাদ করিয়া শেষে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কবিহৃদয়ের চরম পরিচয় পাইয়াছিলাম। পত্রখানি এখন কাছে না থাকায় ঐ অংশটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহার ভাব এই-ই, ভাষা হয় ত কিছু ভিন্ন ছিল;—তিনি লিখিয়াছিলেন. আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি নিতান্ত উৎসুক; যদি আমি শীঘ্র কলিকাতা যাই, তাহা হইলে কবে যাইব, কত দিন ও কোথায় থাকিব, তাঁহাকে জানাইলে তিনি নিজে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুলকিত হইবেন—ইত্যাদি। এইখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, এ সময়ে গয়া ডাকঘরে আমি এক জন ডেকো-কেরাণী, আর তিনি ছিলেন, বঙ্গ ও আসামের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের সহকারী;—যদিও বিভাগ ভিন্ন, তবুও তিনি মাদৃশজনের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ বিশেষ। আমার চিঠির ঠিকানায় স্পষ্টরূপে তিনি Clerk Post Office লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের কোনও পদবী সে চিঠিতে ছিল না,—তাঁহার ঠিকানা ছিল, শুধু (কত দূর ভুলিয়া গিয়াছি) হরিশ মুখার্জ্জীর রোড, ভবানীপুর। [illegible] বিনয়ী ও নিরহঙ্কার পুরুষের ইহা অপেক্ষা আর অধিক নিদর্শন চাই?



রমণীমোহন ঘোষ

এই চিঠি পাওয়ার অল্প দিন পরেই তৎকালীন গয়াপ্রবাসী সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পের যাদুকর, আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও আমি "মানসী"র [illegible] উৎসবে কলিকাতা আসিয়া এক দিন প্রভাতে তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহার সহিত আমার ঐ প্রথম সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ আমার একটি স্মরণীয় ঘটনা; কারণ এই দিনে আমি জীবনে এক জন প্রকৃত মানুষ ও ভদ্রলোক দেখিলাম! আদরে, আপ্যায়নে, স্নেহে, প্রীতিতে আমায় [illegible] এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সেই প্রথম দিন আমার সমস্ত সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, অনৈক্য ও অসমানতা অত্যল্পকালের মধ্যেই চিরদিনের জন্য দূর হইয়া গেল।

সমস্ত দিন কাব্যালোচনা করিলাম। এই আলোচনা কালে দেখিয়াছিলাম, সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে রমণীমোহনের কি গভীর জ্ঞান ও প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়। [illegible] সাহিত্যে তিনি একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচনাতেও কবিগুরুর প্রভাব এত সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিত যে, তিনি নিজেও সে তাহা ঠিক ধরিতে পারিতেন না।

কবিত্বশক্তি তাঁহার প্রচুরই ছিল, কিন্তু তিনখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি বঙ্গসাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন, 'মুকুর', '[illegible]' 'ঊর্ম্মিকা'। ইহা ছাড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নানা মাসিক-পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু কবিতা ও গাথা এখনও হয় ত লুকাইয়া আছে।

আজ রমণীমোহনের বিয়োগ-ব্যথায় যে আমরা অধীর করিতেছি, তাহার কারণ তাঁহার মত মধুর-চরিত্র লোক এ [illegible] বিরল। তিনি আমাদিগকে ভালবাসিতেন, আমরাও তাঁহাকে ভালবাসিতাম। এ দুঃখ প্রিয়বিয়োগজনিত। পদে, মানে, ধনে রমণীমোহন অপেক্ষাও উচ্চতর অনেকে আছেন, [illegible] আছেন, কিন্তু এমন সাহিত্য-রসিক, পরোপকারী, [illegible] ভদ্র সজ্জন বঙ্গদেশে আর কয় জন আছেন, জানি না। রমণীমোহনের বিয়োগে আজ বঙ্গদেশে সত্যকার, এক জন ভদ্রলোকের অভাব ঘটিল।

ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্য-গ্রন্থাবলীর কিছু পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

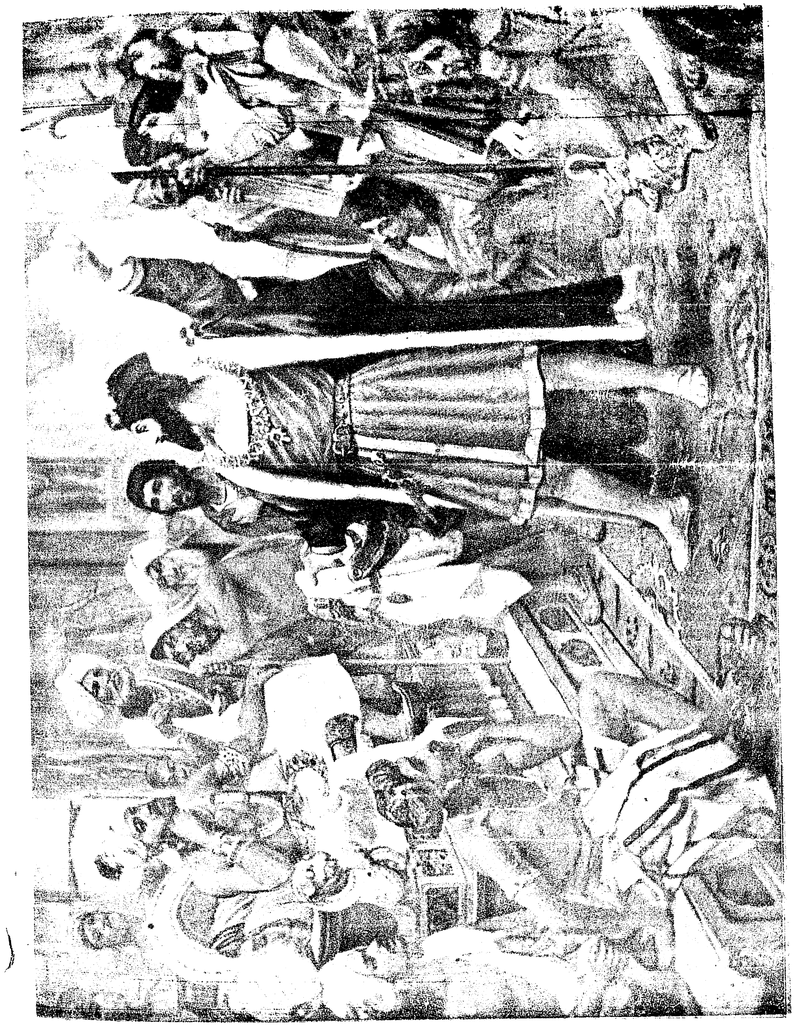

COLOUR ILLUSTRATION

ঋতুসংহার

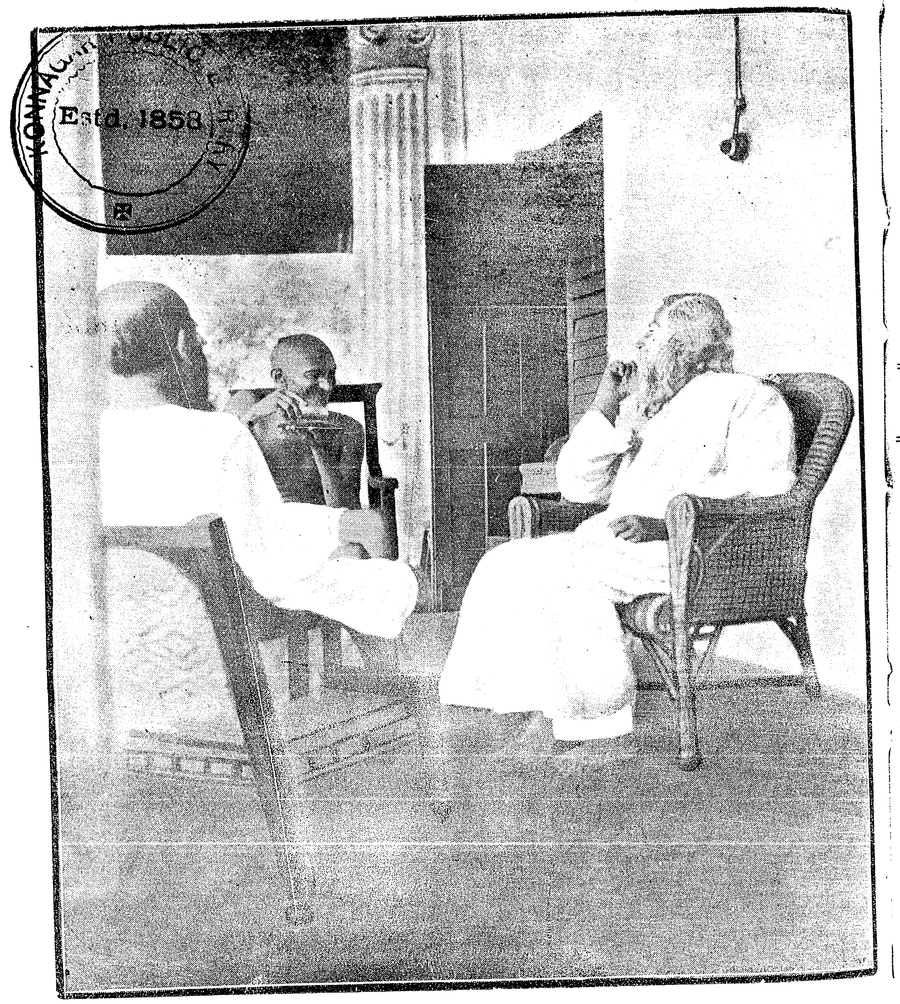



৬ষ্ঠ বর্ষ]　　পৌষ, ১৩৩৪　　[৩য় সংখ্যা

ঋতুরঙ্গ

উদ্বোধন

ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু
শীতের রাতে তোমার সাথে কি খেলা হবে সুরু !
ভাবিয়াছিনু খেলার দিন
গোধূলি-ছায়ে হোলো বিলীন,
পরাণ মম হিমে মলিন
আড়াল তা'রে ঘেরি,—
এমন ক্ষণে কেন গগনে বাজিল তব ভেরী ?

উতর-বায় কারে জাগায়, কে বুঝে তার বাণী ?
অন্ধকারে কুঞ্জদ্বারে বেড়ায় কর হানি।
কাঁদিয়া কয় কানন-ভূমি,
—"কি আছে মোর, কি চাহো তুমি ?

শুষ্ক শাখা যাও যে চুমি
কাঁপাও থরথর,
জীর্ণপাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর।"—



বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা,
তুলিছ ধ্বনি' কি আগমনী আজি যাবার বেলা!



যৌবনেরে তুষার-ডোরে
রাখিয়াছিলে অসাড় ক'রে—
বাহির হতে বাঁধিলে ওরে
কুয়াসাঘন জালে—
ভিতরে ওর ভাঙালে ঘোর নাচের তালে তালে।

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক্ খানখান,
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক্ প্রাণ।
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,
শঙ্খ কহে হুহুঙ্কারি
বাঁধন সে তো মায়,—
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া!



এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে॥

বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তা'রে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি' উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না যে
ঢাকিয়া তারে আঁধার-মাঝে
নিশীথ-নাচে ডমরু বাজে,
অরুণদ্বার খোলে—
জাগে মূরতি, পুরানো জ্যোতি নব ঊষার কোলে।

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা,
উঠুক্ জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্য-লোল চরণতলে
মুক্তি পায় ধরা,—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা॥



PUBLIC LIBRARY
Estd. 1858

নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।

তোমার চরণ পবন পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে ॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।

তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,

যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে ভয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণি তালে।
ওগো সন্ন্যাসী ওগো সুন্দর,
ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে ॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

কাল বৈশাখী

ডাকো বৈশাখ, কাল-বৈশাখী,
করো তারে লীলা-সঙ্গিনী,—
কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী
আসুক্ প্রলয়-রঙ্গিনী ॥

হৃত-নিঃশ্বাস অম্বর তলে
রুদ্ধ বাতাস তাপ শৃঙ্খলে,
ঘন ঝঞ্ঝার দিক ঝঙ্কার
অন্তর তব চঞ্চলি',
মন্থি' আনুক্ মর্ত্ত্যস্বর্গ
তোমার অর্ঘ্য অঞ্জলি।

বাজায় ডমরু তব তাণ্ডবে
গুরু গুরু মেঘ-মন্দ্রিয়া,—
দিগ্বধূ যত হাহাকার রবে
দুর্দ্দাম উঠে ক্রন্দিয়া।

গৈরিক তব জয়-পতাকায়
সন্ধ্যা-রবির রং সে মাখায়,
কুঞ্জে বাজায় শাখায় শাখায়
তাল তমালের খঞ্জনী।

সপ্ততারার লুপ্তির পরে
নাচে সে সুপ্তি-ভঞ্জনী।
তপোভঙ্গের দিবে মন্ত্রণা
তব শান্তিরে তর্জ্জিয়া
তন্ত্র পরাবে রুদ্রবীণায়
রেখেছিলে যারে বর্জ্জিয়া।

দিগন্তরের সঞ্চয় টুটি'
অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি—
বাজিয়া উঠিবে কল-কল্লোল
বন-পল্লবে পল্লবে,—
শ্যাম উত্তরী নির্ম্মল করি
সাজাবে আপন বল্লভে ॥

পান

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
মোহন এল ভীষণ বেশে
আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে,
এল তোমার সাধন-ধন চরম সর্ব্বনাশে ॥

বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসেতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটি'
অবসাদের বাঁধন টুটি',
এল তোমার পথের সাথী বিপুল অট্টহাসে ॥

বর্ষার প্রবেশ

নম, নম, করুণাঘন মম হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শনধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে ॥

প্রত্যাশা।

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে॥

ঐ কি এলে আকাশ পারে *
দিক্-ললনার প্রিয়
চিত্তে আমার লাগল তোমার
ছায়ার উত্তরীয়।

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক্ সোনার কদম্ব ফুল
নিবিড় হর্ষণে॥

মেঘের মাঝে মৃদঙ্ তোমার
বাজায়ে দিলে কিও
ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।

ভরুক্ গগন, ভরুক্ কানন,
ভরুক্ নিখিল ধরা,
দেখুক্ ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদনা-ভরা।
পরাণ ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক্ আড়াল,
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক
পরম দর্শনে॥

---

* এই শ্লোকগুলি বাম পার্শ্বের গান হইতে স্বতন্ত্র।

আষাঢ়

কোন্ বারতার করিল প্রচার
দূর আকাশের ইঙ্গিতে
ঐরাবতের বৃংহিতে
নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন
ধরণী তপস্বিনী,
রুক্ষ অঙ্গ পাংশু-ধূসর,
ধ্যান-অঙ্গন শুষ্ক ঊষর,
নাহি সখী সঙ্গিনী ;—
বুঝি আসন্ন হোলো তার বর,
শুনি গর্জ্জন রথ-ঘর্ঘর,
বুঝি আসে বাঞ্ছিত,
তাই চিত্ত যে হলো চঞ্চল,
আঁখি-পল্লব বাষ্প-সজল,
তাই সে রোমাঞ্চিত।

ওগো বিরহিণী গেল দুর্দ্দিন
দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে,
মনোমাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে,
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে!
ঐ বুঝি আসে আকাশে আকাশে
সমারোহ তার বিস্তারি,
বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা
তৃষা হতে দিবে নিস্তারি।

ললাটে নিপুণ পত্রলেখাটি
আঁকো কুঙ্কুম চন্দনে।
দুলাও চামেলি অলকে তোমার
কবরী রচিয়া এলো-কেশভার
বেঁধে তোলো বেণী-বন্ধনে।
উঠ ধূলি হ'তে ওগো দুঃখিনী
ছাড়ো গৈরিক উত্তরী।
নীলবসনের অঞ্চলখানি
কম্পিত বুকে লহ লহ টানি
হাসিমুখে চাহ সুন্দরী।

বীর-মঙ্গল ঘোষুক মন্দ্র
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে।
কৌতুক সুখ চক্ষে ফুটুক,
বিদ্যুৎ শিখা কম্পি' উঠুক
তব চঞ্চল কঙ্কণে॥

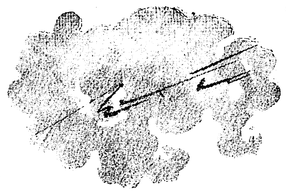

কুঞ্জকানন জাগ্রত হোক
আজি বন্দনা সঙ্গীতে—
শিহর লাগুক শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক শিখীর পাখায়
তব নৃত্যের ভঙ্গীতে।
শ্যাম বন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে।
রাখিবি দুয়ারে আলপনা আঁকি,
চরণের তলে ধূলা দিবি ঢাকি,
টগর করবী রঙ্গনে।

গাও জয় জয়, গাও জয়গান
ঢেউ তোলো স্বর-সপ্তকে,
বনপথে আসে মন-রঞ্জন,
নয়নে পরাবে প্রেম-অঞ্জন,
সুধা দিবে চির-তপ্তকে।

লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব॥

জটার গভীরে লুকালে রবিরে,
ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে!
মেঘমল্লারে কী বলো আমারে
কে মনে ’ব॥



বৈশাখী ঝড়ে সে দিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।

সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো?
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব॥

শ্রাবণ-বিদায়

গান

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার
আভাস পেলে ?
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পূব হাওয়া কয় "ওর ত সময় নাই বাকি আর,"
শরৎ বলে, "যাক্ না সময় ভয় কিবা তার,—
কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে ॥"

কালো মেঘের আর কি আছে দিন,
ও যে হোলো সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো,"
শরৎ বলে, "গেঁথে দেব কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল আকাশ-মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে ॥"

শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
কোন্ শূন্য হ'তে এল কার বারতা।
যাত্রা বেলায় রুদ্র রবে
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে,
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে।

নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত
বিদায় বিষাদে উদাস মতো,
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা ॥
মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চ'লে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।

কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে
মর্ম্মর মুখরিল মৃদুপবনে,
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য্য মানো ওগো ধৈর্য্য মানো,



বর-মাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান,
ফুল-গন্ধ-নিবেদন-বেদন-সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা ॥

শরতের প্রবেশ

নির্ম্মল কান্ত, নমো হে নম।
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নম।
বন-অঙ্গনময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ।

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-ভোলানো সুরে,—
চপল করে হাঁসের দুটি পাখা
ওড়ায় তারে দূরে।
শিউলি-কুঁড়ি যেমনি ফোটে শাখে
অম্‌নি তারে হঠাৎ ফিরে ডাকে,
পথের বাণী পাগল করে তাকে,
ধূলায় পড়ে ঝুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে ॥



শরৎ আজি বাজায় এ কি ছলে
পথ-ভোলানো বাঁশি।
অলস মেঘ যায় যে দলে দলে
গগনতলে ভাসি।
নদীর ধারা অধীর হ'য়ে চলে
কি মেশা আজি লাগালো তার জলে,
ধানের বনে বাতাস কি যে বলে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা,
কাজ-খোওয়ানো সুরে ॥

শরৎ আজি শুভ্র আলোকেতে
মন্ত্র দিল পড়ি,
ভুবন তাই শুনিল কান পেতে
বাজে ছুটির ঘড়ি।

কাশের বনে হাসির লহরীতে
বাজিল ছুটি মর্ম্মরিত গীতে,—
ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিতে
পথিক বন্ধুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে ॥

শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে ॥



সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই ত।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু—
সেই ত।
আমার মনের ভাবনাগুলি
বাহির হোলো পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে।
সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই ত।
এই আলো তার, এই ত আঁধার,
এই আছে এই নেই ত।

শরৎবাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলি তলে।

তাইতো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্‌মরানির
ঢেউ উঠালে ॥

শরতের বিদায়

কেন গো যাবার বেলা
এমন গোপনে চরণ ফেলা,
কেবল যাওয়ার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয় মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে।
সুদূর বিরহতাপে
বনের বাতাসে কি যেন কাঁপে,
পাখীর কণ্ঠ কেমন করুণ ক্লান্তি ভরা,
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়-ম্লান ধরা।
জানিনে গহন বনে
শিউলি পায়ের ধ্বনি কে শোনে,
কখন্ আনমনে তার ভূষণ খসায়ে ফেলে!
মালতী আপন সব ঢেলে দেয় শেষ খেলা তার খেলে।
না হতে প্রহর শেষ
এখনি হবে কি নিরুদ্দেশ,
তোমার নয়নের কোণে এখনো রয়েছে হাসি,
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশি ওঠে উচ্ছ্বাসি।
এই তব আসা-যাওয়া
এ কি শুধু খেয়ালের হাওয়া,
সেদিন মিলন পুলক তাতেও কি অবহেলা।
আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কেবলি খেলা?

বিলাপ

গান

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি!
ছিল ত শেফালিকা তোমারি লিপি-লিখা
তারে যে তৃণদলে আজিকে লীন দেখি?
কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি।
তোমার যে আলোকে অমৃত দিত চোখে,
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি?

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল?
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বন-ছায়ায়,
ভোর বেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হ'লি ব্যাকুল॥

কেন রে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা?
কোন্ ভাষায় চাস্ বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল॥

হেমন্তের প্রবেশ

নম, নম, নম।
তুমি ক্ষুধার্ত্তজন-শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগ-ধন্য
কর' অন্তর মম।

হেমন্তেরে বিভল কর কিসে,
চলিতে পথে হারালো কেন দিশে!
যেন রে ওর আলোর স্মৃতিখানি
বিস্মৃতির বাষ্পে নিল টানি,—
কণ্ঠ তাই হারালো তার বাণী,
অশ্রু কাঁপে নয়ন অনিমেষে।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে!

ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি,
যাত্রা ওর অনেক আছে বাকি।
শিশিরকণা লাগিবে পায়ে পায়ে,
রুক্ষ কেশ কাঁপিবে হিম বায়ে,
আঁধার-করা ঘনবনের ছায়ে
শুষ্ক পাতা রয়েছে পথ ঢাকি।
ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি।

বাসা যে ওর সুদূর হিমাচলে,
শ্যাওলা-ঝোলা তিমির গুহাতলে।

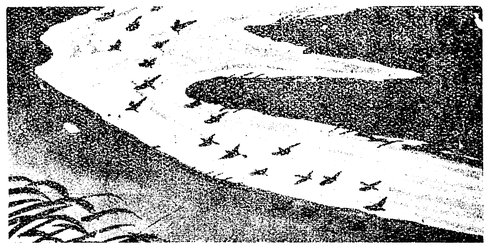

যে পথ বাহি বলাকা যায় ফিরে
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,
সে পথ দিয়ে ধানের ক্ষেত ঘিরে
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে।
যেতে যে হবে সুদূর হিমাচলে॥

চলিতে পথে এলো আঁধার রাতি,
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।
অসুর দলে গগনে রচে কারা,
তাই তো শশী হয়েছে জ্যোতিহারা,
আকাশ ঘেরি ধরিবে যত তারা
কে যেন জেলে কুহেলি জাল পাতি
নিবিয়া গেলো ছিল যে ওর বাতি॥

বধূরা যবে সাঁজের জ্যোতি জ্বালো
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।
দেবতা যারে বিঘ্ন দিয়ে হানে
তোমরা তারে বাঁচায়ো দয়া দানে,
কল্যাণী গো তোদেরি কল্যাণে
ছুটিয়া যাক্ কুস্বপন কালো,—
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো॥

শীতের প্রবেশ

নম, নম, নম নম !
নির্দ্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্ম্মম,
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দ্দম ॥

সর্ব্বনাশার নিঃশ্বাস বায়
লাগ্‌লো ভালে।
নাচ্‌ল চরণ শীতের হাওয়ায়
মরণ তালে।
ক'র্‌ব বরণ, আসুক কঠোর,
ঘুচুক অলস সুপ্তির ঘোর,
যাক্ ছিড়ে মোর বন্ধন-ডোর
যাবার কালে ॥

ভয় যেন মোর হয় খান্ খান্
ভয়েরি ঘায়ে,
ভয়ে যেন প্রাণ ভেসে এসে দান
ক্ষতির বায়ে।
সংশয়ে মন না যেন দুলাই,
মিছে শুচিতায় তারে না ভুলাই,
নির্ম্মল হ'ব পথের ধূলাই
লাগিলে পায়ে ॥

শীত যদি তুমি মোরে দাও ডাক
দাঁড়ায়ে দ্বারে—
সেই নিমিষেই যাব নির্ব্বাক
অজানা পারে।
নাই দিল আলো নিবে যাওয়া বাতি,—
শুক্‌নো গোলাপ ঝরা যুথী জাতী
নির্জ্জন পথে হোক্ মোর সাথী
অন্ধকারে ॥

জানি জানি, শীত, আমার যে গীত
বীণায় নাচে
তারে হরিবার কভু কি তোমার
সাধ্য আছে !
দক্ষিণ বায়ে ক'রে যাব দান
রবিরশ্মিতে কাঁপিবে সে তান,
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান
লতায় গাছে ॥

যাহা কিছু মোর তুমি, ওগো চোর
হরিয়া ল'বে,
জেনো বারেবারে ফিরে ফিরে তারে
ফিরাতে হ'বে।
যা কিছু ধূলায় চাহিবে চুকাতে
ধূলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,
নবীন করিয়া নবীনের হাতে
সঁপিবে কবে ॥

KOLKATA PUBLIC LIBRARY Estd. 1836

স্তব

গান

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদ ভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ
হও প্রসন্ন ॥



সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা
মরণ-সত্রে ?
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী
প্রলয়-বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য
হও প্রসন্ন ॥

শীতের যাত্রী

গান

যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি,
ঝড় এসেছে, ওরে এবার ঝড়কে পেলাম সাথী।
আকাশ-কোণে, সর্ব্বনেশে,
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌চে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
কর্‌চে মাতামাতি ॥

যে পথ দিয়ে যেতেছিলাম ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চল্‌তে হ'বে নিশীথ-অন্ধকারে।
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্ত্তা ক'বে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হ'বে রাতি ॥

নৃত্য

গান



শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে ॥

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আস্‌বে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।

উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে ক'র্‌লো শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে ॥

আমলকি ডাল সাজলো কাঙাল
খসিয়ে দিলো পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি'
যায় যে চ'লে ॥

শূন্য করে ভরে দেওয়া
যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে
সারা বেলা।

সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুম্‌কোলতা।

শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার
হবে কখন্ কোন্ সকালে॥
উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাত্‌লো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কা'র
অট্টরোলে॥

বসন্তের প্রবেশ

নম নম নম নম
তুমি সুন্দরতম।
দূর হৈল দৈন্যদ্বন্দ্ব,
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ
উৎসবপতি মহানন্দ
তুমি সুন্দরতম।

লুকানো রহে না বিপুল মহিমা
বিঘ্ন হয়েছে চূর্ণ,
আপনি রচিলে আপনার সীমা,
আপনি করিলে পূর্ণ।
ভরেছে পূজার সাজী,
গান উঠিয়াছে বাজি,
নাগকেশরের গন্ধরেণুতে
উড়ে চন্দনচূর্ণ।

এ কি লীলা, হে বসন্ত,
ম্লান আবরণ-আড়ালে দেখালে
সব দৈন্যের অন্ত।

অমানিত মাটি, দিবে তারে মান
এসেছ তাহারি জন্য,
পথে পথে দিলে পরশের দান
ধূলিরে করিলে ধন্য।

যেথা আসো তুমি বীর
জাগে তব মন্দির,
বর্ণছটায় মাতে মহাকাশ
স্তব করে মহারণ্য।

এ কি লীলা, হে বসন্ত,
অনেক ভুলায়ে নিমেষে সহসা
দেখালে আপন পন্থ।

ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি এ কি দৃশ্য,
শক্তি তোমার সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।

তব পুষ্পিত তরু
জয় করি নিল মরু,
মূক চিত্তের জাগাইলে গান,
কবি হোলো তব শিষ্য।



এ কি লীলা, হে বসন্ত,
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তি-বিহীন
করিলে প্রজ্বলন্ত !

আবাহন

গান

তোমার আসন পাত্‌ব কোথায়,
হে অতিথি ?
ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায়
কানন-বীথি।
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দ কলি,
উত্তর বায় লুঠ্‌ ক'রে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরল-গীতি,
হে অতিথি ॥



সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশী
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্ম্মে তাহার তোমার হাসি
দাও না ছুঁয়ে।
মাত্‌বে আকাশ নবীন রঙে তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগ্‌বে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি ॥

রাগরঙ্গ

গান

রঙ্‌ লাগালে বনে বনে।
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা
দোল দিয়েচে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে ॥

আন্ বাঁশি তোর আন্ রে,
লাগল সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার গান রে।
সন্ধ্যাকাশের বুকফাটা সুর
বিদায়রাতি করবে মধুর
মাতল আজি অস্তসাগর সুরের প্লাবনে ॥

উৎসব

সন্ন্যাসী যে জাগিল, ঐ জাগিল ঐ জাগিল।
হাস্যভরা দখিন বায়ে
অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি ভাগিল কোথা ভাগিল।
মানসলোকে শুভ্র আলো
চূর্ণ হয়ে রং জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তারে,
হৃদয়ে তার লাগিল।
আয় রে তোরা আয় রে তোরা আয় রে,
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে ॥

রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে,—
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে,
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।
এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো—
এসেছে পথ-ভোলানো,
এসেছে ডাক ঘরের দ্বার-খোলানো।
আয় রে তোরা আয় রে তোরা আয় রে
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

উদয়-রবি যে রাঙা রঙ্ রাঙায়ে
পূর্ব্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চির-প্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল,
অরুণবীণা যে সুর দিল রনিয়া
সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা আয় রে তোরা আয় রে
বাঁধনহারা রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে॥

শেষের রং

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,

তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে॥
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে॥

যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে॥

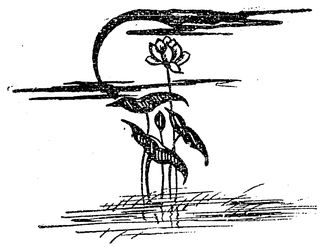

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY
Estd. 1858



ত্রিবেণী

ত্রিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

দিব্যোক যখন রাজপ্রাসাদ হইতে নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন সে যে কোথা দিয়া যাইতেছে, তাহার পা দুইখানা পৃথিবীর মাটীর উপর অথবা শূন্যমার্গে কোথায় যে পড়িতেছে, তাহাও সে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। রাস্তায় লোক চলাচল করিতেছিল, দুই পার্শ্বে বিপণি-শ্রেণীতে বেচা-কেনা চলিতেছে। এক দল পাহাড়ী শ্বেতচামর, অগুরু চন্দন, রুদ্রাক্ষ, ভূর্জ্জপত্র, শিলাজতু প্রভৃতি হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশজাত বস্তুজাত লইয়া হাঁকিতেছিল,—"প্রভু বুদ্ধের সেবার যোগ্য চন্দন-চামর আসিয়াছে; ভক্তগণ! শীঘ্র এস, গ্রহণ কর।" দিব্যোক তাহাদের দলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। এক জন একটি অমল ধবল চমরীপুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া তাহাকে দেখাইল—"বুদ্ধ ভগবানের সেবার জন্য কিনিয়া লও, তিব্বত হইতে আনিয়াছি।" দিব্যোকের কানে সে কথা ঢুকিতেই পাইল না। সে যেমন নতমুখে পথ চলিতেছিল, তেমনই চলিয়া আসিল। পাহাড়ী চামর-বিক্রেতা তাহার উদ্দেশ্যে কৃপণ বলিয়া উপহাস করিয়া পুনশ্চ অন্য ক্রেতার সন্ধানে চলিয়া গেল।

দিব্যোকের সমস্ত মনটা একটা গভীর বিষাদে যেন সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এত বড় দুষ্কার্য্য, এরই অধিনায়ক রাজা! যে রাজাকে সে দেব-প্রতিনিধি বলিয়া মনে মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে, যাঁহাকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমান চক্ষুতে অপরে দেখিলেও তাহার সহ্য হয় নাই, সমস্ত নরের ঊর্দ্ধে নরপালরূপে—নরনাথরূপে যাঁহার স্থান, সেই লোকেন্দ্র প্রজার পিতৃস্বরূপ নরপতি এত বড় অধর্ম্মাচারী! প্রজার ধন-মান-প্রাণ যাঁহার হাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দিয়া এই লক্ষ লক্ষ প্রজা নিশ্চিন্ত হইয়া আছে, সেই সরল, বিশ্বস্তচিত্ত, একান্তভাবে আত্মসমর্পণকারী, পুত্রতুল্য প্রজার সঙ্গে এত বড় নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতা! ইহার নাম রাজা? ইহাকেই দেবতার মত ষোড়শোপচার পূজা করিতে প্রজা বাধ্য?—কখনও নয়! কখনও নয়! কিছুতে না! রাজা যিনি, তাঁহার ব্যক্তিত্ব নাই, পরের সুখের হন্তারক হওয়া দূরের কথা, নিজের সুখ-দুঃখ দেখিবার অধিকার তাঁহার কোথায়? আত্মপরায়ণের রাজা হওয়া সাজে না। যে রাজা প্রজার জন্য নিজেকে বলি করিতে পারে না, নিজের শান্তি, নিজের স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, সে রাজবেশী প্রজা-শত্রু, প্রজা তাহাকে রাজপূজা দিতে বাধ্য নহে!

দিব্যোকের রুদ্ধবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল—"মহীপালদেব, আজ থেকে তুমি আমার রাজা নও; শত্রু!—শত্রু!—মহাশত্রু! এত বড় সাঙ্ঘাতিক শত্রু পৃথিবীতে যেন কারু থাকে না। তোমার এই মহাপাতকের মহাপ্রায়শ্চিত্ত করবার সময় এসেছে, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আর তা-ও খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। মহীপাল! এক দিন তোমার পূর্ব্বপুরুষ গোপালদেবকে এই প্রজারাই তাদের রাজা ব'লে বেচে নিয়েছিল, আর আজ তারাই আবার ছেঁড়া কাপড়ের মত তোমায় তাদের গা থেকে টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেব। পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। যারা গড়তে জানে, তারা ভাঙ্গতে পারে না?"

দিব্যোকের বহু দিনের অসংস্কৃত ঘর-দ্বার বর্ষাশেষে এখন নূতন করিয়া সংস্কৃত হইতেছিল। ইহার গায়ে গায়ে বাঁশ খুঁটা দিয়া ভারা-বাঁধা, ক্ষেত-খোলার এক ধারে চূণ-পোয়া ও ইট-গড়া হইতেছে, ভাঙ্গা কোঠা-ঘরগুলি মেরামত ও নূতন দুই-একখানি তৈয়ারী হইতেছিল। দিব্যোক বাড়ী ফিরিয়া মজুরদের ঐ সকল ভারার বাঁশ খুলিয়া ফেলিতে আদেশ দিল। তাহার পর ভাইপোদের ডাকিয়া বলিল, "চূণের ভাটায় ও ইটের পাঁজায় কলসী-কতক জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে দে।" এক জনকে বলিল "ভীমকে এক্ষনি ডেকে আন।" তাহার পরিবার তাহাদের বৃহৎ অঙ্গনের এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাড়ীর লোক সকলেই একটু ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এ গৃহের গৃহস্বামী সাধারণতঃ সদানন্দ মহাপুরুষ। কিন্তু এই সদাশিবও যখন বিচলিত হন, সে দিন মহাদেবের রূপ ধরেন, এটা সবাই না জানুক, কেহ কেহ জানিত।

ভীম আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতের চরণ-বন্দনা করিল। গভীর যন্ত্রণার একটা অকথ্য জ্বালাভরা ক্ষতচিহ্নে তাহার সমস্ত শরীর-মন চিহ্নিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত তাহাকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

"আমি কোথা গিয়েছিলেম, জানো?"

ভীম বারেকমাত্র তাহার ভীম-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল,—"না—"

"রাজবাড়ী—রাজার সঙ্গে দেখা করতে।"

ভীমের বিস্ময়স্খলিত কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া পড়িল, "রাজার সঙ্গে দেখা করতে?"

"হ্যাঁ, রাজার সঙ্গে দেখা করতে! বিচার চাইতে গেছলেম—ন্যায়বিচার! কিন্তু সে বিচার কার কাছে চাইতে গেছলেম জানো, ভীম? যে অপরাধী, তারই কাছে! এ মন্দ তামাসা নয়! কি বল? দোষী—নিজের সম্বন্ধে নিজের ন্যায়বিচার করবে!"

ভীম এবার অতি সহজভাবেই মুখ তুলিল, স্থির অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "এ আমি জানতেম।"

"কি, তুমি জান্‌তে?" দিব্যোক চমকিয়া উঠিল।

"আপনার বিচারকই যে অপরাধী, তা আমি জানতেম, রাজপ্রতীহার আজ্ঞাবাহক মাত্র।"

"তুমি জান্‌তে? কৈ, কিছু বলনি ত? কেমন ক'রে জেনেছিলে?"

ভীম ঈষৎ হাসিল, অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকিলে যেমন দেখায়, এই হাসি দিয়া তাহার অন্তরের প্রচণ্ড বিপ্লব সেই রকমই ঈষৎমাত্রায় প্রকাশ পাইল।

"বলিনি, না, বলিনি, বল্লেই কি আপনি তা বিশ্বাস করতেন?"

দিব্যোক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল, "নিশ্চয়ই করতেম না! রাজা প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, জননাথ, দোষীর দণ্ডদাতা, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরস্বরূপ; তার যে এত বড় অনাচার—এত বড় অত্যাচার থাকতে পারে, আমার স্বপ্নেরও অতীত!"

বীরকণ্ঠে ভীম কহিল, "কিন্তু রাজাও ত মানুষ! মানুষের দুর্ব্বলতা—"

দিব্যোক অধীর স্বরে বাধা দিল, "বল কি, ভীম! রাজা মানুষ? না, রাজা, রাজা। রাজার ব্যক্তিত্ব নেই, দুর্ব্বলতা থাকতে পারে না। তাই যদি না হলো, তবে কিসের জন্যে তিনি সমস্ত দেশের মাথায় ব'সে থাকেন? কি অধিকারে সমস্ত লোকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা উপার্জ্জনের অংশ ভোগ করেন? দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, ক্ষুদ্র মানুষ যদি তিনি, তবে কেন আমি তাঁকে আমার চেয়ে অতখানি উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজার অঞ্জলি প্রদান করি? না, সে হ'তে পারে না, সে হ'তে দেওয়া হবে না, হয় তিনি তাঁর সমুদয় জাগতিক দুর্ব্বলতাকে পরিহার ক'রে পৃথিবীর মলামাটীর ঊর্দ্ধে উঠুন, না হয় তাঁর পঙ্কিলতার ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে নিমজ্জিত হোন। এ দেশের আদর্শ রাজা ভগবান্ রামচন্দ্র, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, শিবি, নিমি, মান্ধাতা, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, গোপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, এমন কি,……যারা প্রজার চিত্তে চিরদিনের মতই পূজার আসন পেতে দিয়ে গেছেন, সেই দেশে এই রাজা!—ভীম?"

"জ্যেঠামশাই!"

"আমি তাকে কি ব'লে এসেছি জানো? ব'লে এসেছি, আজ থেকে সে আমাদের, এবং আমরা তার মহাশত্রু!"

"কিন্তু যদি কেউ স্বেচ্ছায় কারু অনুগমন করে, তাতে তাকেই প্রধান অপরাধী ধ'রে নিয়ে বিচার করতে গেলে সুবিচার কেমন ক'রে করা হবে?"

দিব্যোক ভীমের এই সুস্পষ্ট দৃঢ় অভিব্যক্তিতে বিস্ময়ে পুনশ্চ চমকিয়া উঠিল, ক্ষণকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের অচঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "স্বেচ্ছায় অনুগমন করা তুই কাকে বলছিস্ রে পাষাণ? তুই কি তাকে চিনিস নে? সে স্বেচ্ছায় তোকে ছেড়ে গেছে, এত বড় কথা তুই মনে করতে পার্‌লি?" তাহার পর তখনও ভীমকে অবিচলিত দেখিয়া গভীর বিদ্ধ-বেদনায় ব্যাকুল স্বরে আর্ত্তনাদের মত করিয়া কহিয়া উঠিল, "ওরে নিষ্ঠুর মায়ের নির্ম্মম ছেলে! তুই এত দিন একসঙ্গে ঘর ক'রেও তারে চিন্‌লি নে? আমি শিব-ভবানীর পা ছুঁয়ে তোকে বলতে পারি, সে নিজের ইচ্ছায় যায়নি,—যায়নি,—যায়নি। কোন রকম চাতুরী ক'রেই তাকে তারা ধ'রে নিয়ে গেছে!" ঈষৎমাত্র থামিয়া থাকিয়া পুনশ্চ নিরুদ্ধ অভিমানের সহিত কহিয়া উঠিল, "তোর যদি তাই মনে হয়ে থাকে, তোর ঘরে তাকে ঠাঁই দেবার কিছু দরকার নেই, আমি তাকে

বুকে ক'রে নিয়ে কাশীবাসী হয়ে থাকবো। তুই যদি বাপের সুপুত্র হোস্ ভীম!—শুধু আমায় তাকে এনে দে, যেমন ক'রে পারিস্, যদি এর জন্যে রাজ্য ধ্বংস ক'রে ফেলতে হয়, সে-ও সই, তাকে আমার কাছে এনে দে! ওরে বল্, তুই পারবি?"

স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাতের চরণপ্রান্তে নত হইয়া ভীম কহিল, "তাই হবে।"—তাহার কঠিন কণ্ঠে কঠোর প্রতিজ্ঞার এই দুইটি বাণী দুইটি অশনিসম্পাতের মতই ভীষণ শুনাইল।

ভীমকে বিদায় দিয়া একটা নির্জ্জন কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া এতক্ষণের সেই রুদ্রতেজে তেজোদীপ্তমূর্ত্তি বৃদ্ধ এক্ষণে একটি মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত ক্ষুদ্র শিশুর মতই অসহায় আর্ত্তরোদনে মূকমৌন প্রকৃতিকে শুদ্ধ যেন অশ্রুভারে আতুরা করিয়া তুলিয়া একবারে হা হা শব্দে কাঁদিয়া উঠিল,—"মা আমার! ওরে মা আমার! ওরে মা রে আমার! তোর ভাগ্যে এ-ও ছিল রে?"

চতুশ্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

সংসারের চারিদিক্ শ্রান্তিহরা শান্তি ভরাইয়া দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে—অতি ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল। জনশূন্য নদীতীরে অস্তগমনোন্মুখ রবির আলো ম্লান মূর্চ্ছাতুরের মত করুণ দেখাইতেছিল। যেন কাহার অজস্র রোদনারক্ত নেত্রের মতই তপনের স্তিমিত করুণ মূর্ত্তিটি ক্রমশঃ দিক্-চক্রের প্রান্তশায়ী হইতেছে এবং জলে-স্থলে চরাচরের সর্ব্বত্রই একটা সুগভীর শ্রান্তি ও অবসাদের খিন্ন ছায়া আপতিত হইয়া তাহাকে যেন বাক্যহীন ও শোকাহতবৎ প্রতীয়মান করাইতেছে।

রাজ-বিলাসভবনের সেই সুবৃহৎ ও সুসমৃদ্ধ প্রশস্ত শয্যা-গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে আজিও উজ্জ্বলা একাকিনী বসিয়া আছে। অঙ্গে তাহার ভারত-রত্নসম্ভারের সারভূত মহামূল্য মণিরত্নের অলঙ্কার, পরিধানে বারাণসীজাত শিল্প-চাতুর্য্যের সারভূত বালার্ক-সদৃশ-বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যসংযুক্ত মহামূল্য ক্ষৌমবাস। এই অনন্যসাধারণ বেশভূষায় তাহার অসাধারণ রূপ-লাবণ্য যেন সহস্র গুণে বর্দ্ধিততর হইয়াছিল। সে যে সেই সামান্য-বেশী গৃহস্থ-বধূ উজ্জ্বলা, কাহার সাধ্য যে আজ তেমন কথা মনেও স্থান দিতে পারে!

আর শুধু রূপেই নহে! উজ্জ্বলা—এই অশ্রু-আঁখি নতমুখী উজ্জ্বলা যে সেই গর্ব্বিতা তেজস্বিনী উজ্জ্বলা, এ কথাও আর মনে করিবার কিছু বাকি নাই। আজ রাজরাণীর আসনে বসিয়াও সে যেন একটা কাঙ্গালিনীর মতই দীনা,আর এত দিন সামান্য ঘরের বধূ হইয়াও সে যেন একটা রাজরাজেন্দ্রাণীর মতই দীপ্তিমতী ছিল! হায়, অশ্রুসাগরে সাঁতার দিয়া সে যে আজ তাহার চারিদিকে এতটুকু একটু কূলের রেখা দেখিতে পাইতেছে না! হাহাকারে বুক তাহার ফাটিয়া পড়িলেও কোথাও তাহার জন্য এক বিন্দু সান্ত্বনা নাই যে!

একাকিনী বসিয়া বসিয়া নিজের সমস্ত অতীতটাকে এই মহাশূন্য বুকটার মধ্যে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরা—এই একমাত্র সম্বল লইয়াই উজ্জ্বলার দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া গেল। আর সে কি বিষম দীর্ঘতর দিবা-রাত্রি! উজ্জ্বলা আজও তাহার স্বামীর কথাই ভাবিতেছিল। হতভাগিনী সে, তেমন স্বামীকেও হারাইয়া ফেলিল! কে জানে, সেখানে তাহার এই নিরুদ্দেশ লইয়া কতই না সত্যে-মিথ্যায় জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে! এই যা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিয়াছে? সম্ভব ত মনে হয় না! আর যদিই বা জানিতে পারে, তাহাতেই বা কি? রাজপ্রাণী তাহারা, কোন্ ভরসায় এই প্রবলপ্রতাপ সাম্রাজ্যশক্তির সঙ্গে বিরোধ করিতে আসিবে? তাহার পর কেহ কি বিশ্বাস করিবে যে, সে নিজের ইচ্ছায় গৃহত্যাগিনী হইয়া এখানে আসে নাই? এমন বিরুদ্ধ প্রমাণ পাইয়া এমন অবিশ্বাস্য কথা কেহ কি বিশ্বাস করে? আর বাস্তবিকই কেহ ত তাহার বলপ্রকাশ করিয়া ধরিয়া আনেও নাই। সে ত ইচ্ছা করিয়া এক জন অজানা—অচেনা স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া সাগ্রহে—সানন্দেই অপরিজ্ঞাত শিবিকায় চড়িয়া বসিয়াছে! এমন অবিমৃষ্যকারিণী, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনা না হইলে কেহ এত বড় দুর্গতিই বা ঘটিয়া বসিবে কেন?

আচ্ছা, যদিই কোনমতে উজ্জ্বলার উদ্ধার হয়, আর উহারা তাহাকে তাঁহাদের ঘরে লইবে? খুবই সম্ভব না! তাহার অপরাধ যতই যা হোক্ বা না হোক্, সমস্ত অপরাধ ত তাহারই ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিবে! কলঙ্কিনী বলিয়া ত উহারা তাহাকে তাহাদের দ্বারেও বসিতে দিবে না! হয় সত্যই কি অতটা পারিবে? উজ্জ্বলা যদি দাসী হইয়া সে থাকিতে চায়? তাহাও কি এতটুকু একটু স্থান দেয়

না হয় তাহাদের ঘর ঝাঁট দিবে, বাসন মাজিবে, গোবর-নাদি দিবে, গোয়াল কাঁড়িবে, তবু ত তাহার স্বামীর মুখখানি সে দিনান্তে একবারও দেখিতে পাইবে? এইটুকুর জন্য সে যে সবই সহিতে পারে। না, না, তা সে পারিবে না! না, পারিবে না। কিন্তু তাহার স্বামী যদি তাহারই সাক্ষাতে আর এক জনকে বিবাহ করে, সে সেই অসহন দৃশ্য সহিতে পারিবে কি? ওঃ, মা ভবানি! কি অপরাধে তাহার এমন দুর্দ্দশা ঘটাইলে, মা? সে ত জানিয়া শুনিয়া তোমার পায়ে এ জন্মে কোন অপরাধই করে নাই, তবে সকল মেয়ের যাহা হয়, তাহার কেন তাহা হইল না? সে স্বামীর পায়ের গোড়ায় একটুখানি স্থান লইয়া এ জন্মটা কেন সেই ঘরেই পড়িয়া থাকিতে পাইল না? এ কি হইল? তাহার এ কি হইল? মা! এমন পাষাণী তুমি কেন হইলে মা? হায় মা!

একবার সহসা উজ্জ্বলার মনে পড়িয়া গেল, শাশুড়ীর সেই অসহ্য গালাগালি! তাহার চোখ দিয়া হু হু শব্দে জল পড়িতে লাগিল, মা হয়ে সন্তানের দুঃখ না বুঝে বড় যা তা বলে যেতো—গুরুজনের শাপ লেগেই আজ আমার এমন দশা গো! ও মা, সতীলক্ষ্মী হয়ে এ কি অভিশাপ দিলি মা! ছি ছি, কি কর্ল্লি মা! কি কর্ল্লি! তবে সেই যে সে দিন মরণকে ডেকেডুকে আমায় নিয়ে নিতে বলেছিলি, সেই গালটাই তোর ফল্লো না কেন? তাই হোক্ গো তাই হোক্, আমায় তোরা নিয়ে নে গো মা! কে কোথায় আছিস্, নে গো, দয়া ক'রে তুলে নিয়ে যা, আর আমি পারিনে গো।

উজ্জ্বলা মাটীতে পড়িয়া মাথা কুটিতে কুটিতে অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল, আর আর্ত্তস্বরে ডাকিতে লাগিল,—"হে মা ভবানি! যদি তুই যথার্থ সতীর মেয়ে সতী হোস, তবে আমার সতী নাম নিয়ে যেন আমি যেতে পারি। মা তারা-দেবি! রোগ-মন্যি ত তোমারই হাতে, আমায় এমন রোগ পাঠিয়ে দে গো মা, যাতে ক'রে আমার তিন সীমানায় কেউ না ঘেঁষতে পারে। মরণ যদি না আসে ত রোগে যেন আমি জেরে পড়ি!"

অন্ধকারে পথিভ্রষ্ট পথিক তাহার হারানো পথরেখা খুঁজিয়া পাইলে যেমন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়, উজ্জ্বলা তেমনই করিয়া সহসা যেন আশা-প্রফুল্ল মুখে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। ঠিক ত! এত ভাবনাই বা কিসের? আর কিছু না থাক, মৃত্যু ত এখনও তাহার সহায় আছে! তবে আবার ভয় কিসের? না হয় সে মরিবে, এর বেশী আর ত কিছু নয়! তবে দুঃখ এই যে, তাহার স্বামী হয় ত সে সংবাদটা কোন দিনই জানিবেন না, আর সমস্ত জগতের লোক জানিয়া রাখিল যে, উজ্জ্বলা অসতী!

তথাপি এই একমাত্র পথ, একটিই উপায় তাহার হাতে আছে। আর সে তাহাই বাছিয়া লইবে। এ ভিন্ন ত আর কোন উপায়ই তাহার নাই!

উজ্জ্বলা উঠিয়া দক্ষিণের জানালার ধারে আসিল। ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। শুধু দেখা গেল, এই গৃহের পরেই দৃঢ় উচ্চ প্রাচীরের কঠিন বেষ্টনী।

এ কি? এত অলঙ্কার তাহার অঙ্গে কেন? নড়িলে চড়িলে এক একটা মণি-রত্ন বিদ্যুৎপ্রভায় জ্বলিয়া উঠিতেছে যে! এ সব তাহাকে কে পরাইয়া দিল? নিশ্চয়ই সেই দূতীটা! উজ্জ্বলা একে একে তাহার সবগুলি খুলিয়া খুলিয়া টান মারিয়া ঘরের এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ছি ছি, এ কি ঘৃণা! নিজের গায়ের দিকে চাহিতেই শোণিত-রক্ত সূক্ষ্ম সাড়ীখানা চোখে পড়িল! সধবার সুন্দর চিহ্ন! হাতে রাঙ্গা শাঁখা আর এই সাড়ী! তাহার মনে হইল, ইহা যদি তাহার স্বামীর দান হইত! চারিদিকে চাহিয়া নিজের পরিত্যক্ত বস্ত্র না পাইয়া সে হতাশ হইল। তখন ঘর হইতে বাহির হইবার চেষ্টায় দ্বার খুলিতে গিয়া দেখিল, সে দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ, এই ঘরে যে সে বন্দিনী!

তবে ত এখান হইতে পলায়ন করা অসম্ভব! দূতী আসিলে তাহাকে তাহার পরিত্যক্ত রত্নসম্ভারের লোভ দেখাইল, তাহার পায়ে ধরিল, তাহাকে জঘন্য গালি দিল, কিছুই ফল হইল না। যত কিছুই বলে, উত্তর শোনে, "ও সব এখন দুদিন মনে হবে, মা; এর পরে আর সেই ভাঙ্গা ঘরখানা দেখলেও চিন্‌তে পারবে না! কথায় বলে যে রাজরাণী! সেই রাজরাণী হয়েছ মা! তবে রাজাধিরাজ এ ক'দিন কেন জানি না আসতে পারেন নি, তাই মন লাগছে না বুঝি? এই আজকে এলেন ব'লে। তা দেখ মা, তখন যেন আমাদের একেবারে ভুলে যেও না!"

গভীর বিরক্তিতিক্ত হতাশ চিত্ত লইয়া উজ্জ্বলা তাহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া আসিল। না, তবে তাহাকে মরিতেই হইবে! সে যে তাহার সমস্ত জীবন দিয়া এই পৃথিবীকে ভালবাসিয়াছিল। এই পৃথিবী যে তাহার প্রিয়ের

স্থিতি-গৌরবে গৌরবান্বিত! তাহার স্মৃতিসুখে আনন্দময়! এ জগতের আলো-হাওয়া সে যে তাহার কত আশার—এ সবই কি তাহাকে আজ এই একান্ত অসময়ে বিদায় দিতে হইবে? তৃষিত বাসনায় বুক যে তাহার আজও অপরিতৃপ্তিতে ভরিয়া আছে! সকল তৃষ্ণাই তাহার অতৃপ্ত রহিয়া গেল! এ কি নিদারুণ পরিণাম! হে বিধাতা! হে নিষ্ঠুর! এমনই করিয়াই কি তাহার বাসনার জাল কঠিন চরণাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া ছিঁড়িয়া দিতে হয়!

নির্জ্জন প্রাসাদ-কক্ষে গন্ধ-দীপ জলিয়া উঠিল, পুষ্পবাসে, ধূপগন্ধে, চন্দনচূর্ণ-সুবাসে কক্ষ-বায়ু মত্ত হইয়া পড়িল, মহারাজাধিরাজ কক্ষপ্রবিষ্ট হইলেন। ডাকিলেন—"উজ্জলা!"

উন্মুক্ত গবাক্ষপথে অপ্রচুর নক্ষত্রালোক কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার উপর উজ্জলা তেমনই সুন্দর, তেমনই বিবর্ণ, তেমনই করিয়াই পড়িয়া আছে। রাজাধিরাজ নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে তাঁহার কথা সরিল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষুতে ভূলুণ্ঠিতা সুন্দরীর শোকাহত মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বর্ষণ-পূর্ব্বের শ্রাবণ-মেঘের মতই অপর্য্যাপ্ত মুক্ত কেশজালে অর্দ্ধাবরিত মেঘজালসমাচ্ছন্ন চন্দ্রকরলেখার ন্যায় সেই অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি ও তাহার সেই অকথ্য যন্ত্রণা, সে যেন দেখা যায় না। রাজার বোধ হইল, নিখিলের শোক একত্র হইয়া যেন তাঁহার এই পাদমূলে জমা হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাকে লইয়া কি করা যায়? কি বলিয়া ইহাকে সম্বোধন করিবেন? রাজাধিরাজ যেন একটুখানি সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এ রকমটা যেন তিনি প্রত্যাশাই করেন নাই।

ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া কুণ্ঠিত মুখে পুনশ্চ ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "উজ্জলা!"

উজ্জলা মুখ তুলিল না, উবুড় হইয়া পড়িয়া তেমনই অব্যক্তরবে গভীর বিষাদে বুক-ফাটা হতাশায় লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। দারুণ দুঃখে যেন বুক তাহার ফাটিতেছিল।

"উজ্জলা! কেন কাঁদ? শুনলেম, এ কয় দিনই জল-স্পর্শ করনি, এত কি দুঃখ? তুমি যা ছিলে, আমি কি তোমায় তার চেয়ে শতগুণ সুখে রাখি নি? এ কি! গায়ে তোমার অলঙ্কারমাত্র নেই কেন? খুলে ফেলেছ? এই যে সব ছড়িয়ে প'ড়ে! এস, নিজের হাতে পরাবো ব'লে আজ এই মরকতের অমূল্য হার নিয়ে এসেছি। ঐ শ্বেতপদ্মের মত বুকের উপরেই এর প্রকৃত শোভা। ছিঃ, অত ক'রে কাঁদে কি? উঠে বসো, আমার পানে চেয়ে দেখ। তোমায় আমি ভালবেসেছি, বড় ভালবেসেছি, এমন আর কারুকে—হাঁ, এখন এ পৃথিবীতে জীবিত কারুকেই বাসি না। একটা কথা কয়ে আমায় একটুখানি আশা দেও।"

"আমায় ছোঁবেন না, রাজা! আমি পরের বউ, আপনার প্রজার বউ। কেন আমায় ছল-চাতুরী ক'রে আপনি ধ'রে আনালেন? আমার যে সব ফুরিয়ে গেল!"

উঠিয়া বসিয়া কাতরকণ্ঠে এই কথা বলিয়াই—উজ্জলা আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাজাধিরাজ তাহার একখানা হাত টানিয়া লইয়াই নিজের উভয় হস্তের মধ্যে সাগ্রহে তাহা ধারণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "কেন ধ'রে আনালেম? সে তোমার ঐ আকাশের বিদ্যুতের মত আশ্চর্য্য দাহকারী রূপকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ! কেন তুমি অত রূপের পসরা নিয়ে আমার চোখের সাম্নে এসে দাঁড়ালে? সেই থেকে তোমায় ত আর ভুলতে পারিনি!"

"ওগো, সে কি আমার দোষে? পোড়া বিধাতা তার এমন ছাইয়ের রূপ আমায় দিলেন কেন? সে কি শুধু আমার মাথা খেতে?"

এই কথা বলিতে বলিতে উজ্জলা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া উঠিয়া গিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া একটা সুবর্ণের পুষ্পাধার দেখিতে পাইয়া তাহাই তুলিয়া লইল ও নিজের কপালের উপর উপর্য্যুপরি সজোরে তাহারই দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, আর হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হে মা ভবানি! হে মা ভবানি! আমার এই ছাই-পাঁশ রূপ তুমি ফিরিয়ে নাও মা! ফিরিয়ে নাও,—ও মা, এমন ছাইয়ের রূপে আমার দরকার নেই গো, আমি চাইনে!"

রাজাধিরাজ এই অভাবনীয় কাণ্ডে প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেও ক্ষণপরে আত্মসংবৃত হইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে আসিয়া উজ্জলার হাত হইতে সেই রক্তচিহ্নিত স্বর্ণপাত্র কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন, তাহার পর সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া সরোষে কহিয়া উঠিলেন, "তোমার সকলই বাড়াবাড়ি! জল তুলে, বাসন মেজে, দুঃখে-কষ্টে মরছিলে, আমি তোমায় তার বদলে রাজরাণী করতে এনেছি, সে আবার পছন্দ হচ্ছে না! ফের যদি এ রকম অভদ্র কাণ্ড করবে ত এমন শিক্ষা দেব যে, তখন বুঝতে পারবে। উঃ! রক্তে যে সব ভেসে গেল। এমন ঘ্যানঘেনে একটা অসভ্য মেয়েমানুষকে এমন রূপ দেওয়া সৃষ্টিকর্ত্তার বিড়ম্বনাই বটে! কি বিপদ! একে নিয়ে ত মহা সমস্যায় পড়েছি দেখছি!"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! ওগো, আপনার দুটি চরণে পড়ি, দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দিন, আমি আমার সেই কুঁড়ে ঘরে ফিরে যাই। আপনার অভাব কি? কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে আপনার পদসেবা করতে পেলেই বর্ত্তে যাবে।"

"তবে তুমিই বা যাবে না কেন? সে হচ্ছে না! শোন উজ্জলা! মাথাই ফাটাও, আর কেঁদে-কেটে প্রাণই বার করো, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। আর দিলেই কি তারা তোমায় ঘরে নেবে মনে করেছ?"

উজ্জলা রাজার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া দুই পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। এই কথায় সে পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার ললাটের ক্ষত হইতে রক্তধারা তখনও ক্ষীণধারে বহিতেছিল। সেই রক্তে রাজাধিরাজের পাদদ্বয় রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে স্থির ভয়লেশহীন কঠিন চক্ষুতে চাহিয়া সে এবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত সহজ সুরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় আপনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না? তারা আমায় না নেয়, আমি তাদের দোরে বসেই কাটাবো, না হয় আস্তাকুঁড় ঝেঁটোবো। সে-ও আমার আপনার এই ঐশ্বর্য্যের চাইতে বেশী সুখ, এতেও আমার সে সুখটুকু থেকে আপনি জোর ক'রে বঞ্চিত করতে চান? আপনার দয়া হয় না?"

রাজাধিরাজ নিকটস্থ পর্য্যঙ্কে শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া দুই হাতে উজ্জলাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের পাশে জোর করিয়া বসাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিলেন, "এ ত গেল তোমার সুখের কথা। আমার সুখের কথাটাও ত আমায় একটু ভাবতে হবে! তোমায় হাতে পেয়ে ছেড়ে দেব, তত বড় সাত্বিক পুরুষ আমি নই, তবে এর পরে ভবিষ্যতে নেহাৎ তোমার আমার ঘরে মন না বসে, কিছু দিন বাদে যদি চ'লে যেতে চাও, তখন না হয় ওদের আস্তাকুঁড় ঝাঁট দিতেই যেও, তা ব'লে ত আর এখনই তোমায় আমি বিদায় দিতে এত করেই নিয়ে আসিনি। এখন দু দিন একটু আমার হয়েই দেখ, ভাল লাগে না লাগে—"

"ওগো! মরতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না গো! নেহাৎ আমি বাঁচতে পেলেম না!"—বলিতে বলিতে কাপড়ের মধ্য হইতে একখানা খোলা পাতলা তরবারি টানিয়া লইয়া উজ্জলা তাহার অগ্রভাগ নিজের বুকের এক পাশে বসাইয়া দিয়াই আবার তাহা সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া তুলিয়া আর এক পাশে সজোরে বিঁধিয়া দিয়াই তীর-বেঁধা পাখীর মত ব্যাকুলতায় ছটফট করিয়া উঠিল। রাজাধিরাজের দৃঢ়বদ্ধ বাহুপাশ তাহার অঙ্গ হইতে মুহূর্ত্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে উজ্জলার বক্ষোবিদ্ধ অসি টানিয়া তুলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"এ যে মরণ আঘাত! সর্ব্বনাশী! এই করতে কি তোকে আমি এত ক'রে এনেছিলেম!"

উজ্জলার কীটে-কাটা ফুলের মতই জীর্ণ ও শুষ্ক মুখে এইবার জয়ের হাসি ফুটিয়া উঠিল,—"আমি ত মরতে চাইনি, আপনিই ত আমায় মরতে ঠেলে দিলেন? নৈলে আমার অমন দেবতার মত স্বোয়ামী, আমার কি মরবার কোন দরকার ছিল?"

"উঃ, দু' যায়গায় আঘাত লেগেছে! দু' আঙ্গুল গভীর গর্ত্ত হয়ে ব'সে গেছে যে! নাঃ, এর কোন উপায়ই নেই! ওঃ, এমন ক'রে ম'রে আমায় এ কি শাস্তি দিলে, উজ্জলা! উঃ, কি করলে!—কি করলে!"

রাজাধিরাজের চোখ দিয়া হয় ত বা জীবনে এই প্রথমবার জল পড়িল। এই রক্তমাখা নারীদেহ তাঁহার অন্তরের আর একটা জলন্ত স্মৃতিকে সবেগেই আকর্ষণ করিয়া টানিয়া তুলিতেছিল, সে দৃশ্য তাঁহার মানসনেত্রে আজও তেমনই সমুজ্জল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিনকার সকল অশ্রু আগুন হইয়া প্রলয়াগ্নি বর্ষণ করিয়াছিল, এমন তুষার গলিয়া জল হয় নাই!

উজ্জলা ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া কক্ষতলে শুইয়া পড়িল,—"আমার স্বামীকে একবার—"

"অসম্ভব! উজ্জলা! সে অসম্ভব! উঃ, এ আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি যাই। তুমি এমন করবে জান্‌লে আমি তোমায় ধ'রে আনতেম না। অনর্থক কতকগুলো শত্রু তৈরী হলো। আর কলঙ্কের ভাগী হলেম মাত্র!"

রাজাধিরাজ চলিয়া গেলেন। সেই নীরব-নিঝুম রাত্রিতে এই জনবিরল পুরীর মধ্যে একাকিনী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় জাগিয়া পড়িয়া রহিল—উজ্জলা। বাতাসে কক্ষস্থিত গন্ধ-দীপ নিবিয়া গিয়াছিল। তাহার ক্ষীণ পাণ্ডুর আলোকে মৃত্যু-পাণ্ডুরতা ধীরে ধীরে মিশিয়া আসিতে লাগিল, আর পাশে পড়িয়া তাহারই মত রক্তরঞ্জিত দেহে সহানুভূতিপূর্ণচিত্তে তাহার আজিকার একক রক্ষাকর্ত্তা সেই তীক্ষ্ণধার তরবারিখানা শুধু ম্লানমুখে তাহার অবস্থার সাক্ষী হইয়া রহিল। সেই প্রথম রাত্রিতে রাজাধিরাজ যখন উজ্জলাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ফিরিয়া যান, এই তরবারি তিনিই তথায় ফেলিয়া গিয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষ আর কাহার দাস, তাহা ঠিক জানা নাই; তবে সে যে সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণের দাস, এ কথাটা ভাল করিয়াই জানা গিয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে প্রমাণকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বড় প্রমাণ দুইটি—একটি চাক্ষুষ এবং একটির নাম আপ্ত। অনেক স্থলে এই আপ্ত প্রমাণটি আবার চাক্ষুষ প্রমাণেরও উপরে উঠিয়া যায়, এমনও আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ, অনেক সময় আমাদেরও সংশয় জন্মিতে থাকে যে, অজ্ঞের চক্ষু অথবা বিজ্ঞের বাক্য, কোন্‌টি অধিক বিশ্বস্ত?

ভীম যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহার নিজের চাক্ষুষ প্রমাণকে কোন দিক্ দিয়াই খর্ব্ব করিবার প্রয়োজন ঘটিতে পারে নাই বটে, তবে তাহার অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর চক্ষু অথবা অত্যন্ত স্নেহশীল ও সুবিজ্ঞ জ্যেষ্ঠতাতের দৃঢ়বিশ্বাস, ইহার কোন্‌টাকে যে সে প্রাধান্য দিবে বা দিবে না, ইহা লইয়াই তাহাকে গোলকধাঁধায় পড়িতে হইয়াছিল। হরি সে দিন স্বীকার না করিলেও পরে করিয়াছে যে, উজ্জলাকে তাহার সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার-বস্ত্রে সাজিয়া হাসিমুখে পাল্কী চড়িয়া যাইতে সে নিজের চোখেই দেখিয়াছে, আবার বাতাসে পাল্কীর ঢাকা খুলিয়া গেলে, নিজের হাতেই সে তাহা তুলিয়া দিয়াছিল। এই খবরটা শুনিবার পর হইতেই ভীমের সমস্ত মনটা যেন একটা গভীর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। উজ্জলার কথা স্মরণ হইলেই তাহার সর্ব্বশরীর যেন বিতৃষ্ণায় শিহরিয়া উঠিতে থাকে। এই পরপুরুষের অভিলাষিণী হয় ত মনের মধ্যে একান্তভাবে তাহারই অনুরাগিণী স্ত্রীকে সে যে এত দিন ধরিয়া কি একনিষ্ঠভাবে ভালবাসিয়া আসিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া তাহার মন যেন পাথরের মত ভারী হইয়া যায়। সে ত দু'দিনের কথা নয়। রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে, এত দিন ধরিয়া তবে ভিতরে ভিতরে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল। আর এই স্ত্রীকে নিতান্ত নিজের জানিয়া কি গভীর স্নেহে বুকে তুলিয়া রাখিয়াছিল!

অথচ মন বেশীক্ষণ ধরিয়া এত বড় সন্দেহ লইয়া থাকিতেও পারে না। উজ্জলা যে তাহাকে এত দিন ধরিয়া নিয়তই প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে, সে যে বাস্তবিকই তাহাকে ভালবাসিত না, বাহিরে তাহার থাকিয়া অন্তরে অন্তরে নিয়তই অন্য পুরুষের ধ্যান করিয়া গিয়াছে, এ কথাও মনে মনকে কোনমতে বিশ্বাস করানো যায় না। উজ্জলা—তাহার উজ্জলা—তাহার সেই দীপ্ত তেজ—সে যে সতীতেজ নয়, অতি হীন নারীর মতই তাহা মুখরতা মাত্র, তাহার সে অকৃত্রিম ভালবাসা, তাহার মধ্যে যে এত বড় ছলনা ঢাকা দেওয়া ছিল, এ যে মনে করিতে পারা যায় না! উজ্জলা সতী নয়, স্বয়ং দেবতা আসিয়া এ কথা বলিলেও যে ভীম বিশ্বাস করিতে পারে না।

এই উভয় সঙ্কটের মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া ভীম যখন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, ঠিক এমনই সময়ে তাহার প্রত্যক্ষদেবতা-স্বরূপ পূজ্য পিতৃব্য তাহার এই মানসিক বিপ্লবের যেটুকু বাকী ছিল, তাহারই পূরণ করিয়া দিয়া আর একটা সমস্যা তুলিয়া দিল।

"তুই কি তাকে চিনিস্‌নে? স্বেচ্ছায় সে তোকে ছেড়ে গেছে, এমন কথা তুই মনে করতে পার্‌লি?"

বজ্রের মতই এই কঠোর তিরস্কার ভীমের সঙ্কট-দোলায়িত বুকের উপর পড়িয়া তাহাকে যেন একেবারেই স্তম্ভিত করিয়া দিল। সে কি তাহাকে চেনে না? বাস্তবিকই ত! সত্যই ত, সে কি তাহাকে চেনে না? এই যে দীর্ঘকাল ধরিয়া দুইটি প্রাণী অনন্যমনা হইয়া পরস্পরকে লইয়া কাটাইল, এত দিনে তাহারা পরস্পরকে চিনিয়া লওয়া নিশ্চিতই তাহাদের উচিত ছিল। তাহার মনে পড়িল, এক দিন সন্দেহের কারণ ঘটিলে উজ্জলা তাহাকে কিছুমাত্র সংশয় করে নাই, সে কিন্তু তাহার

চরণায় নিজেকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে! উজ্জলা পরপুরুষাভিলাষিণী নয়, সতী। ভীমের একমাত্র প্রিয়তমা—মনে-প্রাণে তাহারই, নিশ্চয়ই সে স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় নাই, এমন কি, হয় ত হরির সন্দেহ অমূলক। সে হয় ত কাহাকে দেখিতে কাহাকে দেখিয়াছে। উজ্জলা হয় ত বাঁচিয়া নাই, এত দিন হয় সে মরিয়াছে, বাড়ীর লোকের অবিচার ও অত্যাচারে অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছে। সে যে বড় অভিমানিনী!

কিন্তু হায়! সংশয়ের বিষ যে বড় তীব্র! তাহার দহন-জ্বালা মন হইতে মুছিতে চাহিলেও মুছা যায় না।

ইহার পর যখন সে উজ্জলাকে উদ্ধারের জন্য জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ পাইল, তখন এই সম্পূর্ণ বিস্মৃত কর্ত্তব্যটাকে তাহার মনে পড়িয়া গেল। এটা যে তাহার মনে পড়ে নাই, তাও নয়। আসল কথা, হরির বিশ্বাসমতে যদি সে মহাপ্রতীহারকে উজ্জলার অপহর্ত্তা বলিয়া মনে করিত, নিশ্চয়ই কুমার রুদ্রসেন এতক্ষণ পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কাহিনীর প্রথমেই যে সেই পূর্ব্ব-সূচনার সংযোগ ঘটিয়া ইহার মূর্ত্তি বদলাইয়া দিয়াছিল, তাই উজ্জলার অপহরণকর্ত্তাকে চিনিতেও ভীমের বাকী রহিয়া নাই এবং উজ্জলার প্রতি তীব্র সংশয়ের নিগূঢ় অভিমানমালা তাহার উদ্ধারের কথা এক রকম জোর করিয়াই চিন্তাতে দেয় নাই। যে আপন ইচ্ছায় স্বচেষ্ট আয়োজনে উদ্যোগী হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিছনে ছুটিবে, এত হীন সে নয়।

কিন্তু যুক্তিটা হঠাৎ এবার বদলাইয়া গেল। দিব্যোকের দৃঢ় বিশ্বাসের জোর হাওয়ায় ভীমের মনের সংশয়-মেঘ যেন ছিন্ন ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই উভয় সঙ্কটের দ্বন্দ্ব তাহার মনের ভিতর একটা প্রবল বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে লাগিলেও বাহিরেও তাহাকে সেই সঙ্গে সমান আয়োজনে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। জ্যেঠামহাশয়ের আদেশ, উজ্জলাকে উদ্ধার করিতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক, এ কার্য্য তাহাকে করিতেই হইবে! এ তাহার পক্ষে অলঙ্ঘ্য আদেশ যে।

প্রায় শতাধিক কৈবর্ত্ত যুবক বৃদ্ধ ও কিশোর একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এস ভীম! আমরা আমাদের ঘরের বউকে রাজার হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে আসি। কিসের ভয়?"

তরুণ-সঙ্ঘের সভ্যদল এই সংবাদ পাইয়া ভীমের চারি পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, "আর কেন? আমাদের কায আরম্ভ হোক। আদেশ দেও, কি করতে হবে। আমরা তোমার জন্য সব করতে প্রস্তুত আছি।"

ভীম কহিল, "কিন্তু হয় ত এই সহস্র জীবন আহুতি যাবে। হয় ত এর এক জনও ফিরে আসতে পারবে না।"

তাহারা বলিল, "ক্ষতি কি? এদের মধ্যে অমর হবার আশা ত এক জনও ক'রে না, একবার করে মরতে ত সবাইকেই হবে, দুবার ত আর নয়।"

ভীম গভীর আবেগে উহাদিগকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। গভীর অন্ধকার রাত্রির অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া সেই সহস্রাধিক মৃত্যুপণে বদ্ধ নাগরিক উল্কার মত তীব্র গতিতে ছুটিয়া চলিল। এই ক্ষুদ্র অভিযানের অধিনায়ক আজ ভীম। যে তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহারই উদ্ধারের আশায় আজ সে চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতেছিল, "হায়, সেই যদি চলিলাম, তবে দুদিন আগে গেলাম না কেন?"

নগরী সুপ্তিমগ্ন। প্রশস্ত রাজপথের আশে-পাশে সঙ্কীর্ণ ও আঁকা-বাঁকা গলীপথ, রাস্তাগুলি অন্ধকারে ভরা—সে সব স্থানে সাবধানে ধীরে ধীরে চালিত হইতেছিল। রাস্তার পাশে বাগানের বেড়া, ছোট ছোট কুটীর ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার জমাট বাঁধা। চতুর্দ্দিক্ গভীর নীরবতায় ভরা, অথচ যেন সেই নীরবতার মধ্য দিয়া একটা অমঙ্গলের আর্ত্তরব এই প্রত্যেকটি রাত্রিচর প্রাণীর নির্ভীক চিত্তের মধ্যে আসিয়া দ্রুত আঘাত করিয়া যাইতেছিল। মাথার উপর প্রথম শুক্ল পক্ষের অন্ধকার আকাশ স্বল্প-মেঘাবৃত, তারাগুলি মেঘান্তরালপথে জোনাকীর মতই ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ আলো জ্বালাইয়া পরক্ষণে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছিল। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে প্রহরীর মত স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া আছে বড় বড় গাছের শ্রেণী। অথচ মানুষের কোন লাভ-ক্ষতিতেই তাহাদের লক্ষ্যমাত্র নাই, একান্তই উদাসীন। ক্রমে সহর ছাড়াইয়া সকলে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এতক্ষণ কদাচিৎ একটা আলোর রেখা, কদাচিৎ কোথাও বিনিদ্র এক দল লোকের সম্মিলিত মত্ততাসূচক গান-বাজনার শব্দ শুনা যাইতেছিল, এখন শৃগালের সম্মিলিত রবমাত্রই জাগিয়া রহিল, আর আলোর মধ্যে জোনাকীর আলো। একটা গাছের শাখায় বসিয়া অতি কর্কশ-গম্ভীর কণ্ঠে একটা কাল-পেঁচা ডাকিয়া ডাকিয়া অবশেষে ভীমের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখীরা সেই শব্দে একটা

ভয়ার্ত্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভীমের প্রশস্ত বক্ষ চিরিয়া তাহার উদ্বেগ-শঙ্কিত অন্তরেরও অন্তরমধ্য হইতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসিল। এই মহাবিপদের করাল ছায়ায় সমাচ্ছন্ন সঙ্কটের পথে চলিতে পদে পদেই যেন আশঙ্কা ও অমঙ্গল মূর্ত্তি ধরিয়া আজ দাঁড়াইয়া আছে। কে জানে, এর কি পরিণাম! অবশেষ নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুনিতে পাওয়া গেল। নদীজলসংযুক্ত শীতল বায়ুস্পর্শে ভীমের প্রবল জ্বরতাপদগ্ধবৎ জলন্ত ললাট ঈষৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। পরিধেয় বস্ত্রে অঙ্গের স্বেদক্লান্তি সে মুছিয়া ফেলিল, নদীজলে নামিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল লইয়া সে নিজের শুষ্ককণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইল।

সেই সহস্রাধিক বিদ্রোহীর জন্য প্রায় শতাধিক নৌকা নদীতীরের কসাড় ও বেতবনের মধ্যে লুকান ছিল। গুপ্ত স্থানে কয়েক জন লোকও লুক্কায়িত থাকিয়া স্থানের নিশানা রাখিয়াছিল, সঙ্কেত শুনিয়া তাহারা এই এতক্ষণের পর এই-বারই সর্ব্বপ্রথম দ্রুত হস্তে আগুন জ্বালিয়া মশাল ধরাইল।

গভীর নৈশ নীরবতার মধ্যে বর্ষাবারি-পরিপূর্ণাঙ্গী বেগ-বতী করতোয়ার অশ্রান্ত কলরোল যেন একটা মর্ম্মবিদারক অস্ফুট রোদনের মতই করুণ বোধ হইতেছিল, তীরের বট-গাছে উৎকট ধ্বনিতে ঝিঁঝি ডাকিতেছিল। এই ভীম-গম্ভীর স্তব্ধ অন্ধকারের রাশির মধ্যে এই একটিমাত্র উল্কা-লোক তাহার-জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে তাড়াইতে না পারিয়া যেন তাহাদের আরও বেশী করিয়া জমাট বাঁধাইয়া দিল। উহারই ভিতর যতটুকুর অভাব সে মোচন করিয়াছিল, তাহাতেই এই গৈরিকনিঃস্রাবী কূলপ্লাবিনী নদীজলের মধ্য দিয়া এই নীরব নিস্তব্ধ নৈশ অভিযানকে অতি ভয়াবহই দেখাইতেছিল। সে সময় যদি সেই স্বল্পায়তন আলোকিত স্থানটুকুর মধ্যে দৈবাৎ দৃষ্ট ভীমের মুখের দিকে কেহ চাহিয়া দেখিত, নিশ্চিত ভয় পাইত।

নদীপারে আসিয়া আবার সেই নৌকাগুলিকে তেমনই ঘন জঙ্গলের মধ্যে রক্ষা করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসিগণ অতি সতর্ক অথচ ক্ষিপ্র চরণে এইবার উৎসাহিতভাবে মাঠের আলের উপর দিয়া নূতন শস্যভরা ক্ষেতের ভিতর দিয়া রাজার নূতন বিলাসকাননের দিকে অগ্রসর হইল। সে রাত্রিতে এই জনহীন প্রান্তরমধ্যস্থিত রাজপুরীতে লোকসংখ্যা এক হাতের অঙ্গুলী গণনার বাহিরে উঠিতে পারে নাই। রাজাধিরাজের এই গুপ্ত বিলাসের অনতিবৃহৎ প্রমোদগৃহখানিকে বিশেষ-ভাবেই বন্দিশালার মত করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছিল। ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত, একটিমাত্র তোরণদ্বার ভিন্ন অন্য প্রবেশপথ পর্য্যন্ত কোন দিকেই রাখা হয় নাই। তোরণে দুই জন সশস্ত্র প্রহরী মাত্র রাত্রিতে সতর্ক হইয়া জাগিয়া থাকে। দিনেও দুই জন পাহারা দেয়। ভিতরে বন্দিনী স্বয়ং নিজে এবং তাহারই পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তায় দুই তিন জন মহল্লিকামাত্র। এতদ্ভিন্ন উদ্যানরক্ষী ও উদ্যান-পালক জন দুই ঐ উদ্যানের প্রান্তেই বাস করে। যে দিন রাজাধিরাজ এখানে পদার্পণ করেন, সেই দিন অবশ্য ইহার বিজনতার উচ্ছেদ ঘটে। তাঁহার সৈন্য, শরীররক্ষী সেনা-দল ও দাসগণ এবং পার হওয়ার প্রমোদতরণীর নাবিকরা অনেক লোকই এখানে রাত্রিযাপন করে। সে দিন এই জনবিরল স্বল্পালোকিত নিরানন্দ রাজকীয় পুরী উৎসবমূর্ত্তি ধারণ করে।

আজিকার এই মেঘমন্দ্রিত বায়ুশূন্য অন্ধকার মধ্যরাত্রিতে অকস্মাৎ দীপালীর দীপাবলী যেন আকস্মিক ঝঞ্ঝাবাতায় এক ক্ষণে নিবিয়া গিয়াছিল,প্রায় দেড় প্রহর রাত্রিতে সহসা সুপ্ত-নিদ্রিত অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন রাজপাদোপজীবিগণের ডাক পড়িল। রাজাধিরাজ তখনই নদী পার হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতেছেন। ব্যাপার কি, না বুঝিলেও এত রাত্রিতে হয়ত অবিশ্রান্ত আসা ও যাওয়ার আদেশে ঈষৎ অপ্রসন্নচিত্তে রাজানুগ্রহজীবিগণ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত হইল। এই গৃহে যে আজ মৃত্যু আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এ কথা কেহ জানিতেও পারিল না। এ সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোন আলোচনা করিবার শক্তি মহীপালের ছিল না, তিনি এখান হইতে একবারেই নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

আর তেমনই নিঃশব্দে ভীমের বাহিনী সেই ভীম নিশীথে একেবারে নীরবে আসিয়াই এই কেলিকুঞ্জ ঘেরাও করিল এবং অনায়াসেই ইহার অধিকার লাভ করিয়া বসিল।

কিন্তু এই ঘটনা সেই শত শত যুদ্ধকামী উন্মত্ত বীরকে যেমন হতাশ করিয়াছিল, ভীমকে সেই পরিমাণেই বিস্মিত করিতে ছাড়ে নাই। তবে কি উজ্জ্বলা এখান নাই? মাত্র চারি জন রক্ষক, রাজা উপস্থিত নাই। তবে কি উজ্জ্বলার জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়া এখনই স্বাধীন জীবনের আরম্ভ

গিয়াছে? হয় ত যতক্ষণ ভীম এই অন্ধকার গভীর রাত্রিতে উজ্জ্বলার উদ্ধারের জন্য প্রাণান্ত হইয়া মরিতেছে, সে তখন স্বর্ণপর্য্যঙ্কে তাহার ঈপ্সিতের কণ্ঠলগ্ন হইয়া সুখনিশা যাপন করিতেছে! সে ত আর কাহারও দ্বারা বলপূর্ব্বক গৃহীত হয় নাই, সে ত স্বেচ্ছাসুখে আনন্দিত-চিত্তেই চলিয়া আসিয়াছে!

স্তব্ধ জনবিরল কক্ষে কক্ষে সশব্দচরণধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া যতই তাহারা অগ্রসর হইতেছিল, ভীমের বুকের মধ্যে হাহার ক্ষণে উষ্ণ, ক্ষণে শীতলতর রক্তস্রোত ততই যেন নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। আর কেন সে জ্যেঠা মহাশয়ের এই অনুরোধ ঠেলালে নিজেকে সম্মত হইতে দিল? যদি এখনই তাহার এই দুইটা চোখের উপর উজ্জ্বলার সেই ছবি—যাহা সে কল্পনা করিতেও উন্মাদ হইয়া যায়, তাহাই যদি বাস্তব হইয়া উঠে! যদি কঠিন কঠোর তিরস্কারের ভ্রূকুটি করিয়া রাজ-রাজেন্দ্রাণীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উজ্জ্বলা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে, "তুমি এখানে কেন? আমি যাহাকে চাই, আমি যাহার যোগ্য, আমি সেইখানেই এসেছি, তুমি তাতে বাধা দেও কেন?"—তার পর?—

ভীমের দৃঢ় বক্ষ সহসা অনিশ্বসিত নিশ্বাসের গুরুভারে এক খণ্ড পাষাণের মতই কঠিন ও নিশ্চল হইয়া পড়িল। আর অগ্রসর না হইয়া সে সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ওঃ, এখনও কি আর ফেরা যায় না?

হরি আসিয়া ব্যস্ত স্বরে কহিয়া উঠিল, "বড় সুযোগ ভীম ভাই! দুটো মাগীকে ঘুম থেকে টেনে তুলে বড় বউয়ের ঘরে জিজ্ঞেস করতে, শেষে অনেক কষ্টে জানলাম যে, সাম্নের ঐ বড় ঘরে তিনি রাজাধিরাজের সঙ্গে যাপন করছেন। শীঘ্র এস, তুমি আমি একসঙ্গে দুই জনের ভবযন্ত্রণা মোচন ক'রে দিতে পারবো। কিন্তু জ্যেঠামশাই, না, তিনিও তাঁর গুণবতী বউয়ের গুণ স্বচক্ষেই দেখুন, এই দিকে পথ।"

ভীমের সেই গুরুভারাতুর বক্ষ সহসা সমুদ্রপ্লাবনের বেগে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। হিমায়মান রক্তধারা অসহ্য উত্তাপে ফুটন্ত হইয়া উঠিল, মুক্ত কৃপাণ দৃঢ়হস্তে ধরিয়া সে সেই প্রদর্শিত দ্বারপথে একটা কেন্দ্রচ্যুত উল্কার বেগেই ঘরে ঢুকিয়া বজ্রস্বরে ডাকিয়া উঠিল,—"মহীপালদেব!"

উত্তরে অতি ক্ষীণ অথচ আনন্দতীক্ষ্ণ কণ্ঠের হৃদয়ভেদী স্বর শুনিল, "এ যদি স্বপন না হয়, তবে এ যে তারই গলা গো? ওগো মা ভবানি! সত্যি কি এনে দিলি মা?"

পূর্ব্বাপর সব ভুলিয়া গিয়া আত্মবিস্মৃত ভীম উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"উজ্জ্বলা!"

উজ্জ্বলা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো, সেই যদি এলে, তবে এত দেরী করলে কেন? আমার যে তোমায় ছেড়ে মরতে মোটে মন ছিল না গো! শুধু কোন উপায় নেই দেখেই না আমায় অনেক দুঃখেই এমন ক'রে আজ মরতে হ'লো।"

মশালের তীব্র আলোকচ্ছটায় ভীমের সহিত প্রায় শত কণ্ঠ সমস্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, "এ কি, বড় বউ আত্ম-হত্যে করেছে!"

উজ্জ্বলা আবার কাতরস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল,—"ওগো! সে কি আমি সাধ ক'রে করেছি গো? আমায় তোমরা কাল কেন নিতে এলে না গো? তা হ'লে কি আমায় আজ মরতে হতো? কেমন ক'রে জানবো যে, আজ তোমরা আসবে?"

শতাধিক জিঘাংসাপরায়ণ রক্তপিপাসু রুদ্রমূর্ত্তি বীরের মূর্ত্তি পাষাণের মতই নিশ্চল হইয়া পড়িল। তাহার মধ্যে ভীমও এক জন।

উজ্জ্বলাকে আসন্নমৃত্যু তখনই গ্রাস করিয়া লইয়াছে। চন্দ্রের পূর্ণ-গ্রহণকালে তাহাকে যেমন দেখায়,—একটা চন্দ্রা-কার বস্তু, কিন্তু চন্দ্রত্ব তাহাতে কিছুই নাই, এ উজ্জ্বলাকেও ঠিক তেমনই দেখাইতেছিল। তাহার পরিহিত রক্তবাসে জানা না গেলেও তাহার সন্নিহিত কক্ষভূমে শোণিত-পঙ্ক জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আর সমস্ত দেহ তাহার অতসী-পুষ্পের মতই পাণ্ডুবর্ণ। তাহার সেই বর্ষাকালের নিবিড় জলদের ন্যায় তীক্ষ্ণ কালো চোখের মধ্যস্থ তেমনই বিদ্যুৎপ্রভ সমুজ্জ্বল দৃষ্টি—যাহার দ্বারা তাহার উজ্জ্বলা নামের সার্থকতা দেখা যাইত, আজ তাহার উপর একটা সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া গিয়াছে। শ্বাস লইবার আর তাহার শক্তিমাত্র নাই। তথাপি একটা মরণ-বলে সবল হইয়া সে এতগুলা কথা কহিয়াছিল। এইবার তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল।

সকলেই যখন ভূতাহত বা বজ্রস্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছিল, তাহারই মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আত্মসংযত দিব্যোক অগ্রসর হইয়া আসিল, ধীর অবিচলিত স্বরে সে উজ্জ্বলাকে সম্বোধন করিল, "মা আমার! যাবার আগে শুধু এদের কাছে ব'লে যা, তুই কি নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছিলি?".

উজ্জ্বলার বিবর্ণ মুখ এক নিমেষের জন্য একটা গভীর উত্তেজনায় একটা মত্ত আগুনের শিখার মতই উজ্জ্বল দেখাইল, "কেউ কি বাঘের গর্ত্তে ইচ্ছে সাধে মাথা গলাতে আসে গা! ওরা যে আমায় ওনার নাম ক'রে পাল্কী ক'রে নিয়ে এলো গো! বল্লে যে,—বল্লে যে,—আপনার—আপনার ছেলে তাঁর খেলা দেখাতে আমায় চুপু চুপু যেতে বলে,—বলেছে,—আমি এম্‌নই—পাগল—তাই—তাই—তাই—বিশ্বাস ক'রে—ক'রে—চ'লে এলাম!—এ তারই প্রাচিত্তির! নৈলে,—আমায়—এমন—ক'রে আজ—মরতে হ'লো—কেন?"

উজ্জ্বলা একবারে হাঁপাইয়া পড়িল, তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস কখনও দ্রুত, কখন স্তিমিতভাবে পড়িতে লাগিল। গভীর অবসাদ কিছুক্ষণ তাহাকে একবারেই স্তব্ধ করিয়া দিল। মনে হইল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে!

দিব্যোক গৃহমধ্যস্থ স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে জল লইয়া বধূর মুখে সেচন করিল, তাহার পর স্তব্ধ অনড় ভীমের ভীম-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এইখানে ব'সে আমার মায়ের মাথাটা কোলের উপর তুলে নে, ভীম! মা'র আমার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, একটু কমতে পারে।"

ভীম আদেশ পালন করিল। একবার মুদিত নেত্র উন্মীলিত করিয়া ভীমের মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বলা অতি মৃদু হাসিল, "আঃ! এখনও আমি ভা—গ্য—ব—তী!—আঃ!—"

"উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! তোমার উপর আমি মস্ত বড় অবিচার করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তে এবার বাকী জীবনটাকে আমার আজ এই মুহূর্ত্ত থেকেই উৎসর্গ ক'রে দিলেম। এ জীবনে আমার এ ছাড়া আর কোন কিছুই করবার বাকী রইলো না জেনো।"

"প্রায়শ্চিত্তে নয় ভীম! আমার মায়ের মাথার উপর হাত রেখে বল, প্রতিশোধে! এর কি প্রতিশোধ জানো, ভীম?"

"জানি, মহীপালের ধ্বংস!"

"না,—পাল-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ"—

দিব্যোকের এই দৃঢ় বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করিয়া সমবেত সহস্র কণ্ঠ এক সঙ্গেই মেঘমন্দ্রে গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমরা পাল-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ চাই—উচ্ছেদ চাই—"

অসহ্য লজ্জায় ভীমের সকল দ্বিধা যেন সেই মুহূর্ত্তেই চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সতীর এ রক্তস্রোত—এ কি বৃথা? সহস্রের এ আত্মদান কি অহেতুক? এর কোন মূল্যই কি বিধাতার দরবারে ধার্য্য হয় নাই? বিশ্বের ভাণ্ডারী কি ঋণের পরিশোধ করিতে বাধ্য নন?

উজ্জ্বলার মাথার উপর নিজের দক্ষিণ হস্ত স্থির রাখিয়া অ উদ্বেগ-সংশয়বিহীন অচঞ্চল স্বরে ভীম পুরোহিতের উচ্চারি মন্ত্রের মতই উচ্চারণ করিয়া গেল,—"পাল-সাম্রাজ্যের উচ্ছে এর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত!"

* * * * *

বাতাসে তখনও ঘুমের ঘোর মাখানো। আকাশে ভোরে আলো তখনও আধফোটা, রাত্রির শিশির তখনও গায় গায়ে টলটল করিতেছে, তৃণের উপর ঝিলমিল করিতেছে।

রাগরক্ত কিংশুকে, কমলে, অচঞ্চল লাবণ্যের স্নিগ্ধ হা সুধায় মধুর। জীবন-মৃত্যুর পবিত্র সঙ্গম-তীর্থে আবার এই দু বিরহ-বিধুর-চিত্ত প্রণয়ীর পুনঃ সম্মিলন ঘটিল। এক কিন্তু ইহার একটু পরেই অনন্তের পূজার মন্দিরে চলিয়া গে আর এক জন এই ক্ষণিক মিলনের শেষে গভীর বিচ্ছেদে পরিতপ্ত হাহাকারে পরিপূর্ণ মন-প্রাণ লইয়া এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই দগ্ধ হইতে হইতে বাঁচিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

আমিত্বের অভিমান

তুমি আছ আমাতে যে আমিই প্রমাণ তার,
না থাকিলে তুমি নাথ, আমি কি গো থাকি আর!
আমার যা কিছু সব, তুমিই তাহার মূল,
তবুও মায়ার ঘোরে তোমারেই বুঝি ভুল!
এই সুখ, এই দুখ, এই পুণ্য এই পাপ,
সকলি তোমার প্রভো, শান্তি-ব্যথা-মনস্তাপ!
নিতান্ত অক্ষম আমি, নাহি মোর কোনো বল—
তুমি চালাতেছ বলে তাই মোর চলাচল!

তবু কেন ভাবি নাথ, "আমি আমি" সদা হায়,
আমিত্বের রক্তরেখা কেন নাহি মুছে যায়!
খেলার পুতুল মাত্র—কোনো শক্তি নাহি যার,
এত দর্প, এত দম্ভ, কেন প্রভো বল তার!
অথবা তোমার স্পর্শে ক্ষুদ্র হয় মহীয়ান,
তাই বুঝি ক্ষুদ্র করে আমিত্বের অভিমান!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

প্রাচ্যে প্রতীচ্য বণিক্

কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া প্রতীচ্য জগতে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ইহা সত্য; কিন্তু সে দেশ হইতে আদা, লবঙ্গ, দারুচিনী প্রভৃতি সুগন্ধি মশলা প্রতীচ্যদেশে আমদানী করিবার সুবিধা হয় নাই। অথচ প্রাচ্যের এই বাণিজ্য-সম্পদ্ প্রতীচ্যের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল।

পর্ত্তুগীজ নরপতি ম্যানোয়েল্ প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ হইতে এই বাণিজ্য-সম্পদ্ স্বদেশে আমদানী করিবার জন্য কিছুদিন হইতে কল্পনা করিতেছিলেন। কতিপয় অর্ণবপোত যদি কোনও সাহসী, চতুর ব্যক্তির অধিনায়কত্বে প্রাচ্যদেশে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে প্রাচ্যের সম্পদ্‌রাশি প্রতীচ্যজগতে প্রচার করিয়া বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর লাভবান্ হইতে পারা যাইবে। যুবক নরপতি কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ভাস্‌কো-ডা-গামাকেই নির্ব্বাচিত করেন।

ভারতবর্ষের ধনরত্ন, বাণিজ্য-সম্পদের কাহিনী প্রতীচ্য জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। নব অভ্যুদয়-উন্মাদনায় প্রতীচ্যের বাহুশক্তি ক্রমেই দুর্দ্দম হইয়া উঠিতেছিল! ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে নব নব দেশে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রতীচ্যের প্রভাব পরিব্যাপ্ত করা য়ুরোপের রাজন্যসমাজের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

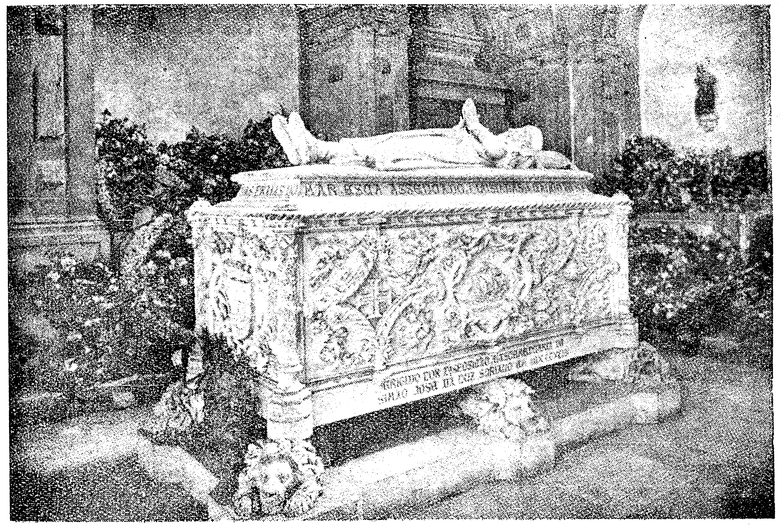

লিসবনে গামার সমাধি

ভাস্‌কো ডা-গামার অর্ণবপোতবহরের সহিত প্রথম পর্ত্তুগীজ ভারতীয় ভূমিতে পদার্পণ করিলে পর, জনৈক আরব তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "তোমরা এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?" উত্তরে সেই পর্ত্তুগীজ নাবিক বিদ্রূপভরে বলিয়াছিল, "খৃষ্টান ও সুগন্ধি মশলার লোভে এখানে আমাদের আগমন।"

কালিকট বন্দরে নামিয়া তত্রত্য নরপতি জামোরিনের সহিত গামার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ইতিহাসে যাহা লিখিত আছে, ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

পর্ত্তুগীজ নৌ-সেনাপতি, ত্রয়োদশ জন বাছা বাছা সহচর সহ কালিকট অভিমুখে জনতাভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার সময় দেখিয়াছিলেন, ক্রমেই দলে দলে ভারতীয়গণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য পথে ভীড় জমাইয়া তুলিতেছিল। জনতার মধ্যে শুভ্র শ্মশ্রু-সুশোভিত পুরুষদিগের কর্ণে বলয় দুলিতেছিল। কৌতূহলী জনসঙ্ঘের মধ্যে—রত্নালঙ্কারভূষিতা নারীও বিদ্যমান ছিল। বিচিত্রদর্শন নরনারীদিগের জনতা ভেদ করিয়া অবশেষে বিদেশীরা মনোরম উদ্যানমধ্যে প্রবেশ-লাভ করেন। সুচিত্রিত উদ্যানমধ্যে শুধু ফলপুষ্প-ভরা বৃক্ষলতার যে প্রাচুর্য্য ছিল, তাহা নহে, লতাপুষ্পশোভিত উৎসরাজি হইতে সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া উদ্যানের শোভাকে মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।



ভাস্‌কো-ডা-গামা

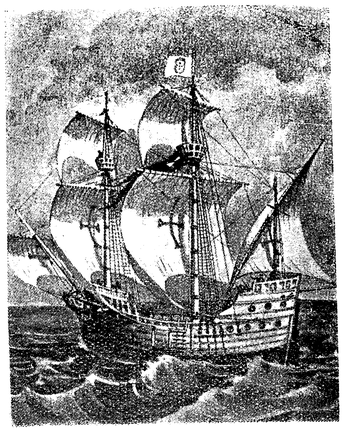

গামার জাহাজ

সুসজ্জিত নানা প্রকোষ্ঠ ও অলিন্দ অতিক্রম করিয়া অবশেষে গামা সদলবলে এক সুপ্রশস্ত দরবার-গৃহে পৌঁছিলেন। এই গৃহ ইন্দ্রধনুর বর্ণরঞ্জিত মহামূল্য বস্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত—নানা রত্নভূষায় অলঙ্কৃত।

সবুজ মখমলমণ্ডিত সুখসেব্য আসনে জামোরিন্ উপবিষ্ট, তাঁহার মস্তকোপরি স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ। গামার দরবার প্রবেশকালে জামোরিনের হস্তে স্বর্ণবিনির্ম্মিত পিক্‌দানী শোভা পাইতেছিল। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এক বিরাট হৈম তাম্বূলাধার; এই আধারটি এত বৃহৎ যে, এক জন দীর্ঘকায় পুরুষ দুই হাত বিস্তার করিয়া তাহার পরিধিকে বেষ্টন করিতে পারে না। খদির, চূণ ও সুপারি-সংযোগে অসংখ্য পানের খিলি সেই স্বর্ণাধারে রক্ষিত ছিল।

নরপতির প্রধান ব্রাহ্মণ উল্লিখিত তাম্বূলাধারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া জামোরিনকে প্রতিমুহূর্ত্তে খিলি পরিবেশন করিতেছিল। একটি পান অল্পক্ষণ চর্ব্বণের পর নরপতি উহা স্বর্ণবিনির্ম্মিত পিক্‌দানীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

যখনই কেহ রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কোন কথা কহিতেছিলেন, অমনই সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রদ্ধাভরে উভয় করতলের দ্বারা স্ব স্ব মুখ আচ্ছাদন করিতেছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ রাজসভার আদব-কায়দা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন।

বিদেশীরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল। রাজপরিচারকগণ নিঃশব্দে গঙ্গার জল আনয়ন করিল। পর্ত্তুগীজগণ জানিতে পারিলেন, চুরু দিয়া জলপান করা অপরিচ্ছন্নতার নিদর্শন। অনভ্যস্ত বিদেশীরা দেশীয় প্রথানুযায়ী জল পান করিতে গিয়া কেহ 'বিষম' খাইল, কেহ বা পরিধেয় বস্ত্র ভিজাইয়া ফেলিল। সে দৃশ্যে রাজার পর্য্যন্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছিল।

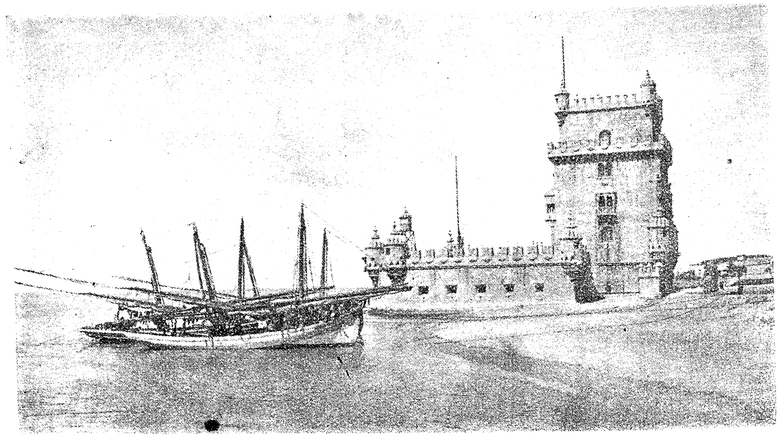

বেলেম্ প্রাসাদ—গামা এই স্থানে রাত্রিবাসের পর জলযাত্রা করেন

জামোরিনের ভৃত্যের অঙ্গেও রেশমের পরিচ্ছদ, তাহাও রত্নখচিত। বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কার বাহুমূলে দীপ্তি পাইতেছে।

য়ুরোপীয়দিগের আগমনে ভারতীয়গণের মনে যে বিশেষ বিস্ময়বোধ হইয়াছিল, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। গামা পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জামোরিনের দরবারে এই ঐশ্বর্য্যের বিলাস শুধু রাজৈশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে আফ্রিকা, পারস্য ও আরব দেশের সহিত কালিকটের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু কালিকটের সমৃদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ কালিকটে আগমন করায় আরব ও পারস্যদেশীয় বণিক্‌গণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে রাজার নিকট নানাপ্রকার কথা রটাইতে লাগিল। উহারা যে জলদস্যু, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিল।



লিসবন্ সহর

ভৃত্যগণ কদলী ও তরমুজ পরিবেষণ করিতে লাগিল; বিদেশীরা তখন জামোরিনের দিকে চাহিয়াছিল। নরপতির দেহ গৌরবর্ণ কৃষ্ণ—শ্বেতবস্ত্র কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত। এরূপ সূক্ষ্মবস্ত্র তখন য়ুরোপ প্রস্তুত করিতে জানিত না। বস্ত্রপ্রান্ত স্বর্ণ ও রত্নখচিত। রাজার বাহুতে মণিমাণিক্যখচিত বলয়—তাহার মধ্যস্থ একখানি হীরক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মত স্থূল!

বিস্মিত দর্শকরা দেখিল, রাজার গলদেশে বাদামের ন্যায় বড় বড় মুক্তাখচিত হার দোদুল্যমান—উহা নরপতির ক্রোড় পর্য্যন্ত বিলম্বিত। কণ্ঠদেশে রত্ন ও মুক্তাখচিত পুষ্পহার—তাহার মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড দ্যুতিমান হীরক। তাঁহার দীর্ঘ কেশরাজি চূড়ার আকারে মাথার উপরে গ্রন্থিবদ্ধ, তদুপরি মূল্যবান্ রত্নসমূহ শোভা পাইতেছিল। কর্ণে বীরবৌলী—সেগুলিও হীরক, চুনি ও পান্নাখচিত।

জামোরিন গামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তিনি এ দেশে আসিয়াছেন। গামা বুদ্ধিজীবী, তিনি আরবদিগের উপর ঢাল চালিলেন—রাজার সহিত সঙ্গোপনে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন।

এক ক্ষুদ্র কক্ষে জামোরিন গামার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে গৃহও অনুরূপভাবে সুসজ্জিত। গামা পর্ত্তুগীজ নরপতির স্বাক্ষরিত পত্র বাহির করিয়া শ্রদ্ধাভরে উহা নয়নে মস্তকে স্পর্শ করিলেন, পরে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক রাজার হস্তে উহা অর্পণ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, উল্লিখিত পত্রখানি সত্যই রাজা ম্যানোয়েলের লিখিত। আবার কেহ কেহ সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। জনৈক ইতিবৃত্ত-লেখক এমন আভাসও দিয়াছিলেন যে, কালিকট বন্দরে গামার জাহাজ পৌঁছিলে



পর্ত্তুগীজ জালুক-গৃহিণী—জাল মেরামত করিতেছে

তিনি জামোরিনের দরবারের ঐশ্বর্যের কাহিনী শুনিয়া স্বয়ং উক্ত পত্র লিখিয়া রাজা ম্যানোয়েলের নাম জাল করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, জামোরিনকে উপঢৌকন প্রদানের সময় গামাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ১২খানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র, চারিখানি রক্তবর্ণ মস্তকাবরণ, ছয়টি টুপী, চারিছড়া প্রবালের মালা, একবাক্স চুরুট, এক পেটি চিনি, দুই পিপা তৈল এবং দুই পিপা মধু লইয়া তিনি জামোরিনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন। রাজা এই যৎসামান্য উপহার পাইয়া বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি প্রশ্ন করিলেন যে, পর্ত্তুগীজরা কি দেখিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন—মানুষ না পাথর? মক্কা হইতে অতি দরিদ্র বণিক্‌ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপঢৌকন প্রদান করিয়া থাকে। পরে তিনি গামাকে জানাইয়াছিলেন যে, পর্ত্তুগালের রাজার সহবৎজ্ঞান নাই, নহিলে প্রতাপশালী জামোরিনের কাছে এমন যৎসামান্য উপহার প্রেরণ করিতেন না। গামা তখন বুদ্ধি করিয়া জানাইলেন, এ সকল উপহার পর্ত্তুগালের প্রেরিত নহে—গামার নিজের শ্বশুর অর্ঘ্য। তিনি ব্যবসা করিতে এ দেশে আসিয়াছেন। যে সকল বিষয় এ দেশে আমদানী করিতে চাহেন, তিনি তাহারই নমুনা দিয়াছেন, উপহার নহে। রাজা যে সকল উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহা অন্য জাহাজে ছিল, কিন্তু ঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়া সে জাহাজখানি সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে।

কৌশলে, বুদ্ধিচাতুর্য্যে গামা জামোরিনের নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ছাড়পত্র যোগাড় করিয়া লইলেন। জামোরিন লৌহ লেখনীর সাহায্যে তালপত্রে পর্ত্তুগালের রাজার বরাবর লিখিয়া দিলেন, "আপনার পরিবারস্থ ভাস্‌কো-ডা-গামা নামক জনৈক ভদ্রলোক আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, ইহাতে আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশ দারুচিনি, লবঙ্গ, আদা, লঙ্কা এবং মূল্যবান্ প্রস্তরের জন্য সুবিখ্যাত। ঐ সকল দ্রব্য বিনিময়ে আমি আপনার নিকট হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং রক্তবস্ত্র প্রত্যাশা করি।"

গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জনৈক ভিনিসীয় ঐতিহাসিক লিখিলেন, "ভিনিসে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, জনসাধারণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করিলেন যে, ইহা অপেক্ষা মন্দ সংবাদ আর কিছুই হইতে পারে না।" এই সংবাদ প্রচারের পর হইতেই ধীরে ধীরে ভূমধ্যসাগর হইতে আটলাণ্টিক সমুদ্রে অর্ণবপোতসমূহ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মিশরের সুলতান এ সংবাদ শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। এতদিন সুয়েজের পথে যে সকল বাণিজ্য-সম্ভার ভিনিস বন্দরে নীত হইত, অথবা ভিনিস হইতে অন্যত্র উল্লিখিত পথে রপ্তানী হইত, মিশরের সুলতান সেই সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া প্রচুর অর্থ পার্জ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। এখন যদি পর্ত্তুগীজগণ নূতন পথে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য য়ুরোপে আমদানী ও তথা হইতে ভারতবর্ষে রপ্তানী করিতে থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রভূত অর্থলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং তিনি ভিনিসীয় কাষ্ঠ কারুকে বন্দরে পোতযোগে পাঠাইয়া দিলেন। তথা হইতে উহা উষ্ট্রপৃষ্ঠে বাহিত হইয়া যোজক পারে পৌঁছিল। সেখানে সুলতানের আদেশে অর্ণবপোতসমূহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। সুলতানের ইচ্ছা, পর্ত্তুগীজগণ পুনরায় যখন ভারতবর্ষে যাত্রা করিবে, ক্ষণভঙ্গুর জাহাজগুলির সাহায্যে তিনি উহাদিগকে আক্রমণ করিবেন।

প্রকৃতপক্ষে ভাস্‌-কো-ডাগামার ন্যায় অন্য কোনও আবিষ্কারক নিজের দেশের জন্য এমন প্রচুর অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। একাদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগাল য়ুরোপে অতি

নগণ্য শক্তি বলিয়াই পরিগণিত ছিল; কিন্তু ষোড়শ-শতাব্দীতে পর্ত্তুগালের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় বার সমুদ্র-যাত্রার পর পর্ত্তুগালের প্রত্যেক কারখানায় দলে দলে যুবকগণ সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একবার পোত-বহরের মধ্যে একখানি পোতের মাঝি-মাল্লাগণের অধিকাংশই এমন অশিক্ষিত ছিল যে, বাম হস্ত ও দক্ষিণ হস্তের প্রভেদ পর্য্যন্ত জানিত না। উহাদিগকে জাহাজের দক্ষিণ দিক্ ও বাম দিক্ বুঝাইবার জন্য পোতাধ্যক্ষদিগকে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হইত। এক জন অধ্যক্ষ এক দিকে পেঁয়াজের বস্তা, অপর দিকে রসুনের বস্তা রাখিয়া কখন কোন্ দিকে হাল ঘুরাইতে হইবে, নাবিকদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন—"পেঁয়াজের দিকে হাল ঘুরাও", "এবার রসুনের দিকে!"

গামার পোতবহর পাইল উড়াইয়া টেগস্ হইতে বহুদূরবর্ত্তী পাড়ি জমাইল। ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিয়া নাবিকদল মৎস্যশিকারের আনন্দে মত্ত হইল। তথা হইতে ভার্ডস্ অন্তরীপ অভিমুখে ৩রা আগষ্ট তারিখে বহরপোতগুলি যাত্রা করিল। সে যুগের পোতগুলি তেমন বৃহদায়তন ছিল না। সমুদ্রপথের কোথায় কি আছে, তখন তাহাও নির্ণীত হয় নাই। ৯৬ দিন ধরিয়া জাহাজগুলি সাড়ে চারিহাজার মাইল পথ অভিযান করিল, তখনও তটভূমির সন্ধান নাই। কলম্বস্ ক্যানেরি হইতে সাড়ে ৩ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করার পর 'বাহামাস্' দ্বীপপুঞ্জের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালের দক্ষ নাবিকগণ গভীর, মুক্ত সমুদ্রবক্ষে পোত পরিচালন অপেক্ষা তটভূমির সন্নিহিত জলরাশির উপর দিয়া পোত পরিচালন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। যদিও ইহাতে বিপদের আশঙ্কা অধিক থাকিলেও মাঝে মাঝে স্থল নামিয়া তাঁহাদের স্থূল যন্ত্রাদির অবশ্যম্ভাবী ভ্রমপ্রমাদগুলি সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহারা মুক্ত সমুদ্রের পক্ষপাতী ছিলেন না।

চলিতে চলিতে গামার পোতবহর একবার প্রতিকূল বায়ুবিতাড়িত হইয়া ঝড়ের মুখে পতিত হইয়াছিল। তাহার পর অনুকূল বায়ুর সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকার তীরভূমির দিকে অগ্রসর হয়। ৭ই নবেম্বর গামা যে স্থানে উপনীত হয়েন, পোতবহরের অধ্যক্ষ তাহাকে সেণ্টহেলেনা উপসাগর নামে অভিহিত করেন।

তীরভূমিতে উপনীত হইয়া নাবিকদল দেখিল, এক জন হটেনটট্ ঝোপের মধ্য হইতে মধু আহরণ করিতেছে। তাহারা ঐ ব্যক্তিকে আহার্য্য দিয়া তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিল। হটেনটট্‌গণ তাহাদের বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের কর্ণে তাম্র ও শুক্তি। মৃগচর্ম্মের লাঙ্গুল লাঠিতে বাঁধিয়া তদ্দ্বারা তাহারা বীজন করিতেছিল। তাহাদের স্কন্ধে মৎস্যবিদ্ধকারী শড়কী।

পর্ত্তুগীজরা সুবর্ণ, মুক্তাবীজ, লবঙ্গ এবং দারুচিনি তাহাদের



নায়ার বালিকা

সম্মুখে উপস্থাপিত করিল; তাহাতে উহারা মুগ্ধ হইল না। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও দস্তার অঙ্গুরীয় দেখিয়া তাহারা মোহিত হইয়া গেল।

১৬ই নবেম্বর তারিখে পর্ত্তুগীজগণ অন্তরীপ অভিমুখে জাহাজ ভাসাইয়া দিল। প্রবল ব্যাতা বশতঃ কয়েকদিন পরে পোতবহর মসেল উপসাগরে উপনীত হইল।

বহুসংখ্যক হটেনটট্ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল—সে অভ্যর্থনায় বাদ্যযন্ত্র ছিল। তবে পিত্তলনির্ম্মিত বংশী তাহাদের ছিল না। কাষ্ঠনির্ম্মিত বংশী হইতে তাহারা মধুর ধ্বনি বহির্গত করিয়াছিল। হটেনটট্‌গণ বিদেশীদিগকে নৃত্য বিদ্যার পরিচয়ও দিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ জাহাজের তুরী সুরে তালে লয়ে বাজাইয়া হটেনটট্‌দিগকে বিস্ময়মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের নৃত্যে স্বয়ং গামাও যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

লোহিত টুপী ও ঘণ্টার বিনিময়ে পর্ত্তুগীজরা গজদন্তনির্ম্মিত কঙ্কনাদি লাভ করিয়াছিল। তথায় হস্তীর প্রাচুর্য্য বিদ্যমান ছিল। 'সিল' দ্বীপ নাবিকগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সিল সে সময় তথায় প্রচুর পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন একটি সিলও দেখা যায় না বলিয়া অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।



গামার আবিষ্কৃত ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের নরনারী

পোতবহর আরও উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল ; কিন্তু গন্তব্য-পথে আবার বাধা পড়িল। অকস্মাৎ এক দিন ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইল। আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, ভীষণ অশনি মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে লাগিল। গামার সহযাত্রীদিগের দলে অভিজ্ঞ নাবিকরা বলিতে লাগিল, এ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে—

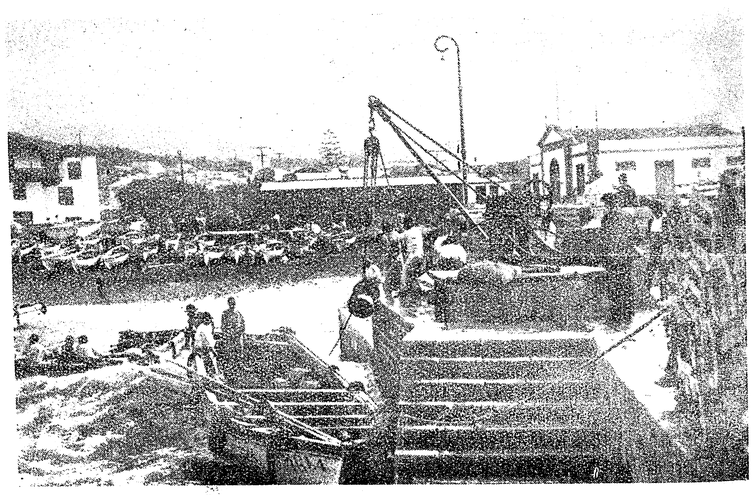

টেনেরিফের ধীবরগণ



কেপ্‌ভার্ড দ্বীপপুঞ্জের নারীরা বস্ত্র ধৌত করিতেছে

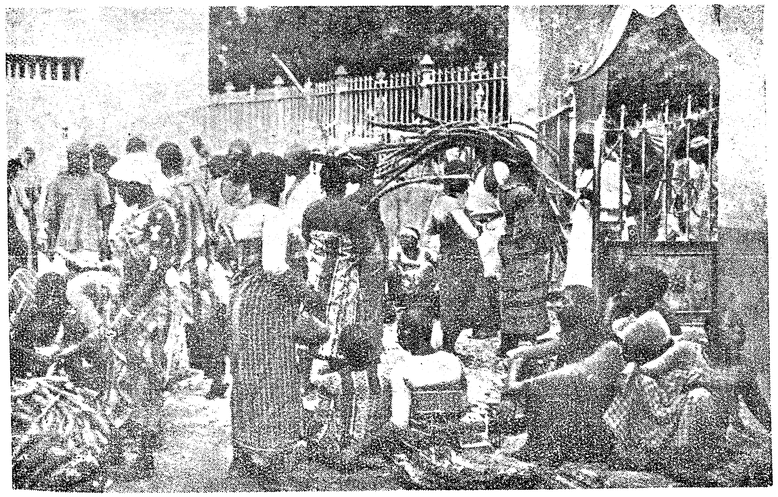

মোজাম্বিকের বাজার—এই স্থান ভাস্‌কো-ডা-গামার আবিষ্কৃত

প্রত্যাবর্ত্তন কর্ত্তব্য। কিন্তু গামা দৃঢ়স্বরে বলিলেন যে, তিনি লিস্‌বন হইতে যাত্রাকালে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছেন, অগ্রসর হওয়া ছাড়া,—এক পদ প্রত্যাবর্ত্তন তিনি করিবেন না। সুতরাং যে কেহ প্রতিবাদ করিবে, তিনি তাহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিবেন।

অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া উঠিল। নাবিকগণ প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল; কিন্তু গামার জীবনচরিতকার বলেন যে, ঝটিকার গর্জ্জনকেও পরাভূত করিয়া গামার কণ্ঠ গর্জ্জন করিতে লাগিল—না, চলিতেই হইবে!

দণ্ডের পর দণ্ড ধরিয়া নাবিকগণ কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা পীড়িত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ ভীষণ ক্লান্তিবশতঃ প্রাণত্যাগ করিল। গামা বলিলেন যে, শত জন মরিলেও তিনি উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবেন না। বরং জাহাজ সহ তিনি সমুদ্রসমাধিলাভ করিবেন, তথাপি পশ্চাদ্‌গামী হইতে পারিবেন না।

তিনখানি জাহাজের নাবিকগণ কখনও শোক করিতেছিল, কখনও গণ্ডগোল করিয়া উঠিতেছিল,—প্রার্থনা, অভিসম্পাৎ—পর্য্যায়ক্রমে তাহাও চলিতেছিল। গামা জাহান্নামে যাউক, এমন কথাও বহুকণ্ঠে বহুবার ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু গামা স্থির-লক্ষ্যে জাহাজ চালাইতেছিলেন।

ক্রমে ঝটিকার বেগ মন্দীভূত হইল। কিন্তু নাবিকগণ তখন বিদ্রোহী। গামা বিশেষজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। তখনও সমুদ্র উত্তাল-তরঙ্গময়; কিন্তু গামা দৃক্‌পাত করিলেন না। সকলকে নিম্নতলে যাইতে আদেশ করিলেন। যদি আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ না হয়, ভালই। সকলে মিলিয়া একটা

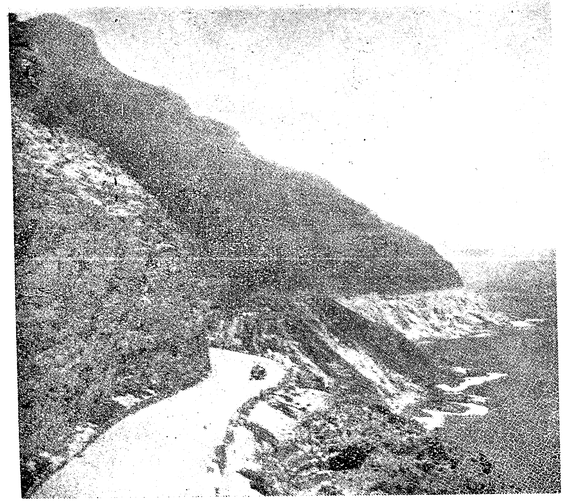

কেপটাউনের একটি পথ, গামা এই স্থানে একটি বলিবর্দ্দ ক্রয় করিয়াছিলেন

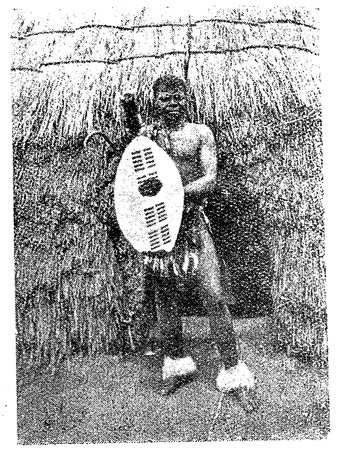

নেটালের জুলু সর্দ্দার

দলিল স্বাক্ষর করিয়া রাখিলে পর্ত্তুগীজ নরপতিকে দেখান যাইবে যে, সত্যই আর অগ্রসর হওয়া অভিজ্ঞগণ সমীচীন মনে করে নাই—অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব।

এইরূপে সকলকে ফাঁদে ফেলিয়া গামা প্রত্যেককে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তার পর তাহাদের নৌচালন উপযোগী যন্ত্রাদি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষের অভিমুখে জাহাজ চালাইলেন।

জাহাজগুলি ক্রমশঃ একটি নদীর মোহানায় উপস্থিত হইল। উহার নাম করণ হইয়াছে নেটাল। এখন যে নদীর নাম লিস্‌পু, মোজাম্বিক নাটা সেই নদীর তীরে দলে দলে বানটপ, ভাটিয়া তথায় উপনীত হইল। তাহাদের বাধা প্রদানকারীর সংখ্যাই অধিক। গামা তাহাদের সর্দ্দারপতিকে প্যাণ্টালুন ও জ্যাকেট উপহার দিলেন।

পর্ত্তুগীজরা সেই স্থানে পর্য্যাপ্ত টিন ও লৌহ আছে বলিয়া জানিতে পারিল। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে তাম্রনির্ম্মিত অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল। পুরুষদিগের হস্তিদন্তনির্ম্মিত কোমরে ছোরার হাতলগুলি দন্তানির্ম্মিত।

তথা হইতে গামা উত্তরাভিমুখে জাহাজ চালাইয়া চলিলেন। ক্রমে প্রাচ্যের নূতন জগতে তাঁহার জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল। কিলিমিনি নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি কৃষ্ণবর্ণ লোকদিগের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাহারা পর্ত্তুগীজদিগকে আহ্বান



মদিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকার স্কুলের ছাত্র—দুষ্টামীর জন্য দণ্ড ভোগ করিতেছে

আনন্দের সীমা রহিল না।

প্রথমতঃ তাহারা দেখিতে পাইল যে, মুসলমান বণিক্‌গণ— অতিসূক্ষ্ম কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত বিবিধ বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল বস্ত্রে সুশোভিত হইয়া পণ্য-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে নিযুক্ত। তাহাদের শিরো-ভূষণ টুপীগুলি রেশম ও সোনার জরীর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসমন্বিত। বন্দরে চারিখানি আরব ধরণের পোত স্বর্ণ, রৌপ্য, লবঙ্গ, লঙ্কা, মরিচ, জায়ফল এবং রৌপ্যনির্ম্মিত অঙ্গুরীয় পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। সেই জাহাজে মুক্তা, চুনি, পান্না প্রভৃতি জহরতও প্রচুর পরিমাণে ছিল।

মোজাম্বিক বন্দরে গামা দুই জন 'পাইলট' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত ৪জন দক্ষ জাতীয় লোকও ছিল। কিন্তু মোম্বাসায় গামার পোতবহর উপনীত হইলে পাইলটরা বুঝিতে জানিতে পারিল যে, তাহাদের মনিবগণ খৃষ্টান, তখন তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিল।

মোম্বাসার অধিপতি আবিষ্কারককে একটি মেষ, কিছু কমলানেবু, কিছু নেবু, ইক্ষুদণ্ড এবং একটি অঙ্গুরীয় ভেট পাঠাইলেন। গামাও রাজসভায় দূত প্রেরণ করিলেন। রাজার নিগ্রো খড়্গধারী রক্ষকগণ দূতগণকে সমত্নে রাজসভায় লইয়া গেল। তাহার পর রাজায় গামার সহচরদিগকে গ্রামগুলি পরিদর্শনের সুযোগ প্রদত্ত হইল।

দুই দিন পরে গামা দেখিলেন, একখানি জলযানে বহুসংখ্যক মূর আরোহণ করিয়া জলের উপর কুচকাওয়াজ করিতেছে। ইহাতে গামার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। মূরগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; আরবদেশে তাহাদের অধিকাংশের জন্মস্থান। তাহাদের মধ্যে সঙ্করজাতীয় মূরও ছিল। গামা মনে করিলেন যে, তাঁহার জাহাজে যে সঙ্করজাতীয় লোকগুলি বন্দিভাবে আছে, তাহাদিগকে পীড়ন করিলে মূরদিগের উদ্দেশ্যের কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এ জন্য তিনি তাহাদিগের ত্বকের উপর প্রতপ্ত তৈলবিন্দু বিন্দু নিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যদি গামার দলবলের বিরুদ্ধে কোনও চক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কথা বাহির হইয়া পড়িবেই।

মধ্যরাত্রিতে জাহাজের রক্ষীরা দেখিতে পাইল, জলের উপর এক ঝাঁক মৎস্য ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু অবিলম্বে তাহারা বুঝিতে পারিল যে, উল্লিখিত মৎস্যগুলি অস্ত্রধারী সন্তরণ-কারী—তাহারা জাহাজের নঙ্গরের রজ্জু ছেদন করিতে আসিয়াছে। একখানি পোতের রক্ষী বিপদবার্ত্তাসূচক সঙ্কেতধ্বনি করিবামাত্র সন্তরণকারীরা নীরবে সাঁতার দিয়া দূরে চলিয়া গেল।

মোম্বাসায় অবস্থানকালীন পর্ত্তুগীজগণ সুবৃহৎ, সুমিষ্ট কমলানেবুর রসাস্বাদনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। ম্যালিণ্ডি অভিমুখে পোতবহর ভাসাইবার পূর্ব্বেই পোতস্থ নাবিকগণের পীড়া উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রচুর ধনরত্ন ও বাণিজ্যসম্ভারের প্রত্যাশায় পোতবহরস্থ প্রত্যেক পর্ত্তুগীজই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গামার প্রতি

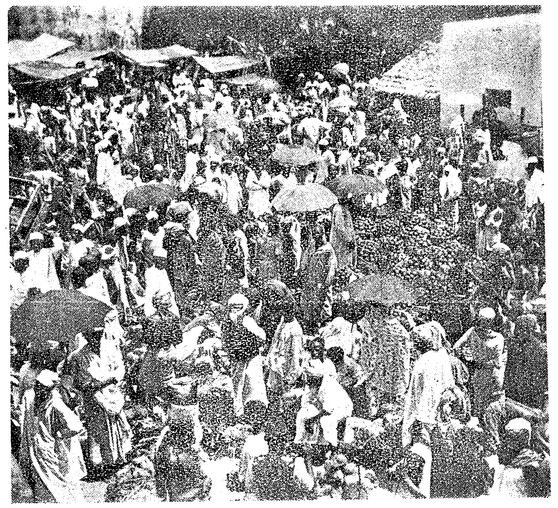

জাঞ্জিবারের বাজার—এই স্থানের ফল ভোজন করিয়া গামার নাবিকদল পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল

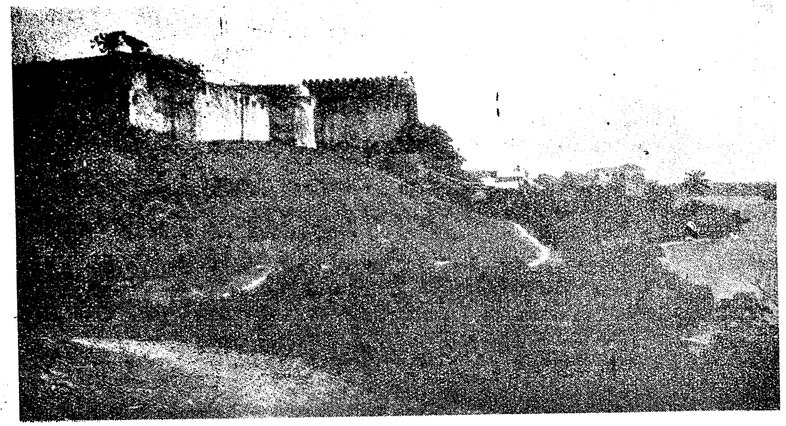

মোম্বাসা—ভাস্‌কো-ডা-গামার সময়ে এখানে ক্যালিকটের ব্যবসায়ীরা বাস করিত

তাহাদের বিরাগ অন্তর্হিত হইয়া তখন তাঁহাকে প্রায় দেবতার স্থানে বসাইয়া প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছিল। গামার প্রাণপণ চেষ্টার ফলেই আজ তাহারা অপর্য্যাপ্ত ধনরত্নভরা দেশের অভিমুখে চলিয়াছে। বাস্তবিক, তখন য়ুরোপের দারিদ্র্য ও প্রাচ্যের অতুল ঐশ্বর্য্যসম্ভারের তুলনা করিয়া ক্রমেই তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল।

গামাও তখন আনন্দে উৎফুল্ল। ভারতমহাসমুদ্র—জাঞ্জিবার হইতে হিন্দুবার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। যাত্রা-পথে তিনি দুইখানি 'শম্বুক' (একজাতীয় বৃহৎ নৌকা) দেখিতে পাইলেন, একখানি ত্বরিতগতিতে পলায়ন করিল, কিন্তু অপরখানি তখনও অপসৃত হইতে পারে নাই। তিনি তাহার সন্নিহিত হইয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের পোতবক্ষে যে পতাকা উড্ডীন হইতেছে, তাহা পর্ত্তুগালরাজের শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সুতরাং রাজা ম্যানোয়েলের নামাঙ্কিত পতাকা

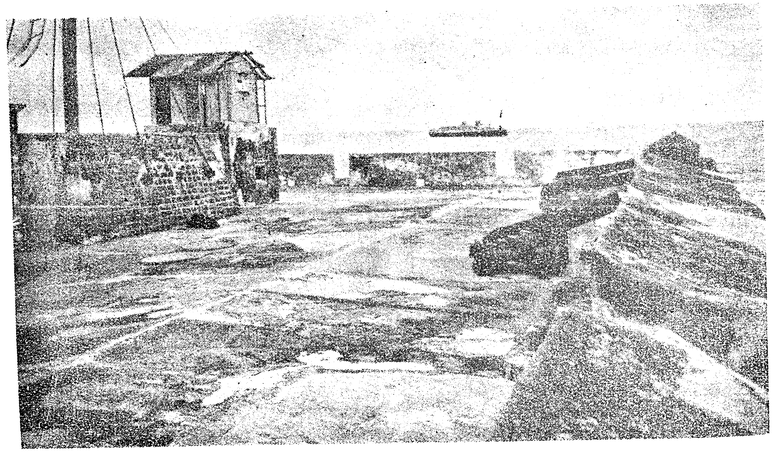

মোজাম্বিকে পর্ত্তুগীজ দুর্গ—গামার সময়ে এই স্থানে একটি আরব সহর ছিল

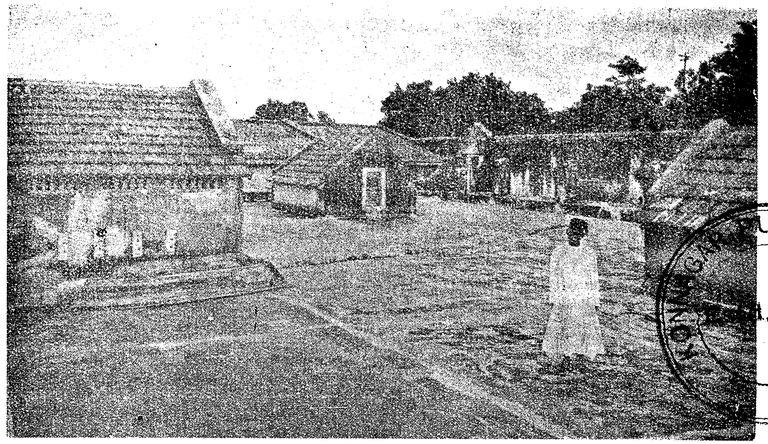

PUBLIC LIBRARY
1858

মোজাম্বিকের একাংশ—কূপ, ঝরণা অথবা নদী এই দ্বীপে নাই

উক্ত পোতে উড্ডীন করিতে হইবে, নহিলে তাঁহার আদেশে উক্ত জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া আরোহীদিগকে সমুদ্রসমাধিগর্ভের শান্তিভোগ করিতে হইবে। শুধু উক্ত জাহাজ নহে, কোনও অর্ণবপোত তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারই প্রতি উক্ত দণ্ড প্রদত্ত হইবে।

উক্ত জলযানের অধ্যক্ষ কখনও পর্ত্তুগাল ও তত্রত্য নরপতি ম্যানোয়েলের নাম শ্রবণ করে নাই। তাহার প্রত্যেক নাবিক সন্তরণপটু, প্রচুর বিক্রেয় হস্তিদন্ত সে পুনরায় সংগ্রহ করিতেও পারিবে; কিন্তু নৌকা-মধ্যে তাহার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী রহিয়াছে। সেই তরুণী তাহার জহরতের বাক্স আঁকড়িয়া ধরিয়া

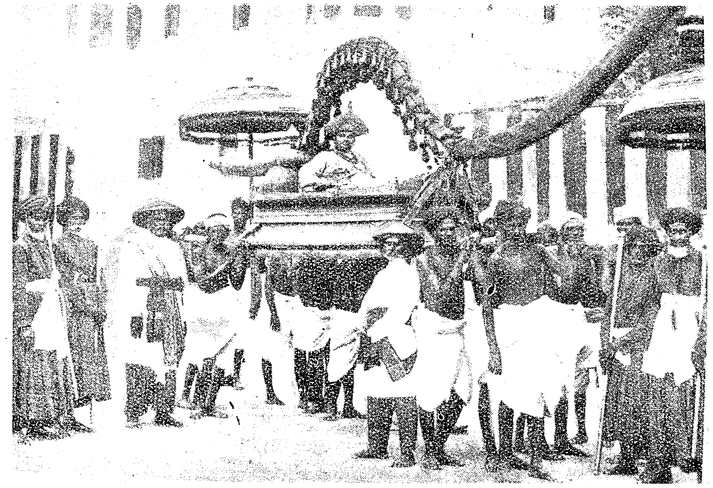

এতায়াপুরমের রাজা তঞ্জামে চড়িয়া বায়ু সেবন করিতেছেন

তাহার চারি জন ক্রন্দনরতা পরিচারিকাকে সাহস দিতেছিল। সুতরাং স্বামীকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল।

গামা দশ জন পর্ত্তুগীজকে উক্ত জলযানের উপর পাঠাইয়া দিলেন। অধিকৃত পোতসহ গামার পোতবহর মালিন্দীর অনতিদূরে খৃষ্টমাসপর্ব্বের পূর্ব্বদিবস নঙ্গোর করিল। মালিন্দী ভারতবর্ষ নহে; কিন্তু কালিকট বন্দরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে এই শেষ বন্দরেই গামা তাঁহার পোতবহর থামাইয়াছিলেন। এই মালিন্দীতে গামা রাজনীতিকোচিত কৌশল ও শিষ্টাচারের চরম পরিচয় দিয়াছিলেন।



ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ নিরত মালাবারের ব্রাহ্মণ

মালিন্দীর সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতা পর্য্যবেক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই একখানি নৌকাযোগে এক জন স্ববেশধারী লোক আসিয়া গামাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা এ দেশে আসিয়াছেন। যাহা হউক, এ দেশের নরপতি আদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, তাহা পরিপূর্ণ করা হইবে। এ আশ্বাসবাণীতে পর্ত্তুগীজগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। এ জন্য এক জন মূরকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তীরে প্রেরণ করা হইল। সে অনতিবিলম্বে এক নৌকাপূর্ণ উপহারসামগ্রীসহ রাজার প্রধান পুরোহিতকে লইয়া আসিল। গামা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থিত করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গামা দেখিলেন, একখানি বিচিত্রদর্শন জলযান পোতবহরগুলির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। সেই পোতে মালিন্দীর রাজা রাজকীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। দুইখানি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত রাজছত্র অধিকার করিয়া রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপতলে রাজা বসিয়াছিলেন। রাজকীয় বাদকগণ মধুর বাদ্যধ্বনি করিতেছিল। রাজছত্রগুলির মধ্যে শিবের বিষাণাকৃতি শৃঙ্গও ছিল। পিত্তল, কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলি প্রিয়দর্শন। রাজার পার্শ্বে এক জন পরিচারক রৌপ্যদণ্ড সংযুক্ত তরবারী ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

গামার পোতবহরগুলিতে তখনই পতাকা সুশোভিত হইল। পোত হইতে কামানধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। কয়েকটি গোলাও বাহির সমুদ্র অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল। সমগ্র নগরী

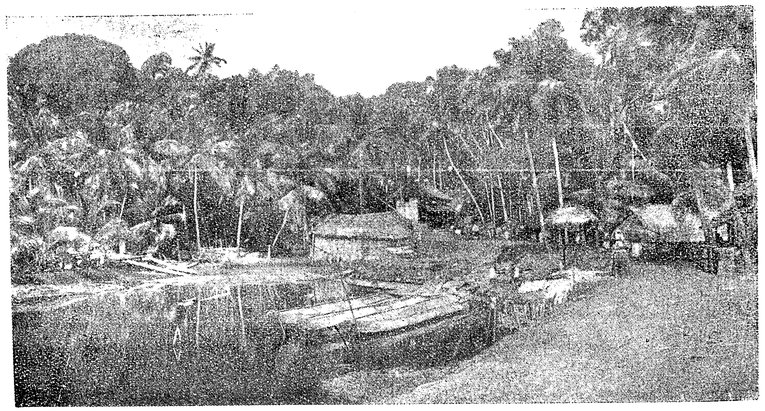

কালিকটের একাংশ

কামান গর্জ্জনে কাঁপিয়া উঠিল। বেলাভূমি দর্শক উপকূলতটে সমবেত হইল। গামা রাজপুরোহিতকে উপহারসহ তীরে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতেছেন, তখন দূত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এক জন মূর বলিল যে, বোধ হয় রাজা ইহাকে প্রতিভূস্বরূপ গামার নিকট রাখিতে চাহেন।

তখন গামা তখনই রাজদূতকে কতকটা প্রবালের মালা পূজাচ্ছলনায় উপঢৌকন প্রদান করিয়া বলিলেন যে, পুরোহিত যেন তাঁহার রাজাকে জ্ঞাত করান—রাজার মহত্ত্ব ও সহৃদয়তাই পর্য্যাপ্ত, কোন প্রতিভূ রাখিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না যে, সম্প্রতি কামানের ধ্বনি সহকারে রাজার প্রতি যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে তীরস্থ লোকজন শঙ্কাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তখন চলিয়া গেলেন।

অতিবিলম্বে রাজসকাশ হইতে পুনরায় ভারে ভারে উপঢৌকন আসিতে লাগিল। গামাও বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। 'শম্বুক' পোতের মূর বন্দীদিগকে তিনি মুক্তিদান

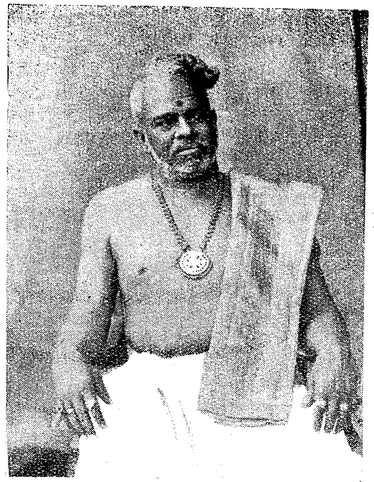

কালিকটের বর্ত্তমান জামোরিন বা হিন্দু মেয়র

করিলেন। উক্ত পোত এবং তন্মধ্যস্থ পণ্যসম্ভার রাজার নিকট প্রেরণ করিয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনের প্রার্থনা জানাইলেন।

তাহার পর উভয় ভ্রাতার মধ্যে কে তীরে অবতরণ করিবেন, এ সম্বন্ধে ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আলোচনা চলিল। ভাস্‌কো বলিলেন যে, তিনিই তীরে যাইবেন। যদি সত্যই কোন বিপদ ঘটে, তখন পাউলো জাহাজগুলি লইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিবেন।

তারপর মালিন্দীর রাজা ও ভাস্‌কো ডা-গামার সাক্ষাৎ বিষয়ে উভয় পক্ষ হইতে নানাবিধ প্রস্তাব আসিল। গামা বলিলেন যে, তাঁহার রাজা এমন ভাবে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তবে রাজামহোদয় যদি অনুগ্রহ করিয়া গামার জাহাজে আসেন, তবে তিনি বাধিত হইবেন। রাজা জানাইলেন, তাহা হইতে পারে না। তাঁহার প্রজাবর্গ কি মনে করিবে?

অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রফা নিষ্পত্তি হইল। রাজা পাল্‌কী করিয়া সমুদ্রকূলে নীত হইলেন—তাঁহার সহিত সহরবাসীরা আসিল। গামাও জাহাজের নৌকায়

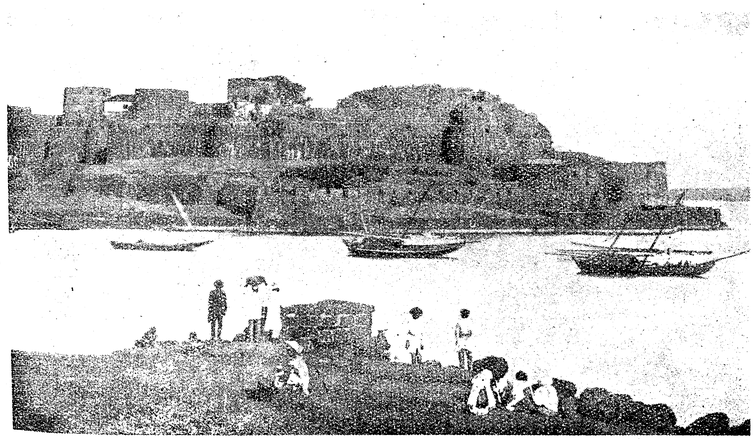

গোয়ার দুর্গ

সহকর্ম্মীদের সহিত উঠিলেন। মালিন্দীর রাজা গামার নৌকায় আরোহণ করিয়া জানাইলেন যে, পর্ত্তুগাল নরপতির সহিত তাঁহার যাবজ্জীবন সৌহার্দ্যবন্ধন দৃঢ় রহিল। গামা রাজাকে একখানি তরবারী উপঢৌকন দিলেন।

রাজা নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণের নিকট হইতে অধিক মূল্য লইয়া কেহ যেন কোন দ্রব্য বিক্রয় না করে। পর দিবস গামা তীরে গমন করিলেন। অতঃপর পর্ত্তুগীজগণ যদৃচ্ছ নগরে গমন করিলে কেহ কোনও কথা কহিত না। লিসবনে তাহারা যেমন স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করিত, এখানেও ঠিক তেমনই ভাবে চলিত।

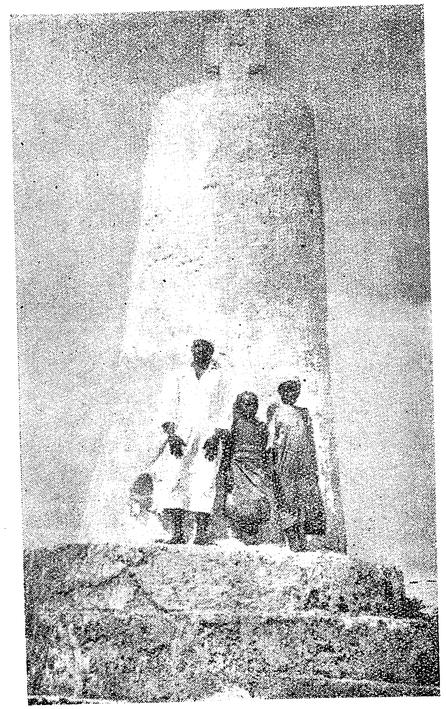

মালিন্দী—এই স্মৃতিসৌধ ভাসকো-ডা-গামার নির্ম্মিত বলিয়া কথিত

নারিকেলের ছোবড়া হইতে কিরূপে রজ্জু প্রস্তুত করিতে হয়, গামার নাবিকগণ এইখানেই তাহা প্রথম শিক্ষা করে। নারিকেল রজ্জু যে, অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী, তাহা তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

রাজা, গামা ও তাঁহার সহচরদিগের জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেন। রাজদূতের সম্মুখে সদলবলে গামা পরিতোষ পূর্ব্বক সে সকল ভোজ্য আহার করিলেন। তিনিও রাজার ভোজনার্থ পিয়ার্শের মোরব্বা পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাহা আহারের সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে ক্রমশঃ বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইল। রাজা এক দিন গামার জাহাজে বেড়াইতে গেলেন। গামা নানাবিধ ফলমূল সাহায্যে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিলেন।

মালিন্দী হইতে যাত্রা করিবার সময় রাজা গামাকে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং নারিকেল প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। কালিকট বন্দরে পৌঁছিয়া কি ভাবে গামা কার্য্য করিবেন, সে সম্বন্ধেও মালিন্দীরাজ অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন।

আরবসাগর-পথে ২৩ দিন যাত্রা করিয়া গামার পোতবহর লাক্ষাদ্বীপ একপার্শ্বে রাখিয়া কালিকট বন্দর অভিমুখে চলিল। মালাবারের গিরিমালাশোভিত উপকূল ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইল। আনন্দের আতিশয্যে গামা বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন; মহা[illegible] দিনে কাহারও প্রাণে তিনি বেদনার চিহ্ন রাখিতে চাহেন না।

ক্রমে কালিকট বন্দরের অনতিদূরে জাহাজগুলি নোঙ্গর [illegible] হইল। সাড়ে ১০ মাস পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজগণ লিসবন পরি[illegible] করিয়াছিল। উপকূলে দূত প্রেরণ করিয়া এবং যাহারা [illegible] দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বাঞ্চে[illegible] কালিকট সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জামোরি[illegible] সহিত সাক্ষাতের [illegible] তাঁহাকে বিশেষ [illegible] হইতে হইয়াছিল।

তিনি সংবাদ [illegible] জানিয়াছিলেন, [illegible] প্রান্তদেশে সুবৃহৎ [illegible] প্রাসাদে কালিকটের [illegible] পরম হিন্দু এবং [illegible] দরবারে অমাত্যবর্গের [illegible] নিরামিষভোজী ব্রাহ্ম[illegible] মাংসাশী নায়ার অ[illegible] এই নায়ারগণ অত্যন্ত [illegible] নিপুণ এবং বীর।

গামা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কালিকটরাজের [illegible] সৈন্য আছে, এবং নায়ার [illegible] সেনাপতি। নায়ার [illegible] ঢাল তরবারী ছাড়া [illegible] না। নিদ্রাকালেও [illegible] তাহার চিরসঙ্গী।

হিন্দুগণের মধ্যে [illegible] রাই অভিজাতবর্গীয় [illegible] শ্রেণীর লোকগণ [illegible] যুগেও উহাদের নিকট [illegible] ছিল। পথিমধ্যে যাহা[illegible] নায়ারের দৃষ্টিপথে [illegible] নিম্ন অস্পৃশ্য জাতি[illegible] পতিত হইত, তাহা [illegible] সে তাহাকে বিনা [illegible] ব্যয়ে কাটিয়া [illegible] এ অঞ্চলে এখনও [illegible] চরণীয় জাতি উচ্চবর্ণের কাছে তেমনই হেয় হইয়া রহিয়াছে।

কালিকটের মেফেয়ার জিলায় মোপলা জাতীয় বণিকগণ বাস করিত। হিন্দু মাতা ও মুসলমান পিতা হইতে [illegible] জাত। মুসলমান পিতার ধর্ম্মই তাহারা পালন করিত। মাতৃপক্ষের হিন্দু আত্মীয়গণের ব্যবসা তাহারা পরিত্যাগ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্যবসাবাণিজ্যই তাহারা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল।

কালিকটের বাণিজ্য বড় সাধারণ ছিল না। এই বন্দরে [illegible] ধরিয়া নানাবিধ মশলা রপ্তানী হইয়া আসিতেছিল। [illegible] হইতে বাজারে কালিকটের মশলা বিক্রীত হইত। গামার [illegible] রোনও য়ুরোপীয় কালিকট বন্দরে আসে নাই।

[illegible] সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে স্পানিয়ার্ড, পর্ত্তুগীজ, [illegible] এবং ইংরাজ বণিকগণ কালিকট বন্দরে উপস্থিত [illegible] ছিল।

[illegible] মশলার দাম অত্যধিক [illegible] তখন অর্দ্ধসের লবঙ্গের মূল্য [illegible] দুইটি পয়স্বিনী গাভী ক্রয় করা [illegible]। মক্কার বণিকদল জলযান [illegible] কালিকট বন্দর হইতে দারু[illegible] পণ্য বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। [illegible] হইতে দারুচিনি, মালাক্কা [illegible] লবঙ্গ, আদা ও লঙ্কা ভারত[illegible] অন্যান্য স্থান হইতে কালিকট [illegible] নীত হইত। মক্কার বণিকদল [illegible] ফল সুগন্ধি মশলা তথা হইতে [illegible] করিত। কালিকট হইতে [illegible] পণ্যভার লইয়া যাইতে সপ্তা[illegible] [illegible] সপ্তাহ অতিবাহিত হইত। [illegible] না হইলে উল্লিখিত জলযান[illegible] অগ্রসর হইতে পারিত না। [illegible] অত্যধিক সময় লাগিত। [illegible] শুল্ক প্রদান করিয়া বণিকগণ [illegible] উপসাগরের বন্দরসমূহে ক্ষুদ্রা[illegible] তরণীযোগে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ [illegible]। সেই সকল বন্দরে আবার [illegible] এক দফা শুল্ক দিতে হইত। সেই [illegible] বন্দর হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্যসম্ভার [illegible] হইয়া ১০ দিনে কায়রো বন্দরে [illegible] হইত।

কায়রো বন্দরে আবার শুল্ক দিতে [illegible]। তার পর পণ্যসম্ভার নৌকা[illegible] নীলনদের উপর দিয়া রসেটায় [illegible]। সেখানে আবার শুল্ক [illegible] বন্দোবস্ত ছিল। সেখান [illegible] উষ্ট্রপৃষ্ঠে বাহিত হইয়া পণ্য[illegible] আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নী[illegible]। তথায় [illegible] হইয়া [illegible] জেনোয়া অথবা ভিনিসের [illegible] প্রতীক্ষা করিত। জেনোয়া অথবা ভিনিস [illegible] য়ুরোপের বিভিন্ন নগরের ক্রেতৃগণ পণ্যসম্ভার ক্রয় [illegible] লইয়া যাইত।

সুতরাং মক্কার বণিকদল যে ভাস্কো-ডা-গামার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, ইহা তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য প্রথমতঃ তিনি কালিকট বন্দরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। মক্কার বণিকগণ তাঁহার প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অনাচার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি কালিকট বন্দর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে জাহাজ নোঙ্গর করিয়া পালকী চড়িয়া কালিকটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

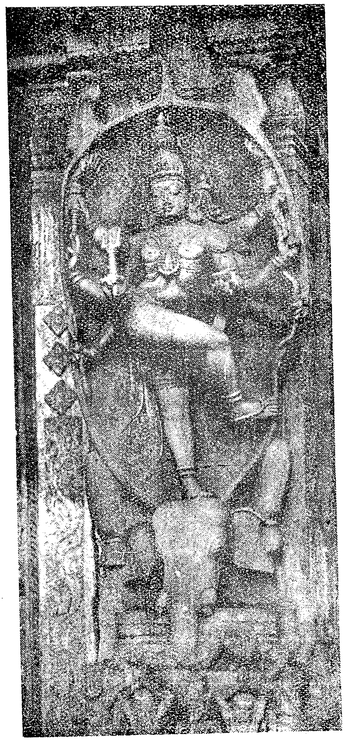

মাদুরার বীরভদ্র—গামা এই মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে কোনও খৃষ্টান মহাত্মা মনে করিয়াছিলেন

পথিমধ্যে পর্ত্তুগীজগণ জনৈক দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর গৃহে সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। কালিকটে পৌঁছিয়া একটি দেবমন্দিরে তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অট্টালিকা প্রস্তরনির্ম্মিত, তাহার কক্ষতল টালীর দ্বারা সুশোভিত।

যে তোরণপথে তাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার উপরিভাগে ৭টি ঘণ্টা দোদুল্যমান ছিল। দলস্থ একজন কালিকট বন্দরের বিবরণ-গ্রন্থে এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, "তাহারা পূত বারিধারা আমাদের উপর বর্ষণ করিয়া শ্বেতমৃত্তিকা আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। এ দেশের ধার্ম্মিকগণ উহা ললাট, বক্ষ, বাহু এবং কণ্ঠদেশে অনুলিপ্ত করিয়া থাকেন।"

মন্দির হইতে নির্গত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ রাজপথের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। জাহাজের বাদকগণ পশ্চাতে তূরীধ্বনি করিতে করিতে চলিল। রাজপথ জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইল, পথিপার্শ্বস্থ ভবন-শিখরে কতকগুলি কৌতূহলী নরনারী দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছিল।

ক্রমে জনবাহুল্যে পর্ত্তুগীজদিগের অগ্রগতি প্রতিহত হইতে লাগিল। এমন সময় রাজপ্রাসাদ হইতে একজন কর্ম্মচারী তথায় উপনীত হইলেন। তিনি রাজার গোয়েন্দা বিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। যে কোনও অনাহূত বৈদেশিকের শিরশ্ছেদনের ক্ষমতা তাঁহার উপর প্রদত্ত ছিল। তিনি উপস্থিত হইয়া জনতা হঠাইয়া দিয়া অভ্যাগতদিগের জন্য পথ মুক্ত করিয়া দিলেন।

তার পর ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিনের দরবারে উপনীত হইয়া কিরূপে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন, প্রবন্ধের প্রারম্ভে তাহা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন, সভা হইতে নির্গত হইতে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। রাজকর্ম্মচারীরা গামাকে সদলবলে সন্নিহিত একটি অট্টালিকায় পালকী সহযোগে লইয়া গেল।

মুরগণ নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা রাজামাত্যদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, গামা একজন পলাতক আসামী অথবা গুপ্তচর। বণিকের বেশে তিনি এ দেশে আসিয়াছেন। কোন

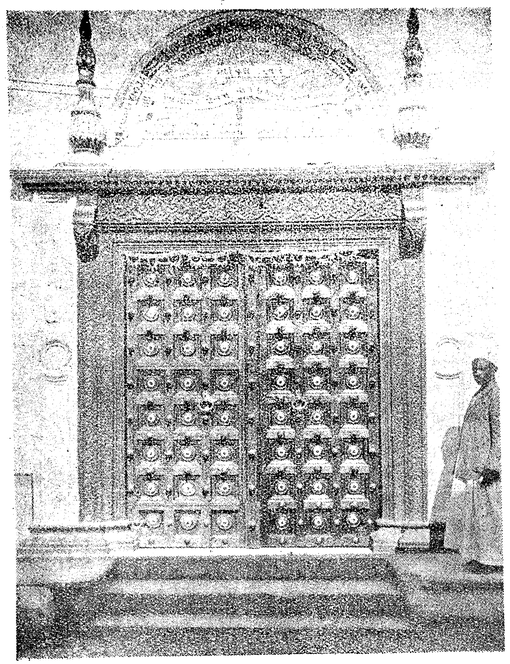

জাঞ্জিবারের মসজেদের প্রবেশ-দ্বার

কোন ঐতিহাসিক এমন কথাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, মুরগণ গামার শরীররক্ষক রাজসেনাদলকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, গামার জন্য জীন-রেকাবহীন এক অশ্ব আনীত হইয়াছিল। গামা সেই অশ্বে আরোহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রার্থনানুসারে অবশেষে পাল্কী আসিয়াছিল। ইহাতে গামার প্রতি অশ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক কালিকট রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে তুষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে। কারণ কালিকটে জীন-রেকাবহীন অশ্বারোহণপ্রথা বহুল প্রচলিত ছিল।

পথিমধ্যে গামার পাল্কী দ্রুত ধাবিত হওয়ায় তাঁহার অনুচরবর্গের অনেকে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাতে গামার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, পদব্রজে যাহারা আসিতেছিল, পাল্কীবাহকগণের সহিত তাহারা সমান তালে হাঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।

পাণ্ডারাণীতে পৌঁছিতে সূর্য্যাস্ত হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সে দিন জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেয় নাই। তিনি ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রোধবশে সে রাত্রিতে তিনি ভাল করিয়া আহার পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। পর দিবস রাজরক্ষিগণ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাঁহার জাহাজগুলি কূলের নিকটবর্ত্তী হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে তিনি সহজে জাহাজে উঠিতে পারিবেন। গামার মনে ইহাতে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, জাহাজগুলি বন্দর হইতে আরও গভীর সমুদ্রে গিয়া যেন অবস্থান করে।

গামার বাসভবনের চারিপার্শ্ব অস্ত্রধারী রাজপ্রহরিদিগের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেহ এই বিদেশী বণিকের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে না পারে, কালিকটরাজ সেই উদ্দেশ্যেই এইরূপ প্রহরার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

কয়েক দিন পরে গামার আনীত পণ্যসম্ভার রাজধানীতে পৌঁছিল। মুসলমানগণের মনোভাব তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহারা পর্ত্তুগীজ পণ্যগুলির দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কেহই সে সকল দ্রব্য ক্রয় করিবে না, এমন কথাও প্রকাশ করিল। তাহাই নহে, গামার জনৈক সহচর তাঁহার নিকট লিপিতে এমনও লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়াই মুসলমান বণিকগণ পুনঃ পুনঃ ভূমিষ্ঠ নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছিল।

জামোরিনের নিকট এ সকল সংবাদ পৌঁছিলে তিনি হিন্দু-বণিকগণকে গামার পণ্যসম্ভার পরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সে সকল দ্রব্য ক্রয় করিল না, তখন নিরুপায় তিনি পণ্যসম্ভার কালিকট সহরে লইয়া গেলে তথায় ক্রেতৃগণ সহজে উহা গ্রহণ করিতে পারিবে।

জামোরিনের জনৈক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী দ্রব্যগুলির দেশীয় মুদ্রায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। দেশীয় মুদ্রার মূল্য পর্ত্তুগীজ মুদ্রার অনুপাতে গামাও অবশেষে স্থির লইয়াছিলেন। ওজনের আদান-প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

তার পর পর্ত্তুগীজগণ দেশীয় পণ্যসম্ভার ক্রয় করিতে লাগিল। আদা ক্রয়কালে গামা দেখিলেন, তাহাতে মাটির ভাগ বেশী। অবশ্য আদা মৃত্তিকাশূন্য হইলে বেশী লাভ হয় না। কিন্তু বিক্রেতৃগণ এত অধিক মাটী মিশাইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে আদা বিক্রয় করিতেছিল যে, তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ অধিক হইতে পারে। গামা কৌশল সহকারে জানাইয়া দিলেন যে, পর্ত্তুগীজ নরপতিকে উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইতে হইবে। মৃত্তিকা মিশ্রিত আদারই প্রয়োজন। মূল্যের সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ করিতেছেন না। জামোরিন এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কিন্তু মুরগণ শত্রুতাচরণে বিরত ছিল না। তাহারা রাজাকে বুঝাইয়া দিল যে, জলদস্যু, ইহারা কখনই বণিক নহে। আর যদিও বা হয়, পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া যাহারা এক বৎসরে স্বদেশে

তাহাদের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাজার কি লাভ হইবে?

গামার আনীত বিক্রেয় পণ্য ক্রেতার অভাবে বিক্রীত হইতেছিল না। সুতরাং তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়া জামোরিনকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দূত কোনওরূপ উপঢৌকন সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। শুধু আনিল এগার হাজার টাকার একটা বিল। শুল্ক বাবদ উহা তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে। জামোরিনের কর্ম্মচারীরা শুল্ক আদায়ের জন্য গামার গুদামের চারিপার্শ্বে প্রহরী নিযুক্ত করিল। গামার ভাণ্ডারী, কেরাণী এবং কতিপয় নাবিককে তাহারা প্রতিভূস্বরূপ আটক করিল। গামাও ১৮ জন হিন্দুকে আটক করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। তাহাদের মধ্যে কতিপয় নায়ার ছিল। তাহারা অনশনব্রত অবলম্বন করায় প্রত্যহই তিনি বন্দীর পরিবর্ত্তে লোক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

গামার দূত পুনরায় জামোরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিলেন। জামোরিন ভাণ্ডার ব্লক প্রভৃতির কোন সংবাদই জানিতেন না বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে পর্ত্তুগীজরাজের উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ পত্রখানি লিখিয়া গামার নিকট প্রেরণ করেন। কালিকটে ১ জন মাত্র লোককে গামা তাঁহার দ্রব্যসম্ভারের বিনিময়ে জাহাজে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

আরবদিগের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গামা কালিকট ত্যাগ করিলেন। গোয়ার উত্তরদিকের উপকূল সহ প্রদক্ষিণ করিয়া গামা আরবসাগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দক্ষিণাভিমুখে জাহাজ পরিচালনকালে তিনি ৮খানি আরব নৌকা দেখিতে পায়েন। উহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তিনি ৪খানি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করেন। বাকীগুলি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। মালিন্দীতে পৌঁছিলে, রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া তিনি জাঞ্জিবারে গমন করেন। মোজাম্বিকের কাছাকাছি আসিয়া 'রাফেল' নামক জাহাজ অচল হইয়া পড়ে। ইতঃপূর্ব্বে রোগাক্রান্ত হইয়া বহুসংখ্যক নাবিক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। রাফেল পরিচালনার উপযুক্ত নাবিক না থাকায় উহা পরিত্যক্ত হয়। দুইখানি জাহাজ লইয়া গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। 'বেরিও' জাহাজসহ তাঁহার কতিপয় সহচর লিসবনে যাত্রা করে। গামা পীড়িত ভ্রাতাকে লইয়া 'আজোরস্' অভিমুখে গমন করেন। জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামে অবশেষে পাউলো দা গামা পরাজিত হয়েন। টারসিরা দ্বীপে জাহাজ পৌঁছিবার পর দিবস তাঁহার জীবনান্ত হয়।

ভ্রাতার জন্য ১০ দিন শোকমগ্ন থাকিবার পর ভাস্কো ডা গামা

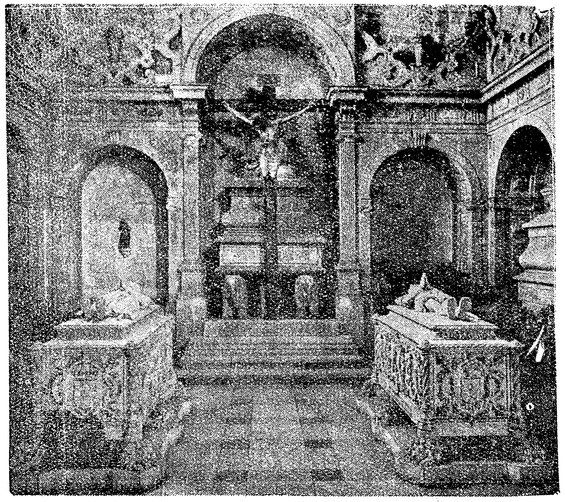

যুগ্ম সমাধি—কবি কামোয়েন ও ভাস্কো-ডা-গামা

লিসবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার ভ্রাতা পরলোকে, তিন ভাগ নাবিকের দুই ভাগ অনন্ত পথের যাত্রী—পোতবহরের অর্দ্ধভাগ বিসর্জ্জিত। তথাপি তিনি স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিয়াছেন। পর্ত্তুগীজগণ তখন ভারতবর্ষের সমুদ্রপথের অধিকারী। কৃতজ্ঞ পর্ত্তুগীজরাজ গামাকে বৃত্তি ও সম্মানজনক পদবী দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

পর্ত্তুগালের আধিপত্য স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছিল। ভাস্কো-ডা-গামার প্রচেষ্টার ফলে আলেকজান্দ্রিয়া, জেনোয়া, মিলান এবং তুরস্ক ও বারবারি জলদস্যুদিগের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাডিজ, লিস্‌বন, ব্রিষ্টল ও এন্‌টোয়ার্পই অতঃপর পাশ্চাত্য-জগতে শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইটালীর নগরসমূহ বাণিজ্য পণ্যসম্ভারের ফলে বিজ্ঞান ও ললিতকলায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে ক্রমশঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং উত্তরসাগরস্থিত দেশনিচয়ে বিজ্ঞান ও ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইতে লাগিল।

গামার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পেড্রো আল্‌ভার্স কাবরাল্ লিসবন্ হইতে ত্রয়োদশ অর্ণবপোত লইয়া দেশ আবিষ্কারে বহির্গত হন। তিনি অবশেষে দক্ষিণ-আমেরিকায় পৌঁছিয়া এক খণ্ড ভূমি পর্ত্তুগালের নামে অধিকার করেন, উহা এক্ষণে ব্রেজিল বলিয়া খ্যাত। তার পর তিনি কালিকট বন্দরে উপনীত হন।

গামা ইহার পর আর দুই বার ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন,

কিন্তু এই যাত্রার উদ্দেশ্য আবিষ্কার নহে—উপনিবেশস্থাপন। দ্বিতীয় যাত্রায় তিনি প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, তৃতীয় যাত্রার উদ্দেশ্য শাসন ও সংরক্ষণ। কাব্‌রাল ৪০ জন পর্ত্তুগীজকে কালিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন। দেশীয়গণ তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া বিদিত।

প্রতিশোধ কামনায় উদ্দীপিত হইয়া গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। মালাবার উপকূলের অনতিদূরে তিনি একখানি আরব নৌকা দেখিতে পান। মক্কাতীর্থযাত্রীরা উক্ত নৌকায় ছিল। উহাকে আক্রমণ করিয়া তিনি নৌকায় অগ্নিসংযোগ করেন এবং আরোহীদিগকে জীয়ন্ত দগ্ধ করিয়াছিলেন। শুধু ২০ জন শিশুর প্রতি তিনি অত্যাচারে বিরত ছিলেন। উল্লিখিত পোতে ৩৮০ জন নর-নারী ছিল। ১২ হাজার ডিউকাট্ মুদ্রা এবং ১০ হাজার মুদ্রার তৈজসপত্র অধিকার করিয়া সকলকে জীয়ন্ত দগ্ধ করার গৌরব অর্জ্জন করিবার কাহিনী গামার সমসাময়িক ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গামা সেই সময়ে বলিয়াছিলেন, "শত্রুকে যে মার্জ্জনা করে, শত্রুহস্তে তাহাকে প্রাণ দিতে হয়।" ২০ জন শিশুকে গামা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

পোতবহর কালিকটে উপনীত হইলে জামোরিন পর্ত্তুগীজগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু গামা তাহাতে উত্তর করেন যে, তাঁহার রাজা জামোরিনের অপেক্ষা যোগ্য শাসনকর্ত্তা তালগাছ হইতে নির্ম্মাণ করিয়া লইবেন।

ইহার পর জামোরিনের পোতবহরকে তিনি কামানের গোলার সাহায্যে সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করেন। কতিপয় ধীবর ও ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া গামা তাহাদিগের হস্ত, কর্ণ, নাসিকা, ছেদন করিয়া কর্ত্তিত অংশগুলি কোনও দূত মারফৎ জামোরিনের নিকট প্রেরণ কালে বলিয়া পাঠান, রাজা যেন উক্ত কর্ত্তিতাংশ অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া ভক্ষণ করেন।

পৈশাচিক ও নির্দ্দয় অত্যাচারপীড়িত হতভাগ্যগণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল। গামার আদেশে তাহাদিগকে একটি ভেলায় চড়াইয়া হস্তপদ এমন ভাবে আবদ্ধ করা হয় যে, তাহাদিগের পলায়নের কোন উপায় ছিল না। পাছে দন্ত সাহায্যে তাহারা বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলে, এজন্য প্রত্যেকের দন্তগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। মুমূর্ষু প্রাণিসমূহের দেহের উপর মাদুর তোষক এবং শুষ্ক পত্র স্তূপীকৃত করিয়া সাজাইয়া গামার অনুচরগণ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে। ভেলাখানি অতঃপর কূলাভিমুখে প্রেরিত হয়। তার পর গামা নগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কামান হইতে গুলী নিক্ষেপ করিতে থাকেন।

প্রতিশোধ গ্রহণের পর গামা কোচিন, ক্যানানুর এবং অন্যান্য স্থানের শাসকদিগের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লিখিত স্থানে পর্ত্তুগীজগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য কারখানা-সমূহ স্থাপন করে।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো ডি আলমিডিয়া প্রথম রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি পর্ত্তুগীজ নরপতিকে লিখিলেন যে, বর্ত্তমানে কোনও দুর্গ নির্ম্মাণ বা জনপদ অধিকার করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। বাণিজ্যপথ নিরাপদ রাখিবার জন্য নৌ-বাহিনীর বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

ইহার পর ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ আধিপত্যের কাহিনী ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ভাস্‌কো-ডা-গামা বিবাহ করিয়া প্রচুর বিত্তবিভব উপার্জ্জন করিতে থাকেন। রাজা ম্যানোয়েলের মৃত্যুর পর রাজা তৃতীয় জন ভাসকো-ডা-গামাকে ২১ বৎসর বিশ্রামের পর আবার ভারতবর্ষাভিমুখে প্রেরণ করেন। ইহাই তাঁহার তৃতীয়বার ভারতবর্ষ যাত্রা।

গামা তখন পরিণত বয়স্ক বৃদ্ধ—শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডলে তাঁহার আনন আবৃত। সম্রাটের ন্যায় মর্য্যাদায় তিনি ভারতবর্ষ শাসন করিতে আসিয়াছেন, তখন পর্ত্তুগীজ অধিকারে পর্ত্তুগীজগণ নানাপ্রকার অনাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি স্বজাতীয় বলিয়া তাহাদিগকে রেহাই দেন নাই। অপরাধী মাত্রকেই তিনি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শাসনশৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন। অনেকে উৎকোচ দানে তাঁহাকে বশীভূত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গামা উত্তরে বলিয়াছিলেন, তিনি নিজের জন্য আসেন নাই। তাঁহার রাজার ঐশ্বর্য্য বৈভব বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত।

শাসনপদ্ধতিতে যে সকল গলদ ছিল, তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকল বিষয়ে সংস্কারসাধন করেন। জলদস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য দ্রুতগামী তরণীসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া সকলের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে সকল দিকে সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছিল। তাঁহার স্কন্ধে একটি স্ফোটক হয়, তাহাই ফলে ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে কোচিনে গামার দেহান্ত হয়।

প্রথম যাত্রায় তিনি ভারতবর্ষের বাণিজ্য-দ্বার যুরোপকে পথিপ্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় যাত্রায় নিষ্ঠুর ব্যবহারে দেশীয়গণের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেন। তৃতীয় যাত্রায় তিনি অকৃত্রিম রাজভক্তি এবং সাধুতার পরিচয় প্রদান করিয়া একটি আদর্শ রাখিয়া যায়েন।

তাঁহার দেহাবশেষ কিছুকাল পরে পর্ত্তুগালে প্রেরিত হইয়াছিল। তখন পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে জাতীয় নায়ক বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিল।

কোচিন হইতে আহৃত গামার দেহাবশেষ বেলেমের মঠ-মন্দিরে পর্ত্তুগীজ কবি কামোয়েনের সমাধি-পার্শ্বে সযত্নে সংস্থাপিত সৌধমধ্যে অবস্থিত। পর্ত্তুগীজ কবি গামার কীর্ত্তিকে অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গামার জলযাত্রা বিবরণ কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা হইতে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। সৈনিক কবি কামোয়েন 'লুসিয়াড্' নামক গ্রন্থে গামার জলযাত্রার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

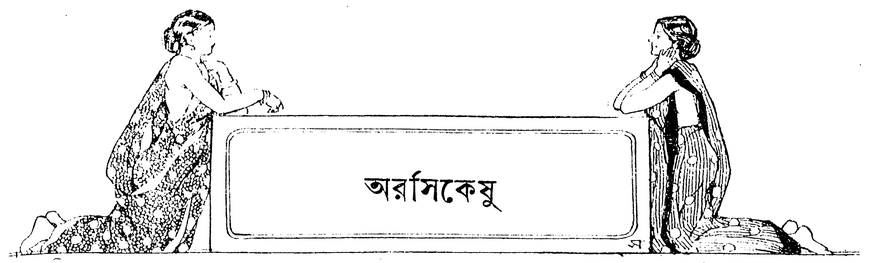

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবুজ সাহিত্য

সুরো ছেলেটির বয়স তেরো পার হইয়াছে—সে জেলা স্কুলের থার্ড ক্লাশে পড়ে। লেখাপড়ায় চাড় তত না থাক্, পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান-সঞ্চার তার এই বয়সেই যা হইয়াছে, তা প্রচুর। থাকে সে ভাগলপুরে। সেখানকার জল-হাওয়া ভালো। একে এই জল-হাওয়া, তায় উর্ব্বর প্রাণ, নবযুগের সবুজ সাহিত্য, কাজেই ডিমাই, ডবল-ক্রাউন প্রভৃতি নানা আকারের মাসিক-পত্রের মারফৎ সে-প্রাণে ভাবের শস্য ভালো করিয়াই গজাইয়া তুলিয়াছে।

তাদের একটা ক্লাব আছে। সে ক্লাবে কলিকাতার থিয়েটারের নাট্য-সাহিত্য হইতে সুরু করিয়া মিশরের প্রাচীন ইতিহাস লইয়াও নাড়াচাড়া চলে। নবযুগের ডিমোক্রেটিক সাহিত্যের চর্চ্চা যে ভালো করিয়াই হয়, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বাড়ীতে মাসিক-পত্রও আসে অনেকগুলি। সুরোর বাপ জলধিনাথ চাটুয্যে ভাগলপুরের মস্ত উকিল। অগাধ পয়সা এবং তাঁর অনেকগুলি পয়সা বাংলা-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে মন্দর হইতে ব্যয় করা হয়। তাঁর মেজ মেয়ে শুকতারা মিশন স্কুলে ম্যাট্রিক পড়িতেছে। তরুণ সাহিত্যের এই বুর্ণী তাকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ার অনেকগুলি তরুণীকেও এদিকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই ঘরে-বাহিরে সাহিত্য-রসের জোগান পাইয়া সুরোর তরুণ মনে সবুজ রঙের ছোপ লাগিবার পক্ষে ভালো রকমই সুবিধা ঘটিয়াছে।

ক্লাবে সে দিন আলিবাবার রিহার্শাল চলিয়াছিল। সুরো মর্জ্জিনা সাজিবে। তাকে হাবভাব শিখাইতে মোশন-মাষ্টারকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। সাহিত্যের কল্যাণে মনস্তত্ত্ব ব্যাপারে সে নেহাৎ অজ্ঞ ছিল না। বেচারা জলধিনাথ মক্কেল লইয়া সর্ব্বক্ষণ এমন ব্যস্ত থাকিতেন যে, পোষ্যবর্গের নানা অভাব-অভিযোগের দিকে দুই হাতে পয়সা ঢালিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতেন, ওদিককার কর্ত্তব্য ঠিক সারা হইয়া গেল,—খুঁটীনাটী দেখিবার আর প্রয়োজন নাই! আসল কথা, প্রয়োজনের কথা ভাবিবার তাঁর অবসরও ছিল না।

হুসেনের সঙ্গে মর্জ্জিনার প্রণয়ের দৃশ্যটা রিহার্শাল দিয়া সুরো যখন গৃহে ফিরিল, রাত তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। জলধিনাথ বাহিরের ঘরে বসিয়া মোটা একখানা আইনের কেতাবের পাতায় এমন মশগুল যে, সুরোর দিকে তাঁর নজরও পড়িল না। সুরো আসিয়া একবারে দোতলায় নিজের পড়ার ঘরে হাজির হইল। আলোটা জ্বালিয়া গুণ গুণ করিয়া সে গান গাহিতেছিল—

আমি ঢের সয়েছি, আর তো সবো না,
তোমার কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন
বেচে পরবো না!……

গাহিতে গাহিতে সে টেবলটা গুছাইতে লাগিল। পড়ার বইগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ব্লটারটার উপর কে দোয়াত উপুড় করিয়া দিয়াছে। সর্ব্বনাশ! তার মর্জ্জিনার পার্ট-লেখা কাগজখানা মসীলিপ্ত! পাশে অ্যালজেব্রার মলাটখানারও সেই দশা! ট্রান্সলেশনের খাতা খোলা ছিল, তার পাতার উপরও কালীর ঢেউ ছুটিয়াছে! কাল সকালে ক্লাশে দেখাইতে হইবে! টীচার ঈশানবাবু খাতা দেখিয়া যা রণমূর্ত্তি ধরিবেন! রাগে সে জ্বলিয়া উঠিল, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—ভিখনা…

কোনো সাড়া নাই। আবার সে হাঁকিল,—ভিখনা…

—যাই দাদাবাবু…জবাবের সঙ্গে সঙ্গে ভিখনা আসিয়া হাজির। সুরো টেবলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—কে এ কায করলে, শূয়ার?

ভিখনা টেবলের দিকে চাহিয়া কহিল,—সাফ করতে আসতেছিনু…মেজদিদিমণি লিখাপড়া করছিলেন। আলো

বাড়িয়ে ওঠে, কমাতে গিয়ে দোয়াত উল্টিয়ে দেহছন···হামায় বললেন, হামিও আসতেছিনু···

টেবলের নীচে কথানা লেখা কাগজ···সুরো কহিল,—সব সাফ কর্···

ভিখনা টেবল সাফ করিতে উদ্যত হইল। সুরো লেখা কাগজগুলা লইয়া দেখিতে লাগিল। এটা বাজারের হিসাব··· পেট্রোলের একটা রসিদ, একখানা পুরানো প্রেসক্রপসন, ফর্ম্মামিণ্টের ছাপা বিজ্ঞাপন···এটা··· ? একখানা চিঠির টুকরা···এ যে মেজদির হাতের লেখা! তাই তো, কাকে লিখিয়াছে··· ?

সুরো পড়িতে লাগিল,—মেজদি লিখিয়াছে—

কাল সে আস্‌চে। আমার তরুণ প্রাণে দুরন্ত ঝড়ের মত··· সেখানে যত সাধ, যত আশা রঙীন ফুলের মত ফুটে বর্ণে-গন্ধে আমায় বিভোর করে রেখেছে, সে-সব সে এসে মত্ত হস্তে ছিঁড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে! একটা দুরন্ত দৈত্য, একটা বৃদ্ধ শয়তান··· আমি তাকে ভালবাসবো? কখনো না। জোর করে বাপ-মা তার হাতে আমার এ তরুণ প্রাণ সঁপে দিতে চান্··· ! হায় রে, প্রাণের উপর এ শাসন চলে কখনো? আর যার চলুক, আমার নয়। আমি চলতে দেবো না। তার হাতে এ তরুণ প্রাণ তুলে দেবার আগে···বিষ! ঠিক! বিষের বাটি মুখে তুলে এ প্রাণ শেষ করে দেবো··· ! তরুণীর প্রণয় চায় এই গর্দ্দভ··· ? এই গলিত জীর্ণ···

এইটুকু! এর পরের অংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে! এটুকু পড়িয়া সুরো দুনিয়া ভুলিয়া গেল। মেজদির বিবাহের কথা যে চলিতেছে, এ খপর তার অবিদিত নয়। কিন্তু এমনি একটা বর্ব্বর বরের সহিত?...আবার সে এখানে আসিতেছে—কালই! মেজদি তাই তার কোনো সখীকে বুঝি এই চিঠিতে প্রাণের বেদনা জানাইয়াছে! বিষ! সর্ব্বনাশ! সুরোর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল! সে ভাবিল, ভাগ্যে সে এ চিঠিখানা দেখিয়া ফেলিয়াছে···এ বিপদ হইতে মেজদিকে সে রক্ষা করিবেই—যেমন করিয়া পারে! গৃহে যদি এ জন্য প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হয়, তবু সে হঠিবে না! নাটক-নভেল হইতে প্রণয়ের মাহাত্ম্য সে ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। তার মনে অনুশোচনা জাগিল এই ভাবিয়া যে, ক্লাবে নিরালায় বসিয়া সে আলিবাবার রিহার্শাল দিতেছিল, আর তারই গৃহে এত বড় হৃদয়-নাটকের করুণ অভিনয় চলিয়াছে, সে তার কোন খোঁজ রাখে নাই!···

বাহিরে কার পায়ের শব্দ শুনা গেল। সুরো তাড়াতাড়ি চিঠির টুকরাটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল, মেজদিদি শ্রীমতী শুকতারা দেবী।

সুরো মেজদিদির পানে চাহিল, চোখের দৃষ্টি সমবেদনায় ভরা···আহা, বেচারী! মেজদি কিন্তু রুষ্ট স্বরে কহিল—এত রাত্রি অবধি কোথায় ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াচ্ছিলে! লেখাপড়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই···বুড়ো হাতী!

সুরোর হাড়-পাঁজরাগুলা এ রূঢ় ভৎর্সনায় যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! হায় মেজদি, তোমার কথা ভাবিয়া তার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছে, আর তুমি রূঢ় ভৎর্সনায়···

মেজদি কহিল,—আমার যত মাসিকপত্রগুলো তোমার পড়ার টেবিলে এলো কি করে? ফের যদি এ সব বই ঘাঁটো তো বাবাকে বলে তোমায় আচ্ছা করে সাজা দেওয়াবো,···লক্ষীছাড়া ছেলে! ও সব বই তোমার পড়ার জন্য নয়···

অত্যন্ত অপরাধীর মত কাঠ হইয়া সুরো দাঁড়াইয়া রহিল। মেজদি ভিখনাকে কহিল,—তোর টেবিল সাফ করা হলো রে?

ভিখনা কহিল—হাঁ···

সুরো এই অবসরে কহিল,—আমার ট্রান্‌স্‌লেশনের খাতা ছাখো দিকিন্ কি হয়েছে···

মেজদি সবজান্তার কহিল—খাতাপত্তর গুছিয়ে রাখতে পারো না···টেবিল নয় তো, যেন আঁস্তাকুড়! ট্রান্‌সেলেশনের খাতা গিয়ে থাকে, ফের লেখো···কথাটা বলিয়া মেজদি কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কি খুঁজিতে লাগিল,—সুরো ভীত-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, তার সাধু সঙ্কল্পের কথা মেজদিকে খুলিয়া বলে, কিন্তু মেজদি গোড়া হইতেই যে ঝাঁজালো ভৎর্সনা সুরু করিয়াছে! কি জানি, বামাল-সমেত গ্রেফতার হইয়া গেলে এখন হয় তো উল্টা ফল ফলিয়া যাইতে পারে। বিশেষ মেজদির হৃদয় যখন এখন বেদনার জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে!···

তার চেয়ে কার্য্যসিদ্ধির পরে বুক ফুলাইয়া যখন সে অভয় বাণী প্রচার করিবে, তখন···ভবিষ্যতের সে ছবি মানস-চক্ষুতে দেখিয়া সে নিজেই বিমোহিত হইয়া উঠিল।

মেজদি কি খুঁজিতেছিল, পাইল না···তখন ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ও শাসনের দুটা স্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া গেল—পড়ো এখন দয়া করে। কাল

রাত্রে বলে দিচ্ছি—বাবুর রাত্রে ফেরা হয় আড্ডা দিয়ে। তোমার যা হাল করি, দেখো কাল···

নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর পৃথিবী! সুরোর মনে হইল, এতটুকু সহানুভূতির অভাবেও এ পৃথিবী আজো টিঁকিয়া আছে কি করিয়া—আশ্চর্য্য!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ-পর্ব্ব

পরের দিন। খাবার-ঘরে এক ধারে বসিয়া মা আহ্নিক করিতেছিলেন। ভাত খাইতে বসিয়া মাকে একান্তে পাইয়া সুরো কস্ করিয়া প্রশ্ন তুলিল,—হ্যাঁ মা, মেজদির বিয়ে হবে?

মা কহিলেন,—হবে না!

সুরো ভাতের গ্রাস মুখে তুলিল। মা জপ সারিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া মাথায় ছিটাইয়া কহিলেন,—কেন, তোমার হঠাৎ সে খোঁজ কেন?

সুরো কহিল,—না, তাই বলছিলুম। ইহার বেশী বলিবার শক্তিও যা ছিল, সেটুকু অন্তর্হিত হইল, তখনি সে ঘরে মেজদি আসিয়া অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়ার দরুণ। শুকতারা কহিল,—কি বল্‌ছিলি রে?

সুরোর টাক্‌রায় মাছের কাঁটা ফুটিল। গলায় আঙ্গুল দিয়া কাসিয়া মুহূর্ত্তে সে এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, সে এ কথার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন, সুরোকে কহিলেন,—লক্ষীছাড়া ছেলে! যত কায খাবার বেলায়! মাছের কাঁটা ছাড়া—ছাড়িয়ে খা, তা নয়, যত তাড়া এই বেলা! স্কুলে যাবেন! কি নিয়ে যাবেন, তার ঠিক নেই!

শুকতারাও ধুয়া পাইয়া কহিল,—আবার নাইতে গিয়ে গোমার ছেলের গান হচ্ছিল।

গলার কাঁটা কোথায় সে উবিয়া গেল! সুরো কাসি থামাইয়া কান্নার সুর তুলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, কোথায় গান গেয়েছি? বা রে!

শুকতারা গম্ভীর মুখে কহিল,—কেন, নাইবার ঘরে।

সুরো কহিল,—সে বুঝি গান! আজকের জিওগ্রাফির পড়াটা মুখস্থ বলছিলুম।—বলিয়া আবার গলায় আঙ্গুল পুরিয়া সে একটা বিকট মুখভঙ্গী করিল।

মা কহিলেন,—কাঁটা নেমে যায় নি?

সুরো অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে জবাব দিল,—না।

মা কহিলেন,—যা তো মা শুকু, একটা কলা এনে দে তো ওকে,···কোঁৎ কোঁৎ করে গেল্—এখনি যাবে'খন।

শুকতারা কলা আনিতে চলিয়া গেল। সুরো বড় বড় ভাতের ড্যালা পাকাইয়া গিলিতে লাগিল। তার পরই সে হাঁকিল,—দুধ দাও।

মা হাঁকিলেন,—ওরে লখিয়া···

লখিয়া গরম দুধের বাটি আনিয়া পাতের কাছে ধরিয়া দিল। শুকতারা কলা আনিয়া দিল। সুরো দুধে ভাত মাখিয়া চট্‌পট্ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। এই মেজদির বিপদে সে ভাবিয়া সারা হইতেছে! ধেৎ, যা হয় হোক,···ভাই বলিয়া এতটুকু যার দরদ নাই, তার জন্য সুরোর ভাবিতে বহিয়া গিয়াছে!

উপরে গিয়া দেখে, পেন্সিল নাই। হারাইয়াছে! কাল সন্ত একটা পেন্সিল কিনিয়াছে,এখন চাহিতে গেলে তাড়া খাইবে! দাদার কাছে চাহিবে? দাদার ঘরে গিয়া সে ঢুকিল। দাদা তখন নিবিষ্ট মনে স্পোর্টিং সর্টের উপর নিজের হাতে ইস্ত্রী চালাইতেছে! সুরো কহিল,—আজ তোমাদের ম্যাচ আদমপুর ক্লাবের সঙ্গে? না?

দাদা সোমনাথ বি-এ পড়ে। বড় বড় বই পড়ার দরুণ ছোট ভাইদের খুবই হেলার দৃষ্টিতে দেখে। বিশেষ সুরো,··· ওটা তো গাধা! দাদা বলিল,—হ্যাঁ।

সুরো কহিল,—তুমি ব্যাকে খেলবে, না, হাফ ব্যাক?

দাদা কহিল,—তোর সে খপরে দরকার! ইস্কুলে যাচ্ছিস, ইস্কুলে যা—

সুরো কহিল,—একটা পেন্সিল দাও না, দাদা। আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না,···আজ ফার্ষ্ট আওয়ারেই অ্যালজেব্রা।···

দাদা কহিল,—আমার সে পেন্সিল তোমায় দিয়ে তার মাথা খেতে পারি না তো।

সুরো কহিল,—তা হলে চারটে পয়সা···

দাদা কহিল,—পকেট থেকে নিগে যা···

সুরো জামার পকেট হাতড়াইতে চলিল। দাদা কহিল,—দেখো, চারটে নিও, তার বেশী একটি নয়···

সুরো কহিল,—আর দুটো···দাদা, লক্ষীটি, দু'পয়সার লজেঞ্জেস—তোমার পায়ে পড়ি···

দাদা চটিয়া কহিল,—যা, নিগে যা, ছ' পয়সা—কিন্তু তার বেশী একটিও নয়,—খবর্দ্দার!

এমন সময় মা আসিলেন; আসিয়া সোমনাথকে কহিলেন,—হ্যাঁ রে, তা হলে তিনটে একুশের ট্রেণের সময় ষ্টেশনে যাচ্ছিস তো···নলিন বাবুকে আনবার জন্য··· ? উনি বলে গেলেন, তোর কলেজের ছুটী আছে···তাই।···

সুরো একবার মার পানে চাহিল, পরক্ষণে দাদার পানে···তাই···তাহা হইলে তার কথাই হইতেছে! সে তবে আসিতেছে, সত্যই···মেজদির তরুণ প্রাণের সেই দুরন্ত দৈত্য, ···বৃদ্ধ শয়তান··· !

সোমনাথ কহিল,—তোমাদের যত এ! আমার আজ বেজায় কায। চারটের মধ্যে গ্রাউণ্ডে যেতে হবে,—ম্যাচ—চাকর-বাকরদের কাকেও পাঠাও না, বাপু। কেন, রতন বাবু যেতে পারেন না ? কি, মুন্সী ?

রতন বাবু ও মুন্সী জলধি বাবুর দুই মুহুরি। মা বলিলেন,—মানী লোক, যাকে তাকে পাঠানো চলে না, মোটরখানা বিগড়ে রয়েছে,—তাই তোমায় বলা! এটুকুও পারবে না ?

সোমনাথ বিরক্ত ভাবে কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে—যাবো, বেশ···

মা কহিলেন,—এত গোরা মেজাজ কিসের। যাঁর কাযে যাচ্ছো, তাঁর কাছে ও মেজাজ চালাতে পারো না! আমার কাছে যত তম্বি! বেশ! কাছারী বেরুবার সময় আমায় বলে গেছলেন, তোমায় মনে করিয়ে দিতে—দিলুম। তোমার কায তুমি কর না কর, তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করো।···মা চলিয়া গেলেন। সুরো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সোমনাথ ইস্ত্রী রাখিয়া সর্টটা সযত্নে ভাঁজ করিতে লাগিল।

তার পর পয়সা লইয়া সুরো ডাকিল,—দাদা—

বিরক্ত ভাবে সোমনাথ কহিল,—কি ? আরো পয়সা চাই না কি ?—পাবে না!

সুরো কহিল,—পয়সা নয়।

সোমনাথ কহিল,—তবে ?

সুরো কহিল,—মা ষ্টেশনে যাবার কথা বলছিল না ?··· কাকে আনবার জন্যে, দাদা ?

সোমনাথ কহিল,—হ্যাঁ। ও নলিন বাবু—মহা খাতিরের ব্যক্তি আসছেন কি না...আলাতন!

বাধা দিয়া সুরো বলিল,—তা তোমার যদি ষ্টেশনে যাবার ফুরসৎ না থাকে, আমি গেলে হবে ? আমি যেতে পারি।... কথাটা বলিয়া সে দাদার পানে কৌতূহল-ভরে চাহিয়া রহিল,.. সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিসন্ধি মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া উঠিল।

সোমনাথ সোৎসাহে কহিল,—পারিস তুই যেতে! এইটুকু বলিয়াই তার উৎসাহ কমিয়া গেল। সে কহিল,—কিন্তু তোর যে স্কুল···

সুরো কহিল,—তা হোক্ গে, ছুটি নেবো'খন। তুমি একটা চিঠি লিখে দাও না হেড-মাষ্টারের নামে।

সুরোর মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আঃ, তাহা হইলে...

দাদা কহিল,—আচ্ছা, লিখে দিচ্ছি। নাম নলিন বাবু... বুঝলি···বেশ মোটাসোটা লোক, আর সৌখীন। জমীদার মানুষ কি না! বয়স প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর—চিনে নিতে পারবি ?

সোৎসাহে সুরো কহিল,—খুব পারবো।

সোমনাথ বলিল,—গয়া প্যাসেঞ্জারে আসছেন, নলহাটি থেকে।···ট্রেণ এসে ভাগলপুরে পৌঁছুবে ৩-২১এ। তা হলে পারবি তো ? যদি পারিস, তা হলে এক বোতল ক্রস্ ব্লাক ওয়েলের জ্যাম কিনে দেবো তোকে!

সুরো কহিল,—কেন তুমি ভাবছো! ঠিক যাবো।

সোমনাথ স্কুলের হেড-মাষ্টারের নামে চিঠি লিখিয়া দিল, সুরো চিঠি লইয়া মহানন্দে স্কুলে ছুটিল।

ক্লাসে ঢুকিয়া সে যতীশকে ডাকিয়া এক ধারে লইয়া গেল। যতীশ তাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। সাহিত্যের পথে সে তাদের অগ্রদূত। তার কবিতা কলিকাতার মাসিক-পত্র 'কচি ও কাঁচায়' নিয়মিত ছাপা হইতেছে। মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে রীতিমত ওস্তাদ সে!

যতীশের কাছে কোন কথা সে গোপন করিল না। কোন্ দিকে যে বাপ-মা একটা দুরন্ত দৈত্যের হাতে জোর করিয়া সমর্পণ করিতেছেন, মেজদির প্রাণের সহস্র নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, এর বিরুদ্ধে সে সকল শক্তি লইয়া দাঁড়াইতে চায়, বাড়ীতে এখনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে তার সাহস হয় নাই।···বাড়ীতে সকলে এ বিষয়ে এমন নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার যে, কাহারো মুখে-চোখে এতটুকু উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই, আশ্চর্য্য··· ··· !

যতীশ কহিল,—তোর মেজদি··· ?

সুরো কহিল,—মেজদির সঙ্গে কথাটা কইতেই পারি না। তার মেজাজ কাল থেকে ভারী গরম হয়ে রয়েছে, আমায় তো বকুনি ছাড়া কথা নেই।

যতীশ কহিল,—তাই হবে! হওয়া উচিতও। বলিয়া সে চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিল। তার পর কহিল,—বাঙ্গালী ঘরের অবলা বালিকা কি না,···নীরবে নির্য্যাতন সহ্য করছেন! তবু প্রাণটা ভিতর থেকে ক্ষোভে আর রোষে জ্বলে জ্বলে উঠছে, তাই সে রোষের আগুন সব-চেয়ে যে নিরীহ, তার উপরই নিক্ষেপ করছেন···বুঝলি রে সুরো··· । বলিয়া যতীশ অত্যন্ত মুরুব্বির ভঙ্গীতে সুরোর পানে চাহিল। তার পর তার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল,—এইটেই যে Psychology···ঠিক!

সুরো চট্ করিয়া সেই ছেঁড়া চিঠির টুকরাটা যতীশকে দেখাইল। যতীশ সেটা পড়িল। পড়া হইলে সুরো কহিল,—কেমন ?

—হুঁ। বলিয়া যতীশ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল। সে যেন বহুল সমুদ্রে পড়িয়াছে, মুখের এমনি ভাব—ভেলা মিলিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই!

সুরো কহিল,—সে আজ আসছে ভাই। মানে, এই দুরন্ত দৈত্যটা—আমাদের বাড়ী,—আজ···

যতীশ উদ্‌গ্রীব হইয়া সুরোর পানে চাহিয়া রহিল।

সুরো কহিল,—গয়া প্যাসেঞ্জারে। ৩-২১ মিনিটে ভাগলপুরে পৌঁছুবে। আমি তাকে ষ্টেশন থেকে আনতে যাবো—

যতীশের দুই চোখ সুগোল ও বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

সুরো কহিল,—ভেবেছি, ঐ ষ্টেশন থেকেই তাকে ধুলো-পায়ে বিদায় করবো। তোমার সাহায্য চাই···

মনস্তত্ত্ববিৎ হইলেও যতীশ স্থির করিতে পারিল না, কি ভাবে সে এ ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে! আবার তার মুখ ছোট হইল এবং সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুরোর পানে চাহিল।

সুরো কহিল,—তুমিও আমার সঙ্গে ষ্টেশনে চলো···তাকে হাল-পথ একেবারে সেই কর্ণ-গড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে।

যতীশ বুঝিল। বুঝিয়া কহিল,—বেশ মতলব বার করেছো, তাই হবে। মোদ্দা সুরো, তোকে এত বলি, তুই শুনিস্ না। তুই গল্প-উপন্যাস-ট্যাস লেখ্। তোর প্লট তৈরী করার বেশ মাথা আছে—আমার কথা শোন্ দিকিনি—Mind-psychology'টা আমি সত্যিই বুঝি—তাই···

সুরো কহিল,—তা কি আমি জানি না! না হলে ঘরের কথা তোমায় বলি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ শয়তান

গয়া-প্যাসেঞ্জার আধ ঘণ্টার উপর লেট। ষ্টেশনের বড় ঘড়িতে চারিটা বাজিতেছে। সিগন্যাল পড়িল। সুরো বলিল—এইবার! মোটা-সোটা লোক—সৌখীন...বয়স ৪০।৪৫ বছর। জমীদার মানুষ! নিশ্চয় সেকেণ্ড ক্লাশে আসছে...

যতীশ কহিল,—তুই পিছনে থাক্, মোদ্দা···

সুরো কহিল—ট্রেণ এলে দূরে দূরে থাকবো...কি জানি, যদি আমাদের গ্রুপ-ফটো কখনো দেখে থাকে!

যতীশ কহিল—আচ্ছা।

একটু পরে ট্রেণ আসিয়া থামিল। সুরো দূর হইতে উঁকি মারিতেছিল—যতীশ ট্রেণের কামরার পানে চাহিয়া রহিল। বহু লোক নামিল। সেকেণ্ড ক্লাশ হইতে এক জন মাত্র। বাঙ্গালী; গায়ে আলপাকার কোট, ঘড়ি—চেন!—ঠিক, এই তবে! জমিদারী চাল...মোটাসোটা···হাতে একটি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ!...সুরো কহিল—ঐ বোধ হয়! বলিয়া সে সরিয়া গেল। যতীশ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছিল।

টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া ভদ্রলোকটি চতুর্দ্দিকে একবার উদ্‌গ্রীব নয়নে চাহিলেন—যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন!

যতীশ আগাইয়া আসিয়া কহিল—আপনি নলহাটি থেকে আসছেন ?

ভদ্র লোক আরাম পাইয়া হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ। তুমি জলধি বাবুর বাড়ী থেকে আসছো বুঝি ?

যতীশ কহিল,—হ্যাঁ। আপনিই তো নলিন বাবু ?

ভদ্র লোক কহিলেন—হ্যাঁ। তুমি জলধি বাবুর ছেলে ?

যতীশ কহিল—আজ্ঞে না। পাড়ায় থাকি...আমাকেই পাঠিয়েছেন আপনার জন্য...

নলিন বাবু কহিলেন—বটে!

যতীশ কহিল—আসুন—

নলিন বাবু কহিলেন—চলো বাবা···

নলিন বাবুকে লইয়া যতীশ পথে আসিল। ষ্টেশনে গাড়ীর অভাব নাই···ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা প্রচুর। নলিন বাবু গাড়ীর জন্য দাঁড়াইলেন। যতীশ কহিল—এই দিকে···

কাছেই তবে ভাবিয়া নলিন বাবু দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া যতীশের পিছনে চলিলেন। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া যে পথ সোজা গিয়াছে, সেটা সহরের বুকে গিয়া মিশিয়াছে। বাঁ-দিকের পথ গিয়াছে নাথনগরের দিকে; ডাহিনে বাজারের পাশ দিয়া গিয়াছে ভিখনপুরের দিকে। সোজা পথটাই জলধি বাবুর বাড়ীর দিকে গিয়াছে। যতীশ সে পথে না গিয়া বাঁ দিকে বেঁকিল।...

পাশে ধরমশালা, নোংরা বস্তী, মসজেদ, কটা বাঙলো...ডান দিকে লালকুঠি, মিশনারীদের আস্তানা। সে সব ছাড়াইয়া যতীশ নলিন বাবুকে লইয়া সোজা চলিল।

বাঁ-দিকে একটা গলি। যতীশ কহিল,—এ পথে শাজঙ্গী।

নলিন বাবু কহিলেন—শাজঙ্গীটা কি বস্তু?

যতীশ কহিল—একটা প্রকাণ্ড তালাও আছে—তার পাশে উঁচু পাহাড়ের মত টিলা। সেই টিলার উপর পীরের আস্তানা। বেশ জায়গা···যাবেন?

নলিন বাবু হাসিয়া কহিলেন—এখন থাক্, আগে কায সারা যাক্—তার পর সময় পেলে দেখা যাবে···

যতীশ ভাবিল, কায সারার মানে, বিবাহ! সেই ছেঁড়া চিঠির কথা তার মনে পড়িল! বৃদ্ধ শয়তান—টাকার জোরে এক বালিকার পাণিপীড়ন করিবে, ভাবিয়াছ? বিবাহ করিতে আসিয়াছ! বুড়া বয়সেঁও বিবাহের সাধ মিটে নাই? চলো, ভালো করিয়াই তোমার বিবাহ দেওয়াইতেছি!

পথে কি ধূলা! বাপ! নলিন বাবুর এ ধূলায় দম বন্ধ হইবার জো! সৌখীন মানুষ তিনি সত্যই—পায়ে হাঁটার অভ্যাস কম...তায় গরমও মন্দ নয়! গায়ে আলপাকার কোট···বেশ কষ্ট হইতেছে! এতখানি পথ হাঁটিয়া সারা দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি রুমালে ঘাম মুছিয়া কহিলেন—আর কত পথ বাকী?

যতীশ কহিল—আজ্ঞে, এই এলুম বলে...

নলিন বাবু কহিলেন,—একখানা গাড়ী নিলে হতো...

যতীশ কৃত্রিম দুঃখের ভঙ্গীতে কহিল—ইস্, ভারী ভুল হয়ে গেছে! আমাদের পায়ে হাঁটাই অভ্যাস কিনা—গাড়ীর কথা মনে ছিল না!

নলিন বাবু হাসিলেন,—নিরুপায়ের হাসি! হাসিয়া কহিলেন—মন্দ কি, exercise হচ্ছে—খিদে হবে'খন!... জলধি বাবুর আয়োজনও তো সামান্য হবে না···এত বলি ওঁকে, বয়স হলো তো—তা শোনেন না।

যতীশ মনে মনে কহিল, সে আয়োজন কোথায় হইতেছে, এটা ভাবিবার কথা বটে!

নলিন বাবু তখন গল্প সুরু করিয়া দিলেন। ভাগলপুরে বাঙ্গালী কত আছে? হিন্দুস্থানীই বা কত? এখানকার বাফতা কাপড়ের বাজারটা কোন্ দিকে? তাঁত আছে, না, কল? বাঙ্গালীরা চাকরির মায়া ছাড়িয়া বাফতা তৈরী করে না কেন? খদ্দরের হুজুগ কেমন? ক'টা স্কুল? কলেজ গভর্ণমেণ্টের নয়? কর্ণগড়টা কি? কোন্ কর্ণের গড়? এমনি নানা কথা...যতীশও হঠিবার পাত্র নয় ..সব কথার সে লাগসৈ জবাব দিয়া চলিয়াছে।

কথায় কথায় পথের কষ্টসম্বন্ধে সচেতন না হইলেও গা এ দিকে বেশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে···আর নাকে চোখে ধূলা ঢুকিতেছে, আঃ!—পথে পা দিয়া চলিয়াছি, না, ধূলার উপর দিয়া...নলিন বাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন—আর কত পথ, বাবা?

যতীশ থামিল এবং অত্যন্ত বিনয়-বিজড়িত স্বরে কহিল—আপনার কষ্ট হচ্ছে?

নলিন বাবু কহিলেন,—না, কষ্ট ঠিক নয়...তবে হাঁটার তেমন অভ্যাস নেই কি না···তা, একখানা গাড়ী পাওয়া যায় না?

যতীশ কহিল,—না, এ ধারে গাড়ী পাওয়া যায় না তো—

নলিন বাবু কহিলেন,—অর্থাৎ বুঝলে কি না, আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হ'লো, তা ৪৫ বছরে এত পথ একটানা কখনো হাঁটিনি! তা ছাড়া আশলে এই ধূলো,···এমন ধূলো কখনো দেখিনি ··

যতীশ কহিল,—আমার মামা এই ভাগলপুরের ধূলো সম্বন্ধে এক মজার গল্প বলেন বেশ···

নলিন বাবু কহিলেন,—বটে! কি গল্প?

যতীশ কহিল,—তিনি বলেন, একবার তিনি ভাগলপুরে এসেছিলেন, তা, কলকাতায় ফিরে তাঁর কাপড়ের ট্রাঙ্ক খুলে দেখেন, সব কাপড় ধূলোয় এমন ময়লা হয়েছে যে, সব কাপড় ধোপার বাড়ী কাচান, কাচিয়ে তবে ব্যবহার করতে পারেন



COLOUR ILLUSTRATION

নলিন বাবু আবার হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—সে নয়ে গল্প নয়··· সত্যিই হবে !

আরো খানিকটা পথ। পাশে একটা ভাঙ্গা মন্দির। নলিন বাবু কহিলেন,—আর পাচ্ছি না বাবা, একটু বসে দম নি। তুমি বাবা, এত কষ্টই করলে যখন, তখন আর একটু কষ্ট করে একখানি গাড়ী বরং ভাখো···

যতীশ কহিল,—কিন্তু আর এই একটুখানি পথ···

নলিন বাবু কহিলেন,—না বাবা, আর পারছি না··· বলিয়া তিনি মন্দিরের ভাঙ্গা একখানা পাথরের উপর বসিলেন। বসিয়া গায়ের আলপাকার কোট খুলিয়া কোলের উপর রাখিলেন।

যতীশ কহিল,—তা হলে একখানা গাড়ীই দেখি···?

যতীশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নলিন বাবু কহিলেন—গাড়ী না পাও যদি, তো একা হলেও চলবে··· বলিয়া তিনি প্রচণ্ড রকমের একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

—তাই দেখি···বলিয়া যতীশ ডান-দিকের একটা বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তরঙ্গ-ভঙ্গ

একলা বসিয়া থাকার পর নলিন বাবুর ক্লান্তি কমিল। তখন তিনি দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন—গাড়ী···গাড়ী আনতে ছোকরা গাড়ী আনিতে সেই যে গিয়াছে, ফিরিবার নাম নাই!···চিন্তা ক্রমে বিরক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং বিরক্তি রাগে পরিণত হইবার জো,—এমন সময় সহসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

নলিন বাবু তাঁকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, জলধি বাবুর বাড়ী কত দূর, মশায় ?

লোকটি আশ্চর্য্য হইয়া নলিন বাবুর দিকে চাহিল, কহিল,—উকিল জলধি বাবু ?

নলিন বাবু তার বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন, এখন তার মুখে এ প্রশ্ন শুনিয়া তিনি একটু আরাম পাইলেন। কহিলেন,—হ্যাঁ। উকিল জলধি বাবুই।

লোকটি কহিল,—তা, তাঁর বাড়ী তো ভাগলপুরে···

নলিন বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন ? না ; এ তবে কোন্ দেশ ? তিনি বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—এটা কি ভাগলপুর নয় ?

লোকটি কহিল,—না, এ হলো নাথনগর। ভাগলপুর এখান থেকে তিন মাইল হবে···আর জলধি বাবুর বাড়ী··· পুরো পাঁচ মাইল।

সর্ব্বনাশ! এই তিন মাইল পথ তিনি পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছেন!

লোকটি কহিল,—আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

নলিন বাবুর প্রাণটা অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র হইয়া উঠিল। করুণ কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—নলহাটি।

লোকটি কহিল,—এই ট্রেণে ?

নলিন বাবু কহিলেন,—হ্যাঁ।

লোকটি কহিল,—তা, নাথনগরে নামলেন কেন ? ভাগলপুর ষ্টেশন ছেড়ে ?

নলিন বাবু কহিলেন,—ভাগলপুরেই নেমেছিলুম···

লোকটি কহিল,—তা হলে সম্পূর্ণ উল্টো পথে এমন করে এলেন যে ?

বয়স অল্প হইলে নলিন বাবু বুঝি কাঁদিয়া ফেলিতেন! এ বয়সে চোখের জল না কি মানায় না, তাই কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া তিনি কহিলেন,—সে কথা আর শুনে কি করবেন! এক হতভাগা ছোকরা···কিন্তু যাক্ সে কথা··· মোদ্দা, ভাগলপুরে যাবার জন্য গাড়ী একখানা পাওয়া যাবে কি ?

লোকটি কহিল,—মুস্কিল!

নলিন বাবু কহিলেন,—একা ?

একমাত্র পুত্রের কঠিন রোগে চিন্তাকুল বিধবা মা ডাক্তারের উত্তরের প্রতীক্ষায় যেমন কাতর-বিহ্বলভাবে ডাক্তারের পানে চাহিয়া থাকেন, এ প্রশ্ন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় তেমনি কাতর-চিন্তাবিহ্বল ভাবে নলিন বাবু লোকটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

লোকটি জবাব দিল,—একা মিলতে পারে। তবে··· মানে, ভাগলপুরের একা কাশীর একার মত নয়···

নলিন বাবু কহিলেন,—না হোক—এ পা-দুটোকে তার উপর গুড়িয়ে ফেলতে পারলে এ যাত্রা বুঝি বেঁচে যাই। বলিয়া তিনি উঠিয়া ভদ্রলোকটির দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন,

কহিলেন,—একখানা এক্কা দয়া করে যদি দেখে দেন, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো···

এ কথায় লোকটির দয়া হইল। সে কহিল,—আচ্ছা, বসুন, আমি দেখছি···

নলিন বাবু ভাবিলেন, এ-ও যদি সরিয়া পড়ে? তিনি কহিলেন,—কত দূরে এক্কা মিলতে পারে?

লোকটি যেদিক হইতে আসিতেছিল, সেই দিকে দেখাইয়া কহিল,—কাছেই নাথনগর ষ্টেশন, সেখানে মিলবে নিশ্চয়।

নলিন বাবু কহিলেন,—চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই···

তাঁর সেই কবে ছেলেবেলায় বইয়ে পড়া কথাটা মনে পড়িল—হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে! তাঁর মনে হইল, এ লোকটিকে তিনিও বলেন, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে কে রাখিবে ভাই? বিশেষ, এই খোটার দেশে?

ভাগ্য ফিরিয়াছিল। গ্রহ কাটিয়াছে···কাযেই এবার একটু অগ্রসর হইতেই এক্কা মিলিল, চলন্ত এক্কা। নাথনগরের দিক হইতে আসিতেছিল। ভাগলপুরের খঞ্জরুপুরে জলধি বাবুর বাড়ী। এক্কাওয়ালা দু'টাকা ভাড়া চাহিল। লোকটি কহিল,—ধেৎ! আট আনা।

নলিন বাবু কহিলেন,—দু'টাকাই দেবো, উঠে বসতে দে, বাবা···

নলিন বাবু এক্কায় উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া লোকটিকে কহিলেন,—আপনিও তো ভাগলপুর যাবেন। আসুন···

লোকটি কহিল,—আমি হেঁটেই যাবো···

নলিন বাবু কহিলেন,—বিলক্ষণ। তা-ও কখনো হয়! আপনি আজ আমায় কি বাঁচন বাঁচিয়েছেন···আর একটু এমন থাকতে হলে আমি বোধ হয় ভেবেই মরে যেতুম।

এক্কা বিপুল বিক্রমে ভাগলপুরের দিকে ছুটিল।

সুজাগঞ্জের পর পথে হঠাৎ এক্কার চাকার নাল খসিয়া গেল। গাড়োয়ান জানাইল, নামিতে হইবে, নামা ছাড়া উপায় নাই।

লোকটি কহিল,—আমি অন্য পথে যাবো। আর কতটুকুনই বা! পাঁচ-সাতখানা বাড়ীর পরই মস্ত বাড়ী দেখবেন ডান-দিকে, সামনে পাঁচিল-ঘেরা বাগান, বড় ফটক···সেইটে জলধি বাবুর বাড়ী।

নলিন বাবু তাকে ধন্যবাদ দিয়া এক্কাওয়ালার ভাড়া চুকাইলেন, তার পর ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া আবার পথে পথিক হইলেন।

এ লোকটি ভালো, সত্য কথা কয়। একটু আগে ডান-দিকে সত্যই মস্ত বাড়ী।

ফটকের সামনে দু'টি ছেলে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল। নলিন বাবু তাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—এইটে জলধি বাবুর বাড়ী?

কথা শুনিয়া এক জন ছোক্‌রা চমকিয়া উঠিল। সে সুরো। মুখ দেখিয়া সে চিনিল, ষ্টেশনে-দেখা সেই নলিন বাবু!

রাস্কেল যতীশ! বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! তাকে সে দাদার ফাউণ্টেন পেনটা চুরি করিয়া দান করিয়া আসিয়াছে, সে না বলিল, নলিন বাবুকে ভাগলপুর-ছাড়া করিয়া দিয়াছে! আর এই···নাঃ, পলাইবারও উপায় নাই।

তাড়াতাড়ি বন্ধুকে বিদায় দিয়া সুরো কহিল,—আপনি জলধি বাবুর বাড়ী যাবেন?

নলিন বাবু কহিলেন,—হাঁ।

দিনের আলো তখন নিব-নিব। সুরো অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—তা—জলধি বাবুর বাড়ী যে মস্ত বিপদ!···

বিপদ! নলিন বাবু শিহরিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি বিপদ?

সুরো তেমনি কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—মানে, তাঁর একটি মেয়ে—অর্থাৎ তাঁর মেজ মেয়ে শ্রীমতী শুকতারা দেবী, যার বিয়ের কথা এক রকম পাকা হয়েছিল, সে আজ মারা গেছে!

নলিন বাবু মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পর কহিলেন,—তাই তো, কিন্তু কাল আমি জলধি বাবুর চিঠি পেয়েছি, তাতে কারো অসুখের কথা কৈ, লেখেন নি তো তিনি!···

তাঁর দুই চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল।

সুরো কহিল,—আজ্ঞে অসুখ-বিসুখ এমন কিছু নয়, কি একটা মনে আঘাত পেয়ে নাকি—মানে, sudden shock ···তাতেই হার্ট-ফেল হয়ে হঠাৎ মারা গেছে।

আহা! নলিন বাবু কাতরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সুরো তাঁর পানে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বুকে ঘা লাগিয়াছে? বটে! বর্ব্বর-বুর! তোমার সঙ্গে বিবাহ হইবে, এই চিন্তায় হার্ট-ফেল হইয়া মারা গিয়াছে, বেচারী বালিকা,···ইহা ভাবিয়া বুড়ার অনুতাপ কতখানি ফুটে, সুরো তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

নলিন বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তা হলে এ [illegible] তাঁকে বিব্রত করা—তাই তো,·····অথচ এত বড় [illegible] তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাওয়াও ঠিক হবে [illegible]···নলিন বাবু কি ভাবিতে লাগিলেন।

সুরো কহিল,—তিনি বড্ড কাতর হয়ে পড়েছেন,—মানে, ঐ মেয়েটিই ছিল তাঁর প্রাণ—অর্থাৎ

নলিন বাবু আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর অন্যমনস্কভাবেই কহিলেন,—এখন থাক ন'য়।—বলিয়া তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই পথে ফিরিলেন।

সুরোর মনে হইল, সে একবার খুব উচ্চহাস্য করিয়া [illegible] একটা লাফ দিয়া আকাশটাকে টানিয়া নীচে [illegible] আনে!···কিন্তু, না, ও শয়তান এখনো দৃষ্টির [illegible] যায় নাই। সে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। [illegible] মনে যে আনন্দ হইতেছিল,—সেকন্দর শাহ যুদ্ধ জয় করিয়াও বুঝি কোন দিন এমন আনন্দ পান নাই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেকন্দরের পরাজয়

[illegible] আসিতেই দাদা ডাকিল,—এই যে শূয়ার···! সুরো··· সুরো কাছে আসিল। সোমনাথ কহিল,—ষ্টেশনে গেছলি? সুরোর বুক কাঁপিল। সে কহিল,—গেছলুম।

সোমনাথ কহিল,—নলিন বাবু কোথায় গেলেন তবে?

সুরো কহিল,—তা আমি কি জানি!

সোমনাথ ডাকিল,—মা—

সোমনাথ কহিল,—তিনি আসেন নি?

মা পাশের ঘরে ছিলেন, আসিলেন। সোমনাথ কহিল,—ও শোনো সুরোর কাছে, ও যাবে বললে···তাই···

মা বলিলেন,—যাও, দুই ভাইয়ে বোঝাও গে—উনি রাগ করছিলেন, ওঁর মান গেল···ইজ্জৎ গেল! এটুকু কাযও ছেলেরা করতে পারে না? আমায় কত বকছিলেন!

সোমনাথ কহিল,—তোমার এই রত্নটিকে জিজ্ঞাসা করো মা,—ষ্টেশনে গেছলো কি না,···ও ভার নিয়েছিল বলেই না—

মা বলিলেন,—আমি জানি না বাছা,—দু ভাইয়ে ওঁর কাছে গিয়ে ওঁকে বোঝাও গে—

সোমনাথ সুরোর কান ধরিল, ধরিয়া কহিল,—চ রাস্কেল, বাবার কাছে—দেখছি আমি!

সুরো যেন চোর! বাপের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। দাদা ছাড়ে না! বাবা মোকদ্দমার কাগজ-পত্র রাখিয়া গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়া আছেন। সোমনাথ কহিল,—সুরো ষ্টেশনে গেছলো, বলছে—

বাবা সুরোর পানে চাহিলেন। সুরো কহিল,—গেছলুম, বাবা।

বাবা কহিলেন,—নলিন বাবু আসেন নি?

সুরো কি উত্তর দিবে? বাবা রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—তোর মিছে কথা। তুই কখ্‌খনো যাস্‌নে—

সুরো কহিল,—গেছলুম।

বাবা ধমক দিয়া কহিলেন,—তবে কি ভদ্রলোকটি উবে গেলেন, বল্‌তে চাস রে হতভাগা বাঁদর?

তার জবাব দিবার পূর্ব্বেই নলিন বাবু আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর মুখে-চোখে কাতরতার ভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একে অত পথ ধূলায় হাঁটিয়া শ্রান্তি, তায় এত বড় দুঃসংবাদ! তার ছায়ায় তিনি যেন কি হইয়া গিয়াছেন। তাঁর পানে চাহিয়া তাঁর মূর্ত্তি দেখিয়া জলধিনাথ চমকিয়া উঠিলেন।

সুরো···? ভয়ে সে নিস্পন্দ!

ঘরে ঢুকিয়াই নলিন বাবু বিচলিত কণ্ঠে কহিলেন,—আপনার এ বিপদের কথা শুনে বড্ডই আমি কাতর হয়েছি, জলধি বাবু!

অভ্যর্থনার সুযোগ মিলিল না। তাঁর কথা শুনিয়া জলধি বাবু অবাক্ হইয়া কহিলেন,—বিপদ? আমার বিপদ? কেন, কি হয়েছে? কোথায় শুনলেন?

জলধি বাবুকে এ অবস্থায় দেখিবেন, নলিন বাবু তা কল্পনাও করেন নাই। তিনি কেমন যেন ভড়কাইয়া গেলেন! কোথায় কি একটা যেন মস্ত গোল বাধিয়াছে! হঠাৎ তাঁর নজর পড়িল সুরোর উপর;—সে তখন সন্তর্পণে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল।

নলিন বাবু কহিলেন,—এই যে···এই ছেলেটিই বলছিল, আপনার মেজ মেয়েটি হঠাৎ মারা গেছে নাকি আজই···

—মেজ মেয়ে মারা গেছে!···আমার···? সরোষ দৃষ্টিতে জলধি বাবু সুরোর পানে চাহিলেন,—সুরো ততক্ষণে সরিয়া বাঁচিয়াছে!

জলধি বাবু নলিন বাবুকে বুঝাইয়া দিলেন, বিপদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—নলিন বাবুকে না দেখিয়া তিনি দুশ্চিন্তায় কতখানি যে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন,···হতভাগা ছেলে···

নলিন বাবু কহিলেন,—যাক্, যাক্···ভালো তো ? আঃ, বাঁচলুম !···এমন আমার ভাবনা হয়েছিল ! তা ছাড়া যে গ্রহের ভোগ আজ গেছে—যাক্, আপনার খবর ভালো জেনে ভারী আরাম পেলুম !

জলধি বাবু হাঁকিলেন,—ভিখ্না—

ভিখনা আসিল। তিনি কহিলেন,—বাবুকে বাথ-রুমে নিয়ে যা। তার পর নলিন বাবুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—আপনি মুখ-হাত ধুয়ে নিন—তার পর জিরোন—জল-টল খান ! আপনাকে দেখে বাঁচলুম ! কি অস্বস্তি যে বোধ করছিলুম···সোমনাথকে তিনি কহিলেন,—যাও সোমনাথ, এ দের বলো গে, নলিন বাবু এসেছেন। এঁরা সবাই বড় ভাবিত হয়ে রয়েছেন, কোনো অসুখ-বিসুখ হলো, না, কি—

* * * * *

মেঁজদি নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া এ মাসের 'তরুণ আলো' পড়িতেছিল। সুরো আসিয়া চোরের মত খাটের পাশে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ডাকিল,—মেজদি ··

মেজদি বই রাখিয়া কহিল,—কি রে ?

স্বরে বেদনা মিশাইয়া সুরো কহিল,—সে এসেছে, ভাই—

—কে রে ? মেজদির বিস্ময়ের সীমা নাই !

সুরো কহিল,—এত করেও আটকাতে পারলুম না—ভাই মেজদি।

—কাকে ?

মেজদির বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল। মেজদি উঠিয়া বসিল।

সুরো কহিল,—সেই যে তুমি লিখেছিলে, তরুণ প্রাণের দুরন্ত দৈত্য···

শুকতারা অবাক্ ! তরুণ প্রাণ···দুরন্ত দৈত্য···সুরো এ সব বলে কি ! পাগল হইয়া গেল না কি ?

শুকতারা কহিল,—কি পাগলের মত বক্‌ছিস্ ! এ্যাঁ !

সুরো সেই চিঠির টুকরা বাহির করিয়া কহিল,—তোমার সঙ্গে বাবা-মা জোর করে যার বিয়ে দিচ্ছে···এই যে তুমি কাকে চিঠিতে লিখেছো,—দুরন্ত দৈত্য,—বৃদ্ধ শয়তান···

শুকতারা গর্জ্জিয়া উঠিল, কহিল,—ওরে হতভাগা ছুঁচো, বটে ! বড্ড ডেঁপিয়ে উঠেছো—দেখছি ! হস্তি-মূর্খি জ্ঞান নেই,···বড় বোনের সঙ্গে ন্যাকরা ! বাবাকে বলে তোমায় জুতো খাওয়াচ্ছি—স্যাখো মজা,···দে এ দেখা। একটা গল্প লিখেছি, 'তরুণ আলোয়' পাঠাবো বলে···একখানা পাতা খুঁজে পাচ্ছিলুম না,···তুমি নিয়ে বসে আছো,··· ফাজিল, বাঁদর, ভূত···

এ কথার পর তিলমাত্র আর দাঁড়ানো চলে না ! বিশেষ-গুলা একবারেই গর্হিত ! সুরো কাগজ ফেলিয়া দে ছুট !

ব্যাপারখানা পরিষ্কার হইল আরো আধ ঘণ্টা পরে, ভিখনা আসিয়া যখন কহিল,—আজ ছোট দাদাবাবু, তুমি মার ঘরে শুবে—এ ঘরে ঐ বাবুটি শুবেন।

সুরো কহিল,—কে ? ঐ যে বাবু এসেছে ?

ভিখনা বলিল,—হাঁ।

সুরোর হাড় জ্বলিয়া উঠিল ; সে কহিল,—ও বাবুটি রে রে যে এত আদর ?

ভিখনা বলিল,—ও এক ভারী জমিন্দার, বাবুর খুব বড় মোয়াক্কেল আছে—ভারী মোকদ্দমা লড়তে এসেছে। বহুৎ ফীজ দেবে—কথাটা বলিয়া সে দাঁত মেলিয়া হাসিল।

জবাব শুনিয়া সুরোর মনে হইল, পৃথিবীখানা দু' ফাঁক হয় না কেন ? তা হইলে তার মধ্যে ঢুকিয়া এ বিপদের আশ্রয় লয় ! কাল সকালে তাকে লইয়া বাড়ীতে যে কি কাণ্ড ঘটিবে, তা কল্পনা করিয়া ভয়ে-ভাবনায় সে মেঝের উপর লুটাইয়া শুইয়া পড়িল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

—রাজশেখর কবি—

সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কবি রাজশেখরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রণীত 'কর্পূরমঞ্জরী' নামক প্রাকৃতভাষায় লিখিত নাটিকখানি তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি আরও তিনখানা নাটক লিখিয়াছেন, যথা—বালরামায়ণ, বালভারত এবং বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা।

কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার 'কাব্য-মীমাংসা' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজকীয় লাইব্রেরী হইতে এই পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। সমগ্র কাব্য-মীমাংসা এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাব্য-মীমাংসার কবিরহস্য নামক প্রথম অধিকরণ বা প্রথম খণ্ডই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য-মীমাংসায় কবি রাজশেখর সংস্কৃত কবি ও কবিতা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক ও পাঠিকাবর্গের নিকট এই সকল বিষয়ের আলোচনা কৌতূহলপ্রদ হইবে, এই আশায় এই প্রবন্ধটি লিখিত হইতেছে।

রাজশেখর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কান্যকুব্জের নরপতি মহেন্দ্রপাল রাজশেখরের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপাল রাজশেখর কবিকে যে বিশেষ সম্মান করিতেন, তাহা রাজশেখরেরই লেখা হইতে জানিতে পারা যায়। 'সিদোনী' শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৯০৩ হইতে ৯০৭ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহেন্দ্রপাল রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, "Epigraphia India" (Vol 1, P. 171) নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহীপাল ৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। 'কর্পূরমঞ্জরীতে' রাজশেখর নিজের পরিচয়প্রসঙ্গে যাযাবরকে বালকবি কবিরাজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার 'বালরামায়ণ' ও 'বালভারত' তরুণ অবস্থায় রচিত হইয়াছিল, 'কর্পূরমঞ্জরী' এবং 'কাব্যমীমাংসা' প্রবীণ বয়সে বিরচিত হয়। রাজশেখরের পত্নীর নাম অবন্তীসুন্দরী, অবন্তীসুন্দরীর নামেও অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক সংস্কৃত সাহিত্যিক-গণের মধ্যে এখনও সুবিদিত আছে। কাব্য-মীমাংসায় তিনি সমকালিক ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ ৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা—পূর্ব্বদেশ, দক্ষিণাপথ, পশ্চিমদেশ, উত্তরাপথ ও মধ্যদেশ। মধ্যদেশের পূর্ব্বসীমা কাশীপ্রদেশ, দক্ষিণসীমা মাহিষ্মতী, পশ্চিমসীমা দেবসভ এবং উত্তরসীমা পৃথূদক নামে অভিহিত হইয়াছে। অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোশল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর, বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্লবর্ত্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর প্রদেশ পূর্ব্বদেশের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পূর্ব্বদেশীয় পর্ব্বতগণের মধ্যে বৃহদ্‌গৃহ, লোহিত-গিরি, চকোর, দর্দ্দুর, নেপাল ও কামরূপ প্রভৃতি পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নদ ও নদীগণের মধ্যে শোণ, লৌহিত্য, ধৃষ্টা, করতোয়া ও কপিশা প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণাপথের মধ্যে যে সকল প্রদেশ প্রবিষ্ট ছিল, তাহাদের নাম যথা—মহারাষ্ট্র, মাহিষ্ক, অশ্মক, বিদর্ভ, কুন্তল, ক্রথকৈশিক, সুপারক, কাঞ্চী, কেরল, কাবের, মুরল, বানবাসক, সিংহল, চোড়, দণ্ডক, পাণ্ড্য, পল্লব, গাঙ্গ, নাসিক্য, কোঙ্কণ, কোল্লগিরি ও বল্লর প্রভৃতি। যে সমস্ত পর্ব্বতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের নাম যথা—বিন্ধ্যদক্ষিণপাদ, মহেন্দ্র, মলয়,মেকল, পাল, মঞ্জর, সহ্য ও শ্রীপর্ব্বত ইত্যাদি। নদীগণের মধ্যে এই সকল নদীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়—নর্ম্মদা, তাপী, পয়োষ্ণী, গোদাবরী, কাবেরী, ভৈমরথী, বেণা, কৃষ্ণবেণা, বঞ্জুরা, তুঙ্গভদ্রা, তাম্রপর্ণী, উৎপলাবতী ও রাবণগঙ্গা ইত্যাদি।

পশ্চাদ্দেশ বা পশ্চিমদেশের মধ্যে যে সকল প্রদেশ প্রবিষ্ট ছিল, তাহাদের নাম যথা—দেবসভ, সুরাষ্ট্র, দশেরক, ত্রবণ, ভৃগুকচ্ছ, কচ্ছীয়, আনর্ত্ত, অর্ব্বুদ, ব্রাহ্মণবাহ ও যবন ইত্যাদি। পশ্চিম-দেশের মধ্যে এই সকল পর্ব্বতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—গোবর্দ্ধন, গিরিনগর, দেবসভ, মাল্যশিখর ও অর্ব্বুদ ইত্যাদি। নদীগুলি যথা—সরস্বতী, শ্বভ্রবতী, বার্ত্তঘ্নী, মহী ও হিড়িম্বা প্রভৃতি। উত্তরাপথের মধ্যে যে সকল প্রদেশ প্রবিষ্ট ছিল, তাহা-দের নাম যথা—শক, কেকয়, বোক্কাণ, হূণ, বাণাযুজ, কাম্বোজ, বাহ্লীক, বহ্লব, লিম্পাক, কুলূত, কীর, তক্ষণ, তুষার, তুরুষ্ক, বর্ব্বর, হরহূর, হূহূক, সহুড়, হংসমার্গ, রমঠ ও করকণ্ঠ ইত্যাদি।

হিমালয়, কলিন্দ,ইন্দ্রকীল ও চন্দ্রাচল প্রভৃতি পর্ব্বত এবং গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু,চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, কুহূ ও দেবিকা প্রভৃতি নদী সকল উত্তরাপথের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কবিত্বের উপকরণ—

রাজশেখরের মতে কবি হইতে হইলে কোন্ কোন্ সামগ্রীর আবশ্যকতা আছে, তাহা এই কাব্য-মীমাংসায় কবিচর্য্যা নামক অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যা এবং উপবিদ্যা এই দুইটিকে আয়ত্ত করিয়া তবে কবি হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই বিদ্যা শব্দের অর্থ—কাব্যবিদ্যা। নাম ও ধাতু সমষ্টিজ্ঞান, অভিধানের জ্ঞান, ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান এই হইল কাব্যবিদ্যা। আর চতুঃষষ্টি কলার জ্ঞান হইল উপবিদ্যা। তাহা ছাড়া সহৃদয় সুশীল যে সকল কবি তাহাদিগের সেবা, দেশসমূহের বৃত্তান্তজ্ঞান, কাব্যজ্ঞ পুরুষের সহিত আলাপ, লোকচরিত্রজ্ঞান এবং পণ্ডিতগণের সভা ও প্রাচীন কবিগণের রচিত গ্রন্থ এই কয়টি বস্তুকে তিনি কাব্যের মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বাস্থ্য, প্রতিভা, অভ্যাস, ভক্তি, পণ্ডিতসহবাস, বহুজ্ঞতা, স্মৃতি-শক্তির দৃঢ়তা ও আত্মশক্তির উপর নির্ভর এই কয়টিকেও কবিত্বের মাতা বা জননী বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাঁহার মতে কবি হইতে হইলে শুচি হইতে হইবে। এই শুচি তিন প্রকার—বাক্‌শৌচ, মনঃশৌচ ও দেহশৌচ।

বাক্য ও মনের শৌচ লাভ করিবার উপায় শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কবির কায়শৌচ কি প্রকারে হয়, সে বিষয়ে রাজশেখরের বর্ণনা নিতান্ত কৌতূহলপ্রদ। তাঁহার

মতে কবি হইতে হইলে হস্ত ও পদের নখচ্ছেদ করিতে হইবে। সর্ব্বদা মুখে তাম্বুল থাকিবে। সুগন্ধি দ্রব্যে সর্ব্বদা অঙ্গবিলেপ করিতে হইবে। বহুমূল্য ও কোমল বস্ত্র তাহাকে পরিধান করিতে হইবে, কবির মস্তক সর্ব্বদা কুসুমভূষিত থাকিবে। তাহা ছাড়া কবির অভিভাষণ স্মিতপূর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাঁহার কথাবার্ত্তায় রহস্য পূর্ণ থাকিবে, সকল বস্তুরই ভিতরকার রহস্য কি, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। কবির আর একটি গুণ এই যে, অপর কবি কর্ত্তৃক বিরচিত কাব্যের দোষ তিনি কখনও অযাচিত হইয়া বলিবেন না। যদি সে বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে যাহা উচিত ও ন্যায্য, তাহাই বলিবেন।

কবির গৃহ কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও বিস্ময়াবহ। তিনি বলিয়াছেন, কবি যে বাড়ীতে নিত্য বাস করিবেন,সে বাড়ীটি সুবৃহৎ ও সুগঠিত হওয়া দরকার। সেই গৃহের সংলগ্ন একটি বৃক্ষ-বাটিকা থাকা আবশ্যক। সেই বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে নানাপ্রকার ছায়াবহুল বৃক্ষের নীচে কবির বসিবার জন্য বেদিকা নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক এবং তাহার মধ্যে একটি ক্রীড়া-পর্ব্বত থাকিবে। সেই বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী থাকা উচিত, কৃত্রিম নদী ও কৃত্রিম সমুদ্র থাকিলে ভাল হয়। ছোটখাট 'নহর' ও কুল্যা অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালী থাকা দরকার। ময়ূর, কোকিল, চক্রবাক, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষী ও হরিণ প্রভৃতি মৃগ তথায় থাকিবে। চকোর, ক্রৌঞ্চ, কুরর, শুক, সারিকা প্রভৃতি পক্ষীও তথায় থাকিবে। গ্রীষ্ম-কালের ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ভূমিগৃহ ধরাগৃহ ও লতামণ্ডপ প্রভৃতি তথায় থাকা আবশ্যক। দুলিবার জন্য বৃহৎ দোলা এবং ছোট-খাট দোলাও অনেকগুলি থাকা দরকার। এই ত গেল কবির অর্থাৎ মহাকবির ভবন-সন্নিবেশ। তাহা ছাড়া কাব্যরচনায় ও কাব্য-চিন্তায় কবি যখন খিন্ন হইয়া পড়িবেন, তাঁহার সেই খেদ-প্রশমনের জন্য বিশুদ্ধ বিজন স্থানও সেই গৃহে থাকা চাই। গৃহের যাহারা পরিজন থাকিবে, তাহারা নীরবে কবির আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। পরিচারকবর্গ যেন অপভ্রংশ ভাষায় অভিজ্ঞ হয়, গৃহে যাহারা পরিচারিকা থাকিবে, তাহাদের কিন্তু মাগধভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কবির অন্তঃপুরবাসিনী আত্মীয়াগণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় অভিজ্ঞ থাকিবেন। কবির যাঁহারা মিত্র, তাঁহাদের সকল ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক। শুধু ইহাই নহে, কবির এক জন লেখক অর্থাৎ 'গণেশ' থাকা একান্ত আবশ্যক। কবি যাহা বলিবেন, তাহা লিখাই তাহার কার্য্য হইবে, সেই লেখক সর্ব্বভাষায় কুশল হওয়া চাই, হাতের লেখা সুন্দর হওয়া দরকার। কবির লেখককে ইঙ্গিতাকারবিদ্ শীঘ্রবাক্ হইতে হইবে। স্বয়ংও কবি হওয়া আবশ্যক। নানা দেশপ্রচলিত লিপিবিষয়ে তাহার জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। নিজ ভবনে কোন্ ভাষায় সর্ব্বদা বাগ্‌ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কবি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এই বিষয়ে তিনি কয়টি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "মগধদেশে শিশু-নাগ নামে এক জন রাজা আছেন। শুনা যায়, রাজা শিশুনাগ নিজ অন্তঃপুরে যে ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ট ঠ ড ণ শ ষ স ও ক্ষ-কার এই আটটি বর্ণের উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "শূরসেন দেশে কুবলয় নামে এক জন রাজা আছেন, তাঁহার নিজ অন্তঃপুরে কর্ণ-যুক্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" "কুন্তল দেশে সাতবাহন নামে রাজা ছিলেন, তিনি নিজ অন্তঃপুরে প্রাকৃত ভাষা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করিতে দিতেন না। উজ্জয়িনীতে সাহসাঙ্ক নামে রাজা ছিলেন, তাঁহার অন্তঃপুরে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইত।"

কবি-গৃহের প্রধান উপকরণের মধ্যে এই দ্রব্যগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—সম্পুটিকা (ছোট বাক্স), সমুদ্গক (কলমদানী), লেখনী সহিত মসীভাজন, লিখিবার জন্য তালপত্র বা ভূর্জ্জপত্র, তালপত্রে লিখিবার জন্য লোহকণ্টক। তাড়ীপত্র (পাকে তালপত্রবিশেষ), সুমার্জ্জিত ভিত্তি, (চিত্রাদি অঙ্কনের জন্য) এই সকল বস্তু সর্ব্বদা যেখানে কবি থাকিবেন, সেইখানে থাকা চাই। কারণ, এইগুলি হইল কাব্যবিদ্যার পরিকর, এই কয় আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ইহার উপর রাজশেখর একটু টীকা কাটিয়াছেন। তিনি বলেন, কবির প্রতিভাই কবির অসাধারণ সাধন হইয়া থাকে। সুতরাং আচার্য্যগণের বর্ণিত যে সকল উপকরণের উল্লেখ হইয়াছে, প্রকৃত কবির পক্ষে সে সকলের সমাবেশ সম্ভবপর না হইলেও ক্ষতি নাই। একমাত্র প্রতিভার সাহায্যেই কবি কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

কবি কোন্ ভাষাকে আশ্রয় করিবেন, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া কবি রাজশেখর বলিয়াছেন, "আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে,কবিকে প্রথমতঃ নিজ সামর্থ্য কত, তাহা বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার কবিত্বসংস্কার কিরূপ, কোন্ ভাষায় তাঁহার প্রকৃত অধিকার হইয়াছে, তাঁহার কাব্য যাহারা পড়িবে তাহাদের রুচিই বা কি প্রকার, দেশের রাজাই বা কিরূপ, তাঁহার সভাই বা কি প্রকার, রাজা কি ভালবাসেন, এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া কবি ভাষাবিশেষকে আশ্রয় করিবেন।" আচার্য্যগণের এই প্রকার উক্তির সমালোচনা করিতে যাইয়া রাজশেখর বলিয়াছেন যে, এই সকল পূর্ব্বাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদর্শিত যে নিয়ম, ইহা একদেশ কবি অর্থাৎ ছোট-খাট কবিগণের জন্য; কিন্তু 'স্বতন্ত্র' অর্থাৎ মহাকবিগণের পক্ষে এরূপ কোন নিয়ম মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সকল ভাষায় কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ। রাজশেখরের সময়ে কোন্ দেশের কোন্ কবি কোন্ ভাষায় সাধারণতঃ গ্রন্থ রচনা করিতেন, সে বিষয়ে একটি শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেষ্ণা,
সাপভ্রংশপ্রয়োগাঃ সকলমরুভুবষ্টক্কভাদানকাশ্চ।
আবন্ত্যাঃ পারিযাত্রাঃ সহ দশপুরজৈর্ভূতভাষাং ভজন্তে,
যো মধ্যে মধ্যদেশং নিবসতি স কবিঃ সর্ব্বভাষানিষণ্ণঃ॥"

গৌড় প্রভৃতি দেশের কবিগণ সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। লাটদেশীয় সুরুচিসম্পন্ন কবিগণ প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় লইয়া থাকেন। মরুভূমিবাসী, টক্কভ ও আদানকবাসী ইহারা অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবন্ত্য, পারিযাত্র ও দশপুরজাত কবিগণ 'ভূত' অর্থাৎ পৈশাচ ভাষার ব্যবহার করেন, কিন্তু মধ্যদেশে যে কবি বাস করিয়া থাকেন, তিনি সকল ভাষাতেই কাব্যগ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ। [ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ



হানা-বাড়ী



৬২

রাত্রে শয়ন করিতে অনেক বিলম্ব হইলেও অভ্যাসবশতঃ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া যখন বৈঠকখানায় আসিলাম,তখন সাড়ে ৫টা। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য আসিয়া টেবলের উপর আমার চা'য়ের সরঞ্জাম রাখিয়া গেল। ঠিক সেই সময় একখানা ঠিকা গাড়ী আমাদের সদরে আসিয়া দাঁড়াইল।

এত সকালে কোন মক্কেল বা অপর কেহই দেখা করিতে বোধ হয় আসেন নাই। সেই জন্য আগন্তুক লোকটি কে, জানিতে কৌতূহলী হইয়া জানালার দিকে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে, গাড়ীর দ্বার ও জানালা সবই বন্ধ। তাহা হইলে ভিতরে কেহই কোন মহিলা আছেন মনে করিয়া পিসীমাকে সংবাদ দিব কি না, ভাবিতেছি, এমন সময় সবিস্ময়ে দেখিলাম, সাহেবী পোষাকধারী এক জন পুরুষ ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী হইতে নামিয়াই ঘরের প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতে গাড়োয়ানকে কি একটা আদেশ দিয়া আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। তখন বিস্ময়ে বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম যে, লোকটি সেন সাহেব।

এই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে লোক পলাইয়া পুলিসের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল এবং যে আমাকেও তাহার আক্রমণ-কারিগণের দলভুক্তরূপে দেখিয়াছিল, সে যে স্বেচ্ছায় আবার আমারই নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। পলাইবার সময় তাহার মুখমণ্ডলের নগ্ন অংশে আমি যে মুহূর্ত্তে দেখিয়া তাহাকে চিনিয়াছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে-ও যে আমাকে দেখিয়াছিল এবং চিনিতেও পারিয়াছিল, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। সেই জন্য, সে প্রত্যূষে সে কি অভিপ্রায়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহা অনুমানও করিতে পারিলাম না। শুধু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সেন সাহেব কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বেশ সহজ-ভাবেই আমার সম্মুখস্থ টেবলের অপর দিকে একখানা চেয়ারে বসিল এবং সামান্য একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "গত রাত্রির ঘটনার পর এত শীঘ্র আপনার কাছে এসেছি দেখে বোধ হয় আপনি যে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করছেন, তা বুঝতে পারছি। সেই কথা। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কোন উপায়ও নেই। পুলিসের লোকরা আবার কিছু হাঙ্গামা করবার পূর্ব্বেই আপনার কাছে আমার কতকগুলা কথা খুলে বলা দরকার বিবেচনা করেই আপনার কাছে এত সকালে এসেছি। এখন আমার কথা শুনে আপনাদের যা অভিরুচি হয়, তাই করবেন। যদি হয়ত পুলিসের হাতে সমর্পণ করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন ত তাতেও আপত্তি করব না; কেন না, পুলিসের লোকরা আমাকে না চিনলেও আপনি যখন চিনেছেন, তখন আর আমার আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব হবে না। তবে, আমিই যে গত রাত্রির পলাতক আসামী, এ কথা যদি আপনি পুলিসের লোককে এখনও না জানিয়ে থাকেন ত আমার বোধ হয়, আপনার পক্ষে সেটা তাদের না জানানই ভাল।"

লোকটার অসীম দুঃসাহসে পূর্ব্বে যত না বিস্মিত হইয়াছিলাম, এখন আবার তাহার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধায় ততোঽধিক বিরক্তি জন্মিল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"দেখুন, অরুণ বাবু, আপনার কাছে এখন আর আমার গোপন করবার কিছু নেই। কাল রাত্রিতে যখন প্রমোদার মুখে শুনলাম যে, আমার আর কানের ষড়্‌যন্ত্র ও কার্য্যকলাপের কথা সবই সে পুলিসকে জানিয়ে দিয়েছে, তখন প্রথমেই একটা ভীষণ জিঘাংসার আবেগে আমাকে এতই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল যে, আমি তৎক্ষণাৎ তাকে সেইখানেই একটা নৃশংস রকমের শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠায় আমার জ্ঞানসঞ্চার হ'ল, তার পরে যা যা ঘটেছিল, সে ত আপনি সবই জানেন। পুলিস যখন স্মৃতিরত্নকে ধরবার উদ্দেশ্যে ওখানে জাল পেতে বসেছিল, আর সেই ক্ষেত্রে আপনিও যখন উপস্থিত ছিলেন, তখন এটাও নিশ্চিত যে, প্রমোদা পুলিসকে যা কিছু বলেছে, সে সবই আপনিও শুনেছেন। এখন বলুন দেখি, আপনি যদি আমাকে স্মৃতিরত্ন ব'লে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেন, তা হ'লে তার ফলে শুধু যে আমার ও কানের জেল হবে, তা ত নয়,—যমুনারও ত সেই সঙ্গে টান পড়তে পারে?"

"হাঁ, তা ত পড়বেই! পুলিস আপনাকে ধরতে পারুক আর নাই পারুক, তাঁকে ত কোনমতেই ছাড়বে না।"

"অ্যাঁ! বলেন কি? কিন্তু সে বেচারী যে একেবারে নির্দ্দোষ, এ সব ষড়যন্ত্রের ব্যাপার সে ত কিছুই জানে না!"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "ও কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তিনিই ত কোর্টে সাব্যস্ত করিয়েছেন যে, হানা-বাড়ীর নন্দন সাহেব আর বিহারী ঘোষ একই লোক,—আর সেই মিথ্যা প্রমাণের ফলে উইল প্রোবেট করিয়ে ইন্‌সিওরেন্সের টাকাও আত্মসাৎ করেছেন। এখন ঐ সব জুয়াচুরী ও সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের ষড়যন্ত্র যখন আদালতে প্রমাণ হবে, তখন যে ষড়যন্ত্রের ভিতরে তিনি ছিলেন না বা ও বিষয় কিছুই জানতেন না, এ কথা বল্‌লে কি কেউ বিশ্বাস করবে?"

"কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ ত কিছু নেই? বরং প্রমোদাই যখন ষড়যন্ত্রের বিষয়ে পুলিসের একমাত্র সাক্ষী, তখন তার কথাতেই ত প্রমাণ হবে যে, উমাপতির সঙ্গে বিহারীর অদল-বদল ব্যাপারের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই যমুনা কখনও লিপ্ত ছিল না!"

"প্রত্যক্ষে না থাকলেও, পরোক্ষেও যে ছিলেন না, বা ঐ সব

কাযে তাঁর সাহায্য কিম্বা সম্মতি ছিল না, তা কি থেকে প্রমাণ হবে? হয় ত তিনি টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তাও ত হ'তে পারে? বিহারী বাবুর গৃহত্যাগের পর, তাঁর বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত আয় ত আপনার মেয়ের হাতেই আস্‌তো?"

"নামে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ আমার হাতেই সব থাকতো। খরচ-পত্রও সব আমারই হাত দিয়ে হ'তো।"

"বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকলে, এ কথা আদালতে গ্রাহ্য হবে না। তা ছাড়া, আপনার মেয়ে যে ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই ছিলেন, তার অন্ততঃ একটা বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।"

"কি?"

"নন্দন সাহেবের একটা কড়ে আঙ্গুলের পাব ছিল না, কিন্তু বিহারী বাবুর সবই আছে। অথচ, আপনার মেয়ে বলেছিলেন যে, বিহারী বাবুর যখন গালে ক্ষত হয়েছিল, সেই সময়েই ঐ আঙ্গুলের পাবও নষ্ট হয়েছিল। জেনে শুনে ও রকম মিথ্যা বলার উদ্দেশ্য প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি হ'তে পারে?"

"কথাটা মিথ্যা হ'লেও সে যে বাস্তবিক সব জেনে শুনে মিথ্যা বলেছিল, তা নয়। আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হবার পরে বিহারীর হয় ত কোন কারণে ঐ আঙ্গুলের পাব নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ও রকম আন্দাজী বা অনিশ্চিত কথা বল্‌লে, আদালতে বা ইন্‌সিওরেন্স আফিসে একটা সংশয়ের বিষয় থেকে যাবে;—সেই জন্য আঙ্গুলের পাবের অভাবটার সম্বন্ধে ঐ রকম সামান্য একটু মিথ্যা কথা বল্‌লে কিছু হানি হবে না।"

আমি পুনরায় একটু হাসিয়া বলিলাম, "একেই বলে 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে'।—ঐ সামান্য একটু মিথ্যা কথাই আপনাদের এই সমস্ত জাল-জুয়াচুরী ধরা পড়বার মূল সূত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল!

"বটে! তাই না কি?"

"হাঁ; বিহারী বাবুর মেয়ে যখন প্রথম জানতে পারলেন যে, হানা-বাড়ীতে যে লোকটা খুন হয়েছিল,—যা'কে আপনারা বিহারী ঘোষ ব'লে সাব্যস্ত করিয়েছিলেন,—তার কড়ে আঙ্গুলের দু'টা পাব ছিল না, তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে, হত ব্যক্তি কখনই তাঁর বাপ নয়; কারণ, তাঁর বাপের কোন আঙ্গুলের কোন অংশই নষ্ট হয়নি। তার পরে অনুসন্ধানে ক্রমে সব কথাই জানা গেল।"

"যাক, সে যা হবার তা ত হয়ে গেছে। এখন যমুনা আমার একেবারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়েও, আমাদের অপরাধের জন্য জেলে যাবে,—এটা যে ভয়ানক অবিচার হবে, অরুণ বাবু! এর কি কোন প্রতীকারের উপায় নেই?"

"তা ত আমি বল্‌তে পারি না, মিঃ সেন!—আর শুধু জেলই বা বল্‌ছেন কেন? আপনাদের সব অপরাধের সহকারী হিসাবে তাঁর আরও গুরুতর দণ্ডও ত হ'তে পারে?"

"সে কি? আর কোন্ অপরাধের কথা বল্‌ছেন?"

"কেন,—নন্দন সাহেবের খুন?"

৬৩

আমার কথা শুনিয়া, সেন সাহেবের মুখখানা যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে আমার দিকে নীরবে চাহিয়া, শেষে উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের বিরুদ্ধে এ ও অভিযোগটাও করা হবে না কি?"

"হাঁ, তা হবে বৈ-কি! আপনাদের অভিসন্ধি যখন প্রকাশ হয়েছে, তখন আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিলম্ব হচ্ছে দেখে আপনারাই যে নন্দন সাহেবকে খুন করেছেন, এ কথা কত যুক্তিসঙ্গত বলেই বোধ হয়!"

"কিন্তু, খুনের সম্বন্ধে আমাদের তিন জনের কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ কিছুই নেই!—আর বাস্তবিক ও বিষয়ে আমরা তিন জনেই যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এ কথা ধ্রুব সত্য, তা জানেন মশায়! আমি যথার্থই বল্‌ছি যে, উমাপতিকে কে খুন করেছে, তা আমি এখনও কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পারিনি।"

"কিন্তু আপনারা ছাড়া আর কোন লোক যদি খুনটা করে থাকে ত তার উদ্দেশ্য কি ছিল?—চুরী নয়; কেন না, নন্দন কোন জিনিষই চুরী যায় নি, তা ত জানেন? তা ছাড়া যে খুন করেছে, সে নিশ্চয়ই আপনাদের ঐ গুপ্ত পথ দিয়ে ওখানে যাতায়াত করেছিল। কিন্তু আপনারা কয় জন ছাড়া পথটা ত আর কেউ জান্‌তো না?"

"হাঁ, আরও একটা লোক জান্‌তো; কিন্তু সে আমাদের দলভুক্তও ছিল না, আমাদের গুপ্ত অভিসন্ধির বিষয়ও কিছু জান্‌তো না। কাযেই খুনের সম্বন্ধে তার পক্ষেও সে একই কথা খাটতে পারে,—উদ্দেশ্যহীনতা।"

"কিন্তু সে লোকটা কে?"

"আপনি এই খুনের সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেছেন,—কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতেও গিয়েছেন, তা শুনেছি। সেখানে নিতাই নামে একটা চাকর ছিল, তাও অবশ্য জেনেছেন। সে নিতাই চাকরটা ঐ গুপ্ত পথের বিষয় জানত। আমি তার কাছে প্রথম ঐ পথের সন্ধান পেয়েছিলাম।"

"বটে? কিন্তু আমার কাছে সে ত ও বিষয় কিছু জানন বলেছিল।"

"সে মিথ্যা কথা বলেছিল। ছোঁড়াটা যেমন মিথ্যেবাদী চালাকও তেমনই। পথটা যে শুধু জানত, তা নয়, সে নিজে বোধ হয় ওটা আবিষ্কার করেছিল। আমি যখন উমাপতিকে বাড়ী ভাড়া করবার অভিপ্রায়ে ঐ হানা-বাড়ীটা দেখিয়েছিল তখন পিছনের বাড়ীতে দু'টা ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে নোটিশ টাঙ্গানো ছিল দেখে সে বাড়ীটাও দেখতে গিয়েছিল নিতাই আমাকে বাড়ীটা সব দেখিয়েছিল। পায়খানার সিঁড়ি লাগানো দেখে, নিতাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে করেই ছিলাম যে, ইচ্ছা করলে এক বাড়ী থেকে অপর বাড়ীতে দুঃসাধ্য হবে না। সেই জন্যই ঐ ছুটা ঘর আমি ভাড়া ছিলাম, পরে নিতাই আমার কাছে বেশ দু'পয়সা তবে আমাকে ঐ পথটা দেখিয়েছিল। ক্রমে তার জেনেছিলাম যে, হানা-বাড়ীর ঐ নামটা নিতাইয়ের প্রচার হয়েছিল। বাড়ীটা যখন খালি ছিল, তখন বেশী রাত্রিতে লুকিয়ে ঐ পথ দিয়ে ওখানে গিয়ে বাতি নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত, কখনও বা চীৎকার বা গান কর্‌তো। উমাপতি ওখানে বাস করার পরেও নিতাই সেখানে মাঝে মাঝে যেতো।

কিছু না কর্‌লেও, সুবিধা পেলে খুচরা পয়সা-কড়ি বা জিনিষপত্র চুরী কর্‌ত। উমাপতি দু'একবার তাকে ঐ চুরী কর্‌তে ধরেও ফেলেছিল; দু'এক ঘা দিয়েও ছিল। সেই জন্য তার সঙ্গে ওর মোটেই বন্‌ত না। কিন্তু তবু সে মাঝে মাঝে যেতেও ছাড়ত না। আমি মানা কর্‌লেও শুন্‌ত না। যাহোক, ঐ পথ দিয়ে সময়ে সময়ে আমিও যেতাম, উমাপতিও যেতো, তা সে জান্‌ত, এমন কি, আমাদের যাতায়াতের সাহায্যও কর্‌ত। কাযেই আমি তাকে মিষ্ট ব্যবহারে এবং পয়সা-কড়ি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখ্‌তাম। কিন্তু, কান্‌ও প্রমোদার ও পথ দিয়ে যাতায়াতের বিষয় নিতাই বোধ হয় জান্‌ত না। কেন না, ওরা এখানে এলেই আমি নিতাইকে কোন একটা কাযের ছুতায় বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দিতাম। শেষ বারে, সেই খুনের রাত্রিতে, যখন তারা এসেছিল, তখনও আমি নিতাইকে আমার জন্য মদ্য কিনে আনতে সিমলার বাজারে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু সে অন্য কাযে বোধ হয় জোড়া ছিল ব'লে যেতে পারেনি। সেই কান্‌কে সিঁড়িতে উঠবার সময় সে দেখ্‌তে পেয়েছিল। সে লোক, ছোঁড়াটা চালাক এবং বজ্জাত ছিল বটে; উমাপতির প্রতি সে সন্তুষ্টও ছিল না বটে,—কিন্তু তা হ'লেও উমাপতির প্রতি তার এমন কিছু আক্রোশ ছিল না, যে জন্যে সে তাকে খুন কর্‌তে পারে।"

আমিও নিতাইয়ের দ্বারা ঐ খুনের কোন হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। শেষে সেই ভোজালীটার কথা স্মরণ হওয়ায় সেন সাহেবকে বলিলাম, "উমাপতি যে ভোজালীর দ্বারা খুন হয়েছিল, সেটা যে বিহারী বাবুর বর্দ্ধমানের বাড়ী থেকে ঐ হানা-বাড়ীতে আনা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে,—এ কথা বোধ হয় আপনি শুনেছেন?"

"আপনাদের অনুসন্ধানের ফলাফল প্রায় সবই আমি যমুনার কাছে শুনেছি, কিন্তু সে ভোজালীটা হানা-বাড়ীতে আনা হয়েছিল বলেই, যে-লোক সেটা ওখানে এনেছিল, সে-ই উমাপতিকে খুন করেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত যদি ক'রে থাকেন, তা আপনাদের নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। আপনাকে যখন সব কথাই খুলে বলবার জন্যে আজ এখানে এসেছি, তখন ঐ ভোজালীর কথাটাও বল্‌ছি, শুনুন।—বর্দ্ধমানের বাড়ীতে ঘোষজা মশায়ের পড়বার ঘরটা এক দিন গোছাবার সময় যমুনা ভোজালীখানা দেওয়াল থেকে নামিয়ে, তার স্থানে স্থানে মরচে ধরেছিল দেখে, কান্‌কে সেটা সাফ কর্‌তে দিয়েছিল। তার পরে কান্ যখন কলকাতায় আসে, তখন সেটা সঙ্গে এনে কোন একটা দোকান থেকে মরচে সাফ করিয়ে, পরে কানাই মল্লিক লেনে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিল। আমি তখন উমাপতিকে কিছু টাকা দেবার জন্যে হানা-বাড়ীতে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম দেখে সে আর অপেক্ষা না ক'রে,—আমার হাতে ভোজালীটা গছিয়ে দিয়েই চ'লে গেল। আমিও সেটা হাতে নিয়েই উমাপতির কাছে গেলাম। তাকে টাকা দেবার সময়, সেখানা তার টেবিলের ওপর রেখেছিলাম; পরে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, ফিরে আসবার সময় সেটা নিয়ে আস্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা ঐখানেই রয়ে গেল। তার ২।৩ দিন পরেই উমাপতি খুন হ'ল। কিন্তু সেই ভোজালীর দ্বারাই যে ও খুন হয়েছিল কি না, আর জিনিষটা গেলই বা কোথা, তা ত এ পর্য্যন্ত কিছু বুঝতে পারলাম না।" [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)।

বিশ্ব-গীতি

বিশ্ব-যন্ত্রে মহাগীতি দিনরাতি উঠিছে ঝঙ্কারি,
মোহন সুরের মায়া মূর্চ্ছনায় স্বপন সঞ্চারি!
আবেশে আপনা-হারা শোনে সবে পাতিয়া দু'কান
বিশ্বময় গুঞ্জরিত মধুময় সঙ্গীতের তান।
অতৃপ্ত শ্রবণে সিন্ধু শুনিতেছে তটিনীর কল্লোল মধুর,
তরুলতা শুনে মুগ্ধ কোরকের বিকাশের সুর!
কুসুম অধীর হিয়া মধুপের গুঞ্জরণ তরে,
মলয় ঘুমায়ে পড়ে গন্ধ-গীতে কুসুমের পরে!
জাগে ঊষা রক্তবাসা, বিহগের কাকলীর তানে,
নিশীথ সুন্দরী মুগ্ধা ঝিল্লীর সে সুমধুর গানে!
শিখী মুগ্ধ কৃষ্ণ-শ্যাম জলদের মন্দ্রিত সঙ্গীতে,
চাতক সে বরষায় রিমি-ঝিমি বরষণ গীতে!
জননীর কানে বাজে আধ-ভাঙ্গা কাকলী শিশুর,
বিচিত্র মূর্চ্ছনা তুলি প্রাণ-মন করে ভরপূর!
শিশু শুনে ফুল্ল প্রাণে খেলানার রঙ্গীন রাগিণী,
তরুণ প্রেমিক গাহে রূপ-গীতি, প্রণয়-কাহিনী!
সে সুরে সে শুনে গান যেই গ্রামে বাঁধা যার বীণ
কবি, কিন্তু শুনে গীতি সব সুরে আবেশ নিলীন।
উদারা মুদারা তারা সব গ্রামে বুঝে সে ঝঙ্কার
সেই ত শুনিছে গান, তার মত শ্রোতা কেবা আর!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল, বি-এ।

বাস-গৃহ

বৈদিক যুগে গৃহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদ (১,১১,৬), অথর্ববেদ (৮,৩,২২; ১৪,১,৬৯), বাজসনেয়ী সংহিতা (৩০,১০) ও শতপথব্রাহ্মণ (১১,১,১,২; ১৪,৩,১,১৩) প্রভৃতিতে গৃহের দ্বার ও স্তম্ভ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শতদ্বারযুক্ত যন্ত্রগৃহে অত্রি প্রবদ্ধ হইয়াছিলেন; ত্রিধাতুশরণ বা ত্রিতলগৃহ বসিষ্ঠ নিজের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; সহস্র স্তম্ভযুক্ত মনোরম সভাগৃহ রাজদর্শনের জন্য নির্ম্মিত হইত; মিত্র ও বরুণ সহস্র স্তম্ভ ও সহস্র দ্বারযুক্ত প্রাসাদে বাস করিতেন ইত্যাদি সংবাদ ঋগ্‌বেদের নানা-স্থানে (১,১১২,৭; ৪, ২০০; ২,৩১৩; ৪,১৭৯; ২,৪১,৫; ৫,৬২,৬; ৭, ৮৮, ৫) দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং বৌধায়ন ও আপস্তম্বের কল্পসূত্রের অঙ্গীভূত শুল্বসূত্রে চিতি বা বেদি-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি হইতে প্রাচীন গৃহ-নির্ম্মাণ-কৌশলের অনেক আভাস পাওয়া যায়। চতুরস্র-শ্যেন চিৎ, কঙ্কচিৎ, অলজচিৎ, প্রৌগচিৎ, উভয়তঃ প্রৌগ-চিৎ, রথচক্রচিৎ, দ্রোণচিৎ, পরিচয্যাচিৎ, সমূহচিৎ ও কূর্মচিৎ নামক দশ প্রকারের বেদির উল্লেখ আছে। ইহাদের প্রত্যে-কটিই পাঁচ, দশ বা পনের স্তরের ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইত। প্রত্যেক স্তরে দুই শত করিয়া ইট থাকিত। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম স্তরের প্রত্যেকটি একইভাবে দুই শত ভাগে, এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্তরও সেইরূপ এক আকারে অন্যভাবে বিভাগ করা হইত। ফলে এক মাপ ও আকারের ইটের উপরে সেরূপ মাপের ও আকারের ইট কখনও স্থাপন করা হইত না। প্রত্যেক প্রকারের চিতি বা বেদির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ সাড়ে সাত পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক লোকের ঊর্দ্ধোত্থিত হস্তযুক্ত উচ্চতা। এই হিসাবে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ প্রত্যে-কের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত। বেদির প্রত্যেক স্তর এরূপ মাপে প্রস্তুত হইত। ফলে পাঁচ স্তরের বেদির উচ্চতা প্রায় সাড়ে সাতাশ হাত হইত, দশ স্তরের ৫৫ হাত ও পনের স্তরের উচ্চতা প্রায় সাড়ে বিরাশী হাত হইত। এই সকল বেদিগৃহ বর্ত্তমান যুগের বিশাল অট্টালিকার সমতুল্য।

বৌদ্ধ যুগের ধর্ম্মগ্রন্থেই বাস-গৃহের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বিনয় নামক গ্রন্থের মহাবগ্‌গ (১,৩০,৪) ও চুল্লবগ্‌গ (৬,১,২) খণ্ডে লিখিত আছে যে, বুদ্ধ ভগবান্ স্বয়ং কোন এক সময়ে ভিক্ষুদিগকে গৃহ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ অনুসারে বাস-গৃহসমূহ বিহার, অর্দ্ধযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও গুহা নামক পাঁচ প্রকারে বিভাগ করা হই-য়াছে। এই পাঁচ প্রকারের গৃহের মধ্যে অর্দ্ধযোগ নামক গৃহ সুবিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধ ঘোষের মতানুসারে বাঙ্গালারই নিজস্ব গৃহপদ্ধতি। বর্ত্তমান যুগের 'বাংলা' নামক গৃহই বোধ হয় প্রাচীন কালের অর্দ্ধযোগের প্রতিনিধি। বাস-গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়েও বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব পদ্ধতি রক্ষা করিয়া চলিত, উৎকর্ষ হিসাবে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

আরাম নামক বাস-গৃহ নগরের নাতিদূরে নির্ম্মিত হইত। এই অঞ্চলের সিভিল লাইন্‌স্ বা বড় বড় নগর-নগরীর উপ-কণ্ঠে বা সাবার্‌বসে আজকাল যেরূপ আরামপ্রদ অট্টালিকা দেখা যায়, বৌদ্ধযুগের আরাম-গৃহও সে ভাবে নির্ম্মিত হইত। এই সকল আবাস এরূপ ভাবে অবস্থিত হইত, যাহাতে নগরের কর্ম্মকোলাহল দিবাভাগে শুনা যাইত না, অথচ রাত্রিকালে অরণ্যের নির্জ্জনতারও ভয় থাকিত না। এই সকল আবাসে বিস্তীর্ণ উদ্যান ইত্যাদি ইষ্টক, প্রস্তর ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ত্রিবিধ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত।

সপ্তভূমিক প্রাসাদ বা সপ্ততলযুক্ত প্রাসাদের উল্লে-খও জাতকে (১,২২৭; ৩৪৬; ৫,৫২,১২৬; ৬,৫৭৭) দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ ভগবানের স্মৃতিরক্ষার জন্য শাক্যরাজ যে সকল স্তূপ নির্ম্মাণ করিত, তাহাদের উচ্চতা সেপ্টেম্ব নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার সমতুল্য।

বিনয় (৩,১০৫-১১০,২৯৭) ও দীঘ নিকায়ে আর এক প্রকার গৃহের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। টার্কিস্ বাথ বা তুর্কীদের সুপ্রসিদ্ধ স্নানাগার বস্তুতঃ এই বৌদ্ধ যুগেরই অবি-ষ্কার। দিল্লী ও আগ্রার দুর্গে এখনও এরূপ স্নানাগারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বড় বড় হোটেলে ও হাঁসপাতালেও এরূপ স্নানাগার আছে। এই সকল স্নানাগারে নানারকম কক্ষ থাকে। কোনটি উষ্ণ, তাহাতে কৃত্রিম উৎপাদন করা হয়। কোনটি শীতল মার্ব্বল প্রস্তর-মণ্ডিত। কোনটিতে আবার সন্তরণ উপযোগী নাতিশীতোষ্ণ জল পূর্ণ। তৈলমর্দ্দন, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি মাখিবার দ্রব্য স্বতন্ত্র কক্ষ থাকে। বস্ত্রপরিবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য বিস্তীর্ণ আয়না-যুক্ত কক্ষও থাকে।

রামায়ণের যুগে অট্টালিকার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে (১,৫,১০-১৫) লিখিত আছে যে, অযো-ধ্যার দেবায়তনসমূহ আকাশস্পর্শী ছিল; সভাগৃহ ও প্রপা (দানগৃহসমূহ সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশন উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত। রাজহর্ম্ম্য ও অপর সহস্রাধিক বাস-গৃহ ও বিমান বিশাল শৈলোপম শিখরযুক্ত হইয়া পটে অঙ্কিত সুদৃশ্য চিত্রের মত দেখাইত।

মহাভারতের যুগে গৃহের বর্ণনা আরও চিত্তাকর্ষক। সভাপর্ব্বে (১,৫,৯-১২) বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মার সমকক্ষ ময় নামক দানবদের মহাকবি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের সন্তুষ্টির জন্য এক আশ্চর্য্য সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কৃতলোকে সেরূপ অট্টালিকার তুলনা ছিল না। সেই গৃহের লেপচিত্রে, লেখ্যচিত্রে ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অসুরাদির যাহা যাহা অভিপ্রেত, সমস্তই বর্ণিত পাওয়া যাইত। সেই গৃহের অনুকরণ কেহই এখনও করিতে পারে নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমাগত রাজা-মহারাজাদিগের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে সহস্র সহস্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল গৃহ মনোরম হ্রদ, উদ্যান ও উদ্যানাদি দ্বারা চিত্তাকর্ষক করা হইত। ইহাদের চারি পার্শ্বে উচ্চ শ্বেত (প্রস্তরনির্ম্মিত) প্রাচীর থাকিত। উহার এই সকল গৃহ কৈলাস পর্ব্বতের শিখরতুল্য ছিল। এই সকল রাজপ্রাসাদ মূল্যবান্ শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত হইত। চারি মাইল দূর হইতেও রাজহংসের মত দেখা যাইত। চন্দ্রের ন্যায় মনোরম আভায় মণ্ডিত হইয়া পটে অঙ্কিত ছবির মত দেখাইত। এই সকল গৃহ দেখিয়াই কবি লিখিতেছেন, অভ্যাগত রাজগণ সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া গিয়া-ছিলেন।

পৌরাণিক যুগে গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি আরও উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ মহাপুরাণের সর্ব্বত্রই গৃহাদির বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণে (১০৪, ৫, ১১-১৩) ও গরুড়পুরাণে (৪৭, ১-২০, ৩২-৪৭) আকৃতি অনুসারে গৃহকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা, চতুরস্র বৈরাজ, আয়তা-স্র পুষ্পক, গোলাকার কৈলাস, ডিম্বাকার মণিক এবং ত্রিকোণ ত্রিবিষ্টিব। এই পঞ্চ প্রকারের প্রত্যেকটি আবার নয় ভাগে বিভক্ত। সুতরাং এই পুরাণদ্বয়ের বর্ণনা অনুসারে সেই কালে গৃহসমূহ মোটে, মেরু, মন্দর প্রভৃতি পঁয়তাল্লিশ প্রকারে নির্ম্মিত হইত। এই সকল গৃহের সবিশেষ বর্ণনা মদীয় ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্‌চার (পৃঃ ১৫-২২, ১১৩-১১৪) ও ডিক্‌সনারি অব হিন্দু আর্কিটেক্‌চার (পৃঃ ৩৯৩-৪১৬) নামক গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যাইবে।

ভবিষ্যপুরাণ (১৩০, ২৩-৩৫) ও বৃহৎসংহিতা (৫৬, ১-১৯) নামক গ্রন্থদ্বয়ের প্রত্যেকটিতে বিংশতি প্রকার গৃহের বর্ণনা আছে। মৎস্যপুরাণে (২৬৯, ১-২৭, ২৮-৫১) বিংশতি প্রকার গৃহের অধিকতর বিশদ ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই পুরাণের বর্ণনা অনুসারে মেরু নামক গৃহ পঞ্চাশ হাত উচ্চ, ষোড়শ-তলযুক্ত এবং শতশৃঙ্গ ও নানাবিধ শিখরশোভিত। মন্দর নামক গৃহ দ্বাদশতল উচ্চ, তেতাল্লিশ হাত বিস্তৃত এবং নানাবিধ শিখর ও প্রবেশদ্বারভূষিত। কৈলাস নামক গৃহ নবতল, বিমানচ্ছন্দে অষ্টতল, নন্দিবর্দ্ধনে ও নন্দনে সপ্ততল, সর্ব্বতো-ভদ্রে পঞ্চতল, ষোল কোণ, চন্দ্রশালা থাকিত। বল্লভীচ্ছন্দও পঞ্চতলযুক্ত। বৃষ নামক গৃহ বৃষাকৃতি, দ্বিতল ও পঞ্চশৃঙ্গ-শোভিত। সিংহ সিংহাকৃতি ও ছয়তলযুক্ত। গজ গজা-কৃতি ও ষোল হাত বিস্তৃত। কুম্ভাকৃতি কুম্ভও ষোল হাত বিস্তৃত ও দ্বিতল। পদ্ম নামক গৃহ ত্রিতল, ষোল কোণ ও বিশ হাত বিস্তৃত। গরুড়, পক্ষীর মত আকৃতিবিশিষ্ট, সপ্ততল-যুক্ত এবং চারিদিকে ছিয়াশী কক্ষ সুশোভিত। হংস, হংসাকৃতি, দশ হাত বিস্তৃত। বর্ত্তুল দেখিতে বর্ত্তুলেরই মত এবং বিশ হাত বিস্তৃত। চতুরস্র গৃহ চারিকোণ-বিশিষ্ট, অষ্টাস্র, অষ্টভুজ ও ষোড়শাস্র ষোল পক্ষযুক্ত। অবশিষ্ট পুরাণগুলিতেও গৃহের অল্পবিস্তর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যাবর্ত্তের অষ্টাদশ পুরাণের অনুকরণে রচিত দাক্ষিণাত্যে অষ্টাবিংশতি আগম নামক গ্রন্থ আছে। ইহাদেরও প্রত্যেক-টিতে গৃহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কামিক আগম নামক গ্রন্থে গৃহের এত অধিক বর্ণনা যে, ইহাকে বাস্তুশাস্ত্র নামও দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পঁচাত্তর অধ্যায়ের মধ্যে ষাট অধ্যায়ে কেবল গৃহাদিরই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আগমে (৭৫, ৬-১১, ১২৮-১৩০; ৩৫, ৮৭-৯১; ৪৫, ২৩-৬৪) গৃহসমূহ সিন্দুকাদি বিংশতি প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে। সুপ্রভেদ আগমে (৩১, ৪০-৫২) প্রাসাদ কৈলাসাদি দশ প্রকারে এবং মণ্ডপ প্রথমতঃ দেব, অসুর, ঋষি ও নৃত্ত এই চারি

ভাগে; তার পর নন্দ্যাবর্ত্ত, শ্রিয়াবৃত্ত, বীরাসন, জয়ভদ্র, মণিভদ্র ও বিশালাদি নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, আগমেও প্রায় চল্লিশ অধ্যায় গৃহাদির বর্ণনায় নিযুক্ত হইয়াছে। বৈখানস ও অংশুমদ ভেদাদি অবশিষ্ট আগমগুলিতেও গৃহাদির অল্পবিস্তর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত মদীয় গ্রন্থদ্বয়ে অষ্টাবিংশ আগমোক্ত গৃহবর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যাইবে। কৌচিনীয় অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র, শুক্রনীতি, বাণ কবির হর্ষচরিত, কহ্লণ পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণী, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে, যাস্কের নিরুক্ত, অমরকোষাদি অভিধানে, মৃচ্ছকটক, বিক্রমোর্ব্বশী ও উত্তররামচরিতাদি নাটকে এবং মেঘদূতাদি খণ্ডকাব্যে গৃহাদির যে সকল অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে, সে সকল মদীয় গ্রন্থদ্বয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।

এক্ষণে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। এই যে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ পঞ্চদশ খৃষ্ট শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের নানাবিধ গ্রন্থে গৃহাদির এরূপ উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে, এই সকলের উৎপত্তি কোথায়? সঠিক মাপাদিযুক্ত এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবি-কল্পনামাত্র কখনও হইতে পারে না। বৃদ্ধা কুমারী কেথরিন্ মেয়ো আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অসভ্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও প্রাচীন ভারতে গৃহাদি নির্ম্মাণের পদ্ধতি ও আশ্চর্য্য রকমের নিপুণতা ঐতিহাসিকরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইলোরা গুহাগৃহের চিত্রাবলীর নিজস্বতা মেয়োরও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমেরিকার যুকতন অরণ্যের আদিম অধিবাসী ময় নামক লোকদিগের গৃহাদির ভগ্নাবশেষের আবিষ্কার হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহারা খুব সম্ভব মহাভারতে উল্লিখিত দানবদের বিশ্বকর্ম্মাতুল্য মহাকবি ময় অসুরেরই বংশধর। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মদীয় অভিধানে (পৃঃ ৭৭২-৭৭৯) দেওয়া হইয়াছে। আমাদের গৃহাদির আকারাদি হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈদিকাদি গ্রন্থে যে যুগের হর্ম্ম্যাদির বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, সে যুগে মেয়োর মাদার-কান্‌ট্রির লোকরা ত নিশ্চয়ই, এমন কি, গ্রীস রোম ছাড়া য়ুরোপেরই অধিকাংশ দেশের লোকরাও অসভ্যজনোচিত নির্ম্মাণ-কৌশলবিহীন গুহাদিতেই বাস করিত। বেবিলোন, মিশর ও চীন দেশ হইতেও আমাদের গৃহনির্ম্মাণপদ্ধতি আমদানী হয় নাই, তাহাও গৃহাদির আকৃতি প্রভৃতি হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর একটা প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের বৌদ্ধগ্রন্থ, পুরাণ, আগম, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও কাব্যাদি গ্রন্থে গৃহাদির এরূপ পারিভাষিক বিবরণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল? এরূপ বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থকর্ত্তারা সমভাবে গৃহনির্ম্মাণ-কৌশলেও সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন, সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বস্তুতঃ গৃহনির্ম্মাণপদ্ধতি আমাদের দেশে এতটা উৎকর্ষতা ও লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে, তাহা প্রাচীনকালেই শাস্ত্রাকারে পরিণত হইবার গৌরবলাভ করিয়াছিল। য়ুরোপের প্রাচীনতম গৃহশিল্পের বিট্রুভিয়স্ নামক গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মাত্র লিখিত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রাদি গ্রন্থে (পৃঃ ৩২-৩৫, ৯৩, ৯৫) উল্লিখিত চতুঃষষ্টি কলা বা শিল্পের মধ্যে সমাবিষ্ট থাকিলেও বাস্তুবিদ্যা অবশিষ্ট কলা হইতে প্রাচীনতর, তাহা মনে করিবার বিশ্বাসযোগ্য কারণ আছে। বস্তুতঃ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাদির প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহাদির নির্ম্মাণের আকাঙ্ক্ষা প্রাণিমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক, তাহা পক্ষীর নীড় ও পশুর গুহাদিতে বাস হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আহারের জন্য পরিপাটীর সহিত অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধনাদির ন্যায় বাসের জন্য কুশলতার সহিত সুদৃশ্য, স্থায়ী ও প্রয়োজনোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণও লোকের সভ্যতার উৎকর্ষের প্রথম ও প্রকৃত পরিচায়ক। এখানে সংক্ষেপে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন ভারতের গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগেরই নিজস্ব। আজই না হয় আমরা ইংরেজের সেরাসিনিক নামক মুসলমান-পদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত গৃহ অথবা না-য়ুরোপীয়, না-ভারতীয় পদ্ধতিতে ইংরাজের আমলে নির্ম্মিত গৃহে আমাদের এতাদৃশ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষদিগের পিণ্ডদান পর্য্যন্ত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি না। কিন্তু আমরা চিরদিনই এরূপ পরমুখাপেক্ষী ছিলাম না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সহজতর। ব্যষ্টিরূপে আমাদের দেশে যখন শাস্ত্রাকারেই অতি প্রাচীনকালে পরিণত হইয়াছিল, তখন বাস্তুশাস্ত্রের পরবর্ত্তী কালে রচিত অপর গ্রন্থসমূহে গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ে যে সকল পারিভাষিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহ বাস্তুশাস্ত্র হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল,

আমাদের সহস্রাধিক বাস্তুশাস্ত্রের গ্রন্থ এক সময়ে হয় ত ছিল, এরূপ অনুমান অত্যুক্তি হইবে না। বিগত পনেরো বৎসরের অন্বেষণার ফলে লেখক দুই তিন শত পরিমিত হাতের লেখা বাস্তুশাস্ত্রের পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তদীয় অভিধানের পরিশিষ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন। বাস্তুশাস্ত্রের সকল গ্রন্থই যে মৌলিক ও স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কোন এক মূলগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচিত, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এই মূল গ্রন্থের নাম মানসার। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত রোমীয় শিল্পী বিট্রুভিয়সের গ্রন্থের আশ্চর্য্য রকম সোসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিল্পশাস্ত্রের খনি-বিশেষ। ইহার ৭০ অধ্যায়ে পাথীর নীড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সকল প্রকারের গৃহের প্রাকার, দ্বার, স্তম্ভ, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, প্রাঙ্গণাদির সঠিক মাপ ও বিস্তারিত বিবরণ আছে। দীপদণ্ড, পাদুকা, হার, বলয় প্রভৃতির মাপ ও বিশেষ বিবরণও বাদ পড়ে নাই। এই স্থলে সংক্ষেপে বাস-গৃহেরই একটু আভাস দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইতেছে।

মানসারের এক অধ্যায়ে চক্রবর্ত্তী, মহারাজ, নরেন্দ্র, মণ্ডলেশ, পার্ষ্ণিক, পট্টধর, পট্টভাজ, প্রাহারক ও অস্ত্রগ্রাহী নামক নয় শ্রেণীর রাজাদের বাসোপযোগী রাজ-হর্ম্ম্যের বর্ণনা আছে। রাজসভা, রাজমহিষী, রাজকুমার, রাজনন্দিনী, রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিতাদির বাস-গৃহাদি স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দেব-মন্দিরের বর্ণনা আরও বিস্তারিত; বিমানম্, পরিবারালয়ম্, গোপুরম্ ও মণ্ডপাদি ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যায়ে নানাভাবে মন্দিরাদির সঠিক মাপ ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। বিমানের বর্ণনা বর্ণনীয় বিষয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক হইতে দ্বাদশ তল পর্য্যন্ত প্রত্যেক তলের মাপ ও বিশদ বর্ণনা প্রথমতঃ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—নাগর, বেসর, ও দ্রাবিড় নামক তিন প্রকারের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর যথাক্রমে স্তূপিকীল, লুপা ও মুখভদ্রাদির বর্ণনা আছে। পরিবারালয় আনুষঙ্গিক দেবতাগণের মন্দির। ৮ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩২ পর্য্যন্ত আনুষঙ্গিক দেবতা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবায়তনে থাকিত। গোপুরম্ এরূপ দেবায়তনের বিশাল দ্বারগৃহ বা ফটক। এই সকল অট্টালিকা ১৭ তল পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত। বিশাল বাস-গৃহ ও মন্দিরের ৫ মহলের প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন প্রকারের গোপুর থাকিত। অন্তর্মণ্ডল বা প্রথম মহলের গোপুরের নাম ছিল দ্বারশোভা। দ্বিতীয় মহলে দ্বারশালা নামক গোপুর থাকিত। তৃতীয় মহলের গোপুরের নাম দ্বারপ্রাসাদ। চতুর্থ মহলের গোপুরকে দ্বারহর্ম্ম্য এবং মহামর্য্যাদা বা পঞ্চম মহলের গোপুরকে মহাগোপুর বলা হইত। এই পাঁচ শ্রেণীর গোপুর আকৃতি অনুসারে আবার ১৫ ভাগে বিভক্ত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় অংশবিশেষের স্বতন্ত্র নাম ও মাপাদি দেওয়া আছে। উদাহরণরূপে গবাক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গবাক্ষসমূহ অন্য প্রকারের গৃহেও প্রযুক্ত হয়। এইগুলি নানা আকারে নির্ম্মিত হইত; যথা,—নাগবন্ধ, বল্লী, কুঞ্জরাক্ষ, স্বাস্তিক, সর্ব্বতোভদ্র, নন্দ্যাবর্ত্ত, পুষ্পবন্ধ ইত্যাদি। মণ্ডপ নামক গৃহ দেবায়তন, আরাম ও বাস-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। হিমজ, নিষদজ, বিজয়, মাল্যজ ইত্যাদি নামক প্রায় শতাধিক মণ্ডপ পরিমাপাদিসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বাস-গৃহসমূহকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তর, ইষ্টক ও কাষ্ঠাদির মিশ্রণ বা অমিশ্রণ দ্বারা নির্ম্মাণ অনুসারে বাস-গৃহসমূহ শুদ্ধ, মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ নামে অভিহিত হইত। মাপের হিসাবে এইগুলিকে একবার জাতি, ছন্দ, বিকল্প ও আভাস, এই চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। আবার স্থানক, আসন, শয়ন এবং সংচিত, অসংচিত ও অপসংচিত বলা হইত। আকৃতির হিসাবে এই সকল গৃহ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসক নামে পরিচিত। প্রধান বিভাগ বস্তুতঃ তলের হিসাবে। একতল গৃহ ৮ প্রকারের হইত; যথা—বৈজয়ন্তিক, ভোগ, শ্রী-বিশাল, স্বস্তিবদ্ধ, শ্রীকর, হস্তিপৃষ্ঠ, স্কন্দতার ও কেসর। দ্বিতল গৃহও ৮ প্রকারের; যথা—শ্রীকর, বিজয়, সিদ্ধ, পার্ষ্ণিক বা পৌষ্টিক, অন্তিক, অদ্ভুত, স্বাস্তিক ও পুষ্কল। ত্রিতল গৃহের ৮ প্রকারের, নাম—শ্রীকান্ত, আসন, সুখালয়, কেসর, কমলাঙ্গ, ব্রহ্মকান্ত, মেরুকান্ত ও কৈলাস। চারিতল গৃহও ৮ প্রকারের, যথা—বিষ্ণুকান্ত, চতুর্মুখ, সদাশিব, রুদ্রকান্ত, ঈশ্বরকান্ত, মঞ্চকান্ত, বেদিকান্ত ও ইন্দ্রকান্ত। পাঁচতল গৃহের ৮ প্রকারের, নাম—ঐরাবত, ভূতকান্ত, বিশ্বকান্ত, মূর্ত্তিকান্ত, যমকান্ত, গৃহকান্ত, যজ্ঞকান্ত ও ব্রহ্মকান্ত। ষট্‌তল গৃহ ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—পদ্মকান্ত, কান্তার, সুন্দর, উপকান্ত, কমল, রত্নকান্ত, বিপুলাক্ষ, জ্যোতিষ্কান্ত, সরোরুহ, বিপুলাকৃতিক, স্বাস্তিকান্ত, নন্দ্যাবর্ত্ত ও ইক্ষুকান্ত। সপ্ততল গৃহ ৮ প্রকারের; যথা—পুণ্ডরীক, শ্রীকান্ত, শ্রীভোগ, ধারণ,

পণ্ডধর, আশ্রমাগার, হর্ম্ম্যকান্ত ও হেমকান্ত। অষ্টতল গৃহও ৮ প্রকারের ; যথা—ভূকান্ত, ভূপকান্ত, স্বর্গকান্ত, মহাকান্ত, জনকান্ত, তপস্কান্ত, সত্যকান্ত ও দেবকান্ত। নবতল গৃহ ৭ প্রকারের ; যথা—সৌরকান্ত, রৌরব, চণ্ডিত, ভূষণ, বিরূত, সুপ্রতিকান্ত ও বিশ্বকান্ত। দশতল ছয় প্রকারের গৃহের নাম—ভূকান্ত, চন্দ্রকান্ত, ভবনকান্ত, অন্তরীক্ষকান্ত, মেঘকান্ত ও অজ্রকান্ত। একাদশতল গৃহসমূহও ছয় প্রকারে বিভক্ত ; যথা—শম্ভুকান্ত, ঈশকান্ত, চক্রকান্ত, যমকান্ত, বজ্রকান্ত ও অক্রকান্ত। দ্বাদশতল গৃহ তদানীন্তন প্রদেশের নাম অনুসারে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—পাঞ্চাল, দ্রাবিড়, মধ্যকান্ত, কালিঙ্গকান্ত, বিরাটকান্ত, কেরলকান্ত, বংশকান্ত, মাগধকান্ত, জনকান্ত ও গুর্জরক। দ্বাদশতলযুক্ত গৃহ প্রাচীন ভারতের দশ প্রদেশেই বিদ্যমান ছিল, ইহাতে দেশের ঐশ্বর্য্য ও শিল্প-প্রিয়তা প্রমাণিত হইতেছে। ঈদৃশ বিশাল অট্টালিকার বর্ণনা হইতে আমাদের বিগত গৌরবের নানাবিধ ঐতিহাসিক সত্যের বিষয় জানিতে পারা যায় ; সে সকল বিষয়ের আলোচনা মদীয় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিতভাবে করা হইয়াছে। এই ৯৮ প্রকার গৃহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের নানাবিধ মাপ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মানসারে দেওয়া হইয়াছে। দ্বার, গবাক্ষ, সচল ও অচল সোপানাদিরও বর্ণনা আছে। প্রকোষ্ঠাদির বিবরণও বিস্তারিত। সাধারণ গৃহস্থের বাসোপযোগী আবাসের কক্ষাদির সমাবেশের বিবরণ গ্রন্থান্তরে অধিকতর প্রাঞ্জল। এরূপ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাস-গৃহে সাধারণতঃ ১৬ প্রকোষ্ঠ থাকিত। বাস্তবিদ্যা নামক গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে (পৃঃ ১) পূর্ব্বোত্তর-কোণে দেবগৃহ বা পূজার ঘর থাকিত ; পূর্ব্বে সর্ব্ববাস্তুগৃহ বা প্রধান হল-কামরা, স্নানগৃহ ও দধিমন্থনগৃহ ; দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে রন্ধনাগার, দক্ষিণে বৃতসগৃহ, শৈলগৃহ ও পুরীষ্কগৃহ থাকিত ; দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে শাস্ত্রমণ্ডপ ; পশ্চিমে শাস্ত্রাভ্যাস-গৃহ, ভোজনগৃহ ও রোদনগৃহ থাকিত ; পশ্চিমোত্তর-কোণে ধান্যগৃহ অবস্থিত ; উত্তরে সম্ভোগগৃহ বা শয়নাগার, দ্রব্যগৃহ বা ভাঁড়ার ও ঔষধগৃহ থাকিত। শিল্পশাস্ত্রসার-সংগ্রহ নামক গ্রন্থেও (৯, ২৬-২৮) প্রায় এরূপ সমাবেশই দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তু-প্রবন্ধের (২, ২৫-২৬) বর্ণনা অনুসারে পশ্চিমে স্নানাগার ; পূর্ব্বদক্ষিণ-কোণে পচনালয় ; দক্ষিণে শয়নাগার ; দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে শাস্ত্রমন্দির ; পশ্চিমে ভোজনাগার ; পশ্চিম-উত্তরকোণে পশুশালা, উত্তরে ভাণ্ডকোষ বা ভাঁড়ারাদি এবং পূর্ব্বোত্তর-কোণে দেবমন্দির বা পূজার ঘর থাকিত। মৎস্য-পুরাণের (২৫৬, ৩৩-৩৬) বর্ণনা অনুসারে ঈশান বা পূর্ব্বোত্তর-কোণে দেবতাগার ও শান্তিগৃহ থাকিত ; অগ্নিকোণে মহানস বা রন্ধনাগার এবং তাহার পার্শ্বে উত্তরে জল থাকিত ; গৃহের উপস্করসমূহ দক্ষিণপশ্চিম-কোণে স্থাপিত হইত ; মৎস্য-মাংসের জন্য বধস্থান ও স্নানমণ্ডপ গৃহের বাহিরে অবস্থিত ; ধন-ধান্যাগার বায়ু বা পশ্চিমোত্তর-কোণে এবং তাহার বাহিরে কর্ম্মশালা থাকিত। এরূপ বাস্তুবিশেষ এই পুরাণের মতে শুভাবহ। অগ্নিপুরাণের বর্ণনা অনুসারে (১০৬, ১৮-২০) পূর্ব্বে শ্রীগৃহ ; অগ্নিকোণে মহানস ; দক্ষিণে শয়নাগার ; দক্ষিণ-পশ্চিমে আয়ুধ বা অস্ত্রাগার ; পশ্চিমে ভোজনালয় ; বায়ুকোণে ধান্যাগার ; উত্তরে দ্রব্যসংস্থান বা ভাঁড়ার-ঘর ; ঈশানকোণে দেবগৃহ থাকিত। কামিক আগমের (৩৫, ১৭৭-১৯১) বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণের পচনস্থান পূর্ব্বোত্তর-কোণে, ক্ষত্রিয়ের পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে, বৈশ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে এবং শূদ্রের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। আগম দক্ষিণ-ভারতের নিজস্ব। দক্ষিণের জাতিভেদের দাগ গৃহ-নির্ম্মাণ-বিষয়েও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের জন্য যে নিয়ম ছিল, তাহাতে এই ভেদ লক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ পূর্ব্বে ভোজনস্থান, অগ্নিকোণে মহানস বা রন্ধনাগার, দক্ষিণে শয়নাগার, দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে আয়ুধাগার, পশ্চিমে উদকাগার, বায়ুকোণে গোষ্ঠালয়, উত্তরে ধনালয় এবং নিত্যনৈমিত্তিক পূজার জন্য ঈশানকোণে যাগমণ্ডপ থাকিত। এই প্রবন্ধে কাঞ্জি ও লবণ রাখিবারও স্থান করা হইত। অন্তরীক্ষপ্রদেশে চুল্লী ও উলূখল থাকিত, আর্য্যাংশে অন্নপ্রাশন-গৃহ বা ভোজনাগার, বিবস্বত অংশে শ্রবণাগার, মৈত্রাংশে বিবাদ-গৃহ, মৃগাংশে প্রসূতিগৃহ, অপবৎসাংশে কোষাগার ও কুণ্ড থাকিত। মহেন্দ্রাংশে অঙ্গন, মহীধরাংশে পেষণী থাকিত। উপস্কর বা আবর্জ্জনা বাহিরেই নিক্ষিপ্ত হইত। দ্বারদক্ষিণে বাহনাগার, পশ্চিমে স্নানশালা, অসুরাংশে ধান্যাগার, পূর্ব্বে আয়ুধাগার। মিত্রাবাস বা অতিথিশালা মিত্রাংশে এবং রোগাংশে উদূখল থাকিত। ভূধরাংশে কোষগৃহ এবং নাগাংশে ঔষধাগার ও ঘৃতশালা। বিষের প্রত্যৌষধাগার জয়ন্তাংশে, কূপ অপবৎসাংশে এবং পর্জন্যাংশে দেবগৃহ থাকিত। আহ্বান-মণ্ডপ বা হলুকাংশে ঋক্ষ, ভল্লাট বা সোমাংশে থাকিত।

এই সকল গ্রন্থের বিভিন্ন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশের উপযোগী। দক্ষিণ-ভারতে ও বাঙ্গালাদেশে দক্ষিণ দিক হইতেই সমুদ্রের হাওয়া পাওয়া যায়। এই সকল প্রদেশে সেই জন্যই দক্ষিণমুখো গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত এবং বাগানের দক্ষিণ দিকে থাকিত। গ্রীষ্মপ্রধান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে উত্তরমুখো বাড়ী ও গৃহের উত্তরাংশে শয়নগৃহ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য—পশ্চিম হইতে হিমালয়ের হাওয়া পাওয়া ও পূর্ব্ব-দক্ষিণের উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলা।

বাসগৃহের কক্ষাদির আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের বিস্তৃত বিস্তারিত বর্ণনা মানসারে ও অপর গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আভাসমাত্র দিবার অবসরও এখানে নাই। মানসারে অন্তর্ভূষণ ও বহির্ভূষণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গৃহ-সরঞ্জাম বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্ভূষণের মধ্যে পর্য্যঙ্ক বা খাটই ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইত, যথা—পঞ্জর, কর্ণী, মঞ্চ, কাকাষ্ঠ, ফলকাসন ও বালপর্য্যঙ্ক। রাজহর্ম্ম্যে ও দেবায়তনে নানাপ্রকারের সিংহাসন থাকিত ; যথা—প্রথমাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, বিজয়াসন, নিত্যব্যবহার্য্য আসন, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহারোপযোগী আসন, পদ্মাসন, পদ্মকেসর, স্বস্তিক, শ্রীভদ্র, শ্রীবিশাল, শ্রীবন্ধ, শ্রীমুখ, ভদ্রাসন, পদ্মবন্ধ ও গজবন্ধ ইত্যাদি। বহির্ভূষণের মধ্যে দীপদণ্ড, ব্যজন বা পাখা, দর্পণ বা আয়না, মঞ্জুষা বা বস্ত্রাদি রাখিবার আলমারী ও তৈজসাদির ভাণ্ড, দোলা অর্থাৎ দোলনা ও পাল্কী প্রভৃতি, এবং দাঁড়িপাল্লা এবং গৃহপালিত বিড়ালাদি পশুর পঞ্জর ও শুক-চকোর-চাতকাদি পক্ষীর নীড় উল্লেখযোগ্য। অন্তর্ভূষণের বিবরণ চুল্লবগ্গ (৬, ১৩, ২ ; ৬, ১৪, ১ ; ৬, ৮, ১ ; ৬, ২, ৪, ৬, ৭ ; ৬, ২০, ১) ও মহাবগ্গেও (৫, ১০, ২ ; ৫, ১০, ৩) দেখিতে পাওয়া যায়। লম্বা বেঞ্চী, আসন্দি বা বড় কৌচ, আসন্দক বা আয়তাকার চেয়ার, সত্তঙ্গ বা সোফা, ভদ্রপীঠ বা বড় চেয়ার, পীঠিকা বা কুশন চেয়ার, কোচ্চম্ বা বেতের চেয়ার, বল্লিক বা বহুপাদযুক্ত চেয়ার ইত্যাদির এই স্থলে উল্লেখমাত্র করা যাইতে পারে। মূল্যবান্ মশারি, কার্পেট, নানাবিধ র‍্যাগ বা কম্বল, বালিস, পাশ-পালিস, গিদ্দা এবং এ সকলের ওয়াড় প্রভৃতি রেশমী কাপড়ের উপর সোনা ও জরীর ঝালরযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইত। মেজের জন্য নানাবিধ সূতী ও পশমী গালিচা প্রস্তুত হইত। নানাপ্রকারের রুমালেরও উল্লেখ আছে। পিকদানী পর্য্যন্ত গৃহ-সরঞ্জাম হইতে বাদ পড়ে নাই। এ সকলের বিস্তারিত বিবরণ লেখকের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এ সকল ঐশ্বর্য্যের বিবরণ আমাদের নিজেদের কানেই হয় ত স্বপ্নের অলীকতার মত শুনাইবে। নর্দ্দমার কৃমির অনুসন্ধানে তৎপর জন্তুবিশেষের ন্যায় কুমারী মেয়োর মত যাহারা আমাদের কুৎসা-ঘোষণার জন্য নিযুক্ত, তাহাদের দ্বারা আমাদের এতাদৃশ প্রাচীন সভ্যতার অকাট্য প্রমাণ সর্ব্বসাধারণের নজরে কখনও আনীত হইবে না। আমাদের বিগত ঐশ্বর্য্যের পুনরুদ্ধার আমাদেরই হাতে। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমান কালের ব্যবহারউপযোগী করিয়া গৃহাদির নির্ম্মাণ দ্বারা আমরা ধনী, দরিদ্র সকলই এক দিকে যেমন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারি, অন্য দিকে সেরূপ সুস্থ ও সুখী হইতে পারি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য
(এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, আই-ই, এস্-এ)।



অমরনাথ



২৫

লতার জন্য একটা কলের ময়ূর কিনিয়া কৃষ্ণনাথের ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। যখন তিনি উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়া মোটরে আসিতেছিলেন, তখন সূর্য্য অস্তপ্রায়। সোফেয়ার মোটর হাঁকাইতেছিল, কৃষ্ণ ভিতরে লতা ও নরুকে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। মোটর ক্ষিপ্ত দানবের ন্যায় ছুটিতেছে; কৃষ্ণ সহসা দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুর হরনাথ পথিপার্শ্বে একাকী দণ্ডায়মান থাকিয়া গাড়ীকে থামিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। গাড়ী একটু দূরে গিয়া থামিল। হরনাথ কহিলেন, "বাবা, একবার আমাদের ওখানে চল।"

"সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।"

বলিয়াই কৃষ্ণনাথের মনে পড়িয়া গেল, "অমর থাক্‌লে সে ত যেত, আমার এ অবাধ্যতা সে ত পছন্দ করত না। সে বলে, যে মানী, সেই মানীর মান রাখে—চাঁদের মান শিবের কাছে, রাহুর কাছে নয়। কৃষ্ণনাথ তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "আজ্ঞে, চলুন।"

শ্বশুরকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কৃষ্ণনাথ চলিলেন। পথে কেহ কাহারও সহিত আলাপ করিলেন না। গৃহদ্বারে আসিয়া মোটর লাগিলে কৃষ্ণনাথ নামিলেন, ছেলেমেয়েরা নামিল না। কৃষ্ণ কহিলেন, "তোরা গাড়ীতে থাক্, আমি এখনই আস্‌ছি।"

হরনাথ নামিয়া কহিলেন, "ওরা থাকবে কেন, খেয়ে যাবে।"

নরু। আমরা কলকাতায় খুব খেয়েছি, আর খাব না দাদু।

হর। খাবে বই কি দাদা, এস।

বলিয়া তাহার হাত ধরিলেন। নরু তাহার দাদামহাশয়ের বড় ভক্ত ছিল, দিদিমাকে অত পছন্দ করিত না। দাদুর আহ্বান অবহেলা করিতে না পারিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। হরনাথ তার পর গাড়ীতে উঠিয়া লতাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। লতা প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, "আমি হেঁটে যাচ্ছি, নামিয়ে দিন।"

তাহাকে নামাইয়া দিয়া দুই হাতে দুই জনকে ধরিয়া হরনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। হরনাথ যাইতে যাইতে কহিলেন, "আমি তোমাদের অপেক্ষায় পথের ধারে অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম। এস দাদা, এস, এস মা, এস।"

তাহাদের লইয়া হরনাথ একেবারে উপরে উঠিলেন। কৃষ্ণনাথের এককালে ইচ্ছা ছিল না, লতা সে বাড়ীতে আর প্রবেশ করে; তিনি বা নরু অন্দরমহলে কখনও আসেন, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে আবার আসিতে হইল। একবার কৃষ্ণনাথের ইচ্ছা হইল, বলে, আমরা অন্দরে যাব না; কিন্তু বলিতে পারিলেন না—অমরনাথের মূর্ত্তি যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, গুরুজনকে অসম্মান করিও না। তিনি নীরবে শ্বশুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

উপরে উঠিয়া কর্ত্তা জ্যোতিকে ডাকিলেন। জ্যোতি তখন জানালার পাশে বসিয়া শোভার নিকট কোন্নগরের গল্প করিতেছিল। সে গল্পের নায়ক—অমরনাথ। নায়িকা কেহ না থাকিলেও শোভা নায়িকার পদে রেবাকে বসাইয়া তাহার অনুরাগের কথা বলিতেছিল। শোভা চায়, জ্যোতির সহিত অমরের বিবাহ হয়। অমর যা', তার চেয়ে তাঁকে বড় করিয়া চিত্রিত করিয়া শোভা বলিতেছিল, 'বহুভাগ্যে অমরকে স্বামিরূপে পাওয়া যায়; রেবা তাঁকে চিনেছে, তাই ভালবেসেছে। জন্মান্তরে সেও তপস্যা করেছিল—তুই অমন কর্‌ছিস কেন লা? তুই কি—'

পিতার আহ্বানে উভয়ে ফিরিয়া চাহিল। লতা প্রকৃতির দেখিবামাত্র জ্যোতির প্রত্যেক রক্তবিন্দু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহারা উন্মুখ হইয়া দেখিতে লাগিল, কৃষ্ণনাথের পিছনে আছেন কি না। যখন তাহারা দেখিল, তিনি নাই, তখন তাহারা ফিরিয়া নিজ নিজ কাযে চলিয়া গেল। শান্তভাবে উঠিয়া জ্যোতি, নরু ও লতার কাছে আসিল। শোভা তাহার মাকে ডাকিতে পার্ব্বতী আসিলেন, রূপো আসিল, মেজ-বউ আসিল। কর্ত্তা কহিলেন, "ময়ি, আগে এদের খেতে দেও; এরা কলকাতার দোকানে দোকানে খেয়ে বেড়িয়েছে।"

"দোকানে কেন খেতে যাব, দাদু? আমরা সকলে—"

"যাও ময়ি, খাবার নিয়ে এস।"

জ্যোতি খাবার আনিতে গেল। পার্ব্বতী দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে এলো না?"

কৃষ্ণ। কে, অমর? সে ত চ'লে গেল।

পার্ব্ব। চ'লে গেল? কোথা?

কৃষ্ণ। দিল্লী।

পার্ব্ব। দিল্লী গেল? কবে—কবে আবার সে ফিরবে?

কৃষ্ণ। তা'র কিছু ঠিক নেই।

পার্ব্ব। আমি ত (কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল) আমি ত এ দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌তে পারব না! তাকে লিখো—

কৃষ্ণ। কি লিখব?

পার্ব্ব। আমি তার মা, সে আমার ছেলে—আমার জন্য

আর কথা সরিল না, পার্ব্বতী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরনাথ কহিলেন, "কাঁদ, খুব কাঁদ; অনুতাপে পাপ ধুয়ে গেলে যদি আবার তার দেখা পাও।"

জ্যোতি খাবারের থালা তিনখানা একে একে আনিল; রূপো আসন ও জল আনিল, কিন্তু কেহ আসনে বসিল না। তখন সেই কান্নার সুর ঘরময় বহিয়া চলিয়াছে। সে সুর ভাঙ্গিয়া দিল নরু সহসা কহিল, "কাকা হাওড়ায় কি করেছেন, জান দাদু?" (কথাটা বলবার জন্যে নরু ছটফট করিতেছিল)।

শোভা। কে, অমর বাবু? কি করেছেন রে?

নরু। গাড়ীতে উঠেই এক সাহেবকে মেরেছেন।

রূপো। তিনি দেখ্‌ছি সকলকেই মেরে বেড়ান, গায়ে কতটুকু জোর আছে কি না।

শোভা। কাকে তুই মারতে দেখলি, রূপো? একটা কায করে দেখা, যেটা তিনি অন্যায় করেছেন, ভেবে-চিন্তে কথা বল্‌বি। রূপোর কথায় নরুও চটিয়াছিল; কহিল, "তা কাকার দোষ কি? সাহেবটা যে কোন্নগরের মামাকে মেরে ফেলছিল।"

শোভা। শরৎ দাদাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁরও যে আজ হাওয়া যাবার কথা ছিল। তার পর কি হ'ল?

নরু। কাকা গাড়ীতে উঠে দেখলেন, সাহেব মামাকে মারছে—

শোভা। শুধু শুধু মারছিল? একটা কিছু হয়ে থাকবে ত—

নরু। বাবা বলছিলেন, যায়গা নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল।

শোভা। শরৎ দাদাও ত খুব ষণ্ডা, তিনি নিশ্চয়ই চুপ ক'রে থাকেন নি—

নরু। হ্যাঁ, তিনি আবার মারবেন! শুয়ে প'ড়ে মার খাচ্ছিলেন।

রূপো। বলিস কি! শরৎদা ত চাকরবাকরকে খুব মারেন।

পার্ব্ব। তোরা চুপ কর্ না, নরুকে কথাটা বলতে দে।

নরু। কাকা গিয়েই ত সাহেবের হাত ধরলেন। সাহেব মামাকে ছেড়ে কাকার উপর পড়ল। কাকার সে কি জোর? লতা যেমন! কেঁদেই মেয়েটা ভাসিয়ে দিলে—

কৃষ্ণ। তুমিও ত ছড়ি দিয়ে সাহেবকে মারতে গিয়েছিলে।

নরু। তা মারব না, দাদু? সে যে আমার কাকার গায়ে হাত তুলেছিল।

হর। বেশ করেছিলে, দাদা। আমার দাদু ওর কাকার মত নির্দ্দোষ—কখন অন্যায় কায করে না, কখন মিথ্যা বলে না।

নরু। মিথ্যে বললে যে কাকা আমার সঙ্গে কথা কবেন না।

শোভা। তার পর কি হ'ল বল্।

নরু। তারপর কাকাকে মারতে সাহেব ঘুষি উঠাল। কাকা তার হাত ধ'রে কি করলেন, বুঝলাম না—ফলে, সাহেব মেজেতে পড়ে গেল। সেই সময় মামা উঠে সাহেবকে লাঠি দিয়ে মারতে গেল। কাকা তাই দেখে রেগে উঠলেন,—মামার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে সাহেবকে ছেড়ে দিলেন—

শোভা। তোমার মামা কি বীরপুরুষ! সাহেব প'ড়ে রয়েছে, তখন তাকে লাঠি মারতে গেছেন! মেয়েমানুষেরও অধম। ছ্যা!

পার্ব্ব। চুপ্ কর্ শোভা, আমার ছেলের কথা নরুকে বলতে দে।

নরু। সাহেব তখন ধুলো ঝেড়ে উঠে কাকার কাছে মাপ চাইলে, কাকার সঙ্গে সাহেব-মেমের খুব ভাব হয়ে গেল—

রূপো। মেম ছিল বুঝি?

নরু। খুব ভাল মেম। লতাকে দু'খানা ছবির বই দিলেন, কত আদর কর্‌লেন, চুমো খেলেন; সাহেব লতাকে আমাকে কত কি খেতে দিলেন—

শোভা। শুনলি রূপো? অমর বাবু কি অন্যায়টা করেছেন বল? তুই যে তাঁর বড় নিন্দে করছিলি—

রূপো। নিন্দে আবার কি করেছি!

শোভা। তাঁর সম্বন্ধে ঐটুকু বলাও নিন্দে। বাসিকরা সাদা কাপড়ে এক বিন্দু কালিও অসহ্য, চক্ষুঃশূল।

হর। ঠিক বলেছ শোভা, বড় খুসী হলাম।

শোভা। হ্যাঁ নরু, তোর মামা কি বললে অমরবাবুকে?

নরু। মামা কত কি বললেন, কিন্তু কাকা তাঁর পানে ফিরেও দেখলেন না। কিন্তু বাবা—

শোভা। তোমার বাবা আবার কি করেছেন?

নরু। মামাকে গাধাটাধা ব'লে গাল দিয়েছেন।

শোভা। কেন?

নরু। সাহেবকে এক ঘাও মারেন নি ব'লে।

রূপো। মামা মারেন নি, বাগ পান নি বলে; তাই ব'লে গাল দেওয়া—

হর। কৃষ্ণ ঠিক করেছে; কৃষ্ণ আমার অন্যায় কিছু বলে না, তাই অমর ওকে এত ভালবাসে।

লতা একটিও কথা বলে নাই, চুপ করিয়া হরনাথের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। পার্ব্বতী তাহাকে ডাকিলেন, "খেতে বসো,মা।"

লতা নড়িল না। পার্ব্বতী পুনরায় আদর করিয়া ডাকিলেন। লতা এক পাও নড়িল না। পার্ব্বতী তখন উঠিলেন। লতা সরিয়া দাঁড়াইল, পার্ব্বতী অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে লতা ছুটিয়া পলাইল। রূপো ছুটিয়া গিয়া তাহাকে পথের মাঝে ধরিল। টানাটানি করিলে লতা স্পষ্ট কহিল, "আমি কিছুতেই ওঁর কাছে যাব না—উনি আমার দাদাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

রূপো। সত্যি না কি?

লতা। আমি কি মিথ্যে বলছি!

রূপো আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল। লতা গাড়ীতে গিয়া বসিল। এ দিকে রূপো ফিরিয়া গিয়া তাহার মাকে কহিল, "সে এলো না।"

শোভা। আমি যাচ্ছি, দেখি কেমন সে না আসে।

জ্যোতি। তুমি যেও না, মেজদি।

শোভা। কেন রে?

জ্যোতি। সেজদি, তোমাকে সে কি বললে?

রূপো। বললে, যে আমার দাদাকে অপমান করেছে, তার কাছে আমি যাব না।

শোভা। ও বাবা, ঐটুকু মেয়ের পেটে এত বিদ্যে!

লতার প্রতি আক্রমণ নরু সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিল, "লতা অন্যায় কি বলেছে, মেজমাসি? তোমরা আমার কাকাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়েছ, আমিও ত আর কখন এখানে আসব না।"

শোভা। কে তোর কাকাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়েছে?

নরু। কেন, দিদিমা।

শোভা। মা, সত্যি ? সত্যি তুমি অমর বাবুকে তাড়িয়েছ ?

মা নীরব। ভিতরের কথা শোভা জানিত না—এত বড় অপরাধের কথা শোভাকে বলিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। কিন্তু স্বামীর নিকট বলিয়াছিলেন। যখন বলিয়াছিলেন, তখন অপরাহ্ণ, রেলগাড়ী তখন অমরকে বহিয়া লইয়া তাঁহার বাড়ীর দোর দিয়া ছুটিতেছে। ট্রেণের শব্দে চমকিত হইয়া হরনাথ শূন্য পানে চাহিলেন। গাড়ী দেখা গেল না, শব্দটুকু শুধু শুনা গেল। শব্দ নিকটে আসিল—বিদায় চাহিল—বিদায় লইয়া দূরে চলিয়া গেল—হরনাথের কানে অভিমানভরে কত কথা বলিয়া গেল। যখন শব্দ আর শুনা গেল না, তখন হরনাথ উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গঙ্গার দিকে প্রস্থান করিলেন এবং যাহারা অমরনাথের প্রিয়, তাহাদের প্রতীক্ষায় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহাদের ধরিয়া গৃহে আনিলেন বটে, কিন্তু একটুও শান্তি পাইলেন না। লতা ও নরু বেঁকিয়া দাঁড়াইল—তাহারা বসিল না, খাইল না।

পুত্রের কথা শুনিয়া কৃষ্ণনাথের আনন্দ হইল। তাঁহার মনের ভাব সে প্রকাশ করিল। তিনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমরা এখন তবে যাই—লতা গাড়ীতে একা বসে রয়েছে।"

কেহ কোন আপত্তি করিল না। শোভার মুখ গম্ভীর, গৃহিণী রোরুদ্যমানা, জ্যোতি স্থির। কর্ত্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক। এখন এই খাবারগুলো নিয়ে জলে ফেলে দেও। অমর ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হ'ল, আর সে যখন ক্ষুধার্ত্ত হয়ে আমার গৃহে এল, তখন আমি তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলাম !"

সকলের প্রাণের ভিতর বাঁদিয়া উঠিল। কৃষ্ণ কহিলেন, "অমর আপনাকে বড় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সিমলা হ'তে হঠাৎ চিঠি আসাতে তাকে চ'লে যেতে হ'ল, কিন্তু আপনার নিকট হ'তে বিদায় না নিয়ে সে যেতে পারলে না। তাই সে বিদায় নিতে, আপনার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছিল—বাড়ীতে খেলে না।"

পার্ব্বতীর কান্না আরও বাড়িয়া উঠিল, হরনাথ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমার মনে হয়, তার সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ, নইলে কয়েক দিনের মধ্যে তাকে এত ভালবাসব কেন ? এত মানুষ ত আসে যায়। তোমার বন্ধু ব'লে তাকে যে আমি ভালবাসি, তা নয় কৃষ্ণ ; তাকে আমি ভালবাসি আমার বন্ধু ব'লে, আমার শিক্ষাগুরু বলে, আমার প্রিয় সন্তান ব'লে। মুহূর্ত্তের জন্যে এসে আমার হৃদয়মন দখল ক'রে কোথায় সে চ'লে গেল—হয় ত আর তা'র দেখা পাব না।"

জ্যোতি আসিয়া পিতার হাত ধরিল ; কহিল, "বাবা !"

"কি মা ?"

"কেঁদো না বাবা, তিনি আবার আসবেন।"

"আর সে এসেছে ! আমি কখন কোন অতিথিকে বাড়ী হ'তে তাড়াই নি, আর আজ আমি তাকে তাড়ালাম !"

জ্যোতির চক্ষু বহিয়া তখন জল গড়াইল। কৃষ্ণনাথ নরুকে লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন।

২৬

দিল্লীতে আসিয়া অমর তাঁহার বন্ধু বিপিনের বাসায় উঠিলেন। বন্ধু সিমলা হইতে ফিরিবার সময় অমরকে দিল্লীতে আসিতে পত্র দিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র লাট সাহেবের খাস দপ্তরে একটা বড় চাকরী করেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব অনেক, প্রতিপত্তিও খুব। যাঁহারা সরকারের দ্বারে সেলাম দিতে আসেন, তাঁহারা আগে বিপিনকেই ধরেন। বিপিন পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে তাঁহারা উপরে উঠিতে পারেন। যে ভূ-স্বামীর জমী কিনিবার জন্য অমর ব্যস্ত, সে ব্যক্তি রাজ-সরকারে নিয়ত যাতায়াত করিয়া থাকে। বিপিনের সহিত তাহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সুতরাং অমরের সুবিধামত সর্ত্ত লাভ করিতে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হইলে ক্ষুদ্র তৃণটিও সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসে। এক হাজার একর জমী অমর এক হাজার টাকায় কিনিয়া লইলেন ; জমীদারের সমস্ত অধিকার পাইলেন। লেখাপড়া হইয়া গেল। দুই পক্ষের লোক উপস্থিত থাকিয়া সীমানা ঠিক করিয়া লওয়া হইবে এবং স্তম্ভ উঠাইয়া ভবিষ্যৎ গোলমালের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, এরূপ বন্দোবস্ত হইল।

যখন কার্য্যাদি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন এক দিন অমর কহিলেন, "ভাই বিপিন, তোমার নিকট একটা কথা গোপন ক'রে রেখেছি, আজ তা বলব।"

বিপিন। এর মধ্যে বিলেত ঘুরে এসেছ, না বিয়ে করেছ ?

অমর (সহাস্যে)। দু'টোর একটাও করি নি, কবার আপাততঃ ইচ্ছাও নেই। এই জমীটা নিলাম কেন, জান ?

বি। তা জান্‌বার আমার দরকার নেই। এখন তুমি বিলেত না যাও, বিয়ে করতে ত হবে।

অ। এখন নয়।

বি। বাঃ, সে কথা বললে চলবে না—পাত্রী ঠিক করেছি।

অ। পাত্রী কে ? তুমি না কি ?

বি। প্রায় তাই—আমার বোন্ লাবণ্য। এখানে গাছ পাওয়া দুষ্কর ; যা পাওয়া যায়, তা লাবণ্যর অযোগ্য। তুমিও তাকে দেখেছ, যার তার হাতে সে প্রতিমা দেওয়া যায় না।

অ। তা হ'লে আমাকেই সে প্রতিমার যোগ্য ঠাওরেছ ?

বি। হ্যাঁ ; যোগ্যতর রূপে গুণে দেখি নি।

অ। তুমি জান না বিপিন, আমার আহারের সংস্থান নেই। উপায় করা দূরে থাক্, যা ছিল তা'ও নষ্ট করেছি। নিজে খেতে পাই না, আর এক জনকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনব ? ছি!

বি। আমি সাহেবকে ধ'রে তোমার জন্যে একটা চাকরী যোগাড় করেছি—বেতন আপাততঃ তিন শত টাকা—

অ। চাকরী আমি করব না—

বি। সে কি ! চাকরীর মত সুখের জিনিষ আছে ?

অ। তুমি তা মনে করতে পার, আমি কিন্তু করি না। যাদের সঙ্গে মনের মিল নেই, মতের মিল নেই, তাদের সঙ্গে একযোগে কায অসম্ভব !

বি। তাতে ক্ষতি কি ? যা তারা বলবে, তাই ক'রে যাবে—ব্যস—মাস মাস টাকাটা ঘরে আসবে।

অ। তুচ্ছ টাকার জন্যে আমি মনের স্বাধীনতা বলি দিতে পারি না, আমার বিবেককে পীড়ন করতে পারি না—জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিপথে নিয়ে যেতে পারি না।

বি। টাকাটাকে তুমি তুচ্ছ মনে কর ? আমার বিশ্বাস

টাকার চেয়ে কেউ বড় নয়। টাকা যার আছে, তার সব আছে ; যার টাকা নেই—

অ। তারও সব থাকতে পারে। আমার ধারণা, যার বিবেক নেই, তার কিছু নেই। আমি আমার বিবেককে বিসর্জ্জন দিতে পারব না ভাই—ক্ষমা কর।

বি। তবে খাবে কি ?

অ। যে তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে, তাকে অনাহারে মরতে হয় না—গাড়ী-ঘোড়া না পাই, ভাত-ডাল পাব।

এমন সময় দুইখানা মোটর আসিয়া বিপিনের দ্বারে দাঁড়াইল। কয়েক জন ভদ্রলোক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া নমস্কারাদি পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। বিপিন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করত কহিলেন, "ওঃ, আপনারা সেই কাযের জন্যে এসেছেন বুঝি ? দেখুন, দরখাস্ত লেখা-টেখা আমার আসে না। আমার এই বন্ধু অমর বাবু এক জন মস্ত পণ্ডিত। ইনি লিখে দিন, আমি উপদেশ দিচ্ছি।"

অ। কিসের দরখাস্ত ?

বি। এঁদের কালীমন্দিরের কাছে কয়েক ঘর অন্য জাতের বাস আছে। এঁদের মন্দিরে বাজনা বাজলে তারা চড়াও হয়। তাই এঁরা পুলিসে একটা দরখাস্ত করতে চান—

অ। ভাই, ভিক্ষা করা আমার অভ্যাস নেই—ক্ষমা কর।

বি। গভর্ণমেণ্টের দোরে ভিক্ষে না করে এঁরা করবেন কি ?

অ। প্রতিমা নিয়ে যমুনার জলে ফেলে দেবেন।

বি। খুব পরামর্শ দিলে ত ! আচ্ছা লোককে জিজ্ঞেস করছি !

অ। আমার কাছে পরামর্শ নিতে হ'লে আমি এই পরামর্শই দিব। যে ব্যক্তির ধর্ম্ম, মন্দির রক্ষা করবার সামর্থ্য নেই, যে দেবতা পরের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে চীৎকার ক'রে বেড়ায় —তাঁকে আমার ধর্ম্ম মান ইজ্জত রক্ষে কর', তার পূজাপাট বন্ধ করে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বি। ঝুলি নিয়ে রাজদ্বারে যাওয়া ভিন্ন আমাদের উপায় কি ?

অ। গিয়ে কখন কেহ কিছু পেয়েছে ?

বি। যার দেবার ইচ্ছে নেই, তার দ্বারে চীৎকার করতে গেলেও ত কিছু পাওয়া যায়।

অ। হ্যাঁ, তাকে বিরক্ত ক'রে, জ্বালাতন ক'রে। তাই তবে যাও—যদি কিছু পাও, তাই দিয়ে তোমার ধর্ম্ম মান ইজ্জত রক্ষা কর গে।

বি। কি জ্বালা ! তুমি যে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ ; বিবেচনা করতে হবে, তাই বল না ?

অ। স্মরণ করতে হবে, এ হিন্দুস্থান হিন্দুর ; এখানে যার যা ইচ্ছা, তা ক'রে যেতে দেব না—দেব না ব'লে প্রাণপণ ক'রে দাঁড়াতে হবে।

বি। দাঁড়াতে গিয়েই ত আমাদের এত নিগ্রহ-ভোগ করতে হচ্ছে।

অ। এ ত সামান্য অত্যাচার, আরও অত্যাচার দরকার। তবেই তোমার শক্তি জাগবে কেন ? শক্তি তোমাতে জেগেছে দেখলেই প্রতিপক্ষ শান্ত হবে। যুক্তি-তর্ক, ধর্ম্মকথা হিংস্রক বুঝবে না, বুঝবে শুধু তোমার শক্তির আস্ফালন। এই শক্তি জেগে উঠছে, হিন্দুর অভ্যুদয়ের বড় বেশী বিলম্ব নেই।

বি। কবে কি হবে, তার ঠিক নেই, এখন যে চোখের জলে আমাদের ভাসতে হচ্ছে।

অ। চোখের জল কখন বৃথা যায় না, ভাই ; প্রত্যেক অশ্রু-বিন্দু অভিসম্পাতরূপে বৈরীকে দগ্ধ করবে। বিধাতার রাজ্যে কেহ কাহাকে কাঁদিয়ে নিষ্কৃতি পাবে না।

বি। এ ত গেল তোমার ধর্ম্মের কথা—

অ। ধর্ম্মই চিরদিন ইতিহাস নিয়মিত করছে। ঔরংজীব কাঁদিয়ে, শেষে কেঁদে গেল। স্পেনে মুররা, মেক্সিকোয় স্প্যানিয়ার্ড, এমনই অনেকে অনেক দেশে অত্যাচার করেছে, মন্দির বিগ্রহ ভেঙ্গেছে, স্ত্রীকে বেইজ্জত করেছে, ঘর জ্বালিয়েছে, সম্পত্তি লুঠ করেছে। ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, অত্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাই বলছিলাম, উপদ্রুতের চোখের জল কখন বৃথা যায় না।

একটি ভদ্রলোক কহিলেন, "বাবুজীর কথাগুলি বেশ লাগছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, হাঙ্গামা হ'লে বাবুজী আমাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে সম্মত আছেন কি না ?"

"যা আমি নিজে করতে পেছব, তা পরকে করিতে পরামর্শ দিব না। যখনই হিন্দুর বিপদ্ দেখব, তখনই আমি ছুটে যাব—আপনার ডাকবার অপেক্ষা রাখব না।"

"আজ আমরা উঠলাম, তবে বাবুজীকে এক দিন আমাদের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাব।"

আগন্তুকরা প্রস্থান করিলে, বিপিন কহিলেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলুম ? তুমি না বলছিলে, চাকরী-বাকরী করবে না ? বেশ, করো না ; আর কিছু কর। যাতে দু'পয়সা রোজগার হয়, এমন ত কিছু করা চাই।"

অ। করা চাই বলেই ত এ-দেশ-ও দেশ ক'রে বেড়াচ্ছি।

বি। এখন বিয়ে না কর, কথাটা দাও। তুমি কথা দিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করতে পারি।

অ। আমি কোনরূপ প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারব না।

বি। লাবণ্যের যৌতুকস্বরূপ দু'তিন হাজার একর জমী—

অ। আমাকে টাকার লোভ দেখিও না বিপিন ; এক জন দেখিয়েছিলেন, কোন ফল হয় নি।

বি। টাকার লোভ নয় অমর, রূপের লোভ। এ রকম মেয়ে তুমি এ তল্লাটে পাবে না—সাহেব-মেম সকলেই একে ভালবাসে।

অ। ভাই, ধন ও রূপ ছাড়া আরও ত অনেক জিনিষ আছে।

বি। তা থাকতে পারে। এটাও বোধ হয় আছে যে, কোন বন্ধু উপকারপ্রার্থী হ'লে তার উপকার করা বন্ধুর কর্ত্তব্য ?

অ। বন্ধুর যতটুকু সামর্থ্য, সে ততটুকু করতে পারে। তার কাছে বেশী চাওয়া ঠিক নয়।

বি। আমি কি বেশী কিছু চেয়েছি ?

অ। চেয়েছ। যাকে আমি সহধর্ম্মিণী ব'লে গ্রহণ করব, তাকে কোন বন্ধনে প'ড়ে—প্রলোভনে প'ড়ে—কাহারও অনুরোধে বিবাহ করব না।

বি। অর্থাৎ পছন্দ না হ'লে বিবাহ করবে না।

KUNTALIN PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

অ। অনেকটা তাই বটে।

বি। অনেকটা কেন?

অ। দুই পক্ষরই বুঝা-পড়া চাই ত।

বি। আচ্ছা, তোমরা বোঝাপড়া কর। এখন ত তুমি আছ; তোমার কায শেষ হ'তে এখনও বিলম্ব। যাক্, আমার কিন্তু ভাই ষোল বছরে বিয়ে হয়েছিল, স্ত্রীর বয়স তখন মোটে দশ। বোঝাপড়া করবার কোন পক্ষেরই সুযোগ হয় নি। তা আমাদের কোন পক্ষের যে অপচ্ছন্দ হয়েছে, এমন কথা বলতে পারিনে।

অমর আর কোন উত্তর করিলেন না।

২৭

পরদিন প্রভাতে অমর দেখিলেন, লাবণ্য তাঁহার কাছে পড়া বলিয়া লইতে আসিয়াছে। সে আই-এস-সি পড়িত। অমর পড়া বলিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর আবার সে অমরের নির্জ্জন কক্ষে পড়া জানিয়া লইতে আসিল। অমর এক ঘণ্টাকাল বকিলেন। এইরূপে দুই চারি দিন কাটিল। এক দিন বিপিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাবণ্যকে কেমন দেখছ, অমর?"

"বেশ বুদ্ধিমতী।"

"আমি তা বলছি নে।"

"আমি এখনও আর কিছু বুঝতে পারিনে।"

"ক্রমে বুঝবে।"

"আমি শীঘ্রই দেশে ফিরব ভাবছি।"

"তোমাদের সীমানা এখনও ঠিক হয়নি, এখন ফিরলে ত হবে না।"

"সেটা ঠিক ক'রে নিলেই ত হয়।"

"মালিক এখানে নেই, সিমলে গেছেন। তিনি আসুন—"

"তাঁর লোক-জনরা ত আছে।"

"আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।"

"যদি দেরী হয় বোঝ, আমি এখন চ'লে যাই।"

"না, না, দু'দশ দিন অপেক্ষা কর।"

দুই চারি দিন অমর অপেক্ষা করিলেন। লাবণ্য প্রত্যহ সন্ধ্যার পর অমরের ঘরে পড়িতে যায়। এক দিন লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি শুনে থাকবেন, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে।"

অমর বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে লাবণ্যর পানে চাহিয়া রহিলেন। লাবণ্য কহিল, "আমি সে দিন শুনেছি, দাদা বৌদিকে বলছিলেন, আপনি পছন্দ না ক'রে বিয়ে করবেন না।"

"এখন পড়বার সময়, ও সব কথা আলোচনার প্রয়োজন নেই।"

"ক্ষমা করবেন, একটু আছে।"

বিপিন সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ওহে অমর, কালীমন্দিরের মালিকরা তোমাকে খুঁজছেন।"

অমর উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন, "হাঙ্গামা বেধেছে না কি?"

"বোধ হয়, কিন্তু যদি তুমি এই সব গোলমালে থাক, তা হ'লে তোমাকে পত্রপাঠ চালান দিতে হবে—তোমাকে রাখা আমার পক্ষে নিরাপদ হবে না।"

"চালানই দেও।"

"কা'ল তুমি চলে যাও সীমানা ঠিক ক'রে নিতে।"

"বেশ।"

উভয়ে বাহিরের বৈঠকখানায় আসিলে জনৈক মাড়ওয়ারী ভদ্রলোক কহিলেন, "বাবুজী, জল্‌দি আসুন, গোল বেধেছে।"

"চলুন।"

"লাঠি নিন।"

"লাঠি আমার নেই, আপনারা দরকার হয়, দেবেন।"

"পিস্তল?"

"তাও আমার নেই। আমি মানুষ মারতে শিখিনি, তবে আত্মরক্ষার্থ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ জান্ নিতে পারি, দিতেও পারি।"

"বেশ, তবে চলুন।"

অমরনাথ তাঁহাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলেন। ঘণ্টা দুইপর ফিরিয়া আসিয়া বিপিনকে কহিলেন, "কোন হাঙ্গামাই হ'ল না; দু'চার জন অন্য পক্ষের এসেছিল বটে, কিন্তু কিছু করেনি। আমার বোধ হয়, বাবুজীরা আমাকে পরীক্ষা করছিলেন—আমি কথায় কাযে ঠিক রাখি কি না। এমনও হ'তে পারে, এঁরা অল্পতেই ভয় পেয়ে আমাকে খবর দিতে এসেছিলেন।"

"এরা বড় ভীরু। আমি সময় সময় ভাবি, এরাই কি সেই রাজপুতানার সন্তান! যাদের অভিধানে ভয় ব'লে জিনিষ ছিল না, এখন তাদের অভিধানে সাহস ব'লে জিনিষটা নেই!

"যারা পার্থিব জিনিষে বেশী মেতে যায়, তারা অপার্থিব জিনিষের চিন্তা করতে পারে না। মায়ের পূজা দিতে এসে বলবে, 'মা, তুমি যদি আমাকে দু'লাখ টাকা এই কাযে পাইয়ে দেও, তা হ'লে তোমাকে আমি এক লাখ টাকার পূজো দেব।' যাক্ এখন এ সব কথা। আমি তা হ'লে কাল যাচ্ছি সীমানা ঠিক ক'রে নিতে।"

"হাঁ, তোমার ফিরতে বোধ হয় বেশী দেরী হবে না। তুমি ফিরলে আমি সিমলে যাব। ভাল কথা, কেষ্টকে আসতে লিখে দিয়েছি।"

"কেন, তাকে আবার কেন?"

"সে তোমার প্রাণের বন্ধু, লাবণ্যকে একবার এসে দেখুক।"

"দেখবার কোন প্রয়োজন নেই।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন চল খাই গে—রাত হয়েছে।"

পরদিন অমরনাথ জমীদার-পক্ষীয় লোকের সঙ্গে সীমানা ঠিক করিয়া লইতে প্রস্থান করিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে সাত আট দিন বিলম্ব হইল। ফিরিলেন যখন, তখন মধ্যাহ্ন। বিপিন আফিসে। লাবণ্য তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিল। আহারান্তে অমরনাথ তাঁহার ঘরে বিশ্রাম করিতে আসিলে লাবণ্য পাণের ডিবা লইয়া আসিল। লাবণ্যের রূপ অমর বুঝিলেন, সে এখন ঘর ছাড়িয়া যাইবে না। সে এটা ওটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এত দিন নির্জ্জন পাহাড়ে ছিলেন কি ক'রে?"

"কোন কষ্ট হয় নি, তাঁবুতে বেশ ছিলাম।"

"সময় কাটত কি ক'রে?"

"সমস্ত দিন কাযে থাকতাম, সন্ধ্যের পর খাওয়া দাওয়া ক'রে অন্ধকার পানে চেয়ে ব'সে থাকতাম।"

"বই-টই পড়তেন না কেন?"

"পড়ার চেয়ে অনেক সময় চিন্তা করতে ভাল লাগে।"

লাবণ্য একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া অমরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি বাঙ্গালা উপন্যাস পড়েন?"

অ। আগে পড়তাম, এখন পড়ি না।

লা। সেকেলে লেখকদের কথা ছেড়ে দিন—

অ। সেকেলে কাদের বলছ?

লা। এই বঙ্কিম, রমেশ, দামোদর—

অ। তাঁদের লেখা ছাড়া আমি আর কারুর বই বড় একটা পড়ি ব'লে মনে হয় না।

লা। তাঁরা বড় পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু এখনকার লেখকদের মত তাঁরা উপন্যাস লিখতে পারতেন না।

অ। সত্যি না কি? আমি তা জান্‌তাম না।

লা। এঁদের লেখার ভঙ্গী কি! স্বাধীনতা কি! সেকেলে লেখকরা সমাজের মত ধর্ম্ম ধর্ম্ম সতীত্ব সতীত্ব ক'রে চীৎকার করেন না। এঁরা বলেন, যারা হালে পানি পায় না, তারাই ভগবান খাড়া করে সাহায্য করতে তাঁকে ডাকে। বেশ পরিষ্কার কথা। সকল দেশের সকল ধর্ম্ম যখন এক রকম নয়, তখন বুঝতে হবে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকের কল্পনা ও সুবিধা অনুসারে ধর্ম্মটাকে খাড়া করা হয়েছে।

অ। আজকালকার লেখকরা তাই বলেন না কি?

লা। তা ত বলেনই; তা' ছাড়া আরও বলেন, সতীত্ব ব'লে কোন পদার্থ নেই—বিবাহিতা হলেও তুমি যাকে ইচ্ছে ভালবাসতে পার।

অ। আমি—আমি কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

লা। এই ধরুন, রাম ও হরিতে খুব ভাব। রাম বিয়ে করেছে নীলাকে; হরি ভালবাসলে নীলাকে। রাম বুঝতে পারে, কিন্তু কি করবে? চুপ ক'রে গেল। হরি অবশেষে রামের ঘরের বার্ করে স্বামি স্ত্রীর মত ঘর করতে লাগল। রাম—নীলার এই ব্যবহারে—হরির এই আচরণে আপনি কি দোষ দেখেন?

অ। তুমি এ কি বলছ? এ যে মহাপাপ।

লা। এতে পাপ নেই, এতে শুধু হৃদয়ের স্বাধীনতা আছে—আর আছে। প্রেমিক তাকেই বলি, যে কোন বন্ধন মানে না, কারুর শাসন স্বীকার করে না।

অ। তাকে প্রেম বলে না, তাকে লালসা বলে। এটা অতি নীচ প্রবৃত্তি। যাকে ভালবাসবে, তার ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি সকলের দিকে লক্ষ্য করবে। তুমি যে তিনটি চরিত্রের উল্লেখ করলে, তিনটি চরিত্রই অতি জঘন্য। বন্ধু ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিশ্বাসঘাতক; স্ত্রী স্বাধীনতাকী, স্বামী মনুষ্যত্বরহিত।

লা। আপনি তা হ'লে চরিত্রগুলির সৌন্দর্য্য কিছুই প্রণিধান করতে পারলেন না। আজকালকার বড় বড় লেখকরা—

অ। তাঁরা বড় বড় লেখক হ'তে পারেন, কিন্তু আমার মতে ব্যক্তির বিবেচনায় এ সব লেখা দেশের সর্ব্বনাশ করে। লোকে পড়ে চরিত্র উন্নত হয়, জ্ঞান লাভ হয়, সেই সব লেখা পড়া উচিত; যাতে লালসা বাড়ে, প্রবৃত্তি মেতে উঠে, সে সব লেখা পড়া উচিত নয়।

লা। আপনার মত বলতে আরও দু'চার জনকে দেখেছি, কিন্তু তাঁরাই আবার লুকিয়ে এ সব লেখা পড়েন।

অ। পাপের একটা আকর্ষিণী শক্তি আছে; বুঝেও অনেকে দুষ্কার্য্য করেন, তবে লুকিয়ে।

লা। আপনি পাপ কাকে বলছেন? পাপ ত মনের বিকারমাত্র। আমি যদি স্বামীকে না ভালবেসে আর কাউকে ভালবাসি, তাতে দোষ কি? ভালবাসাটা ত আমার মুঠোর ভেতর নয়। সে জিনিষটা সামাজিক বন্ধন হ'তে স্বতন্ত্র—আমার হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ—

অ। তুমি নাটক প'ড়ে অনেকগুলো কথা শিখেছ দেখছি।

লা। আপনি আমার কথার জবাব দিন।

অ। জবাব ত আগে দিয়েছি; তুমি যেটাকে ভালবাসা বলছ, সেটা ভালবাসা নয়—সেটা লালসা—

লা। আপনি নিতান্ত সেকেলে। যাক্ ও সব কথা। যা' বলবার জন্যে এত বড় ভূমিকা ফেঁদেছি, সেই কথাটা এখন বলি। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আপনি কি সুখী হন?

এরূপ প্রশ্নের জন্য অমর একবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি স্তম্ভিত হইলেন। এ জাতের মেয়ে তিনি জীবনে কখন দেখেন নাই। অমর থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন, "আমি ঠিক তা বলতে পারি নে।"

লা। অর্থাৎ আপনি সুখী হন না, আমিও হই না। আপনার কাছে লুকিয়ে কি হবে? আমি—আমি আর এক জনকে ভালবাসি। দাদার হুকুমে আপনাকে হয় ত বিয়ে করতে হবে, কিন্তু আমার 'হরি'—আমার প্রেমাস্পদ—আপনার ঘরে হয় ত আমাকে থাকতে দেবে না—এক দিন সরিয়ে নিয়ে যাবে। কাযটা যে বিশেষ নিন্দনীয় হবে, এমন মনে হয় না।

অমর হতবুদ্ধি হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। লাবণ্য কহিল, "স্পষ্ট কথা বলাই ভাল। আপনি হয় ত আমাকে নির্লজ্জা, মুখরা মনে করছেন; কিন্তু আমি অনেক কেতাবে পড়েছি, এ রকম স্পষ্ট কথা শিক্ষিতা স্ত্রীলোকমাত্রেরই বলা উচিত। আপনি আমার কোন অপরাধ নেবেন না।"

অ। আমার কাছে কোন অপরাধই কর নি। আমি কোনমতেই তোমাকে বিয়ে করতাম না।

লা। আমার মুখের উপর সে কথাটা ব'লে কেন আমাকে অপমান করেন? আমি জানি, আমার রূপ আছে, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, আমাকে অপছন্দ করতে পারে, এমন লোক নেই।

অ। বটে?

এমন সময় বিপিনের স্ত্রী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ কঠোর কণ্ঠে লাবণ্যকে কহিলেন, "তোকে আর পড়তে হবে না—উঠে আয়।"

লাবণ্যের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বুঝিল, তার বউদিদি অন্তরাল হইতে সব শুনিয়াছেন। তাহার অদৃষ্টে লাঞ্ছনা-তিরস্কার আছে ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার বউদিদির অনুসরণ করিল।

পরদিন প্রভাতে অমর বিপিনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঝরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



কতিপয় প্রসিদ্ধ বিষবৃক্ষ

সকল দেশেই এমন কতকগুলি দেশান্তর্জাত উদ্ভিদ আছে, যেগুলির মূল, ত্বক্, পত্র, ফুল কিংবা ফল মনুষ্যের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বিষক্রিয়া উৎপাদিত হয়। এই সমুদয় গাছকে মানুষ চিরকালই ভয় ও ভক্তির চক্ষুতে দেখিয়া আসিতেছে। নানাবিধ বিষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহু পুরাকাল হইতে মানব সৎ অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে বিষ প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে। বলবানের সহিত সংগ্রামে বিষ দুর্ব্বলের সহায়। মৃগয়ার জন্য বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার খুবই পুরাতন। আত্মরক্ষা ও শত্রুনাশের জন্য বিষাক্ত বাণপ্রয়োগ

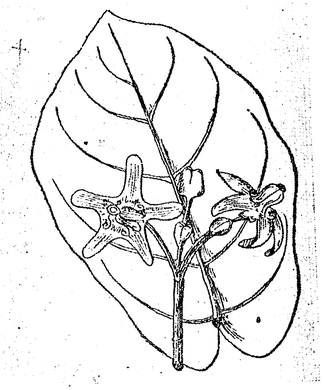

আকন্দপত্র ও পুষ্প

এখনও অনেক বন্য ও অর্দ্ধ বন্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সহিত মানব বিষকে জীবননাশ অপেক্ষা জীবনরক্ষাকার্য্যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ঔষধে ব্যবহার

বর্ত্তমান সময়ে অনেক উগ্রবীর্য্য উদ্ভিদকেও চিকিৎসার্থ প্রয়োগ করা হইতেছে। বস্তুতঃ যে সমস্ত গাছ যত বেশী বিষাক্ত, সে সকল সেই অনুপাতেই ত্বরিত কার্য্যকর ঔষধ উৎপাদন করে। অন্যান্য গুণাবলী বাদ দিয়া এ স্থলে এই প্রকার কতিপয় গাছের বিষক্রিয়ার উল্লেখ করা হইল :—

বিষ, মিঠাতেলিয়া (Aconite) অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে, বিশেষতঃ হিমালয়বাসিগণের নিকট সুপরিচিত। পার্ব্বত্য জঙ্গলে বিষগুল্মের নীলবর্ণ বিচিত্রাকার পুষ্প দেখিয়া ইহা সাধারণ গাছ নহে বলিয়া সন্দেহ হয়। অনেক পার্ব্বত্য যাদি কিম্বা মানুষের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য মিঠাতেলিয়াই দায়ী। পাহাড়ীরা তীরের ফলকে বিষ-মূলের প্রলেপ দিয়া বাঘ পর্য্যন্ত শিকার করে। কখন কখন হিংস্র জন্তু যেখানে জল পান করে,

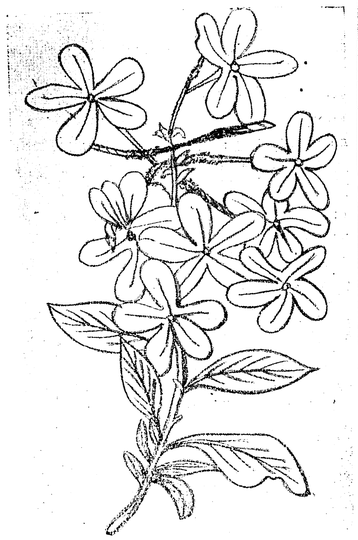

চিতা-গাছ

তথায় বিষ ভিজাইয়া রাখিয়া পানীয় জল বিষাক্ত করিয়া দেয়; তাহাতে হিংস্র ভিন্ন অহিংস্র আরণ্য পশুও মারা যায়।

আকন্দ, অর্ক :—শ্বেত ও গোলাপী আভাযুক্ত পুষ্পযুক্ত উভয় জাতীয় আকন্দ-গাছই সর্ব্বত্র সুলভ। আকন্দ যে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিতে নানাবিধ প্রবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, আকন্দ পূর্ব্বে নিতান্ত নিরীহ গাছ বিবেচিত হইত না। ইহার মূল, ত্বক, ফুল ও আঠা ব্যবহৃত হয়।

আনন্দ শাখার দ্বারা পূর্ব্বে লোক নানা প্রকার অসাধু কার্য্য সাধন করিত। তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। মোটের উপর আকন্দের রস জীবের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

শ্বেত ও রক্তচিত্রার মূল প্রদাহজনক; ইহাদের পুরাতন সংস্কৃত নাম—'দারুণ', 'দহন' ইত্যাদি দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রকটিত হইতেছে। রক্তচিত্রা দ্বারা নানা প্রকার অপকর্ম্ম করাইবার অনেক প্রমাণ আছে; তদ্ভিন্ন দুষ্ট লোক ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা নরহত্যা করে। ভিক্ষুক ও ফকির প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে ক্ষতোৎপাদন করিবার জন্য রক্তচিতার মূল বাটিয়া লেপন করিয়া থাকে।

ধুতুরা—যেমন সুলভ, তেমনই বিষাক্ত গাছ। সমতল ভূমি হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত তিন জাতীয় ধুতুরা দেখিতে

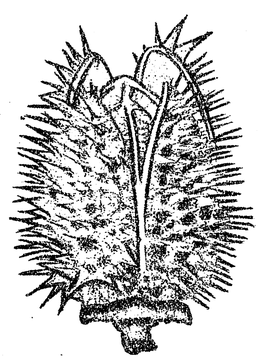

ধুতুরা-ফল

পাওয়া যায়। পূর্ব্বে চুরী ডাকাতিতে এবং বর্ত্তমান সময়েও মেলা প্রভৃতিতে অসাবধান লোককে ঠকাইয়া তাহার অপহরণ করিতে ধুতুরা-বীজ অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হয়।

কুঁচিলা :—ভারতের অন্যতম বনজ ঔষধ। পশ্চিম-বঙ্গের মেদিনীপুর জিলা হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্য-ভারত প্রভৃতি স্থানে ইহা যথেষ্ট জন্মে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভারতের আদিম অধিবাসী, সুলভ ও বীর্য্যবান্ বৃক্ষ হইলেও প্রাচীন হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম নাই। কুঁচিলা-বীজে প্রসিদ্ধ তীব্র বিষ Strychnine ও Brucine পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার পীতবর্ণ ফল পাকিয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন যে, ফলের শাঁসেও সামান্য পরিমাণে বিষ আছে, কিন্তু কয়েক জাতীয় পক্ষী যেরূপ আগ্রহের সহিত শাঁস ভক্ষণ করে, তাহাতে শাঁসের বিষক্রিয়া আছে বলিয়া বোধ হয় না। আত্মহত্যা উদ্দেশ্যে কুঁচিলা-বীজের প্রয়োগ অসাধারণ নহে। মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলে কুঁচিলা-পাতা খাইয়া গৃহপালিত পশু-দিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকার Curare নামক যে উগ্র বিষ দ্বারা আদিম অধিবাসিগণ তীর-ফলক বিষাক্ত করে, তাহা কুঁচিলার নিকট-আত্মীয় গাছ হইতে পাওয়া যায়।

বেলাডোনা (Belladona) এবং হায়োসায়েমাস্ (Hyosiyamus) উভয়েরই এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় যথেষ্ট প্রচলন। বেলাডোনা উচ্চ পাহাড়ের গাছ। হরিদ্রা ও পীতবর্ণের ফুল ও ঘোর বেগুণী রঙ্গের, টেপারির মত ছোট ছোট ফল বেলাডোনা গাছের উগ্র গুণের আভাস দেয়। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে অসদুদ্দেশ্যে বেলাডোনা ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। সময়ে সময়ে কেবল ২।১ জন দুরন্ত রাখাল বালক ইহার ফল খাইয়া দিন কয়েকের জন্য অসুস্থ ও অন্ধ হইয়া থাকে। হায়োসায়েমাস্ সমতল দেশ ও পর্ব্বত উভয় স্থানেই জন্মিয়া থাকে। ইহার দুর্গন্ধযুক্ত পাতাই ইহার প্রকৃতির পরিচয় দেয়। গাঁজার ন্যায় ইহার পাতাও পাহাড়ীরা সেবন করে ও মাত্রাধিক্য হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে, উক্ত খাদ্যভোজনের ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে সংজ্ঞা লোপ পায়। পাহাড়িয়াগণ ইহার মাদকশক্তি বিশেষরূপে অবগত আছে, এবং ইহাকে কোহি (পার্ব্বত্য) ভাঙ্গ, বাগর (ভল্লুকের) প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকে।

আমরা এ স্থলে আফিং, সিদ্ধি, গাঁজা প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ করিলাম না, যদিও এগুলিও বিষের মধ্যে গণ্য। ইহাদের চাষ সরকারী তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। বন্য আফিং ও সিদ্ধির গাছও নানা স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। কাশ্মীরে ঝিলম নদীর তীরে এক এক স্থলে বিস্তৃত সিদ্ধির জঙ্গল বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল স্থানের লোক গাঁজা ও সিদ্ধি অপেক্ষা মধ্য-এসিয়া হইতে আনীত চরস অধিক ব্যবহার করে।

উদ্যান-জাত উদ্ভিদে বিষ

পাতা, ফল, ফুল প্রভৃতির সৌন্দর্য্যের জন্য আমরা সচরাচর যে সমস্ত গাছ গৃহ-প্রাঙ্গণে অথবা বাগানে রোপণ করি, সেগুলির মধ্যেও কয়েকটি খুব বিষাক্ত গাছ আছে। করবী তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ইহার গোলাপী শ্বেতবর্ণের পুষ্পগুচ্ছ এবং গাঢ় হরিৎ পত্রাবর্ত্ত খুবই মনোরম; কিন্তু করবীপত্র ও মূল তীব্র বিষ। সমতল দেশ হইতে হিমালয়ের ৫।৬ হাজার ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত করবী জন্মিয়া থাকে এবং সর্ব্বস্থলেই ইহার বিষক্রিয়া সুবিদিত। আত্মহত্যা ও নরহত্যায় করবী-মূল-প্রয়োগের অনেক প্রমাণ আছে। পার্ব্বত্য রমণীগণের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইলে পরস্পরে 'কাণের' অথবা করবী খাও বলে। প্রাচীন হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রে করবীকে 'অশ্বমারক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার বিষক্রিয়া পূর্ব্বেও জানা ছিল।

কল্কে ফুল করবীর সমবর্গীয় গাছ। ইহার ফলও বিষাক্ত। ৮।১০টি ফল খাইয়া ফেলিলে মৃত্যু হয়। বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশে কল্কে-ফল খাইয়া আত্মহত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বোম্বাই অঞ্চলে পশ্বাদি মারিবার জন্যও কল্কে ফলের ব্যবহার অসাধারণ নহে।

গোলাপবর্গীয় অনেক জাতীয় গাছের বীজে Hydrocyanic acid নামক তীব্র বিষ পাওয়া যায়। তিক্ত বাদাম, চেরী, পিচ প্রভৃতির বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল তাহার উদাহরণ। পীচ অর্থাৎ আড়ু ফলের আঁঠি একটি অতি প্রাচীন বিষ। প্রাচীন কালের মিশরীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থেও 'পীচের শাস্তির' (Penalty of peach) উল্লেখ আছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে পীচ-আঁঠির তরল সার প্রস্তুত করিয়া খাইতে দেওয়া হইত। তাহাতে অপরাধী স্বল্পকালের মধ্যেই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত।

ফুল ও পল্লবের সৌন্দর্য্যে 'বিষে লাঙ্গলীর' (Gloriosa Superba) সমকক্ষ গাছ কমই আছে। ইহার মূলের সহিত

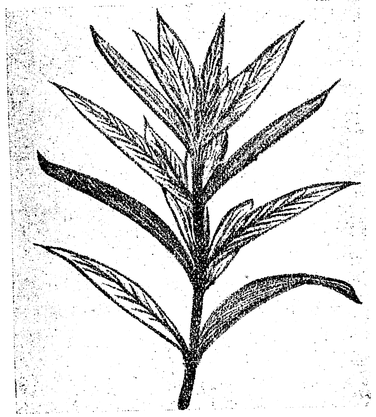

করবী-শাখা

লাঙ্গলের সাদৃশ্য থাকায় এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহার সংস্কৃত নাম লাঙ্গলিকা, চিহ্নণমুখী ইত্যাদি। অনেকে সখ্ করিয়া ইহা বাগানে রোপণ করেন। বিষে লাঙ্গলীর মূল এত তীব্র বিষাক্ত যে, একটি স্ত্রীলোক উহার চূর্ণ খাইয়া চারি ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আরণ্য বিষবৃক্ষ

উপাস (Upas) বৃক্ষ—Antiaris toxicaria—ত্রিবাঙ্কুরে ছালা গাছ বলিয়া পরিচিত। ইহার ত্বক হইতে থলে প্রস্তুত হয় বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এক সময় ইহার বিষ-ক্রিয়া সম্বন্ধে নানারূপ ভীতিজনক প্রবাদ ছিল। লোক বলিত, ছালা গাছের চতুর্দ্দিকে ১০।১২ মাইলের মধ্যে কোন প্রাণী জীবনধারণ করিতে পারে না। উহা অতিরঞ্জন বলিয়া এখন প্রমাণিত হইয়াছে। ছালা বৃক্ষের রসে ও বীজে যে একপ্রকার মারাত্মক বিষ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থান, ঋতু ও জাতিভেদে উক্ত বিষের অনেক তারতম্য হইয়া থাকে।

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে যেমন উপাস্, উত্তরপ্রান্তেও সেইরূপ ইউ (yew) একটি প্রসিদ্ধ বিষবৃক্ষ। দেশীয় ঔষধের দোকানে উহার শাখা ও পত্রাদি 'তালীশপত্র' নামে বিক্রয় হয়। মাত্রাধিক্য হইলে তালীশপত্র দ্বারা শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মানুষ মারা যায়। তালীশপত্র দ্বারা এতদ্দেশে মৃত্যু ঘটিবার বিবরণ অধিক না পাওয়া গেলেও বিষরূপে পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহার প্রয়োগ একবারে বিরল নহে।

সুন্দরবনের 'ঢাকুর' নামক গাছ দেখিতে মন্দ নহে। ভারত উপকূলের আর্দ্রস্থানসমূহে প্রায়ই ইহা দৃষ্ট হয়। অপক্ক আম্র সদৃশ ঢাকুর ফলের মধ্যে একটিমাত্র শ্বেতবর্ণ বীজ থাকে। উহা এত উগ্রবীর্য্য যে, ২।১ টি বীজ খাইয়া ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যেই ভক্ষকের মৃত্যু হয়। মাদ্রাজ অঞ্চলে

Fig. 56.

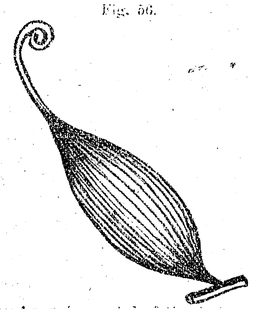

বিষে লাঙ্গলীর পাতা

আত্মহত্যা উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকরা ইহা সচরাচর ব্যবহার করে। উক্ত প্রদেশের আর একটি বিষাক্ত গাছের নাম ওদুয়ার (Cleistanthus collinus)। ইহার মূল, পত্র, বিশেষতঃ বীজ অতিশয় বিষাক্ত। পাতার রস কিম্বা ফলের চূর্ণ খাইলে মৃত্যু ঘটিতে অধিক বিলম্ব হয় না। বন্য পশ্বাদি কখনই ওদুয়ার পত্র খায় না।

কুঁচ :—উদ্যানে জন্মিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা বন্য গাছ। ঔষধে কুঁচের ব্যবহার অল্পবিস্তর রহিয়াছে। কুঁচ-বীজে কিন্তু এক ভয়ঙ্কর বিষ নিহিত আছে। উহার ক্রিয়া কতকটা সর্পবিষের ন্যায়। বীজের খোসা ছাড়াইয়া ভিতরের শাঁস জলে ভিজাইয়া ও বাটিয়া চামারগণ একপ্রকার ছুঁচ প্রস্তুত করে। উক্ত প্রকার ২।১ টি ছুঁচ গরুর পেটের তলদেশের নরম চামড়ায় প্রবেশ করাইয়া দিলে গরু মরিয়া যায়। কুঁচ দ্বারা নরহত্যার কোন বিবরণ না পাওয়া গেলেও ইহার দ্বারা দুষ্ট লোক অনেক পালিত পশুর বিনাশসাধন করে।

দুষ্পৃশ্য গাছ

কেবল এতক্ষণ যে সমস্ত উদ্ভিদের কথা বলিলাম, সেগুলির কোনবিশেষে বিষ পাওয়া যায় ও তাহা অধিক মাত্রায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অন্য এমন কতকগুলি গাছ আছে, যাহাদের বিষ ঠিক মারাত্মক নহে, কিন্তু গাছ অথবা গাছের কোন বিশেষ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিলে যে জ্বালা-যন্ত্রণা ও ফোড়া হয়, তাহা শীঘ্র বিস্মৃত হওয়া যায় না। 'ভেলা' তাহার একটি সাধারণ উদাহরণ। ইহার রস এরূপ চর্ম্মপ্রদাহ উপস্থিত করে যে, জঙ্গলী লোকও ভেলা গাছ কাটিতে ভয় পায়। ভেলা-ফলের খোসায় যে তৈল আছে, তাহা গায় লাগিলে ফোস্কা হয় এবং চর্ম্ম কাল হইয়া যায়; চোখে লাগিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। কাঁকড়াশৃঙ্গীর সমবর্গীয় গাছ Rhus Wallichi এবং R Punjabensis সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়। ইহাদের রস গাত্র স্পর্শ করা মাত্রই রক্তবর্ণ জলপ্রদায়ক ফোস্কা বাহির হয়; রস লাগিলে চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও নয়নগোচর হইয়াছে।

'বিছাতি' (বিছুটি) জাতীয় গাছের এতদ্দেশে অভাব নাই। সাধারণ বিছাতি লাগিলে অল্পবিস্তর যন্ত্রণা হয়, তাহা সকলেই জানেন। Urtica gigantea বিছাতির রাজা। দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ হুল-মণ্ডিত এই অতিকায় বিছাতির গাছ দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। ইহার হুল অঙ্গস্পর্শ করিলে কাঁকড়াবিছা কামড়াইবার মত যন্ত্রণা হয়। কিন্তু উহা ২।৩ ঘণ্টার অধিক স্থায়ী হয় না। যদি কেহ Urtica Crenulata নামক অন্য একটি পার্ব্বত্য বিছাতির সংস্পর্শে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ঘটনা তিনি কখনই বিস্মৃত হইবেন না। এই শেষোক্ত বিছাতির গাছ ছোট এবং হুলও খুব স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু স্পর্শ করিলে কিম্বা খুব নিকটে দাঁড়াইলেও অবিলম্বে দেহময় ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি, নাক দিয়া অবিরত জল পড়া, হাত-পা খিঁচুনি দেখা যায়। এমন কি, দুই দিন পর্য্যন্তও যন্ত্রণার অবসান হয় না; সম্পূর্ণ উপশমলাভ করিতে এক সপ্তাহেরও অধিক সময় লাগিয়া যায়। সুখের বিষয় যে, এই গাছ সমতল দেশে অথবা নিম্ন পাহাড়ে জন্মায় না। মানবের গতিবিধিবিরল উচ্চ পার্ব্বত্য জঙ্গলই ইহার বাসস্থান।

বিষাক্ত শস্য

এমন কতকগুলি ফল, মূল ও শস্য আছে, যাহাদের একপ্রকার (variety) পুষ্টিকর আহার্য্য ও অন্য প্রকার বিষ। 'খেসারি' তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ভারতের অনেক স্থানে খেসারি গরীব লোকের খাদ্য। দেখা যায় যে, অধিক দিন খেসারির ডাল ব্যবহার করিয়া কোন কোন অঞ্চলের লোকের দেহের নিম্নার্দ্ধ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়াছে। এইরূপ পক্ষাঘাতকে Lathyrism বলে। খেসারির মধ্যে কি পদার্থ থাকায় এরূপ হয়, তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, গোধূম-ক্ষেত্রে উৎপাদিত বড় খেসারি যাহারা খায়, তাহাদের মধ্যেই এইরূপ রোগ দেখা দেয়; ধান্যক্ষেত্রজাত ছোট খেসারির কোন বিষক্রিয়া নাই। কোন কোন অবস্থায় 'জোয়ার' শস্যও বিষাক্ত হয়। যে স্থলে সেচন অথবা বৃষ্টির জলের অভাবে জোয়ার পূর্ণ পুষ্টিলাভ করিতে না পারিয়া অসময়ে পাকিয়া যায়, সেইরূপ স্থলেই ইহা গবাদি পশুর বিষাক্ত খাদ্যরূপে কার্য্য করে। বিকৃত 'চাউল' হইতে বেরিবেরি রোগের উৎপত্তি এবং 'কোদো' শস্যের বিশেষ অবস্থায় বিষক্রিয়া সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলিতেছে। রাসায়নিক গঠনের পরিবর্ত্তন, ছত্রক রোগের (Fungus diseas-) প্রভাব, কিম্বা উভয়ের সন্নিপাত —কোন প্রকারে যে শস্যমধ্যে বিষ উপস্থিত হয়, তাহা স্থির করিতে হইলে এখনও অনেক পরীক্ষার আবশ্যক।

বিষের সদ্ব্যবহার

পূর্ব্বকালে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ বিষ মানব দ্বারা অপকর্ম্মে প্রযুক্ত হইলেও ইহা নিশ্চয় যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক প্রকার বিষেরই কোন না কোনরূপ সদ্ব্যবহার হইতে পারে। বিষাক্ত গাছের বিষক্রিয়া-উৎপাদক বীর্য্য নিষ্কাশন করত উহার মাত্রা স্থির করিয়া চিকিৎসার্থ প্রয়োগ করা হয় :—Strychnine, Atropine, Quinine, Morphia, Podophyllin, Digitalin ইত্যাদি তাহার উদাহরণ। এইরূপে উদ্ভিজ্জ বীর্য্য (Alkaloid) নিষ্কাশন করা সূক্ষ্ম রাসায়নিক শিল্পের মধ্যে গণ্য হয়। এতদ্দেশে এই শ্রেণীর শিল্প সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইতে অনেক বিলম্ব আছে। সাধারণতঃ বিষাক্ত বৃক্ষের ফল, মূল, ত্বক ইত্যাদিতে বিষের মাত্রা অতি সামান্য। অনেক পরিমাণে কাঁচামাল হইতে সামান্য পরিমাণে কার্য্যকর বীর্য্য পাওয়া যায়। বিদেশীয় বণিককে অনেক টাকা জাহাজ ভাড়া দিয়া উক্ত মাল লইয়া যাইতে ও পরে তজ্জাত বীর্য্য পুনরায় ভারতে পাঠাইতে হয়; তদুপরি প্রস্তুতের খরচ আছে। এ সকল সত্ত্বেও তাহার যথেষ্ট লাভ থাকে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতমধ্যে এইরূপ শিল্পসংস্থাপন ও পরিপুষ্টির ক্ষেত্র কত বড়। অনেক ভারতীয় বিষবৃক্ষের বিষের মাত্রা কার্য্য, স্বরূপ, নিষ্কাশনের উপায়, শিল্পাদিতে প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নিতান্ত সামান্য তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ে ধারাবাহিক গবেষণা একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে বিষ-বৃক্ষের সদ্ব্যবহারের উপায় কখনই উদ্ভাবিত হইবে না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।



গুরুচরণের মুক্তি

গুরুচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বিধাতৃপুরুষ আজ পর্য্যন্ত তিন বার হাসিয়াছিলেন।

একমাত্র সংসারের বন্ধন কন্যা হিরণবালার বিবাহ দিয়া যখন গুরুচরণ নিজেকে সর্ব্ববিষয়ে মুক্ত মনে করিয়া কাশীবাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল,—তখন একবার। তাহার পর, বৎসর দুই তিন পরে, তাহার কাশীযাত্রার দিন দুই পূর্ব্বে, হঠাৎ যে দিন হিরণবালা তাহার ছয় মাসের শিশু পুত্রকে কোলে করিয়া, বিধবার বেশে এ বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং তাহার বাঁধা পোঁটলা-পুঁটলি খুলিয়া ফেলিয়া তাহার তীর্থের পথ রুদ্ধ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন একবার। পরিশেষে, যে দিন দেড় বছরের দাসুকে হিরণ নিজের কোল হইতে তাহার কোলের উপর চাপাইয়া দিয়া বিধবার বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল,—সেই আর একবার।

বিড়ম্বনার যে বিষ হিরণের গলা পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিয়াছিল, একান্তমনে নিজের অন্তর্য্যামীকে ডাকিয়া ডাকিয়া হিরণ ত তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল, কিন্তু দৌহিত্রটিকে বুকে চাপিয়া, সেই বিষের ক্রিয়া ভোগ করিতে রহিল শুধু গুরুচরণ; আর তাহারই একটু পূর্ব্বাপরের কথা আজ উত্থাপন করিতে গিয়া এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের সৃষ্টি।

গ্রামের জমীদার—রতিকান্ত বসু। কিন্তু জমীদার হওয়া তাঁহার যে কিছুতেই মানায় না, এ কথা ভূ-ভারতে সকলে স্বীকার না করিলেও অনেকেই করিয়া থাকে। কারণ, তাঁহার ন্যায় আছে, নিষ্ঠা আছে, তপ আছে, জপ আছে, দয়া আছে, ধর্ম্ম আছে। তিনি নিরহঙ্কার, দুঃখীর দুঃখ বোঝেন, মানীর মান রাখেন, এবং দুর্ব্বৎসরের দিনে, যখন দরিদ্র প্রজার পেটে অন্ন ও চালে খড় থাকে না, তখন তাহাদের চোখের কোণের একটুখানি জল দেখিয়াই তাহাদের বাকী খাজনা রেহাই করিয়া বসেন। অথচ এমনই করিয়াই তাঁহার জমীদারী চিরকাল বজায় থাকিয়া আসিয়াছে। কোন দিন লাটের কিস্তির জন্য ভাবিতে হয় নাই বা চিরকালের দোল-দুর্গোৎসব কখন বন্ধ যায় নাই।

কিন্তু ভাবী জমীদার যিনি, তাঁহার এ সমস্ত পৈতৃক দোষ-ত্রুটির লেশও ছিল না। নরেশচন্দ্রই রতিকান্তের একমাত্র বংশধর। তাহার নিভৃত পৃথক বৈঠকখানা-ঘর সদাসর্ব্বদা ইয়ারবক্সি, পাত্র-মিত্র, সভাসদ্-পারিষদগণে পরিবৃত থাকিয়া তীর্থে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে নভেল পড়িয়া নায়িকা-চরিত্রের দিগ্-বিশেষের আলোচনা হয়, কাব্যের রস ছড়াছড়ি হয়, সঙ্গীত-বিদ্যার চর্চ্চা হয়, বাদ্যও বাজে, তাস-পাশা পড়ে, চা চলে, চুরুট পোড়ে, এবং সন্ধ্যার পর আরও ঐ ধরণের কত কি হয়।

ঠিক এমনই সময়ে যখন হিরণবালা আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আবার ফিরিয়া আসিল, তখন এ-হেন মহাতীর্থে তাহার বয়স ও রূপ লইয়া প্রথম দিনকতক একটু একটু চাপা আলোচনা চলিল এবং কয়েক দিন পরেই এই চাপা আলোচনা আর চাপা না থাকিয়া ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল।

হিরণ খুব সুন্দরী না হইলেও কুৎসিতা ছিল না। সে যৌবনের মাধুরী তাহার নিটোল দেহের সর্ব্বাঙ্গে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শীতের প্রাতঃকাল। প্রাঙ্গণ রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছিল। সে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া হিরণ মান-পাতার উপর বড়ী দিতেছিল। দাসুকে বুকে করিয়া গুরুচরণ দাওয়ার উপর পায়চারী করিতে করিতে তাহার সহিত নানাপ্রকারের আলাপ করিতেছিল, আর মাতামহের কোলে থাকিয়া, দাসু তাহার আলাপের উত্তর অনবরত লাল ফেলিতেছিল, এবং দুই হাতে সেই লাল মাখিয়া তাহার বুকের চুল থাবড়াইয়া থাবড়াইয়া ভিজাইতেছিল।

"গাঙ্গুলী ম'শায় বাড়ী আছেন না কি?" বলিয়া 'মর্ণিং-ওয়াকে'র ফেরত নরেশচন্দ্র ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দরজা ঠেলিয়া একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া যেন থতমত খাইয়াই কহিল,—"কি রে হিরণ?—কবে এলি তুই?"

হিরণ ডালমাখা হাতেই মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল।

গুরুচরণ ব্যস্ত হইয়া জমীদার-পুত্রকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া কহিল,—"দুর্ভাগ্যের কথা সকলই শুনেছ ত ভায়া?" ইত্যাদি ইত্যাদি—

তা'র পর নরেশচন্দ্র যে কারণে প্রাতঃকালেই তাহার কাছে আসিয়াছে—অর্থাৎ, গ্রামে সু-পানীয়ের একটা ব্যবস্থার জন্য—তাহার উল্লেখ করিল এবং সে বিষয়ে গুরুচরণের সঙ্গে অল্প পরামর্শ আলোচনা হইল। আলোচনা সেই দিনেই শেষ হইল না। এই লইয়া নরেশ প্রায়ই আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। এই জিনিষটা কিন্তু প্রথম হইতেই হিরণের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা ভিতরে ভিতরে তাহার জমা হইয়া উঠিতেছিল।

ইহারই দিন কয়েক পরে এক দিন হিরণ তুলসীতলে সন্ধ্যার দীপ রাখিয়া, গলায় আঁচল দিয়া, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, ও-পাড়ার গয়লাদের পক্ষা আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সেইখানেই তুলসীতলার প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে হিরণ কাগজখানি খুলিয়া পড়িল. একটি কবিতা—নীচে নরেশের নাম। বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বদেহে কাঁপিয়া উঠিল।

সেই হইতে সু-পানীয়ের ব্যবস্থার জন্য নরেশ যতদিন এ বাটীতে আসিয়াছে, একটি দিনও আর হিরণ তাহার সম্মুখে বাহির হয় নাই। নরেশের সাড়া যেন তাহার বুকের হাড়গুলিকে সজোরে নাড়া দিয়া দিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া তেলীদের বাড়ী গিয়া বসিত।

এমনভাবে কিন্তু বেশী দিন আর যাইল না।

এক দিন অপরাহ্নে নরেশ সদর-দরজায় সাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি খিড়কীর পথে ঘুরিয়া আসিতেই হিরণ একেবারে তাহার সম্মুখে পড়িয়া গেল। একখানা ভাঁজ-করা পত্র তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া নরেশ বলিল,—"দয়া ক'রে একবার পড়তে ত আর কোন দোষ নেই! তোমার খোকার দিব্যি, হিরণ, যদি না পড়" বলিয়াই সে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ঢাকতে ফিরিয়া গেল। হিরণের সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া অবসন্ন হইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, পায়ের নীচের মাটী যেন ভূগর্ভে বসিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত শক্তি দিয়া সে কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বারান্দার উপর আসিয়া শুইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছার হাত হইতে কোনমতে নিজেকে রক্ষা করিল।

সেই দিন গুরুচরণের কাছে, নরেশের সু-পানীয়ের ব্যবস্থা সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল। গুরুচরণ সে দিনকার সেই কবিতাটি ও পত্রখানি সঙ্গে করিয়া তখনই রতিকান্তের উদ্দেশে যাত্রা হইল এবং নরেশের সম্বন্ধে সকল কথাই তাঁহাকে জানাইল। সেই রাত্রিতে রতিকান্ত নরেশকে নিভৃতে ডাকাইয়া তাহার প্রতি কি শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন, তাহা রতিকান্ত ও নরেশ ভিন্ন অপর কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু পরদিন প্রভাতে যখন রতিকান্ত গুরুচরণকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার পদপ্রান্তে পুত্রকে কান ধরিয়া নাকে খৎ দেওয়াইলেন, তখন নরেশের মুখ ঘৃণায় লজ্জায় রাগে অভিমানে অপমানে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে নিজের বৈঠকখানা-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গুরুচরণের উদ্দেশে বন্ধুদের সমক্ষে বলিল, "আমার নাম যদি নরেশ হয় ত এর শোধ আমি একদিন ভাল কোরেই নোবো।"

* * * *

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে—প্রায় তিন বৎসর। হিরণ নরাধম নরেশচন্দ্রের পাপ-দৃষ্টি এড়াইয়া ইহজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। রতিকান্ত বসুও দুই বৎসর হইল গত হইয়াছেন। তাঁহার সাজান-গোছান পুণ্যের মন্দিরে এখন নরেশচন্দ্রের 'কাফি-খানা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দাসু এখন বছর চারেকেরটি হইয়াছে। সে এখন অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারে। দাদামহাশয়ের সহিত তাহার এখন অনেক কথাই হয়। কখন তিনি হন শ্রোতা—ইনি হন বক্তা, কখন ইনি হন শ্রোতা—তিনি হন বক্তা। মোটের উপর, এই 'প্রবীণ' সাথীটি গুরুচরণের সর্ব্বকর্ম্মের সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। দুইজনের মধ্যে তাহাদের এইরূপ আলাপ হইত। হয় ত, গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই ধন!"

"কি ভাই ধন!"

"নোরে বেটা জমীগুলো সব একে একে জোর ক'রে খাস ক'রে নিতে লাগ্‌লো, কি করা যায় বল দেখি?"

"কি করা যায়, তুমি বল না।"

"বলাবলি আর কি, মোকর্দ্দামা ত জুড়েই দিয়েছি, দেখা যা'ক কি হয়। বেটা রেগে ঘর না জ্বালিয়ে দেয়। আমার শুধু তাই ভাবনা!"

"ভাই ধন, আমি আর একটু বড় হ'লে তাকে থু-উব মারবো, কেমন ভাই ধন?"

"হ্যাঁ ভাই, মেরো। মোকর্দ্দামায় কি হবে, বল দেখি ভাই ধন?"

"কি হবে বোলবো? মকরদানায় মকরদানা হবে। আমি মকরদানা দেখিছি—রাঙ্গা রাঙ্গা—ভাই ধন, আমার রাঙ্গা কাপড়?"

"এইবার হাতে পয়সা হ'লেই আগে তোমার রাঙ্গা কাপড় কিনে দেবো ভাই।"

"আর খরতাল?"

"খরতালও কিনে দেবো।"

"ভাই ধন!"

"কি ভাই ধন?"

"রেণুর বাবা এসেছে। তার জন্যে ইন্‌জিন্ গাড়ী এনেছে, খাবার এনেছে। আমার বাবা কবে আসবে? বলেছিলে পূজোর সময় আসবে—কৈ এলো? একখানা চিঠি লিখে দাও না, ঐ রকম একখানা ইঞ্জিন-গাড়ী আনতে আমার জন্যে। কবে বাবা আসবে, বল না?"

"এই, আসবে ভাই এক দিন, তুমি আগে বড় হও।"

"বড় ত হয়েছি, আরও কত বড় হব? তুমি খালি বল আসবে—কৈ, আসে না ত!" তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হয় ত জিজ্ঞাসা করিত, "ভাই ধন, মাও আসবে হাঁসপাতাল থেকে?"

"হ্যাঁ ভাই, সব আসবে।" তার পর গুরুচরণ পিছন ফিরিয়া চোখ মুছিয়া বলিত, "ভাই ধন, তোমার নারকোল সন্দেশ রয়েছে, খাবে না?"

খাবার কথায় হয় ত বালক তখনকার মত এ সব কথা ভুলিয়া যাইত। তবুও পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েদের মা-বাপকে দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে তাহার শিশু-হৃদয়ে কিসের যেন একটা অভাব বাজিয়া উঠিত, আর অমনই সে তাহার ভাই ধনের কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাহার নিজের মা-বাবার সন্ধান লইত, আর গুরুচরণকে এমনই করিয়াই তাহার জবাবদিহি করিতে হইত। কোন দিন বা পাড়ার কোন ছেলেদের বাড়ী খেলা করিয়া আসিয়া মুখখানি বিমর্ষ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইত। তাহা দেখিয়া গুরুচরণের বুক ফাটিয়া যাইত, জিজ্ঞাসা করিত, "অমন ক'রে এসে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভাই ধন? এসো, আমার কোলে এস" বলিয়া গুরুচরণ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইত। হয় ত তবুও দাসু তেমনই ম্লান হইয়া থাকিত। গুরুচরণ আবার জিজ্ঞাসা করিত, "কি হয়েছে ভাই ধন! কেউ কিছু তোমায় বলেছে ভাই?"

"না, কেউ কিছু বলে নি, ঐ নান্নুর মা বলছিল—"

"কি বল্‌ছিল ভাই?"

"বল্‌ছিল যে, 'আহা! একরত্তি ছেলে মা-টি ম'রে গেল'!"

"এই কথা! তা তাতে কি হয়েছে?"

"না, কিছু হয়নি। হ্যাঁ, ভাই ধন, ম'রে গেলে তার পর বুঝি হাঁসপাতালে যায়?"—তখন গুরুচরণ আর পারিত না। সে ত লোহার গুরুচরণ নয়! ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার দু'চোখ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। তাহা দেখিয়া দাসু যদি জিজ্ঞাসা করিত, —"ভাই ধন, কাঁদ কেন?" গুরুচরণ চোখের জল মুছিতে মুছিতে

বলিত,—"বুকে একটু হাত বুলিয়ে দে ত ভাই, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে যে রে ভাই ধন!" দাসু তখন তাহার ছোট্ট হাতে ভাই ধনের বড় বুকটিতে হাত বুলাইয়া দিত।

এমনই করিয়াই পিতৃমাতৃহারা শিশু তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের কথা গভীর নির্ভরতায় মাতামহের নিকট ব্যক্ত করিত আর এমনই করিয়াই গুরুচরণ পাষাণ হইয়া সেই সব শুনিত।

নরেশচন্দ্রের কড়া নিষেধে কেহ বড় একটা তাহার বাড়ীতে ভয়ে আসিতে পাইত না। পাপিষ্ঠ তাহার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার ধোপা, নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়াইয়াছিল। গোপনে ছাড়া প্রকাশ্যে কাহারও তাহাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিবার সাধ্য ছিল না। অসুখ-বিসুখ হইলে ডাক্তারেরও সে বাটীতে প্রবেশ নিষেধ ছিল। হায় রে মানুষ! হায় রে, মানুষকে মানুষের ভয়!

* * * *

নরেশ শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার শিশু পুত্রটি ঘুমাইতেছে, স্ত্রী ব্রজবালা তাহার ধারে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বাতাস করিতেছে। নিদ্রিত পুত্রের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া নরেশ কহিল,—"খোকার ঘাগুলো ত বেশই সেরে উঠেছে দেখছি।"

ব্রজবালা বলিল, "শুধু তাই নয়। ওর তাড়সে রোজ যে জ্বরটুকু হচ্ছিল, মা কালীর ইচ্ছেয় তা'-ও আর হয় না ক'দিন।"

"ডাক্তারের ওষুধটা ত তা হ'লে খুবই ভাল!"

পাখাখানি খোকার মাথার শিয়রে রাখিয়া দিতে দিতে ব্রজবালা বলিল, "ছাই ভাল।"

"তার মানে?"

"তার মানে, দেড় মাস ধ'রে ডাক্তারের মলম লাগিয়ে লাগিয়ে ক্রেমেই ও ঘাগুলো সব যতদূর বাড়বার বেড়ে উঠেছিল। জ্বরও দিন দিন বেশী হচ্ছিল। এই সাত দিন ত সে সব আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি। মধুসূদন বাঁচিয়েছেন, নইলে ছেলে ত আমার একেবারে পচেই উঠেছিল!"

"সত্যিই ঘাগুলো বড় সাংঘাতিক হয়েই উঠেছিল, কিন্তু ওষুধ বন্ধ ক'রে আপনা হইতেই এই ক'দিনের মধ্যে ত বেশ সেরে এসেছে!"

"আপনা হ'তেই সারে নি গো মশাই।"

"তবে?"

"সে আর শুনে কায নেই।"

"না—না—বল। বাস্তবিকই বড় সুন্দর ওষুধ ত! কা'র ওষুধ বল দেখি? বলাই কোবরেজ? সিধু ডাক্তার?"

"ও গো না,—ওদের কা'রো নয়। এ এক জন তেল প'ড়ে দিয়েছেন। সাত দিন বাড়ীতে এসে ঘা দেখে তেল প'ড়ে দিয়ে যেতে হয়। দেখ না, সাত দিনের ভেতরেই বার আনা ঘা শুকিয়ে এসেছে।"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু সাত দিন এসে তেল প'ড়ে দিয়ে গেলেন কে? তা'কে ত কিছু বক্‌শিস্ করাও দরকার।"

"তাঁকে আর তোমার বক্‌শিস্ করার দরকার কেই। গাঁয়েরই লোক তিনি, তা যা বক্‌শিস্ ব্রাহ্মণকে করেছ তুমি, তারই জ্বালায় তিনি অস্থির।"

"কে বল দেখি? গাঙ্গুলী না কি? তার একটা খুব ভাল তেলপড়া আছে বটে! সে কি আমার ছেলের জন্যে এই সাত দিন ধ'রে রোজ আমার বাড়ী এসে তেল প'ড়ে দিয়ে গিয়েছে?"

"তোমার ভয়ে কি সহজে আসতেই চান।"

"কৈ, এক দিনও ত তাকে আমি দেখিনি।"

"তুমি আর বাড়ীর মধ্যে থাক কখন্? আমি তাঁকে লুকিয়ে আনিয়েছি, তিনিও লুকিয়ে এসেছেন। নান্নুকে আমার বড্ড ভালবাসে কি না ঐ দাসুটি।"

"নান্নুকে ভালবাসে!"

"নান্নু আর দাসু যে খেলার জুড়ি। নান্নু ভাল থাকতেই দাসু প্রায়ই এ বাড়ীতে আসত। দুটিতে উঠোনের জামতলায় ব'সে খেলাধুলো করত। খালি এই মাস দুত্তিন আর গাঙ্গুলী মশাই তা'কে আসতে দেন নি। আহা, বেচারাদের কি কষ্টেই যে দিন যাচ্ছে! একমুঠো ধানও ঘরে নেই যে, নাতিনটিকে শাক সেদ্ধ ক'রে দু'বেলা দু'টি খাওয়াবে!"

"জমীর ভাগের ধান এবার কিছু পায়নি বুঝি?"

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া ব্রজবালা কহিল, "কত রকমই যে জান তুমি!"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মেঝের একধারে আসন পাতিয়া ব্রজবালা বলিল, "একেবারে জল খেয়ে বাইরে যাও।"

নরেশ চুপ করিয়া কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্রজবালা বলিল, "জল-টল কিছু খেয়ে গেলে না?" কিন্তু তাহার কথা নরেশের কর্ণে প্রবেশ করিল না। নরেশ বরাবর নীচে নামিয়া আসিয়া এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, 'বিষ্টু বাগ্দীকে এখনই ডেকে নিয়ে আয়। আমি বাগানে আছি।'

* * * *

আজ তিন দিন হইল গুরুচরণের জ্বর হইয়াছে। মনটা ভাল ছিল না, শরীরটাও দুর্ব্বল। দাওয়ায় একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া গুরুচরণ শুইয়া ও-পাড়ার রাধিকা ঘোষালের সহিত কথা কহিতেছিল। গাঁয়ের মধ্যে এই লোকটিই কেবল কোন নিষেধ না মানিয়া গুরুচরণের কাছে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বসিত। গুরুচরণের সে ছিল বাল্য-সঙ্গী।

রাধিকা বলিল, "আচ্ছা বাঁধনে বাঁধা পড়লে গুরু! আর তোমার কিন্তু কোথাও নড়বার যো-টি রইল না। আচ্ছা, এ বাপের বাড়ীতে কি আর কেউ-ই নেই? সেইখেনেই না হয় দাও না গছিয়ে। দিয়ে, চল দু'জনে বেরিয়ে পড়ি,—দেখি, যদি বিশ্বনাথ পায়ে স্থান দেন কি না!—তোমার বোধ হয় আর যাবার মনই নেই,—অ্যাঁ?"

গুরুচরণের মন রাধিকার কথার দিকে ছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। দাসু খেলা করিয়া এখনও ফিরে নাই। মনটা তাহার সেই দিকেই ছিল। সুতরাং রাধিকার কথা কয়টি তাহার কানে না যাইলেও, গুরুচরণ বলিল, "হুঁ, তা ত বটেই।"

"তা ত বটেই কি হে? তুমি যাবে না তা হ'লে?"

"কোথায়?"

"কাশী।"

"কাশী যেতে হবে বৈ কি।—কৈ রে, আয় ভাই!"

"ও কি? কারে সাড়া দিলে?"

"দাসু না?"

"কোথায় দাসু? সাঁওতালদের ছেলেরা বাঁশী বাজাচ্ছে! বুঝ, গুরু, একটা বড় সুবিধে আছে হে! দিতে চাও গছিয়ে?"

"কাকে?"

"কাকে আবার? তোমার দাসুকে।"

"কোথায় বল দেখি?"

"আছে এক যায়গা। পশ্চিমে মধুবাণী,—দ্বারভাঙ্গা। এই রকম মা-বাপ-খেকো ছোট ছোট ছেলেদের তারা খাইয়ে পরিয়ে রাখে, লেখাপড়াও একটু একটু শেখায়। তার পর বড়-সড় হলে কোন না কোন কায-কর্ম্মে ওরাই আবার লাগিয়ে দেয়। আমি বলি, দাও সেইখেনে গতিয়ে। ও পেছটান না কাটাতে পারলে, ভাই রে, বিশ্বনাথের চরণে আর স্থান হবে না। কি বল? দেবে সেখানে গতিয়ে?"

"হ্যাঁ, তা দিলেই হয়।"

"তাই দাও। কেন না, কবে হয় ত ম'রে-টরে যাব—বুঝ্‌ছ না? বলি, দু'জনের বয়েসও ত বড় কম হ'ল না। তোমার কত হ'ল, গুরু?"

"কি?"

"বয়েস?"

"এই পুরো চার বছরের হ'ল আর কি।"

"কার কথা বলছ?"

"দাসুর ত?"

"না, জ্বর হয়ে তোমার মাথার একেবারেই ঠিক নেই! তুমি শুয়ে থাক, আমি উঠনুম।" বলিয়া রাধিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

গুরুচরণ বলিল, "ভাই, ছোঁড়াটাকে একবার ডেকে দিয়ে যেও ত, ঐ রেণুদের বাড়ী ব'সে খেলা কচ্ছে। কখন্ যে আজ পালা করতে গেছে!"

রাধিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "না, দাসু ত বেশীক্ষণ যায় নি, এই ত আমি আসবার পর গেল।"

রাধিকাচরণ চলিয়া গেল। খানিক পরেই সদর-দরজা খোলার শব্দ হইল ও পাঁচিলের আড়াল হইতে একটা শব্দ হইল "ঘোঁৎ—ঘোঁৎ—ঘোঁরোঁর্—র্।"

"আর ভয় দেখাতে হবে না ভাই, এস, সন্ধ্যে হয়ে এল যে।"

একখানি কাপড়ের ছবি হাতে করিয়া দাসু আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। গুরুচরণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি যাও ভাবাও, ভাইধন! তোমাকে দেখছি, রাধিকার ঐ মধুবাণীতেই পাঠিয়ে দিতে হবে!"

"কোথায় পাঠিয়ে দেবে আমাকে?"

"মধুবাণী।"

"মধুবাণী! সে কোথায়, ভাইধন? কেন পাঠিয়ে দেবে?"

"কেন দেবো?—আরে ভাই, পেছ-টান না কাটাতে পারলে বনবাস আর কি ক'রে হবে?"

"কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে আমার কাছে! আমি একলাটি থাকতে পারব না।" তাহার পর হাতের ছবিখানি দেখাইয়া বলিল, "দেখ, কেমন ছবি!"

"বেশ ছবি, কোথা পেলে ভাই?"

"রেণুর বাবা দিলে, কাপড়ে লাগানো ছিল—খুলে দিলে।"

"বাঃ, খাসা ছবি! রেখে দাও ভাই। এই রকম তোমার একটি বৌ হবে, কেমন?"

"না—আ, এ রকম নয়,—রেণুর মত।"

"আচ্ছা ভাই, তাই হবে, রেণুর মতই হ'বে।"

"আর, রেণুর মত আমার রাঙ্গা কাপড়?"

"তা'ও হবে। বলিছি ত ভাই, কিনে দেবো।"

"না—আ,—এক্ষুনি দিতে হবে,—দাঁ—আঁ—ও।"

"আজ আর কি ক'রে হয় ভাই, সন্ধ্যে হয়ে এল যে! কাল ঠিক কিনে দেবো। আজ আর উঠতে পাচ্ছিনি যে, ভাইধন!"

"না—আ,—আজ দিতেই হবে, এক্ষুনি দাও।"

রাঙ্গা কাপড়ের জন্য দাসু সে দিন বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। গুরুচরণ কিছুতেই আর তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারেই জ্বর-গায়ে তাহাকে কোলে করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ও-পাড়ার দত্তদের দোকানে কাপড় কিনিতে বাহির হইল।

নরেশচন্দ্রের বাগানের বৈঠকখানা-ঘরের পাশ দিয়াই দত্তদের দোকানে যাইবার পথ। কাপড় কিনিয়া ফিরিবার সময় গুরুচরণ শুনিল, নরেশ বিষ্টু বাগ্দীকে বকাবকি করিতেছে। তার পর যখন সেই বকাবকির মধ্যে নিজের নামেরও উল্লেখ শুনিতে পাইল, তখন গুরুচরণ সব কথাটা না শুনিয়া আর যাইতে পারিল না। বৈঠকখানাঘরের পাশেই একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ ছিল। তাহারই অন্তরালে দাঁড়াইয়া গুরুচরণ শুনিতে লাগিল।

নরেশ বলিতেছে, "বেটা ছোটলোক, মুখ্যু, তোর একটুও আক্কেল নেই!"

বিষ্টু বাগ্দী বলিল, "কিছুই ত করিনি, বাবু মশাই, কি অপরাধ——"

গর্জ্জাইয়া উঠিয়া নরেশ বলিল, "কি অপরাধ? কিছুই জানিস্ নি তুই? গাঙ্গুলীমশা'য়ের ভাগের ধান এবার দিস্‌নি কেন রে, হারামজাদা! মনে করেছ, গাঁয়ের মাথা নেই—অ্যাঁ, অরাজক রাজিত্যি!"

"হুজুরেরই হুকুম দিতে এবার নিষেধ ছিল।"

"হুজুরেরই নিষেধ ছিল! বলি, জমীগুলো কি হুজুরের, না গাঙ্গুলীর? বেটা তেঁতুলে বাগ্দী কোথাকার! একেবারে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত! হুজুরের না হয় ধরলুম নিষেধই ছিল, কিন্তু তো-বেটার ত একটা আক্কেল আছে! ঐ দশ বার বিঘের ধানের ভাগেতেই বামুনের সারা-বছরটি চলবে, এ-ও তুই জানিস্। তোর ইচ্ছেটা কি, ঐ কচি ছেলেটাকে নিয়ে, না খেয়ে উপোস ক'রে ম'রে যাক!—ওঁর সে ভাগের ধান কোথায়?"

"সে ত নায়েব মশাইকে বুঝিয়ে দিয়ে, আপনার গোলাতেই তুলে দিয়েছি হুজুর।"

"বেশ করেছ হুজুর! এখন ভাল চাস্ ত রাত পোয়ালেই, বেবাক ধান গোলা থেকে বার ক'রে ওঁর ওখানে দিয়ে আসবি, এই ব'লে দিলুম। বামুনের ধান খাব আমি! আমার বাবার নামে এখনও বামুনরা দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে।"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুরুচরণ সমস্তই শুনিল। এও কি

সম্ভব? নরেশ তাহাকে দেখিতে পাইয়া শুনাইয়া শুনাইয়া এ সব বলিতেছে! কিন্তু কেন? ভাবিতে ভাবিতে তাহার সর্ব্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। একে তিন দিন ধরিয়া প্রবল জ্বরভোগ হইতেছে, তাহাতে বলকর তেমন কিছু পথ্যও জুটে নাই, তাহার উপর নানাপ্রকার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা এবং সর্ব্বোপরি এই অবস্থায় দাসুকে কোলে করিয়া এতটা পথ চলিয়া আসা! গুরুচরণের দেহ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। এক পা চলিতে গিয়া তেঁতুল-গাছের বড় একটা শিকড়ে বাধিয়া, গুরুচরণ দাসুকে লইয়া সেইখানে পথের উপরেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। আঘাতটা দাসুকেও খুব লাগিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দাসুর চীৎকার শুনিয়া নরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গাছের তলায় আসিল ও ধূলার উপর হইতে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া নানাপ্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিজের গলা হইতে কবচশুদ্ধ সোনার গোটহার ছড়াটি তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, "ছিঃ ভাই, কাঁদতে আছে কি? নান্নু তোমার কান্না শুনতে পেলে মনে করবে—'ছি ছি দাসু, ঐ অমন ক'রে কাঁদে!'"

যাহা হউক, দাসু চুপ করিল। গুরুচরণও উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন নরেশ বাগানের মালীকে ডাকাইয়া বিষ্টু বাগ্দীকে বলিল, "দু'জন সঙ্গে গিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবি।"

গুরুচরণ তখনও মাতালের মত টলিতেছিল। কম্পিতহস্তে দাসুর গলা হইতে হারছড়াটি খুলিয়া দিতে গেলে, নরেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি যখন পরিয়ে দিয়েছি, তখন ও আর কিছুতেই খোলা হ'তে পারবে না, গাঙ্গুলী মশাই! শুধু ঐ কবচখানা কাল আমাকে খুলে দিলেই হবে।"

গৃহে আসিয়া গুরুচরণ আর বসিতে পারিল না, শুইয়া পড়িল। তাহার শরীরের অবস্থা তখন বড়ই খারাপ বোধ হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার বুকে একটা ব্যথা উঠিয়া তাহাকে একবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। দাসুকে বুকে চাপিয়া গুরুচরণ বলিল, "ভাইধন!"

"কি ভাইধন!"

"নোরে বেটার মতলবটা কি বল দেখি? ও ঠিক এবার একটা বড় গোছের বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে, বুঝেছ ভাইধন।"

"হ্যাঁ, ভাইধন।"

"আর এখানে থাকা হ'ল না ভাই, পালাতে হ'ল এখান থেকে। ও বেটা ঠিকই—হঠাৎ যে এতটা সদয়—না, ঠিকই ওর একটা কিছু মতলব আছে।"

আবার বুকের ব্যথাটা বাড়িয়া উঠিল। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "তোর জন্যেই আমার যত মুস্কিল রে ভাই! তোকে নিয়ে পালাই বা কোথা? আমার সব পথ যে তুই ভাই বন্ধ ক'রে আগ্‌লে রইলি! তোরা আমার কি কম শত্তুর!"

"আমাকে না হয় সেই মধুবাণীতেই পাঠিয়ে দাও, ভাইধন; আমি একলা থাকতে পারব এখন।"

ঘুমে দাসুর চোখ জুড়িয়া আসিতেছিল।

গুরুচরণ ডাকিল, "ভাইধন!"

সাড়া পাইল না। দাসু তখন গুরুচরণের বুকের উপরই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গুরুচরণের চক্ষুতে আর সারা রাত নিদ্রা আসিল না। থাকিয়া থাকিয়া নরেশের কথাই কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার প্রতি নরেশের হঠাৎ এত দয়া হইল কেন? ও কি সত্যিকারের দয়া? কখ্খনো না। আচ্ছা, বিশ্বাস করেই দেখি না কেন—মানুষকে বিশ্বাস করাই ত ভাল। করেও এসেছি এ পর্য্যন্ত। না, না, ও কি মানুষ! ও যে কালও আমার সঙ্গে—ও কি এক রাত্রের মধ্যে—ওর মতলব আছে। কি মতলব? ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে? পুড়িয়ে মারবে? নিজের গলার হার খুলে দাসুর গলাতেই বা পরিয়ে দেবার মানে কি? চোর ব'লে বামাল শুদ্ধ পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবে? তা ছাড়া আর কি? ঠিকই তা'ই; ও সবই পারে; একেবারে মানহঁস ধরিয়ে দিয়ে জেল খাটাবে। হয় ত আজ রাত্রিতেই থানায় খবর দিয়েছে; ভোর না হতেই দারোগা-জমাদার নিয়ে এসে হাজির হবে। নাঃ, এ বাড়ীতে ত আর থাকা হবে না,—কিছুতেই হবে না। এখুনিই পালাতে হবে। পালাবই বা কোথা? রাতটার মত রাধিকার ওখানেই গিয়ে থাকা যাক্, তার পর যা হয় হবে। উঠে চ'লে যেতে পারব না এইটুকু? পার্‌তেই হবে।

তখন রাত্রিও আর বড় বেশী ছিল না।

গুরুচরণ ডাকিল, "ভাইধন!"

দাসু তখন কিসের একটা স্বপ্ন দেখিয়া ঠোঁট ফুলাইতেছিল। গুরুচরণ তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। হারছড়াটি তাহার গলা হইতে খুলিয়া লইয়া উঠানের জঙ্গলের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। রাঙ্গা কাপড়খানি তখনও দাসুর কোমরে জড়ান ছিল। গুরুচরণ বলিল, "ভাইধন, পালাতে হবে যে ভাই এক্ষুনি?"

দাসু তাহার কোলে শুধু ঢ লিতে লাগিল।

গুরুচরণ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া তাহাকে বুকে করিয়া রাধিকার বাটীর উদ্দেশে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

শিবতলার কাছেই রাধিকার গৃহ। শিবতলা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া গুরুচরণ আর পারিল না। সেই ব্যথাটা হঠাৎ উঠিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া লাগিল। তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার মত হইল। সেইখানেই শিবের মন্দিরের বাঁধানো রোয়াকের উপর, দাসুকে বুকে করিয়া গুরুচরণ শুইয়া পড়িল।

* * * *

অতি প্রত্যূষে নরেশ বাহির-বাটীর সম্মুখে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। চাটুয্যে মহাশয় কানে পৈতা জড়াইয়া গাড়ু হস্তে করিয়া আসিয়া কহিলেন, "বাবাজী, গুরুচরণটা ম'রে গেল!"

চমকিত হইয়া নরেশ বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ,—দেখে এলুম, চিৎ হয়ে ম'রে শিবের মন্দিরে রোয়াকে প'ড়ে রয়েছে, আর ছেলেটা একখানা নতুন রাঙ্গা কাপড় প'রে তার বুকে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে!"

নরেশ মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। তাহার নয়নে ও কি অশ্রুবিন্দু? পর মুহূর্ত্তে সে দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে ছুটিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত-সাহিত্য

৩

রামায়ণ-কথা (ক)

দশরথ

ঋষি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের, অনেকে অনেক প্রকার বিবরণপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন, "ইহার অনেক স্থল প্রক্ষিপ্ত, উত্তরকাণ্ডটা আদৌ আদি-কবির রচিত নহে।" বাল্মীকি ত বহু প্রাচীন, তদপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন কবির কাব্যেই যখন নানা অবান্তর প্রক্ষেপ দৃষ্ট হয়, তখন প্রাচীনতম আদি-কবির যে তাহা একবারেই থাকিবে না বা থাকিতে পারে না, তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর? বাল্মীকির তুলনায় এই সেদিন-কার কবি কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যেই কত কবির কত অদ্ভুত অদ্ভুত লেখনী-চালনের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারে আবার কতকগুলি সর্গই বেমালুম কালিদাসের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আদি-কবির গ্রন্থে ও-দোষ থাকারই কথা। তাই বলিয়া গোটা উত্তরকাণ্ডটা এক লংটম-কামানের গোলায় উড়াইয়া দিবার মত বুকের পাটা আমার নাই। অন্যের কথা থাকুক, আমি ঐ কাণ্ড মহর্ষি-কৃত বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। *

এক কথায়, উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডের চাবি-কাঠি। উহা বাদ দিলে রামায়ণকে কদাচ একখানি সম্পূর্ণ কাব্য বলিয়া স্বীকার করা চলে না এবং অপর ছয় কাণ্ডের মধ্যে স্থলে অনুপপত্তি থাকিয়া যায়। "কেন?"—তাহার ক্রমশঃ মদীয় প্রবন্ধ-নিচয়েই প্রসঙ্গানুসারে বিবৃত হইবে। এই স্থলে পাঠকবর্গের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, আমি রামায়ণের কোনওরূপ "টীকা" বা "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" করিতে বসিয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে, তাহাই অকপট-হৃদয়ে পাঠকবৃন্দের সমক্ষে—সুধী সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহাতে—

"নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ নানপেক্ষিতমুচ্যতে।"
(মল্লীনাথ।)

মূল গ্রন্থের বিরোধী কিছুই লিখিত হইবে না বা কোনও প্রয়োজনীয় কথাও অনুক্ত থাকিবে না।

রামায়ণের বালকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে দেখি,—

"স যথা কথিতং পূর্ব্বং নারদেন মহাত্মনা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ॥" ৯

ভগবান্ বাল্মীকি মহাত্মা নারদের মুখে যেমন যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইরূপে রঘুবংশের আখ্যান রচনা করিলেন। এই রঘুবংশ শব্দটি কালিদাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর ঐ সর্গেরই ঊনচল্লিশ শ্লোকে আছে—

"অনাগতং চ যৎকিঞ্চিৎ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ॥" ৩৯

তৎপরে ভগবান্ বাল্মীকি রামচন্দ্রের বসুধাতলে অনাগত সমস্ত বৃত্তান্ত উত্তর-কাব্যে (উত্তরকাণ্ডে) বর্ণন করেন। ইহার দ্বারা মোটামুটিভাবে দেখিলে বুঝা যায়,—বাল্মীকিই সাতকাণ্ড রামায়ণের রচয়িতা। কিন্তু ইহার কিছু পরেই মহা গোলমালে পড়িতে হয়। আদিকাণ্ডের চতুর্থ সর্গের প্রথমে পাই—

"প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্র-পদ-মর্থবৎ॥ ১
চতুর্ব্বিংশ-সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ২
কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ॥" ৩

"ভগবান্ বাল্মীকি লব্ধরাজ্য রামের সমস্ত চরিত বিচিত্র-পদ ও সুপ্রশস্ত অর্থ-সমন্বিত প্রবন্ধে বর্ণন করেন। মুনিবর এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ ছয়কাণ্ড, পঞ্চশত সর্গ ও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক এবং শেষে উত্তরকাণ্ড নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"—সুতরাং রামায়ণে দেখিতেছি, চব্বিশ হাজার শ্লোকপূর্ণ, পাঁচশত সর্গ-বিশিষ্ট ছয়কাণ্ড ও শেষে উত্তরকাণ্ড মুনি রচনা করেন।

* রামায়ণের তিন সংস্করণ প্রচলিত আছে। (১) বঙ্গদেশীয় (২) উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশীয় (কাশী). (৩) বোম্বাই-প্রদেশীয় (বোম্বে)" ত্রিবেদী। রামায়ণ-বিষয়ক মৎকৃত প্রবন্ধাদি গৌড়ীয় সংস্করণ অবলম্বনে লিখিত। এই পুস্তক সন ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে "বঙ্গবাসীর" অনুবাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সানুবাদ সম্পাদিত হয়।

রামায়ণের লেখাতেই ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান রামায়ণে পাইতেছি—

কাণ্ড	সর্গ
আদি	৭৭
অযোধ্যা	১১৯
অরণ্য	৭৫
কিষ্কিন্ধ্যা	৬৭
সুন্দর	৬৮
লঙ্কা	১৩০
	৫৩৬

মোট পাঁচ শত ছত্রিশ সর্গ। ইহা ছাড়া উত্তরকাণ্ডে আছে—এক শত চব্বিশ সর্গ। সুতরাং কোথায় যে কি গোল হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। তবে গোল যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে দেখা যাউক।

যাহাই হউক না কেন,—উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকির রচিত, তাহাতে মতভেদের কোনও কারণ দেখি না। কেন না—মূলগ্রন্থেই তাহা পাইতেছি। যদি মূলগ্রন্থের ঐ "সভবিষ্যং সহোত্তরম্" অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হয়, তবে উল্লিখিত শ্লোক ও সর্গপরিচায়ক কবিতাটিকেও প্রক্ষিপ্ত বলিলে আপত্তির তত হেতু দেখি না। নিজের প্রতিপাদ্য মতের পরিপোষক যতটা, তাহাই "মূল বা আসল" আর—স্বমতের প্রতিকূল যাহা, তাহাই "প্রক্ষিপ্ত", এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না।

রামায়ণের ঘটনাবলী নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, একটা বৃহৎ রাজ-সংসারের—খুব বড় একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্রের সবিস্তর বর্ণন। তবে সেই বর্ণনার মুখে, তদানীন্তন ইতিহাসের অনেক তথ্য ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে এবং তাহা আদি-কবি বাল্মীকি-বিরচিত ও এমনই ভাবে সুললিত-শ্লোকনিবদ্ধ যে, হিন্দু আমরা তাহা আনতমস্তকে বেদবাক্যের মত মানিয়া লইতে বাধ্য। ভগবানের অবতাররূপী রামের সম্বন্ধে কোন কথাই আমাদের নিকট অসম্ভব বা অদ্ভুত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। তাহাতে আবার মহর্ষি বাল্মীকির কবিতার মাহাত্ম্যে সেই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ বলিয়াই মনে হয় এবং আর্ষবাক্যে দ্বিধা করিবার মত উপাদানে আমাদের হৃদয় গঠিত নহে, সংস্কারও তদ্রূপ নহে।

রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা

পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র বনগমন করিলে, তাঁহার শোকে দশরথের মৃত্যুর পর, ভরত যখন সেই সংবাদ লইয়া বনবাসী রামের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবার জন্য বার বার জিদ করিতে লাগিলেন, তখন রামচন্দ্র কিছুতেই ভরতকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া কহিলেন,—

"পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ সঃ মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীৎ রাজা-শুল্কমনুত্তমম্॥"

অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ, শ্লোক—৩।

"ভাই! পূর্ব্বকালে আমাদিগের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আপনার এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকেই আমি রাজ্যদান করিব।" সুতরাং এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া সেই পত্নী কৈকেয়ীর গর্ভজাত ভরতকে রাজ্য না দিয়া দশরথ রামচন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে গিয়া যে ঘোর অন্যায় কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রতিজ্ঞার পর, বৃদ্ধ দশরথ পতিব্রতা তরুণী কৈকেয়ীর নিকট আবার দুইটি বরদানেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী সে বর দুইটি ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন—প্রয়োজনমত লইবেন। মন্থরার কুমন্ত্রণায় যখন কৈকেয়ীর মতিভ্রংশ ঘটিল, তখন সেই প্রতিশ্রুত দুইটি বর রাজার নিকট চাহিয়া বসিলেন। হিসাবমত কৈকেয়ী বর না চাহিলেও, দশরথের সেই বিবাহ সময়ের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক ভরতকেই রাজ্য দেওয়া উচিত ছিল। রাজা এ সমস্তই জানিতেন, তাই ভরতের সান্ত্বনার জন্য বলিলেন,—

"দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ।
সম্প্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ॥

ঐ, শ্লোক—

ততঃ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী।
অযাচত নরশ্রেষ্ঠং দ্বৌ বরৌ বর-বর্ণিনী॥

ঐ, শ্লোক—

তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা।
তচ্চ রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্॥"

ঐ, শ্লোক—

সুতরাং দেখিতেছি, রাজা দশরথের আর গত্যন্তর ছিল না। তিনি নিজের ফাঁসে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতার এই দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়াই গুণাভিরাম রাম নীরবে বনগমন-পূর্ব্বক সকল দিক্ রক্ষা করিলেন। নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিশাল কোশলরাজ্য ও বিরাট্ রাজ-সংসার ধ্বংস করিতে দিলেন না। নতুবা, হয় ত ত্রেতাযুগেই আর একটা কুরুক্ষেত্রের মহাসমর বাধিত। অন্য দুই রাণী—কৌশল্যা এবং সুমিত্রার কেহ দশরথের এ গুপ্ত প্রতিজ্ঞার কথা জানিতেন কি না, বলিতে পারি না; তবে অসামান্য রূপ-লাবণ্যের জন্যই হউক বা অনুপম তারুণ্যের জন্যই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, কৈকেয়ীর সহিত ঐ দুই রাণীর যে ততটা প্রাণের মিল ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ রামায়ণে আছে। দশরথ রামকে ডাকিয়া যখন কহিলেন যে, কালই তোমার যৌবরাজ্যাভিষেক হইবে, তুমি উপবাসী থাকিও, তখন রামচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে সেই সংবাদ কৌশল্যাকে দিলেন; কহিলেন—

"অম্ব! পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালন-কর্ম্মণি।
ভবিতা খ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ॥"

অযোধ্যা ৫ম সর্গ, ৩৫ শ্লোক।

"মা! পিতা আমাকে প্রজাপালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, কল্য তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে।"

তখন কৌশল্যা আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে ও গদ্‌গদবচনে কহিলেন—

"বৎস রাম চিরং জীব, হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্ মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়॥"

ঐ, শ্লোক—৩২।

"বৎস রাম! তুমি চিরকাল জীবিত থাক। তোমার শত্রু সকল নিহত হউক এবং তুমি রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়া আমার ও সুমিত্রা দেবীর বান্ধবগণকেও আনন্দিত কর।" এ স্থলে,—"তোমার শত্রু" বলিতে কাহাকে বুঝিব? রামের যৌবরাজ্য-প্রাপ্তির পক্ষে যাহারা প্রধান বিঘ্নস্বরূপ, তাহাদিগকে, না—রাজার যাহারা শত্রু, অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ—তাঁহাদিগকে? কোন্‌টা প্রসঙ্গসঙ্গত হয়? আমার ত মনে হয়, ভরত এবং ভরতের পক্ষপাতী কৈকেয়ীর ভ্রাতা কুমার যুধাজিৎ প্রভৃতি। যুধাজিৎ প্রায়ই অযোধ্যায় থাকিতেন ও অতি-বৃদ্ধ ভগিনীপতি দশরথের আনুগত্য করিতেন। ব্যাপারটা দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি রাজার কথন্ কি হয়, রাজা কখন কি করেন, চৌকী দিতেন। এ দিকে দেখি, "রাজা দশরথের অন্যান্য শ্বশুর কেবল কায-কর্ম্মের সময়েই নিমন্ত্রিত হইতেন, কেকয়রাজের (কৈকেয়ীর পিতার) সঙ্গে কিন্তু সর্ব্বদাই তত্ত্ব-তালাস চলিত।" * যাহা হউক, আনন্দাতিশয়ে কৌশল্যার হৃদয়ের অন্তস্তলের কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। "তুমি রাজা হইয়া আমার ও সুমিত্রা দেবীর বান্ধবগণকেও আনন্দিত কর।" কেন? কৈকেয়ীর অপরাধ? তাঁহার নামগন্ধও এ আনন্দপ্রবাহের ত্রিসীমায় নাই। সুতরাং "হতাস্তে পরিপন্থিনঃ"—আর এই কৈকেয়ীর অনুল্লেখ, এই দুই ব্যাপারে সহজেই মনে হয়, ছোট রাণীর সঙ্গে আর দুই রাণীর তেমন মনের মিল ছিল না এবং ঐ "পরিপন্থী" পদের লক্ষ্য ভরত প্রভৃতি ছাড়া আর কেহ নহে। অন্তঃপুরে রাণীদের মধ্যে যখন এইরূপ ভাব, সেই সময়ে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে সঙ্কল্প করিলেন। যেমন সঙ্কল্প—অমনই কার্য্যারম্ভ। এত বড় একটা ব্যাপার, যেন নিমেষের মধ্যে স্থির হইয়া গেল। মন্ত্রীদের সঙ্গে দুই এক কথায় পরামর্শ করিয়াই দশরথ আদেশ করিলেন, "সর্ব্বসাধারণের মতানুসারেই কায করা কর্ত্তব্য, সুতরাং পৃথিবীর তাবৎ গণ্য-মান্য ব্যক্তি-দিগকে এবং নৃপতিবৃন্দকে আহ্বান করিয়া সত্বর আনা হউক। বড়ই তাড়াতাড়ি কাযটা সারিতে হইবে, তাই কেকয়রাজ ও রাজর্ষি জনক এই দুই জনকে এখন আর আনিবার দরকার নাই, তাঁহারা পরেই এই সুসংবাদ শ্রবণ করিবেন।"

"ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপম্।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥"

অযোধ্যা, ১ম সর্গ—৪৮ শ্লোক।

সুতরাং দেখিতেছি, এই অভিষেকে যে দুই জন বাদ পড়িলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে আনা উচিত ছিল। ১ম কেকয়রাজ—কৈকেয়ীর পিতা, যাঁহার নিকট দশরথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, কৈকেয়ীর গর্ভজাত সন্তানকেই রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গপূর্ব্বক অপরকে রাজ্যদান করিতেছেন। চিরকাল "সত্যব্রত" বলিয়া

* অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০ সর্গ।

পরিচিত দশরথ আজ সত্যবিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন, কাযেই কোন্ মুখে তিনি কৈকেয়ীর পিতাকে আনিতে সাহস করিবেন? অথচ অযোধ্যার রাজসংসারে অতি সামান্য সামান্য খুটনাটি ব্যাপারেও সর্ব্বাগ্রে ছোট রাণীর বাপের বাড়ীর খোঁজ করা হইত, আর কোন কুটুম্বের খোঁজ হউক আর না-ই হউক। আজ কিন্তু তিনিই বাদ পড়িলেন। দশরথ যে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিতেছেন, ইহা অন্যের অপেক্ষা তিনি যে কত অধিক পরিমাণে বুঝিতেছিলেন, তাহা এই কেকয়রাজ-বর্জ্জনে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কি জানি, যদি কৈকেয়ীর পিতা আসিয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত, দৌহিত্র ভরতের যৌবরাজ্য দাবি করিয়া বসেন, তখন উপায়? বীরকেশরী কেকয়রাজের শৌর্য্যবীর্য্যও দশরথের অবিদিত ছিল না। নানারূপ গণ্ড-গোলের আশঙ্কা করিয়াই দশরথ তাঁহাকে এই অভিষেক-কথা পূর্ব্বাহ্ণে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। ২য় হইলেন, রাজর্ষি জনক। রঘুবংশের সহিত জনকবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ পরস্পরের বড়ই গৌরবের কারণ হইয়াছিল। তাহাতে আবার সীরধ্বজ জনকের সমকক্ষ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পর, সত্যপ্রিয় ও ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন তাপস ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে তেমন বড় কেহ ছিলেন না। বৃদ্ধ রাজা দশরথ সীরধ্বজ জনককে বৈবাহিকরূপে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। উদারহৃদয় জনকও জরাজীর্ণ দশরথকে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। হরধনুর্ভঙ্গের পর বৃদ্ধ রাজাকে পাইয়া জনক প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—

"যথা দশরথস্যেহ তথাযোধ্যাপুরী মম।
প্রভুত্বে নাস্তি সন্দেহঃ————————"

আদি, ৭২ সর্গ—১৬ শ্লোক।

আমার যেমন অযোধ্যায়, দশরথের তেমনই আমার এই রাজ্যে প্রভুত্ব আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ আমরা উভয়ে শরীরমাত্রে পৃথক্, কিন্তু প্রাণে আমরা অভিন্ন, এক বস্তু। এত বড় আত্মীয়, অত বড় রাজর্ষি, অত বড় সত্যশীল পুণ্য-শ্লোক বৈবাহিক জনককেও, তদীয় জামাতার—হর-ধনুর্ভঙ্গপণ-জেতা জামাতা রামেরই অভিষেক-উৎসবের কথা বিন্দুমাত্রও জানিতে দেওয়া হইল না। রামের যৌবরাজ্যাভিষেকে কৌশল্যা ও দশরথের পরেই জনকের আনন্দ। অথবা বুঝি, অযোনি-সম্ভবা বীর্য্য-শুল্কা দুহিতা সীতার স্বামীর এই অভিষেকে, সীতাময়-প্রাণ পিতা জনকের আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন যে জনক, তাঁহাকেও দশরথ বাদ দিলেন। নিমন্ত্রণ করিলেন না। জনকের সত্যনিষ্ঠা, জনকের তেজ, জনকের অকপট ব্যবহার দশরথের অবিদিত নহে। তাদৃশ সত্যপ্রিয় পরমতাপস রাজর্ষি জনক যে কদাচ সত্যভ্রষ্ট দশরথের এই রামাভিষেক-কার্য্য অনুমোদন করিবেন না, রাম জামাতাই হউন, আর পুত্রই হউন, ন্যায়ানুরাগী জনকের নিকট অন্যায়ের আদর বা সমর্থন যে কদাচ সম্ভবপর নহে, ইহা দশরথ বিলক্ষণ-রূপেই বুঝিয়াছিলেন। হয় ত, অথবা "হয় ত" কেন, বস্তুতই জনক আসিয়া দশরথের এই গর্হিত কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া বসিবেন, তখন তিলে তাল হইয়া দাঁড়াইবে, তাই রাজা দশরথ জনককে আহ্বান করিতে সাহস করিলেন না। মনের বল বড় বল, সে বলের নিকট দৃপ্ত সিংহকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, দশরথ ত কোন্ ছার। তাই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-শঙ্কিত রাজা দশরথ জনকের নিমন্ত্রণটা ধামা-চাপা দিয়াই সারিলেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, দশরথ নিজের হৃদয়ের নিকটেও কতটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাহার পর সমাগত রাজন্যবর্গের ও গ্রামবৃদ্ধ প্রজাবৃন্দের নিকট যে ভাবে, যেরূপ হ-য-ব-র-ল করিয়া রামের অভিষেকে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাতেও তিনি হাতে-কলমে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন যে, তিনি কত বড় অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমাগত সভাসদ্‌গণ দশরথের মতে মত দিবার পর বয়োবৃদ্ধ ও চাতুর্য্যবৃদ্ধ দশরথ যেন কত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—

"অহোঽস্মি পরমঃ প্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ॥"

অযোধ্যা ৩য় অঃ, শ্লোক ২

আপনারা যে আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের যৌবরাজ্যাভিষেক অভিলাষ করিতেছেন, ইহাতে আমি পরম প্রীত হইলাম ও বুঝিলাম যে, আমার প্রভাব কত অতুল!" যে তাঁহাদের অনুরোধেই দশরথ রামকে রাজ্যভার অর্পণ করিতেছেন, তাঁহার নিজের যেন কোন পক্ষপাত নাই! দশরথ বলিতেছে, তিনি করেন কি? শেষে রামচন্দ্রকে যখন এই কথা বলেন, তখনও কত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এটা-ওটা-সেটা বলিয়া রামকে অভিষেকের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন

না, রামকে ত সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই বেশী জানেন। রাম গুপ্ত প্রতিশ্রুতির বিষয় বিদিত ছিলেন। হয় ত বাঁকিয়া বসে, তাই রাজা একবারে পিতৃত্বের গুরুভার পাষাণের ন্যায় পিতৃভক্ত, "পিতৃদেব" রামকে রাজী করিলেন।

রাম পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে, সভাসদ্‌গণও স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দশরথ কিন্তু তখনই আবার মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক,—অবিলম্বে রামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাম তাড়াতাড়ি আবার ছুটিয়া আসিলেন! তখন দশরথ নিজের অনেক কথার পর, অনেক কৈফিয়ৎ দিবার পর কহিলেন—

"ন কিঞ্চিন্ মম কর্ত্তব্যং তস্যান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতো যৎ ত্বামহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্ত্তুমর্হসি॥"

অযো, ৩য়, শ্লোক ১৫।

"তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা ব্যতীত আমার অন্য কোন কর্ত্তব্য বাকী নাই। অতএব আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তোমার তাহা করা উচিত।"

"অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুব-রাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক!॥"

ঐ ঐ শ্লোক ১৬।

"এক্ষণে প্রজারা সকলেই তোমাকে তাহাদের রাজা করিতে চাহিতেছে। সুতরাং তোমাকেই আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব।" তাহার পর আরও কহিলেন যে, আমি আজ কতগুলি এমন দুঃস্বপ্ন ও দুর্লক্ষণ দেখিয়াছি যে, যাহার ফল আমার মৃত্যু।

"প্রায়েণৈব নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি—" ঐ ১৯ শ্লোক,

"সুতরাং আমার আর বিলম্ব নাই; এখন যত তাড়াতাড়ি কাজটা সারিয়া লওয়া যায়। আগামী কল্যই মাহেন্দ্র-যোগ—অতি চমৎকার দিন, পুষ্যা-যোগ আছে, তাহাতেই তোমাকে অভিষিক্ত করিব।" (ঐ, ঐ, ২০,২১,২২) এরূপ বলিতে বলিতে দশরথের মনের আসল কথাটা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল। তিনি কহিলেন:—

"বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্ত কালো মতো মম॥"

ঐ ঐ শ্লোক—২৫।

ভরত যত বেলা এখানে অনুপস্থিত, তাহার মধ্যেই তোমার অভিষেকটা সারিয়া ফেলা আমার মতে সমীচীন; কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

"ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যেষ্বেবংবিধানি হি।"

ঐ, ঐ, শ্লোক—২৪।

"এইরূপ কার্য্যেই নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে;" ইত্যাদি দশরথের বাক্যের ও কার্য্যের আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে,—তিনি কতটা সন্দিহান-হৃদয়ে ও সতর্কাচরণে এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভরত যখন মাতুলালয়ে, তখন রামের অভিষেকের আয়োজন করিয়া কতটা দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং একটা অঙ্গীকারের অপলাপ করিতে গিয়া কত নূতন নূতন অপলাপ করিয়া বসিয়াছিলেন। পাছে ভ্রাতৃ-বৎসল রাম, নিরপরাধ ভরতের প্রতি দশরথের ঐরূপ কটাক্ষে চটিয়া যান বা বিরক্ত হন,—এই শঙ্কায় অতি বৃদ্ধ রাজা পুত্রের মন রাখিবার জন্য কহিলেন—

"কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।"

ঐ, ঐ, ২৬।২৭ শ্লোক।

"জানি, যদিও তোমার ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতা ভরত সাধুদিগের মতের অনুবর্ত্তী ও সর্ব্বদা তোমার অনুগত, যদিও ভরত সদয়-হৃদয় ও জিতেন্দ্রিয়, তথাপি রাম, মনুষ্যের চিত্ত বড়ই অস্থির" বলিয়াই "এখন তুমি যেতে পার"—বলিয়া তাড়াতাড়ি রামকে বিদায় করিয়া দশরথ যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। দশরথ এক দিন যে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ-লালসায় পূর্ব্বাপর কিছু বিচার না করিয়া, একটা বিরাট্ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাঙ্গিবার জন্য আকাশ-পাতাল—স-সাগরা ধরণী আলোড়ন করিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বিষাদে প্রসাদ



৮

শৈলেন্দ্র ও বিমলা দুই জনই কমলাকে ভালবাসিয়াছিল। শৈলেন্দ্রের ভালবাসা স্বার্থলেশবিরহিত কি না, তাহা বুঝিবার অবসর এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু বিমলার ভালবাসার যে স্বার্থের গন্ধ একবারেই ছিল না, তাহা শপথ করিয়াই বলিতে পারা যায়।

বিমলা বড়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মানুষের মুখের দিকে একবার চাহিলেই সে তাহার মনের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত। সে তাহার পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা, বাল্যকালে তাহার মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর যুবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গোরখপুর ও বালিয়া জিলায় বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিতরুচি—অথচ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার পিতা লোকনাথ চক্রবর্ত্তী এলাহাবাদ হাইকোর্টে সে কালের এক প্রকার এক-চেটিয়া ওকালতীর প্রসাদে প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়া যায়েন, এবং তাহারই সাহায্যে গোরখপুর অঞ্চলে প্রচুর ভূসম্পত্তিও তাঁহার হইয়াছিল। লোকনাথের লোকান্তরপ্রাপ্তির পর জ্ঞানেন্দ্র-নাথ পিতৃ-পরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া প্রিয়তমা সহধর্ম্মচারিণী শৈলবালার সহিত বড়ই আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, দুর্দ্দৈব কিন্তু তাহা সহিল না, পাঁচ বৎসরের শিশু-কন্যা বিমলাকে প্রিয়তম পতির হস্তে সমর্পণ করিয়া শৈলবালা বাইশ বৎসর বয়সে কাঁদিতে কাঁদিতে ধরা হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল।

সেই শিশু মাতৃহীনা বিমলাকে বুকে করিয়া, যুবা জ্ঞানেন্দ্র-নাথ উল্লাসহীন উদাস হৃদয়ে বিমলার জন্য, বিমলার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখে-সৌভাগ্যে ও গৌরবে সমুজ্জ্বল করিবার আশায় নূতনভাবে সারশূন্য সংসারযাত্রা আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজে পাশ্চাত্যভাবে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত-শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুপণ্ডিতগণের নিকট ভাল করিয়া আধ্যাত্মশাস্ত্রও পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দু-আদর্শের প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদলের মধ্যে প্রবিষ্ট ছিলেন না, এই কারণে তিনি তাঁহার স্নেহের দুহিতা বিমলাকে মনের মত করিয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যভাবের উচ্চশিক্ষা দিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই এবং সে জন্য এখনও প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিতেছিলেন। বিমলা কিন্তু বিলক্ষণ প্রকৃতির মেয়ে ছিল, সে যখন যাহা ইচ্ছা করিত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখনই তাহা পূর্ণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন, এবং সেজন্য বিল-ক্ষণ অর্থ-ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। বিম-লার আত্মগৌরবজ্ঞান, তেজস্বিতা ও সচ্চরিত্রতা বিষয়ে কখনও জ্ঞানেন্দ্রনাথ সন্দিহান হয়েন নাই; সুতরাং বিমলা তাহার সকল কার্য্যেই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনই ছিল, তাহার স্বকৃত কোন কার্য্যের জন্য সে কখনও কাহারও নিকট জবাবদিহিং করিত না, কেন সে এইরূপ করিয়াছে, এ কথা তাহার নিকটে এ পর্য্যন্ত কেহ জিজ্ঞাসাও করে নাই বা জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও কাহারও ছিল না।

কমলার প্রথম দর্শনদিন হইতেই বিমলা তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিমলা সময় পাইলেই কমলার কাছে আসিত, তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিজেদের মোটরে চড়াইয়া নিজেই সেই মোটর চালাইয়া এলাহাবাদের নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়া আনিত, কখনও বা গঙ্গার পাকা বাঁধের উপর তাহারা দুই জনে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় বেড়াইয়া হাওয়া খাইত। এই বেড়াইবার সময় তাহাদের দুই জনের মধ্যে নানা-প্রকার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক বিষয়ে মন খুলিয়া নিজ নিজ শিক্ষার অনুরূপ আলাপ হইত। তাহাতে তাহারা দুই জনেই পরম আনন্দ উপভোগ করিত, কোন কোন দিন অবসরমত শৈলেন্দ্রও আসিয়া তাহাদের সঙ্গী হইত। শৈলেন্দ্রও তাহাদের ঐ সকল আলাপে বেশ উল্লাসের সহিত যোগ দিত। কমলার শান্তিমাখা মধুর প্রকৃতি আর বিমলার সামঞ্জস্য

উত্তেজনাময় প্রতিভাপূর্ণ বাগ-বিন্যাসের মাঝখানে শৈলেন্দ্রের চিরপ্রফুল্ল, হাস্য-পরিহাসবহুল, অথচ শিক্ষা, বিনয় ও সৌজন্য-মণ্ডিত বচনবিন্যাস, এই তিনের ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নাত হইয়া তাহারা প্রত্যেকেই পরিতৃপ্তি অনুভব করিত।

গত পূর্ণিমার রাত্রিতে কমলার জন্মতিথির উৎসব-সভায় করুণানন্দের অতর্কিত আবির্ভাব ও বিস্ময়াবহ তিরোধানের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কমলা, বিমলা ও শৈলেন্দ্রের এইরূপ প্রাতঃ ও সান্ধ্য ভ্রমণের ভাবধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম বেশ মধুর-ভাবেই জমিয়া আসিতেছিল, সেই দিনের পর কিন্তু তাহাদের সেই আনন্দের ভ্রমণ একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সেই দিন হইতেই কমলার এই মানসিক ভাবান্তর বিমলা ও শৈলেন্দ্রের পক্ষে একান্ত অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শৈলেন্দ্র ভাবে, কমলা করুণানন্দকে দেখিয়া, করুণানন্দের গান শুনিয়া যে হঠাৎ এমন হইয়া উঠিল, ইহার নিমিত্ত ত সে ছাড়া আর কেহই নহে, কেন দুর্বুদ্ধিবশতঃ সে করুণানন্দ ব্রহ্মচারীকে সান্ধ্য-সভায় উপস্থিত করিয়াছিল, সে যদি তাহা না করিত, হয় ত এত দিনে তাহার আশাময় সুখের স্বপ্ন সত্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ লাভ করিত, সে হয় ত এত দিনে সরলার ভাবপ্রবণ মানসক্ষেত্রে অনুরাগের বীজকে অঙ্কুরিত হইতে দেখিয়া আত্মজীবনের চরিতার্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হইত, এ সবই যে নৈরাশ্য ও বিষাদের উত্তপ্ত মরুভূমিতে মৃগমরীচিকায় পরিণত হইয়া পড়িল, তাহা কে ঘটাইল, সেই ত তাহার স্রষ্টা! কেন সে করুণানন্দকে সেই সভায় আনিয়াছিল? আর করুণানন্দ! তুমিই বা কেন আসিয়াছিলে? যদিই বা আসিয়াছিলে, কেন করিয়া গান গাহিলে কেন? বিমলা কিন্তু ভাবিত, কমলা কেন এমন হইল? সে যে করুণানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সেই দিন হইতে তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, কিন্তু কমলার ন্যায় বিদুষী ও বুদ্ধিমতীর পক্ষে এইরূপ অসম্ভা-বিত অনুরাগের পরিণাম যে কখনই পরিণাম-মধুর হইতে পারে না, ইহা সে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছিল, কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়? সে নিজে নারী, সুতরাং সে বুঝিয়াছিল যে, নারীহৃদয়ে প্রকৃত ভালবাসার দুর্নিবার গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে, এমন শক্তি ত পৃথিবীতে কিছু নাই। কেমন করিয়া বিমলা কমলার এই মনোবৃত্তিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া আবার পুরান পথে ফিরাইয়া আনিবে? শৈলেন্দ্র যে কমলাকে ভালবাসিয়াছে, সরলারও তাহার প্রতি অসন্তোষ ছিল না, বরং অনুরাগের পরিস্ফুট ইঙ্গিত পূর্ব্বেও যে সে দেখে নাই, তাহাও নহে। হঠাৎ তাহার সেই ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিমলা বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে কি করা যাইতে পারে? কেমন করিয়া কমলার অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যৎকে আবার আশা ও ভরসার আলোকে সমুজ্জ্বল করা যাইতে পারে? এই সকল চিন্তা তাহাকে এখন সর্ব্বদাই ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে অবশেষে স্থির করিল যে, একলা এমন করিয়া বৃথা চিন্তায় সময় না কাটাইয়া এই সকল বিষয়ে খোলাখুলিভাবে শৈলেন্দ্রের সহিত একটা পরামর্শ করিলে বোধ হয় ভাল হয়, শৈলেন্দ্র সুখী হয়, সরলারও শিক্ষিত-নারী-জীবনের গৌরবমণ্ডিত সাফল্যও হয়, ইহাই এক্ষণে তাহার জীবনের একটা প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। তাই বিমলা আজ রবিবারে শৈলেন্দ্রের অবসর বুঝিয়া একাকিনী অতর্কিতভাবে তাহার গৃহে মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইল, শৈলেন্দ্র তখন তাহার বিশ্রাম-গৃহে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

৯

বিমলাকে এমনভাবে হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া শৈলেন্দ্রের একটানা ভাবনার স্রোত হঠাৎ বাধা পাইল, তাহার মুখে বিস্ময়ের আকারও ব্যক্ত হইয়া পড়িল। এমন ভাবে না জানাইয়া পূর্ব্বে ত কখনও বিমলা তাহার গৃহে উপস্থিত হয় নাই, তাহাকে আত্মসংবরণের চেষ্টার যথেষ্ট অবকাশ না দিয়াই তাহার বিস্ময়-স্তিমিত স্নিগ্ধ নয়নদ্বয়ে নিজের অচঞ্চল প্রসন্ন নয়নদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বিমলাই অগ্রে কহিল—"শৈলেন্দ্র বাবু, ক্ষমা করিবেন, আগে না জানাইয়া এই অনধিকারপ্রবেশটা করিয়া ফেলিয়াছি।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিবার জন্য অতি যত্নের সহিত বিমলাকে অনুরোধ করিয়া শৈলেন্দ্র বলিল,—"এ কি কথা বিমলা! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুটীরে স্নেহের ভগিনীর প্রবেশ, ইহাতে আবার অধিকার অনধিকারের চর্চ্চা আসে কেন?"

এই বলিয়া শৈলেন্দ্র নিজের আসনে বসিল, বিমলা পার্শ্বেই বসিয়াছিল।

অন্যদিকে নতদৃষ্টিতে চাহিয়া একটু গম্ভীরভাবে বিমলা তখন বলিল,—"শৈলেন্দ্র বাবু! একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি? বেয়াদবি মাফ করিবেন—"

"তোমার ন্যায় সুশীলা মহিলার মুখে বেয়াদবি বা মাফ এই দুইটি অর্থশূন্য কথার আবৃত্তি আমি একেবারেই পছন্দ করি না, তাই বলি বিমলা! যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা সরাসরি বলিয়া ফেলিলেই অধিকতর বাধিত হইব।"

শৈলেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বিমলা একটু হাসিল এবং কহিল,—"কথাটা আর কিছুই নহে, আমার মনে আজ কয় দিন হইতেই একটা সংশয় উঠিয়াছে, আপনি ছাড়া তাহার মীমাংসা আর কাহারও কাছে হইতে পারে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। তাই শেষে আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। সংশয়টা এই যে, স্নেহ ও অনুরাগ—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি ভাল?'

বিমলার প্রশ্ন শুনিয়া শৈলেন্দ্র ত অবাক্, এই নিষ্প্রয়োজন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিমলা হঠাৎ এমন ভাবে তাহার কাছে আসিয়াছে, এ কি বিমলার পরিহাস না পাগলামী। ব্যাপার কি, ভাল করিয়া সে বুঝিতে পারিল না, বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে সে তখন বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শৈলেন্দ্রের মনের ভাব বুঝিয়া, একটুমাত্রও অপ্রতিভ না হইয়া আরও গম্ভীরভাবে বিমলা কহিল,—"শৈলেন্দ্র বাবু, হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, আমি সে দিন একখানা বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিলাম, স্নেহে ও অনুরাগে বড়ই অন্তর আছে। এই দুইটি ভাবের মধ্যে একটি অপার্থিব, আর একটি পার্থিব। কথাটা কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি জানি, আপনি বৈষ্ণব-গ্রন্থের বেশী রকম আলোচনা করিয়া থাকেন, তাই বলি, আপনি হাসিয়া আমার এই প্রশ্নটি এমন ভাবে উড়াইয়া দিবেন না, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর কিন্তু আমার ও আমারই ন্যায় আর এক জনের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে,—"

বিমলার সহিত শৈলেন্দ্রের পরিচয় নূতন নহে। ভালই হউক বা মন্দই হউক, সে যখন যেটা ধরিয়া বসে, তাহাতে বাধা পাইলে তাহার জিদ্ আরও বাড়িয়া যায়,—ইহা শৈলেন্দ্রের বেশ জানাই ছিল। তাই সে অন্য প্রসঙ্গের অবসর না হওয়াই উচিত মনে করিল এবং গম্ভীরভাবে অথচ স-কৌতূহল দৃষ্টিতে বিমলার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—

"যতদূর মনে পড়িতেছে, তাহাতে বোধ হয়, রূপ গোস্বামী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণিতে স্নেহ ও অনুরাগের পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, অতৃপ্তি বা প্রিয়জনের সেবা করিয়াও অচরিতার্থতার অনুভূতিই স্নেহ, আর প্রিয়-জনকে নিজের অনুকূলভাবে পাইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই হইতেছে অনুরাগ। রূপ গোস্বামীর এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা ত মানিতেই হইবে। স্নেহ যখন হইতে পবিত্র, সুতরাং স্নেহ স্বর্গীয় আর অনুরাগ পার্থিব।

এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় শৈলেন্দ্র বিমলার মুখ-বদনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিমলা তখন হাতে যে আসনে বসিয়া ছিল, তাহা ছাড়িয়া শৈলেন্দ্রের ঠিক সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল, গললগ্নীকৃতবসনে দুই হাত জোড় করিয়া ছল-ছল নেত্রে বিস্ময়-স্তব্ধ শৈলেন্দ্রের মুখের উপর তাহার সেই কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টি সন্নিবেশিত করিল এবং ভাব-বেশ-বিহ্বলতাময় মৃদু অথচ অকম্পিত স্বরে বলিল, "শৈলেন্দ্র বাবু! ইহাই শুনিবার জন্য বড় অধীর হইয়া আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। এ বিষয়ে আপনার কাছে অধিক আজ আর শুনিতে চাহি না, প্রয়োজনও নাই। আর একটি বিনীত প্রার্থনা, আপনার দেবোপম নির্ম্মল স্বভাব, অন্য সকলের উপর আপনার নারীজাতির প্রতি অসীম করুণার উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে বলিয়াই, আপনার সম্মুখে আজ এই অনুচিত প্রার্থনা করিতে সাহস করিতেছি। স্পষ্ট করিয়া বলুন শৈলেন্দ্র বাবু, কমলার প্রতি আপনার ভালবাসাকে আজ হইতে বিমলা কি বলিয়া বুঝিবে,—ইহা কি স্নেহ, না ইহা অনুরাগ?"

যদি অকস্মাৎ জগতের কি বাহ্য কি আন্তর সকল আলোক একবারে নিবিয়া যাইত, অথবা শূন্য নীলাকাশের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া অকস্মাৎ সেইখানে শত শত বজ্রপাত হইত, তাহাতেও শৈলেন্দ্র তেমন জড়ভাব ধারণ করিত না, বিমলার এই অভাবনীয় আকস্মিক প্রশ্নরূপ সাঙ্ঘাতিক আক্রমণ যেমন করিয়া তাহাকে জড়ীভূত ও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় করিয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তখন নীরব শৈলেন্দ্র স্তব্ধ, বিক্ষুব্ধ চকিতের ন্যায় লক্ষ্যশূন্য নয়নে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, বিমলাও তেমনই ভাবে বসিয়া বসিয়া কম্পিতহৃদয়ে শৈলেন্দ্রের সেই আকস্মিক ভাবান্তর নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল!

কিছু কাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া শৈলেন্দ্র হঠাৎ আসন ছাড়িতে উঠিল। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে করুণভাবে চাহিতে চাহিতে সে তখন কোমলভাবে দুই করে বিমলার কম্পমান ফুলিবদ্ধ কর-যুগল ধারণ করিয়া, তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইতে উঠাইতে সনে বসাইল, নিজেও ধীরভাবে আপনার [illegible] হইল এবং শূন্যদৃষ্টিতে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে বলিল—

"[illegible] বিমলা! জানি না, কোন্ অসাবধানতার [illegible] পদস্খলন। তোমার ন্যায় হিতৈষিণী ও বুদ্ধিমতী ভাগ্নীকে আকুল করিয়া তুলিয়াছি। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল, এ [illegible] সংসারে ইচ্ছা করিয়া আর কাহাকেও জানাইব না। বিমলা! স্নেহের ভগিনি! তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা করি। তোমার নিকট আত্মগোপন করিব না। বিমলা, আশ্বস্ত হও, নিশ্চিন্ত হও; নিশ্চয় জানিও, কমলার সুখের পথে কণ্টক উদ্ধার করা ছাড়া শৈলেন্দ্রের এ জীবনে অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য নাই। কখনও যে হইবে, সে আশঙ্কাকেও মনে স্থান দিও না।"

এইমাত্র বলিয়া শৈলেন্দ্র বিরত হইল, তাড়াতাড়ি বিমলা তখন উঠিয়া, ভক্তিভরে মস্তক ভূমিতে নত করিয়া শৈলেন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিল। বিমলারও আকর্ণবিস্তৃত বিশাল নয়নদ্বয় তখন অশ্রুভারাবনত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সুর-বালার ন্যায় প্রীতিপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে শৈলেন্দ্র ভাবিতেছিল, এ কি মানবী না দেবী? তাহার পর শৈলেন্দ্র ও বিমলার কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা পরে পাঠক ও পাঠিকা-গণ যথাসময়ে বুঝিবেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

প্রকৃতির ভুল

এই বরিষার শেষে বিয়ে হ'ল যা'র
আশিনের রাঙা প্রভাতে,
সে দিন সধবা সাজিলে যে হায়
সীঁথিতে-সিঁদুরে-ভূষণে।
আমি কি জানি, শুধাব কাহারে,
আঘণ না যেতে কে এমন করি'
বিধবা সাজাল তাহারে!

নেই অঙ্গে সে আর আলো-ঝলমল
নীল-বরণিয়া সাটী সে,
হাসিতে হিরণ, আঁখিতে কিরণ;—
নলিন ফোটে না হাঁটিতে।
আমি কি কব, কি জানি, অভাগি,
কে সে অকরুণ এমন করিয়া
ভেঙে দিল ভরা সভাটি!

মাগো বড় যে 'কু' লাগে পরিধানে তোর
আঁখিজল-ভেজা মলিনা
কুজ্ঝাটিকার ও শোক-সজ্জা—
কেমনে এমন হ'লি মা!
আমি না কাঁদি' পারি কি থাকিতে?—
কি ও হাহাকার, দীর্ঘ কি শ্বাস,
শিশির ঝরিছে আঁখিতে!

হাঁগো তবু এ কি দেখি, হায় রে অভাগি,
হায় রে অবোধ বালিকা,
বুকের কাঁটাতে লুকিয়ে গোপনে
গেঁথেছ কামনা-মালিকা?
আমি কি আর বলিব, বল মা,
বুল্‌বুল্-হীন বাগানে গোলাব—
সে কি সাজে, সে কি ভালো মা!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

সাধন ও মুক্তি

সাধ্যতে কর্ম্ম নিষ্পাদ্যতে অনেনেতি সাধনম্।

কর্ম্মনিষ্পাদন-ব্যাপারকেই সাধন বা সাধনা বলে। এই নিখিল জগতে মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তাহাই তাহার সাধনা অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক উভয়বিধ কর্ম্মপ্রাপ্তির কারণই সাধন বা সাধনা নামে অভিহিত। সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে তিন প্রকার। যদিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটিই সেই অচিন্তনীয়া মাতৃস্বরূপা পরমা প্রকৃতিরই গুণ বা শক্তি এবং এই গুণ বা শক্তিত্রয়ই সেই শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, অবিকৃত আত্মাকে জীবের দেহমধ্যে অভিসম্বদ্ধ করে, তথাপি ঐ গুণ বা শক্তি তিনটির মধ্যে সত্ত্ব-গুণটিই নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। ঐ সত্ত্বগুণ হইতেই মানবের অন্তরে আত্মতত্ত্বের বিকাশ ঘটায় এবং তাহাতেই তাহার অকৃত্রিম সুখোদয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিদৃশ্যমান এই নিখিল জগদভ্যন্তরে একমাত্র অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় চিৎ-স্বরূপ পরমাত্মাকে পরিদর্শন করিতে জীবের বাসনা থাকিলে একমাত্র এই নিষ্কাম সাত্ত্বিক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ঐ সাত্ত্বিক কর্ম্মই তখন আবার জীবের সুখপ্রাপ্তির কারণ বা সাধন হইবে। ঐরূপ রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম জীবের দুঃখের কারণ হয়। অতএব সাধকের ত্রিবিধ কর্ম্মের বিষয়েই জ্ঞানার্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সু না কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥"

১৮ অঃ, ২৩ শ্লোঃ।

অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও ফলকামনা-রহিত হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসীনভাবে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এই আসক্ত্যাদিরহিত সাত্ত্বিক কর্ম্মই জীবের একমাত্র মুক্তির সাধন। কিন্তু এখানে সাধারণের মনে একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে,—যে আসক্ত্যাদিরহিত কোনও কর্ম্ম করা যায় কি না? কারণ, যে ইচ্ছাশক্তি জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, সেই ইচ্ছাই ত কামনা? তাহা হইলে কামনা ও আসক্ত্যাদিরহিত কর্ম্ম কিরূপে করা যায়? কোন কর্ম্ম করিতে গেলেই ত তাহাতে কামনা থাকিবে। এখানে বক্তব্য, সাত্ত্বিক সাধক সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন, তাঁহার যে কামনা, তাহা "তৎপ্রীতে" অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত। কেন না, তিনি তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার প্রীতিসাধন জন্য কর্ম্ম করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার নিজের কোনও কামনা বা আসক্তি নাই। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম; এই কর্ম্মের দ্বারাই জীব মুক্তির যোগ্যতা লাভ করে।

আর যে কর্ম্ম জীবের ক্লেশজনক, তাহাই রাজসিক, ইহাতে মুক্তি ঘটে না। কারণ, এই কর্ম্ম প্রবৃত্তিমার্গে সাধিত হয়। ইহার দ্বারা জীব নিয়ত কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে তাহার বহু ক্লেশই হইয়া থাকে। এই রজোগুণ হইতে জীবের অনুরাগ ও যাবতীয় কামনার উদয় হয় এবং ঐ অনুরাগাদি হইতে তাহার অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য তৃষ্ণা ও প্রাপ্তবিষয়ের রক্ষা নিমিত্ত আসক্তি উপস্থিত হয়। শেষে ঐ অনুরাগ, তৃষ্ণা ও আসক্ত্যাদি গুণগুলি যেন তাহার আত্মারই গুণ বলিয়া ভ্রম ঘটায়। ইহাতে তাহার আত্মাভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অভিমানজন্য তাহার অহঙ্কার উদিত হয় এবং সে অহঙ্কারজনিত কর্ম্মসাধনে বহু ক্লেশ পাইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥"

১৮ অঃ, ২৪ শ্লোঃ।

অর্থাৎ যে কর্ম্ম কামনা বা অহঙ্কার পূর্ব্বক বহু যত্নসহকারে কৃত হয়, তাহারই নাম রাজসকর্ম্ম। এই কর্ম্ম যে মুক্তির পরিপন্থী, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কর্ম্মে আত্মাভিমান উপস্থিত হয়। সেই অভিমান হইতে অহঙ্কার উদিত হয় এবং অহঙ্কার হইতেই জীব এই বিশ্ব-বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারটাকে ভিন্নাকার বোধ করে। এই ভিন্নাকারজ্ঞানই অসমাক্ জ্ঞান। এই জ্ঞানে মুক্তি কখনও ঘটে না বা ঘটিতে পারে না। সমাক্ জ্ঞান অর্থাৎ অভিন্নাকারজ্ঞানই একমাত্র মুক্তির সাধন। কেন না, জীবের এই জ্ঞান হইতেই আত্মদর্শন ঘটে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

১৩ অঃ, ২৮ শ্লোঃ।

অর্থাৎ যিনি চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর বা পরমাত্মাকে সমভাবে বিনাশশীল ও চিরস্থায়ী বলিয়া দেখিতে পান, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান ব্রহ্ম হইতে কীট, পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বত্র, সেই শুদ্ধ, বুদ্ধ, অভিন্ন, চৈতন্যময় আত্মাকে অবিকৃত অবস্থায় সমভাবে দর্শন ঘটায়, তাহাই তাহার সম্যক্ জ্ঞান। এই জ্ঞানই জীবকে মুক্তির যোগ্যতা দান করে।

আর যাহা জীবের মোহজনক কর্ম্ম, তাহাই তামসিক। জীবের ঈদৃশ কর্ম্ম হইতে তাহার জ্ঞান আবরিত হইয়া থাকে। জ্ঞান মোহাবৃত হইলে প্রমাদ-আলস্যাদি আসিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হয় এবং তজ্জন্য সে আত্মদর্শনে চেষ্টারহিত হইয়া থাকে। ব্যাধের লক্ষীভূত মৃগ যেমন সুমধুর বংশীরবে মোহিত হইয়া আত্ম-পরিত্রাণে যত্নবান্ হইতে পারে না, তেমনই মায়াতে মুগ্ধ সংসারী জীব প্রমাদ-আলস্যাদি জন্য মুক্তিলাভে যত্নবান্ হইতে পারে না। জ্ঞানই মুক্তির সাধক; সেই জ্ঞান এই তামসিক কর্ম্মে মলিনই হয়। সুতরাং তাহাতে মুক্তিও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। জ্ঞান বিশুদ্ধ ও নির্ম্মলতা প্রাপ্ত না হইলে মুক্তি কখনও কোনওরূপে ঘটাইতে পারে না বা পারিবে না।"

এক্ষণে তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়,—মুমুক্ষুর একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্মকরণরূপ সাধনই করা কর্ত্তব্য। উহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানদায়ক, কেন না, বিশুদ্ধ জ্ঞান একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্ম বা সাত্ত্বিক সাধনার দ্বারাই জীবের অন্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে মুক্তির পথ দেখায়। এই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং ইহাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান; এই জ্ঞান জীবকে পরমাত্ম-চিন্তায় অভিনিবিষ্ট করে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—

"সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্॥"

অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দোষবিহীন, শুদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নির্ব্বিকার পরমেশ্বর বা পরমাত্মাকে জানিতে বা দর্শন করিতে বা লাভ করিতে পারা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান। এতদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই অজ্ঞানপদবাচ্য। একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্ম দ্বারা ঐ জ্ঞানকে লাভ করা যায়। ইহাই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর নাই। মুণ্ডমালাতন্ত্রে উক্ত আছে—

"ব্রহ্মবিদ্যাসমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যসমা ক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যাসমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই, ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য ক্রিয়া নাই, ব্রহ্মজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই। এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে সর্ব্বত্র সমদর্শন ঘটে। যাঁহার সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সেই পরমাত্ম-দর্শন ঘটিয়াছে, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। নিরালম্বোপনিষদে উক্ত আছে—

"সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান্।"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্নিহিত সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি বিদ্বান্ বা জ্ঞানী। বস্তুতঃ আত্মা সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও অদ্বিতীয় বস্তু। তাঁহার দর্শন একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। তিনি প্রতি দেহেই অবস্থিত হন বলিয়া পরমজ্ঞানী যোগিগণ স্ব স্ব দেহেই সেই নিত্য ও চৈতন্যময় অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। জ্ঞানই এই দর্শন ঘটায়, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা তাঁহাকে কখনও দর্শন করা যায় না। তিনি যে ইন্দ্রিয়াধিগম্য নহেন, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতেই সমর্থ হয় না; কারণ, সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমাত্মা ঐ ইন্দ্রিয়গণ হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত আছে—

"ভীতঃ পান্থ ইবাহিভ্যঃ পুরুশেভ্য ইব দ্বিজঃ।
দূরে তিষ্ঠতি চিন্মাত্রমিন্দ্রিয়েভ্যো হ্যনাময়ম্॥"

অর্থাৎ সর্পভয়ে ভীত পথিক ও কদাচারী চণ্ডালস্পর্শভয়ে ভীত দ্বিজ যেমন তাহাদিগের বহুদূরে অবস্থান করেন, সেইমত সেই অনাময় ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাও সেই ইন্দ্রিয়গণ হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেখানে ইন্দ্রিয়গণ পৌঁছিতেই পারে না। আরও, পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গণের গোচরীভূত কিরূপে হইবেন? পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম নির্গুণ, আর ইন্দ্রিয়গণ সগুণ। যিনি রূপাদি কোনও গুণবিশিষ্ট নহেন, তিনি কিরূপে সগুণ ইন্দ্রিয়গণের গোচরীভূত হইতে পারেন? কখনও তাহা হইতে পারেন না। হয় ত বা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, তিনি যখন বিশ্বব্যাপক, তখন এই বিশ্বকে দর্শন করিলেই ত তাঁহাকে দর্শন করা হয়? কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ, তিনি বিশ্বব্যাপক হইলেও বিশ্ব তিনি নহেন। যেমন অরণিমাত্রেই অগ্নি ব্যাপকভাবে নিহিত থাকিলেও সেই অরণিদর্শনে

অগ্নিদর্শন হয় না, তেমনই পরমাত্মা বিশ্বব্যাপক হইলেও সেই বিশ্বদর্শনে কখনও পরমাত্মদর্শন হইতে পারে না। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত আছে—

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"

অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা, বাক্যদ্বারা, কিংবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অথবা তপস্যাদির দ্বারা তাঁহাকে দর্শন বা লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ধ্যান দ্বারা সেই নিষ্কল অর্থাৎ মায়াতীত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। মোট কথা, নির্গুণ পরমাত্মায় রূপাদি গুণগুলি লিপ্ত থাকিলেও তিনি সেই গুণে "নীরে ভাসমান" পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্তই থাকেন। কোনও গুণে লিপ্ত হন না বলিয়াই তিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও অরূপ। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাঁহার প্রণিধান করিতে যাওয়া বামনের চাঁদ ধরার মত অসম্ভব হয়। দেবী-ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত আছে—

"বস্তুমাত্রং হি যদ্দৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণংহি তৎ।
দৃশ্যঞ্চ নির্গুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ সংসারে যে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট। দৃশ্য অথচ নির্গুণ, এমন বস্তু জগতে কখনও হয় নাই বা হইবে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, সগুণ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে নির্গুণ পরমাত্মাকে দর্শন করা যায় না, তাহাতে সংশয় নাই। এক্ষণে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, জীবগণ কিরূপে সেই পরমাত্মাকে প্রণিধান করিবে? বক্তব্য—একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে প্রণিধান করিবে। জ্ঞানই জীবের অন্তশ্চক্ষু, সাধনার দ্বারা সেই জ্ঞান বা অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, তাহাতেই তাহার পরমাত্মদর্শন হইবে। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত আছে—বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

"সর্ব্বশক্তিরনন্তাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত আত্মা সর্ব্ববস্তুতেই অবস্থান করিতেছেন। যিনি সেই অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত পরমাত্মদর্শন করিয়া থাকেন। এই অন্তশ্চক্ষু সমাধিস্থ না হইলে প্রস্ফুটিত হয় না। দৃঢ়চিত্ত সাধক প্রথমতঃ সদ্‌গুরু-সন্নিধানে উপদিষ্ট হইবে। পরে সেই গুরূপদিষ্ট সাধন অভ্যাস করিতে করিতে যখন তাহার জ্ঞান ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণভাবে বিকশিত হইবে, তখনই সে সমাধির যোগ্য হইবে। সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধক তখন তাহার সেই দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে অনিত্য দেহাদি জাগতিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সেই ইন্দ্রিয়াদি হইতে বহুদূরস্থিত পরমাত্মাকে জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা পরিদর্শন করিবে। মোট কথা—দেহাদি জাগতিক বিষয়ে চিন্তাশূন্য না হইতে পারিলে সেই নিত্য সত্ত্ব পরমাত্মাকে পরিদর্শন করা কখনই সম্ভব হইবে না। অষ্টাবক্র-সংহিতায় অষ্টাবক্র ঋষি বলিতেছেন,—

"সশরীরমহো! বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে॥
যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেন-বুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্॥"

অর্থাৎ ঋষি বলিতেছেন—অহো! আমি এইক্ষণে শরীর বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কোনও অলৌকিক কৌশলে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেছি। যেমন সলিলোৎপন্ন তরঙ্গমালা, ফেন, বুদ্বুদ প্রভৃতি ঐ সলিল হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, তেমনই পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত এই নিখিল বিশ্বও সেই পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। পাঠক! এই মহা-পুরুষের অলৌকিক কৌশলটি বুঝিয়াছেন কি? ইহা যোগবল বা সাধন-কৌশল। এই পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ঋষির সাধনলভ্য জ্ঞানই পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া তাঁহাকে পরমাত্ম-দর্শন করাইতেছে। জ্ঞানই যে একমাত্র পরমাত্মদর্শনের বা মুক্তির যোগ্যতা দান করে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তন্ত্রে উক্ত আছে,—"জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্‌জ্ঞানং পরাৎপরম্।" অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই মুক্তি ঘটে, তজ্জন্য জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু। এই পরমজ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে সাধনার আবশ্যক এবং একমাত্র সাত্ত্বিক সাধনার দ্বারাই এই পরমজ্ঞানলাভ হয়। তামসিক বা রাজসিক সাধনায় পরমজ্ঞানকে লাভ করা যায় না; কারণ, একমাত্র সাত্ত্বিক সাধনা হইতেই মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়গণকে অনিত্য দেহাদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয়। অনাদিভূতা অচিন্তনীয়া মহামায়ার মায়াতে মোহিত হইয়া জীব প্রথমতঃ

এই নিখিল জগতে জন্মগ্রহণ করে। পরে যথাকালে তাহার রজঃশক্তি বিকশিত হয় ও ক্রমে সেই রজঃশক্তির প্রভাবে সে ক্রিয়ানিষ্ঠ হইয়া থাকে। ঐ ক্রিয়ানিষ্ঠা হইতে তাহার ক্রমে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় এবং এই সাত্ত্বিক ভাববিশিষ্ট কর্ম্মনিষ্ঠা হইতেই তাহার দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ অনিত্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় ও ঐ সঙ্গে তাহার পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ পায়। এই প্রকাশমান পূর্ণ জ্ঞানই তখন তাহাকে সমাধিস্থ করে এবং সেই সমাধিযোগ দ্বারা সে পরমাত্মাকে জানিতে পারে। সমাধিযোগস্থ না হইলে পরমাত্মদর্শন হইতে পারে না; একমাত্র সমাধিযোগীই জ্ঞানমার্গে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। গোরক্ষ-সংহিতায় উক্ত আছে,—

"আত্মানং পরমং বেত্তি যোগযুক্ত-সমাধিনা।
যুক্তাহার-বিহারশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কর্ম্মসু॥"

অর্থাৎ পরিমিত আহার-বিহার-সম্পন্ন (ইন্দ্রিয়-সংযমী) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদিতৎপর ব্যক্তি সমাধিযোগ দ্বারা পরমা-ত্মাকে জানিতে পারেন। পরমাত্মা একমাত্র সমাধিগম্য; সমাধিযোগ ভিন্ন তাঁহাকে কোনওরূপে উপলব্ধি করা যায় না। মোট কথা, নিবৃত্তি-সাধন ভিন্ন পূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ হয় না এবং জ্ঞান পূর্ণভাবে প্রকাশ না পাইলে পরমাত্মদর্শন কখনই সম্ভব হয় না। কিন্তু নিবৃত্তি-সাধন বড়ই কষ্টসাধ্য। জীব একবারে ভোগস্পৃহাদিশূন্য না হইলে এই নিবৃত্তি-সাধনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে না। সাধারণতঃ জীবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটি ভাবই থাকে। তন্ত্রে উক্ত আছে,—

"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি॥"

অর্থাৎ সাধারণতঃ সংসারী জীবমাত্রেই প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা পরমাত্মলাভেচ্ছু, তাঁহারাই ভোগ-স্পৃহাদিশূন্য হইয়া নিবৃত্তি-পথাবলম্বন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগাদি জন্য কামনাযুক্ত হইয়া যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাই প্রবৃত্ত-কর্ম্ম, আর একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান জন্য যে সকল নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায়, তাহাই নিবৃত্ত-কর্ম্ম। মনুতে উক্ত আছে,—

"ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥"

এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভাবদ্বয় যথাক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। কারণ, জীব প্রথমতঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবৃত্তিমার্গে শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মগুলি যথানিয়মে করিতে থাকিবে। ইহাতে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইবে। কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির কারণ। বিবেকচূড়ামণিধৃত বচনে উক্ত আছে,—"চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।" অর্থাৎ কর্ম্ম একমাত্র চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত; ইহাতে বস্তু অর্থাৎ পরমা-ত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষ তখন পরমজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইবে এবং ঐ বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তখন অনন্যমনা হইয়া নিষ্কাম তপস্যায় রত হইবে। কারণ, তখন সেই শুদ্ধচিত্ত সাধক বুঝিবে যে, একমাত্র তপস্যাই তাহার অমার্জ্জিত জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিতে সমর্থ। তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না বা হইতে পারে না। কদাচিৎ হয় ত বা কোনও ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যালব্ধ প্রকাশমান জ্ঞান ইহজন্মে অমলিন অবস্থায় থাকিয়া যায়; কিন্তু তাহাও তপস্যা দ্বারা তাহার পরিচ্ছন্নতাকে স্থায়ী করিতে হইবে। নচেৎ ঐহিক সকাম কর্ম্মাদির দ্বারা তাহা মলিন হইয়া যাইবে। এই জন্য মনুতে উক্ত আছে,—

"তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবং মানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥"
১১ অধ্যায়, মনু।

অর্থাৎ ইহজগতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই এই তপস্যা কারণরূপে বিরাজ করিতেছে। দেবতা ও মানুষের যাহা কিছু সুখ-সম্পত্তি, তাহার মূলই তপস্যা। বস্তুতঃ কোনও কার্য্য করিব বলিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। কৃতকার্য্য হইতে হইলে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্রকারগণ তাই বলিয়াছেন,—"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ"। তাই বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্য পরমাত্মদর্শন জন্য তপস্যাকে উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই তপস্যায় তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় এবং সেই জ্ঞানই শেষে তাঁহাকে পরমাত্মদর্শন করায়। বিনা তপস্যায় এই পরমাত্ম-দর্শন হয় না। শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—"না-তপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।" অর্থাৎ তপস্বী না হইলে যোগ-সিদ্ধি (পরমাত্মা-জীবাত্মার সংযোগসিদ্ধি) হইবে না। তপস্যা অসাধ্যসাধন করিতেও সমর্থ হয়। মৈত্রেয় উপনিষদে উক্ত আছে,—"তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যং হি

তপস্ততঃ।" অর্থাৎ তপস্যা হইতে সর্ব্ববিধ অভীষ্টই লাভ করা যায়। তপস্যার অসাধ্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে তপস্যা কাহাকে বলে, তাহাই উক্ত হইতেছে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে দুশ্চর ব্রত-নিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নামই তপস্যা। এইরূপ তপস্যা-নিরত হইলে ক্রমে ঐ তপস্যা হইতে জীবের অষ্টবিধ পাশ মোচন হইবে অর্থাৎ তপস্যা-নিরত ব্যক্তির ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল এই অষ্টবিধ পাশ মুক্ত হইয়া থাকে। এই পাশমুক্ত ব্যক্তির অন্তরে নির্ম্মল দেবভাবের উদয় হইবে এবং ঐ দেবভাব হইতে ক্রমে তাহার পরমজ্ঞান প্রকাশ পাইবে ও সেই প্রকাশমান জ্ঞানই তখন তাহাকে পরমাত্মদর্শন করাইবে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, ভাব ও তপস্যার মধ্যে কোন্‌টি প্রথমাবলম্বনীয়? ভাবই প্রথমাবলম্বনীয়। যদিও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তপস্যা হইতেই দেবভাবের উদয় হইবে, তথাপি ভাবই যে প্রথমাবলম্বনীয়, তাহা দেখাইতেছি। বিনা ভাবে তপস্যা হয় না। কিন্তু এই ভাব ত্রিবিধ। রুদ্রযামলে দ্বিতীয় পটলে উক্ত আছে,—"ভাবস্তু ত্রিবিধো দেব দিব্য-বীর-পশুক্রমাৎ।" অর্থাৎ পশু, বীর ও দিব্য এই তিনটি ভাব আছে। "ক্রমাৎ" এই বাক্য থাকায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ত্রিবিধ ভাবেই পরমাত্মদর্শন ঘটে না। সাধনার দ্বারা একটির পর একটি অর্থাৎ পশু হইতে বীর এবং বীর হইতে দিব্য ভাবের উদয় হইলে তখন সাধকের পরমাত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পশুভাবে অর্থাৎ সদাদ্বৈত ভাবে সংশয়চিত্তে সাধনা বা কর্ম্মাভ্যাস করিতে থাকিবে, ইহাই পশুভাব। এই পশুভাব আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোভেদে তিন প্রকার। তমঃপ্রধান পশুভাবে মন্ত্রাদিতে বর্ণজ্ঞান, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি ও অবিশ্বাস, প্রতিমাদিতে শিলাবুদ্ধি প্রভৃতির উদয় হয়। আর রজঃপ্রধান পশুভাবে কেবলমাত্র আপন ইষ্টদেবেই আস্থাসম্পন্ন এবং অন্যান্যের ইষ্টের প্রতি দ্বেষ প্রভৃতির উদয় হয়। সত্ত্বপ্রধান পশুভাবে বেদ ও আগমাদিসম্মত বিধি-ব্যবস্থায় আস্থিত করিয়া সকল দেবতায় ভক্তিমান্ করে। এই সত্ত্বপ্রধান পশুভাব হইতে ক্রমে সাধক সংযম, তীর্থসেবা, গুরুতে দৃঢ়-বিশ্বাসবান্ হইয়া বীর-সাধনার যোগ্যতা লাভ করে। তখন সেই সাধক বীরভাব গ্রহণ করিয়া বীরসাধনায় রত হয়। অর্থাৎ বীরভাবী সাধক আগমাদিসম্মত গুরুপূজাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ঐ সাধক তখন গুরুকে সর্ব্বদেবময় জ্ঞানে তাঁহাতেই ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকে। এই সাধক স্ত্রীমাত্রকেই ইষ্টদেবী কল্পনা করে এবং তাঁহাদের পদতলকে গুরুবৎ চিন্তা করে। এইরূপ ভাবসম্পন্ন হইবামাত্র তাহাতে বৈরাগ্য আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং সাধকও তখন সেই বৈরাগ্যকে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত তাহার আশ্রয়স্থল গৈরিক বস্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ ভাবনা করিবে। ক্রমে এইভাবে সাধনা করিতে করিতে তাহার দৈব-ভাব বা দিব্যভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই দিব্যভাব উদিত হইবামাত্র তাহার যাবতীয় কামনা দূর হইয়া যাইবে এবং "অহং ব্রহ্ম" এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সমাধিস্থ হইবে। এই সমাধিযোগসম্পন্ন সাধকের তখন সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-অক্ষুধা, কিছুই থাকিবে না। ঈদৃশ অবস্থায় তাহার জ্ঞান পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া পরমাত্মদর্শন করাইবে। তখন সে দেখিবে যে, জীবই শিবস্বরূপ—একমাত্র এই পরমাত্মাই সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই দর্শনই পরমাত্মদর্শন এবং ইহাই জীবন্মুক্তি। জীব এইরূপে পরমাত্মদর্শন করিয়াই জীবন্মুক্তিলাভ করে। জীবন্মুক্তি গীতায় উক্ত আছে,—

"জীবঃ শিবঃ সর্ব্বত্রৈব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি জীবকে শিবস্বরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিতে দেখেন, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। এইরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তখন স্বয়ং তত্ত্বমসি জ্ঞানে বিভোর হইয়া মাত্র জাগতিক মঙ্গলসাধন জন্য কর্ম্মাভ্যাসে রত থাকেন এবং এইরূপে তাঁহার দেহাবস্থানকাল অতিবাহিত করিয়া শেষে দেহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাই মুক্তি। ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

শ্রীরামেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন।

মেঘ-মুক্তি



১

সেদিন রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া অন্য দিনের মত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিলাম না। নরেশ বাবুর কথাগুলি যেন জীবন্ত রূপ ধরিয়া মনের মধ্যে ঘা দিতেছিল। যুক্তি ও বিজ্ঞানের দিক দিয়া তাঁহার কথা অস্বীকার করিবার হয় ত কোন উপায় ছিল না, কিন্তু আজ সমস্ত মন দিয়া এ কথাটা অনুভব করিয়া দেখিলাম—হৃদয় যেন সম্পূর্ণ সায় দিতে চাহিতেছিল না। কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয় লইয়া আলোচনা হইলে আমিও নরেশ বাবুর মত অকুণ্ঠিতচিত্তে নিঃসংশয়ভাবে কথাটা হয় ত মানিয়া লইতাম। আজ আমার চিত্তলোকে যে আনন্দের রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, প্রথম প্রণয়ের যে বিচিত্র অনুভূতি ও মাধুর্য্য আমার নেত্রপথে সংসারকে নূতনরূপে নূতন সুষমায় পূর্ণ ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কাছে যেন এ সব কথা নিতান্ত বিসদৃশ ও রসহীন বলিয়া মনে হইতেছিল। বিনিদ্রনয়নে শয্যার উপর শয়ন করিয়া আমি শুধু নিশীথ ও যূথিকার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। দারজিলিং বেড়াইতে গিয়া প্রথম যে দিন নিশীথ যূথিকাকে দেখিয়াছিল, সে দিন হয় ত তাহার মন আমারই মত সঙ্গীতের সুরে সুরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন সে হয় ত আমার মত এমনই আকুল হৃদয়ে এমনই প্রাণের আবেগে প্রতিদিন তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। তাহার অন্তরের এই ব্যাকুল প্রেম-নিবেদন যূথিকা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। সে-ও নিশীথকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিল। এক দিন এক মধুভরা চাঁদিনী রাত্রিতে বাঁশীর গানে ও আনন্দ-উৎসবের মাঝে তাহাদের মিলন-বাসর সার্থক হইয়াছিল। তাহার পর তাহারা কতদিন এমনই হাসি ও গানে, প্রেমে ও আনন্দে সুখ-স্বপ্নের মধ্য দিয়া জীবনের পথে চলিয়াছে; কিন্তু আজ? যূথিকা আজও তাহার হৃদয়-ভরা ভালবাসার অর্ঘ্য সাজাইয়া নিশীথের জন্য বসিয়া আছে; কিন্তু নিশীথ আজ কোথায়? সে আজ বহু—বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে! গত দিনের প্রেমের স্মৃতি আজ তাহার চিত্তে নির্ব্বাণপ্রায়! আর যূথিকা?—একটা অজ্ঞাত বেদনায় আমার সারা চিত্ত টন্ টন্ করিয়া উঠিল। যাহাকে কোন দিন দেখি নাই, যাহার সঙ্গে জীবনে কোন পরিচয় নাই—সেই অপরিচিতা নারীর ব্যর্থ প্রেমের সকরুণ কাহিনী আমার সমগ্র অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পরদিন বৈকালে আকাশ নির্ম্মল মেঘহীন—ঝড়-বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না। নরেশ বাবুর বাড়ী গিয়া দেখিলাম—তাঁহারা সকলে প্রস্তুত হইয়া আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। গাড়ীতে উঠিয়া অমিয়া সকলকে শাসাইয়া সাবধান করিয়া দিলেন—আজ যেন আর ও-সব লাঠিমারা প্রসঙ্গের অবতারণা না হয়—তাহা হইলে এমন সুন্দর যাত্রার আনন্দ মাটী হইয়া যাইবে।

আমরা পাঁচ জনে ষ্টীমারে উঠিলাম। সে দিন প্রথম শ্রেণীর কামরায় লোক বেশী ছিল না। এক ধারে একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা বসিয়া ছিলেন, তিনি একবার কটাক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া সেলাইয়ের বাক্স হইতে একটা সেলাই তুলিয়া লইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন। এ দৃশ্যে অমিয়া ত হাসিয়াই অস্থির! তিনি মৃদুস্বরে আমাদিগকে বলিলেন, "দেখুন—পরমব্রহ্মের এ কি অবিচার! এমন ফুলের মত সুন্দর মেয়েটিকে একেবারে এমন আকাট্ ক'রে সৃষ্টি করেছেন? এই সুন্দর সন্ধ্যা—উপরে উদার উন্মুক্ত নীল আকাশ—আর নীচে এই চঞ্চল গঙ্গার জল—চারিদিকে রূপ ও রঙের ছড়াছড়ি—ও কি না এ সময় কোন দিকে না চেয়ে সেলাই করতে বসলো?"

আমরা সকলেই তাঁহার বলার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিলাম।

অমিয়া বলিলেন, "আর একবার এই রকম কাণ্ড হয়েছিল। তখন মাঘমাস—উৎসব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এক দিন একটা গার্ডন-পার্টি ক'রে শেষের আমোদটা একটু জমাবার

আয়োজন করা হ'ল। এই উপলক্ষে স্থানীয় এক জন বড় লোকের গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ী পাওয়া গিয়েছিল। তার পর ছেলে বুড়ো—সবাই ত দল বেঁধে সেখানে আমরা হাজির হলুম। চমৎকার বাগানবাড়ী! সমস্ত দিন তা যে যেমন ক'রে পারলে—হুড়োহুড়ি-ছুটোছুটি, গান-চেঁচামেচি! খুব হুল্লোড়! ক্রমে বেলা প'ড়ে এলো—দিনশেষের শান্ত মধুর সৌন্দর্য্যে বাগান তখন ভরপুর—গঙ্গার জলে আধ-আলো—আধ-ছায়া—এক এক বায়গায় পড়ন্ত রোদের আভা লেগে জল ঝিক্‌মিক্ করছে। আমরা সকলে গঙ্গার তীরে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখ্‌তে জড় হলুম। হঠাৎ দলের মধ্যে সব চেয়ে প্রবীণ যিনি—তাঁর মাথায় কি খেয়াল চাপ্‌লো—তিনি অতি গম্ভীর-ভাবে প্রস্তাব করলেন, 'অতি সুন্দর রমণীয় সন্ধ্যা—এসো একটু উপা-স-না করা যাক্!' যে কথা—সেই কায! তখনই সেখানে ব্যবস্থা ক'রে পরব্রহ্মের উপাসনা সুরু হয়ে গেল। আমরা সকলে মুখ-চাওয়াচায়ি করছিলুম—ধর্ম্মাত্মারা চোখ বোজবামাত্র যে যে দিকে পারলুম—একবারে দৌড়!"

মনীষা বলিলেন, "তোদের সবতাতেই বেশী বাড়াবাড়ি! কেন, সেইখানে ব'সে উপাসনা শুন্‌তে শুন্‌তে কি সূর্য্যাস্তের শোভা দেখা যেত না? এত পালাবার ধুমই বা কেন?"

অমিয়া বলিলেন, "ব্যাপারটা জান না ত? তাই এত সহজে ও-কথাটা বলতে পাল্লে। কানের কাছে অনবরত ঐ একেঘেয়ে সুরে বকুনী শুনতে থাকলে মনের কোন স্ফূর্ত্তি থাকে? বাবা! আমার ত উপাসনার নাম শুনলেই 'প্যাল্‌পিটে-শন' আরম্ভ হয়! অনেকের আবার সে সময় আকস্মিক শিরঃ-পীড়াও ধ'রে যায় দেখেছি। যাই হোক, আমি শুধু ভগবান্ বেচারার কথাই ভাবি! অহোরাত্র উঠতে বসতে এত লোক এমন কাতরভাবে তাঁকে ডাকতে থাকলে তাঁর অবস্থাটা কি রকম হয়, বল দেখি? আমি হ'লে ত এক দণ্ড মাথা স্থির রাখতে পারতুম না।"

ঊষা বলিলেন, "তুমি যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ—তাতে অন্তে তোমার ভাগ্যে অনন্ত নরকবাসই আছে—দেখছি!"

নরেশ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ ক্ষেত্রে আমি অমিয়াকে অভয়দান করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, দেখা যাচ্ছে, অন্তে নরকের যাত্রি-সংখ্যাই বেড়ে যাবে। আমাদের সকলের গতিও ঐ পথেই হবে। কাযেই তখন সকলে মিলে এখানকার মতই নরকটা গুলজার ক'রে তোলা যাবে। কিন্তু ঊষা, তুমি সাবধান! যদি ধর্ম্মের পথে যেতে চাও, তা হ'লে তুমিই ফাঁকে পড়বে, সেটা ভেবে দেখো।"

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ষ্টীমার রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া আবার কলিকাতার দিকে ফিরিতেছে। আমাদের সহযাত্রিণী শ্বেতাঙ্গমহিলা পথিমধ্যে নামিয়া গিয়াছিলেন। সে দিন পূর্ণিমা, চাঁদের আলোক-প্লাবনে চারিদিক ভরিয়া গেল!

নরেশ বাবু ও মনীষা একান্তে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি ষ্টীমারের ধারে দাঁড়াইলাম। অমিয়া ও ঊষা কথা বলিতে বলিতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, ক্রমে তাঁহারাও আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুই ধারে জল কাটিতে কাটিতে ষ্টীমার চলিয়াছে। তাহার আলোড়নে জল যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। আমিও সেই স্ফীত জলরাশির দিকে চাহিয়া ছিলাম। অমিয়াও খানিক নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া জলের খেলা দেখিতেছিলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি হঠাৎ আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা দুজনে কোন কথা বলছেন না যে? আমার কিন্তু এমন সুন্দর সময়ে চুপ ক'রে থাকতে ভাল লাগে না। আজকের সন্ধ্যাটা বড় চমৎকার লাগছে—নয়?"

যাহা সত্য, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন, "এ সময় খুব সোরগোল-গান-গল্প ক'রে জমিয়ে তুলতে হয়, আপনারা কিন্তু সবাই চুপ-চাপ! ঊষা ত কথাই বলতে চান না, ও দিকে মনীষা-দির কাণ্ডটা দেখুন! কি রকম হাঁ ক'রে তন্ময়ভাবে নরেশ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কথা শুনছে! ওর আগে তবু একটু পদার্থ ছিল, বিয়ে হবার পর থেকে একবারে উচ্ছন্ন গেছে! সব মেয়েরই এই এক ধারা? কেন ক'রে যে নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা হারিয়ে ফেলে! আমার কিন্তু এটা মোটেই ভাল লাগে না।"

আমি বলিলাম, "এখন ঐ কথা বলছেন বটে, কিন্তু কালে হয় ত আপনার এ মতের পরিবর্ত্তন হতেও পারে, তখন আবার ঠিক—"

অমিয়া সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না, মনীষা-দির মত 'আমারে কর তোমার বীণা—আমি হব তব পদাবলীনা!' এই ভাবটা দাঁড়াতে পারে—নয়? তা আর আশ্চর্য্য কি? সব মেয়েরই যখন একাভিমুখী গতি দেখা যাচ্ছে, তখন আমিও হয় ত কোন এক বসন্তের সন্ধ্যায় নববল্লরীর মত অকস্মাৎ বিকশিত হয়ে উঠে দেখবো, কোন এক অনাগত অতিথির আসার আভাসে অন্তর-মন পুলক-চঞ্চল হয়ে উঠেছে! তখন আর—"

ঊষা তাঁহার পিঠে একটা ঠেলা দিয়া মৃদু তর্জ্জনের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! অমিয়া-দি! ও-সব কি হচ্ছে? দিন দিন তোমার দুষ্টামী ও নির্লজ্জগিরী সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, দেখছি!"

অমিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাঃ! তোমরা যব জীবনে ও কার্য্যগুলি করতে পার, তাতে দোষ নেই, আর আমি মুখে বল্‌লেই যত দোষ? আমার সত্যই যদি মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা সে কথা আমি মুখে বলতে পারবো না? এই ত এখনই—সেই আভাস আমার মনে জেগে উঠছে—" তিনি নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গাহিয়া উঠিলেন—

"আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি, বনে বনে রে, গন্ধ-বিধুর সমীরণে!
আজি আম্র-মুকুল সৌগন্ধে—নবপল্লব মর্ম্মর ছন্দে
চন্দ্রকিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে!
আমি পুলকিত কার পরশনে—গন্ধ-বিধুর সমীরণে!"

অমিয়া সহসা ষ্টীমারের অন্য ধারে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার জলে জ্যোৎস্নার তরল রজতধারা তখন চারিদিকে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই মায়ার স্পর্শে সমস্ত চরাচর যেন সুষুপ্ত। শুধু ষ্টীমারের গতির বেগে জলের হুহুস্ শব্দমাত্র শুনা যাইতেছিল। তরঙ্গায়িত নদীর বুকে তন্দ্রাভরা নীল-আকাশের আন্দোলিত প্রতিচ্ছায়া! চারিদিক শান্ত, নীরব, সেই গভীর স্তব্ধতার মাঝে চাঁদের আলোয় ঊষা আর আমি উভয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তাঁহার সুকুমার আননে জ্যোৎস্না তাহার সমস্ত সুষমা ঢালিয়া দিয়া মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়াছিল। স্নিগ্ধ-মধুর বাতাস তাঁহার শুভ্র ললাটের দুই পাশের ঘনকৃষ্ণ চূর্ণালকগুচ্ছ দুলাইয়া দিয়া যাইতেছিল। আমি মুগ্ধনেত্রে কতক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার অন্তর তখন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল—যেন আমাদের চারিদিকে সংসারের সকল অস্তিত্ব মুছিয়া গিয়াছে। জনমানব-হীন রজনীর এই নীরব পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে শুধু আমরা উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছি!

ঊষা অন্যমনে গঙ্গার ও-পারের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার চোখেও যেন একটা স্বপ্নালসভাব!

কতক্ষণ পরে তিনি মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন, কাল নরেশ-দার কথাগুলো সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? মানুষ একই জীবনে বহু ক্ষেত্রে এক জনের পর অন্য এক জনকে সত্য ক'রে ভালবাসতে পারে—এ কি সম্ভব?"

বুঝিলাম, আমার মত তিনিও ঐ কথাটা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মানুষের জীবনে প্রেম ও ভালবাসা—তাহার অন্তরের সকল প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম উন্নত বিকাশ। সেই প্রেম যে পবিত্র ও একনিষ্ঠ না-ও হইতে পারে—এ কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার মনে কোথায় যেন আঘাত লাগিয়া-ছিল—তিনি যেন সুস্থ হইতে পারিতেছিলেন না।

আমি বলিলাম, "একবারে ত অসম্ভব কিছুই নয়। দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ মাত্রেরই স্বভাব, রুচি-প্রবৃত্তি—সবই বিভিন্ন-মুখী—কারু সঙ্গে কারু মিল প্রায়ই থাকে না। কাযেই এ সব ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই যে কোন একটা সাধারণ নিয়ম বা নীতি অনুসারে কায হবে—এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। এক জনের পক্ষে যা অসম্ভব—অন্য এক জনের পক্ষে ঠিক সেই জিনিষটাই হয় ত সম্ভব বা একান্ত প্রয়োজনীয়, এ রকম ঘটাও বিচিত্র নয়।"

ঊষা নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। আমি একটু থামিয়া আবার বলিলাম, "অপরের জীবনের কথা ঠিক বলতে পারিনে, তবে আমার নিজের মত বা বিশ্বাসের কথা যদি বলেন, তা হ'লে আমি বলি, সত্যকার ভালবাসা মানুষের জীবনে একবারই আসে। ও-রকম খণ্ড খণ্ডভাবে যে ভালবাসা, তাকে প্রেম বলা যায় না। প্রেম একনিষ্ঠ ও একাভিমুখী।"

ঊষার মুখ তৃপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অন্য এক জন কথাটা ঠিক তাঁহার মত করিয়া ভাবিতেছে দেখিয়া তিনি যেন আনন্দ অনুভব করিলেন।

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "আমার জীবনে এত দিন এ সব কথা বোঝবার বা ভাববার কোন অবসর ঘ'টে ওঠেনি। তবে কিছু দিন হ'তে আমি মনে মনে একটা বিচিত্র ভাব অনুভব করছি। তাই আজ মনে হয়, সংসারে যাকে প্রথম ভালবেসেছি, চিরদিন তার পাশে থেকে জীবনের সকল সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে তারই হাত ধ'রে পাশাপাশি চলেছি, এই চিন্তায় এই কল্পনাতেই মন আনন্দে ভ'রে ওঠে! সেই এক জনের কথা ছাড়া বহুজনের কথা আমি এখন কিছুতেই ভাবতে পারি না, ঊষা দেবি! আপনার এ সম্বন্ধে কি মনে হয়?"

ঊষা একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হইতেই তাঁহার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল! নতমুখে অতি মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "আমারও তাই বিশ্বাস!"

তাঁহার সেই কম্পিত মৃদু কণ্ঠস্বর, আরক্ত আননের লজ্জাভাস যাহা ব্যক্ত করিল, তাহাতে আমি তাঁহার অন্তরের সমস্ত সত্যই আমার অন্তরে যেন অনুভব করিলাম, তাঁহার চিত্তের এত দিনের অনুচ্চারিত গোপন মর্ম্মকথা আজ এক মুহূর্ত্তেই আমার মনের মধ্যে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল! আমার আশা কি দুরাশা?

আমার মনে তখন অপূর্ব্ব আনন্দ ও পুলকের স্পন্দন বহিয়া যাইতেছিল; কিন্তু উভয়েই তখন নীরব।

অমিয়া চঞ্চল বসন্তের বাতাসের মতই উৎফুল্ল হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ এক সময় আমাদের কাছে আসিয়া আমাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনাদের এ কি ব্যাপার? এ যে বিষম ভাবগ্রস্ত অবস্থা দেখছি! ধন্য! ধন্য! আপনারা দুজনেই জগতে অসাধ্যসাধন করতে পারবেন। আমিই শুধু ফাঁকে প'ড়ে গেলুম!"

রাত্রিতে যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ত শান্তির আনন্দে মন আমার পরিপূর্ণ! আজ আমি স্থির বুঝিয়াছি, ঊষার মন আমার সম্বন্ধে বিমুখ নহে। এত দিন এ বিষয়ে আমার যে কিছু সংশয় ও উদ্বেগ ছিল, আজ সে সব একবারে নিশ্চিন্ত হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখময় চিত্র কল্পনায় মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল! আমার এ নিঃসঙ্গ গৃহহীন জীবন এক দিন ঊষার মধুর সংস্পর্শে সুখে ও গর্ব্বে সার্থক হইয়া উঠিবে; এই রিক্ত শূন্যগৃহ কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর আগমনে এক দিন সমস্ত দৈন্য ও মলিনতা মুছিয়া ফেলিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ও সুষমায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। না, আর রাত্রি বিলম্ব নহে, এবার অবসর পাইলেই ঊষাকে আমার মনের কথা জানাইতে হইবে।

পরদিন একটা বিশেষ কার্য্যবশতঃ নরেশ বাবুদের বাড়ী যাইতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। সে দিন ঊষার ওস্তাদের আসিবার দিন। ঊষা অন্য ঘরে। অমিয়া ও নরেশবাবু বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিবার ঘরে দাঁড়াইয়াছিলেন। মনীষা আমায় দেখিয়াই আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনার এত দেরি হ'ল যে?"

নরেশ বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, "উনি আজ লেট্ হয়েছেন! সভার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ফাইন আদায় ক'রে নিও মনীষা? এ ক্ষেত্রে আমাদের ফাইন হচ্ছে, যতক্ষণ লেট্ হবেন, তার দ্বিগুণ সময় এখানে কন্‌ফাইন থাকতে হবে!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে ত ভালই কথা! দ্বিগুণের বদলে রাত ভোর হলেও আপত্তি ছিল না! আপনারা কোথাও বেরোচ্ছেন না কি?"

মনীষা বলিলেন, "অমিয়া আজ বালীগঞ্জে মাসীমার কাছে যাচ্ছে, আপনি বসুন, উনি ওকে পৌঁছে দিয়ে এখনই আসবেন।"

অমিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকভরা চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কাল কিন্তু অজিত বাবু কাণ্ডটা করলেন, দেখেছিলে ত মনীষা-দি? উনি আর উনি ষ্টীমারের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একেবারে ধ্যানস্থ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, কারুর কোন চৈতন্য নেই! সে কি মুগ্ধ তন্ময় ভাব! শেষে আমি এসে ডেকে ডেকে তবে ওঁদের ধ্যানভঙ্গ করি! আপনি খুব বেঁচে গেছ কিন্তু, অজিত বাবু! মিঃ চক্রবর্ত্তী এখানে থাকলে কি নিশ্চয় আপনাকে ডুয়েল লড়তে হ'ত।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! আমাদের সহজ হাসি-তামাসার মধ্যে এ কথাটা যেন কি রকম বেসুরে বাজিয়া উঠিল। আমার মুখের হাসি তখনই মিলাইয়া গেল।

মনীষা আমার ভাবান্তর দেখিয়া অমিয়াকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কি যে তুই বাকে বকিস্, অমিয়া! তোর যা

কোন কালে জ্ঞান-বুদ্ধি হবে না। আপনি বসুন, অজিত বাবু! উনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমরা দু'জনেই সভা জমিয়ে রাখবো।"

নরেশ বাবু বলিলেন, "আমি বেশী দেরি করবো না, এখনই আস্‌ছি। আপনি ততক্ষণ গল্প করুন। আজ অনেক কথা আছে, ফিরে এসে আলোচনা করা যাবে। এসো অমিয়া!"

অমিয়া বলিলেন, "তুমি তবে বসো, মনীষা-দি! আমি চল্লুম, অজিত বাবু! আপনি মুখটা অমন হাঁড়ির মত ক'রে রইলেন কেন? দোহাই আপনার! একটু প্রসন্ন হোন্! যাবার সময় ও-রকম মুখ দেখে বেরোলে এ দুটো লোকের কি গতি হবে, ভেবে দেখেছেন কি?"

আমি হাসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। অমিয়া প্রসন্ন মনে নরেশ বাবুর সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

আমি আর তখন অন্য দিনের মত সহজভাবে মনীষার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিলাম না। আমার মন ছিল এত দিন মেঘমুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল, সংশয়-লেশহীন—আমি এত দিন নিজের আনন্দে নিজের কল্পনায় বিভোর ছিলাম। আমার এবং ঊষার মধ্যে যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভবপর, এ সন্দেহ কোন দিন মনের প্রান্তেও স্থান পায় নাই। ইঁহাদের সহিত এত দিনের আলাপের মধ্যেও কোন দিন এ রকম কোন আভাস পাই নাই। আজ হঠাৎ অমিয়ার মুখে এ কি কথা শুনিলাম! এ কি শুধুই ঠাট্টা—না ইহার মধ্যে কোন সত্য আছে? সংশয় ও উদ্বেগে আমার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ সাহস করিয়া মনীষাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভরসা হইল না, কি জানি—হয় ত কি শুনিতে হইবে!

মনীষা অন্যান্য নানা কথায় ও গল্পে আমায় প্রফুল্ল করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে দিন কোন গল্পই জমিল না। শেষে তিনি বলিলেন, "আজ আপনি বোধ হয় অমিয়ার কথাটাই ভাবছেন, অজিত বাবু! এটা কিন্তু আমাদেরই অন্যায় হয়ে গেছে। মিঃ চক্রবর্ত্তীর কথা এক দিনও আপনার কাছে বলা হয়নি। চক্রবর্ত্তী আমাদের বন্ধু, শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধও ঘটবে। ঊষার সঙ্গে তাঁর 'এন্‌গেজমেণ্ট' হয়ে গেছে। এখন তিনি বিলাতে বারিষ্টার হ'তে গেছেন।"

আমার হৃৎস্পন্দন যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। জীবনের আশা, আনন্দ, ভালবাসা—সবই তবে এবারকার মত শেষ! মনে হইল, সহসা সংসারের সব দিক হইতে সব বন্ধন, সব অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল! অব্যক্ত, অসীম যাতনায় যেন আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আমার স্তব্ধমুখে কি বিবর্ণতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছিল? মনীষা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কক্ষান্তর হইতে ঊষার গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল—

"পল্ না লাগি মোরি আঁখিয়া
তুয়া বিনা জীয়া নাহি পড়ত চয়ন
পল্ না লাগি মোরি আঁখিয়া!"

ওস্তাদের গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠের সঙ্গে ঊষার মৃদুমধুর স্বর মিশিয়া এক অপূর্ব্ব সুরের সৃষ্টি! আগে এই কঠোর ও কোমল মাধুর্য্যের সম্বন্ধে এ ঘরে বসিয়া আমরা কত হাসি, কত আমোদ—কত মন্তব্যই না প্রকাশ করিয়াছি! যে সুরে যে গানে এত দিন আমার অন্তরে সুখের ও আনন্দের লহরী নৃত্য করিয়া উঠিত, আজ সে গান শুনিয়া মনে শুধু হতাশার হাহাকার জাগিয়া উঠিল! আমার এত দিনের এত আশা—কিন্তু যাক্! আর ও কথা ভাবিয়া বা ফল কি?

অনেকক্ষণ পরে মনীষা তাঁহার ব্যথাভরা দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই আমাদের সকলেরই আপনাকে এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে, এই বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হ'লে আমরা সকলে সেটা আমাদের সৌভাগ্য ব'লে মেনে নিতুম। কিন্তু সে ত হবার নয়, অজিত বাবু! ঊষার বিবাহ-সম্বন্ধে তার নিজের বা আমাদের কোন হাত নেই। মিঃ চক্রবর্ত্তীর বাবা ছিলেন আমার বাবার প্রিয়তম বন্ধু। বাবা নিজেই এ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ক'রে গেছেন।"

আবার উভয়েই নীরব। আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। সে ঘরের বাতাসে আমার যেন নিশ্বাস-রোধ হইয়া আসিতেছিল।

কতক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আজ তা হ'লে এখন উঠি।"

মনীষা আমায় বাধা দিলেন না, শুধু বলিলেন, "কথাটা আরও পূর্ব্বে আপনাকে বলা উচিত ছিল, কিন্তু বলি বলি

ক'রেও এত দিন বলা হয়ে ওঠেনি। আপনাকে আমরা অনর্থক অনেক কষ্টই দিলুম।"

আমি সামান্য দুই একটা কথা বলিয়া বাহির হইলাম। সমস্ত শরীর যেন তখন মাতালের মত টলিতেছিল। উষার ঘরের পাশ দিয়াই সিঁড়ির দরজা। আমায় তখনই চলিয়া যাইতে দেখিয়া উষা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আজ আপনি এখনই চ'লে যাচ্ছেন যে? এ কি? আপনার শরীর অসুখে বোধ হচ্ছে না কি?"

আমি একটু থমকিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার সেই স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সমস্ত রুদ্ধ-বেদনা যেন চোখের জলে গলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। তাঁহাকে দুই একটা কথা বলিতে গেলাম; কিন্তু বলা হইল না। শুধু একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

সঞ্জীবন

চমকিল চন্দ্রাপীড় সতৃষ্ণ চুম্বনে,
আজি অভিশাপ শেষ! গাঢ় আলিঙ্গন,
খুলি গেল দুটি পদ্ম-আয়ত নয়ন,
মৃত্যু-মূর্চ্ছা-মুক্ত প্রেম জাগিল বদনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে কিবা মধুর বেদনা,—
আশা-প্রেম-উৎসাহের অপূর্ব্ব প্রকাশ,
আধ আধ, অশ্রুরুদ্ধ সুমধুর ভাষ
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রণয়ের অমৃত চেতনা।
নবীন যৌবন-তীর্থে মৃত্যু আরাধনা,
বঞ্চিতা প্রণয়-সুখে স্থির অকাতর,
শোকচ্ছবি-প্রতিমূর্ত্তি—তবু নিরন্তর
শব লয়ে প্রেমপূজা করি পদ্মাননা,—
লভিল বাঞ্ছিত নিধি, মধুর মিলনে—
গেল তপস্যার শ্রান্তি সুভুজ-বন্ধনে।

* * *

ব'সে আছে স্পন্দহীন তরুশাখা-পরি
অগভীর জলতল স্থির লক্ষ্য করি।
জ্যেষ্ঠী দূরে পুকুরের শমীবৃক্ষমূলে
স্থাণুসম স্থিরদৃষ্টি, নক্রগ্রীবা তুলে
ভাবিছে ত্রিকাল কথা নির্নিমেষ আঁখি
উজ্জ্বল মুকুতা-দৃষ্টি ঘাটপানে রাখি।
দেখিল কিশোরী এল বনলক্ষ্মীরূপে,
কমল-নয়ন দুটি খচিত মধুপে—
গুঞ্জরী চরণে বাজে দোলে রক্তাঞ্চল,
করে কঙ্কণের শোভা, রক্ত করতল,
সংবরিছে বরবক্ষে চঞ্চল বসন,
কুটিল কবরী, কর্ণে দুলিছে ভূষণ,—
স্মিতশালী গণ্ডযুগ গোলাপ-গরবী,
সায়াহ্নে বিরলালোকে যেন স্বপ্নচ্ছবি,
আশায় উজ্জ্বল মুখে আধ হাসিরেখা
মনে কার মুখচ্ছবি প্রেম-স্বপ্নে দেখা—
বসিল সোপানপরে, কলসিটি পাশে!
কত কথা মনে পড়ে প্রিয় পরবাসে।
প্রেমলিপি স্মরি তার মুখে ফোটে লাজ,
আসিবার দিন বটে আসিবে কি আজ?
"টিক্ টিক্ টিক্ টিক্" জ্যেষ্ঠীর ভাষণে
আনন্দ-আবেগে বালা চাহে কূল মনে।
পুষ্টপুচ্ছ হেলাইয়া উচ্চ করি গ্রীবা
যেন আশীষিল তারে, রৌদ্রদগ্ধ দিবা
মিলাইল অন্ধকারে,—প্রেম-স্বপ্নাকুল
দেখিল ফুটিছে জলে কুমুদ-মুকুল।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শাসন-সংস্কার কমিশন

ভারতবাসীদিগকে শাসন-সংস্কার কমিশনে সদস্যরূপে কেন গ্রহণ করা হয় নাই, সে বিষয়ে গতবার আমি সামান্য একটু আভাসমাত্র দিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম যে, "সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যে কারণে শাসনকর্ত্তাদিগের খাস পরিষদে ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই রক্ষণশীল মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবাসীদিগকে এই কমিশনে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছেন।" সে ব্যাপারটা কি, তাহা এ স্থানে খুলিয়া বলাই কর্ত্তব্য। লর্ড মর্লিং স্মৃতিকথায় তাহার উল্লেখ আছে, অধিকন্তু সার সিডনী লী প্রণীত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের চরিতে তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। গবর্ণর জেনারলের এবং প্রাদেশিক গবর্ণরের শাসন-পরিষদে ভারতবাসীদিগকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড অত্যন্ত প্রবলভাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি লর্ড মিণ্টোকে যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানেই উদ্ধৃত করা হইল।—

"However clever the Native might be and however loyal you and your Council might consider him to be you never could be certain that he might not prove a very dangerous element in your Councils and impart information to his country-men which it would be very undesirable should go further than your Council Chamber."

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ: "দেশীয়গণ (অর্থাৎ ভারতবাসীরা) যতই চতুর হউন না কেন, আপনি এবং আপনার পারিষদবর্গ তাঁহাকে যতই রাজভক্ত মনে করুন না কেন, তিনি আপনাদের পরামর্শ-পরিষদের মধ্যে এক জন শঙ্কনীয় ব্যক্তি হইবেন না, এবং যে সকল কথা শাসন-পরিষদ-প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাওয়া উচিত নহে, সেই সকল কথা তিনি তাঁহার দেশের লোককে জানাইতে পারিবেন না, এ বিষয়ে আপনি কখনই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।" এই ব্যাপারটা কি, তাহা সকলে বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখুন।

শাসন-পরিষদই গবর্ণর বা শাসন-কর্ত্তাদিগের পরামর্শ-পরিষদ। ঐ পরিষদে সরকারের শাসননীতি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। শাসন-কার্য্যে কিরূপ নীতি কি ভাবে অবলম্বিত হইবে, ঐ পরিষদের সদস্যবর্গের সহিত শাসন-কর্ত্তা সে বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ করিয়া থাকেন। শাসননীতি নির্দ্দেশে ভারতীয় ব্যুরোক্রেশীর দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। একটি ভারতবাসীর স্বার্থ, আর একটি বৃটিশ জাতির স্বার্থ। প্রত্যেক কার্য্যে কোন্ পক্ষের স্বার্থ কতখানি রক্ষিত হইবে এবং কতখানি বর্জ্জন করিতে হইবে, শাসকগণের তাহা অবশ্যই চিন্তা করিতে হয়। সে সকল কথা ভারতবাসীদিগকে জানিতে দেওয়া উচিত নহে, ইহা অনেকটা নিশ্চিত। কাযেই শান্তিকামী সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষসঞ্চারের আশঙ্কায় শাসন-পরিষদে ভারতবাসীকে গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতশাসনে বৃটিশ জাতির স্বার্থ কোথায় এবং কতখানি, এ ক্ষেত্রে আমাদের তাহাই বিবেচ্য। কিছু কাল পূর্ব্বে ইংরাজের পক্ষে ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করা প্রয়োজন কি না, সে সম্বন্ধে বিলাতে এথার্টন মার্শার এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কিছু কাল কলিকাতা য়ুরোপীয় এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ছিলেন, সুতরাং ইহার উক্তিতে এ দেশের বেসরকারী ইংরাজদিগের মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অবশ্য ভারত-শাসনে ইংরাজ জাতির দায়িত্বের কথা, ইংরাজ ভারত পরিত্যাগ করিয়া গেলে ভারতবাসীর যে কি অনন্ত দুর্গতি ঘটিবে, তাহার কথাও মামুলিপ্রথাতে বলিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ইংরাজ বক্তারা অবশ্যই জানেন যে, তাঁহাদের বিলাতের বক্তৃতা ভারতে প্রতিধ্বনিত হইবেই হইবে। সুতরাং তাঁহারা বৃটিশ দ্বীপের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপনে ভারতের যে কতটা উপকার হইয়াছে, তাহা বলিতে কখনই বিস্মৃত হয়েন না। সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বন্ধের ফলে বৃটিশ জাতির যে কতটা উপকার হইতেছে, তাহা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। সেই কথাগুলিই তাঁহাদের মর্ম্মকথা। মিঃ মার্শার স্বয়ং এক জন বণিক। ইংরাজ বণিকের জাতি। সুতরাং ইংরাজের নিকট বাণিজ্যগত স্বার্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, পৃথিবীর মধ্যে যত বড় বড় বাণিজ্যপ্রধান দেশ আছে, ভারতবর্ষ তন্মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানীয়। তিনি যে বৎসর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব-বৎসর ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে যত পণ্য আমদানী করিয়াছে, তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে খাস বিলাত হইতে শতকরা ৫৮ ভাগ। পক্ষান্তরে, ভারত যত পণ্য বিদেশে বিক্রয় করিয়াছে, তাহার শতকরা ৩০ ভাগ খরিদ করিয়াছে বৃটিশ সাম্রাজ্য, তন্মধ্যে বৃটেন খরিদ করিয়াছে শতকরা ২৫ ভাগ।

ইহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারত আমাদের নিকট হইতে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য খরিদ করিয়াছে। অর্থাৎ বিলাত ভারতবাসীর নিকট হইতে যত মূল্যের পণ্য কিনিয়াছে, ভারত বিলাতের নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা ২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের অধিক পণ্য কিনিয়াছে। এই সময়ে পাউণ্ডের মূল্য ছিল ১৫ টাকা। সুতরাং বৃটেন ভারত হইতে বাণিজ্য বাবদ ৩৯ কোটি টাকা অধিক পাইয়াছে।

এই সঙ্গে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য রপ্তানী এবং ১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পণ্য আমদানী করিয়াছে, তাহা হইলে ভারতের সহিত বিলাতের পণ্য আদান-প্রদানের হিসাব ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। সমগ্র পৃথিবীর সহিত ভারতবাসীরা যত মূল্যের পণ্য (৩৮ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড) আদানপ্রদান করে, বৃটেনের সহিত তাহারা তাহার অর্দ্ধেক মূল্যের পণ্যের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং বাণিজ্যসম্পর্কে

বৃটিশ জাতির ভারতের সহিত পণ্যের আদান-প্রদানে কত লাভ, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন।

দ্বিতীয়তঃ, এথার্টন আর একটা কথা বলিয়াছিলেন। "কার্পাস উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করিয়া আছে। গত বৎসর ভারতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমীতে কার্পাস-তুলার চাষ হইয়াছিল। ইংরাজ জাতির পক্ষে তুলার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। তুলা না পাইলে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে। মার্কিণের সহিত ইংলণ্ডের চিরদিন সদ্ভাব না থাকিতে পারে। তখন উপায়? অতএব এই বিষয়েও ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখা যে কত আবশ্যক, তাহাও সকলে ভাবিয়া দেখুন। পাট ভারতের আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পণ্য। উত্তর-পূর্ব্ব ভারত (বঙ্গদেশ) হইতেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পাটই সরবরাহ হইয়া থাকে। ইংরাজ জাতির উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভারত হইতে যত পাট ও পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ বৃটেনবাসীরা ক্রয় করে। ইহা ভিন্ন ইহার পূর্ব্ব-বৎসর ভারতে ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত একর জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল। তথা হইতে ৩৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ওজনের চা বিদেশে রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে বিলাতে যায় প্রায় ২৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, কানাডায় ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ায় সাড়ে ৪২ লক্ষ পাউণ্ডের উপর। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভারতীয় পাটের কল এবং চায়ের চাষ প্রায় সমস্তই ইংরাজ জাতির মূলধনে এবং ইংরাজ জাতির ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত। সুতরাং ইহার প্রায় সমস্ত লাভই ইংরাজ জাতিই পাইয়া থাকেন।

ইহা ভিন্ন ভারতে কারবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুবিধার এবং প্রভুত্বের সহিত ব্যবসায় পরিচালিত করিয়া এবং ভারতীয় রাজ-সরকারে অতি উচ্চ বেতনে চাকুরী করিয়া ইংরাজ জাতি এ দেশ হইতে কিরূপ লাভবান্ হইয়া থাকেন, তাহাও সকলের চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ে ভারতে বৃটিশ স্বার্থের গুরুত্ব কত, তাহা অনেকটা উপলব্ধ হইবে। ইংরাজ জাতির এইরূপ স্বার্থের কথা অন্যান্য ইংরাজ ও মার্কিণ চিন্তাশীল লেখকের লেখা হইতে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে আর সে সকল কথা উদ্ধৃত হইল না।

এখন প্রশ্ন, ইংরাজ জাতির পক্ষে এত বড় স্বার্থত্যাগ করা কি সম্ভবে? যদি তাঁহারা এত বড় বিরাট স্বার্থত্যাগ করিয়া ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে আরূঢ় করিতে পারেন, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন, ইহা সত্য। সকল ইংরাজই তাহা বুঝেন। কিন্তু যে জাতি ভোগে অতিমাত্র আসক্ত, পার্থিব প্রভাব ও প্রতাপপ্রতিষ্ঠাই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহাদের পক্ষে তাহা করা সহজ বলিয়া মনে হয় না। ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ করা ভোগাসক্ত ব্যক্তির সাধ্য নহে। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, কমিশনে বৃটিশ জাতির স্বার্থরক্ষার কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইবেই। বৃটিশ জাতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবাসীদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতদূর চরিতার্থ করা সম্ভবে, কমিশনের সদস্যদিগের মধ্যে পরস্পর সে কথার আলোচনা হইবেই। সে আলোচনা অপরিহার্য্য। কাযেই একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, রক্ষণশীল মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে এই কমিশনে ভারতবাসীদিগকে স্থান দেওয়া সম্ভব নহে, সমীচীনও নহে। সত্য বটে, সরকার বিধান করিয়া শাসনকর্ত্তাদিগের শাসন-পরিষদে ইদানীং ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার কারণ, শাসন-পরিষদে ভারতবাসীদিগকে পরিহার করিয়াও উহার ইংরাজ সদস্যরা স্বতন্ত্রভাবে পরামর্শ করিতে পারেন। উহাতে প্রকাশ্য আলোচনায় অধিকাংশের মতই গৃহীত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাদিগকে তাঁহারা শাসন-পরিষদে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিরাপদ লোক বলিয়াই বিবেচিত। তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার ভারতবাসীর নাই। শাসন-সংস্কার কমিশনে সেরূপ লোককে গ্রহণ করিলে তাহার ফল কিরূপ হইত, তাহা মুডিম্যান কমিশনে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজকে এবং সার মহম্মদ ফকিকে গ্রহণ করাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। লর্ড বার্কেণহেড মাইমন কমিশনে সেরূপ লোক গ্রহণ না করিয়াই ভাল কায করিয়াছেন।

কমিশন যাহাতে একমত হইয়া রিপোর্ট প্রদান করেন, লর্ড বার্কেণহেডের তাহাই ইচ্ছা। সেই অজুহতে তিনি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বার্থে স্বার্থবান্ ভারতবাসীদিগকে কমিশনে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "কমিশনে যদি সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে কমিশনের সদস্যসংখ্যা ১৮ কিম্বা ২০ হইত। তাহা হইলে উহাতে কেবল গোলমালই হইত, কায কিছুই হইত না। পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী সেই নানা স্বার্থ-প্রতিবিম্বিত রিপোর্ট হইতে কোন সাহায্যই পাইতেন না। তাহার এই কথার উত্তরে উদারনীতিক সম্মিলনের সভাপতি সার তেজ বাহাদুর সপ্রু বলিয়াছেন, যদি ১৮।২০ জন কমিশনার লইয়া কমিশন গঠিত করিলে কমিশনের রিপোর্ট এতই শৃঙ্খলাশূন্য ও গোলযোগপূর্ণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা হইলে ১২ জন কমিশনার লইয়া কমিশন গড়িলেও ত চলিত। ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেড অবশ্য বলিতে পারেন যে, ১২ জন কমিশনার লইয়া কমিশন গঠিত করিলেও ঐরূপ সামঞ্জস্যশূন্য (এলোপাতাড়ী) রিপোর্ট পাওয়া যাইত। তিনি আরও বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেও কমিশনের রিপোর্ট একমত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমান কমিশনারেরা একই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া একই মূলনীতির অনুসরণ করিয়া এই রিপোর্ট লিখিবেন।" তাঁহার আসল কথা এই যে, কমিশনে যদি সকল শ্রেণীর ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে হিন্দুরা হিন্দুদিগের টানিয়া রিপোর্ট লিখিতেন, মুসলমানরাও তাঁহাদের আপন কোলে ঝোল টানিতেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকরাও তাঁহাদের মনগড়া রিপোর্ট লিখিতেন। সুতরাং সেই রিপোর্ট হইতে কমিশনের কোন উপকারই হইত না। এ বিষয়ে আমরা সার তেজবাহাদুরের সহিত একমত হইয়া বলিতে চাহি,—ইহা এক পক্ষ-সমর্থক উকীলের যুক্তি, ইহা রাজনীতিকের উক্তি নহে। এরূপ উক্তি সাম্প্রদায়িকতার নিরসক নহে, উহা সাম্প্রদায়িক ভাবের বর্দ্ধক ও প্রশ্রয়-প্রদানকারী। ইহাতে সরকারের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

কমিশনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে লর্ড বার্কেণহেডের আগ্রহ যে

অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই হেতু তিনি সুধীর বিবেচনার সহিত সাইমন কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। তিনি যাঁহাদিগকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সার জন সাইমনই বিলাতী রাজনীতিক দলেরদের মধ্যে অগ্রণীদলের লোক; আর কেহই সেই দলভুক্ত নহেন। অবশিষ্ট ছয় জন সদস্যই তাঁহার পরবর্ত্তী দলের লোক। অর্থাৎ ইঁহারা নায়কদলের নহেন, অনুবর্ত্তী দলের লোক। বিলাতী ষ্টাইমস সে কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং কমিশন সার জন সাইমন কর্ত্তৃকই চালিত হইবে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মিষ্টার বাল্ডিউইন বলিয়াছেন যে, সার জন সাইমনের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। সেই পরিচয়-জনিত অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝিয়াছেন যে, সার জন সাইমন ভারতবাসীর আশার ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের বিশেষ অনুকূল নহেন। তিনি বটে তিনি উদারনীতিক; কিন্তু উদারনীতিক হইলেও তিনি পূর্ণ না হউন, অন্ততঃ আংশিকভাবেও সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়াই অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। এই সাম্রাজ্যবাদের মূলমন্ত্র মিষ্টার হারবার্ট স্পেন্সার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে মূলমন্ত্রটি এই :—

You shall submit. We are masters and we will make you acknowledge it.

অর্থাৎ ইঁহারা বিজিত জাতিকে বলিয়া থাকেন, "তোমাদিগকে আমাদের বশে চলিতেই হইবে। আমরা তোমাদের প্রভু, আমরা তোমাদিগকে সে কথা স্বীকার করাইয়া তবে ছাড়িব।" ইঁহার মনোভাব এইরূপ. তাঁহার নায়কত্বে কমিশনের সিদ্ধান্ত কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যেরূপভাবে কমিশন গঠিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে 'টাইমস্'র কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণ কমিশনে তুল্য প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতামতের যেরূপ আলোচনা এবং মতের আদান-প্রদান হয়, তাহা হইবে না। এ কমিশনে সাধারণ সৈনিকগণ অথবা নিম্নপদস্থ সেনানায়কগণ উচ্চপদস্থ সেনাপতির মতের যেরূপ ভাবে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই কমিশনের অন্যান্য কমিশনারগণ কতকটা সেইরূপই তাঁহাদের প্রজ্ঞাশালী সভাপতির মতের অনুবর্ত্তন করিবেন বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। সেই জন্যই লর্ড বার্কেণহেড বলিয়াছেন যে, "যে মনে এই কমিশন গঠিত করা হইল, তাহাতে কমিশনারগণ যদি পরস্পরই একমত না-ও হইতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের রিপোর্ট একই নীতির এবং একই ভাবের অনুবর্ত্তী হইবে।" সুতরাং এই কমিশনের সিদ্ধান্তের মূল্য কিরূপ হইবে, তাহা সহজে অনুধাবন করিয়া দেখুন।

ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেড এই ভাবে কমিশন গঠনের সমর্থনকল্পে লর্ড-সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বোম্বাইয়ের নৈতিক সঙ্ঘের সভাপতি তেজ বাহাদুর সপ্রু তাহার সকল যুক্তি এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, লর্ড বার্কেণহেডের পক্ষে তাহার জবাব দিবার উপায় নাই। বোম্বাইয়ের "টাইমস অব ইণ্ডিয়াও" তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল হেরাল্ড'ও বলিয়াছেন যে, বাল্ডুইন, বার্কেণহেড এবং ম্যাক্‌ডোনাল্ডের উক্তির সমালোচনা করিতে যাইয়া ঐ সকল বক্তা যে কিরূপ ফাঁকিবাজী, কৌশলে আসল কথার উত্তরদানের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা এবং কথার ছলনা করিয়াছেন, সার তেজ বাহাদুর তাহা পূর্ণমাত্রায় সপ্রমাণ করিয়াছেন।" 'লীডার' বলিয়াছেন যে, "কংগ্রেসে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহারা বরাবরই শাসন-সংস্কারের বা শাসনসংস্কার কমিশনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন, এই অজুহতে তাঁহাদের কথা কেহ কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত শাসন-সংস্কারে সরকারের কার্য্যের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি উদারনীতিক সঙ্ঘের সভাপতি হইয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা কোনমতেই উড়াইয়া দিতে পারেন না।" শত্রু মিত্র সকল সম্প্রদায়ের লোকই সার তেজ বাহাদুরের সমালোচনার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ লেখকগণই কেবল এ বিষয়ে অধিক কথা বলেন নাই।

লর্ড বার্কেণহেড এই কমিশনের সমর্থনে যে কত ছলা-কলাই করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি অনুন্নত জাতিদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বুদ্ধি পাইবে ভিন্ন নিবৃত্তি পাইবে না। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে অনুন্নত জাতির অবস্থা অত্যন্ত "ভীষণ এবং যন্ত্রণাদায়ক।" এ কথা সত্য নহে। যে ইংরাজ জাতি আজ ভারতের অনুন্নত জাতির দুঃখে আপনাদের নয়নে অশ্রুর নায়াগ্রা-প্রপাত বহাইতেছেন,—মনে পড়ে কি, সেই ইংরাজ জাতি, যখন তাঁহাদের দেশে কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের দেশের শ্রমিকদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? উইলিয়ম ক্লার্ক তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"There was not a savage in the islands of the Pacific who were not better fed, happier, healthier and more contented than the majority of the workers in the industrial parts of England."

অর্থাৎ ইংলণ্ডের যে অঞ্চলে শ্রমশিল্প কার্য্য হইত, সেই অঞ্চলের অধিকাংশ কর্ম্মী অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর আহার্য্য পায় না। অধিকতর সুখী, স্বাস্থ্যবান্ ও সন্তুষ্ট নহে, এমন এক জন অসভ্যকেও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ভারতের অনুন্নত জাতির ও সম্প্রদায়ের অবস্থা সেরূপ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। তাহাদের সামাজিক জীবনে অনেকটা স্বাধীনতা আছে। তাহারা অশিক্ষিত এবং শৌচাচার-বর্জ্জিত বলিয়াই তাহাদের অবস্থা হীন। যে সময়ে ইংরাজ ভারতে আসিয়া রাজত্ব পাইয়াছিলেন, সে সময়ে ইংলণ্ডের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবস্থা অপেক্ষা আমাদের দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবস্থা অধিক ভীষণ, যন্ত্রণাদায়ক ছিল না, বরং অনেক উন্নত ছিল। ইংরাজ জাতি শিক্ষা-বিস্তার এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের ও জাতির জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন? এই দেশের স্বর্গীয় গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে যখন ভারতের সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন সরকার সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই, এ কথা লর্ড বার্কেণহেড

কি অস্বীকার করিতে পারেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই দেড় শত বৎসরকালব্যাপী রাজত্বকালে ইংরাজ জাতি বা বৃটিশ সরকার অনুন্নত জাতিদিগের আর্থিক উন্নতিসাধনের জন্য কি সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন? অনেক ইংরাজ ত এ দেশে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, অনুন্নত জাতির মধ্যে অনেকে তাঁহাদের নিকট মুটে-মজুরের কায করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল ইংরাজ বণিক অনুন্নত জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কয়টি অবৈতনিক স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল বা স্কলারশিপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন? তাঁহারা যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহাদের এই আকিঞ্চন কেবল মৌখিক মাত্র, উহা আন্তরিক নহে।

কমিশনের কার্য্য এবং ক্ষমতা কি হইবে? লর্ড বার্কেণহেড সে সম্বন্ধে একরূপ কথা বলেন নাই। তাঁহার কথায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, কমিশনের কার্য্য রিপোর্টারের কার্য্যের ন্যায় হইবে, অর্থাৎ কমিশন শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যাহা শুনিবেন, তাহাই পার্লামেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবেন। বিলাতী পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী ভারতীয় শাসনপদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহা সেই রিপোর্ট দেখিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার পরই তিনি বলিয়াছেন যে, কমিশন জুরীর কার্য্য করিবেন। এই দুইটি বাক্যের সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন। রিপোর্টারের কায আর জুরীর কায এক নহে। রিপোর্টার যথাযথ তথ্য বর্ণনা করিয়াই খালাস। তিনি তথ্যাদি সম্বন্ধে কোন মতামতই ব্যক্ত করেন না। কিন্তু জুরীর কায তাহা নহে, জুরর তথ্যাদির আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। যখন উভয়ের কার্য্য স্বতন্ত্র, তখন কমিশনকে একবার রিপোর্টার ও একবার জুরী বলিলে লোক কি বুঝিবে?

লর্ড বার্কেণহেড বলিয়াছেন যে, এসেমব্লি বা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদ একটি কমিটী গঠিত করিবেন। সেই কমিটী শাসনসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব সাইমন কমিশনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন। কমিশন সেই প্রস্তাবগুলির বিশ্লেষণ, সমালোচন, এবং বর্জ্জন বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভারতের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিও তাঁহাদের নিজ নিজ পক্ষ হইতে ঐরূপ এক একটি কমিটী রচনা করিবেন; সেই কমিটী ও প্রাদেশিক শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব কমিশনের নিকট উপস্থাপিত করিবেন। কমিশন সেই প্রস্তাব সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কেন্দ্রী ব্যবস্থাপরিষদের এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কমিটী নিযুক্ত করিবে কে বা কাহারা? ইহার উত্তর এইমাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক সভা কর্ত্তৃকই নিজ নিজ কমিটী নিযুক্ত করা হইবে। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সরকারী, সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত এবং দেশের ভোটদাতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এই তিন শ্রেণীর সদস্যই সম্মিলিত হইয়া কমিটী গঠিত করিবেন। সত্য বটে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা অধিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে কেবল বে-সরকারী সদস্যরাই কমিটী নিয়োগ করিতে পারিবেন, তাহা নহে। সকলেই একত্র হইয়া কমিটী নিযুক্ত করিবেন। এরূপ অবস্থায় কমিটী একমত হইয়া একটা পদ্ধতি নির্ব্বাচিত করিতে অসমর্থ, ইহা দেখানই যাঁহাদের স্বার্থ, তাঁহাদের অনুকূল বা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী দুই এক ব্যক্তি যে কমিশনে স্থান পাইবেন না, তাহা নহে। মনে করুন, বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ২৬ জন রাজপুরুষ এবং সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্য আছেন। অবশিষ্ট ১ শত ১৪ জন নির্ব্বাচিতসদস্য; সুতরাং বাহ্যতঃ জনসাধারণের প্রতিনিধি-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ নির্ব্বাচনে সহর ও মফঃস্বল হইতে ৪২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। আর বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে ২২ জন এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী হইতে ৪২ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। অথচ যেখানে বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের এত বাহুল্য, সেখানে সরকারের কতকগুলি খয়েরখাঁর নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক হইয়াই থাকে। সাধারণ নির্ব্বাচনেও দুই চারি জন স্বার্থান্বেষী এবং সরকারের ছন্দানুবর্ত্তী লোক নির্ব্বাচিত হয়েন না, তাহা নহে। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রকৃত হিতকামী, কুশাগ্রবুদ্ধি ও স্বাধীনচেতা লোক যে সকল সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন, তাহা নহে। যাঁহারা সকল দেশের (মায় স্বাধীন দেশের) শাসন-পদ্ধতির ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কোন দেশের বুরোক্রেশীই দেশের প্রজাসাধারণের রাজনীতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির অনুকূল হয়েন না। এ দেশের বুরোক্রেশী যে ভারত-বাসীর অনুকূল নহেন, তাহা বিদিত ভুবনে। এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভাগুলির গঠিত কমিটীতে ঐকমত্যপ্রতিষ্ঠা যে অসম্ভব হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন্দ্রী ব্যবস্থাপরিষদ সম্বন্ধে সে আশঙ্কা অধিক বই অল্প নহে। অথচ এই আশঙ্কা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু সে আশা কি সফল হইবে?

শাসনপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, কমিটীগুলি তাহা সাইমন কমিশনের সমক্ষে পেশ করিবেন। তাঁহারা সে সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বপক্ষের কথা কমিশনকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করিতে পারিবেন,—অন্য মত খণ্ডন করিতেও পারিবেন, কমিশনকে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী করিবার জন্য সকল কথাই বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন। তাহা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই করিতে পারিবেন না। অন্য সাক্ষীকে জেরা করিবার বা রিপোর্ট লিখিবার সময় মতামত ব্যক্ত করিবার কোন অধিকারই তাঁহাদের থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় কমিটীর অবস্থা অনেকটা বিচারকের সমক্ষে আসামীর পক্ষসমর্থক উকীলের ন্যায়, আর কর্ত্তৃপক্ষ জুরীর সমক্ষে আসামীর ন্যায় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কমিটী কখনই কমিশনের সহযোগী হইতে পারিবে না। ভারতীয় কমিটীর ললাট হীনতার তিলকে লাঞ্ছিত থাকিবেই। সেই জন্য সার তেজ বাহাদুর বলিয়াছেন—"যদি উকীল বিচারকের সহযোগী হয়, যদি আসামী জুরবর্গের সহকর্ম্মী হয়, তাহা হইলে ভারতীয় কমিটীগুলিও কমিশনের সহযোগী হইবে।"

এই উক্তির যথার্থতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কমিটীগুলি যে কমিশনের সমক্ষে



"সাহিত্য-ধর্ম্ম"

চিরদিনই সাহিত্যে দুইটি মত প্রচলিত আছে। এক দল বলেন যে, আর্ট বা শিল্পের এমন একটা উচ্চ আদর্শ থাকা চাই, যাহা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, খাওয়া-পরা অর্থাৎ নিখুঁৎ খাঁটি বস্তুতন্ত্রতার ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হইয়া মানবমনের গভীরতম, শ্রেষ্ঠতম অনুভূতির পরিচায়ক হইতে পারে। আর এক দল বলেন যে, বস্তুতন্ত্রতা বাদ দিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় শূন্য বিমানে বিচরণ করিলে কোন লাভ নাই।

সমাজে চিরকালই ব্যবসায়ী আছে। ব্যবসায়ীর লক্ষ্য থাকে, রাষ্ট্রশক্তি গণনার দিকে। ভেজাল দিয়া লোক ঠকাইয়া হউক কিম্বা যে কোন উপায়ে হউক, তাহার উদ্দেশ্য নিজ স্বার্থ সিদ্ধি, খাঁটি জিনিসের বিজ্ঞাপন দিয়াও সে চাহে দু'টা পয়সা লাভ করিতে। শিল্প বা ললিতকলার ক্ষেত্রেও ব্যবসাদার আছে। সে ভুলিয়া যায় যে, ললিতকলা সাধনার ধন—মানব-জীবনের পূর্ণবিকাশ। জগতের সাধারণ মানুষ রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া, চাকচিক্যশালী বেশভূষার ব্যবহার করিয়া বা বিভিন্ন উপায়ে দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া মানুষ জীবনের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে চাহে। শ্রেয় ও প্রেয় লইয়াই মানব-জীবন, কিন্তু শ্রেয়কে ছাড়িয়া দিয়া প্রেয় লইয়া মত্ত থাকে, সে কামনার উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া চলে। বস্তুর জগতে মানুষ বুদ্ধি লইয়াই বিচার করে। কি উপায়ে সে প্রেয় লাভ করিতে পারে, তাহা সে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষিয়া মাজিয়া দেখিতে চাহে, যাহাতে তাহার সুখ হইবার সম্ভাবনা, তাহা সে গ্রহণ করে, যাহাতে সে দুঃখ এড়াইয়া চলিতে পারে, তাহার সাধনা, তাহার চেষ্টা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মানুষের জীবনের আর একটা দিক আছে। ইহা তাহার আবেগ হৃদয়। বুদ্ধি ও আবেগ-রূপ দুইটি উপাদানে মানব-জীবন গঠিত। বুদ্ধি দ্বারা মানুষ তাহার জীবনের সকল কায নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা হয় সত্য, বাস্তব জীবনের প্রেয় লাভ করিতে একান্ত সুধীও হয় সত্য, কিন্তু আমাদের জীবনে এমন সময় আসে, যখন বুদ্ধির মাপকাঠি ছোট হইয়া পড়ে, যখন আমরা বুদ্ধির সতর্কতা ও সাবধানতা মানিতে চাহি না, যখন দেশ, কাল ও পাত্রের ক্ষুদ্র গণ্ডী মুছিয়া যায়, হৃদয়ের আবেগ বা অনুভূতির উচ্ছ্বসিত ধারা বুদ্ধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দুকূল প্লাবিত করিয়া বৃহত্তর দেশকেও ভাসাইয়া দেয়। এই যে বুদ্ধি ও অনুভূতির ঘাতপ্রতিঘাত, সসীম ও অসীমের বিষম দ্বন্দ্ব তাহাতেই ললিতকলার উদ্ভব, তখন বিচার ও তর্কের অবসর থাকে না, তখন মানবমনের সেই চির-সনাতন ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করে, তখন মানুষ জগতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক অখণ্ড নিত্য শাশ্বত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। সেই আনন্দের বিকাশই আমাদের ললিতকলা। এই মানবকে মানুষ যখন বাটালি কুর্শি সাহায্যে ইট পাটকেল, প্রস্তর-মূর্ত্তিকায় রূপান্তরিত করে, তখন আমরা তাহাকে ভাস্কর বলি, যখন ইহাকে সে তুলি ও রংএর সাহায্যে ফুটাইয়া তুলে, তখন আমরা তাহাকে কবি বলি।

প্রকৃত সাহিত্য জীবনের বিকাশ, সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি, অনুভূতির, হৃদয়াবেগের পরিমূর্ত্ত ফল, কিন্তু যখনই আমরা সাহিত্যের এই সৌন্দর্য্য-দর্শকে নামাইয়া আনিয়া বাস্তবের ভোগলালসায় পর্য্যবসিত করি, দেহধর্ম্ম-সাধনের বস্তুরূপে পরিগণিত করি, খাওয়া-পরা চলা-ফেরার মত নিখুঁৎ বস্তুতন্ত্রতার নগ্নতায় পরিণত করি, তখন আর সে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য থাকে না, কেবলমাত্র ব্যবসার জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ লোকের নিকট দৈহিক ভোগ বড় হইতে পারে, তাহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য বস্তু হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থান অতি নিম্নে। মানুষের মহত্ত্ব চিন্তায়, আদর্শে, ভোগে নহে। ভোগের মূল লালসা তৃপ্তি। সুন্দর ফুলটি আঘ্রাত হইলে তাহাতে আর দেবার্চ্চনা চলে না, সুখাদ্য দ্রব্য উচ্ছিষ্ট হইলে তাহাতে আর দেবতার ভোগ হয় না, বস্ত্র ব্যবহৃত হইলে তাহা দানের অনুপযোগী হয়। কামনার পূতিগন্ধ যাহার পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে, তাহা অকেযো ও অব্যবহার্য্য। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে, যদি আমরা ভোগকে বা রসনাতৃপ্তিসাধনকে একমাত্র আরাধ্য বস্তুরূপে মাথায় তুলিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আমরা রান্নাঘরটাকে সামনে রাখিতাম, বৈঠকখানা পশ্চাতে নির্ম্মাণ করিতাম। বৈঠকখানা না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু রান্নাঘর না হইলে জীবনধারণ অসম্ভব। কিন্তু রান্নাঘর উদরপূর্ত্তিরূপ ভোগসাধনের উপায় বলিয়া উহার স্থান পশ্চাতে, এবং উৎকর্ষ, সভ্যতা ও রুচির পরিচায়ক বলিয়া বৈঠকখানা গৃহের সম্মুখে প্রধান স্থান দখল করে। আবার, সজিনা-ফুল দেখিতে অসুন্দর নহে, কিন্তু ইহা মানুষের রসনাতৃপ্তিসাধন করে বলিয়া, ভোগের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কবি ও শিল্পিগণ ইহার বর্ণনা করেন নাই। টগর বা কুন্দের সুগন্ধ নাই এবং দেখিতে সজিনাপুষ্পাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরও নহে, কিন্তু উহা মানুষের ভোগে লাগে না বলিয়া কবিগণ মুক্তকণ্ঠে তাহার সৌন্দর্য্য ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভোগ দ্বারা আমরা বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দুঃশাসনের মত দ্রৌপদীর অনন্ত অনাবৃদিত রূপরাশির অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া, তাহার নগ্নতা সম্পাদন করিয়া প্রাকৃতজনের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়া তাহাকে "হাটের জিনিষে" পরিণত করি, তাহার মাধুর্য্যের খর্ব্বতাসাধন করি।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে স্বৈরাচার আরম্ভ হইয়াছে। গল্পবর্ণিত যুবক যুবতীর প্রণয়-অভিনয়ে নগ্নতা দেখা দিয়াছে। বস্তুতন্ত্রতার অজুহাতে লেখকগণ প্রণয়ের নগ্নচিত্র অঙ্কন করিয়া নায়ক-নায়িকাকে বিকট রসালাপ ও বিজাতীয় ভাবাদর্শের স্রোতে ছাড়িয়া দিতেছেন। সামান্য লেখকগণও সামাজিক রীতিনীতি ও বেষ্টনী অবজ্ঞা করিয়া যৌন সম্পর্কের যে চিত্র লেখনীমুখে বিবৃত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, তাহার সহিত ভারতীয় বা হিন্দুর জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না। ইঁহাদের আদর্শ অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর। ইঁহারা দেশ, কাল ও পাত্র বিস্মৃত হইয়া, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বেষ্টনী উপেক্ষা করিয়া, নৈতিক আদর্শ অবজ্ঞা করিয়া,

জাতিগত সংস্কার ও ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া লেখনী চালন করিতেছেন। ভোগলিপ্সাই তাঁহাদের প্রেমতত্ত্বের ভিত্তিভূমি। কামনা-তৃপ্তি তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। বাসনা-পরিতৃপ্তি তাহার পূর্ণতা। কদর্য্য নগ্নতা তাহার সৌন্দর্য্য। উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার বিশেষত্ব। স্বৈরাচার তাহার প্রকৃতি। যথেচ্ছচারিতা তাহার অলঙ্কার। ধনাগম-তৃষ্ণা তাহার অন্তরের ভাব। চাঞ্চল্য তাহার শিক্ষা।

ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। কিন্তু স্বাধীনতা যথেচ্ছচারিতা নহে, ব্যক্তিত্ব খেয়াল নহে। ব্যক্তিগত খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজ, ধর্ম্ম, ভগবান্, জাতীয় উৎকর্ষ, যুগযুগান্তরের জাতীয় ভাব ও সাধনা উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছচারী হইয়া উঠিলে মনুষ্যত্ব-বিকাশ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। জগৎটাকে শুধু ভালবাসা-বাসির স্বপ্নময় রাজ্যে পরিণত করা চলে না, সেইরূপ ইহা শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্য লালসা মিটাইবারও স্থান নহে। নূতন আদর্শবাদী চাহিতেছেন, নরনারীর মিলনে জগৎটাকে এক অপরূপ শোভা-সৌন্দর্য্যময় অনন্ত অফুরন্ত প্রেমের আলোকে আলোকিত করিতে, তাহার স্বপ্নের আবছায়া বা অবগুণ্ঠন অপসারণ করিয়া ভোগলালসা-তৃপ্তি সাধনের যন্ত্র বা উপায়রূপে দর্শন করিতে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। রস মানব-মনের কলুষতা নষ্ট করিয়া তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব পবিত্রভাবের অবতারণা করে। পবিত্রতা দুর্ব্বলতা-প্রতিপাদক নহে। যে কার্য্য অবসাদ আনয়ন করে, তাহা হেয়। পবিত্রতা প্রকৃত আনন্দের জনক। আনন্দই প্রকৃত জীবন। সত্যই আনন্দ। আবার আনন্দ শিব ও সুন্দর। প্রাণিজগৎ আনন্দের অন্বেষণে নিয়ত ধাবমান। এক জন মদ্যপান করিয়া আনন্দ লাভ করে, অন্য জন ভগবৎ-আরাধনা করিয়া আনন্দ পায়। দুই জনেরই উদ্দেশ্য আনন্দ। আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ উদ্ভূত, আনন্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত, আনন্দেই ইহার লয়। কিন্তু মদ্যপের আনন্দ অবসাদ আনিয়া তাহাকে অভিভূত করে, দুঃখ দেয়, কিন্তু সাধকের আনন্দ হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে। যে পথে সত্যের আভাস পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত আনন্দ দান করে। ইংরাজ কবি কীট্‌স্ বলিয়াছিলেন—Beanty is truth, truth beanty. যাহা সুন্দর, তাহা সত্য, যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর। অতএব সুন্দরের উপাসনা সত্যের উপাসনা। সত্যের উপাসনা মঙ্গলের কারণ। যে কবি বা লেখক অনুভূতি বা কল্পনাবলে বাহ্যপ্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সত্য ও সুন্দরকে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি দার্শনিক না হইয়াও, বিচার ও তর্কের গহনকাননে প্রবেশ না করিয়াও মহান্ সত্য দর্শন করেন। তখন তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি হন, সৎসাহিত্য রচনা করেন ও বিশ্বসাহিত্যের আসরে দণ্ডায়মান হন। সৎসাহিত্য-রচয়িতার সাধনা বিশ্বজনীনতা। বিশ্বজনীনতা দেশ, ধর্ম্ম, ভগবান্‌কে বাদ দিয়া নহে, সামাজিক কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠানকে জলাঞ্জলি দিয়া নহে। যৌনসম্পর্ক ভাল জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু মানবের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহা একটি খণ্ড বস্তু। বহু খণ্ড বস্তুর সমবায়ে মানবজীবন পূর্ণ, সুন্দর ও কল্যাণজনক হইয়া উঠে। সমাজ ও দেশ মনুষ্যত্ব-বিকাশের কর্ম্মকোলাহলময় রঙ্গভূমি। ধর্ম্ম ও আদর্শ এই যুদ্ধের নিশান। জাতীয় আদর্শের পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়া নর-নারী ক্ষত-বিক্ষত হইতে পারে, পরাস্তও হইতে পারে, কিন্তু শত্রুর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলে তাহার বীরত্ব প্রকাশ পায় না, সুধীজন-সমাজে সে আদৃত হয় না। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—ক্লীবত্ব ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করাই প্রকৃত বীরের কায ও ধর্ম্ম।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রেমকে সম্ভোগের মূর্ত্তিতে সজ্জিত করিলে, খণ্ডকে সর্ব্বস্ব করিয়া একমাত্র সাধনার বস্তু করিয়া তুলিলে, হয় ত ভাল কাব্য রচিত হইতে পারে, প্রেমের বৃন্দাবন-সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্ব-বিকাশের স্থান হইবে না, তাহা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শক্ত মানুষের উপযুক্ত বাসস্থান হইবে না। অতএব কল্যাণ প্রেমের লক্ষ্য, মঙ্গল প্রেমের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম্ম কিছুই নহে, দুষ্মন্তই সমস্ত, তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। ** যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোট এবং বড়, আত্মীয় ও পর কাহাকেও ভুলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থানে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে মঙ্গলমাধুর্য্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবমানব কেহই আঘাত করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যক্ষির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসারধর্ম্মের অকস্মাৎ পরাভবরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝঞ্ঝার মত অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজে বহন করে। মহাকবি কালিদাস প্রেমের ক্ষমতা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহার তাড়নায় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য নির্জ্জিত ও অবজ্ঞাত হইলে সমাজের হিতকর হয় না, এই শিক্ষা তিনি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন।

ভোগের তৃষ্ণা মানুষকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, কোন্ সময় কোথায় তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া নরনারীকে অভিভূত করে, তাহার স্থিরতা নাই। তাহার শক্তি স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড অগ্নিময় লেলিহান জিহ্বায় আত্মসমর্পণ করিলে, আপনা ভুলিয়া নিজেকে আহুতি দান করিলে মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে, সন্দেহ নাই, দেশও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। এই দেশের আদর্শ ও সভ্যতা মানবহৃদয়সঞ্চারী অপ্রতিহত প্রেমকে সহত ও সংযত করিবার জন্য তাহাকে বিবাহরূপ সরল পবিত্র খাতে বহাইয়া দিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন ও উত্তালতরঙ্গভঙ্গ নাই বটে, কিন্তু তাহা নির্ম্মল সলিলবাহী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর পুণ্যপীযূষধারায় সংসারমরুর বক্ষে শ্যামল লতাকুঞ্জশোভিত এক নন্দনকানন সৃষ্টি করিয়াছে।

যে প্রেম মানবজীবনকে গলাধঃকরণ করিয়া বসে, তাহা প্রেম নহে, তাহা লালসার নামান্তরমাত্র। লালসায় ইন্ধন যোগায় ভোগ। মানুষকে সংসারী হইতে হইবে, সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত তাহাকে সমাজের নরনারীর মধ্যে বাস করিতে হইবে, মানুষের মত বাঁচিতে হইবে, প্রেমভিখারী, প্রেমের সন্ন্যাসী সাজিলে চলিবে না, যথেচ্ছাচার-প্রসূত মানুষী প্রেম ব্যক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। ভক্তির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়। এ দেশের ধর্ম্মে গার্হস্থ্যজীবন গর্হিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া বিবাহ ও পিতৃত্বের ভিতর দিয়া তাহার পরিধি প্রশস্ত করিতে হইবে। চিরকৌমার্য্য বা অবাধ যৌনসম্পর্ক সাধারণ হিন্দুজীবনের আদর্শ নহে। চিরকৌমার্য্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের আদর্শ, কিন্তু এই আদর্শই ভারতে তাহার মৃত্যুবীজ বহন করিয়া আনিয়াছিল। অবাধ প্রেম পাশ্চাত্য জাতি-সাধারণের সামাজিক নীতি, কিন্তু এই নীতিই পাশ্চাত্যখণ্ডে সামাজিক দুর্নীতির প্রধান কারণ। সামাজিক কর্ত্তব্যের ভিত্তির উপর মানবজীবন গঠিত। যথার্থ জীবন লাভ করিতে হইলে অনুশীলন চাই। অনুশীলন ব্যতীত সৎপ্রবৃত্তিলাভ করা যায় না। অনুশীলন দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইবে, ধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাংশই শাসিত হইবে। ইহাই হিন্দুর প্রকৃত আদর্শ, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম। শুধু intellectual বা emotional দিক্‌টার দিকে লক্ষ্য করিলে বা ঝোঁক্ দিলে চলিবে না। দুইটির সামঞ্জস্য প্রকৃত জীবন। একটিকে বাদ দিলে বা ধ্বংসসাধন করিলে মনুষ্যজাতির ধ্বংস হইবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রেম বা ভালবাসা সমাজের অকল্যাণকর। ইহা ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র। যখনই প্রেম বা ভালবাসার মাত্রা ছাপাইয়া উঠে, তখনই তাহার দমন উচ্ছেদ নহে। এই জন্য অনুশীলন দ্বারা

আমাদের সহজ বৃত্তিগুলিকে প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত বা সঙ্কোচন করিতে হইবে। কোন একটি বৃত্তির প্রাবল্য বা উচ্ছেদে মানবজীবন ক্ষুণ্ণ হয়। দেহের কোন অংশের বৃদ্ধি বা হ্রাস রোগ ব্যতীত কিছুই নহে। বৃদ্ধি হইলে অস্ত্রোপচার ও হ্রাস হইলে ঔষধ-সেবন চিকিৎসকের বিধি। পারিবারিক বা মানসিক বৃত্তিগুলির সংযমে প্রকৃত জীবন, ইহাই প্রকৃত সুখ। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন—"এখন বাঙ্গালায় উনবিংশ (বর্ত্তমানে আরও এক ডিগ্রি বেশী, বিংশ) শতাব্দী। সেই রক্তমাংসপূতিগন্ধশালিনী, কামান-গোলা বারুদ-ব্রীচ-লোডের টর্‌পীডো প্রভৃতিতে শোণিতা রাক্ষসী—এক হাতে শিল্পীর রথ চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তৎসমুদয় ঝাঁটাইয়া ফেলিতেছে। সেই পোড়ারমুখী, এ দেশে আসিয়াও কালামুখ দেখাইতেছে।" "এই পোড়ারমুখী"র উপযুক্ত বিধান সমার্জ্জনী। আর ইহাই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়োচিত উপদেশ।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল।

ভারতের আদর্শ ও কর্ম্মের সাড়া

১

কর্ম্মের সাড়া সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যগণের অনেকেই দেশে বিদেশে বহু লোকহিতকর কর্ম্ম করিতেছেন। ভারতের স্ত্রীলোকদিগকে কর্ম্মে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন নারীমঙ্গল সমিতি। বঙ্গসাহিত্যে আক্র-বেআক্র লইয়া বিচার করিতেছেন বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতনামা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়গণ। অবতার কোন্ বস্তু, তাহার বিচার করিতেছেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। এতদ্ভিন্ন রাজনীতিক মহাশয়গণও বহু কর্ম্ম করিতেছেন। সর্ব্বজনমান্য সার গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, বর্ষাকালে যখন নদীতে বন্যা আইসে, তখন নদীর জল ঘোলা হয় এবং বহু বস্তু নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া যায়; কিন্তু কালে ঘোলা জল নির্ম্মল হয়, মন্দ যাহা ছিল তাহা ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহার কতক বা তীরে নিক্ষিপ্ত হয়, কতক বা মিলাইয়া যায়।

স্ত্রীপুরুষ সকলেই আজ ভারতের উপকার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্যার জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সাহায্যে বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন, যেখানকার বৃক্ষ, সেইখানে বৃক্ষকে রাখিতে যত্ন কর এবং গাছের বৃক্ষের মূলে জলসেকের ব্যবস্থা হয়, তাহাই কর। ভারতকে শ্মশান করিতে চেষ্টা করাও যাহা, ভারতবাসীকে বিনাশ করাও তাহাই।

ভারতকে ভারত রাখিয়াই উন্নত করিতে হইবে,আমরা এই কথারই আলোচনা করিতে যাইতেছি। ভারতকে ভারত রাখিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, ভারতের আদর্শ কি ছিল এবং কি দিয়া ভারত গঠিত হইয়াছিল।

ভারত এক দিন আপন সন্তান-সন্ততিগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া যাহাতে সকলের উপকার হয়, তাহাই করিয়াছিলেন। উপকার করার অর্থ আলোচনা করিলে দেখা যায়, একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেই এই উপকার সাধিত হয়। উপ অর্থ সমীপে, কার অর্থ করিয়া দেওয়া। জগতের-নর-নারীকে কাহারও সমীপবর্ত্তী করিয়া দাও, তবেই মানবজাতির যথার্থ উপকার হইবে।

শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তী করাই যথার্থ উপকার। জাতি বল বা ব্যক্তি বল—মানবজাতির যথার্থ উপকার হইবে তখন, যখন মানুষ ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিবে। এই যে ভারতে কর্ম্মের সাড়া দেখা যাইতেছে, এই কর্ম্ম যখন ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া, ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিবার জন্য কৃত হইবে, তখনই ইহা মানুষকে প্রকৃত কল্যাণপথে সঞ্চালিত করিবে।

যদি বলা যায়, লোকের উপকারের জন্য কর্ম্ম করিতেছি—প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা হইতেছে—ইহাতে ভগবান্‌কে স্মরণ করি বা না করি, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্ম্ম কৃত হউক বা না হউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি হইবে?

দরিদ্রের আহারের ব্যবস্থা করিতেছি, দুর্ভিক্ষপীড়িতের জন্য কত কর্ম্ম করিতেছি, ইহা হইলেই ত হয়; ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করিতেছি—ইহা বলিলেই কি সংসক্ত হইবে, তদ্ভিন্ন হইবে না?

যে ভাবে সমাজ কর্ম্ম করিতেছে, তাহাতে সাময়িক উপকার কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু কয় জন দরিদ্রকে তুমি অন্ন বস্ত্র দিবে? দুঃখী, ভিক্ষুক, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অন্ধ, খঞ্জ, বধির ইহাদের অন্ত কোথায়? কত দিন তুমি ইহাদিগকে অন্নবস্ত্র দিবে? চিরদিন অন্নবস্ত্রের জন্য প্রাণপাত করিয়াও যখন দেখিবে, বহু দুঃখী থাকিয়া গেল, তুমি সকলের দুঃখ দূর করিতে পার নাই, বল দেখি, তখন নৈরাশ্য আসিবে কি না? আর শেষ বয়সে মনে হইবে না কি—তাই ত, কি হইল? ফলের দিকে লক্ষ্য করিলে কখন উৎসাহ, কখন নিরুৎসাহ আসিবেই। শুধু জগতের অভ্যুদয়ের জন্য যদি পরিশ্রম কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণে শান্তি আসিবে না; কারণ, তুমি তোমার আপনার প্রতি আর একটি কর্ম্ম যাহা আছে, তাহা কর নাই বলিয়া। এই কর্ম্মটি হইতেছে নিঃশ্রেয়সের কর্ম্ম। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য সমকালে কর্ম্ম করা চাই। ইহাতে অবসাদ আসিবে না, ইহাতে কোন গ্লানি হইবে না। এক জন দরিদ্রের উপকার করিয়াও তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। ভগবান্ এই ভাবেই কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ বলিতেছেন—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥" ৪০, ২য় অধ্যাঃ গীতা।

নিষ্কাম কর্ম্মে, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্ম্মে, ভগবান্‌কে স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম করিলে ইহাতে আরম্ভের নাশ নাই ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এই ধর্ম্মের স্বল্পও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে।

আপনার মোক্ষও হয় এবং জীবেরও যথার্থ কল্যাণ হয়, এই ভাবে কর্ম্ম করিতে ভগবান্ বলিতেছেন। সমকালে এই দুইই সাধিতে হইবে। তবেই জগতের কল্যাণ হইবে, আর তোমাকেও ভগ্নহৃদয়ে মরিতে হইবে না। কারণ, তুমি ভগবানের জন্য যখন কর্ম্ম কর, তখন কর্ম্ম দ্বারাই তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর। ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া তুমি যে কর্ম্ম কর, তাহাতে তোমার একটা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে বলিয়া তাহাতে তোমার বন্ধন হয়, সেই জন্য তাহার ফল ভগ্ন হৃদয়। উপাসনার জন্য একান্তের কর্ম্ম কর এবং লোকহিতকর কর্ম্ম কর, তবেই যথার্থ উপকার আনিতে পারিবে। তুমি আত্মকর্ম্ম ও লোকহিতকর কর্ম্ম সমকালে সাধন করিয়া প্রতি কর্ম্মে আপ্যায়িত হইবে, তোমার উৎসাহ বাড়িয়া যাইবে অথচ ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিবার কর্ম্ম করিতেছ বলিয়া, তুমি সেই যন্ত্রীর যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিলে বলিয়া ভগবান্ তোমাকে তাঁহার দিকেই টানিয়া লইবেন; তোমার ইহাতে আত্মার কল্যাণও হইল, আর জগতের উপকারও হইল।

ভারতের আদর্শ ছিল শ্রীভগবান্। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবানেরই সেবা করিতে হইবে। ভারত কখন ভগবান্‌কে ভুলিয়া কোন কিছু করিতে বলেন নাই। যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, যিনি তোমার দয়িত, তোমার ঈপ্সিত, তোমার "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" তাঁহাকে বাদ দিয়া কি কখন জীবের যথার্থ কল্যাণ হয়, না তোমার যথার্থ কল্যাণ হইতে পারে?

সেই জন্য আমরা বলি, কর্ম্ম কর, কিন্তু নিজের জন্য জপ, ধ্যান, আত্মবিচার সমকালে কর, বাসনাক্ষয়, মনোনাশ, তত্ত্বাভ্যাস সমকালে কর। একটি বাদ দিয়া অন্যটি করিতে গিয়া আপনি ডুবিও না এবং এই শিক্ষা সমাজে চালাইয়া সমাজকে ডুবাইও না।

বেদোক্ত সাধনা

২

যে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বর সমকালে করিতে বলিয়াছেন, তাহার এক অংশ যদি কর, অন্য অংশ যদি বাদ দাও, তবে তাহা মৃত ব্যক্তিকে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করার মত নিষ্ফল। চিত্তশুদ্ধির জন্য কিছু করিলে না, কেবল শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিতে থাকিলে—যদি আত্ম-প্রতারণা না কর, তবে দেখিবে, বহুকাল শ্রবণমননাদি করিয়াও তুমি অতি অল্প কারণে ক্রোধ কর, অতি অল্পে বিরক্ত হইয়া উঠ। তবেই ত হইল তোমার শ্রবণমননাদি বৃথা হইয়াছে।

লোক বেদান্তের শিক্ষা প্রচার করিতেছেন—ইহা ভালই, কিন্তু শুধু তত্ত্বাভ্যাসের জন্য বেদান্তের ব্যাখ্যা মাত্র করিলাম। ব্যাখ্যা করিয়াই নিশ্চিন্ত—লিখিয়া দিয়াই মনে ভাবিলাম, শিক্ষা ত দিয়াদিলাম, কিন্তু নিজেও ইহার অভ্যাস করিলাম না, অন্যকেও এই অভ্যাসের জন্য আর কি কি করিতে হইবে, তাহার দিক দিয়াই গেলাম না, ইহাতে তোমার বেদান্তের ব্যাখ্যাতে কোন কিছুই হইল না—শুধু তোমার পরিশ্রম, আর কাগজ-কালির অপব্যবহার।

এই দোষের প্রতীকার কিরূপে হইবে? ঈশ্বর সমকালে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই ধরিতে হইবে, তাহাই করিতে হইবে, তাহাই করাইতে হইবে, তবেই ভারতের আদর্শ শিক্ষার অনুসরণে প্রাণ জাগিয়া উঠিবে এবং জড়প্রায় সমাজও জাগিয়া উঠিবে। তুমি যদি জ্ঞানমার্গের পথিক হও, তবে তোমাকে সমকালে করিতে হইবে বাসনাক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস।

"বাসনাক্ষয়বিজ্ঞান-মনোনাশা মহামতে।
সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা মতাঃ ২।১১।"
মুক্তিকোপনিষৎ।

বেদের এই সাধনাক্রম বহু শাস্ত্রেই দেখা যায়। এইগুলি একসঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে এবং বহুদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে, তবে স্বরূপে স্থিতিলাভ হইবে। বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য অতি প্রাচীন তান্ত্রিক প্রামাণিক গ্রন্থ ত্রিপুরারহস্যে এই বাসনাক্ষয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহাও বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরাধবাসনা, কর্ম্মবাসনা এবং কামবাসনা ইহারা স্বরূপ-স্থিতির প্রধান বিঘ্ন। নতুবা স্বরূপটি ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। জ্ঞানের সাধনা নাই। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। চিত্ত-রূপ পেটিকাতে চিন্মণি সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে। পেটিকা কিন্তু বাসনা দ্বারা এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন যে, তাহাতে চিন্মণির প্রকাশ আবৃত। প্রকাশের এই আবরণ মোচন করাই সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। যে অপরাধ-বাসনার কথা প্রথমে বলা হইয়াছে, তাহা অশ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধা-জাত বিপরীত জ্ঞানের জনক। অশ্রদ্ধাই প্রধান অপরাধ। ইহা হইতেই বস্তুটিকে বিপরীতভাবে দেখা হয়। শাস্ত্রে যখন অশ্রদ্ধা জন্মে, তখন ঋষিগণের বাক্যে কাহার কি হইয়াছে—এই মন্ত্রজপে কি হইবে—এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। ভ্রান্তি জন্মিলেই প্রতীতি হয়, ঋষি-গণের দিব্যদর্শন ছিল না—তাঁহারাও অপর সাধারণের মত। শাস্ত্রে অশ্রদ্ধায় কি বিপরীত ফল হয়, তাহা আমরা আজকাল সর্ব্বত্রই দেখি। দ্বিতীয় কর্ম্মবাসনা। মন স্থির করিতে চেষ্টা কর, মন কত প্রকার সঙ্কল্প তুলিবে—কত অসম্বন্ধ প্রলাপ দেখাইবে। এই কর্ম্মবাসনার মূলে রহিয়াছে—অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার। যত দিন কর্ত্তব্য-শেষ রহিয়াছে, তত দিন আপনা আপনি ভাবে স্থিতি কোথায়? তৃতীয় কাম-বাসনা—ইহার সংখ্যা করিবে কে? ত্রিপুরা-রহস্যে ভগবান্ দত্তাত্রেয় বাসনা-ক্ষয়ের জন্যও উপদেশ করিতেছেন। আমি অপরাধী, ইহা যিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন, তিনি অশ্রদ্ধা, বিপরীত ভাবনা নিবারণ করিতে পারেন। কর্ম্মবাসনা মানুষ কোন পুরুষকার দ্বারাই নাশ করিতে পারে না, কর্ম্মবাসনা-ক্ষয় জন্য উপাসনা চাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে ভগবান্ কৃপা করিয়া অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারের বিনাশ করেন। আর কামবাসনার অন্ত হয় বস্তুর দোষদর্শনবিচারে। ত্রিপুরা-রহস্য বাসনা-ক্ষয় ও মনোনাশ কিরূপে করিতে হয়, তাহাই দেখাইলেন। কিন্তু মূল কথা হইতেছে—তত্ত্বাভ্যাস। স্বরূপটিই বা আপনা আপনি থাকাই তত্ত্ব। ইহারই প্রতিবন্ধক হইতেছে বাসনা। তত্ত্বাভ্যাসকে মুখ্য করিয়া এক দিকে স্বরূপের আলোচনা চাই, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন চাই, সঙ্গে সঙ্গে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের কর্ম্ম করা চাই। এই সাধনা দ্বারা মানুষ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি লাভ করিয়া ভবসংসার-সাগর পার হইয়া যায়।

যাঁহারা ভক্তিমার্গের পথিক, তাঁহাদিগকেও সমকালে অভ্যাস করি-বার কর্ম্ম করা চাই। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সমকালে সাধনা করা চাই। সহজ কর্ম্ম জপ, ভক্তির জন্য ধ্যান এবং জ্ঞানের জন্য আত্মবিচার সমকালে করা চাই। সেই জন্য মহাদেব উপ-দেশ করিতেছেন—"জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ। জপধ্যানপরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ।" জপ করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে ধ্যান করিবে, জপে ও ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে আত্মবিচার করিবে। এই ধ্যানের সুবিধার জন্য লীলাগ্রন্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ করা চাই এবং আত্মবিচার জন্য গীতা, অধ্যাত্মরামায়ণ এবং যোগবাশিষ্ঠাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করা চাই অথবা সৎসঙ্গে শ্রীভগবানের লীলা এবং আমি কে, জগৎ কি, এই আত্মবিচার শ্রবণ করা চাই। এইগুলি সম-কালে চলিবে কিরূপে, তাহাও বেশ করিয়া বুঝিয়া লওয়া চাই। মনে কর, কেহ জপ করিতেছে—জপের সরসতা আনিবার জন্য শ্রীভগবানের কোন লীলা মনে আনিয়া ঈশ্বরের চরণ-কমল ধ্যান করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিতে হয়—ভগবন্, আমি বড় অপরাধী, তুমি কৃপা করিয়া আশ্রয় না দিলে আমার অন্য উপায় নাই। এই জপ-ধ্যানে বিঘ্ন হইতেছে—মনে অন্য চিন্তা উঠা বা মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ। ইহা নিবারণের জন্য জপ ও ধ্যানের সঙ্গেই মনের অসম্বন্ধ প্রলাপে, ভগবানের নাম ও ধ্যান ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয়কে মায়া, মিথ্যা বলিয়া ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সমস্তকেই অগ্রাহ্য করা চাই। প্রকৃত সাধক যাঁহারা, তাঁহারাই বুঝেন, জপ করিলেই সমকালে ধ্যান ও আত্মবিচার কিরূপে করা হইয়া যায়।

সংক্ষেপে—অতি সংক্ষেপে বেদের সাধনার কথার আভাস দিতে চেষ্টা করা হইল; উপসংহারে আমরা ঋষিগণের লঘুপায় বা সকলে সাধ্য সহজ উপায়ের সাধনার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। আমি আদি-কবির মহাগ্রন্থ হইতে এই সহজ সাধনার কথা বলিতে যাইতেছি, অধ্যাত্মরামায়ণও ইহা বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

ভগবান্ বাল্মীকি এমন একটি বিষয় লইয়া রামায়ণ আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা সকল যুগে সকল নরনারীর নিত্য প্রয়োজন। এই মর-জগতে মানুষ চায় কি? নরনারী চাহে নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, গ্লানিশূন্য ভালবাসা এবং তাহার আধার ভালবাসার পাত্র।

সকল জাতির নরনারী এমন পুরুষোত্তমকে ভালবাসিতে চাহে, যাঁহাকে পাইলে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, চক্ষু আর নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে ছুটাছুটি করে না, শ্রবণ আর নূতন কথা শুনিতে এধার ওধার করে না, সকল সৌন্দর্য্য, সকল গুণ সেই একের মধ্যেই আছে, দেখিতে পায়। যাঁহাকে দেখিলে প্রাণ জাগিয়া উঠে, স্মরিলেও প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়, সকল সাধুপ্রবৃত্তি আপনি ফুটিয়া উঠে, মানুষ এইরূপ হইতে চাহে। যে নিজত্ব মানুষ অতি ক্লেশে ত্যাগ করিতে পারে, যথার্থ ভালবাসা পাইলে সেই নিজত্ব আপনা হইতেই বিসর্জ্জিত হইয়া যায়, মানুষ আপনা হইতেই সেই চরণে লুটাইয়া পড়ে, সেই চরণে বিকাইয়া যায়; আপনার সুখ আর চাহে না, চাহে তাঁহার প্রসন্নতা। বলপ্রয়োগ করিয়া নিজের দোষ ছাড়িতে হয় না। তাঁহাকে দেখিলেই আপনা হইতে সকল দোষ ধৌত হইয়া যায়, সকল মালিন্য মুছিয়া যায়। মানুষ ভালবাসার আদর্শ দেখিয়া, পুরুষোত্তমের সেবা করিয়া আর কোন কিছুতে অভিভূত হয় না, আর কোথাও যাইবার প্রয়োজন বোধ করে না। এই পুরুষকে ভজনা করিতে করিতে মানুষ এমন অবস্থা লাভ করে, যে অবস্থায় সে অনুভব করিতে পারে—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, সমস্তই আমাতে দেখে, আমি কখন তাহার অদৃশ্য হই না, সেও কখন আমার অদৃশ্য হয় না। সে ও আমায় সর্ব্বদা দেখে, আমিও তাহাকে সর্ব্বদা দেখি। আমাদের পরস্পরের চক্ষু পরস্পরের চক্ষুতে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে, সে দর্শনে সমস্ত দৃশ্যদর্শন তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। এক কথায় মানুষ পূর্ণ হইয়া যায়, কোন অভাব আর থাকে না, কাযেই কোন সঙ্কল্প আর উঠে না।

এই ভালবাসার বস্তু পায় না বলিয়াই মানুষ গুণলুব্ধ হইয়া বহু বস্তু ভালবাসিয়া ফেলে, যাহার যাহা সৌন্দর্য্য দেখে, তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ত এক স্থানে পায় না, ক্রম গুণের সঙ্গে দোষও ফুটিয়া উঠে। প্রথম প্রথম অন্ধ হইয়া কিছুই দোষ দেখিতে পায় না, দোষ দেখাইয়া দিলেও দোষ দেখিতে চাহে না; কিন্তু কালে কালে দোষ ফুটিয়া উঠে। প্রকৃত স্থানে মন না পড়ায়, মন ফিরিয়া আইসে, কেবল কর্ম্মভোগবশতঃ, কতকগুলি নূতন সংস্কারে মনকে জড়াইয়া, পক্ষীর আঠাকাঠিতে আবদ্ধ হইয়া জলপানের চেষ্টা করার মত কেবল ছট্‌ফট্ করে—সম্মুখে জল পাইয়াও পিপাসা মিটাইতে পারে না।

মানুষের মধ্যে সকল রূপের—সকল গুণের একত্র অবস্থান কোথায় পাইবে? তাই কাহার উপরে কি আরোপ করিয়া আদর পাইতে চাহে আদর করিতে চাহে, শেষে বিজাতীয় গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া হায় হায় করে।

ইহার দৃষ্টান্ত আমরা আজকাল সর্ব্বত্রই দেখি। আর দেখি, মানুষ কত দুঃখী। মানুষ সংসারে সুখ পায় না, ভালবাসিতে চায়, ভাল-বাসিতে পায় না, মানুষ আপনার নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কোথাও বিকা-ইয়া যাইতে পারে না—মানুষ আপনার প্রাণ-জুড়ান আদর্শ কোথাও পায় না বলিয়া আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে পারে না।

ভগবান্ বাল্মীকি জগতের নর-নারীকে আনন্দে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য দেবর্ষি নারদকে এই আদর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্য-ভাবে তাঁহার মহাগ্রন্থ আরম্ভ না করিয়া দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চারিত্রেণ তু কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈব প্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥"

উপসংহারে আমরা বলি, ভারতকে ভারত রাখিতে হইলে ভারতের বিশেষত্ব যে তপস্যা, তাহা করা চাই—অর্থাৎ নিজে সাধনা করা চাই এবং অন্যকেও করান চাই, আর লোকহিতকর কার্য্যে সাধ্য বলিয়া অনুভব করা চাই! এই জন্য আমরা বেদোক্ত সাধনা হ ঋষিগণের লঘুপায় পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম।

আজকালকার মানুষ কঠিন সাধনা করিতে পারে না, এই জন্য সকলে যাহা পারিবে, আমরা সে কথাও আলোচনা করিব।

আবার বলি, তপস্যাই ভারতের বিশেষত্ব। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম সকল দিয়াই তপস্যা হয়।

ঋষিগণের সিদ্ধান্ত—তপস্যা কর, যাহা চাও, পাইবে। জীবের দুঃখ দূর করিতে চাও, তপস্যা কর; সর্ব্বদা ভগবান্ লইয়া চলিতে চাও, তপস্যা কর; দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি চাও, তপস্যা কর; সংসারকে আবর্জ্জনাবর্জ্জিত করিতে চাও, তপস্যা কর; তপস্যা করাও; শরীর নীরোগ করিতে চাও, তপস্যা কর; মন শান্ত করিতে চাও, তপস্যা কর; উপদ্রব নিবারণ করিতে চাও, তপস্যা কর; এমন কি, অমর হইতে চাও, তপস্যা কর।

আর যে তপস্যা কর, তপস্যা কখন ঠিক হইবে না—যদি মানুষ সমকালে ভগবানের আজ্ঞা-পালনরূপ নিত্যকর্ম্ম না করে এবং গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে ও সৎসঙ্গে শ্রীভগবানের স্বরূপ, রূপ, গুণ ও কর্ম্মের বিশেষ-ভাবে শ্রবণ না করে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

গত বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে "শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চৈতন্যের জন্মপত্রিকা, তাঁহার জন্মদিনের সাঙ্কেতিক পঞ্জিকা এবং গ্রহগণের স্ফুট-রাশ্যাদি স্বাধীনভাবে গণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের গণিত এবং ১৩২৯ সালের ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যা "গৌরাঙ্গসেবকে" প্রকাশিত জাতপত্রই গণনাশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও আমাদের গণিত জাতপত্র ও গ্রহস্ফুটরাশ্যাদি তুলনা করিয়া দেখি-লাম—তাহাতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হইল না। গ্রহস্ফুট-রাশ্যাদিতে যে এক আধ অংশের পার্থক্য দেখা গেল, তাহা স্বাভাবিক। কারণ, কোন দিনের পঞ্জিকা সার্দ্ধচারিশত বৎসর পরে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিক্রমে গণিত হইলে, উক্তরূপ পার্থক্য উৎপন্ন হওয়া বিস্ময়কর নহে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গণনার যে কয় স্থানে আমাদের সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কয়টি বিবৃত করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে চন্দ্রগ্রহণকালে মহাপ্রভুর জন্ম হয়" এবং "চৈতন্যচরিতামৃতে সিংহলগ্নে জন্ম হওয়ার উল্লেখ আছে।" এ কথায় কাহারও কিছু বলিবার নাই—ইহা প্রমাণসিদ্ধ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রহস্ফুটে লিখিয়াছেন, রবি—১০।২৩।৬, চন্দ্র—৪।১৪।২ এবং কেতু—৪।২৮।১৮। তিনি গ্রহদের ঔদয়িক বা আর্দ্ধরাত্রিক স্ফুট দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিলেও, তাঁহার লিখিত ঐ দিনের সাঙ্কেতিক পঞ্জিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার দত্ত গ্রহস্ফুট ঔদয়িক। তাঁহার পঞ্জিকায় অভীষ্ট দিনের দং ৩৯।১০ পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল লিখিত হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রহস্ফুট ও পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করিয়া, তদ্দিবসের চন্দ্রগ্রহণ কোন্ সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল, দেখা যাউক। গ্রহণের স্থিতিকালের প্রথমার্দ্ধ পূর্ণিমার শেষ কয় দণ্ড ও অপরার্দ্ধ প্রতি-পদের প্রথম কয় দণ্ড ব্যাপ্ত থাকে। চন্দ্রগ্রহণের স্থিতিকাল উর্দ্ধসংখ্যা

৫ ঘণ্টা বা দং ১২।৩০ ধরিলে পূর্ণিমার শেষ দং ৬।১৫ চন্দ্র রাহু-গ্রস্ত ছিল। সুতরাং মহাপ্রভুর জন্মদিনে অন্ততঃ দং ৩২।৫৫ গতে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিনের দিবামান দং ২৮।৩৪।২৯ এবং সূর্য্যাস্তের পর দং ১।১০ সিংহ লগ্ন ছিল। অতএব মহাপ্রভুর জন্ম সিংহলগ্নে চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে হইয়া থাকিলে, সেই দিনের চন্দ্রগ্রহণ অন্ততঃ দং ২৯।৪৭।২৯ সময়ের পূর্ব্বেই আরম্ভ হওয়া উচিত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গণনা অনুযায়ী এই সময়ের অন্যূন দং ৩।৯।৩১ বা প্রায় ১½ ঘণ্টা পরে গ্রহণের সম্ভাবনা হয়। আমরা এই গ্রহণের কাল স্থূল গণনা দ্বারা দেখাইলাম, সূক্ষ্মভাবে গণিত হইলে, এই গ্রহণ আরও পরে ঘটিবে বলিয়াই মনে হয়। মোট কথা, এই গণনায় সিংহ লগ্নে গ্রহণ-সম্ভাবনা হয় না। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গণনা নির্ভুল হইলে, মহাপ্রভুর জন্মসময়ে সিংহলগ্ন ও চন্দ্রগ্রহণের একটিকে ত্যাগ করিতে হয়।

আর একটি কথা আছে, মান্দ্রাজনিবাসী বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বিদ্যারণ্যপঞ্চানন পণ্ডিত রামচন্দ্র চালু বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নির্দেশ-মত গণনাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া "শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিন" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ ৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা "গৌরাঙ্গসেবকে" প্রকাশিত হইবার পর, আমরা এই গণনার বিষয় রামচন্দ্রাচার্য্য মহাশয়কে অবগত করি। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর জন্মদিনে ৬ ঘটিকার সময় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল এবং তিনি নূতনভাবে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ৮টার সময় সমগ্র ভারতে গ্রহণ দেখা গিয়াছিল। এরূপ অনৈক্য হওয়ায় তিনি আমাদের গণনাক্রম জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমরাও যথাসময়ে আমাদের গণনাপ্রণালী তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তদ্দৃষ্টে তিনি আমাদের গণনার ক্রম ও ফল সমর্থন-পূর্ব্বক আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ৪ শত ৫০ বৎসর পূর্ব্বের দিন-বিশেষের পঞ্জিকার গণনা সহজসাধ্য নহে—সেই গণনায় নানাপ্রকার ভ্রমের উৎপত্তি বিচিত্র নহে। এমন উপকরণ সমুদায় আমাদের হাতে আছে, যাহা দ্বারা সকলের সমবেত চেষ্টা ও আলোচনার ফলে চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবসময় এবং জাতপত্র নির্ভুলরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

শ্রীফণিভূষণ দত্ত।

পাঠকের প্রতি সৎসাহিত্য

বোশেখ মাসের 'শীতল-প্রসাদ' নয় এ বেলের ঘোলের পানা,
ঢক্ ক'রে যে চুম্‌কে দেবে মেরে,
বোতল-ভরা নেইক সুরা, এ নয় শুঁড়ীর সরাইখানা
পান ক'রে যে বল্‌বে, "বাঃ বাঃ বেড়ে।"

মিল্‌বে নাক 'চা-গরম' কি ঠাণ্ডী মিঠে রঙীন জল,
'আঃ! কি আরাম' বল্‌বে যে পান করি,
ডাব কেটে কেউ দেবে না'ক, নিভাবে না তৃষ্ণানল,
বরফ দিয়ে পেয়্‌লা গেলাস ভরি'।

চাকের মধু নিঙড়ে কেহ মিশিয়ে আঙুর-ডালিম-রসে,
রাখেনিক হেথায় বাটি বাটি,
ভাঁড় ভ'রে যে আখ-খেজুরের রস খাবে যে শুয়ে ব'সে
নেইক উপায়, এ নয় গুড়ের ভাটী।

অক্লেশে বা অনায়াসে—একটুও না ন'ড়ে খেটে,
গলার তলে যা চ'লে যায় সোজা,
ছটাক খানেক জিভকে দিয়ে সের-আড়াইয়েক ঢাল্‌বে পেটে
এমন কিছুই হেথায় বৃথাই খোঁজা।

পথের কাঙ্গাল নয় রসনা কণ্ঠনালীর ভিক্ষা যেচে,
রসের সাথে মৈত্রী হেথায় তার,
দন্তগুলি অলস হয়ে রয় না হেথা বৃথাই বেঁচে,
নয়ক তালু ঢালু নালীর ধার।

এ যে আমার ফলের বাগান গুল্মলতা কাঁটায় ঘেরা
শাখায় শাখায় পাখীর বাসা দোলে,
চারদিকে এর মন্‌সা-সিজু মুগরো আনারসের বেড়া
শীতল ছায়া ইহার আঁধার কোলে।

রসের তৃষ্ণা শাঁসের ক্ষুধা থাকে যদি তোমার, তবে
করতে হবে বৃক্ষে আরোহণ,.
হাতের জোরে উচ্চশাখা নোওয়ায়ে ফল পাড়তে হবে,
সইতে হবে মৌমাছি-দংশন,

ঠোঁটেও আঠা লাগতে পারে, ভাঙতে হবে ফলের খুলী,
ছিঁড়তে হবে চিরতে হবে চোকা,
চিবিয়ে চুষে খেতে হবে, খাটতে রবে দন্তগুলি,
সফল তবে এ ফলবাগে ঢোকা।

পেট-ভরানো, বুক-জুড়ানো—মুখকে ক'রে প্রবঞ্চনা
চলবে না এ ফলের জলযোগে,
দন্তগণের সেবার গুণে হেথায় রসের প্রতি কণা
ঐ রসনার লাগ্‌বে উপভোগে।

শ্রমের গুণে রসের সনে সপরিবার বদনখানি
হর্ষভরা মর্য্যাদা তার পাবে,
তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ-সুখ রসিক জানে—বাড়ায় পাণি
'গৌড়ী' ফেলি গুড়শলাকা লাভে।

শ্রীকালিদাস রায়।

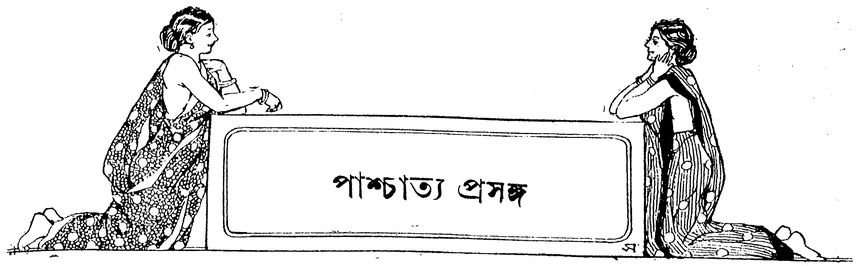

হাকিম মহম্মদ আলি

যে সকল মুসলমান চিকিৎসক আমাদের দেশে 'হকিম' বা 'হাকিম' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, কেনিয়া উপনিবেশেও তাঁহারাই 'হাকিম'; কিন্তু কেনিয়ার 'হাকিম' মহাশয়দের আর একটি শক্তি আছে—তাঁহারা দৈবজ্ঞ, মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন। মিঃ সি, টি, টড্ গত ডিসেম্বর মাসের 'ওয়াইড্ ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনে' কেনিয়াবাসী হাকিম মহম্মদ আলির যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মিঃ টডের বর্ণিত বিবরণ তাঁহারই কথায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মিঃ টড লিখিয়াছেন, "এই প্রবন্ধে আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি—তাহার প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে কেনিয়া গিরির উত্তরস্থিত উপত্যকায় কৃষিকর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিতি করিবার সময় আমার এক অঙ্গ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

"আমার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমার মাতা আমাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য কেনিয়া উপনিবেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আমি উত্থানশক্তিরহিত হইয়া নাইরোবির য়ুরোপীয় হাঁসপাতালে বাস করিতেছিলাম। আমার মাতার আগমনের পর আমি হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া কিলিমানি জিলায় একখানি বাংলো ভাড়া লইয়া তাঁহার সহিত সেখানে কিছু দিন বাস করিয়াছিলাম। সেই বাংলো হইতে আমি চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ হাঁসপাতালে যাইতাম।

"এক দিন হাঁসপাতাল হইতে রিক্‌সযোগে বাসায় ফিরিয়া আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। শয্যায় শয়ন করিয়া আমি আমার বালক-ভৃত্যকে সিগারেট-কেসটি আনিতে আদেশ করিলাম। কয়েক মিনিট পরে সে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল, সিগারেট-কেসটি সে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। আমার বেশ স্মরণ ছিল—আমি তাহা বাসায় আনিয়াছিলাম; এ জন্য আমার মা'কেও তাহা খুঁজিয়া দেখিতে বলিলাম; কিন্তু তিনিও তাহা কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না। তখন আমার মনে হইল—আমার বাংলোয় প্রত্যাগমনের সময় হয় ত তাহা আমার অজ্ঞাতসারে পকেট হইতে পথে পড়িয়া গিয়াছে।

"বুঝিলাম, আর তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা নাই। সিগারেট-কেসটি হারাইয়া গিয়াছে—এ সংবাদ আমি স্থানীয় থানার য়ুরোপীয় কন্‌ষ্টেবলের নিকট পাঠাইলাম বটে; কিন্তু পুলিস তাহা উদ্ধার করিতে পারিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি জানিতাম, নাইরোবিতে দেশীয় তস্করের অভাব নাই; তাহারা পথে কোন মূল্যবান্ দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলে তাহা বিক্রয় করিতে বিলম্ব করে না।

"ঘণ্টাখানেক পরে আমার চাকর আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল—এক জন আরব হাকিম আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে আমার শয়ন-কক্ষে আনিতে আদেশ করিলাম। ভৃত্য যে হাকিমকে আমার নিকট লইয়া আসিল, সে লামু আরব। হাকিম আমার শয়ন-কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাকে সেলাম করিল, তাহার পর আমার ইঙ্গিতে শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল।

"উপন্যাসে আরব হাকিমদের বর্ণনা পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, হয় ত তাহার অঙ্গে সুদীর্ঘ আলখেল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী এবং মুখমণ্ডলে আবক্ষ-প্রসারিত সুপক্ক দাড়ি দেখিতে পাইব, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মহম্মদ আলির পরিধানে অত্যন্ত কদর্য্য য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ দেখিলাম। তাহার মস্তক একটি পুরাতন 'টরবুসে' আবৃত ছিল। তাহার দেহ কৃশ,

গাল তোবড়ান, দাড়ি-গোঁফের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কিন্তু তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার দেহের সকল ত্রুটি বিস্মৃত হইলাম। সেরূপ বৃহৎ ও উজ্জ্বল চক্ষু আর কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

"সে আমার আদেশে আমার শয্যাপ্রান্তে একখানি টুলের উপর বসিয়া, কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই তাহার আগমনের উদ্দেশ্য আমার নিকট ব্যক্ত করিল,—বলিল, আমার অনুমতি পাইলে সে আমাকে নীরোগ করিতে পারে।

"সে আমাকে নীরোগ করিতে পারিবে—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইল। তাহার সেরূপ শক্তি আছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল। আমি মনে করিলাম, সে যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে—তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার চিকিৎসা করিবার অনুমতি দিব।

"আমি তাহাকে জানাইলাম, সে আমার রোগের উপশম করিতে পারিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু সেই দিন প্রভাতে হাঁসপাতাল হইতে বাসায় ফিরিবার সময় আমার যে সিগারেট-কেসটি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা কোথায় আছে, এ সংবাদ যদি সে দিতে পারে—তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার চিকিৎসা করিবার সুযোগ দিতে পারি।

"মহম্মদ আলি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমি তাহার অনুরোধে আমার সিগারেট-কেসের অন্তর্দ্ধান বৃত্তান্ত তাহার গোচর করিলাম, এবং কোন্ পথে আমি হাঁসপাতাল হইতে বাসায় ফিরিয়াছিলাম, তাহাও তাহাকে বলিলাম। সে আমার কথা শুনিয়া মাথা নাড়িল, তাহার পর পকেট হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির করিল। খাতাখানি কাল কাপড় মোড়া। সে সেই খাতাখানি খুলিয়া প্রায় ২০ মিনিট উচ্চৈঃস্বরে কি পড়িল, তাহার পর নিস্তব্ধ ভাবে দুই তিন মিনিট বসিয়া রহিল; বোধ হয় খোদার মেহেরবাণী প্রার্থনা করিল।

"অবশেষে সে বলিল, 'বাওয়ানা! আপনার বিশ্বাস সিগারেট-কেসটি হারাইয়া গিয়াছে; কিন্তু আপনার এই ধারণা সত্য নহে। আপনি তাহা বাসায় লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পাশের কামরার টেবলের উপর রাখিয়াছিলেন; এ কথা আপনার স্মরণ নাই। আপনি এই কক্ষে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিবার পর সিগারেট কেসটি সেই কামরা হইতে চুরী গিয়াছে। আপনি এই চুরীর কথা চাকরদের নিকট প্রকাশ না করিয়া আপনার মা—মেম সাহেবকে তাহা খুঁজিয়া দেখিতে বলিবেন; কিন্তু তিনি কি খুঁজিতেছেন—তাহা চাকররা যেন জানিতে না পারে। আজ হইতে চতুর্থ দিন সেই কামরার জানালার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সেই সিগারেট-কেসটি দেখিতে পাইবেন; হাঁ, তখন না খুঁজিতেই তাহা পাওয়া যাইবে। চতুর্থ দিন পুনর্ব্বার আপনার সঙ্গে দেখা করিব।'

"মহম্মদ আলি আমাকে সেলাম করিয়া বিদায় লইল।

"চতুর্থ দিন আমার মা আমার শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থিত কামরার জানালায় সংরক্ষিত একটি পাত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিবামাত্র সিগারেট-কেসটি সেই জানালা হইতে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। মা সিগারেট-কেসটি সেখানে খুঁজিবার চেষ্টা করেন নাই, সেখানে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, ইহাও আশা করেন নাই। সুতরাং মহম্মদ আলির গণনা সত্য, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, মহম্মদ আলি আমার নিকট শুনিবার পূর্ব্বে আমার সিগারেট-কেসের অন্তর্দ্ধান-সংবাদ জানিতে পারে নাই এবং তাহার সেই দৈববাণীতে কোন রকম চালাকী ছিল না।

"এই ঘটনার কিছু কাল পরে হাকিম পুনর্ব্বার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, সিগারেটের কৌটা পাওয়া গিয়াছে। আমার কথা শুনিয়া সে বিস্ময় প্রকাশ করিল না, গম্ভীরভাবে বলিল, 'পাইবেন, তাহা জানিতাম।' সে আমার নিকট পুরস্কার পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিল না।

"অতঃপর আমি আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাকে আমার চিকিৎসা করিবার অনুমতি দান করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহার মন্ত্রশক্তিতে আমার আস্থা না থাকিলেও কেবল কৌতূহলবশতঃই তাহার চিকিৎসা-প্রণালী দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। হাকিম বলিল, আমি তাহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিব এবং সে আমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় না করিয়া আমার নিকট হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে না। আমি তাহাকে কয়েক দিন পর আসিতে আদেশ করিলাম।

"নির্দ্দিষ্ট দিন সে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রসারিত দেহে শয্যায় শয়ন করিতে বলিল। আমি

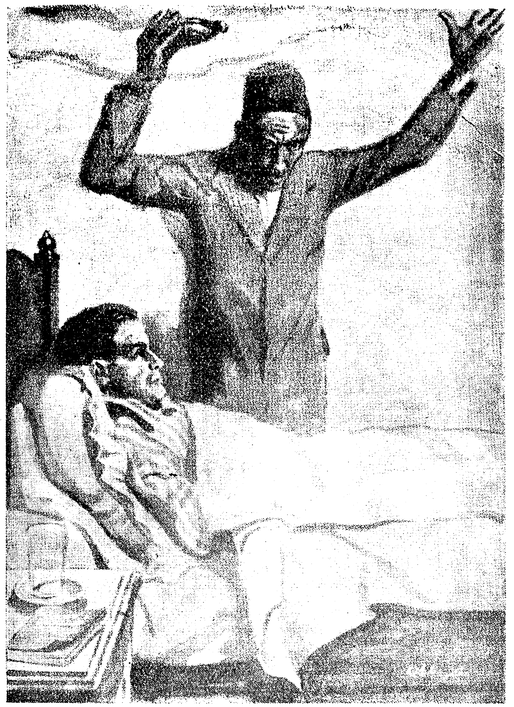

হকিম জল গন্ধদ্রব্যযুক্তপূর্ণ ডিসখানি আমার দেহের উপর আন্দোলিত করিতে লাগিল

শয়ন করিলে সে একখানি সাদা কাপড় দিয়া আমার আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিল এবং একখানি ক্ষুদ্র ডিসে এক প্রকার গন্ধদ্রব্য ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। তাহা হইতে ধূম নির্গত হইলে সে সেই ডিসখানি আমার দেহের উপর আন্দোলিত করিয়া কোরাণের বয়েৎ ও আরবী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহার পর মুসলমান পীরগণের নাম বলিল। অবশেষে আমার ও আমার মাতার নাম উচ্চারণ করিয়া ডিসখানি সরাইয়া রাখিল। এই কার্য্যে তাহার প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল অতীত হইলে সে এক পেয়ালা চা পান করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার পূর্ব্বে সে আমাকে বলিল, তিন দিন পর সে পুনর্ব্বার আসিবে, সে দিন যেন একটি কৃষ্ণবর্ণ মোরগ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়।

"তিন দিন অতীত হইলে হাকিম আসিল না; চতুর্থ দিন সে আসিলে আমি তাহাকে নির্দ্দিষ্ট দিনে অনুপস্থিত থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, ভূতরা তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে না আসায় পূর্ব্বদিন আমার কাছে আসিয়া কোন ফল হইবে না বুঝিয়া আসে নাই। ভূতের সহিত পরামর্শ না হইলে তাহার আসা না আসা সমান।

"আমার বালক-ভৃত্যকে পূর্ব্বেই একটি কাল মোরগ সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলাম; তাহাকে সেই মোরগটি আনিতে বলিলে সে সভয়ে বলিল, মোরগটি দিয়া সে হুজুরের খানা পাকাইয়াছে; উহা যে হাকিম সাহেবের জন্য আনিতে বলা হইয়াছিল, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। আমি একটু হাসিয়া চাকরটাকে আর একটা কাল মোরগ কিনিয়া আনিতে বলিলাম।

"কাল মোরগ আনীত হইলে হাকিম আমাকে পূর্ব্ববৎ শয়ন করাইয়া আমার আপাদমস্তক সাদা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল, তাহার পর সেই মোরগটি আমার মাথার উপর তিনবার আন্দোলিত করিল। আমার দেহে যে ভূতের ভর হইয়াছিল, এরূপ করায় সেই ভূত না কি মোরগের দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই মোরগটি আমি পরে দেখিতে পাই নাই; সম্ভবতঃ মহম্মদ আলি তাহা বাড়ী লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল।

"কয়েক দিন পরে হাকিম একটা বীয়ারের বোতলে আমার জন্য কিছু ঔষধ লইয়া আসিল। সে আমাকে তাহা পান করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম না, ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সম্ভবতঃ সেই ঔষধটি পান করিলে আমার অনিষ্ট হইত না; কিন্তু সেই ঔষধের চেহারা দেখিয়াই আমার অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে তাহার সহিত

রফা হইল, সে সেই ঔষধ আমার পদদ্বয়ে লেপন করিয়া আমাকে ঔষধ-পানের দায় হইতে নিষ্কৃতি দান করিবে; কার্য্যতঃ তাহাই হইল।

"অতঃপর হাকিম আরও তিন দিন আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল; তন্মধ্যে এক দিন সে একটি ছোট টিনে সিংহের চর্ব্বি আনিয়া আমার পায়ে মালিশ করিয়াছিল।

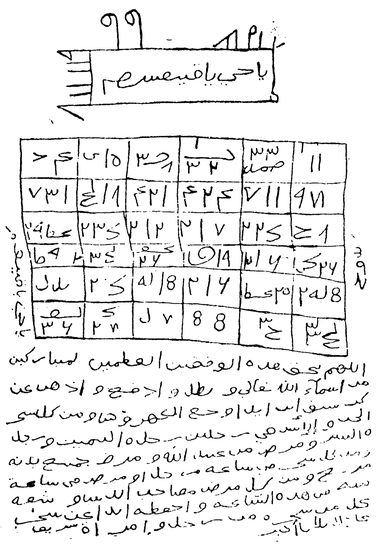

দুইখানি মন্ত্রপূত কবচ

সেই দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস, সিংহের চর্ব্বির একটি গুণ এই যে, ইহা শক্তিদায়ক। শেষ দিন হাকিম তাহার সেই খাতা হইতে মন্ত্র পাঠ করিয়া আমার পদদ্বয়ে মন্ত্রপূত কবচ বাঁধিয়া দিয়াছিল। সেই কবচদ্বয় এখনও আমার কাছে আছে।

"মহম্মদ আলি সেই কবচ দুইখানি বাঁধিয়া দিলে আমি ঈষৎ বিদ্রূপভরে তাহাকে বলিলাম, 'তুমি কি তোমার যাদু-বিদ্যার বলে আমাকে বলিয়া দিতে পার, ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে?'

"সে তৎক্ষণাৎ বলিল, 'হাঁ, বাওয়ানা, আমি তাহা বলিতে পারি'—অতঃপর সে আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার চেতনাসঞ্চার হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। চেতনা লাভ করিয়া সে সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি দেখিতেছি, আমার চিকিৎসা-প্রণালীর উপর আপনার আস্থা না থাকায় আমাকে আপনার দেহ রোগমুক্ত করিতে দিলেন না। আপনি শীঘ্রই ডাকের জাহাজে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া আপনি একটি বৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করিবেন এবং সেখানে কয়েক মাস বাস করিবেন; কিন্তু সেখানেও আপনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন না। তাহার পর আপনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি স্থানে গমন করিবেন; সেখানে আপনার রোগের কথঞ্চিৎ উপশম হইবে। সেই স্থানে থাকিতে থাকিতে আপনার কোন বন্ধুর নিকট হইতে সংবাদ পাইবেন, আপনি যে রোগে কষ্ট পাইতেছেন, আর একটি লোক ঐ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আপনি সেই বন্ধুর উপদেশে সমুদ্র পার হইয়া এরূপ একটি দেশে উপস্থিত হইবেন, যে দেশ পর্ব্বতাকীর্ণ, সেই সকল পর্ব্বতের শিখরদেশ সম্বৎসরকাল তুষাররাশি দ্বারা আবৃত থাকে। সেই দেশে আপনার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। তাহার পর আপনি আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিবেন এবং দেড় বৎসরের মধ্যে আপনি পুনর্ব্বার হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইবেন।'

"হাকিম মহম্মদ আলির এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি বিশ্বাস না করিলেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহার সকল কথাই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কেনিয়া হইতে আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম। সেখানে আমি একটি হাঁস-পাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিলাম; কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফললাভ করিতে পারি নাই।

"অতঃপর আমি সমুদ্রপথে দেশান্তরে গমন করি, সেখানে আমার রোগের কথঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল। সেই স্থানে অবস্থিতিকালে আমার একটি বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলাম, তিনিও আমার মত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন; কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে গমন করিয়া সেই দেশের এক জন চিকিৎসকের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই বন্ধুর উপদেশে আমি সুইটজারল্যাণ্ডে গমনের সঙ্কল্প করিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় আশাতীত ফল লাভ করিলাম। এখন

আমি হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেছি। হাকিম যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই হাঁটিবার শক্তি লাভ করিয়াছি। আমার দেহ সম্পূর্ণ সবল হইলে কেনিয়ায় প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা আছে।

"মহম্মদ আলি আমার অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা বলিলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে আমার অতীত জীবনের কথাও বলিতে পারে কি না? আমার প্রশ্নে সে কিছুমাত্র বিব্রত না হইয়া আমি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কেনিয়ায় আসিয়া বিভিন্ন স্থানে বাস-কালে যে সকল কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম, এবং সেই সময় আমার জীবনে যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা একে একে বলিতে লাগিল, এবং তাহা সমস্তই ঠিক মিলিয়া গেল। এমন কি, আমার একটি গোলাবাড়ীতে যে সকল অনুচর ছিল, তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ, তাহাও বলিয়া দিল। আমার পরিচারকবর্গের নিকট এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকিতেও পারে; কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিল—তাহা সম্পূর্ণ সত্য হওয়ায় আমার ধারণা হইয়াছিল, সে আমার ভৃত্যগণের নিকট সন্ধান না লইয়াই ঐ সকল কথা বলিয়াছিল। তাহার সাধুতায় আমার গভীর বিশ্বাস ছিল।

"আমি কেনিয়া হইতে স্বদেশযাত্রা করিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে মহম্মদ আলি পুনর্ব্বার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। আমি তৎপূর্ব্বে এক দিন কথায় কথায় তাহাকে বলিয়াছিলাম, একখানি সোনালি ছোরা সংগ্রহ করিবার জন্য বহুদিন হইতে আমার আগ্রহ আছে।—সেই কথা স্মরণ করিয়া সে সেইরূপ একখানি ছোরা আমাকে উপহার প্রদানের জন্য লইয়া আসিয়াছিল। আমিও তাহাকে নানাদ্রব্য উপহার দিয়াছিলাম; কিন্তু সে পুরাতন পরিচ্ছদ ও জুতা পাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। আমার চিকিৎসা করার পারিশ্রমিকস্বরূপ তাহাকে কোন দিন কিছু দিই নাই।

"আমার ইচ্ছা আছে, কেনিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া আমি মহম্মদ আলিকে ডাকাইয়া বলিব, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে শুনিয়া সে বিস্মিত হইবে, কি 'উহা জানা কথা' বলিয়া সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিবে, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে।"

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1859

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নিরাশায়

১

দুখের সৃজন এ পুরী বিজন,
(হেথা) আছি পথ চাহি বসিয়া;
পরশি আমায় কম্পিত বায়
গোপনে যেতেছে খসিয়া।
সে যে গেছে ছলি দূর পথে চলি,
(তাই) কিবা দিবা কিবা প্রভাতে
আসে রে আঁধার ঘিরি চারি ধার—
উজল আলোক নিভাতে।

২

বিজন তিমিরে কাননের তীরে
(বুঝি) বাজে পুন বেণু বীণা গান!
না, না! এ যে কানে বায়ু বহে আনে
সুদূর সিন্ধুর কলতান।
কেন চিত হায়, ভুলাইতে চায়—
(ওগো) আপনারি গড়া ছলনায়?
বিনোদিতে মন রচিব স্বপন?
নাই, নাই, তাহে ফল নাই।

৩

কোন খেদ নাই, পুষি বেদনায়
যাব এ জীবন যাপিয়া—
শুধু স্মৃতি তার রাখিব আমার
(এই) প্রেমভরা প্রাণ ছাপিয়া!
আজি নিরাশায় ওগো কি ভাষায়
কাঁদিব জানাব যাতনা?
যাক রাতি যাক্ জীবন পোহাক্,
(করি) বিজনে নিরাশ সাধনা।

মহারাজকুমারী ৺অনঙ্গমোহিনী দেবী।

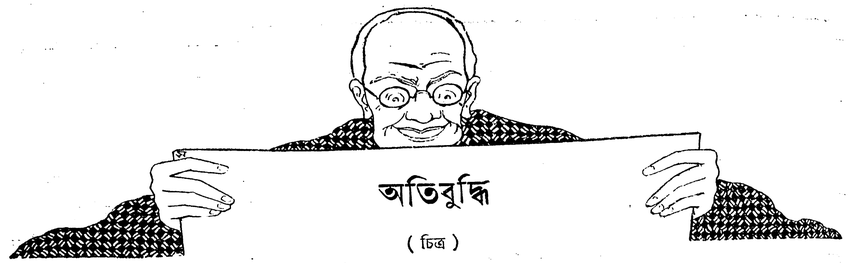

অতিবুদ্ধি

(চিত্র)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুমারপুরের ভূধর চাটুয্যে যখন কৃষ্ণগঞ্জের বাবুদের নায়েব ছিল, তখন যাহা হউক, দু' পয়সা এক রকম রোজগার করিত মন্দ নয়। সংসারটা ছোট, মাত্র পাঁচটি প্রাণী, কাজেই ৫।৭ বৎসর নায়েবী করিয়া ভূধর সরলাকে অনন্ত, বালা ও গলায় বিছেহার গড়াইয়া দিল; অপ্টি, ঘণ্টি ও মণ্টি নামিকা তিনটি কন্যার পায়ে মল, হাতে ও গলায় সুতাহার দিয়া অন্নপ্রাশন দিয়াছিল—শেষে এক জন মুসলমান প্রজাকে উচ্ছেদ করাইয়া তাহার তিন বিঘা ভাল ধানী জমী পর্য্যন্ত কৌশলে হস্তগত করিয়া কেবলমাত্র উন্নতির আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু গ্রামের লোক এমনই এক-চোখো যে, পরের ভাল কিছুতেই দেখিতে পারে না—সকলে ষড়-যন্ত্র করিয়া, আস্তে আস্তে কানপাতলা বাবুদের কান-ভারী করিয়া দিল। ছোটবাবু সাহেবা মেজাজের লোক, তিনি নায়েবের কার্য্য-পরিদর্শনমানসে মহালে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, চাটুয্যে মহাশয়ের চেকমুড়ীতে ৭ প্রজাকে প্রদত্ত চেকে বরাবর একটা পার্থক্য এবং প্রায়ই বাবুদের নামে ফলটা মাছটা পাঁঠাটা হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে আদায় হইয়া নায়েব মহাশয়ের গৃহে গিয়াই পরিসমাপ্ত হইতেছিল। চাটুয্যে মহাশয় বলিল, প্রজাদের এ সমস্ত চালাকী, ষড়যন্ত্র এবং তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য একজোটে কুমন্ত্রণা। তবে চেকে যে টাকার দু'রকম লেখা, ওটা ভ্রান্তি-মাত্র—ভুল কি মানুষের হয় না? কাজ করিতে গেলে ওরকম ভুল-ভ্রান্তি হ'য়াই থাকে। কিন্তু ছোটবাবু তাহা মোটেই বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, পুলিস ডাক। চাটুয্যে মহাশয়, নিজ দোষ-ক্ষালনের জন্য বহু প্রকার ওকালতী-তর্ক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া যখন দেখিল, কোনও সুফল ফলিল না—তখন গিয়া গিন্নী-মাকে ধরিয়া পড়িল। অবশেষে ব্রাহ্মণত্বের দাবীতে পুলিসের হাঙ্গামা হইতে অতি কষ্টে নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু চাকরীটি গেল। তা যাউক্, প্রাণটা যে রক্ষা হইল, ইহাই যথেষ্ট। ভূধর পলাইয়া আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সরলা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল?"

ভূধর উত্তর দিল,—"তুমিও যেমন, এই সব ছোট-লোক মুখ্যু শালাদের কাছে চাকরী করা গুখুরি। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম, দেখুক্ ব্যাটারা এইবার মজাটা—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম্মটা তো আর বুঝলে না—"

সরলা। তাদের আগে মজা যে আমরাই দেখব, সেটা ভেবেচ কিছু? গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে এমন কাজটা ছেড়ে দিলে?—

ভূধর। আরে, আমার কাজের ভাবনা কি? একটা কি? ইচ্ছে করলে, এক্ষুনি দশটা কাজ পাব, তার জন্যে ভয় করি না। ঐ তো হুশেনপুরের বাবুরা ক'দিন থেকে আমায় সাধাসাধি করচে—বলচে, ওখানে যা পাও, তার ওপর আরও পাঁচ টাকা বেশী দিচ্ছি, তুমি চ'লে এস। আমি যাচ্ছি না ব'লে তাঁরা কত দুঃখিত।

সরলা। এইবার যাও না কেন তবে?

ভূধর। নাঃ, এ দেশে আর থাকব না। এ দেশের লোক বড় বেইমান্। আমি কল্‌কাতা যাব,—দেখাচ্ছি বেটাদিকে মজা—

স্বামী মনের দুঃখে কৃষ্ণগঞ্জের বাবুদের উপর রাগ করিয়া চাকরী করিতে কলিকাতা যাইবে, ইহাতে সাধ্বী সরলার বড় কষ্ট হইল। একটু ভয়ও হইল, বিদেশ বিভূঁই—তাতে কলি-কাতা! শরীরটা ভাল থাকিলে হয়!

সরলা। তা ওদের ওপর রাগ ক'রে বাড়ী ছেড়ে যাবে কিসের জন্যে? এ যে চোরের উপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়া হচ্ছে তোমার।

ভূধর। বোঝ না, এমনি তো কাজ ছাড়ায়, বাড়ীসুদ্ধ সবাই মা'য় গিন্নী পর্য্যন্ত আমায় কাজ না-ছাড়াবার জন্যে মহা পীড়াপীড়ি—অর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত বড়বাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন, অনেক বোঝালেন, কিন্তু আমার ওদের উপর মন একেবারে ছোট হয়ে গেছে, আর হয় না। এখন দেশে যদি থাকি, তা হ'লে ওরা কি আমায় কম সাধাসাধি করবে? শেষে যদি চক্ষুলজ্জা এড়াতে না পেরে রাজীই হয়ে পড়ি? তাই কলকাতা পালাতে চাচ্ছি যে, আমার কথাও বজায় থাকবে, ওরাও জব্দ হবে—

সরলা। তা যদি রাজীই হও, তাতে মন্দ কি? ভালই তো হয়। গাঁয়ে-ঘরে ব'সে যা পাও, তাই তো ভাল।

ভূধর। না গো না, তা হয় না। আমার যা কথা, তাই কাজ। আজ তা'দিকে যে দশ-কথা শুনিয়ে দিয়ে এলাম, তার পর কি আর তাদের ওখানে গিয়ে চাকরী করতে পারা যায়! না, করলে মান থাকে? গিন্নি, যাক্ প্রাণ, থাক্ মান। প্রাণের চেয়েও মান বড়—বুঝলে?

বাঙ্গালীর চাকরী যাওয়ার দিনের মত ভীষণ দুর্দ্দিন আর নাই। তবু সরলা স্বামীর তেজ, মহত্ত্ব ও আত্মসম্মানজ্ঞান দেখিয়া এ দুর্দ্দিনেও গৌরব অনুভব করিল, স্বামিগর্ব্বে তাহা বুক দশ হাত ফুলিয়া উঠিল।

ভূধর পত্নীর প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবের সুস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া, আত্ম-গৌরবে স্ফীত বক্ষে নিকটস্থ হুক্‌গীটি টানিয়া লইয়া বীরের মত তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রায় ছয় মাসকাল বিনা রোজগারে গৃহে বসিয়া থাকিয়া সঞ্চিত অর্থ যখন নিঃশেষে ফুরাইল, তখন সরলা স্বামীকে জানাইল যে, এইবার কিছু উপায় না করিলে সংসার অচল হইবে।

ভূধর বলিল, "হেঁঃ, মেয়েমানুষের বুদ্ধি কি না! সংসার কি কখনও অচল থাকে? কার জন্যে কি আট্‌কায়? দিন কি কারু ব'সে থাকে?"

সরলা। দিন যায়, তবে সেটা ছেলেপিলে নিয়ে ক্ষিধেয় চি-চি করতে করতে।

ভূধর। কেন? লোকে গয়না গড়ায় কি জন্যে? সময়ে অসময়ে কাজে লাগবে ব'লে তো? আপাততঃ কোনও রকমে চালাও, আমায় একবার ক'লকাতা যেতে দাও, তার পর আর ভাবনা কি?

সরলা নিজের ৩।৪ খানি যে গহনা ছিল, একে একে সব বন্ধকখানাই বন্ধক দিল। ভূধর কলিকাতা গেলেই ভাগ্য-পরি-বর্ত্তন অনিবার্য্য, কিন্তু এক বৎসর হইতে চলিল, ভূধরের সেরূপ কোনও চেষ্টা না দেখিয়া, সরলা স্বামীর বিদ্যা-বুদ্ধিতে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভূধর সুধু বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "আমার বুদ্ধিতে যদি তুমি ঢুকতে পারতে, তা হ'লে কি তুমি মেয়েমানুষ হ'তে কখনও?"

সরলা ভাবিল, তাও তো বটে। উনি যে পুরুষমানুষ।

উদ্যোগী ব্যক্তিকেই পুরুষসিংহ বলে, এবং তিনিই লক্ষ্মী-লাভ করিয়া থাকেন, কিংবদন্তী এইরূপ। ঘটিলও তাই। ভূধরের অক্লান্ত পরিশ্রমে, বিদ্যাবত্তায় ও উদ্যোগে গ্রামে শীঘ্রই দুইটি দল হইল, দুই দিকেই দুই জন সম্পন্ন চাষী। এক পক্ষের বারীশ পদ্ধান নেতা, অন্য পক্ষে রহিলেন গুরুদাস কারফর্‌মা। ভূধর উভচররূপে মধ্যে বিরাজমান থাকায় ব্যাপারটি এমন জটিল হইয়া উঠিল যে, গ্রামের শান্তিরক্ষা করিতে নিকটস্থ পুলিস আসিল এবং সদরে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী উভয় আদালতেই উভয় পক্ষই দ্বিবিধ আর্জ্জি দাখিল করিয়া আসিয়া, তবে জল-গ্রহণ করিল। যে জমীর ছেঁচ লইয়া এত কলহ, তাহা অনাবাদীই থাকিয়া গেল।

দারোগা-বাবু প্রবীণ ও বিচক্ষণ, তিনি আসিয়াই ভূধরকে বিশেষ নেক্‌নজরে দেখিলেন, এমন কি, ভূধরের বৈঠকখানাতেই রাত্রিবাস পর্য্যন্ত করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভূধর বারীশকে নিজ বাটীর খিড়কী-পুকু-রের ধারে দাঁড়াইয়া কানে কানে বলিল, "খুড়ো, তুমি কিছু ভেব না, আমি তোমারি। দারোগা-বাবুকে আমি সব ঠিক-ঠাক্ বুঝিয়ে সুঝিয়ে এমন তালিম দিয়ে দেব যে, দেখি কে তোমার জিৎ মারে! দারোগা-বাবু যখন আমাদের হাতের মুঠোয়, তখন আর ভাবনা কি? ঐ গুরো শালাকে ধনে-প্রাণে যদি না মারি, তবে আমি বামুনের ছেলেই নই—এ তুমি দেখে নিয়ো! তোমার মত লোকের পিছনে কাঠি? দেখ দেখি?"

বারীশ নগদ কুড়িটি টাকা দারোগা-বাবুর সম্মানের জন্য ভূধরের হাতে দিয়া, মাছ, সিধা ও পাঁঠা পাঠাইবার জন্য তাড়াতাড়ি খুসী হইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে গুরুদাস আসিয়া ভূধরকে ইশারা করিয়া মল্লিক-দের আম-বাগানে ডাকিয়া ভূধরের হাতে পঁচিশটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, "বাবা, আমার মান-ইজ্জৎ সব এখন তোমারি হাতে, দেখো বাবা! দারোগা-বাবুকে পাণ খেতে আপাততঃ এই ক'টি দিলাম, পরে ওঁকে খুসী করব, বেশ ক'রে বুঝিয়ে ব'লে দিও, বাবা! দেখ্‌চ তো আমার উপর কি অত্যা-চার?"

ভূধর বলিল, "সে কথা আবার বল্‌তে, মামা? কথায় বলে, মামার খেয়ে ভাগ্‌নে মানুষ। আমি তোমার টান্ টান্‌ব না তো, কি ঐ শালা বারশে চাষার টান্ টান্‌বো? তুমিও তো বাবা আচ্ছা লোক, আমায় চিন্‌লে না? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মামা, কোনও ভয় নেই। তোমার কথা এখুনি দারোগা-বাবু বল্‌-ছিলেন। তোমার ভালই হবে। তবু ওঁর যেটুকু সন্দেহ আছে, সেটুকু আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি। আর আমায় না সুধিয়ে তো উনি রিপোর্ট লিখচেন্ না! সেই রিপোর্ট লিখবার সময়েই আমি কাজ ফতে করব, ভাবনা কি? আমি আছি, কোনও ভয় নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা—দারোগা-বাবুর জন্যে সের দশেক ভাল চা'ল, কিছু আলু ও সের ২।৩ ভাল ঘি যে পাঠাতে হবে, মামা?"

গুরু। বেশ তো, বেশ তো, এখুনি তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবা, তুমি কাল ওঁর যাবার সময়ে দিয়ে দিও।

ভূধর। ধেৎ—কাল কি হয়? লোকে দেখবে যে! তুমি পাঠিয়ে দাও তো, তার পর পাঠাবার ব্যবস্থা আমি পরে করব গো, ভয় কি? আমি খাব না, আমার জন্যে আমি চাচ্ছি না।

গুরু। ছি ছি বাবা, কি বল তুমি, তার ঠিক নেই।

গৃহে মহা ধূমধাম—একটা যেন উৎসব। ভারে ভারে চাউল, ডাইল, তরকারী, মাছ, তেল, ঘি, মশলা, পাঁঠার মাংস, পেঁয়াজ—পাহাড় প্রমাণ জমিল।

সরলা। কি করচে সব এরা, দেখেচ? এত জিনিষ-পত্তর কেন পাঠাচ্ছে? মানা করচি, আর আনিস না, তবু যদি এরা শুন্‌বে? এনেই যাচ্ছে, এনেই যাচ্ছে—নাও, এ সব ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। আমার যা দরকার, আমি সব নিইচি।

ভূধর। (সরোষে) তুমি একটা লক্ষীছাড়া হাড়হাবাতে গাড়োল। এ কি সব আজকের জন্যেই এরা দিচ্ছে? দারোগা বাবু আর আস্‌বেন্ না? ওদের কাজে আস্‌বেন্, ওরা এ সব বন্দোবস্ত করবে না তো কে করবে? আমি করব না কি? উনি রোজ আস্‌বেন্, রোজ রোজ ওরা এই সিধেই পাঠাবে, আর কোনও কাজ-কর্ম্ম ওদের নেই? তা ছাড়া, আমি যে ওদের জন্যে এত খাট্‌চি, আমার সম্মান নেই? ছোটলোক মাগী, তোল্ সব জিনিষ-পত্তর, ঘরে তোল্ আগে, এখন থাক গে রান্না-বান্না, আগে সব ঘরে তোল্। দশ জন লোক আস্‌চে, দেখ্‌বে, বরং আরও বল্‌বি—এটা নিয়ে আয়, ওটা নিয়ে আয়—আ মোলো হতভাগা মাগী—মুখ্যু—

সরলা স্বামীর আদেশ পালন করিল, জিনিষগুলি ঘরে তুলিল;

কিন্তু প্রসন্নমনে নহে। তাহার কেমন একটা লজ্জা, কি একটা সঙ্কোচ যেন কেবলি তাহাকে বিঁধিতে লাগিল।

রাত্রিতে আহারাদির পর ভূধর দারোগা-বাবুকে কুড়িটি টাকা দিয়া কহিল,—তুজনেই দশ টাকা ক'রে আপনাকে পাণ খেতে দিয়ে গেছে। এই নিন্।"

দারোগা-বাবু অপ্রসন্নমুখে পনেরটি টাকা পকেটে পুরিয়া পাঁচটি ভূধরকে দিয়া কহিল,—"ওঃ, মোটে দশ টাকা ক'রে দিয়েচে? আচ্ছা—তোমার মেয়েদিকে সন্দেশ খেতে দিও, ধর'।"

টাকা কয়টি ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে ভূধর কহিতে লাগিল, "এ কি, এ কি, এ আবার কেন? আমায় দয়া করেন, এই আমার লক্ষ টাকা—দেখুন্ দেখি, দেখুন দেখি—"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দারোগা রিপোর্ট দিল, এ সিভিল্ ডিস্‌পিউট, দেওয়ানী আদালতে মীমাংসা হওয়া কর্ত্তব্য। ভূধর একে একে বারীশ ও গুরুদাস দুই জনকেই গিয়া বলিল—"কেমন, যা বলেছিলাম, দেখ এইবার তাই হ'ল কি না?" উভয়েই প্রীত হইল; কারণ, ভূধর উভয়কেই বুঝাইয়াছিল যে, তাহারই অন্যায়, দারোগা তাহারই বিরুদ্ধে। তবে সে তাহার বন্ধু দারোগাকে বলিয়া কহিয়া তাহাকে কোনও রকমে বাঁচাইয়া দিবেই।

মকদ্দমা এই:—বারীশের নিজের পুষ্করিণী হইতে সে তাহার ক্ষেতে ছেঁচ লইয়া যাইতে চায়; কিন্তু তাহার জমীতে ছেঁচ লইয়া যাইতে হইলে গুরুদাসের জমীর ধার দিয়া যাইতে হয়। গুরুদাস বলিল, সে নিজের জমীতে ছেঁচ না লইয়া উহার ক্ষেতে জল যাইতে দিবে না; অথচ পুষ্করিণীতে জল অত্যন্ত কম, মাত্র দুই হাত বলিয়া বারীশ গুরুদাসকে ছেঁচ দিতে অস্বীকার করে। এই লইয়া বিবাদের সূত্রপাত। বারীশ বলিল,"এই নিয়ে চললাম, লে দেখি তুই জল, কেমন ক'রে লিবি। মেরে মাথা ফেটিয়ে দুবো না? গুরুদাসও রুখিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"ফাটা দেখি তুই মাথা?" তোর কোন্ বাবার মাথা ফাটাস্, একবার দেখি।" বারীশ ও গুরুদাস দুই জনে শালা-ভগিনীপতি সম্বন্ধ।

বারীশকে ভূধর বলিল—"খুড়ো, অন্যায় যে তোমারই তা দেখ্‌চ তো? আইনে বলে যে, পাশের ভূঁয়ে ছেঁচ না দিয়ে জল নিয়ে যেতে পারে না। দারোগা-বাবু তো তোমার উপর মহা খাপ্পা, হাত-কড়ি দেয় আর কি? কত ক'রে তবে তাঁকে থামাই।"

বারীশ। খুব তবে বাঁচালে, বাবাঠাকুর। ভাল-ভালয়ে মকদ্দমাটা মিটুক, অফিসর বিয়েতে যত মাছ আর আলু লাগবে, আমি দুবো।

গুরুদাসকে ভূধর বলিল—"কি কাণ্ডটা করেছিলে দেখ দেখি, মামা? ছিছি ছিছি, একবারে দ্বীপান্তরে যেতে বসেছিলে? যে কষ্টে দারোগা-বাবুকে রাজী করি, তা আমি জানি আর ভগবানই জানেন। ও বারুশে শালার জল, ও তার জমীতে নিয়ে যাবে, তুমি তাকে বাধা দেবে কে হে, বাপু? এ কি মগের মুলুক না কি? যাক্, এখন কালাপানি থেকে যে বাঁচলে, এই যথেষ্ট। আমি তোমার নামে নারায়ণকে ১০৮ পাতা তুলসী মেনেচি।"

গুরু। পায়ের ধুলো দাও, বাবাঠাকুর! তোমারি ভরসা আমি করি। মকদ্দমাটা আগে জিতি, তার পর আমার মনেই আছে—তোমার এ ধার আমি জন্মেও ভুল্‌বো না। তা যাক্, বৌমা-ঠাকুরুণ তাঁর হারগাছটা আমাদের বাড়ী বন্ধক রেখেছেন্ ২৫ টাকায়, সেটা ফিরিয়ে লেবে চল। এ টাকা আমি আর নিচ্ছি না—তোমার দ্বারা আমি একশো টাকার কাজ পেয়েচি। এস, লেবে এস।

ভূধর হার ত ফিরাইয়া আনিলই, উপরন্তু ফর্দ্দমত নগদ ১১৷৵১৫ নারায়ণকে গুরুদাসের নামে তুলসী দিবার খরচটাও আনিতে ছাড়িল না।

হার পাইয়া সরলা আহ্লাদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এত টাকা কোথায় পেলে?"

ভূধর। (গম্ভীরভাবে) পুরুষমানুষ রোজগার করে বুদ্ধিতে। ওরো ব্যাটার যে উপকার করেচি, তার তুলনায় এ তো কিছুই নয়। সে টাকা নিল না, আর নেবেও না, অমনিই খুসী হয়ে ছেড়ে দিতে পথ পেল না! আমি তার বড় কেউ-কেটা নই, তাকে কালাপানি থেকে বাঁচালাম, স্রেফ দারোগা-বাবু আমার বিশেষ বন্ধু বলেই তো? যাক্, এ সব কথা এখন কারও কাছে, কিছুতেই কিছু ভেঙ না যেন। দেখো, খুব সাবধান!

সরলা স্বামীর বুদ্ধিমত্তায় নির্ব্বাক্ হইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া স্বামি-সৌভাগ্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এ দিকে গ্রামে ভূধরের পশার-প্রতিপত্তি হঠাৎ এমন বাড়িয়া গেল যে, তদ্দ্বারা তাহার সংসারের শ্রীও একবারে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আজ বারীশের বাড়ী হইতে দশ সের ভাল চাউল, কাল গুরুদাসের বাড়ী হইতে পাঁচ সের সোনা-মুগের ডাল, এ বাড়ী হইতে আধ মণ আলু, ও বাড়ী হইতে ১৫ সের ভাল সাড়ি-গুড়; এখান হইতে দুই ঝুড়ি তরকারীপাতি, ওখান হইতে ২ সের মাছ—এ প্রত্যহই আসিতে লাগিল, কামাই নাই। সরলা দেব-দুর্ল্লভ স্বামিলাভে সরল বিশ্বাসে নিজেকে পরম ভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া কেবলই ভাবিত—"আমার স্বামী নিশ্চয়ই গতজন্মে এক জন বড় হাকিম ছিলেন, তা নৈলে না-চাইতে এত জিনিষ-পত্তর রোজ রোজ আস্‌বে কি জন্যে? আর তা' নৈলে, এত বুদ্ধিই বা কোত্থেকে এল? গাঁয়ে তো এত লোক রয়েচে, কার বাড়ীতে দারোগা যায়? কে এমন এক কথায় অমন কৃষ্ণগঞ্জের বাবুদের নায়েবী ছেড়ে দিতে পারে? কার এমন তেজ? কার এত খাতির?"

মকদ্দমার দিন সন্নিকট। বারীশ ও গুরুদাস জীবনে আর কখনও মকদ্দমা করা দূরে থাকুক্, বিষ্ণুনগরেও যায় নাই। জেলায় গিয়া মামলা করা বড় সহজ কাজ নহে, কাজেই দুই জনেই আবার ভূধরের শরণাগত হইল।

বারীশ বলিল—"বাবাঠাকুর, তোমায় যে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি ত কিছু জানিও না, বুঝিও না—মুখ্যু চাষা আমি, মকদ্দমা করা কি চাষার কাজ?" ইত্যাদি।

ভূধর কহিল—"আমি আর কেন, মিছামিছি? এই বাড়ী ঘর ফেলে—আমার এই টানাটানির সংসার, কাজকর্ম্ম কিছু নেই—"

বারীশ। তা হবে না বাবা, তোমার যা খরচ হয়, সব আমি দুবো। তোমায় যেতেই হবে। ওই ওরো শালাকে জব্দ কর্‌তে না পার্‌লে আমি আপ্তহত্যে হব। সে শহুর, উকীল মোক্তার হাকিমদের কাছে গিয়ে কি আমি দাঁড়াতে পারি, না কথা কইতে পারি? শেষে কি-বল্‌তে কি, বেরিয়ে যাবে? তা হচ্ছে না-বাবা। তুমি বরং এই দশটা টাকা লাও—এ আর ক'দিনই বা—

ভূধর। (টাকা দশটি গণিয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া) আর একটা কথা কি জান? তোমরা কর্‌ছ ঝগড়া-বিবাদ এক রকম আপনা-আপনির মধ্যেই, দু'দিন বাদে সব মিটে যাবে; কিন্তু আমি যদি আজ তোমার পক্ষে দাঁড়াই, জিত তা হ'লে অবিশ্যি তোমার হবেই, কিন্তু আমার বদ্‌নামটা কি রকম হবে, তা একবার ভেবে দেখেচ কি? সবাই বল্‌বে, ভূধর চাটুয্যে লেগেই গুরুদাসকে হারিয়ে দিলে। গুরুদাস ত আমার কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাই বল্‌চি যে, এ ক্ষেত্রে আমার কোনও পক্ষেই দাঁড়ানো উচিত—

বারীশ বিষম উত্তেজিতভাবেই কহিল, "না বাবাঠাকুর, ওরোর সঙ্গে আমার এ জীবনে আর মিল হবে না, এ নিশ্চয় কথা। তবে, তুমি যা ভয় করচ, সেটা কতকটা ঠিক বটে। তা তুমি এক কাজ কর, তুমি গোপনে গোপনে আমার কাজটা ক'রে দেবে?"

ভূধর। হাঁ, এ হয়। তা হ'লে আমায় আলাদা বাসা ক'রে থাকতে হবে। আমি যেন দু'পক্ষের কারুরই নই—নিজের কাজে বিষ্ণুনগর গিয়েচি, এমনই ভাব দেখাতে হবে। অথচ তলায়-তলায় তোমার কাজ ক'রে দেব। লোকে কেন, কাকপক্ষিতেও টের পাবে না—তুমিও আমার নাম কর্‌বে না। কেউ যদি বলেও, তবু তুমি বল্‌বে যে, আমি তোমার পক্ষে নেই। পাঁচ জনের সাক্ষে আমার মুখের ওপরেও তোমায় বল্‌তে হবে এ কথা, যদি দরকার হয়। কাজ অবিশ্যি তোমারই কর্‌ব, জিতিয়ে তোমায় দেবই এ মকদ্দমা—কারণ, তুমি আমার এত হিতৈষী লোক, এমন ক'রে যখন ধ'রে পড়েচ, তখন এড়াই কি ক'রে বল? চক্ষুলজ্জা আছে তো? হাঁ, এমন কি, তুমি আমার বাসায় পর্য্যন্ত আস্‌বে না। তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা যা কইব—তা অন্য-স্থানে গিয়ে, লুকিয়ে। কেমন, এ সব পার্‌বে তো?

বারীশ। লিচ্ছস্ পার্‌ব—এ আর শক্ত কি, বাবাঠাকুর? যা নিজের কাজের জন্যে এ না কর্‌লেই বা চল্‌বে কেন? তা হ'লে তোমার সেখানকার বাসাখরচও আমিই দুবো।

গুরুদাস আসিল, সেও এইরূপ প্রস্তাব করিল, ভূধর তাহাকেও এই উত্তর দিল, গুরুদাসও উক্ত প্রকার একই সর্ত্তে রাজী হইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় দশ টাকার দুইখানি নোট ভূধরের চরণপ্রান্তে অতি সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বিদায়গ্রহণ করিল।

যথাসময়ে ভূধর বিষ্ণুনগরে একটি হিন্দু হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রায় এক বৎসরকাল বিষ্ণুনগর আর ঘর করিয়া-করিয়া অবশেষে মকদ্দমা শেষ হইল। বারীশের জিত হইল, মায় দুই শত টাকা ক্ষতিপূরণ সুদ্ধ—গুরুদাস কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ভূধরের ইচ্ছা ছিল না যে, মামলাটি এত শীঘ্র শেষ হয়; কারণ, এই মামলার দৌলতে তাহার নায়েবী অপেক্ষাও ভাল রোজগার চলিতেছিল, কিন্তু মুন্সেফ-বাবুর ইহা সহ্য হইল না তিনি তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া দিয়া যেন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। দুই টাকার উকীল দিয়া কাজ করাইয়া, দশ টাকা উকীল-ফী ও আরও দশ বার টাকা অন্যান্য খরচ বাবদ উভয় পক্ষ হইতে আদায় করিয়া, প্রত্যেক শুনানীর দিন গড়ে ভূধর যে ৩০।৩৫ টাকা উপার্জ্জন করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহা বন্ধ হইয়া গেল দেখিয়া ভূধর অপ্রসন্ন মনে যখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য উপায়ান্তর চিন্তায় তন্ময় হইয়া বসিয়া আগুন-নেভা কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া প্রাণপণে টান দিতেছিল, তখন হো-হো করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদাস আসিয়া ভূধর বাবাঠাকুরের দাওয়ায় সটাং লম্বমান্ হইয়া শুইয়া পড়িল।

গুরুদাস কহিল, "বাবাঠাকুর, ধনে-প্রাণে হাবাৎ হই যে—এখন বাঁচাও। এত দিন মড়াইএর ধান বেচে ত মকদ্দমা কর্‌লাম, আমার ৫ শো টাকার ধান জলের দরে ৩ শো টাকায় বেচে ফেল্‌লাম, এখন এ দু'শো টাকা আবার কি ক'রে দিই? এবার জমী বেচতে হয় যে,—তা হ'লে খাব কি, বাবাঠাকুর?"

ভূধর বলিল, "মামা, বল, তোমায় আমি গোঁড়া থেকেই বল্‌চি কি না,—যে তোমার মামলা খারাপ। বল—বল?"

গুরু। হাঁ, তা বল্‌চ বটে; তা বাবা, তোমরা হ'লে ন্যাকা-পড়া জানা লোক, ভদ্দর লোক, আইন বে-আইন জান, বড় কাজ করেচ, অত বড় কৃষ্ণগঞ্জের বাবুদের সদর নায়েব ছিলে—তুমি বল্‌বে না তো কে বল্‌বে? আমি নিজেও দেখচি, আর গাঁয়ের সবাই বল্‌চে, তোমার যা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তা উকীল-মোক্তার জজ-মাজিষ্ট্রেটরের নেই। চাষার গাঁয়ে রয়েচ বাবাঠাকুর, তাই তোমার কদর হচ্ছে না, শহরে যদি গোড়াগুড়ি থাক্‌তে, তা হ'লে কোন্ দিন তুমিও এক জন হাকিম হয়ে যেতে। আহা, তা হ'লে আমায় আজ আর এই মকদ্দমাটা হারতে হ'ত না—

ভূধর। (আত্মপ্রসন্নভাবে) এখন সে সব কথা ভেবে আর লাভ কি, মামা? এখন আমার মতে এর আপীল করাই তোমার উচিত, আপীলে তুমি নিশ্চয় জিতবে। আরে, জজসাহেব তোমায় না জেতায়, তোমায় জুতো মার্‌তে-মার্‌তে হাইকোর্ট থেকে আমি জিতিয়ে আনব—ভেবেচ কি? ভূধর চাটুয্যে এমন হেঁজিপেঁজি নয়, সে যা ধরে তাই করে,—দেখেচ ত এক কথায় অমন নায়েবীর মুখেই—

গুরু। এজ্ঞে, তার আর কথা কি? এ কে না জানে? তা হ'লে এতে কি রকম কি কর্‌তে হবে?

ভূধর। যা কর্‌তে হবে, তোমার জন্যে আমি সব কর্‌তে প্রস্তুত, সব কর্‌ব। বুদ্ধি দিয়ে, গতর দিয়ে, যাতে তোমার হিত হবে, তা আমার উপর যখন ভার দিচ্ছ, তখন সে সব বল্‌লেও কর্‌ব, না বল্‌লেও কর্‌ব। তবে বাপু, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, টাকা পয়সা ত আমার নেই—টাকাটি তোমায় যখন যেমন চাইব, তখনি

তেমনি সর্ব্বরা কর্‌তে হবে। মকদ্দমা মানে টাকার খেলা—যার টাকা বেশী, তারই জিৎ। যে যত খরচ কর্‌তে পারে, তার তত সুবিধে। হাকিমরা তো তাই দেখে কি না যে, দুই পক্ষের মধ্যে কে বড়লোক—আর বড়লোকের টান না টানে, এমন মুখ্যু এ সংসারে কে আছে, বল? এই ধর, কৃষ্ণগঞ্জের কি হুশেনপুরের বাবুদের মধ্যে কেউ যদি কিছু বলে, তা হ'লে, তুমিই বল না মামা, তুমি সেই বাবুর কথা শুনবে, না আমার কথা শুনবে?

গুরু। তা' এজ্ঞে, বাবুর কথারই তো জোর বেশী—

ভূধর। কেমন? জোর বেশী তো? এ-ও তাই। আসল কথা টাকা। পুরো টাকা আনো, হাতে দাও, নাম্‌তে বল, নাম্‌চি, কাঁদুনী-গাওয়া বন্ধ কর। জিদের মকদ্দমা—জিততে চাও, টাকার মায়া কর্‌লে চল্‌বে না। আর জিৎলে, তুমিও ক্ষতিপূরণ খরচা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে সব ডিক্রি পাবে—তোমার ঘরের পয়সা দু দিন বাদে তোমার ঘরেই ফিরে আস্‌বে। আর হারো—গেল। এই সোজা কথা বাপু,—বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে বুঝে, তবে একটা হাঁ কি না উত্তর দাও। নাচতে নেমে ঘোমটা কাড়লে চলবে না, এ কিন্তু আমি এখন থেকেই তোমায় বলে রাখচি, মামা। আর সে রকম যদি তোমার কোনও মতলব থাকে, তা হ'লে আমায় ছেড়ে দাও, তোমার যা খুসী, তাই কর গে বাপু।

গুরুদাস চিন্তিত হইয়া পড়িল। ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কত আন্দাজ খরচ পড়বে?"

ভূধর। তা আমি কি ক'রে বল্‌ব, বল? আমি তো জজ সাহেব নই। তবে আপীল রুজু, বাবুদের একবার একটা করেছিলাম, তাতে প্রায় টাকা-শো-পাঁচেক পড়েছিল, জানি। তোমারও ঐ রকমই পড়বে বোধ হয়। বাপু হে, এতে আমার তো কোনও লাভ নেই, বরং লোকসানই ষোল-আনা। কেবল তোমার খাতিরে, ঘরের খেয়ে এই বনের মোষ তাড়াতে আমার নামা বই তো নয়? মকদ্দমা জিৎবে তুমি, টাকা নেবে উকীলে আর সরকারে, আমি তো মাঝের মাছখানি। তোমাদের কি যে এই কাল মামলা বাধল, তোমাদের ভাগ্যে যা হয়, তা হোক্‌গে, আমি যে নিজের সংসার চালাবার ধান্দায় কিছু কর্‌ব, তার পর্য্যন্ত জো নেই। অণ্টিটা দশ বছরে পড়ল—তার বিয়ে এই অঘ্রাণ মাসের মধ্যে না দিলেই নয়—তারও কোনও ব্যবস্থা এ নাগাদ কর্‌বার ফুর্‌সুৎ পাচ্ছি না, তোমাদের জ্বালায়। মহা বিপদে পড়েচি, যা হোক—

গুরু। পাঁচ শো টাকা, বাবা ঠাকুর? তাই তো, এ টাকা মামলা জিৎলে ফিরে পাব তো?

ভূধর। আসল তো পাবেই, মায় সুদ সুদ্ধ পাবে।

গুরু। তবে লাগেঃ।

গুরুদাস জমী-জমা বন্ধক দিয়া টাকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল। ভূধর বারীশকে বলিল, "বারীশ খুড়ো, গুরো শালা যে আবার আপীল কর্‌তে চল্‌ল, তুমি তো বেশ নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ! বলি, শেষটা বুড়ো বয়সে ধনে প্রাণে হাবাত হয়ে অপমানী হবে? এ আমরা প্রাণ থাকতে দেখি কি ক'রে?"

বারীশ। হাঁ, বাবাঠাকুর, শুনচি তো তাই, তা' যা' হয় একটা বিহিত কর। তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসা, বাবা।

আবার জজ-কোর্টে আপীল রুজু হইল। তিন মাসের মধ্যে রায় বাহির হইল, গুরুদাস হারিয়াছে, বারীশের পূর্ব্ব ডিক্রির টাকা আরও কিছু বাড়িল।

* * * *

অগ্রহায়ণ মাসে অণ্টির বিবাহ হইল। বারীশ মাছ ও আলু প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া নগদ পঞ্চাশটি টাকাও সানন্দে সবিনয়ে বাবাঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া সকৃতজ্ঞ দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেল। সর্ব্বস্বান্ত গুরুদাস, অর্থাভাবে হাইকোর্টে আপীল করিতে অক্ষম হইলেও, বাবাঠাকুরের কন্যাদায়ে কায়ক্লেশে কর্জ্জ করিয়া কুড়িটি টাকা প্রণামী দিয়া উৎসববাড়ী হইতে দূরে হরিসভার শূন্য আটচালাটিতে গিয়া আত্মগোপন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিবাহ সব ঘরেই হয়, প্রায়ই হয়, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু ভূধরের কন্যা অণ্টির বিবাহ শুধু এ গ্রামে নয়, পঞ্চক্রোশের মধ্যে এক অভাবনীয় ব্যাপার। পল্লীগ্রামে মেলা দেখিতে বা যাত্রা শুনিতে যেমন বহু দূরের লোক পর্য্যন্ত আসে, ভূধরের জামাতা এবং তাহার বিবাহ দেখিতেও তেমনই বহু দূরদূরান্তর হইতেও লোক আসিল। তাহার কারণ, জামাতা শ্রীমান্ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, খাস বিষ্ণুনগরের এক জন প্রবীণ হাকিম। হাকিম আদালতে গেলেই দেখা যায়, যেমন দেওয়ানী ফৌজদারী জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সব আদালতের ঘরে ঘরেই আছে; তাহা ছাড়া, মাঝে রেজিষ্ট্রার, সাবডেপুটী, সার্কেল-অফিসার প্রভৃতি বিশিষ্টনামা বহু হাকিম আদালত ভরিয়া বিরাজ করে; হাকিমের সংখ্যা মক্কেলের চেয়েও বেশী। কিন্তু হাকিমের বিবাহ, এই পৃথিবীতে কয় জন ভাগ্যবান্ দর্শন করিয়াছে?

জামাতা বাবাজীবন শ্রীমান্ শম্ভুনাথের বয়স ৫৩ কি ৫৪ বৎসর। উপর্য্যুপরি দুইটি স্ত্রী সর্ব্বসাকুল্যে আটটি পুত্রকন্যা রাখিয়া সতীলোকে গমন করায়, তিতৈষী আত্মীয়-বন্ধুজনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, স্রেফ অপোগণ্ড পুত্রকন্যা কয়টির মুখ চাহিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এই তৃতীয়বার বর-সভা আলোকিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার অত্যন্ত দয়ার শরীর, কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ পিতার মর্ম্মভেদী আবেদন তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না বলিয়াই, এমন ভরদ্বাজ-কুলালঙ্কার কুলীন হইয়াও বিনা পণে এই ব্রাহ্মণকে দায়-উদ্ধার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

শম্ভুনাথের নিবাস বিষ্ণুনগরের সহরতলী কশাইপাড়া মহল্লায়। পূর্ব্বে তিনি সার টমাস্ হল্যাণ্ডের নিজস্ব বিশ্বস্ত কেরাণী ছিলেন; যুদ্ধের পর সাহেব হঠাৎ বিলাত চলিয়া গেলেন, তিনিও মনের দুঃখে চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া হঠাৎ তাঁহারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; কাঁচা বাড়ীখানি সংস্কারকালে তাঁহার অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অজ্ঞাত কোনও হয়-ত-ছিদ্দে এক খুল্ল-পিতামহীর কিছু গুপ্তধন হাতে আসায়, অচিরে এক-খানি দোতলা বাড়ী উঠাইলেন ও স্বাধীন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য পাঁচখানি তৈলের কল বসাইয়া সংসারযাত্রার পথ কিঞ্চিৎ সুগম করিয়া ফেলিলেন। নানা লোকে কিন্তু নানা কথা রটাইল।

এমন সময় নন-কো-অপারেশনের যুগে, সরকার পক্ষে লোক-গণের বিপক্ষে কিছু মুখরোচক সংবাদ দেওয়ার ফলে, তিনি হঠাৎ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার ও স্থানীয় হাকিমদিগের অত্যন্ত

প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। অবস্থা এক সময় এমন সঙীন্ হইল যে, শম্ভুনাথ রায় সাহেব হন আর কি, কিন্তু প্রস্তাবকের উপরওয়ালা মালিকরা শম্ভুনাথকে উক্ত ফাঁড়া হইতে রক্ষা করিলেন বটে, তবে শম্ভুনাথকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট না করিয়া তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িলেন না। শম্ভুনাথ সেই হইতে বেঞ্চিহাকিম, সাধারণলোকে বলিত, আনাড়ী হাকিম। তৎকালে এ পদের জন্য অন্য এক জন টমেলার ছিল; শম্ভুনাথ জনৈক বন্ধুমারফৎ সেই হতাশ হাকিমকে একটু ঠোকর দিতেও ছাড়েন নাই; বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন —"ওহে বাপু তাকে, কার সঙ্গে লাগতে আসে সে—First desire thendeserve. আগে যোগ্যি হও—তার পর হাকিম হয়ো! বাবা, বঙ্কিম বাবু লিখে গিয়েচেন—Survival of the fittest অর্থাৎ কি না যোগ্যতমের উদ্বন্ধন!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই বিবাহে, দেশে ভূধর চাটুয্যের পশার-প্রতিপত্তি হঠাৎ বাড়িয়া আরও বাড়িয়া উঠিল। কারণ, চাটুয্যে মহাশয় আর পাঁচ দশে লোক নয়, হাকিমের তৃতীয় পক্ষের শ্বশুর। বোঝা ঠেলা!

সরলা পাত্রসম্বন্ধে পূর্ব্বে তেমন কিছু শোনে নাই। ভূধর ইচ্ছা করিয়াই বলে নাই, পাছে, মায়ে ও মেয়েতে এই লইয়া রোজ রকম একটা গোলমাল বাধাইয়া, এমন সুন্দর বিনাখরচের বিবাহটা পণ্ড করিয়া দেয়! কাজেই সরলা বরকে প্রথম দেখিয়াই চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল; পরে, ভূধর যখন এই মূর্খ স্ত্রী-লোকটিকে দিব্যজ্ঞান দিল, তখন সরলা তাহার গৌরবটাকে সমাক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিয়াছিল। কি কঠিন তপস্যা করিয়া সে যে এমন জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বগুণাকর স্বামী পাইয়াছে, তাহার একটু হদিশও আজ যদি সে পাইত—তাহা হইলে এই দণ্ডেই এই নববিবাহিত স্বামীটিকে তাহা শিখাইয়া দিয়া সরলা ধন্য হইত এবং কন্যার পরজন্মের স্বামি-সৌভাগ্যের আশাতেও মা ও মেয়ে উভয়েই এক-রূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলেই দশমবর্ষীয়া অণ্টিকে হাকিম-গিন্নী হাকিম-গিন্নী বলিয়া সাদর ব্যঙ্গ করিতে লাগিল; অণ্টিও শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ উক্ত পদবীতে নিজেকে গৌরবান্বিত ভাবিতে লাগিল। স্বামী বৃদ্ধ বলিয়া একটু অশ্রদ্ধা যে প্রথমটায় অণ্টির মনের মধ্যে উঁকি মারিয়াছিল, সেটা আস্তে আস্তে মাটিতে লাগিল; হাকিমের গিন্নী হওয়াই যে তাহার একমাত্র কারণ, তাহাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়—বয়সের ধর্ম্মও তো আছে?

লোকে যাহাই বলুক্ আর ভাবুক, গৌরবে ও প্রশংসায় ফুলিবৃত্তি, লজ্জারক্ষা বা সংসার-প্রতিপালন একবারেই হয় না; এ তথ্য সরলা ও ভূধর অবিলম্বেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। অণ্টিও অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও ভূধর গ্রামে আর একজোড়া বারীশ-হুকদাস মিলাইতে পারিল না। গ্রামের মূর্খ লোকেরাও মক-দ্দমা করার ফলাফল দেখিয়া, কিছু চালাক হইয়া পড়িয়াছিল। সকলের বিশ্বাস—বারীশ জিতিয়া যাহা পাইয়াছে, গুরুদাস হারিয়াও তাহাই লাভ করিয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বনাশ। তাহারা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, অবস্থা দেখে তা হ'লে কি ক'রে জানা যাবে যে, কে জিৎল কে হার্‌ল—"

ভূতনাথ বলিল,—"অবস্থা একই হয় বটে, তবে মুখের দাপটে চিনে নিতে হবে। যে জিৎবে—সে চোট্‌পাট কর্‌বে, আর যে হার্‌বে, সে মুখটা কাঁচুমাচু ক'রে নামিয়ে থাক্‌বে। মাম্‌লার জিৎ-হারের এই চেনা—

চাষারা আশ্বস্তভাবে কহিল,—"ওঃ—এ?"

কাজেই এ দেশে এ-মন্ত্রে ভূধরের সংসার আর চলিবে না—নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সরলা বলিল, এবং ভূধরের নিজের বিশ্বাসও তাই যে, তাহার মত ক্ষণজন্মা বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ম্মস্থল এ পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র পরিসরে নহে, কলিকাতার বিস্তীর্ণ লোকারণ্যে। ভূধর আর বৃথা সময় নষ্ট করিল না, সত্য সত্যই এক দিন হুশেনপুর ইষ্টিশনের পথে "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করিল। গ্রামে বলিয়া গেল, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এষ্টেটে ম্যানেজার হইয়া সে কলিকাতা যাত্রা করিতেছে। সম্বলের মধ্যে গামছায় বাঁধা একখানি আধময়লা ধুতি, একটি তালিমারা পিরিহান ও একখানি ছেঁড়া উড়ানী এবং কাছার খুঁটে খুব ভাল করিয়া বাঁধা একখানি দশটাকার নোট ও ৩৷৵১০ ভাঙানী।

বেলা প্রায় এগারটার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই ভূধর বুঝিতে পারিল যে, কলিকাতায় ও কুমারপুরে অনেক তফাৎ। এত দিন আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও চালাকী সম্বন্ধে তাহার যে সব উচ্চ ধারণা ছিল, সেগুলি সব সাপের মুখে ব্যাঙের ডাকের মত ক্রমশঃ অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু একবার যখন ঘরের কড়ি খরচ করিয়া এত দূর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন রিক্ত হস্তে সে ফিরেই বা কি করিয়া? হাওড়া ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের কাঠাসনে বসিয়া ভূধর এইরূপ নানা কথা ভাবিতে লাগিল, কারণ, যাইবে কোথায়?

এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল, অদূরে চারি জন খেম্‌টাওয়ালী কোথাও যাইবে বলিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে বাঁয়া, তবলা, হার্ম্মোনিয়ম, চাকর, বিছানা, পাণের বাটা, সিগারেটের বাক্স এবং চৌদ্দআনা-দুই-আনা-চুলছাঁটা, পরিপাটী টেরি, চেকসার্ট গায়ে, ছেঁড়া কোটশূ পায়ে, ৪।৫ জন লোক উক্ত নর্ত্তকীদের সঙ্গে হাস্যালাপ করিতেছে; তন্মধ্যে এক জন নিবিষ্টচিত্তে বামকরতলে কি রাখিয়া দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া কোলের উপর হাত রাখিয়া গম্ভীরভাবে সজোরে কি টিপিতেছে। ভূধর আর স্থির থাকিতে পারিল না; আস্তে আস্তে উঠিয়া নীরবে সেইখানে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। অত্যল্পকাল-মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে ভূধর স্ত্রীলোকগুলির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। বড়-তামাকের প্রসাদে তখন সকলের চক্ষুই "জবাকুসুমসংকাশম্।"

খেঁদী। চাটুয্যে, আমাদের সঙ্গে মোজরায় চল না?

ভূধর। গেলেই হ'ল—

রাণী। তোমায়, ভাই, এমনি তামাক তৈরি কর্‌তে হবে খালি—

পুঁটি। মাইরী, দাদা, তোমার কথাগুলি আমার বেশ লাগে কিন্তু—

নেড়ী। শোন বেই, তোমায়, ভাই, আমার বাড়ীতে থাক্‌তে হবে; আমি বাবুকে ব'লে তোমার একটা বেশ মোটা মাইনে করিয়ে দোবো—থাকবে ত? লক্ষ্মী দাদা, থাক্‌বে ত?

ভূধর। আপত্তি কি? পেটে খেলেই পিঠে সয়।

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ভূধর এত দিন নিজেকে খুব চতুর এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়াই জানিত; কিন্তু তাহার মধ্যে যে এমন এক জন রসিক মহাপুরুষ লুক্কায়িত ছিল, আজ শ্রীশ্রীমৎ তুরীয়ানন্দজীর প্রসাদে নূতন আবিষ্কার করিয়া, মনে মনে বলিল —আর কি? এই তো প্রথম বইনে। এখন ইহাদিগকে দোহন করিতে পারিলেই তো অভীষ্ট সিদ্ধ। আনন্দের প্রাবল্যে ভূধর হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়া দিল।

গাড়ীর সময় হইল। দুই জন যুবক বাবু ইংরাজী, বাঙ্গালা ও মোগলাই তিন রকমের পোষাকের বিচিত্র সংমিশ্রণে অপরূপ-ভাবে সজ্জিত হইয়া, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—"টিকিট ক'রে এনেচি,এইবার ওঠ—সাত নম্বর প্লাটফরমে গাড়ী।" কপালে ঘাম না থাকা সত্ত্বেও, সুগন্ধি রুমালের গন্ধটি জানাইবার জন্য, ইহাদের মুখের কাছে রুমালখানি বারে বারে ঝাড়িয়া, কপাল ও মুখ মুছিতে মুছিতে অবনী বাবু কহিল—"উঃ, ছুটী কি দেয়, শালা? সাহেব ছুটী মঞ্জুর করলে, বড়-বাবু আমার বড়-কুটুম্ব, বলে কি না, তিনটের সময় যেও—বাপস্ —একেবারে দশ হাত জলে আর কি?" বলিয়া খেঁদীর হাত হইতে অর্দ্ধ-ভুক্ত সিগারেটটি লইয়া, ইঞ্জিনের ষ্টীম্ ছাড়ার মত সজোরে একটা টানের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল। ভূধর হাঁ করিয়া বাবুদের মুখপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া ছিল।

খেঁদী বাবু-দুই-জনের সঙ্গে ভূধরের পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিল—"চট ক'রে এরও একখানি টিকিট নিয়ে আয় তবে।"

অবনী বাবু। যা ভাই রাধু, আর একখানা টিকিট দৌড়ে নিয়ে আয়—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, একটু বসি।

রাধাপদ বাবু টিকিট আনিতে গেল।

মজুরা হইতে ফিরিয়া, ভূধর ধূলা-পায়ে, শ্রীমতী নেড়ির গৃহেই প্রবেশ করিল এবং পঁচিশ টাকা বেতনে বাবুর দুই নম্বর খাস-মহালের চৌকীদারী-অফিসার নিযুক্ত হইল। সরলাকে পত্র দিয়া জানাইল যে, ঠাকুর-এষ্টেটে মাইনে কম, খাটুনি বেশী বলিয়া ভাগবত দাঁর খাসমহলে প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছে। এ নেড়ি-মহলের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভাগবতচরণ দাঁ। বলিতে ভুলিয়াছি, ভূধর কিন্তু তাহার নাম বলিয়াছে ধরণীধর, আর বাড়ী বলিয়াছে কাশিমবাজার। বলিহারি ভূধর, বাস্তবিকই তোমার বুদ্ধি আছে! বাবুরা এখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাত-পুরুষের পরিচয় দেন, আর তুমি সত্য পরিচয়টাও লুকাইলে!

তিন মাস বাদ অতিকষ্টে ভূধর শ্রীমতী নেড়ীকে ধরিয়া তবে পঞ্চাশ টাকা বেতন আদায় করিয়া দেখিল যে, এ চাকুরীতে তাহার সুবিধা হইবে না। যদিও খাই-খরচ বাসা-খরচ কিছুই লাগে না, তবু উপরি নগদ-নারায়ণ কিছু হাতে না লাগিলে কি মন বসে? টাকার চেয়ে টাকার সুদ যে বড় মিষ্টি, ছেলের চেয়ে নাতি যে প্রিয়তর।

ভূধর প্রথমটা ভাবিয়াছিল যে, এই সকল দুগ্ধবতী গাভী দোহন করা নিতান্তই সহজসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিয়া দেখিল, তাহা ঠিক নয়—ভূধর এখনও ইহাদের কাছে শিশু। ভূধর কতকটা নিরাশ হইল, কিন্তু দমিল না।

তিন মাসের মধ্যেই ভূধর এ গল্লীতেও নগদ উপায়ের এক অদ্ভুত ফন্দী বাহির করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যা হইতে, যেমনি ভাগবত-বাবু আসিলেন, অমনি বাহির হইয়া, রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত চিৎপুর, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, গরাণ-হাটা, চিত্তরঞ্জন-এভেনিউ ও রামবাগানের তেমাথায় গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত ও অপরিপক্ক ও তরুণ নাগর-নবীশদিগকে কুঞ্জে পৌঁছাইয়া দিয়া, প্রত্যহ বেশ ৫।৭ টাকা কামাইতে লাগিল। এক দিন ভাগবত-বাবু ইহা জানিতে পারিয়া ভূধরকে তাড়াইয়া দিলেন। বিদায়ের দিন ভূধর শ্রীমতী নেড়ীর দেরাজ খুলিয়া ১৪ ভরির হার ও ১২ ভরির সোনার চুড়ী দশগাছা অম্লানবদনে পকেটে ফেলিয়া প্রসন্ন অন্তরে গৃহত্যাগ করিয়া হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভূধর ওরফে ধরণীধর উত্তর-অঞ্চলে পাঁচ ছয়টি গৃহ উত্তরূপে বড়বিস্তার প্রভায় আলোকিত করিয়া, অবশেষে এক দিন দক্ষিণদিকে গমন করিয়া, মা-কালীর শরণাপন্ন হইল। মাথায় বড় বড় চুল, লম্বা দাড়ি, গলাতে বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র—দেখিয়া ভূধরকে আর চেনাই যায় না। এ যেন অতীত যুগের এক কাপালিক। শুনা যায়, সহরের দুষ্ট লোকদের জ্বালায় এই সময়ে চেহারার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন নাকি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বেশ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও তৃতীয় সংস্করণ হইল; প্রথম সংস্করণের ভূধর, দ্বিতীয় বারের ধরণীধর, এক্ষণে ধূমানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া, দিবারাত্র গঞ্জিকার ধূমে মত্ত হইয়া থাকিতে লাগিল। প্রায় এক বৎসরের মধ্যে ভূধর যে স্বীয় প্রচ্ছন্ন প্রতিভায় এতটা উন্নত লাভ করিতে পারিবে, ইহা সে ইতিপূর্ব্বে নিজেই অবগত ছিল না বলিয়া, নিজের ক্ষমতায় এখন নিজেই চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

এ দিকে কুমারপুরে ভূধরের প্রায় ৭।৮ মাস কাল কোনও কুশল সংবাদাদি না পাইয়া,সরলা তো পাগলের মত হইয়া উঠিল। ঘরে যৎসামান্য অর্থ ছিল, তাহা বহু দিন খরচ হইয়া গিয়াছে; ভূধর ২।৩ বারে যাহা পাঠাইয়াছিল, বহু মিতব্যয়সত্ত্বেও তাহা ফুরাইয়াছে; অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, সে সমুদায়ই আবার বন্ধক পড়িয়াছে। ঘরের মটকা উড়িতেছে, কন্যা দুটির পরিধান-শাড়ীর একান্ত অভাব, সাংসারিক খরচের ভীষণ টানাটানি, তাহার উপর স্বামীর কোনও সংবাদ নাই; সরলা আর কুমারপুরে থাকিতে পারে না।

সরলার এক ভাই ও তিন ভগিনী। ভাই সত্যকিঙ্কর সকলের জ্যেষ্ঠ, নেপালে থাকে, অধ্যাপনা করে; কালে-ভদ্রে দেশে আসে। তাহার কাছেই মধ্যমা ভগিনী মঙ্গলাও থাকে; মঙ্গলা বাল-বিধবা। তৃতীয়া সরলা। চতুর্থী ভগিনী বিমলা, এখনও অবিবাহিতা, বয়স প্রায় পনের বৎসর হইল। সত্যকিঙ্কর বিবাহের সব ঠিক করিয়া, মাত্র ১৫ দিনের ছুটী লইয়া বিমলার বিবাহ দিতে বাড়ী আসিয়া, সরলাকে লইয়া গেল। সরলার পিত্রালয় নবীনগর, কুমারপুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে।

বিমলার বিবাহ হইল ভালই। পাত্রটির নাম অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এক জন ডাক্তার, নিবাস মালদহ; সংসারে ইহার কেহই নাই। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে ছিল, এখন বড় হইয়া উপায়ক্ষম হইয়াছে। মামারা মারা গিয়াছেন; মামীরা ও মামাতো ভাইরা তেমন আদর করে না—মফস্বলও আর মামার বাড়ী যায় না। ছেলেটি খুব ভাল, স্বভাব-চরিত্র বড় মধুর, ডাক্তারী-জানা ডাক্তার, পাশ-করা হাতুড়ে নয়। চাকরী করে না, ঝরিয়ায় স্বাধীনভাবে ডাক্তারী করে।

বিবাহের ২।১ দিন পরেই সত্যকিঙ্করের যাইবার তাড়া পড়িল। সরলা ও মঙ্গলাকে বাড়ীতে রাখিয়া সত্যকিঙ্কর সপরিবারে আবার নেপাল রওনা হইল।

অতুলের গৃহে বিমলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে সংসারের কাজ-কর্ম্ম কিছুদিন শিখাইয়া দিবার জন্য মঙ্গলাকে সত্যকিঙ্কর কিছুদিনের জন্য রাখিয়া গেল। কিন্তু সরলার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া, তাহাকে এ ভাবে একা ফেলিয়াও আর কেহ যাইতে পারে না। কাজেই, অতুল প্রস্তাব করিল, মঙ্গলা ও বিমলা সমর্থন করিল, সরলাকেও অতুলের বাসায় লইয়া যাইবার জন্য। সরলার আর কোনও ওজর আপত্তি টিকিল না—যাইতেই হইল।

আরও প্রায় এক বৎসর যায়-যায়; অতুল বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু ভূধরের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। ও দিকে সত্য-কিঙ্করও নেপাল হইতে অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহার ফলও এই এক রকমই হইল। ভূধরের জন্য সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। সরলা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কাঁদে। ঘন্টির বয়সও প্রায় এগার বছর হইতে চলিল।

ভাদ্র মাস। সকাল। বেলা প্রায় ৯টা। অতুলের ডাক্তার-খানায় স্থানীয় ৮।১০ জন নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোক চা-পানান্তে পাণ ও সিগারেট-মুখে পৃথিবীর যত অনাবশ্যক কথার তুমুল আলোচনায় ব্যস্ত, এমন সময় জনৈক সাধু বৈষ্ণব 'জয় রাধাগোবিন্দ' বলিয়া দ্বারে প্রবেশ করিয়া, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া একখানি লোহার চেয়ারে গিয়া বসিয়া, তাহার দপ্তর খুলিতে মনোনিবেশ করিল। মতুল ও তাহার বন্ধুগণ, বৈষ্ণবের এবম্বিধ সাহসে নির্ব্বাক্ হইয়া বৈষ্ণবের মুখপানে অপ্রসন্নভাবে চাহিয়া রহিল। সব তর্ক এক-বারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

বৈষ্ণব বলিল, "আমি আপনাদের কথাবার্ত্তায় ব্যাঘাত দিলাম, আমায় মাফ কর্‌বেন্।" বলিয়া একখানি বাঁধান ছেলে-দের এক্সারসাইজ বই নিকটোপবিষ্ট তারাপদ বাবুর হাতে দিয়া সোৎসুকভাবে সকলকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সমবেত সকলেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই খাতার লেখাগুলি মনোযোগ-সহকারে পড়িতে লাগিল।

খাতায় লিখিত ব্যাপারের সংক্ষিপ্তসার এই:—ইনি স্বনাম-ধন্য কৃষ্ণদাস বাবাজী, এক জন চিরকুমার, আজন্ম-ব্রহ্মচারী ও সিদ্ধ মহাত্মা। বহু অলৌকিক বিষয়েও ইনি বিভূতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীধাম নবদ্বীপে একটি পরাবিদ্যার টোল, একটি বিধবা ও অনাথ আশ্রম, একটি দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় ও যুগলমূর্ত্তির মন্দিরনির্ম্মাণ করিতে চাহেন। সম্প্রতি ইঁহার নিকট ৩৮ জন ছাত্র পড়ে; তন্মধ্যে ১৬ জন উপনিষদ, ৭ জন বেদ, ৪ জন পুরাণ, ২ জন জ্যোতিষ, ৪ জন দর্শন ও ৫ জন বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছে। স্থানাভাববশতঃ বহু ছাত্রকে প্রায় প্রত্যহই বিদায় দিতে হইতেছে, ইত্যাদি বহু ভূমিকাসম্বলিত এক অর্থসাহায্যের আবেদন। তৎসঙ্গে দাতাদিগের নাম, দানের পরিমাণ ও তারিখসহ একটা লম্বা ফর্দ্দও ছিল। ইহাতে ছিল—মহারাজাধিরাজ দ্বারভাঙ্গা ৫০১, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান—৫০১, এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশীয় তাবৎ মহারাজা, রাজা, জমীদার হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম-সহি-করা দানের এক ছয়-পৃষ্ঠাব্যাপী তালিকা। তালিকার বিশেষত্ব এই যে, স্বাক্ষরিত দানগুলির মধ্যে ২৫ টাকার কম একটিও ছিল না।

এই সব পরিদর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজীর উপর সকলের প্রথমে যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছিল, সেটা ক্রমশঃ কাটিয়া গিয়া তাহার স্থানে প্রচুর শ্রদ্ধা ও ভক্তিরই বন্যা আসিল। অতুল বলিল, "তা হ'লে অন্য এক সময় আসবেন, আমরা সবাই মিলে একটা মোটা রকমের কিছু তুলে আপনাকে দেব। এ বেহার—বাঙ্গালী যে কয়জন আমরা এখানে আছি—সবাই আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় গজেন্ ঘোষের অর্থাৎ আমাদের সরকারী গজেন্ দাদার বৈঠকখানায় জমায়েৎ হই; সেখানে সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে তার পর আপনাকে খবর দেব। আপনি কোথায় উঠেচেন এখানে?"

কৃষ্ণদাস। আমি এখানে এসেচি এই ঘণ্টাখানেক প্রায় হ'ল, ভাগা দিয়ে এলাম। এখনও কোথাও উঠি নাই, তা হোক্ গে, তার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হবেন না—সে প্রভু নিত্যানন্দ আছেন। যা হয় একটা হবেই—

অতুল। তা হলে আমার এইখানেই যদি দয়া ক'রে—

কৃষ্ণ। আপনি ব্রাহ্মণ, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। আমার জন্য আপনাদের কোনও কষ্ট না হলেই হ'ল।

অতুল জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল যে—তাঁহার আহারে কোনও প্রকার বাছ-বিচার নাই। বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহাকে যে আতপ চাউল নিরামিষ খাইতেই হইবে, তাহা তিনি বিশ্বাসও করেন না, মানেনও না। অতুল বাড়ীতে খবর দিতে ছুটিল। বাড়ীর মেয়েরা পুণ্যার্জ্জনমানসে একপাটি জানালা খুলিয়া, পর্দ্দাটি একটু সরাইয়া এই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে লাগিল।

বাবাজীর ক্ষীণ তপোজীর্ণ কৃশ দেহ, মস্তক মুণ্ডিত; গোঁপ-দাড়ি কামানো, সর্ব্বাঙ্গে তিলক, তদুপরি নামাবলী; পরিধানে পীতাম্বর, পায়ে খড়ম, কাঁধে একটি বৃহৎ থলে, বগলে দপ্তর, মাথায় মস্ত এক শিখা।

বন্ধুগণ আস্তে আস্তে উঠিল; কারণ, আর একটু বসিলেই চাঁদার খাতায় নাম-সহি করিতে হইবে। অতুল বাল্যাবধিই একটু সাধু-সন্ন্যাসিভক্ত, বাবাজীকে নিরিবিলি পাইয়া, ধীরে ধীরে সাধনভজন সম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, বাবাজী উত্তর দিতেছে, এমন সময় ভিতরে তাহার ডাক পড়িল; জোর তলব। অতুল অন্দরে গেল।

বাহিরে আসিয়া অতুল বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজী মশায়, জ্যোতিষ জানেন কি আপনি?"

বাবাজী। হাঁ, সামান্য, একটু সামান্য জানি বৈ কি। প্রভু নিতাই, প্রেম দাও (হাঁই তুলিলেন)—

অতুল। আমার হাতটা একবার তবে দেখুন না।

বাবাজী। (হাত দেখিতে দেখিতে) এবার আপনার বড় সুবৎসর যাচ্ছে। গুরুলাভ—ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ, যশ। বর্ত্তমানে আপনার দুইটি সন্তান কি? পিতা নাই, মাতা আছেন। ভাই-ভগিনীও বর্ত্তমান,অন্তর বড় দয়ালু,সাহসী, ধার্ম্মিক,পরোপকারী—

অতুল। ঠিক মিল্‌চে।

বাবাজী। তা মিল্‌বে না? জ্যোতিষশাস্ত্র এক রকম অঙ্কই কি না? দুই আর দুয়ে যেমন চার হতেই হবে, এ সব তেমনি মিল্‌তেই হবে। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ হে—

অতুল। মেয়েরা বড় ব্যস্ত হয়েচেন, তাঁদের হাতটাও যদি অনুগ্রহ ক'রে একবার—

বাবাজী। চলুন না, আপত্তি কি? দয়াল গৌর হে—

ভিতরে আসিয়া অতুল প্রথমে মঙ্গলার হাত দেখাইল; বাবাজী কহিল, ইনি বিধবা আত্মীয়ের ঘরে বসবাস করিতেছেন, অন্তর অতি মহৎ, সেবা, দয়া ও স্নেহপরায়ণা।

অবগুণ্ঠনবতী সরলার হাত দেখিয়া বাবাজী কহিল—ইনি স্বামি-সোহাগিনী, শীঘ্রই কিছু গুপ্তধন পাইবেন, শত্রুসংখ্যা এঁর খুব বেশী, পুত্রকন্যাগুলি প্রায়ই অসুস্থ থাকে, ইনি নিজেও মাঝে মাঝে অসুস্থ হন, বৈধব্য নেই। পরমায়ু প্রায় ৮০ বৎসর, শেষ বয়সে বহু তীর্থদর্শন, মন্দির প্রতিষ্ঠা—

হঠাৎ ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সরলা বলিল, "তোমার মাথা প্রতিষ্ঠা! লক্ষ্মীছাড়া ভিখিরী, ঠক্ বিটলে, এই তোমার মেনাজারী করা! আ পোড়াকপাল! এমনি ক'রে লোক ঠকিয়ে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি দেশময়? গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াই সরলা হাপুস-নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

কৃষ্ণদাস ওরফে ভূধর ত অবাক্! তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল, মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল, ভায় পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ভূধর যে কি হইয়া গেল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

মঙ্গলা। আমায় চিন্‌তে পার বোষ্টমঠাকুর? এ অতুল—আমাদের ছোট বোন্ বিম্‌লীর সোয়ামী। বিম্‌লীকে মনে পড়ে কি? সেই যে তোমার যেবার বিয়ে হয়, সেইবার হয়েছিল?

ঘণ্টি ও নণ্টিকে এতক্ষণ ঘরে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তবু ভূধর একটু নড়িলও না—চড়িলও না, একটা কথার উত্তর পর্য্যন্ত করিল না।

ভূধরের তখনও বিহ্বল ভাব কাটে নাই, স্থানীয় দারোগা অতুলকে ডাকিল। অতুল বাহিরে যাইতেই দারোগা কহিল, "করেচেন কি ডাক্তারবাবু, কাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েচেন? এ যে এক জন বিখ্যাত চোর, জোচ্চোর, খুনে, গুণ্ডা। এঁর অনেক গুণ—অনেক কীর্ত্তি, নোট ডবল পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেন। সম্প্রতি বিয়ে সেজে এক বস্তির মেয়ে বিয়ে করে,কিছু টাকা মেরে পালিয়েচেন। আজ তিন বছর ধ'রে উনি কি কম নাকালটা করেচেন আমাদের? এই দেখুন—কলকাতা থেকে এঁর পিছন পিছন এঁরাও সবাই ধর্‌তে এসেচেন। এঁর নামে সাতখানা ওয়ারেণ্ট।"

অতুল নির্ব্বাক্, ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পুলিসের লোকেরা আস্তে আস্তে বাটীর ভিতর ঢুকিয়া, ভূধরের হাতটি ধরিয়া যেমন হাতকড়ি পরাইল, অমনি ভূধরের চৈতন্য হইল। তখন বাড়ী লাল-পাগড়ীতে ভরা। বাড়ীসুদ্ধ সবাই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শীতের বাতাস

শীতের বাতাস, শীতের বাতাস, কি ব্যথা জানাস্ মোরে?
তোর শ্বাসে হায় আশা ঝ'রে যায় হিয়া কাঁপে থর থরে!
যারা ভুলে আছে, যারা দূরে যায়,
যারা চিরদিন বিরহে কাঁদায়
তোমার মতন তারা যেন হায় আমার সুমুখে এসে—
বিষ-ভরা সূচী বিঁধে দিয়ে গায় ফিরে ফিরে যায় হেসে!

শীতের বাতাস, মরণের সম শীতল পরশ তোর!
প্রভাতের চোখে দেখা দেয় তাই দুখের শিশির-লোর!
শ্বেত কুহেলীর বসন পরিয়া
ধরণী যে থাকে মুখ আবরিয়া
আমলকী-শাখে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শোকের বেদন ভরে;—
তারকার চোখে অশ্রু প্লাবিয়া নিশীথে রোদন করে!

শীতের বাতাস, ফিরে ফিরে যাস্—বুকভরা হাহাকার!
তোর সম দুখী মরতের পরে নাই, নাই কেহ আর!
কামিনী কুসুম কোথায় লুকায়
সবুজ যে পাতা বোঁটাতে শুকায়
ফোটে না ত কেউ তোর কালে হায়, হতাশ প্রেমিক তুই!
পারুল ফোটে না, কমল ফোটে না, ফোটে না বকুল যুঁই!

শীতের বাতাস, তোর তরে নহে ফাগুন-দিনের সুখ!
তোর তরে শুধু হিম-দেহ পৌষ মাঘের শীতল দুখ!
অতল বিষম কালো সরোবর—
যেথায় রয়েছে মরণের ঘর,
সেথায় নিশীথ ম্লান শশিকর তোমার পরশভরে—
তোমার মতন মরিবারে চায় ঢেউ-ভাঙ্গা বুক 'পরে!

শীতের বাতাস, অবসাদ-ভরা নিরাশ জীবন তোর!
যার কাছে যাস্ সে-ই ত পালায় পরায় না প্রেম-ডোর!
তোমার জীবনে ডাকিল না পিক,
দোয়েলের গানে ধ্বনিল না দিক্,
যে-ই শুনে সে-ই করে ধিক্ ধিক্ দেয় রে গ্লানির ডালি!
ফাগুনের আগে মাঘের সীমায় দুখেতে মরিবি খালি!

শীতের বাতাস, ফিরে কেন যাস্ এই বুকে আয় আয়!
সুখ-তাপ-হীন শীতল কঠিন আমার প্রাণের ছায়!
হেথা আছে পৌষ, হেথা আছে মাঘ—
নাই রে ফাগুন, নাই অনুরাগ?—
মধু মাস হেথা ফেলে নাই দাগ, নাই রে আশার রেখা!
শীতের বাতাস, এ গিরিগুহায় সখার পাইবি দেখা!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।



জাতীয় মহাসভা

মাদ্রাজ সহরে কংগ্রেসের দ্বিচত্বারিংশত্তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সঙ্গে প্রথামত নানা কনফারেন্সের ও সভাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতিবৎসর বড়দিনের পর্ব্বে ভারতের কোন-এক কেন্দ্রে এই ভাবের অধিবেশন হইয়া থাকে। এবারও তাহাই হইয়াছিল। এ সকলের মধ্যে কংগ্রেসই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। অপরগুলি হয় সাম্প্রদায়িক, না হয় এক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কংগ্রেসে সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের স্থান আছে। এই হেতু ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব-প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, নানা কারণে আজ কয় বৎসর হইতে ইহা রাজনীতিক ও ধর্ম্মগত মতভেদের ফলে কংগ্রেসে একতার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সুরাটে ভাঙ্গনের পর হইতে কংগ্রেস যেন কংগ্রেস হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। উৎসাহী দলটা যতটা অগ্রসর হইতে চাহে, যাঁহারা কষিয়া মাজিয়া কাজ করিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইতে চাহেন, সেই প্রাচীনের দল তাহাদের মতে সায় দিতে না পারিয়া কংগ্রেস বর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। তাহার পর লক্ষ্ণৌ সহরের অধিবেশনে একবার মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাতে কিছু ফলও যে না হইয়াছিল, এমন নহে; কিন্তু কাচ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে যোড়া লাগা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই সে মিলনের মধ্যেও বিরোধ সুপ্ত ছিল। বিশেষতঃ ধর্ম্মগত মতপার্থক্যের ফলে দেশের প্রধান দুই দল, হিন্দু ও মুসলমান, পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ফলে ঐ ভাঙ্গনে সাময়িক একটা মিলন ঘটিল বটে, কিন্তু উহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা ছিল না। তাহার পর গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানে মিলন হইয়াছিল। সে সময়ে দেশে যে অবস্থার উদয় হইয়াছিল, তাহার তুলনা ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কংগ্রেসী দলের মুষ্টিমেয় কয়জন লোক কংগ্রেস বর্জ্জন করিলেও দেশের অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমান সেই সময়ে একমন একপ্রাণ হইয়াছিল। তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনায় যে একতা দেখা দিয়াছিল, ঐ সময়ে সারা ভারতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক একতা ও ত্যাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সকলেই আশায় উৎফুল্ল হইয়া মনে করিয়াছিল যে, স্বরাজ মুক্তির আর বিলম্ব নাই। তখন কঠোর আমলাতন্ত্র সরকারও দেশের রাজনীতিক আলোচনার ফলে কঠোরতা পরিহার করিয়া শান্ত হইতে হইয়াছিল, দেশের লোকের ইচ্ছানুসারে কার্য্যের কথায় প্রায় সম্মত হইতে হইয়াছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের এত সুখ অদৃষ্টে সহে নাই। আমলা-তন্ত্র সরকার কাউন্সিলের টোপ ফেলিলেন, দেশের লোকও সেই টোপ গলাধঃকরণ করিল। নির্ব্বাচনাধিকার ও চাকুরী লইয়া আবার দেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে মন-কষাকষি আরম্ভ হইল, পরন্তু অসহযোগব্রতী অহিংসার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইল, ত্যাগস্বীকারে অসমর্থ হইল। ফলে আবার দেশে স্বার্থদ্বন্দ্ব প্রবল আকারে দেখা দিল। এই দ্বন্দ্ব আপাততঃ ধর্ম্মগত বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিগত; কেন না, রাজনীতিক অধিকারলাভের সম্পর্কেই স্বার্থদ্বন্দ্বের হলাহল উত্থিত হইয়াছিল। এমন ভীষণ দ্বন্দ্ব দেশে আর কখনও দেখা দেয় নাই। এই সুযোগে আমলাতন্ত্র শাসকও আবার নষ্ট শক্তি ও প্রভাব উদ্ধার করিয়া লইলেন।

বহুভাগ্যে জাতির মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। কত ত্যাগ, কত সহিষ্ণুতা, কত দৃঢ়সঙ্কল্পতা থাকিলে জাতি একমন একপ্রাণ হইতে পারে এবং তাহার ফলে আপনার মুক্তি আপনি সাধন করিয়া লইতে পারে,—ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হয় ত জাতির জীবনে একবার সেই সুযোগ আসিতে পারে। ভারতের ভাগ্যে একবার অসহযোগ আন্দোলনের দিনে সেই সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু সে সুযোগ জাতি নিজের দোষে হারাইয়াছিল। তাহার পর আবার এই সাইমন কমিশনের কল্যাণে আর একবার সেই সুযোগ আসিয়াছে। এই সৌভাগ্যলাভ স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা দয়া করিলে কি হয়, আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, বিধাতার এই দান আমরা লইব না। এমন হতভাগ্য জাতি জগতে আর একটি আছে কি? কান্ত কবি রজনী সেন গাহিয়াছিলেন,—

"ও পথে যেয়ো না, ফিরে এস ব'লে
আমার কানে কানে কত কয়েছ।
আমি তবু চ'লে গেছি, আমায় ফিরায়ে আনিতে
আমার পাছে পাছে তুমি গিয়েছ॥"

ইহাও কতকটা সেইরূপ। সকলেই ভাবিয়াছিল, দেশের এই ঘোর সঙ্কটের দিনে—পরন্তু এই সন্ধিক্ষণে দেশের লোক সকল দলাদলি ভুলিয়া গিয়া একমন একপ্রাণ হইয়া সাম্রাজ্যগর্ব্বী শাসক সম্প্রদায়ের সদম্ভ উক্তির যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিবে। যাহারা ভারতের ভাগ্যবিধাতা সাজিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে উদ্যোগী হইয়া ভারতীয়কে সেই নির্দ্ধারণ কালের সলাপরামর্শে আহ্বান না করিয়া ভারতকে অপমানিত ও অপদস্থ করিয়াছে, তাহাদের 'নির্দ্ধারণের' সহিত কোন সম্পর্ক না রাখাই ভারতীয়মাত্রেরই আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচায়ক। কংগ্রেস জাতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই কংগ্রেসে

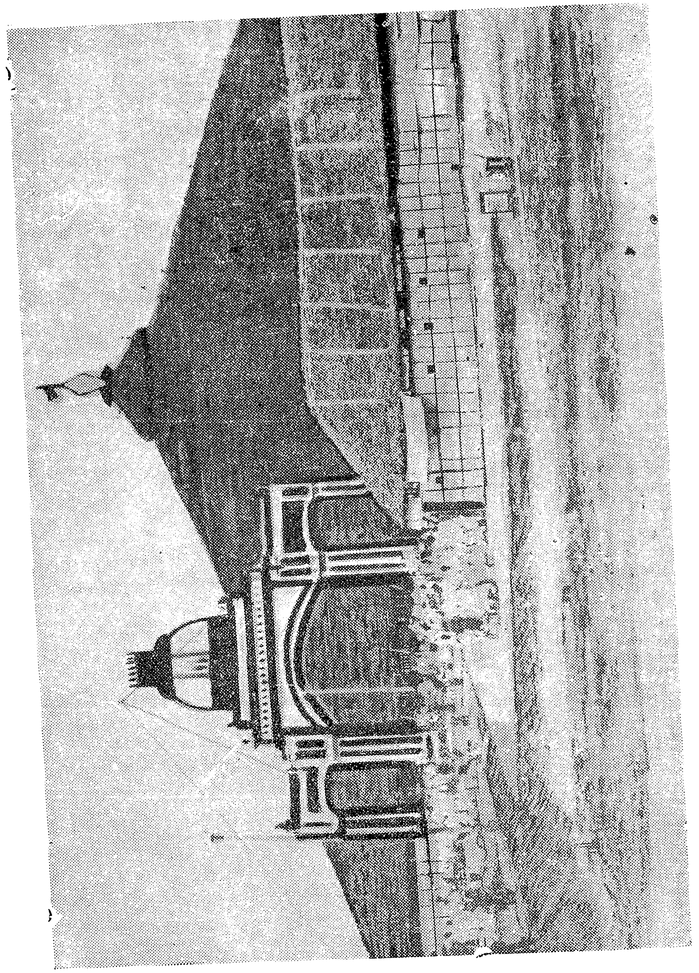

মাদ্রাজ কংগ্রেসের মণ্ডপ তোরণ



কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

সকলে দলাদলি ভুলিয়া, মিলিত হইয়া এই স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অটল অচল হিমাচলের মত দণ্ডায়মান হইবে, এই আশা করা অসঙ্গত হয় নাই। প্রথমে যেরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে একযোগে ভারতবাসীর দণ্ডায়মান হওয়ার কথা অলীক-কুসুম বলিয়া মনে হয় নাই। এক দিকে অসহযোগকামী কাউন্সিলত্যাগী ও স্বরাজী, অন্যদিকে সহযোগকামী মধ্যপন্থী লিবারল ও মডারেট; এক দিকে পণ্ডিত মদনমোহন ও লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ হিন্দু সভার নেতৃগণ, অন্যদিকে সার আবদর রহিম ও মিঃ মহম্মদ আলি প্রমুখ মুসলমান-স্বার্থের প্রবল সংরক্ষক,—অর্থাৎ ভারতের কোন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকই এই সাইমন কমিশনকে মানিয়া লইতে চাহেন নাই। আসমুদ্র হিমাচল রব উঠিয়াছিল,—বর্জ্জন কর। তাই মনে হইয়াছিল, হয় ত বিধির অনভ্যা বিধানে এই সাইমন কমিশনের মারফতেই ভারতে অসম্ভবও সম্ভব হইবে,—দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে অসহযোগী সহযোগকামী, হিন্দুমুসলমান, চরমপন্থী মধ্যপন্থী, সকলেই একমন একপ্রাণ হইয়া যোগদান করিবে। এই হেতু এবারের কংগ্রেসের একটা বৈশিষ্ট্যের আশা সকলেই করিয়াছিল। সেই আশা সমূলে বিনষ্ট হইল!

মাদ্রাজে কংগ্রেস বসিল, কিন্তু তাহাতে মডারেট ও মুসলমানরা যোগদান করিলেন না। হিন্দুসভার বহু গণ্যমান্য সদস্যও যেন কংগ্রেস হইতে দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লিবারল কনফারেন্স ও মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র বসিবার কথা ধার্য্য হইল। অর্থাৎ ভারতবাসী জগৎকে তাহাদের অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়া বলিল, "আমরা সকলেই সাইমন কমিশন চাহি না, এ কথা ঠিক; কিন্তু সে কথা আমরা প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের কথায় জগৎকে জানাইব, একযোগে মনের কথা ব্যক্ত করা আমাদের ধাতুসহ নহে। আমাদের দাস মনোবৃত্তির ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়।"

এই হিসাবে এ বারের মাদ্রাজ কংগ্রেস সফল হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যে সর্ব্বনাশকর রাজনীতিক মতবিরোধ আমাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উহা আমাদের জাতিগঠনের ও জাতীয়তার স্ফুরণের কিরূপ পরিপন্থী, তাহা কি আমরা ভারিয়া দেখিবার সামর্থ্যও হারাইয়াছি? বার বার ঠেকিয়াও যদি আমরা না শিখি যে, মিলনে শক্তিসঞ্চয় আর বিরোধে শক্তিক্ষয়, তাহা হইলে আমাদের মুক্তির আশা কোথায়? কেবল কংগ্রেস কনফারেন্স আর মোশান রেজোলিউশানে জাতির মুক্তি সাধিত হইবে না, উহাতে জাতির শক্তির অপচয় ঘটিতেছে মাত্র।

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার আনসারি দেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল শ্রেণীর লোককেই কংগ্রেসে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, মডারেট ও মুসলমান সেই আহ্বানে সাড়া দেন নাই। কেন,—এ কথা দেশের লোক অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারে। যদি তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে, কংগ্রেসে তাঁহাদের মতের পরিপন্থী মন্তব্য পেশ বা গৃহীত হইবে, তবে তাঁহারা সেই সমস্ত মন্তব্য পেশকালে সভায় অনুপস্থিত থাকিতে পারিতেন, অথবা পেশ হইলে সেগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে পারিতেন। কেবল সাইমন কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব পেশকালে সকলের সহিত যোগদান করিয়া উহার সমর্থন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে উহাতে আর কিছু না হউক, জগতের লোক জানিত যে, সাইমন কমিশন বর্জ্জন বিষয়ে ভারতবাসী একমতাবলম্বী। এই সুযোগ কংগ্রেসকে প্রদান করা প্রত্যেক দেশহিতকামীর কর্ত্তব্য ছিল না কি?

যাহা হউক, কংগ্রেস পূর্ণাবয়ব না হইলেও কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করে নাই। এবার দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার কথা,—সাইমন কমিশন, হিন্দু-মুসলমান-মিলন এবং দেশের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতির ধারা ও পদ্ধতি নির্ণয়। কংগ্রেস এই তিনটি বিষয়ে বিচার আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনার সিদ্ধান্তফলে কি হইবে, ভবিষ্যৎই তাহা নির্ণয় করিয়া দিবে। কংগ্রেসে অন্যান্য অনেক কথাও আলোচিত হইয়াছে। এমন

প্রতিবৎসরই হইয়া থাকে। ঐ সম্পর্কে নূতন কথা কিছু বলিবার নাই।

সভাপতির অভিভাষণ

মাদ্রাজ ঃ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ডাক্তার আনসারি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা-সমূহের প্রায় সকল দিকই আলোচিত হইয়াছে, এ কথা সত্য; তবে সমস্ত অভিভাষণ পাঠ করিয়া দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, তাঁহার অভিভাষণে স্বদেশপ্রেমের ও দেশের উন্নতিকামনার আন্তরিক অভিব্যক্তি থাকিলেও উহাতে দেশবাসীকে বর্ত্তমান সঙ্কটকালে কর্ত্তব্য পথ সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হয় নাই। দেশের হিন্দুমুসলমান সমস্যা যখন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে, তখন ডাক্তার আনসারির মত প্রকৃত মিলনকামী মুসলমান নেতাকে দলপতির পদে বরণ করিয়া দেশবাসী বিশেষ বিবেচনারই পরিচয় দিয়াছেন এবং ডাক্তার আনসারিও নির্ভীক ও স্পষ্ট কথায় মিলনের অন্তরায়গুলিকে লোকচক্ষুর সমক্ষে কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্যপালনই করিয়াছেন; পরন্তু তিনি মিলনের পন্থাগুলিকে দোষরহিত করিবার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া দেশবাসীর মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি গঠনমূলক কার্য্যের পন্থা সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার অভিভাষণ তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে নাই।

ডাক্তার আনসারি অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, এ যাবৎ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ভারতবাসী তিনটি পন্থা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, যথা,—সহযোগের পথ, অসহযোগের পথ এবং বাধা-প্রদানের পথ। সহযোগনীতি ৩৫ বৎসরকাল অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাচীনপন্থীদের বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজ যথার্থই ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দানের পক্ষপাতী, অতএব তাহাদের সহিত সহযোগ করিয়া নিয়মানুগপথে আন্দোলন ও আবেদন-নিবেদন করিলেই ভারতীয়ের অভীষ্টলাভ হইবে, ইংরাজ ভারতকে ক্রমে ক্রমে স্বরাজ দান করিবেন। কিন্তু ৩৫ বৎসরকাল সহযোগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা দ্বারা ভারতীয়ের ঈপ্সিত ফললাভ হয় নাই, উহা সুদূরপরাহত। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজ ও ভারতীয়ের আদর্শ এক নহে, সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে সহযোগ সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ আজ যদি উভয়ের মধ্যে সহযোগ সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সার তেজবাহাদুর সপরু ও সার আলি ইমামের মত সহযোগকামীরা সাইমন কমিশন উপলক্ষে সহযোগের পথ ত্যাগ করিয়া বর্জ্জনের পথ গ্রহণ করিতেন না।

যাঁহারা অসহযোগে আস্থাবান্, তাঁহাদিগের একাংশ কাউন্সিলের মধ্যে থাকিয়া বাধাপ্রদান করিয়া দ্বৈতশাসন অচল করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারাও ৪ বৎসর অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়াও সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। আমলাতন্ত্র-শাসন তাঁহাদের কঠোর আক্রমণ সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখনও অচল হয় নাই, ধ্বংস ত হয়ই নাই। সুতরাং বাধাপ্রদান-নীতিও কার্য্যকর হয় নাই।

তৃতীয় পন্থা অসহযোগ। ইহাতে দেশের মুক্তির প্রকৃত কার্য্যের ভিত্তিপত্তন হইয়াছিল। দেশ মহাত্মা গন্ধী-প্রদর্শিত অহিংস-অসহযোগ নীতিতে মাত্র বৎসরাধিককাল অবিচলিত ছিল; তাহাতেই কিন্তু অসাধ্যসাধন হইয়াছিল। জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান প্রকৃতই জাতীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কেন্দ্র ও শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামে নগরে 'সজীব' হইয়া উঠিয়াছিল, দেশের লোক ত্যাগে ও কষ্টসহনে অভ্যস্ত হইয়াছিল,

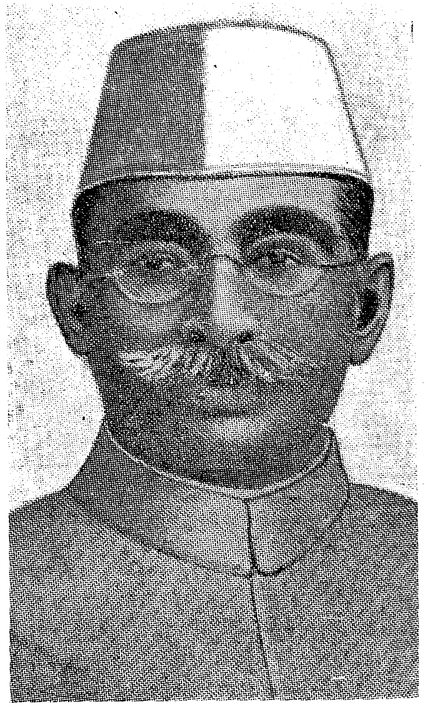

সভাপতি ডাক্তার আনসারি

কুটীরবাসী কাঙ্গাল হইতে প্রাসাদবাসী রাজারাজড়া পর্য্যন্ত ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশের জন্য কর্ম্ম করিতে ও হাসিমুখে রাজরোষ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃত কর্ম্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল, দ্রুতগতি দেশ ও জাতি গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার পর চৌরিচৌরা, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে লোক অহিংসায় অবিচলিত হইয়া থাকিতে পারে নাই, কাযেই মহাত্মা

গন্ধীকে বারদোলিতে অসহযোগনীতি স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। ফলে অবসাদ ও ক্রমাবনতি। ডাক্তার আনসারি সখেদে বলিয়াছেন,—"আমাদের নিজের দোষেই অসহযোগনীতি ঈপ্সিত ফল দান করিতে পারে নাই। অসহযোগের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা আমরা স্বীকার করিতে পারি নাই।" এই ত্রুটির ফলে অসহযোগ-কামীর একাংশ (যাহা পরে অধিকাংশে পরিণত হইয়াছে) অতঃপর কাউন্সিল গ্রহণ করিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যে ত্যাগবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগনীতিতে অবিচলিত থাকিয়া ব্যুরোক্রেশীর বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম করিয়া কারাবরণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই কারামুক্তির পর অসহযোগ নীতিমূলক কার্য্যপদ্ধতি বর্জ্জন করিয়া দেশকে কাউন্সিল গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন,—দেশের এমনই দুর্ভাগ্য! এই কাউন্সিলের মোহে আকৃষ্ট হইয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় বহু নেতা জাতি ও দেশ গঠনে মনোযোগ দান না করিয়া বাধাপ্রদান ব্যাপারে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে দেশের গ্রাম ও নগরের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য ও শক্তির অভাবে ধ্বংস-মুখে পতিত হয়, পরন্তু উহা হইতে নির্ব্বাচন-অধিকার ও চাকুরী লইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে হলাহল উত্থিত হয়, তাহা হইতে জাতীয়তার চণ্ডীমণ্ডপ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে—দেশ ইংসন্নের পথে ধাবিত হয় এবং আমলাতন্ত্র সরকার পরম সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অসহযোগের যাহা কিছু শুভ ফল দেখা দিয়াছিল, তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হয়েন।

সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, অন্য দুই পন্থা ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হইলেও অসহযোগের পন্থার ফলাফল সম্যক্‌রূপে পরীক্ষিত হয় নাই। ডাক্তার আনসারিও এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অসহযোগে অবিচলিত থাকিয়া আমরা কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হই নাই, এ কথা ডাক্তার আনসারিও বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাহার পর এখন আমাদের মুক্তি-সমরের জন্য কোন্ পথ অবলম্বনীয়, কি কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ডাক্তার আনসারি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যেন তাঁহার চিন্তার ধারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সংশয়াকুল হইয়া বলিতেছে,—"আমি স্বীকার করি, সাম্প্রদায়িক বিবাদে দেশে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে। সে জন্য এবং পরস্পর রক্তারক্তি ও কাটাকাটির জন্য এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে যে, উহাতে শীঘ্র অসহযোগ-নীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর নহে।"

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া অবশ্য এ কথার জন্য ডাক্তার আনসারিকে মসীকাশে তুলিয়া দিতে পারে, কেন না, অসহযোগে তাহাদের আতঙ্ক অত্যধিক! কিন্তু দেশের লোক কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টকে এমন হতাশ হইতে দেখিলে কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যে অসহযোগ-পন্থা দ্বারা মাত্র বৎসরাধিক কালের মধ্যে মুক্তি-সমরে আমরা ঈপ্সিত ফললাভের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলাম—যে অসহযোগ আন্দোলন প্রবলপ্রতাপ আমলাতন্ত্র সরকারকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং যাহার ফলে এই সরকার দেশের লোকের সহিত আপোষ বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন,—সেই অসহযোগ যখন মুক্তির একমাত্র পথ, তখন তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা সম্ভবপর না হইলে দেশের মুক্তি কিরূপে সাধিত হইবে? অন্ততঃ তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করাও ত কর্ত্তব্য। ডাক্তার আনসারি সেই আশার কথা দেশবাসীকে শুনাইলেন না কেন? আজ যে সাইমন কমিশন বর্জ্জন করিবার কথা হইয়াছে, উহাতেও কি অসহযোগের পথ অবলম্বিত হয় নাই? আজ ত মডারেটরাও এই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে এই পথ অবলম্বন করা কিরূপে অসম্ভব? ডাক্তার আনসারি কি মনে করেন, এখনও কাউন্সিলে বাধা প্রদান করিয়া আমাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে? যদি তাঁহার সে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তিনি অসহযোগে পূর্ণ বিশ্বাসী বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিলেন কেন? তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, সহযোগ দ্বারা বা কাউন্সিলে বাধাপ্রদান দ্বারা মুক্তি-লাভ সম্ভব নহে। তবেই বুঝিতে হইবে, কেবল অসহযোগনীতি দ্বারাই আমরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব। আমরা যখন হিংসার পথ গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত, তখন নিয়মানুগ পথে একমাত্র অসহযোগই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র। সে ক্ষেত্রে "শীঘ্র অসহযোগের পুনঃপ্রবর্ত্তন সম্ভবপর নহে" বলিয়া কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের কি দেশবাসীর আশা ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

তবে ডাক্তার আনসারি হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ও সাইমন কমিশন বর্জ্জনের কথায় যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের পদোচিত কর্ত্তব্য বিশিষ্ট-রূপে পালিত হইয়াছে। তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হইয়াছে—কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ভিত্তি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সাইমন কমিশনও বর্জ্জিত হইয়াছে, জাতি একমত হইয়া বার্কেণ-হেডের দান দূরে পরিহার করিয়াছে। এ জন্য এবার কংগ্রেসের অধিবেশনের সার্থকতা সম্পন্ন হইয়াছে। জাতি যদি কংগ্রেসের এই নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া একমনে একপ্রাণে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইবে না।

অসহযোগ পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—কংগ্রেসে সাইমন কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাবের সম্পর্কে যে সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সাইমন কমিশনের প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের কাউন্সিল বর্জ্জন করিবার কথা ছিল, পরন্তু কাউন্সিল বর্জ্জন করিয়া কংগ্রেস গঠনে, জাতিগঠনে, জাতীয় শিক্ষা ও খাদি প্রচারে আত্মনিয়োগ করিবার কথা ছিল। তিনি ডাঃ আনসারির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন, "অসহযোগ বিফল হয় নাই, আমরাই আমাদের অকর্ম্মণ্যতা ও অযোগ্যতার দ্বারা অসহযোগ বিফল করিয়াছি। অতএব পুনরায় অসহযোগ সফল করিবার জন্য কংগ্রেসের আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য, যুক্তি অনুসারে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।"

কিন্তু এই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। অসহযোগের সার্থকতা অনেকেই স্বীকার করিয়াছিলেন, এমন কি, মওলানা মহম্মদ আলি বলিয়াছিলেন, "কেহ কেহ বলেন, যদি কংগ্রেসে

অসহযোগকামীরা বাধা-প্রদান করিতে প্রবেশ না করেন, তাহা হইলে, খয়ের খাঁরা কাউন্সিল দখল করিয়া বসিবে। আমি বলি, তাহাতে ক্ষতি নাই। কাউন্সিলে কে প্রবেশ করিল, না করিল, তাহা আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই, আমরা আমাদের জাতিগঠন কার্য্য লইয়া থাকিব।" এই কথা বলিবার পরেও কিন্তু মওলানা সাহেব করযোড়ে শ্যামবাবুকে প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অনুরোধও করিয়াছিলেন! শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সাইমন কমিশন বর্জ্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "শ্যামবাবুর সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইলে সর্ব্বনাশ হইবে!"



পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

ইহা হইতেই কংগ্রেসের কাউন্সিলকামীদিগের মনোভাব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছেন যে, কাউন্সিল-বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে বহুসংখ্যক সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন। একেই ত অসহযোগের গন্ধ আছে বলিয়া মডারেট ও ন্যাশানালিষ্টদিগের মধ্যে অনেকে সাইমন কমিশন বর্জ্জন হেতু কংগ্রেসে যোগদান করিলেন না, ইহার উপর যদি কাউন্সিল বর্জ্জন করা হয়, তাহা হইলে বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন, ইহাই আশঙ্কা। এমনই কাউন্সিলের মোহ বটে! যাহা হউক, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর অসহযোগ পুনঃপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া নিশ্চিত ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই সৎসাহস প্রশংসনীয়।

কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব

যদিও প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনসারি বলিয়াছেন যে, "অবিলম্বে অসহযোগের পুনঃপ্রবর্ত্তন সম্ভব নহে," তথাপি তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলিয়াছেন যে—"অসহযোগের ভাব ভারতের রাজনীতিতে প্রবল শক্তিরূপে বিরাজিত থাকিবেই।" পরন্তু তিনি আশাহীন নহেন, তিনি বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনও অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটিলেও আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ, সঙ্ঘবদ্ধতা ও আত্মশক্তি দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব।" সুতরাং তিনি আপাততঃ অসহযোগ আন্দোলন পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা অসম্ভব বিবেচনা করিলেও অসহযোগের কার্য্যকারিতায় সন্দিহান নহেন, আর এই কারণেই সাইমন কমিশন সম্পর্কে সরকারের সহিত অসহযোগনীতি গ্রহণে বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই কমিশন সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,"বিধাতা দয়াপরাবশ হইয়া আমাদিগকে একটি প্রকৃত দান দিয়াছেন, উহা রয়্যাল কমিশন। এই কমিশন গঠনে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে ভাবে পদদলিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সকলেরই চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত। আমাদের এখন দলাদলি ছাড়িয়া একযোগে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য নহে কি? ভারতীয়কে কমিশনে লওয়া হয় নাই বলিয়া বিস্ময় ও হতাশা ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আমি ইহাতে বিস্মিত বা হতাশ হই নাই। হিন্দু লর্ড বা মুসলমান নাইট ইহাতে নিযুক্ত হইল কি না, তাহা লইয়া আমাদের ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। আসল ব্যথা অন্য স্থানে। কোনও আত্মসম্মান জ্ঞান-সম্পন্ন ভারতীয় স্বীকার করিতে পারেন না যে, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক উন্নতির গতি ও কাল সম্বন্ধে ইংলণ্ডই যথেচ্ছা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যৎকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব। এই অধিকার হইতে কেহই আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না। যত দিন না ইংলণ্ড ভারতের এই অধিকার স্বীকার করিয়া কমিশন গঠন করেন, তত দিন সেই কমিশন মিশরে মিলনার কমিশনের মত আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবেই।" ইহা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের পদোচিত কথাই হইয়াছে। ডাক্তার আন্সারি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দেশবাসীকে এই বিষয়ে পথিপ্রদর্শন করিয়া প্রকৃত নেতার কার্য্যই করিয়াছেন।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনাসমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুত মুথুরঙ্গ মুদেলিয়ারও অসহযোগ নীতির পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"আমি যতটুকু সময় মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের কাব করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, গৌহাটী কংগ্রেসে গৃহীত কংগ্রেস কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে আমরা কার্য্যে অসাফল্য লাভ করিব—সেই কার্য্যপদ্ধতি কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইবার নহে। উহা কাউন্সিলে কংগ্রেস পার্টিকে উৎসাহহীন ও সাহসহীন করিতেছে। আমি মহাত্মাজীর সর্ব্বপ্রথম নীতিতে পুনরায় আস্থাস্থাপন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, এই সকল কাউন্সিল বর্জ্জন করাই আমাদের একমাত্র রাজনীতিক কর্ম্মপন্থা।" শ্রীযুত মুথুরঙ্গ মুদেলিয়ার যেমন কাউন্সিল কামনার নিরর্থকতা দেখিতে পাইয়াছেন, তেমনই সাইমন কমিশনের অসারতাও উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "এই কমিশন গঠন দ্বারা ভারতের আত্মসম্মানে অপমান করা হইয়াছে, ভারতকে তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ১৯২৪ ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এসেম্বলি ভারতের পক্ষ হইতে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, অথচ তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য,এই সুযোগ হেলায় না হারান। এখন এই কমিশন বর্জ্জন উপলক্ষে সকল রাজনীতিক দলের এক হইয়া ভারতের স্বরাজ শাসনপদ্ধতির খসড়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।"

বস্তুতঃ যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, এই সাইমন কমিশন যেন ভগবানের দয়াদত্ত দানের মতই অদ্ভূত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার আন্সারি ঠিকই বলিয়াছেন। না হইলে কংগ্রেসে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হইত না। কেবল কংগ্রেসে নহে, লিবারল কনফারেন্সে এবং মোসলিম লীগ ও খিলাফৎ কনফারেন্সেও উহা গৃহীত হইত না।



অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুত মুথুরঙ্গ মুদেলিয়ার

[illegible]শিষ্টের উপদেশ, লেবার দলের 'সৎ' পরামর্শ, সার মহম্মদ সফির [illegible]রচুপি—সবই বিফল হইল। ভারতবাসী যদি এই বিষয়ে [illegible]স্বার্থ অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ না করিত, তাহা হইলে [illegible]এমন দৃঢ়ভাবে কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব সর্ব্বত্র গৃহীত হইত না। কংগ্রেসে বর্জ্জন প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে যে উৎসাহ দেখা দিয়াছিল, তাহা উপভোগ্য, বর্ণনীয় নহে। কংগ্রেসে ইহা গৃহীত হইবারই কথা।

কিন্তু যে লিবারলরা এ যাবৎ অসহযোগকে ভারতের পক্ষে [illegible]মঙ্গলকর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন, সেই লিবারলরা তাঁহাদের কনফারেন্সে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, ইহা কি অভাবনীয় ঘটিতব্যনীয় ছিল না? সার তেজ বাহাদুর সপরু প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ—যাঁহারা এত দিন আমলাতন্ত্র সরকারের মস্তিষ্ক ও [illegible]ডেমোক্রিটিউটস কাউন্সিলারী পর্য্যন্ত বড় বড় চাকুরী করিয়া [illegible]আসিয়াছেন, যাঁহারা সহযোগকেই এত দিন মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া স্থির বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা না করিয়া কমিশন বর্জ্জন করিয়াছেন, পরন্তু অন্যান্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? আমলাতন্ত্র সরকার কি ইহাতে প্রকৃত ভারতের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না?

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, যে হিন্দু-মুসলমানে আজ তিন চারি বৎসর ভীষণ স্বার্থদ্বন্দ্ব ও রক্তারক্তি চলিয়া আসিতেছে—যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছে, যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংরক্ষণে দেশ-জননীর বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে ইতস্ততঃ করে নাই,—সেই হিন্দু-মুসলমান এই কমিশন ব্যাপারে আবার দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ভুলিয়া একমত হইয়াছে। মাদ্রাজে খিলাফৎ কনফারেন্সও কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার টাউনহলে মুসলিম লীগেও বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বর্জ্জন প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন।

কেবল একমাত্র পঞ্জাবের লাহোরে সার মহম্মদ সফির নেতৃত্বাধীনে যে মুসলিম লীগ বসিয়াছিল, তাহাতে কমিশনের সহিত সহযোগ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। এই লীগ কিরূপ লীগ, তাহা ভারতের শীর্ষস্থানীয় মুসলমান নেতৃবর্গের লাহোর ত্যাগ করিয়া সার মহম্মদকে বর্জ্জন করিয়া কলিকাতায় লীগ বসাইবার আয়োজনেই স্পষ্টই জানা যায়। সার মহম্মদ আমলাতন্ত্র সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ; সুতরাং তাঁহার মতামত কিরূপ, তাহা জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। তাঁহার সহিত যে কয়জন অজানা অচেনা নগণ্য মুসলমান লাহোরের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কথাও সুবিদিত। তাঁহারা যে কোনমতেই হিন্দুর সহিত একযোগে আমলাতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না, তাহাও কাহারও অবিদিত ছিল না। এই কারণেই এবার লাহোরে সার মহম্মদের নেতৃত্বে লীগের অধিবেশনের কথা পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শীর্ষস্থানীয় মুসলমান নেতারা লীগের ও সার মহম্মদের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাহেন নাই। তাই কলিকাতায় লীগের অধিবেশন হইয়াছিল। পঞ্জাব যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থদ্বন্দ্বের আকরভূমি, তাহাও সকলের জানা ছিল, তাই পঞ্জাব বর্জ্জিত হইয়াছিল। পরন্তু কলিকাতার অধিবেশনে মুসলিম লীগ পঞ্জাবের প্রাদেশিক লীগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং পঞ্জাবের মুসলমানগণকে নূতন করিয়া একটি প্রাদেশিক লীগ সভা গঠন করিতে বলিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, লর্ড সিংহ, দ্বারবঙ্গের মহারাজা ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ আমলাতন্ত্র সরকারের খাতায় 'ভাল ছেলে'নাম লেখান কয়জন হিন্দু এবং পঞ্জাব সরকারের প্রিয় সার মহম্মদ চালিত মুষ্টিমেয় কয়জন মুসলমান ব্যতীত কমিশন গ্রহণের পক্ষে কেহ নাই; নিখিলভারতের তাবৎ শিক্ষিত সমাজই বর্জ্জনের পক্ষপাতী। এমন কি, সার আলি ইমাম্ ও সার তেজ বাহাদুর সপরুর মত আমলাতন্ত্র সরকারের ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারীরাও বর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প। এমন যে হইবে, জানাই ছিল, কেন না,

যাহাতে ভারতের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, ভারত তাহা কখনই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে না। সাগর-পারের বিদেশী পার্লামেণ্ট আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রভু, এ কথা ভারতবাসী স্বেচ্ছায় কখনই মানিয়া লইবে না।

লেবার দলপতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারতবাসীর মনোভাব অবগত হইয়া লেবার দলের পক্ষ হইতে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলেন, "লেবার দল চিরদিনই পার্লামেণ্টকে সাম্রাজ্যের নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করে; সুতরাং সাম্রাজ্যের একাংশের (ভারতের) ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে পার্লামেণ্টের দায়িত্ব লেবার দল কখনও অস্বীকার করিতে পারে না। সাইমন কমিশন পার্লামেণ্ট হইতে গৃহীত, এই হেতু লেবার দল উহাতে সন্তুষ্ট। লেবার দল এখনও ব্ল্যাকপুল কনফারেন্সে গৃহীত ভারতকে স্বায়ত্তশাসন অধিকার দানের মন্তব্য মান্য করে।"

কিন্তু ভারতবাসী সে কথা স্বীকার করে না, তাহারা বলে, "তাহাদের নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ তাহারা নিজেই করিবে, ইহা তাহাদের জন্মগত অধিকার। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মুখবন্ধে (Preamble) কি বলে, তাহা তাহারা শুনিতে চাহে না। যদি গায়ের জোরে তাহাদিগকে উহা মানিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে শক্তিশালী প্রভু যথেচ্ছা করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু ভারতবাসী স্বেচ্ছায় তাহা গ্রহণ করিবে না, তাহার সহিত কোনও সংস্রব রাখিবে না।"

সুতরাং অবস্থা দাঁড়াইতেছে এই যে, শক্তিশালী প্রভু তাঁহার মরজিমত কমিশন বসাইবেন, তাহার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য এবং তাহাকে অন্যরূপে সাহায্য দিবার জন্য সরকারের প্রসাদভোজী খয়ের খাঁরও অভাব হইবে না, কিন্তু প্রকৃত ভারত সেই কমিশনকে বিষবৎ বর্জ্জন করিবে। ইহাতে ভয় দেখান হইতেছে যে, ভবিষ্যতে ইহাতে ভারতেরই অমঙ্গল হইবে, কেন না, যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। সে ত ভাল কথা। যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও ভারতবাসী চাহে না, সুতরাং তাহা কাড়িয়া লইলেই বা ক্ষতি কি? সমুদ্রে যাহার শয্যা, শিশিরবিন্দুতে তাহার ভয় কি?

মিলন-প্রস্তাব

সাইমন কমিশন বিধাতার দান, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে সময়ে হিন্দুমুসলমানে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্পর্কে গলাকাটাকাটি চলিতেছে, ঠিক সেই সময়ে সাইমন কমিশন নিয়োগে ভারতের অপমান করিয়া আমলাতন্ত্র সরকার যেন অমঙ্গলেও মঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন। কেন না, ইহাতে বিরোধের হলাহল হইতে মিলনের অমৃত উদ্ভূত হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলমান সাইমন কমিশন গঠনের আভাস পাইয়াই বুঝিয়াছে, আমলাতন্ত্র সরকারের রাজ্যে তাহাদের স্থান কোথায়। তাহারা যে সাম্রাজ্যের 'সমান অংশীদার' হইয়াও প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের তাঁবেদার তল্পীবাহক মাত্র, তাহা বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, সাইমন কমিশন বিধাতার দান!

কলিকাতায় মিলন বৈঠকে হিন্দুমুসলমানে একতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উহার উপর মিলন-মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা ভারতের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কি ভাবে মিলন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব এইরূপ :—

(১) যুক্ত নির্ব্বাচন।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইবে, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভা সমূহে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে যুক্ত নির্ব্বাচন নীতি (Joint Electorate) অবলম্বন করা হইবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আইনসঙ্গত যুক্তিযুক্ত স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আপাততঃ লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি সদস্যপদ স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইবে। এই অনুপাত ব্যবস্থাপরিষদেও রক্ষিত হইবে।

(২) ভাষানুযায়ী প্রদেশ গঠন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, কিন্তু ঐ সঙ্গে উপযুক্ত বিচার-ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। ভাষার অনুযায়ী কয়েকটি প্রদেশকে—যেমন সিন্ধু, অন্ধ্র ও কর্ণাট—পৃথক্ প্রদেশে পরিণত করা কর্ত্তব্য।

(৩) বিবেকের বা মতের স্বাধীনতা।

ভারতীয় বা প্রাদেশিক কোন্ ব্যবস্থাপক সভাই বিবেকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া কোনও রূপ আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রজার ধর্ম্মকার্য্য, ধর্ম্মশিক্ষা ও প্রচার প্রভৃতির স্বাধীনতাই বিবেকের স্বাধীনতা। এক সম্প্রদায়ের বিবেকের স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিবার কালে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনোভাবের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৪) গোহত্যা ও মসজেদের সম্মুখে বাদ্য-সমস্যা।

এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়কেই স্ব স্ব ধর্ম্ম-কার্য্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে দেওয়া হইবে, তবে পরস্পর পরস্পরের মনে দুঃখ বা আঘাত দিয়া এ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা না করে, তাহাও দেখিতে হইবে।

(৫) শুদ্ধি বা তবলিগ।

যুক্তি-তর্ক দ্বারা এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের লোককে স্বধর্ম্মে আনিতে বা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে, তবে বা লোভ প্রদর্শন দ্বারা নহে। অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বিধর্ম্মীকে অপর ধর্ম্মাবলম্বী আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় দেখিয়া নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবে না, বরং তাহাকে তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইলে কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত মধ্যস্থগণ মীমাংসা করিয়া দিবেন।

মুসলিম লীগের গৃহীত মিলন-প্রস্তাব প্রায় ইহার অনুরূপ; কেবল দুইটি বিষয়ে নূতনত্ব আছে :—(১) ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান সদস্য থাকা আবশ্যক। (২) দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথক্ নির্ব্বাচন

(Communal) ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। যত দিন সিন্ধু পৃথক্ প্রদেশে পরিণত এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানে শাসনসংস্কার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত না হয়, তত দিন মুসলমানরা পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যখন উক্ত ব্যবস্থাগুলির সমাধান হইবে, তখন যুক্ত বা মিশ্র নির্ব্বাচন-প্রথা গৃহীত হইবে; কিন্তু তখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সদস্য-আসন থাকিবে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে মিলন-প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। এ জন্য মুসলমান পক্ষ হইতে তাঁহার জয়গান উত্থিত হইয়াছিল, এমন কি, তাঁহাকে 'সঙ্কট-মোচন' (Saviour of the situation) বলিয়া অভিহিত করাও হইয়াছিল।

হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা ডাক্তার মুঞ্জে কিন্তু কংগ্রেসের মিলন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়েন নাই বলিয়া মনে হয়। যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, "কংগ্রেস যাহাই বলুক, আমি কিন্তু জাতীয় ভাবের

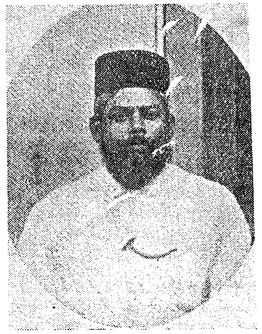

ডাক্তার মুঞ্জে

হাওয়ায়, আমি সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণা করি," তথাপি তাঁহার মিলন-প্রস্তাবের সম্বন্ধে অভিমতে কথার বেশ ঝাঁঝ আছে। যথা,—"মহাত্মা গন্ধী ২১ দিন উপবাস করিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, কংগ্রেস সাগরজে প্রস্তাব গড়িয়াই তাহা করিয়াছেন," "যে দ্বাই হইতে হিন্দুপ্রদেশ স্বতন্ত্র করিয়া দাও, তথাস্তু," "হিন্দুর নিকট মুসলমান যাহা চাহিবেন, তাহা দিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ অবসানের উপায়!" ইত্যাদি। কিন্তু ডাঃ মুঞ্জের বুঝা উচিত ছিল, কোন পক্ষই যদি ত্যাগস্বীকার না করে, তাহা হইলে মিলন কখনও সম্ভবপর হয় না। মসজেদের সম্মুখে বাদ্য যদি মুসলমানরা ধর্ম্মে আঘাত বলিয়া স্থির করিয়া বসিতেন, তবে মিলন কিরূপে সম্ভব হইত? পরন্তু বহু স্থলে মুসলমান কাজি মোল্লা এখনও জিদ করে যে, তাহাদের ধর্ম্মে বলপূর্ব্বক অপরকে মুসলমান করার অনুজ্ঞা আছে। মুসলমানরা এ বিষয়ে বিবেকের সম্মান-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া মোল্লাদিগের মুখ বন্ধ করিয়াছেন বলিতে হইবে।

অবশ্য হিন্দুদিগকে সমধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। এই যে সিন্ধু এবং সীমান্ত ও বেলুচিস্থান সম্বন্ধে সর্ত্ত করা হইল, ইহাতে মুসলীম লীগ পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন,—যদি সিন্ধু বোম্বাই হইতে পৃথক্ হয় এবং সীমান্ত ও বেলুচিস্থানে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাঁহারা মিশ্র নির্ব্বাচনে সম্মত হইবেন। এখন এই সমস্ত অধিকার দিবার কর্ত্তা হিন্দু নহেন, আমলাতন্ত্র সরকার। হিন্দু-মুসলমান একতা হিন্দু-মুসলমান ব্যতীত তৃতীয় পক্ষের কিরূপ বাঞ্ছনীয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে ক্ষেত্রে যদি কর্ত্তৃপক্ষ বিরোধ জাগাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যক সংস্কার না করেন, তাহা হইলে ত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং তাহার ফলে অহর্নিশ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিবে। এত বড় একটা বাধা সত্ত্বেও হিন্দুরা যে মিলন-প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে সদাশয়তা ও উদারতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, মুসলমানরা হিন্দুর পক্ষে এই ত্যাগ স্বীকারের সম্মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

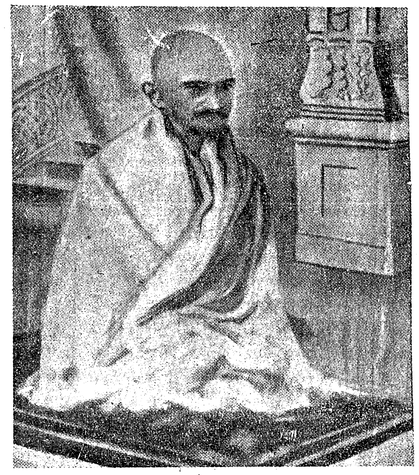

মহাত্মা গন্ধী

মহাত্মা গন্ধী এক দিন বলিয়াছিলেন,—"হিন্দু-মুসলমান এক দিন শক্তি-পরীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া পরস্পরের সাহায্য ও বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিবে।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কি সফল হইবার সূচনা হইল? অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সাইমন কমিশন যেমন এই মিলন সম্ভবপর করিয়াছে, তেমনই ভারতে মহামান্য আমীর বাহাদুরের আগমন ও হিন্দু-মহাসভার সদস্যগণের সদাশয়তা মিলনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নরপতি আমানুল্লা খাঁ স্বাধীনতার মর্ম্ম জানেন, তাই তিনি হিন্দু-মুসলমানের গৃহবিবাদ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, মিলনের সদুপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ সুফলপ্রদ হইয়াছে। হিন্দু-মহাসভার নেতৃবৃন্দও শুদ্ধি আন্দোলনের হিন্দু নেতৃগণের

হত্যার কথা ভুলিয়া গিয়া মিলনের হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। উহাও মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। এখন হিন্দু-মুসলমান প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া চলিলে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবেই।

স্বাধীনতার প্রস্তাব

এবার কংগ্রেসের বিশেষত্ব যেমন একতা-প্রস্তাব গ্রহণে, তেমনই বিশেষত্ব পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণে। কংগ্রেসের সৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত এ যাবৎ এই ভাবের প্রস্তাব কখনও কংগ্রেসে গৃহীত হয় নাই। সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার লাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া এ যাবৎ বিদিত ছিল, কংগ্রেসের 'ক্রীড' বা মূলনীতিও তাহাই।



জহরলাল নেহরু

কিন্তু এ বার পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর প্রস্তাবে কংগ্রেসের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইল বলিয়া জানা যায়। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে,—

"This Congress declares that the goal of the Indian people is complete National Independence, অর্থাৎ এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, ভারতবাসীদিগের লক্ষ্য পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা।" কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের ক্রীডের পরিবর্ত্তন হয় নাই। পূর্ণ স্বাধীনতা জাতির লক্ষ্য হইলেও বর্ত্তমান কার্য্য-ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের জন্য কংগ্রেস যত্নবান্ থাকিবে,—ইহাই কংগ্রেসের মূলনীতি।

এত দিন যে কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের অতিরিক্ত দাবী করে নাই, আজ তাহার লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হইয়াছে কেন, তাহা আমলাতন্ত্র শাসকগণ অবশ্যই বুঝিতেছেন। বার বার আশাহত হইলে লোক যেমন সহিষ্ণুতা হারাইয়া চরমের দিকে ধাবিত হয়, কংগ্রেসেও তেমনই হইয়াছে। বিলাত হইতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বলিয়া পাঠাইয়াছেন, "বৃটেনের সদাশয়তায় আস্থা স্থাপন করিও না; টোরী বা লেবার,—আমাদের পক্ষে সকল দলই সমান। নিজের চেষ্টায় আমাদিগকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে।" কথাটার মূলে সত্য নিহিত আছে। আজ যদি বৃটেনের আশ্বাসবাণীর কোনও সার্থকতা থাকিত, তাহা হইলে মহাত্মা গন্ধীর মত সত্যসন্ধ ইংরাজ-প্রেমিক জননায়ক ইংরাজ-শাসনের সহিত সম্পর্ক রহিত করিতে—ব্যুরোক্রেশীর সহিত অসহযোগ করিতে দেশবাসীকে উপদেশ দিতেন না। মহাত্মা গন্ধী স্বয়ং বলিয়াছেন,—"কোন ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমার অসদ্ভাব বা বিদ্বেষ নাই, বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমার প্রিয় বন্ধু, কিন্তু ইংরাজের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ আছে। তাই আমি এই শাসনের সহিত অসহযোগ করিতে দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়াছি।"

জার্ম্মাণ যুদ্ধাবসানের পর হইতে ভারতের প্রতি ইংরাজের এ যাবৎ ব্যবহারের কথা স্মরণ করিলে এ কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। যুদ্ধকালে কত প্রতিশ্রুতি, কত আশার কথা, কত ভাই-ভাই, কত সমান-সমান—আর যুদ্ধ ফুরাইলে, কায় গুছাইয়া লওয়া হইলে তাহার বিপরীত। এ যেন নদী পার হইয়া তরণীর কর্ণধারকে কদলীপ্রদর্শনেরই মত। টোরী দলের কর্ত্তৃপক্ষ বলডুইন বার্কেণ্ডহেড স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সাগরপারের দয়াদত্ত দানের অধিক ভারত কিছুই পাইবে না, পার্লামেণ্ট ভারতের ভাগ্যলিপি লিখিয়া দিবেন। লেবার দলের কর্ত্তা ম্যাকডোনাল্ড ইহাতে সায় দিয়াছেন, বলিয়াছেন, পার্লামেণ্ট যখন ভারতের বিধাতা, তখন 'পার্লামেণ্টারী' কমিশন হওয়াই ন্যায্য হইয়াছে। আবার লিবারল দলের মুখপত্র "ডেলি নিউজ" ভিতরের কথা খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—"কমিশন বর্জ্জন করিয়া তোমরা নিজেরা একজোট হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ স্বরাজের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কর বা আর যাহাই কর, তোমাদের বরাতে বড় জোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পর্য্যন্ত জুটিতে পারে, ততোধিক কিছুই হইবে না। সাইমন কমিশনও তোমাদিগকে ইহার বেশী কিছু দিতে পারিবে না।" এমন স্পষ্ট অভিব্যক্তির পর ভারতবাসী সাম্রাজ্যের মুখ চাহিয়া কত দিন বসিয়া থাকিতে পারে? তাই কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য করিয়া লইয়াছে। যত দিনেই হউক, আর যত বিপদ্-আপদ্ বরণ করিয়াই হউক, এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ভারতবাসী কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইবে। তাহার পথ হিংসার নহে, অহিংসার, তবে সে পথে সে বিদেশীর দয়ার প্রার্থী হইবে না, আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিবে।

এই প্রস্তাব গ্রহণে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া অন্তরে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণে গাত্রদাহ নিবারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, বলিয়াছে,—"ঢাল নাই, তরবারি নাই, নিধিরাম সর্দ্দার! এমন প্রস্তাবে কংগ্রেস জগতের লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছে।" অন্যে পরে কা কথা, আমাদের ঘরের লোক ডাক্তার মুঞ্জে বলিয়াছেন,—"যাহারা নিজের ঘরের পত্নী-কন্যা-ভগিনীকে গুণ্ডার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা মানায় ভাল!"

কিন্তু একটা কথা এই শ্রেণীর সমালোচকরা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ঢাল-তরবারি না থাকিবার অথবা ঘরের নারীকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য না থাকিবার মূল কারণই হইতেছে স্বাধীনতার অভাব। ভারতবাসী স্বাধীন হইলে তাহার ঢাল-তলোয়ারের অভাব হইত না অথবা তাহার নারীকে রক্ষা করিবার ক্ষমতারও অভাব হইত না। বহুশতাব্দীর দাসমনোবৃত্তির ফলেই এ অভাব হইত না। বহুশতাব্দীর দাসমনোবৃত্তির ফলেই এ তাহাদের সামর্থ্যহীনতা ও অক্ষমতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কি ডাক্তার মুঞ্জে জানেন না? বহুকাল 'ঢাল তলোয়ার' কাড়িয়া লওয়ার ফলে যে তাহাদের ক্লীবত্ব আসিয়াছে, তাহা কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া জানেন না? সেই স্বাধীনতালাভের আশা করিতেও কি দোষ! উহা practical politics না হইতে পারে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায়, তথাপি উহা লক্ষ্য করিয়া রাখাও যে inspiring—উহার চিন্তাও যে মানুষের মনে উন্মাদনা আনিয়া দেয়, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন?

স্বরাজের খসড়া

এবার মাদ্রাজের কংগ্রেস, কলিকাতার ও এলাহাবাদের মুসলীম লীগ, বোম্বাইয়ের লিবারল কনফারেন্স প্রভৃতি দেশের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সভায় সর্ব্বত্রই স্বরাজের একটা খসড়া প্রস্তুত করিবার কল্পনা স্থির হইয়াছে এবং এই খসড়া প্রণয়নে সকলে পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতে সম্মত হইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, ভারতবাসী তাহাদের নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এত দিন ভারতের মুক্তির বিরুদ্ধবাদী শত্রুরা বলিয়া আসিয়াছে যে, ভারতীয়রা কি চাহে, তাহা নিজেরাই জানে না, অথচ স্বরাজের দাবী করে। যখন সকলেই জানেন, এই অভিযোগ মিথ্যা। কেন না, ১৯১৯-২৫ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপরিষদ ভারতের দাবীর খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ব্যুরোক্রেশী সেই দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। যদি ইহাতেও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এইবার বুঝা যাইবে, বিরুদ্ধবাদীদিগের দৌড় কতটুকু। এবার ত দেশের তাবৎ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানই পরস্পর পরামর্শান্তে স্বরাজের খসড়া প্রস্তুত করিতেছেন। এই খসড়া প্রস্তুত হইলে যাহাদের 'চোখ আছে' তাহারা দেখিতে পাইবে, যাহাদের 'কান আছে', তাহারা শুনিতে পাইবে। তখন তাহারা কি করে, তাহাই দেখিবার বিষয়। ইংরাজ যদি যথার্থই ভারতের স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবী স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য এই খসড়া তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তবে ছলের অভাব হইবে না; পার্লামেণ্টই বিচারকর্ত্তা,—পার্লামেণ্টে দাবী পেশ করা হয় নাই, পার্লামেণ্ট কমিশন বসাইয়াছেন, আবার এ খসড়া কেন,—এমন অনেক ছলের কথা কার্য্যকালে উঠিবেই। উঠুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তথাপি জগতের লোকের কাছে আর মিথ্যা ধুয়া তুলিবার মুখ থাকিবে না যে, ভারতীয়রা কি চাহে, তাহা তাহারা নিজেরাই জানে না।

শিল্প কংগ্রেস

এবার মাদ্রাজ শিল্প কংগ্রেসের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা তাঁহার অভিভাষণে ইংরাজ শাসকদের যে মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমলাতন্ত্র শাসকদিগের লজ্জায় অধোবদন হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আমাদের শাসকদিগের স্বল্পদর্শিতা ভারতের আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা আনয়ন করিয়াছে। ভারতের অর্থনীতিক সমস্যা-সমাধানে তাঁহারা এ যাবৎ কেবল অদূরদর্শী নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। ফলে ভারতের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। তিনি জাপানের সহিত ভারতের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জাপান স্বাধীন বলিয়া নানা উপায়ে আপনার জনসাধারণের ভাগ্যোন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছে, আর ভারত পরাধীন বলিয়া সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের শাসকের (সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের) নির্দ্দেশমত চলিতে বাধ্য হইয়া তাহার অবস্থার কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। উভয় জাতিই এসিয়াবাসী। লোক-সংখ্যার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে বরং ভারত-বাসীই জাপ হইতে শ্রেষ্ঠ, অথচ জাপজাতি আজ এত উন্নত কেন, আর ভারতবাসীই বা আজ এত অশিক্ষিত দরিদ্র মুমূর্ষু জাতি কেন? সার ইব্রাহিম বলেন,—"বৃটেন বলেন, ভারতের অভিভাবকতা তাঁহারা ভগবানের নিকট পাইয়াছেন। এ কথা কেবল ভারতবাসীর চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপের জন্য বলা হয়। বৃটিশ ব্যাঙ্কার এবং বণিক ও কারখানাওয়ালারা ভারতের শাসননীতি নির্দ্ধারণে প্রভুত্ব (predominant in determining the policy) করিয়া থাকে। পরন্তু প্রজার করভার এত গুরু যে, প্রজা কর দিবার পর নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য সামান্য মূলধনও সঞ্চয় করিতে পারে না; তাহার ফলে দেশ ক্রমে অবনতির পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, টাকার ক্রয়ের শক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, প্রজার সঞ্চয়ের উপায় নাই, তাই দিন দিন প্রজা দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে নিপতিত হইতেছে।"

কি চমৎকার চিত্র! ইহাই কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার উন্নতিশীল ভারত? শিল্প কমিশনে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিমূলক কয়েকটি প্রয়োজনীয় মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, যথা—ব্যাঙ্কিং, কৃষি, খনিজ ব্যবসায়, চা রেশম আদি ব্যবসায়, জলপোতের ব্যবসায় ও কার্য্য ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খইতান এই কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছেন যে,—"দেশের বণিক ও ব্যবসায়ী ধনী মহাজনরা ক্রমশঃ বুঝিতেছেন যে, তাঁহা-দের নিজের চেষ্টা ব্যতীত কেবল সরকারের উপর নির্ভর করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইবে না। এই হেতু তাঁহারা শিল্প কংগ্রেসে এই সকল দেশহিতকর মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে দেশের লোককেও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। যাহাতে ব্যবস্থাপক সভাসমূহের মারফতে বার বার সর-কারকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহার জন্য দেশবাসীকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। একটা খুবই সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। সরকারের এ দেশের বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের কথায় ক্রমশঃ ঔদাসীন্যের ফলে ব্যবসায়ী মহাজনরাও ক্রমশঃ সরকারের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা এখন বুঝিতেছেন, দেশের রাজনীতিকরা সরকারের বিপক্ষে যাহা বলেন, তাহা ভিত্তিহীন নহে। এ জন্য তাঁহারাও ক্রমশঃ দেশের রাজনীতির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতেছেন ও রাজনীতিক-দিগের সহিত মিলিত হইতেছেন।" বস্তুতঃ পূর্ব্বে যাঁহারা কেবল কড়ি গণনা করাই জীবনের সার ব্রত বলিয়া মনে করিতেন, সরকারও যাঁহাদিগকে 'স্থিরমস্তিষ্ক' (sane and sober) এবং দেশের খোঁটাওয়ালা (stake in the country) বলিয়া খাতির করিতেন, তাঁহারা ক্রমে অবস্থা বুঝিয়া নিজের পথ নিজে করিয়া লইতেছেন। ইহা দেশের পক্ষে নিশ্চিতই মঙ্গলকর।

বিজ্ঞান কংগ্রেস

এবার বিজ্ঞান বৈঠকে বহু মনীষী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সমক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার বক্তৃতায় আছে,—"বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে দেশের মঙ্গলকর উন্নতিবিধায়ক কার্য্যসম্পাদনে আমরা সত্যই অত্যন্ত দরিদ্র। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রমশঃ দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবার শক্তির উপর আমাদের দেশের ৩০ কোটি লোকের অবস্থার উন্নতি নির্ভর করে। এই ধনসম্পদবৃদ্ধিও সম্ভব হইবে কেবল কৃষি-শিল্পের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিলে।"

কথাটা যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-শিল্পের উন্নতিসাধনের উপর যে দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি কতক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু এ দেশে বৈজ্ঞানিকও ত অনেক গঠিত হইতেছেন। সার জগদীশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁহাদের অসংখ্য ছাত্রবর্গের মধ্যে বহু জনই ত বিজ্ঞানবিদ্। তাঁহাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও তবে দেশে কৃষিশিল্পের উন্নতি কেন হইতেছে না, সে কথা ত সার রাজেন্দ্রনাথ বুঝাইয়া দেন নাই। এ দেশের বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত এ দেশের সরকারের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা সার রাজেন্দ্র নিশ্চিতই জানেন। এ দেশের বিদ্যামন্দিরে বৈজ্ঞানিক গড়া হয় কেরাণী করিবার জন্য, অথবা বড় জোর অধ্যাপক গড়িবার জন্য, তাহার অধিক তাহাদিগকে কোনও শক্তিবিকাশের ক্ষেত্র, উপায় বা সুযোগ দেওয়া হয় না। ভূমিতত্ত্ব, খনিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিভাগে নানা পণ্ডিত বানান হইয়াছে, কিন্তু কেহ কোথাও সরকারের সাহায্যে কৃষি বা খনিজ বিভাগে দেশের ধনবৃদ্ধির কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছেন কি? অধিক কথা কি, বিদ্যুৎ ও অগ্নির বিজ্ঞানবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াও এ দেশের পণ্ডিত রেলে বড় চাকুরী পান না, অথচ পেটে যাহাদের সামান্য বিদ্যাও নাই, এমন মেটে ফিরিঙ্গী দুই এক বৎসর কারখানায় হাতুড়ি পিটিয়া বড় বড় চাকুরী পায়! হাতে-কলমে কায শিখিবার দেশীয় শিক্ষার্থীর সুযোগ ও সুবিধাই বা বিশেষ কোথায়? আর যাঁহারা বিজ্ঞানের উচ্চ স্তরের শিক্ষা নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বা প্রতিভা-বিকাশের স্থান কোথায়? সার রাজেন্দ্র বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান রাজনীতির ধার ধারে না।" এ কথা অন্য দেশে সত্য হইলেও এ দেশে নহে, এ দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রাজনীতিক জাতিবিচার নাই, এমন কথা সার রাজেন্দ্র কেন, কেহই বলিতে পারেন না। আসল কথা, পরাধীন পরমুখাপেক্ষী জাতির পক্ষে বিজ্ঞানে কেন, কোন ক্ষেত্রেই দেশের উন্নতিসাধন করা সম্ভব নহে। জাপানীরাও আমাদের মত অন্নভোজী প্রাচ্য জাতি, কিন্তু তাহারা স্বাধীন বলিয়া, তাহাদের শাসনদণ্ড তাহারা নিজে চালায় বলিয়া তাহারা জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যেরও উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইহাই সহজ সরল সত্য কথা।

হিন্দু মহাসভা

মাদ্রাজের কংগ্রেস-মণ্ডপে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে এবার হিন্দু মহাসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা সাইমন কমিশন বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সভাপতি পণ্ডিত মালব্যজী হিন্দুদের মধ্যে একতা-প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেবল হিন্দুদের মধ্যে নহে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাব-সংরক্ষণ সম্বন্ধেও সভাপতি উপদেশ দান করিয়াছিলেন। মোটের উপর এবার হিন্দু মহাসভায় পণ্ডিতজী শান্তিপ্রয়াসী হইয়াই যেন দেখা দিয়াছিলেন। ইহার শুভফলও দেখা দিয়াছে, গিলাফৎ কন্‌ফারেন্স ও মুসলিম লীগও সদ্ভাব ও একতার মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে দেশে বেশ একটা শান্তির সুবাতাসও বহিয়াছে। এ জন্য পণ্ডিত মদনমোহন সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। হিন্দু পক্ষে প্রশংসার কথা এই যে, তাঁহারা লাহোরের মুষ্টিমেয় সফিভক্ত মুসলমানগণের মত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য দেশের মঙ্গলকে বিসর্জ্জন দেন নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিত মালব্য ভাল পথই দেখাইয়াছেন।



পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

অস্পৃশ্যতার সমস্যা মাদ্রাজে অত্যন্ত প্রবল, এ জন্য এই সমস্যার কথা মহাসভায় উঠিয়াছিল। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-সমস্যার কথা বেদে নাই। আমরা এই পার্থক্য ও ভেদব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছি।" পণ্ডিতজীর এ কথা কি সকল প্রাচীনপন্থী মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন? পণ্ডিতজী নিজে আনুষ্ঠানিক হিন্দু ব্রাহ্মণ। তিনি হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র, বোধ হয়, এমন অতি অল্প লোকই আছেন। তিনি যখন স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের পার্থক্যের কঠোরতা বর্জ্জনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আশা হয়, হয় ত এ বিষয়ে প্রাচীনপন্থীরাও কঠোরতা কতক পরিমাণে শিথিল করিয়া দিবেন। তবেই হিন্দু-সমাজ শক্তিশালী হইবে, সমাজ আবার জীবন লাভ করিবে।

খৃষ্টান কংগ্রেস

এলাহাবাদে নিখিল ভারত খৃষ্টান কংগ্রেসের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মিষ্টার জে, এন, ডেভিড বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "লর্ড বার্কেণ্ডহেড বলেন, ভারতের অশিক্ষিতগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি সাইমন কমিশনে ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করেন নাই। ভারত-সচিবের এই উক্তির আন্তরিকতায় ঘোর সন্দেহ হয়। এই

বৃটিশ ভারতে যে ২৩ কোটির মধ্যে ২২ কোটি লোক অশিক্ষিত, তাহার জন্য দায়ী কে? বৃটিশ জাতি আজ দেড় শত বৎসরকাল ভারত শাসন করিতেছেন। ইহাতেও যদি এ দেশে মূর্খতার পরিমাণ এত অধিক থাকে, তবে সেই কলঙ্কের দায়িত্ব বৃটিশ জাতির ও সরকারের।"

দেশীয় খৃষ্টান ভ্রাতারা যে আজকাল দেশের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন, ইহাও দেশের পক্ষে মঙ্গল বলিয়া মনে হয়। সরকারের মনস্তুষ্টির জন্য আসল সত্য কথা চাপা দিয়া চাকুরীর প্রত্যাশী হইয়া থাকিলে যে প্রকৃত দেশের কায করা হয় না, পরন্তু উহাতে পেটও ভরে না,—এ কথাটা এখন ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন এই দুই সম্প্রদায় যদি এ দেশবাসীকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া এ দেশবাসীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন, তবেই ত কংগ্রেসের শক্তিসঞ্চয় হয়।

বাঙ্গালার বন্দিগণ

কংগ্রেস ও রাজনীতিক লীগ ও কনফারেন্সমাত্রেই বাঙ্গালার বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত বা আটক আসামীদের পক্ষে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। হইবারই কথা। কোন দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ বিনা বিচারে কেবল রাজনীতিক শান্তিরক্ষার অজুহতে বিনা বিচারে এরূপে লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আটক রাখা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বাঙ্গালার গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন মসনদে বসিবার পর প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব অবশিষ্ট রাজবন্দীদিগকে অবস্থা অনুকূল হইলে মুক্তি দেওয়া হইবে। প্রথম কয়জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর আর বড় মুক্তির কথা শুনা যায় না। বরং পুলিস নিত্য নূতন রাজদ্রোহের মামলা খুঁজিয়া বাহির করিবার আগ্রহ দেখাইতেছে। সরকার যেরূপ হিসাব দিয়াছিলেন, তাহাতে লোকের মনে হইয়াছিল, এখন ১ শত জনও আর বিনাবিচারে আটক নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, ১ শতের উপর লোক এখনও বিনাবিচারে আটক আছেন। অবশ্য সরকার যাহাকে দয়াপরবশ হইয়া 'মুক্তি' বলেন, সে মুক্তির হিসাবে অনেকে মুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত মুক্তি তাহাকে বলে না। বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, নির্দ্দিষ্ট এক স্থানে বসবাস করিবে—গণ্ডীর বাহিরে স্বাধীনতা নাই, অথবা নিজগৃহের বাহিরে কোথাও যাইতে পাইবে না,—এগুলিকেও যদি মুক্তি বলা যায়, তাহা হইলে জেলের আসামীও মুক্ত; কেন না, জেলের মধ্যে ত তাহারা বসবাস করিতে পায়! তাহার পর মুক্তির পরেও যাহাদিগকে গোয়েন্দা পুলিস ছায়া করিয়া থাকে, তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া বা নানারূপে লাঞ্ছিত না হইয়া যাহাদের কোথাও যাইবার উপায় নাই,—তাহারা যদি মুক্ত, তবে বন্দী কে? এমন ভাবে প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া মুক্তি দিয়া লাভ? যাঁহারা এখনও সরকারের হিসাবে আটক আছেন, তাঁহাদেরও সকলের স্বাস্থ্য কেমন? দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে সে সম্বন্ধে ত নিত্যই অভিযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর ব্যবহার? সে কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াই বা ফল কি? সরকার এক ওজুহত ধরিয়া রাখিয়াছেন, "তাহাদের বিপক্ষে অপরাধের প্রমাণ আছে, তবে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই, করিলে অনেকের বিপদ, কাযেই দেশে শান্তিরক্ষার জন্য বিনা বিচারেই উহাদিগকে আটক রাখিতে হইতেছে।" যাহাদের জন্য শান্তিরক্ষা, তাহারা আটক আসামীদের মুক্তি চাহিতেছে, অথচ সরকার শান্তিরক্ষার জন্য ব্যস্ত,—এ প্রহসন কি চমৎকার নহে?

হাকিম আজমল খাঁ

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দিল্লী হইতে সংবাদ রটিত হইয়াছে যে, গত ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রিকালে দিল্লীর অবিসংবাদী জননায়ক হাকিম আজমল খাঁ সাহেব হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এমনই বজ্রাঘাতের মত সংবাদ আর এক দিন দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে রটিত হইয়াছিল, সে দিনও আর এক বিরাট জননায়কের মৃত্যুসংবাদে আসমুদ্র হিমাচল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। হাকিম আজমল খাঁও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত বড় অসময়ে দেশ ও জাতিকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া অকালে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।



হাকিম আজমল খাঁ

বস্তুতঃ যে সময়ে দীর্ঘ বিরোধ ও সংঘর্ষের পর হিন্দু মুসলমান সবেমাত্র মিলনের পবিত্র চণ্ডীমণ্ডপ গড়িয়া তুলিবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে মিলনকামীর অগ্রগণ্য, হিন্দুমুসলমান-মিলনযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হাকিম সাহেব কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তিনি স্বহস্তে যে একতার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অঙ্কুরোদ্গম না দেখিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? হাকিম সাহেবের অন্য যে কোনও গুণই থাকুক, তিনি বিদ্বান্, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, সুধী, সজ্জন, অমায়িক, দেশপ্রেমিক,—যাহাই হউন, তাঁহার হিন্দু-মুসলমানে একতাস্থাপনের আন্তরিক প্রয়াস তাঁহার জীবনের যে শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাক্তার আনসারি এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ ব্যতীত তাঁহার ন্যায় আন্তরিক মিলনপ্রয়াসী মুসলমান নেতা ভারতে একান্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যুনানী চিকিৎসক ও ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত

বলিয়া তাঁহার খ্যাতি অসাধারণ ছিল, এ কথা সত্য ; কিন্তু ঘোর গৃহবিবাদের দিনে তাঁহার মিলন-প্রয়াসের আন্তরিকতার খ্যাতি তাঁহাকে এ দেশের জাতীয় ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই। আজ হিন্দুমুসলমান একযোগে তাঁহার জন্য নয়নাশ্রু মোচন করিতেছে, ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা ?

মৃত্যুকালে হাকিমজী রামপুররাজ্যে ছিলেন। তথাকার নবাব সাহেব তাঁহার পরম বন্ধু। কিছু দিন হইতে হাকিম সাহেবের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও এই হেতু তিনি কিছু দিন হইতে জনসাধারণের সেবায়—দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। এই হেতু তিনি এবার কংগ্রেসে অথবা মুসলিমলীগেও যোগ দিতে পারেন নাই। তবে গত ১১ই ডিসেম্বর তাঁহার দিল্লীর আবাসগৃহে মুসলিমলীগের অধিবেশন-স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তিনি তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার জীবনের শেষ দেশের কায।

মহৎ বংশে হাকিম সাহেবের জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম নিবাস ছিল—মধ্য-এসিয়ার তুর্কীস্থানের কাসগর নগরে। তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ বাদশাহ বাবরের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন এবং অশ্বারোহী সেনাদলের অন্যতম নায়করূপে ভারতবিজয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর খাজা কাশিম ও খাজা হালিম নামক ভ্রাতৃদ্বয় সিন্ধু হাইদ্রাবাদে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা সিন্ধুদেশবাসী বহু মুসলমানের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। তাহার পর তাঁহাদেরই বংশধর হাকিম ফজিল খাঁ য়ুনানী চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হয়েন। তদবধি এই বংশ "হেকিম" বা চিকিৎসকরূপে সুপরিচিত। হেকিম আজমল খাঁ ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পিতামহ হেকিম সরিফ খাঁও হেকিমিতে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হেকিম আজমল খাঁর পিতা হেকিম নামুদ খাঁও উচ্চাঙ্গের হেকিম ছিলেন। কিন্তু আজমল খাঁ সকলের অপেক্ষা অধিক যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান,—সকলেই তাঁহাকে ধন্বন্তরি বলিয়া বিশ্বাস করিত।

হাকিম সাহেব আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিদ্যায় ও প্রাচ্যের চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চাতেই কালাতিপাত করিতেন, রাজনীতিতে প্রথম জীবনে কখনও যোগদান করেন নাই। কিন্তু খিলাফতের আন্দোলনকালে এবং অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনকালে তিনি পূর্ণোৎসাহে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের অনাচার এবং খিলাফতের অপমান তাঁহাকে পূর্ণ ত্যাগানালিষ্টে পরিণত করিয়াছিল। তিনি মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে বার কারাদণ্ডহেতু চিত্তরঞ্জন আমেদাবাদ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াও কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, সেইবার দেশের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে দেশের লোক হাকিম সাহেবকে তাঁহার স্থানে প্রেসিডেণ্টের গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তিনিও সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারে দেশবাসীকে পথিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবার জালিয়ানওয়ালার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর-বৎসর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অমৃতসরের মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহার নেতৃত্বে পরম আস্থাস্থাপন করিত।

জাতির বহুভাগ্যে এমন নেতা কদাচিৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আজ দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার মহাপ্রস্থানে শোকের রোল উঠিয়াছে। এমন নেতা নাই, যিনি আজ তাঁহার জন্য ব্যথায় কাতর হয়েন নাই। মহাত্মা গন্ধী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন, "হাকিম আজমল খাঁকে হারাইয়া আমি এক জ্ঞানী দৃঢ়ব্রত সহকর্ম্মীকে হারাইয়াছি, কেবল ইহাই নহে, আমি এমন এক জন বন্ধুকেও হারাইয়াছি, যাঁহার উপর হিন্দুমুসলমান-মিলনের ভারার্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।"

দিল্লীর টিব্বী ও জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া কলেজ হাকিমজীর জীবনের চিরস্মরণীয় অনুষ্ঠান। তাঁহার শেষোক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি দেশের লোক বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তবেই তাঁহার স্মৃতিসম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, যদি দেশের লোক হিন্দু-মুসলমান-একতা চিরস্থায়ী করিতে পারে, তবেই এই দেশপ্রেমিক হিন্দু-মুসলমান-মিলনকামীর মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্মৃতিসম্মানও রক্ষা করিতে পারিবে।

পাবনার প্রহসন

পাবনার হিন্দু-নেতৃগণের মামলার আপীলের রায়ে কলিকাতা হাইকোর্ট শীতলাইয়ের জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ীপ্রমুখ হিন্দুগণের কারাদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন, এ কথা সকলেই জানেন। তাহার পর হঠাৎ বাঙ্গালার সরকার পাবনার হাঙ্গামায় দণ্ডিত হিন্দু-মুসলমান-মাত্রকেই দয়া প্রকাশ করিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। ইহাতে সরকারের খামখেয়ালি খেলার চমৎকারিতা দেখিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে হয়।

সকলেই জানেন, পাবনা সহরের ভগ্ন হিন্দু-প্রতিমাদি বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, নিম্ন-আদালতের বিচারে তাহাতে হিন্দু নেতৃগণ শান্তিভঙ্গ করা ও দাঙ্গা করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে দায়রা জজের নিকট আপীলের ফলে তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করেন। তিনি হিন্দু-নেতৃগণকে প্রথমে শান্তিভঙ্গের জন্য দায়ী করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সরকার এই রায়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপারে "আগ্ সর্দ্দারী" করিয়া রায়ের বিপক্ষে হাইকোর্টে আপীল করেন। এমন অবস্থায় যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছিল, হাইকোর্ট দায়রা জজের রায় নাকচ করিয়া দিয়া নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল করিয়াছেন। হাইকোর্টের এই রায়ের জন্য দেশের লোক প্রস্তুত হইয়াছিল।

যে সরকার 'মুড়ুলী' করিয়া কোমর বাঁধিয়া হিন্দু-নেতৃগণকে দণ্ডিত করিবার উদ্দেশে হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সরকারই হঠাৎ পাবনার হাঙ্গামায় দণ্ডিত (সমস্ত পাবনা জিলার দাঙ্গায় দণ্ডিত) হিন্দু-মুসলমানমাত্রকেই

দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন কেন, ইহাই এখন জল্পনার বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, অন্য কাহারও নিকট না হউক, হিন্দু নেতৃগণের নিকট সর্ত্ত করিয়া এই ব্যবস্থা হইয়াছে। অথচ হিন্দু নেতা যোগেন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সংবাদপত্রে এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সরকারও তাঁহার প্রতিবাদের পর উচ্চবাচ্য করেন নাই। তবে ভিতরের কথাটা কি ?

হাইকোর্ট দায়রার রায় নাকচ করিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ঘটনার সত্যাসত্য অথবা সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা সম্পর্কে বিচারকগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। দায়রা জজ সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, হিন্দু নেতৃবর্গ দাঙ্গা করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, অথবা ঐ উদ্দেশ্যেই ভগ্নপ্রতিমাদির শোভাযাত্রা লইয়া গিয়াছিলেন ; পরন্তু হিন্দু নেতারা যে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া হিন্দুদিগকে মুসলমানদিগের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিলেন অথবা শোভাযাত্রাকালে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য হিন্দুদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহাও তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণ লইয়া বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, হিন্দুরা সংখ্যায় যেরূপ অত্যধিক ছিল, তাহাতে তাহারা সশস্ত্র ও প্রস্তুত হইয়া মুষ্টিমেয় মুসলমানগণকে আক্রমণ করিলে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ এত সামান্য হইত না, বা হিন্দুরা মুসলমানের নিকট গুরুতর আহত হইত না। হাইকোর্ট কিন্তু ইহার বিপরীত বিশ্বাস করিয়াছিলেন। দায়রা জজ যে সকল সাক্ষীর কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই, হাইকোর্ট তাহাদের কথায় 'আস্থাস্থাপন করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় আদালতের মতভেদ হইবার কথা। ইহা মনোবৃত্তির উপর কতকটা নির্ভর করে। ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় বিচারকের মনোবৃত্তির দ্বারা হইয়া থাকে। এখানে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণে এইটুকুমাত্র বলিতে পারে যে, ঠিক সত্য নির্ণীত হয় নাই—এ জন্য বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

কিন্তু সরকারকে ইহাতে অপরাধ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। পাবনার দাঙ্গা-হাঙ্গামা বহু দিন হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সে ক্ষতের কথা প্রায় ভুলিয়া আসিতেছিল। সরকার ইহাও জানিতেন যে, পাবনা সহরে না হউক, পাবনা জিলার মফঃস্বলে হিন্দুরাই মুসলমানের হস্তে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছে। সে অবস্থায় দণ্ড হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিন্দু নেতৃবর্গকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহাদের এই অসহ্য জিদ কেন ? এ রহস্য কে ভেদ করিবে ?

তাহার পর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াই এই ক্ষমাপ্রদর্শনের আড়ম্বরই বা কেন ? ইহা কি এক অপূর্ব্ব প্রহসন নহে ?

কাকোরি ষড়যন্ত্রের আসামী

এই ষড়যন্ত্র মামলায় কয়জন দেশীয় যুবকের প্রতি যে কঠোর দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল, তাহাতে দেশে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই। যদিও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীরা রাজদ্রোহ অথবা দস্যুতা অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকে, তথাপি তাহারা যে ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াছিল, অথচ একটা কোনও নীচ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধ করে নাই, এ কথাও ত স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাহাদের কোমল বয়সের ও ভাবপ্রবণতার কথা বিবেচনা করিয়া দণ্ডদান-কালে দয়াপ্রদর্শন করাও কি কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য ছিল না ? এই কয়টি প্রাণীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সরকার যে বিশেষ কিছু লাভ করিলেন, এমন ত মনে হয় না। তাহাদের পক্ষ হইতে দয়াভিক্ষার যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহাতে পাষাণও বিগলিত হয়, কিন্তু এ দেশের কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হয়েন নাই।

যাহাই হউক, এই তরুণ ভাবপ্রবণ দণ্ডিত আসামীরা মৃত্যুকালে যে নির্ভীকতা ও দেশপ্রেমিকতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে উহাদের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে বলিয়া সরকার কি এ কথা বিশ্বাস করিবেন ? এক জন বলিয়াছে, সে আবার আসিবে, আবার তাহার জন্মভূমির সেবা করিবে। এমন একাগ্রতা, এমন দেশপ্রেমের তন্ময়তা যাহাদের মধ্যে নিহিত ছিল, তাহাদের মধ্যে যে মহত্ত্বের বীজও নিহিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকার দয়াপ্রদর্শন করিয়া যদি তাহাদিগের সেই মহৎ মনোবৃত্তিকে সৎপথে চালিত করিবার প্রয়াস পাইতেন—যদি হিংসার পথ হইতে তাহাদিগকে অহিংসার পথে লইয়া আসিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে তাহা কি লাভ না ক্ষতিকর হইত ?

সাংবাদিকের পরলোক

(১) বাঙ্গালার সাংবাদিক-জগতে এক জন প্রাচীন কর্ম্মীর অভাব ঘটিল। 'বেঙ্গলীর' পৃথ্বীশচন্দ্র রায় পরলোক প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি কেবল সাংবাদিক ছিলেন না, গ্রন্থরচয়িতৃরূপে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার ভারতের 'দারিদ্র্য-সমস্যা' সুচিন্তিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থপ্রণয়নের ফলে এ দেশে ও বিদেশে তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার আরও কয়খানি গ্রন্থের সমাদর হইয়াছিল। এইহেতু সাহিত্যিকরূপেও তাঁহার খ্যাতি ছিল।

তাঁহার নিজস্ব 'ইণ্ডিয়ান ওয়ারল্ড' পত্র এক সময়ে এ দেশে প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, উহাতে তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে সার সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করিলে তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি জাতীয় কংগ্রেসের এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিক অভিমত মধ্যপন্থানুযায়ী ছিল, এ কথা সত্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নির্ভীক ও স্পষ্ট কথায় সরকারের অব্যবস্থার সমালোচনা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

মডারেট হইলেও তিনি পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র জাতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া থাকিতেন। দীঘাপাতিয়ার রাজপ্রাসাদে তিনি জাতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বড় বড় রাজপুরুষের সহিত একত্র পানভোজনে যোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া নিমন্ত্রণের স্থল ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিপ্লববাদীদিগের ত্যাগ ও দেশ-প্রেমিকতার কথা তিনি নিজপত্রে

CENTRAL LIBRARY 358

শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারই গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পৃথ্বীশচন্দ্রই বাঙ্গালার নেতৃ-সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের এই ব্যথায় আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

(২) গত ১৬ই পৌষ রবিবার 'ক্যাপিটাল' পত্রের সম্পাদক মিঃ প্যাট্রিক ওরেলি লোভাট নিউমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।



প্যাট লোভাট

এই ৬৪ বৎসরের মধ্যে ৪৪ বৎসর তিনি এই ভারতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল তিনি সাংবাদিকরূপে কার্য্য করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' ও 'এডভোকেট অফ ইণ্ডিয়া' এবং কলিকাতার 'ডেলি নিউজ' 'প্ল্যান্টার্স গেজেট' এবং 'ক্যাপিটাল' পত্রে তিনি লেখকতা করিয়াছিলেন এবং বারো বৎসরকাল শেষোক্ত পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাতে সরকারী বে-সরকারী অনেক লোকই সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। 'ডিচার' নাম স্বাক্ষরিত মন্তব্যে তিনি কলিকাতার নানা অনাচার নিবারণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সকল বিষয়ে লিখিতে সমর্থ ছিলেন, বিশেষতঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যসম্পর্কিত সমস্যায় তাঁহার নানা নিবন্ধ অনেকের পক্ষে শিক্ষার বিষয় ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নির্ভীকভাবে ভারতীয়ের স্বার্থের পক্ষে লেখনীধারণ করিতেন, এ জন্য নিজ সমাজের অনুরাগ-বিরাগের অপেক্ষা রাখিতেন না। এমন লোকের অভাব সাংবাদিক জগতে নিশ্চিতই অনুভূত হইবে।

অনাগত

বর্ত্তমানে দেশের মুক্তিসমরে রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে, নানাভাবের ভাবুক সে সম্বন্ধে নানা পথ দিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। এ সম্বন্ধে একটা বড় সমস্যার কথা উঠিয়াছে,—আন্দোলন কি দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, না দীন দরিদ্র নিরক্ষর শ্রমিক ও কৃষককেও সেই গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়া উহাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার চেষ্টা করা হইবে? 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার 'অনাগত' নামক উপন্যাসের মধ্য দিয়া সেই সমস্যাসমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্রফুল্ল বাবু সাংবাদিক জগতে সুপরিচিত। কথা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার এই নূতন উদ্যম। তাঁহার সুষ্ঠু সুমার্জ্জিত রচনার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে যে তাঁহার স্বচ্ছন্দগতি ভাষার পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে এবং ভাবের সমাবেশেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাশিয়ায় এবং মহাচীনে আজ যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, সেই কৃষক ও শ্রমিক জাগরণকে আদর্শ রাখিয়া এ দেশেরও 'নির্য্যাতিত অপমানিত অনাহারক্লিষ্ট' দীন-দরিদ্রকে জাগাইতে না পারিলে মুক্তি আসিবে না, ইহাই তিনি চরিত্র-চিত্রের সমাবেশে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে তাঁহার গ্রন্থ কেবল উপন্যাস নহে, ইহা দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক সমস্যা-সমাধানেও অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং এ গ্রন্থ দেশের চিন্তাশীলগণের অবসর-বিনোদন করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থখানির মূল্য ১৷৷০ টাকা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

তবে একটা বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার আছে। প্রফুল্ল বাবু মার্জ্জিত ভাষা-সম্পদের অধিকারী হইয়াও বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল ভাষাস্রোতে 'গা-ভাসান' দিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। বঙ্কিম-মধুসূদনের ভাষাকে ঢালিয়া সাজিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষার গড্ডলিকা-প্রবাহের কি তিনি পক্ষপাতী?

ভরতপুর

ভরতপুরের মহারাজা সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। নাভার মহারাজা, ইন্দোরের হোলকার, ভরতপুরের মহারাজা—একে একে ভারতের সামন্ত নৃপতিগণের মধ্যে কয় জন রাজ্যচ্যুত হইলেন। এতদ্ব্যতীত হাইদ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের সহিত ভারত সরকারের যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহাতেও ভারতের

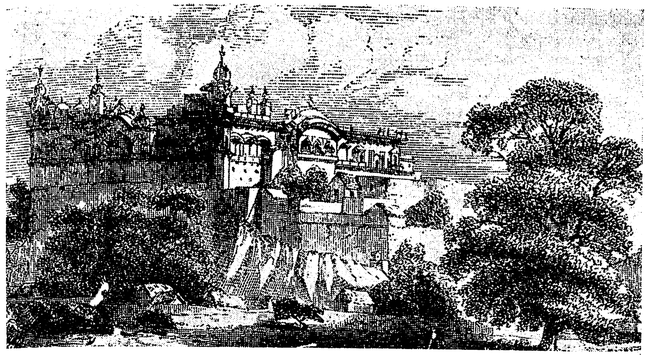

ভরতপুরের রাজপ্রাসাদ

নৃপতিরাজগণের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে অনেক সমস্যার কথা উত্থিত হইয়াছে।

প্রথমে ভরতপুরের মহারাজার রাজ্যশাসন সম্পর্কে ভারত সরকার এক তদন্ত কমিশন নিয়োগের আয়োজন করিয়াছিলেন। মহারাজাও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। তিনি ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন, তাঁহার রাজ্যটিকে ভারত সরকার পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য বড়লাট যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে তিনি সম্মত হইবেন।

তাঁহার এই কথায় ভারতের রাজন্যমহলে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজার অপরাধ কি, তাহা ভারত সরকার প্রকাশ করেন নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক তদানীন্তন বড়লাটের প্রতিনিধিরূপে বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ব্বপুরুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মহারাজার রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না"; তাহার পর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতেও এই প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, বৃটিশ সরকার তাঁহার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ইহার পরেও লর্ড কার্জ্জন মহারাজা রামসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার ২৭ বৎসর পরে আবার এক জন মহারাজার রাজ্যচ্যুতি ঘটিল।

এখন জিজ্ঞাস্য, দেশীয় রাজন্যগণের বৃটিশ শাসনাধীনে অবস্থা কিরূপ? তাঁহাদিগকে যদি বৃটিশ ভারতের বড়লাট রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য রাজ্যচ্যুত করিতে পারেন, তবে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধির মূল্য কি? উহা কি চোতা কাগজ?

শুনা যাইতেছে, ভারতীয় রাজন্যগণ রাজন্য-মণ্ডলী সভার মারফতে ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, তাঁহারা বৃটেনের রাজার সার্ব্বভৌমত্বের অধীন অর্দ্ধস্বাধীন নরপতি। স্বাধীন নরপতির মর্য্যাদা অনুসারেই তাঁহাদের সহিত আচরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত এক্ষণে সামান্য জমীদারের মত ব্যবহার করা হইতেছে। এই ব্যবহার সম্পর্কে তাঁহারা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে একটা খোলাখুলি কথা শুনিতে চাহেন।

সুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, এই ব্যাপার লইয়া একটা রীতিমত বিচার-বিতর্ক চলিবে।

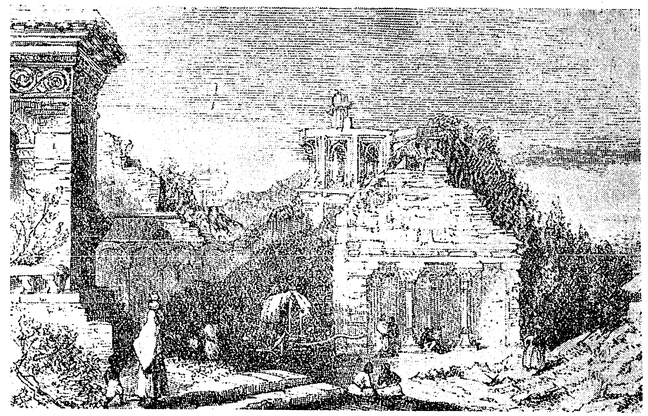

ভরতপুরের ডীগ দুর্গের ভগ্নাবশেষ



সতীর পতি

(উপন্যাস)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার আয়োজন

"যা হোক, একটা ঠিক ক'রে ফেল—আর ব'সে ব'সে ভাবলে কি হবে? আমি পাঁজি দেখেছি, বুধবারে ভাল দিন আছে—ঐ দিন আমরা বেরিয়ে পড়ি চল।"

সন্ধ্যার পরে হীরালাল বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে টাইম-টেবল দেখিতেছিল, রেবতীর কথায় সে মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, "দেখ, আলমোরা ত অনেক দূর, নৈনিতালেই যাওয়া যাক চল।"

রেবতী বলিল, "বাড়ীর কি হবে? নূতন যায়গা, সেখানে পৌঁছে আমরা উঠবো কোথা?"

হীরালাল বলিল, "সেই ত সমস্যা। নৈনিতালের কয়েকটা হোটেলের বিজ্ঞাপন এতে রয়েছে বটে, কিন্তু সবই দেখ্‌ছি, সাহেবদের হোটেল। সেখানে গিয়ে ওঠা কি আমাদের পোষাবে?"

"তা কি আর পোষায়? তা হ'লে নৈনিতাল-ফৈনিতাল ছেড়ে দাও—ঐ দার্জ্জিলিঙই ভাল। কাছাকাছি যায়গা, ভাড়াও কম, বাড়ী-টাড়ীও একটা সহজে পাওয়া যাবে। দার্জ্জিলিঙের কত খালি বাড়ীর বিজ্ঞাপন ত কাগজে থাকে দেখতে পাই!"

হীরালাল বলিল, "তা থাকে,—তবে সেখানেও ত সমস্যা!"

"চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার কথা বল্‌ছ ত? তা, আমি পর্দ্দানশীন সেজে থাক্‌বো এখন, আমি তোমার ঘরেরটি কি বাইরেরটি, কে-ই বা জানতে পারবে? এক পাতা সিঁদুর কিনে এনে দিও আমায়—আর সোনার পাতে মোড়া একগাছা সাবিত্রী নোয়া।"—বলিয়া রেবতী হাসিল।

হীরালাল বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "কিন্তু তুমি পর্দ্দার ভিতরে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তোমার স্বাস্থ্যের উপকারটা কি হবে? সকালে বিকালে একটু বেড়ানো দরকার ত? জুতো-মোজাও তোমায় পরতে হবে, নইলে বেড়াবে কি ক'রে?"

রেবতী বলিল, "সেটা আর আজকাল দোষ ব'লে গণ্য হয় না। দার্জ্জিলিঙ গিয়ে আমি থেকেছি ত পূর্ব্বে, কত হিঁদুঘরের বউ, দিব্যি জুতো মোজা প'রে স্বামীর সঙ্গে বা অন্য কোনও পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়। তবে হ্যাঁ, পথে স্বামীর কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে তারা শেক-হ্যাণ্ড ক'রে হাড়ুডু বলে না, একটু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ বা রিক্‌সা ক'রে বেরোয়,—একটু দূরে গিয়ে, নির্জ্জন স্থান দেখে নামে, হেঁটে বেড়ায়।"

হীরালাল বলিল, "তবে তাই চল। দার্জ্জিলিঙেই তিনটে মাস কাটিয়ে আসা যাক্। প্রথমে গিয়ে জুবিলি স্যানিটেরিয়মে ওঠা যাবে, তার পর দেখে শুনে একটা বাড়ী ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে, কি বল? স্যানিটেরিয়মে পরিবার নিয়ে থাকবার ব্যবস্থাও আছে শুনেছি।"

দুই জন ঝির মধ্যে সৌদামিনী সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। অন্য ঝি কিছু দিন হইতে বাড়ী যাইবার জন্য ছুটী চাহিতেছিল —সে বাড়ী যাউক। দ্বারবান্ হরি সিং এখানে থাকিয়া বাড়ী আগলাইবে। জিনিষপত্র যাহা প্রয়োজন, তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। হীরালাল বলিল, "এইবার খাবার দিতে বলি,—তুমি রোগা মানুষ, আর বেশী রাত ক'রে খাওয়া ঠিক নয়!"—বলিয়া হীরালাল সৌদামনীকে ডাকিয়া উভয়ের খাবার আনিতে আদেশ করিল।

পরদিন সারাটা দিন যে হীরালালের কোথায় দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। জিনিষপত্র কেনা, শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া গাড়ী রিজার্ভ করা, স্যানিটেরিয়মে ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স ঠিক রাখিবার জন্য দার্জ্জিলিঙে টেলিগ্রাম করা, আহীরিটোলার মেসে গিয়া হিসাবপত্র চুকাইয়া দিয়া নিজের জিনিষপত্র লইয়া আসা, ইত্যাদি। হীরালালের নিজের জন্য আলমোরা বা নৈনিতালের উপযোগী দুই প্রস্থ গরম স্যুট পূর্ব্বেই অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলিও আনিতে হইল।

সন্ধ্যার পর হীরালাল বাড়ী ফিরিয়া একান্ত অবসন্ন দেহে সোফায় এলাইয়া পড়িল। রেবতী সোডা-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ "ঔষধ" হীরালালকে পান করাইয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। এখন আর এ সকল বিষয়ে হীরালালের কোনও আপত্তি ছিল না।

দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া, বাড়ী খুঁজিয়া লইতে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। সপ্তাহমাত্র স্যানিটেরিয়মে বাস করিয়া রেবতী ও হীরালাল সেই নূতন বাসায় উঠিয়া গেল।

রেবতী ইহার পূর্ব্বে আর একবার দার্জ্জিলিঙে আসিয়া মাসখানেক বাস করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেবার তাহার চোখে দার্জ্জিলিঙ এত ভাল লাগে নাই। প্রথম মাসটা পরম আনন্দেই রেবতীর কাটিল। প্রভাতে ও বিকালে বেড়াইতে যাইবার পরামর্শই তাহাদের ছিল; কিন্তু প্রভাতে বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না,—প্রভাতে চা পান করিয়া স্থানীয় ভৃত্য গাহাড়িয়া বালক কাঞ্চিকে সঙ্গে লইয়া হীরালাল বাজার করিতে যাইত। বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতে বেলা ৯টা বাজিয়া যাইত। তাহার পর কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর স্নানাদির ব্যবস্থা। বিকালে চারিটা বাজিলেই উভয়ে সাজ-সজ্জা করিয়া ভ্রমণে বাহির হইত। প্রথম প্রথম রেবতী বেশী দূর যাইতে পারিত না, বিশেষ, চড়াই উঠিতে হইলেই সে অত্যন্ত হাঁপাইয়া পড়িত; কোথাও বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইত। ক্রমে পথ হাঁটা, চড়াই ওঠা তাহার অভ্যাস হইয়া আসিতে লাগিল, তেমন আর কষ্ট হইত না। তবে এই এক মাসে দুইবার তাহার দেহাশ্রিত ম্যালেরিয়া মস্তক মাথা তুলিবার উপক্রম করিয়াছিল,—কিন্তু রেবতীকে কাবু করিতে পারে নাই। সৌভাগ্যবশতঃ পথে ঘাটে কোনও পরিচিত লোকের সহিত ইহাদের আজিও সাক্ষাৎ হয় নাই।

মাসকাবার হইয়া গেলে, রেবতী থিয়েটরের ম্যানেজার বাবুকে পত্র লিখিল, যেন তাহার বেতনের টাকাটা মনি-অর্ডার করিয়া এখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। হীরালালও সেই সঙ্গে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিল, ম্যানেজার বাবু যেন দয়া করিয়া তাহার বেতন হইতে পঁচিশটি টাকা দেশে তাহার মাতাঠাকুরাণীকে পাঠাইয়া দেন এবং বাকী টাকা রেবতীর টাকার সঙ্গে একযোগে এখানে পাঠাইয়া দেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙে

আষাঢ় মাস। দার্জ্জিলিঙে বর্ষা নামিয়াছে। আজ সারা-দিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িয়াছে; বৃষ্টির জন্য বিকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া যায় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমস্ত দিন বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া দুই জনেরই বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। হীরালাল আসিয়াই রেবতীর অনুরোধে কাশীশ্বরী পাব্‌লিক লাইব্রেরীর মেম্বর হইয়াছিল;—সন্ধ্যার পর প্রায়ই উভয়ে ঘণ্টা দুই বহি পড়িয়া কাটাইত। বাজার করিয়া ফিরিবার পথে হীরালাল লাইব্রেরী হইতে বহি বদলাইয়া আনিত। শেষ যে বহিখানা আনিয়াছিল, তাহা গতকল্যই শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ বৃষ্টির জন্য হীরালাল নিজে বাজারে যায় নাই —বহিও বদলাইয়া আনা হয় নাই। সময় কাটানোই মুস্কিল।

রেবতী প্রস্তাব করিল, "খানিক ব'সে দু'জনে বিস্তি খেলা যাক এস।"

হীরালাল বলিল, "মন্দ কি! যা হোক্ কিছু একটা করা যাক্।"

রেবতী শয়নকক্ষে গিয়া তাহার বাক্স হইতে তাস বাহির করিয়া আনিল। ছোট একখানা টিপয় মাঝে রাখিয়া দুই জনে বিস্তি খেলা সুরু হইল।

হীরালাল কলের পুতুলের মত বসিয়া খেলিতে লাগিল বটে, কিন্তু খেলায় মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। অকারণে তাহার "চৌদ্দ" ধরা পড়িয়া যায়,—তাহার হাতে ফেরাই থাকিতেও রেবতী নিজ "দশ"গুলা লইয়া পলায়ন করে—এইরূপ হইতে লাগিল। হীরালাল হারিতে লাগিল।

রেবতী বলিল, "ও কি হচ্ছে তোমার? মন তোমার কোথায় বল দেখি?"

হীরালাল বলিল, "কি জানি, খেলায় কেমন মন লাগাতে পারছিনে। এ থাক্ গে—দু'জনে ব'সে একটু গল্প করা যাক্ এস।"

"আচ্ছা, হাতের বাজিটা তা হ'লে শেষ হোক্।"—বলিয়া রেবতী তাস ফেলিল।

খেলা শেষ করিয়া, নিজ হাতঘড়ির পানে চাহিয়া রেবতী বলিল, "৮টা বাজে। এইবার পেগ দিতে বলি ?"

"বল।"

প্রথম গ্লাসের মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিয়া রেবতী বলিল, "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব, সত্যি বল্‌বে ?"

"কোন্ দিন তোমায় মিথ্যা বলেছি ?"—বলিয়া গ্লাসে একটা চুমুক দিয়া হীরালাল উহা রেবতীর হাতে দিল।

রেবতী বলিল, "তা বলনি বটে। আচ্ছা, আজ বিকেল থেকে তুমি কি কিছু ভাবছ ? প্রায়ই দেখছি, তুমি যেন কেমন অন্যমনস্ক। আজ বেলা তিনটের পর থেকে একটিবারও তোমার মুখে আমি হাসি দেখিনি।"

হীরালাল বলিল, "দিনের বেলায় ঘুমানোটা অন্যায় হয়ে গেছে।"

"তা ত হয়েছেই। এই ঠাণ্ডায়, দিনে ঘুমিয়ে শরীরটে আমারও কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করছে। কিন্তু তোমার শুধু শরীরটে নয়, মনটাও যেন কেমন বিকল হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাই নয় কি ?"

হীরালাল বলিল, "মনটাও আমার খারাপ হয়েছে, তা সত্যি।"

"কেন ? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে ?"

"ঠিক তাই নয়। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।"

রেবতী বলিল, "কি দুঃস্বপ্ন, আমায় বল না গো ?"

"তোমায় ব'লে ফল কি ? মিছে তোমারও হয় ত মন খারাপ হয়ে যাবে।"

"আমার মন খারাপ হবে—এমন কি স্বপ্ন ?—আমি ম'রে গেছি, এই কি তুমি স্বপ্ন দেখেছ ?—তা যদি দেখে থাক, তাকে ত দুঃস্বপ্ন বলা যায় না,—সেটা ত সুস্বপ্ন, ভাই !"

হীরালাল বলিল, "না, সে স্বপ্ন আমি দেখিনি। যা দেখেছি, তোমায় বলব—কিন্তু গ্লাস খালি হয়ে গেছে, আর একটু ঢাল। আমি যা স্বপ্ন দেখেছি, শুনে তুমি বল, আমার এখন কি করা উচিত।"

রেবতী আবার গ্লাস ভর্ত্তি করিয়া দিল। হীরালাল কিঞ্চিৎ পান করিয়া, রেবতীকে দিয়া, নীরবে একটা সিগারেট ধরাইল। রেবতী কাতর নয়নে হীরালালের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হীরালাল তখন ধীরে ধীরে বলিল, "মরার স্বপ্নই দেখেছি বটে। স্বপ্ন দেখলাম, যেন দেশে গেছি, আর সুরবালা মৃত্যুশয্যায়। আমাকে দেখে যেন তার দু'টি চোখ দিয়ে টস্-টস্ ক'রে জল পড়তে লাগল। আমি রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, তার মাথায়, গায়ে হাত বুলুতে লাগলাম। সে যেন আমার পায়ের ধুলো নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আমার পা খুঁজতে লাগলো। আমি তাকে বল্‌লাম, 'তুমি সতী লক্ষ্মী—পুণ্যবতী, আমি পাষণ্ড পাপী দুরাচার—আমার পায়ের ধুলো নিয়ে নিজেকে তুমি অপবিত্র ক'রো না।' কিন্তু সে শুন্‌লে না,—আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিয়ে, চোখ বুজে রইল। তার মুখখানি তখন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে চোখ বুজেই রইল। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে, আমি তাকে নাম ধ'রে ডাকলাম, কিন্তু আর উত্তর পেলাম না। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস আর বইছে না—সব শেষ হয়ে গেছে।"

রেবতী শুনিয়া চক্ষু নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষে রেবতী বলিল, "তুমি এখানে এসে অবধি বাড়ী ত চিঠিপত্র কিছুই লেখনি,—নয় ?"

হীরালাল বলিল, "কৈ আর লিখেছি।"

"তাদের কোনও চিঠিও তুমি ত কৈ পাও নি! বোধ হয়, তোমায় তাঁরা চিঠিপত্র যা লিখেছেন, তা সেই আহীরি টোলার বাসাতেই এসে প'ড়ে আছে।"

"সম্ভব।"

"বিপিন বাবুর নামে একটা তার পাঠিয়ে দাও না। বাড়ীর সবাই কে কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কর। এত দিন বাড়ীতে কোনও চিঠিপত্র না লেখা তোমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে কিন্তু।"

"আজ লিখি কাল লিখি ক'রেই লেখা হয় নি। আর কি-ই বা লিখ্‌বো ছাই! তবে কলকাতা ছাড়বার আগে বিপিনকে আমি একখানি ছোট চিঠি লিখেছিলাম,—পাকে-প্রকারে সব কথা তাকে জানিয়েছিলাম। আর তাতে লিখেছিলাম, বাড়ীর লোক যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে সে যেন বলে, সে আমার চিঠি পেয়েছে, আমি ভালই আছি।"

"তুমি যে দার্জ্জিলিঙে আসছ, সে কথা তাঁকে জানিয়েছিলে ?"

"না—তা জানাই নি। লিখেছিলাম, অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করছি, তিন মাস পরে কলকাতায় ফিরে এসে আবার চিঠি লিখ্‌বো।"

রেবতী বলিল, "তুমি টেলিগ্রাফ ক'রেই দাও। বিপিন বাবু যখন আসল কথাই জানেন, তখন দার্জ্জিলিঙে তোমার ঠিকানা জানলে কি আর তেমন ক্ষতি হবে ? আর্জেণ্ট ক'রে দাও—কাল দিনের মধ্যে এক সময় জবাব এসে পৌঁছবে।"

রেবতীর পরামর্শ অনুসারে হীরালাল টেলিগ্রাম লিখিল। ভৃত্য-বালক কাঞ্চি তখনই গিয়া সে টেলিগ্রাম রওয়ানা করিয়া আসিল।

পরদিন বেলা দুইটার পর তারের জবাব আসিল। বিপিন বাবু লিখিয়াছেন, "তোমার বাড়ীর সকলেই কুশলে আছেন, কোনও চিন্তা নাই।"

টেলিগ্রাম পাইয়া হীরালালের মনটা নিশ্চিন্ত হইল। তাহার মুখে আবার হাসি ফুটিল।

রেবতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখলে ত! আমি তোমায় বলেছিলাম, কিছু ভয় নেই, সুরবালা ভালই আছে। এখন আমায় কি বক্‌শিস দেবে দাও।"

হীরালাল বলিল, "আমার থাকবার মধ্যে ত আমি নিজেই—তা তোমায় দিয়ে ফেলেছি! আর কোথায় কি পাব বল ?"

এইরূপ হাস্য-পরিহাসের মধ্যে চা-পান সমাপ্ত করিয়া, উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইল। আজ আকাশটা বেশ পরিষ্কারই ছিল।

"আজ কোন্ দিকে যাওয়া যায় ?"—গল্প করিতে করিতে দুই জনে পদচালনা করিল। ক্রমে উভয়ে দার্জ্জিলিঙের হিন্দু-শ্মশানের দিকে নামিতে লাগিল। শ্মশানভূমির প্রান্ত দিয়া ক্ষুদ্র গিরি-নির্ঝরিণী কুলু-কুলু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। নিকটে কোনও জনমানব দৃষ্ট হইতেছে না। দাহস্থানের কাছাকাছি পৌঁছিয়া দুই জনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এ স্থানে পূর্ব্বেও এক দিন ইহারা বেড়াইতে আসিয়াছিল। রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরবে ? না, একটু বসা যাবে ?"

হীরালাল বলিল, "চল, জলের কাছে বসি। ঐ দেখ, ঠিক একখান পাথর রয়েছে—বসবার সুবিধে আছে।"

শ্মশানভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া, দুই জনে গিয়া সেই শিলাতলে উপবেশন করিল।

রেবতী বলিল, "আচ্ছা, তোমার সে টেলিগ্রামখানায় লেখা ছিল, কখন্ বিপিন বাবু সেটা রওয়ানা করেছিলেন ?"

হীরালাল পকেট হইতে টেলিগ্রামখানা বাহির করিয়া, উহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আজ সকালে ১০টা ২০ মিনিটে।"

"তা হ'লে আজ সকালেই বোধ হয় বিপিন বাবু তোমার টেলিগ্রামখানা পেয়েছিলেন ?"

"তাই সম্ভব।"

"তিনি বোধ হয়, তোমার বাড়ীতে গিয়ে, সবাই কেমন আছে জেনে এসে, তার পর তার করেছেন ?"

"নিজে গিয়ে হোক, অথবা কাউকে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে হোক্, খবরটা আগে নিয়েছেন নিশ্চয়।"

"আচ্ছা, কলকাতা থেকে তুমি তাঁকে যে চিঠি লিখে এসেছ, সে চিঠি পেয়ে তিনি কথাটা সেখানে প্রকাশ ক'রে দেন নি ত ?"

"সে রকম হাল্কা সে নয়।"

"এত দিন তিনি তোমার ঠিকানা জানতেন না, কাযেই সে চিঠির কোন উত্তর দিতেও তিনি পারেন নি। এইবার ঠিকানা জেনেছেন, এইবার একখানা খুব কড়া চিঠি তুমি পাবে বোধ হয় তাঁর কাছ থেকে। আমার সঙ্গে মিশতে পৈ-পৈ ক'রে তোমায় বারণ করেছিলেন। যে ভয়ে করেছিলেন, তাই তুমি ঘটালে, তবে ছাড়লে।"

হীরালাল এ কথার কোন উত্তর করিল না, শুধু তাহার মুখে একটু বিষাদের হাসি প্রকাশ পাইল।

হীরালালকে নীরব দেখিয়া রেবতী আদরের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তুমি কি ভাবছ, বল না!"

হীরালাল বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। কাল সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে যখন আমি স্বপ্নের কথা বলেছিলাম, তখন একটা কথা বলতে ভুলেছি। স্বপ্নে সুরোকে যখন পোড়াতে গিয়েছিলেম, তখন আমাদের গ্রামের নদীর ধারের সে শ্মশান ত দেখিনি। এই শ্মশানটাই দেখেছিলাম।"

রেবতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এই শ্মশান! বল কি ?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, ঠিক এই শ্মশান।"

রেবতী বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তা হ'লে বুঝেছি!"

"কি বুঝেছ ?"

"স্বপ্নে সুরোকে তুমি পোড়াতে আসনি, আমাকেই পোড়াতে এসেছিলে।"

"না না—সুরোকে। আমাদের বাড়ীতে, আমার শোবার ঘরে, সেই তক্তপোষের উপর—সুরো আমার পায়ের ধুলা নিয়ে

চোখ বুজলে—সেখানে তুমি যাবে কি ক'রে?—সে সুরোই।"

রেবতী বলিল, "বর্দ্ধমান জেলার সেই মাধবপুর গ্রাম থেকে, সুরোর দেহ দার্জ্জিলিঙের এই শ্মশানেই বা আস্‌বে কেমন ক'রে, তাই বল। সুরো সতীলক্ষ্মী, সে কেন মরবে? সে দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকুক, পাকা মাথায় সিঁদুর পরুক—আমিই বোধ হয় এই দার্জ্জিলিঙে দেহ রাখ্‌বো। তুমি আমায় পুড়িয়ে—কাঁদতে কাঁদতেই বোধ হয়—কলকাতায় ফিরে যাবে। দেখ, লোকে কথায় বলে, স্বপ্নে আপনার ভাল বা মন্দ কিছু দেখ্‌লে সেটা পরের হয়।"

হীরালাল রেবতীর একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল, "তুমিই কি আমার পর?"

রেবতী সেইরূপ স্বরে বলিল, "পর না ত কি! এ জন্মে ত পর! আস্‌ছে জন্মে, যদি পার ত তোমার রেবিকে আপন ক'রে নিও। জাল সিঁদুর, জাল নোয়া যেন আমায় আর না পরতে হয়!"—বলিতে বলিতে রেবতীর চক্ষু দিয়া টপ্‌-টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

"ছি ছি, মিছে তুমি মন খারাপ করছ কেন ভাই?"—বলিতে বলিতে হীরলাল সযত্নে রেবতীর অশ্রু মুছাইয়া দিল। বলিল, "চল, এবার ফেরা যাক্‌। ঐ দেখ, সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে। অনেকটা দূর চড়াই উঠতে হবে।"

রেবতী বলিল, "না, আর একটু বসি। সত্যি, আমার বেশ লাগছে। শ্মশানে এলে মানুষের মন পবিত্র হয়, সে কথা ত মিথ্যে নয়! আমি এমন পাপী মানুষ, আমারও মনে হচ্ছে, যেন কত উঁচুতে উঠেছি।"

হীরালাল নীরবে, নতমুখে বসিয়া রহিল। রেবতীও কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর বলিল, "আচ্ছা, যে পাপী, সেই যে চিরকাল পাপীই থাকবে, এমন কিছু কথা আছে কি?"

হীরালাল মুখ তুলিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই না।"

"তা হ'লে, আমরা দু'জনে ইচ্ছা করলে ত এই পাপ পথ পরিত্যাগ করতে পারি?"

হীরালাল বিষাদপূর্ণ স্বরে বলিল, "ভালবাসা কি পাপ?"

রেবতী বলিল, "আমি মূর্খ মেয়েমানুষ। ভালবাসা পাপ কি না, তা জানিনে। কিন্তু কারু মন্দ করা, কারু মনে কষ্ট দেওয়া, নিশ্চয়ই পাপ। সুরবালা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী—তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার তারই। আমি তার স্বামীটিকে কেড়ে নিচ্ছি—তা আমি তাকে যতই ভালবাসি না কেন—এটা নিশ্চয়ই পাপ। তবে, ভালবাসা যে পাপ নয়, সেটাও ঠিক। কেন না, পূর্ব্বেও আমি অন্য পুরুষের সংস্রবে এসেছি, তখন কৈ এক দিনও ত আমার মনে হয় নি যে, আমি এক জন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করছি। আজ আমার সে কথা কেন মনে হচ্ছে জান?—ভালবাসা যে কি জিনিষ, তা ত আমি আগে জানতাম না! আগে বুঝতাম স্বার্থসিদ্ধি—বাসনা-পরিতৃপ্তি। তোমাকে পেয়ে, এত দিনে আমি সত্যি ভালবাসা যে কি, তার স্বাদ পেয়েছি। সেই ভালবাসার আগুনে, আমার মনের সব ময়লা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার কি মনে হয় জান?—আমি স্বচ্ছন্দে, সতীকে তার পতি ফিরিয়ে দিয়ে, চ'লে যেতে পারি। পুরাণের যুগে, পুণ্যাত্মা রাজারা, অন্য কাকেও পৃথিবী দান ক'রে নিজেরা নিঃস্ব হ'তে পারতেন; আমি কি পরের জিনিষের লোভটুকুও পরিত্যাগ করবার মত শক্তি রাখিনে?"—বলিয়া রেবতী নীরব হইল।

হীরালাল ধীরে ধীরে রেবতীর একখানি হাত টানিয়া লইয়া, নিজ বক্ষে তাহা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার বুকের ভিতরটা কি রকম তোলপাড় করছে, দেখ।"

রেবতী নিজ হাতখানি হীরালালের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি অধীর হচ্ছ কেন, ভাই? সত্যিই কি আমি মর্‌বো, কিম্বা সত্যিই কি আমি তোমায় ছেড়ে চ'লে যাব? মুখে এত যে বক্তৃতা করলাম—অভিনেত্রী যদি বক্তৃতা না করবে ত করবে কে বল? যা বল্লাম, সত্যিই কি আমি তা পারবো?—সত্যিই কি এত উঁচুতে আমি উঠতে পেরেছি? ষ্টেজের উপর আমি যে সীতা সাজি—অগ্নিপরীক্ষায় পার হয়ে আসি—এও বোধ হয় সেই রকম। না-না,—আর এ শ্মশানে বেড়াতে আসা হবে না। এ পর্য্যন্ত রেবতী হাসিতে হাসিতে বলিল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মুখখানি আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল, "এবার যে দিন আস্‌বো—তুমি আসবে পায়ে হেঁটে, আমি আসবো কাঁধে চ'ড়ে। ওঠ ভাই—চল এখন বাড়ী যাই—অন্ধকার হবার আর দেরী নেই।"

দুই জনে তখন উঠিয়া, হাত-ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



বিমানপোত হইতে ডাক সংগ্রহ

পশ্চিম-আমেরিকার অরণ্যপ্রদেশে ডাঙ্গাপথে ডাক প্রেরিত হয় না। তত্রত্য অধিবাসীরা আকাশপথে ডাকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। পর্ব্বতোপরি একটি করিয়া অত্যুচ্চ

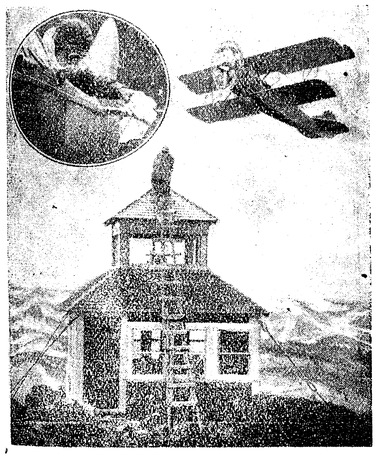

বিমানপোত হইতে ডাক সংগ্রহ।

আবাস নির্ম্মিত। ডাক আসিবার সময় প্রহরী উহার চূড়ায় আরোহণ করিয়া বিমানপোত হইতে প্রদত্ত ডাকের পুলিন্দা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভাবে এতদঞ্চলে ডাক বিতরিত হয়।

জার্ম্মাণ পুলিসের শিক্ষাপদ্ধতি

বার্লিন নগরের প্রত্যেক অংশের অভ্রান্তরূপ 'মডেল' লইয়া কর্তৃপক্ষ পুলিস-কর্ম্মচারীদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। এই মডেলে প্রত্যেক রাজপথ, অট্টালিকা প্রভৃতির স্থানসমাবেশ আছে। কোন্ অংশে কোন্ পুলিস-প্রহরী কি ভাবে কার্য্য পরিচালন করিবে, এই মডেল সাহায্যে তাহার শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

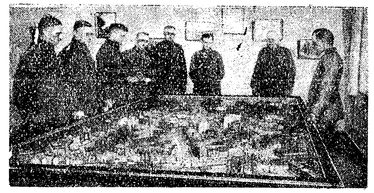

নগরের মডেল দেখিয়া পুলিস যানবাহন নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা করিতেছে

রাণী ইসাবেলার রত্নহার

কলম্বসের আমেরিকাযাত্রার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য স্পেনের রাণী ইসাবেলা তাঁহার হীরকহার বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তখন উক্ত হারের দাম ১৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই রত্নহারের মূল্য অত্যন্ত অধিক। প্রায় ৫ শত তোলা ওজনের ২ শত ৮০ খানা মূল্যবান্ প্রস্তর উক্ত রত্নহারে ছিল।

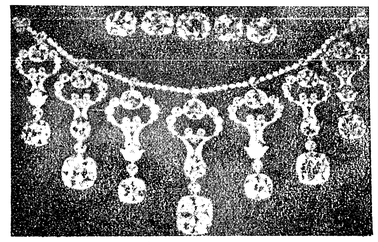

রাণী ইসাবেলার রত্নহার

অভিনব ক্ষুদ্র প্রাসাদ

কালিফোর্ণিয়ার এক ব্যক্তি খেয়ালবশে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ক্রীড়নকস্বরূপ প্রাসাদ হইতে যে তাঁহার অর্থাগম হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই। এই বিচিত্রদর্শন প্রাসাদ সন্দর্শন করিবার জন্য বহু যাত্রী তথায়

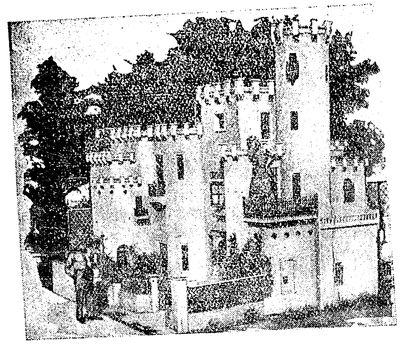

অভিনব ক্ষুদ্র প্রাসাদ

গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বারপথে কোনও মতে দেহ প্রবিষ্ট করাইয়া দর্শক অপ্রশস্ত পথে প্রাসাদটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। এ জন্য প্রত্যেক দর্শককে দর্শনী দিতে হয়।

জুতার আকারবিশিষ্ট কাফিখানা

কালিফোর্ণিয়ায় জুতার আকারবিশিষ্ট কাফিখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার চূড়ায় একটি হংসীমূর্ত্তি। এই জুতার আকার-

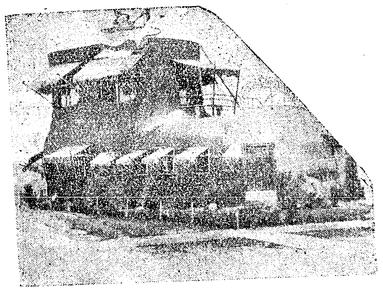

জুতার আকারবিশিষ্ট কাফিখানা

বিশিষ্ট কাফিখানার জানালা, দরজা এবং বায়ু ও আলোক প্রবেশের পর্য্যাপ্ত বন্দোবস্ত আছে। নূতনত্বের ভক্ত মার্কিণগণ পুরাতনে আর আনন্দ ও রস অনুভব করেন না। তাই কাফিখানায় জুতার আকার দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন।

দাঁড় টানা অভিনব ব্যবস্থা

জনৈক ইংরাজ দাঁড় টানা শিখিবার জন্য নিজের গৃহপ্রাঙ্গণে একটি বড় চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তুলাকার চৌবাচ্চার উপর একখানি স্থায়ী নৌকা সংলগ্ন করিয়া একখানি দাঁড়ের সাহায্যে

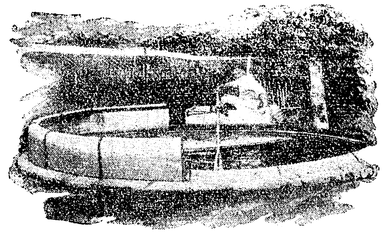

ঘরে বসিয়া দাঁড় টানা শিক্ষা

তিনি উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া থাকেন। নৌকাখানি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, দাঁড় টানিবার সময় উহা জলের উপরিস্থিত নৌকার ন্যায় আন্দোলিত হয়।

গ্যাসে সামুদ্রিক পীড়ার উপশম

জনৈক জার্ম্মাণ চিকিৎসক সামুদ্রিক পীড়া উপশমের জন্য এক প্রকার 'গ্যাস' প্রস্তুত করিয়াছেন। চোঙ্গায় উক্ত গ্যাস



সামুদ্রিক পীড়ারোগে গ্যাস

ভরিয়া রাখা হয়। চোঙ্গার গায় একটি নল সংলগ্ন থাকে। সামুদ্রিক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি উহা শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত টানিলে অচিরাৎ সুস্থ বোধ করিবে।

বিচিত্র ক্ষুর

প্রতি বিলাতে এক প্রকার ক্ষুর বাজারে বিক্রীত হইতেছে। এই ক্ষুর স্থায়িভাবে না থাকিয়া ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া থাকে। ক্ষুরের হাতলের কাছে একটি ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় যন্ত্র



ঘটিকাযন্ত্রসংযুক্ত ক্ষুর



দর্পণ সাহায্যে মূকের উচ্চারণ শিক্ষা

থাকে; উহার দ্বারাই ক্ষুর এক স্থানে স্থায়িভাবে থাকিতে পারে না। যাহাদের শ্মশ্রু অত্যন্ত কর্কশ ও দৃঢ়, তাহাদের পক্ষে এই অভিনব ক্ষুরের সাহায্যে ক্ষৌরী হওয়ার বিশেষ সুবিধা আছে।

কুরীর গ্যাসের মুখোস

খনিনির্ব্বাণকারীরা যে গ্যাসপূর্ণ মুখোস পরিয়া অগ্নিনির্ব্বাণ-কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে জলের মধ্যে অনেকক্ষণ নিমগ্ন থাকা যায়। সম্প্রতি লস্ এঞ্জেল্‌সের ক্যাপ্টেন ভার্ডিন্ উহা পরিধান করিয়া ২০ মিনিটকাল জলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। এই মুখোস পরিধান করিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

দর্পণ সাহায্যে মূকের উচ্চারণ শিক্ষা

আট্‌লাণ্টা, গা নামক স্থানের একটি বিদ্যালয়ে দর্পণের সাহায্যে মূক শিশুদিগকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দর্পণের সাহায্যে শিশুরা ওষ্ঠাধরকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করে। ছাত্রগণ শিক্ষকগণকে অনুকরণ করিয়া আপনাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া থাকে। দর্পণের সাহায্যে এই কার্য্য অত্যন্ত সুকর।

কুরীর গ্যাসের মুখোস



গ্যাসের মুখোসে ডুবুরী

মুষ্টিযুদ্ধের অভিনব কৌশল

অরিগণ কৃষি-কলেজে মুষ্টিযোদ্ধারা অভিনব উপায়ে মুষ্টিযুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। কাঠের পিপা গলদেশ হইতে বিলম্বিত করিয়া যোদ্ধৃগণ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়াছিল। কটিবন্ধের নিম্নপ্রদেশে কেহ কাহাকেও যাহাতে আঘাত করিতে না পারে, এ জন্য কাঠের পিপা ব্যবহৃত হইয়াছিল। এইরূপ বেশে ক্রীড়ার্থীরা আবির্ভূত হওয়ায় দর্শকগণও অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়াছিল।



কাঠের পিপার দ্বারা বিভূষিত মুষ্টিযোদ্ধা



যুবক-জীবন

৪

মহিম বাবু ছিলেন রাণাঘাটের সাবডিভিসনাল অফিসারের হেড ক্লার্ক। কাপ্ হলেও বারেন্দ্র সমাজে মৈত্র মহাশয় সমধিক সম্মানিত ছিলেন—তাঁর চরিত্রগুণে। চাকরী খুব বড় মাহিনার নয়; কিন্তু ঐ পদে অধিষ্ঠিত হয়েও সময়ে সময়ে লোকের উপকার করার অনেক সুযোগ হ'ত এবং শুভযোগ যখনই উদয় হ'ত, তখনই তিনি তার সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি কোন-ও বিবাদীর নিকট থেকে কখন-ও কিছু নগদ নিতেন না; তবে আমের সময় আমটা, পুকুরে জাল ফেলালে মাছটা বা মাতৃশ্রাদ্ধে লৌকিকতা, কি কন্যার বিবাহে বেনারসী সাড়ী বা শান্তিপুরে ডুরে কেউ তত্ত্ব ব'লে পাঠালে ফিরিয়ে দিয়ে আত্মীয়তার অপমান করতেন না।

রাণাঘাট সাবডিভিসনের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দিশী ও বিলাতী সকল হাকিমরাই অতি ভদ্র ব্যবহার করতেন। বোধ হয়, হাকিম'দের সঙ্গে কর্ম্মচারীদের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ভাল রকম ক'রে ফুটে উঠে, সেই অনেক দিন আগে যখন 'রৈবতকের' কবি নবীনচন্দ্র সেন সেখানকার সাব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, সেই সময় থেকে। নবীনের বাহ্যটা ছিল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ; এমন ভয়ানক গাম্ভীর্য্য যে, অনেক লোক সময় সময় সেটা আত্মম্ভরিতার লক্ষণ ব'লে মনে করত; কিন্তু যাঁরা-ই তাঁর সঙ্গে একটু ভাল ক'রে 'মেশামিশি' করেছেন, তাঁরা-ই জানতেন যে, কবির হাকিমী প্রাণের ভিতর-ও এমন একটি তার ছিল, যাতে এতটুকু ঘা লাগলে-ই তাঁর চোখে জল আসত। দয়া, স্নেহ, মমতা নবীনের হৃদয়ে প্রবৃত্তিরূপে অবস্থিত ছিল না; ঐ কবির ভাবগুলি সৌন্দর্য্য-পূজার এক একখানি প্রতিমা। কবির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মিষ্টতা কেবল ভাষার উচ্ছ্বাসে, ছন্দের গন্ধে ও ভাবের বৈভবে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই সুশিক্ষিত শিল্পীর কল্পনার ছটা তাঁর রচিত বাসভবন, পল্লী-বিদ্যালয় ও পুষ্প-বাটিকাতে-ও প্রকটিত হয়েছিল। তাঁর লক্ষ্মীস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণীর কর্ম্মশক্তি, ধর্ম্মে ভক্তি, পতি-আত্মরক্তি ও মুক্তা-বিমল প্রকৃতির প্রভাব নবীনের স্বভাব মধুর হইতে মধুরতর করেছিল; জগতে অল্প কবির ভাগ্যে-ই এমন স্ত্রীলাভ হয়েছে। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি একটা যে মর্ম্মের টান, সেটা-ও তাঁর সৌন্দর্য্য-পূজা।

মহিম মৈত্র মহাশয় যখন হেড ক্লার্ক, তখন রাণাঘাটের সাবডিবিসনাল অফিসার ছিলেন, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সোম। এই বাঙ্গালী যুবক বিলাতী সিভিলিয়ান, পদে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। অল্পদিনেই ইনি কার্য্যদক্ষতায় প্রশংসিত। প্রকৃতি ও গৃহাদর্শ সোম সাহেবের সামাজিক শিষ্টাচারের মধ্যে এমন একটু মিষ্টতার সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি দিশী-বিলাতী কোন সমাজের কাছে-ই একঘরে ছিলেন না, অথচ "Be thou familiar, but by no means vulgar," এই মন্ত্রটিকে সিদ্ধিতে পরিণত করেছিলেন।

"But he did not dull his palm with entertainment of each new-hatched unfledged comrade."

দিশী-বিলাতীর বেশ এক রকম খাপ খাওয়া সংমিশ্রণে তাঁর গৃহস্থালীর কার্য্য পরিচালিত হ'ত। মিসেস উপাধিলাভে-ও সোম-বধূর মন বিশেষ ব্যাধিগ্রস্ত হয়নি; পরিচয় আরম্ভে কোন মহিলা তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, "শ্রীমতী তৃপ্তিলতা সোম।" তিনি যে "শ্রীমতী", তা তাঁর গোয়াল, রান্নাঘর থেকে ড্রয়িংরুম পর্য্যন্ত যিনি দেখতে, তিনি-ই বুঝতে পারতেন; আর "তৃপ্তি" নামের মধুর দীপ্তি আলো করেছিল,—শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্বামি-সখী সবার মনকে।

মহিম বাবুর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়েছে পাবনার এক সুশিক্ষিত জমীদার-পুত্রের সঙ্গে; এঁর সখ কৃষি ও উদ্যানচর্চ্চায়; দ্বিতীয় জামাইটি "ল" পড়ছেন, বাড়ী সাঁতার-গাছী। অকুলীন ও কেরাণী হলেও মেয়ে দু'টি সুরূপা ব'লে আদরে ভাল ভাল বরে ও ঘরে গৃহীতা হয়েছে। তৃতীয়া কন্যা বিভাবতী সত্য-ই সুন্দরী; অনলস কর্ম্মপটুতা বিভাবে মাংসপিণ্ডে বা বংশদণ্ডে পরিণতা করতে সমর্থ হয়নি। যথার্থ সুন্দরী মেয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ক্রমে দুর্লভ হয়ে দাঁড়াচ্ছে; তাই রঙ্গটাকে সাদাটে দেখাবার জন্য দোকানে দোকানে এত সাবান-পাউডার-হেজলীন বিক্রী; ক'নে দেখাবার সময় থিয়েটার থেকে ড্রেসার ডাকতে হয়। বিলাতী মাল ভূতটা আমাদের কাঁধে এমন জোরে চেপে বসেছে যে, শ্যামের দূর্ব্বাদলের চেয়ে খড়ির ধবল বাবুদের যেন পাগল ক'রে তুলে। আগা, অমানিশার শিশিরে গড়া এক একটি কমনীয় বাঙ্গালীর মেয়েকে নাক, মুখ, চোখ, চুল ও গড়নের লালিত্য-গুণে আমার চোখে কি সুন্দর দেখায়! অধিকাংশ মে সাহেবকে দেখে আমার মনে হয়, ভগবানের কি দয়া, এঁরা উপর কোন রঙ না চড়িয়ে খালি খড়ি মাখিয়ে-ই ছে দিয়েছেন, নইলে আমাদের মত কালো হ'লে এঁদের উপায় কি হ'ত!

সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য-রক্ষার শ্রেষ্ঠ পথা শ্রম। ঔষধসেবনে যদি স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে মদ্যপানের মত্ততা-ও যে বীরত্ব আনয়ন করে, এ কথা নিশ্চয়। আলস্য দাস্যের জনক, কি পশ্চিমা, কি বাঙ্গালী—যে চাষীর ঘরের ছেলের গায়ে ক্ষেতে লাঙ্গল দেবার বল নেই, সে-ই কলকাতা বা অন্য সহরে পা-টেপা চাকরী করতে চায়। আমাদের দেশের অনেক বড়মানুষ মনে করেন, তাঁরা "বাবু", কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন, তাঁদের মত চাকরের চাকর আর ভূ-ভারতে নেই; খেতে হ'লে তাঁরা-ও উড়ে গামুনের চাকর, উঠতে বসতে মুখ ধুতে, কাপড় পরতে খান-সামার চাকর, কোথা-ও বাইরে যেতে আসতে সইস-কোচম্যান-সোফারের চাকর আর বিষয়কর্ম্মে ম্যানেজারের গেটেলাভা চাকর।

ভাটীয়া, নাখোদা, মাড়োয়ারীদের মত অনবসর পরিশ্রম করতে চায় না ব'লে বাঙ্গালী বাবুরা কেবল চাকরী খুঁজেন এবং কে কবে কোন্ নামজাদা লোকের একটা কুকুর ম'লে এক দিন ছুটী হবে, তাই ভাবেন।

পূর্ব্ববঙ্গ, সাবধান! এখন-ও সে দিন টাটানগরে তোমাদের কয়েক জন ভদ্র শিক্ষিত যুবককে আগুনের হল্কার সামনে দাঁড়িয়ে কয়লা মেখে কলের কায করতে দেখে এসেছি; কিন্তু রেলওয়ে, হোষ্টেল ও পলিটিক্স তোমাদের মাথা খেতে বসেছে। সাময়িক উত্তেজনার বশে একটা কাণ্ড ক'রে জেল খেটে আসতে একটা মাতালে-ও পারে, সত্য বীরত্ব কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অচল অধ্যবসায়ে, অনলস শ্রমে—নিজের ও জাতির উন্নতিকল্পে পরিশ্রমে। কর্ম্ম ঈশ্বরের, শ্রম তাঁর উপাসনা; ঈশ্বর মল্লিক মশাই নয় যে, স্তোত্রপাঠেই তুষ্ট হবেন ও মাসহারা বাড়িয়ে দেবেন।

গৃহিণীর গুণে মহিম বাবুর সংসারে যক্ষের ধন অপেক্ষা লক্ষ্মীর শ্রীর ও জ্বলা সমধিক প্রভাসিত ছিল। বাসাটি কাছারী হ'তে একটু দূরে হ'লে-ও ইষ্টকের মাৎসর্য্য অপেক্ষা পল্লীর সহজ সৌন্দর্য্য দম্পতির মনকে অধিকতর আকর্ষণ করত, সেই জন্য মহিম বাবু একটু পথ হাঁটার পুরুষত্বকে কষ্ট ব'লে মনে করতেন না। শোবার বিছানাগুলি পাতা থাকত উঁচু মেঝের উপর উলুর চালার তলায় পাতা তক্তাপোষে বটে, কিন্তু ঘর কটি পরিসরে সঙ্কীর্ণ না হওয়ায় সেগুলি বালি-খসে-পড়া পুরাতন কাঠরার দোকানের মত দেখাত না। বেশ বড় উঠানটির এক দিকে লম্বা বাঁশের মাচা, তার উপরে শিমের ফুল রং-বেরঙের বেলোয়ারি-বসা-ঝাড়ের মত আলো ক'রে আছে; ঝিঙে ধুন্দুল লাউ ডগার গায়ে গায়ে যেন সোনারূপার ফুল ফুটিয়ে দেছে, ফলগুলি যেন মাচার নীচে সবুজ বেল-ঝুলনের মত দুলছে। উঠানের অপর দিকে বক, শেফালী, পদ্ম, করবী, স্থলপদ্ম গাছ এক একটি ক'রে; গুটি দুই রক্তজবা আর কৃষ্ণকলি, দোপাটী, গাঁদা ও বেলের সারি। রান্নাঘরের চালে কুমড়া গড়াগড়ি, ঢেঁকিশাল ও গোয়ালের চালায় পুঁই। সংবৎসর বাড়ীটির মুক্ত বাতাস বিষশূন্য ক'রে রাখে, নবীন পাতায় সবুজ ও কুসুমদলের সুরভি। খিড়কিতে একটি পরিষ্কার হিংচে-কল্মী-দেওয়া ডোবা, তার পাড়ে একটা পুরাতন জাম-রুলগাছ, নূতন বসানো একটি আমের কলম, একটি ছোট-খাট বেগুন-বাড়ী—আরও সময়ের মত দু'চারটে আনাজ-তরকারি। যে সব ডেলি-প্যাসেঞ্জার বাবু বৈকালে কল্‌কেতা থেকে ডেঙোর ডাঁটা, সজ্‌নে খাড়া কিনে নৈহাটী কি ব্যাণ্ডেলের দিকে ফেরেন, তাঁদের উচিত—একটা ছুটীর বারে রাণাঘাটে গিয়ে মহিম বাবুর বাসাটি দেখে আসা; আর-ও ভাল হয়, যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌ-মাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারেন; বলবেন—রাণাঘাটের পান্তুয়া বড় সরেস।

মহিম বাবুর গৃহিণী; গৃহিণী বল্লেম শাশুড়ীর অবর্ত্তমানে গৃহের কর্ত্রী ব'লে, নইলে গিন্নীর নিশানার স্বরূপ তাঁর চুলের চিকণ একটুকু-ও ম্লান হয় নি; বড় মেয়ে প্রভার বয়েস এখন উনিশ, বিভা পনেরোতে পা দিয়েছে, বিভার পিসী বলেন—মেয়ে তের বছরের, জ্ঞাতিরা বলেন আঠারোর ওপর।

সোম-সাহেবের স্ত্রী বিভাকে বড় সুনয়নে দেখেন, স্কুলের ফের্ত্তা সে প্রায় তৃপ্তির কাছে যায়, সংসারকার্য্যে মাকে সাহায্য করবার সূত্রে বিভা গৃহস্থালীর অনেক কর্ম্ম বেশ গুছিয়ে করতে শিখেছে; তৃপ্তি দেবী তাকে কন্যার মত স্নেহ-যত্নে কিছু কিছু আধুনিক রুচি অনুযায়ী কলাশিল্পের-ও শিক্ষা দেন; আপনার মা'র কাছে যেমন সে চন্দ্রপুলী, ক্ষীরের ফল গড়তে, আর কড়ির ঝালোর, পুঁথির গহনা গাঁথতে শিখেছিল, ম্যাজিষ্টার-মা'র কাছে তেমনই সুতোর মত সরু ক'রে শসা বানাতে, কুমড়োর চাঁপাফুল গড়তে, কেক, পুডিং তৈরি কত্তে, ল্যাম্প-সেড্ কাট্‌তে, য়্যাণ্টি-ম্যাকেসার বুন্‌তে শিখেছে। এই সময় যখন বিভার বয়স সত্য-ই তেরো, তখন তার পিসীমা ভায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কুষ্টিয়া থেকে রাণাঘাটে আসেন।

এই পিসীমা'র একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। পিসে-মশাই মুন্সেফ, কুমিল্লা থেকে বদলী হয়ে বছর দেড়েক কুষ্টিয়াতে এসেছেন। সাধারণতঃ মুন্সেফরা কিছু মিতব্যয়ী হয়ে থাকেন। সমাজের মাঝেই বাসনার সৃষ্টি, কাযের গতিকে এঁরা সমাজের সঙ্গে মেশবার বেশী অবসর পান না, সুতরাং উৎসাহের রৌদ্র, আলাপের বাতাস ও হাস্য-পরিহাসের বৃষ্টির অভাবে জানালা-দরজা বন্ধ করা হৃদয় বিবর্ণ ও রসশূন্য হয়ে যায়। শুধু যে মেশা-মিশি করবার অবসর পান না, তা নয়, বিচারাসনে ব'সে, নাজীর, পেস্কার, উকীল, মোক্তার, বাদী, প্রতিবাদী, পাইক পেয়াদা, সাক্ষী প্রভৃতি যার পানে তাকান, দেখেন, প্রত্যেকে তাঁর চোখে দেবার জন্য দু'হাতে দু'মুঠো ধুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; মিথ্যাকে সত্য ব'লে প্রতিপন্ন করার জন্য, আইনের দফার পর দফাকে বাগ্‌জালের চপারে

কুপিয়ে নিজের স্বার্থসাধনের তরে "ওয়নালা"কে"বয়নামা" ব'লে প'ড়ে যাবার অভিপ্রায়ে সবাই ব্যস্ত, সবাই অবসর খুঁজছে। তার উপর বাসায় ব'সে রাত্রি দুপুর অবধি মাথা চোখ তেল জানিয়ে মন-মেজাজে এমন ধনুষ্টঙ্কার ধরে যে, শরীরের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পেটের ভেতরকার উনুনটায় যায় ছাই প'ড়ে, রসগুলো যায় টোকে তিতিয়ে, আর মুখখানায় ধরে কালী। জাল জুচ্চুরী মিথ্যা ছলনের গোলোকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে প্রায়ই নর-বিদ্বেষের বিষটা প্রকৃতিগত মাধুর্য্যকে হত্যা ক'রে ফেলে, সুতরাং সমাজ হ'তে অন্তরালে থেকে থেকে রসহীন হৃদয়ে আর ভোগের বাসনা অঙ্কুরিত হ'তে পায় না। কদর্য্যতার আবর্জ্জনা উড়ে উড়ে চোখের পরকোলায় এমন চিটে ধ'রে যায় যে, যিনি যমের দৃষ্টি এড়িয়ে সবজজ হবার সময় পর্য্যন্ত বেঁচে থাকেন, তাঁর মুন্সেফী-অম্বল দাঁড়ায় ডায়েবেটিসে, পেটটা ওঠে তাল পাকিয়ে ফুলে, আর চেহারাখানা হয় যেন যশোরের আমদানী সেকালের হেড কনেষ্টবলের মত। তখন জীবনের উপর প্রতিহিংসাসাধনের উদ্দেশে একমাত্র টাকা জমাবার প্রবৃত্তিটা বলবতী হয়ে ওঠে, সকলকে ফাঁকি দেবার জন্য—মায় নিজেকে।

জানকী বাবু এই সবে ক'বছর চাকরী কচ্ছেন; চৈত্রের মাঝামাঝি পল্লী-পুকুরের যা অবস্থা, এঁর প্রাণের অবস্থা প্রথম পাঁচ বছর পার হবার সময়-সময়—সেই রকমই ছিল; তাদের গুঁড়ি দিয়ে গড়া সিঁড়ির আজও তিন-চারটে ধাপ ডুবে আছে, জলে একটু একটু শেওলা-গোলা রঙ ধরেছে, তবে কুলকুচো করতে এক আধ ঢোঁক গলার ভেতর গেলে এখন-ও কম্প দিয়ে জ্বর আসে না।

এমন সময় একটা ঘটনা পিসেমশায়ের সংসারের খালের ভেতর খানিকটা রূপনারায়ণের জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়ে দিলে। সীতাপতি বাবু জানকীনাথের মেজদা; তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন এটর্ণি, খুব নামজাদা নয়, তবে নিজে আপিস করেছেন, সেখানে জন আষ্টেক ভদ্রসন্তান, এক জন পেয়াদা-সন্তান আর দু'জন বেহারা-রূপী বেহারী-গাইটান নিজ নিজ অন্নবস্ত্রের জন্য ছোট বড় পাঁচটি অঙ্গুলী-অস্ত্র ধ'রে দশটা আটটা মোতায়েন থাকেন। সীতাপতি বাবু যখন বি-এ পড়েন, তখন হাটখোলার এক ক্রোরপতি মহাজনের উত্তরাধিকারীকে বাড়ীতে পড়াতেন, আর্টিকেল্‌ড্ ক্লার্ক হয়েছিলেন সেই সদাশয় ধনীর সুপারিসে ও সাহায্যে এবং পড়ানর কায বন্ধ হওয়ার পর নিত্য যাতায়াতে ও এটা-ওটা-সেটা লেখাপড়া বা শলা-পরামর্শ দেওয়ার কায-কর্ম্ম করতে করতে তাঁদের সংসারের এক জন আত্মীয়ের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তিন বারের পর চতুর্থ বার যখন সীতাপতি পাশ হন, তার কিছু পূর্ব্বে মহাশয় দক্ষিণাভিমুখে অকস্মাৎ যাত্রা করায়, উত্তরাধিকারী গদির উদ্ধতম আসনে উপবিষ্ট হলেন। যদিও প্রতিবাসী ধনীদের মধ্যে অনেকে-ই অত বড় বিশিষ্ট মহাজনের হার্টফেলে অকস্মাৎ মৃত্যু দেখে নিজের নিজের হার্টকে বুকের ভেতর হ'তে বিদায় ক'রে দিলেন, কিন্তু উত্তরাধিকারী যুবকটি পিতৃধনের সঙ্গে পিতৃ-মনাট-ও দখল ক'রে বসলেন। তিনি মাষ্টার মশাইকে নিজের আফিস খোলবার পরামর্শ দিয়ে বল্লেন, যদি-ও জি, সি, চন্দ্র, বি, এন, বসু আর পল্‌ বাবুই আমাদের এখানকার সব কাযকর্ম্ম ক'রে আসছেন, তবু-ও পঞ্চাশ হাজারের কমে ছোট-খাটো মর্টগেজের কাযগুলো আপনার হাতে কতক কতক দিলে এক রকম বেশ চ'লে যাবে। ল'বিজ্‌নেশ যা আসে আসবে, নয় এইতেই কায আরম্ভ করুন। আর পার্টি আপনার থু দিয়ে এলে কমিশন-ও চার্জ্জ করবেন। ক্রমে আপিসের আয় যে সময় একখানা মোটর রাখবার অবস্থায় তুলে দিয়ে টিফিনের সময় চা-রুটীর সঙ্গে একটা চিকেন্‌-রোষ্ট বা আইরিশ-ষ্ট্‌, টুইগোছ সাইড-ডিসের বন্দোবস্ত করবার অবস্থায় পৌঁছে দিলে, তখন মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারী বক্ষরাজের ইঙ্গিতে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রণীত সুমিষ্ট বঙ্গানুবাদ আইন পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সারস্বরূপ যে "বঙ্গকী আইন"খানি প্রণয়ন করেছিলেন, তা মোক্তারী শিক্ষাভিলাষী "সন্দেশপ্রার্থী" যুবকরা সাদরে সাত টাকা মূল্যে ক্রয় করতে আরম্ভ কল্লেন। জমার সঙ্গে খরচের মিত্রতার সন্ধিবন্ধনে এমন একটা চিরস্থায়ী চুক্তিপত্র লিখিত আছে যে, প্রথমোক্ত খাতে ভুক্ত হবা মাত্র ডাইনের দোহারকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে শুধু যে হস্তবৃদ্ধ তার হাতে তুলে দেন, তা নয়। খরচ-সরকার মহাশয়ের ওভার-ড্রাফ্‌ট-ও চক্ষু বুজে মঞ্জুর করেন। যেমন এক দিকে জাতীয়তা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ উঠিয়ে দেবার জন্য লেক্‌চার চলছিল, তেমন-ই সেই লেক্‌চার করতালি-ধ্বনিতে অনুমোদন ক'রে আসার পর-ই কাহার থেকে কায়স্থ পর্য্যন্ত সকল জাতির-ই মান্যবররাই আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ বর্ণের জীব ব'লে প্রমাণ করতে মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্যের বক্কল খুলে গুপ্ত সূত্রের গূঢ় অর্থ বার কচ্ছিলেন। আবার এক দল শিক্ষিত লোক দেখলেন, যে ব্রাহ্মণ অর্থে এখন ইজ্‌দি ওন্‌লি চাল-কলাবিশিষ্ট বর্ণ ব'লে পরিগণিত হ'তে হ'লে আজকাল একবার বিলাতযাত্রা প্রয়োজন। অনেক শিক্ষিতা কন্যার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, বিবাহের পর তিনি নি-জামাইকে বিলাত বেড়িয়ে আসার খরচ দেবেন, তবে তিনি কন্যাদায় হ'তে মুক্তি পান।

সীতাপতি দেখে যে, বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদের অনুকরণে কোন কোন উকীল এটর্ণি-ও ইদানীং লম্বা ছুটীর অবসরে "হোম"কুণ্ডের ঘৃতঢেলে এ'স অমৃতফললাভ করেন। দেখেন আপশোষে গুম্‌রে-গুম্‌রে পচেন। এমন সময় এক দিন তিনি পাঁজিতে দেখলেন যে, বৃশ্চিকের ভ্রমণ, ধন ও সম্মানলাভ

পাঁজি আজকাল ইতর পাঁজর হাতে প'ড়ে উপদংশ, রক্তশক্তি ও চটিজুতার সংবাদ বহন ক'রে নারায়ণের সিংহাসনতলে ব'সে কুল-নারীর পূজাগ্রহণের কলঙ্ক মাথা পেতে নিলেও

গণনাগুলো প্রায় ঠিক রাখে, তাই বৃশ্চিকরাশিগ্রস্ত সীতাপতির অদৃষ্ট মতিহারি জিলায় এক বড় ষ্টেটের জন্য আশী লক্ষ টাকা কর্জ্জের আবশ্যক হ'ল; আস্‌বিত আস কাযটা পড়লো সীতাপতির হাতে, ঋণ দিতে রাজি হলেন সীতাপতির ভূতপূর্ব্ব শিষ্য ও বর্ত্তমান তিনি নিজে যাঁর অবশ্যপোষ্য সেই হাটখোলার তরুণ অরুণ।

কমিশন ও লেখাপড়াদির হিসাবে সীতাপতি সে বৎসর ছয় মাসে পেলেন প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার উপর। পরিবার বলেছিল, আগে কলকেতায় একখানি বাড়ী কর, কিন্তু বাবু বল্লেন, একবার বিলেতটা ঘুরে এসে তার পর মেজোবৌ—তার পর, আগে মান তার পর স্থান। সেপ্টেম্বরে আদালত বন্ধ হ'তেই এস, পি, বুহস্পতিবারের শুভ বারবেলায় যাত্রার দিন ধার্য্য কল্লেন।

জাতি হারানোর কলঙ্কটা মাথায় পেতে নিয়ে বাঁড়ুয্যে, ললিত প্রভৃতি প্রথম আমলের বাঙালী ব্যারিষ্টাররা ঘরে-ফুরে পুরাপুরি সাহেবি চাল চ'লে বিলাতী-বার দিশী চাটার ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠা ক'রে যাবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে ফিরে-ফেরতারা আমার আচারে ব্যবহারে ভাষণে বসনে ইদানীং আমাদের সমাজের সঙ্গে বেশ মিশে গেছেন, আমরা-ও যে তাঁদের সঙ্গে কোলাকুলি করবার জন্য চা-চুরট হাতে, উড়ুনি গুড়িয়ে গোঁফের ডগা মুড়িয়ে দু'পা এগিয়ে যাইনি, এমন নয়। হ্যাট-কোটটা চাকরীর উদ্দিরূপে জেণ্টলম্যান ব'লে পরিচয় দেয়। জুতা খুলে প্রণাম না কল্লে ব্রাহ্মণরা অভিশাপ দিতেন; মাথায় পাগড়ী বেঁধে না গেলে মোসলমান মনিব সেলাম নিত না; এখন ইংরাজ-প্রভুকে সম্মান দেখাই মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে, যস্মিন্ যুগে যদাচারঃ। বিলাত-ফেরৎ বাবুদের এই চার-পাঁচ বছরের লব্ধ অভ্যাস ত্যাগ করতে লেগেছে প্রায় ষাট বৎসর; ধার নেওয়া যায় দু'মিনিটে, কিন্তু ঋণমুক্ত হ'তে লাগে বছর দশেক, সুদের কড়ি ঘর থেকে গুণে দিয়ে।

প্রায় আট মাস অনুপস্থিতির পর সীতাপতি এপিলের শেষাশেষি যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন দেখা গেল, তিনি তত্টা ফুল বনেন নি, কেবল হরিঘোষ ষ্ট্রীটের খোপের মত অন্ধকার বাসাটা ছেড়ে শিয়ালদহের কাছে গোমেস্‌ লেনে একটি লটওয়ালা কতকটা চটকদার বাড়ীতে উঠে গেলেন আর ফল-ঘর বারাণ্ডাটারাণ্ডা-গুলো মেকেঞ্জি লায়েলী আসবাব মজিয়ে সামনের ফাঁকা মাটীটুকুতে গোটাকয় পাম ক্রোটন ক্যানা গোছের গাছ বসিয়ে দিলেন।

কিন্তু মুস্কিলে পড়লেন বিভার পিসীমা ও পিসেমশাই। কুমিল্লা থেকে বদলী হওয়ার সময় এঁরা সরাসরি কুষ্ঠিয়ায় না নেমে দিন চোদ্দর মঞ্জুরী ছুটীতে কল্‌কেতায় এসে সাণ্ডেল সাহেবের বাড়ীতে ক'টা দিন কাটিয়ে যান। সাণ্ডেল সাহেব শুধু আমি বল্লেম না, এ উপাধিটি এখন সকলেই তাঁকে দিয়ে থাকে, বাড়ীর চাকর-বাকররা-ও লোকজন এলে "সাহেব বাহার গিয়া" "সাহেব আভি নীচে নাহি উতারা" ইত্যাদি জবাব দিয়ে থাকে। এটুকু যদি দৌর্ব্বল্য হয়, তবে সমাজ, এর জন্য সীতাপতিকে তোমায় মাপ কত্তে হবে। বাঙ্গালা কথা ভুল্লুম না, একবেলা থালা ক'রে অন্দরের মাছের ঝোল-ভাত খাই, ধুতি প'রে নিমন্ত্রণ যাই, অনেক বনেদি হিন্দুর বাড়ী বিবাহের সভাতে-ও একটা গোলা হুঁকো মেলে না, আমার এখানে দু-চটো গড়গড়া বারোমাস মজুত, আর লোকে একটু সাহেব ব'লে ডাকলেই যত দোষ। তবে প্রায় হাজার আষ্টেক টাকা খরচ ক'রে লণ্ডন, এডিনবরা, প্যারিস, বার্লিন, ইটালী এ সব ঘুরে এলেম কি ঘাস কাটতে? এই যে পুলিস, পোষ্ট আফিস, একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতিস্থলে ইংরাজের চিরাবিকৃত পদ কোন কোন বাঙালী যদি উন্নীত হয়ে পড়েন, তাঁদের কি জমাদার, পাহারাওয়ালা, কেরাণী, চাপরাসীরা "বড় বাবু" "ছোট বাবু" বলে, না "বড় সাহেব" "ছোট সাহেব" বলে?

যা হোক, সস্ত্রীক জানকীনাথ মেজদার বাড়ীতে এসে সপ্তাহাধিক কাল বেশ আরামেই ছিলেন। কুমিল্লার সেই লঙ্কার কালের পর প্রাতে পার্শে মাছ ভাজা, গলদা চিংড়ির মালাই কারি, সন্ধ্যার পর রীতিমত টেবলে ব'সে ডিনারের সঙ্গে গরম গরম ফুল্কা লুচি—তপ্সে মাছ; তা ছাড়া যথাযথ সময়ে চা-কাফি রুটী-মাখম পোচ্-প্যাটি; কলা পেঁপে আঙুর আপেল; রাতারাতি ক্ষীরমোহন হালুয়া আদি ত আছে-ই। আবার আমকাঠের তক্তা ছেড়ে বেড়ে আরামে নিদ্রা বিজলী পাখার নীচে তারের জালবোনা স্প্রাঙের খাটের উপর শুভ্র-কোমল শয্যায় শয়ন ক'রে।

আতিথ্যের পঞ্চম রাত্রিতে শয্যাগ্রহণের পর দম্পতির মধ্যে এইরূপ নিভৃত কথোপকথন মন্দ রবে সম্পাদিত হয়ঃ—

পিসী। ঘুমালে না কি?

পিসে। পোনেরো আনা।

পিসী। তা ঘুমাও; ঘুমায়ে ঘুমায়ে-ই তুমি গেলে; পোলে আর ঘুমালে।

পিসে। ঘুমুতে পাই কোথা ছোট-বৌ! নথী ঘেঁটে ঘেঁটে, রায় কেটে-কেটে আর ছারপোকা খুঁজে খুঁজে-ই ত রাত কাটে। মেজ-দার আশীর্ব্বাদে আর তিন-চারটে রাত মনের সাধ মিটিয়ে ঘুমিয়ে নিই; তুমি-ও একটু ঘুমোও না।

পিসী। তোমার মত নির্ভাবনা-পুরুষ হতাম ত ঘুমাতাম।

পিসে। কেন, এত রাত্রে তোমার আবার কিসের ভাবনা পেলে?

পিসী। মেয়েমানুষের ভাবনার অন্ত নাই। তোমাদের কি, বিছানা থেকে উঠলে, হাসি-গল্প কল্লে, তার পর তৈরি ভাত মুখে দিয়ে—

পিসে। হাসি-গল্পের অবসর আছে ছোট-বৌ? দেখতে পাও না, হাতের কলম ভুঁয়ে রাখবার সময় নেই?

পিসী। ওগো, আজ নয় দু'দিন মুন্সোব হয়েছে, ন'লে—

পিসে। তার আগে পড়া ; খালি পড়া, পড়া, পড়া—

পিসী। পড়া বুঝি আবার একটা কাযের মধ্যে কায! আমি যখন রাঘবপুরের মেয়ে স্কুলে পড়তাম, তখন চুল ঝাড়তে ঝাড়তে পড়া মুখস্থ ক'রে ফেলতাম।

পিসে। তোমাদের ত আর পাস করার বালাই ছিল না।

পিসী। নাঃ, আমি এক্‌জামিন দিয়ে প্রাইজ পাইনি, অমনি মন্তরের চোটে তোমার চিঠিগুলো বেছে দিই ; হেম-ডেপুটী আর রজনী উকীলের বাড়ী থেকে যে ইংরিজী খবরের কাগজ সব আসতো, তা বার-তারিখ মিলিয়ে মিলিয়ে কে গুছিয়ে ফেরৎ পাঠাতো ?

পিসে। তা তুমি যে ছাত্রবৃত্তি ছাড়িয়ে প্রায় ইংরিজী মাইনর ক্লাস পর্য্যন্ত পোড়েছ ; তা ছাড়া স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, স্মরণশক্তি—

পিসী। ছাই, সব ভুলে মেরেছি ; পোড়া অড়র ডালের দেশে গিয়ে বুদ্ধি-ও হয়েছে তাদের মত, আর গায়ের রংটা-ও হয়ে এসেছে সেখানকার বাস হুঁকোর মত ; নইলে অভ্যাস রাখলে অন্ততঃ চিঠিটা কাগজখানা পড়তে পাত্তাম।

পিসে। অভ্যাস হ'তে কতক্ষণ। দাঁড়াও, রওনা হবার আগে খান চার-পাঁচ হাল্‌কা-হাল্‌কা ইংরিজী গল্পের বই কিনে নিয়ে যাব।

পিসী। ক'দিন যে এখানে রইলে, লাগছে কেমন ?

পিসে। সে—সে বুঝতে-ই পাচ্ছ ; একটু মুখের তার বদলে আহার ক'রে আর আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে দিন পাঁচেকের মধ্যে-ই যেন শরীরে কতকটা স্বচ্ছন্দ ও মনে আনন্দ অনুভব কচ্ছি। বোধ হয়, মাসেক দেড় মাস এমনি ক'রে কাটাতে পারলে জীবনে আবার একটা জোয়ার আসতে পারে। স্কুল কলেজ আর চাকরী, এই ত্রাহস্পর্শের ধাক্কায় নার্ভ-টার্ভগুলো একেবারে থেঁতলে গেছে।

পিসী। তা এখানের মেয়াদ ফুরুবে ত গোটা পাঁচ ছ' দিনের পর-ই। কুষ্ঠেতে গিয়ে আমাদের খাওয়া-দাওয়া থাকা-টাকার ধরণগুলো কিছু বদলে ফেলতে হবে।

পিসে। থাকা—টাকা ! থাকাটা যেন তোমার হাতে ; কিন্তু টাকার ধরণা নির্দ্ধারণ ক'রে দেন যে গভর্ণমেণ্ট ; সে বিধিলিপির ত আর এদিক্ ওদিক্ হবার জো নেই। এ কি এটর্ণিগিরি যে, একটা লোকের কাযে একেবারে চল্লিশ হাজারের চেক।

পিসী। হেম ডেপুটীর মাইনে তোমার চেয়ে এমন কি বেশী, তবু তাঁরা আমাদের মত ইল্লুতে অবস্থায় থাকেন না।

পিসে। ও ছোট-বৌ, এই পাঁচ দিনের টিপাই টেবল সোফা ফ্যান গোসলখানা রশুল খানসামা তোমার চোখে আমাদের ঘরকন্নাটা একেবারে ইল্লুৎ ক'রে দেখিয়ে দিলে ?

পিসী। দিলে বৈ কি। স্নান ক'রে উঠে যে দিন ধপ্‌ধপে কাপড় পরি, সেই দিন-ই বুঝতে পারি, বিছানার চাদর-ওয়াড়গুলো কত ময়লা হয়েছে ; তার পনেরো দিন আগে থেকে যে সে সবে চাম্‌সে ধরতে সুরু হয়েছে, নিজের পরা কাপড়ের সঙ্গে মিলিয়ে তা আর চোখে পড়ে নি ; এখানে চোখ মানে মন ; কাপড়ের ময়লায় গা ময়লা, অঙ্গের ময়লা থিতিয়ে তলায় প'ড়ে মনটাকে-ও আঁস্তাকুড় ক'রে তোলে।

পিসে। এ রকম কথা আগে ত তোমার মুখে কখন-গুনি নি।

পিসী। কেওড়া বন থেকে শেওড়া বন, সেখান থেকে কচুর ডাঁটা শেয়াল কাঁটা, এই রকম একটু একটু ক'রে ভাঁটা প'ড়ে নৌকো যে কখন্ কাদায় ব'সে গেছে, তা টের পারি নি।

পিসে। এখন গোলাপবাগে যুঁইয়ের ঝাড়ের নীচে সুখের জোয়ারের ঢেউ দেখে—

পিসী। আজ ঘুমাও ; তোমাকে অনেকক্ষণ না ঘুমিয়ে রেখেছি।

নার্শের কার্য্যে যে জাতীয় জীবের জন্মগত অধিকার, মনোব্যাধিবারণ চিকিৎসাশাস্ত্র যাঁরা গর্ভে বাস করতে করতে শিখে তবে পৃথিবীতে প্রবেশ করেন, পিসীমা সেই মোহিনী শক্তির আধারস্বরূপা নারী ; সুতরাং ঔষধ ওভারডোজ হয় আশঙ্কায় সে রাত্রি স্বামীকে শেষ হাফডোজ দিয়াই ঘুম পাড়ালেন ও স্বপ্নে কুমিল্লার বাসায় বঁটি পেতে কচুপাতা কুটতে কুটতে যেমন থোরা খুঁজতে রান্নাঘরে ঢুকলেন, অমনি মেজো-বটঠাকুরের গোসলখানার সাওয়ার বাথের শীতল জল তাঁর মাথায় ঝর ঝর ক'রে প'ড়ে পদ্মা নদীতে পরিণত হয়ে তিনি নৌকায় উঠেই—তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয় অচৈতন্য।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



"কে গো কল্পনা জননী লক্ষ্মীর—
কে নারীরূপের পূর্ণ মানবী!"—রবীন্দ্রনাথ।

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

COLOUR ILLUSTRATION



৬ষ্ঠ বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৪ [৪র্থ সংখ্যা

CALCUTTA PUBLIC LIBRARY Estd. 1836

কবি রাজশেখর

২

রাজশেখর রচনা-বিষয়ে কবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লোকচরিত্রবিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতাই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"জানীয়াল্লোকসাম্যন্তং কবিঃ কুত্র মনোমতং চ।
অসম্মতং পরিহরেন্মতেঽভিনিবিশিতে চ।
জনাপবাদমাত্রেণ ন জুগুপ্সেত চাত্মনি।
জানীয়াৎ স্বয়মাত্মানং যতো লোকো নিরঙ্কুশঃ॥"

অর্থাৎ কবি কোন্ বিষয়টি লোক চাহে এবং তাঁহার আপনার হৃদয়ও কি চাহে, তাহা অগ্রে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন। যাহা লোকসম্মত এবং নিজের অভিমত, তাহা বুঝিয়া লইয়া তদ্‌বিষয়ে কাব্যাদি রচনা করিবার জন্য কবি প্রস্তুত হইবেন। তাঁহার কাব্য পড়িয়া বা তাঁহার রচনা দেখিয়া লোক নিন্দা করিতেছে বলিয়া কবি কখনও যেন আপনাকে অযোগ্য বলিয়া ভাবিবেন না, আত্মশক্তিকে জানাই কবির প্রথম কার্য্য। লোক কি বলে, তাহার উপর কবির প্রণিধান করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ, লোক চিরকালই যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"গীতস্থক্তিরতিক্রান্তে স্তোতা দেশান্তরস্থিতে।
প্রত্যক্ষে তু কবৌ লোকঃ সাবজ্ঞঃ সুমহত্যপি।
প্রত্যক্ষ-কবিকাব্যঞ্চ রূপং চ কুলযোষিতঃ।
গৃহবৈদ্যস্য বিদ্যা চ কস্যৈচিদ্ যদি রোচতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কবি লোকান্তরে গমন করিলে লোক তাঁহার রচনার প্রশংসা করিয়া থাকে। স্তোতাদিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা দূরদেশস্থিত অপরিচিত কবিরই প্রশংসা করিয়া থাকে। পরিচিত ব্যক্তি মহাকবি হইলেও লোক তাহাকে প্রায়শঃই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। পরিচিত কবির কাব্য, কুলাঙ্গনার রূপ ও গৃহ-বৈদ্যের বিদ্যা অধিকাংশ লোকেরই রুচিকর হয় না।

যাহার নিজের কবিত্ব-শক্তি নাই, পরের কবিতা চুরি করিয়া আপনার বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রাজশেখর বলিয়াছেন,—

"ইদং মহাহাসকরং বিচেষ্টিতং
পরোক্তিপাটচ্চরতারতোঽপি যৎ।
সদুক্তিরত্নাকরতাং গতান্ কবীন্
কবিত্বমাত্রেণ সমেন নিন্দতি॥"

অর্থাৎ পরের কবিতা চুরি করাই যাহার স্বভাব, এমন তথাকথিত কবিগণ সুকবিতা-রত্নের রত্নাকরস্বরূপ মহাকবিগণকেও আপনার সদৃশ কবি বিবেচনা করিয়া লোক-সমাজে নিন্দা করিয়া থাকে। তাহাদিগের এই প্রকার চেষ্টা বাস্তবিকই অতীব হাস্যজনক হইয়া থাকে।

কাহার কবিতা লোকের প্রিয় হইয়া থাকে, সে বিষয়ে রাজশেখর বলিয়াছেন যে,—

"পিতুর্গুরোর্নরেন্দ্রস্য সুতশিষ্যপদাতয়ঃ।
অবিবিচ্যৈব কাব্যানি স্তবন্তি চ পঠন্তি চ॥"

অর্থাৎ পুত্রের নিকট পিতার কাব্য, শিষ্যের নিকট গুরুর কাব্য, পাইকের নিকট রাজার কাব্য বড়ই আদরের হইয়া থাকে। ইহারা ইঁহাদের কাব্যের গুণদোষ বিচার না করিয়াই প্রশংসা করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকে।

কাব্য অর্দ্ধ-সমাপ্ত করিয়া লোকের নিকট পড়া উচিত নহে বা প্রকাশ করা উচিত নহে। এইরূপ করিলে সে কাব্যের আর সমাপ্তি হইয়া উঠে না, ইহাই হইল রাজশেখরের মত। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

"কিঞ্চ নার্দ্ধকৃতং পঠেৎ অসমাপ্তিস্তস্য ফলম্।"

সকল কবিকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন, যথা—

"ন নবীনমেকাকিনঃ পুরতঃ। স হি স্বীয়ং ব্রুবাণঃ কত্তরেণ সাক্ষিণা জীয়েত। ন চ স্বকৃতিং বহু মন্যেত। পক্ষপাতো হি গুণদোষৌ বিপর্য্যাসয়তি। ন চ দৃপ্যেৎ। দর্পলবোঽপি সর্ব্বসংস্কারানুচ্ছিনত্তি। পরৈশ্চ পরীক্ষয়েৎ। যদুদাসীনঃ পশ্যতি ন তদনুষ্ঠাতেতি প্রায়ো বাদঃ। কবিমানিনং তু ছন্দোঽনুবর্ত্তনেন রঞ্জয়েৎ। কবিষ্মন্যসা হি পুরতঃ সূক্তমরণারুদিতং স্যাদ্ বিপ্লবেত চ।"

আপনাকে যে কবি বলিয়া অভিমান করে, তাহার নিকটে একাকী নিজের কাব্য পড়িয়া শুনাইবে না। ইহার ফল এই যে, সে যদি তোমার রচিত কাব্য অভ্যাস করিয়া বা তাহার ভাব লইয়া নূতন কাব্য রচনা করিয়া লোকসমক্ষে নিজের বলিয়া প্রচার করিয়া বসে, তাহা হইলে তোমার এমন কোন সাক্ষী থাকিতে পারে না, যাহার দ্বারা তোমার নিজের রচিত বলিয়া প্রমাণ করিতে পার।

নিজের লেখা বলিয়া বড় ভাল হইয়াছে, এ প্রকার মতিমানও যেন কবি না করেন, আপনার উপর এতাদৃশ পক্ষপাত থাকিলে গুণ-দোষের বিচার হইয়া উঠে না। কবি কখনও আত্মশক্তি বিষয়ে দর্প করিবেন না, অল্পমাত্র দর্পও কবির সকল সংস্কারকে নষ্ট করিয়া দেয়। নিজের আত্মীয়ও নহে, অথচ শত্রুও নহে, এরূপ যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা নিজের কাব্যের পরীক্ষা করান উচিত। কারণ, প্রায়ই লোক বলিয়া থাকে এই যাহা বলিয়া থাকে, তাহা সত্য যে, উদাসীন ব্যক্তি যাহা দেখিয়া থাকে, কর্ত্তা তাহা দেখে না। (আর একটি বিশেষ উপদেশ এই যে,) আপনাকে যে ব্যক্তি বড় কবি বলিয়া মানিয়া থাকে, তাহার অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে খুসী করিবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, এইরূপ অভিমানী ব্যক্তির নিকটে ভাল কবিতাপাঠও অরণ্যে রোদনবৎ হইয়া থাকে এবং সেইরূপ পাঠের পরিণামও বিষময় হইয়া থাকে।

সময় বিভাগ করিয়া কার্য্য না করিলে কবির অভীষ্ট ফলদায়ী হয় না, ইহাই ছিল রাজশেখরের মত। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

"অনিয়তকালাঃ প্রবৃত্তয়ো বিপ্লবন্তে, তস্মাদ্দিবসং নিশং চ যামক্রমেণ চতুর্দ্ধা বিভজেৎ। স প্রাতরুত্থায় কৃতসন্ধ্যাবিধিঃ সারস্বতং সূক্তমধীয়ীত। ততো বিদ্যাবয়সি যথাসুখমাসীনঃ কালে বিদ্যা উপবিদ্যাশ্চানুশীলয়েদাপ্রহরাৎ। ন হ্যেবংবিধমন্যৎ প্রতিহেতুর্যথা প্রত্যগ্রসংস্কারঃ। দ্বিতীয়ে কাব্যক্রিয়াম্। উপস্নায়াদবিরুদ্ধং ভুঞ্জীত চ। ভোজনান্তে কাব্যগোষ্ঠীং প্রবর্ত্তয়েৎ।

সময় না বাঁধিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়ই তাহা প্রবৃত্তি নিষ্কাম হইয়া থাকে, এই কারণে দিন ও রাত্রিকে কয় চারি ভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া সন্ধ্যা-বন্দন ও দেবতা-পূজা করিবার পর সারস্বত সূক্ত অধ্যয়ন করিবেন, তাহার পর নিজের বিদ্যাগুলি আরামের সহিত উপবেশন করিয়া কাব্যবিদ্যা এবং উপবিদ্যা (যাহার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) অনুশীলন করিবেন। প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত কবির ইহাই হইল প্রাত্যহিক কর্ম্ম। কবিশক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে হইলে এই প্রকার বিদ্যা এবং উপবিদ্যার অনুশীলনের তুল্য অন্য উপায় নাই। দ্বিতীয় প্রহরে

কবির কাব্য প্রভৃতি রচনা করা আবশ্যক, মধ্যাহ্নের কাছাকাছি সময়ে কবি স্নান করিবেন এবং অনুকূল (অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির) আহার করিবেন। ভোজনের পরে কাব্যগোষ্ঠীর প্রবর্ত্তন করা উচিত।"

"চতুর্থ একাকিনঃ পরিমিতপরিষদো বা পূর্ব্বাহ্ণ-ভাগগৃহিতস্য কাব্যস্য পরীক্ষা। রসাবেশতঃ কাব্যং বিরচয়তো ন হি বিবেক্ত্রী দৃষ্টিস্তথাদনুপরীক্ষেৎ। অধিকস্য ত্যাগো ন্যূনস্য পূরণম্, অন্যথাস্থিতস্য পরিবর্ত্তনং, প্রস্মৃতস্যানুসন্ধানং চেত্যহীনম্। রাত্রিসন্ধ্যামুপাসীতে সরস্বতীং চ। ততো দিবাবিহিত-পরীক্ষিতস্য নাতিলেখনমাপ্রদোষাৎ।.....দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ সাধু শয়ীত। প্রাক্ স্বাপো বপুষঃ পরমারোগ্যায়। চতুর্থে সপ্রযত্নং প্রতিবুধ্যেৎ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে মনঃ প্রসীদত্তাংস্তানর্থানধ্যক্ষয়তীত্যাহারাত্রিকম্।"

দিবসের চতুর্থ প্রহরে সুবিধা অনুসারে একটি অথবা পরিমিত বয়স্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাহ্ণে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। রসাবেশে রচনার সময় কাব্যের কোথায় কোন অংশ অধিক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, এই কারণে তাহার পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা যদি বুঝিতে পারা যায় যে কোন অংশ অধিক হইয়াছে, তবে তাহা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি কোন অংশে ন্যূন থাকে, তবে তাহা পূরণ করিতে হইবে। অন্যথাস্থিত অংশের অর্থাৎ যাহা উল্টা-পাল্টা হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হইবে। যদি কিছু রচনাকালে মনে না পড়া নিবন্ধন উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা অনুসন্ধান করিয়া রচনামধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সন্ধ্যা-বন্দনা করিবে ও সরস্বতীর উপাসনা করিবে। তাহার পর দিনে পরীক্ষিত হইয়াছে যে রচিত অংশ, তাহা ভাল করিয়া সুন্দরভাবে প্রদোষকাল পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিবে, অর্থাৎ পাকা খসড়ায় লিখিয়া রাখিবে। তাহার পর আবশ্যক কার্য্য সমাপন করিয়া.....দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রহরে নিদ্রা যাইবে। কারণ, সুনিদ্রা শারীরিক স্বাস্থ্যের অসাধারণ উপায়। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে কিন্তু কবিকে জাগিতে হইবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত ব্যক্তির চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে এবং সেই প্রসন্নচিত্তে আগামী দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্মাবলী অনুশীলন করিলে মনে হয়। কবি কয় প্রকারের হইতে পারে, তাহার নিরূপণ করিতে যাইয়া রাজশেখর বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধশ্চাসৌ। অসূর্য্যম্পশ্যো, নিষণ্ণো, দত্তাবসরঃ, প্রায়োজনিকশ্চ। যো গুহাগর্ভ-ভূমিগৃহাদি-প্রবেশান্নৈষ্ঠিকবৃত্তিঃ কবতে, অসাবসূর্য্যম্পশ্যস্তস্য সর্ব্বে কালাঃ। যঃ কাব্যক্রিয়ায়ামভিনিবিষ্টঃ কবতে ন চ নৈষ্ঠিকবৃত্তিঃ স নিষণ্ণঃ, তস্যাপি ত এব কালাঃ। যঃ সেবাদিকমবিরুদ্ধানঃ কবতে স দত্তাবসরস্তস্য কতিপয়ে কালাঃ। নিশায়াস্তরীয়ো যামার্দ্ধঃ স হি সারস্বতো মুহূর্ত্তঃ। ভোজনান্তঃ সৌহিত্যং হি স্বাস্থ্যমুপস্থাপয়তি। ব্যবায়োপরমঃ যদার্ত্তিবিনিবৃত্তিরেকো একমেকাগ্রতায়তনং যাপ্যা যানযাত্রা। বিষয়ান্তরবিনিবৃত্তং হি চিত্তং যত্র যত্র প্রণিধীয়তে তত্র তত্র গুড়ূচীলাগং লগতি। যদা যদা চাত্মনঃ ক্ষণিকত্বং মন্যতে স স কাব্যকরণকালঃ। যস্ত প্রস্তুতং কিঞ্চন সংবিধানকমুদ্দিশ্য কবতে স প্রায়োজনিকঃ তস্য প্রয়োজনবশাৎ কালব্যবস্থা, বুদ্ধিমদাহার্য্যবুদ্ধ্যোরিয়ং নিয়মমুদ্রা, ঔপদেশিকস্য পুনরিহৈব সর্ব্বে কালাঃ সর্ব্বাশ্চ নিয়মমুদ্রাঃ।"

কবি চারি প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—অসূর্য্যম্পশ্য, নিষণ্ণ, দত্তাবসর ও প্রায়োজনিক। যিনি কোন পর্ব্বতগুহায় বা বাড়ীর মধ্যে কোন নিভৃত গৃহে অথবা মাটীর তলায় রচিত গৃহে একাকী নির্জ্জনভাবে থাকিয়া প্রায় সর্ব্বদাই রচনা করিয়া থাকেন, এইরূপ কবিকে অসূর্য্যম্পশ্য কবি কহে। তাঁহার পক্ষে কবিতা রচনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। যিনি অভিনিবিষ্টভাবে কাব্য-রচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া কাব্যাদি রচনা করেন, অথচ সর্ব্বদাই কাব্য-রচনা লইয়া মাতিয়া থাকেন না, তাঁহাকে 'নিষণ্ণ কবি' বলা যায়, তাঁহার পক্ষেও কোন বিশেষ কালের বিধান নাই। যিনি জীবিকার্থ সেবা প্রভৃতি কার্য্যের অবিরোধে কাব্য রচনা করেন, তাঁহাকে 'দত্তাবসর' কবি বলা যায়, তাঁহার পক্ষে কতিপয় কালই কাব্য-রচনার অনুকূল হইয়া থাকে, যেমন রাত্রির চতুর্থ প্রহরার্দ্ধ ভাগ, ইহারই নাম সারস্বত মুহূর্ত্ত। আহার করিবার পর আরাম করা উচিত। কারণ, এরূপ করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।.....যখনই চিত্ত একাগ্র হয়, অন্য কোন কার্য্য না থাকে, সে সময় এই জাতীয় কবি কাব্য রচনা করিতে পারেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ পাল্কীতে চড়িয়া যাইবার সময়কে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ফল কথা এই, চিত্ত বিষয়ান্তর হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া যে যে বিষয়ে প্রণিহিত হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহা গুড়ূচীরাগের ন্যায় লাগিয়া থাকে। যখন যখন কবি আত্মাতে স্ফূর্ত্তি অনুভব করিবেন, সেই সেই সময়ই তাঁহার কাব্য-রচনার প্রশস্ত কাল। যে ব্যক্তি

কোন একটি কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাসমত অর্থাৎ প্রয়োজনবশতঃ কাব্য-রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রায়োজনিক কবি বলা যায়। তাঁহার পক্ষে কাব্য-রচনার কাল প্রয়োজনবশতঃ অর্থাৎ ফরমাসমত হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কালবিশেষের নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক নাই। এই সকল নিয়মের কথা যাহা বলা হইল, তাহা বুদ্ধিমান্ ও আহার্য্যবুদ্ধি নামে যে দ্বিবিধ কবির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু যিনি ঔপদেশিক কবি (ইঁহার কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে), তাঁহার পক্ষে তাঁহাদিগের ইচ্ছাই কালের নিয়ামক। নিয়মের অবলম্বনও তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

রূপহীনার ব্যথা

ও বোন্ আমার নেইক' দুখের ওর,—
দুঃখ কিসের বল্‌তে সেটাই দ্বিগুণ দুঃখ মোর।
আর বলিস্‌নি', আর বলিস্‌নি' ভাই,
তাঁর কথাটি শুন্‌লে আমি কেমন হ'য়ে যাই ;
দেহের সকল বাঁধন যেন শিথিল হ'য়ে আসে
কুহকের এক কুহেলিকা চোখের আগে ভাসে,
হাত পা' আসে ধরে'—
সে নাম আমায় নেশায় ভুলায়, সুখে অবশ করে।

আচ্ছা দিদি, সুধাই একটা কথা—
বলিস্ যদি কাউকে তবে খাবি আমার মাথা !
বল্‌বি না তো ? আচ্ছা, কাছে আয়,
কি জানি কেউ আড়াল হ'তে শুন্‌তে যদি পায় ?
হাসি-মুখে সইচি কেন ? নৈলে যে ভাই সবে
নিন্দিবে তাঁয়, প্রাণে তাঁরে ব্যথা পেতে হবে !
না ভাই নার্‌বো তা—
তাঁর দুখের আর ভার বাড়াতে আমি পার্‌বো না।

আমি বড়ই হতভাগী, ভাই,
নৈলে অমন স্বামী আমি পেয়েও না পাই !
রূপে গুণে বিদ্যায় সম্মানে
তুলনা তাঁর একটিও নাই মহীর মধ্যখানে।
এমন ভাগ্যবতী হয়েও বড় ভাগ্যহীনা
সকল সুখ তো এক জনেরে দেন্ না বিধি কিনা !
রূপহীনা আমি—
বঞ্চিত তাই সকল সুখে, চান্ না ফিরে স্বামী।

আচ্ছা দিদি, রূপ কেমনে পায় ?
কি কর্‌লে এ কালো বরণ গৌর করা যায় ?
চক্ষু দু'টি টানা পটল-চেরা
কেমন করে' করি চিকণ কোঁকড়া চুলের বেড়া ?
এই খাঁদা নাক বাঁশীর মত বদ্‌লানো কি যায় ?
কেমন করে' হয় লোকে ভাই স্বামী যেমন চায় ?
রূপ কি এমন নিধি ?
রূপ নাই যার মরণ তাহার হয় না কেন, দিদি ?

কুরূপা যে আমি এতখানি—
বিয়ের আগে এ ছাই আমি একটুও কি জানি ?
এখন যে লো মস্ত অপরাধী,
বুঝিয়ে দে' ভাই, এ ভার নামাই—তাই তো তোকে সাধি !
ভালবাসা সোহাগ প্রীতি রূপবতীদের
নিশ্চয় এ কুরূপাদের চাইতে বেশী ঢের !
অবাক্ হ'য়ে ভাবি,
আমার চেয়েও অধিক প্রেমের কেমন তাদের দাবী !

এই তো আমার একটু ভালবাসা—
পাগল-করা সব-ভুলানো সকল কর্ম্ম নাশা !
আমার চেয়েও ভালবাসে যে,
বুঝ্‌তে নারি—কেমন করে' প্রাণে বাঁচে সে।
এই যে আমার একটু প্রীতি, পায় না পতির সাড়া
তাতেই আমার বিশ্বভরা ! ওদের কেমন ধারা ?
মোর মত তো নয়—
যুগ্ম-প্রেমের গভীর ব্যথা কেম্‌নে ওরা সয় ?

আমার স্বামী, আমার স্বামীর ঘর,—
স্বামীর সহিত জড়িত যা'—তাই যে মনোহর !
তিনি চান—আড়ালেতেই থাকি,
দেহের সাথে প্রাণটাকে ভাই কেমন করে' ঢাকি ?
আমার বুকে কেন তবে এত আশা প্রীতি—
এ কি বিধির বিধান, দিদি, এই বা কেমন রীতি ?
অবহেলায় এ-ই !
বাঁচ্‌তাম কি তবে যদি কর্‌তো সোহাগ সেই ?

সাধ্যমতে লুকিয়ে রাখি নিজে ;
দৈবে যদি সাম্‌নে পড়ি, তিনি চাহেন পিছে !
আড়াল থেকে দেখে তাঁহার মুখ,
লুকিয়ে তাঁহার সেবা করে' ভরে আমার বুক !
পূজায় এ রূপ লাগ্‌লো না তাই সেবার অর্ঘ্য ঢালি—
এমন কপাল, তবুও তাঁর যায় না মনের কালি !
আর কামনা নাই—
ও চাঁদমুখে একটু হাসি দেখে মর্‌তে পাই।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অমরনাথ



২৮

চন্দননগরের বাটীতে একদা প্রভাতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া ভাত খাইতে খাইতে নরু কহিল, "লতাকে আমার সঙ্গে খেতে দেও না, মা।"

জননী হিরন্ময়ী কহিলেন, "তুই এখন খেয়ে নিয়ে স্কুলে যা', লতা এর পরে আমার সঙ্গে খাবে।"

নরু। ও অত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাক্‌তে পারবে না, তুমি ওকে এখন দেও না কেন ?

হির। এই ত জল খেলে।

নরু। জল ত খেয়েছে ভারি, হয় ত বাসি রুটী একখানা গেলে দিয়েছে।

হির। গেরস্ত ঘরে আবার কি দেবে রে ?

নরু। কেন, আমাকে দেবার বেলা ত সন্দেশ রসগোল্লা যোগায় !

হির। তুই যে ছেলে—

নরু। বাবার কাছে ছেলের চেয়ে লতা বড়। তিনি এখানে থাক্‌লে কত ভাল জিনিষ লতাকে খাওয়াতেন।

হির। আমি ওকে মন্দ জিনিষ খেতে দি না কি ?

নরু। দেও বই কি, নইলে আমার সঙ্গে ওকে খেতে দেও না কেন ? সকালে দেবে আমাকে আগে, রাতে দেবে ওকে আগে। আমি প'ড়ে আসতে আসতে দেখি যে, তুমি ওকে খাইয়ে দিয়েছ। বাবা ফিরে আসুন, আমি সব তাঁকে ব'লে দেব।

হির। ব'লে দিবি কি ? আমি করেছি কি ?

নরু। ঠাক্-মা, তুমি ত কিছু দেখ না।

দয়াময়ী এক পাশে নিরামিষ রাঁধিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে আবার টানিস কেন, দাদা ? আমি কি কাউকে খাবার দি ?"

নরু। দেও না কেন ?

দয়া। আমি বুড়ো মানুষ, জপ-তপ নিয়ে থাকি।

নরু। এখন থেকে লতাকে আমার সঙ্গে খেতে না দিলে আমি খাব না।

বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। হিরন্ময়ী গাল দিয়া উঠিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি ছেলের হাত ধরিলেন। ছেলে যে বেঁকিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে আর সোজা করা গেল না। দয়াময়ী তখন কহিলেন, "লতাকে এর সঙ্গে খেতে দিলেই ত সব গোল চুকে যায়, বউ-মা, শুধু শুধু বাছাকে গাল-মন্দ করছ কেন ?"

এমন সময় লতা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া নরুকে কহিল, "তোমার দু'খানা খাতাই বেঁধে দিয়েছি, নরু।"

নরু কথা কহিল না। হিরণ বলিল, "তুই কেন লতা, নরুর সঙ্গে খেতে বসিস নে ?"

লতা। তুমিই ত আমাকে নরুর সঙ্গে খেতে বারণ করেছ।

হির। কবে এক দিন কি বলেছিলাম—

লতা। কবে এক দিন নয় বউদিদি ; তুমি ত রোজই ওর আড়ালে আমাকে খেতে বল। আজ সকালে আমাকে মুড়ি খেতে দিয়ে বললে, নরু যেন টের না পায়—

নরু আর শুনিল না—বেগে প্রস্থান করিল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না—কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার দাদু, দিদি-মা ও জ্যোতি। পার্ব্বতী নরুর হাত মুঠার মধ্যে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন দাদা, কি হয়েছে ?"

নরু চোখের জল লুকাইবার চেষ্টা পাইয়া ব্যথিত ও রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "দেখ না দিদিমা, মা লতাকে খেতে দেয় না, আজ তাকে মুড়ি খাইয়ে রেখেছে।"

পার্ব্ব। তা তুই কাঁদছিস্ কেন ?

নরু। বাবা যাবার সময় সকলকে বার বার ক'রে ব'লে গেছেন, লতার যেন কোন কষ্ট না হয়, আমি যা খাব, লতাও যেন তাই খায়। তা মা কিছুতেই তা করবে না ; লতাকে দেবে মুড়ি, আর আমাকে দেবে লুচি-সন্দেশ। আমি ত আর খাব না।

হরনাথ নরুর কথা শুনিয়া ধীরভাবে কন্যাকে ডাকিলেন। হিরণ অগ্রসর হইয়া মাতা-পিতাকে প্রণাম করিল। হরনাথ কহিলেন, "তোমার সম্বন্ধে এ সব কি শুনছি, হিরণ ?"

হির। শুনুন বাবা, নরুর একটা কথাও আপনি বিশ্বাস করবেন না, ও আমার সকল কাযই মন্দ দেখে।

নরু। মন্দ দেখব না ত কি ? তুমি বাবার মত ভাল কায কর, আমি ভাল দেখব।

হির। আমি মন্দটা কি করি ?

নরু। মন্দ কর না ? তুমি লতার ময়ূরটা চুরি ক'রে বোলতাকে পাঠিয়ে দেও নি ? ও কেঁদে কেঁদে বেড়ায়—

হির। তুই আমাকে চোর বললি ?

নরু। বলব না ত কি ? যে চুরি করে, লোকে তাকেই চোর বলে।

হির। আমাকে চুরি করতে তুই দেখিছিস ?

নরু। শুধু এক আধবার? সে দিন বাবা লতাকে কত কি কিনে দিয়ে গেলেন, তার অর্দ্ধেক জিনিষ তার বাক্সে নেই।

হির। আমি কি সে-গুলো খেয়ে ফেলিছি?

নরু। বোলতাকে পাঠিয়ে দেও নি? আমি সব জানি।

পার্ব্ব। কি কি জিনিষ নরু পাওয়া যাচ্ছে না?

নরু। একখানা নীল রঙের কাপড়, সেই রকম কাপড়ের জামা, চুলের ক্লিপ, চিরুণী আরও কত কি।

পার্ব্ব। হুঁ। আচ্ছা নরু, তুই কাঁদিস্ নে, এ সব কথা তোর বাবাকেও বলিস্ নে—আমি সব কিনে পাঠিয়ে দেব।

নরু। আমি না বলি, রামু সব বাবাকে ব'লে দেবে।

পার্ব্ব। রামুটা কে?

নরু। সেই যে, কাকা যাকে কোন্নগর হ'তে নিয়ে এসেছেন।

পার্ব্ব। সে বুঝি আজও এখানে আছে?

নরু। তাকে তাড়ায় কে? সে লতার ছেলে। লোকে মা-কে এত ভালবাসে না, রামু যা ভালবাসে লতাকে।

হরনাথ কহিলেন, "হ্যাঁ দাদু, তোমার বাবা কবে ফিরবেন?

নরু। তা বল্‌তে পারি না, একটা মস্ত কায বাবা পেয়েছেন—অনেক লাভ হবে।

হর। তুমি কেমন ক'রে তা জানলে, ভাই?

নরু। বাবা যে লতাকে বলছিলেন। লতা কিছুতেই বাবাকে ছেড়ে দেবে না, তখন বাবা আদর ক'রে লতাকে বুঝিয়ে বল্‌লেন, তাই শুনে লতা বাবাকে ছেড়ে দিলে।

হর। তোমার বাবা ত গেছেন অনেক দিন—মাসখানেকের উপর। আমরা ভেবেছিলাম, তিনি এত দিন অমরকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। আচ্ছা, কৃষ্ণনাথ যত দিন না ফেরেন, তত দিন হিরণ আমার ওখানে থাকবে—প্রস্তুত হয়ে নেও হিরণ, এখনই আমাদের সঙ্গে যাবে।

হির। এখানে চলবে কি ক'রে?

হর। আমি জ্যোতিকে রেখে যাচ্ছি, সে তোমার চেয়ে ভাল গিন্নী।

হির। আমাকে বাড়ীতে দেখতে না পেলে—

হর। কৃষ্ণ কিছু বলবে না, যখন সে শুনবে, আমি তোমাকে নিয়ে গেছি।

হির। আমার ঘর ছেড়ে যাবার দরকার কি, বাবা?

হর। দরকার আছে মা, পরে বুঝিয়ে দেব।

পার্ব্ব। বোঝাতে হবে না, নিজেই বুঝবে।

হর। এখন আর দেরী কর না—তৈরী হও।

জ্যোতি এ দিকে লতার কাছে গিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। হরনাথ তাহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে থাকতে পারবে, ময়ি?"

"তুমি বললেই পারব।"

"বেয়ান রইলেন, তিনি সব দেখবেন; তুমি শুধু দেখবে ময়ি, নরু-লতার কোন কষ্ট না হয়।"

লতা কহিল, "জ্যোতিদিকে পেলে আমার আর একলা বোধ হবে না। নরু স্কুলে যায়, আমি একা ব'সে পড়ি। কিন্তু বেশীক্ষণ কি পড়তে ভাল লাগে, জ্যেঠামশাই?"

হর। গান কর না কেন?

লতা। বউদিদি গান পছন্দ করেন না; বলেন, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও-সব কি!

পার্ব্বতী অগ্রসর হইয়া লতাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। লতা কোন আপত্তি করিল না—হাস্যমুখে আদর খাইয়া যাইতে লাগিল। তিনি যখন ছাড়িয়া দিলেন, তখন সে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, জ্যেঠাইমা, মেয়েদের গান গাওয়াটা কি দোষের?"

"রেবা জ্যোতি ওতরপাড়ায় গান গাইত, শুনেছ ত? যদি দোষের হ'ত, তা হ'লে তোমার দাদা কি তাদের গাইতে দিতেন?"

"তা হ'লে আমরা গান করব?"

"খুব কোরো।"

তখন লতা জ্যেঠামহাশয়ের কাছে গিয়া কহিল, "আপনি বসবেন চলুন, আজ আপনাকে যেতে দেব না।"

হরনাথ তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "আমাকে যে এখনই যেতে হবে, মা।"

লতা। দাদা, বড়দা নেই ব'লে বুঝি? তাঁরা থাকলে আপনাদের যাওয়া হ'ত না।

হর। হয় ত যাওয়া ঘটত না; তোমার দাদা থাক্‌তে বললে আমি যেতে পারতাম না। তাকে দেখব বলেই আমরা এসেছিলাম।

লতা। আপনি কি কখনও এখানে আসেন নি?

হর। তোমার বড়দার এ বাড়ীতে আসি নি। এ বাড়ীত বেশী দিন হয় নি। আচ্ছা মা, তুমি তোমার দাদার ঠিকানা জান?

লতা। জানি। কিন্তু দাদা ত দিল্লীতে আর থাকবেন না—এত দিন হয় ত বেরিয়ে পড়েছেন।

হর। এখানে আসবেন?

লতা। না, ঝরিয়া যাবেন।

নরু জ্যোতিকে বলিতেছিল, লতার কোন্ কোন্ জিনিষ অপহৃত হইয়াছে। লতার শেষ কথাটা তাহার কানে যাইবামাত্র সে সরিয়া আসিয়া কহিল, "কাকার কথা বলছিস, লতা? তিনি ত এখন ঝরিয়া যাবেন না—দিল্লীতেই থাকবেন; বিয়ে-টিয়ে ক'রে তার পর যদি যান।"

পার্ব্বতী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে কি রকম?"

নরু। কাকাবাবুর এক বন্ধু আছেন সেখানে, তাঁর নাম বিপিন বাবু, তাঁরই বোন্—লবঙ্গ না কি—তারই সঙ্গে কাকার বিয়ে।

পার্ব্বতী হিরণের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের কথা কি রে?"

হির। আমি কিছু জানি নে; আমাকে কেউ লিখেছে যে, আমি জানব?

নরু। মা, তুমি বড় মিথ্যে বল। বাবার নামে বিপিন বাবুর চিঠি এসেছিল, তা কি তুমি খুলে পড় নি? তুমি চিঠিখানা প'ড়ে লুকিয়ে রেখে দিলে, বাবাকে আর পাঠালে না। এখন বলছ, কিছু জান না।

হির। তুই কেমন ক'রে জান্‌লি, আমি লুকিয়ে ফেলিছি?

নরু। আমি বুঝি তা দেখিনি মনে করেছ? বাবা না থাকলে তুমি তাঁর চিঠিগুলো খামের পিঠে জল দিয়ে খুলে পড়; কোনটা আবার এঁটে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেও, কোনটা বা দেও না। বাবা এলে এবার আমি সব ব'লে দেব।

হির। তোর আমি আর মুখ দেখব না, পোড়ারমুখো ছেলে।

হর। মিথ্যে ওকে গাল দিচ্ছ, হিরণ—দাদুর কোন দোষ নেই।

হির। তুমি ওর কথা বিশ্বেস করলে, বাবা?

হর। বালকরা মায়ের নামে কখন মিথ্যে বলে না; আর নাদু ত আমার মিথ্যে বলতেই জানে না—ও যে ওর কাকার কাছে সত্য বলতে শেখেছে।

হির। আমিই যত মিথ্যে বলি, না?

হর। মা, আমরাই আমাদের সুখ-দুঃখ তৈরী করি। যা কিছু ইচ্ছা কর বা কায কর, তা চিত্রগুপ্তরূপী ভগবানের খাতায় গুপ্তভাবে চিত্রিত হচ্ছে। ফল তোমাকে নিতেই হবে—ব্যত্যয় নেই—

নরু। মাকে শাপ দিও না, দাদু!

হর। আমি ত শাপ দিচ্ছি নে, ভাই। যে যা করবে, তাকে তার ফল নিতে হবে, এই কথাই আমি বলছি। আগে ইচ্ছা, তার পর কর্ম্ম, তার পর জ্ঞান। যে মুহূর্ত্তে তুমি ইচ্ছে করলে, আমার এই নস্যদানীটা চুরি করতে হবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি পাপ সঞ্চয় করলে। তার পর যখন অনেক কৌশলে ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত করলে, তখন তোমার অন্তরে ভয় ঢুকল, কেমন ক'রে তুমি চোরাই মাল লুকুবে। লুকুতে যখন না পেরে ধরা পড়লে, তখন তোমার জ্ঞান হ'ল—অনুতাপ এল।

নরু। আচ্ছা দাদু, আমি কেমন ক'রে জানতে পারব, কোন্ ইচ্ছাটা অন্যায়—

হর। সেটা তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে আগে হতেই ব'লে দেবেন।

নরু। কৈ, আমি ত শুনতে পাই না—

হর। শুনতে পাও, কিন্তু গ্রাহ্য কর না। তিনি তোমাকে ভয় দেখিয়ে বলেন, এ কায করো না; ধরা পড়লে সাজা পাবে।

নরু। তা হ'লে যে ইচ্ছার সঙ্গে ভয় আসে, সে কাযটা করা উচিত নয়?

হর। ঠিক বলেছ দাদু। আবার যে কাযের গোড়ায় ভয় নাই, শুধু আনন্দ—

নরু। বুঝলাম না দাদু, বুঝিয়ে দেও না।

হর। শুনতে তোমার ভাল লাগ্‌ছে?

নরু। তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

হর। আচ্ছা, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, তুমি সকালবেলা বেড়াতে গিয়ে দেখলে, একটি রুগ্ন ক্ষুধাতুর বুড়া মানুষ গাছতলায় শুয়ে প'ড়ে শীতে কাঁপছে। তার কেউ নেই, সম্বলও কিছু নেই। তাকে দেখবামাত্র তোমার ইচ্ছা হ'ল, ওকে খাওয়াতে, কাপড় পরাতে। তুমি বাড়ী হ'তে দুধ এনে তাকে খাওয়ালে, তোমার গায়ের কাপড়খানা তার গায়ে জড়িয়ে দিলে। তোমার ইচ্ছানুসারে কায করলে, কোথাও একট ভয় নেই। তার পর সে যখন উঠে ব'সে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে বললে, "বাবা, এত যত্ন আমাকে কেউ কখন করে নি, তুমি কে বাবা!" তখন তোমার মনে কত আনন্দ। শুভ কাযে গোড়ায় উৎসাহ, শেষে আনন্দ—কোথাও একটু ভয় নেই।

নরু। যাতে আমি আনন্দ পাই, সেই কায করব, দাদু; আর যাতে আমি ভয় পাই, সে কায করব না।

হর। তাই কোরো ভাই, ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখবেন। (হিরণের প্রতি) এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে নষ্ট কোরো না হিরণ, কৃষ্ণনাথের অপ্রিয় হয়ো না।

হিরণ আর কিছু না বলিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইতে গেল। পার্ব্বতী কহিলেন, "হ্যাঁ রে, বিয়ের কথাটা কি, খুলে বল্ না।"

নরু। কাকার বিয়ে হচ্ছে বিপিন বাবুর বোনের সঙ্গে; বাবাকে তিনি যেতে লিখেছেন। আর কিছু জানি নে।

পার্ব্বতী কাতর হইয়া পড়িলেন। হরনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "ভেবো না, কৃষ্ণের কি ইচ্ছা, দেখ না।"

জ্যোতিও এই হৃদয়বেধী সংবাদে স্থির থাকিতে পারে নাই। তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বে এক ঘটনায় প্রেম জাগিয়াছিল। কিন্তু তখন সঞ্চার হইয়াছিল মাত্র, অমরকে পাইবার আশা তাহার অন্তরে জাগে নাই। যখন দেখিল, অমর অপরের হইয়া যাইতেছেন, তখন তাহার মনে অমরকে স্বামিরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। এই আকাঙ্ক্ষা যত তাহাকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিল, তাহার নিঃসহায় অবস্থাও তাহাকে তত মনঃপীড়া দিতে লাগিল।

২৯

কয়েক দিন পরে কৃষ্ণনাথ গৃহে ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, গৃহে গৃহস্বামিনী নাই। তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া জ্যোতি সুচারুরূপে সংসার চালাইতেছে। বাগান, গোশালা সকল দিকেই তাহার লক্ষ্য আছে। অথচ অধিকাংশ সময়েই হাসিমুখে গান গাহিয়া বেড়াইতেছে। যখন কৃষ্ণ জ্যোতির মুখে শুনিলেন, "বাবা এসে আমাকে রেখে দিদিকে নিয়ে গেছেন," তখন তিনি বুঝিলেন, একটা কিছু গুরুতর ঘটনা হইয়া থাকিবে। ঘটনার কথা তখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরাহ্ণে রামুকে তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে ডাকিলেন। রামু সকল কথা বলিল, কিছু বাড়াইয়াও বলিল—বলিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছিল। সকল কথা শুনিয়া তিনি রামুকে বিদায় দিলেন এবং নরুকে ডাকিলেন। নরু ভয়ে ভয়ে আসিল; দেখিল, পিতার মুখ অন্ধকার—তাহার ভয় আরও বাড়িয়া গেল। পিতা কখন তাহাকে তিরস্কার করিতেন না; অথচ নরু তাঁহাকে ভয় করিত। মা গাল দিতেন, প্রহার করিতেন; অথচ নরু তাঁহাকে ভয় করিত না। নরু আসিলে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নামে কি চিঠি এসেছিল, নরু?"

নরু আশ্বস্ত হইল; ভাবিল, তাহার মায়ের সঙ্গে যে ঝগড়া করিয়াছে, তাহার জন্য তিরস্কৃত হইবার আর সম্ভাবনা নাই। নরু উত্তর করিল, "দিল্লী থেকে বিপিন বাবু তোমাকে লিখেছিলেন।"

কৃষ্ণ। চিঠিখানা আন দেখি।

নরু। নেই; যাবার সময় মা কতকগুলো চিঠিপত্র ছিঁড়ে

ফেলে দিয়ে গেলেন। আমি ছেঁড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে রেখেছি—দেখবে?

কৃষ্ণ। আন দেখি।

নরু আনিল। তিনখানা চিঠি ছিল। দুইখানা অমরের, একখানা বিপিনের। নরু ছিন্নাংশগুলি এক একখানা কাগজের পিঠে আঠা দিয়া যুড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঠিক পারে নাই। না পারিলেও চিঠিগুলির ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে কৃষ্ণনাথের বিলম্ব হইল না। আগে বিপিনের চিঠি পড়িলেন। তার পর অমরের চিঠি পড়িলেন। অমর একখানায় লিখিয়াছেন, তোমার শাশুড়ীকে বোলো, তিনি আমার মা—সুবিধা পাইলে আমি তাঁহার কাছে যাব। দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছেন, আমি কাল সকালে দিল্লী ছাড়িয়া ঝরিয়ায় যাইব। কৃষ্ণ তারিখ মিলাইয়া দেখিলেন, বিপিনের চিঠি তার কয়েক দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। "এর মধ্যে কি বিয়ে হয়ে গেল? না, আমাকে না জানিয়ে অমর বিয়ে করবে না। পাঁজিখানা নিয়ে আয় ত, নরু। বিয়ের নির্ঘণ্ট আবার কোথা? বিজ্ঞাপনের জঙ্গলের ভিতর হ'তে নির্ঘণ্ট খুঁজে পাওয়া দায়। এবার থেকে পাঁজি কিনে আগে বিজ্ঞাপনগুলো ছিঁড়ে ফেলব। এই যে নির্ঘণ্ট—না, এর মধ্যে বিয়ে হয় নি—শুভ দিন নেই।"

"আপনাপনি কি বকছ, বড়দা?"

কৃষ্ণনাথ মুখ তুলিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, লতা, নরু, জ্যোতি নিকটে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। কৃষ্ণনাথ হাসিয়া কহিলেন, "বকছি কি শুনবি? তোর দাদাকে বেত মারব না আদর করব, তাই পাঁজি দেখে ব্যবস্থা নিতেছিলাম।"

লতা। এখন কি করবে ঠিক করলে?

কৃষ্ণ। আদর করব—সে কখন অনাদরের কায করে না।

লতা। দাদা কি করেছেন ভেবেছিলে?

কৃষ্ণ। ভেবেছিলাম, বুঝি সে লাবণ্যকে বিয়ে করেছে।

লতা। বিয়ে করেন নি?

কৃষ্ণ। না। তিনি যাকে বিয়ে করবেন, তার বাড়ী ও-দেশে নয়।

লতা। তবে কোন্ দেশে বড়দা?

কৃষ্ণ। এই নিকটেই—

লতা। খুলে বল না—

কৃষ্ণ। আমি পাঁজিতে দেখলাম, তার বাড়ী উত্তরপাড়ায়।

আনন্দে জ্যোতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিরানন্দের পর এ আনন্দপ্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অধীর হইয়া সে ছুটিয়া পলাইল। কৃষ্ণনাথ বুঝিলেন, জ্যোতিও অমরকে ভালবাসে। আমার অমরকে কে না ভালবাসে? বাসে না শুধু সেই হতভাগীটা। আচ্ছা, বাসে না কেন? কেন সে লতা ও অমরকে ঘৃণা করে? মহতের সামনে ক্ষুদ্র দাঁড়াতে পারে না—তাই বুঝি সে অমরের নামে এত জ্ব'লে উঠে। ক্ষুদ্রের স্বভাবই হচ্ছে মহতের হিংসা করা, নিন্দা করা। যার অর্থ আছে, তার নিন্দা দরিদ্রের মুখে। যার ধর্ম্ম আছে, তার নিন্দা পাপীর মুখে। আবার এটাও দেখেছি, যে কোন রকমে দু'বেলা গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে যাচ্ছে, তারও হিংসা করে তার প্রতিবেশী। হিংসার কারণ, আর কিছু নয়—সে কেন সুখে থাকে? তার গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করতে না পেরে, দেও তার কলঙ্ক রটিয়ে। কোন রকমে তার সুখ-শান্তি নষ্ট ক'রে দিতে হবে। মানুষ এত হিংস্র। বনের পশুও এত হিংস্র নয়; তারা হিংসা করে উদর-পূর্ত্তির জন্যে, মানুষ হিংসা করে কোন্ ইষ্টসাধনার্থে? সে শুধু পাপসঞ্চয় করে, প্রবৃত্তির মুখে ইন্ধন দেয়। আমার এখন কি কর্ত্তব্য? স্ত্রীকে ত্যাগ করা, না যেমন চলছিল, তেমনই চলতে দেওয়া? না, এ ভাবে আর কাটান যায় না। আচ্ছা, তাকে কি ভাল করা যায় না? অমর কাছে থাকলে একটা পরামর্শ করা যেত। এখন—

ডাকপিয়ন আসিয়া দুইখানা চিঠি দিল। একখানি অমরের। লতা ও নরু চুণারের মাটীর খেলনা দেখিতেছিল। কৃষ্ণ এবার অনেকগুলি মাটীর জিনিষ তাহাদের জন্য আনিয়াছেন; কোনটা পরী, কোনটা ফুলদানী, কোনটা দেবদেবীর মূর্ত্তি। পিয়ন চিঠি দিতেই লতা নরু ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণের পাশে দাঁড়াইল। খামের উপরের লেখা দেখিয়াই লতা কহিল, "এ যে দাদার হাতের লেখা—পড় না বড়দা। দাঁড়াও—আগে জ্যোতিদিকে ডেকে আনি।"

বলিয়া ছুটিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিল জ্যোতির সঙ্গে। কৃষ্ণনাথ অমরের পত্র পড়িলেন। এক স্থানে লেখা ছিল—এবার আমি দিল্লীতে বড় বিপদে পড়েছিলাম। বিপিনের এক বোন্ আছে, নাম লাবণ্য। বয়স তার সতর-আঠার—কলেজে পড়ে—চোখে চশমা দেয়। লাবণ্য আর তার দাদা মনে করে, সে পরমা সুন্দরী। যাই হউক, এই সৌন্দর্য্য-ডালি আমাকে উপহার দিবার জন্য বিপিন বড়ই ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। আমি সব ছেড়ে দিল্লী হ'তে পালাব ভাবছিলাম, এমন সময় ভগবান্ আমাকে রক্ষে করলেন। কিরূপে, তা দেখা হ'লে বলব।

পত্রের আর এক স্থানে লেখা ছিল—আমার এখানে কত বিলম্ব হবে, তা ঠিক বলতে পারি না। এখানে শেখবার আছে অনেক। তোমাদের ওখানে এখন আর যাব না; যদিও জানি, তুমি ও লতানরু আমার বুকে আসবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছ। যদি খুব ব্যাকুল হয়ে থাক, তবে দেখা করো মীরপুরে; আমি সেখানে যাব পূজার সময়। পশুপতি বাবুর নিমন্ত্রণ নিয়েছি। তোমার শ্বশুর শাশুড়ীকে আমার প্রণাম দিও—আর আর শ্যালিকাদের স্নেহপ্রীতি দিও। তারা সকলেই কি আমাকে ভুলে গেছে? না কেউ কেউ মনে রেখেছে?

কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "আমি উত্তরে লিখে দেব, শ্যালিকারা কেহই তোমার নাম করে না, যা' একটু আধটু করে রেবা।"

লতা। বাঃ, তা' বই কি! জ্যোতিদি লক্ষ বার দাদার নাম করেন। বলেন, এই রকম ক'রে তিনি গান করতেন, এই রকম ক'রে বসতেন—

কৃষ্ণ। বটে! তবে তাই লিখে দেব।

জ্যোতি পলায়নোদ্যতা হইল। কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "হ্যাঁ রে জ্যোতি, শোভা শ্বশুরবাড়ী গেছে?"

"এ মাসে যাবে না।"

"রূপো কোথা?"

"সে অনেক দিন হ'তে শ্বশুরবাড়ী।"

"এবার তোমাকে আমি শ্বশুরবাড়ী না পাঠিয়ে ছাড়ছি নে। তার দয়িতালয়টা তোমার অনেক দূরে হয়ে পড়ল, তাই ভাবছি।"

জ্যোতি পলাইল। লতা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বড়দা, জ্যোতিদির কোথা বিয়ে হবে?"

"তোকে তা বলব কেন?"

"বল না বড়দা।"

"আজ বলব না। পাঁজি-টাঁজি দেখে এর পরে তোমাকে জানাব।"

লতা তখন জ্যোতির অনুসরণ করিল। নরু বাপকে একা পাইয়া কহিল, "বাবা, মাকে আনতে গাড়ী পাঠাও না।"

কৃ। কেন বল্ দেখি?

ন। মায়ের জন্যে আমার মন কেমন করছে।

কৃ। তুমি কেন ঝগড়া কর?

ন। আর ঝগড়া করব না। কি জানি বাবা, কেমন রাগ হয়ে যায়; তোমার উপর ত কখন আমার রাগ হয় না—তুমি যা' কর, সব ভাল।

কৃ। আচ্ছা, তোর মাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দে।

ন। তুমি মাকে এখন আনবে না?

কৃ। না; তুমি ঝগড়া কর ব'লে এখন আনব না।

বালকের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। কিছু বলিল না বটে, কিন্তু তাহার সজল চক্ষু অনেক কথা বলিল। কৃষ্ণনাথ তখন তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "কাঁদিস নে নরু, কাল যাদের ওতরপাড়ায় যাব।"

নরু তখন হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

দ্বিতীয় পত্রখানা আসিয়াছিল, পশুপতি বাবুর নিকট হইতে। পত্রের মর্ম্ম এই যে, তিনি স্ত্রীক উত্তরপাড়ায় আসিতেছেন, তাঁহার মীরপুরের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেছেন। লতা, নরু, কৃষ্ণ সকলকেই তথায় যাইতে হইবে। অমর যদিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পত্রখানা পড়িয়া কৃষ্ণনাথের আনন্দ হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, অমরের সহিত তাঁহার শাশুড়ীর গোলমাল মিটিয়া যায়। এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে মনে করিয়া তিনি সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

৩০

পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণনাথ নরুকে লইয়া উত্তরপাড়ায় আসিলেন। স্টেশনে গেলেন—মোটরে নহে; ইচ্ছাপূর্ব্বকই মোটরে গেলেন না। বৃদ্ধ দাদুকে আগে প্রণাম করিয়া উপরে মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল। মাকে কহিল, "মা, আমরা তোমাকে নিতে এসেছি—চল।"

মায়ের বুকে অভিমান ঠেলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমি এখানে বেশ আছি—তোরা সেখানে বড় জ্বালাতন করিস।"

ছেলে। আর জ্বালাতন করব না মা, চল।

মা। না, আমি যাব না।

ছে। কেন মা?

মা। সে বাঁদরী মেয়েটার মুখ দেখতে আমার ইচ্ছে করে না। সে এসে অবধি ত আমার জ্বালা বেড়েছে।

ছেলে মায়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'কে বাঁদরী বলছ মা?"

মা। কা'কে আবার? সেই ভিখিরীটাকে। চাল নেই, চুলো নেই, খাবার সংস্থান নেই—আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

ছে। ছি, মা, এ রকম কথাগুলো বলো না; বাবা শুনলে রাগ করবেন।

মা। রাগ করলেন ত ব'য়েই গেল। আমি ত সেখানে যাব না—অপমান খেতে আর ত যাব না।

ছে। এখানেই তা হ'লে থাকবে?

মা। হ্যাঁ, তোরা চলে যা। তবে যদি—

ছে। তবে যদি কি?

মা। তবে যদি সেই ভিখিরীটাকে তোরা তাড়িয়ে দিস—

ছে। মা, আমি যাচ্ছি।

ছেলে মাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অধিকতর আগ্রহ দেখাইল না দেখিয়া ভিরণ আরও রাগিয়া গেল; কহিল, "কে তোকে আসতে বলেছিল? চ'লে যা—"

বালক কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিল না। ক্রোধ অভিমান দমন করিয়া পিতার অন্বেষণে প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ তখন পার্ব্বতীকে কহিতেছিলেন, "আপনি অত কাঁদছেন কেন? অমর আবার এখানে আসবে লিখেছে।"

হরনাথ কহিলেন, "কাঁদতে দেও কৃষ্ণ, চোখের জল মহৌষধ।"

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আপনাকে বলতে ভুলে গিছলাম—পশুপতি বাবু সস্ত্রীক এখানে আসছেন।

হর। আমার এখানে? হঠাৎ কেন?

কৃষ্ণ। নিমন্ত্রণ করতে।

হর। আমি কখন তাঁর বাড়ীতে যাই নি।

কৃষ্ণ। অমর সেখানে আসবে।

হর। তা হ'লে আমি যাব।

পার্ব্ব। আমিও যাব।

হর। বেশ, যেও।

নরু আসিয়া বাপের পিছনে দাঁড়াইল। হরনাথ দেখিলেন, বালকের মুখখানি নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ। যাহার মুখে সকল সময়ে হাসি, তাহার মুখ অন্ধকারে ভরা। হরনাথ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, দাদু?"

বালক উত্তর করিল না—অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া হরনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদুর কাছে বল ভাই।"

নরুর গণ্ড বহিয়া জল গড়াইল। কৃষ্ণনাথ বুঝিলেন, মায়ের নিকট নরু লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাঁহার মুখও অন্ধকার হইল। তিনি ধীরভাবে কহিলেন, "আমরা তবে এখন যাই!"

পার্ব্ব। এখন যাবে কি? খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিকেলে যেও।

কৃষ্ণ। আমাকে এখনই ফিরতে হবে, তাদের একলা রেখে এসেছি।

পার্ব্ব। তা হোক্, লোকজন ত আছে।

হরনাথ এ দিকে আদর করিয়া নরুর নিকট হইতে ব্যাপারটা

জানিয়া লইলেন। তাঁহার কথার উত্তরে নরু বলিয়া ফেলিল, "মা বলেছে, সেই ভিখিরী মেয়েটাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিলে তবে—"

নরু কথাটা শেষ করিতে পারিল না—কাঁদিয়া ভাসাইল। হরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিখিরী কাকে বলেছে মা? লতাকে?"

"হ্যাঁ।"

হরনাথ, নরুকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণনাথকে কহিলেন, "তোমরা এখন এস তবে।"

কৃষ্ণ সপুত্র প্রস্থান করিলেন। হরনাথ কিন্তু নড়িলেন না, একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পার্ব্বতী ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া ঝড়ের মত মেয়ের উপর পড়িলেন। উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ রে হিরণ, তুই না কি লতাকে ভিখিরীর মেয়ে বলেছিস্?"

"ভিখিরী বলিছি, ভিখিরীর মেয়ে বলি নি।"

"একই কথা। তুই তাকে সে কথা বললি কেন?"

"ভিখিরীকে ভিখিরী বলব, তাতে দোষটা কি?"

"তোমার হাতে এখন দু'পয়সা হয়েছে, তাই বুঝি এত তেজ বেড়েছে, না? জানিস্ সে কে? যার অন্ন খেয়ে তোর স্বামী আজ মানুষ হয়েছে, দু'পয়সা রোজগার করছে, এ তারই মেয়ে।"

"হ'লই বা তার মেয়ে, আমি ত আর তার অন্ন খেতে যাই নি। আমার দোরেই তার মেয়ে হাত পেতেছে।"

হরনাথ আসিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইলেন। শোভাও আসিল। হরনাথ কহিলেন, "তোমার দোর কৈ হিরণ? কাঁটা দিয়ে সে পথ বন্ধ করলে।"

হিরণ ঠিক বুঝিল না। শোভা মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মা?"

পার্ব্ব। হবে আর কি! হতভাগী মেয়ে যা মুখে এসেছে, তাই বলেছে।

শোভা। কা'কে কি বলেছে মা?

পার্ব্ব। নরুকে। বাছা আমার তায় মাকে নিতে এসেছিল। তা' হতভাগী তাকে বলে কি না, ভিখিরীর মেয়েটাকে বাড়ী হ'তে না তাড়ালে সেখানে যাব না।

শোভা। কা'কে ভিখিরীর মেয়ে বলেছে? লতাকে? হুঁ, দেখছি দিদির তেজ হয়েছে। কপাল পোড়বার আগে এই রকমই দুর্ব্বুদ্ধি হয়।

হির। (শোভার প্রতি) তুই আমাকে যা' তা' বলবি কেন রে? হরেন দু'চার দিন এয়েছিল ব'লে বুঝি তোর এত দেমাক হয়েছে?

হরনাথ। আমি জানতাম হিরণকে ঠাণ্ডা মেয়ে বলে; কখন উঁচু গলা শুনি নি, কথার অবাধ্য হতেও দেখি নি, কিন্তু এখন এ কি দেখছি!

শোভা। তুমি তোমার মেয়েকে চিনতে না বাবা, কিন্তু আমি চিনতাম। তোমার বা কেষ্টদার সামনে উনি জুজুটি, যেন চালভাজাটিও চিবুতে জানেন না। আড়ালে—

হির। দেখ্ শোভা, আমার আর রাগ বাড়াস নে—তোর ভাল হবে না বল্‌ছি।

শোভা। কি, বিষ খাওয়াবে? তা তুমি পার। আমরা রাগী হই, মন্দ হই, যা হই, কিন্তু তোমার মত খোলো কুচুটে নই। সোনার চাঁদ মেয়ে, বাপ-মা নেই, ভাই বিদেশে, তাকে তুমি বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিতে বল! তুমি কি মানুষ? তোমাকে দিদি ব'লে ডাকতে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল। পার্ব্বতী কহিলেন, "আমারও তোকে মেয়ে বলতে ঘেন্না হচ্ছে। ছি ছি! আমার গর্ভের সন্তান হয়ে তুই স্বামি-পুত্রকে এই কথা ব'লে ফিরিয়ে দিলি!"

হির। তোমার গর্ভের সন্তান হয়েই—

হর। চুপ কর হিরণ। আমি তোমার বিয়ে দিয়েছি সুপাত্রের সঙ্গে। পিতার কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছি। এখন তোমার পথ তুমি দেখে নিতে পার; আমার সঙ্গে তোমার আর সম্বন্ধ নেই। তবে যদি কৃষ্ণ কখন তোমাকে গ্রহণ করে, তা হ'লে তোমাকে আমি গৃহে স্থান দেব; নইলে, নইলে এই পর্য্যন্ত।

হির। তুমি আমাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

হর। যে মেয়ে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী নয়, সে মেয়ে আমার গৃহে স্থান পাবে না।

হির। বেশ, তবে যাচ্ছি—জন্মের মত বিদায়—

হর। তাতে আমার তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ তোমার হৃদয়ের বিকার দেখে।

হির। যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই। এখন আমারে দুষছ, কিন্তু আমার দোষ কি? দই বিগড়ে যায় কেন জান? কখন দুধের দোষে, কখন দম্বলের দোষে—দইয়ের অপরাধ কি!

বলিয়া হিরণ কক্ষত্যাগ করিল। পার্ব্বতী কহিলেন, "মেয়েটা কোথা যায় দেখি।"

"দেখতে হবে না। যদি ডুবে মরে, তাতেও আমার দুঃখ নেই। তোমার যদি আরও গাল খেতে ইচ্ছে থাকে, যাও।"

"আমি তাকে চন্দননগরে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

কর্ত্তা আর আপত্তি করিলেন না।

৩২

পার্ব্বতী কন্যাসহ চন্দননগরে আসিলেন। কন্যার সঙ্গে তাঁহার আসিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু হিরণ তখন ক্ষিপ্ত—আত্মহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই মোটরে নিজেও উঠিলেন। চন্দননগরে আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণনাথ তখনও ফিরেন নাই। জ্যোতি ও লতা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লইতে গিয়া দেখিল, তাঁহাদের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন। হিরণ বালিকাদের মুখপ্রতি চাহিয়াও দেখিল না; নিজের ঘরে গিয়া বসিল।

ক্ষণপরে কৃষ্ণনাথ নরুকে লইয়া ফিরিলেন। হিরণকে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কিন্তু পার্ব্বতীকে দেখিয়া মাত্র তিনি বুঝিলেন, হিরণ স্বেচ্ছায় স্বামিগৃহে আসে নাই। তিনি হিরণের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া কক্ষবাহিরে শাশুড়ী গৃহে আসিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন, "আমি তবে এখন যাই জ্যোতি, তুই আমার সঙ্গে চল্।" স্বল্পকালমধ্যে মায়ে-ঝিয়ে প্রস্থান করিলেন।

আকাশ ডাকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণনাথ বাহিরে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

মায়ের কাছে গেল না, লতার সঙ্গেও বাক্যালাপ করিল না। কৃষ্ণনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন; অবশেষে সঙ্কল্প স্থির করিয়া রামু প্রভৃতি কয়েক জন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, পাশের একটা ঘর পরিষ্কার করিতে। ঘর ঝাড়া হইলে কৃষ্ণনাথ হিরণের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ ঘরে শুতে ইচ্ছা কর?"

হিরণ উত্তর না করিয়া মাটী পানে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, আমাকে সেই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি যদি এ ঘরে শুতে ইচ্ছা কর, আমরা খাট-বিছানা নিয়ে ও ঘরে যাই। কোন্ ঘর তোমার পছন্দ বল?"

হির। আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।

কৃষ্ণ। যখন এসেছ, তখন ভাবতে হবে বই কি।

হির। আনতে গিছলে কেন?

কৃষ্ণ। আনতে আমি যাই নি—আমি রেলপথে গিছলাম।

হির। তবে ছেলেটা আমাকে সাধাসাধি করছিল কেন?

কৃষ্ণ। তার হৃদয় তা'কে যা' বলেছিল, সে তাই করেছে; আমি কিছু ব'লে দিই নি।

হির। তুমি কি বলতে চাও?

কৃষ্ণ। তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে থাকতে পার।

হির। ভাল।

বলিয়া হিরণ উঠিল। দ্রুতপদে গৃহ-উঠান অতিক্রম করিয়া খিড়কীতে আসিল। খিড়কীতে পাঁচিল-ঘেরা পুকুর ও বাগান ছিল। হিরণ চঞ্চলচরণে সিঁড়ি নামিতে লাগিল, কিন্তু জল স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে পড়িয়া গেল। সিঁড়ির কোণ তাহার মাথায় লাগিল। সে আর উঠিতে পারিল না—পড়িয়া রহিল।

জানালা হইতে লতা তাহা দেখিল। সে ছুটিয়া ঘাটে আসিল। দেখিল, হিরণ অচৈতন্য—মাথা দিয়া রক্ত গড়াইতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। কৃষ্ণ, নরু তাহার চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, লতা হিরণের মাথায় জল দিতেছে আর হিরণ সংজ্ঞাশূন্য। তখন তিন জনে ধরাধরি করিয়া হিরণকে ঘরে আনিলেন। যে ঘর পরিষ্কার করা হইতেছিল, সেই ঘরে শয্যা পাতিয়া হিরণকে তদুপরি শোয়াইলেন।

ডাক্তার আসিল। ঔষধাদির ব্যবস্থা হইল। দণ্ড দুই পরে হিরণের জ্ঞান হইল। চক্ষু খুলিয়া হিরণ দেখিল, লতা তাহার মাথায় মুখে পাখা করিতেছে। চক্ষু বন্ধ করিল। দুগ্ধ খাওয়াইতে বলিয়া কৃষ্ণ, নরুকে লইয়া উঠিয়া গেলেন; লতা দুগ্ধ খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হিরণ খাইল না।

"দুধ একটু খাও, বউদি।"

হিরণ দাঁত চাপিয়া রহিল।

"ওষুধ খাবে বউদি।"

হিরণ কাপড় টানিয়া মুখ ঢাকা দিল।

লতা কিছু করিতে না পারিয়া পাখা করিয়া যাইতে লাগিল। আহার করিতে দয়াময়ী ডাকিলে আহার করিয়া আসিয়া লতা আবার হিরণের পাশে বসিল। দয়াময়ী আসিয়া দুধ খাওয়াইলেন। অপরাহ্ণে দেখা গেল, হিরণের খুব জ্বর। ডাক্তার আসিল, ঔষধ আসিল। নরু পড়াশুনা করে, আর মাঝে মাঝে মায়ের কাছে ছুটিয়া যায়। পরদিন জ্বর ছাড়িল না, রোগ ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ ডাক্তার আনেন, পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া দেন, কিন্তু নিজে বড় বেশীক্ষণ রোগীর কাছে থাকেন না। নরু মাঝে মাঝে রোগীর পাশে আসিয়া বসে। লতা ঔষধ খাওয়ায়, মাথা টেপে, পায়ে হাত বুলায়। কিন্তু রোগী তাহার হাত হইতে পথ্য গ্রহণ করে না—দয়াময়ী অথবা নরু তাহাকে পথ্যাদি দেয়।

রোগীর অবস্থা ক্রমে ভালর দিকে আসিল। এক দিন প্রভাতে হিরণ নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, লতা তাহার পা টিপিয়া দিতেছে। হিরণ পা সরাইয়া লইয়া কহিল, "আর টিপতে হবে না, তুমি শোও।"

"বেলা হয়েছে বউদি, এখন শোব কেন?"

"আমাকে একটু জল দেও।"

ঘরে আর কেহ ছিল না, লতা জল দিল। তাহার হাতে সজ্ঞানে এই প্রথম জলগ্রহণ। লতার বিপুল আনন্দ।

অপরাহ্ণে জ্বর আসিল। লতা রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল। নরু স্কুলে, দয়াময়ী নিদ্রিতা। হিরণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। লতা সাধ্যমত শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কখন মাথা টিপিয়া দেয়, কখন সোডার জল দেয়, কখনও বা বাতাস করে। ছট্‌ফট্ করিতে করিতে হিরণ ডাকিল, "লতা!" এই প্রথম ডাক। লতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বউদি!"

"তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, না?"

"আমার কোন কষ্ট নেই, তোমার কষ্ট দেখে আমার যা' কিছু কষ্ট।"

"আমার কষ্ট দেখে কই আর ত কারুর দুঃখ হয় না।"

"হয় বই কি। নরু কত বলে—"

"কেউ আসে না, কেউ কিছু বলে না। তুমি যা' আমাকে দিনরাত নিয়ে প'ড়ে আছ।"

"নরুকে স্কুলে যেতে হয়, মাষ্টারের কাছে পড়তে হয়।"

"বাড়ীতে আরও ত লোক আছে।"

"পিসীমা একা, সব দিক্ তাঁকে দেখতে হয়।"

"বাড়ীতে আর লোক নেই?"

"আর কে আছে? ঝি-চাকর? তাদের আসতে বড়দা বারণ ক'রে দিয়েছেন।"

"কেন?"

"বড়দা বলেন, মেয়েদের ঘরে চাকররা যাবে কি? ঝি এক জন এসে ঘর-দোর ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। আর কারুর আসবার ত দরকার হয় না।"

বালিকা বুঝিল না, হিরণের দরকার কত বড়। যাঁহার নাম শুনিবার জন্য হিরণ ব্যাকুল, তাঁহার নাম লতা করিল না—কতকগুলি বাজে লোকের নাম করিল! হিরণ যাঁহাকে খুঁজিতেছিল, তিনি তখন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দয়াময়ীকে কহিতেছিলেন, "কোথা যাচ্ছ পিসীমা?"

"একবার বউমাকে দেখে আসি।"

"তোমাকে যেতে হবে না—লতা আছে।"

"সে ছেলেমানুষ, সব কায ঠিক ক'রে পারবে কেন?"

"বেশ পারে, তার মত তুমি পার না।"

"তবে কি আমি বোয়ের কাছে যাব না?"

"যাবে দিনে দু' একবার। ডাক্তার বলেছে রোগীর সঙ্গে একেবারে কথা কবে না, আর তাকে মাঝে মাঝে একা থাকতে দেবে।"

দয়াময়ী ফিরিয়া গেলেন। নরু স্কুল হইতে আসিয়া মায়ের ঘরের দিকে ছুটিল। পথিমধ্যে কৃষ্ণনাথ তাহাকে ধরিলেন, কহিলেন, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু তিন মিনিটের বেশী তোমার মায়ের কাছে থাকবে না। আসবার সময় লতাকে ডেকে নিয়ে আসবে। সে অনেকক্ষণ সেখানে আছে।"

হিরণ এইরূপে বড় একা হইল। পিসী কথা কহেন না, পুত্র দুই চারিটি কথা কহিয়া চলিয়া যায়। স্বামী আসেন না। কথা কহিতে বা শুনিতে লতা ছাড়া আর কেহ নাই। তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় আহার, লতা ছাড়া আর কেহ দেয় না। পিসীমাকে কিছু দিতে বলিলে তিনি বলেন, তোমাকে ছুঁলে আমাকে এখুনি চান্ করতে হবে। মলমূত্র ত্যাগের সময় লতা ছাড়া আর কেহ সাহায্য করিতে আসে না। অবলম্বন একমাত্র লতা। লতা সেবা করিতে আলস্য করে না, ঘৃণাও করে না—প্রাণ ঢালিয়া সকল কায করে।

একদা রাত্রিকালে হিরণ ডাকিল, 'লতা!' লতা একটু দূরে মেঝেতে বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। দুই চারিবার ডাকাডাকির পর লতা উঠিল। কহিল, "আমাকে ডাকছ বউদি?"

"আমাকে ধ'রে বসিয়ে দেও না।"

লতা সাহায্য করিল। একটু দূরে জলপূর্ণ একটা বালতি ছিল; তাড়াতাড়ি করিয়া তাহা আনিতে গিয়া পড়িয়া গেল। হিরণ আহা বলিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ লতা উঠিয়া যথাস্থানে বালতি আনিল। হিরণ শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া লতাকে ডাকিলেন; কহিলেন, "আমার কাছে এস, কোথা লেগেছে দেখি।"

"বেশী লাগে নি—এই কোমরটায় একটু—"

"আহা, হাড়টা ফুলে উঠেছে।"

"ও কিছু নয়, তুমি ঘুমোও।"

"তোকে কত কষ্ট দিচ্ছি, লতা।"

"আমার কোন কষ্ট নেই, আমি বেশ আছি।"

হিরণ তাহার মুখচুম্বন করিলেন; কহিলেন, "আজ হ'তে তুই আমার মেয়ে। তুই যা' আমার সেবা করছিস, এত সেবা মেয়েতেও করে না।"

দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণনাথ তাহা শুনিলেন। পতনের শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন বুঝিলেন, লতার আঘাত সামান্য, তখন তিনি রোগীর কক্ষে প্রবেশ না করিয়া নিজের শয্যায় ফিরিয়া গেলেন। অন্তরালে থাকিয়া তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বিপুল আনন্দ দান করিল। এই রকম ফলেরই আশা করিয়া তিনি লতাকে রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখনও অনেক বাকি। হিরণের মনের মলা কিসে যায়? ক্ষুদ্রত্ব কিরূপে প্রস্থত হইয়া মহত্ত্বে পরিণত হয়? কৃষ্ণনাথ অনেক চিন্তা করিলেন। অবশেষে লতাকে ডাকিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, "তোমরা সমস্ত দিন কি কর?"

"কখন গল্প করি, কখন বা চুপ ক'রে ব'সে থাকি।"

"আমি তোমাকে একখানা বই দিচ্ছি, সেইখানা প'ড়ে তোমার বউদিকে শোনাবে। ভারতবর্ষের প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাদের জীবনের কথা এই কেতাবে পাবে। কখন কখন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলবে। তোমার বউদি ইংরিজী শিখেছেন, কিন্তু ও-সব বই পড়েন নি। তোমার দাদার গল্পও মাঝে মাঝে বলবে।"

লতা বই লইয়া প্রস্থান করিল। হিরণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রামায়ণ প্রভৃতির গল্প শুনিতে লাগিল। একখানা বই শেষ হইলে লতা আর একখানা বই আনে। জ্ঞানের একটা পিপাসা আছে, তাহা মানুষকে সময় সময় উন্মত্ত করিয়া তুলে। এই পিপাসা উভয়ের জাগিল। রাত্রিতেও বিরাম নাই; আলো জ্বালিয়া এক জন পড়িতে থাকে, অপরে চক্ষু বুজিয়া শুনিতে থাকে। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ শেষ হইল, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলা ফুরাইল। গৃহে আর ভাল বই নাই, কিন্তু বই চাই। স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে বই আসিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে কৃষ্ণনাথ একবার চুণারে গিয়াছিলেন। রোগীর কক্ষে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণনাথ বিদায়কালে লতাকে কহিয়াছিলেন, "তোমার উপর তোমার বউদির ভার দিয়ে যাচ্ছি, লতি।"

ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বউদি কেমন আছেন, লতি?"

লতা কহিল, "বেশ আছেন, উঠে হেঁটে বেড়ান—"

কৃষ্ণ। তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করেছ। আমি জানি তুমি করবে; আমি তাই তোমার জন্যে একছড়া নেকলেস এনেছি। এই নেও।

লতা। এই নেও বউদি—বড়দা কি এনেছেন।

হিরণ গহনার কেস খুলিয়া সযত্নে লতার গলায় হার পরাইয়া দিলেন। লতা হাসিয়া কহিল, "এ হার তুমি আমাকে দিলে বউদি, দাদা নয়।"

সেই দিন অপরাহ্নে হিরণ তাঁহার পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া লতার জন্যে বিশ ভরির চুড়ি গড়াইতে দিলেন। কৃষ্ণনাথ আনন্দিত হইলেন; বুঝিলেন, হৃদয়ের প্রশস্তি আসিয়াছে।

সন্ধ্যার পর হিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা লতা, তোমার দাদা যখন গঙ্গা হ'তে সুকু ও তার বাপকে পিঠে ক'রে উঠিয়ে আনেন, তখন তুমি উপস্থিত ছিলে?"

"উঠিয়ে আনতে দেখি নি; তবে তাঁরা বারান্দায় যখন উঠেছেন, তখন সেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

"তার পর তোমরা কি করলে?"

"আমরা তাঁদের বিছানায় শুইয়ে সেবা করতে লাগলাম কিন্তু বড়দা গিয়ে না পড়লে আমরা বড় কিছু ক'রে উঠতে পারতাম না। বড়দার কি বুদ্ধি, কি দয়া,—"

"তুমি গোড়া হ'তে আবার সেই গল্পটা বল।"

লতা বলিল। দশ দিন বলিয়াছে, আবার আজ বলিল। সে গল্প বলা শেষ হইলে কোন্নগরে ঘোড়ার দৌরাত্ম্যের কথা জিজ্ঞাসিত হইল। কি ভাবে দাঁড়াইয়া অমরনাথ ঘোড়ার পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা হিরণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকল কথা বলা শেষ হইলে হিরণ চিন্তামগ্ন হইলেন।

নীরবে কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে লতার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "লতা, আমি কি মূর্খ ছিলাম?"

"বা রে! আজ বুঝি তুমি পণ্ডিত হয়ে গেছ?"

"হাঁ, পণ্ডিত হয়েছি, আর তুমি আমাকে পণ্ডিত করেছ। গুরু ব্যক্তিরা ব'লে থাকেন, ক্ষুদ্রকেও অগ্রাহ্য করবে না, কেন বলেন, তা তোমা হ'তে বুঝেছি।"

"ও, বউদিদি, তুমি ও রকম কথা বোলো না, আমি যে জবাব দিতে পারছি নে।"

"এ কথার জবাব নেই লতা, তুমি আমার বুকে এস।"

পরদিন প্রভাতে শয়নঘরে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া হিরণ লতাকে কহিল, "এক কায করতে পার লতি?"

"তুমি যা বলবে, তাই করব, তুমি যে আমার মায়ের মত।"

"তোর বড়দাকে একবার ডেকে আনতে পারিস্? কিন্তু বলিস নে আমি ডাকছি।"

"বড়দা যদি জিজ্ঞেস করেন, কে ডাকছে, তখন আমি কি ক'রে মিথ্যে বলব?"

"তবে থাক্।"

"না, থাকবে না বউদি, তোমার কায করতে না পারলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।"

"তবে যা' ভাল বোঝ কর।"

ক্ষণকাল চিন্তান্তে লতা কহিল, "আচ্ছা, আমি ডেকে আনছি।" বলিয়া সে উঠিল এবং বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া তাহার বড়দার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। কৃষ্ণ কহিলেন, "কেন রে, কি হয়েছে, বল্।" লতা কোন কথা কহে না, শুধু টানিতে থাকে। কৃষ্ণ কোন জবাব না পাইয়া হাসিতে লাগিলেন, অবশেষে উঠিলেন। লতা তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া হিরণের ঘরে হাজির করিল। পাছে বড়দা পলাইয়া যায়, তাই দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। কেন তাহার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন নহে। কৃষ্ণ রোগীর ঘরে বড় একটা আসিতেন না, ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যা' আসিতেন। কোন প্রয়োজনে আসিতে হইলে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিয়া কক্ষত্যাগ করিতেন। লতা এই সব দেখিয়াই দোর চাপিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণনাথ হিরণের চক্ষুতে এমন কিছু একটা দেখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার দেহে পুলকসঞ্চার করিল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। হিরণ উঠিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া স্বামীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া তাঁহার পানে করুণ-নয়নে চাহিলেন। কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "স্নান করেছ দেখছি—বেশ—গায়ে একটা জামা দেও। ঘরটা বড় ভিজে, চল ও ঘরে যাই।"

বলিয়া হিরণের হাত ধরিয়া উঠাইলেন। স্বামীর করস্পর্শে হিরণের দেহ কণ্টকিত হইল। আবেগ একটু কমিলে হিরণ অভিমানভরা কণ্ঠে কহিল, "আমি মরতে বসেছিলাম, তুমি ত আমাকে দেখ নি।"

"আমি ত তোমার দোরের পাশে সমস্ত দিন কাটাতাম, রাতে তুমি ঘুমুলে তবে শুতে যেতাম।"

সত্য! ও আমার প্রেমময়, তুমি আড়ালে থেকে এত ভালবাস! আমি না বুঝে কত অনুযোগ করেছি। হিরণ আনন্দে বিভোর হইয়া চতুর্দ্দিক আনন্দময় দেখিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পথহারা

আঁধারে আঁধারে ভ্রমিয়া শ্রান্ত প্রাণ, পথহারা নারী আমি—
আজি বাসনার বন্ধন অবসান মুক্ত দিবস যামি;
পড়ে মনে কোন আকুল মাধবী-রাতে
সীঁথির সিঁদুর মুছিনু আপন হাতে—
স্নেহ-ডোর কাটি' পাপের পশরা-ভার বহিয়া আসিনু নামি!
আঁধারে আঁধারে ভ্রমিয়া শ্রান্ত প্রাণ, পথহারা নারী আমি!

ছিল যাহা কিছু বলিতে যে আপনার ছিঁড়িয়া ফেলেছি সব—
ভুলিতে আপন গোপন বেদনা-ভার বৃথা গান, কলরব!
নিত্য নূতন আমোদে প্রমোদে মাতি'
মদিরা আবেগে বিসরিনু দুখ-রাতি!
বাঞ্ছিতা নারী-হিয়া-পঞ্জর টুটি' বাহিরায় হাহারব!
ছিল যাহা কিছু বলিতে যে আপনার ছিঁড়িয়া ফেলেছি সব!

সে কি যন্ত্রণা বলিব কেমনে আর, চোখ ফেটে আসে জল!
দহন করি' অমিয়ার পারাবার উঠিল যে হলাহল।
অতীতের স্মৃতি রহিয়া রহিয়া দহে
মরুর অনল-নিশ্বাস হৃদে বহে
জ্বালার সায়রে শয়ন রচেছি যেন দেহভারে দুরবল!
সে কি যন্ত্রণা বলিব কেমনে আর চোখ ফেটে আসে জল!

বিয়াকুল হিয়া পিয়াসায় সুগভীর কেঁদে কেঁদে সারা হায়!
আকুলি ব্যাকুলি বিগলি অশ্রুনীর নিশিদিন বহে যায়!
সহসা কাহার মধুর পরশে আজি—
ক্রন্দন মম ছন্দে উঠিল বাজি'!
রমণী-হিয়ার সুপ্ত মায়ের ব্যথা টুটিতে ফুটিতে চায়!
বিয়াকুল হিয়া পিয়াসায় সুগভীর কেঁদে কেঁদে সারা হায়!

সুখের মাঝারে পাই নাই যেই সুখ দুখেতে লভেছি আজ—
জনমে জনমে চেয়েছি যাহার মুখ পেয়েছি হিয়ার মাঝ!
বিদলিত বুকে গোপন মরম আশা,
আকুল-করা সে সরমের মূক ভাষা,
মাতৃ-গরবে পলকে পুলকি' জাগে লভিয়া নবীন সাজ—
সুখের মাঝারে পাই নাই যেই সুখ দুখেতে লভেছি আজ!

পথহারা আমি পতিতা বিশ্বমাঝ, নাই কোথা মোর ঠাঁই—
হলাহল পিয়া অমর হয়েছি আজ আর বেশি নাহি চাই!
একটি চুমায় ভুলে যাই আপনারে—
শীতল পরাণ শান্তির বারিধারে!
চাই নাকো কিছু জগত-মাঝারে যদি খোকারে বক্ষে পাই!
পথহারা আমি পতিতা বিশ্বমাঝ নাই কোথা মোর ঠাঁই!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন কীর্ত্তি-নিদর্শন

উড়িষ্যায় এবং রাঢ়ের পশ্চিমভাগে যে অনুচ্চ পর্ব্বতমালামণ্ডিত বনভূমি আছে, তাহা এক সময় ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত ছিল। উড়িষ্যাবাসীরা এই ঝাড়খণ্ডের অধিবাসিগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে; এক শ্রেণীর নাম হাটুয়া, আর এক শ্রেণীর নাম কলাপিঠিয়া। হাটুয়া বলিতে উড়িয়া গৌড়িয়া (বাঙ্গালী) সভ্য লোক বুঝায়। হাটুয়া শব্দের অর্থ বোধ হয়, যাহারা সচরাচর হাটে-বাজারে যাতায়াত করে। কলাপিঠিয়া বলিতে কোল, সাঁওতাল, ভূমিজ, ভুঁইয়া, বাথুড়ী প্রভৃতি বনভূমির আদিম অধিবাসীকে বুঝায়। কলাপিঠিয়া শব্দের অর্থ, যাহাদের গায়ের (পিঠের) রং কাল। কলাপিঠিয়াগণের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী দেখা যায়। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল জাতি এখনও নিজেদের "ঠার" (আদিম ভাষা) ছাড়ে নাই, তাহারা এক শ্রেণীর সামিল এবং ভুঁইয়া, বাথুড়ী প্রভৃতি যে সকল কলাপিঠিয়া জাতি উড়িয়া ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা অন্য শ্রেণীভুক্ত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ভুঁইয়ারাই প্রধান এবং বাথুড়ী সাঁউতী জাতি তাহাদেরই শাখা। ঝাড়খণ্ডের বা গড়জাতের করদ রাজ্যের মধ্যে ভুঁইয়াদিগের এক সময় যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন রাজ্যের রাজার অভিষেকের সময় ভুঁইয়া সর্দ্দারই কপালে তিলক দিয়া থাকে। কোন কোন রাজ্যের প্রধান দেব বা দেবীর মন্দিরে ভুঁইয়াই দেহুরী বা পূজারী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ভুঁইয়ারা কোন সাঁওতালের তুলনায় সভ্যতার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভুঁইয়ারা যদিও সময় সময় ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করে এবং কতকগুলি ইতর জাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, তথাপি ইহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংযম শিক্ষা করিতে পারে নাই। কোল সাঁওতালের তুলনায় ভুঁইয়ারা গুণের মধ্যে অর্জ্জন করিয়াছে আলস্য। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বিচার করিলে মনে হয়, বিভিন্ন জাতির মানুষ মূলে যোগ্যতার হিসাবে পরস্পরের সমান, কিন্তু সুযোগের অভাবে বর্ত্তমানে তাহারা অসমান অবস্থায় আছে, এই মতবাদ সত্য নহে।

ঝাড়খণ্ডের ভুঁইয়ার মুলুকের বিভিন্ন রাজ্যে ভুঁইয়ারা এক সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিলেও যাহাকে তাহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় মনে না করিত, এমন ব্যক্তিকে কখনও রাজপদ অধিকার করিতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কেউঞ্জরের রাজা গদাধর ভঞ্জের মৃত্যুর পরে কেউঞ্জর রাজ্যের ভুঁইয়ারা যাহাকে গদিতে বসাইতে চাহিয়াছিলেন, ইংরাজ সরকার তাঁহাকে মনোনীত না করিয়া অন্য এক জন দাবীদারকে গদি প্রদান করায় কেউঞ্জরের ভুঁইয়ারা "মেলিয়া" (বিদ্রোহী) হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ঝাড়খণ্ডের প্রবাদ এই, রাজা-নির্ব্বাচনব্যাপারে ভুঁইয়ারা এ যাবৎ স্বজাতির দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বাহিরের কোন না কোন ক্ষত্রিয় রাজবংশের বংশধরকে আনিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই প্রথার ফলে প্রাচীন কালেই ঝাড়খণ্ডে হিন্দু-সভ্যতা প্রবেশের অবকাশ পাইয়াছিল এবং উহা স্থানে স্থানে তাহার প্রাচীন কীর্ত্তির যথেষ্ট নিদর্শনও রাখিয়া গিয়াছে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে এই প্রকার কীর্ত্তির যে নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে, এই প্রস্তাবে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে যে কিছু প্রাচীন কীর্ত্তি-নিদর্শন আছে, তাহা প্রধানতঃ খিচিং নামক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লীর নাম খিচিং। এই পল্লীর উত্তরে খয়েরডাঙন নামক নদ এবং দক্ষিণে কন্টাখয়ের নামক ক্ষুদ্র নদ। খিচিংএর উপকণ্ঠে এই দুইটি নদ মিলিত হইয়া আরও ৩ মাইল দক্ষিণে বৈতরণী নদীতে পতিত হইয়াছে। খিচিংএর ভগ্নাবশেষ খয়েরডাঙনের তীর হইতে কন্টাখয়েরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে দুইটি গড়ের চিহ্ন আছে; একটিকে বলে বিরাট গড়, এবং আর একটিকে বলে কীচক গড়। গ্রামের বর্ত্তমান অধিবাসীরা বলেন, এই দুইটি গড় এবং খিচিংএর অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপ মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার কৃত। বিরাট গড়ের এবং কীচক গড়ের ভগ্নস্তূপের ভিতর কি যে লুক্কায়িত আছে, তাহা খনন না করিলে বলা যায় না। খিচিংএর জমীর উপরে এখনও যে সকল কীর্ত্তি-নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গ্রামে প্রবেশের পথে দর্শক প্রথম দেখিতে পাইবেন, কুটাই তুণ্ডী বা সর্ব্বেশ্বর শিবের মন্দির (১নং চিত্র)। এই মন্দির শিখর-যুক্ত বাস্তু-শাস্ত্রোক্ত নাগর রীতিতে নির্ম্মিত। এই রীতির মন্দির দ্রবিড় দেশের মন্দির অপেক্ষা আচারে স্বতন্ত্র। এই জন্য ফারগাসান এই রীতির নাম দিয়াছেন হিন্দু-আর্য্যরীতি।

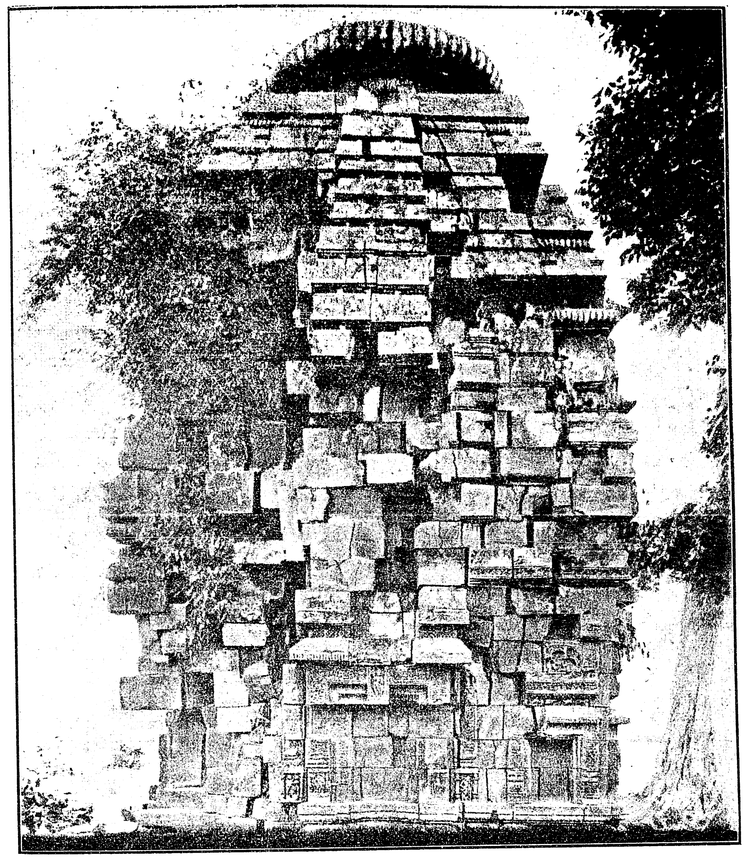

১নং চিত্র—কুটাইতুণ্ডী—খিচিং

নাগর-মন্দিরে যে অংশে উপাস্য বস্তু প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার নাম গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ। গর্ভগৃহের উপরে শুকপক্ষীর নাসার বা চঞ্চুর আকারের শিখর বা মঞ্জরী অবস্থিত। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে গর্ভগৃহের সম্মুখে মুখমণ্ডপ বা মুখশালা থাকার কথা। কুটাইতুণ্ডীর মুখমণ্ডপ নাই, মন্দিরটি এককই দণ্ডায়মান। রৌদ্র-বৃষ্টি ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য উপাসক মুখমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। মুখমণ্ডপ-বিহীন মন্দির দেখিলে মনে হয়, উপাসক নিজের সুবিধার বিষয় একবারে বিস্মৃত হইয়া উপাস্য দেবতার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুটাইতুণ্ডীর কারুকার্য্য-খচিত অনেক পাথরই খসিয়া পড়িয়াছে এবং শিখরের যতটা অংশ এখন বিদ্যমান আছে, সত্বর মেরামত না করিলে তাহাও ভূমিসাৎ হইবে। এই কারুকার্য্য উচ্চ অঙ্গের না হইলেও, এই মন্দিরের শিখরের আয়তন মাননসহি এবং বাঁক বড় সুন্দর। প্রকাণ্ডের অনুপাতে ভুবনেশ্বরের

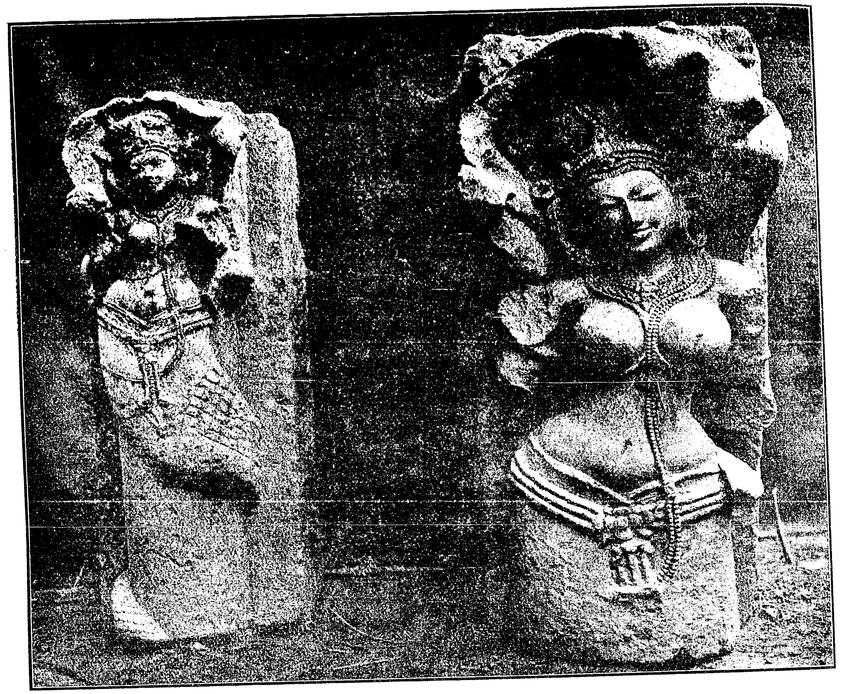

২নং চিত্র—খণ্ডিয়া দেউল—খিচিং

মুক্তেশ্বরের শিখর অনুচ্চ এবং লিঙ্গরাজের শিখর অত্যুচ্চ মনে হয়। লিঙ্গরাজের শিখরের বাঁকও সহজে লক্ষিত হয় না। কুটাইতুণ্ডী যখন পূর্ণাঙ্গ ছিল, তখন ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব চমৎকার ছিল।

কুটাইতুণ্ডীর প্রায় ৪ শত গজ পশ্চিমদিকে ঠাকুরাণীশালা বা ঠাকুরাণীর বাড়ী। এই স্থানে কতকগুলি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে এবং একটি (চন্দ্রশেখরের) মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঠাকুরাণী বা কিঞ্চকেশ্বরীর মূর্ত্তি একটি ভগ্নস্তূপের উপর ইষ্টকনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি ভগ্ন চামুণ্ডা-মূর্ত্তি কিঞ্চকেশ্বরী নামে পরিচিত। কিঞ্চকেশ্বরী চামুণ্ডা ময়ূরভঞ্জের মহারাজের কুলদেবী। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদার রাজবাড়ীতে এবং বহন্দায় কিঞ্চকেশ্বরী চামুণ্ডা প্রতিষ্ঠিত আছেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজগণের পৃষ্ঠপোষিত অষ্টাদশ শতাব্দে সম্পাদিত সনন্দে দেবী খিচিঙ্গেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, বর্ত্তমান কিঞ্চকেশ্বরী নামটি আদিম খিচিঙ্গেশ্বরী নামের অপভ্রংশ। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমি যখন খিচিং প্রথম পরিদর্শন করি, তখন কিঞ্চকেশ্বরীর ইষ্টক-মন্দিরের সম্মুখে, ভগ্নস্তূপে কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত খণ্ডিয়া দেউল নামক একটি অসম্পূর্ণ মন্দির বর্ত্তমান ছিল। ২ নং চিত্রে এই মন্দিরের সম্মুখভাগ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন সম্মুখের দিকে, তেমনই খণ্ডিয়া দেউলের অন্যান্য দিকেও দেবদেবীর এবং নাগ-নাগিনীর অনেক ভগ্নমূর্ত্তি পড়িয়াছিল। খণ্ডিয়া দেউলের

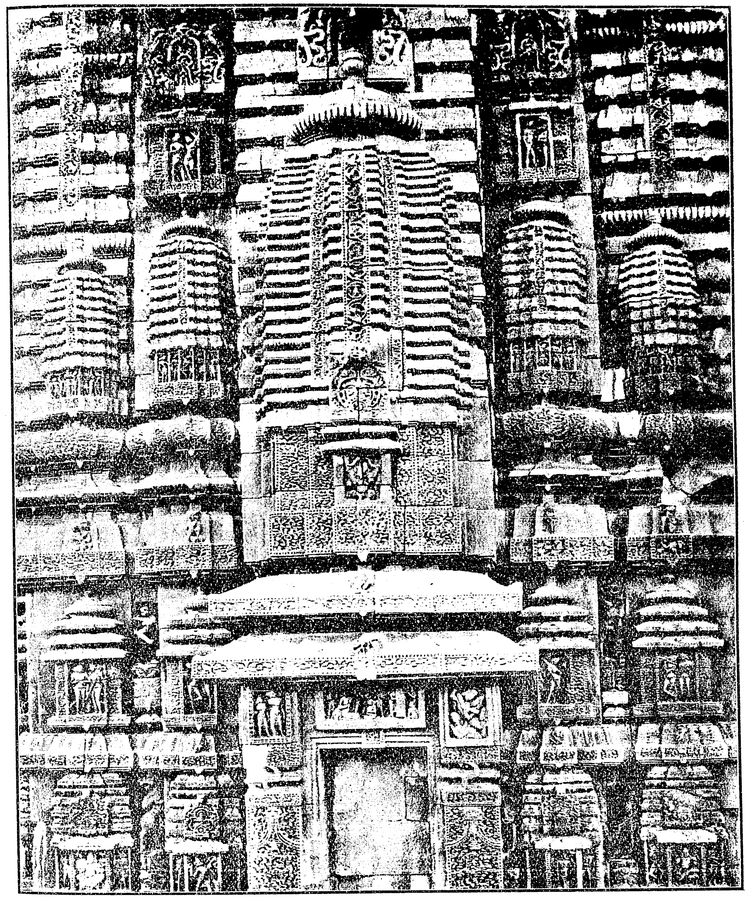

৩নং চিত্র—ভগ্নমন্দিরের প্রাচীরের পার্শ্বফলক—খিচিং

দ্বারের ঊর্দ্ধ-ফলক এবং পার্শ্ব-ফলকত্রয় আদৌ নিশ্চয়ই কোন প্রাচীন বৃহত্তর মন্দিরের দ্বারফলক ছিল। এই ফলকত্রয় মনোরম কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত। দক্ষিণদিকের পার্শ্ব-ফলকের নিম্নাংশে গঙ্গামূর্ত্তি এবং বামদিকের পার্শ্বফলকের নিম্নাংশে যমুনা-মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই দুইখানি প্রতিমার নিকট প্রণিপাত করিয়া যে উপাসক মন্দিরে প্রবেশ করিত, সে বোধ হয় মনে করিত, তাহার দেহ গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নানের পবিত্রতা ও ফললাভ করিয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমি এই ভগ্নস্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাহা সমাপ্ত করিয়াছিলাম।

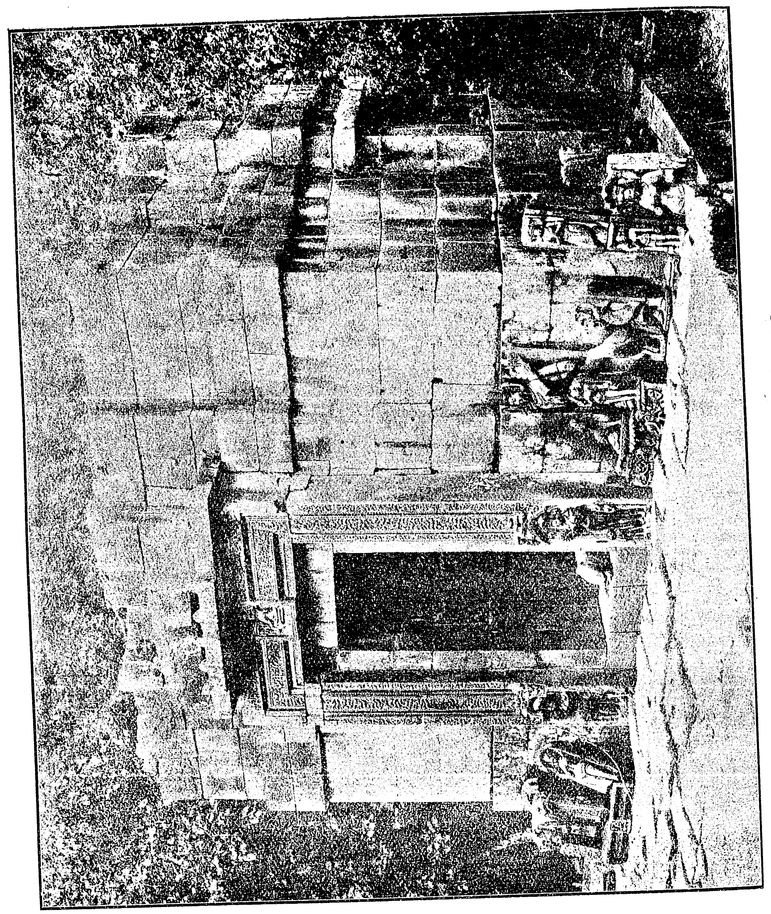

৪নং চিত্র—শিখরের কারুকার্য্য—ভুবনেশ্বর—বিন্দুসাগর



৫নং চিত্র—ব্রহ্মেশ্বর—ভুবনেশ্বর



৬নং চিত্র—শিব—খিচিং

এই ভগ্নস্তূপের গর্ভে এবং খণ্ডিয়া দেউলের প্রাচীরের ভিতর হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর পাষাণের প্রতিমা এবং কারুকার্য্য-খচিত ফলক উদ্ধৃত হইয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, এই সকল প্রতিমা এবং ফলকের দ্বারা দুইটি পাষাণের মন্দির অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই দুইটি মন্দিরের মধ্যে যেটি আয়তনে বড় ছিল, তাহাকে আমি খিচিংএর বিলুপ্ত বড় দেউল বলিব। বড় দেউলের কোন ফলকে কোন লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু খিচিংএর অন্য একটি ভগ্নস্তূপে আবিষ্কৃত একটি ভগ্ন অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমার পাদদেশে এই লিপিটি ক্ষোদিত আছে,—

"ওঁ রাজ্ঞঃ শ্রীরায়ভঞ্জস্য
লোকেশো ভগবানয়ম্।
শ্রীধরণীবরাহেণ
সহ কীর্ত্ত্যা বিনির্ম্মিতঃ॥"

ভগবান্ লোকেশের প্রতিমা এই রাজা শ্রীরায়ভঞ্জের জন্য কীর্ত্তির সহায়তায় শ্রীধরণীবরাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরের ছাঁদ অনুসারে এই লিপি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে সম্পাদিত

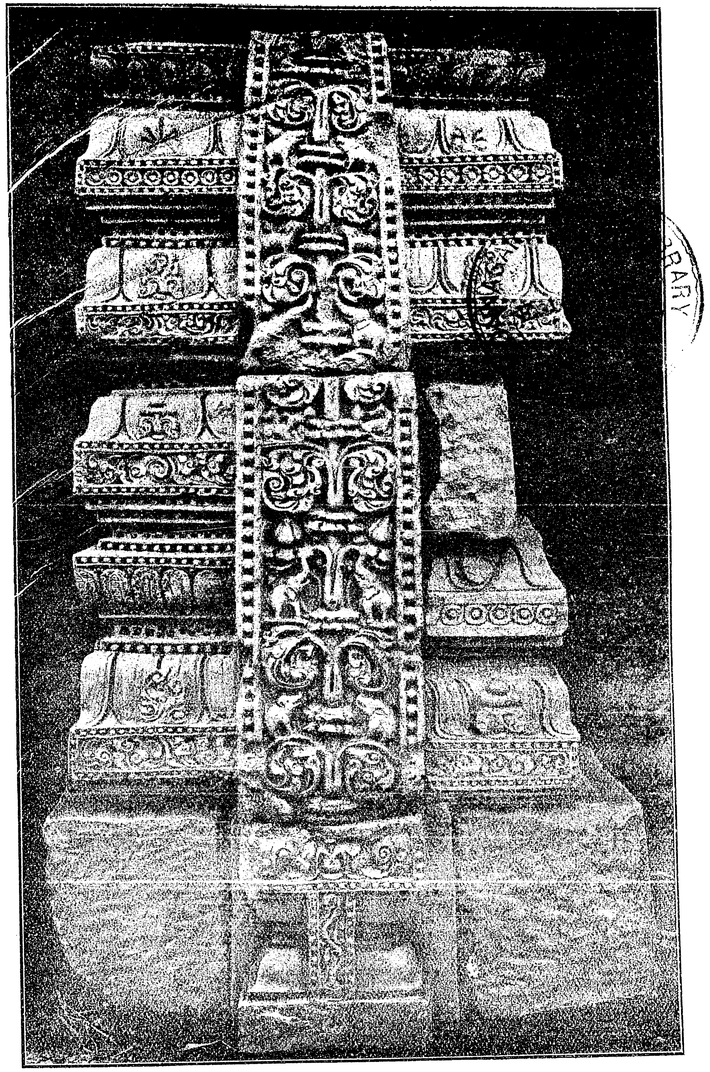

৭নং চিত্র—কার্ত্তিকেয়—লিঙ্গরাজ—ভুবনেশ্বর



৮নং চিত্র—মহিষমর্দ্দিনী—খিচিং

হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই লিপিযুক্ত প্রতিমা যে ঢঙ্গে নির্ম্মিত এবং যেরূপে অলঙ্কৃত, বড় দেউলের সংলগ্ন প্রতিমা-নিচয়েও সেই ঢঙ্গ এবং সেই রীতি দেখা যায়; সুতরাং অনুমান হয়, বড় দেউল এবং লিপিযুক্ত অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা একই যুগের সৃষ্টি। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত বামনঘাটীর এলাকায় তিনখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তিনখানির মধ্যে দুইখানির সম্পাদক রাজা রণভঞ্জ এবং একখানির সম্পাদক রণভঞ্জের পুত্র রাজা রাজভঞ্জ। এই সকল তাম্রশাসনের অক্ষরের ছাঁদ অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমার ছাঁদের অনুরূপ। সুতরাং এই তাম্রশাসনত্রয়ও খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল, মোটের উপর এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এই তাম্রশাসনত্রয়ে কথিত হইয়াছে, বীরভদ্র আদিভঞ্জ ময়ূরাণ্ড ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠ মুনি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আদিভঞ্জের বংশে রাজা কোটভঞ্জ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোটভঞ্জ



৯নং চিত্র—নাগিনীদ্বয়—খিচিং

পুত্র রাজা দিগ্‌ভঞ্জ। দিগ্‌ভঞ্জের পুত্র রাজা রণভঞ্জ। রণভঞ্জ খিজ্জিঙ্গকোট্ট (খিচিং)-নিবাসী ছিলেন এবং শৈব ছিলেন। রণভঞ্জের পুত্র রাজা রাজভঞ্জ। এই রাজভঞ্জ এবং অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমার লিপির রায়-ভঞ্জ অভিন্ন ব্যক্তি। খিচিংএর বড় দেউলে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই দেউল সম্ভবতঃ রাজা রণভঞ্জ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

খিচিংএর মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা রণভঞ্জ, রাজভঞ্জ প্রভৃতি প্রাচীন ভঞ্জরাজগণ স্থানীয় কিংবা কোনও বিদেশ হইতে আগত, এই বিষয়ে শিল্পরীতি হইতে কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। খিচিংএর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের মধ্যে বেণু সাগর ভিন্ন আর কোথাও প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন দেখা যায় না। বেণু সাগরের তীরে যে সকল মূর্ত্তি ও মন্দিরের চিহ্ন আছে, তাহা খিচিংএর মন্দিরাদির মত অতটা প্রাচীন নহে। খিচিংএর শিল্প স্থানীয় প্রাচীনতর শিল্পের পরিণতির ফল নহে, আগন্তুক বস্তু; সুতরাং আগন্তুকগণের কীর্ত্তি। এই আগন্তুকগণ কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন? ৩নং চিত্রে খিচিংএর বড় দেউলের ক্ষোদিত ফলকের এবং ৪নং চিত্রে দেউলের শিখরের কারুকার্য্যের মধ্যে উড়িষ্যার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। নমুনা-স্বরূপ ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের কতকাংশ ৫নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উভয় মন্দিরের শৈলবিন্যাস-রীতি এবং লতাকর্ম্ম প্রায় এক প্রকার, যেন একই শিল্পশিক্ষালয়ে শিক্ষিত শিল্পীর হাতের কায। সুতরাং অনুমান হয়, যে সকল কারিগর বড় দেউল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে আনীত। খিচিংএর প্রাচীন মন্দিরাদির নিদর্শন দেখিলে মনে হয়, উড়িষ্যা হইতে কোনও অসমসাহসিক কৃতী ব্যক্তি আসিয়া এই বনভূমিতে এক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যা হইতে কারিগর আনাইয়া নব একাম্রকানন (ভুবনেশ্বর) প্রতিষ্ঠার

উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু খিচিংএর প্রাচীন মন্দিরের অলঙ্কারপদ্ধতি উড়িষ্যার অনুরূপ হইলেও মূর্ত্তির গড়ন-রীতি অন্য প্রকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৬নং চিত্রে খিচিংএর শিবমূর্ত্তির সহিত ৭নং চিত্রে প্রদর্শিত ভুবনেশ্বরের লিঙ্গ-রাজ মন্দিরের বাহিরের একটি নিসার (niche) বা প্রকোষ্ঠের কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তির তুলনা করা যাইতে পারে। শিবমূর্ত্তির দাঁড়াইবার ভঙ্গী স্বাভাবিক, কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তির ভঙ্গী অস্বাভাবিক, যেন ছাঁচে ঢালা। খিচিংএর মূর্ত্তির মুখাকৃতি মানানসহী; কার্ত্তিকেয়ের মুখ-খানি অধিক প্রশস্ত এবং চিবুক কতকটা সঙ্কীর্ণ। খিচিংএর মূর্ত্তির উপরার্দ্ধ যেরূপ যত্নের সহিত গড়া হই-য়াছে, নিম্নার্দ্ধে ততটা যত্নের চিহ্ন দেখা যায় না। উভয় মূর্ত্তির চালচিত্রের ভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভুবনেশ্বরের মন্দিরনিচয়ে মুঙ্গনি পাথরের যত মূর্ত্তি আছে, তাহা এই কার্ত্তিকেয়ের ঢঙ্গে গঠিত। পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য প্রদেশে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে গঠিত মূর্ত্তির সহিত খিচিংএর তুলনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য প্রদেশের মূর্ত্তিতে কারখানার ছাঁচের প্রভাব যত প্রবল, খিংচিংএর মূর্ত্তিতে ছাঁচের প্রভাব তত প্রবল নহে। খিচিংএ শিল্পী কারখানা-নমুনার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তেমনই স্বাভাবিক মনুষ্যাকৃতি এবং মনুষ্যদেহের ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া-ছিলেন। খিচিংএর শিল্প-বিদ্যালয়ের ধরণীবরাহ এবং কীর্ত্তি এই দুই জন ভাস্করের নাম আমরা জানি। ইঁহারা বা ইঁহাদের ওস্তাদ বোধ হয় উড়িষ্যা ছাড়া অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রণভঞ্জ বা আর যে কোন প্রাচীন ভঞ্জ রাজা এই শ্রেণীর ভাস্কর আনয়ন করিয়া প্রতিমা গড়িতে প্রথম নিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনিও বোধ হয়, উড়িষ্যা ব্যতীত আর কোন সভ্যদেশ হইতে আসিয়া প্রাচীন ভঞ্জরাজ্য এবং খিচ্জিঙ্গকোট্ট (খিচিং) প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শিল্পরীতির সূত্র ধরিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা সুকঠিন। * শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (এম্-এ)।

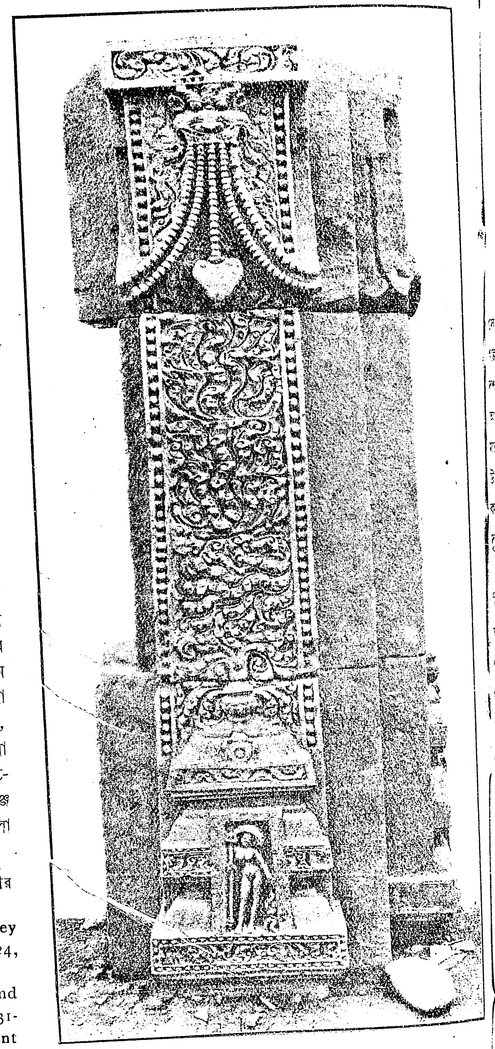

১০নং চিত্র—বীণাবাদিনী নাগিনী—খিচিং

* খিচিংএর বিস্তৃত বিবরণ এবং প্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রমাণের ঠিকানার জন্য এই সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—

Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1922-23, pp. 124-128 Ibid, 1923-24, pp 85-87; Ibid. 1924-25, pp.

এই প্রবন্ধের অনেক কথা Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol xiii (pp. 131-136)এ প্রকাশিত লেখকের Notes on the Ancient Monuments of Mayurbhanj প্রবন্ধে বিনিবদ্ধ হইয়াছে।

মেঘ-মুক্তি



ঊষার কথা

১

সে দিন ষ্টীমার হইতে নামিয়া ইডেন উদ্যানে কিছুক্ষণ বসিয়া গল্প করার পর যখন বাড়ী ফেরা হইল, তখন প্রায় রাত্রি দশটা। অজিত বাবু আজ প্রায় সর্ব্বক্ষণ নীরবেই ছিলেন। আমাদিগকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি প্রতিদিনের মত সকলের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আজ আমাদের উষার মনে কি যে ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, আমরা কেহ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। শুধু চকিতের মত একটি নীরব দৃষ্টিতেই সে দিনকার বিদায়-সম্ভাষণ শেষ হইল।

আহারের পর বিছানায় শয়নের ইচ্ছা হইল না। আলোটা নিভাইয়া দিয়া জানালার কাছে আসিয়া বসিলাম। জ্যোৎস্নার আলোকে ঘর পরিপূর্ণ। আশ-পাশের বাড়ী-ঘরগুলি যেন জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রামগ্ন। আজ শুধু সন্ধ্যাবেলার কথাই মনে পড়িতেছিল। এ কি অপূর্ব্ব অনুভূতি! এ কি বিচিত্র আত্মপ্রকাশ! কথাটা স্পষ্ট করিয়া নিজের মনে মনে ভাবি-তেও আমার সাহস হইতেছিল না! নিশীথ-দার কথা উপলক্ষ করিয়া তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই ত সব—তার আমার মুখের উপর তাঁহার সেই গভীর বিহ্বল দৃষ্টি! তবে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সমস্ত শরীরে মনে এ কি পুলকের বন্যা বহিতেছে! কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে ধীরে ধীরে তীব্র লজ্জা ও ধিক্কার জাগিয়া উঠিল। আমি না অপরের বাগ্‌দত্তা? এ ভাবে অন্য পুরুষের ভালবাসা গ্রহণ করিবার আমার কোন অধিকার আছে কি? দূরে—সাগরপারে একটি সরল বিশ্বস্ত হৃদয় অনুক্ষণ আমার কথা ভাবিয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসি-বার প্রতীক্ষাতেই দিন গণিতেছে না? আর আমি কি না তাঁহাকে ভুলিয়া, তাঁহার চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া, এত অল্পদিনে, এত সহজেই—লজ্জায় ঘৃণায় মরিতে ইচ্ছা হইল।

সাগরপারে অবস্থিত মোহিত বাবুর মুখ যেন মানস-পটে আঁকিয়া বল-সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে গেলাম। অবাধ্য মন কিন্তু কোনমতেই সাড়া দিল না। শুধু একই চিন্তা—

না, এ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া বাক্স হইতে তাঁহার চিঠিগুলি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম। দেড় বৎসর ধরিয়া প্রতি মেলে লিখিত এক তাড়া চিঠি! সেই সব চিঠিতে তাঁহার প্রবাসী হৃদয়ের কত অশ্রু, কত হাসি, কত ভালবাসার উচ্ছ্বাস! বিনিদ্র নয়নে সারারাত্রি ধরিয়া পত্রগুলি পড়িতে পড়িতে উদ্বেল হৃদয় যেন কতকটা শান্ত হইল। পত্ররাশির মধ্যে কখন্ শ্রান্ত মস্তক নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, মনে নাই।

পরদিন প্রভাতে আমার কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। অজিত বাবুর সঙ্গে পরিচিত বন্ধুর মতই শুধু ব্যবহার করিব; তাহার অধিক অগ্রসর হইব না। বরং সম্ভবমত তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেই হইবে। আমার নিজের জীবনের পথ যখন নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন যত অন্তরে থাকা যায়, উভয়ের পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের পর আমি যথাসাধ্য এই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি, মধ্যে কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এ দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহা তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য করি নাই বলিয়া এখন অনুতাপ হইতে লাগিল।

সমস্ত দিন নানা ভাবে নানা রকম চেষ্টা করিয়া আমার এ গাম্ভীর্য্য ও প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিবার জন্য সজাগ ছিলাম। কোন একটা কাযের ভার হাতে থাকিলে মন অনেক পরিমাণে স্থির থাকিতে পারে, সেই জন্য সুবিধামত একটা কাযে নিজেকে নিযুক্ত রাখিব, ইহাও সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল। কিন্তু তবু যত সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই মন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সে দিন আমার ওস্তাদ আসিবার

দিন। ওস্তাদকে একটা শুভগ্রহ ভাবিয়া আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই সে ঘরে গিয়া সুরযন্ত্রের কাছে বসিলাম।

ওস্তাদ আসিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া আমার নিয়মিত শিক্ষার কায চলিতে লাগিল। তার পর যখন গান অভ্যাস করিতে করিতে আর সব কথা মন হইতে সরিয়া গিয়াছে—তখন সহসা সিঁড়ির কাছে তাঁহার পরিচিত পায়ের শব্দ শুনিয়া আমি ফিরিয়া চাহিলাম। "এ কি! আজ এখনই চ'লে যাচ্ছেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম। তাঁহার সমস্ত শরীর টলিতেছিল কেন? রক্তহীন ঘোর বিবর্ণ মুখ! আমি সভয়ে বলিলাম, "আপনার কিছু অসুখ কচ্ছে না কি?"

তিনি একবার দাঁড়াইলেন। বোধ হইল, কিছু বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তার পরই আমায় একটা নমস্কার করিয়া টলিতে টলিতে চলিয়া গেলেন!

এ কি ব্যাপার? কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না! মনটা কেমন গোলমাল হইয়া গেল! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে দিনকার মত ওস্তাদকে বিদায় দিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বসিবার ঘরে দিদি একলা ছিল। তাহাকেও যেন বড় বিষণ্ণ—বড় কাতর বলিয়া মনে হইল। আমি কি বলিব, কি করিব ভাবিতেছি, সেই সময় নরেশ-দা আসিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা দু'জনে যে? অজিত বাবু কোথায়?"

দিদি বলিল, "তিনি চ'লে গেছেন। তাঁর শরীর হঠাৎ কেমন খারাপ মনে হ'ল—তাই তিনি আর তোমার জন্য অপেক্ষা করতে না পেরে—"

নরেশ-দা দিদির মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "চ'লে গেছেন? কিন্তু এই ত আমি যাবার আগেও তাঁকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখে গিয়েছিলুম—এর মধ্যে এমন কি অসুখ হ'ল যে, তখনই চ'লে গেলেন?"

দিদি নতমুখে বলিল, "তা ত কিছুই ব'লে যান নি।"

উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। কি ভাবিয়া তাঁহারা সে প্রসঙ্গে আলোচনা বন্ধ করিলেন, বুঝিলাম না। আমার খালি মনে হইতে লাগিল, কি যেন একটা অঘটন ঘটিয়াছে! সামান্য কিছু হইলে এমন কাণ্ড ঘটিত না।

সে দিন সবই কেমন গোলমাল হইয়া গেল। আমাদের তিন জনের মধ্যে কোন কথা—কোন আলাপই জমিল না। বিশেষ দিদি যেন অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এমনভাবে থাকিয়া আমরা নীরবে রাত্রির আহার সারিয়া যে যাহার ঘরে গেলাম।

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ও উদ্বেগে আমি যেন অন্তরে হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম। অথচ কি যে অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা অনুমানও করিতে পারিতেছিলাম না। মনটা স্থির করিবার জন্য গত রাত্রির অপঠিত চিঠিগুলি আবার পড়িতে বসিলাম; কিন্তু আজ আর সে সব কথার কোন অর্থবোধই হইল না। যেন শুধু কতকগুলি অর্থহীন হিজিবিজি লেখা মাত্র।

সে রাত্রি এই রকম অশান্তি ও উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটিয়া গেল, পরের দিনটাও সেই ভাব। দিদি সর্ব্বক্ষণ নিস্তব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া তাহার নিজের ঘরে কাটাইয়া দিল। নরেশ-দা লাইব্রেরী-ঘরেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি শূন্যমনে এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বই-পত্র নাড়াচাড়া করিয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিলাম।

মনে মনে আশা ছিল যে, চায়ের সময় তিনি নিশ্চয় আসিবেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইবার পর হইতে ঝড়, জল, বৃষ্টি কোন কারণেই তাঁহার নিয়মিত সময়ে উপস্থিতির এক দিনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কাল ও-রকম ভাবে শীঘ্র চলিয়া যাওয়ার জন্য আজ হয় ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই আসিতে পারেন। এই রকম একটা আশা হয় ত দিদি এবং নরেশ বাবুরও মনে জাগিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের মত আমরা বসিবার ঘরে সমবেত হইয়াছিলাম। চা-পানের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অজিত বাবু আসিলেন না। আরও কিছুক্ষণ ব্যর্থ প্রতীক্ষায় চলিয়া গেল। শেষে যখন সাতটা বাজিয়া গেল, তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "তিনি ত কৈ আজও এলেন না, দিদি! কি হলো?"

দিদি তখন ঘড়ীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তিনি হয় ত আর কোন দিনই আস্‌বেন না, ঊষা! আমি কালই বুঝেছিলুম।"

আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। দিদি তখন নরেশ-দার দিকে চাহিয়া বলিল, "কাল তোমাদের বালিগঞ্জে যাবার আগে অমিয়া মোহিতের নাম ক'রে ঊষার সম্বন্ধে ঠাট্টা করেছিল, মনে আছে ত? সে কথাটা শুনে পর্য্যন্ত তিনি এমন—"

দিদি কথাটা শেষ না করিয়াই থামিল। মোহিত বাবুর নাম শুনিয়াই আমার দৃষ্টি নত হইয়া গেল! সেই মুহূর্ত্তেই চকিতের মত এতক্ষণের সব সংশয় তিরোহিত হইয়া ব্যাপারটা আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

দিদি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তাঁর উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য দেখে শেষটা আমায় সব কথা ভেঙ্গে বলতেই হ'ল! এ কথাও বল্লুম যে, এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও হাত নেই, বাবা এ বিষয় স্থির ক'রে রেখে গেছেন। তিনি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তার পর কোন কথা না ব'লে শুধু বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। তাঁর পক্ষে এটা যে কি অপ্রত্যাশিত মর্ম্মান্তিক আঘাত—তা আমি তখনই বুঝেছিলুম। তখনই আমার মনে হ'ল যে, হয় ত তিনি আর এখানে আসবেন না।"

কিছুক্ষণ সবই চুপচাপ—নরেশ-দা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

দিদির চোখের পাতা বোধ হয় আর্দ্র হইয়াছিল। সে রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল, "তবু সমস্তক্ষণ একটা ক্ষীণ আশা জাগ্‌ছিল যে, হয় ত আজ সন্ধ্যার সময় এক বার আসতেও পারেন—এত দিনের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, এ কি এক কথায় ভাঙ্গতে পারে? তিনি মন থেকে সত্য সত্যই আমাদের সকলকে ভালবেসেছিলেন, এত সহজে কখনও একবারে ছাড়তে পারবেন না। কিন্তু এখন দেখছি—আমার কালকের অনুমান সত্যই হ'ল, আমাদের কাছে আর তিনি আসবেন না।"

নরেশ-দা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নাঃ! এ কখনও হতেই পারে না! মোহিতের কথায় তার আঘাত লাগতে পারে, তা ব'লে আমাদের যে ছাড়তে হবে, এমন কি কথা আছে? তোমরা বসো, আমি এখনই গিয়ে তাকে ধ'রে আনছি, আমাদের বন্ধুত্বের কি কিছু দাবী নেই?"

তিনি তখনই চলিয়া গেলেন। দিদি এক বার সে দিকে চাহিয়া বলিল, "উনি নিজে যাচ্ছেন, হয় ত ওঁর কথা মুখের উপর একবারে অস্বীকার করতে তিনি পারবেন না। এক বার হয় ত আসতেও পারেন; কিন্তু ঊষা! আমাদের সকলেরই এটা বড় অন্যায় হয়ে গেছে! এত দিন আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তার মাঝে মাঝে মোহিতের কথাটা তাঁকে বলা আমাদের উচিত ছিল। প্রথম আলাপেই সে কথা জানতে পারলে আজ তাঁর এত বড় আঘাত লাগত না।"

আমি কোন কথা বলিলাম না।

প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে নরেশ-দা একা ফিরিয়া আসিলেন। আমরা উভয়েই উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। দেখিলাম, তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখেও বিষাদ ও উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

খানিক বাদে আমাদের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "অজিত বাবুর মাথাটা একেবারে গোলমাল হয়ে গেছে! তাঁকে কোথাও পেলুম না। বেহারা বল্লে, বাবু কাল অনেক রাতে এসে রাতভোর ছাতের উপরই পায়চারী ক'রে কাটিয়েছিলেন। আজ সকালে তিনি কলকাতা ছেড়ে বাইরে চ'লে গেছেন। কোথায় গেছেন, কবে ফিরবেন, কিছুই ব'লে যাননি!"

স্পন্দনহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। নরেশ-দা নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, "যে ডিস্পেন্সারীতে বসতেন, সেখানেও গিয়েছিলুম, তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারাও বল্লে, কোন খবর জানে না। কারুকে কোন কথা ব'লে যাননি। এমন কাণ্ড হলো যে, কোনখান থেকে তাঁর যে কোন খবর আমরা পাবো, এমন উপায় রইলো না!"

দিদি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। আমি অনেকক্ষণ বসিবার পর শেষে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলাম।

সে রাত্রিতে আমি কোন কথা ভাবিতে বা বিশেষ কোন যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলাম না। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি কি আজ স্পন্দনরহিত হইয়া গিয়াছে? জানালার ধারে খাটের উপরে নীরবে বসিলাম। আমাদের বাড়ীর ও প্রতিবাসীদিগের গৃহের কলরব, জিনিষ-পত্র ধোয়া-মোছার ধ্বনি, দরজা-জানালা বন্ধ করার শব্দ ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিল। পথচারীদিগের চলাচলও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ—সুপ্তিমগ্ন। আমি শুধু নীরবে বসিয়া আছি।

পাশের ঘরের ঘড়ীতে বারোটা—একটা—দুটো—তিনটে বাজিয়া গেল, শরীর যেন তখন আরও অবসন্ন। মাথার ভিতর কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। চাঁদের আলো ক্রমশঃ দৃষ্টিপথে অস্পষ্ট—নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। তার পর—আর কিছু মনে পড়ে না।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ঊষার প্রথম রক্তিম আভায় পূর্ব্বদিক্ রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। ভোরের শীতল

বাতাসের স্পর্শে ছাতের ফুলগাছগুলি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ মনে হইল—কি একটা দুঃসহ বেদনার গুরুভার যেন বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে!

ছাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম! তখন ধীরে ধীরে এই দুই-দিনের সকল ঘটনা আমার মনে পড়িয়া গেল! না, আর তিনি কোন দিন আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিবেন না! আমি এক দিন তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে চিরদিনের মত তাঁহার সংস্রব হইতে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন। আমার সম্মান, আমার ন্যায়, নীতি সবই বজায় থাকিল—ইহজীবনে আর কখনও তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইবার আশা রহিল না!

তখন আমার সমস্ত সঙ্কল্প, কর্ত্তব্যজ্ঞান—সবই কোথায় ভাসিয়া গেল! মোহিত-দার কোন কথা আর আমার মনে রহিল না। আমার সমস্ত চিত্ত—সমস্ত চিন্তা পূর্ণ করিয়া সে দিনের সেই ব্যথাহত বিবর্ণ মুখের ছবি জাগিয়া উঠিল।

দুই মাস পূর্ব্বে এক দিন অতর্কিতভাবে যে দিন তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেই দিনের কথা আজ মনে পড়িল। মেডিকেল জর্ণালে প্রতি মাসে তাঁহার নানা তথ্যপূর্ণ যে সব প্রবন্ধ বাহির হইত, নরেশ-দা অত্যন্ত আগ্রহে সে সব পড়িতেন। আমাদিগকেও কত দিন পড়িয়া শুনাইয়া বলিতেন, "এই তরুণ ডাক্তারটি, অন্য যে সব ডাক্তার গতানুগতিকভাবে পাঠ্য বিষয় চর্চ্চা ক'রে ব্যবসায়ে নেমে যান, তার পর এ সব বিষয়ে আরও যে সব জ্ঞাতব্য বস্তু আছে, তার দিকে আর মনোযোগ রাখেন না, ইনি সে দলের নন। এঁর জ্ঞান-পিপাসা ও অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি গভীর, এঁর নিজের বিষয়ে অগাধ জ্ঞান-লাভ করবার ইচ্ছা ও সে বিষয়ে গবেষণা করবার শক্তিও প্রবল—এ সব দুরূহ বিষয় যথাসম্ভব সহজ ও সরল ক'রে গুছিয়ে বলবার মত ভাষা ও বর্ণনা করবার ভঙ্গীও বড় মনোরম। আমার এঁর উপর বড় শ্রদ্ধা হচ্ছে, সুবিধা পেলেই এক দিন নিজে গিয়ে এঁর সঙ্গে আমি আলাপ ক'রে আসবো।"

বাড়ীতে প্রায়ই এ রকম কথা হইত বলিয়া তাঁহার নাম আমাদের কাছে খুব পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই যে দিন ইনষ্টিটিউটে নরেশ-দা আমাদিগকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন, সে দিন বেশ একটু আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হইতে তখনই দৃষ্টি ফিরাইতে পারি নাই। জ্ঞান ও প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল অপূর্ব্ব সুন্দর মুখশ্রী! আমি এক মুহূর্ত্ত অপলক-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিলাম। তিনিও অবাক্ হইয়া আমায় দেখিতেছিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টির ভিতর বিস্ময়, লজ্জা ও আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নরেশ-দা তাঁহাকে আমাদের বাড়ী আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি সে রাত্রিতে মনে মনে একটা নূতন ভার লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম।

সে রাত্রিতে শয়নঘরে অনেকক্ষণ বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মুখে আমার রূপের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া কথাটা এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আমি নিজে কোন দিন ও-বিষয়ে মনোযোগ দিবার কোন প্রয়োজন মনে করি নাই। আজ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের রূপ নূতন করিয়া দেখিয়া নিজেই আনন্দিত হইলাম।

পরদিন বৈকালে তিনি আমাদের বাড়ী আসিলেন। দিদি সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। আমি কিন্তু দিদির মত সহজভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না। শুধু নমস্কার করিয়া নীরবে রহিলাম।

তাঁহাদের সব কথাবার্ত্তা ও আলাপের মধ্যে তাঁহার সকল আগ্রহ ও মনোযোগ যে আমারই উপর রহিয়াছে, ইহা আমি তাঁহার দিকে না চাহিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তার পর যখন তিনি নরেশ-দার কথার উত্তরে বেদগান সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন, তখন সেখানে বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমি চায়ের উল্লেখ করিয়া সেখান হইতে পলাইয়া আসিলাম।

বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাসে ও লজ্জায় আমার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কেন যে মনের এই ভাব কেন যে কাল হইতে আমার এমন সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চিরদিনই তরুণ পুরুষের মুখে আমার রূপের, আমার গানের কত প্রশংসা শুনিয়াছি, তাহাতে কোন দিন ত এমন ভাব হয় নাই। আমি জানিতাম, সে সব আমার প্রাপ্য—পাওয়া উচিত বলিয়াই পাই—তবে আজ?

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া গেলাম। স্থির করিলাম, আমিও আর সকলের মত পরিচিত বন্ধুর হিসাবে তাঁহার সঙ্গে সহজ ভাবে আলাপ করিব। অনেক চেষ্টায় দুই একটা কথা বলিয়াও ফেলিলাম। আমায় এত সহজে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তার পর হইতে আমার সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্কোচ ও লজ্জা অনেকটা কাটিয়া গেল।

তিনি চলিয়া যাইবার পর সে রাত্রিতে দিদি বলিল, "অজিত বাবুকে আমার বড় ভাল লেগে গেছে! যেমন সুন্দর শ্রী, তেমনই ভদ্র ও শিক্ষিত। আর মনটি যেন শিশুর মত স্বচ্ছ ও সরল। আমাদের ভাই নেই, তাঁকে দেখে পর্য্যন্ত খালি মনে হচ্ছে, যদি ছোট ভাইটির মত তাঁকে কাছে পেতুম!"

নরেশ-দা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞজনোচিত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার অভিজ্ঞতা ও মানব-চরিত্র-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে কতটা প্রখর, সেটা এখন হৃদয়ঙ্গম হয়েছে ত? এ রক্তিকে নয়নগোচর করবার পূর্ব্বে শুধু তাঁর রচনামাত্র দেখে যে সব ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলুম, তখনকার কথাগুলো স্মরণ ক'রে দেখ এবং মিলিয়ে দেখে নিয়ে অবহিতচিত্তে আমার গুণ-কীর্ত্তনে রত হও। কি বলব যে, সে সময় নিতান্ত একটা মোহের বশে অনায়াসলভ্য হয়ে পড়েছিলুম, তাই এতটা গুণ চেনায়—"

দিদি তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আবার? সর্ব্বক্ষণ নিজের গুণের কথা নিয়েই বিভোর! তোমার ও-সব বাজে কথা রাখ! অজিত বাবুকে রোজ বিকেলে এখানে আসবার কথা তোমায় ভাল ক'রে ব'লে ব্যবস্থা করতে হবে।"

নরেশ-দা বাধা দিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন; বলিলেন, "সে ভারটা আমার চেয়ে উষার উপর দাও না? তাতে ফল ভাল হবে। কাল থেকে সে বেচারার অবস্থাটা দেখছো ত? আজ ত বেদগানের কথায় একবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।"

দিদি মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিল; বলিল, "তাঁর মনে ত কপটতা কিছু নেই? তোমাদের মত এত কথার মার-প্যাঁচ—এত রেখে ঢেকে ভব্যতা বাঁচিয়ে কথা বলার নিয়ম উনি ত জানেন না—যা ভাল লেগেছিল, প্রাণ খুলে সহজ ভাষায় ব'লে ফেললেন, তাতে আর হয়েছে কি?"

নরেশ-দা মুখটা খুব চিন্তাগ্রস্তের মত করিয়া বলিলেন, "নাঃ, ভয়নি কিছু, তবে দেখো, শেষটা যেন তাল সামলাতে বিব্রত হ'তে না হয়।"

অজিত বাবু প্রতিদিনই নিয়মিত ভাবে আসিতে লাগিলেন। যতই তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, ততই আমরা সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে লাগিলাম। ইহাতে অবশ্য আর কাহারও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না, কিন্তু মুস্কিল বাধিল নিজেকে লইয়া।

প্রথম দিন হইতেই তিনি আমার দিকে একটু বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি ঘরে উপস্থিত না থাকিলে তিনি কেমন যেন উন্মনা ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। আমার সঙ্গে কথা বলিতে কিংবা আমার গান শুনিতে তাঁহার মনে যেন কত আগ্রহ, কত ঔৎসুক্য ছিল, অথচ তিনি নিজে কোন দিন মুখ ফুটিয়া আমায় কোন কথা বলিতে বা গান শুনাইতে অনুরোধ করিতে পারিতেন না। আমাকে কাছে আসিতে দেখিলেই তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তাঁহার মন ছিল এত পবিত্র ও সরল যে, তিনি তাঁহার এ ভাব গোপন রাখিবার কোন চেষ্টা করিতে জানিতেন না। আমি বুঝিয়াছিলাম, আমার সান্নিধ্য, আমার সঙ্গ-সুখটুকু পাইয়াই বোধ হয় তিনি সুখী হইতেন। আমায় দেখিলেই তাঁহার চোখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহা যেমন নির্ম্মল, তেমনই পবিত্র।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সেই দৃষ্টির স্পর্শে দিনে দিনে আমার মন যেন নব নব ভাবে পূর্ণ হইয়া—নবীন উচ্ছ্বাসে চঞ্চল ও আকুল হইয়া উঠিতেছিল। সূর্য্যোদয়ের প্রথম রশ্মি-সম্পাতে মুদিত কমলকোরক যেমন তাহার মুকুলিত দলগুলি একে একে খুলিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনই তাঁহার সেই গভীর দৃষ্টির সংস্পর্শে আমার এত দিনের সুপ্ত যৌবন—সুপ্ত নারীত্ব—যেন স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

আমার জীবনে প্রেমের এই প্রথম অনুভূতি! শুনিয়াছি, মানুষের জীবনে এ অনুভূতি না কি বড় সুখের—বড় আনন্দের! কিন্তু আমি আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া চমকিত ও ভীত হইয়া উঠিলাম! আনন্দের পরিবর্ত্তে তীব্র বেদনায় মন মুহ্যমান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখনই আমার মনে হইল, তাঁহার এ ভালবাসা গ্রহণ করিবার বা তাঁহাকে ভালবাসিবার অধিকার আমার নাই। বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই আমার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। তখন নিজেকে বড় অসহায়—বড় দুঃখী বলিয়া মনে হইল। কিন্তু উপায় কি?

আমি তখন প্রাণপণে নিজের মনোভাব দমন করিয়া তাঁহার সঙ্গে একটা স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। সাধ্যমত বাড়ীতে আমি কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম মুখে আনিতাম না। সন্ধ্যার সময় সকলের মধ্যে আমি উপস্থিত থাকিলেও কথা-বার্ত্তা সামান্যই বলিতাম। ব্যবহারে, আলাপে, আলোচনায় সর্ব্বদাই আমি আপনাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিলাম।

কিছু দিন এইরূপেই চলিল। তার পরে অমিয়া-দি আসিল। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল বাতাসের মত সে আসিয়াই দুই দিনের মধ্যে আমাদের উভয়ের মনের গতির পরিচয় বোধ হয় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তার পর উঠিতে বসিতে তাহার উপহাস-বিদ্রূপের কশাঘাতে অস্থির হইয়া উঠিলাম।

সে নিজে এক দণ্ড স্থির থাকিতে পারিত না। যখন যেখানে থাকিত, সকলের মনই গানে গল্পে হাসি-তামাসায় উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। আমাদের এই ছোট সভাটিও সে তাহার প্রাণের ও স্ফূর্ত্তির প্রাচুর্য্যে উচ্ছ্বসিত ও মুখর করিয়া তুলিল! ফলে, অজিত বাবুর কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ আরও অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। নরেশ-দা আরও বেশী বাঙ্ময় হইয়া উঠিলেন ও সেই অনুপাতে কি জানি কেন, দিদি যেন একটু নীরব ও গম্ভীর হইয়া গেল! অবশ্য অমিয়া-দির উচ্ছ্বসিত গান-গল্পের মধ্যে দিদির এ সামান্য ভাবান্তর বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল না। অমিয়া-দি কিন্তু আমার অটল গাম্ভীর্য্য তার সব শক্তি প্রয়োগ করিয়াও টলাইতে পারিল না। সে দুষ্টামী করিয়া যতই অজিত বাবুর প্রসঙ্গ আমার কাছে তুলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার কথা শুনিতে চাহিত, আমি ততই একবারে নীরব হইয়া থাকিতাম। সে মাঝে মাঝে দিদিকে বলিত, "মোহিত বাবুর অবস্থাটা কি হবে, সেটা ভেবে দেখছো কি, মনীষা-দি ?"

দিদি হাসিয়া বলিত, "কেন—কি আবার হবে ?"

অমিয়া-দি বলিত, "হবে চমৎকার! অজিত বাবু ত উষার ভাবে তন্ময়। উষাও অবশ্য তাই, কিন্তু ও ত আর স্পষ্ট কিছু বলতে পারে না ? এটা যে ওর পূর্ব্বরাগের অবস্থা! যা-ই বল বাপু! অবস্থাটা লোভনীয় বটে! প্রাণ এদিকে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য উন্মুখ, আকুল—আবার ভয়—পাছে সে কিছু বুঝে ফেলে, পাছে সে কিছু মনে করে। তাই সদাই সাবধান! আহা! ব্যাপারটা কি চমৎকার! উষার ভাবটা দেখছো না ?—

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাবে এও কি প্রেম জানে ?
আমি ত এর পানে চাহিনি !

উষা সর্ব্বদা দেখায়, যেন অজিত বাবুর সম্বন্ধে ওর কোন আগ্রহই নেই !"

দিদি বলিত, "কেন ওকে রাত-দিন জ্বালাস্ বল্ ত ? তোর কি আর কোন কথা নেই ?"

আমি বলিতাম, "অমিয়া-দি নিজের কথায় নিজেই ধরা প'ড়ে যাচ্ছে! আজকালকার নতুন কথা এই যে, যার মনে যে ভাব প্রবল হয়ে ওঠে, সে যদি লজ্জা বা আর কোন কারণে সেটা নিজে প্রকাশ করতে না পারে, তবে অপরের নামেই তাকে সে কথা চালাতে হয় !"

অমিয়া-দি বলিত, "তা হয় ত হ'তে পারে, কিন্তু আমার যে দিন সত্যই ও-অবস্থাটা আসবে, আমি সে দিন কিন্তু লজ্জা ক'রে ব্যাপারটা লুকোতে চেষ্টা করবো না! সে দিন তোদের সকলের কাছে গান গেয়ে গেয়ে ব'লে যাব—

'আমার প্রাণের পরে চ'লে গেল কে—
বসন্তের বাতাসটুকুর মত !'

তোর মত অত নিয়ম-কানুন বজায় রেখে পূর্ব্বরাগের অভিনয় করা আমার ধাতে পোষাবে না, ভাই! আমার সব খোলাখুলি ব্যবস্থা !"

দিদি বলিত, "থাম্! থাম্! আর বাজে বকুনি বকতে হবে না! আমি বলে ভেবে ভেবে মরছি, উপরি উপরি দুটো মেল ফাঁক গেল, মোহিতের কোন চিঠি-পত্র এলো না, কেমন আছে, কে জানে !"

অগত্যা তখন অমিয়া-দি একটু ক্ষান্ত দিত। এক দিন আমার ওস্তাদ আসিয়াছে। আমি এ-ঘরে বসিয়া গান অভ্যাস করিতেছি। আর সকলে বসিবার ঘরে গল্প করিতেছেন। ওস্তাদ চলিয়া গেলেই আমি ও-ঘরে যাইতেই অমিয়া-দি বলিল, "বাক্! এতক্ষণে বাঁচা গেল! উষার গান শেষ হয়ে এইবার তবু অজিত বাবুর কথা গল্প সবই জমে উঠবে। এতক্ষণ ত কিছুতেই ওঁর মন লাগছিল না। কেবল উষার করছিলেন।"

অজিত বাবু একবার আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসি বলিলেন, "আপনি যদি এখান থেকে উঠে যেতেন, তবে

দেবী! তা হ'লে দেখতেন, আমি আরও বেশী চঞ্চল হয়ে উঠতুম! আমাদের পাঁচ জনকে নিয়ে ছোট সভাটি জমাট হয়ে ওঠে, এ থেকে এক জনকেও বাদ দেওয়া চলে না! তা হ'লে যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে !"

অমিয়া-দি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল; বলিল, "বাঃ! বাঃ! দেখছেন নরেশ বাবু! আপনার বন্ধুর উপস্থিতবুদ্ধি ও বাক্-চাতুর্য্য কেমন দিন দিন বেড়ে উঠছে! আগে ত একটা কথা বলতে হ'লে লজ্জায় কুণ্ঠায় বিব্রত হয়ে উঠতেন! হঠাৎ এত উন্নতির কারণটা কি ?"

নরেশ-দা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কারণ—তোমার সঙ্গ-মাহাত্ম্য! তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে ? এক দিন তুমি ওঁকে অরসিক ব'লে ত্যাগ করতে চেয়েছিলে, তাই এখন দিনি সুবিধা পেলেই ওঁর রসবোধের প্রমাণ দেবার জন্য বাগ্র হয়ে ওঠেন! কিন্তু অমিয়া! তুমি ত কথায় কথায় আর সকলকে ঠাট্টা ক'রে অস্থির ক'রে তোল—তোমার নিজের যে দিন ও-অবস্থাটা হবে, সে দিনকার কথা ভেবে দেখেছ কি ?"

অমিয়া-দি খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "ভাবি নি আবার ? খুব ভাবি! কারণ, বেশী দিন ওটা টেনে চলা পোষায় না! একবার সুরু করা গিয়েছিল, তা দিন পোনেরর বেশী যায় পেরে উঠলুম না! কাযেই ঐ অল্পসময়ের মধ্যেই সেটাগুলো সেরে ফেলে, মূল ব্যাপারটাই সাঙ্গ ক'রে দেওয়া গেল! শুনবেন, কি হয়েছিল ?"

সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অমিয়া-দি বলিল, "কলেজের মেয়েদের মধ্যে একবার এ ব্যাপারটা যেন সংক্রামক রোগ হয়ে দাঁড়াল। তিন চারটি বন্ধুর ক্রমে ক্রমে একই দশা দেখে দেখে তখন আমিও অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। এটা যে কি জিনিষ, একবার নেড়ে চেড়ে দেখতে বড়ই সাধ হলো। সুবিধাও হয়ে গেল তখনই। বাবার জনকয়েক জুনিয়ার বারিষ্টারের মধ্যে এক জন আমার গান শুনে একটু বেশী রকম, তখন যাতায়াত করছিলেন। তাঁর সঙ্গেই একটু বেশী মিশতে আরম্ভ করলুম। জমীদারের ছেলে, বেশ সুন্দর চেহারা, খুব ভদ্র ও শিক্ষিত লোকটি। ভেবে দেখলুম, যখন একটা ব্যাপার করেই তোলা যাচ্ছে, তখন একবারে গোড়া থেকে শাস্ত্রসঙ্গত ভাবে করাই ভাল, কাযেই প্রথম দু' দিন পূর্ব্বেকার অবস্থায় সুর ধরলুম—'কি হ'ল আমার, বুঝি বা যদি হৃদয় আমার হারিয়েছি !' ও তার সঙ্গেই—

'আজি শরত তপনে—প্রভাত-স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায় !'

ভদ্রলোক খুব খুসী! তিনি চমৎকার ক্লারিওনেট্ বাজাতে পারতেন, দু' তিন দিন তাঁর বাঁশী শোনালেন। আমিও যথারীতি তখন প্রথম পরিচয় হবার ভাবে গান গাইতুম—

'আমি কারেও চিনিনে, শুধু চিনেছি তোমারে !'

কিছু দিন এই রকম চল্লো, তার পর এলো একটা আশা-প্রতীক্ষার পালা। সে পালাটায় যদিও তাঁর কোন দোষ ছিল না, কারণ, তাঁর আসবার সময় ছিল বেলা পাঁচটা এবং কোন দিনই তার একটুও ব্যতিক্রম হ'তো না, কিন্তু আমি বেলা তিনটে থেকেই সাজগোজ ক'রে চঞ্চল ও অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম, আর কখনো বেহাগে—

'ওগো, শোন কে বাজায়!
বনফুলের মালার গন্ধ, বাঁশীর তানে মিশে যায় !'

আবার কখনও ঘড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে—

'ওই বাঁশীস্বর তার, আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসে না !
এই হৃদয়-আসন, শূন্য প'ড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা !'

এই সব গান গেয়ে গেয়ে বাড়ী-শুদ্ধ সকলকে জ্বালিয়ে তুললুম! মাঝে একটু সংশয়ের ভাব এসেছিল। সে সময় প্রায়ই তিনি এলে একটা মর্ম্মদাহী করুণস্বরে গাইতুম—

'ভালবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন, তবে কেন—
মিছে ভালবাসা ?
মিছে মায়া মোহ, মোহ-মরীচিকা, তবে কেন
তবে কেন, মিছে এ দুরাশা !'

এই রকম ক'রে দিন দশ বারো কেটে গেল। তখন বড় বিরক্তি ধরতে লাগলো! আর কাঁহাতক্ পারা যায় বলুন ? কিন্তু তখনই ত ছেড়ে দিতে পারি না ? তা হ'লে রসভঙ্গ হয়ে যায়! কাযেই ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত টানতে হ'ল এবং এক দিন সন্ধ্যার সময় চাঁদের আলোয় ইমন-কল্যাণে গান ধরলুম—

'ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি !
রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি !'

গানটা সে দিন জমেছিল! ব্যস্! তার পরদিন থেকে সব খতম্!"

অমিয়া-দির ভালবাসার গল্প শেষ হইল! আমরা সকলেই খুব হাসিলাম। নরেশ-দা বলিলেন,"তুমি কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, অমিয়া! প্রাণ ব'লে কোন একটা জিনিষ তোমার মধ্যে নেই, একবারে পাষাণ! যা হোক্, সে ভদ্রলোকটির তার পরে কি হ'ল?"

অমিয়া-দি হাসিতে লাগিল, বলিল, "কি আর হবে? আমিও সেই ইমন-কল্যাণের পর থেকে একবারে ডুব! বেলা তিনটের সময় বাড়ী থেকে বেরোই, আর রাত নটা বাজলে বাড়ী ঢুকি! সে বেচারার রোজই এসে হতাশ অবস্থা! শেষ এক দিন বেলা তিনটের আগেই এসে সে ভদ্রলোক আমায় ধ'রে ফেললেন এবং সবিনয়ে জানালেন যে, তাঁর কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমার প্রসন্নতা লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন, এখন তাঁর অজানিত কোন্ দোষে সেটা হারালেন?"

"আমি তখন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছি! তবু সামলে নিয়ে খুব সপ্রতিভভাবে তাঁকে জানালুম যে, দোষ তাঁর কিছুই হয় নি। তবে সম্প্রতি একটা বিশেষ প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকায় আমি এখন অবসর নিয়েছি। তিনি ভাল বুঝলেন না, খানিক অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে শুনেছি, তাঁর বন্ধুবর্গের কাছে তিনি বলেছেন যে, আমার মাথায় কিছু ছিট আছে। যাক্, তিনিও শেষ পর্য্যন্ত বেশ ভালই রইলেন এবং বেশ ভাল যায়গায় তাঁর বিয়েও হয়ে গেছে, উপন্যাসে বর্ণিত ভগ্নহৃদয় নায়কের মত হার্টফেল কর্‌বার কোন লক্ষণই তাঁর মধ্যে প্রকাশ হয়নি।"

অমিয়া-দির এই সব বাজে বকুনি ও গল্প আরম্ভ হইলে দিদি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধমক দিত ও তাহাকে আরও একটু সংযতভাবে রাখিবার চেষ্টা করিত। আমিও কত দিন তাহাকে এ জন্য কত বকিয়াছি, সে কিন্তু এ সব মোটেই গ্রাহ্য করিত না। নিজের কথায় নিজের গল্পে নিজেই অস্থির! অজিত বাবু তাহার এই চঞ্চল আনন্দময় স্বভাব দেখিয়া খুব খুসী হইয়া উঠিতেন। তাহার গল্প শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অস্থির হইতেন, কিন্তু সব চেয়ে তাহাকে বেশী ভাল লাগিয়াছিল—নরেশ-দার। তিনি ওকে সত্যই ভালবাসিতেন। কথায় কথায় তাহার সেই উচ্ছ্বসিত হাসি-গান তাঁহার বড় ভাল লাগিত। দিদি যখন তাহার অসংযত কথার মধ্যে তাহাকে ধমক দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিত, তখন নরেশ-দা বলিতেন, "আহা! ও যা বল্‌তে চায়, তাই বল্‌তে দাও না, মনীষা। ওকে ধমকানি দিয়ে দমিয়ে দিও না। দেখছ ত, ও নিজে যেন অফুরন্ত আনন্দের খনি—ও কি তোমাদের বাঁধাধরা অত নিয়মকানুন মেনে চল্‌তে পারে? ওকে বাধা দিলে ওর অন্তরের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের ভাব নষ্ট হয়ে যাবে!"

কাযেই অমিয়া-দির এ সব কাণ্ড বাধা না পাইয়া আরও পূর্ণমাত্রায় উদ্দাম হইয়া উঠিত। আমরা যখন উপস্থিত থাকিতাম না, তখনও সে মাঝে মাঝে নরেশ-দার ঘরে গিয়া খুব বাচালতা প্রকাশ করিত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

সহিষ্ণু

নীরবে সহিব তোমার তাড়না,
নীরবে ফেলিব নয়নের জল,
নীরবে বহিব হৃদয়-বেদনা,
শত আঘাতেও রব অবিচল।

শুকাবে এ অশ্রু তপ্ত সাহারায়,
বরিব মরণে, কিবা ভয় তায়?
সাগরের বুকে বুদ্বুদের প্রায়,
বাঁচি কিম্বা মরি কিবা আসে যায়?

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুন্দরবন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কঙ্কণদীঘি

১১৬ নম্বর লাটের পশ্চিম পার্শ্বে পূর্ব্বোল্লিখিত রায়দীঘির গাংএর উপর ২৬ নম্বর লাট কঙ্কণদীঘি অবস্থিত। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় ১৷৷০ ক্রোশ যাইলে জটার দেউলে পৌঁছান যায়। আজিও এই লাটের দক্ষিণাংশপ্রদেশ অরণ্যাবৃত হইয়া আছে, হাসিল হয় নাই। ইহার উত্তরাংশে রায়দীঘি গাংএর অনতিদূরে তিনটি জঙ্গলাবৃত বড় বড় ইষ্টকস্তূপ আছে। স্থানীয় লোকের নিকট উহারা গজগিরীর বাটী, দিঘিথানার বাটী ও শ্বেতরাজার বাটী নামে পরিচিত। এই স্তূপগুলির ইষ্টকের সহিত জটার দেউলের ইষ্টকের যেরূপ সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানও ৮৯ শতাব্দী পূর্ব্বে কোন জনগণের হর্ম্ম্যাবলীতে পরিশোভিত ছিল। ইহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানও প্রাচীন ইষ্টক-সমাকীর্ণ। অনেক অংশ খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তথায় বহুসংখ্যক গৃহের ভিত্তি শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত আছে। ঐরূপ বহু ভিত্তির উপর তথাকার লোক গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা ব্যতীত এখায় বহুসংখ্যক বড় বড় মজা পুষ্করিণী, একটি পোস্তা-বাঁধা পুষ্করিণী ও অনেকগুলি কাল প্রস্তরের থাম, চৌঠা ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটি নবগ্রহ প্রস্তর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুমূর্ত্তিটি ৪ ফুট উচ্চ এবং বহু অলঙ্কারে ভূষিত। উহার অন্যতর দক্ষিণ হস্তে পদ্ম। অন্যতর বাম হস্তে শঙ্খ। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণপার্শ্বস্থ লক্ষ্মীচনা বা স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গাদেবীর মস্তকে ও বাম হস্ত বামপার্শ্বস্থ লম্বোদরের মস্তকোপরি ন্যস্ত। হেমাদ্রি-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর অনুসারে উহার নাম বাসুদেব এবং উহার বামপার্শ্বস্থ লম্বোদর আর কেহ নহেন, স্বয়ং চক্র। নবগ্রহ প্রস্তরটি উচ্চতায় ১ ফুট ৭½ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে ৩ ফুট ৩½ ইঞ্চি। উহার চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার কারুকার্য্য ক্ষোদিত। ঐ সকল কারুকার্য্যের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে ১৭টি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর নয়টি গ্রহ দাঁড়াইয়া আছে। বামদিকে রবির পার্শ্বে গ্রহগণের ন্যায় দণ্ডায়মান একটি সুন্দর গণেশমূর্ত্তি। ইহার দক্ষিণহস্তে দাঁড়াল ও বামহস্তে সারঙ্গের ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র।



জলঘাটাগ্রামে পুষ্করিণী খননকালে প্রাপ্ত গরুড়মূর্ত্তি

প্রস্তরখানির পাদপীঠের উপর কারুকার্য্যের মধ্যে ও তন্নিম্নে উক্ত দেবতাগণের বিভিন্ন প্রকার বাহনের উনিশটি মূর্ত্তি। প্রাচীন স্থাপত্যাদির নিদর্শন হইতে বুঝা যায় যে, এইরূপ নবগ্রহমূর্ত্তি প্রস্তরখণ্ডে ক্ষোদিত করিয়া পূর্ব্বকালে মন্দির ও তৎসংলগ্ন মণ্ডপাদির প্রবেশদ্বারের সরদালরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালে এই লাটের পশ্চিম সীমায় পূর্ব্বোক্ত রায়দীঘির গাং নামে যে নদী প্রবাহিত আছে, উহার মধ্য হইতেও ভগ্ন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষের বহু নিদর্শন বাহির হইয়াছে এবং এখনও উহার পূর্ব্বতীরে নানা স্থানে প্রাচীন ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে। এই গাং হইতে একটি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছিল। ইহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পুরাতন মানচিত্রাদি দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। বছরদ্দী মীর নামক এক জন এক শত পাঁচ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের নিকট হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহা খালের ন্যায় খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল। বর্ত্তমান কালের মত প্রশস্ত ও উহার স্রোত এত প্রবল ছিল না। এই লাটের উত্তরদিকে যে সকল স্থানে লোকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাকার ভূমি উহার পার্শ্বস্থ জটা প্রভৃতি লাটের ভূমি অপেক্ষা উচ্চ ও পুরাতন। তজ্জন্য এখানে যে সকল পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে সেগুলির জল সুস্বাদু, লোণা নহে। আমরা সুন্দরবনমধ্যে এই লাটেই আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ ও বাঁশের ঝাড় দেখিয়াছি। পূর্ব্বদিকে শ্বেতরাজার খাল নামে একটি মিঠাজলের খাল আছে। প্রবাদ, উহাও অরণ্যমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাসাসখালী, বুড়ীরতট, পাথরপ্রতিমা, নামখানা ও নারায়ণীতলা

কঙ্কণদীঘি হইতে পূর্ব্বোক্ত রায়দীঘির গাং দিয়া দক্ষিণে যাইতে হইলে ছাট্টিয়ানদী ও সরাল গাং নামে দুইটি বড় নদী অতিক্রম করিতে হয়। উক্ত সরাল গাংএর পশ্চিমে ১১৪ নম্বর লাট অবস্থিত। এই লাটের অষ্টম খণ্ডে কয়েকটি বড় বড় কাল প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলি

তথায়ই রক্ষিত আছে। নানা কারণে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা ঐ মূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাই নাই। এই স্থানের ৫।৬ ক্রোশ দক্ষিণে F প্লট অবস্থিত। এখানে রাসাসখালী নামক স্থানে প্রায় ২০।২১ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া একটি প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ দাঁড়াইয়া আছে। উহার উচ্চতা এখানে ১৯।২০ ফুট হইবে। ইহার উপরে উঠিলে প্রাচীন গৃহের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোক ইহাকে গড়বাড়ী বলে। ইহার চতুর্দ্দিক খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তথায় প্রায় ১ শত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অসংখ্য ইষ্টকরাশি শ্রেণীবদ্ধভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া আছে। উহা দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে উক্ত সমগ্র স্থানটির উপর অনেকগুলি অট্টালিকা ছিল। F প্লটএর সকল স্থান এখনও হাসিল হয় নাই। আজিও প্রায়ই উক্ত গড়বাড়ীর সন্নিকটে রাজব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দেখা যায়। ইহার পশ্চিমে পাথরপ্রতিমার আবাদ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব পার্শ্বে বুড়ীরতট। এই দুইটি আবাদেও কয়েকটি মন্দিরের ও গৃহের ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি কাল প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যেও একটি ছোট জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটির মস্তক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গত বৎসর বন্দোবস্ত কার্য্যোপলক্ষে সাব ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় এখানে আসিয়া উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত বুড়ীরতট আবাদের ভূমিও কঙ্কণদীঘির ন্যায় উচ্চ ও পুরাতন। সে কারণ সেখানে নানা প্রকার ফলের গাছ জন্মিয়া থাকে।

এই সকল আবাদের পশ্চিমদিকে শতমুখী নদী প্রবাহিত। এই নদী পার হইলে D প্লট বা নামখানা আবাদে আসা যায়। এখানেও প্রাচীন গৃহের ও মন্দিরের অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে চন্দনপিঁড়ি নামক স্থানে অরণ্যমধ্যে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দনপিঁড়ির দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে নারায়ণীতলা দ্বীপ অবস্থিত। ছোট লাট সার এণ্ডরু ফ্রেজার কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিবৃন্দের জন্য সমুদ্রোপকূলে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হাসিল করাইয়াছিলেন। এই সময় এখানেও প্রাচীন মনুষ্যাবাসের কতকগুলি নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ইহার দক্ষিণে Henrys ও Frederik দ্বীপের গভীর অরণ্যমধ্যেও কয়েকটি ভগ্ন মন্দির, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও স্থানে স্থানে পাকা রাস্তার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, এখনও এই প্রদেশের নানা অংশ অরণ্যাবৃত হইয়া আছে। ঐ সকল স্থান হাসিল হইলে ঐরূপ আরও অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সাগরদ্বীপ ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমতীর্থ

নারায়ণীতলার পশ্চিমে C ও A. B প্লট অরণ্যাবৃত হইয়া আছে। উহাদের পশ্চিমে মড়ীগঙ্গা বা বারাতলা নদী প্রবাহিত। এই নদী পার হইলে সাগরদ্বীপে উপনীত হওয়া যায়। ইহা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন সাগরথানার অন্তর্গত। এই সাগরথানার সংপ্রতি সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহা কুলপী থানার অধীন ছিল। ইহাই এতদঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপ। বর্ত্তমান সময় ইহার পরিমাণ প্রায় ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮ শত বিঘা। ডি, ব্যারোর মানচিত্রে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ইহা ৪।৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত ছিল। রেনেলের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার ঐরূপ আকার ছিল। উহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইহার মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলি ক্রমশঃ মজিয়া গিয়া ইহা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানে ইহার উত্তরে ঘোড়ামারা ও লোহাচোরা নামে দুইটি দ্বীপ আছে। পূর্ব্বে ঐ দ্বীপ দুইটিরও অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহার উত্তরাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া ঐ দ্বীপ দুইটির ও উহাদের মধ্যে ও দক্ষিণে প্রবাহিত লোহাচোরা ও ঘোড়ামারা গাংএর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে যে উত্তুঙ্গ বাতীঘর আছে, তাহা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে এই স্থানের হাসিল কার্য্য আরম্ভ হইলেও, ঝটিকা ও জলপ্লাবনের অত্যাচারে আজিও ইহার সকল স্থান হাসিল হইয়া উঠে নাই। যে সকল অংশ হাসিল হইয়াছে, তন্মধ্যে বামুনখালী, মন্দিরতলা ও মনসাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি প্রাচীন গৃহের ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, প্রাচীনকালে এই দ্বীপে বহু লোকের বসতি ছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ জলপ্লাবন হয়, তাহাতেই ইহার উক্ত প্রাচীন লোকালয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায় এবং প্রায় ৬০ হাজার লোক দিগ্বিদিকে ভাসিয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (১) বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অরণ্য হাসিলকালে ইহার নানা অংশে বহুসংখ্যক মজা পুষ্করিণী, গৃহের, মন্দিরের ও ঘাটের ধ্বংসাবশেষ ও কাল প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

Hedgesএর ডায়েরী পাঠে জানা যায় যে, তিনি ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দেও তথায় গিয়া বহু মন্দির দেখিয়াছিলেন। (২) পুরাতন Calcutta Review পত্রিকায় দেখা যায় যে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেও তথায় ঐ সকল প্রাচীন মনুষ্যাবাসের বহু নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। (৩) প্রসিদ্ধ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমতীর্থ এ স্থানে ইহার দক্ষিণে ধবলাট নামক স্থানের পশ্চিমদিকে একটি নদীর মোহনায় অবস্থিত। প্রবাদানুসারে এই নদী ভাগীরথীর মূল প্রবাহের অংশ। ইহার কথা ইতঃপূর্ব্বে ভাগীরথী নদীর আদি প্রবাহ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বৈদেশিক নাবিকগণ পূর্ব্বে ইহাকে Pagoda creek বলিত। ইদানীং যে স্থানে মেলা হইতেছে

(১) Imperial Gazeteer. Vol. XII. Page 16[illegible]

(২) "We went in our Budgeros to see Y[illegible] Pagodas at Sagore" (Hedges)

(৩) "In the island of Sagore which lies upon the extreme edge of the Deltaic basin, consequently lying higher than the centre of the Delta, the remains of tanks, temples and roads are still to be seen, showing that it was once densely populated. Calcutta Review. 185[illegible] The Gangetic Delta.

প্রাচীনকালে উহার দক্ষিণাংশে মেলা হইত। বর্ত্তমান সময় উক্ত স্থানের অস্তিত্বই নাই। উহা উক্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান মেলাস্থানের দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্যে এক বিস্তৃত চর দেখা যাইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে, এই নিমজ্জিত চরই পূর্ব্বোক্ত সাগরদ্বীপের অংশ। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে সেখানে ২।৩টি মন্দির, বাঁধাঘাট সমেত পুষ্করিণী, বিল্ব ও নারিকেল প্রভৃতি ফলের বাগান ছিল। Wilson লিখিয়াছেন যে, তখন তথায় একটি উত্তুঙ্গ মন্দিরের সম্মুখে এক বটবৃক্ষের নিম্নে প্রস্তরের রাম ও হনুমানের দুইটি মূর্ত্তি ও উক্ত মন্দিরমধ্যে ৭।৮ ফুট উচ্চ একটি কপিল মুনির মূর্ত্তি ছিল। ঐ মন্দিরটির পশ্চাতে সীতাকুণ্ড নামে একটি ছোট জলাশয় ছিল, উহার জল বারমাসই সমান থাকিত, কখনও কমিত না। তীর্থযাত্রিগণ কপিল মুনি দর্শন করিয়া উহার জল পান করিত। (১) কপিল মুনির উক্ত প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তি সাগরদ্বীপের পূর্ব্বোক্ত অংশের সহিত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইবার পর ইদানীং একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর নূতন এক কপিল মুনির মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে। উহা এক্ষণে বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় রক্ষিত হয় এবং গঙ্গাসাগর মেলার কিছু দিন পূর্ব্বে সাগরদ্বীপে নীত হইয়া থাকে। (২) প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নানযাত্রা উপলক্ষে এই মেলা হয়। ইহাতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং ভারতবর্ষের নানা অংশ হইতে, এমন কি, সুদূর পঞ্জাব ও কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি দেশ হইতেও বহু তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে। অধুনা প্রতি বৎসরই প্রায় ৪০ বিঘা ভূমির জঙ্গল কাটাইয়া এই মেলাস্থান প্রস্তুত করা হয়। মেলার পরে আবার জঙ্গলে স্থানটি পূর্ণ হইয়া যায়। মেলার পূর্ব্বে উক্ত মেলাস্থানে ২৪ পরগণা জেলাবোর্ড সারি সারি বহুসংখ্যক হোগলার কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। যাত্রীরা ও দোকানীরা ভাড়া দিয়া ঐ সকল কুটীরেই আশ্রয় গ্রহণ করে। এই গঙ্গাসাগর-সঙ্গমতীর্থ বহু প্রাচীন। রামায়ণে ইহার উৎপত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে, ত্রেতাযুগে এই স্থানে সগর রাজার সন্তানগণ মহর্ষি কপিলের শাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের উদ্ধারের জন্য পরবর্ত্তী কালে সগররাজের অধস্তন বংশধর দিলীপের পুত্র ভগীরথ সাধন বলে গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করেন। গঙ্গা ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভস্মীভূত সগরতনয়গণের অন্বেষণে এই প্রদেশে শতমুখে বিভক্ত হন এবং অবশেষে এই স্থানে গঙ্গাজলস্পর্শে সগরসন্তানগণের উদ্ধার-সাধন করিয়া সাগরে মিলিত হন। সেই জন্য এই স্থান পরমপবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে জগতে প্রসিদ্ধ হয়।

মহাভারতে দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে আসিয়া নন্দা ও কৌশকী তীর্থে স্নানাদি করত এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তখন এই প্রদেশে গঙ্গার শত শত মুখ ছিল, তাঁহারা ঐ সকল নদীতে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গদেশান্তর্গত বৈতরণী নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। (১) মহাভারতের অন্যান্য অংশ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তখন এই স্থানের সন্নিকটে, বর্ত্তমান তমলুক ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে, তাম্রলিপ্ত নগরী, তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সদর স্থানরূপে বিদ্যমান ছিল। মহাভারত ব্যতীত পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য বহু প্রাচীন গ্রন্থে এই গঙ্গাসাগর-সঙ্গমতীর্থের উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে ইহাকে এক বিস্তৃত জনপদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, তখন তথায় সুষেণ নামে চন্দ্রবংশীয় এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সভায় আগত প্লক্ষ-দ্বীপস্থ দীপ্যন্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কন্যা ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী সুলোচনা পুরুষবেশে ভীমনাদ নামে এক গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন। (২)

পাল-সম্রাট আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয়ী দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপির ৭ম শ্লোক পাঠে বুঝা যায় যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও পালবংশীয় দ্বিতীয় সম্রাট ধর্ম্মপাল দেবের সমভিব্যাহারে ভৃত্যবর্গ এখানে আসিয়া সাগর-সঙ্গমে স্নান ও বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। (৩) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ছত্রভোগ ও এই স্থানের মধ্যে ভাগীরথীর উভয়তীরে বহু জনপদ ছিল। উজানি নগরের প্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত সওদাগর ভাগীরথী-পথে সিংহলযাত্রাকালে ছত্রভোগ ফেলিয়া ঐ সকল জনপদের মধ্যে সঙ্কেত-মাধব নামক স্থানে সোনার মহেশ দর্শন করিয়া এই স্থানে আসিয়া স্নান-তর্পণাদি করিয়াছিলেন। যথা—

"ঝড় বৃষ্টি দূর হইল চণ্ডীর কৃপায়।
তরী মেলি সদাগর শীঘ্রগতি যায়॥
ডানি বামে ছাড়ি যায় কত কত দেশ।
সঙ্কেত-মাধবে দেখে সোনার মহেশ॥
সাগর-সঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর-প্রসঙ্গ॥

শুন রে কাণ্ডারী ভাই, তীর্থ বড় এই ঠাঁই,
রামায়ণে শুনি ইতিহাস।
সগর-বংশের কর্ম্ম, শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
নাহি হয় পাপের প্রকাশ॥

(১) H. H. Wilson's essays on the religions of the Hindus. Vol. II. Pages 164-169. Edition 1862.

(২) "The image of Kapil is a shapeless block of stone, daubed with red paint. During the greater part of the year it is kept in Calcutta, but a week or two before the festival it is handed over to the priest who take charge of it during the festival and receive a share of the pilgrims gift." Bengal District Gazeteer. Vol. XXXI. Page 256.

(১) মহাভারত। বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্ব।
(২) পদ্মপুরাণ। ক্রিয়াযোগসার, ৫ অধ্যায়।
(৩) গৌড় লেখামালা। পৃষ্ঠা ৪২, ১ম স্তবক।

আগে দেখাইয়া পথ, চলে বালা ভগীরথ,
বায়ুবেগে জলের প্রয়াণ।
পবিত্র করিল ধরা, সুরনদী তীর্থবরা,
আইল সাগর-সন্নিধান॥
আসি গঙ্গা এই পথে, কহিলেন ভগীরথে,
কোথা মৈল সগরনন্দন।
ভগীরথ বলে বাণী, সবিশেষ নাহি জানি,
আপনি করহ অন্বেষণ॥
প্রপিতামহের কথা, বিশেষ না জানি মাতা,
কেহ নাহি পুরাতন লোক।
যত দেখি চরাচর, নাহি তব অগোচর,
কৃপা করি দূর কর শোক॥
ভগীরথে কৃপাময়ী, চায়া বুলে ঠাঁই ঠাঁই,
জুড়ালেক বিংশতি যোজন।
তনু পাংশু হাড় নখে, পরশি বৈকুণ্ঠ লোকে,
নিল গঙ্গা বিমান গমন॥
এ ঠাঁই সগরবংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস,
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে,
হয়ে সব চতুর্ভুজ বেশ॥
মুক্তিপদ এই স্থান, এই স্থানে করি স্নান,
চল ভাই সিংহল নগরে।
তর্পণ করিয়া জলে, ডিঙ্গা লয়ে সাধু চলে,
গাইল মুকুন্দ কবিবরে॥"



কঙ্কণদীঘিতে প্রাপ্ত নবগ্রহমূর্ত্তি

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বিখ্যাত ইংরাজ-দূত সার টমাস রোর সহচর বেসিন কর্ত্তৃক অঙ্কিত ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের একখানি মানচিত্র ও অন্যান্য কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্থানে বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অন্যতম রাজধানী ছিল ও তাঁহার নৌবাহিনী রক্ষিত হইত। তাঁহার মতে এই স্থানকেই পর্ত্তুগীজগণ চ্যাণ্ডীকান বলিত এবং প্রতাপাদিত্য ইহাকে নৌবাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা তাঁহার রাজধানী যশোহর অপেক্ষা য়ুরোপীয়গণের নিকট সুপরিচিত ছিল। এই জন্য তাঁহারা তাঁহার রাজ্যকেও চ্যাণ্ডীকান ও তাঁহাকে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিত। বিশেষতঃ, সাগর তাঁহাদের পক্ষে সুগম হওয়ায় তথায় সর্ব্বদা তাঁহাদের গতায়াত ছিল। প্রতাপাদিত্য অনেক সময় তথায় অবস্থিতি করিতেন। (১) শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার A History of Indian shipping and maritime activity নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে নিখিল বাবুর উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্বংসাবশেষগুলি ব্যতীত উক্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত জলঘাটা, নালুয়া, মনিরটাট, নলগোড়া, জটা, গুনাই, খুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ, ঘুঘুডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে ও ১০।১১১।১২।১৩।১৪।১৯।১১১।১১৪।১১৫।১২২ নম্বর লাটের নানা অংশে বহুসংখ্যক ইষ্টক গৃহের ভিত্তি, মন্দির ও ঘাটের ধ্বংসাবশেষ, পুষ্করিণী প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং শতাধিক কালী, বুদ্ধ, নৃসিংহ, মহাদেব, সূর্য্য, বিষ্ণু ও দশভুজা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি, বালি-পাথরের থালা, চৌকী প্রভৃতি দ্রব্যাদি ও কাল পাথরের থাম ও থামের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে যতগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি চক্রযুক্ত গরুড়োপরি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটি গরুড়মূর্ত্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গরুড়মূর্ত্তিটির উভয় দিকে দুইটি মূর্ত্তি ক্ষোদিত, দুইটিরই মনুষ্যের ন্যায় আকার। একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর মূর্ত্তি দুইটি উপবিষ্ট। উহাদের বাম জানু ভূমিস্পৃষ্ট, মস্তক মুকুটমণ্ডিত, তুঙ্গ নাসা, দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ ও পক্ষযুক্ত। শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দেশ হইতে বুঝা যায় যে, বিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এইরূপ গরুড়মূর্ত্তি গঠিত হইত, যথা—

"উপেন্দ্রস্যাগতঃ পক্ষী গুঢ়াকেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
বামজানু গতো ভূমৌ মুদ্ধা চ ফণিমণ্ডিতঃ॥
স্থূলজঙ্ঘো নরগ্রীবস্বঙ্গনাসো নবাঙ্গকঃ।
দ্বিবাহুঃ পক্ষযুক্তশ্চ কর্ত্তব্যো বিনতাসুতঃ॥"

উক্ত মূর্ত্তিটি জলঘাটা গ্রামে কুমার ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাছারী-বাটীর মধ্যে এত দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া ছিল। প্রবাদ, ঐ কাছারী-বাটীর পশ্চিমপার্শ্বের পুষ্করিণী সংস্কারকালে উহা ১৩০৭।৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটি দেখিলে বোধ হয়, উহা কোন একটি বড় হিন্দু মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া সংপ্রতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় উক্ত মূর্ত্তিটি পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণচন্দ্রপুরের চন্দ্র বাগানে প্রাপ্ত কুবেরমূর্ত্তি ও একটি নৃসিংহ মূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়ামে লইয়া গিয়াছেন এবং গরুড়মূর্ত্তিটি খুবই সুন্দর ও মূল্যবান্ বলিয়া মিউজিয়ামের G llery র মধ্যস্থলে এক নূতন থামের উপর রাখিয়াছেন।

শ্রীকালিদাস স

(১) প্রতাপাদিত্য। শ্রীনিখিলনাথ রায়।—পৃষ্ঠা—১৩১৩ পরিষৎ গ্রন্থাবলী—

রাজা গোবর্দ্ধন

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তঃপাতী যশোদল গ্রামে কায়স্থ কুলতিলক রাজা গোবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই একদা সমৃদ্ধ নগরটি অধুনা একটি পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়া সুদূর অতীতের গৌরবকাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার জীর্ণ কঙ্কালটি রক্ষা করিতেছে। গোবর্দ্ধনের বিশাল ভবন এখন ধ্বংসে পরিণত! তাঁহার বৃহৎ দীর্ঘিকাটি এখনও ইহার পূর্ব্বতন আয়তনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে! গোবর্দ্ধন এই নগরটিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য স্বীয় আবাসবাটীর সন্নিকটে একটি প্রশস্ত 'জাঙ্গাল' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা এক সময়ে তাঁহার রাজভবনটিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিত। সম্প্রতি ইহা কৃষকের নির্ম্মম হলচালনে অধিকাংশ স্থানে ভগ্ন হইয়া একরকম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বিশাল জাঙ্গালটি প্রায় সার্দ্ধ তিন মাইল ব্যাপী ছিল। কথিত আছে যে, রাজা গোবর্দ্ধন অশ্বারোহণে ইহার উপর দিয়া প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেন। রাজবাটীর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে খরস্রোতা নদসুন্দা বহমান থাকিয়া পরিখার কার্য্য করিত। সেই সময়ে এই নদীটি বেগবতী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা চড়া পড়িয়া তাহার পূর্ব্ব-বেগ হারাইয়াছে। এইক্ষণ একটি ক্ষীণ জলরেখা শুধু বর্ষাগমে তাহার অস্তিত্ব সূচিত করিয়া থাকে। রাজভবনের দক্ষিণদিকে একটি প্রশস্ত খাল ছিল। ইহাকে তখন লোক নগরী-খাল বলিত। রাজা গোবর্দ্ধন তাঁহার জলবিহারের জন্য এই খালটি খনন করাইয়াছিলেন। ইহার ভিতর অসংখ্য কোষ-নৌকা রাজার ব্যবহারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহার কোনও চিহ্ন নাই,—শুধু জনশ্রুতি ইহাকে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছে। গোবর্দ্ধন বহু অর্থব্যয়ে তাঁহার ভবনের উত্তরদিকে একটি প্রকাণ্ড দেবায়তন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্থানীয় লোক ইহাকে 'মঠবাড়ী' নামে অভিহিত করে। এই 'মঠবাড়ী'র খনন-কার্য্য প্রথম করাইয়াছিলেন রাজার অন্যতম বংশধর স্বনামধন্য কালীকিশোর আইচ রায় মহাশয়। তিনি ভূগর্ভ হইতে অনেক ইষ্টক সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। খননকালে একটি কষ্টি-পাথরের গণেশ-মূর্ত্তি, একটি সুদীর্ঘ প্রস্তর-খণ্ড ও পাথরের খিলান করা চৌকাঠ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, এই স্থানটি খনিত হইলে ইতিহাসের অনেক অমূল্য উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। রাজা এক জন পরম নিষ্ঠাবান্ শাক্ত ছিলেন। এই জন্য তিনি স্বীয় ভবনের ভিতর একটি ভৈরবী-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রাজা প্রত্যহ এই দেবীমন্দিরে আহ্নিক করিতেন এবং মাঝে মাঝে না কি দেবী-সমক্ষে নরবলি প্রদত্ত হইত। বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজার অন্যতম বংশধর ৺গিরিশচন্দ্র আইচ রায় তাঁহার আবাসগৃহের পশ্চাদ্ভাগে একটি পুষ্করিণী খনন করাইবার সময় প্রায় পাঁচ ফুট মৃত্তিকার নীচে একটি কারুকার্য্যখচিত চীনা-মাটীর কলসীর ভিতর কতকগুলি সুপ্রাচীন রৌপ্য-মুদ্রা প্রাপ্ত হন। এই মুদ্রা সম্বন্ধে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর তদানীন্তন Numismatic Reporter মিঃ টি, ব্লক বলেন—

" * * * * * * * * *
They are Rupees of different Bengal Sultans; a few coins belong to the Bahmani Sultan Tajud-din Firoze Shah, to the Suri Kings Islam Shah and Muhammad Shah and the Mughal Emperor Humayun. As is the case with nearly all the Bengal coins, they are generally much disfigured by Shroff marks, a few specimens being too badly damaged as to be identified at all.

There are few more specimens among this find which possess great numismatic value, the majority, however, belongs to more or less known and common types." (1)

গোবর্দ্ধনের প্রপিতামহ দেবীবর আইচ,—রাঢ় হইতে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে আগমন করেন। ইনি কায়স্থ-কুল হইতে উদ্ভূত এবং ইঁহাদের কৌলিক উপাধি—আইচ; গৌড়ের হিন্দুরাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জালালউদ্দীন আবুল মজঃফর মহম্মদ শাহ নাম ধারণপূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই যদুকে ইংরাজ ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধ Mr. Stewart The offspring Mahommedan Concubine অর্থাৎ মুসলমানী রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যদু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। রিয়াজ-উজ-সালাতিনের গ্রন্থকর্ত্তা গোলাম হোসেন বলেন—"জালালউদ্দীন পিতার মত উপেক্ষা করিয়া অনেক হিন্দুকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ স্বর্ণনির্ম্মিত গাভী গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোমাংস দ্বারা তাঁহাদের জাতিপাত করিলেন।" (২) ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য তাঁহার 'গৌড়ের ইতিহাসে' বলেন—"জালালউদ্দীন পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় মুসলমানধর্ম্ম বিস্তারের জন্য ঘোষণা করিলেন যে, হয় মুসলমান হইতে হইবে—নতুবা খড়্গমুখে প্রাণ দিতে হইবে। এই ঘোষণা হইবার পর প্রাণভয়ে অনেকে কামরূপরাজ্যে এবং আসাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে পলায়ন করে।" (৩) বর্ত্তমান পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলটি তখন কামরূপরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অগত্যা দেবীবর জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য আনুমানিক ১৪০০ খৃঃ সপরিবারে গৌড়নগর ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের অরণ্যসমাকুল, হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ, বিরলবসতি প্রদেশটিকে

(1) XII Report on 317 old Silver coins forwarded by Collector of Mymensingh with his No 104, dated 15th April, 1898.

(২) রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত সটীক বঙ্গানুবাদ রিয়াজ-উজ-সালাতিন।

(৩) গৌড়ের ইতিহাস—(রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।)

স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। ক্রমশঃ স্বকীয় অলোক-সামান্য বুদ্ধির প্রভাবে দেবীবর শীঘ্র, কোচ ইত্যাদি জাতির হৃদয় আকর্ষণ করিয়া আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিলেন। কালক্রমে তাঁহার যশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গৌড়ের রাজসভায় অচিরে তাঁহার ডাক পড়িল। দেবীবর তদানীন্তন গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে সুলতান তাঁহার তিন পুত্রকে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। দেবীবরের তিন পুত্র—শ্রীমন্ত খাঁ, বিদ্যাধর খাঁ ও যশোমন্ত খাঁ। কনিষ্ঠ যশোমন্ত খাঁ হইতে যশোদল নামের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্ত খাঁর এগারটি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে গোবিন্দই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৫১০ খৃঃ হোসেন শাহ কামরূপ জয় করিবার জন্য একটি বিরাট বাহিনী গঠিত করিয়া নিজে সৈন্য-চালনা করেন। আসাম বুরুঞ্জির মতে এই ঘটনা ১৫২৭ খৃঃ হয়। এই সময় শ্রীমন্ত খাঁর পুত্র (গোবিন্দ) হোসেন শাহকে সৈন্য ও রসদ যোগাইয়াছিলেন। এই অভিযানে মুসলমান সৈন্যগণ কামরূপরাজের আক্রমণে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গোবিন্দের ব্যবহারে সুলতান পরম পরিতোষ লাভ করিয়া ১৫২০ খৃঃ তাঁহাকে এক হাজারী মন্‌সবদারের পদ ও নবগঠিত হোসেনশাহী ও হাজরাদী পরগণার অধীশ্বর করিলেন এবং পুত্র গোবর্দ্ধনকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময় হইতে গোবিন্দ হাজরা উপাধিতে পরিচিত হইতে লাগিলেন এবং ইহার 'হাজরা' উপাধিটি হইতে বর্ত্তমান 'হাজরাদী' পরগণার নামটি উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই 'হাজরাদী' শব্দটির মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া 'ময়মনসিংহের ইতিহাস'-প্রণেতা সুলেখক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় যে বিবরণটি তাঁহার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বহু-শতাব্দী-প্রচলিত কিংবদন্তীর সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি লক্ষ্মণ হাজো নামক জঙ্গলবাড়ীর এক কোচ রাজাকে 'হাজরাদী' শব্দটির জনক বলিতেছেন। তিনি নিজ 'হাজরাদা' পরগণার অধিবাসী হইয়া চিরাগত কিংবদন্তীকে উপেক্ষা করিয়া নিজের অভিনব মতটি লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাঁহার যুক্তির পরিপোষক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কেদার বাবুর পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর বিগত ১৯১০ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ Mr. Stapleton বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর Journalএ প্রচলিত কিংবদন্তীকে সমর্থন করিয়া যে মতটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"From the name of one of the Parganahs, (i.e. Hazradi) * * * * * * it would appear that the grant of land was made by Hussain Shah's son, Nasrat Shah, to the Rajah's father Govinda Hazra, after whom the Mymensingh Parganah Hazradi seems to be named, and not to the Raja himself."

গোবিন্দ এই প্রকারে হোসেন শাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া 'হাজরাদী' ও 'হোসেনশাহী'র * স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। যশোদল হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কোচরাজ লক্ষ্মণ জঙ্গলবাড়ীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি গোবিন্দের পরাক্রম উপলব্ধি করিয়া স্বকীয় রাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। শীঘ্রই গোবিন্দের সহিত লক্ষ্মণ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। গোবিন্দ তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের ভিতর শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। ইহার পর তিনি যশোদল নগরের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য বিদেশ হইতে শিল্পীদিগকে তাঁহার রাজধানীতে আশ্রয়দান করিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য তিনি অনেকগুলি সুদক্ষ লৌহশিল্পীকে স্বীয় ভবনের পশ্চিমদিকে বাসের জন্য স্থান দিয়াছিলেন। এখনও যশোদলের প্রাচীন রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে একটি পল্লী 'কামারপাড়া' নামে অভিহিত। বর্ত্তমানে এই পল্লীতে কোন 'কামারের' অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ইহা আমাদিগকে এখনও যশোমন্ত-গোবিন্দ-গোবর্দ্ধনের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এখনও এই পল্লীর স্থানে স্থানে লৌহমল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কামারপাড়ার একটু উত্তর-পশ্চিমে একটি বৃহৎ প্রান্তর আছে। ইহাকে এখন 'বাণিয়াকান্দির মাঠ' বলা হয়। আমাদের বোধ হয়, এই স্থানটিতে বণিকদিগের একটি সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল। এই মাঠটির নীচ দিয়া তখন নরসুন্দা নদী প্রবাহিত ছিল এবং দেশ-বিদেশ হইতে পণ্যবাহী তরণীসমূহ এই নদীতে সমাগত হইত। এই জন্য মনে হয়, এই স্থানটি 'বণিয়াকান্দি' আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

হোসেন শাহার প্রদত্ত সম্মান অল্পকাল ভোগ করিয়া প্রায় ১৫২৫ খৃঃ গোবিন্দ পরলোকগমন করিলেন। কিন্তু এই অল্পকাল-মধ্যে যশোদল নগরের উন্নতিবিধান করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা সমস্তই তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা, পুত্র গোবর্দ্ধন যশোদলের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই তিনি প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে থাকিয়া গোবর্দ্ধন 'রাজা' ও 'গুণিকচন্দ্র',—এই দুইটি উপাধি তাঁহার কর্ম্মকুশলতার পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার পিতৃদত্ত গোবর্দ্ধন-নামটির স্থান অধিকার করিল তাঁহার দুইটি উপাধি—'রাজা' ও 'গুণিকচন্দ্র'। যেমন আজ-কাল বিদ্যাসাগর বলিলে শুধু দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝায়, সেই রকম 'গুণিকচন্দ্র' বলিলে সেই সময়ে যশোদলের আইচ-বংশের কুলদীপ গোবিন্দ হাজরার পুত্র গোবর্দ্ধনকে বুঝাইত।

অতি অল্পকালের ভিতর যশোদল একটি সমৃদ্ধিপূর্ণ নগর হইয়া দাঁড়াইল। গোবর্দ্ধনের বিশাল ভবনটি সুরম্য সৌধ-রাজিতে শোভিত হইয়া তাঁহার অতুল বিভবের সাক্ষ্যদান

* "হোসেন শাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকের যে অংশ অধিকার করেন, তাহার নাম পরে হোসেনশাহী পরগণা হয়।"
(গৌড়ের ইতিহাস—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য)

করিতে লাগিল। * 'ঈশান মিশ্রবংশম্'-রচয়িতা তদানীন্তন যশোদলের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এই মনোহর যশোদল নগর বহু আর্য্যগণের বাসভূমি ছিল এবং প্রতি গৃহে দেবশালা, চতুষ্পাঠী, মনোহর উদ্যান (প্রমোদ-কানন) ও বৃক্ষ-বাটিকা (বাগান) সমূহ সংস্থাপিত ছিল। বীথিকাসমূহে সুন্দর পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। অজস্র বেদধ্বনি দ্বারা এই নগর মুখরিত হইত। সর্ব্বদা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান হওয়ায় মনে হইত, যেন যজ্ঞাগ্নি এই স্থলে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিয়া বেড়াইতেছে। রাজা যশোদল নগরে হোমগৃহ, দেবমন্দির, কূপ, পুষ্করিণী, যজ্ঞীয় কুণ্ড প্রভৃতির সংহত গুরুদেবের উপযুক্ত ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখানে বৃহস্পতিতুল্য সহস্র সহস্র শিষ্য সর্ব্বদা মন্ত্রপারদর্শী গুরুদেবের পদসেবা করিতেন ও রাজা মস্তকস্থ মণির প্রভা দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম রঞ্জিত করিয়া দিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পটুতা ও নিত্য অধ্যাপনাবশতঃ ক্রমে তিনি 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার গৃহ 'ভট্টবাটিকা' বলিয়া কথিত হইত, যাহার শোভার নিকট ইন্দ্রের অমরাবতী তুচ্ছবোধ হইত। রাজার বংশধরগণ আজিও যশোদলে শ্রীনিবাস শিরোমণির সন্তানগণের শিষ্য এবং 'আইচ' বলিয়া বিখ্যাত।

নসরৎ শাহার মৃত্যুর পর গৌড়ের কোনও মুসলমান রাজা পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের বড় একটা খোঁজ রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্য নসরৎ শাহার পরবর্ত্তী ৪০ বৎসরের অধিক কাল এই প্রদেশটি একটি বেওয়ারিসী মালের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রের একান্ত অভাব ছিল। এই সময়টিকে লক্ষ্য করিয়া Stapleton বলেন—"Eastern Bengal was for the last forty years any one's land." এই অরাজকতার সুবিধাটি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সামন্ত-নৃপতিগণ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন এবং নিজেদের স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য শক্তি সংগ্রহ করিতে কোন ত্রুটি করিলেন না। কিয়াজের মতে "দাউদ খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকারপূর্ব্বক স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন।" কিন্তু পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে তিনি তাঁহার প্রভুত্ব কতটা বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সময় গোবর্দ্ধনও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বস্তুতঃ তিনি গৌড়ের অধীনতাপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বস্ত সমর-কুশল সেনাপতির হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। সুদক্ষ লৌহশিল্পিগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া গোবর্দ্ধনের সৈন্যদিগকে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত করিল। কিন্তু গোবর্দ্ধন স্বাধীনতার যে স্বপ্নটি মানসনয়নে দেখিতেছিলেন, তাহা অচিরকালমধ্যে শূন্যে বিলীন হইল! সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত খিজিরপুরের ঈশা খাঁ প্রায় ১৫৮০ খৃঃ জঙ্গল-বাড়ীর কোচরাজ লক্ষ্মণের উপর আপতিত হইলেন। লক্ষ্মণ সেই আক্রমণটি প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। জঙ্গলবাড়ী বিজেতা ঈশা খাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হইল। এখন ঈশা খাঁর লোলুপদৃষ্টি গোবর্দ্ধনের রাজ-ধানী যশোদলের উপর পড়িল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, গোবর্দ্ধনের মত একটি প্রবলপরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাঁহার নবগঠিত রাজ্যের সন্নিকটে বর্ত্তমান থাকিতে দেওয়া স্বীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। সেই জন্য গোবর্দ্ধনকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য অনেক কূট রাজনীতির আশ্রয় লইলেন। কিন্তু যখন তাঁহার অবলম্বিত পন্থা তাঁহাকে অভীষ্ট ফলদান করিতে সম্যক্ অপারগ হইল, তখন তিনি গোবর্দ্ধনের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। ঈশা খাঁর রণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাঙ্গালার ভিতর তখন কাহারও অবিদিত ছিল না। তথাপি গোবর্দ্ধনের সৈন্যগণ স্বীয় জন্মভূমি ও রাজার মান রক্ষা করিবার জন্য হৃদয়ের তপ্ত শোণিত লইয়া দলে দলে আসিয়া রাজকীয় পতাকাতলে সমবেত হইল। এ দিকে গোবর্দ্ধনও স্বীয় জন্মভূমি ও রাজ্যের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও দেশের ভিতর শ্রীমন্ত খাঁ, কচু রায়, ভবানন্দের মত বিশ্বাসঘাতক দেশ-দ্রোহীর অভাব ছিল না! অর্থের প্রলোভন ও চাকরীর মায়াপাশ বাঙ্গালীকে অনেকবার বিবেক ও মনুষ্যত্ব কি ভাবে অনায়াসে বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছে! ঈশা খাঁর প্রলোভনের কুহকে আত্মবিস্মৃত হইয়া গোবর্দ্ধনের পিতার অন্যতম পিতৃব্য বিদ্যাধর খাঁর পৌত্র শ্রীহরি আইচ ও তাঁহার (গোবর্দ্ধনের) পরম বিশ্বস্ত 'গজিয়া ভাণ্ডারী' নামক ভৃত্যগণ গোপনে ঈশা খাঁর সহিত যোগদান করিয়া জঙ্গলবাড়ী হইতে যশোদলের 'নগরী খাল' পর্য্যন্ত একটি খাল খনন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। যথাসময়ে গোবর্দ্ধনের অলক্ষ্যে এক রাত্রির ভিতর একটি খাল খনিত হইল। এই খালটি অবলম্বন করিয়া ঈশা খাঁ সহজে যশোদলের দিকে সৈন্য চালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীহরি আইচ এই দেশদ্রোহিতার পুরস্কারস্বরূপ শুধু অনন্ত অখ্যাতি ভিন্ন অন্য কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গজিয়া ভাণ্ডারীগণ অন্নদাতা প্রভুর বিপক্ষতাচরণ করিয়া ঈশা খাঁর দপ্তরখানায় চাকুরী পাইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এ দিকে ঈশা খাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনী যশোদলের দিকে চালনা করিলেন। যশোদল নগররক্ষার ভার গোবর্দ্ধনের অন্যতম পিতৃব্যপুত্র সেনাপতি রামানন্দ খাঁর উপর অর্পিত হইল। তিনি যুদ্ধে অসীম রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ঈশা খাঁর আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। এই যুদ্ধ ঈশা খাঁর নূতন রাজধানী জঙ্গলবাড়ীর সন্নিহিত কাকরদিয়া খালের তট-ভূমিতে সংঘটিত হইয়াছিল এবং গোবর্দ্ধনের অন্যতম পিতৃব্য উমাপতি হাজরার পৌত্র রমাকান্ত ও তাঁহার (গোবর্দ্ধনের) পিতার অন্যতম পিতৃব্য যশোমন্ত খাঁর প্রপৌত্র—(১) শ্রীচন্দ্র

* যশোদলনিবাসী পণ্ডিতবর কালীহর বিদ্যালঙ্কার প্রণীত।

(১) "কথিত আছে যে, শ্রীচন্দ্র খাঁ ও রামচন্দ্র খাঁ আট শত পাইক সহ চলাফেরা করিতেন।"

এবং রামচন্দ্র খাঁ এই যুদ্ধে নিহত হয়েন। ঈশা খাঁ এখন বুঝিতে পারিলেন যে, গোবর্দ্ধন উপেক্ষার পাত্র নহেন। সেই জন্য তাঁহাকে সবংশে নিধন করিবার জন্য যে উপায় ঈশা খাঁ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ষ্টেপলটনের একটি প্রবন্ধ (১) হইতে উদ্ধৃত হইল ;—

"Isa Khan, however, was unable to defeat Raja Ganik Chandra and finally had recourse to the same strtagem as that used by Hussain Shah in capturing Kamtapur in 1494, as well as by Sher Shah at fort Rhotas in 1538, while Humayun idled at Gaur, Isa Khan suggested that fighting should cease and that as a sign of amity between the families, his Ladies sould visit the Zenana of the Raja.

Instead of women, however, the palanquins were filled with armed men, who, as soon as they were safely inside the walls of the Raja's house, leapt out and killed him.

The Raja is said to have been worshipping at the time in his private temple of Bhairavi (Kali) and it was near the ruins of this temple (২) that the coins were found.

গোবর্দ্ধন এই ভাবে শত্রুর হস্তে প্রায় ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে প্রাণ হারাইলেন এবং যশোদল শ্রীহীন হইয়া তাহার পূর্ব্ব-গৌরব হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইল! তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিসমূহ অধুনা মৃত্তিকা-গর্ভে নিহিত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছে সত্য ; কিন্তু আজিও প্রচলিত কিংবদন্তী তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। এখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যশোদলের ভট্টাচার্য্যগণ 'রাজপণ্ডিত' আখ্যাটির একমাত্র অধিকারী হইয়া পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন। যত দিন যশোদলের (১) ভট্টাচার্য্য ও গোস্বামিবংশের একটিমাত্র বংশধর জীবিত থাকিবেন, তত দিন গুণিকচন্দ্র গোবর্দ্ধনের নাম কিছুতেই লুপ্ত হইবে না।

রাজার এই শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম পিতৃব্য গোপীনাথ মজুমদারের পুত্রদ্বয়—বিক্রম ও বল্লভ রায় ঈশা খাঁর প্ররোচনায় হতভাগ্য, হৃতসর্ব্বস্ব গোবর্দ্ধনের প্রাসাদ আক্রমণ করিল। ঈশা খাঁ বোধ হয় ইহাদিগকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকিবেন,—নচেৎ এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে কখনও তাহারা অগ্রসর হইত না। এই সময় রাজার বিধবা মহিষী (ঘোষের কন্যা) ও পুত্র ভবানন্দ ও শ্রীরাম রায় এবং অন্যতম পিতৃব্য উমাপতির পৌত্র পূর্ণানন্দ মজুমদার জীবিত ছিলেন। এইবার ইহারা বংশের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া সহান্তে অসিহস্তে এই (২) দুইটি স্বজনদ্রোহী, দেশের ও বংশের শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ঈশা খাঁ বিক্রম ও বল্লভের পক্ষাবলম্বন করিলেন। এইবার ঈশা খাঁর যুদ্ধে জয়লাভ হইল এবং দেশভক্ত, বীর পূর্ণানন্দ যুদ্ধে বন্দী হইলেন। দুঃখের বিষয়, ঈশা খাঁ এই বীরের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কথিত আছে যে, হতভাগ্য পূর্ণানন্দকে ঈশা খাঁ 'ছালায়' ভরিয়া জলে ডুবাইয়া বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতাহেতু পূর্ণানন্দের পুত্রগণ প্রাণভয়ে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী জামালপুর উপরিভাগস্থিত 'মুজাটা' গ্রামে পলায়ন করেন। এই ভাবে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের একটি পরাক্রান্ত কায়স্থ-রাজবংশের অবসান হইল।

শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী, (বি.এ, এম, আর, এ, এস)
(লণ্ডন)

(১) J. A. S. B. (1910)

(২) ঈশা খাঁর আক্রমণ দিবা দ্বিপ্রহরে হইয়াছিল। এই সময় গোবর্দ্ধন ভৈরবী-মন্দিরে উপাসনা করিতেছিলেন।

(১) যশোদলের ভট্টাচার্য্য ও গোস্বামিগণ এক পূর্ব্বপুরুষের সন্তান।

(২) বিক্রম রায় ও বল্লভ রায়।

নির্ভর

বন্ধুর কঙ্করময় বিপৎ-সঙ্কুল
দীর্ঘ পথ প'ড়ে আছে সম্মুখে আমার ;
কত যে স্খলন হায়, কত কিছু ভুল
পদে পদে দিবে দেখা, সংখ্যা কোথা তার!

তবু যদি অনুখণ রহ সাথে সাথে,
মোরে ঘিরি রহে তব বরাভয় কর,—
আকাশের যত বাজ প'ড়ুক এ মাথে,
হে মোর ঠাকুর, মোর তাহে কিবা ডর?

প'ড়ে যাই, বিপথেতে চলি পথ ভুলে,—
তুমিই দেখাবে পথ, তুমি নিবে তুলে।

শ্রীঅজিতকুমার সেন।

বিষাদে প্রসাদ



৯

বিমলার সহিত সেদিনকার কথাবার্ত্তার পর হইতে কমলার মনের ভাব যেন কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গায় প্রতিপদের জোয়ার আসিবার পূর্ব্বে যেমন বান ডাকে, প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বাসটা বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ও কল-কল শব্দময় হইয়া উঠে, তাহার পর জোয়ার বাড়িতে থাকে, জলের উচ্ছ্বাসও বাড়িতেই থাকে, অথচ সে প্রথম তরঙ্গময় কোলাহলপূর্ণ ভাবটা আর বড় দেখা যায় না। রমণী-হৃদয়ে প্রথম প্রেমের জোয়ার যখন আরম্ভ হয়, তখন নদীর জোয়ারের ন্যায় তাহাতেও বিশৃঙ্খল আবেগ কিছু কালের জন্য বিলক্ষণভাবে প্রকাশ পায়, যতই দিন যায়, বাহিরের উত্তেজনাময় ছবি ধীরে ধীরে বিলীন হইলেও ভাব-বিবর্ত্তময় উচ্ছ্বাস কিন্তু জোয়ারেরই ন্যায় বাড়িতেই থাকে, চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে গম্ভীরতা ও বেগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই থাকে।

কমলারও প্রকৃতিতে এই ভাবেই প্রেমের গতি অপরের লক্ষিত হইয়াও আত্মপ্রভাব' ক্রমেই বিস্তার করিতেছিল, সে এখন পূর্ব্বের ন্যায় একলা বসিয়া. কে কি বলিবে বা বলিতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লক্ষ্যশূন্য নয়নে কখনও গঙ্গার দিকে, কখনও অনন্ত নীলাকাশের দিকে শূন্যমনে চাহিয়া সময় কাটায় না, নির্জ্জনে একাকী থাকা তাহার যে ভাল লাগে না, তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহার সেই ভাবে একলা বসিয়া থাকাটা যে সকলেরই লক্ষ্য হউক, ইহা সে সহিতে পারে না, তাই সে পূর্ব্বের ন্যায় পিতামাতা ও অন্যান্য পরিচিত নরনারীর সঙ্গের সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহাতে উপেক্ষা দেখায় না, প্রফুল্ল মনের ভাব গোপন করিয়া পূর্ব্বেরই ন্যায় সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যথাসম্ভব হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটাইতে সাধ্যমত চেষ্টাও করিয়া থাকে, কিন্তু অবসর পাইলেই অন্যের অলক্ষিতভাবে সে নির্জ্জনতাকে প্রিয় সহচরের ন্যায় জড়াইয়া ধরিতে বড়ই ভালবাসে, সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নির্জ্জনতা পাইলে তাহার শান্তি বোধ হয়। সেই শান্তিময় নির্জ্জনতায় বসিয়া বসিয়া সে যে কি ভাবে, কি কল্পনাময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করে, আশা ও নৈরাশ্যের উল্লাসময় ও বিষাদময় গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া কেমন করিয়া হাবুডুবু খায়, তাহা কিন্তু সে ও তাহার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহ বুঝে না। এক বিমলা ছাড়া আর কেহ বুঝিবার জন্য চেষ্টাও করে না। আজ সন্ধ্যাকালে বিমলা কমলাদের বাড়ী আসিয়াছে, মধ্যে তিন চার দিন সে কমলার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, তাহাদের বাড়ীতে আসেও নাই। আজ হঠাৎ সন্ধ্যার পর তাহাকে দেখিতে পাইয়া কমলা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি সযত্নে তাহার হাত ধরিয়া সে তাহাকে নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। তথায় দুই জনে মুখোমুখি করিয়া দুইখানি পৃথক্ চেয়ারে বসিল। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বিমলার কেমন একটা উদ্বেগের ভাব মনে আপনা হইতে উদিত হইল। কোনও রকমে মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া সে কহিল—"আজ একটা বড় রহস্যময় অথচ আনন্দের খবর লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, এই খবরটা পাইয়াছি বলিয়াই আজ আসিতে পারিয়াছি, তা না হ'লে হয় ত তোমার সহিত আজও দেখা করিতে পারিতাম না।" এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় বিমলা কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমলার কথা শুনিয়া কিন্তু কমলা কোন উত্তরই করিল না, নির্নিমেষ নয়নে সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমলা বলিল, "অমন করিয়া একদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে কেন? আমি যে এত কষ্ট করিয়া এমন একটা উপাদেয় খবর সংগ্রহ করিয়া আনিলাম!" ওঃ কপাল, যা'র জন্য এত কষ্ট করিয়া এ খবর সংগ্রহ করা গেল, সে ত দেখি তাহা শুনিতেই চায় না। এই ভাবিয়া বিমলা একটু হাসিল, কমলা আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, শেষে গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "প্রিয় ভগ্নি! বিমলা! তোমার রহস্য তুমিই যত্ন করিয়া রাখ, আমি তাহা শুনিতে চাহি না, কারণ, আমার মন স্বতঃই বলিয়া দিতেছে যে, তোমার রহস্য শুনিয়া আমার কোনই লাভ হইবে না। লাভ ত হইবেই না, বরং মনে হয়, তাহা শুনিলে হয় ত আমার পক্ষে একটা আবার নূতন ক্লেশ আসিয়া জুটিবে। তোমারই কথামত দেখ বিমলা, আমি অনেক কষ্টে আমাকে একটা সোজা পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছি, সে পথটা ভাল কি মন্দ, তাহা জানি না, কিন্তু—"

কমলার কথা শেষ হইতে না হইতেই বিমলা মাঝখানে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও সব কথা আমার কাছে এখন বলাও যা, না বলাও তা। আমি বড় সুখী হইলাম যে, সেদিনকার আমার কথায় তুমি একটা সোজাপথ চলিবার জন্য স্থির করিয়া লইয়াছ। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে কথা আজি আমি তোমাকে শুনাইবার জন্য আসিয়াছি, তাহা শুনিলে তোমার সে পথে চলিবার কোন নূতন বাধা হইবে না, বরঞ্চ তোমার তাহাতে কিছু উপকারই হইবে।"

কমলা বলিল—"দেখ বিমলা, তুমি যাহাকে বড় রহস্য বলিয়া ঠিক করিয়াছ, আমার কাছে তাহা একেবারেই রহস্য বা নূতন হইবে বলিয়া মনে করি না। তুমি ভাবিয়াছ, করুণানন্দ ব্রহ্মচারীর কোনও নূতন কথা শুনাইয়া আমাকে সুখী করিবে। প্রকৃতপক্ষে আমি সে কথা আর কাহারও কাছে শুনিতে চাহি না, কারণ,

তাহাতে আমার আর কোন প্রয়োজনবোধই নাই। সেদিনকার ব্যাপার আমার কাছে স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল। মানুষ জাগিয়া উঠিলে স্বপ্নকে যেমনভাবে উড়াইয়া দেয়, আমার জীবনের সেই অভূতপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্তকেও আমি তেমনই করিয়াই উড়াইয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি, সুতরাং সে স্বপ্নকে আবার সত্য করিবার চেষ্টা কেন ভাই করিতেছ? তাই বলি, তোমার রহস্য যদি করুণানন্দকেই লইয়া হয়, তবে সে কথা আমি শুনিতে আর প্রস্তুত নহি।"

যেরূপ গম্ভীরভাবে এই কয়টি কথা বলিয়া আরও গম্ভীরতরভাবে কমলা মৌন অবলম্বন করিল, তাহা দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইল। সে বাস্তবিকই করুণানন্দের কোন বিশেষ খবর পাইয়া তাহাই শুনাইবার জন্য এবং শুনাইয়া কমলাকে সুখী করিবার জন্য বড়ই আশার সহিত কমলার কাছে আসিয়াছিল। কমলার কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সত্য সত্যই সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "কমলা আমার কাছে গোপন? জিজ্ঞাসা করি, এ কি অভিমান না উপেক্ষা?"

অকম্পিত স্বরে কমলা উত্তর দিল, "বিমলা, ভুল বুঝিয়াছ, ইহা অভিমানও নয়, উপেক্ষাও হইতে পারে না। আপনার বলিয়া যাহাকে বুঝি নাই, তাহার উপর অভিমান হইবে কিরূপে? উপেক্ষা? কাহাকে উপেক্ষা করিব? যাহাকে দেখিয়া দেখিয়াও নয়নে তৃপ্তি হয় না, হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে উপেক্ষা করিবার শক্তি যদি থাকিত, তবে নারী হইয়া জন্মিলাম কেন?" কমলার এই কথায় বিমলা মনে মনে বড়ই সন্তোষ অনুভব করিল এবং উৎসুকনেত্রে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অভিমান নহে, উপেক্ষাও নহে, তবে কি ইহা কমলা, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না।" উদাসভাবে কমলা উত্তর করিল—"ইহা কি, তাহা শুনিবে? মানস-দেবতার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ইহা হতভাগিনী কমলার আত্ম-বলিদান।"

কমলার এই কথায় বিমলার দুই নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। বিস্ফারিত নয়নে পুনঃ-প্রত্যাগত আশার ভরসা-মাখা দৃষ্টিতে স্থির গম্ভীরভাবে কমলার দিকে চাহিয়া তখন বিমলা বলিল—"কমলা, তোমার এত লেখাপড়া সবই দেখিতেছি বৃথা হইয়াছে। অভিমান যে মানুষের মনে কখন্ কোন্ আকারে উদয় হয়, তাহা মানুষ নিজে বোঝে না, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা নারীর পক্ষে তাহা ত একেবারেই অসম্ভব। আমি বিমলা ঠাকুরাণী মনস্তত্ত্ববিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিনী, শপথ করিয়া তোমারই মানসদেবতাকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তোমার ইহা আত্ম-বলিদান নহে। ইহা বিষম অভিমানের নামান্তরমাত্র। কেমন করিয়া কমলা, জানিলে, সে তোমার আপনার নহে? সে যে তোমার আপনার, ইহা আমি বিমলা জানিয়াছি বলিয়াই তাহারই দু'টা কথা তোমাকে শুনাইব বলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি। অতিথির প্রত্যাখ্যান হিন্দুর ঘরে যে কতদূর বিসদৃশ, তাহা মনে করিয়া আমার কথা দুইটা তোমাকে শুনিতেই হইবে।"

বিমলার কথা শেষ হইতে না হইতেই কমলার পিতা যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয় অকস্মাৎ সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে আসিয়াই তিনি বলিলেন, "ও কমলা, এই যে বিমলাও বসিয়া আছ দেখিতেছি। তা বেশ হইয়াছে। কমলা, তোমার কি মনে নাই যে, আজ সন্ধ্যার পরে আমাদিগকে রামলীলা দেখিতে যাইতে হইবে? চল বিমলা, তুমিও আমাদের সঙ্গে।" শৈলেন বাবু তাঁহার বড় মোটরখানি লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন. তুমি, আমি ও কমলা এই তিন জনে শৈলেন বাবুর সঙ্গে যাইব। সুরবালার শরীরটা আজ ভাল নাই, একটু সর্দ্দি লাগিয়াছে, সুতরাং তাহার যাওয়া হইবে না। চল, আর বিলম্ব করিয়া কায নাই। ঐ শুন, শৈলেন বাবু তাড়া দিতেছেন।"

পিতার অকস্মাৎ আগমনে কমলা একটু থতমত হইয়া উঠিল, আত্মগোপন করিয়া তাড়াতাড়ি বিমলার হাত ধরিয়া সে নীরবে লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে শৈলেন্দ্রের মোটরে যাইয়া বসিল, মোটর শৈলেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রামলীলার দিকে দৌড়িল।

১০

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রামলীলা এ দেশবাসী হিন্দুদিগের পক্ষে, বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে দুর্গোৎসবের ন্যায় এক বিরাট জাতীয় উৎসব। লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী, মুরাদাবাদ, কাশী ও প্রয়াগ প্রভৃতি বড় বড় সহরে প্রতি বৎসর শরৎকালে এই মেলার আরম্ভ হয়, প্রায় মাসাধিককাল ইহা থাকে। যে নগরে ইহা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ৮।৯ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে অসংখ্য নরনারী এই মেলা দেখিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকে। দূরদেশবর্ত্তী সাধুসন্ন্যাসী বৈরাগীর দলও প্রতি বৎসর এই মেলার যোগ দিয়া সনাতনী হিন্দুর আদর্শ ভগবদবতার শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীজানকীর লোকপাবন চরিতাবলীর অভিনয় দর্শনে অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। রামলীলা নগরের একই স্থানে যে নিত্য হয়, তাহা নহে, অযোধ্যালীলা, মিথিলালীলা, চিত্রকূটলীলা, জনস্থানলীলা, কিষ্কিন্ধ্যালীলা ও লঙ্কালীলার জন্য নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বড় বড় রাস্তা, বাগিচা বা পড়ো জমী নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সেই স্থানে লীলারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই দোকানপাট বাজার বসিয়া যায়, নানাপ্রকার মাটীর খেলানা ও বালক্রীড়নক দ্রব্যই অধিকাংশ বিক্রীত হয়, আর সেই সঙ্গে মেঠাইএর সারি সারি দোকানে গ্রামবাসী নবাগত যাত্রীর ভিড় খুব জমিয়া যায়। লীলারম্ভ প্রায় সন্ধ্যার পরই হইয়া থাকে। সুবিস্তৃত সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে সাধুসন্ন্যাসী ও বৈরাগীর দল বসিয়া তদ্‌গতচিত্তে উল্লাসের সহিত হিন্দীভাষার মহাকবি তুলসীদাসের সুধা-স্যন্দি দোঁহাবলীর আবৃত্তি করিতে থাকেন, আর সেই সুযোগে শ্রীরাম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতির বেশধারী অভিনেতৃবর্গ তুলসীদাসের দোঁহাবলীর সূচনানুসারে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অবসরমত সুকণ্ঠ গায়কগণ হারমোনিয়ম বা সারেঙ্গের সুরে সুর মিলাইয়া তাল-লয়-যোগে তুলসীদাসের মর্ম্মস্পর্শী গীতনিচয়ের মধুর আলাপের ঝঙ্কারে ভক্ত শ্রোতৃ নর-নারীবৃন্দের ভাবপ্রবণ হৃদয়-সমুদ্রে শোক, স্নেহ, করুণা ও বিষাদ প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিনিচয়ের উত্তাল তরঙ্গ উঠাইয়া ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর রসাস্বাদময় প্রবল বন্যার সৃষ্টি করিয়া

থাকে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন—সমবেত শিক্ষিত, অশিক্ষিত বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ বর্ত্তমান ভারতের নরনারীবৃন্দ তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় বিষাদমাখা পরাধীনতার তীব্র অবসাদময় দুর্ব্বিষহ ধ্বংসের করালগ্রাস হইতে হঠাৎ মুক্তি লাভ করিয়া সেই ধর্ম্মময় ন্যায়ময় আনন্দময় রামরাজ্যের প্রজারূপে পরিণত হইয়াছে—হিন্দু স্বরাজের স্বর্গীয় চিত্রাবলী প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের নয়নের আশেপাশে সম্মুখে নব-জীবনের মধুময় আলোকে যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে।

এলাহাবাদের রামলীলা বড়ই জাঁকজমকের রামলীলা—স্বদেশ-প্রেমিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাতে দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার ও শিক্ষা করিবার অনেক সামগ্রীর সমাবেশ আছে, তাই আজ কমলা, বিমলা ও শৈলেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া শিক্ষিত—স্বয়ং শিক্ষাভিমানহীন এবং শিক্ষাকার্য্যপ্রবীণ এটর্ণী যতীন্দ্র বাবু রামলীলার শ্রেষ্ঠলীলা ভরত-মিলন দেখিবার জন্য চলিয়াছেন। তাঁহাদের দ্রুতগামী মোটর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেলার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল—এখান হইতেই বিরাট জনতা আরম্ভ হইয়াছে। পুলিসের বন্দোবস্ত বড়ই কড়াকড়ি বলিয়া বোধ হইল। চারিদিকেই পথের মোড়ে রেগুলেশন লাঠিহস্তে দৃঢ়কায় ও সমুন্নতদেহ লাল পাগড়ীর দল উপচীয়মান জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বৃহদায়তন চতুষ্পথের মধ্যস্থানে বিচিত্র স্তম্ভাতপের অধোভাগে কাষ্ঠবিনির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, চারিদিকে তাহার নানাবর্ণের বিচিত্র ধ্বজাপতাকা পরিবেশিত। মঞ্চের উপরিভাগে বৃহৎ সমতলক্ষেত্রে সুন্দর গালিচার আসন, চারিদিকে স্তরে স্তরে মালতী-যূথি-চামেলীর দোদুল্যমান মাল্যাবলী প্রাণমনোহর সৌরভ-সম্ভার ছড়াইয়া দিতেছে। বিচিত্র ঝাড়-লণ্ঠনের অগণিত সমুজ্জ্বল দীপমালায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। সমুচ্চ কাষ্ঠময় মঞ্চের উপরে উঠিবার জন্য চারিদিকে চারিটি সুসজ্জিত সোপানাবলী। দক্ষিণের ও উত্তরের সোপানপংক্তি অধিকতরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে। কারণ, দক্ষিণ ও উত্তরের সোপানাবলী দিয়া যথাক্রমে শ্রীরামচন্দ্র ও ভরত মঞ্চের উপরে উঠিয়া মিলিত হইবেন, মঞ্চের নিকটবর্ত্তী চারিপার্শ্বে ঘন-সন্নিবিষ্ট বিরাট জনতা উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল বাত্যাবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় তীব্র কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। যতীন্দ্র বাবুর মোটর সেই মিলন-মঞ্চের দুই শত হস্ত দূরে যাইয়া পুলিস কর্ত্তৃক আর আগে যাইবার হুকুম নাই বলিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইল, বামদিকের এক বিশাল পতিত ভূমিতে মোটর-গাড়ীগুলির জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখান হইতে বিপুল জনতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া পদব্রজে মঞ্চ পর্য্যন্ত যাইয়া ভরত-মিলন দর্শন—কোমলপ্রকৃতি বাঙ্গালী ভদ্র নরনারীর পক্ষে অসম্ভব বিবেচনা করিয়া যতীন্দ্র বাবু পুলিসের ইঙ্গিতানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোটর থামাইয়া তাহাতে বসিয়াই ভরত-মিলন যথাসম্ভব দর্শন করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ হইবে, ইহা লোকমুখে অবগত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করিয়া ভাল অপেরা গ্লাস ছিল, তাহারই সাহায্যে ভরত-মিলন দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা মোটরের উপরেই বসিয়া উৎসুক নয়নে সেই জনতা-পরিবেষ্টিত-মিলন-মঞ্চের উপর প্রত্যাশিত ভরতমিলন দর্শনের শুভ অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

খুঁজি'ছি

তোমারে কি যায় দেখা
জীবন ধ'রে চেষ্টা ক'রে?
দেখাটি কি এম্‌নি কঠিন,
মেলে না তা যুগান্তরে?

পরাণের আকুলতা
খুঁজিতেছে তুমি কোথা,
চ'লে যায় কাল সে কেবল
দিনের পরে দিনের পরে।

সদাই আমার কাছে থেকে
আপনারে রাখছ ঢেকে,
অরূপ তোমার রূপের নেশায়
নয়ন আমার নিত্য ঝরে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন।

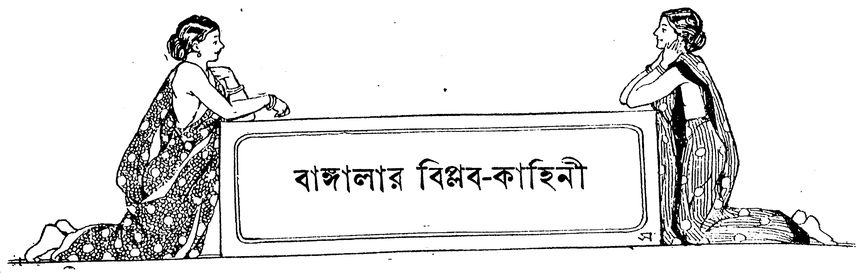

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের Morale

নরেন গোঁসাই নিহত হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আলিপুর জেলের এক নির্জ্জন প্রদেশে আমাদের সকলকে রাখা হয়েছিল। সারি সারি ৪৪টা কুঠরী আছে ব'লে ঐ ষায়গাটার নাম ৪৪ ডিগ্রী। কুঠরীগুলো প্রায় দশ ফুট লম্বা আর আট ফুট চওড়া। সুমুখে লোহার গরাদে দেওয়া একটা-মাত্র দরজা। প্রত্যেক কুঠরীর সামনে প্রায় আট ফুট দূরে আট ফুট উঁচু প্রাচীর। প্রত্যেক দুটো কুঠরীর মাঝে থেকে ঐ প্রাচীর অবধি আবার দেওয়াল অর্থাৎ প্রত্যেক কুঠরীর সাম্‌নে আট ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া একটুখানি উঠোন। তার সামনের দিকে দরজায় মোটা কাঠের একবাল কপাট, তার মাঝে প্রহরীদের উঁকি মেরে দেখবার জন্য একটা ছোট ফুটো। এই দরজাগুলোর সামনে চৌদ্দ পনের ফুট দূরে আবার চৌদ্দ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খুব লম্বা উঠান। এ যেন চিড়িয়াখানার মধ্যে খাঁচা। আলিপুর জেলের (এখন নাম হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেল) কয়েদীরা এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর নামে ভয়ে কাঁপে।

এর একটা ঐতিহাসিক গৌরব আছে। মণিপুরের স্বাধীন হিন্দুরাজা টীকেন্দ্রজিত, তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি আদি, ফাঁসী ও আন্দামানের আসামী হয়ে এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে বন্দি-দশায় ছিলেন। আর ঐখানেই ঐ ভাবে ছিলেন নাকি চীনা সম্রাটের ক্যান্টনস্থিত ভাইস্‌রয় "ইয়ে" (প্রায় ১৮৫৮)। আরও অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিও নাকি একে পবিত্র ক'রে গেছেন।

যাই হোক, ওখানে রেখে আমাদের খুব কম সম্মান দেওয়া হয় নি। একে ত আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগই ছিল অতি বড় সম্মানসূচক অর্থাৎ কিনা ব্রিটিশরাজ ভারতসম্রাট এচ,আই, এম, পঞ্চম জর্জ্জকে ভারত-সাম্রাজ্যের ন্যায়ানুমোদিত অধিকার-চ্যুত করবার জন্য যুদ্ধঘোষণার আয়োজন, ষড়যন্ত্র ও সে জন্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি মাল-মসলা গোপনে আমদানী ও প্রস্তুত। এ সেই জাতীয় অভিযোগ, যা নাকি কীর্ত্তিমান কৈজারের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। তার ওপর আমাদের সুরক্ষিত ক'রে রাখবার জন্য যত্ন-চেষ্টার যে রকম এলাহী ব্যাপার করা হয়েছিল, সে সৌভাগ্য বোধ হয়, জেলখানার কোন অতিথির ভাগ্যে জোটে নি।

চার জন স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী গোরা সৈন্য নিয়ত আমাদের হেফাজাত করবার জন্য ওয়ার্ডাররূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এদের উপর লালবাজার থানার এক জন গোরা সার্জ্জেণ্ট হয়েছিল চিফ ওয়ার্ডার। এদের অধীন প্রায় আট দশ জন হিন্দুস্থানী সিপাহী ওয়ার্ডারও ছিল। এ ছাড়া লম্বা উঠোনে পালাক্রমে দিনরাত রাইফেল ঘাড়ে পাহারা দিত বারো জন নাঙ্গা পঞ্জাবী অর্থাৎ হাইল্যাণ্ডার সৈন্য। এতেও দুশ্চিন্তা নাকি দূর হয় নি, তাই বড় দেয়ালের বাহিরে থাকৃত অনেক রাইফেলধারী গুরখা।

নরেনের হত্যার আগে অত সব কিছুই ছিল না। আমাদের প্রতি সরকারের, আগেকার ভাবগতিক দেখে আমাদের যে বিশেষ তেমন কিছু দণ্ড হবে ব'লে অথবা হলেও সে দণ্ড তেমন মারাত্মক হবে ব'লে মনেই হ'ত না। পরে ৪৪ ডিগ্রীর রকম-সকম দেখে আপনা হতেই অনেকের মনে হয়েছিল আমাদের মধ্যে সব ক'টি মাতব্বরকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়ে দেবে আর বাকী ছেলে-ছোকরাদের যাবজ্জীবনের তরে হবে আন্দামানবাস। তখন আমাদের আন্দামান সম্বন্ধে একটা অতি বিকট ধারণাই ছিল।

জেল ডিসিপ্লিন যে কি বীভৎস ব্যাপার, তা মালুম হয়েছিল তখনই—যখন শীতকালে প্রতিদিন ভোর ৫টায় এক ঘণ্টার সকলকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিছানা গুটিয়ে নিজের নিজের দরজার সামনে "এটেন্‌স্যান" হয়ে দাঁড়াতে হ'ত; হুকুমদার ওয়ার্ডার সাহেব দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেককে স্যালিউট করতে হ'ত। তার পরে ৫ মিনিটের মধ্যে ঝাঁট-পাট দেওয়া সেরে চৌবাচ্চা থেকে মাত্র একটি বালতী জল এনে, লোহার সরুচে-ধরা থালি কটোরা সাফ করা, দাঁত মাজা, স্নান করা ও কাপড় কাচা সারতে হ'ত। একটু দেরী হলেই অকথ্য রকমারী গালাগাল আর ধমকানী। সন্ধ্যার সময় তালাসী দিতে আর কুঠরী বদল করতে হ'ত। পরস্পর আলাপ ত দূরের কথা, চোখোচোখী হলেও গালাগালির অন্ত থাকত না। রাত্রিতে যাহারা বদলের সময় হঠাৎ ভীষণ শব্দে তালা নাড়া দিয়ে ডেকে জাগিয়ে দেখত, বেঁচে কি ম'রে আছি। আদালত থেকে আসবার সময় জেলের বড় ফটকে সকলের সাম্‌নে সমস্ত কাপড় ছেড়ে, পা ফাঁক ক'রে উঠ বোস হয়ে তালাসী দিতে হ'ত। এর আগে তিন মাস যাবৎ যে হরেক রকম উপাদেয় অপর্য্যাপ্ত খাবার আসত, তা তখন স্বপ্ন ব'লে মনে হ'ত। আর পেটের কষ্টটাই যে সব চেয়ে বড় কষ্ট, তার পূর্ণ উপলব্ধি তখনই হয়েছিল।

সব চেয়ে অসহ্য হয়েছিল কথা বলতে না পাওয়া। তখন পূজোর ছুটী; কাযেই আদালত যাওয়া ঘটত না। দিনের পর দিন, সব সময় শুয়ে ব'সে কেবলই চিন্তা আর চিন্তা! তাও আবার খালি দুশ্চিন্তা। সে কি ভীষণ!

চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে বন্ধ হওয়ার দু' তিন দিনের মধ্যে যদিও দেয়ালে টোকা দিয়ে, দু'পাশের কুঠরীর লোকের সঙ্গে আলাপের ফন্দি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তথাপি প্রথম প্রথম তা সহজসাধ্য ছিল না ব'লে সকলে তা পারত না। (কিছু দিন পরে অবিশ্যি এতে খুবই আলাপ চলত)। কাযেই দুশ্চিন্তার যাতনা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখন ব্যথার হা-হুতাশের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণের দু' একটা কথা এত জোরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত যে, পাশের কুঠরী থেকে তা বেশ শোনা যেত। তাতে অতীত জীবনের রহস্যসূচক শব্দ বা নাম, আর তখনকার নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণের ফলে, ভবিষ্যৎ আতঙ্কে মনে হঠাৎ উদ্ভূত সঙ্কল্প-প্রকাশক এমন কথাও বেরিয়ে পড়ত, যা শুনে তখন তাদের মানসিক অবস্থা কেমন, তা সহজে বুঝতে পারা যেত।

দেশহিতের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণাভোগেই যারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আর এই আত্মপ্রসাদকেই যারা জীবনের চরম আনন্দ ব'লে জেনেছে, তারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, এই বিচারাধীন অবস্থায় যখন এত, তখন সশ্রম কারা বা আন্দামানবাসরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হ'লে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখা একবারে অসম্ভব।

এ স্থলে কেউ এই সঙ্কট থেকে মুক্তির আশায়, এমন কি, ভ্রান্ত আশায়ও যদি স্বপক্ষদ্রোহিতা করে, তা হ'লে সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী একমাত্র তাঁরা, যাঁরা বিপ্লববাদ প্রচারের নেতা সেজেছিলেন। কারণ, তাঁরা স্বপক্ষপ্রীতি সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন শিক্ষা দেন নি, যা নাকি ৪৪ ডিগ্রির অতটুকু কষ্টের অবস্থাতেও আমাদিগকে অবিচলিত রাখতে পারত।

যে সনাতন ভাবের শিক্ষাতে আমরা সে-কাল হ'তে এ-কাল পর্য্যন্ত ওতপ্রোতভাবে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি, তার সঙ্গে স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয় অভ্যুদয়ের যোগাযোগ অসম্ভব।

যে সকল কারণে এ দেশবাসীকে স্বদেশপ্রীতিতে শিক্ষিত বা অভ্যস্ত করা দুঃসাধ্য, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কারণটি এই যে, স্বদেশ-প্রীতির একমাত্র লক্ষ্য জাতীয়-শ্রী বা অভ্যুদয়। এটা সম্পূর্ণ ইহলৌকিক বাস্তবিক (Materialistic) ব্যাপার। (তবে কারও আবশ্যক হ'লে এটাকে পারলৌকিক ব'লেও এই ভাবে ধ'রে নিতে পারেন যে, যদি পরলোক ব'লে কোন কিছু থাকে, তা হ'লে ঐজাতীয় শ্রীলাভ জন্য চেষ্টার ফলে, পরলোকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারলাভের সম্ভাবনাই বরং বেশী)। কিন্তু কোন ধর্ম্ম, বিশেষ ক'রে হিন্দু-ধর্ম্মের অস্তিত্বই নির্ভর ক'রে এসেছে উক্ত বাস্তব জাতীয় শ্রীকে অস্বীকার করার ওপর; কাযেই দেশ-হিতকল্পে দুঃখ-ভোগ-জনিত আত্মপ্রসাদলাভের আনন্দকেও অস্বীকার করতে কর্ত্তারা বাধ্য হয়েছিলেন।

জনসাধারণের মনে যে কোনও অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার স্পৃহা অর্থাৎ মানুষের অধিকারলাভের তীব্র ইচ্ছা জাগাতে হ'লে, সর্ব্ববিষয়ে তাদের যতটুকু উন্নত করা আবশ্যক, ততটুকু উন্নতিরও পথরোধক যে ধর্ম্ম, এ সত্য দুনিয়ার অতীত ইতিহাস প্রমাণ করেছে। আর একটা সহজ বুদ্ধিতে বোঝবার মত অকাট্য প্রমাণ এই যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা যদি ধর্ম্মের থাকত, অথবা ঐ শক্তিলাভের পথ রুদ্ধ করবার ক্ষমতা যদি ধর্ম্মের না থাকত, তা হ'লে স্বদেশী বিদেশী, স্বধর্ম্মাবলম্বী বা বিধর্ম্মী কোন শাসকই, শাসিতের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করবার হাঁক-ডাক ক'রে প্রতিশ্রুতি

দিতেন না, আর ধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা, পৃষ্ঠপোষক কিম্বা প্রবর্ত্তকও হতেন না।

স্বদেশ-প্রীতি আর ধর্ম্ম, অন্য কথায় জাতীয় অভ্যুদয় (কিম্বা ডেমক্রেশী) আর ধর্ম্মতন্ত্র, এ দুটি জিনিষের মধ্যে যে সম্বন্ধ, আলো ও আঁধারের মধ্যেও ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ বিদ্যমান। সস্তায় নেতৃত্ব করবার জন্য এ-দুটি বিরুদ্ধ ভাবকে গোঁজা মিল দিয়ে মেলাতে গিয়েই নেতারা এত লীলা প্রকট করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখনও হচ্ছেন।

এখন এই লীলা-রহস্য সংক্ষেপে বলি। নরেনের হত্যার দু'তিন সপ্তাহ পরে এক দিন আমাদের জেলার যোগেনবাবু এসে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লেন, "দোহাই মশায়, রক্ষা করুন। এই বুড়ো বয়েসে আপনাদের জন্য চাকরী গেল, পেনস্যান গেল; শেষে কি ঘানি টানিয়ে ছাড়বেন!" ব্যাপার কি জান্‌তে চাইলে বললেন, "আপনাদের 'অমুক' পুলিসের কর্ত্তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, জেলের ভেতর আপনারা যে সব কীর্ত্তি করেছেন, তা সব ব'লে দেবে। অরবিন্দ বাবুকে বললুম, তিনি কিছু জানেন না বললেন। এখন আপনারা কিছু উপায় না করলে" ইত্যাদি।

এর দু-তিন সপ্তাহ পরে ১৯শে অক্টোবর প্রথম জজ আদালতে যাওয়ার জন্য আমাদের অর্দ্ধেক আসামী যখন গাড়ীতে মিলিত হয়েছিলাম, তখন উক্ত জেলারের কথা তুলেছিলাম। উক্ত শ্রীমান্ 'অমুক' আমাদের সঙ্গে ছিল না। কর্ত্তারা বলেছিলেন, তাঁরাও ও কথা শুনেছেন, এ কথা চেপে রাখাই উচিত; এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে, তার চক্ষুলজ্জা চলে যাবে; আর তাকে Denounce করলে আক্রোশে পুলিসকে আরও বেশী ক'রে বলবে। বরং তাকে প্রেম ও সহানুভূতি দেখাতে হবে। অরবিন্দ বাবুও এতে সায় দিয়েছিলেন। নরেন গোঁসাইর বেলায়ও যে এই প্রেম আর Will-forceএর ব্যবস্থা হয়েছিল, তা পূর্ব্বে লিখেছি।

আমি যা আশা ক'রে কর্ত্তাদের কাছে এ কথাটা তুলেছিলাম, সেটা হচ্ছে কর্ত্তারা তাকে যুক্তি দেখিয়ে, তার বিবেকের দোহাই দিয়ে, তার ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট আবেদন জানিয়ে, স্বদেশপ্রেমিকতার মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে, স্বদেশ উদ্ধার জন্য কঠিনতম দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, এমন কি, সে জন্য ধন-প্রাণ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়ার মহিমা কীর্ত্তন ক'রে, পাশ্চাত্য স্বদেশ উদ্ধারকারীদের দুঃখ-কষ্ট নির্য্যাতন-ভোগের কীর্ত্তি বর্ণনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ক'রে, তার মতিগতি পরিবর্ত্তন করতে নিশ্চয় পারবেন। অথবা আমাদের নেতাদের পন্থাই যখন "ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধার" করা আর গীতাকে সেই ধর্ম্মশিক্ষার প্রধানতম গ্রন্থ ব'লে যখন অবলম্বন করেছেন, তখন এ-হেন স্থলে গীতাকে অব্যর্থরূপে কাযে লাগাবেন।

ঠিক এই রকম ধরণের অবস্থাতে অর্জ্জুনের দুর্ব্বলতা দূর ক'রে ফলাফল-বিচার-শূন্য-নিষ্কাম-কর্ম্মে প্রেরণা দেওয়ার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীতা নাকি গীত হয়েছিল। তাই আশা করেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণের এই ভাইস্‌রয়রা বচনের কেরামতির দ্বারা উক্ত শ্রীমানের দুর্ব্বলতা দূর করবেন। অথবা গীতার আশ্রয় নেওয়ার চাইতে আরও ভাল কায করতে পারবেন, যদি সেই শ্রীমান্ অমুককে উপলক্ষ্য ক'রে একটা নব্য গীতার সৃষ্টি করতে পারেন। তা হ'লে এই ব্যাপারটার একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেত।

কর্ত্তারা গীতার পরম ভক্ত হয়েও শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ না ক'রে, কিম্বা আমাদের সনাতন আর্য্য সভ্যতার আদর্শ রাজা রামচন্দ্র দাম্পত্য কলহেও প্রেমের বদলে সীতাদেবীর প্রতি যে নির্ম্মম দণ্ডের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, আমাদের কর্ত্তারা সেই আদর্শ রাজাবতারের নজীরও তুচ্ছ ক'রে, কল্লেন কিনা নবাব সিরাজদ্দৌলার অনুকরণ। সিরাজ প্রেমের দ্বারা, বিশ্বাসঘাতক শ্রীমান্ মিরজাফরের মতিগতি ফেরাতে চেষ্টার পরিণামে নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, প্রেমের বিধান কেবল দাম্পত্য বা ঐ রকম কোন কিছু কলহেই প্রশস্ত। অন্যত্র বড়ই বিপজ্জনক।

এই প্রেমের গ্যারাণ্টি দেওয়ার ফল শীঘ্রই ফলেছিল। চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে সি, আই, ডি-র বড় কর্ত্তা ডেমহাম সাহেব ও সামসুল মিঞা প্রভৃতির খুব ঘন ঘন শুভাগমন ও গোপন আলাপ সুরু হয়েছিল। একে একে অনেকে এই অযাচিত প্রেমের লোভ সম্বরণ করতে না পেরেই বুঝি, কে কত ইনফরমেশন দিতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চালাতে লাগল।

আদালতে আমাদের পক্ষসমর্থনকারী বড় বড় ব্যারিষ্টার উকীলরাও পাছে লোকে কিছু বলে, এই লজ্জায় আর ভয়ে অর্থাৎ প্রেস্‌টিজ রক্ষার জন্য "ঢাক ঢাক চাপ চাপ" নীতিরই ব্যবস্থা করলেন। এতে ক'রে প্রকারান্তরে এঁরাও ইন্‌ফরমেশন দেওয়ার সুধু প্ররোচনা নয়, পরন্তু ইনফরমেশন দেওয়া-জনিত গর্হিত কাযের জন্য লোকনিন্দার বদলে দোষ গোপনের আর প্রেম ও সহানুভূতির গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন।

এই গ্যারাণ্টি পেয়ে ইন্‌ফরমার ও তাদের সাহায্যকারীরা এমনই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়েছিল যে, এই ইন্‌ফরমেশন দেওয়া উচিত ব'লে দাবী করতে একটুও লজ্জাবোধ করেনি। আমাদের মধ্যে দু'এক জন এর প্রতিবাদ করাতে ভীষণ ঝগড়াঝাটিও ঘটেছিল। সব চেয়ে মজার কথা এই যে, প্রতিবাদ করবার কি অধিকার আছে, এই প্রশ্ন উঠেছিল। অবশেষে ইন্‌ফরমেশন দেওয়া বৈধ কি না, এই সমস্যার মীমাংসার জন্য ঋষিতুল্য নিরপেক্ষ অরবিন্দ বাবুর মতামত প্রার্থনা করা হয়েছিল। তিনি যা বিধান দিয়েছিলেন, তার সার মর্ম্ম হচ্ছে, ইনফরমেশন দিয়ে মুক্তিলাভের পর বেশী ক'রে দেশের কায করলেই এই ইনফরমেশন দেওয়া-জনিত সামান্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। নেড়া যে আবার বেলতলায় যায় না, অর্থাৎ আবার বেশী ক'রে দেশের কায ক'রে বেশী বিপদের মুখে যাবে, তার সিকিউরিটি যে কতটুকু, দেশের কায করতে গিয়ে যেই ধরা পড়বে, সেই যে এই বিধানের বলে ইনফরমেশন দিয়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে না বা সবাই এরূপ চেষ্টা করলে যে ইন্‌ফরমেশনের মূল্য থাকবে না, কাযেই মুক্তিলাভও ঘটবে না, এই সহজ কথা সেই হেতু তখন বোধ হয় কেউ ভেবে দেখেননি, যেহেতু, তখন জানা ছিল না, আমাদের দেশের জেলখানা রাজদ্রোহীদের পক্ষে কি রকম অব্যর্থরূপে রিফর্‌মেটারী (reformatory)। আর এও জানা ছিল না, ইন্‌ফরমেশন দেওয়ার ফলে মুক্তিলাভ করবার পর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য বেশী ক'রে দেশের কায কেউ করতে পারে কি না। কারণ, তখনও এর নমুনা দেখাবার সুযোগ এ দেশে কারও বোধ হয় ঘটেনি। বিশেষতঃ অরবিন্দ বাবুর কথা পৃথক্। কারণ, তিনি যে বৈপ্লবিক গুপ্ত ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, তা সকলেই জানেন। কিন্তু অন্যের পক্ষে এই যুক্তি মেনে নেওয়া কি ক'রে সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ খুঁজে বের করবার ভার তত্ত্ববিদ্‌দের ওপর দিয়ে উক্ত প্রেমপন্থীদের এক জনের মুখে যা শুনেছিলাম, তা বলি। ইন্‌ফরমারদের প্রতি যারা প্রেম ও সহানুভূতি দেখায়, সেই আসামীরা মনে করে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে কিছু বল্‌বার প্রবৃত্তি ইনফরমারদের হবে না। ইনফরমারদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করলে কিংবা তাদের কুকাযের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করলে তারা নিশ্চয় বিদ্বেষকারীর বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে বেশী ক'রে লাগাবে, আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের মত বদলিয়ে দিলে বা দেবার চেষ্টামাত্র করলেও পুলিস তা জানতেই পারবে, তখন সেই মতিপরিবর্ত্তনকারীর উপর পুলিস প্রতিশোধ নেবেই। এই ভেবেই না কি কর্ত্তারা গীতার ভক্ত হয়েও শ্রীকৃষ্ণের পন্থা অবলম্বন করতে পারেননি।

জগতে বড় বড় কর্ম্মবীরের অনুকরণে এঁরা হয় ত মনে করতেন বা এখন তাঁদের হয়ে কেউ দাবী করতে পারেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে, বিশেষ ক'রে বৈপ্লবিক ব্যাপারে মামুলী উচিত অনুচিত জ্ঞানের তৌলে, আগে থেকে কায করা চলে না। সেই কাযের শেষ জয় বা পরাজয়ের দ্বারাই তা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। এই বড়লোকী মতের অনুবর্ত্তন ক'রে এখন দেখা যেতে পারে। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত কায করবার মত লোকের অভাব হয়েছে কি না, এই অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর বাহুল্য মাত্র। এ ছাড়া দেশসেবার কি রকম ব্যবসা সুরু হয়েছে, অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে দরিদ্র দেশবাসীকে সদ্য রক্ষা করবার জন্য বা তথাকথিত স্বরাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নামে হরেক রকম ফণ্ড খুলে, তাতে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ টাকায়, সে-কাল হতে এ-কাল পর্য্যন্ত কতটুকু দারিদ্র্য নিবারিত হয়েছে বা হবার আশা হয়েছে, আর স্বরাজ কতদূর এগিয়ে এসেছে, অথবা তাতে ক'রে কত চোর, জুয়াচোর, জালিয়াৎ, অপব্যয়কারী, ভক্তপালক, ভণ্ড ইত্যাদি তয়ের হয়েছে, তা পূর্ব্বোক্ত "বেশী ক'রে দেশহিতকর কাযের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা" রূপ নীতি, এই "ঢাক ঢাক চাপ চাপ" নীতি এবং প্রেম আর সহানুভূতির গ্যারাণ্টি, এই ত্রিনীতির কল্যাণে কিনা, তা ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

এ ছাড়া আরও ভারী মজার কথা এই যে, এখন নেতারা যে এই ত্রিনীতির প্রভাবে এ-হেন সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন দেশেও কায খুঁজে পাচ্ছেন না, তা প্রকট হয়ে পড়ে তাঁদের যত সব অকাযের ফর্দ্দ আর তাতে মস্তিষ্কের অপব্যবহার থেকে; যথা বৃথা অতীত গৌরবের রোমন্থন, বাহিরে তার অন্বেষণ, বিদেশীর কৃত তার অতিরঞ্জনের বিঘোষণ, পাশ্চাত্যবাসীকে আমাদের সভ্যতার কি কি দান করতে হবে, আর কেমন ক'রে করতে হবে, তার উদ্ভাবন ও আয়োজন ইত্যাদি।

যাই হোক্, তার পর এক দিন তদানীন্তন বাঙ্গালার মাননীয় লাট সার এডওয়ার্ড বেকার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের বোধ হয় জানুয়ারীতে আমাদের মধ্যে চার জনকে পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ বাবু, ইন্দ্রনাথ নন্দী

(লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এন, নন্দীর সন্তান) আর বালকৃষ্ণ হরিকানে। পাত্র-মিত্র সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দূরে রেখে, লাট সাহেব সটান সামনেকার উঠোন পেরিয়ে গেছলেন। কুঠরীর গরাদে ধ'রে মৃদুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রে যা বলেছিলেন, তার মর্ম্ম যতটুকু মনে আছে, তা হচ্ছে—আমরা যখন উচ্চ শিক্ষিত, বিশেষ ক'রে য়ুরোপীয় শিক্ষা যখন পেয়েছি, আর উচ্চবংশজাত, তখন আমাদের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের আনীত ঐ মোকর্দ্দমায় গভর্ণমেণ্টকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। সকলের সঙ্গে ঠিক এ রকম আলাপ হয় ত হয়নি। সকলের সঙ্গে ভূমিকাটা বোধ হয় এই রকমই ছিল।

য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডার আমাদের অনেককে প্রথমে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখত, এক জন প্রভাস ও আমায় অকথ্য গালাগাল দিয়ে প্রায়ই বলত, সরকারের নিকট প্রার্থনা ক'রে আমাদের জল্লাদ নিযুক্ত হবে; তার পর নিজ হাতে আমাদের ফাঁসী দিয়ে ধন্য হবে। সে অরবিন্দ বাবুকেও এক দিন অপমান করতে দ্বিধাবোধ করেনি। সে অত্যন্ত গোঁয়ার ছিল ব'লে সকলে তার নাম রেখেছিল "রাফিয়ান।" সেই রাফিয়ান কিন্তু কয়েক দিন পরে আমাদের অনেকের পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। আরও দু'এক জন য়ুরোপীয় ওয়ার্ডারের রাফিয়ানের মত এমন একটু মহৎ হৃদয় ছিল, যা আমাদের মধ্যে বড়ই দুর্ল্লভ। আমাদের মধ্যে যারা পুলিসকে ইন্‌ফরমেশন দিত, তাদের এরা এমন বিদ্বেষ ও ঘৃণা করত যে, তারা পুলিসকে যা বলত, তা শোনবার চেষ্টা করত, আর আমাদের মধ্যে যারা পুলিসের সঙ্গে ও রকম সম্বন্ধ স্থাপন করতে ঘৃণাবোধ করত, তাদের তা ব'লে দিয়ে সহানুভূতি দেখাত, আমাদের মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত অনেক খবরও দিত, আর অনেক সাহায্যও করত।

লাট সাহেবের পরিদর্শনের কয়েক দিন পরে শোনা গেল, অরবিন্দ বাবুকে জেলের কুঠরীর মধ্যে কিছু লেখবার জন্য কাগজ-কলম দেওয়া হয়েছিল। আমাদের গোচর থেকে এই ব্যাপারটা গোপন করতে গিয়ে অকারণ এমন বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিল যে, আমাদের সন্দেহের উদ্রেক না হয়ে পারেনি। হঠাৎ নিতান্ত অসাধারণভাবে ৪৪ ডিগ্রির ফাটক থেকে অরবিন্দ বাবুর কুঠরী পর্য্যন্ত সবগুলো উঠোনের সামনের দরজা মায় তার ফুটো, উপরো-উপরি দু-বার বন্ধ করা হয়েছিল দেখে এর তথ্য জানবার প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল। রাফিয়ান সত্য কিছুই জানাতে সাহস করে নি। পরে এই পর্য্যন্ত জেনেছিলাম, অরবিন্দ বাবুর জন্য কাগজ-কলম আদি নিয়ে যাওয়া-আসা ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোপন করবার জন্যই ঐ ব্যবস্থা হয়েছিল। অথচ দরজা না বন্ধ ক'রেও আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে এই সামান্য কাযটা সম্পন্ন করতে অনায়াসে পারত।

পরে কোর্টে যাওয়ার সময় গাড়ীতে অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম, তিনি কিছু লিখেছেন। এর বেশী কিছু জানতে পারি নি। তিনি যখন আমাদের দলভুক্ত নন, তখন এই সামান্য ব্যাপার এত গোপন করবার কারণ বুঝতে পারি নি।

যাই হোক, এর কয়েক দিন পরে ঐ লেখা ব্যাপারটা সংক্রামক হয়ে পড়েছিল। তার পর অনেকের পিতা ও অভিভাবকরাও লাট সাহেবের কাছে তাঁদের ছেলেদের কি সব লিখে পাঠাবার জন্য বিশেষ ক'রে জিদ করেছিলেন। কোর্টে ব্যারিষ্টার সাহেবরা (বিশেষ ক'রে দেশবন্ধু) শুনে তাঁদের পরামর্শ ব্যতীত ও-রকম লিখতে, এমন কি, অনুনয় ক'রেও নিষেধ করেছিলেন। অর্থাৎ গোড়াতে আমাদের মধ্যে যে Morale ব'লে জিনিষটা ছিল, তা তখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছল।

ও দিকে খবরের কাগজে আমাদের বীরত্ব ঘোষণার আর তারিফের অন্ত ছিল না। অর্থাৎ গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের যে আমরা সম্পূর্ণ আদর্শ কর্ম্মী, আমরা সুখে দুঃখে যে একবারে সম্পূর্ণ সমজ্ঞান জীবন্মুক্ত পুরুষ, তা দেশের লোক সংবাদপত্রের মারফত জেনে ধন্য হয়ে যাচ্ছিল।

এ ধারে আমরা প্রথমে সেসন আদালতে গিয়ে দেখলাম, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় দলের আট জনের মধ্যে ছয় জন সেসন সোপর্দ্দ হয়ে আমাদেরই দলভুক্ত হয়েছেন। বাকী দু'জনের এক জন চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, ফরাসী রিপাব্লিকের অধিকারভুক্ত স্থানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অপরাধে তাঁর গ্রেপ্তার, ইণ্টারন্যাসেন্যাল আইন বিরুদ্ধ ব'লে, স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যোমকেশ তাঁর মুক্তির দাবী করাতে জজ সাহেব মিঃ বিচক্রফট সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। পরে না কি এই আইন অমান্য করার জন্য ফরাসী সরকার খেসারত আদায় করেছিলেন। অন্য এক জন যিনি বেকসুর খালাস হয়েছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন না কি তিনি নিরালম্ব স্বামী। ইনি পূর্ব্বে এক জন নেতা ছিলেন। পরে না কি বারীনের সঙ্গে ঝগড়া আদির ফলে রাষ্ট্রনৈতিক মত বদলে সনাতন প্রথা অনুযায়ী হয়েছিলেন সন্ন্যাসী।

এই দলের মধ্যে দু'জন ছাড়া বাকী সকলেই অল্পাধিক না কি বৈপ্লবিক নেতা ব'লে ধৃত হয়েছিলেন। চারু বাবু জেলর পক্ষ ও সি, আই, ডি কর্ম্মচারীর সামনে, "বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে" ব'লে না কি কেঁদে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়তেন। সুতরাং তখন মনে হয়েছিল, উনি যদি আমাদের গুপ্ত সমিতির নেতা হতেন, তা হ'লে আমাদের হয় ত বোধনে বিসর্জ্জন হ'ত না। সত্য সত্যই না কি তাঁর মনের অবস্থা তখন ঐ রকমই হয়েছিল। আমি তাঁর সম্বন্ধে তখন কিছুই জানতাম না। তাই মনে হয়েছিল, এ সব তাঁর গুপ্তসমিতির সভ্যদের অভ্যাসসুলভ কঠিন ন্যাকামী।

মর্ব্বদসমেত আমরা ছত্রিশ জন আসামী তখন রইলাম। একখানা কয়েদী যান (Prison Van) গাড়ীতে আঠার জন ক'রে দুবারে আদালতে নিয়ে যেত। অবশ্য প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া থাকত। হাতকড়াগুলো আবার একটা লম্বা শেকলে গেঁথে গাড়ীর সঙ্গে তালা দিয়ে আটকান থাকত।

দ্বিতীয় দিন গিয়ে দেখি, আদালত-গৃহের এক কোণে জজ সাহেবের সুমুখের দিকে প্রায় ৬´×১০´ ফুট স্থান আমাদের বসবার জন্য লোহার জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের পুরে দিয়ে তালা বন্ধ করা হ'ত। এই জালের তার কেটে নিয়ে চাবি তৈরী ক'রে মুহূর্ত্তমধ্যে হাতকড়া খুলে ফেলা যায়। পুলিস হায়রান হয়ে অগত্যা ঐ খাঁচার মধ্যে থাকতে আর হাতকড়া দিত না।

অরবিন্দ বাবুকে সমর্থন করবার প্রথমে ভার নিয়েছিলেন মিঃ ব্যোমকেশ। তিনি আইনের মারপেঁচে আমাদের মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হ'ল। কম ফিতে হাইকোর্ট ছেড়ে নিম্ন আদালতে থাকতে রাজী হলেন না। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে হয় হ'ল। তিনি এককালীন অগ্রিম ছ'হাজার টাকা এবং মোকর্দ্দমা শেষ করতে ১২ হাজার টাকা দাবী করেছিলেন। তখন অরবিন্দ বাবুর ভগিনী শ্রদ্ধেয়া কুমারী সরোজিনী ঘোষ দাদার পক্ষসমর্থনের জন্য চাঁদা সংগ্রহের 'ফাণ্ড' খুলে দিলেন। তাতে সে যাবৎ লব্ধ টাকা ব্যারিষ্টার সাহেবকে বিদায় দিতে ব্যয়িত হয়ে গেছল। অথচ সেই দিনই ছ'হাজার টাকা চাই। কারণ, পরদিন মোকর্দ্দমা চলবার কথা ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মশায়ের মুখে পরে শুনেছি, এক জন সহৃদয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে বলা মাত্রেই ছ' হাজার টাকা তক্ষুনি দিয়েছিলেন।

তখন যা শুনেছিলাম, তাতে মনে হয়, উক্ত ফাণ্ডে না কি উঠেছিল চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা। অরবিন্দ বাবু ছাড়া বারীন, উল্লাস, উপেন প্রভৃতি আরও দশ বারো জনের পক্ষসমর্থনের ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ ফাণ্ড থেকে। মিঃ আর, সি, ব্যানার্জি ব্যারিষ্টার না কি বিনা ফিতে, আর কয়েক জন অল্প ফিতে রাজি হয়েছিলেন। বাকী সকল আসামীকে যে যার পথ দেখতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেইমত অনেকে আপন আপন বাড়ীর অবস্থানুযায়ী উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেই থোক-থাক টাকাতে একেবারে চুক্তি ক'রে নিয়েছিলেন। কেবল সহৃদয় স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন মশায় বিনা ফিতে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকলের জন্য মোকর্দ্দমা তদ্বিরের সমস্ত ভার নিয়েছিলেন। তিনি যে রকম আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম ও যত্ন করেছিলেন, মাতৃপিতৃ-দায়েও বোধ হয় এত কেউ করে না। ফি ছাড়া মোকর্দ্দমা তদ্বিরের অন্যান্য বিস্তর খরচ সকলের নিকট হারাহারি আদায় করা হয়েছিল।

যে সকল আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্য অর্থাভাবে উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি, তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ দুই ভাই নগেন ও ধীরেন কবিরাজ, যাদের দোকানে উল্লাস বোমা তৈরীর মাল-মসলা-পূর্ণ কয়েকটি বাক্স রেখে এসেছিল। ঐ বাক্সগুলোতে কি ছিল, বেচারা কবিরাজরা কিছুই জানত না। এই দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে অস্ত্র-আইনের মামলায় হাইকোর্টের বিচারে এক দফা সাত সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড তারা লাভ করেছিল। তার পর আমাদের ষড়যন্ত্রের মোকর্দ্দমায় লিপ্ত ব'লে সেসন সোপর্দ্দও হয়েছিল। তাদের অবস্থা নেহাতই অস্বচ্ছল ছিল। তাই তাদের পক্ষ-সমর্থনের কোন ব্যবস্থা হয় নি। এদের সঙ্গে আরও কয়েক জন ধৃত হয়েছিল। তাদের অবস্থা বোধ হয় স্বচ্ছল ছিল, তাই তাদের বাড়ীর খরচে উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হয়েছিল।

নিজ দোষ স্বীকার ক'রে আবার নির্দ্দোষ প্রমাণ করবার জন্য উকীল-ব্যারিষ্টার নিয়োগ আদির দ্বারা পক্ষ-সমর্থন চেষ্টার

যে কোন কারণ দেখান হউক না কেন, তা যে অকারণ কার্য্য, তা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। পরন্তু যেখানে অনেকের খালাস পক্ষসমর্থনের ওপর নির্ভর করছিল আর অর্থাভাবে তা যেখানে হচ্ছিল না, সেখানে অকারণ নিজেদের পক্ষ-সমর্থনের ব্যয়টা যে উক্ত ফাণ্ড থেকেই হচ্ছিল, তা কর্ত্তারা জানতেন। কবিরাজদের এ-হেন আপদের জন্য দায়ী কারা, তাও জানতেন,আর তাদের মত নির্দ্দোষ আসামীর পক্ষ-সমর্থন না হ'লে যে আরও [illegible] ভাবনা ছিল, তাও জানতেন। এই সব জেনে [illegible] নিজেদের সমর্থনের সুবিধা আর কাউকে [illegible] কবিরাজদের দেওয়া উচিত ছিল। তা যে দিলেন [illegible], তার কারণ কি এ নয় যে, খালাসের আশাতেই প্রথমে দোষ স্বীকার করেছিলেন? তাতে কিছু হ'ল না দেখে অবশেষে আবার খালাসেরই জন্য অন্ধ হয়ে (যেমন সাধারণ আসামীরা নিত্য হয়ে থাকে) ব্যারিষ্টারের কেরামতীর ওপর বৃথা আশা করেছিলেন।

বোধ হয়, খবরের কাগজে এই ব্যাপারটা প'ড়ে সদ্য বিলাত থেকে আগত এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার মিঃ পরমেশ্বর লাল কবরেজদের পক্ষসমর্থন জন্য এসেছিলেন। আর স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মশায়ও শেষে দয়া ক'রে এই ব্যারিষ্টারকে সাহায্য করেছিলেন।

কর্ত্তাদের কাছ থেকে ইন্‌ফরমেসন সংগ্রহ ক'রে পুলিস নাগপুর থেকে বালকৃষ্ণ হরিকানেকে ধ'রে এনে আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। তার অবস্থাও কবিরাজদের মত হয়েছিল। অথচ কানের মত আসামীরই পক্ষসমর্থনের দ্বারা খালাসের আশা ছিল। বাড়ী থেকে সাহায্য পাওয়াতে হাইকোর্টের আপিলে বেচারী মুক্তিও পেয়েছিল, তবু এক বছর হাজত-বাস ছাড়া, সাত মাস যাবৎ বেড়ী প'রে সশ্রম কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। আরও কয়েক জনকে প্রায় এই রকম [illegible] পড়তে হয়েছিল।

যাই হোক, নেতাদের সঙ্গে চেলারা ধরা পড়লে, ভালমানুষী দেখাবার জন্য দরকার হ'লে চেলাদের দোষও প্রকাশ করবেন, আদালতে বিচারের সময় পক্ষসমর্থনের সমস্ত সুবিধা নিজেরা ভোগও করবেন, আর চেলাদের দয়াময় ভগবানের কৃপার ওপর ছেড়ে দেবেন, এ সর্ত্ত বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষাকালীন চেলাদের জানিয়ে দিলে কেমন হ'ত?

বিশেষ ক'রে বাঙ্গালার বিপ্লব-প্রচেষ্টা সফল হ'লে, ঐ নেতাদের দ্বারা যে নূতন আধ্যাত্মিক স্বরাজ গড়ে উঠত, তার ন্যায়ের বিধানটা কেমন সুষ্ঠু হ'ত, সেইটাই এখানে বিশেষ ক'রে প্রণিধানযোগ্য। আসলে অপ্রিয় হ'লেও এটা অতি সোজা সত্য কথা যে, বিবেক ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নাই, অর্থাৎ আমাদের চিন্তাশক্তি পরাধীন। আমরা যা চিন্তা [illegible] যে কায করি, তা পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ভগবানের প্রদত্ত পুরস্কারের আশা এবং দণ্ডের ভয় দ্বারা কতকটা চালিত হয়ে করি। তাতে আমরা অনেকে মনে করি, ভগবান্ সি, আই, ডি, পুলিসের মত, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীবগুলি ভাল কায করছে কি মন্দ কায করছে, দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা তার খোঁজ ক'রে কাউকে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়ে দিচ্ছেন, আর হাকিমের মত কাউকে দণ্ড বা এক তরফা ডিগ্রির বিধান দিয়ে, আবার পুলিস কিংবা জল্লাদের মত তা কাযে পরিণত করছেন। তার পর অপেক্ষাকৃত একটু কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিরা ভগবানের ওপর এই দণ্ড-পুরস্কারের কাযটা আরোপ করা অর্ব্বাচীনতা মনে ক'রে, ভগবান্‌কে এ কায থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য যে কাযে নিয়োগ করেছেন, সেই কাযটা হচ্ছে, ঐ নিয়োগকারীদের, তাঁর প্রতি ভক্তির মাত্রানুযায়ী আনন্দ আর কখনও কখনও না কি দর্শন দেওয়া। এ ছাড়া অনেকে ভগবান্‌কে আরও অনেক কাযে লাগিয়ে থাকেন।

যাই হোক্, আমরা দেশের কায বা অন্য কিছু করবার বেলায় ভগবানের প্রদত্ত পুরস্কারের প্রলোভন আর দণ্ডের ভয় অপেক্ষা পুলিস আর আইন-আদালতের ঢের বেশী ভয় যে করি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এত অধিক পুলিস আর হাকিমের অস্তিত্ব। আবার পুলিস আর হাকিম আদির চাইতেও পার্শ্বিক লোকনিন্দাকে আরও ঢের বেশী ভয় যে করি, তার প্রমাণ, সাহানশা ইংরাজ বাদশার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী পুলিস কর্ত্তার অভয় পেয়েও ভগবানের বিশেষ ভক্ত—আমাদের কর্ত্তা লোকনিন্দার ভয়েই "ঢাক ঢাক চাপ চাপ" নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পাপ-পুণ্যের বিধাতা ভগবান্, কর্ম্মফল, পরকাল ও পরকালে কর্ম্মফল-ভোক্তা আত্মা, এই কটি জিনিষ, যা নিয়ে শুধু ভক্তদের জন্যই ধর্ম্ম তয়ের হয়েছে, ধর্ম্মের ধ্বজাধারী নেতারা তা যে বিশ্বাস করেন না, তার প্রমাণ, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থের হানি করবার বেলায় ধর্ম্ম, তুরীয়ানন্দ, ভগবানের আদেশ, তাঁর আদর্শ অথবা বিবেকাদির কোনটাই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। তাঁদের কেবল একমাত্র গ্রাহ্যের বিষয় হয়েছিল—লোকনিন্দার ভয়। লোকের চক্ষু এড়াবার আপাতসম্ভাবনাও থাকলে দেশ-উদ্ধারকারীদের অনেকে না পারেন, এমন দুষ্কর্ম্ম কিছুই নাই। টাকা-কড়ির অপব্যবহার, অপব্যয়, চুরী, জুয়াচুরী, এ সব অতি সামান্য কথা; এ সব হয় ত তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। এর চেয়ে যা না কি শতগুণে সমাজের অনিষ্টকর, সেই ভাবের ঘরে চুরী জুয়াচুরী করছেন, ধরাও পড়ছেন। ভক্তির দেশ। হাড়-মাস-রক্তই হোক বা কাঠ-পাথর-রাংতাই হোক, সাকার না হ'লে আমাদের ভক্তি উথলোয় না। ভাব বা আদর্শ না কি আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খায় না। কাযেই ভাবের ঘরে চুরী-চামারী হ'লে আমাদের একটুও বাধে না। ভাবের বিপর্য্যয় ঘটলেও সেই ভাবাধার শরীর, বিশেষ ক'রে আমাদের ভক্তির কেন্দ্রস্থল শ্রীচরণখানির কোন পরিবর্ত্তনই দেখতে পাই না। তাই নেতারা যা-ই করুন, তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তি অটুট থাকে। তাঁদের পূজা ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়। এ রকম সিকিউরিটী আছে বলেই ত নেতারা এত বেপরোয়া, এত বিবেকহীন।

নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা অবধারিত মঙ্গলকর কায করে, সে জন্য লোকমত বিশেষরূপ নিন্দিত হ'লেও আত্মপ্রসাদ লাভে পরম তৃপ্তি, আর লোকমতে নিন্দিত নয়, বরং বিশেষ প্রশংসিত, এমন কিছু করে, নিজের বিচারবুদ্ধিতে বা বিবেকের দংশনে যা মন্দ ব'লে জেনে আত্মগ্লানির অনুভূতি, এই দুটি জিনিষের আমাদের মধ্যে বড়ই অভাব কেন? যেহেতু, কার্য্যত দেখতে পাই, আমাদের ভাল মন্দ কায বা চিন্তার প্রবর্ত্তক অথবা পরিচালক প্রধানতঃ লোকমতের নিন্দা আর স্তুতি। আবার লোকমত আমাদের ধর্ম্মের বা শাস্ত্রের অথবা পরম্পরা-নিয়মিত লোকাচার দ্বারা চালিত। শাস্ত্র আর আচার সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থপ্রণোদিত। শাস্ত্র আবার এমন বস্তু, যাতে খুঁজে নিতে পারলে হাঁ আর না উভয় বিধান পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিধানের দৌলতে এমন গর্হিত কায নাই, যা আমাদের চোখের সামনে নিত্য অবারিত আচরিত হচ্ছে না। অথচ সে জন্য আমাদের একটুও আত্মগ্লানির অনুভূতি নাই।

অন্যদিকে সমাজের মঙ্গলজনক কায বা দেশসেবারূপ মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পালন করতে যাই—কেবল লোকপূজা পাবার আকাঙ্ক্ষায়। যদি তা না হ'ত, তবে শুধু চুয়াল্লিশ ডিগ্রির দুঃখ নয়, দেশসেবার জন্য অনিবার্য্য দুঃখ, কষ্ট, নির্য্যাতন যত অধিক ভোগ করতাম, ততই পরম তৃপ্তি লাভ ক'রে জীবন সার্থক মনে করতে পারতাম।

যাই হোক, এই ভাবে দু-পক্ষের বিচার অবিচারে সেসন আদালতের পালা সাঙ্গ হ'ল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে। আমাদের মধ্যে ১৭ জনের বে-কসুর খালাস হ'ল। বাকী ১৯ জনের মধ্যে বারীন ও উল্লাসের হয়েছিল ফাঁসীর হুকুম। উপেন, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, সুধীর, ইন্দু (পোর্টব্লেয়ারে আত্মহত্যা করে), অবিনাশ, [illegible] ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাস, অধিকন্তু সম্পত্তি [illegible]। নিরাপদ (পরে মৃত), শিশির, পরেশ দশ বছর দ্বীপান্তর। [illegible] (পরে মৃত), বালকৃষ্ণ (পরে মৃত), সাত [illegible] দ্বীপান্তর। কৃষ্ণজীবন (পরে মৃত) এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিল। অশোক নন্দী থাইসিস্ রোগে বিচার শেষ হওয়ার আগেই মারা যায়।

যারা ছাড়া পেল, তাদের সঙ্গে সদ্য দণ্ডিতদের শেষ বিদায় পনের কি বিশ মিনিটের মধ্যে সারতে হয়েছিল। সে কি মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার! সত্যকার চোখের জল ফেলবার লোক থাকলে অতি দুঃখও যে মধুর হয়, অর্থাৎ যত বড় দুঃখই হোক আর যতকাল স্থায়ী হোক, সেই চোখের জলের স্মৃতি সেই দুঃখটাকে যে মাধুরী-মণ্ডিত ক'রে দেয়, তা সে দিন দেখে মনে হয়েছিল। অনেকেরই সে সৌভাগ্য হয়েছিল; আবার অনেকে সে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়েছিল।

তার পর চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে ফিরে এসে বন্দিবেশে সাজতে গিয়ে বন্দি-জীবনের বাস্তবতার উপলব্ধি হয়েছিল। সাত আট পাউণ্ড ওজনের বেড়ী দ্বীপান্তরের যাত্রীদের দুপায়ে রিভেট ক'রে দিল। এক হাত ঝুল-বিশিষ্ট জাঙ্গিয়া পরতে হ'ল। বেড়ী পায়ে জাঙ্গিয়া পরা, সে এক সমস্যা। তার পর মাথাটি মুড়াল। গলায় একটা লোহার হাসলি পরিয়ে দিয়ে তাতে একটা কাঠের তক্তি লাগিয়ে দিল। তাতে লেখা ছিল ১২ ক ১২২, আর ছিল নামের বদলে একটি নম্বর। চলতে ঠুন-ঠান শব্দে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

রাত্রিতে শুতে গিয়ে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। কোন উৎসবের রাত্তিরে আমাদের কুলবধূরা পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথার চুল অবধি, কত রকম খোঁচ-খেঁচবিশিষ্ট গয়না প'রে যদি তৃপ্তি সহকারে ঘুমোতে পারেন, তবে আমাদের মোটে দুখান গয়নাতে জ্বালাতন হ'তে লজ্জা বোধ করা উচিত।

এর পর চুয়াল্লিশ ডিগ্রির অবস্থা ক্রমে আরও নিদারুণ হ'তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সি, আই, ডির শুভাগমনও ততই ঘন ঘন হ'তে লাগল। আর আপীলে খালাসের আশাও তত গজাতে সুরু হ'ল।

অবশেষে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের বোধ হয় ডিসেম্বরের প্রথমে হাইকোর্টের রায় বেরোল। বারীন ও উল্লাসের ফাঁসী ফেঁসে গিয়ে হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উপেন আর আমার সাবেক রায় বাহাল থাকল। হৃষীকেশ, ইন্দু, বিভূতি দশ বছর আর বীরেন, সুধীর, অবিনাশের সাত বছর দ্বীপান্তর। নিরাপদ, পরেশ, শৈলেন পাঁচ-পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ পেয়েছিল।

দ্বীপান্তরের যাত্রীরা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর আলিপুর হ'তে রওয়ানা হ'ল।

এই যাবজ্জীবন কথাটার আবার ব্যাখ্যা আছে। উত্তেজনাবশে কোন্ অপরাধ করার জন্য যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হয়, সে যাবজ্জীবন মানে ২০ বছর। আগে থেকে মতলব এঁটে বা দল বেঁধে কোন অপরাধ করলে যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, তার মানে ২৫ বছর; পরে যদি সরকার বাহাদুরের খুসী হয়, তবে ছাড়া পেতেও পারে। এ রকম কয়েদী ক্বচিৎ কখনও খালাস পেলেও সকলে খালাসের আশা করতে পারে, আর সেই আশাতেই বেঁচে থাকা সম্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের বেলা যাবজ্জীবন কথাটার অর্থের ব্যতিক্রম ঘটে না। মৃত্যু পর্য্যন্তই দ্বীপান্তরে শুধু থাকতে হয় না, অতি কঠিন শ্রম-ভীষণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এই যাবজ্জীবনের ধারণাটাই এত অধিক ভীষণ যে, তার তুলনায় পিনালকোডের সমস্ত দণ্ড একত্র করলেও অতি তুচ্ছ।

কোন বিষয়ের একটুমাত্র অংশ দেখে সমস্তটার ধারণা ক'রে নেওয়াকে অন্ধ-হস্তিন্যায় বলা হয়। বাঙ্গালায় বিপ্লব কখনও ঘটে নাই, তার আবার কাহিনী কি? ইহার 'বাঙ্গালায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' নামই থাকা উচিত। আমাদের এই বিপ্লব-প্রচেষ্টারও অনেক দিক ছিল। এর যে একটা দিক মাত্র সাধারণে দেখেছেন বা দেখান হয়েছে, সেটা হচ্ছে বাইরে এমন একটা দিক, যা দেখে শুনে বাঙ্গালী আমরা বেশ গৌরব অনুভব করছি, আর একটা সস্তা আশায় বুক বেঁধে নিশ্চিন্ত আছি যে, দেশ-উদ্ধারের আর দেরী নাই; বাঙ্গালা দ্রুত অগ্রনিশ্চিত উন্নতির পথে চলেছে; পেছন ফিরে আর দেখবার আবশ্যক নাই। অধিকন্তু অন্ধ-হস্তিন্যায়ের অনুসরণ ক'রে এও মনে করছি—এই গৌরবের দিকটাই এ ব্যাপারের সব। কিন্তু তা যে নয়, এর অন্য দিক যে আছে, এবং কষ্টদায়ক হ'লেও তা না দেখলে শুনলে এ ব্যাপারের একটা অনিষ্টকর মিথ্যা ধারণা যে থেকে যেতে পারে, তা দেখানও এই প্রবন্ধের একটা উদ্দেশ্য। চিন্তাশীল পাঠক অনুগ্রহ ক'রে ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দিলে বাধিত হব।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো

সমাপ্ত।

কিম্বা রহে গর্ব্ব-অভিমান!

পতঙ্গ যে বহ্নিমুখে ছুটে যায় আপন ইচ্ছায়,
শিখা মুখে পড়ে যদি, প্রাণটুকু সে কি ফিরে পায়?
হৃদয়-মাঝে কেন জ্বালে বাসনা-অনল,
শান্তি-সুখ কেন খায় সাধে অশান্তি-গরল!

পতঙ্গ সম কে যায় সবে বহ্নিমুখে ছুটে,
মরণ-কৌতুক দেখে সে কৌতুক কেন নাহি টুটে!
বিবেকের তাড়নায় কেন প্রাণ হয় নাক স্থির,
সকলে সকল বুঝে, তবু কেন হয় বা অধীর!

মোহ—মহানিদ্রা-পথে টেনে টেনে যত লয়ে যায়,
মায়ার সুবর্ণ-বেড়ী দিন দিনে তত বৃদ্ধি পায়!
"আমিত্ব" হৃদয় হ'তে সহজে যে হয় নাক লীন,
দিন দিন ভেবে ভেবে হয় নর দীন হ'তে দীন!

কিন্তু যদি একবার "তুমিত্বেতে" ভ'রে যায় প্রাণ,
সে কি ছুটে বহ্নিমুখে—কিম্বা রহে গর্ব্ব-অভিমান!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

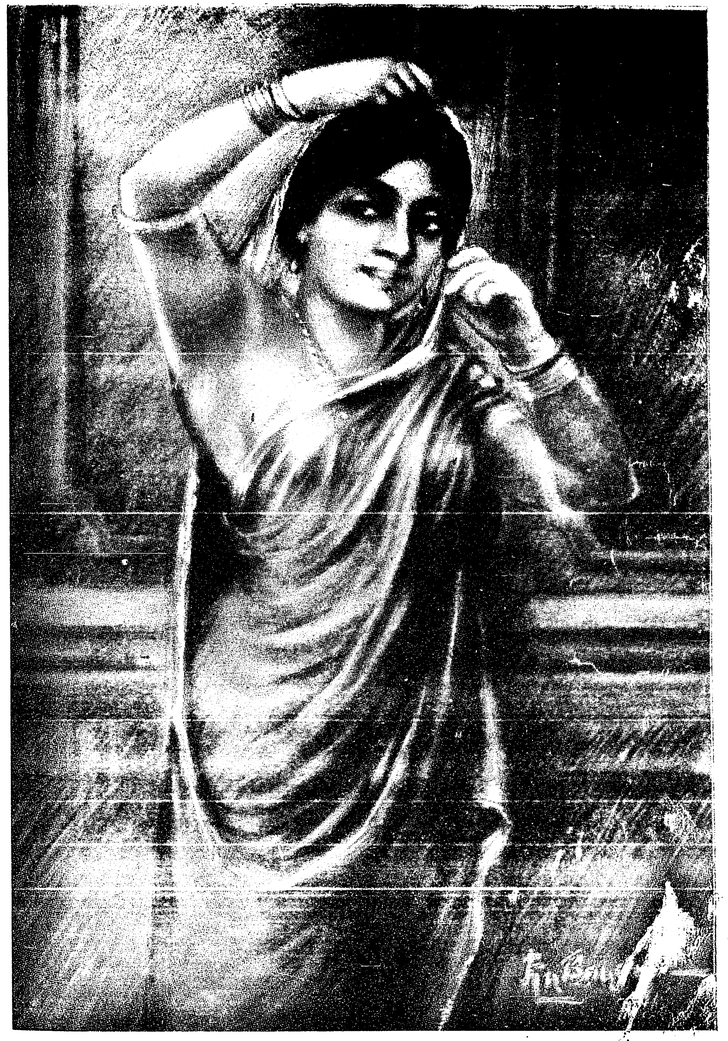

"আপনা আপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আনমন হয়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছুখণ সেইখানে।"—রবীন্দ্রনাথ।

[শিল্পী—কে, এন, ব্যানার্জ্জী।

বসুমতী প্রেস]

COLOUR ILLUSTRATION



আনন্দময়

১

বেলা ৮টা বাজিয়াছে। শীতকাল; মিষ্ট রৌদ্রে সারাপথ, ঘর-বাড়ী যেন ভরিয়া গিয়াছে। ঠিক কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের সম্মুখে আসিয়া ট্রামের গতি মন্দ হইবামাত্র এক যুবক ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। সাইনবোর্ডের লেখা দেখিয়া সে বাহিরের রোগী দেখিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

সম্মুখের বারান্দায় কতকগুলি লোক বেঞ্চে বসিয়া, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে। যুবক তাহাদের পাশ দিয়া যেখানে ডাক্তার রোগী দেখিতেছেন, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার তাঁহার সম্মুখস্থ রোগীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহাদের বিদায় করিলে যুবক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ডাক্তার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি?"

যুবক মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হ'তে চাই।"

"টিকিট করেছেন? ঐখানে গিয়ে টিকিট ক'রে বাহিরে দাঁড়ান, তার পর আপনার নাম ডাকা হ'লে আস্‌বেন।" বলিয়া ডাক্তার টেবলের উপর হইতে অপর একখানি কাগজ উঠাইয়া লইলেন।

'অজ্ঞানতঃ ভুল ক'রে ফেলেছি' বলিয়া লজ্জিত মৃদু হাস্যের সহিত মার্জ্জনা চাহিয়া যুবক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঐ ঘরেরই অপর অংশে এক জন যুবক একখানি খাতায় রোগীর নাম, ধাম ও কি রোগ, প্রথমে লিখিয়া লইয়া একখানি কাগজে আবার তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছিল। সেই স্থানে বেশ একটু ভীড়ও হইয়াছিল। যুবক এক পাশে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিল। নূতন পুরাতন কত রোগী আসিয়া নাম লিখাইল। নাম-লিখা টিকিটগুলি গৃহের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট ডাক্তারের কাছে গেল। রেলওয়ে ষ্টেশনের বুকিং আফিসের মত এখানেও সকলের আগে টিকিট লইবার ত্বরা। যুবক কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া ৯টা পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ৯টার পর ভীড় কমিয়া গেলে সে একটু সম্মুখে আসিল। তখনও দুই জন লোক বাকি ছিল। তাহাদের টিকিট লিখা হইয়া গেলে লেখক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম?"

"আনন্দময় দাস।"

লেখক মুখ তুলিয়া যুবকের পানে চাহিল। যুবকের বয়স ত্রিশ; দীর্ঘ, লঘু ও ঈষৎ শীর্ণ দেহ, মুখে যেন একটি স্নিগ্ধ হাসির রেখা বর্ত্তমান। পরিধানে সাদা ধবধবে খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের কামিজ ও একখানি মুগা পাড়ের চাদর।

যুবকের মুখপানে চাহিয়া লেখক বলিল, "আপনার নামটি ত বেশ!"

যুবক একবার মৃদু হাসিয়া মাথা নত করিল।

টিকিট লইয়া আনন্দময় নিকটস্থ বেঞ্চের উপর বসিল। কত রকম-বিরকমের নাম ধরিয়া ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন, আর ঐ সমস্ত নামধারী রোগী ব্যস্তভাবে ডাক্তারের কাছে ছুটিতে লাগিল। এই ভাবে আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে আনন্দময়ের ডাক পড়িল। আনন্দময় ধীরপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি অসুখ?"

আনন্দময় বলিল, "খাওয়ার পর আমার বুকে একটা যন্ত্রণা হয়, একেবারে অস্থির হয়ে পড়ি। আমি হাঁসপাতালে পেয়িং ওয়ার্ডে ভর্ত্তি হ'তে চাই।"

"অগ্রিম সাত টাকা দিতে হবে এক সপ্তাহের জন্য—টাকা এনেছেন সঙ্গে?"

"এনেছি।"

ডাক্তার আনন্দময়ের টিকিটের উপর ভর্ত্তি করিবার আদেশ-লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ রাস্তা দিয়ে যান, গিয়ে সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্টের আফিসে এ টাকা জমা দিয়ে রসীদ নিয়ে আসুন।"

আনন্দময় ডাক্তারের কথামত টাকা জমা দিয়া ফিরিয়া আসিলে ডাক্তার তাহাকে মোটামুটি পরীক্ষা করিয়া অপর একখানি কাগজে আপনার মন্তব্যলিপি লিখিয়া একটি কুলীর সঙ্গে তাহাকে হাঁসপাতালের ভিতর পাঠাইয়া দিলেন।

কুলীর সঙ্গে ভিতরে আসিয়া সিঁড়ি বাহিয়া আনন্দময় উপরে উঠিল ও সম্মুখের একটি লম্বা ঘরে প্রবেশ করিল। তখনও তাহার মুখে সেই মৃদু হাসির রেখা।

২

সন্ধ্যা হইয়াছে। হাঁসপাতালের ঘরে ঘরে বিজলীর বাতি জ্বলিয়া উঠিয়া বাহির হইতে তাহাকে এক ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। বাহিরের পথচারী লোক এই বিশাল অট্টালিকার দ্বার ও বাতায়নের মধ্য দিয়া উচ্ছ্বসিত উজ্জ্বল আলোকমালার পানে তৃপ্তনয়নে চাহিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বুঝিতেও পারে না, এই প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রতি শয্যা হইতে কত ব্যথা, কত হাহাকার, সুদূরস্থিত প্রিয়জনের বারেক দর্শনের জন্য কি গভীর আকুলতা প্রতিক্ষণে পুঞ্জীভূত হইয়া প্রতি কক্ষের প্রতি পাষাণ-পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে।

চাঁদ উঠিয়াছে। সম্মুখের নারিকেলগাছের বহু ঊর্দ্ধে খণ্ড-চাঁদ এই মৃত্তিকার ধরণীর নাট্যশালা, রোগি-ভবন, রাজগৃহ, কুটীর সকলের পানে সমদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

আনন্দময় দক্ষিণদিকের বারান্দায় একটি কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া আছে। রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া আকাশের পানে চাহিয়া সে কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। আকাশ নীল, নির্ম্মল, স্থির। কখনও যে বিদ্যুতের বজ্ররেখা ইহার বক্ষ দীর্ণ ও রক্তাপ্লুত করিয়া দিয়াছে বা দিতে পারে, আজিকার শান্ত ও নির্ম্মল আকাশের পানে চাহিয়া কে তাহা মনে করিতে পারে? সুস্থ, সবল ও যৌবনোৎফুল্ল মানব দেহ ও মনের পানে চাহিয়া কেই বা ভাবিতে পারে যে, তাহাদের জীবনে এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিতে পারে।

আনন্দময় ভাবিতেছে, এমন সময় এক অতি প্রৌঢ় শীর্ণ রোগী ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁ মশায়, আমার অবস্থা শুনেছেন?"

ঘাড় নাড়িয়া আনন্দময় বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—শুনেছি বৈ কি।"

"কে বল্‌লে?"

"আপনি যে বল্‌লেন তখন!"

"ওঃ, তা হবে। ডাক্তার বলেছে intestine tuberculosis। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়—সারবে না?"

"সারবে না কেন? না সারলে হাঁসপাতালে আপনাকে কখন এত দিন রাখে? আপনি বল্লেন, ৫ মাস আছেন।"

"তা আছি। দেখুন কি কষ্ট! স্ত্রী নেই, ছোট ছেলে-মেয়ে দুটি বোনের বাড়ী রেখে এসেছি, যদি না সারি, কি হবে তাদের?"

"তার জন্য কেন মন খারাপ করছেন? আপনি সেরে গিয়ে আবার তাদের ভার নেবেন। আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন যে! বসুন।"

আনন্দময় উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না না, সে কি হয়? আপনি রইলেন দাঁড়িয়ে!"

"আপনি বসুন, আমি আর একখানা টুল নিয়ে আস্‌ছি।"

অতি শীর্ণ রোগীটিকে আপনার আসনে বসাইয়া আনন্দময় আর একখানি টুল আনিয়া তাহার সম্মুখে বসিল।

লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে, বলুন ত?"

"একটু রোগা দেখাচ্ছে!"

"আগেকার চেয়ে?"

"আগে ত আপনাকে দেখিনি; ঠিক তুলনা ত করতে পারব না। তবে দেখে মনে হয়, যেন উন্নতি করেছেন।"

"দেখুন, আপনার বাপমা'র আশীর্ব্বাদে যদি ভাল হই।"

"ভাল হবেন বৈ কি। ভগবানের নাম নিন, আর আনন্দ করুন।"

"হ্যাঁ—আপনি ত বল্লেন আনন্দ করুন, আনন্দ আসে কোত্থেকে? দেখুন, অসুখটা হ'ল শুধু চা খেয়ে।"

"চা খেয়ে? বলেন কি?"

"হ্যাঁ, তাই। ৬টবার চা খেতুম। এক নামজাদা ডাক্তারের কথায় আফিং ধরলুম—সঙ্গে সঙ্গে চা আরও বেড়ে গেল। এখন দেখুন অবস্থা। এক গেলাস জল দরকার হ'লে আন্‌বার উপায় নাই। কুলী বাবুদের ত দশ ডাকে পাওয়া যায় না।"

"মানুষের অবস্থা কি চিরদিন সমান থাকে? আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে এ সব কথা ত আর বোঝাতে হবে না। আপনার যা দরকার হবে—আমাকে বল্‌বেন।"

আনন্দময় বারান্দা হইতে ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় সকল রোগীই উঠিয়া বসিয়াছে। অধিকাংশের কাছেই বন্ধুবান্ধব আসিয়া বসিয়াছে। তাহাদের ক্লিষ্ট মুখে একটা প্রফুল্লতা আসিয়াছে। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত এই দুই ঘণ্টা সময় হাঁসপাতালের রোগিগণের পরম প্রেয়। মাত্র এই সময়টুকুর জন্য তাহাদের ম্লান বক্ষে আশার আলোক ফুটিয়া উঠে। ৭টা বাজিতে বাজিতে আত্মীয়বন্ধুরা যখন যে যাহার স্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের চোখের সে আনন্দের আলো আবার নিভিয়া যায়।

আনন্দময় দেখিল, কেবল এক জন রোগী, বয়স বৎসর ৩০ হইবে, আপনার শয্যার উপর বসিয়া আছে। তাহার নয়নে ব্যথিত দৃষ্টি। দুয়ারের দিকে পদশব্দ শুনিবামাত্র একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আর তাহার চোখ দুটি দ্বিগুণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছে।

আনন্দময় ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া বসিল ও মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনার সঙ্গে ত আলাপ হ'ল না? আপনার দেশ কোথায়?"

"দেশ আমার যশোর। থাকি এই কলকাতায়, নেবুতলা।"

"আপনার নাম কি?"

"নির্ম্মলচন্দ্র রায়।"

"আপনার অসুখ কি?"

"গলার ভিতর কি এক রকম একটা ঘা হয়েছে, মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে আর খেতে গেলে জ্বালা করে।"

"এখানে এসে একটু উপকার পেয়েছেন ত?"

"এই এসেছি এক সপ্তাহ—রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, দুমাস থাকতে হবে—কিন্তু মন বড় অস্থির হয়েছে।"

"মন অস্থির কল্লে কি চলে, ভাই! এ কদিন ঘর-বাড়ী কথা মনে করবেন না। ভাববেন, আপনার জন ভগবানের চরণে রেখে এসেছেন—সেখানে কোন বিপদ—শঙ্কা নেই।"

"তা যে পারি নে! আমার নিজের বাড়ীতে যদি তা রেখে আস্‌তে পার্‌তাম—তা হ'লে বোধ হয়, এত হ'ত না।"

"কোথায় তাঁদের রেখে এসেছেন?"

"আমার স্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই—নেবুতলা আমার শ্বশুরবাড়ী, সেখানে আমিও থাকি। দেশে ম্যালেরিয়া—দুবার স্ত্রীকে দেশে নিয়ে গিয়েছিলাম, দুবারই জ্বরে ভুগে ভুগে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। শেষে শ্বশুরবাড়ী সবাই বল্‌লেন, এখানে এস, দু'জনেই এখানে থাক। ছিলাম। চাকরী কর্‌ছিলাম, যা পাচ্ছিলাম, ওঁদেরই

দিচ্ছিলাম—এক রকম চ'লে যাচ্ছিল।" রোগী কয়েক মুহূর্ত্ত বাহিরের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "প্রথম অসুখটা দিনকতক চেপে রেখেছিলাম, আমার স্ত্রী জানতে পেরেই কিছুতে আমাকে আফিসে যেতে দিলে না। অর্দ্ধেক মাহিনায় ছুটী নিতে হ'ল। সেই হ'ল বিপত্তি। শ্বশুরবাড়ীর এঁরা চ'টে গেলেন—একটু অসুখেই ছুটী নেওয়া—এত নবাবী কেন? আমার স্ত্রী আমাকে গোপনে বল্‌লে, 'আলাদা বাসা কর, আমরা সেইখানে গিয়ে থাকি।' পূরা মাইনে যখন পেতাম, তখন এ কথা বল্‌লে কোন ক্ষতি ছিল না। ৬০৲ টাকা মাইনে, তার অর্দ্ধেক ৩০৲ টাকায় আলাদা বাসা ক'রে সপরিবারে কি ক'রে থাকি বলুন?"

আনন্দময় সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রোগী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সম্বলের মধ্যে সেভিং ব্যাঙ্কের শ দুই টাকা; তা যদি বাসা-খরচেই উড়ে যায় ত চিকিৎসা হবে কোত্থেকে? শেষটা এক দিন আমার মামী বোল্লে, তোমার রোগ বড় ছোঁয়াচে, আমার ছেলে-পুলের বাড়ী, এ অবস্থায় এখানে থাকা উচিত নয়। তোমার জন্য হাঁসপাতালে থাকার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। ডেলি ১৲ টাকা ক'রে লাগবে—খুব ভাল থাকবে। আজই কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে নাও, কাল তোমায় রেখে আসব।' মনে দুঃখ হ'ল, ঘৃণাও হ'ল, কিন্তু স্থির কর্‌লাম, হাঁসপাতালে যেতেই হবে, এ বাড়ীতে আর নয়। তার পর যদি ফিরে আসি, অন্য বাসা করতেই হবে। আমার স্ত্রী জানতে পেরে বড়ই অস্থির হয়ে উঠল। তার বৌদিদিকে বল্‌লে, 'এ অসুখটা ত এমন নয় যে, হাঁসপাতালে যেতেই হবে। আমরা নীচের ঐ কোণের ঘরটায় থাক্‌ব, ছেলেপুলেদের কাউকে সে দিকে যেতে দেব না'।"

রোগীর মুখে ম্লান হাস্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আনন্দময়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "কিন্তু ফল কিছু হ'ল না। উপরন্তু নির্লজ্জ অপবাদ তার নামে সবাই দিলে; বড় ভাইদের কথার উপর স্বামীর কথা নিয়ে কথা বলে! কেঁদে কেঁদে আমার স্ত্রী রাত্রিতে আমাকে বিব্রত ক'রে তুল্‌লে। অনেক ক'রে তাকে বোঝালাম। বল্‌লাম, দেখ, হাঁসপাতালে চিকিৎসা ভাল হবে, খরচও কম, সেখানে গিয়ে সেরে আসা মন্দ নয়। তার পর সেরে এসে অন্য বাসা কর্‌ব। এক মাস একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক। আর খরচার দিক আছে, সেটাও ভাবা উচিত। যদি ধর অসুখ না সারে, যদি মারা যাই, তা হ'লে আজ এঁদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে গেলে এঁরা কি তোমায় ভাল মুখে আশ্রয় দেবেন?' কিছুতেই তাকে বোঝাতে পার্‌লাম না। পরদিন জোর করেই আসতে হ'ল। চ'লে এলাম, কিন্তু তার সে কান্না কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছিনে।"

কান্নার কথা বলিয়া বুঝি বা সেই কান্নার সময়কার তাহার স্ত্রীর ব্যাকুলতা-পূর্ণ মিনতিটুকু স্মরণ করিয়া সে নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু গোপন করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়টা দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

আনন্দময়ের আনন্দ এখানে বড় আঘাত পাইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখও ম্লান হইয়া আসিল। পরক্ষণে ওষ্ঠাধরে সেই সরল স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক হাসি ফুটাইয়া বলিল, "এর জন্য কখনও ছেলেমানুষের মত কাঁদে! আপনাদের দু'জনেরই মনে খুব কষ্ট হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, অসুস্থ অবস্থায় ভাল রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা না ক'রে যদি দু'জনে এক যায়গায় ব'সে হা-হুতাশ করতেন, তাতে কি কিছু লাভ হ'ত? এ সব ভাবার চেয়ে বরং ভাবুন, যখন সুস্থ, রোগমুক্ত হয়ে ফিরে যাবেন, তখন কত আনন্দ হবে। তখন এ ব্যথার স্মৃতি আনন্দকে শতগুণ ক'রে দেবে—নয় কি?"

মুখ খুলিয়া অশ্রু মুছিয়া সে বলিল, "সে কথা ঠিক। তবে এসে পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর কোন খবর পাইনি; ভেবেছিলাম, অন্ততঃ একটা চাকর-বাকরও পাঠিয়ে দেবেন তাঁরা, তা হ'লেও একটা খবর পেতাম তার।"

"এই কথা! আচ্ছা, আপনি সেখানকার ঠিকানাটা ব'লে দিন, আমি কাল নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীর সংবাদ এনে দেব।"

সে তাহার শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। আনন্দময় পকেট হইতে একখানা ছোট নোট-বই বাহির করিয়া তাহাতে টুকিয়া লইল।

রোগী অনেকখানি আশ্বস্ত হইল।

৩

পরদিন ডাক্তারের কাছে ঘণ্টা দুয়েকের ছুটী লইয়া আনন্দময় যখন নেবুতলায় নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটার সম্মুখে পৌঁছিল, ঠিক সেই সময় সেই বাড়ীর ঝি বাহিরে আসিতেছিল। আনন্দময় বলিল, "আমি হাঁসপাতাল থেকে আস্‌ছি। নির্ম্মল বাবু একটু ভাল আছেন; কিন্তু বাড়ীর কোন খবর না পেয়ে বড্ড ভাবিত আছেন। তাঁর স্ত্রী কেমন আছেন, আমি কেবল সেইটুকু জেনে যেতে চাই।"

ঝি খুব নিম্নস্বরে বলিল, "আপনি জামাইবাবুর কাছ থেকে আসছেন! আচ্ছা, আপনি পাশটায় একটু দাঁড়ান—আমি চট্ ক'রে দিদিমণিকে কথাটা ব'লে আসি। আহা, দিদিমণির এ ক'দিন চোখের জলের আর বিরাম নেই। জোরে কথা বল্‌বেন না, ওরা টের পেলে আবার কত কথা বল্‌বে।"

আনন্দময় একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

মিনিট পাঁচেক পরে ঝি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি একটু এ-ধারে আসুবেন।"

আনন্দময় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দেখিল, স্বল্পাবগুণ্ঠিতা এক যুবতী নতমুখে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আনন্দময় আসিতে সে সামান্য একটু মুখ তুলিয়া বলিল, "তিনি কেমন আছেন?"

একবারমাত্র যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু নামাইয়া লইয়া আনন্দময় বলিল, "এ কদিনেই তাঁর উপকার হয়েছে। তবে ডাক্তার বলেছেন, মাস দুয়েক থাকতে হবে।"

"আচ্ছা, সে চিকিৎসা কি বাড়ীতে হয় না?"

"কেন হবে না? তবে তিনি বল্‌ছিলেন, এ বাড়ীতে থাকায় তাঁর সুবিধা হবে না।"

"আমি এই দয়া দিদিকে দিয়ে এই পাড়াতেই একটা বাসা দেখে রেখেছি। আজই এক মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে দেব।

তিনি যেন কালকে বরাবর এখানে আসেন। তিনি এলেই আমি তাঁর সঙ্গে সে বাসায় যাব। আপনি তাঁকে সব বুঝিয়ে বলবেন, আমি গুছিয়ে বলতে পারছিনে।"

কথা কয়টা বলিতেই যুবতীর দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

আনন্দময় বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। মিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার ছোট বোনের মত। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তাঁকে বুঝিয়ে কালই আমি এখানে পাঠিয়ে দেব। কেঁদ না বোন্—আমি এখন যাই।"

"আপনি যদি একটু দাঁড়ান—আমি একখানা চিঠি লিখে আপনার হাতে দিই।"

যুবতী চলিয়া গিয়া নীচেরই একটা ঘরে প্রবেশ করিল। ঝি সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। যুবতী চলিয়া যাইতে ঝি বলিল, "জামাইবাবু বাড়ী থেকে চ'লে যাওয়ার পর থেকে দিদিমণি আর উপরের ঘরে যাননি—এই ঘরেই প'ড়ে থাকেন, আর চোখের জলে ভাসেন।"

কিছুক্ষণ পরেই যুবতী একখানা খামে বন্ধ-করা পত্র আনিয়া আনন্দময়ের হাতে দিল। আনন্দময় পত্র লইয়া যুবতীকে আবার একবার নির্ভাবনায় থাকিবার জন্য বলিয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল তখনও দুয়ারের পানে চাহিয়া আনন্দময়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল। আনন্দময় আসিতে নির্ম্মলের ভয় হইল, বুঝি বা এখনই সে বলিবে, ডাকিয়া কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না, কোন খবর মিলিল না। সে জন্য নির্ম্মল চট্ করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। আনন্দময় নির্ম্মলের সম্মুখে টুলের উপর বসিয়া হাসিমুখে বলিল, "কৃতকার্য্য হয়ে এসেছি, ভাই। কোন ভাবনা নেই। তিনি ভাল আছেন। তবে তোমার জন্য বড় ভাবছেন। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করেছেন। এই চিঠি দিয়েছেন, আগে পড় ভাই, তার পর যা যা বলেছেন, পরে বল্‌ছি।"

কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে আনন্দময়ের পানে চাহিয়া—ব্যগ্র হস্তে চিঠি-খানি লইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে লেখাগুলি নির্ম্মল পড়িয়া ফেলিল।

"তোমাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া আমি হতভাগিনী বাপের বাড়ী বসিয়া আছি। আমার জন্য তুমি কেন ভাবিবে? আর যদি সত্যই আমার জন্য তোমার ভাবনা হয়, আমাকে আর কাঁদাইও না, আর যন্ত্রণা দিও না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। তোমার যাওয়ার মুহূর্ত্ত হইতে আমার দিন কাটিতেছে না, আমি পাগলের মত হইয়াছি। যেখান হইতে তোমাকে তোমার অনিচ্ছায় হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছে, সে পাপপুরীতে আমি আর তিলার্দ্ধ টিঁকিতে পারিতেছি না। আমি বাসা ঠিক করিয়াছি। সেখানে আমরা দু'জনে থাকিব—সেই বাসায় আমি তোমার চিকিৎসা করাইব। কাল তুমি অবশ্য অবশ্য এক-খানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া চলিয়া আসিবে, আমি প্রস্তুত হইয়া থাকিব। তোমাকে এ বাড়ীতে আমি আর পা দিতে দিব না। দুয়ারে তোমার গাড়ী আসিবামাত্র আমি আমাদের বাক্স ও বিছানা লইয়া গাড়ীতে উঠিব। বৌদিদিকে বলিয়া রাখিব, তাহাতে ইহারা যাহাই মনে করুন না কেন!

"যদি তুমি না আইস, পরশু আমি গাড়ী লইয়া হাঁসপাতালে তোমাকে আনিতে যাইব। যাইব—যাইব—যাইব, তিন সত্য করিলাম! তখন আমার দোষ দিতে পারিবে না, কিন্তু তুমি আসিও। আমাকে আর কাঁদাইও না। প্রণাম জানিবে। ইতি—

সেবিকা—সুনীতি।"

৪

রাত্রি শেষ হইয়াছে। উষার আলোক আকাশ হইতে ধীরে ধীরে নামিতেছে। হাঁসপাতালের ঘরে আলো জ্বলিতেছে বলিয়া বাহিরের স্নিগ্ধ অথচ ম্লান আলোক ভিতরে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না, কিন্তু খোলা দরজা দিয়া বাহিরের মিষ্ট বাতাসটুকু ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

রোগিগণ শয্যার উপর পাতলা স্বল্পমূল্যের কম্বল মুড়ি দিয়া শীত-নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। না পারিলে এক এক বার বলিতেছে, "বাবা, কি শীত!"

কেবল আনন্দময় টুলটি লইয়া গিয়া বাহিরে বারান্দায় বসিয়াছিল ও আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল,—

"জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে মধুর রবে
বাজিবে হৃদি-মাঝে।"

মৃদু মধুর স্বরে আনন্দময় দুই বার তিন বার করিয়া অমর গানটি গাহিল। এই গানের মধ্য দিয়া তাহার হৃদয়ের সত্যকার ছবিটি যেন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে যেন সবাইকে তুষ্ট করিবার জন্য দুঃখের রেখা দেখিলেই তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সেখানে আনন্দের বর্ণরাগ ফুটাইয়া তুলিবে, এই তপস্যাই করিতেছে। এই যেন তাহার অন্তরের একমাত্র কাম্য—তাহার জীবনের একমাত্র সাধনা।

ক্রমে ভিতরে প্রভাতের আলো স্ফুটতরভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং সেখানে বিভিন্ন দৃশ্য অভিনীত হইতে চলিল।

"দু'নম্বর বাবু উঠলেন?"

"উঠিনি, শুয়ে আছি—তবে ওঠাই এক রকম।"

"ছ' নম্বর বাবুর ভারী ঘুম।"

"কিসে ঘুম দেখলেন মশায়—রাত তিনটে থেকে সমান জেগে।"

"কৈ, সাড়া ত পাওয়া যাচ্ছিল না।"

"কি ক'রে সাড়া দিতে হবে? চিম্‌টি কাট্‌ব?"

এমন সময় কুলী আসিয়া বলিল, "লাও লাও সব গরম জল—কুলি কর।"

এক জন রোগী বলিল, "খাবার দেবার সময় চু-চু-কুলি করাবার খুব ধুম। পটলডাঙ্গার হাঁসপাতালে হবে দেখতে একবার খাওয়ার ব্যাপার। বেদানা, আঙ্গুর পর্য্যন্ত রোগীকে খেতে দেওয়া হয়।"

যে রোগীটি চিম্‌টি কাটিবার কথা বলিয়াছিল, সে বলিল, "এখানে খেতে কোন বাধা নেই। ডাক্তার আপত্তি করবে না। আপনি আনিয়ে খান না।"

"খুব কথা বল্‌লেন ত আপনি! আনিয়ে খেলে আপনি করবে না! কি দয়া!"

"নৈলে আপনি কি বল্‌তে চান, এতগুলি রোগীকে রোজ আঙ্গুর, বেদানা খাওয়াতে হবে? তা হ'লে ত হাঁসপাতালের ভিতর পেশোয়ার সহরটি এনে বসাতে হয়।"

"সকালবেলায় দুর্গা নাম করুন, দত্ত মশায়, ও-সব কথা ছেড়ে দিন। আপনিও চুপ করুন এক নম্বর বাবু। দুঃখে প'ড়ে—কষ্টে প'ড়ে এখানে এসেছি সবাই। পরস্পরকে সহানুভূতি করাই এখানে দরকার।"

"সে ত লেহ্য কথাই মশায়। ওনার কি রকম বাক্যি শুনলেন ত? হাঁসপাতালে এসেছি কি না, তাই উনি আমাকে একেবারে অমান্যি করলেন। আপনার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে আমরা একেবারে ফেল্‌না নই। শ্বশুর মস্ত বড়লোক। লঙ্কা-পোস্তার ত্রিলোচন শেঠকে সবাই চেনে। আমার বোনাইয়ের টালায় মস্ত বড় আড়ত। আমাদেরও বল্‌তে নেই—আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে অবস্থা ভালই।"

দত্ত মশায় এ সব কথা সত্যই ছাড়িয়া দিয়া দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রোগীরা একে একে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া লইল। ছোট ও বড় দুইটি টিন বহিয়া একটি লোক আসিয়া দেখা দিল। ছোটটি হইতে দেড় চামচ চিনি ও বড়টি হইতে একখানি পাঁউরুটী প্রায় প্রত্যেক রোগীর শিয়রেই কৃপাবিন্দুর মত বর্ষিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল, "আর একটু চিনি দাও বাপু—এইটুকু চিনি দিয়ে কি এই শুকনো রুটী খাওয়া যায়?"

সঙ্গে যে সরকার বাবুটি ঘুরিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "ডাক্তারবাবুকে দিয়ে এক পোয়া চিনি লিখিয়ে নেবেন—এক পোয়া চিনিই পাবেন।"

কল-লাগানো পাত্র বহিয়া আর একটি ভৃত্য আসিল। কোন কোন ভাগ্যবানের লকারের উপরস্থিত বাটিতে কল খুলিয়া এক পোয়া দুধ দিয়া চলিয়া গেল।

এক জন বলিল, "হাঁসপাতালের দুধ ত পরীক্ষা করা, খাঁটি দুধ দিতে হবে। কিন্তু জল এতে আসে কোথা থেকে?"

"গোয়ালা ঠিক দিয়ে যায়, মশায়! হাঁসপাতালের উনানে চড়লেই দুধে জল জন্মায়।"

"যাই বলুন দত্ত মশায়, দেখা-শোনা এখানে মোটেই নেই। শুনেছি, এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। তাঁর প্রকাণ্ড বাসা ত দেখছি—এসে পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁকে ত এক দিনও দেখতে পেলাম না। বড় হাঁসপাতালে বাবার ওপর বাবা আছে, এখানে প্রত্যেকেই কর্ত্তা।"

"কায় কি ভাই আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে। দু'বেলা পথ্য পাচ্ছি, তিন বার ঔষধ পাচ্ছি, ডাক্তার এসে দু'বার দেখছেন—আর কি চাইবেন? আমি ত মনে করি, এক টাকা রোজে এ সস্তা।"

"যা পাচ্ছিনে, তার জন্য বৃথা ক্ষোভ না ক'রে যা পাওয়া যাচ্ছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই ভাল।"

"তাই থাকা ভাল হ'ত—যদি মাত্র এই হাঁসপাতালের পুঁজি হ'ত। কিন্তু তা ত নয়। জিনিষ আসে এর ঢের বেশী—কিন্তু যায় কোথায়, এই সমস্যা। ব্যাপার দেখলেন না, রাতে যে বুড়ীটা এখানে থাকেন ঠিক নয়, নিদ্রা যান,—তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে দিন, তোমার মাইনে কত? বল্‌লে কি না, আমার মাইনে বেশী—ষাট টাকা।"

"ষাট টাকা কি রকম? না, হাঁসপাতালের অমুক বাবুর ওখানে কায করি—১০৲ টাকা পাই, কলেজে ১০৲ টাকা পাই, আর এই হাঁসপাতালে কাযের দরুণ ২৮৲ টাকা পাই। হিসাবে ঠিক না মিলুক, তার মধ্যে একটু সত্য আছে যে, ও কায করে কোন বড় কর্ম্মচারীর ওখানে আর মাইনেটা নেয় হাঁসপাতালে এই মশারি কটা খাটিয়ে—অর্থাৎ একবার হাজরে দিয়ে ও নাক ডাকিয়ে—আর ব্যাটার স্পর্দ্ধা একবার দেখেছ—কাউকে যেন গ্রাহ্য করে না।"

ক্রমে যাহারা স্নান করিবে—স্নান করিয়া লইল। যাহারা মাথা মুছিবে—তাহারাও তাহা সারিয়া লইল। কেহ নার্সকে বলিল—আমার হাতে ব্যথা মা। মাথায় একটু তেল দিয়ে দিতে হবে। নার্স তাহাই করিল।

হাঁসপাতাল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিল।

১১টা বাজিবার পর মধ্যাহ্নের আহার আসিল। আবার কিছুক্ষণের জন্য সাড়া পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, ভাত কম; কেহ বলিল, ঝোলে কাঁচকলা নাই কেন? কেহ বা অভিযোগ করিল, "খোলা শুদ্ধ কচু, মশায়, মানুষে রাঁধে?" কেহ সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহাই খাইল।

আনন্দময় তাহার পথ্য বাহির হইতে আনাইত। এ সকল কথায় সে যোগ দিল না। নিজের সম্বন্ধে সে কাহাকেও কোন কথা বলিত না।

৫

নির্ম্মল চলিয়া যাইবার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। হাঁসপাতালের রোগিগণের সহিত আনন্দময়ের দিন কাটিতেছে। আপন চিকিৎসার অপেক্ষা পরের অসুবিধা দূর করিবার দিকে আনন্দময়ের ঝোঁক বেশী। কেহ একটু দুধ গরম করিয়া দিবার জন্য কুলীকে অনুরোধ করিতেছে, কুলী খুব জোরের সহিত উত্তর দিতেছে—আনন্দময় তাড়াতাড়ি সেই রোগীর দুধটুকু গ্যাসের উনানে লইয়া গিয়া গরম করিয়া আনিল। কেহ মেথরকে ডাকিতেছে—বেড্‌প্যান দিবার জন্য। খাটের নীচ হইতে বেডপ্যান লইবারও তাহার সামর্থ্য নাই। আনন্দময় তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেডপ্যান দিয়া পর্দ্দা দিয়া ঘিরিয়া দিয়া আসিল। ঠিক দুই দিন অন্তর তাহার একখানি খামে পত্র আসিত—সেই সময়টি কেবল তাহাকে একটু উন্মনা দেখাইত। চিঠি আসিত কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীট ডাক ঘরে। সেখান হইতেই কেহ হাঁসপাতালের ঠিকানায় পত্র পাঠাইয়া দিত।

আজ বেলা ৯টার সময় আনন্দময় একখানি চিঠি পাইল। তাহাতে লেখা ছিল,—

"শ্রীচরণেষু—

"তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ, তুমি ভাল আছ। কিন্তু তথাপি কি জানি কেন, আমাদের মন প্রবোধ মানিতেছে না। মা কাল রাত্রিতে স্বপন দেখিয়াছেন, তুমি যেন তাঁহাকে কাতর হইয়া ডাকিতেছ, আর বলিতেছ,

মা, বুক জ্বলিয়া গেল। স্বপ্ন দেখিয়া অবধি মা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি আমাকে মায়ের ভার দিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি মায়ের মনের উদ্বেগ কি করিয়া দূর করিব? আমি কত বলিতেছি, না মা, তিনি ভাল আছেন—অসুখ হ'লে তিনি খবর দিতেন বা চ'লে আসতেন। মা কি তাহা শোনেন? তিনি উত্তর দিলেন, সে পাগলকে তুমি জান না মা! সে নিজে সব দুঃখ সহ্য করবে, কিন্তু অপরকে এক তিল দুঃখও দেবে না। তাই ত তার জন্য আমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

সত্য কথা বলিতে কি, আমারও মনে বড় ভয় ও ভাবনা হইয়াছে। তোমাকে চিঠি লিখিতেছি, আর আমার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছে। পাছে মা দেখিতে পান, সেই ভয়েই তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিতেছি। আমারও মন বলিতেছে, তোমার কোন অসুখ করিয়াছে। যদি অসুখ করিয়া থাকে, তুমি পত্র পাঠ চলিয়া এস। তুমি সকলের সেবা করিয়া বেড়াও, একটিবার তোমাকে সেবা করিবার সুযোগ এ দাসীকে দাও। তোমার সেবার অধিকার পাইয়াও তাহার সুযোগ কখন পাইলাম না, এই আমার জীবনের একমাত্র দুঃখ। আমার সে দুঃখ তুমি দূর কর।

মা বড় উন্মনা হইয়া আছেন। আমার সঙ্গেও ভাল করিয়া কথা কহিতেছেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে গেলেই তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিয়া পড়িতেছে। হয় তুমি এস, না হয় আমায় উপদেশ দাও, মাকে সুস্থ করিবার কি উপায় আমি করিব।

ইতি—

উৎকণ্ঠিতা চরণাশ্রিতা

ঊর্ম্মিলা।"

পত্রখানি পড়িয়াই আনন্দময়ের মুখ একবারে ম্লান হইয়া গেল। তাহার সদা প্রকাশমান আনন্দ মুহূর্ত্তে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। খানিকক্ষণ প্রশান্ত চিত্তে ভাবিয়া সে তখনই দুইখানি পত্র লিখিল। একখানি মাকে, একখানি স্ত্রীকে। মাকে লিখিল, "মা, আমি খুব ভাল আছি। তুমি আমার জন্য ভাবিতেছ শুনিয়া আমার উদ্বেগের অন্ত নাই। এখন বড়ই কম অবসর, কিন্তু যখন এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, আমি এই সপ্তাহেই কায সব মিটাইয়া পর-সপ্তাহে বাড়ী গিয়া তোমার চরণ দর্শন করিয়া আসিব। মা, তুমি নিশ্চিন্তমনে থাকিও। তুমি ভাল থাকিলেই আমি ভাল থাকিব। ইহা নিশ্চয়ই জানিও।"

স্ত্রীকে লিখিল—

"ঊর্ম্মিলা,

তুমি আমার অনেক তপস্যার নিধি। তোমাকে পাইয়া আমার জীবন চিরদিনের মত ধন্য হইয়া গিয়াছে, এ কথা তোমাকে কতবার মনে করাইয়া দিব? মায়ের পরই আমি তোমার নিকট জন্মজন্মান্তরের জন্য ঋণী। তোমার সেবা যে নিত্য-সেবা—যাহা আমার হৃদয়ে প্রতিক্ষণ আসিয়া পৌঁছিতেছে। মায়ের স্নেহপ্রবণ হৃদয় মাঝে মাঝে অকারণে আমার অমঙ্গল আশঙ্কা করে। তোমারও সেই অবস্থা। তুমি নিজে হৃদয়ে বল না পাইলে মাকে বল কিরূপে দিবে? আর তুমি ছাড়া মাকে সান্ত্বনা ও ভরসা কে দিতে পারে? আমি সত্যই ভাল আছি। তোমাদের পাইয়া আমার অন্তর বাহির নিরন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ আছে। অমন মা, এমন স্ত্রী কাহার ভাগ্যে থাকে? আমি সেই—ভাগ্যবান্।"

চিঠি দুইখানি লিখিয়া আনন্দময় তখনই একটি কুলীকে দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

ইহার দুই দিন পরে ঠিক সন্ধ্যার সময় সুন্দর অশ্ববাহিত একখানি পাল্কী গাড়ী হাঁসপাতালের সম্মুখে আসিল। গাড়ী হইতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবতরণ করিয়া হাঁসপাতালের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। একটু পরেই একখানি মোটর সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। মোটর হইতে যিনি নামিলেন, তিনি এক জন চিকিৎসক। প্রায় এখানে রোগীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি সম্মুখস্থ ভদ্রলোকের সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন, "আমার বেশী দেরী হয় নি ত অরুণ?"

"একটুও না। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তুমি এসেছ। আমি দু মিনিট আগে এসেছি, তাই একটু দাঁড়াতে হয়েছে।"

"তা হ'লে চল, তোমার রোগীকে খোঁজা যাক্।"

"চল। রোগীর নাম নিয়ে একটু গোলমাল হচ্ছে। যার কাছে সংবাদ পেলাম, মণীন্দ্র এখানে আছে, সেও এই হাঁসপাতালে ছিল। কিন্তু নাম বলেছে আনন্দময়। কিন্তু মণীন্দ্রের যে সব বিশেষত্ব আছে, এই আনন্দময়ে তার প্রকাশ, তাই মনে হচ্ছে, এই সেই।"

"চল, এখনই সন্দেহভঞ্জন হয়ে যাবে।"

আনন্দময় তখন শয্যার উপর বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। এমন সময় ডাক্তারের সঙ্গে অরুণ নামক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইলেন।

আনন্দময় বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ কি দাদা, আপনি এখানে?"

"দুষ্টু ছোকরা!—আমি যদি বলি, এ কি মণীন্দ্র, তুই এখানে?"

ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা মণীন্দ্র বাবু, সকলের সঙ্গে আপনার এ রকম ব্যবহার কি উচিত হয়েছে? আপনি মণি ত্যাগ ক'রে জাতীয় কলেজের অধ্যাপক হলেন, বেশ ভাল শেষটা কি নামটাও ত্যাগ করলেন?"

লজ্জিতমুখে আনন্দময় কহিল, "আনন্দময় নামটা আমার নাম—এটা মায়ের দেওয়া নাম।"

"আচ্ছা, বেশ, তোমার শত নাম আছে, আমি স্বীকার করি। তুমি কি পাগ্‌লামী কচ্ছ দিন দিন বল দেখি? তোমার জন্য হ'লে মা উদ্বিগ্ন হবেন, আর উদ্বিগ্ন হলে তিনি অসুস্থ হবেন, এই ভয়ে তুমি বাড়ী গেলে না। আর মা তোমার অসুখ হয়েছে এটা অন্তরে অনুভব করেই তোমার জন্য ভেবে সারা হচ্ছেন। ঊর্ম্মিলা একটি ছেলেকে সঙ্গে ক'রে আজ দুপুরে এসে পৌঁছেছে। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। এখন চল। তোমার ডাক্তার বাবুর অনুমতি নিয়েছি। আচ্ছা, চল। তোমার কষ্ট হচ্ছিল, আমার বাসায় একবার গেলে কি তোমার খ্যাতি একটু কমে যেত?"

"না দাদা, মাপ করবেন। আমি কোন দিন তা মনে করি নে। জানেন ত, আমি কারও কাছে গতিবিধি করলে তাঁরও বিপদ হ'তে পারে। বিশেষ আপনি এক জন সরকারী কর্ম্মচারী।"

"যা হোক, চল এখন। ভাগ্যে নির্ম্মল বাবুরা পাশের বাড়ীটা নিয়েছিলেন, তাই ত তোমার খবর পেলাম। নইলে সারা সহরটা তোমার জন্য চুঁড়ে বেড়াতে হ'ত।"

আনন্দময় উঠিয়া আপনার জিনিষপত্র গুছাইয়া লইল। ডাক্তার ছাড়পত্র লিখিয়া দিলেন। আনন্দময় একবার ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইল। বলিল, বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদের খবর লইবে। এই সব রোগীকে ত্যাগ করিতে তাহার মন কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা সে-ই জানে।

দুইখানি গাড়ী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদিগকে নীচে নামিতে দেখিয়া গাড়ী একটু আগাইয়া আসিল।

সমাগত ভদ্রলোকটি আনন্দময়ের স্ত্রীর খুড়তুতো ভাই। তিনি ডাক্তারের সঙ্গে মোটরে উঠিয়া বলিলেন, "তুমি ঐ গাড়ী ক'রে বাসায় চল। আমি একটু ঘুরেই বাসায় পৌঁছাব।"

মোটর ছাড়িয়া দিল।

পাল্কী গাড়ীর দুয়ার বন্ধ ছিল। আনন্দময় দুয়ার খুলিয়া ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে গাড়ীতে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলিল। তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে ভিতর হইতে কে গাড়ীর দুয়ারটা বন্ধ করিয়া তাহাকে কোমল বাহুপাশে বাঁধিয়া বলিল, "মানুষকে এত কষ্ট দিতেও পার তুমি।"

আনন্দময় কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অশ্রুধারা-স্নাত কোমল আননের প্রগাঢ় স্পর্শে তাহার বলিবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

হোলকার হুল্লোড়

মমতাজ লাগি' তাজ হারায়েছি
'মিলারের' লাগি মিলিয়ন (Million)
আমি Brahmin Bull হ'য়ে ফিরি
কায নাই মোর বুলিয়ন (Bullion)

ইন্দোর আমি তোমরা জানো ত
কাছাকাছি বটি ইন্দ্রের,
দুটি চক্ষুতে ভুলায় আমারে
হাজার চক্ষু নিন্দের!
'হেলেন' লাগিয়া পারিস অমর
চিনেছে ভদ্র-ইতরে,
পদ্মিনী কোথা! 'আলার' অনলে
চিতায় ঘেরিল চিতোরে!
রূপের জহুরী রূপা চেয়ে আমি
দামী মনে করি রূপসী,
চাঁদি পেয়ে চাঁদে ভুলিলা চকোর,
তার চেয়ে ভাল উপস-ই।
শত বরষের পরে আমাদের
কথা কহিবে না কেহ ত,
খাটি-ও অনলে মাটী হয়ে যাবে
এত আদরের দেহ ত।

যতখন মেঘে আছে রামধনু
ততখন নাচি পুলকে;
ফুল-কুঁড়ি ল'য়ে খেলা করে যাই
যা বলে বলুক কু-লোকে।
তপসী হইয়া চাহিনে চলিতে
সাধু স্বরগের সড়কে,
রাজী আমি আছি জীবনে-মরণে
নারী সাথে যেতে নরকে।
প্রেম বল আর লালসাই বল
পুড়ে মরি আমি মরুতে,
রাঙা হিন্দোলা দাগি দিল দাগা
মড়ক আনিল তরুতে।
রূপ কুহেলিকা গোলকধাঁধায়
ফেলেছি নিজেরে হারায়ে,
পতিত-পাবন তার এ পতিতে
দূরে কেন আছ দাঁড়ায়ে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

PUBLIC LIBRARY Estd. 1859



কাচ-শিল্প

যে সকল দ্রব্যের বহুল প্রচার আধুনিক বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়, তন্মধ্যে কাচ অন্যতম। আধুনিক হইলেও বর্ত্তমান যুগে কাচ নানাপ্রকারে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণ, চিকিৎসালয় ও বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রাদি প্রস্তুতে, সৌখীন আসবাব, যান, আলোক ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে কাচ না হইলে আর চলে না। শীতপ্রধান দেশ সমূহে সভ্য মানবগণের কাচ ব্যতীত বাস করা অসম্ভব। গৃহের মধ্যে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, অথচ ঝড়-বৃষ্টি ও হিমের প্রভাব অনুভূত না হয়, এরূপ গৃহনির্ম্মাণের উপাদান কাচ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রতীচ্যে নানাবিধ কার্য্যে কাচের চলন যত অধিক, এতদ্দেশে তত নহে; তবুও প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের কাচের দ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় দেশীয় কাচশিল্পের উন্নতির উপায়বিধান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

দেশীয় শিল্পের অবস্থা

কাচের আবিষ্কার চীন দেশেই হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভারতেও কাচ নিতান্ত নূতন নহে। পঞ্চনদ, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, আর্কট, জয়পুর ও পাটনায় এখনও পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর পরিমাণ কাচ প্রস্তুত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ

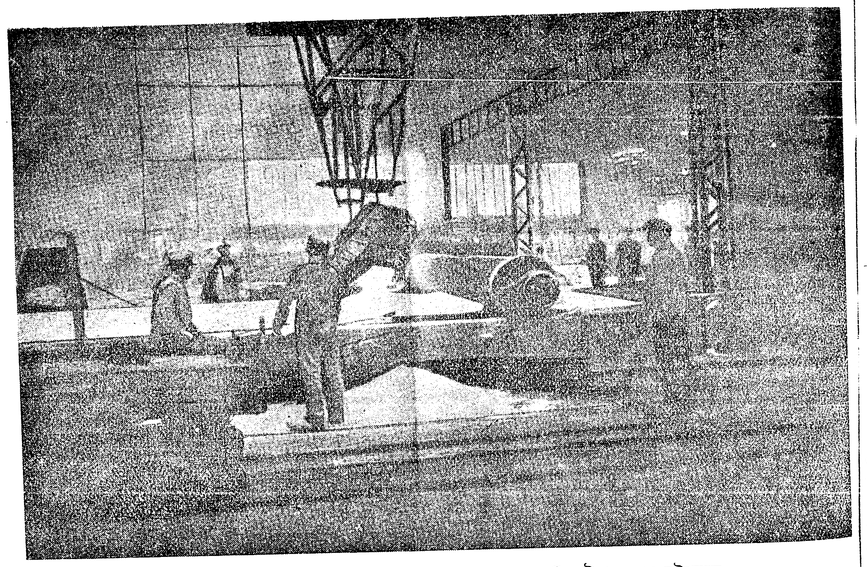

গলিত কাচ-মিশ্র টেবলে ঢালিয়া রুল সাহায্যে সমভাবে বিছাইয়া দেওয়া হইতেছে

প্রস্তুতপ্রণালী যেমন সেকেলে ধরণের, উৎপাদিত দ্রব্যাদিও তেমনই অপকৃষ্ট। উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের রাজপ্রাসাদ সমূহে কাচের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সাধারণ শিল্প বলিয়া ধরা যায় না। সেরূপ দ্রব্য পূর্ব্বে রাজাদেশে প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান সময়ে ফুঁকা শিশি, তৈলাধার, চুড়ি, নল প্রভৃতিই দেশীয় কাচ-শিল্পের দ্রব্য। কলিকাতা, বোম্বাই ও এলাহাবাদের নিকটে বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে কয়েকটি কাচের কারখানা চলিতেছে। কিন্তু তৎসমুদয় হইতে উৎপাদিত দ্রব্য এখনও বিদেশীয় কাচ-দ্রব্যের সহিত গুণে ও মূল্যে সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না।

আধুনিক কাচ-প্রস্তুত-প্রণালী

এখন জগতে যে সমুদয় কাচ-প্রস্তুতের কেন্দ্র আছে, তন্মধ্যে ফর্ম্মণী অন্যতম। উক্ত দেশে কাচ ও কাচজাত দ্রব্য কিরূপে প্রস্তুত হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ অধ্যয়নযোগ্য। কাচের চাদর (Plate ও sheet glass) কাচজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। কাচের চাদর প্রস্তুতে কি প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

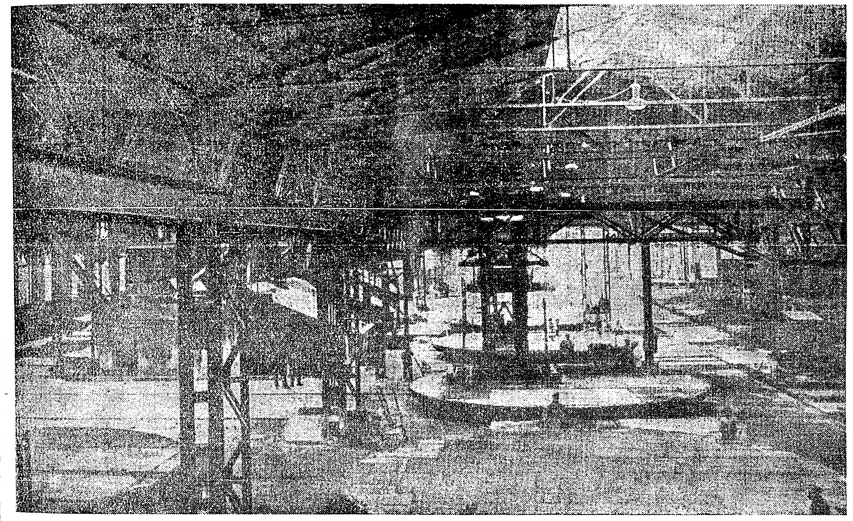

কাচ ঘষিবার ও পালিশ করিবার কারখানা

কাচ প্রস্তুতের উপাদান—বালি, খড়ি ও সোডা সলফেট অথবা তৎপরিবর্ত্তে সাজি মাটী। ঈষৎপরিমাণ হরিতাল সংযোগ করিয়া এই উপাদানগুলিকে গুঁড়াইতে ও মিশাইতে হয়। ইহাকেই 'কাচ-মিশ্র' বলা যায়। Fire-clay নামক অত্যুত্তাপ-সহ পদার্থ-বিরচিত বড় বড় পাত্র উক্ত কাচ-মিশ্র দিয়া আগুনে গলাইয়া লওয়া পরবর্ত্তী কার্য্য। চুল্লীতে Fire-clay পাত্র বসাইয়া, উপযুক্ত যন্ত্রসাহায্যে উহাতে কাচ-মিশ্র ভর্ত্তি করিয়া ক্রমশঃ তাপের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। ১ হাজার হইতে ১৬ শত সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে কাচ-মিশ্র গলিয়া যায়। বড় বড় লোহার শিক দ্বারা গলিত মিশ্র ক্রমাগত আলোড়ন করিয়া সকল প্রকার আবর্জ্জনা দূর করা হয়। উপযুক্তরূপে পরিষ্কৃত হইলে চুল্লীর গ্যাস ও বাতাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই অবস্থায় গলিত মিশ্রণকে ২৪ ঘণ্টা রাখা দরকার। উক্ত সময়ের পর চুল্লীর মুখ খোলা হইলে বড় বড় ভাম্যমাণ চিমটা মিশ্র সহ পাত্রকে বাহির করিয়া ট্রলি-যোগে ঢালাই টেবলে লইয়া গিয়া তদুপরি ঢালিয়া দেয়। টেবলের উপর ১৯ টন রোলার সংযুক্ত আছে। উহার চাপে গলিত মিশ্র সমভাবে চারিদিকে মিশ্রিত হয়। কোথাও কিছু দোষ থাকিলে তাহা শোধরাইবার জন্য লম্বা লোহার শিক হস্তে লোক দাঁড়াইয়া থাকে। ইহার পর চাদরে আবার উত্তাপ প্রদান করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে পুরু করা হয়।

তজ্জন্য বিশেষ কামরা আছে। এইরূপ ৫।৬টি কামরার মধ্য দিয়া কাচের চাদর অবশেষে পয়ঃপ্রণালীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়ায় কাচ খুব দৃঢ় হয়। ঠাণ্ডা হইলে চাদর হইতে বড় বড় শার্শি (Panes) কাটা ও দোষযুক্ত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইয়া থাকে।

এখন যে চাদর প্রস্তুত হইল, তাহা স্বচ্ছ নহে; তাহার এক দিক বালি ও অন্য দিক আঁচড় প্রভৃতি দাগযুক্ত। উহাকে স্বচ্ছ ও মসৃণ করিতে হইলে ঘষা-মাজা আবশ্যক এবং তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ৩০ ফুট ব্যাসযুক্ত ঢালাই লোহার টেবলের উপর কল দ্বারা চাদর আনা হয়। টেবলের উপর প্লাষ্টার (plaster) ঢালা থাকে এবং তাহাতেই চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। প্লাষ্টার বসিয়া গেলে চাদর টেবলের সহিত

দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর টেবলকে ঘর্ষণযন্ত্রের তলদেশে লইয়া যাওয়া হয়। সূক্ষ্ম বালি ও এমেরি চূর্ণের সাহায্যে ঘূর্ণ্যমান টেবলের উপরিস্থ কাচের চাদরকে অল্পসময়ের মধ্যেই ঘষিয়া স্বচ্ছ ও সমতল করিয়া লওয়া হয়। পরে উহা আবার পালিশ যন্ত্রের দ্বারা মার্জ্জিত ও সুচিক্কণ করা হয়। চাদরের এক পৃষ্ঠ এইরূপ প্রস্তুত হইলে উহাকে উল্টাইয়া লইয়া অপর পৃষ্ঠও সমভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রস্তুতীকৃত চাদর পরীক্ষার জন্য সুদক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং কয়েক প্রকার বিশেষ প্রথা অবলম্বিত হয়। পরীক্ষিত কাচ গুণানুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। বলা আবশ্যক যে, ঢালাই দ্বারা কাচ প্রস্তুত আধুনিকতম প্রথা। ফুকো কাচ (blown glass) প্রস্তুতপ্রণালী এখনও উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু উহা অধিক শ্রমসাধ্য এবং বহু বর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন ফুঁ দেওয়ার লোক (glass-blower) নিখুঁত কাচ প্রস্তুত করিতে পারে না। আমরা এ স্থলে কাচ প্রস্তুতপ্রথার আভাস মাত্র দিলাম। বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালীর তারতম্য আছে, কিন্তু মূল প্রথা প্রায় এক এবং পূর্ব্ববর্ণিত প্রথার অনুরূপ।

জর্ম্মণীর কাচ-শিল্প

যুদ্ধের পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত কাচের দ্রব্য আমদানী হইত, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে আসিত। যুদ্ধের সময় অবশ্য সে সব খুব কমিয়া গিয়া বাজারে জাপানী মালের আধিপত্য হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধিসংস্থাপনের সহিত আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। জর্ম্মণী, জেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রীয়া হইতে এখন প্রচুর কাচের মাল আসিতেছে। এই তিন দেশের মধ্যে জর্ম্মণীর কাচ-শিল্পই পুরাতন ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত। জর্ম্মণীর কাচ-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র দুইটি—থুরিঞ্জিয়া ও জেনা। থুরিঞ্জিয়া অরণ্যের মধ্যে লোকালয়ের অভাব নাই এবং তথায় কল-কব্জা, তন্তুজ-দ্রব্য, খেলনা ও চীনা মাটীর দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। কাচ-শিল্পের স্থান পূর্ব্বোক্ত চারিটি শিল্পের পরেই। আয়তনে পঞ্চম হইলেও থুরিঞ্জিয়া অঞ্চলের কলকারখানায় যত লোক নিযুক্ত হয়, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ লোক কাচ-শিল্পে নিযুক্ত।

থুরিঞ্জিয়া অরণ্যের দক্ষিণপূর্ব্ব অংশেই কাচ-কারখানার বাহুল্য দেখা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য থুরিঞ্জিয়ায় সাধারণ রকমের কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। Sonneberg ও Konigsee প্রভৃতি অংশে গৃহ-শিল্পরূপ কাচের খেলনা, পুতুল, কৃত্রিম চক্ষু ও খুচরা অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ফাঁপা কাচের (hollow glass) দ্রব্যেই থুরিঞ্জিয়ার প্রাধান্য অধিক ; নল, শিশি, বোতল, ফানেল, গোলক ও নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার দ্রব্য জর্ম্মণীর অন্য নানা স্থানেও হয়, কিন্তু তাহা হইলেও অর্দ্ধ-প্রস্তুতীকৃত (Semi finished) মাল যথা নল, গোলক ইত্যাদি থুরিঞ্জিয়া হইতেই গৃহীত হয়।

কয়েক বৎসর জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ ব্যবহারিক তথ্যবিৎ ডাক্তার মূলার কাচ-শিল্পসম্বন্ধীয় একখানি বিবরণ প্রচার করেন। তাহাতে দেখা যায় যে, থুরিঞ্জিয়ায় ২শত ৫০টি কাচের কারখানা আছে এবং তৎসমুদয়ে অন্যূন ১৪ হাজার লোক কায করে। ছোট কারখানার সংখ্যা আরও অধিক, প্রায় ১৮ শত এবং সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৫ হাজারের কম নহে। ইহার মধ্যে ২ শত কারখানা ও ৪ হাজার মজুর শুধু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুতে নিযুক্ত। যখন বাজারের অবস্থা ভাল থাকে, তখন ২৪ হাজার লোক কাচের কারখানাসমূহে কায করে। ইহা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা ; বর্ত্তমান সময়ে থুরিঞ্জিয়ার কাচ-শিল্প যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী এবং তৎসহ যে কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহের অবসর নাই।

থুরিঞ্জিয়ার বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন শ্রেণীর কাচের দ্রব্য প্রস্তুতে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। Ilmenau এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ থারমোমিটার এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে বিশেষ পটু; কাচ ঘষার কারখানাও এই সকল স্থানে অধিক। Laucha অঞ্চলে শোভন সামগ্রী (Ornamental goods), খেলনা ও পুতুল প্রচুর পরিমাণ প্রস্তুত হয়। এই সমুদয় কার্য্যে নিম্ন শ্রমিকের সংখ্যা ৫ হাজারের কম হইবে না। কিন্তু সকলেই কারখানায় কায করে না। অনেক গৃহস্থবাড়ীতে এইরূপ দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং এই জন্যই অনেক জর্ম্মণ কাচদ্রব্যের মূল্য খুব সুলভ।

জেনার কাচ-শিল্প প্রধানতঃ জেনা সহরেই আবদ্ধ। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ও অন্যান্য বীক্ষণযন্ত্রের ও চশমার কাচের জন্য জেনা চিরপ্রসিদ্ধ। এ স্থলের কাচ-শিল্প প্রায় অশীতিবর্ষব্যাপী। সুপ্রসিদ্ধ কার্ল জাইসের কারখানা, যথা হইতে শ্রেষ্ঠ বীক্ষণযন্ত্রাদি প্রস্তুত হওয়ায় জীব ও জীবাণুতত্ত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস্ত্রী, Carl Zeiss দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিখ্যাত জেনা কাচ-কারখানারও (Jena Glass Work) সূত্রপাত ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে হয়। বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বত্রই জেনা-কাচের গুণ সুপরিচিত এবং এমন বিজ্ঞানাগার নাই, যথায় কোন না কোন প্রকারের জেনা-কাচ ব্যবহার না হয়। বস্তুতঃ জেনা সহরে উৎপাদিত কাচের ন্যায় সূক্ষ্ম, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কাচ পৃথিবীর অন্যত্র কোথায়ও উৎপাদিত হয় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যতীত উৎকৃষ্ট আলোকের চিমনী, দুধ খাওয়ার বোতল, বায়ুরুদ্ধ শিশি ইত্যাদি অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যও জেনায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। জেনায় যে সমস্ত কাচ প্রস্তুত হয়, উহাদের ঘর্ষণ ও পালিশের বন্দোবস্তও উক্ত স্থলে আছে। জেনার কারখানা সমূহে ৫।৬ হাজার লোক কার্য্য করে।

থুরিঞ্জিয়া বনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে অপেক্ষাকৃত বড় বড় কারখানাগুলি অবস্থিত,—Altenfeld, Franenwald, Gehreu, Hasenthal Luisenthal, Piesan, Schmiedefeld, Steinnach, Stutzerbach। এতদ্ভিন্ন আরও ১০।১২টি কেন্দ্র হইতে কাচের মাল বিদেশে চালান যায়। চালানী মালের মধ্যে থারমোমিটর, পিচকারী, ডাক্তারী য

গোহালের সরঞ্জাম, রঞ্জন-রশ্মি নল, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, রং, গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শিশি, বোতল ইত্যাদিই অন্যতম। কাচের গহনা প্রস্তুতেরও কতকগুলি বেশ কেন্দ্র আছে। সাধারণতঃ যে সকল চুড়ী এতদ্দেশে রপ্তানী হয়, তাহার অধিকাংশই Czecho Slovaldia র কারখানাসমূহে প্রস্তুত ; কিন্তু কয়েক প্রকার চুড়ী থুরিঞ্জিয়া হইতেও আইসে। বিগত মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতি দেশ কাচ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সফলমনোরথ হইতে পারে নাই। তাহার মূল কারণ তিনটি বলিয়া বোধ হয় :—(১) জর্ম্মণীর ন্যায় শ্রম ও বিশেষজ্ঞের সমবায়ে কার্য্য করিবার প্রথা আর কোথাও নাই, (২) গৃহ-শিল্পরূপে ও স্থানীয় দক্ষ লোকের দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হওয়ায় জর্ম্মণীতে কাচের দ্রব্য সুলভ, (৩) ভূরি উৎপাদন ও শ্রম বিভাগ ; এক শ্রেণীর দ্রব্য এক স্থানেই বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয় ; তাহাতে এক এক প্রকার কার্য্যে এক এক স্থানের লোক এত বিচক্ষণ হইয়া উঠে যে, তাহাদের কাযে কোন খুঁত দেখা যায় না, অথচ দ্রব্য মূল্যে সুলভ হয়।

ভারতে কাচজাত দ্রব্যের চাহিদা

কিরূপে কাচ-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর কাচজাত দ্রব্যের কাটতি অধিক। কোন বৎসরের আমদানীর হিসাব দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা এ স্থলে ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি :—

চুড়ি	টাকা ১,০০,২২,০৩৬
দানা ও ঝুটা মুক্তা	৩৭,৭৫,৭৪১
শিশি-বোতল	৩৪,৫৯,৫৯৬
ফোঁদল, বেল ও দীপের অংশ	১৬,৫৯,২৮১
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি	২,১৭,৭০৭
চাদর ও মার্জ্জিত কাচ	৩৩,৮৫,৩৭৯
পান ও আহার কার্য্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি	৮,৯৮,৮৬৬
অন্যান্য কাচজাত দ্রব্য	২৫,৮২,৭৩২
মোট টাকা	২,৬০,০১,৩৩৮

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, বিলাসিতার দ্রব্যই (১ ও ২ নং) আমদানীর মালের মূল্যের কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধেক পরিমাণের ভাগী। চুড়িই তালিকার সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। এ দেশ হইতে কত মূল্যের মাল আমদানী হয়, তাহা আলোচনা করিতে গেলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। জর্ম্মণী, অষ্ট্রীয়া ও জেকো-স্লোভাকিয়া হইতে মোট ১ কোটি লক্ষ ১৪ হাজার ৫৪ টাকার মাল আইসে ; উহা মোট মূল্যের অর্দ্ধেকের কিছু কম। শেষোক্ত দেশই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার মাল প্রেরণ করে এবং তাহার অধিকাংশই চুড়ি। দানা ও নকল মুক্তার আমদানী সামান্য পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু চুড়ির আমদানী বাড়িয়া চলিয়াছে। আমদানীর দেশের হিসাবে জেকো-স্লোভাকিয়ার নিম্নেই জাপানের স্থান ; জাপান হইতে সকল শ্রেণীর কাচজাত দ্রব্য আইসে, কিন্তু সাধারণতঃ উহারা জর্ম্মণ মালের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। এক শ্রেণীর জিনিষ পূর্ব্বোক্ত তালিকায় প্রদর্শিত হয় নাই—তাহা বৈদ্যুতিক আলোর ফানুস ইত্যাদি। উহাদের বাৎসরিক আমদানীর মূল্য ১৫ লক্ষ টাকার কিছু উপর ; এই শ্রেণীর দ্রব্য হলণ্ড হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় আইসে।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে কেবলমাত্র সামান্য পরিমাণে চুড়ি, শিশি-বোতল, চিম্‌নী, কয়েক প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও আরও ২।৪ রকমের দ্রব্য দেশে প্রস্তুত হইতেছে। নিরক্ষর ফুকো শিশি প্রস্তুতকারকগণের স্থান শিক্ষিত ক্ষুদ্র কারখানাওয়ালাগণ দ্বারা বহুল পরিমাণে অধিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত কাঁচামালের অথবা যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাবে প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য বিদেশীয় দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যাঁহারা কাচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ভাঙ্গা কাচ গলাইয়া লইতেছেন। বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী যন্ত্র প্রস্তুতকারকগণ বিলাতী কাচ প্রয়োগ করিতেছেন। দেশীয় উপাদানের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা কমই হইয়াছে। সাধারণ ধারণা এই যে, কাচ প্রস্তুতের উপযুক্ত বালি এতদ্দেশে সুলভ নহে, কিংবা বড় বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্রের নিকট পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কাচের ন্যায় বৃহৎ শিল্প ঠিক যে ব্যবসায়কেন্দ্রে স্থাপিত হইবে, তাহা আশা করিতে পারা যায় না। অবশ্য রেল কিংবা ষ্টীমার পথ হইতে কারখানা বহু দূরে দূরে অবস্থিত হইলে বিলক্ষণ অসুবিধা আছে। কিন্তু সঙ্গত ব্যয়ে রেল কিংবা ষ্টীমারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারা যায়, অথচ কারখানার স্থানে কাঁচামাল ও মজুরের অভাব না হয়, এরূপ স্থান পাওয়া অসম্ভব নহে। বৃহৎ কাচ-কারখানা স্থাপনের কোন উদ্যোগ এ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। বিগত যুদ্ধের সময় Munitions Boardএর প্রযত্নে ভারতে কাচ প্রস্তুতের উপাদান সম্বন্ধে কতক গবেষণা হইয়াছিল এবং কোন কোন কারখানায় তাঁহাদিগের উপদেশ অনুযায়ী কাচও প্রস্তুত হইয়াছিল। সে-গুলি মন্দও হয় নাই। সেরূপ গবেষণা যদি ধারাবাহিকরূপে চলিত, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারিত। এখনও যদি দেশের লোক কাচ-শিল্পে মনোযোগী হয়েন এবং বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আনাইয়া কাচ-শিল্প গঠনের প্রয়াসে সরকার সাহায্য করেন, তবে সময়ক্রমে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও সুবৃহৎ কাচ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

দাদামশাই

৩

সেবার মাস আড়াই ধ'রে রোজই তাঁর কাছে গেছি। বাড়ীতেও বেশী কেউ ছিল না। শুধু আমার ছেলে ও ছোট ভাই। দুইটিই তখন ছোট। ওদের জন্য আমাদের বিশেষ কিছু করবার দরকার ছিল না। সুরজপ্রসাদ বাড়ীর ভার নিয়ে সব দেখা-শোনা করতো। কোন দিন তারা বাড়ী থাকলে আমরা রাত্রিতে ফিরে এসে দেখতুম, ওরা ঘুমুচ্চে। দাদামশাইএর সেবক সতীশ প্রায়ই আমাদের গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিয়ে যেত। আশ-পাশের পৃথিবী থেকে আমরা মনটাকে খুবই সরিয়ে দিয়েছিলুম। তবু যে দিন নেহাৎ যাওয়া না হতো, কাছেই "কুরুক্ষেত্রে" অনেক-গুলি বদরীনাথের ফেরৎ সন্ন্যাসী যাত্রী এসে ঘোর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাদেরই চিকিৎসা করতে যেতুম। যে কেসটা একটু শক্ত দেখা যেত, ওঁকেও জিজ্ঞেস ক'রে নিতুম। অনেক রোগীই ভাল হয়ে উঠ্‌লো। অবশ্য এ চিকিৎসার ওষুধ, পথ্য, কাপড়, কম্বল সবই চিকিৎসককে ঘর থেকে দিয়ে তবেই চিকিৎসা করতে পাওয়া গেছলো। আবার একবার এমন হলো যে, একটি মুমূর্ষু রোগী মরবে জেনে তাকে আর পাঁচ জনে মিলে গঙ্গার ঘাটে রেখে এসেছিল। আমরা তার শ্বাস হয়েছে দেখে, গঙ্গা-জলের সঙ্গে একটু ল্যাকেসিস মিশিয়ে খেতে দিয়ে নৌকা ক'রে বেড়িয়ে ফিরে তাকে একটু যেন ভাল মনে হওয়ায়, এক জনকে পয়সা দিয়ে তাকে দুধ ও ওষুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে পুলিসের লোক ডাকিয়ে তাকে তুলিয়ে জগন্নাথ-মন্দিরের বাগানে রাখিয়ে দিতে ক'দিনেই সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠ্‌লো। পাঁচ সাত দিন আমরাও তাকে খেতে দিয়ে তার পর ভুলেও গেলুম। এক দিন সে এসে আমাদের যা খুসী ব'লে গাল দিলে। বল্লে, "খেতে দিবে না যদি ত শুধু শুধু বাঁচাতে গেছলে কেন? আমি ত মরছিলুমই, চুকেই যেত! তোমাদের সখ হলো!"

তা সত্যি! বেঁচে উঠেই খাবার বেলা যাকে ভাবতে হবে, তার প্রাণদাতার কাছে কৃতজ্ঞতার বাণী বেরোয় কোত্থেকে! এ ক্ষেত্রে প্রাণদাতারই অন্নদাতা হবার দায়িত্ব এসেই পড়ে।

যাই হোক, এই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত-ভাবে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। এই সময় রোজই তাঁর কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখতে লাগলুম। পড়া-শোনার চর্চ্চাও চল্লো। ইংরাজী এবং সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য আমার কতকটা পড়া আছে এবং দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানও অল্পস্বল্প রয়েছে দেখে তিনি আমায় কতকগুলি বিষয় নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। বাড়ীতে সেগুলি প'ড়ে এসে তাঁর কাছে ঐ সূত্র-ধ'রে বহু বিস্তৃত আলোচনা শুন্‌তুম। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুইয়েরই সামঞ্জস্য ক'রে এতই সূক্ষ্মভাবে দুরূহ তত্ত্ব সব বুঝিয়ে দিতেন যে, আমাদের মত লোকের পক্ষেও অতগুলা জিনিষকে ধারণা ক'রে নিতে মোটেই কঠিন ঠেকতো না। সাংখ্যযোগ বেদান্তএর সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ দার্শনিকদের মতামত ও তাঁদের বই থেকে দরকারী অংশগুলি এই সময়েই নিজে কত যত্ন করেই পড়িয়ে দেন। তার পর সেবার যখন বাঁকিপুরে ফেরার সময় হলো, নিজের সে সময়ে ছাপা বইগুলি তাঁর সেবক সতীশকে ডেকে আমায় দিতে বল্লেন। বল্লেন, "এইবার এগুলি তুমি অনেকটাই বুঝতে পারবে। অবশ্য সব যায়গা হয় ত বেশ পরিষ্কার না হ'তেও পারে। আবার দু এক মাস পরেই আসছো, বড় দিনের বন্ধে। সেই সময় আবার যতটা পারি, বুঝিয়ে দেব। যে সব যায়গা বুঝতে পারবে না, দাগ দিয়ে রেখো।"

প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার যে সব কথাবার্ত্তা হতো, আমার জ্যোতিহারা উপন্যাসে অণিমার মুখ দিয়ে তার দাদা-মশাইকে আমি প্রায় সেই গুলোকেই বলিয়েছি। অবশ্য আমি কোন দিনই নাস্তিকতার শিক্ষা পাইনি। তবে শাস্ত্রকারেরা মেয়েদের উপর বড় অন্যায় করেছেন, অর্থাৎ কেনই বা তারা বেদে অধিকার পাবে না? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাজ্য হোক, সে অবশ্য ভাল কথাই। কিন্তু নারীকে নরকের দ্বার কেন বলা হ'ল? স্ত্রী-শূদ্রকে দ্বন্দ্ব সমাসে যোগ করা অন্যায় হয়েছে! ইত্যাদি নারীদ্রোহের যত কিছু নালিশ নির্ভয়ে ওঁকেই জানিয়ে যেতুম। উত্তরে কিন্তু তেম্‌নি সকল দ্বিধা মিটিয়ে দিয়ে চির-দিনের মতই সন্দেহের শেষ ক'রে দিতেন। এমনই ভাসা ভাসা একটা আবছা গোছের উত্তর কোন তুচ্ছ বিষয়েই তিনি কোন দিন কারুকে বোধ হয় দেননি! যতক্ষণ না জিজ্ঞাসুর অন্তরের সমুদয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রশমিত হয়ে যেত, ততক্ষণ ধ'রেই তাকে যে দিক দিয়ে তার পক্ষে সুগম হয়, যুক্তি-তর্ক দ্বারা তার জিজ্ঞাসার উত্তরকে সহজ ক'রে দিতেন। এর জন্য সারাজীবনকালটা ধ'রেই কি কম পরিশ্রমটা ক'রে গেলেন! অথচ—অথচ, হয়ে কি? তেমন ক'রে কেউ কি কিছুই বুঝান না শিখলে? বেঁধে বনে মুক্তো ছড়িয়েই গেলেন কি?

তাই বা কেন? যে বীজটি ফলবার, সে ঠিকই ফলে, হয় সে সহস্রের মধ্যে একটা। চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্ম মহা স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতার জন্য এদেশের সনাতন ধর্ম্মকে ধর্ম্মের মূলধর্ম্ম ব'লে পাশ্চাত্য জগৎ যে স্বীকার ক'রে নিয়েছে সেই মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ এঁর খুব প্রিয় ছিলেন। ইনি যখন বালি ও পরে বরানগরে থাকতেন, প্রায়ই এঁর কাছে আসা যাওয়া করতেন। পুরনো চিঠির মধ্যে একখানায় লিখতে দেখেছি,—"আপনার কাছ থেকে অনেক বিষয়েই পেয়েছি। আপনার বলেই বলীয়ান্ হয়ে আমি নির্ভয়ে করছি। ফল তাঁর হাতে।.....যদি কিছু জানার পড়ে, উত্তর যেন পাই।....."

তবে সে আর ক'জন? আমাদের মতই ভাগ!

বড় দিনের ছুটীতে ফের ফিরে এলেম। এবার সঙ্গে কেউ কেউ ছিল। সময়টা তাই একটু ভাগ হয়ে গেল। ছাড়া সময়ও কম। বাবা ছিলেন, আমার স্বামী ছি আলোচনা খুবই হতো, আমি নিবিষ্টমনেই শুন্‌তেম। যায়গা নোট ক'রে ক'রে নিতুম। আমার এর পরের

প্রবন্ধে এই সময়কার শ্রুত মতবাদগুলি আমি দিয়েছি। 'সন্ধ্যা' 'স্বাধ্যায়' 'ধ্যান' প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধই তাঁর মুখের ব্যাখ্যা শুনে গুনেই লেখা। বল্লেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, হেগেল, কাণ্ট এদেরও কিছু কিছু বই প'ড়ে দেখা ভাল। প্রথম স্পেন্‌সারের 'ফার্ষ্ট-প্রিন্‌সিপল' দু'খানা পড়বো ঠিক করলুম। যে ক'দিন ছিলুম, রাতে যতখানি শিখে নিতে পারলুম, ফিরে এসে এক বছরেও তা হয় না। এমন অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি কোথাও দেখি নি! ইংরাজ, ফরাসী, রাসিয়ান, জার্ম্মাণ এবং বৈদিক ঋষি সবাই-কার এক ধরণের মত পর পর মুখস্থ ব'লে গেলেন। এর ওইখানে গলদ, তার সেইখানে ফাঁকি, এই রকম ক'রে প্রমাণ

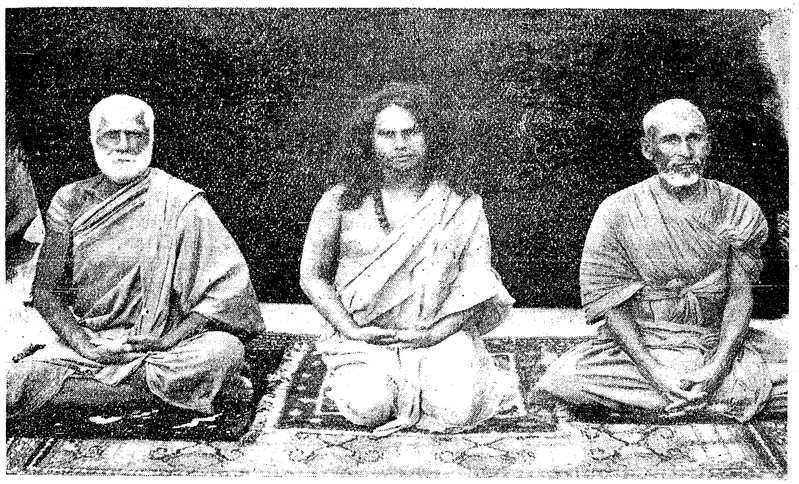

শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ (দাদামশাই)

ক'রে দিলেন যে, বৈদিক ঋষির মতই অভ্রান্ত। আর এক অদ্ভুত শক্তি তাঁর ছিল। শ্রোতার শিক্ষা এবং মানসিক অবস্থায় ঠিক উপযুক্ত ক'রে শেখানো। আমার স্বামী সাধকের এক জন ভাল স্কলার। তাঁকে কিছু বোঝাতে হ'লে সেই দিক দিয়েই বোঝাতেন, বেশ সহজেই বুঝতে পারতেন। বাবার সঙ্গে সব বিষয়েই সমানভাবে কিছু কিছু আলোচনা চলে। প্রকৃতী-জানাদের সঙ্গে (ফিজিওলজী) শরীর-বিজ্ঞান দিয়ে বোঝাতেন। আমি ও সব ত জানিই না, তবু বোঝানর ধরণে অল্প-স্বল্প সবই যেন বুঝতে পার্‌তুম মনে হ'ত। বলার শক্তিটাই তাঁর এত চমৎকার!

মধ্যে মধ্যে আমাদের সেখানে নিমন্ত্রণ খাওয়াও চলত। শনিবারে যখন এসেছিলেন, এক দিন বল্‌লেন, "দেখ অনু, একটা ইচ্ছে করে, কিন্তু যদি তোমাদের আপত্তি থাকে, তাই কিছু বলি না। একটা কথা বলি, শুন্‌বে?"

বিস্মিত হয়ে বল্‌লেম, "বাঃ! আপনার কথা শুন্‌ব না?"

বল্‌লেন, "দেখ, তোমরা কত দিন রাত ক'রে যাও, আমার ইচ্ছা হয়, বলি এখানে খেয়ে যাও, কিন্তু যদি তোমরা না খাও, তাই বল্‌তে পারি না।"

সাশ্চর্য্যে ব'লে উঠলেম, "আপনি বল্‌লে আমরা খাব না? আমাদের এতটাই গোঁয়ার কি থেকে মনে ক'রে নিলেন, দাদামশাই?"

তিনি হেসে ফেল্লেন, "না রে, তার জন্যে নয়। তোরা রাঢ়ী, আর আমরা যে বারেন্দ্র। আমাদের বাড়ী খাবি?"

রাঢ়ী-বারেন্দ্রে সর্ব্বত্র যে খাওয়া চলে না, সে আমি জানতুম; বল্‌লুম, "কেন, জাত যাবে বুঝি? বারেন্দ্র যখন ব্রাহ্মণ, তখন খেতে দোষ কি?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যখন বারেন্দ্র, তখন বারেন্দ্রের বাড়ী খেতে দোষ আছে, আমি কি স্বীকার করব? সেটা তোরাই বল্‌বি।"

আমি বল্‌লেম, "সেটা আমরা আর কোন্ লজ্জায় বল্‌তে যাব? তা ত খাওয়াটাই আমাদের পছন্দ এবং সুবিধাও বটে!"

সেই থেকে মধ্যে মধ্যে খাওয়ার কথা বল্‌তেন। এক দিন বাবাকেও বল্‌লেন, "বাবা, আজ এখানে খেয়ে যেও, কোন অসুবিধে হবে না ত?"

এক দিন আমি দাবী তুল্‌লেম, "আমি এক দিন রেঁধে দেব, আমার হাতে আপনাকে খেতেই হবে।"

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "এক দিন মাত্র। বারোমাস যদি

দিতিস্ ত না হয় খেতুম, এক দিন খাইয়েই তুমি হাঁপিয়ে পড়বে। অমন খেয়ে আমার লাভ ?"

আমিও এই হাস্যপ্রচ্ছাদিত যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া আর ও দাবী তুলি নাই। নিজেই বল্‌লেন, "দেখ, তোমার হাতে খেতে আমার আপত্তি হ'ত না, তবে আর সবাইও ত এই দাবী তুলবে ? তাদেরও ত মনে কষ্ট হ'তে পারে ? কায কি ?"

স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন আর কারও হাতের অন্ন গ্রহণ তিনি করতেন না।

পূর্ব্বে যখন বরানগরে থাকতেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহার এক জন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা এখনও মধ্যে মধ্যে ওঁর কাছে আস্‌তেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখুয্যের কন্যা তাঁহার দীক্ষিতা শিষ্যা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ঐখানেই সেবার আমাদের আলাপ হ'ল। এবারও আমাদের বাড়ীশুদ্ধ সবাই সেই দুপুর থেকে যতটা রাত পর্য্যন্ত থাকা যায়, এখানেই কাটিয়ে আসি। সব দিন তখন দরজা খোলা হয় না, দোর বন্ধ ক'রে সাধনায় মগ্ন থাকেন, আমরা দোরের কাছে বসেই আছি। সে-ও ভাল, কারণ, দেরী হ'য়ে গেলে অন্য পুরুষের দল যদি ঘরে ঢুকে পড়ে, আমাদের পক্ষে দেখা পাওয়াই ত কঠিন হবে। রোগের জন্যই বেশীর ভাগ লোক আসে, ওষুধপত্র ঠিক ত আর এমনই ডাক্তারদের মত 'ফোমেন্‌টেসন্ বাতলাও' ক'রে চুকিয়ে দেন না। কত বই দেখে মিলিয়ে ভেবে-চিন্তে তবে ত দেবেন। সে ঢের সময় লাগে। তবে আমরা সহজে কারু ক্ষতি করতাম না। কোন বড় রোগী বা তার আত্মীয়রা এসেছে জান্‌লে আমরা নিজেরাই সে কথা তাঁকে জানাতুম। অনুমাত্র হ'লে আসতে দিয়ে স'রে যেতুম। নেহাৎ অজানা বা না বেরুনোর মত কেউ হ'লে উঠেও যেতুম।

আমাদের ওখানকার অপ্রতিহত প্রভাব দেখে অনেক লোকই আমাদের হিংসা করত। আমরা আস্‌ছি দেখতে পেলে ছুটে গিয়ে সম্ভব হ'লে ঘর বা দোর দখল ক'রে বসত। শুনেছি, আমরা উপরে আছি জেনে, কেউ কেউ "মুকুন্দ বাবুর মেয়েরা রয়েছেন ! তবেই আর দেখা হয়েছে !" ব'লে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু আমরা যতক্ষণই কেন থাকি না, তিনি একটুও অসন্তুষ্ট এক দিনের জন্যও হন নি। যদি কোন দিন যেতে দেরী হয়েছে, জিজ্ঞেস করেছেন "সব ভাল ত ? দেরী দেখে আমার মনে হয়েছে, হয় ত তোমরা আসতে পারলে না।"

আমরা চ'লে আস্‌বার আগে বলেছেন, "এই জন্যই জাগতিক মেলামেশা এ সব ভাল না ! এই তোমরা রোজ আসতে, কাল চ'লে যাবে, ঐ সময়টায় মনটা একটু শূন্য বোধ হবেবৈ কি।"

সেবারে ফিরে গিয়ে তাঁহাকে মনে ক'রে এই কবিতাটা লিখেছিলাম,—

আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকার দাদামহাশয় !

ঋষি তুমি উন্নত উদার
গরিমপূর্ণ জ্ঞান মহিমার,
সমুজ্জ্বল দীপ্ত রবি, চরিত্র মহান্ ছবি,
পূর্ণ মূর্ত্তি নর কল্পনার,
পরহিতে উৎসর্গিত প্রাণ, নরাকারে দেবতা সমান,
ব্যাধি-প্রপীড়িত মনে, বিলাইছ জনে জনে,
আরোগ্যের সুধা সঞ্জীবনী
ঢালি করুণার মন্দাকিনী
বেদজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ ধীর, সত্যসন্ধ জ্ঞানবীর
ইন্ধন-বিহীন অগ্নি প্রায়,
সৌম্য শান্ত তেজঃপুঞ্জকায়,
পতিত ভারতে আজ, আবির্ভূত ঋষিরাজ,
জ্ঞাননেত্র খুলিতে সবার,
শাস্ত্রতত্ত্ব করিতে প্রচার।
ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য-তেজে দীপ্ত হোমানল
শারদ চন্দ্রমা সম স্নিগ্ধ সুশীতল ॥

তাঁহাকে পদ্য দিয়ে কিংবা গদ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারবো, এমন ধৃষ্ট আশা আমার মোটেই নেই। বিবেক-চূড়ামণিতে যে একটি শ্লোক আছে,—"চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্ !" চন্দ্রকে নিজ চক্ষু দ্বারা না দেখিলে অন্যের চক্ষু দ্বারা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করা যায় না। যারা তাঁকে দেখেছেন, যারা এমন ক'রে পেয়েছেন, তাঁরা ভিন্ন আর কেউ তাঁহাকে এ সব তুচ্ছ লেখার মধ্য দিয়ে চিনে নিতে পারে না। জানি, তবুও এ চেষ্টা যে কেন করছি, তা ত নিজেই জানি না! এ শুধু গভীরতর একটা প্রাণের আবেগমাত্র। কৃতজ্ঞতাভরা ভগ্নচিত্তের এতটুকু একটুখানি অক্ষম অভিব্যক্তি ! ভক্ত তার যে অপরিসীম ভক্তির প্রস্রবণ ঝরিয়ে দিয়ে তাঁরই তলায় জমা যেমাটীতে বিশ্বেশ্বরের প্রতীকভাবে যাণেশ্বরের শিল্পকৌশলবিহীন মূর্ত্তি গ'ড়ে ধুতুরায় ও বিল্বদলে পূজো ক'রে নিজেকে ধন্য বোধ ক'রে থাকে, আমারও এ সেই রকমেরই সর্ব্বানুষ্ঠানবিবর্জ্জিত, অক্ষম অশক্তের উপাদান উপচারবিহীন সামান্য পূজা মাত্র ! যদি বিশ্বের দেবতা সে পূজায় অতৃপ্ত না হয়ে থাকেন, আমার দেবতাও তা হবেন না। তিনি ত জানেন, শক্তি আমার যত সামান্য হোক, ভক্তি আমার কারু চেয়েই কোন দিন কম ছি না, আজও নেই !

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

৺শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ *

দেবতা দেখিনি কভু একমাত্র দেখেছি তোমারে
সৌম্যমূর্ত্তি হে ব্রাহ্মণ, হে সংসারী সংসার-বিরাগী,
নতশিরে মানিয়াছি মানুষ দেবতা হ'তে পারে,
লক্ষ নেত্রে অশ্রু ঝরে দিকে দিকে আজি তোমা লাগি!

অন্তরে ভক্তির সিন্ধু সর্ব্বজীবে বুকভরা স্নেহ
বেদের ঊষায় যা'রা তপোবনে ছিল যোগাসনে
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুল তুমি বুঝি তাহাদেরি কেহ
কলির সন্ধ্যায় আজ এসেছিলে কি ব্রতসাধনে,

সে ব্রত হ'ল কি সাঙ্গ ? সঙ্গোপনে চ'লে গেলে তাই
সবার সাধিয়া শুভ, আজীবন জ্ঞানচর্চ্চা করি ?

* আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার শ্রীশ্রীশশিভূষণ সান্ন্যাল মহাশয়।

কেহ কথা শুনল না, মুক্তিতীর্থে ডাকিলে বৃথাই
বদ্ধজীবে, অবশেষে পাপলোক গেলে পরিহরি।
করুণার অবতার—বিশ্ববন্ধু দীনের দেবতা !
যুগে যুগে আসিয়াছ ঘুচাইতে পরের বেদনা,
পাপীরে দিয়েছ কোল শুনায়েছ মুক্তির বারতা,
যে যজ্ঞাগ্নি বক্ষে ছিল লক্ষ বক্ষে সেই অগ্নিকণা
বিতরিতে চেয়েছিলে, সব তার হবে না নিষ্ফল।
স্ফুলিঙ্গ স্ফুরিবে তার বহু বক্ষে নিত্যকাল তরে,
ব্যথায় সান্ত্বনা দিবে দুর্দ্দিনেতে আনি দিবে বল,
অনাগত ভবিষ্যতে মুমুক্ষু নমিবে শ্রদ্ধাভরে
পড়ি তব গ্রন্থরাজি, শুনি তব জ্ঞানগর্ভ বাণী,
ভক্তের মানস-পটে মূর্ত্তি তব প্রসন্ন উদার—
চিরদিন জেগে রবে। যাহাদের বক্ষে নেছ টানি,
তোমারে চিনেছে যারা প্রস্রবণ প্রীতি-মমতার
তাহাদের অশ্রু আর শুকাবে না—শুকাবার নয়,
দুর্দ্দিনের কর্ণধার গুরু, বন্ধু, জাগ্রত দেবতা,
শোকে শান্তি,—রোগে স্বাস্থ্য, আমাদের দাদামহাশয়
তুমি ইহলোকে নাই কেমনে ভাবিব হেন কথা ?
প্রতিভার দীপ্ত সূর্য্য, হিমগিরি তুঙ্গ-মহিমার,
ভক্তির অগাধ সিন্ধু, সারল্যের শারদ আকাশ,
ভাবিতে যে বুক ফাটে এ জীবনে হেরিব না আর
পুণ্যগন্ধি কক্ষে সেই দেবতার মূর্ত্ত সে প্রকাশ !
কেমনে ভাবিব মনে আশ্রিতের সহায় সম্বল—
সকল ব্যথার ব্যথী চ'লে গেছ এ জগত ছাড়ি,
গঙ্গাজলে নিভে গেছে ভারতের শেষ হোমানল
মরদেহে অমরার সে বিগ্রহ কাল নেছে কাড়ি !
ঈশ্বরে বিশ্বাস তব নাস্তিকে করেছে শ্রদ্ধানত,
পাণ্ডিত্যে বিস্মিত মুগ্ধ নমিয়াছে পণ্ডিত-সমাজ,
সংশয় মীমাংসা লাগি' বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক যত
বসিয়াছে পদপ্রান্তে, যোগী নমিয়াছে ভক্তরাজে।
প্রতীচ্য বিজ্ঞান-জ্যোতি ভারতের জ্ঞানালোকে মিশি
ফুটেছে সহস্রদলে তোমার ও উদার অন্তরে,
'আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপে' যে রশ্মিশিখা জ্বালিয়াছ ঋষি
অন্ধকারে জ্বলিবে সে নিত্যকাল কালের প্রান্তরে।
ক্ষুধিতেরে অন্ন দেছ,—আতুরে দিয়েছ বরাভয়,
মুমূর্ষু উঠেছে বসি সুস্থদেহে মৃত্যুশয্যা হ'তে,
সুদূর প্রবাসে থাকি ভক্তেরে করেছ নিরাময়
এ ত নিজ চক্ষে দেখা, মানুষের বেদনার ক্ষতে
অমৃত-প্রলেপ তুমি দিয়েছিলে, দেহে রোগ যার
তাহারে ঔষধ দেছ বৈদ্যরাজ অমোঘ অদ্ভুত,
প্রাণে যার শান্তি নাই শোকে তাপে করে হাহাকার
তাহারে অশোক-মন্ত্রে শান্তি দেছ হে অমৃত দূত !
এ দেহ ছাড়িয়া গেছ তবু তব মৃত্যু সত্য নয়,
ও গো অমৃতের পুত্র, মুক্ত তবু মুক্তিকামী নহ,
বিশ্বের কল্যাণ লাগি যুগে যুগে তোমার উদয় !
সমস্ত অন্তর ভরা সপ্রণাম শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য লহ।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাণী-বন্দনা

বাণি ! বাণি !
কমলদলাসীনা, হস্তে ধৃত বীণা
বিকশিত পদ্মে, চরণ দু'খানি।

চন্দ্রকর জিনি তনুখানি উজলা,
ক্ষীণ কটিতটে মণিময় মেখলা
শ্বেতাম্বর-ধরা, বিশ্ব-মনোহরা
শুভ্ররুচি-লীলা পঙ্কজ-পাণি।

হিয়া'পরে শোভিত হেমগিরি-শৃঙ্গ,
বদন-কমল-ভ্রমে ভ্রমে পাশে ভৃঙ্গ,
গজমতি-যুক্তা, শতনরী মুক্তা
বক্ষে বিলম্বিত জ্যোতিঃ প্রদানি।

পঙ্কজ-আননে সুমধুর-হাসিনী,
মেঘদলকুন্তলা বেদবাণী-ভাষিণী ;
আঁখিযুগ-উৎপল সুশোভিত কজ্জল
সীমন্তে সিন্দুর নবরবি-গ্লানি !

ত্রিভুবন-পূজ্যা সুরনর-বন্দিতা
অজ্ঞান-তমো-হরা ত্রিভুবন-নন্দিতা,
তব বীণা-যন্ত্রে শত সুর মন্দ্রে
মোহিলে মা বিশ্ব—জ্ঞান বাখানি।

সন্তান আছে আজি অজ্ঞানে সুপ্ত,
হে জননি, কর তার সে জড়তা লুপ্ত,
তব জ্ঞান-আলোকে জাগুক সে পুলকে
ধন্য কর মা, তারে পদযুগ দানি।

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী (বি, এ)।


নারী মন্দির

জ্যাকেট-সেমিজ

যাহার সেমিজ, তাহার গায়ের নিম্নলিখিত স্থানের মাপের আবশ্যক। ঝুল, ছাতি, পুট, পুটহাতা, মুহুরী ও সেস্ত।

সেমিজের জন্য অন্য কোনও মাপের আবশ্যক নাই।

এখন মনে কর, একটি সেমিজ কাটা হইবে, তাহার মাপ :—ঝুল—৪০", ছাতি—৩২", পুট—৮" ; পুট হাতা—১৭" ; মুহুরী—৯" ও সেস্ত ১৭"।

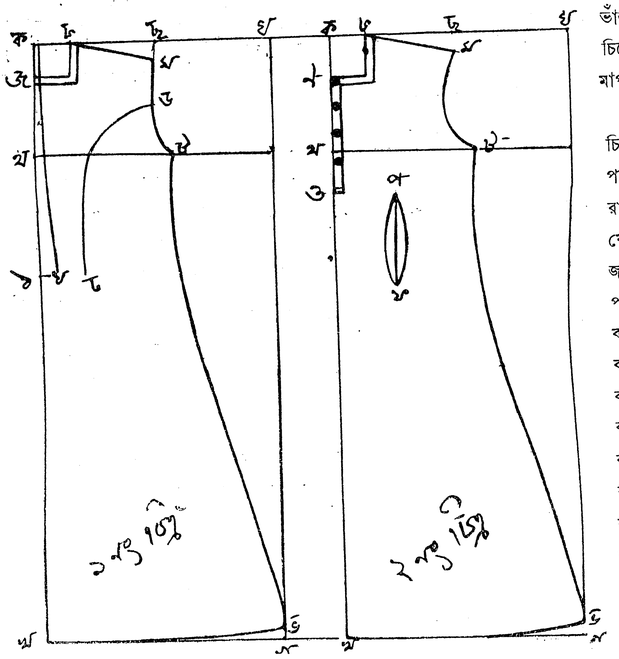

কতখানি কাপড় লাগিবে—সেমিজের জন্য মাত্র দু লম্বা কাপড় লাগে। এ ক্ষেত্রে ৪০"+৪"= ৪৪"×২=৮৮"=২ গজ ১৬ ইঞ্চি কাপড় লাগিবে।

সেমিজ কাটিবার নিয়ম—থান হইতে দুই লম্বা (৮৮") কাপড় কাটিয়া লইয়া তাহার এড়ো দিকে যতখানি ছাতি, ততখানি ঘের রাখিয়া সমস্ত লম্বাটাকে মুড়িয়া যাও। যখন সমস্ত লম্বা কাপড়টাকে ঐরূপে ভাঁজ করা হইয়া যাইবে, তখন সেই ৮৮ ইঞ্চি লম্বাকে আধাআধি করিয়া ভাঁজ করিবে। তাহার পর পার্শ্ববর্তী চিত্রের ন্যায় সমস্ত স্থানে কথিতমত মাপ ধরিয়া অঙ্কিত করিয়া কাট।

১ নং চিত্র—পিছন পাত। ২ নং চিত্র সামনা পাত। ফতুয়ার মত পিছন পাতে আর সামনা পাতে ঢিলে কম বেশী রাখিতে হয় না। সামনের পাতে কেবল 'প' 'ফ' মোড়াইটুকু দেখাইবার জন্য ২ নং চিত্রটি দিলাম।

পশ্চাতের পাত।

ক হইতে খ = ঝুল + ৪ ইঞ্চি = ৪৪ ইঞ্চি
ক " ঘ = ছাতির অর্দ্ধেক = ১৪"
ক " ছ = পুট + ।০" = ৮।০"।
ক " থ = ছাতির $\frac{১}{৪}$ = ৮"।
ক " ঠ = সেস্ত = ১৭"।
ক " চ = ছাতির $\frac{১}{১২}$ = ২$\frac{২}{৩}$"।
ক " জ = " = ২$\frac{২}{৩}$"।
থ " ট = ছাতি + ৭" ইঞ্চির $\frac{১}{৪}$ = ৩২ + ৭ = $\frac{৩৯}{৪}$ = ৯$\frac{৩}{৪}$"
ছ " ম = ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

গ " ভ = ১ ইঞ্চি।
ড —— = ম এবং ট এর মধ্যস্থলে।
ঠ " য = $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

সামনা পাত।

ক " ণ = 'ক' '২' হইতে ১।০" বেশী = ৪ ইঞ্চি।
ক " ত = ১০ কিম্বা ১১ ইঞ্চি।

আর সব ১ নং চিত্রের সমান। কাটিবার কালে দুই পাতই একত্রে ফেলিয়া কাটিতে হয়। (পাঞ্জাবীর মত)।

হাতা (ঘটী) কাটিবার প্রণালী—কাপড় লম্বা (১৭—৮) ৯ ইঞ্চি লইয়া তাহাকে এড়ো ৪ ভাঁজ করিয়া কাট।

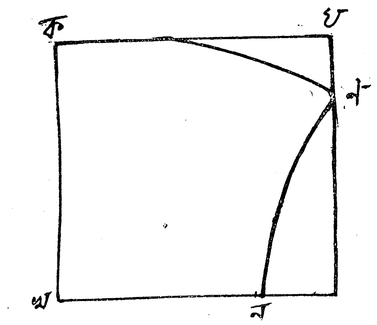

ক হইতে খ = লম্বা + ॥০ ইঞ্চি = ৯॥০ ইঞ্চি।
ক " ঘ = ছাতির $\frac{১}{৪}$ এবং মহড়ার কোঁচ দিবার জন্য ১॥০ ইঞ্চি = ৯॥০ ইঞ্চি।
ঘ " ণ = ২$\frac{১}{২}$ কিম্বা ৩ ইঞ্চি।
খ " ন = মুহুরীর $\frac{১}{২}$ + ॥০ ইঞ্চি এবং মুহুরীতে কোঁচ দিবার জন্য ২ ইঞ্চি = ৭ ইঞ্চি।

জ্যাকেট সেমিজ কাটা শেষ হইল, এখন সেলাই।—প্রথমে পেছনের পাতটি লইয়া 'ক' 'য' এই লাইনটি লম্বা সেলাই করিলে (এটা ভিতর দিক) সামনা দিকে 'ঠ' 'য' যেটুকু ফুলিয়া থাকিবে, সেটাকে Bodyর সঙ্গে সেটে সেলাই কর। এই কাপড়টাকে বিছাইলে 'ড', 'ঢ', 'ক', 'খ'র দক্ষিণে ও বামে দুই দিকেই থাকিবে। এই দুই দিকেই 'ড' 'ঢ' ঠিক যেমন সেপ (shape) করিয়া দাগ দেওয়া আছে, সেই সেপেই আধ ইঞ্চি মারিয়া সেলাই কর। এই 'ড' 'ঢ, লাইনটা কাটিতে হইবে না, কেবলমাত্র খানিকটা কাপড় কমাইয়া সেলাই করিয়া পিঠের দুই পার্শ্বে ঠিক ঐরূপ দাগ করিতে হইবে।

তাহার পর সামনা পাতে ঠিক পাঞ্জাবীর মত করিয়া 'ণ' 'ত'তে বোতামপটী ও বোতামের ঘর করিবার পটীটি সেলাই করিতে হইবে। তৎপরে কোমরের কাছে—ঠিক 'ড' 'ঢ' যে রকম সেলাই হইল, 'প' 'ফ'টুকুও ঠিক সেই রকম সেলাই হইবে—যাহাতে সামনা পাতে ঠিক কোমরের কাছে ঐ সেলাই দুইটি বেশ ভাল দেখা যায়। এইরূপ করার উদ্দেশ্যই হইতেছে, কোমরটাকে একটু কমান এবং দেখিতেও সুন্দর হয়। অনেকটা ঠিক জ্যাকেটের মত হয় বলিয়া ইহাকে জ্যাকেট সেমিজ বলে।

তাহার পর 'ট' 'ভ' এবং 'চ' 'ম' পাঞ্জাবীর মত ডবল সেলাই করিলেই Body জোড়া হইয়া গেল। এখন চৌকা গলার চারি ধারে একটা পটী কিম্বা লাল ফিতা বসাইয়া সেলাই করিলেই চৌকা গলা তৈয়ারী করা হইবে। তৎপরে হাতার ('ক' 'ঘ') মহড়া কোঁচ দিয়া Bodyর মহড়ার সঙ্গে কাঁচা (অমনি বসিয়ে সেলাই) সেলাই করিলেই ঘটী-হাতা জ্যাকেট সেমিজ হইল।

হাতার মুহুরীতে (খ, ণ) একটা ১০ ইঞ্চি পটী গিলাইয়া সেলাই করিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে (খ, ণ) ১৪ ইঞ্চি কাপড়টাকে কোঁচ দিয়া ১০ ইঞ্চিতে পরিণত করিতে হইবে। তাহা হইলে হাতার মহড়াতে ও মুহুরীতে কোঁচ হইল। সেই জন্য এ রকম হাতাকে ঘটী-হাতা বলে। তৎপরে ণ ন ডবল সেলাই করিতে হইবে। এখন বোতাম ও বোতামের ঘর হইলেই জামা শেষ হইল। লম্বা যে ৪ ইঞ্চি কাপড় বেশী লওয়া হইয়াছিল, তাহা দ্বারা নীচুতে মোড়া হইল এবং ২।৩টি ফ্রিল দেওয়া হইবে।

শিল্পী—শ্রীসন্তোষকুমার বসু।



অত্যাচারে

কারণ অতি সামান্য।

দুইটি বালিকা আপনাদের খেয়ালমত যথাসাধ্য ঝগড়া করিতেছিল, একটি সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই ক্রন্দন-শব্দে উপর হইতে হাবিলদার জঙ্গ বাহাদুর রাইডার হাতে নামিয়া আসিল, ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত।

অপর বালিকার পিঠে অনবরত চাবুক পড়িতে লাগিল।

বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ব্যথিত ক্রন্দন সেই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরকে শব্দমুখর করিয়া তুলিল, কেহ নাই তাহাকে সাহায্য করে।

আবার চাবুক পড়িল, হাবিলদার উন্মত্তের মত চাবুকের উপর চাবুক মারিতে লাগিল। বালিকার হাতে, পিঠে, মাথায় রক্তের ঝরণা বহিল, গোলাপের মত ঢল-ঢল মুখখানা বেদনায়, হতাশায়, দুঃখে নীল হইয়া গেল, তথাপি হাবিলদার থামিল না—তাহার নেশা লাগিয়াছে! এ যে কতটুকু অসহায় শিশুর উপর তাহার মত্ত আক্রোশ চলিতেছিল, সে জ্ঞান তাহার ছিল না।

দ্বিতীয় বালিকাটি সিঁড়ির পিছনে লুকাইয়া সভয়ে এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিতেছিল, উপর হইতে হাবিলদার-গিন্নী রেলিঙ্গে ভর করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। বালিকার কাতর ক্রন্দন যতই মর্ম্মদাহী হইয়া উঠিতেছিল, তাহার আনন ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, ক্রূর আনন্দে অমন সুন্দর মুখখানা নরকের ছাপ মাখিতেছিল।

বালিকা ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,'আর মারবো না, সাহেব।'

তথাপি রাইডার উঠিল, বালিকা ভূতলে পড়িয়া গেল।

উপর হইতে গিন্নী বলিয়া উঠিল, "বাঁদীর বেটীকে আচ্ছা সমঝিয়ে দাও, আমার বেটীর সাথে আর ঝগড়া না করে।"

আবার উদ্যত চাবুক দেখিয়া বালিকার মরণ-ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিল।

এবার রাইডার বালিকার পিঠে পড়িল না। বালিকা দেখিল, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার পিতা তাহাকে বুকে তুলিয়াছে; আনন্দে, বেদনায় মুহ্যমান হইয়া বালিকা পিতার বুকে লুটাইয়া পড়িল, উদ্বেল অশ্রুধারায় বুকখানা তাহার সিক্ত করিয়া তুলিল। হতাশার দীর্ঘশ্বাস আশ্রয়ের অনুভূতিতে প্রশমিত। সহসা বলভদ্রকে দেখিয়া হাবিলদার গর্জ্জিয়া উঠিল। গুম্ফহীন তাম্রবর্ণ আননখানি রক্তদীপ্ত হইয়া উঠিল, ক্ষুদ্র নয়ন দুটি ক্রূরতায় আরও জ্বলিয়া উঠিল।

হাবিলদার হাঁকিল, 'বেইমান্!'

'সাহেব, যা খুসি আমার উপর চালাও, বেটীর গায়ে একটি দাগ দিও না।'

"বটে? আচ্ছা!"

বলভদ্রের উপর অনবরত চাবুক পড়িতে লাগিল। বলভদ্র কন্যাকে আড়াল দিয়া কঠোর মৌনভাবে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। পাষাণের মত মৌন মূক অচপল দৃঢ়। বেদনায় এতটুকু ম্লান হয় না, অত্যাচারে এতটুকু টলে না—এ যে ক্ষোদাই করা কাঠের মূর্ত্তি! বলভদ্র পুরুষানুক্রমিক হাবিলদারের ক্রীতদাস!

নেশা লাগিয়াছে—অত্যাচারের নেশা লাগিয়াছে। বুদ্ধি বিবেচনা, মনুষ্যত্ব সকলকে দলিয়া, মথিয়া, চূর্ণ করিয়া অত্যাচারের নেশা দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সবাইকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। অত্যাচারে অবিবেচনার সম্মুখে মানব-সভ্যতা আজ টলমল।

হাবিলদার ক্লান্ত হইয়া পড়িল, বলভদ্রের পিঠের চামড়া তাহার রাইডারের মাথায় উঠিয়াছে।

পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া বালিকা তখন আকুল ক্রন্দনে পৃথিবীর বুকখানাকে ব্যথিত, মথিত করিয়া তুলিতেছিল। বলভদ্র কন্যাকে আরও একটু জোরে বুকে চাপিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। রক্তস্রোত তখন পিঠের উপর বহিয়া যাইতেছিল, তাহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

কি ভাবিয়া হাবিলদার রাইডার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, ওষ্ঠ প্রান্তে একটু অতি ক্ষীণ ক্রূর হাসি। হাবিলদার চলিয়া গেল।

'পিতৃঋণ পরিশোধের এক অধ্যায় আজ সমাপ্ত'—বলভদ্র আপন মনে বলিল। কন্যাকে নীচে নামাইয়া দিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলভদ্র বলিল, "বেশী লাগেনি ত, মা!" পিতার আহত পৃষ্ঠদেশের উন্মুক্ত রক্তধারা দেখিয়া কন্যা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল।—"ও কিছু নয় মা, কিছু নয়, এখনই সেরে যাবে। তে মার লাগেনি ত?"

ব্যথিত বিবর্ণ আননখানি তুলাইয়া বালিকা বলিল, "না।"

* * * * *

সে দিন নিশীথে অল্প-পরিসর অন্ধকার গৃহে অপরিচ্ছন্ন শয্যার উপরে বলভদ্র জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। বেদনায় তাহার সারা অঙ্গ জ্বলিতেছিল, উত্তাপে মাথা হইতে আগুন ছুটিতেছিল; ক্ষত নিষ্ফল আক্রোশে বুকখানাও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। মাথার কাছে সাত বছরের মাতৃহীনা বালিকা কন্যা—ক্রন্দনরত। নরম দুটি অবিশ্রাম বর্ষণে ফুলিয়া উঠিয়াছে, দিনের অত্যাচারে রেশমের অঙ্গখানি অবশ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি কোন রকমে জাগ থাকিয়া পিতাকে সান্ত্বনা দিতেছিল, "বাবা, চল এখান থেকে চ'লে যাই।"

"তাই বোধ হয় যেতে হবে, মা! অত্যাচারে কখন্ তোকে মেরে ফেলে, তা যে সইতে পারবো না।"

দুই জনে ঘুমাইয়া পড়িল। বেদনার ঘুম শান্ত প্রলেপ মাখিয়া দিল।

উপরে হাবিলদার তখন জাগিয়া উঠিল। কি দিয়া সে অত্যাচারের প্রলয়-ক্ষুধা নিভাইবে? কোন্ অমানুষিক অত্যাচার এই ক্রীতদাসের অচল মৌন মূক গর্ব্বকে চূর্ণ করিয়া তাহার পায়ের তলায় লুটাইবে? তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ক্রীতদাসের কি অপরিসীম সহ্য করার ক্ষমতা! এতটুকু টলে নাই, বেদনায় তাহার মুখখানা এতটুকুও বিকৃত হয় নাই? তাহার নিস্পন্দ শরীরখানা অত্যাচারকে উপহাস করিয়াছে! ভাবিল, এমন একটা অত্যাচারের বন্যা সে বহাইবে—হাবিলদার নিজের চিন্তায় নিজেই শিহরিয়া উঠিল! না না, তা ত হবে না, তা হ'লে যে নিজেরই ক্ষতি!' কি করিবে, হাবিলদার ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমোবে-ও এক বার বলিয়া উঠিল, "বহুৎ আচ্ছা, তাই হবেগা।" মুখখানা ক্রূর হাসিতে বিকৃত হইয়া উঠিল।

গভীর রাত্রিতে সহসা কন্যাকে বুকে পিষিয়া বলভদ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, "এখানে তোকে রাখা চলবে না, মা। চারিদিকে বসন্ত লেগেছে, তোকে বাঁচাতে হবে।"

বলভদ্র এক বার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল, অন্ধকার শয্যাগৃহ, চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কোথাও কেহ নাই, ভাবিল, স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার পর আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুদিন চলিয়া গেল।

এ দিকে একের অত্যাচারকে পরিম্লান করিয়া রুদ্র ভগবান্ তাঁহার সংহার-দণ্ড নেপালী জাতির মাথায় আন্দোলিত করিতেছিলেন। এ জাতির অত্যাচারের উন্মাদনা ভীষণ। কিন্তু ভগবান্ যেখানে জাতির লালসার অবতাররূপে, নির্ম্মম সয়তানরূপে অপর জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতে ব্যগ্র, সেখানেই জাতির মাথায় টনক পড়ে। হিন্দুস্থান নেপালকে গ্রাস করিতে উন্মুখ, সমগ্র নেপালে তাই মহা বিক্ষোভ—মহা উত্তেজনা উপস্থিত।

রাজধানী হইতে পরোয়ানা আসিয়াছে। হাবিলদার শঙ্কিতভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল, হাবিলদার-গিন্নী তাহাদের কন্যাটিকে বুকে চাপিয়া বসিয়া ছিল, উভয়ে নির্ব্বাক্।

বলভদ্র সেই সময়ে কি কাযে প্রাঙ্গণ দিয়া যাইতেছিল। হাবিলদার-গিন্নী হাঁকিল, "বলভদ্দর, এ বলভদ্দর—"

বলভদ্র আসিয়া সেলাম জানাইল। কি ভাবিয়া হাবিলদার বলিয়া উঠিল—"সহর থেকে পরোয়ানা এসেছে, তোমাকে লড়ায়ে যেতে হবে।"

কন্যার মুখ স্মরণ করিয়া সেই সাহসী গুর্খার মুখও সহসা চমকিত হইয়া উঠিল। অব্যক্ত একটা ভয় ক্ষণেকের জন্য তাহার শরীরখানাকে স্পন্দিত করিয়া তুলিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলভদ্র বলিল, "কোথায়? কেন?"

"হিন্দুস্থানের বাদশা নেপাল আক্রমণ করেছে, তুমি দেশের নামে জীবন উৎসর্গ ক'রে ধন্য হও।"

কত বড় মিথ্যা কথা! জীবন? যাহা দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, যাহার জন্য অস্তিত্ব, সেই জীবনকে স্বদেশ-প্রেমের মিথ্যা চাতুরীতে, কথার ছলনার মুখে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হওয়াটা কতখানি মিথ্যা, তাহার স্বরূপ একমাত্র আত্মঘাতী নিজ মরণের দ্বারে বসিয়া অনুভব করিতে পারে, অন্য কেহ পারে না।

বলভদ্র হাবিলদারের শঠতা দেখিয়া আপন মনে একবার হাসিল। তার পর শির নত করিয়া বলিয়া উঠিল,"বহুৎ আচ্ছা।"

"এ যুদ্ধের পর হ'তে তুমি মুক্ত, তোমার পিতৃঋণ যুদ্ধে যাওয়ার সাথে সাথেই শোধ হয়ে যাবে।"

হাবিলদারের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দেখিয়া বলভদ্র ক্ষণেকের জন্য পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঋণমুক্তি!

পিতৃঋণমুক্তির জন্য হেলায় সে কত দিন নিজের কুলিজাকে কুকরী দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া দিতে চাহিয়াছিল, ক্রীতদাসের রুদ্ধ বেদনার ক্ষুব্ধ আক্রোশে কত দিন সে পাহাড়তলীর বেগবতী স্রোতস্বিনীর উদ্দাম বুকে চিরসমাধি লইতে চাহিয়াছিল, নয়নাভিরাম আদরের দুলালী কন্যার বুকফাটা অশ্রুধারা দেখিয়া উন্মত্তের মত কত রাত্রিতে সে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিয়া সকল দুঃখের অবসান করিতে চাহিয়াছিল, আজ সেই মুক্তি আপনা হইতে নিজেকে ধরা দিয়াছে। হউক না সে মরণের আগমনী-সংহারের পূর্ব্বাভাস! তথাপি তাহা মুক্তি! কৃতজ্ঞতায় সম্ভ্রমে তাহার মস্তক আনত হইতেছিল, আনন্দের উদ্বেল-তরঙ্গে বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সস্মিতবদনে সে বলিয়া উঠিল, "বহুৎ আচ্ছা।" তার পর সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হাবিলদার স্ত্রীর মুখপানে চাহিল।

"কিন্তু এ কাপুরুষতা!"

"কেন?"

'পুরুষ আমি—ক্রীতদাসের জীবন-বিনিময়ে নিজের জীবন রক্ষা করা কাপুরুষতা, বিশেষতঃ লড়ায়ের সময়।"

"তুমি ত তাকে পুরস্কারই দিচ্ছ, মুক্তি দিচ্ছ।"

"মুক্তি দিচ্ছি—হুঁ"—হাবিলদার চুপ করিয়া গেল, তাহার পত্নী অন্য দিকে চলিয়া গেল।

* * * * *

খোলা জানালা হইতে হাবিলদার দেখিতে পাইল, কন্যার হাত ধরিয়া সেই উঁচু-নীচু পাহাড়ের পথে বলভদ্র চলিয়া যাইতেছে, দিক্‌চক্রবালের রেখা তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, আর দেখা যায় না। হাবিলদারের মনে পড়িল, সেই দিন কত বড় অত্যাচার—নির্ম্মমের মত সে ঐ পিতা-পুত্রীর বুকের উপর চালাইয়াছে! রাত্রির গভীর অন্ধকারে এই একান্ত অসহায় ক্রীতদাসের উপর কি অমানুষিক প্রতিহিংসা লইবার চিন্তা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে; আর আজও নিজের জীবন রক্ষা করিতে অবহেলায় সে অপরের জীবনকে মরণের দ্বারে তুলিয়া ধরিয়াছে! হাবিলদার আর ভাবিতে পারিল না।

আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ে অবসাদ আনিয়া দিতেছিল। পর্ব্বতের কটিদেশে ছোট একখানা গ্রামে বলভদ্র তাহার সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার হাত ধরিয়া শ্রান্তদেহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ম্লানিমার আবছায়ার অন্তরালে লতাপাতা-ঘেরা একখানা ক্ষুদ্র গৃহে বৃদ্ধ লাল বাহাদুর তাহার দীর্ঘজীবনের ঘটনা-পরম্পরার কথা ভাবিতেছিল; আর সম্মুখের সেই ঘনায়মান গাঢ় অন্ধকারের বুকের উপর তাহার শীর্ণ নিশ্বাস ছড়াইয়া দিতেছিল। নির্ব্বাক্ বলভদ্র তাহার কন্যার হাত ধরিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। বহুদিন পূর্ব্বের একটি স্মৃতি মনের দুয়ারে সহসা আসিয়া হানিয়া গেল, সেই পাহাড়ের মত কঠিন আনন হইতে সহসা লহরে লহরে অশ্রুর রাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, যৌবনের সেই নবীন জাগরণের দিনে কি একখানা প্রেমময়ী ছবি তাহার বুকখানা রাঙ্গাইয়া দিয়াছিল, কি এক নবীন উত্তেজনায় সে নিশিদিন এইখানে, এই বৃদ্ধের কুটীরে তাহার আশে-পাশে বিহ্বলের মত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। কত সুখনিশির স্মৃতি! তাহার জীবনের আনন্দ-যজ্ঞের স্মৃতি! তাহার ক্রীতদাস-জীবনের এক মধুর অধ্যায়। তার পর সব চলিয়া গিয়াছে। এখন বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসমাত্র তাহার কর্ম্মক্লান্ত শরীরখানাকে মাঝে মাঝে আকুল করিয়া তুলে!

ঝর-ঝর করিয়া আজ তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। অতি কষ্টে কন্যাকে বলিল, "ডাকো, মা, তোমার দাদুকে ডাকো!"

"দাদু—দাদু!" গৃহের ভিতর হইতে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কে? কে?"

"আমি দাদু, আমি নাতনী।"

কম্পিতপদে বৃদ্ধ বাহির হইয়া বালিকাকে কোলে টানিয়া লইল, তাহার অশ্রুরাশি আর বাঁধ মানিল না। এই একমাত্র কন্যার দেহে প্রবাহিত রক্তকণা তাহার বৃদ্ধ জীবনে একটি আশার আলো বহিয়া আনিত। নাতনীর মস্তকে হাত বুলাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছিস্ ত দিদি? আজ অনেক দিন পরে যে দাদাকে মনে পড়েছে?"

বলভদ্রকে দেখিয়া বৃদ্ধ আর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এস বাবা, ভাল আছ ত?" বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলভদ্র তাহার মুক্তির খবর জানাইল।

সে মুক্তি পাইয়াছে—সমরাঙ্গনের মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাইলে মুক্তি সে ভোগ করিবে।

উদ্যত মৃত্যু সম্মুখে, তথাপি উৎসাহে তাহার বুকখানা উচ্ছ্বসিত। বলভদ্র বলিল, কন্যাকে তাহার দাদুর নিকট রাখিয়া লড়ায়ে যাইবে, তার পর যদি বিধাতা দিন দেন—

লড়ায়ের নাম শুনিয়া বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিল। তাহার যৌবনে সে অনেক লড়াই করিয়াছে, মরণোন্মুখের আর্ত্তনাদ অতি ক্ষীণ শ্বাসের মত—দূর-স্বপ্নের মত এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তাহার একমাত্র পুত্র যে এই লড়ায়েই জীবন দিয়াছে, দেশরক্ষার আহ্বানে সে যে তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া ফকির হইয়াছে, লক্ষের তরেও দেশ ত তাহা মনে করে না! আজ এই নিঃসহায় বৃদ্ধের করুণ ক্রন্দন ত দেশের কানে পশে না। বৃদ্ধ বলিল, 'লড়ায়ে যাবে?'

'এই লড়ায়ে আমাকে মুক্তির আশ্বাস দিয়াছে, শুদ্ধ এই লড়ায়েই আমাকে লড়ায়ে যেতে হবে।'

'ভগবান্ তোমায় নিরাপদে রাখুন' বৃদ্ধ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু সম্বরণ করিল।

* * * * *

বিদায়ের বেলা গাঢ় কুয়াসায় পর্ব্বতগাত্র আচ্ছাদিত করিয়াছিল। অশ্রুসজল মুখখানি কোনমতে দৃঢ় করিয়া কন্যার নিকট বিদায় লইতে বলভদ্র প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকা লড়াই সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বৃদ্ধ লাল বাহাদুর দূর বিষণ্ণ নেত্রে আকাশের আবছায়ার দিকে তাকাইয়া ছিল; অকাশ তাহার মুখে হিমানীর ঝরা অশ্রু ছড়াইয়া দিতেছিল। বলভদ্র কন্যাকে সহসা কোলে তুলিয়া চাপিয়া ধরিল। এই স্নেহের পেষণে বালিকা পিতার বুকে মুখ লুকাইল। হয়ত জীবনে এই তাহাদের শেষ সাক্ষাৎ। বালিকা এই মর্ম্মিক আদরে অর্থহীন দৃষ্টি শুধু পিতার মুখে তুলিয়া ধরিল। 'আজ আমাকে যেতে হবে মা, হয় ত'—বলভদ্র কাঁদিয়া ফেলিল।

'কোথায় যাবে?'

'বহু দূরে যেতে হবে মা'—অশ্রু রুদ্ধ করিয়া বলভদ্র কহিল। 'আমিও যাবো বাবা, আমাকেও নিয়ে চলো।'

'সেখানে তোমাদের যাওয়া চলে না মা, আবার আমি ফিরে আসবো।'

সহসা অন্তরের ভিতর হইতে বলভদ্র জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হাঁ, সত্যি বলছি, আবার আমি ফিরে আসবো, কেউ আমায় রুখ্‌তে পারবে না।'

এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া বালিকা ভয় পাইল। কাঁদিয়া বলিল, 'না বাবা, আমায় নিয়ে চলো, তোমায় ছেড়ে যে একা থাকতে পারবো না।'

'কয়েকটা দিন এখানে দাদুর কাছে কাটিয়ে দাও মা।'

বালিকার মস্তক নিজের বুকে লইয়া বলভদ্র তাহাকে সান্ত্বনা দিল, আদর করিল, চুম্বন দিল। তার পর ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া সটান পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া কুজ্ঝাটিকার ঘনান্ধকারে মিলাইয়া গেল।

বালিকা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আমায় ফেলে যেও না বাবা, তা হ'লে আমি বাঁচবো না, আমায় নিয়ে চলো।'

বৃদ্ধ তাহার ব্যথিত বুকে বালিকাকে টানিয়া লইল। বৃদ্ধের বুকে মাথা রাখিয়া করুণ স্বরে বালিকা বলিল, 'দাদু, বাবা আমায় ফেলে কোথায় গেল, আমি ত আর তাকে দেখবো না।'

বৃদ্ধ কি বলিবে? বলিবে কি, তাহার পিতা মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলিয়াছে? বলিবে কি, তাহার পিতার মুক্তির দাম মৃত্যু?

কন্যার দূরাগত ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বলভদ্র এক বার থমকিয়া দাঁড়াইল। আজ যে সে নিজের কলিজাটাকে নিজ হাতে ছিঁড়িয়া চলিয়াছে। কন্যার বুকভাঙ্গা ক্রন্দনের রোল এখনও যে কুহেলিকার ধূম্র যবনিকা ভেদ করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে! ব্যথা-উদ্বেল বুকখানাকে হাত দিয়া সে চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধ নিশ্বাস তাহার বুকে জমাট বাঁধিয়া গেল। বলভদ্র আবার পথ চলিল।

যুদ্ধক্ষেত্র। অষ্টারলিজ যুদ্ধাবসানে অসংখ্য চন্দ্রতারকাদীপ্ত সুনীল আকাশতলে টলষ্টয় দেখিয়াছিলেন, বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান কত ক্ষুদ্র, তাহার তেজ কত স্তিমিত, কত নগণ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে, আহতের বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে, নিহতের বিকৃত নিথর নিস্পন্দ শরীরে বলভদ্র দেখিল, মানুষের তুলনা ইতর জন্তুর সহিত করিলেও ইতর জন্তুর অবমাননা করা হয়। এক একটা হিংস্র পশু আর কত জীব নষ্ট করিতে পারে?

অনেক সময় পশুর হিংস্র স্বভাব জীবনধারণ করার জন্য। মানবের হিংস্র স্বভাবের উত্তর নাই। উত্তর শুধু মানুষ পশু হইতেও নিকৃষ্ট।

আমরা মানবতার গর্ব্ব করি, উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তির গর্ব্ব করি, সব মিথ্যা। মানুষ হইয়া মানুষের বুকের রক্ত পান করিতে আমরা চিরলালায়িত। এ লালসা বর্ত্তমানের নহে, আবহমান কাল মানবের এই বৃত্তি চলিয়া আসিতেছে, চলিতেছে, চলিবে। মানবের এই যে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, ইহার অন্ত কোথায়?

বলভদ্র দেখিল, মৃত্যু কিরূপ সহজে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সহযোগীদিগকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। গোলার পর গোলা আসিতেছে, জড়পিণ্ড নিমিষে চেতনের সকল আশা ভাঙ্গিয়া দিয়া জড়পিণ্ড করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যু জলের মত সহজ, জীবন কত দুঃসাধ্য, তার রক্ষণ? চাই প্রাণ—বলভদ্র চীৎকার করিয়া উঠিল,—প্রাণ চাই!

একটি রক্তিম গোলা আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সহযোগীর মুখখানা উড়াইয়া লইয়া গেল। কি ভীষণ দৃশ্য! এই ক্ষণিক পূর্ব্বেও সৈনিক তাহার গৃহের কথা বলিতেছিল, তাহার স্ত্রীর কথা—তাহার কন্যার কথা। বলভদ্রেরও কন্যার কথা মনে পড়িয়া গেল। হয় ত জীবনে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। চারিদিকে অগ্নিরাশি প্রধূমিত, কামানের গর্জ্জনে, বারুদের ধূমে, সৈনিকের চীৎকারে, মৃত্যুর বিভীষিকায়, মানবের ক্রূরতায়—হিংসায় আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন। জীবন-মৃত্যু রুদ্রতালে বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের মত, মহাপ্রলয়ে ধূর্জ্জটীর ভয়াল নৃত্যের মত যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মরণোন্মুখ মানব রক্তযজ্ঞে আপনাদের রক্তাহুতি দিতেছে, রক্তোন্মির বুকের উপর সভ্যতা তাহার বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়াছে—রক্তোন্মাদনা মানবের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া দিতেছে। বলভদ্র দেখিল, রাক্ষসের মত মানুষ মানুষের বক্ষোরক্তপানে তৃষ্ণার্ত্ত, এখানে দয়া নাই, মানবতা নাই—শুধু হিংসার তাণ্ডবলীলা, নররক্তের অস্বাভাবিক তৃষ্ণা। লহরে লহরে শোণিতস্রাব—যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রাব প্রবাহিত হইতেছে। স্তূপে স্তূপে হতভাগ্য সৈনিকদিগের শরীর মৃত্যুর বৈজয়ন্তী তুলিতেছে। শ্রাবণের ধারার মত আগ্নেয়াস্ত্র আকাশের বুক চিরিয়া পড়িতেছে, লোক মরিতেছে স্বচ্ছন্দগতিতে। বলভদ্র সভয়ে দেখিল, চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া অগ্নিরাশি তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। বিস্ফোরণের গর্জ্জনে শ্রবণ বধির হইয়া আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছে। সহস্র সহস্র নরমুণ্ডের মাঝে রাক্ষসী দেবতা তাহার খর্পর ভরিয়া রক্তপান করিতেছে, করাল বদন ব্যাদান করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। ক্লান্তিতে, ভয়ে, বিস্ময়ে বলভদ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন বলভদ্র দেখিল, হাঁসপাতালের একঘেয়ে সেই নিথর স্বভাব—উঠিতে গিয়া বুঝিল, একটি পদ তাহার জন্মের মত বিদায় লইয়াছে। তাহার পর এক দিন ভারাক্রান্তহৃদয়ে কোনমতে ক্লান্ত চরণ টানিয়া বলভদ্র গৃহের দিকে ফিরিল। আজ অনেক দিন পরে তাহার এই কথা মনে পড়িল, গৃহে ফিরিয়া কন্যাকে বুকে পিষিয়া সে মুক্তির আস্বাদ লইবে। এবার ধরিত্রীর অত্যাচার!

* * * * *

ক্ষুদ্র কুটীরে বৃদ্ধ তাহার নাতনীটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়া ছিল। বলভদ্র অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন সংবাদ নাই। বালিকা থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধের নিকট পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। স্নেহ-বুভুক্ষু মনটা তাহার আর কিছুতেই বাগ মানিতে চাহিতেছিল না। অনেক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দূর-পর্ব্বত-শৃঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ঐ পথ দিয়াই তাহার পিতা চলিয়া গিয়াছে, অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণচ্ছটার ভিতর দিয়াও তাহার দৃষ্টি দিগন্তরালে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। কখন্ তাহার পিতা ফিরিয়া আসিবে?

রাত্রিতে বাহিরে ধরিত্রী ঝঞ্ঝোন্মত্তা, ভিতরে বালিকা শোকোন্মত্তা। ঝঞ্ঝার চপল ভঙ্গিমায় আর শোকের মুহ্যমান প্রভাবের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ ভাবিতেছিল। এক একবার পার্ব্বত্য ঝড় বাসুকিগর্জ্জনে আসিয়া তাহাদের কুটীরখানি ঘর ঘর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছিল, বৃদ্ধও চমকিয়া উঠিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বালিকার করুণ আর্ত্তনাদ বৃদ্ধের বুকে একটা অসহ্য হাহাকার আনিয়া দিতেছিল। বালিকা কাঁদিয়া উঠিল, 'দাদু, বাবা যে আজও এলো না?' বালিকার মাথাটি কোলের কাছে টানিয়া বৃদ্ধ বলিল, 'শীগ্‌গিরই আস্‌বে দিদি, একটু ঘুমোও।'

'আমার মন বলছে, দাদু, বাবাকে আর দেখতে পাবো না।'

'ছি, ও কথা বলে না।'

বাহিরে গিরিশৃঙ্গ প্রকম্পিত করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল। বালিকা বৃদ্ধকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, 'দাদু, আমার যেন ভয় কচ্ছে।'

'ভয় কি দিদি, এমন ঝড় ত এ দিকে হামেসাই চলে, এখনই থেমে যাবে।'

ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ঝঞ্ঝা আরও মাতাল হইয়া টলিতে টলিতে পৃথিবীর বুকখানার উপর লুটিয়া পড়িতেছিল, বিদ্যুৎ আরও গভীর গর্জ্জনে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। বালিকা বৃদ্ধের বুকের ভিতর লুকাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,'দাদু, এবার বোধ হয় আর বাঁচবো না, আমার বড় ভয় কচ্ছে।' 'ভয় নাই দিদি, ভয় নাই' বাহিরের ঝঞ্ঝা বৃদ্ধকেও শঙ্কাকুল করিয়া তুলিল। তাহার এই দীর্ঘজীবনে ধরিত্রীর এমন ছন্নছাড়া উন্মত্ত দৃষ্টি সে আর কোন দিন দেখে নাই। তথাপি বালিকাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

বালিকা সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'দাদু, ঐ যে—'

'কি দিদি?'

'না, কিছু না দাদু, বাবা যে এলো না, বাবাকে ত আর দেখতে পাব না—আবার দাদু, ঐ—ঐ—বাবা—বা—'

অবিশ্রাম বারিধারায় পর্ব্বতগাত্রে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড বসিয়া পড়িয়াছিল, ঝঞ্ঝার ভৈরব হুঙ্কারে, মুহুর্মুহুঃ বজ্রের গভীর গর্জ্জনে, শ্রাবণ-ধারার অশান্ত কলরবে তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। সহসা ধরিত্রীর বুক প্রকম্পিত করিয়া, গিরিজঙ্ঘা দলিয়া মথিয়া সেই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড নামিয়া আসিল। নিষ্পেষণে নিমেষণে সম্মুখের সকল বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। বালিকা ভীত-ত্রস্ত হইয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিল। সহসা এ দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধ প্রমাদ গণিল। বালিকাকে বুকে ধরিয়া প্রস্তরখণ্ডকে রোধ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। মুহূর্ত্তে বল দলিয়া মথিয়া চূর্ণ করিয়া প্রস্তরখণ্ড নীচে নামিয়া গেল, দুর কুটীরখানির চিহ্নমাত্র রহিল না।

* * * * *

ঝঞ্ঝা-বাদল থামিয়া গিয়াছে। মাতাল পৃথিবী এখন সুপ্তিমগ্ন; রাত্রির মুখে কত ক্ষতি করিয়াছে, তাহা তাহার মনেও নাই। দূরে আবার সহস্র তারকা-খচিত নীল আকাশ, বাতাস আবার নিথর, দিগন্তরালে চন্দ্রও তখন চলিয়া যাইতেছিল।

বর্ষণসিক্ত শ্রান্ত দেহখানি টানিয়া ক্লান্তচরণে বলভদ্র গৃহে ফিরিতেছিল। আজ সে মুক্ত, মুক্তির মদিরা আজ চুমুকে চুমুকে পান করিয়া তাহার অভিশপ্ত জীবনকে সার্থক করিবে, তাহার জীবন সে এমনই একটা দিনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। মাথার উপর রুদ্র ঝঞ্ঝা তাহাকে পথাতিক্রমে বাধা দিতে পারে নাই। শ্রাবণধারার দুকূলপ্লাবী বর্ষণে তাহার গতি মন্থর হয় নাই। বিদ্যুৎ তাহার পথ আলোকিত করিয়াছে। মুক্তির আনন্দে সকল বাধা তাহার পায়ের তলায় পিষিয়া গিয়াছে। সে কন্যাকে বুকে পিষিয়া মুক্তির চরম সার্থকতা উপভোগ করিবে।

সেই স্তব্ধ নিশীথে গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া সে ডাকিল, 'মা!' কোথাও কিছু নাই, কুটীর নাই, তাহার চিহ্ন নাই, বৃদ্ধ নাই, কন্যা নাই, কে উত্তর দিবে?

বলভদ্র ভাবিল, ভ্রম হইয়াছে, স্বপ্ন দেখিতেছে। চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া আবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। না, এ ত সেই গৃহ-প্রাঙ্গণ, ঐ ত দূরে পার্ব্বত্য ঝরণার মৃদু কলোচ্ছ্বাস! ঐ ত তমালগাছের কালো ছায়া, ঐ ত দূরে বেদীমঞ্চ। বলভদ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মা—মা!'

স্তব্ধ পৃথিবী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'মা—মা!'

পর্ব্বতের আড়াল হইতে চন্দ্র সরিয়া গেল। এক ঝলক আলো আসিয়া বলভদ্রকে পথ দেখাইল, সব শেষ হইয়াছে, চিহ্নমাত্র রাখিয়া যায় নাই।

বলভদ্রের মস্তকে বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। সে একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তাহার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হইল। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি হইতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের উন্মত্ত দৃষ্টির মত অগ্নিকণা ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত, হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ। সে কোষ হইতে কুক্‌রী বাহির করিয়া প্রলয়-গর্জ্জন করিল, তাহার পর উন্মত্তের মত পাষাণের বুকে কুক্‌রী হানিতে লাগিল।

ক্ষমতা-মত্ত মানুষের অত্যাচার, লালসা-দীপ্ত জাতির অত্যাচার, ছন্নছাড়া ধরিত্রীর অত্যাচার একসঙ্গে মিলিয়া এই হতভাগ্য ক্রীতদাসের মস্তকে চির-অভিশাপ ঢালিয়া দিল।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত।

মতভেদ

রাত এসেছে, কায বেড়েছে, বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়;—
ঘরের ভিতর কর্ম্ম-কাতর, নিজের কারা কেন গড়?
কালের দিনে এমন ক'রে ভাবলে ব'সে কি লাভ হবে?
থাকার মিছে তুমিই পিছে, উল্লাসে সব ফির্‌বে যবে।
বায়ুবিরোধ ঢের হয়েছে, মিটিয়ে ফেল, মিটিয়ে ফেল,
নিজ ঘরের ওই তোমাদের মতভেদেই সকল গেল।

আপনি বাঁচ, বাঁচাও সবে, রক্ষে কর, রক্ষে কর,
দোহাই দোহাই, হাত ধ'রে ভাই, বল্‌ছি, ফের, আজও ফের।
আজকে যদি যায় বৃথা দিন, এম্‌নি ধারা তর্ক ক'রে,
করবে যে ধার জীবন তোমার, শুধবে তাহা ম'রে ম'রে।

কুমারী—অশ্রুকণা দাস।



বিবাহজ প্রেম ও প্রেমজ বিবাহ

বিবাহের পর প্রেম অথবা প্রেমের পর বিবাহ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, এই বিষয় লইয়া পুনা ফার্গুসন কলেজের এক সভায় বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচনা-প্রসঙ্গে কেহই মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই! আলোচনা দেখিয়া মনে হয়, বক্তৃগণের অনেকেরই যৌবনের নেশা কাটে নাই। প্রকৃতপক্ষে যৌবন-সীমা অতিক্রম না করিলে ইহার প্রকৃত পরিণাম ধারণায় আসে না। তাই অনেকে বিবাহজ প্রেমকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ পাণ্ড্য হিন্দুসমাজকে গালি দিতেও ছাড়েন নাই। মিঃ মার্চ্চেণ্ট Economic point of view হইতেও প্রেমজ বিবাহকে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়াছেন।

আজকাল অনেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাই মনে হয়, এ বিষয়ে দুই এক কথা লিখা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই প্রেমজ বিবাহের পক্ষপাতী। ইহার কারণ রূপজ মোহ। প্রথমতঃ দেখা যাউক্, রূপ, যৌবন ও প্রেম পদার্থটি কি? আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় বলিতে গেলে—"সন্তান-ধারণের উপযোগী যে সমস্ত লক্ষণ, তাহাই নারীর রূপ। নারীর বাল্যরূপ যদিও মানুষকে আকৃষ্ট করে, তথাপি তাহাকে মাতাল করে না। আবার যে দিন নারীর সন্তান ধারণের বয়স পার হইয়া যায়, তখনও ঠিক তাহাই। পুরুষেরও সেই দশা। ততক্ষণই নারীর বা পুরুষের রূপ থাকে, যতক্ষণ তাহারা সৃষ্টি করিতে পারে। এই সৃষ্টি করার ইচ্ছাই তাহার রূপ-যৌবন, ইহাই তাহার প্রেম।" যৌবন সুন্দর, কারণ, সে রূপবান্ ও শক্তিশালী। কুঁড়ি ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে, ফুল ফলে পরিণত হয়—এ যেমন সহজ ও সুন্দর সাধনা, যৌবনও প্রকৃতির সেইরূপ সিদ্ধ সম্পদ্, অনাবিল আনন্দের একটানা প্রবাহ।

যুবক-যুবতীর পরস্পর ভালবাসার আদান-প্রদানের ফলে যে বিবাহ হয়, তাহাই প্রেমজ বিবাহ। পাশ্চাত্য জগতে অনেক-স্থলে যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতার আবরণে নৈতিক চরিত্র অধঃপতিত, আমাদের দেশে সেরূপ নহে। যুবক-যুবতীর প্রকাশ্যে বা গোপনে অবাধ মিলামিশা আমাদের দেশের আদৌ ধাতুসহ নহে।

রূপের নেশা যৌবনের উপর যেমন প্রভাবশীল, তেমন আর কখনও নহে। বিশেষতঃ, যুবকের হৃদয় ও চক্ষু যৌবন-মদিরায় ভরপুর থাকে, যুবতীরও তাহাই। উভয়েরই মন উচ্ছৃঙ্খল। উন্মাদনা ও আশার আলেয়া উভয়ের চিত্তকে প্রভাবিত করে। যুবক-যুবতী কেন, বৃদ্ধের নিকটেও যৌবন সুন্দর। যখন সমধর্ম্মী দুইটি যুবক-যুবতী নিটোল স্বাস্থ্য, পরিপূর্ণ রূপ ও বুকভরা আকাঙ্ক্ষা লইয়া পরস্পরের সংস্পর্শে আসে—রূপের মদিরায় তখন কাহারও অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। উভয়েরই প্রকৃত রূপ অর্থাৎ স্বভাব তখন লুক্কায়িত থাকে, কেবল বাহ্য একটা রূপ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। সেই রূপ অন্তঃসারশূন্য হইতে পারে। তখনই প্রেমের বনামে কামের সৃষ্টি। স্বধাভ্রমে হলাহল পান করিলে দুই চারি দিন নেশায় কাটে বটে, কিন্তু দুই দিন পরেই যখন প্রত্যেকের নেশার ঘোর কাটে, তখন প্রকৃত রূপ বাহির হয়। অনেক স্থলেই যুবক-যুবতী তখন চণ্ডিদাসের শ্রীমতীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—

(আমি) সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
ধাঁয়িনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পড়িব এতেক দুঃখে॥

যৌবন এত উদ্দাম ও উন্মত্ত যে, বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে চাহে না। তাই পরে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ প্রেমজ বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই দেশে ন্যায় বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নিরাশ প্রেমিকের আত্মহত্যার এত বিরহ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বাৎসরিক বিবাহ-বিচ্ছেদ ও আত্মহত্যার বিবরণ দেখিয়া রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রহীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের ন্যায় দাম্পত্য-জীবনে নিরুদ্ধ আনন্দ পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের অনেকেই অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং ভারতীয় নারীজাতি অশিক্ষিতা ও অসভ্যা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে অযৌক্তিক। কয়েক মাস হইল, আমেরিকার নারী-বৈঠকের এক জন প্রতিনিধি ভারতীয় নারীদের গার্হস্থ্যজীবন ও তাহার আদর্শ গবেষণা করিতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় গার্হস্থ্য প্রথার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

তাহার পর মানুষমাত্রেরই বাহির-ভিতর দুইটি দিক আছে। বাহিরের রূপ দিয়া অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিবাহে প্রেমজ বিবাহে যুবক বাহিরের রূপই দেখে, অন্তরের প্রকৃত রূপ তাহার নিকট ধরা দেয় না। অন্তরের রূপই মানুষের প্রকৃত রূপ, বহিঃরূপ ক্ষণস্থায়ী। দুইটি যুবক-যুবতী সুন্দর না হইলে যৌবন-শক্তির প্রভাবে এক জনের অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে, কারণ, যৌবন যৌবনই চাহে।

বিবাহজ প্রেমে অনেক স্থলেই এ সমস্ত অভাব অভিযোগ দেখা যায় না। সাধারণতঃ হিন্দু (ভারতীয় যে কোন জাতি) বুক মনে করে, পিতামাতা সর্ব্বদাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। পুত্রের ন্যায় পিতামাতার ন্যায় আর কেহই জানে না, কন্যারও তাহাই। যুবতীও জানে, বাল্যকাল হইতে শিবঠাকুরের ন্যায় বর পাওয়ার জন্য সে যে সাধনা করিয়া আসিয়াছে, পিতামাতার নির্ব্বাচিত স্বামী সেই আশীর্ব্বাদই মাথায় লইয়া আসিবে। বাহ্য রূপের মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। যদিও বর্ত্তমানে অনেক স্থলে উপযুক্ত পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচিত হয় না, তথাপি সাধারণতঃ সমধর্ম্মী ও একই স্বভাবযুক্ত যুবক-যুবতী মিলিত হয়। যুবক-যুবতীর পিতামাতা উভয় পরিবারও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হয় না। এ ভাবে বিবাহিত স্বামি-স্ত্রীর যে প্রেম, তাহা স্বর্গীয় ও মহান্। সেই প্রেমে চঞ্চলতা নাই, উন্মত্ততা নাই—আছে গভীর প্রাণারাম শান্তি। প্রেম কর্ত্তব্যের সহায়ক, প্রেম কখন কর্ত্তব্য ভুলাইয়া দেয় না। প্রেমজ বিবাহকে অনেক স্থলে প্রণয়জ বিবাহ বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রেমজ বিবাহ অনেক স্থলেই পিতামাতা ও অভিভাবকের প্রতি কর্ত্তব্যের বিচ্যুতি ঘটায়। বিবাহজ প্রেমে সে ভয় নাই। পাশ্চাত্য কবিতা ও উপন্যাসে প্রেমজ-বিবাহের যে সমস্ত কীর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি পড়িলেই অনেকে ইহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক শরৎবাবু গৃহদাহে এই প্রেমজ বিবাহ ও বিবাহজ প্রেমের বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের অপূর্ব্ব সম্মিলন। সামান্য একটি যুবতী যখন মহিম ও সুরেশ দুইয়েরই আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল, তখন অচলাকে কি ভাবে নিরাবরণ অন্তর্যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। তার পর বিবেকের তুলাদণ্ড যখন মহিমের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার কিছু দিন পরেই অচলা তাহার ক্ষণিকের ভুল বুঝিতে পারিয়া সুরেশের সহিত কলিকাতায় আসিল। ইহা স্বাভাবিক; যুবক-যুবতী কখনও নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে পারে না। তাই অচলার জীবন মরুময় হইয়াছিল। কেদার বাবু যদি পূর্ব্ব হইতেই অচলার ভবিষ্যৎ নিজ হাতে গড়িবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে অচলার জীবন অন্যরূপ অঙ্কিত হইত। ইহার পার্শ্বেই হিন্দু নারীর আর একটি চরিত্র, তাহার স্বামী, তবুও প্রেম কত গভীর, কত মহান্! যৌবন প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামিহারা, কিন্তু তবু স্বামীর স্মৃতিই বুকে লইয়া কি ভাবে সে নিজকে পরের সেবায় উৎসর্গ করিল! মহিম-অচলার মাঝেও প্রেমজ বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সেই মিলন বিষময় হইল কেন? মহিমের গৃহদাহ হইল কেন?

রবিবাবুর নৌকাডুবিতেও তাহাই দেখিতে পাই। এই প্রেমজ বিবাহের আদর্শেই হেমনলিনীর জীবন বাহ্য অর্থাৎ পারিবারিক ব্যর্থতায় পূর্ণ। অবশ্য হেমনলিনী প্রকৃত প্রেমের আদর্শ পাইয়াছিল বলিয়াই এই ব্যর্থতার মাঝেও সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক সাহিত্যেই এমন অনেক চিত্র আছে। বিবাহজ প্রেমে বাল্যবিবাহ ও যৌবন-বিবাহ কাহার কেমন প্রভাব, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

মিঃ ট্যাচারকার সত্যই বলিয়াছেন, আদর্শ প্রেমজ বিবাহ কবির কল্পনাকুঞ্জেই বিশেষ শোভা পায়; বাস্তব-জীবনে ইহার স্থায়িত্ব ও সার্থকতা অতি অল্প।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই সমস্যা উত্থাপন করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমানে আমরা পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত; পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজের মোহে মুগ্ধ। যদিও অনেকের এই মোহ বর্ত্তমান জাগরণে টুটিয়া গিয়াছে, তবুও পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব আমরা এড়াইতে পারি নাই। অবশ্য পাশ্চাত্যের ভাল ভাবটা লওয়া অতি আবশ্যক। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, প্রথমেই ইহা বিচারসাপেক্ষ। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের কয়েকটি মন্তব্য পাঠ করিলেই পাশ্চাত্যের এই বিবাহ প্রথার ব্যর্থতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সমগ্র প্রদেশ ছাড়িয়া আমরা বিলাতের কথাই আলোচনা করিব। এই বৎসর মোটের উপর ৩ হাজার ৫ শত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা শুনানী হইবার কথা। অথচ ২০ বৎসর পূর্ব্বে ৫ শতের বেশী হইত না। গত ৪ বৎসরেও গড়ে প্রায় ন্যূনাধিক ৩ হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা হইয়াছে। এ বৎসরে ইহা হইতেও মামলার সংখ্যা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলে নারীর স্বাধীনতা ও কামনার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। লণ্ডনের "Evening Standard" পত্রিকায় জনৈক চিন্তাশীল লেখক সমাজের অধোগতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—খৃষ্টান-বিবাহে প্রেমজ ও কামজ বিবাহের পার্থক্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান কামজ বিবাহের প্রথা আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। জনৈক পাদরী বলেন, ধর্ম্ম ও মানবতার পবিত্র ভাব নষ্ট হইয়া যদি বিবাহ আইনানুমোদিত বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে মানবতার স্থান কোথায়?

ইহা দ্বারাই বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। স্বেচ্ছা-সম্মিলনে সংযম, পিতামাতার অনুমতি ও সুনির্ব্বাচনের অভাব অবশ্যম্ভাবী। উহার ফলে স্বাধীনতাকামী নরনারী মনের সামান্য খেয়াল বশতঃও অনেক সময় পরস্পরের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ যখন তখন অন্বেষণ করে।

পাশ্চাত্য ভাষাভিমানী হইয়া সমাজের সুশৃঙ্খল প্রথাকে বিনষ্ট করিয়া ইহার স্থলে অর্ব্বাচীনের ন্যায় অন্য প্রথার প্রচার যুক্তি-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সেই প্রথা সমাজের অনিষ্টকর। আমরা যতই পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ হই না কেন, পাশ্চাত্যদেশবাসী ভোগের চরমসীমায় পৌঁছিয়া আজ এই অধঃপতিত ভারতের দিকেই ত্যাগ বা অন্য কোন মহান্ আদর্শের জন্য উন্মুখ হৃদয়ে চাহিয়া আছে। পাশ্চাত্য প্রেমজ বিবাহের স্থানে বিবাহজ প্রেমের প্রচার এই উন্মুখতারই পরিচায়ক। আমরা আশা করি, ক্ষণিক উত্তেজনা ও সুখের আকর্ষণে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হইতে দেওয়া জাতীয়তাবাদী ও সমাজকামী কেহই উচিত মনে করেন না।

শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্ম্মন্।

খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতে এক সময়ে যেমন পণ্ডিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রালোচনার একটা প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, পাশ্চাত্যক্ষেত্রেও তেমনই মধ্যযুগে এক সময়ে শাস্ত্র-বিচারের একটা গুরু সমস্যার দিন আসে। এই সময়টা dark age বা অজ্ঞানযুগের পর হইতে Reformation বা সংস্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় ১২ শত বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিচারের বিষয় ছিল প্রধানতঃ বাইবেলের ধর্ম্মমত। এই ধর্ম্মমত লইয়া প্রতীচ্যে যে তুমুল তর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস দুই চারিটি কথায় বুঝান শক্ত। শত শত গ্রন্থেও ইহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় নাই এবং সেই সকল গ্রন্থের অনেকগুলি আজিও লোকলোচনের বহির্ভূত রহিয়াছে। বাইবেলকে সেকালের পণ্ডিতগণ যদি কোন ধর্ম্মগ্রন্থই মনে করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এত গোল উঠিত না; কিন্তু তাঁহারা প্রাচ্যের ন্যায় প্রতীচ্যের ধর্ম্মমতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কি শুভক্ষণেই যে ফীলো (১) (Philo the Jew) ইহুদীদিগের ধর্ম্মমতের ভিতর গ্রীসীয় দর্শনতত্ত্বের বীজ বপন করিলেন? সে আজ ১৯ বৎসরের কথা। পণ্ডিতগণ তখনও প্লেটোর আদর্শ-তত্ত্বের ঘোর সম্পূর্ণ কাটাইতে পারেন নাই। গ্রীসের অ্যাকাডেমী (Academy) উঠিয়া গেলেও প্লেটোর প্রতিভা প্লোটিনাস্ (Plotinus) এবং পর্‌ফাইরীর (Porphyryr) মতের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া, আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে নিও-প্লেটোনিক্ বা নব-আদর্শবাদ মতের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমোনিয়াস্ (২) (Amonius) উক্ত মতাবলম্বীদিগের কর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকাল দর্শনালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার নিও-প্লেটোনিক্ সম্প্রদায়টি দেখিতে দেখিতে এতই উন্নতিলাভ করে যে, সমসাময়িক প্রধান প্রধান খৃষ্টভক্তও উক্ত সম্প্রদায়ের উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিতেন। অপর দিকে আবার সেণ্ট পল্‌ও (St. Paul) গ্রীসের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, নানা নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমত-গুলি জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছিলেন। ইহুদী এবং গ্রীক উভয়ের কেহই তাঁহার উপদেশ সহজে গ্রহণ করেন নাই; অগত্যা পল্‌কে খৃষ্টের কোন কোন মত গ্রীকদিগের মধ্যে রূপকের ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইয়াছিল। (৩) আরও কিছুকাল পরে সেণ্ট আগষ্টাইন্ (St. Augustine) প্লেটোর আদর্শসংক্রান্ত মতগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন; অ্যারিষ্টটলের মতও যে কোন কোন অংশে না লইয়াছিলেন, তাহা নহে। সেণ্ট আগষ্টাইন্ প্রকৃত পক্ষে গ্রীসীয় দর্শনমত এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের সংযোগক্ষেত্র, অর্থাৎ তাঁহার মতের ভিতর দিয়াই মধ্যযুগের য়ুরোপীয় তত্ত্বচিন্তায় গ্রীসীয় চিন্তার প্রবাহ পরিস্ফুটরূপে প্রবেশলাভ করে। এই প্রবেশের ফলে যে নূতন শাস্ত্রের উদয় হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব ভাগকে Patristic philosophy বা খৃষ্টীয় আদর্শবাদ এবং উত্তর-ভাগকে Scholastic philosophy বা খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারক বা "ফাদার" (father) হইতে patristic নামের প্রয়োগ হইয়াছিল। সেণ্ট আগষ্টাইন্ এক জন প্রধান খৃষ্টীয় আদর্শবাদী। (১) তিনি একাধারে ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিদ্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং নীতিবিদ্ ছিলেন। খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে সেণ্ট আগষ্টাইনের মতের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। দর্শন এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে সেণ্ট আগষ্টাইন্ জগত্তত্ত্ব এবং বিশ্বরচনা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ঈশ্বর অনাদি-কারণ, পূর্ণ এবং মঙ্গলময়। আলেক্‌জান্দ্রীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনেকগুলি মত তাঁহার মতে প্রবিষ্ট হইলেও, নিও-প্লেটোনিক্ ঈশ্বর-তত্ত্বের সহিত একটি প্রধান বিষয়ে তাঁহার বিরোধ আছে। তিনি সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন নাই (not ab aeterno)। তাঁহার ঈশ্বরসংক্রান্ত মতও সর্ব্বদেবত্ব-বাদের বিরোধী (antipantheistic)। বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁহার জড় (maker) এবং রূপ (form) সংক্রান্ত মতই প্রধান; পর-বর্ত্তী কালে দার্শনিক তর্কের ইহা একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়া ছিল। জড় এবং রূপ সম্বন্ধে সেণ্ট আগষ্টাইন্ মোটের উপর অ্যারিষ্টটলেরই পোষকতা করিতেন। (২) তাঁহার আর একটি প্রধান মত সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের পূর্ব্বজ্ঞান, শ্রেষ্ঠ জগতের পরিকল্পনা। ইহাও পরবর্ত্তী দর্শনতত্ত্বের একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছিল। অধ্যাত্মক্ষেত্রে সেণ্ট আগষ্টাইন্ আত্মাকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন (spiritual) এবং অমর (immortal) বলিয়াছেন। আত্মার "স্পিরিচুয়ালিটী" জন্মলব্ধ সংস্কার। আত্মার অপরাপর বৃত্তিগুলিও আত্মার সহিত অভিন্ন এবং আত্মাও পূর্ণ নির্দ্দেশ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আত্মার অমরত্ব লইয়াও পরে গোল বাধিয়াছিল। মানববুদ্ধি (intelligence) সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার সহিত ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ (Divine illumination) র যোগ আছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরই আত্মার সৃষ্টি এবং নিখিল জ্ঞানের আলোক, যে আলোকে বস্তুসমূহের অস্তিত্ব নাশিত্ব সূচিত হয়। মানবজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, উহা আত্মারই সহজাত এবং ধারণাগুলি চিন্তা প্রভাবে (by reflection) আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। সেণ্ট

(১) খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৫০ The complete fusion of Jewish Theology and Grecian philosophy was the work of Philo the Jew. —De Wulf's History of Medieval Philosophy. Page 73.

(২) ইনি গ্রীক দার্শনিক প্রোক্লাসের শিষ্য; ২য়—৩য় শতাব্দী।

(৩) বাইবেল গ্রন্থের Acts বিভাগের ১০শ হইতে ২৬শ অধ্যায় এবং Epistle গুলি দ্রষ্টব্য।

(১) "The fathers of the church have handed down to the Middle Ages in their theological writings both their own philosophical theories and those of the ancients. Amongst them St. Augustine holds the first place."—De Wulf.

(২) "He refers to matter as to an undeterminate something, incapable of existing without a form,—in language that recalls Aristotle."—De Wulf.

আগষ্টাইনের আর একটি বিশেষ মত, will বা ইচ্ছার ক্রিয়া লইয়া। "ইচ্ছাকে" তিনি "বুদ্ধির" উপরে স্থান দিয়াছেন। নীতিক্ষেত্রে ঈশ্বর পরমমঙ্গল (supreme goodness) মানবের চরম লক্ষ্য (ultimate end) এবং ঈশ্বরের সহিত আত্মার মিলনই (union) চরম সুখ। শুভাশুভ বিচারও ঈশ্বরের ন্যায়-পরতায় সূচিত হইয়া থাকে।

উপরে সংক্ষেপে যে কয়েকটি মতের উল্লেখ করা গেল, সেগুলি আলেক্‌জান্দ্রিয়ার শিক্ষালব্ধ এবং তাহাদের ভিতর গ্রীসীয় শিক্ষার সহিত পূর্ব্বদেশীয় অর্থাৎ সম্ভবতঃ ভারতীয় জ্ঞানও কিয়দংশে বিদ্যমান ছিল। সেণ্ট আগষ্টাইনের পর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সিনিসিউস্ (১) (Synesius of Cyrene), প্রোকোপিয়াস্ (২) (Procopius of Gaza) প্রভৃতি কয়েক জন লেখকের আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ যিনি, লোক তাঁহাকে সিউডো ডেনিস্ (Pseudo Denis) বলিত। সিউডো ডেনিস্ যে ঠিক কে, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই; তবে তিনি প্রোক্লসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার লেখায় প্রাচ্যশিক্ষার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রেততত্ত্ব, দেবদূত, স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রভৃতি বিষয়ে সিউডো ডেনিসের গ্রন্থ হইতে বহু মূল্যবান্ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার সমগ্র মতের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির মিলন। এই প্রকার মতকে য়ুরোপীয়গণ রহস্যবাদ (mysticism) আখ্যা দেন। ঈশ্বর স্বয়ংই যাবতীয় সৃষ্টির মূল এবং পরিণাম, আদি এবং অন্ত, প্রেম এবং মঙ্গলের নিদান। তিনি যাবতীয় সৃষ্টিকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। মঙ্গল বা আনন্দ ঈশ্বর হইতেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয় এবং পুনরায় ঈশ্বরেই বিলীন হইয়া থাকে। নিখিল সৃষ্টি এই শুভ মিলনের সাক্ষ্য দিতেছে। জীবের পরমানন্দ বা সমাধিতেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়। গ্রীক দার্শনিক প্রোক্লাসের (Proclus) সহিতও সিউডো ডেনিসের ব্যবধান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সিউডো ডেনিসের মতের সহিত পূর্ব্বদেশীয় দার্শনিক মতের যতই ঐক্য থাকুক, আসলে কিন্তু তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, অর্থাৎ সর্ব্বদেবত্বে বিশ্বাস করিতেন না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যখন শৈশবাবস্থা, তখন এই ধর্ম্মকে ইহুদীদিগের হাত প্রধানতঃ অখৃষ্টীয় মতের মিশ্রণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত আচার্য্যগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়াছিল, ধর্ম্মের মূল মতগুলির (Dogmas) ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা, যাহাতে সেগুলি ইহুদীদিগের প্রচ-লিত মতের সহিত মিশিতে না পারে। এই নিমিত্ত "ডগমা"-গুলির দার্শনিক মীমাংসারও প্রয়োজন হয়; কারণ, যীশুখৃষ্ট কোন বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা না করিলেও, অশাস্ত্রীয় কোন কথাই বলেন নাই। জগতের উপর ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব, প্রতিবিধান, প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি মানবের নির্ভরশীলতা, বস্তু-সমূহের পার্থক্য, বিশ্বের সসীমত্ব, দেহ এবং আত্মার পার্থক্য, পুনর্জ্জন্ম, স্বর্গ এবং নরক, পাপ এবং পুণ্য ইত্যাদি বহু বিষয় য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং যীশুও ঐ সকল বিষয়ে সাধারণভাবে উপদেশ দিতেন। প্রচারকগণ খৃষ্টের মূল উপদেশগুলির ব্যাখ্যা করিলেও সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের সবিশেষ আলোচনা করেন নাই, অথবা দার্শনিক মতগুলি একত্র করিয়া তাহা হইতে কোন নূতন মতের প্রতিষ্ঠাও করেন নাই। বিশেষতঃ যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তাহা প্রাচীন গ্রীকো-রোমান্ সভ্যতার বার্দ্ধক্যকাল। তৎকালে জগতের যাহা কিছু বাঞ্ছনীয় এবং শোভনীয়, গ্রীস এবং রোমের সভ্যতার দিনে তাহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তখন কোন নূতন মতের আবশ্যকতাই ছিল না। প্রচারকগণ খৃষ্টীয় মতের দার্শনিক মীমাংসা করিতে গিয়া গ্রীস-রোমের তত্ত্বচিন্তারই নূতন করিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা নিও-প্লেটোনিকদিগের নিকট হইতে বাছিয়া বাছিয়া "ক্যাথলিক্" ধর্ম্মমতের অনুকূল প্লেটোর মতগুলিরই সঞ্চয় করেন, অ্যারিষ্টটলের মতও বহুস্থলে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেবতা সংক্রান্ত গ্রন্থ (Theodicy), জড়-বিজ্ঞান (Physics) এবং মনোবিজ্ঞান (Psychology) বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। যে কয়টি প্রধান বিদ্যাপীঠ হইতে তাঁহারা দার্শনিক তথ্য সংগ্রহ করিতেন, তন্মধ্যে দুইটি পূর্ব্বদেশে অর্থাৎ আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় এবং বাইজাণ্টীয়ামে এবং তৃতীয়টি পশ্চিমে অর্থাৎ ইতালীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এথেন্সের পুরাতন বিদ্যাপীঠ (Academy) ৫২৯ খৃষ্টাব্দে উঠিয়া যায়। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বিদ্যাপীঠ উত্তরকালে খৃষ্টীয় মতেরই পোষণ করিত। ফিলোপোনাস্ (Philoponus) নামে ইহার এক অধ্যাপক ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রকাশ্যভাবে ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রচারেই ব্রতী হইয়াছিলেন। অপর এক অধ্যাপক অলিম্পিডোরাস্ (Olympidorus) ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষাই লইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই শিক্ষা-কেন্দ্রটি প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টীয় শিক্ষার প্রচারে নিয়োজিত হইয়া-ছিল। আরবীয়গণ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মিশর ধ্বংসকালে কেন্দ্রটির উচ্ছেদ না করিলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংসর্গে আসিয়া তাহার প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইত। এই আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরেই ২০০ খৃষ্টাব্দে প্যাণ্টিনাস্ (Panteenus) কর্ত্তৃক অপর একটি খৃষ্টীয় শিক্ষালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট ক্লেমেণ্ট (১) (St. Clement) এবং ওরাইগেন্ (২) (Origen) প্রমুখ সাধুগণ খৃষ্টীয় বিদ্যাপীঠেই শিক্ষা দিতেন। এই বিদ্যাপীঠের লক্ষ্য ছিল, "নস্তিসিজম্" (Gnosticism) নামক খৃষ্টীয় মতের বিরোধী মতের প্রতিবাদ করা। তৎকালে এই প্রকার অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী মত প্রচলিত ছিল, প্রথম প্রথম আলেক্‌জান্দ্রিয়ার পুরাতন বিদ্যাপীঠ এবং খৃষ্টীয় বিদ্যাপীঠে প্রতিযোগিতা বলিলেও, উত্তরকালে উভয় ক্ষেত্রেই খৃষ্টীয় মতেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(১) ইনি নিও-প্লেটোনিক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।—৩৫০-৪৩০ খৃঃ অঃ।

(২) গ্রীক ঐতিহাসিক; মৃত্যু ৫৬৫ খৃঃ অঃ।

(১) ইনি অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট, ২য়-৩য় শতাব্দীর লোক।

(২) ওরাইগেন্ Father of the Christian Church নামে পরিচিত। ১৮৫-২৫৪ খৃঃ অঃ।

চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভসময়ে খৃষ্টীয় সমাজ স্বকীয় প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত কয়েকটি মহতী সভার আহ্বান করেন। মিলানের মহাসভা হইতে যে আদেশ বা Edict প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে কন্‌ষ্ট্যান্‌টাইন্ দি গ্রেটের(Constantine the Great) প্রস্তাবানুসারে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাসভা কাউন্সিল অব নাইস(Council of Nice) নামে পরিচিত। এই মহাসভাতেই 'ডগমা'গুলির ব্যাখ্যা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে সকল তর্কের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(ক) ত্রিত্ববাদ (The doctrine of Trinity), (খ) খৃষ্টতত্ত্ব (Christology) এবং (গ) মানবতত্ত্ব (Anthropology)। "এরীয়ানিজম্" মত হইতে নিত্যবাদের উৎপত্তি। অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বিশপ সেণ্ট আথেনেসিয়ুস্ (St. Athanasius), (১) কাপাডোকিয়ার সেণ্ট গ্রেগরী, (২) (St Gregory) এবং তদীয় ভ্রাতা সেণ্ট বেসিল্ দি গ্রেট (St. Basil the Great) ও সেণ্ট গ্রেগরী নজিয়াঞ্জেন্ (৩)(St. Gregory Nazianzen) এরীয় মতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পশ্চিম প্রদেশেও সেণ্ট হিলারী এবং বিশপ আম্বোস (৪) কর্ত্তৃক উক্ত মত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নেষ্টরিয়াস্ (Nestorius) (৫) খৃষ্টতত্ত্ব সংক্রান্ত তর্কের প্রবর্ত্তক। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সেণ্ট কীরিল্ (St. Cyril) ইহার প্রবল শত্রু ছিলেন। মানবতত্ত্ব সংক্রান্ত তর্কের ফলে "পীলেজীয়" বা ব্যক্তিগত মতের উৎপত্তি হয়। সেণ্ট আগষ্টাইন্ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন।

উপরিলিখিত মতগুলির উল্লেখ করার কারণ এই যে, ঐগুলিই পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের (Scholasticism) উপকরণ হইয়াছিল। ইমারাত প্রস্তুত করিতে যেমন ইট, কাঠ, চূণ ইত্যাদি মাল-মসলার প্রয়োজন হয়, এই সকল মত ও তর্কগুলিকে সেইরূপ খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের মালমসলা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় আদর্শবাদের সাময়িক অন্তর্ধান হইয়া তৎপরিবর্ত্তে যে শাস্ত্রের উদয় হয়, তাহাকেই খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র বলা হইয়াছে। ইহার সংজ্ঞা লইয়াও বহু গবেষণা হইয়াছিল। মোটের উপর, খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র বলিতে বহু দেশের এবং বহু লোকের দার্শনিক, অ-দার্শনিক, অবিসংবাদী, বিসংবাদী বহু মত বুঝায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচ্য, প্রতীচ্য এবং বৈজাণ্টী দর্শনশাখার অন্তর্গত বহু প্রশাখার বিভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত হইলেও, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে এক বা ততোঽধিক স্থলে সংযোগ ছিল। সমভাবাপন্ন বিশেষ বিশেষ মত একত্র গ্রথিত হইয়া উক্ত দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি করে। যে সকল প্রতিভাশালী দার্শনিক কর্ত্তৃক এই মিলনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে সেণ্ট আন্‌সেলম্ (১) (St. Anselm), হেলে'র আলেক্‌জাণ্ডার (২) (Alexander of Hales), সেণ্ট বনাভেন্‌টুরা (৩) (St. Bonaventura); টমাস্ একুইনাস (৪) (Thomas Aquinas), ডান্সস্কটাস্ (৫) (Duns Scotus) এবং উইলিয়ম্ ড্যাকাম্ (৬) (William Deccam) সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে সেণ্ট আন্‌সেলম্ ও সেণ্ট আগষ্টাইনের মূল মতে ভেদ ছিল না। আন্‌সেলম্ প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া বিশ্বাসকেই সর্ব্বধর্ম্মের মূল বলিয়া মনে করিতেন। আলেক্‌জাণ্ডার কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় দর্শন মত সমূহের অনেকাংশে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। তিনি চিন্তা-পদ্ধতির কতকগুলি নূতন নিয়মেরও প্রবর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন আলেক্‌জাণ্ডার কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথম অ্যারিষ্টটলের সমগ্র গ্রন্থাবলীর ব্যবহার হইয়াছিল। সেণ্ট বনাভেন্‌টুরা মোটের উপর সেণ্ট আগষ্টাইনের অনুবর্ত্তন করিতেন, তবে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সহিত একমত ছিলেন না। তিনিও সেণ্ট আগষ্টাইনের ন্যায় 'ইচ্ছাকে' যাবতীয় মনোবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতেন। রূপের বহুত্ব (plurality of forms) সম্বন্ধে ইহার একটি প্রধান মত আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারসাপেক্ষ এবং সৃষ্টি কালের অধীন, এই সকল মতও বনাভেন্‌টুরা কর্ত্তৃক দক্ষতার সহিত প্রচারিত হইয়াছিল। সেণ্ট টমাস্ প্রসিদ্ধ "টমিষ্ট" মতের প্রবর্ত্তক। ইহার মতের সহিত অ্যারিষ্টটলের মতের সর্ব্বাংশে মিল থাকায় কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাকে দ্বিতীয় অ্যারিষ্টটল্ বলিয়াছেন। জড় ও রূপের বিচার এবং বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ইহার দুইটি প্রধান মত। স্কটাস্, টমাসের বিপক্ষতা করিলেন, এজন্য "টমিজম্"এর ন্যায় "স্কটিজম্"ও একটি বিশিষ্ট মতে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য ইহার দার্শনিক মতের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ওকাম্ হইতে "টার্মিনিজম্" (Terminism)মতের উদ্ভব হইয়াছিল। ইনি দার্শনিক বিচারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ রক্ষার বিরোধী ছিলেন। "টার্মিনিজম্" বলিতে পাশ্চাত্য নামবাদের (nominalism) শৈশবাবস্থা বুঝিতে হইবে।

উপরে যে সকল দার্শনিকের নাম করা হইল, ইহাদের প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য চিন্তা-গগনের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ এবং ইহাদের দ্বারাই খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের গঠন, বর্দ্ধন এবং শোভন সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই প্রধান প্রধান দার্শনিক সমস্যাগুলির ভঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মত সমূহের পরস্পরের মধ্যে একটা জাতিগত সাদৃশ্য (family likeness) দেখা যায়। De Wulf এর মতে খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র একটি প্রকাণ্ড জ্ঞান-সৌধ (a great monument of ideas) ইহা বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। বিভিন্ন মতগুলির সমন্বয়সাধনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে বিসদৃশ মত (heterogenous doctrines)-গুলি থাকিলেও, সেগুলি মাথা তুলিতে পারে নাই; সদৃশ (homogenous) মত হইতে সেগুলিকে বাছিয়া লওয়া যায়। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের গোড়ার কথা, খৃষ্টীয় এবং অখৃষ্টীয় মতের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ যে কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে। 'প্যাট্রিষ্টিক্' মতে অখৃষ্টীয় গ্রীক এবং ইহুদী মতের উপাদানগুলি (elements) পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, তবে সেগুলি যে প্রথম হইতেই দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নহে। বহু পূর্ব্বে সেণ্ট পল্ কর্ত্তৃক সেই উপাদানগুলি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে কিলো ইহুদী-ধর্ম্মের সহিত মিল রাখিয়া তাহাদিগকে দার্শনিক আবরণ দান করেন এবং সেণ্ট আগষ্টাইন্ তাহাদিগকে খৃষ্টীয় মতানুপন্থী করেন। আগষ্টাইন এবং আগষ্টনীয় শাখার সকল পণ্ডিতই খৃষ্টীয় মতের সহিত প্লেটোর মতের সামঞ্জস্য রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এ কারণ, ইঁহাদের বিচার-প্রণালীতে আদর্শের ভাবটাই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

(১) অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার প্রধান বিশপ। ২৯৬-৩৭৩ খৃঃ অঃ।
(২) খৃঃ অঃ ৩৩১-৩৯৪।
(৩) খৃঃ অঃ ৩২৯-৩৯০।
(৪) আনুমানিক ৩৪০-৩৯৭ খৃষ্টাব্দ।
(৫) ৫ম শতাব্দী।

(১) ১০১৩-১১০৯ খৃঃ অঃ।
(২) মৃত্যু ১২৪৫ খৃঃ অঃ।
(৩) ১২২১-১২৭৪ খৃঃ অঃ।
(৪) ১২২৭-১২৭৪ খৃঃ অঃ।
(৫) ১২৬৫-১৩০৮ খৃঃ অঃ।
(৬) মৃত্যু আনুমানিক ১৩৪৭ খৃঃ অঃ।

খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের শৈশবাবস্থাতেই পূর্ব্ব-কথিত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে এবং দেখিতে দেখিতে বন্যাপ্রবাহের ন্যায় বিদেশীয় লোকের দক্ষিণ-য়ুরোপ ভরিয়া যায়। এই বিপ্লবের ফলে উদীয়মান শিক্ষাকেন্দ্রগুলি আপাততঃ বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে কিন্তু চর্চ্চা বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরগুলির বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই। প্রাচীন গ্রীসীয় এবং রোমীয় শিক্ষার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা চার্চ্চের অভ্যন্তরেই স্থান পায়। বিপ্লব প্রশমিত হইয়া নূতন জ্ঞানালোকের উদয় হইতে প্রায় ৬ শত বৎসর লাগিয়াছিল। এত দিন যাবৎ শিক্ষিত য়ুরোপ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই সুদীর্ঘ কালের অবসরে পাশ্চাত্যসমাজ নূতন নূতন লোকের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন নূতন জ্ঞানের আদানপ্রদান করিতে পারিয়াছিল। এই সময়ে নব-লাটীন্ (Neo-Latin) নামে এক নূতন ভাষারও সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সের প্যারী, মেলুন, অর্লার, কোলন প্রভৃতি বহুস্থানে নূতন নূতন বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল বিদ্যাপীঠে পুনরায় নূতন উৎসাহে ধর্ম্মশাস্ত্রের দার্শনিক মীমাংসা হইতে লাগিল। বহু দার্শনিক পণ্ডিত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশই অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থের অনুবাদ। এই অনুবাদ কার্য্যের এক দীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাস আছে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ গ্রন্থ অনূদিত হয়, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মুসলমান-বিজয়ীদিগের দ্বারা দক্ষিণ স্পেন অধিকৃত হইলে উক্ত দেশের টোলেডো, গ্রাণাডা, সেভীল্ প্রভৃতি উপনিবেশে আরবীয় শিক্ষার প্রচার হয়। ঐ সময়ে কতকগুলি ইহুদী পণ্ডিত কর্ত্তৃক ও পীরোনিজ পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে ইহুদী শিক্ষারও চর্চ্চা হইতেছিল। ফলতঃ, মুসলমান এবং ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ঐ অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণ হয়ত অথবা হিব্রু অনুবাদ ভাল বুঝিতেন না, এ কারণ প্রচলিত লাটীন্ অনুবাদের প্রয়োজন হওয়ায় সিসিলীর রাজা দ্বিতীয় রজার্ (১) (Roger II) এবং সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক্ (২) (Emperor Fredrick II) আরবীয় পণ্ডিত নিযুক্ত করত তাঁহাদের দ্বারা আরবী ভাষায় অনূদিত অ্যারিষ্টটলের বহু গ্রন্থ এবং ভাষ্যের লাটীন্ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থ বলোগ্না, প্যারী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইতে লাগিল। এ যাবৎ য়ুরোপের লোক কেবলমাত্র বীথিয়াস্ (৩) (Boethius)-কৃত অ্যারিষ্টটলের অর্গেনন্ বা তর্কশাস্ত্রের সহিতই পরিচিত ছিলেন। ১২৫০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে লিঙ্কনের বিশপ রবার্ট (Bishop Roeert) "নিকোমেকিয়ান্ এথিক্স" বা অ্যারিষ্টটলের প্রধান নীতিশাস্ত্রের লাটীন্ অনুবাদ বাহির করিয়াছিলেন। ডমিনিক্ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আলবার্ট (Albert of Bolsladt) এবং সেণ্ট টমাস্ ও অ্যারিষ্টটলের কতকগুলি মূল্যবান্ ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অ্যারিষ্টটলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানশাস্ত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন—আরবীয় গ্রন্থকারগণ। পারস্যে ইবন্ মীনা (৪) এবং স্পেনে ইবন্ রশীদ্ (৫) এই দুইশাখার গ্রন্থাবলীর অনুবাদক। ইহুদী অনুবাদক সলমন্ বেন্ গেবীরোল্‌এর (৬) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থকর্ত্তা কেবল অনুবাদক নহেন, সকলেই দার্শনিক এবং দার্শনিক সাহিত্যে ইহাদের প্রত্যেকেরই গবেষণা আছে। যাহা হউক, মোটের উপর অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ সমূহের প্রচার হইতে য়ুরোপীয় চিন্তা-জগতে এক নূতন আবেগের সাড়া পড়িয়াছিল। ইহাতে চার্চ্চের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রথম প্রথম প্রমাদ গণিয়াছিলেন। বহু চেষ্টার ফলে তাঁহারা যে একটি বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, হঠাৎ যেন তাহার মূলেই আঘাত লাগিল। ইহার কারণ এই যে, অ্যারিষ্টটলের বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক এবং জ্যোতিষিক মতগুলিকে তাঁহারা মোটের উপর বাইবেলের প্রতিকূল মত বলিয়াই মনে করিতেন। জড় (matter), রূপ (form) এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাকে তাঁহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলে, অ্যারিষ্টটলের "ফিজিক্স" (Physics) এবং "মেটাফিজিক্স" (Metaphysics) কিয়দ্দিনের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ-বিষয়ক মতগুলিকে তাঁহারা পূর্ব্বদেশ হইতে আনীত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু অ্যারিষ্টটল সম্বন্ধে চার্চ্চের বিরাগ অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

(১) ১০৯৬-১১৫৪ খৃঃ অঃ।
(২) ১১৯৪-১২৫০ খৃঃ অঃ।
(৩) দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক (৪৫৫-৫২৪ খৃঃ অঃ)।
(৪) আবু ওয়াসীদ্ ইবন্ সীনা। য়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণ ইহার Avicenna নাম দিয়াছেন। ইহা ইবন্ সীনার বিকৃত উচ্চারণ। পারস্যের স্বনামখ্যাত দার্শনিক (৯৪০-১০৩৭ খৃঃ অঃ)
(৫) আবু ওয়াসীদ্ মহম্মদ ইবন্ রসীদ্। দার্শনিক জন্ম কর্ডোভা, মৃত্যু—মরাক্কা (১১২০-১১৯৮ খৃঃ অঃ)। ইবন্ রসীদ্‌ও য়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক Averroesতে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার মতকে Averro-ism বলা হয়
(৬) প্রসিদ্ধ ইহুদী দার্শনিক, ইঁনি Avicebron নামে পরিচিত। জন্ম—মালাগা (১০২০-১ ৭০ খৃঃ অঃ)।

অল্পকালের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই অ্যারিষ্টটলের অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। গণ্যমান্য অনেকেই জড়, রূপ এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব বিষয়ক মতগুলিকে "গস্পেল্" বা বাইবেল মতের অনুকূল বলিয়াই প্রতিপন্ন করিলেন। অতঃপর গোলযোগ শুধু মিটিয়া গেল না, অ্যারিষ্টটলের প্রভাবে অপরাপর প্রাচীন মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল এবং আরও কিছু দিন পরে, এমনও দাঁড়াইল যে, যে তর্কের মূলে অ্যারিষ্টটলের দৃষ্টান্ত না থাকিত, সে তর্ক তর্ক বলিয়াই গ্রাহ্য হইত না। ইহাই মধ্যযুগে "পেরিপ্যাটেটিক্ বা অ্যারিষ্টটেলীয় দর্শন মতের অভ্যুত্থানকাল" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সময় হইতেই খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র পূর্ণ বিকশিত হয়।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে, খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্যগুলি কি? কোন্ কোন্ তত্ত্বের মীমাংসা লইয়া দার্শনিকগণ এত দিন মাথা ঘামাইলেন? ইহার উত্তর এই যে, সকল দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য চিরকাল এক। দেশকাল-পাত্র-ভেদে চিন্তা বা ভাবের অভিব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও, প্রতিপাদ্যে ভেদ থাকে না। এ স্থলেও দেখিতে পাইবে, ঈশ্বর ঈশ্বরের অবস্থিতি, জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, পূর্ব্ব নির্দ্দেশবাদ ও তাহার ফল, "ট্রিনিটি" তত্ত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর, খৃষ্ট এবং মানবের সম্বন্ধ, ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-বিচার এবং সত্তা, শ্রেণী এবং জাতি-বিষয়ক বহু তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে। তবে সমস্ত তর্কের মূলে একটি বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, উহাদের প্রত্যেকের সহিত বাইবেল-তত্ত্বের মিল রাখাই দার্শনিকগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনে যিনি যত অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি খৃষ্টীয় সমাজে তত অধিক সম্মান পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, যে যে স্থলে ইহার ব্যাতক্রম ঘটিয়াছে, অর্থাৎ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া যখনই চার্চ্চের প্রতিকূল মতের প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই গোল বাধিয়াছে। খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাকে এক ব্যক্তি কোন একটি বিশিষ্ট প্রসঙ্গের চর্চ্চা করিয়া পরিত্যাগ করিলে, সেই সম্প্রদায়ের অপর ব্যক্তির দ্বারা সেই মতটি পুনরায় গৃহীত, আলোচিত এবং পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। এই প্রকার ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে প্রত্যেক মূল মতেরই উত্তরোত্তর সংস্কার এবং উন্নতি হইয়াছিল। সেণ্ট আগষ্টাইন্ হইতে যত দার্শনিক মতামতের আলোচনা করিয়াছিলেন, সকলের পরিণতি হইয়াছিল, সেণ্ট টমাসে। সেণ্ট টমাস্ অসাধারণ প্রতিভাবলে অ্যারিষ্টটলের সমগ্র মতের পুনরুদ্ধার করিয়া এবং তাহার সহিত বাইবেল মতের যথাসাধ্য সামঞ্জস্য রাখিয়া খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। এই নিমিত্তই বলা হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "স্কলাষ্টিক্" দর্শন বা খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল। টমাসের পর হইতে ইহার অবনতির সূত্রপাত হয়। অবনতির প্রধান কারণ, বহুকাল হইতে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর পণ্ডিতগণ বুঝিয়াছিলেন যে, দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের গণ্ডী পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত "স্কটিষ্ট" সম্প্রদায়ের প্রস্তাব, "টামিনিজমে"র প্রচার, রজারুবেকনের বৈজ্ঞানিক মত সমূহ, ডুরাণ্ড (Durand), বুরীডান (১) (Buridan) গেব্রীয়েল বীল্ (২) (Gabriel Biel), মার্কুরীয়ার জন্ (৩) (John of Mercuria), আর্টিকুরীয়ার নিকোলাস্ (Nicholas of Aurticuria) প্রভৃতি বহু সন্দেহবাদীর স্বাধীন মত, যুদ্ধবিগ্রহ, মুদ্রাযন্ত্র এবং নূতন মহাদেশের আবিষ্কার প্রভৃতির ফলে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হইয়া যায়। অনেকে আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে "পরশ পাথরের" (Philosophers' Stone) সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে পাল্‌মার রেমণ্ড লালাস্ (Don Raymond Lullus of Palma) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "দর্শনচক্র" (Ars magna) উল্লেখযোগ্য। "আর্স ম্যাগনা" সাহায্যে অতি সহজেই তর্কের মীমাংসা হইত এবং ইহাই পরবর্ত্তী কালে চক্রক্ বিচারপদ্ধতিতে (Syllogistic reasoning) পরিণত হইয়াছিল। টুলুসের এক প্রফেসরও বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্যহস্ত-লিখিত গ্রন্থাপেক্ষা ঈশ্বর-বিরচিত বিশ্ব-প্রস্তরফলক বিরাট গ্রন্থের অধ্যয়ন অধিকতর উপযোগী। উপযুক্ত মস্তিষ্কের অভাবে সর্ব্বত্র যেমন হইয়া থাকে, চিন্তাক্ষেত্রেও গাস্তীর্য্যের পরিবর্ত্তে আপাততঃ প্রগল্‌ভতার উদয় হইলেও, ইহাই ভাবী বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রারম্ভকাল। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের এই অবনতির দিনে আর একবারের নিমিত্ত "ওরিয়েণ্ট" বা প্রাচ্য প্রতীচ্যের সাহায্যের নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছিল। বাইজণ্টীয়ার শিক্ষাকেন্দ্রে তখনও গ্রীনীয় দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং প্রাচীন সাহিত্যের পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে তুর্কী কর্ত্তৃক বাইজণ্টীয়াম্ আক্রান্ত হইলে বহু গ্রীক পণ্ডিত তাঁহাদের চির-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সহ ইতালী প্রভৃতি নানা দেশে প্রস্থান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরে প্লেটোর অনুকরণে এবং তাঁহার নামে একটি নব "আকাডেমী" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত দেশে তৎকালে অ্যারিষ্টটলের অনুকরণে একটি "লিসীয়ম্"ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্লেথো, (৪) (Gemistus Plethо), বেসারীয়ন্ (৬) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্লেটোর মতের প্রচার করিতে লাগিলেন। গেনাডিয়াস্ (Gennadius), থিওডোরাস্ (Theodorus Gaza) এবং

(১) জন্ বুরীডান্ (John Buridan) মৃত্যু—১৩৫৮ খৃঃ অঃ। ইনি "ওক্যামিজম্"এর এক জন প্রধান নেতা ছিলেন।

(২) আনুমানিক ১৪২৫-১৪৯৫ খৃঃ অঃ। ইনি ওক্যামিটামিনিজম্ মতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

(৩) সীস্টার্সিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত।

(৪) রেমণ্ড লালান্ বা লালী, খৃঃ অঃ ১২৩৫-১৩১৫। ইনি মেজর্কা দ্বীপের অধিবাসী এবং প্রেততত্ত্বের (Theosophy) উন্নতিসাধক বলিয়া পরিচিত। ইনি ১০০ গ্রন্থের রচয়িতা।

(৫) ইহার প্রকৃত নাম Georgius Gemistos (খৃঃ অঃ ১৩৩৫-১৪৫০)। ইনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক ফ্লোরেন্সের ধর্ম্মসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(৬) কার্ডিন্যাল্ বেসারীয়ন্ (খৃঃ অঃ ১৪০৩-১৪২৬)। ইনি প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের মতের সমন্বয়-স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

জর্জ্জীয়াস্ (Georgius) প্রভৃতি অ্যাকাডেমীর বিরুদ্ধে অ্যারিষ্টটলের পরিচয় দিতেছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ লইয়া তুমুল প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। ক্রমান্বয়ে "লিসীয়াম্" হইতে অ্যারিষ্টটলের সংস্কারবর্জ্জিত খাঁটী তর্জ্জমা বাহির হইল। ইহাতে এবার সাম্প্রদায়িক মতের গন্ধ পর্য্যন্ত রহিল না। প্যাডুয়ার লিসীয়ামের অধ্যাপকদিগের মধ্যে পাম্পোনেটীয়াসের (Pomponatius) নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি এক জন প্রকৃত শক্তিশালী লেখক ছিলেন এবং আত্মার অমরত্বে, খ্রীষ্টিক বা অলৌকিক ব্যাপারে এবং অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করিতেন না। ইহার মত অ্যারিষ্টটলের উদার মত (Liberal peripateticism) বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দক্ষিণ-ইতালীতে যে সময়ে প্লেটো, আরিষ্টটল্, পারমিনাইডীস্, এম্পিডক্লীস্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক্ মনীষীদিগের মতের আলোচনা হইতেছিল, সেই সময়েই আল্‌পস্ পর্ব্বতের উত্তরস্থিত প্রদেশে ফরাসী পণ্ডিতগণ নীতিশাস্ত্রের (Ethics) এবং নাস্তিকতার (Positivisim) পরিচয় দিতেছিলেন। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর কথা। এই সময়েই য়ুরোপখণ্ডে ধর্ম্মসংস্কারের (Religious Reforms) বহ্নি প্রবলতর হইয়া দেখা দেয়।

উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্ররূপ দুরূহ এবং জটিলশাস্ত্রের একটা মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে দৃশ্যতঃ এই শাস্ত্রের অন্তর্দ্ধান হইলেও ইহার চিন্তা-প্রণালী দার্শনিক সাহিত্যের অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। মহামতি হেগেলের মতে ইহার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। মোটের উপর খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্ররূপ মহামহীরুহ গ্রীক্ চিন্তাতে অঙ্কুরিত হইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল হইতে ইহা জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছিল। বিরুদ্ধ কিংবা অনুকূল হইলেও, প্লেটো কিংবা অ্যারিষ্টটল হইতে যখনই ইহা বিচ্যুত হইয়াছে, তখনই ইহাতে নির্জ্জীবতা আসিয়াছে, নানাবিধ পরগাছার উৎপত্তি হইয়াছে। অতিবৃদ্ধির ফলে কিরূপে ইহার পতন হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিতে পাইলাম।

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

সন্ধ্যাতারা

১

সোনার তপন গুটায়ে কিরণ
ছুটিছে অস্তাচলে
শিহরি পবন কি দুখ ভাবিয়া
খসিয়া খসিয়া চলে।
সন্ধ্যা বিছায় আঁধার-আঁচল
সুদূর গগনতলে
বিহঙ্গম-কুল আকুলি-বিকুলি
কি ব্যথা কাহারে বলে!

২

শ্মশানে শৃগাল ডাকিছে ভয়াল
স্বাধীন মত্ত সুখে
একাকী পথিক বিপদ ভাবিয়া
ধাইছে ত্রস্ত বুকে!
কীচককুঞ্জ বিলাপি কাঁদিছে
বাতাসের গলা চাপি!
কি যেন নিরাশ দুখের কাহিনী
ছুটিছে জগত ব্যাপি'!

৩

সুদূরের ঐ আকাশের বুকে
চকিতে সন্ধ্যা-তারা—
কি বারতা ঐ বহিয়া এনেছে
কি হেম শান্তিধারা!
জগতের তরে কাঁদিছে হৃদয়
নয়নে করুণা ভাসে,
ব্যথার ব্যথী সে দরদী দোসর
জেগে আছে নীলাকাশে।

৪

দিনের আলোক নিভিলে জগৎ
উঠিবে আঁধারে মাতি',
তাই ব'লে কেহ করিও না ভয়
আঁধারে, জুটিবে সাথী!
আঁধারের বুকে আলোক রয়েছে
জানাইতে এই বাণী—
অগ্রদূতী সে গোধূলি-তারারে
পাঠালো স্বপ্ন-রাণী!

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান।

পশ্চিমের আত্মরক্ষা

গত ২৫শে জানুয়ারীর 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে একটা কথা প'ড়ে অবাক্ হয়ে গেলুম। Reforms নিয়ে এ দেশে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছে, তাতে না কি জর্ম্মাণরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দুজন জর্ম্মাণ দার্শনিক Oswald Spengler এবং Court Keyserling না কি এর ফলে হিন্দুধর্ম্মের মায়া ও অহিংসার সঙ্গে Kant এবং তাঁর পরবর্ত্তী জর্ম্মাণ দার্শনিকদের মত এক ক'রে এক নতুন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়তে চাচ্ছেন।

জর্ম্মাণ-দর্শনের সঙ্গে হিন্দু-দর্শন মেলানো যায় কি না, এবং এ একীকরণে মানুষের মনোজগতে একটি নূতন বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি হবে কি না, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু Spengler এবং Keyserlingএর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের হবু Reformsএর কি যোগাযোগ আছে, বুঝা গেল না। কেন না, Spengler এবং Keyserlingএর দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থই লেখা হয়েছিল গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের আগে, শুধু—ছাপা হয়েছে পরে।

'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে'র লেখক মহাশয়ের সে সব বইয়ের সঙ্গে যদি চাক্ষুষ পরিচয় থাকৃত, তা হ'লে তিনি এ রকম আজগুবী কথা বলতেন না যে, আমাদের Reformsএর গণ্ডগোলের ফলে জর্ম্মাণীতে নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে Reformsএর বালাই ছিল না। কে না জানে যে, ঐ যুদ্ধের ধাক্কাতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের Angle of vision বদ্‌লে গেছে। এই দুই জর্ম্মাণ দার্শনিকের নাম লেখক মহাশয় কার মুখে শুনেছেন, তা পরে বল্‌ব। জর্ম্মাণীর কথা ছেড়ে দিয়ে এখন ফ্রান্সের কথায় আসা যাক্। লেখক বলেছেন যে, Miss Mayoর বই য়ুরোপের মনকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেমন সজাগ ক'রে তুলেছে, তেমনই ঐ শ্রেণীর বই ফ্রান্সে বেরিয়েছে—যাতে ফ্রান্সের লোকের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, সে বইয়ের ইংরাজী নাম Defence of the West এবং তার লেখক হচ্ছেন Massis. Miss Mayoর বইয়ের সঙ্গে Massisএর বইয়ের এইটুকু মিল আছে যে, উভয় লেখকেরই নামের প্রথম অক্ষর হচ্ছে M, এ ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর কোনই মিল ত আমরা চর্ম্মচক্ষুতে দেখতে পাই নি। কারণ, উক্ত গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় আছে, তার প্রমাণ গত আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় আমি Massisর মতামত সম্বন্ধে "পূর্ব্ব-পশ্চিম" নামক একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখি এবং তার পর আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী উক্ত বিষয়ে 'সবুজপত্রে' একটি বিস্তৃত আলোচনা করেন। Defence of the West ইংরাজীতে অনূদিত হবার পূর্ব্বেই তার মতামত আমরা বাঙ্গালার সাহিত্য সমাজে প্রচার করি। সুতরাং যাঁরা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁরা Massisর তরবারির কথা আগেই শুনেছেন। এ বইয়ের আর যাই দোষ থাক্, এ বই Miss Mayoর মত ইতর বই নয়। কারণ, এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে Metaphysics। বুদ্ধ ও শঙ্করের দর্শন ঠিক, না Aristotle ও St. Thomasএর দর্শন ঠিক, এই নিয়েই Massis বিচার করেছেন। Massis হচ্ছেন মারমুখো রোমান ক্যাথলিক, সুতরাং তিনি অবশ্য St. Thomasএর মতাবলম্বী। কিন্তু শঙ্কর ঠিক St. Thomas ঠিক, তাতে miss Mayor কি যায় আসে!

Massisএর গ্রন্থ নিয়ে পূর্ব্বে যে আলোচনা করেছি, তার পুনরাবৃত্তি করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। বিশেষতঃ যে আলোচনার বিষয় যখন পরাবিদ্যা। প্রসিদ্ধ ইংরাজ নভেলিষ্ট Chesterton শুনছি এ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা লিখেছেন, "পশ্চিম এখন পূর্ব্বের দেহের উপর প্রভুত্ব করছে, এর পরে পূর্ব্ব পশ্চিমের আত্মার উপর প্রভুত্ব করবে।" আমার Massisএর ভয় ওতেই। Chesterton যে Massisএর বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন, তার কারণ, তিনিও পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি হচ্ছেন সাহিত্যিক হিসাবে Massisএর নিকট-কুটুম্ব।

Massisএর বইয়ের নাম "পশ্চিমের আত্মরক্ষা" আর আত্মরক্ষার মানে আত্মার রক্ষা। Massisএর বই প'ড়ে ফরাসী দেশের সাহিত্যিকের দল ভয় পান নি—হেসে উঠেছেন। তাঁদের মধ্যে এক জন বলেছেন, "মা ভৈঃ, য়ুরোপের আত্মাকে কেউ মারতে পারবে না, কারণ, য়ুরোপের আত্মা আর এখন নেই, ইতঃপূর্ব্বেই পলিটিক্স ও ইকনমিক্‌সের চাপে মারা গিয়েছে।"

আসলে Massis, জর্ম্মাণী ও রুসিয়াকেই আক্রমণ করেছেন শুধু এসিয়ার বেনামীতে। Spengler ও Keyserlingএর নাম Massis পাতায় পাতায় উল্লেখ করেছেন। ব্যাপার হচ্ছে, Massisএর আক্রমণ হচ্ছে Protestantismএর উপর Catholicismএর আক্রমণ। তিনি reformএর পক্ষে বিপক্ষে এক কথাও বলেন নি, কিন্তু তাঁর চোট্ reformationএর উপর। আর তাঁর মতে Kant থেকে Herbert Spencer তক্ সব নাস্তিকের দল protestantismএরই সন্তান। আর সেই সব মন-ঘোলানো মত, জর্ম্মাণরা না কি এখন বুদ্ধ ও শঙ্করের নামে বেনামী ক'রে চালাচ্ছে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। Statesmanএর সম্পাদাতা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের উপরে Massisএর অবজ্ঞা অগাধ। Massis তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার নাম অবজ্ঞা নয়, আশঙ্কা। লোকে বাহুল্য, মানুষ যাকে অবজ্ঞা করে, তাকে ভয় করে না। এ আশঙ্কার কারণ, ফ্রান্সের এক জন শীর্ষস্থানীয় লেখক Paul Valeryর কথায় বিবৃত করছি। Valery বলেছেন যে, "ঝড় থেমে গিয়েছে, কিন্তু য়ুরোপের মন নিশ্চিন্ত হয় নি। তার মন কখন্ আবার ঝড় আসে, এই ভয়ে থেকে থেকেই চম্‌কে উঠে।" এবার ঝড় না কি পৃথিবীর ঈশানকোণ থেকে আসবে। Ossendowski নামক জনৈক পোলিস বৈজ্ঞানিক য়ুরোপকে এসিয়া নামক জুজুর ভয় দেখিয়েছেন। Ossendowskiকে তাঁর পলিটিক্যাল মতামতের জন্য রুসিয়ার Czar জুলুম পোরেন। Czarএর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে তিনি কিছু প্রতিষ্ঠিত রুস-গভর্ণমেণ্টের জনৈক মন্ত্রী হন। তার পর এল Leninএর শাসন। রুসিয়ার এই নূতন শাসক তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তিনি "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই নীতির অনুসরণ করেন। পদব্রজে রুসিয়া থেকে মঙ্গোলিয়া যান, সেখান থেকে চীনদেশে এবং চীন থেকে জাহাজে চ'ড়ে আমেরিকায় যান। তাঁর এই অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তিনি "Beasts, Men and Gods in Asia" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কথা এতই অদ্ভুত যে, রূপকথা রূপকথার তুলনায় সত্য কথা ব'লে মনে হয়। এই বইএ তিনি য়ুরোপকে এসিয়ার ভয় দেখিয়েছেন যে, চীন-তাতার তার য়ুরোপের ঘাড়ে চ'ড়ে বস্‌বে, যেমন পুরাকালে জেঙ্গিস খাঁর দলবল আর একবার করেছিল এবং য়ুরোপের অনেক শিক্ষিত লোক তাঁর কথা সত্য ব'লে মেনে নিয়েছেন। ১৯২৪ সালে Ossendowski যখন ফ্রান্সে উপস্থিত হন, তখন ফরাসী সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এক দিন Frederic Lefevre নামক ফ্রান্সের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক আর চার জন সাহিত্যিককে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সে দিন এঁদের ভিতর যে কথাবার্ত্তা হয়, তা Lefevre নিয়ে ছাপিয়েছেন। তার কতক অংশ নীচে অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি, তা থেকেই দেখতে পাবেন—রবীন্দ্র সাহিত্য, ফরাসী-সাহিত্যিকের মন বহুকাল থেকে উত্তেজিত করছে। Fredric Lefevre বর্ত্তমান ফরাসী-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে এক জন অগ্রগণ্য লেখক, তিনি অবশ্য কোনরূপ জুজুর ভয় করেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁর সহচরদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ এঁদের কথোপকথনের মর্ম্ম ঠিক বোঝা যাবে না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন Rene Guenon। ইনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড বই লিখেছেন—যাতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞানের ধর্ম্ম হচ্ছে হিন্দুধর্ম্ম, বাদবাকী সব অজ্ঞানের ধর্ম্ম। Lefevreএর অন্যতম সঙ্গী হয়েছিলেন Rene Granssel। ইনি "এসিয়ার ইতিহাস" নামক একখানি বিপুল এবং অতি চমৎকার ইতিহাস লিখেছেন। আর ছিলেন Jacques Maritain। এই শেষোক্ত লেখক হচ্ছেন Massisএর জুড়ীদার। উভয়েই রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীর যত প্রকার অ-ক্যাথলিক দার্শনিক মতবাদ আছে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। এক কথায় এঁরা য়ুরোপের নানা জাতীয় দার্শনিকদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই নব-ক্যাথলিক সাহিত্যিকদের নিকটই একটি হেঁয়ালী। এঁরা রবীন্দ্র-মতকে ডরান, কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতামতের প্রভাব যে য়ুরোপের মনকে পেয়ে বস্‌ছে, সে কথা এঁরা অস্বীকার করেন না। এখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এঁদের কথোপকথন শুনলেই সকলেই বুঝতে পারবেন যে, Defence of the Westএর লেখক তাঁর স্বজাতিকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য তাঁর সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। Miss Mayoর Mother Indiaর মত গ্রন্থকে এঁরা সকলেই এক-বাক্যে যে অস্পৃশ্য বলবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন এঁদের কথোপকথন হতে আন্দাজ—অনুবাদ নিম্নে বিবৃত করছি।

Lefevre—আপনার কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় আছে? তিনি কি য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে মারাত্মক বিদ্রোহের প্রতিবাদ করেন নি?

তাঁর বাণীর—ফরাসী ভাষায় Nationalism নামক যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখতে পাই যে, তিনি বলেছেন যে,

"পূর্ব্বের জন্য পশ্চিমের সভ্যতার প্রয়োজন আছে। পশ্চিম সত্যের এক অংশের সাক্ষাৎ পেয়েছে, পূর্ব্ব আর এক অংশের। সেই কারণেই যদিচ পশ্চিমের সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে ঝড়ের মত এসে পড়েছে, তবুও তা আমাদের দেশে এমন দু চারটি জীবনের বীজ ছড়িয়ে যাবে যার আর মৃত্যু নেই এবং যখন আমরা ভারতবাসীরা য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যে অংশ চিরন্তন, সে অংশ আত্মসাৎ করতে সমর্থ হব, তখনই পূর্ব্ব-পশ্চিমের সভ্যতার সমন্বয় হবে।

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে পরিপুষ্ট। তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আমি পূর্ব্ব-পশ্চিমের সত্যকার মিলনে আস্থাবান্। মানবজাতির পক্ষে যা যথার্থ গৌরবের সামগ্রী, তাতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। পৃথিবীর কোন জাতিই অপর সকল জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলগা হয়ে নিজের চরম উন্নতিসাধন করতে পারে না।' এই জন্যই তিনি গান্ধীর চেলাদের ভয় করেন—যদিচ স্বয়ং গান্ধীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ অনুরাগ আছে।

Ossendowski—লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ঠাকুর এসিয়ার লোক। তাঁর কালো চোখের ভিতর দিয়ে তাঁর মনের কথা পড়া যায় না। আমি যখনই তাঁর চোখের দিকে তাকাই, তখনই মনে হয়, তাঁর চোখের পর্দ্দা তুলে ফেলা আবশ্যক।

René-Guenon—রবীন্দ্রনাথ এসিয়ার লোক হলেও মনে য়ুরোপীয় হয়ে গিয়েছেন।

Ossendowski—ভুলেও তা মনে করো না।

* * * * *

Maritain—নিজের বল দিয়ে অপরের বল পরাভূত করাই যথেষ্ট নয়, আত্মা দিয়ে আত্মাকে পরাভূত করতে হবে।

Rene-Guenon—তুমি বিগ্রহের কথা কেন বলছ? উঃ, এসিয়ার সঙ্গে য়ুরোপের আত্মার সন্ধি করতে হবে।

Maritain—সত্যের সঙ্গে অসত্যের কখনও সন্ধি হয় না।

Guenon—আমারও তাই মত। যে সত্যের সন্ধান Aristotle পেয়েছিলেন এবং যার উপর রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, এসিয়াও আজ সেই সত্য আমাদের কাছে ধ'রে দিচ্ছে। এ সত্যের ধারণা এসিয়াতে কখনও লুপ্ত হয়নি।

Maritain—আমার তা বিশ্বাস নয়। রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রস্থান, হিন্দুধর্ম্মের প্রস্থান—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর ক্যাথলিক মন নিয়েই য়ুরোপ বাঁচতে পারে—হিন্দু মন নিয়ে নয়।

* * * * *

Lefevre—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বইয়ের য়ুরোপের নানা ভাষায় অনুবাদ কেউ বন্ধ করতে পারবে না এবং পৃথিবীময় শিক্ষিত সম্প্রদায় তা পড়বে—ফলে পূর্ব্বের আধ্যাত্মিকতা পশ্চিমের মনে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে বাধ্য।

René-Granssel—তুমি যা বলছ, তা ঠিক, আর ইংরাজ জাতি ইতঃপূর্ব্বেই তা বুঝেছে।

উপরি-উক্ত কথোপকথন শুনে সকলেই বুঝতে পারছেন যে, ফ্রান্সের সাহিত্য-সমাজ এখন Simon কমিশন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যা নিয়ে তারা মাথা বকাচ্ছে, তা পলিটিক্সের বহির্ভূত বিষয়। যে চারটি ফরাসী সাহিত্যিকের জল্পনা-কল্পনা শোনা গেল, তাঁরা এক জনও পলিটিসিয়ান্ নন এবং তাঁরা প্রায় সকলেই পলিটিক্সের দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। এর কারণ—এঁরা সকলেই গত যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঘরে ফিরেছেন। এ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মতে পলিটিসিয়ানরাই এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধের জন্য দায়ী। এরা নিজেও পলিটিসিয়ান নন এবং পলিটিসিয়ানদেরও কোনরূপ খাতির করেন না। বরং ফ্রান্সের পলিটিসিয়ানরাই এদের ভয়ে ভীত। কারণ, এঁদের প্রত্যেকেই এক এক জন যোদ্ধা। এঁরা তরবারি হস্তে যুদ্ধ করতেও যেমন পটু, লেখনী হস্তে যুদ্ধ করতেও তদ্রূপ পটু এবং উৎসুক। যুদ্ধ কি ব্যাপার, সে বিষয়ে এঁদের প্রত্যেকেরই বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং পূর্ব্ব-পশ্চিমের ভাবী যুদ্ধের কথা শুনে এঁদের মন নৃত্য ক'রে ওঠে না।

এঁদের ভাবনা মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে। উপরে যে চার জনের কথা শোনা গেল, তাঁদের মধ্যে তিন জনের বিশ্বাস, পূর্ব্ব-পশ্চিমের সভ্যতার পরস্পর আদান-প্রদানের উপরই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি নির্ভর করছে। আর পশ্চিমের আত্মরক্ষা নামক গ্রন্থের লেখকের সমধর্ম্মীর সাহিত্যিকদের মতে য়ুরোপ তার স্বধর্ম্ম রক্ষা করেই আত্মরক্ষা করতে পারবে। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম তাঁর কাছে ভয়াবহ, কেন না, তা য়ুরোপের পক্ষে পরধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথকে এ শ্রেণীর লোক ভয়াবহ মনে করেন, কেন না, তিনি য়ুরোপে পরধর্ম্ম প্রচার করছেন। উপরন্তু তাঁদের মনে এ সন্দেহের উদয় হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বের আত্মার সঙ্গে পশ্চিমের আত্মার মিলন চাইতে পারেন, কি তা পূর্ব্বে তিনি চান—এসিয়ার দেহের সঙ্গে য়ুরোপের দেহের বিচ্ছেদ। এই হচ্ছে, Massisএর রবীন্দ্র-ভীতির মূল কারণ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

মুষ্টিযোগ



১

শ্যামল ছেলেটির তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ মেধাশক্তি দেখিয়া যখন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "এ ছেলে হাইকোর্টের জজ না হয়ে যায় না", তখন অলক্ষ্যে বিধাতা-পুরুষ বোধ হয় মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। কারণ, ১৬ বৎসরে পড়িতেই শ্যামলকে ক্রমশঃ 'কাব্যি' রোগে ধরিল। লাঞ্ছনা, পীড়ন, কোন ঔষধ প্রয়োগেই তাহার এ রোগ সারিল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির শাসন, অনুনয় তাহাকে আর স্কুল-মুখো করিতে পারিল না। সে মাথায় কবিজনোচিত বড় বড় রুক্ষ চুল রাখিল, অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া সকলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গভীর ঔদার্য্যের সঙ্গে উপেক্ষা করিয়া চলিল এবং ভাল ভাল গ্রন্থকারের অমৃত-তুল্য নূতন নূতন বই "চাতকিনী" "জীবন-মরু" "ছন্নছাড়া" "পরাণ-পুঁ" প্রভৃতি আনিয়া তাহার ঘরটি পরিপূর্ণ করিল। সে বাণী-মন্দিরে আর কাহারও প্রবেশাধিকার রহিল না, কারণ, সকাল-সন্ধ্যা সব সময়েই দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। শ্যামলের বাবা তারক বাবু কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। অনেক মাথা ঘামাইয়াও ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার পুত্রকে কেমন করিয়া এমন কঠিন রোগে ধরিল। যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহার বংশে এ রোগ ত কাহারও ছিল না। পূর্ব্ব-পুরুষরা—সকলেই লক্ষ্মীর পিছনে তাড়া করিয়া আসিয়াছেন। তিনি নিজেও এই বৃদ্ধবয়সে এখনও ছুটি-ছুটি করিতেছেন, আর তাঁহার পুত্র কি না দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মিল! থাক্, কি আর করিবেন; হেড্ মিনিংটা না কি অঙ্ক, তাই তিনি শ্যামলকে তাহার পথেই চলিতে দিলেন ও মৃতা পত্নীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্যান্য পুত্রদের বারণ করিয়া দিলেন, যেন শ্যামলকে কেহ পীড়ন না করে। শ্যামল নিশ্চিন্ত হইল। স্কুল হইতে তাহার নাম কাটান হইয়াছে, মাষ্টার-টীও বিদায় হইয়াছে, তিনি আর দুই বেলা আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবেন না, এইবার সে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া কবিতা-দেবীর আরাধনা করিতে লাগিল। ছোট বড় সকল মাসিক পত্রের সে গ্রাহক হইল এবং গ্রাহক নম্বর দিয়া তাহার রচনা পাঠাইতে লাগিল। গ্রাহক নম্বর দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্পাদক গ্রাহক জানিয়া তাহার কবিতা ফেরত না দিয়া নিশ্চয়ই ছাপিবেন। কিন্তু বৃদ্ধ সম্পাদকদের প্রাণ না কি নেহাৎ ঝামা হইয়া গিয়াছে, তাই তাঁহারা একটুও রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া শ্যামলের সাধের কবিতাগুলিকে ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে ফেলিয়া দিলেন। মাসের প্রথমেই একে একে সকল মাসিক-পত্রিকা আসিল। শ্যামল কম্পিত আগ্রহে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া গেল; কিন্তু "হা হতোঽস্মি",—কোন কাগজেই তাহার কবিতা ছাপা হয় নাই। উপরন্তু "ভারতবাসী" কাগজ, যাহার সে প্রধান ভক্ত বলিলেই হয়, সেই কাগজের বৃদ্ধ সম্পাদক কি না "সাহিত্যে আবর্জ্জনা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "অকালপক্ক ডেঁপো ছেলেদের কবিতার জ্বালায়".....

শ্যামল আর পড়িতে পারিল না, তাহার কান্না আসিল, সে কাগজখানা পাকাইয়া পায়ের সরু গলিটার আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং মনে মনে বৃদ্ধ সম্পাদক ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নামের সঙ্গে এমন সব বিশেষণ জুড়িয়া দিল, যাহা শুনিলেই কানে আঙ্গুল দিতে হয়। বাঁচিয়া থাক্ "পতাকা" কাগজের সম্পাদক, তাঁহার "পতাকা" পত-পত শব্দে উড্ডীয়মান হউক; তিনি লিখিয়াছেন, "মহাশয়, স্থানাভাবে আপনার কবিতা এ মাসে ছাপিতে পারিলাম না, পরের মাসে নিশ্চয় ছাপিব জানিবেন। আপনি আপনার বন্ধুদিগকে গ্রাহক করিয়া দিবেন এবং প্রতিমাসে আপনার রচনা পাঠাইবেন। পতাকা আপনাদেরই গৌরব বহন করে। আপনার ন্যায় তরুণ লেখকদের চষিবার জন্য বিস্তীর্ণ এই উর্ব্বরা-ভূমি, ইহার বার্ষিক খাজনাও খুব কম, মাত্র ১৷৷০ টাকা!" শ্যামল তখনই তাহার বন্ধুদের নাম-ঠিকানা দিয়া নিজের খরচে 'মণি-অর্ডার' করিল এবং বন্ধুদের প্রত্যেককে বলিয়া আসিল, "আমি 'পতাকা'

কাগজে লেখা দিই ব'লে লেখক হিসাবে যেখানা পাব, সেখানা তোমার নামে পাঠাতে বলেছি, এলে প'ড়ে দেখো, এমন ভাল কাগজ আর নাই!" প্রতি মাসেই শ্যামলের কবিতা প্রকাশিত হয় এবং সে কাহাকেও দেখাইতে বাকী রাখে নাই, এমন কি, তাহাদের বাড়ীর বুড়ী-ঝি মঙ্গলা পর্য্যন্ত সে দিন "পুষি" কবিতাটা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "দাদাবাবু, আমার বেড়ালটা যত দিন বেঁচে ছিল, সে-ও অমনি ম্যাও ম্যাও করত, কে বলবে জানোয়ার, বেশ পষ্ট 'মা-মা' ব'লে ডাকছে। লোকের বাড়ী মাছ চুরী ক'রে খেয়েছে, কিন্তু এক দিনের তরেও আমার হেঁসেলে ঢোকেনি!" শ্যামল তখনই মঙ্গলাকে ২৲ টাকা বক্‌শীস করিল! শ্যামলের সেজ বউদি মালতী সে দিন দুপুর-বেলা তাঁহাদের মেয়ে-মজলিসে যখন 'পতাকায়' প্রকাশিত শ্যামলের "তৃষা" কবিতাটা পড়িতে পড়িতে হাসিয়া অস্থির, তখন চটাপট চটর আওয়াজ করিয়া শ্যামল আসিল। বউদির চোখ-দুটি একবার সকলের প্রতি ঘুরিয়া গেল! তিনি অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাঁা ঠাকুরপো, তুমি এমন সুন্দর কবিতা লেখ ভাই, আর আমাদের শোনাও না; হলুমই বা মুখ্যু, তাই ব'লে যে কিছুই বুঝতে পারব না, এমন ত নয়!"

"হাঁা,···হাঁা,···কি যে বল বউদি, আমার আবার লেখা··· তবে 'ভারতবাসী' কাগজ আমার লেখা চেয়েছে···তা আমার সময় কোথায়? 'তৃষা' কবিতাটা কেমন হয়েছে?"

"চমৎকার হয়েছে, শোন না বড়দি:—

'চাতকের সম আমি চেয়ে আছি তব পানে
কর দয়া কর মোরে এক বিন্দু সুধা-দানে,
নহে প্রাণ ফে.টে যাবে পাবে কি গো সুখ
পাথরের সম তব কঠিন কি বুক'?"

যতগুলি শ্রোতা ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ মুখে কাপড় দিল, কেহ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল, কেহ বা হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া পলাইল!

সেজ বউদি বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলেন, "বুক একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে? সেটা ভাল হবে না ভাই, এই বেলা তোমার দাদাদের বলি···এই অগ্রহায়ণ মাসেই···"

শ্যামল বাধা দিয়া লজ্জিতভাবে বলিল, "ও রকম ঠাট্টা করলে আর তোমায় কবিতা পড়াব না, তোমার কোন কথা শুনব না! হাঁা, তোমার পেটার্ণ আর উল্ আমি কিনে এনেছি বউদি, তোমায় আর ওর দাম দিতে হবে না!"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই শ্যামল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, তাহার বউদি ও আর আর সকলে বেদম হাসিতে লাগিল।

২

শ্যামলদের পাশের বাড়ীটা, যেটা এত দিন খালি পড়িয়া ছিল, সম্প্রতি এক ভদ্রলোক ২ মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। থাকিবার মধ্যে ভদ্রলোক নিজে, বৃদ্ধা মাতা, বড় মেয়ে রাণী, বয়স ২৬।২৭, ছোট মেয়ে মিনী, বয়স ১১। বাড়ীটার ছেলে খারাপ হইয়াছে, সেই কথা ভদ্রলোক তারক বাবুকে বলিতে আসিলে শ্যামল সেখানে উপস্থিত হইল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা, আমি প্লাম্বারকে ডেকে এনে ওটা আজই সারিয়ে দেব।"

"তাই দিস বাবা। ও সব ছাই-পাঁশ লেখা ছেড়ে বরং বাড়ী-ঘরগুলো দেখিস, ভাড়াগুলো আদায় করিস, তা হলেই যে বেঁচে যাই, বাবা!"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। শ্যামল দুপুরবেলা মিস্ত্রীর সন্ধানে গিয়া কড়া নাড়িলে রাণী আসিয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। শ্যামল বলিল, "দিদি, এটা আমাদেরই বাড়ী···এই চিঠি এসেছে ড্রেণ সারতে···আর কোথায় কি করতে হবে, বলুন, আপনাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়।"

শ্যামলের মুখে "দিদি" সম্বোধন শুনিয়া আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও রাণী লজ্জা করিল না, সহজভাবেই বলিল, "ছাদটাও সারিয়ে দাও ভাই, কাল জল পড়েছে···বারান্দার দুটা কোণ ভাঙ্গা···খোকাটা কখন্ প'ড়ে যায়···ওপরে এস, সব দেখিয়ে দিই!" শ্যামল উপরে আসিয়া দেখিল, মিনী একখানা বই পড়িতেছে। পদশব্দে মিনী ফিরিয়া চাহিয়া শ্যামলের সারা দেহে কি যেন কিসের একটা প্রবাহ খেলিয়া গেল। শ্যামল বলিল, "এ বুঝি আপনার ছোট বোন্?"

"হাঁ, ওর নাম মিনী···ওর বিয়ের জন্যেই ত বাড়ীভাড়া নেওয়া!"

শ্যামল সারা বাড়ী ঘুরিয়া দেখিয়া পিতাকে আসিয়া কহিল, "বাড়ীটা একবারে খারাপ হয়ে গেছে বাবা, ছাদ সারাতে হবে, দেয়ালেও ফাট ধরেছে—"

তারক বাবু বলিলেন, "যা সারাতে হয়, মিস্ত্রীকে ডেকে করিয়ে নাও, বাবা।" শ্যামল মহা উৎসাহে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া মিস্ত্রী খাটাইতে লাগিল। আস্ত দেয়াল

ভঙ্গা হইয়া সারানো হইল, ছোট-খাট কায লাগিয়াই রহিল, এক মাসেও বাড়ী মেরামত শেষ হইল না। শ্যামল খুব মজুরাণ জমাইয়া ফেলিয়াছে। সে দিন ঠাকুরমার রান্না চড়ে না, কাঠ নাই, ঠিকা ঝি কামাই করিয়াছে; শ্যামল নিজে কোথা হইতে কাঠ বহিয়া আনিল। কোন কিছু কাযের অভাব করিলেই শ্যামল হাসিমুখে বলিত, "আমি এখনই দিচ্ছি"; কিন্তু নিজের বাড়ীর কোন কায এ পর্য্যন্ত সে করে নাই! ঠাকুরমা বলিলেন, "বাড়ীওলাদের ছেলেটি বড় ভাল, কেমন মিশুক।" রাণী মুখ টিপিয়া হাসিল। মিনী তিনদিন শ্যামলের নিকট হইতে কেক, 'মৌচাক', ছবির বই প্রভৃতি উপহার পাইতে লাগিল। রাণী কিছু বলিলে কেবল হাসিয়া বলিত, "আমার দিদি, অনেক আছে কি না।" কিন্তু মিনী ধীরে ধীরে শ্যামলের মনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিল। সে কত কবিতা লিখিয়া তাহার খাতা ভরাইল এবং কত রকম অদ্ভুত কল্পনা যে তাহার মাথায় আসিত, তাহা বলা যায় না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিত, যেন মিনীদের বাড়ী আগুন লাগিয়াছে, সকলে চীৎকার করিতেছে, "জল জল", "গেল গেল"; সে ছাদ টপ্‌কাইয়া আগুনের ভিতর হইতে মিনীকে বুকে করিয়া বাহিরে আসিল। মিনীর মা বলিলেন, "শ্যামল, তুমি জীবন বিপন্ন ক'রে ওকে বাঁচিয়েছ, আত্মত্যাগের পুরস্কার আর কি দিব, মিনীকে তোমায় দিলাম।" শ্যামল বিপুল আবেগে মিনীকে বুকে চাপিয়া ধরিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, হায়, কোথায় মিনী, এ যে বালিস! মনটা নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল। সে দিন ছাদে মিনীকে একা পাইয়া শ্যামল তাহার কাছে গিয়া গদ্‌গদস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মিনী, তুমি আমায় ভালবাস?"

"ধেৎ, তুমি ভারী অসভ্য"—মিনী হাত ছাড়াইয়া পলাইল। শ্যামলের ভারী দুঃখ হইল, সে আর ৩।৪ দিন মিনীদের বাড়ী গেল না, লুকাইয়া ছাদ হইতে মিনীকে দেখিত, কিন্তু মিনী দেখিলেই পলাইয়া যাইত। সে দিন দুপুরবেলা মিনী ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়াছে, হঠাৎ একটা পাকানো কাগজ তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কেহই নাই!

তাহার দিদি চুল শুকাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মিনী?"

"দেখ না দিদি, আমায় কে কাগজ ছুড়ে মারলে;

নিশ্চয় ঐ বাড়ীওলাদের ছেলেটা—মুখপোড়া, বাঁদর, হতচ্ছাড়া ছেলে!"

তাহার দিদি হাসিয়া বলিল, "কাগজটা দেখি?" তাহাতে লেখা···

"কি দোষ করেছি আমি,
কথা কেন কও না তুমি?
মায়া কি হয় না?
একবার ফিরে চাও না।
তোমার জন্য কত ব্যথা,
প্রাণেতে রয়েছে গাঁথা।"

"আচ্ছা, তুই নীচে যা, আমি দেখছি।"

শ্যামলের খুড়ীমা যখন নীচে আসিয়া বলিলেন, "শ্যামল, তুই ওদের মেয়ের নামে কবিতা লিখে ওদের ছাদে ফেলেছিস্?···"

"আমি? কখ্খনো না···কালীর দিব্যি···তোমার পা ছুঁয়ে বলছি খুড়ীমা···কাগজটা হাওয়ায় উড়ে·····"

"তোমার দাদারা শুন্‌লে পিঠের চামড়া তুলবে, জান?"

"এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, দেখো, ছাদে আর আমি যাব না, ওদের বাড়ীমুখো হব না, আর ওর নামে কবিতা লিখব?···বয়ে গেছে···পেন্‌পেনানী···পাড়াকুঁদুলী··· হতচ্ছাড়ী·····"

"হাঁা, এ সব ভাল নয়।" খুড়ীমা চলিয়া গেলেন। শ্যামল তাহার ঘরে আসিয়া খিল দিল। লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে তাহার কান্না আসিল। উপন্যাসের কোন নায়িকাই ত এমন সব তীব্র ভাষা প্রয়োগ করে নাই, যাহা আজ মিনী করিয়াছে?··· তাহার এতখানি প্রেমের এমন করিয়া অপমান?···তাহাকে এমন নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান?···তার ওপর খুড়ীমার কাছে লাগানো?···শ্যামলের বক্ষ বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যায়! সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দিন সাতেক পরে পাশের বাড়ীটায় যখন এক দিন রসুন-চৌকী বাজিল, শ্যামলের কি জানি কেন, হঠাৎ মামার বাড়ীর জন্য ভয়ানক মন কেমন করিয়া উঠিল এবং সে একটা ছোট ব্যাগে খান-দুই জামা কাপড় লইয়া সেই দিনই বেলা ১২টার গাড়ীতে বারাসত গেল। ১৫ দিন কাটাইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, পাশের বাড়ীটা খালি, ছাদে কতকগুলি ভাঙ্গা গেলাস, খুরী, ছেঁড়া কলাপাতা পড়িয়া আছে। এ যেন তাহারই শ্রাদ্ধের শেষ চিহ্ন সে দেখিতেছে—কোন্ অসীম হইতে অশরীরী

অবস্থায়! শ্যামল চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে কি একখানা ভাল মাসিকপত্রে প্রকাশিত একটা গল্পে পড়িল, "বেথুন কলেজের গাড়ীর সঙ্গে ট্রামের সংঘর্ষ হইল, গাড়ী উল্টাইয়া গেল, বীর যুবক সুদর্শন মূর্চ্ছিতা কনকলতার দেহলতা বক্ষে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া মেডিক্যাল কলেজে গেল। কনকের জ্ঞান হইলে সে সুদর্শনের হাতটি লইয়া চুম্বন করিয়া কহিল, 'এই হস্ত আমায় আজ রক্ষা করিয়াছে, হে দেবতা আমার, এই বরহস্ত কি এমনই ভাবে আমায় চিরকাল রক্ষা করিবে?···বলুন, বলুন, স্তব্ধ থাকিবেন না!' যুবক সুদর্শন কনকের অধরে অধর রাখিয়া কহিল, 'কনক, আমি তোমার'!"

শ্যামল সেই দিনই সাইকেল লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, কতক্ষণে বেথুন কলেজের গাড়ীখানা তাহাদের গলি কাঁপাইয়া যাইবে। গাড়ীখানা আসিতেই সে তাহার পশ্চাতে সাইকেলে চলিল। গাড়ীখানা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। পিছনে একখানা ট্রাম আসিতেছে, শ্যামল ফুটপাত ঘেঁসিয়া সাইকেলে চলিয়াছে, "হে মা কালী, কোচম্যানটা যেন ট্রামের ঘণ্টা শুনতে না পায়, ঐ এল···আর হাত চারেক তফাৎ মাত্র···লাগ্ ধাক্কা···জয় মা কালী···শা···কোচম্যান!" ট্রামখানা চলিয়া গেল, গাড়ীখানা নির্ব্বিঘ্নে কলেজের ফটকের মধ্যে ঢুকিল, শ্যামল ক্ষুণ্ণমনে ঘরে ফিরিল। প্রতিদিনই শ্যামল গাড়ীখানার পিছনে যায়, কিন্তু এক দিনও কোন দুর্ঘটনা হইল না। মাঝে মাঝে গাড়ীখানা যখন থামিয়া মেয়ে তুলিয়া লইত, শ্যামল সাইকেল হইতে নামিয়া চাকায় "পম্প" লাগাইবার অভিনয় করিত, কখনও বা মুখ ফিরাইয়া এমন ভাবে হেলিয়া দাঁড়াইত, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে হাসাহাসি করে, কেহ বলে, "ছেলেটা কি ভয়ানক কালো আর বিশ্রী মোটা ভাই, কি রকম তাকিয়ে থাকে দেখেছিস; যেন গিলতে আসে, আর সুশীকে ওর ভারী পছন্দ হয়েছে।" "আমাকে নয়, তোমাকে, তুমি দরজার পাশে ব'স কি না" ইত্যাদি···। কথাগুলা ছিটকাইয়া শ্যামলের কানে আসে, সে ভাল করিয়া শুনিবার আশায় গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলেই সহিস মুখ খিচাইয়া বলে, "উধার রাস্তা নেহি হ্যায়?" মেয়েরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে, শ্যামল ঘাড় হেঁট করিয়া সাইকেল ছুটাইয়া দূরে অপেক্ষা করে ও সহিসটার চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ডের ব্যবস্থা করে। দিন কুড়ি এই রকম যাতায়াতের ফলে দাঁড়াইল এই, এক দিন কোচ-ম্যানটা বলিল, "এই তুম্ ভদ্দর আদমীকা লেড়কা হোকে রোজ গাড়ীকা পিছু ঘুম্‌তা, এ আচ্ছা নেহি হ্যায়; এক রোজ চাবুক খানে মাংতা?" অসভ্য মেয়েগুলি শ্যামলের পানে চাহিয়া বেদম হাসিল, রাস্তার লোকগুলি তাহার দিকে বুঝি ঐ চাহিয়া রহিয়াছে! শ্যামল বোঁ বোঁ শব্দে সাইকেল ছুটাইয়া পলাইল, আর তাহাকে কোন দিন "বাসে"র পিছনে ধাওয়া করিতে দেখা যায় নাই।

এই ঘটনার পর হইতে হঠাৎ কি জানি কেন, নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি শ্যামলের প্রগাঢ় ভক্তি বাড়িয়া উঠিল। রবিবার হইলেই সে সাধারণ ব্রাহ্মমন্দিরে সর্ব্বাগ্রে গিয়া প্রথম বেঞ্চে স্থান অধিকার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। এক দিন যখন সে এমনই চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে, মহিলাদের আসন হইতে একটা ঠুন্ ঠুন আওয়াজ হইল! সে চোখ চাহিয়া দেখে, কতকগুলি মেয়ে তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে! "ও হরি, এ সেই গাড়ীর মেয়েগুলো···এরা এখানেও মরতে এসেছে! শ্যামল আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, সকলকে বিদ্ধি করিয়া এক রকম ছুটিয়া পলাইল!

৩

শ্যামল পুরী আসিয়াছে। সঙ্গে এক বন্ধু। তাহার না "হার্ট" খারাপ হইয়াছে, ডাক্তার সমুদ্রের হাওয়া খাইতে য়াছে। পিতাকে এই বলিয়া বুঝাইয়া আসিলেও আ কিন্তু তাহার এক বন্ধু তাহাকে উপদেশ দিয়াছে যে, "স প্রেম পুরীতে সমুদ্রের ধারে যেমন হয়, এমন আর কো হয় না। প্রেমে পড়িতে হইলে এক দিন সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধা ঘুরিয়া বেড়াইলেই হইল। সেখানে না কি ঝাঁকে ঝাঁ মেয়েরা শুধু প্রেমে পড়িবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্যা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় সাজ-গোছ করিয়া সমুদ্রের ধারে যেখানে মেয়েরা বসিয়া থাকে, তাহারই অনতিদূরে বসিয়া দিন বাঁশী বাজাইতে থাকে, কোন দিন গলার মোটা যতদূর সম্ভব মিহি করিয়া গাহিতে থাকে—

"আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি
আমায় চেন কি?"

কোন দিন বা চক্‌চকে একখানা বই হাতে করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া রিয়া থাকে। এক এক দিন খাতাখানা কোলে ফেলিয়া পেন্সিলটা দাঁতে কামড়াইয়া আকাশ পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার মানসী-প্রতিমা আজ পর্য্যন্ত ধরিয়া ধরা দিল না। এক দিন সন্ধ্যায় যখন সে এমনই অবস্থায় বসিয়া আছে, হঠাৎ পিছনদিক্ হইতে এক-খানি আসমানী রঙ্গের শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্ত তাহার মস্তক স্পর্শ করিতেই সে চমকিয়া দেখে, একটি ষোড়শী এক বৃদ্ধের সঙ্গে যাইতেছে এবং পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া এক একবার দেখি-তেছে। বন্ধু শ্যামলের গা টিপিল। শ্যামল উঠিয়া অনুসরণ করিল। স্বর্ণদ্বারের কাছে একটি সাদা বাড়ীতে তাহারা প্রবেশ করিলে শ্যামল ফিরিয়া আসিল। সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে সকাল-সন্ধ্যায় সেই বাড়ীটার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়া-ইতে লাগিল। মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলে তাহার চার পাঁচ হাত পশ্চাতে থাকিয়া ভারতচন্দ্র ও বৈষ্ণব কবিদের আদিরসাত্মক কবিতাগুলি আওড়াইয়া যায়। মেয়ে-টির মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠে; কিন্তু কিছুই বলে না। বৃদ্ধ লোকটিও গম্ভীরভাবে চলিতে থাকে। মেয়েটির নাম "শান্তি", কিন্তু তাহার স্বভাবের সঙ্গে নামটা মোটেই খাপ খায় নাই; সে না,ছেলেবেলা হইতে বেটাছেলের মত সে ডাম্বেল ভাঁজে, ঘোড়ায় ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। একবার পল্লীগ্রামে বাড়ী গিয়া সে গাছে চড়া ও সন্তরণবিদ্যাও না কি করিয়া আসিয়াছে। পুরুষ দেখিলেই ছুটিয়া পলাইবার অবস্থা তাহার আজিও হয় নাই। তাহার পরিপূর্ণ দেহ দেখিয়া শ্যামল মুগ্ধ হইল এবং তাহার সম্মুখ দিয়া তাহাকে একাকী কুণ্ঠাহীন হইয়া চলাফেরা করিতে দেখিয়া তাহার ধারণা হইল, নিশ্চয় মেয়েটি তাহার প্রেমে পড়িয়াছে, নহিলে তাহার মত অমন ছট্‌ফট্ করিবে কেন? থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিবে কেন? বন্ধু শ্যামলকে বলিল, "দিন্দু, যা বলেছিলুম, মিলল ত? এইবার উঠে প'ড়ে লেগে যাও।"

যথাক্রমে সে দিন সন্ধ্যায় শ্যামল দেখিল, শান্তি একাকী বাহির হইল। শ্যামল বন্ধুকে পশ্চাতে রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিল। আধ ঘণ্টাকাল, যত ভাল ভাল প্রেমোদ্দীপক গান তাহার জানা ছিল, সে গাহিয়া গাহিয়া তাহার কর্ণকুহর শীতল করিল। কিন্তু ঐ অকৃতজ্ঞ মেয়েটা দুই একবার পিছনে তাকানো ছাড়া একটা কথাও বলিল না। "ঐ ত ওদের বাড়ীর কাছে এসেছি, এখনই ত বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িবে, এমন সুযোগ আর ত পাওয়া যাইবে না!" সাহস সঞ্চয় করিয়া শ্যামল আগাইয়া আসিয়া শান্তির একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "সুন্দরি, আমি তোমায় ভাল-বাসি"—

শান্তি হাতটা ঘুরাইয়া শ্যামলের হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া বলিল, "সে ত আমার সৌভাগ্য; বাবার কাছে আসুন"—

বৃদ্ধের নিকট শ্যামলকে আনিয়া শান্তি বলিল, "বাবা, ইনি আমায় আজ একা দেখে আমার হাত ধ'রে ফেলে বল্লেন, আমায় ভালবাসেন, প্রতিদানে·····" চটাপট্ এলোপাথাড়ি প্রহারের শব্দে এক জন যুবক বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে শান্তি?"···

"প্রেমিক বরকে একটু শিক্ষা দিচ্ছি, ধীরু-দা!"

"ছাড় ছাড়, ম'রে যাবে; এ কি?···শ্যামল?···তুমি?"

শান্তি বলিল, "যাও, যদি লজ্জা থাকে, আর কখনও ভদ্র-লোকের মেয়ের গায়ে হাত দিও না।"

শ্যামল মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহারই সহপাঠী চিরশত্রু ধীরেন! শ্যামলের পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবীটা সরিয়া দাঁড়াইল। সে টলিতে টলিতে কোনমতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন আর কেহ তাহাকে পুরীতে দেখিতে পায় নাই।

৪

বছর পাঁচেক পরের কথা বলিতেছি। শ্যামল এখন তাহার পিতার আফিস চালায়! সে বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার একটি পুত্রও হইয়াছে। বিবাহের সময় নববধূ মলি-নাকে দেখিয়া যখন সকলে বলিল, "পছন্দ ক'রে এ কি বউ আন্‌লি রে, শ্যামল?···অমন সুন্দরী মেয়ের সব সম্বন্ধ এল·····"

"ঘাঁটা মারি তোমাদের সুন্দরী মেয়ের মুখে।"·····

শ্যামলের এই কথার উপর আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না; কিন্তু সকলে বুঝিতে পারিল না,কেন শ্যামল সহরের ধনীর শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা মনোনীত না করিয়া কোন্ অজ পাড়া-গাঁ হইতে এক গরীবের কালো মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিল!

সে দিন সন্ধ্যায় শ্যামল আফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, তাহার খোকা মাটীতে খেলা করিতেছে ও পত্নী মলিনা চেয়ারে

বসিয়া বই পড়িতেছে। খোকাকে কোলে তুলিয়া শ্যামল বলিল, "কি বই পড়া হচ্ছে ?"

মলিনা হাসিয়া বলিল, "রবিবাবুর চয়নিকা ; 'বধূ' কবিতাটা দেখ কি সুন্দর !"

শ্যামল ছোঁ মারিয়া বইখানা লইয়া জানালা গলাইয়া আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ও ছাই-পাঁ আর পড়তে পাবে না ; কবিতার জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে পাড়াগাঁয়ে গেলুম, সেখানেও কবিতা ? তোমরা কি আমায় বাঁচতে দেবে না ?"

মলিনা অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গার ঘাটের সুব্যবস্থা

কলিকাতা পোর্ট কমিশনারদের বিরাট আফিস আছে—পোর্ট ইন্‌সপেক্টর, জেটী-চাপরাসী, টোল-দরোয়ান, লাইসেন্স-ক্লার্ক, সর্দ্দার-কলেক্টর,—কোন আড়ম্বরেরই অভাব নাই ; অভাব কেবল স্নানার্থীর জীবনরক্ষার ব্যবস্থার। তেমনই পোর্ট পুলিস বলিয়াও সরকারের একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান আছে। সে বিভাগেও লোকের ঘটাও খুব—জল-পুলিস-বাহিনী, জল দারোগা, জলপুলিসবাহী নৌকা, সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মোটর-লঞ্চ পর্য্যন্ত কোন কিছু আড়ম্বরেরই অভাব পরিলক্ষিত হইবে না ; কিন্তু তাহা যে ট্যাক্স-প্রদানকারী স্নানার্থীর কোন উপকারে আসিয়াছে—কোন সংবাদপত্রে তাহার কোন সংবাদ প্রকাশ হইতে দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না।



চণ্ডীচরণ রায়

হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র বহুকাল পূর্ব্বে নিমতলা ঘাটে স্নান করিতে গিয়া চোরাখাদে ডুবিয়া মারা যান। তাহার পর নিমতলার এই চোরাখাদে নিমজ্জিত হইয়া অনেক স্নানার্থী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মিত্র মহাশয়ের পুত্র নিমতলা ঘাটের যে হানা খাদে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, স্নেহভাজন প্রিয়দর্শন চণ্ডীচরণ রায় বর্ষীয়ান্ ব্যক্তির শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের আনন্দে মাতিয়া অনেকগুলি বন্ধুর সহিত স্নান করিতে গিয়া সেই স্থানেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পোর্ট কমিশনারদের বিরাট ব্যবস্থা-নৈপুণ্যে এই সুদীর্ঘ ১৫ বৎসরেও এই চোরা-খাদের কোনরূপ সংস্কার হওয়া সম্ভবপরই হয় নাই। সংস্কার করা ত দূরের কথা, হানা-খাদের উপর কোনরূপ আবেষ্টন করা—অন্ততঃ ঘাটের উপর একখানি কাষ্ঠফলকে সাবধানতার বিজ্ঞাপন প্রদানও এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহারা আবশ্যক বলিয়াও করেন নাই।

এই দুর্ঘটনার জন্য জলপুলিসবাহিনীর ব্যবস্থা-নৈপুণ্যে একটা বড় রকম প্রশংসা আমরা করিতে বাধ্য। এ শ্বেতাঙ্গী বিবি সমুদ্রে স্নান জলবিহার করিতে নামিলে দুই দুই জন পোর্ট-প্রহরী মোতায়েন থাকিয়া তাঁহার সম্ভ্রম ও জীবনরক্ষার জন্য সতর্ক পাহারা দেন। জলের মলিনতায় যদি শ্বেতাঙ্গী শুভ্র সৌন্দর্য্যের হানি হইবার আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা যখন স্নানের জাঙ্গিয়া পরিয়া জলে হংসীর ন্যায় জলকেলি করিতে তখন সারবন্দী খাড়া প্রহরীরা তাঁহাদের সম্ভ্রম ও জীবনরক্ষার জন্য পাহারা দিত। কিন্তু বহু যুবক করিয়া স্নান করিতে আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয় ত ডুবিয়া যাইতে পারেন বা পরস্পরের ঝগড়া মারামারি হইতেও পারে, সম্ভাবনা কল্পনা করিয়াও এক জলপুলিস সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিল না। তবে তাঁহারা জলে জীবনরক্ষার অজুহাতে জাঁকজমকে অবস্থান করিতেছেন দিয়া আমরা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উদারহৃদয় চণ্ডীচরণের জীবন আলোচনা করিয়াছি—আবার তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া মুকুলিত যৌবনেই এমন একটা জীবন গঙ্গাবক্ষে চিরবিসর্জ্জন করিল—জলপুলিস সংবাদ পাইয়াও হানা-খাদের উপর ফ্লাটখানি সরাইয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ না করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিল !

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

[কাকোরী ষড়যন্ত্রের আসামী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে সে যে নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। রাজার বিচারে সে সমাজের অনিষ্টকারী নরহন্তা দস্যু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে,—এ জন্য তাহাকে জীবন দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। সে ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াছিল, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার দেশপ্রেম ও চরিত্র যে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যদি প্রবলপ্রতাপ সরকার তাহাকে অহিংসার পথের আদর্শ দেখাইয়া মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগের অবসর প্রদান করিতেন, তাহা হইলে একটি তরুণ ভাবপ্রবণ প্রাণ যে দেশের ও সমাজের পক্ষে লাভ হইত, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আমরা নিম্নে এই যুবকের স্বল্পায়ু জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।]—বসুঃ সঃ।



রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"—এই কথাকয়টি রাজেন্দ্রনাথকে প্রায়ই আবৃত্তি করিতে শুনিতাম। রাজেন্দ্রনাথ যে পথেই চলুক, জীবনাবসান কালে সে যে নির্ভীকতা দেখাইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার এ কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে বলিতে হইবে।

বাঙ্গালা ১৩০৮ ও ইংরাজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৯ই আষাঢ় সোমবার রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় রাজেনের মাতুলালয় পাবনা জিলার ভারেঙ্গা গ্রামে তাহার জন্ম হয়। 'স্বদেশী' আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তখন রাজেনের বয়স চারি বৎসর। রাজেনের বয়স ও জ্ঞান যত বাড়িতে লাগিল—ততই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনও ক্রমেই জমিয়া উঠিতে লাগিল। জ্ঞান হইতেই সে দেখিল, তাহার পিতা ক্ষিতিমোহন লাহিড়ী, তাঁহার স্বগ্রাম পাবনা জিলার মোহনপুর গ্রামের প্রৌঢ় ও যুবকদিগকে সঙ্গে লইয়া, খোল-করতালের সাহায্যে—রজনী সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—'আমরা নেহাৎ গরীব, নেহাৎ ছোট, তবু আজি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো'—'লালটুপি কি কালো কোর্ত্তা জুজুর ভয় কি আর চ'লে—' ইত্যাদি স্বদেশী গান গাহিয়া পল্লী মাতাইয়া তুলিতেছেন, স্বদেশী-অর্জ্জন ও বিদেশী-বর্জ্জন মন্ত্র তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন,—গৃহস্থরা সেই মন্ত্র, প্রাণে প্রাণে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর উৎসাহ ও প্রাণের পরিচয় পাইয়া তাহাতে সাড়া না দিয়া পারিতেছে না। তাই তাহারা বিদেশী লবণ ফেলিয়া দিয়া, কাচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া, বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া বহুদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। 'রাখীবন্ধনের' সেই মহোৎসবের মধ্যে রাজেন, দিনের পর দিন বাড়িতে লাগিল। সেই দিন হইতেই তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিল এই শৃঙ্খলাবদ্ধা মৃন্ময়ী ভারত-মাতার দুর্দ্দশার রূপ—সেই দিন হইতেই সে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিল—আমরা পরাধীন। আমাদিগকে এই শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিতেই হইবে, আমাদের দেশের সমস্যা আমাদিগকে নিরাকরণ করিতে হইবে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত রাজেন স্বগ্রামে বাস করিবার পর কাশী-যাত্রা করিল, তখন তাহার বয়স মাত্র ৮ বৎসর।

শিশুকাল হইতেই রাজেনের শারীরিক ব্যায়ামের দিকে আগ্রহ হইয়াছিল। দৌড়াদৌড়ি, হুটোপাটি—লাফালাফি—এক মিনিট সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। স্কুলে

যত রকম স্পোর্টস্ হইত, রাজেন তাহার সকলগুলিতে নামিত। সে কোনটাতে প্রথম স্থান, কোনটাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ড্রিলের সময় সে ক্যাপ্টেন ছিল।

রাজেন ও তাহার আর কয়টি ভ্রাতা জলখাবারের পয়সা জমাইয়া একটি পারিবারিক লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিয়াছিল। রাজেনের মাতার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে তাহার নামকরণ করা হইয়াছিল "বসন্তকুমারী স্মৃতি-পুস্তকালয়।" দিন দিন লাইব্রেরীটি বড় হইতে লাগিল আর তাহাতে বাছা বাছা বইগুলি সংগৃহীত হইতে লাগিল।



গোণ্ডাজেলে ফাঁসীর পর রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

এই লাইব্রেরীর কল্যাণেই রাজেন ধীরে ধীরে সাহিত্যানুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল এবং কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হাস্য-রসাশ্রিত কবিতা লিখিতে রাজেন বড়ই দক্ষ ছিল,—হাস্য-রস-পূর্ণ একাঙ্ক নাটকও রাজেন রচনা করিত। অবসর কালে চিত্রাঙ্কন করিয়া বা হারমোনিয়মের সাহায্যে গান করিয়া সে চিত্ত বিনোদন করিত। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে, অভিনয়ে,—সকল বিষয়েই তাহার আগ্রহ ও রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত।

বাল্যকাল হইতে রাজেনের ধর্ম্মের দিকেও মতি ছিল। তাহাকে কখনও কেহ মিথ্যা কথা বলিতে শুনে নাই—কৌতুক করিবার জন্যও সে কখনও একটি মিথ্যা কথা বলিত না।

রাজেনের সেজ-দাদার রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল! রাজেনের বয়স যখন ১৪ বৎসর, তখন তাহার সেজ-দাদার এক জন আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দ-ভক্তের সহিত আলাপ হয়। নাম তাঁহার ফ্র্যান্সিস্ জন আলেক্-জেণ্ডার। ইনি কাশীস্থ রামকৃষ্ণ মিশনে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। ইনি যেমন বিদ্বান তেমনই ধনী। রাজেনদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন আর রাজেনকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তখন রাজেন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। রাজেনকে ধীরে ধীরে তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। স্বামীজীর বইগুলি রাজেন একে একে পড়িতে লাগিল আর মিঃ ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁহার জীবনী ও আদর্শ লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। "সন্ন্যাসীর-গীতি" ইংরাজী ও বাঙ্গালায় মুখস্থ করিয়া মিঃ ফ্র্যাঙ্ক গাহিতেন, আর ভাবে বিভোর হইয়া উঠিতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন রাজেন পড়ে, তখন বিবেকানন্দের পত্রাবলী ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্ত্তমান ভারত, ভাববার কথা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ, প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়া শেষ করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এক দল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক চাহিয়াছিলেন। তাহাদের এক জন হইতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমের আনন্দমঠ, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অনুশীলন প্রভৃতি, রবি বাবুর স্বদেশী যুগের ও তৎপূর্ব্বের আবেগময়ী কবিতা, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকও তাহার পাঠ্য ছিল। দৈনিক সংবাদ পত্র সে প্রত্যহ পাঠ করিত।

সকল ধর্ম্মের প্রতিই যেন তাহার একটা প্রাণের টান ছিল। সে কখনও গির্জ্জায় খৃষ্টানদের প্রার্থনা শুনিত; কখনও ব্রাহ্ম-মন্দিরে ব্রাহ্মদের উপাসনা, কখনও শিখদিগের গুরুদ্বারে উপাসনা, আবার কখনও মুসলমানদিগের প্রভাতের নমাজ শুনিয়া সে মোহিত হইত।

বিলাসিতার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে এক দিনের জন্য ফুটিয়া উঠে নাই। হৃদয়ে নীচতা সে এক দিনের জন্যও আসিতে দেয় নাই। যাহার মধ্যে সে নীচতা দেখিত, তাহাকে সে মোটেই পছন্দ করিতে পারিত না।

ইতিহাসের প্রতি তাহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। সে যখন ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হয়, তখন তাহার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে স্থান পাইল ইতিহাস ও অর্থনীতি। এই দুইটি বিষয়ে তাহার যে আসক্তি জন্মিল, সেটি শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। বি-এ ক্লাশেও ঐ ইতিহাস আর অর্থনীতি। এম-এ ক্লাশেও ঐ ইতিহাস। সমস্ত স্বাধীন দেশের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেশের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক অবস্থা পড়িয়া, তাহার হৃদয়ে স্বদেশের উজ্জ্বল ও গৌরবময় অতীত এবং দৈন্যগ্রস্ত বর্ত্তমানের ছবি প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশের সেই গৌরবময় অতীত ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল।

শৈশব হইতেই রাজেন ভয় কাহাকে বলে জানিত না। বিবেকানন্দের "ভয়ই—পাপ" কথাটি সে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিল। আত্ম-সম্মানজ্ঞান ছিল তাহার প্রবল।

যৌবনে সে কেবলই অসাধ্য-সাধন করিতে তৎপর থাকিত। কখনও সাইকেলে একাই ২০।২৫ মাইল—কখনও বা কয়েকজনের সহিত মিলিয়া ৮০ মাইল ভ্রমণ করিত। কখনও বা গঙ্গানদী ৪।৫ বার পারাপার হইত। কখনও বা ১৫।২০ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিত।

সে গৃহে বার মাস একটি সতরঞ্চির উপর শয়ন করিত। শীতের দিনে আর একখানি কম্বল মাত্র ব্যবহার করিত। ব্রহ্মচর্য্য ও শক্তি-চর্চ্চার দিকে তাহার প্রবল আগ্রহ ছিল।

তাহার স্বভাব ছিল এতই মধুর যে, যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসিত, তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার মুখমণ্ডল সদা হাস্যময় ছিল। কোর্টে ও জেলের হাতেও তাহার সেই হাসি দেখা গিয়াছিল। ফাঁসীর হুকুম শুনিবার দুই দিন পরে তাহার সঙ্গে যখন দেখা করিলাম, তখনও তাহার সেই সদা হাসিমুখ একটুও মলিন হয় নাই। ফাঁসীর হুকুম শুনিবার কিছু দিন পরে তাহার শরীরের ওজন বাড়িয়া গেল ৫ পাউণ্ড!

তাহার হৃদয় এত উদার ছিল যে, কাহারও নিন্দা বা কুৎসা সে করিতেই পারিত না।

রাজেন দেশবাসীকে সত্যই ভালবাসিত। দেশবাসীর উপর তাহার ছিল অগাধ স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, আর ছিল তাহার তরুণ প্রাণ। সেই তরুণ প্রাণ মায়ের চরণে সে উৎসর্গ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। সে ফাঁসীর রাত্রিতে সমস্ত দিন ভগবানকে ডাকিয়াছিল, গীতা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছিল, দেশজননীর নাম করিয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করিয়া নিজেকে পবিত্র করিয়া জীবন-আহুতি দিতে গিয়াছিল। জেলের ওয়ার্ডাররা যখন তাহার হাতে হাতকড়া লাগাইতে গেল, সে তখন তাহাদিগকে হাতকড়া দিতে দেয় নাই, পাছে তাহাদের স্পর্শে তাহার দেহ অপবিত্র হইয়া যায়। বধ্যভূমিতে সে উন্নতশিরে স্ফীতবক্ষে গমন করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে যেন কত আনন্দ! ফাঁসীমঞ্চে উঠিবার পূর্ব্বে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন বলিলেন, "মিষ্টার লাহিড়ী, তোমাকে একা উঠিতে হইবে না, ইঁহারা তোমাকে ধরিয়া তুলিয়া দিতেছেন।" উত্তরে তখন সে বলিয়াছিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, আমি ঠিক আছি, আমাকে কাকেও সাহায্য করতে হ'বে না।"

মৃন্ময়ী ভারতমাতার চিন্ময়ী মূর্ত্তি তখন রাজেনের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে হাসিতে হাসিতে মায়ের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইল!

বার বার এই ভারতেই জন্মিবে, আর জীবন ভরিয়া ভারত-মাতার সেবা করিবে, এই প্রার্থনাই সে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।



বজ্র

১

লোকপাল দেবেন্দ্রের শ্রীহস্তের অস্ত্র খরশাণ,
ধ্বংস তব ধর্ম্ম নয়, ভয়াবহ তব অভিযান
অশিবে নাশিতে, শুধু, গর্জ্জি কহ মা ভৈঃ মা ভৈঃ,
প্রলয় আসন্ন ভাবি মূঢ় মোরা ভয়ে সারা হই।

মঙ্গলেরে শিশুসম বক্ষে ধরি জননী কোপনা,
ছুটিয়াছ উল্কাবেগে, নেত্রে ক্ষরে অনলের কণা।
অসুরেরি বক্ষপানে তব রুদ্র অব্যর্থ সন্ধান,
উদ্বেগ-বিস্ময়-ভয়-মিশ্ররসে এ ক্ষুদ্র পরাণ,
উদ্বেলিত, অঙ্গে তায় অতর্কিত রোমাঞ্চ-সঞ্চার,
গূঢ়মর্ম্ম জানে মর্ম্ম সেথা উঠে আনন্দ-ঝঙ্কার।

ভিষকের করে তুমি ক্ষতহর শলাকা-বেধনী,
ভাস্করের করে তুমি ক্ষুরধার আগ্নেয়ী ছেদনী।
চিরিয়া নীরদপুঞ্জ রুদ্রহস্তে কোটি কোটি ভাগে
ঝরাও জীবনরস, শুষ্ককণ্ঠে ধরা যাহা মাগে—
যার লাগি সারা গ্রীষ্ম তপ করে তপস্বিনী ধরা,
অঙ্গে তার আঁচ লাগে, বিন্দুমাত্র নহে সে কাতরা,
ছিন্ন করি' তমশ্ছদ হের তার সুপ্রসন্ন মুখ,
ধরা হাসে তুমি হাসো, ভুঞ্জ' দোঁহে অপূর্ব্ব কৌতুক,
অঙ্গে তার জেগে উঠে রোমাঞ্চনে কোটি রোমাঙ্কুর,
উল্লাস-বেপথু জাগে—মোরা মিছে হই ভয়াতুর।

অপসারি' ধূলিরোধ রচ' কোটি জীবন-কলিকা,
ভস্মস্তূপ ভেদ করি জাগাও চঞ্চল প্রাণশিখা
বীজবক্ষ বিদারিয়া বীজমন্ত্র উদ্ভেদনোপম
মুক্তিফল-সম্ভাবনা দাও তুমি, দীক্ষা গুরুসম।

কন্দরের বক্ষ চিরি জাগাইলে বৈদূর্য্য-শলাকা,
রূঢ় তরু-ত্বক চিরি ফুটাইছ সহস্র প্রশাখা,
মীন-ডিম্বকোষ চিরি প্রাণময় করো জলধারা,
গিরিগাত্র বিদারিয়া নির্ঝরের ভাঙ্গিয়াছ কারা।

দিলে মর্ম্মপুট চিরি কুটজের প্রাণের বিস্তার,
কেতকীর বক্ষ চিরি সৌরভেরে করেছ উদ্ধার,
বনবক্ষ বিদারিয়া সঙ্গীতেরে আনিয়াছ টানি;
ফুটালে শ্যামল ছন্দে প্রান্তরের অন্তরের বাণী।

হ্রদের স্ফটিক বক্ষ বিদারিয়া বজ্রমণি দিয়া
প্রাণময় কারুশিল্প 'পদ্ম'রাগে তোল ফুটাইয়া,
সর্ব্ব বাধা বন্ধ টুটি' দীর্ণ করি জড়তা রূঢ়তা,
লালিত্যে জাগায় পুন নবতেজে তোমার ক্রূরতা।

নিরুদ্ধ জীবন যারা গর্ভে পোষে তোমার মহিমা
জানে তারা, সদ্যোজাত বাৎসল্যের নাহি পায় সীমা।
মোরা ভয়ে কেঁপে মরি—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা তোমার
চৈতন্য জাগায় জড়ে বিদারিয়া ঘন অন্ধকার।
মন্ত্রময় শর তব মন্দ্রময় গুপ্ত আশীর্ব্বাদ
গ্রীষ্ম রণশিষ্য-শিরে,—কহে কানে অভয়সংবাদ।
যাত্রার হুঙ্কার তুমি জীবনের জয় অভিযানে,
জীবনের অরাতিরা মর্ম্ম তার মর্ম্মে মর্ম্মে জানে।

লাঞ্ছনা-বধির বিশ্ব সুবিরাট, কোলাহলময়
তাই তুমি বিরাটের সুবিরাট আশ্বাস অভয়,
মন্দ্রিত ভৈরব ছন্দে। নিত্য মোরা করি শুধু ভুল
আশীর্ব্বাদে অভিশাপ মনে ভাবি হই শঙ্কাকুল।
দেবের দাক্ষিণ্য দয়া বরাভয় এই ধরাধামে,
হে অশনি, চিরদিনই তব ছন্দে তব রূপে নামে।

২

তুমি শুধু মেঘে নও,—যাত্রা তব ব্যাপিয়া জগৎ
সৃষ্টির বিজয়পথে মঙ্গলের তুমি জৈত্ররথ।
ঘনীভূত তপঃশক্তি তুমি শত দধীচি-কঙ্কালে,
সংযম নিবিড়ায়িত স্মররিপু শঙ্করের ভালে।
ঘনীভূত শব্দশক্তি তুমি বজ্র প্রণব-ঝঙ্কারে,
কর্ম্মশক্তি শূরশ্রেষ্ঠে,—ধর্ম্মশক্তি মূর্ত্ত অবতারে,
কল্পশক্তি কাব্যে শিল্পে,—বোধশক্তি প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে
মুক্তি-শক্তি বজ্রমণি—চিত্তশক্তি ঘনীভূত ধ্যানে,
সৃষ্টিশক্তি বিন্দু-সারে, দৃষ্টিশক্তি তৃতীয় নয়নে
সংহত আলোক ভর্গে, তাপসার তুমিই দহনে।
অগস্ত্য-গণ্ডূষে সিন্ধু,—জড়শক্তি বৈদ্যুতী-ছটায়,
বজ্র তুমি ঘনীভূত রসধারা রুদ্রের জটায়।
মানবের মনে তুমি কেন্দ্রীভূত সকল ইন্দ্রিয়
ঘনীভূত মধুরিমা, মৃত্যুজয়ী তুমিই অমিয়।

যে বলে তোমার ধর্ম্ম ধ্বংসমাত্র বুঝে সে ত স্থূল
হুঙ্কৃত শাসনে তুমি 'প্রতিকূলে' কর 'অনুকূল'।
তব জয়-বশীভূত সে যে হয় সৃষ্টির সহায়,
মোরা তারে ধ্বংস ভাবি' মূঢ়কণ্ঠে করি হায় হায়।
শক্তি লভে রূপান্তর তব তেজে, সৃষ্টির বাধক
তোমার মঙ্গলব্রতে হয় তব উত্তরসাধক।
মঙ্গলার হাতে খড়্গ, মঙ্গলের হাতে তুমি শূল,
আপনারে বৃত্র ভাবি', বজ্র, মোরা নিত্য করি ভুল।

শ্রীকালিদাস রায়।

নব্য ভারতে রসায়ন-চর্চ্চা

৩

প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। এক দিকে যেমন বেদ-বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি চিন্তামূলক শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত, অন্য দিকে গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও পরীক্ষামূলক শাস্ত্রের তেমনই চর্চ্চা হইত। বৌদ্ধযুগের বহু পরেও পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের আলোচনা ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল,—জয়পুর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের মানমন্দির আজিও পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞের বিস্ময় উদ্রেক করে। বৌদ্ধযুগে নাগার্জ্জুন, ধুণ্ডুকনাথ প্রভৃতি মনীষি-গণের রসশাস্ত্রের চর্চ্চা প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক প্রতিভার জ্বলন্ত নিদর্শন। অজন্তার গিরিগুহার অপরূপ রাগ-বিন্যাস, ইন্দ্রপ্রস্থের নিষ্কলঙ্ক লৌহস্তম্ভ, কণারকের অর্কমন্দিরের লৌহদণ্ড প্রাচীন হিন্দুর বৈজ্ঞানিক মনীষার পরিচায়ক। রাগ-শিল্পে পাশ্চাত্য জগৎ নিশ্চয়ই প্রাচীন ভারতকে ছাড়াইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধযুগের চিত্র-শিল্পী সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব-খান্দেশের লুক্কায়িত গিরিগাত্রে যে সকল বর্ণের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, কালের ব্যবধানে তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। লৌহপ্রস্তুতের বিরাট্ চুল্লী তখন নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হয় নাই, তাই কি উপায়ে প্রাচীন দিল্লীর লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা রস্কো, হাড্‌ফিল্ড প্রভৃতি ইংরাজ রসায়নিকের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

কণাদের বৈশেষিক দর্শন না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, প্রাচীন হিন্দুর চিন্তাধারার সহিত তাহার অসামঞ্জস্য না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান-চর্চ্চা যে সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই, তাহার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট বর্ত্তমান। বিচক্ষণ শিক্ষকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ধুণ্ডুকনাথ রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে বলিতেছেন,—

"অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যম্
শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি।
যৎ কর্ম্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূণাম্
প্রৌঢ়ানাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ॥
অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সুতেন্দ্র কর্ম্মগুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে॥"

অর্থাৎ যাঁহারা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রমাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। আর যাঁহারা গুরুর উপদেশানুযায়ী অধীত পরীক্ষাকে পুনঃ সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত ছাত্র। এতদ্ভিন্ন সকলে (গুরু ও ছাত্র উভয়েই) রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র।

রসায়নশাস্ত্রের কোন কোন প্রক্রিয়া প্রাচীনকালে এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। নাগার্জ্জুন কৃত রসার্ণব গ্রন্থে পারদশুদ্ধির যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই,—

"মিশ্রিতৌ চেদ্রসে নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা।
তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষস্তন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ॥"

অর্থাৎ অসাধু ব্যবসায়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পারদকে বঙ্গধাতু (সীসক) দ্বারা বিষাক্ত করে; কিন্তু বারত্রয় তির্য্যক্‌পাতন দ্বারা ইহার দোষ খণ্ডিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও সম্ভবতঃ পারদশুদ্ধি ইহা অপেক্ষা উন্নত উপায়ে সম্পন্ন হয় না।

ধাতু যে অগ্নির সংস্পর্শে আসিলে অগ্নিকে বিশিষ্টভাবে রঞ্জিত করে, ইহা পাশ্চাত্যদেশে অধিক দিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই; ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহ য়ুরোপে এ বিষয় লক্ষ্য করেন নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত। কিন্তু রসার্ণবে (৪০০ খৃষ্টাব্দ') ইহার উল্লেখ আছে,—"তাম্র অগ্নিশিখাকে নীল, রঙ্গ (টিন) ধূসর এবং বঙ্গ আকাশের বর্ণে রঞ্জিত করে।"

প্যারাসালসাসের পূর্ব্বে য়ুরোপীয় সাহিত্যে দস্তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু রসার্ণবে এই ধাতুর (যশদ) প্রস্তুত-প্রকরণ এরূপ বিশদরূপে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে * এই অংশ অনায়াসে আধুনিক রসায়নের পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া দিলে কেহই প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারিবেন না।

প্রাচীন হিন্দুগণ যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষারের প্রভেদ জানিতেন; সুশ্রুত-সংহিতায় এই উভয়বিধ তীক্ষ্ণ ও মৃদু ক্ষারের পার্থক্য ও প্রস্তুত-প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুশ্রুতে ক্ষার প্রস্তুতের যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক প্রস্তুত-প্রকরণ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। কিন্তু সুশ্রুতের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে এডিনবরার অধ্যাপক ব্ল্যাক্ অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া এই উভয়বিধ ক্ষারের রাসায়নিক প্রকৃতি ও প্রস্তুত করিবার উপায় বৈজ্ঞানিক জগতে প্রকাশ করেন। অবশ্য ব্ল্যাক্ সুশ্রুতের গবেষণার বিষয় অবগত ছিলেন না। তীক্ষ্ণ ক্ষার যে লৌহপাত্রে মুখ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, তাহারও নির্দ্দেশ সুশ্রুতে বর্ত্তমান।

"আয়সে কুম্ভে সংবৃতমুখে নিদধ্যাৎ।"

ব্ল্যাক্ এই প্রক্রিয়ার কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, বাতাসের অঙ্গারাম্লের সহিত সম্মিলিত হইয়া তীক্ষ্ণক্ষার মৃদুক্ষারে পরিণত হয়, সুতরাং তীক্ষ্ণক্ষারকে বাতাসের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হয়।

য়ুরোপে প্যারাসালসাসই প্রথম ধাতব ঔষধের প্রবর্ত্তন করেন; কিন্তু বৃন্দ, চক্রপাণি প্রভৃতি ভারতীয় চিকিৎসক বহু শত বৎসর

* Chemical Knowledge of the Hindus of old by Sir P. C. Ray, Quarterly Journal, Indian Chemical Society Vol, 3, 1925.

DOUBLE COLOUR PAGE

পূর্ব্বে কজ্জলী, রসপর্পটীব (পারদ ও গন্ধকের যৌগিক পদার্থ) ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন ; য়ুরোপে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা অজ্ঞাত ছিল, ইহা একরূপ নিশ্চিত। বৌদ্ধযুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষে তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় রসশাস্ত্রে মস্ততন্ত্র প্রবেশ করে। পারদশাস্ত্র এই সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণি প্রভৃতি রসতান্ত্রিকগণের গ্রন্থে নানাবিধ ধাতব ঔষধের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, মাধবকর-বিরচিত গ্রন্থ তুরস্কাধিপ খলিফের আদেশে আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই আরবীয়গণ যে ভারতীয় রসতান্ত্রিকগণের নিকট ঋণী ছিল, এ সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে।

তান্ত্রিক যুগে (খৃষ্টাব্দ ১১০০-১৩০০) বৌদ্ধদিগের মহাকাল-তন্ত্র ও রসরত্নাকর এবং শৈবগণের রসার্ণব, রসহৃদয়, রসসিদ্ধান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে রসশাস্ত্রের চর্চ্চা দেখিয়া মনে হয় যে, বৌদ্ধ ও শৈবদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কলহ চলিলেও উভয়েই রসশাস্ত্রকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। রসার্ণবে শ্রীভৈরব (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) রসশালার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা আধুনিক নামে প্রকাশ করিলে পাশ্চাত্য ল্যাবরেটরী হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। গন্ধক, হরিতাল (Orpiment), সিন্ধুত্থ (Sea salt), সৈন্ধব (Rock-salt) চুলিকা (Sal ammoniac), টঙ্কণ (Borax), অম্ল, ক্ষার, মাক্ষিক প্রভৃতি রাসায়নিক উপকরণ ও ধমনী (Bellows), লৌহযন্ত্র, খল্বাপাষাণমর্দ্দক (Stone mortar & pestle), বক্রনল (Mouth blow pipe), সংড়সীয়াদৃশংদংশ (Pair of Tongs), অয়ঃকরোটক (Iron vessel), তুলাযন্ত্র, প্রতিমান (Weights), লৌহনালী প্রভৃতি যন্ত্র লইয়াই ত আধুনিক রসায়নশালা গঠিত হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সে গৌরবময় অতীতের সম্মুখে নৈরাশ্যময় ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছিল। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও ঘটনার ফলে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কূটতর্কের সমাদর হইতে লাগিল, জড়বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা সাধারণের আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইল। পরাধীনতার শৃঙ্খলের ভারে জাতীয় প্রতিভা ও মনুষ্যত্ব অল্পে অল্পে লুপ্ত হইতে লাগিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কেমন করিয়া লোক স্বজাতিকে অক্লেশে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতে পারে, সে সকল পুরাতন কালিমাময় ইতিহাস উল্লেখ করিয়া জাতির নৈতিক অবনতির প্রমাণ করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন ভারতের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক আলোচনা যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে এবং অধিকাংশই বৌদ্ধযুগে ও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে। এই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে লিখিয়াছিলেন, "ভারতের উর্ব্বরক্ষেত্র ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তাহাতে বয়েল অথবা নিউটনের আবির্ভাব অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।"

যিনি নব্য-বাঙ্গালার তথা নব্য-ভারতের শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু, এমন কি, যাঁহাকে যুগপ্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই রাজা রামমোহন রায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্টকে শিক্ষা-বিভ্রাট সম্বন্ধে যে পত্র লিখেন, তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করেন।

তাঁহার স্বদেশীয়গণ যাহাতে অন্তঃসারশূন্য কূটতর্ক হইতে নিরস্ত হইয়া পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করে, ইহাই ছিল রামমোহনের একান্ত অভিপ্রেত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি নিজে সংস্কৃতভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক প্রভৃতি উপনিষদ্ বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করেন, সেই রামমোহনই আবার পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রশংসায় শতমুখ হইয়া বিদেশী রাজপুরুষের সম্মুখে ভারতীয় দর্শনকে অনাবশ্যকভাবে খাটো করিয়াছিলেন। * তিনি সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, এই জড়ভরতার যুগে কেবল চক্ষু মুদিয়া মায়াবাদের দোহাই দিলে এ ভীষণ প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা অসম্ভব। আর এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই রামমোহন মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় (১৮১৭খৃঃ) হিন্দুকলেজ স্থাপিত করেন। হিন্দু-কলেজের স্থাপয়িতৃবর্গের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম না থাকিবার কারণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতায় পরিচায়ক ; পাছে তাঁহার নামে রক্ষণশীল নেতৃগণ সরিয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় রামমোহন আপনাকে পিছনে রাখিয়াছিলেন। হিন্দু-কলেজ স্থাপনের ফলে বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার বিশেষ উৎসাহ হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে মেডিক্যাল কলেজেই বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রগণ মেডিক্যাল কলেজে পদার্থশাস্ত্র, রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইতেন।

আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় মিশনরীগণের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা সম্ভবতঃ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যাঁহাদের উৎসাহে প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় ও প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র, ব্যাকরণ, অভিধান ও উপন্যাস মুদ্রিত হয়, ভাষার এই উন্নত অবস্থায় তাঁহাদের কথা ভুলিলে বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কায হইবে। আর ইহারাই প্রথম বাঙ্গালাদেশে রসায়ন-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হন নাই, শ্রীরামপুরের ছাত্রগণের জন্য একখানি "বাঙ্গালা রসায়ন" পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যখন প্রবল যুক্তিতর্ক সহকারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার আপেক্ষিক গুরু নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় জন্ ম্যাক্ নামে এক জন খৃষ্টান মিশনরী যুবক মার্শম্যানের প্রবোচনায় শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতে "কিমিয়া বিদ্যাসার" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, যখন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়, তখন কেমন করিয়া এই জন বিদেশী সাহস করিয়া বাঙ্গালাভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। শুনিতে পাই, বাঙ্গালা-সাহিত্যের এখন বড় দুর্দ্দিন ; কিন্তু এই তথাকথিত পরিণত অবস্থায় কয়খানি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানশাস্ত্রের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তালিকা লইলে সম্ভবতঃ কেহই বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ বলিবেন না নিশ্চিত।

জন্ ম্যাক্ Principles of Chemistry নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন এবং "কিমিয়া বিদ্যাসার" নামে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে কিমিয়া-প্রভাব (Chemical forces) ও দ্বিতীয় ভাগে কিমিয়া বস্তু (Chemical substances) আলোচিত হইয়াছে। মার্শম্যানের আদেশে শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রগণের জন্য এই পুস্তক রচিত হয়, গ্রন্থকার বাঙ্গালাভাষাতেই অধ্যাপনা করিতেন। বহু দিন হইতে শিক্ষার বাহন লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, আজ পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে প্রদত্ত হয় না ; কিন্তু এক শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষার কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে বিদেশী শিক্ষক যে অসাধ্যসাধন করিতে পারিয়াছিলেন, শতাধিক বৎসরেও আমরা নিজে সে সমস্যার আংশিক সমাধান করিতে পারি নাই। পাঠকগণের অবগতির জন্য ম্যাক্-রচিত "কিমিয়া বিদ্যাসার" হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

"আলোকের চলন ও কার্য্য দ্বারা অনেকে বোধ করে যে, সে এক প্রকার বস্তু। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সে বিশেষ সংলোড়ন দ্বারা উৎপন্ন।" ৫০ পৃষ্ঠা।

"আলোকের চলন শীঘ্র বটে, কিন্তু তথাপি মাপিত হইতে পারিবে। অপর আলোচলন বাধিত কিংবা অন্য দিকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবেক"। ৫০ পৃষ্ঠা।

"সামান্য আকাশের মধ্যস্থিত অক্সিজানের দ্বারা, তাবৎ জীবজন্তুর প্রাণরক্ষা হয় এবং তাহাতে মানুষের ব্যবহার নিমিত্তক যায়ং অগ্নি জাজ্বল্যমান হয়, অতএব আমাদের ভদ্রদ সৃষ্টিকর্ত্তা ইশ্বরের হিতজনক কার্য্যের মধ্যে সামান্য আকাশকে বিশেষভাবে গণনা করিতে হয়।" ১১১ পৃষ্ঠা।

"সোদিয়মের খোরিণ অর্থাৎ সামান্য লবণের ৮ ঔন্স আর ৪ড়াক্ত মাঙ্গানীসের কালা অক্সিজানের ৩ ঔন্স হামামদিস্তাতে ৪ড়া করিয়া তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সের মিশ্রিত গান্ধকিকারের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া সে সকল অল্প অল্প উত্তপ্ত কর, তাহাতে খোরিন্ আকাশ নির্গত হইবে"। ৭২ পৃষ্ঠা।

উলিয়ম্ ইয়েটস্ নামক এক জন মিশনরী ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে "পদার্থ-বিদ্যাসার" নামক আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। নামের সাদৃশ্য ও প্রকাশকালের সমসাময়িকত্ব দেখিয়া মনে হয়, পদার্থ-বিদ্যাসার ও কিমিয়া বিদ্যাসার উভয় পুস্তকই মার্শম্যানের নির্দ্দেশক্রমে লিখিত হয়।

মেডিক্যাল কলেজের বিজ্ঞান-শিক্ষকগণের মধ্যে ওসোগ্‌নেসী ও ম্যাক্‌নামারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওসোগনেসীর ন্যায় উৎসাহী শিক্ষক ভারতবর্ষে অতি অল্পই আসিয়াছেন। বাঙ্গালী যুবকগণ যাহাতে অধিকসংখ্যায় রসায়ন-চর্চ্চায় ব্রতী হয় এবং রাসায়ন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করে, ওসোগ্‌নেসী তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় যুবকের বুদ্ধি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন ; তাঁহার নিজের কথায়, "সত্য বটে, এই নূতন পথে ভারতীয় যুবককে পদে পদে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, কিন্তু এই সকল অতিক্রম করিবার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই নিহিত রহিয়াছে। কোন কঠিন সমস্যার অর্থগ্রহ করিতে তাহার বিলম্ব হয় না ; ধীরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা তাহার আছে এবং সূক্ষ্ম পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান ব্যাপারে সে তুল্য সুদক্ষ। এই সকল গুণের অধিকারী হইয়া ভারতীয় যুবক যে বিজ্ঞানচর্চ্চায় পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।" কয় জন বিলাতী শিক্ষক এই ভাবে দেশীয় যুবকের হিত চিন্তা করিয়াছেন ? শুধু শিক্ষক ও উৎসাহদাতা হিসাবেই ওসোগ্‌নেসী এ দেশীয় লোকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন নাই, এ দেশে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের তার স্থাপনের সঙ্গে তাঁহার নাম জড়িত হইয়া আছে। দেশীয় ঔষধ ও গাছগাছড়া সম্বন্ধে ওসোগ্‌নেসী মূল্যবান্ পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, Bengal Dispensary নামক গ্রন্থে তাঁহার বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ওসোগ্‌নেসীর পরবর্ত্তী কালে ম্যাক্‌নামারা রসায়ন-শিক্ষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ইনিই পানীয় জলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। ম্যাক্‌নামারার এক জন বাঙ্গালী সহকারী মৌলিক গবেষণা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতবাসীর মধ্যে সম্ভবতঃ কানাইলাল দে সর্ব্বপ্রথম রাসায়নিক গবেষক। কানাইলাল রাসায়নিক পরীক্ষকের সহকারিরূপে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং পরে রাসায়নিক পরীক্ষকের পদে উন্নীত হয়েন। কানাইলাল প্রধানতঃ দেশীয় গাছগাছড়ার রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতীয় অহিফেনের নূতন পরীক্ষা আবিষ্কার করেন। ভারতীয় অহিফেন যে অন্য দেশীয় অহিফেন হইতে বিভিন্ন, তাহা অনেকেই পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু কানাইলালই প্রথম এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করেন। ভারতীয় অহিফেনে পর্‌ফিরোক্সীন (porphyroxyn) নামক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, কানাইলাল ইহারই বিশেষ পরীক্ষা বাহির করেন। ইহার ফলে অহিফেন-বিষ-সংক্রান্ত অনুসন্ধানে অনেক সুবিধা হইয়াছে। দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে কানাইলাল দে এক জন বিশেষজ্ঞ ছিলেন ; এ বিষয়ে তিনি একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। রসায়ন শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি "কিমিতি নির্ণীতি" নামে বাঙ্গালা রাসায়নিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র দত্তও এই সময়ে সহকারিরূপে মেডিক্যাল কলেজে কার্য্য করিতেন। কুর্চ্চীর ত্বক্ হইতে তিনি নূতন এক রাসায়নিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার "কুর্চ্চীসীন" নামকরণ করেন। রামচন্দ্র দত্তলিখিত "রসায়ন-বিজ্ঞান" অতি সুন্দর গ্রন্থ। পুস্তকখানি প্রধানতঃ

* তাঁহার চরিতকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে রাজা রামমোহন রায় হিন্দুদর্শনের নিন্দা করেন নাই, বেদান্ত বাঙ্গালাদেশে বেদান্ত প্রভৃতির চর্চ্চা হইত, তাহাতেই অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণের জন্য লিখিত হইয়াছিল ; সম্ভবতঃ ইহা সে সময়ে সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু ইহার লিখন-প্রণালী ও ব্যাখ্যা অতি মনোরম। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই জাতীয় পুস্তক আধুনিক "পরিপুষ্ট" বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিশেষ মিলে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এ দেশে প্রথম রাসায়নিক গবেষণার সূত্রপাত হয় চিকিৎসকের উৎসাহের ফলে এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া যাহা কিছু সামান্য মৌলিক অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন বিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, ওয়াডেল্, সেরীফ, ওয়াট্, উদয়চাঁদ দত্ত প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ গভীর অধ্যবসায় সহকারে দেশীয় ওষধির দ্রব্যগুণবিচার করিয়া যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, মৌলিক রাসায়নিক গ্রন্থ হিসাবে তাহাদের মূল্য কম নহে। আবার লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, য়ুরোপে প্যারাসালসাস্ প্রভৃতি প্রাথমিক যুগের রাসায়নিকগণ যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রকে সংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যেই রসায়নের চর্চ্চা প্রারম্ভ করেন, বাঙ্গালাদেশেও রাসায়নিক গবেষণা প্রথম অবস্থায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কেবল দেশীয় ঔষধ ও গাছগাছড়া লইয়াই চলিয়াছিল। এ দেশে প্রকৃত রাসায়নিক গবেষণা আলেকজাণ্ডার পেড্‌লারের সময় হইতেই আরম্ভ হয়, পরবর্ত্তী সংখ্যায় ইহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

যে সকল মনীষী বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা-প্রসারের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অন্যতম। ইহারই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "ভারতীয় বিজ্ঞান-চর্চ্চা সমিতি" (Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপিত হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক তারাপ্রসন্ন রায় রসায়ন-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকে ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের দৃশ্য কল্পনা করিবার শক্তি সকলের থাকে না, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকারের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এখনকার মত তখন বিজ্ঞান-শিক্ষার কলেজের আধিক্য ছিল না ; প্রেসিডেন্সী, সেণ্ট জেভিয়ার্স ও মেডিক্যাল কলেজ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও বিজ্ঞান অধ্যাপনা বিশেষ হইত না। বিজ্ঞান-চর্চ্চার পথ সাধারণ ছাত্রদিগের নিকট উন্মুক্ত করিবার জন্যই মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন ; তাঁহার আশা ছিল যে, ক্রমে ক্রমে ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হইবে। জীবিতকালে চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষার সাফল্য দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই ; তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা যে আংশিক সফল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধ্যাপক রমণের তত্ত্বাবধানে ইহা পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

সরল বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রচার ভিন্ন জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক সময়ে পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও প্রাণি-বিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিকৃত রুচির পরিবর্ত্তনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের ওজস্বিনী ভাষা দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অপরূপ সৌষ্ঠবে ভূষিত করিত।

রাজেন্দ্রলালের বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫০-৫৬) ও রহস্যসন্দর্ভ (১৮৫৮-৬০) বৈজ্ঞানিক পত্রিকারূপে সাময়িক সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল ; রাজেন্দ্রলালের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিভিন্নমুখী প্রতিভা ইহাদের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইত। দুঃখের বিষয়, এই দুই পণ্ডিতের তিরোভাবের পর বাঙ্গালাদেশে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক পত্রিকার আবির্ভাব হয় নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার।

ব্যথার আবেদন

চিন্‌বে মোরে আর কি প্রিয় !
পড়বে কি আর মনে ?
নতুন দেশের, নতুন পথে
নতুন সাথীর সনে।

দুঃখ-ভরা এ আঙিনায়,
দেখা কি আর তোমায় আমায় ;
হবে পুনঃ সুখের সাথে !
বেলা শেষের ক্ষণে ?

চিন্‌বে তুমি আর কি আমায়,
পড়বে কি আর মনে !

নিত্য সেথায় নতুন পূজায়
প্রীতির রস পানে।
পুলকে প্রাণ ভরবে তোমার
নিত্য নতুন গানে।

হতাশার এই বিষাদ আলো,
লাগ্‌বে কি আর তোমার ভালো ;
মনে হবে আর কি তোমার !
সেই সে পুরাতনে ?

নতুনেরি উজল আলোয়,
নতুন আবাহনে !

আজকে স্মৃতির ব্যথা তব
জাগ্‌ছে প্রাণে তিতি,
পড়ছে মনে তোমার সাথে
আলাপনের প্রীতি,

তোমায় বিনা, নীরবতা,
জাগায়ে প্রাণে গোপন ব্যথা।
পারি না যে ভুলতে প্রিয় !
চিত্ত আরাধনে।

শূন্য পুরী কাঁদ্‌ছে শুধুই ;
হেথায় নিরজনে ॥

শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী।

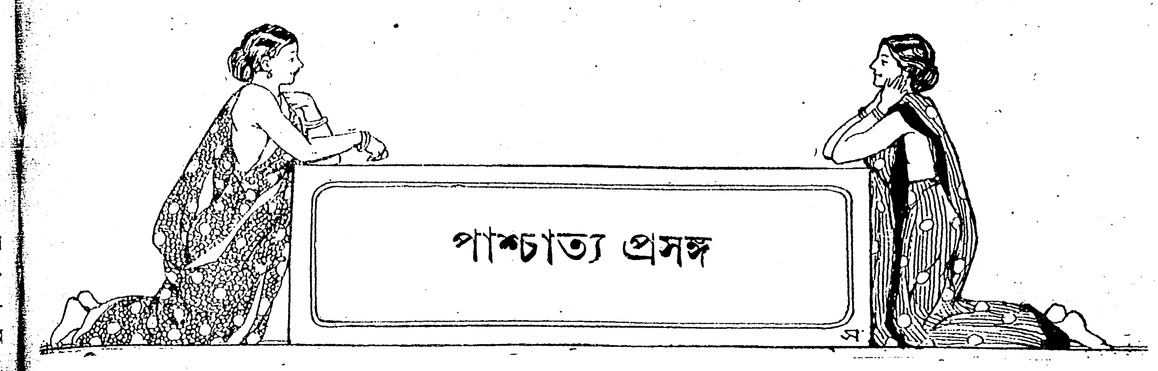

শনির দৃষ্টি

কথায় বলে শনির দৃষ্টি ! শনির দৃষ্টিতে রাজ্যেশ্বরও সর্ব্বস্বান্ত হয়, পথে পথে ভিখারী সাজিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। আমাদের পুরাণেতিহাসে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাজা নল শনির দৃষ্টিতে রাজ্যহারা—পত্নীহারা—সর্ব্বস্বহারা হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও প্রায় সর্ব্বস্বহারা হইতে হইয়াছিল।

শনির দৃষ্টি নানা মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দেয়। কখনও রুগ্ন সশরীরে, কখনও বা অক্ষরূপে, কখনও বা পশুপক্ষীর রূপে। আবার চোখের নেশার রূপ ধরিয়া যে শনৈশ্চর কখনও কখনও মানুষের সর্ব্বনাশসাধন করে, তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্তের কথা এই স্থানে উল্লেখ করিব। ঘটনাটি সত্য, ফ্রান্সের বন্দিণাংশের প্রসিদ্ধ মার্সেল বন্দরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। উহা যেমন রহস্যজনক, তেমনই চিত্তাকর্ষক। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র গৃহস্থও কিরূপে 'চোখের নেশা'-রূপ শনির দৃষ্টিতে অধঃপতনের চরম স্তরে অবতরণ করিতে পারে এবং পরিণামে রাজার বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ডাক্তার বুগরাট্

এই ভদ্র শিক্ষিত গৃহস্থের নাম ডাক্তার পিয়ারে বুগরাট্। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের এনেসি নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। গত মহাযুদ্ধকালে বীরত্ব-প্রদর্শনের জন্য তিনি ফরাসী সরকারের নিকট মহাসম্মানের পরিচায়ক Legion of Honour উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহুকাল তিনি মার্সেল বন্দরে ডাক্তারী করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়া সকলের শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমন লোকও 'শনির দৃষ্টি' হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুগরাট্ মার্সেল বন্দরের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার আভিয়েরিনসের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মার্সেলের ৩৭নং রু-সেনাক রাজপথিস্থ গৃহে বসবাস করেন। বৃদ্ধ ডাক্তার আভিয়েরিনস তাঁহার বড় বড় ঘর জামাতার হস্তে প্রদান করেন। ফলে ডাক্তার বুগরাট্ অতি অল্পকালের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন মান্যগণ্য মার্সেলবাসী হইতে সমর্থ হয়েন। মার্সেলে বাস করিবার এক বৎসর পরে তাঁহার একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন তাঁহার সুখের সংসার। রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা, পিতৃতুল্য মান্যগণ্য অভিভাবক শ্বশুর, সংসারে স্বচ্ছলতা সুখ ও আনন্দ, অগণিত বন্ধুবান্ধব, স্তাবক ও শুভানুধ্যায়ী, রাজদ্বারে সম্মান ও সমাদর—অথচ এ-হেন লোকও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আই-এন-প্রোভেন্সের বিচারালয়ে গিলোটিন্ যন্ত্রের দ্বারা ছিন্নমস্তক হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিবাহের দিনে

ভূম্যসাগরের 'মলয়' বায়ু মার্সেল বন্দরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, সোনার বরণ সূর্য্যকরে বন্দরের জলস্থল হাসিতেছে, মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশে এক কণামাত্রও মেঘ নাই। এমনই এক দিনে মার্সেলের বহু প্রাচীন নটরডেম



ডাঃ পিয়ারে বুগরাট

ডে ডলরেস উপাসনালয়ে ডাক্তার বুগরাট্ ও কুমারী আভিয়েরিনসের উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সহরের গণ্যমান্য বিস্তর সম্ভ্রান্ত নরনারী নানাবর্ণের নানা ছাঁদের পরিচ্ছদালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেই বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। গির্জ্জার সম্মুখস্থ গৃহ-পথাদি নানা পতাকা ও পুষ্পমাল্যাদিতে শোভিত করা হইয়াছিল। পথে নানা জাতীয় নরনারীর জনতা। ভূমধ্যসাগরের বন্দর বলিয়া তথায় য়ুরোপীয় ও মূর,—ফরাসী, স্পানিয়ার্ড, পোর্টুগীজ, মূর, আরব পাশাপাশি দণ্ডায়মান ছিল। এক দিকে যেমন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত

ভদ্রঘরের নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল, অন্য দিকে বন্দরের গাঁট-কাটা, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েসও তথায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোট ছোট বালিকা ও কিশোরী—কমলালেবুর টুকরী মাথায়—ফলবিক্রয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া একমনে একপ্রাণে বরকন্যার নির্গমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সূর্য্যকরে তাহাদের গোলাপী গণ্ডস্থল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই দৃষ্টি গির্জ্জার দ্বারদেশে ন্যস্ত ছিল।

হঠাৎ গির্জ্জার গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিল, মেঘমন্দ্রের মত গির্জ্জার পিয়ানোর সুর বাজিয়া উঠিল, গির্জ্জার দ্বারপথে নবদম্পতি উপস্থিত হইল,—সঙ্গে বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। প্রথমটা গির্জ্জার অভ্যন্তর-ভাগের ছায়ালোক হইতে বাহিরের সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত জগতে নির্গত হইয়া নব-দম্পতির দৃষ্টি যেন ঝলসিত হইয়া গেল, তাহার পর সকলের আনন্দ ও জয়ধ্বনির মধ্যে অভিনন্দিত হইয়া বর ডাক্তার পিয়ারে বুগরাট্ সম্মুখস্থ জনতার দিকে সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তখন দুইটি নীলোৎপল-নয়নের সম্মোহন দৃষ্টি যেন তাঁহার দৃষ্টিকে অন্য সকল দৃষ্টি হইতে সবলে আকর্ষণ করিল,—সে কি বিধাতার নির্ব্বন্ধ ?

সুস্থ, সবল, কমনীয়কান্তি নববিবাহিত বর,—পরম সুন্দরী নববিবাহিতা কন্যা, যেন মদন-রতি! সকলে একাগ্রচিত্তে বর-কন্যার রূপের ও সাজ-সজ্জার প্রশংসা করিতেছিল, হঠাৎ সকলে বরের মুখ-চক্ষুতে অপূর্ব্ব ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার লক্ষ্য-পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। নবোঢ়া বধূও স্বামীর অঙ্গে নির্ভর করিয়া রাজপথে পদার্পণ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহারও দৃষ্টি স্বামীর দৃষ্টিপথের প্রতি সবিস্ময়ে সম্প্রসারিত হইল।

গির্জ্জার সম্মুখস্থ পথের অপর পার্শ্বে একটি সুন্দরী যুবতী জনতার বক্ষ ভেদ করিয়া সকলের অগ্রভাগে আসিয়া স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। তাহার নীলোৎপল-নয়ন হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। তাহার সুবর্ণ-বর্ণ তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে মুখখানি প্রস্ফুটিত সুবর্ণ-শতদলের মত শোভা পাইতেছিল। কৌতুকাগ্রহে ঈষদুদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠের মধ্য দিয়া তাহার দন্তপাঁতি যেন মুক্তার মত ঝকমক করিতেছিল।

এই যুবতীর দিকে পিয়ারের দৃষ্টি একবার নিপতিত হইবামাত্র পিয়ারে স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। ময়ালসর্প যেমন হরিণ-শিশুকে দৃষ্টিতে সম্মোহিত করিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিতে থাকে, তেমনই সেই যুবতীও পিয়ারেকে আকৃষ্ট করিল। উভয়ে উভয়ের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, মনে হইল যেন তাহাদের সমস্ত মনোবৃত্তি দৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। উভয়েরই যেন অন্য বাহ্যবস্তুর জ্ঞান রহিত হইয়াছে, উভয়েই যেন হারানিধি কুড়াইয়া পাইয়াছে। ইহাই কি শনির দৃষ্টি!

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র—মুহূর্ত্ত পরেই ডাক্তার পিয়ারে বুগরাটের মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—তিনি অপ্রতিভ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সুন্দরী পত্নীর পরম সুন্দর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি অমনই ক্ষিপ্রগতিতে বধূকে আকর্ষণ করিয়া সুসজ্জিত শকটের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে সে যুবতী এই ঘটনার কারণ, সে হাসিয়া জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অ্যাণ্ড্রিয়া অডিবার্ট

এই যুবতীর নাম অ্যাণ্ড্রিয়া অডিবার্ট। তাহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময়ের পর হইতে ডাক্তার বুগরাটের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন সুসজ্জিত শকট তাঁহাকে ও তাঁহার নব-পরিণীতা পত্নীকে বহন করিয়া লইয়া চলিল, তখন তাঁহার মনের মধ্যে ভাব-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল,—কে এই মনোহারিণী মোহিনী যুবতী? কি নিষ্ঠুর উজ্জ্বল নীলোৎপল নয়ন দুইটি তাহার! আর একটি বার ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না?



অ্যাণ্ড্রিয়া অডিবার্ড

অকস্মাৎ পত্নীর মধুর অথচ চিন্তাব্যাকুল সম্ভাষণে ডাক্তার বুগরাটের তন্ময়তার ঘোর ভঙ্গ হইল—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। পত্নী বলিলেন, "কে ঐ যুবতী, পিয়ারে? সে কি তোমার পরিচিত? মা গো! যে ক'রে তোমার দিকে চেয়েছিল—যেন গিলতে আসছিল! কে সে? তুমি ওকে চেনো?"

পিয়ারে তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, গভীর প্রীতিভরে পত্নীর একখানি হস্ত ধারণ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, "না, প্রিয়তমে! আমি ইহার পূর্ব্বে জীবনে কখনও উহাকে দেখি নাই। তুমি ত জান, এই শ্রেণীর—এই নীচ শ্রেণীর নারীরা কেমন প্রকৃতির হয়। ওরা অমনই ক'রে অভিনয় করতে খুবই অভ্যস্ত। ওরা এই ভাবে ভদ্রলোককে অপ্রস্তুত ক'রে নিজেদের বন্ধু-মহলে পসার বাড়াতে ভালবাসে। আমি ভাবলুম, তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে।"

ডাক্তার শেষ কথাটা মিথ্যা বলিলেন কেন, বুঝা যায় না। তবে অন্য সব কথাই সত্য। সত্যই তিনি অ্যাণ্ড্রিয়াকে জীবনে আর কখনও দেখেন নাই; তিনি তাহাকে জানিতেনও না। সে যাহাই হউক, দিনটা যেন নব-দম্পতির উপর কেমন একটা গাঢ় ছায়া করিয়া রহিল। ইহার পর শকট যখন নব-দম্পতিকে বহন করিয়া ইটালীর মনোহর হ্রদাঞ্চলে মধুবাসর যাপন করিবার জন্য পৌঁছাইয়া দিল, তখন উভয়েরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—বস্তুতঃ নব-বিবাহিতা বধূ স্বামীর সঙ্গে নিরালায় প্রকৃতির রম্য ক্রোড়ে কালযাপন করিতে পাইয়া স্বর্গের সুখশান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। বুগরাটও প্রেমময়ী পত্নীর সান্নিধ্য-সুখে মগ্ন হইয়া মনে অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই আনন্দের মধ্যেও যেন কিসের একটা ব্যথা—কিসের একটা অভাব অনুক্ষণ জাগরূক থাকিত। সেই দৃষ্টি-বিনিময়ের মুহূর্ত্ত হইতে অ্যাণ্ড্রিয়ার মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহাকে ক্ষণমাত্রও স্বস্তি প্রদান করে নাই—সে যেন সর্ব্বদা হাসি হাসি মুখে উজ্জ্বল নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাঁহাকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিত। চক্ষু মুদিত করিলেই তিনি দেখিতেন,—সম্মুখে ভাসিতেছে অ্যাণ্ড্রিয়ার বান্ধুলী-পুষ্পের মত হাস্যস্ফুরিত ওষ্ঠাধর, উজ্জ্বল নীলোৎপল নয়ন, কুঞ্চিত কেশদাম! রাত্রিকালেও স্বপ্নে অ্যাণ্ড্রিয়া তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিত না। ডাক্তার এক এক দিন বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিতেন,—"ডাকিনী আমায় যাদু করেছে! হে ভগবান্, কিসে নিষ্কৃতি পাই!"

এক দিন রাত্রিকালে বিনিদ্রনয়নে ডাক্তার পত্নীর সহিত শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জেত্তাতুরায় বিশ্বাস কর?" জেত্তাতুরা ইটালীয়ান ভাষার কথা, ইহার অর্থ শনির দৃষ্টি (evil eye)! তাঁহার পত্নী প্রশ্নের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন প্রিয়তম? কি বিদ্‌ঘুটে তোমার প্রশ্ন?"

ডাক্তার জবাব দিলেন, "কেন? কেন—জিজ্ঞাসা করছ? বিবাহের দিনের কথা মনে আছে? সে দিন যে নারীটা আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল, এখনও মনে হয়, সে যেন তেমনই ক'রে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে!"

তাঁহার পত্নী শিহরিয়া উঠিলেন এবং রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টানদের প্রথানুসারে বক্ষের উপর হাত দুইখানি ক্রশের আকারে রক্ষা করিলেন (শয়তান বা ডাইন তাড়াইবার ঔষধ—আমাদের 'রাম, রাম' শব্দের মত), স্বামীর মঙ্গলার্থ উপরে কত প্রার্থনা জানাইলেন। ইহার পর ডাক্তার তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে নির্জ্জনে অশ্রুবিসর্জ্জনও করিতে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তারের আত্মরক্ষার এই শেষ চেষ্টা। ইহার পর ভাগ্য তাঁহাকে অ্যাণ্ড্রিয়ার দিকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

অ্যাণ্ড্রিয়ার জন্য প্রবলকামনা

ডাক্তার যতই চেষ্টা করেন, এ্যাণ্ড্রিয়ার চিন্তাকে মন হইতে বিসর্জ্জন দিবেন, ততই সেই চিন্তা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসে। সে যেন এক প্রবল কামনার উন্মাদরোগ! ডাক্তার শিক্ষিত, বিদ্বান্, সম্ভ্রান্ত, গণ্য, মান্য। তিনি জানিতেন, তিনি বুঝিতেন যে, অ্যাণ্ড্রিয়ার প্রতি আসক্ত হইলে তাঁহার সুখের সংসার ছারেখারে যাইবে, তিনি ভদ্রসমাজে মিশিবার উপযুক্ত থাকিবেন না, কেন না, অ্যাণ্ড্রিয়া সমাজের যে স্তরের নারী, সে সমাজে আর তাঁহার সমাজে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ, হয় ত এই অসমান মিশ্রণের ফলে তাঁহাকে সমাজের অধঃস্তরে নিপতিত হইয়া নানা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, মনুষ্য নামের উপযুক্ত গুণে বঞ্চিত হইতে হইবে। ডাক্তার এ সকল কথাই বুঝিতেন। কিন্তু তবু চোখের নেশার কি ভীষণ আকর্ষণ,—তাঁহার প্রাণ অ্যাণ্ড্রিয়াকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই বাসনানল অহরহঃ তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মধুবাসরের সুখ আরাম-নিবাসে ডাক্তারের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল—নবোঢ়া সুন্দরী যুবতী পত্নীর ঐকান্তিক প্রেম ও সেবা তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল।

তখন তিনি কোন কথা না শুনিয়া এক দিন মার্সেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রু-সেনাক নামক রাজপথে পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য একখানি বাটী ভাড়া করা হইয়াছিল। সেখানে প্রথম কয় দিন গৃহের সাজসজ্জা সম্পন্ন করিতে এবং বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সহিত আদর-আপ্যায়ন, আমোদ-প্রমোদ ও আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে বেশ একরূপ আনন্দে অতিবাহিত হইল।

কিন্তু ডাক্তারের মন আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তার রোগী দেখিতে যাইবার নাম করিয়া মার্সেলের অলি-গলি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—কোথায় তাঁহার মনোমোহিনী ডাকিনী লুকাইয়া আছে! ইহার জন্য তিনি চোর-ছেঁচড়, গাঁটকাটা, বদমাসদের আড্ডা ও বস্তীসমূহেও ঘুরিয়া বেড়াইতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না, প্রাণের আশঙ্কাও করিতেন না।

কিন্তু কোথায় সেই মনোহারিণী! তাহাকে ত কোথাও পাওয়া যায় না। তখন ডাক্তার একরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এখন হইতে তিনি স্ত্রীরোগ-চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ হইলেন, আশা,—হয় ত স্ত্রী-রোগীর মধ্যে এক দিন না এক দিন 'তাহার' সাক্ষাৎ পাইবেন! কি ভয়ানক নেশা, মনে করুন দেখি? সন্ধ্যার পর রোগী দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া তিনি অলি-গলি ঘুরিতে লাগিলেন এবং শুঁড়িখানায়, চাটের দোকানে, হোটেলে, রেস্তোঁরায় অ্যাণ্ড্রিয়ার শ্রীমুখদর্শনের আশায় পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একবার তাহাকে দেখিব—একবার তাহার নয়নের চুম্বক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব,—এই কামনা জ্বলন্ত পাবকের মত তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে টগ-বগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তিনি ডাক্তার, তাই সহজেই বুঝিলেন যে, পাগল হইয়া যাইতেছেন, তাই সেই কুহকিনীর আকর্ষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সাধ্য কি তাঁহার সেই আকর্ষণের বন্ধন ভঙ্গ করেন!

আবার দেখা

কয়েক মাস অহরহঃ ঘুরিয়াও ডাকিনীর সাক্ষাৎ মিলিল না। এ দিকে গৃহে অশান্তি উপস্থিত হইল। যে স্বামী পত্নীকে এক দিনও ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না, তিনি এখন সেই পত্নীকে রীতিমত অবহেলা অনাদর করেন। নিজের দেহ শীর্ণ হইয়াছে, পত্নীরও

ভাবিয়া ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়া তাহাই হইয়াছে। এমন দিন যায় না, যে দিন পতি-পত্নীতে কলহ না হয়! অথচ এই গৃহই পূর্ব্বে কি শান্তির আগার ছিল!

এই সময়ে একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। কিছু দিন এই মায়ার পুত্তলী পিতা-মাতার মধ্যে নষ্ট-প্রীতি পুনরানয়ন করিয়া দিল। কিন্তু—সেও অতি অল্পদিন,—ডাক্তার আবার অশান্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, আবার তাঁহার বুকের ভিতর অ্যাণ্ড্রিয়ার দর্শনের অভাবানল শতগুণে জ্বলিয়া উঠিল। ওগো, কোথায় আছ, একটিবার দেখা দাও!

শয়তান তাঁহার আকুল কামনা পূর্ণ করিল—এক দিন হঠাৎ ঘোড়দৌড়ের মাঠে অ্যাণ্ড্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল, শয়তান তাহার আকর্ষণের শৃঙ্খল ভাল করিয়া তাঁহার অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি অতি নীচ-শ্রেণীর কাফে ও রেস্তোঁরায় অ্যাণ্ড্রিয়ার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল জঘন্য স্থানে কাফরী, লস্কর, চীনা কুলী এবং নানাজাতীয় শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণকায় গুণ্ডা ও চোরদের আড্ডা ছিল। প্রায়ই এই সকল স্থানে ছোরামারামারি, ঘুষাঘুষি, পিস্তল ছোড়াছুড়ি চলিত, প্রায়ই এই সকল স্থানে খুন-জখম হইত; মাতলামি, জুয়াখেলার বাজী রাখিয়া মুষ্টিযুদ্ধ এই সকল কাফে রেস্তোঁরার অঙ্গভূষণ ছিল। অনেক দিন ডাক্তার নিশাশেষে আহত ও বিকলাঙ্গ হইয়া কোনরূপে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সরল সাধু প্রকৃতিও অন্তর্হিত হইল, তিনিও গুণ্ডা-বদমাসদের সহবাসে ক্রমশঃ ধূর্ত্ত, নির্দ্দয় এবং জুয়াচোর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! দিবাভাগে তিনি সেই মানুষ থাকিতেন না—তখন গণ্যমান্য শিক্ষিত ডাক্তার সাজিয়া রোগী দেখিয়া ভদ্রসমাজে মিশিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার এই দুই রূপধারণ উপন্যাসের ঘটনার মত রোমাঞ্চকর।

যখন ডাক্তারের মনের অবস্থা এইরূপ, সেই সময়ে এক দিন হঠাৎ ঘোড়দৌড়ের মাঠে তিনি দূর হইতে দেখিলেন, অ্যাণ্ড্রিয়া সাজিয়া গুজিয়া মাঠে খেলা দেখিতেছে। কতকগুলা লোক হর্ষভরে চীৎকার করিতে করিতে একটা জকিকে স্কন্ধে তুলিয়া আস্তাবলের দিকে দৌড়াইতেছিল,—তাহার ঘোড়া বাজী জিতিয়াছিল। ডাক্তার সেই ভিড়ের মধ্যে অ্যাণ্ড্রিয়াকে দেখিলেন,—সে কুন্দদন্তে রক্তাধর টিপিয়া ভিড় হইতে বাহির হইতেছিল। ডাক্তারের মাথা ঘুরিয়া গেল,—তিনি জনতা ভেদ করিয়া উন্মত্তের মত তাহার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জনতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হতাশ ও রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, জনতার নিকট উত্তম-মধ্যম শিক্ষাও পাইলেন। কিন্তু হায়, যাহার জন্য এই উন্মাদনা, সে তখন এক দল গুণ্ডা বদমাসের (Apaches) দ্বারা বেষ্টিত ছিল—তাহাদের ব্যূহভেদ করিয়া ঈপ্সিতের নিকট অগ্রসর হওয়া সহজ কথা নহে। তখন হতাশ প্রেমিক ডাক্তার বুরগাট অনন্যোপায় হইয়া দূরে থাকিয়া অ্যাণ্ড্রিয়ার অনুসরণ করিলেন।

বদমাসের দল এক মদের দোকান হইতে অন্য মদের দোকানে গিয়া হল্লা করিয়া 'রাজীমাতের' আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। ডাক্তার দেখিলেন, অ্যাণ্ড্রিয়াও পূর্ণমাত্রায় তাহাদের এই পাশব উৎসবে যোগদান করিল। তখন ডাক্তার বুঝিলেন, তাঁহার মোহিনী কোন্ শ্রেণীর নারী! কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই, শনির দৃষ্টি এড়াইবার তাঁহার আর তখন কোন উপায় ছিল না।

প্রায় তৃতীয় প্রহরের শেষে এই গুণ্ডার দলের হল্লা ভাঙ্গিল। তখন দলের একটা লোক দল-ছাড়া হইয়া অ্যাণ্ড্রিয়াকে একরূপ আলিঙ্গন করিয়া সমুদ্রতটের এক অন্ধকূপ—জঘন্য বস্তীতে লইয়া চলিল—অ্যাণ্ড্রিয়া তখন সুরাপানে একরূপ বিভোরের মত হইয়া গিয়াছে, তাহার সুন্দর মুখ হইতে অতি অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ গান বাহির হইতেছে। কিন্তু শনির এমনই 'গুভদৃষ্টি' যে, ডাক্তার তাহাতেও বিচলিত হইলেন না, তিনি এই যুগল-মূর্ত্তির অনুসরণ করিয়া এক নোংরা আবাস-গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীটা দেখিয়াই ডাক্তার বুঝিলেন, উহা চোর-ছেঁচড় ও খুনে ডাকাতের আবাস! ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছে, সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ভদ্রঘরের ভদ্রসন্তান, শিক্ষিত মার্জ্জিত-রুচি ডাক্তারের তথাপি কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাছে অ্যাণ্ড্রিয়া দৃষ্টি-ছাড়া হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি সেই বাড়ীটার বিপরীত ফুটপাথের উপর অবস্থিত এক চীনার চায়ের দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই গভীর রাত্রিতেও তথায় ছোটলোক বদমায়েসের হল্লা চলিতেছিল। ডাক্তার শ্রান্তি দূর করিবার মানসে পর পর তিন পেয়ালা অহিফেনের আরক-মিশ্রিত চা-পান করিয়া ফেলিলেন। শেষ পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দেখিলেন, দুইটি যুবতী চা খাইতে খাইতে তাঁহার দিকে চাহিয়া ফুসফুস করিতেছে। তাহারা তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া বিন্দুমাত্রও অপ্রতিভ হইল না, বরং একটি যুবতী উঠিয়া আসিয়া বলিল, "তুমি কি পুলিসের লোক?"

বুগ্‌রাট। না। আমি ঐ বাড়ীতে যে নীলনয়না রক্তাধরা বালিকা বাস করে, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।

বালিকা। (বিস্মিত হইয়া) ওঃ, তুমি অ্যাণ্ড্রিয়া লা গুপ্পার কথা বল্‌ছো? তুমি ত দেখছি আমাদের গণ্ডীর নয়, আর সে-ও ত প্যান্থার মেরায়াসের প্রণয়িনী—যার নাম শুনলে পুলিস ভয়ে থর থর কাঁপে, তার মত গুণ্ডা বদমাস এই মার্সেলস বন্দরে নেই। তাই বলছি, লা-গুয়াপার কাছে যেও না, হ'লেই বুকে ছোরার ঘা খাবে। যাও, পালাও।

বুগ্‌রাট। (সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া) অ্যাণ্ড্রিয়া কি? ওর পদবী কি?

বালিকা। অভিবার্ট। সে আর্লেসের বাসিন্দা, এখানে এসেছে। আমরা ওকে লা-গুয়াপা বলি, কারণ, ওকে দেখতে স্প্যানিয়ার্ডদের মত। মেরায়াসকে ভালবাসে বলেই ও ঘর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। যদি ইচ্ছে কর, আমি গিয়ে ওকে বলতে পারি যে, তুমি ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাও—অর্থাৎ যদি টাকা ছাড়তে পার, তা হ'লে না হয় মেরায়াসের ছোরার ভয় তুচ্ছ ক'রে ওকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আস্‌তে পারি।

ডাক্তার বুগ্‌রাট তখন একবারে উন্মত্ত; জ্ঞানহারা হইয়া পকেট হইতে মণি-ব্যাগ বাহির করিয়া একখানা ব্যাঙ্কনোট যুবতীর হস্তে ফেলিয়া দিলেন—একবার মনেও ভাবিলেন না যে, সেই জঘন্য স্থানের বদমাস ডাকাতরা তাঁহার ব্যাগের পেট মোটা দেখিয়া তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে!—এমনই উন্মত্ত তিনি তখন অ্যাণ্ড্রিয়ার লোভে!

যুবতী সম্মুখের গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, ডাক্তার অস্থির আশাব্যাকুল চিত্তে গৃহের সম্মুখে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কতক্ষণে অ্যাণ্ড্রিয়ার দর্শনলাভ করিবেন। আশ্চর্য্য! অ্যাণ্ড্রিয়া সুন্দরী যুবতী, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিক সুন্দরী তিনি নিজ শ্রেণীর মধ্যে বহুবার দেখিয়াছেন, কিন্তু এ যে শনির দৃষ্টি, শয়তানের আকর্ষণ! ডাক্তার তখন ভাবিতেছেন,—শয়তান তাঁহার ও অ্যাণ্ড্রিয়ার মধ্যে যে শিকল পরাইয়া দিয়াছে, তাহা ইহজীবনে ছিন্ন হইবার হইলে মনের এমন অবস্থা হইবে কেন?

অল্পক্ষণ পরেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইল, দ্বারপথে দুইটি নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইল—সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল—ঈপ্সিত ধন সম্মুখে, অথচ চরণ যেন চলিতে চাহে না! শয়নে স্বপ্নে যাহাকে অহরহঃ দেখিতেছেন, যাহার কামনায় আকুল হইয়া সংসার ভাসাইয়া দিয়াছেন, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, পথে পথে চোর-ছেঁচড়ের মত, ছোটলোকের মত মাতাল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,—সেই মনোমোহিনী অ্যাণ্ড্রিয়া একবারে চক্ষুর সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত, অথচ কি আশ্চর্য্য, একটি আদরের কথা—একটি সম্ভাষণের কথাও মুখে সরে না! শেষে বহুকষ্টে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, "কুমারি! (Mademoiselle) আমি—আমি—আমার বিয়ের দিনে যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই ভালবেসে ফেলেছি—আমায়—আমায়—দয়া—"

সহসা সেই নৈশ-নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অ্যাণ্ড্রিয়ার উচ্চ হাস্য-ধ্বনি ছাইয়া ফেলিল—ডাক্তার সেই বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার হাসি শুনিয়া একবারে এতটুকু লইয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দূতী বালিকাটিও সরিয়া পড়িল। তখন একবারে ডাক্তার বুগ্‌রাটের মুখে কথার বন্যা বহিয়া গেল—গৈরিক নিঃস্রাবের মত তাহা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল, সম্মুখে যাহাকে পাইল, দলিত পিষ্ট করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। কেমন করিয়া অ্যাণ্ড্রিয়ার চিন্তা তাঁহার শান্তি হরণ করিয়াছে, কেমন করিয়া সে শয়নে স্বপনে জাগরণে ধ্যানে সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে, কেমন করিয়া সে তাঁহাকে স্ত্রী-কন্যা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, কেমন করিয়া সে তাঁহাকে দরিদ্র বস্তীর কাফে রেস্তোরায় চোর-ডাকাতের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া সহবাস করিতে অভ্যস্ত করাইয়াছে,—ডাক্তার ঝড়ের বেগে সেই সকল কথা বলিয়া গেলেন।

অ্যাণ্ড্রিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বড়লোক?"

ইহা প্রণয়িনীর প্রথম সম্ভাষণ! কিন্তু ডাক্তার ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝিলেন না—অ্যাণ্ড্রিয়া কি ধাতুতে গঠিত, তাহার পরিচয় পাইয়াও টলিলেন না, এক মুখ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, প্রিয়তমে! আমি খুব বড়লোক, আমি তোমায় খুব সুখে রাখব—গাড়ী-জুড়ী, হীরে-জহরৎ, মাণিক-মুক্তো—"

অ্যাণ্ড্রিয়া বিম্বাধরে হাসি ফুটাইয়া তাঁহাকে আরও উন্মত্ত করিয়া বলিল, "তা ত বুঝলুম, কিন্তু মেরায়াস—"

কথাটা শেষ করিতে হইল না, অতি নিকটেই কর্কশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজে কে প্রশ্ন করিল, "কে আমার নাম করছে এখানে?" সঙ্গে সঙ্গে গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে একটা বলিষ্ঠ মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল,—ডাক্তার চিনিলেন, সে-ই মেরায়াস। লোকটা দেখিতে সুপুরুষ হইলেও তাহার মুখখানা তখন অতিরিক্ত মদ্যপানে এবং হিংসাক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। সার্থক তাহার সঙ্গীরা তাহাকে 'প্যান্থার' বা ব্যাঘ্র নাম দিয়াছিল,—সে এক লম্ফে ডাক্তার বুগরাটের সম্মুখীন হইল এবং এক হস্তে তাহার প্রণয়িনী অ্যাণ্ড্রিয়াকে একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়া মুখখানা একবারে ডাক্তারের মুখের নিকট লইয়া গিয়া বিকট রবে হাসিয়া উঠিল। ডাক্তার কোনও প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বেই সেই প্রকাণ্ডদেহ অসুরটা ঘাড় গুঁজিয়া ডাক্তারের তলপেটে আক্রমণ করিল, মুহূর্ত্তে চৈতন্য হারাইয়া ডাক্তার সেই দ্বারপথে পড়িয়া গেলেন—তাঁহার অন্তরের চক্ষুর সম্মুখে তখন যেন সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

চন্দ্রশেখর-পাদমূলে

কত লক্ষ যুগ ধরি' কি অত্যুগ্র করিয়ে সাধন
কোমল-মৃত্তিকা-তনু প্রস্তরেতে হ'ল পরিণত!
প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপ ঝঞ্ঝা বৃষ্টি বজ্র-গর্জ্জন—
উপেক্ষিয়া এ সকল অবিচল আছ যোগ-রত।
দুর্ভেদ্য-প্রস্তর-অঙ্গ কত মতে আঁকড়ি' আঁকড়ি'
কত লক্ষ বৃক্ষ-লতা অরণ্যানী করেছে সৃজন,
সুবিশাল দেহ জুড়ি' সে অরণ্য রহিয়াছে পড়ি';
রচিয়াছ ভূ-কৈলাস চন্দ্রনাথ-শিব-নিকেতন।

কোথায় পরম-শিব নিত্যানন্দ দেব চন্দ্রনাথ!
কোথায় ক্ষরিছে সুধা সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্র-মুখে!
সে সুধা করাতে পান বারে বারে পরম কৌতুকে
কুলকুণ্ডলিনী মায়ে মিলাইছ মহেশ্বর সাথ।
জাগাইতে ভুজঙ্গীরে বম-বম-হুঙ্কার-ঘোষণা—
উঠিছে ওঙ্কার-ধ্বনি; সিদ্ধ তব চরম সাধনা।

শ্রীপ্রসাদকুমার রায় (বি, এ)

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1853



ত্রিবেণী

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অমাবস্যার পর আজ দ্বিতীয়া মাত্র, চাঁদের আলো নাই, আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমিয়া উঠিতেছে। অন্ধকারের পর অন্ধকার যেন গায়ে গায়ে জড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই নিবিড়তা যেন নিশ্ছিদ্র, কোনখানে এর এমন একটু ফাঁক দেখা যায় না, যেখান দিয়া এতটুকু একটু আলোর রেখা চোখে পড়ে! মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়ায় আকাশের মেঘগুলা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়া চলন্ত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একটা নক্ষত্র একটুখানি উঁকি দিয়া দেখিয়া আবার যেন তখনই সভয়ে মুখ লুকাইতেছে। কখনও এই বিরাট্ অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে একীভূত কোন একটা গাছের গায়ে কতকগুলা জোনাকীও ঠিক উহাদেরই অনুকরণ করিতেছিল। ঐ অসীম অন্ধকাররাশির উপরে সুগভীর লজ্জা-জ্বালাময় বেদনার্ত্ত দৃষ্টি স্থির রাখিয়া রাজাধিরাজ মূঢ়ের মতই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নিদারুণ দুঃখ-গ্লানির একটা অকথ্য আবেগ তাঁহার স্বভাবতঃ অনুতাপহীন নিষ্ঠুর চিত্তকে আজ একটা নূতন পথে পরিচালিত করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দোলা আসিয়া তীর-সংলগ্ন হইল, রাজপাদোপজীবী দাসগণ আসিয়া হাত ধরিয়া নামাইয়া পুনশ্চ তাঁহাকে সুসজ্জ তরণীর উপর আস্তৃত সুকোমল রাজাসনে বসাইয়া দিল, রাজাধিরাজ সে সবের কিছুই যেন উপলব্ধি করিতেও পারিলেন না। তিনি যন্ত্রপরিচালিত প্রাণহীন পুত্তলিকার মতই নিজেরও অজ্ঞাতে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চলিতেছিলেন। মনের মধ্য হইতে তাঁহার তখন আজিকার এই অভাবনীয় ভয়াবহ ও শোচনীয় ঘটনার আঘাতের বিহ্বলতা বিদূরিত হয় নাই। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আজ চিরদিনান্তে মহীপালদেবকে যেন তাঁহার চিরবিলুপ্ত অন্তর্য্যামী বড় কঠিন বলেই আঘাত করিয়াছিলেন! এই দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অবিস্মৃত ভীষণ স্মৃতি—যে স্মৃতির জ্বালা ভুলিবার জন্য আজিকার এই নূতন জ্বালার সৃষ্টি করা, সেইটা শুদ্ধ যেন তাঁহার চিত্ত-সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে থাকিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেই সঙ্গে এই দুইটি নারীরক্তের গাঢ় উজ্জ্বল রক্তিমার মধ্য দিয়া কি ভীষণভাবেই প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল—তাঁহার নিজের জীবন!

করতোয়া কুলু কুলু রবে গাহিয়া ভঙ্গীভরে নাচিয়া চলিতেছিল। জগৎপ্রসিদ্ধ পাল-সম্রাটগণের সহস্র কীর্ত্তিগাথা হয় ত তাহার ঐ কলধ্বনির মধ্য দিয়া বিচিত্র সুরে গাহিয়া চলিয়াছে! কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিসমূহ দ্বারা বিভূষিত, কীর্ত্তিমেখলা মহানগরীর সুপবিত্র পদরজঃ ধোয়াইয়া দিয়া অমৃতসলিলা করতোয়া পুণ্যবতী ভাগীরথী সঙ্গমের মহোল্লাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। বক্ষে তাহার এই সাম্রাজ্যেশ্বরগণের কত উন্নতি অবনতির, হর্ষ-শোকের স্মৃতিচ্ছায়া একসঙ্গে বিজড়িত। এজন্ম সুখে আত্মসুখ-নিমজ্জনকারী রাজযোগিগণ ইহারই অঙ্কে সহাস্যে আশীর্ব্বাদপূত পবিত্র দেহ বিসর্জ্জন করিয়া কে জানে আজ কোন্ সে অজানা আনন্দলোকে অধিষ্ঠিত! তাঁহাদেরই কীর্ত্তি-সঙ্গীত এর কণ্ঠে এখনও গীত হয়। আর আজ? আজ এই যে তাহার এই অফুরন্ত কলতান, এ কি শুধু কোন এক সেই মর্ম্মন্তুদ করুণকাহিনীর স্মৃতি-গাথা নহে? এ কি আজিকার এই অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ব্যাপার—যাহা স্মরণপথে আসিলে শোক-লেশহীন, করুণালেশশূন্য পাষাণচিত্ত রাজাধিরাজকেও ভিতর হইতে শব-শীতল ও বজ্র-স্তম্ভিত করিতেছে, তাহারই জন্য মর্ম্মান্তিক বিলাপকাতরতা? উঃ—উঃ—উঃ, রাজাধিরাজ অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। চিরপরিচিত এই নদীজলের তৃণদল, যাহা এক সময় প্রমোদ-মত্ততায় কেলি-কুঞ্জে বসিয়া সুন্দরীর সুমধুর নূপুর-নিক্কণ-রব, অথবা বনমালীর বেণুরবমুখর প্রেমোন্মাদিনী যমুনার আনন্দ-বিলাস বোধ হইত, আজ তাহাই যেন তাঁহার কানে কাহার মরণ-যাতনা মর্ম্মবিদারক রোদনের মতই অসহ্য হইয়া উঠিল! এ কি হইল? এ কি হইল? উজ্জ্বলা! ওঃ, চন্দ্রকলা! উজ্জ্বলা! এই যুগল-স্মৃতির বেড়া আগুন যে আজ চারিদিক দিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ যে তাঁহাকে রীতিমতই দগ্ধ করিতে লাগিল।

ঘুমন্ত স্তব্ধ বিশাল রাজপ্রাসাদ যেন একটা প্রকাণ্ডাকার দৈত্যের প্রাণহীন শবদেহের মতই নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। ইহার কোন অঙ্গেই যেন এতটুকু একটু প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। প্রাসাদে ঢুকিয়া রাজাধিরাজ ক্ষণে ক্ষণে যেন চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল; এই সুষুপ্ত অন্ধকারের কৃষ্ণ আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া যেন কাহার মৃত্যু-শীতল নিস্পন্দ দেহ কোথায় পড়িয়া আছে, চলিতে গেলে হয় ত এখনই তাহার সেই তুষারশীতল অঙ্গে তাঁহার এই থরকম্পিত চরণ স্পৃষ্ট হইয়া যাইবে! রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে আর্ত্তব্যাকুলতায় কোনমতে উচ্চারণ করিলেন, "ক্ষেমন্ত! আরও আলো চাই,—আলো, আলো—আরও অনেকগুলো আলো জ্বালাও!"

বিশ্রাম! হায়, বিশ্রাম আজ কোথায়? এ কি শয্যা! সর্পর্য্যঙ্কে কোমল পট্টশয্যা—এ যে কণ্টকশয্যার মতই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে! চন্দ্রকলা! কে ঐখানে? ঐ যে মৃদু মৃদু অলঙ্কারের শিঞ্জনরব শ্রুত হইল না? কতবার সে যে এমনই নিঃশব্দপদে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছে! আঃ, কি সেই নবনীত-কোমল হাত দুখানি! কি স্নিগ্ধ মধুর সেই প্রিয়স্পর্শ! সর্ব্বাঙ্গে হর্ষসা সে কি স্মিত শিহরণ আনিয়া দিত! কত কাল—কত দিন—কত যুগই রে! ওরে, এ জন্মের মতই সেই প্রিয়-স্পর্শ-সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে! কিন্তু—কিন্তু—এ স্মৃতি যে যায় না। নশ্বর জগতে সবই যখন অস্থায়ী, তখন স্মৃতিগুলাই বা এত বড় স্থায়ী কেন? ওরে, যাক্, যাক্, এই সুখের স্মৃতি দুঃখের মধ্যে বিলীন হইয়া যাক্! প্রতি রাত্রিতে এত কষ্ট আর এমন করিয়া সহ্য করা যায় না! চন্দ্রা! না না, চন্দ্রা! কোথা তুমি? কোথা তুমি প্রিয়া! প্রেয়সী আমার! কেন মিথ্যা মহাশত্রু রামপালকে ভালবাসিতে গেলে? তার প্রেমে আমায় কেন অত তুচ্ছ করিলে? কেন নিজের সুন্দর সুকুমার সানন্দ জীবনকে অকালে এমন নিষ্ঠুর রূপে শেষ হয়ে যেতে দিলে? ওঃ,—ওঃ,—কেন দিলে চন্দ্রা! কেন দিলে?

রাজাধিরাজ উপধানতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিবস্ত্র দেহ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতে থাকিল, তাঁহার উত্তপ্ত ললাট ও কর্ণমূল গাঢ় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া যেন তাঁহাদের অগ্নিদাহ-জ্বালায় জ্বালাইয়া তুলিল। ক্ষণপরে পুনশ্চ অতি মৃদুমন্দস্বরে আত্মগতই বলিয়া উঠিলেন, ওকে ত এক রকম চাপা দিয়েছিলেম, কিন্তু এ কি আর ভুল্‌তে পারব? পেলুমও না, কিছুই না, শুধু শুধু একটা যন্ত্রণা বাড়িয়ে গেল! কি শত্রুই যে ছিল ও! কেন বাপু, সে দিন ভরা-সন্ধ্যেবেলা প্রকাণ্ড একটা কলসী নিয়ে জল নিতেই বা এলি? আর আমার চোখেই বা পড়তে গেলি কেন? নাঃ, এ সব যেন কার ষড়যন্ত্র! ওকে না দেখলে ত আর আমি কোন দিনই ওকে পেতে চাইতুম না! এ সব মিথ্যে বিড়ম্বনার ভোগও আমায় তা হ'লে ভুগতে হ'ত না! আঃ, এখন করি কি? যাই কোথায়? ঘুম ত আর হবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না! যাই কোথায়? পারছি না যে! একা থাকতে পারছি না যে! কি করি? কি করি? সেই মূর্চ্ছা-কাতর মুখখানা ভোরবেলার চাঁদের মত ক'দিন আমায় ক্রমাগত তারই দিকে টেনেছিল, কিন্তু আজ ওর রক্তমাখা মূর্ত্তি কি বীভৎস, কি ভয়ানকই যে দেখাল! অকথ্য যন্ত্রণায় অমন যে অপার্থিব সুন্দর মুখ সে যেন এক নিমেষেই কালিঢালা হয়ে গেল। না না, মনে কর্‌তে পারছি না। সহ্য কর্‌তে পারছি না। কাকে ডাকতে বলি? কার কাছে যাই? কে আমায় সে দৃশ্যটা ভুলিয়ে দেবে? কে দেবে? পার্‌বে কি কেউ? বিদ্যুৎ, উহুঁ, না—না—না—ও হাসি-খুসী রঙ্গরস, ও যেন আজ আর মনে কর্‌তে পারছি না—ভাল লাগছে না। বোধ হচ্ছে যেন ভাল লাগবে না! কাকে ডাকি? কার কাছে যাই? কে আস্‌বে? কে আমায় এতটুকু শান্তি দিতে পার্‌বে? একটু শান্তি, একটু ঘুম—একটু শান্তি, একটু ঘুম! কে কে, কে দেবে? কে দেবে? কেউ না—কেউ না—কে আছে? কে আমার আছে যে দেবে?

মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহীপালদেব তাঁহার বিশাল সম্রাজ্যের মধ্যে দীনাতিদীন, দীনতম ভিখারীরও অধমভাবে অনন্যসহায় একা সেই গভীর মনোদ্বেগের মধ্যে শয্যালুণ্ঠিত থাকিয়া আর্ত্ত-বিলাপের সহিত মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'আমার কে আছে? কেউ নেই—নেই!'

সহসা তাঁহার মনের ভিতরে যেন গভীর অন্ধকার-রাশিমধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই চকিতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল—একখানা পরিচিত মুখ! সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, সে মুখ গৌড়-মগধের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পট্টমহাদেবীর!

মহারাজাধিরাজের বক্ষোবদ্ধ কৃচ্ছ্র-শ্বাস জোরে বহিল, উষ্ণ-রক্তের পূর্ণ তাপ শীতলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সহসা তাঁহার প্রাণের ও প্রাণের মধ্য হইতে একটা নিদারুণ তীব্র আকাঙ্ক্ষা সবেগে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে সবলে টানিয়া তুলিল এবং সে তাহার সমুদয় বিরুদ্ধ-যুক্তি এবং অপরিসীম লজ্জার ব্যবধানকে তারস্বরে অস্বীকার পূর্ব্বক তীব্র প্রলোভনের সঙ্গে বলিতে লাগিল, "হোক তা, তবু সেই তোমার আপনার! সে তোমায় কখনই ত্যাগ করে নাই, আজ একমাত্র তার সেবা-শীতল সঙ্গই তোমার প্রার্থিত। তাই যাও—তাই যাও।"

মহীপালদেব ডাকিলেন, "শুভদাস!"

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"—মহাদেবি!"

সেই মাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে পট্টমহাদেবী লজ্জাদেবী শিবস্মরণ করিয়া দারুণ দুঃস্বপ্নের দুশ্চিন্তাকে চাপা দিতে চেষ্টিত হইতেছেন, সহসা তাঁহার কর্ণকুহরে এই একান্ত অপ্রত্যাশিত আহ্বান-ধ্বনি জাগিয়া উঠিল।

ও কে ডাকে? এ কি মহারাজাধিরাজের কণ্ঠস্বর না? সত্যই কি তিনি? অথবা এ-ও ঐ রকমেরই আরও একটা দুঃস্বপ্ন? লজ্জাদেবী কি এখনও নিদ্রিতা?

কৈ না! এই ত চোখ তাঁহার খোলাই রহিয়াছে! স্তিমিত-শিখ সুবর্ণ-দীপ সুবৃহৎ কক্ষের মধ্যে আলোছায়ার স্বপ্ন-লোক যদিও রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি স্বপ্নের অপেক্ষা ইহাতে বাস্তবেরই প্রাধান্য।

"পট্টমহাদেবি! লজ্জাদেবি!"

সত্য সত্যই তবে মহারাজাধিরাজ আসিয়াছেন! রাত্রির এই তৃতীয়যামে ও অসময়ে—এ সময়ে তিনি এখানে কেন? এ কি অভূতপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত এ ঘটনা? নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিতান্তই কোন বিসদৃশ ঘটনার কোন অঘটনঘটনার সমাবেশ আছে। পট্টমহাদেবী ত্রস্ত-বিস্ময়ে দ্বার মুক্ত করিলেন।

"আঃ মহাদেবি! বড় ক্লান্ত আমি! একটু ঘুম, একটু বিশ্রাম চাই, দেবে কি আমায়!"

"আসুন—আসুন, রাজাধিরাজ!"

লজ্জাদেবী দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজের উপভুক্ত শয্যা হইতে আস্তরণ উঠাইয়া লইয়া তদুপরি নূতন ও শুভ্রতর আবরণ-বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া তাহাতে নাগেশ্বর-পুষ্পরেণু-সংযুক্ত অগুরু-চন্দনের ছড়া দিয়া দিলেন, কক্ষভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত খসখসের তৈয়ারি হাতপাখাখানা হাতে লইয়া বীরকণ্ঠে কহিলেন, "শয্যা গ্রহণ করুন, আমি বাতাস করছি, ঘুমোতে পারবেন।"

"আঃ, পারবো কি? পারবো, লজ্জা! ঘুম আমার হবে! আমার যেন মনে হচ্ছে, এ-জন্মে আর কখন আমি ভাল করে ঘুমোতে পারবো না। তুমি বল, পারবো?"

"পারবেন বই কি"—বলিয়া মহাদেবী স্বর্ণপাত্র-পূর্ণ শীতল জল আনিয়া তাঁহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন।—"পান করুন, শরীর স্নিগ্ধ হবে।"

জলপানান্তে অনেকখানি সুস্থ বোধ করিয়া রাজাধিরাজ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ!" তাহার পর ঈষৎ সঙ্কুচিতপদে অগ্রসর হইয়া নিজের প্রথম জীবনের মাত্র কয়েক দিনেরই অভিকৃত পালঙ্কে আরোহণ পূর্ব্বক শয্যা গ্রহণ করিলেন।

এই কার্য্যটি করিতে তাঁহাকে অনেকখানিই দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটাইতে হইল, কিন্তু যতটা হইতে পারিত, মহাদেবীর স্বাভাবিক ব্যবহারে তেমন কিছুই হইল না! তাঁহার মনেরমধ্যে ইহার পূর্ব্বে যেটুকুও সংশয় ছিল, তাহাও এবার বিদূরিত হইয়া গেল। বাস্তবিকই এ জগতে এর চেয়ে কেহই তাঁহার আপনার নাই! এই চির-অনাদৃতা তাঁহার চিত্তে যে কি প্রভাতে যে নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, আজ তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিল। এই জন্যই জগতে সতীর এ মহিমাগান! এতই তাহার সম্মাননা! কোথায় চন্দ্রকলা, কোথায় এই লজ্জাদেবী! অন্য স্নেহ ছাড়িয়াও এক জনে অনন্যানুরাগিণী রাখিতে পারা যায় নাই! আর এক জনে স্নেহ ত দূরের কথা, এক দিনের জন্য এক বিন্দু করুণা পর্য্যন্তও দান না করিয়া বরঞ্চ অকথ্য অবমাননা, লাঞ্ছনা ও সর্ব্বহারা করিয়াও এই একান্তানুরাগিণী করিয়া রাখিতে রাজাধিরাজের চক্ষু দিয়া সহসা দুইটি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। এমন পুণ্যবতী স্নেহময়ী পত্নী যাহার ঘরে, সে কি—সে কি না—উঃ! বলিবার আবশ্যক আর বুঝি কিছু ভাষাই নাই।

বহুক্ষণ স্তব্ধ অ-নড় অবশদেহে মহীপালদেব শয্যালীন হইয়া রহিলেন। তাঁহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে অনেকখানিই যেন শীতল ও তাঁহার সঘনে আলোড়িত উদ্দাম চিত্ত-বেগ বহুলাংশে প্রশমিত হইয়া আসিতেছিল। তিনি এখন প্রাণ-মন শক্তিকে একীভূত করিয়া তুলিয়া মুদিতনয়নে যেন ধ্যান-নেত্রে এই লজ্জাদেবীকেই দেখিতেছিলেন। জগদ্বিজয়ী প্রবল-পরাক্রান্ত কর্ণাটেশ্বর-দুহিতা, প্রথম যে দিন এই পাল-সাম্রাজ্যেশ্বরের পুত্রবধূ-বেশে মগধ-বরেন্দ্রীর ভবিষ্যৎ পট্টমহাদেবীরূপে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিনের সকল উৎসব ও সকল দৃশ্যই আজ রাজাধিরাজের মানস-দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। তাহার পর? তার পর, তাহার খুবই বেশী দিন পরের কথাও নহে, এই বিভিন্ন-চরিত্রের পতি-পত্নীর মধ্যে একটা গভীর এবং সুদৃঢ় বিচ্ছেদের ব্যবধান ক্রমশঃই সৃষ্ট হইতে লাগিল এবং এক দিন সহসা সেটা সম্পূর্ণরূপেই সুদৃঢ়তর হইয়া উঠিয়া তাঁহাদের দুই জনকে একবারেই দুই দিকে ঠেলিয়া দিল। রাজভ্রাতা রামপালই যেন বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মধ্যের এই বিচ্ছেদ-ঘটনার প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন। রাজাধিরাজ আজ সহসা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, এই রামপালকে যে চিরদিনই তিনি তাঁহার পরম শত্রু-রোষে হিংসা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কৈ, সে ত তাঁহার সঙ্গে সে রকম কিছুই করিল না? এমন কি, অত বড় যন্ত্রণা-গৃহ কষ্টাগারের জীবন হইতে মুক্ত হইয়াও না! দেশে প্রজা-দ্রোহের সূত্র বর্ত্তমানেও তাহার দ্বারা রাজদ্রোহের কোন চেষ্টাই দেখা গেল না! তবে কি বাস্তবিকই তিনি চিরদিন একটা অনর্থক ভ্রান্তির উপরেই তাঁহার এই মিথ্যা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন? বস্তুতঃ রামপাল রাজদ্রোহী নহেনই, বরং তাঁহার কার্য্যাবলী হইতে যেন এই রকমটাই বেরুত যে, তিনি এতদভয়েরই বিপরীত! সত্যই কি তাই? বৃদ্ধদেব বলিয়াছিল, রামপাল তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করিতে কি কোথাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! এই কি সত্য কথা? তবে কি—সে কি সে প্রতিজ্ঞা এই তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদা ভ্রাতৃজায়ারই স্নেহপ্রেমের ফল! ওঃ! এ সব কি নিগূঢ় রহস্যের জালই অদ্যকার এই ঘোরতর দুর্ঘটনা-কুটিল কালরজনীতে অকস্মাৎ তাঁহার কাছে বিমুক্ত হইতেছে! ওঃ! ওঃ! সেই চির-চরিত্রভ্রষ্ট ভাই! আর এই চির-অনাদৃতা পত্নী! এরাই কি তবে সব চেয়ে তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী? তীব্র অনুশোচনার সহিত মিশ্রিত অতর্কিত একটা প্রবলতর লজ্জার উচ্ছ্বাসে নৃপতির সমস্ত মনটা যেন একই ক্ষণে ভরিয়া উঠিল। মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা অস্বস্তিকর কি যেন মুহুর্মুহুঃ ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। এমন করিয়া নীরব স্তব্ধ ভাবে আর থাকিতে পারা যেন সম্ভব হইতেছিল না। অথচ বলিবার মত ভাষাই বা এর কোন্‌খানটায় কি আছে যে, সেই কথাটাই আজ বলিবেন? তাহা ছাড়া মনের মধ্যেই বা তত বড় বল কোথায় যে, যাহাতে করিয়া আজ—বিশেষতঃ এই রাত্রিতেই আবার আর একটা অত বড় ভয়াবহ আলোচনার সূত্রপাত করা চলে? বর্ষার মেঘভরা আকাশে একটুখানি দমকা হাওয়া লাগিলেই হয় ত তাহার মধ্যে জমা করা জলের স্রোতে সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। অথচ,—অথচ এই যে নীরবতা, এ-ও যেন মানুষের সহিষ্ণুতার সীমা ধরিয়া নাড়া দেয়। বিশেষতঃ আজিকার রাত্রিতে!

রাজাধিরাজ ডাকিলেন, "মহাদেবি!"

লজ্জাদেবী ব্যজনীচালনা বন্ধ করিয়া এক মুহূর্ত্ত প্রশ্ন-প্রত্যাশী স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ যথাকার্য্যে নিরত হইলেন। মৌখিক কোন উত্তর তাঁহার কাছে পাওয়া গেল না।

রাজাধিরাজও কিছুক্ষণ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের ভিতরটা তখন যেন কি এক রকম অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুতভাবে অভিভূতবৎ হইয়া আসিতেছিল। ক্ষণকাল বাক্য-হারা স্তব্ধতার সহিত তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী ধর্ম্মপত্নীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ কি! তিনি কি অন্ধ হইয়াছিলেন? এত দিন, এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়াই তাঁহার কেমন করিয়া এত বড় দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়াছিল? আজ সেই উজ্জ্বল সূর্য্যাস্তরাগ-সদৃশ প্রভাময় শোণিত-স্রোতে তাঁর সেই রুদ্ধদৃষ্টি কি ধুইয়া গিয়া নির্ম্মল হইল? তাই যদি, তবে কেন এত দিনে, কেন এত দেরি—

কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ীই এই কর্ণাটকুমারী! যেমন উজ্জ্বল শ্বেতপদ্মপ্রভ অনন্যসাধারণ দেহ-বর্ণ, তেমনই কি মৃণালসদৃশ সুগঠিত দেহলতা! আর তাহার সঙ্গে মিলাইয়া—এই যে মহিমময় শান্ত ভঙ্গী, এ যেন কোন অপার্থিব লোকের বার্ত্তা স্মরণ করাইয়া দেয়!

মুগ্ধস্বরে রাজাধিরাজ ডাকিলেন, "মহাদেবি! লজ্জাদেবী!"

ঈষৎ সরিয়া আসিয়া তাঁহার ব্যজনীযুক্ত হাতখানি ধরিয়া নিজের কাছে তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন।

মহাদেবীর শান্ত মুখের উপর পরিবর্ত্তনের রেখা একটিও পরিলক্ষিত হইল না ; কিন্তু তিনি একটি মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার হাতখানি ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া পুনশ্চ পাখা তুলিয়া লইলেন।

রাজা কহিলেন, "পাখা থাক্ মহাদেবি! আমার বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলছে, তোমার ঐ ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেলে হয় ত বা একটু জুড়াতে পারে—"

ব্যজনী রাখিয়া লজ্জাদেবী স্বামীর নিকট সরিয়া আসিলেন। ধীর হস্তে তাঁর বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

সেই শীতল-কোমল স্নেহ-সহানুভূতিভরা স্পর্শসুখে কিছুক্ষণ বিহ্বলবৎ রাজাধিরাজ অবশভাবে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইল, এ যেন তিনি কোন কল্পনালোকে বা অপার্থিব লোকে অবস্থিত রহিয়াছেন! এ যেন সত্য নয়! এ যেন এই নশ্বর জগতের কোন কিছুই নহে! তাঁহার এই ত্রিতাপ-তপ্ত জ্বলন্ত হৃদয়-প্রাণকে, শুদ্ধ এর অতুলনীয় স্পর্শশক্তি যেন এক মুহূর্ত্তে শীতল করিয়া জুড়াইয়া দিল। ওরে, অভাগা রাজা! এত বড় শান্তির উপাদান তোর নিজের ঘরেই থাকিতে তুই কিসের মোহে কাঁটা-বনে শান্তির ফুল খুঁজিতে ছুটিয়া ফিরিলি! হায় মূঢ়!

"দেবি!"

"রাজাধিরাজ!"—অকস্মাৎ তাড়িতপূর্ণ কোন বস্তু হস্তস্পৃষ্ট হইলে মানুষে যেমন করিয়া শিহরিয়া উঠে, লজ্জাদেবীর পৃষ্ঠে তাঁহার স্বামীর সপ্রেম করস্পর্শ তাঁহাকে তেমনই করিয়াই হয় ত বা তাঁহারও অজ্ঞাতে তাঁহাকে তেমনই করিয়াই শিহরিত করিল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নিকট হইতে অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "আমায় আপনি স্পর্শ করবেন না, রাজাধিরাজ!"

মহীপালদেবও তাঁহার এই কথায় ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বাক্য এবং ব্যবহার তাঁহার সুদীর্ঘ দিনের পরিত্যক্তা অসম্মানিতা ধর্ম্মপত্নীর পক্ষে একটুও যে অস্বাভাবিক নহে, এ কথাটা আত্মাভিমানে বাধিলেও আজিকার দিনে নিতান্তই নিজের কাছে অস্বীকার করিবারও নহে! কিন্তু ঐ যে শান্ত-স্তব্ধ সেবাপরায়ণা নারীর জিহ্বা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল, ইহার মধ্যে যে অভিমানের তুচ্ছতার চেয়ে অনেকখানি জিনিষেরই আভাস ভাসিয়া উঠিতেছিল, এটাও যেন তেমনই স্বীকৃত!

তথাপি নারী-চরিত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতার অভিমান লইয়া রাজাধিরাজ ইহাকে তীব্র অভিমানেরই প্রকাশ অনুমানে ঈষৎ সলজ্জ বিনতির সহিত কহিলেন, "ক্ষমা যখন করেছ, তখন দূরে যেও না, লজ্জা! আজ আমার তোমাকেই প্রয়োজন।"

মহাদেবী পুনশ্চ নিকটে আসিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে আসন লইলেন। তাঁহার পায়ের উপর নিজের কোমল হস্ত স্থাপন করিয়া এবার তাঁহার স্বভাব-কোমল স্বরে উত্তর করিলেন, "আমি ত কোন দিনই দূরে যাইনি, রাজাধিরাজ! কোন দিন ত যেতেও পারবো না। আপনার সেবাধিকার যে একমাত্র আমারই। কিন্তু দয়া ক'রে ও-ভাবে আমায় আপনি আর কখন স্পর্শ করবেন না, এই আমার আপনার কাছে একমাত্র অনুরোধ। যে-হেতু, এতে আপনার প্রত্যবায় ঘটিবারই আমি বেশী ভয় করি।"

নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত মহারাজাধিরাজ অর্দ্ধোত্থিতভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, "এ কথার অর্থ কি মহাদেবি? তোমায় স্পর্শ করলে আমি প্রত্যবায়-গ্রস্ত হব? অথচ তুমি আমার স্ত্রী!"

মহাদেবী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "আপনার দেহ বারনারী এবং পরনারীর স্পর্শ-কলুষিত হয়ে গেছে, সে দেহ নিয়ে আর আপনি এ জীবনে নিজের সতী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পাবেন না, রাজাধিরাজ! করলে, আপনি ধর্ম্মের কাছে দায়ী হবেন, আর আমিও হব। তাই আপনাকে যোড়হাতে মিনতি করছি, আমার এ দেহ স্পর্শ ক'রে একে আর অপবিত্র হ'তে দেবেন না।"

তার পর ঘোর বিস্ময়ে এবং অপ্রত্যাশিত আঘাতে একবারে বিমূঢ়বৎ স্তব্ধ রাজাধিরাজের দিকে চাহিয়া তাঁহার পদযুগ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিলেন, "কিন্তু যদি দাসীকে এত দিন পর তার এই ন্যায্য অধিকারটুকু দয়া ক'রে ফিরিয়েই দিলেন, আর যেন তা কেড়ে নেবেন না।"

মহীপালদেব অনেকক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ সেই ভাবেই থাকিয়া তাহার পর গভীর অবসন্নদেহে উপধানে ক্লান্ত মস্তক হতাশভাবে নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ গাঢ়-স্বরে উত্তর করিলেন, "তাই হোক লজ্জা! যা বিকই আমি তোমায় স্পর্শ করবার যোগ্যও হয় ত নই।"

ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আমায় তুমি এ সময়ে ত্যাগ করো না, মনে হচ্ছে, আমার জীবনে যেন একটা দুঃসময় দেখা দিয়েছে। কি জানি, মনটা যেন আজ আমার বড়ই ভেঙ্গে পড়েছে।"

ধীর-হস্তে স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে নম্র কোমলকণ্ঠে লজ্জাদেবী কহিলেন, "সব অমঙ্গল কেটে যাবে, প্রভু! আমি কি আপনাকে ত্যাগ করতে পারি? আমি যে আপনার চিরদাসী।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ত্রিবেণী উপন্যাস লিখিতে বসিয়া অনেক প্রকার ভয় মৈত্রীপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সংপ্রতি একখানি বিনা-স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া একটু স্তম্ভিত হইয়াছি!

ভীমের স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করা হইয়াছে বলিয়া লেখক আমায় অভিযুক্ত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও কোন চরিত্র সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখা যে মোটেই হয় না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের জেব-উন্নিসায়, ডি, এল্, রায়ের প্রায় সমস্ত পুরাণ এবং ঐতিহাসিক নারী-চরিত্রে, রাখালদাস বাবুর কুমারগুপ্ত, অনন্ত প্রভৃতিতে যাঁহারা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন) কত বড় ব্যতিক্রম? তথাপি (আমার নিজের চোখে এই জিনিষটা বিসদৃশ ঠেকে বলিয়াই) ঐতিহাসিক বিদ্বান্ পাঠকমাত্রেই একটু প্রণিধান করিয়া পাঠ করিলে বুঝিতে পারা সম্ভব যে, আমার লিখিত 'রামগড়' অথবা ত্রিবেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র (যতটুকু অবশ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়) যতদূর সম্ভব ইতিহাসসম্মতভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ভীম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁহার সম্বন্ধে লেখকের একটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে লেখক কাহারও নিকট তেমন ভাবে অবশ্য দায়ী হইতে পারেন না! তবে বিশেষভাবে যে কোন চরিত্রকেই যথা কলঙ্কিত করিলে অবশ্য সমালোচনার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র কোন জাতিরই সম্পত্তি নহে। কানিংহাম স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঐতিহাসিক এবং লেখক তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী এবং বিশ্বাসানুগতভাবে ইঁহাদের লইয়া প্রবন্ধনিবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা যাহার যাহা খুসী লিখিতে পারেন। তাঁহাদের সহিত মতভেদ ঘটিবে, তাঁহারা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বা পুস্তিকা অথবা পুস্তক লিখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ।

তাহার পর আসল কথা এই যে, ভীমের স্ত্রীর চরিত্রের কোন্‌খানটায় 'কলঙ্ক লেপন করিয়া' আমি মাহিষ্য-সমাজের মাথা হেঁট করিয়াছি, তাহা আদৌ দেখিতে পাইলাম না!

উজ্জ্বলার চরিত্রে কলঙ্ক বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার স্থান কোথাও নাই। রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা দেবী সীতার, দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিতা যাজ্ঞসেনীরও তাহা হয় নাই, বরং তাঁহাদের সতীত্ব-খ্যাতি তাহাতে উজ্জ্বলতরই হইয়াছিল। উজ্জ্বলাকে মহীপালের দূতী তাহার স্বামীর নাম করিয়া ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতে বাহিরে তাহার একটা অপকলঙ্ক রটিয়াছে, বটে। এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই এই ভীম-ভক্ত পাঠকটি লেখকের প্রতি মহাত্মা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন!

অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইবে যে, আমার উপন্যাসের যে প্লট আমি স্থির করিয়া লইয়া উহাকে পরিচালিত করিতেছি, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। পাঠকের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য্য যদি না থাকে, অগত্যাই আমি নিরুপায়!

আমি ইহাতে দেখাইতে চাহিয়াছি, ধার্ম্মিক ছোটর হাতে পাপী প্রবলতমের পরাজয়! আমি ইহাতে দেখাইতে চাহিয়াছি, মর্ম্মান্তিক আঘাতে দুর্ব্বলও সবল হইয়া উঠিয়া অসাধ্যসাধন করিতে পারে। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি, অত্যাচারী মহীপালের পাপের ফলে অত বড় পাল-সাম্রাজ্যের ধ্বংস কত সহজে তাহার নিজের মধ্য হইতেই সম্ভব হইয়াছিল! আর ঐতিহাসিক সত্যও তাহাই।

তবে যদি বলা হয়, ভীমকেই এই রাজ-অত্যাচারে অত্যাচারিত করিলাম কেন? তাহার উত্তর এই যে, ইহাই স্বাভাবিক। যে আঘাত পায়, সে-ই ঠিক প্রবলভাবে প্রত্যাঘাত করিতেও পারে। মানব-চরিত্র-জ্ঞান যাহাদের সামান্য ভাবেও আছে, তাহাদের এ কথাটাও এত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের রামচরিতের ভূমিকায় "The Kaivartas were smarting under oppression of the king." দিব্যোকাদিও রাজ-অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করা যায় এবং মানুষকে সব চেয়ে বিচলিত করিতে এ অত্যাচারের মত অপর কোন অত্যাচারই যে জগতে নাই। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি হইতে আধুনিকতম খড়্গবাহাদুর সিংহ প্রভৃতিই ইহার প্রমাণ। হিন্দুর নিকট সতী নারীর অবমাননা মহাপাপ এবং অত্যাচারের চরম। এই পাপে রাবণের ও কুরুকুলের ধ্বংসপ্রাপ্তি!—লেখিকা।



রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ভারতের প্রচলিত মুদ্রা এবং আর্থিক বিষয়ের সংস্কারসাধন-কল্পে সরকার যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই কমিশন ভারতীয় প্রচলিত মুদ্রার আদি সংখ্যার (যাহা আজকাল টাকা বা রুপেয়া নামে অভিহিত) মূল্য ৮'৪৭৫১২ গ্রেণ পাকা সোনার মূল্যের ঠিক অনুরূপ হইবে ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন এবং সেই মুদ্রামূল্য ঐ পরিমাণ স্বর্ণমূল্যে অবিচলিত রাখিবার ভার একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে প্রদান করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কমিশন টাকার বদলে নোট বা কাগজের মুদ্রা প্রচলনের পক্ষপাতী। কিন্তু বিশেষ হিসাব করিয়া নোট বাহির করিতে না পারিলেই আর্থিক ব্যাপারে ঘোর প্রমাদ ঘটিবেই ঘটিবে। সেই জন্য ইহার নিয়ন্ত্রণ-ভার কমিশন এক স্বাধীন ব্যাঙ্কের হস্তে প্রদান করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। সেই ব্যাঙ্কের নামই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য যদি পক্ষপাতশূন্য এবং অভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে মুদ্রার মূল্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং দেশের মানুষমাত্রেরই ঘোর ক্ষতি ঘটে। বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, শিল্পের বিকাশসাধনে ঘোর বাধাও জন্মে; এমন কি, দৈনন্দিন জীবন-ধারণেও সকলের অবস্থা অল্পাধিক ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং এই ব্যাঙ্কটি যাহাতে অভ্রান্ত বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কই প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক। সূর্য্য যেমন নিজস্থানে অচল থাকিয়া অন্য সকল গ্রহকে তাহাদের কক্ষ-পথে নিয়মিত রাখেন, তাহাদিগকে সেই কক্ষপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেন না, এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সেইরূপ স্বীয় কর্ত্তব্যপথে অচলপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্ককে তাহাদের কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত রাখে। সেই জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক বলা হইয়া থাকে। এই ব্যাঙ্ক না থাকিলে কারেন্সি নোট চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে। মার্কিণ ত এত বড় সমৃদ্ধ দেশ। শিল্পে, বাণিজ্যে এবং কৃষিতে ইহার সমৃদ্ধি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। কিন্তু যত দিন এই দেশে একটা কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক বা মূল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হইয়াছিল, তত দিন এই দেশের আর্থিক ব্যাপারে অনেক গোলযোগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার পর এই দেশে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফেডারাল রিজার্ভ সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত হয়। এ সময়ে যদি উহা প্রবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে বিগত যুদ্ধের সময় মার্কিণের আর্থিক অবস্থা যে কিরূপ হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন। বিগত যুদ্ধের সময় মার্কিণ যে এতটা আর্থিক সুবিধা করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার মূল কারণ তাঁহাদের এই কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক। এই কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক যদি সুপরিচালিত না হইত, তাহা হইলে মার্কিণের আর্থিক অবস্থা কখনই এত সুবিধাজনক হইত না, ইহাই অনেক অর্থনীতিবিশারদের মত।

কিন্তু একটা বিষয়ে সকলের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক। এই কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ ব্যবসাদারী হিসাবে পরিচালিত করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। তাহা করিতে যাইলেই বিষম প্রমাদ ঘটিবে। সেই জন্য হিল্টন ইয়ং কমিশন অর্থাৎ বিগত কারেন্সি এণ্ড ফাইনান্স কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

In general, they are entrusted with the sole right of note issue and the responsibility of maintaining the stability of the currency. They are the custodians of the currency and banking reserves and of the cash balances of their Governments. Their business in the main, is confined to that of a bank of banks and of the Government. These functions of necessity require that the character of their business should be of the soundest. Such limitations of their business prevent these Central Banks from transacting the everyday commercial banking business of the country or from entering into competition with the commercial banks in any general sense.

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—"সাধারণতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির হস্তে কেবলমাত্র নোট প্রচার এবং মুদ্রার মূল্য অবিচলিতভাবে রক্ষার ভারই ন্যস্ত হইয়া থাকে। উহারা প্রচলিত মুদ্রার, ব্যাঙ্কে, রিজার্ভ ফণ্ডের এবং সরকারের মজুত টাকার ন্যাসরক্ষক। ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ও সরকারের কার্য্য পরিচালন ব্যাপারেই তাহাদের কার্য্য নিবদ্ধ। এই কার্য্যভার সম্পাদনার্থ তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি অভ্রান্ত হওয়া আবশ্যক। তাহাদের উপর এইরূপ গুরুভার অর্পিত আছে বলিয়া তাহাদের সাধারণ ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কার্য্যে অথবা অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহিত লাভজনক কার্য্যে প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মিষ্টার সি, এ, ফিলিপ্‌স অর্থশাস্ত্রে এবং ব্যাঙ্কপরিচালন ব্যাপারে এক জন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলিয়াছেন—

"The issue of Bank notes and the receipt of interest-bearing deposits are absolutely incompatible services. According to Mr. Burdeau their union in a single hand would replace the present organisation by an entirely new one which in case of crisis would offer much less vitality and power of resistance."

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ;—"ব্যাঙ্ক হইতে নোট বাহির করা আর সুদ দিয়া টাকা আমানত রাখা এই দুই কার্য্যের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্যসাধন করা সম্ভবে না। একই প্রতিষ্ঠানের হস্তে উক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইলে ব্যাঙ্কগুলির বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে; যে ব্যবস্থা সঙ্কটকালে জীবনী শক্তি এবং সঙ্কটনিবারিণী শক্তির হ্রাস প্রকটিত করিবে।" সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা আমানত রাখা বা টাকা ধার দেওয়া সঙ্গত হইবে না। তাহার কারণ আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

নোট প্রচলিত করিবার পর হইতে সরকার টাকার বাজারে এক বিষম জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রচলিত মুদ্রায় বাহুল্য আর সাক্ষাৎভাবে জিনিষের মূল্য পরিমিত হয় না। এই উপর আজকাল বিলাতের এক দল অর্থনীতিবিশারদ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে কেবল মূল্যনির্দ্দেশক প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি সরল ভাবে এইরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে। মনে করুন, রাম একটি মোহর (এক তোলা পাকা সোনা) লইয়া বাজারে গেল এবং তাহার বিনিময়ে ৮/ মণ চাউল কিনিল। ইহাতে বুঝা গেল, ৫/ মণ চাউলের মূল্য ১ তোলা পাকাসোনার মূল্যের সমান। আবার যে দোকানদার সেই মোহরের বিনিময়ে রামকে ৫/ মণ চাউল দিয়াছে, সেই দোকানদার মোকামে যাইয়া সেই মোহরটি দিয়া এক কৃষকের নিকট হইতে ৫৷৷০ মণ চাউল কিনিল। ইহাতে বুঝা গেল, কৃষকের ঘরে ৫৷৷০ মণ চাউলের মূল্য ১ ভরি পাকা সোনার মূল্যের সমান। কৃষক আবার সেই মোহরটি লইয়া ১টা বলদ কিনিল। বুঝা গেল, ঠিক এরূপ একটা বলদের মূল্য ঠিক এক ভরি পাকা সোনার মূল্যের সমান। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মুদ্রার দ্বারা কেবল বিনিময়-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না, অধিকন্তু উহার দ্বারা বিনিময় মূল্য মিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মুদ্রা যেন মূল্যপরিমাণের মাপকাঠি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মুদ্রা লইয়া বাজারে বাজারে না ঘুরিয়া মুদ্রার নিদর্শনস্বরূপ একখানি কাগজ লইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য করিলেই সুবিধা হইবে। উহা করিলে কতকগুলি সুবিধাও জন্মিবে। ঐ কাগজে লেখা থাকে, যে ব্যক্তি এই কাগজখানি দেখাইয়া ইহাতে লিখিত মুদ্রা চাহিবেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঐ পরিমাণ মুদ্রা দেওয়া হইবে। তাহাই দেওয়া হয়। সুতরাং ঐ নোটের উপর লোকের যথেষ্ট আস্থা আছে। সরকার বা ব্যাঙ্ক যত নোট বাহির করেন, তাহার সিকি নোটও লোক ব্যাঙ্কে রাখাইতে যায় কি না সন্দেহ। একটা হুজুক বা আতঙ্ক উপস্থিত হইলে বড় জোর তিন ভাগের এক ভাগ নোট কারেন্সিতে যায়। ইহাতে কতকগুলি সুবিধা আছে এবং লাভ আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যত টাকার নোট বাহির করা হইয়াছে, কারেন্সিতে তত টাকা আমানত রাখিতে হয় না। লোকের পক্ষে নোট ব্যবহারেও কতকগুলি সুবিধা আছে। এক জনের পক্ষে হাজার টাকা বহিয়া লইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তাহার পক্ষে একখানি বা দশখানি অথবা ১ শতখানি নোট লইয়া যাওয়া একটুও কঠিন নহে।

আজকাল অনেক অর্থনীতিবিশারদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মূল্যবহুমূল্য ধাতু ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, যে মুদ্রার আদত মূল্য কিছুই নাই, সেই মুদ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই সিদ্ধান্ত লইয়া যে মতভেদ নাই, তাহা নহে। যাহা হউক, তদনুসারে নোটের বহুল প্রচলন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। নোটের উপর চাহিবামাত্র নোটের অধিকারীকে নোটে উল্লিখিত টাকা দেওয়া হইবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার কোন প্রয়োজন নাই। নোটের উপর যত টাকা লেখা থাকিবে, তত টাকায় উহার আদান-প্রদান হইবে, টাকা লাইবেলে আর ধাতুর টাকা পাওয়া যাইবে না। মতের হিসাবে এই ব্যবস্থা নিখুঁত, কিন্তু কাযে উহা প্রচলিত করা কঠিন। যুদ্ধের পর যখন য়ুরোপ হইতে সুবর্ণ প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে, মুনুকে যাইয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিল, তখন য়ুরোপে নোটই স্বাভাবিকভাবে চলিয়াছিল। ভারতে তখন রজত ছিল এবং ঐ ধাতুর মূল্যের অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই জন্য ভারতে যুদ্ধজনিত অর্থকষ্ট তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হয় নাই। তথাপি সরকার ঐ সময় অত্যন্ত অধিক পরিমাণে এক টাকার নোট প্রচলিত করাতে উহার তরঙ্গ কিছু ভারতের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

যদি আসল মুদ্রা অর্থাৎ যে মুদ্রার ধাতুগত মূল্য তাহার বাজার প্রচলিত মূল্যের সহিত এক, সেই মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া কেবল ভাক্ত মুদ্রা (token currency), নোট প্রভৃতি প্রচলিত করিতে হয়, যদি উহা ভাঙ্গাইয়া আসল মুদ্রা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে অতি সাবধানে হিসাব করিয়া সেই নোট চালাইতে হয়। কি পরিমাণে ঐ নোট বাহির করিতে হইবে, তাহা হিসাব করিয়া ধরা অত্যন্ত কঠিন। হিসাবে ভুল হইলেই উহা বিষম ক্ষতির কারণ হইবেই হইবে। কিছুতেই উহা রক্ষা করা যাইবে না।

ভারতে প্রচলিত মুদ্রার দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। একটি কার্য্য—পণ্য-মূল্য অচল রাখা ; আর একটি কার্য্য—বিদেশী মূল্যের সহিত বিনিময় মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখা। ভারতের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ইহার একটির বিপর্য্যয় ঘটিলেই বিপদ ঘটিবে। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক শত টাকার নোটও বাহির করা হয়, তাহা হইলে তাহাও পণ্য-মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিবে, দ্রব্যাদি অকারণ মহার্ঘ্য হইবে। আবার নোট অল্প বাহির করিলে বহির্ব্বাণিজ্যে আঘাত পড়িবে, পণ্য-উৎপাদকদিগের কষ্ট জন্মিবে। অতএব নোটকে কেবল প্রচলিত মুদ্রা করিলে ব্যবস্থা পূর্ব্বক উহার সঙ্কোচন এবং প্রসারণ সাধন করা অতিশয় কঠিন হইবেই হইবে। সেই কার্য্য-সাধনের জন্য এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কল্পনা হইয়াছে। হিল্টন ইয়ং কমিশন সরকারকে ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

হিল্টন ইয়ং কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন যে, টাকার মূল্য ৮·৪৭৫১২ গ্রেণ হইবে,—কিন্তু সরকার টাকাকে আর ধাতুমুদ্রা-রূপে প্রচলিত করিবেন না। তাঁহারা কেবল এক টাকার নোটই প্রচলিত করিবেন। ঐ নোট ভাঙ্গাইয়া কেহ সুবর্ণমুদ্রা বা রজতমুদ্রা পাইবেন না। এক টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লোক খুচরা মুদ্রা পাইতে পারিবে, কিন্তু তাহাও ত ভাক্ত মুদ্রা বা অভিজ্ঞান মুদ্রা। সুতরাং টাকার মূল্য যে ৮·৪৭৫১২ গ্রেণে স্থির আছে, সাক্ষাৎভাবে তাহা বুঝিবার কাহারও উপায় থাকিবে না। কিন্তু লোককে তাহা সাক্ষাৎভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য সার বেসিল ব্ল্যাকেট টাকার ঐরূপ মূল্য হিসাবে ১ হাজার ৬৫ তোলা ওজনের খাঁটি সোনার পিণ্ড বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক 'বসুমতী'তে ঐ প্রস্তাবে আপত্তি করা হইয়াছিল। সার বেসিল ব্ল্যাকেট তাঁহার দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার মূল্যের সহিত সুবর্ণ মূল্যের সঙ্গতি আছে, ইহা দেখাইবার জন্য সাধারণের নিকট ২ শত ৫০ ভরি ওজনের খাঁটি সুবর্ণের পিণ্ড বিক্রয় করিবেন। এই প্রস্তাব পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল সত্য, কিন্তু এ দেশের পক্ষে উহাও সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না। ব্যাঙ্কের পক্ষে ৫০ ভরি করিয়া সুবর্ণ-পিণ্ড বিক্রয় করিলে বরং ভাল হইত।

সুতরাং সুবর্ণ-মূল্যের সহিত প্রচলিত নোটের মূল্য ঐ নির্দ্দিষ্ট হারে বজায় রাখাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কায হইবে।

এক টাকা মূল্যের নোটের সুবর্ণের সহিত যে খুঁট বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে এক দিকে হয় ব্যাঙ্কের লাভ হইবে, না হয় ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইবে। ভারতের বাহিরে সুবর্ণের মূল্য যেরূপ হইবে, ভারতেও সুবর্ণ-মূল্য সেইরূপ রাখিতে হইবে। নতুবা বিদেশী মুদ্রার সহিত ভারতীয় ভাক্ত মুদ্রার বিনিময়-ব্যাপারে বাটার হার বিপর্য্যস্ত হইবে। মুদ্রা-মূল্য ঠিক থাকিলে দুইটি বিষয় সাধারণ অবস্থায় ঠিক থাকে, প্রথম, দেশে পণ্য-মূল্যের সমভাব (Price level); দ্বিতীয়, বৈদেশিক মুদ্রার সহিত (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বিদেশী সুবর্ণ মুদ্রার সহিত) বাটার হারের অচলতা। এই দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নোট বাজারে বাহির করাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল কায হইবে এবং উহাই তাহাদের একমাত্র কায হওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নোট বাহির করেন, তাহা হইলে দেশের পণ্য-মূল্য এবং সুবর্ণ-মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে, পক্ষান্তরে ব্যাঙ্ক যদি প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প নোট বাহির করেন, তাহা হইলে ঠিক উহার বিপরীত ফল ফলিবে এবং দেশীয় পণ্য-প্রস্তুতকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বিদেশী পণ্য দেশে অধিক আমদানী হইবে। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে যে কার্য্যভার অর্পিত হইবে, তাহা অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। উহার কার্য্য পরিচালনা করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতার এবং বিচক্ষণতার প্রয়োজন।



সার বেসিল ব্ল্যাকেট

রাজনীতি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভা থাকিলেই যে লোক এই কার্য্য পরিচালিত করিতে পারিবেন, তাহা মনে করাই ভুল। কার্য্যক্ষেত্রে যাঁহাদের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা আছে, অর্থনীতি শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব সমাধানে যাঁহারা বিশেষ পারদর্শী, সেইরূপ লোকই এইরূপ ব্যাঙ্ক পরিচালনের যোগ্য। এরূপ কার্য্যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

সার বেসিল ব্ল্যাকেট ইতঃপূর্ব্বে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-বিল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনার্থ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপরিষদের এবং রাষ্ট্রীয় সভার কয়েক জন সভ্য লইয়া গঠিত জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর হস্তে আলোচনার্থ এবং সংশোধনার্থ অর্পিত হইয়াছিল। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটী উহার কতকগুলি ধারার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মুসলমানগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর বা ডেপুটী গবর্ণরের মধ্যে এক জন মুসলমান হওয়া চাই, এইরূপ দাবী করেন। এ দাবী কেবল অসঙ্গত নহে, উহা নিতান্ত অজ্ঞতাজনিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তথাচ ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ হিন্দুরা উহার মধ্যে এক জন হিন্দুই হইবেন, এমন কোন দাবী করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, উহার মধ্যে অন্ততঃ দুই জন ভারতবাসী হওয়া চাই। এই ভারতবাসীর মধ্যে কেহ যে হিন্দু হইবেন, এমন কথা উঠে নাই। ব্যাঙ্কের কার্য্যে দক্ষ এবং অর্থনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভারতবাসী পার্শী, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, মুসলমান, আর্য্য-সমাজী এবং হিন্দুদিগের মধ্য হইতে স্বাধীনতা এবং যোগ্যতম ব্যক্তিকে দুই পদ প্রদান করিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের কথা ছিল। কারণ, অর্থনীতিসম্পর্কিত জটিল সমস্যা সমাধানে যাঁহারা যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহারা হিন্দুদের কেহ এই পদ পাইতে পারেন না। সুতরাং, এরূপ পদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীই যদি খ্রীষ্টান বা পার্শী হয়েন, হিন্দুরা তাহাতে যে আপত্তি করিবে, এমন কথা হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে বলা হয় নাই। তাহার কারণ, হিন্দুরা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এবং আবার সরকার পুরাতন বিলখানির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় ডেপুটী গবর্ণর যে ভারতবাসী হইবেন, এ কথা অধিকাংশের ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

তাহার পর সার বেসিল এই বিলখানি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ভারত হইতে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, ভারত-সচিব এই বিলখানি সম্বন্ধে সার বেসিলের সহিত সাক্ষাতে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহাকে বিলাতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতে যাইয়া সার বেসিল কেবল ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেডের সহিতই এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই,—যাঁহারা কারবারী লোক, যাঁহারা লাভজনক কারবারে এবং ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, এমন কতকগুলি লোকের সহিতও এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। ইহাতেও ভারতবাসীদিগের মনে একটু সন্দেহ জন্মিয়াছে। কারণ, ভারতবাসীদিগের ধারণা এই যে, বৈদেশিকদিগের স্বার্থ-রক্ষার্থ ভারতের মুদ্রানীতি অনেক সময় ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতিকূলে পরিচালিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদ পূর্ব্ববর্ত্তী পাণ্ডুলিপির আলোচনাকালে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে পাঁচটি বিষয় এই :—

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কটিকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত করিতে হইবে।

(২) এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার-মণ্ডলীতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কয়েক জন প্রতিনিধিকে স্থান দিতে হইবে।

(৩) ডিরেক্টারমণ্ডলীতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে অধিক সংখ্যায় স্থান দিতে হইবে।

(৪) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১ জন গবর্ণর এবং ২ জন ডেপুটী গবর্ণরের মধ্যে অন্ততঃ ২ জনকে ভারতবাসী করিতে হইবে, এবং

(৫) সুবর্ণ মোহর প্রচলিত করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, সার বেসিল ব্ল্যাকেটের এই দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে উহার কোনটিই রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা এই ব্যবস্থা যে কিসে ভাল হইল, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। প্রথমতঃ ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক করিবার প্রস্তাবে সার বেসিল সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি কি কারণে সেই মত পরিহার করিয়া দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কটি অংশীদারের ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিলেন, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অংশীদারের ব্যাঙ্ক করিলে অংশীদারদিগের মতানুসারেই ব্যাঙ্কটি পরিচালিত হইবে, ইহা মনে করিয়াই হয় ত সার বেসিল এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অংশীদাররা অধিকাংশই ভারতবাসী হইবেন, সুতরাং কার্য্যতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কটি ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। সম্ভবতঃ ইহা মনে করিয়াই সার বেসিল ও তাঁহার পরামর্শদাতারা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাধারণে যাহাতে এই ব্যাঙ্কের অংশ খরিদ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারও তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কোন প্রদেশের লোক অধিকাংশ অংশ খরিদ করিয়া সেইটিতে পক্ষবিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন, তাহার জন্যও দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিখানিতে দৃশ্যতঃ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। তিনি দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কটিকে অংশীদারের ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়া কি ভাবে উহার কার্য্যনির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল :—

(১) ব্যাঙ্কের মূলধন হইবে ৫ কোটি টাকা। ৫টি কেন্দ্র হইতে উহার অংশ বিক্রয় করা হইবে। কোন্ কেন্দ্র হইতে কত অংশ বিক্রয় করা হইবে, তাহাও পাণ্ডুলিপিতে বিবৃত হইয়াছে। যথা,—বোম্বাই এবং কলিকাতা এই ২টি কেন্দ্রের প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার, মাদ্রাজ এবং রেঙ্গুন এই ২টি কেন্দ্রের প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে ৪০ লক্ষ টাকা করিয়া ৮০ লক্ষ টাকার এবং দিল্লী কেন্দ্র হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় করিয়া ঐ ৫ কোটি টাকা মূলধন সংগৃহীত হইবে। সুতরাং কোন প্রদেশের লোকই অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় অংশ কিনিয়া ব্যাঙ্কে প্রাদেশিক স্বার্থ প্রবল করিয়া তুলিতে পারিবেন না। প্রত্যেক অংশের মূল্য ১ শত টাকা হইবে। উহার সুদ শতকরা ৫ টাকার অল্প বা ৭ টাকার অধিক হইবে না। ১ শত টাকার অংশ অনেকেই খরিদ করিতে পারিবেন। যাঁহারা এক একটি অংশ খরিদ করিবেন, তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে অংশ দেওয়া হইবে। তবে এক এক জন ২ শতের অধিক অংশ খরিদ করিতে পারিবেন না। যদি কেহ ২ শতের অধিক অংশ খরিদ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দুই শতের অধিক অংশের সুদ বা লাভ দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ যদি প্রত্যেক অংশের বার্ষিক লাভ ৬ টাকা করিয়া হয়, তাহা হইলে অংশীদারের যত অধিক অংশই থাকুক না কেন, তিনি বার্ষিক ১২ শত টাকার অধিক মুনাফা পাইবেন না। অংশীদারদিগের ভোট ব্যক্তিগত হইবে; কোনমতেই অংশের সংখ্যাগত হইবে না। অর্থাৎ যিনি ১টি মাত্র অংশ ক্রয় করিবেন, তিনিও যেমন একটি ভোট দিতে পারিবেন, যিনি ২ শত অংশ খরিদ করিবেন, তিনিও তেমনই একটিমাত্র ভোট দিবার অধিকারী হইবেন। কোন অংশীদারই একাধিক ভোট দিতে পারিবেন না।

ব্যাঙ্কের পরিচালন সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার-সংখ্যা হইবে ২৪ জন। তন্মধ্যে অংশীদারদিগের পক্ষ হইতে গৌণ নির্ব্বাচনে ১১ জনকে ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত করা হইবে। সেই নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা এইরূপ হইবে। এই পাঁচ কেন্দ্রের অংশীদারগণ সর্ব্বসমেত ৯২ জনকে তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি বা মুখপাত্র নির্ব্বাচিত করিবেন। সেই ৯২ জন ভোট দ্বারা ঐ ১১ জন যোগ্য ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত করিবেন।

অবশিষ্ট ১৩ জন ডিরেক্টারের মধ্যে ১ জন রাজপুরুষ থাকিবেন। তিনি কোন ব্যাপারে ভোট দিতে পারিবেন না। অবশিষ্ট ১২ জন ডিরেক্টারের মধ্যে ৪ জন বড়লাটের মনোনীত ব্যক্তি, ২ জন য়ুরোপীয় এসোসিয়েশনের এবং ২ জন দেশীয় বণিক-সভার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি, ব্যাঙ্কের ২ জন ডেপুটী গভর্ণর এবং ১ জন গভর্ণর এবং ১ জন প্রতিনিধি সমবায় ঋণদান সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইবেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কটি অংশীদারী কারবারে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ অংশীদাররাই প্রবল পক্ষ হইবে। কিন্তু কার্য্যে যে তাহা হইবে, তাহা মনে হয় না। যাহা হউক, প্রথমবারে ঐ ২৪ জন ডিরেক্টারই সরকারের মনোনীত সদস্য হইবেন। পরে নির্ব্বাচিত সদস্যরা তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবেন।

এই প্রবন্ধে এই ব্যাঙ্কসম্পর্কিত ব্যবস্থার অন্য সূক্ষ্ম বিষয়ের

আলোচনা হইল না। কেবল স্থূলভাবে কয়েকটি কথামাত্র বলা হইল। প্রথম কথা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কটিকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইবার পর সার বোসল ব্ল্যাকেট আবার কেন উক্ত ব্যাঙ্ককে অংশীদারের ব্যাঙ্কে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ব্যাঙ্কটিকে অংশীদারের ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবল যুক্তি আছে, যথা,—

(১) অংশীদারের ব্যাঙ্ক হইলে এবং অংশীদারদিগের দ্বারা ঐ ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইলে অংশীদারদিগের স্বার্থরক্ষার অর্থাৎ লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাঙ্কটি পরিচালিত করা হইবে। অংশীদারগণ ব্যাঙ্কের লাভ-ক্ষতি-ফলভোগী; সুতরাং তাঁহারা ব্যাঙ্কটি যে লাভের জন্য পরিচালিত করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। তাহা করিতে গেলে দেশের লোকের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ ব্যাঙ্কওয়ালারা যখন নোট ভাঙ্গাইয়া স্বর্ণমুদ্রা দিবেন না, তখন তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়া যাহাতে লাভ হয়, এমন ভাবে নোট বাহির করিবার পথে কোন কণ্টকই থাকিবে না। অংশীদারগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান নিতান্ত সভ্যদেশ ভিন্ন অন্য দেশে কখনই কেবলমাত্র সাধারণের হিতার্থ পরিচালিত হইতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক অংশীদার দ্বারা বহু দেশেই পরিচালিত হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় যখন সেণ্ট াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তথাকার সরকারই ঐ ব্যাঙ্কের সমস্ত মূলধন প্রদান করিয়াছিলেন। শেষে উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ সেই সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া ব্যাঙ্কটিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। টাকার মূল্য ৮·৪৭৫১২ গ্রেণে অবিচলিত রাখাই কেন্দ্রী ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্য। তাহা করিতে হইলে লাভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঙ্কটি পরিচালিত করিলে চলিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কটি যদি ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলে উহার লাভ সরকারের হইত, সেই লাভের অর্থ সরকার দেশের জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিলে তাহাতে দেশের লোকের লাভ হইত। কিন্তু উহাকে অংশীদারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলে তাহা হইবে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব্বতন পাণ্ডুলিপির কার্য্য স্থগিত রাখিবার পর হইতেই সরকারপক্ষ বলিয়া আসিতেছেন যে, সরকার সকল দিক বিবেচনা করিয়া এই কেন্দ্রী ব্যাঙ্কটি অংশীদারের ব্যাঙ্কে পরিণত করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন। সার বেসিল বিলাতে ভারত-সচিবের সহিত পরামর্শ করিতে যাইবার পূর্ব্বেই সরকার এই কথা বলিয়াছিলেন। সার বেসিল কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিতর্ককালে বলিয়াছিলেন যে, একতানতার ভাব রক্ষার খাতিরে সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কটিকে অংশীদারদিগের ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্য কোন সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন না। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ভারত-সচিব কিছুতে তাঁহাদের জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন।

কিন্তু কেন্দ্রী ব্যাঙ্কটিকে অংশীদারের ব্যাঙ্কে পরিণত করিলে অন্য দিক দিয়াও ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা ঘটিবে। মনে করুন, কোন সওদাগরী আফিসের বড় কর্ত্তা তাঁহার অধীনস্থ কতকগুলি কেরাণীকে দিয়া কতকগুলি অংশ খরিদ করাইলেন। সেই অংশীদারদিগের ভোট যে সেই কারবারের কর্ত্তার মনোমত লোকদিগকে ডিরেক্টরী পদ দিবার জন্য ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইবে না, এবং সে চেষ্টায় তাঁহারা অনেকটা সফল হইবেন না, তাহা কে বলিতে পারেন? জমীদারদিগের ভোট এবং চাকরীয়া উমেদারদিগের ভোট যে ঐ ভাবে ব্যবহার করিবার শঙ্কা জন্মিবে না, তাহা কি কেহ বলিতে পারেন?

আর এক কথা। প্রথমতঃ অংশীদারদিগের দ্বারা ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হইবে না। প্রথমতঃ ডিরেক্টার মনোনীত করাই হইবে। সুতরাং প্রথমবারের পরিচালকবর্গ সরকারের মনোমত লোকই হইবে। তাঁহারাই ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কার্য্য চালাইয়া দিবেন। ইতোমধ্যে অনেক অংশ খরিদ বিক্রয় হইবেই। কিছু বিনা (premium) ধরিয়া দিলে অনেকেই তাঁহাদের অংশ বিক্রয় করিতে প্রলুব্ধ হইবেন। সুতরাং বিশেষ স্বার্থে স্বার্থবান লোকের পক্ষে ডিরেক্টার মনোনীত করিবার সময় অনুকূল ভোটসংগ্রহের জন্য অংশ খরিদ করা অসম্ভব হইবে না। যদি এ দেশ-প্রবাসী বিদেশী বণিকরা কোন গতিকে ২ শত অংশ খরিদ করিয়া রাখিতে পারেন এবং ডিরেক্টার নির্ব্বাচনকালে সেই অংশগুলি তাঁহাদের অনুকূল ব্যক্তিদিগকে বিক্রয় করিয়া নিজপক্ষীয় ব্যক্তিবিশেষকে ডিরেক্টার নির্ব্বাচন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে 'কার সাধ্য রোধে তাঁর গতি!' যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন দেশের লোক বা কারবার এ দেশে অস্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহারা অংশ ক্রয় করিবার এবং ভোটদানের অধিকারী হইবেন, তখন এরূপ ব্যাপার যে না হইতে পারিবে, এমন কথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে বোম্বাই অঞ্চলের যাঁহারা টাকার মূল্য ১৮ পেন্স করিয়া ১৬ পেন্স করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারাও যে ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করিবেন না,—ইহা কে বলিতে পারে? বোম্বাই কলওয়ালা প্রভৃতির আত্মরক্ষার্থ টাকার মূল্য হ্রাস করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। তাঁহাদের কার্পাস-পণ্য প্রস্তুত করিতে ব্যয় অত্যন্ত অধিক পড়িয়া যাইতেছে। অন্যান্য প্রদেশের মজুরীর হার অপেক্ষা তাঁহাদের দেশের মজুরীর হার শতকরা ৩০ ভাগ অধিক। ইহা ভিন্ন দূর-দেশ হইতে তাঁহাদিগকে কার্পাস আমদানী করিতে হয়, এবং স্থানীয় কর অত্যন্ত অধিক হারে দিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের পণ্য প্রস্তুতে খরচা অত্যন্ত অধিক পড়িয়া যায়। মুদ্রা-মূল্য হ্রাস পাইলে তাঁহাদের ঐ সকল খরচা আপনা আপনিই যেন অনেকটা কমিয়া যায়। সুতরাং সেই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহাদের সে প্রবৃত্তি হইতেই পারে। কিন্তু তাঁহাদের এ দেশের অহিত করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা বিদেশ পণ্যের আমদানী করেন, তাঁহাদের পক্ষে মুদ্রা-মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করিবার প্রয়াসও স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় কেন্দ্রী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার সভাকে বিভিন্ন স্বার্থে স্বার্থবান লোকদিগের বল পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

এ দেশের প্রবাসী য়ুরোপীয়দিগের মুখপত্র পাইওনীয়ার [illegible] বলিতেছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কটিকে অংশীদারের ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়া সরকার এ দেশের লোককে আধিক [illegible] স্বরাজ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু দেশের লোক এতই [illegible] যে, তাহারা তাহা বুঝিতেছে না। বলা বাহুল্য, এই [illegible]

ইংরেজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রের কথা আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। কোন ব্যবস্থাই সর্ব্বদেশে সর্ব্ব অবস্থায় সমান ফলোপধায়ী হয় না। অবস্থাভেদে অংশীদারের ব্যাঙ্ক আর্থিক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে সত্য, কিন্তু সকল অবস্থায় তাহা হইতে পারে না। যে সময়ে বুলগেরিয়ায় কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কল্পনা হইয়াছিল, সেই সময়ে বিলাতের 'ফাইনান্স্যাল নিউজ' কি লিখিয়াছিলেন শুনুন:—

"There is no magic about a shareholders bank. It is simply one device among many possible devices for securing independence: and there are other devices that are no less effective. Because the device is most suitable to the highly developed Western countries of Europe, it does not follow that it is the only one suitable to the less developed countries of Eastern Europe."

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—"অংশীদারী ব্যাঙ্কের কোন মন্ত্রশক্তি নাই। ব্যাঙ্ককে স্বাধীন করিবার জন্য যত উপায় আছে, ইহা তাহার মধ্যে অন্যতম মাত্র। ইহা ভিন্ন উহাকে স্বাধীন করিবার বহু বহু উপায় বিদ্যমান। এই উপায় য়ুরোপের কতকগুলি ষ্টেট দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়াই যে পূর্ব্ব য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের পক্ষে ইহা উপযোগী হইবে, এমন কোন কথা নাই।"

এখন জিজ্ঞাস্য, বুলগেরিয়া প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্ব-য়ুরোপের স্বাধীন দেশে যখন অংশীদারের ব্যাঙ্ক ঠিক উপযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না, তখন ভারতের ন্যায় পরাধীন দেশে উহা কি কোনমতেই উপযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? বুলগেরিয়ার ন্যায় স্বাধীন দেশে শুল্কনীতি, রেলওয়ের ভাড়ার হার নির্দ্দেশ প্রভৃতি দেশের হিতার্থ দেশের যোগ্য লোক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, ইহা জানে সর্ব্বজনে। সে দেশের পক্ষেও যদি অংশীদারী ব্যাঙ্ক অযোগ্য বলিয়া উচ্চ অঙ্গের বার্ত্তাবিশারদগণ কর্ত্তৃক ব্যক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের মত সর্ব্ববিষয়ে পরতন্ত্র, নিঃস্ব এবং দেশাত্মবোধ-বিহীন দেশে উহা কতটা অনুপযুক্ত হইবে, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন।

ব্যবস্থাপরিষদের প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার প্যাটেল সার বেসিল ব্লাকেটের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিখানি উপস্থাপিত করিতে না দিয়া এই বিলখানি শীঘ্র আইনে পরিণত করিবার পথে বিষম বাধা দিয়াছেন। কিন্তু সরকার যেরূপেই হউক, কার্য্যতঃ এই পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। শেষ উপায়, হয় পাণ্ডুলিপিখানি রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বারা এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে যে, উহা যেন মুখ্যতঃ এবং কার্য্যতঃ দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির আকার ধারণ করে। এই উপায় দ্বারা পাণ্ডুলিপিখানি অতি শীঘ্রই আইনে পরিণত করা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং সরকার সেই ব্যবস্থাই করিবেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পুরাতন তিনখানিকে নূতন বিলের আকারে গঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমরা নূতন বিলখানি সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিলাম।

নূতন পাণ্ডুলিপিতে ব্যবস্থা-পরিষদের ও সভার সদস্যগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হইতে পারিবেন না বলিয়া স্পষ্টই নিয়ম করা হইয়াছে। আমাদের দেশের অবস্থা হিসাবে ঐ ব্যবস্থা উপযোগী হইতে পারে না। বিদেশী ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কারবারে অর্থ-নিয়োগ-কর্ত্তাদিগের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হইয়া থাকে, ইহাই এ দেশের সকলের বিশ্বাস। যাহাতে তাহা না হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটী এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-পরিচালক সমিতিতে দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদের সদস্যদিগকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সার বেসিল ব্ল্যাকেট নূতন আইনের পাণ্ডুলিপিতে সে নিয়ম এবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। নূতন পাণ্ডুলিপিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যদি কোন আইন সভার সদস্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থাপক সভা বা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর্থিক ব্যাপারে রাজনীতিক দলাদলি টানিয়া আনা উচিত নহে,—এই নীতি অনুসারেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মার্কিণের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মার্কিণের নজীর এ দেশে খাটিতে পারে না। মার্কিণের সকল প্রতিষ্ঠানই তথাকার জনমতের এবং গৌণভাবে সিনেটের মতের অধীন। এখানে তাহা নহে। সুতরাং এখানে সে ব্যবস্থা চলিতে পারে না। সে দেশের লোক কোন বিদেশীকে তাঁহাদের আর্থিক ব্যাপারে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে দেন না। এ দেশে তাহা রুদ্ধ করিবার উপায় নাই। সুতরাং এ দেশে ঐ ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে না। সার বেসিল এখন পুরাতন বিলেই এই ব্যবস্থা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম পরিচালকমণ্ডলী বা ডিরেক্টারগণ সরকার প্রথমে ৫ বৎসরের জন্যই মনোনীত করিবেন। তাহা হইলে ৫ বৎসর এই ব্যাঙ্ক সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারেই চালিত হইবে। ইহাতে আপত্তির অনেক কারণ আছে। এবার আর তাহার আলোচনা করা গেল না।

বিলখানিতে আপত্তি করিবার আরও অনেক বিষয় আছে। এবার আমরা আর তাহার আলোচনা করিব না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

লুৎফ-উল্লা



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মানব-চরিত্রের আবর্ত্তন।

দূরে থাকিয়া নূরবাঈ সমস্তই শুনিল। তখন সে দিল্লী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু চারিদিকে ভীষণমূর্ত্তি কিজিলবাস অশ্বারোহী তখন জাঠের সন্ধানে ফিরিতেছে, মথুরা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বাদশাহী সড়কে চলা-ফেরা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জীর্ণ পরিত্যক্ত তোগলকাবাদ হইতে হোডল ও বল্লমগড় পর্য্যন্ত জাঠ ও গুর্জ্জর প্রাচীরবেষ্টিত গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে; সুতরাং নূরবাঈ সহস্র চেষ্টা করিয়াও দিল্লীতে ফিরিবার সঙ্গী খুঁজিয়া পাইল না।

সাহেবজাদা আক্রামজমান খাঁ ও গোলাপী আনন্দরামের পরিচারকদিগের সহিত তখনও নূরবাঈএর নিকটে ছিল। অর্থের অভাবে সাহেবজাদার নেশা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং চেতনা ফেরায় তিনি আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নূরবাঈ অপর লোক না পাইয়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই দিল্লীতে ফিরিবার চেষ্টা করিল। দীর্ঘকাল অত্যধিক মাত্রায় সুরাপান করিয়া আক্রামজমানের চিত্তবৃত্তি বিকল হইয়া গিয়াছিল, মদ্যপের বুদ্ধি স্বাভাবিক পথে পরিচালনা করিতে গিয়া নূরবাঈ প্রথমে অত্যন্ত বাধা পাইল। এই সময়ে গোলাপী আসিয়া তাহার চেষ্টার প্রতিবাদী হইল। সরলা ক্ষুদ্রবুদ্ধি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণী প্রথমে ভাবিল যে, এই রূপসী গুণবতী মুসলমানী তাহার অকূল সমুদ্রের একমাত্র আশ্রয় মত্তপ লম্পট অবাবস্থিতচিত্ত সাহেবজাদাটিকে অধিকার করিতে চাহে। দুই এক দিনের মধ্যে নূরবাঈ বুঝিল যে, গোলাপী তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে দিল্লীর মাচ্ছিত উদ্ধৃতে যথাসম্ভব ভাঙ্গা বাঙ্গালা মিশাইয়া গোলাপীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল যে, সে প্রয়োজনে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আক্রামজমানরূপী পশুটাকে অন্তত কয়টা দিনের জন্য মানুষ করিয়া তুলিতে চাহে।

মদ যখন তাহাকে পশু করিয়া না রাখিত, তখন আক্রামজমান সঙ্গীতশাস্ত্রের মর্য্যাদা বুঝিত। বিপদে পড়িয়া সুরাপান পরিত্যাগ করিয়া সে আকুলচিত্তে একটা নেশা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় কলকণ্ঠী নূরবাঈ উপযাচিকা হইয়া তাহাকে গান শুনাইতে আরম্ভ করিল। সেই কণ্ঠমল্লিকা ধূলিধূসরিত গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া অপরূপ বিনিন্দিতা রূপসী যখন প্রভাতে বা মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় সুরঞ্জিত বাঞ্ছিত সুরলহরীর সৃষ্টি করিত, তখন একে একে গৃহস্থ ছাড়িয়া গুর্জ্জর-বধূ গ্রামপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইত, জাঠ বংশীবাদক গোপাল ও রাখাল চারণ ছাড়িয়া, গ্রামবৃদ্ধ নিত্য দেবার্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে আসিয়া বেষ্টন করিত হিংসায় গোলাপী প্রথম দুই এক দিন আসে নাই বটে, কিন্তু তাহার পরে সে যখন দেখিল যে, নূরবাঈ উপযাচিকা হইয়া কেবল গানই শুনায়, অথচ প্রেমবিতরণ করে না এবং তাহার ফলে আক্রামজমান সুরার অভাবে ভাঙ্গ অথবা আফিমের আশ্রয় লয় না, তখন ধীরে ধীরে সেও সেই আম্রবৃক্ষতলে আসিয়া আসর আরম্ভ করিল। দূর হইতে এক জন জাঠ একটা তম্বুরা সারেঙ্গী লইয়া আসিল, আক্রামজমান যখন তাহা মেরামত করিয়া লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল, তখন নূরবাঈ বুঝিল যে বাঙ্গালার এই হতভাগা সাহেবজাদা কেবল সমজদার শ্রোতা নহে, সে এক জন সিদ্ধহস্ত বাদক। ওস্তাদে ও কন্যাকুমারীতে এক সঙ্গে যখন সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ক্রমে চারিদিকের সমস্ত গ্রাম হইতে শ্রোতা ছুটিয়া আসিল।

যে কলকণ্ঠ মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ, যে চারুনেত্র-চটুলচরণদ্বয় কর্ণালের মহা কুরুক্ষেত্রের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাবিক্রান্ত মোগল সেনাপতিগণকে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যে ক্ষুদ্র গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত গুর্জ্জর ও জাঠদিগকে মুগ্ধ করিবে, এ কথা আশ্চর্য্যজনক নহে। ধীরে ধীরে আক্রামজমানের চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইতেছিল। সে ভাবিত, এই অপরূপ লাবণ্যবতী মহীয়সী রমণী কে? মুহূর্ত্তের শান্ত অপরাহ্ণে যখন কানাড়া ধরে, তখন সেই [illegible]

আম্রকুঞ্জের পত্রমর্ম্মর পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে মায়াবিমুগ্ধা হইয়া সে যখন তাহার কম্বুকণ্ঠের হেলনে কোন বিশিষ্টা রাগিণীর ভাববিকাশ করিয়া ফেলে, তখন তাহার অপরূপ রূপচ্ছটায় দিগন্ত যেন সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নূরবাঈ কেবল হাসে। ক্রমে নূরবাঈএর কিঞ্চিৎ পরিচয় আক্রামজমান যখন গোলাপীর নিকট শুনিল, তখন তাহার শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হইল। আক্রামজমান যখন বুঝিল যে, যে কিন্নরকণ্ঠ বিশ্ববিজেতা নাদির শাহকে বিজয় করিয়াছে, ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তাহা আজ ধূলিধূসর গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে বিশেষ কারণে তাহার মনোরঞ্জনে রাপৃত।

সময় বুঝিয়া এক দিন সেই আম্রকুঞ্জের প্রান্তে নূরবাঈ রঞ্জিত বিভাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের কথা ধরিল। নূরবাঈ বলিল যে, আজ সে বখশীস্ চাহে;—এত দিন ধরিয়া সে সুবা বঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার ভারতবিখ্যাত সুবাদার সুজাউদ্দীন খাঁ বাহাদুরের পুত্রকে গান শুনাইয়া আসিয়াছে এবং মোগল বাদশাহীর বড় দুর্দ্দিন হইলেও সে কিছু পারিশ্রমিক চাহিতে বাধ্য হইয়াছে। ভয়ে নিঃস্ব আক্রামজমান কথা কহিল না। নূরবাঈ বলিয়া যাইতে লাগিল,—সে অর্থ চাহে না, খোদার অনুগ্রহে সে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, সে প্রেম চাহে না, কারণ এই হিন্দুস্থানে সে অনেক স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ প্রেমিক পাইয়াছে; আজ হঠাৎ এই পুরুষবহুল হিন্দুস্থানে এক জন যথার্থ পুরুষের অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

সহসা কোন অজ্ঞাত কারণে বাগ্‌দেবী আসিয়া সেই মত্তমূক মত্তপ লম্পট নবাব-পুত্রের কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইলেন; মধুর কণ্ঠে আক্রামজমান বলিয়া উঠিল, "বিবি, আমি তোমার গোলাম, আমি এত দিন পশু হইয়া ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি আমার এই ব্যর্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াও আপনার যদি কোনও ইষ্ট সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।" নূরবাঈ ঈষৎ হাসিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, নিঃস্বার্থ পরোপকারী আনন্দরাম হিন্দু হইয়াও জীবন পণ করিয়া কেমন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। এখন মুসলমানী নূরবাঈ অজ্ঞাতকুলশীলা বেশ্যা, সে মরিলে কেবল তাহার প্রেমিক সম্প্রদায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবে এবং দুই এক জন ওস্তাদ ও কলাবৎ বিলাপ করিবে। সে কেবল ভয়ে এবং তাহার তুচ্ছ জীবনের মায়ার বশীভূত হইয়া আনন্দরামকে এই বিপদে ফেলিয়াছে। এখন সে নিজকৃত পাপের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছে। সাহেবজাদার নিকট সে এইমাত্র পারিশ্রমিক চাহে যে, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে নাদিরশাহের দরবারে উপস্থিত করিয়া দিন। সহসা মানুষ আক্রামজমান বলিয়া উঠিল, "আলবৎ বিবিসাহেব, জীবন্ত অবস্থায় যদি তোমাকে পৌঁছা'তে না পারি, তা হ'লে মৃত অবস্থাতেও তোমাকে দরবার-ই-আমে পৌঁছে দিব।"

সেই দিন হইতে কিন্নরকণ্ঠের গীত অভাবে চিরস্তব্ধ আম্রকুঞ্জ আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল, দলে দলে গুর্জ্জর আহীর ও জাঠ শ্রোতা ফিরিয়া যাইতে লাগিল। গোলাপী কাঁদিল, আক্রামজমানের পায়ে জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু নিশ্চিন্ত মরণের পথযাত্রী দুইটিকে ফিরাইতে পারিল না। দুইটি ঘোড়া লইয়া আক্রামজমান ও নূরবাঈ দিল্লীর পথ ধরিল।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিচার

দরবারে আনন্দরাম আবার বলিল, "শাহানশাহ, আমি সুবা বাঙ্গালার লোক, মোগল বাদশাহের আশ্রিত। আমার পরিচয় মেহেরবান্ কদরদান্, মহম্মদশাহ বাদশাহ গাজীর নিকট অজ্ঞাত নয়।" বিস্মিত হইয়া নাদিরশাহ মোগল-কুল-কলঙ্ক মহম্মদশাহের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "আনন্দরাম রায় সুবা বাঙ্গালার আমীর এবং খাস দরবারের দরবারী।"

নাদিরশাহ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মহম্মদশাহের প্রভুভক্ত ভৃত্য হয়ে এমন কায করতে গেলে কেন?" আবার তিনবার কুর্ণিস করিয়া আনন্দরাম বলিল, "শাহানশাহ, নর্ত্তকী নূরবাঈ বহুবার আমার বহু উপকার করে'ছে, তা'কে যখন বাদশাহী মহলে কয়েদ করবার হুকুম হ'ল, তখন সে ভয়ে বিহ্বল হয়ে আমার শরণাগত হয়েছিল। সেই জন্য তাকে ইরাণী সৈন্যের অধিকারের সীমা পার ক'রে রেখে এসেছি।"

"তুমি তাকে খুঁজে এনে দিতে পার!"

"শাহানশাহ, মুক্তি পেলে তার সন্ধান করতে পারি; কিন্তু সে যদি স্বেচ্ছায় না আসে, তা হ'লে আন্‌তে পার্‌ব না।"

"বাঙ্গালী কাফের, এর শাস্তি কি জান?"

"শাহানশাহ দীন ও দুনিয়ার মালিক, আপনার হুকুমে কত বাদশাহ শাহজাদার মুণ্ড দিল্লীর পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে, আমি ত কোন্ ছার। যার মৃতদেহ এখানে প'ড়ে আছে, বাঙ্গালার উকীল সরকার এনায়েৎ উল্লাহ্ খাঁ বাহাদুর জীবিত থাক্‌লে বল্‌তে পারতেন, আনন্দরাম রায় কোন্ বংশের লোক। মেহেরবান্ অনেক দিন ধ'রে এই মাথাটা কাঁধের উপরে বড় ভার বোধ হয়েছে, সে'টা হুজুর দরবারে হাজির হয়ে সওগাত দিতে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়েছি।"

নাদিরশাহ আশ্চর্য্য হইয়া এই বিনয়ী অথচ দৃঢ়চিত্ত যুবার মুখের দিকে চাহিলেন, হঠাৎ তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাফের, তুমি নিজের ইচ্ছায় ধরা দিয়েছ কেন? তুমি যে তিনটি স্ত্রীলোকের মুক্তির জন্য ধরা দিয়েছ, তারা তোমার কে?

"জনাব-ই-আলা, তা'রা আমার কেহ নয়।"

"কাফের, জল্লাদের হাতে মৃত্যু তোমার সম্মুখে, হিন্দুস্থানী কাফেরের যদি ঈশ্বর থাকে, তা হ'লে তা'র পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে বল, এই তিনটির মধ্যে যুবতীটি তোমার উপপত্নী কি না?"

"শাহানশাহ, হিন্দুর কোটি কোটি দেবতার নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি, এই তিনটি রমণী পাঞ্জাবী ভদ্রবংশ-জাতা, এরা কস্‌বী নয়। আমি পিতৃ-মাতৃহীন আত্মীয়-স্বজনবিরহিত ব'লে এঁরা আমাকে পুত্রের মত ও ভ্রাতার মত যত্ন করেছেন। মাতৃ-বিয়োগের পরে এত যত্ন কোথাও পাই নি; সেই জন্য তাঁদের বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌বার চেষ্টা করেছিলুম। মেহেরবান্, সকল ভাষায় কৃতজ্ঞতা ব'লে একটা শব্দ আছে। আনন্দরাম রায় রূপের মোহে এই বৃদ্ধার ও তার পৌত্রী দুটিকে রক্ষা করতে যায় নি। বৃদ্ধার অপূর্ব্ব স্নেহ এবং তার পৌত্রী দুটীর স্বর্গীয় ভালবাসায় এই সুদূর প্রবাসে তাদের ক্রীতদাস হয়ে ছিল।"

"দেখ কাফের, যুবতী তোমার উপপত্নী হ'ক বা না হ'ক, তা'তে আমার প্রয়োজন নেই; নর্ত্তকী নূরবাঈকে আমার প্রয়োজন। তুমি যদি তাকে পৌঁছে দিতে পার, তা হ'লে তোমরা সকলে মুক্তি পাবে।"

"পূর্ব্বেই বলেছি শাহানশাহ, অনুমতি পেলে চেষ্টা কর্‌তে পারি; কিন্তু নূরবাঈ যদি না আসে?"

"তোমার সঙ্গে বাদশাহী নসক্‌চী ও হাজার সওয়ার দিচ্ছি।"

"বলের আবশ্যক নেই জনাব, আপনার এলাকার বাহিরে আনন্দরাম রায় একাই সহস্র। এই লক্ষ লক্ষ কিজিলবাস মঙ্গোল, তাতার সেনার মধ্য হ'তে একা আনন্দরাম রায় এই চারিটি নারীকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিল।"

"তুমি একা?"

"সাহানশাহ, আমি একা।"

"এখন তুমি একা দিল্লী থেকে পালাতে পার?"

"সাহানশাহের মেহেরবাণী হ'লেই পারি। তবে তিনটি সর্ত্ত আছে, প্রথম আমাকে দরবার থেকে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় আটক করা হবে, কেহ আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ কর্‌বে না, দুসরা আমি পালাতে পার্‌লে শাহানশাহ রমণী তিনটিকে যাতে দেবেন না, তিসরা নূরবাঈ যদি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসে, তা হ'লে আমাকে মুক্তি দিন আর না দিন, আগে রমণী তিনটিকে মুক্তি দেবেন।"

"বখশীদম, তাই হবে।"

নাদিরশাহের ইঙ্গিতে দশ জন সশস্ত্র নসক্‌চী আনন্দরামকে বেষ্টন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল। বাদশাহী দরবারের সমস্ত কথা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ হইত, যে কর্ম্মচারী এই কার্য্য করিত, তাহার উপাধি "খাসওয়াকিয়া নিসার।" সে দিনের বিবরণ লিখিতে গিয়া সে লিখিল যে, ইরাণী বাদশাহের প্রাপ্য অর্থদণ্ড দিতে না পারিয়া ইরাণী নসক্‌চীর অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠায় বাঙ্গালার উকীল-ই-সরকার এনায়েৎ উল্লা খাঁ বাহাদুর সপরিবারে আত্মহত্যা করিয়াছেন। দিল্লীর চুড়ীওয়ালী গলির চাচী, তাহার প্রেমপাত্র কিজিলবাস এনায়েৎ-উল্লার দিবাদৃষ্টি লাভ এবং চাচীর হত্যা তাহাতে ধরা পাইল না। মোগলের সরকারী ইতিহাস এইভাবে লিখিত হইত।

[ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ

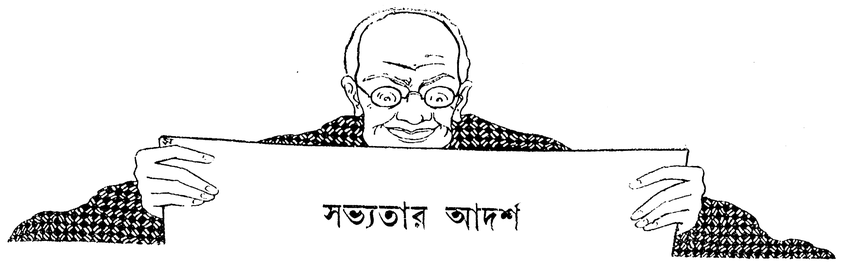

সভ্যতার আদর্শ

মা!—

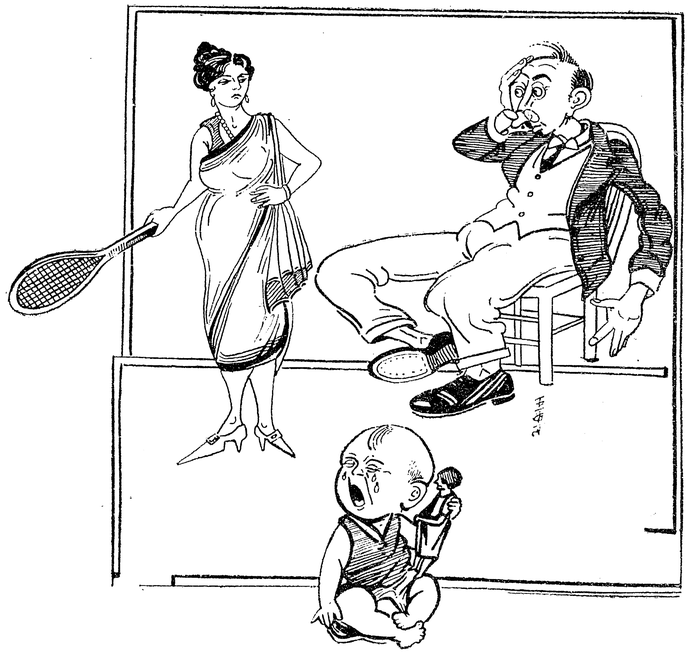

টেনিস্ খেল্‌তে গিন্নী চলেন, অশেষ তাঁহার গুণ।
ছেলে কেঁদে আকুল হলো, কর্ত্তা ভেবে খুন॥

হুম্‌কা !



ব্যারিষ্টারের বক্তৃতাতে জজের কানে তালা।
কাঠগড়াতে আসামা কাঠ, ভাবে এ কি জ্বালা ॥

উদ্ধার !



ভজ্‌বি যদি যীশু তবে আয় না ত্বরা ক'রে।
ঠাকুর-ঘরে গড়্‌ কর্ত্তে গেলি কিসের তরে ॥

শিক্ষার গর্ব্ব !



ইংরেজীটা শিখেছিলাম—বড়ই ছিল ঝোঁক।
কার সঙ্গে কইব কথা, পাইনে খুঁজে লোক ॥

ইঙ্গ বঙ্গ—

"আমরা বিলাতী ধরণে হাসি বিলাতী ধরণে কাসি।
পা ফাঁক ক'রে সিগার টানিতে বড্ডই ভালবাসি॥"

সাহেব ও বাবু—

গুড্‌মর্ণিং গুড্‌মর্ণিং সার।
আজ্ঞে করুন, তামিল করি হুকুম আপনার॥

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাট্‌-ছাঁটেতে দেখুন সাহেব কিছু ত্রুটি নাই।
গায়ে দিতে চেহারার কি বেড়েছে শোভাটাই॥

বাঙ্গালার ভাবী বংশধর—



মশাই! মশাই! ডাকছি এত শুন্‌তে কি পান নাই?
ম্যাচিস্ আছে?—দিন ত বারেক ধরিয়ে নি বার্ড্‌সাই॥

[শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক।



মহাচীনের বলশেভিকাতঙ্ক

চীনদেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়া এরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। নানা জনের নানা স্বার্থের অনুকূল পরস্পরবিরোধী অনেক তথ্যই অবগত হওয়া সম্ভবপর। রাজ্যের অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে এমন সকল দেশেই হইয়া থাকে। যত দিন বন্যার জল নদীকে আচ্ছন্ন ও আবিল করিয়া থাকে, তত দিন তাহার অভ্যন্তরভাগ পঙ্কিল ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে,—অতিরিক্ত জল সরিয়া গেলে, উপরের আবর্জ্জনা বিগতইয়া গেলে আবার নদীর স্বাভাবিক জল দর্পণের মত স্বচ্ছ হইয়া থাকে।

যখন ক্যাণ্টনের ত্যাশানালিষ্ট দল ভীমবিক্রমে উত্তরের রাজ্যগুলি নির্গত হইয়া একে একে হাঙ্কো, সাংহাই, ন্যাংকিং প্রভৃতি সহর অধিকার করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হয় নাই, তখন ঐ দলের দলপতি জেনারল চিয়াং কাইসেক, আর তাঁহার সহকর্ম্মী ইউজিন চেন, মাইকেল বোরোডিন ও অন্যান্য চীনা ও রাসিয়ান। পরলোকগত জাতীয় দলপতি ডাক্তার সান ইয়াটসেনের বিধবা পত্নী এবং তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিও তাঁহার পরম পৃষ্ঠপোষক। তখন দক্ষিণের জাতীয় দলের মধ্যে কোনও বিরোধের কথা শুনা যায় নাই, স্বয়ং দক্ষিণের চীনাদের মধ্যে বলশেভিক কম্যুনিষ্ট বলিয়াও কোন দল দেখা দিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তখন চীনের জাতীয় দল একই দেশপ্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একই দেশের মুক্তির লক্ষ্যে একই দেশ-বৈরী উত্তরের দস্যু-সর্দ্দার চাঙ্গসোলিন ও তাহার সহকারী জেনারেল উপেইফু, সানচুয়ান ফ্রু ও য়ুয়ান সান চুয়াং এবং তাহাদের সকলের উৎসাহদাতা বিদেশীদিগের বিপক্ষে জয়যাত্রায় ধাবমান হইয়াছিল।

কিন্তু সাংহাই ও নানকিং জয়ের পর হইতেই একতায় ঘুণ ধরিল—চিয়াং কাইসেক চরমপন্থী চীনাগণকে (নিজের দলের মধ্যে যাহারা বিদেশীদিগের সহিত কোনও সর্ত্ত করিতে সম্মত হইল না, যাহারা বিদেশীকে চীনদেশে বিদেশীর মত রাখিবার পক্ষ দৃঢ়সঙ্কল্প হইল) সেই চীনাগণকে বলশেভিক ও কম্যুনিষ্ট বলিয়া দিলেন এবং সেই সূত্রে বহু চীনাকে দণ্ডিত, নিহত ও নির্য্যাতিত করিলেন। ইহা হইতেই দলাদলির সূত্রপাত হইল,—চিয়াং বিদেশীদিগের নিকট sane and sober আখ্যা পাইলেন এবং ইউজিন চেন, বোরোডিন ও অন্যান্য কয়জন দক্ষিণী দলপতি চরমপন্থী বলশেভিক ও কম্যুনিষ্ট বলিয়া মার্কামারা হইয়া গেলেন। চিয়াংএর আড্ডা হইল নানকিং, ইউজিন চেনের হাঙ্কো। নানা ঘটনার পর চিয়াং দলপতিত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার পুত্র পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া সম্বোধন করিল, এমন কি, তিনি বিদেশীর নিকট ঘুষ খাইয়া উত্তরের দস্যু দেশবৈরী চাং ও সান চুয়াংয়ের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়াও জনরব রটিল। এ দিকে ইউজিন চেন ও বোরোডিন মঙ্গোলিয়া হইতে খৃষ্টান সেনাপতি ফেংউসিয়াংকে জাতীয় দলের নেতৃত্ব ও সেনাপতিত্ব করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।

দিনকতক ইউজিন চেন হাঙ্কো হইতে জাতীয় দলের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি হাঙ্কোর জাতীয় দলের পররাষ্ট্র-সচিবরূপে ইংরাজ ও অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির সকাশে কূট রাজনীতিক জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরদিন চীনের মুক্তির ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। বোরোডিনও চীন-সেনাকে যে ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমরবিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন, পরন্তু জাতীয় দলের নেতৃগণের পশ্চাতে থাকিয়া যেরূপ রাজনীতিক চাল দিয়া ইংরাজকে কোণঠাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই রাসিয়ান বলশেভিষ্টও চীনার ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাসে নিশ্চিতই স্থান পাইবেন।

কিন্তু চীনের বর্ত্তমান অরাজক অবস্থার রাজনীতি মুহূর্ত্তে বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতেছে। তাই কয়েক দিন পরে চেন ও বোরোডিন পদচ্যুত হইলেন, হাঙ্কো ও নানকিং হইতে কম্যুনিষ্টরা বিতাড়িত হইল এবং চিয়াং কাইসেক আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন বলিয়া সংবাদ রটিত হইল। সত্যই বোরোডিন নির্ব্বাসিত হইলেন, চেন পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু চিয়াং স্বপদে অধিষ্ঠিত হইলেন কি না পাকা খবর পাওয়া গেল না। শুনা গেল, হাঙ্কো ও নানকিংয়ের দ্বিধা-বিভক্ত জাতীয় দল আবার মিলিত হইয়াছে এবং ডাক্তার উ নানকিং গভর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ হাঙ্কো, নানকিং ও ক্যাণ্টন এই সম্মিলিত গভর্ণমেণ্টের) বৈদেশিক সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন এবং জেনারেল হো ইং চিং জাতীয় দলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া উত্তরের বিপক্ষে পিকিং সহর অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মাঝে প্রকাশ পাইল, তিনি পুকৌ সহর অধিকার করিয়াছেন, উত্তরের সেনারা পেংপুর দিকে হটিয়া যাইতেছে। এইভাবে যদি জাতীয় দল অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে খৃষ্টমাস পর্ব্বের পূর্ব্বেই তাহারা পিকিং অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।

কিন্তু খৃষ্টমাস অতীত হইল, অথচ জাতীয় দল পিকিং অধিকার করিতে পারিল না, উত্তরের সর্দ্দার চাংসোলিন পূর্ব্ববৎ উত্তরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াই আছেন।

ডাক্তার উ জেনারল চিয়াং কাইসেকের বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ। তিনি জেনারল চিয়াংকে নানকিংয়ের কর্ত্তৃত্বপদে ফিরাইয়া

আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্যে যাহাই বলুক, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, চিয়াং বর্ত্তমান চীনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি কোনও সংবাদ-সংগ্রাহককে সখেদে বলিয়াছেন,—"চিয়াং আর সাংহাইয়ে ফিরিয়া আসিবে না। জাতীয় দল তাহাকে একবারে হারাইয়াছে—ইহা জাতির দুর্ভাগ্য। হাজার হাজার লোকের সঙ্গে আমিও তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সকল অনুরোধই ব্যর্থ হইয়াছে। সে আর আসিবে না। যে এক দিন কাণ্টন হইতে ১ হাজার মাইলের উপর পথ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া ধূলির ন্যায় উত্তরের উপেইফুর সুশিক্ষিত সেনাকে উড়াইয়া দিয়াছিল এবং এখনও যে ইচ্ছা করিলে সান চুয়াং ও চাংসোলিনকে পরাজিত ও পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারে, সে আজ সামান্য নগণ্য লুক্কায়িত জীবন অতিবাহিত করিতেছে, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!" যখন সংবাদ-সংগ্রাহক জিজ্ঞাসা করেন,—"কেন চিয়াং নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না?" তখন ডাক্তার উ বলেন, "কিরূপে লইবে? তাহার অধীন যাহারা, তাহারাই নিজের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিতেছে, তাহাকে প্রকাশ্যে অপমান করিতেছে, দেশদ্রোহী বলিয়া ধিক্কার দিতেছে। এ অবস্থায় সে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কেন? এই দলাদলির সুযোগ পাইয়া উত্তরের দস্যুরাও মহা আনন্দিত!"

বস্তুতঃ এই ঘরোয়া বিবাদই সকল পরাধীন মুক্তিকামী জাতির কাল! আজ চিয়াং দেশের উদ্ধারকর্ত্তা, কাল তিনি দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার! আজ ইউজিন চেন পরম কূট রাজনীতিক, —তাঁহারই রাজনীতিক চালে বলডুইন চেম্বারলেন কোম্পানী মাত হইল, কাল তিনি বিতাড়িত বলশেভিক কম্যুনিষ্ট! ইহাই ত পরাধীন জাতির বৈশিষ্ট্য! আবার কোন্ দিন শুনিব, ডাক্তার উ দেশের শত্রু, উত্তরের গুপ্তচর!

আশ্চর্য্য কিছুই নাই। তাই ক্যাণ্টন হইতে কম্যুনিষ্ট-বলি-যজ্ঞে সহস্র সহস্র চীনার আহুতি দেওয়া হইয়াছে। সেখানে মৃত্যুর তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে। বলশেভিক ও কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া অসংখ্য চীনার রক্তপাত করা হইতেছে। জগতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের সমর্থক পত্রসমূহ তারস্বরে আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিতেছে,—"এত দিনে চীনের বলশেভিক খোলস খসিয়া পড়িল, এইবার চীন শান্ত ও সংযত হইল।"

এই শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী সমালোচক যখন পিঠ চাপড়ায় ও বাহবা দেয়, তখন তাহার পশ্চাতে একটু কিছু ভাবিবার চিন্তিবার আছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ইহার মধ্যে Rallying the Moderates নীতির মাল-মশালার গন্ধ পাওয়া যায় কি না, খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। উত্তরের Sane and sober চাং ও সানের সহিত ক্যাণ্টনের কম্যুনিষ্ট-বলশেভিক-বিরোধী নূতন কর্ত্তাদিগকে একই বগলসে বাঁধিবার চেষ্টা হইতেছে কি না, এখন অবস্থাভিজ্ঞকে তাহারই বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

শিখিলাম কি?

চীনের এই দাবা-বোড়ের ছকের খেলায় আমরা শিখিলাম কি? চীনও আমাদের মত প্রাচ্য ও প্রাচীন সভ্য জাতি—তাহারাও আমাদের মত পরাধীন—(অবশ্য এক মনিবের নহে, বড় বড় পাঁচ মনিবের), তবে ঠিক কাগজে-কলমে তাহাদিগকে পরাধীন আখ্যা দেওয়া হয় না বটে। যাহাই হউক, তাহারা স্বাধীনই হউক, পরাধীনই হউক বা আধা-স্বাধীনই হউক, ইহা সত্য যে, প্রতীচ্যের পরম হিতৈষী, জনসেবাপরায়ণ, স্বেচ্ছায় পরার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাপুরুষরা আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আমাদের অকর্ম্মণ্য হস্ত হইতে আমাদের দেশের ধনরত্ন আহরণের কষ্টের ভার একে একে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, চীনদেশেও প্রায় তাহাই হইতেছে, তবে চীনের হিতৈষী এক জন নহেন, একবারে পরমহংসের সেবার দল! কিন্তু আশ্চর্য্য এইটুকু, এই সেবাদলের মধ্যে চীনের জাতীয় দল মার্কামারা করিয়া রাখিয়াছে এক জনকে —তিনি আমাদেরই প্রভু স্বয়ং বৃটিশ সিংহ মহাশয়!

আজ ২ বৎসর যাবৎ চীনদেশে চীনের জাতীয় আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যিকতার বিপক্ষেই চলিয়াছে। গত বৎসরের শেষ-ভাগে চীনের জাতীয় দল সমগ্র জগতের শক্তিপুঞ্জকে—বিশেষতঃ বৃটিশসিংহকে যে নিজের মুঠার মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার গূঢ়-তত্ত্ব কয় জন জানেন? সে সময়ে তাহারা শক্তিপুঞ্জকে নিজের সর্ত্তমতে চীনে থাকিয়া বসবাস ও বাণিজ্য করিবার হুকুম দিতেছিল। কোনও শক্তিরই সেই সময়ে সাধ্য হয় নাই যে, সেই হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, চীন জগতের মধ্যে অন্যতম দুর্ব্বল ও দরিদ্র জাতি! জগতে স্থলে তাহার কি শক্তি ছিল যে, জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি বৃটেনের মুখের উপর কথা কহে, বৃটেনকে ভয় দেখাইয়া নিজের সর্ত্তে বাধ্য করে? যে সময়ে ইংরাজ সাংহাইয়ের উদ্দেশে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং যে সময়ে সেই অভিযান সাংহাইয়ে পৌঁছায় নাই, সেই সময়ে ইউজিন চেন চীনের জাতীয় দলের পররাষ্ট্র-সচিবরূপে সার অষ্টেন চেম্বারলেনকে (বৃটেনের পররাষ্ট্রসচিব) ভয় দেখাইয়া স্বীকার করাইয়া লইলেন যে, সার অষ্টেন অন্তরে একটি ব্রিগেড সৈন্যকে সাংহাই না পাঠাইয়া হংকংএ রাখিয়া দিতে বলিবেন। কেবল ইহাই নহে, ইউজিন চেন সার অষ্টেনকে হ্যাঙ্কো ও কিউকিয়াংএর 'কনশেসান' চীনের জাতীয় দলের গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। অথচ এই দুইটি সহর বানাইতে ও উহাদের বাণিজ্য-সম্পদে গড়িয়া তুলিতে ইংরাজকে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল! ইংরাজের জাতীয় ইতিহাসে এমন অপমান বোধ হয় কখনও তাহাকে সহ্য করিয়া হজম করিতে হয় নাই। দুর্ব্বল, দরিদ্র, অশিক্ষিত বর্ত্তমান চীন এক দিকে, অন্য দিকে প্রবলপ্রতাপ সাম্রাজ্যগর্ব্বী শিক্ষিত সভ্য ইংরাজ। যে ইংরাজ 'নেটিভ' জাতিমাত্রকেই নিম্নশ্রেণী দেখিয়া থাকে, যে ইংরাজ কথায় কথায় বলিয়া থাকে 'No damned nonsense', যে ইংরাজ জাতির অপমান কোন জাতির নিকট সহ্য করিতে পারে না, যে ইংরাজ দুর্ব্বল জাতিগণের বিধাতার নির্ব্বাচিত অভিভাবক বলিয়া আপনাকে মনে করে, যে ইংরাজ জগতের জলপথে আপনাকে শান্তিরক্ষক বলিয়া গর্ব্ব করে,—সেই ইংরাজ গৃহযুদ্ধে দুর্ব্বল চীনাম্যানের নির্দ্দেশ মাথা পাতিয়া পালন করিল, ইহার অপেক্ষা ইংরাজের অপমান হজম করার পরিচয় আর কি পাওয়া যাইতে পারে?

কেবল ইহাই নহে, চীনের জাতীয় দল চীনে যাবতীয় বৈদেশিক শক্তির extra-territorial অধিকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছে এবং বেলজিয়ামের সহিত সন্ধি অমান্য করিয়া টিণ্টসিনের অধিকার-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়াছে, অথচ এই অধিকার বেলজিয়াম বহুকাল হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছে।

ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার এইটুকু যে, একটিমাত্র গোলাগুলী না ছুড়িয়া বিনা রক্তপাতে চীনের জাতীয় দল ইংরাজের মত প্রবল শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জাতিকে হ্যাঙ্কো ও কিউকিয়াংএর অধিকারস্বত্ব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে। চীনের জাতীয় দল নিজের অধিকার বলপূর্ব্বক দাবী করিবার পূর্ব্বেই ইংরাজদূত সার মাইলস ল্যাম্পসন কেবল চীনের বন্ধুতা লাভ করিবার উদ্দেশে চীনের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শতযুদ্ধ জয় অপেক্ষা ইউজিন চেনের এই রাজনীতিক চালবাজী কি অধিক ফলপ্রসূ হয় নাই?

ইহার মূল কারণ কি? সার অষ্টেন স্বয়ং এই রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই সময়ে বলিয়াছিলেন,—চীন বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করিয়া বৃটেনের বাণিজ্যের যে সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল, তাহাই পূর্ণ করিতে—আবার চীনে বৃটিশ বাণিজ্য অটল করিতে চীনের ন্যায্য দাবী এইরূপে পূর্ণ করা হইতেছে। আবার লর্ড সভায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল যে,—চীন যদি ইংরাজের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া বৃটিশ-বাণিজ্যের পুনঃপ্রবর্ত্তনে সহায়তা করে, তাহা হইলে সাংহাই বন্দরও চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। যখন এই সংবাদ প্রথমে সাংহাইএ উপস্থিত হইল, তখন সাংহাইএর বৃটিশ প্রতিনিধি সার সিডনি বার্টন প্রাণপণে খবর চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ২৫ ঘণ্টাকাল এই বিষম সংবাদ চাপিয়া রাখা হইয়াছিল এবং এ সংবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে তার করা হইয়াছিল। যখন বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষও সংবাদ সত্য বলিয়া জানাইলেন, তখন সাংহাইএর No damned nonsenseওয়ালা গর্ব্বের ও দম্ভের অবতার ইংরাজ বণিকরা মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। পরন্তু সাংহাইএর অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি একবারে পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্তের মত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা হইতে আমাদেরও শিখিবার যথেষ্ট আছে। আমরাও দুর্ব্বল, দরিদ্র ও 'অসভ্য', 'নাবালক' জাতি। আমরাও কি একটি গোলাগুলী না ছুড়িয়াও—বিনা রক্তপাতে আমাদের নষ্ট জন্মগত অধিকার উদ্ধার করিতে পারিব না? এ দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ দম্ভভরে বলিয়া থাকে যে, "ভারতীয়ের মুখে স্বরাজের দাবী বাতুলতামাত্র, উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয়। ভারতীয়রা যতই চীৎকার করুক, আর আবেদন-নিবেদন করুক, এ যাবৎ আমরা যে ভাবে ভারত শাসন করিয়া আসিয়াছি, সেই শাসন-নীতি হইতে আমরা এক পদও নড়িব না।" কিন্তু চীনেও এ যাবৎ বৃটিশ-রাজ কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন? আজ সেই নীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে কেন? জাতি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। চীন কিরূপে সেই অসাধ্য সাধিত করিল? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ বাধা ও ভয়প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া বিনা রক্তপাতে দরিদ্র দুর্ব্বল চীন নিজের জন্মগত অধিকার আদায় করিয়া লইল কিরূপে? ভারতও চীনের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, দুর্ব্বল ও দরিদ্র, কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়? চাই মন, চাই একাগ্রতা, চাই ত্যাগ, চাই যথার্থ দেশপ্রেম!

জগতে নারীর স্থান

অধুনা প্রতীচ্যে নারী প্রায় সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত স্থান লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, অবসর ও সুযোগ অভাবে নারী এত দিন এ বিষয়ে সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা দেখাইতেছেন যে, চিন্তারাজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের অপেক্ষা তাঁহারা বহু উচ্চে স্থান লাভ করিতেছেন। ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়েও যে তাঁহারা ঐরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন না, এমন কোনও কথা নাই। শারীরিক ব্যায়ামক্ষেত্রেও এখন নারীকে পুরুষেরই মত ফুটবল ক্রিকেট খেলিতে, সন্তরণ করিতে, বাচ খেলিতে, দৌড়-ঝাঁপ করিতে, সার্কাস জিমনাষ্টিক করিতে, এমন কি, মল্ল ও মুষ্টিযুদ্ধ করিতেও দেখা যাইতেছে। রাসিয়ার নারী-পল্টন কথার কথা নহে। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডেও নারী বাসে, ট্রামে, তার আফিসে, ডাকঘরে, হাঁসপাতালে, ব্যাঙ্কে, কেরাণীর আফিসে,—সর্ব্বত্র পুরুষের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং এখন মার্কিণ যুক্তপ্রদেশে ও ইংলণ্ডে নারী লেখক, নারী শিল্পী, নারী চাকুরীজীবিনী, নারী সংসার-পালয়িত্রী, নারী বিচারক, নারী ব্যবস্থাপক প্রভৃতির ত ছড়াছড়ি। সুতরাং ঘোর তর্ক উঠিয়াছে,—নারী ছোট কিসে? —কি জন্য তাঁহার পক্ষে পুরুষের মত মর্য্যাদা ও সম্মানের পথ উন্মুক্ত হয় না? দৃষ্টান্তস্বরূপ নারী লেখিকারা দেখাইয়া থাকেন, নোবেল পুরস্কার প্রদান প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মাত্র দুই জন নারী পুরস্কার দানের উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। বিলাতের রয়্যাল একাডেমিতে কয় জন নারী-শিল্পী সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন? সাহস ও শৌর্য্য প্রদর্শন করার দরুণ কয় জন নারী রয়্যাল হিউমেন সোসাইটীর পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন? নারীর কৃতিত্বের অভাব নাই, কিন্তু পুরুষের একদেশদর্শিতার ফলে এইরূপ হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে বিলাতে তর্ক-বিতর্ক উঠিয়াছে। 'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের সম্পাদক এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নিমিত্ত বহু নারী লেখিকাকে তাঁহার পত্রে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। সেই সমস্ত মতামত বড়ই কৌতূহলপ্রদ। আমরা নিম্নে তাহার আভাস দিতেছি।

প্রথমেই কয়জন বিশিষ্টা নারীর পরিচয় প্রদান করিব, না হইলে অবস্থা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। নারী যে উন্নতির কত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তা নারীর কথা উল্লেখ করা যাউক। গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ঐ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির

জন্য ইটালীর খ্যাতনামা মহিলা ঔপন্যাসিক শ্রীমতী গ্রেজিয়া দেলেদ্দা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রায় ২৫ বৎসর কাল জগতে এই নোবেল পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। সুইডেনের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক নোবেল এক পরিচালক সমিতির হস্তে বহু অর্থ প্রদান করিয়া যান। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার আয় হইতে প্রতি বৎসর সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারীকে কয়েকটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে, উহারই নামই নোবেল পুরস্কার। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমাদের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' রচনার জন্য ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া—আমরা এই পুরস্কারের কথা সবিশেষ অবগত হইয়াছি।

২৫ বৎসর কাল বহু পুরুষ এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীমতী দেলেদ্দার পূর্ব্বে মাত্র ১ জন মহিলা ঐ পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী দেলেদ্দা সার্ডিনিয়া দ্বীপের অধিবাসিনী। তত্রত্য মোরো গ্রামে কৃষক, শ্রমিক ও মেষপালকের মধ্যে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করেন, তাই তাঁহার উপন্যাসসমূহে গ্রাম্য-জীবনের চিত্র ও কৃষক শ্রমিকের সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যের কথা স্বভাব-সুন্দর ভাব ও ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে কৃত্রিমতার গন্ধ নাই। তাঁহার "লা মাত্রে" নামক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাই নারী লেখিকারা বলেন, অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দেলেদ্দা এত বড় লেখিকা হইতে পারিয়াছিলেন। নারীকে সুযোগ ও সুবিধা দিলে নারীও পুরুষের মত নোবেল পুরস্কার পাইতে পারেন। দেলেদ্দার মত শক্তিশালিনী নারী যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু পুরুষ তাঁহাদিগকে ফুটিতে দেয় না,—সংসারের চাপে অবসন্ন করে বলিয়াই মাত্র আর এক জন নারী এই সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রয়্যাল একাডেমির সদস্য শ্রীমতী লরা নাইটের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। এই একাডেমিতে বড় বড় চিত্র-শিল্পী সদস্য পদ পাইয়া থাকেন। সবই প্রায় পুরুষ সদস্য। কেবল ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে এঞ্জেলিকা কফম্যান ও মিসেস মোজার নাম্নী নারীদ্বয় এই একাডেমিতে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী অ্যানি, এল, সুইনার্টন এবং গত বৎসরে শ্রীমতী লরা নাইটের ভাগ্যে এই সদস্য পদ লাভ ঘটিয়াছে। আর এক জন নারীও জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হন নাই। অথচ শ্রেষ্ঠ নারী-চিত্রশিল্পীর অভাব নাই!

মহত্ত্ব ও শৌর্য্যের বিকাশেও নারী যে পুরুষের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী নহেন, তাহা প্রাচীনকালের গ্রেস ডার্লিং হইতে বর্ত্তমানের অ্যাডা ব্ল্যাকজ্যাক পর্য্যন্ত বহু নারীর চরিত্র-চিত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রেস ইংরাজ-বালিকা, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সমুদ্রে সলিল-সমাধি হইতে কয়েকজন জাহাজের যাত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে ত তবু অতীতের স্বপ্নময় রাজ্যের কথা। সম্প্রতি বাস্তব জগতে এস্‌কিমো বালিকা অ্যাডা ব্ল্যাকজ্যাক (তাহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর) যে অদ্ভুত মানসিক ও দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর—উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার মত চমকপ্রদ।

কানাডার আর্টিক অঞ্চলের আলাস্কা প্রদেশের কোডিয়াক গ্রামে ইহার জন্ম হয়। বাল্য হইতেই তিনি সেই হেতু এই অনন্ত তুষার মরু-রাজ্যের কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নোম নামক জনপদে খৃষ্টান মিশনারী দগের বিদ্যালয়ে যৎসামান্য লিখিতে পড়িতে ও সেলাই করিতে শিখিয়াছিলেন।



শ্রীমতী লরা নাইট

১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী ব্ল্যাকজ্যাক অশিক্ষিত, গোঁয়ার, সে তাঁহার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত। অ্যাডা সন্তানগণের মুখ চাহিয়া নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতেন; কিন্তু যখন দুইটি সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন তৃতীয় সন্তানটিকে লইয়া স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি নোম সহরে বসবাস করিতে লাগিলেন। সেখানে শ্বেতাঙ্গদিগের গৃহে রন্ধনকার্য্য করিয়া এবং সীবনকার্য্য করিয়া আপনার ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নোম হইতে একটি অভিযান ১ শত ১০ মাইল উত্তরে তুষার ও বরফ-রাজ্যমধ্যে র‍্যাঙ্গেল দ্বীপে যাত্রা করে। ইংরাজ ঐ দ্বীপ অধিকার করিবার মানসে অ্যালান ক্রফোর্ড প্রমুখ ৪ জন উৎসাহী যুবককে "সিলভার ওয়েড" নামক কুদ্র অর্ণবপোতে প্রেরণ করেন। অ্যাডা তাঁহাদের রন্ধনকার্য্য ও গৃহস্থালীর কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত তুষারমরুর উদ্দেশে যাত্রা করেন; যাত্রার পূর্ব্বে তিনি পুত্রকে কোডাক গ্রামে জননীর নিকটে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

এই অভিযানের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বরফ-বেষ্টিত হইয়া

অ্যাডা ২ বৎসর কাল মানুষের সহিষ্ণুতার সীমার অতিরিক্ত কষ্ট ও বিপদ বরণ করিয়া কেবল ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহাদের জাহাজ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে তাম্বু ও রসদপত্রাদিসহ নামাইয়া দিয়া নোমে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কথা রহিল, ১ বৎসর পরে অন্য জাহাজ আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। কিন্তু এক বৎসর অতীত হইলেও কোন জাহাজ আসিল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হইল, রসদ ফুরাইল, রোগ দেখা দিল,—তখন তাঁহাদের কি অবস্থা হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহার প্রায় ২ বৎসর পরে হ্যারল্ড নইস নামক এক জন স্কট 'ডোনাল্ডসন' জাহাজে আসিয়া দ্বীপে অবতরণ করেন। দূর হইতে তাম্বু দেখিয়া তাঁহার আশা হইয়াছিল, বুঝি অভিযানকারীরা বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাম্বুতে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, মাত্র অ্যাডা জীবিতা, আর সকলেই মরিয়াছে!



অ্যাডা ব্ল্যাকজ্যাক ও তাঁহার পুত্র

দারুণ শীতে আহার্য্যাভাবে ভীষণ কষ্ট পাইয়া এবং 'কাউর খা' রোগে ভুগিয়া শ্বেতকায়রা পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। ৮ মাস পূর্ব্বে ক্রফোর্ড, মরিয়র ও গল বরফের উপর দিয়া হাইবিরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, আর ফিরে নাই। অনন্ত শীতল শুভ্র বরফরাজ্যের কোন না কোন স্থানে তাহাদের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। নাইট রোগে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া ৮ মাস পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, আড্যা তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়াছিলেন এবং এখনও দেহ আগুলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন!

অ্যাডা, নাইটের রোজনামচা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি কিরূপ সাহস ও ধৈর্য্য, মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যগুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার সকল গুণের মূলে ভগবানে অবিচলিত বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরতা। ইহা তাঁহার রোজনামচার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চারিদিকে অনন্ত অবিশ্রান্ত বরফের পর্ব্বতমালা, জনমানবহীন বরফবেষ্টিত দ্বীপ, ভয়াল গম্ভীর নীরবতা, পার্শ্বে নাইটের মৃতদেহ,—আর সেই ভীষণ নির্জ্জনতার মধ্যে একাকিনী স্বল্পবয়স্কা নারী—তিনি যে পাগল হইয়া যান নাই, ভগবানে বিশ্বাস ও চরিত্রের মহত্ত্বই তাহার মূল কারণ। এমন অসাধারণ ধৈর্য্য, সাহসিকতা, মহত্ত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস পুরুষের মধ্যেই বা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

নারীজাতির মধ্যে এমন মনীষা ও মহত্ত্বের পরিচয় নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে। তথাপি নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে কেন?—এই প্রশ্ন 'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র উত্থাপন করিয়াছেন। এই পত্র বলেন, "জগতের কলাবিদ্যায় বা সাহিত্যে নারী পুরুষের অনুরূপ দান দিয়া যাইতে পারেন নাই। নারীর মধ্যে হোমার, ভার্জ্জিল, দাঁতে, সেক্সপিয়ার নাই; রাফেল, গিডোও নাই।" এই পত্র এই যুক্তি দেখাইয়া এ সম্বন্ধে নারীর যুক্তি-তর্ক আহ্বান করিয়াছিলেন। উত্তরে নারীর পক্ষ হইতে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা কৌতূহলপ্রদ। আমরা কেবল নারীর মতামতই এই স্থলে উদ্ধৃত করিব।

লণ্ডনের 'ডেলী ক্রণিকল' পত্রে শ্রীমতী জোয়ান সাদার্ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন, "চিত্র-শিল্পে এঞ্জেলিকা কফম্যান, রোজা বনহরু ও ভাইগী লে ব্রুণও মাইকেল এঞ্জেলো, রেমব্রাঁ, গিয়োটো ও ডা ভিন্সির সহিত তুলনীয় হইতে পারেন না। কেন এমন হয়? নারীকে এত দিন গৃহস্থালীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই কি এইরূপ হইয়াছে? কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকিলে এমন ত হয় না। যদি যথার্থ প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে উহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্ররোচিত হইলে জগতে কোন বাধা-বিঘ্ন মানে না। নারীই কি আর পুরুষই কি,—যাহারই মধ্যে প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, সে জগৎকে কিছু না কিছু দান করিয়া যাইবেই, জগৎও তাহার নাম চিরদিন বক্ষে ধারণ করিবেই। এই হেতু বলিতে হয় যে, সর্ব্বোচ্চ অঙ্গের কলা-সৃষ্টির অনুকূল প্রতিভা নারী জাতি-হিসাবে পুরুষের মত অন্তরে লাভ করে নাই—নারী উহাতে প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, চিত্র-শিল্পে যেমন, তেমনই সঙ্গীত-বিদ্যাতেও নারীজাতির মধ্যে একটি বিঠোভেন, একটি বাক, একটি মোজার্ট বা একটি পার্শেলের সৃষ্টি হয় নাই। নারী প্রকৃতির নিকট সুকণ্ঠ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গীত-সৃষ্টির ব্যাপারে বিঠোভেন ও মোজার্টের মত বিরাট প্রতিভা প্রাপ্ত হন নাই। আবার সাহিত্যেও অমর রচয়িতৃগণের মধ্যে এক স্যাফো ব্যতীত অন্য নারীর স্থান নাই। কিন্তু পুরুষের দিকে প্রতিভাবান্ অসংখ্য অমরের নাম পাওয়া যায়,—হোমার, প্লেটো, এরিষ্টটল, সফোক্লিস, সক্রেটিস,—কত নাম করিব?

"তবে কি প্রকৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশক্তির ভার নারীর উপর অর্পণ করিয়াছে বলিয়া নারী অন্য প্রকার সৃষ্টি-শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন? পাছে অন্য দিকে নারীর এই শ্রেষ্ঠ শক্তি অপব্যয়িত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় কি প্রকৃতি এই শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নারীর পক্ষে অন্যান্য শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছেন? নারীকে সন্তান-জননী হইতে হয় বলিয়াই কি তাঁহাকে কলা-সৃষ্টির শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে?

"হয় ত ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু সন্তান প্রজনন-ক্রিয়া এত সাধারণ হইয়া গিয়াছে যে, ঐ ঘটনা মৃত্যুর ন্যায় যতক্ষণ আমাদের নিজের জীবনে অনুভূত না হয়, ততক্ষণ উহার অস্তিত্বই আমরা অনুভব করি না। নারী সন্তান প্রসব করিবেন, ইহা প্রকৃতির নিয়ম, কাযেই জগৎ ইহাকে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, ইহা যে সকল সৃষ্টি-শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা জগতের লোকের মনেও কখনও উদয় হয় না। কিন্তু যথার্থ ধরিতে গেলে জন্ম জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-শক্তির বিকাশ। তাই মনে হয়, এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-শক্তির বিকাশ নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকৃতি তাঁহাকে অন্য প্রকার অপেক্ষা-কৃত অল্পপ্রয়োজনীয় সৃষ্টি-শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। অন্য সৃষ্টি-শক্তি জগৎ সাজাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু জগৎ রক্ষা ও ধারণের জন্য সন্তান-প্রজননের সৃষ্টি-শক্তি প্রয়োজনীয়। কোন্‌টি বড়?"

কথাটা ভাবিবার বটে। এই হেতুই কি আবহমান কালের ধারণা, অন্তঃপুরই নারীর প্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠ স্থান? সংসারের পবিত্রতা ও শৃঙ্খলারক্ষাকল্পে যে প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা নারীতেই সম্ভবে, পুরুষ তাহাতে বঞ্চিত। বোধ হয়, প্রকৃতি পুরুষকে অন্য দিকে প্রতিভা-বিকাশের অবসর অধিক পরিমাণে দিয়াছেন বলিয়া এ দিকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীমতী জোয়ান সাদার্ল্যাণ্ড তাঁহার সমালোচনার এক স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রজনন-শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-শক্তি হইলেও উহাতে প্রতিভার বিকাশের প্রয়োজন নাই, অথচ শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি-শক্তিতে অতি উচ্চাঙ্গের প্রতিভা-বিকাশের প্রয়োজন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রজনন-শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশক্তি হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টি দ্বারা জগৎকে শোভিত সজ্জিত করা হয় মাত্র, কিন্তু সন্তান-প্রজনন দ্বারা জগৎকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা হয়। কোন্‌টা অধিক প্রয়োজনীয়, কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? এই সমস্যার সমাধান করা সহজ নহে। মানুষ জন্ম-গ্রহণ না করিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে না, এ কথা ঠিক। কিন্তু মানুষ জন্মিয়া যদি শিল্প, সাহিত্য আদি রস হইতে বঞ্চিত হইয়া পশু-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার জন্মই বৃথা বলিয়া মনে হয়। জন্মও যেমন প্রয়োজন, রসের অস্তিত্বও কি তেমনই প্রয়োজনীয় নহে? এই সমস্যা-সমাধানের সময় আসিয়াছে।

সোভিয়েট-শাসনের পরিচয়

কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েক জন বৃটিশ জাতীয় লোক রাসিয়ায় বর্ত্তমানে সোভিয়েট-শাসন কি ভাবে চলিতেছে দেখিতে গিয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে একবার বৃটিশ শ্রমিক দলের কয় জন প্রতিনিধি রাসিয়ায় গিয়া অবস্থা দেখিয়া আসিয়া এক রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৃটিশ দর্শকরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট অপেক্ষা স্পষ্ট এবং বিস্তৃত।

এই রিপোর্টে প্রথমেই রাসিয়ার হর্ম্ম্যাদির বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ,—নানা বিপ্লবের ফলে রাসিয়ার অনেক সুদৃশ্য ইমারত ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সোভিয়েট সরকার ক্রমে সেই সকলের সংস্কারসাধন করিতেছেন ও নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছেন। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, রাসিয়ার বলশেভিকরা কেবল ধ্বংসের উপাসক নহে, গঠনেরও উপাসক। প্রাচীন অভিজাতসম্প্রদায়ের গৃহাদি এখন সোভিয়েটের কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং অত্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

বলশেভিকরা বহুমূল্য বিখ্যাত চিত্রসমূহ, মর্ম্মরপুত্তলীসমূহ এবং জাতির গৌরবের বহু নিদর্শন সযত্নে রক্ষা করিতেছে। ইহাতেও জানা যায় যে, তাহারা রাক্ষস ও বর্ব্বর গথ ভ্যাণ্ডালের মত নহে।

রাসিয়ার শ্রমিকগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পারিশ্রমিক পাইত, এখন তাহা হইতে বেশী পাইতেছে। য়ৌথপ্রথায় ট্রেড য়ুনিয়ানসমূহ এবং সরকার তাহাদিগকে অন্যান্য উপায়েও সাহায্য দান করিতেছে। বৃটিশ দর্শকরা বলেন, রাসিয়ার শ্রমিকের অবস্থা বৃটিশ শ্রমিকের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথায় দর্শকরা বলেন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শিল্প-বাণিজ্যের অর্থনীতিক অবস্থা যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ঐ অবস্থা যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা অপেক্ষা শতকরা ১২ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যে কয়লা উত্তোলিত হইত, এখন তাহা হইতে শতকরা ২৪ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; এইরূপে তৈল শতকরা ২০ ও তূলা শতকরা ১২ পরিমাণে বাড়িয়াছে। তবে খনিজ ধাতু উত্তোলিত হইতেছে কম। এখন ক্রমে এ বিষয়ে দ্রুত উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষিজ পণ্য যে পরিমাণ উৎপাদিত হইত, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাহার অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল, এখন উহার শতকরা ৮ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাসিয়ার গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৪০ হাজার, এখন হইয়াছে ৮ লক্ষ। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রেল-লাইন ছিল ৩৯ হাজার মাইল, এখন হইয়াছে ৫১ হাজার মাইল—ইহা যুদ্ধের পূর্ব্বের অপেক্ষা ১/৩ পরিমাণে অধিক।

তবে রাসিয়ার এখন অনেক 'সেকেলে' যন্ত্রাদি কারিগরি ইত্যাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দর্শকরা জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা গৃহনির্ম্মাণে এই সব পুরাতন যন্ত্র ব্যবহার কর কেন?" তাহারা উত্তর দেয়, "তোমরা আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য কর না কেন?"

শিক্ষার বিষয়ে বলশেভিক রাসিয়া যে উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। জার-শাসনের আমলে রাসিয়ার প্রজার অধিকাংশই অশিক্ষিত ছিল, এখন অতি দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকের সন্তানও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। জারের আমলে প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্পর্কিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল; এই হেতু কুসংস্কার ও গোঁড়ামি বড়ই বেশী ছিল। ১০ বৎসর বলশেভিক শাসনে সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সোভিয়েট শাসকরা এখন রাসিয়ার কর্ম্মজীবিমাত্রকেই শিক্ষিত করিতেছেন। গ্রামে, নগরে, কারখানায়, ট্রেড য়ুনিয়নে, ওয়ার্কসপে,—সর্ব্বত্রই লোককে কর্ম্মে সুদক্ষ করিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক ও অন্য প্রকার শিক্ষা দান করা হইতেছে। ফলে রাসিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থী অপেক্ষা বহুগুণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে। তাহাদের শিক্ষার প্রণালী, শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার বিষয় ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক উন্নত। লণ্ডনের ছাত্ররা কিরূপ গুণ্ডামী করে এবং পরে তাহার জন্য জরিমানা দেয়, তাহা সকলেই জানেন, রাসিয়ার ছাত্ররা গুণ্ডামী জানে না। ছাত্ররা স্বয়ং শৃঙ্খলা মানিয়া চলে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাসিয়ার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষ, এখন হইয়াছে ১ কোটি। এখন কারিগরি কায শিক্ষার্থীর সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬ লক্ষ। যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের অপেক্ষা এখন শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় দেড়গুণ অধিক। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাসিয়ায় ৯০টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এখন হইয়াছে ১ শত ৩৬টি। ইহার সহিত ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থার একবার তুলনা করিয়া দেখুন। প্রায় ২শত বৎসরের বৃটিশ শাসনে লোকসংখ্যার মাত্র ৬ জন শিক্ষা লাভ করিতে পাইতেছে! আর ১০ বৎসরের বলশেভিক শাসন রাসিয়া হইতে নিরক্ষরতাকে প্রায় নির্ব্বাসিত করিয়াছে! এ কথা ইংরাজ দর্শকরাই রিপোর্টে লিখিয়াছেন।

আর একটা বিষয়ে অবজ্ঞাত বলশেভিকরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-পুঞ্জের নিকট আদর্শস্থলরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। শেষোক্ত শক্তিদের মধ্যে অনেকে জেলে তাঁহাদের রাজনীতিক বন্দীদিগের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করেন, তাহার তুলনায় বলশেভিকরা তাহাদের জেলের কয়েদীদের প্রতি ব্যবহারে জেলকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। বলশেভিক জেলে হিংসা ও প্রতিশোধ-স্পৃহার নাম-গন্ধ নাই, প্রকৃত চরিত্র সংশোধনের প্রয়াস আছে। কয়েদী মাঝে মাঝে বাড়ী যাইবার ছুটী পায় এবং স্বজনগণের সহবাসে চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায়—এমন ব্যবস্থা কোন্ দেশে আছে?

বিদেশীর প্রতি ব্যবহারে বলশেভিকরা যে হৃদয়ের পরিচয় দেয়, তাহার তুলনা প্রতীচ্যের অন্য কুত্রাপি পাওয়া যায় না। তাহারা বর্ণ বৈষম্য তুলিয়া দিয়াছে, এ কথা সকলেই জানেন। সকল জাতির লোকই তাহাদের comrade বা বন্ধু। ভারত হইতে যে সকল মুসলমান মহাজের হইয়া মস্কৌ গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরম সমাদরে তথায় অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। রাসিয়ার স্থানীয় খাদকবর্গ তাঁহাদিগকে ভ্রাতার মত আদর-যত্ন করিয়াছিলেন, Comrade বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এমন সকল জাতির প্রতিই ব্যবহার! সকলেই ষ্টেটের অতিথি, শত্রু মিত্র কেহ নাই। বৃটিশ দর্শকরা বলিয়াছেন,—The first and most universal impression of the people is their extraordinary friendliness and interest in the foreign visitors। তাহার পরেই বলিতেছেন,—"আমরা যেখানে গিয়াছি, সেই স্থানেই কেবল সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হই নাই, আগ্রহ ও উৎসাহভরে অভ্যর্থিত হইয়াছি।"

সুতরাং প্রচারকার্য্যের দ্বারা বলশেভিককে যতই রাক্ষস ও বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হউক, জগতের নিরপেক্ষ লোক এই বৃটিশ ডেপুটেশানের রিপোর্ট পড়িয়া বুঝিবে, রাসিয়ার বলশেভিকরা সমাজের ধ্বংসকারী নহে, বরং এক হিসাবে নূতন-ভাবে সমাজ-গঠনকারী।

বলশেভিক রাসিয়ার বিজয়োৎসব

সম্প্রতি মস্কৌ সহরে বলশেভিক রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার দশম বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাসিয়ার যে বলশেভিক বিপ্লব জগৎকে কম্পান্বিত করিয়াছিল, আজ তাহার পর ১০ বৎসর অতীত হইল। বিপ্লবের প্রথমাবস্থায় বহু রাজনীতিক ভবিষ্যবক্তা ইহার স্বল্পায়ুর কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, বলশেভিক নীতি সমাজ-সংহারের অনুকূল, সমাজ-রক্ষার অনুকূল নহে, উহার ধ্বংসলীলার অভিনয়ে শীঘ্রই রাসিয়ার লোক ও তথা জগতের লোক বিরক্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, তখন আপনিই এই বিরাট রাক্ষসের মত বলশেভিক সৌধ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু আজ ১০ বৎসর পরে বলশেভিক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের দিকে বিদ্রূপের অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"কৈ হে জ্যোতিষি! তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর কি হইল? আমরা ত তোমাদের অভিসম্পাতের ও অশুভকামনার নায়েগ্রাধারায় এখনও ভাসিয়া যাই নাই—আমরা ত রাসিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা-সম্মত কৃষক ও শ্রমিকের রাজ্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছি—এমন ন্যায়বিচারসম্মত রাজ্য জগতে আর একটি দেখাইতে পার কি?" সাম্রাজ্যবাদীরা জবাবে বলিতেছেন,—"তোমরা কৃষক ও শ্রমিককে মুক্তি দিয়াছ বলিয়া বড়াই করিতেছ, কিন্তু উহা কি প্রকৃত মুক্তি—না মুক্তির ব্যভিচার? তোমাদের সবাই কর্ত্তা, সবাই শাসক, সবাই মালিক—কে কাহার কথা শুনে, কে কাহার কর্ত্তৃত্ব মানে? তাই ত তোমাদের ভিতরে এত ঘন ঘন কর্ত্তার পরিবর্ত্তন হইতেছে। তোমাদের রাজ্য টিকিবে কয় দিন? তোমাদের উৎসবের মধ্যেও ব্যসন লুক্কায়িত রহিয়াছে।"

ইংরাজ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী (Imperialist) জাতি, আর রাসিয়া বর্ত্তমানে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী জাতি; সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে এখন ভীষণ মতবিরোধের উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরাজদের মধ্যেও দুই শ্রেণীর লোক আছেন। এক শ্রেণীর লোক বলেন,—বলশেভিক রাসিয়া ভাল, অন্য শ্রেণী বলেন, উহারা নর-রাক্ষস, সমাজের শত্রু। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই সমধিক।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর মুখপত্র 'ডেলী ক্রণিকল' পত্র; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি 'টাইমস,' 'ডেলী মেল', 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার

গেজেট' প্রভৃতি অসংখ্য সংবাদপত্র। 'ডেলী ক্রণিকলের' দিকে আছেন 'ডেলী হেরাল্ড',—উহা শ্রমিক দলের পত্র।

'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেট' এই বলশেভিক বিজয়োৎসব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর রাসিয়ার প্রতি মনোভাবের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :—"রেড রাসিয়া জগৎকে কি দিয়াছে? লেনিন শিব গড়িতে চাহিয়াছিল, বানর গড়িয়াছে, অন্ততঃ তাহার পরবর্ত্তী বুখারিন প্রভৃতি বলশেভিকরা তাহাই করিয়াছে, এক শ্রেণীর ধনী জমীদার monopolistএর পরিবর্ত্তে আর এক শ্রেণীর monopolistএর সৃষ্টি করিয়াছে, এই নূতন জমীদার



ভূতপূর্ব্ব নেতা ট্রোটস্কি

শ্রেণীর কৃষক-জমীদার ও মধ্যবিত্ত কারিকর। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, জগতে যাহা করা অসম্ভব, বলশেভিকরা তাহাই করিতে গিয়াছিল, তাই অকৃতকার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্বকালে জারের আমলে একচেটিরা অধিকার ভোগকারীরা কয়েক জন জমীদার (aristocracy) ছিল; এখন তাহার পরিবর্ত্তে ১০ কোটি জমীদার হইয়াছে। নিরক্ষর অশিক্ষিত কৃষক-জমীদারের একগুঁয়ামি চিরপ্রসিদ্ধ,—তাহারা যাহা নিজস্ব বলিয়া একবার ধারণা করিতেছে, তাহা কিছুতেই ছাড়িতেছে না। সুতরাং বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট সমতামূলক ধন বণ্টনে উদ্যোগ করিলে কৃষকরা তাহাতে বিষম বাধা প্রদান করিতেছে। ফলে লেনিনের পরবর্ত্তী কর্ত্তা ট্রোটস্কি অনুযোগ করিতে লাগিলেন যে, এই কৃষক-জমীদার-শক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ফলে কম্যুনিষ্ট নেতারা যে ভাবে সোসালিজম বা সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাহা হইয়া উঠিতেছে না। এই সমস্যা লইয়াই ট্রোটস্কি ও ষ্ট্যালিনের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। ষ্ট্যালিন বুঝেন, 'কৃষকের মারফতেই হউক আর যাহার মারফতেই হউক, রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে ধনসম্পদ হস্তগত করিয়া রাখিতে হইবেই, নতুবা ধন-সম্পদের ন্যায্য বণ্টন হইল না বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে গভর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে না,—ঐ বিষয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিলে গভর্ণমেণ্টকে কেহ মানিবে না।' ট্রোটস্কি বলেন, 'তাহাই যদি হয়, তবে জারের আমলের অভিজাত-সম্প্রদায় কি অপরাধ করিয়াছিল? তাহারা জমী ও ধন একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধন করা হইল তবে কি জন্য?' ষ্ট্যালিন Realist, ট্রোটস্কি Romantic. যাহারা স্বপ্ন দেখে,



নূতন রাষ্ট্রনেতা ষ্ট্যালিন

তাহারা রাজ্য চালাইতে পারে না, তাই ট্রোটস্কির পতন হইল ষ্ট্যালিন কর্ত্তা হইলেন। তবেই বুঝা যাইতেছে, বলশেভিকরা প্রথমে যে উদ্দেশ্য লইয়া রাজ্যগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা অনুসরণ করা হয় নাই, করিলে বলশেভিক শাসন বিফল হইত। ষ্ট্যালিন ধনীর সাহায্য লইয়া এবং ধনি-পোষক রাজ্যের শাসনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া সোসালিষ্ট শোভিয়েট রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় করিতে চাহেন। তাঁহার এই পরীক্ষা পরিণামে কতটা সফল হইবে, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, স্বপ্নরাজ্যে বিচরণকারীদের অপেক্ষা ষ্ট্যালিন ভাল। কিন্তু বলশেভিকের বিজয়োৎসব ত ঠিক বলশেভিক মতবাদের বিজয়োৎসব বলা যায় না, কেন না, ষ্ট্যালিনের বলশেভিকবাদ লেনিনের বলশেভিকবাদ নহে।"

এ দিকে 'ডেলী ক্রণিকল' পত্র কিন্তু বলিতেছেন, "যাঁহারা এই দিন কেবল ভবিষ্যৎবাণী করিয়া আসিতেছেন যে, বলশেভিক শাসন শীঘ্রই ধ্বংস হইবে, তাঁহাদের বাণী ত সার্থক হইল না

বলশেভিক শাসন এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তাকে বিদ্রূপ করিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে। বাহির হইতে রাসিয়ার এই শাসনকে গলা টিপিয়া মারিবার যত চেষ্টা হইয়াছে, সবই ব্যর্থ হইয়াছে, বরং বাধা পাইয়া রাসিয়ার বলশেভিক শাসকদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুদৃঢ় হইয়াছে এবং এখন তাঁহারা বাহিরের বাধা পদতলে দলিত পিষ্ট করিতে পারেন, এমন শক্তি লাভ করিয়াছেন। বলশেভিক শাসনের মুখবন্ধে নির্ম্মম কঠোরতা ও অত্যাচার, বিষম বিভীষিকা, বলপূর্ব্বক শ্রম আদায়, কথায় কথায় প্রাণদণ্ড ও নির্ব্বাসন,—এমন কত কি চলিয়াছিল। তখন জন কয়েক লোক সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল, তাহারা জনসঙ্ঘের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না, তাহারাই জনসঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রিত করিত। তখন কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, রাজত্ব সকলেরই ভীষণ অবনতি ঘটিয়াছিল। তখন প্রাইভেট ক্যাপিট্যালের (ব্যক্তিবিশেষের ধনসম্পদের) সাহায্যে অথবা বিদেশীর ধনের সাহায্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং বিদেশের সহিত আদান-প্রদানের জন্য উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু জনসাধারণ গোঁয়ারের মত বিদেশীর সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে চাহে নাই বলিয়া সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, রাসিয়া ডুবিতে বসিয়াছিল।

"আর আজ? আজ ১০ বৎসর পরে লক্ষ লক্ষ রাসিয়ান প্রজা বলশেভিক শাসনকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছে। এখন বলশেভিক রাসিয়া ক্রমশঃ বিদেশীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কায করিতে চাহিতেছে। সুতরাং রাসিয়ার এই সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে এখনও অস্পৃশ্য পারিয়ার মত করিয়া রাখা কি অর্ব্বাচীনতার কায নহে?"

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন"ও ঠিক এই ভাবের কথা বলিয়াছেন,—'রাসিয়ার বলশেভিক বিপ্লব শেষ হইয়া গিয়াছে, এমন ত নহে, সে বিপ্লব এখনও চলিতেছে। আজ যে স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইতেছে, কাল সে পদচ্যুত হইতেছে, তাহার স্থানে আর এক কর্ত্তা আসিতেছে। হয় ত সে-ও স্বেচ্ছাচারী হইতেছে; কিন্তু সে-ও পাকাপোক্ত হইয়া বসিতেছে না, তাহার স্থানে আবার অন্য জন আসিতেছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে যে কর্ত্তা শাসনপাটে বসিয়াছে, সে অবস্থার অনুকূল ব্যবস্থা (Adaptability) করিতেছে। তবে তাহার ব্যবস্থাও যে চিরস্থায়ী হইবে, এমন কথা নাই। রাসিয়া ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সেই পরিবর্ত্তন অতি দ্রুতই সংঘটিত হইতেছে। বর্ত্তমানের রাসিয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রাসিয়া নহে, ইহা ১৯২০ খৃষ্টাব্দেরও নহে। তবে এইটুকু লক্ষ্য রাখিবার যে, বর্ত্তমান বলশেভিক রাসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে।"

এমন শক্তিকে উপেক্ষা করা চলে না। তাই বিলাতের শ্রমিকদলের পত্র 'ডেলী হেরাল্ড' বলিয়াছেন,—"এই ১০ বৎসরে বলশেভিক রাসিয়া যাহা করিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর—তাহার প্রভাব জগতে অসাধারণ হইবে—বিশেষতঃ জগতের শ্রমিক-সম্প্রদায়ের উপর অত্যন্ত অধিক হইবে। এই হেতু আমরা শ্রমিকের পক্ষ হইতে উহার মঙ্গল কামনা করি এবং আমরা আমাদের সাধ্যমত সামরিক বা আর্থিক চাপ দিয়া রাসিয়াকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা বিফল করিয়া দিব। আমাদের শ্রমিক সরকার যখন শাসনপাটে বসিয়াছিলেন, তখন রাসিয়ার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে আন্তরিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কুফণে বলডুইনের সরকার পাগলামী করিয়া সেই নীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।"

মিঃ ব্রেলসফোর্ড ইংরাজ শ্রমিকদলের অন্যতম সদস্য, তিনি রাসিয়ার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বলিয়াছেন, "বলশেভিকদের যত দোষই থাকুক, তাহারা এই জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র যে, তাহারা জগতের শ্রমিক সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়াছে, খাটোকে বড় করিয়াছে, শ্রমের প্রাপ্য মর্য্যাদা ও সম্মান দান করিয়াছে। বলশেভিকরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য রক্তদান করে নাই, উহা প্রতীচ্যের স্বাধীনতার ধারণা মাত্র। বলশেভিকরা 'সকলের' জন্য স্বাধীনতা কামনা করিয়াছে এবং তাহাই পাইয়াছে। এইখানেই তাহাদের সহিত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভেদ। বলশেভিকরা যে বিজয়োৎসব করিতেছে, তাহার মূল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নহে, জনগত স্বাধীনতা। তাহাদের জয়ে শ্রমিক ও কৃষক এখন নিজের জীবনযাত্রার ধারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এবং সমাজসৌধকে আপনাদের শ্রেণীর অনুকূল গঠন-প্রণালীতে গড়িয়া তুলিতেছে।"

এই সকল মতামত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, রাসিয়ার বলশেভিকের দশম বাৎসরিক বিজয়োৎসব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহারা এই উৎসব করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, এ কথা নিরপেক্ষমাত্রেই স্বীকার করিবে। বিশেষতঃ বিকানীরের ওসমানী নামক মুসলমান-যুবক মহাজের রূপে রাসিয়ায় গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ধারণা হয় যে, রাসিয়া জগতে কোন জাতির মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য মানে না, জগতের সকল কর্ম্মজীবীই (Worker) তাহাদের বন্ধু (Comrade), তাহারা সকল জাতিরই মুক্তি কামনা করে।

টমাস হার্ডি

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৭বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার লোকান্তরে জগতের সাহিত্য-লোকের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া, তাঁহার মৃত্যু শোচনীয়। তিনি ইংলণ্ডের কবি ও উপন্যাসিক, এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ কেবল ইংলণ্ডের বা ইংরাজ জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে, উহা সমগ্র জগতের সাহিত্যরস-রসিকমাত্রেরই অমূল্য সম্পত্তি। আজ এই হেতু তাঁহার দেহাবসানে জগতের সাহিত্যিকমাত্রেই আজ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

হার্ডি প্রধানতঃ বিয়োগান্ত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের অনুপ্রেরণাই তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় বিয়োগান্ত রচনা লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত করিয়াছিল। তিনি নাটক ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া বিয়োগের করুণ সুর ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক ছিলেন। কবিতা রচনা দ্বারা তিনি

সাহিত্য-জগতে প্রথম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এত মধুর এবং বিনম্র স্বভাব ছিল যে, খ্যাতি লাভ করিবার পরেও তিনি সাময়িক পত্রের সম্পাদকের নিকট ভয়ে ভয়ে কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনয়নম্র ভাষায় বলিতেন, "আমার রচনায় যদি ভুল-ভ্রান্তি থাকে, আমায় জানাইলেই সংশোধন করিয়া দিব।" আর এখনকার কালের 'কবির' দলের দাম্ভিকতা কত, তাহা সকলেই জানেন।

কিন্তু বাণীর সেবায় তাঁহার এই স্বভাবসুন্দর বিনয়নম্র ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিলেও কেহ ভাবিবেন না যে, সে জন্য তাঁহার নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা বা সত্যপ্রিয়তার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল। নির্ভীকতাই তাঁহার রচনার মূলমন্ত্র ছিল। নির্ভীক ও অকুণ্ঠভাবে সত্যপ্রকাশে তিনি কাতর ছিলেন না বলিয়াই তিনি অনেকের নিকট নৈরাশ্যবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সত্য-প্রকাশ করিবার কালে তিনি কখনও সামাজিক রীতি-নীতি, প্রচলিত বিশ্বাস বা সমসাময়িক লোকমতকে ভয় করিয়া চলিতেন না। প্রচলিত লোকমতের বিরুদ্ধে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি স্বীয় অভিমত অকম্পিত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

উপন্যাস-রচনার সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। উপন্যাসেও যেমন, নাটকেও তেমনই তিনি অদ্ভুত দক্ষতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি সমাজের দুষ্ট ব্রণ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কৃষির অবনতি ও শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, গ্রামের ধ্বংস ও নগরের কলকারখানার উদ্ভব তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। প্রতীচ্য তাঁহার অভিপ্রেত গন্তব্যস্থলের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস এবং ইহাই তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই হেতু তাঁহার মতবাদ 'নৈরাশ্যবাদেরই' পরিচায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও হার্ডির অভিমত 'নৈরাশ্যবাদের' পরিচায়ক বলিয়া কথিত। জগৎ ধর্ম্ম ও ন্যায়পরতাকে অবজ্ঞা করিয়া মানবসমাজে অধর্ম্ম ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেছে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। বর্ত্তমানে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রাণহীন—



টমাস হার্ডি

ধর্ম্মের কঙ্কাল। এই ধর্ম্ম মানুষকে উন্নত দার্শনিক জগতের দিকে আকৃষ্ট না করিয়া স্বার্থমূলক ধর্ম্মবিশ্বাসহীন যন্ত্রতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, ইহাই তাঁহার অভিমত। এই হেতু প্রতীচ্য জগতে তিনি অনেকের নিকট নাস্তিক, পৌত্তলিক, অবিশ্বাসী, নৈরাশ্যবাদী বলিয়া পরিগণিত।

এই সাময়িক পত্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার রচনার যথার্থ সমালোচনা সম্ভবপর নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জগতে টমাস্ হার্ডির ন্যায় লেখকের অভাব বহু দিন পর্য্যন্ত অনুভূত হইবে।

গোধন

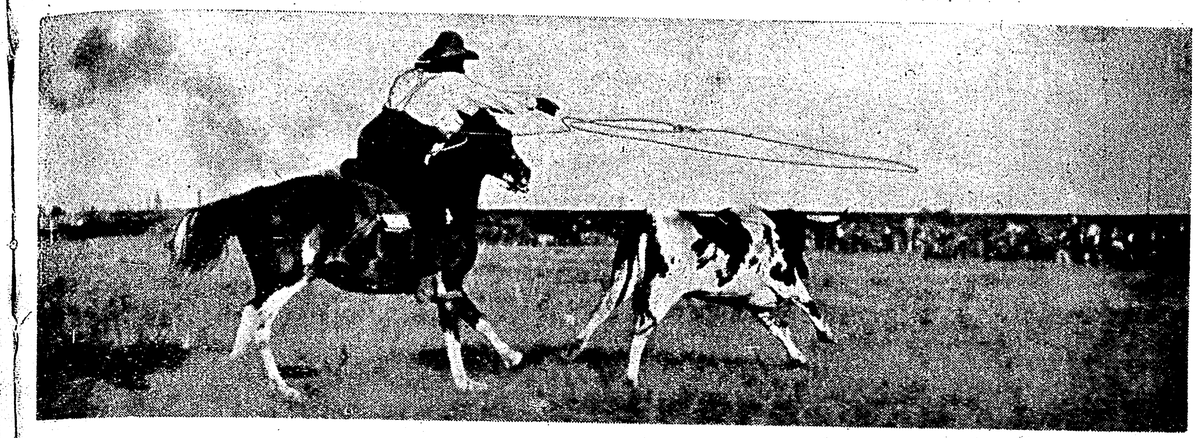

দুষ্ট বৎসতরকে বশে আনিবার উপায়

প্রাচীন মানব-সমাজে গো, মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি প্রাণীই চল সম্পত্তি ছিল। এখনও পশুপালন মানবের পরম উপকারী সম্পত্তি। পশুর দুগ্ধ থেকে কত সুখাদ্য প্রস্তুত হয়; তাদের মাংসও অনেকের আহার্য্য; তাদের শিং, লোম, চামড়া, হাড় কিছুই ফেলা যায় না। গো-মহিষ চাষের কার্য্যে ও ভার বহনের কার্য্যে প্রধান সহায়।

হিন্দুরা গোরুর উপকারিতা দেখে তাকে ভগবতী বোধে পূজা করে। কিন্তু কোনও কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে; গোরুকে আমরা তেল-সিঁদুর হলুদ দিয়ে পূজা করি, কিন্তু তাদের যত্ন করি না; গোরু-মহিষ পেট ভ'রে খেতে পায় না, লেজে-গোবরে হয়ে থাকে, পীড়ায় চিকিৎসিত হয় না। এতে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে,



পারস্য দেশে শস্য মলাই

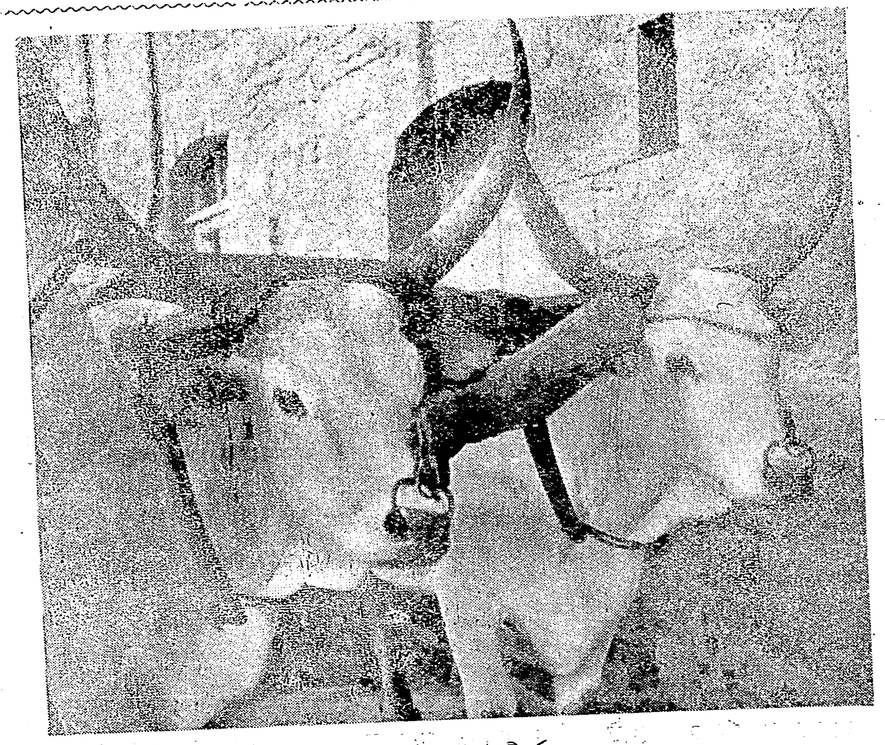

সান্ মারিনোর বন্দীবৃন্দ

বংশক্ষয় হচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দুগ্ধাভাবে অপুষ্ট দুর্ব্বল দরিদ্র জাতিতে পরিণত হচ্ছি; শিশু দুগ্ধাভাবে মারা পড়ছে।

কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার, যেখানকার লোক গো-খাদক, সেখানে গোজাতির প্রতি যত্ন দেখলে শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। এই যত্নে প্রতিযোগিতা উদ্রেক করবার জন্য প্রত্যেক দেশে মেলা হয় এবং সুস্থ সবল অতিকায় পশুর মালিককে পুরস্কার দিয়ে দেশের লোককে গোপালনে মনোযোগী হ'তে উৎসাহিত করা হয়।

গোরুর লেজের লোমে মোটর-গাড়ীর ও চেয়ারের গদী ভরা হয়; কানের ভিতরকার কোমল সূক্ষ্ম লোমে চিত্রকরদের তুলী তৈরি হয়; চামড়ায় ব্যাগ জুতা প্রস্তুত হয় ও বই বাঁধা হয়; ঘোড়ার সাজ আর কলের চাকা ঘুরাবার বেল্ট তৈরি হয়; শিং আর খুর দিয়ে ছাতার বাঁট, চিরুণী, চুলের কাঁটা, বোতাম, চুরুটের পাইপ, কৌটা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। হাড় দিয়েও অনেক জিনিষ তৈরি হয়, আর হাড়ের গুঁড়া দিয়ে তারা জমীতে সার দেয় এবং প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে। হাড়ের কয়লা লবণ-চিনি প্রভৃতির ময়লা সাফ করতে লাগে। শিরীষ, সাবান, বাতি, গ্লিসারিন্ প্রভৃতি প্রস্তুত করতেও গোরুর সাহায্য আবশ্যক। গোরোচনা গোরুরই অঙ্গজাত সামগ্রী, ঔষধে ও হিন্দুর পূজায় লাগে। গোদুগ্ধ থেকে ছানা, মাখন, ক্ষীর প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য ছাড়াও ছানা থেকে টেলিফোনের শব্দ-সংগ্রাহক যন্ত্র, চিরুণী, হাতপাখার হাতল, সিগারেটের নল, ছবি ছাপার আর্টপেপার নামক কাগজের

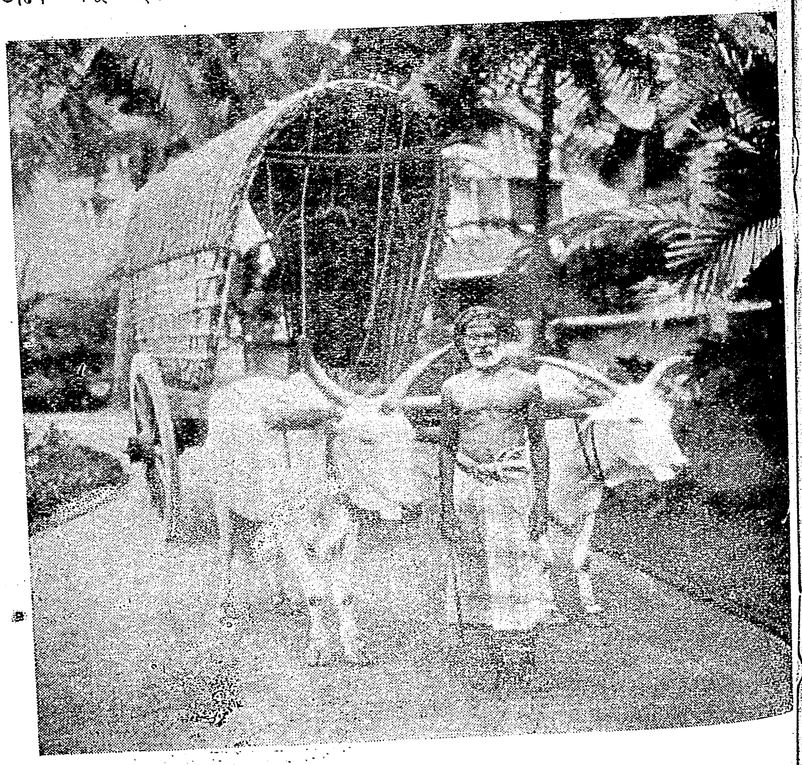

সিংহলের গো-শকট

চক্‌চকে পালিশ প্রভৃতি হচ্ছে, এর খবর আমরা রাখি না।

সমস্ত পৃথিবীর গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা গণনা ক'রে স্থির হয়েছে—৫০ কোটি; কিন্তু একা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ গো-মেষাদি পশু আছে।

মানুষ পিছু গোরুর সংখ্যা তুলনা করলে ইংলণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা গো-ধনে সম্পন্ন। ইংলণ্ডই গোজাতির সুপ্রজননে অবহিতচিত্ত হয়ে গোজাতির উন্নতি-বিধান করেছে এবং বিদেশে সুস্থ বলিষ্ঠ পশু বিক্রয় ক'রে জগদ্‌ব্যাপী উন্নতির মূল হয়েছে। এই জন্য বৃটিশ বিফ জগতের সর্ব্বত্র গোখাদক জাতির নিকট সমাদরলাভ করেছে।

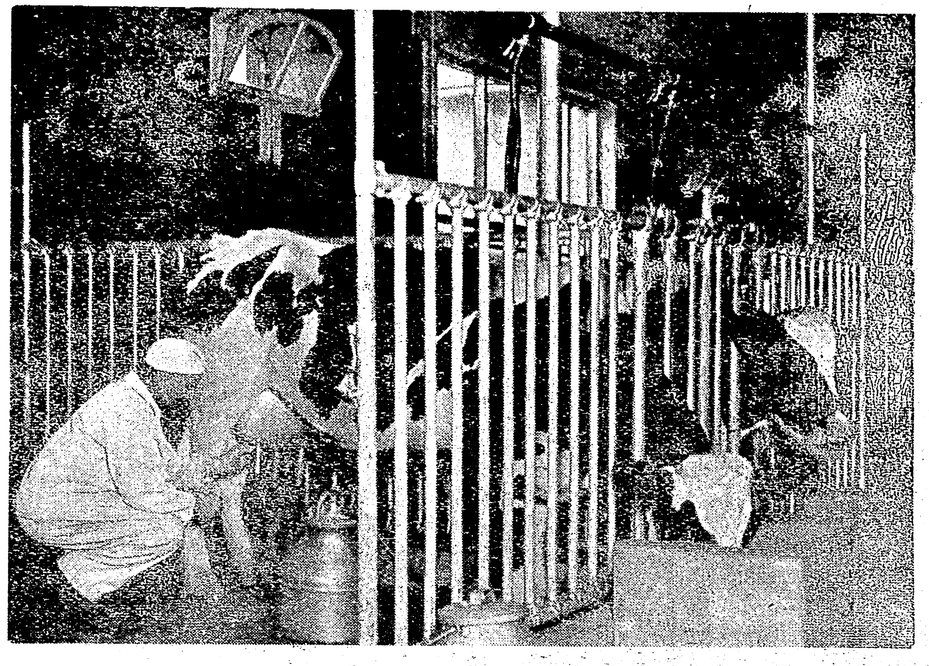

ওয়াশিংটনে বিদ্যুতের সাহায্যে গো-দোহন

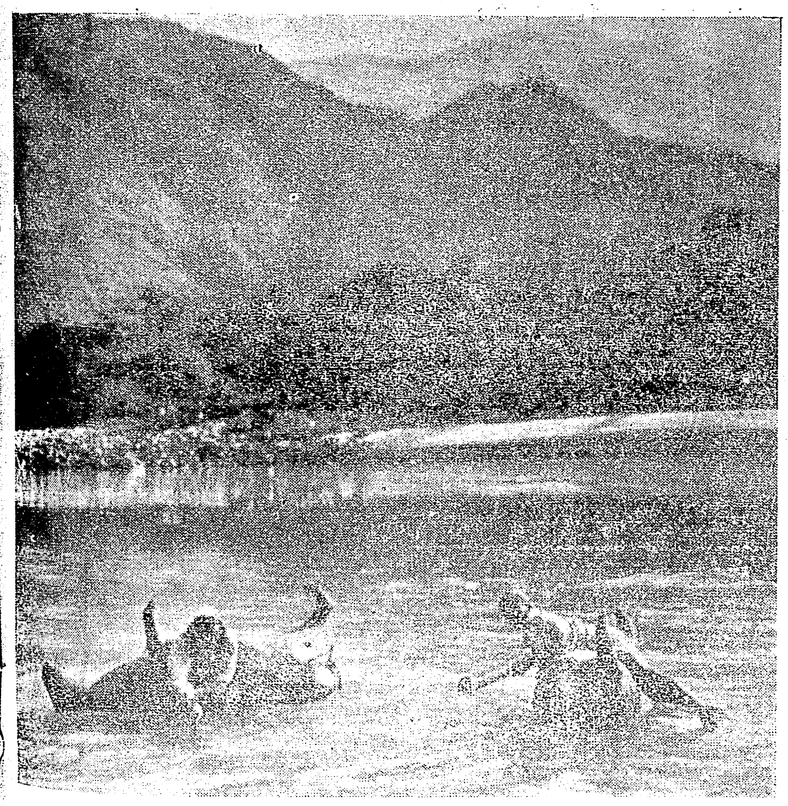

বায়ুপূর্ণ মোশকের ভেলা

নেপোলিয়ন বলতেন, সৈন্যগণ পেট হাঁটে; অর্থাৎ সৈন্যগণ খেতে পেলেই দীর্ঘ পথযাত্রা ক'রেও ক্লান্ত হয় না এবং অক্লান্ত হয়ে যুদ্ধ করতেও পারে। হিন্দুরা অনেকে গোমাংস ভিন্ন আর পশুর মাংস ভক্ষণ করে; দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য পান ও আহার করে। অতএব হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকের কর্ত্তব্য গোপালনে মনোযোগী হওয়া; কেবলমাত্র গোরুর পূজা ক'রেই হিন্দুর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, গো-জাতির



গ্যালওয়ের দীর্ঘ-রোমাবৃত ষণ্ড

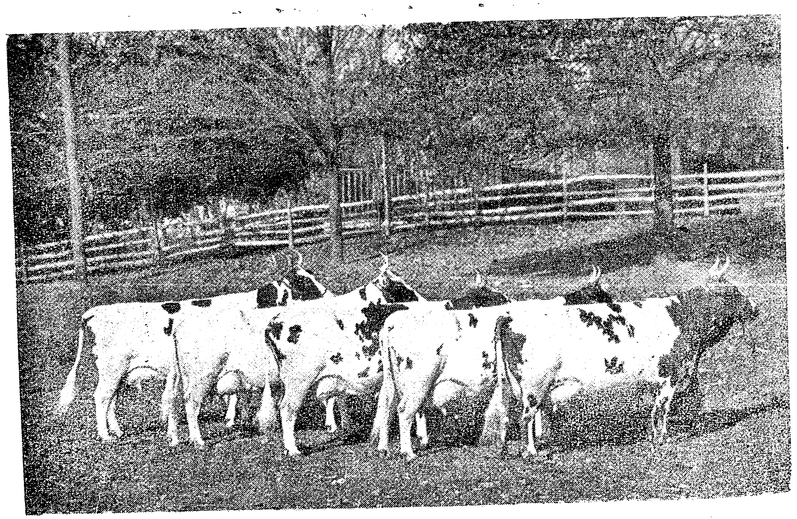

আনারনায়ারের গাভীবৃন্দ

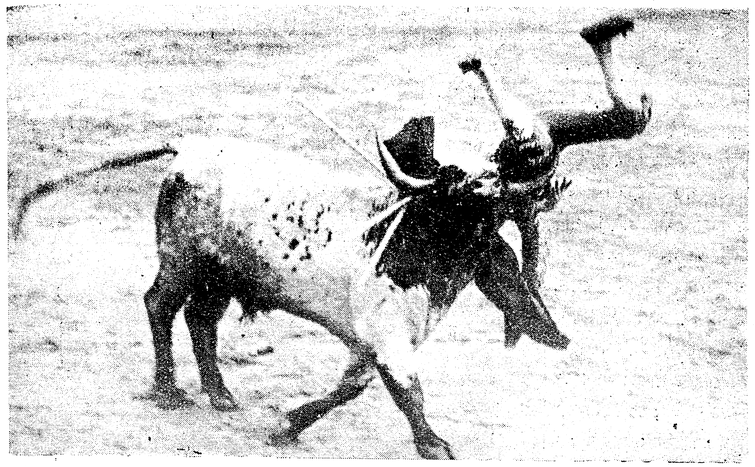

ষাঁড়ে মানুষে লড়াই

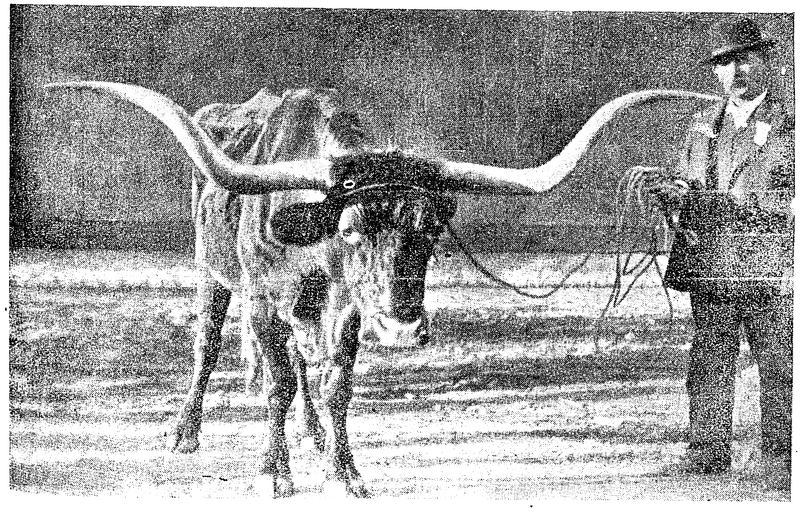

লড়ায়ে ষাঁড়ের শেষ বংশধর—চিত্র গ্রহণের সময় এই বলদের বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

উন্নতিতে মানব-জাতির উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌ছে। তাই ঋষিরা বিষ্ণুকে প্রণাম কর্‌বার সময় গো-ব্রাহ্মণের হিতের সঙ্গে বিশ্বহিত জড়িত ব'লে ঘোষণা ক'রে গেছেন—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

গো-জাতির মধ্যে মহিষ, মেষ, ছাগ, উষ্ট্র প্রভৃতি দুগ্ধদাতা পশু গর্ত্তব্য। তিব্বতের য়াক, মধ্য-এসিয়ার গৌর, গারো পাহাড়ের মিঠান, পাহাড়ী গয়াল প্রভৃতিও গোধনের অন্তর্গত। কল্‌কাতার পশুশালায় গেলে এই প্রকার গোরু মহিষই দেখতে পাওয়া যায়।

গোরু, মহিষ, মেষ, ছাগ সকলের মধ্যেই বিভিন্ন জাতি দেখতে পাওয়া যায়। কারও শিং লম্বা, কারও খাটো; কেউ লোমশ, কেউ স্বল্পলোম; রঙ্গের তারতম্যও অনেক প্রকার। কলকাতার পশুশালায় ইংলণ্ডের জংলী গোরু ছিল দেখেছি, তাদের গায়ে শুভ্র লম্বা লোম। এই সব বিভিন্ন স্বভাবজ জাতির সংমিশ্রণে বহু কৃত্রিম জাতি উৎপাদন করা হয়েছে এবং এতে স্বভাবজ জাতি অপেক্ষা কৃত্রিম জাতি অনেক উন্নত শ্রেণীর হয়েছে।

স্বভাবতঃ প্রাণীর জীবনধারণের জন্য যতটুকু মেদ-মাংস পাওয়া দরকার, প্রকৃতি তার বেশী দেয় না। মানুষ পশুকে গৃহ-পালিত ক'রে কৌশলে কৃত্রিম উপায়ে তার কাছ থেকে প্রকৃতিদত্ত দামের অধিক আদায় ক'রে ছাড়ছে। মাংসাশী লোকরা পশুকে অল্প পরিশ্রম ও বেশী খাদ্য দিয়ে মোটা কর্‌ছে। পশুর শাবকের উপযোগী দুগ্ধ-পরিমাণকে মানুষ খোল, ভুসি, ফেন, নুণ খাইয়ে বর্দ্ধিত কর্‌ছে এবং মানুষ ক্রমাগত দুগ্ধ দোহন ক'রে নিচ্ছে ব'লে পশুরা শাবক-পালনের উপায়স্বরূপ দুগ্ধ-বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতির কাছ থেকে সাহায্য লাভ কর্‌ছে। এইরূপে এক একটা গোরু দিনে এক মণ পর্য্যন্তও দুগ্ধ দিচ্ছে।

গোরু এইরূপ উপকারী ব'লে প্রাচীন সকল জনপদে তারা দেব-সম্মান পেয়ে এসেছে। গ্রীসে দেব-পূজায় গো-বলি দেওয়া হ'ত; ভারতেও গো-মেধ ও শূল-গব যজ্ঞ করা হ'ত। ঈজিপ্টে ইসিস দেবীর বাহন গো পবিত্র বিবেচিত হ'ত। প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, ঈজিপ্টে, ভারতে সর্ব্বত্র গোরুকে পুষ্পচন্দনে ভূষিত ক'রে উৎসব করা হ'ত। প্রাচীন ভারতে গো-বর্দ্ধন উৎসব আভীর জাতির প্রধান উৎসব ছিল।



টেক্‌সসাসের ষণ্ড

কৃষিকার্য্যে ও ভার-বহনে গো-মহিষ পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই নিযুক্ত আছে।

লিভীর ইতিহাস পাঠে জানা যায়, প্রসিদ্ধ কার্থেজ-বীর হ্যানিবাল্ যখন রোম আক্রমণ কর্‌বার জন্য ইটালীর উপস্থিত হন, তখন রোমের সেনাপতি জাল দিয়ে তাঁর গতি রোধ করলেন। হ্যানিবাল্ বাধা পেয়ে এক বুদ্ধি করলেন—

তিনি দু'হাজার গোরু সংগ্রহ ক'রে তাদের শিঙে এক-একটা মশাল বেঁধে তাদের পিছনে সৈন্যদের তাড়া কর্‌তে বললেন এবং গোরুগুলো তাড়া পেয়ে ছুটে গিয়ে জালের উপর পড়লো এবং জাল ছিঁড়ে খুঁড়ে রোমের সৈন্যদলের মধ্যে ঢুকে তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে; এই সুযোগে হ্যানিবাল্ রোমের সৈন্যদের পরাজিত ক'রে অগ্রসর হয়ে গেলেন।



পূর্ব্ব-ভারতের বন্য ষণ্ড

কিংবদন্তী আছে যে, ভারতবর্ষেরও এক হিন্দু রাজা গোরুর পাল সম্মুখে ক'রে মুসলমান আক্রমণকারীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এসেছিলেন এই ভরসায় যে, মুসলমানরা ভগবতী গাভীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে পার্‌বে না; হিন্দু রাজার আশা যে ভঙ্গ হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য, বরং তিনি শত্রুকে কিছু রসদ জুগিয়ে তাদের সুবিধাই ক'রে দিয়েছিলেন।

কাশ্মীরে ও পঞ্জাবে গোরু-মহিষের চামড়ার মোশকে বাতাস ভ'রে লোক তার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে একটা বৈঠা দিয়ে জল টেনে টেনে নদী পার হয়। ভারতের সর্ব্বত্রই ভিস্তীরা মোশকে ক'রে জল বহন করে।

আমেরিকায় বড় বড় বাথান আছে; সেখানে বাথানকে র‍্যাঞ্চ বলে; সেই সব বাথানে বহু গোরু থাকে। বাথানের রাখাল-দের কাউ-বয় বলে। সেই সব রাখাল ঘোড়ায় চ'ড়ে গোরু চরায়; কোন গোরু দুরন্তপনা করলে বা অবাধ্য হ'লে তারা দূর থেকে দড়ি ছুড়ে ফাঁস দিয়ে সেই গোরুকে আশ্চর্য্য কৌশলে বেঁধে বশ করে।

আজকাল গো-দোহন করারও নানা উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। গোরুর দুধের সঙ্গে কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের বীজাণু মানুষের পেটে যায়; এ জন্য পাশ্চাত্য দেশে দুগ্ধ দোহনের পাত্রগুলি শোধন ক'রে বীজাণু-শূন্য করা হয় এবং হাত দিয়ে দুগ্ধ দোহন না ক'রে যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোওয়া হয়। যন্ত্রের নলের বায়ু শোষণ করা হয় এবং সেই টানে গোরুর বাঁট থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। তার পরেও হাত দিয়ে দুধ ছোঁওয়া হয় না; যন্ত্রের বা শোধিত পাত্রের সাহায্যে দুধ শোধিত বোতলে ভরা হয় ও বাড়ী বাড়ী জোগান দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্য দেশ এইরূপ বিবিধ উপায়ে গোধনের উন্নতি ও পরিপোষণ দ্বারা দেশের লোকের খাদ্যাভাব দূর করেছে এবং কৃষিরও উন্নতি কর্‌তে পেরেছে। আমাদেরও উচিত সুস্থ বলিষ্ঠ গো-জাতির সুনির্ব্বাচিত মিথুনতার দ্বারা গোরুর জাতের উন্নতিবিধান করা; গোরু বলিষ্ঠ, সুস্থ, বৃহৎ হ'লে তার কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে।

যে সকল উৎসাহী যুবক চাকরীর জন্য লালায়িত হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে হতাশ হচ্ছেন, তাঁরা এই দিকে মনোযোগ

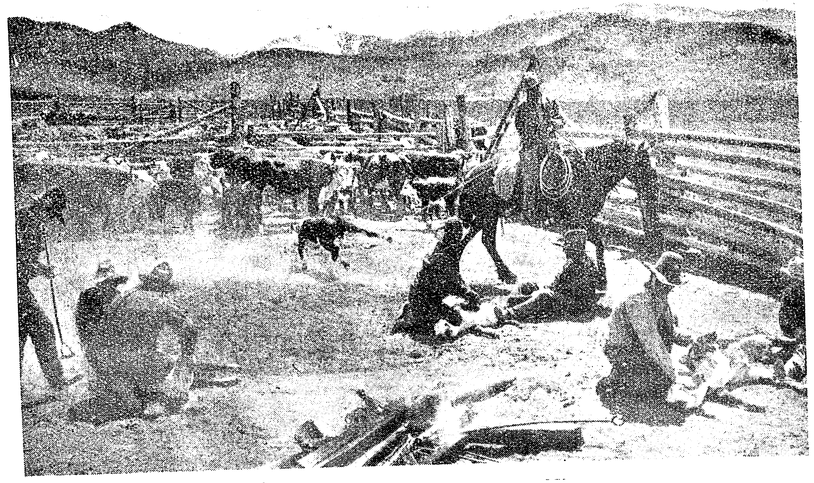

বাছুর দাগিয়া দেওয়া

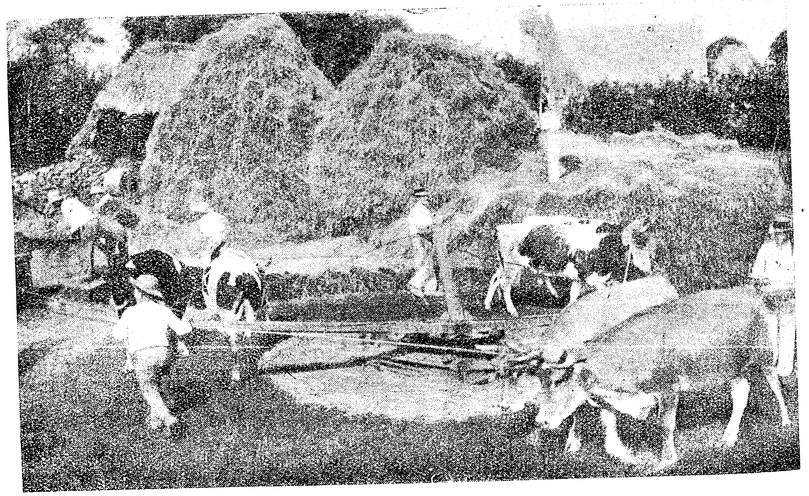

ফরাসী বলীবর্দ্দ—শস্য মলাই করিতেছে

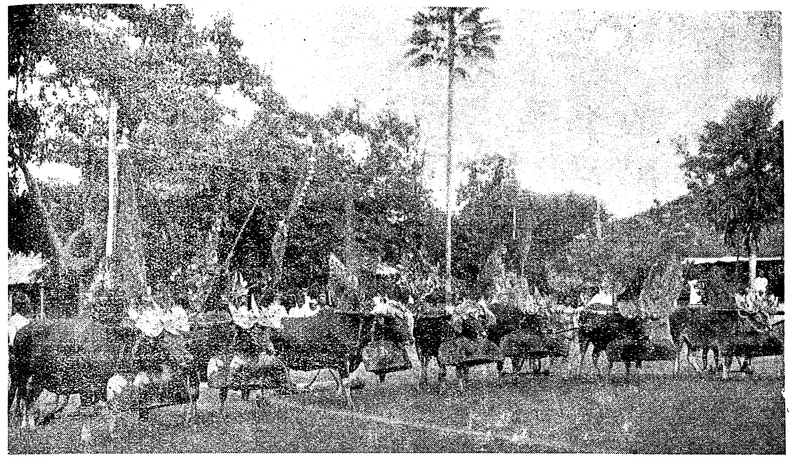

বালীদ্বীপের গাভী—উৎসবকালে ইহাদের দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে



পশ্চিম হাইলাণ্ডের গাভী ও বৎসতর

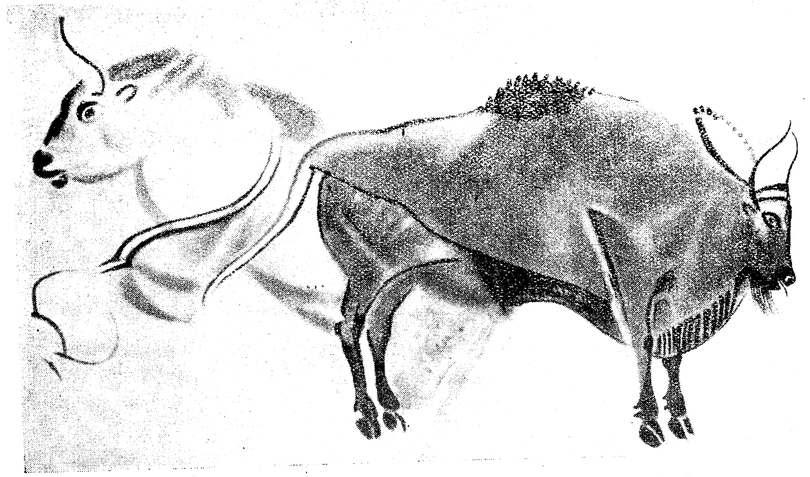

২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পিরিনিস গিরিমালার গুহাগাত্রে স্ত্রী ও পুরুষ মহিষের ক্ষোদিত চিত্র



পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মহিষ

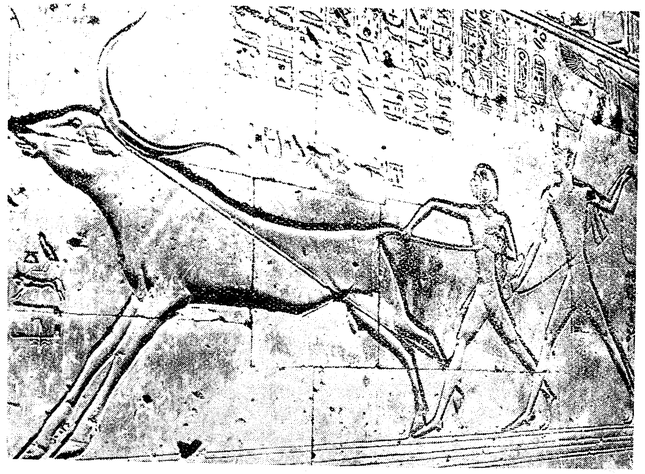

মিশরের প্রথম সেতীর মন্দিরে অঙ্কিত ষণ্ডের চিত্র

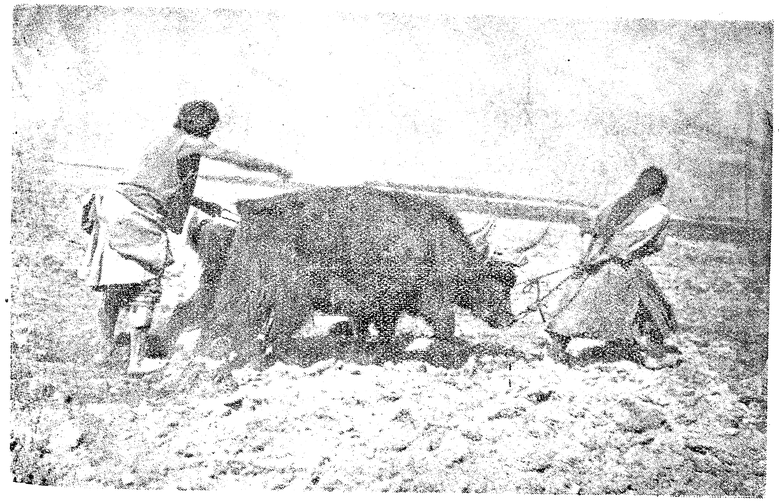

তিব্বতের কৃষিকার্য্যের সহায়ক পশু

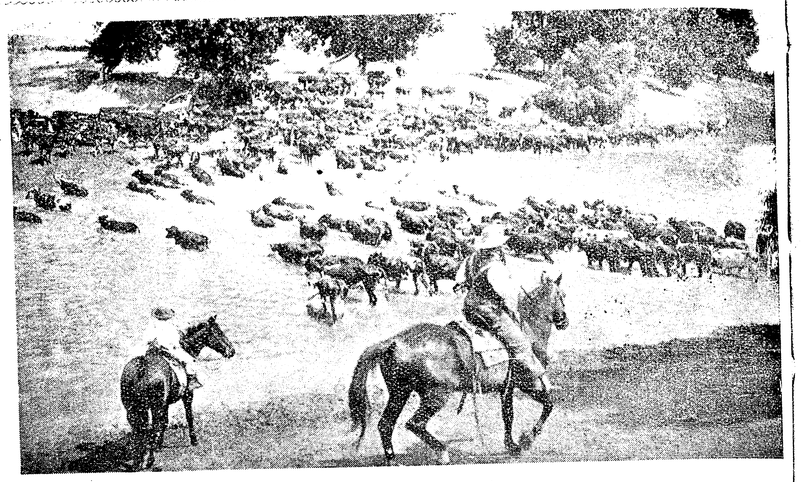

মণ্টানা—গোরুর দল নদী পার হইতেছে

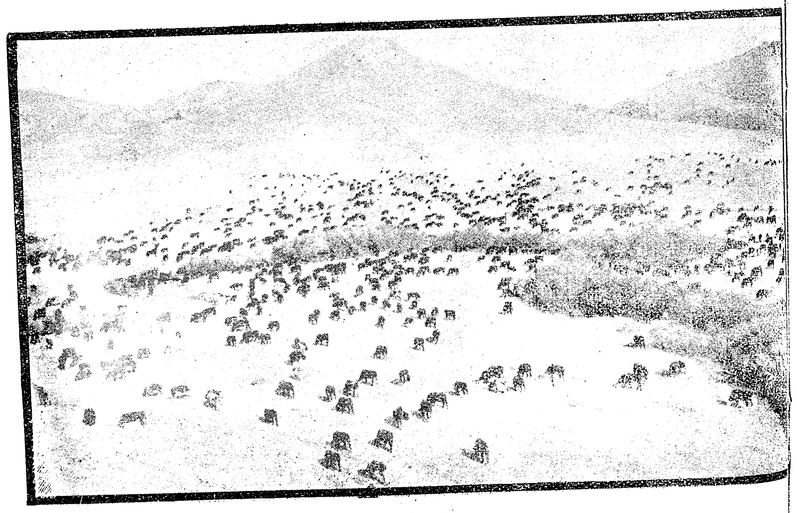

পর্ব্বতবিহারী গোধন

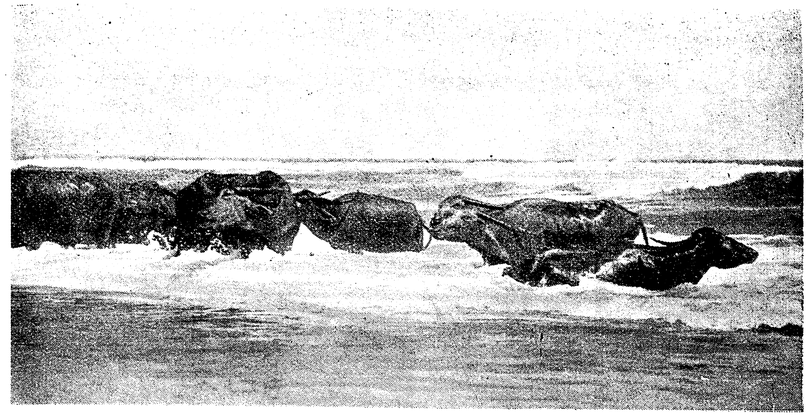

মাদ্রাজের মহিষ

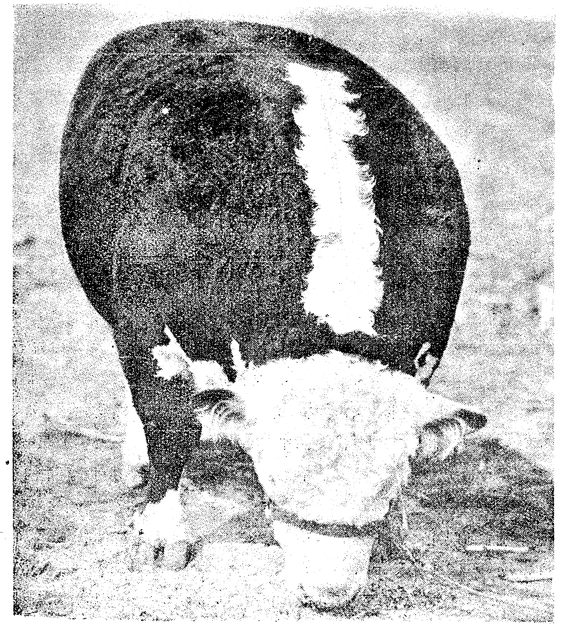

শূকরাণ ৭৩

করলে তাঁদের নিজেদেরও উন্নতি হবে ও দেশেরও অভাব-মোচন হবে।

ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকটি মেধাবী ছাত্র সম্মানের সহিত প্রথম শ্রেণীতে বি-এ, বি-এস-সি ও এম-এ, এম-এস-সি পাশ ক'রে গোপালনের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন; এই সব কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তান স্বহস্তে গো-দোহন, গোচারণ করছেন ও নিজেরা বাল্‌তী ভ'রে দুধ বহন ক'রে বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করছেন। এতে এঁরা চাকরীর চেয়ে অধিক লাভ করবেন সকলেরই আশা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা সকলেই এঁদের অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে পরামর্শ দিয়ে এবং দুগ্ধ ক্রয় ক'রে সাহায্য করছেন। প্রত্যেক গ্রামে যদি উদ্‌যোগী ছাত্ররা এই রকম চেষ্টা করেন, তবে দেশে অন্নসমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যেতে পারে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

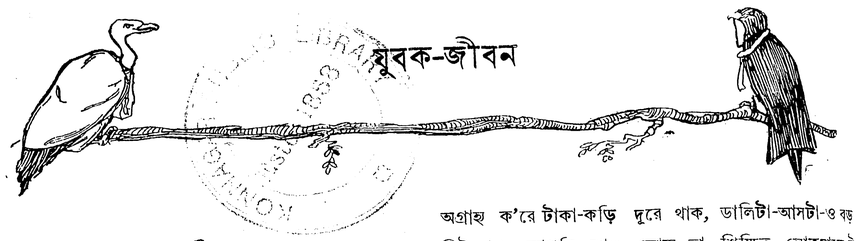

যুবক-জীবন

৫

দর্প যখন সাড়াশব্দ না দিয়া মানবের মনের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে, তখন দ্বারে উপবিষ্ট আত্মারাম ঠাকুর যদি জিজ্ঞাসা করেন, "কে বাপু তুমি ?" তখন সে বলে, "আমার নাম আত্মসম্মান ; সিদ্ধির মাদকতায় আত্মারাম-ও সে সময় ঢুলু ঢুলু নেত্রে স্বপ্নক্ষেত্রে বিচরণ কচ্ছেন, কাযে-ই তিনি বলেন, "ওহো, বুঝিছি, তুমি ভদ্রলোক, সে কালে তুমি ধর্ম্মশর্ম্মার হাত ধরে-ই যাওয়া-আসা করতে একখানা গামছা কাঁধে ফেলে, এমন পোষাক-আসাক ছিল না ; আর নামটি-ও চমৎকার হয়েছে ; আত্মার শেষ 'আ'কারটা সম্মানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাসে লুপ্ত হয়েছে, তা ছাড়া "সেল্‌ফ" পদার্থটা বৈদেশিক হলে-ও বহু দিন থেকে কেবল যে এ বাড়ীর বসন, ভূষণ ও বিবিধ তোষণের আধাররূপে চলিত হয়েছে, তা নয় ; ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ইট ফাঁক ক'রে সম্মানের বোঝা বইবার জন্য বুক পেতে রেখেছে। তা যাও, বাপু, বাড়ীর ভিতর যাও। আত্মার পূজা যাতে ষোড়শোপচারে হয়, তার ব্যবস্থা কর গে।"

জানকীনাথের মনের আগড় ঠেলে ঢোকবার জন্য "দর্প বাহাদুর" মাঝে মাঝে অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছেন, কিন্তু বেড়ার গায়ে "cash on delivery অর্থাৎ "নগদ আদায়" বচনটি পাঠ ক'রে ফিরে যেতে হয়েছে। উপার্জ্জনক্ষম মধ্যমা-গ্রজের বাহ্য জীবনের চাকচিক্যের ধাক্কা কিন্তু সেই দম্ভার আগড় সামলাতে পারলে না।

এখন জানকীনাথ দর্পের পদার্পণমাত্রেই তাঁকে আত্ম-সম্মান সম্ভাষণে আপ্যায়িত ক'রে বললেন, "দেখুন, পদ্মার ধারের মুন্সেফের কি বিলাত-ফেরত এটর্ণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া ভাল দেখায় ? তা ছাড়া আমি নিজ অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট আছি। সম্মান আমার দেশে-ও আছে, কর্ম্মস্থানে-ও আমি বজায় রেখে এসেছি। পেস্কার-নাজির-টাজিরের ইসারা-ইঙ্গিত অগ্রাহ্য ক'রে টাকা-কড়ি দূরে থাক, ডালিটা-আসটা-ও বড় নিই না। আপনি ভাল লোক, তা শিক্ষিত লোকমাত্রেই জানে। কিন্তু সেই যে বুড়ো লোকটি আগে আপনার সেবা যত্ন করত, যাকে আপনি 'সন্তোষ' ব'লে ডাকতেন, তাকে বিদায় ক'রে দিয়ে ইদানীং "লোভ" নামে যে চাকরটি আপনার ঘুটকস ঘাড়ে ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, ওর চেহারাখানা দেখলেই আমি শিউরে উঠি।"

আত্মসম্মান গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "জানকীনাথ, সন্তোষের সঙ্গে আমি দুর্ব্ব্যবহার করিনি ; তাকে বিঘে তিনেক জমী আর একটি গাই কিনে দিয়েছি, যদ্দিন বেঁচে থাকবে, নিজের গ্রামে বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করবে ; তবে একটা মাত্র সর্ত্ত করেছি যে, কোন সহরে বা 'শিক্ষিত' লোকের সংসারে সে কখন যেন প্রবেশ না করে। এই সর্ত্ত কেবল আমি তোমাদের দেশের মুখপানে চেয়ে-ই করেছি, বুড়োর পরামর্শে-ই দেশটা পেছিয়ে পড়েছিল ; মূর্খরা নূতন লোকটিকে 'লোভ' ব'লে ডাকে, ওর আসল নাম 'উন্নতিবরণ গঙ্গোপাধ্যায়'। দেখতে পাচ্ছ না, সন্তোষটা যদ্দিন বিদায় হয় নি, লোক কলেরাতে বলত পেটের অসুক, ব্রঙ্কাইটিসকে বলত জলকাসি। সকল দিকে-ই ছিল ইতর নজর, ঘটী-বাটিটা চুরি করত—বড় জোর পকেটমারা ; খবরের কাগজে নামটা-ও উঠত না। এখন উন্নতিবরণ এসে অবধি বড় বড় ব্যাঙ্ক, মিল, ইনসিওর অফিস—লোক কত না কি করছে। দেশের পুষ্টিসাধন হয় না ব'লে মুষ্টিভিক্ষা উঠে গিয়ে গৃহস্থের মেয়েদের গওনা রওনা হচ্ছে দেশ-সীমার পিপাসা ঝুলিতে।"

মুন্সেফী বিজ্ঞতার সঙ্গে মৌসুমী বাগ্মিতার বিশেষ কুটুম্বিতা নাই, তাই জানকীনাথ নীরব নেত্রে চেয়ে রইলেন। (নীরব নেত্রে কথাটি হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, ব্যুৎপত্তি-স্থল—চোখ মটকালে)।

আত্মসম্মান আবার বললেন, "ভাল, তোমার যেন হাকিম নামে-ই একটা মান আছে, তার উপর শিষ্টাচারে সমাজে অন্ততঃ তোমার একটু যায়গা আছে, কিন্তু তিনি—যিনি তাঁর জীবনের সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়ে একগাঁছি হেলে হীরমাত্র গলায় জড়িয়ে তোমার মেজো ভাজের লেশবসান বডিসের পাশে লাজনত মুখে দাঁড়িয়ে এক রকম দড়ির সাহায্যে মুন্সেফ-গৃহিণীরা শমনের রাজ্যে সহজে পৌঁছুতে—"

"চুপ করুন—চুপ করুন" ব'লে জানকীনাথ আত্মসম্মানকে একবারে বুকে জাপটে ধরলেন।

তিন ভাই-ই উপার্জ্জনোপলক্ষে সপরিবারে বাইরে থাকতেন ; এজমালি যে বিঘা ত্রিশ জমী, বাগান ও দুটা পুষ্করিণী ছিল, তার উপস্বত্ব থেকে সেখানকার দেবসেবা নিত্য খরচ কুলান হয়ে-ও বার্ষিক কিছু কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকত, সুতরাং নিজ খাতার জমার দিক্ ঠিক্ দিয়ে দেখে তিন জনের ঠোঁটেই একটু ফিক ক'রে হাসি উঠত। বিশেষতঃ অনাবশ্যক প্রয়োজনের প্রলোভন দেখাবার জন্য দোকান বা ফেরিওয়ালা—কলিকাতা কি বড় ভাই যেখানে প্রফেসরি করেন, সেই ঢাকার তুলনায় কুমিল্লায় অতি কম; তার উপর জানকীনাথ কৃপণাপবাদের সংবাদ কানে না তুলে বেজায় টেনে খরচ করতেন ; পেড়াপীড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসতে বাধ্য হলে-ও স্থান ও লোকজনের অনাটনের অছিলায় নিজের বাসায় কাকে-ও কখন চা খেতে-ও ডাকতেন না। স্ত্রীর যত্ন-ভালবাসা বা আপনার আয়-সঞ্চয়ের উপর ডাকাতি করতে আজ-ও "বাবা" বলতে বলতে কোন প্রাণপ্রিয় জীবন্ত পুতুল থাবা বাড়িয়ে আগিয়ে আসেনি ; কাযে-ই বনিতারূপী সেভিংস ব্যাঙ্কে গহনা ব'লে টাকাশ তেরো জমা দিয়ে, খান পঞ্চাশেক গিনি কিনে-ও এই বছর পাঁচেকের মধ্যে জানকীনাথ নগদ প্রায় সাত হাজার টাকা জমিয়ে ফেলেছেন। কুমিল্লার লোকাল ব্যাঙ্কে যে চোদ্দশো টাকা মজুত ছিল, আসবার সময় সেটা সমস্ত ড্র ক'রে আনায় বিভার পিসীমার হাতবাক্সে চৌদ্দখানি নোটের আকারে সেগুলি আপাততঃ গোমেশ লেনেই কারা-যন্ত্রণা ভোগ করছে।

সস্ত্রীক সীতাপতি সাহেবকে প্রণাম ক'রে মুন্সেফ-দম্পতি যখন কুষ্টিয়ায় এসে কাছারী ও বাসার চার্জ্জ নিলেন, তখন সেই চৌদ্দশোর মধ্যে পিসীমার নূতন হাতবাক্সে আছে নগদে তেরোশোর কিছু উপর ; বাকি এসেছে তাঁর অঙ্গে ও সঙ্গে জিনিস, শিল্ক, ব্লাউজ, জ্যাকেট, মাদ্রাজী শাড়ী, দোর-পর্দ্দা-জানলার কার্টেন, সোনার আংটী, বড়ী, নেকলেশ, ব্রেশলেট প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে ; পশ্চাদ্ধাবন ক'রে এসে ডাকযোগে পৌঁছিল খান তিনেক রেলওয়ে রসিদ এক একখানি বিলের সঙ্গে পিন করা। সাবেক মুন্সেফদের মামুলী উলুর চাল দেওয়া বাসাবাড়ীতে-ই প্রথমে জানকীনাথকে উঠতে হ'ল ; কিন্তু মেজদার বাড়ীর বিচিত্রবর্ণ-কমনীয়তা ও শান্ত সৌরভের নম্র গৌরবের পর এই ভিজে মাটীর মেঝে, ঝরা খড়ের চাল, অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত যেন টেনে তুলতে উদ্যত হ'ল। পিসী-মাসী হলে-ই কিছু আর রূপের রাশি বাসি হয় না, আর যৌবন মনোভঙ্গে বন-গমন করে না। কত নবীনা বৌন্-ঝি ছোট্ট মাসীটিকে কোলে তুলে আদর করে দেখা যায়। বিভার পিসী তার মায়ের ছোট বোনের চেয়ে-ও কমবয়সী, আর দেখতে যেন শরতের সপ্তমী শশী ; নিষিদ্ধ ফল আস্বাদনের পূর্ব্বে তিনি কুমিল্লার কুয়ার ধারে ব'সে অবাধিত শুদ্ধ মনে স্নান করতেন, অথবা কেউ কোথা-ও নেই দেখে চট্ ক'রে নানুয়া দীঘিতে ডুব দিয়ে আসতেন ; কিন্তু আজ কোথায় সেই সাবান-গন্ধে ভরা দোর বন্ধ গোসলখানা, আর কোথায় এই হেঁসেল-ঘরের ছাঁচতলায় পাতা ভাঙ্গা চৌকী ! আর তার পর সেই টরলেট-টেবলের সামনে নরম চেয়ারে ব'সে আশির মধ্যে একটি ফুটন্ত পদ্মফুল দেখতে দেখতে চাঁচর চুলে চিরুণী-চালনা ! কাছারীর আপার প্রাইমারী পাশ করা পাইক মাণিক ভুঁইমালী একখানা চট্ জোগাড় ক'রে এনে উঠানের এক ধারে একটু ঘিরে দিলে, তার-ই ভিতর ব'সে দু' বাল্‌তি জলের সাহায্যে গা-মাথা ভিজিয়ে এসে হোয়াইটওয়ের বাড়ীর নূতন তোয়ালের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে নিলেন। ভাবনা হ'ল, এ গরুর গোয়ালে নূতন আমদানী ফার্ণিচারই বা ঢোকান কোথা, আর অত ক্রোকারি কট্‌গ্লাস বেনারস-ব্রাস-ই বা সাজান কোন্‌খানে !

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল যখন প্রথম খোলে, তখন টার্মিনাস ছিল কুষ্টিয়াতে। বেসাতি-বাণিজ্যে, মামলা-মোকর্দ্দমায় কুষ্টিয়া তখন বসতি হিসাবে একটি ছোট-খাট সহরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ; সৌভাগ্যের অন্যান্য অর্ঘ্যের সঙ্গে ভাল ভাল বাড়ী-বাংলো-ও কতকগুলি তখন প্রস্তুত হয়েছিল ; তারই এক অধুনা পরিত্যক্ত কোঠা নূতন মুন্সেফ মহাশয়ের বাসের জন্য নাজির ভাড়া ক'রে দিলেন।

কুষ্টিয়ার লোক চম্‌কে গেল ; কাছারী-ঘরের চেহারা ফিরে গেছে। মোক্তাররা বলেন, জানকী হাকিমের খাস কামরা অনেক সাতশোর ডেপুটীর বৈঠকখানাকে হার মানিয়ে দেছে। ছোকরা উকীলরা সাবডেপুটী বাবুকে সঙ্গে নিয়ে

এক দিন সন্ধ্যার পর প্রবীণ প্রথম মুন্সেফ মহাশয়ের বাসায় গিয়ে বল্লেন, "আমাদের ইচ্ছা, গবর্ণমেণ্টের কাছে মেমোরিয়াল পাঠাই যে, বৃটিশ কোর্টে মুন্সেফ নামটার একবারে ডিগ্‌নিটী নাই, পরিবর্ত্তন ক'রে পোষ্টের নাম রাখা হ'ক্ সাব্ এসিষ্টেণ্ট জজ।"

কৃষ্ণনগরের বড় উকীল হরপ্রসন্ন বাবু একটা ফৌজদারী কেসের ডিফেন্সের জন্য সে দিন কুষ্ঠিয়ায় এসে প্রথম মুন্সেফের বাসায় ছিলেন; তিনি বললেন, "আপনাদের প্রস্তাব খুব ভাল, আমি সদরে ফিরে গিয়ে এ সম্বন্ধে জজ সাহেবের সঙ্গে কথা কয়ে তিনি কি বলেন, লিখে পাঠাব।" প্রথম মুন্সেফকে লক্ষ্য ক'রে তিনি আর-ও বললেন, "রাগ করবেন না জয়লাল দাদা, ওই সর্ষের তেল মেখে মেখে আর ঘণ্টাখানেক ধ'রে সন্ধ্যা-আহ্নিক ক'রেই আপনি এ বয়স পর্য্যন্ত সাবজজের চেয়ারখানা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। মুন্সেফ নামটা-ই যেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ উদ্দাম উদ্যমকে নিবিয়ে মাদা মেরে দেয়। নামের শক্তি বড় জবর; যে সন্দেশের নাম 'দেদো', সে জোর লক্ষ্মীপুজোর নৈবেদ্যের পাশে ঠাঁই পায়; কিন্তু 'লেডি ক্যানিং' জম্‌কে বসে একেবারে ডিনার-টেবলের ঝকমকে প্লেটের উপর।"

দাদা বললেন, "আর ভায়া, আমাদের পালা শেষ হয়েছে; সাতাশ বচ্ছর সার্ভিসের অনেক পাওনাগণ্ডাই বুঝে পেয়েছি; রংপুর থেকে বর্ণ, জলপাইগুড়ীর ভুঁড়ি, চাঁটগাঁর দ্রব্য, মুর্শিদাবাদি ডায়েবিটিশ, সব-ই অঙ্গের অলঙ্কার হয়েছে। এখন কুষ্ঠের এই গেঁটে বাতটুকু চৌরঙ্গীতে প্রোমোশন পেতে না পেতে অবসর নিয়ে কাশীর পেন্সন-ঘাটে বৈকালে ব'সে 'দৈনিক বসুমতী' পড়া শুনতে শুনতে শিবতলাভের পূর্ব্বদিনটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। এখন জানকী-টানকীর মত বৃটিশ-বাইণ্ডিং লাইব্রেরী এডিসন ছোকরারা সার্ভিসে ঢুকছে, পিয়ার্শ সোপের ভ্যালিনা-গন্ধে মুন্সেফ নাম আপনা-আপনি লোপ পাবে; হাওলদার থেকে হেড কনষ্টেবল, হেড কনষ্টেবল থেকে দাঁড়িয়েছে এসিষ্টাণ্ট সাব ইন্‌স্পেক্টর; তা মুন্সেফ যে সাব এসিষ্টাণ্ট জজ হয়ে যাবে, এর যথেষ্ট সম্ভাবনা। হরপ্রসন্ন ভায়া, ঠিক বলেছ, জাঁকাল নামের একটা জয়-জয়কার আছে বৈ কি; দিনাজপুরের জজ আদালতে একটি বেশ মস্করা ছোকরা কেরাণীগিরি করত, তাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতো, আজ কি দিয়ে ভাত খেলে, সে তখনি জবাব দিত, ব্যাসিলিয়ালুসিডিয়া-কম-শূপ্প।"

হরপ্রসন্ন। অর্থাৎ?

জয়লাল। পুঁইশাক দিয়ে কুচো চিংড়ি।

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। মফঃস্বলের নিরামিষ মজলিসে অতি পাতলা রসিকতাতেও ভদ্রলোক হাসে।

যা হোক, বিভার পিসে-পিসী হাই লাইফের আসর সাজিয়ে দর্শন-ডালিতে মেজদাকে-ও হারিয়ে দিলে। এটা অনেক স্থলে দেখা যায়, যিনি বিলাত গেলেন, তিনি নিজে যত সাহেবী করুন আর না-ই করুন, তাঁর ভাই কি ভাগ্নে গোঁপের ডগগুটো মুড়ুলেন, বৈকালে পাঁচটায় মুখে সাবান না দিলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে, খোসা সুদ্ধ পেঁপের ফালি চাম্চে দিয়ে কুরে না খেলে মিষ্টি লাগে না। মষ্টার্ড না মেখে ডুমুর ভাজা মুখে উঠে না।

৬

জানকীনাথের জীবনের কারবারের এই নূতন ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট তাঁর ব্যাঙ্ক-বইয়ের ব্যালান্স-ক্রেডিটের চেয়ে ডেবিটের কলমে মাঝে মাঝে ফিগার দেখিয়ে দিলে-ও সমাজের বাজারে তাঁর নামের দর প্রিমিয়মে উঠলো। আমরা সাধা-সিধে লোক, মোটা খদ্দরের পিরাণ, কাবুলী জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটা বাহবা দিই ততক্ষণ—যতক্ষণ বেশ জানি, তিনি শয়ন করেন জোড়া খাটের উপর পাতা পালকভরা গদিতে, আহার করেন চল্লিশ টাকা মণ পেশোয়ারি চাউলের দু' আউন্স অন্ন, মাখন পো মালাই দিয়ে মেখে, এডমণ্ডের বাড়ীর আলমারীতে রাখা সাটিন, মখমল, মস্‌লিন, শিল্ক সব গরমে হাঁফিয়ে উঠ্‌লে মন্টিথ কথবার্টনওয়াটের বাড়ীর বুট, সু, শ্লিপার থাকে খাস পোষাক-ঘরে সাজান, আর অন্ততঃ দু'খানা বিশ হাজা মোটার তাঁর গ্যারেজে পেট্রল পেটে পূরে খাড়া আছে।

প্রথমেই কথা উঠল, যত বড় ভকিলই হ'ন না, জজের সামান দাঁড়িয়ে "মাই লর্ড মাই লর্ড" ত করতেই হয় তাই হাইকোর্টের দিক্-ও জানকী সাহেব মাড়ালেন না, is a born ধর্ম্ম অবতার। এখানকার কলেজের ছোকরা পর্য্যন্ত জানে যে, ইংরাজদের মধ্যে বড় মেয়ের নাম মিস্, পদবী ধ'রে মিস্ জেঙ্কিনসন হয়, তার পর মেজো, ছোটরা হন মিস্ এলিস্ লিনি-টেনি ব'লে।

স্যাণ্ডেল সাহেব, তাই ছোটকে লোক জানকী সাহেব ব'লে সম্মান দেয়। বধির কবি মহিলামোহন বললেন, "সাহেব ক্যালক্যাটাকে ব্রিক-জঙ্গল বলেন; রুরাল লাইফ ওঁর বড় প্রিয়, তাই রবীন্দ্র হৃদয়ানন্দদায়িনী পয়ার তরঙ্গ ছন্দে পদ্মের সুরভি সিন্ধোড়ার ঈষৎ গোলাপী সাড়া প্রাণের মটকায় যাতে পৌঁছায়, সেই তৃষায় নাথাধিক জানকী কুষ্ঠিয়ায় সহজ বিশিষ্টতা অনুভব করবার জন্য এখানকার ধর্ম্মাসনে—'এলাইয়ে কেশ-কাশ গাঁথিয়ে যুথিকা বাস, শশার শীতল শাঁসে রাঙ্গাইয়া ডেঙ্গো ডাঁটার কাঁটাহীন গোঙানির মূর্চ্ছিত মানবের—শঙ্কিত উৎসব'—" চক্ষু খুলে কবি দেখলেন, শ্রোতারা বিষ্ণু ময়রার দোকান থেকে উঠে যে যার বাজার করতে গেছেন।

জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে আজ কাল এক এক জন নিজস্ব পোয়েট লরিয়েট চাই, তাই কুষ্ঠিয়া এই যুবকটিকে তাদের "কবি" করেছিল, আর গৌরবার্থে তাঁকে বধির কবি উপাধিতে ভূষিত করেছিল; নচেৎ তাঁর ভাবের সঙ্গে কার-ও বড় একটা প্রাণের ভাব ছিল না।

যা হোক, দিশী বিলিতী উচ্চ সমাজে-ই জানকীনাথের বিশেষ মান বেড়ে গেল। জজ সাহেব পরিদর্শন-কার্য্যে কুষ্ঠিয়ায় আসাকালীন জানকী-সাহেব ডাক বাংলোয় তাঁর জন্য ফুল ফল প্রিজার্ভ ও ঘরের তৈরী কিছু সৌখীন ভোজ্য প্রেরণ করেন, তার মধ্যে গরম গরম পাঁঠার কচুরি ক'খানি সাহেবের মুখে বেশী সুস্বাদু বোধ হয়েছিল; সেই অবধি তিনি সদাই বলতেন—

That patty fellow of Kushtea is a brick. I wonder how he can keep such a rich pantry Government should—well"—

এর কিছু দিন পরে জানকীনাথকে নদীয়ায় গিয়ে মাস চারেকের জন্য কায়েমমোকামি সাব জজগিরি ক'রে আসতে হয়; এই ক'মাস ছাড়া এঁর পাঁচ বছর তিনি কুষ্ঠিয়াতে-ই আছেন; সম্ভব তাঁর বগলিটা ছ'শোর চেয়ে একটু বেশী লম্বা ক'রে দেবার পূর্ব্বে আর তাঁকে বদলি করা হবে না।

ঠিক এই সময়ে ভাই ভাজকে একবার দেখে আসবার জন্য পিসীমার অত্যন্ত ইচ্ছা হ'ল। ভগ্নীপতির এংগ্লো-লোক-প্রাপ্তির সংবাদ মোহিত বাবু কতকটা পেয়েছিলেন, সুতরাং ভগ্নীর অবস্থানের জন্য যতটা সম্ভব আপনার বাসায় তাঁর বন্দোবস্তের চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু বিভার মুখে খবর পেয়ে মিসেস্ সোম স্বামীকে বললেন, "তুমি তাঁদের আমাদের এখানে এক হপ্তা থাকবার জন্য চিঠি লেখ।"

সাহেব উত্তর করলেন, "সে কি, আমাদের সঙ্গে পরিচয় টরিচয়—"

তৃপ্তি বললেন, "খুব আছে—খুব আছে, তুমি লেখ মিষ্টার স্যাণ্ডেলকে, আর মিসেস স্যাণ্ডেলকে আমি লিখছি। বিভা যখন আমায় মা বলে, তখন ননদ হয়ে ভাজের বাড়ী কেন দুদিন থাকবেন না?"

এ কথা না ব'লে রাখলে অন্যায় হবে যে, সাত দিনের ভিতর চার দিন পিসী-পিষে দু'জনেই দিনের খাওয়াটা বিভাদের বাড়ী থেকে-ই সেরে এসেছেন, আর ক' বছর পরে "ঠাকুর-ঝি" সম্বোধনটা পিসীমার কানে এত মিষ্ট লেগেছিল যে, স্বামী অনুগ্রহণান্তে চ'লে যাবার পর-ও তিনি বৌয়ের সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রে ডিনারের অব্যবহিতপূর্ব্বে সোম-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতেন। যতই মেম হন, বিভার মা'র ঋণহীন স্বচ্ছল সংসারের সহজ সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি না ক'রে পিসীমা পারলেন না। ষেঠের কোলে যাট দিয়ে বিভা কদ্দিনের হ'ল? ননদের এই প্রশ্নে বধূ এই উত্তর করলেন, "এই সামনের জ্যষ্টিতে পুরোপুরি তেরো হবে, ষষ্ঠীবাটার দিন সকালে ও হয়! তুমি তখন শ্বশুরবাড়ী।'

পিসীমা সেই শ্রেণীর হিন্দু কুলবধূ, যাঁরা স্বামীর সামাজিক জীবনে অনুশ দিবার জন্য দু'কান চেপে ফুলো চুলে এলো খোঁপা বাঁধেন, গায়ে ব্লাউজ এঁটে কোচান সরুপাড় শাড়ী ঘুরিয়ে পরেন, একটু আধটু বাইরে বার হন ও সময়ে সময়ে পায়ে আগ্রাই জুতা দেন। এঁরা বিলিতী আসবাবে ঘর সাজান, ভাসুরের সঙ্গে কথা কন, স্বামীর টেবলে মুর্গী পরিবেষণ ক'রে সেই রাত্রে স্নান ক'রে তবে নিজে আহারে বসেন। এঁদের মুখে "তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি যেতে ভাই অনেক দিন সময়াভাবে", অথচ প্রাণের ভিতর "ওলো"-ও আছে, "যেটের কোলে যাট"ও আছে, "নারায়ণের ইচ্ছেও" আছে, আর আছে সীঁথির সৌন্দর্য্য সিন্দুরের গৌরব ও হ্যামিল্টনের কোলে লোহার আদর!

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।



কলম্বসের বিরাট স্মৃতি-মূর্ত্তি

স্পেনের প্যালোস্ বন্দরে কলম্বসের সম্মানার্থ একটি বিরাট স্মৃতি-মূর্ত্তি স্থাপিত হইতেছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক এই নগরের বন্দর হইতে নূতন জগৎ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রায় ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইবে স্থির হইয়াছে। যে পাদপীঠের উপর স্মৃতি-সৌধ অবস্থিত হইবে, তাহার উচ্চতা ১ শত ১৪ ফুট হইবে। কলম্বসের

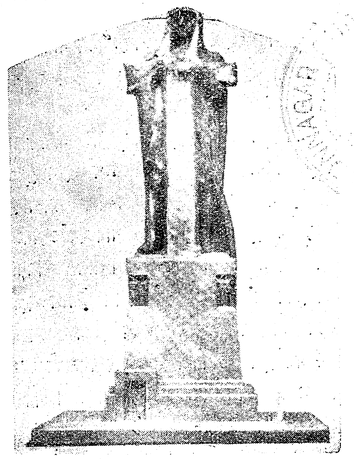

কলম্বসের বিরাট স্মৃতি-মূর্ত্তি

মূর্ত্তিও প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ হইবে। রাজা ফার্দ্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলার মূর্ত্তিও এই স্মৃতিমন্দিরে ক্ষোদিত হইবে। ২০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট প্রস্থ একটি ঘর এই মন্দিরমধ্যে থাকিবে। প্রাচীরের চারিদিকে সেই যুগের জগতের মানচিত্র যথাযথভাবে প্রদত্ত হইবে। কলম্বসের স্মৃতি-বাসর দিবসে ঐ স্মৃতি-মূর্ত্তি উৎসর্গীকৃত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

আট শতাব্দীর প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির

নরওয়ের ওস্‌লোতে দারুনির্ম্মিত একটি প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির আছে। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিস্ময়ের

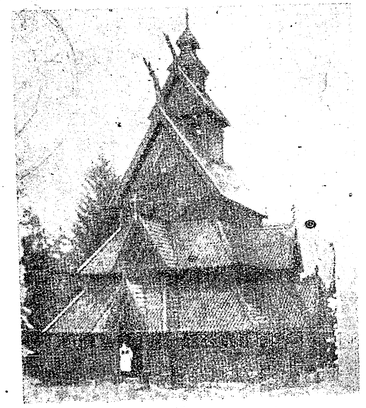

৮ শত বৎসরের প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দির

বিষয়, কোনও লৌহ-কীলক এই মন্দিরের কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই। শিরীষ কাঠের কীলক প্রভৃতির সাহায্যে এই সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার আকৃতি অনেকটা প্যাগোডার মত। সেই যুগে ঐরূপ আদর্শেই ধর্ম্মমান্দরাদি নির্ম্মিত হইত।

পীড়িতের স্নানের অভিনব ব্যবস্থা

যে সকল রোগী উত্থানশক্তি-বিরহিত, তাহাদিগকে স্নান করাইবার অভিনব সুব্যবস্থা কোনও ইংরাজী স্বাস্থ্য-নিবাসে অবলম্বিত হইয়াছে। এইরূপ রোগীর শয্যায় এক প্রকার যন্ত্র সংলগ্ন

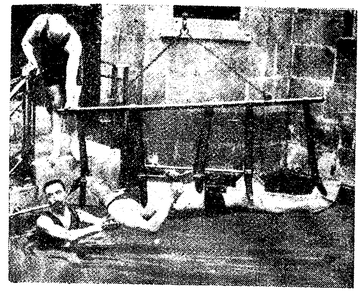

স্নানাগারে রোগীকে জলের মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে

আছে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীদিগকে উত্তোলিত করিয়া জলের মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা-শতঃ রোগীর স্নানের সময় শুশ্রূষাকারীর প্রয়োজন হয় না—রোগীরা স্বয়ং স্নান করিতে পারে।

বিলাসিতার অভিনব ব্যবস্থা

নৌযান পুরুষ কোটের উপর, বোতামের ছিদ্রপথে প্রস্ফুটিত পুষ্প-গুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকে। বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাবে অল্পসময়ের মধ্যেই সুদৃশ্য পুষ্পগুচ্ছ ম্লান হইয়া পড়ে। ইহার প্রতীকারের জন্য নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। কোটের ভিতরের দিকে এক জল-



পুষ্পগুচ্ছ সতেজ রাখিবার ব্যবস্থা

পূর্ণ ক্ষুদ্র পুষ্পাধার সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। আধারমধ্যে পুষ্প-গুচ্ছের বোঁটার অংশ ডুবাইয়া রাখিলে সহসা পুষ্পগুচ্ছ ম্লান হইয়া পড়ে না। জলাধার পাত্র যাহাতে কোনও মতে স্থানচ্যুত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও আছে।

হাত-ব্যাগে ছত্র

মহিলাদিগের পক্ষে ছাতা শুধু শুধু বহন করা বিরক্তিজনক। এ জন্য এক প্রকার হাত-ব্যাগ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে হ্রস্বাকৃতি ছত্র রাখিবার সুব্যবস্থা আছে। ব্যাগের পকেটের



হাত-ব্যাগে ছাতা রাখিবার ব্যবস্থা

মধ্যে ছাতা রাখিয়া দিলে এক হস্তে ব্যাগ অপর হস্তে ছাতা আর বহন করিতে হয় না। ব্যাগের পকেট এরূপ পদার্থে নির্ম্মিত যে, আর্দ্র ছাতা পকেটের মধ্যে রাখিলে ব্যাগের অন্যান্য পদার্থের কোনও ক্ষতি হইবে না।

রবারনির্ম্মিত দ্রুতগামী নৌকা

অধুনা রবার-নির্ম্মিত দ্রুতগামী নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে। জল কোনও মতে নৌকায় প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা দীর্ঘকাল জলে থাকিলেও উহার কোন ক্ষতি হয় না। এই আকৃতির সাধা-

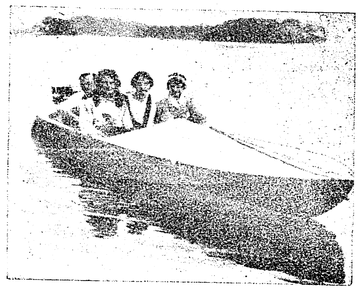

রবার-নির্ম্মিত দ্রুতগামী নৌকা।

রণ নৌকার তুলনায় রবারের নৌকার গতি দ্রুত। কোনও কঠিন পদার্থে আহত হইলে নৌকার কোনও ক্ষতি হয় না। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞগণ এই নৌকার সর্ব্ববিধ পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন।

নক্ষত্রের উত্তাপ-পরিমাপক যন্ত্র

নক্ষত্রের উত্তাপ পরিমাপ করিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। যখন নক্ষত্রালোক এই দণ্ডের সংলগ্ন কাচের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে, তখন যন্ত্রসংশ্লিষ্ট পাখার মত কৃষ্ণবর্ণ অংশ আবর্ত্তিত হইতে

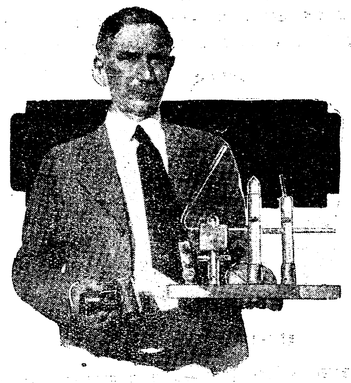

নক্ষত্রের উত্তাপ-পরিমাপক যন্ত্র

থাকে। তদ্দ্বারা পাখাটি কি পরিমাণ আবর্ত্তিত হইল, তাহা দর্পণে রেখাপাত করিয়া যায়। এই তাপ-পরিমাপক যন্ত্র সাহায্যে নক্ষত্রের উত্তাপ অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

কোরিয়ায় রোগ-প্রতীকারের ব্যবস্থা

কোরিয়ার অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, কাষ্ঠদণ্ডের উপর ভীষণদর্শন-মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিলে রোগ পলায়ন করে। অধুনা দেশবাসীর



কোরিয়ার রোগ-প্রতিষেধক।

এই বিশ্বস ক্রমশঃ নাকি অন্তর্হিত হইতেছে। অনেকে রোগের প্রতীকারের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে। তরুণদল পূর্ব্বযুগের সংস্কার-বিমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। জনৈক ধর্ম্ম-প্রচারক এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মোটর গাড়ীতে শয্যা

জনৈক মার্কিণ মোটর গাড়ীর জন্য এক প্রকার শয্যা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা এমনভাবে পশ্চাতের গদির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে যে, সহসা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না।

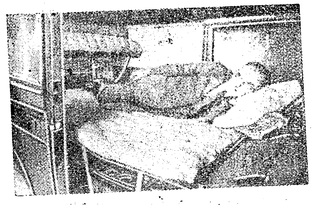

মোটরগাড়ীতে অদৃশ্য শয্যা

শয্যা বিস্তৃত করিবার প্রয়োজন হইলে কৌশলে আবর্ষণ করিবা মাত্র উহা সম্মুখের আসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। শয্যা এমনভাবে স্প্রীংযুক্ত যে, উহাতে শয়ন করিলে আরামবোধ হয়। দূরযাত্রীদিগের পক্ষে এইরূপ শয্যা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিচিত্র রস-নিষ্কাশন যন্ত্র

এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা কমলালেবুর রস নিষ্কাশিত করা যায়। এই যন্ত্রের সুবিধা এই যে, হস্তে



রস-নিষ্কাশন যন্ত্র

দ্বারা লেবুর কোন অংশ স্পর্শ করিতে হয় না। এই আবিষ্কারের পর কমলালেবুর রস নিষ্কাশনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অতি অল্পসময়ে রসনিষ্কাশনক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

বিরাট কেদারা

ক্যালিফোর্ণিয়ার কোনও কারখানায় একখানি বিরাটাকার চেয়ার বা কেদারা নির্ম্মিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই অবশ্য এইরূপ অতিকায় চেয়ার বিনির্ম্মিত। বেত্র ও বংশ প্রভৃতির সাহায্যে শিল্পী ১০ ফুট উচ্চ কেদারা নির্ম্মাণ করিয়া কারখানার বাহিরে বিজ্ঞাপনার্থ রাখিয়া দিয়াছে। ১২খানা কেদারা নির্ম্মাণ

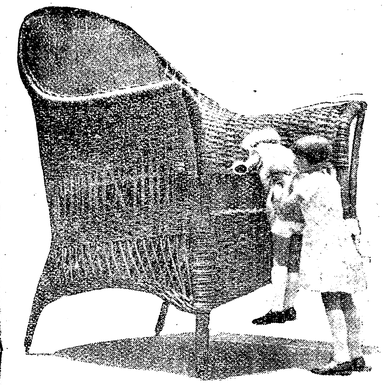

অতিকায় কেদারা

করিতে যেরূপ দ্রব্যাদির প্রয়োজন, একখানির জন্য তাহাই ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেকগুলি ব্যক্তি এক সঙ্গে এই বিপুলকায় কেদারায় উপবেশন করিলে স্থানাভাব হইবে না। ২০ ফুট দীর্ঘ কোনও অতিকায় মানব অনায়াসে এই কেদারায় উপবেশন করিতে পারে।

বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরী

বিজ্ঞান-বিশারদগণ বলিয়া থাকেন, জীবমাত্রেরই কিছু না কিছু বুদ্ধি আছে। একটি গল্‌দা বা মোচা চিঙ্গড়ী মৎস্যকে লইয়া জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ সম্প্রতি মৎস্যের বুদ্ধির প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রাণিতত্ত্ববিদ্ জনৈক চিকিৎসক। তিনি কোনও জাহাজে চিকিৎসকের কায করিয়া থাকেন। শুনা যায়, তাঁহার



বৈজ্ঞানিকের ইঙ্গিতে চিঙ্গড়ী মৎস্য মাথার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে

ইঙ্গিতে উল্লিখিত মৎস্য মাথার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শুধু মৎস্য নহে, অন্য জীবকেও তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন, সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবেই তিনি না কি এইরূপ বিস্ময়কর কার্য্য করিয়া থাকেন।

অভিসারের গান

ডাকিস্ না রে পিছু আমায় দেখাস্ না রে ভয়—
সাধ্য কি তোর কর্‌বি মূর্খ আমার চিত্ত জয়।
যাব গো তার পাছে পাছে
থাক্‌ব গো তার কাছে কাছে
হয় যদি সে গৃহ-হারা ফির্‌ব জগৎময়!

অস্ত্র যদি দিতে আমায় শক্তিতে তার নাহি কুলায়,
তোমার সাথে হে উপবাস কর্‌ব পরিচয়।
মলিন চীর-বাসের ফাঁকে
না যদি মোর আব্রু ঢাকে
কর্‌ব তাকে বক্ষে চেপে সকল লজ্জা জয়!

তবু কারু কথা শুনে
দেখ্‌ব না কো আঙ্গুল গুণে
বেণের মত আগের থেকেই পরের ক্ষতি ক্ষয়।
যতই পিছু ডাক্ না কেন যতই দেখা ভয়—
হয় যদি হোক্ হব না হয় সেই প্রলয়ে লয়!

শ্রীমতী আরতি দেবী।



সাইমন কমিশন ও হরতাল

সার জন সাইমনের নেতৃত্বে রয়াল কমিশন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এ দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে এ দেশের সর্ব্বত্র কমিশনের প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপক হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হরতাল সম্পর্কে কলিকাতায় ও মাদ্রাজে উপদ্রব ও অশান্তি ঘটিয়াছিল, বহুলোক আহত ও বিচারার্থ ধৃত হইয়াছিল, মাদ্রাজে একটি ভারতীয়ের প্রাণবিয়োগও ঘটিয়াছিল। উপদ্রব ও অশান্তির মূল কি, কাহারা এই অশান্তি আনয়ন করিয়াছিল, সে কথা পরে বলিব। প্রথমে সাইমন কমিশনের কথা আলোচনা করা যাউক।

বিলাতের টোরী, লেবার ও লিবারল,—এই তিন প্রধান রাজনীতিক দলের মিলিত কমিশন সার জন সাইমনের নেতৃত্বে এ দেশের ভাগ্য নির্ণয় করিতে আসিতেছেন এবং ভারতকে আর এক প্রস্থ স্বায়ত্তশাসন অধিকার দেওয়ার জন্যই এই কমিশন পার্লামেণ্টের আদেশে পার্লামেণ্টের জন্য ভারতে সাক্ষ্য-সাবুদ লইয়া রিপোর্ট প্রণয়ন করিতে যাইতেছেন, মহা আড়ম্বরে এই কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। সেই কমিশনে কেবল পার্লামেণ্ট হইতেই সদস্য বাছাই করিয়া লওয়া হইয়াছিল, পাছে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে অথবা প্রবাসী য়ুরোপীয়ের পক্ষ হইতে কিম্বা ভারতীয়ের পক্ষ হইতে সদস্য লইলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভারতীয়দের নানা দল, তাহাদের এক দলকে খাটো করিয়া অন্য দলের সদস্য অধিক লইলে কলহ হইতে পারে; পরন্তু ভারতীয়দের স্বার্থ তাহাদিগকে পক্ষপাতিতাদোষে দুষ্ট করিতে পারে। বৃটিশ সরকার বা ভারতীয় সরকার এবং বে-সরকারী য়ুরোপীয় প্রবাসী ও পক্ষপাতিতা-দোষে আক্রান্ত হইতে পারেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নিরপেক্ষ পার্লামেণ্ট হইতে সদস্য বাছাই করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ সার জন সাইমনের ন্যায় বিচক্ষণ আইনজ্ঞ লিবারল যখন কমিশনের সভাপতি, তখন ভারতীয়দের কমিশনের নিকট সুবিচার পাইবায় ষোল আনা আশাই থাকিবে।

অন্যায় নির্ব্বন্ধপরায়ণ ভারতবাসী কখনও নিজের মঙ্গল বুঝে না, তাই এমন সুবিধা পাইয়াও—স্বরাজের দানের ডালি হাতের মুঠার গোড়ায় পাইয়াও এই কমিশন বর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই বর্জ্জন আন্দোলনে লিবারল মডারেট, ন্যাশনালিষ্ট স্বরাজী, সহযোগী অসহযোগী, হিন্দু-মুসলমান,—সকল দলের সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীই যোগদান করিল। তাহারা বলিল, সাইমন ভাল লোক, নিরপেক্ষ লোক, কমিশনের সদস্যরাও ভাল লোক,—সব স্বীকার করিয়া লইতেছি, কিন্তু পার্লামেণ্ট আমাদের ভাগ্য নির্ণয় করিবার কে—আমরা আমাদের নিজের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া লইব। তোমাদের লর্ড বার্কেণহেড (আমাদের ভারতসচিব ভাগ্যনিয়ন্তা) লর্ড সভায় স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে যে, এই শাসনসংস্কার ব্যাপারে পার্লামেণ্ট তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব পরিহার করিতে পারেন না এবং করিবেন না। ভারতে বা বিলাতে যদি কেহ সত্যসত্যই মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা আমাদের বিচারের ক্ষমতায় প্রথম ও শেষ দায়িত্ব পরিহার করিয়া ভারত সম্বন্ধে যে কোনও সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করিব, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বলি যে, তাঁহারা বাস্তব অবস্থার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।"

লেবার পার্টির দলপতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও পার্লামেণ্টে এই 'প্রথম ও শেষ দায়িত্বের' অধিকার মানিয়া লইয়াছিলেন এবং কমিশনে লেবার দলের সদস্য-নির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়াছিলেন। আর সার জন সাইমন স্বয়ং লিবারল দলের হইতে কমিশনের চেয়ারম্যানি গ্রহণ করিয়া এই মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, বিলাতের সমস্ত রাজনীতিক দল একযোগে ভারতবাসীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, পার্লামেণ্টই তাহাদের ভাগ্যবিধাতা, তাহারা বাহিরে টেবল পরামর্শের প্রস্তাব করুক বা যাহাই করুক, পার্লামেণ্ট ভিন্ন তাহাদের ভাগ্যনির্ণয় করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এ অবস্থায় ভারতবাসী আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কমিশন গ্রহণ করিতে পারে না, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

এই জন্য সার জন সাইমন ভাল লোক হইলেও এবং কমিশনের সাধু উদ্দেশ্য আছে, ইহা নানারূপে বুঝাইয়া দিলেও ভারতবাসী তরা ফেব্রুয়ারী তারিখে কমিশনের ভারতে প্রথম পদার্পণ দিনে হরতাল অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এই হরতালে জোরজবরদস্তী ছিল না, ভারতবাসী দেশের শ্রমিক ও দোকানদার বাবসাদারকে অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে শান্তিপূর্ণ সভা-সমিতি বক্তৃতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছিল—এমন দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলনও হইয়াছিল। দুই চারি খয়েরখাঁ এবং জয়চাঁদ মিরজাফর ব্যতীত দেশের আপামর সাধারণ কমিশন বর্জ্জনে পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল। আবদর রহিমের মত বহুরূপী (প্রথমে কমিশনের বিপক্ষ, পরে স্বপক্ষ) এক শ্রেণীর মুসলমান বর্জ্জনের বিপক্ষেও আন্দোলন করিয়াছিল। তাহার ফল অবশ্য কিছুই হয় নাই। কলিকাতার হরতালের দিনে চাঁদনী ও হগ মার্কেটের মত মুসলমান দোকানদারের প্রধান আড্ডাতেও মুসলমানরা দোকানপাট বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সার আবদরের দলভুক্ত দুই চারি জন মুসলমান মালিকের দুই চারিখানা গো বা মহিষ-যান অশ্ব-যান চলিয়াছিল, দুই চারিখানা ট্যাক্সিও চলিয়াছিল, আর দুই চারিখানা দোকানও খুলিয়াছিল। ইহা ছাড়া অবশ্য য়ুরোপীয় য়ুরোপের পোঁ-ধরা মালিকের ট্রাম ও দুই চারিখানা বাস চলিবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানা ছিল, পরন্তু ইহাদের আফিস ও দোকান যে খুলিবে, তাহাও সকলে জানিত। ইহা ছাড়া আর সরকারের দপ্তর ও আফিস ছাড়া কলিকাতার আর সব স্থানের কাযকর্ম্ম সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। যদি বলপূর্ব্বক হরতাল অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা থাকিত, তাহা হইলে আফিসে কেরাণী যাইতে পারিত না, সমস্ত দোকানপাট হাটবাজার বন্ধ সত্ত্বেও দুই একখানা দোকান খুলিবার সাহস কাহারও হইত না। সহরের উত্তরাংশে অবাধে দুই চারিখানা ট্যাক্সি, গাড়ী, গো-যান ও মহিষ-যান চালাইবার সাহস কাহারও হইত না।

কেবল অনুরোধ উপরোধ, কেবল যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝান, যার সহজ বুদ্ধিতে আত্মসম্মানজ্ঞানই এই হরতালের সাফল্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কর্ত্তাদের ও উপ-কর্ত্তাদের এবং তাঁহাদের পো-ধরা 'সরকার' কোম্পানীদের ইহাতেই এত রাগ! তাই তাঁহারা কাগজে হরতাল বে-আইনী করিবার আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ব্যর্থ ক্রোধে রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত তাঁহারা গর্জ্জন করিতেছেন। মাদ্রাজে পুনরায় হরতাল করার বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে, অন্যত্রও যে হইবে না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। বলিলেই হইল, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হরতালে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা,—তা সে হরতাল লোকের ইচ্ছাকৃত হরতাল হউক, বা না হউক, ক্ষতি নাই। এমন লোক পথ থাকিতে হরতালের অনুষ্ঠানের জন্য আন্দোলনের দিা টিপিয়া মারিবার আশঙ্কা কোথায়?

মাদ্রাজে হরতালের দিনে এক কালা আদমীর প্রাণ গিয়াছে, কলিকাতায় প্রাণ যায় নাই বটে, তবে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ প্রদর্শনের বিপক্ষে আন্দোলন করিয়াছিল, তাহার মাথা ফাটিয়াছে এবং বিস্তর ছাত্র রেগুলেশান লাঠি, গোরা সার্জ্জেণ্টের বুটের লাথি এবং গুর্খার খোঁচা খাইয়া জখম হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১০ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য" বালকও আছে! আর ভবানীপুরে সার আশুতোষের বাড়ার সম্মুখেও রক্তপাত হইয়াছে, সার আশুতোষের পুত্রগণ অন্যান্য লোকের সহিত থানায় চালান হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বাড়ীর দেউড়ীতেও চাকর-বাকর সার্জ্জেণ্টের বুটের লাথি ও অন্য 'শান্তিরক্ষকের' রেগুলেশান লাঠির কোমল স্পর্শ অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ সব শান্তিরক্ষকের মধ্যে অনেকের পুলিসের উর্দ্দী ছিল না, নম্বরও ছিল না! আজ বাঙ্গালার বাঘ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, তাই এই সম্ভবও সম্ভব হইল!

যাহা হউক, সহরের শান্তিরক্ষক কমিশনার সার চার্লস টেগার্ট এই হরতাল 'রায়টের' এক রিপোর্ট হুজুরে পেশ করিয়াছেন। 'রায়ট' বা দাঙ্গা দুই পক্ষে হয়, এই কথাই এ যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। এক পক্ষে যে রায়ট হয়, এমন অদ্ভুত কথা এই প্রথম শুনিলাম। মাথা ফাটিয়া, বাঙ্গালী বালকের রক্তপাত হইয়াছে লোকের, ধাক্কা খোঁচা তাড়া খাইয়াছে অনেকে, —শান্তিরক্ষকের দিকের কাহারও কিছু হয় নাই। তাঁহার বিরাট অ য়োজন সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র বুক ফুলাইয়া বেড়াইয়াছে বৃটিশ বেয়নেট-বন্দুকের অপূর্ব্ব ক্ষমতার সগর্ব্ব পরিচয় দান করিয়াছে। কলেজ ষ্ট্রীটের ও ভবানীপুরের রসা রোডের মোড়ে মোড়ে মেসিন গান, আর্ম্মার্ড কার, গোরা পল্টন, খাড়া সঙ্গীন, মোটা মোটা রেগুলেশান লাঠি, সার্জ্জেণ্টের ব্যাটন,—অভাব কিছুরই ছিল না। আর 'রায়টের' অপর পক্ষের কি ছিল? নিরস্ত্র, দুর্ব্বল, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত বালক ও যুবা,—তাহারা করযোড়ে দেশেরই লোককে কর্ম্ম হইতে মাত্র ঐ দিনটি বিরত হইতে অনুরোধ করিতেছে, বড় জোর কোথাও ট্রামের লাইনে বসিয়া বা শুইয়া পড়িতেছে (ইহা পুলিসের বড় কর্ত্তার রিপোর্টে প্রকাশ), কোথাও বা পথিককে ভিড় করিতে নিষেধ করিতেছে, ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছে। ইহারাই কি রায়টের অপর পক্ষ?

সার চার্লস রিপোর্টে বলিয়াছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ফোন পাইয়াছিলেন যে, সেখানে ভয়ানক 'রায়ট' চলিতেছে, তাই তিনি সাহায্যার্থ বৃটিশ পুলিস ও সৈন্যবাহিনী লইয়া তথায় রণে হানা দিয়াছিলেন। এই ফোন কে বা কাহারা করিয়াছিল? 'রায়ট' কাহাতে কাহাতে হইতেছিল? কলেজের ছেলেরা কি আপনা আপনি মাথা ফাটাফাটি করিতেছিল? নিজের দেশের লোককে কায বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলে কি 'রায়ট' করা হয়? হরতাল কেমন সফল হইয়াছে দেখিবার জন্য পথে চলিলে কি 'রায়ট' করা হয়? পথে বাহির হইলে যখন রেগুলেশান লাঠি ও ব্যাটন চলে, তখন আকাশে একসঙ্গে ৪ খানা এরোপ্লেন উড়াইয়া পথে লোক জমা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

সার চার্লসের রিপোর্টের সমালোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে, উহা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। তবে মাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সার চার্লসের অপেক্ষা পদ-মর্য্যাদায় ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে যাঁহারা কোনও অংশে হীন নহেন, বরং বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং কলেজের অধ্যাপক, উকীল, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রভৃতি আছেন। ইহাদের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সার চার্লসের শান্তি-রক্ষকরা অকারণে পথিক ও বালকগণকে তাড়া করিয়াছিল ও প্রহার করিয়াছিল। তাহাদের অপরাধের মধ্যে যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করা অথবা ট্রামের আরোহী দেশীয়কে লক্ষ্য করিয়া "লজ্জার কথা" উচ্চারণ করা। ইহার জন্য ১০ বৎসরের বালককে ৪।৫ জন গোরা সার্জ্জেণ্টের প্রহার কেমন শোভন হইয়াছিল? এই ভদ্রলোকগণের রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, ভবানীপুরে বিস্তর শান্তিরক্ষক পুলিসের উর্দ্দী ও নম্বর ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে পথে 'শান্তি'রক্ষা করিতেছিল এবং লাঠি, খোঁটে ও ব্যাটন লইয়া যদৃচ্ছা লোকদিগকে তাড়া ও প্রহার করিতেছিল। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, একটা যুবক এক মোড় হইতে আর এক মোড়ে গিয়া ট্রামে ইট ছুঁড়িতেছিল, অথচ 'শান্তিরক্ষকরা' তাহাকে ধৃত করা প্রয়োজন মনে করে নাই। আরও কয় জন লোককে এইরূপ ইটপাটকেল ছুড়িতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে গেলেও ধরা হয় নাই।

ইহারা কাহারা? উর্দ্দী নম্বরবিহীন গুণ্ডারাই বা কে? এ সকল বিষয়ে যতক্ষণ লোকের সন্দেহভঞ্জন না হইতেছে,

ততক্ষণ সার চার্লসের কৈফিয়ৎ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না।

যাহা হউক, হরতাল যে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, ইহা ধ্রুব সত্য যে, সাইমন কমিশন এ দেশে পদার্পণ করিলে এ দেশের লোক তাঁহাদের প্রতি আপনাদের অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া হরতাল অনুষ্ঠান করিয়াছিল। কিন্তু সার জন সাইমন ইহাতেও হটিবার লোক নহেন। তিনি বড়লাটকে এক পত্র লিখিয়া উহার মারফতে এদেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার ও তাঁহার কমিশনের উদ্দেশ্য সাধু, (যেন এ দেশের লোক তাঁহাদের সাধুতায় কখনও সন্দেহ করিয়াছে)! পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমরা কি ভাবে কার্য্য করিব এবং কি কার্য্য করিব, ইহা লইয়া নানা প্রকার ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য অবস্থাটা খোলসা করিয়া দিতেছি।

"এই দুই মাস সরকারীভাবে কার্য্য করা সম্ভব হইবে না। এখন কেবলমাত্র গোড়াপত্তন করা হইবে। এই জন্য একটি সম্মিলিত বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব করিতেছি, ঐ বৈঠক বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রস্তুত কাগজপত্র পরীক্ষা করিবেন। ঐ বৈঠকে আমাদের ৭ জন ছাড়া ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৭ জন সদস্য থাকিবেন। আমি বৈঠকের সভাপতি হইব। রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং ব্যবস্থা পরিষদ হইতে ৭ জন বে-সরকারী সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক। আমরা যেমন বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি, ভারতীয় সদস্যগণও তেমনই ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।"

কেমন সুন্দর ব্যবস্থা! সম্মিলিত বৈঠক ত হইবে, কিন্তু সাক্ষ্যগ্রহণ ও রিপোর্ট প্রস্তুত ও দাখিল করার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? সার জন পত্রেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"যে স্থল-বিশেষে যুক্ত বৈঠকে সাক্ষ্য লওয়া সম্ভব নহে, সে স্থলে আমরাই কেবল সাক্ষ্য লইব, ভারতীয় সদস্যরা আমার সাধুতায় আস্থা স্থাপন করুন। ইচ্ছা করিলে ভারতীয় সদস্যরা পৃথগ্‌ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" এখানে দেখিতে হইবে, 'স্থল-বিশেষ' কথার অর্থ কি? যুক্ত বৈঠকে একযোগে যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে, সেই সাক্ষ্যের কি নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে, ভারতবাসী তাহা জানিতে পাইবে না। ভারতীয় সদস্যের স্বতন্ত্র সাক্ষ্যগ্রহণেরই বা মূল্য কি?

রিপোর্ট দাখিল করা সম্বন্ধে সার জন পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমরা যাহাদের নিকট দায়ী, তাহাদের (পার্লামেণ্টের) নিকট রিপোর্ট দাখিল করিব, আর ভারতীয় সদস্যরা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের রিপোর্ট আমাদের রিপোর্টের সহিত গাঁথিয়া পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবে পারিবেন।"

এখন কথা এই, এই ধুকড়ীর মধ্যে খাসা চাল কোনটুকু? প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সকল মালমশালার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারেরা কমিশনে দাখিল করিবার নিমিত্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সকল মালমশালা যদি ভারতীয় সদস্যরা দেখিতে না পান, তাহা হইলে কাগজপত্রের মূল্য কি? বিভিন্ন সরকারেরা যে মালমশালাই প্রাপ্ত হউন, তাহা হইতে নিজেদের মনের মত করিয়া যে কাগজপত্র তৈয়ার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা যখন আমলাতন্ত্র সরকারের স্বার্থের অনুকূল করিয়া গড়া হইয়াছে, তখন উহাতে দেখিবার কিছুই নাই, আসল মালমশালাই দেখিবার জিনিষ। সম্বন্ধে এত ঢাক ঢাক কেন, সার জন সাইমন তাহা ত খোলসা করিয়া দেন নাই।

তাহার পর স্থলবিশেষে সাক্ষ্য গ্রহণের পার্থক্যও আছে। সার জন এখানে তাঁহার সাধুতার উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? সাধু কে নহে? লর্ড বার্কেণহেড, মিঃ বলড়ুইন, সকলেই ত সাধু, তাঁহারাও ত স্পষ্টবাদী। কিন্তু সাধুতা এক জিনিষ, আর প্রকৃত কার্য্যকরী এক জিনিষ। যাহাতে ভারতবাসী প্রকৃতরূপে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এমন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার অধিকার সার জন তাহাদিগকে দিতে পারেন নাই, দিবার অধিকারও তাঁহার নাই।

গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে কমন্স সভায় কমিশন সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ককালে মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচিত যদি কোনও কমিশন প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট ঐ কমিশনকে তাঁহাদের সকাশে রিপোর্ট দাখিল করিবার অধিকার দিতে পারেন না, সে অধিকার রদও করিতে পারেন না। ঐ কমিশন পার্লামেণ্টের কমিশন নহে, আমরা উহার জন্য দায়ীও নহি। কমিশনও পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী নহে। সুতরাং ঐ কমিশন পার্লামেণ্টে রিপোর্ট দাখিল করিলেও পারে, না করিলেও পারে। যে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে ঐ কমিশনের সৃষ্টি হইবে, ঐ পরিষদই রিপোর্ট সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার উপভোগ করেন, যেমন আমাদের পার্লামেণ্টারী কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে, অন্য কাহারও নাই।"

এমন সহজ স্পষ্ট কথার পরেও সার জন যে বিষয় সম্মিলিত বৈঠকের এবং ভারতীয় কমিশনের পার্লামেণ্টে রিপোর্ট দাখিল করিবার কথা মুখে আনিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। প্রথমতঃ সার জনের এই কমিশন সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই। তাহার পর ঐ কমিশন সৃষ্ট হইলেও তাহার রিপোর্ট প্রয়োজনীয়তা পার্লামেণ্টকে বাধ্য করিয়া গ্রহণ করাইবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। তবে এই সম্মিলিত বৈঠকের দিবার মূল্য কি?

মূল্য নাই বলিয়াই দিল্লীতে সমবেত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সার জনের এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। গোড়ার কথা, পার্লামেণ্ট আমাদের ভাগ্য বাঁধিয়া দিবে, এ কথনই ভারতবাসী মাথা পাতিয়া লইবে না। যত বাধাই আসুক, সে তাহার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়িয়া লইবে।

[আমাদের ছাত্র-সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রতি এই প্রশ্ন সম্পর্কে এবং অন্যান্য ব্যাপারে স্বয়ং ভাইস-চ্যান্সলার হইতে করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ষ্টেপলটন যে হার করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়া

এবার স্থানাভাব। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ মিস্ রাইট এবং দিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্পর্কেও অনেক কথা বলিবার আছে। এবার এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালার ছাত্রসমাজে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, এবার তাহার অপেক্ষা অবস্থা আরও সঙ্গীন। সরকারের পুলিস ও পল্টনের সহিত যোগাযোগে ছাত্রগণের স্বাধীন চিন্তা দমনের যে তাণ্ডবলীলা হইয়াছে, তাহাতে সেই যুগের ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশান অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্যপদ্ধতির চিন্তার সময় আসিয়াছে বলিতে হইবে। সমগ্র জাতির এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।]

জাতির আত্মসম্মান ও কলেজের অধ্যক্ষ

এ দেশে ইদরু পিদরু চা-কর নীল-করের ছাতাতল্ক জুতা-তলের কথা শুনা যায়, গোরা-বারিকের ধলা সেনানীর সেলাম আদায়ের বাতিকের কথাও অবিদিত নহে, মফঃস্বলের ক্ষুদে হুজুরদের হাঁটিটিকটিকিতেও জবরদস্তি কাণ ধরিয়া ঘোড়দৌড় করান কথা শুনা যায়,—কিন্তু কৃতবিদ্য উচ্চশিক্ষিত শ্বেতকায় কলেজ-অধ্যক্ষের এ দেশের জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকাতল্কের কথা বোধ হয় এই প্রথম শুনা গেল।

কলিকাতার সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ষ্টেপলটন যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার নাম এদেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে চিরদিন লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই। কলেজের বার্ষিক উৎসবে 'বন্দে মাতরম্' গীত গীত হইয়াছিল, স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয় পতাকার অনুরূপ ত্রিবর্ণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল এবং কলেজ য়ুনিয়নের সম্পাদকের বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ছিল,—এই বিষম অপরাধে শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ একবারে 'ক্ষেপ্পা' হইয়া উঠিয়া সম্পাদককে তিরস্কার করিয়াছিলেন; সম্পাদকও নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে এই তিরস্কার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন নাই,—তিনি ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত হইয়াছেন বলিয়া কোনও প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার জাতীয় পতাকার এবং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অধ্যক্ষ অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন এবং য়ুনিয়নের অনারারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ ষ্টেপলটনের গাত্রচর্ম্ম এত কোমল নহে যে, সম্পাদকের মিষ্ট অথচ ন্যায্য প্রতিবাদে তাহাতে দাগ বসিবে, তিনি বরং আরও অধিক দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানহারা হইয়া তাঁহাকে সাসপেণ্ড করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। এই ব্যাপারে অধ্যক্ষ ষ্টেপলটন এক হিসাবে আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিলেন। নাড়াবুনে 'কীর্ত্তনে' হইলে হাতে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়িয়া থাকে। মিঃ ষ্টেপলটন শিক্ষা-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সস্তায় নাম বাজাইয়া যাইবার অবসর অন্বেষণ করা অস্বাভাবিক হয় নাই, যাই তিনি স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের কাস্তে ভাঙ্গিয়া কলেজের অধ্যক্ষের করতাল গড়াইয়া তাহার আওয়াজে বাঙ্গালার জলস্থল মুখর করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টরী করিলে তথায় অজানা অচেনা থাকিয়াই তাঁহার চাকুরী-জীবনের অবসান হইত, কিন্তু একবারে খাস সহর কলিকাতা—তাহার প্রধান সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—বাপ রে! এমন অবসর কি হেলায় হারান যায়? আদালতের পেয়াদা বা পোষ্ট আফিসের পিয়ন নিজের পদে বসিয়া যতটুকু সম্ভব ক্ষমতা দেখাইয়া যায়, আর এ ত প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল! নাম কি চিরস্মরণীয় থাকিবে না?

আর এক হিসাবেও তিনি সস্তায় নাম বাজাইয়াছেন। এই যে তিনি এক বাঙ্গালী তরুণের জাতীয় আত্মসম্মানে আঘাত দিয়া তাহার সুপ্ত দেশপ্রেমকে জাগাইয়া তুলিলেন, ইহাতে দেশের কত মঙ্গল সাধিত হইল? বাঙ্গালী শিক্ষিত তরুণ যে নির্জ্জীব অকর্ম্মণ্য নহে, সে যে এখন তাহার দেশজননীকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে সে যে তাঁহার জন্য আত্মদান করিতে পারে,—তাহাকে এই প্রবৃত্তির পরিচয় কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রদান করিবার অবসর প্রদান করিয়া মিঃ ষ্টেপলটন নিশ্চিতই স্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

অধ্যক্ষে ও ছাত্রে এই সম্পর্কে যাহা ঘটুক, তাহাতে দেশের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যদি কর্ত্তৃপক্ষের বিচার-বিভ্রাটের যূপ-কাষ্ঠে একটি তরুণ শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়, তাহাতে মনে করা যাইবে যে, মাতৃসেবায় এমন ক্ষতি স্বীকার দুই একটা করিতে হইবেই। কিন্তু ইহার অপেক্ষা বড় কথা আছে। দেশের দিক হইতে—জাতির দিক হইতে এই জাতির আত্ম-সম্মানের অবমাননাকারী অধ্যক্ষকে কিছু বলিবার আছে। তিনি বৃটিশ-জাতীয় বলিয়া নিশ্চিতই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। তিনি যদি কাহাকেও তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত 'God Save the King' অথবা জাতীয় পতাকা 'Union Jack'এর অসম্মান করিতে দেখেন, তাহা হইলে কি করেন? তিনি নিশ্চিতই অবগত আছেন যে, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা জাতির আত্মসম্মানজ্ঞানের প্রতীক। ফরাসী জাতি মার্সেল সঙ্গীতে রণোন্মাদে মাতিয়া উঠে, মার্কিণ জাতি 'Star and Stipes' পতাকা দেখিলে অথবা 'Under the Star-spangled Banuer সঙ্গীত শুনিলে তাহারা সম্মানরক্ষার জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। এই কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফরিকা য়ুনিয়নের জাতীয় পতাকা-সমস্যা লইয়া ইংরাজের সহিত দক্ষিণ-আফরিকার যুদ্ধ সংঘটিত হইবারই উপক্রম হইয়াছিল, জেনারল হার্টজগের প্রস্তাবমত যদি য়ুনিয়ান জ্যাকের সঙ্গে দক্ষিণ-আফরিকার নিজস্ব পতাকার সম্মানরক্ষা করা না হইত, তাহা হইলে আবার দক্ষিণ-আফরিকায় যুদ্ধ সংঘঠিত হইত। ফাসোদায় ফরাসী নিজ জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। পাঁচদের ব্যাপার কতকটা এইরূপ; সেখানেও রাশিয়ার পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল বলিয়া ইংরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে আত্ম-সম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন জাতিমাত্রেই নিজের জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য জীবনান্ত পণ করে। ভারতবর্ষ কি একাই বিপরীত-দৃষ্টান্ত

হইয়া থাকিবে? না হইলে মিঃ ষ্টেপলটন কোন্ সাহসে বলেন, —"ভারতীয় ছাত্রগণের কলেজে জাতীয় পতাকা আনিবার অধিকার নাই?" এই অধিকার দিবার বা না দিবার মালিক কি তিনি? ভারতের ছাত্র ভারতের কলেজে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিবে, ইহার অনুমতি দিবে কি বিজাতি বিধর্ম্মী শ্বেতকায় অধ্যক্ষ? দক্ষিণ-আফ্রিকায় যদি য়ুনিয়ান জ্যাকের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় পতাকা একত্র উড্ডীন হইতে পারে, তবে প্রেসিডেন্সী কলেজে শ্বেতকায় ষ্টেপলটনের য়ুনিয়ন জ্যাকের সহিত কৃষ্ণকায় ভারতীয়ের জাতীয় ত্রিবর্ণ-পতাকা উড্ডীন হইবে না কেন? এক কথা বলিতে পার,—তুমি বিজেতার জাতি, ছাত্ররা বিজিত জাতির। তবেই সেখানে যুক্তি বা ন্যায়ের স্থান হইল না, পশুবলের কথা আসিল। যে মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়া অধ্যক্ষ ষ্টেপলটন একটা জাতির জাতীয় পতাকার প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছেন, সেই মনোবৃত্তির অনুকূল শিক্ষাদানে কি ফল হইতে পারে? প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-ভেদে যে দাস-মনোবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিতে লক্ষ্য করা হইল, এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাহারই অনুশীলনের সুযোগ হইতেছে না কি?

আরও শুনা যাইতেছে, অধ্যক্ষ ষ্টেপলটন বলিয়াছেন, "আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।" কেন? কোনও এ দেশীয় ভাষাভিজ্ঞ য়ুরোপীয় মনীষীই বলিয়াছেন,—"বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত,—এমন কি, ফরাসীর 'মার্সেলস' সঙ্গীতও ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। সেই সঙ্গীতে আমরা লজ্জানুভব করিব? এত বড় দুঃসাহসিক কথা যে বলিতে পারে, তাহাকে এ দেশের ছাত্রের চরিত্রগঠনে নিযুক্ত করা সরকারের পক্ষে কত দূর যুক্তিসঙ্গত? যে গানে ভারতীয়ের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, তাহা লজ্জাজনক? অধ্যক্ষের এ ধৃষ্টতার সীমা কোথায়?

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অধ্যক্ষ ষ্টেপলটন যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত অর্ব্বাচীনেই সাজে। সুভাষচন্দ্র দেশের জন্য কি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার সঙ্ঘগঠনের কি অদ্ভুত শক্তি আছে,—তাহার ধারণা ক্ষুদ্র ষ্টেপলটন কি করিবেন? তাঁহার মত ক্ষুদ্র ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকে সুভাষচন্দ্রের মাতৃযজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণের স্নিগ্ধ-গম্ভীর আরাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।

একটা কথা বাঙ্গালার—বাঙ্গালার কেন, ভারতের জনসাধারণের ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের জাতীয় পতাকায় অথবা জাতীয় সঙ্গীতে যদি 'সিডিশানের' গন্ধ থাকে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে পুলিস বা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ। কলেজের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য শিক্ষাদান করা, কলেজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পতাকা ও সঙ্গীতে কি কলেজের শৃঙ্খলা-ভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়াছিল? তবে তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন কেন? তাহাতে রাজদ্রোহ আছে কি না, সে বিচারের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই, পুলিস তাহা বিচারালয়ে যাচাই করিয়া লইতে পারে। তবে তিনি উপর-পড়া হইয়া পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের কাষ করিয়া কলেজের চাকুরীর সময় বাজে নষ্ট করিলেন কেন?

বাঙ্গালার জনসাধারণের এ বিষয়ে কি কোনও কর্ত্তব্য নাই; যে শিক্ষা-বিভাগের লোক এ দেশের পয়সায় পুষ্ট হইয়া এ দেশেরই জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীতের অসম্মান করে, তাহাকে শিক্ষা-বিভাগে রাখিতে দেওয়া কি এক মুহূর্ত্তও উচিত? জনমত কি এ বিষয়ে বাঙ্গালা সরকারের কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন না?

—

বাঙ্গালায় বন্যার সমস্যা

নদীমাতৃক বঙ্গদেশের পল্লী-মফঃস্বলে সুপেয় পানীয়ের অভাব ঘটিলেও প্রায় প্রতিবৎসরই বন্যার সর্ব্বনাশ হইতে তাহার নিস্তার নাই। প্রায় প্রতিবৎসরই দেখা যায়, বাঙ্গালার কোন না কোন জিলা অথবা দুই তিনটা জিলা বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। ঘাঁটালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া মেদিনীপুর-হুগলীর ভীষণ বন্যার পর হইতেই যেন বন্যার সর্ব্বনাশের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। অথচ প্রতীকারের উপায় এ যাবৎ প্রকৃষ্টরূপে অবলম্বিত হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি যথেষ্ট আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কয় বৎসর পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে দেশের লোক যদি বন্যাপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্তগণের সেই বিপদে অক্লান্ত প্রাণপাত পরিশ্রমে সাহায্য দান না করিতেন, তাহা হইলে দেশের কি অবস্থা হইত, বলা যায় না। লোকমত সেই সময়ে এরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল যে, গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য দূর হইয়া চৈতন্যোদয় হইতে বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালা সরকার উত্তরবঙ্গের বন্যা সম্পর্কে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক কমিটী নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কমিটীর অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সম্প্রতি বাঙ্গালার বন্যা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সরকার উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

এই রিপোর্টখানি বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষ হইতে আদ্যন্ত পঠিত ও আলোচিত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু সরকার ইহার মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন অতিরিক্ত অধিক। ইহা যে অমূল্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের লোকই বন্যায় পীড়িত হয়, সুতরাং তাহাদের পক্ষে বন্যা সম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হওয়া কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ যদি ঐ রিপোর্টে বন্যার প্রতীকারোপায় থাকে, তাহা হইলে তাহা জানিয়া রাখা ত একান্ত আবশ্যক। কিন্তু মূল্যাধিক্য বশতঃ যদি ঐ পুস্তিকা সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য না হয়, তাহা হইলে ঐ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া লাভ কি? তাহা হইলেও যাঁহাদের সামর্থ্যে কুলাইবে, পরন্তু যাঁহারা দেশের ব্যাপার মমতা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে মূল্য অত্যধিক হইলেও ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইহা ক্রয় করা উচিত।

যাহা হউক, রিপোর্টে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ আমরা জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। ইহা হইতেও তাঁহারা দেশের অবস্থা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

রিপোর্ট পাঠে প্রথমে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গোপসাগরে বিষম ঘূর্ণীবায়ু মাঝে মাঝে উত্থিত হয়, ঐ সঙ্গে প্রচুর বারিবর্ষণও হইয়া থাকে। এই ঘূর্ণীবাত্যা ও বারিবর্ষণই বঙ্গের বন্যার মূল কারণ। এই হেতু গত ৫০ বৎসরকাল বঙ্গের নানা স্থানে বন্যা হইয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ ইহা হইতে অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বন্যা পৃথিবীর অন্য দেশেও হইয়া থাকে, তবে এ দেশের মত বন্যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে নাই। তাহার কারণ এই যে, বন্যা প্রতিষেধের উপায় অস্ত্রত্র অবলম্বিত হয়, এ দেশে 'কিসমতের' উপর নির্ভর করিয়া কালক্ষেপ করা হয়। যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, দুর্ভিক্ষ এ দেশবাসীর গা-সহা হইয়া গিয়াছে,—এ সকল আধিব্যাধির কথা উঠিলে কেহ দুঃখও অনুভব করে না, তেমনই বন্যার কথাও যেন দেশবাসীর গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এই বন্যা নিবারণ করা যে মানুষের আয়ত্তাধীন—এমন বন্যা যে অন্যান্য সভ্যদেশের সরকার সরকারী অর্থব্যয়ে নিবারণ করিয়া থাকেন, এ কথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রিপোর্ট বলিতেছে,—উত্তর-বঙ্গের জলনিকাশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে, অন্ততঃ অধিকাংশ স্থানেরই সম্পর্কে এ কথা বলা যায়। নদীগর্ভের অবনতি ঘটিতেছে। মধ্যস্থলে পলি পড়িয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতেছে। এই কারণে এবং রেলের বাঁধ ও রাজপথ যদি বাধায় জলের স্বাভাবিক প্রবাহপথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে বলিয়া দেশ বন্যাময় হইতেছে। পরন্তু এই সকল কৃত্রিম ও স্বাভাবিক বাধা দূর করিবার চেষ্টা না হওয়ায় বন্যা ম্যালেরিয়া-দুর্ভিক্ষেরই মত কায়েম-মোকায়েম হইয়া বসিতেছে। আবার রেলের বাঁধে বন্যার জল আটকাইয়া থাকায় বন্যা দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইতেছে।

রেলের বাঁধে প্রয়োজনানুরূপ পয়ঃপ্রণালী ও সেতুর ব্যবস্থা না থাকায় এ দেশের কি ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ম্যালেরিয়া-সম্বন্ধে কমিটীর সদস্যরূপে বহুকাল পূর্ব্বে রাজা দিগম্বর মিত্র দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রেলের বাঁধে জলনিকাশে বাধা ঘটায় দেশ কলুষিত হয় এবং ঐ জল আটকাইয়া থাকায় উহা হইতে ম্যালেরিয়া (তখন নাম ছিল বর্দ্ধমানের জ্বর) উদ্ভূত হইয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি করে।

রেলের বাঁধে যে এই সর্ব্বনাশ হয়, তাহা জানা থাকিলেও কেন যে এ দেশে জলনিকাশের উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা না রাখিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহার একমাত্র কারণ এই বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের গভর্ণমেণ্ট লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। নতুবা জনমতের চাপে এইরূপ যথেচ্ছাচার করিবার ক্ষমতা কোন রেল-কর্ত্তৃপক্ষের থাকিতে কুলাইত না। পয়ঃপ্রণালী অথবা সেতুর সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ করিতে হইলে তাহাতে ব্যয়াধিক্য আছে; এ দেশের রেল-কর্ত্তৃপক্ষ সেই ব্যয়টুকু করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্য করাইতে বাধ্য করিবারও কেহ নাই। সুতরাং অনর্থক অধিক ব্যয় করিয়া সেতু ও পয়ঃপ্রণালীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন কি? দেশ প্লাবনে ও ম্যালেরিয়ায় উৎসন্নে গেলে রেল-কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষতি কি?

এই সকল সমস্যার সমাধানার্থই বোধ হয় রিপোর্ট বলিতেছে, —"উত্তর-বঙ্গের প্রধান সমস্যা,—যত শীঘ্র সম্ভব বন্যার জল-নিকাশের ব্যবস্থা করা। জলনিকাশের ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইলেই দেশের উপকার হইবে।"

সুতরাং সরকারের পক্ষে এখন প্রধান কর্ত্তব্য, রেলের বাঁধের উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী ও সেতু নির্ম্মাণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে। উপযুক্ত জলনিকাশ হইয়া গেলে লোক বন্যার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া দূর হইয়া দেশের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। প্রজার মঙ্গলার্থে সরকারের ইহা আশু কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে বিদেশের অভিজ্ঞদের মতামতও বিচার-আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সার উইলিয়াম উইলকক্স মিশরের নীল-নদের আসাউন বাঁধের নক্সা করিয়াছিলেন। জলনিকাশ ও জলসেচ সম্পর্কে এক জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি বাঙ্গালার জলসেচ ও জলনিকাশের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালাদেশকে ম্যালেরিয়া-পীড়িত অথচ জলসেচ দ্বারা সুগঠিত উদ্যানরূপে দেখিব বলিয়া আশা করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমি বাঙ্গালাকে ম্যালেরিয়া-পীড়িত মরুভূমি দেখিয়া হতাশ হইয়াছি।" বাঙ্গালার এই অবস্থা কেন হইয়াছে? এই বাঙ্গালাই ত পূর্ব্বে নদীমাতৃক দেশ ছিল। তবে? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বিদেশী ধনী কোম্পানীরা এ দেশে রেললাইন খুলিতে পাইয়াছে কেবল লাভের দিক দিয়া নিজেদের সুবিধা দেখিয়া, তাহারা দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশের বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করে নাই। ইহার ফলে বহু নদী ভরাট হইয়া গিয়াছে, বহু নদী হাজিয়া-মজিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গের দুরবস্থা এ বিষয়ে সমধিক। এই জন্যই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা আজ "ম্যালেরিয়া-পীড়িত মরুভূমিতে" পরিণত হইয়াছে। তাই সার উইলিয়াম উইলকক্স বলিয়াছেন, "আমি এঞ্জিনীয়ার। জলনিকাশ ও জলসেচের ব্যবস্থা করা ব্যতীত বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া তাড়াইবার উপায় নাই, এ কথা আমি এঞ্জিনিয়াররূপে বলিতে পারি।" কেবল ম্যালেরিয়া কেন? ওলাউঠা বসন্তও যে ইহার জন্য বাঙ্গালা দেশে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। এবার এই বাঙ্গালার "মরুভূমিতে" জলাভাবে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গের অনেক জিলায় লোক পোকা-মাকড়ের মত ওলাউঠায় মরিয়াছে। এমন শুনা গিয়াছে যে, এক বাড়ীর একটি শব দাহ করিয়া ফিরিয়া আসিতে না আসিতে অন্য শব দাহার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এক এক গৃহে ৭।৮টি প্রাণী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। ভদ্র গৃহস্থের পরিবারে নারীর মৃত্যুর সংখ্যাই সমধিক।

এ অবস্থার আশু প্রতীকার করা কি শাসকের কর্ত্তব্য নহে? এখনও গ্রীষ্ম ঋতু দেখা দেয় নাই—এখনই এই অবস্থা। গ্রীষ্মে জলাভাবে কি হইবে? যে রেল-লাইন সার উইলিয়াম উইলকক্সের মতে নদী হাজিয়া-মজিয়া শুকাইয়া যাইবার মূল কারণ, সেই রেল-লাইনের মালিকগণকে জলনিকাশের উপযুক্ত পথ করিয়া দিতে বাধ্য করা কি সরকারের কর্ত্তব্য নহে?

ততক্ষণ সার চার্লসের কৈফিয়ৎ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না।

যাহা হউক, হরতাল যে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, ইহা ধ্রুব সত্য যে, সাইমন কমিশন এ দেশে পদার্পণ করিলে এ দেশের লোক তাঁহাদের প্রতি আপনাদের অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া হরতাল অনুষ্ঠান করিয়াছিল। কিন্তু সার জন সাইমন ইহাতেও হটিবার লোক নহেন। তিনি বড়লাটকে এক পত্র লিখিয়া উহার মারফতে এদেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার ও তাঁহার কমিশনের উদ্দেশ্য সাধু, (যেন এ দেশের লোক তাঁহাদের সাধুতায় কখনও সন্দেহ করিয়াছে)! পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমরা কি ভাবে কার্য্য করিব এবং কি কার্য্য করিব, ইহা লইয়া নানা প্রকার ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য অবস্থাটা খোলসা করিয়া দিতেছি।

"এই দুই মাস সরকারীভাবে কার্য্য করা সম্ভব হইবে না। এখন কেবলমাত্র গোড়াপত্তন করা হইবে। এই জন্য একটি সম্মিলিত বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব করিতেছি, ঐ বৈঠক বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রস্তুত কাগজপত্র পরীক্ষা করিবেন। ঐ বৈঠকে আমাদের ৭ জন ছাড়া ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৭ জন সদস্য থাকিবেন। আমি বৈঠকের সভাপতি হইব। রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং ব্যবস্থা পরিষদ হইতে ৭ জন বে-সরকারী সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক। আমরা যেমন বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি, ভারতীয় সদস্যগণও তেমনই ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।"

কেমন সুন্দর ব্যবস্থা! সম্মিলিত বৈঠক ত হইবে, কিন্তু সাক্ষ্যগ্রহণ ও রিপোর্ট প্রস্তুত ও দাখিল করার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? সার জন পত্রেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"যে স্থল-বিশেষে যুক্ত বৈঠকে সাক্ষ্য লওয়া সম্ভব নহে, সে স্থলে আমরাই কেবল সাক্ষ্য লইব, ভারতীয় সদস্যরা আমার সাধুতায় আস্থা স্থাপন করুন। ইচ্ছা করিলে ভারতীয় সদস্যরা পৃথগ্‌ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" এখানে দেখিতে হইবে, 'স্থল-বিশেষ' কথার অর্থ কি? যুক্ত বৈঠকে একযোগে যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে, সেই সাক্ষ্যের কি নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে, ভারতবাসী তাহা জানিতে পাইবে না। ভারতীয় সদস্যের স্বতন্ত্র সাক্ষ্যগ্রহণেরই বা মূল্য কি?

রিপোর্ট দাখিল করা সম্বন্ধে সার জন পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমরা যাহাদের নিকট দায়ী, তাহাদের (পার্লামেণ্টের) নিকট রিপোর্ট দাখিল করিব, আর ভারতীয় সদস্যরা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের রিপোর্ট আমাদের রিপোর্টের সহিত গাঁথিয়া পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবে পারিবেন।"

এখন কথা এই, এই ধুকড়ীর মধ্যে খাসা চাল কোনটুকু? প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সকল মালমশালার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারেরা কমিশনে দাখিল করিবার নিমিত্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সকল মালমশালা যদি ভারতীয় সদস্যরা দেখিতে না পান, তাহা হইলে কাগজপত্রের মূল্য কি? বিভিন্ন সরকারেরা যে মালমশালাই প্রাপ্ত হউন, তাহা হইতে নিজেদের মনের মত করিয়া যে কাগজপত্র তৈয়ার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা যখন আমদানীর সরকারের স্বার্থের অনুকূল করিয়া গড়া হইয়াছে, তখন উহাতে দেখিবার কিছুই নাই, আসল মালমশালাই দেখিবার জিনিষ। এ সম্বন্ধে এত ঢাক ঢাক কেন, সার জন সাইমন তাহা ত খোলসা করিয়া দেন নাই।

তাহার পর স্থলবিশেষে সাক্ষ্য গ্রহণের পার্থক্যও আছে। সার জন এখানে তাঁহার সাধুতার উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? সাধু কে নহে? লর্ড বার্কেণহেড, মিঃ বলডুইন, সকলেই ত সাধু, তাঁহারাও ত স্পষ্টবাদী। কিন্তু সাধুতা এক জিনিষ, আর প্রকৃত কার্য্য আর এক জিনিষ। যাহাতে ভারতবাসী প্রকৃতরূপে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এমন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার অধিকার সার জন তাঁহাদিগকে দিতে পারেন নাই, দিবার অধিকারও তাঁহার নাই।

গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে কমন্স সভায় কমিশন সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ককালে মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচিত যদি কোনও কমিশনের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট ঐ কমিশনকে তাঁহাদের সকাশে রিপোর্ট দাখিল করিবার অধিকার দিতে পারেন না, সে অধিকার রদও করিতে পারেন না। ঐ কমিশন পার্লামেণ্টের কমিশন নহে, আমরা উহার জন্য দায়ীও নহি। ঐ কমিশনও পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী নহে। সুতরাং ঐ কমিশন পার্লামেণ্টে রিপোর্ট দাখিল করিলেও পারে, না করিলেও পারে। যে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে ঐ কমিশনের সৃষ্টি হইবে, ঐ পরিষদই রিপোর্ট সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার উপভোগ করেন, যেমন আমাদের পার্লামেণ্টারী কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে, অন্য কাহারও নাই।"

এমন সহজ স্পষ্ট কথার পরেও সার জন যে বিষয়ে সম্মিলিত বৈঠকের এবং ভারতীয় কমিশনের পার্লামেণ্টে রিপোর্ট দাখিল করিবার কথা মুখে আনিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। প্রথমতঃ সার জনের এই কমিশন সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই। তাহার পর ঐ কমিশন সৃষ্ট হইলেও তাহার রিপোর্ট প্রয়োজনীয়তা পার্লামেণ্টকে বাধ্য করিয়া গ্রহণ করাইবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। তবে এই সম্মিলিত বৈঠকের আর দিবার মূল্য কি?

মূল্য নাই বলিয়াই দিল্লীতে সমবেত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সার জনের এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর গোড়ার কথা, পার্লামেণ্ট আমাদের ভাগ্য বাঁধিয়া দিবে, এ কথনই ভারতবাসী মাথা পাতিয়া লইবে না। যত বাধা-বিঘ্ন আসুক, সে তাহার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়িয়া লইবে।

[আমাদের ছাত্র-সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রতি এই হরতাল সম্পর্কে এবং অন্যান্য ব্যাপারে স্বয়ং ভাইস-চ্যান্সলার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ষ্টেপলটন যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য

এবার স্থানাভাব। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ মিস্ রাইট এবং রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্পর্কেও অনেক কথা বলিবার আছে। এবার এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বরাজ ও স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালার ছাত্রসমাজে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, এবার তাহার অপেক্ষা অবস্থা আরও সঙ্গীন। সরকারের পুলিস ও পল্টনের সহিত যোগাযোগে ছাত্রগণের স্বাধীন চিন্তা দমনের যে তাণ্ডবলীলা হইয়াছে, তাহাতে সেই সুপ্রীম ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশান অপেক্ষাও গুরুতর রাষ্ট্রীপদ্ধতির চিন্তার সময় আসিয়াছে বলিতে হইবে। সমগ্র জাতির এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।]

জাতির আত্মসম্মান ও কলেজের অধ্যক্ষ

এদেশে ইদরু পিদরু চা-কর নীল-করের ছাতাতঙ্ক জুতা-মারের কথা শুনা যায়, গোরা-বারিকের ধলা সেনানীর সেলাম না-হুজুরদের হাঁটিকটিকিতেও জবরদস্তি কাণ ধরিয়া ঘোড়দৌড় করান কথা শুনা যায়,—কিন্তু কৃতবিদ্য উচ্চশিক্ষিত শ্বেতকায় কলেজ-অধ্যক্ষের এ দেশের জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকাতঙ্কের কথা বোধ হয় এই প্রথম শুনা গেল।

কলিকাতার সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ষ্টেপলটন যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার নাম এদেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে চিরদিন লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই। কলেজের বার্ষিক উৎসবে 'বন্দে মাতরম্' গীত হইয়াছিল, স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয় পতাকার অনুরূপ ত্রিবর্ণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল এবং কলেজ য়ুনিয়নের সম্পাদক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ছিল,—এই বিষম অপরাধে শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ একবারে 'ক্ষেপা' হইয়া উঠিয়া সম্পাদককে তিরস্কার করিয়াছিলেন; সম্পাদকও নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে ঐ তিরস্কার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন নাই,—তিনি অন্যায়ভাবে অপমানিত হইয়াছেন বলিয়া কোনও প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার জাতীয় পতাকার এবং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অধ্যক্ষ অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন এবং য়ুনিয়নের অনাগারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ ষ্টেপলটনের গাত্রচর্ম্ম যে কোমল নহে যে, সম্পাদকের মিষ্ট অথচ ন্যায্য প্রতিবাদে তাহাতে দাগ বসিবে, তিনি বরং আরও অধিক দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানহারা হইয়া তাঁহাকে সাসপেণ্ড করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। এই ব্যাপারে অধ্যক্ষ ষ্টেপলটন এক হিসাবে আপনাকে নিরস্ত্রীকৃত করিয়া রাখিলেন। নাড়াবুনে 'কীর্ত্তনে' হইলে হাতের তালিয়া করতাল গড়িয়া থাকে। মিঃ ষ্টেপলটন শিক্ষা-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সস্তায় নাম কিনিয়া যাইবার অবসর অন্বেষণ করা অস্বাভাবিক হয় নাই, তাই তিনি স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের কাস্তে ভাঙ্গিয়া কলেজের অধ্যক্ষের করতাল গড়াইয়া তাহার আওয়াজে বাঙ্গালার জলস্থল মুখর করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টরী করিলে তথায় অজানা অচেনা থাকিয়াই তাঁহার চাকুরী-জীবনের অবসান হইত, কিন্তু একবারে খাস সহর কলিকাতা—তাহার প্রধান সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—বাপ রে! এমন অবসর কি হেলায় হারান যায়? আদালতের পেয়াদা বা পোষ্ট আফিসের পিয়ন নিজের পদে বসিয়া যতটুকু সম্ভব ক্ষমতা দেখাইয়া যায়, আর এ ত প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল! নাম কি চিরস্মরণীয় থাকিবে না?

আর এক হিসাবেও তিনি সস্তায় নাম বাজাইয়াছেন। এই যে তিনি এক বাঙ্গালী তরুণের জাতীয় আত্মসম্মানে আঘাত দিয়া তাহার সুপ্ত দেশপ্রেমকে জাগাইয়া তুলিলেন, ইহাতে দেশের কত মঙ্গল সাধিত হইল? বাঙ্গালী শিক্ষিত তরুণ যে নির্জ্জীব অকর্ম্মণ্য নহে, সে যে এখন তাহার দেশজননীকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে সে যে তাঁহার জন্য আত্মদান করিতে পারে,—তাহাকে এই প্রবৃত্তির পরিচয় কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রদান করিবার অবসর প্রদান করিয়া মিঃ ষ্টেপলটন নিশ্চিতই স্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

অধ্যক্ষে ও ছাত্রে এই সম্পর্কে যাহা ঘটুক, তাহাতে দেশের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যদি কর্ত্তৃপক্ষের বিচার-বিভ্রাটের যূপ-কাষ্ঠে একটি তরুণ শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়, তাহাতে মনে করা যাইবে যে, মাতৃসেবায় এমন ক্ষতি স্বীকার দুই একটা করিতে হইবেই। কিন্তু ইহার অপেক্ষা বড় কথা আছে। দেশের দিক হইতে—জাতির দিক হইতে এই জাতির আত্ম-সম্মানের অবমাননাকারী অধ্যক্ষকে কিছু বলিবার আছে। তিনি বৃটিশ-জাতীয় বলিয়া নিশ্চিতই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। তিনি যদি কাহাকেও তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত 'God Save the King' অথবা জাতীয় পতাকা 'Union Jack'এর অসম্মান করিতে দেখেন, তাহা হইলে কি করেন? তিনি নিশ্চিতই অবগত আছেন যে, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা জাতির আত্মসম্মানজ্ঞানের প্রতীক। ফরাসী জাতি মার্সেল সঙ্গীতে রণোন্মাদে মাতিয়া উঠে, মার্কিণ জাতি 'Star and Stipes' পতাকা দেখিলে অথবা 'Under the Starspangled Banuer সঙ্গীত শুনিলে তাহারা সম্মানরক্ষার জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। এই কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফরিকা য়ুনিয়নের জাতীয় পতাকা-সমস্যা লইয়া ইংরাজের সহিত দক্ষিণ-আফরিকার যুদ্ধ সংঘটিত হইবারই উপক্রম হইয়াছিল, জেনারল হার্টজগের প্রস্তাবমত যদি য়ুনিয়ান জ্যাকের সঙ্গে দক্ষিণ-আফরিকার নিজস্ব পতাকার সম্মানরক্ষা করা না হইত, তাহা হইলে আবার দক্ষিণ-আফরিকায় যুদ্ধ সংঘঠিত হইত। ফাসোদায় ফরাসী নিজ জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। পাঁচদের ব্যাপার কতকটা এইরূপ; সেখানেও রাসিয়ার পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল বলিয়া ইংরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে আত্ম-সম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন জাতিমাত্রেই নিজের জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য জীবনান্ত পণ করে। ভারতবর্ষ কি একাই বিপরীত-দৃষ্টান্ত

রিপোর্টে উত্তর-বঙ্গের প্রজাবর্গকেও সতর্ক করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে উত্তর-বঙ্গের প্রজারা নাবাল জলা বা বিল-ভূমি হইতে উঠিয়া উচ্চভূমিতে বাস করে, তাহা করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ত মুখের কথা নহে। দীনবন্ধু লিখিয়াছিলেন, "ভাই, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা?" বস্তুতঃ পিতৃ-পিতামহের আবাসগৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করিতে যাওয়া দরিদ্র প্রজার পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এ বিষয়েও সরকারের সাহায্য প্রয়োজন। সরকার এ বিষয়ে প্রজাদিগকে শিক্ষা দিন এবং তাহাদের বাস-পরিবর্ত্তনে সহায়তা করুন। কেবল ইহাই নহে, উচ্চভূমিতে আসিয়া বসবাসের পর তথায় কিরূপে চাষবাস করা সুবিধাজনক, তাহাও প্রজাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। অন্যথা কৃষিজীবী প্রজা কিরূপে ফসল রক্ষা করিবে? ফসল না হইলেই বা দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে কিরূপে? কেবল নিম্নভূমি হইতে উচ্চভূমিতে বাস উঠাইয়া লইয়া গেলেই ত হইবে না।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, বন্যার পূর্ব্বে লোককে বিপদের সম্ভাবনা জানাইলে লোক পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে। এ জন্য উত্তর-বঙ্গের নানা স্থানে বৃষ্টিপাত-পরিমাপক যন্ত্র রাখিতে হইবে। নদীর জলের হ্রাসবৃদ্ধির এবং বৃষ্টিপাতের হ্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে নানা স্থানে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটা রীতিমত হিসাব রাখিয়া যাইতে হইবে।

এইরূপ আরও অনেক উপদেশ ও পরামর্শের কথা রিপোর্টে আছে। এ সকল পরামর্শ দেশবাসীর পক্ষে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সরকারও যদি পরামর্শমত কার্য্যপথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উত্তর-বঙ্গ ভবিষ্যতে বন্যাভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষও নিবারিত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সময় থাকিতে বারিপাতের আধিক্যের কথা অথবা নদীর জলবৃদ্ধির কথা তারযোগে সর্ব্বত্র লোককে জানাইতে পারেন সরকার। পূর্ব্বাহ্নে নৌকা আদি যোগাইবার বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে সরকারের পুলিস ও চৌকীদার;—সেই ব্যবস্থার ফলে বন্যার ভীষণতার পূর্ব্বেই বিপন্ন প্রজারা যথাসাধ্য সম্পত্তি ও গো-ধন লইয়া অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে পারে।

আসল কথা, মনের ইচ্ছা। সরকার যদি যথার্থই প্রজার মঙ্গলের জন্য অবহিত হয়েন, তাহা হইলে এ সকল রিপোর্টের উপদেশেরও প্রয়োজন হয় না। যখন রেল-লাইন নির্ম্মিত হয়, তখন সরকার কি রেল-কর্ত্তৃপক্ষকে রেল-বাঁধের জন্য উপযুক্ত-সংখ্যক সেতু ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন না? উত্তর-বঙ্গের রেলপথ (পূর্ব্ববঙ্গ-রেলের একাংশ) ত সরকারী লাইন। এ পথে তবে সেতু ও পয়ঃপ্রণালীর এত অভাব হইয়াছিল কেন?

ভারতই অপরাধী

ভারত সরকারের সাধারণ স্বাস্থ্য-তত্ত্বাবধায়ক কর্ণেল গ্রেহাম এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, পীতজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগ ভারতবর্ষই পৃথিবীতে সংক্রামিত করিবার মূল কারণ; সুতরাং স্বাস্থ্য-সম্পর্কে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির নিকট ঘোর অপরাধী।" তিনি বলেন, "এই সকল সংক্রামক ব্যাধির সহিত কেবল ভারতবাসীর সম্বন্ধ আছে, ইহা নহে, প্রত্যুত পৃথিবীর সকল দেশের সহিত ইহার সংস্রব রহিয়াছে। কারণ, ভারতবর্ষ এখন আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে বহু জাতির সহিত সম্বদ্ধ। এই হেতু ভারতের স্বাস্থ্যের অবস্থার প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিবর্গে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। অতএব ভারতবর্ষ নিজের জন্য যত না হউক, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত বাণিজ্যাদি সম্বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে প্রতীকার-পরায়ণ হইবার চেষ্টা করুক, অন্যথা তাঁহাদের হস্ত হইতে স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে। পরন্তু ভারত যদি নিজের স্বাস্থ্য-হানির ও রোগাক্রমণের প্রতীকার না করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ভারতে আর তাঁহাদের বাণিজ্য-পোতাদি প্রেরণ করিবেন না। তাঁহারা বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-বন্দরের স্বাস্থ্যের অবস্থা অবগত হইতে এতদূর আগ্রহান্বিত যে, প্রতি শনিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে এই হেতু এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আফরিকা প্রভৃতি দেশের ১ শত ৩৭টি বন্দরের স্বাস্থ্যের অবস্থা সিঙ্গাপুর হইতে অন্যত্র প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্য হইতে যেন মিস্ মেয়োর মত এক নর্দ্দামা-পরীক্ষকের নর্দ্দামা ঘাঁটার বোঁটকা গন্ধই বহির্গত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত ভারত-হিতৈষীর কথা ইহা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ভারতের অর্থে পুষ্ট কর্ণেল গ্রেহাম ভারতের ঘাড়েই যত রোগের বোঝা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না, বলিতেন না যে, ভারতবর্ষই যত রোগের আকর আর ভারতবর্ষই জগৎময় যত সংক্রামক রোগ ছড়াইয়া থাকে!

বস্তুতঃ রোগ সকল সময়ে সকল দেশেই আছে। তবে কোথাও কম, কোথাও বা বেশী। শীতপ্রধান দেশের যে সকল রোগ 'স্বধর্ম্ম', তাহার প্রকোপ ঐ সকল দেশেই হইয়া থাকে। ফুসফুসের রোগ, (যেমন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) ঐ সকল দেশে অত্যধিক হইয়া থাকে, এই হেতু বাণিজ্য বা অন্য কোন সূত্রে শীতপ্রধান দেশের সহিত যদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সম্বন্ধ ঘটে, তাহা হইলে শীতপ্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ভাবের সংক্রামক রোগ আহরণ করে। চর্ম্মরোগ শীতের দেশেরই রোগ, উহার মধ্যে যেগুলি সংক্রামক, তাহাও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সংক্রমিত হইতে পারে। ফেরঙ্গ রোগ বা উপদংশ বিদেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমদানী হইয়াছিল বলিয়াই উহার নাম 'ফেরঙ্গ', ইহা অনেকের বিশ্বাস। এই রোগ কি সর্ব্বনাশকর নহে? প্লেগের নাম এ দেশ কখনও শুনে নাই, অথচ এই প্লেগে, ব্ল্যাক-ফিভারে যুরোপ কতবার উৎসন্ন গিয়াছে। তাহা বলিয়া আমরা কখনও অস্বীকার করি না যে, আমাদের দেশে প্লেগের মত মারীভয় হয় নাই। দ্বারকায় হইয়াছিল কিরূপে? পথে পথে ও ঘরে ঘরে মৃত মূষিকের স্তূপ ঐ সম্পর্কে পুরাণে পাওয়া যায়। এ দেশেও বিসূচিকা ছিল আছে, তবে কলেরা কথা বিদেশের আমদানী। ম্যালেরিয়া

যায়ই; তবে এ দেশের মত মারাত্মক রোগ বিদেশের ম্যালেরিয়া-কলেরা নহে।

আসল কথা, ভারতে সংক্রামক রোগ বিদ্যমান আছে, এ কথা সত্য, তবে ভারতবর্ষ যে সমস্ত সংক্রামক রোগের উৎপত্তি-স্থান, তাহা মস্ত পণ্ডিত বলিলেও ভারতবাসী স্বীকার করিবে না। বরং ভারতবাসী প্রমাণ করিতে পারে যে, প্লেগ, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, স্প্রিপিং-সিকনেস প্রভৃতি ভীষণ রোগ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। যক্ষ্মা এ দেশে রাজরোগ নামে প্রসিদ্ধ, ইহা কচিৎ দরিদ্রের ঘরে হইত। কিন্তু বিলাতে এই রোগ পূর্ব্বে ঘরে ঘরে ছিল বলিয়া শুনা যায়। নিউমোনিয়ায় একটা ফুসফুস নষ্ট হইয়াও মানুষ বিলাতে বাঁচিয়া থাকে বলিয়া শুনা যাইত। পূর্ব্বে এ সকল ভীষণ রোগ য়ুরোপেরই একচেটিয়া ছিল। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধারণ জ্বরই হইত, কচিৎ সান্নিপাতিক রোগ দেখা দিত। এখন ত ঘরে ঘরে টাইফয়েড, টাইফাস! এ সব কি বাণিজ্যাদি সূত্রে এ দেশে আমদানী হয় নাই? প্লেগ এ দেশে প্রথমে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জাও তাহাই। ঐ বন্দরেই প্রতীচ্যের মালের সঙ্গে এই ভাবের ভীষণ দুরারোগ্য রোগ আমদানী হইয়া থাকে। প্লেগ কলিকাতার কপালীটোলায় প্রথম ধরা পড়ে বটে, কিন্তু উহা যে প্রথম বোম্বাই দিয়া প্রবল আকারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, (বিউবনিক) প্লেগ চীনদেশের আমদানী, চীনদেশ হইতে প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। যাহাই হউক, উহা যে এই যুগে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমাদের ধারণা, সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা নূতন রোগের উৎপত্তি হইতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার লীলাভূমি পাশ্চাত্য দেশসমূহ। সেই সকল দেশে কৃত্রিম উপায়েও রোগের সৃষ্টি করা হয়। গত জার্ম্মাণ-যুদ্ধে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষের (শত্রুর দেহের) মধ্যে জীবাণু ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। তবে য়ুরোপে যেমন কৃত্রিম উপায়ে নানা রোগের সৃষ্টি করা হইতেছে, তেমনই বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগ ধ্বংস করিবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীকে স্বতন্ত্রীকরণ (Segregation) ইহার মধ্যে একটি। তাহার পর নানা বাছাই প্রণালী (Elimination) দ্বারা রোগ নির্ণয় এবং জীবাণু-নাশক Injection প্রক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা রোগনাশের পরীক্ষা চলিতেছে। এ সকল ব্যাপারে বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে। সে সকল দেশের স্বাধীন সরকার সে বিষয়ে প্রভূত অর্থ-সাহায্য করেন, বৈজ্ঞানিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সামান্য একটু জন্ম-মৃত্যুর হারে আশঙ্কার কারণ ঘটিলে রাজ্য তোলপাড় করিয়া ফেলেন। ইটালীর ক্যাম্পানা-অঞ্চলে কিরূপ অর্থব্যয় করিয়া জল-নিকাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তজ্জন্য বহুকালের ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ পানামা খাল খননকালে ঐ অঞ্চলের ভীষণ ম্যালেরিয়া কিরূপে দূর করিয়াছিলেন, তাহাও অনেকে জানেন।

আমাদের এ দেশ দরিদ্র। দারিদ্র্য যে অনেক দুরারোগ্য রোগের জনক এবং সহায়ক, তাহা জগতে সুবিদিত। এ দেশের ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি যে দারিদ্র্যহেতু দুশ্চিকিৎস্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। একে দেশের লোক দরিদ্র বলিয়া উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর আহার্য্য অভাবে রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহার উপর দারিদ্র্যহেতু রোগ তাড়াইবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই—নিষ্কৃতি তাহারা পাইবে কিসে? এ সকল বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার একমাত্র প্রবল শক্তিশালী সরকার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অন্যের দ্বারা নহে, এ কথা কি কর্ণেল গ্রেহাম জানেন না? কিন্তু সেই সরকার দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার অজুহতে পুলিস ও পল্টনে রাজস্বের প্রায় সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেছেন, এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহকে জাতিরক্ষা ও গঠনমূলক কার্য্য (যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতিকল্পে) নির্ব্বাহ করা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। এ অবস্থায় ভারতবাসী সংক্রামক রোগ তাড়াইবার কি উপায় নির্দ্ধারণ করিবে?

—

বঙ্গীয় জনহিতসাধনমণ্ডলী

কলিকাতার ৭০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে উক্ত মণ্ডলীর প্রদর্শনী উদ্বোধিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনী বাঙ্গালা দেশে অভিনব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যত প্রকারে যত দিক দিয়া বাঙ্গালী সমাজের অসংখ্য অভাব ও অভিযোগের নিরাকরণ হইতে পারে, এই প্রদর্শনীতে চিত্র, মূর্ত্তি, হিসাব, ছায়াচিত্র ইত্যাদি সাহায্যে তাহা বিশদরূপে দর্শকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। পুরুষ ও নারী দর্শনার্থীর জন্য স্বতন্ত্র দিবসের ব্যবস্থা আছে। আমরা বাঙ্গালীমাত্রকেই এই সাধু প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনী দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি। ইহাতে একটি পয়সা ব্যয় নাই, বিনাব্যয়ে এমন উপদেশপ্রদ মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনী দেখিয়া আসিবার সুযোগ বাঙ্গালী কখনও হারাইবেন না, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

মাত্র কয়েক জন উদ্যোগী পুরুষের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি অতি সামান্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমান বর্দ্ধিত আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে,—ইহাদের মধ্যে ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সম্পাদক। ইনি এবং ইহার সহকারীরা প্রদর্শনীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকিয়া জনসাধারণকে জনহিতসাধনের সকল দিক বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী,—সকলের পক্ষেই ইহা অবারিতদ্বার এবং শিক্ষাস্থল, সকলেই ইহা দর্শন করিয়া আপনার সমাজের ব্যথা বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। জাতির সমবেত চেষ্টায় সমাজের গলদ দূর হয়। কিন্তু সে চেষ্টা আসিবে কোথা হইতে? জাতি নিজের অবস্থা নিজে জানে না, কিন্তু একবার প্রত্যক্ষ দেখিলে তাহার প্রাণ নিশ্চিতই কাঁদিয়া উঠিবে, তখন প্রতীকার-চেষ্টাও তাহার মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে।

এই আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তৃবর্গ প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই জনহিতসাধনমণ্ডলী



ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এত দিন পরে প্রতিষ্ঠাতৃগণের মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ইহাও এই বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কেন না, এখানে সাধারণের হিতার্থে কোন অনুষ্ঠান দেখা দিলেও তাহাতে লোকের দৃষ্টি সম্যক্ আকৃষ্ট হয় না।

যাহা হউক, উদ্যোক্তৃবর্গের চেষ্টায় এই প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতিক উন্নতিসাধন, গ্রাম-গঠন, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে চিত্রাদি সাহায্যে লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অশিক্ষিতা অপরিচ্ছন্না গ্রাম্য-'দাই' ও শিক্ষিত গৃহস্থনারীর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রসূতি ও শিশু-পরিচর্য্যায় নিযুক্তা আবশ্যক যন্ত্রাদির সাহায্যপ্রাপ্তা ধাত্রীর মধ্যে প্রভেদ, আদর্শ গোপালকের গোপরিচর্য্যা ও গোশালা এবং নিরক্ষর লোভী গোয়ালার গোশালা ও গোপালনের মধ্যে প্রভেদ, আদর্শ গ্রামের পথ-ঘাট, বিদ্যালয়, ব্যায়ামক্ষেত্র, মন্দির, চিকিৎসালয় এবং রোগগ্রস্ত আশাহত দূষিত পুষ্করিণীর জলপায়ী জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার বাঙ্গালীর গ্রামের ভগ্ন জীর্ণ অস্বাস্থ্যকর কুটীর, কর্দ্দমাক্ত পথঘাট পাট-পচান দূষিত পুষ্করিণীর মধ্যে প্রভেদ, ভীরু কাপুরুষ গ্রামবাসীর সম্মুখে নির্য্যাতিতা নারীর এবং সুস্থ সবল সাহসী বাঙ্গালীর গ্রামের হাস্যাননা নির্ভয়ে বিচরণশীলা নারীর মধ্যে প্রভেদ, বরপণগ্রাহী চামার বাঙ্গালী এবং নারীর মর্য্যাদারক্ষাকারী বাঙ্গালীর মধ্যে প্রভেদ, ব্যায়ামে অত্যন্ত মুক্ত আলোক ও বায়ুসেবী বাঙ্গালীর এবং অলস নেশাখোর ব্যসনাসক্ত অকর্ম্মণ্য রোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রভেদ,—এইরূপ নানা-বিষয় চিত্রমূর্ত্তি আদির সাহায্যে এমন সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে যে, অতি অজ্ঞ নিরক্ষর লোকও সামান্য চেষ্টায় উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেহের মধ্যে নানা জীবাণু কি ভাবে ভীষণ শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, অথচ কত সহজ উপায়ে আমরা উহাদিগকে পরাস্ত ও নিহত করিতে পারি, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক উৎকৃষ্ট প্রথায় হলচালনা এবং ফসলোৎপাদন, ব্যবসায় ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সামান্য চেষ্টায় অল্প মূলধনে চঞ্চলাকে নিজগৃহে অচলা করিবার উপায়, কোমলমতি শিক্ষার্থীকে সহজ উপায়ে নিজের দেশ জাতি ইতিহাস ইত্যাদির বিষয়ে শিক্ষাদানের উপায়, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের আর্থিক, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয়, সমাজ-সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য অবস্থা কিরূপ তাহার আলোচনা,—এই প্রদর্শনীতে এমন অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ফল কথা, ইহাতে বাঙ্গালীর দেখিবার, শিখিবার, ভাবিবার অনেক জিনিষ আছে। তাই আশা হয়, এই দেশ-প্রেমের বন্যার যুগে বাঙ্গালী হেলায় এই সুযোগ হারাইবে না।

সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী ৫ই ও ৬ই ফাল্গুন দিবসদ্বয়ে ১৪৩।১ অপার সার্কুলার রোডস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে ২৪ পরগণা সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। সাহিত্য-সুহৃদ্ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির পদে বৃত হইয়াছেন। আরও আনন্দের কথা যে, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ সাহিত্যিক 'বসুমতী'র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার সংবাদপত্র-জগতে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ সাহিত্যিক আমরা খুঁজিয়া পাই না। আশা আছে, আমরা তাঁহার নিকট বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনেক পুরাতন কথা শুনিতে পাইব।

দিক্‌পালের তিরোধান

বাঙ্গালার গৌরবের যুগে যে কয় জন দিক্‌পাল দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় গত ১৩ই মাঘ শুক্রবার ৺কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। বরিশালে যেমন অশ্বিনীকুমার, চট্টগ্রামে যেমন যাত্রামোহন, ফরিদপুরে যেমন মথিকাচরণ, ঢাকায় যেমন আনন্দচন্দ্র, বহরমপুরে যেমন বৈকুণ্ঠনাথ,—ময়মনসিংহে তেমনই অনাথবন্ধু বাঙ্গালার অন্যতম দিক্‌পাল। বরিশাল বলিতে যেমন এখনও অশ্বিনীকুমার এবং অশ্বিনীকুমার বলিতে এখনও যেমন বরিশাল বুঝায়, ময়মনসিংহ বলিতে তেমনই এখনও অনাথবন্ধুকে বুঝায়। যদিও তাঁহাদের কর্ম্ম-জীবনের বহুদিন পূর্ব্বে অবসান হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের

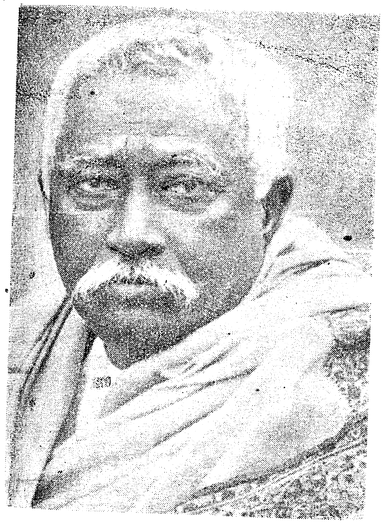

অনাথবন্ধু গুহ

নামের মাহাত্ম্য বাঙ্গালার এক এক দিকে এখনও প্রভাব বিস্তার করিতেছে। দিন এমন ছিল, যখন এই সকল দিক্‌পালের মুখের একটি কথায় বাঙ্গালার এক একটা দিক্ উঠিত বসিত! এমন মানুষের মত মানুষ জাতির ভাগ্যে দুই একটি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং যদিও অনাথবন্ধু পরিণত বয়সে (৮৩ বৎসর) হিন্দুর পরমবাঞ্ছিত কাশীর মত পবিত্র তীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি আজ তাঁহার অভাব বাঙ্গালাদেশ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছে। যদিও তিনি বহুদিন রাজনীতির কর্ম্ম-কোলাহল হইতে—সংসারের ধূলিমলিন কার্য্যক্ষেত্র হইতে আপনাকে সংযত করিয়া নীরবে পরপারের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তথাপি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে একবারে পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই।

অনাথবন্ধু দরিদ্র পিতার সন্তান ছিলেন; কিন্তু নিজের মেধা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও অন্যান্য চরিত্রগুণে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, "লোকে যারে নাহি ভুলে, সেই ধন্য নরকুলের" দশ জনের এক জন হইয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার বেলতা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় গুহের পুত্র—তাঁহার পিতা এত দরিদ্র ছিলেন যে, পুত্রের শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিধাতা যাঁহাকে বড় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভা-উন্মেষের অন্তরায় দূর হইয়া যায়। বালক অনাথবন্ধু ১০ বৎসর বয়সে পদব্রজে বেলতা গ্রাম হইতে ময়মনসিংহ সহরে গমন করিয়াছিলেন এবং এক সদাশয় মোক্তারের গৃহে পাচকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। প্রশংসার সহিত ২০৲ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়া কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

অতঃপর ময়মনসিংহে তাঁহার উকীল-জীবন আরম্ভ হয়। উহাতে তিনি প্রভূত যশঃ ও অর্থ লাভ করিয়া গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্ব ময়মনসিংহে ত স্বীকৃত হইয়াছিলই, পরন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার দেশপ্রেমের কথা এবং বুদ্ধি-বিবেচনা ও নেতৃত্বের কথা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কালে এমন দিন উপস্থিত হইয়াছিল যে, সমগ্র বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য নেতার সহিত সমান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ জাতির কর্ত্তব্যপথ নির্ণয়ে গৃহীত হইত।

কংগ্রেসের তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের সহায়তায় ময়মনসিংহে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ও প্রভাব সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ময়মনসিংহের বহু শক্তিশালী জমীদারের পরামর্শদাতা উকীল ছিলেন। তাহারই ফলে বহু জমীদার কংগ্রেসের হিতকামী হইয়াছিলেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকালে উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যে এবং দেশের কল্যাণকামনায় অনাথবন্ধু অনেক অর্থ-সাহায্যও করিয়াছিলেন।

স্বদেশী ও বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনের যুগে অনাথবন্ধু কায়মনে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—সে জন্য রাজরোষের ভয়ে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। ফুলারী রাজনীতির কল্যাণে যখন এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুর বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, তখন অনাথবন্ধু তরুণ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়া হিন্দুর ইজ্জৎ ও ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

অনাথবন্ধু যখন উকীল হইয়াছিলেন, তখন ওকালতী করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতমিত্র' নামে এক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহাই এক্ষণে 'চারুমিহির' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ময়মনসিংহে তিনি তাঁহার পিতার নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং পত্নীর নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেলতা গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ও তাঁহার

কীর্ত্তির পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত বারাণসীর রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে তাঁহার দানের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষ দোষ-গুণে জড়িত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অনাথবন্ধু যে এই সাধারণ নিয়মের অতীত ছিলেন, এমন কথা কেহ বলিবে না। তবে তুলনায় তাঁহার সদ্‌গুণরাশি এত অধিক যে, দোষের ভাগ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এমন একটি বাঙ্গালী আবার বঙ্গভূমি কবে অঙ্কে ধারণ করিবেন, তাহা বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

শোক-সংবাদ

এবার আমাদিগকে একাধিক শোক-সংবাদ দিতে হইতেছে, এ জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

(১) প্রথমেই উদীয়মান যুবক সাহিত্যিক হরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। গত ২৯শে পৌষ হরেন্দ্রকৃষ্ণ অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে আসিয়া নিজের সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জননীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁহাকে কিরূপ ব্যথিত ও আহত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দুর্ব্বল হৃদয়ে তিনি সেই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়াই অকালে অন্তর্হিত হইয়াছেন। হরেন্দ্রকৃষ্ণ ময়মনসিংহ জিলার মুগা গ্রামনিবাসী। সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বি, এ, উপাধিলাভের পর তিনি 'ওয়েলফেয়ার' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালাবধি যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। ঐ মাসিকে তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি বাঙ্গালার মাসিক পত্রসমূহে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। নারীজাতির উন্নতির বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই রচিত। তাঁহার রচনায় চিন্তাশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট। মাত্র ৩১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এমন উদীয়মান সাহিত্যিকের অকাল-মৃত্যু নিশ্চিতই শোচনীয়।



ডালচাঁদ সিংঘী

(২) বাগবাজার 'লক্ষ্মী-নিবাসের' প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় সাহিত্যিক ও জনসেবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিণত বয়সে যে পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। তাঁহার পুত্র কালীকৃষ্ণ দুরন্ত টাইফয়েড রোগে গত আশ্বিন মাসে তাঁহাকে এবং তাহার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছে। দত্ত-পরিবার শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের অনুরক্ত ভক্ত। কালীকৃষ্ণেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। এদিকে সাংসারিক জীবনে সে অল্পবয়সেই পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল। কালীকৃষ্ণের ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরক্তি, দেবদ্বিজে ভক্তি, জীবে প্রেম, দরিদ্র-নারায়ণে দয়ামমতা অসাধারণ ছিল। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল।

(৩) মাদারীপুর মহকুমার খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব রেবতী-মোহন ঘোষ মহাশয় গত পৌষ মাসে ৫৭ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি মাদারীপুর ও ফরিদপুরের যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি এতদঞ্চলের এক জন অক্লান্তকর্ম্মা কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। মাদারীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁহার প্রাণপাত পরিশ্রম ছিল। তাঁহার কৃতী পুত্রগণ দেশীয় ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া পিতার পন্থা অনুসরণ করিতেছেন, ইহা মঙ্গলের কথা।

(৪) আজিমগঞ্জের ব্যবসায়ী ধনী ডালচাঁদ সিংঘী ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সাধারণ মধ্যবিত্ত অবস্থা হইতে শ্রম, অধ্যবসায় ও আগ্রহ-উৎসাহের গুণে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া ইনি পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং এই সামান্য সূত্র ধরিয়া নানা দিকে নানা কার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে সাধুতা তাঁহার উন্নতির মূল সোপান বলিয়া শুনা যায়। ডালচাঁদ অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও সামান্য সাদাসিধা ভাবে জীবনযাপন করিতেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। "চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে" তাঁহার ১০ সহস্র মুদ্রা দান তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। কাশীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়, যোধপুর বালিকা-বিদ্যালয়, জিয়াগঞ্জ হাঁসপাতাল প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠানে তাঁহার দানের কথাও উল্লেখযোগ্য।

দ্রষ্টব্য :—"ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন কীর্ত্তি-নিদর্শন" প্রবন্ধের চিত্রাবলীর নাম মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। আগামী সংখ্যায় সংশোধিত নামগুলি প্রকাশিত হইবে। এবার সূচীপত্রে নামগুলি সংশোধিত হইল। মাঃ বঃ সঃ।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী 'রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


মাসিক বসুমতী

৬ষ্ঠ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৪ [৫ম সংখ্যা

কবি রাজশেখর

৩

[illegible]লোকের কবিত্ব-শক্তি ও শিক্ষানৈপুণ্য বিষয়ে রাজ-[illegible]রের মত কিরূপ উদার ছিল, তাহা তাঁহারই উক্তির দ্বারা [illegible] বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন :—

"পুরুষবৎ যোষিতোঽপি কবী ভবেয়ুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি [illegible]। ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে। শ্রূয়ন্তে [illegible] রাজপুত্র্যো মহামাত্যদুহিতরো গণিকাঃ কৌতুকি-[illegible] শাস্ত্রপ্রতিবুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ।"

পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকরাও কবি হইতে পারেন, [illegible] আত্মার ধর্ম্ম, তাহা স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্বরূপ বিভাগকে [illegible] করে না। শুনা যায় এবং দেখিতেও পাওয়া যায় যে, বহু [illegible], মন্ত্রিদুহিতা, গণিকা ও কৌতুকিগণের। বিদূষক নট [illegible] ভার্য্যাগণ শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া [illegible], এবং তাঁহারা কবিও হইয়া থাকেন।

[illegible] রচনা বিষয়ে প্রতিবন্ধক কি কি, তাহা দেখাইতে [illegible] রাজশেখর বলিয়াছেন :—

"দারিদ্র্যং ব্যসনাসক্তিরবজ্ঞা মন্দভাগ্যতা।
দুষ্টে দ্বিষ্টে চ বিশ্বাসঃ পঞ্চ কাব্যমহাপদঃ।"

অর্থাৎ দারিদ্র্য, দ্যূতক্রীড়া বা মদ্যপানাদি ব্যসনে আসক্তি, অবজ্ঞা অর্থাৎ গুণবান্ ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা, মন্দভাগ্যতা এবং দুষ্ট ও দ্বিষ্ট অর্থাৎ শত্রুর প্রতি বিশ্বাস—এই পাঁচটি হইতেছে কাব্যের পক্ষে মহাবিপত্তি।

গ্রন্থ বা কাব্য রচিত হইয়াও অনেক সময় প্রচারিত হয় না, লোক-সমাজে আদৃতও হয় না। তাহার কারণ কি, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রাজশেখর যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনেকের পক্ষে ভাবিবার যোগ্য।

"পুনঃ সমাপয়িষ্যামি, পুনঃ সংস্কারয়িষ্যামি, সুহৃদ্ভিঃ সহ বিবেচয়িষ্যামীতি কর্ত্তুরাকুলতা রাষ্ট্রোপপ্লবশ্চ প্রবন্ধবিনাশ-কারণানি।"

গ্রন্থ একবার শেষ করিয়াও তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে আবার দেখিয়া শুনিয়া ভাল করিয়া শেষ করিব এবং ইহার উৎকর্ষবিধান করিব, সুহৃদ্‌গণের সহিত এ বিষয়ে ভাল করিয়া বিচার করিব, এই ভাবে গ্রন্থকর্ত্তার যে আকুলতা, তাহা এবং রাষ্ট্রবিপ্লব কাব্যপ্রবন্ধের বিনাশের হেতু হইয়া থাকে।

এক আধটি শ্লোক অনেকেই রচনা করিতে পারেন। কতকগুলি

শ্লোক লিখিয়া অনেকে বাহাদুরী লইতে পারেন ; কিন্তু এক সময়ে এক জাতির মধ্যে মহাপ্রবন্ধ বা মহাকাব্য রচনায় সমর্থ কবি এক জন বা দুই জনই হইয়া থাকেন। তিন জন হইয়াছেন, ইহা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাই ছিল রাজশেখরের মত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"মুক্তকে কবয়োঽনন্তাঃ সংঘাতে কবয়ঃ শতম্।
মহাপ্রবন্ধে তু কবিরেকো দ্বৌ দুর্লভাস্ত্রয়ঃ॥"

কবিগণকে লইয়া রাজার কিরূপ সমাদর করা উচিত, কিরূপ সভায় বসিয়া রাজা কবিগণের সহিত কাব্যগোষ্ঠী করিবেন, সেই বিষয়ে রাজশেখর যাহা বলিতেছেন, তাহাও শুনিবার ও ভাবিবার যোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"রাজা কবিঃ কবিসমাজং বিদধীত।
রাজনি কবৌ সর্ব্বো লোকঃ কবিঃ স্যাৎ।
স কাব্যপরীক্ষায়ৈ সভাং কারয়েৎ।"

রাজা স্বয়ং কবি হইয়া কবিসমাজের গঠন করিবেন। কারণ, রাজা যদি কবি হন, তাহা হইলে সে রাজ্যের প্রায় সকল লোকই কবি হইতে পারিবে। কবি রাজা কাব্য-পরীক্ষার জন্য সভা নির্ম্মাণ করিবেন, কিরূপ সভা হইবে, তাহার পরিচয়প্রসঙ্গে রাজশেখর বলিতেছেন—

"সা ষোড়শভিঃ স্তম্ভৈশ্চতুর্ভির্দ্বারৈরষ্টাভির্মত্তবারণাভি-রুপেতা স্যাৎ তদনুলগ্নং রাজ্ঞঃ কেলিগৃহম্। মধ্যেসভং চতুঃ-স্তম্ভান্তরা হস্তমাত্রোৎসেধা সমণিভূমিকা বেদিকা। তস্যাং রাজাসনম্। তস্য চোত্তরতঃ সংস্কৃতাঃ কবয়ো নিবিশেরন্, বহুভাষাকবিত্বে যো যত্রাধিকং প্রবীণঃ স তেন ব্যপ-দিশ্যতে। যস্ত্বনেকত্র প্রবীণঃ স সংক্রম্য তত্র তত্রোপ-বিশেৎ। ততঃ পরং বেদবিদ্যাবিদঃ, প্রামাণিকাঃ, পৌরা-ণিকাঃ, স্মার্ত্তা, ভিষজো, মৌহূর্ত্তিকা, অন্যেঽপি তথাবিধাঃ। পূর্ব্বেণ প্রাকৃতাঃ কবয়ঃ, ততঃ পরং নট-নর্ত্তক-গায়ক-বাদক-বাগ্‌জীবন-কুশীলবতালাবচরা অন্যেঽপি তথাবিধাঃ। পশ্চিমে-নাপভ্রংশিনঃ কবয়ঃ। ততঃ পরং মিত্রলেপ্যকৃতো মাণিক্য-বন্ধকা বৈকটিকাঃ স্বর্ণকার-বর্দ্ধকি-লৌহকারা অন্যেঽপি তথাবিধাঃ। দক্ষিণতো ভূতভাষাকবয়ঃ, ততঃ পরং ভুজঙ্গ-গণিকাঃ, বল্লক-শৌভিক-জম্ভকমল্লাঃ শস্ত্রোপজীবিনোঽন্যেপি তথাবিধাঃ।"

সেই সভায় ষোলটি স্তম্ভ থাকিবে, চারিদিকে চারিটি দ্বার থাকিবে। উপরে আটটি চূড়া হইবে। সেই সভাগৃহের সহিত সংলগ্ন রাজার জন্য একটি ক্রীড়াগৃহ থাকিবে। সভার মধ্যস্থলে একটি মণিময় বেদিকা নির্ম্মিত হইবে, তাহা এক হস্ত পরিমাণে উচ্চ হইবে এবং সেই মণিবেদিকার চারি-দিকে চারিটি স্তম্ভ থাকিবে। সেই মণিময় বেদীর উপর রাজার বসিবার জন্য আসন থাকিবে। রাজসিংহাসনের উত্তরদিকে সংস্কৃতভাষার কবিগণ উপবেশন করিবেন। এক জন লোক যদি বহু ভাষাতে কবিত্বসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে যে ভাষাতে তাঁহার অধিক প্রবীণতা আছে, তিনি সেই ভাষার কবি বলিয়া পরিগৃহীত হইবেন, আর যদি এক ব্যক্তির অনেক ভাষাতেই কবিত্ববিষয়ে প্রবীণতা থাকে, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছানুসারে তত্তদ্‌ভাষার কবিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিবার অধিকারী হইবেন। সংস্কৃতভাষার কবিগণের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহার উত্তরে বেদবিদ্যাবিৎ, প্রমাণশাস্ত্রজ্ঞ, পৌরাণিক, স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ, চিকিৎসক ও গণক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উপবেশন করিবেন। রাজসিংহাসনের পূর্ব্বদিকে প্রাকৃত কবি-গণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রাকৃত কবিগণের পূর্ব্বভাগে নট, নর্ত্তক, গায়ক, বাদ্যবাদক, বাগ্‌জীবী, কুশীলব, তালজ্ঞ প্রভৃতি তত্তৎকলাবিদ্‌গণ উপবেশন করিবেন। রাজসিংহাসনের পশ্চিমভাগে অপভ্রংশ ভাষার কবিগণ উপ-বেশন করিবেন। তাঁহাদিগের পশ্চিমে চিত্রকর, লেখকগণ, মাণিক্যাদি গ্রহণকারিগণ ও মণিমাণিক্যবিক্রয়জীবী, স্বর্ণকার, সূত্রধর ও লৌহকার প্রভৃতি উপবেশন করিবেন। এইরূপ রাজসিংহাসনের দক্ষিণভাগে ভূত বা পৈশাচিক ভাষার কবিগণ উপবেশন করিবেন। তাঁহাদিগের দক্ষিণভাগে ভুজঙ্গ অর্থাৎ বিটজাতীয়, বেশ্যা, সন্তরণদক্ষ, শৌভিক, (রাজসভা-গৃহ প্রভৃতি উৎসবাদিতে সাজান যাহাদিগের কর্ম্ম, তাহারা), জম্ভক (সাহসিক), মল্ল (যাহারা কুস্তি লড়িয়া থাকে) এবং শস্ত্রোপজীবী প্রভৃতিগণ উপবেশন করিবেন।

এইরূপ সভাগৃহে বসিয়া কিরূপে রাজা কাব্যগোষ্ঠীর প্রবর্ত্তন করিবেন, তদ্‌বিষয়ে রজেশেখর কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক—

"তত্র যথাসুখমাসীনঃ কাব্যগোষ্ঠীং প্রবর্ত্তয়েৎ, ভাবয়েৎ পরীক্ষেত চ। বাসুদেব-সাতবাহন-শূদ্রক-সাহসাঙ্কাদীন্ সকলান্ সভাপতীন্ দানমানাভ্যামনুকুর্য্যাৎ। তুষ্টপুষ্টাশ্চাস্য সভ্যা ভবেয়ুঃ স্থানে চ পারিতোষিকং লভেরন্। লোকোত্তরস্য কাব্যস্য যথার্হা পূজা কবের্বা। অন্তরান্তরা চ কাব্যগোষ্ঠীং

শাস্ত্রবাদাননুজ্ঞা... মধ্বপি নানবদংশং স্বদতে। কাব্যশাস্ত্র-বিরতৌ বিজ্ঞানির্ঘভিরমেত। দেশান্তরাগতানাং চ বিদুষামন্য-দ্বারা সঙ্গং কারয়েদৌচিত্যাদ্ যাবৎ স্থিতিঃ পূজাং চ। বৃত্তিকামাংশ্চোপজপেৎ সংগৃহ্ণীয়াচ্চ। পুরুষরত্নানামেক এব রাজোদন্বান্ ভাজনম্। রাজচরিতং চ রাজোপজীবিনোঽপ্যনু-কুর্য্যুঃ। রাজ্ঞ এব হ্যসাবুপকারো যদ্ রাজোপজীবিনাং সংস্কারঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—সেই সভাগৃহে আরামের সহিত বসিয়া রাজা কাব্যগোষ্ঠীর প্রবর্ত্তন করিবেন, স্বয়ং কাব্যরসের আস্বাদন করিবেন এবং কাব্যসমূহের পরীক্ষা করিবেন। উপযুক্ত কবিকে অনুরূপ দান ও সম্মানের দ্বারা প্রাচীন বাসুদেব, সাতবাহন, শূদ্রক ও সাহসাঙ্ক প্রভৃতি কবি-সম্মানকারী নরপতিগণের চরিত্রের অনুকরণ করিবেন। সেই সভার সভ্যগণ যাহাতে তুষ্ট ও পুষ্ট হয়েন, সেরূপ ব্যবস্থা রাজা করিবেন, সেই সকল সভ্যগণও অবসরমত পারিতোষিক লাভ করেন, এরূপ ব্যবস্থাও রাজা করিবেন। সেই কাব্য-গোষ্ঠীতে যে কাব্য অসাধারণ বলিয়া নির্ণীত হইবে, সেই কাব্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাজা সেই কাব্যের রচয়িতা কবির উপযুক্ত সৎকার করিবেন। কাব্য-গোষ্ঠী যাহাতে একঘেয়ে হইয়া বিরক্তিকর না হয়, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে অন্যান্য শাস্ত্রবিষয়ক বিচারও সেই সভায় রাজা করাইবেন। নিরবচ্ছিন্ন আস্বাদ্যমান হইলে মধুও লোকের রুচিকর হয় না। কাব্যও শাস্ত্রের প্রসঙ্গবিরত হইলে শিল্প-বিজ্ঞানাদি বিষয়ে বিশেষদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া তত্তদ্‌বিষয়ে আলাপ করিয়া রাজা প্রীতি লাভ করিবেন। দেশান্তর হইতে সমাগত পণ্ডিতগণকে পরিচিত লোকের দ্বারা আহ্বান করাইয়া রাজা আলাপ করিবেন এবং আলাপের পর যাহার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হইবে, সেই ভাবে সেই পণ্ডিতগণের রাজধানীতে অবস্থানের ব্যবস্থা করিবেন এবং যথোপযুক্ত সম্মান-পূজাদি করিবেন। রাজার নিকট হইতে বৃত্তিলাভ করিয়া যাহারা সেই স্থানে বাস করিতে চাহেন, এই-রূপ পণ্ডিতগণকে বৃত্তিদানাদি দ্বারা বশীভূত করিবেন। কারণ, সমুদ্র যেরূপ রত্নসমূহের অসাধারণ আশ্রয় হয়, রাজাও সেইরূপ পুরুষরত্নগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন। রাজার উপজীবিগণও যেন এইরূপ রাজার চরিত্রের অনুকরণ করেন, রাজোপ-জীবিগণের এই ভাবে সংস্কার ও শিক্ষার দ্বারা প্রকৃতভাবে রাজাই উপকৃত হইয়া থাকেন।

কেবল রাজধানীতেই এই প্রকার কাব্যশাস্ত্রাদির আলো-চনার জন্য সভা-নির্ম্মাণাদি করাইয়াই যে রাজা কৃতকৃত্য হইবেন, তাহা নহে ; কিন্তু—

"মহানগরেষু চ কাব্যশাস্ত্রপরীক্ষার্থ-ব্রহ্মসভাঃ কারয়েৎ। তত্র পরীক্ষোত্তীর্ণানাং ব্রহ্মরথযানং পট্টবন্ধশ্চ।"

নিজ রাজ্যের অন্তর্গত প্রধান প্রধান নগরীতেও এই ভাবে কাব্যশাস্ত্রের পরীক্ষার জন্য রাজা সভা নির্ম্মাণ করাইবেন। এইরূপ সভাকে ব্রহ্মসভা কহে। সেই সভাতে পরীক্ষা দিয়া যাহারা উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার-স্বরূপে ব্রহ্মরথ নামক যান রাজা অর্পণ করিবেন এবং তাঁহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণতাসূচক পট্টবন্ধ (পাগড়ী বা বস্ত্র) প্রদান করিবেন।

ইহার পর রাজশেখর বলিতেছেন যে, কবিগণের এইরূপ পরীক্ষার কথা তিনি যে কল্পনা করিয়াই লিখিতেছেন, তাহা নহে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এই কবিপরীক্ষাপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—

শ্রূয়তে চোজ্জয়িন্যাং কাব্যকারপরীক্ষা। "ইহ কালিদাস-মেণ্ঠাবত্রামররূপসূরভারবয়ঃ। হরিচন্দ্র-চন্দ্রগুপ্তৌ পরীক্ষিতা-বিহ বিশালায়াম্।" শ্রূয়তে চ পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকারপরীক্ষা। "অত্রোপবর্ষবর্ষাবিহ পাণিনি-পিঙ্গলাবিহ ব্যাভিঃ। বররুচি-পতঞ্জলী ইহ পরীক্ষিতাঃ খ্যাতিমুপজগ্মুঃ॥"

ইত্থং সভাপতির্ভূত্বা যঃ কাব্যানি পরীক্ষতে।
যশস্তস্য জগদ্ব্যাপি স সুখী তত্র তত্র চ॥"

শুনিতে পাওয়া যায় যে, উজ্জয়িনীতেও এই প্রকার কবি-পরীক্ষা হইত। কারণ, এখনও উজ্জয়িনীতে লোকমুখে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই স্থানে কালিদাস ও মেণ্ঠ নামক দুই জন কবি পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইখানে অমর, রূপ, সূর ও ভারবি নামক কবির পরীক্ষা হইয়াছিল আর উজ্জয়িনীর এইখানে, হরিচন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত নামে দুই জন কবির পরীক্ষা হইয়াছিল। উজ্জয়িনীতে যে প্রকার কবিপরীক্ষা হইত, সেইরূপ পাটলিপুত্রেও শাস্ত্রকারগণের পরীক্ষা হইত, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ, পাটলিপুত্র-বিষয়েও এই প্রকার কিংবদন্তী লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এইখানে উপবর্ষ ও বর্ষ পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইখানে পাণিনি ও পিঙ্গলের পরীক্ষা হইয়াছিল, এই স্থানে ব্যাভির পরীক্ষা হইয়া-ছিল, এইখানে বররুচি ও পতঞ্জলি পরীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এবং ইঁহারা সকলেই এই এই স্থানে পরীক্ষিত হইয়া শাস্ত্রকার-রূপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

এইভাবে সভাপতি হইয়া যে রাজা কাব্যশাস্ত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার যশ জগদ্‌ব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি সকল স্থানে সুখী হইয়া থাকেন।

কবি রাজশেখর উজ্জয়িনীতে যে কয় জন কবির পরীক্ষার কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কালিদাস, অমর ও ভারবি আমাদিগের সুপরিচিত, কিন্তু মেণ্ঠ, রূপ ও সুর, হরিচন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত এই কয় জনের রে। এখনও পাই নাই। রাজশেখরের সম নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদিগের রচিত প্রচলিত ছিল, এরূপ সম্ভাবনাও করা যায়; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদিগের প্রণীত কোনও কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

[ক্রমশঃ

(মহামহোপাধ্যায়) শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

প্রেম

১

এ ধরাপথ দীর্ঘ দারুণ, শ্রান্তি কে তার সইত ?
ঘাড়-ভাঙা ভার-বোঝার বালাই কার তরে কে বইত ?
থাকতে বিশাল মুক্ত উদার
পুলিন, ভূধর, কানন কেদার,
লোকালয়ের কূপের আঁধার-মাঝে কে হায় রইত ?

২

বলোদ্ধতের পীড়ন-জ্বালা সইত কে হায় মুখ বুজে ?
মরত কে এই মর্ত্যলোকের ব্যর্থ লাভের পথ খুঁজে ?
সমাজপীড়ন, রাজার শাসন
হাজার গণ্ডী হাজার বাঁধন,
তার মাঝারে থাকত কে হায় ভেকের মত ঘাড় গুঁজে ?

৩

ফুটিল হে প্রেম, তোমার টানে সকল পঙ্ক পঙ্কজে।
পায়ের তলের নূ-কঙ্কালে হলো হাতের শঙ্খ যে।
বিষ হারিয়ে ব্যথার ফণী
আঁধার ঘরে জ্বালায় মণি,
রনের কাঁটা পড়ল ঢাকা লজ্জাবতীর সঙ্কোচে।

৪

কর্ম্মপীড়ার ঘর্ম্মে, হরি-চন্দনে আজ স্নান করি,
বৈতরণীর কূলে ব'য়েও গঙ্গা-বারিই পান করি।
দৈন্যশরের শয্যা মম
বাসর-ঘরের শয্যাসম,
ভগ্ন শানাই উঠল বেজে আজ শাহানার তান ধরি'।

৫

হে প্রেম, তুমি কংস-কারায় করলে মোরে সংসারী,
হাড়-পাঁজরের চামড়া-তারে তুল্লে কি সুর ঝঙ্কারি' ?
জল দিয়েছ শুষ্ক মুখে,
বল দিয়েছ রুগ্ন বুকে,
পথের দাহ দূর করেছ শীতল ছায়া সঞ্চারি'।

(ভাবলেখক) শ্রীকালিদাস



ত্রিবেণী

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন রাজবন্ধুত্ব-গর্ব্বে গর্ব্বস্ফীতবক্ষে নিজের আবাসভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, মহামাত্যের পত্র লইয়া তাঁহার প্রেরিত লোক তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। মহামাত্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে অবিলম্বে সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া বিশেষভাবেই আহ্বান করিয়াছেন।

মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া অস্ফুট গর্জ্জনে উচ্চারণ করিলেন,—"উৎসন্ন যাক্ ঐ বিট্‌লে বামুন ব্যাটা! ভেবেছিলেম, বড় বেঁচে গেছি! না; এ বাম্টাদের খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করা দেখছি সোজা নয়! একে ব্রাহ্মণ, তাতে হিন্দু! সোনায় সোহাগা!"—তাহার পর নিরুপায়ে অগত্যাই গুনশ্চ অশ্বারোহণে বাহির হইতে হইল। সঙ্গে চলিল মহারাজাধিরাজের নির্দ্দেশানুমোদিত সেই এক শত সশস্ত্র নাসির সেনা।

বাসুদেবভট্ট কোষাধ্যক্ষঘটিত সকল কথা জানাইয়া অবশেষে কহিলেন, "আমার মনে হয়, রাজ্যের এই বিশৃঙ্খলার দিনে সাহীলের মত এক জন উচ্চপদস্থ লোককে বিনা বিচারে সহসা বন্দী করা এবং তার সম্পত্তি অধিকার করা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক ভ্রম হচ্ছে। সাহীলের বিরুদ্ধে এর পূর্ব্বে এমন কোন প্রমাণ কোন দিনই পাওয়া যায় নি, যাতে ক'রে নিঃসংশয়িত হ'তে পারা যায় যে, তিনি রাজকোষ লুণ্ঠন করেছেন।"

রুদ্রদমন কহিলেন, "তা হ'লে তাঁকে বন্দী করা হচ্ছে কেন? না করলেই ত ফুরিয়ে যায়!"

মহামাত্য কহিলেন, "উপায় কি? রাজার আদেশ।"

মহাপ্রতীহার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন রাজাকে নিবৃত্ত করলেন না?"

মহামাত্য হতাশকান্ত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "চেষ্টা কি আর করি নি, ভাবছেন? তিনি যদি বুঝালে বুঝতেন, তা হ'লে আর ভাবনা কি? আমি এখন এই কথাটাই ভাবছি যে, সাহীল যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হ'ত, তা হ'লে তাকে বন্দী করতে আমি এতটা ভয় পেতাম না, কিন্তু সে কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তদের মধ্যে একতাটা আমাদের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের চেয়ে অনেক বেশী। ওদের মধ্যে এক জনের সম্বন্ধে সামান্য অত্যাচার হলেও ওরা ক্ষেপে উঠে, হিতাহিতজ্ঞান হারায়! আর আমাদের সমস্ত নৌ-বাহিনীই ঐ কৈবর্ত্তদের হাতে। তা ছাড়া মহাক্ষপটলিক প্রভৃতিও সাহীলের আত্মীয়।"

রুদ্রদমন কিছু বিমনাভাবে প্রশ্ন করিলেন, "এ সব কথাও বলেছিলেন?"

বাসুদেব কহিলেন, "সমস্ত।"

"মত বদলায় নি?"

"না।"

"তবে আর উপায় কি?"

রুদ্রদমন কহিলেন, "আদেশপত্র আছে?"

মহামাত্য দুঃখিতচিত্তে নীরবে আদেশপত্র দিলেন।

"এই রাত্রিতেই বন্দী করবার আদেশ যে দেখছি!"

মহামাত্য মাথা হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, পরে ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু এর পরিণাম—"

"অশুভ হওয়াই সম্ভব! তবে উপায় কি? আমরা আজ্ঞাবাহী দাসমাত্র।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মহামাত্য আরম্ভ করিলেন, "আপনাকে স্নেহ করেন, আপনি যদি একবার অনুরোধ জানিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, হয় ত—"

মহাপ্রতীহার সবেগে বাধা দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওঃ, না না, সে অসম্ভব! আমায় স্নেহ করেন! হাঁ, তা করেন বটে! কিন্তু কেন করেন? আমার কাছ থেকে অণুমাত্র বাধা পান না বলেই না? স্নেহ ত আমায় করেন না, আমার বাধ্যতাকেই করেন, এ ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে তাঁর কার্য্যের প্রতিবাদকে তিনি অধিকতর অপরাধস্বরূপেই গ্রহণ করবেন, আর তার সামান্য প্রমাণ আমি এই কতক্ষণ-মাত্রই পেয়ে আসছি।"

"তবে আর উপায় কি ?"

"কিছু না, রাজ-আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য !"

"পাল-সাম্রাজ্যকে জগদীশ্বর রক্ষা করুন।"

মহাপ্রতীহার রাজার স্বহস্ত-লিখিত আদেশপত্র লইয়া দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ডেকে দেখুন, ইচ্ছে হলেই পারতে পারেন। আপনাদের তিনি ত সহস্রবাহু, সহস্রশীর্ষ এবং সহস্রাক্ষ। এক-হাজারটা শক্তিমান পুরুষ আর কতকগুলা নাগরিককে পরাস্ত করতে পারবে না ? বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় ত আর আমরা করছি না।"

কোষাধ্যক্ষ সাহীল সাম্রাজ্যের মধ্যে এক জন ধনী এবং সৌখীন ব্যক্তি, তাঁহার বাসগৃহ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও ভৃত্যে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। পানভোজন, নৃত্যগীত সকল সময়েই সে গৃহকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়া রাখিত। যত্র আয় তত্র ব্যয় বলিয়া যে কথাটা আছে, ইঁহার সম্বন্ধে সেটা সম্পূর্ণই খাটিয়া যায় !

সে রাত্রিতেও সে গৃহে উৎসবের বাতি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। পানভোজনে সুপরিতৃপ্ত অতিথিবর্গ প্রমোদনিরত রহিয়াছিল। যন্ত্রালাপ ও কণ্ঠসঙ্গীতের মধুর আরাবে গৃহপথ মুখরিত। সহসা সেই রঙ্গভূমে বিনা মেঘে অশনিসম্পাত তুল্য সসৈন্য মহাপ্রতীহারের অপ্রত্যাশিত আগমন বিঘোষিত হইল। শশব্যস্তে সাহীল উঠিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরেই মহাপ্রতীহারকে অভ্যর্থনা করিলেন, "আজ আমার এ অতর্কিত সৌভাগ্যের কারণ কি, ভট্টারকপাদীয় মহা-প্রতীহার মহাশয় ?"

মহাপ্রতীহার অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "রাজার আদেশে আমি আপনাকে বন্দী করলেম, কোষাধ্যক্ষ !"

কোষাধ্যক্ষের উত্তেজিত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, "বন্দী করলেন, আমাকে ? রাজার আদেশে ? কৈ, কোথায় রাজার আদেশ ?"

"এই দেখুন"—বলিয়া মহাপ্রতীহার বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া রাজার স্বহস্তলিখিত আদেশলিপি প্রদর্শন করিলেন।

কোষাধ্যক্ষ সাহীল উহা দেখিয়াই রাজহস্তলিপি চিনিতে পারিলেন।

"আমার অপরাধ কি, মহাপ্রতীহার ?"

মহাপ্রতীহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "এতেই লেখা আছে, এই দেখুন, রাজকোষ লুণ্ঠন !"

কোষাধ্যক্ষের আরক্ত মুখ শবশুভ্র হইয়া গেল। তিনি স্খলিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ ?"

রুদ্রদমন কহিলেন, "আমি ত বিচারক নই, সাহীল! প্রমাণ-প্রয়োগ উপস্থাপিত করা হবে ধর্ম্মাধিকরণে।"

সাহীল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই বিকৃত হাস্য একটা অস্বাভাবিক অশুভ ছন্দে কক্ষভূমির প্রত্যেক কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়া আঘাত করিল, গৃহমধ্যস্থ আকস্মিক রসভঙ্গে উন্মনা জনমণ্ডলীর উৎপ্রেক্ষিত বক্ষতলে সভয় শিহরণ আনিয়া দিল।

"বিচারক !—বিচারক কি এ সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে আর বেঁচে আছে মহাপ্রতীহার ? বিচারক কোথায় ?"

"কোষাধ্যক্ষ সাহীল !"

সাহীল পুনশ্চ সেইরূপ মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিলেন, "'মরার আবার খাঁড়ার ভয়' কি মহাপ্রতীহার ? আমি ত মরেই গিয়েছি। তবে আর নিঃশব্দে মুখ বুজে মরবো কেন ? বলি, আমার বিচার হবে ত তাঁরই কাছে, যাঁর কাছে মহাবলাধিকৃত ও মহাসামন্ত মহাকুমারদ্বয়ের বিচার হয়েছিল, যিনি পালসম্রাটদের বংশগত মহামাত্যের উপযুক্ত পুত্র অমাত্য বোধিদেবকে সুবিচার করেছিলেন, নিজের উপভুক্তা প্রেয়সী নর্ত্তকীকে স্বহস্তে যিনি বধ করেছেন, গরীব চাষাদের হল-লাঙ্গলে যিনি কর বসিয়েছেন, রাজ-অত্যাচারের প্রতিবিধান চাইতে যাওয়ায় সমস্ত জনপ্রতিনিধি প্রধানবর্গের বিনা বিচারে নির্ব্বাসন এবং মুণ্ডচ্ছেদ যাঁর প্রকাশ্য কীর্ত্তি ! তার পর—তার পর—সমস্ত ভদ্রাভদ্র-ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকল প্রজার গৃহবধূ ও কন্যাগণকে—"

"সাহীল ! সাহীল !"

প্রবল উত্তেজনা-প্রমত্ত সাহীল এই দুর্ব্বল প্রতিবাদচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করিয়া তীব্রবিদ্ধ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হাঁ, সমস্ত প্রজাসাধারণের গৃহবধূগণকে নিজের পাপ-সম্ভোগের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করা যাঁর সাধারণ ধর্ম্ম, নারীর সতীত্ব যাঁর চক্ষুতে উপহাসের বস্তু, অশ্রদ্ধার বিষয়, সেই চরিত্রহীন—"

"সা—হীল ! এ সব রাজদ্রোহ !"

আবার সেই উন্মত্ত ঝটিকা-গর্জ্জনবৎ হাস্যধ্বনিতে উৎকর্ণ গৃহাভ্যন্তরস্থ অতিথি এবং আত্মীয়বর্গ চমকিয়া উঠিল।

"মহাপ্রতীহার ! রাজদ্রোহী আমি নই, ইচ্ছা করলে এখনই আমি রাজাদেশ প্রত্যাখ্যান ক'রে আত্মরক্ষা করতে পারি, কিন্তু তাতে আমার স্পৃহা নেই। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্যই হোক।"

মহাপ্রতীহারের ইঙ্গিতে দুই জন সৈনিক কোষাধ্যক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

"এক মুহূর্ত্ত, কুমার ! একবার আমার নিমন্ত্রিতদের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে দিতে আজ্ঞে হোক।"

মহাপ্রতীহার দ্বার রোধ করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "অসম্ভব !"

শান্তস্বরে সাহীল কহিলেন, "অসম্ভব ? তবে কায নেই, চল্লুম যাই।"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া মহাপ্রতীহার কহিলেন, "যাবার আগে আর একটি অপ্রিয় কার্য্য আমায় সম্পন্ন ক'রে যেতে হবে। আদেশপত্রে লেখাই আছে, দেখেছেন বোধ হয়, আপনার সম্পত্তি রাজকোষে প্রত্যর্পিত করবার নির্দ্দেশ রয়েছে !"

একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মৃদুহাস্যমাত্র সাহীলের বিবর্ণ মুখে একটি নিমেষের জন্য ঈষৎ অনুরঞ্জিত করিয়াই পর-মুহূর্ত্তে তাহাকে সমধিক বিবর্ণতর করিয়া অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া গেল। তিনি নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "তাই হোক, কিন্তু অনু-সন্ধানের সময়টায় আমায় সঙ্গে রাখবেন, তাতে আপনাদের অনুসন্ধানের সুবিধাই হবে, অবশ্য বন্দিভাবে।"

মহাপ্রতীহার ইঁহাকে এতটাই সহজে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন, এ আশাই করিতে পারেন নাই, তাই ইঁহার এই নিম্নবাধ্যতায় পরিতুষ্ট ও তাঁহার দৃঢ় আত্মসংযমে সহানুভূতি-পূর্ণ হইয়া কহিলেন, "আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা আপনার অতিথিদের মধ্য দিয়ে ভিতরে যেতে ইচ্ছা করি না। অন্য পথ নেই ?"

"আসুন" বলিয়া সাহীল মহাপ্রতীহারের অগ্রবর্ত্তী হইতেই মহাপ্রতীহার দ্রুত নিকটে আসিয়া কহিলেন, "ক্ষমা করবেন !"

রক্ষিদ্বয় আসিয়া সাহীলের দুই হাত ধরিল। তিনি কিছুই বলিলেন না বা বাধাও দিলেন না।

অন্তঃপুরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সাহীল ডাকিলেন, "সুদেষ্ণা !"

এক জন বর্ষীয়সী রমণী কোন একটা ঘরের মধ্য হইতে তাঁহার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে ডাকিয়া বলিল, "ছোটবৌ পান সাজছে, বড়বৌকে ডেকে দেবো কি ?"

সাহীল বলিলেন, "দু'জনকেই ডেকে দাও, দিদিমা, শীঘ্র আসতে বল, আর ব'লে দিও, সমস্ত চাবি যেন সঙ্গে আনে।"

অনতিবিলম্বে দুই জন নারী এক সঙ্গে কোন একটা ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দালান পার হইয়া উঠান অতি-ক্রম করিয়া খিড়কির দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। দুই জনই যুবতী, দুই জনই সুন্দরী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠা নবীনা, ষোড়শী এবং অপূর্ব্বদর্শনা রূপসী। জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "কৈ, কোথায় তোর বর লো, ছুঁড়ি ?"

কনিষ্ঠা সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল, "ও মা গো ! দিদি যেন কি ! ও বুঝি শুধু আমার একলারই বর ? তোমার নয় বুঝি ?"

জ্যেষ্ঠাও হাসিয়া কি প্রত্যুত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারসন্নিহিত হইয়া সাহীল ডাকিলেন, "তিলোত্তমা ! সুদেষ্ণা !"

সুদেষ্ণা ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সপত্নীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই নাও চাবি, কিন্তু এ কি ! এ কারা ? তুমি বন্দী ?"

বন্দী গৃহস্বামী দ্বারের নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসি-লেন—"আমি বন্দী, কি অপরাধে ? আমি রাজকোষ লুণ্ঠন করেছি, তাই রাজা আজ আমায় লুণ্ঠন ক'রে তার শোধ তুল-বেন। শোন তিলোত্তমা ! তুমি বড়, তোমার উপরেই আমি সমস্ত ভার দিয়ে গেলেম। আমার অন্তঃপুরিকারা যেন রাজ-সৈন্যের দ্বারা অবমানিতা না হয়, আর আমাদের সমস্ত গুপ্তগৃহ, পেটিকা প্রভৃতি যাতে এই রাজপ্রতিনিধি মশাই অনুসন্ধান ক'রে দেখতে সমর্থ হন, তার যথোচিত ব্যবস্থা তোমার ভাই যুধিষ্ঠিরকে ডেকে করিয়ে দাও। তার পর ? তার পর আর কি ? আমাদের শিশু দুটিকে নিয়ে ভ্রাতৃগৃহেই নিবাস করো। নৈবল-ব্যাপৃতক যুধিষ্ঠির তার অনাথা ভগিনী ও ভাগিনেয়দের নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন।"

তিলোত্তমার ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট রব নির্গত হইয়া গেল, সে দ্রুতবেগে স্বামীর দিকে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু অপরিচিত পুরুষদলের মধ্যে অদম্য আগ্রহসত্ত্বেও সে তাহার স্বামীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। সর্ব্বশরীরে কম্পিত

হইয়া আর্ত্তনাদের মতই সে উচ্চারণ করিল,—"তুমি চোর! নিজের সর্ব্বস্ব নির্ব্বিচারে সকলকে বিলিয়ে দিচ্ছ ব'লে আজ যার গৃহ মুক্তাশূন্য প্রবালের মত শূন্যগর্ভ, সে রাজকোষ লুণ্ঠন করেছে! এত বড় অবিচার! এর কি কোন প্রতিবিধান নেই?"

সাহীলের রক্তশূন্য অধরে আবার সেই তীব্র জ্বালাময় উপহাসের হাসি এবার অতি মৃদুভাবেই ফুটিয়া উঠিল! হাসিবার শক্তিও বোধ করি তাঁহার এইবার ফুরাইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন,—"প্রতিবিধান? তিলোত্তমা! তুমি মেয়েমানুষ ব'লেই এমন প্রশ্ন করতে পারলে, এ রাজ্যের কোন পুরুষমানুষেই এমন সন্দেহ করতো না। যাক্, মিথ্যা সময় নষ্ট নিষ্প্রয়োজন, ভিতরে যাও, দিদিমা আর সকলকে নিয়ে ছাদের উপর গিয়ে চিলে কুঠরীতে নিজেদের বন্ধ ক'রে রাখ গে, এঁরা অনুসন্ধান ক'রে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলে নেমে এস। আর আমার কিছু বলবার নেই।"

তিলোত্তমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে দাসী, আত্মীয়া ও আশ্রিতারা শশব্যস্তে গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। সকলেরই ত্রস্তগতি এবং সন্দেহশঙ্কিত মুখভাব!

তিলোত্তমা ফিরিয়া গেলে অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া সুদেষ্ণা আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সৈনিকের হস্তধৃত উজ্জ্বল মশালের আলো তাহার মুখের উপর পতিত হইতেই সাহীলের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী মহাপ্রতীহার যেন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে হইল, সহসা ঘন মেঘজালমধ্য হইতে পূর্ণায়ত পূর্ণিমার চাঁদ বুঝি বাহির হইয়া আসিল। এতক্ষণ পরে সাহীলের প্রতি একটা প্রবল অনুকম্পার ভাবও তাঁহার চিত্তে উদিত হইল। আহা, বেচারা সাহীল! এমন অপ্সরাতুল্যা পত্নীকে অনাথা অভাগা করিয়া তাহাকে যাইতে হইবে!

সুদেষ্ণার সেই অদ্ভুত সুন্দর মুখের উপর একটিও ভাবের রেখা পরিবর্ত্তিত হইল না। স্থির-শান্ত সেই মুখখানি সমুজ্জ্বল তীব্র আলোকে উন্নমিত করিয়া সে রমণী অতি সহজকণ্ঠেই কথা কহিল,—"আমায় ত তুমি কিছুই ব'লে গেলে না?"

"তোমাকে!" বলিয়া সাহীল ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিল, বোধ করি, মনের ভিতর সহসা উচ্ছ্বসিত একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত দেখা দিয়াছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় তার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে কতকটা সময় লাগিল। তা যাই হউক, ফলে কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াই তিনি কথা কহিলেন। স্নেহপূর্ণ অথচ গাম্ভীর্য্যময় কণ্ঠে ধীরে ধীরে সাহীল কহিলেন, "তোমায় বেশী কিছু বলবার মত নেই, সুদেষ্ণা! শুধু আমার একটি জিনিষ তোমায় দিয়ে যাবার আছে। একটু দাঁড়াও।"

সাহীল মহাপ্রতীহারের দিকে ফিরিলেন, "আপনাকে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, একবারের জন্য প্রহরীরা যদি আমার হাত ছেড়ে দেয়—"

রুদ্রদমন সৈনিকদের ইঙ্গিত করিলে তাহারা তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিল। তখন মহাপ্রতীহার কহিলেন, "আমারও আপনাকে কিছু বলবার আছে, যদি উপদেশ নেন, একটু স'রে এলে বলতে পারি।"

সাহীল সুদেষ্ণাকে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া মহাপ্রতীহারের সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

"আদেশ করুন।"

মহাপ্রতীহার একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তাহার পর জোর করিয়াই যেন মনের মধ্য হইতে সঙ্কোচের জড়তাটাকে দূর করিয়া দিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোষাধ্যক্ষ সাহীল! আপনি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকতে চান, মুক্তি কি আপনার এখনকার প্রধান কাম্য নয়?"

সাহীল বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন, প্রথমতঃ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না, পরে সচেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কে না বাঁচতে চায়, মুক্তি কার না কামনার বস্তু মহাপ্রতীহার?"

মহাপ্রতীহার বলিলেন, "আপনি ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রাণ, মান এবং সম্পদ সমস্তই রক্ষিত হ'তে পারে। অবশ্য তার জন্য সামান্য একটা ত্যাগ করতে হবে।"

সাহীলের বক্ষ গভীর আগ্রহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, রুদ্ধশ্বাসে আরক্ত মুখে তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "কুমার রুদ্রদমন! আপনি মহৎ! আপনার মনে দয়া আছে! আদেশ করুন, কি করলে আমি এ মহা বিপদ হ'তে মুক্ত হয়ে আজীবন আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারি। আমার পক্ষে অসাধ্য না হ'লে আমি আপনার উপদেশ নিশ্চয়ই গ্রহণ করব এবং জানবো, আপনিই দীনবন্ধু!"

মহাপ্রতীহার একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, "কোষাধ্যক্ষ! চাণক্য শাস্ত্রটা ত জানা আছে? তাতে তিনি বলেছেন, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি'—এটা শুনেছ ত? আমাদের রাজাধিরাজ এই দুটি জিনিষকেই সমানভাবে গ্রহণ করতে ভালবাসেন, ধন যদি পর্য্যাপ্ত সত্যই তোমার না থাকে, ঐ সুদেষ্ণা নামের বউটিকে তুমি রাজার কাছে পাঠিয়ে দাও, এখনই সমস্ত বিপদ তোমার কেটে যাবে। চাই কি—উঃ, রাক্ষস! পাষণ্ড! তোর ভাল করতে গেলেম—তার এই ফল? প্রহরী! হতভাগাকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেল!"

মহাপ্রতীহারের অমূল্য উপদেশবাণীর সমস্তটুকু সমাপ্তির ধৈর্য্য পর্য্যন্ত না রাখিয়াই কোষাধ্যক্ষ উহার প্রস্তাবমাত্র শুনিয়াই আহত সিংহের মত গর্জ্জিয়া নিমেষমধ্যে তাঁহার পার্শ্ব-বিলম্বিত কৃপাণ মুক্ত করিয়া মহাপ্রতীহারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অতর্কিততায় তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া তাহা মহাপ্রতীহারের বাম বাহুমূলে লঘুভাবেই বিদ্ধ হইয়াছিল মাত্র।

পরমুহূর্ত্তে অসংখ্য সৈনিক আসিয়া সাহীলকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিল। তখন উন্মত্ত সাহীল তরবারি ঘুরাইয়া তাহাদের মধ্যের দুই তিন জনকে ধরাশায়ী করিলেন, তাহার পর সেমেই ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া এই অতর্কিত বিপদে হতবুদ্ধিপ্রায় বীতসংজ্ঞা সুদেষ্ণার বক্ষে প্রচণ্ডবেগে মাদুল তরবারি বসাইয়া দিয়া প্রলয়াগ্নিশিখার মতই চণ্ড হাস্য করিয়া কহিলেন, "সুদেষ্ণা! সুদেষ্ণা! এই আমার তোমাকে শেষ দান! নারীর সতীত্বকে যে অসভ্য বর্ব্বররা খেলার জিনিষ মনে করে, পণ্যের বিষয় বোধ করে, তারা নিজের ঘরের অসতীদের নিয়ে সে খেলা খেলুক, ব্যবসায় করুক, জগতে নরের সাধুতার এবং নারীর সতীত্বের মূল্য বাস্তবিকই তুচ্ছ নয়। আসুন মহাপ্রতীহার! এইবার জল্লাদের খড়্গতলে নিকট পূতিগন্ধময় মশানক্ষেত্রে অনায়াসে কোষাধ্যক্ষ সাহীল তার এই অনাবশ্যক অন্ধকার জীবন নিশ্চিন্ত আনন্দের সঙ্গেই সঁপে দিতে পারবে। বিদায়! চিরবিদায় সুদেষ্ণা! চিরবিদায় সুখনিকেতন! চিরবিদায় বন্ধুবর্গ!"

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

রাত্রির অন্ধকারে যাহা রহস্যময় ও ভয়াবহ বোধ হয়, দিনের আলো তাহাকে সুপরিস্ফুট ও সহজ করিয়া তোলে,

দিবালোকের মধ্যে এই শক্তি আমরা অনেকবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবও গত রাত্রির অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয় ঘটনার সঙ্ঘাতে যেরূপ বিহ্বল ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাত্রিশেষে সুপরিচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বলতর দিবারম্ভের প্রথমেই সে সমস্তকে যেন একটা ক্লেশকর দুঃস্বপ্নের মতই অনুভব করিলেন এবং উহার দিক্ হইতে মন ফিরাইয়া লইয়া নিজের চিরাভ্যস্ত পথেই গা ভাসাইয়া দিলেন। রাজকীয় প্রাসাদ-উদ্যানে অনেকগুলি পালিত পশু-পক্ষী রাজার চিত্তবিনোদন জন্য রক্ষিত ছিল। উহাদের জন্য লতাকুঞ্জ, কাষ্ঠময় ক্ষুদ্র গৃহ, কৃত্রিম নির্ঝরযুক্ত গণ্ড-শৈল এবং পদ্ম-কুমুদ-খচিত দিব্য সরোবর সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। মহীপালদেব প্রভাতে উঠিয়া ইহাদের মধ্যেই নিজের স্নান করিয়া লইয়াছিলেন। বাঘ, ভল্লুক, মৃগযূথ, মরাল, শশক, পারাবত, নানাজাতীয় পক্ষী এবং একটা অলঙ্কৃতা বানরী তাহাদের নানা ভাব ও নানা ভাষা দিয়া রাজাধিরাজকে স্বাগত জানাইল।

প্রতীহার আসিয়া মহামাত্যের আগমন-সংবাদ প্রদান করিল।

"আঃ! ঐ শিখাধারীটার অশুচি-জনক মূর্ত্তিটা দেখলেই আমার অমঙ্গল ঘটে! অথচ ওটার হাত ছাড়াবারও যেন পথ নেই! ওর চেয়ে যদি বোধিদেবকে কণ্ঠাগার থেকে মুক্ত ক'রে এনে মহামন্ত্রিত্ব প্রদান করতেম, বোধ করি, ভাল হ'ত। লোকটা অপ্রিয়বাদী হ'লেও প্রিয়দর্শন বটে।"

মহামাত্য শুষ্কমুখে প্রবেশ করিলেন।

"কি? রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় নি, না? ভোরে উঠেই আমার পিছনে তাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন যে? ব্যাপার কি?"

বাসুদেবভট্ট কহিলেন, "গত রাত্রির ঘটনা রাজাধিরাজের কর্ণগোচর হয়ে থাকবে। কোষাধ্যক্ষ সাহীলকে বন্দী করা হয়েছে। কিন্তু এ দিকে আর এক দুঃসংবাদ জানা গেছে, সাহীলের আত্মীয় বলেই কি অন্য কোন কারণে, তা ঠিক বলা যায় না, কৈবর্ত্তদলের মধ্য থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে ব'লে সংবাদ পেয়েছি।"

রাজাধিরাজ ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যথাসম্ভব স্থৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন,—"বিদ্রোহ-দমনের ব্যবস্থা হ'তেও নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাকি নেই।"

মহামাত্য ঈষৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন,—"আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের বল-প্রয়োগ না ক'রে ধীরতার সঙ্গে বিদ্রোহীদের অভিযোগ শুনে তার যথাসাধ্য প্রতীকার চেষ্টা করা ও তাদের সঙ্গে সদ্ভাবস্থাপন করাই সমীচীন। যত দূর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, যদি একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তা হ'লে এমন কি, রাজসৈন্যদের মধ্য হ'তে-ও অনেকে তাতে যোগদান করতে পারে। তাই বলি—"

রাজাধিরাজ ঘোর অসন্তোষে ভরা অসহিষ্ণু দৃষ্টি মহামাত্যের মুখের উপর তীব্রভাবে নিক্ষেপ করিয়া অধীর কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কিছু ব'লে আর কায নেই, ভট্টরাজ! আপনাকে কি গুণে যে মহামন্ত্রিত্ব দান করা হয়েছে, আমি যদি কিছু বুঝতে পারছি! এ পদের আপনি আদৌ যোগ্য নন। গোটাকত ছোটলোক কৈবর্ত্ত বিদ্রোহী হয়েছে ত আপনি ভয়ে একেবারে চোখের সাম্‌নে সর্ষে-ফুল দেখতে লেগেছেন! এই শক্তি ও সাহস নিয়ে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদের অমর্য্যাদা করতে আপনাকে কে আসতে বলেছিল? ছেড়ে দিয়ে নিজের পল্লীগৃহে ফিরে যান, যজ্ঞকুণ্ডে গব্যঘৃত ও পক্ক কদলী দগ্ধ ক'রে, তোষামোদ দ্বারা আপনার মিত্রাবরুণ অর্য্যামাদিগকে সন্তুষ্ট রাখুন গিয়ে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমায় যথোচিত ব্যবস্থা করতে ছেড়ে দিন। দেবতাদের স্তবস্তুতি ক'রে ক'রে আপনাদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন ইতর-ভদ্র, শত্রু-মিত্র সবার সম্বন্ধে ঐ একই পন্থাই অবলম্বন করা সঙ্গত বোধ হয়।"

এই তীব্র ও নিতান্ত অবমাননাজনক তিরস্কারে মহামাত্য মনের মধ্যে যথেষ্ট আহত হইলেও বাহিরে তাঁহার এমন শক্তি ছিল না, যাহাতে করিয়া তিনি আর রাজবাক্যের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেন। বাসুদেবভট্ট জানিতেন, রাজা রাজকার্য্য দেখেন না; সে এক প্রকার তাঁহাদেরই মঙ্গল-জনক। এই হেতু তাঁহার ক্ষমতাও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাগমও অনেক বেশী হয়। তাই নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে অথবা নিশ্চিত বিপদেই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে রাজার অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হয়। নতুবা সহজে তিনিও রাজাকে কোন অন্যায় অহিতাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টাও করেন না। জানেন, শত চেষ্টাতেও কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব নহে, অথচ,তাঁহার নিজের পক্ষে হয় ত তাহার চেষ্টা সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিকর হইতে পারে। কাযেই নীরব হইয়া রহিলেন।

একযোড়া কৃষ্ণসার পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া একটা খণ্ড-যুদ্ধের ক্ষুদ্রাভিনয় করিতেছিল, রাজা আকৃষ্ট দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া মধ্যে মধ্যে হাসিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতেছিলেন, "ধন্য!" "বাঃ!"—মহামাত্যকে নীরব দেখিয়া নিজেকেই জয়ী বুঝিয়া প্রসন্নমুখে মুখ ফিরাইলেন:—"বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে খুব কঠোরতার সঙ্গেই ব্যবহার করা আবশ্যক। এই মুহূর্ত্তে মহাপ্রতীহারকে ডেকে পাঠান, তাঁর মতামত সমস্ত শুনা যাক্, তার পর—ঐ যে! আঃ— নাম করতেই যে আমাদের উপযুক্ত মহাপ্রতীহার মশাই এসে উপস্থিত! এস, এস, রুদ্রদমন! এইমাত্র আমি তোমার কথাই বলছিলেম। রাজ্যের সংবাদ কি?"

রুদ্রদমন আসিয়া সবিনয়ে নতজানু হইয়া মহারাজাধিরাজকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইলেন:—"রাজ্যের সংবাদ, মহারাজ, কিছু শুভ, কিছু অশুভও বটে! গত রাত্রিতে প্রভুর আদেশমত কোষাধ্যক্ষ সাহীলকে বন্দী করা হয়েছে, কিন্তু—"

রাজা সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, এ ত খুবই সুসংবাদ! সেই ক্ষুদ্র রাক্ষসটির গর্ভ থেকে আশা করি, আমরা যা ফিরিয়ে পেয়েছি, তাতে আমাদের বর্ত্তমান অর্থকষ্ট সম্পূর্ণই বিদূরিত হ'তে পারবে? কি বল হে রুদ্রদমন?"

মহাপ্রতীহার মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর করিলেন, "দুর্ভাগ্য-ক্রমে তা হবে না রাজাধিরাজ! সাহীল লোকটা বাঙ্গ-জাতীয়, সে যা খেয়েছে, তা একেবারেই শুষে খেয়েছে, কিছু বাকি রেখে দেয় নি। আজ তার পরিবারস্থ লোকরা কি খাবে, তা পর্য্যন্ত তার ভাণ্ডারে সংস্থান নেই। অথচ কাল যখন তাকে বন্দী করি, তখনও তার গৃহে প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোক পানভোজনে আমোদে-প্রমোদে নিরত ছিল!"

"ওঃ! তা হ'লে ত কাযটা তেমন ভাল হ'ল না! কি বল হে কুমার? অনর্থক একটা—যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি! এ শাস্ত্রেই বলেছে। এখন ওটাকে নিয়ে আর বন্দিশালা বোঝাই ক'রে লাভ কি? না হয় ওকে মুক্ত করেই দাও গে।"

কুমার রুদ্রদমন নতমস্তকে রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পরক্ষণে কহিলেন—"কিন্তু এখন আর সাহীলকে মুক্তি দিলেও সে

আমাদের শত্রুতা করবে না, তা সম্ভব নয়। বরং ঐ বিদ্রোহী দলের মধ্যেই নিজের স্থান বাড়িয়ে তাকে পুষ্ট করবে।" এই বলিয়া রুদ্রদমন সাহীলের গৃহে গতরাত্রিতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সমুদয়ই বর্ণনা করিলেন, কেবল মহা-মাত্যের উপস্থিতি জন্য সুদেষ্ণাকে যে তিনিই উৎকোচস্বরূপে রাজার হাতে সঁপিয়া দিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই কথাটিই শুধু চাপিয়া গেলেন। রাজা ঈষৎ চিন্তিত হইলেন। গত রাত্রির আর একটা ভীষণ দুর্ঘটনা, যেটা এখনও তাঁহার মনকে থাকিয়া থাকিয়া ঈষৎ পিষ্ট ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল, সেই ভয়াবহ কাণ্ডটার কথাই মনে পড়িয়া গেল।

মহামাত্য এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া মহাপ্রতীহারের বর্ণনা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন, "বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেছেন, মহাপ্রতীহার? বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করা হচ্ছে কি না? এ সম্বন্ধে সংবাদ কি কি জান্‌তে পারা গেছে? তাদের সংখ্যা কত, সংবাদ পেয়েছেন ত?"

মহাপ্রতীহার ঘোর অবজ্ঞাসূচকভাবে মুখ বিকৃত করিলেন,—"বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে যেরূপ করা কর্ত্তব্য, সে সমস্তই আমি ইতোমধ্যে স্থির ক'রে নিয়েছি এবং তার মত সুব্যবস্থাও এতক্ষণ হয়ে যেতে বাকি থাকেনি, এর জন্য আপনাদের কিছুমাত্র ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। সংখ্যা তাদের যতই হোক, আমাদের সৈন্যসংখ্যা তার অপেক্ষা মন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ ত বেশী!"

মহামাত্য কহিলেন, "নৌবলব্যাপৃতক যুধিষ্ঠির জাতিতে কৈবর্ত্ত, আমাদের নৌ-সৈনিকদের মধ্যে অধিকাংশই কৈবর্ত্ত-জাতীয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিদ্রোহটা যেন ঐ জাতীয় লোকের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে বলেই বোধ হচ্ছে! তাই ভয় হয়।"

মহাপ্রতীহার ঘোর বিদ্রূপের সহিত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন,—"ভয় হয়? তা হ'লে আর উপায় নেই। যজ্ঞো-পবীত গ্রহণ ক'রে ইষ্টমন্ত্র জপ করুন! তবে এইটুকু ভরসা রাখবেন যে, যতই যা হোক, পালসাম্রাজ্য এখনও এতই দুর্ব্বল হয়নি যে, দু'টো লাঙ্গল-বওয়া চাষার ভয়েই আমাদের মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়তে হবে। এতটুকু যদি সহ্য না হয়, তা হ'লে সাম্রাজ্য শাসনের পরিবর্ত্তে আপনার বানপ্রস্থ এবং আমাদের শ্রমণবৃত্তি গ্রহণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ!"

রাজাধিরাজ নৌবলব্যাপৃতক এবং নৌ-সেনা ও সেনানী-দের কথায় মনের মধ্যে কিছু অশান্তি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক দিকে সাহীল, আর এক দিকে দিব্যোক, ভাগ্যক্রমে এ দুই জনই ঐ একই জাতীয়, যে জাতীয় নায়-কের হস্তে পালসাম্রাজ্যের প্রধান বল নৌবল সংরক্ষিত। সাহী-লের শ্যালক যুধিষ্ঠির হয় ত এই বিদ্রোহী দলে যোগদান করি-লেও করিতে পারে। কৈবর্ত্তদের বিশ্বাস নাই! কিন্তু মহাপ্রতীহারের নির্ভীক ও সগর্ব্ব বাক্যে তাঁহার সেই ক্ষণিক চলচ্চিত্ততা বিদূরিত হইয়া গেল। প্রসন্ন-স্মিত মুখে রাজাধিরাজ কহিলেন,—"যাও রুদ্রদমন! এই বিদ্রোহ-দমনের সম্পূর্ণ ভার আমি তোমারই হাতে ন্যস্ত ক'রে দিলেম; যা ভাল হয়, তাই কর। আমায় আর এ সম্বন্ধে তোমরা উত্যক্ত ক'র না, তার চেয়ে বরং আমি একটু—আঃ, দেখ দেখ! রুদ্রদমন! রুদ্রদমন! শীঘ্র যাও, ঐ দেখ, রূপসী বানরীটা শিকল ছিঁড়ে পালাচ্ছে! আঃ, একটু যদি ওদের উপর আমার মন দেবার উপায় আছে! রাজা হওয়া যেন চোরদায়ে ধরা পড়া! রাজা হ'লে তার আর ব্যক্তিগত আমোদ বা বিশ্রামের দরকার থাকবে না। মহাবিপদ! ধরতে পেরেছ? বেশ! এখন ওটাকে আমার কাছে এনে দাও, এই পক্ক রম্ভাটি দিয়ে ওর স্বাধীনতা-হরণের ক্ষতিপূরণ করা যাক্। কি বল? আঃ! দেখ, দেখ, কেমন পরিতোষের সঙ্গে খাচ্ছে! মানুষগুলোও যদি ওদের মত এই রকম রম্ভা-প্রিয় হ'ত, তবে অনেক সমস্যারই সমাধান হ'তে পারত।"

মহামাত্য এবং মহাপ্রতীহার প্রস্থান করিলে রাজাধিরাজ অনেকখানিই সুস্থ চিত্তে তাঁহার পারিপার্শ্বিকবৃন্দের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্ন রহিলেন। কাকাতুয়া সকৌতুকে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিল। দোয়েল তাঁহার শিষ দেওয়ার অনুকরণ করিল, হরিণ-দম্পতি একত্র আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নবীন দূর্ব্বাদল স্বচ্ছন্দভাবে আহার করিতে লাগিল। রাজাধিরাজ ক্ষণকাল ইহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রসন্নচিত্তে শিষ দিতে দিতে মনে মনে বলিলেন,"উজ্জ্বলা,সুদেষ্ণা, চন্দ্রকলাদের চেয়ে এরাই দেখছি যথেষ্ট নিরাপদ! নাঃ, আর ও পথে নয়। মহাদেবী লজ্জাদেবীর সঙ্গে একটা সন্ধি ক'রে নিতে পারলে মন্দ হয় না! ভাল ক'রে কখন কি ওকে দেখিনি? ও যে অত সুন্দরী, কৈ, মনে হয়নি ত! কি? কি সম্বাদ রুদ্রদমন?"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! প্রায় এক শত বিদ্রোহী ধরা পড়েছে। তাদের সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য?"

রাজাধিরাজ উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "ধরা পড়েছে! কেমন ক'রে?"

"ওরা রাজসভার দ্বারে এসে উৎপাত করছিল যে, আপনার কাছে শেষ উত্তর নিতে এসেছে, সাহীল কি জন্য এমন বিনা বিচারে নিগৃহীত হলেন, এই তাদের প্রশ্ন! এর নায়ক হচ্ছে, নৌবলব্যাপৃতক যুধিষ্ঠির!"

রাজাধিরাজ ঈষৎ চিন্তিত হইলেন, "যুধিষ্ঠির! তাকে কিন্তু আমি অসন্তুষ্ট হ'তে দিতে পারিনে। নৌবল আমাদের বিপক্ষের দিকে না যায়, এই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাখতে হবে। কি করা যায়, বল ত?"

মহাপ্রতীহার এবার একা আসেন নাই, তাঁহার সহিত মহাসন্ধিবিগ্রহিক এবং মহামাণ্ডলিকও আসিয়াছিলেন। মহাসন্ধিবিগ্রহিক বুদ্ধবন্ধু কহিলেন, "যা করলে আর তাঁর শত্রুতা সম্বন্ধে আমাদের ভয় করবার কোনই পথ থাকবে না, সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ উপায়।"

মহামাণ্ডলিক কহিলেন, "কিন্তু তিনি বিদ্রোহী দলে যোগ না দিয়ে রাজার কাছেই বিচার চাইতে এসেছেন, এটা তাঁর মহত্ত্ব! বিচার চাইবার অধিকার সকলেরই আছে!"

বুদ্ধবন্ধু কহিলেন, "সকলের থাকতে পারে, তাঁর নেই! একে বিচার চাওয়া বলে না, কৈফিয়ৎ চাওয়া বলে।"

মহাপ্রতীহার বলিলেন, "ঠিক তাই!···চাওয়া—"

রাজাধিরাজ ঈষৎ উন্মনা হইয়া সন্দিগ্ধভাবে কহিতে গেলেন, "কিন্তু অত বড় শক্তিমান লোকটাকে হঠাৎ আবার এ সময়ে—"

রুদ্রদমন মৃদু হাসিয়া বাধা দিলেন, "শক্তিমান বলেই ত আমাদেরও এতটা ভয়-ভাবনা! তা না হ'লে ত এত সব প্রশ্নোত্তর উঠতেই পেত না।"

রাজার মনের মধ্যে তখনও একটুখানি দ্বিধার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে কি তোমাদের মতে—"

পুনশ্চ বাধা দিয়া সন্ধিবিগ্রহিক বুদ্ধবন্ধু কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের মতে করতলায়ত্ত শত্রুকে—"

রাজা কহিলেন, "কি, বন্দী করা?"

মহাপ্রতীহার হাসিয়া কহিলেন, "সমস্ত বিদ্রোহীকে যদি বন্দী ক'রে আশ্রয় ও আহার যোগাতে হয়, তা হ'লে যারা বিদ্রোহী নয়, তাদেরই নিরাশ্রয় ও অনাহারী হ'তে হবে না কি? তার চেয়ে ও একেবারেই—"

"কিন্তু যদি তাতে নাগরিকরা আরও বেশী অসন্তুষ্ট হয়ে—"

"আমাদের পঞ্চদশ সহস্র রাজসৈন্য কি জন্য সুসজ্জিত হয়ে দুর্গদ্বারে রাজ-আজ্ঞার প্রতীক্ষা করছে? প্রয়োজন হ'লে আরও অধিকসংখ্যকেরও ত অপ্রতুলতা নেই।"

রাজা কহিলেন, "আঃ, তোমরা যদি এতই শক্তিমান, তা হ'লে এ সব নিয়ে আমায় কেন বিব্রত ক'রে তুলছো? যা ভাল বিবেচনা হয়, নিজেরা করলেই ত পার! আমি সমস্ত ভার তোমাদের উপরেই ফেলে দিলেম। রুদ্রদমন! যাবার সময় উদ্যানপালককে ব'লে যেও, যেন হীরামনের জন্য পায়স আর কাজলার জন্য আরও কিছু শস্য-কণিকা দিয়ে যায়। বাঃ! বাঃ! ময়ূরটা কি চমৎকার পেখম তুলেছে দেখ হে, বুদ্ধবন্ধু! নাঃ! ওকে আজ একটা সোনার বালা পুরস্কার না দিলেই নয়! যদিও এইটেই আমার শেষ বালা। আর সব দান করা হয়ে গেছে! অথচ চাণক্য বলেছেন কি না, 'দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং' প্রত্যক্ষ দেখছি যে, নিত্যই তা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছেই হচ্ছে! অথচ মুখে উচ্চারণ করতে হবে, 'দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং'—হাঃ হাঃ হাঃ!"

বুদ্ধবন্ধু ও রুদ্রদমন একসঙ্গে উচ্চহাস্য করিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ! রাজাধিরাজ! যা বল্লেন! চাণক্যের ভুল আপনি ইচ্ছা করলে অমন একশোটা ধ'রে দিতে সমর্থ!"

রাজাধিরাজ বিস্ফারিতপুচ্ছ নর্ত্তনশীল ময়ূরের কণ্ঠ হীরকখচিত সুবর্ণ-বলয় দ্বারা ভূষিত করিয়া দিতে দিতে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত পুনশ্চ কহিলেন, "তা ব'লে কিন্তু এও স্বীকার করবো যে, চাণক্য লোক ভাল। ওর অনেক কথাই বেশ কথার মত কথা বটে! ঐ যে একটা শ্লোকে ব'লে গেছেন, 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু'—ওটা আমি বড্ডই মানি। ওদের এখনও কিছুই অন্ত পেলাম না! তা কি নিজের স্ত্রীর কি পরের স্ত্রীদের—"

রাজা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। মহাপ্রতীহার সহাস্যে কহিলেন, "আর ঐ 'রাজকুলেষু চ' এই কথাটা আপনার কেমন মনে হয়?"

রাজাধিরাজ ক্রূরদৃষ্টি বক্র হাসির সহিত বন্ধুর মুখে নিক্ষেপ করিলেন, "ওটাও বড় মন্দ লাগে না! আর মেলেও খুব! তা ওতে রাজার কথা ত আর বলেনি, রাজা ব্যতীত রাজকুলের আর কেহই যে বিশ্বাসী নন, সেটা সুরপাল

রপাল ত প্রমাণ করেই দিয়েছেন। এখন রাজকুলীয় ...লে তোমার সম্বন্ধেও একটুখানি পরীক্ষা বাকি আছে।"

কুমার রুদ্রদমন অপ্রতিভ ও সলজ্জ হইলেন। "তা হ'লে ...ত বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে—"

"হ্যাঁ, সে তোমরা যেমন ভাল বোধ কর। পুষ্পরাণী! পুষ্পরাণী—পুসু! পুসি! এ দিকে আয়—"

রাজাধিরাজ গান্ধারদেশজ একটি অত্যন্ত সুশ্রী শ্বেত-বিড়ালীকে সাদরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

"ত্রিবেণী"সম্বন্ধে আর এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—"পর-সংখ্যা ...তে যেন 'কৈবর্ত্ত-নায়ক' না লিখিয়া 'মাহিষ্য-নায়ক' শব্দ ব্যবহার ...হয়!

কিন্তু এ অনুজ্ঞার কোন অর্থবোধ হইল না! 'মাহিষ্য-নায়ক' শব্দ কোন্‌খানে আছে যে, আমায় পত্রলেখক উহা লিখিতে আদেশ দিয়াছেন? রামচরিতের ২৯ শ্লোকের টীকায় আছে,—

"দ্বিষঃ শত্রোঃ কৈবর্ত্তস্য নৃপস্য।"—১।২৯।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত রামচরিতের টীকাতেও তিনি মূলানুযায়ী ভাবেই অনুবাদে ভীম প্রভৃতিকে "কৈবর্ত্ত" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

The Kaivartas were a very powerful and warlike people of northern Bengal. Dibyok was their chief."

কাযেই 'মাহিষ্য' 'মাহিষ্য' বলিয়া ক্রমাগত উল্লেখ আমি এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে না করায় আমার অপরাধ আমি দেখিতে পাইলাম না এবং ইতিহাসের সম্মানরক্ষার্থেই ঐ শব্দ পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত মনে করি না। সম্ভবতঃ, সে সময়ে 'মাহিষ্য' শব্দের প্রচলন সেখানে ছিল না। থাকিলে রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী ঐ শব্দই প্রয়োগ করিতেন। আমি যথাসাধ্য প্রকৃত ইতিহাসকেই অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক এবং সে জন্য যথেষ্টই পরিশ্রম করিয়াছি ও করিতেছি। যদি নূতন কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাতে ভীম প্রভৃতিকে 'মাহিষ্য' শব্দে অভিহিত করা থাকে, তাহা হইলে সেই সময়ে ত্রিবেণীর নূতন সংস্করণে কোথাও 'কৈবর্ত্ত,' কোথাও বা 'মাহিষ্য' শব্দ আমিও বসাইতে বাধ্য হইব। নতুবা পূর্ব্বেই যখন তাহাদের 'চাষী কৈবর্ত্ত' গত ফাল্গুনের বসুমতীতে ত্রিবেণীর ফুটনোটে বলা হইয়াছে, তখন আর বেশী কিছু বলিবার বাকি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার ঐতিহাসিক কোন পুস্তকেরই ব্রাহ্মণনায়ক সম্বন্ধে তাঁর কোন্ শ্রেণী, কোন্ গোত্র, কাহার সন্তান, কুলীন বা কাপ অথবা বংশজ, তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কোথাও এ পর্য্যন্ত করি নাই। কাল্পনিক পাত্রদের ইচ্ছামত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক সকল বর্ণেই স্থান দিয়াছি। ব্রাহ্মণপাত্রীকে বড় করিয়াছি বলিয়া সুবর্ণবণিক-পাত্রীদের ছোট করি নাই। উপাখ্যান-গঠিত চরিত্রে যার কাশে যাহা পড়ে, তাহা বর্ণ ধরিয়া হিসাব করা হয় না। ব্রাহ্মণী পতিতপাবনী বা সিদ্ধেশ্বরী, (মহানিশা ও পোষ্যপুত্র) বড় বধূ (বাগ্‌দত্তা) বৈদ্যজায়া মঙ্গলাদেবী (পথহারা) ইঁহাদের কুটিলা ও কলহপরায়ণা প্রভৃতি করিয়াছি, ইহাতে কোন দিনই কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না বটে, তবে মহীপালজননী যৌবন-শ্রীকেও ত খুব গুণবতী করিয়া অঙ্কিত করি নাই। অথচ ভীমের মা-কে বধূ-নির্য্যাতিকা করায় উহা 'ঈর্ষ্যাপ্রসূত' বলিয়া পত্র আসিয়াছে!

ভীমের মা যে বধূ-নির্য্যাতিকা ছিলেন না, অশিক্ষিতা ছিলেন না, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? তাহার পর 'ঈর্ষ্যা' যে দিব্যোক-রাজ্যোক এবং ভীমের কয়টি বৎসর রাজ্য করায় কেনই আমার মনে আসিল, এইটেই ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! আমি আমার 'স্বজাতি' বলিতে শুধু ব্রাহ্মণ বর্ণকেই বুঝি না এবং বোধ হয়, পূর্ব্বতন সমাজ-স্রষ্টা রাজ্যেরাও তাহা বুঝিতেন না, নতুবা ব্যাস-বশিষ্ঠকে রাজাধিরাজের পরিবর্ত্তে শাস্ত্রজীবী দেখা যাইত না। পত্রলেখকের অপর আদেশ কোন মাহিষ্য-চরিত্রই খারাপভাবে অঙ্কিত করিবেন না।"

ইহার উত্তর দিবারও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। যে সব পাঠক এত বড় সঙ্কীর্ণতা লইয়া পুস্তক পাঠ করিতে বইসেন, তাঁহাদের জন্য নূতন লেখক তাঁহারাই যেন গড়িয়া তুলেন এবং অন্যের লেখা দয়া করিয়া বয়কট করেন। কাহারও ফরমায়েস লইয়া বা আবদার শুনিয়া উপন্যাস বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা চলে না।

কোন ক্ষত্রিয় সন্তান যদি আজ আমায় অন্য দিক হইতে ধমক দিয়া বলেন, "মহীপালকে অমন নরাধম অঙ্কিত করিলে কেন? তিনি যে আমার স্বজাতি।" হয় ত বা এখন আর আশ্চর্য্য হইব না!

কিন্তু এই উপন্যাসের আদর্শ দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে ঠিক বিপরীতই লওয়া হইয়াছিল। সমস্ত স্থিরমস্তিষ্ক ইতিহাসজ্ঞ পাঠক যাঁহারা দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধীয় এই কাহিনীর সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, রামচরিতকার ভীমকে উজ্জ্বল চরিত্রেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস যখন স্পষ্টাক্ষরেই দেখাইতেছে যে, প্রবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজ হইলেও তাঁহার সামান্য প্রজা সম্বন্ধে অনীতিপরায়ণতায় ধ্বংস ঘটে, তখন মাহিষ্য সমাজকে তুষ্ট বা রুষ্ট করিবার জন্য না হইলেও আমাকে আমার ঐতিহাসিক ধারাকেই অনুবর্ত্তন করিয়া শেষ সীমায় পৌঁছিতে হইবে। উত্যক্ত বা বিরক্ত হইয়াও এর অনুকূলে বা প্রতিকূলে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিব না, আমার পক্ষে এখন বৈদান্তিকের মতই "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী" হইতে হইবে।

* * * * *

দিব্যোককে রাজা করিয়া উপন্যাসে নামানো হয় নাই বলিয়া এক জন মাহিষ্যজাতীয় পত্র-প্রেরক ঘোর অপছন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। দিব্যোকাদি পূর্ব্বাবধি রাজা থাকিলে আমার উপন্যাসের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয় ত হইত না। হয় ত আমার লেখার উদ্দেশ্যের সহিত এক নয় বলিয়া এই ঐতিহাসিক প্লটটি লইতামই না। অথবা যদিই বা লইতাম, এত লোকের কাছে জবাব লিখিতে হইত না। কি করিব, ইতিহাসে উহা মোটেই পাওয়া যায় নাই। কৈবর্ত্তরাজ শব্দ যেখানে বসান আছে, তাহাতে পূর্ব্বাবধি রাজা থাকা বুঝায় না, এবং তৎপূর্ব্বে অপর শ্লোকে অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাই তাহা করিতে পারি নাই। এই শ্লোক ও শ্লোকার্থ হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।

মাংসভুজোচ্চৈর্দ্দশকেন জনকভূর্দস্যুনোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বয়েন সীতাবাসালংকৃতির (রা) হারি কান্তাস্য,
(৩৮) কুলকম্।

* * * * *

অন্যত্র,—

অস্য রামপালস্য জনকভূঃ পৈত্র (পৈত্র্য) ভূমির্বরেন্দ্রী সীতাবাসালঙ্কৃতিঃ লাঙ্গলপদ্ধতিগত্যলঙ্কারা চাবাসসংপন্নেত্যর্থঃ। অতএব কান্তা কমনীয়া দিব্যাহ্বয়েন দিব্যনাম্না দিব্যোকেন মাংস (শ) ভুজা লক্ষ্ম্যা অংশং (সং) ভুঞ্জানেন ভৃত্যোনোচ্চৈর্দশকেন উচ্চৈর্মহতী দশা অবস্থা যস্য অত্যুচ্ছ্রিতেনেত্যর্থঃ। দস্যু (শু) না শত্রুণা তদ্ভাবাপন্নত্বাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনি ব্রতী, যদ্বা আচার ক্বিপ্, হেতুমন্নিজ (য) ন্তাদিণি অহারি গৃহীতা। ৩৮

এই শ্লোকে রামচরিতকার সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যোকাদিকে মাহিষ্য-রাজ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার লেখা হইতে দেখা যায় যে,

যেন কোন পূর্ব্বতন রাজভৃত্য হইতে সহসা অতিশয় উচ্চাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমার 'ত্রিবেণী'তেও তাহা ব্যতীত আর কিছুই নাই!

* * * *

বোধিদেবকে ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত করা সম্বন্ধে আমার প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করিয়া দিলাম। ইহা হইতেই আমার উত্তর পাইবেন।

গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে পালরাজগণের মন্ত্রিবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে পালবংশীয় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম নৃপতির মন্ত্রিবৃন্দের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ লিপি হইতে জানা যায় যে, পালরাজগণের মন্ত্রিপদ বংশানুগত ছিল। নিম্নে নৃপতিদের ও তাঁহাদের মন্ত্রিবৃন্দের নাম ঐ লিপি হইতে প্রদত্ত হইতেছে। এই মন্ত্রিবংশ ব্রাহ্মণ ছিলেন। উক্ত লিপিতে উঁহাদের বিদ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা, নীতি-জ্ঞানের এবং তাহার সহিত বাহুবলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপাল
|
ধর্ম্মপাল—গর্গ=ইচ্ছা
|
দেবপাল দর্ভপাণি=শর্করাদেবী
|
সোমেশ্বর=রল্লাদেবী
|
দেবপাল ও শূরপাল কেদার মিশ্র=বব্বাদেবী
|
নারায়ণপাল গুরব মিশ্র

নারায়ণপালদেবের ভাগলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ইনি ভট্ট-গুরব বলিয়া উল্লিখিত। উক্ত তাম্রলিপির ২২শ শ্লোকে ইঁহার যুদ্ধ-বিদ্যার পরিচয় দেওয়া আছে। ৯ম শ্লোকে সোমেশ্বর বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিতেন, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। বৈদ্যদেব কামরূপ জয় করায় তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণই দেখিতেছি না।

শ্রীবামনভট্ট মহীপালের মন্ত্রী (বাগগড়লিপি, ২০শ শ্লোক) ছিলেন। ভট্ট নাম হইতেই জানা যাইতেছে যে, ইনিও ব্রাহ্মণ।

১ম মহীপালের পৌত্র ৩য় বিগ্রহপালের রাজত্বের ১৩শ বর্ষে উৎকীর্ণ একটি তাম্রশাসন দিনাজপুর জিলার আমগাছি নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপিটির এক্ষণে নিতান্তই চরমদশা। তাহার শেষাংশের পাঠ এখনও উদ্ধৃত হয় নাই। তাই উহাতে (১ম মহীপালের বাগগড়-লেখের অনুরূপ) রাজমন্ত্রীর নাম দূতকরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। কিন্তু কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের কমৌলীলিপি হইতে এই তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রীর নাম পাওয়া যাইতেছে। বৈদ্য-দেবের পিতামহ যোগদেব বংশক্রমে বিগ্রহপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া উহাতে লিখিত আছে।

যস্য বংশক্রমেণাভূৎ সচিবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ।
যোগদেব ইতি খ্যাতঃ স্ফুরদ্দোর্দ্দণ্ডবিক্রমঃ॥ ৩ শ্লোক।

৩য় বিগ্রহপালের পুত্র রামপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই যোগদেবের পুত্র বোধিদেব (৫ম শ্লোক)। রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব (৯ম, ১২শ শ্লোক)।

(১১শ) ৩য় বিগ্রহপাল
|
(১২) মহীপাল (১৩) শূরপাল (১৪) রামপাল
|
রাজ্যপাল (১৫) কুমারপাল সামদেবপাল=চিত্রমতিকা
|
(১৬) গোপাল ৩য়

যোগদেব
|
বোধিদেব—প্রতাপদেবী
|
বৈদ্যদেব বুধদেব

'কুলদেব' বলিয়া বৈদ্যদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না। কুলপঞ্জিকার মত তাম্রশাসনের নিকট যে নিতান্তই অগ্রাহ্য, তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, যখন যোগদেব বংশক্রমে পাল-সম্রাটের মন্ত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বামনভট্টের বংশীয় না বলিবার কারণ কি? মাত্র নরপালের মন্ত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি কায়স্থবংশীয় কেহ হইলেও তৎপুত্র যোগদেব সম্বন্ধে "বংশক্রমে" কথাটা ব্যবহৃত হইত না। অন্ততঃ দুই তিন পুরুষ না গেলে এ শব্দের ব্যবহার সম্ভব নহে। ইহা ভিন্ন বৈদ্যদেব যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা কমৌলি লিপির ১৬শ শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। নিম্নে উক্ত শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

দোর্দ্দণ্ডারণিজে হবির্ভুজি ভটব্রাতেঽনৈরেধিতে,
সংগ্রামাধ্বরপূজিতে রিপুশিরঃশ্রেণীলসৎশ্রীফলৈঃ।
কৃত্বা হোমবিধিং পরক্ষিতিভুজা দত্ত্বাথ পূর্ণাহুতিং,
লব্ধোদগ্রযশো মহৎ ফলমসৌ শ্রীবৈদ্যদেবো বভৌ॥

অরণিরূপে ব্যবহৃত নিজ বাহুদণ্ডজাত, ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত শত্রু-সেনাশরীর দ্বারা প্রজ্বলিত যুদ্ধরূপ যজ্ঞে শ্রীফলরূপে ব্যবহৃত রিপু-শিরঃসমূহে হোম-বিধির অনুষ্ঠান করিয়া ও শত্রু-নৃপতিগণ দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া এই বৈদ্যদেব যশোলাভে দীপ্তিমান হইয়াছিলেন।

এই শ্লোকে হোমকার্য্যের যে উপমা প্রদত্ত হইয়াছে, বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণ না হইলে তাহা কখনই তাঁহার সম্বন্ধে প্রদত্ত হইত না। অরণি, ইন্ধন, যজ্ঞে শ্রীফলের ব্যবহার, পূর্ণাহুতি দান ইত্যাদি যজ্ঞকার্য্যসম্বন্ধীয় উপমাই বৈদ্যদেবের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ। যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রাহ্মণের অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রশস্তিকার বলিতে চাহিতেছেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত হইলেও বৈদ্যদেব সে কার্য্যে নিবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি তখনও যেন যজ্ঞকার্য্যই করিতেছিলেন, তবে এ ক্ষেত্রে তাঁহার এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপাদানগুলি ভিন্ন মাত্র। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর পক্ষে যুদ্ধকার্য্য তখন নিতান্ত অসাধারণ ব্যাপার ছিল না, এই প্রসঙ্গে সোমেশ্বর ও গুরবমিশ্রের কথা স্মর্ত্তব্য।

পরিশেষে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বৈদ্যদেবের অনুশাসনের যিনি প্রথম পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ ভিন্সিস, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি সকলেই বৈদ্য-দেবকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করেন।—(E. I. II. p 348—"There can be little doubt that he was a Brahman." এবং গৌড়লেখমালা পৃষ্ঠা ৮৪।)

এই সকল প্রমাণে আমি আমার 'ত্রিবেণী' উপন্যাসে মহীপালদেবের ভূতপূর্ব্ব মহামাত্যপুত্র বোধিদেবকে ব্রাহ্মণরূপেই চিত্রিত করিয়াছি। আমার মনে হয়, আমগাছি লিপির শেষাংশের পাঠোদ্ধার সম্ভব হইলে এই অনুদ্ঘাটিত রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটিত হইয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। এক্ষণে বৈদ্যদেবের পিতামহ যোগদেব বংশক্রমে বিগ্রহ-পালের মন্ত্রী হওয়া শব্দটির উপর নির্ভর করিয়া আমার উপন্যাসে আমি বোধিদেবের ব্রাহ্মণ্যই বজায় রাখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, অনুমান ব্যতীত তেমন কোন অখণ্ডনীয় উচ্চপ্রমাণ না পাইলে পরমেশ্বর মহাশয় ইহার জন্য দুঃখিত হইবেন না।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

দোলযাত্রা

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক কালে, পাঁজির বলিয়ুগের আদিতে, পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্র-যুক্ত পূর্ণিমায় সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হতো। উত্তরায়ণ থেকে শীতের অবসান ও বসন্ত ঋতুর আগমন সূচিত হয়; শীতান্তে বসন্তের শুভা-গমনে লোকের মন হর্ষোৎফুল্ল হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং সেই দিন বসন্ত ঋতুর উৎসবদিবস ব'লে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।

এই ব্যাপারকে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—ফাল্গুন মাসে সূর্য্যের সহিত সোমের বিবাহ।—সবিতা কন্যা সূর্য্যাকে সম্প্রদান করেন এবং অশ্বিনীকুমাররা বরযাত্রিরূপে উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ সূর্য্য যখন অশ্বিনী নক্ষত্র থেকে ফল্গুনী নক্ষত্রে সংক্রমিত হত। এই কথা পরে আনন্দোল্লাস ও মদনরূপে পরিণত হয়েছে।

শীতের প্রকোপে জড়ীভূতা ও নিরাভরণা ধরণী বসন্তের আবির্ভাবে নব পল্লবপুষ্পে সুশোভিতা হয়ে ওঠে; যেন বসুন্ধরাপ্রকৃতি মৃত্যুর পর সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে নবজীবন লাভ করে; পুরাতনের বিদায়ের মধ্য থেকে নূতনের অভ্যুদয় ঘটে। এই জন্যও মানুষের মনে বসন্ত ঋতুর প্রথম আগমনের দিনটি নূতনের আবির্ভাব ও নূতন শস্য-জন্মের সহিত মিলিত হয়ে যায়। তাই সেই অতি প্রাচীন কালে পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্র-যুক্ত পূর্ণিমা তিথিটি নববর্ষারম্ভের দিন ও নূতন ফসল ঘরে আনন্দ-সূচনার দিন ব'লে পরিগণিত হয়েছিল।

এইরূপে এই একই দিনে তিনটি উৎসব সম্মিলিত হয়ে-ছিল—বসন্তোৎসব, নববর্ষারম্ভের উৎসব, নব শস্যলাভের হর্ষের উৎসব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হ'লে সূর্য্যের দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হতো ভাদ্র মাসে; সূর্য্যের এই দোল খেয়ে একবার উত্তরে ও আর-বার দক্ষিণে যাওয়া দেখে এই বসন্তোৎসবের সঙ্গে দোলায় দোল খাওয়া প্রচলন হয়ে থাকবে। আগে বোধ হয় মাত্র মাসে আর একবার দোল খাওয়ার উৎসব হতো; এখন হয় পাঁজির কাল-গণনার গোলমালে শ্রাবণ মাসে। সূর্য্যকে একটু এক দোলকের মতন ছয় ছয় মাসে উত্তর থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ থেকে উত্তরে দুলতে দেখে যে দোল খাওয়া উৎসবের সৃষ্টি হয়েছিল, তার নাম হয়েছিল দোল-যাত্রা অর্থাৎ সূর্য্যের দোলা-গতির অনুকরণ; এবং শ্রাবণের দোল খাওয়া উৎসবের নাম হয়েছিল হিন্দোল বা ঝুলন।

সূর্য্য আপনার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও দিবাকরত্বের জন্য আদিম মানবের পরম বিস্ময় ও ভক্তি আকর্ষণ করেছিল। সূর্য্য মানুষের আদিম দেবতাদের অন্যতম। বসন্তোৎসব ও নব-বর্ষের উৎসবের সঙ্গে যেই দোল-যাত্রা সংযুক্ত হল, অমনি এই উৎসবটি সূর্য্যেরই উৎসব হয়ে দাঁড়াল।

বেদে সূর্য্যের এক নাম বিষ্ণু। বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর নানারূপ বিগ্রহ দোলায় চাপিয়ে উৎসব কর্‌তে লাগ্‌লো। গোলাকার শালগ্রাম হয় তো বা সূর্য্যেরই প্রতীক।

শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে দাঁড়ালেন; তখন দোলায় কৃষ্ণরাধাকে চড়িয়ে দোল দেওয়া চল্‌লো; কিন্তু ব্যবস্থা হলো, কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে দক্ষিণমুখো ক'রে দোলায় বসাতে হবে, কারণ, উত্তরায়ণের সময় সূর্য্য যেন দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে থাকে। তাই গরুড়পুরাণ ব্যবস্থা দিচ্ছেন—

"চৈত্র মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥"

দোলাস্থ কৃষ্ণকে স্তুতি করবার সময় এখনো বলা হয়—
জয় দেব দিনেশান রজনীশ-বিলোচন।

হে দেব, তুমি সূর্য্য, তুমিই চন্দ্রের জ্যোতির্বিধাতা চক্ষু-স্বরূপ, তোমার জয় হোক।

সূর্য্যের রং জবাকুসুমসঙ্কাশ লাল। সেই জন্য দোলযাত্রায় এই লাল রং ছোড়াছুড়ি হ'তে লাগলো। ফাল্গুন মাসে যে রং ছোড়া হ'তে লাগলো, তার নাম হলো ফল্গু, বাংলা ফাগ। আবীর শব্দ আরবী, পরে মুসলমানী আমদানী। এই ফাগ যে সূর্য্যেরই লাল রঙের রূপক, তার পরিচয় পাওয়া যায় বিষ্ণুকে ফল্গুচূর্ণ দানের মন্ত্রের মধ্যে—

"ফল্গুস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং শিরোধার্য্যোঽসি সর্ব্বদা।
হরেঃ প্রীতিস্ত্বয়া কার্য্যা নমস্তেঽরুণতেজসে।"

এই মন্ত্রে ফল্গুকে অরুণতেজ ব'লে নমস্কার করা হচ্ছে। পুরাণ মতে দোলের পূজা অরুণোদয়-কালে কর্ত্তব্য।

যখন ফাল্গুন-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ণ শেষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হতো, তখন মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে শারদ-বিষুব হতো। কোনো কোনো দেশে সেই দিন থেকেই নূতন বৎসর প্রবর্ত্তিত হতো। এই জন্য মার্গশীর্ষ মাসের অপর নাম হয়

অগ্রহায়ণ অর্থাৎ বৎসরের আদি মাস। এই জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতুনাং কুসুমাকরঃ"—আমি সকলেরই আদি, এক দিকে আমি মার্গশীর্ষ মাস, অপর দিকে আমি বসন্ত ঋতু।

মৃগশিরা নক্ষত্রের আকার মৃগানুসারী অস্ত্রধারী যোদ্ধার ন্যায়; এজন্য এর সংস্কৃত নাম মৃগব্যাধ, গ্রীক নাম orion ব্যাধ, বাংলা নাম কাল-পুরুষ। কেউ কেউ অনুমান করেন, দক্ষ প্রজাপতির ছাগমুণ্ড হওয়ার উপাখ্যানের মূল এইখানে।

মৃগব্যাধের উদয়ে হিম ঋতুর আগমন সূচিত হয়; হিম লাগলে লোকের অসুখ করে; অসুখ করলেই লোক মরে; তাই মৃগব্যাধের উদয় লোকের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করতে লাগলো; মৃগব্যাধকে লোক রাক্ষস, কালপুরুষ বা যম ব'লে কল্পনা করতে লাগলো। কার্ত্তিক মাসের এক নাম হলো যম-দংষ্ট্রা; বৈদিক ঋষিরা কামনা করতে লাগলেন—জীবেমঃ শরদঃ শতম্—যেন শরৎ কালের হিম কাটিয়ে বেঁচে বর্ত্তে থাকি। মৃগব্যাধ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে মানুষের কটিবন্ধ সদৃশ তিনটি নক্ষত্র আছে; সেই নক্ষত্র তিনটির নাম ইল্বক বা ল্বিক। এই ইল্বক পরে পুরাণে বাতাপির ভাই ইল্বল রাক্ষসে ও হোলাকা বা হোলিকা নাম্নী রাক্ষসীতে পরিণত হয়।

মৃগশিরা অর্থাৎ ভেড়ার মাথার আকারের নক্ষত্রপুঞ্জ যখন পুরাণে ইল্বল নামে পরিচিত হলো, তখন উপাখ্যান তৈরী হলো যে, রাক্ষস ইল্বল মেষের বা মেঢ়ার আকার ধারণ ক'রে ঋষিদের বধ করতো, শেষে অগস্ত্য তাকে খেয়ে জীর্ণ করেন।

হোলিকা ছেলেখাকী রাক্ষসী। এরই অপর নাম পূতনা। শ্রীকৃষ্ণ যখন দোলায় শুয়ে ছিলেন, তখন এই পূতনা তাঁর মুখে বিষাক্ত স্তন দিয়ে তাঁকে মারবার চেষ্টা করেছিলো। শেষে বেচারী নিজেই মারা পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ দোলায় দোল খেতে থাকেন। এইরূপে দোল খাওয়ার সঙ্গে হোলিকার সম্বন্ধ স্থাপিত হলো।

রাক্ষস-রাক্ষসীকে লোক ভয় করে। তারা কল্পনার রাক্ষসীকে গালাগালি দিয়ে ভাগাতে চায়, রাক্ষসকে পুড়িয়ে মারতে চায়। তাই নববর্ষের উৎসবের আর-এক নাম হলো হোলি, এবং সেই দিন কুৎসিত গালাগালি দিয়ে রাক্ষসী তাড়ানো আর মেঢ়াসুরকে পুড়িয়ে মারার অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। এই হোলিকা রাক্ষসী হলো সম্বৎ অর্থাৎ বৎসরের ভগিনী।

রাক্ষসকে পুড়িয়ে মারার অনুষ্ঠানের মধ্যে শীতাগমে আগুন পুইয়ে হিম নিবারণ করবার ব্যবস্থাটাও জড়িয়ে গিয়েছিলো বোধ হয়। পুরাতন যায়, নূতন আসে; নূতনের আবাহনে হর্ষপ্রকাশের বাহ্য অনুষ্ঠানও আগুন জে'লে করা স্বাভাবিক।

যে মেঢ়া-পোড়ানো এক সময় কোনো দেশের বৎসর গণনার প্রথম মাস অগ্রহায়ণে অনুষ্ঠিত হতো, তা পরে বসন্তোৎসবের সঙ্গে নববর্ষ প্রবর্ত্তনের উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। এর সংস্কৃত নাম হলো বহ্ন্যুৎসব; এই থেকে মহারাষ্ট্র দেশে ও পশ্চিম-ভারতে দোল-পূর্ণিমার নাম হুতাশনী।

মেঢ়াসুরকে পোড়াবার অভিনয় যখন আরম্ভ হলো, তখন সত্য সত্যই আগুনে একটা ভেড়া পোড়ান হতো—স্কন্দপুরাণে ব্যবস্থা দেখা যায়—

"বহ্ন্যুৎসবং প্রকুর্ব্বীত দোলমণ্ডপপূর্ব্বতঃ।
সপঙ্কং কারয়িত্বা তু বহ্নিং তত্র বিনিক্ষিপেৎ॥"

কোনো কোনো জায়গায় রাক্ষসের প্রতিনিধিস্বরূপ নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হতো। সেই প্রথার অবশেষস্বরূপ কোনো কোনো স্থানে নরমূর্ত্তি গঠন ক'রে পোড়ানো হয়, অথবা গন্‌গনে আগুনের উপর দিয়ে কোনো লোক ক্ষিপ্রপদে হেঁটে যায়। পদ্মপুরাণ বলেন,—অগ্নি মন্থন ক'রে তাতে পশু নিক্ষেপ করবে। এখনও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পিঠালি দিয়ে মেষ নির্ম্মাণ ক'রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। উত্তর-বঙ্গে খড়-বাঁশ দিয়ে একটা ছোটো ঘর করা হয় এবং তার ভিতরে একটা জীবন্ত মেষ রাখা হয়; পরে মেষ বাহির ক'রে নিয়ে ঘর পোড়ানো হয় এবং মেষ বলি দিয়ে তার মাংস দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পূর্ব্বকালে মেষ পুড়িয়ে খাওয়া হতো হয়তো। দোলযাত্রার সময় মেলার হাটে বাজারে চিনির মঠ বিক্রী হয়; এই মঠ বোধ হয় সেই মেষের ঘর, এবং গৃহমধ্যস্থ মেষ আহার করার বৈষ্ণব সংস্করণ। মেষ-মন্দির দাহের মন্ত্র এই—

"ওঁ বিষ্ণু রুদ্র-সমুদ্ভূত মহাশন হুতাশন।
মেষ-মন্দির-দাহেহত্র সমুদ্ভূতশিখো ভব॥"

এই মেঢ়া-পোড়ার আখ্যান নানা পুরাণে ও নানা দেশে নানা রকম। ভবিষ্যোত্তর পুরাণে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—রাজা রঘুর রাজত্বকালে ঢুণ্ঢা নামে এক রাক্ষসী প্রজাদের উপর উপদ্রব করতে আরম্ভ করে; শিবের কাছে সেই ঢুণ্ঢার

বরে মালিনী মাতার জন্য অমর হবার বর চাইলে শম্ভু বল্‌লেন—ঢুণ্ঢা প্রায় অমর হবে; কেবল ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় মনোরী উৎসবমত্ত হ'লে সে মারা যাবে। রঘু ঢুণ্ঢার উপদ্রবে চিন্তিত হয়ে গুরু বশিষ্ঠের পরামর্শ চাইতে বশিষ্ঠ বল্‌লেন—আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা; আজ শীত শেষ ও বসন্ত আরম্ভ হচ্ছে; আজ সকলে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুক, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আগুন প্রদক্ষিণ ক'রে নৃত্যগীতে উন্মত্ত হোক; তা হলেই রাক্ষসী মারা যাবে।

ঝাঁসী জেলার লোকরা বলে—হোলিকা রাক্ষসী হিরণ্যকশিপুর ভগিনী; হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার হরি যদি সর্ব্বব্যাপী, তা হ'লে কি তিনি এই স্ফটিকস্তম্ভেও আছেন? প্রহ্লাদ সেখানেও হরির অস্তিত্ব স্বীকার করলে হোলিকা সেই স্তম্ভান্তর্গত হরিকে পুড়িয়ে মারবার জন্য স্তম্ভে অগ্নিপ্রয়োগ করে এবং সেই আগুনে হোলী নিজেই পুড়ে মরে!

পৃথ্বীরাজ রাসো গ্রন্থে চাঁদকবি একটি আখ্যায়িকা দিয়েছেন—চৌহান বংশে এক রাক্ষস জন্ম নিয়েছিলো, তার নাম ঢুণ্ঢ। তার ভগিনীর নাম ঢুণ্ঢিকা। ঢুণ্ঢ আজমীঢ়-দিল্লী থেকে কাশীতে গিয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয় ও চিতা প্রজ্বালিত ক'রে নিজেকে দগ্ধ করে। ঢুণ্ঢিকাও কাশীতে এসে তপস্যা করে। পার্ব্বতী বরদাত্রী হয়ে তার সম্মুখে আবির্ভূত হ'লে সে বর চাইলো, যেন সে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে ধ'রে ধ'রে খেতে পারে। পার্ব্বতী শিবের পরামর্শ অনুসারে বল্‌লেন—তথাস্তু; কিন্তু যারা উন্মত্তবৎ আচরণ করবে, তাদের তুমি খেতে পারবে না। এই বর পেয়ে ঢুণ্ঢিকা মানুষ খেতে উদ্যত হলো; কিন্তু তখন শিবাজ্ঞায় পবন লাল ধূলা উড়িয়ে অন্ধকার ক'রে দিলেন এবং সেই ধূলার অন্ধকারে লোকরা উন্মত্তবৎ হয়ে উঠলো; ঢুণ্ঢিকা আর কাউকে খেতে পারলে না। তদবধি ধূলি উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

হরিদ্বারে জনপ্রবাদ যে, এই হোলিকা সম্বতের ভগিনী; সে মাতার মৃত্যুতে সহমরণে যায়। সেই সহমরণের চিতাগ্নি থেকে প্রত্যেক বৎসর সম্বৎ ও হোলিকার স্মৃতি রক্ষা করা হয়।

নেপালে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ধ্বজপতাকা-ভূষিত একটি কাঠের খুঁটি পোড়ানো হয়। নেপালীরা বলে, পুরাতন পুড়িয়ে তারা এইরূপে নূতনকে আবাহন করে। মীর্জ্জাপুরের দ্রবিড় অধিবাসীরাও এইরূপে কাঠের খুঁটি পোড়ানকে বলে সম্বৎ জলানা। কুমাউন জেলার লোকরাও একটা গাছ কেটে তার পাতা ছিঁড়ে ফেলে এবং বৃক্ষকাণ্ডটিকে ধ্বজ-পতাকায় অলঙ্কৃত ক'রে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। মাড়োয়ারীরা বাজারের মধ্যে একটা গাছপালার তৈরি মূর্ত্তি খাড়া করে; তার নাম নাথুরাম। তারা লাঠি মেরে মূর্ত্তিটা ভেঙ্গে ফেলে ও পরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

দাক্ষিণাত্যেও এইরূপ বহ্ন্যুৎসব করা হয়।

এই বহ্ন্যুৎসবের নাম সংস্কৃতে হয় চর্চ্চরী; তা থেকে বাংলা হয়েছে চাঁচর। এই চর্চ্চরী যে কোন্ ভাষার শব্দ ও এর যে কি অর্থ, তা নিশ্চয় নির্ণীত হয় নি। এর অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো বসন্তোৎসব। তা থেকে বসন্তোৎসবে গেয় গানের বিশেষ একটি সুরের নাম হয় চর্চ্চরী। বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে এই রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়।

রাজস্থানে হোলি হচ্ছে সূর্য্যের অয়ন-গতির উৎসব; কোনও কোনও যায়গায় নূতন ফসল জন্মের উৎসব।

ছোটা-নাগপুরের ওরাওঁ, মুণ্ডা, কোল প্রভৃতির কাছে এই উৎসবের নাম ফাগুয়া; এটি বসন্তোৎসব। তারা এই উৎসবের একটি কবিত্বপূর্ণ নাম দিয়েছে—একে তারা বলে "ফুল-খুশী পরব।" যখন শালের বনে ফুল ফোটে, তখন পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের বিয়ে হয়; শালবনে (সরণায়) তারা সারহুল (শাল ফুল ফোটার উৎসব) করে; তারা ফুলবনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গান করে—

হায় রে কেঁওদ গোঁসাই,
হায় রে সারনা গোঁসাই,
হায় রে সারহুল মানোয়,
হায় রে ফাগু মানোয়,
হিও-হি দল দল,
হিও-হি দল-দল!
ওগো গাব-গাছের দেবতা,
ওগো শালবনের দেবতা,
শালফুল ফোটার উৎসব এসেছে,
ওগো ফাগুন এসেছে।
এসো ওগো এসো, আমরা খেলা করি,
এসো ওগো এসো, আমরা উৎসব করি!

শাহরাণপুরে এক বিশেষ সুরের হোলি গানকে সাঙ্গ বা স্বাঙ্গ বলে; চমোলা নামেও তার পরিচয় দেয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে অম্বারাম নামে এক গুজরাটী ব্রাহ্মণ এই গান প্রচলন করেন। এখন স্থানীয় কবিদের মধ্যে এই গান রচনার প্রতিযোগিতা চলে।

পঞ্জাবে ফসলের কুশলকামনায় হোলির দিন দ্বারের দুই পার্শ্বের দেয়ালে লাল ও হল্‌দে রঙে স্বস্তিক-চিহ্ন আঁকা হয়।

দোলযাত্রা, হোলি বা ফল্‌গুৎসব যখন নূতন আবির্ভাবের উৎসব হলো, প্রকৃতির উজ্জীবন-শক্তির উৎসব হলো, তখন সেটা সহজেই মানুষেরও সেই শক্তির উৎসব হয়ে দাঁড়ালো। এর নাম হলো মদনমহোৎসব। রত্নাবলী নাটক এই উৎসবের বর্ণনা দিয়েই আরম্ভ হয়েছে—

"বৎসরাজ্যে আজ বসন্তোৎসব। প্রকীর্ণ আবির-কুঙ্কুমপুঞ্জে দশদিক পিঙ্গলবর্ণ ধারণ ক'রে লোহিত-পীতবর্ণ-সমুৎপাদক দিবসপ্রারম্ভের অনুকরণ করছে; আনন্দিত নরনারীর করতালিতে রাজপথ মুখর হয়ে উঠেছে; মধুমত্ত কামিনীরা ফণাকৃতি পিচ্‌কারী-মুখে রঞ্জিত জল নিক্ষেপ ক'রে নৃত্যপরায়ণ নাগরজনদের তাড়না করছে।·····ধারাযন্ত্র-নির্ম্মুক্ত জলপ্রবাহ দ্বারা সকল দিক্ আপ্লাবিত হওয়াতে পথের কর্দ্দম পর্য্যন্ত সিন্দূরবর্ণ হয়েছে এবং তার উপর বিচরণ করাতে সকলের চরণ অলক্তক-রঞ্জিতের ন্যায় বোধ হচ্ছে।·····ঋতুরাজের আগমনে নরনারী নিজেদের অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেছে, তারই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ এই মহামহোৎসব।"

সেই উৎসবে মকরন্দোদ্যানে বিকশিত-কুসুম রক্তাশোক-বৃক্ষতলে কুসুমায়ুধকে রাজমহিষী পূজা করেন। এখনও কাঠিয়াওয়াড়, মধ্যপ্রদেশের রাজনগর, ওড়িষার কেন্দ্রপাড়া, মুর্শিদাবাদ ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে এক জন লোক রাজা সাজে এবং তাকে ঘিরে লোক রঙ্গভঙ্গ করে। এই দূর দূরদেশে একই প্রথা বিদ্যমান থাকাতে এই অনুমান হয় যে, এককালে এই প্রথা সার্ব্বভৌম ছিলো।

এই মদনোৎসব যখন লজ্জাজনক হয়ে উঠলো, তখন মদন শব্দের বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিয়ে এর নাম হলো দমনকোৎসব—অর্থ একই রইলো। পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে দমনকোৎসবের ব্যবস্থা আছে। পদ্মপুরাণ বল্‌ছেন, দোলা টাঙিয়ে কৃষ্ণকে দোল দেবে; এই কৃষ্ণ গোপীবল্লভ এবং কামদেবের জনক; তিনিই আবার শ্যামসুন্দর—শ্যামল উদ্ভিদের নয়নলোভা শোভা। কৃষ্ণের সঙ্গে রতি ও মদনেরও পূজাবিধি—

"গুর্ব্বাজ্ঞয়া প্রকুর্ব্বীত পূজনং রতিনা সহ।
কামদেব নমস্তেঽস্তু বিশ্বমোহনকারক॥"

—পদ্মোত্তর ৮৩।৮৪ অধ্যায়।

এই পূজার একমাত্র নৈবেদ্য কদলী; এই কদলী যে কিসের প্রতীক, বুঝতে পারা যাবে—রমণীর এক নাম কদলীক্ষতা থেকে।

পূজা করতে হবে দেবানন্দসমুদ্ভূতা দিব্যা দমনমঞ্জরী দিয়ে, এবং কৃষ্ণের ধ্যান করতে হবে—"গোপীজন-মুখাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রত" রূপে।

স্কন্দপুরাণেও এই উৎসবের নাম দমনকোৎসব। সেখানে দোলায় বিষ্ণুর সঙ্গে শিব-প্রতীককেও স্থাপন করবার ব্যবস্থা আছে—

"চতুর্দ্দশী-দিনে হস্ত-নক্ষত্রে হর্ষণাভিধে।
যোগে চৈত্রে সিতে পক্ষে আসীদ্ দমনকোৎসবঃ॥
অত্র সৌবর্ণ-দোলায়াং লিঙ্গ আরোপিতে জনৈঃ।
নিশায়াম্ অধিরূঢ়াংং দোলাং তাঞ্চ ব্যচালয়ন্॥"

—স্কন্দপুরাণ।

লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় দোলযাত্রার দিন দারুময় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করে ও তার মধ্যে কামের অঙ্কারূঢ়া রতির মূর্ত্তি স্থাপন ক'রে পূজা করে। নরনারী সেই মন্দিরের সম্মুখে নৃত্যগীত করে ও অগ্নি প্রজ্বালিত করে।

মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মোত্তরখণ্ডের নাম শিবলীলামৃত। সেই পুরাণে আছে যে, তারকাসুর ও তার তিন ছেলে প্রবল হয়ে উঠলে দেবতারা অস্থির হয়ে ওঠেন; তারকাসুরকে বধ করতে পারবেন একমাত্র শিবপুত্র। শিব তখন বিপত্নীক হয়ে ধ্যানমগ্ন। মদন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে হরকোপানলে ভস্ম হয়ে গেল। সে দিন ছিলো ফাল্গুনী পূর্ণিমা। মদনের পরাভব ও শিবের জয় দেখে নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণ আনন্দে অধীর হয়ে অশ্লীল নৃত্যগীত ও গালাগালি করেছিলো। শিব বল্‌লেন, এই উৎসব প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠিত হবে।

পূর্ব্বে মাস ও বৎসর পূর্ণিমাতে ধরা হতো; পরে অমান্ত ধরা হ'তে লাগলো। তখন ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যায় বৎসর শেষ হ'তে লাগলো। সেই অমাবস্যার নাম হলো মহাশিবরাত্রি (New Year's Eve)—শিবরাত্রি বা শুভরাত্রির অবসানে নূতনের আবির্ভাব হবে। এইরূপে কার্ত্তিক মাসের দীপালী অমাবস্যায় এক কালের বৎসর শেষ হতো। তার পরের পূর্ণিমায় কৃষ্ণের রাসযাত্রা। রাসপূর্ণিমার এক নাম ত্রিপুরী-পূর্ণিমা—এই দিন শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করেন—কার্ত্তিকেয় কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয়টি নক্ষত্রপুঞ্জ এবং তারকাসুর মৃগশিরা বা মৃগব্যাধ নক্ষত্রপুঞ্জ; যখন শারদবিষুব মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা হ'তে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় হ'টে

গেছিলো, সেই সময় তারকাসুর বধ হয়েছিলো। মতান্তরে দুর্গাদেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী; কারণ, ফল্গুনী নক্ষত্র সিংহরাশিতে অবস্থিত। এই জন্যে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে দোলযাত্রার এক নাম সিংগা অর্থাৎ সিংহ রাশির উৎসব।

ভিল জাতিও এই উৎসবকে সিংগা বলে। সে দিন ভিল স্ত্রীলোকরা ও পুরুষরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে নকল যুদ্ধ করে, গুলাল বা আবীর ছুড়ে এবং মদ খেয়ে মাতলামী করে। ভিল স্ত্রীলোকরা সেদিন পুরুষ দেখলেই অশ্লীল রসিকতা করে। কোনও কোনও ভিলসম্প্রদায় দোলের আগুন সমস্ত বছর জীইয়ে রাখে।

মধুরাতেও নরনারীর নকল যুদ্ধ হয়ে থাকে।

গুজরাটের কুমারীরা বহ্নুৎসবের স্থানে হোলির ১০।১২ দিন পরে এসে সেই স্থানটির পূজা করে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে কানাড়ীরা এই উৎসবকে বলে কামন্নান হব্বু অর্থাৎ কামের হবন বা কামদেবের যজ্ঞ। আরও দক্ষিণের লোকরা একে বলে কাম-পাণ্ডীয় বা কাম-দহনম্, কন্নড় পাড়ুগাই, তামিল দেশে এর নাম।

দোলযাত্রা এত লোকপ্রিয় উৎসব যে, এ কেবল ফাল্গুন মাসে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। চৈত্র মাসের নাম মধুমাস; বৎসরের নাম মাধব-মাস; এই দুই মাসেও উৎসব হয়; এই উৎসবের নাম চন্দনযাত্রা, চন্দনীয় পুষ্পদোলযাত্রা। এই উৎসবে গোপীবেষ্টিত কৃষ্ণকে পূজা করতে হয়—

"ওঁ অরেদেবুন্দাবনে রম্যে মোহনস্তম্ভনারতন্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।"

এবং এই পূজার মন্ত্র বলতে হয়—

"ওঁ কামবীজায় কীলকায় নমঃ।"

মুসলমান বিজয়ের পর সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে মুসলমান রাজা ও তাঁদের দেখাদেখি আমীর-ওমরাহ এই উৎসব পালন করতেন। লাহোরবাসী মুহম্মদ হুসেন আজাদ কর্ত্তৃক লিখিত দরবার-আকবরী নামক পুস্তকে আকবরের দরবারের হোলি খেলার বিবরণ আছে। এই ব্যাপারের একটি চিত্রও অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

ইন্‌শা-ই-মীর তাকী পুস্তকে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে হোলি উৎসবের বর্ণনা আছে।

শুজা-উদ্দৌলা হোলির উৎসব করতে ও লোকের গায়ে রং দিয়ে সং বানাতে খুব ভালবাসতেন।

সয়ের-উল-মুতাক্ষরীন গ্রন্থে তৎকালের হোলির বিবরণ আছে—সেই উৎসবে বহ্নুৎসব হতো এবং নরনারী কাদা রং মেখে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় উন্মত্তবৎ আচরণ করতো।

কর্ণেল টডের রাজস্থানের ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথ রাজপুত-মহিষীর নিমন্ত্রণে পাঠান-সেনাপতির হোলি খেল্‌তে গিয়ে দুর্দ্দশার কথা কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

মুসলমানরা যে এই উৎসবে প্রবৃত্ত হ'তে পেরেছিলেন, তার কারণ পারস্যদেশে নূতন বৎসরের শুভাগমনে নওরোজ উৎসব হতো। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি ফার্সী কবিতার অনুবাদ করেছেন—"নওরোজের গান।" এই উৎসবের মধ্যেও ভালো ফসল পাওয়ার আর নরনারীর মিলনের কামনা জড়িয়ে ছিলো—

* * * * *

হাজির হলো নূতন বছর ক্ষেতে খামারে,
ঘোড়া কোথায় বাঁধ্‌বো এখন বল্ তা আমারে।
নওরোজে আজ খোস মেজাজে না দিলে বক্‌শিস্,
গমের ক্ষেতে বাঁধ্‌বো ঘোড়া, কাঁদ্‌বে যবের শীষ।

* * * *

গিয়েছিলাম সাঁকোর দিকে সকালে পায় পায়,
দেখেছিলাম কুর্দ্দি মেয়ে কুর্ত্তি-পরা গায়,
সেই থেকে মন হলো কেমন—যেনো আপন নয়,
নওরোজে এই নূতন দিনে হোক তোমাদের জয়!

* * * *

বন্ধু ওগো বন্ধু তোমার ঠোঁট দুখানি বেশ,
ঠোঁটের উপর তিলটি কালো, কালো মাথার কেশ।

* * * *

পাহাড়তলীর বিবি মোদের সুর্ম্মা-আঁকা চোখ,
ভগবানের দোহাই তোমার একটি গোকা হোক।
সুরবাহারীর কন্যা ওগো কণ্ঠে কুঁচের হার,
নওরোজের এই নূতন হাওয়ায় যন্ত্রে চড়াও তার!

শুধু ভারত ও পারস্য কেন, সকল দেশেই নূতনের অভ্যুদয়ে আনন্দোৎসব হয়েছে, হচ্ছে ও হবে—এটি মানবমনের চিরন্তনী প্রকৃতি। প্রাচীন ব্যাবিলনে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব-দিন থেকে নববৎসর গণনা হতো এবং সেই দিন হোলি-উৎসবের ন্যায় উৎসব হতো। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও এইরূপ বহু উৎসব হতো—Lupercalia Festa উর্ব্বরা শক্তির দেবতা

Lupercus বা প্যানের উৎসব, Matronalia Festa মাতৃত্বের উৎসব, Anna Perenna চিরন্তন বৎসরের উৎসব, Saturnalia ও Bacchanalia কামদেবের উৎসব, Festum stuttorum ও Carnival সং সেজে রঙ্গব্যঙ্গ করার উৎসব। প্রাচীন য়িহুদিদের Passover উৎসবও কতকটা এই শ্রেণীর—এই উৎসবে মেষ বলি দিয়ে তার চামড়া ছাড়ানো হতো এবং সেই রক্তবর্ষী চামড়া গায়ে মুড়ি দিয়ে আর চামড়ার এক চাবুক হাতে ক'রে লোক উদ্দাম নৃত্য করতো; লোকের বিশ্বাস ছিলো যে, ঐ চাবুকের মার খেলে বন্ধ্যার সন্তান হয়, অপুত্রবতীর পুত্রলাভ হয়। এই রক্তমাখা শেষকালে রং মাখাতে পর্য্যবসিত হয়েছিলো!

এই সব পর্ব্ব নূতনের জন্মোৎসব হওয়াতে এদের অধিপতি হয়ে ওঠে মদন এবং তার পরিণাম হয় কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী ক'রে নৃত্য ও অশ্লীল গালাগালি ও গান। এই সব উৎসব-এক সময় এমন কদর্য্য অশ্লীল হয়ে উঠেছিলো যে, ১৮৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে রোমের সেনেট আইন ক'রে এ সবের অনুষ্ঠান বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। Bacchanalia Carnival উৎসবের বিবরণ এক জন প্রাচীন কবি Neo Georges দিয়ে গেছেন—

Then old and young are both as much as guests of Bacchus' feast,
And four days long they tipple, square, and feede and never rest.
The tongue is set at libertie, and hath no kind of stay,
All things are lawful then and done, no pleasure passed by.
No matron olde nor sober man can freely by them come.

এই সব উৎসবের অবশেষ এখনো সকল দেশে আছে। ইংরেজদের All Fools Day, ইটালীর Carnival এবং আমাদের দেশে চৈত্র-সংক্রান্তিতে সং সেজে মিছিল ক'রে শোভাযাত্রা হয়। পশ্চিমারা এখনো হোলির সময় সং সেজে বাড়ী বাড়ী পয়সা আদায় ক'রে বেড়ায়। রোমের Anna Perennaই আমাদের অন্নপূর্ণা কি না, কে বলবে? এই বসন্তকালে মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা পূজার নাম বাসন্তী পূজা।

মদনমহোৎসবের অশ্লীল আচরণ পশ্চিমাঞ্চলে এখনো পূরা দস্তুর আছে; রোমের সেনেটের মতন সে দেশের গভর্ণমেণ্ট তা এখনো বন্ধ ক'রে দেন নি। বাংলা দেশ অনেকটা সভ্য হয়ে বেলেল্লাপনা ছেড়েছে এবং অশ্লীল মন্ত্র উচ্চারণ করবার ভার পুরোহিতের উপর দিয়ে গৃহস্থ শুচি হয়েছে এবং সুখের ও দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ পুরোহিতই মন্ত্রের অর্থ বোঝে না বা বুঝতে পারলেও গূঢ় অর্থের দিকে লক্ষ্য করবার মত মনীষা তাদের নাই।

Science of Mythology নামক পুস্তকে মোক্ষমূলর লিখে গেছেন,—

The birth of the New Year and the death of the Old, were still celebrated in Germany when I was a boy. . . . those who celebrate them are hardly aware whether these festivities are of Christian or pre-Christian origin. . . . winter or the dying year is conceived as an old man or an old woman.

এই বৃদ্ধাই আমাদের দেশের হোলিকা রাক্ষসী।

সাধারণ নরনারীর কাছে হোলি, দোলযাত্রা, ফাগুয়া অশ্লীলতার উৎসব হয়ে উঠলেও মধ্যযুগের সাধক-সাধিকারা এই উৎসবের মধ্যে পরম আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও আনন্দ উপলব্ধি ক'রেছিলেন। আমি সেইরূপ কয় জন ভক্তের বাণী শুনিয়ে আমার কথার উপসংহার করি।*

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

* The journal of the Anthropological Society of Bombay, 1924, Vol. XIII, No. 2 Articles by B. Nirmal Kumar Basu and S. S. Mehta; Pandit Amulyacharan Vidyabhusan Jnanasagar's article on Holi in Vidyasagar College Magazine: রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বিজ্ঞানভূষণের দোলযাত্রার উৎপত্তি প্রবন্ধ ১৩৩২ সালের ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা থেকে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছি। প্রবন্ধের শেষে মহাজন-পন্থারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ থেকে নেওয়া। এঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

কবীর (১৩৯৮)

খেলো নিত মংগল হোরী,
নিত বসংত নিত মংগল হোরী।

(নিত্য নিত্য মঙ্গলের হোলী খেলো, নিত্যই বসন্ত, নিত্যই মঙ্গলের বসন্তোৎসব করো)।

ভক্তি-ভার ছিড়্‌কো সাহিব পৈ
সুফল জন্ম্‌ নরনারী।

(স্বামীর উপরে ভক্তিভাব ছিটিয়ে দাও, সকল নরনারী আপন আপন জন্ম সফল ক'রে নাও)।

মানুষ-তন পায়ো বড়ে ভাগ।
অব বিচারকে খেলো ফাগ॥

(বড় ভাগ্যে মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছো, এখন সচেতন হয়ে ফাগ খেলো)।

বিন জিহ্বা গাবৈ গুণ রসাল।
বিন চরণ নাচৈ অহদ চাল॥

(যেখানে জিহ্বা বিনা রসাল গুণগান হচ্ছে, চরণ বিনা অসীম নৃত্য চলছে)।

বিন কর বাজা বজে বৈন।
নিরখ দেখ জহঁ বিন নৈন॥

(যেখানে যন্ত্র ব্যতীত ও হস্ত ব্যতীত বীণা বাজছে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিনা নয়নে এই লীলা প্রত্যক্ষ করো)।

বিনহী মারে মৃতক হোয়।
বিন জারে হোয় খাক সোয়॥

(যেখানে মৃত্যু বিনাই সকলে মরণ লাভ করেছে, দাহ বিনাই সকলে ভস্ম হয়ে আছে)।

বিন মাংগে বিন জাঁচে দেয়।
সো সালিম বাজী জিত লেয়॥

(না চাইতেই, না যাচ্‌তেই যে দিতে পারে, পরিপূর্ণ বাজী সেই জিতে নেয়)।

বিন দীপক বরৈ অখণ্ড জোত।
পাপ পুন্ন্‌ নহিঁ লাগে ছোত॥

(দীপ বিনা অখণ্ড জ্যোতি উদ্ভাসিত, পাপ-পুণ্যের স্পর্শের অতীত সেই স্থান)।

চন্দ্র সুর নহিঁ আদি অংত্‌।
তহঁ কবীর খেলৈ বসন্ত্‌॥

(যেখানে চন্দ্র-সূর্য্য নেই, যেখানে আদি-অন্ত নেই, সেখানে কবীর বসন্তের উৎসব করো)।

খেলে সাধ সদা হোরী।
তহঁ দ্বন্দ্ব উপাধি নহী থোরী॥

(যেখানে সাধক নিত্য হোলী খেলেন, সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, উপাধি নেই, দৈন্য নেই)।

তাল মূল সুর সদা বাট ধরি।
পচ্ছিম দিসা পর বাজৈ হোরী॥

(যেখানে আদি-তাল ও মূল-রাগ চিরন্তন পথে যাত্রা ক'রে পশ্চিম দিকে বসন্তোৎসবের সঙ্গীতে পূর্ণ করেছে)।

খোল কপাট সহজ ঘর পায়া,
সুন্দর রূপ সুরত গোরী।

(দ্বার খুলে আমি সহজের ঘরের সন্ধান পেয়েছি, সেই সহজের কি সুন্দর রূপ, কিবা তার গৌর কান্তি)!

নির্ত্ত সখী, চতুর সব গাবৈ।
বাজত তুরহী দৈ দৈ তারী॥

(চতুরা সখীরা নৃত্য-গীত করছে, সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে বাঁশী বাজছে)।

ছিড়কত চীর রংগ্‌ চিত্‌ চংচল্‌।
প্রেম-কেসর ভরি পিচুকারী॥

(প্রেম-চঞ্চল চিত্ত পিচকারীর মধ্যে প্রেম-জাফরাণের রং ভ'রে কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিচ্ছে)।

সুর নর মুনি তঁহ হোত কুলাহল
গীত গুলাল উড়ত ভারী।

(সুর নর মুনিরা সেখানে আনন্দ-কোলাহল করছে—প্রীতির রং যে খুব উড়েছে)।

কোই নিরগুন কোই সরগুন রাচা
আপ বিসারি চলে সবহী।

(কেউ তাঁকে নির্গুণ কল্পনা করছে, কেউ বলছে তিনি সগুণ; আসল আত্মাকে সকলে ভুলেই চলেছে;)

কহৈ কবীর চেত নর প্রাণী
জুকত অতীত মিলৌ অবহী॥

(কবীর বলেন, হে প্রাণবান্ নর, যিনি বিশ্বের সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুক্ত অথচ বিশ্বাতীত, তাঁর সঙ্গে এখন মিলিত হও)।

মন মিলি পিতমরা খেলো হোরী॥
(হে মন, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলে হোলী খেলো)।

সংসয় সকল জাত ছিন মাঁহী
আবা গবন-কে ফংদা তোরী।

(আসা-যাওয়ার বন্ধন ছিঁড়ে যাবে, সকল সংশয় দূর হয়ে যাবে)।

চিত চংচল অস্থির করি রাখো।
সুরত নিরত কর এক ঠৌরী॥

(চঞ্চল চিত্তকে স্থির ক'রে নাও, এবং প্রেম ও বৈরাগ্যকে এক আধারে স্থাপন করো)।

বাজত তাল মৃদংগ ঝাঁফ ডফ।
অনহদ ধুনকৈ ঘন ঘোরী॥

(মৃদঙ্গ, জগঝম্প, দফ ঘন ঘোর রবে অসীম সঙ্গীতের তালে তালে বাজছে)।

আবত রাগ সবৈ অনুরাগী।
সার সুর অন্তর মোরী॥

(সব রাগ-রাগিণী অনুরাগ-ভরে আমার অন্তরে সার সুর নিয়ে আসছে)।

অগর বাস মহকৈ চহুঁ ওরী।
সেত অবীর লৈ ভরি ঝোরী॥

(চারিদিকে অগুরু-গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আমি অরূপ আবীর মন-ঝুলিতে ভ'রে নিয়েছি)।

অজর অমর ফগুবা নিত পাবৈ।
কহৈ কবীর গয়ে জমজোরী॥

(অজর অমর নিত্য বসন্তোৎসবের সন্ধান আমি পেয়েছি। কবীর বলেন—এইবার যমের সব জারিজুরি ঘুচলো)।

তুম ঘট বসন্ত খেলো সুজান।
সত্ত শব্দমেঁ ধরো ধ্যান॥

(তোমার অন্তরে সেই অন্তর্যামী বসন্তোৎসব করছেন ; তাঁর সত্য স্বরূপকে তুমি ধ্যানে ধারণ করো)।

কহৈঁ কবীর সুখ ভয়ো ভোগ।
এক প্রেম বিনা সকল রোগ॥

(কবীর বলেন—সুখভোগ ত খুবই হলো, এক প্রেম বিনা সবই রোগস্বরূপ)।

আঁধর কর রাখে সবহিন্‌কো
নৈনন ডার অবীর।
চীন্‌হো রে নর প্রাণী বাকো
নিসদিন চেতত গভীর॥

(সকলের চক্ষুতে শোভার আবীর দিয়ে যিনি সকলকে অন্ধ ক'রে রেখেছেন, হে প্রাণবান্ নর! তুমি গভীর চেতনার মধ্যে তাঁকে চিনে নাও।)

শরীর মহলমেঁ বাজা বাজে
হোত ছতীসোঁ রাগ।
সুরত সখী জঁহ দেখ তমাশা
বালম খেলৈঁ ফাগ॥

(আমার শরীরমহলে বাদ্য বাজছে, ছত্রিশ রাগিণী ঝঙ্কৃত হচ্ছে ; আমার সখী প্রীতি এই তামাসা দেখ্‌ছে, আজ বল্লভ ফাল্গুন-খেলায় মেতেছেন্।)

আপ্‌নে পিয়া সংগ্ হোলী খেলৈঁ
লজ্জা ভয় নিবার।
সারা জগ্‌মে হোত কুতূহল
ঝরৈঁ রাগ অনুরাগ॥

(আমি লজ্জা ভয় ছেড়ে আপন প্রিয়তমের সঙ্গে হোলি খেল্‌ছি, সারা জগতে আজ কৌতূহল জেগেছে, আজ রাগ অনুরাগ ঝ'রে ঝ'রে পড়্‌ছে!)

কায়া-নগর মঁঝার
সাঁঝ খেলৈঁ হোরী।
গাব্‌ত রাগ সরস সুর সোহৈ
অতি আনন্দ্ ভয়োরী॥

(কায়া-নগরের মাঝে স্বামী হোলি খেল্‌ছেন ; সরস রাগিণী গাওয়া হচ্ছে, সরস সুর শোভা পাচ্ছে,—আজ অতিশয় আনন্দ এসে উপস্থিত হয়েছে রে!)

শরীর-মহলমেঁ বাজে বাজা
জগমগ জোত উজেরী।
সহজ রংগ রচ রহ্যো সকল তন
ছুটন নাহিঁ করেরী॥

(আমার শরীরমহলে বাদ্য বাজ্‌ছে, উজ্জ্বল জ্যোতি ঝকমক করছে, সকল তনু ভ'রে সহজ রঙ্গ রচিত হয়ে চলেছে, সেই আনন্দের আর অবসান নাই।)

অনহদ বাজে বজৈ মধুর ধুন
বিন করতাল তংবুরা।
বিন রসনা জঁহা রাগ ছতীসোঁ
হোত মহানন্দ পূরা॥

(বিনা করতাল তানপুরা অসীম রাগিণীর মধুরধ্বনি বাজ্‌ছে; বিনা রসনায় ছত্রিশ রাগিণী গীত হয়ে মহানন্দকে পূর্ণতা দান করছে!)

হামরেকো খেলৈ ঐসী হোরী।
পংথ নিহারত জনম সিরানা
পরঘট মিলে ন চোরী॥

(আমার সঙ্গে প্রিয়তম এমন হোরিই খেল্‌ছেন! পথের পানে চেয়ে চেয়ে জন্ম কেটে গেলো, তবু লুকোচুরি ধরা পড়্‌লো না!)

শ্রবন ন সুনেব, নৈন নহিঁ দেখেব,
প্রাণন প্রাণ লগাব্‌বরী॥

(যাক, এখন কানেও তাঁকে শুনতে চাই না, নয়নেও তাঁকে দেখ্‌তে চাই না, একেবারে তাঁর প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ মিলাতে চাই!)

মেরে সাহব আয়ে আজ
খেলন ফাগরী॥

(আজ আমার প্রভু আমার সঙ্গে বসন্তোৎসব করতে এসেছেন!)

বাণী বিমল সগুন সব বোলে,
অতি সুখ মংগল রাগরী।

(আজ বাণী পবিত্র শোভন মঙ্গল রাগ গান করছে।)

চাচর সরস সখা সংগ বোলে
অনহদ বাণী রাগরী॥

(সখার সঙ্গে মিলনের সরস বসন্তোৎসবে অসীমের বাণী অসীমের রাগিণী বাজ্‌ছে!)

শব্দ সুনত অনুরাগ হোত হৈ
ক্যা সোবে্ উঠ জাগরী।
পানী আদর পব্‌ন বিছৌনা,
বহুত করৈঁ সনমানরী॥

(সেই সঙ্গীত শুনেই অনুরাগসঞ্চার হয়, তুমি কেন শুয়ে আছো, জেগে উঠো। ঐ দেখো, জল তোমার প্রতি আদর হয়ে এবং পবন তোমার বিছানা পাতা হয়ে তোমাকে বহুতর সম্মান করছে)!

প্যারে হম ঘর কন্ত সুজান
খেলোঁ রঙ্গ হোরী।
জনম-জনমকী মিটী হৈ কল্পনা
পায়ো জীবন প্রাণ রী॥

(হে বন্ধু, আজ আমার ঘরে সুরসিক কান্ত এসেছেন, আমি আজ রঙ্গে হোলি খেল্‌যো। জন্ম-জন্মান্তরের সাধ আজ মিটেছে, আজ জীবন পেয়েছি, প্রাণ পেয়েছি রে!)

বাজত তালে মৃদঙ্গ ঝাঁফ ডফ
অনহদ শব্দ গুলজার রী।

(তালে তালে মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডফ বাজ্‌ছে, অসীম সুর আজ ফুলের মত ফুটে উঠেছে রে!)

খেলন চলী পংথ প্রীতমকে
তনকী তপন গঈ রী।
পীতম মিল, আপ বিসরায়ো,
লাগো খেল অপার রী।
সুখ-সাগর অসনান কিয়ো হৈ
ফগুব্‌া পায়ো কবীর রী॥

(প্রিয়তমের পথে আজ খেল্‌তে এসেছি, তনুর তাপ জুড়িয়ে গেছে রে; প্রিয়তম এসে মিলেছেন, আপনাকে বিস্মৃত হয়েছি, অপার খেলা লেগে গেছে! কবীর সুখ-সাগরে স্নান করেছেন—আজ তিনি বসন্তকে পেয়েছেন!)

কৈসে হোরী খেলোঁ পিয়া সংগ
দুবিধা রার মচায় রহী রে।

(কেমন ক'রে প্রিয়তমের সঙ্গে হোলি খেল্‌বো, দ্বিধা যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে!)

তীনো তাল মৃদঙ্গ্ বজাবৈ
মৈঁ মৈঁ রাগিণী ছায় রহী রে।

(উচ্চ, নীচ, মধ্যম তিন তালেই মৃদঙ্গবাদ্য থেকে কেবল আমি আমি ধ্বনিই আমাদের মিলনকে আচ্ছন্ন করছে!)

নাচত লাজ কর্ম্মকে আগে
সংসা ভাব বজায় রহী রে।

(কর্ম্মকে পশ্চাতে রেখে লজ্জা সম্মুখে নৃত্য করছে, সংশয় সেই তালের সঙ্গে তাল বাজাচ্ছে।)

আপা কটোরা মদ বিষ ভরি ভরি
তৃষ্না মনকো ছকায় রহী রে।

(অহমিকার পাত্রে মদবিষ ভ'রে ভ'রে তৃষ্ণা মনকে ছলনা করছে!)

দাস কবীর কহৈঁ কর জোরী
হমরী তো ঐসিহী বীত গঈ রে॥

(দাস কবীর করযোড়ে বলছেন—আমার জন্ম ত এমনই করেই কেটে গেলো!)

চাচর খেলো হো সমঝ
মন চাচর খেলো॥

(ওরে মন, সচেতন হয়ে বসন্তোৎসবে প্রবৃত্ত হও, সচেতন হয়ে প্রেমের খেলা খেলো!)

চাচর খেলো কংত মিলি
চিত চরণ লগাই।
সত সংগত সত ভাব করি
সুখ মংগল গাই॥

(কান্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে হোলি খেলো, তাঁর চরণে তোমার চিত্ত নগ্ন করো। সত্যের সঙ্গ করো, সত্যকে ভাবনা করো, আনন্দ-গীত গীত করো।)

জনম জনম ভরমত রহো
জীব নেক ন বুঝেব।
কামনাকে ভীড়মেঁ
নিজ খেল ন সুঝেব॥

(হে জীব, জন্ম জন্ম ঘুরে মরছো, তবু কল্যাণকে চিন্‌লে না। কামনার ভীড়ের মধ্যে নিজের প্রেম-খেলা ত তোমার চোখেই পড়্‌লো না!)

* * * *

তীন লোক চাচর রচী,
ভুলোঁ ভ্রম মায়া।
সেবককো সেবা করোঁ
সাহিব বিসরায়া॥

(তিন লোকে—স্বর্গে মর্ত্যে অন্তরীক্ষে—বসন্তের উৎসব রচিত হচ্ছে, তুমিই কেবল মায়াভ্রমে ভুলে রইলে! প্রভুকে বিস্মৃত হয়ে তুমি সেবকের সেবা করছো।)

* * * *

খেলো সুরত সম্হারিকে
প্রীত পতি উর রাখো।
প্রেম-মগন রহো প্যারসোঁ
অমৃত-রস চাখো॥

(সাবধান হয়ে প্রেমের খেলা খেলো, পতির প্রতি প্রীতি রাখো, প্রিয়তমের প্রেমে মগ্ন থাকো এবং অমৃতরস আস্বাদন করো।)

প্রীত সন্তোষকী অর্গজা
সব অংস লগাবো।
সকল জগত ছায়কে
অবীর গুলাল উড়াবো॥

(প্রীতিসন্তোষের সুরভি সুগন্ধ সকল অঙ্গে লাগাও, আর সকল জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে আবীর গুলাল উড়াও।

নাচৈ নবেলী নারী
সবৈ মিলিকে ইক ঠৌরা।
চাচর খেলো প্রীতসোঁ
ছুটে সব ঔরা॥

(এক স্থানে মিলিত হয়ে নব-যুবতী নারীরা (নূতন ভগবদ্‌ভক্তরা) নৃত্য করছে, প্রিয়তমের সঙ্গে বসন্তের খেলা খেলো,—আর সব দূরে যাক্।)

পিচুকারী ভরু অগর বাস
খেলো পিয় সংগা।
মহকৈ বাস সুবাস
খেল লাগে অতি রংগা॥

(অগুরু সুবাস পিচকারীতে ভ'রে প্রিয়ের সঙ্গে খেলা করো, সুবাস ছড়িয়ে পড়্‌ছে, বিচিত্র রঙ্গে বসন্তের খেলা আরম্ভ হয়েছে।)

* * * *

কহৈঁ কবীর বিচারকে
ছাঁড়ো সব আসা।
ঐসী চাচর খেলই
প্রভু বনৈ দাসা॥

(কবীর বিচার ক'রে বল্‌ছেন—সব তৃষ্ণা ত্যাগ ক'রে এমন বসন্তের খেলা খেলো যে, প্রভু তোমার দাস হয়ে যান!)

মীরা (১৪৯৯)

হোলী পিয়া বিন মোহিঁ ন ভাবৈ,
(প্রিয় বিনা হোলী আমার ভাল লাগে না।)
ঘর আঁগন ন সুহাবে।
(এ গৃহ-অঙ্গনের তো শোভা হবে না।)

দীপক জোয় কহা করূঁ হোলী,
(দীপ জেলে কি করবো ওলো সখী।)
পিয় পরদেশ রহাবে॥
(প্রিয় যদি বিদেশেই থাক্‌বে।)

সূনী সেজ জহর জুঁ লাগে
(শূন্য শয্যা বিষের মতন লাগে।)
সুসক সুসক জিয়ে জাবে
(শুযে শুযেই জীবন যাবে)

নীঁদ নৈন নাহি আবে।
(নয়নে নিদ্রা আসে না)
কব কী ঠাঢ়ী মৈঁ মগ জোউঁ
(কত দিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে থাকি,)
নিস দিন বিরহ সতাবে।
(নিশিদিন বিরহ ব্যথা দিচ্ছে)
কহা কহুঁ কুছ কহত না আবে
(কি বল্‌বো আমি, কথা যে আসে না)
হিবড়ো অতি অকুলাবে।
(হৃদয় যে অতি আকুল হচ্ছে)
পিয় কব দরস দিখাবে ?
(প্রিয়তম কবে দর্শন দেবেন ?)
ঐসা হৈ কোই পরমসনেহী
(এমন কেউ পরমস্নেহময় আছে)
তুরত সঁদেসা লাবে ?
(সত্বর প্রিয়ের সংবাদ এনে দেয় ?)

ঐসী বিরিয়াঁ কব হোসী মোকুঁ
(এমন সময় কবে আমার হবে)
হঁস কর নিকট বুলাবে!
(প্রিয়তম হেসে হেসে আমাকে কাছে ডেকে নেবেন)

মীরা মিল হোলী গাবে!
(এবং মীরার সঙ্গে মিলে হোলি গান করবেন!)
ফাগুন-কে দিন চার রে
(ফাগুনের দিন যে এলো রে,)
হোলি খেল মনা রে!
(ওরে মন হোলি খেলা শুরু ক'রে দে!)
বিন করতাল পখাবজ বাজে
অহনদ কী ঝনকার রে!
(বীণা করতাল পাখোয়াজ বাজ্‌ছে, ওরে অনাহতের ঝঙ্কার উঠছে!)

বিন সুর রাগ ছত্তিসুঁ গাবে
(বীণার সুরে ছত্রিশ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে)
রোম রোম রংগসার রে!
(আমার রোমে রোমে রঙ্গ ভ'রে উঠছে!)

সীল সঁতোষ-কে কেসর ঘোলী,
প্রেম-প্রীতি পিচকার রে!
(শীলতা ও সন্তোষের জাফ্‌রাণী রং গুলে প্রেম-প্রীতির পিচ্‌কারী ছাড়ো।)
উড়ত গুলাল, লাল ভয়ে বাদল,
(ফাগ আবীর উড়্‌ছে, যেন লাল মেঘ করেছে)
বরসত রংগ অপার রে!
(এবং অপার রঙ্গ বর্ষণ হচ্ছে)
ঘট-কে সব পট খোল দিয়ো হৈঁ.
(মনের সব ঘোমটা আমি খুলে ফেলেছি)
লোকলাজ সব ডার রে।
(সব লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়েছি)
হোলী খেল প্যারী, পিয় ঘর আয়ে,
(ওরে প্রিয় মন, হোলি খেল রে, প্রিয়তম ঘরে এসেছেন!)
সোই প্যারী পিয় প্যার রে!
(হে প্রিয়, সেই প্রিয়তমকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নে!)
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণ কঁবল বলিহার রে!
(মীরার প্রভু ও নাগর গিরিধারী শ্যাম, বলি হারি তোমার চরণ-কমল!)



অমরনাথ



৩২

ঝরিয়ার রামগড় কয়লার খনিতে এঞ্জিনীয়ারের বাংলোতে এক দিন সন্ধ্যার পর অমরনাথ য়ুরোপীয়দিগের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। বাজি রাখিয়া ব্রিজ খেলা চলিতেছিল। অমরের পার্টনার ছিলেন খনির ম্যানেজার মিঃ গার্থ; আর এঞ্জিনীয়ার বেনসনের পার্টনার ছিলেন তাঁহার স্ত্রী মিরা। গার্থের পিতা বাঙ্গালী, মাতা বিলাতী। গার্থ বিলাতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজের সকল অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ণ ও নীল চক্ষু পান নাই। দেহশোভা না পাইলেও শিক্ষাবলে ম্যানেজারের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

চারি ব্যক্তির মধ্যে যখন খেলা চলিতেছিল, তখন সুরা-পানাদি যে চলিতেছিল না, এ কথা বলা যায় না। তবে পানটা য়ুরোপীয়দের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল—অমর বা মিরা সুরা স্পর্শ করেন নাই। গার্থ যতই হারিতেছিলেন, ততই তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তখন ঘন ঘন পাত্র উঠাইয়া কণ্ঠ ভিজাইতেছিলেন। তাসের পড়্‌তা বেনসনের দিকে এতই চলিয়াছিল যে, গার্থ আর সৎপথে থাকিতে পারিলেন না—তিনি ইঙ্গিত-ইসারায় অমরকে তাঁহার হাতের তাস জানাইতে লাগিলেন। অমর সে নীচ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাস খেলিতে লাগিলেন। গার্থের মেজাজ তাহাতে আরও উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যখন দেখিলেন, অমর তাঁহার ইঙ্গিত বারম্বার উপেক্ষা করিতেছেন, তখন তিনি রুক্ষভাবে কহিলেন, "তুমি খেলতে জান না, অমর বাবু।"

অম। তোমার মত খেলতে জানি না বটে।

গার্থ। কথাটার মানে কি ?

অম। তোমার ইচ্ছামত অর্থ ক'রে নিতে পার।

গার্থ। তুমি য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আগে বোধ হয় খেল নি ?

অম। তোমার মত য়ুরোপীয়ের সঙ্গে খেলি নি, এ কথা ঠিক।

গার্থ। মানে ?

অম। মানে কি, তুমি বুঝছ—প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য কর কেন ?

গার্থ বোতলের বিষ খুব খানিকটা ঢালিয়া লইয়া উদরে পাঠাইলেন। অমর দেখিলেন, ঝগড়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তার ঝগড়া করিবেন বলিয়া গার্থ পাত্র নিঃশেষ করিয়া মদ্যপান করিলেন। অমর তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গার্থ কহিলেন, "আমার কথাটার উত্তর দিয়ে যাও।"

অম। যথেষ্ট উত্তর দিয়েছি।

গার্থ। উত্তর যা দিয়েছ, তা বাঙ্গালীর উপযুক্ত। সাহস থাকে, খুলে বল।

অম। তবে খুলে বলছি—তুমি আমাকে হরতন দেখিয়ে ইঙ্গিত করলে সেটা খেলতে। আমি খেলতাম হরতন, কিন্তু তুমি দেখালে ব'লে আমি সেটা খেললাম না। এর পূর্ব্বে এক বাজিতে ডাকের সময়—

গার্থ। তুমি মিথ্যাবাদী—

অম। তুমি জোচ্চোর, ঠকিয়ে পয়সা নিতে চাও।

গার্থ আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "বাঙ্গালী জাতটাই মিথ্যাবাদী, আমি তোমাকে শিক্ষা দেব।"

অম। তা হ'লে আগে তোমার বাপকে শিক্ষা দেও গে।

গার্থ একটা গালি দিয়া ঘুসি উঠাইলেন। বেনসন ঝটিতি উঠিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন। গার্থ কহিলেন, "স'রে দাঁড়াও বেন্‌সন্, এই নিগারটাকে একটু শিক্ষা দি।"

বেন। নিগার অমর বাবু নয়, নিগার তুমি।

গার্থ। বেন্‌সন!

বেন। কি গার্থ ?

গার্থ। তুমি এখনই ক্ষমা চাও—

বেন। তোমার মত কুকুরের কাছে ক্ষমা চাইব ?

গার্থ। তবে তোমাকে এখান হ'তে তাড়াব।

বেন। তাড়াবার সামর্থ্য নেই তোমার।

গার্থ একটা কুৎসিত গালি দিয়া উঠিল। বেনসন আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া গার্থকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। আঘাতের উপর আঘাত—গার্থ ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার নাক-মুখ দিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। অমর জল আনিয়া রক্তাদি ধুইয়া দিলেন। গার্থ তখন অচৈতন্য। অনেক শুশ্রূষার পর তাঁহার যখন চৈতন্য হইল, তখন অমর তাঁহাকে বুকের উপর ফেলিয়া লইয়া চলিলেন। গার্থের বাংলো নিকটে; তথায় তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কেহই ছিল না। কাযেই অমরকে সমস্ত রাত্রি তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে হইল। ডাক্তার আসিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

প্রভাতে দেখা গেল, গার্থের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অমর পুনরায় ডাক্তার আনাইলেন। এ অবস্থায় ডাক্তারের যাহা সাধ্য, তিনি তাহা করিলেন। কিন্তু ভাঙ্গা দাঁত জোড়া দিতে না পারিয়া কৃত্রিম দন্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা দান করত প্রস্থান করিলেন। অমরও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে গার্থ কহিলেন, "আমি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি, চিন্তার আর কারণ নেই। কিন্তু অমর বাবু, আমার মনে বড় দুঃখ হচ্ছে যে, আপনাকে

DOUBLE COLOUR PALE

কহৈঁ কবীর বিচারকে
ছাঁড়ো সব আসা।
ঐসী চাচর খেলই
প্রভু বনৈ দাসা॥

(কবীর বিচার ক'রে বল্‌ছেন—সব তৃষ্ণা ত্যাগ ক'রে এমন বসন্তের খেলা খেলো যে, প্রভু তোমার দাস হয়ে যান!)

মীরা (১৪৯৯)

হোলী পিয়া বিন মোহিঁ ন ভাবৈ,
(প্রিয় বিনা হোলী আমার ভাল লাগে না।)
ঘর আঁগন ন সুহাবে।
(এ গৃহ-অঙ্গনের তো শোভা হবে না।)

দীপক জোয় কহা করূঁ হোলী,
(দীপ জেলে কি করবো ওলো সখী।)
পিয় পরদেশ রহাবে॥
(প্রিয় যদি বিদেশেই থাক্‌বে।)

সূনী সেজ জহর জুঁ লাগে
(শূন্য শয্যা বিষের মতন লাগে।)
সুসক সুসক জিয়ে জাবে
(শুযে শুযেই জীবন যাবে)

নীঁদ নৈন নাহি আবে।
(নয়নে নিদ্রা আসে না)
কব কী ঠাঢ়ী মৈঁ মগ জোউঁ
(কত দিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে থাকি,)
নিস দিন বিরহ সতাবে।
(নিশিদিন বিরহ ব্যথা দিচ্ছে)
কহা কহুঁ কুছ কহত না আবে
(কি বল্‌বো আমি, কথা যে আসে না)
হিবড়ো অতি অকুলাবে।
(হৃদয় যে অতি আকুল হচ্ছে)
পিয় কব দরস দিখাবে ?
(প্রিয়তম কবে দর্শন দেবেন ?)
ঐসা হৈ কোই পরমসনেহী
(এমন কেউ পরমস্নেহময় আছে)
তুরত সঁদেসা লাবে ?
(সত্বর প্রিয়ের সংবাদ এনে দেয় ?)

ঐসী বিরিয়াঁ কব হোসী মোকুঁ
(এমন সময় কবে আমার হবে)
হঁস কর নিকট বুলাবে!
(প্রিয়তম হেসে হেসে আমাকে কাছে ডেকে নেবেন)

মীরা মিল হোলী গাবে!
(এবং মীরার সঙ্গে মিলে হোলি গান করবেন!)
ফাগুন-কে দিন চার রে
(ফাগুনের দিন যে এলো রে,)
হোলি খেল মনা রে!
(ওরে মন হোলি খেলা শুরু ক'রে দে!)
বিন করতাল পখাবজ বাজে
অহনদ কী ঝনকার রে!
(বীণা করতাল পাখোয়াজ বাজ্‌ছে, ওরে অনাহতের ঝঙ্কার উঠছে!)

বিন সুর রাগ ছত্তিসুঁ গাবে
(বীণার সুরে ছত্রিশ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে)
রোম রোম রংগসার রে!
(আমার রোমে রোমে রঙ্গ ভ'রে উঠছে!)

সীল সঁতোষ-কে কেসর ঘোলী,
প্রেম-প্রীতি পিচকার রে!
(শীলতা ও সন্তোষের জাফ্‌রাণী রং গুলে প্রেম-প্রীতির পিচ্‌কারী ছাড়ো।)
উড়ত গুলাল, লাল ভয়ে বাদল,
(ফাগ আবীর উড়্‌ছে, যেন লাল মেঘ করেছে)
বরসত রংগ অপার রে!
(এবং অপার রঙ্গ বর্ষণ হচ্ছে)
ঘট-কে সব পট খোল দিয়ো হৈঁ.
(মনের সব ঘোমটা আমি খুলে ফেলেছি)
লোকলাজ সব ডার রে।
(সব লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়েছি)
হোলী খেল প্যারী, পিয় ঘর আয়ে,
(ওরে প্রিয় মন, হোলি খেল রে, প্রিয়তম ঘরে এসেছেন!)
সোই প্যারী পিয় প্যার রে!
(হে প্রিয়, সেই প্রিয়তমকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নে!)
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণ কঁবল বলিহার রে!
(মীরার প্রভু ও নাগর গিরিধারী শ্যাম, বলি হারি তোমার চরণ-কমল!)



অমরনাথ



৩২

ঝরিয়ার রামগড় কয়লার খনিতে এঞ্জিনীয়ারের বাংলোতে এক দিন সন্ধ্যার পর অমরনাথ য়ুরোপীয়দিগের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। বাজি রাখিয়া ব্রিজ খেলা চলিতেছিল। অমরের পার্টনার ছিলেন খনির ম্যানেজার মিঃ গার্থ; আর এঞ্জিনীয়ার বেনসনের পার্টনার ছিলেন তাঁহার স্ত্রী মিরা। গার্থের পিতা বাঙ্গালী, মাতা বিলাতী। গার্থ বিলাতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজের সকল অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ণ ও নীল চক্ষু পান নাই। দেহশোভা না পাইলেও শিক্ষাবলে ম্যানেজারের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

চারি ব্যক্তির মধ্যে যখন খেলা চলিতেছিল, তখন সুরা-পানাদি যে চলিতেছিল না, এ কথা বলা যায় না। তবে পানটা য়ুরোপীয়দের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল—অমর বা মিরা সুরা স্পর্শ করেন নাই। গার্থ যতই হারিতেছিলেন, ততই তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তখন ঘন ঘন পাত্র উঠাইয়া কণ্ঠ ভিজাইতেছিলেন। তাসের পড়্‌তা বেনসনের দিকে এতই চলিয়াছিল যে, গার্থ আর সৎপথে থাকিতে পারিলেন না—তিনি ইঙ্গিত-ইসারায় অমরকে তাঁহার হাতের তাস জানাইতে লাগিলেন। অমর সে নীচ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাস খেলিতে লাগিলেন। গার্থের মেজাজ তাহাতে আরও উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যখন দেখিলেন, অমর তাঁহার ইঙ্গিত বারম্বার উপেক্ষা করিতেছেন, তখন তিনি রুক্ষভাবে কহিলেন, "তুমি খেলতে জান না, অমর বাবু।"

অম। তোমার মত খেলতে জানি না বটে।

গার্থ। কথাটার মানে কি ?

অম। তোমার ইচ্ছামত অর্থ ক'রে নিতে পার।

গার্থ। তুমি য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আগে বোধ হয় খেল নি ?

অম। তোমার মত য়ুরোপীয়ের সঙ্গে খেলি নি, এ কথা ঠিক।

গার্থ। মানে ?

অম। মানে কি, তুমি বুঝছ—প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য কর কেন ?

গার্থ বোতলের বিষ খুব খানিকটা ঢালিয়া লইয়া উদরে পাঠাইলেন। অমর দেখিলেন, ঝগড়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তার ঝগড়া করিবেন বলিয়া গার্থ পাত্র নিঃশেষ করিয়া মদ্যপান করিলেন। অমর তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গার্থ কহিলেন, "আমার কথাটার উত্তর দিয়ে যাও।"

অম। যথেষ্ট উত্তর দিয়েছি।

গার্থ। উত্তর যা দিয়েছ, তা বাঙ্গালীর উপযুক্ত। সাহস থাকে, খুলে বল।

অম। তবে খুলে বলছি—তুমি আমাকে হরতন দেখিয়ে ইঙ্গিত করলে সেটা খেলতে। আমি খেলতাম হরতন, কিন্তু তুমি দেখালে ব'লে আমি সেটা খেললাম না। এর পূর্ব্বে এক বাজিতে ডাকের সময়—

গার্থ। তুমি মিথ্যাবাদী—

অম। তুমি জোচ্চোর, ঠকিয়ে পয়সা নিতে চাও।

গার্থ আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "বাঙ্গালী জাতটাই মিথ্যাবাদী, আমি তোমাকে শিক্ষা দেব।"

অম। তা হ'লে আগে তোমার বাপকে শিক্ষা দেও গে।

গার্থ একটা গালি দিয়া ঘুসি উঠাইলেন। বেনসন ঝটিতি উঠিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন। গার্থ কহিলেন, "স'রে দাঁড়াও বেন্‌সন্, এই নিগারটাকে একটু শিক্ষা দি।"

বেন। নিগার অমর বাবু নয়, নিগার তুমি।

গার্থ। বেন্‌সন!

বেন। কি গার্থ ?

গার্থ। তুমি এখনই ক্ষমা চাও—

বেন। তোমার মত কুকুরের কাছে ক্ষমা চাইব ?

গার্থ। তবে তোমাকে এখান হ'তে তাড়াব।

বেন। তাড়াবার সামর্থ্য নেই তোমার।

গার্থ একটা কুৎসিত গালি দিয়া উঠিল। বেনসন আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া গার্থকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। আঘাতের উপর আঘাত—গার্থ ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার নাক-মুখ দিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। অমর জল আনিয়া রক্তাদি ধুইয়া দিলেন। গার্থ তখন অচৈতন্য। অনেক শুশ্রূষার পর তাঁহার যখন চৈতন্য হইল, তখন অমর তাঁহাকে বুকের উপর ফেলিয়া লইয়া চলিলেন। গার্থের বাংলো নিকটে; তথায় তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কেহই ছিল না। কাযেই অমরকে সমস্ত রাত্রি তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে হইল। ডাক্তার আসিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

প্রভাতে দেখা গেল, গার্থের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অমর পুনরায় ডাক্তার আনাইলেন। এ অবস্থায় ডাক্তারের যাহা সাধ্য, তিনি তাহা করিলেন। কিন্তু ভাঙ্গা দাঁত জোড়া দিতে না পারিয়া কৃত্রিম দন্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা দান করত প্রস্থান করিলেন। অমরও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে গার্থ কহিলেন, "আমি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি, চিন্তার আর কারণ নেই। কিন্তু অমর বাবু, আমার মনে বড় দুঃখ হচ্ছে যে, আপনাকে

DOUBLE COLOUR PALE

আমি পূর্ব্বে চিন্‌তে পারি নাই। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অমর সরিয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাতে গার্থ অমরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমর আসিলে কহিলেন, "তোমাকে আমার সঙ্গে ধানবাদে যেতে হবে, অমর বাবু।"

"কেন?"

"দেখুন অমর বাবু, আপনাকে আমি চিনেছি—আপনি একটি প্রকৃত মানুষ। অনেক রূঢ় ব্যবহার করেছি—ক্ষমা করবেন।"

"ধানবাদে কেন, তাই আগে বলুন।"

"আমি বেনসনের নামে মোকর্দ্দমা করব—"

"তা, আমাকে কি করতে হবে?"

"তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।"

"আমি জীবনে সাক্ষ্য দিই নি কোন মোকর্দ্দমায়।"

"তুমি ছাড়া আমার সাক্ষী আর নাই। বেনসনের স্ত্রী মিথ্যে ব'লে স্বামীকে বাঁচাবে—তুমি বেনসনের বন্ধু হ'লেও মিথ্যে বলবে না।"

"সাহেব, আমাকে ক্ষমা কর, আমি সাক্ষ্য দিতে পারব না।"

"দেখছি সমন না ধরালে তুমি যাবে না; বেশ, তাই হবে।"

অমর প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্লাব-ঘরে বাসা লইয়াছিলেন, সভ্য কম হইয়া যাওয়ায় ক্লাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এক্ষণে খালি পড়িয়া থাকায় য়ুরোপীয়রা ঐ গৃহটি অমরের শ্বাসের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এঞ্জিনীয়ারের বাংলোর অতি নিকটেই এই ক্লাবঘর। অমর স্বয়ং রন্ধন করিতেন। পূর্ব্বে এক জন ভৃত্য ছিল, সম্প্রতি রামু আসিয়া তাঁহাকে সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

অমর ক্লাব-ঘরে ফিরিয়া আসিলে বেন্‌সন্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "গার্থ তোমাকে ডেকেছিল কেন?"

অ। সে তোমার নামে নালিশ করবে।

বে। আমিও ভেবেছিলাম, তার এই রকম একটা মতলব। তোমাকে বোধ হয় সাক্ষ্য দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল?

অ। হাঁ।

বে। তুমি কি বললে?

অ। আমি সাক্ষ্য হ'তে পারব না ব'লে এসেছি।

বে। সে যদি সমন ক'রে তোমারে নিয়ে যায়?

অ। আমিও তাই ভাবছি। মনে করছি, দেশে চ'লে যাই।

বে। তা হ'তে পারে না—যে মহাজন তোমার খনির কাযে টাকা দেবে বলেছে, সে আজও আসে নি। আগে আসুক—

অ। এর পরে যা হয় করা যাবে, এখন পালাই।

বে। তা হ'তে পারে না—তোমাকে থাকতেই হবে।

অ। থাকলেই ত সাক্ষ্য দিতে হবে।

বে। সাক্ষ্য দেবার সময় কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললেই সকল গোল চুকে যায়।

অ। আমি তা পারব না বেন্‌সন্, আমি মিথ্যে বলতে পারব না।

বে। তুমি কি কখন মিথ্যা বল নি?

অ। কথা রাখতে পারি নি, এমন হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলি নি।

বে। তবে তোমাকে আমি মিথ্যে বলতে বলি না; আমার কপালে যা আছে, ঘটতে দেও।

পরদিন অপরাহ্ণে অমরনাথ চুপিচুপি পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার দ্রব্যাদি সামান্য, রামু সত্বর গুছাইয়া ফেলিল। যখন তিনি শকটের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন গার্থ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছ, বাবু?"

"কলিকাতা।"

"তুমি যে পালাবার চেষ্টা করবে, তা আমি জানতাম; আমিও সেইমত ব্যবস্থা করেছি।"

"কি ব্যবস্থা করেছ গার্থ?"

"এখনই তা দেখবে।"

বলিয়া গার্থ মুহূর্ত্তের জন্য বাহিরে আসিলেন এবং আদালতের পিয়াদাকে ডাকিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। পিয়াদা সেলাম করিয়া অমরের হাতে সমন দিল।

সন্ধ্যার সময় অমর একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। চুরুট নিবিয়া গিয়াছে, তখনও তিনি চুরুট টানিয়া যাইতেছেন। সহসা শুনিলেন, বেন্‌সন্ বলিতেছেন, "আর তোমার পালাবার পথ নেই অমর—ভালই হ'ল।"

অ। এখন পালালে বুঝি ওয়ারেণ্টে ধ'রে আন্‌বে?

বে। আইন ত তাই।

অ। তোমার কি শাস্তি হ'তে পারে বেন্‌সন্?

বে। জেল; তবে দু' এক বছর না হয়ে দু' এক মাস হ'তে পারে; দাঁত না ভাঙ্গলে বড় কিছু হ'ত না।

অমর চিন্তামগ্ন হইলেন। মিরা আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন; কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি অত ভাবছ কেন, অমর বাবু? তুমি সত্য বোলো, আমরা ইংরাজ, সত্যের সম্মান করতে জানি।"

"মিথ্যে ত বলতে পারবই না মেম সাহেব, কিন্তু সত্য বললে ত নিষ্কৃতি নেই।"

"তোমাকে একটা কথা চুপিচুপি বলি, অমরবাবু। ধানবাদের হাকিম-পত্নীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, কালই আমি তাঁর কাছে যাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

অমর যে মিরার আশ্বাসবাক্যে নিশ্চিন্ত হইলেন, এরূপ বুঝা গেল না। তিনি মিঃ বেনসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মামলা কি মেটে না, বেন্‌সন্?"

"না, মিটতে পারে না।"

"কেন?"

"তুমি কি সেই জানোয়ারটার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে বল? তা আমার দ্বারা হবে না। আমাদের ভেতর মনের অকৌশল অনেক দিন হ'তে চলছে; আজ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। লোকটা অতি দুশ্চরিত্র—কুলী মেয়েদের কাছে মার খেয়ে এসে আমার স্ত্রীর কাছে কুপ্রস্তাব করে। আমি বরাবর লোকটাকে ঘৃণা করি।"

"তোমাকে আর আমি মেটাতে বলি না। আমাকে ধর্ম্ম রক্ষা করবেন; আমি তাঁর শরণাগত।"

৩০

রেবার বিবাহ স্থির হইয়াছে এক উকীলের সঙ্গে। পাত্রপক্ষীয়রা যেদিন কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, সে দিন রেবা বাঁকিয়া দাঁড়াইল। বিবাহ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই। পার্ব্বতী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, শোভাও সঙ্গে ছিল। শোভা স্পষ্টাস্পষ্টি রেবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাপড় জামা পরছিস নে কেন?"

রেবা। পরব না আমার ইচ্ছে।

শোভা। তুই কি বিয়ে করবি নে?

রেবা। না।

শোভা। অমর বাবুকে পেলে বিয়ে করিস, কেমন?

রেবা। যাও।

পার্ব্বতী ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা অমরের সঙ্গে বিয়ে দিলে না কেন?"

স। অমর বিয়ে করলে কৈ? সে কোথা চ'লে গেল। তা ছাড়া—

পা। তা ছাড়া কি?

স। শরতের ইচ্ছে নয়, তার সঙ্গে রেবার বিয়ে হয়।

পা। সে কি! অমরের মত সুপাত্র—

স। কি জানি দিদি, অমরকে সে একেবারেই পছন্দ করে না।

পা। শুনলাম, সে দিন অমর তাকে এক 'সাহেবের' হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এতটা উপকার—

স। শরৎ তা স্বীকার করে না।

শোভা থাকিতে পারিল না, কহিল—"স্বীকার করাটাই শরৎ-দার পক্ষে অন্যায় হ'ত।"

কথাটার উত্তর কেহ করিল না। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সরল, অমর সে দিন এখানে খেতে এসে কি গোল করছিল?"

সর্ব্বা। একটা ভিখিরীকে ভিক্ষে দেওয়া হয় নি, তাই তিনি রাগ ক'রে উঠে পড়েছিলেন।

শোভা। সত্যি কথা বল মাসীমা; এ রকম ক'রে একজন মহত্তকে কালিমালিপ্ত করো না। আমি রেবার কাছে সব শুনিছি।

সর্ব্বা। কি শুনিছিস?

শোভা। ভিখিরীকে ধ'রে দরওয়ানরা মারছিল, মারের চোটে তিনি খাওয়া ফেলে ছুটে যান—

সর্ব্বা। আমিও ত তাই বলছি।

শোভা। তুমি তা বলছ কৈ? তুমি বলছ, তিনি রাগ ক'রে উঠে গিছলেন। অমর বাবুর রাগ নেই—শান্ত শিষ্ট সদাহাস্যমুখ, অথচ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কেমন একটা ভয় হয়।

সর্ব্বাণী উত্তর দিবার পূর্ব্বে শরৎ আসিয়া কহিলেন, "এখনও জাম-গোজাম হয় নি? তারা কি রাত পর্য্যন্ত ব'সে থাকবে?"

সর্ব্বা। মেয়েটা যে কাপড়চোপড় পরছে না, আমি কি করি?

শর। পরছে না কেন?

সর্ব্বা। বলে, বিয়ে করব না।

শর। একদম বিয়ে করবে না?

সর্ব্বা। তাই ত বলছে।

শর। কথাটা মন্দ নয়, বিলেতে মেমরা এমনই ক'রে থাকেন। অনেক বড় ঘরের মেয়েরা একেবারে অবিবাহিত থেকে যায়, আমি কেতাবে পড়েছি।

শোভা কহিল, "রেবা বিয়ে করতে রাজি আছে—যদি অমর বাবুকে পায়।"

রেবা। হুঁ, আমি তোমাকে তাই বলতে গেছি?

শর। অমরের সঙ্গে রেবার বিয়ে হতেই পারে না। লোকটাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না।

শোভা। কেন কর না শরৎ-দা?

শর। লোকটা গোঁয়ার-গোবিন্দ; হাত ত উঠেই আছে—কখন্ কা'কে মেরে বসে।

শোভা। তোমাকে না কি তিনি রেল-গাড়ীতে রক্ষে করেছেন?

শর। আমাকে? কিছুই সে করে নি; সাহেবটাকে একাই আমি মেরে ফেলতে পারতাম। তবে কি জান? থাক্ ও সব কথা—এখন রেবাকে সাজিয়ে দেও। আমি আর দেরী করতে পারছি নে, সন্ধ্যের পর আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।

রেবা উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। শোভা তাহার অনুসরণ করিল। উভয়ে একখানা খাটের উপর বসিল। উভয়ের মুখ গম্ভীর। অতঃপর শোভা ধীরভাবে কহিল, "রেবা, তোর দুঃখ বুঝি, কিন্তু সে ত তোর হবার নয়। তুই আজন্ম কুমারী হয়ে ব'সে থাক্‌লেও সে তোকে বিয়ে করবে না।"

রেবা কোন উত্তর করিল না। শোভা কহিল, "তুই আমার কাছে লুকুস নি; আর লুকুবিই বা কি? কে না জানে তোর প্রেমের কথা? উত্তরপাড়ায় কারুর জানতে আর বাকি নেই।"

"কি যে বকছ শোভা-দি?"

"বকছি তোরই ভালর জন্যে; অধীর হ'স নি—বিয়ে কর্—"

"তুমিও লাগলে শোভা-দি! তবে আমি যাই কোথা?" বলিতে বলিতে রেবা কাঁদিয়া ফেলিল। শোভা তাহাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কাঁদিসনে বোন্; তোর কান্না দেখ্‌লে আমি স্থির থাকতে পারি না।"

রেবার কান্না বাড়িয়া গেল। শোভার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া রেবা অনেকক্ষণ কাঁদিল। শোভা কহিল, "কাঁদ্‌লে কি হবে বোন্, তাকে যে পাবার নয়; অনেক দূর সে চ'লে গেছে, হয় ত আর ফিরবে না।"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে রেবা কহিল, "আমার কি হবে দিদি? আমাকে বুদ্ধি দেও—"

শো। তুই কি উপায়হীন হয়ে পড়েছিস?

রে। সত্যি হয়েছি—

শো। বিয়ে কর্, তা হ'লে উপায় হবে।

রে। বিয়ে আর হ'তে পারে না, শোভা-দি।

শো। তুই বলছিস কি?

রে। আমি সত্য বলছি—এ দেহমন আর কাউকে দিতে পারব না।

শো। তুই যে আমাকে অবাক্ করলি! ছেলেখেলা করতে গিয়ে এ কি!

রে। ছেলেখেলা কোন দিনই করি নি শোভা-দি। প্রথম দিনই তিনি আমার হৃদয় অধিকার করেছিলেন; কিন্তু তখন বুঝি নি ভালবাসা কা'কে বলে—তোমরা বিবাহের প্রস্তাব ক'রে আমাকে তা বোঝালে। তখন আমার লজ্জা সরম্ সকল বাঁধন ছিঁড়ে গেল—আমি সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে দিয়ে তাঁকে ভালবাসলাম; এখন আর ত ফেরবার বা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই, শোভা-দি।

শো। নাটক-নবেল প'ড়ে দেখছি তোর মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। এ সব ঢং আমাদের ঘরে আগে ছিল না। তুই এ সব নাটুকে কথা ছেড়ে দিয়ে এখন লক্ষ্মীমেয়ের মত বিয়ে কর্।

রে। বিয়ে ত আমার হয়ে গেছে—আমি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করেছি।

শো। তুই বরণ করলেই ত আর হ'ল না, তিনি বরণ ক'রে নেবেন, তবে ত—

রে। তিনি না নেন, আমি চিরদিন তাঁর—রেবার দ্বিতীয় স্বামী নাই।

শোভা মুগ্ধ হইল—প্রতিবাদ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। রেবার মাথায় হাত দিয়া কহিল, "আমি অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি তাঁকে স্বামিরূপে লাভ কর।"

শোভার চরণধূলি মাথায় লইয়া রেবা কহিল, "পুরস্কারের আশা ক'রে তাঁকে আমি সিংহাসনে বসাই নি, শোভা-দি, তিনি আপন হ'তে এসে আমার হৃদয়ে বসেছেন; আমি চেষ্টা করেও তাঁকে সরাতে পারব না।"

শো। সরিয়ে কায নেই বোন্; তিনি এক দিন তোমার হবেন।

রে। যদি আমার পূজা তাঁর গ্রহণযোগ্য হয়—

সর্ব্বাণী আসিয়া কহিলেন, "কাপড়-চোপড় পরতে হবে না? আয়—"

শোভা। রেবা যাবে না, যেতেও আর বোলো না।

সর্ব্বা। না বললে চলবে কেন? বিয়ে ত করতে হবে।

শোভা। তবে তুমি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া কর গে—বলিয়া প্রস্থান করিল। রেবা ডাকিল, "মা!"

স। কি বল্—

রে। আমার বিয়ের কথা আর তুলো না।

স। কেন?

রে। মনে কোরো, তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কুলটা হ'তে তাকে বোলো না।

সর্ব্বাণী স্তম্ভিত হইলেন; ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "হুঁ, বুঝেছি; কিন্তু রেবা, তাকে যে পাবার নয়।"

রে। না পাওয়া যায়, আমি এমনই থাকব—বিয়ের কথা আর বোলো না।

স। আমি যেমন ক'রে পারি—

পার্ব্বতী আসিয়া পড়িলেন; কহিলেন, "তা হ'লে আমরা যাই সব্বু, আশীর্ব্বাদ ত আর হ'ল না।"

স। এর মধ্যে যাবে কি, দিদি? খাওয়া-দাওয়া কর।

পা। দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা সব্বু, ঠাকুরঝিকে তোর মনে পড়ে?

স। কে বল দেখি?

পা। হেমমালা; যার মীরপুরে বিয়ে হয়েছে।

স। হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে; তারা বড় জমীদার, না?

পা। হাঁ। ঠাকুরঝি যে আসছে।

স। কোথা? তোমাদের ওখানে? এত দিন পরে কি মনে ক'রে?

পা। আসছে আমাদের নেমন্তন্ন করতে। আমরা যাব—বড় জামাইরাও যাবে।

স। কেন কেন, এত দিন পরে নেমন্তন্নের এত ঘটা কেন?

পা। কেষ্ট বলছিল, লতার সঙ্গে ঠাকুরঝির ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ঠাকুরজামাইয়ের খুব ইচ্ছে লতাকে ঘরের বউ করতে।

স। অমন মেয়েকে নিতে কা'র না ইচ্ছে হয়? আমার ছেলে থাকলে—

পা। তোমার ছেলে থাক্‌লে কি হবে? অমর বিয়ে দিতে রাজি হবে, তবে ত।

স। আমার ছেলের সঙ্গে অমর বিয়ে দিতে রাজি হবে না, বল কি দিদি?

পা। তুমি কোন্ ছার, ঠাকুরঝির একটিমাত্র ছেলে, লাখ-লাখ টাকার মালিক—তারই সঙ্গে বিয়ে দিতে অমর রাজি হয় নি।

স। ও মা, সে কি গো! অমরের বুদ্ধিশুদ্ধি অমন কেন?

পা। তার বুদ্ধির পরিচয় আরও শুনবে? অমরের বাপের না কি কয়লার খাদ ছিল। ঠাকুরজামাই তা চালাতেন। এখন তার আয় দাঁড়িয়েছে হাজার হাজার টাকা; জমেছেও লাখ টাকা। ঠাকুরজামাই সে সব কড়ায় গণ্ডায় অমরকে দিতে চাইলেন; অমর নিলে না, বললে, আপনি আমাকে দান করছেন।

স। দেখছি, অমর পাগল।

পা। সে নিজে পাগল না হলেও অপরকে পাগল ক'রে তোলে। ঠাকুরজামাই ত অমর অমর ক'রে পাগল, কত সাধ-সাধনা ক'রে তাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন। তারই খাতিরে আমাদের নেমন্তন্ন।

স। অমর যাবে? কবে যাবে?

পা। পূজোর সময়।

সর্ব্বাণী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "কবে তারা আসবে?"

"কে, ঠাকুরঝি? দশ বিশ দিনের মধ্যে আসতে পারে।"

"এলে আমাকে খবর দেবে, দিদি?"

"দেখি আগে, তারা ক'দিন থাকে?"

"আচ্ছা, আমি লোক পাঠিয়ে রোজ খবর নেব।"

কর্ত্তা গণেশবাবু আসিয়া পড়িলেন। উভয়ে মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে কি তোমরা দেখাবে না?"

"না, দেখাব না—মেয়ের জ্বর হয়েছে।"

৩৪

ধানবাদের হাকিম এক জন নবীন ইংরাজ। তিনি রহস্যপ্রিয়, উদারহৃদয়, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত। তাঁহার এজলাসে গার্থের মোকর্দ্দমা উঠিল। আসামী প্রভৃতি সকলেই হাজির। গার্থ কিরাকে সাক্ষী মানেন নাই।

তাঁহার সাক্ষী ছিলেন, ডাক্তার ও অমরনাথ।

আগে গার্থের জবানবন্দী লওয়া হইল। তিনি কিছু কিছু মিথ্যা বলিলেন। তিনি এজাহার দিলেন, বেন্‌সন্ মাতাল হইয়া তাঁহাকে মারিয়াছে, বেন্‌সনের সহিত তাঁহার ঝগড়া হয় নাই, ঝগড়া হইয়াছিল সাক্ষী অমরের সঙ্গে, বেন্‌সন্ হঠাৎ উঠিয়া তাঁহাকে মারিল। অমর বেন্‌সনের বন্ধু, বন্ধুর পক্ষ লইয়া আসামী তাহাকে মারিল। আসামীর সঙ্গে তাহার কোন বচসা হয় নাই, ইত্যাদি। কিন্তু জেরায় সকল কথা টিকিল না; তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, তিনি মদ খাইয়াছিলেন, খেলায় মাতিতেছিলেন, বেনসনের সঙ্গে বচসা হইয়াছিল; অমর তাঁহার বন্ধু, ক্লাব-ঘর তাঁহার বাসের জন্য তিনিই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

প্রথম সাক্ষী ডাক্তার ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। আঘাত সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তাহার পর অমরের সাক্ষ্য। তাঁহারই সাক্ষ্যের উপর মোকর্দ্দমার ফলাফল নির্ভর করিতেছে। অমর আদালত-গৃহে প্রবেশ করিলে সকলের নয়ন তাঁহার উপর পড়িল। তাঁহার পরিধানে ধুতী, কোট, চাদর, মোজা। এক এক জনের দেহের সুবিধা বিধাতা এমনই করিয়া দিয়াছেন যে, সে যাহা কিছু পরিধান করে, তাহাকে তাহাতেই সুন্দর দেখায়, অমরের অঙ্গে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতে বিধাতা একটুও কার্পণ্য করেন নাই। সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি বিচারগৃহে প্রবেশ করিলে অনেকের মনে হইল, তিনি রাজভূষা পরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে পথ দিতে কেহ কেহ সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি হাকিমকে অভিবাদন জানাইয়া সাক্ষীর আসনে গিয়া দাঁড়াইলেন। তথা হইতে দেখিলেন, আসামী কাঠগড়ার একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট বলিয়া অমরের মনে হইল। মিরা তাঁহার উকীলের পার্শ্বে নীরবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখে হাসি নাই—বিষাদ ভরা নিবিড় মেঘ তাঁহার মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়াছে। অমর চতুর্দ্দিক লক্ষ করিয়া অবশেষে হলফ পাঠ করিলেন। গার্থ তাঁহার উকীলকে বলিলেন, "আমার এ সাক্ষী কিছুতেই মিথ্যা বলিবে না।" উকীল মৃদুহাস্যসহকারে উত্তর করিলেন, "একটু আধটু মিথ্যা বলে না, এমন সাক্ষী আমি আজও দেখি নি।"

উকীল উঠিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। নাম-ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসার পর উকীল—"আপনি এক জন বড় পণ্ডিত না কি?"

অ। একেবারেই নয়।

উ। এম এ পাশ করেছেন?

অ। করেছি।

উ। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-স্কলারসিপ পেয়েছেন?

অ। পেয়েছি।

উ। পণ্ডিত আর কাকে বলে?

অ। পণ্ডিত বলে তাকে—যার অন্ততঃ একটা বিষয়েও জ্ঞান জন্মেছে।

উ। যাক্, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে। এখন আপনি এ মোকর্দ্দমার কি জানেন বলুন।

অ। জানি, গার্থ ফরিয়াদি, বেনসন আসামী, আমি সাক্ষী, আর আপনি উকীল।

উ। আপনি বেন্‌সনকে মারতে দেখেছেন?

অ। যে দেখেছে, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন।

উ। কে দেখেছে?

অ। আমার চক্ষু।

উ। আচ্ছা, আমি তাকেই জিজ্ঞেস করছি।

অ। সে ত কথা কইতে পারে না।

উ। সে আবার কি?

অ। চক্ষু কি কথা কইতে পারে, মশাই?

উ। তা পারে না বটে, কিন্তু আপনি ত পারেন।

অ। আমার কোন্ ইন্দ্রিয় কথা কইতে পারে?

উ। আপনার জিহ্বা।

অ। বেশ; সে দেখতে পায় কি?

উ। না।

অ। তবে সে যা দেখেনি, তাকে আপনি তা বলতে বলেন কেন?

উ। জিজ্ঞেস করেছি ব'লে আপনি আমার কৈফিয়ত চান না কি?

অ। যে দেখেছে, তাকে জিজ্ঞেস করাই ঠিক।

উ। এ যে মহাবিপদ্ দেখছি। আচ্ছা, আপনার চোখকেই আমি জিজ্ঞেস করছি।

অ। বলেছি ত সে কথা কইতে পারে না।

উ। তবে আমাকে কি করতে হবে, তাই বলুন।

অ। আপনি ব'সে পড়ুন।

উ। ব'সে পড়ব? হুকুম ত মন্দ নয়। আমি আজ ত্রিশ বৎসর ওকালতী করছি, এ রকম বিপদে কখন পড়িনি।

হাকিমের মহা-আনন্দ হইল। যুবকের হস্তে বৃদ্ধের নির্য্যাতন, তরুণ হাকিম উপভোগ করিলেন। এমনটা অনেক তরুণ যুবক করিয়া থাকেন। উকীল হাকিমকে কহিলেন, "হুজুর, আমি পারলাম না, আপনি এবার জিজ্ঞাসা করুন।"

হাকিম। আপনার সাক্ষী, আপনি ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারেন।

উকীল। আমার যে আর সাক্ষী নেই।

হাকিম। তা আমাকে কি আপনি সাক্ষী সংগ্রহ করতে অনুরোধ করছেন?

উকীল। তা কেন—আপনি দয়া ক'রে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করুন—

হাকিম। আপনি চেষ্টা দেখুন না।

উকীল। যে বলবে না; তাকে বলাব কি ক'রে?

হাকিম। সাক্ষীকে বুঝিয়ে বলুন, কথার জবাব না দিলে

আদালতের অপমান করা হবে, আর সে অপরাধের জন্যে দণ্ড নিতে হবে।

উকীল। আমার চেয়ে সাক্ষী সে কথা ভাল বোঝে—মূর্খ ত আর নয়। (সাক্ষীর প্রতি)—শুনতে পাচ্ছেন কি, হাকিম যা বলছেন ? না, আপনার কানও শুনতে পায় না।

অ। আপনার চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি যে যে কায করে, আমার চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সেই সেই কায করে ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনার ইন্দ্রিয়াদির যদি কোন বিশেষত্ব থাকে, তাহা আমি অবগত নই।

উ। বেশ—শুনে সুখী হলাম, আপনার চক্ষুকর্ণ ঠিক কায করে। এখন বলুন দেখি, ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে আপনি বেন্‌সনের কুঠীতে ব'সে তাস খেলছিলেন কি না ?

অ। খেলছিলাম।

উ। আপনি মদ খেয়েছিলেন ?

অ। না।

উ। আপনি মদ খান না ?

অ। খেতাম আগে, কয়েক মাস ছেড়েছি।

উ। ছাড়লেন কেন ?

অ। আমার কোন বন্ধু আমাকে ব্রহ্মচারী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন ; আমার তাতে আত্মগ্লানি জন্মেছিল—তাই ছেড়েছি।

উ। বেশ করেছেন—অভ্যাসটা বড় খারাপ। এখন বলুন দেখি, সাহেবরা খুব মদ খেয়েছিলেন কি না ?

অ। খুব কথাটার অর্থ আমি ঠিক বুঝি না। আপনি হয় ত আধ বোতল হুইস্কি খুব মনে করেন না।

উ। আমাকে আবার টানেন কেন ?

অ। খুব কথাটার অর্থ বোঝাতে ও বুঝতে—

উ। আচ্ছা, ও কথাটা ছেড়ে দিন। খেলতে খেলতে আপনার সঙ্গে গার্থের ঝগড়া হয়েছিল ?

অ। গার্থ আমার পার্টনার ছিলেন।

উ। আপনার খেলার ভুল নিয়ে তর্ক উঠেছিল ?

অ। বিশেষ কোন ভুলের কথা উঠেছিল ব'লে আমার স্মরণ হয় না।

উ। তাঁর খেলার ভুল আপনি ধরেছিলেন ?

অ। আমার এত বিদ্যে নেই যে, তাঁর খেলার ভুল ধরি।

উ। আচ্ছা, বেন্‌সন্ বাদীকে মারলে কেন ?

(অপর পক্ষের উকীল এ প্রশ্নে আপত্তি করিলেন)

অ। আপনি আমার সম্বন্ধে যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার উত্তর আমার জিহ্বা দিয়েছে। যাহা আমার চক্ষু দেখেছে বা কর্ণ শুনেছে, তাহার উত্তর আমার জিহ্বা দিতে পারবে না।

উ। অর্থাৎ আপনি উত্তর দেবেন না।

অ। আপনার ইচ্ছামত অর্থ ক'রে নিতে পারেন।

হাকিম তখন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন ?"

অ। আমি ত বলেছি, আমার জিহ্বা কিছু দেখে নি, শোনে নি, সুতরাং সে কিছু বলতে পারে না।

হা। আপনি আদালতকে অপমান করছেন।

অ। যদি ক'রে থাকি, আমি সে জন্য দুঃখিত।

হা। আমি আপনাকে দণ্ড দেব।

"আপনার দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব।"

এ প্রকার উত্তরে হাকিম খুসী হইলেন। তিনি একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে কি লিখিলেন। লেখা শেষ হইলে অমরকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ২২৮ ধারার অপরাধ করিয়াছেন—আপনি দোষী না নির্দ্দোষ ?"

অ। হুজুর যখন আমাকে দোষী মনে করেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই দোষী।

হাকিম প্রসন্ন হইলেন। কহিলেন, "আপনার পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ড করিলাম, অনাদায়ে এক সপ্তাহ মিয়াদ।"

অ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি এখনিই জরিমানা দিতেছি।

অবিলম্বে টাকা জমা দেওয়া হইল। হাকিম অমরকে নিষ্কৃতি দিলেন। লঘুদণ্ড দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইলেন; কিন্তু হাকিম অমরের প্রতি প্রসন্ন—অমর সুপুরুষ, বিদ্বান্, সত্যবাদী। বাদীর প্রতি তিনি একবারেই সদয় নহেন, কেন না, সে ফিরিঙ্গী—সে মার খেয়ে না মেরে নালিশ করতে এসেছে।

মূল মোকর্দ্দমাও ফাঁসিয়া গেল। হাকিম আসামীকে মুক্তি দিয়া রায়ে লিখিলেন—উভয় পক্ষ মাতাল হইয়া মারামারি করিয়া থাকিবে। যে পক্ষ হারিয়াছে, সেই পক্ষ নালিশ করিতে আসিয়াছে। কে প্রথম আঘাত করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ হইল না। অতএব আসামীকে মুক্তি দিলাম ইত্যাদি।

অমরকে লইয়া মিরা মোটরে উঠিলেন। আসামী তখনও বিচার-গৃহে। মিরা কহিলেন, "তোমার নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম, অমর বাবু।"

" ছি ছি, ও কথা বলবেন না। বোন্ ভাইয়ের কাছে কখন কৃতজ্ঞ হয় না।"

"এত বড় উপকার ভাইও করে না।"

বেন্‌সন্ আসিয়া পড়িয়া পশ্চাৎ হইতে কহিলেন, "অমরকে তুমি চেননি মিরা, তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অপমান করো না।"

অ। আমার জন্যেই ত তোমার এই বিপদ বেন্‌সন্।

বে। তোমার জন্যে নয় অমর—আমি পুরাতন ঋণ শোধ করেছি। নইলে তোমার হাতেই তাকে ছেড়ে দিতাম, তোমার কব্জির জোর ত আমার জানা আছে।

৩৫

মীরপুরে পূজার ধূম লাগিয়াছে। এবার পূজা আশ্বিনের শেষে। কালিন্দী নদী কূলে কূলে পূর্ণ না থাকিলেও তখনও শুকায় নাই। বড় বড় নৌকা নদী বহিয়া সে সময়েও যাতায়াত করিতেছে। বর্ষাটা বোধ হয় পিছাইয়া হওয়ায় আশ্বিনের শেষেও নদীতে এত জল। অনেকগুলি বড় বজরা ও নৌকা মীরপুরের ঘাটে বাঁধা। রাজমহল, মালদা, মথুরাপুর, সুবেমারা প্রভৃতি স্থান হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া তরণীনিচয় নিয়ত যাতায়াত করিতেছে। সুবেমারায় বিশ্বাসঘাতক ফকির, অতিথি সিরাজ-উদ্দৌলাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। এক বৃদ্ধ মুসলমানকে

দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, এই পথে নিরাশ্রয় নবাব স্ত্রী-কন্যার হাত ধরিয়া আহার্য্য ও আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে পথের ধূলা উড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি উড়ে নাই—অনেকের মনে গাঁথা রহিয়াছে।

সেই সুবেমারার নিকটবর্ত্তী গ্রাম মীরপুরে আজ পূজার খুব ধূম। ঘাটের উপর নহবতখানা, পথের ধারে কদলীবৃক্ষশ্রেণী, পুষ্পপত্রের মালা। গৃহসান্নিধ্যে কোলাহল, গৃহমধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস। এ বৎসর ধুমটা কিছু বেশী। চতুর্দ্দিক্ হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, উত্তরপাড়া হইতে হরনাথ বাবু সপরিবারে আসিয়াছেন ; কোন্নগর হইতে গণেশ বাবু স্ত্রী-কন্যাসহ আসিয়াছেন, চন্দননগর হইতে কৃষ্ণনাথ লতা, নরু ও হিরণকে লইয়া আসিয়াছেন ; তাহা ছাড়া পশুপতি বাবুর অনেক আত্মীয়-কুটুম্বও আসিয়াছেন, আসেন নাই শুধু অমরনাথ।

আসিলেন তিনি মহাষষ্ঠীর দিন মধ্যাহ্নে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গৃহস্বামী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। হরনাথের পাদবন্দনা করিয়া অমর উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি অমরকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিলেন। গণেশ বাবুও অমরকে দুই চারি কথায় আপ্যায়িত করিলেন। কৃষ্ণনাথের সহিত কথা কহিবার তাঁহার বড় একটা সুযোগ হইল না—লতা, নরু, সুকু তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ জুতা খুলিয়া দেয়, কেহ জামার বোতাম টানে, কেহ বা হাত ধরিয়া টানে। তাহাদের কাছে দেহটাকে ছাড়িয়া দিয়া অমর কৃষ্ণনাথের পানে চাহিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "আমার পালা শেষে, এখন উপরে যাও, সেটা সেরে নিয়ে—তার পর।"

অমর স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া উপরে আহারার্থ কৃষ্ণনাথের সহিত গমন করিলেন। লতা প্রভৃতি আগে আগে ছুটিল। অমর উপরে উঠিয়া দ্বারসমীপে দেখিলেন, পার্ব্বতী দেবী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমর প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। পার্ব্বতী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাবা!"

"মা।"

এই মিষ্ট সম্বোধন পার্ব্বতীর মর্ম্ম স্পর্শ করিল—তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। একটু শান্ত হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে মাকে ক্ষমা করেছ বাবা ?"

"মায়ের কাযের বিচার করবার অধিকার সন্তানের ত নেই, মা!"

"তোমার মত সন্তান যে পায়, সে কত ভাগ্যবতী!"

সর্ব্বাণী আসিয়া পড়িলেন। হেমমালা, রেবা প্রভৃতি অনেকেই আসিলেন। অপরিচিত মহিলাদের বদন কৌতূহলোদ্দীপ্ত ; তাঁহারা অমর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই। হেমমালা ছুটিয়া দেখিতে আসিয়াছেন—কে তাঁহার পতিপুত্রকে সলিলসমাধি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় অমরের নিকট দিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, "আমার এই বোন্‌টি তোমাকে দেখবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছিলেন।" অমর তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, সর্ব্বাণীকেও নমস্কার করিলেন ; কিন্তু কাহারও পদধূলি লইলেন না। সর্ব্বাণী নমস্কারেই পরম তুষ্ট হইয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন ; কহিলেন, "তোমার জন্যে আমরা বড় ব্যস্ত হয়েছিলাম বাবা—আসতে এত দেরী করলে।"

অ। আমি এজটা মোকর্দ্দমার সাক্ষী হয়েছিলাম ; সেটা মিটেছে আজ ক'দিন হ'ল। তাই দেরী—

স। মোকর্দ্দমা আবার কিসের ?

অ। সে এক সাহেবের।

স। দিল্লী হ'তে এসে কোথা গিছলে ?

অ। ঝরিয়ায়। সেখানেই ত দেরী হ'ল—প্রায় দু'মাস ছিলাম—বেশ যায়গা।

সহসা অমরের মুখ দীপ্ত হইল, কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। পূর্ণিমা-নিশিতে অন্ধকার ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিলে ঘর যেমন মুহূর্ত্তের জন্য হাসিয়া উঠে, তখনই আবার নিবিয়া যায়, অমরের মুখও তেমনই ক্ষণেকের জন্যে দীপ্ত হইয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণ ছাড়া অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, পিছনে—সকলের পশ্চাতে—জ্যোতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সর্ব্বাণী চুপি চুপি কন্যাকে কহিলেন, "অমরকে পেরণাম কর।"

"আমার লজ্জা করছে।"

"পেরণামে আবার লজ্জা কি—কর্।"

"এত দিন ত লজ্জা করত না মা ?—আজ করছে।"

"এখন না করলে আর করতে পারবি নি।"

"জ্যোতি ত করলে না।"

"জ্যোতি কৈ ? ঐ যে আসছে পেরণাম করতে।"

জ্যোতি প্রণাম করিল, রেবাও করিল। জ্যোতির সহিত অমর কথা কহিলেন না। রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নূতন গান শিখেছ, রেবা ?"

"শিখেছি।"

"আমাকে শোনাবে না ?"

রেবার অন্তর হইতে উত্তর আসিল, "তোমারই জন্যে ত শিখেছি।" কিন্তু মুখে কিছু বলিল না—ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর ভোজনের পালা। দুই বন্ধুতে আহারে বসিলেন। আহার শেষ করিয়া অমর তাঁহার বউদির ঘরে আসিলেন। হিরণ তখনও দুর্ব্বল। তাঁহাকে বাড়ী রাখিয়া আসিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি থাকিলেন না—জিদ করিয়া আসিলেন। লতা তাঁহার অনেক কায করে, সুতরাং বিশেষ কোন কষ্ট তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় না। অমর আসিয়া হিরণকে প্রণাম করিলেন। হিরণ ছি ছি করিয়া উঠিয়া অমরের চরণতলে মাথা ঠুকিলেন। অমর কহিলেন, "বউদি, এত কাল আমি তোমাকে প্রণাম ক'রে এসেছি ; তুমি কখনও প্রতিবাদ করনি। আজ এ সম্পর্কবিরুদ্ধ কায করলে কেন ?"

হি। সম্পর্ক যদি ধর, তাতে তুমি বড়।

অ। কিসে বড় হলাম ?

হি। তুমি ও আমার স্বামী অভেদাত্মা। তোমাকে প্রণাম ক'রে আমি স্বামীর চরণে প্রণত হলাম।

অমর মুগ্ধ হইলেন। কহিলেন, "আর সম্পর্ক যদি না ধরি ?"

হি। তা হ'লেও তুমি আমার প্রণম্য। বাবা মা তোমাকে সন্তানতুল্য জ্ঞান করেন ; সুতরাং তুমি আমার বড় ভাই।

অ। এ কথাটাও একটা সম্পর্ক ধ'রে বললে।

হি। যদি বলি, তুমি আমার লতার দাদা, তা হলেও তুমি হয় ত বলবে, সেটা সম্পর্কের কথা।

অ। নিশ্চয় বলব।

হি। তা হ'লে শোন বলি ; আগে জানতাম তোমাকে মানুষ বলে—

অ। এখন জেনেছ গাধা ব'লে ; বেশ—তা হ'লে প্রণাম আমার নিশ্চয়ই প্রাপ্য।

হি। ঠাকুরপো, আমাকে বেশী বকিও না, আজও আমি দুর্ব্বল।

অ। তা আমি জানি ; কৃষ্ণ সব লিখত।

হি। আমি তোমাকে দেখতেই এখানে এসেছি।

অ। তা বুঝতে পেরেছি।

হি। কিসে তা বুঝলে ?

অ। আমি আসবামাত্র সকলে আমাকে দেখতে ছুটে গেল, আর তুমি ঘরের ভিতর ব'সে রইলে।

আমি ত সকলের সঙ্গে তোমাকে দেখতে যেতে পারি না। তুমি যেমন সকল হ'তে স্বতন্ত্র, আমিও তেমনই তোমাকে দেখব সকলের অন্তরালে।

অ। তোমাকে এত কথা কে শেখালে, বউদিদি ? আগে ত তুমি বড় একটা কথা কইতে না।

হি। কথা কইতাম না—তখন তোমাকে চিনতাম না ব'লে, তোমাকে ভাল লাগত না ব'লে।

অমর বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণনাথের পানে চাহিলেন। কৃষ্ণনাথ অন্যদিকে নয়ন ফিরাইয়া রহিলেন। অমর কহিলেন, "আমি তোমার কাছে পরাস্ত হলাম, বউদি।"

অতঃপর দুই বন্ধু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিয়তি

কি চাই, স্বার্থ সাধিতে, ব্যর্থ সাধনার নামে কেঁদে ?
এ মোর অভাবে, এই বেদনায়,
কার হবে ক্ষতি ? কার এসে যায় ?
ভুলি নিজ সুখ, মুছে ফেলি দুখ, রাখি গো পরাণ বেঁধে।

কেবলি ভাঙ্গিতে যদি মোর ঘর
প্রবল বেগেতে বহে যায় ঝড়,
আমার ক্ষুধার গ্রাস আসি যদি লয়ে যায় কেহ কেড়ে ;—
অসীম বিশ্বে কিবা হবে কার ?
কি আছে আমার হেন অধিকার
অপরের দেওয়া ক্ষীণ করুণায়, জগতে উঠিব বেড়ে ?

যাহা চাই তাহা পাব নাক কভু ;—
কেন সে বিধান, তুমি জান প্রভু !
যতটুকু তুমি দিয়েছ বিধাতা, সেইটুকু নিয়ে থাকি।
দুঃখ হোমানল উঠ তবে জ্বলি ;
এ যজ্ঞেতে সুখ, আশা, দিব বলি—
দগ্ধ বাসনার শেষ চিহ্ন ওই ভস্মটুকু দেহে মাখি।

মহারাজ-কুমারী—৺অনঙ্গমোহিনী দেবী (ত্রিপুরা)।



সংস্কৃত-সাহিত্য

৪

রামায়ণ-কথা (খ)

কৈকেয়ী।

কৈকেয়ীর সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাব যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে হঠাৎ কিছু বলিতে ভয় করে। কিন্তু রামায়ণ পাঠে যতটা বুঝা যায়, তাহাতে কৈকেয়ী ততটা অপরাধিনী আদৌ নহেন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। শুধু ছোট রাণী বলিয়া নহে, বশবর্ত্তিনী কৈকেয়ীর পাতিব্রত্যে, ত্যাগে, ক্ষত্রিয়-কন্যাসুলভ সাহস ও শৌর্য্যে,—বৃদ্ধ নরপতি দশরথের হৃদয়েও নবীন উৎসাহ-উদ্যম ফিরিয়া আসিয়াছিল। দশরথ অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে যাইবেন, শৌর্য্যবতী কৈকেয়ী সঙ্গে চলিলেন। রণাঙ্গনে দশরথ আহত হইলেন, পতিব্রতা কৈকেয়ী নিরন্তর প্রাণপাতিনী শুশ্রূষার দ্বারা পতিদেবতাকে নিরাময় করিয়া তুলিলেন। রণক্ষেত্রে দশরথের তখনকার অবস্থা যে কি শোচনীয়ই হইয়াছিল, তাহা আদি কবির ভাষায় অবগত হউন।—

মন্থরা কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—

"তত্রাকরোন্মহাযুদ্ধং রাজা দশরথস্তদা।
অসুরৈশ্চ মহাবাহুঃ শস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ॥ ১৫
অপবাহ্য ত্বয়া দেবি ! সংগ্রামান্নষ্টচেতনঃ।
তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতস্ত্বয়া॥ ১৬
তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে।
যা ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি ! যদিচ্ছেয়ং তদা বরম্॥ ১৭
গৃহ্ণীয়াস্ত তদা ভর্ত্তস্তথেত্যুক্তং মহাত্মনা।
অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ! ত্বয়ৈব কথিতা পুরা॥ ১৮
কথৈষা———"

অযো, ৯ম সর্গ।

তৎকালে (সেই শম্বরাসুরযুদ্ধ-সময়ে) মহাবাহু রাজা দশরথ সেই অসুরদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন এবং সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। দেবি ! তখন তুমি তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে এবং সেই স্থানেও তোমার স্বামীর অঙ্গে অসুরগণ অস্ত্রাঘাত করিতে থাকিলে তুমি আরও দূরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়াছিলে। তোমার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তোমাকে ২টি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তুমি বলিয়াছিলে,—দেব ! যখন ইচ্ছা আমি এই বর দুইটি চাহিয়া লইব, এখন নহে। তদুত্তরে দশরথও "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। দেবি ! আমি ত ইহা জানিতাম না, তুমিই আমাকে এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিলে।

একে বৃদ্ধবয়সের পত্নী, তাহাতে আবার অনিন্দ্য-সুন্দরী রাজার কন্যা, আর সর্ব্বোপরি—পতিগতপ্রাণা, বশবর্ত্তিনী, সদা-সহচরী প্রণয়িনী, সুতরাং দশরথের তাদৃশী পত্নীর উপর হৃদয়ের আবেগ একটু উচ্ছল হইলে দোষ দেওয়া চলে না। কৈকেয়ীকে রাজা ভালবাসিতেন বলিলেই আর দুই রাণীকে যে তিনি অবজ্ঞা করিতেন, ইহা স্বীকার করিয়া লইবার কোন হেতু নাই। কবিও কোন স্থানে সেরূপ বলেন নাই। নিজের গুণেই কৈকেয়ী রাজার প্রিয়তমা হইয়াছিলেন।

রাম যৌবরাজ্য পাইবেন কি না, ইহা লইয়া রাজসংসারে—অন্তঃপুরে যে একটা বিষম গোলমাল, তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল, তাহা রাজার তাড়াতাড়ি,—ভরতের অনুপস্থিতকালে কোন মতে রামের অভিষেকটা সারিয়া লওয়ার অতিপ্রায়েই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে ! রাজা নানা যুক্তিতর্কেও তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। দশরথ রামকেই যৌবরাজ্যাভিষেক করিবেন, এই সংবাদ রামই গিয়া সর্ব্বাগ্রে মাতা কৌশল্যার নিকট কহিলেন। কৌশল্যাও অমনই চিরকালের ঈপ্সিত, পুত্রের এই অভিষেকবার্ত্তা-শ্রবণে আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন—

"বৎস রাম চিরং জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্ মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়॥"

অযো, ৫ম, ৩৯।

"বৎস রাম ! তুমি চিরকাল জীবিত থাক, তোমার শত্রু-সকল নিহত হউক এবং তুমি রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়া আমার ও সুমিত্রা দেবীর বান্ধবগণকেও আনন্দিত কর।" কৌশল্যার এই আনন্দাতিশয়-মুক্ত হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত কথাটিতে অন্তঃপুরের তদানীন্তন অবস্থাটা একবারে খুলিয়া দিয়াছে। "তুমি

আমার ও সুমিত্রা দেবীর বান্ধবগণকে আনন্দিত কর,"—ইত্যাদিতে কৌশল্যা ও সুমিত্রা যে একপর্য্যায়ভুক্ত, সোজা কথায় এক দলের, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অন্তঃপুরে আছেন ত সবে তিন জন রাণী,—কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী। তাহার মধ্যে রামের রাজ্যাভিষেকে প্রথম দুই জনেরই যত কিছু আনন্দ, প্রথম দুই জনের আত্মীয়-স্বজনেরই যত কিছু আহ্লাদ, আর এক জন—যিনি কৈকেয়ী, তাঁহার বা তৎসম্পর্কিত কাহারও নাম-গন্ধও কৌশল্যা করিলেন না। ইহা দ্বারাই অন্তঃপুরের দলাদলিটার আভাস বেশ পাওয়া যাইতেছে। রামের রাজ্যাভিষেক লইয়া যে একটা বিলক্ষণ "ঘোঁট" চলিতেছিল, রাণীমহলে দল পাকান চলিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আবার কৌশল্যার "হতাস্তে পরিপন্থিনঃ"—"তোমার বিরুদ্ধবাদীরা উৎসন্ন যাউক, বা এত দিনে তাহারা নিহত হইল"—কথাতেও স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, এই বিরুদ্ধবাদী আর কেহই নহেন,—ইনি হইলেন ঐ "একঘরে" রাণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। মহারাজ দশরথ নিজেও পূর্ব্বে এ কথাটার আভাস দিয়া গিয়াছেন। যখন যৌবরাজ্যের সংবাদ রামকে প্রথম দেন, তখন দশরথই বলিয়াছিলেন যে,—

"বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম॥"

অযো, ৪র্থ, ২৫।

রাজধানীতে ভরত এখন কিছুদিনের জন্য অনুপস্থিত, আমার মতে এই সময়েই তোমার অভিষেক হওয়া বিধেয়।—রাজার এই উক্তিতেও তাঁহার দুর্ব্বল মনের অবস্থা ও রাজসংসারের আভ্যন্তর অবস্থা অনেকটা বুঝা যাইতেছে। এই ত গেল এক পক্ষের বা এক দলের কথা। এখন দেখি—ছোট-রাণীর দলের ব্যাপারটা কি রকম।

দশরথ পতিপ্রাণা কৈকেয়ীতে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন সত্য, এবং কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণের সময়ে তাঁহার গর্ভজাত-পুত্রকে রাজা করিবেন, প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন সত্য,—কিন্তু রাজার হৃদয়ের টানটা সম্পূর্ণই ছিল রামের উপর। তবে মুখ ফুটিয়া ত বলিতে পারেন না যে, 'রামকেই রাজা করিব;' তাই নানারূপ কৌশল অবলম্বনে নিজের "সাফাই" দেখাইয়া, যেন আর দশজনের কথায়, প্রজা-প্রতিনিধি ও সামন্ত নৃপতিগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রামকেই রাজত্ব দিতে রাজি হইলেন। আদিকবিকৃত দশরথের মুখে রামের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাবের গৌরচন্দ্রিকা পড়িলে, বৃদ্ধ নৃপতির জন্য দুঃখ হয়। এক দিকে কর্ত্তব্য ও স্নেহের টান, অন্য দিকে নিগূঢ় শপথ—এই দোটানায় পড়িয়া রাজা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। অন্তঃপুরে—কৌশল্যা, সুমিত্রা, দশরথ—তিন জনই রামের দিকে। তাঁহারা নিজেরাই একটা তাল-গোল পাকাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু ছোটরাণী সম্পূর্ণ অন্ধকারে। বিবাহের সময়ে কি শপথ রাজা কৈকেয়ীর পিতার নিকট করিয়াছিলেন,—কৈকেয়ীর তাহা হয় ত মনেই নাই, বা রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে তিনি এতই আনন্দিত হইয়াছেন যে, ও সব স্বার্থের মলিন ছায়া সে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে আদৌ স্থানই পায় নাই। তাই যখন মন্থরা, রামের অভিষেকের খবর লইয়া আসিয়া প্রথম কৈকেয়ীকে শুনাইল, তখন আনন্দ-বিহ্বলা কৈকেয়ী এই শুভ সংবাদের জন্য মন্থরাকে নানাবিধ ধনরত্ন-আভরণাদি পুরস্কার দিলেন। মন্থরা প্রথম হইতেই রামের রাজ্যাভিষেক যে কৈকেয়ীর ও ভরতের কত বড় সর্ব্বনাশের হেতু, তাহা দ্বিজিহ্ব-প্রকৃতি নারীর ভাষায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেও কৈকেয়ী তাহা আদৌ কানেই তুলিলেন না; বরঞ্চ আরও পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ও একটি বর দিতে চাহিলেন। "রাম আর ভরতে আমিত কোনও প্রভেদ দেখি না, ইহারা উভয়েই ত আমার নিকট সমান"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে কৈকেয়ীর নয়ন আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে চিত্রটি বড়ই সুন্দর।

"মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা।
উত্তস্থৌ হর্ষ-সম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী॥ ৩১॥
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা।
দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্॥ ৩২॥
দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা।
কৈকেয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্॥ ৩৩॥
ইদন্তু মন্থরে! মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিংবা ভূয়ঃ করোমি তে॥৩৪॥
রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাৎ তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ৩৫॥
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ,
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।

তথা ব্রুবোচন্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং,
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু॥ ৩৬॥"

অযো, ৭ম সর্গ।

উদ্ধৃত কবিতাগুলির অধোরেখ চরণ কয়েকটিতে দৃষ্টিপাত করিলেই কৈকেয়ীর আনন্দ-বিহ্বল হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম হইতেই মন্থরা কতপ্রকার ক্ষতির কথা, ভরতের এবং সেই সঙ্গে কৈকেয়ীরও একপ্রকার পথের ফকির হইয়া যাইবার কথা নানামতে কৈকেয়ীকে বুঝাইলেও—তিনি তাহা শুনেন নাই, ও সব ঘৃণিত কথায় ভ্রূক্ষেপও করেন নাই; বরঞ্চ রামের অভ্যুদয়বার্ত্তায় উৎফুল্ল হইয়া মন্থরাকে যে পুরস্কার দিয়াছিলেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া আরও পুরস্কৃত করিতে চাহিতেছিলেন। "তুমি যে বর চাও, তাহাই দিব" বলিয়া মন্থরাকে বর চাহিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। এই শুভ-সংবাদে তিনি এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, পুত্র ভরতের কথা তাঁহার মনেই পড়ে নাই।

তাহা হইলে আমরা পাইতেছি দুইটি চিত্র, তাহা আবার দুইটি পৃথক্ দলের। একটি রামজননী কৌশল্যার, অপরটি রামের বিমাতা কৈকেয়ীর। পুত্রের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া কৌশল্যার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আর কৈকেয়ীর মনোভাবও বর্ণিত হইল। দুইটি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে রামজননী কৌশল্যার উক্তিতে প্রাণে যেমন ব্যথা লাগে, বিমাতা কৈকেয়ীর উক্তিতে সেই আনন্দ হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাম যৌবরাজ্য পাইবেন কি না, ইহা লইয়া যত চিন্তা, যত ভাবনা, সে সমস্তই ছিল—কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতির হৃদয়ে; কিন্তু কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে ও-সব দ্বন্দ্ব কখনও উদিত হয় নাই। অন্তঃপুরে যেন "একতরফা" দুইটা দল ছিল। অর্থাৎ দশরথ কৌশল্যা প্রভৃতিই আপন মনে নিজেরা একটা দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আর কৈকেয়ীকে একটা দলে ফেলিয়াছিলেন। অথচ কৈকেয়ী তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

দুর্জ্জয় শম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধে দশরথ আহত ও মৃত্যুমুখে পতিতকল্প হইলে পতিব্রতা কৈকেয়ীই রক্ষা করিয়াছিলেন; রাজাকে সে যাত্রায় বাঁচাইয়াছিলেন। তাই বশংবদ ভর্ত্তা দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর সেই রণক্ষেত্রেই দিতে প্রতিশ্রুত হন। প্রীতি-বিহ্বল স্বামীর আনন্দ-চন্দনলিপ্ত ঐ বররূপ মাল্য প্রতিদানরূপে গ্রহণ করিতে রাজনন্দিনী, কর্ত্তব্যপ্রিয়া, পতি-প্রাণা কৈকেয়ীর বুঝি কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল; তাই তিনি সহসা হর্ষোৎফুল্ল পতির প্রদেয় ঐ বর প্রত্যাখ্যান করিয়া পতিকে ব্যথিত না করিলেও "আচ্ছা, এখন থাকুক, পরে লইব" বলিয়া কোনমতে রণক্ষত আর্ত্ত দশরথকে প্রীত করিয়াছিলেন। ইহাতে কৈকেয়ীর হৃদয়ের কোমলতাই পরিস্ফুট হইতেছে। কিন্তু ঐ "পরে লইব" কথাও ঐ পর্য্যন্ত। তাহা কোনও দিন কখনও ভ্রমেও কৈকেয়ীর আর মনে পড়ে নাই, "লওয়া" ত দূরের কথা। "রাম কাল যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হইবেন",—মন্থরার মুখে শুনিয়া কৈকেয়ীর আনন্দের সীমা নাই। কত কি পুরস্কারে মন্থরাকে পরিতুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন। মন্থরা উল্টা বুঝাইতে লাগিল, কৈকেয়ীর কিন্তু কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই, বরঞ্চ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "ও সব বল কেন? আমার রাম আর ভরতে ত আমি কোনও পার্থক্য দেখি না। তোমার উপযুক্ত পারিতোষিক হয় নাই; আমার এত বড় সুখের সংবাদের পুরস্কারস্বরূপ তুমি যা চাও, আমি তোমাকে সেই বর দিচ্ছি, বল কি চাও?" এ সময়েও কিন্তু ঐ তুলিয়া রাখা বর দুইটির কথা রাণীর মনে জাগে নাই। সে হৃদয়ের কোনরূপ ভাবান্তর ঘটে নাই। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, রণক্ষেত্রে আহত স্বামীর শুশ্রূষার প্রতিদান বা মূল্যস্বরূপ ঐ দুইটি বর কৈকেয়ী কতটা বাস্তব বলিয়া, কতটা গ্রহণার্হ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মনে হয়, ঐ বরদান ব্যাপারটা ছোট রাণীর বলিষ্ঠ হৃদয়ে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কৈকেয়ীর উহার কথা ঘুণাক্ষরে মনে না থাকাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাপের বাড়ীর পরিচারিকা মন্থরাকে গল্পে গল্পে কৈকেয়ী ঐ ভীষণ যুদ্ধের কথাপ্রসঙ্গে—রাজার অঙ্গীকৃত ঐ বরের কথাও বলিয়াছিলেন,—যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, বিবৃত করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু মন্থরা, অতি হিতৈষিণী মন্থরা, কৈকেয়ী ভুলিলেও ঐ বরের কথা মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল, এবং আজ সময় বুঝিয়া, ঐ বররূপ শাণিত অস্ত্রের দ্বারা অযোধ্যার সোনার রাজ-সংসারের সকল শান্তির মূলে আঘাত করিল। নানা কল্পিত-বিভীষিকার দুর্ভেদ্য জাল বিস্তার-পূর্ব্বক কল্পনা-কুশলা মন্থরা সরলা মুগ্ধা কৈকেয়ীকে পাড়িয়া ফেলিল।

আদি কবি বাল্মীকি,—সীতা-সুমিত্রা-অরুন্ধতীর সৃষ্টিকর্ত্তা বাল্মীকি কেন যে কৈকেয়ীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত

করিয়া, আবার দানবীর লীলাক্ষেত্রে টানিয়া নামাইলেন,—তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কত জনে ইহার কত রূপ কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন,—দিয়াছেনও; কিন্তু কোনটাই মনের মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই।

কৈকেয়ীর মুখে রামের নির্ব্বাসন ও ভরতের অভিষেক শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষুণ্ণহৃদয় দশরথই তিরস্কারচ্ছলে কৈকেয়ীর দেবীত্ব প্রকটিত করিয়া ফেলিয়াছেন। দশরথ কহিতেছেন,—"সেই ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ শ্রী-সম্পন্ন রামই আমার জ্যেষ্ঠ তনয়—এইরূপ কত কথা যে তুমি আমাকে কতবার বলিয়াছ, এখন বুঝিতেছি, সে সমস্তই তোমার অলীক। কৈকেয়ি! ইতঃপূর্ব্বে তুমি ত কখনও আমার অপ্রিয় বা যাহা করিবার অযোগ্য—এরূপ কোনও কার্য্যই কর নাই, সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় তোমার যে এইরূপ অভিপ্রায় হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। তুমিই ত আমাকে কত বার বলিয়াছ যে, রাম আর ভরত—দুই-ই তোমার নিকট তুল্য।" ইত্যাদি। (অযো, ১২শ, ১৭-২২ শ্লোক)। "কে তোমাকে এই ন্যায্যবৎ প্রতীয়মান বাস্তবিক অনর্থ-বিষয়ের উপদেশ দিয়াছে?" (ঐ, ঐ, ৫৬ শ্লোক)। "তোমার যৌবনাবস্থায় তোমাকে ত এত মন্দ, এত কঠোর বলিয়া জানিতে পারি নাই, আজ প্রৌঢ় বয়সে তোমার এ কি মতিবিপর্য্যয়?" (ঐ, ঐ, ৫৭ শ্লোক।) ইত্যাদি ও আরও বহু উক্তি দ্বারা শোকাতুর রাজার অনর্গল হৃদয় হইতে কৈকেয়ীর দেবীমূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। এ হেন কৈকেয়ীকে রাজা দশরথ,

"নৃশংসে! দুষ্টচারিত্রে! কুলস্যাস্য বিনাশিনি!
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে! পাপং ময়াঽপি বা?"

অযো, ১২শ সর্গ, ৭।

"রে নৃশংসে, কলুষিতচরিত্রে! আমার কুলনাশিনি! পাপিষ্ঠে! তোর এমন কি অপকার রাম করিয়াছে, বা আমি করিয়াছি যে, তুই আজ এত নিষ্ঠুর হইলি?" এই যে তিরস্কার করিয়াছেন, ইহার সার্থকতা তত দেখিতেছি না। দশরথ নিজেই দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত আছেন, বিকৃত-বুদ্ধি কৈকেয়ী তাহার দাবি করিতেছেন। তাহা ছাড়া এই সঙ্কটকালে কৈকেয়ীর মনে না থাকিলেও রাজা ত জানেন, তিনি বিবাহের সময়ে চুক্তি করিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীর পুত্রকে রাজ্যার্পণ করিবেন; ইহা সত্ত্বেও কুলের বিনাশ কে আজ করিতেছে, বা কেই বা বহুদিন পূর্ব্বে করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা ত দশরথ মনে মনে বেশই বুঝিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে "দুষ্টচারিত্রে"—এই অত্যুৎকট বিশেষণ কি কৈকেয়ীরই প্রাপ্য?

মন্থরার কুমন্ত্রণাবিষে আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৈকেয়ী দেবীর যে দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহার নিকট কৌশল্যার চিত্রও নিষ্প্রভ। কিন্তু হঠাৎ সেই দেবীমূর্ত্তির রূপান্তরে—প্রাণে ব্যথা লাগে, মনঃপীড়া জন্মে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বসন্ত-প্রভাতে

বসন্ত-প্রভাতে আজি রসালে রসালে
মঞ্জুল মুকুলমালা, মধুবিন্দু ঝরে—
কম্পিত শিরীষ-পুষ্প, সম্মোহন শরে
নিখিল আকাশ বিদ্ধ রবি-রশ্মিজালে।

বিজড়িত কুজ্ঝটিকা দিগন্তরেখায়—
যেন অপ্সরীর দীর্ঘ নীল-উত্তরীয়
গ্রথিত কনকতন্ত্রে, হেথা বন-প্রিয়,
চাহিছে চপল নেত্রে, উৎপল-লেখায়—

লীলায়িত চারু-দৃষ্টি ঋষি-কন্যাগণ
আহরিছে ফুলরাশি,—কুটীর-অঙ্গনে
চন্দন-সৌরভ শুভ নিস্তব্ধ পবনে
হয়েছে সুদূর ব্যাপ্ত, মক্ষিকা-গুঞ্জন

উঠিছে তিমিরমাঝে, মূর্চ্ছনায় মোহ—
অস্পষ্ট কানন-ছবি পুষ্প সমারোহ।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

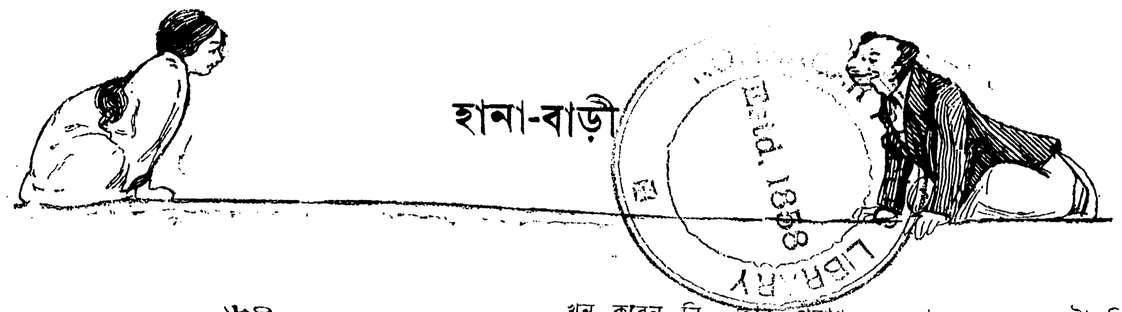

হানা-বাড়ী

৬৪

আমি বলিলাম, "তা হ'লে আপনার কথা থেকেই ত দেখছি, আপনি কি কান সাহেব কিম্বা আপনারা দু'জনেই খুনের জন্য দায়ী হয়ে পড়তে পারেন?"

"ভোজালীর বৃত্তান্তটা আপনাকে এখন বল্‌লাম বলেই ও কথা বলছেন। কিন্তু বাস্তবিক আমাদের দুজনের কেউ-ই উমাপতিকে খুন করেনি। যে দিন উমাপতির কাছে অস্ত্রখানা ফেলে এসেছিলাম, তার পর থেকে ওখানে আর কানও যায় নি, আমিও যাইনি।"

"কিন্তু আপনি নিজেই যে রাত ১২টা নাগাত ওখানে গিয়ে, ঐ ভোজালী দিয়ে উমাপতিকে খুন করেন নি, তার প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ আছে; সে কথা পরে বলছি। কিন্তু তার আগে আপনিই বলুন দেখি, আমার বা কানের দ্বারাই যে উমাপতি খুন হয়েছে, তা মনে করছেন কেন? যে উদ্দেশ্যে আমরা প্রমোদা ও উমাপতির সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে এত কাণ্ড করেছিলাম, সে উদ্দেশ্যের কথাও ত প্রমোদা আপনাদের বলেছে? তা' হ'লে সে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উমাপতিকে খুন করা ত আমাদের দ্বারা হতেই পারে না।"

"তা বটে; কিন্তু আপনাদের আসল উদ্দেশ্য ত ওদের কাছে বলেন নি? সেটা ছিল এই যে, বিহারী বাবুর ইন্‌সিওরেন্সের টাকাগুলা কোনও গতিকে শীঘ্র শীঘ্র হাসিল করা। আসল ও নকল বিহারীর মধ্যে একটি মারা গেলেও আপনাদের সে উদ্দেশ্যসাধনের পথ পরিষ্কার হবে মনে করেছিলেন। কিন্তু দুজনেই যে মরতে এত দেরি করবে, তা আপনারা ভাবেন নি। শেষে আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে না পেরে নকলটিকেই মেরে ফেলেছেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

"তর্ক হিসাবে ধরতে গেলে, আপনার এ যুক্তি অবশ্য খুব সমীচীন। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যদি মানুষ খুন করাই আমাদের দ্বারা সম্ভব হতো, তা হ'লে এত ষড়্‌যন্ত্রের হাঙ্গামা, পয়সা খরচ ও বিলম্ব না ক'রে যখন বিহারীর নিরুদ্দেশের পরে তাকে আমরা প্রথম হাতে পেয়েছিলাম, তখন তাকেই খুন ক'রে ফেল্‌লেই ত সব গোল সহজে চুকে যেতো! তা না ক'রেই ধরা পড়বার বেশী সম্ভাবনা সত্ত্বেও দুজন অপরিচিত বাইরের লোকের সঙ্গে এমন একটা বিষম রকমের ষড়্‌যন্ত্র ক'রেছিলাম, তা থেকেই কি প্রমাণ হয় না যে, খুন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় বলেই আমরা ঐ সব কাণ্ড করেছিলাম?"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুঝিলাম যে, সেন সাহেবের যুক্তিটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সেই জন্য ও বিষয়ে আর তর্ক না বাড়াইয়া বলিলাম, "তর্কের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আপনি নিজে খুন করেন নি, তার প্রমাণ যে আছে বল্লেন, সেটা কি, বলুন দেখি?"

আমি সে রাত্রিতে ১০টার পর থেকে প্রায় ২টা পর্য্যন্ত বাড়ীতেই ছিলাম না। গোঁসাইজীর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে শ্যামবাজারে তাঁর এক জন ধনী যজমানের বাড়ীতে ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে সঙ্কীর্ত্তনও হয়েছিল। সে সব শুনে আমরা দুজনে একসঙ্গেই রাত প্রায় ২টার সময় বাড়ী ফিরেছিলাম।"

"এ কথা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?"

"হাঁ; দরকার হ'লে গোঁসাইজী ও তাঁর সেই যজমান, এ দু'জনের দ্বারাও প্রমাণ হ'তে পারবে।"

"তা হ'লে খুনের দায় থেকে না হয় অব্যাহতি পেতে পারেন। কিন্তু, এই জাল-জুয়াচুরির দায় থেকে পার পাবেন কি ক'রে?"

"সেই জন্যেই ত আপনার কাছে এসেছি। মনে করুন, আপনিই যদি এ বিষয়ে আমার উকীল হন, তা হ'লে কি কোনও উপায় করতে পারবেন না? দেখুন অরুণ বাবু, আমার বা কানের যদি জেল হয় ত সে আমাদের কর্ম্মফল ব'লে মনে করবো। কিন্তু যমুনারও যদি সেই সঙ্গে কোন শাস্তি হয়, তা হ'লে সেটা ত সম্পূর্ণ অবিচার হবে? ওকে কোন রকমে আপনার রক্ষা করতেই হবে!"

এই কথা বলিয়াই সেন সাহেব অতি কাতরভাবে আমার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিলেন।

তাঁহার এই বিপন্ন ভাব দেখিয়া আমি কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে বলিলাম, "দেখুন, মিঃ সেন, এই খুনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিষয়ে বিহারী বাবুর মেয়েই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। যতক্ষণ তাঁর (ও সেই সঙ্গে আমাদেরও) ধারণা ছিল যে, বিহারী বাবুই খুন হয়েছেন, ততক্ষণ দোষীর অনুসন্ধান ক'রে তাকে শাস্তি দেওয়ানোর ইচ্ছা তাঁর খুবই ছিল। কিন্তু, যখন থেকে জানা গেছে যে, হত ব্যক্তি বাস্তবিক বিহারী বাবু ন'ন, তখন থেকে তাঁর মেয়ের বা আত্মীয়দের কারও আর এ ব্যাপারের সংস্রবে থাকতে ইচ্ছা নেই। বরং আপনার মেয়েকে যাতে কোন হাঙ্গামে পড়তে না হয়, তাঁদের এখন তাই ইচ্ছা। কিন্তু, তা হ'লেও পুলিস এখন এ বিষয়ে একটু বেশী রকম উদ্যোগী হয়েছে ব'লে এটা এখন আমাদের হাতের বাইরে চ'লে গেছে। পুলিসকে বা সরকার বাহাদুরকে যে একেবারে নিরস্ত করা যাবে, সে আশা করা যায় না। তবে আপনাদের এই সব কার্য্যকলাপের ফলে যখন শুধু ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীরই স্বার্থে আঘাত লেগেছে, তখন তারা ছাড়া আর কারও আপনাদের বিরুদ্ধে লাগবার বিশেষ জেদ হবে ব'লে মনে হয় না। আর তারাও

যখন ব্যবসাদার লোক, তখন তাদের যে ক্ষতিটা হয়েছে, সেটা পূরণ ক'রে দিলেই,—অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে যে টাকাগুলা আত্মসাৎ করেছিলেন, সেগুলা ফিরিয়ে দিলে,—বোধ হয়, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী হাঙ্গামা না করতেও পারে।"

"তা না হয় হ'লো ;—আর টাকা ফিরিয়ে দেবার মুস্কিলও কিছু হবে না ; কেন না, আসল টাকাগুলা সবই বজায় আছে ; এ পর্য্যন্ত কেবল সুদই খরচ হয়েছে ;—কিন্তু ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী কিছু না করলেও পুলিসও কি একবারে চুপ ক'রে থাকবে ?—ঐ যে কি বল্লেন,—আদালতকে ফাঁকি দিয়ে উইল প্রোবেট করানো হয়েছিল—তাই নিয়ে সরকারের তরফ থেকেও ত আমাদের উপর একটা অভিযোগ হ'তে পারে ?"

"শুধু হ'তে পারে কেন ?—হবেই। পুলিসও যখন যড়যন্ত্রের কথা জেনেছে, তখন তারা চুপ ক'রে থাকতেই পারে না। কিন্তু কান্ সাহেব যদি আপনার মেয়ের বা আপনার বিরুদ্ধে কিছু না বলে, তা হ'লে আপনাদের সম্বন্ধে শুধু প্রমোদার সাক্ষ্য দ্বারা কিছুই প্রমাণ হবে না। আপনারা বেকসুর খালাস হয়ে আসতে পারবেন।"

"কান্ যদি কোন কথা বলেও ত সে শুধু আমারই সম্বন্ধে না হয় বল্‌তে পারে। যমুনাকে কখনই জড়াতে পারবে না। তা হ'লে আমার যা হয় হোক,—যমুনার ত কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না ?"

"না ; ইন্‌সিওরেন্সের টাকাগুলা যদি তিনি ফেরত দেন ত তাঁর কোন ভয় করবার কারণ থাকবে না।"

"আঃ, বাঁচলাম মশায়! আমার যমুনা যে রক্ষা পাবে,—আমার দোষে তাকেও যে মজতে হবে না,—এতে যে আমার কি আহ্লাদ হলো"—বলিয়াই সেন সাহেব বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লোকটা দুর্বৃত্ত হইলেও ঐ একমাত্র কন্যার প্রতি তাহার এই অপরিসীম স্নেহের নিদর্শনে আমার মনটাও একটু আর্দ্র হইয়া পড়িল,—চোখ দুইটাও সম্পূর্ণ শুষ্ক রহিল না।

যাহা হউক, এ দিকে বেলাও যথেষ্ট হইয়াছে দেখিয়া কোন মক্কেল আসিবার পূর্ব্বেই সেন সাহেবকে বিদায় দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "তা হ'লে আজই যাতে ইন্‌সিওরেন্সের টাকা ফেরত দেওয়া হয়, তার বন্দোবস্ত করুন্ গে। এ বিষয়ে দেরি করা চলবে না।"

"হাঁ,—এখন তা হ'লে আমি চল্লাম, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, সে জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমাকে আপনি ভুলবেন না, অরুণ বাবু ; আমি আবার আপনার কাছে আসবো,—আর এ সব বিষয়ে আপনাকেই আমার পক্ষে উকীল থাকতে হবে, এই আমার অনুরোধ। অবশ্য, আমি সাধ্যমত আপনার সব ফী-ও দেবো।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।"

তিনি তখনকার মত প্রস্থান করিলেন।

৬৫

ভবানীপুরে কান্ সাহেবকে ধরিতে গিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই সংবাদ জানিবার জন্য বৈকালে কোর্ট হইতে বাহির হইয়া তাঁহার আফিসে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত দেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি তখন নিতান্ত ব্যস্তভাবে আফিস হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন বলিয়া সেখানে আমাকে বসিতে আহ্বান না করিয়া, তাঁহার সঙ্গেই যাইতে অনুরোধ করিলেন। পরে দুই জনে একখানা ঠিকা গাড়ীতে উঠিলাম। পথে যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন, "আপনার এই হানা-বাড়ীর ব্যাপারটা আমাকে বড় বিব্রত ক'রে ফেলেছে মশায়! সবই শেষে পণ্ডশ্রমে দাঁড়ালো দেখছি।"

আমি বলিলাম, "কেন বলুন দেখি ? কাল রাত্রে কান্ সাহেবকে কি ধর্‌তে পারেন নি না কি ?"

"ঠিক তা না হ'লেও, তাকে ধরা না ধরা এখনও এক রকম সমান হয়ে রয়েছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার মানে ?"

"মানে আর কি ?—ধরেছি শুধু তার দেহটাই, তাতে এখনও প্রাণ আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান নেই।"

"কি হয়েছে, একটু বাঙ্গালা করেই বলুন না!"

"হবে আর কি ? লোকটা পালাবার চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে মাথা যাবার দাখিলে পড়েছে! তাকে ধরবার সব আয়োজন ক'রে কাল বিকেলে ভবানীপুরে গিয়েছিলাম, তা ত জানেন ? সন্ধ্যার ঠিক আগেই যমুনা ঘোষের পাঞ্জাবী বন্ধুর বাড়ীর পিছনের গলিতে তাদের খিড়কী দরজার কাছাকাছি, আমি ও দুজন পাহারাওয়ালা সাদা পোষাকে আলাদা আলাদা যায়গায় ওৎ পেতে রইলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই দেখলাম, ঐ গলির মধ্যে একটু দূরে একখানা বেশ ভাল রকমের ঠিকা গাড়ী এসে দাঁড়াল,—আর তার মধ্য থেকে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, মুখে গোঁফ-দাড়ীওয়ালা, পাঞ্জাবী পোষাক পরা একজন দীর্ঘকায় লোক নেমে প'ড়ে প্রথমে সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে। তার পরে ধীরে ধীরে সে খিড়কীর দিকে এগিয়ে এসে, সেখানে একবার দাঁড়িয়ে আবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে। তখন বেশ বুঝা গেল যে, ঐ লোকটাই আমাদের আসামী। তা হলেও আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তার পরে তাকে ধরবো মনে করলাম। কিন্তু লোকটা তার পর পায়চারী করতে করতে খিড়কী ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে যখন আমার দলের রামসিং পাহারাওয়ালার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কি জানি কেন, রামসিং বোধ হয় লোভ সামলাতে না পেরে পিছন থেকে লোকটাকে আঁকড়ে ধরবার অভিপ্রায়ে যেই নিজের হাত দুটা মেলিয়েছে, অমনই সে লোকটা বোধ হয় রামসিংএর অঙ্গচালনা কোন রকমে দেখতে পেয়ে তার মৎলব বুঝতে পেরে, একবারে সোজা সামনের দিকে দৌড় দিলে। সঙ্গে সঙ্গে রামসিং এবং আমি আর অন্য পাহারাওয়ালাটাও তার পেছু পেছু আমাদের 'হুইসল' বাঁশী বাজাতে বাজাতে ছুটলাম। এই ভাবে অল্পদূর গিয়ে, গলিটার মোড়ের কাছে আসবামাত্র অন্য দিক থেকে আর একটা পাহারাওয়ালা আমাদের বাঁশীর শব্দ শুনে ছুটে আসছে দেখে, লোকটা তাকে এড়িয়ে যেমন মোড় ফিরতে গেছে, অমনই সেই সময় সে দিকের গলি থেকে একখানা জুড়ী-গাড়ী খুব বেগে এ গলিতে ঢুকছিল দেখে, সেটাকেও এড়াবার জন্যে একটা লাফ দিলে। কিন্তু সেই লাফটাই তার কাল হ'ল। দু'দিকের তাড়ায়, বোধ

হয় ভড়কে গিয়ে, লাফটা ঠিক আন্দাজমত দিতে না পেরে ঘোড়ার মুখের ধাক্কা খেয়ে একেবারে উল্টে প'ড়ে গেল, আর একটা ঘোড়ার সম্মুখের খুরের বিষম চোট তার মাথায় লাগল। গাড়ীর কোচম্যানটা খুব হুঁসিয়ার বলেই হোক, কিংবা আমরাও জনে তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে পড়লাম বলেই হোক,—ঘোড়া দুটাকে তখনই থামিয়ে ফেলে, তাদের পায়ের ভিতর থেকে লোকটাকে বার ক'রে আনা গেল। তখন সে সম্পূর্ণ অচেতন, মাথা থেকেও খুব রক্ত বেরুচ্ছিল। তাই দেখে,—আর সে গাড়ীখানাতেও তখন কোন সওয়ারী না থাকায়,—তাকে ধরাধরি ক'রে সেই গাড়ীতেই উঠিয়ে নিয়ে একেবারে সটান হাঁসপাতালে এনে হাজির করা গেল। সেই থেকে এখন পর্য্যন্ত তার চেতনা হয়নি। এইমাত্র খবর পেলাম যে, ডাক্তার মনে কচ্ছেন যে, এইবার চেতনা একটু হ'তে পারে। তাই শুনে সেইখানেই আবার যাচ্ছ,—এইবার নিয়ে আজ আমার তিনবার সেখানে যাওয়া হবে। তা ছাড়া আমাদের এক জন লোক ত সেখানে হাজির আছেই।"

আমি বলিলাম, "তাই ত! বেচারার অবস্থা ত তা হ'লে বেশ সঙ্গীন দেখছি! বাঁচবার আশা আছে কি ?"

"মোটেই না। ডাক্তার বলছেন, আজ রাত কাটবে কি না সন্দেহ।—লোকটার যমুনার উপর টানটা খুবই ছিল বটে। তার মন্ত্র পেয়ে প্রাণটাও খোয়ালে!"

"সেটা নিশ্চয় ক'রে বলা শক্ত। কথাটার মধ্যে মনস্তত্ত্বের একটু জটিল সমস্যা আছে বোধ হয়। যা হোক, সবই ভগবানের হাত!"

"তা ত বটেই! বাঁচলে হয় ত ফাঁসী-কাঠে ঝুলতো ;—যমের জেল ত খাটতেই হ'ত। ভগবান্ ওসব থেকে ওকে রক্ষা করলেন, তাতে সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু ঐ লোকটাই যে কান্ সাহেব, তা ঠিক করলেন কি ক'রে ?"

"ওঃ! আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি যে। লোকটা যখন পড়ে গিয়ে আহত হলো, তখনই তার পাগড়ীটা মাথা থেকে খুলে গেলো, আর মুখের নকল দাড়ীটাও সেই পাগড়ীর সঙ্গে বোধ হয় কোন রকমে আটকানো ছিল ব'লে সেটাও পাগড়ীর সঙ্গেই খুলে গেল। তখন তার আসল গোঁফ-ওলা মুখ বেরিয়ে পড়লো। আমার সঙ্গে চৌবে নামে যে দ্বিতীয় পাহারাওয়ালাটা ছিল, সে কান্‌কে চিনতো। বৌবাজারে কানের সঙ্গে সে দিন দেখা হবার সময়ে যে লোকটা গলির মোড়ে সিগারেট বিড়ীর দোকানওয়ালা সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই ঐ চৌবে। যা হোক, আহত লোকটাকে গাড়ীতে তোলবার সময় তার মুখ দেখে সে চৌবে কান্ সাহেব ব'লে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু সঙ্গে তার মুখে কালো রং মাখানো আছে। পরে তাই সাব্যস্তও হয়। হাঁসপাতালের ডাক্তার যখন কানের ক্ষতগুলা ধুয়ে মুছে দিলে, তখন মুখের কৃত্রিম রং সব উঠে গিয়ে আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়লো। তখন চৌবে তাকে স্পষ্টই কান্ বলে সনাক্ত করলে। তা ছাড়া আজ সকালে প্রমোদাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেও তাকে কান্ বলেই চিনেছে।

তৎপরে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বিরক্তি-ব্যঞ্জকভাবে বলিলেন, "আবার উনিও যে কিছু গোল বাধিয়ে বসবেন কি না, তাও বলা যায় না।"

"উনি কে ?"

"ঐ যে আপনার প্রমোদা ; আবার কে ?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "আপনার মাথাটা আজ বড়ই বিগড়ে হয়েছে দেখছি। প্রমোদা আপনার না হয়ে আমার হ'ল কি ক'রে ?"

"আরে, যান মশায়!—এখন আর তামাসা ভাল লাগে না। আপনারই হোক আর আমারই হোক,—সে এখন টেঁকলে বাঁচা যায়।"

"কেন ? তার আবার কি হ'ল ?"

"আর বলেন কেন ? কাল রাত্রিতে হানাবাড়ীতেও সব পণ্ডশ্রম হ'ল, তা ত জানেন। স্মৃতিরত্ন ত বেমালুম লম্বা দিলে,—কেবল ধরা পড়লো, তার নকল চুল আর গোঁফদাড়ী! তার আসল মুখখানাও ওদের তিন জনের মধ্যে কেউই দেখতে পেলে না যে, পরে আবার তাকে দেখলে চিনতে পারবে; আপনিও বোধ হয় তথৈব চ ?—যাক্, ও সবই ত শুনেছি; তা ছাড়া আরও শুনলাম যে, ওখানে যাবার আগে থানা থেকে বেরোবার সময় ওঁরা তিন জনেই না কি সামনে একটা কুলপী-বরফওয়ালা দেখতে পেয়ে, বেশ ক'রে কতকগুলা কুলপী-বরফ খেয়েছিলেন। বোধ হয়, তারই ফলে আজ সকাল থেকেই তিন জনেরই পেটের গোলযোগ আরম্ভ হয়েছিল। প্রমোদাকে যখন হাঁসপাতালে কান্ সাহেবের কাছে নিয়ে যাই, তার আগেই তার না কি বার দুই ভেদ হয়েছিল। সেখানে গিয়ে কান্ সাহেবকে চেনবার পর থেকে রোগটা বেশ বেড়েই গেল। পেটের যন্ত্রণা, ভেদ, আবার সেই সঙ্গে বমিও আরম্ভ হ'ল। তাই দেখে তাকেও ঐ হাঁসপাতালেই থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এলাম।"

"এখন তারা কেমন আছে, খবর পেয়েছেন কি ?"

"হাঁ, খবর নিচ্ছি বৈ কি! মাঝে একবার হাঁসপাতালে গিয়েও ছিলাম। সবর্হন্‌স্পেক্টার আর কনেষ্টবলটা বেশ সামলেছে ; কিন্তু প্রমোদার অবস্থা বড় সুবিধে নয়। তার ভেদ-বমি বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু খুব জ্বর হয়েছে, পেটও খুব ফেঁপে আছে। ডাক্তার বলছে, আবার না কি ভেদবমি হ'তে পারে, আর তা হ'লে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"তাই ত! তা হ'লে আপনার এক জন আসামী ত এক রকম বেহাত হয়েই গেছে,—আবার প্রধান সাক্ষীটিও যাবার দাখিলে পড়েছে দেখছি!"

"আর বলেন কেন! সাধ ক'রে কি আর মেজাজ বিগড়ে আছে ?"

৬৬

হাঁসপাতালে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রথমে সেখানকার ডাক্তারের সহিত দেখা করিলাম। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, কান্ সাহেবের অবস্থা আশাপ্রদ না হইলেও আপাততঃ একটু ভাল ; প্রায় এক ঘণ্টা হইল, জ্বর একটু কমিয়াছে এবং অল্প অল্প জ্ঞান-সঞ্চার হইয়া, এখন অনেকটা সঙ্গতভাবে বাক্যালাপ করিতে

পারিতেছে। ডাক্তার আমাদিগকে রোগীর কক্ষে লইয়া গিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তৎপরে ক্রমে তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ আরম্ভ হইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপের ফলে অনেক কষ্টে যাহা কিছু বুঝা গেল, তাহাতে দুই একটি বিষয় ছাড়া বিশেষ কিছু নূতন তথ্য ছিল না। তাহার কথায় প্রমোদার কথিত বৃত্তান্তগুলার সত্যতা প্রতিপন্ন হইল এবং সকালে সেন সাহেবের কাছে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহারও সমর্থন হইল। বলা বাহুল্য যে, তাহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় যমুনা যে কিছুই জানিত না, এ কথা সে বিশেষরূপে বলিতে ভুলে নাই; কিন্তু তাহাদের দলস্থ স্মৃতিরত্ন বাস্তবিক যে কে, কানের উক্তি হইতে তাহা কিছুই প্রকাশ হইল না। উমাপতির খুনের সম্বন্ধে সে বা তাহার দলের কেহই কিছু জানে না, তাহাও বলিল।

নূতন তথ্যের মধ্যে তাহার কথা হইতে জানিলাম যে, নিতাইয়ের নিকট হইতে আমি যে ছাতাটা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক কান্ সাহেবই প্রমোদার জন্য উইলসনের সাহায্যে সেই বিলাতী দোকান হইতে কিনিয়াছিল। তাহার কথায় আরও জানিলাম যে, আমি সে দিন যখন তাহার সঙ্গে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বেও সে নিতাইকে বক্‌শীসের দ্বারা নিজের পক্ষভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং সেখানে গিয়াছিল; এবং অনুসন্ধানে যখন জানিল যে, নিতাই ও তাহার প্রভু উভয়েই সে বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, ও তাহার মিথ্যা কথা প্রকাশ হইবার তখন কোন সম্ভাবনা ছিল না জানিয়াও আমাকে তাহার সঙ্গে তথায় লইয়া গিয়াছিল।

রোগীর পুনরায় অল্পাধিক সংজ্ঞালোপের ভয় লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার আমাদিগকে আর বেশী কথা বলাইবার চেষ্টা করিতে নিষেধ করিলেন।

প্রমোদার সন্ধান লইয়া জানা গেল, সে নিদ্রিত এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থ।

পথে আমরা আপনাপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া বাক্যালাপ হইতে বিরত রহিলাম। উভয়ের চিন্তাস্রোত বোধ হয় একই দিকে বহিতেছিল; কেন না, কিছুক্ষণ পরে আমি যখন নলিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করবেন, কিছু ঠিক করেছেন কি?" তখন তিনি বিরক্তিভরে বলিলেন, "কি আর করব? এরা না সেরে ওঠা পর্য্যন্ত ত কিছুই করা যাবে না?"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "খুনটার কিন্তু কোন কিনারা হ'ল না।" তিনি বলিলেন, "কৈ আর হ'ল? ব্যাপারটা নিতান্তই আপনাদের ঐ হানা-বাড়ীর ভূতের কীর্ত্তিই হয়ে রইল দেখছি!"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিলেন, "নিতাইও ত ক'রে থাকতে পারে?"

আমি বলিলাম, "সেটা ত অনুমানমাত্র। সবটাই আপনার ঐ 'হয় ত' দিয়ে গড়া! প্রমাণ কিছু নেই ত?"

"নিতাইকে ধরতে পারলে হয় ত কিছু প্রমাণ হ'তে পারে।"

"কিন্তু, তাকে দোষী ব'লে গ্রেপ্তার করলে সে যদি কিছু স্বীকার না করে, তা হ'লে আসামীকে ত জেরা করতে পারবেন না?"

নলিনী বাবু আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিলেন, "নাঃ! ওদিকে সুবিধে হবে না। দেখছি, স্মৃতিরত্নটাই সব নষ্টের গোড়া! ওকে না ধরতে পারলে খুনের কোনই কিনারা হবে না।"

আমি বলিলাম, "তাতেই বা কি হবে। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়?"

অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে নলিনী বাবু বলিলেন, "তা হ'লে ইংরেজের আদালতে অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ হবে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে ভূতে ছোরা দিয়ে মানুষ খুন করে!—যাক্ গে মশায়, আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আধ মণ তেলও পুড়বে না,—রাধাও নাচবে না। স্মৃতিরত্ন যখন চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে,—তখন সব লেঠাই মিটে গেছে!"

আমাদের গাড়ী রামপাল লেনের কাছে উপস্থিত হওয়ায় আমি নলিনী বাবুর নিকট বিদায় লইলাম।

৬৭

পূর্ব্ব-কথিত ঘটনাবলীর পর তিন সপ্তাহেরও অধিক সময় কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে হানা-বাড়ীর খুন-জুয়াচুরীর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার অবকাশ আমার ছিল না।

হানা-বাড়ীর ষড়যন্ত্রকারিগণের অভিসন্ধির পরিণাম যাহাই হউক, আমার পিসীমা প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারিণীগণের 'ফন্দী'টা কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাবণ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই শুভদিনে ও শুভলগ্নে আমার সহিত শ্রীমতী কাকলীর শুভ-পরিণয়কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে।

আমার দিদিরা দুই জনেই যথাসময়ে সপরিবারে আসিয়া পিসীমার বাড়ীর কাছেই একটা বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য বিবাহকার্য্যটা কলিকাতায় যোগীন বাবুর বাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলি আমাদের দেশের বাড়ীতে সমাধা হইয়াছিল। তাহার পর প্রথানুযায়ী অষ্টাহ পরে নববধূ পিত্রালয়ে (বর্দ্ধমানের বাড়ীতে) ফিরিয়া গিয়াছেন। সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই যোগীন বাবু সপরিবারে ঘোষজা মহাশয়কে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহারা সকলে সেখানেই আছেন। এ দিকে দিদিরা নববধূকে আবার আনাইয়া তাহার সহিত কিছুকাল একত্র দেশের বাড়ীতে বাস করিবার ইচ্ছায় সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে পিসীমাও তাঁহার সন্তানদের লইয়া সেখানে আছেন।

উৎসবাদির পর আজ দুই দিন হইল, আমি রামপাল লেনের বাড়ীতে আসিয়াছি। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে হানা-বাড়ীর ব্যাপারটাও মনে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

আমি ও নলিনী বাবু যে দিন একত্র হাসপাতালে গিয়া কান্ সাহেব ও প্রমোদাকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার দুই তিন দিন পরে নলিনী বাবুর এক চিঠিতে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, সেই রাত্রি হইতেই কান্ সাহেবের পুনরায় খুব জ্বরবৃদ্ধি হইয়া পরদিন বৈকালে তাহার ইহলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। প্রমোদার অবস্থাও বিশেষ সঙ্কটাপন্ন না হইলেও একবারে আশঙ্কাশূন্য নহে।

হামার বিবাহ উপলক্ষে নলিনী বাবু বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, প্রমোদার রোগটা ক্রমে দারুণ রক্তামাশয়ে পরিণত হইয়া, তখনও তাহাকে শয্যাশায়ী রাখিয়াছিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত প্রমোদার আর কোনও সংবাদ পাই নাই।

বিবাহের পূর্ব্বেই আমার সহিত সেন সাহেব পুনরায় দেখা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, আমার পরামর্শ অনুসারে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে সমস্ত টাকাই তিনি তাঁহার কন্যা দ্বারা প্রত্যর্পণ করাইয়াছেন, এবং তাহারাও ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কন্যার বিরুদ্ধে কোনরূপ অবৈধ আচরণের অভিযোগ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু টাকা ফিরাইয়া দেওয়ার ফলে পিতাপুত্রীর আর্থিক অবস্থা এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, ঘোষজা মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু সাহায্য না পাইলে, তাঁহাদের স্বচ্ছলভাবে সংসার নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়াছে। আমি তখন তাঁহাকে এ বিষয়ে যোগীন বাবু ও ঘোষজা মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে কথা কহিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। পরে যোগীন বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে, সেন সাহেব ও তাঁহার কন্যা উভয়েই যোগীন বাবুর বাড়ীতে গিয়া, সেখানে ঘোষজা মহাশয় ব্যতীত অপর সকলের সঙ্গেই দেখা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে কতকটা সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, ঘোষজা মহাশয়ের জীবদ্দশায় যমুনা তাঁহার সহিত পুনরায় একত্র বসবাসের প্রয়াস করিবেন না ও তৎপরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র ভরণপোষণের উপযোগী একটা মাসহারা পাইবেন।

এই বিবাহ উপলক্ষে ঘোষজা মহাশয়ের এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিতে না পারিলেও, পূর্ব্বাহ্নে বিবাহ-উৎসবে যোগদানে এবং বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও তাঁহার সম্মতিক্রমেই কন্যাপক্ষ হইতে যমুনা ও সেন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করায় তাঁহারা বিবাহের দিন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি ঘোষজা মহাশয় স্বয়ং তাঁহাদের সহিত দেখা করেন নাই; এমন কি, পাছে উঁহারা অতঃপর তাঁহার সহিত পুনরায় ঘনিষ্ঠতা করিতে প্রয়াসী হন, এই আশঙ্কায় তাঁহার ইদানীং আবার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে, এবং স্বাস্থ্যও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু খারাপ হইয়াছে।

আজ বৈকালে কোর্ট হইতে আসিবার পরে বিশেষ কোন কাজ না থাকায়, নীচের ঘরে আরাম-চেয়ারে বসিয়া একখানা বইতে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছিলাম। মনটা কিন্তু বড়ই উদাসী হইয়া বইখানা ছাড়া অপর সকল দিকেই বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। এমন সময় দেখিলাম, স্বয়ং নলিনী বাবু আমার ঘরের দ্বার অতিক্রম করিয়া ঠিক আমার সম্মুখেই উপস্থিত।

সম্মুখে বসিয়া বলিলাম, "হানা-বাড়ীর ব্যাপারটার পরিণাম কি হ'ল, নলিনী বাবু?"

"তা বুঝি জানেন না?"

"না, ব্যাপার কি?"

"প্রমোদাও আর নেই!"

"সে কি! বলেন কি?—আহা! বেচারা শেষে মারা গেল?"

"হাঁ, বাস্তবিকই দুঃখের কথা। ডাক্তারেরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। সেই রক্তামাশয়ে ভুগে, শেষে কাল সকালে মারা গেল!—সবই তাঁর ইচ্ছা! তবে, মঙ্গলের ভিতর দিয়েও যে তিনি ভাল করেন, সেটা যেন এ ক্ষেত্রে একটু দেখা গেছে বোধ হয়।"

"ভালটা কি?"

"আপনার হানা-বাড়ীর খুনের জন্যে আর অন্ধকারে হাৎড়ে বেড়াতে হবে না। এত দিনে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়েছে!"

আমি একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলাম, "ওঃ! এ বুঝি আপনার সেই 'হয় ত' তার একটা নূতন সংস্করণ?"

"আঃ! আপনি যে ঐ 'হয় ত' নিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললেন দেখছি!—এবারে কিন্তু আর হয় ত—ফয় ত নয়! খাঁটি সত্য।"

"বটে? তা হ'লে ত এবারে খুব বাহাদুরী নিয়েছেন, বলতে হবে! ফিরে 'গেজেটে' রায় বাহাদুর না হয়ে ছাড়ছেন না দেখছি!"

"বাস্তবিক ঠাট্টা নয়, অরুণ বাবু! তবে, এতে বাহাদুরী বা কেরামতি কারোই কিছু নেই! যার হাত দিয়ে কাযটা হয়েছিল, সেই বলেছে।"

নলিনী বাবুর স্ববের গাম্ভীর্য্যে, তাঁহার কথার সত্যতা বেশ উপলব্ধি হইল। তখন আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে বলুন ত?"

ঠোঁটের কোণে একটু মৃদুহাসি খেলাইয়া তিনি বলিলেন, "কি বকসিস্ দেবেন?"

"উপস্থিত চা বিস্কুট ছাড়া অন্য কিছুর যোগাড় নেই।"

"ওঃ! বৌমা এখন হাজির নেই ব'লে বুঝি?—আচ্ছা, আপাততঃ তাই স্বীকার। তিনি এলে কিন্তু একটা রীতিমত বাগান-পার্টি চাই,—তা ব'লে রাখছি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তথাস্তু।" পরে চাকরকে তৎক্ষণাৎ চা-বিস্কুট আনিবার আদেশ দিয়া, নলিনী বাবুকে বলিলাম, "এখন বলুন দেখি, লোকটা কে?"

৬৮

নলিনী বাবু বলিলেন, "প্রমোদা।"

আমি উত্তেজনাবশে একবারে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "বলেন কি! প্রমোদা?"

নলিনী বাবু বলিলেন, "হাঁ, বড়ই আশ্চর্য্য নয় কি? আমি ত একবারও ভাবিনি যে, ওর হাত দিয়ে এ কাযটা হয়েছে। তবে সে যা বল্লে, তা'তে ব্যাপারটা খুনও নয়, আর কাযটা সে ইচ্ছে করেও করেনি। দৈব-বিপাকে ওর হাত দিয়ে উমাপতির প্রাণটা গেছে বটে।"

আমার চাকর চা-বিস্কুট আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া গেল। তখন আমি বলিলাম, "ঘটনাটা কি হয়েছিল?"

"তবে গোড়া থেকেই বলি, শুনুন।"

চা পান করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "পরশু দিন থেকেই প্রমোদার অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে, সে নিজেই বুঝতে পেরেছিল যে, তার আর সারবার আশা নেই।

ক্রমে যখন দুর্ব্বলতা খুব বাড়তে লাগলো, তখন সে ডাক্তারের দ্বারা আমাকে ডেকে পাঠালে। আমি বেলা ৩টা নাগাত সেখানে গেলাম। ডাক্তার ও আমি তার কাছে বসবার পর সে বল্‌লে, 'আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, আমার আর বেশী দেরি নেই। কিন্তু মরবার আগে পুলিসকে একটা বিশেষ কথা ব'লে যেতে চাই। সেটা না বল্‌লে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।'

"আমরা দুজনেই তাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু সে একটু হেসে বল্‌লে, 'আপনারা বোধ হয় মিথ্যা স্তোক দিচ্ছেন। তা যাই বলুন,—মরি আর বাঁচি—আমি কিন্তু কথাগুলো ব'লে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।' তখন আমি বল্লাম, 'তা বেশ ত; কি বল্‌তে চাও বল না। যদি ইচ্ছে কর ত না হয় তোমার কথাগুলা সব লিখে নিতে পারি। তাতে শেষে সই ক'রে দেবে এখন!' সে বল্লে, 'না, না; লিখতে হবে না। আমি সই করতেও পারবো না। আমি যা বল্‌বো, আপনারা দুজনে তা শুধু শুনলেই যথেষ্ট হবে।'

"তার পরে সে যে সব কথা নিজে বল্লে, আর আমি তাকে প্রশ্ন ক'রে যা কিছু জানলাম, তার মোট তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, ওদের ঐ সব ষড়যন্ত্র হবার আগে, যখন উমাপতির টাকার টানাটানি চলছিল, তখন উমাপতি নিজের সোনার পকেট-ঘড়ীটা বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা ধার করেছিল। হানাবাড়ীতে আসবার পর সে কান্ আর স্মৃতিরত্নকে জেদাজেদি করে, তাদের দিয়ে ঐ ধার শোধ করিয়ে, ঘড়ীটা উদ্ধার করাতে রাজী করেছিল। পরে কান্ সেটা উদ্ধার ক'রে এনে প্রমোদাকে দিয়েছিল। প্রমোদার কাছে উমাপতি সে কথা শুনে, ঘড়ীটা তাকে এনে দিতে বলেছিল। প্রমোদা কিন্তু তার পরে যতবার হানাবাড়ীতে এসেছিল, ততবারই ঘড়ীটা আনতে ভুলে যাওয়ায় প্রতিবারই তাই নিয়ে উমাপতির সঙ্গে তার খিটিমিটি হয়েছিল। বিশেষতঃ শেষবারের আগে উমাপতি ঐ নিয়ে একটু বেশী রকম রাগারাগি বাধিয়েছিল; এমন কি, প্রমোদাকে দু-এক ঘা খেতেও হয়েছিল। সেই জন্য শেষকালে অর্থাৎ সেই সরস্বতীপূজার আগের রাত্রিতে ও যখন ওখানে যাবার জন্যে কানের সঙ্গে কানাই মল্লিক লেনে এসেছিল, তখন প্রমোদা আর ঘড়ীটা আন্‌তে ভোলেনি। কিন্তু সেবারে ত হানাবাড়ীতে তখন যাওয়াই হলো না; কানাই মল্লিক লেনের বাড়ী থেকেই চ'লে আসতে হলো। কান্ সাহেব প্রমোদার সঙ্গে তার বাড়ীতে ফিরে এসে, সে রাতে ঐখানেই থাকবার মতলব করেছিল। কিন্তু দুজনে কিছুক্ষণ বোতলের সেবা ও আহারাদি করবার পর হঠাৎ নেশার ঝোঁকে কানের মতলব বদলে গিয়ে, বিহারী ঘোষকে একবার দেখবার জন্যে সেই রাত্রিতেই ডাঃ ভাদুড়ীর আশ্রমে যাবার খেয়াল চেপে উঠলো। প্রমোদাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু সে যেতে রাজী হলো না, বরং কান্‌কেও নিষেধ করলে। কিন্তু কান্ নেশার ঝোঁকে নিষেধ না মেনে চ'লে গেল।

"তার পর প্রমোদার নিজেরও একটা খেয়াল জন্মালো। ঘড়ীটা এর আগে উমাপতিকে না দিয়ে আসাতে তার উপর উমাপতির তাড়নাগুলা এ পর্য্যন্ত কান্ ও স্মৃতিরত্নের অসাক্ষাতেই হয়েছিল। এবারে সেটা নিয়ে গিয়েও যখন দিয়ে আসা হলো না, তখন এর পরে যে দিন আবার সেখানে যাওয়া ঘটবে, সে দিন যদি আবার ভুলে যায়, তা হ'লে তাড়না নিশ্চয়ই আরও বেড়ে হবে, এমন কি, হয় ত কানের সম্মুখেই হবে, এই ভয়ে প্রমোদার সেই রাত্রিতেই উমাপতিকে ঘড়ীটা দিয়ে আসবার,—অন্ততঃ স্মৃতিরত্নের জিম্মায় রেখে আসবার—ঝোঁক চাপলো। সেই ঝোঁকের মাথায় ঘড়ীটা নিয়ে সে-ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

"সে যখন কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে উপস্থিত হলো, তখন রাত প্রায় ১১টা। সেখানে স্মৃতিরত্নের জানালায় কিছুক্ষণ টোকা মেরে, তাকে মৃদুস্বরে ডাকাডাকি করেও যখন তার কোন সাড়া পেলে না, তখন পাশের সেই সরু পথটার মুখের কপাট ঠেলে দেখলে যে, সেটা খোলাই আছে। বোধ হয়, স্মৃতিরত্ন সেটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। যা হোক, দোর খোলা পেয়ে প্রমোদা সটান সেই পথ দিয়ে হানাবাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো।

"সেখানে গিয়ে দেখলে যে, উমাপতি তখনও শোয়নি। সচরাচর সে যে রকম সাহেবী পোষাকে সেজে থাকতো, সেই পোষাকেই শোবার ঘরে ছোট টেবল্‌টার পাশে একখানা চেয়ারে ব'সে ঝিমোচ্ছিল। তার ডান হাতটা টেবলের উপরে রাখা ছিল, আর তার পাশে একটা মদের গেলাস, একখানা রুপার বাটিওয়ালা ছোট ভোজালী, একটা চক্‌চকে জরির ফিতে, আর সেই ছোরালীর খাপখানাও ছিল। প্রমোদার পায়ের শব্দ পেয়ে উমাপতি একবার চোখ চেয়ে তাকে দেখলে, কিন্তু কোন কথা কইলে না। তার অবস্থাটা বেজায় মাতালের মত দেখে প্রমোদা তার কাঁধ ধ'রে নাড়া দিলে, আর ঘড়ীটা তার হাতে দিয়ে বল্‌লে, 'এই নাও, তোমার ঘড়ী এনেছি।' উমাপতির ঘড়ী-চাঁদ খালি চেনটা তার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটেই লাগানো ছিল। সে ঘড়ীটা হাতে পেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা চেনের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পকেটে রাখলে। কিন্তু ঘড়ী পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, বরং নেশার মাথায় রূঢ়ভাবে প্রমোদাকে কান্ সাহেব সম্বন্ধে কটূক্তি করতে আরম্ভ করলে। প্রমোদার নিজের অবস্থাও তখন খুব সহজ ছিল না। কাজেই দুচার কথাতেই পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু আগুন জ্ব'লে উঠলো। তার পর উমাপতি হঠাৎ তার ভোজালীটা দেখিয়ে বল্‌লে, 'এই ছোরাখানা কেন রেখেছি জানিস্? এই দিয়ে আমার সব শত্রুনিপাত করবো। তুই যেমন আমার শত্রুদের সঙ্গে মিশে আমার গায়ে ধুলো দিয়েছিস্, তেমনই আজ এই দিয়ে তোর নাক কেটে এখান থেকে বিদায় করবো।' এই বলেই, ছোরাখানা হাতে নিয়ে সে নেশায় টল্‌মল করতে করতে উঠে দাঁড়ালে। তার মূর্ত্তি দেখে প্রমোদা ভয় পেয়ে ঝাঁ ক'রে তার হাত থেকে নিজের হাত দিয়ে অস্ত্রখানা কেড়ে নিয়ে, হাতটা নিজের ডান দিকে যতদূরে যায়, ততদূরে ধ'রে রইলো। উমাপতি তাতে আরও রেগে গিয়ে প্রমোদার হাত থেকে সেটা আবার কেড়ে নেবার জন্যে যাই তেড়ে যাবার চেষ্টা করলে, প্রমোদাও অমনই পিছু হাঁটতে গিয়ে একখানা চেয়ারের পায়ায় বাধা পেয়ে, একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে উমাপতিও নেশায় টাল সাম্‌লাতে না পেরে, সটান তার ওপর উবুড় হয়ে পড়ে গেল।

নিমেষের ফেরে পড়াটাও ঘটলো এমন বে-কায়দায় যে, প্রমোদার দুজনের সেখানে ছোরাখানা তার হাতে মুঠোয় নোজা উঁচু ক'রে ধরা ছিল, উমাপতির বুকের বাঁ-দিকটা ঠিক তা'রি ওপরে চেপে পড়লো! আর, যাই পড়া, অমনই ছোরাখানার সমস্তটা তার সেই দিকের বুকে বিঁধে গেল! তা'তে ফল যা হবার, তাই হলো। উমাপতি একবারমাত্র একটা আর্ত্তনাদ ক'রে বুকটা একটু তুলে নিজেই আবার যেমন ভাবে প্রথমে পড়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই উবুড় হয়ে প'ড়ে পঞ্চত্ব পেলে। আর, সেই সামান্যমাত্র বুকটা তুলে নেওয়ার অবকাশে, প্রমোদা নিজের মুষ্টিবদ্ধ অস্ত্রশুদ্ধ হাতখানা টেনে নিয়ে উঠে বস্‌লো। তখন সেই ছোরাখানা সমস্তই মৃত তার হাতটা পর্য্যন্ত রক্তে রক্তময় দেখে, আর তখনও উমাপতির বুকের রক্ত সে দিকের সতরঞ্চটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে দেখেই প্রমোদা ভয়ে এমন অবসন্ন হয়ে পড়লো, মাথাটাও এমন ঝিম-ঝিম করতে লাগলো যে, সে আর উঠে দাঁড়াতে পারলে না; একবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসেই রইলো।

"কতক্ষণ যে ঐ ভাবে সে বসেছিল, তা বলা যায় না। তার পর যখন তার বিবেচনাশক্তি ফিরে এলো, তখন বিপদে আত্মরক্ষার বুদ্ধিটা স্বতই আগে জেগে উঠলো। কিন্তু সেই বুদ্ধিবলে সে তখন কি কি করেছিল, আর কেনই বা করেছিল, তা তার ঠিক মনে নেই। তবে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত জানে যে, সে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে উঠে দেখলে যে, সেই ছোট তেপায়া টেবলটা আর তার ওপরের জিনিষগুলাও মেঝেয় প'ড়ে আছে। মদের গেলাসটা ভাঙ্গেনি, কিন্তু ছোট খাজের কাছে গড়িয়ে গেছে। ছোরার খাপ ও জরির ফিতে যেই যায়গায় পড়েছিল দেখে সে-দুটো কুড়িয়ে নিয়ে তার কোমরে গুঁজলে, আর গেলাসটা সেই দেরাজের উপর রেখে, সেইখানে যে আলোটা জ্বলছিল, সেটা নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলে। এ কাযগুলা সে বাঁ হাতেই করলে, কারণ, ছোরাখানা তখনও তার ডান হাতেই ছিল।

"তার পর পায়খানায় ঢুকে খাপটা কোমর থেকে নিয়ে, তাতে ছোরাখানা ভ'রে দিয়ে, সব শুদ্ধ পায়খানার 'প্যানের' ভিতর জোর ক'রে হাত দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে। শেষে, স্নানের ঘর থেকে এক বাল্‌তি জল এনে, ঐ পায়খানার ভেতরেই হাতদুটা আর বাকী জলটা সব মেঝেয় ঢেলে দিলে। তার পর বাল্‌তিটা স্নানের ঘরে রেখে সেই গুপ্ত পথ দিয়ে সন্তর্পণে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এলো; আর সেখান থেকে উল্টো দিক দিয়ে একটা গলি-ঘুঁজি ঘুরে যখন বেশ বুঝলে যে, কেউ তাকে কোথাও তার পেছু নেয়নি, তখন সটান নিজের বাড়ী ফিরে এসে সেখানে সেই রাত্রিতেই নিজের পরনে যা কিছু ছিল, এমন কি, তার জোড়াটা পর্য্যন্ত বেশ ক'রে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌লে। তার পরে সঙ্গে প্রমোদা সে কিতেটা কোমরে রেখেছিল, সে কথা তার একবারও কিছু মনে ছিল না। বাড়ীতে এসে সে ছাড়বার সময় সেটার কথা মনে হওয়ায় অনেক খুঁজলে, কিন্তু পেলে না। কোথায় যে সেটা প'ড়ে গিয়েছিল, তা কিছুতেই পালিয়ে আসবার সময় গাছসিন্দুকের মাথায় উঠে, কোমরটা একটু আল্‌গা বোধ হওয়ায়, সেখানে সাড়ীখানা আবার গোছালো ক'রে প'রে নিয়েছিল। তাতেই তার এখন মনে হলো যে, হয় ত কিতেটা সেইখানেই কোথাও প'ড়ে গিয়ে থাকবে। তবু সে বাড়ী থেকে আবার একবার বেরিয়ে, কাছের মোড় পর্য্যন্ত রাস্তাটা বেশ ক'রে দেখে কোথাও যখন কিতেটা পেলে না, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এসে শুয়ে পড়লো।

"পরদিন সন্ধ্যায় যখন স্মৃতিরত্ন তার কছে এসে খুন ও পুলিসের অনুসন্ধান ইত্যাদির খবর দিলে, তখন প্রমোদা অবশ্য তাকে আসল কথা কিছুই বলেনি; বরং স্তম্ভিতভাব দেখিয়ে ন্যাকা সেজে বস্‌লো।

"তার পর থেকে ওর নিজের সম্বন্ধে যা কিছু ঘটেছিল, তা ত প্রমোদা পূর্ব্বেই আমাকে বলেছিল। আপনিও আমার কাছে সে সব শুনেছেন। জরির ফিতেটা সম্বন্ধে প্রমোদা যা অনুমান করেছিল, তাই যে ঠিক, তা'ও আপনারই অনুসন্ধানের ফলে গাছসিন্দুকের পিছন থেকে সেটা বার হওয়ায় বেশ প্রমাণ হয়েছে।

"যা হোক, প্রমোদা এই সব কথা বলবার পরে বড় শ্রান্ত বোধ করতে লাগলো ব'লে ডাক্তার তাকে একটু ঘুমাতে বল্‌লেন। আমরা দুজনেই তার পর সেখান থেকে চ'লে এলাম। পরদিন সকালেই বেচারা মারা গেল।"

পরিশিষ্ট

জ্যোৎস্নাপুলকিত মাধবী যামিনী। কলিকাতা নগরীর বুকের উপর পূর্ণচন্দ্রের কিরণধারা যেন তরঙ্গায়িত হইতেছিল। 'হানা-বাড়ীর' একটি কক্ষে তখন আমার সহধর্ম্মিণী কাকলীকে লইয়া আমি বাতায়নপথে দাঁড়াইয়াছিলাম।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। যে 'হানাবাড়ীর' বিচিত্র ব্যাপারের সংস্পর্শে আসিয়া আমার জীবনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল, তাহার মায়া আমার সমগ্র চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল।

উক্ত বাড়ীর অধিকারী যখন কোনও মতে বাড়ীর ভাড়াটিয়া পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হন, তখন স্বল্পমূল্যে আমি উহা কিনিয়া ফেলিয়াছিলাম। আত্মীয়-স্বজন—দিদিরা, পিসীমা, যোগীন বাবু, এমন কি, বন্ধুবর নলিনীদা পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কাকলী কোন কথা বলে নাই, তবে সে-ও যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিল, তাহা বুঝি নাই।

ভাগ্যলক্ষ্মী—জননী ইন্দিরা আমার উপর তাঁহার স্বর্ণঝাঁপি খুলিয়া প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিতেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই হানাবাড়ীর আমূল সংস্কার করিয়া তাহাকে ত্রিতল অট্টালিকার জয়টীকা পরাইয়া দিয়াছি।

আমার এই খেয়াল প্রথমতঃ সকলকেই বিরক্ত করিয়াছিল; কিন্তু সুসংস্কৃত অট্টালিকায় যখন বাস করিব বলিয়া আত্মীয়-স্বজনকে আহ্বান করিলাম—শ্রীতিভোজের বিপুল আয়োজন করিলাম, তখন সকলেই বিস্মিত হইলেন।

আজ প্রীতিভোজের উৎসব-শেষে বন্ধুবান্ধবগণ বিদায় লইয়াছেন। দিদিরা কক্ষান্তরে সুখসুপ্ত। পিসীমাও একটি কক্ষে হয় ত এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন।

কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত আমার শ্বশুর মহাশয় আজ ইহলোকে নাই। বিহারী বাবু তাঁহার আদরিণী কন্যার সহিত কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বস্বাস্থ্য আর কোনও মতে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় নাই। দেড়বৎসর পরে প্রথম দৌহিত্রের মুখ দেখিয়া তিনি ভগ্নপ্রাণে কিছু তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার নূতন উইলের সর্ত্ত অনুসারে যোগীন বাবু ও আমি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার বিধবা পত্নী, কাকলীর বিমাতা, শ্রীমতী যমুনা উইলের সর্ত্ত অনুসারে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইয়াছিলেন। প্রথম দলিলের প্রবেটখানা দরখাস্ত দ্বারা তিনি বাতিল করিয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার ভ্রমস্বীকারে আদালত তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী যমুনাকে অধিক দিন বৈধব্য ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার জনৈক পাঞ্জাবী বন্ধুর পরিচিত পাঞ্জাবপ্রবাসী বিপত্নীক যমুনাকে বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতাইয়াছিলেন। শ্রীমতী যমুনা নূতন পতির বিপুল বিত্তের পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। বিবাহের পর নবদম্পতি য়ুরোপের নানা স্থানে 'মধুচন্দ্র' যাপন করিতেছেন। সেন সাহেব জামাতার বিষয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আমাদের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে প্রীতিভোজে তাঁহাদের কেহ যোগ দিতে পারেন নাই।

যোগীন বাবু ব্রহ্মদেশের ব্যবসা বন্ধ করিয়া অধুনা কলিকাতায় বাস করিতেছেন। আজ তিনি সপরিবারে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

দূরে কোতোয়ালীতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষিত হইল। আমরা উভয়ে বিনিদ্রনয়নে তখনও রজনীর শোভা দেখিতেছিলাম। অদূরে খোকা ফেন-শুভ্র শয্যার উপর সুখসুপ্ত।

কাকলী সহসা আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আচ্ছা, এই বাড়ী কিনে এখানে বাস করবার এত ঝোঁক তোমার কেন হ'ল, তা ত একদিনও বল্‌লে না?"

নববসন্তের পবনপ্রবাহ তরুণীর অলকগুচ্ছ দুলাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

আমি তাহাকে রাণী বলিয়া ডাকিতাম। বলিলাম, "এত দিনেও বুঝতে পারনি, রাণি? এই বাড়ীর সংস্পর্শে এসেই আমার জীবনের কোহিনুরকে যে আমি লাভ করেছি?"

সুন্দরীর লজ্জারক্ত আননে তৃপ্তি ও আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"ফটকের দেওয়ালে কালো পাথরের উপর সোনার অক্ষরে তাই হানাবাড়ীকে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখেছি।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)

সমাপ্ত

শেষ প্রশ্ন

ভাণ্ডারেতে বস্তু ভরা—নেই ত অভাব কিছু;
হায় গো তবু কাঙ্গাল ক'রে রাখ্‌লে সবার পিছু?
তোমার কৃপা-কণায় যাদের রয় না চাওয়ার বাকী;
কোন্ সে ক্ষতির আশঙ্কাতে দিচ্ছ তাদের ফাঁকি?

বিশ্ব-ধনের মালিক প্রভো,—সন্তানেরা দীন;
লজ্জা এ কি নয় গো তোমার—নিন্দা অতি হীন?
কও না তবে কেন ওগো—রিক্ত করি মোরে,—
একটি কণা সোনার লাগি ফেরাও দোরে দোরে?

পথে পথেই দিন ফুরাল বৃথাই ভিক্ষা করা,
শূন্য থালি এই দেখ নাথ—চোখের জলেই ভরা!
শূন্য মরুর তপ্ত পথে চরণ হ'ল ক্ষত;
বুকের শোণিত শুকিয়ে পাথর,—পরাণ ভাবে নত!

হৃদয় ভরা প্রীতি-প্রণয়—নিত্য রসের ফুল,
তোমার স্নেহে না ভিজায়ে করিলে নিরমূল?
চোখের তারা নিবু নিবু, আঁধার আগে পিছে;
তোমার দেয়া জীবনটা কি জেনেই যাব মিছে?

ভোগ চাহি না—লোভ করি না, জ্বালাও প্রাণে আলো!
শুধু জান্‌ব, কেন ভক্ত বলে,—তোমার লীলা ভালো!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি, এ)


দপ্তর

কাশীর ইতিহাস

৪

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে যে, সুনিক-বংশীয় প্রদ্যোত, পালক, বিশাখযূপ, রাজক ও নন্দিবর্দ্ধন এই পাঁচ জন রাজা ১ শত ৩৮ বৎসর কাশীতে রাজত্ব করেন। তৎপরে শিশুনাগ এই সুনিক-বংশের সকল যশঃ নষ্ট করিয়াছিলেন ও নিজপুত্র কাকবর্ণকে বারাণসীর রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া গিরিব্রজ নামক মগধের রাজধানীতে গমন করেন। (১)

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতাদিতে আছে যে, মগধের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়কে তাঁহার ভৃত্য সুনিক হত্যা করিয়া নিজ পুত্র প্রদ্যোতকে অভিষেক করেন। এই অভিষেক ৯২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল, ইহা গণনা দ্বারা জানা যায়। প্রদ্যোতবংশীয় শেষ রাজা নন্দিবর্দ্ধন ৭৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মগধের রাজা ছিলেন। ইঁহারা কাশীরও রাজা ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পাদটীকার শ্লোকে দেখা যায়, শিশুনাগ সুনিকবংশের যশঃ নষ্ট করিয়া নিজপুত্র কাকবর্ণকে বারাণসীতে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

শিশুনাগের পুত্রের নাম যে কাকবর্ণ, ইহা বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে আছে। কাশীরাজ কাকবর্ণ নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলে নগরের উপকণ্ঠে আততায়ীর খড়্গাঘাতে নিহত হয়েন। (২)

জৈনপুরাণ ও অন্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, আমাদের সাবতারের ন্যায় জৈনদিগের ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইতেই জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে ৭ম ও ২৩শ এই দুই জন তীর্থঙ্কর বারাণসীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইঁহাদের নাম সুপার্শ্ব ও পার্শ্বনাথ।

বারাণসীধামে প্রতিষ্ঠরাজের ঔরসে সুপার্শ্বদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই নির্ব্বাণলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সুপার্শ্বদেব হইতেই কাশীতে প্রথমে জৈনমত প্রচারিত হয়।

২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কাশীরাজ অশ্বসেনের পুত্র। লোকপ্রবাদ—ইনি কাশীর ভেলুপুরা নামক মহল্লার বিজয়নগর রাজবাড়ীর পশ্চিমদিক্‌স্থিত বর্ত্তমান দিগম্বর জৈনমন্দিরের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া যোগবলে জ্ঞানলাভ করেন ও চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। কল্পসূত্রাদি প্রাচীন জৈনশাস্ত্রানুসারে ৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথ কাশীতে চাতুর্যাম মত প্রচার করেন। চাতুর্যাম মত নির্গ্রন্থ-প্রসঙ্গে পালি বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। (১)

পার্শ্বনাথের সময় বারাণসীধামে বহুতর নির্গ্রন্থ দেখা দিয়াছিল, এই সময়ে হিন্দুদিগের প্রাধান্যও কিছু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পরে বুদ্ধ শাক্যসিংহ কাশীতে পদার্পণ করেন। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় শাক্যসিংহ নামা ও শুদ্ধোদনের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম রাহুল। বিষ্ণুপুরাণের ভবিষ্যরাজগণ মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় শাক্য, তৎপুত্র শুদ্ধোদন, তৎপুত্র রাতুল—এইরূপ সামান্য বিপর্য্যয়যুক্ত নাম দেখা যায়।

সিংহলের মহাবংশ কিংবা দীপবংশাদি পুরাতন পালিগ্রন্থে আচার্য্যপরম্পরার বর্ণনানুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে, ৮০ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ হয়, ইহা জানা যায়। মোক্ষমুলরের সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকাল ৪৭৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। রিজ ডেভিড্‌স্ ইহা অপেক্ষা ৬৫—ও ১০০ বৎসর আরও পিছাইতে চাহেন। প্রোঃ গায়গর বিচার করিয়া খৃঃ পূর্ব্ব ৪৮৩ বৎসরে বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল বলেন।

'বৌদ্ধ জাতক' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—"৫৬৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের কপিলাবস্তুতে জন্ম; ৫৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সংসারত্যাগ এবং ৪৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ব্বাণলাভ হয়।"

জনপরম্পরাগত কিম্বদন্তী হইতে জানা যায়, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, মগধরাজ শিশুনাগবংশীয় বিধিসার, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত, এবং কৌশাম্বীরাজ জনমেজয়ের বংশীয় উদয়ন এবং

---

(১) অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।
হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাগো ভবিষ্যতি।
বারাণস্যাং সুতং স্থাপ্য সংপ্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম্॥

ব্রহ্মখণ্ড ৩৪ অধ্যায়।

এই শ্লোকের অর্থে কাশীপরিক্রমায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন, "প্রদ্যোতবংশীয় পঞ্চপুত্র ১ শত ৩৮ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। তৎপরে শিশুনাগ এই বংশীয়দিগকে নিহত করিয়া প্রিয়পুত্র যশযশকে বারাণসীতে স্থাপন পূর্ব্বক গিরিব্রজে গমন করেন। (কাশীপরিক্রমা ২৩৪ পৃ)।

(২) কাকবর্ণঃ শৈশুনাগিশ্চ নগরোপকণ্ঠে নিচকৃতে নিস্ত্রিংশেন।—দর্শচরিত ষষ্ঠোচ্ছ্বাস।

(১) নির্গ্রন্থ—গ্রন্থি, অবিদ্যা বা বন্ধন তদ্রহিত, ক্ষপণক বৌদ্ধসন্ন্যাসী।

শাক্যবংশীয় বুদ্ধদেব এক দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধিসার কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রাজার কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং ঐ বিবাহে কাশীপ্রদেশ যৌতুকরূপে প্রাপ্ত হয়েন। বিম্বিসার বা বিধিসার বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহাকে নিত্য দর্শনকামনায় বেণুবন নামক রাজোদ্যান বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন। পুরাণসকলের মতে ইঁহার প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের জন্মকাল ধরিতে হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময় ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইলে, নন্দবংশের রাজ্যকাল শতবর্ষ, শিশুনাগবংশীয় ১০ জন রাজার রাজ্যকালে ৩৬০ বর্ষ, ঐ ১০ জন রাজার ৫ম রাজা বিধিসার বা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। সুতরাং ৫ম রাজার জন্মকাল ৬৮৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ধরিতে হইবে; উহাই বুদ্ধদেবের জন্মসময় এবং নির্ব্বাণকাল ৬০৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ অবশ্য ইহা স্থূল গণনার ফল, সূক্ষ্ম গণনায় ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে। গড়পড়তায় প্রতি রাজার রাজ্যকাল ৩৬ বর্ষ হয়, বুদ্ধদেব ৮০ বর্ষে নির্ব্বাণলাভ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পর সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসরকাল নিজধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থমতে বারাণসীর উত্তরসীমাসংলগ্ন ঋষিপত্তন মৃগদাব নামক স্থানে (সারনাথে) বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে কাশীর সহস্র সহস্র প্রজা বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতেও বহুতর যাত্রী ধর্ম্মমত শুনিবার জন্য ঋষিপত্তনে উপস্থিত হইয়াছিল। যে স্থানে বুদ্ধদেব প্রথমে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, সেই ঋষিপত্তন বা মৃগদাবই পরে বৌদ্ধগণের কেন্দ্রস্থান ও বহু জনাকীর্ণ নগরী হইয়াছিল। কাশীধামের যশ নামক এক শ্রেষ্ঠিনন্দনই শাক্যসিংহের প্রথম শিষ্য হইয়াছিল, এবং সেই তাহার পিতা প্রভৃতি স্বজনগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়াছিল।

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে ৫৪৭টি জাতকের মধ্যে ৩৭২টি জাতক বারাণসীরাজের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আরব্যোপন্যাসের গল্পসকল যেমন হারুণ-উল-রশীদের রাজ্যকালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, জাতকগুলিও সেইরূপ বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মদত্তের কথা কোন পুরাণে দেখা যায় না। মহাভারতে ও খিল হরিবংশে একজন পাঞ্চালরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়; তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি ভারতযুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী; তাঁহাকে কোন স্থানেই কাশীরাজ বলা হয় নাই এবং সেই সময়ে পুরাণোক্ত কাশীরাজগণই কাশীর রাজা ছিলেন। বৌদ্ধজাতকের উপাখ্যানগুলি কল্পিত, উপদেশগ্রহণের সৌকর্য্যার্থ কথিত হইয়াছে, উহা হইতে কোনরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া কঠিন, কেবল তৎকালীন আচার-ব্যবহার, শিক্ষা প্রভৃতির কিছু নমুনা পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ ও জৈনগণ যখন আর্য্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতন ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা আর্য্যদের পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি সকলই নিজ ধর্ম্মানুকূল্যে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা আর্য্যদের গ্রন্থ ধ্বংস করিয়া নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করেন এবং যে সময়ে মৌর্য্যরাজগণ হীনবংশ বলিয়া সমাজে হেয় হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সেই সমাজ পূজ্যতা লাভ করিয়াছিল। এই সুযোগে রাজসাহায্যপুষ্ট বৌদ্ধগণ আর্য্যশিক্ষা ও আর্য্য গ্রন্থরাশির বিলোপসাধন করিয়াছিল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী বৌদ্ধরাজন্য ও বৌদ্ধকর্ণধারগণের চেষ্টায় আর্য্যদের শিক্ষা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং রাজার সাহায্যে সর্ব্বত্র বৌদ্ধশিক্ষকগণ বিদ্যাদান করিতেন। বৌদ্ধ ভিন্ন সকলেরই শিক্ষার দ্বার এইরূপে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্য কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ সাক্ষিগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষার পথ প্রথমে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজের দীর্ঘকাল বৌদ্ধসংস্রবজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তুষানলে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎপরে আচার্য্য শঙ্কর সেই মতের পোষণ ও আর্য্যধর্ম্মের বিস্তার করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থের পুনরুদ্ধারসাধন করেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কাশীরাজ দিবোদাসকেই বৌদ্ধজাতক-কথিত ব্রহ্মদত্ত বলিয়া মনে করেন। কারণ, কাশীখণ্ডের বর্ণিত ঘটনায় জানা যায়, ব্রহ্মা দিবোদাসকে রাজত্ব দিয়াছিলেন; সুতরাং দিবোদাসই ব্রহ্মদত্ত। দিবোদাস বৌদ্ধ হইয়া অনেক দেবমূর্ত্তির ধ্বংস করিলেন, পরে সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই পাঁচ সম্প্রদায়ের চেষ্টায় যখন কোন ফল হইল না, তখন শাকদ্বীপীয় দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপী গণপতির চেষ্টায় রাজা দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এইরূপে কাশীরাজ আর্য্যধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। কাশীখণ্ডের ৪৩ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে আছে,—"হে রাজন্! আপনার রাজত্বে দেবগণ থাকিতে পারে না; সুতরাং আমরা স্ব স্ব বিভবানুসারে আপনার পূজা করিব।" (১) এই উক্তিই কাশীখণ্ডের বর্ণিত ঘটনা যে রূপক, তাহার প্রমাণ। এই সকল কল্পনার দৌড় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। প্রথম কথা, ব্রহ্মা রাজাকে রাজ্য দান করিলেন, তাহাতে রাজার নাম ব্রহ্মদত্ত না হইয়া রাজ্যের নামই ব্রহ্মদত্ত হইতে পারে, অপর যিনি প্রতর্দ্দনের পিতা দিবোদাস, তিনি রাজা দিবোদাসরথের সমসাময়িক; সুতরাং তিনি কোন ব্রহ্মদত্ত নহেন। আর কাশীখণ্ডোক্ত শ্লোকে ঐ রূপকথার আভাসমাত্রও আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। এই রূপক কল্পনার বিচার করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না।

স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে এক জন চিত্রসেন নামক কাশীরাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ধার্ম্মিক ও বহু সদ্‌গুণশালী ছিলেন। একদা মৃগয়া করিতে গমন করিয়া ভ্রমক্রমে বীর্য্যতপা নামক ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে হত্যা করেন এবং তৎপরে স্বীয় ব্যবহার দ্বারা ঋষি ও ঋষিপত্নীর কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। (২)

শিশুনাগবংশীয় ১০ জন রাজা মগধের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন এবং তাঁহারাই কাশীর অধিরাজ ছিলেন এবং তন্মধ্যে কাকবর্ণ ও অজাতশত্রু কাশীর রাজা বলিয়া অন্যত্র উক্ত হইয়াছেন। অন্য সকলের সময়ে অপর কেহ কাশীর কর্ত্তা রাজা ছিলেন কি না, জানা যায় না। কিন্তু কাকবর্ণের পুত্র

(১) সংসেব্যিয়ামহে রাজন্নস্মরাস্তাং স্বর্বৈভবৈঃ। বয়ং যতস্তদ্বিষয়ে স্মরারাধোঽপি দুর্জ্জয়ঃ॥—কাশীখণ্ড।

(২) স্কন্দপুরাণ আবন্ত্য খণ্ড—৫৫ অধ্যায়।

রোধ হয়, কিছু দিন কাশী কোশলরাজের অধীনে ছিল; কারণ, অজাতশত্রুর মাতুল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ নিজ ভগিনীর বিবাহে কাশীরাজ্য মগধরাজ বিধিসারকে দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

শিশুনাগ হইতে ষষ্ঠ মগধরাজ অজাতশত্রু কৌষীতকী উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী কাশীরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই অজাতশত্রু যখন গর্ভে ছিলেন, তৎকালে তাঁহার মাতার এক অদ্ভুত রকমের ভোজনলিপ্সা হইয়াছিল। রাজা বিধিসার একদা পত্নীর নিকট তাঁহার গর্ভদোহদ জানিতে চাহিলে তিনি স্বামীর রক্তদেশের শোণিতপানেচ্ছা জানাইয়াছিলেন। রাজা বিধিসার তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্কন্ধের শোণিত প্রিয়তমা পত্নীকে দিয়াছিলেন।

রাজা বিধিসার পরমধার্ম্মিক অহিংস্র বুদ্ধদেবভক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেবের কতিপয় আত্মীয় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ করিত এবং বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত প্রবলপরাক্রান্ত রাজা বিধিসারের জন্য তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিত না। একবার বেণুবন নামক রাজোদ্যানে অবস্থিত বুদ্ধদেবকে হত্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াও রাজার সতর্কতায় বিফলমনোরথ হইয়াছিল। ইহার পর ঐ লোক সকল বিধিসারপুত্র অজাতশত্রুকে পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। তাহার ফলে একদা রাজার নিকটে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে অজাতশত্রু উপস্থিত হইলে রাজা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস! তুমি রাজ্যলালসায় উন্মত্ত হইয়া তোমার স্নেহশীল পিতাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ; তুমি যখন গর্ভস্থ ছিলে, তখন তোমার জননীর প্রার্থনায় আমার স্কন্ধের রক্ত তাহাকে পান করিতে দিয়াছিলাম; ইহা তাহারই পরিণাম। তুমি এই রাজ্য এখনই গ্রহণ কর। পিতৃহত্যার পাপে কলঙ্কিত হইও না।" ইহার পরে অষ্টাদশবর্ষীয় সেই অজাতশত্রু পিতার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ও সেই দিনের জন্য বিকৃতমস্তিষ্করূপ মহাপাতক হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু দৈবের বিচিত্র লীলায় ইহার পরে এক দিন তিনি সেই মহাপাতক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবেকজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতি সকলই বৌদ্ধবিদ্বেষে তিরোহিত হইয়াছিল। ইনি পরে এক জন জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের প্রিয়তমা কন্যাকে কৌশাম্বীরাজ উদয়ন (বৎস) অপহরণ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যার নাম 'বাসবদত্তা।' ঐ ঘটনাবলম্বনে অনেক উপাখ্যান এ দেশে প্রচলিত আছে। ঐ ঘটনা 'কথাসরিৎসাগর' নামক গ্রন্থে আছে।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয় 'মেঘদূতে'র টীকায় বলিয়াছেন, প্রদ্যোত উজ্জয়িনীরাজ নহেন, তিনি মগধরাজ,—উজ্জয়িনীরাজ চন্দ্র মহাসেন এবং মগধরাজ প্রদ্যোতের কন্যা পদ্মাবতীকেই উদয়ন বিবাহ করেন। আমাদের মনে হয়, গোস্বামী মহাশয় কথাসরিৎসাগরের বিরুদ্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে; কারণ, মগধরাজ প্রদ্যোত কৌশাম্বীরাজ উদয়নের (বৎসের) প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার ছিলেন, ইহা বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণপাঠকমাত্রেই জানেন। মেঘদূতের মধ্যে "প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথা কোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্" এই উল্লেখ দ্বারা এবং 'প্রদ্যোতস্য প্রিয়হিতবরং বৎসরাজোঽথ জহ্রে' এই মল্লিনাথ পরিত্যক্ত শ্লোকাংশ দ্বারা উদয়ন যে বৎস, তাহা জানা যায় এবং পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তী দ্বারাও বৎসরাজ বা উদয়নকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জানা যায়।

বিষ্ণুপুরাণমতে ভবিষ্যরাজগণের একটি নামতালিকা প্রদত্ত হইল। উহার দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মগধরাজ প্রদ্যোত এবং কৌশাম্বীরাজ উদয়ন সমনামায়িক হইতে পারেন না। বুদ্ধদেব বিধিসারও অজাতশত্রুর সমসাময়িক, উদয়নও সেই সময়ের। বিধিসারের পূর্ব্ববর্ত্তী দশম মগধরাজ প্রদ্যোত ছিলেন। সুতরাং গোস্বামী মহাশয় যে কথাসরিৎসাগরের কথায় আস্থাস্থাপন করেন নাই, ইহা তাঁহার কত দূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ইহার পর মহানন্দীর পুত্র শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মানন্দ পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষাত্রক্ষয়কারী হইয়াছিলেন। (১) সম্রাট মহাপদ্ম ও তাঁহার সুমাত্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র এই নয় জন একশত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইঁহারা সকলেই অত্যন্ত উদ্ধত ছিলেন এবং কৌটিল্য চাণক্য ১৬ বৎসরের চেষ্টায় ইঁহাদিগের উচ্ছেদসাধন করাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ চাণক্যের সহিত রাজগণের যে দুর্ব্ব্যবহারের দরুণ তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই ঘটনাটি এইরূপ—এক দিন রাজার পিতৃশ্রাদ্ধে কৌটিল্য চাণক্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধভুক্ ব্রাহ্মণের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, রাজা শ্রাদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের কুৎসিতাকার দর্শনে ক্রুদ্ধ, হইয়া তাঁহার শিখা ধরিয়া আসন হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। অবমানিত প্রাজ্ঞ কৌটিল্য (২) অর্থশাস্ত্র নামক অত্যুপাদেয় নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা ছিলেন। তিনি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে বলিয়াছিলেন, যে স্থানে আমার অবমাননা হইল, সেইখানেই এই কলঙ্কিত নন্দবংশ সমূলে যে পর্য্যন্ত না উচ্ছেদ করিতে পারি, সেই পর্য্যন্ত আমার এই উন্মুক্ত শিখা আর বন্ধন করিব না। এই কৌটিল্যের চাণক্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি আখ্যা ছিল; ইহা অভিধান-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩)

(১) নব নন্দা ভবিষ্যন্তি চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি। (ভবিষ্যখণ্ড)

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভজাতোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তক-কারী ভবিতা—তস্যাপ্যষ্টৌ সুতাঃ সুমাল্যাদ্যা ভবিতারঃ। তস্য চ মহাপদ্মস্যাদু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মস্তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতং অবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যে অভিষেক্ষ্যতি।—(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশ)

(২) কৌটিল্যঃ কৌটল্যঃ প্রধানঃ বাৎস্যায়ন-বিষ্ণুগুপ্তাদি-পর্য্যায়শব্দশকাঃ সমুদ্ধরিষ্যতি উন্মূলয়িষ্যতি।—বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশের শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা)

(৩) বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥
অভিধান-চিন্তামণিঃ।

বিষ্ণুপুরাণমতে ভবিষ্যরাজগণের নাম

পরীক্ষিৎ-বংশ

পরীক্ষিৎ।
১। জনমেজয় (ভবিষ্য)।
২। শতানীক।
৩। অশ্বমেধদত্ত।
৪। অধিসোমকৃষ্ণ।
৫। নিচক্ষুঃ (কৌশাম্বী রাজধানী)।
৬। উষ্ণ।
৭। চিত্ররথ।
৮। শুচিরথ।
৯। বৃষ্ণিমান।
১০। সুষেণ।
১১। সুনীথ।
১২। ঋচ।
১৩। নৃচক্ষুঃ।
১৪। সুখাবল।
১৫। পরিপ্লব।
১৬। সুনয়।
১৭। মেধাবী।
১৮। নৃপঞ্জয়।
১৯। মৃদু।
২০। তিগ্ম।
২১। বৃহদ্রথ।
২২। বসুদাম।
২৩। শতানীক।
২৪। উদয়ন (বৎস)।
২৫। অহীনর।
২৬। খণ্ডপাণি।
২৭। নিরামিত্র।
২৮। ক্ষেমক।

ইক্ষ্বাকুবংশ

বৃহদ্বল।
১। বৃহৎক্ষণ।
২। গুরুক্ষেপ।
৩। বৎস।
৪। বৎসব্যূহ।
৫। প্রতিব্যোম।
৬। দিবাকর।
৭। সহদেব।
৮। বৃহদশ্ব।
৯। ভানুরথ।
১০। সুপ্রতীক।
১১। মরুদেব।
১২। সুনক্ষত্র।
১৩। কিন্নর।
১৪। অন্তরীক্ষ।
১৫। সুবর্ণ।
১৬। অমিত্রজিৎ।
১৭। বৃহদ্রাজ।
১৮। ধর্ম্মী।
১৯। কৃতঞ্জয়।
২০। রণঞ্জয়।
২১। সঞ্জয়।
২২। শাক্য।
২৩। শুদ্ধোদন।
২৪। রাতুল।
২৫। প্রসেনজিৎ।
২৬। ক্ষুদ্রক।
২৭। কুণ্ডক।
২৮। সুরথ।
২৯। সুমিত্র।

মগধরাজবংশ

জরাসন্ধ।
সহদেব।
১। সোমাপি।
২। শ্রুতবান্।
৩। অযুতায়ুঃ।
৪। নিরামিত্র।
৫। সুক্ষত্র।
৬। বৃহৎকর্ম্মা।
৭। সেনজিৎ।
৮। শ্রুতঞ্জয়।
৯। বিপ্র।
১০। শুচি।
১১। ক্ষেম্য।
১২। সুব্রত।
১৩। সুভ্রম।
১৪। দৃঢ়সেন।
১৫। সুমতি।
১৬। সুবল।
১৭। সুনীত।
১৮। সত্যজিৎ।
১৯। বিশ্বজিৎ।
২০। রিপুঞ্জয় (মন্ত্রী সুনিক)
২১। প্রদ্যোত।
২২। পালক।
২৩। বিশাখযূপ।
২৪। জনক।
২৫। নন্দিবর্দ্ধন।
২৬। শিশুনাগ।
২৭। কাকবর্ণ।
২৮। ক্ষেমধর্ম্মা।
২৯। ক্ষত্রৌজা।
৩০। বিম্বিসার।
৩১। অজাতশত্রু।
৩২। দর্ভক।
৩৩। উদয়াশ্ব।
৩৪। নন্দিবর্দ্ধন।
৩৫। মহানন্দী।
৩৬। মহাপদ্মানন্দ বা মহাপদ্মী।
৩৭। সুমাত্যাদি।
৩৮। চন্দ্রগুপ্ত।
৩৯। বিন্দুসার।
৪০। অশোকবর্দ্ধন।
৪১। সুযশ।
৪২। দশরথ।
৪৩। সঙ্গত।
৪৪। শালিশূক।
৪৫। সোমশর্ম্মা।
৪৬। শতধন্বা।
৪৭। বৃহদ্রথ।

রাজসমক্ষে রাজবংশধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করিয়া উপহসিত চাণক্য বহির্নির্গমনসময়ে বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই। যদি কেহ মগধসাম্রাজ্যপ্রার্থী থাক, তবে আমার অনুসরণ কর।" চাণক্যের তেজোদীপ্ত মুখ হইতে নির্গত এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজার অসবর্ণ ভ্রাতা (অর্থাৎ মহাপদ্মের রক্ষিতা মুরা নাম্নী নাপিতবংশীয়া দাসী-গর্ভজাত) চন্দ্রগুপ্ত রাজার এইরূপ দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত এবং চাণক্যের পক্ষপাতী হওয়ায় ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা নামক অনুচরগণের সহিত কৌটিল্যের শরণাগত হইয়াছিল এবং সে জানিত, এই বংশ ব্রাহ্মণবিজ্ঞার ফলে কখনও থাকিতে পারে না এবং থাকিলেও কখনও আমার রাজ্যলাভের আশা নাই; যদি ঐ তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞাবলে তাঁহার বাক্য সত্যে পরিণত হয়, তবে আমার রাজ্যলাভ হইলেও হইতে পারে, এই বিবেচনায় মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। চাণক্যও নিজ বুদ্ধিবলে ঐ রাজগণকে ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব করিতে অনিচ্ছুক থাকায় অথচ মৌর্য্যরাজ্য সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে নন্দের বুদ্ধিমান্ যোদ্ধা সাহসী কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী রাক্ষসকে সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেন এবং নন্দমন্ত্রী রাক্ষস অত্যন্ত প্রভুভক্ত ছিলেন বলিয়া রাজগণের অভাবেও তিনি চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে বহুতর ষড়যন্ত্র করেন। পরিশেষে চাণক্যের উদ্ভাবিত উপায়ে রাক্ষসের সকল চেষ্টা-ষড়যন্ত্র বিফল হয় এবং তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হইতে বাধ্য হয়েন। এই ঘটনাবলম্বনে মুদ্রারাক্ষস নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, ইহার প্রণেতা সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র মহারাজ ভাস্করদত্তের পুত্র বিশাখদত্ত ইনি কোন্ দেশীয় ছিলেন এবং কখন্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় করা যায় না। তবে তাঁহার লিপি গৌড়ীয় রীতি প্রধান বলিয়া তাঁহাকে গৌড়দেশীয় বলিয়া মনে হয়, এবং বটেশ্বর নাম হইতে ও বটেশ্বর শিব বা বটেশ্বর নগরের ভক্তজনগণমধ্যে ইহার জন্ম, ইহাও অনুমান করা যায়। পরন্তু বিশাখদেব কোন্ সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করেন, তৎসম্বন্ধে বহুতর বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে গ্রন্থকারের সময় নির্দ্দেশ করেন। প্রাতঃস্মরণীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক

তৈলঙ্গ গ্রন্থকারকে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন ও বহুবিধ প্রমাণ যুক্তি দ্বারা সমর্থন করেন। অধুনা জার্ম্মাণ দেশীয় অধ্যাপক হিলীব্রাণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণানন্তর নানা স্থানস্থিত হস্তলিখিত পুস্তক সমালোচনা দ্বারা এই নাটকের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন; সুতরাং এখন পণ্ডিতগণের সময় সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বেল্লুনগরে মুদ্রিত মুদ্রারাক্ষসের ভরতবাক্যে "স শ্রীমদ্বন্ধুভৃত্যশ্চিরমবতু মহীং পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্তঃ।" এইরূপ পাঠ থাকায় ইতিহাসরসিক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়লাল মহোদয় এই নাটক চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে রচিত ও অভিনীত হয়, ইহা স্থির করিয়াছেন। পরন্তু চন্দ্রগুপ্ত নামে তিন জন রাজা দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, তিনি এই নাটকের নায়ক; সুতরাং তাঁহার সভায় এই নাটকের অভিনয় সম্ভবপর নহে এবং হূণাদি বহুতর পরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণের উল্লেখ থাকায় এই নাটক তাদৃশ প্রাচীনকালের লিখিত নহে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশীয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলিপুত্রে বর্ত্তমান পাটনায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য তাদৃশ বিস্তৃত ছিল না, এবং তাঁহার সভায় পণ্ডিতগণের সমাগমবার্ত্তা শুনা যায় না।

তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের পৌত্র, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর, পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা বহুতর শিলালিপিতে দেখা যায়, এবং তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই সভায় তাঁহারই সভাসদ্ বিশাখদত্ত এই নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করেন। হূণাদি ম্লেচ্ছগণ তৎপূর্ব্বেই পঞ্চনদের প্রান্তদেশে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, ইহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ; সুতরাং ভরতবাক্যে "ম্লেচ্ছৈরুদ্বেজ্যমানা ভুজযুগমধুনা সংশ্রিতা রাজমূর্ত্তেঃ" এই ম্লেচ্ছগণের আক্রমণের কথাও সঙ্গত হয়। উপরিলিখিত নাটকের সময়-সম্বলিত এই সমালোচনা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ মহোদয় উক্ত নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন। তিনি যে দুইটি কারণে ১ম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নাটক রচিত বা অভিনীত হয় নাই বলেন, সেই দুইটি যুক্তি আমাদের নিকট পর্য্যাপ্ত বা দৃঢ় বলিয়া মনে হয় না।

১ম—নাটকোদ্দিষ্ট নায়কের সম্মুখে অভিনয় হইতে পারে না। কি জন্য পারিবে না? নাট্যশাস্ত্রে ত ইহার কোন নিষেধ নাই এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা বহুসম্মানাস্পদ মন্ত্রী চাণক্য এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রী রাক্ষসের বিনয়-নম্র ব্যবহার, অপূর্ব্ব নীতিজ্ঞতা, আদর্শ প্রভুভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণরাশির পরিচয় থাকায় এবং রাজমহিষীর চরিত্রালোচনে সম্রাট ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, এই ভয়ে নাটককে অঙ্গহীন করিয়াও নায়িকার উল্লেখ না থাকায় মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সমক্ষেই অভিনয় হইয়াছিল বলিয়া মনে করি; এবং ভরতবাক্যেও নাটকোদ্দিষ্ট নায়ককে দীর্ঘজীবী হইবার আশীর্ব্বাদ করা স্বাভাবিক। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, নাটকের শেষে নায়ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া কিম্বা দেশের মঙ্গল প্রভৃতি কামনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই স্থানে যদি গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিত্যোপাধিধারী ৩য় চন্দ্রগুপ্তই প্রকৃত ভরতবাক্যে লক্ষিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ এই নাটকে থাকা উচিত ছিল এবং তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়েও ম্লেচ্ছ গ্রীকগণ কর্ত্তৃক প্রজাবর্গ উৎপীড়িত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের বাহু আশ্রয়ে শান্তিলাভ করিয়াছিল, চাণক্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইবার পূর্ব্বে এই দেশে মাৎস্য ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল (১) এবং উপযুক্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে সমর্থ হওয়ায় মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন। (২) দ্বিতীয় কারণ, ঐ নাটকে হূণশব্দের উল্লেখ। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে হূণজাতির অস্তিত্ব ছিল না। পরন্তু মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের ৯ম অধ্যায়ে যে স্থানে জনপদ বা নগর সকলের নাম ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলা হইয়াছে, তথায় শক, যবন, ম্লেচ্ছ, হূণ, পারসীক, চীন এই নাম সকল দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) পৌরাণিক মতে হূণগণের উৎপত্তি ও যবনত্ব-প্রাপ্তিকথা দ্বারাও তাহা নন্দবংশের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী মনে না করিবার কারণ দেখা যায় না।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকবর্দ্ধন প্রিয়দর্শী নামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি ভারতের সম্রাট ছিলেন ও বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার করেন। বারাণসীর উপকণ্ঠে তাঁহারই নির্ম্মিত স্তূপ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভারতের নানা স্থানে প্রায় ৪০টি স্তূপ ও স্তম্ভাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, পথ, ঘাট, ছাত্রগণের থাকিবার স্থান ও অধ্যয়নের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। বৈদেশিক যবনগণ তাঁহার পিতামহের সময় হইতে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দর্শনে জানা যায় যে, তৎকালে এ দেশ কেমন উন্নত ছিল। সে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নগরসকলের বিপণিমালায়ও রাত্রিতে কেহ দ্বার অর্গলিত করিত না; কারণ, চোর ছিল না। রাজার কোন বিচার করিবার আবশ্যকই প্রায় হইত না। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। যদি কোন বিদ্বান্ কোন বিষয়ে অভিনব মত প্রচার করিতেন, তবে বৎসরান্তে মিলিত হইয়া ভারতীয় নিখিল বিদ্বজ্জনগণ-সভায় ঐ মত বিচারিত সুপরীক্ষিত হইত। পরে বাদবিচারে উহা অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলে মত-প্রচারক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইতেন, ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলে দণ্ডিত হইতেন। ইহাদের সম্বন্ধীয় এইরূপ বিবরণ এখন অধিকাংশ ইতিহাসে পাওয়া যায়। অশোকের জীবনাবসানের পর মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ক্রমশই ক্ষুদ্র-আয়তন হইয়াছিল।

---

(১) মাৎস্য-ন্যায়—

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ডেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানি বা ভক্ষন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥

মনু-৭ অ, ২০ শ্লোক।

প্রবল-নির্ব্বল-বিরোধে সবলেন নির্ব্বলবাধবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ।
পরস্পরামিষতয়া জগতে ভিন্নবর্ত্মনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে॥

(২) অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে তেন গুপ্তঃ প্রভবতি॥

১।৪, শ্যামশাস্ত্রীয় সংস্করণ পৃঃ ৯।

(৩) যবনাশ্চীন-কাম্বোজা দারুণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥ ৬৫
সকৃদ্গ্রহাঃ কুলত্থাশ্চ হূণাঃ পারসীকৈঃ সহ॥

মহা-ভী—৯।

রাজ্যলোলুপ গ্রীক্‌গণ প্রথমে কপিশা, গান্ধার, উদ্দণ্ডপুর, বাহ্লিক, দরদ, কেকয় ও পঞ্চনদ হস্তগত করেন। অশোকের সময়ে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রাদির অবনতি আরম্ভ হয়। বৌদ্ধবিদ্যালয় ও ছাত্রগণের বাসস্থানের নাম ছিল "বিহার।" সমগ্র মগধরাজ্যব্যাপী ঐরূপ [illegible]হার থাকায় উহা পরিশেষে বিহার নামেই পরবর্ত্তী কালে পরিচিত ও অভিহিত হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল অভ্যুত্থানে এবং রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় পরিশেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, শিক্ষালাভ করিতে হইলে বৌদ্ধ অধ্যাপক ব্যতীত শিক্ষক মিলিত না এবং তথায় অধ্যয়ন করিলে বৌদ্ধ হইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রই প্রায় ধ্বংস করেন। তাঁহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট যাহা ছিল, মুসলমানদিগের কৃপায় তাহাও অগ্নিগর্ভে অথবা সলিলমধ্যে চিরসমাধি লাভ করিয়াছিল। কেবল তৎকালের হিন্দুপণ্ডিতগণের কণ্ঠে যাহা ছিল, তাহাই পরবর্ত্তী কালে লিপিবদ্ধ হওয়ায় অনেক স্থলে পাঠভেদ ও অর্থবোধের অযোগ্য হইয়াছে, এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। এইরূপ দৈনন্দিন অবনতির পরে যখন চরম অবনতি উপস্থিত হয়, তখন কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার শেষ সময়ে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহাদের অসাধারণ প্রযত্নে যেরূপ হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহা শঙ্কর-দিগ্বিজয়াদি গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা যায়। আচার্য্য শঙ্করের সময় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

মৌর্য্যবংশে ১০জন সর্ব্বসমেত রাজা হইয়াছিলেন। উঁহাদের শেষ রাজার নাম বৃহদ্রথ। ইনি ১৪৮ খৃঃ পূঃ স্বীয় ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্পমিত্র বা পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।

তৎপর শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র ১৮৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত মগধের রাজা ছিলেন। ইঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র। তাঁহার ঘটনাবলম্বনে কবিকুলসম্রাট কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নামে প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। ১৫৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পুষ্পমিত্রের চেষ্টায় যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধিত হয়, সেই যজ্ঞে পতঞ্জলি ঋষি উপস্থিত ছিলেন। পতঞ্জলি পাণিনিব্যাকরণের মহাভাষ্য, যোগদর্শন ও চরকসংহিতা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ মলনাশের উপায় সৃষ্টি করেন। এই কথা ভোজদেব ১০ম শতাব্দীতে তৎকৃত যোগদর্শন টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন। কাশীধামে এখনও প্রতিবর্ষে পতঞ্জলি ঋষি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী ও ছাত্রগণ শ্রীপঞ্চমীর দিনে মিলিত হইয়া থাকেন। ঐ স্থান আলাইপুরার নিকটে সুপ্রসিদ্ধ বাগীশ্বরীর মন্দিরোপকণ্ঠে নির্দ্দিষ্ট হয়।

মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথহন্তা (১) পুষ্পমিত্রের পুত্র, অগ্নিমিত্র কপিশা এবং পঞ্চনদের যবনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই শুঙ্গবংশীয় রাজগণেরও রাজধানী পাটলিপুত্রেই ছিল। এই বংশের শেষ রাজা দেবভূমি বা দেবভূতি। ইনি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী কাণ্ববংশীয় বাসুদেব প্রচ্ছন্নভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। (১) খৃঃ পূঃ ৩৬শ অব্দে বাসুদেব রাজা হইয়াছিলেন। শুঙ্গবংশীয় ১০জন রাজা সর্ব্বসমেত ১ শত ১২ বৎসর রাজত্ব করেন।

১। পুষ্পমিত্র।	৬। পুলিন্দক।
২। অগ্নিমিত্র।	৭। ঘোষবসু।
৩। সুম্বোষ্ঠ।	৮। বজ্রমিত্র।
৪। বসুমিত্র।	৯। ভাগবত।
৫। আর্দ্রক।	১০। দেবভূতি।

এই সময়ে মগধসাম্রাজ্য মগধেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, এই রাজত্বকালে ইন্দ্রাগ্নিমিত্র নামক কোন সামন্ত রাজা বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসনের উপর অশোকনির্ম্মিত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে একটি পাষাণনির্ম্মিত বেষ্টনী দিয়াছিলেন।

শুঙ্গ ও কাণ্বরাজাদের কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত না হওয়ায় কাশী তৎকালে কোন্ রাজার অধীনে ছিল, তাহা বলা যায় না। কাণ্ববংশীয় বাসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ, সুশর্ম্মা, এই চারিজনে ৪৫বর্ষ মগধের রাজা ছিলেন।

৯ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রজাতীয় 'শিপ্রক' নামা সুশর্ম্মার ভৃত্য সুশর্ম্মাকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিল। এই অন্ধ্রবংশীয় ৩০ জন রাজা ৪৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ২৪শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণমতে ১৭২ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রজাতীয় ষষ্ঠ রাজা 'হাল'নামে এক নরপতি ১বৎসরের জন্য রাজা হইয়াছিলেন; বিষ্ণুপুরাণে হালরাজ অন্ধ্রজাতীয় ১১শ সংখ্যক রাজা। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই হালরাজই শালিবাহন শকাব্দের প্রবর্ত্তয়িতা। যদি পুরাণোক্ত হালরাজই শালিবাহন হয়েন, তবে তাঁহার সময় উক্ত সময়ের ৯৮বর্ষ পূর্ব্বে ধরিয়া লইতে হইবে। শালিবাহন নামে এক জন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার গুরু সর্ব্ববর্ম্মা অতি বিখ্যাত মনীষী পণ্ডিত ছিলেন। রাজার এক বিদুষী পত্নী ছিলেন, তাঁহার সহিত জলক্রীড়ার সময় রাজাকে রাজ্ঞী জল দেওয়ায় 'মোদকং দেহি' বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। রাজা সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন কয়েকটি মোদক (মোয়া) রাজ্ঞীকে দিলে তিনি রাজাকে মূর্খ বলিয়াছিলেন। পত্নী কর্ত্তৃক মূর্খ সম্বোধন লাভ করিয়া রাজা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া নিজগুরু সর্ব্ববর্ম্মাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন। তখন গুরু সর্ব্ববর্ম্মা 'কলাপব্যাকরণ' নিজে নির্ম্মাণ করিয়া রাজাকে পড়াইয়া ষণ্মাসাভ্যন্তরে তাঁহাকে সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই কথা 'কথাসরিৎসাগরে' কথিত আছে।

পুরীজিলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরি পর্ব্বতের হস্তিগুম্ফা নামক একটি গুহার উপরে কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব খারবেলের একখানি ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায়, তিনি পঞ্চদশবর্ষে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন। তাঁহার দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে দাক্ষিণাত্যরাজ শাতকর্ণীর ভয়ে তিনি ভীত না হইয়া পশ্চিমদিকে সেনা প্রেরণ করিয়া কুশুম্বগণের সাহায্যে একটি নগর দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার ৫ম রাজ্যাঙ্কে রাজধানীর একটি পয়ঃপ্রণালী সংস্কৃত হইয়াছিল।

(১) প্রজ্ঞাদুর্ব্বলঞ্চ বলদর্শনব্যাপদেশদর্শিতাশেষসৈন্যঃ সেনানীঃ অনার্য্যো মৌর্য্যং বৃহদ্রথং পিপেষ পুষ্পমিত্রঃ স্বামিনম্। —হর্ষচরিত ষষ্ঠোচ্ছ্বাস।

(১) দেবভূতিস্তু শুঙ্গরাজানং বাসনিনং তস্যৈবামাত্যঃ কাণ্বো বাসুদেবনামা নিপাত্য স্বয়মবনীং ভোক্তা।

এই পয়ঃপ্রণালী নন্দবংশীয় রাজগণের মৃত্যুর পর বা সিংহাসনচ্যুতির পর ১০৩ বৎসর কাল ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি মগধ ও উত্তরাপথের রাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই লিপির শাতকর্ণী যদি পুরাণোক্ত ১০৬ খৃষ্টাব্দের অন্ধ্রজাতীয় রাজা শাতকর্ণী হয়েন, তবে ১৬৫ মৌর্য্যাব্দ সম্ভবপর হয় না, উহা ৪৬৫ মৌর্য্যাব্দ হইলে ঠিক হইত। পুরাণে শাতকর্ণীকে এক জন বড় রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শুঙ্গ ও কাণ্ববংশীয় রাজগণের সময় হইতে কাশীতে আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং গুপ্তসম্রাটগণের সময়ে ৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে (এই সময় ডাক্তার ফ্লিট ও বুলারের গণনালব্ধ) বারাণসীতে বহু গৌরবোদ্ধার হইয়াছিল, এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত চিহ্ন পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়। কারণ, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা হিয়ান যখন বারাণসীধামে আগমন করেন, তখন বারাণসীতে তিনি বৌদ্ধপ্রভাব কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি বারাণসীর উত্তরোপকণ্ঠে মৃগদাব নামক স্থানে (বর্ত্তমান সারনাথে) বিহার ও সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। ফা হিয়ান বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন ও কীর্ত্তন করিবার নিমিত্তই ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীর কোন উল্লেখ করেন নাই।

দশকুমারচরিতের চতুর্থোচ্ছ্বাসে চন্দ্রঘোষ ও তৎপুত্র সিংহঘোষ নামক দুই জন কাশীরাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা ভারতের তৃতীয় মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, ইহা ব্যতীত তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা জানা যায় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।

জন্মান্তরবাদ

দেহ, ন্যায়, সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে আত্মা এক কি বহু, জগৎ সৎ কি অসৎ, মুক্তি জীবপ্রবিলয় কি পরমেশ্বরকৈঙ্কর্য্য—এ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। জন্মান্তরবাদ প্রথম প্রচারিত হয়—দর্শনশাস্ত্রের মূল শ্রুতি উপনিষদে। পল্লবিত হয় পুরাণ, সংহিতা, সূত্র ও দর্শনের ভাষ্যটীকায়।

মুক্ত পুরুষ ব্যতীত মানবাদি সকল জীবকে মৃত্যুর পর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, মৃত্যুই জীবনের দ্বার। মৃত্যুতে জীবের শেষ নহে। কুসুমের গন্ধের মত স্থূলদেহের নাশে জীবাত্মা লোপ পায় না; মৃত্যু-অন্তে কিছু দিন বা কিছু কাল জন্মদেহে থাকিয়া বা না থাকিয়া জীবকে পুনরায় মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, ইহা বিধাতার বিধান, প্রকৃতির নিয়ম।

"ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং" (ছান্দোগ্যশ্রুতি)। দেহাত্মাভিমানী, কুরুকর্ম্মা, মায়ামোহমুগ্ধ মানবাদিই বারংবার জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ কর, মৃত্যুকে প্রাপ্ত হও—ইহাই তাহাদের প্রতি ব্যবস্থা।

যাহারা জ্ঞানাভিধানায় কামনা-বাসনার দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া যায়, আত্মতত্ত্ব অনুশীলন না করিয়া দেহাত্মাভিমান লইয়া জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহারা "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি"—তাহারাই কৃপণ, আর যাহারা তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলন করে, ত্যাগের পথে চলিয়া বাসনা-কামনার জাল ছিন্ন করে—তাহারাই ব্রাহ্মণ।

জন্মান্তরবাদ না মানিলে সৃষ্টি-রহস্য অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হয় না। এ সংসারে কেহ রাজা, কেহ ভিখারী; কেহ নীরোগ, কেহ চিররুগ্ন; কেহ মেধাবী, কেহ নির্ব্বোধ; কেহ ধর্ম্ম-পরায়ণ, কেহ বা পাপিষ্ঠ—এই দারুণ বৈষম্যের কোনও সন্তোষপ্রদ হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতার পাপ-পুণ্যই সন্তান গ্রহণ করে—তৎফলেই এই বৈষম্য, ইহাও সকল স্থলে ঘটে না। আপত্তি উঠে—সন্তান যদি পিতামাতারই পাপ-পুণ্য গ্রহণ করিল, তবে আবার ঐ পিতা-মাতাও তাহাদের পিতা-মাতার পাপ-পুণ্য গ্রহণ করুক, তাহা হইলে পাপপুণ্য আর কাহাকেও অনুষ্ঠান করিতে হয় নাই বলিতে হইবে।—ইহা কেমন কথা? আর অপরের কৃতকর্ম্মের ফল কখন অপরে গ্রহণ করে না। এক জন পাপ করিল, অপরে তাহার জন্য যন্ত্রণা ভুগিবে—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। নিজের কর্ম্মের ফল নিজেই ভোগ করিবে, এবং সেই ভোগ করিবার উপযোগী দেহও তাহাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে; কাযেই তদনুরূপ পিতৃ-মাতৃপ্রাপ্তি, তদনুরূপ জন্মলাভ। দাঁড়াইল—পাপপুণ্য সন্তানেরই; পিতামাতার নহে। আর সেই জন্মের শিক্ষা, দীক্ষা ও সংসর্গের ফলেই সেই জন্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, ইহা বলা চলে না।

প্রারব্ধ জন্মান্তরীণ কর্ম্মেরই নাম। দৈব, প্রারব্ধ, অদৃষ্ট বা নিয়তি বৃষ্টিধারার মত অকস্মাৎ আকাশ হইতে নামে না। প্রারব্ধ—নিজেরই কর্ম্মফলের জন্য কেহ রাজা, কেহ নিরন্ন ইত্যাদি অবস্থা-বৈষম্য ঘটে। "প্রারব্ধ নাই, পূর্ব্বজন্ম নাই অথচ এই বৈষম্য" ইহা মানিলে বিশ্ব-সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য-শৃঙ্খলাহীন, অকারণোৎপত্তিক ও নিরর্থক বলিতে হয়। এত বড় সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য নাই, শৃঙ্খলা নাই, ইহাও বলা যায় না, আর কারণ নাই অথচ কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে, এই অনুভববিরুদ্ধ যুক্তিও মানা যায় না। পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি কোন কোন সময়ে সুফল লাভ করে, তাহা তাহার প্রারব্ধেরই ফল। আকস্মিক বলিয়া এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নাই। আকস্মিকভাবে আইসে বটে, কিন্তু আকস্মিক নহে।

জন্মান্তরবাদ না মানিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে খামখেয়ালী স্বেচ্ছাচারী বা পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট বলিতে হয়; এমন কি, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর না বলিয়াও পার নাই। এত বড় বৈষম্য, এত বড় পক্ষপাত! অকারণ কাহাকে সুখী, কাহাকে দুঃখী, কাহাকে রাজা, কাহাকে ভিখারী যিনি করিয়াছেন, তাঁহাকে খামখেয়ালী স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর না বলিয়া কি বলিব? মানবগণের নিজ নিজ কর্ম্মফলেই এই বৈষম্য ঘটিয়াছে, ভগবান্ ন্যায়বিচারক বা পাপপুণ্য-নিয়ন্তা মাত্র, ইহা মানিলে আর কোন গোল থাকে না। অতএব জন্মান্তরবাদ-স্বীকারই নিরাপদ। যাহা নিরাপদ—তাহাই অবলম্বনীয়।

বানর-শিশু যেমন জন্মগ্রহণ করে, অমনই বৃক্ষের শাখা

ধরিয়া থাকে। গোবৎসকে আপনা হইতে মাতার স্তন খুঁজিয়া লইয়া দুগ্ধ পান করিতে দেখা যায়। কোন কোন পক্ষিশাবক ডিম্ব ভেদ করিয়াই উড়িতে আরম্ভ করে। ইহা তাহাদিগকে কে শিখাইয়াছিল? পূর্ব্বজন্ম যদি না থাকে, তাহা হইলে জন্মান্তরীণ অভ্যাস, প্রকৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা, কিছুই আসিতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে প্রাণীরা প্রাণধারণার্থ যাহা করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহাই করিতেছে মাত্র, নূতন নহে; তাই বানর-শিশু শাখা ধরে—ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে, জন্মান্তরবাদ অস্বীকার্য্য নহে।

বর্ত্তমান জন্মে উৎকট পাপ করিয়াও কেহ কোন দণ্ড পাইল না; হয় ত সুখে-স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটাইয়া দিল; পক্ষান্তরে কেহ ধর্ম্মপথে থাকিয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গেল, সারা-জীবনে সুখের মুখ দেখিতে পাইল না;—এই যে পক্ষপাত, এই যে অবিচার, সত্যই কি ইহা বিধাতার আকাঙ্ক্ষিত, সৃষ্টির ধর্ম্ম? যেখানে সূর্য্য-চন্দ্র নিয়মিত আলো দেয়, বাতাস মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হয় না, পৃথিবী কখনও কোন দিন শস্যশূন্যা দেখা যায় না—সেই সৃষ্টিতে এই পক্ষপাত, এই অবিচার কি সম্ভব? নিজের প্রাণ—নিজের অনুভূতিকে জিজ্ঞাসা কর, বলিবে, ইহা কখনও সম্ভব নহে। পাপী বর্ত্তমান জন্মে পাপের ফলভোগ না করিলেও পরলোকে না হউক, জন্মান্তরে যে করিবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই যে অতীত এবং বর্ত্তমান যুগে এক জাতিকে দুর্ব্বল ও অসহায় পাইলে প্রবল জাতি নানামতে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে, তাহার ফল তাহারা পায় নাই, পাইতেছে না বা পাইবে না, কে বলিল? আভিজাত্য-গর্ব্বিত অথবা ধন-মদমত্ত ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণীকে চিরদিনই নিষ্পেষিত করিয়া থাকে—ইহার ফল ভোগ করিতে হয় না, ইহা যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি ভ্রান্ত। ভগবানের বিচারে, সৃষ্টির নিয়মে পাপপুণ্যের ফলাফল এ জন্মে না হইলেও পর-জন্মের জন্য তোলা থাকে, ইহা যেন সকলেই মনে রাখেন।

"ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম ইত্যাদি"

অনেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত লোভ, অসংযম, দুর্ব্বলতা এবং জন্মান্তরের বা ইহ-জন্মের পাপটিকে পরের ঘাড়ে চাপাইয়া আপনা-দিগকে নিরাপদে রাখেন। কখন শাস্ত্র বা শাস্ত্রকার, কখন ধর্ম্ম ও আচারপদ্ধতি, কখন অদৃষ্ট ও সমাজ প্রভৃতিকে দোষী করিয়া প্রকারান্তরে নিজেরা নির্দ্দোষ এবং নিষ্পাপ, ইহাই দাঁড় করাইবার প্রয়াস পান। আবার কেহ কেহ পূর্ব্ব-জন্মের পাপকর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত দুঃখ, বেদনা, ও অপমান লাঞ্ছনাকে জাতির পাপ এবং পূর্ব্বপুরুষের পাপ বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, নিজেদের দুঃখ-কষ্ট, অপমান-লাঞ্ছনা,—সমস্ত নিজেদেরই পাপের ফল; পূর্ব্বপুরুষগণেরই পাপ, নিজেদের নহে—ইহা হইলে তাঁহারা তাহা নরকে ভোগ করিতেন। কবে জয়চাঁদ নামক এক ব্যক্তি পাপ করিয়াছিলেন, শত শত বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি ব্যক্তি তাহারই ফলভোগ করিতেছেন—ইহা শুনিলে হাসি পায়। বিধাতার চক্র একবার উপরদিকে, একবার নিম্নদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, আজ যে ইংরাজ, জন্মান্তরে হয় ত সে ভারতবাসী, আজ যে ভারতবাসী, জন্মান্তরে হয় ত সে জাপানী। আবার হয় ত আজ যে মানব, কাল সে প্রস্তর। আজ যে ধনী, কাল সে নিরন্ন। শত ব্যক্তির অন্ন কাড়িয়া লইয়া তুমি ভোগবিলাস চরিতার্থ করিতেছ। ভোজনের অজুহাতেই বা অন্য ছলেই হউক অসহায় জীবকে হত্যা করিতেছ, কষ্ট দিতেছ;—মনে করিও, নিরন্নের সেই ব্যথা তোমাকে জন্মান্তরে ভোগ করিতে হইবে, সেই হত্যার যন্ত্রণা, সেই কষ্ট তোমাকে জন্মান্তরে পাইতে হইবে।

জন্মান্তর মানিলে—মনে প্রাণে মানিলে জগতে এ অবিচার, এ অত্যাচার, এ নিষ্ঠুরতা, এ আত্মম্ভরিতা অনেক কমিয়া যাইত। পরলোক বা জন্মান্তর মানিলে পুণ্যবানের আশ্বাস ও তৃপ্তি; পাপকারীর নৈরাশ্য ও ভয়। পরলোক নাই, জন্মান্তর নাই, পাপের ফলভোগ নাই, ইহা মনে করিয়া যথেচ্ছাচারীর সুখ কেন না, যথেচ্ছাচারের কোনও বাধা জন্মিবে না, ভোগবিলাসেচ্ছা, আধিপত্যপ্রয়াস বেশ সহজেই চরিতার্থ করা যাইবে। জন্মান্তরে ফলভোগ মনে থাকিলে কি যুদ্ধের নামে এই নরহত্যা, আত্ম-রক্ষার নামে এই অত্যাচার, সুবিধার অজুহাতে ইতর জীবের প্রতি এই উৎপীড়ন হইতে পারিত? সংস্কারের বা আচারের দোহাই দিলেও যাহা পাপ, তাহা পাপই।

"বর্ত্তমান জন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ (১) সেই জন্মেই হউক্ বা (২) পরলোক—স্বর্গ নরকে হউক্, জন্মান্তর-স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।"—

(১) সেই লোকে—ইহা বলা চলে না। কারণ, যদি উৎকট পাপ এবং অতি বড় পুণ্যেরই ইহলোকে ফল দেখা যায়, সকল পাপপুণ্যের ইহলোকে ফল দেখা যায় না। সকল পাপ-পুণ্যের ফলভোগ যদি প্রত্যক্ষভাবে ইহকালেই হইত, তাহা হইলে বিশ্বের এই রহস্যময়ী লীলা চলিত না।

(২) পরলোক—স্বর্গ-নরকেই ভোগ হউক—ইহাও বলা চলে না, কারণ, মানুষ নিরবচ্ছিন্ন পুণ্য বা পাপ করিয়া যায় না; ইহারা তবে কোথায় যাইবে? স্বর্গে অথবা নরকে—ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবিচারই হইল বলিতে হইবে। চিরকাল স্বর্গে কিম্বা নরকেই বাস করিবে? কাল অনন্ত—অনন্তকাল ধরিয়াই তাহারা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে? আর নিরবচ্ছিন্ন পাপপরায়ণ ব্যক্তিদেরও কখনও কি সে যন্ত্রণা হইবে না?—যুক্তি ও অনুভবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন—ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত।

পরিমিত কাল স্বর্গ-নরক-ভোগ (নাই করুক, ক্ষতি নাই) তৎপরে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, মানিলে উপরি-উক্ত অন্য মঞ্জস্য থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন পুণ্য-পাপই করুক, পাপপুণ্য মিলাইয়া করুক, অনন্তকাল ত কাহাকেও স্বর্গ বা নরক ভোগ করিতে হইল না।

পরলোকে বা জন্মান্তরে—যাহা পূর্ব্বজন্মে করা হইয়াছে তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান জন্মে প্রত্যেকেরই মনে করা উচিত, কাহাকেও ব্যথা দিব না, কাহাকে উপর অত্যাচার করিব না, পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

এই জন্মান্তর মানিয়া কেহ যদি ভাবেন—"আমি যখন

হইয়া জন্মিয়াছি, তখন ছোটকে ঘৃণা করিব, দুর্ব্বলকে দলিত করিব।" আমরা বলিব, তিনি জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না, বা তিনি কপট। কারণ, এ জন্মে যিনি জীবকে যে ভাবে কষ্ট দিবেন, সুদে আসলে পরজন্মে তাঁহাকে তাহাই ভোগ করিতে হইবে। ঘৃণা করায় যে ব্যথা, দলিত করায় যে বেদনা দেওয়া হয়, জন্মান্তরে তাহাই দ্বিগুণ ভুগিতে হইবে মনে হইলে—কেহ কাহাকে ঘৃণা করিত না, কেহ কাহাকে দলিত করিত না। স্বধর্ম্মপালন ও শাস্ত্রবিধিপালনের নাম লইয়া জাত্যভিমান বা আভিজাত্যগণের কার্য্যকে সমর্থন করা যায় না।

পাশ্চাত্যদেশে জন্মান্তরবাদ মনীষিগণ কর্ত্তৃক অধুনা অংশত স্বীকৃত হইতেছে বটে; কিন্তু এত কাল উহা অজ্ঞাতই ছিল। অবশ্য অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত নরকের কল্পনা করিয়া মানবকে পাপপথ হইতে বিরত রাখার প্রচেষ্টা হইয়াছিল সত্য, উহাতে কিছু সুফলও ফলে বটে, কিন্তু যাহা যুক্তিতে টিকে না বা অনুভবের বিরুদ্ধ, তাহা অধিক দিন মানবচিত্তে আধিপত্য করিয়া থাকিতে পারে না।

"জন্মান্তর থাকিলেই তাহার স্মৃতি ফুটিত; অতএব জন্মান্তর অস্বীকার্য্য—" এ যুক্তি অসার। জন্মান্তর ফুটিলে বিশ্বের এ বৈচিত্র্যময় রহস্যময়—খেলা চলে না, মায়ার এ মমতাময় কোমল বাঁধন থাকে না। জ্ঞানের পথে যাওয়া ঘটিল না, অথচ মায়ার বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে হইল, জীবনের কোন মাধুর্য্য পাওয়া গেল না, অথচ দুঃখের আশ্বাস জাগিয়া থাকিল, এই অবস্থা বড় কষ্টের। পূর্ব্বজন্মে ঐ আমার পুত্র ছিল, ঐ আমার সম্পত্তি, এ ধারণা চিত্তে বলবতী থাকিলে ফল ভাল হয় না। জন্মান্তরের বহু পরিচিত স্থান বা প্রিয়জনকে দেখিয়া কখনও কখনও যে অস্ফুট আকারে স্মৃতি ফুটিয়া উঠে, উহা আশা বা কল্পনার রশ্মির মত। উহাতে জীবনযাত্রার পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না।

জন্মান্তরবাদ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব। উহা প্রত্যক্ষের মত স্পষ্ট প্রতিভাসিত কোন সময়েই হইবে না। ভগবানের ইহা অভি-প্রেতও নহে। তবে জন্মান্তরবাদ মানিয়া অন্ততঃ সামান্য শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিয়া লোক যদি অল্প-বিস্তর অনুশীলন করে, তবে মানবের পাপপ্রবৃত্তি অবশ্যই লুপ্ত হইবে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির রহস্যময় দ্বারটি অল্পে অল্পে খুলিয়া যাইবে।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

দূরের মিলন

সুদূরের সাথী, ওগো প্রিয়ে! তব লাগি'
কাটাই দিবস দূরের মিলন মাগি'।
প্রভাত-প্রদোষ দীর্ঘ যামিনী ধরি'
আনমনে ব'সে দূরের ধেয়ান করি।
সন্ধ্যাকাশের রক্তিম আলো-ছায়া—
এঁকে দিয়ে যায় দূরের মোহিনী মায়া।
কাছে যাহা রয়—বুকে রহে জড়াইয়া,—
দূর গগনের কোলে পড়ে ছড়াইয়া!
নিশীথ গগনে তারাগুলি হাসে দূরে;
ইঙ্গিতে করে ডাকাডাকি কোন্ সুরে!
তারায় তারায় সারা রাত কানাকানি;
বাসর-শয়নে মিলনের মৃদু বাণী!
অমা-নিশীথিনী ঘন তমসার তলে,
চেতনা আমার ঢেকে দেয় কোন্ ছলে;—
মনে হয় তারি বাহু-বন্ধন-সুখে—
দূরে যে রহিল—এল যেন মোর বুকে।
নব বসন্তে নবীন দখিণা বায়,
সুদূরের কত কথা গুঞ্জরি' যায়;
ওরি সাথে তব গোপন বারতাখানি—
আমার মরমে রেখে দিয়ে যায় আনি'।

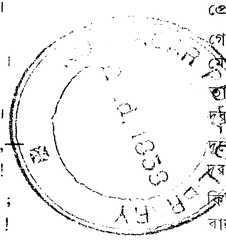

তোমার দীর্ঘ নিশাসের মালাগাছি,
প্রেমালিঙ্গন, বাহু-বন্ধন যাচি',
গোপনে বহিয়া উতলা দখিণা বায়,
মোর বুকে তার পরশন রেখে যায়।
তাই ত সুদূর ব্যবধান রচি' আমি
দূর মিলনের বাসরে কাটাই যামী।
দূরে দূরে মোর হয় প্রেম-বিনিময়;
দূর ব্যবধান নিবিড় মিলনময়!
কিবা খেদ তাহে না যদি পাইনু তারে—
বাহু-বন্ধনে বাঁধিবারে গেনু যারে।
একান্তে যারে লভিতে নারিনু কাছে,—
ব্যবধান মাঝে পরাণ জুড়িয়া আছে।
অয়ি প্রিয়ে! অয়ি প্রিয়তমে! মোর রাণি!
মিলন-সুরায় ভরিয়া পাত্রখানি;—
ব্যবধান মাঝে বাসক-শয়ন পাতি',
আবেশে আবেগে কাটাও মিলন-রাতি।
ওগো দূর! ওগো সুদূর বন্ধু! তুমি
মিলন-বাসরে এসে যাও মোরে চুমি'।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।



মেঘমুক্তি

ঊষার কথা

২

আমি যতক্ষণ এই সব দলের মধ্যে থাকিতাম, ততক্ষণ স্বতন্ত্র ভাবে আমার নিজের কথা মনে আসিতে পারিত না। কিন্তু রাত্রিতে নিজের ঘরে গিয়া একা বসিলেই আমার নিজের জীবনের কথা মনে উদয় হইত। এই যে একটা দো-টানার মধ্যে পড়িয়া আমার মন সংশয়ে, দ্বিধায়, বেদনায় আকুল হইয়া উঠিতেছে, ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে? যত দিন অজিত বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় নাই, তত দিন ত কখনও আমার মনে এ সব চিন্তা জাগে নাই। বাবা আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, আমি নতমস্তকে তাহাই মানিয়া লইয়াছিলাম। তবে কি তখন আমি মোহিত বাবুকে ভালবাসিতাম? এই কথাটা আমি অনেকবার অনেক রকম ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু অনুকূল উত্তর মনের নিকট হইতে পাই নাই। অজিত বাবুর সম্বন্ধে আমার মনে আজ যে ভাব উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, মোহিত বাবু ত কোন দিন আমার মনে সে ভাবের উদ্রেক করিতে পারেন নাই। ছোটবেলা হইতে আমরা সবাই একসঙ্গে মানুষ হইয়াছিলাম। মোহিত বাবু আমার শৈশবের খেলার সঙ্গী। একটু বড় হইবার পর আমরা পড়াশুনা, বেড়ান সব সময়েই একত্র থাকিতাম। মোহিত-দা বলিয়াই তাঁহাকে ডাকিতাম। তাঁহার স্কুল-কলেজের যত গল্প, তাঁহার বন্ধুবান্ধবের কথা ও তাঁহার ক্রিকেট হকি ফুটবল ম্যাচের বীরত্বের কথা আমায় না বলিয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন না। আমারও স্কুল-টিচার, বেলা-দি, তরঙ্গিণী-দির গল্প, পণ্ডিতের ঘণ্টার সব মজার মজার কথা, আশা চারু সুষমা নীলা প্রভৃতি বন্ধুদিগের বন্ধুত্বের নানা গোপন ইতিহাসের বর্ণনার ধৈর্য্যবান্ শ্রোতা মোহিত-দার মত আর কেহ ছিল না। আমরা উভয়েই উভয়কে ভালবাসিতাম। বাবা মোহিত-দাকে যেমন ভালবাসিতেন, জ্যেঠামহাশয় ও জ্যাঠাইমারও তেমনই আমার উপর অপার স্নেহ। তাই যে দিন আমাদের উভয়ের অভিভাবকগণ একমত হইয়া আমাদের পরস্পরের ভাগ্যসূত্র একসঙ্গে গাঁথিয়া দিলেন, সে দিন আমরা দুই জনই ইহা একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনার মত খুব সহজ ভাবে ও বিনা বাধায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের মনে সে দিন কোন কথা—কোন প্রশ্নই উঠে নাই। আজ কিন্তু অহরহ সেই সব ঘটনার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ও নিজের মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া বুঝিতেছি, আমি তাঁহাকে তখন আমার নিত্য সঙ্গী ও বন্ধুর মতই শুধু ভালবাসিয়াছিলাম। এখনও তাঁহার প্রতি আমার সেই মনের ভাবই বজায় আছে। কিন্তু এখন আর সে কথা বুঝিয়াই বা উপায় কি?

সে দিন কি একটা কথাপ্রসঙ্গে পুরাকালের সত্যরক্ষা সম্বন্ধে আদর্শের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। নরেশ-দা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তর্ক ও যুক্তির অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগে এত দিনের উচ্চ আদর্শকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। অজিত বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন না। দিদি নরেশ-দার কথা শুনিয়া একবারে উত্তাক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমার এই সব আজগুবী কথা শুন্‌লে আমার হাড়ে জ্বালা ধরে! যুগ যুগ ধ'রে যে প্রথা—যে নিয়ম আদর্শ ব'লে মানুষ মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, যে আদর্শের উচ্চ সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ কত ত্যাগস্বীকার করেছে, তার নিজের সব সুখ, আশা, এমন কি, কত স্থানে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছে, তার কোন মূল্য নেই; সে জিনিষটা বড় নয়, বড় হ'ল ওনার ঐ সব বাজে কথা! তোমার কথামত বলতে গেলে সংসার থেকে সব উচ্চ আদর্শ, ত্যাগ, মনুষ্যত্ব উঠে যায়—থাকে শুধু ক্রূর স্বার্থ ও নিছক আত্মপ্রীতি!"

নরেশ-দা খুব প্রশংসমান দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিয়া আমায় বলিলেন, "বাঃ! রাগ হ'লে তোমার দিদিকে আরও কত সুন্দর দেখায় দেখেছ ঊষা? আমার এ সময় একটা সংস্কৃত শ্লোক মনে প'ড়ে যাচ্ছে,—যদি তোমরা দুজনে অভয় দাও ত আবৃত্তি করি—"

দিদি আরও রাগিয়া বলিল, "আবার ঐ সব বাজে কথা বল্‌তে লজ্জা হয় না? আমি একটা এত বড় সিরীয়স কথা বল্লাম, তার জবাব দেওয়া নেই, তার উপর আবার ঠাট্টা?"

নরেশ-দা বলিলেন, "জবাব আর কাকে দেব বল? তোমরা অর্থাৎ নারীজাতিরা ত কোন কালে মস্তিষ্ক জিনিষটার ব্যবহার ক'রে দেখবে না, এ একবারে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছ। তোমরা শুধু হৃদয়ের আবেগের বশে ভাবাবেশের উচ্ছ্বাসেই চলবে; সুতরাং তোমাদের কাছে চিন্তাশীলতার বা যুক্তি ও বিচার ক'রে কোন জিনিষ বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার কোন মূল্য নেই। আমি কি সত্যরক্ষা করাটা অন্যায় কাষ ব'লে বোঝালুম? না তার উপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই বলেছি? আমি শুধু এই কথাটা তোমাদের বোঝাতে চাই যে, কোন এক সময়ে কোন একটা বিষয়ে সত্যবদ্ধ হলেই যে তার অনেক প্রতিকূল অবস্থা প'রে আসা সত্ত্বেও অনর্থক একটা আদর্শের মোহে সর্ব্বত্যাগী হওয়া বা দুর্ব্বহ দুঃখ বরণ ক'রে নেওয়ায় কোন গৌরব নেই। তুমি বলবে, তা হ'লে সত্যের বা কোন প্রতিজ্ঞা করার কি কোন মূল্য নেই? আমি বলছি, খুব আছে এবং সত্যবদ্ধ হলে যথাসম্ভব ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেও তার সম্মান রাখা উচিত। কিন্তু যদি অবস্থাবিশেষে কালে সেখানে কোন জটিলতা বাধে, যদি সেই এক সত্যরক্ষা করতে গিয়ে আরও কতকগুলি অন্যায় ও অসত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হ'তে হয়, যদি সেই এক সত্যের সম্মান রাখতে গিয়ে কোন স্থলে জীবন-মরণের সমস্যা শুরুই হয়ে উঠে, এ রকম অবস্থায় এত বড় মূল্য দিয়ে সেই সত্যরক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নেই।"

দিদি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "যত সব অনাসৃষ্টি কথা—পুরাকালে এত বড় বড় চিন্তাশীল মুনি-ঋষিরা যে সব উচ্চ চিন্তা, উন্নত আদর্শ রেখে গিয়েছেন, সে সবের উপর কোন শ্রদ্ধা নেই—"

নরেশ-দা বলিলেন, "আমার একটা কথার আগে উত্তর দাও তুমি, মনীষা! সে কালের আর্য্য ঋষিরা যে সব বিশ্বাস ও চিন্তার কথা ব'লে গেছেন, সেই কি চরম কথা বলা হয়ে গেছে? তাঁরা কি সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বকালের অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমায় ব'সে সেই সব বাণী দিয়ে গেছেন—যা কোন সময়ে কোন অবস্থায় বদল হ'তে পারে না ব'লে তোমার বিশ্বাস?"

দিদি বলিল, "আমি ও রকম কথা কোন কালে বলি নি!"

তখন নরেশ-দা বলেন, "তবে তোমার সবতাতে এত বিরোধ বাধছে কেন? তাঁরা তাঁদের সময়ে উচ্চ চিন্তার ফলে যেটুকু আবিষ্কার করেছিলেন, মানুষের কল্যাণের জন্য সেই সব বাণী জগতে প্রচার ক'রে গেছেন এবং আজ অবধি মানুষ নিজের সব স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে সেই বাণীর সম্মান রেখে চ'লে তাঁদের গৌরব অব্যাহত রেখেছে। যদি তাঁদের কথা মানুষের মনে এত দীর্ঘকাল ধ'রে এত উচ্চ স্থান পেয়ে থাকে, তবে আধুনিক যুগে যে সব মহা ধীমান্ মনীষী সূক্ষ্ম বিচার ও চিন্তা ক'রে সেই সব চিন্তার ফল জনসমাজে প্রচার করছেন—তাঁদের কথাই বা মানুষ শ্রদ্ধায় গ্রহণ না ক'রে ঠেলে ফেলবে কি ক'রে?"

দিদি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল; তাহার পর বলিল, "তাঁদের কথা মানুষ নেবে না, এ কথা বলা যায় না। তবে তুমি সর্ব্ববিষয়ে যে রকম মতামত প্রকাশ কর, সেই সবই যদি আধুনিক যুগের মনীষীদের চিন্তার ফল হয়, তা হ'লে ধরতে হবে যে, তাঁরা নিতান্ত সুবিধাবাদী, তাঁদের প্রচারিত বাণীর মধ্যে সে কালের মত উচ্চ মনুষ্যত্ব-বিকাশের কোন পন্থা নেই, সে শুধু পুর্ব্বকথিত ক্রূর স্বার্থ ও নিছক আত্মপ্রীতির মন্ত্র।"

নরেশ-দা এবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "অয়ি কোপনে? কোপ পরিত্যাগ ক'রে একটু প্রণিধান ক'রে দেখ! দেখবে, এই স্বার্থ ও আত্মপ্রীতির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই জগৎ চলছে! অত্যন্ত সামান্য প্রাণিজগৎ থেকে আরম্ভ ক'রে উন্নত মহামানব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক সুর, এক ভাব এবং এই মহাসত্য আধুনিক সুবিধাবাদী মনীষীদের আবিষ্কার নয়, এ সত্য সেই পূর্ব্বযুগের আর্য্য ঋষিদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ীর প্রতি উপদেশবাণীগুলি এখানে আবৃত্তি ক'রে শোনাব কি?"

দিদি বলিল, "থাক্! থাক্! আর উপনিষদ্ আবৃত্তি করতে হবে না! তোমার নিজের কথারই জয়-জয়কার হচ্ছে ত? আবার তার সাক্ষী-প্রমাণ বেদ উপনিষদ শ্রুতি স্মৃতি সব টেনে আনবার দরকার কি?"

নরেশ-দা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখছো ঊষা, এটা তোমার দিদির নিছক অভিমানের কথা! এ রকম তর্কে সুখ নেই। আমি আমার কথাটার ব্যাখ্যা ক'রে তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি, মনীষা? আমি বলছিলুম যে, স্বার্থ ও আত্মপ্রীতির বশেই জগৎ চলছে। যত স্তরে স্তরে জীব উন্নত ও বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছে, তত এই স্বার্থ ও আত্মপ্রীতির অনুভূতিও উচ্চ ও সূক্ষ্ম হয়ে আসছে, প্রভেদ কেবল এইখানেই, না হ'লে মূলে

ঠিক ঐ বস্তুই রয়েছে! এখন দেখ, সামান্য প্রাণিজগতে এর প্রকাশ কতটুকু? তারা শুধু প্রয়োজনমত প্রচুর আহার পেলেই সন্তুষ্ট—একটা কুকুরকে তুমি সামান্য একখানা হাড় ফেলে দিলে সে যে রকম সন্তুষ্ট হয়, একটা কোন সাধারণ মানুষও শুধু দু মুঠো ভাত পেলে অত খুসী হ'তে পারে না, কারণ, তার আত্মপ্রীতির প্রসার কুকুরের চেয়ে বেশী। সে আরও কিছু চায়। তেমনই তার চেয়ে আমাদের আত্মপ্রীতির জন্য তার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে আরও বেশী দরকার হয়। আমরা হয় ত ভাল খেয়ে প'রে সমাজে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে পারলেই তৃপ্ত হই, কারণ, আমার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু সকলেই তাই নয়। যে দেশভক্ত, সে দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগ ক'রে সুখী, ধার্ম্মিক তার ধর্ম্মের জন্য সাংসারিক সুখ তুচ্ছ ক'রে কত রকম কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রাণপাত কচ্ছে, যে সত্যকেই জীবনের আদর্শ ব'লে জেনে রেখেছে, সে তার জন্য অবাধে সব সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর। বুদ্ধদেব সংসারসুখের সর্ব্ববিধ সুখ ও ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি, তিনি তাঁর আত্মপ্রীতির মূলমন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন—নিখিল জগতের কল্যাণকামনায়। তাই তিনি এ সব অসার বস্তু হেলায় ঠেলে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। তবেই দেখ, বিচার ক'রে দেখলেই বোঝা যায় যে, সামান্য প্রাণী থেকে নর-দেবতা ব'লে যাঁদের মানি, তাঁরা পর্য্যন্ত সেই এক ভাবেরই পথিক। আর অত কথারই বা দরকার কি, চোখের সামনেই জীবন্ত প্রমাণ রয়েছে ত। এই আমি যে দিন-রাত্রি তোমার কাছে এত তাড়া, এত লাঞ্ছনা খেয়েও সর্ব্বক্ষণ তোমার আঁচল ধ'রেই বেড়াই, এটাই বা কি? ঐ নিছক আত্মপ্রীতি মাত্র!"

নরেশ-দার অত উচ্চ অঙ্গের বিচার শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তাঁহার শেষের কথাগুলি শুনিয়া দিদি হাসিয়া ফেলিল।

নরেশ-দাও তখন খুব উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাক্! বেঁচে গেছি! যে রকম মেঘাড়ম্বর ক'রে দুর্য্যোগ ঘনিয়ে উঠছিল, দেখে ভয় হচ্ছিল, বুঝি কিছু দিন ধ'রেই এর জের চলবে!"

নরেশ-দার ত দুর্য্যোগ কেটে যাওয়ায় খুব স্ফূর্ত্তিই হ'ল, এ দিকে ঐ সব কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে বিষম গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। সে রাত্রিতে ঘরে আসিয়া আমি কেবল নরেশ-দার কথাগুলাই ভাবিতে লাগিলাম। দিদির মত আমারও ধ্রুব বিশ্বাস, মানুষ একবার যে সত্য স্বীকার করে, তাহার অপলাপ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। তাহা ক সব রকম ত্যাগ স্বীকার করিয়াও সে সত্যরক্ষা করিতে হইবে। অন্যথা তাহার মনুষ্যত্বের হানি হয়। আমিও এত দিন সেই ভাবে চলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু যখন নরেশ-দা বলিলেন, "সময়বিশেষে সত্যপালন করাও অন্যায়। বিশেষ যখন কোন সত্যপালন করতে গেলে অন্য কতকগুলি অসত্য ও অন্যায়কে স্বীকার ক'রে নিতে হয়"—তখন আমার হঠাৎ যেন চমক লাগিয়া গেল। আমার মনে হইল, এই যে আমি অজিত বাবুর সম্বন্ধে আমার যে মনোভাব, তাহা জানিয়াও শুধু সত্যরক্ষার জন্যই মোহিত বাবুর বাগ্‌দত্তা হইয়া সত্যের মর্য্যাদা রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, এটা কি সম্পূর্ণ ভণ্ডামী ও অন্যায় নহে? যে দিন আমাদের এ বিবাহসম্বন্ধে গুরুজনরা স্থির করিয়াছিলেন, সে দিন আমি এটা স্বীকার ক'রয়া লইলেও আজ মোহিত-দার স্ত্রী হইবার মত যোগ্যতা আমার নাই, সে আমি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। তবু এই দারুণ অন্যায় ও অসত্যকে বরণ করিয়া লইয়া মোহিত বাবুকে এবং নিজেকে সারা-জীবন এইভাবে প্রতারণা করিয়া চলিলেই কি ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে? আমার প্রাণপাত করিয়া সত্য রক্ষা করিয়া চলিবার সঙ্কল্পের ভিতর এই বিরাট ফাঁকি দেখিতে পাইয়া আমি ভীত ও বিব্রত হইয়া উঠিলাম। লজ্জায় ও সঙ্কোচে কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না; কিন্তু মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলাম। এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? নরেশ-দার কথা যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে মোহিত বাবুকে আমার এই কথা জানা করিয়া জানান উচিত। কিন্তু কথাটা মনে আসিতেই লজ্জা ও সঙ্কোচে নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। আজ এত দিন পরে এত দীর্ঘ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার পর আমি কেমন করিয়া এ কথা তাঁহাকে জানাইব? কি করিয়া বলিব যে, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি, কোন দিনই আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি নাই। অতএব এ বিবাহে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব! মানুষের জীবন কি এত হেলাফেলার জিনিষ? খেয়ালের বশে যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই কি আমরা করে চলে? নরেশ-দার কথা মনে মনে আমি সঙ্গত বলিয়াই মানিলাম; কিন্তু তাঁহার মত জীবনে কথা কাজে পরিণত করিবে কথা ভাবিলেই আমার এত দিনের শিক্ষা, সংস্কার, নীতিজ্ঞান

সব যেন মাথা তুলিয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়! অথচ অসত্য ও অন্যায়কে স্বীকার করিয়া লইয়া সারা জীবন ধরিয়া ভণ্ডামী ও প্রতারণা করিয়া চলিবার মত দৃঢ়শক্তি ত আমার নাই। দ্বিবিধ চিন্তার ফলে আমার সব শান্তি মন হইতে নির্ব্বাসিত হইল—জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন বিষময় হইয়া উঠিল।

দুই তিন দিন ধরিয়া অহর্নিশ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া আমার শরীর-মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে দিন রাত্রিতে একা বসিয়া বসিয়া নিজের মনে আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি জীবনে কাহারও সম্বন্ধে অন্যায় বা প্রতারণা করিয়া চলিতে চাহি না। এ জন্য আমাকে যত দুঃখ সহ্য করিতে হয়, করিব; আমায় যেন অন্যের দুঃখের কারণ না হইতে হয়, আমার এখন কি কর্ত্তব্য—তুমিই দেখাইয়া আমায় সেই পথে চলিবার মত বল দাও! একান্ত মনে বার বার এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বাবার ছবিখানার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল! আমি উঠিয়া আসিয়া সেই ছবির দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ক্রমে যেন আমার মন শান্ত হইয়া আসিল। মনে হইল, আগে যেমন তিনি তাঁহার অগাধ স্নেহের ছায়ায় আমার সকল দুঃখ সব অশান্তির দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিতেন, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে আমার প্রতি তাঁহার সেই স্নেহময় অভয় দৃষ্টি যেন জাগ্রত রহিয়াছে! সেই দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি নরেশ-দার সমস্ত যুক্তি-তর্ক ভুলিয়া গেলাম। বাবা আমার মঙ্গলের জন্য আমার ভবিষ্যৎ জীবনসম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতির অপলাপ করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে বেদনা দিতে ও তাঁহার অসম্মান করিবার কথা আমি আর ভাবিতে পারিলাম না। ছবির নীচে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া আমি বার বার বলিলাম, "আমি ভাল-মন্দ কিছুই বুঝি না, তোমার উপর নির্ভর ক'রে আমি সারা জীবন তোমারই প্রদর্শিত পথে চলব—আমার মঙ্গল অমঙ্গল সব ভারই তোমার উপর ছেড়ে দিয়ে আমি নির্ভয় হলুম।"

তখন একটা নিশ্চিন্ত আরাম ও শান্তিতে মন পূর্ণ হইয়া গেল। বুকের উপর যে দুর্ব্বহ গুরুভার এত দিন পাষাণের মত চাপিয়াছিল, তাহা যেন নামিয়া গিয়া বুক হাল্‌কা হইয়া গেল। ইহার পর হইতে আমি অজিত বাবুর সঙ্গে যথাসম্ভব বাধ্যতা রাখিয়া চলিতে সুরু করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আমি আমার দুর্ব্বলতা জয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়াছি। কিন্তু মানুষের সব দম্ভ—সব কল্পনাই অসার। তাঁহার অন্তরের প্রবল আকর্ষণ চুম্বকের মত আমায় তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল, কখন্ যে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমার দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। তার পর অমিয়া-দির আবির্ভাব।

সে দিন ষ্টীমারে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিবার পর আবার নূতন করিয়া 'মোহিত-দার' কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু এবার আর আমার আত্ম-সংযমের কোন প্রয়োজন হইল না। যেমন অতর্কিতভাবে তিনি আমাদের কাছে আসিয়াছিলেন, তেমনই আচম্বিতে তিনি আমাদের নিকট হইতে অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার যাইবার পর হইতে একটা গভীর নিস্তব্ধ বিষণ্ণতার ছায়া লইয়া আমাদের দিন চলিতে লাগিল। নরেশ-দা মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রসঙ্গ তুলিয়া দুঃখ করিতেন, দিদি তাহাতে যোগ দিত। আমি আর কোন দিন তাঁহার নাম মুখে আনি নাই। তিনি আচম্বিতে যে গভীর বেদনা লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সে ব্যথা আমি নিজের অন্তর দিয়া সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিতাম। আমার দিনের সকল কাযে, সকল চিন্তার মধ্যে সেই পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখের ছবি জাগিয়া থাকিত। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পরিপূর্ণ ছিল, তবু আমি তাঁহার কথা আর মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতাম না। যে নাম অন্তরের প্রতি নিশ্বাসে ধ্বনিত হইয়া উঠিত, জিহ্বা যেন সে নাম উচ্চারণ করিতে গেলে স্তব্ধ হইয়া যাইত। বাহিরের জগৎ হইতে তাঁহাকে একবারে হারাইয়া আমি আমার অন্তরের মধ্যে নিভৃতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম।

এই নীরব মৌন বিষাদ ও স্তব্ধ শোকের মধ্যে আমার দিন কাটিতে লাগিল। তবু বাহিরে আমি খুব সহজ ভাবে ও পূর্ব্বাপেক্ষাও মনোযোগী হইয়া আমার প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট কায-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতাম। আমার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, যাহাতে আমার মনের এ ভাব আমার বাহ্য আচরণে কেহ না জানিতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া কে কবে মনের গতি-বেগ রোধ করিতে পারিয়াছে? সকাল বেলা পাণ সাজিতে বসিলে হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়িত, আজ আর স্বতন্ত্র ডিবায় আলাদা করিয়া পাণ সাজিবার কোন দরকার নাই। বৈকালে যখন জল-খাবারের ঘরে চা ও খাবার তৈয়ার করিতে যাইতাম, তখন

অকারণ অশ্রুভারে নয়ন ভরিয়া আসিত। মনে হইত, কার বুঝি কত কমিয়া গিয়াছে, তিনি আর আসিবেন না, তাঁহার জন্য আর চা প্রস্তুত করিয়া—জলখাবার সাজাইয়া লইয়া যাইতে হইবে না। সন্ধ্যার সময় ওস্তাদ আসিলে যন্ত্রচালিতের মত গান শিখিতে বসিতাম, গান করিতে করিতে হঠাৎ কোন সময়ে ছিন্নতার বীণার মত আমার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিত। তখন মনে হইত, বসিবার ঘর শূন্য—আমার গান শুনিবার জন্য আর কেহ ও-ঘরে উন্মুখ হইয়া বসিয়া নাই।

আমার জীবনের সকল সময় তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার ধ্যানেই কাটিতেছিল, মনের এ গতির প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টাই আর আমার মনে আসিত না। আমি বুঝিয়াছিলাম, মানুষের কোন কর্তৃত্ব নাই। সে শুধু প্রবল নিয়তির হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। আমি আরও বুঝিয়াছিলাম, সংসারে স্নেহ, ভালবাসা বা প্রেমের মূল্য কতটুকু, এখানে কেহ কাহারও দুঃখ বেদনা কিছুই বুঝে না বা বুঝিতে পারে না। প্রকৃতি তাহার নিজের খেয়ালে—নিজের গতিতে চলিয়াছে। এই নিয়তির বশে চলাই যদি সংসারের নিয়ম হয়—নিজের স্বাধীন চিন্তা বা কাযের যদি কোন মূল্য না থাকে, তবে অনর্থক তাহার বিরুদ্ধে শক্তিক্ষয় করিয়া কষ্ট পাইবার দরকার কি? বরং ঐ অদৃশ্য শক্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া চলাই ভাল।

তাই আমি আর আমার মন সংযত রাখিবার কোন চেষ্টাই করিতাম না। আমি কষ্ট পাই আর না পাই—তাহাতে ক্ষতি কি? যাহা হইবার—তাহা হইবেই! আমি জানিতাম, আমার মন অনুক্ষণ যাঁহার জন্য কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তিনি দিন দিন আরও দূরেই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাতে অদূরবর্ত্তী উৎসবের কোন অন্তরায় ঘটিবে না। আলোয় ও হাসিতে—ফুলের সাজে আর গানে গানে সে দিন মিলনের মহোৎসব পূর্ণ হইয়া উঠিবে, বাঁশীতে বাঁশীতে সাহানার তান আরও মধুময় হইয়া মধুর সুরে বাজিতে থাকিবে এবং যে বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিবে, সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিয়া তাহার মহিমা গানে মুখর হইয়া আমার সখীরা উৎফুল্ল কণ্ঠে গান ধরিবে—"দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়ে বসো হে হৃদয়নাথ!"

* * * *

অমিয়া-দি আট দিন পরে বালিগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া ও সব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে এই কয় দিনে যে সব নূতন নূতন গল্প সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিল, সে সব কিছুই আর বলা হইল না। সে চারি দিন সেও শুধু শুধু আমাদের কাছে কাছে ঘুরিত, কিন্তু আগেকার মত কথা গল্প কিছুই জমিত না। সে আমায় এক দিন বলিল, "অজিত বাবু যে এমন একটা কাণ্ড করবেন, তা ভাই আমি কি ক'রে জান্‌বো? ঠাট্টা ক'রে কি একটা কথার কথা বল্লুম—তাতেই কি একেবারে এমনি করতে হয়? আমি কি লজ্জায় পড়লুম—দেখ দেখি?"

যে সর্ব্বক্ষণ হাসি-গানে চঞ্চল ও মুখর হইয়া থাকিত, তাহার এই রকম কুণ্ঠিত ও বিষণ্ণ রূপ দেখিয়া আমার বড় আঘাত লাগিল। আমি বলিলাম, "তার জন্য তোমার লজ্জা পাবার কি আছে, ভাই? এক দিন ত সব তিনি জানতেনই—না হয় দুদিন আগে জেনেছেন, এই বৈ ত নয়? তা ছাড়া, তিনি যে এমন করবেন, তাই বা তুমি জানবে কি ক'রে?"

অমিয়া-দি গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে কথা ত তুই বলছিস—কিন্তু মনীষা-দি আমার উপর কি রকম রাগ ক'রে আছে দেখছিস ত? আমি যত বারই কাছে যাই, সে আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই বলে না! আমি কি ইচ্ছে ক'রে তাঁকে এ কথা বলেছিলুম? আমারও ত তাঁর জন্যে কত কষ্ট হচ্ছে, ভাই!"

আমি বলিলাম, "দিদি তোমার উপর রাগ করবে কেন? তুমি ভুল বুঝছো অমিয়া-দি! ও ত তাঁর যাবার পর থেকেই চুপ-চাপ ক'রে থাকে; তুমি কিছু অন্যায় করেছ, এ কথা সে কোন দিনই ত মনে করে নি।"

অমিয়া-দি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে তাই হয় ত হবে! আমার মনটাও অজিত বাবুর জন্য বড় খারাপ হয়ে গেছে, উষা! কিছু যেন ভাল লাগে না। তবে নিজেই তোদের মত চুপ ক'রে থাকা স্বভাব নয়, তাই পারি না—এ-দিক্ ও-দিক্ ক'রে বেড়াই, মনটায় যেন শান্তি পাই না।"

অমিয়া-দি আমাদের কাছে বাক্যালাপের কোন সুবিধা না পাইয়া প্রায়ই নরেশ-দার কাছে হাজির হইত। সে বেচারার সত্যই বড় মুস্কিল হইয়াছিল। প্রাণ খুলিয়া হাসিতে বা কথা বলিতে না পাইয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। নরেশ-দা যদিও বেশীর ভাগ সময় লাইব্রেরীতেই কাটাইতেন, তবু অমিয়া-দি গিয়া পড়িলে তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাকে খুশী করিতে কোন দিনই তাঁহার ভুল হইত না।

দিদির কি হইয়াছিল, কে জানে! সে যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা কোথায় মুহূর্ত্তে হইয়া গিয়াছিল। প্রায় সর্ব্বদাই সে নিজের ঘরে বসিয়া কি যে ভাবিত, তাহা সে-ই জানে। আমি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে বলিত, "মোহিতের খবর না পেয়ে বড় ভাবনা হচ্ছে।" এদিকে কিছু দিন ধরিয়া মোহিত-দার চিঠিপত্রের সংখ্যা বিরল হইয়া আসিতেছিল। শেষ তিন মাস আর তাঁহার কোন খবর আমরা পাই নাই। কিন্তু সেই চিন্তাতেই দিদির এমন মর্ম্মান্তিক পরিবর্ত্তন হইতেছিল, এটাও যেন কেমন মনে লাগিত না। নরেশ-দা তাহার জন্য দিন দিন চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি কত দিন কত রকমে তাহার এ ভাবের কারণ জানিতে চাহিতেন; কিন্তু দিদি ঐ কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলিত না।

এই রকম ভাবে আরও দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর এক দিন একটা অতর্কিত সংবাদ আসিয়া আবার আমার জীবনের নির্দ্ধারিত ধারা ওলট-পালট করিয়া দিল।

সে দিন আহারের পর আমরা সকলে বসিবার ঘরে এক-সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। দিদি একটা সেলাই লইয়া একমনে কায করিয়া যাইতেছিল। আমি একখানা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতেছিলাম, আর অমিয়া-দি নরেশ-দার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। বৈকালের দিকে বেহারা সে দিনের ডাক আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া গেল। নরেশ-দা চিঠি-গুলি একবার নাড়িয়া দেখিয়াই একটা বড় খাম তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বাঃ, এ যে মোহিতের চিঠি! বহুকাল পরে!" তিনি মহা সেই চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দিদি মোহিত-দার নাম শুনিয়াই সেলাই হইতে মাথা তুলিয়াছিল; সে উৎসুক দৃষ্টিতে নরেশ-দার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! আমি ছাদের দিকে দৃষ্টি নামাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

চিঠিতে বোধ হয় বেশী কথা ছিল না; নরেশ-দা দুই মিনিটের মধ্যেই সেটা পড়িয়া টেবলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, বলিলেন, "খবর না ভেবেছিলুম, ঠিক তাই।"

তাঁহার কঠোর স্বর শুনিয়া আমি চমকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চোখ-মুখ বিষম রাগে ও উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি কখনও নরেশ-দাকে রাগ করিতে দেখি নাই। আমায় অবাক্ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "দেখছো কি? চিঠিখানা তোমাদের দুজনেরই প'ড়ে দেখা উচিত।"

তিনি দিদির ও আমার মধ্যে চিঠিটা ফেলিয়া দিলেন। অমিয়া-দি আগেই পড়িয়া দেখিয়াছিল। সে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মোহিত-দা সামান্য দুই চারি কথায় জানাইয়াছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহার মনের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, বিশেষ না বুঝিয়া হঠাৎ আমাদের মধ্যে যে 'এন্‌গেজমেণ্ট' করিয়া ফেলা হয়, সেটা ঠিক উচিত হয় নাই। তাঁহার দিক্ হইতে তিনি যখন এ কথা বুঝিয়াছেন, তখন আর এ অসত্যের জের টানিয়া চলা অন্যায়, তাই তিনি এখন আমাদের এ কথা জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া যেন সকলে তাঁহাকে ক্ষমা করেন। মাসখানেক পূর্ব্বে মিস ক্লারা জনষ্টনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে!

দিদি কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল! অনেকক্ষণ পরে শেষে সে শূন্যদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মোহিত? মোহিত শেষ এই করলে?"

নরেশ-দা খুব উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিলেন; তিনি নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "করেছে—ভালই! মিথ্যার স্বরূপ প্রত্যক্ষ ক'রে সে যে এটা ভাঙ্গতে পেরেছে, তার জন্য তার সৎসাহস ও ভদ্রতার প্রশংসা করছি! তবে কিছুদিন আগে কথাটা জানালেই আরও ভাল হ'ত!"

আমার মাথার ভিতরে রক্ত যেন সন্ধুক্ষিত বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। এ কি দারুণ অদৃষ্টের খেলা! কোন দিকে আমার শান্তি নাই? কোনখানে আমার আশ্রয় নাই? অপমানে ও লজ্জায় আমি যেন আর মাথা তুলিতে পারিলাম না! কিছুক্ষণ পরে সেখান হইতে উঠিয়া ছাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমাদের সম্মুখের তিন-তলা বাড়ীটার আড়ালে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার শেষ আলোর আভায় পশ্চিম-আকাশ তখনও ঘোর লাল। আমি সেই লাল আলোর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে কে ধীরে ডাকিল, "উষা!" ফিরিয়া দেখিলাম, অমিয়া-দি! তাহার দুই নয়নে মুক্তা-বিন্দু! দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল, "আজ যদি ভাই, অজিত বাবু থাকতেন!" [ক্রমশঃ।

শ্রীনতী সরোজকুমারী দেবী।

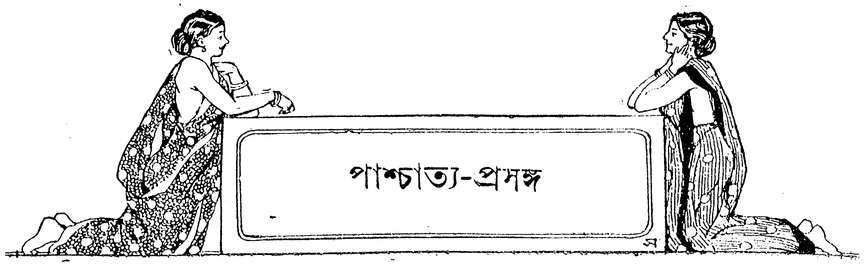

২

শনির দৃষ্টি

মেরায়াসের পত্র

যখন জ্ঞান হইল, তখন ডাক্তার বুগরাট দেখিলেন, তিনি পথের পার্শ্বে নর্দ্দমার মধ্যে পড়িয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, পরিধেয় বসন ছিন্ন-ভিন্ন, শরীরের স্থানে স্থানে রক্তের ধারা জমিয়া রহিয়াছে, পকেট-বুক, ঘড়ী, চেইন, অঙ্গুরীয় ও টাকাকড়ি মায় অঙ্গাবরণ লুণ্ঠিত হইয়াছে!

তখনও রজনীর অন্ধকার একবারে অপসারিত হয় নাই, অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ বস্তীর গলির মধ্যে মিট মিট করিয়া কেরোসিনের আলোক, আলোক অপেক্ষা ধূমই চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। ভোরের মিষ্ট শীতল বাতাস তাঁহার ললাট স্পর্শ করিবার পর তিনি যেন কতকটা সুস্থ বোধ করিলেন, কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন,—পূর্ব্বাকাশে রাঙ্গা উষার ক্ষীণ রশ্মি ক্রমে অন্ধকার দূর করিতেছে।

ক্ষণপরে ডাক্তার দাঁড়াইয়া উঠিয়া কোনওরূপে গৃহাভিমুখে যাইবার অভিপ্রায়ে পথাতিক্রম করিতে লাগিলেন—মাত্র দুই চারি পদ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, তিনি একবারে সমুদ্রতটের পার্শ্বস্থ রাজপথে উপনীত হইয়াছেন। সেখান হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, তাঁহার পত্নী দুর্ভাবনায় পাগলের মত হইয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে বুঝাইলেন, ডাকে বাহির হইয়া অধিক রাত্রিতে পথে তিনি দস্যুহস্তে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত জিনিষ লুণ্ঠিত হইয়াছে। পতিব্রতা পত্নী তাহাই বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তাঁহার অটল বিশ্বাসও টলিয়া গেল—তিনি স্বামীর ওয়েষ্ট কোটের পকেটে এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন,—

"গাড়ল! আর কখনও অপরের প্রণয়িনীকে চুরি করিতে যাইও না।—মেরায়াস।"

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই ডাক্তারের পত্নীর জন্মতিথির উৎসব। আণ্ড্রিয়ার আকর্ষণে পাগল ডাক্তার পূর্ব্বদিন সে কথা ভুলিয়া গিয়া সকাল সকাল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর জন্মোৎসব উপলক্ষে যে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং সে জন্য আয়োজন করিতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান ছিল না।

স্বামীর এই অপরাধ পত্নী ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তাহার উপর এই বিষম পত্র! তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই দিনই তাঁহার জিনিষপত্র গুছাইয়া শিশু পুত্রকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

দেখুন একবার শনির যোগাযোগ! সেই সময়ে যদি তিনি স্বামীর নিকটে থাকিয়া স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন—সর্ব্বরূপে স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণীরূপে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন, সম্পদে যেমন—বিপদেও তেমনই তাঁহার সহায় হইয়া অবস্থান করিতেন,—তাহা হইলে হয় ত ডাক্তার বুগরাটের জীবনপ্রবাহ অন্য খাতে পরিচালিত হইতে পারিত। কিন্তু ঠিক যে সময়ে প্রেমময়ী পত্নীর সাহচর্য্য ও সহায়তার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সময়েই তিনি অভিমানভরে পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন! ঠিক এই ভাবেই ভ্রমর মায়ের কাছে চলিয়া গিয়া নিজের ও গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল। তবে ভ্রমর হিন্দুর পত্নী—বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করে নাই, বুগরাট-পত্নী সেটুকুও বাকী রাখিলেন না,—স্বামীর নামে বিবাহচ্ছেদের মোকর্দ্দমা রুজু দিলেন।

ডাক্তার আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া প্রথমটা যেন সকল অনুভূতির বাহিরে চলিয়া গেলেন, স্তম্ভিত ও হতভম্ব হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে অল্পদিনমাত্র। তাঁহার দৃষ্টগ্রহ শনি তাঁহাকে সে অবস্থায়ও অধিক দিন রাখিল না, মাত্র এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই সে তাঁহার কানে কানে ফুসফুস করিতে লাগিল,—"আর কেন, এখন তুমি স্বাধীন, যাও, এবার আণ্ড্রিয়ার সন্ধানে যাও।"

তাহাই হইল, ডাক্তার বুগরাট এইবার 'বে-পরোয়া' হইয়া প্রণয়িনীর সন্ধানে বাহির হইলেন। মর্ফাইন, এবসিন্থে প্রভৃতি অনিষ্টকারক মাদকদ্রব্য তাঁহার সহায় হইল। তাহা সকল রোগী দেখা ঘটিয়া উঠে না। এক জন 'সহকারী' নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন এবং বদমাইসের সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া পকেটে গুলী-ভরা পিস্তল পুরিয়া রাত্রিকালে বদমাইসের আড্ডা-সমূহে ও নোংরা বস্তীসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে সমুদ্র-তটের বস্তীর সেই বাড়ীটার খোঁজ করিয়া দেখিলেন, পাখী পলাইয়াছে, আণ্ড্রিয়া ও মেরায়াস সেই বাসা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় গা-ঢাকা দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার হতাশা প্রাপ্ত হইল না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি তাহাদের খোঁজ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার চিত্র অতি চমৎকার—দিনে তিনি ডাক্তার, রাত্রিকালে পাপাচারী মাতাল জুয়া-চোর বদমাস! দিনে তিনি যখন সুসভ্য মূল্যবান্ পোষাক পরিয়া গাড়ী চড়িয়া রোগী দেখিতে যাইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া কে বলিবে যে, তিনি রাত্রিকালে বদমাইসদিগের সহিত কাফে রেস্তোরাঁয় জুয়া খেলিয়া মারামারি করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঘরে ফিরেন!

আবার সাক্ষাৎ

এক দিন তিনি আবার তাঁহার চিত্তহারিণীর সাক্ষাৎ পাইলেন। সে সময়ে মেরায়াস ও তাহার প্রণয়িনী আণ্ড্রিয়া এক বদমাইসের আড্ডায় জুয়া খেলিতেছিল। ডাক্তার এই সময়ে নিরস্ত্র ছিলেন না, পকেটে তাঁহার গুলীভরা পিস্তল ছিল। তিনি সদম্ভে মেরায়াসের টেবলের সান্নিধ্যে অগ্রসর হইয়া এক ঝটিতি একটা টেবলের উপরে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ চুপ,—আমার হুকুম, সবাই চুপ কর।"

আশ্চর্য্য! কক্ষমধ্যে অমনই একবারে গভীর শান্তি মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিল, উদ্যত অস্ত্র অবনমিত হইল। আণ্ড্রিয়া তখন পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমার প্রণয়ী মেরায়াস ও আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এই ডাক্তারের মধ্যে ন্যায়-যুদ্ধ চলুক, আর সকলে কেবলমাত্র দর্শক ও বিচারক থাকুক। যে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, আমি তাহার হইব।"

মুহূর্ত্তে সেই জনসঙ্ঘ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আণ্ড্রিয়ার জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল, সকলে সমস্বরে বলিল, "তাহাই হউক, তাহাই হউক।"

তখন সমুদ্রতটে এক নির্জ্জন স্থানে যুদ্ধের অঙ্গন নির্দ্দিষ্ট করা হইল, যুযুৎসু "বীর"দ্বয়কে একই রকমের দুইখানা প্রকাণ্ড ছোরা দেওয়া হইল এবং ঐ স্থানের উভয় দিকের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া তথায় প্রহরী বসান হইল।

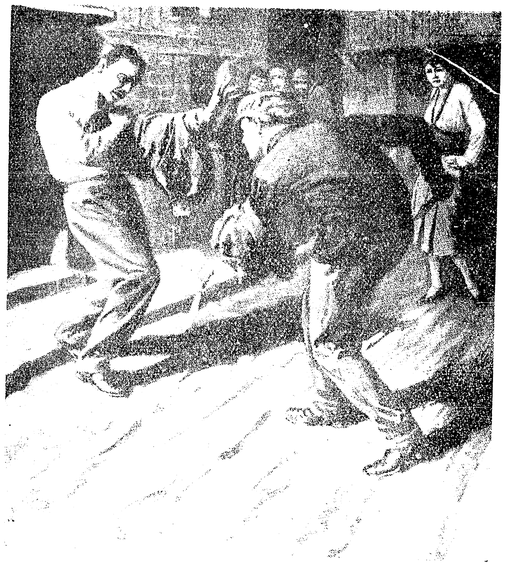

বুগরাট ও মেরায়াসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

তখন সেই গভীর রাত্রিতে বদমাইসের পল্লীতে ভদ্রবংশজ ডাক্তারে আর গুণ্ডা বদমাইস মেরায়াসে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—উভয়ে পরস্পরকে হিংস্র পশুর মত আক্রমণ করিল। উভয়েই বাম হস্তে নিজের নিজের জামা জড়াইয়া (ঢালের মত করিয়া) ছোরা লইয়া উভয়কে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। ডাক্তার বুগরাট পিস্তল যুদ্ধে পটু ছিলেন বটে, কিন্তু আবাল্য ছোরার লড়ায়ে অভ্যস্ত সর্ব্বদা প্রাণভয়ে যুদ্ধে অভ্যস্ত মেরায়ামের নিকটে ছোরা-যুদ্ধে তিনি প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন কেন? তাঁহার স্কন্ধে মেরায়াসের ছোরার সামান্য আঘাত লাগিবামাত্র তিনি কম্পিতকলেবরে ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

মেরায়াসও অমনই নিষ্ঠুর অট্টহাস্য করিয়া তাঁহার উপর বসিয়া তাঁহার বুকে আমূল ছোরা বসাইয়া দিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিল, চারিদিকে বদমাস গুণ্ডা নরনারী প্রেতের মত করতালি দিয়া হর্ষোল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল। বুগরাটের তখন শেষ মুহূর্ত্ত!

হঠাৎ বুগরাট প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"থাম, থাম, আমায় খুন কোরো না, তার চেয়ে টাকা দিচ্ছি, আণ্ড্রিয়াকে আমায় বিক্রী কর।"

মেরায়াস থমকিয়া দাঁড়াইল—এ্যাঁ, টাকা? নরহত্যায় লাভ কি? তাহাতে ত রাজদণ্ড আছে। না, না, টাকা—বড়, না উপভুক্তা আণ্ড্রিয়া ভাল?

মেরায়াস বলিল, "কত টাকা দিতে পার?"

ডাক্তার।—২ হাজার ফ্রাঙ্ক।

আণ্ড্রিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কঞ্জুস! আমার দাম মাত্র ২ হাজার ফ্রাঙ্ক? মেরায়াস, ওকে খুন ক'রে ফেল।"

কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ জনতা আর ডাক্তারকে হত্যা করিতে দিল না। তাহারা জানিত, বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিয়দংশ তাহাদের জন্য

সরাপ সরবরাহে ব্যয়িত হইবে, কামেই ব্যবস্থা হইল, ভোটে যে পরিমাণ টাকার কথা উঠিবে, ডাক্তারকে তাহাই দিয়া আণ্ড্রিয়াকে ক্রয় করিতে হইবে।

তাহাই হইল, ভোটে ৪ হাজার ফ্র্যাঙ্কের কথা ধার্য্য হইল। মেরায়াসকে সর্ত্ত লিখিয়া দিতে হইল যে, "এই নগদ টাকার বিনিময়ে সে আণ্ড্রিয়ার উপর সমস্ত স্বত্বাধিকার ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু ডাক্তারকেও এ জন্য এখনই উপস্থিত সকলকে কফি ও রম খাওয়াইতে হইবে এবং মাসে মাসে মেরায়াসকে ৩ শত ফ্র্যাঙ্ক দিতে হইবে। যদি কোন মাসে কিস্তি খেলাপ হয়, তাহা হইলে আণ্ড্রিয়াকে পুনরায় মেরায়াসের দখল করিবার অধিকার থাকিবে।"



আণ্ড্রিয়ার প্রণয়ী মেরায়াস

মেরায়াসের স্বাক্ষরিত এই পত্রখানি ডাক্তার বুগরাটের বিচারকালে দাখিল করা হইয়াছিল।

অতঃপর ডাক্তারের আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আণ্ড্রিয়াকে লইয়া মেরায়াস ও বুগরাট, ডাক্তারের রুগ্ন সেনাকের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, মেরায়াস ৪ হাজার ফ্র্যাঙ্ক নোট গ্রহণ করিয়া আপনার বাড়ী চলিয়া গেল, ডাক্তারের গৃহে আণ্ড্রিয়ার অধিষ্ঠান হইল। সে সময়ে হতভাগ্য ডাক্তার মনে করিল, সে যেন স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছে!

পাপের জীবন

পাপের পথ বড় সুন্দর, বড় মসৃণ,—একবার তাহাতে পাদবিক্ষেপ করিলে কেমন বাধালেশহীনভাবে সে পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায়! দুষ্টগ্রহ শনি ডাক্তার বুগরাটকে দ্রুত সেই পথের চরম প্রান্তে লইয়া চলিল। ইহার চরম প্রান্ত বা পরিণাম যে গিলোটিন, তাহাতে সন্দেহ কি?

আণ্ড্রিয়া যে শ্রেণীর রমণী, সেই শ্রেণীর সঙ্গ ও সাহচর্য্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত চরিত্রবান্ গৃহস্থকে জীবনে কি সুখ, কি আনন্দ প্রদান করিতে পারে? উদ্দাম পশুবৃত্তি চরিতার্থ ব্যতিরেকে ইহাতে কি সঙ্গসুখ আছে? সমপর্য্যায়ের প্রণয়ি-প্রণয়িনীর মধ্যে যে সঙ্গসুখের সম্ভাবনা—যে মনের প্রকৃত মিলনের সম্ভাবনা, ইহাতে তাহার অবসর কোথায়? ফরাসী বিপ্লবকালে বাষ্টিল দুর্গে বহু অভিজাতবংশীয় নরনারী কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ আসিত, তখন তাঁহারা হতভম্ব হইয়া অবস্থায় শকটযোগে বধ্যভূমিতে নীত হইতেন। মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের নিদর্শন দেখাইতে হাসিয়া, গাহিয়া, নাচিয়া, চুম্বন করিয়া রাজপথ অতিবাহিত করিতেন। ডাক্তার বুগরাটও তেমনই মনে মনে জানিতেন, তাঁহার দ্রুত অবনতির পরিণাম কি, তথাপি ভাগ্যকে সে উপহাস করিয়া আণ্ড্রিয়াকে আঁকড়িয়া ধরিয়া নাচিয়া গাহিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শীঘ্রই আণ্ড্রিয়ার প্রতি তাঁহার রূপোন্মাদ বিতৃষ্ণায় পরিণত হইল। এদিকে আণ্ড্রিয়ারও একমাত্র চিন্তা,—টাকা, টাকা, টাকা! ডাক্তার যতই টাকা যোগান দেন, ততই যেন তাহার অর্থের তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়—সে সেই টাকা নীচজনের মত বেশ-প্রসাধনে, পান-ভোজনে এবং পুরস্কার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্ফূর্ত্তি করিতে উড়াইয়া দিত। ডাক্তারের মত কৃতবিদ্য লোক সহবাসেও তাহার এক দিনের জন্য ভদ্র শিক্ষিত মহিলা সাজিবার বাসনা মনে জাগিত না—তাহার সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, সে ছিল নর্দ্দমার পোকা, সুতরাং সেই নর্দ্দমা ভিন্ন তাহার আর কিছু ভাল লাগিত না, তাই সে ডাক্তারকেও সেই নর্দ্দমায় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তারও মনের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত—ভুলিয়া থাকিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত নেশাভাঙ্গ করিতে লাগিলেন। ফলে শীঘ্রই দারিদ্র্য-রাক্ষস দ্বারে উপস্থিত হইল; রোগীরাও একে একে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, বন্ধু দেখিলে পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল। অর্থের অনাটনের জন্য—প্রিয়তমার তুষ্টিসাধনের জন্য—তাহার ক্রমশঃ বর্দ্ধমান কামনানলে আহুতি যোগাইবার জন্য ডাক্তার অবশেষে গুরু পাপের পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রথম পাপ

অডেটি লেপোক্যাল একটি সুন্দরী যুবতী গ্রীকনারী। সাঁ মার্শেলের সহরতলীর লা সিওটাট নামক পল্লীতে এক নিভৃত ভিলা বা বাগানবাটীতে বাস করিত। সে চিকিৎসিত হইবার নিমিত্ত সপ্তাহে এক দিন ডাক্তারের নিকট আসিত এবং একটি সিরাম ইনজেক্ট করাইয়া লইয়া যাইত।

এক দিন ডাক্তার নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ং তাহার ভিলাবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, তিনি আর একটি রোগী দেখিতে ঐ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, তাই ঐ সঙ্গে তাহাকে দেখিয়া যাইবেন, কষ্ট করিয়া তাহাকে আর মার্শেলে সহরে যাইতে হইবে না। অডেটির মনে কোনওরূপ সন্দেহের উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না, বরং সে সম্ভ্রান্ত ডাক্তারকে নিজে আসিয়া দেখিয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত মনে করিল। সুতরাং সেই দিন ডাক্তার তাহাকে ইনজেক্‌শন দিলেন। কিন্তু এ দিন ঔষধ দিবামাত্র অডেটি বিষম যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল এবং মূর্চ্ছিত পরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে সে দেখিল, সে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহ একটা খাটের সহিত বদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং এক



অডেটি লেপোক্যাল

বোরখা-পরা লোক তাহার নাসিকার নিকটে একটা শিশি ধরিয়াছে, আর কয়েক জন বদমাস একটা টেবলের উপর বসিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, সেইরূপ তাহার শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে নাড়িবার বা চীৎকার করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। মুখোস-পরা লোকটাকে সে কিন্তু ডাক্তার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই লোকটা তাহার হাতের নাড়ী টিপিয়া দেখিতেছিল এবং অন্যমনস্কভাবে ঐ সময়ে তাহার পকেট হইতে দড়া বাহির করিয়াছিল। ইহাতেই সে তাহাকে ডাক্তার বলিয়া চিনিতে পারে; কেন না, অভ্যাসমত যে ডাক্তার ইনজেক্‌শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডাক্তার বুগরাট কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কর্কশ করিয়া বলিলেন, "তোমার টাকাকড়ির, সিন্দুকের ও চাবীর সন্ধান বলিয়া দাও, নতুবা এই অবস্থায় তোমাকে কয়েদ করিয়া রাখা হইবে।" ইহার পর আবার জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে।

পাপের পর পাপ

কি ঘটিয়াছিল, তাহা পরে সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই রাত্রিকালে টুলু সহর হইতে একখানি মোটরগাড়ী তাহার বন্ধুর আসিতেছিল। পথে এক স্থানে কতকগুলা মুখোস-পরা লোক গাড়ীখানাকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের একটি গুলীও চালকের অঙ্গ স্পর্শ করিল না। চালক সোফার হাওয়ার মত গাড়ীখানাকে উড়াইয়া লইয়া গেল। সোফারটা খুব শক্তিশালী ছিল, তাই সে ও তাহার আরোহিবর্গ কোনরূপে সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

ইহার পর দুইটি রোগী—দুই জনই নারী—পুলিসে খবর দিল যে ডাক্তার বুগরাট তাহাদিগের শরীরে ফুটাইয়া ঔষধ দিবামাত্র তাহারা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুই ক্ষেত্রেই ডাক্তার তাহাদের বাড়ী গিয়া ইনজেক্‌শান দিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন, অথচ এ যাবৎ রোগীকে তাঁহার ডাক্তারখানায় গিয়া ইনজেক্‌শান লইয়া আসিতে হইত। চৈতন্য হইবার পর তাহারা দেখে, ডাক্তার তাহাদের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাহাদিগকে অতঃপর উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইয়া চলিয়া যান। তাহারা পরে দেখিয়াছিল, তাহাদের উভয়েরই টাকাকড়ি ও অলঙ্কার-পত্র চুরি গিয়াছে।

জ্যাক্‌স্ রুমিব, ডাক্তার বুগরাটের বন্ধু, এক সময়ে দুই জনে একই দলে সৈন্য হইয়া জার্ম্মাণ যুদ্ধে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে রুমিব এক মস্ত কারখানায় বেতন-নবিশের (pay clerk) কাজ করিতেন। তিনি প্রত্যেক শনিবার ব্যাঙ্ক হইতে এ জন্য ২০ হাজার (বিশ হাজার) ফ্রাঙ্ক মুদ্রা কারখানায় বিতরণার্থ লইয়া যাইতেন। আবার ঐ শনিবার প্রাতঃকালেই তিনি প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার বন্ধুর গৃহে ইনজেকশান লইতে যাইতেন।



জ্যাক্‌স্ রুমিব

এক দিন সকালে একটা ইনজেকশান দিবার পর ডাক্তার বলিলেন, "আর একটা আজই দেওয়া প্রয়োজন, অতএব তুমি যেন ব্যাঙ্ক হইতে কারখানায় ফিরিবার পথে বেলা ২টার সময় আবার ইনজেকশান লইয়া যাইও। তবে তুমি আমার লেবরেটারীর দ্বার দিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিও, আমি ঐ দিকেই থাকিব।" সরল রুমিব এই চাতুরীর বা চক্রান্তের কিছুই বুঝিল না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ করিল,

কিন্তু দৈবক্রমে সে দিন তাহার নিকট ৯ হাজার ফ্র্যাঙ্ক ছিল। ইহার পর রুমিবকে কেহ আর জীবিত অবস্থায় দেখে নাই।

ঐ দিন রাত্রিকালে ডাক্তার দুই হাতে মুঠা মুঠা টাকা খরচ করিতে লাগিলেন এবং বদমাস গুণ্ডা বন্ধুদের মদ খাওয়াইতে লাগিলেন। ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সেই রাত্রিতে তিনি আণ্ডিয়াকে তাড়া তাড়া নোট দিয়াছিলেন, তাহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এ দিকে দস্যু মেরায়াস নিভৃত পল্লীর নির্জ্জন কক্ষে কুমারী অডেটিকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়া প্রহরা দিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। অডেটি নিরুদ্দেশ হইবার পর সামান্য একটু হৈ-চৈ পড়িয়াছিল; কিন্তু রুমিব নিরুদ্দেশ হইবার পর পুলিসের সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল, সাধারণ লোকও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অডেটি বিবাহিতা ছিল না, তাহার আত্মীয়স্বজনও সেখানে কেহ ছিল না, সুতরাং তাহার পক্ষ লইয়া গোলযোগ করিবার কেহ ছিল না; কিন্তু রুমিব বিবাহিত, তাহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা ছিল, তাহারা চারিদিক্ তোলপাড় করিয়া তুলিল। আশ্চর্য্য এই, রুমিবের স্ত্রী যখন স্বামীর বন্ধু ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে গেল, তখন ডাক্তার ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কি? আর যদিই তোমার স্বামী নিহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমায় দিয়া শব-ব্যবচ্ছেদ করাইও, আমি একটি পয়সাও পারিশ্রমিক লইব না!" লোক অধঃপতনের চরম স্তরে অবতরণ করিলে কিরূপ হৃদয়হীন হয়, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

নীচের সহবাসে এবং অর্থতৃষ্ণায় ডাক্তার কিরূপ পিশাচে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ঘরে বসিয়া রুমিবের শোকার্ত্তা পত্নীকে এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, সেই কক্ষেই রুমিবের মৃতদেহ লুক্কায়িত ছিল।

কিন্তু গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ আর লুকাইয়া রাখা চলে না। ইহার পর এক দিন না এক দিন ধরা পড়িতেই হইবে। ডাক্তার তখন সত্বর মার্শেল হইতে পলায়নের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পলায়নের জন্য ত অর্থ চাই। কাযেই ডাক্তার অর্থ সংগ্রহের জন্য নূতন শিকার খুঁজিতে লাগিলেন।

রুমিবকে হত্যা করিবার ২ দিন পরে ডাক্তার বুগরাট, এবিয়েটি নামক মণিকারের দোকানে গিয়া বলিলেন, তাঁহার মনোনীতা পাত্রীর জন্য একটি হীরকাঙ্গুরীয় চাই। মণিকার তাঁহাকে আর এক দিন আসিতে বলিলেন; কেন না, সে দিন ভাল আঙটী ছিল না। দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার ৩৯ হাজার ফ্রাঙ্ক মূল্যের একটি অঙ্গুরীয় দেখিয়া পছন্দ করাইয়া আনি বলিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। অবশ্য এ জন্য একখানি চেক দিয়া গেলেন, তবে বলিয়া গেলেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, তাঁহার ভাবী পত্নীর ঐ অঙ্গুরীয় পছন্দ হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত তিনি ব্যাঙ্কের চেক ভাঙ্গাইতে পারিবেন না। ডাক্তার পরদিন আসিয়া অঙ্গুরীয়টি পছন্দ হয় নাই বলিয়া ফেরত দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ৪৯ হাজার ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের অপর একটি অঙ্গুরীয় লইয়া গেলেন। ইহারও জন্য সেই চেকখানি রাখিয়া গেলেন। যাত্রাকালে বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা, আমি রাসিয়ান পল্লীর ডাক্তার। এক রাসিয়ান কাউণ্টেস তাঁহার অলঙ্কারপত্র বিক্রয় করিতে চাহেন। অলঙ্কার বহুমূল্য—বোধ হয়, দাম হইবে অন্যূন দুই লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক। তবে তাঁহার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, একটু চাপ দিলেই বোধ হয় ৫০ হাজারে তিনি ছাড়িয়া দিতে পথ পাইবেন না; যদি আপনার ঐ অলঙ্কার ক্রয় করিবার ইচ্ছা হয়, তবে আজ সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে যাইবেন, কাউণ্টেস ঐখানেই থাকিবেন। যদি টাকাটা সঙ্গে আনেন, তবে চাই কি হাতে হাতে কাযটা হইয়া যাইবে।"

মণিকার বলিলেন, তাঁহার হাতে এখন নগদ ৩০ হাজার ফ্র্যাঙ্কের উপর টাকা নাই। ডাক্তার উৎসাহভরে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া জবাব দিলেন, "আঃ, তার জন্যে ভাবনা কি,—বাকী টাকা আমিই কর্জ্জ দিব। কেমন? আর এক কাযও করা যাইতে পারে। আপনি দুই চারি ছড়া মুক্তাহার ঐ সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আমার ভাবী স্ত্রীর যদি পছন্দ হয়, তাহা হইলে এক ছড়া হার আমি লইব, তাহার টাকাও আমি নগদ চুকাইয়া দিব, আপনি উহা হইতে ৫০ হাজারের বাকী পূরাইয়া দিবেন।"

মণিকার ভাবিলেন, হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন—এমন দাঁও, এত বড় সম্ভ্রান্ত খরিদদার! কিন্তু তাঁহার পত্নী অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা—তিনি বলিলেন, "বেশ ত, যাওই যদি, তা হ'লে তোমার সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

সে দিন কাযেই বুগরাটের সুবিধা হইল না; কেন না, সঙ্গে লোক সাক্ষী থাকিলে পরে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তিনি মণিকারকে ঘরে বসাইয়া কাউণ্টেসকে ডাকিবার ছলে বাহিরে আসিয়া যেমন দেখিলেন যে, সহকারী তাঁহার ডিসপেনসারীর অপর দিকে একখানা গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পাহারা দিতেছে, অমনই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আজ কাউণ্টেস হঠাৎ এক কাযে গিয়াছেন, দেখা হইবে না, তবে বলেন ত আর একটা দিন ঠিক করিতে পারি।"

পরদিন মণিকার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ডাক্তার যে অঙ্গুরীয় পছন্দ করিতে লইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার এক সহকর্ম্মী মণিকারকে বিক্রয় করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ডাক্তারের প্রদত্ত চেক ভাঙ্গাইতে গিয়া ব্যাঙ্কে জানিতে পারিলেন যে, ডাক্তারের হিসাবে টাকা উহার পূর্ব্বে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। তখনই তিনি ঐ সহকর্ম্মীকে লইয়া ডাক্তারের রু সেনাকের ভবনে উপস্থিত হইয়া অঙ্গুরীয় অথবা উহার মূল্য দাবী করিলেন। পুলিসের হাতে যাইবার ভয়ে ডাক্তার প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন যে, পরদিন সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিবেন।

এ দিকে ডাক্তারের হাতে তখন এক কপর্দ্দকও নাই, অঙ্গুরীয় বিক্রয়ের টাকার কিছু নষ্টামিতে এবং বাকী আণ্ডিয়ার খেয়াল মিটাইতে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কাযেই চক্ষুতে অন্ধকার দেখিয়া ডাক্তার কিছু টাকা যোগাড় করিয়া মার্শেল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই দিন মুসিয়ে বুঁলে নামক এক বন্ধু তাঁহাকে অন্যান্য অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত এক হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র ২ দিন পূর্ব্বে এক মাতুলের নিকট ১৫ হাজার ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার তাঁহার পানপাত্রে বিষ মিশাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। ভাগ্যক্রমে পাত্রে বিষ দানকালে মুসিয়ে বুঁলে ডাক্তারের ঐ কুকার্য্য দেখিতে পান। তখন তিনি কৌশলে হাতের ধাক্কায় পানপাত্র উল্টাইয়া দিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

ডাক্তারের জেল

কিন্তু এইবার ডাক্তার বুগরাটের পাপের ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। তিনি কুড়াইয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পরদিন প্রত্যূষে গোপনে প্যারিস যাত্রা করিবার উদ্দেশে যে মুহূর্ত্তে রেলে চাপিয়া বসিলেন, সেই মুহূর্ত্তে পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইলেন। তখন কিন্তু তাঁহার নামে অভিযোগ—মাত্র ব্যাঙ্কে মিথ্যা চেক দাখিল করা!

কিন্তু "কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল।" রু সেনাকের বাড়ীতে যখন খানাতল্লাস হইতেছিল, তখন এক গোয়েন্দা পুলিস ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের টেবলের উপর একখানা কেতাব লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিল, সেখানা এডগার অ্যালেন পোর গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ। ঐ গ্রন্থের এক স্থানে দুইখানা পাতার কানি মোড়া ছিল, সেই খানে "কৃষ্ণকায় বিড়ালের" গল্প টা ছিল। গোয়েন্দা সেই পাতাটা পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, ডাক্তার ঐ স্থানে দর্শনী করিতেছেন, কিরূপে দেহটা দুইটি দেওয়ালের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলা হইয়াছে!

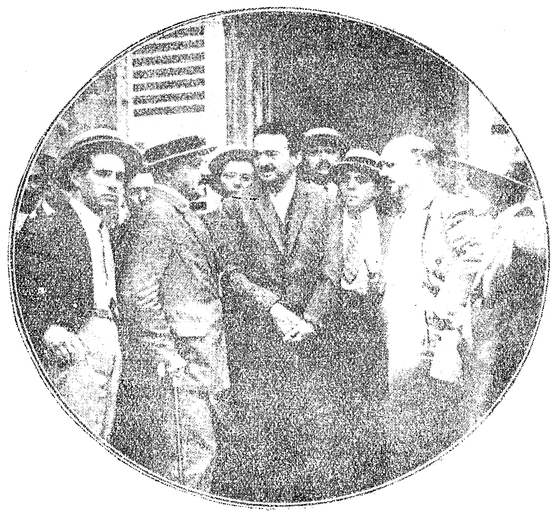

পুলিসের বড়কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাক্তার, এই কুলুঙ্গীতে কি লুকাইয়া রাখিয়াছ?

হঠাৎ গোয়েন্দার মাথা খুলিয়া গেল। তখন ডাক্তারের চাকর-বাকরকে প্রশ্ন করা হইতে লাগিল। ডাক্তারের রাঁধুনী বলিল যে, গা-আলমারীতে ঔষধাদি রাখা হয়, উহার মাথার উপর একটা ফাঁকা কুলুঙ্গীর মত আছে। তবে উহা এখন দেওয়ালের সঙ্গে কাগজ মারিয়া একলপ্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুলিস তখনই শৃঙ্খলিত ডাক্তার বুগরাটকে জেল হইতে তথায় আনয়ন করিল। তাঁহার চুল রুক্ষ, মুখ পাংশুবর্ণ।

পুলিসের বড় কর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার, এই কুলুঙ্গীতে কি লুকাইয়া রাখিয়াছ?"

ডাক্তার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "না, না, কিছুই লুকাই নাই, তোমরা এখানে কি দেখিতেছ?" তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

কিছু দিন হইতেই পুলিসের সন্দেহ হইয়াছিল—পুলিস ডাক্তারের উপর খর দৃষ্টি রাখিয়াছিল। পুলিসের কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কি তোমার বন্ধু রুমিবের মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিয়াছ?"

ডাক্তার বুগরাট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পুলিস দেওয়ালের কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিল। যখন কুলুঙ্গীর আঁটা দেওয়ালটুকুর এক একখানি করিয়া ইট খসান হইতে লাগিল, তখন বুগরাটেরও যেন এক একখানি করিয়া বক্ষের পঞ্জর খসিয়া পড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরেই সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িল—কুলুঙ্গীর মধ্য হইতে হতভাগ্য রুমিবের শবদেহ বাহির হইল।

ডাক্তার তখনও মিথ্যা বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিলেন। তিনি পুলিসের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—"আমার বন্ধু ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া আফিসে ফিরিবার সময়ে এক দল দস্যু তাঁহার নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। তিনি তখন ভয়ে দিশাহারা হইয়া তাঁহার বাড়ী আসিয়া ঐ টাকা ধার দিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করেন। তাঁহার হস্তে তখন নগদ টাকা ছিল না। তিনি সেই হেতু অন্যত্র বন্ধুর জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে গেলেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, বন্ধু বিষ পান করিয়া অচৈতন্য হইয়াছেন, পার্শ্বে বিষের শিশি পড়িয়া আছে। তিনি নানা ঔষধ দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তখন তিনি বিষম ভীত হইয়া ঐ কুলুঙ্গীতে শবটা লুকাইয়া দেওয়াল গাঁথিয়া ফেলিলেন।"

পুলিস যখন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি অত ভারী দেহ লইয়া এত উচ্চ স্থানে একাকী কাহারও সাহায্য না লইয়া—উঠিলে কিরূপে?" তখন ডাক্তার অম্লান বদনে বলিলেন, "শিকারীরা যেমন শিকার কাঁধে ফেলিয়া পথ চলে, আমি তেমনই করিয়া শব স্কন্ধে লইয়া কাষ্ঠ-সোপান বাহিয়া উঠিয়াছিলাম!"

শেষ অঙ্ক

তখন সহরময় ডাক্তার বুগরাটের গ্রেপ্তারের কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকে পুলিসের লোক ছুটাছুটি করিতেছে। সকলেরই মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন,—এঁ্যা, ডাক্তার বুগরাট খুনে ডাকাত? পৃথিবীতে তবে কি অসম্ভব?

পুলিস বাড়ী ঘেরাও করিয়া যুবতী আণ্ডিয়াকে গ্রেপ্তার করিল। তাহার পর সমস্ত ঘরে ডাক্তারের কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ডাক্তারের ল্যাবরেটারী-কক্ষে এই ভাবে অন্বেষণ চলিতেছে, এমন সময়ে পশ্চাতের একটা গুপ্ত দ্বার খুলিয়া একটি লোক কক্ষমধ্যে মুখ বাড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিল—পুলিস মুহূর্ত্তেই তাহাকে চিনিল—সে 'প্যান্থার' মেরায়াস। সে-ও ব্যাপার দেখিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্দ্ধান করিল।



কারাগারে ডাক্তার বুগরাট

পুলিসও তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়া করিল। রাত্রির অন্ধকার, তাহার পর মার্শেলের গলিঘুঁজি সবই মেরায়াসের সুপরিচিত। সে এ গলি সে গলি পার হইয়া একবারে সমুদ্রতটে উপনীত হইল। পুলিস হতাশ হইয়া পড়িল; দেখিল, সে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল! কিন্তু ক্ষণ পরে দেখা গেল, একখানা মোটর বোট হুস হুস করিয়া দ্রুতগতি অন্ধকার ভেদ করিয়া তট-পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতেছে। পুলিসও অমনই তাহার অলক্ষ্যে থাকিয়া চুপি চুপি অন্য মোটর বোটে তাহার অনুসরণ করিল।

কিছু পরে বোটখানা তটে বাঁধা হইল, মেরায়াস প্যান্থার লম্ফ দিয়া তীরে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে একখানা ভগ্ন পুরাতন জীর্ণ গৃহে প্রবেশ করিল। পুলিস তখনই বাড়ীখানা ঘেরাও করিয়া ফেলিল এবং তন্ন তন্ন করিয়া কক্ষসমূহ তল্লাস করিতে লাগিল। দ্বিতলের একখানা ঘরে দেখা গেল, অভাগী গ্রীক কুমারী অডেটি খাটের উপর বদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

তখনই তাহার মুখে সকল কাহিনী শুনিয়া পুলিস অন্য ঘরে মেরায়াসকে পাঁতিপাঁতি করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই মেরায়াস ধরা পড়িল।

বুগরাটের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারকালে বুগরাট আপনাকে বাঁচাইবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। তাঁহার নামে অসংখ্য জাল-জুয়াচুরী, ডাকাতি, রাহাজানি—নানা অভিযোগ ছিল; তাহার পর সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অভিযোগ, রুমিবকে হত্যা করা। ডাক্তার দুইটা সাক্ষী যোগাড় করিলেন। তাহাদের এক জন বলিল, ঘটনার (হত্যার) দিন ডাক্তার এক মহিলার নিকট ৯ হাজার ফ্র্যাঙ্ক কর্জ্জ করিতে গিয়াছিলেন। অপর সাক্ষী বলিল, সে রুমিবকে হত্যা করিয়াছে; সেই সাক্ষী জেলের কয়েদী, মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছিল যে, সে রুমিবকে অর্থের জন্য আক্রমণ ও হত্যা করিয়াছিল।

কিন্তু জুরী কাহারও সাক্ষ্যে আস্থা স্থাপন করিলেন না, ডাক্তার বুগরাটকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। বিচারে বুগরাটের প্রাণদণ্ড হইল। গভর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া এই হতভাগ্য ডাক্তারের প্রাণদণ্ড কমাইয়া দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে ডাক্তার বুগরাটের অদ্ভুত জীবন-নাটকের অবসান হইল। মানুষের উপর শনির দৃষ্টি পড়িলে দেবতুল্য মানুষও কিরূপ নরঘাতক দস্যুতে পরিণত হয়, ডাক্তার বুগরাট তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।



একটা রাত

বহু কষ্টে রুগ্ন পুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া, অতি সন্তর্পণে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া সুষমা যখন বাহিরে আসিল, তখন সূর্য্যাস্তের আর বেশী দেরী নাই। ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া বিদায়-রবির শেষ স্বর্ণ-রশ্মিটুকু অতি ম্লানভাবে পৃথিবীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। ধরিত্রী তাহার সহস্র তরুবাহু প্রসারিত করিয়া সেই গমনোন্মুখ কিরণজালটিকে ধরিয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। বেলা একবারে শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া সুষমা চিন্তিত হইল। "বোন্‌পোর" অসুখের উপলক্ষ করিয়া ঠিকা ঝি আজ ৪।৫ দিন গিয়াছে, তাহার পর আর তাহার কোনই খোঁজ নাই! আড়াই বৎসরের শিশু পুত্র লইয়া আফিসের ভাত ও সংসারের সমস্ত কায একা হাতে করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি ছেলে যদি ভাল থাকিত, তবে একরূপ চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ ১৫ দিন পর্য্যন্ত সে-ও জ্বরে ভুগিতেছে। যে ছেলে পূর্ব্বে সারাদিন আপন মনে খেলিয়া বেড়াইত, রোগের যন্ত্রণায় এখন আর সে মুহূর্ত্তমাত্র মাকে ছাড়িতে চাহে না—আর সে-ই বা কোন্ প্রাণে রুগ্ন কঙ্কালসার শিশুকে কাঁদাইয়া সংসারিক কাযে হাত দেয়! কিন্তু না করিলেও যে চলে না; ক্ষুদ্র সংসারটির সমস্ত কাযই যে বিশৃঙ্খলভাবে তাহার অপেক্ষা করিতেছে! করিতে হইবে অনেক কিছুই, কিন্তু সময় বড় অল্প। এখনই খোকা উঠিয়া মা'র খোঁজ করিবে। সুষমা মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া ঝাঁটাগাছা তুলিয়া লইল।

ঝাঁটার আঘাতে ঘরের আবর্জ্জনা যত দূর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ চিন্তা ও ভাবনা তাহার মনের মধ্যে জমাট হইয়া আসিতে লাগিল। আজ ১৫ দিন হইল খোকার অসুখ, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু স্বামীকে অনেক করিয়া বলিয়াও সে আজ পর্য্যন্ত এক জন বড় ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইতে পারে নাই। পুত্রের এইরূপ অসুখ দেখিয়াও কোন্ পিতা এমন নিরুদ্বেগচিত্তে বসিয়া থাকিতে পারে? আজ ৭ বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে ধীরেনকে ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এই খেয়ালী আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব লোকটি আপনার চারি পাশে যে স্বার্থের গণ্ডী টানিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া তাহার স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটাইবার সাধ্য কাহারও ছিল না। মার্চ্চেণ্ট আফিসে ৭০ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি করিলেও, মেজাজটি তাহার বেশ আমীরী গোছেরই ছিল। মাথার চুল হইতে জুতার ফিতাটি পর্য্যন্ত ধীরেন বাবুর সৌখীন রুচির পরিচয় প্রদান করিত। পাঠ্য জীবনে অভিভাবককে লুকাইয়া একটু আধটু কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল, এবং যদিও তাহা সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়া খাতার পৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ রহিত, তবুও সে বন্ধুমহলে "কবি" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ও তাহারই ফলে তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে বলিবার ভঙ্গী, এমন কি, কথার সুরটুকু পর্য্যন্ত বেশ কবিত্বপূর্ণ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঘরে বাধা-বিঘ্ন থাকুক না কেন, নিতান্ত ঠেকিয়া না পড়িলে, কোনও সপ্তাহে তাহার থিয়েটার দেখা বাদ যাইত না বা সিনেমা কোম্পানীতে কোনও ভাল "ফিলম" বাহির হইলে তাহার তাহা না দেখিলে চলিত না। আজ শনিবার, তাহার থিয়েটার দেখিবার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট দিন। সুষমা ভাবিতেছিল, আজ ধীরেন আফিস হইতে ফিরিলে যেমন করিয়া হউক, একবার তাহাকে কোন বড় ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিবে, আর কত দিন এমন করিয়া ঐ হাতুড়ে ডাক্তার হারাণ সরকারের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা যায়! খোকা সারাটা দিন আজ যে রকম অস্থিরভাবে কাটাইয়াছে, তাহাতে মায়ের প্রাণ কত না আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত একটা যুগের রূপান্তরে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, পুত্রের যাতনা শতগুণ হইয়া মাতার বক্ষে আঘাত করিয়াছে! খোকার সেই যন্ত্রণাকাতর মুখচ্ছবি মনে করিয়া সুষমার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ত্রস্তা মাতা ত্বরিতে বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ঝাঁট দিতে লাগিল।

"কি কচ্ছ গা? খোকা কেমন আছে?" বলিতে বলিতে আফিস-প্রত্যাগত ধীরেন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীকে দেখিয়া সুষমার চিন্তাব্যাকুল হৃদয় অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইল। ঝাঁটি দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। ঝাঁটাগাছা বারান্দার এক কোণে রাখিয়া আসিয়া বলিল, "খোকা? খোকা মোটেই ভাল নেই! জ্বরটাও আজ খুব বেশী হয়েছে, সারাটা দিন যা কচ্ছিলো, দেখে ভয়ে বাঁচিনে। এমন কেউ নেই যে, তোমাকে আফিস হ'তে ডেকে পাঠাব! এই এতক্ষণে একটু ঘুমুলো, তবে উঠে এসেছি!"

"চটি-জোড়া আবার গেল কোথায়? আঃ, এ ঘরের একটা জিনিষও যদি ঠিক থাকে! আফিস থেকে খেটে খুটে হয়রাণ হয়ে এসে, কোন জিনিষটি একটু ঠিকমত পাওয়ার উপায় নাই! এমন ক'রে আর চলে না!" ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া হাতের কাছে চটিজোড়া খুঁজিয়া না পাইয়া ধীরেন মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

সুষমার ইচ্ছা হইল যে, একবার বলে, আজই না হয় ছেলের অসুখের জন্য ঘর-সংসার এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু চিরকাল ত কখনও এমন ছিল না। ইহার পূর্ব্বে সে সমস্ত জিনিষ ঠিক করিয়া গুছাইয়া হাতের কাছে রাখিয়া দিয়াছে, আফিস হইতে ফিরিয়া ধীরেন কবে কোন্ জিনিষটি নিজে বাহির করিয়া লইয়াছে? কিন্তু স্বামীর ক্রোধ ও বিরক্তিব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না, খাটের নীচে হইতে চটি-জোড়াটি নীরবে বাহির করিয়া আনিয়া দিল।

আফিসের কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ধীরেন বলিল, "তাড়াতাড়ি চটপট আমাকে কিছু খাবার ক'রে দাও দিকি। সময়ও ত প্রায় হয়ে এল! আর শালার আফিসও হয়েছে তেমনই, একটু যদি শীগ্‌গির বেরুনো যায়! এত ক'রেও ৬টার আগে বেরুতে পারলাম না!"

সুষমা ভীতভাবে বলিল, "তুমি থিয়েটারে যাবে না কি? আজকের দিনটা আর কোথাও যেও না, খোকার অসুখটা বড্ড বেড়েছে আজ—"

বাধা দিয়া রুক্ষস্বরে ধীরেন বলিল, "খোকার অসুখ বেড়েছে, তা আমি ঘরে ব'সে থেকে কি করব শুনি? ডাক্তার আসছে, দেখে যাচ্ছে, ওষুধ খাওয়াচ্ছ, এর ওপর একটা রাত আমার ঘরে না থাকলে চলবে না? নাঃ, তোমরা জ্বালালে দেখছি।"

সুষমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "ওগো, না, তুমি দেখনি তাই বলছ! অন্য দিনের চেয়ে খোকা আজ বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। সারাটা দিন ছট্‌ফট্ ক'রে এইমাত্র শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আজ আর কোথাও না গিয়ে একবার মহেন্দ্র ডাক্তারের ওখানে যাও, একবার তাঁকে এনে খোকাকে দেখাও। এমন ক'রে হারাণ ডাক্তারের হাতে ফেলে রেখে দিয়ে অচিকিৎসেয় ছেলেটাকে মেরো না। ও-বাড়ীর দিদিও তাই বলছিলেন যে, ঐ হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে রেখে আমরা কি ক'রে নিশ্চিন্দি আছি! দিনকের দিন ছেলে যে শেষ হয়ে আসছে! আজ একবার মহেনবাবুর কাছে যাও, দেরী কোরো না।"

ধীরেনের জামা-কাপড় ছাড়া হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি আজ নিজেই যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিল, "ও-বাড়ীর দিদি যখন বলেছে, তখন আর কি! তোমাদের মেয়েমানুষের ঐ কেমন এক রোগ, নিজেরা যে-টি ভাল বুঝবে, হাজার বোঝালেও সে-টি আর কিছুতেই ছাড়বে না! তোমাদের বিশ্বাস, বেশী টাকার খাঁই যে করে, সেই ভাল ডাক্তার, আর খুব টাকা খরচ করলেই ভাল চিকিৎসা করা হয়, না? মেয়ে বুদ্ধি আর কাকে বলে! পাশে-পাশের সকলেই হারাণ ডাক্তারের হাত-যশের কত সুখ্যাতি করে, তোমরা ঘরে ব'সে তার কি জানবে বল? ঐ যে এক পেয়ে বসেছ 'মহেন ডাক্তার', সেই থেকে কেবল ঘ্যান্-ঘ্যান্ করছ 'মহেন ডাক্তারকে আনো, খোকাকে দেখাও।' আরে বাপু, সে এসে কি হাত দিয়ে রোগ তুলে নেবে? যত দিন রোগের ভোগ অদৃষ্টে লেখা আছে, তত দিন তার সে ভোগটা কেউ যাবে বল? অসুখ-বিসুখ লোকের হামেসা হয়েই থাকে, সে জন্য উঠতে বসতে আট টাকা ভিজিটের ডাক্তার এনে দেখালে আমাদের চলবে কেন? কৈ, কোথায় খোকা ঘুমিয়ে আছে বুঝি?"

ধীরেন রুগ্ন পুত্রের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সে নয়নানন্দবর্দ্ধক বলিষ্ঠ সুন্দরকান্তি শিশু দুরন্ত রোগ-রাক্ষসীর কঠোর হস্তস্পর্শে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া বিছানার সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে! সদাচঞ্চল হাস্য-বিকশিত আঁখির চারিপাশে কে যেন গাঢ় কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে! ঝরিয়া-পড়া মুকুলের ন্যায় পুত্রের রোগ-কাতর, বিশীর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরেনের সুপ্ত পিতৃ-স্নেহে আঘাত লাগিল। খোকার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া সে স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে ডাকিল,—"খোকো!"

পিতার আগমন-প্রত্যাশায় যে উৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিত, আফিস-প্রত্যাগত ধীরেনকে দেখিয়া যাহার রোগশুষ্ক ক্ষুদ্র অধর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, আজ সে পিতার স্নেহ-ব্যাকুল আহ্বানের কোনও উত্তর দিল না। যেমন নিমীলিতনেত্রে পড়িয়া ছিল, তেমনই নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। পুত্রের গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া সুষমার দিকে চাহিয়া চিন্তিতভাবে ধীরেন বলিল, "তাই ত, জ্বরটা যে আবার বেড়েছে দেখছি। নাঃ, কাল একবার মহেন বাবুকে এনে দেখাতেই হবে। এমন ক'রে আর রাখা যায় না, সত্যি। ছেলেটা বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছে।"

সুষমা ব্যাকুল মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কাল না গিয়ে আজই একবার যাও না কেন। দেখছ ত, খোকার আমার কি অবস্থা হয়েছে। এত দিন হারাণ ডাক্তারের হাতে রেখে কিছুই হ'ল না, জ্বরটা না ক'মে দিনকের দিন বেড়েই চলেছে। আজ সারাটা দিন ও যে-ভাবে কাটিয়েছে, দেখলে যত বড় শত্রুরও চোখে জল আসে! এমনভাবে আর দিন থাকলে ও আর বাঁচবে না।" বলিতে বলিতে সুষমা কাঁদিয়া ফেলিল।

"ও কি, কেঁদে ফেল্‌লে একেবারে! পাগল আর কি! অসুখ-বিসুখ ছেলে-পিলের হয়েই থাকে, আবার সেরেও যায়, তার জন্য অত কান্না কিসের? আজ জ্বরটা একটু বেশী হয়েছে, তাই অমন করছে; এতেই এত ভয় পেলে চলে কেন? তবে মহেন ডাক্তারকে আজ নিয়ে এলেও হ'ত, কিন্তু আমার যে আর এখন সময় নেই! তাঁর বাড়ীও ত দূরে নয়, যেতে আসতে ১ ঘণ্টার ওপর লেগে যাবে। সময়ের সব কথা দিয়ে এসেছি, তা না হ'লে—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুষমা বলিল, "তোমার ছেলের যেন অসুখ, তার থেকে কি ওদের কথা দিয়ে আসাটাই বেশী হ'ল? তুমি কি গো? মানুষ না পাষাণ? ছেলের এমন অসুখ দেখেও তোমার কাছে থিয়েটার দেখাটাই বড় হ'ল? তুমি যে কাল ডাক্তার নিয়ে আসবে, আজ আমি কি ক'রে খোকাকে নিয়ে এই রাতটা কাটাব? তোমার কি একটুও বিবেচনা নেই?"

ধীরেন পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিল, সুষমার প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি বুঝতে পারছ না সুষমা, চুণিরা সকলেই আমার জন্য ব'সে থাকবে, আমি না গেলে আজ তারা কেউ থিয়েটারে যাবে না বলেছে। আজ আবার অনেক দিন পরে 'মাধবীকঙ্কণ' অভিনয় হচ্ছে, বিশেষতঃ হেনাবালা সকলের অনেক অনুরোধে মাত্র আজকের রাতটি জেলেখার 'পার্ট' করবে। তোমার মনে নেই, সেই যে 'কপালকুণ্ডলার' ভূমিকায় হেনাবালাকে দেখেছিলে? কি সুন্দর দেখতে, আর কি গানটাই না গায়! খোকা ভাল নেই, তা না হ'লে তোমাকেও নিয়ে যেতাম। ইস! বেজায় দেরী হয়ে গেল! চুণিরা সকলে খাওয়া-দাওয়া সব সেরে হয় ত আমার জন্য ব'সে আছে।" হস্তবদ্ধ রিষ্টওয়াচটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরেন পুত্রের পার্শ্ব ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুষমা বলিল, "তুমি সত্যি করেই থিয়েটারে যাচ্ছ তা হ'লে?" বাহিরের আসন্ন দুর্য্যোগের প্রতি চাহিয়া ধীরেন বলিল, "তুমি রাগ ক'র না লক্ষ্মীটি, না গিয়ে কি করি বল? আমার জন্য ওদের সবাইএর এমন 'প্লে'টা দেখা হবে না, এটা ত ঠিক কথা নয়! আর একটা রাত বৈ ত নয়? এই দেখ ৮টা বাজে, আর আমার ফিরতে বড় জোর দেড়টা কি দুটো হবে। ক'ঘণ্টা আর বল? আমি কাল সকালে উঠেই আগে ডাক্তার নিয়ে আসব, পরে অন্য কথা। হ্যাঁ, ভাল কথা, খাবার আর এখন কখন্ হবে? কিছু বেশী দাও, আমি যা হয় কিছু কিনে খাব এখন। একটু বেশী ক'রে দিও, বুঝলে? চুণিরা জন তিনেক আমার সঙ্গে যাবে, ওদের না দিয়ে একলা কি ক'রে খাই বল? খোকার বেদানা, আঙ্গুর আর ডাক্তারের ভিজিট লাগবে বলছ? তা হয়ে যাবে'খন। টাকার জন্য কিচ্ছু আটকাবে না, ও-সব আমি কাল যা হয় করব। নাঃ, ভয়ানক দেরী হয়ে গেল, এখন বায়গা পেলে হয়!" ধীরেন দ্রুত হস্তে কেশবাস ঠিক করিয়া জুতা পায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুষমা কোন কথা না বলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। যাইবার সময় রুগ্ন পুত্রের শয্যাপার্শ্বে অশ্রুভারাবনতমুখী পত্নীকে দেখিয়া ধীরেন একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিকটে আসিয়া খোকাকে একটু আদর করিয়া পত্নীকে সান্ত্বনাসূচক বাক্য বলিল, "তুমি কিচ্ছু ভেব না, ও ভাল হয়ে যাবে। রোস না, কাল সকালে উঠেই মহেন ডাক্তারকে নিয়ে আসছি! শুধু এই আজকের একটা রাত, এই একটা রাতে আর কত খারাপ হবে বল? আর ভাল কথা, আমার জন্য রাঁধতে হবে না ব'লে তুমি যেন আবার উপোস

ক'রে থেক না। খোকাকে শুইয়ে কোন ফাঁকে যা হয় একটু কিছু রেঁধে নিও—বুঝলে? কাল ত রবিবার, আমি ঘরে থাক্‌ব। মনে থাকে যেন কথাটা, একটু কিছু খেয়ে নিও।"

অশ্রুবাষ্পে সুষমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। বহু কষ্টে সে বলিল, "আমার জন্য তোমার ভাবতে হবে না। কিন্তু এই রোগা ছেলে নিয়ে এই ঝড়-বৃষ্টির অন্ধকার রাতে আমি একলা কি ক'রে কাটাব, সে কথাটা ত কৈ একবার মনে করলে না! যদিই রাতে খোকার কিছু বাড়াবাড়ি হয়, তখন আমি কি করব?"

চারিদিকের অন্ধকার তখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুরন্ত বাতাস উচ্ছৃঙ্খল গতিতে হু হু শব্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দলে দলে জলভরা মেঘ ভাসিয়া আসিয়া শূন্যপথে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছে, যেন আদেশ পাইবামাত্রই শতধারে বারি-বর্ষণ করিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া দিবে। বাহিরের বিদ্রোহী প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, এখনই প্রবল বৃষ্টি নামিয়া তাহার সব পণ্ড করিয়া দিবে! অধীরভাবে সে বলিল, "ও ঝড়-বৃষ্টি এখনই থেমে যাবে। আর খোকা ত এখন খুব ঘুমুচ্ছে, ভালই আছে নিশ্চয়, তা না হ'লে আর এত ঘুমুত না। আমি ত এই এলাম ব'লে, ক'ঘণ্টার আর মামলা? এরই মধ্যে আবার বাড়াবাড়িটা কি হবে? যত সব গেরো আর কি? যাক, এখন তবে আসি। দোরটা দিয়ে যাও।" ধীরেন বাহির হইয়া গেল, সুষমা দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া পুত্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

বাহিরে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া ক্রুদ্ধ সিংহের মত কর্ণ-বধিরকারী ভীষণ শব্দে অশনি গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে। উন্মত্ত বাতাস প্রলয়ঙ্কর অট্টহাস্যে চারিদিক্ প্রকম্পিত করিয়া তাণ্ডব গতিতে নাচিয়া বেড়াইতেছে। এক কোণে ক্ষুদ্র "টাইমপিস" ঘড়ীটি টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছিল! মৃদু দীপালোকে পুত্রের রোগক্লিষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া সুষমা স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

বাহিরের প্রকৃতির ভীষণ বিপ্লবের সঙ্গে অন্তরেও তাহার তুমুল আলোড়ন চলিতেছিল। ধীরেনের আত্মসুখসর্ব্বস্ব স্বার্থপর হৃদয়ের পরিচয় সে বহুপূর্ব্ব হইতেই পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে যে এত বড় নির্ম্মম হৃদয়হীন, তাহা সে পূর্ব্বে ধারণাও করিতে পারে নাই। কঠিন রোগশয্যাশায়ী পীড়িত পুত্র ও সংসারানভিজ্ঞা পত্নীকে, এই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে একলা রাখিয়া অভিনয়দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতে যায়, তাহার হৃদয় যে কতটা স্নেহমমতাহীন পাষাণ, তাহাই সে ভাবিতেছিল। অতীতের বহু সুখ-দুঃখ-পূর্ণ স্মৃতির চিত্র-সূত্রের অনুসরণ করিয়া মন তাহার বহু দূরে সরিয়া গেল। চিরমধুর বাল্য ও কৈশোর, বিবাহিত জীবনের রঙ্গীন নেশাপূর্ণ প্রথম কয়টা বৎসর, তাহার সম্মুখে উজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। অজ্ঞাতে তাহার হৃদয় হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

তীব্র কড় কড় শব্দে আকাশের বুক চিরিয়া দিয়া দূরে কোথাও বোধ হয় বজ্রপতন হইল। সেই শব্দে শিহরিয়া, চমকিতা সুষমা পুত্রকে বুকের নিকট টানিয়া লইল। সামান্য দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া খোকা সেই যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এখন পর্য্যন্ত তাহার আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই। কেমন যেন একটা মহাচ্ছন্নের মত সে পড়িয়া ছিল। নিয়মিত ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইবার সময় বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাকে জাগাইয়া ঔষধ ও পথ্য দিতে সুষমার সাহস হইতেছিল না। অসুখের সূত্রপাত অবধি সে-ও এমন করিয়া এক দিনও ঘুমায় নাই। আজ যদি সে ঘুমাইয়া তাহার যাতনাক্লিষ্ট প্রাণে একটু শান্তি অনুভব করিয়াছে, তবে সুষমা কি করিয়া তাহাকে জাগাইয়া করিয়া আবার তাহার সেই অসহনীয় যন্ত্রণা ডাকিয়া আনিবে! ঘড়ীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, বারোটা বাজিবার আর বেশী দেরী নাই। ইহার মধ্যে খোকার দুইবার ঔষধ খাইবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, আর ত দেরী করিলে চলে না! কি জানি, যদিই এই অনিয়মে তাহার অসুখ আরও বাড়িয়া যায়! সুষমা খোকার গায়ে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার জ্বর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে! আশা-উৎফুল্লহৃদয়ে নিকটস্থিত টিপায়া হইতে ঔষধের শিশিটি তুলিয়া লইল। পুত্রের জাগরণ আশঙ্কায় অতি সন্তর্পণে ঔষধটি খাওয়াইতেছিল, কিন্তু সমস্তটুকু তাহার কস্ বাহিয়া পড়িয়া গেল। নিদ্রিত পুত্রকে জাগাইবার অভিপ্রায়ে সুষমা ধীরে ধীরে ডাকিল, "খোকন, বুড়ু!" মায়ের স্নেহপূর্ণ আহ্বানে খোকা কোন উত্তর দিল না, কেবল একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করিয়া নীরব করিল। বহুক্ষণ শুষ্ককণ্ঠে থাকিয়া গলা শুকাইয়া গিয়া

মুখে করিয়া সুষমা ক্ষিপ্রহস্তে বেদানার রস করিয়া আনিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দেখিল, তাহার সমস্ত শরীর ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে, হস্ত ও পদের উত্তাপ কমিয়া তাহা তুষারশীতল হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর নিদারুণ অধিকার ক্রমশঃ তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, নিস্পন্দ-প্রায় দেহ হইতে থাকিয়া থাকিয়া একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার অস্পষ্ট ধ্বনি বাহির হইতেছিল।

ভীতিব্যাকুল কণ্ঠে মা ডাকিল, "খোকন, সোনা, মাণিক, যাদু আমার, ধন আমার!" কে উত্তর দিবে? অস্ফুট কাতর শব্দ করিয়া খোকা একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। এই কি সেই দৃষ্টি, যাহা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও মায়ের প্রাণে কত আশা ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে! সুষমা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে এখন কি করিবে? কাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সর্ব্বস্বধনের এমন অবস্থা কেন হইল, তাহা দেখাইবে? দূরের বন্ধ-বাতাস হায় হায় শব্দে কাঁদিয়া ছুটিয়া আসিল! বিদ্যুৎ-চকিতের প্রায় সুষমার মনে কি কথা স্মরণ হইল। শতঝঞ্ঝা-প্রতিহত অস্থির ব্যাকুলহৃদয়ে পুত্রকে একবার জড়াইয়া ধরিল, তাহার তুষারশীতল আননে একবার চুম্বন করিল, তাহার পর ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে গেল। বৃষ্টির প্রবল ঝাপ্‌টা ও বাতাসের প্রচণ্ড বেগ তাহাকে পুনর্ব্বার ঘরে ঠেলিয়া দিল। সুষমা একবার বাহিরের বজ্রবিদ্যুন্ময়ী ঘনান্ধ-কার প্রকৃতির পানে চাহিল, আর একবার শেষ-শয্যা-শায়িত মুমূর্ষু পুত্রের পানে চাহিল, তাহার পর বিদ্যুদ্‌বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় পাশের বাড়ীতে ছুটিয়া গেল!

* * * * *

দুর্য্যোগ থামিয়া গিয়াছে। রজনীর অবগুণ্ঠন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। "মাধবীকঙ্কণ" ও বিশেষতঃ "জেলেখার" ভূমিকায় মিস্ হেনাবালার অভিনয়দর্শনে পরমপ্রীত ধীরেন, অনতিকালপূর্ব্বে শ্রুত কোন সঙ্গীতের কিছু অংশ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে, রাত্রিশেষে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিতে-ছিল। বাড়ীর নিকটে আসিয়া তাহারই পাশের বাড়ীর শশাঙ্ক বাবুকে, আরও জনকয়েক প্রতিবেশীর সহিত সমবেত হইয়া মৃদুস্বরে কি আলোচনা করিতে দেখিয়া তাহার মন বিস্মিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ধীরেনকে দেখিয়া আলোচনাকারিগণ নীরব হইয়া গেলেন ও নিঃশব্দে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের ঘৃণাব্যঞ্জক কঠোর মুখভাব দেখিয়া ধীরেনের কাহা-কেও কিছু প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। উদ্বেগব্যাকুল হৃদয়ে সে দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ভিতর হইতে সুষমার আর্ত্তবিলাপ উত্থিত হইল, "খোকন রে, আমি যে কাল তোকে বড় ডাক্তার দেখাব, বাবা! আর একটা রাতও কি তোর দেরী সইল না, ধন!"

বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হৃদয়ে বীরেন সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

শ্রীমতী শৈলজা সেন গুপ্তা।

বসন্ত

বন্ধ ছিলে শীতের কুঁড়ির অন্ধ কুয়াশায়,—
কে তোমারে সোনার কাঠী বুলিয়ে দিলে গায়!
মলিন কুঁড়ির পাপ্‌ড়ি খুলে'
অমল কমল উঠ্‌লে দুলে'
তুষার টুটে' তৃণের পাথার রঙ্গে উথলায়;
মগ্ন হ'ল ঋতুর মৃণাল রূপের মোহানায়।

জাগলে কালো রাতির কোলে তুমি ভোরের ভাতি,
ঘোম্‌টা-তলের মুখটি লাজুক—আঁচল-ঢাকা বাতি।
সাদার জয়ায় জাগল জীবন
যৌবনেরি সবুজ স্বপন,
নিখিল কোকিল আকুল হয়ে কুজন-গাথা গায়;
কে তোমারে সোনার কাঠী বুলিয়ে দিলে হায়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

জ্ঞানতপস্বী ওমর খৈয়াম

ভারতবর্ষের মত প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় জ্ঞান-সাধনাকে উচ্চ-শ্রেণীর সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া মুক্তি-সমরে অবতীর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হয়েন। ভারতের উপনিষদাদি ঋষিশাস্ত্র যেমন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছে, জ্ঞানই ব্রহ্ম, যিনি জ্ঞানের সাধনায় জয়যুক্ত হইবেন, তিনিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, তেমনই আরবের কোরাণও বলিয়াছে, যে জ্ঞানে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, হে আল্লা, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবগণ জ্ঞানহীন ছিল; পরে মহম্মদের উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সজীব হয়। হজরত মহম্মদও বলিয়াছেন, বিশ্বাসীর (মুসলমানের) জ্ঞানসঞ্চয়ে জন্মগত অধিকার, যেখানে জ্ঞানের সন্ধান পাইবে, সেই স্থান হইতেই সে জ্ঞান সঞ্চয় করিবে। মুসলমানগণ হজরতের বাণী শিরোধার্য্য করিয়া জ্ঞান-সঞ্চয়ে অগ্রসর হন। তাঁহারা বিদ্যা বা জ্ঞান-সাধনাকেই উচ্চাঙ্গের সাধনার মধ্যে গণ্য করেন এবং জগতের উন্নতিশীল জাতির জ্ঞান-উৎস হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া বিদ্যা-জ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া উঠেন।

ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্যা-জ্ঞানকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—(১) স্বদেশীয় ও (২) বিদেশীয় বিদ্যা বা জ্ঞান। যে বিদ্যা বা জ্ঞান কোরাণের বিধি-ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কান্বিত, তাহাই স্বদেশীয় এবং যাহা বিদেশীয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত—অর্থাৎ দার্শনিক তত্ত্বমূলক, উহাই বিদেশীয় বিদ্যা আখ্যায় অভিহিত হইত। স্বদেশীয় বিদ্যা মূলতঃ হদিস্ বা ধর্ম্মবিজ্ঞান (অল্-উলম্-অল্-নকলিয়া ওয়াল শরিয়া) ও ভাষাতত্ত্ব (উলম্-উল্-লিসান-উল্-আরবী)। স্বদেশীয় বিদ্যা আবার নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) ইলম্-উল্-তফসির (কোরাণীয় ভাষ্য Koranic Exegises)
(২) ইলম্-উল্-কেরাত (কোরাণ-সমালোচনা Koranic Criticism)
(৩) ইলম্-উল্-হদীস্ (হদীস-বিদ্যা Science of Apostolic Tradition)
(৪) ফেকা (স্মৃতি বা ব্যবহারশাস্ত্র Jurisprudence)
(৫) নহয়ো (ব্যাকরণ Grammar)
(৬) ইলম্-উল্-কালাম (যুক্তিশাস্ত্র Scholastic Theology)
(৭) লোগা (শব্দকোষ, অভিধান Lexicography)
(৮) বয়ান (অলঙ্কারশাস্ত্র Rhetoric)
(৯) আদব (সাহিত্য Literature)

স্বদেশীয় বিদ্যার মত বিদেশীয় বিদ্যা—দর্শনশাস্ত্র আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) ন্যায়শাস্ত্র (Logic) (২) মনোবিজ্ঞান (Philosophy of mind), (৩) গণিতশাস্ত্র, (Mathematics), (৪) ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Medicine) এবং (৫) পদার্থবিজ্ঞান (Physical Science)

প্রাচীন মুসলমানগণ (১) অল্-আরবিয়া (সাহিত্য), (২) অল্-শরিয়া (ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মতত্ত্ব-বিদ্যা) এবং (৩) অল্-হিকমিয়া (দর্শনশাস্ত্র)—এই তিন বিদ্যা বা জ্ঞানের সাধনা করিতেন।

ওমর খৈয়ামের সমগ্র জীবন-অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি আজীবন যেমন সত্যানুসন্ধিৎসু, সত্যসাধক, তেমনই জ্ঞান-তপস্বী ছিলেন। তিনি জ্ঞানযোগী ও জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য না হইলে 'গিয়াস্-উদ্দীন' শ্রেষ্ঠ উপাধি কখনই তাঁহাকে প্রদত্ত হইত না। "গিয়াস উদ্দীন", "মহীউদ্দীন" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপাধি সকল সাধারণতঃ তৎকালে জ্ঞানিগণাগ্রগণকেই প্রদত্ত হইত। ওমর খৈয়াম আজীবন জ্ঞানের সাধনা দ্বারা হজরত মহম্মদের বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একটি রুবাইতে তাঁহার জ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

সুদীর্ঘকাল জ্ঞানের তাঁবু সৃজন করি ওমর-খৈয়াম
দগ্ধ হ'ল, ধ্বংস হ'ল, লুপ্ত হ'ল তাহার নাম;
জীবন-সূত্র ছিন্ন হ'ল অদৃষ্টের অস্ত্রাঘাতে—
বৃথাই সে যে বিক্রী হ'ল মৃত্যুরূপী দালাল হাতে।

বাস্তবিকই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত "জ্ঞানের তাঁবু" সৃষ্টি কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনাতেই নিযুক্ত ছিলেন এবং এই সাধনায় জয়যুক্ত হইয়া জ্ঞান-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি-স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা এই প্রবন্ধে জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ইমাম ওমর খৈয়ামের জ্ঞানসাধনার কথা আলোচনা করিব।

জ্ঞান-তপস্বী ওমর খৈয়াম একাগ্র সাধনাবলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বিদ্যাতেই অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়া অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দ্বারা দেশবাসীকে চমৎকৃত করেন। প্রথমে তাঁহার স্বদেশীয় বিদ্যা-জ্ঞানের আলোচনা করা যাউক। স্বদেশীয় বিদ্যার মধ্যে (১) ইলম্-উল কেরাত, (২) ফেকা, (৩) নহয়ো এবং (৪) আদব এই চারি বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই চারি বিদ্যায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া কিরূপ যশস্বী দেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কয়েকখানি ইতিহাস ও চরিতাভিধানে পাওয়া যায়।

ইলম্-উল্-কেরাত—কোরাণ-সমালোচন-বিদ্যায় ওমরের গভীর জ্ঞান ছিল। তৎকালীন যুগে এই বিদ্যায় যাঁহারা সুপণ্ডিত না হইতেন, জ্ঞানী বা পণ্ডিত-সমাজে তাঁহাদের কোন স্থান ছিল না। কোরাণ-সমালোচক, কোরাণের ভাষ্যকার, কোরাণের পাঠক জনসাধারণের দৃষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সুদক্ষ সাধক ওমর খৈয়াম কোরাণের যেমন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন, তেমনই শ্রেষ্ঠ 'কারীও' (কোরাণ পাঠক) ছিলেন। বেদ যেমন সুর করিয়া পাঠ করিতে হয়, কোরাণও ঠিক সেই প্রকার সুর করিয়া ভঙ্গীসহকারে পাঠ করিবার নিয়ম আছে। মোস্লেম জগতে কোরাণ-পাঠ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যারূপে সম্মানিত। এই বিদ্যাকে 'কিরয়ৎ' এবং পাঠককে 'কারী' নামে অভিহিত করা হয়। কোরাণ সাত প্রকার সুরে পাঠ করিতে হয়। জ্ঞানের আধার ওমর খৈয়াম কোরাণ সাত প্রকার সুর

এবং ভঙ্গীতে পাঠ করিতে জানিতেন এবং এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 'কিরয়ৎ' বিদ্যায় ওমরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশেষজ্ঞতার সম্পর্কে ইতিহাসে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক মহম্মদ শহরজুরি (১) লিখিয়াছেন, সুলতান মলিকের মন্ত্রী আবদুর রজ্জাক রাজকার্য্যের অবসরে কবি, সাহিত্যিক, কারী, বিদ্বান্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া নানা জ্ঞানালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এক দিন উজীর আবদুর রজ্জাক, কারিগণের নেতা আবুল হসন অল-গজ্জালির সহিত 'কিরয়ৎ' সম্বন্ধে তর্কালোচনা করিতেছিলেন। যখন তাঁহাদিগের তর্ক পূর্ণস্রোতে চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার ওমর খৈয়াম মন্ত্রিগৃহে প্রবেশ করেন। ওমরকে দেখিয়াই মন্ত্রী আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠেন, "আর আমাদের তর্কের প্রয়োজন নাই, এই যে আমাদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আসিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের অভিমতের উপর আর তর্ক চলিবে না" বলিয়া উপস্থিত তর্কসম্বন্ধে ওমরের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ওমরকে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য মন্ত্রিপ্রবর অনুরোধ করেন। ওমর খৈয়াম সাত প্রকার সুরে ও ভঙ্গীতে কোরাণ পাঠ করেন এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক সুরের ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রচলিত সপ্ত পদ্ধতি বা সুর ব্যতীত আরও যে একটি বিশেষ সুর আছে, তাহার সম্বন্ধেও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ওমরের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া কারীগণের প্রধান অল-গজ্জালী উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠেন, ভগবান্ করুন, যেন এই প্রকার জ্ঞানী পণ্ডিতের সংখ্যা পৃথিবীতে দিন দিন বৃদ্ধি পায়! সত্য কথা বলিতে কি, কোন কারীই ওমর খৈয়ামের মত কিরয়ৎ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ত নহেনই, উপরন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞ। (২)

মুসলিম ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানেও জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের আধার ওমর খৈয়াম প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি দেশবাসীকে তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান বিতরণ করিতেন। মোল্লা এবং অন্যান্য জ্ঞানীর মত তিনি মসজেদে গিয়া বক্তৃতা দিতেন না। তিনি তাঁহার গৃহে বসিয়াই উপদেশামৃত বিতরণ করিতেন। তাঁহার ছাত্রসংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। ঐতিহাসিক মহম্মদ শহরজুরি এই বিজ্ঞানে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন, ইমাম ওমর খৈয়াম নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন; দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা বিভাগে তিনি যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের—প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনই ইতিহাস ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানেও অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। (১)

কোরাণ ও ধর্ম্মতত্ত্বে ওমরের কি গভীর জ্ঞান ছিল, কাজী আবদুর রশিদের প্রদত্ত বিবরণ হইতেও তাহা জানা যায়। কাজী আবদুর রশিদ লিখিয়াছেন, কোরাণের কোন সুরার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া তাৎপর্য্যের জন্য কোরাণ-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ওমর খৈয়ামের শরণাপন্ন হই এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই সুরার মধ্যে কোন কোন শব্দ উপর্য্যুপরি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কেন, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ইমাম ওমর খৈয়াম সুদীর্ঘ এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়;—জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক সন্দর্শনে আমি মুগ্ধ হই। ওমর এই সুরার ব্যাখ্যাকালে এত অধিকসংখ্যক বিশেষজ্ঞের উক্তি যুক্তিসহকারে প্রকাশ করেন যে, তাহার অনুলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে, উহা ধর্ম্ম সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের মূল্যবান্ পুস্তক হিসাবে গণ্য হইতে পারিত। (২)

ওমর খৈয়াম তাঁহার স্বাধীন মতবাদের জন্য অনেক সময় লাঞ্ছিত হইতেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, সদা-সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রাণের ভয়ে দিন-যাপন করিতে হইত। প্রকৃত সুফীরা তাঁহার উক্তিতে সুফী সম্প্রদায়ের অনেক গুপ্ত রহস্যকথা নিহিত দেখিয়া কখনও গোপনে, কখনও বা প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত সুফী রহস্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিত। কিন্তু ওমরের এই সকল উদার উক্তি বা মতবাদ গোঁড়া সম্প্রদায় সহ্য করিতে পারিত না। এ জন্য তাহারা তাঁহার উপর একেবারেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল না। উপরন্তু তাহারা ওমরকে গোপনে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিয়াছিল। ওমর তাহাদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে মক্কায় পলায়ন করেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার লেখনী ও রসনা কথঞ্চিৎ সংযত করেন। কিছু দিন পরে মক্কা হইতে বোগদাদে উপস্থিত হয়েন। বোগদাদবাসিগণ অদ্বিতীয় জ্ঞানী ওমরের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট প্রাচীন বিদ্যা (৩) জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ-বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য দলে দলে আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়। কিন্তু ওমর তাহাদিগকে ঘাতুক সম্প্রদায়ের লোক মনে করিয়া ঘৃণাভরে অবরুদ্ধ দ্বার অর্গলমুক্ত করেন নাই! এইরূপে অসংখ্য জ্ঞানামৃতপানেচ্ছু হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। মানব-সমাজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া এই সময় তিনি তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য গোপন করিয়াই চলিতেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

গোঁড়া সম্প্রদায় তাঁহাকে সর্ব্বদাই ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তর্ক-বিচারে আহ্বান করিতেন। তিনি ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, অবজ্ঞাভরে তাহাদিগের আহ্বান উপেক্ষা করিতেন। তিনি এই ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়কেই গর্দ্দভ সম্ভাষণ করিয়াছেন।

(১) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইহার সম্পূর্ণ নাম শামস্ অল-দীন অল-শহর্জুরি। ইনি দর্শনশাস্ত্র-সম্পর্কীয় কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনা করেন। দার্শনিকগণের ইতিহাস-লেখক হিসাবেই ইনি প্রসিদ্ধ। তাঁহার "নুজহৎ-উল-আরওয়া" গ্রন্থ-সাহিত্যের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ পুস্তক। এই পুস্তক হইতে তৎকালীন মুসলিম-সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণের বিবরণ ও দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

(২) নুজহৎ-উল্-আরওয়া।

(১) নুজহৎ-উল-আরওয়া।
(২) মিরাত-ই-জহাননামা।
(৩) গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান।

অনেক সময় ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ ওমরকে একরূপ জোর করিয়াই তর্ক করিতে বাধ্য করিত। ওমর স্বভাবতঃ ধীর-প্রকৃতির লোক ছিলেন, শান্তভাবে তার্কিকগণের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতেন। তিনি জানিতেন, ইহারা উত্তেজিত হইয়াই তর্ক করিতে আসিয়াছে, সুতরাং তর্ক অপেক্ষা ইহাদিগকে শান্ত করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সকল সময়েই তিনি তর্ক করিতে চাহিতেন না। বিনা প্রয়োজনে তর্ক করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।—অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানের বলেই ওমর অনেক সময়ে অনেক বিপদ হইতে মুক্ত হইতেন।

ওমর স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বিদ্যাতেই এরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহার তুল্য জ্ঞানী বিদ্বান্ তৎকালীন যুগে আর কেহই ছিলেন না। তিনিই সে যুগের মূর্ত্তিমান জাগ্রত প্রজ্ঞা ছিলেন।—তিনি তৎকালীন যুগে জাগ্রত প্রজ্ঞা না হইলে, হুজ্জৎ-উল্-ইসলাম, ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদ্ ইমাম আবু হামিদ অল্-গজ্জালী—যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া মিশরীয় জ্ঞানী, ধর্ম্মসাধক জলাল উদ্দীন বলিয়াছিলেন, "মহম্মদের মৃত্যুর পর যদি অপর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,—অল্-গজ্জালীই সেই পয়গম্বর"—সেই জইন-উল দীন (ধর্ম্মের জ্যোতিঃ), অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানপাণ্ডিত্যের আধার অল্-গজ্জালীও জ্ঞানের মূর্ত্ত অবতার ওমর খৈয়ামের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন ; কোন বিষয়ে কোন সমস্যার নিরাকরণ করিতে অপারগ হইলে সুপণ্ডিত ওমরের শরণাপন্ন হইতেন।—বিদ্যা-জ্ঞানের আধার ওমরও সানন্দে তত্ত্বকথা বুঝাইয়া তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু অল্-গজ্জালী ওমরের স্বাধীন মতবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। এই স্থানেই ওমরের সহিত গজ্জালীর মতানৈক্য ঘটিত। আমরা অল্-গজ্জালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।—ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর যাহারা এই ধর্ম্মের গৌরব-পতাকা বহন করিয়া দিকে দিকে ইহার মহিমা প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞান পাণ্ডিত্যের আধার ইমাম আবু হামিদ মহম্মদ অল্-গজ্জালী তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া ধর্ম্ম-জগতের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অল্-গজ্জালীর তুল্য মুসলিম ধর্ম্মশাস্ত্রে অশেষ জ্ঞানী, ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদ্ ইসলাম-জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই—যাঁহার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। ইমাম গজ্জালী খোরাশানের অন্তর্গত তুশ নগরে ৪৫০ হিঃ (১০৫৮ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। সুকুমার জীবন-প্রভাতে পিতৃ-মাতৃহীন হন। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর গজ্জালী তাঁহার পিতৃবন্ধু আহমদ অল্-রাধখানির সংসারে প্রতিপালিত হয়েন এবং বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। পরে খোরাসানের উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। নিশাপুরের ও জুর্জন প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ যথাক্রমে, ইমাম উলহার ম্যেনের ও আবু নসর অল্-ইসমাইলির নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কুড়ি বৎসর বয়সের সময়েই অধ্যাত্মতত্ত্বের গভীর গুহায় আত্ম-নিমজ্জন করেন। এই বয়স হইতেই তিনি ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান ও কতকগুলি ধর্ম্ম-পুস্তিকা প্রচার করেন। এই ধর্ম্ম-পুস্তিকাগুলি বিদ্বান-কুল-গৌরব, শেলজুক মন্ত্রী নিজাম-উল্ মুলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুপণ্ডিত মন্ত্রিপ্রবর গজ্জালীর জ্ঞান-পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নব প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। অল্-গজ্জালী যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমস্তগুলিই ধর্ম্ম-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ্রূপে মুসলিম-জগতে সম্মানিত। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই আরবী ভাষায় লিখিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তক পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। গজ্জালীর গ্রন্থাবলী লাতিন, জর্ম্মাণ, ফরাসী, হিব্রু, এবং ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি ৫০৫ হিজরাব্দে (১১১১ খৃঃ) দেহত্যাগ করেন।

অল্-গজ্জালী, ওমরকে "আকাশের অবস্থা" সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া ওমর শান্ত এবং গম্ভীর স্বরে গজ্জালীকে বলেন, তিনি তাঁহার "এরাইয়সুন নাফিসা" নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। অল্-গজ্জালী তৎক্ষণাৎ এ বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করেন। তিনি ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের উপর ঘুরিতে থাকে, গোলকের সমস্ত অংশ একই প্রকার হওয়া সত্ত্বেও ঐ অংশটি অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্‌রূপে জানা কিরূপ সম্ভব ?" ওমর, গজ্জালীর অনুরোধে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, এই ব্যাখ্যা দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ণের শেষ হয় নাই। অপরাহ্ণ-নমাজের সময় উপস্থিত হওয়ায় ওমর গাত্রোত্থান করেন। অল্-গজ্জালী মুগ্ধ চিত্তে ওমরের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। তিনি গাত্রোত্থানকালে বলেন, "সত্য মূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিলাম। মিথ্যা-যবনিকা অপসারিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে আমার যে ধারণা ছিল, উহাই মিথ্যা, আজ সত্যসাধক ওমরের ব্যাখ্যায় সত্য মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে।" (১)

ওমর সাহিত্য-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন।—ঐতিহাসিক শহরজুরি লিখিয়াছেন—ওমর-খৈয়াম অল্-আরবিয়াতেও (প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্র, Classical Arabic) সুপণ্ডিত ছিলেন। আবুল হসন অল্-বৈহাকী (২) ওমর খৈয়ামের সাহিত্যশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ৫০৫ হিজরাব্দে (১১১১ খৃঃ) আমি ইমাম ওমরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তাঁহার গৃহ নানা বিদ্বান্‌মণ্ডলীতে পূর্ণ। সকলেই তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছে ;—ওমর একে একে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলের সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন—আমি একটি দুরূহ আরবী কবিতার তাৎপর্য্য এবং ইহার টীকা বোধগম্য করিবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। একে একে সকলের ব্যাখ্যা শেষ হইলে, তাঁহাকে হামসা হইতে একটি কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার

(১) নুজহৎ-উল আরওয়া।

(২) খোরাসানের অন্তর্গত বৈহাক প্রদেশের বিদ্বান্। ৪৫০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ৫৩৬ খৃঃ সমাধিস্থ হন। ইনি ওমরের সমসাময়িক। প্রাচীন আরবী সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন। Vide Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts prepared by Dr. Charles Rieu, kept in the Bodlean Library, Oxford

ইহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করি। সাহিত্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ওমর খৈয়াম ঐ শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন। (১)

জ্ঞান-তপস্বী ওমর খৈয়াম স্বদেশীয় বিদ্যায় কিরূপ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার যথাসাধ্য পরিচয় দিলাম। এইবার আমরা বিদেশীয় বিদ্যায় তিনি কিরূপ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার বিষয় আলোচনা করিব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাগ্র সাধক ওমর খৈয়াম জ্ঞান-রাজ্যে এতই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার চরম জ্ঞানের পরিচয় দেন—গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানানুশীলন দ্বারা। গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞান অনুশীলন তৎকালীন যুগে সাধারণের মধ্যে সুলভ ছিল না। প্রসিদ্ধ গ্রীক বিদ্বান্‌গণের পুস্তকাবলী আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোক অনূদিত পুস্তকের সাহায্যেই গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হইত। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণই কেবলমাত্র মূল গ্রীক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধক ওমর খৈয়াম তাঁহার সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ গুরু আবু-সিনা, (২) ইবনে রোশদ, (৩) অল্-কিন্দী, (১) অল্-ফ্যারাবী, (২) প্রভৃতি যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাবীরগণের মত মূল গ্রীক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া গ্রীক-জ্ঞান-প্রতীকরূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ওমর খৈয়াম গ্রীক-বিদ্যা আলোচনা করিয়া কিরূপ সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, দার্শনিকগণের বিবরণী লেখক, ঐতিহাসিক জমল উদ্দীন কফ্‌তী (৩) প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। অল্-কফ্‌তী লিখিয়াছেন,—যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, ইমাম ওমর খৈয়াম গ্রীক-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানা বিভাগেই অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানানুশীলন করিতে এবং ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে দেশবাসীকে উপদেশ দিতেন। (৪)

আর এক জন চরিতকার ওমরের গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধেও যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে বিবৃত হইল :—

খোরাসানের বিশিষ্ট বিদ্বান্ ওমর খৈয়াম গ্রীক-জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রীক-জ্ঞানানুশীলন তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রবর্গকে গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা উপদেশ প্রদান করিতেন। (৫)

ওমর খৈয়াম জন্মান্তরবাদ ও জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলজনিত সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই জটিল বিশ্বরহস্যের সমুদয় অবগত হওয়া যায়। ওমর পুনর্জ্জন্মতত্ত্বেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া বিশেষজ্ঞের সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে জন্মান্তর স্বীকার করিতেন, নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি।

(১) ফারদৌস-উৎ-তওয়ারীখ্। এই ইতিহাসখানির বিস্তৃত বিবরণ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের Journal of the Royal Asiatic Societyতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) পারস্যদেশে স্বাধীন চিন্তা, মতবাদ প্রচার, পাণ্ডিত্য গবেষণা দ্বারা যে সমস্ত মনীষী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞানপাণ্ডিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আবু-সিনার নাম সসম্মানে ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। পারস্যদেশে আবু-সিনার মত চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্য-সৃষ্টিকার, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও কবি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একাধারে সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার এরূপ একত্র সম্মেলন জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ওমর-খৈয়াম ভিন্ন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আবু-সিনা বোখারা শহরে ৩৭৩ হিঃ (৯৮০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সের সময় ইনি সমগ্র কোরাণ, সাহিত্য, মোস্‌লেম ধর্ম্মতত্ত্ব, গণিতবিজ্ঞানে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ঐ সুকুমার বয়সেই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাধি সকল লাভ করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, সতের বৎসর বয়সে সমানদবংশীয় রাজকুমারের চিকিৎসার জন্য রাজপ্রাসাদে তাঁহার আহ্বান হয়। আবু-সিনা গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞান অনুশীলন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয় দেন। গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার গ্রন্থসংখ্যা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ৪২৭ হিঃ (১০৩৭ খৃঃ) হামদান নগরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

(৩) দার্শনিক রোশদ্ কর্ডোভা শহরে ১১৪৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার তুল্য বিশিষ্ট ও কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিক প্রাচীন মোস্‌লেম সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে স্পেনীয় মুর সম্রাটের প্রধান ইমাম ও কাজী হইয়াছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্র, দেবতত্ত্ব, গণিত-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকা প্রচার করেন।

(১) মোস্‌লেম দর্শনশাস্ত্রের জনক অল-কিন্দী নবম খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এই নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। খলিফা মামুন ও মুতাসিমের দরবারে বিদ্বান্-পারিষদ ছিলেন। এই সময়েই তিনি গ্রীক-দর্শন গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। ইহার তুল্য গ্রীক বিদ্যা-বিশারদ তৎকালে কেহই ছিলেন না।

(২) তুর্কিস্তানের অন্তর্গত ফ্যারাব প্রদেশবাসী দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি গ্রীক-বিদ্যায় আসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া "দ্বিতীয় আরিষ্টটল" নামে সম্মানিত হয়েন। ৩৪৩ হিঃ (৯৫৪ খৃঃ) সিরিয়া দেশে ঘাতুক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিহত হন।

(৩) ত্রয়োদশ শতাব্দীর দার্শনিক। শহরজুরির মত ইনিও মোসলেম দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস ও দার্শনিকগণের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। "তারিখ-উল্-হুকমা" তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ জীবনী পুস্তক ; Dr. R. A. Nicholson ও জর্ম্মণ প্রাচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিত Brocklen প্রণীত আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুস্তকখানির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) তারিখ-উল্-হুকমা।

(৫) আকবর-উল্-উলেমা।

নিশাপুরের এক কলেজে ওমর ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হয়েন। এই সময় কলেজের জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল এবং কতকগুলি গর্দ্দভ ইষ্টকবহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে একটি গর্দ্দভ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। ইহা দেখিয়া ওমর সহাস্যে গর্দ্দভটির নিকট গমন করিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। অতঃপর গর্দ্দভ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। ইহাতে বিস্মিত ছাত্রের দল ওমরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই গর্দ্দভটির দেহে আপাততঃ যে আত্মা বিরাজমান, পূর্ব্বে সে এই বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের দেহে ছিল, এই জন্য লজ্জায় সে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু এখন তাহার সহযোগীরা তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া উপায়ান্তরের অভাবে প্রবেশ করিল। (১)

ওমরের স্মরণশক্তিও অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। ইস্পাহানে অবস্থানকালে ইমাম ওমর খৈয়াম একখানি দর্শনশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হয়েন যে, ঐ পুস্তকখানি উপর্য্যুপরি সাত বার পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তিনি ইস্পাহান হইতে নিশাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন শিষ্যকে সমগ্র পুস্তকখানি মুখস্থ বলেন। মূল পুস্তকের সহিত ওমরপ্রদত্ত শ্রুতিলিখন মিলান হইলে দেখা যায় যে, অতি অল্পই মূল হইতে তফাৎ হইয়াছে। (২)

নূতন নূতন সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করা, দর্শনের ক্ষেত্রে নব নব চিন্তাধারা প্রবর্ত্তন করা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা ব্যক্তিবিশেষের অনন্যসাধারণ প্রতিভার উপর নির্ভর করে। যিনি এই অসাধারণ কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই অসাধারণ বা যুগ-মানবরূপে সম্মানিত হন। এই সকল মনীষীর সংখ্যা কোন যুগেই অধিক নহে। ইহারাই জ্ঞান-রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ।—জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভার উজ্জ্বল মূর্ত্তি ওমর খৈয়াম জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে দর্শন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায় ও গবেষণা দ্বারা নূতন আলোক-রশ্মিপাত করিয়া জ্ঞান-রাজ্যের অধীশ্বর—যুগ-মানবরূপে সম্মানিত হন। সেলজুক সম্রাট্ মলিক শাহের রাজত্বকালে যদি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ওমর খৈয়ামের নবনব-উন্মেষশালিনী বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিকাশ। দশম শতাব্দীতে যেমন ওমর-গুরু আবু-সিনার প্রতিভাচ্ছটায় সমগ্র পারস্যদেশ আলোকিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগেও তেমনই আবু-সিনার উপযুক্ত শিষ্য যুগ-মানব ওমর খৈয়ামের অপূর্ব্ব প্রতিভা-লোকে সমগ্র পারস্য আলোকিত হয়! সুলতান মলিক শাহের রাজত্ব-ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগের ইতিহাস!

জ্ঞান-তপস্বী ওমর খৈয়ামের অলৌকিক প্রতিভা, জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া চরিতাভিধানকার সৈয়দ আলি বিন মহম্মদ অল্ হুসেনী (৩) পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ যে মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন, ওমর খৈয়াম এরূপ অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁহাকে অকুতোভয়ে জ্ঞান-আকাশের ধ্রুবনক্ষত্র, জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্তারূপে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতে পারা যায়। পারস্যের পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার ক্রীতদাস ছিল। অর্থাৎ জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যুগ-মানব ওমর-খৈয়ামের জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের নিকট তাহাদিগের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য অকিঞ্চিৎকর; এই কারণে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত একবাক্যে ওমরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আরবীয় জ্ঞানিগণও ওমর খৈয়ামকে অদ্বিতীয় জ্ঞানি-রূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ওমর খৈয়াম এরূপ মনীষাসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক মনীষী ইউক্লিডকেও জ্ঞানের উৎকর্ষ্যে অতিক্রম করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহার জ্ঞানপাণ্ডিত্যের নিকট গ্রীক বিদ্বান্ আরিষ্টটলের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-মনীষাও ম্রিয়মাণ। (১)

ওমর খৈয়াম তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ও অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার দ্বারা যেমন যুগ-প্রসিদ্ধ হইয়া যুগ-মানবরূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, তেমনই দেশের সুলতান,—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।—তাঁহারা জ্ঞান-তপস্বী ওমরের সহিত শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। সুলতান মলিক শাহের দরবারে বিদ্বান্ পারিষদ্‌রূপে অবস্থান করিলেও, সুলতানের মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ওমর তাঁহার নর্ম্মসখা ছিলেন। সুলতান মলিক শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান সঞ্জর সিংহাসনারোহণ করিলে, তিনিও ওমর খৈয়ামের সহিত পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। শুধু ইহাই নহে, প্রতিভার অবতার ওমর খৈয়ামের যোগ্য আসন তাঁহার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বোখারার শাসন-কর্ত্তা খাকান শামস-উল-মুলক সফলসাধক ওমর খৈয়ামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও সুলতান সঞ্জরের মত রাজসিংহাসনের পার্শ্বে ওমরের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। (২)

জ্ঞান-যোগী ওমর খৈয়াম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় জয়যুক্ত হইলে পারস্যের জ্ঞান-দেবতা যে অলক্ষ্যে তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল ললাটে অমরত্বের জয়টীকা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বাস্তবিকই ওমর জাগ্রত প্রজ্ঞা না হইলে গ্রীক-মনীষী আরিষ্টটল (Aristotle)—যিনি মুসলিম দার্শনিকগণের গুরু ছিলেন, যাঁহার দর্শন অবলম্বন করিয়া মুসলিম সম্প্রদায় দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন,—সেই গ্রীক জ্ঞানবীর আরিষ্টটলের প্রতিভা-জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করিতে পারিতেন না! পক্ষান্তরে, ওমর যুগ-মানব ও জাগ্রত প্রজ্ঞা ছিলেন বলিয়াই গ্রীক বিদ্বান্ ইউক্লিডকেও (Euclid) জ্ঞানের উৎকর্ষে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

---

(১) তারীখ-ই-অল্‌ফী।

(২) নুজহৎ-উল্-আরওয়া।

(৩) ষোড়শ শতাব্দীর লেখক। কবি-বিবরণী লেখক-রূপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কবি-বিবরণী বা চরিতাভিধানের নাম "বাজমারাই"। এই গ্রন্থ তিনি ১০০০ হিজরাব্দে (১৫৯২ খৃঃ) সমাপ্ত করেন। এই চরিতাভিধানখানির পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়ম পাঠাগারে রক্ষিত আছে। সুবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিৎ ডাক্তার চার্লস রিউ তাঁহার পারস্য ও আরব ভাষার পাণ্ডুলিপি তালিকার পরিশিষ্টে এই পাণ্ডুলিপির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) বাজমারাই। (২) নুজহৎ-উল্-আরওয়া।

লুৎফ-উল্লা



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বহুরূপী

গাহানশাহের দরবারে আনন্দরাম যে ভাবে কথা কহিয়া আসিল, তাহাতে কিজিলবাস ও ইরাণী মহলে তাহার খাতের জমিয়া গেল। তাহার উপর তাহাকে যখন সাধারণ কয়েদ-খানায় না লইয়া গিয়া পুরাতন দিল্লীর কাবুল দরওয়াজার পার্শ্বে আলীমর্দ্দান খাঁর প্রাসাদে রাখা হইল, তখন দিল্লীর সকল লোকই মনে করিল যে, বাঙ্গালী আমীর আনন্দরাম রায় রাজা মহারাজার মত খাতের পাইয়াছে। সহরের মহল্লায় মহল্লায় মশহুর হইয়া গেল যে, নুরবাঈকে উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া শাহান-শাহ আনন্দরামকে নজরবন্দী মাত্র করিয়াছেন। তখন ভারত-বর্ষে, বিশেষতঃ দিল্লীতে হিন্দুস্থানী মুসলমানের এমনই দুরবস্থা হইয়াছিল যে, যখন গুজব উঠিল যে, এত দিন হেলিয়া দুলিয়া প্রজাপতি উড়াইয়া দিয়া নুরবাঈ গোলাপ অবশেষে এক বাঙ্গা-লীর সঙ্গে মজিয়াছে, তখন নুরবাঈএর মাশুকের দল কেহ তাবিজ কিনিল, কেহ বা নিজামুদ্দিন অথবা কুতুব শরিফে চিল্লা বাঁধিতে গেল, অবশিষ্ট দুই এক জন প্রকাশ্য রাজপথে হায় হায় করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

আনন্দরাম প্রথম দিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিল না, মুসলমানে তাহার খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছিল বলিয়া তাহা স্পর্শ করিল না। সংবাদ এক ঘণ্টার মধ্যে নূতন দিল্লীর কোতোয়াল কুলাদ খাঁর নিকটে পৌঁছিল, তিনি ছুটিয়া আসিলেন। নিশ্চয়ই শাহানশাহ মাদির শাহ আনন্দরাম সম্বন্ধে কড়া হুকুম দিয়াছিলেন। কারণ, চাহিবামাত্র সে বন্ধনের ব্রাহ্মণ, জল তুলিবার ব্রাহ্মণ, বাসন মাজিবার হিন্দু চাকর পাইল। নুরবাঈএর পলায়নে কুলাদ খাঁ সাবধান হইয়া গিয়াছিল, সে চৌকীর জমাদারকে বার বার করিয়া সাবধান করিয়া দিয়া গেল যে, রাত্রিকালে বন্দী অথবা তাহার কোন পরিচারক ঘরের বাহির হইতে না পারে এবং প্রত্যেককে যেন রাত্রিতে স্বতন্ত্র ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। দিনের বেলায় সমস্ত দিন দরজায় ও ছাদে পাহারা থাকে। সন্ধ্যাবেলায় আনন্দরাম স্নান করিয়া ভোজন করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে মুসলমান জমাদারের সম্মুখে মৎস্য আনিবার জন্য একটি আসরফী দিলেন। তাহার পরিচারক কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেল, জমাদার তাহাতে আপত্তি করিল না। সে যখন গেল, তখন জমাদার যদি তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিত, তাহা হইলে তাহার নিজের মাথাটা পরে বাঁচিতে পারিত।

প্রভাতে ঊষাকালের নমাজের আজান পড়িবার পূর্ব্বে পরি-চারক ও ব্রাহ্মণ দুইটি ঝোড়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পরে আনন্দরামের কার্য্যকলাপ দেখিয়া চৌকীর সিপা-হীরা বিস্মিত হইয়া জমাদারকে ডাকিয়া তুলিল। আনন্দরাম ঊষাকালে স্নান করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিল। আলীমর্দ্দান খাঁর প্রাসাদের অঙ্গনে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া হোম করিতে বসিল। হঠাৎ তীব্র কাশ্মীরী আরকের গন্ধে কিজিলবাস ও ইরাণী সিপাহী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল, যে মহামূল্য দ্রব্য খোদা মানব-কণ্ঠের জন্য সৃষ্টি করিয়াও নিষেধ করিয়াছেন, এই উন্মাদ কাফের তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিতেছে। জমাদার উঠিয়া বুঝিল যে, এই দুষ্ট কাফের পলাইবার চেষ্টায় ভূত-প্রেত ডাকিতেছে। আবার কুলাদ খাঁর নিকটে খবর গেল, তিনি দূর হইতে আনন্দরামের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ডবল পাহারার হুকুম দিয়া গেলেন এবং সহরে ফিরিয়া দুই চারি জন হিন্দু পণ্ডিতকে ডাকিয়া বুঝিলেন যে, ইহা ভূতের পূজা নহে, হিন্দুর এক দেবতার পূজা। তথাপি আনন্দরাম যাহাতে ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া না যায়, তাহার জন্য ছাদের উপরে শক্ত জাল টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। দ্বিপ্রহরেও হোম চলিতে লাগিল, অগ্নিতে দিবার কাশ্মীরী আরক ফুরাইয়া গেল এবং যে ব্রাহ্মণ মৎস্য কিনিতে গিয়াছিল, সে আবার আসরফী লইয়া বাজারে গেল। সে যখন চারি ঝাঁকা চামড়ার বোতল আনিল, তখন ডবল পাহারা পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। পূরা এক বোতল আরক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া জাল পোড়াইয়া দিল। জমাদার যখন জাল রক্ষা করিতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে এক জন ব্রাহ্মণ প্রসাদ বণ্টন করিতে গেল। কিজিলবাস ও ইরাণী পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিল। কারণ, তাহা ছাগ ও মেষমাংসের কোপ্তা ও অপর্য্যাপ্ত সুরা। জমাদার ফিরিয়া আসিতে আসিতে প্রসাদ শেষ হইয়া গেল। তখন জমাদার বিপদ গণিল। কারণ, পাহারায় মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তীব্র কাশ্মীরী আরক পুষ্পিত হইয়া ফলবান্ হইল। সিপাহীরা কেহ নিদ্রিত হইয়া পড়িল, কেহ বা গান ধরিল। এমন লোক রহিল না যে, কুলাদ খাঁর নিকটে সংবাদ লইয়া যায়। তখনও হোম চলিতেছে এবং অন্ধকারের অবতরণে প্রসাদ নিয়মিতরূপে সকল লোকের নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে। জমাদার দেখিল যে, আনন্দরাম তখনও হোম করিতেছেন।

হঠাৎ নীচে এক কক্ষে সারেঙ্গী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে

রমণী-কণ্ঠে গজল গীত হইল। জমাদার আশ্চর্য্য হইয়া নীচে আসিল। অন্ধকারে কে তাহাকে ধরিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। যে ব্রাহ্মণ অন্ধকারে আনন্দরাম সাজিয়া হোম করিতেছিল, সে উঠিয়া আসিল.আনন্দরাম জমাদারকে হোমকুণ্ডের সম্মুখে বসাইয়া বাকী প্রসাদ বাঁটিয়া দিল। প্রথম প্রহর রাত্রিতে যখন পাহারার বদলী আসিল, তখন তাহাদের জমাদার দেখিল যে, পাখী উড়িয়া গিয়াছে ; পাহারার সমস্ত সিপাহী নেশায় অচেতন, কেবল জমাদার হিন্দু সাজিয়া রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ভস্মস্তূপের সম্মুখে বসিয়া আছে।

তৎক্ষণাৎ কুলাদ খাঁর নিকটে সওয়ার ছুটিল। তিনি আসিলেন এবং দিনের পাহারার জমাদারের নিকট সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার হুকুমে হাজার সওয়ার চারিদিকে বিভক্ত হইয়া মথুরার পথে ছুটিল। শাহানশাহের নিকট খবর গেল যে, বাঙ্গালী আমীর আনন্দরাম রায় পাহারার সিপাহীদিগকে মাতাল করিয়া পলাইয়াছে। জমাদারের প্রাণদণ্ড হইল এবং সিপাহীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কোতোয়ালীর কারাগারে পড়িয়া রহিল।

আনন্দরাম কিন্তু মথুরার পথে যায় নাই, সে সহরতলী দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পাহাড়ীধিরাজে আশ্রয় পাইয়াছিল। ইহারই মধ্যে ব্রাহ্মণ দুই জন ও পরিচারক তাহার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ. তাহারা কাঙ্গড়ার ব্রাহ্মণ এবং জ্বালামুখীর উপাসক শাক্ত। তাহাদিগকে পাচকুয়ায় পাঞ্জাবীদের মধ্যে রাখিয়া আনন্দরাম নিজে আজমীর ফটক দিয়া নূতন দিল্লীতে প্রবেশ করিল। পথে চলিতে চলিতে সে উপরের পোষাকটা খুলিয়া ফেলিল, তাহার অঙ্গে তখন চারিপ্রস্থ পোষাক ছিল। সে যে পোষাক পরিয়া দরবারে গিয়াছিল, তাহা জমাদারকে পরাইয়া দিয়াছিল এবং তাহার নিম্নে মুসলমানী পোষাক ছিল। সে এখন মুসলমানী পোষাক ছাড়িয়া হিন্দু রমণী সাজিল এবং পূর্ব্বের বাসায় গিয়া প্রতিবেশীদের নিকট নিজের পরিচয় দিয়া পদ্মিনী ও লক্ষ্মীর সংবাদ লইল। সে শুনিল যে, পদ্মিনী ও লক্ষ্মী সহরের ভিতর ফতেপুরী মস্‌জেদে আবদ্ধ আছে।

সেই রাত্রিতে সে প্রতিবেশীদের নিকট হইতে একটা সারেঙ্গী চাহিয়া ফতেপুরী মহল্লায় গেল এবং মসজেদের দুয়ারে বসিয়া গান গাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। কতকগুলি গান ফার্‌সী গজল, দুই একটা হিন্দী এবং মাঝে মাঝে এক একটা বাঙ্গালা। ক্রমে ফতেপুরী মস্‌জেদের দক্ষিণদিকে সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটা বড় বাড়ীর বাতায়ন-পথে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, আবার সরিয়া গেল। আনন্দরাম সঙ্কেত বুঝিল। সে যখন লক্ষ্মীদের বাড়ীতে থাকিত, তখন এসরাজ বা সারেঙ্গী বাজাইয়া গান গাহিত এবং লক্ষ্মীকে দুই একটা বাঙ্গালা গান শিখাইয়াছিল। রাত্রি শেষ হইলে সে বুর্‌খা ঢাকা দিয়া মস্‌জেদের এক কোণে পড়িয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জিন

প্রভাত আসিল, অশেষ দুরবস্থা সত্ত্বও দিল্লীর পথে অসংখ্য লোক চলিতে আরম্ভ করিল। বণিক দোকান খুলিল, কুঞ্জী বা তরকারীওয়ালী বাড়ী বাড়ী ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দরাম বেলায় উঠিয়া বুর্‌খা ঢাকা দিয়া ফতেপুরী মস্‌জেদের চারিদিকের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। শেষ রাত্রিতে যে বৃহৎ অট্টালিকার বাতায়নে প্রদীপ জ্বলিয়া আবার সরিয়া গিয়াছিল, তাহার দুয়ারে গিয়া আনন্দরাম দেখিল যে, কোতোয়ালীর পাহারা দাঁড়াইয়া আছে। অনেক মিনতি করিয়াও ভিক্ষা চাহিয়া সে কেবল গালি খাইল, এক জন সিপাহী তাহাকে একপাটি ছেঁড়া জুতা ছুড়িয়া মারিল ; কিন্তু তাহাতেও সে সরিল না, পথের ধূলায় বসিয়া বুর্‌খার ভিতর হইতে সারেঙ্গীটী বাহির করিয়া গজল গাহিতে আরম্ভ করিল। গলিতে লোক জমিয়া গেল, সিপাহী চারি জন পরমানন্দে খাটিয়ার উপরে বসিয়া সঙ্গীত-সুধা উপভোগ করিতে আরম্ভ করিল। বেহই দেখিল না যে, পদ্মিনী ও লক্ষ্মী উপরের বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গজল শেষ হইতেই আনন্দরাম হঠাৎ একটা বাঙ্গালা গান ধরিল, সেটা কৃষ্ণবিষয়ক ; গোকুলের ধূলা উড়াইয়া ব্রজের পথে গোরু যখন গৃহে ফিরিবে, তখন শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিবে, তখন গোপললনার মন আকুল হইয়া যমুনাপুলিনের মালতী-বিতানে ছুটিবে ; ইত্যাদি।

স্পষ্ট বাঙ্গালা কথায় কৃষ্ণবিষয়ক গান গাহিয়া আনন্দরাম একটা হিন্দী গান ধরিল, দুই এক জন তাহার সম্মুখে দুই একটা পয়সা ফেলিয়া দিল, সিপাহীরা কুৎসিত পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল, আনন্দরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। সমস্ত দিন সে কি করিল, তাহার সন্ধান কেহ রাখিল না। যে কিজিলবাস যুবা তাহার যৌবনের ভরা হৃদয়ের প্রেম প্রথমে স্বর্গগত চাচীর চরণে সমর্পণ করিয়া পরে পদ্মিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আনন্দরামের দুর্ভাগ্য বশতঃ সে গলির ভিতরে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। আনন্দরামকে সে চিনিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদ্মিনী যখন বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন কিজিলবাস তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল ; দেখিয়াই তাহার ক্ষুধা আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। গান শেষ হইলে সে সিপাহী চারি জনের সহিত আলাপ করিতে বসিয়া গেল, এক প্রহর ধরিয়া তাহাদের হুঁকায় তামাক খাইল। সিপাহীরা কোতোয়ালীর সিপাহী, সুতরাং ভারতবাসী, তাহারা নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া নাদির শাহের সিপাহীকে খাতের করিল। কিজিলবাস যখন তাহাদের অনুমতি না লইয়াই উপরে উঠিয়া গেল, এবং লক্ষ্মী ও পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহীকে ঘরের বাহিরে আসিতে হুকুম করিল, তখন পাহারার সিপাহীরা কোনই আপত্তি করিল না। পদ্মিনী ও লক্ষ্মী আপাদমস্তক বস্ত্র জড়াইয়া তাহার হুকুমে ঘরের বাহিরে আসিল। কিজিলবাস সেই দুই দৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। আনন্দরামের গলার স্বাওয়াজ পাইয়া এবং পরে বাঙ্গালা গান শুনিয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই লক্ষ্মী ঘরের ভিতরে নৃত্য করিতেছিল। কিজিলবাস যখন উপরে আসে, তখন সে তাহাদের কথা না বুঝিতে পারিলেও এটা বুঝিয়াছিল যে, বন্দিনীদের কোন উল্লাসের কারণ হইয়াছে। সে নীচে নামিয়া গিয়া কোতোয়ালীতে চলিয়া গেল এবং বিকালবেলায় সেই বাড়ীতে পাহারায় থাকিবার হুকুম কুলাদ খাঁর নিকট হইতে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

প্রতিশ্রুতি অনুসারে আনন্দরাম আলীমর্দ্দান খাঁর প্রাণ

হইতে পলায়ন করিলেও নাদিরশাহ পদ্মিনীদের উপরে কোনও অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু ভয় পাইয়া কোতোয়াল কুলাদ খাঁ ফতেপুরী মহল্লায় পাহারা বসাইয়াছিলেন। চারি জন সিপাহী পদ্মিনীদের বাড়ীতে বসিয়া থাকিত, এখন তাহাদের উপরে ষোল জন সওয়ার চারি দলে বিভক্ত হইয়া দিন-রাত্রি ফতেপুরী মহল্লার চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্ণে পাহারা বদলাইয়া গেল, পদ্মিনীদের বাড়ীর চারি জন সিপাহীর পরিবর্ত্তে পাঁচ জন আসিল, তাহারা আসিবার অল্পক্ষণ পরেই গলির মোড়ে এক জন মেওরাটী সাপুড়ে তুবড়ী বাজাইয়া সাপ খেলাইতে আরম্ভ করিল। দুই এক বাড়ী সাপ খেলাইয়া সাপুড়েরা অযাচিতভাবে পদ্মিনীদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া জুটিয়া গেল। তাহারা সংখ্যায় চারি জন ; কিন্তু কেবল এক জন বাজাইল, বাকী তিন জন পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। ফতেপুরী মহল্লা জনাকীর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এতক্ষণ ধরিয়া তুবড়ী বাজনা শুনিয়াও গলিতে লোক জমিল না। পাহারার সিপাহীরা তখন খাটিয়া ছাড়িয়া বাহির হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, গলির বাহিরে প্রত্যেক মোড়ে দুই জন সশস্ত্র হিন্দু মুষলধারী দাঁড়াইয়া আছে। সাপ খেলাইতে খেলাইতে হঠাৎ সাপুড়ে তুবড়ী বাজান বন্ধ করিল, বৃহদাকার কৃষ্ণসর্প গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন পিছনের এক জন একটা বাঁশের বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল, সর্প মোহিত হইয়া দুলিতে লাগিল। বাঁশীর রব শুনিয়া লক্ষ্মী ছুটিয়া বাতায়নে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বংশীবাদক ঈষৎ হাসিল,লক্ষ্মী সরিয়া গেল। হঠাৎ বংশীরব থামিল, সাপুড়ে সাপ ঝাঁকায় বন্ধ করিয়া ফেলিল,চকিতের মধ্যে চারি জন লাফাইয়া খাটিয়ার উপরে গিয়া পড়িল। তাহারা চারি জন, কিন্তু সিপাহীরা পাঁচ জন, সুতরাং সিপাহীদিগকে আয়ত্ত করিতে সময় লাগিল। এক জন হিন্দুস্থানী সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন পদ্মিনী, লক্ষ্মী ও তাহাদের পিতামহী প্রস্তুত হইয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুইজন সিপাহী জখম হইল, এক জন সাপুড়ের মাথার পাগড়ী খুলিয়া যাইতে তাহার পরচুলা খুলিয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া কিজিলবাস চিনিল এবং উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। কারণ, সে আনন্দরাম। আনন্দরাম ও তাহার সঙ্গীরা পাঁচ জন সিপাহীকে আয়ত্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাদের চোখ ও মুখে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া তাহারা লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহীকে পুরুষের পোষাক পরাইয়া বাড়ীর বাহিরে লইয়া গেল। পল্লীর হিন্দু বা মুসলমান কেহই সিপাহীদের সাহায্য করিতে আসিল না। গলির মোড়ে যে কয় জন সওয়ার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা অনন্দরামের দলকে বাহির হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। মস্‌জেদের পশ্চিমদিকে এক জন সওয়ার সাত আটটা ঘোড়া লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আনন্দরাম ও তাহার সঙ্গীরা তাহার নিকটে গিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল, আনন্দরাম পদ্মিনীকে তাহার পিছনে উঠাইয়া লইল, বাকী দুই জন তাহার পিতামহীকে ও লক্ষ্মীকে নিজেদের পিছনে লইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। অন্ধকারে কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল না। তাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া কাবুল দরওয়াজার দিকে চলিয়া গেল।

কাবুল দরওয়াজায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে দলের পশু ও মানুষের একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঘোড়াগুলি পথের অন্ধকারে খচ্চর হইয়া উঠিল, স্ত্রীলোকগুলি তাহাদের পৃষ্ঠে ময়লা কাপড়ের বস্তা ও পুরুষগণ সংখ্যায় দুই জন এবং রজক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে কাবুল ফটক পার হইয়া কর্ণাল ও লাহোরের পথে বাহির হইয়া গেল। তাহারা ফটকের আলো ছাড়িয়া কিছু দূরে চলিয়া যাইবার পরে অন্ধকার হইতে অনেক লোক আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। দুই জন রজকের মধ্যে এক জন খচ্চর লইয়া দিল্লী সত্বরে ফিরিয়া গেল। সে পাহাড়ীধিরাজের এক জন গুজর এবং সাপ খেলাইতে জানিত। যাহারা ফটকের বাহিরে ছিল, তাহারা সকলেই পাহাড়গঞ্জ ও জয়সিংহপুরার হিন্দু। তাহারা আনন্দরামকে শহর ঘুরিয়া তাহাদের গ্রামে যাইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু আনন্দরাম তাহাদিগের মধ্যে মাত্র এক জনকে লইয়া লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহীর সহিত দক্ষিণদিকে যাত্রা করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

দিল্লীর সহরময় যখন সোরগোল উঠিল যে, বাঙ্গালী জীন হাওয়া হইয়া উড়িয়া গিয়াছে এবং নিজের হিন্দু কসবীগুলিকেও লইয়া গিয়াছে, তখন হিন্দু ও মুসলমানে একটা দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইল। পাহাড়গঞ্জ, পাঁচকুয়া প্রভৃতি স্থানের পঞ্জাবী হিন্দুরা বলিতে আরম্ভ করিল যে, বাঙ্গালী আমীর আনন্দরাম রায় কালীমাতার পূজা করিয়া দেবানুগ্রহে অদৃশ্য হইয়া বৃদ্ধা হিন্দু কুলমহিলা এবং তাহার অনাথা পৌত্রী দুইটিকে নরক সদৃশ ইরাণী মুসলমানের প্রেম-সম্ভাষণ হইতে রক্ষা করিয়াছে ; কিন্তু দিল্লীর দীর্ঘশ্মশ্রু দীর্ঘকায় পাঠান, সৈয়দ ও মোগল বৃদ্ধরা একবাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল যে, বাঙ্গালী আমীর হয় সয়তান, না হয় জীন ; কারণ,সে যে ভাবে নিশানা না রাখিয়া স্ত্রীলোক তিনটিকে লইয়া গিয়াছে, তাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ফল কথা, আনন্দরাম, লক্ষ্মী, পদ্মিনী ও তাহাদের পিতামহী দিল্লী হইতে পরিষ্কার সরিয়া গেল। হিন্দুস্থানী রমণী-রূপের নিদর্শন সংগ্রহে উৎসুক এক দল কিজিলবাস সেই সময়ে দিল্লীর মহল্লায় মহল্লায় ছড়াইয়া পড়ায় সেই সময়ে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ সহসা মিটিয়া গেল। কারণ, বিদেশীয় যখন ভারতবর্ষে রমণী রূপের সন্ধানে নির্গত হয়, তখন তাহারা সৈয়দ বা মোগল বাছিয়া রাখিয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-পত্নী লইয়া যায় না। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর হিন্দু, মুসলমান, এমন কি, মোগল সম্রাটবংশীয় মির্জ্জা ইলাহীবখ্‌স্ পর্য্যন্ত তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে আনন্দরাম ও তাহার সঙ্গী যখন দিল্লী হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাদশাহী সড়ক প্রায় এক ক্রোশ বামে রাখিয়া চলিতেছিল, তখন আনন্দরামকে চিনিয়া উঠা দুঃসাধ্য তাহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, হজ-প্রত্যাগত মুসলমানের উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী দেখিয়া কেহই তাহাকে সুবা বাঙ্গালা চাকলা মুরশিদাবাদনিবাসী বাঙ্গালী বাবু বলিয়া চিনিতে পারিত না। লক্ষ্মীর পিতামহী ও পদ্মিনী সবুজ রঙের মুসলমানী

পোষাক পরিয়া, মাথায় একটা সবুজ রঙের তাজ দিয়া মুখ ঢুলিয়া যাইতেছিল। দ্বিপ্রহরে প্রখর তপনতপ্ত শূন্য রাজপথে হঠাৎ সারেঙ্গী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চিরাতৃপ্ত বাসনা-প্রমথিত হৃদয়ের প্রবল তৃষ্ণাদীপ্ত মথ্‌কীর গজল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। আলমগীরের চিরকুমারী কন্যা জেব-উন্নিসা বেগম চিরসঞ্চিত কলুষ-রাশির প্রায়শ্চিত্তরূপে যে সঙ্গীত-সুধা-লহরী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, ধূলিধূসরিত জনশূন্য রাজপথে কে তাহা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল? সে কণ্ঠস্বর আনন্দরামের পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত আর সকলেরই পরিচিত। লক্ষ্মী আনন্দরামের মুখের দিকে চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে হাজীর দল বিনা বাক্যব্যয়ে রাজপথের দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইল। তাহারা যখন বাদশাহী সড়কে আসিয়া পৌঁছিল, তখন আনন্দরামের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতেছে।

তালকুঞ্জের স্বল্প ছায়ায় মলিন-বেশধারী এক উজ্জ্বলকান্তি যুবা বসিয়া সারেঙ্গ বাজাইতেছে এবং তাহার পার্শ্বে বসিয়া এক অপরূপ-রূপসী কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে গীত গাহিতেছে। তখন আনন্দরাম ভুলিয়া গেল যে, সে হজ-প্রত্যাগত অশীতিপর মুসলমান, লক্ষ্মী ভুলিয়া গেল যে, সে সম্ভ্রান্ত মুসলমান কুলকুমারী, একলক্ষে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সে পুরুষ ও রমণীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল, কিন্তু ভিখারিণীরূপী নূরবাঈ তাহাকে চিনিতে পারিল না; সে বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সাহেব, সাহেব, আমি ভিখারিণী, আপনার কন্যার বয়সী।" আনন্দরাম যখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বহিন্, তুমি যদি ভিখারিণী হও, তা হ'লে আমিই তোমাকে ভিখারিণী করেছি। তোমায় বাদশাহের দৌলত থেকে ছিনিয়ে এনে আমিই তোমাকে পথের ধূলায় বসিয়েছি।" তখনও নূরবাঈ তাহাকে চিনিতে পারিল না। এই অবসরে লক্ষ্মী অনেক কষ্টে তাহার ঘোড়া হইতে নামিয়া যখন তাহার ক্ষুদ্র হস্ত দুইটি দিয়া নূরবাঈয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিল, তখন সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁ বলিয়া উঠিলেন, "বাবুজী!" আনন্দরাম তখন ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "জনাব, এ কি? আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" তখন নূরবাঈয়ের চক্ষু দিয়া জল বাহির হইল। আনন্দরাম তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও পলায়ন এবং লক্ষ্মীদের মুক্তির কথা বলিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বহিন্, তোমরা এ ভাবে কোথায় যাচ্ছ?" তখন স্মিতবদনে মাথার বুর্‌খা খুলিয়া ফেলিয়া নূরবাঈ বলিল, "ভাই সাহেব, যে ভুল করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি।" আনন্দরাম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নূরবাঈ বলিতে লাগিল, "ভাই, যত দিন দিল্লীতে ছিলাম, তত দিন স্বপ্নের ঘোরে মুগ্ধ ছিলাম, আজ খোদার মেহেরবাণীতে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছে। কে আমি? আমার জন্য শত শত লোকের জীবন কেন যাবে? আমি কস্‌বী, কস্‌বীর কন্যা, অর্থলোভে আমার কস্‌বী মা আমাকে আর এক কস্‌বীর কাছে বিক্রয় করেছিল। যে কস্‌বী আমাকে কিনেছিল, সে আমার রূপ বিক্রয় ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্য অর্থব্যয় করেছিল। আমার কাঁদবার কেহ নাই, ইরাণের বাদশাহ আমাকে ইরাণে ধ'রে নিয়ে গেছে, হিন্দুস্থানে কেহ আমার সম্মান করবে না। অথচ আমার রূপে মোহে ভুলে আমার জন্য শাহানশাহ কত লোকের প্রাণদণ্ড করেছেন। ইরাণী সিপাহী কত শত শত সম্ভ্রান্ত পরিবারে কুলস্ত্রী ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। সাবিত্রীস্বরূপা সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান কুললনার ধর্ম্ম ও জীবন কি কস্‌বীর জীবন অপেক্ষা হীন? সেই শান্ত গুর্জ্জর গ্রামপ্রান্তে বসে যখন শুনতে পেলাম, ভাই আমার, যে আমার জন্য তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত, তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। গোলাপী বহিনের কাছে ছুটী নিয়ে সাহেবজাদাকে সঙ্গে ক'রে তোমাকে মুক্ত করতে দিল্লী চলেছি।" আনন্দরাম বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল এবং নূরবাঈয়ের হস্তদ্বয় ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "বহিন্, বহিন, এই দেখ, আমি মুক্ত, এই দেখ, লক্ষ্মী, পদ্মিনী সকলকে মুক্ত করেছি, তোমাকে আর দিল্লী যেতে হবে না। ফিরে চল।" "আনন্দরামকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া, বুরখার কোণ দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া নূরবাঈ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না ভাই, আমি ফিরে যাব না। খোদার অসীম কৃপায় তোমরা মুক্ত হয়েছ, তোমরা যে যার নিজের দেশে ফিরে যাও। তোমাদের সাহেবজাদাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি বুঝছি, দিল্লী অতি নিকট, কারণ, ঐ দূরে শাহজাহান বাদশাহের জুম্মা মস্‌জেদের মিনার দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে আমি একাই যেতে পারব।"

আনন্দরাম অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু নূরবাঈ বুঝিতে চাহিল না। সে শুনিয়াছিল যে, নাদিরশাহ অনেক ইরাণী সিপাহীর প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। সে কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাহিল না। কোনমতেই যখন নূরবাঈ বুঝিল না, তখন আনন্দরাম আক্রমজমানের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, মস্তপ লম্পট মমতাপুত্রের ভীষণ পরিবর্ত্তন [illegible] ছে। আক্রমজমান কোন তাহার দিকে চাহিয়া [illegible] না উঠিয়াছিল। [illegible] ও কথা কহিলেন না। দেখিয়া আনন্দরাম বুঝিল যে, মৃত সুজাউদ্দীন খাঁর পুত্রের যথার্থ ফিরিয়া আসিয়াছে। পদ্মিনী ও তাহার পিতামহীকে নূরবাঈয়ের নিকট রাখিয়া আনন্দরাম আক্রমজমানকে দূরে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল।

সূর্য্যের তাপ কমিয়া আসিলে মলিনবসনা নূরবাঈ একাকিনী দিল্লীযাত্রা করিল। তাহার সম্মুখে আনন্দরাম অন্য সকলকে অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া মথুরার পথ ধরিলেন। নূরবাঈ দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র সকলেই ঘোড়া ফিরাইল এবং দূরে থাকিয়া নূরবাঈয়ের অনুসরণ করিল। সহসা রাজপথে একটা ধূলার স্তম্ভ দেখা দিল। এক দল অশ্বারোহী আসিয়া নূরবাঈকে বেষ্টন করিয়া, [illegible] হইতে তাহা দেখিয়া আনন্দরাম তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া উত্তর পশ্চিমে চলিয়া গেল এবং সন্ধ্যার পরে পাহাড়গঞ্জে পৌঁছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।



সীবনাঞ্জলি

টিলাহাতা পাঞ্জাবী ঃ—নানা রকমের পাঞ্জাবী হয়। এক একটির পাঞ্জাবীর হাত পরিবর্ত্তনে নামের পরিবর্ত্তন ঘটে। যেমন টিলাহাতা, চুড়িদার, বাবু কপ পাঞ্জাবী ইত্যাদি।

সরঞ্জাম ঃ—(Material) কাপড় ৩½ গজ (সোয়া ৩¼ গজ)।

পাঞ্জাবীর মাপ ঃ—লম্বা—৪০", ছাতি—৩৪", পুট—৭॥", পুট হাতা—৩২", গলা—১৪", মোহরী টিলা-হাতা—১৬"।

পাঞ্জাবী কাটিবার প্রণালী ঃ—যদি ৩৬" ইঞ্চি বহরের কাপড় হয়। কাপড় কাটিবার সময় দেখিতে হইবে, ছাতি কত আছে, সেই মাপে ঘেরের কাপড়কে চওড়ায় দুল ভাঁজ করিয়া যত লম্বা [illegible] তাহা হইতে ১" ইঞ্চি বেশী রাখিয়া দুবল ভাঁজ করিতে [illegible] ভাঁজ করা হইয়া গেলে পাশ কাটিতে হইবে। ক, খ লম্বা ৪০" + ১" = ৪১" ক, গ ছাতির মাপের ½ – ১" = ৭½" ইঞ্চি গ, ঘ ছাড়িয়া মাপের লাইন ঘ নীচে সোজা ভাবে কাপড়ের উপর দাগ কাটিতে হইবে। ঘ, চ পুটের মাপের ৭½" + ½" চ, ঝ সোজা ভাবে গ লাইনের সঙ্গে সংযোগ করিয়া এখন ছাতির মাপ লইতে হইবে। ঘ ঙ ছাতির মাপের ½ অংশ + ২½ = ১২½ ঘ জ ছাতির মাপের ½ অংশ জ বিন্দু খ লাইন হইতে ১" ইঞ্চি উপরে যদি কোণা করি পাঞ্জাবী হয়, খ লাইন হইতে ½" ইঞ্চি নীচে বাঁকা দিয়া ছ জ বাঁকা ভাবে সমবরাবর ১" ইঞ্চি ভিতর দিক চিত্রানুযায়ী দাগিতে হইবে। এখন গলা দাগিতে হইলে ট ঘ গলার মাপের ½ অংশ ক ঠ ৩" ইঞ্চি নীচে চিহ্ন ঠ্ঠা ঠ, ট সংযোগ করিয়া ক লাইন হইতে চ বিন্দু ১" নীচে ছাতির সেইরূপ (Shape) জন্য দাগিয়া চ ও ছ চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে সংযোগ করিয়া এখন ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ লাইন কাটিয়া লইলে পাঞ্জাবীর সাম্‌না ও পেছনের কাটা হইল। এখন উপরকার দুপাত দাগ দেওয়া অংশকে সামনা দাগিতে হইবে। ঠ ১ গলার ¾ অংশ ২¼" ইঞ্চি চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে দাগিয়া কাটিয়া ফেলিবে। চ, ২, ছ মোহড়ায় সেইরূপ (Shape) এর জন্য চিহ্নিত মতে দাগিয়া কাটিয়া লইলে সামনা ও পেছন কাটা শেষ হইল। পাশে যে কাপড় বাড়তি রহিল, তাহা হইতে পাশ পকেট ও বোতামপটী ইত্যাদি সঙ্গাবাদি করিয়া লইতে হইবে।

হাতের অংশ কাটিবার প্রণালী ঃ—যদি ৩৬" ইঞ্চি বহরের কাপড় হয়, তা হ'লে ১ লম্বা পুট বাদ দিয়া লইতে হইবে। মনে করুন, পুট হাতা ৩২" পুট বাদ ৭½ = ২৪½" ইঞ্চি এখন কাপড়ের সেলাই ও কাট-ছাট বাদ দেওয়ার জন্য দেড় ইঞ্চি কাপড় বেশী রাখিতে হইবে, ২৪½ + ১½ = ২৬" ইঞ্চি কাপড়ের উপর এখন ঐ হাত দাগিতে হইবে। প্রথমতঃ কাপড়কে চওড়া দিকে চারি ভাঁজ করিতে হইবে। এখন গ, চ পুট বাদ পুট হাতা ২৬" ঝ ছ যত ইঞ্চি দ, ধ ছাতির মাপে সিকি অংশ চ, ঘ মোহরীর মাপের অর্দ্ধ অংশ ৮ + ½ = ৮½ চ থ চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিতে হইবে। তার পর প, ধ চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিলে পাঞ্জাবীর হাতের অংশ কাটা শেষ হইল।

পাঞ্জাবী সেলাই ঃ—পাঞ্জাবীর সাম্‌নার অংশকে লইয়া কাপড়ের মাঝামাঝি ঠ লাইন হইতে সোজাসুজি কাঁধ হইতে অর্থাৎ ক বিন্দু হইতে ১৬" ইঞ্চি নীচে মাঝখানে কাটিয়া লইয়া বোতামপটী ও কাষঘর পটী কাটিতে হইবে। যেন বাম দিকে বোতামপটী ও ডান দিকে কাষঘরের পটী বসান হয়। এখন পাশের অংশ জুড়িতে হইবে। পাশ জুড়িবার পূর্ব্বে মোহড়ার নীচে ৯" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া তাহা হইতে ৬" ইঞ্চি পর্য্যন্ত পকেটের মুখ বাদ রাখিয়া তার ৩ ইঞ্চি নীচে সেলাই করিয়া নীচের অংশ খোলা রাখিতে

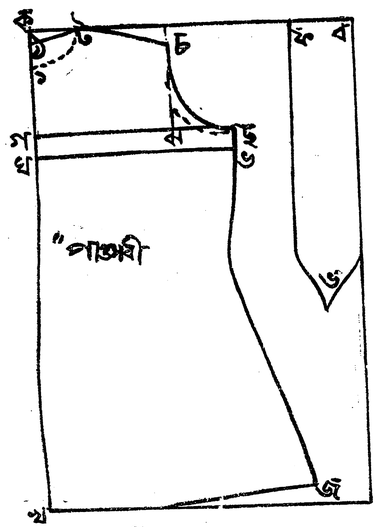

১নং চিত্র

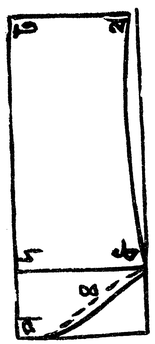

২নং চিত্র



৩নং চিত্র

হইবে, উহাকে কফ বলে। এরূপ দু'দিক সেলাই হইয়া গেলে কাঁধ জুড়িয়া নীচের অংশ সরু হইলে হাতের দ্বারা বা হেমিং যন্ত্র দ্বারা বকেয়া সেলাই করিয়া পাশ ও কাঁধ বকেয়া দিলে সেলাই একরূপ হইল। বাকী ঢিলা হাতা সেলাই করিতে হইলে মোহরীর সেলাই করিয়া হাতের দুই মুখ একসঙ্গে সেলাই দিয়া মোহড়ায় জুড়িয়া লইয়া দুই দিকের পাশ পকেট জুড়িতে হইবে। পাশ পকেট ১৮" ইঞ্চি ফ, ব ও ভ দাগে কাটিয়া ফ, বকে ৬" ইঞ্চি ডবল ভাঁজ করিয়া সেলাই দিয়া দু-পাশে যে পকেটের মুখ রাখা হইয়াছে, সেখানে উপর দিক ড চিহ্ন রাখিয়া সেলাই দিলে পাশ পকেট সেলাই হইল।

এখন সচরাচর বুকপকেট পাঞ্জাবীতে হয় না, যদি বুক-পকেট দেওয়া দরকার হয়, ৭" × ৮½ এক টুকরা কাপড় ১" ইঞ্চি পকেটের মুখের পটী ভাঁজ করিয়া তিন দিক মুড়ি খিলনী দিয়া লইতে হইবে। এইটি মনে থাকে যেন, ডিজা একটি ঘড়ি-পকেট দিতে হইবে। সেইটি এই পকেটটি সঙ্গে ঘড়ি জন্য আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক রাখিয়া সেলাই দি এখন সামনার বাম দিকের কাঁধ হইতে ১০" ইঞ্চি নীচে ক পকেট বসাইতে হইবে। প্রথমতঃ ঘড়ির পকেটটি মুড় কাপড়ের সঙ্গে জুড়িয়া বুকপকেটটি খিলনী দিয়া মুড়ি সেলাই দিলে বুকপকেট ও ঘড়ি-পকেট সেলাই হই তার পর গলার মাপের দেড় ইঞ্চি বেশী একখানি সরু দিয়া ভিতর দিক গলার অংশে বসাইয়া লইলে গলার ভাগে চারিটি ঘর করিয়া বোতামপটি সমস্থানে বোতাম দিলে বা যদি আলগা বোতাম হয়, তাহা হইলে সমস্থানে করিয়া লইলে "ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী" সেলাই সম্পূর্ণ হইল

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র দ

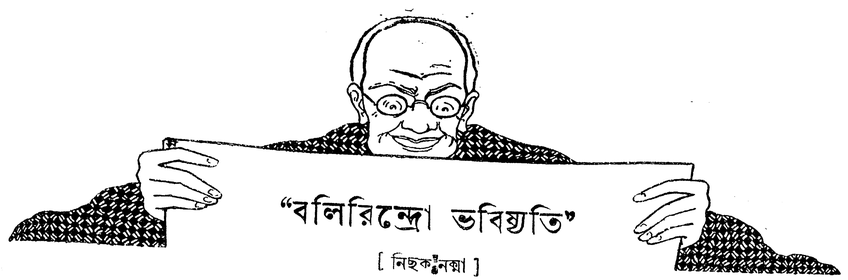

"বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি"

[নিছক নক্সা]

জীবনকৃষ্ণের পুত্র যতীশ্বর বি, এ, পাস্ করিবার পর তাহার পিতা-মাতা পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে খামকা একটা মতভেদ করিয়া বসিলেন। মাতা বলিলেন, সুন্দরী চাই। পিতা বলিলেন, টাকা।

যতির ভগিনীপতি সতীনাথ পরিহাসচ্ছলে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে সন্তঃ সনন্দপ্রাপ্ত শ্যালক বলিল, সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়।

তবে কি পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ ? তোমার কামনা, টাকা ?

তাও নয়।

তাও নয় ? উঃ ভায়া, তা যদি পার, তা হ'লে একটা তারি কিছু হয়। কি হয়, তা বিধাতারও অগোচর। আমার সেই মাতাল শম্ভুর কথা মনে পড়ছে। মদ আর ছোট একটি বুদুর ছিল শম্ভুর চিরসঙ্গী। একদিন রাত্রিতে মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেছে। শম্ভু টল্‌তে টল্‌তে আস্‌ছে। পথে নব্‌নে গায়কীর সঙ্গে দেখা। শম্ভু বলিলেন, এই যে নবীন, তোমার খানেই গেছলুম।

নবীন যোড়হাতে জিজ্ঞাসিল, আজ্ঞে, কি আজ্ঞে ?

শম্ভু ট্যাঁক থেকে চারটি টাকা বা'র ক'রে বল্‌লেন, এক-খানা জম্‌কালো কাপড় চাই। কি জানো বাবা, কোমরে কাপড় থাকে না, কেমন খুলে পড়ে !

নবীন বলিল, যে-আজ্ঞে—

যে-আজ্ঞে নয়, নবীন, তুমি বুঝলে না ! তোমাদের সেই গরদ-ডজা ওরুর নাম কি হে ? সেই—খুব গান বাঁধত ?

নবীন সসম্ভ্রমে মহাপুরুষের উদ্দেশে করযোড়ে প্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে, লালশশী।

লালশশী না তেরেলাল ! উঃ, মাতালের যাশু ছিল ! সেই গানটা শুনেছ ত ?—

"যারে টলিয়ে দিলে নাহি টলে, ভুল্‌লে ভোলে না।
বন্ধু ব'লে বাঁধন দিলে খুল্‌লে খোলে না !"

এ গান বাঁধা কি যার তার কর্ম্ম, নবীন ? আমি তেমনই একখানি কাপড় চাই। যেমন তাঁকে বুনে দিয়েছিলে। দেবে ত ?

যে আজ্ঞে। কি রকম হাতে-বহরে হবে ?

হুঁ ! হাতে-বহরে ! মহা সমস্যার কথা ! দেখ, যে-আজ্ঞে—থুড়ি—নবীন !

নবীন মাতালের হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। বলিল, চাটুয্যে মশায়, মাপটা ?

শম্ভু বলিলেন, মাপ ? বারো হাতও নয়, তেরো হাতও নয় ; সরুও নয়, মোটাও নয়, কিছুই নয়। এই বায়না নাও, তুমি যদি দাও, তোমার বাপের মুখে—আমি যদি নি, আমার বাপের মুখে—ব'লে নবীনের হাতে চারটে চক্‌চকে টাকা দিয়ে মাতাল গাইতে গাইতে চ'লে গেল—"বন্ধু ব'লে বাঁধন দিলে খুল্‌লে খোলে না।" তোমরাও যে ভায়া, সেই রকম দেখছি ! বারো হাতও নয়, তেরো হাতও নয় ; সরুও নয়, মোটাও নয় ; সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়, টাকাও নয়। তবে তোমার কি ?

যতি বলিল, আমি যে কন্যাদায়-নিবারিণী সভার সভ্য। প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করেছি, বরপণ না নিয়ে আমরা প্রত্যেকে দুঃস্থ গৃহস্থকে কন্যাদায়মুক্ত করব।

এক এক জন ক'টি ক'রে মুক্ত করবে, তার কিছু নিয়ম আছে ?

না।

ঠিক্ ঠিক্ ! এই ত চাই ! একেবারে একধার থেকে এন্তার কন্যাদায় উদ্ধার ! উঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের কি অনিষ্টই ক'রে গেছেন !

যতি প্রশ্ন করিল, কেন, তিনি আবার কি করলেন ?

বহু বিবাহ নিবারণ। যদি না করতেন, দেশে কন্যাদায়

ব'লে কিছু থাকৃত ? আর কি পক্ষপাত দেখ, ভাই! পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহ অসঙ্গত, কিন্তু বিধবা বে করুক। তা যাই হ'ক্, আমাকে তোমাদের সভার সভ্য ক'রে নাও না।

কেন বল দিকি ?

পরোপকার, ভায়া, নিছক্ পরোপকার। কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ গৃহস্থদের কৃতার্থ করা। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে যে আমি হতভম্ব হচ্ছি।

কেন বল দিকি ?

আরে ভায়া, বিয়েটা সেনেট্ হল্ থেকেই হওয়া ভাল। একখানি সার্টিফিকেট্ দিয়ে বরণ ক'রে। কিন্তু বিয়ের বাসরে শ্বশুরমশাই যে সার্টিফিকেট্ দেন, সেটিকে বাক্সবন্দী ক'রে রাখা চলে না। চিরজীবন মাথায় ক'রে বেড়াতে হবে। তার পর ইনি আহার করেন, অলঙ্কার পরেন এবং তাঁর বাক্যের শাসন না মান্‌লে সম্মার্জ্জনী ধরেন। শেয়াল ডাক্‌লেই গোয়াল বন্ধ, আগড়ের বাইরে আর পা'টি দেবার যো নেই। সর্ব্বদাই গোলাম হাজির, তবু মন পাওয়া যায় না। ইউনিভার্সিটীর সার্টিফিকেট্ উমেদারী অবস্থায় কদাচ কখন দরকার হয়। কিন্তু এঁর উমেদারীতে জীবন-ভোর।

যতি হাসিয়া কহিল, করি কি! এক দিকে মা, এক দিকে বাবা, 'দোনো পাল্লা ভারি'!

সতী বলিল, সেই পুরানো সঙ্কট একপাশে সিলা (scylla) একপাশে কেরিবডিস্ (charybdis)। কিন্তু এ দের ত দু'জনের দু'মত ?

তা হ'ক্। শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে যে সার্টিফিকেট্ আদায় করতে হবে, এ বিষয়ে উভয়েই একমত। তবে বাবা বলেন, সার্টিফিকেটের সঙ্গে স্কলারশিপ চাই। মা বলেন, সেটা চাই সোনার জলে ছাপা।

দু'জনে কিছু বাজি রেখে কোট্ করেছেন, বল্‌তে পারো ?

তা জানিনি দাদা। তবে আমি মধ্যপথ ধ'রে বাজিমাৎ করবার চেষ্টায় আছি।

কিন্তু বাজিমাৎ করতে যে একেবারে ধাত ছেড়ে যাবে, বন্ধু! হা হতোহস্মি!

ভয় নেই। প্রবাদ আছে জান ত ? যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব। আর ধাত ছাড়লেই বা! তাতেও চিকিৎসা চলে।

হরি-ঈ বল! চিকিৎসা! "যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়াঃ"—নিদানের মতে ততক্ষণ চিকিৎসা।

তবে আর কি! নেহাৎ প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, সূচিকাভরণ আছে।

সূচ ফুট্‌বে ভায়া, সর্ব্বাঙ্গে প্রতি লোমকূপে সূচিকাভরণ হবে। আর কণ্ঠাগত কি বল্‌ছ, বন্ধু! এ-যে "ওষ্ঠাগত প্রাণ মন যোগাতে!" তার পর নিরিন্দ্রিয় ? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এর একটাও তোমার নিজের অধিকারে থাকবে না। হার্ মাজেস্টী এসে সব জীবন-স্বত্ব দখল ক'রে বস্‌বেন। দেখতে হবে তাঁর চোখে। অন্য নারী—পরীই হ'ক্ আর অপ্সরী কেন হ'ক্ না—সুন্দরী দেখবার যো নেই। নাসার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে হবে শ্রীমতীর জন্য, নইলে দম বন্ধ। শুনতে হবে তাঁর কানে, তা গুরুবাক্য হ'ক্ না কেন। আর জিহ্বা ? প্রেয়সীর স্তব-বন্দনা ছাড়া ভগবানের নামটী পর্য্যন্ত করতে পাবে না। তার পর প্রেয়সী যদি কোন তরকারিতে পুড়িয়ে দেন, তা হ'লেও বল্‌তে হবে—বাঃ!

এখনও যে একটা বাকি রইল।

ত্বক্ ? তা হক্ বলতে, ঐ যে সূচিকাভরণ বলেছ, তার মানুষের চামড়া আর তোমার গায় থাক্‌বে না।

এ তোমার হক্ বলা নয়, দাদা, নিন্দা।

আরে নিন্দা কি! শাস্ত্রে এরেই বলে অব্যভিচারিণী ভক্তি। ও কি, উঠছ যে! তন্নামে অরুচি ? বোস, বোস। রোস, শান্তিকে ডাকি, তোমার ব্যাখ্যা শুনুক।

বন্ধু, কেন আর শান্তিভঙ্গ করবে! একে তোমার দিদি মাতার মতভেদ; তার ওপর তোমার ভগ্নী শান্তিমণি যদি বিচ্ছেদ করেন, তা হ'লে তোমার দাঁড়াবার স্থল থাক্‌বে না।

কথোপকথন হইতেছিল, সতীনাথের বাটীতে, তার বৈঠক্‌খানায় বসিয়া। যতি বলিল, খাট্ ভাঙ্গলে ভূমিতে দাঁড়াবার স্থল না থাকে, পথে দাঁড়াব।

উঃ, একেবারে মরিয়া!

যতি ডাকিল, শান্তি!

আধকোটা ফুলের মত একটি কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দাদা!

সতী গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি কি মনে করেছিলে—

শান্তি বলিল, ব্যক্তিবিশেষকে বটে!

শোন, ভায়া, হাতে হাতে প্রমাণ!

যে বয়সে শান্তির বিবাহ হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে স্বামীকে লজ্জা করিবার ভাব তখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। তার পর এখন নূতন করিয়া লজ্জা করিতে লজ্জা করে। বলিল, দাদা, আমি ময়দা মাখি গে, গরম লুচি ভেজে দেব, তুমি খাবে এস। বলিয়া শান্তি আবার ছুটিল। মেয়েটির ভঙ্গী যেন একটি অঙ্গীভূত তরঙ্গ! এক মুহূর্ত্ত স্থির নয়। চক্ষু দুটি যেন নটন-পটু খঞ্জন! ঠোঁট দুটি হাসিতে ফুটিয়া উঠিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে! বরং হাওয়া ধরা যায়, কিন্তু শান্তিকে আবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। যতি তাড়াতাড়ি ডাকিল, ওরে শোন্ শোন্, আমি এখন কিছু খাব না।

সতী কহিল, ইস্! লুচিতে অরুচি! অবস্থা বড় সঙ্গীন! ওগো, তোমার দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন, পাণিগ্রহণ না ক'রে উনি জলগ্রহণ করবেন না। তা ভায়া, না খাও, খাওয়া দেখলে তবু প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয় নেই। বলিয়া সতী যতিকে অন্তঃপুরে টানিয়া লইয়া চলিল।



যতি ও সতী আহারে বসিয়াছে

দুই জনকে আহারে বসাইয়া শান্তি পরিবেষণ করিতে লাগিল। এই সময় "শান্তিদি" বলিয়া অপরাজিতা কলিকার ন্যায় একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইতে যতি অকপট বিস্ময়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল—এ কি, কালো এমন সুন্দর হয়!

কালো কক্ষে পা দিয়াই প্রশ্ন করিল, শান্তিদি, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন ?

শান্তি হাসিয়া বলিল, তোর রূপ দেখবার জন্যে! দাদা, বে করবে ?

সতী কহিল, কাকে ? তোমাকে, না, তোমার সঙ্গিনীকে ?

শান্তি যতগুলি লুচি আনিয়াছিল, রাগ করিয়া সব সতীর পাতে উজাড় করিয়া দিল। সতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, দেখলে ভায়া, মনের মত কথা হয়েছে কি না, তাই সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার!

শান্তি তর্জ্জনী তুলিয়া বলিল, ফের যদি তুমি আমার কথায় কথা কইবে—

সতী তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, তা হ'লে গরম লুচি দিয়ে তোমার মুখ পুড়িয়ে দেব।

শান্তির সঙ্গিনী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। যতির কানে বাজিল যেন জলতরঙ্গের গান।

শান্তি পুনঃ প্রশ্ন করিল, বল না, দাদা, বে করবে কি না ?

যতি অন্যমনস্কে বলিল, হুঁ। তার পর লজ্জিত হইয়া বলিল, দূর পোড়ারমুখি!

শান্তি বলিল, নাম জিজ্ঞাসা কর না, দাদা!

যতি কহিল, তুই কর না, আমার দরকার কি ?

শান্তি হাসিয়া বলিল, বল্ ত ভাই, তোর নাম।

মেয়েটি বলিল, কালো।

শান্তি বলিল, ও কি লো, ভাল নাম বল্। জানিস্‌নি বুঝি ?

ইস্, তা বৈ কি! আমি অপরাজিতা। বানান্ করব ?—অ-প-রা-জি-তা।

আমাদের দেশে উদ্বাহযোগ্যা কন্যার লাঞ্ছনা পদে পদে। প্রথমতঃ, পাত্রী-পক্ষ হইতে মাজা-ঘষা, পুতুল-সাজানো। তার পর পাত্র-পক্ষ হইতে ওঠ-বোস্, চলা-ফেরা, পড়াশোনার পরীক্ষা করা। নাম বলা ও বানান্ করিতে করিতে অপরাজিতার একটা কু-অভ্যাস হইতেছিল, নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বানান্ করিয়া ফেলিত। যতি অন্যমনস্কে কহিল, অপরাজিতা ? সত্য ?

তুমি কি গো, দাদা ? নাম কি মিথ্যা হয় ?

সতী বলিল, হয় না ? শ্বশুর মশায় যে তোমার নাম রেখেছিলেন শান্তি, সেটা কি ভাল কায—

শান্তির কোপ-কটাক্ষে কি লুচির অখণ্ড প্রতাপে সতীর মুখ তখনকার মত বন্ধ হইয়া গেল। আহারান্তে উভয়ে বাহিরে আসিবার পর সতী বলিল, একটা ধন্যবাদও দিলে না, বন্ধু ?

কেন ?

ঠিক্ তোমার প্রতিজ্ঞার মত পাত্রী দেখিয়েছি ব'লে !

আমার কি প্রতিজ্ঞা ?

সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়।

তা বটে ! মেয়ে কার ?

গরীব মিয়ার।

যতির মুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল। বলিল, মুসলমান ?

না হে ! দুঃস্থ গৃহস্থ। তা হ'লে যোগাড় করি ?

তা যা হয়, কর। কিন্তু আমাকে জড়িয়ো না।

আরে রাম রাম ! যে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে, তাকে আবার জড়াবো কি ?

কিন্তু তুমি সে ব্যক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন ?

এক ঢিলে দুই পক্ষী মারব, বন্ধু ! ফকির বাবুকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার করা হবে, আর তোমারও একটা হিল্লে লাগবে।

কিন্তু দায় কেন ?

একে কালো মেয়ে, তাতে রেস্ত নেই। সব সম্বন্ধই ভেঙ্গে যাচ্ছে।

যতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল—লোকের চোখ নেই ! এই মেয়ে কালো ! শ্যামা প্রতিমা !

* * * * *

জীবনকৃষ্ণ উন্নতি করিয়াছেন নিজের চেষ্টায়। তাঁহার মাথায় বিশাল টাক দেখিয়া শত্রুপক্ষ বলেন, ঝাঁকামোট ব'য়ে। মিত্রপক্ষ বলেন, ছোট কপাল ফেঁপে উঠেছে। ও টাক নয়, টাকার মরাই।

ব্যবসায়-সমুদ্রে বিস্তর ঝড়-ঝাপট, ওলট-পালট খেয়ে জীবনকৃষ্ণ যখন দুই পায় ভর দিয়া মাটীর উপর দাঁড়াইলেন, তখন দেখা গেল, তাঁহার অনাহার-ক্লিষ্ট উদর ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে।

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, কিসের সাবধান ডাক্তার বসু ! ওটা মালক্ষ্মীর স্বস্তি-বচন—বাড়ং !

ডাক্তার উত্তর দিলেন, বাড়ং না ডিস্‌পেপসিয়ার আড়ং !

জীবনের গৃহিণীর একটি প্রিয় পরিচারিকা ছিল। অবশ্য পরিচারিকা স্ত্রীলিঙ্গ হয় কি না, তাহা পণ্ডিতগণের বিচার্য্য। যাঁহারা সম্মার্জ্জনী-হস্ত, গাছ-কোমর বাঁধা এই জীবটিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমারই মত সন্দিগ্ধ হইবেন। গৃহিণী ডিস্‌পেপসিয়া শুনিয়া ঝিকে বলিলেন, ওলো, ডাক্তার পেট টিপে ব'লে গেল, কর্ত্তার ভুঁড়ি ডাঁসিয়ে উঠেছে !

কমলার কৃপার অভ্রান্তনিদর্শন ভুঁড়ি এবং চাটুকার। মধুর গন্ধে পিপীলিকা যেমন কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, মা তেমনই তাঁহার বরযাত্রীর দলকে অগ্রে পাঠাইয়া দেন ; পরে স্বয়ং আসিয়া পেটটিতে অধিষ্ঠান করেন। ইহার তথ্য মনস্তত্ত্ববিদ্ আলোচনা করিবেন। যাহা ঘটে, আমি তাহাই লিখিলাম।

কর্ত্তা সম্প্রতি দেশে গিয়াছিলেন। পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া একটু গা-ভার হইয়াছে। পুরোহিত প্রস্তাব করিলেন, দশরূপ চণ্ডীপাঠ, দশহাজার দুর্গানাম জপ আর নারায়ণকে দশসহস্র তুলসী। তার সঙ্গে সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে পারলে ভাল হয়। ওরে, দাওয়ান্‌জী মশায়কে ডাক্ ত !

জীবন ভাবিলেন, সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ যত হ'ক্ না হ'ক, হাল্‌ফিল্ কতকগুলা টাকার শ্রাদ্ধ নিশ্চিত। উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আরে না-না, শ্রাদ্ধ আবার কে করে !

পুরোহিত বলিলেন, সে কি ! আমি রয়েছি কি করতে ! আমি আপনার হয়ে যা করবার করব।

কর্ত্তা বলিলেন, ও কিছু না। দেশে গিয়ে নেয়েছিলুম, পুকুরের জলটা ভারি কি না !

এক নম্বর চাটু বলিল, ভারি ব'লে ভারি ! একটা ঘটি ডুবিয়ে তোলে কার বাবার সাধ্যি !

দুই নম্বর কহিল, ঘটি কি, ভায়া ! আমি গণ্ডূষ করতে পারলুম না, হাত এমনি ভেরে উঠল !

পুরোহিত বলিলেন, তা হ'ক্, ন কারণাৎ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ-কারণ নইলে ক্রিয়া হয় না। তার উপর শাস্ত্রে লিখছে—

জীবনকৃষ্ণ একটু চটিয়া বলিলেন, শাস্ত্রে কি লিখছে ?

লিখছে—শ্রীহরেঃ তুলসীং দত্ত্বাৎ দক্ষিণা দীয়তে যদি—

আরে বাবা, আজ দশ বছর ধ'রে তুলসীও দিচ্ছ, দক্ষিণাও দিচ্ছি, কিছু করতে পারলে ?

সমবেত চাটুত্রয় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, পারলে ?

মানুষমাত্রেরই একটা-না-একটা খেয়াল থাকে। জীবনকৃষ্ণের খেয়াল—জমীদারী। তাঁহার নগদ্ টাকা যথেষ্ট আছে আর জমীদারীও অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ইনি মাটীর দরে মাটী কিনিবার প্রত্যাশী। পুরোহিতকে বলিলেন, বল ছিল, তুমি শালিগরামকে (শালগ্রামকে) তুলসী দেবে, তিনি

রামাকে জমীদারী দেবেন, তা এক ছটাক জমীও ত দ'ল না!

রামায়ণগানের দোহারের মত তিন চাটুকারই সমস্বরে সুর ধরিল—হ'ল না, হ'ল না, হ'ল না রে।

অক্ষমতার আরোপে পুরোহিতও চটিয়া উঠিলেন। আবার চটিলে ইঁহার মুখ দিয়া কেবল তোৎলা কথা বাহির হইত না, অজস্র নিষ্ঠীবন বর্ষিত হইত। চাটুত্রয়ের ইহা বিলক্ষণ জানা ছিল, তিন হাত তফাতে সরিয়া বসিল।

পুরোহিত কহিলেন, হ-হ হ'ল না ? সো-যো-যোগাযোগ হয় নি ?

কর্ত্তা বিস্মিত হইয়া পুরোহিতের মুখের পানে চাহিলেন। জমীদারী বিক্রয়ের জন্য মাম্‌লা-মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত এক জমীদারের আজ আসিবার কথা আছে। এ-বেটা জানিল কি করিয়া ?

পুরোহিত নিষ্ঠীবন বর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হ-হ-হ'ল না ? কে-কে-কে বলে ? শ-শ-শস্যার-তু-তু-তুল্যী কথা কয়। মি-মি-মিত্রদের ছেলের না-না-নামে-দি-দি-দিলুম—তার ড-ড-ড-ড-ড-ড-ডবল্ নিমোনিয়া—

এক চাটু তাহার পরিণাম জানিত। আরও একটু দূরে সরিয়া বলিল, তার ফল কি হ'ল ?

পুরোহিত ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, ফ-ফ-ফল কি হ'ল ! মা-মা-মারা গেল, সে-সে কি আ-আমার দোষ ? তা-তা-তার পে-পে-পেরমাই ফুরিয়েছিল।

তবে ?

ত-ত-ত-তবে, রো-রো-রোগ ত সার্‌লো ?

তা বটে ! কিন্তু আমাদের কর্ত্তার যোগাযোগ কি হ'ল ?

মূ-মূ-মু-মূ-মূর্খ ! দে-দে-দে-দে-দেহ ত মা-মা-মাটীর ? বলিয়া নিজের পেটের উপর হাত ঘুরাইয়া বলিলেন—বাড়ছে না ?

কর্ত্তা ভাবিলেন, আগতপ্রায় জমীদার নিশাকর বাবুর কথাটা বলিলে পুরোহিত একটা ফ্যারেক্কাও তুলিবে এবং তজ্জন্য একটা লম্বা ফর্দ্দিও বাহির হইবে। বলিলেন, তোমার নোড়ানুড়ির কর্ম্ম নয়, ঠাকুর ! ঢাল-খাড়া চাই।

রাম-রাম বলিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পুরোহিত মা-জননীর কাছে দরবার করিতে গেলেন।

ইতোমধ্যে মা-জননীর পোষা ছাগল ঝাম্‌রু বৈঠক্‌খানায় এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। হঠাৎ পার্শ্বে অর্‌র্‌ শব্দ শুনিয়া একনম্বর চাটু ফিরিয়া দেখিল, মা-জননীর পরম প্রিয় রামছাগল ঝাম্‌রু তাহার উত্তরীয়ের অর্দ্ধাংশ উদরস্থ করিয়া বাকিটার জন্য বলিতেছে—সর্‌র্‌ ! চাটুত্রয়



ঝাম্‌রু উত্তরীয়ের অর্দ্ধাংশ উদরস্থ করিতেছে

ইহার দৌরাত্ম্যে যে-যার চাদরগুলির উপর চাপিয়া বসিত। আজ পুরোহিতের নিষ্ঠীবন বর্ষণ আশঙ্কায় সেই যে সরিয়া বসিয়াছিল, অন্যমনস্কতায় চাদর সম্পূর্ণ সাম্‌লাইয়া বসে নাই। দৈবের নির্ব্বন্ধ ! ঝাম্‌রু কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিয়া রক্ষকের হাত ছাড়াইয়া একবারে বৈঠকখানায় উপস্থিত। জীবনকৃষ্ণের সহিত ঝাম্‌রুর প্রাণান্তিক শত্রুতা। রক্ষকের হাত হইতে দড়ি ছাড়াইতে পারিলেই ঝাম্‌রু তিন লাফে তৎক্ষণাৎ কর্ত্তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। অভিপ্রায় —রণং দেহি, দ্বিষো জহি।

মানুষের চোখ কথা কয় এবং জীব-জন্তু তাহা বুঝে। ঝাম্‌রু যখন শিশু, তাহার নধর পুষ্ট কান্তি দেখিয়া জীবনকৃষ্ণের জিহ্বা অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল। তিনি নিরতিশয় সরস বাক্যে বলিলেন, আর একটু বড় হ'ক্ ! মা-জননী তৎক্ষণাৎ ঝাম্‌রুকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। বাড়ীতে শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠা হইল এবং চণ্ডীপাঠ বন্ধ হইয়া গেল। জীবনের উদর-স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ঝাম্‌রুর ক্রমে শৃঙ্গোদ্গম হইল। কর্ত্তার সে লালা-নিঃসরণ সকলে ভুলিয়া গেল। ভুলিল না কেবল ঝাম্‌রু। একদিন জীবন অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন। ঝাম্‌রু নবোদ্গত শৃঙ্গের দ্বারা তাঁহার ভুঁড়ি আলোড়িত করিতে লাগিল। কে কুতুকাতু দিতেছে মনে করিয়া জীবন হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, তোর পায় পড়ি, তোর পায় পড়ি। ঝাম্‌রু ভাবিল, তিনি তাহাকে উৎসাহ দিতেছেন। ক্রমে ঢু মারিতে সুরু করিল। আর চোখ না মেলিয়া থাকা

যায় না। কিন্তু চোখ মেলিতেই চক্ষুস্থির। দূর-দূর! কিন্তু কে কাকে দূর করে! ঐ নধর নেয়াপাতির ভিতর কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত ঝাম্‌রু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

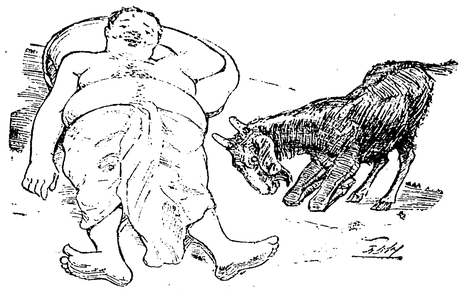

ঝাম্‌রু ভুঁড়িতে মারিতেছে

জীবন ছুটিয়া গিয়া ছাদে উঠিলেন। অধিকন্তু সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গেলেন। ঝাম্‌রু বদ্ধ দ্বারে বার কতক ঢুঁ মারিয়া ছাদের উপর কর্ত্তার পানে চাহিয়া বলিল, তিষ্ঠ! পরক্ষণেই উরুর্ (হুর্‌রে?) বলিয়া দেয়াল বহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সেই অবধি রামছাগলের আওয়াজ শুনিলেই জীবন চকিত হইয়া ভুঁড়ির সাম্‌নে একটি তাকিয়া আড়াল দেন। কে জানে, যদি পক্ক কুষ্মাণ্ড ভ্রমে ছাগপ্রবরের অমৃত-সেবন-ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে! ঝাম্‌রুকে সজুত রাখিবার জন্য জীবন কুকুর পুষিলেন। ঝাম্‌রু তাহাকে দেখিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল। সেই অবধি সে কুকুরকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু জীবন ঝাম্‌রুর উপর যতই বিরূপ হউন, সে যতই দুরন্ত দুর্দ্দান্ত হউক, গৃহিণীর একটিমাত্র কথায় জীবনকে সকল শত্রুতা শিকায় তুলিয়া রাখিতে হইয়াছে। গৃহিণী এক দিন সন, তারিখ, বার, তিথি, মাস, হিসাব করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ঝাম্‌রুর শুভাগমন হইতে সংসারের সকল উন্নতি সূচিত। জীবন মনে মনে সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ঝামরুর এখন অখণ্ড প্রতাপ।

এ দিকে এক নম্বর চাটু কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া বলিল, দেখুন কর্ত্তা, আমার এই সবেধন নীলমণি—

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন, বাপু, আমার যুক্তি যদি শোন, চাদরখানি ভালয় ভালয় ছেড়ে দাও, বাকিটা আর চেপে রেখ না। ও যখন ধরেছে, খাবেই! এখন তোমার শরীরের আধখানা বাঁচাও! কেন, এরই মধ্যে পালোয়ানের (সেই কুকুর) কথা ভুলে গেছ না কি? কর্ত্তার বিশ্বাস, পালোয়ান্ এখনও ঝাম্‌রুর পেটের ভিতর বাস করিতেছে।

এমন সময় সদর দরজায় বাঁশী বাজাইয়া একখানা মোটর দাঁড়াইল এবং অনতি পরেই একটি ভদ্রলোক উপরে উঠিয়া আসিলেন।

জীবন সসম্ভ্রমে গদী হইতে উঠিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন, আস্তাজ্ঞে হ'ক! আমার কি সৌভাগ্য! মহাশয়ের শুভাগমন! ওখানে কেন? উঠে বসুন। আপনি জমীদার!

কর্ত্তা হাত ধরিয়া তুলিয়া ভদ্রলোককে নিজের পার্শ্বে গদীর উপর বসাইলেন এবং হাস্যমুখে বলিলেন, তবে, নিশাকর বাবু—

ভদ্রলোকটি বলিল, আজ্ঞে না, দিবা—

কর্ত্তা বলিলেন, দিবা কি? আপনি জমীদার নিশাকর বাবু নন্?

ব্যক্তি বলিল, আজ্ঞে না, আমি দিবাকর ভট্টাচার্য্য।

জীবনের দারুণ ক্রোধ হইল, এতটা আদর ঠকাইয়া লইয়াছে। তথাপি প্রশ্ন করিলেন, ঠিক্ জানেন, আপনি নিশাকর নন্?

আজ্ঞে হাঁ, ঠিক্ জানি, খুব ভালরকমই জানি, আমি দিবাকর ভট্টাচার্য্য। যদি কেউ বলে দিবু ভট্চায, ত জান্‌বে সে একই ব্যক্তি।

নিশ্চয় আপনি নিশাকর।

কখন না, আমি দিবাকর।

তা হ'লে জমীদারও নন্?

আজ্ঞে না।

তবে কে?

ঘটক।

কর্ত্তা ভাবিলেন, এখনও ভাঁড়াইতেছে। বলিলেন, আপনি মটর চ'ড়ে ঘটকালি করেন?

আজ্ঞে না, হটর হটর ক'রে করি।

তবে মটর কা'র?

আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁর?

জীবন স্বগত—ওঃ, নিশ্চয় নিশাকর পাঠিয়েছে। প্রকাশ্যে—কে পাঠিয়েছেন? জমীদার?

আজ্ঞে না, ফকির।

ফকির? ফকির আবার কে?

জমীদার।

জীবন এবার কৌতূহলে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আরে মশায়, অমন টিপেটিপে কথা ছাড়ছেন কেন? সব খুলে-খেলে ভেঙ্গেই বলুন না। কোথাকার জমীদার?

আজ্ঞে, নি-ভুঁইপুর মহল্ জানা আছে কি?

আছে বৈ কি! নিশ্চয় জানা আছে। কোথায় বলুন দিকি?

আজ্ঞে, পেটুগাখালি পরগণার উত্তর দক্ষিণ কোণে।

ঠিক্ ঠিক্! মনে পড়েছে। তা আপনার আসা হয়েছে কি জন্য?

মহাশয় ত জমীদারী কিন্‌বেন?

আজ্ঞে হাঁ।

ছিঃ!

ছি কি রকম?

আপনার মত লোক জমীদারী কিন্‌বেন কি?

তবে কি কিন্‌ব?

আপনি জমীদার কিন্‌বেন! কায়ের একেবারে খতম ক'রে দিন।

সে কি! আপনাদের ফকির বাবু—

আজ্ঞে হাঁ, ঠিক্ বলেছেন, আমাদের ফকির বাবু। ইচ্ছা করলে আপনিও আপনার ক'রে নিতে পারেন।

বলেন কি মশাই! টাকায় কি মানুষ কেনা যায়?

আজ্ঞে না। মানুষ দিয়ে মানুষ কেনা যায়। আপনার একটি ছেলে আছে না?

তা ত আছে; বি, এ, পাস্।

ও বি, এ, কোন কায়ের নয়।

জীবন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বলেন কি মশায়! অত টাকা খরচ ক'রে বি, এ, পাস্ করালুম—

সব জলে গেছে, মশাই, সব জলে গেছে! বিয়ে দেন নি ত?

না।

এইবার দিয়ে বি, এ, পাস্ সার্থক করুন!

মশাই, ভেঙ্গেই বলুন না!

এ আর বুঝলেন না! তবে যে শুনি, জীবন বাবুর মত বুদ্ধিমান্ নেই।

লোকে তাই বলে না কি?

বলে না! তারা ত নির্ব্বোধ নয়।

কি বলে, কি বলে?

বলে জীবন বাবুর মত বুদ্ধিমান্, অমায়িক, ধর্ম্মভীরু, পরোপকারী, ছাগল—

জীবন মহা গরম হইয়া বলিলেন, ছাগল?

দিবা বলিল, আপনি নয়। ঐ দেখুন না, কার এক পাটী নতুন জুতো চিবুচ্ছে!



ঝাম্‌রু জুতা চিবাইতেছে

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া দিবা আপনার জুতা জোড়াটি তুলিয়া আনিয়া হাতে করিয়া বসিল।

ও-দিকে দুই নম্বর চাটু হায় হায় করিয়া উঠিল।

জীবন ব্যস্ত হইয়া হাঁকডাক্ করিতে লাগিলেন। ঝাম্‌রুর রক্ষক ছিল দুই জন জোয়ান ভোজপুরী। তাহারা ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ঝাম্‌রু সহজে বন্ধন স্বীকার করিল না। মুহূর্ত্তে বৈঠকখানায় একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। হাত-পা-ভাঙ্গা চেয়ার, টেবিল, আল্‌মারী প্রভৃতির স্তূপ হইতে যখন তাহাকে টানিয়া বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল, তাহার শরীরের বহুস্থান নির্লোম হইয়াছে, স্থানে স্থানে রক্তের নির্ঝর বহিতেছে; কিন্তু ঝাম্‌রু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিবিষ্টমনে জুতা চিবাইতেছে!

জীবন দিবাকরকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, ও কিছু নয়। অমন নিত্যই ঘ'টে থাকে। আপনি কি বল্‌ছিলেন?

বল্‌ছিলুম, আপনি জমীদারী কিন্‌বেন কেন, জমীদারকেই কিনে নিন্ না ?

ফকির বাবুকে ?

আজ্ঞে।

কি ক'রে ?

ঐ ত বল্‌লুম, আপনার ছেলেটিকে দিয়ে।

কি পুষ্যিপুত্তুর ?

তা পুষ্যিপুত্তুরই বলুন আর জামাই-ই বলুন। তাঁর একটি কন্যা আছে। ঐ একটিমাত্র মেয়ে। তাঁর যা খুদ-কুঁড়ো আছে, সবই আপনার।

জীবন একটু ধীরে-সুস্থে প্রশ্ন করিলেন, ফকির বাবুর কত আন্দাজ আয় ?

এখন আয়, বছরে বারো হুণ্ডণে চব্বিশ।

লোভ মানুষের দুরন্ত শত্রু। জমীদার কিনিবার লোভে জীবন জিজ্ঞাসাও করিলেন না, চব্বিশ হাজার, কি শ, কি চব্বিশ টাকা। আর দিবাকরও সে প্রশ্ন করিবার অবসর দিল না। বলিল, আয় কি আর রেখেছে মশাই ? লোকটার কি যে বাই ! ছেলেরা মান্ধাতার আমলের সব ডাক্‌টিকিট কেনে জানেন ত ?

জীবন বলিলেন, হাঁ হাঁ, জানি ! আমার ছেলে যতীও যে জমায়। কেন বলুন দিকি ?

আজ্ঞে, শীঘ্রই বোধ হয়, সায়েবরা আইন্‌জারী করবেন যে, ও না হ'লে পূর্ব্বপুরুষদের পিণ্ডদান হবে না।

বলেন কি ! ফকির বাবুও কি তাই কেনেন না কি ?

রামঃ ! তাতে স্যায়না আছে মশায় ! এ খালি জহরৎ কিন্‌ছে ! কোথায় হারুণ-অল্-রশিদের আংটী, কোথায় নুর-জাহানের পায়ের চুটকি, কোথায় কোন্ বেগমের গুষ্টীর পিণ্ডি, এই সব করছে। তবে সস্তাখোর। সে দিন সিরাজের এক পাটী জুতো কিন্‌লে বারো আনায়। তাই ত বল্‌ছিলুম, আপনার মত শক্ত পাল্লায় পড়লে লোকটা ঠিক থাক্‌বে। একটা ঘরও রক্ষা হবে।

জীবন বলিলেন, তা ত হবে ! এখন নগদ্ কি ছাড়ছ বল ?

ঐটি মাপ করতে হবে, গরিব হলেও কুলপ্রথা লঙ্ঘন করবেন না। আপনি অলঙ্কারে পুষিয়ে নেবেন, মশায়। ওঁরা নবাব-সরকারে চাকরী ক'রে জমীদার কি না ! তাঁদের ঘরের অনেক জহরৎও ফকির বাবুর কাছে আছে। সব এই মেয়ে পাবে। সে সবও সেই সেকালের জহরৎ ত ? এখনও ঝক্‌মক্ করছে, মশায় !

দিবাকরের বর্ণনা শুনিয়া জীবনের চক্ষুর্দ্বয় চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

দিবা বলিল, কি আপনি নগদ নগদ করছেন, মশায় ! কত পাবেন ? হাজার ? দু'হাজার ? নয় পাঁচ হাজার ? আর একছড়া মতির মালাতেই যে পাঁচ হুণ্ডণে পঞ্চাশ হাজার মেরে দেবেন !

জীবন লুব্ধ হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ফকির বাবু এখন দেশে না কল্‌কাতায় ?

মেয়ের বে দেবেন ব'লে কল্‌কাতায় বাসা ক'রে আছেন। সে কি বাসা, মশাই ? লোকটা একেবারে অমায়িক, মশায়। পাছে জমীদার ব'লে লোক টের পায়, এ জন্য একখানা বাস ভাড়া করেছেন, তা সে সত্য সত্যই পাখীর বাসা ! পাঁচ জন লোক গেলেই মনে হয়, বাড়ীতে বাইশকোপ হচ্ছে, তাই এত ভীড় ! তবে মোটর চড়া চিরকেলে অভ্যাস, আর মা-লক্ষ্মীর নিত্য গঙ্গাস্নান করেন কি না, তাই গাড়ীখানা রেখেছেন এক বন্ধুর আস্তাবলে ! তাও বটে ! আর অলীকনগরের বাবুরা এঁদের বেজায় শত্রু ! যেখানে সম্বন্ধ হয়, ভাংচী দেয়। তাই ছদ্মবেশে কল্‌কাতায় এসে কায সারবেন, এই মৎলব। তিনি বলেন কি জানেন, মশায় ! বলুন দিকি, কি বলেন ?

জীবন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তা আমি কি ক'রে বলব !

সে কি, মশায় ! ফকির বাবু যে বলেন, জীবন বাবুর মত বুদ্ধিমান্ ভূ-ভারতে নেই ! লোকের মন বুঝতে, মৎলব আঁচতে অদ্বিতীয়। মশায়, গোসাপের চাম্ বেচে পয়সা ! এ কি কথা ! বনে-বাদাড়ে গোসাপ জন্মাচ্ছে, বনের জীবজন্তু খেয়ে মানুষ হচ্ছে ! মরবার সময় চামখানি খুলে দিচ্ছে, জীবনরক্ষার তহবিল্ ভারি হবে ব'লে ! পূর্ব্বজন্মে গোসাপরা আপনার কেউ ছিল, মশায় ! আপনি কি বলেন ?

তা কি ক'রে জান্‌ব ?

সে কি মশায়, আপনি না জানেন কি ? এখন ফকির বাবুর মৎলব কি বলুন ? পারলেন না ? পারলেন না ? এমন পারবার যো নেই মশায় ! এ আর কেউ নয়—ফকির ! তিনি বলেন, সব ত উড়িয়েছি ! এখন সিকিটা গয়না ত রাখতে পারি, সে আমার মেয়ে জামাই বেয়া'য়ের !

বটে ! বটে !

সুধু 'বটে' কি, মশায় ? 'বটে' ত বটেই ! তার ওপরও বটে !

জীবন বলিলেন, তা হ'লে ত লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হচ্ছে !

আপনি যাবেন, তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ! আপনাকে এখানে তিনি বসাবেন কোথা ? তবে হাঁ, দয়া ক'রে তাঁর দেশে নিভুঁইপুরে যদি কখন পায়ের ধূলা দেন—

পায়ের ধূলা কি ভট্‌চায ! তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমিই পবিত্র হব !

সে হ'তে পারে না। তিনিই আস্‌বেন।

অত বড় জমীদার !

জমীদার কি ! তিনি এলে জমীদার ব'লে যদি তাঁকে চিন্‌তে পারেন ত আমি গুণে সাত—

জীবন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ছি ছি ছি, করেন কি ? আপনি ব্রাহ্মণ !

আহাহা—জুতো কেন, মশাই ! মণ্ডা—সাতগণ্ডা মণ্ডা ! দাঁড়ান, আগে শুভ কর্ম্মটা হয়ে যাক্ ! আমি কালই তাঁকে পাঠিয়ে দেব !

দিবাকর উঠিলেন। সভাভঙ্গ হইল। এক নম্বর চাটু আধখানি চাদর ও দুই নম্বর এক পাটি জুতা হাতে গৃহে গেলেন।

* * * *

গৃহ-প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঝাম্‌রুকে দেখিয়াই ফকির বলিলেন, এ ত বড় ঘরোয়ানা দেখছি !

পুত্রের ভাবী শ্বশুরকে দেখিবার নিমিত্ত অদম্য কৌতূহলে জীবনের গৃহিণী দোতলার একটা জানালা দিয়া উঁকি মারিতেছিলেন। এই এক কথায় তাঁহার কান জুড়াইয়া গেল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যদি বধূ করিতে হয়, ইঁহারই কন্যাকে।

জীবন কিন্তু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বড় ঘরোয়ানা ! কি ক'রে জান্‌লেন ?

সে কি, আপনি লক্ষণ না দেখেই জন্ত জানোয়ার পোষেন ?

জীবন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না, তা বলছিনি, লক্ষণ দেখি বৈকি !

আপনি দেখবেন না ত দেখবে কে ! আপনার মত বুদ্ধিমান্, অমায়িক লোক বিরল। আমি দেখেছি, মশাই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যারা বুদ্ধিমান্, তারা অমায়িক হয় না আর আর যারা অমায়িক, তারা বুদ্ধিমান্ হয় না। কেমন ? এ কথা মানেন কি না ?

সংসারে যাঁহারা বুদ্ধিমান্ বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন, এমন আজগবি কথা নাই, যাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। জীবন কথাটা নিরাপত্তিতে মানিয়া লইলেন। কিন্তু প্রশ্ন করিলেন, আপনি কোন্ লক্ষণটা বল্‌ছেন, তা ত বুঝতে পারলাম না।

সে কি ! ঐ গোঁফ ! ছাগল ঢের দেখেছেন, ছাগলদাড়ীও অনেক দেখেছেন, কিন্তু ছাগলের গোঁফ কখন দেখেছেন কি ?

জীবন বলিলেন, ঠিক্ ত ! এটা ত কখন লক্ষ্য করিনি ! কেমন হে ! বলিয়া এক নম্বর, দুই নম্বর চাটুর পানে চাহিলেন।

এক নম্বর সেই ছাগ-ভুক্ত উত্তরীয়ার্দ্ধ এবং দুই নম্বর সেই অর্দ্ধাবশিষ্ট জুতার পাটীটি হাতে করিয়া খালিপায় দাঁড়াইয়া ছিল। অন্তরে প্রবল আশা—কর্ত্তা যদি দয়া করিয়া অর্দ্ধ খণ্ড পূর্ণ করেন। দুই জনেই বিষণ্ণমুখে ঘাড় নাড়িল—না, ছাগলের গোঁফ তাহারা লক্ষ্য করে নাই !

ফকির বলিলেন, শুধু গোঁফ ! আধ-কামানো গোঁফ ! যে ফেশিয়ান্ এখন প্রজাপতি (Butterfly) নামে বাজারে প্রচলিত হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠাতা কে জানেন ?

আজ্ঞে না।

এঁরই বংশের আদি-পুরুষ।

জীবন অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, কও কথা ! তা ত জানিনি ! কি রকম ? কি রকম ?

দক্ষ-প্রজাপতির ছাগমুণ্ড হয়েছিল, স্মরণ আছে কি ?

আজ্ঞে হাঁ। তা বেশ মনে আছে। মহাদেব বর দিলেন, তাইতে ছাগমুণ্ড হ'ল।

আর মশায়, সে গাঁজাখোরটা ত বর দিয়ে পরিবারকে কাঁধে ক'রে নিয়ে নাচতে নাচতে চ'লে গেল। তার পর ? দেবতারা পড়লেন ফাঁপরে। তখন দধীচির ন্যায় পরোপকারী, আপনার এই রামছাগলের আদি-পুরুষ—কি নাম ওর ?

ঝাম্‌রু।

হাঁ ঝাম্‌রু ! ঝাম্‌রুর সাড়ে তিপ্পান্ন কোটি পুরুষের পূর্ব্বে যিনি জন্মেছিলেন, তিনি বল্‌লেন, কুছপরোয়া নেই ! আমার বংশের প্রতিষ্ঠা আর খ্যাতির জন্য আমি মুণ্ডপাত ক'রে আমার মুণ্ডদান করব। তাই হ'ল ! দক্ষ-প্রজাপতি উঠেই ভ্যা ভ্যা ক'রে বল্‌লেন, আজ হ'তে তোমার বংশধরগণ প্রজাপতি-গোঁফ

ধারণ করুক ! সিদ্ধবাক্য ! যেমন মুখ থেকে বেরুনো, আর অমনি ঝামরুর বংশের যে যেখানে ছিল, সকলের মুখে দেখতে দেখতে গোঁফ গজিয়ে উঠল—যেন জমীদারের জমা-ওয়াশীল্-বাকি !

জীবন বলিলেন, বটে, বটে, মশাই, তা ত জানিনি যে, ঝামরুর পেটে এত আছে !

ফকির বলিলেন, ওঁর পেটে যে কি আছে আর কি নাই, তা স্বয়ং বেদব্যাস বল্‌তে পারেন কি না সন্দেহ। সন্দেহ কেন, তিনি পারেন না। পারলে কি তিনি কুরু-পাণ্ডব নিয়েই বই লিখতেন, মশায় ! ঝামরু-ভারত লিখতেন।

জীবন প্রবল বেগে মাথা চালিয়া বলিলেন, লিখ্‌তেনই ত ! এত কি জানি ! আমি গিন্নীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়াই করি।

কদাচ করবেন না ! ওতে প্রমাই ক্ষয় হয়। শোনেন নি ? মনু ব'লে গেছেন, "দম্পতি-কলহেশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—বহু পরমায়ুও ওতে লঘু হয়। এখন আপনার ঝামরুর দাড়ীর বায়নাক্কা শুনুন !

বলুন, মশাই, বলুন !

কোন সময়,—সন-তারিখ আমার ঠিক মনে নাই, তবে টোকা আছে। তা যাক্ !

কোন সময়, নীর ক্ষীর খাজা, মস্তানা মিহিদানা, মৌলানা আব্‌দুল্ ড্যামফুল্ শ্যামশুল্ জাহির জামরুল্ আলি নোয়াখালি, দেরাদুন খাঁ ছিলেন গৌড়ের সম্রাট্।

নাম শুনিয়া জীবন বলিলেন, বাপ্ ! এত বড় নাম !

আজ্ঞে, তবু সবটা বলিনি। কাজি-গাজি-দরবেশ-সন্দেশ-খন্দ্-কালাকন্দ্—এমনি এখনও কত আছে !

এ ত প্রকাণ্ড নাম, মশাই !

আজ্ঞে—তাঁর নাম ছিল যেমন প্রকাণ্ড, দাড়ী ছিল তেমনি ছোট। সম্রাট্ সেই ছোট-দাড়ী বড় করবার জন্য রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ ক'রে প্রাণায়াম আরম্ভ করলেন।

বলেন কি !

আজ্ঞে হাঁ, প্রাণায়াম। তাতে তিনি হলেন সিদ্ধ।

এক নম্বর দেখিল, একে ঝামরুর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ, তার উপর ইনি ইন্ধন দিতেছেন। বলিল, সম্রাট্ সিদ্ধ হলেন ?

কেন হবে না, মশায় ! আলু-পটল-ওল্-কচু সিদ্ধ হ'তে পারে, আর সম্রাট্ সিদ্ধ হ'তে পারেন না ? থাক্ মশায় ! না পারেন, না পারবেন, আর বলায় দরকার নেই ! তবে কর্ত্তা বুঝেছেন, আমি সত্যি বল্‌ছি কি না !

জীবন ধমক্ দিয়া বলিলেন, পারেন, পারেন, খুব পারেন। তুমি বোঝ না-সোঝ না খামকা কথা কও কেন বল দিকি এক নম্বর ?

তার পর ফকিরকে বলিলেন, ও লোক খুব চালাক, ওকে বেকুব।

ফকির বলিলেন, মশায়, ছোট থেকে বড় হয় কি না হয়, আপনিই ত তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ !

সতীনাথ ফকিরকে এ পরিবারের সকল ইতিহাস বলিয়া সকলের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করিয়া দিয়াছেন। ফকির বলিলেন, মশয়, সামান্য পুঁজি নিয়ে এত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ড করতে পারেন যে মহাপুরুষ, তাঁকে সামনে দেখেও যিনি—

এক নম্বর ঘোড় হাত করিল।

বলুন মশায়, আপনি ঝামরুর দাড়ীর কথা।

ফকির অভিমান করিয়া কহিলেন, না, মশায়, থাক্!

না-না, আপনি কার ওপর রাগ্ করছেন ? কেউ না বিশ্বাস করে, আমি করব আর গিন্নীও করবেন। তার পর সম্রাট্ ত প্রণাম-সিদ্ধ হলেন, তার পর ?

সে সিদ্ধ কি যে-সে সিদ্ধ ! তিনি যখন পূরক করতে তখন তাঁর শ্বাসের টানে সাধন মস্‌জিদের চারিদিকের দেওয়ালই তাঁকে চেপে ধরত। কিন্তু ধরলে কি হবে ? টিকি কুম্ভক ব'লে বোধ করতেই পারতেন না। তার পর রেচক করবার সময় যখন নিশ্বাস ছাড়্‌তেন, তখন একটা দেয়াল্ টি ক'রে চ'লে যেত গৌরীশঙ্করের চূড়ায়, একটা ঝুপ্ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ত ভারতসাগরে। একটা যেত দ্বারকায় য একটা যেত মগের মুল্লুকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাড়ী বাড়্‌তে লাগ্‌ল যেন শালের কোঁড়া। শেষ এমন হল যখন তিনি অন্দর থেকে দরবারে আস্‌তেন, তখন তাঁর আগে এক শ' জন খোজা তাঁর দাড়ী কাঁধে ক'রে আসত।

অনেক ঐতিহাসিক-দাড়ীর বিবরণ পাঠক অবশ্য শুনিয়াছেন। কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম ! আমার এ দাড়ী গোঁজামিল নয়। চুরি করিলে গল্পটা পাঠকের মনোমত করিয়া দিতে পারিতাম। আমি ত চুরি করিই নাই। বরং ইহাই আমার কল্পনা চুরি করিয়াছে কি না, আপনারা বিচার করিবেন। আমি হলপ্ করিয়া বলিতে পারি, ওরকম দাড়ী আমি চাক্ষুষ দেখিয়াছি—স্বপ্নে !

হঠাৎ 'এ কি সম্ভব' বলিয়াই দুই নম্বর চাটু জিব কা

কর্ত্তা কট্‌মট্ করিয়া চাহিলেন। ফকির বলিলেন, কেন মশায় ? মেয়েদের ঘাগ্‌রার বেড়্ বইবার জন্য যদি ছোক্‌রা চাকর রাখ্‌তে হয়—

কর্ত্তা ধমক্ দিলেন, ফের যদি তোমরা কথা কবে ত আমি রক্ত-গঙ্গা হব। আপনি বলুন।

এমনি ক'রে দিন যায়। এক দিন উজীর বল্‌লেন, নিত্য একশ' খোজার বাজে খরচ হচ্ছে !

সম্রাট বল্‌লেন, বয়ে গেল !

উজীর বল্‌লেন, নবাবজাদার বয়ে গেল বটে, কিন্তু ওদের দাড়ী বয়ে বয়ে কাঁধ ক্ষয়ে গেল।

সম্রাট্ জীবের দুঃখে অধীর হয়ে বল্‌লেন, তোবা-তোবা ! গোবানি খিলাও !

তার পর পূরক ক'রে শ্বাস টেনে—লাটায়ে যেমন ঘুড়ির সূতা গুটায়—তেমনি ফর-ফর ক'রে দাড়ী গোটাতে আরম্ভ করলেন। ব্যস্ ! একেবারে দাড়ীকে দাড়ী লোপাট্। কেবল লোকহিতার্থে সাধন-চিহ্ন রাখ্‌লেন, একটু ছাগল-দাড়ী—ফরাসীরা যাকে Imperial ব'লে মহা মান্য করে !

জীবন উৎকট কৌতূহলে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু ঝামরু পেলে কেমন ক'রে ?

বল্‌ছি ! ক্রমে সম্রাটের যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন শমন বল্‌লেন, কোন্ বেহেস্তে যাবে ?

সম্রাট্ বল্‌লেন, নেই মাংতা, আমি চাই মুক্তি।

তবে উপাধি ত্যাগ কর।

সম্রাট্ তখন ঝামরুর বিয়াল্লিশ কোটি পূর্ব্বের পুরুষকে ডেকে বল্‌লেন, তোমরা নেমক্‌হালাল্। আমাকে আত্ম-দেহ দিয়ে কালিয়া কোফ্‌তা, কাবাব্ খাইয়েছ ! ধন্য তোমাদের ত্যাগ ! শিবিরাজের অপেক্ষা প্রশংসার্হ। কি পুরস্কার দেব ! আমার এই নূর নাও ! আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন আত্ম-দেহ-দানে পরোপকারসাধন কর।

কর্ত্তা বলিলেন, দাড়ী ত প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি। কিন্তু বিয়াল্লিশ কোটি পূর্ব্বপুরুষ কি ক'রে জানা যায় ?

ওর লোম গণনা করুন। এক এক পুরুষ নামে আর এক একগাছি লোম বাড়ে।

কিন্তু গণা যায় কেমন ক'রে ?

ভুলে গেছেন ? এ বিদ্যা ত আপনারই পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ ঋতুপর্ণ নলরাজকে দান করেছিলেন।

জীবন নিরতিশয় গর্ব্বের সহিত বলিলেন, রাজা ঋতুপর্ণ আমার পূর্ব্বপুরুষ !

তবে কে ? ছিদাম মুদি ? যাক্ সে কথা ! অযোধ্যায় আপনাদের রাজপাট ছিল। এখন সে ঋতুপর্ণ নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন হয়েছে বানরের রাজ্য ! কিন্তু এখন সাবধান থাকবেন, কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ঝামরুকে না চুরি ক'রে নিয়ে যায়।

কেন ? কেন ?

আরে মশায় ! তারা দক্ষ-প্রজাপতির সেই ছাগবংশকে খুঁজ্‌ছে ! কোথাও পায়নি। পাবেই বা কোথা ? তাঁর বংশ কলিতে এই ঝামরুতে এসে ঠেকেছে। ঝামরুর কোটিপুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বংশতালিকায় তারা সন্ধান পেয়েছে।

তারা সব কোথা ?

তারা কুলপ্রথামত সবাই বহুজন-হিতায় আত্মদান করেছে ! এখন এই গুঁড়োটুকু মাত্র আছে ! সাবধান ! কোন প্রত্ন-তাত্ত্বিক সন্ধান না পায় ! বেমালুম হাতাবে।

হাতিয়ে করবে কি, তাই ভাব্‌ছি।

প্রথম ফটো করবে, তার পর কাবাব্।

যাঁহারা নিরন্তর চাটুবাক্য শ্রবণে অভ্যস্ত, তাঁহারা সহসা সত্য-মিথ্যার ধারণা করিতে পারেন না, সকল কথাই নির্ব্বিচারে প্রত্যয় করেন। কিন্তু যে যেমন বর্ব্বর, আপন কাযে তৎপর। যতীশ্বরের বিবাহের কথা উঠিতে জীবন সতর্ক হইয়া বসিলেন। অলঙ্কারের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইল। কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার, বাকি সব জড়োয়া গয়না।

গৃহিণীর কাছে ফর্দ্দ পেশ হইলে তিনি বলিলেন, আমি আর কিছু চাইনি, আমার ঝামরুকে চার পায় ঘুঙ্গুর দিতে ব'ল।

জীবন বলিলেন, সব কথাই যখন হচ্ছে, তখন তত্ত্ব-তাবাস্‌টার কথা বাকি থাকে কেন ?

ফকির বলিলেন, তত্ত্ব-তাবাস্ ! সে আজকাল সভ্য-সমাজে যে প্রথা প্রচলিত হয়েছে, সেইমতই হবে।

সভ্যসমাজে কি প্রথা চল্‌ছে ?

দেখেন না পত্রে লেখে—'লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।' আজকাল কি জিনিস-পত্তর দিয়ে কেউ তত্ত্ব করে। সে সব অসভ্যতার লক্ষণ। এখন সন্দেশ মিঠাই প্রভৃতির যুগ উঠে গিয়েছে। এখনকার তত্ত্ব—খালি মনস্তত্ত্ব।

জীবন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তাই না কি? মনস্তত্ত্ব মানে কি?

মানে আপনি মনে করবেন, আমি তত্ত্ব করেছি, আমিও তাই।

ফকির বলিলেন, তা হ'লে কবে মেয়ে দেখ্‌বেন, বলুন?

কিছু প্রয়োজন নাই, একেবারে পাকা দেখ্‌ব।

ফকির বলিলেন, পাকা লোক, তাই পাকা কথা বল্‌লেন। কিন্তু কত লোক নিয়ে যাওয়া হবে? আমি ত এখানে ছদ্মবেশে আছি। কি জানি, জীবন বাবু—

আর জীবন বাবু কেন, বেই মশায়!

দুই বৈবাহিকে কোলাকুলি হইল।

জীবন বলিলেন, হাঁ, বেই মশাই! ছদ্মবেশে আছেন কেন?

ফকির এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া বলিলেন, কাউকে ভাঙ্গবেন না ত?

রামঃ!

কি জানেন, অনেক ক'রে সর্ব্বস্ব দিয়ে রত্নগুলো সংগ্রহ করা গেছে। জান্‌তে পারলে যদি স্বদেশী ডাকাতে মেরে দেয়! আমার যা কিছু আছে, এখন ত আর আমার নয়। সব আপনার, আমি রক্ষক মাত্র।

জীবন বলিলেন, ঠিক্ ঠিক্। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পাকা-দেখায় বে'তে আমি খালি বামুন নাপিত নিয়ে যাব। কিন্তু বেই, সেই ঋতুপর্ণের কথাটা—

সে ত ঠিক! আপনি তাঁর বংশধর।

তা হ'লে ত সরকার বাহাদুরের উচিত আমাকে উপাধি—এই ধরুন, রায় বাহাদুর—

ফকির বলিলেন, রায় বাহাদুর কি বেই?—রাজা—রাজাবাহাদুর! আচ্ছা, সে ভার আমার। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক লাগিয়ে ঋতুপর্ণের বংশতালিকা প্রস্তুত করাব। তবে—

ফকির দেখিলেন, বিবাহের খরচগুলা যোগাড় করিবার এই সুযোগ! আবার বলিলেন, তবে—

তবে কি বেয়াই? কথাটা ভেঙ্গেই বলুন?

কি জানেন বেই, তারা টাকা নইলে এক পুরুষেরও নাম ফাঁদ্‌বে না।

ওঃ, এই কথা! কত চাই?

আপাততঃ হাজারখানেক—

জীবন হাতে হাতে নগদ পেমেণ্ট করিলেন।

গৃহিণী কিন্তু এখনও গোঁ ধরিয়া আছেন, সুন্দরী বউ চাই। আগে বউ দেখে এস।

জীবন কথা দিয়াছেন, একবারে পাকা দেখিবেন। ফকিরের হাতে 'রাজা-বাহাদুর' খেতাব। কথার নড়-চড় করিতে সাহস করিলেন না। একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি মাথায় আসিল। একটা দিন দেখিয়া, না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ এক দিন পাকা দেখিতে যাইবেন।

গৃহিণী বলিলেন, কি ভাবছ?

জীবন বলিলেন, সে হবে, হবে। তোমার কথা কি ঠেল্‌তে পারি।

তৎপরে হঠাৎ এক দিন জীবন ফকিরের গৃহে গাত্র দেখিতে উপস্থিত। ফকির বলিলেন, তাই ত বেইমশায়, এঁরা যে আজ কালীঘাটে গেছেন। তা একটু বসুন, সম্ভব এখনি ফিরবেন, যদি বীরু হাল্‌দার মশাই প্রাণ পাবার জন্য আট্‌কে না রাখেন। আমি পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করি।

ফকির অন্দরে গিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন, ভিতরে না টুঁ শব্দ হয়। কি জানি, কালো মেয়ে—কূলে ডিঙিয়াও যদি তরী ডুবে!

রাস্তায় মোটর-বাঁশী শুনিলেই ফকির চকিত হইয়া বলেন, ঐ বুঝি আস্‌ছে।

ক্রমে জীবন একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। একখানা জরুরী হুণ্ডি আছে, ভাঙ্গাইতে হইবে। যে মাড়োয়ারীর উপর হুণ্ডি, সে না কি গণেশ উল্‌টাইবার চেষ্টায় আছে।

ফকিরের তদ্বিরেই হউক বা যেরূপেই হউক, ইতোমধ্যে দিবাকর আসিয়া উপস্থিত।

দিবাকর বলিল, এই যে জীবন বাবু! চিন্‌তে পেরেছেন? আমি নিশাকর নই, দিবা। ঝাম্‌রু ভাল আছে?

ফকির বলিলেন, ওহে দিবু, এঁরা ত কালোকে নিয়ে কালীঘাটে গেছেন। এ দিকে বেইমশাই পাকা দেখতে এসেছেন। ওঁর আবার ওঠবার তাড়া। একটু এগিয়ে দেখতে পার? এই মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালেই হবে। তুমি মোটর দেখতে পেলেই ছুট্ এসে খবর দেবে।

ভাই, যতই ছুটি, মোটরের আগে এসে পৌঁছুতে পার না। তা পাকা দেখতে এসেছেন, তার জন্য ভাবনা কি!

গাছ আর ফল কি আলাদা? জীবন বাবু তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যান, তা হ'লেই হবে।

তাহাই হইল। জীবন ফকিরের মাথায় ধান-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শঙ্খধ্বনি করিলেন দিবাকর।

অতঃপর শুভদিনে যতীশ্বরের বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু গোল উঠিল পরদিন। এক জন পরিচিত জহুরী জীবনকে বলিয়া দিল, জড়োয়া সব ঝুঁটা, আর বেশীর ভাগ অলঙ্কার গিল্‌টি!

বধূ কালো দেখিয়া গৃহিণী প্রথম মুখ ভার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, কর্ত্তা ঠকিয়াছেন, তখন তাঁহার যেমন আনন্দের, তেমনই বধূরও আদরের পরিসীমা রহিল না। জনৈক প্রতিবাসিনী বলিল, হ'ক্ ম্যানে, বউটি কালো।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিলেন, কে বলে রে কালো! আমার ঝাম্‌রু কালো নয়? কালোয় আমার ঘর আলো!

কিন্তু ফকির অত সহজে পার পাইলেন না। তাঁহাকে দেখিয়াই জীবন বলিলেন, জোচ্চোর! মুখ দেখাতে লজ্জা করে না!

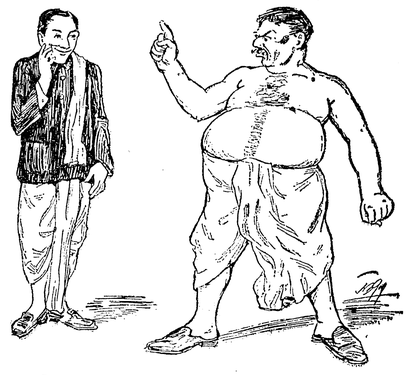

ফকির বাবুকে দেখিয়াই জীবন বলিলেন, জোচ্চোর!

ফকির একবারে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কেন বেই, কি হয়েছে?

কি হয়েছে? ঝুটো গিল্‌টি আসল ব'লে চালিয়েছ, জান না?

সে ত যে দিন কিনেছি, সেই দিনই জানি, বেই! এ আর নূতন কথা কি!

জীবন নির্ব্বাক্ হইয়া ফকিরের মুখ চাহিয়া রহিলেন। বলে কি! তবে এক সান্ত্বনা, কালো বউ আনায় গৃহিণীও ঠকিয়াছেন! তবু কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, তোমার আগাগোড়া মিছে!

সপ্রতিভ ফকির বলিলেন, সে ত ঠিক! কিন্তু বুঝে দেখ বেই, ঋতুপর্ণের বংশধরকে বেই বল্‌ব, যতিকে জামাই কর্‌ব, এর জন্য দু টি একটা মিছে কথা কি বড় বেশী হ'ল? মনে ক'রে দেখ, লক্ষ মিছে কথা নৈলে বিয়ে হয় না। কিন্তু বেই, ফাঁকি দিয়ে হ'ক্ যা ক'রে হ'ক, তোমার বেই ত হয়েছি। তার যোগ্য সম্মান—

তা বটে! তা বটে! বলিয়া জীবন হাঁকিলেন, ওরে বেইমশায়কে তামাক দে! কিন্তু বেই হাজারটা টাকা—

ফকির ভাবিলেন, ইহার প্রভূত অর্থ আছে। একটু তদ্বির করিতে পারিলে, রাজাধিরাজ কেন, বাজবাহাদুর হওয়া বিচিত্র নয়! বলিলেন, না বেই, ঋতুপর্ণ মিছে হবে না! কিন্তু আরও কিছু ছাড়্‌তে হবে!

নিশ্চয়! তা নৈলে কি হয়!

ফকির তদ্বির করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, তাহাতে উপাধি কেন, সকল ব্যাধিই পাওয়া যাইতে পারে।

অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস্ (Associated Press) বলেন, জীবনকৃষ্ণের সম্বন্ধে সরকার রায় প্রকাশ করিয়াছেন—"বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

প্রকৃত সাধক

জগতের ছোট বড় সমুদয় জীবে,
যে জন আপন বলি ভাবিতে পারিবে,
বাসিবে তাদের ভাল দিয়ে প্রতিদান,
বসুধা-বান্ধব সেই সাধক মহান্!

তাঁহার প্রার্থনা-কালে নিজে ভগবান্
আপনি অন্তর-মাঝে হন অধিষ্ঠান।

শ্রীমতী সুরবালা বিশ্বাস।

বৈদিকযুগে মিথিলা

বৈদিক যুগে মিথিলাদেশ 'বিদেহ' নামে অভিহিত হইত। বেদের সংহিতা ভাগের মধ্যে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ সংহিতায় (তৈত্তিরীয় সংহিতা) 'বিদেহ' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহা বিদেহ-দেশবাচক কি না, তদ্‌বিষয়ে মতভেদ আছে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ সংহিতার একটি মন্ত্রে 'গাব উদায়ন্ তা বৈদেহোঽভবন্' এইরূপ লিখিত আছে। (১) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ 'গাব বৈদেহ' এই বাক্যের অর্থ বিদেহ-দেশের গো-সমূহ এইরূপ অনুমান করেন। (২) কিন্তু কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ঐ বাক্যের 'বিশিষ্ট দেহসম্বন্ধী গো:-সমূহ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। (৩) বেদের সংহিতা ভাগের মধ্যে আর কোথাও বিদেহ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও কল্পসূত্রের বহু গ্রন্থে বিদেহ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের বহুস্থলে বিদেহ দেশের উল্লেখ আছে। উক্ত ব্রাহ্মণের একটি আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"বিদেঘ মাথব মুখমধ্যে অগ্নি ধারণ করেন। গোতম রাহূ-গণ নামক এক ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি মাথবকে সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু কি জানি, অগ্নি পাছে মুখরন্ধ্র হইতে বিনির্গত হন, এই শঙ্কায় মাথব প্রত্যুত্তর করিলেন না। পুরো-হিত অগ্নিদেবকে ঋকমন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করিলেন—'হে অগ্নি, হে জ্ঞানময়, তুমি মহান্ দ্যুতিমান ও বীতিহোত্র। আমরা তোমাকে যজ্ঞস্থানে প্রজ্বালিত করি; (হে বিদেঘ)।' মাথব তথাচ উত্তর করিলেন না। পুরোহিত পুনরায় কহিলেন, 'হে অগ্নি, তোমার দীপ্তিমান্ উজ্জ্বল ও শুভ্র শিখা ও কিরণ সমুদয় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে; (হে বিদেঘ)।' পুরোহিত ইহাতেও প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় স্তব করিলেন, 'হে ঘৃত-প্রেরক অগ্নি, আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি।' এই অবধি আবৃত্তি করিয়াছেন আর অগ্নি 'ঘৃত' এই শব্দ শ্রবণমাত্র মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। সে সময়ে বিদেঘ মাথব সরস্বতী-তটে অবস্থিত ছিলেন। অগ্নি তখন দহন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগি-লেন। গোতম রাহূগণ ও বিদেঘ মাথব উভয়ে ঐ দাহবান্ অগ্নির অনুগামী হইলেন। অগ্নি বৈশ্বানর এই সমস্ত নদী দহন করিয়া-ছিলেন। এই সদানীরা নদী উত্তর-গিরি হইতে প্রবাহিত। অগ্নি বৈশ্বানর ইহাকে দহন করেন নাই, সেই জন্য পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ উহাকে উত্তরণ করিয়া যাইতেন না। এখন অনেক ব্রাহ্মণ উহার পূর্ব্বপারে অবস্থান করেন। অগ্নি বৈশ্বানর উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহা অবাস্তব্য ও জলসিক্ত ছিল, এক্ষণে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা বাসযোগ্য হইয়াছে। অগ্নি বৈশ্বানর ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করেন নাই, এই নিমিত্ত উহা গ্রীষ্মাবশেষেও শীতল থাকে, বোধ হয় যেন হূহূ হইয়া রহিয়াছে। বিদেঘ মাথব বলিলেন, 'আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব?' অগ্নি কহিলেন, 'এই নদীর পূর্ব্ব প্রদেশ তোমার আবাসভূমি হইবে। অদ্যাপি এই নদী কোশল ও বিদেহবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী। তাহারা মাথব সন্তান।' (১)

এই আখ্যায়িকায় আর্য্যগণের ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দিক্ হইতে ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইবার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। বিদেঘ মাথব সম্ভবতঃ এক জন আর্য্য নরপতি ছিলেন এবং গোতম রাহূগণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। অগ্নি বৈশ্বানর বৈদিক আর্য্যদিগের যজ্ঞীয় অগ্নি এবং তাহার দহন অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অনার্য্যজাতি অধ্যুষিত যে সমস্ত জনপদে আর্য্যজাতির সমাগমে বৈদিক সভ্যতার বিস্তার হয় নাই, সেই সমস্ত জনপদে অপবিত্র বোধে আর্য্যঋষিগণ যাইতেন না; পরে আর্য্যনরপতিগণের উক্ত জন-পদাদিতে প্রভুত্ব ও আর্য্যসভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অপবি-ত্রতা দূরীভূত হইয়া সে সকল জনপদ ব্রাহ্মণাদির বাসযোগ্য বিবেচিত হইত।

শতপথ ব্রাহ্মণের উক্ত আখ্যায়িকার সারাংশ বর্ত্তমান কালে ভাষায় এইরূপ দাঁড়ায়;—মাথব নামক জনৈক আর্য্যনৃপতি সর-স্বতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ সে সময় পর্য্যন্ত সরস্বতী-নদীতীর পর্য্যন্তই আর্য্যগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঋগ্-বেদের বহুস্থলে এই সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে, ভারতে সরস্বতী নাম্নী কয়েকটি নদী প্রসিদ্ধ আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বৈদিক কালে প্রসিদ্ধ সরস্বতী নদী হিমালয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাজপুতানার অন্ত-র্গত বিকানীর প্রদেশের মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা এক্ষণে ঘাগ্‌গার বা কাগ্‌গান নামে প্রসিদ্ধ। এই সরস্বতী নদী তীর হইতে আর্য্য প্রভাব-বিস্তারের জন্য আর্য্যনৃপতি বিদে মাথব গোতম রাহূগণ নামক পুরোহিত সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কোশল ও বিদেহের মধ্য-বর্ত্তী সদানীরা নদীর পশ্চিমতটে আসিয়া উপনীত হন। তখন পর্য্যন্ত বিদেহ দেশ জলসিক্ত ও আর্য্যগণের 'অবাস্তব্য' ছিল। বিদেঘ মাথব ও গোতম রাহূগণ সদানীরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বিদেহদেশে আর্য্যবসতি স্থাপন করেন। তৎপরে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে আর্য্যগণের বাস-যোগ্য হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া ঐ নদী পূর্ব্বপারে বাস করেন এবং শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় ব্রাহ্মণ বিদেহ দেশে বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে শতপথ

(১) তৈত্তিরীয় সংহিতা; ২য় কাণ্ড, ১ম প্রপাঠক, ৪র্থ অনু-বাক, ৫ম মন্ত্র।

(২) "Vedic Index" by Keith & Mackdonell; Vol. II. P. 298.

(৩) 'গাবো বিশিষ্টদেহসম্বন্ধিনোঽভবন্ তাসাং গবাং'।

(১) শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৪।১।১০-১৭। অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে অনুবাদিত।

ব্রাহ্মণ রচনার কাল জানিতে পারিলে বিদেহদেশে আর্য্যো-পনিবেশের কাল জানা যাইতে পারে।

জ্যোতিষজ্ঞ পাঠকগণ অয়নচলনের (Precession of equinoxes) বিষয় অবগত আছেন। পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, উভয় মেরু কিঞ্চিৎ চাপা ও মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ স্ফীত। পৃথিবীর স্ফীত মধ্যদেশের উপর সূর্য্য-চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর অক্ষদণ্ড (axis) প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ বিপর্য্যস্ত হয়, এবং ইহার ফলে রবি-মার্গের (ecliptic) ও বিষুবৎ বৃত্তের (celestial equator) ছেদবিন্দু সূর্য্যের গতির বিপরীত দিকে ৫০.২″ বিকলা সরিয়া যায় এবং প্রায় ২৫০০০ বৎসরে এই ছেদবিন্দু পূর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া আইসে, ইহাকেই অয়নচলন বলে। এই অয়নচলনের ফলে স্থির নক্ষত্র (stars) গুলির রাশ্যংশ (longitude) প্রতিবৎসর ৫০.২″ বিকলা করিয়া বাড়িয়া যায় এবং এক সময়ে বিষুবৎ বিন্দুর (equinoctical point) উপরে থাকার জন্য যে তারার রাশ্যংশ শূন্য ছিল, সুদীর্ঘকাল পরে তাহার রাশ্যংশ অনেক বাড়িয়া যায়। কোনও তারার বর্ত্তমান রাশ্যংশ জানা থাকিলে কত কাল পূর্ব্বে উহা বিষুবৎ বিন্দুর উপর ছিল, তাহা অয়ন-চলনের গতি হইতে জানিতে পারা যায়।

প্রাচীনকালে আর্য্যঋষিগণ এই অয়নচলনের বিষয় অবগত ছিলেন, হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁহারা এই অয়নচলনের গতি বার্ষিক ৫৪″ বিকলা ধরিতেন। বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থে তাৎকালিক বিষুবৎ বিন্দু (equinoctical point) অয়নাংশ বিন্দুতে (Solistical point) কোন্ তারা বা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে উক্ত নক্ষত্র বা নক্ষত্রগুলির বর্ত্তমান রাশ্যংশাদি হইতে অয়নচলনের গতির হিসাব করিয়া কত কাল পূর্ব্বে উক্ত নক্ষত্রগুলি পূর্ব্বোক্ত স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই প্রকারে ঐ সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের রচনাকাল নিরূপণ করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকালও উক্ত প্রকারে নিরূপণ করিতে পারা যায়।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "কৃত্তিকা নক্ষত্রাদিগের মুখ," "বসন্ত ঋতুর মুখ," কৃত্তিকা হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত নক্ষত্র, দেব-নক্ষত্র এবং অনুরাধা হইতে অপভরণী যমনক্ষত্র, দেবনক্ষত্র দক্ষিণ-মুখে এবং যমনক্ষত্র সকল উত্তরমুখে যায়। (১) শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা দেবগণের ঋতু এবং শরৎ, হেমন্ত ও শিশির পিতৃগণের ঋতু·····যখন সূর্য্য উত্তরে যান, তখন তিনি দেবতাদিগের মধ্যে থাকেন এবং তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, এবং যখন তিনি দক্ষিণদিকে ফিরেন. তখন তিনি পিতৃগণের মধ্যে থাকেন এবং তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। (১) লোকমান্য পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলক এই সমস্ত পাঠ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের গবাময়ণ যজ্ঞারম্ভের কালের বিধানের তাৎ-পর্য্য আলোচনা করিয়া অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা দ্বারা নিম্ন-লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। প্রথমতঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ বাসন্তবিষুবদ্দিন (vernal equinox) হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করিতেন। পরে শীতায়ন (winter solistice) হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় ঐ দুই প্রকার গণনাই প্রচলিত ছিল।

২। শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচনার সময় কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে বাসন্তি বা ক্রান্তিপাত (vernal equinox) সংঘটিত হইত এবং কৃত্তিকা নক্ষত্র চক্রের আদিনক্ষত্ররূপে গণ্য হইত। (২)

ডাঃ থিব তিলক মহোদয়ের Orion গ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, তিলক মহোদয় তৈত্তিরীয় সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির যে সমস্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ রচনাকালে কৃত্তিকায় বিষুবৎ (celestial equator) থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ঐরূপ যে নিশ্চিতই ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। (৩) কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের একটি উক্তি দ্বারা ডাক্তার থিবের উক্তরূপ আপত্তি সম্পূর্ণ খণ্ডিত হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "অন্য নক্ষত্র এক দুই তিন চারি আছে, কিন্তু কৃত্তিকা ভূয়িষ্ঠ। কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে। কেবল এইটি পূর্ব্বদিক হইতে চলিয়া যায় না, অন্য নক্ষত্র সকল পূর্ব্বদিক্ হইতে চ্যুত হয়। অতএব কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে। (৪)

জ্যোতিষজ্ঞ পাঠকমাত্রই জানেন যে, যখন কোনও নক্ষত্র বিষুবৎ বৃত্তের (celestial equator) উপরে থাকে, তখনই উক্ত নক্ষত্র ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায় ও উত্তর-দক্ষিণে উহার কোনও গতি থাকে না। শতপথ ব্রাহ্মণের "কৃত্তিকা পূর্ব্বদিক হইতে চলে না" এবং "চ্যবন্তে" এই বর্ত্তমান কালবাচক ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় কৃত্তিকা নক্ষত্র বিষুবৎ বৃত্তের উপর ছিল এবং শত-পথ ব্রাহ্মণকার তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্তরূপ বর্ণনা করিয়া-ছেন। কৃত্তিকা নক্ষত্রের ঐরূপ অবস্থান বাসন্তবিষুবদ্দিন (vernal equinox) বা শারদ বিষুবদ্দিনেই (autumnal equinox) হইতে পারে। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তরূপ উক্তি কৃত্তিকায় শারদ বিষুবদ্দিন সংঘটন লক্ষ্য করিয়া বর্ণিত হয় নাই, যেহেতু,

১। কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীত মুখং বা এতন্নক্ষত্রাণাং যৎকৃত্তিকাঃ মুখং বা এতদৃতূণাং যদ্বসন্তঃ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।১।২।৩; ১।১।২।৬। কৃত্তিকা প্রথমং বিশাখে উত্তমং তানি দেব-নক্ষত্রাণি। অনুরাধা প্রথমং অপভরণিরুত্তমম্। তানি-যমনক্ষত্রাণি। যানি দেবনক্ষত্রাণি তানি দক্ষিণেন পরিযান্তি। যানি যমনক্ষত্রাণি তান্যুত্তরেণ।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৫।২।৭।

১। বসন্তো গ্রীষ্মো বর্ষা তে দেবা ঋতবঃ শরৎ হেমন্ত শিশিরস্তে পিতরো যত্র বা পূর্ব্বতেহর্ষমাসঃ স দেবা যোঽপক্ষীয়তে স পিতরোঽহরেব দেবা রাত্রিঃ পিতর···শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৩।১-৩।

২। The Orion by B. G. Tilak, Chap. III,

৩। The Indian Antequary, 1895 April.

৪। "এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্ব্বাণি হ বা অন্যানি প্রাচ্যৈ দ্রিশশ্চ্যবন্তে।"—শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২-৩.

তাহা হইলে শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল অতি দূরবর্ত্তী সময়ে হইয়া পড়ে। অতএব শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণ রচনাকালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবন থাকিত এবং ঐ সময় বাসন্ত বিষুবদ্দিন সংঘটিত হইত।

নক্ষত্র অর্থে বৈদিককালে কি বুঝাইত? এক্ষণে দেখা যায় যে, রবিমার্গ (ecliptic) কে ২৭টি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ প্রত্যেকটি ভাগকে এক এক নক্ষত্র বলে, অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রীতে রবিমার্গকে ২৭ ভাগ করিয়া রবিমার্গের কোনও নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে ১৩°২০′ তের অংশ কুড়ি বিকলা পরিমাণ রবিমার্গের প্রত্যেক অংশকে এক একটি নক্ষত্র নামে অভিহিত করা হয়। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত বিন্দু হইতে রবিমার্গের প্রত্যেক ১৩°২০′ অংশকে অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (১) কাযেই আকাশমার্গের কল্পিত সমান দূরত্ব-বিশিষ্ট অংশবিশেষকে এক একটি নক্ষত্র বলে। কিন্তু আকাশ-মার্গের এইরূপ বিভাগ সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত করা সম্ভব নহে। প্রাচীনকালে রবিমার্গের উপরে বা সন্নিকটে যে ২৭টি পরিদৃশ্যমান উজ্জ্বল তারা (Star) ছিল, প্রাচীন আর্য্যরা তাহাদিগকেই কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন এবং সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ উক্ত যে কোনও পরিদৃশ্যমান তারার সন্নিকটে থাকিত, সেই নক্ষত্র আছে বলিয়া রবিমার্গে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেন। ক্রমে ঐ এক একটি উজ্জ্বল তারার সন্নিকটে অবস্থিত তারা-সমষ্টিকে...উক্ত নক্ষত্র (asterism) নামে বুঝাইত। পরবর্ত্তী কালে জ্যোতিষিক জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইলে রবিমার্গ যখন পূর্ব্বোক্ত-রূপ ১৩°২০′ করিয়া ২৭টি সমান ভাগে বিভক্ত হয়, তখন উক্ত এক একটি সমান ভাগের মধ্যে বা সন্নিকটে যে নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ থাকিত, সেই নক্ষত্রের নামেই রবিমার্গের উক্ত বিভাগকে বুঝাইত। কিন্তু ঐ সমস্ত দৃশ্যমান নক্ষত্র (Star) বা নক্ষত্রপুঞ্জ (asterism) সমান দূরে অবস্থিত নহে। কোনটি রবিমার্গের পূর্ব্বোক্তরূপ সমান বিভক্ত অংশের আদিতে, কোনওটি মধ্যে বা শেষাংশে অবস্থিত। কোনওটি বা প্রকৃতপক্ষে রবিমার্গের বাহিরে অবস্থিত। সুদূর বৈদিককালে সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্য-সাপেক্ষ রবিমার্গের কৃত্রিম বিভাগকে নক্ষত্র বলা আর্য্য ঋষিদের সম্ভব ছিল না। তৎকালে তাঁহারা চক্ষুর্দ্বারা পরিদৃশ্যমান উজ্জ্বল তারা বা তারাপুঞ্জের যোগতারাকেই নক্ষত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইহাই যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত মনে হয়। বিশেষতঃ শতপথ ব্রাহ্মণের যে উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পরিদৃশ্যমান কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জের (asterism) যোগ-তারাই (n Tauri) বুঝায়, রবিমার্গের নাক্ষত্রিক কৃত্রিম বিভাগ নহে।

অতএব জানা যাইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় কৃত্তিকা-নক্ষত্রপুঞ্জের যোগতারা (n Tauri)তে বিষুবন ছিল এবং সেই স্থানে সূর্য্য আসিলে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। তাহা হইলে সেই সময় উহার রাশ্যংশ (longitude) শূন্য ছিল। n Tauri র ১৯২১ খৃঃ অব্দের রাশ্যংশ ৫৮'৫৪ অর্থাৎ কৃত্তিকা যোগতারা হইতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাতস্থান ১৯২১ খৃঃ অব্দে ৫৮'৫৪″ পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে। অয়নচলনই উহার কারণ। অয়নচলনের বার্ষিক গতি ৫০'২″ ধরিয়া হিসাব করিলে ৪২২১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩০৩ খৃঃ পূঃ অব্দে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের যোগতারায় বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। অতএব এই প্রকারে শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার কাল ২৩০৩ খৃঃ পূঃ অব্দে পাওয়া যাইতেছে।

কোনও কোনও প্রতীচ্য পণ্ডিত (Oldenberg, Whitney প্রভৃতি) এই প্রকার গণনা দ্বারা বৈদিক যুগের কাল-নির্ণয়ে আপত্তি করেন। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই যে, বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য্যগণ আকাশমার্গে ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের গতির বিষয় অর্থাৎ ভ-চক্রের (lunar zodiac) বিষয় অবগত থাকিলেও তাঁহারা ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্যের গতির বিষয় অর্থাৎ দ্বাদশ রাশিবিশিষ্ট রবিমার্গের (Solar zodiac) বিষয় জানিতেন না, যেহেতু, বেদসংহিতা বা ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে দ্বাদশ রাশির কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, (Jacobi Piunket) প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ও অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত উক্ত মতের সারবত্তা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। তবে এই মোক্ষ মতের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে স্পষ্টভাবে রাশিচক্রের উল্লেখ না থাকিলেও ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ যে রাশিচক্রের বিষয় জানিতেন, তাহার আভাস ঋগ্বেদের বহুস্থানে পাওয়া যায়। (১) প্রাতীচ্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় ৩০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ব্যবিলনের অধিবাসিগণ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত রাশিচক্রের ও প্রত্যেক রাশির বর্ত্তমান কালে প্রচলিত অনুরূপ এক একটি কাল্পনিক আকৃতির বিষয় জানিতেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের মত এই যে, ভারতবাসিগণ প্রায় ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গ্রীক জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে উক্ত প্রকার রাশিচক্রের বিষয় জানিতেন না। সুমেরীয় নামক এক প্রাচীন সভ্যজাতি প্রায় ৪০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া ব্যাবিলনে অধিকার করিয়া স্থানীয় সেমিটিক জাতির মধ্যে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সূত্রপাত করে। সুমেরীয় জাতি সেমিটিক জাতীয় ছিল না এবং তাঁহারা যে ভারতবর্ষ হইতে ব্যাবিলনিয়ায় আসিয়াছিলেন, ইহা কোনও প্রাতীচ্য পণ্ডিত অনুমান করেন।(২) প্রায় ৩,৪ হাজার খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকাপ্রদেশে সুমেরীয়দিগের ন্যায় সভ্যতাপ্রাপ্ত জাতি বাস করিত, তাহার প্রমাণ ভারতীয় Archaeological Departmentএর দ্বারা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।- (৩)

কাযেই ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতার প্রবর্ত্তক সুমের জাতির সহিত ভারতবাসীদের প্রায় ৩,৪ হাজার খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অন্ততঃ

১। রবিমার্গের এইরূপ বিভাগ বরাহমিহিরের সময় (৪৩০ খৃঃ অব্দ) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যেহেতু, তৎকালে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অশ্বিনীর আদিতে হইত।

১। 'Ancient Calendars and constellations' by E. M. Plunket pp. 90-172.
২। 'The Ancient History of the Near East' by H. R. Hall, 9th ed. pp. 171-174.
৩। 'Illustrated London News. Sept. 1924.

যোগাযোগ ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ব্যাবিলনের সন্নিকটবর্ত্তী মিতান্নি ও কাশীয় প্রভৃতি জাতিগণের প্রায় দেড় হাজার খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রচলিত ভাষা ও উপাস্য দেব-দেবীর সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষা ও উপাস্য দেবতার অনেক ঐক্য ছিল, এবং তাঁহারা আর্য্যজাতীয় ছিলেন। তাহারও প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। (১) কাশীয় জাতি খৃঃ পূঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া ব্যাবিলন অধিকার করিয়া তথায় কিছু কাল অবস্থান করে। মিতান্নিগণ পরবর্ত্তী কালে আসিরিয়া অধিকারের পর তথায় কিছু কাল রাজত্ব করে। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় আর্য্যগণ গ্রীকজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে ব্যাবিলনবাসিগণ যে রাশিচক্রের বিষয় অবগত ছিল, তাহা জানিত না, ইহা অতি কষ্টকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্ত কারণে Oldenberg প্রমুখ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা শতপথব্রাহ্মণ রচনার কাল নির্ণয়ের আপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

বিদেহ দেশে প্রথম আর্য্য নরপতি বিদেঘ মাথব গোতম রাহুগণ নামক পুরোহিত সমভিব্যাহারে সরস্বতী নদীতীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া বিদেহ দেশে আর্য্যাধিকার ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত দেশ বিদেহ নামে অভিহিত হইয়াছিল, (২) বিদেঘ মাথব সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্য হইতে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৭৪ হইতে ৯৩ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি রচয়িতার নাম গোতম রাহুগণ। ঐ সমস্ত সূক্তের মধ্যে বহুস্থানে গোতমের সহিত কয়েকটি কূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত B, N, W Railway রসৌল ষ্টেশনের নিকট গৌতমাশ্রম নামক যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তাহার সন্নিকটে একটি কৃত্রিম সরিতের মধ্যে কয়েকটি অতি প্রাচীন কূপ আছে। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ঐ কূপগুলিই ঋগ্বেদোক্ত কূপ এবং এই স্থানেই ঋগ্বেদের ঋষি গোতম রাহুগণের আশ্রম ছিল এবং ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তগুলি ঐ স্থানে গোতম রাহুগণের আশ্রম স্থাপনের পর রচিত হয়। (৩) মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে আম্বিক্ষিকী বিদ্যার প্রবর্ত্তক (ন্যায়-সূত্রকার) সুবিখ্যাত গৌতম ইঁহারই বংশধর ছিলেন। (৪) ঋগ্বেদের ঋষি গোতম রাহুগণ ও শতপথব্রাহ্মণোক্ত বিদেঘ মাথবের পুরোহিত গোতম রাহুগণ একই ব্যক্তি হইলে বিদেহ দেশে আর্য্যগণের আগমন শতপথরচনার বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদসংহিতা রচনার সমসাময়িক হইয়া পড়ে। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণাভাবে উক্তরূপ অনুমান অসমীচীন বোধ হয়। শতপথব্রাহ্মণ হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, গোতম রাহুগণ মিত্রবরণ নামক যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, বিদেহরাজ জনক ইহার প্রচারক ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ইহার ব্যাখ্যাতা ছিলেন। (১) তাহা হইলে বিদেহরাজ জনক শতপথব্রাহ্মণ রচনার পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিলেন। বিদেহরাজ জনকের রাজত্ব-কালে বিদেহ দেশে যেরূপ আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে ন্যূনকল্পে শতপথব্রাহ্মণ রচনার দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিদেহ দেশে আর্য্যগণ আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে।

শতপথব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কোশল জনপদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগেই বিদেহ জনপদ অবস্থিত ছিল এবং সদানীরা নদী এই উভয় জনপদের মধ্যবর্ত্তী সীমা ছিল। শতপথব্রাহ্মণোক্ত সদানীরা নদীর বর্ত্তমান নাম ও অবস্থানস্থান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। সায়ণ, হেমচন্দ্র ও অমরসিংহের মতে সদানীরা করতোয়া নদীর নামান্তর। বর্ত্তমানে উক্ত নামের এক নদী উত্তর-বঙ্গের রংপুর এবং বগুড়া জিলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কাযেই কোশল ও বিদেহ দেশের সীমা-নির্দ্দেশক সদানীরা নদী যে বর্ত্তমান করতোয়া নদী নহে, তদ্‌বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ত্রিহুত ও ভাগলপুর বিভাগই প্রধানতঃ প্রাচীন বিদেহ বা মিথিলা দেশ নামে খ্যাত ছিল এবং অদ্যাপি সারণ ও চম্পারণ জিলার পশ্চিম সীমায় প্রবাহিত গণ্ডক নদী মিথিলা দেশের পশ্চিম সীমা বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কারণে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান গণ্ডক নদীই শতপথব্রাহ্মণ সদানীরা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে সদানীরা ও গণ্ডক এই দুই পৃথক নদীরই নামোল্লেখ দেখা যায়। সভাপর্ব্বে (২) লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে জরাসন্ধের বধার্থ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে মগধ-যাত্রাকালে সরযূ, গণ্ডক, সদানীরা প্রভৃতি নদী অতিক্রম করেন। কিন্তু মহাভারতে এই স্থলে বর্ণিত দেশ, নদ-নদীগুলির বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, সেই সমস্ত দেশ ও নদ-নদীর পূর্ব্বাপর্য্য ভৌগোলিক সংস্থান যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে কি না সন্দেহস্থল এবং এই বর্ণনা হইতে সদানীরা নদীর সংস্থান নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে মহাভারতের ঐ উক্তি হইতে গণ্ডক ও সদানীরা দুই পৃথক নদী বলিয়া জানিতে পারিলেও উক্ত সদানীরা নদী যে উত্তর-বঙ্গের করতোয়া নদী নহে, তাহাও স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে; যেহেতু, ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে মগধে আসিতে হইলে করতোয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার কোনও আবশ্যক হয় না। মহাভারতের ঐ বর্ণনা হইতেও জানা যায় যে, পূর্ব্ব-কোশলার পরই মিথিলা দেশ ছিল। সম্ভবতঃ মিথিলা ও কোশল দেশের মধ্যবর্ত্তী গণ্ডক বা সরযূ নদীর কোনও শাখা-নদী বৈদিককালে সদানীরা নদী নামে অভিহিত হইত। মিঃ পজ্জিটার

১। The Ancient History of the Near East by H. R. Hall, p. 201, 4th Ed.
২। রামায়ণ ও পুরাণাদিতে 'বিদেহ' নামের ব্যাখ্যা অন্যরূপ আছে। যথা—রাজা নিমি স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া বশিষ্ঠের অভিশাপে ইনি দেহহীন অর্থাৎ মৃত হন, সেই জন্য নিমি বিদেহ নামে খ্যাত হন এবং ইঁহার রাজ্য বিদেহ নামে খ্যাত হয়। অপুত্রক নিমি-রাজার মৃতদেহ মন্থন করিয়া ইঁহার এক পুত্র উৎপাদন করেন, তিনি মিথি নামে খ্যাত হন এবং তাঁহার নাম হইতে তাঁহার রাজ্যের নাম মিথিলা হয়।
৩। "ভারতবর্ষ" মাসিক-পত্র; ১৩২১ সাল, ৯৬৩ পৃষ্ঠা।
৪। "History of Indian Logic" by S. C. Vidyabhusan p. 17.

১। শতপথব্রাহ্মণ, ১১।৪।৩।২০।
২। মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ১৯শ অধ্যায়।

আর্য্যাবর্ত্তের একটি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া সরযূ ও গণ্ডকী নদীর মধ্যবর্ত্তী সরযূ নদীর একটি শাখা-নদীকে (রাপ্তি) সদানীরা নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) সম্ভবতঃ গণ্ডক নদীর পশ্চিমদিকস্থ রাপ্তি নদী বৈদিক কালের বিদেহ রাজ্যের পশ্চিম-সীমা ছিল, উক্ত নদী তৎকালে সদানীরা নামে খ্যাত ছিল। পরবর্ত্তী কালে উক্ত সীমা পূর্ব্বদিকে অপসৃত হইয়া গণ্ডক নদীই উক্ত রাজ্যের পশ্চিমসীমা নির্দ্ধারিত হয়। গঙ্গা নদী বিদেহ রাজ্যের দক্ষিণ-সীমা ও হিমালয় পর্ব্বত উত্তরসীমা ছিল। বৈদিক যুগে বিদেহ দেশের পশ্চিমে কোশল, দক্ষিণ-পশ্চিমে কাশী, দক্ষিণে কীকট (মগধ), পূর্ব্বে পুণ্ড্র ও পূর্ব্ব-দক্ষিণে বঙ্গ ও সুহ্মদেশ ছিল।

ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের দেশ সমূহের মধ্যে কাশী, কোশল ও বিদেহ দেশেই বৈদিক যুগে আর্য্যদিগের উপনিবেশ ও প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে প্রামাণ্য বলিতে ঐ কয় দেশকেই বুঝাইত, এবং বিদেহ দেশই বৈদিক যুগের আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বতম সীমা ছিল, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে তখনও আর্য্যজাতির প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। ঋগ্বেদে কীকট দেশের উল্লেখ আছে। (২) মগধের প্রাচীন নাম কীকট। নিরুক্ত-কার লিখিয়াছেন, কীকট দেশে অনার্য্যদিগের নিবাস ছিল। (৩) অথর্ব্ব বেদে অঙ্গ ও মগধ দেশের নাম পাওয়া যায়। (৪) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র নামক এক অতিশয় নীচ জাতির উল্লেখ আছে। (৫) পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বা স্থূলতঃ উত্তর-বঙ্গে এই জাতির বাস ছিল। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, ইহারা ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। (৬) ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ (সম্ভবতঃ মগধ) ও চের-দেশবাসিগণকে পক্ষিবৎ বলা হইয়াছে। (৭) সারণ ও চম্পারণ জিলার প্রচলিত জনপ্রবাদমূলে জানা যায় যে, বহু প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে চের নামক এক অসভ্য জাতি বাস করিত এবং উক্ত জিলাদ্বয়ের বহুস্থানে প্রাচীন মৃত্তিকা-স্তূপের ধ্বংসাবশেষমধ্যে এই জাতির প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। (৮) আর্য্যাধিকারের বহুকাল পরেও এই অঞ্চলে চের জাতির বস-বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলের অসভ্য জাতিগণ আপনাদিগকে চের জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। দাক্ষিণাত্যে চের নামক এক প্রাচীন রাজ্য ছিল। যে সমস্ত জাতি আপনাদিগকে চের জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়, নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে তাহারা দ্রাবিড় জাতীয়, আর্য্যজাতীয় নহে। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ ও চেরদেশবাসিগণকে পক্ষিবৎ বলিয়া বর্ণনা করায় বোধ হয় যে, তাহারা একজাতীয় ছিল বলিয়া বৈদিক আর্য্যগণ তাহাদিগকে অবজ্ঞাভরে পক্ষীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বৌধায়ন-ধর্ম্ম-সূত্রে লিখিত আছে যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে পুনষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (১)

উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ রচনাকালে বৈদিক আর্য্যগণ অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দেশসমূহের বিষয় অবগত থাকিলেও ঐ সমস্ত দেশে তৎকালে আর্য্যদিগের বাস ছিল না বা তাহাদের অধিকারভুক্ত হয় নাই; তখনও ঐ সমস্ত দেশে দ্রাবিড় জাতীয় অনার্য্যগণ বাস করিত, এবং শতপথব্রাহ্মণে উল্লিখিত বিদেহ দেশে আর্য্যাধিকার স্থাপনের বহুকাল পরেও ঐ সমস্ত দেশে আর্য্যাধিকার স্থাপিত হয় নাই বলিয়াই ঐ সমস্ত দেশ ও দেশবাসিগণ বৈদিক ও পরবর্ত্তী শাস্ত্রে অপবিত্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে নেমিসপ্য নামক আর এক জন বিদেহ রাজের নাম জানিতে পারা যায়। ইনি সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গলাভ করেন। (২) সাঙ্খ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে পঞ্চ অহ্নার নামক এক জন বিদেহের রাজার এবং হিরণ্যনাভ নামক কোশল দেশের রাজার নাম উল্লিখিত আছে। (৩) কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে পর-অহ্নারকে কোশল দেশের রাজা এবং হিরণ্যনাভকে পুত্র বলা হইয়াছে। (৪)

বৈদিক যুগে বিদেহ রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ও বিখ্যাত রাজা রাজর্ষি জনক। বিদেহরাজ জনকের নাম জানেন না, এমন ভারতবাসী হিন্দু খুব কমই আছেন। ইনি রামায়ণোক্ত সীতা দেবীর পিতা সীরধ্বজ জনক হইতে পৃথক ব্যক্তি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ইহার পর হইতে তদ্বংশীয় মিথিলার রাজগণ "জনক" এই উপাধি ধারণ করেন। মহারাজ জনকের রাজত্বকালে বিদেহ রাজ্য আর্য্য-সভ্যতা ও জ্ঞানগরিমায় সমধিক উন্নতি লাভ করিয়া বৈদিক যুগের আর্য্যজনপদসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যে ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা ও অধ্যাত্মজ্ঞান ভারতীয় আর্য্যগণের গৌরবের প্রধান বিষয় এবং বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিত আধুনিক প্রতীচ্য জগতেও যাহা ভারতের নিকট প্রধান শিক্ষার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা ও অধ্যাত্মজ্ঞান রাজর্ষি জনকের রাজত্বকালে বিদেহরাজ্যে সমধিক উন্নতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ জনক স্বয়ং ব্রহ্মবিৎ ও মহাজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন এবং রাজর্ষি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা সদাসর্ব্বদা কাশী, কোশল, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজনপদসমূহ হইতে সমাগত ব্রহ্মবিদ্ বিশারদ ও আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু বিবুধগণের ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহা আমরা শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকী প্রভৃতি উপনিষদ্‌পাঠে জানিতে পারি। জনকের রাজসভায় কিরূপ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইত, তাহার বিশদ বর্ণনা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কৌষীতকী উপনিষদে লিখিত আছে যে, রাজর্ষি জনক স্বয়ং ব্রহ্ম বিদ্যায় এরূপ নিপুণ ছিলেন যে, লোক তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার দাতা জনক বলিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ ধাবিত হইত। (১) আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে জনকের রাজত্বকালে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বিদেহ রাজ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভের বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, মহারাজ জনক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (২) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে জানা যায়, তিনি "সম্রাট" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। (৩) বিখ্যাত বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ইঁহার প্রধান সভাসদ এবং অশ্বল তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান এবং জনকের রাজসভায় জনক ও সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক আলোচনার বিবরণ শতপথব্রাহ্মণে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও জাবাল উপনিষদের বহুস্থানে পাওয়া যায়। ইনি রাজগণের সংহিতা বা শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ইহার পিতার নাম বাজখনি ছিল, সেই জন্য বাজখনের নামে অভিহিত হইতেন। সম্ভবতঃ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ-মিশ্রিত যজুর্ব্বেদের যে অংশ তিনি মন্ত্রও ব্রাহ্মণ ভাগ পৃথক করিয়া সংস্কার করেন, সেই অংশ বাজসনেয় বা শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণের কয়েক স্থানে ইহার সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে অনুমান হয়, ইনি বিদেহদেশবাসী ছিলেন এবং পাঞ্চালদেশীয় অরুণির শিষ্য ছিলেন। (৪) যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতার সংস্করণ ইহা দ্বারাই বিদেহ দেশে সাধিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি মিথিলাদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার এই সংস্কার ও উন্নতিসাধনই পরবর্ত্তী পুরাণাদি গ্রন্থে নানা প্রকার অতিপ্রাকৃত উপখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছে।

একদা বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চালদেশের বহু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন। বিদেহরাজ এই সভায় বলিয়াছিলেন যে, এই সভায় যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ বা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাকে তিনি সহস্র সুবর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত গাভী দান করিবেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই সভায় সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলীর ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হন এবং বিদেহরাজ জনক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। (৫) কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল। মৈত্রেয়ীও বিদুষী ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণা রমণী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ধন বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মৈত্রেয়ী ধনসম্পত্তির অসারতা হেতু তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। (১) বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে আরও জানা যায় যে, বিদেহরাজ জনকের সভায় যে বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গার্গী নাম্নী এক বিদুষী রমণী ছিলেন এবং তিনিও যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন। (২)

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, শতপথব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়, বিদেহরাজ জনক ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ভুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে মিথিলায় জাতিভেদ আধুনিক কালের ন্যায় কেবল জন্মগত ছিল না; নিম্নবর্ণ যোগ্যতা ও গুণ থাকিলে উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতে পারিতেন এবং পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিও বেদাদি শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন ও রাজসভাদি প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া পুরুষের সহিত জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

কৌষীতকী উপনিষদ্ হইতে জানিতে পারা যায়, কাশীরাজ অজাতশত্রু জনকের সমসাময়িক ছিলেন। (৩) বলা বাহুল্য, ইনি বৌদ্ধযুগের মগধরাজ অজাতশত্রু হইতে পৃথক ব্যক্তি। কাশীরাজ অজাতশত্রুও ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন। কাশীরাজ্য বিদেহরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি উপমা পাঠে অনুমান হয় যে, উভয় রাজ্যমধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদও উপস্থিত হইত এবং বিদেহরাজ স্বয়ং শত্রু-সংহারক ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিবাদক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। (৪)

বৈদিক যুগে বিদেহ রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। নেপাল তরাইর মধ্যে জনকপুর নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে মিথিলার রাজধানী মিথিলা নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং জনপ্রবাদ যে, জনকপুরই প্রাচীন মিথিলা নগরী; উক্ত স্থানেও জনকের রাজধানী ছিল। জনকপুরে এক্ষণে যে সমস্ত কীর্ত্তি ও স্থান দেখা যায়, তাহার সমস্তই রামায়ণোক্ত সীতা দেবীর পিতা সীরধ্বজ জনক, রাম এবং সীতার উপাখ্যানের সহিত জড়িত। তথায় এক্ষণে যে সমস্ত মন্দির দেখা যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক

১। Journal of the Asiatic Society of Bengal
২। ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৫৩।১৪
৩। নিরুক্ত ৬।৩২
৪। অথর্ব্ববেদ সংহিতা ৫।২২।১৪
৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭,৩৩।৬
৬। মনুসংহিতা ১০।৪৩, ৪৪
৭। ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১
৮। District Gazetteer of Sarun p. 16.

১। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ১।১।২
২। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ২৩।১০।১৭
৩। সাঙ্খ্যায়ন শ্রৌত সূত্র ১৬।২৯।৫
৪। শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৫।৪।৪

১। জনকো জনকো ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ দাতা ইতি বা উ জনা ঘাবন্তীতি কৌষীতকী উপনিষদ্ ৪।১, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২।১।১
২। শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।২।১০
৩। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬।১।৭
৪। ঐ ৬।৩।৭
৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩য় অধ্যায়

১। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ
২। ঐ " " ৬ষ্ঠ "
৩। কৌষীতকী উপনিষদ্ ৪।১
৪। "সা হো বামাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্র পুত্র ঔজ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাবতি ব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপতিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বাং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থানৌ মে ব্রূহীতি, পৃচ্ছ গার্গীতি।—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৮।২

সময়ে নির্ম্মিত। খননাদি দ্বারা উক্ত স্থানের প্রাচীনত্বের নির্শ্চয় অনুসন্ধানের চেষ্টাও অদ্যাপি হয় নাই। এমত অবস্থায় বৈদিক যুগে বর্ত্তমান জনকপুর বিদেহ রাজ্যের রাজধানী ছিল কি না, তাহা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান চম্পারণ জিলার অন্তর্গত লৌরিয়ানন্দনগড় নামক স্থানে একটি অশোকস্তম্ভ আছে, তাহারই সন্নিকটে এবং বর্ত্তমান বেতিয়ানগর হইতে ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ৬ সারি মৃত্তিকা-স্তূপ আছে। স্থানীয় লোকরা এই মৃত্তিকা-স্তূপকে ভিসা এবং ঐ স্থানকে রাজা উত্তানপাদের রাজধানী বলে। ডাক্তার কনিংহাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এই স্থানের মৃত্তিকাস্তূপগুলিকে ১৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে উত্তরভারতের অতিপ্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ সমূহের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিবেচনা করেন। (১) সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাঃ ব্লকের তত্ত্বাবধানে উক্ত মৃত্তিকাস্তূপগুলির মধ্যে কয়েকটি স্তূপ খনন করিয়া উহাতে অস্থিভস্ম কীটদষ্ট জীর্ণ কাষ্ঠখণ্ড ও স্ত্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত দুই ইঞ্চি প্রমাণ সুবর্ণ-পাত পাওয়া গিয়াছে। (১) ডাক্তার ব্লক দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অস্থিভস্ম সমাহিত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকাস্তূপ রচিত হইত। তাঁহার মতে ঐ স্থানটি বৈদিক যুগের মিথিলাবাসী আর্য্যগণের একটি শ্মশানভূমি এবং উক্ত মৃত্তিকাস্তূপগুলি ন্যূনপক্ষে ১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সমাহিত অস্থিভস্মের উপর নির্ম্মিত হয়। বৈদিক যুগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ গৃহ্য-সূত্রাদিতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, মৃতদেহকে দাহ করিয়া দশম দিবসে অস্থিভস্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক এক পাত্রে স্থাপনানন্তর সমাহিত করিয়া তদুপরি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ নির্ম্মিত হইত, এবং তদুপরি কাষ্ঠদণ্ড বা 'স্থূণা' প্রোথিত হইত। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তে এই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ব্লক উক্ত মৃত্তিকাস্তূপ খননকালে যে একটি প্রোথিত জীর্ণ কাষ্ঠখণ্ডের অংশ পাইয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহাই ঋগ্বেদোক্ত 'এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্ত' মন্ত্রের 'স্থূণা।'

শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র, (এম, আর, এ, এস)।

১। Cunningham's Ancient Geography of India p. 450.

১। Archaeological Survey Reports of India, 1906-7; p. 126.

খিড়্‌কী

আমি নইক পাথর-গাঁথা সিংহদুয়ার—
যেথা লোহার ফটক রুধে পথের জুয়ার ;
সদা সান্ত্রীর সন্ত্রাসে শঙ্কিত জন ;
পাছে সঙীন রঙীন চোখে বিঁধে বা কখন !

যার মুক্তি কেবল জানে ধনের চাবী,
যেথা মান ছাড়া মিলে না'ক মনের দাবী ;
যেথা রথের সারথি শুধু পায় ঠিকানা,
খালি পায়ের প্রবেশে আছে নিষেধ নানা।

আমি খিড়কীর পথখানি মাটীর কোলে,
যেথা ঘাসের অবুঝ শোভা সবুজে দোলে ;
যার ধূলায় পড়িছে ছাপ ভিখারী পায়ের—
যারা গোপনে শরণ মাগে গৃহিণী মায়ের।

যেথা আল্‌তা পরশে ধূলা হীনতা ঘুচায়,
কত পাখীর পায়ের রেখা মানুষে মুছায় ;
সদা শিশুরা করিছে খেলা যাহার পাশে,
হেরি' দু' ধারে দোপাটি গাঁদা হরষে হাসে।

আমি খিড়কীর পথখানি ধনীর ঘরে,
তবু গোপনে পিছনে আছি লুকায়ে ডরে ;
হোথা পথের পাথর যত বেদনা বিলায়,
যেন আমার ধূলায় তারে মুছায় মিলায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

প্রাচীন ভারতে বিচার-বিভাগ

শাসন-যন্ত্রে তিনটি মূল বিভাগ বিদ্যমান। প্রথম শাসন বিভাগ, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপন বিভাগ এবং তৃতীয় বিচার বিভাগ। ইহার মধ্যে কোনও বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অল্প নহে। আমি ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের শাসন এবং ব্যবস্থাপন বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের বিচার বিভাগের কথা আলোচনা করিব। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। এই তিন বিভাগ পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হওয়া যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, প্রাচীন হিন্দুগণ তাহা বেশ বুঝিতেন বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপন বিভাগ যে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং রাজপ্রভাবের বহির্ভূত ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রে রাজাই শাসন এবং বিচার-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। রাজা যেমন শাসক ছিলেন, তেমনই বিচারকও ছিলেন। শাসন-কার্য্য তিনি যেমন একাকী পরিচালিত করিতে পারিতেন না, তেমনই বিচার-কার্য্যও তিনি একাকী সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন না। শাসন-কার্য্যে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর এবং রাজসভার মতামত লইয়া চলিতে হইত। তাহা না করিলে তিনি ধর্ম্মশাসনের লঙ্ঘনকারী বলিয়া নিন্দিত হইতেন। কেবল নিন্দিত হইতেন না, তাঁহার রাজ্যে অনেক সময় প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। তেমনই বিচারকার্য্যও রাজা একাকী সম্পাদন করিতে পারিতেন না। এ বিষয়েও তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। ধর্ম্মশাস্ত্র কোথাও রাজাকে একাকী বিচার-কার্য্য সাধন করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন নাই। তাঁহাকে কয়েক জন প্রাড্‌বিবাক সঙ্গে লইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,:—

'রাজা ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণা-কুশল মন্ত্রিগণের সহিত বিনীতভাবে ধর্ম্মাধিকরণ সভায় গমন করিবেন। তথায় তিনি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান থাকিয়া অর্থী এবং প্রত্যর্থীদিগের মোকর্দ্দমা করিবেন। মোকর্দ্দমা করিবার সময় তিনি দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া থাকিবেন এবং বেশভূষা প্রভৃতিতে কোন প্রকার উদ্ধত ভাব দেখাইতে পারিবেন না।" এ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন্ত্রীরা, অন্ততঃ মন্ত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিচার-বিষয়ে রাজাকে সৎপরামর্শ দিতে পারেন, তাঁহারাও বিচারকালে রাজার সহিত বিচার-সভায় উপস্থিত থাকিতেন। আর থাকিতেন কয়েক জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণরাই বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষি ছিলেন না, তাঁহারা সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণই ছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বকালে বণিয়া সমাজে এক শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধিশূন্য লোক গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টায় তাঁহারা কতদূর সাফল্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা এত কাল পরে বলা কঠিন সত্য, কিন্তু ভাব দেখিয়া মনে হয় যে, কৌলিক ধারা অনুসারে সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতি বা সম্প্রদায় কতকগুলি মানসিক গুণে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়রা যেমন শৌর্য্যে, সাহসে এবং বলচর্চ্চায় অনেকটা বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিলেন, বৈশ্যগণ যেমন ব্যবসায়বুদ্ধিতে বিশেষ যোগ্যতা প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণও তেমনই কৌলিক অনুশীলনের এবং শিক্ষার প্রভাবে কতকটা সাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতেই প্রাড়্‌বিবাক বাছিয়া লইতে হইত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ধার্ম্মিক, সদাশয় ও সমদর্শী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেন, রাজার আদেশে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। যে ক্ষেত্রে রাজা বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন, সে ক্ষেত্রে ঐ সকল প্রাড়্‌বিবাক রাজার সহিত একাসনে বসিয়া বিচার করিতেন। কিন্তু বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজগণের পক্ষে সকল মামলার বিচার করা সম্ভব হইত না। সেই জন্য রাজাকে বিচারকার্য্য-সাধনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইত। যাঁহারা নিরপেক্ষ, ব্যবহারজ্ঞ, এবং উদারস্বভাব, বিচারাসনে ঐরূপ লোকদিগকে প্রতিষ্ঠিত করা হইত। বিচারক যদি স্বাধীনচেতা, নিরপেক্ষ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং লোকাচারজ্ঞানসম্পন্ন না হয়েন, তাহা হইলে তিনি শত চেষ্টা করিলেও সুবিচার করিতে পারিবেন না, ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। সেই জন্যই বিচারকার্য্যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতেন।

কিন্তু বিচারকার্য্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ হইতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিচারকদিগের মধ্যে রাজা এক জন প্রধান ব্যক্তি। তিনি ক্ষত্রিয়। সুতরাং বিচারকার্য্য যে কেবল ব্রাহ্মণদিগের একচেটিয়া ছিল, তাহা নহে। তখন এক ব্যক্তির দ্বারা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত না। বিচারাসনে বহু ব্যক্তিকে বসিতে হইত। যাঁহারা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের সকলকেই সদাচারসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মজ্ঞ এবং লোকাচারজ্ঞানসম্পন্ন হইতে হইত। রাজা যে একাকী বিচারকার্য্য করিতে পারিতেন না, এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি আছে। এ সম্বন্ধে মনুর অনুশাসনের বঙ্গানুবাদ এই সন্দর্ভের প্রথমেই উদ্ধৃত হইয়াছে। (মনু ৮।১-২ দ্রষ্টব্য) যাজ্ঞবল্ক্য এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, সকলে শ্রবণ করুন :—

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ॥" [যাজ্ঞ ২।১]

অর্থাৎ নরপতি ক্রোধ এবং লোভশূন্য হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত মোকর্দ্দমার বিচার করিবেন।

কিন্তু রাজা যে তাঁহার বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই সকল মামলার বিচার করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা কখনই আশা করা যায় না। কাযেই রাজাকে প্রজার মামলা নিষ্পত্তি করিবার জন্য নানা স্থানে বিচারালয় সংস্থাপন করিতে হইত। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য উহার পরই বলিয়াছেন :—

"অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ॥" [যাজ্ঞ ২।৩]

কার্য্যবশে রাজা যদি স্বয়ং বিচারকার্য্য পরিদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি সভ্যগণের সহিত এক জন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন।

মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

"যদা স্বয়ং ন কুর্য্যাৎ তু নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্।
তদা নিযুজ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥
সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভ্যমেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা॥" [মনু ৮।৯-১০]

রাজা যখন স্বয়ং বিচারকার্য্য পরিদর্শন করিতে না পারিবেন, তখন তিনি তাঁহার পরিবর্ত্তে এক জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে বিচারকার্য্য দর্শনে নিযুক্ত করিবেন, সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিন জন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণসভায় প্রবেশ করিবেন এবং উপবিষ্ট বা উত্থিতভাবে রাজকার্য্য সমস্ত সমাধা করিবেন।

এখানে বলা হইয়াছে যে, বিচাপতি ৩ জন সহচর লইয়া বিচারকার্য্য সমাধা করিবেন। একাকী বিচার করিবেন না।

বিষ্ণুসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, রাজা স্বয়ং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্র বসিয়া বিচার করিবেন অথবা বিচারকার্য্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন (বিষ্ণু ৩।৫০-৫১)।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৬৯ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে :—

"শ্রোতৃঞ্চৈব ন্যসেদ্রাজা প্রজ্ঞান্ সর্ব্বার্থদর্শিনঃ।
ব্যবহারেষু সততং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

রাজা অর্থিপ্রত্যর্থিগণের কথা শুনিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য নিয়ত সর্ব্বার্থদর্শী পণ্ডিতগণকে (বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে) নিযুক্ত করিবেন; কারণ, তাঁহাদের দ্বারাই রাজ্য সুরক্ষিত হইয়া থাকে।

আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিচারকার্য্য সম্পাদনের জন্য এক জন ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এবং সকলের প্রতি সমদর্শী ব্রাহ্মণকে বিচারাসনে বসাইতেই হইত। ইহা ভিন্ন বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আরও কয়েক জন সভাসদ্ থাকিতেন। এই সভাসদ্ যে সকলেই ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা মনে হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণাদগের সহিত কয়েক জন সভ্যকেও বিচার-দর্শনকার্য্যে নিযুক্ত করা আবশ্যক। এই সভ্যগণ যে ব্রাহ্মণই হইতেন, তাহা মনে হয় না। কারণ, মূলে—

"সভ্যৈঃ সহ নিষোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ॥"

এই কথা থাকাতে সভ্যগণ ভিন্নবর্ণ লোক হইতেন বলিয়া মনে হয়। মনুও তিন জন সভ্য কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণ বিচারকার্য্য সমাধা করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ ও সভ্য স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। সুতরাং এই সভ্যরা ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতেও পারিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সভ্য অর্থাৎ "রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত বণিক্" এরূপ অর্থও কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ, এক জন কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন বিচার ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। মানুষ যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউন না কেন, তিনি যে কখনই ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইবেন না, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এক জন বিচারকের পক্ষে অজ্ঞানতঃও পক্ষপাতিত্ব করা অসম্ভব নহে, কিন্তু অধিক বিচারকের পক্ষে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ, ঠিক আধুনিক জুরীর বিচার-পদ্ধতির মত কোন পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে ছিল না। কিন্তু প্রাড়্‌বিবাকের সহিত যে সকল সভ্য থাকিতেন, তাঁহারা কতকটা জুরীর ন্যায় কার্য্য করিতেন। সেই জন্য প্রাচীন ভারতে একাধিক বিচারপতি কর্ত্তৃক বিচার করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রাচীন রোমেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

আধুনিক ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্‌গণ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বিচারকের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব এবং পরাধীনভাব ন্যায়বিচার-সাধনের প্রবল অন্তরায়। সেই জন্য প্রাচীনকালে যাঁহারা শত্রু এবং মিত্রে সমদর্শী (রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ), সেইরূপ লোকের বিচারকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বকালে ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের উপর রাজার আধিপত্য অধিক ছিল না। রাজা ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মস্ব অপহরণ বা ব্রাহ্মণকে অযথা দণ্ডদান বা প্রাণ-দণ্ড করিতে পারিতেন না। যত দিন ব্রাহ্মণের অধঃপতন হয় নাই, তত দিন ব্রাহ্মণগণ অনেকটা স্বাধীনচেতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাড়্‌বিবাক ভৃতি বা বেতন লইতেন না। তাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে অবৈতনিকভাবে বিচারকের কায করিতেন। তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই তিনি স্বাধীনভাবে সমাজের নিকট বা রাজভাণ্ড হইতে পাইতেন। কাযেই তিনি রাজসরকারের ভৃত্য ছিলেন না, কর্ম্মত্যাগ করিলেও তাঁহার সামাজিক বৃত্তি লোপ পাইত না। বিচারকগণ অবৈতনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের চাকুরী যাইবার ভয় ছিল না। বরং কোন বিচারক যদি ইচ্ছা-পূর্ব্বক কাহাকেও অবিচার বা কুবিচারে দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সে জন্য কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। যথা—

"রাগাল্লোভাদ্‌ভয়াদ্বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্॥"
(যাজ্ঞ ২।৪)

অর্থাৎ বিচার-সভার সভ্যগণ যদি স্নেহ, লোভ বা ভয়প্রযুক্ত অন্যায় বিচার করেন, তাহা হইলে সেই বিচারে পরাজিত ব্যক্তি যে দণ্ড বিহিত, রাজা বিচারকদিগের প্রত্যেককে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিবেন।

মনুও বলিয়াছেন :—

"যত্র ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ॥" (মনু: ৮।১৩)

অর্থাৎ বিচারকদিগের সম্মুখে যদি ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক এবং সত্য যদি মিথ্যা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তথায় বিচারকগণ সভাসদ্‌গণই বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

সুতরাং ইচ্ছাকৃত অবিচারের জন্য বিচারপতিগণকে কেহ দণ্ডিত হইতে হইত না;—তাঁহাদিগকে বিচারকার্য্য হইতে অপসারিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা অল্প অপমানের কথা ছিল না। তখন হিন্দুসমাজ সজীব ছিল। সুতরাং অবিচারের জন্য বিচারককে দণ্ডিত হইতেই হইত। বিচারকের

অবিচারজনিত পাপ রাজায় বর্ত্তে, এই বিশ্বাস থাকাতে রাজাও অবিচারকদিগকে দণ্ড দিতে বাধ্য হইতেন।

বিচারক যাহাতে পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন, আইনে তাহার জন্য সম্যক্ ব্যবস্থা ছিল। বাহুল্যবোধে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল না।

এই ব্যবস্থা ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, তাহাও এ স্থলে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে এক জন বিচারপতি কর্ত্তৃক যে বিচার হইয়া থাকে, সে বিচার অপেক্ষা অন্ততঃ চারি পাঁচ জন লোক কর্ত্তৃক বিচার অনেকটা ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয়তঃ ব্যবস্থার ভাল মন্দ বিচার করিতে হইলে সমসাময়িক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, অবস্থাভেদেই ব্যবস্থার ভেদ হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে লোক ধর্ম্মভাব এবং ধার্ম্মিকের সম্মানরক্ষাকারী ছিল। সেই জন্য বিচারকগণ অধর্ম্মাচরণ করিতে ভয় পাইতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ যদি অধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত সামাজিক সম্মান হারাইতেন। জনসমাজে তিনি অবজ্ঞাত এবং উপেক্ষিত হইতেন। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন :—

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে না বেদবিদি ধর্ম্মবিৎ॥"

অর্থাৎ যে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) বিড়ালতপস্বী, অর্থাৎ যাহার ভিতরে লোভ, কিন্তু বাহিরে ধার্ম্মিকতার ভাণ বিদ্যমান এবং যে দ্বিজ সুবিধা পাইলে ছিদ্রান্বেষী মার্জ্জারের মত পরস্ব অপহরণ করে, তাহাকে এবং যে ব্রাহ্মণ বকধার্ম্মিক অর্থাৎ শঠ, স্বার্থপর এবং ভিতরে দাম্ভিক হইলেও বাহিরে বিনয় দেখায় এবং যে ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা নহে, সেই দ্বিজ ও সেই ব্রাহ্মণকে (মরণ-কালে) মুখে জল পর্য্যন্তও দিবে না। ইহা ভিন্ন অধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদি পুণ্যকার্য্যে ভোজন করাইলে কায পণ্ড হইয়া যায়। এই ব্যবস্থাও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। সুতরাং পূরাকালে অধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগের উপর কঠোর সামাজিক শাসন ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন এই সকল সামাজিক শাসন ও রাজশাসন বলবৎ ছিল। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণ বিচারকগণ জানিয়া শুনিয়া অবিচার করতঃ দুষ্কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেন না। অন্যজাতীয় সভাসদ্‌গণও অবিচার করিতে ভয় পাইতেন। সেই জন্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-দিগকে প্রাড়্‌বিবাকের পদ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ের জুরীর বিচার অপেক্ষা পূর্ব্বকার এই বিচারপদ্ধতি অনেক ভাল ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা জুরী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান অল্প এবং অনেকে বিশেষ শিক্ষিত নহেন বলিয়া সময়ে সময়ে বিচার-বিভ্রাট ঘটে। অনেকে প্রলোভনেরও বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় বিচার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। পূর্ব্ব-ব্যবস্থায় তাহা হইতে পারিত না। সুতরাং পূর্ব্ব-ব্যবস্থাই ভাল ছিল বলিয়া মনে হয়।

বিচারে ভুল হইলে বর্ত্তমান কালের ব্যবস্থার ন্যায় পূর্ব্ব-কালেও নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করা যাইত। যথা মনু—

"অমাত্যাঃ প্রাড়্‌বিবাকো বা যৎ কুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥"

অমাত্য সকল অথবা প্রাড়্‌বিবাক যদি কোন মামলার অন্যায় বিচার করেন, তাহা হইলে রাজা পুনর্ব্বার ঐ মামলার বিচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারীর সহস্র পণ দণ্ড করিবেন।

নিম্ন আদালত যে বিচার করিয়াছেন, সে বিচার ধর্ম্মতঃ বা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে ঐ মামলার আর পুনর্ব্বিচার বা আপীল গ্রাহ্য হইত না।

প্রাচীন ভারতে মামলা করিবার জন্য রাজনিযুক্ত আদালতেই লোক যাইতে বাধ্য ছিল না। গ্রামের লোক এবং সমাজের লোক প্রায় অধিকাংশ মামলারই বিচার করিতেন। গ্রাম্য আদালতের বা সালিসীর বিচারে লোক সন্তুষ্ট না হইলেই রাজ-নিযুক্ত আদালতে গমন করিত। রাজকীয় আদালত গ্রাম্য বা সামাজিক আদালতের রায় আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারিতেন। অধিকাংশ মামলার বিচারই গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা সমাজমুখ্যগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইত। এ বিষয়ে আর প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল না। কারণ, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

বিচারের কথা আলোচনা করিতে হইলে সাক্ষ্যপ্রমাণের কথাও বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হয়। সাক্ষীর উপরই বিচার-ফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালেও মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা লোককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা হইত। সেই জন্য লোক যাহাতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিতে না পারে, সে জন্য বিচারক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে সাক্ষীদিগকে যেরূপ সত্যপাঠ করান হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালেও বিচারকগণ সেইরূপ সাক্ষীদিগকে প্রতিজ্ঞা পাঠ করাইতেন। কেবল তাহাই নহে; সাক্ষ্য দিবার সময় প্রতি বিচারক সাক্ষীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে সত্যবাক্য বলিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। সে উপদেশ অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ছিল। সেই সময়ের লোক ধর্ম্মে ও পরকালে আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া ঐ সকল উপদেশ-বাক্য সাক্ষীদিগের মর্ম্মস্পর্শী হইত। সে উপদেশ-বাক্য-গুলি অত্যন্ত দীর্ঘও হইত। আমি তাহার কয়েকটি নমুনা দিলাম। বিচারপতি মিষ্ট ভাষায় সাক্ষীদিগকে বলিতেন :—

"আপনাকে এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষী মানা হইয়াছে, অতএব আপনি এই মামলা সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা সত্য করিয়া বলিবেন। সাক্ষী সাক্ষ্যপ্রদানকালে ঠিক সত্য কথা বলিলে পরকালে উত্তমা গতি এবং ইহকালে অত্যুত্তমা কীর্ত্তি লাভ করে। ব্রহ্মাও সত্য বাক্যের পূজা করিয়া থাকেন। * * * আপনি যদি সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা কথা বলেন, তাহা হইলে লোক ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, মিত্রদ্রোহিতা এবং কৃতঘ্নতার দ্বারা যে পাপ অর্জ্জন করে, আপনিও সেই পাপ অর্জ্জন করিবেন এবং আপনার সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য কুক্কুরে গমন করিবে। হে কল্যাণ! আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আপনি একাকী আছেন, অর্থাৎ আপনার পাপ অন্য কেহই জানিতে পারিবে না, তাহা হইলে আপনি ভুল করিবেন; আপনার পাপ-পুণ্যের দ্রষ্টা

সর্ব্বজ্ঞ মুনি আপনার পরমাত্মা নিত্য আপনার দেহে বিরাজ করিতেছেন। এই বৈবস্বত যমই পরমাত্মারূপে আপনার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। আপনি যদি সত্য কথা বলেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আপনার কোন বিবাদ ঘটিবে না। আপনি যদি তাঁহার সহিত নির্ব্বিবাদে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আপনি ঘরে বসিয়াই গঙ্গাস্নানের বা কুরুক্ষেত্রতীর্থ-গমনের ফল লাভ করিবেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে নগ্ন, মুণ্ডিতশিরা, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত এবং অন্ধ হইয়া ভিক্ষা-কপাল হস্তে শত্রুর দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্ম-নিশ্চয় স্থলে জিজ্ঞাসিত হইয়া যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, সেই মহাপাপী অধোমুখ হইয়া মহান্ধকার নরকে যায়। সাক্ষ্যবাক্য বলিবার সময় যাঁহার অন্তরস্থ আত্মা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না, দেবতারা ইহলোকে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া জানেন। * * * আপনি মিথ্যা বাক্য বলিয়া যাঁহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, নিশ্চয় জানিবেন, আপনার শত জন্মের সঞ্চিত পুণ্য সমস্তই তাহাতে গমন করিবে। অতএব আপনি কখনই মিথ্যা কথা কহিবেন না, যাহা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তাহাই নির্ভয়ে যথাযথভাবে বিবৃত করিবেন; কদাচ সত্য হইতে বিচ্যুত হইবেন না।" (মনু ৮ম, বশিষ্ঠ ১৬ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

এইরূপ ভাবে সাক্ষীকে সত্য কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিবার পর প্রাড়্‌বিবাক স্বয়ং শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্নে দেবপ্রতিমা অথবা ব্রাহ্মণসমীপে শুচি দ্বিজদিগকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগকে মোকর্দ্দমার বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। সে সময়ে সাক্ষীদিগকে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত। (মনু ৮।২৭)

ইহার কারণ, দেবপ্রতিমা-সমক্ষে এবং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-সমক্ষে পূর্ব্বকালের লোক মিথ্যা কথা বলিতে চাহিত না। উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া সূর্য্য সাক্ষ্য পূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলিতেও লোক সহজে সম্মত হইত না। (মনু ৮।৮৭)

প্রাচীন কালে বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন প্রকারে শপথ গ্রহণ করাইয়া তবে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত। যথা—ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা, ক্ষত্রিয়কে তাহার বাহন এবং আয়ুধ স্পর্শ করাইয়া, বৈশ্যকে তাহার গো, বীজ এবং কাঞ্চন স্পর্শ করাইয়া এবং শূদ্রকে সমস্ত পাতক দ্বারা শপথ করান হইত (মনু ৮। ১১৩)। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ শুচি এবং সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ছিলেন না, তাঁহাদিগকে শূদ্রের ন্যায় শপথ করাইতে হইত, যথা—

"গোরক্ষান্ বাণিজিকাংস্তথা কারু-কুশীলবান্।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধ ষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ॥"
(মনু ৮।১০২)

যে ব্রাহ্মণ গোরুর রাখালী করিয়া থাকে, অথবা যে বাণিজ্যজীবী, পাচক, নর্ত্তক, দাসকর্ম্মজীবী, এবং যে মহাজনী করে অর্থাৎ সুদ লইয়া টাকা ধার দেয়, তাহার সহিত শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে; সুতরাং শূদ্রকে যেরূপ শপথগ্রহণ প্রভৃতি করিতে বাধ্য করান হইয়া থাকে, ঐ সকল সত্ত্বগুণবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকেও সেইরূপ ভাবে শপথাদি করাইতে হইবে।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণমাত্রই যে আদালতে বিশেষ অধিকারের দাবী করিতে পারিতেন, তাহা নহে; যে সকল ব্রাহ্মণ বিশেষ ধার্ম্মিক ও সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন নহেন, তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় অবজ্ঞাত হইতেন। এক কথায় ধর্ম্মসভা বা আদালতে ধার্ম্মিকতার ও সত্ত্বগুণেরই সম্মান করা হইত, জাতির সম্মান করা হইত না। ধার্ম্মিক শূদ্রের প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের কথা সাধারণভাবে বলা আছে।

আদালতে যে ব্যক্তিই মিথ্যা কথা বলিত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ কঠোর দণ্ড দেওয়া হইত। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিত, সেই ব্যক্তি যে মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, সেই মামলার আসামী যে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল, সেই অপরাধে যে দণ্ড বিহিত আছে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড এবং অপরাধের গুরুত্ব অধিক হইলে (অর্থাৎ অর্থ বা লোভের বশীভূত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে) তাহার মূল আসামীর পক্ষে বিহিত দণ্ডের অষ্টগুণ দণ্ডভোগ করিতে হইত (যাজ্ঞ, ২।৮৩-৮৪)।

ব্রাহ্মণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা যাহাতে অবিচার না হয়, সে জন্য পুরাকালে বিশেষ চেষ্টা করা হইত। অবিচারে রাজার এবং প্রাড়্‌বিবাকদিগের ধর্ম্মভয় ছিল।

সাক্ষী এবং দলীল সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা অতি সুন্দর। এ ক্ষেত্রে তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। অবিচার প্রতিরোধের জন্য যত প্রকার উপায় করা সম্ভব, তাহা সমস্তই বিহিত ছিল। অবশ্য সে বিধান সমাজের তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনায় বিহিত হইয়াছিল।

বিচারের কথা আলোচনা করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডদান-ব্যবস্থার কথাও বিবেচনা করিতে হয়। পুরাকালে সকল দেশেই কঠোর দণ্ড প্রদত্ত হইত। সমাজের অবস্থা বুঝিয়া তাহা তখন প্রয়োজন হইত বলিয়া মনে হয়। তবে কতকগুলি দণ্ড যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা-ব্যঞ্জক ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যথা—অঙ্গচ্ছেদ ও অঙ্গদাহ দণ্ড। অপরাধী না মরে, এরূপভাবে ঐ সকল দণ্ড প্রদান করা হইত। অপরাধের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক না হইলে উচ্চতম দণ্ড প্রদত্ত হইত না। সাধারণতঃ এই প্রকার দণ্ডই বিহিত হইত। যথা—

(১) প্রাণদণ্ড। সে কালে ফাঁসী দিবার রীতি ছিল না। অগ্নি বা জলমধ্যে নিক্ষেপ, উচ্চস্থান হইতে নিক্ষেপ, শূলারোহণ এবং যজ্ঞীয় পশুরূপে হত্যা, এই কয় প্রকার প্রাণদণ্ডই ছিল। কিন্তু কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করানই অত্যন্ত বর্ব্বরতাসূচক দণ্ড ছিল। উহা ক্বচিৎ প্রযুক্ত হইত। (২) নির্ব্বাসন দণ্ড, (৩) কারাদণ্ড, (৪) কশাঘাত দণ্ড, (৫) সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড, (৬) অর্থদণ্ড এবং (৭) অঙ্গচ্ছেদ বা অঙ্গদাহ দণ্ড।

শাস্ত্রে অবশ্য অতি কঠোর দণ্ডই নির্দ্দিষ্ট আছে; উহা চরম দণ্ড। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাড়্‌বিবাক যে আসামীকে সেই চরম দণ্ডই দিতেন, তাহা নহে। অতি ভীষণ অপরাধ ভিন্ন প্রায় দণ্ড প্রদত্ত হইত না। কামন্দকীয় নীতিসারে লিখিত আছে—

"মহৎস্বপ্যপরাধেষু দণ্ডং প্রাণান্তিকং ত্যজেৎ।
ঋতে রাজ্যাপহারাত্ত্ব যুক্তদণ্ডঃ প্রশস্যতে॥"
(কাম ১৪ স, ১৬)

মহৎ অপরাধেও প্রাণান্তিক দণ্ড করিবে না; রাজ্যাপহরণ ব্যতীত সর্ব্বত্র যুক্তদণ্ড দান করাই কর্ত্তব্য।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন:—

"দণ্ড্যাস্যাদণ্ডনান্নিত্যমদণ্ড্যস্য চ দণ্ডনাৎ।
অতিদণ্ডাচ্চ গুণিভিস্ত্যজ্যতে পাতকী ভবেৎ॥"
(শুক্রনীতি, ৪।১।৫৪।)

যে বিচারপতি দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে মুক্তি দেন অথবা যে দণ্ডনীয় নহে, তাহাকে দণ্ডিত করেন এবং সর্ব্বদা অতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করেন, সজ্জনগণ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং তিনি পাতকী হয়েন।

তবে শাস্ত্রে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে কেন? উত্তরে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অল্পদানাং মহৎ পুণ্যং দণ্ডপ্রণয়নাৎ ফলম্।
শাস্ত্রেষুক্তং মুনিবরৈঃ প্রবৃত্ত্যর্থং ভয়ায় চ॥"
(শুক্র, ৪।১।৫৫)

বড় বড় মুনি, ঋষি প্রভৃতি সামান্য দানেই অত্যন্ত অধিক পুণ্য হয় এবং দণ্ড প্রদান করিলে ফল হয়, ইহা লিখিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা লোককে দানকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং অতি দণ্ডদান করা কর্ত্তব্য নহে। কথাটা তিনি আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন। যথা,—

"অশ্বমেধাদিভিঃ পুণ্যং কৃৎ কিং স্যাৎ স্তোত্রপাঠতঃ।
ক্ষময়া যত্তু পুণ্যং স্যাত্তৎ কিং দণ্ডনিপাতনাৎ॥"
(ঐ ৪।১।৫৬)

অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা যে ফল হয়, স্তোত্রপাঠমাত্র করিলে কি সেই ফল হইতে পারে? কখনই না। সেইরূপ ক্ষমার দ্বারা, করুণার সহিত দণ্ডপ্রয়োগ দ্বারা যে ফল হয়, (কঠোর) দণ্ডপ্রয়োগে কি সেই ফল হইতে পারে?

অর্থাৎ বিচারক দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিবেন সত্য, কিন্তু ক্ষমার গুণ বিস্মৃত হইয়া দণ্ড দিবেন না। শাস্ত্রের ইহাই অর্থ। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, শাস্ত্রে কঠোর দণ্ড লিখিত হইয়াছে বলিয়াই প্রাড়্‌বিবাকগণ আসামীদিগকে অতি কঠোর দণ্ড দিতেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

বিচারক যে কেবল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চরম দণ্ডই প্রদান করিবেন, এমন কোন কথা নাই; মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"জ্ঞাত্বাপরাধং দেশঞ্চ কালং বলমথাপি বা।
বয়ঃকর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥"
(যাজ্ঞ, ১।৩৬৮)

ইহার অর্থ—বিচারপতি আসামীর অপরাধ, দেশ, কাল, বল, কর্ম্ম, বয়স এবং বিত্ত (আর্থিক অবস্থা) বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাকে দণ্ড দিবেন।

এই সকল ব্যবস্থা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাস্ত্রে অপরাধীদিগকে কঠোর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও কার্য্যতঃ একেবারেই কোন অপরাধীকে কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করা হইত না। তবে যে ব্যক্তি প্রথমে অল্প দণ্ড পাইলেও সংশোধিত হইত না, তাহাকেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কঠোর দণ্ড প্রদত্ত হইত। যথা মনু—

"বাগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরম্॥" (মনু, ৮-১২৮)

ইহার অর্থ,—প্রথম অপরাধে বাগ্‌দণ্ড অর্থাৎ ভর্ৎসনাদি করিবে, তাহাতেও যদি তাহার চরিত্রসংশোধন না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় অপরাধে তাহাকে ধিক্কার দিবে; তাহার পর সেই আসামী যদি তৃতীয়বার ঐরূপ অপরাধ করে, তাহা হইলে তৃতীয় অপরাধে তাহাকে অর্থদণ্ড করিবে; অর্থদণ্ডেও যদি তাহার চরিত্র সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধদণ্ড অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদাদি কঠোর দণ্ড করিবে। এখানে বধদণ্ড অর্থে প্রাণদণ্ড নহে, দৈহিক দণ্ড।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে,—
"কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ।" (১০০ সর্গ, ২২)

হে ভরত, তোমার রাজ্যে প্রচণ্ডদণ্ডে প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করা হয় নাই ত? ইহাতে বুঝা যায় যে, কঠোর দণ্ডপ্রদান রাজধর্ম্মসঙ্গত নহে। মহাভারতেও ঐরূপ কঠোর দণ্ডপ্রদান নিষিদ্ধ আছে। (শান্তিপর্ব্ব, ২৬৬ অধ্যায়)

সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কোন স্থানে শূদ্রাদির প্রতি কঠোর দণ্ড দিবার যে ব্যবস্থা আছে, কার্য্যতঃ সহসা সে দণ্ড দেওয়া হইত না। আজকাল অনেকে নিম্ন জাতির প্রতি উচ্চবর্ণের কঠোর ব্যবহারের কথা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা অনেকটা অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত। তবে তখন সামাজিক অবস্থা বুঝিয়া লোকের মনে কুকর্ম্মে ভীতি উৎপাদনের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কার্য্যতঃ ঐ দণ্ড প্রযুক্ত হইত না। ইহার বহু প্রমাণ আছে। সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



বিষাদে প্রসাদ

১১

রামলীলা আরম্ভ হইতে তখনও একটু বিলম্ব ছিল। পুলিসের তত্ত্বাবধানে যেখানে মোটর গাড়ীগুলি রাখা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে বিপুল জনতা। সে জনতার মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য! কমলাদের মোটরখানির পাশে আর একখানি মোটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে গাড়ীতে এক জন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বসিয়াছিল। তাহার পোষাকটা বিলক্ষণ জাঁকজমকের, সে কিন্তু গাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগের আসনে না বসিয়া মোটর ড্রাইভারের সহিত সম্মুখের আসনে বসিয়া মেলা দেখিতেছিল, মোটর গাড়ীখানা দেখিলেই বোধ হইতেছিল, উহা ঘরের গাড়ী নহে, ভাড়াটীয়া অর্থাৎ ট্যাক্সী। এই ট্যাক্সীর ঠিক পাশেই মোটরে বসিয়া কমলা ও বিমলা প্রভৃতি অপেরা গ্লাসের সাহায্যে রামলীলা দেখিবার জন্য সেই মেলার মধ্যভাগস্থিত রঙ্গমঞ্চের দিকে মধ্যে মধ্যে চাহিতেছিল, আর মাঝে মাঝে সম্মুখবর্ত্তী বিশাল জনতার দিকে চাহিয়া একটা কেবল অশান্তির ভাব অনুভব করিতেছিল।

শৈলেন্দ্র অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিয়া বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা যে, ভীড়ের মধ্যে যাইয়া রঙ্গমঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে ভাল করিয়া রামলীলা দেখে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া যতীন্দ্র বাবু বলিলেন, "শৈলেন, তুমি ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া যদি মেলা দেখিতে চাও, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। আমি কিন্তু বুড়া মানুষ, অত ভীড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিব না, কমলা ও বিমলাকে লইয়া আমি এই গাড়ীতেই রহিলাম, তোমার ইচ্ছা হয় ত মেলার মধ্যে ঢুকিয়া তুমি তোমার ঔৎসুক্য নিবৃত্ত করিতে পার।"

যতীন বাবুর এই কথা শুনিয়া শৈলেন্দ্র মোটর হইতে নামিয়া পড়িল। তাহাকে নামিতে দেখিয়া বিমলাও তাড়াতাড়ি মোটর হইতে নামিল এবং বলিল, "আমিও ভাল করিয়া মেলা দেখিতে চাই। শৈলেন বাবু যদি এই ভীড় ঠেলিয়া উহার ভিতর ঢুকিতে সাহস করেন, আমি তাহা করিব না কেন?" কমলার ইচ্ছা ছিল না যে, বিমলা ঐ ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কষ্ট পায়, সুতরাং সে বিমলার এই প্রকার অসমসাহসে বাধা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমার ভাই যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। এই খোট্টা গোঁয়ার লোকে ভরা এমন ভীষণ ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে কিছুতেই উচিত হয় না, তোমার যাওয়া হইবে না।"

কমলার এই কথা শুনিয়া বিমলার যাইবার জিদ আরও বাড়িয়া গেল. হাসিতে হাসিতে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে সে বলিল, "কমলা দিদি, ক্ষমা কর, তোমার আজিকার এই অনুরোধ রাখিতে পারি না। আমার অপরাধটা ত মেয়েমানুষ হওয়া ছাড়া আর কিছু নহে, কিন্তু আমি তোমার ন্যায় বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেও বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করি নাই। এইখানে বসিয়া বসিয়া তুমি দেখ, আমি বিমলা, এই ভেড়ার পালের ন্যায় আহাম্মক পুরুষগুলার মধ্যে সিংহীর বিক্রমে বিচরণ করিয়া আসি; কমলা দিদি, কিছু মনে ক'র না, আমার স্বভাবটাই এইরূপ।"

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি শৈলেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বিমলা বলিল, "কি বলেন শৈলেন বাবু!" থতমত খাইয়া শৈলেন বাবু আর কি বলিবে, সে বলিল, "বিমলা ত আর কাহারও কথা শুনে না, তাহার ইচ্ছায় বাধা দিই, এমন সামর্থ্য আমারও নাই।" এই বলিয়া শৈলেন্দ্র ভীড়ের দিকে অগ্রসর হইল, হাসিতে হাসিতে বিমলাও তাহার অনুসরণ করিল।

১২

প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, বিমলার বা শৈলেন্দ্রের কাহারও দেখা নাই, যতীন্দ্র বাবু ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, কমলাও বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল। বিপদ যখন আসে, তখন একলা আসে না, সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসম্ভাবিত সাথীও জুটাইয়া লয়, শৈলেন্দ্র ও বিমলা চলিয়া যাইবার খানিক পরে আকাশে পশ্চিমদিকে ঘন মেঘের সঞ্চার দেখা দিয়াছিল, বাতাসও ক্রমে বাড়িতে লাগিল, জনতার ঘন-সন্নিবিষ্টভাবও কমিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিমলা ও শৈলেন্দ্রের কোন খবরই নাই। ব্যাপারখানা কি, তাহা যতীন্দ্র ও কমলা উভয়েই কিছুই বুঝিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আসিবার সময় মনোরমাকে অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিল বলিয়া সত্বর গৃহে ফিরিবার জন্য কমলা বিশেষভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বাতাসের তীব্রতাও বাড়িতে লাগিল। যে ভাবে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাহাতে শীঘ্র যে তাহা থামিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। জনতা অনেক কমিয়া গিয়াছে, ভিজিবার ভয়ে তাড়াতাড়ি যে যে দিকে পারে দ্রুতপদে মেলা হইতে সরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু শৈলেন্দ্রেরও দেখা নাই, বিমলারও কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় কি করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়াও যতীন্দ্র বাবু যখন কোন কূল-কিনারা করিতে পারিতেছিলেন না, সেই সময় তাঁহাদের মোটর গাড়ীর পার্শ্বে যে ট্যাক্সীখানা দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। যতীন্দ্র বাবুকে সেই দিকে চাহিতে দেখিয়াই সে ট্যাক্সীর ড্রাইভার দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত যতীন্দ্র বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবু সাহেব, আগর হুকুম হোয় ত মৈ আপকো ডেরা মে পঁহুছা সক্‌তা হুঁ।" যতীন্দ্র বাবু ভাবিলেন, এ বুঝি বিধাতার অনুগ্রহ, ক্ষতি কি? কমলা



পূজারী

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভৌমিক।

COLOUR ILLUSTRATION

সঙ্গে লইয়া তিনি যদি ঐ ট্যাক্সীর সাহায্যে বাড়ী চলিয়া যান, তাহা হইলে ত ভালই হয়। কিন্তু তাঁহাদের মোটরখানি কাহার কাছে থাকিবে? যতীন্দ্র বাবুর এই প্রকার মনের অবস্থা যেন বুঝিতে পারিয়াই ট্যাক্সী-চালক বলিল, "বাবু সাহেব, আপ কেঁউ শোচতে হেঁ? আপইকো মোটর চালায়কর মৈ আপকো ডেরামে পঁহুছাইঙ্গা, মেরী গাড়ী পর তবতক্ মেরে বাবু সাহেব বৈঠে রহেঙ্গে।" ট্যাক্সী-চালকের এই বদান্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া যতীন্দ্র বাবু বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি আদরের সহিত সেই ট্যাক্সীতে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, যদি ইহার মধ্যে শৈলেন্দ্র ও বিমলা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তিনি যেন দয়া করিয়া তাহাদিগকে নিজের ট্যাক্সীতে তুলিয়া লয়েন। শৈলেন্দ্র নিজেই মোটর চালাইতে পারেন, সুতরাং ট্যাক্সী-চালকের ফিরিয়া আসিবার জন্য তাঁহারা যেন অপেক্ষা না করেন। শৈলেন্দ্রই ট্যাক্সী চালাইয়া বিমলাকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইবে। দয়া করিয়া তিনি যদি এই বিষয়ে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি চির-কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

ট্যাক্সীর উপর যে ভদ্রলোকটি বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "ইহাতে কোনই ক্ষতি হইবে না। আমি বসিয়া রহিলাম, শৈলেন্দ্র ও বিমলা যতক্ষণ না ফেরেন, সে পর্য্যন্ত আমি এইখানে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আমার ড্রাইভারকে লইয়া আপনার গৃহে ফিরিয়া যাউন, আমার দ্বারা আপনার এই যে স্বল্পমাত্র উপকার হইল, ইহার জন্য আমি আমাকে চিরদিন সৌভাগ্যযুক্ত ও গৌরবান্বিত বলিয়াই মনে করিব।" অবশ্য এই কয়টি কথা এই হিন্দুস্থানী বাবুটি বেশ পরিষ্কার ইংরাজী ভাষাতেই বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই কয়টি কথা শুনিয়া আরও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া যতীন্দ্র বাবু গৃহাভিমুখে ফিরিতে উদ্যত হইলেন। সেই ট্যাক্সী-চালক তাঁহাদিগের মোটরে যথাস্থানে বসিয়া তাঁহারই ইঙ্গিত অনুসারে দারাগঞ্জ অভিমুখে তাঁহাদের মোটর চালাইতে আরম্ভ করিল।

এই সময় বৃষ্টি অতিবেগে নামিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝটিকাও বহিতে আরম্ভ করিল, মেলা তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। পথে মাঝে মাঝে দু'একটি লোক দেখা যাইতেছে মাত্র; নিবিড় অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া যেন প্রলয়-নিশার ভয়াবহ আকৃতি মনের মধ্যে জাগাইতেছিল। ঠিক এই সময়ে মোটর-চালক যতীন্দ্র ও কমলাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে মোটর হাঁকাইয়া দিল।

১৩

এই দুর্য্যোগে যতীন্দ্রনাথ ও কমলা সশঙ্কহৃদয়ে সেই দ্রুতগামী মোটরের মধ্যে বসিয়া প্রবল শীতে কাঁপিতেছিলেন। ঝটিকা ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মোটরের পর্দ্দা দুই দিকেই ফেলা ছিল, সম্মুখেও ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না যে, মোটর কোন্ দিকে চলিয়াছে। দেখা যাইলেই বা কি হইত? কারণ, যতীন্দ্র বাবু এলাহাবাদের সকল পথ চিনিতেন না, এরূপ দুর্য্যোগে এমন গভীর অন্ধকারে এমন বৃষ্টির মধ্যে পথ চিনিয়া লওয়া বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভবপর নহে। সুতরাং বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াও যতীন্দ্র বাবু কোন্ পথে যাইতেছি বা কোথায় যাইতেছি, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বিরত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আর কমলা আকস্মিক বিপৎপাতের আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যাকুলভাবে নীরবে বসিয়া, কখন্ গাড়ী থামিবে, তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ী কিন্তু নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। রামলীলার মেলা হইতে দারাগঞ্জ চার মাইলের অধিক হইবে না, এইরূপ একটা আন্দাজী দূরত্বের কল্পনা মেলায় আসিবার সময় যতীন্দ্র বাবুর ও কমলার উভয়েরই হইয়াছিল। যেরূপভাবে মোটর চলিতেছিল, তাহাতে চার মাইল যাইতে পনের ষোল মিনিটের বেশী কিছুতেই লাগিতে পারে না। কিন্তু ভয়বিস্ময়ের সহিত যতীন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, তাঁহারা এক ঘণ্টারও অধিক কাল চলিতেছেন। ব্যাপারখানা কি কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি উদ্বেগের সহিত মোটর-চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারাগঞ্জ কত দূর, এত বিলম্ব হইতেছে কেন?" যতীন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া মোটর-চালক গম্ভীরভাবে একটু রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "বাবু, মৎ ঘবড়াইয়ে, রাস্তা ভুল গয়া। চুপ্ চাপ্ রহিয়ে; আভী পঁহুছা দেতা হুঁ।"

মোটর-চালকের সেই রুক্ষস্বরসমন্বিত উত্তর শ্রবণ করিয়া যতীন্দ্র বাবু শঙ্কিত হইলেন, কমলাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল, মোটর কিন্তু থামিল না। সমানবেগে পূর্ব্বেরই ন্যায় চলিতে লাগিল। বৃষ্টিরও বিরাম নাই, ঝটিকার গতিও মন্দীভূত হয় নাই। গাঢ় অন্ধকারে মনের অন্ধকার মিশাইয়া কমলা ও যতীন্দ্রনাথ একটা আকস্মিক বিপৎপাতের অস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইয়া যাইবার পর মোটর থামিল, তখন বৃষ্টি প্রায় থামিয়া গিয়াছে, ঝটিকারও আর সে বেগ নাই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছাড়া ছাড়া মেঘের মধ্য হইতে নবোদিত চন্দ্রের নাতিপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় পার্শ্ববর্ত্তী বস্তুনিচয় প্রতিভাত হইতেছিল। ঠিক এমন সময় মোটর-চালক গাড়ী থামাইয়া নিজে নামিয়া যতীন্দ্র বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং হাসিয়া বলিল—"সেলাম বাবুজী, উতরিয়ে, ঠিকানামে পঁহুছ গয়ে।"

তাড়াতাড়ি কমলার হাত ধরিয়া মোটর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যতীন্দ্রনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, এ এক অপরিচিত নূতন স্থান। একখানি বৃহদাকার বাংলোর দ্বারদেশে তিনি দণ্ডায়মান, সম্মুখে তরবারি ও বন্দুক প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রে সজ্জিত দশ বারো জন ভীষণাকৃতি পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। আরও দেখিলেন যে, সেই সশস্ত্র পুরুষগণের মধ্যে সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রবেশধারী পুরুষটি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। এই ব্যক্তিকেই না তিনি মেলা হইতে ফিরিবার সময় অভাবনীয় সাহায্যকারী বলিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন! এ—কি! এ—কি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? অথবা সত্য সত্যই কোন ভীষণ চক্রান্তকারী প্রবল দস্যুর হস্তে তাঁহারা পড়িলেন! কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যতীন্দ্র বাবু সেই হিন্দুস্থানী বাবুটির মুখের দিকে দৃঢ়তা ও সাহসব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, এ কি ব্যাপার? আপনিই কি এই বিরাট নাট্যলীলার সূত্রধার?"

অণুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই হিন্দুস্থানী বাবুটি উত্তর করিল,"বাবুজী, মিছে ব্যাকুল হইয়া আর কি লাভ? দৈবক্রমে অনেক পরিশ্রমের ফলে আপনার ন্যায় বড়লোক আজ এই দরিদ্রের গৃহে অতিথিরূপে উপনীত হইয়াছেন। এখন বেশী কথা বলিবার সময় নাই, এখান হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৃথা চেঁচামেচি করিয়া আপনাদের বিপদ্‌কে আরও ঘনীভূত করিবেন না; আপনারা পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। আসুন! আমার সামর্থ্যানুসারে আপনাদের আতিথ্য করিয়া আমাকে ধন্য হইবার অবসর প্রদান করুন। বেশী কথা বলিবও না, শুনিবারও অবসর নাই।" এই বলিয়া সেই লোকটি সসম্ভ্রমে যতীন্দ্র বাবুকে অভিবাদন করিয়া একবার কমলার দিকে মৃদু হাস্যের সহিত অতি কোমলভাবে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়িল। তাহার চলিয়া যাইবার পরেই এক জন ভদ্রবেশধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইল, এবং কহিল—"বাবুজী আসুন, আপনাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে আপনাদের আহার প্রস্তুত আছে।"

কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় তাহার বাক্যে কোনও উত্তর না দিয়া কমলার হাত ধরিয়া যতীন্দ্র বাবু সেই বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বৃহদায়তন বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই জন লোক আলোক ধরিয়া পথ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া চলিল। অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা একটি সুসজ্জিত গৃহের মধ্যে উপনীত হইলেন এবং তথায় তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিল, "বাবু সাহেব, বৃষ্টিতে আপনাদিগের কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে, তাই পূর্ব্ব হইতে আপনাদিগের জন্য নূতন বস্ত্রাদি আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; আপনারা বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করুন, চা প্রস্তুত হইয়াছে, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আহারও প্রস্তুত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এইখানেই আপনাদিগকে অদ্য রাত্রি যাপন করিতে হইবে।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া যতীন্দ্র বাবু বড়ই রাগিয়া উঠিলেন; তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণঠাকুর, তোমাদের আতিথেয়তা দস্যুর আতিথেয়তা, আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি না, আমরা এই ভাবেই এখানে রাত্রি কাটাইব। রাত্রিই বা কেন, যে পর্য্যন্ত তোমরা ধরিয়া রাখ, সেই পর্য্যন্ত এই ভাবে রহিব, তোমাদের প্রদত্ত বস্ত্র বা তোমাদিগের প্রদত্ত অন্ন আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিব না। যাও, বিরক্ত করিও না, আমাদিগকে বিশ্রাম করিতে দাও।"

যতীন্দ্র বাবুর মুখের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহার কোপবিকম্পিত উচ্চ কর্কশ স্বর শুনিয়া সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি একটু থতমত খাইল, একটু লজ্জিতও হইল, আর কিছু না বলিয়া আবার অভিবাদন করিয়া সে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

পতিহীনা

চাঁদের পানা মুখখানি তোর কেন বিষাদ-মাখা,
সোনার অঙ্গে গয়না কোথা, হাতে নোয়া-শাঁখা?
সীঁথেয় কেন নাইকো সিঁদুর আল্‌তা বা কই পায়ে,
ঢেউ খেলানো কেশ যে রুখু, মলিন বসন গায়ে।
দেবের ভোগ্য যৌবনে এ কালিমার ছায়া,
একাহারে উপবাসে শুকিয়ে গেল কায়া।
পরের ঘরকে আপন ক'রে করিস্ কত কায,
চিতার আগুন অরুণ-দারুণ, চাপি বুকের মাঝ।
জগতে তোর আছে রে কে বল্‌তে আপনার,
একা ভাবিস্ একা কাঁদিস্ একা হাহাকার।
উদাস প্রাণে হতাশ তানে করিস্ কত গান,
কেউ শুনে না কেউ বুঝে না বিষাদ-ভরা তান।

একটি পরাণ তোর পরাণে জ্বেলেছিল বাতি,
অভাবে তার আঁধার-মাঝে আছিস্ দিবারাতি।
কেউ ত তোরে আদর ক'রে কয় না মধুর বাণী,
স্নেহে ত কেউ দেখে না ও-মলিন মুখখানি।

নাই বাসনা নাই কামনা সদা নির্ব্বিকার,
তুই ছাড়া রে পরম ত্যাগী কোথা পাব আর?
ওরে পতিহীনা অভাগিনী নাইকো যার ঘরে,
হৃদয়-ব্যথা মরম-গাথা বুঝবে কেমন ক'রে?

নিষ্ঠুর সমাজে তোমার দেখি না মা স্থান,
দেবী-ভাবেও কেউ তোমারে করে না সম্মান।
ডুবিয়ে দিয়ে সাগর-জলে মিথ্যা লোক-লাজ,
গহন বনে যাও মা ছেড়ে নিষ্ঠুর সমাজ।

তরু দিবে পত্র-ছায়া পাখী দিবে গান,
নদী দিবে শীতল বারি জুড়িয়ে দিবে প্রাণ।
মলয় দিবে গন্ধ, চাঁদ দিবে মধুর হাসি,
নিভে যাবে মনের আগুন পেয়ে সুধারাশি।
শান্তি-উৎস উঠবে ফুটে, কানন গগন ভরি',
ভুলিয়ে দিবেন সকল দুঃখ—সকল জ্বালা হরি।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

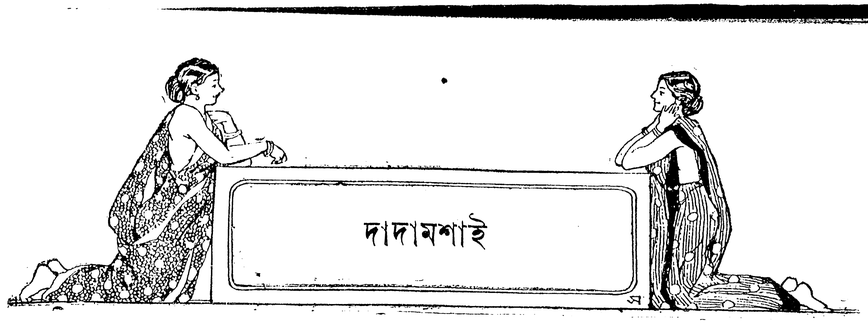

দাদামশাই

৪

এবারকার প্রথম দেখার দিনেই বল্লেন, "কৈ, তুমি গিয়ে ত চিঠিও একখানা দাও নি!"

আমি এই অপ্রত্যাশিত অভিযোগে একসঙ্গে বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠে উত্তর দিলেম, "অতটা ভরসা হয়নি দাদামশাই! একে ত লোক, তাও আবার কত কত গণ্য মান্য বড় বড় লোক আপনাকে দেবতার মত ভয়-ভক্তি ক'রে শশব্যস্ত হয়ে থাকে, আর আমি আপনাকে নিয়ে আদর আবদার অত্যাচারে বিব্রত করতেও ভয় করিনে, তার উপর আবার দূরে থেকে যে এতটা দাবী বাড়াবো, সেটা আর সাহসে কুলায় নি। বেশ, হুকুম যখন পেয়েছি, তখন এবার নির্ভয়েই লিখবো। বেশী হ'লে রাগ করতে পাবেন না।"

স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বল্লেন, "এই জন্যেই ত তোমায় অত ভালবাসি।"

প্রশ্ন কর্‌লাম, "কি জন্যে দাদামশাই? অত্যাচার করি বলে?"

উত্তর দিলেন, "নিতে জোর করেই ত হয় রে! না হ'লে কি আর নিতে পাওয়া যায়?—দেখ, মা-বাপের স্নেহ সবার পরে সমান হলেও যে ছেলে-মেয়ে বেশী মা-বাপের কাছে থাকে, তা'র দিকে পাল্লা একটু ঝুঁকেই পড়ে। ভগবানের ভক্তকেও তাঁর কাছে লেগে থাকতে হয়। এগুলো ঠিক অত্যাচার নয় ত।"

বুঝলেম, অসংখ্য রোগী ও আগন্তুকদলের চেয়ে অনেকটা ভিতরেই স্থান পেয়েছি!

বাঁকিপুরে ফিরে অল্প কিছু দিন পরেই মজঃফরপুরে ফিরে এলেম। ঠিক দেড় বৎসর পরে বাড়ী ফেরা! মনের আনন্দে দেশে বিদেশে ঘুরেছি, তার পর নিজেরও অসুখ ছিল। আর এক মাসের ত এই হিসেব পড়েই রয়েছে।

মন সর্ব্বদা যেন সেই ৪৩ নং সোনারপুরাস্থ বাড়ীখানাতে তাঁর সেই একখানি ঘরেই প'ড়ে রইলো। কিন্তু ওঃ, সে কি পরিবর্ত্তন!

প্রথমতঃ রোগ প্রায় দশ বৎসরের পুরানো। রোগ থেকে দেখতে দেখতে ক'মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়ে যেন নব-কলেবর লাভ হলো। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত কোন দিনই এমন সুস্থ আমি ছিলাম না, বরং চির-রুগ্নই ছিলাম। এ যেন আর কেহ; সে আমিই না! আবার শুধুই বাইরের চেহারা নয়, মনের ভিতরটাও যেন বসন্তের নিয়ে আসা নূতন রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে ওঠা, প্রকৃতির মতই নবীন ও তাজা হয়ে গেল। মনে হলো, যেন জন্ম-জরামরণের যে সকল মহাদুঃখ তাপ মানুষকে তার সর্ব্বক্ষম মহাশক্তি হ'তে বঞ্চিত ক'রে দুর্ব্বল ক'রে রেখে দিয়েছে, তাদের থেকে আমি যেন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছি! নিজের শক্তিকে অপর্য্যাপ্ত বলেই সর্ব্বদা অনুভব করতে লাগলেম। বাইরে সবার সঙ্গেই যোগ রেখে অথচ অনেকটাই নির্লিপ্তভাবে পড়া-শুনা এবং ধ্যান-ধারণা ক'রে যেতে লাগলেম। আসন, প্রাণায়ামও খুব সামান্য কিছু কিছু ব'লে দিয়েছিলেন, এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও যে এগুলি বিশেষ অনুকূল হবে, তাও বলেছিলেন। ফলও খুব প্রত্যক্ষভাবে পেতে লাগলেম। একটা আসন করতে করতে বাঁ-পাটা যে তখনও পর্য্যন্ত কিছু অবশ মত থেকে গেছলো, সেটা বেশ সেরে গেল।

যোগ অর্থাৎ হঠযোগ কিছু শেখাতে বলেছিলেম। তিনি হেসে বল্লেন, "ও সব কসরৎ ক'রে কি করবি? ও তোর ধাতে সইবে না।" পরে বল্লেন,—"বেশী দিন ভালও লাগবে না। ও পথ তোমার নয়! তোমার তপ-স্বাধ্যায়। ধ্যানযোগই তোমার সাধ্য, সেই দিক দিয়েই চ'লে যাও।"

তখন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেম, উনি অত বড় যোগী, অবশ্য হঠযোগের যোগী তিনি মোটেই নন। তিনি ছিলেন সত্যকার রাজযোগী। আমিও যদি তাঁর কাছ থেকে যোগ-সিদ্ধ-টিদ্ধ না হতে পারলুম, তবে আর হলো কি? কিন্তু অল্পদিনেই বুঝা গেল, বাস্তবিকই আমার স্বভাবের সঙ্গে হঠযোগের প্রক্রিয়ার মিল থাকা সম্ভব ছিল না। অগত্যা তাঁর নির্দ্দেশমত আমার পক্ষে অবশ্য যতটুকু সম্ভব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রেই বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে রইলেম। তা ছাড়া পোষ্য পুত্রের শেষ অংশ এবং জ্যোতিঃহারার আরম্ভ এই সময়কারই লেখা। 'ধ্যান', 'স্বাধ্যায়', 'সন্ধ্যা', 'সদ্‌গুরু', আরও কতকগুলি প্রবন্ধও লিখে এডুকেশন গেজেটে ছাপতে দিই। একবারে একসঙ্গে ইহ পর উভয় লোকের সম্বন্ধেই এই নূতন জাগা চিত্ত প্রাণ যেন সমান সজাগ হয়ে উঠলো। ঘোর দুঃখের মধ্যে থেকে এত বড় সুখের উপাদান যে খুঁজে পাওয়াও যেতে পারে, মনে ক'রে যেন মধ্যে মধ্যে বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়ে যেত। আর তখনই গভীর স্নেহে তাঁকেই উদ্দেশ ক'রে বলতেম, সত্যিই তুমি আমাদের মুক্তি দিতে এসেছিলে! নিজে মুক্ত হয়ে আমাদেরও সেই

পথে টেনে নিয়ে ত এলে, এর পরেও যদি আমরা পিছন ফিরি, তা হ'লে আর আমাদের জন্যে করবার কিছু থাকবে না!

আমার স্বামী এই সময় নূতন ক'রে সংস্কৃত-শিক্ষায় মন দিয়েছিলেন, অথচ তাঁর তেজালো ব্রেণের জোরে দু তিন মাসেই আমার কাছে এসে পৌঁছে গেলেন! মাস কয়েকের মধ্যেই ষড়দর্শন এবং বাছা বাছা উপনিষদ সব ক'খানাই তাঁর পড়া হয়ে গেল। এখন আমার সুবিধাই হলো। দুজনেই একসঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় পড়া যেত। বিশেষ কাণ্ট, স্পেন্সার প্রভৃতি আমার পক্ষে খুবই শক্ত হচ্ছিল, ওঁর এই দিকে মন লাগায় উনিই আমার সাহায্য করতে লাগলেন। সব বিষয়েই সঙ্গী না থাকলে বেশী দিন মন রাখাও যায় না, আর ভালও লাগে না। তা ছাড়া বুঝে ওঠাও ত চাই। এখন পড়ার উৎসাহ ও আনন্দও বেশী হলো।

এবার বাঁকিপুরে ফিরে এসেই চিঠি লিখেছিলেম এবং উত্তরও তার পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর প্রথম পত্রখানি এই—

শ্রীসদাশিব
শরণং

কাশীধাম
২৭শে পৌষ

পরম শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন—

অনু, তোমার শরীর যে অসুস্থ হইবে, আমি পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এখানে থাকিতে হইলে আমার একটু সুবিধা হইত, আমি বোধ হয়, তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ দেখিতে পাইতাম। তবে বিশ্বাস আছে, সরল হৃদয়ের প্রার্থনা সুদূর প্রদেশেও ফলপ্রসবে সমর্থ হয়, তোমরা যেখানেই থাক, আমি যদি শুদ্ধ হৃদয়ে তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তাহা কখনও নিষ্ফল হইবে না। শরীরটা সুস্থ থাকা সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়, শরীর অসুস্থ হইলে কোন কার্য্যই হয় না। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।'

তোমরা শরীরের প্রতি একটু যত্ন করিবে। শরীরের জন্য শরীরের প্রতি যত্ন করিতে বলি না, সুস্থ শরীর সাধ্যের প্রধান সাধন। এই জন্য শরীরটা যাহাতে কর্ম্মোপযোগী থাকে, তাহা করা উচিত। ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত স্বপ্রণীত চরকসংহিতাতে প্রথমেই ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গের আরোগ্যকেই উত্তম—শ্রেষ্ঠ মূল বলিয়াছেন, প্রাণৈষণার সর্ব্বাগ্রে উপদেশ দিয়াছেন।

* * * শরীরও ভাল নহে। তাহার শরীরটা যাহাতে সাধনার উপযোগী হয়, তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। আমি শীঘ্রই তাহাকে একখানি খাতাতে নিত্যকর্ম্ম ও যোগসাধন সম্বন্ধে উপদেশ লিখিয়া পাঠাইব। তুমিও যত দূর সম্ভব, ঐ উপদেশ-মত কার্য্য করিবে। খাতাটা * * * কাছেই থাকিবে। আমার শক্তি তত নাই, কিন্তু ইচ্ছা প্রবলা, কিসে তোমাদের প্রকৃত কল্যাণসাধনমার্গের প্রতিবন্ধক সরাইয়া দিতে পারি, সর্ব্বদা তাহা ভাবি। কেন ভাবি, বুঝিতে পারি না। তবে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, কোন জাগতিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এইরূপ ইচ্ছার মূলকে স্পর্শ করে নাই।

আমি তোমাদিগকে স্মরণ করি কি না,—তাহা তোমরা ক্রমশঃ আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আমি প্রাণায়াম সম্বন্ধে তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, আমার খাতা পাইবার পূর্ব্বে তোমরা তদনুরূপ কার্য্য করিও না।

মাকে বলিবে, আমি যদি কোন দিন তাঁহার অপহৃত ধনকে পরম ধনের সহিত মিলিত দেখাইতে পারি, তবেই কৃতার্থম্মন্য হইব। সোমের সর্ব্বজনকমনীয় অঙ্কে আরূঢ় সোমকে সোমের পার্শ্বে বসিয়া মা যখন নিরন্তর নিরীক্ষণ করিবেন, তখন আমার মা'র প্রতি কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইবে। তখনই আমি সোমের ঋণ পরিশোধ করিয়া শান্তচিত্ত হইব।

অনু, আমি * * * জন্য বিশেষতঃ চিন্তাযুক্ত হইয়াছি, যে দিন আমি তাহাকে নিরাপদ স্থানে উপনীত দেখিব, সেই দিন নিশ্চিন্ত হইব। আমার ধারণা, সে শুভদিন শীঘ্রই আসিবে।

আমি তোমার ঔষধ লিখিয়া দুই এক দিনের মধ্যেই পাঠাইতেছি। অম্বুজের ঔষধ পাঠাইয়া দিব এবং যে ঔষধ পাঠাইব, তাহা লিখিয়া দিব। ইন্দুর জন্য কোন চিন্তা করিও না, দয়াময়ী মা তাহাকে রক্ষা করিবেন। বড়মাকে (তোমার মা'র দিদিমাকে) আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। আশীর্ব্বাদ সকলকেই দেওয়া যায়, তবে ব্যবহার নাই।

গণদেব ও কুমারদেবকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। তোমার দিদি সুরূপা ভাল আছেন শুনে সুখী হইলাম। এখানকার সংবাদ ভাল। ছোট আগে চিঠি লিখিবে, এই নিয়মানুসারে * * কে আগে চিঠি লিখিতে হইবে না লিখিলে খাতাও দিব না, চিঠিও লিখিব না।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবরামকিঙ্কর॥

এই নামটি তাঁর গুরুদত্ত, তিনি এই নামটিই ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নিজের নাম কখনও ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তাঁহার দ্বিতীয় পত্রও ইহার অল্পদিন পরেই পাইয়াছিলাম।

শ্রীসদাশিব
শরণং

কাশীধাম
৯ই মাঘ

পরম শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন

অনু, তোমার ও শিখরনাথের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

প্রায় দেড় বৎসর হ'তে আমার বামহস্তে বাত হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, আবার আপনিই কমিয়া যায়। তোমরা এখান হইতে যাইবার পরেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল, এখনও একেবারে কমে নাই। তোমার দ্বিতীয় পত্রের উত্তর দিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ; হাতের বেদনা বশতঃ * * কেও খাতা পাঠাইতে পারি নাই, বেদনা আরও একটু কমিলে খাতা লিখিতে আরম্ভ করিব।

আমার বোধ হইতেছে, অমীর মীনরাশিই স্থির, তাহার পূর্ব্ব-ঠিকুজী শুদ্ধ নহে। আমি শীঘ্রই অন্য এক ব্যক্তি দ্বারা একখানি ঠিকুজী প্রস্তুত করিব, এবং তোমাকে সংবাদ দিব।

সেখানে তোমার শরীর কেমন আছে? কাসিটা কমেছে? এখন কোন ঔষধ ব্যবহার করিতেছ কি? আমি তোমার ৫ অমীর ঔষধ পাঠাইয়া দিব।

সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা ক্রমশঃ বিনা বাধায় গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন কর; প্রকৃত কল্যাণবহ মার্গ তোমাদের নিষ্কণ্টক ও সুখগম্য হউক। যেখানে আধি-ব্যাধির প্রবেশাধিকার নাই, শোকশরে বিদ্ধ হইতে হয় না, যে স্থান অজ্ঞানবিরহিত, বিমল জ্ঞানালোকে সদা প্রকাশিত, সদানন্দময়, যেখানে মিলনের পার্শ্বে বিচ্ছেদের অহৃদ্য ছবি সংলগ্ন থাকে না, সংযোগের আনন্দ যেখানে বিয়োগের ভীতি কর্ত্তৃক প্রতিক্ষণে আবৃত হয় না, ছাড়িতেই হইবে বলিয়া যেখানে প্রিয় জনের সহিত মিলিত হওয়ার উৎসাহ মন্দীভূত হয় না, সেই সর্ব্বমর্ত্ত্য-ধামবাসীর বরণীয় লোক তোমাদের সুলভ হউক।

তোমাদের সহিত আলাপ ক'রে সুখ পাইয়াছিলাম, তোমাদের হৃদয় আমার চক্ষুতে ভাল লাগিয়াছিল। তোমাদিগকে প্রায়ই দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ইহা শুভাবহ নহে। তোমরা চ'লে গেলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। জ্ঞানীর লোক-বিরহে কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আমি জ্ঞানী নই, তাহা আমার জানা আছে, তবে জ্ঞানী হওয়ার ইচ্ছাটাই খুবই প্রবল। যে জ্ঞানের বিকাশ হ'লে শোক হয় না, দুঃখানলে বিদগ্ধ হ'তে হয় না, জ্ঞানাভিমান যে প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, ইষ্টানিষ্ট-বোধ বিলুপ্ত হয়, সর্ব্বভাবই প্রীতিপ্রদ হয়, সেই জ্ঞানে (আমার পক্ষে দুর্ল্লভ হ'লেও) লোভ জন্মিয়াছে। তোমরা এখান হ'তে চলিয়া গেলে আমার যাহাকে শোক বলে, তাহাই হইয়াছিল, তবেই ত আমি এত দিন ধ'রে এত চেষ্টা ক'রেও হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিতে পারলাম না! মোহের আক্রমণকে উপেক্ষা করিতে পারগ হইলাম না। আমি এই জন্য ভীত হইয়াছি, আমার যে কিছুই হয় নাই, তাহা বুঝিয়া হতাশ ও দুঃখিত হইয়াছি।

আচ্ছা, একটুখানি বিচার করিয়া দেখা যাক্ এস—

আমি তোমাদের ভালবাসি, ইহা বোধ হয় সত্য। কেন না, যিনে তোমাদের ভাল হইবে, আমি তাহাই চিন্তা করি, এমন কোন দিনই কাটে না—যে দিন না তোমাদের জন্য ভাবিতে হয়। ইহা কি হেয় স্বার্থসিদ্ধিমূলক? আমি কি তোমাদিগের কাছে কিছু পাইতে চাই? ঠিক বুঝিতে পারি না, তবে মনে হয়, হেয় স্বার্থসিদ্ধিমূলক নহে, কারণ, আমার বিশ্বাস, আমি এই দেহে কখনও স্বেচ্ছায় হেয় স্বার্থসিদ্ধিমূলক কর্ম্ম করি নাই, তাহা করিবার স্বতঃপ্রবৃত্তি আমার কদাচ হয় নাই। তবে তোমাদিগকে ভালবাসি কেন? আমি যাহাকে ভালবাসি ব'লে মনে হয়, তোমরাও তাহাকেই ভালবাস, এইরূপ বিশ্বাস তোমাদের সহিত মিলিত হইবার পরে আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

আমি যাহা বুঝিতেছি, তাহা যদি ভ্রম-প্রমাদ-পরিকল্পিত না হয়, তবে তোমাদিগকে ভালবাসাতে আমার ক্ষতি হইবে না। কিন্তু তোমাদিগকে না দেখিলে কষ্ট হয়, ইহা ভাল নহে, ইহা নিশ্চয়ই অজ্ঞানের লীলা। আমি যে জন্য আমাকে ভালবাসি, সেই জন্য তোমাদিগকেও ভালবাসিব, কিন্তু তোমরা যেখানেই থাক না, তোমাদের জন্য আমার মন অস্থির হইবে কেন? তবেই বোধ হইতেছে, আমার এই ভালবাসা স্থূলভাবে নিবদ্ধ। যাহা হউক, অতঃপর বিচার পূর্ব্বক সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে। এ দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

তুমি আমায় অত্যন্ত বিশ্বাস কর, আমার ব্যবহারে বৈষম্য-বিষ নাই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ কর, তাই আমিও তোমার আনন্দের জন্য সাবধান হইব। তোমার প্রেমপূর্ণ বিমল ও কোমল হৃদয়ে আমা হইতে যাহাতে কোন বাধা স্পর্শ না করে, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অনু, তোমরা বড় ভাল। আবার আশীর্ব্বাদ করি—চিরদিন ভালই থাক!

আসল কথা কি জান অনু, আমি যাহা ভালবাসি, তোমরাও তাহাই ভালবাস, তাই তোমাদের আমার ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে আমি সেই জন্যই অতটা সুখ পাই। আমার প্রাণ সেই জন্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিতে চায়। আমি এমন সরল ভাব, এমন জ্ঞানপিপাসা, (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের), এমন নিত্যে অনুরাগ, অনিত্যে বিরাগ অধিক দেখি নাই। অনু আমার, তাই তোমাদের জন্য মন ব্যাকুল হয়। তবে মায়ার দুর্ভেদ্য রহস্য জানি না, ঠিক বুঝিতেছি কি ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছি। যাহা হউক, করুণাময়ের শ্রীচরণে সদা প্রপন্ন এই আকিঞ্চনের রক্ষাভার ন্যস্ত হইয়াছে, মায়ামোহের হাত হ'তে তিনিই আমায় সর্ব্বদা রক্ষা ক'রে আগলে রাখবেন। আর আমার একান্ত প্রার্থনা, যেন তিনি তোমাদের সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে রাখেন।

শরীরে স্বাস্থ্য, চিত্তে আনন্দ এবং সংসারে অটুট সৌভাগ্য ও সুযশ প্রাপ্ত হয়ে অন্তে যেন তাঁতেই বিলয় প্রাপ্ত হ'তে পার।

তোমাদের চিরসুখপ্রার্থী
দাদামহাশয়।

মায়া-মোহের অভাব তাঁর কোন দিনই আমি দেখি নাই। ইতর প্রাণী থেকে মহারাজা পর্য্যন্ত সবার দুঃখেই তাঁহার মমতা-মাখান চিত্ত সর্ব্বদাই যে গ'লে প'ড়ে যেত। কত দিনের পর দিন অসুস্থ অভুক্ত থেকেও তা হ'লে কি অপরিচিত যার তার জন্য পাতার পর পাতা উল্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে বিচার ক'রে ওষুধ ঠিক করতে পারিতেন? না ছদ্ম-জিজ্ঞাসুর মূর্ত্তি ধ'রে যারা দু'দিন স্ফূর্ত্তি করতে তত্ত্বকথা জানতে আসে, তাদের নিয়েই সমস্ত দিন আপনি সানন্দচিত্তে অনর্গল ব'কে যেতে পারতেন? অনাথ আতুর থেকে ধনী মহাজন পর্য্যন্ত সবার জন্যই অর্থ, সামর্থ্য, সেবা, চিকিৎসা, উপদেশ এমন শান্তা পৃথিবীর আর কোন কালে, কোন দিনই কোথাও ছিল যে, তা কখনও জানা যায় নি, যা' তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ থাকতে দেখেছি। আমার বন্ধু নিরুপমা দেবী তাঁর কাছে ক'দিন যাবার পরই আমায় লিখেছিল, বিদ্যা-বুদ্ধি, যোগবল, চিকিৎসাশক্তি অদ্ভুত হ'লেও সবেরই হয় ত কোথাও গিয়ে একটা সীমা আছে—কিন্তু সেই তাঁর দয়া বা স্নেহের—হায় রে! এতখানি পেয়ে আবার যাকে তা এক নিমেষের ভিতরেই জন্মের মত হারাতে হয়, কত বড়ই দুর্ভাগ্য সে!

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।



পাখীর ভাষা

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিণ মনস্তত্ত্ববিদ সমিতিতে সম্প্রতি পাখীর ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ক্যানারী অপেক্ষাও ক্ষুদ্রকায় পক্ষীর ৩ শতাধিক শব্দ সংগৃহীত হইয়া উহা পরীক্ষার্থ সমিতিতে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ডাক্তার উইলিয়ম মরিসন্ প্যাটারসন্ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক আফ্রিকাদেশে দুই বৎসর ধরিয়া ফিঞ্চ-জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষীর শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, পাখীরা স্বজাতীয়ের সহিত প্রকৃতই কথা কহিয়া থাকে। তাহারা পরস্পরের ভাষা শুনিয়া কথা বুঝিতে পারে, এ কথা তিনি বলেন না বটে; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে উক্ত জাতীয়



আফ্রিকার ফিঞ্চ-জাতীয় পাখী—ইহারা নিজের ভাষায় কথা কহে

পাখী ৩ শত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। ঐ শব্দ কণ্ঠ-রবেরই ন্যায় বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত শব্দগুলির মধ্যে ২৪টি স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণবাচক অক্ষরের সমাবেশ লক্ষিত হয়। ইহা দ্বারা তিনি অনুমান করেন যে, পাখী কথা বলিয়া থাকে। কোন পাখী একটা শব্দ করিলে অপর পক্ষী সেই জাতীয় শব্দের দ্বারা উত্তর দিয়া থাকে। মানুষের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে কথা কহে না।

চলমান গৃহ ও দোকান

অষ্ট্রিয়ায় জনৈক আমীরবংশের ভদ্রলোক য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে অবস্থাহীন হইয়া পড়েন। তিনি একখানি মোটর-চালিত বৃহৎ গাড়ীর উপর বাস ও দোকানগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গ্রাম ও নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বসিবার ঘর, শয়নকক্ষ, রন্ধনাগার প্রভৃতি গাড়ীর উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। অতিথি-অভ্যাগতের জন্য একটি স্বতন্ত্র শয়নকক্ষের ব্যবস্থাও ইহাতে

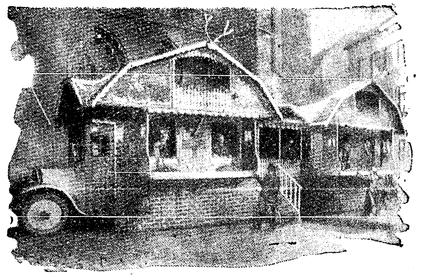

দোকান ও বাসগৃহ

আছে। কোনও গ্রাম বা নগরে পৌঁছিয়া যখন গাড়ী থামে, তখন স্বল্পায়াসেই ঘরগুলিকে দোকানে পরিণত করা যায়। এই ভাবে ভদ্রলোকটি ক্রমশঃ অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বহু ক্রেতা তাঁহার দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে।

ব্যবসায়ের অভিনব পন্থা

লস্ এঞ্জেলসের কোনও ব্যবসায়ী তাঁহার দোকান-গৃহের ছাদের উপর মনোরম উদ্যান রচনা করিয়াছেন। তথায় দোলা প্রভৃতি শিশুর চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থাও আছে। শিশু-সন্তানসহ যে সকল জননী দোকানে ক্রয়-বিক্রয় করিতে যান, তাঁহারা সন্তানদিগকে

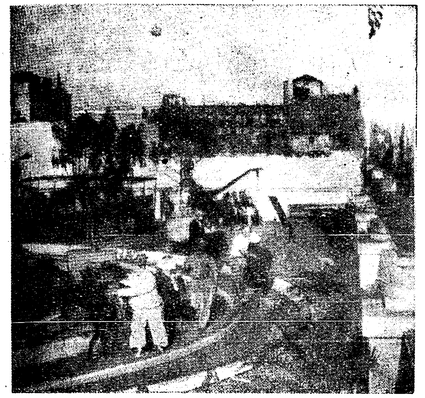

দোকানের-ছাদে ক্রীড়া-উদ্যান

পরিচারক বা পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে বাগানের মধ্যে রাখিয়া জিনিষপত্র কিনিতে থাকেন। শিশুদিগের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। এইরূপ ব্যবস্থায় উক্ত দোকানদারের দোকানে ক্রেতার সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।

রেডিও সাহায্যে বধিরের শিক্ষাদান-ব্যবস্থা

যে সকল বধির বালকবালিকার অন্ততঃ শতকরা ১৫ অথবা ততোধিক পরিমাণ শ্রবণশক্তি অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগকে ইদানীং রেডিও সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। প্রত্যেকের

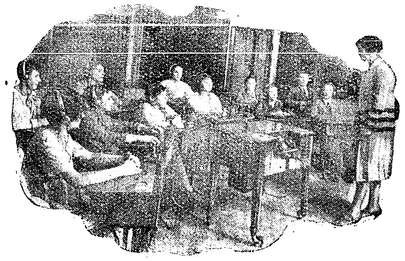

বধির ছাত্র-ছাত্রীরা যন্ত্র-সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতেছে

মাথার সংলগ্ন যন্ত্র তাহার সম্মুখস্থ ডেস্কের সহিত সংযুক্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর আসনে শব্দ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রও সন্নিবিষ্ট থাকে। ৫০টি বালক-বালিকাকে একই সময়ে এইরূপে শিক্ষাদান করিতে পারা যায়। তাহারা নিজ নিজ কণ্ঠরব পরিষ্কার শুনিতে পাইবে। গৃহের মধ্যস্থলে একটি মাইক্রোফোন্ যন্ত্র স্থাপিত থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষাগৃহের যে কোনও স্থানের শব্দ শিক্ষার্থীরা শুনিতে পায়। মাইক্রোফোন্ যন্ত্রের কাছে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে দণ্ডায়মান থাকিয়া শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয় না।

হাত-ক্যামেরা

নারী পর্য্যটকদিগের সুবিধার জন্য হাত-ব্যাগে বহন করিবার উপযোগী এক প্রকার ছোট ক্যামেরা যন্ত্র বাজারে বিক্রীত হইতেছে। ব্যাগের এক দিকে ক্যামেরাটি লুক্কায়িত থাকে। কাহারও আলোকচিত্র গ্রহণের অভিলাষ হইলে তিনি ক্যামেরার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া স্বল্পায়াসেই ছবি তুলিতে পারেন। ক্যামেরা যন্ত্রটি যাহাতে অক্ষত অবস্থায় থাকে, তাহার সকল প্রকার ব্যবস্থাই আছে।



হাত-ক্যামেরা

পীড়িতের শয্যা

মার্কিণ দেশে অধুনা পীড়িত নরনারীদিগের সুবিধার জন্য এক প্রকার শয্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রয়োজনমত এই শয্যা চেয়ারে পরিণত হয়, অথচ শয্যাশায়িতকে নড়িতে হয় না। শয্যার সহিত একটি টেবলও সংলগ্ন থাকে। এই টেবলের উপর

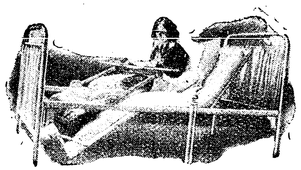

পীড়িতের নূতন শয্যা

খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া রোগী আহারও করিতে পারে। এই অভিনব ব্যবস্থায় রোগীর জন্য অধিক স্থানেরও প্রয়োজন হয় না এবং পরম আরামে রোগী ইচ্ছামত শুইতে বসিতে পারে।

পকেট দূরবীক্ষণ যন্ত্র

সাধারণ দূরবীণের পরিবর্ত্তে ইদানীং এক প্রকার পুরু কাচ বাজারে বাহির হইয়াছে, তাহা দ্বারা দূরবীণের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। একখানি ছোট কাচ চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া অপেক্ষাকৃত

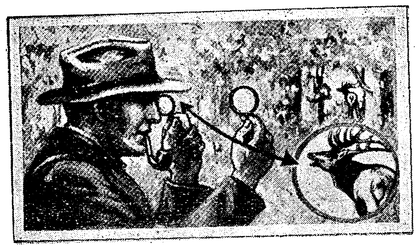

নূতন পকেট দূরবীণ

বড় কাচ সোজাসুজি একটু দূরে ধরিলে ঠিক দূরবীণের মত দূরের পদার্থ নিকটে দেখা যায়। আলোকরেখাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিতে বেশী সময়ও লাগে না। ভারী দূরবীণের পরিবর্ত্তে এইরূপ দুই খণ্ড কাচ শিকার প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধাজনক।

বিচিত্র ছত্র

বাজারে যে সাধারণ ছত্র বিক্রীত হয়, তাহার আশ্রয়ে দুই ব্যক্তি নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে না, গা মাথা সবই ভিজিয়া যায়। জনৈক ইংরাজ এই অসুবিধা দূর করিয়া দিয়াছেন। তিনি ভাঁজ-করা এক প্রকার দণ্ড উদ্ভাবন করায় এখন এক ছাতিতে ২ জন



বিচিত্র ছত্র

অনায়াসে রৌদ্র-বৃষ্টির সময় আশ্রয় লইতে পারে। ভাঁজ-করা দণ্ড এমনই ভাবে খুলিবার ব্যবস্থা যে, তাহাতে ছাতার আবরণ এক দিকে চলিয়া যায়। তখন দুই জন পাশাপাশি চলিলে কাহারও মস্তকে বারিপাতের সম্ভাবনা থাকে না। ইচ্ছা করিলে ছাতার বাঁট বা দণ্ড সোজাভাবেও রাখা যায়।

গাছের গুঁড়ির মধ্যবর্ত্তী পথ

ভাঙ্কুভারের রাজপথে একটি বিচিত্র দৃশ্য আছে। প্রায় ১৩ শত বৎসরের প্রাচীন একটি সিডার বৃক্ষের প্রকাণ্ড গুঁড়ি ভেদ করিয়া

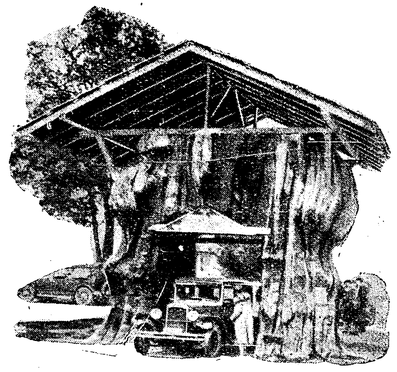

গাছের গুঁড়ির মধ্য-বিদর্পিত রাজপথ

রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। গুঁড়ির উপরিভাগে একটি ছাদ আছে, পথিকগণ ইচ্ছা করিলে তথায় বিশ্রাম করিতে পারে।

লঘুভার ডুবুরীর সরঞ্জাম

অগভীর জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার ডুবুরীর সরঞ্জাম জার্ম্মাণীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে বায়ু সরবরাহের পম্প প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। ডুবুরীর মুখোসের সহিত প্রাণধারক বায়ু সরবরাহের এক প্রকার যন্ত্র সংলগ্ন থাকে, উহা অত্যন্ত লঘুভার—ডুবুরী স্বয়ং বহন করিতে কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করে না। এই পরিচ্ছদ স্বল্পকালের মধ্যে ধারণ করা চলে এবং খুলিয়া ফেলিতেও সময় লাগে না। এই পরিচ্ছদ ও সরঞ্জাম সহ জলের মধ্যে ১০ মিনিট কাল নিরাপদে অবস্থান করা চলে।



ডুবুরীর নূতন পরিচ্ছদ

জীবনরক্ষক পিস্তল

পিস্তলের দ্বারা জীবকে হত্যা করাই হইয়া থাকে; কিন্তু অধুনা ইহার দ্বারা জীবরক্ষার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। একরূপ পিস্তল নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার মধ্যে সরু দড়ি সঞ্চিত থাকে। পিস্তলের ঘোড়া টিপিবামাত্র সেই দড়ি নির্গত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দড়ি কোনও মজ্জমান নৌকার উপর নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার



জীবনরক্ষক পিস্তল

গহিত নৌকার মোটা কাছি বাঁধিয়া দিলে তীরস্থ বা অপর জাহাজস্থিত ব্যক্তি সেই দড়ি গুটাইয়া লয়। তাহার পর মোটা কাছি ধরিয়া আকর্ষণ করিলে মজ্জমান নৌকা জাহাজ বা তীরের নিকটে চলিয়া আসে। তখন আরোহীদিগকে রক্ষা করিতে কষ্ট পাইতে হয় না। পিস্তলের নলের নীচে একটা পর্দ্দার মত ঝুলিতে থাকে। ইহাতে যে পিস্তল ব্যবহার করে, তাহার হাতে বারুদের আঁচ লাগে না।

জীবনরক্ষক পরিচ্ছদ

কালিফোর্ণিয়াবাসী এক ব্যক্তি অধুনা এক প্রকার জীবনরক্ষক পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা দুই মিনিটের মধ্যে পরিধান করা যায়। রবার ও রবার-মিশ্রিত রেশমের দ্বারা এই পরিচ্ছদ নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে কোনমতেই জল প্রবেশ করিতে পারে না। পদতলের দিক্ এমনভাবে নির্ম্মিত যে, জলে পড়িবামাত্র

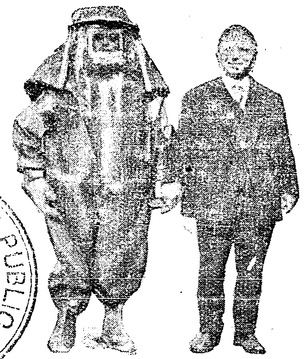

জীবনরক্ষক পরিচ্ছদ

মানুষের মাথা জলের উপর সোজাভাবে ভাসিতে থাকে। মাথার দিকে কতকগুলি ছিদ্র আছে। শরীর জলের মধ্যে নিমজ্জিত হইবামাত্র ছিদ্রপথগুলি আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে আপনা হইতে ছিদ্রপথ মুক্ত হয় এবং সেই পথে বায়ু প্রবেশ করিতে থাকে। পরিচ্ছদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও জল রাখিবার পকেট আছে। সমগ্র পরিচ্ছদের ওজন প্রায় ১০ সের।

পেয়েছি

পাষাণ ব'লে দিয়াছ তোমার পেয়েছি তোমারে আজ;
হৃদয় কেবল খুঁজিয়া গেলাম নিয়ত সকাল সাঁজ।
ভূমি ব্যথিতের বেশে আস,
ভূমি পীড়িতের মুখে হাস,
চক্ষু ক্রন্দন শুনি সন্তান হারা জননীর হৃদি-মাঝ।

সত্যে তোমার পরম তৃপ্তি,
করুণা তোমার আপন বৃত্তি,
সাধ্বী সতীর আঁখি-পল্লবে দেখেছি তোমার লাজ।
ওই রবি শশী তব আঁখি তোমারে চলে না ফাঁকি,
প্রভু জীবন-মরণ কোলাহল মাঝে নিত্য তোমার কাজ।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন।

রাজা রামমোহন রায় ও সাকার উপাসনা

অদ্বৈতবেদান্তবাদী রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, "উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বব্যাপী, আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন—তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির কারণ হয়, আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন—সে সকল কি প্রমাণ? আর পুরাণ ও তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহে? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু, পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমানের অগোচর করিয়া কহিয়াছেন, তবে, পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-বিষয়ের শ্রবণ-মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া—রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনা দ্বারা চিত্ত স্থির করিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ,—স্মার্ত্তধৃত জমদগ্নি-বচন,—

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিকল্পনা॥'

জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশূন্য শরীররহিত যে পরমেশ্বর, তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। রূপকল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,—

'এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।'

এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ, অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত কল্পনা করা গিয়াছে।

অতএব বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন, তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনি করিয়াছেন।"

এই সকল উক্তির দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মত সাকার উপাসনার বিরোধী ছিলেন না। আধুনিক ব্রাহ্মরা সাকার উপাসনাকে ভ্রান্ত ও পরমার্থসাধনের অন্তরায় মনে করেন, কিন্তু রাজা সেরূপ করিতেন না। সাধারণ হিন্দুমাত্রই রাজার এই সত্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট কলেজের এক জন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণীত "বেদান্তচন্দ্রিকা"য় রাজা রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান—সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান?"

রাজা ইহার উত্তরে লিখেন,—

"বিষ্ণুশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি দেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি।"

আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার মোহমুদ্গরে বলিয়াছেন,—

"অষ্টকুলাচলং সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥"

দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও বলিয়াছেন, "কত চতুরানন মরি মরি যাওত সাগর-লহরী সমানা।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজা সাকার উপসনাকে ঘৃণা বা দ্বেষ করিতেন না। যাঁহারা পরমাত্মধ্যানে অক্ষম, তাঁহারা সাকার উপাসনা করিবেন। শুধু তাহাই নহে, রাজা

রামমোহন দেবতাদিগকে মানিতেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন—দেবতাদের জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব!

প্রতিমা-পূজার বিচারে রাজা বলিয়াছেন, "শাস্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি, রামাচারের বিধি, দক্ষিণচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি, ঘোরাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাহাদের প্রতিমাপূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে, এমন নহে। বরঞ্চ পশু, যেমন,—গো, শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী, যেমন শঙ্খচিল, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন,—অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর এবং ব্যবহারে আইসে, তাহারদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারিবিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী—সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি—

'অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ।'

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমাপূজার বিধি আছে, কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে, যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতেও সমর্থ নহেন—তাঁহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।"

এখানে রাজা অধিকারবাদও মানিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া রামমোহন স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন। রাজা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হয়।

রাজা তাঁহার ব্রহ্ম-সঙ্গীতে নিম্নলিখিত গীতটি রচনা করিয়াছেন,—

"দ্বি-ভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়॥
হংসরূপে সর্ব্বান্তরে ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয়।
স্থাবরাদি জঙ্গম বিধি, বিষ্ণু, শিব, যম
প্রত্যেকেতে যথাক্রম যাতে লীন হয়।
কর অভিমান খর্ব্ব ত্যজ মন দ্বৈতগর্ব্ব
একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়॥"

রাজা "অনুষ্ঠান" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে দ্বাদশটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর আছে। এইখানে সেই পুস্তিকা হইতে রাজার উদার সার্ব্বভৌমিক মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

"৫ম প্রশ্ন। বিচারতঃ এই উপাসনার বিরোধী কেউ আছে কি না?

৫ম উত্তর। এই উপাসনার বিরোধী বিচারতঃ কেহ নাই। যেহেতু, আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা, এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি। অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধসম্ভব হয় না। কেন না, প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা—এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিংবা স্বভাব, অথবা বুদ্ধ কিংবা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহ-কর্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচারতঃ এ উপাসনার অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না এবং চীন ও ত্রিব্বৎ ও য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে, আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৭ম প্রশ্ন। আপনারা অন্যান্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হয়েন কি না?

৭ম উত্তর। কদাপি না। যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন, সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিংবা তাঁহার আবির্ভাবস্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে?"

রাজা রামমোহনের এই উদারভাব ও সত্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান সিটি কলেজের এবং রামমোহন হোষ্টেলের ছাত্রগণ সরস্বতীপূজা করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহনের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা মুখে শুধু রাজা রামমোহনের দোহাই দিয়া থাকেন—তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহনের আদর্শ ও ধর্ম্মমতকে দূরে

নিক্ষেপ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণে তাঁহাদের সমাজ গড়িয়াছেন। রাজা রামমোহন কোথায়ও নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ সাধকেরা যে সাধনা ও আদর্শের প্রচার করিয়াছেন, রাজা রামমোহন বিচার-বিতর্কের দ্বারা তাহাই জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ—সাকার উপাসক শাক্ত রামপ্রসাদ এই আদর্শ ও সাধনা প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন—

"মন, তোমার এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বোলে বস্ রে ধ্যানে॥
ধাতুপাষাণ-মাটীর মূর্ত্তি কায কি আর সে গঠনে।
তুমি মনোময়ী প্রতিমা গড়ি পূজা কর আপন মনে॥"
* * * *
"এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা বয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা॥"
* * * *
"প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামেশি।
ওরে, একেই পাঁচ, পাঁচেই এক মন করো না দ্বেষাদ্বেষি॥"

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করেন এবং পৌত্তলিক বলিয়া অহরহঃ হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—

"In religious discussions we should always respect the ideas and feelings of our antagonists. The Vedas teach the only religion which considers toleration to be the duty of man."

রাজা রামমোহন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই ভাদ্র যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর বাড়ী ভাড়া করিয়া ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন। কিন্তু তখনকার উপাসনা-পদ্ধতি ছিল—আধুনিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতি শনিবারে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত উপাসনা চলিত। দুই জন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে—সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। পরে সন ১২৩৬ সালে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৮২৯-৬ই জুন কালীপ্রসাদ করের চারি কাঠা আধপোয়া জমী খরিদ করিয়া ব্রহ্মসমাজের গৃহ ১২৩৬ সালে ১১ই মাঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিষ্ঠার দিনে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্রহ্মসমাজের ট্রষ্টীডীড্ পত্রে রাজা রামমোহন স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থান—

"For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner."

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আধ্যাত্মিক বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি কোনও বিশেষ ধর্ম্মপ্রণালী ঐ স্থানে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই মহান্ আদর্শ সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসমাজ তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পর ব্রাহ্মসমাজ—একটি নির্দ্দিষ্ট সংকীর্ণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইল।

পিতা রামকান্ত পরলোকগমনসময়ে রামমোহন তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। রাজা মিঃ আড্যামকে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে তাঁহার পিতা এরূপ ভক্তির সহিত রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল।

আমরা দেখিলাম, রাজা রামমোহন যদিও নির্গুণ-ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তবুও সাকার উপাসনার বিদ্বেষী ছিলেন না। নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা—যাহা বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত,তাহা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষা নিম্নস্তরের সাধনা বলিয়া রাজা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা বলিয়াছেন, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা "প্রথম অধিকারীর পক্ষে" এবং "প্রতিমাপূজা দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে" চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকে। তিনি বলেন, প্রকৃত ব্রহ্ম-উপাসনাতে কদাপি অপর ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ-ঈর্ষ্যার স্থান থাকিতে পারে না। প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক জগতের সমগ্র ধর্ম্মের ভিতর সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুভূতি করিবেন—ইহাই ছিল রাজা রামমোহনের সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মমত।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।



বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন

রিষ্টমন কমিশন বর্জ্জনোপলক্ষে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার উপরে সরকার বহু স্থলেই ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ও মাদ্রাজে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল। নবাবক স্কুলের ছাত্র পর্য্যন্ত তাহার তাণ্ডবলীলার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় প্রদান করিয়াছি।

মাদ্রাজের ব্যাপার আরও একটু চরমে উঠিয়াছিল। সেখানে দুইটি ভারতীয়কে এই যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে হইয়াছিল; কিন্তু যাহাদের প্ররোচনায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া পরে সরকারের তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই হরতাল-বিরোধীদিগের বিপক্ষে সরকারের কোন বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হয় নাই, বরং যাহারা প্রহৃত ও নির্য্যাতিত হইয়াছে, সেই হরতাল-অনুষ্ঠানকারী জনবর্গের বিপক্ষে ১৪৪ ধারা প্রযুক্ত হইয়াছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে কমিশনের পৌঁছিবার কথা ছিল। ঐ দিন যাহাতে তাঁহারা পুনরায় হরতাল অনুষ্ঠানের জন্য প্রকাশ্যে কোনওরূপ বিরোধ আয়োজন (বক্তৃতা, সভা ইত্যাদি দ্বারা) করিতে না পারেন, এতদুদ্দেশ্যেই ঐ ধারা প্রযুক্ত হইয়াছিল। মাদ্রাজের জনবর্গ স্থির করেন যে, যখন বিশেষ বিধিব্যবস্থা প্রচলন করিয়া কমিশনকে কমিশন বর্জ্জনের অনুকূল হরতাল বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে, তখন উহাতেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে পুলিসের ব্যাটন লাঠির আওতায় কমিশনকে চলা-ফিরা করিতে হয়, প্রকৃত দেশের জনসাধারণ কমিশনকে চাহে না বা তাহার কোনওরূপ অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত নহে। ইহাতেই হরতালের উদ্দেশ্য বিনা হরতালেও সিদ্ধ হইতেছে, অতএব হরতালের জন্য উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন নাই, জনসাধারণ স্বেচ্ছামত হরতাল করিবে, কমিশনের অভ্যর্থনায় কোনরূপ যোগদান করিবে না।

কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারি হয় নাই বটে, কিন্তু নিরপরাধ, নিরস্ত্র ও অহিংসাব্রতে দীক্ষিত জনসাধারণের উপর পুলিস কনষ্টেবলের বেটন ও গুর্খার লাঠি চালনার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিবার কোন প্রতীকার পাওয়া যায় নাই বলিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে বৃটিশ পণ্য—বিশেষতঃ বিলাতী কাপড় বর্জ্জনের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে ইহাই এই আন্দোলনের কারণ, তাহা নহে, জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলাতের সরকার যখন সাইমন কমিশনের কার্য্য সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—হরতালই হউক বা ব্যবস্থা-পরিষদে বিরুদ্ধ বক্তৃতাই হউক, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ কমিশন বসাইবেনই বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প, তখন বাঙ্গালার জনসাধারণ বিলাতের আত্মম্ভরী কর্ত্তাদের চৈতন্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যেও বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

ইহাতে কোন কোন দিক্ হইতে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার পক্ষ হইতে আপত্তি উঠাই স্বাভাবিক; কিন্তু এ দেশেরও কোন কোনও লোকের মুখে তীব্র আপত্তির কথা শুনা যাইতেছে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার যুক্তি-তর্কের কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু প্রথমে দেশের এক শ্রেণীর লোকের আপত্তির কথাটাই ধীরভাবে আলোচনা করা যাউক। বিলাতী পণ্য-বর্জ্জন এ দেশে নূতন নহে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বয়কটের কথা এখনও অনেকের বিলক্ষণ মনে আছে। আপত্তিকারীরা বলেন, বিলাতী বস্ত্র-বর্জ্জনান্দোলনে বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ যখন সাড়া দেয় নাই, তখন উহা বাঙ্গালার একাকী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা কাহার সাড়া পাইয়াছিল? বরং তখনকার অভিজ্ঞতা বাঙ্গালার আছে, সেই অভিজ্ঞতার ফলে তখনকার কালের আন্দোলনে যে সব দোষ বা ছিদ্র ছিল, সেগুলি এখন সংস্কার করিয়া লইয়া আন্দোলন আরও অধিক কর্ম্মক্ষম ও সফল করা সম্ভবপর। স্বদেশী আমলের বয়কট সফল হইয়াছিল। অথচ তখন বাঙ্গালীর আন্দোলনে অনেক ত্রুটি ছিল, বাঙ্গালী তখন এক হইতে—সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই। তখন মুসলমান বয়কটের বিরুদ্ধে ছিল। এবার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান বয়কটে এক হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কৌশল সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছে। সুভাষচন্দ্র যে বয়কট আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বাঙ্গালী তাহা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফল ইতোমধ্যেই কাপড়ের বাজারে অনুভূত হইয়াছে। আমরা কোনও বড় বিলাতী বস্ত্রের আমদানী-কারী অফিসের কর্ম্মচারীর মুখে শুনিয়াছি যে, ইতোমধ্যেই অফিসের 'সাহেবদের' মুখ শুকাইয়াছে, অনেকে বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে মালের নূতন চাহিদা আর জুটিতেছে না। মাত্র এক মাসে যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে এক বৎসরে কি হইবে?

কেহ কেহ বলেন, "'বয়কট' কেন,—তাহা হইতে আসুন না 'স্বদেশী' করা যাউক।" কথাটা শুনিয়া হাসি পায়। এই শাক দিয়া মাছ ঢাকা দিবার চেষ্টায় কি হইবে? যদি দেশের লোকের বিলাতী বস্ত্র কিনিবার মনোবৃত্তি রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা না হয়, তাহা হইলে স্বদেশী বস্ত্রের উন্নতি হইবে কিরূপে? ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঘরে ঘরে তাঁত বা খদ্দর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তথাপি তখন বয়কট আন্দোলনের ফলে বিলাতী কাপড় বাজারে অচল হইয়াছিল, অথচ লোক বস্ত্রাভাবে মরে নাই, বোম্বাই মিলের কাপড় অথবা জাপানী কাপড় তাহাদিগকে বাঁচাইয়াছিল।

এখন খদ্দর দেশে একটা বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে, কেবল মিলের কাপড়ই আমাদের ভরসা নহে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশেও ৩টা কাপড়ের কল (বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী ও ঢাকেশ্বরী) হইয়াছে। স্বীকার করিতে হইবে, বোম্বাই কলওয়ালারা ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়াছিল, বাঙ্গালীর স্বদেশীর 'হুজুগ' পাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা কামাইয়া লইয়াছিল, দেশের মুখের দিকে না চাহিয়া নিজের স্বার্থ চাহিয়াছিল, এখনও হয় ত তাহারা তাহাই করিতে পারে। স্বীকার করি, দেশের লোকের দোষে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। স্বীকার করি, বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলির সম্মুখে বিপদ আপদ অনেক আছে। কিন্তু তথাপি যদি আমরা বয়কট আন্দোলন জাগাইয়া রাখিতে পারি, যদি উহা সফল হয়, তাহা হইলে আমরা কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি অর্থনীতিক্ষেত্রে,—সর্ব্বত্রই যে পরম লাভবান্ হইব, তাহাতে সন্দেহ আছে কি ?

আর এক কথা—ধর্ষণ ও নির্য্যাতন। স্বদেশীর যুগে তাহার চূড়ান্ত হইয়াছিল। তাহাতে কি বঙ্গভঙ্গ-রোধ নিবারিত হইয়াছিল ? বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে কেহ বাধা দিতে পারিয়াছিল কি ? তাহার পর যদিই ধরা যায়, বিলাতী কাপড় বর্জ্জিত হইলে বোম্বাই মিলওয়ালারা ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া মিলের কাপড় অগ্নিমূল্য করিবে, তাহা হইলেও জাপানী কাপড় ও খদ্দরের প্রতিযোগিতায় তাহার দাঁড়াইবার সাহস হইবে কি ?

বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি—একবার যদি সে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে—যদি সে একবার বুঝে, বয়কটের ফলে তাহার দেশের আত্মসম্মান শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে, তাহা হইলে ঝোঁকের মাথায় সে নিজের এই বাঙ্গালা দেশের কাপড়কলগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে,—চাই কি, নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে,—সে ক্ষমতা বাঙ্গালীর আছে। সে সদনুপ্রেরণা জাগাইবার শুভ পুণ্যক্ষণ আমরা হেলায় বর্জ্জন করিব কেন ? অর্থনীতিক দিক্ হইতে দেখিলে ইহাতে আমাদের লাভ বৈ ক্ষতি নাই, রাজনীতিক দিক্ হইতে দেখিলেও তাহাই। আজ যদি বয়কটের চাপে ল্যাঙ্কাশায়ার মুমূর্ষু হয়, তাহা হইলে 'রাউণ্ড-টেবলের' বা আপোষ বৈঠকের বিলম্ব হইবে না।

চীনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রহিয়াছে। যখন ক্যাণ্টনের কুওমিনটাং দল ঝড়ের বেগে উত্তরে ধাবমান হইয়া উপেইফু ও সান্-চুয়ান-ফেঙ্গকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া হাঙ্কো, ওয়ানসিয়েন ও নানকিং অধিকার করিল,—যখন ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের (তখন হাঙ্কোয় তাঁহাদের আড্ডা) বৈদেশিক-সচিব ইউজিন-চেন হাঙ্কো ও ওয়ানসিন হইতে ইংরাজকে পাততাড়ি গুটাইতে বলিলেন (অর্থাৎ ঐ দুই স্থানের কনসেশান ও একষ্ট্রা-টেরিটোরিয়ালিটির অধিকার ছাড়িতে বলিলেন), তখন বৃটিশ-সিংহ কি জবাব দিয়াছিলেন ? এই অধিকার বড় সামান্য নহে। এই সকল স্থানে ইংরাজ কোটি কোটি টাকা মূলধন ফেলিয়াছেন, ইংরাজের লক্ষ লক্ষ টাকার কার-কারবার চলিতেছে, ইংরাজ অপরাধীর জন্য ইংরাজের দূতাবাসের বিচারালয়ে বিশেষ বিচারের ব্যবস্থা আছে,—এক কথায় সে সব স্থানে চীনের দেশে চীন কেহই নহে, ইংরাজই প্রভু। এমন যে অধিকার, যাহা বহু দিন হইতে একচেটিয়ারূপে ভোগ করিয়া আসা হইতেছে, ইংরাজ—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অর্দ্ধধরণীশ্বর ইংরাজ কি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন ? কে সে ইউজিন-চেন ? একটা নগণ্য বিপ্লবতন্ত্রী শৃঙ্খলাহীন শক্তিহীন চীনা গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক সচিব। য়ুরোপীয়ের সহিত যে চীনা সেনার বলপরীক্ষায় চীনাই এ যাবৎ বিধ্বস্ত হইয়াছে—যে চীনার ঢাল নাই, তরবারি নাই—যে চীনা আপনা আপনি ঘরোয়া যুদ্ধে পরস্পরকে জয়পরাজয় করে,—সেই চীনা বিরাট ইংরাজের মানোয়ার, উড়োকল, ট্যাঙ্ক, কামানের সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য ? তবে এই ইউজিন-চেন কোন্ সাহসে ইংরাজকে কনসেশান ছাড়িতে হুকুম দেয় ? আশ্চর্য্য, শক্তিমান্ ইংরাজের বৈদেশিক দূত সার অষ্টেন চেম্বারলেন বিনা বাক্যব্যয়ে সুড় সুড় করিয়া কনসেশান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে স্থানীয় ইংরাজকে আদেশ করিলেন, পরন্তু হংকং হইতে যত ইংরাজ সেনা সাংহাইয়ে পাঠাইবার কথা ছিল, তাহার অধিকাংশকে হংকংয়েই গোস্ত রুটী ধ্বংস করিয়া কাল কাটাইবার আদেশ করিলেন। কেন এমন হইল ? চীনারা কি কামান-বন্দুক লইয়া হাঙ্কো ও ওয়ানসিয়েনে ইংরাজকে তাড়া করিয়াছিল ? ইংরাজের মত আত্মম্ভরী অভিমানী জাতি বিনা রক্তপাতে হাঙ্কো ও ওয়ানসিয়েনের অধিকার ছাড়িয়া দিল কেন ? ইহার জবাব, উত্তর-চীনের দস্যুসর্দ্দার চাং-সো-লিনের অনুচর ইংরাজ-সেনানী জেনারল সাটন দিয়াছেন,—"ক্যাণ্টন ও দক্ষিণ-চীনের ইংরাজী পণ্য বয়কট এবং সাংহাইয়ের চীনা শ্রমিকের ধর্ম্মঘটই এই পরাজয়ের কারণ, চীনার অস্ত্র নহে।" সত্যই তাই। সার অষ্টেন দেখিয়াছিলেন যে, চীনের বয়কটের ফলে প্রাচ্যে ইংরাজ ডুবিতে বসিয়াছে, তাই চীনের মনস্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে তিনি কনসেশান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সম্মুখে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতেও আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক কেন এত সংশয়াকুল হইতেছেন, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আমরা আমাদের দেশজাত পণ্য ক্রয় করিব, বিলাতের আমদানী বিদেশী পণ্য গ্রহণ করিব না, ইহাতে রাজদ্রোহ নাই, জাতিবিদ্বেষ নাই। এই যে এ দেশে শত শত ইংরাজ বাস করিতেছে, ইহারা কি কখনও আমাদের দেশীয় দোকানের কাপড়-জামা ব্যবহার করে ? প্রাণ থাকিতে তাহারা ইংরাজ দোকানদারের জিনিষ ভিন্ন ক্রয় করে না,—ইংরাজী কাপড় না হইলে ক্রয় করে না। এমন কি, গ্রীষ্মে প্রাণ অতিষ্ঠ হইলেও নিজের দেশের জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। ইহাদের বেলায় ত জাতিবিদ্বেষ হয় না,—তবে আমাদের বেলায় হইবে কেন ? ইংরাজের প্রসাদভোজীদের কথা ছাড়িয়া দিই ; যাহারা গাছেরও খায়—তলারও কুড়ায়, দরবারে লেভিতেও দেখা দেয়, আবার ন্যাশানালিষ্ট সাজিয়া লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা দেয় ও প্রবন্ধ লিখে, তাহাদের কথাও ছাড়িয়া দিই ; যাহারা দিনে খদ্দর পরে, রাতে সরকারের ডিনার সারে, তাহাদের কথাও ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাহারা যথার্থ দেশজননীকে ভালবাসে, দেশের বন্ধনে, দেশের দুঃখে ব্যথা পায়,—তাহারা কেন প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে না, দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তাঁত ও কল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবে না ?

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখপত্র 'ষ্টেটস্‌ম্যান' অবাক্ হইয়া এই

ব্যের কথা বলিয়াছেন,—"বয়কটওয়ালারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে। স্বদেশী পণ্যের প্রসারে বিলাতের শ্রমশিল্প ধ্বংস হইয়া যাইবে, এমন ভুল বিশ্বাস তাঁহারা পোষণ করেন কেন ? দেশীর উন্নতি কর, তাহাতে আমাদেরও সহানুভূতি আছে। তবে বয়কট কথা আন কেন ? উহাতে হিংসার ভাব আছে। ইংরাজের শ্রমশিল্প সম্পূর্ণ আত্মরক্ষায় সমর্থ। দুই দেশের শ্রমশিল্প একই সময়ে জাঁকাইয়া উঠিতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মার্কিণও শ্রমশিল্পে বৃটিশ জাতি হইতে ন্যূন নহে। তাই বলিয়া কি উভয়ে পরস্পরকে বয়কট করিয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে ?"

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, জার্ম্মাণ যুদ্ধ বাধিয়াছিল কেন ? বড় বড় ইংরাজ লেখকের লেখনী দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর সহিত ইংরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যুদ্ধের মূল কারণ। বর্ত্তমানে মার্কিণের সহিত শক্তি-হ্রাস সম্পর্কে মতবিরোধ ও মনোমালিন্যেরও মূলে এই বাণিজ্যজাত প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া শুনা যায়। চীনদেশে বাণিজ্য-রক্ষার খাতিরেই যে গর্ব্বিত ইংরাজ মন্ত্রী চেম্বারলেন প্রাচ্যের পীত জাতির নিকট উচ্চ মাথা হেঁট করিয়াছেন, তাহাও সকলে জানে। সুতরাং বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংরাজ যে মাথা পাতিয়া রাখিয়া সহ্য করিতে পারে, তাহার প্রমাণ নাই। ইংরাজ বণিক্ জাতি, এ কথা নেপোলিয়ান বলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বণিক্ ইংরাজ যে ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া মাথার মুকুটে ভারতকে মধ্যমণিরূপে ধারণ করিয়া আছে, সেই ভারতকে বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করিতে দেখিলে আনন্দে গলা জড়াইয়া ধরিবে, এমন অবস্থা সংঘটনের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

এ দেশের বাণিজ্য কিরূপে ধ্বংস হইয়াছিল ? ভারত-গৌরব রমেশচন্দ্র দত্তকে ভারতীয় রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও ষ্ট্রাচি, হাণ্টার, কটন প্রভৃতি ত স্বদেশীয় নহেন, তাঁহারা ত বৃটেনের। তাঁহারা কি লিখিয়া গিয়াছেন ? এ দেশের তাঁতিকুল কিরূপে নির্ম্মূল হইল ? বিস্তৃত লোকগণনায় বাঙ্গালার রূপজীবিনীগণের মধ্যে শতকরা হিসাবে বেশীর ভাগ তাঁতিকুলের কেন হইল ? ল্যাঙ্কাশায়ারের সুবিধার জন্য আইনের চক্রান্তে এ দেশের তাঁতিরা কি উৎসন্ন যায় নাই ? তাই কি তাহারা অন্নাভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, আর সেই হেতুই কি তাহাদের মধ্যে অসহায়া বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই ?

বয়কটের অনেক সভায় এদেশী নেতৃবর্গ বলিয়াছেন,—দেশবাসী স্বরাজ প্রাপ্ত হইলে এ দেশে ইংরাজের বাণিজ্যিক প্রভুত্বের অবসান হইবে, পরন্তু উহাতে বিলাতের ব্যবসায়ী ও শ্রমিকের রুটীর যোগাড়ে টান ধরিবে ; সুতরাং বয়কট কি ভীষণ, কি লেবার কিছুতেই নির্ব্বিকারচিত্তে সমর্থন করিতে পারে না। সার উইলিয়াম জয়েনসন হিকস্ পার্লামেণ্টেই সজোরে জোর গলায় বলিয়াছিলেন,—"আমরা আমাদের ভোগ্য মাল ভারতে কাটাইবার উদ্দেশ্যেই ভারত জয় করিয়াছিলাম।" এক সময়ে 'পাইওনিয়ারও' দর্পভরে বলিয়াছিলেন, আমরা তরবারির দ্বারা ভারত জয় করিয়াছি, তরবারির দ্বারা তাহা দখলে রাখিব।"

কাযেই ইংরাজের ভারতরক্ষা এবং মূক জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার যথার্থ অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এ সমস্ত 'ছেঁদো' কথার অন্তরালে যে আসল কথা এই রহিয়াছে যে, ভারতে ইংরাজের মাল কাটাইতে হইবে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্য ঐখানে আঘাত করিলেই 'আঁতে' আঘাত লাগিবে। তাই বয়কটের সাফল্যসাধন করার প্রয়োজন আছে। অহিংসা মন্ত্রে স্বরাজ-সাধনাই যখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন যাহাতে স্বদেশী-শিল্প সম্যক্ উন্নতিলাভ করে—স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশীর কুকুরের সেবায় আমরা আত্মনিয়োগ না করি, মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত চরকা ও খদ্দরেই দেশবাসী যাহাতে বিলাস-বর্জ্জিত জীবন সদনুষ্ঠানে যাপন করিতে পারে, তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র হউক। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

সাইমন কমিশন

ইংরাজীতে একটা কথা,—ঝড়ের সময় যে কোনও বন্দরই জাহাজের পক্ষে আশ্রয় বলিয়া গণ্য। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ও তথা বিলাতী কাগজওয়ালার সেই অবস্থা হইয়াছে। কংগ্রেস, মোস্‌লেম-লীগ, লিবারল-লীগ, খেলাফৎ-সভা, হিন্দু-মহাসভা, ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস,—অর্থাৎ দেশের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও ধর্ম্মসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান একে একে সাইমন কমিশনে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন ; ইংরাজ এ দেশে যে (নকল পার্লামেণ্ট) ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং যাহাকে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিসভা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেই সভা এবং তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে মধ্যভারত, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশ সাইমন কমিশনে অনাস্থাজ্ঞাপন করিলেন,—তথাপি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ও তাহার মুরুব্বী বিলাতী কাগজওয়ালারা বলিতেছে,—"তা হোক্—ওরা চরমপন্থী। বর্দ্ধমান থাকিতে ভাবনা কি ? উঁহারাই ভাবতের প্রকৃত প্রতিনিধি,—উঁহাদেরই দেশে খোঁটা আছে, তা ছাড়া উঁহারা sane and sober স্থিরমস্তিষ্ক। উঁহারাই দেশের প্রকৃত হিতকামী, দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া পরামর্শ দেন, স্বপ্ন দেখিয়া আকাশের চাঁদ ধরিতে যান না। ইঁহাদের দেখাদেখি ক্রমে অন্যান্য নেতাও এই মতে মত দিবেন। ইঁহারা প্রকৃত মূক জনসাধারণের মঙ্গলার্থ এখনই স্বায়ত্ত-শাসন চাহেন না, কেন না, শিক্ষিতরা ক্ষমতা হাতে পাইলেই উহাদিগকে পদতলে দলিত করিবে, মূক জনসাধারণের স্বার্থ দেখিবে না, কেবল আপনাদের স্বার্থ দেখিবে। ইত্যাদি।"

যাহা হউক, কুল মিলে না দেখিয়া ইহারা তৃণ ধরিয়াছে ভাল ! চরমপন্থী অসহযোগীরা না হয় 'বাঘ'ই হইল, কিন্তু সার তেজ বাহাদুর, সার শঙ্করণ, চিন্তামণি—ইহারা ? ইহারাও কি চরমপন্থী বিপ্লববাদী ? যাঁহারা আজীবন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে চিন্তা করিয়াছেন, যাঁহারা দেশের লোকের অপ্রিয় হইবার আশঙ্কা না রাখিয়াও নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ইংরাজ প্রভুর সহিত আজীবন সহযোগিতা করিয়া সংস্কার আইন সফল করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহাদের আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমে

কোন সন্দেহ নাই,—তাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল কি জানেন না, আর যাঁহাদের রাজনীতিজ্ঞানের দৌড় সরকারী দপ্তর পর্য্যন্ত, যাঁহাদের দেশের মূক জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক খাজনা আদায় পর্য্যন্ত, যাঁহারা দেশের কাযে কখনও সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই, তাঁহারাই ইংরাজী ও আধা ইংরাজী কাগজওয়ালাদের হিসাবে প্রকৃত দেশহিতৈষী ও জনসাধারণের প্রিয়! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!

যুক্তি-তর্কের অভাবে, ন্যায় ও সত্যের অভাবে বিলাতী ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রকে এত দূর নীচে নামিতে হইবে, তাহা সত্যই তাহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। যদি মূক জনসাধারণের স্বার্থ-হানির আশঙ্কায় বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে দক্ষিণ-আফ্রিকার ইংরাজ-বুয়রকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া অসম্ভব হইয়াছিল কিরূপে? সেখানেও উহাদের অপেক্ষা মূক জনসাধারণ কাফ্রি-সংখ্যায় অনেক অধিক—উহাদের স্বার্থহানির আশঙ্কা ছিল না কি? তবে এই ভণ্ডামী কেন? যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এক দিন মিষ্টার কেয়ার হার্ডকে শ্বেত কুলীর সর্দ্দার (Sirdar of white Coolies) আখ্যা দিয়াছিলেন, তাঁহার বিলাতের রাজনীতিক অবস্থাজ্ঞানের দৌড় কত দূর, তাহা সকলের জানা আছে। যিনি বিলাতের শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত শ্রমিককে 'কুলী' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন, তিনি নিজের দেশের মূক জনসাধারণকে কি দৃষ্টিতে দেখেন, সে জ্ঞানও কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ও বৃটিশ সংবাদপত্র কোম্পানীর নাই? অথচ ইহাদের দৃষ্টিতে এই মহারাজাধিরাজই ভারতের 'মূক জনসাধারণের' প্রতিনিধি—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—স্বার্থরক্ষক! বিড়ম্বনা আর কি! দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী লাগিয়া থাকিলেও, জলকষ্ট ও অন্নকষ্টের আশঙ্কা থাকিলেও যে সব রাজা-মহারাজার বিলাসভ্রমণে কামাই নাই, সেই শ্রেণীর রাজার মূক জনসাধারণের হইয়া কথা কহিবার অধিকার কতটুকু, তাহা কিন্তু প্রতিবাদক বুঝাইয়া দেন নাই। যিনি ভারতের একটি সামান্য পরগণার জমীদার হইয়াও নিঃসঙ্কোচে বিলাতের বক্তৃতায় ভারতবাসীকে my people বলিয়া সম্বোধন করিয়া হাস্যোদ্রেক করিতে পারেন, তাঁহার মত নির্লজ্জ প্রেমিক যে স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অমূল্য উপদেশরাশি অকাতরে বর্ষণ করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

একখানা ইংরাজী কাগজ ক্রোধভরে বলিয়াছে,—নেহরুর দল সাইমন কমিশন চাহে না, পার্লামেণ্টকে মানিতে চাহে না, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহে; কিন্তু যদি আজ ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া আসে, তবে নেহরুর দল কোথায় থাকিবে, তাহাদের বক্তৃতা যে অরণ্যে রোদনেই সার হইবে, লোক যে তাহাদিগকে দুই দিনে ভুলিয়া যাইবে!

ইহা কি বিষম ভ্রম নহে? ইংরাজ চলিয়া গেলেই গোকুল কাঁদিয়া আঁধার হইবে না, ইহা নিশ্চিত। ইংরাজ চলিয়া গেলে বোথা স্মাটস বা হার্টজগ বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যায়েন নাই, কসগ্রেভ কলিন্স হা-হুতাশ করিয়া মরেন নাই।

তবে সুখের বিষয়, সকল ইংরাজই সমান নহেন। মিঃ চার্ট্রেস বলিয়াছেন,—"ব্যবস্থাপরিষদের অনাস্থাপ্রদর্শন হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।" বিলাতের "ম্যানচেষ্টার গার্জ্জেন" বলিয়াছেন, "আজ সম্মিলিত ভারত যে দাবী করিতেছে, তাহাতে কর্ণপাত করা প্রত্যেক বৃটিশ রাজনীতিকের কর্ত্তব্য। নতুবা ভারত অদূর-ভবিষ্যতে দ্বিতীয় আয়ার্ল্যাণ্ডে পরিণত হইবে। তখন মোড় ফেরা অনর্থক হইবে।"

কথাটা রাজনীতিকের ভাবিবার বটে। ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধ-কালে সন্তুষ্ট ভারত কি অসন্তুষ্ট ভারত রাখা কর্ত্তব্য? এই সাম্রাজ্যিক দম্ভ ও জিদের ফলে মার্কিণ হস্তচ্যুত হইয়াছে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা নামমাত্র অধীন আছে, সুতরাং বন্ধুভাবে, সমানের ভাবে ভারতের সহিত ব্যবহার করা কি অতীতের অভিজ্ঞতা উপদেশ দেয় না?

সাম্রাজ্যিকের ভণ্ডামী

ভারতবাসী যে মুহূর্ত্ত হইতে জোর গলায় নিজের জন্মগত অধিকার দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তদবধি বৃটিশ স্বার্থ-রক্ষক সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ একটার পর একটা ছুতার কথা তুলিতেছে। প্রথমে বলা হইল, ভারত ত দেশ নহে, একটা মহাদেশ, উহা কি কখনও এক হইতে পারে? নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম, নানা স্বার্থ,—এ সকলের সামঞ্জস্যসাধন কিরূপে সম্ভবপর? তাহার উত্তরে যখন কানাডা ও মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ অথবা দক্ষিণ-আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তখন নূতন কথা উঠিল—হিন্দু মুসলমান পরস্পর স্বার্থ ও ধর্ম্ম লইয়া গলা-কাটাকাটি করিবেই, তখন স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভবপর? এখন হিন্দু-মুসলমান সাইমন কমিশন আগমনের শুভক্ষণে আপনাদের ঘর সামলাইয়া লইয়াছে, তাহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে স্বরাজের খসড়া প্রস্তুত করিতেছে। সর্ব্বনাশ! তবে ত আর ঐ কথা খাটে না! সুতরাং এখন নূতন কথা উঠিয়াছে, 'মূক জনসাধারণ' এবং স্পৃশ্য অস্পৃশ্য—যেন মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ও দক্ষিণ-আমেরিকায় ঐ সব আপদ নাই! মার্কিণ যুক্তরাজ্যে কাফ্রী ও এসিয়াবাসী ত অস্পৃশ্য, দক্ষিণ-আফরিকার নিগার ও ভারতীয় প্রবাসী অস্পৃশ্য; কিন্তু তথাপি ঐ দুই দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা পড়ে নাই।

তবে অস্পৃশ্য অপেক্ষা 'মূক জনসাধারণ' কথাটাই অধিক জাঁকাইয়া তুলা হইতেছে। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড লিটন লণ্ডনে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালায় এমন অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা শাসনের দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু যত দিন না মূক জনসাধারণ শিক্ষিত হয় ও ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়, তত দিন বৃটেনের হস্তে কতক ক্ষমতা থাকা কর্ত্তব্য। এখন বহুকাল পর্য্যন্ত জনসাধারণ নির্ব্বাচনাধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া প্রস্তুত হইতে পারিবে না।"

দুই শত বৎসর ইংরাজ শাসনের পরেও জনসাধারণ এত ঘোর অজ্ঞ কেন, এ প্রশ্ন তুলিলেও লর্ড লিটন কি জবাব দিবেন? এই ভীষণ অজ্ঞতার ফলে দেশ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে, লোক নিরন্ন হইতেছে,—রোগ-শোক-পীড়িত হইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতেছে, ইহার প্রতীকার ইংরাজ সরকার এ যাবৎ করেন নাই কেন? তাঁহাদের সমরসজ্জা ও শান্তিরক্ষার ব্যয়ের পরিমাপে শিক্ষার ব্যয় কতটুকু? তবে কোন্ মুখে লর্ড লিটন মূক জনসাধারণের হইয়া কথা কহিতে আসেন?

ইহার পর ভয়প্রদর্শনের প্রচেষ্টাও আছে! প্রথমে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিরোধ, তাহার পর স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিরোধ, শেষে মূক জনসাধারণ,—কত যুক্তিই উপস্থাপিত হইল। এ সব মামুলী যুক্তি যখন আর লোক ভুলাইতে পারিল না, তখন প্রকৃত ভারত (Real India) অর্থাৎ লর্ড বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর দাঁড় করান হইল। কিন্তু তাহাতেও যখন লোক হাসিল ছাড়া আর কিছুই করিল না, তখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দ্বারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইল। 'নিউ ষ্টেটসম্যানের' মত লিবারল পত্রও ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল,—"ব্যবস্থা পরিষদ যে সিদ্ধান্ত করিল, তাহা মনে হইলে কেবল উহার প্রতি দয়ার উদ্রেক করে—বস্তুতঃ এই ছেলেমানুষী দেখিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর দয়া হয়। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু আবার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিলেন; এই নিষ্ফল দাবী দেখিয়া কমিশন বর্জ্জন বাদানুবাদের নিষ্ফলতার পরিমাণ বুঝা যায়। পণ্ডিত মতিলাল নিশ্চয় জানেন যে, এই দাবী কখনও পূর্ণ হইবে না, তাই এই দাবী করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তেমনই ভাবে পরিষদও জানে যে, তাহাদের বাধাদানে কমিশন বন্ধ হইবে না, তাই বর্জ্জনপ্রস্তাব গ্রহণে সাহসী হইয়াছে। স্বাধীন স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্ত ভারতের অস্তিত্ব-কল্পনা মূলেই বোকার কল্পনা। ভারতের রাজনীতিকরা যাহা বলে, তাহার সহিত বাস্তব জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই। যে অবস্থা বর্ত্তমানে হইবার সম্ভাবনা নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, সে অবস্থার কল্পনা করিয়া লাভ কি?"

এ সকল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরও অনেক জবাব ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে দিতে পারে, বলিতে পারে,—জগতে যে সকল ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, এমন সব ঘটনাও ঘটিয়া যায়, যথা,—(১) দক্ষিণ-আফরিকা য়ুনিয়ন জ্যাকের মাথার উপর বুয়রদের জাতীয় পতাকা উড়ে, (২) আয়র্ল্যাণ্ডের 'রেবেল' বিদ্রোহী নেতা গ্রিফিথস্, কলিন্স, কসগ্রেভ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হয়, (৩) কুকুরের পর্য্যায়ে অবনমিত চীনারা হাঙ্কো, ওয়ানসিয়েন ও নানকিং হইতে ইংরাজের কনসেশান উঠাইয়া দেয়, (৪) অধিক কথা কি, পরাধীন বিজিত জাতি বাঙ্গালীও কার্জ্জনের Settled fact কে unsettled করে, বঙ্গভঙ্গ রদ করে! আরও কত চাই? কিন্তু কথা-কাটাকাটিতে কোন ফল নাই। আমাদের কথা,—তোমাদের বন্দুক-বেয়নেটের জোর বেশী, তাহা ভারতবাসী স্বীকার করে; সে জোরে তোমরা কমিশন বসাইতে পার, পার্লামেণ্টকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা বানাইতে পার, যাহা ইচ্ছা করিতে পার। কিন্তু ভারতবাসী স্বেচ্ছায় তাহা মানিয়া লইবে না। ভারতবাসী কখনও স্বীকার করিবে না যে, সাগরপারের পার্লামেণ্ট তাহাদের ভাগ্যসূত্র বাঁধিয়া দিবার অধিকারী! তোমরা ক্রোধে ক্ষোভে সংস্কার আইন তুলিয়া দিতেও পার বা যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া সাজিতে পার, কিন্তু উহাকে ভারতবাসী স্বেচ্ছায় মুক্তির পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, সে তাহার মুক্তির পথ নিজেই অনুসন্ধান করিয়া লইবে।

ছাত্রদলন

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার হরতাল অনুষ্ঠান এবং গত সরস্বতীপূজা সম্পর্কে সরকারী বা বে-সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে যে ভাবে ছাত্রদলন কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেওয়া সমীচীন কি না, এখন বাঙ্গালার অভিভাবকগণের তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা অথবা শিক্ষকের মর্য্যাদা রক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিলে শিক্ষক তাহাদের দণ্ডবিধান করিবেন, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু যেখানে শিক্ষক ছাত্রদের ন্যায্য স্বাধীন মনোবৃত্তি প্রকাশে বাধা দেন, পরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণের দণ্ডবিধানে অগ্রসর হন, সেখানে তাঁহার কার্য্য সমর্থিত হইতে পারে না। শিক্ষক যদি বেত ছাড়িয়া সরকারী কনষ্টেবলের লাঠি বা সার্জ্জেণ্টের ব্যাটন গ্রহণ করেন অথবা উহাদের আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে যান, অথবা সরকারের ইচ্ছার অনুকূল বা প্রতিকূল রাজনীতির এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে শাসন করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য কেহ সমর্থন করিতে পারে না—অন্ততঃ নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেই পারে না। পরন্তু শিক্ষক যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে একদেশদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া ছাত্রবর্গকে অকারণ দণ্ডিত করেন, তাহা হইলেও তাঁহার কার্য্য সমর্থিত হইতে পারে না।

হরতালের পূর্ব্বে সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রসম্মিলনে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে অধ্যক্ষ মিঃ ষ্টেপলটনের সহিত সম্মিলনের সম্পাদকের যে বিরোধ ও 'সংঘর্ষ' হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। তখন হইতে অধ্যক্ষ ও ছাত্রে একটা অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। যে অধ্যক্ষ ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভারতীয়ের বৃত্তি ভোগ করিয়া (প্রতিষ্ঠান সরকারী হইলেও জনসাধারণের পয়সায় পুষ্ট ও পালিত হয়, কেন না, প্রজার প্রদত্ত রাজস্বই সরকারী পয়সা) ভারতীয়ের জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকার অসম্মান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাঁহার ত ছাত্রদিগের নিকট এই অপরাধের নিমিত্ত (আন্তরিক না হইলেও অন্ততঃ মৌখিক) দুঃখপ্রকাশ করাও কর্ত্তব্য ছিল। বিলাতে তিনি 'য়ুনিয়ান জ্যাকের' বা 'গড সেভ দি কুইনের' এইরূপ অসম্মান করিলে নিশ্চিতই পার পাইতেন না। কিন্তু বিলাত ভারত নহে, সেখানে সরকার ও জনসাধারণ এক, তাহাদের দেশপ্রেম ও রাজনীতি এক; ভারতে উভয়েই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অধ্যক্ষ এ কথা জানিতেন বলিয়াই সরকারের বিরাগের ভয় নাই, বরং অনুরাগ আছে জানিয়াই এইরূপ গর্হিত কাপুরুষোচিত কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ঠিক এইভাবে মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়াই তিনি হরতালের দিন কলেজ খুলিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সাইমন কমিশন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় আসিতেছে, অতএব উহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনের জন্য হরতাল অনুষ্ঠান করা ছাত্রদের পক্ষে রাজদ্রোহ! সুতরাং যে হিসাবে জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়া তাঁহার মতে কর্ত্তব্য, সেই হিসাবে

ছাত্রদের হরতাল বন্ধ করাও কর্ত্তব্য। তবে ছাত্ররা যদি য়ুনিয়ান জ্যাক উড্ডীন করিত বা কমিশনের অভ্যর্থনায় যোগদান করিত, তাহা হইলে উহা তাঁহার মতে বোধ হয় শোভন হইত—উহাতে রাজদ্রোহ রাজনীতি কোনও কিছুরই গন্ধ থাকিত না। ছাত্রের স্বাধীন মনোবৃত্তি দলনের ইহা হইতে প্রকৃষ্ট পরিচয় কি হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে আমরা অধ্যক্ষের পুলিস ডাকান, কলেজ সম্মিলনের সম্পাদকের মাথা ভাঙ্গা, তাঁহার নিকট অধ্যক্ষের ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ প্রভৃতি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে চাহি না। আমরা কেবল এইটুকু জানিতে চাহি,—গভর্ণর তৎপূর্ব্বে কলেজে আসিয়া ৭দিন কলেজ বন্ধ রাখিতে বলিলেও অধ্যক্ষ কেন ঐ দিন কলেজ খুলিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন,—কেন রাজনীতিক ব্যাপারকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত জড়াইয়াছিলেন? তিনি সরকারী দপ্তরখানার সেক্রেটারী বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নহেন, অথবা কমিশনার সার চার্লস টেগার্টের এ্যাসিসটাণ্ট নহেন যে, ঐ দিন তাঁহাকে হাটের লোক জড় করিয়া সাইমন কমিশনের অভ্যর্থনা সফল হইয়াছে বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে! অধ্যক্ষ ৩ মাস কলেজ বন্ধ রাখেনই বা কি হিসাবে? ছাত্ররা এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাদিগকে এই গুরুদণ্ড দিতে হইবে? বরং তাহারাই মার খাইয়াছিল, অপমানিত হইয়াছিল।

বেথুন কলেজের ব্যাপারে মিস রাইটের বিপক্ষে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনি অন্যায় পূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রীরা সঙ্ঘবদ্ধতা ও দৃঢ়চিত্ততা দেখাইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা নিশ্চিতই দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্রী। যে স্থলে জাতির আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে, সেই স্থলে তাঁহারা যদি এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে দেশের অপমানের পরাকাষ্ঠা হইত। শুনা যাইতেছে, মিস রাইট কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবেন। সংবাদ সত্য হইলে, উহাতে ক্ষোভ-দুঃখের কোনও কারণ নাই। তাঁহার ন্যায় সহানুভূতিশূন্যা শিক্ষয়িত্রীর অভাবে ছাত্রীবর্গের কোন অসুবিধা হইবে না বলিয়া মনে হয়।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালকবর্গ তৎসংক্রান্ত রামমোহন রায় হোষ্টেলের ছাত্রবর্গের সহিত সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সত্য বটে, হোষ্টেল-প্রবেশের নিয়মানুসারে তথায় পৌত্তলিক পূজা করিবার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু হোষ্টেলের মাত্র একটি ছাত্র ব্যতীত যখন সকল ছাত্রই হিন্দু, তখন তাহার কম্পাউণ্ডের মধ্যে সরস্বতী-পূজা করিয়া ছাত্ররা বিশেষ অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আর যখন সকল ছাত্রই ঐ পূজায় যোগদান করিয়াছিল, তখন বাছিয়া মাত্র কয়জনকে দণ্ডিত করায় অধ্যক্ষ সুবিচারের পরিচয় প্রদান করেন নাই। আমরা শুনিয়াছি, এই হোষ্টেলে ব্রাহ্ম বিবাহ উপলক্ষে উৎসব-ভোজ হইয়া গিয়াছে। কলেজ কাউন্সিল এক কৈফিয়তে বলিয়াছেন, তাহাতে অধ্যক্ষের অনুমতি ছিল। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা রহিল কোথায়? কালেজের হোষ্টেলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। অধ্যক্ষ হোষ্টেলে প্রতি রবিবার উপাসনা করিতে যান। এ কথা কলেজ কাউন্সিল স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্ম উপাসনার বেলা অপরাধ হয় না, কিন্তু তিনি হিন্দুর পূজার বেলায় দণ্ডের ব্যবস্থা করেন কেন? এই ব্যবহারের তারতম্য কেন? হিন্দু ছাত্র যখন সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক, তখন তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি এরূপ অনাস্থা প্রদর্শন করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কলেজ কাউন্সিল স্বীকার করিতেছেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রদত্ত অর্থ হইতে এই হোষ্টেল নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং উহা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নিজস্ব নহে। তবে ঐ স্থানে প্রতি রবিবার ব্রাহ্ম উপাসনা হয়, অথচ বৎসরে একটি দিন সরস্বতী-পূজা হইবে না কেন? শুনিতেছি, যদি এ বিষয়ে কোনও প্রতীকার-ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে ছাত্রবর্গের অভিভাবকরা তাঁহাদের পুত্র ও আত্মীয় ছাত্রগণকে সিটি কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লইবেন। ইহাই কি ভাল? আমরা আপনারা যদি আপনাদের মধ্যে ঘর সামলাইয়া লইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হইবে? আমরা ব্রাহ্মই হই, আর আনুষ্ঠানিক হিন্দুই হই, সবাই হিন্দু বাঙ্গালী, এক দেশ-মায়ের সন্তান, এ কথাটা আমাদিগকে অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা সুব্যবস্থা করিবেন, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্বন্ধে একটা সুসংবাদ এই যে, গভর্ণরের আদেশে মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দুহোষ্টেল খুলিয়াছে। এই দুইটিই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে দীর্ঘকাল বন্ধ হইয়াছিল। আরও এক সংবাদ,—অধ্যক্ষ ষ্টেপলটন কলেজ হইতে অপসারিত হইতেছেন, হয় ত তিনি ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস পদে নিযুক্ত হইবেন।

এখন অবস্থা ছাত্রদিগের পক্ষে সন্তোষজনক। কিন্তু এক রাজা যায়, অন্য রাজা হয়। এক ষ্টেপলটন যাইতে পারে, অন্য ষ্টেপলটন আসিতেও ত পারে! যত দিন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মূলনীতির পরিবর্ত্তন না হয়, তত দিন তথায় আমাদের ভবিষ্য বংশধরগণের চরিত্র-গঠনের সুযোগ করিয়া দেওয়ায় কি ফল আছে? শিক্ষার অর্থ ত চরিত্র-গঠন?

শুনা যায়, মিঃ ওটেন শিক্ষা-নিয়ামকের পদ হইতে দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন বলিয়া জনরব রটিয়াছে, তাহা সত্য হইলে আমাদের ছাত্রগণের স্বাধীন মনোবৃত্তি অনুশীলনে সম্যক্ বাধা পতিত হইবে বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রাজনীতিক কারণে ছাত্ররা যদি কলেজ কামাই করে, তাহা হইলে তাহাদের কিরূপ দণ্ডবিধান করা হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি নাকি একটা পাকা বন্দোবস্ত যত দিন না হয়, তত দিন হেড্ মাষ্টার ও হেড মিষ্ট্রেসদিগের উপর বিবেকমত ব্যবস্থার ভার দিয়াছেন। তবে ঐ সঙ্গে তাঁহাদের সুবিধার জন্য কিছু উপদেশামৃতও বণ্টন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যতের পাকা বন্দোবস্তের নমুনা। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, বাঙ্গালার ছাত্রজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিরূপে নিষ্পেষিত হইতেছে।

ইংরাজের নিজের দেশে ছাত্রকে অল্পবয়স হইতেই দেশ-প্রেমে নানা রূপে অভ্যস্ত করা হয়। এ বিষয়ে স্কুল-কালেজও সাহায্য করে। আর আমাদের দেশে ছাত্রকে চরিত্র-গঠনের বয়সে দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরত করিবার চেষ্টা করা হয়। ইংরাজীতে যাহাকে বলে উত্তম নাগরিক গঠন করা, তাহা আমাদের দেশে কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যুদ্ধ স্থগিত দিনে (Armistice day) সরকারের আদেশে সামান্য এক ঘণ্টার হরতাল অর্থাৎ কার্য্য হইতে বিরতি বাধ্যতামূলক করা হয়। ইহা কি রাজনীতিক ব্যাপার নহে? শাসক ও রাজপুরুষ যখন অভ্যর্থিত হয়েন, তখন তাহাতে ছাত্রগণকে যোগ দিতে দেওয়া হয়। উহাও কি রাজনীতিক ব্যাপার নহে? কেবল যাহাতে দেশপ্রেমের গন্ধ আছে, তাহাই কি রাজদ্রোহমূলক?

একবার স্বদেশী যুগে এই গোলামী শিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধে বাঙ্গালী বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহারই ফল National Council Education; যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে হয় ত অচির-ভবিষ্যতে বাঙ্গালাকে তদনুরূপ পন্থা অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা

এই সম্পর্কে আমাদের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-রক্ষার সমস্যা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী হরতালের দিন ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। বাঙ্গালার ব্যাঘ্র সার আশুতোষের হাতে গড়া 'জাতীয়' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, তাহা ইহাতেই প্রতীয়মান হয়। যখন অসহযোগের প্রথম আমলে বাঙ্গালীর ছেলে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে থাকে, তখন সার আশুতোষ হুঙ্কারগম্ভীরনাদে বলিয়াছিলেন,—"এই প্রতিষ্ঠান ত তোমাদের নিজের—ইহা ত স্বদেশী, আমরা এইখানেই ত আদর্শ স্বরাজ গড়িয়া তুলিয়াছি, এখানে বাঙ্গালীই কর্ত্তা, বাঙ্গালীই হর্ত্তা, বাঙ্গালীই বিধাতা,—সরকারের এখানে কোনও হস্তক্ষেপ চলিবে না। এই প্রতিষ্ঠান তোমরা ছাড়িবে কি জন্য?" আজ সার আশুতোষের সেই সদম্ভ উক্তি ভিত্তিহীন হইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার বিদ্যা-বুদ্ধিতে বা পাণ্ডিত্যে যোগ্য কি অযোগ্য, সে বিচারের কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল দেখিতে হইবে, তাঁহার হাতে পড়িয়া বাঙ্গালীর সাধারণ প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কি দশা হইয়াছে। এইখানেই তাঁহার যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার করিবার কথা। তাঁহার মনোবৃত্তির সুবিধা পাইয়া সরকার একের পর একটি করিয়া কর্ত্তৃত্বাধিকার নিজ হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। শেষে ভাইস চ্যান্সেলারের পদ বেতনভোগী করিবার কথাও স্থির করিয়াছেন। যে সময়ে কর্পোরেশানের কাউন্সিলে চ্যান্সেলার ও ভাইস চ্যান্সেলারের পদ নির্ব্বাচন-প্রথার উপর স্থায়ী করিবার বিচার-বিতর্ক চলিতেছে, সেই সময়ে ভাইস চ্যান্সেলারকে বাঁধা মাহিনার লোক করিবার প্রচেষ্টায় সরকারের কি মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

বাঙ্গালার বাজেটে সরকার এবার যাঁটতি সত্ত্বেও ভাইস চ্যান্সেলারের বেশ মোটা বেতন বরাদ্দ করিয়াছেন। অদ্ভুত—ভাইস চ্যান্সেলারের অতিরিক্ত কায বাড়িয়াছে। ৭০ বৎসরকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদ অবৈতনিক হইয়া আসিয়াছে। হাইকোর্টের জজিয়তী করিতে করিতেও সার গুরুদাস হইতে সার আশুতোষ পর্য্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের গুরুভার স্কন্ধে বহন করিয়া আসিয়াছেন। হাইকোর্টের কায সামান্য নহে। তাহার উপরও যদি সুশৃঙ্খলার সহিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কায করা এ যাবৎ সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলারের বেলা উহা এত কষ্টদায়ক হইল কিরূপে?

এখন অনেক নূতন স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; পরন্তু পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা এবং ছাত্রাবাস সমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার ভারও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পতিত হইয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু সেই অতিরিক্ত কায একাকী ভাইস চ্যান্সেলারকে করিতে হয় না। নূতন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নূতন পদেরও সৃষ্টি হইয়াছে, যথা,—পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের দুই জন প্রেসিডেণ্ট ও দুই জন সেক্রেটারী, উচ্চ শিক্ষাবোর্ড সমূহের চেয়ারম্যানগণ, পরীক্ষার কণ্ট্রোলার ও সহকারী কণ্ট্রোলার, কলেজ বিভাগের ইনস্পেক্টর ও তাঁহার সহকারিগণ, হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ, ইত্যাদি। এতগুলি লোকের সাহায্য পাইয়াও কি ভাইস চ্যান্সেলারের কায হাল্কা হয় না? তাহার পর মাধ্যমিক (স্কুলের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা) শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য কেবল কলেজের ও পোষ্ট গ্রাজুয়েটের শিক্ষা লইয়াই নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবে কি জন্য ভাইস চ্যান্সেলারের পদ বেতনভোগী করা হইবে?

এবার বাঙ্গালার বাজেট যাঁটতির বাজেট, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি এই যাঁটতির বৎসরেও সরকারের ব্যয়বাহুল্যের প্রবৃত্তি 'চাগিয়া' থাকে, তাহা হইলে কালেজের অল্পবেতনভোগী শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেই ত হয়।

তবেই কি মনে হয় না, সরকার বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলারের বেতনের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত সরকারী গোলামখানায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না? লোক এমনও ত বলিতে পারে, বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার সরকারী দপ্তরখানার হোমরাচোমরা রাজপুরুষদিগের সুরে এ যাবৎ পোঁ ধরিয়া এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেছেন? হরতালের দিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনের মধ্যে যে লীলার অভিনয়ের সুযোগ দিয়াছিলেন—পুলিস ও পল্টন ঐ উপলক্ষে তাহাদের বিরাট শক্তির পরিচয় প্রদানের যে সুযোগ পাইয়াছিল, তাহার বিষয়ে ত একাধিক অধ্যাপকই দৈনিক সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ হেন ভাইস চ্যান্সেলার যদি সরকারের প্রিয় পর্য্যায়ে উন্নীত না হন, তবে কে হইবে! সুখের বিষয়, সরকার মহাশয় বেতন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

নাভার রাজা ও রাজন্য-সম্প্রদায়

লর্ড আরউইনের সরকার নাভার মহারাজা রিপুদমন সিং অথবা গৌরচরণ সিংকে গদীচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই,



নাভার মহারাজা রিপুদমন সিং

সম্প্রতি তাঁহাকে কোদাইকেনালে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন ; এবং তাঁহাকে মহারাজা খেতাব হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন ও তাঁহার মাসিক বৃত্তি ২৫ হাজার হইতে ১০ হাজারে নামাইয়া দিয়াছেন। মহারাজা তাঁহার অনুচরবর্গ সহ এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে লক্ষ্ণৌ যাইতেছিলেন। সেখানে যখন তিনি ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন গোয়েন্দা পুলিস তাঁহাকে অনুচরবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—এক মালগাড়ীর সঙ্গে একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে চড়াইয়া গোপনে ফতেপুর লইয়া যায়। ঐ স্থানে দিল্লী হইতে 'রেল বোর্ড স্পেশাল' নামে একখানা গাড়ী উপস্থিত হয় এবং ঐ গাড়ীতে মহারাজাকে কোদাইকেনালে চালান করা হয়। এত ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্র কারণ কি ছিল, বুঝা যায় না। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব 'চিফ জষ্টিশ' ভাইসরয় লর্ড রেডিং মহামান্য নিজামের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং পর পর হোলকার, ভরতপুর প্রভৃতি রাজন্যের সহিত যে ব্যবহার করা হইল, তাহাতে নাভার রাজার প্রতি ব্যবহারে লুকাচুরির কিছু প্রয়োজন ছিল না। ভারত-সরকার এক কৈফিয়তে জানাইয়াছেন যে, নাভার মহারাজাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ ও সতর্ক করিয়া দিলেও তিনি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনীতিক আন্দোলনে বিরত হয়েন নাই। তাই তাঁহাকে মহারাজা উপাধি হইতে বঞ্চিত করা হইল এবং তাঁহার বৃত্তি কমাইয়া দিয়া কোদাইকেনালে আটক করা হইল। কত দিন তাঁহাকে এখানে রাখা হইবে, তাহা ভারত-সরকারের ইচ্ছাসাপেক্ষ। তাঁহার পুত্র টিকা সাহেবকে নাভার গদীতে অভিষিক্ত করা হইবে।

নাভার মহারাজাকে যখন গদীচ্যুত করা হয়, তখনও ভারত-সরকার এই ভাবের অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট দোষারোপ করিয়াছিলেন। মহারাজা সে সময়ে আবেদনে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার এক প্রবল শত্রুদল আছে, তাহারা তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে। তাঁহার নামে যদি অভিযোগ থাকে, তাহার বিচার প্রকাশ্য আদালতে হউক, তিনি আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবেন।"

কিন্তু বাঙ্গালার বিনা বিচারে আটক বন্দীদের বেলা যেমন গুরু অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করা হয়, অথচ প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচারের অবসর দেওয়া হয় না, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। মহারাজা সুবিচার প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাকে তাঁহার অপরাধের সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখিয়া দণ্ড দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু সাধারণে জানে, মহারাজা রিপুদমন তাঁহার তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও দেশপ্রেমিকতার জন্য নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। সকলেই জানেন, প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি সরকারের মনোনীত সদস্য ছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোখলের প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত বিলের আন্দোলনকালে সরকারের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। তদবধি সকলেই জানিত যে, সরকারের খয়ের খাঁ হইবার মত ধাতু তাঁহাতে নাই।

তাহার পর গুরুদ্বার শিখ আন্দোলনের সময় তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি নির্য্যাতিত দেশ-প্রেমিক সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক আকালী শিখদিগের প্রতি ছিল। ইহাতেও তিনি সরকারের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন।

সে দিন আলোয়াড়ের মহারাজা দেশীয় রাজ্য তদন্ত-সমিতির প্রেসিডেণ্ট সার হার্কার্ট বাটলারকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। সার হার্কার্ট উহার উত্তরে বলেন,—"ভারতীয় রাজন্যগণ সম্রাটের প্রতি রাজভক্তিতে কাহারও ন্যূন নহেন। কেবল মহাযুদ্ধের সময়ে নহে, অন্য অনেক সময়ে রাজন্যরা সাম্রাজ্যের প্রয়োজনকালে রক্ত ও অর্থ স্বেচ্ছায় সানন্দে দান করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের লোক প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত সে কথা বিস্মৃত হইবে না।"

বোধ হয়, নাভার মহারাজার প্রতি ব্যবহারই ইহার নমুনা! যে নিজাম নিজস্ব অর্থে সামর্থ্যে জার্ম্মাণযুদ্ধকালে বৃটিশ সরকারকে মাশাতীত সাহায্য দান করিয়াছিলেন, লর্ড রেডিংএর নিকটে তিনি তাহার কি প্রতিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

সাময়িক প্রসঙ্গ

৬ষ্ঠ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৩৪] সাময়িক প্রসঙ্গ ৮০৯

নৌসামরিক বিল

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতের নিজস্ব নৌশক্তি (Indian Navy) সৃষ্টি করিবার উপযোগী এক বিল সরকার-পক্ষ পেশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পরিষদ উহা না-মঞ্জুর করিয়াছেন। করিবারই কথা, কেন না, প্রকৃতপক্ষে উহা ত ভারতের নৌশক্তি হইবে না, হইবে বৃটিশ নৌশক্তির একটা অঙ্গ, অথচ খরচ যোগাইতে হইবে তাহার ভারতকে! এমন সুন্দর ব্যবস্থা পরিষদ ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইলেন না, ইহাই দুঃখ! তবে পরিষদ না মানিলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। লর্ড বার্কেণহেড সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পারস্য-উপসাগরে অচির-ভবিষ্যতে গোলযোগের কথা তুলিয়াছেন। ভয় ত সুদূর প্রাচ্যের সাগরে জাপান ও চীন হইতেও ভয় দেখাইবেন। আসল কথা, 'রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভি' নামক গালভরা কথার সার্থকতা হওয়া চাই-ই, কেন না, বৃটেনের বর্ত্তমান নৌ-খরচার শতকরা নব্বই অংশ ভারতের স্কন্ধে সরাইয়া দেওয়া চাই-ই। 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার!' ভারতের নিজের বলিবার মত জোর দুই চারিখানা বাণিজ্য-পোত আছে, তাহাও "Indian Mercantile Marine" নামক প্রকাণ্ড বিশেষণে বিভূষিত হইলেও নগণ্য বা বিদেশীর অন্যায় প্রতিযোগিতায় কোনরূপ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একবার নহে, বহুবারই সরকারকে বলা হইয়াছে যে, অন্ততঃ ভারতের উপকূলে এই বিদেশীর অর্ণবপোতগুলিকে বাড়িবার মত সুযোগ করিয়া দাও। তাহাও হয় নাই। তবে কোন্ মুখে Royal Indian Navy র কথা তুলা হয়? বৃটেনের বাণিজ্যপোতেই ভারতীয়কে নাবিকের বড় পদে শিক্ষানবিসী করিতে দেওয়া হয় না, ভারতীয়রা খালাসী-লস্করের উপরে যাইতে পারে না। তখন নৌসেনানীর পদে ভারতবাসী কত প্রলয়ের পরে বসিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাজেট

এবার বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব মিঃ মার সালতামামি হিসাব পেশ-কালে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, অবস্থা সন্তোষজনক নহে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, রাজকোষের অবস্থা দেউলিয়া হইয়া যাইবারই মত। হস্তান্তরিত বিভাগে লোকহিতকর কার্য্যে ত নহেই, সংরক্ষিত বিভাগেও ইচ্ছানুরূপ ও প্রয়োজনানুরূপ ব্যয় করিবার উপায় নাই।

বস্তুতঃ এক পুলিস বিভাগে ৯ লক্ষ টাকা এবং মফঃস্বলে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা ছাড়া বাঙ্গালার বাজেটে উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। অবশ্য মেষ্টনী বন্দোবস্তের উপরেই যত দোষের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেবল মেষ্টনী বন্দোবস্তের দোষ নহে, বাঙ্গালার রাজপুরুষগণের ব্যবস্থারও যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে নাই, এ কথা বলা যায় না। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে এতটা দুরবস্থা হয় না। ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল কেন? তাহার ফল কি হইয়াছে? কমিটী যে ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই নির্দ্দেশমত কার্য্য কি এ যাবৎ হইয়াছে?

আয়ের অঙ্কে এবার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ১৭ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অথচ মিঃ মার নিজেই অন্যত্র স্বীকার করিতেছেন যে, বাঙ্গালায় অনাবৃষ্টি ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে আবগারী বিভাগে আয় হ্রাস হইয়াছে। অনাবৃষ্টি ও চাউলের মূল্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষেরই নামান্তর। দেশের যখন এমন অবস্থা, তখন সেটল্‌মেণ্টের ফলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কি সুশাসকোচিত কার্য্য হইয়াছে? রাজা প্রজার দুঃখ-কষ্ট না বুঝিলে রাজার কর্ত্তব্যপালন করেন কিরূপে বলা যায়?

জনসাধারণের উন্নতিমূলক শিক্ষা, স্বাস্থ্যাদি ব্যাপারে অর্থ-নিয়োগের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। কলেরায় ম্যালেরিয়ায় এবার বাঙ্গালার পল্লী-মফঃস্বলের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার খবর, বোধ হয়, রাজস্ব-সচিব রাখিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতীকারের উপায় তিনি কি করিয়াছেন? বাঙ্গালার মফঃস্বলে ইতোমধ্যেই জলকষ্টের হাহাকার উঠিয়াছে; কলেরা বসন্ত আবার দেখা দিতেছে, অথচ এই সবে ফাল্গুনের শেষ! ইহার পরে দারুণ প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল আছে।

চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয়ের ফলে জগতের নানা উন্নত স্বাধীন দেশ হইতে রোগ দূরীভূত করা হইতেছে। এক এক দেশ একবারে কঠিন-রোগশূন্য হইয়াছে। সেই হিসাবে বাঙ্গালার মত বিপুল অভাবগ্রস্ত প্রকাণ্ড দেশে স্বাস্থ্য-বিভাগের জন্য ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা কি সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর তুল্য নহে?

অথচ পুলিসের ব্যয় বিষয়ে কর্ত্তারা সর্ব্বদা মুক্তহস্ত! দেশের লোক যদি রোগে ভুগিয়া তৃষ্ণায় জল না পাইয়া মরিয়া উড়কুড় হয়, তখন পুলিস শান্তিরক্ষা করিবে কাহার?

ভারত সরকারের সালতামামি হিসাবে সার বেসিল ব্ল্যাকেট ভারতের আয়-ব্যয়ের সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার শেষ বাজেট, কেন না, ইহার পর আর তিনি ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিবরূপে সালতামামি হিসাব পেশ করিবেন না। সুতরাং পর পর কয় বৎসর Surplus Budget অর্থাৎ সমৃদ্ধিজ্ঞাপক হিসাব পেশ করিয়া তিনি মধুরেণ সমাপয়েৎ করিয়া যাইতেছেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। ইতোমধ্যেই অ্যাংলোইণ্ডিয়া তাঁহার জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই দরিদ্র দেশবাসীর নিকট হইতে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কতটুকু উপযুক্ত, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের বাজেটে সার বেসিল দেখাইয়াছেন যে, সম্ভবতঃ এই বৎসরে ১ শত ৩২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রাজস্বের বাবদে আয় এবং ১ শত ২৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। তাহা হইলে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কাষ্টম, আয়-কর, লবণ প্রভৃতি বিভাগে এ বৎসর অধিক আয়ের সম্ভাবনা, এবং রেল, রাজস্ব সংরক্ষণভাণ্ডার, অহিফেন এবং সামরিক ও বে-সামরিক শাসন বিভাগে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক।

সাধারণ হিসাবে দেখিলে সার বেসিলের 'সমৃদ্ধি'-জ্ঞাপক বাজেট ভারতের অবস্থার উন্নতির পরিচায়ক বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে দেখা যায়, সমৃদ্ধির মূল দরিদ্র প্রজার ক্ষমতার অতিরিক্ত কর আদায় করা, আর ঘাঁটতির মূল অমিতব্যয়িতা। যে বাজেটে দেখান যায়, দরিদ্র প্রজার গুরুকর-ভারের লাঘব করা হইয়াছে, অথবা সরকার নানা দিকে অনাবশ্যক ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া প্রজার জনহিতকর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প ইত্যাদি কার্য্যে যথোপযুক্ত অর্থ নিয়োগ করিতেছেন,—সেই বাজেটকেই প্রকৃত 'সমৃদ্ধ' বাজেট বলা যাইতে পারে। সার বেসিল তাঁহার বাজেটে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন কি? এমন দরিদ্র প্রজা আছে, যাহার দুই বেলা লবণ দিয়া এক মুঠা ভাত জুটে না। তাহাদের জন্য লবণ-কর হ্রাস হইয়াছে কি? এই দরিদ্র ভারতে ডাক টিকিটের মূল্য একবার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাহা আর নামান হইল না। ইহার জন্য ডাক বিভাগের আয় বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, বরং হ্রাসই হইয়াছে, কিন্তু সে জন্য ডাক টিকিটের মাশুল কমান হইয়াছে কি? বাজেটে তাহার তকোন চিহ্ন নাই। ইহাতে প্রয়োজন থাকিলেও দরিদ্র প্রজা চারিখানা পত্র লিখিবার স্থলে একখানা পত্র লিখে, চারিখানা ডাক টিকিট ক্রয় করা তাহার পক্ষে পেটের অন্ন মারারই সামিল হয়। ইহাতে প্রজা কত অসুবিধা ভোগ করে? সুলভ সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মারফতে দেশে আপামর সাধারণের মধ্যে জগতের রাজনীতির আলোচনা ও শিক্ষা বিতরণ করা হয়। সেই সুলভ সাহিত্য ও সুলভ মুদ্রণের কাগজের উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া সরকারী বিরাট শাসনতন্ত্রের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য সরকার শিক্ষাবিস্তারে বাধা দিতেছেন। সার বেসিল তাঁহার সমৃদ্ধ বাজেটে সেই সমাজের অনিষ্টকর মাশুল হ্রাস করিয়াছেন কি?

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ উচ্চহারে ইনকামট্যাক্স বসাইয়া সরকার অত্যাচার করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

গত ৫ বৎসর ধরিয়া বাজেটে আয়ব্যয়ের হিসাবের পরও উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিবার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সে জন্য অতিরিক্ত করভার-পীড়িত দরিদ্র করদাতার কোনও কষ্টের বা বোঝার লাঘব হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

এবার উদ্বৃত্ত ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার কি সদ্ব্যবহার করা হইবে? প্রজার কি আর লবণ-কর দিতে হইবে না? ডাক-মাশুল কি কমিয়া যাইবে? কাগজের উপর আমদানী শুল্ক কমিয়া যাইবে? তারের খরচা কি হ্রাস হইবে? ব্যবসায়ীদের ইনকামট্যাক্সের কি কিছু কম হইবে? না—এ সব কিছুই হইবে না। কেবল একটা সু-খবর, মেষ্টনী ব্যবস্থার প্রতিকূলে এবার প্রাদেশিক সরকার সমূহের দেয় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা রেহাই দেওয়া হইবে। ইহার ফলে প্রাদেশিক সরকার সমূহ যে জনহিতকর কতকটা কায করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার পক্ষে সার বেসিল এবারও সুবিচার করেন নাই। বাঙ্গালার পাট নিজস্ব। পাটের শুল্ক বাঙ্গালার প্রাপ্য হইলেও উহা ভারত সরকার খাসের করিয়া রাখিয়াছেন। এই মেষ্টনী বন্দোবস্ত সার বেসিলও কায়েম-মোকায়েম করিয়া যাইতেছেন।

তাহার পর জনহিতকর কার্য্যে উদ্বৃত্ত অর্থ প্রয়োজনমত পাওয়া না গেলেও সামরিক ব্যয়ে কোনরূপ কার্পণ্য করা হয় নাই। এবার যে ১ শত ২৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মোট ব্যয় হইতেছে, উহার মধ্য হইতে সামরিক বাবদে ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাবে যে সামরিক ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আগামী বৎসরের ব্যয় তদপেক্ষা ১৮ লক্ষ টাকা অধিক। আমদানী অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশী দেখাইয়া ব্যয়-সঙ্কোচের কোন ব্যবস্থা না করিয়া ট্যাক্স বাড়াইবার বা উচ্চ হার বাহাল রাখিবার এমন সুকৌশল আর কি হইতে পারে?

ইহাই কি 'সমৃদ্ধ' বাজেটের পরিচয়? বিদেশী শাসিক সদাই শাসিতের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। তাই সর্ব্বদাই তাঁহাকে সমরসাজে সাজিয়া থাকিতে হয়। শান্তিরক্ষা বা বৃটিশ প্রতিপত্তি রক্ষা—যাহাই বলা যাউক, ইহাই যদি শাসকের মূল লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে প্রজারঞ্জনের উপযোগী সমৃদ্ধ বাজেট হওয়ার আশা কোথায়?

সীমান্তের মোল্লা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইংরাজ সেনানী এলিসের পত্নী কোহাটের ছাউনিতে পাঠান দস্যুর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কিশোরী কন্যা কুমারী এলিসকে পাঠানরা টিরা অঞ্চলে ধরিয়া লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছিল, এ কথা অনেকে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। এ জন্য সমগ্র ইংরাজ জাতি হু-হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের সেই 'গেল রাজ্য গেল মান' ধ্বনিতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও পার্লামেণ্ট কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ফলে ভারত সরকারকে জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া রাতারাতি এক বিরাট সেনাদল সুসজ্জিত করিয়া টিরা অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। কুমারী এলিসের উদ্ধারসাধন হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত হত্যাকারী বা 'ছেলেধরা' এ যাবৎ ধৃত বা দণ্ডিত হয় নাই। সম্প্রতি পেশোয়ার সহর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অপরাধী ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপরাধীর নাম গুল আকবর। টিরা পার্ব্বত্য অঞ্চলের আজিব নামক পাঠানবংশের দলপতি সুলতান মির উহার পিতা।

গুল আকবর ফাঁসীর পূর্ব্বেও পেশোয়ারের জেলখানায় তাহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিল, সে নির্দ্দোষ, সে বীর জাতির সন্তান, মরণে তাহার ভয় নাই, তবে সে নারী বা শিশু হত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করে নাই। তাহার মুখের কথা সত্য কি না, তাহা এ স্থলে বিচার্য্য নহে। তবে এই সম্পর্কে সে সীমান্তের ধর্ম্মান্ধ মৌলভী মোল্লাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহা ভারতবাসী দেশহিতকামী হিন্দু-মুসলমানমাত্রেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

গুল আকবর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার বন্ধুকে বলিয়াছিল,—"তুমি বোধ হয় জান, উত্তরাঞ্চল হইতে এক মোল্লা আসিয়া কোরাণের বয়েদ পাঠ করিয়া আমার মৃতকল্প ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। আরও বোধ হয় জান, সে একখণ্ড হরিৎ প্রস্তর আমার খুল্লতাতের অঙ্গের ক্ষতে স্পর্শ করিয়া রোগ নিরাময় করিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের গ্রামে আমাদের মাথার উপর ফিরিঙ্গীদের উড়োকল উড়িতেছিল এবং তাহা হইতে আমাদের উপর অগ্নি (বোমা) বর্ষণ করিয়া ঘর-দুয়ার জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছিল। সুতরাং সেই সময়ে ফিরিঙ্গীদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল। আর সেই সময়ে ঐ মোল্লা আমাদিগকে বুঝাইয়াছিল যে, কাফেরের বিপক্ষে জিহাদ করিয়া মৃত্যু হইলে আমরা বেহেস্তে অনন্ত সুখ উপভোগ করিব; যে গাজী কাফেরকে হত্যা করে, সে আল্লার উদ্যানে অমর হইয়া বাস করে। আমি মোল্লার এই উপদেশ শুনিতাম, আর আমার শরীরের রক্ত তপ্ত হইয়া উঠিত। শেষে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্ততঃ এক জন কাফেরকে মারিয়া স্বর্গে যাইব। মোল্লা আমার হস্তে সিদ্ধ কবচ পরাইয়া দিল, আমি আরও কয় জন গাজীর সহিত বন্দুক হস্তে কাফের হত্যা করিতে বহির্গত হইলাম। আমার পিতার অনুরোধ নিষেধ কিছুই শুনিলাম না।"

মাত্র এইটুকু পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, সীমান্তের অশিক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ ধর্ম্মান্ধ পাঠানের উত্তেজনা ও কাফের-বিদ্বেষের সূত্র কোথায়? এই ভাবের মোল্লা-মৌলভীরা সাধারণ মুসলমানের ধর্ম্মভার ছুতা লইয়া তাহাদিগকে অকারণ অন্যধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি উত্তেজিত করিয়া তুলে। তাহারই ফলে এই ভাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাহিত হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও অন্যান্য হিন্দু ও আর্য্যসমাজী নেতার হত্যা বা হত্যাচেষ্টার মূলে যে কতকটা এই ভাবের প্রভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশেও অশিক্ষিত ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের অসদ্ভাব নাই। বর্ত্তমানে ভগবানের ইচ্ছায় হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। এই সময়ে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানমাত্রেরই এই সময়ে কর্ত্তব্য, অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া। যেখানে অসদ্ভাব বা মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইবে, সেই স্থানে অকুস্থানে যেন শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান নেতা বা দেশকর্ম্মী উপস্থিত হইয়া দুষ্ট পরামর্শদাতার প্রভাব হইতে অজ্ঞ দেশবাসীকে সদুপদেশ দ্বারা মুক্ত করেন।

লর্ড সিংহ

গত ২৭শে ফাল্গুন রবিবার রাত্রিতে বহরমপুর সহরে লর্ড সিংহের লোকান্তর হইয়াছে। তাঁহার এই মৃত্যুসংবাদ অতর্কিতভাবে বাঙ্গালী-সমাজের উপর আপতিত হইয়াছিল; কেন না, মৃত্যুর দিনও তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের উদ্যোগে বহরমপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত ১৭শে মার্চ্চ তাঁহার বিলাতযাত্রার কথা। তৎপূর্ব্বে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি তিনি সস্ত্রীক বরহমপুরে পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অনারেবল সুশীল সিংহ স্থানীয় জিলা-জজ। ১৮ই তারিখে লর্ড সিংহ কলিকাতার হাইকোর্টের বারে গিয়া বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রবিবার তাঁহার বরহমপুরে সম্বর্দ্ধনা হয়। প্রথম রাত্রিতে আহার করিয়া তিনি শয়ন করিতে যান। পরদিন প্রভাতে তাঁহার শয্যাত্যাগে বিলম্ব দেখিয়া পুত্র মনে আশঙ্কা করেন যে, তাঁহার হঠাৎ কোনও পীড়া হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলেন, যে সময়ে পুত্র পিতার কক্ষে প্রবেশ করেন, তাহার অন্যূন দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে লর্ড সিংহের দেহান্তর ঘটিয়াছে। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতেই এই আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে।

লর্ড সিংহই বলি বা সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহই বলি,—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ চিরদিনই সার এস, পি, সিংহ নামে পরিচিত। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এই নামের সহিত বিজড়িত। তিনি বাঙ্গালা মায়ের সন্তান, তিনি বাঙ্গালী,—এই কথা বলিতে আমরা স্বতঃই একটা গর্ব্বানুভব করি; কেন না, তাঁহার ন্যায় রাজদ্বারে সম্মানপ্রাপ্ত দেশের শ্রদ্ধার পাত্র বাঙ্গালী কয় জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

প্রতিভার বরপুত্র—ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র এই বাঙ্গালীর জন্য যশঃ, মান, সিদ্ধি-ঋদ্ধি, সঙ্গতি-সমৃদ্ধির কোন্ দ্বার অনুন্মুক্ত ছিল? কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধাপ্রীতির শ্রেষ্ঠ মুকুট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর রাজদ্বারে তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হয় নাই, এমন সম্মানের দ্বার ত আমরা খুঁজিয়া পাই না! তিনি এডভোকেট-জেনারল এবং নাইট-রূপে, বড় লাটের শাসন-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্যরূপে, ভারত-সচিবের প্রথম ভারতীয় সহকারিরূপে, সমর ও শান্তি-বৈঠকের প্রথম ভারতীয় সদস্যরূপে, বৃটিশ অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রথম ভারতীয় সদস্য (লর্ড)রূপে এবং বৃটিশ-ভারতের প্রথম ভারতীয় গবর্ণররূপে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা এ যাবৎ এ দেশীয়ের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কংগ্রেসে ৩৩ বৎসর বয়সে ভারতীয় রাজন্যগণের পক্ষে বক্তৃতা দিয়া যুবক সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কখনও ভাবেন নাই যে, এক দিন দেশের লোক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃ-পদেই তাঁহাকে বরণ করিবে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার ললাটে সেই জয়টীকাও পরাইয়াছিলেন। তাঁহার স্থান এ ভারতে কে পূর্ণ করিবে?

বীরভূম জিলার রায়পুর গ্রামের প্রাচীন মধ্যবিত্ত কায়স্থ সিংহ-পরিবারে লর্ড সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যে তিনি পিতৃহীন হন, তাঁহার জননীর অঙ্কেই তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। বীরভূম সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কালেজে পাঠাভ্যাস করেন এবং ভ্রাতার সহিত (যিনি পরে মেজর এন, পি, সিংহ হইয়াছিলেন) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিবার পর দীর্ঘকাল তাঁহাকে ভাগ্যলক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রথমে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি বিরক্ত হইয়া মফঃস্বলের মুন্সেফী গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ জজ নরিসের দায়রায় একটা মামলার ব্রিফ জুটিয়া যায় এবং উহা হইতেই তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।

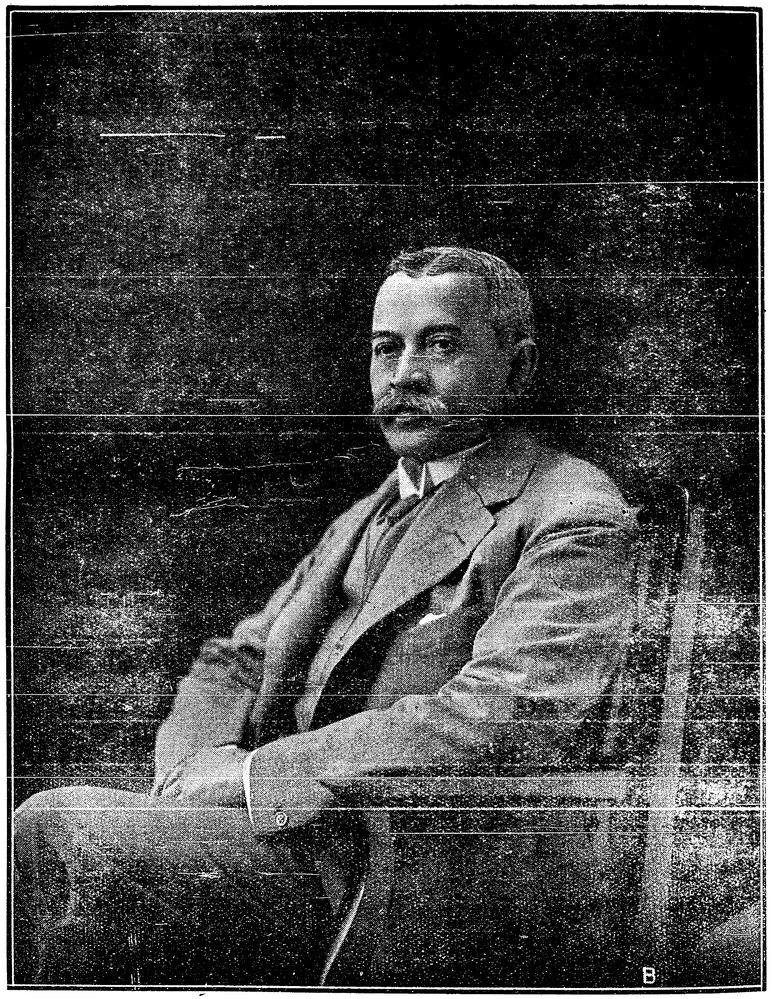

পরলোকে লর্ড সিংহ

তদবধি লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন এবং কালে তিনি মাসিক ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই অর্থোপার্জ্জনের মধ্য হইতেও তিনি দেশ-সেবার কথা বিস্মৃত হন নাই। বড় লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয় নিয়োগে চারিদিক হইতে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। সরকারী ও বে-সরকারী য়ুরোপীয়রা ত খড়্গহস্ত হইয়াছিলেনই, অধিকন্তু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড স্বয়ং উহাতে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইল, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার আদালতে আয় একটা বড় জমীদারীর আয়েরই তুল্য। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন দেশের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে সেই আয় ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প বেতনে সদস্যপদ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা, অসহায় অবস্থার কথা, স্বরাজের কথা, সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে বিরত হন নাই। পরিণত বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—উহা অপেক্ষা কৃষি, স্বাস্থ্য, গণিত প্রভৃতি শিক্ষায় আমাদের পল্লীর গুরুমহাশয়ের শুভঙ্করী ইত্যাদি সুফলপ্রদ। গুরুমহাশয়রা আবার ঘরে ঘরে, চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডীমণ্ডপে, গাছতলায় গাছতলায় শিক্ষাবিস্তার করুন, —দেশের অজ্ঞতা দূর হইবে। আবার যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ-গান আরম্ভ হউক, দেশের জনসাধারণ ঐরূপে জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হইয়া উঠুক, দেশের মঙ্গল হইবে। আমাদের বাঙ্গালীর পল্লীজীবন কিসে উন্নত হইবে, সে জন্য তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন।

লর্ড সিংহ দেশের কি করিয়াছেন, ইহা লইয়া তাঁহার মহত্ত্বের পরিমাপ করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারই (এড্-ভোকেট-জেনারলরূপে) প্রভাবের ফলে অনেক স্বদেশী মামলা, বিশেষতঃ মেদিনীপুরের বোমার মামলা তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দেশসেবার প্রকৃত পরিমাপ হয় না। তিনি আন্তরিক দেশপ্রেমিক ছিলেন, তবে তাঁহার দেশপ্রেমিকতা অনেকের দেশপ্রেমের আদর্শ হইতে বিভিন্ন ছিল। তিনি আজন্ম নরমপন্থী পথের পথিক ছিলেন। এ বিষয়ে সার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত তুলিত হইতে পারেন। যে যুগের বাঙ্গালী বার্ক, মিল্টনের স্বাধীনতা-প্রীতির আলোকে আলোকিত হইয়া ইংরাজ জাতির জন্মগত ন্যায়ধর্ম্মে অনুরাগ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, তিনি সেই যুগের মানুষ। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস,ইংরাজ নিজেই ন্যায়-বিচার করিয়া ভারতবাসীকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলেই স্বরাজ দিবে। ভারতের স্বার্থের সহিত ইংরাজের স্বার্থের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে না, ভারতবাসী ও ইংরাজ একই সাম্রাজ্যের নাগরিক হইয়া সদ্ভাব ও সম্প্রীতিতে বসবাস করিতে পারে।

ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। সেই ধারণার অনুকূলে যে ভারতের মুক্তি সাধিত হইতে পারে, তিনি সেই পথে গিয়াছেন এবং নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে দেশবাসীকে সেই পথ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। সাইমন কমিশন সম্বন্ধেও তিনি সেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে পথেই চলুন বা যে উপদেশই দিন, তাঁহার তাহাতে যে আন্তরিকতা ছিল,—তিনি যাহা উপদেশ দিতেন, তাহা যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ হিসাবে তাঁহার স্বদেশপ্রেমে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

আজ ৬৪ বৎসর বয়সে লর্ড সিংহ লোকান্তরিত হইলেন। তাঁহার পরলোক-গমন অতর্কিত অপ্রত্যাশিত বটে, কিন্তু এমন মৃত্যু কাহার না বাঞ্ছনীয়? কাহাকেও কোন কষ্ট না দিয়া, সন্ধ্যার পর পুত্র ও পরিবারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া, সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল মনে নিশাযাপন করিতে গিয়া, সম্পূর্ণ আত্মবশে থাকিয়া, অবিকৃত শরীরে এমন ভাবে মহাপ্রস্থান করা কি মহা ভাগ্যের কথা নহে?

লর্ড সিংহকে হারাইয়া ভারতবর্ষ কেবল এক দেশপ্রেমিক কর্ম্মী সন্তান হইতে বঞ্চিত হইল, তাহা নহে, এক জন শৃঙ্খলা-মার্গের পথিক, বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে শান্তিস্থাপনপ্রয়াসী অকৃত্রিম সুহৃদ্ হইতেও বঞ্চিত হইল সন্দেহ নাই! আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

——

শশধর তর্কচূড়ামণি

গত ১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১২টার সময়ে বাঙ্গালার প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বহরমপুরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সংখ্যা বর্ত্তমান যুগে অধিক নহে। হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থাবান্ হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা বাগ্মী ব্রাহ্মণপণ্ডিতরূপে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রায় চত্বারিংশ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার জন-সমাজের কল্যাণ-কল্পে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ও বিস্তারের জন্য তখনকার বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানের নবীন সম্প্রদায় না জানিতে পারেন, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাঁহারা সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মোহের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতিগতি-পরিবর্ত্তনে পণ্ডিত শশধর কিরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরম সমর্থক নিষ্ঠাবান্ এক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অভাব হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর হইয়াছিল। পরিণত বয়সে হিন্দুব্রাহ্মণের দেহত্যাগ হইয়াছে, ইহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই; বিশেষতঃ বহু বৎসর যাবৎ তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতেছিলেন, এ জন্য আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না। যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অভাবে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের কি ক্ষতি হইল, তাহা দুই চারি জন প্রাচীন বাঙ্গালী ব্যতীত ধারণা করিবার কেহ নাই।

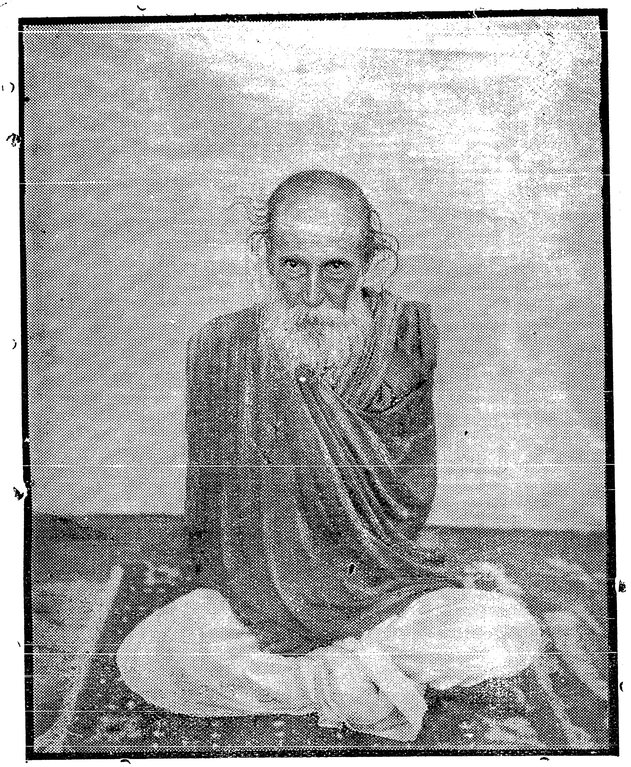

শশধর তর্কচূড়ামণি

বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত একযোগে এক সময়ে হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। সে সময়ে যাঁহারা কলিকাতার টাউনহলে ও অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের উভয়ের প্রাণ-মনোহারিণী বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন, কত 'আধা-সাহেবী' বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তান তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার আচার-নিষ্ঠা পালন করিয়াছে। তাঁহাদের বক্তৃতা-প্রভাবে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক সেই সময়ে হিন্দুত্বের চিহ্ন শিখা ও কণ্ঠী ধারণ করিয়াছিলেন এবং মৎস্য-মাংসাদি বর্জ্জন করিয়া নিরামিষাশী হইয়াছিলেন!

সহবাস-সম্মতি আইন আন্দোলনকালে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি রাজা শশিশেখরেশ্বরের পরম সহায়রূপে হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে আইনের বিরুদ্ধে অসংখ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুসমাজ তাঁহার অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিত শশধর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হইত, উহাতে জানিবার, শিখিবার, বুঝিবার অনেক কিছু থাকিত।

পণ্ডিত শশধর সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহু রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক রচনা ধারাবাহিকরূপে সেই যুগের হিন্দু-সমাজের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী'পত্রে প্রকাশিত হইত। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থও আছে। এই সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

পণ্ডিত শশধর কর্ম্ম-জীবনের শেষভাগে ভাগীরথী-তটে একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পালনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যাহাতে এই অনাচার ও অত্যাচারের যুগেও অন্ততঃ দুই চারিটি নিষ্ঠাবান্ আদর্শ ব্রাহ্মণ গড়িয়া উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য কিয়দংশে সার্থকও হইয়াছিল।

তিনি ফরিদপুর জিলার প্রাণপুর গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে বহরমপুরে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার এই দুই স্থানই যে তাঁহার স্মৃতি ধারণ করিয়া থাকিবে; তাহা নহে, বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রচারকরূপে তাঁহার স্মৃতি চির-জাগরূক থাকিবে।

বঙ্গলক্ষ্মীর মামলা

বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী ৮ বৎসর এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার লাহিড়ী ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মামলার কথা সকলেই জানেন, ইহা লইয়া বঙ্গদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং মামলার আমূল বৃত্তান্তের পুনরুল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে এই সম্পর্কে আমরা এইটুকু বলিতে চাহি যে, এই মামলার বিচারফলে অপরের ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ব্যবসায়ে সাধুতা না থাকিলে প্রকৃত উন্নতি কখনও সম্ভবপর হয় না। বাঙ্গালার লোক সবেমাত্র ব্যবসায়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সময়ে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের

কলের অযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের পরিণাম স্মরণ করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের কর্ত্তৃত্ব যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব এই কাপড়ের কলের কার্য্যপদ্ধতি সাধুতার পথে অগ্রসর হইয়া আবার বাঙ্গালার নষ্ট গৌরব উদ্ধার করুক, ইহাই কামনা। আর বাঙ্গালায় বাঙ্গালী নিজের চেষ্টায় আবার একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হউন, ইহাই প্রার্থনা। যাহাতে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, সাধুতার পথে থাকিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ী 'নিজস্ব' ব্যাঙ্কের সহায়তায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়, তাহার ব্যবস্থা বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে।

ভারতের রেল

ব্যবস্থা পরিষদে সার জর্জ্জ রেণির রেল বাজেট সম্পর্কে তর্কবিতর্ককালে অনেক রহস্যই প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার, (১) রেলবোর্ডে এবং রেলের বড় বড় চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ, (২) রেলে ভারতে প্রস্তুত মালব্যবহার। এতদুভয় সম্বন্ধে ভারতসরকারের পক্ষ হইতে ভারতীয়রা এ যাবৎ কি ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কি জবাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কেন মিঃ কেলকার বলিয়াছেন, "বিজিতদিগের শিরে দুঃখের বোঝা চাপানই কি রেলবোর্ডের নীতি?"

আসল কথা, রেল-বোর্ডের নীতি আর সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র শাসননীতি একই সুরে বাঁধা, সুতরাং উহাদের মারফতে ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ভারতের উন্নতি সম্ভবপর বিবেচনা করা বাতুলতা মাত্র। যে কারণে রেলবোর্ডে এক জন ভারতীয়কেও গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই কারণেই বিলাতে ১ হাজার মালগাড়ীর বায়না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কোনও সদস্য রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—Indianisationএর অর্থ Gidneyigestion অর্থাৎ ভারতীয় অর্থে ভারত-জাত ফিরিঙ্গী জাতিকে ধরা হইয়াছে এবং তাহাদিগকেই রেলে বড় বড় চাকুরী দেওয়া হইয়াছে।

যখন প্রাইভেট কোম্পানীর তাঁবে রেল রাখা হইবে, কি সরকারের খাসে রেল লওয়া হইবে বলিয়া তর্ক উঠিয়াছিল, তখন ভারতীয়দের পক্ষ হইতে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে জানান হইয়াছিল যে, সরকারের খাসে রেল রাখাই সমীচীন। প্রাইভেট কোম্পানীরা বিদেশী, এ দেশের লোকের নিকট তাহাদের কোনও দায়িত্ব নাই, তাহাদের মূল লক্ষ্য—ব্যবসায় ফাঁদিয়া এ দেশের অর্থ চুষিয়া লওয়া। ইহার জন্য রেলে ভ্রমণে বা মাল প্রেরণে এ দেশীয় লোকের যতটুকু সুবিধা করিয়া দেওয়া তাহাদের কড়ি পাইবার পথে অন্তরায় না হয়, তাহারা ততটুকু সুবিধা করিয়া দেয়, যাত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা তাহাদের লক্ষ্য নহে। সরকারের পক্ষে এ কথা খাটে না। কাযে যাহাই হউক, অন্ততঃ মুখে তাঁহারা এ দেশের লোকের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্যের দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারেন না, কেন না, প্রজার অর্থ লইয়াই তাঁহাদিগকে এ দেশের শাসনকার্য্য চালাইতে হয়। এই হেতু দেশের লোক সরকারের কর্ত্তৃত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু ফল তাহার কি হইয়াছে? দুই একটা সামান্য বিষয়ে যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ দেশীয়রা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। বরং দেখা যায়, খাস সরকারের তত্ত্বাবধানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলে যাত্রীর ভাড়া হ্রাসের বিষয়ে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, এখনও অপরের তত্ত্বাবধানে চালিত হাওড়া রেলে তদপেক্ষা অনেক ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে। এক ভস্ম আর ছার!—কাহার কথা রাখিয়া কাহার কথা বলা যায়?

রেলবোর্ডের সদস্য এক জনও ভারতীয় গৃহীত হইল না। ইহার কৈফিয়তে বলা হইয়াছে, ভারতীয়দের মধ্যে কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত লোকের অভাব। এত বড় ভিত্তিহীন কৈফিয়ৎ কেহ কোথাও শুনিয়াছেন কি? হাই কমিশনার হইতে আরম্ভ করিয়া জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকল সরকারী কাযেই ভারতীয় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল, কেবল রেলবোর্ডে হইল না, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ভারত-সচিবের কাউন্সিলে, বড়লাটের শাসন-পরিষদে, প্রাদেশিক গভর্ণর পদে ভারতীয় নিয়োগ হইয়াছে, ভারতীয় প্রধান বিচারপতির পদেও বসিয়াছে, সাতকড়ি ঘোষের মত রেল-বিশেষজ্ঞও দেখা গিয়াছে এবং এখনও অনেক স্থিরমস্তিষ্ক রেলবিশেষজ্ঞ ভারতীয়েরও অভাব নাই, অথচ কোন ভারতীয়ই বোর্ডের সদস্য পদের উপযুক্ত হয় নাই! ইহা কি আশ্চর্য্য নহে?

রেলের উচ্চপদের কথাই না হয় না-ই ধরা গেল, উহা ত য়ুরোপীয় বা য়ুরেশীয়ের একচেটিয়া, কিন্তু নিম্নতন (subordinate) পদের সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ আছে? উহাতেও চাকুরীয়াদের মধ্যে এক সীমানা টানিয়া (ক) ও (খ) শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা 'ক' শ্রেণীর, তাঁহারা প্রায়ই য়ুরোপীয় বা য়ুরেশীয় আর (খ) শ্রেণী কৃষ্ণকায়দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

রেলের মাল খরিদ সম্পর্কে রেলবোর্ড এ যাবৎ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুঝা যায়, কেন বোর্ডটিকে শ্বেতকায়ে পূর্ণ করা হইয়াছে এবং কেনই বা ভারতীয়রা চাকুরীর দাবী করিলেই বলা হয়,—যোগ্যতা নাই, যোগ্যতা অর্জ্জন কর, তাহার পর মেওয়া মিলিবে। বোর্ডে যদি আজ এক জনও কৃষ্ণকায় ভারতবাসী থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, এমন ভাবে রেলের জন্য ভারতের বাহিরে মালের অর্ডার দেওয়ায় ঘোর আপত্তি উঠিত।

সার উইলিয়ম জয়েন্সন হিক্‌স্ এক দিন প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন, "বিলাতের পণ্য কাটাইবার জন্য ভারতের কর্ত্তৃত্ব ইংরাজের রক্ষা করা চাই-ই।" বিলাতের পণ্য কাটাইবার জন্য, বিলাতী শ্রমিক ও বেকারের অন্নসংস্থানের জন্য ভারতের প্রয়োজন সমধিক, তাহা সকলেই জানে। আর সেই জন্যই বোধ হয়, ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রত্ন-মুকুটের মধ্যমণি বলা হয়। সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র যতই বুঝান যে, যেহেতু রেলে যে সকল মাল প্রয়োজন ছিল, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ যাত্রিগাড়ী ও মালগাড়ীই উল্লেখযোগ্য এবং সেই হেতু ভারতে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বাহিরে অর্ডার দিতে হইয়াছে, তথাপি কেহ স্বীকার করিবে না যে, এ বিষয়ে সরকার বা রেলবোর্ড তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থা পরিষদ এক মন্তব্যে

সরকারকে অনুরোধ করেন যে,এ দেশে যেন অচিরাৎ রেলের পণ্য-নির্ম্মাণোপযোগী যথোপযুক্ত কারখানাদি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং যে ১ শত ৫৩ কোটি টাকা পর পর ৫ বৎসরে রেলকে ঢালিয়া সাজিবার উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য ধার্য্য হইয়াছে, ঐ ১ শত ৫৩ কোটি টাকা যেন এতদর্থে ভারতে ব্যয়িত হয়। কিন্তু সে প্রস্তাবানুযায়ী কি কার্য্য করা হইয়াছে ? ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ইস্পাত-শিল্প-সংরক্ষণ আইন দ্বারা ধার্য্য হয় যে, বৎসরে ৭ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব হইতে লইয়া তিন বৎসর যাবৎ উহা মালগাড়ী নির্ম্মাণের সুবিধাকল্পে 'বাউণ্টি' বা সরকারী দানস্বরূপে নিয়োজিত করা হইবে ; তাহাতে ভারতের মালগাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা সমূহ বিদেশের কারখানাসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে। ইহা কি হাস্যকর বন্দোবস্ত নহে ? বহু বৎসর যাবৎ সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত যে সব বিদেশী (বিলাতী) কারখানাওয়ালা মালগাড়ী প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, মাত্র ৩ বৎসরে ২১ লক্ষ টাকা খয়রাতি করিয়া এ দেশে তাহাদের সমকক্ষতা করিবার যোগ্য কারকারবার গড়িয়া তুলা কি সম্ভবপর ? এই ভাবের ছেলে-ভুলানো স্তোকবাক্য দিয়া ভারতবাসীকে ভুলাইয়া রাখিবার কাল কি আর এখনও আছে ?

নারী-মঙ্গল

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের ভাবজগতে যেন একটা স্রোতঃ ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সর্ব্বত্র যেন পুরুষের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে জাগরণের একটা সাড়া পাওয়া যাইতেছে। ৩রা ফেব্রুয়ারীর হরতালের দিনে বেথুন কলেজের কল্যাণী শিক্ষার্থিনীরা যে মনের বলের পরিচয় দিয়াছেন এবং বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলনে বাঙ্গালী মহিলারাও যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে ইহার পরিচয় পরিস্ফুট হয়।

এই প্রাণস্পন্দনের মূলে বাঙ্গালার নারীর জ্ঞান ও কর্ম্ম-পিপাসার উন্মেষ আজ কয়েক বৎসর হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। জমী উর্ব্বর না হইলে—অবস্থা অনুকূল না হইলে সুফল উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বানুহইতেই নারীর মনোবৃত্তি এ দিকে অনুকূল হইয়াছিল বলিয়া জাতীয় জাগরণের এই পুণ্যক্ষণে আমাদের নারীদিগের মধ্যেও যে একপ্রাণতা, তন্ময়তা ও দেশপ্রাণতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

কিছু দিন হইতেই বাঙ্গালার নারীর নানা দিকে কর্ম্মস্পৃহা ও জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে আজ দিকে দিকে নানা নারী-মঙ্গল সমিতি, মাতৃমন্দির, নারী-আশ্রম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সরোজ-নলিনী শিল্পাশ্রম, কাশীর বিধবা আশ্রম, নারী-শিক্ষামন্দির, চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন প্রভৃতির মত দেশের হিতকর প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রে কেন্দ্রে সহরে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলে আরও জননীকল্যাণ সম্ভব হইতে পারে। এই যে সে দিন মহিলা শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও অনুষ্ঠান হইয়া গেল, তাহার মূলেও এই নারী-জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী নারীশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এই প্রদর্শনী বসিয়াছিল। প্রদর্শনী দেখিয়া সত্যই বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনে আশার উদয় হয়। এ দেশের নারীর যে শিল্পরাজ্যে উচ্চ স্থান আছে এবং মাতৃজাতি যে স্বজন-বন্ধু-বান্ধবহারা হইয়া অনাথারূপে পরের আশ্রয় ও দয়াপ্রার্থিনী না হইয়া শিল্প-সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারেন—নিজের পরিশ্রম দ্বারা নিজের ও সংসারের আয়-বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত নানা দ্রব্যাদি দেখিয়া নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

তিনটি কক্ষে বিবিধ প্রকারের কারু-কার্য্য ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। সুদূর পল্লী-মহিলার প্রেরিত সুন্দর কারু-কার্য্যখচিত কাঁথাগুলি দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালী পুরনারী এখনও সূচিশিল্প বিস্মৃত হন নাই। পূর্ব্বে এই সূচিশিল্প বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত ছিল। এক একখানি কাঁথা দেখিলে ঠিক কাশ্মীরী শাল বলিয়া ভ্রম হইত। এখনও পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে এই শিল্পের আদর আছে।

সুপারির খোলা দ্বারা প্রস্তুত টুপী, পাখা, তিলফের ছবি, সুতা ও নানা প্রকার চিত্রবিচিত্র কার্পেটও প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহাতেও আমাদের বাঙ্গালার নারীর শিল্পজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। দড়ীর পাপোষ, শিকা প্রভৃতির কারুকার্য্যও প্রশংসনীয়। ধারিওয়াল পশমে হাতে বোনা চাদরও দেখিবার জিনিষ। পুতির মালা, পুতির আলনা, পুতির আয়না, পুতির পর্দ্দা ও খেলনাও গৃহে সাজাইয়া রাখিবার মত।

পাবনা নারী-শিল্পাশ্রম হইতে প্রেরিত শাটী, জামা, রুমাল, কার্পেট, কাগজের গাছ ও ফুল, এবং শয্যার বালিস ও চিত্রাদি বাঙ্গালার নারীর শিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

আরও এক কক্ষে আমাদের 'ঘরের শেখা বিদ্যায়' প্রস্তুত নানাপ্রকার আচার ও চাটনী নারীর সর্ব্বতোমুখিনী গৃহস্থালী-কর্ম্মস্পৃহার সাক্ষ্যরূপে সজ্জিত ছিল।

নারী যে ফল ও সব্জীর বাগান রচনাতেও সিদ্ধহস্তা, তাহা শ্রীমতী অমিতা রায়ের বাগান হইতে প্রেরিত বড় বড় বেগুন, আলু, শালগম, পেঁয়াজ, কলা, বাঁধাকপি প্রভৃতি পরিচয় দিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের বিধবাদের প্রস্তুত ও নারীমিলন ভবনের প্রস্তুত নানা দ্রব্যও প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহাতেও নারীর শিক্ষা দান ও গ্রহণের সার্থকতা সুপ্রকাশ। অল্পদিনের শিক্ষার ফলে এই দুই স্থানে শিক্ষার্থিনীরা জামা, সেমিজ, রুমাল, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার নানা স্থানের মহিলাদের দ্বারা প্রেরিত চরকায় কাটা সুতা, হাতে বোনা বস্ত্র, সূচিকার্য্যজাত পণ্য, কার্পেট, মাটীর ছাঁচ, রংয়ের কায, মণিমুক্তার কায ইত্যাদি নানা দ্রষ্টব্য জিনিষ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কেবল যে অর্থনীতির দিক্ দিয়া নারীর শিক্ষা প্রয়োজন, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। নারীর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিলে জাতির শিক্ষা যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তাহাও এখন সর্ব্বজন-স্বীকৃত। আমরা যদি জাতি হিসাবে জগতে প্রাধান্য লাভ করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের নারীর শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিলে চলিবে না।

মধ্য-এসিয়া



জিঙ্জিহো থানা—পর্য্যটকগণ এই স্থানে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন

ভারতবর্ষের উত্তরে কাশ্মীরের পরপারে তুষার-কীরিটী হিমালয়ের ও কারাকোরম অদ্রিমালার প্রান্তদেশ হইতে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ মানচিত্র দৃষ্টে জানা যায়, তাহাকে মধ্য-এসিয়া বলিয়া ভৌগোলিকগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই সুবিশাল ভূভাগ অতি বিচিত্র। এখানে মনোরম পর্ব্বতমালা, ভীমদর্শন মরুভূমি এবং শস্যশ্যামলা মরূদ্যান বিদ্যমান আছে। মধ্য-এসিয়ার পশ্চিমভাগ রুসিয়ার শাসনাধীন এবং পূর্ব্বভাগ চীনাদিগের অধিকৃত। চীনারা এই ভাগকে 'সিন্‌কিয়াং' বা নব-রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

সিন্‌কিয়াং বা চীন-তুর্কিস্থান সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কাহিনীর সংস্রব আছে, জয়-পরাজয়ের নানা কাহিনী ইহার বিস্তীর্ণ প্রদেশে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ইহার বুকের উপর দিয়া প্রাচীন যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসিদ্ধ পথ প্রসৃত ছিল। চীনের রেশম অর্থাৎ চীনাংশুক সর্ব্বপ্রথম এই পথে রোমনগরে আনীত হইয়াছিল।

সিন্‌কিয়াংএর উত্তর ভাগে চীনের ত্রিদিব অদ্রিমালা 'টিন্‌সাফ্' সমুন্নত শীর্ষে বিরাজমান। উহার তুষারসমাচ্ছন্ন শিখরে শিখরে আইবেক্স-জাতীয় ছাগসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে ; অপেক্ষাকৃত নিম্ন, অরণ্যসমাকুল স্থানে নানা জাতীয় মৃগযূথ দেখিতে পাওয়া যায়।

চীন-তুর্কিস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে এবং রুসীয়-তুর্কিস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে 'পামির' প্রদেশে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র আরণ্য মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলো ভিনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই জীবের পরিচয় প্রদান করেন। এই জাতীয় মেষের শৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

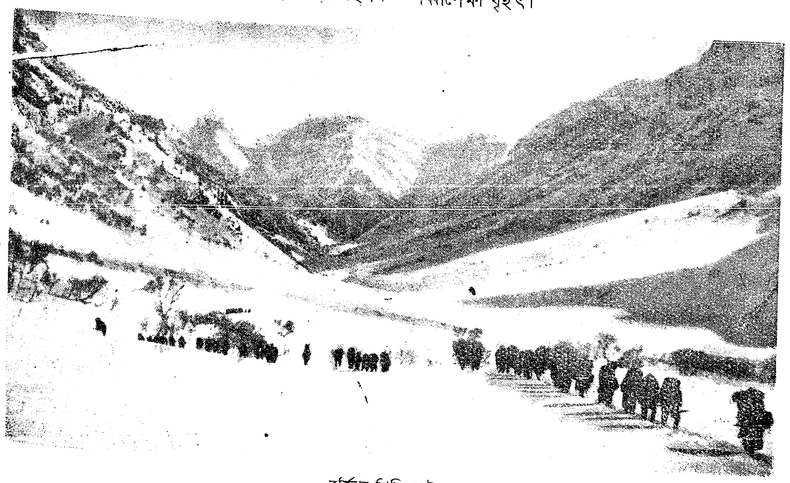

বুর্জ্জল গিরি-সঙ্কট

পামিরের রুসাধিকৃত স্থান সামরিক আইনের অন্তর্গত; এ জন্য তথায় বৈদেশিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এতদঞ্চলে ভ্রমণ করিতে হইলে চীন সরকার, ভারত সরকার এবং রুসীয় গবর্ণমেণ্টের ছাড়পত্রের প্রয়োজন।

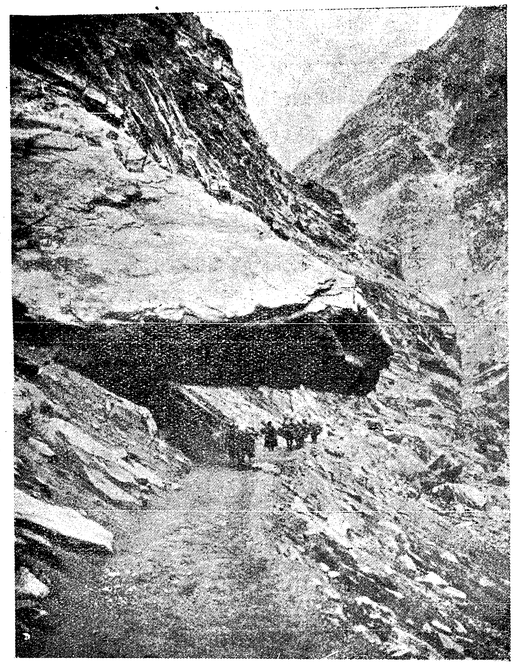

গিল্‌গিট যাইবার পথ

বিগত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ উইলিয়ম মর্ডেন নামক জনৈক মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিক "আমেরিকান্ মিউজিয়ম অব্ ন্যাচারাল্ হিষ্ট্রীর" সহকারী ডাইরেক্টার মিঃ ক্লার্কের সহিত মধ্য-এসিয়া পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বর্ণনা হইতে এই বিচিত্র এবং দুরধিগম্য স্থানের বিচিত্র বিবরণ জানিতে পারা যায়। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে কাশ্মীরের পথে মধ্য-এসিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর হইতে গিরিবর্ত্ম দিয়া তাঁহারা অগ্রসর হন। মে মাসের ১৫ই তারিখে গিরিবর্ত্মগুলি গতায়াতের জন্য উন্মুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত তারিখের ৬ সপ্তাহ পূর্ব্বেই তাঁহারা পামির অভিমুখে যাত্রা করেন। কারণ, 'অভিস্‌পোলি'-জাতীয় মৃগ তাহাদের দীর্ঘরোমাবৃত শীত-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সংগৃহীত না হইলে যাদুঘরে রাখিবার সার্থকতা থাকে না। গ্রীষ্মকালে তাহাদের রোমাবলী আপনা হইতেই ঝরিয়া যায় এবং শরতের শেষে নূতন রোম উদ্গত হইয়া থাকে।

পরিব্রাজকগণ ঝিলম্ নদীপথে নৌকাযোগে প্রথম যাত্রা করেন। কাশ্মীরের চিরমনোরম উপত্যকাভূমি ভেদ করিয়া নদীপ্রবাহ চলিয়াছে। বন্দীপুর হইতে গিলগিট্ পর্য্যন্ত স্থলপথে যাত্রা করিতে হয়। পথের নাম 'গিল্‌গিট্' রাজপথ, কিন্তু সে পথে কখনও কোনও চক্রযুক্ত যান চলিতে পারে না। কুলীরা দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া থাকে। অশ্বতর বা টাটুঘোড়া এই সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথে চলিতে পারে বটে; কিন্তু তুষাররাশি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাও অসম্ভব।

ট্রাগ্‌বাল্ ও বুর্জ্জিল্ গিরিবর্ত্ম দিয়া পথাতিবাহন গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গ্রীষ্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে সে পথও তুষারাচ্ছন্ন থাকে; সুতরাং অশ্বপৃষ্ঠে সে সময় গমনাগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব।



তৃণনির্ম্মিত পাদুকা

পাহাড় ও তুষারের উপর দিয়া হাঁটিবার জন্য স্থানীয় লোকগণ ও য়ুরোপীয়রা কাশ্মীরজাত তৃণনির্ম্মিত জুতা পরিয়া থাকে। এই জুতাগুলি 'সাণ্ডালএর' ন্যায় দেখিতে। দেশীয়গণ শুধু পায়ে উহা ধারণ করে, কিন্তু যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা গরম পশমী মোজা পায় দিয়া, তদুপরি তুলা ও পশমনির্ম্মিত জুতা পরিয়া তবে তৃণনির্ম্মিত জুতা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই জুতা পরিয়া তুষার ও পাহাড়ের উপর বিচরণ করা সহজ।

বন্দীপুর হইতে ট্রাগ্‌বাল্ বিশ্রামভবন পর্য্যন্ত পাহাড়ের উচ্চতা ৪ হাজার ফুট। এই পথ ১২ মাইল দীর্ঘ। ট্রাগ্‌বাল গিরিবর্ত্মের উচ্চতা প্রায় সাড়ে ১১ হাজার ফুট। তথা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া বুর্জ্জিল্ গিরিবর্ত্মে পৌঁছিতে হয়। কাশ্মীর সরকার এই পথের মাঝে মাঝে বিশ্রামভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। পরিব্রাজক এই সকল বিশ্রামভবনে অগ্নি জ্বালিয়া ক্লান্ত দেহের শ্রম অপনোদন করিতে পারেন।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে জমাট তুষারস্তূপ ধ্বসিয়া অনেক সময় যাতায়াতকে বিপন্ন করিয়া তুলে। শীতের সঞ্চিত তুষাররাশি গিরিশীর্ষ হইতে সূর্য্যের উত্তাপে স্থানচ্যুত হইয়া ভীমগর্জ্জনে উপত্যকাভূমি অভিমুখে ছুটিয়া আইসে। তখন সম্মুখে যাহা পায়, সমস্ত ধ্বংস করিয়া তুষারস্তূপ নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হয়। অনেক সময় পথিক-দল এইরূপ তুষারপ্রবাহে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এ জন্য অভিজ্ঞ ও সতর্ক পর্য্যটকগণ অতিপ্রত্যূষে চলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্যের উত্তাপে তুষার বিগলিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছিবার জন্য দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। বুর্জ্জিল গিরিবর্ত্ম মাত্র ১১ মাইল দীর্ঘ। তাহার প্রান্তদেশে একটি বিশ্রামভবন বিদ্যমান।

এই স্থান হইতে গিলগিট্ অল্প দূর নহে। উচ্চ হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিলে তুষারের উৎপাত হ্রাস হইতে থাকে। গিলগিটের অধিবাসীদিগকে 'ডার্ড' বলে।

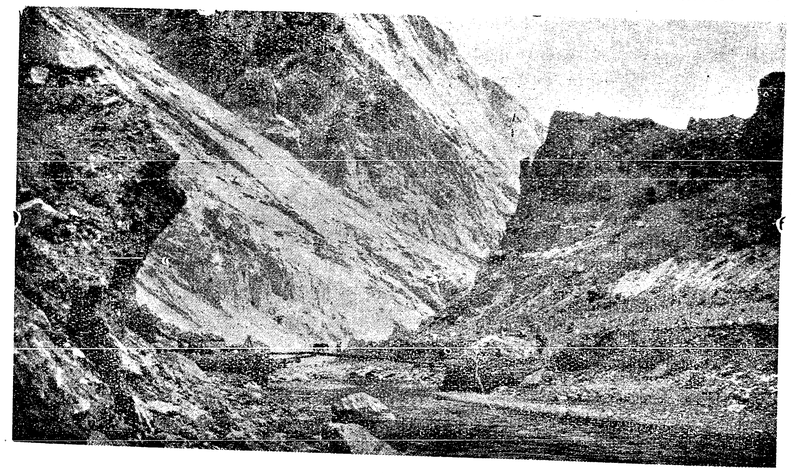

হুন্‌জা গিরি-নদী

ইহাদের সংখ্যা ১০ হাজার। ইহারা সমগ্র গিলগিট্ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের বাসভবন প্রস্তর ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। হিমালয়ে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা সকলেই সেচের খাল-খনন কার্য্যে অত্যন্ত নিপুণ। গিলগিটের অধিবাসীরাও এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। ক্ষুদ্র স্রোতোধারা সুদীর্ঘ, দুরারোহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্তুত করা স্বল্প পরিশ্রমের কার্য্য নহে। এই তৃণশস্যবর্জ্জিত প্রদেশে জীবনধারণের উপযোগী শস্য উৎপাদন করা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে বসিয়া তাহা অনুমান করা অসম্ভব। হিমালয়ের অভ্রভেদী

শৃঙ্গমালার অপর পার্শ্বে কদাচিৎ বারিপাত হইয়া থাকে। ভারত-সমুদ্র হইতে উত্থিত বর্ষার মেঘমালা হিম-গিরি-শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পায় না।

কাযেই এই অঞ্চলে মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত কঠোর সংগ্রাম চলিতে থাকে। যদি কোনও কারণে শস্য না উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।



গেজ নদী পার হওয়া।

গিলগিটের সানুদেশ হইতে পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত এবং অবন্ধুর। কিন্তু গিলগিটের সীমান্ত পার হইবার পর আবার দুরারোহ এবং তৃণগুল্মবর্জ্জিত পাহাড়ের দেশ বিরাজিত। হুন্‌জার এলাকাস্থিত পর্ব্বতগুলি অতিশয় দুরারোহ এবং তথায় তৃণগুল্মের একান্ত অভাব। কারাকোরম অদ্রিমালার মাঝে মাঝে গভীর খাত বিদ্যমান। ইহাদের সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়। উভয় পার্শ্বে ২০।২৫ হাজার ফুট উচ্চ গিরি-শৃঙ্গ—তাহাদের পার্শ্ব-দেশ তুষার-সমাচ্ছন্ন।

হুন্‌জা ও নাগার নামক ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ভারত-সরকারের রক্ষণাধীন। কান্‌জুইট নামক জাতি তত্রত্য অধিবাসী। ইহারা দীর্ঘাকার ও গৌরবর্ণ। সম্ভবতঃ ইহারা আর্য্যবংশোদ্ভূত। পূর্ব্বকালে হুনজার অধিবাসীরা লাদক্ ও তুর্কীস্থান-যাত্রী ব্যবসায়িগণের পণ্যসম্ভার লুণ্ঠন করিয়া জীবন ধারণ করিত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার এই উপদ্রব-নিবারণকল্পে অভিযান করেন। তদবধি হুনজা ও নাগারের অধিবাসীদিগের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হইয়াছে।

ইহারা প্রিয়দর্শন ও বন্ধুবৎসল। হুনজার মীর মহম্মদ নাজিম্‌খাঁ। ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্যদেশ হইতে এই স্থানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হুনজায় বসবাস করেন বলিয়া মীর প্রচার করিয়া থাকেন। হুনজার প্রধান নগরের নাম বাল্‌টিট্। এখানে পোলোখেলার বিশেষ প্রচলন আছে।



কান্‌জুইট্ পুরুষ



কান্‌জুইট্ কুলী



দক্ষিণে সারিকোলি জাতীয় পুরুষ—বাকিগুলি কিরঘিজ

হুন্‌জা হইতে মিস্‌গার—তথা হইতে তিনটি স্থান পার হইলেই চীনের সীমান্তপ্রদেশ। ভারত-সরকারের তাড়িত-বার্ত্তাবহ এই মিস্‌গারএ আসিয়াই শেষ হইয়াছে। এই স্থান হইতে কাসগড়ের বৃটিশ প্রতিনিধির সহিত সংবাদ-বিনিময়ের



খাঁচার আকারবিশিষ্ট 'ডুঙ্গ'

জন্য বাহক ডাক লইয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। এই দীর্ঘ পথ অতিবাহন করিতে ১২ দিন লাগে।

চীন-তুর্কীস্থানে প্রবেশ করিতে দুইটি গিরিসঙ্কট পড়ে। একটির নাম কিলিক, অপরটির নাম মিনটাকা। উভয়ের দূরত্ব অতি অল্প। প্রথম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করা সহজ-সাধ্য; কিন্তু গ্রীষ্মারম্ভের পূর্ব্বে উহা দুরতিক্রমণীয়। তুষারপাতে উহা এরূপভাবে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে যে, কোনও জীবের পক্ষে উহা অতিক্রম করা সম্ভবপর নহে। জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত কিলিক গিরিসঙ্কট রুদ্ধই থাকে। মিনটাকা গিরি-সঙ্কট

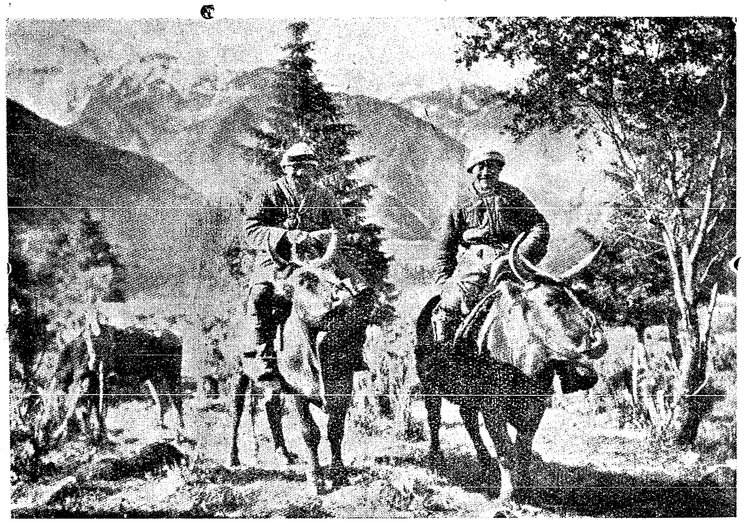

বলীবর্দ্দ আরোহণে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম

অতিক্রমকালে কোনও ইন্ধন সুপ্রাপ্য নহে। কুলীরা পৃষ্ঠদেশে কিছু কিছু কাষ্ঠ বহন করিয়া এই গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করে। এপ্রিল মাসেও মিনটাকা গিরি-সঙ্কট তুষারাচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। গভীর তুষাররাশি ভেদ করিয়া এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে এক দিন লাগে। এই গিরিসঙ্কট পার হইলেই চীন-তুর্কীস্থানের সীমা আরম্ভ হইল।

পারস্য শব্দ পাই-মির (Pai-Mir) হইতে পামিরের উৎপত্তি। ইহার অর্থ,—"পর্ব্বত-শিখরের পাদদেশ।" উচ্চ পর্ব্বতসানুর নাম পামির। আটটি পামির বিদ্যমান। চীন-রাজ্যে একটি, তাহার নাম 'টাগডুমবাস'; দ্বিতীয়টি আফগানিস্থানে, ইহার নাম 'ওয়াখান্।' বাকি ছয়টি রুশীয়-তুর্কীস্থানে।

টাগডুম্‌বাসে আর্য্যগণের এক বংশধর জাতি বাস করে। ইহাদের নাম 'সারিকোলিস্।' সম্ভবতঃ আফগানিস্থান হইতে আসিয়া এই জাতি এইখানে বসবাস করিতেছে। চীন অধিকারে ইহারা বহুকাল বসবাস করিয়াছিল। ইহাদের পেশা সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য। মধ্য-এসিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহারা উচ্চ-শ্রেণীর। সারিকোল প্রদেশে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

পামিরে আর এক জাতি লোকের বাস আছে। তাহারা কিরঘিজ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহারা যাযাবর শ্রেণীর অন্তর্গত। মেষ, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি জীব খাদ্য-তৃণের সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যেমন দলে দলে চলিয়া যায়, ইহারাও তাহাদের অনুগামী হইয়া থাকে।

সারিকোলিসগণের টাগডুমবাস পামিরের মধ্যে কতিপয় গ্রাম আছে। তথাপি ইহারা কিরঘিজ জাতির ন্যায় মেষাদি গৃহপালিত জন্তুর সহিত মাঠে প্রান্তরে অস্থায়ী গোলাকার খাঁচার মত গৃহে বাস করিয়া থাকে। এই খাঁচার আকৃতি-বিশিষ্ট ঘরগুলিকে 'উর্ত্ত' বলে। দারুণ শীতের সময় এইরূপ

গৃহে বসবাস করা বিশেষ সুবিধাজনক। বৃত্তাকার ঘরগুলির ব্যাস সাধারণতঃ ১২ হইতে ২০ ফুট হইয়া থাকে। দৃঢ় ও ভারী কাঠের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া তাহার উপর পশুলোমজাত পুরু চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। দ্বারপথেও ঐ জাতীয় আবরণ পর্দ্দার মত ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এই জাতীয় বাসগৃহ সহজে লইয়া যাওয়া যায়। উল্লিখিত গৃহের মধ্যস্থলে ইয়াক্-জাতীয় গরুর গোময় শুকাইয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হয়। ধূম-নির্গমনের পথ চন্দ্রাতপের মধ্যস্থলে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে উহা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া দেওয়া চলে।



মিনটাকা গিরি-সঙ্কটের তুষার-পথ

মিঃ মর্ডেন ও তাঁহার সঙ্গিগণ রুসাধিকৃত স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, ছাড়পত্র প্রভৃতি থাকিলেও রুসগণ তাঁহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। বলশেভিক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত রুসগণ তাঁহাদিগকে বন্দী করিতে পারে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইবার আশঙ্কাও আছে। হয় ত রসদাদি কাড়িয়া লইয়া তাহারা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেও পারে।

কিন্তু মিঃ মর্ডেন তদীয় বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, দূত প্রেরণের ৫ দিন পরে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে,



মার্কোপোলো বর্ণিত প্রসিদ্ধ মৃগ 'ওভিস্‌পোলী'

স্থানীয় রুসীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করিলেন।

মিঃ মর্ডেন লিখিয়াছেন যে, কিজিলের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাদিগকে সযত্নে অভ্যর্থিত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত 'উর্ত্ত' গৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহারা কোনওরূপ অসুবিধা বোধ না করেন, সে দিকে রুসকর্ম্মচারীরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

পামিরে 'ইয়াক' না থাকিলে তথায় শিকার সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। তুষারাচ্ছন্ন দেশে অশ্ব বা অশ্বতর পদমাত্র অগ্রসর



'ইয়াক'-পৃষ্ঠে তুষারমণ্ডিত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম

হইতে পারে না, কিন্তু ইয়াকগণ অবলীলাক্রমে আরোহী লইয়া উচ্চাবচ তুষারময় স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে।

ইয়াকে আরোহণ করিয়া শিকারীর দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থাকে। 'ওভিস্‌পোলী' মেষদল অত্যন্ত সতর্ক। শিকারীকে এ জন্য বহুক্ষণ আত্মগোপনপূর্ব্বক সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হইয়া থাকে।

মিঃ মর্ডেন বলিয়াছেন, চীনাধিকৃত পামির প্রদেশে ওভিস্‌-পোলী মৃগ দুষ্প্রাপ্য হইলেও রুসীয়-পামির অঞ্চলে এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা যে ভাবে এই মৃগ জাতিকে ধ্বংস করিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের দল ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িবে।

কিজিল হইতে ১ শত ২০ মাইল পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতিক্রম করিলে চীন-তুর্কীস্থানের সুবৃহৎ নগর খাসগড় প্রদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। খাসগড়ের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। তন্মধ্যে তুর্কের সংখ্যাই অধিক।

ইদানীং খাসগড়ে প্রায় ৩০ জন রুস বাস করিতেছে। য়ুরোপীয় মহারণের পূর্ব্বে এখানে বহুসংখ্যক রুস বাস করিত, খাসগড়কে তখন একটা বৃহৎ রুসীয় উপনিবেশ বলা হইত। রুস সম্রাটের আমলের দূতনিবাস এখন সোভিয়েট দূতনিবাসে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ রুস এখন সোভিয়েট-শাসন মানিয়া চলিতেছে, শুধু দুই চারি জন তাহা মানিতে চাহে না।

চীন-তুর্কীস্থান প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীন। তিনি তত্রত্য রাজধানী টিওয়াফুতে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার অধীন আবার ৫ জন শাসক আছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকে নায়েব-গোমস্তা-জাতীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শাসন করিয়া থাকেন। এই সকল নায়েবকে চীন ভাষায় 'আম্বান্' বলিয়া থাকে। ইহা উচ্চপদস্থ চীন রাজকর্ম্মচারীর পদবী। চীন-তুর্কীস্থানের প্রত্যেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীই চীনা।

তবে যাহারা খাজানা আদায় ও সেচের খাল প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, তাহারা তুর্ক।

খাসগড় পশম, মেষচর্ম্ম ও তূলার জন্য প্রসিদ্ধ। এই সকল দ্রব্য খাসগড় হইতে রুসিয়ায় রপ্তানী হয় এবং লৌহ, তৈল প্রভৃতি আণ্ডিজান নামক স্থান হইতে এখানে আমদানী হইয়া থাকে। আণ্ডিজান খাসগড় হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে এক সপ্তাহের পথ ব্যবধান। রুস-সরকার খাসগড়, টিওয়াফু এবং উর্গা প্রভৃতি স্থানে বেতারবার্ত্তা-ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উর্গার বেতারবার্ত্তা-ষ্টেশনের ভার মঙ্গোলদিগের উপর ন্যস্ত

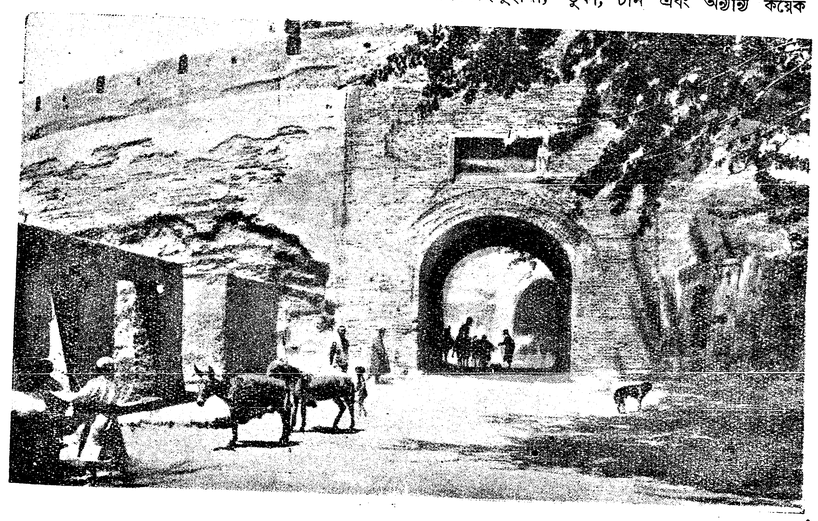

খাসগড়ের প্রাচীর-তোরণ

আছে। কোনও চীন-ষ্টেশন ইহার সহিত সংবাদের আদান-প্রদান করে না। কিন্তু মুক্‌ডেনের সহিত টিওয়াফুর ষ্টেশনের সম্বন্ধ আছে। পেশোয়ারের পথে খাসগড় হইতে বেতারবার্ত্তা প্রেরণ করা চলে। পেশোয়ারের বেতারবার্ত্তা-ষ্টেশন হইতে যে সংবাদ তারযোগে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে প্রেরণ করিতে পারা যায়।

মিঃ মর্ডেন ও মিঃ ক্লার্ক খাসগড় হইতে মঙ্গোলিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এই দুরধিগম্য প্রদেশ হইতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে এমন অভিভূত করিয়া-ছিল যে, বিঘ্নসঙ্কুল পথের আতঙ্ক তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই।

১০৪—১৯

এ জন্য পরিণামে তাঁহাদিগকে মঙ্গোলদিগের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে মিঃ মর্ডেনের ভাষায় প্রদত্ত হইল।

আমরা কাশ্মীর হইতে আনীত কতিপয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা এত দিনের সংগৃহীত ওভিসপোলী জাতীয় মৃগ প্রভৃতি ভারতবর্ষে চালান দিলাম। কারাকোরম অদ্রিমালার পথের লাদক হইয়া তাহারা আড়াই মাসে ভারতবর্ষে পৌঁছিবে। খাসগড় হইতে এক জন সুপকার নিযুক্ত করা গেল। মহম্মদ রহিম হিন্দুস্থানী, তুর্কী, চীন এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার ভাষায় কথা কহিতে পারিত। তাহাকে আমাদের সঙ্গে রাখিলাম।

'আরাবাস্' ও 'মাপাস্' জাতীয় দুই প্রকার শকটে আমাদের দ্রব্যাদি বোঝাই করা হইল। চীন রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে কতিপয় অশ্ব সংগ্রহ করিয়া লইলাম। আরাবাস্‌গুলি অত্যন্ত ভারী, দুই চাকাবিশিষ্ট গাড়ী। দুই হইতে ৫টি ঘোড়া উহা টানিয়া থাকে। 'মাপাস্' গাড়ী অপেক্ষাকৃত লঘুভার এবং আরাবাস্ অপেক্ষা দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া থাকে।

খাসগড় হইতে আক্‌সু পর্য্যন্ত পথ রাত্রিকালেই চলিতে হয়। দিবাভাগে সমতল ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে

মক্ষিকা ও মশকের উৎপাতও অত্যন্ত অধিক। দিবাভাগে পথিপার্শ্বস্থ পান্থনিবাস বা সরাইখানায় পথিকগণ বিশ্রাম করিয়া থাকে। খাসগড়ের চারিপার্শ্বস্থ স্থানকে মরুভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জল দুর্লভ এবং কটু।

আক্‌সু হইতে কয়েক মাইল দূরে পথ শেষ হইয়াছে। সম্মুখে আক্‌সু নদী। প্রায় দেড় মাইল উহার প্রসার। সেই গভীর নদীজল উত্তীর্ণ হইতে গেলে খেয়া নৌকার প্রয়োজন। প্রায় ৩০ ফুট দীর্ঘ নৌকা বা ভেলা-জাতীয় খেয়া নৌকা তীরে বাঁধা ছিল। আমাদের দ্রব্যসম্ভারসহ গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি

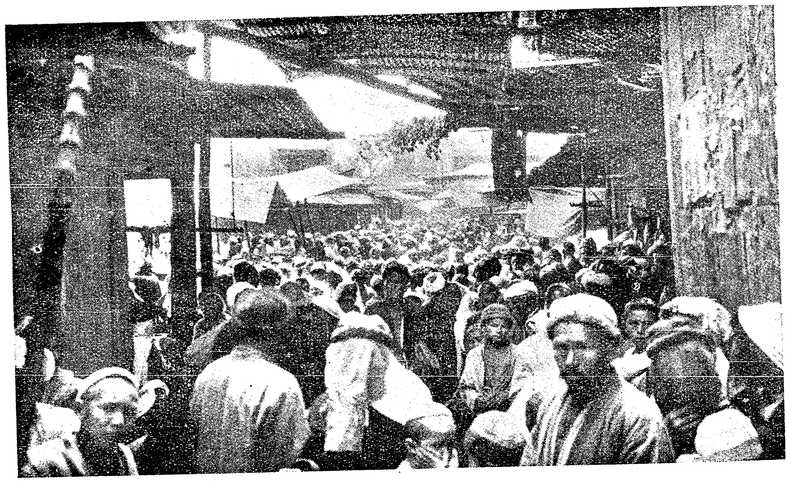

খাসগড়ের বাজার

সমস্তই সেই বিস্তৃত ও দীর্ঘ ভেলার সাহায্যে পরপারে নীত হইল।

আক্‌সুতে পৌঁছিয়া মুদ্রা-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। ভারতবর্ষ হইতে আমরা রৌপ্যমুদ্রা আনিয়াছিলাম। খাসগড়ে উহা ভাঙ্গাইয়া সেই দেশীয় 'টায়েল' মুদ্রার নোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া পাঁচ ও দশ ডবল মুদ্রার রুশীয় মোহরও আমাদের সংগ্রহ করা ছিল। উহা যে কোনও বাজারে ভাঙ্গাইতে পারা যাইবে এবং তাড়া তাড়া 'টায়েল' নোট বহন করা অপেক্ষা সহজে বহনযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আক্‌সুতে আসিয়া 'টায়েল' নোট ভাঙ্গাইয়া লক্ষ টায়েল নোট সংগৃহীত হইল। বহু সহস্র টায়েল নোট বহন করা একটা সমস্যার কথা; কিন্তু উপায় ছিল না। সিয়ান্‌কিয়াংএর শাসনকর্ত্তাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—তাঁহারা বেশী টাকা মূল্যের নোট বাহির করেন না কেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, অধিক মূল্যের নোট বাজারে প্রচলিত হইলে লোভে পড়িয়া অনেকে উহা জাল করিতে পারে। জাল করা অপরাধে সে অঞ্চলে মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হয়। সুতরাং প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখ হইতে প্রলোভনকে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। এ জন্য এক টায়েল মুদ্রার অধিক নোট প্রস্তুত করা হয় না। অল্প টাকার জন্য সাধারণতঃ মানুষ সহসা জাল-জুয়াচুরী করিতে চাহে না।

আক্‌সু হইতে আমাদের দল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিল। আমাদের লক্ষ্য তুষারশুভ্র টিনসান্ পর্ব্বত। কয়েক দিন পরে পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া সমতলভূমিতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া এক প্রকার হরিণ-শিকারে মনোনিবেশ করিলাম। ইয়ারকন্দ গেজেল বা হরিণ মরুভূমি অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

খাসগারিয়া সমতলভূমি হইতে টিনসান পর্ব্বতমূলে পৌঁছিতে হইলে মুজার্ট গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিতে হইয়া থাকে। এই গিরিসঙ্কট ১১ হাজার ৪ শত ৮০ ফুট উচ্চ।

মুজার্ট তুষার-নদীর উপর দিয়া ৫ মাইল পথ অত্যন্ত দুরারোহ। পথিমধ্যে অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র প্রভৃতির কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয়—এই গিরিসঙ্কট অতিক্রম করা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অশ্ব প্রভৃতি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও একটিও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। তবে এই সঙ্কটসঙ্কুল গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে আমাদিগকে রীতিমত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

৫ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর গিরিসঙ্কটের শিখরদেশে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে অবতরণ কষ্টকর হইলেও পর্য্যটকের সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়া যায়। মুজার্ট গিরিসঙ্কটের উত্তরভাগে উপনীত হইতে পারিলে বসন্ত ঋতু-পরিষেবিত মাধুর্য্যময় দেশের দৃশ্য পথিকের দেহ-মনকে আনন্দরসে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

গিরিসঙ্কটের পাদমূলে একটি গ্রামে কিছু কাল অবস্থান করিয়া আমরা টিনসান পর্ব্বতের ক্ষুদ্রকায় হরিণ শিকার করিলাম। সন্নিহিত অরণ্য ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাহারা বাস করিয়া থাকে। এই হরিণগুলি কুকুরের ন্যায় শব্দ করে। সহসা মনে হয়, যেন কুকুর ডাকিতেছে। হরিণ যে কুকুরের ন্যায় ডাকিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

আমরা টেকেস্ নদীর বিস্তৃত বেলাভূমির উপর দিয়া অগ্রসর

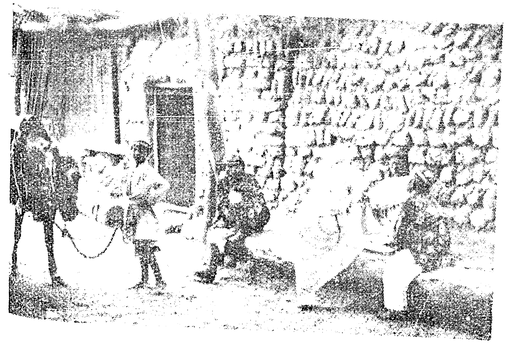

খাসগড়িয়া গ্রামের পল্লী-চিত্র



খাসগড়ে বন্দী—ভিক্ষাই ইহাদের উপজীবিকা

হইলাম। উত্তর ও দক্ষিণ অদ্রিমালার মধ্য দিয়া এই মনোহারিণী নদী এক শত মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত। একটা চীনা থানার সন্নিকটবর্ত্তী হইলে ৫ জন চীন সৈনিক আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত চীন রাজকর্ম্মচারী, শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীদিগের সম্মানার্থ কোনমতেই অন্যমত করিলেন না। আমরা পর্ব্বতসীমামধ্যে যত দিন ছিলাম, সৈনিকগণ নানাভাবে আমাদিগের সেবা করিয়াছিল।

ক্রমশঃ আমরা কোক্‌সু নদীর তটভূমিতে উপনীত হইলাম। তথা হইতে কাজাকের সীমান্তপ্রদেশে যাত্রা করিলাম। এই স্থানের অধিবাসীরা অনেকটা কির্‌গিজদিগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; প্রকৃতিও তদনুরূপ। ইঁহাদের দেহ গৌরবর্ণ, কাহারও কাহারও চক্ষুতারকা নীলবর্ণা কাজাক জাতি কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহারাও যাযাবর জাতি। কাজাকগণ মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু বহু বিবাহ তাহাদের মধ্যে বিরল। ইহাদের মধ্যে একটা বিচিত্র প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও পরিবারের প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী এক দিন ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যাহার ঘোড়া প্রথম হয়, বিধবা স্ত্রী স্বামীর একটি ঘোড়া তাহাকে পুরস্কার দেয়। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তাহাকে একটি গাভী পুরস্কার

প্রদত্ত হয়। তৃতীয় ব্যক্তি একটি মেষ এবং চতুর্থ ব্যক্তি একটি ছাগল প্রাপ্ত হয়।

উল্‌ডজ্‌ উপত্যকাভূমিতে পৌঁছিয়া আমরা কাল্‌মক্‌স্‌ জাতির দেখা পাইলাম। মঙ্গোলদিগের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কিরঘিজদিগের ন্যায় ইহারাও যাযাবর জাতি। ইহারা লামাধর্ম্মাবলম্বী। উর্গার জীয়ন্ত বুদ্ধ ক ইহারা ধর্ম্মগুরু বলিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া থাকে।

টিন্‌সান্‌ পর্ব্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তস্থিত কারাসার নামক একটি ক্ষুদ্র সহরে আমরা উপনীত হইলাম। এখানে বাণিজ্যের প্রসার আছে। এখানে আসিয়া আমরা খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি নূতন করিয়া ক্রয় করিলাম।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চীন-তুর্কীস্থানের টিওয়াফু সহরে প্রবেশ করা গেল। এখানে চীনারই প্রাধান্য অধিক। চীনের অন্যান্য সহরের ন্যায় এই নগরও উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই নগরতোরণ সমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন কোনও পর্য্যটক নগর-প্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইলে আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পায় না; সারারাত্রি বাহিরে থাকিতে হয়। সূর্য্যোদয় হইলে প্রাচীরতোরণ সমূহ উন্মুক্ত হয়।

রাজধানীতে ২ শতাধিক রুস আছে। এক জন সোভিয়েট কন্‌সল টিওয়াফুতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মঙ্গোলিয়ার কোবডোস্থিত সহকর্ম্মীর নামে একখানি পরিচয়-পত্র প্রদান করিলেন। কোবডোতে না গিয়া যদি আমরা আরও পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হই, তাহা হইলেও এই পরিচয়পত্র-সাহায্যে আমাদের উপকার হইতে পারে।

মঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে আমরা কোনও সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কারণ, রাষ্ট্রবিপ্লবের পর মঙ্গোলিয়ার সহিত তুর্কীস্থানের কোনও ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্য্য হয় নাই। চীনারাও এ বিষয়ে আমাদিগকে কোনও সাহায্য করিতে পারিল না।



তুর্কানের তুর্কী নারীগণ

সীমান্তপ্রদেশের ওপারে কি ভাবে কার্য্য চলিতেছে, তাহা কেহ অবগত নহে। মঙ্গোলিয়ায় চীনের প্রভাব বহু দিন পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

কুচেংজি অভিমুখে আমরা চলিতে লাগিলাম। গোবি মরুভূমি পার হইয়া সার্থবাহদল চীন অভিমুখে যাত্রাকালে কুচেংজিতে অবস্থান করে। এখানে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার জন্য উষ্ট্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, মঙ্গোলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিতে গেলে এখানে প্রচুরসংখ্যক উষ্ট্র পাওয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যকালে অতিকষ্টে মাত্র ৩০টি উষ্ট্র সংগৃহীত হইল। দ্বিতীয়বার কার্য্য করিবার জন্য এক জন 'চ্যান্‌টো' সংগ্রহ করা গেল।



এই হরিণ কুকুরের ন্যায় ডাকিয়া থাকে

এসিয়ার উষ্ট্রগণ শীতকালে রাত্রিতে চলিতে ভালবাসে। এ জন্য রাত্রিকালে আমরা পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

উষ্ট্রের দুই পার্শ্বে ঝোলা বা 'জো' ঝুলাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে পা গুটাইয়া নিদ্রা দেওয়া চলে। কিন্তু উষ্ট্র যখন ধাবিত হয়, তখন উত্তালতরঙ্গোপরি জাহাজ যেমন দুলিতে থাকে, আমাদের ঝোলাও তেমনই আন্দোলিত হইত। ইহাতে গাণ্ডুত্রিক পীড়াগ্রস্তের ন্যায় আমরাও অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম।



'আরাবা' গাড়ী

পথিপ্রদর্শকের নির্দ্দেশানুসারে আমাদের বাহিনী উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইল। মরুভূমিমধ্যে জল দুষ্প্রাপ্য। তুষার গলাইয়া যে জল পাওয়া যাইত, তাহাতেই পান-তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইত।

কয়েক দিবস পর্য্যটনের পর দূরে আলটাই পর্ব্বতের শিখরদেশ নয়নগোচর হইল, পথিমধ্যে জনমানবের দেখা পাওয়া গেল না। এ অঞ্চলে কোনও মানবই ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্রসর হয় না। দুই সপ্তাহের পরে আমাদের পথিপ্রদর্শক জানাইল যে, অদূরে প্রথম মঙ্গোল থানা অবস্থিত। পাছে মঙ্গোলগণ শস্যের



টিনসানের দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ

লোভে আমাদিগকে আক্রমণ করে, এ জন্য 'গাইড' আমাদিগকে একটু ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে চাহিল। আমরা সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলাম না। আমরা যে পর্য্যটক, শুধু দেশ-ভ্রমণের জন্য আসিয়াছি, তাহার অনুকূলে আমাদের নিকট বহুদেশের শাসকগণের ছাড়পত্র রহিয়াছে। উহা দেখাইয়া থানাদারের নিকট হইতে স্থানীয় গাইড নিযুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

মঙ্গোলগণ যে আমাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিবে, এরূপ আশঙ্কা একবারও আমাদের মনে উদিত হয় নাই। রুস, চীন সকলেই আমাদিগের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিয়াছে।

তাহাদের ছাড়পত্রও আমাদিগের কাছে বিদ্যমান। বিশেষতঃ মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েট সংকারের বিশেষ আধিপত্য আছে।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে আমরা দেখিলাম, দক্ষিণ-দিক হইতে কৃষ্ণকায় পদার্থ দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল, বুঝি বা নেকড়েবাঘের দল আসিতেছে, কিন্তু পরক্ষণে বুঝিলাম, উহারা অশ্বারোহী; আমাদের দল তাহাদের আদেশে গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহিগণ উষ্ট্রপৃষ্ঠস্থিত দ্রব্যাদি টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাদের চীৎকারে বিভিন্ন দিক হইতে নূতন অশ্বারোহীরা ছুটিয়া আসিল।



কালমক্‌জাতীয় নরনারী



ভেলার উপর 'মাপাস্' গাড়ী

পকেট হইতে বিদ্যুতালোকাধার বাহির করিয়া আমরা আমাদের মুখের উপর আলোকধারা বর্ষণ করিতে লাগিলাম। উহারা বুঝুক, আমরা বিদেশী শ্বেতকায়। আমাদের দ্বিভাষীকেও আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে বলিলাম। মঙ্গোলগণ কখনও এরূপ বিদ্যুতালোক দেখে নাই। তাহারা আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে আমাদিগকে লইয়া থানার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

একটা 'উর্ত্তের' মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ৮।১০ জন মঙ্গোল বসিয়া আছে। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বুঝিলাম, তাহারা আমাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তাহাদের আচরণ আমাদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল।

দ্বিভাষীর সাহায্যে আমরা তাহাদের সেনাপতির সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু সে কথায় তাহারা কর্ণপাত করিল না। এক জন সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কাছে মঙ্গোলিয়ার কোন ছাড়পত্র আছে কি না। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইল যে, উহা আমাদের নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা মার্কিণ ও রুসিয়ার ছাড়পত্র ও চিঠি প্রভৃতি

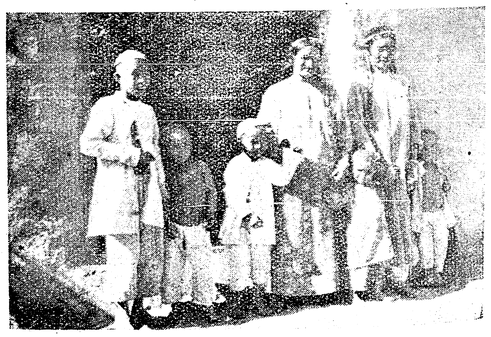

তুর্কীস্থানের তরুণী ও বালকবালিকা



কাজাক নারী ও সন্তানসন্ততি

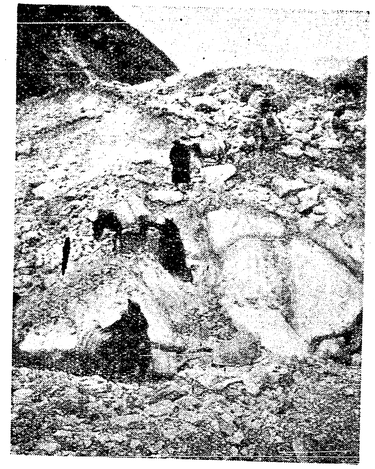

মুজার্ট গিরিসঙ্কট

The Ramagar Public Library
21.1.28.



কারাসার প্রাচীরতোরণ

বাহির করিয়া দিলাম। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া উহারা সেগুলি উপেক্ষাভরে ফেলিয়া দিল।

আমাদের মুখের দিকে দৃঢ়ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহারা নিম্নস্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল। তাহার পর একে একে সকলেই সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। আমাদের উষ্ট্রগুলি তথায় উপনীত হইল, কিন্তু মঙ্গোলদিগের নিকট হইতে আর কোনও উত্তর আসিল না। বুঝিলাম, আজিকার মত কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে। দেখা যাক, পরদিবস কি ঘটে।

প্রভাতে উঠিয়া আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছি,

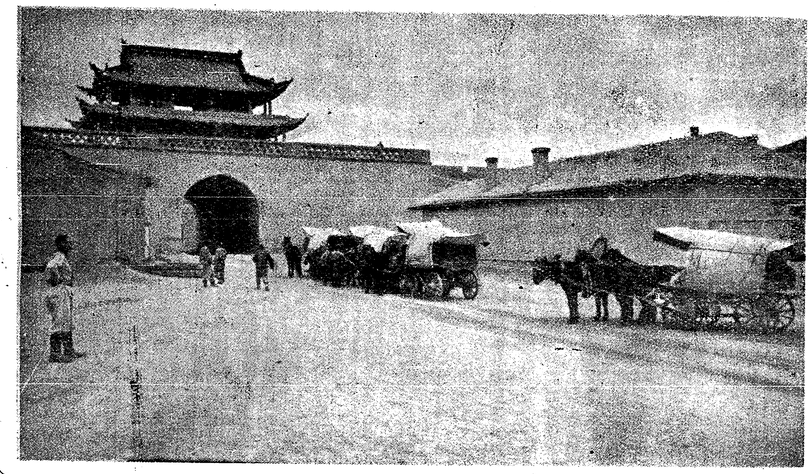

টিওয়াঙ্গু পার্শ্বনিবাস

এমন সময় এক জন মঙ্গোল তথায় আসিয়া আমাদের মহম্মদকে প্রহার করিল। পরক্ষণে আরও কতিপয় মঙ্গোল সৈনিক রজ্জু লইয়া তথায় উপনীত হইল।

ক্লার্ক ও আমি আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই বহু সৈনিকের দ্বারা বেষ্টিত হইলাম। তাহারা আমাদিগকে ভূমিতলে ফেলিয়া দিল। এক জন উত্তপ্ত গরম জল আমার মুখে ঢালিয়া দিতে গেল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা আমার দেহে পতিত হইল না।

কয়েক জন মিলিয়া আমার ও ক্লার্কের হস্ত রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিল। জল শুকাইয়া গেলে বন্ধন দৃঢ়তর হইবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের দলের সকলকেই ঐ ভাবে রজ্জুবদ্ধ করা হইল। তাহার পর আমাদিগকে ভূতলে ফেলিয়া দিল। কাহারও আর উত্থানশক্তি রহিল না। অনেকের উপর কঠোর প্রহারও চলিল। আমাদের বস্ত্রাভ্যন্তরে যাহা কিছু ছিল, মঙ্গোলগণ সমস্তই বাহির করিয়া লইয়া গেল। দ্বিভাষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এক জন মঙ্গোল বলিতেছিল, আমাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে।

বন্ধনের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। ইহা অপেক্ষা বন্দুকের গুলীতে প্রাণত্যাগ করা সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক, স্থির করিলাম, মরিতেই যখন হইবে, তখন ব্যবহারে আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে দেওয়া হইবে না।

রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় আমাদের হাত যেন বরফের মত শীতল হইয়া আসিতেছিল। সন্নিহিত অগ্নিকুণ্ডে অবশ হস্ত উত্তপ্ত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র মঙ্গোল প্রহরী আমাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল।

সম্ভবতঃ দুই ঘণ্টাকাল এই অবস্থায় কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রহরীদিগের আদেশে 'উর্ত্ত' আবাসের বাহিরে আমরা নীত হইলাম। বন্দুকের গুলীর শব্দ কানে যাইবামাত্র ক্লার্ক ও আমি পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। দূরে বন্দুকধারী প্রহরীদিগকে দেখা যাইতেছিল।

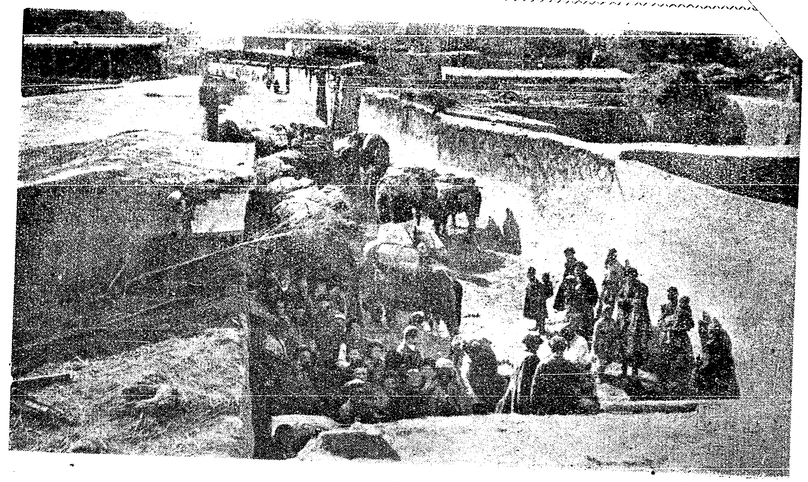

কুচেংজি সহর

কিছু দূরে একটা শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। এতক্ষণ তাহা দেখিতে পাই নাই,উহার অভিমুখে আমাদিগকে যাইতে হইল। আমাদিগকে ভূমিতলে বসাইয়া দিয়া শিবিরের স্তম্ভের সহিত আমাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহার পর সেনাদল চলিয়া গেল। শুধু এক জন সশস্ত্র প্রহরী আমাদের প্রহরায় রহিল।

যন্ত্রণায় আমরা অধীর হইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিন উপবাসী, তাহার উপর এই ভীষণ যন্ত্রণা! যদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের দেহ একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। ভগবানের দয়ায় মূর্চ্ছা আসিল না।

মঙ্গোলগণ দলে দলে তথায় আসিতেছিল, আবার চলিয়া যাইতেছিল। এক জন মঙ্গোল আসিয়া আমাদের অনুচর মহম্মদের সহিত চীনা ভাষায় কথা বলিল। মহম্মদ বুঝাইয়া দিল যে, আমরা রুসগণের বন্ধু, আমেরিকা-বাসী। রুসিয়ার বন্ধু শুনিয়া সম্ভবতঃ মঙ্গোলগণ এতক্ষণ আমাদিগকে গুলী করে নাই।

বহুক্ষণ পরে তাহারা আমাদের হাত পরীক্ষা করিয়া বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিল। কিন্তু তখনও প্রাণের আশা কিছু-মাত্র ছিল না। তাহারা গরম অঙ্গাবরণ আমাদিগকে পরিধান করিতে দিল। লবণাক্ত চা-ও কিছু পান করিতে পাইলাম,দুই এক টুকরা শুষ্ক রুটীও মিলিল; আমাদের নিকট হইতে যে সকল চুরুটকা তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহারাও দুই একটা ধূমপানের জন্য পাইলাম।



মঙ্গোল সৈনিকগণ

হস্তবন্ধন মুক্ত হইলেও স্তম্ভের সহিত আমরা যে ভাবে আবদ্ধ

ছিলাম, তাহা হইতে মুক্তি পাইলাম না। বরং আরও দৃঢ়ভাবে সেই বন্ধন বাঁধিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। অস্ত্রধারী কয়েক জন প্রহরী পাহারায় রহিল।

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে আমাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু আমাদের দিগ্‌দর্শনযন্ত্র, দূরবীণ প্রভৃতি তাহারা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল। তাহার পর ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী অপর এক থানায় আমাদিগকে পাঠাইয়া দিল।



মঙ্গোলিয়ার অশ্বারোহী পুলিস-প্রহরী।

আমরা তুর্কীস্থানে ফিরিয়া যাইতে চাহিলাম; কিন্তু আমাদের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না! আমাদিগকে জিলার প্রধান সহর কোব্‌ডোতে যাইতে হইল। আলটাই পর্ব্বতমালা পার হইয়া প্রায় আড়াই শত মাইল দূরে কোব্‌ডো অবস্থিত। ১২ দিন ধরিয়া যাওয়ার পর কোব্‌ডোয় পৌছিলাম। শীতকালে পথের কষ্ট বর্ণনীয় নহে।

কিন্তু তখনও অদৃষ্টে দুঃখ ছিল। তত্রত্য পুলিস-কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে তখনও গোয়েন্দা বলিয়া মনে করিতেছিল। অবশেষে আর এক জন মঙ্গোল তথায় আসিল। এ ব্যক্তি রুস-ভাষা কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানে। আমাদের চিঠি-পত্র দেখিয়া সেই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি গবর্ণরকে সংবাদ দিল। সে ব্যক্তির মস্তকে কিছু বুদ্ধি ছিল। আমাদিগকে তিনি এক জন রুসীয় লোকের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। এই ভদ্রলোকের সহিত পথে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সহায়তায় আমরা মুক্তি পাইলাম এবং আমাদের অপহৃত দ্রব্যাদিও ফিরাইয়া পাইলাম।

মঙ্গোলিয়া ভ্রমণের সাধ মিটিয়া গেল। পিকিংএর দিকে ছাড়া অন্য দিকে যাইবার আদেশ মিলিল না। ভারত-সমুদ্র হইতে পীত নদ পর্য্যন্ত আমরা ৭ হাজার ৯ শত মাইল পর্য্যটন করিয়াছিলাম।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দোলের আমন্ত্রণ

[গজল গান]

এস গো শ্যাম বনমালী কাননে
অলক দুলা—য়ে,
হেথা যে দোল লেগেছে, খোল বেজেছে
পাখীর কুলা—য়ে।
কুহুর ঐ পিচকারিতে রঙ-বরণা
পিক-বধূ ছু—টায়,
সহকার লাল পরাগের ফাগ ছুড়িছে
মঞ্জরী মু—ঠায়,
সারিকা নটকোনাতে ফটফটিয়ে
কুম্‌কুমী ফু—টায়,
মহুয়া ভার নিয়েছে চোখ রাঙাবার
নেশায় ঢ়লা—য়ে॥
মধুতে রঙ গুলে মৌ-বন রেখেছে
অশোক শিমু—লে,
চাচরের আঙরাগুলো ভোমরা হয়ে
কিংশুকে বু—লে,
দখিণা হিন্দোলাতে দোল হানে
বন-বালারা দু—লে,
হরিণী কস্তুরী বা—সে দেবে গোঠ
গোধন ভুলা—য়ে॥
যশোদা মায় ছেড়ে হেথায় আসিতে
ভয় কি নীলম—ণি,
মাধবী চুম দিয়ে খাও-য়াবে বঁধু
ফুলমধা—ন—নী,
শিখীরা ঘাম পেলে ঢ়-লাবে গায়ে
পাখার ব্যজ—নী
শাখীরা ঘুম পেলে ঘুম ঘোর ঘনাবে
আঙুল বুলা—য়ে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

অভিভাষণ *

আনন্দস্বরূপ মঙ্গলময়ের সৃষ্টিচাতুর্য্যের বিধানে আপাতদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টের মধ্যেও ইষ্টের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষীভূত হয়। সদ্যঃপ্রাণনাশী বিষ-বিজলী-ও ব্যবহারগুণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উপাদানে পরিণতি পায়।

ইংরাজের রেল-বিস্তারের উদ্দেশ্য তোমার আমার পিতাপিতামহীর বারাণসী-দর্শন নয়, স্বদেশজাত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য তিনি রেল-অরণ্যে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেললেন, দেশের শ্রম, শিল্পের আশ্রয়চ্যুত হয়ে মজুরের জমীতে অবনত হ'ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কেবল বারাণসী-বৃন্দাবন-দ্বারকা দর্শন করলেম, তা নয়, দূরদূরান্তরবাসী অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত লক্ষ লক্ষ সমধর্ম্মী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে পড়লেম।

শাসন-শোষণাদি কার্য্য সুলভে নিষ্পন্ন করবার অভিপ্রায়ে ও আর-ও কিছু স্বার্থসিদ্ধির মতলবে বিদেশী বণিক্ তাঁদের কর্ণমালার সহিত আমাদের পরিচয় ক'রে দিলেন, আর অষ্টনিকের জোরে ফাঁকতালে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যটাকে দীপ্ত জীবনে উদ্বোধিত ও অলঙ্কারচ্ছটায় ভূষিত করতে প্রবৃত্ত হলেম। এই শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বারে আমরা যে কৃতজ্ঞতার কি গুরু ঋণে আবদ্ধ, তা' পরে বলবো।

এমন এক দিন গেছে যে, এই ময়মনসিংহে আসতে আমরা ভয় পেতেম। আগরতলা সুসঙ্গ আদি চক্রগুলিকে যেমন ভূগোলের গোলে বঙ্গদেশান্তর্গত ব'লে নির্ণয় করা হয় মনে করতেম, ময়মনসিংহ ঠিক তেমনটি নয় জান্‌তেম বটে, তবু ভাবতেম, জলে স্থলে ভয়াল পথাতিক্রান্ত, দুর্দ্দম জমীদারবহুল সেই ব্রহ্মপুত্রকূলে কে অকূলে প্রাণ হারাতে যাবে! ফলতঃ মনেক অর্থের লোভ সম্বরণ ক'রে আমরা এক সময় অভিনয় করবার জন্য এ চক্রের একটি সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিলেম, সে বহুদিনের কথা—তখন আমরা ন্যাশানাল থিয়েটারে।

এ ভ্রম দূর হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে,—যখন কলিকাতা সহরীতে জুবেয়ার-সাহেবের-বিরাট একজিবিসন খোলা হয়। তখন-ময়মনসিংহ রেল সেই সময় এ জেলার বহু সম্ভ্রান্ত লোককে বহন ক'রে কলিকাতায় নিয়ে যায় ও অনেকের সঙ্গে তাঁদের আমাদের পরিচয় হবার সম্মান ও সৌভাগ্য ঘটে। তন্মধ্যে মুক্তাগাছার অধুনা স্বর্গগত মধ্যম কর্ত্তা হরেন্দ্রকিশোর ও ছোটকর্ত্তা যোগেন্দ্রকিশোর আচার্য্য মহোদয়দ্বয়ের পুণ্যনাম এখানে উল্লেখ না ক'রে থাকতে পাল্লেম না। মাৎসর্য্য-বর্জ্জিত এমন অমায়িক সারল্যের অনাড়ম্বর দৃষ্টান্ত আমার এই দীর্ঘজীবনের মধ্যে অল্পই দেখেছি।

এর পরে তিনবার আমার অদৃষ্টে ময়মনসিংহে আসা ঘটে। দু'বার মুক্তাগাছায় ও একবার রামগোপালপুরে। ঐশ্বর্য্যশালী জমীদারবর্গ থেকে সাধারণ গৃহস্থ শিক্ষিত-সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যে কত শিষ্টাচারী মিষ্টভাষী, তা আমি অনেকের সঙ্গে মেশামেশি ক'রে এইখানে ব'সে ভাল ক'রে বুঝে গেছি।

রামগোপালপুর থেকে ফেরবার পথে নসিরাবাদ সহরের দুর্গাবাড়ীতে আমরা অনুরুদ্ধ হয়ে কয়েক রাত্রি অভিনয় করি; আমি থিয়েটারের সঙ্গে এই বাঙ্গালা দেশের অনেক জেলায় বেড়িয়েছি; বেহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও যে যাই নি, তা নয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমার এই দীর্ঘ-অভিজ্ঞতায় একমাত্র এই ময়মনসিংহেই আমাদের নিকট অভিনয় দর্শনের জন্য কেহ পাশ চান নাই অথবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে-ও চার বা দুই টাকা মূল্য দিয়ে এক একখানি টিকিট গোপনে ক্রয় ক'রে ফেলেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন সাব্‌ডিভিসন্ ও গ্রামে অভিনয় করবার জন্য আমরা এত আহ্বান পেয়েছিলাম যে, বোধ হয়, সে সময় অন্ততঃ আরও দু' তিন মাস এ জেলায় কাটিয়ে যেতে পারতেম, কিন্তু তখনও বাঙ্গালা নাট্যসম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে সৌজন্যভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, তাই সম্ভবতঃ অদিনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি; আদর প্রত্যাখ্যানের ফল হাতে হাতে পেলেম, কলিকাতায় পৌছেই প্রথম সংবাদ শুনলেম, বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র তার পূর্ব্বদিনে লোকান্তর গমন করেছেন।

ময়মনসিংহ সম্বন্ধে যে ভাব প্রাণে তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসর ধ'রে আনন্দে পোষণ ক'রে এসেছি, এত দিন পরে আজ এই

* ধলা বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক উৎসবের সভাপতির অভিভাষণ।

সুযোগে তা প্রকাশ ক'রে ফেললেম ; যদি এই সম্মিলনীর সময় নষ্ট ক'রে থাকি—মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

* * * * *

অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তিন চা'র বার একটা কথার পুনরুল্লেখ শুনলেম যে, "এত দিন পরে বাঙ্গালীজাতি জাগরিত হয়েছে।" কিম্বদন্তী, লিপিবদ্ধ বিবরণ ও প্রত্যক্ষের দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য করতে আমি যতদূর সমর্থ হয়েছি, তাতে বাঙ্গালী যে কবে ঘুমের অসাড় অঙ্কে অচেতন হয়ে পড়েছিল, তা ত' বুঝতে পারিনি। তবে সবার চোখে সব সময়ে সকল মানুষ জাগ্রত ব'লে অনুমিত হয় না। প্রভুর তিন ডাকের পর পরিচারক সম্মুখে হাজির হ'ল, বাবু বললেন, "কি হে বাপু, এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে না কি ?" অথচ ঠিক সেই সময়ে সেই ভৃত্য অন্দরে জলতোলার বন্দোবস্তে প্রভুপত্নী গৃহিণীর আজ্ঞা পালন করছিল। কর্ম্মচারী আফিসে পৌঁছুতেই 'বড়বাবু' ধমক দিলেন, "এতক্ষণ ঘুম হচ্ছিল না কি ?" সেবক নির্ব্বাক্ ; কেন না, সে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শয্যা পরিত্যাগ ক'রে গৃহকার্য্যের ঝঞ্ঝাটে পাঁচ মিনিট বিলম্বে আফিসে এসেছে। বিলম্বে আসার অপরাধে আফিসের কর্ত্তা তাকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খাটিয়ে নিয়ে তবে ছেড়েছেন, বাড়ী ফিরতে-ই বৌমার গঞ্জনা,—"আফিসে গিয়ে দরোয়ানের খাটিয়ায় প'ড়ে ঘুমুচ্ছিলে না কি ?"

প্রয়োজন ভেদাভেদে একের দৃষ্টিতে যা নিদ্রা,অপরের চোখে তা জীবন্ত উদ্যম, একের দৃষ্টিতে যা বাজে কায, অপরের চোখে তা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিশুর জাগরণ প্রকটিত হয়, ক্রীড়ার অঙ্গনে ; ছাত্রকে জাগরিত দেখি তার পাঠাগারে, রন্ধনশালার দিকে দৃষ্টি করলে বুঝতে পারি যে, গৃহিণী জাগ্রত ; ঠাকুরঘরের মেজেয় দেখতে পাই, বৃদ্ধকর্ত্তা চক্ষু মুদে ব'সে আছেন, বুঝি,—তিনি নিদ্রিত ন'ন, ইষ্টমূর্ত্তি স্মরণ ক'রে ধ্যানস্থ।

এইরূপে জাতিবিশেষের মধ্যে-ও জাগরণ রূপান্তর গ্রহণ ক'রে থাকে। পাঞ্জাবের শিখ জাগে রোষে অসি কোষমুক্ত ক'রে ; পাহাড়-দোরস্ত হাড়ে মারহাট্টা জাগে ঘোড়ার পিঠে ভক্ষ্য জোগাড়ে ; মরুর মাড়োয়ারী জাগে উদরের অনুরাগে ধরাতল চুঁড়ে বেড়াতে ; আর প্রবাহিণী শতেশ্বরীহারভূষণা মোলায়েম মাটীর বাঙ্গালী জাগে প্রেমের কাহিনী গান ক'রে।

যে প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়ে এক দূর-দিনে প্রাচীন ময়মনসিংহকে মহুয়া—মলুয়ার গানে জাগ্রত রেখেছিল, সেই প্রেমের মাদনা-ই সাড়া দিয়েছিল চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের লীলাগীতিতে ; আবার সেই প্রেমের উষ্ণ প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে উঠেছিল বঙ্কিমের ভাষা-ঝঙ্কারে 'বন্দে মাতরম্' গানে।

জাতির সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয় না অসির ফলকে ; কামানের ফুৎকার জাতির বিজয়-পতাকাকে উড়ায় না, জাতিকে জাগ্রত রাখে, জাতিকে উদ্দীপিত করে তা'র ভাষার মন্ত্রশক্তি। রাজপুত জাতিকে জীবিত রেখেছিল তার চারণ-রসনানিঃসৃত জাগরণের গান। ভল্টেয়ারাদি ভাবুকগণের লেখনীমুখে-ই ফরাসী-বিপ্লবের অসি শাণিত। আজ-ও সমগ্র ফরাসী জাতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে "মার্সেলিস" গান।

যে নীচ বৃত্তির মোহে এক জোড়া চোখের কালো তারার ঠারে পুরুষের মাথা ঘুরে যায় বা এক গোছা চিকণ চুলের মদির গন্ধে তার দেহ লতিয়ে পড়ে, যুক্ত-অক্ষর উচ্চারণ করবার শক্তি লুপ্ত হয়, তার নাম আসক্তি, প্রেম নয়!

পুরুষের বীরত্ব নারীর মহত্ত্ব ফুটে ওঠে প্রেমের শিশির-সেচনে। সীতার অমৃতময় প্রেম শ্রীরামচন্দ্রকে দশানন-নিধনে শক্তি প্রদান করে ; ভ্রাতৃ-প্রেমের বলে লক্ষ্মণ বুক পেতে দিয়ে শক্তিশেলের আঘাত গ্রহণ করেন। ভীমের গদায়, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে যাজ্ঞসেনী-প্রেমের সংহারিণী শক্তি। স্পেনের নাইট্‌গণ নিজ নিজ প্রণয়িনীর প্রেম-প্রতিমা প্রাণে প্রতিষ্ঠা ক'রে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হতেন। পিতৃ-প্রেমের প্রেরণায় তরুণ শ্রীমন্ত অকূল সাগরে ভেলা ভাসাতে সমর্থ হয়েছিল। হরি-প্রেমের উন্মাদনায় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদের নিষেধ আজ্ঞার বিরুদ্ধে নগরাধ্যক্ষ কাজীর অঙ্গনে প্রবেশ ক'রে নগরকীর্ত্তন-গানে প্রেমের জয় ঘোষণা করেছিলেন। প্রেমদানে মানবকে পরিত্রাণ করতে এসে শ্রীযীশু ক্রশ-কণ্টকালিঙ্গনে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন।

বাঙ্গালী তার সাগর-ছেঁচা রতন এই বাঙ্গালাটুকুকে বরাবর আপনার প্রাণের সমস্ত প্রেম দিয়ে ভালবেসে আসছে। বাঙ্গালা হ্যাংলা নয় ; পরের ধনের প্রত্যাশী হবার তার প্রয়োজন-ও নাই ; তার স্থলে অন্ন, জলে ব্যঞ্জন, রসনা-রঞ্জন মধু তার লতায় লতায় দোলে, শাখায় শাখায় ফলে, কাণ্ডে কাণ্ডে গলে, লেমনেডের বোতল তার গাছের আগায় ঝোলে। বসনের জন্য

বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালীকে কার্পাস দেয়, বঙ্গ-সুন্দরীর চারু অঙ্গ সাজাতে কোটি কোটি কীট প্রাণপাত ক'রে কুসুম-কোমল রেশম প্রস্তুত করে, বনের পাতা, বনের ফুল, গহনার নমুনা গড়ে। হ্যাংলা ত বাঙ্গালা নয়-ই, তার ওপোর মা আমার লুণ্ঠন, বঞ্চন, ভিক্ষা চিরদিন ঘৃণার চোখে দেখেন, তাই এক দিন স্বাবলম্বী হবার জন্য অনেক ভোগ বর্জ্জন, অনেক প্রলোভন ত্যাগ করেছেন। দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই এক রকম না এক রকম শিরোপা ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে, কেবল বাঙ্গালী-ই "নাঙ্গাশির।" আমার বোধ হয়, আত্মনির্ভরতার অভিমানে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা এক দিন এতটা গর্ব্বিত ছিলেন যে, সুদূর ভূভাগ দূরে থাক্, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কামরূপ বা বিহার প্রদেশের কাছে-ও ব্যবহার্য্য বস্ত্রের জন্য ঋণগ্রস্ত হ'তে লজ্জা বোধ করতেন এবং সেই জন্য বাহুল্যবোধে পাগড়ী ইত্যাদি পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র ধুতি উড়ানীকে-ই সমাজের মর্য্যাদারক্ষার আসনে বসিয়েছিলেন।

যে ভেতো বাঙ্গালীর বুকের ভিতর এতটা জাত্যভিমান ছিল, সেই বাঙ্গালী এদিন ঘুমুচ্ছিল—আজ জেগে উঠেছে। এ কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে পৈতামহপুরুষের নিন্দার পাতকী হ'তে হয়।

পাঠান-মোগল-শাসনকালে-ও বাঙ্গালা নামেমাত্র পরাধীন ছিল ; জমীদারদের নিকট থেকে একটা সালিয়ানা খাজনা পেলে-ই নবাব-সুবাদার সন্তুষ্ট ; আভ্যন্তরিক শাসন-পালন জমীদার, জোৎদার বা গ্রাম্যমণ্ডল পঞ্চায়েতের হাতে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ঘরের দোরের পরের হস্তগত হয় নি।

যদি নব-জাগরণ ব'লে একটা কথা ব্যবহার করতে-ই হয়, তবে সেটা ধরতে হবে বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন-কাল হ'তে।

আমি ব্রাহ্মণ মানি। ব্রাহ্মণত্বের চরণতলে এই শুদ্র দেহ আমার সহস্রবার অবনত করি, কুসংস্কারাপন্ন মূর্খের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই 'দেব-দেশের' সর্ব্বতোমঙ্গলের জন্য সত্য সমাজের পুনরভ্যুদয় একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ-হৃদয় ব্রাহ্মণ-আত্মা আর উপবীতশোভিত স্কন্ধ একই বস্তু, এ কথা স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত নই। পৌরোহিত্যের আধিপত্য স্বার্থ-প্রণোদিত স্মৃতির শাসনে সমগ্র জাতিটাকে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন অসাড় জীব-সমষ্টির নষ্টগোষ্ঠীতে অবনত ক'রে দিয়েছিল।

যে মহান্ মানব সমাজবন্ধন গঠনের আদিকালে পার্থিব সমস্ত ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্, ভোগ-বিলাস, অধিকার-প্রভুত্ব, অন্যান্য জাতির হস্তে তুলে দিয়ে, তপশ্চরণ, বেদাধ্যয়ন, সমাজে জ্ঞান-বিস্তার প্রভৃতি জগতের মঙ্গলকর কার্য্যে ব্রতী হয়ে নিজের সামান্য প্রাপ্যকে ভিক্ষা আখ্যায় ভূষিত ক'রে ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করেছিলেন, ক্রমে তাঁর বংশধর আধিপত্যের মাদকতায় বিভোর হয়ে অভিধানকাররূপে লিখলেন, 'ব্রাহ্মণের অর্থ—ভূদেব', আর শূদ্রের অর্থ—'দ্বিজদাস, অন্ত্যজ, জঘন্য।' সঙ্গে সঙ্গে অভিধানকারের মাসতুতো ভাই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ম'শায় আইন জারি করলেন, বঙ্গদেশে একমাত্র সূত্রধারি-পুত্র ভিন্ন অপর সকল লোকই শূদ্র। এই শূদ্র নিজের পিতৃশ্রাদ্ধ করতে ব'সে যদি পুরুত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে যে, "আমায় কি বলাচ্ছেন, বুঝতে পারছি না," অথবা কন্যাদানের সময়ে-ও যদি ঐরূপ একটা প্রশ্ন ক'রে বসে, তবে ঠাকুর তখন-ই সেই অভাগাকে ম্লেচ্ছ, নাস্তিক প্রভৃতি ধর্ম্মমণ্ডিত সম্বোধনে ব্রহ্মশাপের ভয় দেখান।

আধিপত্যের তপ্ত মদিরার মোহে মানবের মস্তিষ্ক যতটা বিকৃত হয়ে ওঠে, বোতলগর্ভস্থ সুরার তারল্যে ততটা তীব্রতা নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতির ইহপরকালের গতি আমার হাতে ব'লে কথায় কথায় শাসিয়ে, তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যের উপর একটা একটা টেক্স বসিয়ে, তোদের মুক্তির চাবি আমার হাতে ব'লে ভয় দেখিয়ে দ্বিজ-পরিচয়ে সমাজের নেতৃত্ব একায়ত্ত ক'রে তাঁরা সমস্ত দেশটার বিবেক-বুদ্ধি, এমন কি, সহজ জ্ঞান পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে দিয়েছিলেন ; ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের-ই গোত্রপতি আদিপুরুষগণ সিদ্ধান্ত ক'রে গেছেন যে, প্রত্যেক মানব-ই সেই পরমব্রহ্মের এক একটি অংশ, শূদ্রের অন্তরস্থ যে ব্রাহ্মণ্য শক্তি ভদ্রভাবরূপে আবদ্ধ ছিল, ঐশিক প্রেরণায় মধ্যে মধ্যে তিনি বিদ্রোহী হবার প্রয়াস পেলে-ও, অজ্ঞান-জনিত ভয়-বিহ্বল রসনা কিছু প্রকাশ করতে সাহসী হ'ত না।

এমন সময় ইংরাজ এসে তাঁদের মুদ্রিত পুস্তক বাঙ্গালীর হাতে দিলেন। এই নূতন ব্রাহ্মণদের বিদ্যাদানরূপ সদাব্রত অনুষ্ঠানের দুইটি অভিপ্রায় ছিল, একটি প্রকট, অপরটি কূট। তাঁদের উভয় অভিপ্রায়-সিদ্ধির ভিতর দিয়ে আমরা কুফল

সুফল দুই-ই লাভ করলেম। কুফল—মস্তিষ্কের তেজোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্রম-শক্তির আশ্রয় হাত-পা অবশ হয়ে পড়ল, সত্য শূদ্রত্ব দাসবৃত্তিকে আমরা ইষ্টের আসনে বরণ ক'রে তুললাম; অপর দিকে পৌরোহিত্য-শাসন অত্যাচার ব'লে বুঝতে পেরে সমস্ত দেশীয় আচার, দেশীয় ব্যবহার, দেশীয় ভাব ভাষা সকলের উপর প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে ক্রিয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব।

মিণ্টন-মেকলে-কল্পিত মদিরা-পান-জনিত প্রথম নেশার অবসানে ইংরাজী অধ্যয়নের সুফল আহরণে আমরা আপনা-দিগকে নিয়োজিত করেছি।

জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণযুগে বিদ্যালাভে বঞ্চিত থেকে আমাদের চোখে ঘোলা প'ড়ে গিয়েছিল; বৃটিশ-বিদ্যা-মদের উত্তেজনা, পরে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে আমাদের প্রাণ শ্বেত-প্রেমে মোহিত ক'রে দিয়েছিল; ইংরাজের দোকান থেকে কেনা চশমা প'রে আমরা শ্যামলের কোমল সৌন্দর্য্যের পানে দৃক্‌পাত না ক'রে মর্ম্মরের কঠোর শুভ্রতাই রূপ-গুণের প্রকৃষ্টাধার ব'লে মনে করতে লাগলেম; কিন্তু অভ্যাসে অভ্যাসে ঐ নূতন চশমা যখন চোখের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে বীক্ষণশক্তি সুস্পষ্ট ক'রে দিলে, তখন যে কেবল আমাদের নিজের ঘরে কত শোভনীয় লোভনীয় সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত রত্নরাজি আছে, তাই দেখতে পেলেম—তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেখে শিউরে উঠলাম যে, চশমাখানির জন্যে সাহেব যে বিলখানি দাখিল করেছেন, তার অঙ্ক গণিতের সংখ্যায় নির্ণীত করা যায় না; বুঝলেম, এই চশমার বিনিময়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিক্রয় ক'রে ব'সে আছি। পুরুত ঠাকুর তিথি-ভেদে মধ্যে মধ্যে আমাদের উপবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পারণে-ও পুণ্য আছে, এ সূত্রটি-ও যোজনা ক'রে দিয়েছিলেন। নবাগত দ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণগণ যে মহাড়ম্বরে রজত-সূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, তার পুণ্যফল লাভার্থ আমাদের যে মাঝে মাঝে উপোস করতে হবে, তা নয়, উপবাসী অপেক্ষা-ও শতগুণে হীন হেয় ভিখারীর ঝুলি দাঁড়াচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকা।

"যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধ'রে।" বুঝলেম, তরোয়াল নয়, বন্দুক নয়, কামান নয়, বিকলাঙ্গকরণের বা জীবনহবনের কোন অস্ত্র-ই নয়; ইংরাজ জয় করেছে আমাদের মনকে, আমাদের ভাবকে, আমাদের আত্মজ্ঞানকে তার সাহিত্যের প্রবল প্রতাপে; আর সেই সাহিত্যের শক্তি জীবন্ত, ইংরাজের স্বদেশ-প্রীতিতে।

"Right about turn"। প্রেমিক বাঙ্গালী তখন একেবারে ঘুরে দাঁড়াল বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে। নিধু বাবুর গীতে, ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারে যা আধ-আধ ভাষায় ফোট-ফোট হয়ে উঠছিল, বঙ্গের নবীন কবি রঙ্গলালের রসনা তা তরঙ্গ তুলে ব'লে উঠলো;—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়॥"

অব্যবহিত পরে দেবেন্দ্র-মন্দিরস্থ সারস্বতকুঞ্জ-বিহারী বিহঙ্গ-কুলকণ্ঠে নানা ছন্দে জাতীয় সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, তার পর স্বদেশ-প্রেমের আকুলতা মধুসূদনের মেঘনাদে, হেমচন্দ্রের ভেরীনাদে, নবীনের পলাশীর পাদে পাদে।

গৌরাঙ্গের জন্মভূমিতে প্রেম-প্রবাহিণী খাতের রেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, মাঝে মাঝে বন্যা আসে, প্রেম দুকূল ছাপিয়ে ওঠে, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ তখন এক হয়ে যায়; তাই নীলকর-পীড়িত দীন কৃষকের প্রেমে ধীরাজ অধীর হয়ে বুকের বেদনা গানে নিবেদন করলেন, অশ্রুপাতে দীনবন্ধু প্রথম নাটকের মত নাটক লিখলেন 'নীলদর্পণ,' সে চোখের জল এত তপ্ত যে, তার অনলবাহী স্রোতে বঙ্গভূমির সমস্ত ইংরাজী নীলক্ষেত চিরদিনের জন্য জলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

পদ্যে বাঙ্গালীর পূর্ব্বসম্পদ্ গৌরবের সহিত সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শনের উপযুক্তই ছিল, ক্রমে পুনর্যৌবনের নব নব লাবণ্য-ছটায় বিভূষিত হয়ে পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের দৈবশক্তির প্রভাবে বঙ্গের কবিতা এক্ষণে জগৎ-পূজিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য নব্য-বঙ্গের নিজের সৃষ্টি। দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত প্রথম যুবকদল-ই সমসাময়িক-সমাজের নিকট ইয়ং-বেঙ্গল বা 'নব্যবঙ্গ' উপাধি লাভ করেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত হ'লে-ও তাঁর সংস্কৃতের মুক্তামালাজড়িত সত্যোনবনীত-তুল্য গদ্যের মধ্যে-ও ইংরাজী-সাহিত্যের সাহচর্য্য-পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর-প্রেমতত্ত্বের নবীন

ধারা ভাষায় প্রকাশের জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে পাশে বসিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদীয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' মুদ্রিত গদ্যের মধ্যে যে নূতন ওজস্বিতা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছেন, তার তেজ, তার ঝঙ্কার আজ-ও পর্য্যন্ত অনেক প্রবন্ধে —অনেক কাব্যে প্রদীপ্ত ও ধ্বনিত। ক্রমে কথাসাহিত্যের সাজে বাঙ্গালাগদ্য দেখা দিলে টেঁকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালে' এবং সিংহ মহোদয়ের 'হুতুম পেঁচায়।'

ইংরাজীশিক্ষিত মনীষিগণ সংবাদ বা সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থাকারে তাঁদের বাঙ্গালা রচনা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে-ও তখনকার শিক্ষিতসাধারণ মাতৃভাষাকে গর্ভধারিণীর সঙ্গে অন্দরের গণ্ডীর মধ্যে-ই আবদ্ধ রেখেছিলেন; নিজের বাপ-ই পত্রস্থ হতেন 'মাইডিয়ার ফাদার' ব'লে, তা অন্যে পরে কা কথা।

ঘরের এই উপেক্ষিতা বাণীটিকে সমাজে তুলে ধরে, বঙ্গ-সাহিত্যাশ্রমের কুলপতি বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্যের পূজামণ্ডপে বঙ্কিমচন্দ্র-ই প্রথমে দুর্গোৎসবের আনন্দরবে সমগ্রদেশকে উদ্বোধিত করেন।

আজকাল শুনতে পাই, নবনব্যবঙ্গের চক্রবিশেষে কথা উঠেছে যে, বঙ্কিমের ভাষা আর চলে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে বলতে হবে যে, জাহ্নবীজল-ও এখন অচল,যতক্ষণ না দ্রবময়ী বিলাতীকলের আকর্ষণে লৌহনলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দ্বিতলের মর্ম্মরমণ্ডিত স্নানাগারে উঠে সাবান-মার্জ্জিত সফেন কেশতরঙ্গের উপর ক্ষীণধারা বর্ষণ করেন। কবি ব'লে গেছেন:—

"We call our fathers fools so wise we grow,
Our wiser sons will also call us so."

ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নবীন চিন্তার ধারা আপনার দেশের ভাষায় প্রকাশ করতে, বঙ্গসাহিত্যকে জাতীয় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করতে প্রথম প্রবৃত্তি দিয়ে যান, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর একাশ্রমী সুহৃৎ কতিপয়। মেঘনাদ-রচয়িতা মধুসূদন যেমন কাশীরামদাস কৃত্তিবাস হ'তে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত বঙ্গের পূর্ব্ব-তন কবিগণের চরণে মস্তক অবনত ক'রে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন, শিষ্টাচার নবীন লেখক-সমালোচকদিগকে সেই কবিশ্রেষ্ঠের পথানুসরণ করতে ইঙ্গিত করে।

সেই পুণ্যাত্মগণ-প্রবর্ত্তিত ঘৃতপ্রদীপের মঙ্গলশিখাই নবাগতের মস্তিষ্কে মোমবাতির কল্পনা জাগ্রত করে; মোমবাতি ব'লে দেয়, গ্যাসের সম্ভাবনা, পরে ক্রমবিকাশে সেই গ্যাস আজ বিজলী-আলোকে বঙ্গের কাব্যসাহিত্যকে দৈবজ্যোতিতে বিভাসিত করেছে।

স্বনামধন্য অনেকগুলি মনীষীর প্রতিভা আজ বাঙ্গালা ভাষাকে জ্ঞানরাজ্যের এই বরণীয় আসনে উন্নীত করেছে; তন্মধ্যে কয়েকটি পুণ্যনাম স্মৃতি, লোক-শ্রুতি ও ইতিহাসে সুস্পষ্ট। জনকস্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়; সৌষ্ঠব-সম্পাদনে সপুত্র মহর্ষি ও অক্ষয়কুমার দত্ত; সালঙ্কারা কন্যা সৎপাত্রে সমর্পণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র; আর ভাষাদেবী এক্ষণে যে বিশ্ববিদ্যালয়-রাজসংসারের পাটেশ্বরীগণের মধ্যে অন্যতমা, তা মুখোপাধ্যায়-কুলাঢ্য সার আশুতোষের ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে।

কথা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য-বাহুল্য-ই এক্ষণে বঙ্গভাষাকে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সমাদৃত করেছে। সংস্কৃতের ভূরিভোজনে নবীন গদ্যের ওজন যখন এমন ভারি হয়ে উঠ্‌ছিল যে, তুলাদণ্ডের বিপরীত দিকে কথায় কথায় অভিধানের বোঝা চাপিয়ে পাষাণ ভেঙ্গে না নিলে বাগর্থ সমান বুঝে আর ভার-গ্রহণ করা সম্ভব হ'ত না; পাঠ-ব্যায়ামরূপ শ্রমসাধনে বাল-বিদ্যার্থী ভিন্ন অপর সাধারণে সে মল্লভূমিতে প্রবেশ করতে সহজে রাজি হতেন না, তখন টেঁকচাঁদ নামধারী স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরে দুলাল' রচনা করেন; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়, বাঙ্গালা বৃহৎ মহাভারত প্রণয়নে অমর কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। সেই সময়ের এই দুই খানি পুস্তক অতি উচ্চ-শিক্ষিত হ'তে বর্ণমালার সহিত পরিচিত মাত্র সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ের আদর অধিকার ক'রে বসে। সংসারের নিত্য ঘটনার বাস্তব চিত্র প্রদর্শনে, লোকালেখ্য-লিখনে ও ব্যঙ্গ-শ্লেষের রঙ্গ-মাধুর্য্যে পুস্তক দু'খানি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হলে-ও ভাষা-ঠাকুরাণীর শ্রীঅঙ্গ হ'তে সংস্কৃতের অলঙ্কার দূরীকরণের প্রয়াসে মাকে যে কেবল সাড়ী-শাঁখায় সাজান হয়েছিল, তা নয়; মাঝে মাঝে যেন তাঁর কোমরে গামছা পর্য্যন্ত জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারা যায়।

সেই সময় হ'তে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিবিধ বিচিত্র বেশ-পরিবর্ত্তনে ভাষার শিঙার সাজ চল্‌ছে এবং চল্‌বে যত দিন বাঙ্গালীর প্রাণে ভাব ও রসনায় রব থাকবে। সকল যুগের সকল দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এই বিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান

করে। বৈদিক ভাষার সঙ্গে রঘুবংশের ভাষার জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু অশৌচ স্পর্শে না, কবিকঙ্কণের পদ্যে ও রবীন্দ্রনাথের পদ্যে-ও ঐরূপ কুটুম্বিতা। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী গদ্য পদ্য বুঝতে হ'লে এখনকার ইংরাজকে-ও টীকাকার খুঁজে বেড়াতে হয়। এই সে দিনকার কথা, আমাদের পাঠ্যাবস্থায় মেকলে-এমারসনের আদর্শ যেরূপ আদৃত হ'ত, বিংশতি শতাব্দীর ছাত্রগণের কাছে তার আর সে আদর নাই। ব্রাউনিংএর ফ্রাউনিংএ যে সোনার বায়রণ-ও বুঝি কলেজ স্কোয়ারের মোড়ের পুরানো আয়রণের দোকানে স্থান পায়। সিংহ মহোদয় তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার' ভূমিকায় লিখেছিলেন যে, বাঙ্গালা বেওয়ারিশ ভাষা; ছোট ছেলেরা যেমন একটু মাথা ময়দার নেচি পেলে যা ইচ্ছে তাই কতকগুলো গ'ড়ে ফেলে, কোন কোন গ্রন্থকার ভাষার সেইরূপ শ্রাদ্ধ করেন। এক্ষণে-ও যে সেইরূপ লেখক-শিশু দেশে নাই, এ কথা বলা যায় না; কিন্তু তার জন্য কার-ও আশঙ্কা পাবার আবশ্যক নাই; কেন না, নাবালক অবস্থার ছেব্‌লামি সাবালক হ'লেই কেটে যায়, তখন সে পৈতৃক সম্পত্তি বেশ হিসাবের সঙ্গে বুঝে নিতে পারে।

আজ তাদের সাধের সাহিত্য-গৌরবে বঙ্গবাসী ন্যায্য প্রাপ্য গরবে গর্ব্বিত। গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে বাঙ্গালা পুস্তকাশ্রম ও পাঠাগার। মাতৃবাসে বা প্রবাসে, চট্টগ্রাম হ'তে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বাঙ্গালীর নিবাস উপনিবেশ আছে, পুণ্যব্রত পালনের ন্যায় সেই সেই স্থানেই বৎসরে বৎসরে সাহিত্য-সম্মিলন সংঘটিত হয়। সাহিত্যভক্ত-পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে ধন্য হবার জন্যই এই দীন প্রাচীন আজ ময়মনসিংহের বাণী-তীর্থে এসেছে।

ধর্ম্মের ন্যায় আমার মনে ধারণা দৃঢ় যে, সাহিত্যের শক্তি, সাহিত্যের মর্য্যাদাই বাঙ্গালী জাতিকে জগতের চক্ষুতে বরেণ্য ক'রে দেবে। হিন্দু সরস্বতীনামা নারী-প্রতিমার পদতলে ব'সে বিদ্যার আরাধনা করে। স্ত্রীশিক্ষা এ দেশে একান্ত বিদেশী আমদানী নয়। পঞ্চশত বর্ষাধিক পূর্ব্বে আপনাদিগের এই ময়মনসিংহের কাব্য-তপোবনে কবি-তপস্বিনী চির-কৌমারব্রত-ধারিণী চন্দ্রাবতী আবির্ভূতা হয়েছিলেন; বঙ্গের অন্যান্য চক্রে-ও শিক্ষিতা ও অক্ষরজ্ঞানবিহীনা অনেক গ্রাম্য কবি নারীরূপে দেখা দিয়ে গেছেন। বর্ত্তমানে আবার সেই দেবীরা লেখনী-ধারিণী, ভাবোচ্ছ্বাসের গীতে মাতৃভূমি-পূতকারিণী। সাহিত্যের একজায়ে হিন্দু-মুসলমান তরুণ নরনারীরও জাতি-সমন্বয়-ও হয়ে যাচ্ছে; এ জোড়কলমে সমজাতীয় রসে রসে মিশে একতার মধুফল ফল্‌বে।

আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখছি যে, অদূর-ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষ শিষ্ট-সাহিত্যের সম্মানে বঙ্গবাণীকে সমাদৃত করবে। আমি প্রথমেই বলেছি যে, কালপ্রভাবে রুচিভেদে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশভূষা অলঙ্কারাদি নূতন নূতন ছাঁচে গঠিত হলে-ও কি প্রাচীন ও কি নবীন বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ প্রেমের রূপান্তর মাত্র। সাহিত্যের সারথ্যে আমাদের প্রেমের রণ-রথ ভারত-ভ্রমণ ক'রে হিন্দুস্থানের মর্ম্মস্থানে বিজয়-পতাকার দণ্ড প্রোথিত করবে।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।




মাসিক বসুমতী

৬ষ্ঠ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বসন্ত

জীবন-মরণের বাজায়ে মঞ্জুরী
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হোলো ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
আজিকে আলো-ছায়া করিছে কোলাকুলি,
আজিকে এক-দোলে দুজনে দোলাদুলি
শুকানো পাতা আর মুকুলে।
আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে
জড়িত পাশাপাশি নূতনে পুরাতনে
চিকন শ্যামলের দুকূলে॥

DOUBLE COLOUR PAGE

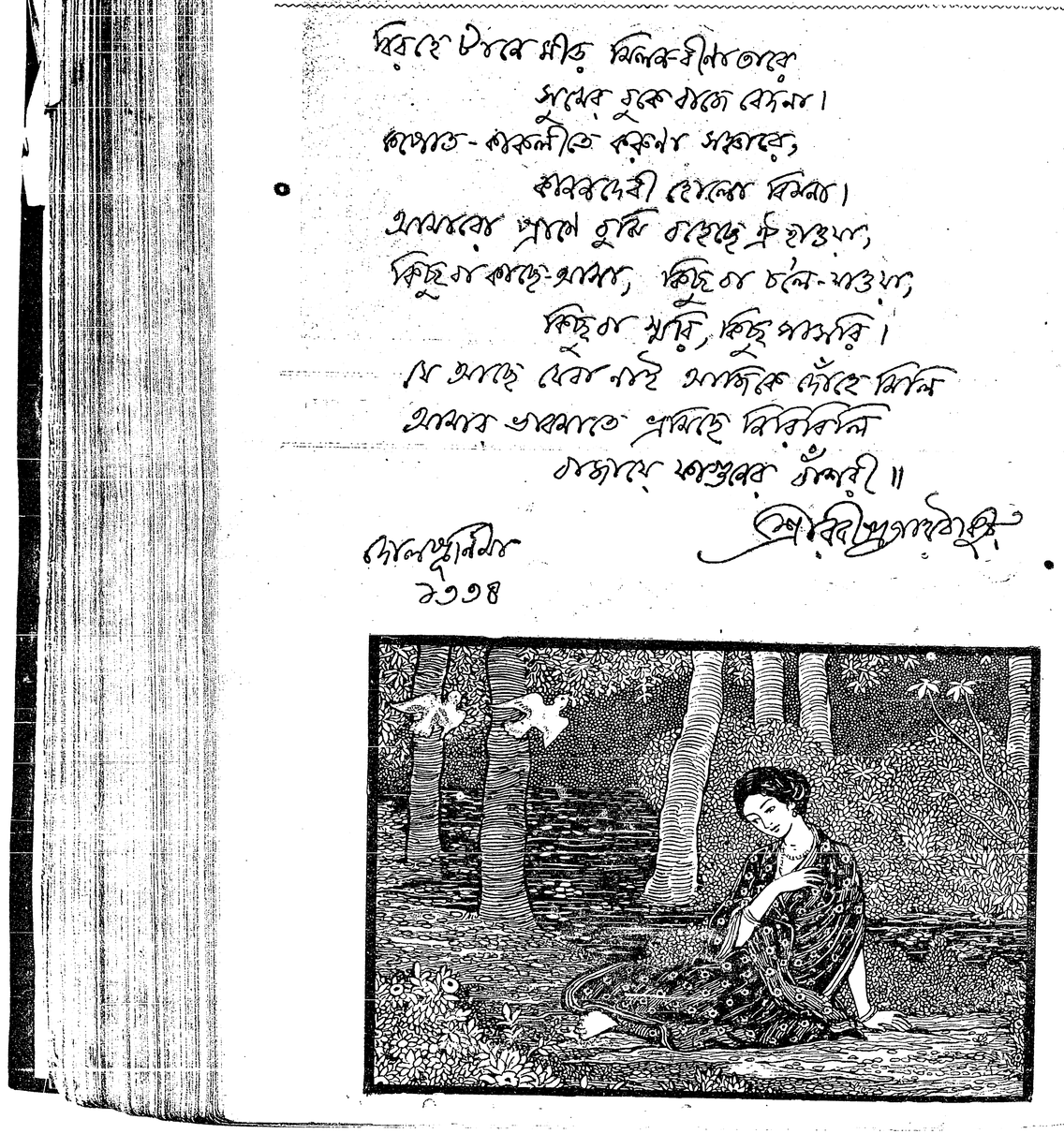

খাদ্য-সমস্যা

২

চা-পান না বিষপান

ইতঃপূর্ব্বে "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধের পর আমি ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছি। চা-পান করার ফলে দেশের লোকের অর্থের ও স্বাস্থ্যের যে কি শোচনীয় অবস্থা, কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। নগর, পল্লী, অন্তঃপুর—সর্ব্বত্রই চা প্রচণ্ড বিক্রমে অভিযান করিতেছে—সারা বাঙ্গালা দেশের নর-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা এই বিষপান করিয়া হৃতস্বাস্থ্য হইতেছে, ইহা অত্যুক্তি নহে। এক রকম ক্ষয়রোগ আছে, ডাক্তারগণ তাহাকে 'গ্যাল্‌পিংথাইসিস্' বা রাজযক্ষ্মা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ব্যাধি রোগীকে লাফে লাফে আক্রমণ করিয়া থাকে। চা-পানরূপ ব্যাধিও এইভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে।

সাহিত্য জাতির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে—জাতীয় জীবনের চিত্র সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, অথবা সাহিত্যের প্রভাব জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার অসংখ্য নাটক, উপন্যাস, গল্প এখন চা-পানের উল্লেখ এবং মনোজ্ঞ বিবরণ না থাকিলে 'ফ্যাশন' হয় না। কথা-সাহিত্যে চা এখন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। ল্যাবরেটরীতে ৪।৫ ঘণ্টা ধরিয়া কায করিয়া নানাপ্রকার গ্যাস ও বাষ্পের ঘ্রাণে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে, আমি মুক্ত বাতায়নযুক্ত উপরের ঘরে আসিয়া ইতিহাস, জীবন-চরিত প্রভৃতি এক ঘণ্টা ধরিয়া পাঠ করিয়া থাকি। ইহার প্রভাবে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি পড়িবার আগ্রহ থাকিলেও এই বৃদ্ধবয়সে—জীবনের অপরাহ্ণে আর তেমন গল্পের কথা-সাহিত্যের মোহে জড়াইয়া পড়িবার অবকাশ হয় না। এখন উপন্যাসাদি পাঠ এক প্রকার বন্ধ বলিলেও চলে। কিন্তু যে ব্যক্তি চায়ের ভক্ত, তাহার নাসারন্ধ্রে চায়ের গন্ধ প্রবেশ করিলেই যেমন সে ব্যগ্র আগ্রহে চা-পানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন বা পুরাতন গল্প বা উপন্যাস পাইলে আমার মনও তেমনই বিচলিত হয়। তখন তাহা পাঠ না করিয়া আমার নিস্তার হয় না।

সম্প্রতি "শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব্ব" পড়িতে পড়িতে যে যে স্থানে চা-পানের উল্লেখ আছে, তাহা আমি চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। ৪০ পৃষ্ঠায় দেখি, সাধুজী বলিতেছেন, 'এক ঘটি জল নিয়ে আয়, চা খেতে হবে।' বলিয়া পাত্রটি তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া সম্মুখের এক জন প্রৌঢ় গোছের লোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'মোড়লের পো, কাছাকাছি কার গরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, এক ছটাক দুধ চেয়ে আনি।' ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে, 'গাবে আমার ওখানে? চা খেয়ে আস্‌বে?' ৮৮ পৃষ্ঠায় রাজলক্ষ্মী বলিতেছে, 'যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস—তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।' ১৮২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, 'রতন চা ও তামাক দিয়া গেল।' ১৯১ পৃষ্ঠায়, রাজলক্ষ্মী রতনকে কহিল, 'তোর বাবুকে চা দে।' ১৯৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'এইরূপে আমাদের সকালের চা খাওয়ার পালাটা যখন সাঙ্গ হইল, তখন বেলা আটটা।' তার পর, 'আর একবার আমরা চায়ের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া বসিলাম।' ২০০ শত পৃষ্ঠায় রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'কই তোমার চা এখনো ত আনলে না?'

শরৎ বাবুর আর একখানি উপন্যাস হাতের কাছেই রহিয়াছে। "পরিণীতা" হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাউক। প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইয়াই দেখি, "ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'মামা, চা আন্‌ছি, ওঠ।' চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার অর্দ্ধেক জ্বালা যেন নিবিয়া গেল।" ৩০ পৃষ্ঠায় দেখি, গুরুচরণ "সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ তিনি গিরীনকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। আফিস হইতে ফিরিতেই তাহার দিবা অবসান হইয়া যাইত। হাত-মুখ ধুইয়াই বলিতেন, 'ললিতে, চা তৈরি হ'ল মা? কালী যা যা, তোর গিরীন-মামাকে এইবার ডেকে আন।' তার পর উভয়ে চা খাওয়া এবং তর্ক চলিতে থাকে।" যাহা হউক, এক স্থানে দেখিয়া

আশ্বস্ত হইলাম যে, এক জন শিক্ষিত প্রধান নায়ক চা-পানে বিমুখ। ৪০ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, "ললিতা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, 'শেখর দা, চা খান না।' গিরীন আর কিছু বলিল না। ললিতার নিজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শেখর নিজেও এটা খায় না, অপরে খায়, তাহাও ইচ্ছা করে না।" ৫৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "তখন গুরুচরণের বাহিরের ঘরে প্রাত্যহিক চা-পানের সভা বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত হাসি ও কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।"

উল্লিখিত নায়ক-নায়িকারা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারা বিলাত-ফেরত এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নহেন। নায়ক-নায়িকা যে গ্রন্থে এই শ্রেণীর অন্তর্গত, সেখানে চায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডকরণের চমৎকার ব্যবস্থা আছে। শুধু "গৃহদাহের" উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলিয়াছি, ইংরাজী বণিক যেমন আগে চার ফেলিয়া পরে বঁড়শীতে শিকার গাঁথিয়া তুলে, চায়ের এমনই মনোমুগ্ধকর গন্ধ যে, বঁড়শী ফেলিবামাত্র আমরা বিনা দ্বিধায় উহা গিলিয়া ফেলি। দেখিতেছি, "শ্রীকান্তেই" শরৎচন্দ্র ঠিক তেমনই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—"বঁড়শীতে টোপ গেঁথে জলে ফেলা যেমন মাছের সাদর নিমন্ত্রণ।" (১৫৪ পৃষ্ঠা)

বড় দুঃখেই বলিতে হইতেছে, হায় শরৎচন্দ্র! তুমি নিজের অজ্ঞাতসারেই এই অর্থ-গৃধ্নু বৈদেশিক বণিকের সাদর নিমন্ত্রণের দালাল হইলে! অবশ্য, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না যে, তিনি বৃত্তিভোগী হইয়া দালালী করিতেছেন। যাঁহার গ্রন্থ রাজদ্রোহোদ্দীপক বলিয়া বাজেয়াপ্ত হয়, তিনি যে সত্যই চা-সমিতির (Tea Association) দালাল, এ কথা কেহ বলিবেও না, বিশ্বাসও করিবে না।

শুধু শরৎ বাবুকেই বা বলি কেন, অধুনা বঙ্গভাষার কথাসাহিত্যে অনেক প্রবীণ ও নবীন লেখকের রচনাতেও চা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছেন। চা না হইলে গল্প জমে না, আর্টের লীলায়িত গতির প্রকাশ হয় না, লেখকের রচনার আধুনিকতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয় না।

বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। ইহার মনোবৃত্তির উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারিলেই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা সম্ভব। কোনও জেতা যদি বিজিত জাতির মনের উপর সূক্ষ্মভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জয়লাভের চেষ্টা সার্থকতার দ্বারা মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। আপাতদৃষ্টিতে সে জয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট না হইলেও উহার প্রতাপ অমোঘ, শক্তি অব্যর্থ এবং বহু-দূরপ্রসারী। ইহাকে ইংরাজীতে Cultural Conquest বলে। ইংরাজ আমাদিগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, এক কথায় আমাদের মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, Physical conquest— বহিরঙ্গের জয় (সৈন্য, এরোপ্লেন প্রভৃতি দ্বারা) তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

কলিকাতার যে সব নন্দদুলাল—ননীর পুতুল ছেলেরা মেসে থাকেন এবং অভিভাবকগণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহাদিগের বিলাসিতার বহর দেখিলে হৃদয়ে বেদনা পাইতে হয়। তাঁহারা স্বয়ং কাপড় কাচিতে পারেন না এবং সাধারণ রজক বস্ত্র ধৌত করিয়া দিলে তাঁহাদের মনঃপূত হয় না। তাই এখন 'ডাইং ক্লিনিং'এর দোকান পল্লীতে পল্লীতে বিরাজিত। আহমদান কাল হইতে যে নরসুন্দর-সম্প্রদায় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণ এখন আর নব্যসম্প্রদায়ের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষসাধন করিতে পারিতেছে না। তাহারা কাঁচি ধরিয়া চুল ছাঁটিলে কেশবিন্যাসের সম্ভ্রমচ্যুতি ঘটিবে—সভ্যতার হানি হইবে। অতএব প্রত্যেক পল্লীতে "হেয়ার কাটারের" সভ্যতাসঙ্গত বিপণি গজাইয়া উঠিতেছে! সে দৃশ্যে কাহারও মনে ব্যথার সঞ্চার হইলেও বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়? নিজ হস্তে এক বেলা রন্ধন করিতে হইলে এই ননীর পুত্তলীদিগকে মূর্চ্ছা যাইতে হয়, এ কথা অতিরঞ্জিত নহে। বাজারের তৈয়ারী খাবার অর্থাৎ বিষ তাঁহারা কিনিয়া খাইবেন, তথাপি ডালভাত সিদ্ধ করিয়া লইতে পারিবেন না। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহাদের নিপুণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেসের ঘরে ঘরে বিলাতী ষ্টোভ্, বিলাতী জমাট দুগ্ধ বিদ্যমান। প্রত্যহ তিনবার, চারিবার অথবা পাঁচবার চা সেবন না করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন হয় না! অনেকে আমায় বলেন, "মহাশয়, যদি দিনের মধ্যে এক আধবার একটু চা-পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায়, তাহাতে আপনার আপত্তি কি?" কিন্তু প্রকৃতই এই প্রকার সংযমী হইয়া কয় জন থাকিতে পারেন? প্রায় দেখিয়াছি, যে গৃহে একবার চা

প্রবেশ করিয়াছে, তথায় সে অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। সে গৃহের আবাল-বৃদ্ধবনিতা—মায় দাসদাসী পর্য্যন্ত চায়ের অনুরক্ত ভক্ত। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীরাও প্রহর প্রহরে চা না পাইলে পৃথিবী অন্ধকার দেখেন—বাবুদের কথা আর না-ই বা বলিলাম।

যাঁহারা দেশের কথা চিন্তা করেন, জাতির ইষ্টানিষ্টের কথা ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা এই "Cultural conquest"-এর কথাটা একবার গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ধীরে ধীরে জাতির মনকে অধিকার করিয়া পরপ্রভাব কিরূপে অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য।

ইংলণ্ডের এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক—জে, ওয়ালটার ফার, এম্ ডি, এফ, আর, সি, পি (লণ্ডন) চা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

'Tea if specially taken on an empty stomach does seriously affect digestion * * Even properly made tea, if taken in large quantities (and in some individuals in quite small amount), may lead to indigestion, general nervousness, palpitation, giddiness and insomnia. It necessarily does harm if taken instead of food or to mask the effects of fatigue, and so enable a man to go on working when his brain really needs rest."

ইহার ভাবার্থ এই যে, চা খালিপেটে সেবন করিলে ক্ষুধামান্দ্য হইবে। যথাপযুক্তরূপে চা প্রস্তুত হইলেও যদি অধিকপরিমাণে উহা সেবন করা যায় (কাহারও কাহারও পক্ষে অল্পপরিমাণ হইলেও), তাহা হইলে অজীর্ণ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মাথা ঘোরা, হৃৎস্পন্দন এবং অনিদ্রারোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে অথবা শ্রমাপনোদনের অছুহতে চা-পান করিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। যখন মস্তিষ্কের বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন, চায়ের উত্তেজনা তাহাকে কায করাইয়া লয়।

চারি পয়সা দিয়া দোকান হইতে এক পেয়ালা চা-পান করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করার পরিবর্ত্তে ঐ মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা উদরপূর্ত্তি করা যায়। আমি পূর্ব্বে প্রাতঃকালে পাঁউরুটী খাইতাম। এখনও দেখি, গ্রেট ইষ্টার্ণের রুটী মোটরযোগে বোঝাই হইয়া কলিকাতার উত্তরাংশে অর্থাৎ বাঙ্গালীটোলায় সরবরাহ করা হয়। যখন আমি বুঝিলাম, মুড়ি, চিঁড়া রাসায়নিকের নিকট বিস্কুট ও পাঁউরুটী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, তখন হইতে আমি দেশীয় মুড়ি-চিঁড়ারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বিস্কুট, পাঁউরুটী, মুড়ি, চিঁড়া একই শ্রেণীভুক্ত। ইহাকে semi-dextarised starchy food বলে। অর্থাৎ শ্বেতসারের অংশ কিয়ৎপরিমাণে শর্করায় পরিণত হইয়া সহজে পরিপাক হয়। আমি তিন আনা দিয়া আধসের চিঁড়া আনিয়া রাখি। সকালবেলা কিছু চিঁড়া জলে ভিজাইয়া দশ পনের মিনিট পরে দানাদার খেজুর-গুড়ের সহিত মিশাইয়া ভক্ষণ করি। আর উহার সহিত যদি একটু দুগ্ধ ও কদলীর সংমিশ্রণ করা যায়, তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা। ইংরাজী রাসায়নিক ভাষায় ইহাকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন খাদ্য (perfect food) বলা যায়। তবে দুগ্ধ সকলের পক্ষে সহজপ্রাপ্য নহে—বিশেষতঃ কলিকাতায়। সুতরাং তাহা বাদ দিলেও আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আমার প্রত্যহ দুই পয়সার বেশী ব্যয় পড়ে না।*

যাঁহাদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য-রক্ষার ভার, তাঁহারা কি মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইবেন না? আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিলে জাতির কল্যাণ নাই, এ কথা তাঁহারা না বুঝিলে কে বুঝিবে?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

* আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে সন্ধান করিয়া দেখিলাম, তিনি একটি টিনের কৌটায় চিঁড়া ও বোতলে দানাদার খেজুরের গুড় (তাঁহার জন্মভূমি খুলনা জিলা হইতে আনীত) রাখিয়াছেন। মাঃ বঃ সঃ।



মেঘ-মুক্তি

ঊষার কথা

প্রত্যাখ্যানের দারুণ লজ্জা ও অপমানের জ্বালার মধ্যে কয়টা দিন কাটিয়া গেল! উত্তেজনার প্রথম প্রবাহের বেগ অন্তর্হিত হইয়া গেলে দেখিলাম, মন যেন কি রকম একটা ভাব পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুখ ও দুঃখে মিশ্রিত সে এক বিচিত্র অনুভূতি! মোহিত-দার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়াছি কি আমার মুক্তির অসীম আনন্দ তাহাতে গুপ্ত ছিল, প্রথম মুহূর্ত্তে ত সেটা ধরিতে পারি নাই। যে দিন এ কথা বুঝিলাম, তখন আমার মন এক অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরিয়া গেল! সেই শান্তি-পূর্ণ অবস্থায় সংসারে আর কাহারও উপর আমার রাগ বা অভিমান থাকিল না। মোহিত-দাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সে দিন ক্ষমা করিলাম!

সে দিন আমি বুঝিলাম, আমাদের উভয়ের মিলনের মধ্যে যে মস্ত বড় ফাঁক আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া মোহিত-দা সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে তাহার কোন অন্যায় হয় নাই। এক দিন আমিও ত আমার অন্তরের এই ভুল ধরিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিবার মত সাহস আমার ছিল না; তাই আমি সব জানিয়াও জীবন ভোর এই ভুলের জের টানিয়া চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। নরেশ-দা যে বলেন, মেয়েরা কোন দিন বিচার করিয়া দেখে না; তাহারা নিজের সেন্টিমেণ্টের বশে চলে, সে কথা খুব সত্য! তাই আজ আমি মোহিত-দার উদ্দেশে বার বার মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। এই জীবনব্যাপী মিথ্যার জাল হইতে সে আমায় মুক্তি দিয়াছে। নির্ভীক—সত্য-পথের পথিক! তোমায় নমস্কার! আমার অতীত জীবনের নিত্যসঙ্গী! আমার বন্ধু, স্নেহের সাথী আমার! তোমায় নমস্কার! তুমি প্রসন্ন থাক, তুমি সুখী হও! যাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহাকে লইয়া যেন তোমার জীবন কল্যাণে প্রেমে সার্থক ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে!

নরেশ-দা সেই প্রথম দিন ছাড়া মোহিত-দার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই। তিনি তাঁহার বিচারবুদ্ধিতে এটা উচিত কায জানিয়া সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিদি ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না। অমিয়া-দি অত শত বুঝে না; সে বেশ প্রসন্নভাবেই আমায় বুঝাইত—"তোর পক্ষে এটা শাপে বর হয়েছে! তোর গলার ফাঁস খুলে গেল, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে হাসিখুসি কর্! অজিত-বাবু কত কাল আর বাইরে থাকবেন? এখানেই তাঁর কায-কর্ম্ম, এইখানেই বাস, ফিরতে ত এক দিন হবেই! মনটা খারাপ হয়েছিল, তাই কিছু দিন বাইরে গেছেন বৈ ত নয়?" নিজের এই সিদ্ধান্তে সে খুসি হইয়া উঠিল। কিন্তু আমরা সকলে এ বিষয়টাকে সহজভাবে গ্রহণ করিলেও আর সকলে ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কথাটা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার পর হইতেই আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিরন্তর যাতায়াত ও অযাচিত সহানুভূতির জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম! তাঁহারা সকলেই একবাক্যে মোহিত-দাকে ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করিয়া তাহার অজস্র নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপেগুণে অতুল্য মেয়ের ভাগ্যে যে এত বড় অপমান ও লজ্জা তোলা ছিল, এই সব নানা কথা নানা ছাঁদে বর্ণনা করিয়া তথাকথিত সহানুভূতির দ্বারা আমার লজ্জার মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে এ ঘটনা যতই সহজ ও শান্ত ভাবেই গ্রহণ করি না কেন, সামাজিক দিক দিয়া ইহার মধ্যে যথার্থই যে অবমাননার অবকাশ ছিল, তাহা ত অস্বীকার করা যায় না? তাই অনুক্ষণ আমাদের হিতৈষীদের সহানুভূতি ও আলোচনার প্রসঙ্গে ইহার স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে আমাদের সম্ভ্রম ও আত্মসম্মানে আঘাত করিত। আমি অবশেষে বিব্রত হইয়া নিজের ঘরেই আশ্রয় লইলাম। সহজে আর কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে চাহিতাম না।

দিদি বেচারা আমার মত অন্তরালে থাকিতে পারিত না। কাযেই সব তাল তাহাকেই সামলাইতে হইত; সুতরাং তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নরেশ-দা আমাদের দুই জনকে লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন।

তিনি এক দিন আমায় বলিলেন, "মোহিতের ব্যবহারে তুমি কি সত্যই অত্যন্ত আঘাত পেয়েছ, ঊষা? আমার ত বিশ্বাস, সে বিশেষ কিছু অন্যায় করে নি। এ ক্ষেত্রে তার যা উচিত ছিল, তাই করেছে!"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হঠাৎ কি উত্তর দিব, মাথায় আসিল না।

নরেশ-দা একটু অপেক্ষা করিয়া আবার বলিলেন, "অবশ্য এ বিষয়টা আমাদের কাছে যাই হোক্, তোমার কাছে এর দাম অনেক বেশী। তাই তুমি যদি মনে কর যে, সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে, তোমার বিশ্বাস নষ্ট ক'রে তোমাকে প্রতারণা করেছে, তা হ'লে—"

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "তিনি আমায় প্রতারণা করেছেন, এ কথা আমি কোন দিনই মনে করি নি। আমারও আপনার মত বিশ্বাস যে, তিনি যা কর্ত্তব্য ব'লে বুঝেছেন, সেইমত কায করেছেন। সত্যই বলছি, তাঁর উপর মন থেকে আমার কোন বিরাগ নেই।"

নরেশ-দার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এই ত ঠিক তোমার মত কথা! তোমার কাছে আমি এই রকম উত্তরই আশা করেছিলুম; কিন্তু তাই যদি হয়, যদি তোমার মনের শান্তি অব্যাহত থাকে, তবে বাইরের দিক থেকে এ জিনিষটাকে এত বড় ক'রে নিয়েছ কেন? যেন তাই কি একটা মহালজ্জাকর কাণ্ড ঘটেছে। আর সে জন্য যে লজ্জা ও দোষ যেন তোমারই, এই ভাব নিয়ে সকলের কাছে কুণ্ঠিত থেকে মাথা নীচু ক'রে বেড়াচ্ছ। এটা আমার চোখে বড় লাগে! মন থেকে এ সব বুঠা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে থাক, তোমার পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ ফিরে আসুক, আমি এই চাই! সত্যই ত একটা এমন কিছু অন্যায় ঘটে নি—যার জন্য তোমায় এমন ভাবে থাকতে হবে? ক'দিনে কি চেহারা করেছ দেখ দেখি?"

নরেশ-দার কথার মধ্যে যেন তাঁহার সবল মার্জ্জিত মনের শক্তি নিহিত থাকে! তাঁহার কথা শুনিলে সত্যই যেন দীন অবশ মনও সুস্থ হইয়া উঠে, আমি তাঁহার কথায় মন হইতে বড় স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম পাইলাম। বলিলাম, "আমি ত সেই রকমই থাকতে চাই, নরেশ-দা; কিন্তু যাঁরা সব এখানে আসেন, তাঁরা এই সব কথা এমন ক'রে বলতে থাকেন যে, সে সব শুনতে শুনতে বড় লজ্জা হয়। তাই ও-সব যায়গায় থাকতে পারি না, উঠে আসি!"

নরেশ-দা আমার মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সে আমি বুঝেছি। ওঁরা ভাবেন, এতেই তুমি খুব সান্ত্বনা পাবে! আমি কিন্তু তোমার ব্যবহার দিয়ে ওঁদের বোঝাতে চাই যে, তোমার সান্ত্বনা পাবার কোন প্রয়োজন হয় নি। না হোক্, ওগুলো অত্যন্ত তুচ্ছ ও সাময়িক ব্যাপার। এ সব ঘটনায় ও রকম দু' চার দিন হয়েই থাকে। তার জন্য এত মন খারাপ ক'রে শক্তিক্ষয় করতে নেই। আমি বলি—আমাদের পড়াশুনা বা বেড়াতে যাওয়া এ সব বন্ধ ক'রে খালি একটা বাজে বিষয় নিয়ে ঘরের কোণে প'ড়ে থাকবার দরকার কি? আবার আগের মত আমাদের সব নিয়ম অনুযায়ী কায হবে!"

নরেশ-দার কথায় আমি আপত্তি করি নাই, কিন্তু দিদি কিছুতেই কোন বিষয়ে সাড়া দিত না। কোথাও বেড়াইতে যাইবার কথা তুলিলেই সে শরীর অসুখের কথা বলিয়া কাটাইয়া দিত। নরেশ-দা কোন ভাল বিষয় পড়িয়া শুনাইতে বসিলে সে এমন নিস্পৃহভাবে চুপ করিয়া থাকিত যে, তাহাতে পড়া আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিত না। সে নিজে কিছু পড়া-শুনা বা গান-বাজনার চর্চ্চা করা বহুদিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। কাযেই নরেশ-দার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না।

অমিয়া-দিও আমাদের আশা একবারে ছাড়িয়া দিল। দিদি ত তাহার সঙ্গে বেশী মিশিতই না; আমি অবশ্য সে রকম ব্যবহার করি নাই, কিন্তু এ রকম আলাপে তাহার তৃপ্তি হইত না। সে আমাদের বাড়ী আসা প্রায় ছাড়িয়া দিল।

শোক, দুঃখ, চিন্তা যতই মানুষের মনকে অভিভূত করুক, যত দিন যায়, ততই মানুষ নিজের অন্তর হইতে নিজেই শান্তি পায়। সময়ের মত এমন শান্তিপ্রদ মহৌষধ আর কিছু নাই। মোহিত-দার চিঠি আসিবার পর হইতে আমাদের উপর দিয়া যে একটা আকস্মিক ঝড় বহিয়া গিয়াছিল, তাহার প্রকোপ ক্রমে ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। আমার বিক্ষুব্ধ চঞ্চল মনও আবার ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন আবার যে চিন্তা

জাগ্রত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে—সর্ব্বক্ষণই আমার অন্তর পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সর্ব্বগ্রাসী চিন্তা আবার ধীরে ধীরে আমার সমগ্র চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

কে বলে ভালবাসা ভোলা যায়? যে প্রেম মানুষের অন্তরতলে জাগ্রত থাকিয়া তাহার চিত্তের সমস্ত চিন্তায়, সব কল্পনায়—তাহার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া থাকে, সে প্রেম কে ভুলিতে পারে? মানুষ জীবনে একবারই ভালবাসিতে পারে। সে প্রেম অমর—অবিনাশী; সেই সত্যকার প্রেম যাহার অন্তরে জাগে, শত ঘাত-প্রতিঘাতেও সে প্রেম নষ্ট হয় না।

সে দিন আবার পূর্ণিমা তিথি ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার তেমনই চারিদিক জ্যোৎস্না-প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে। আমি সন্ধ্যা হইতে একা নিজের ঘরে বসিয়া কত কথা ভাবিতেছিলাম। অমিয়া-দি সে দিন অন্য ঘরে অর্গানের সুরে 'মায়ার খেলার' একটি গান গাহিতেছিল, "এসো এসো বসন্ত ধরাতলে!" তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমরা সবাই মিলিয়া এবার 'মায়ার খেলা' বইখানা অভিনয় করি। সে নরেশ-দা ও অজিত বাবুকেও ভূমিকা গ্রহণের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সকলের একরকম মতও হইয়াছিল। তবে আশ্বিনে গোল-যোগ হইয়া যাওয়ায় সব পণ্ড হইয়া গেল। তাই আমাদিগকে দলে না পাইয়া সে ক্ষুণ্ন মনে নিজেই মাঝে মাঝে গানগুলির সুর ঠিক রাখিবার চেষ্টায় সন্ধ্যাটা কাটাইয়া দিত।

তাহার গানের সুর আমার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। শেষে ঘরে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না। আমি ছাদে আসিয়া বসিলাম, এমনই চাঁদের আলোয় ভরা এক মধুর রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হইয়াছিল! তাহার পর আর এক পূর্ণিমা—এমনই অফুরন্ত রজত-ধারা সে রাত্রিতেও পৃথিবীর অঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল। সেই বিশ্বভরা বিরাট সৌন্দর্য্যের গভীর স্তব্ধ মৌনতার মাঝে এ যাত্রা আমার প্রেম-ব্রতের উদ্‌যাপন হইয়া গিয়াছে।

চাঁদের আলোর মধ্যে কি মাদকতা আছে, কে জানে! কেন এ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রিতে মানুষের মন এত আকুল হইয়া উঠে? বিগত দিনের হারানো স্মৃতি—হারানো প্রেম কোন্ কুহকমন্ত্রে জাগিয়া উঠিয়া সব ধৈর্য্যের বাঁধন ভাঙ্গিয়া এমন পাগল চঞ্চল করিয়া তুলে? যাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই, তাঁহার কথাই আজ আমার সারা চিত্ত মথিত করিয়া পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল! আমার ব্যথিত হতাশ অন্তর হইতে উত্থিত আকুল ক্রন্দন আমায় বিবশ করিয়া তুলিল। কোথায়? আজ তিনি কোথায়? যে দিন তিনি নিকটে ছিলেন, সে দিন আমার উদ্যত হৃদয়ের সকল কথা আমায় প্রাণ-পণ করিয়া চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল! সে দিন আমার আপনাকে প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না। আজ আমার সকল বন্ধন খসিয়া পড়িয়াছে, আজ আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন; কিন্তু আজ তিনি কোথায়?

অমিয়া-দি নিজের মনে সুধাসাগর মন্থন করিয়া গাহিতেছিল,—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুম-বনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!"

আমি কিছুক্ষণ কান পাতিয়া তাহার গান শুনিলাম। আমার অশ্রুসমাকুল দৃষ্টির সম্মুখে আমাদের পূর্ব্বদিনের হাসি ও গানে ভরা সন্ধ্যার সভার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল! কত সুখ—কত আনন্দ—কত উৎসবের রাগিণী! আর কি কখনও সেই অতীত দিন জীবনে ফিরিয়া আসিবে? আর কি কখনও তিনি আমাদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আবার ফিরিয়া আসিবেন?

অমিয়া-দি গাহিতেছিল—

"সে দিনও ত মধু নিশি, প্রাণে গিয়েছিল মিশি
মুকুলিত দশদিশি কুসুমদলে
দুটি সোহাগের বাণী হ'ত যদি কানাকানি
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!"

আজ আর এ বুক-ফাটা অশ্রুধারা কোনমতে বাধা মানিল না! আমার একটি কথা, একটি গান শুনিবার জন্য তিনি কি ব্যগ্র কি উন্মুখ হইয়া থাকিতেন! তবু লজ্জায় কোন দিন মুখ ফুটিয়া আমায় কোন কথা বলিতে পারেন নাই! আমি ত সবই বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইলেও মনের সব ভাব চাপিয়া আমায় কঠিন হইয়া নীরব থাকিতে হইত। এত দিন ধরিয়া যে সব ভাব—যে সব কামনা দমন করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ সেই সব অতৃপ্ত নিষ্পেষিত রুদ্ধ বাসনা

সজীব হইয়া উঠিয়া আমায় ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করিয়া তুলিল। সেই ত সবই শেষ হইয়া গেল, দুই দিনের হাসি-খেলা—দুই দিনের আনন্দ সেই ত দুই দিনেই ফুরাইয়া গেল, কেন তবে তৃষাতুর অন্তরকে এত বড় বঞ্চনা করিয়া দুঃখ দিয়াছিলাম?

আবার গানের সুর ভাসিয়া আসিল—

"মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চ'লে!
ছিল তিথি অনুকূল শুধু নিমেষের ভুল
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!"

যে ফিরিয়া যায়, সে কি সত্যই তবে আর ফিরিয়া আসে না? ইহা যদি সত্য হয়, তবে মানুষ কিসের আশায় সংসারে বাঁচিয়া থাকিবে? আজ আমার ব্যথিত আশাহত চিত্ত কিছুতেই এ কথা মানিয়া লইতে পারিল না। আজ আমার মন হইতে কেবলই একটা আকুল আহ্বান উঠিতে লাগিল। 'ফিরে এসো! হে বন্ধু! হে প্রিয়! পূর্ণিমার মধু-রাত্রি আমার ফিরে এসেছে! জীবনের পথ আজ সমুজ্জ্বল—বাধা-বন্ধনবিহীন আমাদের মধ্যের ব্যবধান স'রে গেছে, তবে আজ আর এ দূরত্ব কেন?'

এই যে মানুষের মনের বিষম ব্যাকুলতা—এই যে তাহার অন্তরের একনিষ্ঠ আহ্বান, ইহার কি কোন সার্থকতা নাই? এই প্রাণভরা আহ্বানের শক্তি যদি তাহার বাঞ্ছিতকে কাছে না টানিয়া আনিতে পারে, তবে মিথ্যা এ সংসার, মিথ্যা এ প্রেম, মিথ্যা এ মায়াময় হাসি-ভরা জ্যোৎস্না।

* * * * *

নরেশ-দা আমাদের উভয়ের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সে দিন দিদিকে বলিতেছিলেন, তোমাদের যে দিন দিন কি হচ্ছে, এ ত কিছু বুঝতে পারি না। উষার না হয় একটা কারণ আছে, বুঝি; কিন্তু তুমি কোন কথাই বলতে চাও না। কেন আমায় এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ, মনীষা?"

দিদি চুপ করিয়া রহিল। চাঁদের আলোয় তাহার চেহারাটা অতি পাণ্ডুর, অত্যন্ত কৃশ দেখাইতেছিল।

নরেশ-দা কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কাল একবার আমাদের ডাক্তার মিঃ ঘোষকে ডেকে পাঠাই। তিনি একবার তোমায় পরীক্ষা ক'রে দেখে যান, কেন এত শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে! কেমন?"

দিদি এবার বলিল, "মিঃ ঘোষকে ডেকে কি হবে? আমার ত কোন অসুখ নেই? ভালই ত আছি!"

নরেশ-দা বলিলেন, "ভাল থাকলে এমন চেহারা হয় কখনও? বেশ, শারীরিক কোন অসুখ না থাকে যদি ত আর কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে! আমি ত দেখি, তুমি দিন-রাতই মনমরা হয়ে কি ভাব। আমাদের সংসারে এমন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ত হয় নি—যার জন্য তোমার মনে আঘাত লাগতে পারে! অজিত বাবু বা মোহিতের কথা এমন গুরুতর নয় যে, সেই কথা মনে ক'রে রেখে শরীরপাত করতে হবে! তবে বল, তোমার এত ভাবনা—এত বিষাদের কারণ কি?"

দিদি বলিল, "ঐ সব পাঁচ কারণেই মনটা ভাল থাকে না। তা ছাড়া কি? কি হয়েছে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না।"

নরেশ-দা বলিলেন, "আমি দেখি, আমাদের মেয়েরা সামান্য বিষয় নিয়ে এত বেশী ভাবনা-চিন্তা করে যে, তাদের সমস্ত স্নায়ু এই সব কারণে উত্তেজিত হয়ে ব্যাধির সৃষ্টি করে। যে সব বিষয় অন্য লোক মোটে গ্রাহ্য করে না, যে সব বিষয় যে কোন সবল-চিত্তের লোককে স্পর্শ করতে পারে না, সেই সব অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মেয়েদের যত মাথাব্যথা! আমি এ সব বিষয় অনেক পড়েছি, অনেক জানি বলেই তোমার এ রকম ভাব দেখ্‌লে আমার শুদ্ধ ভাবনা হয়। যদি মোহিত বা অজিত বাবুর কথা তোমার এত ভাবনার কারণ হয়, তবে তুমি কোথায় নিজে এ সব ঝেড়ে ফেলে উষাকে সুস্থ ও প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করবে, তা না তুমি নিজেই মুহ্যমান হয়ে থাক! ও বেচারাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। এ সব হবে না মনীষা! এতে আমার বড় কষ্ট হয়! বল, তুমি নিজে থেকে আবার সুস্থ ও প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করবে?"

দিদি বলে "চেষ্টা ত করছি!"

নরেশ-দা বলিলেন, "ও রকম চেষ্টায় কোন ফল হয় না। আমি চাই—মেয়েরা খুব সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে সব সময় স্ফূর্ত্তিতে থাকবে। নির্জীব অবসন্ন হয়ে থাকা ত মৃতের লক্ষণ! সংসারে কত ঝড়-ঝাপটা আসে, কত বিপদ-আপদ—কত মনো-ভঙ্গ, বিবাদ, দুঃখ, শোক এ সব থাকবেই ত? এ সবকে

টেনে ফেলে এ সব জয় ক'রে মানুষকে চলতে হবে! তার জন্য চাই অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য আর প্রচুর প্রাণশক্তি! এ না হ'লে ত মানুষ বাঁচতে পারবে না। অমিয়াকে দেখছো ত? ওর মধ্যে যেন সর্ব্বক্ষণ আনন্দ ও উৎসাহ অন্তর ছাপিয়ে উপছে পড়ছে। ওকে কিছুতেই দমাতে পারে না। ঐ জন্যই ত ওকে আমার এত ভাল লাগে!"

দিদি কিছু বলিল না; নরেশ-দার দিক থেকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

নরেশ-দা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মনীষা! চল, দিনকতকের জন্য কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। এখানে আর কারু ভাল লাগছে না। বিশেষ এই বাড়ীতে আর এই সব বন্ধু-বান্ধবের সংস্পর্শে থাকলে তোমার ও উষার শরীর-মনের কোন ভাল পরিবর্ত্তন হবে না। তাই আমি ভাবছি, তোমাদের দুজনকে নিয়ে কিছু দিন পশ্চিমে কোথাও চ'লে যাই।"

দিদি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "আমারও আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না, আমি আর কোথাও থাকলে ভালই থাকবো। তুমি বাড়ীতেই থাক। আমাদের দুজনের সঙ্গে লোকজনের বন্দোবস্ত ক'রে কোথাও পাঠিয়ে দাও!"

নরেশ-দা তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি? আমি এখানে থাকবো, আর তোমরা একলা যাবে, এ আবার কি কথা? আর আমি এখানে থেকেই বা কি করবো? আমার কায ত কিছু নেই?"

নরেশ-দা সরিয়া আসিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "তোমার কি যে হয়েছে, আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না! আমায় ছেড়ে তুমি দূরে গিয়ে একলা থাকতে পারবে মনীষা?"

তিনি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন! দিদি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার মনটা বড় খারাপ লাগছে। তুমি আমায় আর বাধা দিও না। বাড়ীতে থাকলে তুমি ভালই থাকবে। আমায় কিছু দিনের মত একলা থাকতে দাও।"

নরেশ-দা এবার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। পরদিন হইতেই আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। নরেশ-দার কাশীর বাড়ীখানা এ সময় খালি পড়িয়া ছিল, খবর পাইয়া উপস্থিত কাশীতে যাওয়াই স্থির হইল।

দিদি যাত্রার উদ্যোগ দেখিয়া একটু খুশী হইয়া উঠিয়াছিল। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম বটে, তবু আমার একটা ক্ষীণ আশা মনে ছিল---যদি তিনি কোন দিন ফিরিয়া আসেন! আমরা এখানে না থাকিলে ত তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না। কাশীতে যাওয়ার অপেক্ষা এইখানে তাঁহার ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষায় থাকিতেই আমার আগ্রহ ছিল, কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিলাম না।

নরেশ-দা এখানেই থাকিলেন। যদিই তিনি আসেন, তখন নরেশ-দার সঙ্গে দেখা হইলেই আমাদের সব খবর জানিতে পারিবেন। এইটুকুই আমার মনে সান্ত্বনা। নরেশ-দা তাঁহার খোঁজ পাইবার জন্য কত ব্যস্ত, সে ত আমি জানিতাম।

শেষে যাবার দিন আসিয়া পড়িল। অমিয়া-দি আমাদের যাবার কথা শুনিয়া বড় বিমর্ষ হইয়া গিয়াছিল। সে সজল-নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বিদায় দিল। নরেশ-দা ট্রেণ ছাড়িবার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। সে দিন হইতে তাঁহার সেই একই রকম স্তব্ধ বিষণ্ণ ভাব। তাহার পর আমরা যেখানে আশায়, আনন্দে ও মর্ম্মান্তিক বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের জীবন দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতেছিল, সেই চিরপরিচিত বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া উদাস বিষণ্ণ চিত্তে কাশীর দিকে যাত্রা করিলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।



সংস্কৃত সাহিত্য

৫

রামায়ণ (গ)—রাম ও বালী-বধ

শুধু যে সীতা-হরণ-নিবন্ধন রামের সহিতই রাবণের বিবাদ বাধিয়াছিল, তাহা নহে। বহুপূর্ব্ব হইতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি-গণের সহিত রাবণের একটা শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন পঞ্চম নৃপতি অনরণ্যের সহিত রাবণের এক তুমুল সংগ্রাম হয়। অনরণ্য রাবণ-হস্তে নিহত হন। এই সংগ্রামের বহু পরে, ইক্ষ্বাকু হইতে দশম নৃপতি মান্ধাতার সহিতও রাবণের এক যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। (উত্তরকাণ্ড, ১৯শ সর্গ ও ২৬শ সর্গ) রাজা দশরথও রাবণের বলবীর্য্যের কথা বিশেষভাবে জানিতেন, অথবা শুধু জানিতেন কেন, মনে মনে রাবণের নামে তাঁহার বিলক্ষণ আতঙ্ক জন্মিত। রাবণ কখনও ছোট-খাট উৎপাত-উপদ্রব করিতেন না; সে সব কার্য্যে তাঁহার অনুচরবর্গের কাহাকেও লাগাইয়া দিতেন। যেটা অন্যের অসাধ্য, সেইরূপ বিরাট্ ব্যাপারে তিনি স্বয়ং লাগিতেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, রাবণ মারীচ ও সুবাহু নামক দুই জন মহাবল রাক্ষসকে সেই যজ্ঞ-বিঘ্ন করিতে লাগাইয়া দিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট আসিয়া রামকে ভিক্ষা চাহিতেছেন। বিশ্বামিত্র তত্ত্বতঃ প্রভাবে জানিয়াছেন—রাম ছাড়া মারীচ-সুবাহু অন্যের অবধ্য। দক্ষিণ-সমুদ্রপারবর্ত্তী লঙ্কা নগরীতে আছেন রাবণ, বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিতেছেন উত্তরে হিমালয়ের অন্তঃপাতী সিদ্ধাশ্রমে। তথায় রাবণ-প্রেরিত সুবাহু ও মারীচ দুই রাক্ষস যজ্ঞ-বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে,—তাঁহাদের বধের জন্য বিশ্বা-মিত্র আসিয়াছেন অযোধ্যার রাজা দশরথের নিকটে রামকে লইতে। বিরাট পৃথিবী জুড়িয়া কি একটা ব্যাপারের যেন সূত্রপাত হইতেছে। বিশ্বামিত্র-মুখে "রাবণ-প্রেরিত" এই-টুকু শুনিয়াই দশরথের চক্ষুঃস্থির। রাজা অকপটভাবে কহিলেন—

"ন হি শক্তোঽস্মি সংগ্রামে স্থাতুং তস্য দুরাত্মনঃ॥ ২০
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষাঃ পতগ-পন্নগাঃ।
ন শক্তা রাবণং সোঢ়ুং কিং পুনর্মানবা যুধি॥ ২২
স তু বীর্য্যবতাং বীর্য্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ।
তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ॥ ২৩
আদি ২০ সর্গ।

দশরথ স্পষ্টই কহিলেন—রাবণের সাথে ত পারি-ই না, তার সৈন্যগণের সঙ্গেও যুদ্ধ করা আমার কর্ম্ম নহে। আমার পুত্র ত কোন্ ছার। যাহা হউক, বশিষ্ঠের প্ররোচনায় দশরথ রামকে বিশ্বামিত্রের হাতে সঁপিয়া দিলেন। লক্ষ্মণও অগ্রজের অনুবর্ত্তী হইলেন।

মারীচ-সুবাহু নিহত হইয়াছে। রাবণের কর্ণে এ সংবাদ নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছিল এবং এই সংবাদে নিধনকর্ত্তা রামের উপর রাবণের মনোভাব, আদি-কবির ভাষায় পরিস্ফুট-রূপে কিছু জানিতে না পারিলেও, রামায়ণের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনায় কতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহা ক্রমে দেখা যাউক।

রাম বনে গমন করার পর,—মাতুলালয় হইতে ভরত আসিয়া সমস্ত শুনিলেন ও রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহুলোকজন সৈন্য-সামন্ত সহকারে রামের নিকটে গিয়া একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, নানামতে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাম স্পষ্টতই শেষে বলিলেন, "না ভাই, আমি আর ফিরিব না। আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব যেমন 'বিভাগ' করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারেই আমরা রাজ্যভোগ করিব।"

"ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোক-সংকৃতম্।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কল-বাসসা।
এবমুক্ত্বা মহারাজো বিভাগং লোক-সন্নিধৌ॥ ২৩
ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ॥ ২৪
অযো, ১০১ সর্গ।

"তুমি অযোধ্যায় যাও, আমি দণ্ডকারণ্যে যাই। তোমার সহচর শত্রুঘ্ন, আমার সহচর লক্ষ্মণ।" ইত্যাদি (১০১ সর্গ, ১৫।১৬ শ্লোক) নানাপ্রকারে বুঝাইলেও ভরত যখন কিছুতেই বুঝিতে চাহিলেন না, তখন রাম আরও দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—

"ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজ-রাণ্-মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে॥ ১৭
ছায়াং তে দিন-কর-ভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্দ্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কানন-দ্রুমাণাম্
ছায়াং তামতিশায়নীং সুখং শ্রয়িষ্যে॥ ১৮
শত্রুঘ্নঃ কুশল-মতিস্ত তে সহায়ঃ
সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।
চত্বারস্তনয়বরা বয়ং নরেন্দ্রং
সত্যস্থং ভরত চরাম মা বিষীদ॥ ১৯

অযো ১০৭।

যাও ভরত, তুমি গিয়া মনুষ্যগণের রাজা হও, আমিও গিয়া বনচর পশুদিগের মহারাজ হই। তুমি প্রসন্ন-হৃদয়ে নগরে ফিরিয়া যাও, আমিও সানন্দ চিত্তে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। সৌর-রশ্মি-নিবারক ছত্র তোমার মস্তকে শীতল ছায়া বিস্তার করুক, আমিও, ভাই ছত্রচ্ছায়াতিশায়িনী বন-তরুরাজির অতিঘনচ্ছায়া ধীরে ধীরে গিয়া আশ্রয় করি। ভাই, সুবুদ্ধি-সম্পন্ন শত্রুঘ্ন যেমন তোমার সহায়, সুমিত্রা-তনয় লক্ষ্মণও তেমনই আমার প্রধান মিত্ররূপে বিদ্যমান। আমরা চারি ভ্রাতা রাজা দশরথের চারিটি সুপুত্র, এস ভরত, আমরা কয় ভাই মিলিয়া মহারাজকে সত্য-পথে স্থায়ী করি। ইহাতে তুমি দ্বিধা করিও না বা বিষণ্ণ হইও না।"

রামের উক্তিতেই দেখিতেছি, দশরথ যেন সর্ব্বসমক্ষে রাজ্য-বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন—এক জনের অযোধ্যা, অন্যের দণ্ডকারণ্য। রামচন্দ্র পিতৃকৃত এই বিভাগ মাথা পাতিয়া লইয়াছেন ও দণ্ডকারণ্যে নূতন রাজ্য-স্থাপনের জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

রামের বনগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই দণ্ডকারণ্যে রাবণ-ভগিনী বিধবা সূর্পণখা বাস করিতেছিল। মদ-গর্ব্বিত ক্রোধান্ধ রাবণ অজ্ঞাতসারে সূর্পণখার স্বামীকে নিধন করিয়াছিলেন। পরে মাসতুতো ভাই খর নামক রাক্ষসকে চৌদ্দ হাজার সৈন্যের মালিক করিয়া সূর্পণখার রক্ষকরূপে ও দূষণকে সৈন্যাধ্যক্ষরূপে সূর্পণখার সহিত দণ্ডকারণ্যে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের অত্যাচারে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিকুল সতত শশব্যস্ত, তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড প্রায় বিলুপ্ত। রাবণ রহিলেন লঙ্কায়, আর বিধবা যুবতী ভগিনীকে পাঠাইলেন—দূরে সমুদ্র-পারে ঘোর দণ্ডকারণ্যে। সূর্পণখা তথায় স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিত। লঙ্কার কেহ বড় আর তাহার তেমন খোঁজই রাখিত না।

রাবণ যে কত বড় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস, কি ভয়ঙ্কর অপরাজেয় বীর, তাহা দশরথ অতি উত্তমরূপেই জানিতেন। দণ্ডকারণ্যে রাবণের একাধিপত্য যে ছিল, এ কথা তথায় ভগিনী সূর্পণখার বাসস্থান-নির্ণয়েই বুঝা যায়। যখন বিশ্বামিত্র রাবণের পক্ষীয় ও রাবণ কর্ত্তৃকই নিয়োজিত, যজ্ঞবিঘ্নকারী সুবাহু ও মারীচ নামক রাক্ষসদ্বয়ের বধার্থ রামচন্দ্রকে লইতে আসিয়াছিলেন, তখন রাবণের নামের গন্ধেই রাজা দশরথ যে কতদূর ভীত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাজ-সংসারের প্রধান ও প্রথম সন্তান রামকে লক্ষ্মণের সহিত যখন বিশ্বামিত্র লইয়া গেলেন, তখন শিশু রাম-লক্ষ্মণের প্রতি কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী—তিন রাণীরই যে সমান টান ছিল, তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কেন না, যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৈকেয়ী যে রামকে কত ভালবাসিতেন, কি চক্ষুতে দেখিতেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রাবণের পক্ষভুক্ত ও রাবণের নিয়োজিত রাক্ষসদ্বয়ের বিনাশের জন্য বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের যাওয়ার কথা এবং সেই সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ রাবণের বল-বিক্রমের কথা যে রাম-মাতৃগণের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রসঙ্গতঃ দণ্ডকারণ্যে রাবণসোদরা সূর্পণখার সসৈন্যে অবস্থানের কথা, দণ্ডকারণ্যে রাবণের অক্ষুণ্ণ আধিপত্যের কথা, রাবণ-বিষয়ক কত রকম প্রসঙ্গের আলোচনা রাণী-মহলে হওয়া, নারী-সমাজ-সুলভ নানা কিংবদন্তীজনক গোষ্ঠীবন্ধনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেখা যাউক, এই অনুমানের সার্থকতা কত দূর।

মন্থরা কৈকেয়ীকে যখন কু-পরামর্শ দেয়, তখন শুধু বলিয়াছিল যে, দুইটি বর চাও, একটিতে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস, অপরটিতে ভরতের অভিষেক। এইটুকু ছাড়া মন্থরা আর কিছুই কৈকেয়ীকে শিখায় নাই। ঋজুমতি কৈকেয়ী যখন বিগড়াইয়া বসিলেন, তখন মন্থরার বিষপানের পূর্ব্বে যেমনই তিনি ষোল আনা ভাল ছিলেন, বিষপানের পর তেমনই অথবা ততোধিক আঠার আনা মন্দ হইয়া গেলেন।

তিনি ঐ মন্থরার "বনবাস" কথার সহিত "দণ্ডকারণ্য" কথাটা যোগ করিয়া দিলেন। এত ভীষণ অরণ্য থাকিতে একবারে "দণ্ডকারণ্য" তাঁহার মনে উদিত হইল কেন? নিশ্চয়ই দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মনে একটা বদ্ধ-মূল সংস্কার ছিল। তাহা আবার খুব চমৎকার উপভোগ-ক্ষম স্থান বলিয়া নহে, নিশ্চয়ই তাহার বিপরীত, ভয়ঙ্কর রাক্ষসপূর্ণ ও রাবণাধিকৃত, সুতরাং বিপৎ-সঙ্কুল ও বাসের অযোগ্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। নতুবা সুখে থাকিবার জন্য তিনি সেখানে রামকে পাঠান নাই। পিতা দশরথের "বিভাগ" অনুসারে রাম দণ্ডকায় আর ভরত অযোধ্যায় রাজ্য করিবেন, ইহা রামেরই মুখে ভরতকে প্রবোধ দিবার সময়ে শুনিতে পাইয়াছি। "দণ্ডকারণ্য"-মধ্যে সূর্পণখাকে রাখিয়া রাবণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, কেন না, সাগরপারে লঙ্কায় থাকিলেও তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বীরবর বালী দণ্ডকারই সান্নিধ্যে রাজত্ব করিতেন। বালীর জ্ঞাতসারে রাবণের বা রাবণের জ্ঞাতসারে বালীর কোনরূপ ক্ষতি, কোনরূপ আপদ-বিপদ হইতেই পারে না। তাঁহারা উভয়ে অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া Offensive-defensive সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এ-পারে বালীর সাম্রাজ্য আর ও-পারে রাবণের সাম্রাজ্য, মধ্যে বিরাট সমুদ্র। এ-পার হইতে রাবণের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ও-পার হইতে বালীর রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে, সেইরূপ সর্ব্বাগ্রে রাবণের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। ঐ সন্ধির প্রস্তাব রাবণই প্রথম করিয়াছিলেন।

"সোঽহং দৃষ্টবলস্তভ্য মিচ্ছামি হরিপুঙ্গব!
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ॥ ৪০
দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদন-ভাজনম্।
সর্ব্বমেবাবিভক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর॥ ৪১
ততঃ প্রজ্বালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরি-রাক্ষসৌ।
ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্॥ ৪২
অন্যোন্যং লম্বিত-করৌ ততস্তৌ হরিরাক্ষসৌ।
কিষ্কিন্ধ্যাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরি-গুহামিব॥ ৪৩

উত্তর, ৩৯ সর্গ।

বালীর সহিত বল-পরীক্ষায় পরাভূত হইয়া রাবণ কহিলেন, "বানর-বর! আপনার বল আমি স্বচক্ষুতে দেখিলাম, সুতরাং অগ্নি-সম্মুখে আপনার সহিত চিরবন্ধুত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। হরিরাজ! স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন, ভাজন, এ সমস্তই আজ হইতে আমাদের অবিভক্ত রহিল, অর্থাৎ এক হইল।" বলিয়াই অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহারা উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন। পরে দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। সুতরাং দেখিতেছি, সূর্পণখার বিহারক্ষেত্র কেবল দণ্ডকা নহে, রাবণ-রাজ্যের যে কোনও অংশ যে কোনও প্রকারে ভারতবর্ষ হইতে কেহ যদি আক্রমণ করিতে যান, তবে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে বীরশ্রেষ্ঠ বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

রাম পিতৃনিদেশে দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। বনবাস-কালের দীর্ঘ দশ বৎসর নানা আশ্রমে ও তিন বৎসর পঞ্চ-বটীতে কাটাইয়াছেন, আর মাত্র এক বৎসর বাকি, এমন সময়ে রাবণ সীতাকে হরণ করিলেন।

"রাবণের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস আর নাই। লঙ্কা নগরীতে তাহার বাস। তাহাকে দমন করিতে হইলে যাহা যাহা দরকার, সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীব তাহাই করিতেছেন। লক্ষ্মণ, আপনি শান্ত হউন, সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করিয়া রোহিণীর সহিত চন্দ্রের ন্যায় সীতার সহিত রামকে আনয়ন করিবেন। রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সুগ্রীব বহু কোটি বানর-সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" ইত্যাদি তারার উক্তিতে দেখিতেছি, (কিষ্কিন্ধ্যা ৩৫ সর্গ) রাবণের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত সুগ্রীব ঘোরতররূপে আয়োজন-উদ্‌যোগ করিতেছেন। রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহা সকলেই জানিয়াছেন এবং সমুচিত প্রতিবিধানের চেষ্টাও যে হইতেছে, তাহা তারার কথায় স্পষ্টতঃ বুঝিতেছি। কিন্তু এই স্থলে এক মহা গোল উপস্থিত হইতেছে। সুগ্রীব, তারা-লক্ষ্মণের এই কথোপকথনের অনেক পরে—উক্ত কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের ৪০ সর্গ হইতে ৪৬ সর্গ পর্য্যন্ত, পৃথিবীর নানা স্থানের ইতিবৃত্ত খ্যাপনপূর্ব্বক বানরদিগকে উপদেশ করিতেছেন যে, এই এই দেশ সমূহে গিয়া তোমরা সীতাপহারী রাবণের সন্ধান করিবে। রাবণ যে সীতাকে লইয়া লঙ্কায় গিয়াছেন, তাহা ত তারাই পূর্ব্বে লক্ষ্মণকে বলিয়া দিয়াছেন, তবে আবার এত ইতিহাস-ভূগোলের প্রয়োজন কি? সোজা লঙ্কার কথা কহিলেই ত হইত। এ বিষয়ে আলোচনা পরে করা যাইবে। এখন দেখা যাউক, শুধুই কি সুগ্রীবের সহিত

মিত্রতাস্থাপনের জন্য রাম বালীকে বধ করিলেন, না ইহার অন্য কোন কারণও ছিল ?

ভরতকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে রাম যখন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন স্পষ্টই কহিয়াছিলেন যে, পিতার 'বিভাগ'-মতে তুমি অযোধ্যায় গিয়া মানুষগণের 'রাজা' হও, আর আমি দণ্ডকারণ্যে গিয়া বনচরগণের 'রাজ-রাজ' রাজার রাজা হই। 'রাজা' আর 'রাজার রাজায়' অনেক প্রভেদ। দণ্ডকারণ্যে সূর্পণখার অঙ্গচ্ছেদ ও খরদূষণ প্রভৃতির বিনাশসাধনে রাবণের সহিত যে ঘোর শত্রুতা জন্মিল, ইহা রাম-লক্ষ্মণের অবিদিত ছিল না। দণ্ডকারণ্যে প্রথম পরিচয়ের সময়ে সূর্পণখা নিজেই রামের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল যে, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, দূষণ প্রভৃতি তাহার ভ্রাতা। (আরণ্য ১৭শ সর্গ) সুতরাং সেই মহাবল রাবণাদির ভগিনীর অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, রাজনীতিবিদ্ রামের তাহা বুঝিতে বাকি ছিল না।

রাবণের সহিত কিষ্কিন্ধাপতি মহাবীর বালীর মৈত্রী ও সন্ধির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, সীতাহরণের পর সাহায্যলাভের জন্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে রাম যদি বদ্ধপরিকর না-ও হইতেন এবং বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসাইতে প্রতিশ্রুতি না-ও দিতেন, তবুও রামকে বালী-বধ করিতেই হইত। সাগরপারে লঙ্কেশ্বর রাবণকে আক্রমণ করিবার সমস্ত আয়োজন-উদ্‌যোগ এ-পারে, বালীর রাজত্বে থাকিয়া করিতে হইবে। রাবণ-বন্ধু মহাবীর বালী তাহা কদাচ সহ্য করিবেন না। সন্ধি-সূত্রে রাবণের শত্রু বালীরও শত্রু, সুতরাং রামের রাবণের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বালীর সহিত যুদ্ধে নামিতে হইবে। দণ্ডকায় রাজ্যস্থাপন ও লঙ্কেশ্বর রাবণের সহিত বিবাদ, এই দুই-ই বালীর জীবিতকালে অনায়াসসাধ্য নহে, অতএব সর্ব্বাগ্রে রামের কর্ত্তব্য হইতেছে—বালীকে পরাজিত করা। অন্যথা সীতা-উদ্ধার এক প্রকার অসম্ভব। তাই রামচন্দ্র কূট-রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় সমস্ত ব্যাপারটা বিশেষ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন ও বালী-বধে প্রতিশ্রুত হইয়া বহু কোটি বানর-সেনার সাহায্যলাভ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সুদৃঢ় হইলেন। অবশ্য বালীর প্রতিদ্বন্দ্বী সুগ্রীব এতটা তলাইলেন না, ভ্রষ্টরাজ্য সুগ্রীব চান বালীর নিধন ও স্বরাজ্য উদ্ধার। তাঁহার সে দুই উদ্দেশ্যই রামের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে ভাবিয়া তিনি সসৈন্যে রামের সহকারিতায় আত্মনিয়োগ করিলেন। রামচন্দ্র ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য বনে যায়েন নাই। জীবনের প্রারম্ভে রাজপুত্র রাম সংসারের বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া ব্যথিত-হৃদয়ে, তাঁহার বড় সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তুচ্ছ অযোধ্যার সাম্রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর স্পৃহণীয় প্রকৃতির লীলা-নিকেতন নিবিড় দণ্ডকারণ্যে নূতন ও বৃহত্তর সাম্রাজ্য-স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দণ্ডকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। বীর তিনি—তাঁহার নিকট দুষ্কর বলিয়া কোনও কার্য্যই নাই। তিনি প্রসন্নচিত্তে নিজেকে সন্তুষ্ট মনে করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন, ইতোমধ্যে সীতার অপহরণ ও রাবণের সহিত যুদ্ধোদ্‌যোগ এবং তাহারই অঙ্গীভূত অবশ্যকর্ত্তব্য হিসাবে বালীর নিধন-সাধন। ইহাতে তাঁহার উপর কোনওরূপ দোষারোপ করা চলে না। সীতার উদ্ধারের জন্য বালীর রাজত্বে থাকিয়া সমুদ্র-বন্ধন ও রাবণের সর্ব্বনাশের বিপুল উদ্যোগ বালীর জীবিতাবস্থায় অসম্ভব। সীতাকে উদ্ধার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বালীকে বধ করিতেই হইবে। তবে অদৃষ্টের আনুকূল্যে,—প্রসঙ্গতঃ, সুগ্রীবের সহিতও ঐ বালী-বধ উপলক্ষে সখ্যস্থাপন হইয়া গেল। সমুদ্রবন্ধনাদি দুরূহ ব্যাপারগুলি অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাজ-সংসারের একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের কবলে পড়িয়া রামকে বনে যাইতে হইয়াছিল। নিজের অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কালই তাঁহাকে প্রতিকূল দৈবের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। পদে পদে বাধা পাইয়াও গুণাভিরাম রাম বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বত্র অব্যাহতগতিতে, সর্ব্ববিধ বিপদাপদ অতিক্রমপূর্ব্বক রাহুগ্রাসমুক্ত পর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুরুষকারের সাহায্যে তিনি দৈবকে পরাজিত বা অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।



অমরনাথ

৩৬

দুই বন্ধুতে নদীর ধারে এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন। দুই জনে অনেক কথা হইল। দিল্লী ও ঝরিয়ার সমস্ত ঘটনা অমর একে একে বলিলেন। লাবণ্যের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, "মেয়েটার বিশেষ অপরাধ কি ? যেমন শিক্ষা পাবে—"

অমর। অপরাধ মেয়েটার খুবই আছে। ক্লাসে যখন মাষ্টার শিক্ষা দেয়, তখন ছাত্রদের মধ্যে কেউ সে শিক্ষার সার গ্রহণ করে, কেউ অসারটুকু নেয়, কেহ বা হৃদয়ে কিছুই নেয় না। নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে লোক শিক্ষা গ্রহণ করে, সব দোষ শিক্ষার দিলে চলবে কেন ?—হ্যাঁ রে, বোটে ক'রে মায়ের কে আসছে ?

কৃষ্ণ। সায়েব নয় রে, বাঙ্গালী—দেখছিস, বায়স জিনি বর্ণ।

অ। তা এখানে কেন ?

কৃ। শুনেছি, জিলার হাকিমদের নেমন্তন্ন হয়েছে ; তাঁদের কেউ হবেন।

অ। তা হিন্দু হয়ে পূজোবাড়ী এ বেশে নেমন্তন্ন রক্ষে করতে আসা কেন ?

কৃ। নইলে যে কেউ হাকিম ব'লে চিনতে পারবে না। চেহারা ত দেখছ ঐ, যেন বাঁদরছানা—ধুতি প'রে এলে কেউ মানবেই না। ওর বাড়ীতে ত আয়না আছে, তা'তে নিজের মূর্ত্তি ত দেখেছেন।

অ। আচ্ছা, ও বোটখানা কার ? ঐ যে খুব সাজান—

কৃ। ওখানা নগেন বাবুর—পশুপতি বাবুর কুটুম্ব। ওঁর পিতা এক জন খ্যাতনামা ধনী ছিলেন।

অ। নাম ও ধনের পরিচয় দিলে, মানুষটার পরিচয় ত দিলে না।

কৃ। মানুষটার পরিচয় তুমি শীঘ্রই পাবে—নতুন শিকার তিনি ছাড়বেন না।

অ। একটু আভাসই দেও না।

কৃ। বাবুটি মস্ত বিলাসী, অথচ মুখে বলবেন, ধন জন যৌবন পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়। চোখ আকাশের দিকে তুলেই থাকেন ; তোমাকে বুঝাবেন, তিনি চোখ উপরে উঠালেই ভগবান্‌কে দেখতে পান আর তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য বাবাজীর বাৎচিৎ হয়। মুখ দিয়ে অবিরাম বক্তৃতা ফুটছে, আর সে সব বক্তৃতা ধর্ম্ম সম্বন্ধে।

অ। তা'তে তোমার ক্ষতি কি ?

কৃ। ক্ষতি অনেক ; তুমি সে চিজ্ না দেখলে বুঝতে পারবে না। মুহূর্ত্তে তোমাকে আবিষ্ট ক'রে তুলবে।

অ। তুমি কানে শুনে যাবে, তাতে লোকসান কি ?

কৃ। শুধু শুনে গেলে হবে না, তোমায় স্বীকার করতে হবে, তিনি এক জন মহাপুরুষ। তা ছাড়া, তিনি তোমাকে কথা কইতে দেবেন না, একাই অবিরাম ব'কে যাবেন।

অ। যে বকে—সে শক্তি ক্ষয় করে, যে শোনে—সে শক্তি সঞ্চয় করে।

কৃ। তুমি দিল্লী-মিল্লী কোথাও তাঁর জোড়া দেখ নি। তিনি তোমাকে বোঝাবেন, তিনি ত্রৈলিঙ্গস্বামী, কাঠিয়া বাবা বা বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী—

"কার কথা হচ্ছে কেষ্ট বাবু ?" বলিতে বলিতে নগেন বাবু হাস্যমুখে অগ্রসর হইলেন। কৃষ্ণনাথ ফিরিয়া দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ ! মুখ শুকাইয়া গেল। মনে মনে কহিলেন, "না, আর তিষ্ঠুতে দিলে না, একটু আরামে ব'সে অমরের সঙ্গে কথা কইছিলাম।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আসুন, আসুন, নগেন বাবু ! এই আপনারই কথা হচ্ছিল।"

"আমার কথা ? কি বলছিলেন ?"

কৃ। এই—এই হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি প্রকৃত কথা জানতে হয়, তা হ'লে আপনার কাছে—

ন। হ্যাঁ, আমার কিছু জানা আছে বটে—বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, ষড়দর্শন, পুরাণাদি সমস্ত আমার পড়া আছে, আর সে সম্বন্ধে জ্ঞানও আমার জন্মেছে।

কৃ। তা' জন্মাবে বৈ কি, আপনার বয়স কি কম !

ন। বয়েস বেশী না হ'লেও—এই দেখুন না—শঙ্করাচার্য্যের নাম বোধ হয় শুনে থাকবেন—তিনি ছ' বৎসর বয়েসের ভেতর সব পড়া-শোনা শেষ ক'রে ফেলেছিলেন। আমার কিছু বেশী সময় লেগেছে।

কৃ। বড় পরিতাপের বিষয়—(অমরের প্রতি) চল হে, এখন উঠা যাক্।

ন। এর মধ্যে উঠবেন কি, একটু বসুন—আপনার এই বন্ধুটির পরিচয়—

কৃ। আপনার কাছে এঁর আর কি পরিচয় দেব ? ইনি অতি সামান্য ব্যক্তি।

ন। তা হোক ; ভগবান্ সকলকে ত সমান করেন নি। এই দেখুন, কেউ ঈশ্বরকে ডাকবে পরমাত্মা ব'লে, কেউ ব্রহ্ম ব'লে, কেউ ভগবান্ ব'লে, লোকের বুদ্ধি ভিন্ন, তাই ভিন্নভাবে চিন্তা করে। আমি যখন দিল্লীতে গিয়ে এক বিরাট সভায় বক্তৃতা দান করি, তখন কেহ আমাকে খৃষ্টান মনে করে, কেহ ভাবে আমি মুসলমান, কেহ বা স্থির করে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। বিশ্বমানবের এক ধর্ম্ম হওয়া উচিত, এই কথাই আমি প্রচার

করি। কাযেই তারা বুঝে উঠতে পারি নি আমার ধর্ম্ম কি।

অমর। আপনি কবে দিল্লী গিছলেন?

ন। ঠিক তারিখটা ডায়েরী দেখে পরে আপনাকে ব'লে দেব। আমি মিথ্যা বলি না—ফিরেছি দিল্লী হ'তে মাসখানেক হ'ল; ছিলাম সেখানে মাস তিন চার। সেখানে আমার এক আত্মীয় আছেন—তাঁর নাম বিপিন, তিনি লাট সাহেবের খাস দপ্তরে বড় চাকুরী করেন। আমি তাঁর বাড়ীতে ছিলাম না—যমুনার ধারে এক বড় বাড়ী নিয়ে ছিলাম। দিল্লীর লোক আমাকে ছাড়ে না, আজ এখানে সভা, কাল ওখানে নেমন্তন্ন—অবশেষে আমাকে লুকিয়ে পালাতে হ'ল—বিপিনকেও ব'লে আসতে পারি নি। আসবার সময় একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ ক'রে যে আসব, তারও সময় ছিল না; তবে সাহেবরা আমাকে চেনে—গাড়ীতে কোন কষ্ট—যাক্, ও সব বাজে কথা। ধন জন এ সব কিছুই নয়—মায়ার বিকাশ মাত্র! জনক রাজা যেমন ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে ব'সে থেকে নির্ব্বিকারচিত্তে রাজ্য চালিয়েছিলেন, আমিও তেমনই—যাক্, আমার সম্বন্ধে কিছু বলব না—সকলের এইভাবে সংসার নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

কু। আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হ'লে এখন আমরা—

ন। আর দেখুন কেষ্ট বাবু—আর আপনার নাম কি?—অমর? আর আপনিও দেখুন অমর বাবু, সংসারটা কিছুই নয়। কোন জিনিষে আসক্তি থাকাটা ঠিক নয়। সংসার ক'রে যাবেন, কিন্তু আসক্তি জিনিষটাকে তফাতে রেখে চলবেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা আপনার সঙ্গে আসে নি, সঙ্গে যাবেও না। সুতরাং তারা আপনার নয়।

কু। ঠিক কথা—এখন আমরা উঠি।

ন। আর শুনুন কেষ্ট বাবু, একটু আধটু ধ্যান করবেন। তা'তে বড় আনন্দ পাবেন—আগে জ্যোতির্দর্শন; পরে বিন্দু-দর্শন। এ সব আপনাদের কত শেখাব? এই রকম ক'রে আসন করবেন (পদ্মাসনে বসিলেন)—আর এই রকম ক'রে সমাধিস্থ হবেন (পলকশূন্য নয়নে বোটপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন)—আমার সমাধি হয়ে আসছে—আমার চোখ দিয়ে যে জল বড়াচ্ছে, তা বাতাসের জন্যে; আমার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থির হয়ে আসছে, শীঘ্রই জ্ঞান-লোপ হবে—

ইতিমধ্যে বোটের জানালা হইতে একখানি মুখ উঁকি মারিল। মুখখানি বড় সুন্দর—লাবণ্যের মুখ বলিয়া অমরনাথের প্রতীতি হইল। মুখের পর একখানি গহনাপরা হাত বাহির হইল। হাতখানি যেন কাহাকে ডাকিল—বোধ হইল যেন বোটের মালিক নগেন বাবুকে। হাতখানি নড়িবামাত্র নগেন বাবুর সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সমাধির এটা ঠিক সময় নয়—এক মহাপুরুষ আমার কানে কানে সেই কথা ব'লে গেলেন। আমার ভুল হয়েছিল।"

কু। আপনার ভুল হয়, নগেন বাবু?

ন। তা' হয় বৈ কি! ভগবানেরও যে হয়—সে কথা আর এক সময় বলব। এখন আমি উঠি—চা খাবার সময় হ'ল।

কু। আসক্তি থাকা ঠিক নয়, নগেন বাবু।

ন। আমার কি জানেন—আচ্ছা, এর পরে বোঝাব।

বলিতে বলিতে তিনি বেগে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, বাঁচা গেল।" অমর কিন্তু কিছু বলিলেন না। কৃষ্ণ কহিলেন, "কি রে, অমন মুখখানাকে হাঁড়িপানা করলি কেন?"

"কারণ না থাকলে কার্য্য হয় না।"

"কারণটা কি শুনি?"

"বোটের জানালা হ'তে কে এক জন মুখ বাড়িয়ে নগেন বাবুকে ডেকেছিল—দেখেছিস্?"

"না।"

"তুই কোন্ দিকে চেয়েছিলি?"

"নগেন বাবুর চোখের দিকে—জল গড়িয়ে পড়ছিল, তাই দেখছিলাম।"

"বোট হ'তে যে ডাকলে, সে লাবণ্য।"

"বলিস কি? (চিন্তা করিয়া) হয় ত—হয় ত তাকে বিয়ে ক'রে থাকবেন। না, তা' ত হ'তে পারে না—ভাদ্র আশ্বিন মাসে বিয়ে ত হ'তে পারে না।"

"শ্রাবণ মাসে আমি যখন দিল্লী হ'তে চ'লে আসি, তখন বিয়ের দিন ছিল কি না, বলতে পারি না।"

"বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। যদি নগেনের বিবাহিতা স্ত্রী হ'ত, তা হ'লে পশুপতি বাবুর বাড়ী যেত—লুকিয়ে থাকত না। লোকটা একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড, গোড়া হতেই আমি চিনেছি।"

"এই রকম লোকই সংসারে বেশী। ধর্ম্মের ভাণটাই সাধারণতঃ বেশী লোকে করে লোকের পূজা নেবার জন্যে অথবা—ওহে কেষ্ট, তোমার সায়েব যে এবার বেশ বদলেছেন।"

"দেখ্‌ছি পাঁতলুন ছেড়ে লুঙ্গি পরেছেন।"

"অর্থাৎ মুসলমান সেজেছেন, সাহেব সাজলেন, মুসলমান সাজলেন, কিন্তু হিঁদু সাজতে ত দেখলাম না।"

"সেটা সাজবেন রাত্রে—লোকচক্ষুর অন্তরালে।"

"অর্থাৎ হিঁদু হয়ে হিন্দু ব'লে জনসমাজে পরিচয় দিতে নারাজ। কেন, হিঁদু কি এতই ঘৃণ্য? সকলের অনুকরণ করব, কেবল বাপ-পিতামহের করব না। ছি ছি, আমরা কি হয়ে পড়েছি!"

এমন সময় ডাকঘরের পিয়ন আসিয়া কৃষ্ণের হাতে এক 'তার' দিল; সঙ্গে বাড়ীর ভৃত্য। টেলিগ্রাম অমরের নামে। পিয়ন ও ভৃত্যকে বিদায় দিয়া উভয়ে উৎকণ্ঠার সহিত 'তার' পাঠ করিলেন। 'তার' আসিতেছে বেনসনের নিকট হইতে। অমরকে ত্বরায় ঝরিয়ায় যাইতে সাহেব অনুরোধ করিয়াছেন—মহাজন অপেক্ষা করিতেছে। পাঠান্তে অমর কহিলেন, "আমাকে আজই রওনা হ'তে হবে—এখনই 'তার' ক'রে দি।"

কৃষ্ণ বিমর্ষ মুখে কহিলেন, "তোমাকে পেলাম অনেক দিন পরে। ছাড়তে মন চায় না—কি করব? যাও—কায কর গে—বাধা দেব না।"

অ। আমারও কি ভাই বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে না?

কু। তা' জানি। দেখ, আগে পশুপতি বাবু তোমাকে ছাড়েন কি না। তাঁর যে টান তোমার প্রতি।

অ। বুঝিয়ে বললে কেন পশুপতি বাবু ছাড়বেন না?

পশ্চাৎ হইতে পশুপতি কহিলেন, "কি বোঝাতে চাও অমরনাথ? আমি ত তোমাকে এত শীঘ্র ছাড়তে পারব না।"

উভয়ে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পশুপতি কহিলেন, "তোমার নামে টেলিগ্রাম কি এল, তাই খবর নিতে এসেছি।"

অমর। আমরা আপনারই কাছে সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

প। কি বলবে বল, বাবা?

অমর তখন সকল কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে পথ চলিতে লাগিলেন। গৃহে আসিয়া পশুপতি বাবু তাঁহাদের লইয়া এক নির্জ্জন কক্ষে বসিলেন।

৩৭

কিছু পরে হরনাথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন?"

পশু। অমর আজই চ'লে যেতে চায়।

হর। আমার বাবা যখন যেতে চাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে। জিজ্ঞেস ক'রে দেখেছ কি?

পশু। কারণ শুনেছি। অমর একটা মাইকার খনি নিয়েছে, কিন্তু কায চালাবার মত অর্থ নেই। এক ব্যক্তি সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাই আজ 'তারে' তলব এসেছে।

হর। তা হ'লে অমরকে যেতে হবে—

পশু। না, যেতে হবে না, যত টাকা লাগে, আমি দেব। কত টাকা লাগতে পারে, অমর?

অম। সে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, তবে দু' এক লাখ টাকার কম হবে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু—

পশু। কিন্তু কি?

অম। আপনার টাকা নিতে ইচ্ছে নেই।

পশু। কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, এত বড় লাভের ব্যবসায় আমাকে তোমার পার্টনার করতে ইচ্ছে নেই?

অম। টাকাটা যদি নষ্ট ক'রে ফেলি?

পশু। তা হ'লে দেখছি, আমার টাকাটা নষ্ট করতে তোমার কিছু সঙ্কোচ—

হরনাথ অমরকে কহিলেন, "বাবা, তুমি আমার ছেলের চেয়ে বড়—সত্য বলছি, তুমি আমার সন্তানের চেয়ে বড়—আমি একটা অযাচিত উপদেশ দিলে অপরাধ হবে কি?"

অম। ছি ছি, ও কথা বলবেন না, যাকে সন্তান মনে করেন, তার কাছে আবার অপরাধ!

হর। ছেলেরা যে বুড়োদের অপরাধ পদে পদে নেয়, বাবা। যাক্ সে কথা—আমি বলি কি, তুমি স্বচ্ছন্দে পশুপতির প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পার। তবে একটা লেখাপড়া থাকা চাই।

পশু। লাভের সিকি আমার, এর কমে রাজি নই।

অম (সহাস্যে)। আপনি এতটা দাবী করেন? রাজি হওয়া কঠিন।

পশু। তুমি কত অংশ আমাকে দিতে চাও?

অম। অর্দ্ধেক।

পশু। জমী তোমার, বুদ্ধি তোমার, পরিশ্রম তোমার, তার আমি অর্দ্ধেক নেব? আমি তোমাকে বঞ্চনা করতে পারব না।

হরনাথ মধ্যস্থ হইয়া ছয় আনায় দাঁড় করাইলেন। পূজার গোল মিটিলে লেখাপড়া হইবে স্থির হইল। তখন সকলের মনও স্থির হইল। হাসি আনন্দ সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিল। হরনাথ অমরের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমার গান শুনব ব'লে আমি খোল এনেছি; তা' বাবা, এইবার চল, যদি তোমার কষ্ট না হয়।"

অ। আমার বড় আনন্দ হয় গান করতে।

হ। তবে আমি ঠাকুরের আরতিটা সেরে আসি।

তিনি প্রস্থান করিলেন। ভৃত্য ঘরে দীপ দিয়া গেল। লতা, নরু, সুকু সেই সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল। নরু কহিল, "এই যে কাকাবাবু, আমরা কত খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

অমর। বটে! তা' জানলে আমি উঠনে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

নরু। আমি বুঝি তাই বলছি! আমি ত আর খুঁজে বেড়াব না।

অম। তবে আমি তোমাকে খুঁজব, কাকাবাবুকে না দেখে আমি কতক্ষণ থাকতে পারি?

নরু মহা আনন্দিত হইয়া কাকার একখানি হাত টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিল। অমর কহিলেন, "আমি তোমাকে দুটো কথা ব'লে গিছলাম নরু, পালন করেছ?"

"করেছি। আমি মিথ্যা কথা বলি না, গানও শিখেছি। কিন্তু—"

"কিন্তু কি নরু?"

"কিন্তু আমি ভাল গাইতে পারি না—সুকু, লতা আমার চেয়ে ভাল গায়। আর দেখ কাকাবাবু, তুমি যার নাম দেবকণ্ঠী রেখেছ, সেই ছোট মাসী সকলের চেয়ে ভাল গায়। শুনবে?"

"তোমরা গাও, শুনি।"

তিন জনে তখন পরামর্শ করিয়া গান ধরিল। প্রথমেই ধরিল—

"আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো,
ওগো সকলি কি অর্থহীন, শূন্যে শূন্যে হবে লীন,
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো।"

বালক-বালিকা-কণ্ঠে গানটি বেশ শুনাইল। আকৃষ্ট হইয়া গণেশ বাবু প্রভৃতি দুই চারি জন তথায় আসিলেন। বালকরা গাহিল—

"এতই আবেগ প্রভু ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত-ও চরণে সঁপিলে গো
যদি পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন-পতি
পতিত-পাবন নাম নিলে গো।"

নিকটে একটা ঘরে হরনাথ ধ্যানস্থ ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিল। অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন এবং ভূমে গড়াগড়ি দিয়া খানিকটা কাঁদিয়া লইলেন; অবশেষে পূজা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ছেলেদের কহিলেন, "আবার একবার গাও।"

বালকরা গাহিল। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুরে মধুর মিশাইয়া প্রাণ-মন ঢালিয়া তাহারা গাহিল। লতা ভাবের

DOUBLE COLOUR PAGE

দিকেই ঝোঁকটা বেশী দিল, সুর-তালের দিকে বড় নয়। তার ভাব দেখিয়া পশুপতি মুগ্ধ হইলেন, হরনাথ কাঁদিয়া ভাসাইলেন, গণেশ বাহবা দিলেন। মানুষের হৃদয়মধ্যে নানা ভাব অবস্থান করে; কোনটা সুপ্ত, কোনটা জাগ্রত। সুর ও কথা আঘাত করে ভাবসমূহকে। সেই আঘাতে যদি সুপ্ত ভাব সহসা জাগিয়া উঠে, তবে মানুষ জ্ঞানহীনের ন্যায় আচরণ করে। কৃষ্ণনাথের হৃদয়মধ্যে যাহা এত কাল সুপ্ত ছিল, তাহা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল—তাঁহার চক্ষু দিয়া বন্যা ছুটিল। অমর বিস্মিত হইলেন। নরু থামিয়া গেল, লতা গান ভুলিল, সুকুর সুর-তাল কাটিল। অবশেষে গান বন্ধ হইল—কৃষ্ণনাথ উঠিয়া পলাইলেন।

কৃষ্ণনাথ উঠিয়া গেলে নবীন বাবু কহিলেন, "এ সব কান্নাকাটি মেয়েমানুষদেরই শোভা পায়, পুরুষের পক্ষে অশোভন।" কেহ কোন উত্তর না করিলে তিনি তখন সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ছেলেরা বেশ গেয়েছে। আমি এ রকম ছেলের দল পেলে দেশ মাতিয়ে তুলতে পারি। কংগ্রেস দলের ভেতর আমি এমন কাউকে দেখি না যে, আমার মত অকপটচিত্তে দেশের সেবা করে।"

নবীন বাবু এক জন দেশবিখ্যাত কংগ্রেস-কর্ম্মী। তাঁহার যশঃ আছে, বক্তৃতা দিবার শক্তিও আছে। তিনি মীরপুরে আসিয়াছেন ভিক্ষার্থে—চিনাপুরে না কি একটা বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, তথায় শিক্ষা দেওয়া হইবে—কি করিয়া জমী খুঁড়িয়া গাছ পুতিতে হয়। তাঁহার উদ্দেশ্য বন্ধু গণেশের অবিদিত নাই, তবে পশুপতির নিকট সুপারিশ করিবার অবসর গণেশ আজও পান নাই। তৎপূর্ব্বে নবীন বাবু স্বরাজ সম্বন্ধে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ ভণিতা করিলেন। কেহ কোন কথা কহে না দেখিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "জানলেন পশুপতি বাবু, দেশের লোকের প্রাণ নাই—"

হর। (সবিস্ময়ে) প্রাণ নাই? সে কি কথা?

নবী। অর্থাৎ ম'রে আছে—আমার মত দু'চার জন ছাড়া জানবেন, আর সব ম'রে আছে।

হরনাথ নবীন বাবুর কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিস্ফারিত নয়নে চারিদিক পানে চাহিতে লাগিলেন। হয় ত আশঙ্কা করিলেন, কেহ বা বলিয়া ফেলেন, তিনি মৃত, 'ভূত' হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গণেশ তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমরা শুনেছি, আপনার অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায়—ওর নাম কি, দেশের লোক মেতে উঠে। আপনার দেশসেবা, আপনার ভাব—ওর নাম কি, অনন্যসাধারণ। আপনার নিকট দেশ অনেক আশা করে।"

নবী। আমিও দেশের নিকট—জানলেন, অনেক আশা করি। আপনারা মুক্তহস্ত হয়ে আমার ইঙ্গিতমত চলুন, আমি—জানলেন, দেশকে অচিরে স্বাধীন করব।

গণে। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ—ওর নাম কি, না মিটলে কিছু হ'তে পারে না।

নবী। মিটতে কতক্ষণ! দেশকে যে সকলের উপর স্থান দিয়েছে, তার নিকট—জানলেন, কোন বাধা বাধাই নয়।

গণে। আপনি কি ক'রে মেটাবেন?

নবী। কেন, আমি মুসলমান হয়ে মেটাব। তারা যদি চায়—জানলেন, আমরা সকলে মুসলমান হই, তা হ'লে দেশের মুখ চেয়ে—জানলেন, আমরা সকলে মুসলমান হব। মন্দির ছেড়ে মসজেদে যাওয়া বৈ ত নয়! ঘরে ব'সে চুপ ক'রে—জানলেন, পুজো করতাম, তা ছেড়ে না হয় মসজেদে গিয়ে উঠ্‌বোস করব। তাতে—জানলেন, একাগ্রতাও জন্মাবে, আর ব্যায়াম করাও হবে। দেশ আমার উপাস্য দেবতা—জানলেন, দেশের জন্যে আমি সব করতে পারি।

গণে। ধন্য আপনার স্বদেশপ্রীতি!

নবী। কিন্তু লোক আমাকে চিন্‌লে না, আমার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝলে না! লোক আমাকে—জানলেন, ভাড়াটে ব'লে নিন্দা রটনা করে।

গণে। আমারও সেই রকম একটা আক্ষেপ হয়। এঁরা—ওর নাম কি, খোল পেটেন, আর ভাবেন, এঁরা মস্ত ধার্ম্মিক। আর কেউ যে, ওর নাম কি, জগতে ধার্ম্মিক থাকতে পারে—এঁরা তা মনে করেন না। এই যে আমি পৃথিবীর যেখানে যা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, সব প'ড়ে বুঝে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ব'সে আছি, লোক তা একবার বুঝে দেখে না। আমার বাড়ীতে—ওর নাম কি, লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করেছে, কত কাযে কত লোক আমার কাছে চাঁদা নিতে এসেছে, বৎসর বৎসর ধুমধামের সহিত কালীপূজা ক'রে জগৎকে—ওর নাম কি, আমার শুদ্ধা পরা ভক্তি দেখিয়েছি, তবু লোক আমাকে চিনতে পাল্লে না। আপনার ন্যায় আমিও বলি, জগৎ অন্ধ, ভ্রান্ত।

নবী। আহা হা, সকলে নয়—জানলেন, আমি আপনাকে চিনেছি।

হরনাথ স্তম্ভিত হইয়া বাবুদের কথা শুনিতেছিলেন। অতঃপর অমরকে কহিলেন, "চল বাবা, আমরা অন্য ঘরে যাই।"

হরনাথ তাঁহার দলবল লইয়া উঠিলেন।

৩৮

মহাষ্টমীর দিন অপরাহ্নে শরৎ বাবু আসিলেন। তাঁহার অনেক কায ছিল, তাহা সারিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি যখন আসিলেন, তখন দরিদ্রনারায়ণের সেবা আরম্ভ হইয়াছে। অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, রাস্তার ধারে, চারিদিকে লোক বসিয়া গিয়াছে। চারি পাঁচ হাজার লোক আহারে বসিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই নারায়ণ-বৃন্দের সেবার ভার পাইয়াছিলেন অমরনাথ। তাঁহার অধীনে প্রায় তিন শত ব্রাহ্মণ পরিবেষণে নিযুক্ত ছিলেন, অমরনাথ নিজে অভুক্ত থাকিয়া বিপুল আনন্দে ক্ষুধার্ত্তকে আহার দিতেছিলেন। এমন সময় হ্যাটকোট-বুট-পরিহিত শরচ্চন্দ্র সহসা দর্শন দিলেন। তিনি জুতা পায় দিয়া ভোজন-নিরত অতিথিদের মধ্য দিয়া আসিতে উদ্যত হইলে অমরনাথ দূর হইতে ছুটিয়া আসিলেন এবং বিনয়ের সহিত কহিলেন, "আপনি এঁদের মধ্যে জুতো পায় দিয়ে আসবেন না।"

শ। তা আমি যাব কেমন ক'রে?

অ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

শ। আমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভিখিরীদের খাওয়া দেখব?

অ। দেখুন না, দেখে সুখ পাবেন।

শ। রাম, এদের গায়ের গন্ধে ভূত পালায়।

অ। তবে জুতো খুলে আসুন।

শ। কে খুলে দেবে?

অ। নিজে খুলুন, লোক ত দেখছি নে।

শ। আমি খুলতে পারব না—খোলা অভ্যেস নেই—অভ্যেস থাকতেও পারে না।

অ। সঙ্গে চাকর আনেন নি?

শ। এনেছি, সে নৌকায় আছে জিনিষ আগ্‌লে।

অ। সে আসুক, এইটু অপেক্ষা করুন।

শ। না, আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমার খিদে পেয়েছে, সকাল হ'তে এক বাটি চা ছাড়া আর কিছু খাই নি। ভ্যালা নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলাম! এখন বোটে ফিরে যাই।

অ। দাঁড়ান, আমি জুতো খুলে দিচ্ছি।

বলিয়া অমর অগ্রসর হইলেন। চারিদিকে লোক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। নগ্নগাত্র নগ্নপদ অমরনাথ কাহারও বাধা না মানিয়া শরতের জুতায় হাত দিলেন, দোতলার জানালায় দাঁড়াইয়া মেয়েরা খাওয়ান দেখিতেছিলেন; অমরনাথকে জুতায় হাত দিতে দেখিয়া তাঁহারা গোলমাল করিয়া উঠিলেন। হরনাথ, পশুপতি প্রভৃতি বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, অমর ধূলার উপর বসিয়া দণ্ডায়মান শরতের জুতার ফিতা খুলিতেছেন। পশুপতি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইলেন। ক্রোধ দমন করত তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া অমরনাথের হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন; ধিক্কার দিয়া কহিলেন, "ছি অমর!"

"ইনি অতিথি।"

"অতিথির ব্যবহার কি এই?"

শরৎ একটু লজ্জিত হইলেন; অমরের নিকট ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু লজ্জা অন্তরায় হইল।

অম। যিনি আতিথ্য প্রার্থনা করেন, তিনি অতিথি—তাঁহার বেশভূষা, ব্যবহার আমাদের লক্ষ্য নয়।

পশু। যদি এই লোকটি কাহারও আতিথ্য প্রার্থনা ক'রে থাকে, তবে সে আমারই কাছে করেছে—তোমার কাছে নয়।

অম। ইনি ক্ষুধার্ত্ত।

পশু। আমি তা বুঝব; তুমি কেন আমার ঘরে এসে এ নীচ জঘন্য কায করবে?

অম। আমি ত এ কাযে কোন নীচতা এখনও দেখতে পাচ্ছি না; শুধু মনে হচ্ছে, আমি ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত নারায়ণের সেবা—

কৃষ্ণনাথ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার এক একটা কায দেখলে, অমর, আমার গা জ্বলে যায়।"

অ। অন্যায় কিছু করেছি, কৃষ্ণ?

কৃ। খুব অন্যায় করেছ; যে তোমার পায়ের ধূলার যোগ্য নয়—

অ। ছি ছি, নিজেকে কখন বড় মনে করো না—বড় মনে ক'রে নিজেকে অপমানিত করো না।

কৃ। তাই ব'লে নিজেকে ছোট মনে ক'রে আত্মসম্মান নষ্ট করতে পারি না।

অ। আত্মসম্মান নষ্ট হয়, যখন আমি নীচ কায করি, অসত্য ব্যবহার করি। অতিথিমাত্রেই পূজ্য—

কৃ। তাই ব'লে এ রকম অতিথি নয়।

অ। অতিথিকে রূঢ় কথা ব'লে যজ্ঞ পণ্ড করো না।

কৃ। তুমিও অতিথি হয়ে এসে নীচ কার্য্য করো না—তোমার অপমানে আমাদের সকলের অপমান।

অ। এই সেবাকার্য্যে আজ আমি গৃহস্বামীর প্রতিনিধি; আজ যদি আমি এই পাঁচ হাজার অতিথির পদ ধৌত করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি গৌরব মনে করিতাম। যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র অতিথির পদ ধৌত করিয়া দিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন, অতিথিমাত্রই পূজ্য। তিনি যে কার্য্যে নীচতা দেখেন নাই, তুমি সে কার্য্যে নীচতা দেখ কেন? তাঁর শিক্ষা উপেক্ষা কর কেন?

পশুপতিনাথ নীরবে সব শুনিতেছিলেন; অমরের কথা শেষ হইলে তিনি শরতের কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন; এক জন ভৃত্য আসিয়া জুতা খুলিয়া দিল। শরৎকে আদর করিয়া গৃহস্বামী ভিতরে লইয়া চলিলেন। সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া শরৎ অমরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, ইন্দ্র বাবু।"

অ। আপনি ত কোন অপরাধ করেন নি।

শ। পূর্ব্বে আপনাকে চিন্‌তে পারি নি।

অ (সহাস্যে)। কেন, আমি ত চিরদিনই আপনার ইন্দ্র বাবু—নাম ত আপনার ভুল হয় নি।

৩৯

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া গণেশ বাবু তাঁহার বন্ধু নবীনচন্দ্রকে কহিলেন, "অমর ছেলেটি ভাল।" তথায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নবীন বাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ, বেশ ছেলে; আমি এ ক'দিন লক্ষ্য করছি, জানলেন—অতি চমৎকার ছেলে। যদি এ রকম সেবক আমার দলে পাই—"

ধার্ম্মিকবর নগেন কহিলেন, "বিনয়-সৌজন্য অমরে যথেষ্ট আছে, কিন্তু ধর্ম্মানুরাগ বড় একটা দেখি না। সকালে উঠে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিক করা কর্ত্তব্য, তা' করতে অমর বাবুকে এক দিনও দেখলাম না।"

গণেশ। আহা হা, শরতের জুতো খুলে দিয়েছে ব'লে আমি যে ওর সুখ্যাতি করছি, তা' নয়; ওর স্বভাবটা প্রকৃতই মধুর। শরতের জুতো ও ত খুলে দিতেই পারে; শরৎ—ওর নাম কি, বয়সে, ধনে, মানে সবতা'তেই ওর বড়; এমন কি—

নবীন। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

গণেশ। আমি তাই মনে করছি—

নবীন। কি মনে করছেন?

গণেশ। অমরের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দি। এখনও আমি পাকাপাকি কিছু ঠিক করি নি, তবে গিন্নীর বড় ইচ্ছে—শরতেরও বড় কম নয়। আমাকে একটু আগে বলছিল—

নবীন। এ সব কথায় আমি—জানলেন, মতামত প্রকাশ করতে ইচ্ছে করি না; তবে এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি—জানলেন, অমর ছেলেটি ভাল।

গণেশ। ভাল না হ'লে কি আমি রেবার সঙ্গে বিয়ের কথা তুলি? শুধু ভাল হ'লে ত হবে না, ওর নাম কি, পয়সা থাকা চাই। সে দিকে যে শূন্যি। না আছে চাল-চুলো, না আছে চাকরী-বাকরী—

ন। তাই না কি? এত বড় ছেলে বেকার ব'সে আছে?

গণেশ। তবে আর বলছি কি ছাই! আমি না হয় মেয়েকে দশ হাজার টাকা যৌতুক দিলাম, কিন্তু তা'তে ত আর চিরকাল চলবে না।

কৃষ্ণনাথ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অমরকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। অমরও যে এত লোকের সামনে অপদস্থ হইয়া মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না; তিনি একটু তেজের সহিত কহিলেন, "আমি বিয়ে করব না।"

গ। বিয়ে—করবে—না!

অ। বিয়ে করতে আপাততঃ ইচ্ছে নেই।

গ। কেন শুনি?

অ। ক্ষমা করবেন, যতটা বলা যায়, বলেছি।

গ। আমার মেয়েকেও তুমি বিয়ে করবে না?

অ। না।

গ। যদি যৌতুকটা পনর হাজার ক'রে দি?

কৃষ্ণনাথ। আপনি আর কত বাড়াবেন? এক ধনী ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে অমরের হাতে তাঁর মেয়েকে দেবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলেন, অমর ঘৃণার সহিত তাঁহার টাকা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্প্রতি এক রাজা তাঁহার একমাত্র সন্তানকে অমরের হাতে দিতে চেয়েছিলেন, অমর তাঁহাকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নবীন। রাজা! কোন্ দেশের রাজা?

কৃষ্ণ। বেণাপুরের।

নবী। তাঁর যে বিশাল জমীদারী, আর একমাত্র মেয়ে; মেয়েটিও খুব সুন্দরী। এত বড় লোকের মেয়েকেও বিয়ে করতে অমর রাজি হ'ল না? কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে এমন কায করতে পারেন—জান্‌লেন, তা' আমি জানতাম না।

কৃষ্ণ। ধন ঐশ্বর্য্য ছাড়া পৃথিবীতে আরও ত অনেক জিনিষ থাকতে পারে।

পশু। অর্থ অমরের কাছে তুচ্ছ। তাকে বলেছিলাম, তার বাপের কয়লার খনির মুনফাটা নিতে, তা' সে নিলে না।

নবী। কেন, কেন?

পশু। বলে কি না, ওর পাওনা নেই, আমি দান করছি। অনেক টাকা জমেছিল, বছর বছর জমছেও বেশ—

অমরনাথ কৃষ্ণকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গণেশ দেখিলেন, অমর হাতছাড়া হইয়া যায়—এমন পাত্র ছাড়া ঠিক নয়—তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দাঁড়াও, আমার আরও কিছু বলবার আছে।"

অম। আপনার থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছু নেই।

গণে। আহা, শোনই না—যদি সাহেব-সুবোকে ধ'রে—ওর নাম কি, চাকরী-বাকরী যোগাড় ক'রে দি, আর যৌতুকের টাকাটা বিশ হাজার ক'রে দি—

অম। এ প্রসঙ্গ তুলবেন না।

গণে। আজকালকার ছেলেগুলো বড় একগুঁয়ে অসভ্য।

কৃষ্ণনাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আর যিনি এইভাবে প্রস্তাব করেন, তিনি বড় সভ্য!"

গণে। তুমি ত বড় বেয়াদব।

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই, নইলে এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুকে অপমানিত হ'তে দেখছি?

গণে। ওকে অপমান করলাম কখন্?

কৃষ্ণ। তা'ও বোঝবার শক্তি আপনার নেই?

গণে। তুমি ত বড় অসভ্য—দেখছি দুই-ই সমান।

অমর কৃষ্ণের বাহু ধরিয়া টানিলেন, কিন্তু কৃষ্ণনাথ নড়িলেন না—রুদ্ধ ক্রোধ বন্ধনের ভিতর আর থাকিল না, গর্জ্জিয়া উঠিল। কৃষ্ণনাথ ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "যদি মানুষ হতেন, তা হ'লে বুঝতেন, অমরকে আপনি কতখানি অপমান করেছেন। সে আমার বন্ধু, এ গৃহে পূজ্য অতিথি। আর তাকে আপনি কুকুরের অধম জ্ঞান ক'রে দু'টো ভাত ছড়িয়ে ডাকছেন! যে ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার আপনি করেন, (অমর, কৃষ্ণকে টানিতে লাগিলেন) সে ঐশ্বর্য্য অমর ইচ্ছা করলে অনেক সংগ্রহ করতে পারত। যে ডিপুটী পদের গর্ব্বে আপনি উন্মত্ত, সে পদ অমর বহু—বহুপূর্ব্বে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে অমর এক দিন আপনার স্ত্রীকন্যাকে আসন্ন-মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষে করেছিল, যে অমর এক দিন আপনার পুত্রকে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে সাহেবের লাঞ্ছনা হ'তে উদ্ধার করেছিল, সে অমর আজ আপনার দৃষ্টিতে কুক্কুর, শরতের জুতো খুলে দেবার উপযুক্ত পাত্র! (অমর পাঁজাকোলা করিয়া কৃষ্ণকে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন; যাইতে যাইতে কৃষ্ণনাথ কহিলেন) আপনি হ'লেন মানুষ, আর আমরা হলেম অসভ্য বর্ব্বর!"

পশ্চাৎ পশ্চাৎ হরনাথ উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় অমরকে ধরিলেন, "হ্যাঁ বাবা অমর, এ সব কি? এ রকমটা হবে, তা' ত আমি মনে করি নি।"

অমর। চলুন, আমরা কীর্ত্তনানন্দে এ সব ব্যথা ডুবিয়ে দি।

পশুপতি বাবুও উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, "অমর, তুমি কি রাগ করেছ, বাবা?"

অম। মিথ্যে বলব না—রাগ হয়েছিল।

হরনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, তিনি মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন। এমন সময় সুকু আসিয়া অমরের হাত ধরিল, "এই যে দাদা; আপনি যে কোথা থাকেন, খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"এই যে ভাই, আমি সাড়ে তিন হাত দেহ নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি; কি করতে হবে, বল?"

"উপরে চলুন; গাইতে হবে না?"

"চল—হুকুম তামিল করছি।"

পশুপতি বাবু কৃষ্ণনাথকে লইয়া পূজার দালানের দিকে অগ্রসর হইলেন; হরনাথ খোলের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন; অমর একা উপরে গেলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কবি রাজশেখর

৪

রাজশেখর সম্রাট ও চক্রবর্ত্তী এই দ্বিবিধ নরপতির মধ্যে যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত বা কোনও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহার মতে যে নরপতি ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে বিজয় করিয়া তাহার উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই সম্রাট্‌পদবাচ্য। ভারতবর্ষ বলিলে কি বুঝায়, তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"তত্রেদং ভারতং বর্ষমস্য চ নব ভেদাঃ। ইন্দ্রদ্বীপঃ, কসেরুমান্, তাম্রপর্ণো, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপঃ, সৌম্যো, গন্ধর্ব্বো, বরুণঃ কুমারীদ্বীপশ্চায়ং নবমঃ। পঞ্চশতানি জলম্ পঞ্চস্থলমিতি বিভাগেন প্রত্যেকং যোজনসহস্রাবধয়ো দক্ষিণাৎ সমুদ্রাদুদ্রিরাজং হিমবন্তং যাবৎ পরস্পরমগম্যাস্তে। তান্যেতানি যোজয়তি স সম্রাড়িত্যুচ্যতে।"

হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ নামে যে ত্রিবিধ বর্ষের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই অর্থাৎ আমরা যেখানে বাস করিয়া থাকি, ইহার নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ নয় ভাগে প্রবিভক্ত। অর্থাৎ নয়টি দ্বীপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত। সেই নয়টি দ্বীপের নাম যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান্, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বরুণ, কুমারীদ্বীপ। এই সকল দ্বীপ প্রত্যেকেই যোজনসহস্র-পরিমিত অর্থাৎ ইহাদিগের প্রত্যেকের স্থলভাগের পরিমাণ পাঁচ শত যোজন আর জলভাগের পরিমাণ পাঁচ শত যোজন। ইন্দ্রদ্বীপের দক্ষিণে যে সমুদ্র আছে, তাহাকেই দক্ষিণসমুদ্র বলা যায়। সেই দক্ষিণসমুদ্র হইতে উত্তরে অদ্রিরাজ হিমালয় পর্য্যন্ত দেশকে ব্যাপিয়া—যথাক্রমে এই ইন্দ্রদ্বীপ হইতে কুমারীদ্বীপ পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপ আছে। এই নয়টি দ্বীপের মধ্যে ইন্দ্রদ্বীপ হইতে কুমারীদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্বীপের মধ্যে পঞ্চশত যোজনব্যাপী জলভাগ বিদ্যমান থাকায় ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে পরস্পর গমনাগমন একপ্রকার অসম্ভব। এই বিশাল ভারতবর্ষকে যিনি জয় করিতে পারেন, তিনিই সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

কুমারীদ্বীপের আরম্ভ হইতে অর্থাৎ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হৈমাদ্রি বিভাগের অন্তর্গত বিন্দুসরঃ পর্য্যন্ত দশশত যোজনব্যাপী ভূমিভাগের নাম হইল চক্রবর্ত্তী ক্ষেত্র। এই চক্রবর্ত্তী ক্ষেত্রকে যে নরপতি জয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকেই চক্রবর্ত্তী কহে। উপরে যে ভারতবর্ষ ও চক্রবর্ত্তী ক্ষেত্র বলিয়া দুইটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কুমারীদ্বীপই অর্থাৎ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমবৎপ্রদেশ পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ—যাহাকে রাজশেখর চক্রবর্ত্তী ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিকট বর্ত্তমান সময়ে তাহাই ভারতভূমি বলিয়া সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। রাজশেখরের কথিত ভারতবর্ষ এই চক্রবর্ত্তী ক্ষেত্ররূপ ভারতবর্ষ হইতে নয়গুণ অধিক। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের মধ্যে ইন্দ্রদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া বরুণদ্বীপ পর্য্যন্ত যে আটটি দ্বীপের ও তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান ভৌগোলিক সন্নিবেশের মধ্যে সেই সকল দ্বীপ ও সমুদ্রের কোথায় সন্নিবেশ, কি নাম, তাহার কোনই খবর আমরা রাখি না। বর্ত্তমান সময়ে ভৌগোলিক তত্ত্ববিদ্‌গণের সমক্ষে ইহা হয় ত পরিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু সেই উপেক্ষা সনাতনধর্ম্মাবলম্বী শাস্ত্রপ্রমাণোপজীবী হিন্দুগণের নিকট উপেক্ষণীয় কি না, তাহার বিচার বর্ত্তমান সময়ে কে করিবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

কুমারীদ্বীপ বলিলেই যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষই প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা রাজশেখরেরই উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তিনি কুমারীদ্বীপে কয়টি কুলপর্ব্বত আছে, তাহা বলিতে যাইয়া ইহাই বলিয়াছেন—

"বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
মহেন্দ্র-সহ্য-মলয়াঃ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥"

অর্থাৎ কুমারীদ্বীপের মধ্যে এই সাতটি কুলপর্ব্বত বিদ্যমান আছে, যথা—বিন্ধ্য, পারিযাত্র, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, মহেন্দ্র, সহ্য ও মলয়।

রাজশেখর খুব স্বাধীনপ্রকৃতি ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। প্রাচীনকালের কবিগণ যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য বা তাহা সকলই নির্য্যুক্তিক, এরূপ অন্ধ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে একটি শব্দ আছে—

কবিসময় বা কবিপ্রসিদ্ধি। এই কবিসময় বা কবিপ্রসিদ্ধি কেমন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহার মধ্যে কতটা সত্য, কতটাই বা মিথ্যা, ইহার বিচার করিতে যাইয়া তিনি নিজ স্বাধীন প্রকৃতি ও সাহসিকতার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন—

"অশাস্ত্রীয়মলৌকিকং পরম্পরায়াতং যমর্থমুপনিবধ্নন্তি কবয়ঃ স কবিসময়ঃ।"

যাহা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না অথবা লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ বস্তু প্রাচীন কবিপরম্পরায় বর্ণিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া যদি কোন কবি বর্ণনা করেন, তবে তাহাকে 'কবিসময়' বলা যায়।

এইরূপ বর্ণনা করা উচিত হয় কি না, তাহা নির্ণয় করিতে যাইয়া রাজশেখর বলিয়াছেন :—

"নন্বেষ দোষঃ কথঙ্কারং পুনরুপনিবন্ধনার্হঃ ? ইতি আচার্য্যাঃ।"

আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, ইহা ত দোষ। সুতরাং কাব্যে এইরূপ কবিসময় কেন উপনিবদ্ধ হইবে ?

"কবিমার্গানুগ্রাহী কথমেষ দোষঃ ? ইতি যাযাবরীয়ঃ।"

ইহা কবিমার্গের উৎকর্ষবিধানই করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা দোষ হইবে কেন ? ইহাই হইল যাযাবরীয় পণ্ডিতের (অর্থাৎ রাজশেখরের নিজের) মত।

এই প্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও লৌকিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বস্তু কিরূপে কাব্যমার্গের উৎকর্ষসাধন করিতে পারে, এইরূপ শঙ্কার সমাধান করিতে যাইয়া তিনি কল্পনার সাহায্যে এই সকল কবিপ্রসিদ্ধির মূলে কিরূপ সত্য নিহিত থাকিতে পারে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহাতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

এই বিষয়ে তাঁহার বিচারপদ্ধতি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। পাঠকবর্গের তাহা রুচিকরই হইবে বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"নিমিত্তং তর্হি বাচ্যম্ ইতি আচার্য্যাঃ,
ইদমভিধীয়তে ইতি যাযাবরীয়ঃ।"

কেন এমন প্রমাণশূন্য কবিসময় সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বলিতে হইবে, এইরূপ প্রশ্ন আচার্য্যগণ করিয়া থাকেন, তাহার উত্তর ইহাই দেওয়া হইতেছে, এইরূপ কথা যাযাবরীয় বলিয়া থাকেন।

সে উত্তর কিরূপ ?—

পূর্ব্বে হি বিদ্বাংসঃ সহস্রশাখং সাঙ্গং চ বেদমবগাহ্য শাস্ত্রাণি চাববুধ্য দেশান্তরাণি দ্বীপান্তরাণি চ পরিভ্রম্য যান্ অর্থান্ উপলভ্য প্রণীতবন্তস্তেষাং দেশান্তরবশেন কালান্তরবশেন, অন্যথাত্বেঽপি তথাত্বেনোপনিবন্ধঃ যঃ স কবিসময়ঃ কবিসময়শব্দশ্চায়ং মূলমপশ্যদ্ভিঃ প্রয়োগমাত্রদর্শিভিঃ প্রযুক্তো রূঢ়শ্চ।"

প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ সকলপ্রকার অঙ্গের সহিত সহস্র শাখায় প্রবিভক্ত বেদ পাঠ করিতেন। এইরূপে সুবিস্তীর্ণ বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নের পর বহুশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া দূরবর্ত্তী দেশদেশান্তর ও দ্বীপান্তর পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহারা যে সকল বিষয় অবগত হইতেন, তাহাই তাঁহারা নিজ নিজ রচিত গ্রন্থসমূহে বর্ণন করিতেন, দেশান্তর বা কালান্তর বশতঃ তাঁহাদের বর্ণিত বিষয়গুলি এখন অন্যথাভাবকে প্রাপ্ত হইতেছে। এই দেশান্তরকৃত বা কালান্তরকৃত অন্যথাভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা প্রথমে যে ভাবে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাবেই বর্ণনা করার যে প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহারই নাম হইতেছে কবি-সময়। মূলে কি সত্য আছে বা ছিল, সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া গতানুগতিকভাবে প্রাচীন কবির প্রয়োগমাত্র দেখিয়া সেই ভাবে বর্ত্তমান সময়ে যে বর্ণনা করা হয়, তাহাকেই বুঝাইবার জন্য কবি-সময় এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং এই শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থ এইরূপই হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপে কবি-সময় শব্দটির সাহিত্য-শাস্ত্রে প্রবেশ কিরূপে হইয়াছে, তাহার গবেষণা শেষ করিয়া, কবি-সময়কে অবলম্বন করিয়া তিনি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারও কিয়দংশ প্রাসঙ্গিক বোধে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"তত্র কশ্চিদাদ্যত্বেন ব্যবস্থিতঃ কবিসময়েনার্থঃ কশ্চিৎ পরম্পরোপক্রমার্থং স্বার্থায় ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্ত্তিতঃ। স চ ত্রিধা—স্বর্গ্যো ভৌমঃ পাতালীয়শ্চ। স্বর্গ্য-পাতালীয়য়োঃ ভৌমঃ প্রধানঃ। স হি মহাবিষয়ঃ। স চ চতুর্দ্ধা জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়ারূপার্থতয়া। তেঽপি প্রত্যেকং ত্রিধা অসতো নিবন্ধনাৎ সতোঽপ্যনিবন্ধনাৎ নিয়মতশ্চ। তত্র সামান্যস্যাসতো নিবন্ধনং

যথা—নদীষু পদ্মোৎপলাদীনি জলাশয়মাত্রেঽপি হংসাদয়ঃ যত্র তত্র পর্ব্বতেষু সুবর্ণরত্নাদিকঞ্চ।"

তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই কবিপ্রসিদ্ধি অনুসারে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, আবার কোন কোন বিষয় বর্ত্তমান কালের ধূর্ত্ত কবিগণ পরস্পরের রচনা-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য নূতন করিয়া কবি-সময় প্রসিদ্ধ বলিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে চালাইয়া দিয়াছে। এই প্রকারের কবি-সময় বা কবিপ্রসিদ্ধ বিষয়গুলি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—স্বর্গীয়, পার্থিব ও পাতালীয়। ইহাদের প্রত্যেক বিভাগটিই আবার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াস্বরূপ। এই চারিটির প্রত্যেকটিকেও আবার তিন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—অসতের অর্থাৎ অসত্যের বর্ণনা, সত্যের বর্ণনা না করা এবং নিয়তভাবে অর্থাৎ সঙ্কোচ করিয়া বর্ণনা। তাহাদের মধ্যে সামান্যতঃ অসত্যের বর্ণনা যথা—নদীমাত্রেই পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতির বর্ণনা কিংবা যে কোন জলাশয়ই হউক না কেন, তাহাতে হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীর বর্ণনা অথবা যে কোন পর্ব্বতই হউক না কেন, সকল পর্ব্বতেই সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার রত্নাদির খনি রহিয়াছে, এইরূপ বর্ণনা।

যাহা সত্য, তাহার বর্ণনা না করা কিরূপে হইয়া থাকে, তাহার নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রাজশেখর বলিতেছেন—

"সতোঽপ্যনিবন্ধনং যথা—ন মালতী বসন্তে ন পুষ্পফলং চন্দনদ্রুমেষু ন ফলমশোকেষু।"

যাহা যেখানে বা যে কালে আছে বা হইয়া থাকে, সেখানে বা সে কালে তাহার বর্ণনা না করা-রূপ কবি-সময়ের উদাহরণ যথা—বসন্তকালে মালতীকুসুম ফুটিবে না, চন্দনবৃক্ষসমূহে পুষ্প ও ফল হইবে না, অশোক-বৃক্ষসমূহে ফল হইবে না ইত্যাদি।

নিয়মতঃ বর্ণনারূপ কবি-সময়ের স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া রাজশেখর বলিয়াছেন—

"অনেকপ্রবৃত্তবৃত্তীনাং একত্রাচরণং নিয়মস্তদ্যথা—সমুদ্রেষ্বেব মকরাঃ, তাম্রপর্ণ্যামেব মৌক্তিকানি।"

যাহা অনেক স্থলেই হইয়া থাকে, তাহাকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই নিয়তভাবে যদি বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ বর্ণনাকে নিয়ম বলা হয়, যেমন সমুদ্রসমূহেই মকরের অবস্থিতি, তাম্রপর্ণীনামে প্রসিদ্ধ নদীতেই মুক্তার উৎপত্তি প্রভৃতি।

"অসতোঽপি দ্রব্যস্য নিবন্ধনং তদ্যথা—মুষ্টিগ্রাহ্যত্বং সূচীভেদ্যত্বঞ্চ তমসঃ। কুম্ভাপবাহ্যত্বঞ্চ চ জ্যোৎস্নায়াঃ। দ্রব্যস্য সতোঽনিবন্ধনং তদ্যথা—কৃষ্ণপক্ষে সত্যা অপি জ্যোৎস্নায়াঃ শুক্লপক্ষে ত্বন্ধকারস্য। দ্রব্যনিয়মোঽপি তদ্যথা—মলয় এব চন্দনস্থানং, হিমবানেব ভূর্জ্জোৎপত্তিস্থানম্।"

যে দ্রব্য নাই, তাহার বর্ণন যথা—মুষ্টিগ্রাহ্য বা সূচীভেদ্য অন্ধকার, অথবা ঘড়া ভরিয়া জ্যোৎস্নার আনয়ন প্রভৃতি। যে দ্রব্য আছে, তাহার বর্ণনা না করা, যেমন—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে জ্যোৎস্না উঠিলেও তাহার বর্ণনা করিবে না। কিংবা শুক্লপক্ষের রাত্রিতে অন্ধকার থাকিলেও তাহা বর্ণনা করিবে না ; এইরূপ দ্রব্য-নিয়মের উদাহরণ যথা—মলয় পর্ব্বত ছাড়া অন্য কোন পর্ব্বতেই চন্দনবৃক্ষ জন্মিবে না, হিমালয়পর্ব্বত ছাড়া অন্য কোন পর্ব্বতেই ভূর্জ্জত্বক্ জন্মিবে না ইত্যাদি।

রাজশেখর স্বকৃত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে এইরূপ বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া, প্রাচীনকালে সংস্কৃত কবিকুলের ও কবিতার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ন্যায় সত্যপক্ষপাতী নির্ভীক বহুজ্ঞ কবি-সমালোচক সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে অতি অল্পই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার কাব্য-মীমাংসাগ্রন্থখানি অসম্পূর্ণভাবে আমাদের নয়নপথের পথিক হইয়াছে। কাব্য-মীমাংসার কেবল কবিরহস্য নামক অংশটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই অংশটুকুতে রাজশেখর কবির যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সমালোচনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয় এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, প্রতীচ্য ভাবের সমালোচন-পদ্ধতি যে কেবল প্রতীচীরই নিজস্ব সম্পত্তি, তাহা প্রতীচীর নবযুগের জাগরণের বহুপূর্ব্বে এই পুণ্য ভারতবর্ষের বিদ্বৎ-সমাজে ঐ তথাকথিত প্রতীচ্য সমালোচনপদ্ধতি সমীচীন-ভাবেই অনুশীলিত হইত। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

আধুনিক কালের উপযোগী ভারত স্থাপত্য

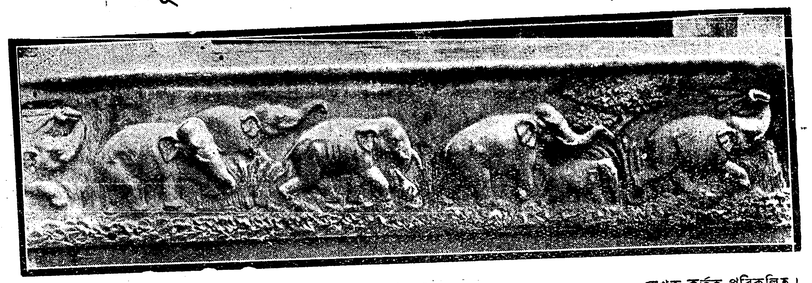

ভ্রমণশীল হস্তীযূথ

লেখক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত।

সেকালে আমাদের আবাস-গৃহগুলি আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের উপযোগী করিয়া সুদৃশ্যভাবে রচনা করা হইত। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী পৃথিবীর অন্যান্য মানবজাতির জীবনযাত্রার পদ্ধতি হইতে যেরূপ বিভিন্ন, আমাদের আবাসগৃহগুলির গঠনরীতিও তদ্রূপ অন্যান্য দেশের বাসগৃহ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। বিদেশীর শাসনের ফলে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইতে বসিয়াছি। বিদেশী স্থাপত্য আসিয়া আমাদের দেশের বিশিষ্ট স্থাপত্য-কলার উচ্ছেদ-সাধন করিতেছে। ইহা ভারতবাসীর পুষ্টিসাধনের পক্ষে অনুকূল নহে। শিশুরা জননীর নিকট হইতে যেরূপ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, দেশের স্থাপত্যকলা হইতে দেশের সন্তানরাও সেইরূপ নিজেদের অজ্ঞাতসারে জাতীয়তার প্রাথমিক

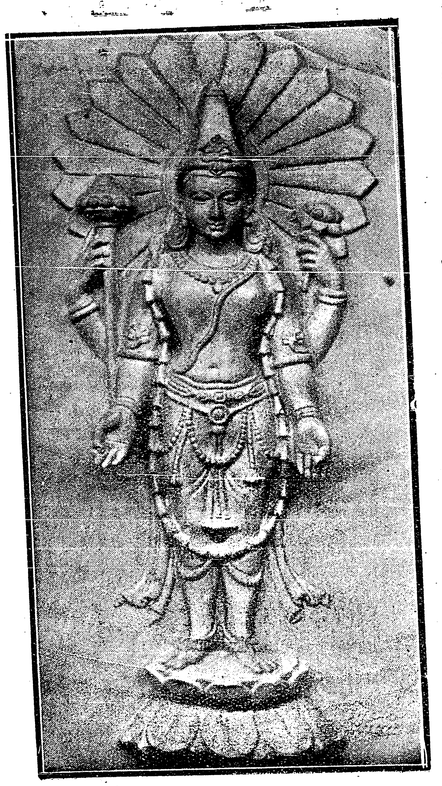

বাসুদেবমূর্ত্তি

লেখক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত।

শিক্ষা গ্রহণ করে। স্থাপত্যই জাতির আত্মার প্রতিভূ; দেশের নিখিল সভ্যতার নিদর্শন। নগরের সৌধমালা হইতেই নাগরিকদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হয়, তাহারা চিরসুন্দর এমন একটি পারিপার্শ্বিক ভাব সৃষ্টি করে, যাহা নগরবাসীর মহতী আকাঙ্ক্ষার পক্ষে তৃপ্তিকর। সৌধমালা হইতেই শিল্পী নগরবাসীদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি পরিব্যক্ত করেন। আমাদের দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের স্থাপত্য-শিল্পকে রক্ষা করা প্রয়োজন। তৎসঙ্গে আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রণালী ও আদর্শের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইয়াছি। খৃষ্টান মিশনারীদের মতবাদ প্রচারের মত খৃষ্টান স্থাপত্য শিল্পী আসিয়া ভারতের বৈশিষ্ট্যের ও

শিল্পের ধ্বংসসাধন করিতেছে। ব্রহ্ম-চীন-সীমান্তে অতি নগণ্য গ্রামেও খৃষ্টান স্থাপত্য-শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমন কি উত্তর-হিমালয়ের তুষারাবৃত বদরীনারায়ণ তীর্থেও খৃষ্টান স্থাপত্য-শিল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ বিদেশী বাস্তু-শিল্পের অধিকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেশীয় ধরণের আবাস ও মন্দির দেখা যায়, কিন্তু দেশীয় ধরণের আবাসগৃহ বাঙ্গালায় বিরল বলিলেই চলে। ফলতঃ, জাতীয় জীবনের অনুকূল ও ভারতীয় ভাবের উদ্দীপক স্থাপত্যের আবহাওয়ার অভাবে বিদেশী রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার বাঙ্গালী যতটা অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে, ভারতের অন্যান্য জাতি ততটা করে নাই। বাঙ্গালায় প্রস্তর মিলে না। সেই কারণে দুই চারিটি পাথরের মন্দির ব্যতীত, প্রাচীনযুগে বাঙ্গালার মন্দিরগুলি ইষ্টকে নির্ম্মিত ও ইষ্টকের উপর দেব-দেবী, যক্ষ-রক্ষ, কিন্নর-কিন্নরী প্রভৃতির ক্ষোদিত মূর্ত্তি ও পশু-পক্ষী-পুষ্পলতাদি বিচিত্র নক্সা দ্বারা পরিশোভিত হইত। প্রাচীন কালের অধিকাংশ মন্দিরই এখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কয়টি কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, বিদেশীর অনুকরণে অভ্যস্ত বাঙ্গালী জমীদার মহাশয়দের অবহেলার দোষে অচিরে সেগুলিও বিলুপ্ত হইবে। ভুবনেশ্বর ও খাজুরাহোর মত উচ্চশ্রেণীর মন্দির আধুনিক বাঙ্গালার সহরে ও জনবহুল পল্লীতে নাই; সেই কারণে বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিবার মত উচ্চদরের দেশীয় স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শের বাঙ্গালায় নিতান্তই অভাব। য়ুরোপীয় ধরণের আবাসভবন সমগ্র বাঙ্গালা অধিকার করিয়া আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাসগৃহ, জল-প্রাসাদ ও চণ্ডীমণ্ডপ



নাগিনী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক পরিকল্পিত।

প্রভৃতি কিরূপ সুদৃশ্য ছিল, আমরা সচরাচর আধুনিক বাঙ্গালায় তাহা দেখিতে পাই না। ফলতঃ আমাদের নূতন গৃহের গঠন-রীতি যাচাই করিবার সম্ভাবনা ও স্পৃহা আমাদের উদ্ভূত হয় নাই।

যাঁহারা কাশী অথবা পুরীধামে গিয়া দেশীয় ভাবের পাথরের বসতবাটী ও মন্দিরের শোভা দেখিয়াছেন, বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের সেইগুলি মনে থাকে না। তাঁহাদের নিজের বাটীও যে তদ্রূপভাবে নির্ম্মাণ করাইতে পারা যায় এবং নির্ম্মাণ করা বিধেয়, সে বিষয়ে তাঁহারা চিন্তাও করেন না। তীর্থযাত্রা বা কার্য্যোপলক্ষে তাঁহারা সেখানে গমন করেন, কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে, ঘরবাড়ী অথবা অধিবাসীদের প্রতি নহে। মাত্র যে দুই এক জন রসগ্রাহী ব্যক্তির দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, এ দেশেও সেইরূপ পাথরের বাটী নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর ও ব্যয়সাধ্য হইবে না বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। দেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। অধিক-অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় তাঁহারা বর্ত্তমান বিদেশী ধরণের শ্রীহীন বাটী নির্ম্মাণ করিতেই বাধ্য হন। যাঁহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, দেশাত্মবোধ ও বিচার করিবার শক্তি নাই, দেশের শিল্পে তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা দুরূহ ব্যাপার। অযথা অতিরিক্ত খরচের ভয়ই সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের বুঝাইতে হইবে যে, তাঁহাদের ভয় অযথা, বিশ্বাস অমূলক। রাজপুতানায় অবস্থান কালে যখন আমি ছাত্রের মত দেশীয় স্থাপত্যের আদর্শে বাটী নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ইট কাঠ লইয়া বাঙ্গালাদেশে দেশীয় ভাবের সুদৃশ্য

বাটী নির্ম্মাণ করা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হইবে না। আমরা বাঙ্গালায় সচরাচর যে সকল বাটী নির্ম্মাণ করি, তাহাতে অল্প-বিস্তর কারুকার্য্য থাকে। সেই সব কার্য্যেও অর্থব্যয় হয়। কিন্তু কয়েক পুরুষ হইতে আমরা সেই সকল বাটী দেখিয়া এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবার কালে সেইগুলির প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না। সেইগুলিও যেন দরজা-জানালা, কার্ণিশের সামিল অত্যাবশ্যক দ্রব্য। পক্ষান্তরে, দেশীয় স্থাপত্যে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের গঠন ও কারুকার্য্যের সমাবেশ আছে, তাহা দেখিতে আমরা অভ্যস্ত না থাকায় আমাদের মনে হয়, ঐরূপ থাম, জালি ও গম্বুজ প্রভৃতি করিতে আমাদের অনেক খরচ পড়িবে ও

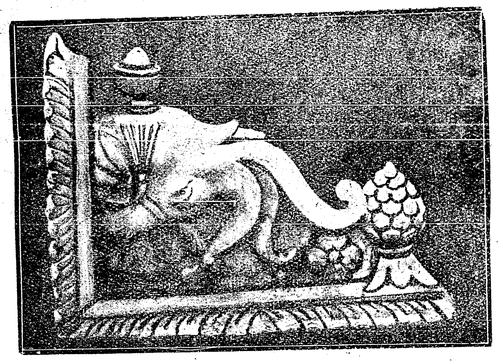

গজরাজের বন্ধনী—লেখক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত

সেগুলি করা বাহুল্যমাত্র। মাল মশলা ও মজুরীর উপর খরচ নির্ভর করে। গোলাকার থাম, বিলাতী ফুল ও গম্বুজ করিতে যতটুকু ইট, চুণ, বালি, সিমেণ্ট লাগে, অষ্টকোণী থাম, পদ্মফুল এবং ছত্র অথবা ঘণ্টাকৃতি গম্বুজ করিতেও ততটুকু মসলা প্রয়োজন হয়। কাঠের ফর্ম্মা দিয়া তাহাদের গড়ন করিতে হয়। একটি ফর্ম্মা হইতে অন্যূন পঞ্চাশটি স্তম্ভ ও একশত ফুল গঠন করা যায়। সেই ফর্ম্মাগুলি গোলাকার অথবা বিলাতী ফুলের মত না করিয়া অষ্টকোণী এবং পদ্মফুলের মত করিলেই দেশী জিনিষ করা হইল এবং তাহাতে দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিল; বাটীও সুদৃশ্য হইল। রয়েল এক্সচেঞ্জ অথবা হোয়াইটওয়ে লেডল কোম্পানীর বাড়ীর কোরিন্থিয়ান থাম, রেণেসাঁস মোল্ডিং ও গম্বুজ করিবার জন্য যে মসলা ও মজুরী খরচ হইয়াছে, কারুকার্য্য-সমন্বিত সুদৃশ্যতর দেশী ধরণের স্তম্ভ ও বিমান করিতে তদপেক্ষা কম খরচ পড়িত সন্দেহ নাই। বহুবাজার ষ্ট্রীটের "গিনি হৌসে" অথবা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বিদ্যাসাগর হোষ্টেলের দক্ষিণে বিদেশী ভাবের বহুবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট অট্টালিকাতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার দুইয়ের তৃতীয়াংশ অর্থব্যয় করিলে অতীব সুন্দর দেশীয় ধরণের বাড়ী করা যাইত। আমাদের সংস্কার কিন্তু অন্যরূপ। সেই কুসংস্কারের বশে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কম খরচেও দেশী ভাবের সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য বাটী প্রস্তুত করাইতে পারি। অল্পব্যয়ে আড়ম্বরহীন সুন্দর বাটী করানো সম্ভব। তাহার প্রমাণ জগৎকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনস্থ 'উত্তরায়ণ' ভবন।

একে আমাদের কুসংস্কার দেশীভাবে বাটী-নির্ম্মাণের বিরোধী, তাহার উপরে বাঙ্গালায় আমরা বাটীর নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল ইঞ্জিনীয়র আর্কিটেক্টকে নিযুক্ত করি, দেশীয় প্রণালীতে বাটীনির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহাদের অক্ষমতা হেতু তাঁহারাও প্রাণপণে বাধা দেন ও গৃহস্বামীকে ভয়প্রদর্শন করেন, যাহাতে সে ভাবের বাটী না করা হয়। ইংরাজ ত আমাদের জাতীয় জাগরণের কার্য্যে বাধা দিবেই; কিন্তু দেশের সন্তানের পক্ষে সেটা লজ্জাকর ও ধর্ম্মদ্রোহী কার্য্য। বিদেশী শিক্ষা ও রাজনীতি-কৌশলের ফলে আমাদের চিত্ত এত দূর বিকৃত হইয়াছে যে, নূতন ধরণের সহজ কার্য্যও আমরা অসাধ্য বলিয়া ভাবি। আমাদের একতা নাই। পরস্পরকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, প্রাণপণে আমরা পরস্পরকে বাধা দিয়া থাকি। য়ুরোপীয়দিগের সে দোষ নাই, সেই জন্য তাঁহারা বড় হইতে পারিয়াছেন, আর আমরা ক্রীতদাসের জীবন বহন করিতেছি। উক্ত ইঞ্জিনীয়র মহাশয়গণ দেশীয়ভাবের বাটীর নক্সা ও তত্ত্বাবধান করিতে শিখিয়া লইতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। শিখিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি মুনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের পূর্ত্তবিভাগে ভারতীয় স্থাপত্যের একটি শাখা খুলিতে, অল্পলাভে সাধারণের দেশীয় ভাবের বাটী করিবার ঠিকা লইতে এবং ঢালাই কংক্রিটের থাম, জালি,

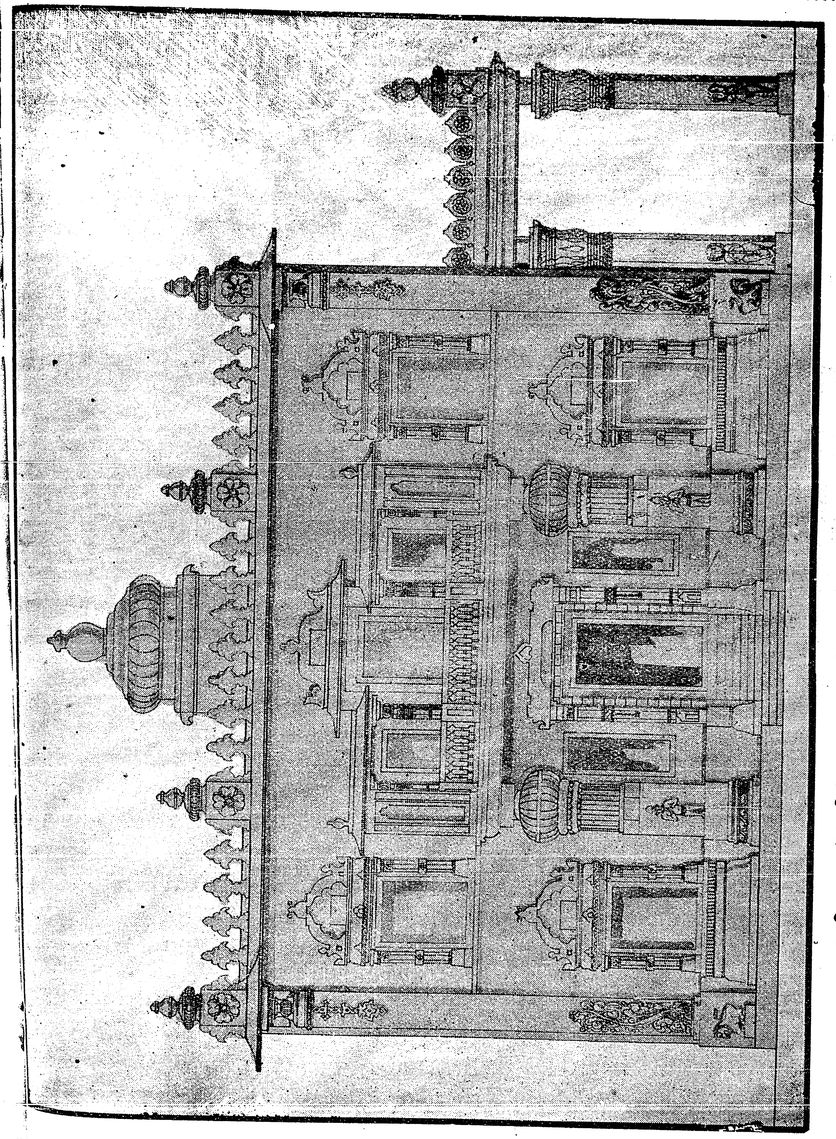

আধুনিক কালের উপযোগী বিশুদ্ধ হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন—লেখক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত এবং শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

মূর্ত্তি ও নক্সা-কাটা টালি প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিবার জন্য কারখানা খুলিতে। সার জগদীশ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আমাকে যেমন উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার তেমনই আমার পরিকল্পনাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতেও চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,—বর্ত্তমান ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় উক্ত কার্য্য করা নিতান্ত অসম্ভব। কয়েক বৎসর যাবৎ বহু পরিশ্রম করিয়া আমি যে কয়খানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা হইতে আমি তাঁহাদের বিচার করিতে অনুরোধ করি যে, বক্তৃতাকালে অথবা প্রবন্ধ লিখিয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম—অক্ষরে অক্ষরে আমি তাহা পালন করিয়াছি কি না? শুধু যে আমার "উদ্দাম পরিকল্পনাকে" মূর্ত্তিমতী করিয়া আমার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছে তাহা নহে, এত সস্তায় যে এতাদৃশ সুদৃঢ় সুদৃশ্য বাসভবন করাইতে পারিব, তাহা আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। ম্যুনিসিপালিটী আমার প্রস্তাবকে উপেক্ষা করিলেন এবং মান্যগণ্য বাঙ্গালী কণ্ট্রাক্টর আমার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলেন না বটে, কিন্তু অর্থলাভের সুগম পথ উপলব্ধি করিয়া কয়েক জন প্রথিতনামা য়ুরোপীয় পূর্ত্তব্যবসায়ী আমার প্রস্তাবমত ভারতীয় স্থাপত্যের ইমারত প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং দেশীয় ভাবের জালি, থাম, টালি প্রভৃতি ঢালাই করিতেছেন। ইহা কি স্বরাজ্যকামী বাঙ্গালীর অক্ষমতার ও দূরদর্শী ইংরাজের সুতীক্ষ্ণ ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচায়ক নহে? আজ কলিকাতায় অল্পবিস্তর দেশীয় ভাবের কতকগুলি নূতন বাটী প্রস্তুত হইতেছে। আরও কয়েকখানি সুলভমূল্যে নির্ম্মিত হইলে সাধারণের ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং দেশীয় স্থাপত্যের প্রসার সুনিশ্চিত হইবে। তবে স্থাপত্যের সম্বন্ধে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র দেশীয় ভাবের কয়েকটি অলঙ্কার পরাইয়া বিদেশী প্লানের বাটী নির্ম্মাণ করিলেই দেশীয় স্থাপত্যের আদর্শ ও মর্য্যাদা রক্ষা করা যাইবে না, তাহার প্লান-টিও আলোক, বাতাস ও স্বাস্থ্যরক্ষার পথ অটুট রাখিয়া যথাসম্ভব দেশীয় রীতি অনুসারে করিতে হইবে। কলিকাতার বাহিরে স্থানের অভাব হইবে না, সুতরাং সেখানে যথারীতি দেশীয় ভাবের প্লান করা কষ্টকর হইবে না। বিলাতী আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত বিশুদ্ধ স্থাপত্য-কলা হইতে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর না হইলেও আমাদের স্বাধীন চিন্তার ও শিল্পের ধারা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে হইবে। অদূর-ভবিষ্যতে দেশকালোপযোগী ভারতীয় স্থাপত্যের নূতন সংস্করণ করিতে আমরা সকলকাম হইব। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—অবিলম্বে আমাদের বিপথগামী চিন্তার স্রোতকে পরিবর্ত্তন করা এবং মৃতপ্রায় ভারত-শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করা। কার্য্যের সুফল হইতে কিছু সময় লইবে। আর যথার্থ কার্য্য হইবে তখন—যখন আমরা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিব এবং হিন্দুভাবে হিন্দুর জীবন যাপন করিব। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের অবহেলার জন্য যে সকল দেশীয় শিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহাদের পুনঃ প্রচলন করা। অজন্তা, এলোরা, ভুবনেশ্বরের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে শীঘ্র হয় ত সফলকাম হইব না। না হইলেও ক্ষতি নাই। শিক্ষাগার খুলিয়া ছাত্র তৈয়ারী করিতে হইবে।

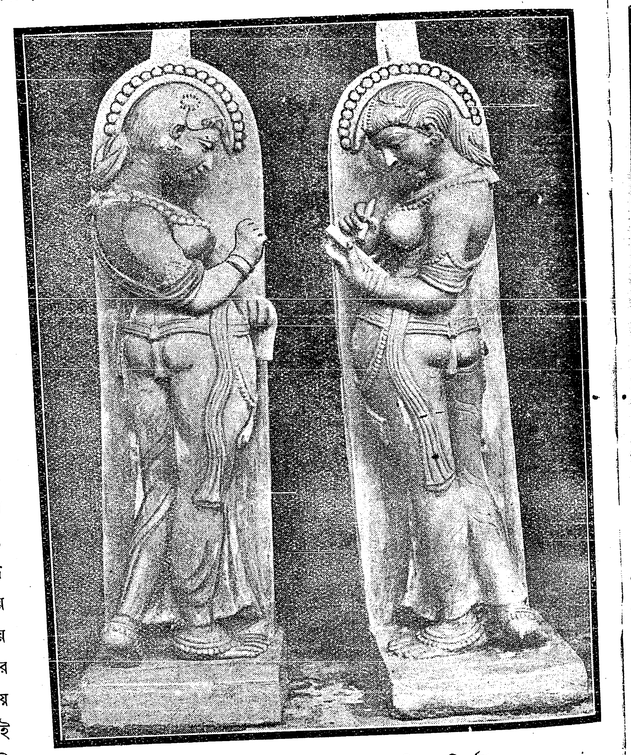

প্রোথিত ভৃঙ্গী—ভুবনেশ্বরের তক্ষণ-শিল্পের নিদর্শন

বাঙ্গালার স্থাপত্য-শিল্প এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার শিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উৎকলের কেশরী-বংশের ও বরেন্দ্রভূমির পাল ও সেন রাজগণের, গৌড়ের ও বিষ্ণুপুরের অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত টালি-সমন্বিত বাসুদেব-মন্দির ও মসজেদ এবং পাষাণের প্রাণবন্ত তক্ষণ-মূর্ত্তি। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও উক্ত অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত টালির মৃৎশিল্প বাঙ্গালায় জীবিত ছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল বৃদ্ধ মিস্ত্রীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের দুই জন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের পিতামহদের মুখে শুনিতেন যে, তাঁহারা যৌবনকালে উক্তরূপ টালি প্রস্তুত করিতেন। উক্ত প্রকারের মৃন্ময় টালি বাঙ্গালার নিজস্ব। মূর্ত্তিও বাঙ্গালীর কল্পনাপ্রসূত। বাঙ্গালার স্থাপত্য-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে বাঙ্গালার সেই মৃৎশিল্পের উদ্ধার করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমি বিগত ১৫ বৎসর হইতে কামনা করিয়া আসিতেছি যে, মৃত্তিকা দ্বারা এবং কৃত্রিম প্রস্তরে উক্ত প্রকার টালি নির্ম্মাণ করিব এবং তৎসাহায্যে বাটী অলঙ্কৃত করিয়া আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব—যাহাতে দেশের শিল্পে তাঁহাদের মমতা ফিরিয়া আসে। দেবতার মূর্ত্তি, মঙ্গলঘট ও পদ্ম না থাকিলে হিন্দুর বাড়ীর হিন্দুত্ব বজায় থাকে না, প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে সেগুলি শোভমান থাকা অবশ্য-কর্ত্তব্য। রাজপুতানা হইতে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। আমি মনস্থ করি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনকে উক্ত কার্য্যের কেন্দ্র করিব। তাহাতে জয়পুর কলাভবনের মত শান্তি-নিকেতনেরও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হইবে, শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পাইবে, দেশের শিল্প আবার জাগিয়া উঠিবে, এইরূপ মনে করিয়াছিলাম। বোলপুর কলাভবনের

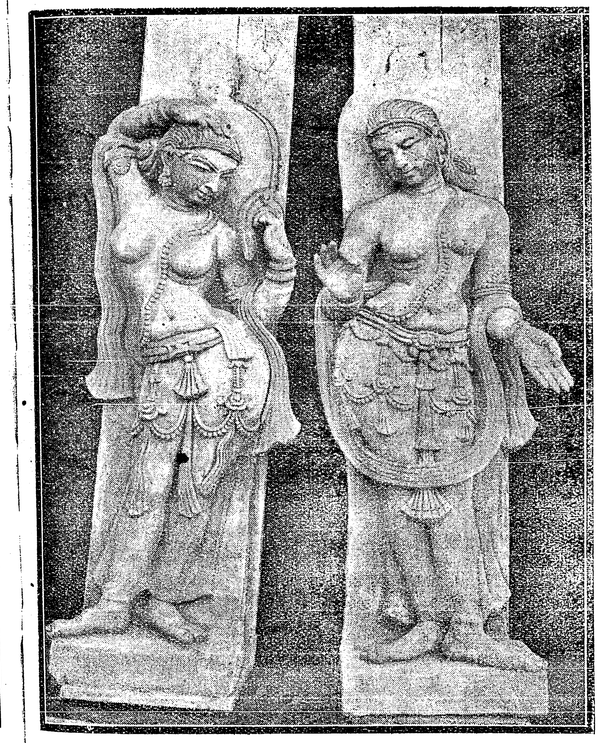

প্রসাধন নিরতা—ভুবনেশ্বরের তক্ষণ-শিল্পের নিদর্শন

কার্য্য-সচিব শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বাবুর সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে শান্তিনিকেতনে তাহা করা সম্ভবপর হইল না। তৎপরে মনে করিলাম, কোনও বাঙ্গালী পূর্ত্ত-ব্যবসায়ীকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করি। কেহ কেহ আমাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। পরিশেষে স্থানীয় কয়েক

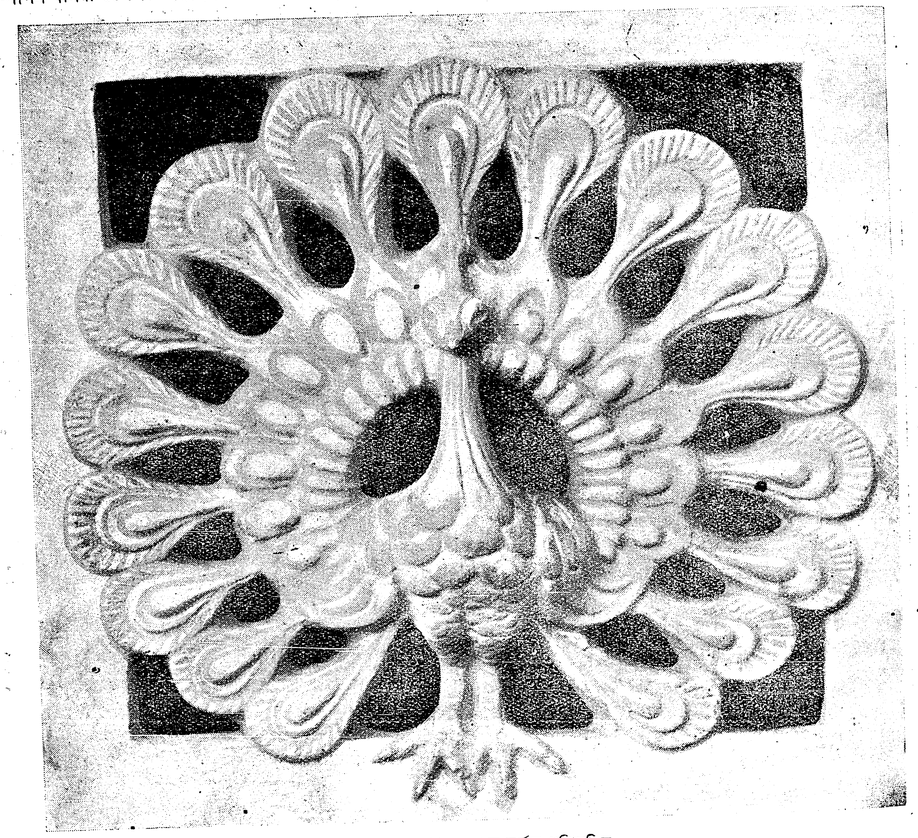

বায়ু-সঞ্চালনের পথ—লেখক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত

জন কুম্ভকার শিল্পী সংগ্রহ করিয়া আমি নিজেই উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইলাম। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে কয়েকটি আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা সেই চেষ্টার ফল। তন্মধ্যে নাগিনীর টালিখানি নন্দলাল বাবুর পরিকল্পিত। মূল্য যথাসম্ভব সুলভ। আধুনিক কালের উপযোগী ভারত স্থাপত্যের নির্দ্দন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার উপদেশ অথবা সাহায্য গ্রহণ করিব। যদি কোনও ছাত্র দেশীয় স্থাপত্য-শিল্প শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি সানন্দে তাঁহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব। আশা করি, বঙ্গের লুপ্তপ্রায় স্থাপত্য-শিল্প নব-জীবন লাভ করিবে। *

শ্রীশীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বরূপ লেখকের পরিকল্পিত একখানি বাটীর চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। বাটীখানি নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত-কুমার রায় কাশীপুরে নির্ম্মাণ করাইতেছেন। টালি কয়খানি সেই বাটীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি কোন ইঞ্জিনীয়র আমার কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক থাকেন, কিম্বা

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।



নূতন তারার ইতিহাস

পাশ্চাত্য দেশের বহু মান-মন্দির হইতে প্রতিদিন দূরবীক্ষণ-যোগে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ ও ফটোগ্রাফের যন্ত্রযোগে চিত্র গ্রহণ করা হয়। যে সকল ক্ষুদ্র তারা শক্তিশালী দূরবীণেও দেখিতে পাওয়া যায় না, ফটোগ্রাফের প্লেটে তাহাদের ছায়াচিত্র ধরা পড়ে। ঐ সকল চিত্র দেখিয়া কোন্ দিন কোন্ তারার কি পরিবর্ত্তন ঘটিল অথবা অগণিত তারার মধ্যে কোন নূতন তারার আবির্ভাব হইল কি না, তাহার পরীক্ষা করা হয়। এই প্রকারে নূতন তারা, ক্ষুদ্র গ্রহ ও বহুরূপ তারার অধিকার আজকাল পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-তত্ত্ববিদ্‌গণের নিত্যকৃত্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌ স্টেটের প্রধান নগর বোষ্টনের অন্তর্গত কেম্‌ব্রিজস্থ হারভার্ড কলেজ-মান-মন্দির এই বিষয়ে অগ্রগণ্য। হারভার্ড মান-মন্দিরের অক্ষাংশ ৪২°২২´ ৪৭·৬´´ উত্তর, সুতরাং ঐ স্থান হইতে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের নক্ষত্রনিকর পর্য্যবেক্ষণ করা যায় না বলিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু প্রদেশের এরিকুইপা গিরিশৃঙ্গের উপরিভাগে একটি এবং চিলি প্রদেশের চুকিকামাটা নামক স্থানে আর একটি হারভার্ডের শাখা মান-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। যখনই কোন নূতন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয়, তৎক্ষণাৎ ঐ সংবাদ রেডিও সাহায্যে অন্যান্য জ্যোতিষ্কতত্ত্ববিদ্‌-গণের নিকট এবং মানমন্দির-সমূহে ঘোষণা করা হয়। যেখানে রেডিও সাহায্যে সংবাদ-প্রদান সম্ভব না হয়, সেখানে টেলিগ্রামে এবং বুলেটীন, সার্কুলার প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়া ডাকযোগে ঐ সংবাদ প্রচার করা হয়। প্রভাতী সংবাদপত্রসকল তৎপরতার সহিত ঐ সকল সংবাদ মুদ্রিত করিয়া সাধারণ জনসমাজে প্রচার করেন।

১৯২৫ খৃঃ অব্দের ২৫শে মে তারিখে দক্ষিণ-আফ্রিকায় কেপ-টাউন নগরস্থ রাজকীয় মান-মন্দির হইতে জ্যোতিষ্কতত্ত্ববিদ্‌ ওয়াটসন্ কর্ত্তৃক চিত্রপটুরাশিতে একটি নূতন তারার আবিষ্কারের সংবাদ দেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন নগর হইতে প্রচারিত হয়। চিত্রপটুরাশি দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের অন্তর্গত; সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রই এরিকুইপা শাখা মানমন্দির হইতে ডাঃ পেয়েস্কো-লোপলাস্ উহার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ২৭শে মে ঐ তারাটির মূলত্ব ২·৩ ও ২৮শে মে ২·২ ছিল, সুতরাং দক্ষিণ দেশের তারা-পর্য্যবেক্ষকগণ উহাকে খালিচক্ষুতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার পরে কেপটাউন মান-মন্দির হইতে এবং পরে দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জ্জেনটাইন প্রদেশের লা প্লাটার মানমন্দির হইতে কিরণ-বিশ্লেষণ যন্ত্রে ঐ নূতন তারার ফটো লওয়া হয়। লা প্লাটা মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ হার্টম্যান উহাকে বিশেষ শ্রেণীর নূতন তারা বলিয়া ঘোষণা করেন। যে হেতু, এই শ্রেণীর নূতন তারা সচরা-চর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর তারা তিনটিমাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি ১৯১৮ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন গরুড় রাশিতে, দ্বিতীয়টি ১৯২০ খৃঃ অব্দের ২১শে আগষ্ট বক রাশিতে আবির্ভূত হইয়াছিল। তৃতীয়টি বক্ষ্যমাণ নূতন তারা। এই তারাটির আবিষ্কার-সমাচার প্রাপ্ত হইয়া কুমারী উড্, ১৮৯০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯২৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত গৃহীত এক শত তিনখানি ফটোচিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, ঐ তারাটির স্থানে একটি ত্রয়োদশ শ্রেণীর তারার চিহ্ন বিদ্য-মান রহিয়াছে। হারভার্ডের ক্রমপর্য্যায় অনুসারে উহার স্থূলত্ব ১২·৭৬। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে উহার জ্যোতির্ব্বৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। ১৮৯০ খৃঃ অঃ হইতে ১৯১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত "বাকী" দূরবীণে গৃহীত উনত্রিশখানি প্লেটে নূতন তারার চতুর্দ্দিকে, এক ডিগ্রী স্থানের মধ্যে, যতগুলি ত্রয়োদশ শ্রেণীর তারা ছিল, তাহাদের সকলগুলিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ঐ তারাটির জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তারাটি তাহার স্বাভাবিক স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবতঃ ১৯২৫ খৃঃ অব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পায় নাই; কারণ, ৪ঠা, ১১ই ও ১৩ই জানুয়ারীতে গৃহীত চিত্রগুলিতে একাদশ শ্রেণীর এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারীর ফটোচিত্রে দ্বাদশ শ্রেণীর তারার চিহ্ন উঠিয়াছিল, ঐ সকল চিত্রে নূতন তারাটির চিহ্ন না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, তখনও উহা দ্বাদশ শ্রেণীর তারা হইতে ক্ষীণ-জ্যোতিঃ ছিল। ১৩ই এপ্রিল নূতন তারাটিকে তৃতীয় শ্রেণীর তারার স্থূলত্বে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ২৭শে মে উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থূলত্বে উপনীত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৩ই এপ্রিলের মধ্যবর্ত্তী কালের ফটো না থাকায় ঠিক কোন্ দিন উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ২৭শে মের পর হইতে তারাটির জ্যোতিঃ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ৯ই জুন তারিখে উহা ১০১ স্থূলত্বে উপনীত হয়, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর তারার স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। হারভার্ড বুলেটীনের ৮২১ সংখ্যায় ও পরবর্ত্তী কতিপয় সংখ্যায় এই নূতন তারাটির পর্য্যবেক্ষণের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৯ই জুন হইতে নূতন তারাটির জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। এই তারাটির কিরণ-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার কিরণ-রেখার সহিত নীহারিকার কিরণ রেখার চিহ্ন রহিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয় যে, কোন ভ্রাম্যমাণ নীহারিকা পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ শ্রেণীর তারাটিকে অতিক্রম করিয়া গমন কালে সংঘর্ষণের ফলে অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছিল।

জার্ম্মাণীর বেডেন প্রদেশের উত্তর ভাগে, রাইনের শাখা-নদী নিকারের দক্ষিণ তীরে, হিডেনবার্গ নগরের সন্নিহিত ব্ল্যাক-ফরেষ্ট নামক বনাকীর্ণ পর্ব্বতমালার উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত কনিগষ্টুলে একটি মান-মন্দির স্থাপিত আছে। ডাঃ ম্যাক্সউল্‌ফ ঐ মান-মন্দির হইতে ১৯২৫ খৃঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর গরুড় রাশিতে একটি নূতন তারার আবিষ্কার করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হারভার্ড মান-মন্দিরের জ্যোতিষ্কতত্ত্ববিদ্‌গণ ১৮৯৯ খৃঃ হইতে ১৯২৫ খৃঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গৃহীত গরুড় রাশির এক শত ত্রিশখানি ফটোচিত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে বসিয়া গেলেন। ঐ সকল ফটোচিত্রের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীণে গৃহীত। ষোড়শ শ্রেণীর ক্ষুদ্র তারার চিহ্নও উহাতে ধরা পড়িয়াছে। পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে,২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত গৃহীত কোন চিত্রে ঐ নূতন তারাটির চিহ্ন নাই। ৮ই সেপ্টেম্বরের চিত্রে উহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উহার স্থূলত্ব ৯·৮ ছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর উহার জ্যোতিঃ সামান্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৯·২ হইয়াছিল। ইহার পর ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত যে সকল ফটো লওয়া হয়, তাহার সকলগুলিতেই ঐ নূতন তারার স্থূলত্ব প্রায় সমানই ছিল। অবশ্য এ তারাটি খালি চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

১৯২৬ খৃঃ অব্দের মে মাসে ঐ কনিগষ্টুল মান-মন্দির হইতে ডাঃ রিটন মাউথ ও ডাঃ ম্যাক্সউল্‌ফ উভয়ে একত্র কন্যারাশির এন্, জি, সি, ৪৩০৩ সংখ্যক নীহারিকার মধ্যে আর একটি নূতন তারার আবিষ্কার করেন। ১৯২৬ খৃঃ অব্দের ৯ই ও ১২ই মে তারিখে এন্, জি, সি, ৪৩০৩ সংখ্যক নীহারিকার চারিখানি ফটো লওয়া হয়, ঐ সকল ফটোচিত্রের তারা পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, উহার মধ্যে একটি নূতন তারার আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ সময়ে নূতন তারাটি তাহার নিকট হইতে ২′·৬ অংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ১৩০ স্থূলত্বের একটি তারার সমান জোতিষ্মান্ ছিল। হারভার্ড মান-মন্দির হইতে গৃহীত ফটোচিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তখন তারাটি তাঁহাদের হিসাবে ১৪·২ স্থূলত্বে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শ্রেণীর তারার ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ ছিল। ডাঃ উলফ্ বলিয়াছেন যে, ১৫ই এপ্রিল তারিখে ডাঃ রিইনমাউথ যে ফটো লইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ তারাটির কোনই চিহ্ন ছিল না। হারভার্ড হইতে ১৬ই মেট্‌কাফ দূরবীণে এন্, জি, সি, ৪৩০৩ নীহারিকার একটি ফটো ১৭ই মে তারিখে একত্রিশ মিনিটের অবকাশে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ ফটো প্লেটে তারাটির স্থূলত্ব ১৪·৬ ছিল। পরবর্ত্তী রাত্রিতে কুড়ি মিনিটের অবকাশে যে ফটো লওয়া হয়, তাহাতে তারাটিকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দেখাইয়াছিল। চন্দ্র-কিরণে ফটো প্লেটখানি অত্যন্ত ফিকে হওয়ায় তারাটির প্রকৃত স্থূলত্ব নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল।

ঐ নূতন তারাটির বিস্ময়কর দূরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে,প্রায় এক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ঐ তারাটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, সুতরাং ঐ তারাটি জন্মলাভ করামাত্র উহার আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে দ্রুত গমন করিতে করিতে এক লক্ষ বৎসর পরে আমাদের পৃথিবীতে উপনীত হইয়াছে। ইহা শুনিতে যতই আশ্চর্য্য-জনক হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ঐ তারাটির জ্যোতিঃ নর-চক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই যেহেতু, ওরূপ শীর্ণ-জ্যোতির তারা উৎকৃষ্টতম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানব কখনও দেখিতে পান না, তারাটি কেবলমাত্র যন্ত্রযোগে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, (এম্, বি)

পিপীলিকা

মৌমাছি সম অবিরত শ্রমশীল,
নীরব কর্ম্মী, অবসর নাহি তিল,
নিপুণ শিল্পী, অতি বড় সন্ধানী,
শিশুকাল হ'তে তোমারে বিশেষ জানি
অনলস পিপীলিকা !
তোমার উপর হয় নি কবিতা লিখা।

হে বীর-হৃদয়, তব অগম্য ঠাঁই
দেখিলাম এই দুনিয়ার মাঝে নাই।
আবিষ্কর্ত্তা, পরিব্রাজক, গৃহী—
কর সংগ্রহ তিল তণ্ডুল ব্রীহি,
ঝিঁঝির দীক্ষা-গুরু !
তোমারি নিকট মিতব্যয়িতা সুরু।

তোমাতে আসিয়া শেষ সব উপকথা
মেলে নদনদী সাগরের বুকে যথা।
প্রলয়ের দিনে শ্রীভগবানের প্রায়,
বটপত্রেতে ভাস তুমি বন্যায়
উৎসাহী পিপীলিকা !
তুমি ধৈর্য্যের কনকোজ্জ্বল শিখা।

গড় বল্মীক, গড় করি তোমা দেখি,
ঋণী তব কাছে কবি গুরু বাল্মীকি।
হৃদয় তোমার কবিত্ব-রসে ভরা,
এত ভালবাস তাই তুমি শর্করা
রসজ্ঞ পিপীলিকা !
তোমার ললাটে দিনু আজ রাজটীকা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

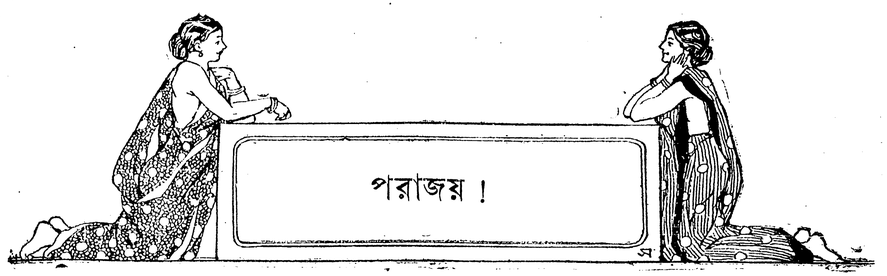

১

"আশীর্ব্বাদে" পুরোহিত-প্রণামী ৪ টাকা লইয়া আসিয়া পুরোহিত ঠাকুর যখন পাত্রের প্রশংসা করিয়া অদন্তের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যোগ্যং যোগ্যেন," তখন তাঁহার সহগামী-দিগের মধ্যে কাহারও মুখভাবে তাঁহার মত প্রতিফলিত হইল না, কাহারও কণ্ঠ হইতে তাঁহার মতের সমর্থক কথা বাহির হইল না; সকলেরই মুখে যেন অসন্তোষের অন্ধকার। কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করিবার সময় রণেশচন্দ্র কাহারও সহিত পরামর্শ করেন নাই—এমন কি, গৃহিণীর সহিতও নহে। রণেশচন্দ্র কলিকাতার এক ধনি-পরিবারের সন্তান—কিন্তু পুরাতন বাড়ী ছাড়িয়া নূতন বাড়ী করিয়াছিলেন এবং ব্যবসা-বুদ্ধিবলে পৈতৃক অর্থ এক গুণ হইতে দশ গুণ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ীর একটা বড় গুণ তাঁহার ছিল—তিনি "এক কথার মানুষ"; কথা যাহা দিতেন, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন এবং কর্ত্তব্য স্থির করিতেও বিলম্ব করিতেন না। তাঁহার আর দুইটি কন্যার বিবাহ কলিকাতাতেই হইয়াছিল। এই দুইটি বিবাহের একটি তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা বিলাতী হইয়া পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ "উড়াইয়া" দিয়াছিল এবং শেষে তিনিই "ঘর পোড়ার কাঠ" হিসাবে কতকটা অংশ রক্ষা করিয়া কন্যা-জামাতাকে দারিদ্র্যের আক্রমণ হইতে একটু দূরে রাখিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে দিনকতক যে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কন্যাদ্বয়ের বিবাহে পাত্রের প্রতিভা ও চরিত্রই নির্ব্বাচনের আদর্শ করিবেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহে তিনি সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আপনি পাত্র সন্ধান করিয়াছিলেন। পাত্র নরেশচন্দ্র সেই বার মেডিক্যাল কলেজ হইতে সবগুলা "মেডেল" লইয়া বাহির হইয়াছিল। তাহার সেই সাফল্য ও তাহার চরিত্র এই দুইটিই পাত্র-নির্ব্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া রণেশচন্দ্র পাকা কথা দিয়াছিলেন। নরেশচন্দ্রের বাড়ী নদীয়া জিলায়—একটি গণ্ডগ্রামে; সংসারে তাহার মা ছাড়া আর কেহ নাই; জমী-জমা যাহা আছে, তাহাতে ভাগ-চাষে পল্লীগ্রামে "সে টা ভাত মোটা কাপড়ে"র অভাব হয় না বটে, কিন্তু "হাল ফ্যাসানে" বিলাসের সীমারেখার গণ্ডীর মধ্যে পা দিলেই আয়ে ব্যয় কুলায় না—"যশোদার দড়ীর" দুই মুখ এক হয় না। কলিকাতায় একখানা ছোট ভাড়া-বাড়ীতে ছেলে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে। মা "দু'টানায়" পড়িয়া কখন দেশে, কখন কলিকাতায় থাকেন—বাড়ীতে গৃহ-বিগ্রহ শ্রীধর, কলিকাতায় একমাত্র সন্তান; যে কয় মাস পুরোহিত ঠাকুর ঠাকুর-পূজার সব ভার লইতেন, সেই কয় মাস মা কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন—অবশিষ্ট সময় দেশে থাকিতেন।

কলিকাতায় জাতা ও পালিতা কন্যার পক্ষে অনভ্যস্ত পল্লী-জীবন যে কষ্টকর হইতে পারে, সে বিষয় বিষয়ী রণেশ-চন্দ্র যে বিবেচনা করেন নাই, এমন নহে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নরেশচন্দ্র কলিকাতাতেই বাস করিবে—কেন না, তাহার মত প্রতিভাবান্ ডাক্তারের কার্য্যক্ষেত্র পল্লীগ্রামে হইতে পারে না। জামাতা কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসা করিবে, তিনি তাহাকে একটা বড় ডাক্তারখানা করিয়া দিবেন। তাহার ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে রণেশচন্দ্রের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় নাই। তিনি যতদূর সম্ভব সন্ধান লইয়াছিলেন—নরেশচন্দ্রের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর; সে সচ্চরিত্র। তিনি তাহাতে যে উপকরণ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু রণেশচন্দ্র যে বিবেচনা করিয়াছিলেন, সে বিবেচনা "আশীর্ব্বাদের" দিন তাঁহার সহগামী তাঁহার দুই পুত্র, এক শ্যালক ও তাঁহার পিতৃষ্বসৃপুত্র কেহই করেন নাই। তাঁহারা

দেখিয়াছিলেন, নরেশচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র ভাড়া-বাড়ীতে বাস করে, গৃহটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত হইলেও তাহাতে আসবাবের বাহুল্য বা বিলাসের পরিচয় নাই, পরন্তু তাহার সাজসজ্জা সবই যেন কঠোর ও বিলাসবর্জ্জিত ভাবের পরিচায়ক। কাযেই রণেশচন্দ্রের নির্ব্বাচন তাঁহাদের প্রীতি-প্রদ হয় নাই। তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই—রণেশচন্দ্র কেন এমন ঘরে কায করিতেছেন। তিনি প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহে ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন নাই, এ বিবাহেও যে হইবেন না, তাহা তাঁহারা জানিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপ-লাবণ্য ও রণেশচন্দ্রের "দানের" খ্যাতি সহরে অনেক ধনীকে তাঁহার সহিত কুটুম্বিতায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তিনি সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাহার পর—এই সম্বন্ধ! সেই জন্যই তাঁহারা কেহ পুরোহিত-ঠাকুরের "মন-রাখা" কথার সমর্থন করিলেন না; পরন্তু বাড়ীতে যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সদরের মেঘ অন্দরেও ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বৈশাখের সূর্য্য যতক্ষণ প্রখর তাপ বিকীর্ণ করে, ততক্ষণ মেঘ বারিবর্ষণ করিতে পারে না—তাই "রাশ-ভারী" রণেশচন্দ্রের কথার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। গৃহিণী একবার বলিলেন, "ছেলেদের চাল না কি বড় মোটা?"

রণেশচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, সে ত আমি জানি, কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "ওরা তাই বল্‌ছিল।"

রণেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'রা?"

গৃহিণী একটু বিব্রত হইলেন—ছেলেদের নাম করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না, তিনি তাঁহার ভ্রাতার ও রণেশ-চন্দ্রের পিসতুত ভ্রাতার নাম করিলেন। শুনিয়া রণেশচন্দ্র বলিলেন, "হুঁ, কিন্তু তা'রা কেউ মেয়ের বাপ নয়।" প্রায় ৩০ বৎসর এই মানুষটিকে লইয়া গৃহিণী "ঘর করিয়াছেন"—ইঁহার প্রকৃতি তিনি নখদর্পণে দেখিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। তখন কর্ত্তা বলিলেন, "ছেলে দেখেই কায করছি—ও ছেলের টাকার অভাব হ'বে না; টাকা আর মান ওর পায় লুটিয়ে পড়বে—আমি তত দিন থাকি আর না থাকি, তুমি দেখে নিও।"

গৃহিণী বলিলেন, "মুখে কি আ-কথা কু-কথা ছাড়া আর কিছু নেই?"

হিন্দুর ঘরে বিবাহ একটা ধর্ম্ম-সংস্কার; তাহাতে যদি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেমস্ফুরণের সুযোগ না থাকে, তথাপি পবিত্রতার অভাব কখন হয় না; যদি কোথাও তাহাতে স্বামীর সক্রিয় প্রেম-তৃষ্ণা পূর্ণ না হয়, তবুও সংসারে শৃঙ্খলার অভাব কখন হয় না। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই স্ত্রীর নিকট স্বামী অপেক্ষা সাধ্যের মূল্য ও আদর অধিক হয়; স্বামী সুস্থ থাকুন—তাঁহার কোন অসুবিধা না হয়, ইহাই স্ত্রীর লক্ষ্য হয়; তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সেবা-যত্নের কথা আর স্ত্রীর মনে থাকে না—সে সব যেন যৌবনের চঞ্চল প্রেমের পরিচায়ক, অতিক্রান্তযৌবনার পক্ষে লজ্জার কথা। কাযেই তখন সংসারপরিচালন—পুত্র-কন্যাপালন—ব্রত-পার্ব্বণ প্রভৃতিই স্ত্রীর কায হইয়া দাঁড়ায়, স্বামী কতকটা অমনোযোগজনিত স্বাধীনতায় কালাতিপাত করেন। রণেশচন্দ্রের পত্নী কুসুমকামিনীর সেই অবস্থা হইয়াছিল। রণেশচন্দ্র জানিতেন, তাঁহার কাযে গৃহিণীর কোন আকর্ষণ বা কৌতূহল নাই; কুসুমকামিনী জানিতেন, কর্ত্তার কায কর্ত্তা করেন—ঘরের কায তাঁহার নিজের; কাযেই কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে স্বামি-স্ত্রীতে আলোচনায় এই স্থানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িল।

কুসুমকামিনীর কিন্তু কর্ত্তার কথায় কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা নিবৃত্ত হইল না। যে পথ স্বাভাবিক, সে পথে বাধা পাইলে নদীর জল যেমন অন্য দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেই কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা তেমনই বাড়ীর অন্যান্য লোকের কাছে জিজ্ঞাসায় ও পরামর্শে ব্যাপ্ত হইল। কাযেই সম্বন্ধটা যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় নহে—কোনমতেই জ্যোতির্ম্ময়ীর উপযুক্ত হয় নাই, এই কানাকানিটা জ্যোতির্ম্ময়ীর কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু হিন্দুর ঘরের মেয়ে—একে ভাগ্যে বিশ্বাস-বতী, তাহাতে পিতার উপর নির্ভরশীল—তাহার তরুণ চিত্তে বিদ্রোহের বিকাশ হইল না; তবে একটু অসন্তোষের ভাব যে রহিল না, তাহা নহে; অর্থাৎ বৈশাখের দিনান্তদিগন্তে কালবৈশাখীর আবির্ভাব না হইলেও খানকতক মেঘ যে দেখা দিল না, এমন নহে। এমন মেঘের গতায়াতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না; সেগুলি একটু বাতাসেই সরিয়া যায়—ভাল-বাসা, বিবাহিত জীবনের ভালবাসা এরূপ অসন্তোষ সঞ্চিত হইতে দেয় না। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইয়া গেল। জামাই দেখিয়া কেহ নিন্দা করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই বাড়ীর

মহিলাদিগের মন "ভারী" হইয়াছিল—"গায় হলুদের তত্ত্ব" যেন ঠিক নিয়মরক্ষা করিয়া পাঠান হইয়াছিল, তাহাতে সকল দিকে—সকল ভাবে বাহুল্যের অভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অর্থাৎ আর্থিক হিসাবে জামাতার অবস্থা গোপন করিবার কোন চেষ্টাই তাহাতে ছিল না। সেই তত্ত্ব দেখিয়া গৃহিণীর যেন মাথা কাটা গিয়াছিল—পূর্ব্বে তিনি অনেক তত্ত্ব দেখিয়া-ছেন. তুলিয়াছেনও বটে, কিন্তু এ কি! তিনি কাহার মুখে চাপা দিবেন? বিশেষ যাহার মুখখানা সর্ব্বদাই ভীমরুলের চাকের মত, সেই তাঁহাকে "মানুষকরা" ঝি মাতঙ্গিনীর মুখ বন্ধ করে, "হেন সাধ্য কার এ ভুবনে?" সে যখন কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া স্বভাবতঃ স্ফীত ওষ্ঠ ঝুলাইয়া দিয়া বলিয়া-ছিল, "মা গো! এর নাম তত্ত্ব!" তখন চারিদিক্ হইতে তাহার কথার প্রতিধ্বনিই শুনা গিয়াছিল।

২

আষাঢ়ের প্রথমে বিবাহ হইল। মাতঙ্গিনীই মেয়ের সঙ্গে "ঘর করাইতে" গেল। ফুলশয্যার পরদিন মাতঙ্গিনী যখন একবার সব সংবাদ দিতে আসিল, তখন কুসুমকামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তত্ত্ব দেখে কি বললে?"—তখন যেন গিন্নীদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাত হইল; সে বলিল—"বল্‌বে আবার কি? কোন পুরুষে অমন তত্ত্ব দেখেছে? বলে কোন্ পাড়াগাঁয়ের ভূত—বাড়ীতে তত্ত্ব তুলবার যায়গাই নেই।" মাতঙ্গিনী আসিয়াছে জানিয়া রণেশচন্দ্র সংবাদ লইবার অভিপ্রায়ে সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাতঙ্গিনী যেন ফুলিয়া উঠিল—কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া (সেইটি তাহার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তী) বলিল, "হাঁগা বাবা! কি দেখে সম্বন্ধ করেছিলে? ঐ কি তোমার কুটুম হ'বার মত ঘর?" রণেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি ছেলে দেখেই সম্বন্ধ করেছি—অবস্থা দেখে নয়। অবস্থা মানুষই ফিরাতে পারে। আমার প্রপিতামহের কি ছিল? তিনি হাঁটা পথে হুগলী জিলা হ'তে এসে নিজে হা'ত করে গিয়েছিলেন—তিন পুরুষ খেয়ে প'রে বাবুগিরী করে এত টুকরো হ'বার পরও তাই খাচ্ছি।" বলিয়া রণেশ-চন্দ্র বিরক্তভাবে বাহিরে চলিয়া যাইলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মাতঙ্গিনীও আর কথা কহিতে পারিল না। কুসুম-কামিনীরও আর মেয়ের বাড়ীর সব কথা শুনিবার সুবিধা হইল না। সে "রাশ" কর্ত্তার ছিল।

নরেশচন্দ্রের কুলপ্রথা, বিবাহের পর এক বৎসর বধূ আনিতে বা কন্যা পাঠাইতে নাই। মা ছেলেকে বলিলেন, "দেখ বাবা, সেকালে ছোট মেয়ের বিয়ে হ'ত; তাই এক বৎসর শ্বশুরবাড়ী না পাঠানই রীতি ছিল। এখন তুই যদি বলিস, আমি আর সে মানি নে; তা হ'লে 'ধুলো পা'র ব্যবস্থা করি।" মাতা-পুত্রের মধ্যে স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্বন্ধটা যেরূপ ছিল, তাহাতে মা যেমন পুত্রকে তুই করিতে চাহিতেন, পুত্রও তেমনই সর্ব্বতোভাবে মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিতে অনি-চ্ছুক ছিল। নরেশচন্দ্র জানিত, মা কুলপ্রথা মানিতে পারি-লেই সন্তুষ্ট হইবেন। সে বলিল, "যে প্রথা আছে, তা' থাকুক না কেন? তুমি ত বাড়ী যেতে চাচ্ছ—ক'মাস যাও নি, পূজার আগে ফিরবে না; তা'র পর বলেছ, আমার বিয়ে দিয়ে একবার তীর্থ-দর্শনে যা'বে। সেই ত প্রায় আট ন' মাস কেটে যা'বে।"

তাহাই স্থির হইল।

জ্যোতির্ম্ময়ীকে পিত্রালয় পাঠাইয়া এক পক্ষের মধ্যেই মা দেশে চলিয়া যাইলেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে রণেশচন্দ্র এক দিন জামাতৃ-গৃহে যাইয়া জামাতার জন্য একটা বড় ডিস্‌পেন্সারী করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে নরেশচন্দ্র বলিল, "আমি মেডিক্যাল কলেজে চাকরী পেয়েছি, এক বৎসর সেই চাকরী করি—শিক্ষাও হ'বে, লোকের সঙ্গে—ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচয়ও হ'বে। তার পর যা' হয় করা যা'বে।" রণেশচন্দ্র এই কথাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং ইহাতে জামাতার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া প্রীত হইলেন।

রণেশচন্দ্র প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু সে প্রীতি পরিবারে পরিব্যাপ্ত হইল না। চাকরী! চাকরীতে কি হয়? এক-খানা গাড়ী রাখার খরচও কুলায় না!

শ্বশুরবাড়ীতে নরেশচন্দ্রের ঘন ঘন নিমন্ত্রণ হইত বটে, কিন্তু দুই কারণে তাহার পক্ষে ঘন ঘন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হইত না। প্রথম কারণ—তাহাকে কখন কখন রোগীর কাছে রাত্রি কাটাইতে হইত; নূতন ধরণের রোগ-চিকিৎসার সুযোগ পাইলে সে যেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিত—রোগের গতি দেখিত। দ্বিতীয় কারণ—সে স্বভাবতঃ কেন্দ্রস্থ ছিল—আপনার সব ব্যবস্থা আপনার গণ্ডীর মধ্যে যে ভাবে করিয়া লইত, তাহাতে সে গণ্ডীর বাহিরে যাইলে সে কেবল অস্বস্তি অনুভব করিত। তবুও

সে পারিলেই নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইত—কারণ, তাহার তরুণ হৃদয় নবোদ্গত ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যে ভালবাসা আঞ্জিতকে সত্য সত্যই বলিতে পারেঃ—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

তাহার পুণ্যপূত হৃদয়ে সেই ভালবাসার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এক দিন অন্য জামাতৃগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া সে যখন তাঁহাদের গাড়ীঘোড়া-বাড়ী-মোটর-চর্চ্চায় ও পরচর্চ্চায় বিরক্ত হইতেছিল, সেই সময় তাহার এক শ্যালকের বক্রোক্তিতে সে বুঝিতে পারিল, সে যে কলিকাতার সমাজে "স্রোতের শেয়ালা", ইহা তাহার শ্বশুরবাড়ীতে আলোচনার বিষয়, তখন হইতে সে নিমন্ত্রণরক্ষাও কমাইয়া দিল, কেবল শিষ্টাচার ত্যাগ করিল না।

তাহার শ্বশুরবাড়ীতে তাহাও বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল এবং তাহার গুঞ্জন জ্যোতির্ম্ময়ীর কর্ণেও প্রবেশ করিত। কিন্তু সবই সহিয়া যায় বলিয়া শ্বশুরবাড়ীতে বাড়ীর কর্ত্তা ব্যতীত আর সকলের তাহার প্রতি বিরক্তি সক্রিয় হইতে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হইয়া দাঁড়াইতেছিল। এই সময় পূজা আসিল এবং নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিতে ইন্ধনযোগের কারণ ঘটিল। নরেশচন্দ্র যে দুই-চারিবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহার অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহার শ্বশুরবাড়ীতে হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল—"বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর," কেহ বলিয়াছিল, "ও বিদ্যের গুমোর—কেন, অন্য জামাইরা কি মূর্খ; আর তা'রা হ'ল সহরের জানাঘরের ছেলে।" এবার তত্ত্বের দ্রব্যের স্বল্পতায় পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিরক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল; যেন নিদাঘের দিনান্তে পশ্চিমে পুঞ্জীভূত মেঘে প্রবল বারিপাত হইল। রণেশচন্দ্রের নিয়ম ছিল, তত্ত্ব পাঠাইবার সময় বা তত্ত্ব আসিলে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখাইতে হইত। তিনি আসিয়া তত্ত্ব দেখিয়া যখন বলিলেন, "বেশ তত্ত্ব", তখন কুসুমকামিনীও আর নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না; বলিয়া ফেলিলেন, —"বেশ!" রণেশচন্দ্র বুঝিলেন—বলিলেন, "হাঁ।" কেহ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। রণেশচন্দ্র চলিয়া যাইলেই কুসুমকামিনী তত্ত্ব তুলিয়া ফেলিলেন, আর কেহ না দেখে। তিনি লুকাইয়া তাঁহার পিত্রালয়ের কাপড় বদলাইয়া দিয়াছিলেন।

নরেশচন্দ্রের মাতা দেশ হইতে আসিয়া যখন বধূকে দেখিতে আসিলেন, তখন তাহার, "কেবল মনে করি, কবে মা'কে আমার বাড়ী নিয়ে যা'ব, ঘর আলো হ'বে" ইত্যাদি উক্তিতে কুসুমকামিনীর মন একটু নরম হইলেও মাতঙ্গিনী কিন্তু বলিল, "ও কেবল তত্ত্ব নেবার ফন্দী।"

শ্বশুরবাড়ীর এবং স্বামীর উপর অনেকেরই বিরুদ্ধ-ভাবের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী কেবল পিতার ব্যবহারে অন্য ধারণা দেখিতে পাইত। তিনি যেন সর্ব্বপ্রযত্নে নরেশচন্দ্রের ও তাহার জননীর কার্য্যের সমর্থন-চেষ্টা করিতেন এবং এক চন্দ্র যেমন যে অন্ধকার নাশ করে, শত তারকা তাহা পারে না—তাঁহার একার ব্যবহার তেমনই আর সকলের অসন্তোষ ও বিরক্তি নষ্ট করিত। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা লক্ষ্য করিত; কারণ, তাহার হৃদয় স্বামীর ভালবাসার পরশপাতরের স্পর্শ পাইয়াছিল।

নরেশচন্দ্র চিকিৎসায় ক্রমে সুনাম অর্জ্জন করিতেছিল—তাহার সন্ধান পাইলেই রণেশচন্দ্র বাড়ীতে তাহা জানাইয়া দিতেন—"আমি জানি, অমন ছেলে দশ হাজারে একটি হয় না। এক দিন ওর যশ দেশে ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে।" তিনি প্রায়ই জামাতাকে দেখিতে যাইতেন।

৩

যে সময় নরেশচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে চাকরী করিতেছিল, সে সময়টা রাজনীতিক হিসাবে ভারতের পক্ষে যুগ-সন্ধিক্ষণ। জার্ম্মাণী পৃথিবীব্যাপী যে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে বটে, তাহার জ্বলদঙ্গার য়ুরোপের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সমগ্র পৃথিবীতে অশান্তি। ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের শ্মশানে নিরস্ত্র নিরপরাধ ভারতবাসী প্রাণের বিনিময়ে আপনাদের দুরাবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে। আর সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত—মোহনদাস করমচাঁদ গন্ধী। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অসহযোগনীতি দেশের লোকের হৃদয় জয় করিতেছে।

পাঠ্যাবস্থায় নরেশচন্দ্র আপনাকে রাজনীতিচর্চ্চা হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়াছিল। হাঁসপাতালে এক জন চিকিৎসার্থী আসিয়াছিল—সে জালিয়ানওয়ালাবাগে ছিল, আহত হইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালীই রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্বের অধিকারী; তাই সে সেই সময়ে পঞ্জাবের

কথা ডাক্তারের কাছে বিবৃত করিত। নরেশচন্দ্র শুনিত আর ভাবিত—এ অবস্থার কি কোন প্রতীকার নাই?

মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে অসহযোগনীতি বহুমতে গৃহীত হইল। নরেশচন্দ্রের মনে হইল, সে মনের মধ্যে কাহার আহ্বান শুনিতে পাইতেছে। তাহার পূর্ব্বে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রথম—তাহার চাকরীর মেয়াদ ফুরাইলে, সে আরও এক বৎসরের জন্য চাকরী পাইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে তাহার পসার হইতেছিল বলিয়া চাকরী রাখিবে কি ছাড়িবে বিবেচনা করিতেছিল। দ্বিতীয়—শ্রাবণমাসে "ভাল" দিন দেখিয়া তাহার মাতা বধূকে গৃহে আনিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, শীতকালে বধূকে দেশে লইয়া যাইবেন। তিনি তাহার আয়োজন করিতেছিলেন।

নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভূত হইতেছিল। সে যতই ভাবিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতেছিল—সে তাহার কর্ত্তব্যপালন করিতেছে না। কয় দিন ভাবিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিল—চাকরী ত্যাগ করিল। কিন্তু চাকরী ত্যাগ করিয়াও সে শান্তিলাভ করিতে পারিল না—গঠনকার্য্য তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সে মনে করিল, যে পল্লীর অঙ্কে তাহার জন্ম, সেই অস্বাস্থ্যকর, অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন পল্লীগ্রামই সে কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইবে—আপনার চেষ্টায় আদর্শ গ্রাম গঠিত করিবে।

সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া সে যখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিল, তখন রণেশচন্দ্র আসিলেন—তিনি সে দিন জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। নরেশচন্দ্র চাকরী ছাড়িয়াছে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ করেছ। এইবার ডাক্তারখানা কর। আমি আগেও তাই বলেছিলাম। ক'হাজার টাকা লাগবে?"

অঙ্গুলীর স্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন সঙ্কুচিতা হয়, নরেশচন্দ্রের উত্তরে রণেশচন্দ্রের উৎসাহ তেমনই সঙ্কুচিত হইয়া গেল। সে বলিল, "আমি কলকাতায় থাকব না—দেশে যা'ব।"

বিস্মিতভাবে রণেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"সেখানে অস্বাস্থ্যের স্থানে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠা করব—লোকের কল্যাণ করতে পারব।"

"সেখানে পয়সা দেবার লোক কোথায়? তোমার মত ছেলের কাযের যায়গা কলিকাতা।"

"পয়সা আমার ছিল না—না হয় হ'বে না।"

রণেশচন্দ্র যেন স্তম্ভিত হইলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া বাড়ী যাইবার সময় পথে গাড়ীতে রণেশচন্দ্র একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন,—এ কি দুর্ব্বুদ্ধি! সাফল্য অর্থ ও যশের জয়মাল্য লইয়া যাহাকে বরণ করিতে আসিয়াছে, সে সেই দুর্ল্লভ মালা পঙ্কে ফেলিয়া পদদলিত করিয়া মরুভূমিতে চলিয়া যাইবে! কেবল কি তাহাই? তিনি জিদ করিয়া—কেবল ছেলেটি দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন। তিনি জীবনে কোন কাযে নিজের বুদ্ধিতে চলিয়া ঠকেন নাই—এইবার কি তবে তাঁহার গ্রহ প্রতিকূল হইবে? বাড়ীর লোক মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে হাসিবে?

কথাটা রাষ্ট্র হইতে না হইতে কুসুমকামিনী আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই না কি চাকরী ছেড়ে দিয়েছে?" রণেশচন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "হুঁ।" কুসুমকামিনী তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "না কি দেশে যাবে?"

রণেশচন্দ্র আবার বলিলেন, "হুঁ।"

কুসুমকামিনী বুঝিলেন, কর্ত্তার মন চিন্তাকুল। তিনি তবুও বলিলেন, "জ্যোতি কি সেই পাড়াগাঁয় গিয়ে থাকতে পারবে?"

রণেশচন্দ্র বলিলেন, "উপায় কি?"

"আমার কপাল"—বলিয়া কুসুমকামিনী চলিয়া যাইলেন। সেই দুইটি কথায় তাঁহার প্রতি কি তীব্র তিরস্কার ছিল, তাহা বুঝিতে রণেশচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। তাঁহার মনে হইল, সেই দুইটি কথা যেন দুইটি বিষলিপ্ত বাণ—তাঁহাকে বিদ্ধ করিল।

দুই দিন রণেশচন্দ্র ভাবিলেন—দুই রাত্রি তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। তৃতীয় দিন তিনি বুঝাইবার জন্য জামাতৃ-গৃহে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, জামাতা দ্রব্যাদি গুছাইতেছে—যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দুই চারিটি কথা বলিয়াই রণেশচন্দ্র বুঝিলেন, বুঝাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই দিন তাঁহার আহারের সময় কাছে বসিয়া কুসুমকামিনী যখন জামাতার কথা পাড়িলেন, তখন রণেশচন্দ্র আর বিরক্তির ভাব গোপন করিলেন না, গোপন করা

প্রয়োজন মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন, "গেঁয়ো বুদ্ধি! আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করছে—বললেও বুঝবে না।"

কর্ত্তার এই কথায় ফল হইল—যে নিন্দার স্রোতঃ অন্তঃসলিলা ফল্গুর জলের মত গোপন ছিল, তাহা প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল; বাড়ীর লোক বলাবলি করিতে লাগিল, "বলে, হাজার হ'লেও 'বন থেকে বেরুল টিয়ে'—তা'র মাথায় সোনার টোপর থাক্‌লেও সে বন থেকে এসেছে। বিদ্যা, বুদ্ধি—এই ত এক আঁচড়ে সব ধরা পড়ল। কর্ত্তা কমসে কম দশ হাজার টাকা দিয়ে ডাক্তারখানা ক'রে দিতেন—তা হ'ল না, চল্লেন গাঁ গড়তে! গাঁয়ে যা'রা আছে, তা'রা পারলে না—উনি গিয়ে সোনার কাঠি ছোঁয়ালেই ঘুমন্ত রাজকন্যে জেগে উঠে ব'সে হাস্‌বেন—তাঁর হাসিতে হীরে ঝর্‌বে। এমন কথা কি কেউ কখন শুনেছে?"

সকলকে ছাপাইয়া মাতঙ্গিনীর ক্ষুরধার কথা বাহির হইতে লাগিল। সে যেন আর থামে না—থামিতে জানে না।

জ্যোতির্ম্ময়ী সব শুনিতে লাগিল। পিত্রালয়ে তাহার শ্বশুরালয়ের প্রতি বিরক্তির সমুদ্রেও সে তাহার বিশ্বাসের নৌকা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল—কেন না, পিতার মত গুরুভার নোঙ্গরের মত তাহাকে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই। কিন্তু এবার যখন তাহার ভালবাসার রজ্জু সে নোঙ্গর হইতে সরিয়া গেল, তখন সে যেন আর বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিবে না। তবুও তরুণীর স্বাভাবিক প্রেমে সে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু সে দুর্ব্বল—সে একা।

এই সময় গ্রামে যাইবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া নরেশচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী সাক্ষাৎ করিতে আসিল—আর বলিতে আসিল, শীতকালেই সে আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া যাইবে। কুসুমকামিনী তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, "পাড়াগাঁয় তোমার আদর কে জান্‌বে? এখানে তোমার পসার দেখতে দেখতে হ'বে। ডাক্তারখানা কর—উনি ত বল্‌ছেন। মোটর কর—বড় বাড়ী নাও।"

নরেশচন্দ্র কেবল বলিল, "মা, আশীর্ব্বাদ করুন, যা'দের উন্নতি কর্‌ব ব'লে যাচ্ছি, যেন তা'দের উন্নতি কর্‌তে পারি। তা হ'লেই আমার জীবন সার্থক মনে কর্‌ব।" কুসুমকামিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রণেশচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না নরেশচন্দ্র তাঁহাকে তাহার সহিত ব্যবহারে পূর্ব্বে কখন তেমন গম্ভীর দেখে নাই।

এক দিন যে শ্যালকের বক্রোক্তিতে নরেশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে গতায়াতের সঙ্কোচ করিয়াছিল, সে বলিল, "শুন্‌ছি না কি তুমি ছোট গন্ধী হ'তে চাচ্ছ? এ যে 'সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়'!" নরেশচন্দ্র সে কথায় কোন উত্তর দিল না—মনে মনে বলিল, যে জাতির সুখের কল্পনাও করিতে পারে না—আপনার স্বার্থসর্ব্বস্ব হৃদয়ে কেবল আপনার সুখকেই অণুবীক্ষণের নিম্নে ধূলির মত অতিরঞ্জিতভাবে দেখে, সে কৃপার পাত্র।

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখখানাও নরেশচন্দ্রের কাছে ভার-ভার মনে হইল। এই অবস্থায় সে দেশে গেল।

৪

বহু আশা হৃদয়ে লইয়া উৎসাহী যুবক নরেশচন্দ্র গ্রামে আসিল। গ্রামে কায করিবার পথে যে এত বাধা-বিঘ্ন আছে, তাহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। প্রকৃতি যে সব বাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, সে সব বাধাই যে কেবল অতিক্রম করিতে হয়, তাহা নহে—সে সকল অপেক্ষাও বিষম বাধা মানুষ ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করে। সে জানিত না, যেমন যে সব রোগ সহরে থাকিতে পায় না, তাহারা পল্লীগ্রামে যাইয়া "আসন" করে, তেমনই যে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-সঙ্কীর্ণতা সহরে কার্য্যে ব্যস্ত মানুষের হৃদয়ে স্থান পায় না, সে সব পল্লীগ্রামে নিষ্কর্ম্মাদিগের হৃদয়ে পতিত জমীতে আগাছার মত বাড়িয়া উঠে।

নরেশচন্দ্র গ্রামে আসিল। সে যুবকদিগকে লইয়া সঙ্ঘ গঠিত করিল—গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে, পুষ্করিণী সাফ করাইতে, অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইল; গ্রামের এক দল লোক ভাবিল—এ কি? সে যে প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে? আমার পৈতৃক জমী আমার তিন পুরুষের জঙ্গল, মশা, সাপ, ম্যালেরিয়াকে অবারিত আশ্রয় দিয়া আসিতেছে, তাহা নষ্ট করিবার নরেশচন্দ্র কে? সরিকের পুষ্করিণী পানাশূন্য করিবার অনুমতি কে দেয়? চাষার ছেলেদের "ক-খ" শিখাইয়া তাহাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া—ও সব গ্রামে চলিবে না;

"সব গোপ গয়লা সদরওয়ালা
কে দেবে গো ঘোল?"

তাহার কাযে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা দিতে লাগিলেন গ্রামের জমীদার বলিয়া পরিচিত গাঁতিদার চৌধুরী বাবুরা। অনেক তালপুকুরে যেমন জল শুকাইয়া যাইলেও নামটি থাকে, ইঁহাদিগেরও তেমনই জমীদারী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্যবসায়ী নূতন ধনী চক্রবর্ত্তী ঠাকুরদের কাছে বন্ধক থাকিলেও এবং বন্ধকের টাকা আসলে ও সুদে সম্পত্তির মূল্য ছাপাইয়া যাইলেও ইহাদের জমীদারী চালে পোকা ধরে নাই। পরন্তু অভাব যত অধিক হইতেছিল, প্রজার উপর অত্যাচার তত বাড়িতেছিল। চক্রবর্ত্তী বাড়ী এক জন জীর্ণ রোগীকে চিকিৎসায় সুস্থ করিবার ফলে নরেশচন্দ্রের পসার যখন পাকা হইল, তখন চৌধুরী বাবুরা স্থির করিয়া লইলেন—নরেশচন্দ্র ধনীর জামাতা, শ্বশুরের পয়সায় তাঁহাদের সম্পত্তি কিনিয়া লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই সে গ্রামে আসিয়া বসিয়াছে, লোককে "হাত" করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা নরেশচন্দ্রকে অপদস্থ করিবার জন্য সর্ব্ববিধ হীন ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইল, তাহাতে দুইটি কারণ না থাকিলে সে গ্রামে তিষ্ঠিতে পারিত না। প্রথম কারণ—সে ডাক্তার; গ্রামের সাধারণ লোক বিনাব্যয়ে সুচিকিৎসা পাইত বলিয়া এবং থানার দারোগা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের চক্রবর্ত্তী ঠাকুররা পর্য্যন্ত সেই জন্য তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ—গ্রামের যুবকদল তাহার সহায়; যে সব পরিবারের বৃদ্ধরা চৌধুরী বাবুদের বৈঠকখানায় তামাক পুড়াইয়া তাঁহাদের কথায় "হাঁ" দিতেন, সে সব পরিবারের যুবকরাও নরেশচন্দ্রের কাযে আকৃষ্ট ছিল। এই যুবকরাই অনেক স্থলে তাহাকে বিপন্ন করিবার ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিত। আর তাহার চিকিৎসাগুণে, তদতিরিক্ত তাহার বিনয়স্নিগ্ধ ব্যবহারে এবং বাড়ীর ছেলেদের কাছে তাহার প্রশংসা শুনিয়া গ্রামের মহিলারা তাহাকে স্নেহ করিতেন।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ তিন মাসে অনেক চেষ্টা করিয়াও নরেশচন্দ্র গ্রামের উন্নতিকর উল্লেখযোগ্য কোন কায করিতে পারিল না, তবে কাযের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিল। যখন কাযের হিসাব নিকাশ করিলে তাহার মনে নিরাশার উদ্ভব হইত, তখন সে আপনাকে আপনি বুঝাইত, শত বৎসরের অজ্ঞতা তিন মাসে দূর করা যায় না—শত বৎসরের অবহেলার চিহ্ন এক বৎসরে মুছিয়া ফেলা কখন সম্ভব নহে। তাহার হৃদয়ে যে উৎসাহের প্রস্রবণ ছিল, তাহার স্নিগ্ধ সলিল কিছুতেই তাহার আশা শুষ্ক হইতে দিত না।

পৌষমাসের প্রথমেই মা মাঘমাসের প্রথমে দিনস্থির করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে আনিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর পিত্রালয় হইতে একটা অছিলায় সে দিন পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। শেষে মা মাঘের শেষে দিনস্থির করিয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন—নহিলে লোক তাঁহার নিন্দা করিবে। নরেশচন্দ্র যাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে আনিয়াছিল। সঙ্গে আসিয়াছিল—মাতঙ্গিনী।

যে দিন চাকরী ত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিবার সঙ্কল্প নরেশচন্দ্র ব্যক্ত করিয়াছিল, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামীর সঙ্গে যাত্রার দিন পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী পিত্রালয়ে কেবলই স্বামীর বুদ্ধির ও স্বামীর কাযের নিন্দা শুনিয়াছে। বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে পড়িতে পাতরও ক্ষয় হয়, জ্যোতির্ম্ময়ীর মনেও যে স্বামীর বুদ্ধি ও স্বামীর কায সম্বন্ধে বিরুদ্ধ বিশ্বাস স্থান পায় নাই, এমন নহে। বিশেষ যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে তাহার শ্বশুরালয়ের নূতন পরিবেষ্টনের পার্থক্য সে পদে পদে অনুভব করিতে লাগিল। যে স্থানে কল টিপিলে জল, বোতাম টিপিলে আলো, দেশ-বিদেশের সকল দ্রব্য ও বিলাসের সকল উপকরণ যে স্থানে বিক্ষিপ্ত, সেই স্থান হইতে আসিয়া পল্লীগ্রামের বৈচিত্র্যবর্জ্জিত জীবনে অভ্যস্ত হইতে বিলম্ব ঘটে—ত্যাগের সাধনা না করিলে সেই নূতন জীবনে আনন্দ ও সুখ লাভ করা যায় না। বিশেষ পল্লীগ্রামে সরলতার পরিচায়ক বলিয়া যে ব্যবহার অভিহিত হয়, তাহা অনেক সময় শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে। দিনের পর দিন অপরিচিতার দলের বধূ দেখিতে আগমন ও বধূর সম্মুখেই তাহার সমালোচনা প্রভৃতি এক দিকে যেমন জ্যোতির্ম্ময়ীর ভাল লাগিত না, অন্য দিকে তেমনই মাতঙ্গিনী তীব্র উক্তির উৎস মুক্ত করিত। সেই উক্তির প্রবাহে সময় সময় শাশুড়ীর স্নেহে ও স্বামীর ভালবাসায় জ্যোতির্ম্ময়ীর নূতন জীবনের প্রতি আকর্ষণ-সূচনাও যেন ভাসিয়া যাইত। কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামে, রণেশচন্দ্রের প্রাসাদ হইতে নরেশচন্দ্রের সাধারণ গৃহস্থের গৃহে আগমনাবধি মাতঙ্গিনীর স্বভাবতঃ

ভীমরুলের চাকের মত মুখ বিরক্তিতে আরও কুশ্রী ধারণ করিয়াছিল—আর সেই মুখ হইতে যে সব সমালোচনা বাহির হইত, সে সকলের ভাষা ভীমরুলের হুলবিদ্ধ হওয়ার যাতনারই মত তীব্র—তাহাতে নরেশচন্দ্রের মাতার স্বাভাবিক ধৈর্য্যও সময় সময় বিচলিত হইবার উপক্রম হইত—তিনি বহু চেষ্টায় তাহা অবিচলিত রাখিতেন।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর আর একটা বড় অসুবিধা হইয়াছিল—সমবয়সীর অভাব। সে আসিবার পর কয় দিন অপরিচিতাদিগের "বৌ দেখা" তাহাকে বিব্রত করিয়াছিল; তাহার পর জোয়ারের জল যেন ভাঁটার টানে সরিয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে শাশুড়ী আর বধূ—উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য আলোচনার বিষয়ের প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বামীকেও সে কমই পাইত—কারণ, রোগী দেখিয়া আসিয়া নরেশচন্দ্র তাহার গঠনকার্য্য লইয়া ব্যাপৃত হইত, জঙ্গল পরিষ্কার করান, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রভৃতিতে মনোযোগ দিত। পাড়ায় তাহার বয়সী বধূরাও তাহারই মত লজ্জার বহিরাবরণ ঘোমটায় মুখ আবৃত রাখিত—গ্রামের মেয়েরা যদি বা আসিত, তাহাদের কথার বিষয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী কোনরূপে আকৃষ্ট হইত না। মাতঙ্গিনী কেবলই বলিত—"বাবা! এ ত শ্বশুরবাড়ী আসা নয়, জেলখানায় আসা। কি শাস্তি! এ যায়গায় কি মানুষ বাঁচে? পাড়াগাঁ—বলে, 'জল জঙ্গল আঁধার রাত।' আমি আর থাকতে পারব না।"

নরেশচন্দ্রের আদর্শের মত্ততা ছিল—জ্যোতির্ম্ময়ীর তাহা ছিল না। কাযেই জ্যোতির্ম্ময়ীর মন যেন এই "পাখী-ডাকা ছায়া-ঢাকা" অপরিচিত পল্লীগ্রামে হাঁপাইয়া উঠিত—পরিচিত পিতৃগৃহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

মানুষ আপনাকে পরিবেষ্টনে অভ্যস্ত করিয়া লয়, কিন্তু তাহা সময়সাধ্য। কিছুকাল কাটিলে কি হইত বলা যায় না, জ্যোতির্ম্ময়ী, বোধ হয়, নূতন জীবনেই স্বামীকে ভালবাসিয়া ও স্বামীর ভালবাসা পাইয়া সন্তোষ লাভ করিত; কিন্তু তাহা হইল না। ফাল্গুনের মধ্যভাগে কয় দিন বৃষ্টি হইল—বাড়ীর উঠানে কাদা হইল—আগাছাগুলা মাথা তুলিল। সেই সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্বর হইল। যে দিন জ্বর দেখা দিল, তাহার পরদিনই মাতঙ্গিনী মা'কে বলিল, "এই বিদেশে অসুখ—শেষে কি বেখোয়ারে প্রাণ যাবে?"

মা বলিলেন, "এ কি অলক্ষণের কথা, ঝি? অসুখ হয়েছে—সেরে যাবে।"

"এই পাড়াগাঁয় না হ'বে চিকিচ্ছে, না পাওয়া যাবে পত্যি।"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন, নরেশ ত ওষুধ দিচ্ছে; পত্যি যা বল্‌ছে, তাই দেওয়া হচ্ছে।"

মাতঙ্গিনী শিরে করাঘাত করিয়া বলিল, "ক'দিনের ডাক্তার? বলে, সেখানে মাথা ধরলে 'সাহেব' ডাক্তার আসে; হাঁচলে ওষুধ দেওয়া হয়। আর পত্যি—একটা ব্যাদানার মুখ দেখবার উপায় নেই—পত্যি! পোড়া কপাল আমার!"

যখন মাতঙ্গিনী পুত্রের সম্বন্ধেও এমন কথা বলিল, তখন মা আর চুপ করিয়া থাকিলেন না, বলিলেন, "সে জেনেই ত বেহাই মেয়ের বিয়ে পাড়াগাঁয় দিয়েছেন।"

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "তখন কে জানত যে, মেয়েকে এই বনগাঁয় ঘর করতে আসতে হবে?"

"কেন, আমরা কি বলেছিলাম, দেশে আসব না?"

"আস্‌বে, তা-ও ত বল নি।"

"তা হ'লে সেটা জেনে নিয়ে তবে কায করা তাঁর উচিত ছিল।"

"তিনি ত আর বুঝতে পারেন নি, লেখাপড়া শিখে জামাইয়ের এমন বুদ্ধি হ'বে। বুঝলে কখনই সোনার পিত্তিমে পানাপুকুরের পচা জলে ফেলে দিতেন না। বলে, কলকাতার কত বড়মানুষ ঐ ঘরে কায করবার জন্যে সাধাসাধি করে। তিনি কি না কায করলেন, পাড়াগাঁয় এই ঘরে! তাই ত বলে, যার হাঁড়ীতে যে চাল দেয়। মেয়েটার অদেষ্টে কষ্ট আছে, সে আমি তখনই বুঝেছি।"

মা বলিলেন, "দেখ ঝি, তুমি কুটুমবাড়ীর লোক ব'লে আমি অনেক সহ্য করেছি; কিন্তু এ তুমি ঠিক জেনো, আমার বৌয়ের ঝি আমার বাড়ীতে ব'সে আমার ছেলের নিন্দে করলে আমি তা সইব না—সইব না।"

মাতঙ্গিনী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি করবে? আমি কি ভাত-কাপড়ের জন্যে তোমার দোরে এসেছি যে, ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবে? অমন কুটুম মাতু অনেক দেখেছে। আরও দুই মেয়েকে ঘর করিয়ে এসেছি, তাদের বাড়ী গাড়ী দেখলে তুমি হাঁ ক'রে থাকবে। তারা গরীব নয়।"

"তোমাকে আমি আবার বলছি, ঝি, তুমি সাবধান হয়ে কথা বলো।"

"সাবধান! বলে, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর, কিসের এত গরম? আমি যদি মাতু হই, তবে এ অপমানের শোধ নেব—নেব—নেব।"

মাতঙ্গিনী গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৫

জ্বরের আরম্ভ হইতে তিন দিন পরেই জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্বর-ত্যাগ হইল এবং পঞ্চম দিন নরেশচন্দ্র অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিল। সেই দিন মধ্যাহ্নের পরই সে এক দল যুবককে লইয়া গ্রামের এক পার্শ্বে যাইতেছিল—তথায় জল-নিকাশের নালা বন্ধ হওয়ায় খাল খালে যাইয়া পড়িতেছিল না—তাহারা নালার মুখ ছাড়াইয়া দিতে যাইতেছিল। এমন সময় গ্রামের পথে একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী দেখা গেল। রেল-ষ্টেশন হইতে গ্রাম তিন ক্রোশ—এই তিন ক্রোশ রাস্তার এক ক্রোশ মাত্র "পাকা", অবশিষ্ট অংশ "কাঁচা"—বৎসরের মধ্যে আট মাস ঘোড়ার গাড়ী চলে। দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা নিকটে আসিয়া পড়িল। যুবক-দল পথের এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্য হইতে প্রধান আরোহী নরেশচন্দ্রকে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন—গাড়ী থামিল। গাড়ীর মধ্যে নরেশচন্দ্রের এক শ্যালক—যিনি তাহাকে "ছোট গন্ধী" বলিয়াছিলেন, তিনি—আর সরকার; উপরে দ্বারবান্ ও চাকর।

নরেশচন্দ্র বলিল, "কি খবর?"

তাহার শ্যালক বলিল, "জ্যোতির অসুখের খবর পেয়ে মা'কে নিতে এসেছি।"

"আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আস্‌ছি"—বলিয়া নরেশচন্দ্র যুবকদিগের এক জনকে বলিল, "তুমি গাড়ীতে যাও, বাড়ী চিনিয়ে দিও।"

গাড়ী নরেশচন্দ্রের গৃহাভিমুখে এবং নরেশচন্দ্র খালের দিকে চলিয়া গেল; যুবকদিগকে নালার মুখ ছাড়াইয়া দিবার উপদেশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া দেখিল, তাহার শ্যালক বেশ-পরিবর্ত্তনও করে নাই। সে স্নানের কথা বলিলে শ্যালক বলিল, "বাবা—এখানে স্নান! পাছে জল খেতে হয়, তাই আমি ফ্লাস্‌কে জল এনেছি।"

নরেশচন্দ্র বলিল, "কেন, আমরা কি জল ফুটিয়ে ফিল্‌টার ক'রে নিতে জানিনে? ফ্লাস্‌কের জল কতটুকু?"

"আমরাই বা আর কতক্ষণ? আধ ঘণ্টার মধ্যে না বেরুলে সন্ধ্যার আগে ট্রেণ পাওয়া যাবে না।"

"এত ব্যস্ত কেন?"

"কলকাতায় খবর পেয়ে মা-বাবা যে ব্যস্ত হয়ে আছেন!"

"খবর দিলে কে?"

"মাতু। সে আমাদের 'মানুষ' করেছে, জ্যোতির অসুখ দেখে কি স্থির থাকতে পারে?"

"অসুখ ত সেরে গেছে।"

"আবার হ'তে কতক্ষণ? ম্যালেরিয়া একবার ধরলে সহজে ছাড়ে না।"

"ম্যালেরিয়া নয়—সর্দ্দি।"

"তা হ'ক, তুমি এখন জ্যোতির যা'বার জোগাড় ক'রে দাও—সময় বেশী নেই। আমি এসেই তাগাদা দিয়েছি।"—বক্তা বাম হস্তের মণিবন্ধে সোনার পাতে বদ্ধ ঘড়ি দেখিল।

"এখন কেমন ক'রে যাওয়া হ'বে? মা'কে এখনও জিজ্ঞাসা করাই হয় নি!"

"তিনি ত জানেন, আমরা এসেছি। এই তিন ক্রোশ পথ ছ্যাকড়া গাড়ীতে গা ব্যথা ক'রে এসে আমরা কি ফিরে যা'ব?"

"কিন্তু নিয়ে যা'বার দরকার কি?"

"মাতু যা' লিখেছে, তা'তে মা বড় ব্যস্ত হয়েছেন।"

"মাতু যদি মিথ্যা কথা লিখে থাকে, আপনি গিয়ে তা' বলবেন; বলবেন, আপনার ভগিনী ভালই আছেন।"

"সে কিছুতেই হ'বে না।"

সরকার বলিল, "বড়বাবু এসেছেন, ওঁর অপমান করবেন?"

"এতে অপমানের কি আছে? বরং আপনারাই আমার অপমান করতে উদ্যত হয়েছেন—যেন আমার স্ত্রীর সামান্য অসুখেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

মাতঙ্গিনী সদর ও অন্দরের মাঝের দ্বারপথে দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, "এখানে কোন্ বড় ডাক্তার আছে যে, চিকিচ্ছে হ'বে?"

নরেশচন্দ্র বলিল, "আপনারা বড় মানুষ—কিন্তু

আপনাদের ঝি চাকর অপমান করলে আমরা তা' সহ্য করব না—এটা জানবেন।"

ঘরে যাহা ছিল, তাহাই দিয়া মা রেকাবী সাজাইয়া খাবার পাঠাইয়া দিলেন—নরেশচন্দ্রের শ্যালক বলিল, সে কিছু খাইবে না।

নরেশচন্দ্র শয়নকক্ষে যাইয়া দেখিল, মাতঙ্গিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর কাপড়, জামা প্রভৃতি তোরঙ্গে তুলিয়াছে, জ্যোতির্ম্ময়ী পাশে দাঁড়াইয়া আছে। যাত্রার আয়োজন শেষ হইয়াছে।

নরেশচন্দ্র স্ত্রীকে বলিল, "আজ তোমার যাওয়া হ'তে পারে না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মাথার কাপড় কপালের উপর একটু টানিয়া বলিল, "মা নিতে পাঠিয়েছেন, দাদা এসেছেন—না গেলে অপমান করা হ'বে।"

"তাঁ'দের অপমান করা হ'বে না—আমারই অপমান হ'বে। তুমি যদি যাও—এইটে জেনে যেও যে, আমার অমতে যাচ্ছ—দোষ আমার নয়, দায়িত্ব আমার নয়।"

মা পাশের ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ যেতে চাচ্ছে, তুই না হয় আর অমত করিস নে।"

"আজ তা হ'তে পারে না"—বলিয়া নরেশচন্দ্র চলিয়া গেল।

মা ছেলেকে ভালরূপই চিনিতেন; বধূকে বলিলেন, "বৌমা, যে মানুষ সহজে রাগ করে না, সে রাগ করলে তা'কে সহজে ঠাণ্ডা করা যায় না। তুমি আজ যেও না—পাঁচটা দিন বিলম্ব কর; আমি নরেশকে দিয়েই তোমাকে পাঠিয়ে দেব।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কিছু বলিল না।

মাতঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"কেনে গা? এই জেলখানা থেকে বেরুন—আজ হ'লে কাল নয়, এখন হ'লে তখন নয়।" সে সশব্দে তোরঙ্গের ডালাটা বন্ধ করিয়া চাবি দিল। সে মা'র কথার শোধ লইতেছিল। মা আর কিছু বলিলেন না; কেবল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—হা ভগবান্, এ কি করিলে?

মাতঙ্গিনী বলিল, "যাত্রার সময় নিশ্বেস ফেলছে—আক্কেল দেখ! তা' ধেড়ের শাপে গাঙ শুকায় না।" সে বাক্স লইয়া যাইবার জন্য চাকরকে ডাকিল।

এ দিকে নরেশচন্দ্র বাহিরের ঘরে আসিতেই তাহার শ্যালক বলিল, "আর দেরী হ'লে ট্রেণ পাওয়া যা'বে না। যে পথ!"

নরেশচন্দ্র বলিল, "যা করতে হয়, আপনারা করুন—আমাকে আর কিছু বলবার দরকার নেই। তবে আমার এই কথাটা শুনে রাখুন—গরীব আমি, আমার স্ত্রীকে আনবার জন্য কখন বড়মানুষের দ্বারস্থ হ'ব না। যে অধিকার আজ শিষ্টাচারের অনুরোধে ত্যাগ করলাম, তা' আর গ্রহণ করব না।"

নরেশচন্দ্র বাড়ীর বাহির হইল।

তখন তাহার শ্বশুরবাড়ীর চাকর ও দ্বারবান্ গাড়ীর উপর জ্যোতির্ম্ময়ীর তোরঙ্গ-বাক্স তুলিতেছিল।

খালের দিকে যাইবার সময় পথে নরেশচন্দ্র দেখিল, ঘোড়ার গাড়ী তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল; গাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময়ী। গাড়ীর ভিতর হইতে তাহার শ্যালকের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"কোচম্যান, জোরসে হাঁকাও—নইলে ট্রেণ মিলবে না।"

নরেশচন্দ্রের মনে হইল—পল্লীগ্রামের কাঁচা রাস্তায় দ্রুতগামী গাড়ীর চাকায় ও ঘোড়ার খুরে যে ধূলা উড়িল, তাহা তাহার মুখেই আসিয়া পড়িল।

৬

নরেশচন্দ্রের অনুমান কেবল সত্যই হইল না, পরন্তু সত্যকেও অতিক্রম করিয়া গেল; গ্রামের যে দল চৌধুরী বাবুদের নেতৃত্বে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, সেই দল ধূলার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যার পানাপুকুরের পচা পাঁক লইয়া তাহার মুখে মাখাইয়া দিতে ব্যস্ত হইল। নরেশচন্দ্র জানিত না, কিন্তু গ্রামের "ভদ্র" মহাশয়গণ দুই দিন হইতে এমনই একটা ঘটনার প্রতীক্ষায় কৌতূহল যেন আর নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিলেন না। মাতঙ্গিনী রাগে গর-গর করিতে করিতে যাইয়া বরদা ঠাকুরুণের শরণ লইয়াছিল। তিনি বালবিধবা—শুচিবায়ুগ্রস্তা এবং কলহে সর্ব্বদাই আনন্দিতা। তিনিই জমীদারবাড়ীর মুহুরী হরিকে ডাকাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর মাতার কাছে মাতঙ্গিনীর পত্র লিখাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে জ্যোতির্ম্ময়ীর কঠিন রোগ, চিকিৎসার অভাব, শাশুড়ীর অত্যাচার প্রভৃতি কল্পিত অভিযোগের বিরাট ফিরিস্তি ছিল। তাহার পর তিনিই অপরাহ্ণে পাড়ার পুকুর-ঘাটে মেয়ে পার্লামেণ্টে তাহার আলোচনা করিয়া সকলকে ব্যাপারটা জানাইয়া

দিয়াছিলেন—পার্লামেণ্টের সদস্যরা যে যাহার গৃহে ফিরিয়া "হাঁ গো শুনেছ" ভণিতা করিয়া এই মুখরোচক কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ কর্ত্তাদের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। চৌধুরী বাবুদের বৈঠকখানাতেও তাহার আলোচনা হইয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া গাড়ী গ্রাম পার হইবার পূর্ব্বেই কথাটা লইয়া গ্রামে কানাকানি, হাসাহাসি আরম্ভ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চৌধুরী বাবুদের বৈঠকখানায় জন্ম-মোসাহেবের দল রসান দিয়া কথাটায় নানা গড়ন গড়িতে লাগিলেন। এক জন বলিলেন, "কাংস্যপাত্র ও মৃৎপাত্র একত্র হইলে মৃৎপাত্রই ভাঙ্গিয়া যায়—গরীবের ছেলে, বড়মানুষের মেয়ে বিবাহ করিলে ফল এমনই হয়।" আর এক জন বলিলেন, "বলে—'বড় বাড় বেড়ো না ঝড়েতে ভাঙ্গিবে।' বড়মানুষের মেয়ে বিয়ে ক'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করে—মানীর মান রাখে না, ছোঁড়াগুলোকে মাটী ক'রে দিলে। আবার আশা কত—জমীদার হ'বেন! এখন? এই ত—

'ফুরাল বাগানের আম;
কি খাবি রে হনুমান্?'

ও মেয়ে গরীবের ঘর করবে কেন?"

এইরূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। আর যত আলোচনা চলিতে লাগিল, সত্যের সঙ্গে মিথ্যা ততই অধিক মিশিতে মিশিতে শেষে অতিরঞ্জনের মধ্যে সত্যের সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিল।

এই আলোচনা কখনই গুঞ্জনমাত্র ছিল না; কেন না, প্রথম হইতেই ইহা বর্ষাকালে পানাপুকুরের ভেক কলরবের মত অপ্রীতিকর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তবুও যদি ইহা আলোচনার পাত্রদিগের কর্ণগোচর না হয়, তবে ত সবই ব্যর্থ হইবে মনে করিয়া তাহাদিগকে বেদনাদানের জন্যই "কল্যাণকামী" বন্ধুর দল আলোচনার বিষয় তাহাদিগকে জানাইতে লাগিলেন।

এ বিষয়ে বরদাঠাকরুণই সর্ব্বাগ্র-দূত হইয়া ঘাটে যাইবার ছলে নরেশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিলেন এবং মা'কে বলিলেন, "এই জন্যেই ত আমার সঙ্গে লোকের বনে না! বলি, কেন, বৌও বৌ কি বাপের বাড়ী যায় না যে, তোমার বৌ গেল বলে অত কথা? সবাই বলছে, বড়মানুষের মেয়ে গরীবের ঘরে এসে কষ্ট সইতে পারলে না, তাই চ'লে গেল। কিসের কষ্ট? তুমি হাতের তেলোয় তুলে রেখেছিলে। কি যত্ন! চোখখাগীরা তা দেখতে পায় নি! কিন্তু কি করব বল, কা'র মুখ সরা-চাপা দেব?"

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যেমন বরদাঠাকরুণ, পুরুষদিগের মধ্যে তেমনই রায় মহাশয় প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন বা নরেশচন্দ্রকে পথে পাইলে বলিতে লাগিলেন, "দেখ না, লোকের খেয়ে আর কায নেই, কেবল পরচর্চ্চা—কেবল পরনিন্দা; বৌমা বাপের বাড়ী গেছেন, তা' হয়েছে কি? কিন্তু বাবাজী, হঠাৎ বৌমা গেলেন কেন? বাপের বাড়ীতে কা'রও অসুখ হয়নি ত?" নরেশচন্দ্র মিথ্যার আশ্রয় লইতে ঘৃণা বোধ করিল, বলিল—"না।" এই সব হিতৈষীর কপট সহানুভূতি যে হীন কৌতূহলের অভিব্যক্তি এবং বিদ্বেষের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু ইহাদের ব্যবহার তাহাকে কতটা পীড়িত করিতে পারে; প্রবল পীড়া সে জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যবহারে নিজের মনে নিজে পাইতেছিল; সে মর্ম্মবেদনার তুলনায় এই সব নিন্দকের উক্তি যুদ্ধে ছিন্নবাহু সৈনিকের পক্ষে পিপীলিকাদংশন-যাতনারই মত।

গ্রামে আলোচ্য বিষয়ের যেমন অভাব, গ্রামের নিষ্কর্ম্মাদের কাযেরও তেমনই অভাব, সেই জন্য এই মুখরোচক পরচর্চ্চার হ্রাস হইতে বিলম্ব ঘটা অনিবার্য্য। মা ও নরেশচন্দ্র উভয়েই এই সব হিতৈষীর দ্বারা বিব্রত হইয়া উঠিলেন এবং উভয়েই আবিষ্কার করিলেন—গ্রামে তাঁহাদের এই জাতীয় হিতৈষী ও হিতৈষিণীর সংখ্যাই অধিক; অথচ তাঁহারা জ্ঞানতঃ গ্রামের লোকের উপকার ব্যতীত কখন কোন অপকার করেন নাই।

দুই দিন নরেশচন্দ্র কেবল ভাবিল, মা'র সঙ্গেও পরামর্শ করিল না। গ্রামে আসিয়া গঠনকার্য্যে নানারূপ বাধা পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার মনে হইতেছিল, পল্লী-সংস্কারের পথে প্রাকৃতিক বাধা অপেক্ষা পল্লীবাসীদিগের সংস্কারের বাধাই প্রবল। কিন্তু আপনার উৎসাহের প্রভাবে সে মনে করিয়াছিল, তাহাদের সংস্কার সংস্কৃত করা অসম্ভব নহে—সে কায উপদেশে দুঃসাধ্য হইলেও কাযের দ্বারা সুসাধ্য হইবে; তাই সে সকল বাধা অবজ্ঞা করিয়া, সকল নিন্দা অবহেলা করিয়া কায করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আজ যখন জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যবহারে সে স্বয়ং আঘাত পাইল, তখন সংশয় ধারণায় পরিণতি লাভ করিতে লাগিল—দৌর্ব্বল্য ও আত্মশক্তিতে অনাস্থা তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল—পুরুষানুক্রমে

সঞ্চিত আবর্জ্জনা যেমন গ্রামকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিলে তাহার প্রতীকার করা অসম্ভব হইতে পারে, পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত পল্লীবাসীর এই পরশ্রীকাতরতা ও হীনতা দূর করাও বুঝি তেমনই অসম্ভব। সে যে স্থানে জয়লাভের আশায় উপনীত হইয়াছিল, তাহার মন সেই স্থানে যেন কেবল পরাভব স্বীকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

তৃতীয় দিন সে মা'কে বলিল, "মা, গ্রামের লোক যে আমার সেবার বিনিময়ে আমাকে পদাঘাত করবে, তা' আমি আগে মনে করতে পারি নি।"

মা বলিলেন, "তাই ত দেখছি, বাবা।"

"এমন অবস্থায় গ্রামে ত আর তিষ্ঠিতে পারব না।"

মা যে কথাটা বলিবার জন্য কেবল অবসর সন্ধান করিতেছিলেন, সেই কথাটা বলিলেন, "আমি বেহানকে চিঠি লিখে দি, তুই গিয়ে বৌমা'কে নিয়ে আয়।"

নরেশচন্দ্র যেন সহসা বিদ্যুতের স্পর্শে চমকিয়া উঠিল, বলিল, "মা, একটা কথা, এটা তোমাকে রাখতেই হ'বে—এ সম্বন্ধে আমাকে কখন কোন অনুরোধ করো না।"

"তুই যা' বলবি, আমি তাই করব; কিন্তু একবার ভেবে দেখ, ছেলেমানুষ সে যদি একটা ভুলই ক'রে থাকে—তবে তুই তার স্বামী, আর আমি তোর আর তা'র মা, আমরা তা'কে ক্ষমা করব না?"

"তা'র অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা করব। কিন্তু আমরা গরীব, আমরা যে অপরাধ করেছি, তা'র ক্ষমা নেই—নেই। তা'র জন্য আমাদের দণ্ড নিতেই হ'বে—আমরা সে দণ্ড নেব।" —এই কথার মধ্যে যে আকুলতা ছিল—কথা বলিবার সময় বক্তার কণ্ঠস্বরে যে কম্পন ছিল—তাহাতেই তাহার বুকের ব্যথা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

মা তাহা বুঝিলেন। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না, কেবল মনের মধ্যে বেদনা-বারণ দেবতাকে ডাকিলেন—"ঠাকুর, দুঃখিনীর সম্বল ঐ ছেলে—উহার জীবন ব্যর্থ করিও না।" আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন—"আর ঐ ছেলে-মানুষ বৌ, তুমি ওর অদৃষ্টে দুঃখ লিখ না—ওকে সুখী কর।"

"মা, চল আমরা গ্রাম থেকে চ'লে যাই।"

মা বলিলেন, "তুই যা' ভাল বুঝবি, তাই করবি; আমার আবার তা'তে মত কি, বাবা?"

"আমি ক'দিন ভেবে দেখলাম, এই বাড়ী আর জমীজমা আমি গ্রামের লোকের জন্যই দেব; এ সব জিলা-বোর্ডে দেব—বাড়ীতে বাবার নামে ডিস্‌পেনসারী আর স্কুল হ'বে, জমীজমার আয়ে সে দুটির খরচ চলবে।"

"ঠাকুর?"

"ঠাকুর তোমার সঙ্গে যা'বেন। তোমার আশীর্ব্বাদে আর ঠাকুরের কৃপায় তাঁ'র সেবার ব্যবস্থা আমি করতে পারব।" ঠাকুর-সেবার জন্য ব্যাকুলতায় মা যে বৎসরে কয় মাস তাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতেন, তাহা নরেশচন্দ্র জানিত। বিধবার শুচিতার মধ্যে লালিতপালিত হইয়া সে মা'র ভক্তিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল

তাহার পর নরেশচন্দ্র বলিল, "আমি কাল সদরে গিয়ে সব ঠিক ক'রে আসব। চৈত্রমাস পড়বার আগেই আমরা যাত্রা করব।"

মা চুপ করিয়া রহিলেন—শ্বশুরের ভিটা, তিনি নরেশকে লইয়া—নরেশের জন্য এই ভিটা আগলাইয়া ছিলেন;—এই গৃহের সহিত তাঁহার সমস্ত জীবনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িত; কত আশা এই গৃহকে বেষ্টন করিয়া হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। আজ! কিন্তু সে সকলের অপেক্ষা নরেশচন্দ্র বড়।

যে কথা, সেই কায। নরেশচন্দ্র পরদিন জিলার সদরে যাইয়া দুই দিনের মধ্যে দানপত্র রেজেষ্টারী করিয়া—সব ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিল।

গ্রামের লোক তাহার কয় দিন অনুপস্থিতির কারণ জানিতে না পারিয়া কৌতূহলবশে নানা কারণ কল্পনা করিতে লাগিল। শেষে চৌধুরী বাবুদের বৈঠকখানায় অধিকাংশের মতে স্থির হইল, সে স্ত্রীকে আনিতে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল—তাহারা মেয়ে পাঠায় নাই—"তোতা মুখ ভোঁতা" করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দুই দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার পর একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী নরেশচন্দ্রের গৃহে আসিল। রায় মহাশয় গৃহিণীকে বলিলেন, "নরেশের বৌ কি সত্যিই এল না কি?" রায়-গৃহিণী মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "তা আমি কি জানি? আমার যেন কেবল ঐ চিন্তে!"

সে গাড়ীতে জিলা-বোর্ডের কর্ম্মচারী সম্পত্তি দখল লইতে আসিয়াছিলেন।

সেই গাড়ীতেই শেষরাত্রিতে নরেশচন্দ্র ঠাকুর ও মা'কে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় মা বহুকষ্টে চক্ষুর জল

সংবরণ করিলেন। নরেশচন্দ্রের মনে হইল, কয় মাস পূর্ব্বে সে যে আশা লইয়া গ্রামে আসিয়াছিল—গ্রামের অনাচারের শ্মশানে তাহার শব দাহ করিয়া সে ফিরিয়া যাইতেছে।

৭

জ্যোতির্ম্ময়ী পিত্রালয়ে আসিল।

নরেশচন্দ্র যে বলিয়াছে, যখন তাহার অমতে জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন গরীব সে, তাহার স্ত্রীকে আনিবার জন্য কখন বড়মানুষের দ্বারস্থ হইবে না—তাহা শুনিয়া রণেশচন্দ্র ছেলেকে বলিলেন, "বললে না কেন, আমিও কখন মেয়ে ঘাড়ে ক'রে তা'র দুয়ারে দিতে যাব না?"—আর কুসুমকামিনী বলিলেন, "যখন দেখলি, জ্যোতিঃর অসুখ সেরে গেছে, তখন জামাই অমন কথা বলবার পরও ওকে নিয়ে এলি কেন?"

কুসুমকামিনী কন্যাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, মাতঙ্গিনী যাহা লিখাইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্তা হইলেন এবং কয় দিন পরে এক দিন স্বামীকে বলিলেন, "মাতুটা ভারী দজ্জাল—শ্বশুর-বাড়ী জ্যোতিঃর কোন কষ্ট হয় নি, ও মিছে কথা লিখিয়েছিল। জামাই ত রাগ করেছে। আমি বলি, জ্যোতিঃকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক—আমি বেহানকে লিখে দি, চোত মাস পরে বৈশাখেই পাঠিয়ে দেব।"

শুনিয়া রণেশচন্দ্র বলিলেন, "কখনই না। মেয়ে আমার এমন ভার হয় নি যে, তা'কে ঘাড়ে ক'রে দিয়ে আসব। না হয়, আর সেখানে যা'বেই না।"

"বল কি?"

"কেন?"

"স্বামীর ঘর করবে না! ছেলে কোল আলো করবে না! জীবন ব্যর্থ হ'বে, তবুও অন্যায় জিদ বজায় রাখতে হবে?"

"সবার জীবনই যে সফল হয়, তা' নয়।"

স্বামীর এই কথায় কুসুমকামিনীর মাতৃ-হৃদয় এমনই আঘাত পাইল যে, তিনি স্বামীর মেজাজ অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যা বলেছ, বলেছ—আর কখন অমন কথা মুখে এনো না।"

তিনি যে জামাতৃ-নির্ব্বাচনে ভুল করিয়াছেন, তাহাতেই রণেশচন্দ্র আপনার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর এই সব কথা! তিনি বলিলেন, "আমি ভুল করেছি, আমিই তা'র প্রায়শ্চিত্ত করব। আমি ওকে একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা দেব।"

"তবেই সব হ'ল! পুরুষমানুষের বুদ্ধিই এমনই! আমি মেয়েকে পাঠিয়ে দেব।"

কথায় কথা বাড়িবে এবং স্বামীর সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইবে বুঝিয়া কুসুমকামিনী আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী পিতামাতার কথা-কাটাকাটি শুনিয়াছিল। তাহার মনে একটা নূতন পথ খুলিয়া গেল—চিন্তা সেই পথে যাইতে লাগিল।

কুসুমকামিনী স্বামীকে বলিয়াছিলেন, তিনি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু স্বামীর মেজাজ তিনি জানিতেন, তাই সে কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে পাঠাইতে পারিলেন না—স্বামীর উগ্রতা শান্ত হইবার জন্য এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিলেন। পক্ষকাল পরে তিনি বেহানকে পত্র লিখিলেন—জ্যোতির্ম্ময়ীর অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া ছেলেকে পাঠাইয়াছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বে কখন তাঁহার কাছ-ছাড়া হয় নাই, সেই জন্য তাঁহার মা'র মন বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। সে জন্য কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে তিনি যেন তাহা ক্ষমা করেন। চৈত্র মাসের কয়টা দিন কাটিলে বৈশাখের প্রথমে তিনি যে দিন স্থির করিয়া নরেশচন্দ্রকে পাঠাইবেন, জ্যোতির্ম্ময়ীকে সেই দিনই পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। যদি নরেশচন্দ্রের আসিবার কোন অসুবিধা হয়, লিখিলে তিনিই কন্যাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

এই পরাজয়স্বীকার—এই ক্ষমাপ্রার্থনা লইয়া সরকার যখন নরেশচন্দ্রের গ্রামে গেল, তখন যাওয়া নিষ্ফল। সরকার দেখিয়া আসিল, বাড়ীতে ডাক্তারখানা বসিয়াছে, বিদ্যালয় বসাইবার আয়োজন হইতেছে—নরেশচন্দ্র মা'কে লইয়া কোথায় গিয়াছে, তাহা গ্রামের লোক জানে না।

সরকার ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে কুসুমকামিনী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এত দিন আশঙ্কার মেঘ তাঁহার আনন্দের আলো মধ্যে মধ্যে ম্লান করিতেছিল, আজ বিপদের প্রলয় সূচিত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার ব্যাকুল বিপন্নভাব রণেশচন্দ্রের

দৃঢ়তাকেও বিচলিত করিল। তিনি বলিলেন, "তবে কি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব ?"

কুসুমকামিনী বলিলেন, "ছিঃ! ছিঃ! এই কথা আবার লোক-জানাজানি ক'রে লোক হাসাবে ? শত্রু-মিত্র সবারই আছে, বিশেষ তোমার ভাগ্যোদয়ে যা'দের মিত্র ভাব, তা'দেরও অনেকে তোমার শত্রু হয়েছে—জ্ঞাতি শত্রুদের ত কথাই নেই। তা'রা এই কথা নিয়ে ঘোঁট কমিটী ক'রে তোমার মাথা হেঁট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে না ?"

রণেশচন্দ্র বুঝিলেন, গৃহিণী সত্য কথাই বলিয়াছেন।—ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। জ্যেষ্ঠের সহিত তাঁহার এত সদ্ভাব ছিল যে, লোক বলিত "রাম-লক্ষ্মণ ভাই।" যত দিন তিনি স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে অর্থ ও যশ বর্দ্ধিত না করিয়াছিলেন, তত দিন ভ্রাতার ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু তাহার পরই সে ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই পরিবর্ত্তনই তাঁহাকে সে পথে "ডেন্‌জার সিগন্যাল" বা বিপদের সম্ভাবনা দেখাইয়া দিয়াছিল—তিনি তাহা বুঝিয়া "ভিন্ন" হইয়াছিলেন।

রণেশচন্দ্রও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তবে কখন্ কাহার কি হয় বলা যায় না মনে করিয়া, প্রথম সঙ্কল্প অনুসারে ভাড়াটিয়া বাড়ীর মধ্যে একখানি ও দশ হাজার টাকার "কোম্পানীর কাগজ" জ্যোতির্ম্ময়ীর নামে লিখিয়া দিয়া দুশ্চিন্তা হ্রাসের প্রয়াস করিলেন।

কুসুমকামিনীর রাগ সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে মাতঙ্গিনীর উপরেই পতিত হইল। এক দিন একটা কথা উপলক্ষ করিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার যেমন সর্ব্বনাশ করেছ, অতি বড় শত্রুরও কেউ তেমন সর্ব্বনাশ করে না।" মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিল, তাহার পর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল, "আমার কপাল যদি পোড়া না হ'বে, তবে এমন ক'রে পরের ঘরে দাসীবৃত্তি ক'রে খেতে আসব কেন ? যা'কে 'মানুষ' করেছি, সে কি না শেষে বলে, আমি তা'র অতি বড় শত্তুরের কায করেছি! হ্যাঁ গা—আমি কি কর্‌লুগা ?"

যখন সহসা অতিবর্ষণে বন্যার জল অতর্কিতভাবে গৃহ গ্রাম ভাসাইয়া বহিয়া যায়, তখন বিপদের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতত্ব হেতু লোক সহসা ক্ষতির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না—ক্রমে তাহা উপলব্ধ হয়; তেমনই যখন কতকগুলি অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা অল্পদিনের মধ্যে সংঘটিত হয়, তখন লোক তাহাদের ফল সহসা বুঝিতে পারে না। জ্যোতির্ম্ময়ীর তাহাই হইয়াছিল। মাতঙ্গিনীর তাহার শাশুড়ীকে শাসান, তাহার দাদার তাহাকে আনিতে গমন, স্বামীর অনভিমতে তাহার পিত্রালয়ে আগমন, নরেশচন্দ্রের নিরুদ্দেশ যাত্রা—এ সব এত অল্পদিনের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল যে, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রথমে সে সকলের স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই; কুসুমকামিনীর ব্যাকুলতা না দেখিলে—পিতার সহিত তাঁহার কথা না শুনিলে—মাতঙ্গিনীকে তাঁহার দোষারোপ অবগত না হইলে সে, বোধ হয়, বিলম্বে তাহা বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। অন্ধকার রাত্রিতে অজ্ঞাত পথে অগ্রসর হইতে হইতে পথিক সহসা বিদ্যুদালোকে সম্মুখে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগর দেখিলে যেমন আপনার অবস্থা মুহূর্ত্তমধ্যে উপলব্ধি করে, সে তেমনই ভাবে আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিল। সে কি করিবে ? কুসুমকামিনী স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—কন্যার জীবন কি ব্যর্থ হইবে ? তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই, নরেশচন্দ্র গ্রাম ও গৃহ ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে—হয় ত আর কখনও তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। শাশুড়ী যে বলিয়াছিলেন, "যে মানুষ সহজে রাগ করে না, সে রাগ করলে তা'কে সহজে ঠাণ্ডা করা যায় না"—সে কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি তাহাকে পাঁচটা দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন—সে তাহাও করে নাই। এমন দুর্ব্বুদ্ধি তাহার কেন হইয়াছিল ? তাহার বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত বেদনাকীট যেন কুরিয়া কুরিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীরও মাতঙ্গিনীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাগ হইল। সে কেন কতকগুলা মিথ্যা কথা লিখিয়া তাহার পিতাকে ক্রুদ্ধ ও মাতাকে শঙ্কিত করিয়াছিল ? সে এমন না করিলে ত এ সব হইতেই পারিত না! মা সত্যই বলিয়াছেন, সে যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অতি বড় শত্রুও তাহা করে না।

যত দিন যাইতে লাগিল, কন্যার জন্য কুসুমকামিনীর চিন্তা ততই বাড়িতে লাগিল, শেষে সেই চিন্তাই যেন তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি সৌখীন প্রকৃতির লোক ছিলেন—বেশভূষার পারিপাট্য তিনি আপনি ভালবাসিতেন, অপরেরও দেখিতে চাহিতেন। এখন সে দিকে তাঁহার অমনোযোগ লক্ষিত হইত। অন্য কন্যারা কোন দিন সে কথা বলিলে তিনি

উত্তর দিতেন, "আর বলিস নে ছাই, ও সব কথা। জ্যোতির জন্যে আমার ঘুমিয়েও স্বস্তিলাভ হয় না, আমার যেন এখন মরতেও ভয় করে, ও কা'র কাছে থাকবে ?" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিত।

কুসুমকামিনীর অন্য দুই কন্যা আসিলে সকলের সেই একই আলোচনার বিষয় ছিল—কি হইবে ? কিন্তু কি হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারিতেন না। যেন সম্মুখে কেবলই অন্ধকার।

জ্যোতির্ম্ময়ী লক্ষ্য করিত, মা তাহাকে লইয়া ব্যস্ত। তিনি স্বয়ং তাহার বিষয় আলোচনা করেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতৃবধূরা তাহার আলোচনা করিলে, সে আলোচনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমাদের শ্বশুর শুন্‌লে রাগ করবেন; তিনি বলেন, ওঁ নিয়ে তোমরা আলোচনা ক'রে কেবল মেয়ের মন খারাপ কর। জামাই রাগ করেছে—পুরুষমানুষের রাগ; গ'ড়ে যা'বে।" পাছে জ্যোতির্ম্ময়ী মনে করে, সে সকলের কৃপার পাত্রী, সেই ভয়ে যে তিনি এমন কথা বলিতেন, তাহা সে বুঝিতে পারিত এবং সেই জন্যই বিশেষভাবে বুঝিত—সে কৃপার পাত্রীই হইয়াছে।

লোকলৌকিকতা—গতায়াত—এ সব কুসুমকামিনী ভালবাসিতেন। আত্মীয়কুটুম্বের বাড়ী বা রণেশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবের বাড়ী কায়কর্ম্মে তিনি সর্ব্বাগ্রে যাইয়া সর্ব্বশেষে আসিতেন। কিন্তু এখন তিনি নিমন্ত্রণ কাটাইবার চেষ্টাই সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেন। এক দিন একটা নিমন্ত্রণের কথায় তিনি রণেশচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি ত যা'বে, ব'লে দিও, আমার শরীর ভাল নেই।" রণেশচন্দ্র বলিলেন, "সে কি ভাল দেখাবে—ওরা সব কাযে আসে।" কুসুমকামিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি কি ইচ্ছে ক'রে বলছি—বল্‌ব না। গেলেই জ্যোতির কথার আলোচনা হ'বে; একটা মিথ্যে দিয়ে সত্যি ঢাকতে হ'বে, তাও হয় ত লোক বিশ্বাস কর্‌বে না—আড়ালে হাসবে। আমি যাব না।" বলিতে বলিতে কুসুমকামিনীর গলাটা ধরিয়া আসিল। জ্যোতির্ম্ময়ী পার্শ্বের কক্ষে ছিল—সে সব শুনিল। সে দিন সে আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না—উৎসমুখ মুক্ত হইয়া গেল।

মাসের পর মাস কাটিল—বৎসর ঘুরিয়া আসিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে হইত, সে যদি স্বামী ও শাশুড়ীর উপর রাগ করিবার কারণও পাইত! কারণ, তাহা হইলে সে আপনার কাযের সমর্থন করিয়া কতকটা সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ কোন কারণ সে পাইত না। শাশুড়ী তাহাকে তাঁহার স্নেহে যেন অভিভূত করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, তাঁহার কন্যা নাই—তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যা পাইয়াছেন, দীর্ঘকাল তিনি তাহারই আগমন-প্রতীক্ষায় অন্ধকার ঘরে বাস করিয়াছেন—সে আসিয়া সেই ঘরের অন্ধকার দূর করিয়াছে। তাঁহার ব্যবহার স্মরণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার উক্তির আন্তরিকতা অনুভব করিত। আর স্বামী ? তাহার মনে হইত, তেমন প্রেমলাভের সৌভাগ্য বুঝি অল্পলোকেরই হয়—ভ্রাতৃবধূদিগের সহিত ভ্রাতাদিগের ব্যবহারে এবং ভগিনীদিগের সহিত ভগিনীপতিদিগের ব্যবহারে সে ত্রুটি লক্ষ্য করিত; কিন্তু নরেশচন্দ্রের ব্যবহারে তাহা খুঁজিয়া পাইত না। যে দিন সে চলিয়া আইসে, সে দিন নরেশচন্দ্র যে তাহাকেই আসিয়া বলিয়াছিল—"আজ তোমার যাওয়া হ'তে পারে না"—সেই উক্তিতে স্ত্রীর উপর কতটা বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—সে স্বামীর অমতে কায করিবে না! চলিয়া আসিবার সময় পথে সে গাড়ী হইতে নরেশচন্দ্রকে দেখিয়াছিল—তাহার মুখে কি বিষণ্ণভাব! সেই দেখাই কি তাহার শেষ দেখা হইবে ? জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু ফাটিয়া যেন জল ঝরিত।

এক এক দিন একাকী বসিয়া সেই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সে যখন কাঁদিত, তখন হয় ত কুসুমকামিনী তথায় আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইতেন—মেয়েও কাঁদিত, মা-ও কাঁদিতেন।

ইহার উপর জ্যোতির্ম্ময়ী কখনও হয় ত শুনিতে পাইত, তাহার ভ্রাতারা বা ভ্রাতৃবধূরা নরেশচন্দ্রের "পাড়াগেঁয়ে গোঁয়ারের রাগের" ও তাহার ব্যবহারের নিন্দা করিত। তখন তাহার ব্যথিত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উক্তি বাহির হইতে চাহিত "মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। তাঁহার কোন দোষ নাই। দোষ তোমাদের—আর দোষ আমার।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর চিত্ত দিন দিন আপনার উপরই অধিক তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় জ্যোতির্ম্ময়ীর কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। রণেশচন্দ্র জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহের অভিজ্ঞতার পর মনে করিয়াছিলেন, আপনার লোকচরিত্রজ্ঞানে তাঁহার

আস্থা নষ্ট হইয়াছে ; তাই এবার তিনি পাত্র-নির্ব্বাচনের ভার পুত্রদিগের উপর দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "তোমাদের মা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কায় করবে ; আমাকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।" কলিকাতার বড়মানুষের ঘরেই সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল এবং উভয় পক্ষের অর্থ ও সম্ভ্রমের উপযুক্ত সমারোহে বিবাহের সব ব্যবস্থা হইতেছিল। এমন সময় কুসুমকামিনী স্বামীকে বলিলেন, "আমার কথা—মেয়ে নেমন্তন্ন হ'বে না।" রণেশচন্দ্র বিস্মিতভাবে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন ?" কুসুমকামিনী বলিলেন, "একশ' ঘরের মেয়েরা এসে জ্যোতির শ্বশুরবাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করবে—তা'র আলোচনা করবে, সে মেয়ে সহ্য করতে পারবে না, আমিও পারব না।" রণেশচন্দ্র বুঝিলেন, বলিলেন, "কিন্তু লোক কি বলবে ?" কুসুমকামিনী উত্তর দিলেন, "যা' বলবে, অসাক্ষাতে বলবে। অসাক্ষাতে লোক রাজার মা'কেও ডাইনী বলে। সামনে কেউ কিছু বলবে না—ঐ কথা নিয়ে ঘোঁট কমিটী হবে, সে আমি করতে দেব না।"

কথাটা, বোধ হয়, জ্যোতির্ম্ময়ীকে শুনাইবার জন্যই তাহার যে ভ্রাতা নরেশচন্দ্রকে "ছোট গন্ধী" বলিয়াছিল, তাহার স্ত্রী জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিল, "তুমি মা'কে বল, মেয়ে নেমন্তন্ন করতে হ'বে! নইলে বাড়ীর নিন্দে হ'বে।" কথাটা শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী কুণ্ঠিতা হইল—কোনরূপে বুকে বলসঞ্চয় করিয়া মা'কে বলিল, "মা, খুকীর বিয়েতে মেয়ে নেমন্তন্ন কর।" কুসুমকামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকে কে এ সব কথা বল্‌লে ?" জ্যোতির্ম্ময়ী চুপ করিয়া রহিল। মা বুঝিলেন, বধূরা কেহ জ্যোতির্ম্ময়ীকে এ কথা বলিয়াছে। তিনি বলিলেন, "তুই বলিস, বাড়ীর যত দিন আমি কর্ত্রী, তত দিন আমি যা' ভাল বুঝব, বাড়ীতে তা'ই হ'বে!" তাহার পর তিনি কন্যার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভগবান্ যদি দিন দেন—নরেশ যদি ফিরে আসে, তবেই উৎসব করব—নইলে সব কেবল নিয়মরক্ষে হ'বে।"

৮

জ্যোতির্ম্ময়ীর কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নরেশচন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে কুসুমকামিনীকে প্রৌঢ়ত্বেও যৌবনের সৌন্দর্য্যে ভূষিতা মনে হইত, তাঁহার দেহে জরার স্পর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—চিন্তা তাঁহাকে জীর্ণ করিয়াছে। তাঁহার কন্যাচতুষ্টয়ের রূপে যে তীব্রতা ছিল, জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপে তাহা আর নাই—বিষাদের আতিশয্য তাহাতে যে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। কুসুমকামিনীর ও রণেশচন্দ্রের কন্যাকে লইয়া দুশ্চিন্তার অবধি নাই। তাঁহাদের মৃত্যুর পর কি হইবে ? আজকাল একান্নবর্ত্তি-পরিবার স্থায়ী হয় না—টাকা থাকিলেও যে স্ত্রীলোককে অভিভাবকের অভাবে বিব্রত হইতে হয়, তাহা রণেশচন্দ্র এখন উপলব্ধি করিতেছেন। সেই উপলব্ধির উৎস হইতেই তাঁহার ভাবনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে।

কনিষ্ঠা কন্যাকে লইয়া কুসুমকামিনীর বড় বিপদ গিয়াছে। সে কয় দিন প্রসব-বেদনা ভোগ করিয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছিল—তদবধি তাহার স্বাস্থ্য শঙ্কাজনক হইয়াছিল ; ঔষধ, পথ্য, সেবা—কিছুরই ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু দেহের রক্তাল্পতা দেহের বর্ণ হইতে চক্ষুর দৃষ্টি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। শেষে ডাক্তাররা বলিয়াছেন, ঔষধ খাইয়া যাহা হইল না—"হাওয়া খাইলে" তাহা হইবে। কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া প্রয়োজন।

যাহারা কলিকাতার সীমার বাহিরেই "বিদেশ" দেখে, তাহাদিগের বিদেশযাত্রা একটা বিরাট ব্যাপার। সেই জন্য সহর ব্যতীত অন্যত্র যাওয়া অসুবিধাজনক বুঝিয়া রণেশচন্দ্র সকলকে কাশীতে পাঠান স্থির করিয়া তথায় বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

লোক যাইয়া কাশীর এক পার্শ্বে, কতকটা ফাঁকা যায়গায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া সংবাদ দিলে রণেশচন্দ্র নিজে যাইয়া সকলকে তথায় রাখিয়া আসিলেন—তিনি নিজে থাকিতে পারিলেন না ; কারণ, তাঁহার তখন ব্যবসার মরশুম। তিনি কলিকাতায় থাকায় ছেলেদের মধ্যে এক জনকে ও এক বধূকে কলিকাতায় থাকিতে হইল।

কাশীতে আসিয়া কুসুমকামিনীর কন্যার আশাতীত উপকার হইতে লাগিল ; তিন নিজে প্রাতঃদিন গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের পরামর্শমত পীড়িতা কন্যাকে প্রতিদিন বজরায় গঙ্গাবক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আনা হইত। বর্ষার পর গঙ্গার জল প্রায় কূলে উঠিয়াছে—নদীকূলে কোন কোন মন্দিরের মধ্যেও জল প্রবেশ করিয়াছে। কাশীর শোভা উত্তরবাহিনী গঙ্গা—অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কাশীর চরণ ধৌত করিয়া

প্রবাহিতা ; আর সেই গঙ্গার শোভা বর্ষার পর—শরতে, যখন গঙ্গার স্রোতঃ পুষ্ট ও পূর্ণ। কূলে মন্দির ও গৃহ, ঘাটে নর-নারীর জনতা—নারীদিগের বস্ত্রে বর্ণের বৈচিত্র্য, সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম। ইহা কলিকাতার মধ্যে আবদ্ধাদিগের কাছে যেমন নূতন, তেমনই চিত্তাকর্ষক।

কুসুমকামিনী প্রতিদিন দেবদর্শনে যাইতেন, আর দেবতার নিকট জ্যোতির্ম্ময়ীর কল্যাণ কামনা করিতেন—বিশ্বনাথ বিশ্বের কামনা পূর্ণ করেন, তাঁহার কামনা কি অপূর্ণ থাকিবে ?

এইরূপে প্রায় এক পক্ষ কাটিয়া গেল—পূজার আর এক মাসও বিলম্ব নাই। স্থির ছিল, পূজার পর কন্যার স্বাস্থ্য কেমন থাকে দেখিয়া তবে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইবে ; পূজার সময় রণেশচন্দ্র কাশীতে আসিবেন, তিনি স্বয়ং দেখিয়া ব্যবস্থা করিবেন। কুসুমকামিনীর ইচ্ছা ছিল—যখন একবার বাহির হইতে পাইয়াছেন, তখন আর কয়টি তীর্থ দর্শন করিয়া যাইবেন—বাহির হওয়া ত প্রায় ঘটে না! অযোধ্যা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার—এইগুলি দেখিবার কল্পনা তাঁহার ছিল। এখন তাঁহার পক্ষে কোথাও যাইবার সর্ব্বপ্রধান বাধা—জ্যোতির্ম্ময়ী ; তাহাকে রাখিয়া কোথাও যাইতে তাঁহার মন সরে না। এবার তাহারা চারি ভগিনীই কাশীতে উপস্থিত—তিনি তাই মনে করিতেছিলেন, তাহাদিগকে রাখিয়া একা ঘুরিয়া আসিবেন।

কিন্তু সহসা কুসুমকামিনীর কল্পনায় ছেদ পড়িবার উপক্রম হইল। কাশীতে আসিয়া যে সকল দাসদাসী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনের জ্বর হইল। যেমন হয়, তেমনই হইল—জ্বর সে-ও বড় গ্রাহ্য করিল না, আর কেহও সে জন্য ব্যস্ত হইল না। তিন দিন পরে দেখা গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বসন্তের বিস্ফোটকে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল বটে, কিন্তু হাঁসপাতালে পাঠান সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে একটা প্রবল কুসংস্কার থাকায়, নিযুক্ত দাসদাসীরা কায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল—"অতান্তরে" পড়িয়া কুসুমকামিনী ভাবিলেন, এখন কি করা যায় ? যে সময় অন্য দাসদাসীর সন্ধান করা হইতেছিল, সেই সময় কলিকাতা হইতে আগত ভৃত্য সুদর্শনও গাত্রে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দেখা দিল। কুসুমকামিনী ভয় পাইলেন—বিদেশ-বিভুঁই! তাঁহার মধ্যম পুত্র বলিল, সে আর কিছুতেই কাশীতে থাকিবে না। সে কলিকাতায় পিতাকে টেলিগ্রাফ করিল—উত্তরে রণেশচন্দ্র টেলিগ্রাফ করিলেন—"সুদর্শনকে হাঁসপাতালে পাঠাও। তোমরা চলিয়া আইস।"

যাইতে কুসুমকামিনীর মন সরিতেছিল না—বিশেষ কাশীতে আসিয়া কনিষ্ঠা কন্যার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছিল। তিনি এমনও বলিলেন, "আর একটা বাড়ী দেখলে হ'ত না ?" পুত্র বলিল, "না। বাবা রাগ করবেন।" অগত্যা কুসুমকামিনী বলিলেন, "তবে চল। ভেবেছিলাম, একটু ঘুরে যা'ব, তা' অদেষ্টে নেই।"

কাশীতে কুসুমকামিনীর এক মাসীমা বাস করিতেন। তাঁহার সহিত এত দিন তাঁহার সাক্ষাৎ করা হয় নাই ; যখন কাশীতে কিছু দিন থাকা হইবে স্থির ছিল, তখন সে জন্য ব্যস্ত হইবার কোন কারণ তিনি অনুভব করেন নাই। এখন মনে করিলেন, যাইবার পূর্ব্বে একবার দেখা করিয়া আসিতে হইবে। ঠিকানা তিনি জানিতেন—ছেলে গাড়ী "রিজার্ভ" করিবার জন্য ষ্টেশনে যাইবে, তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুই যা'বার পথে আমায় নামিয়ে দিয়ে যা'বি, আবার আসবার সময় তুলে নিয়ে আসবি।" তাহাই হইল।

মাসীমা কুসুমকামিনীকে কয় বৎসর পরে দেখিলেন, দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে এসেছিস, মা ?" তিনি প্রায় এক পক্ষকাল আসিয়াছেন জানিয়া মাসীমা বলিলেন, "এই এত দিনের মধ্যে এক দিন মাসীকে দেখতে আসিস্‌নি ?" কুসুমকামিনী লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "মাসীমা, কাশীতে দেখবার জিনিষ এত যে, ছেলে-মেয়েরা তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিল।" মাসীমা বলিলেন, "সে সব কিন্তু, মা, পালিয়ে যেত না ; বুড়ী মাসীমাই পালিয়ে যা'বে।" বলিয়াই তিনি বলিলেন, "যদি এলি, দাদা-দিদি দের নিয়ে এলি নে! তোদের আজকালকার মেয়েদের কি যে বুদ্ধি!" কুসুমকামিনী হাসিয়া বলিলেন, "মাসীমা, আমি কি আজকালকার মেয়ে ?"

মাসীমা বলিলেন, "আমার কাছে ত তা'ই!"

"আসত যদি নাতনীরা, তবে দেখতে, আজকাল মেয়েরা কেমন।"

মাসীমা'র শাশুড়ী বলিলেন, "তুমি কি মনে করেছ, তা'দের না নিয়ে এসে আমি ছাড়ব ? তা' হ'বে না। কাল সকালে তা'দের সব নিয়ে আসবে।"

কুসুমকামিনী বলিলেন, "আমরা যে কাল চ'লে যা'ব, দিদিমা ?"

"কেন ?"

কুসুমকামিনী তখন সব কথা বলিলেন ; শুনিয়া মাসীমা'র শাশুড়ী বলিলেন, "কেন, মাসীর বাড়ী এলে কি জাত যা'বে ? তুমি আজই সকলকে নিয়ে এখানে এস—নাতজামাইকে লিখে দাও, মেয়ের শরীর সারলে তবে যা'বে।"

সম্মতি দিতে কুসুমকামিনীর সাহসে কুলাইতেছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহার পুত্র আসিয়া সংবাদ দিল, দুই দিনের মধ্যে "রিজার্ভ" পাওয়া যাইবে না, তখন তিনি পুত্রকে মাসীমা'র শাশুড়ীর কথা বলিলেন ; পুত্রও মন্দের ভাল হিসাবে সে প্রস্তাবে সম্মতি দিল। সে তখনই কলিকাতায় তাহা টেলিগ্রাফ করিয়া দিবে, বলিল। যে রোগ সৌন্দর্য্য হরণ করে, সে রোগে তাহার বড় ভয়।

পুত্র বাড়ীতে যাইয়াই জিনিষ পাঠাইতে আরম্ভ করিবে বলিলে কুসুমকামিনী বলিলেন,"আজই তাড়াতাড়ি ক'রে ওঁদের ব্যস্ত করবি ?"

শুনিয়া মাসীমা'র শাশুড়ী বলিলেন, "কিছু ব্যস্ত করা হবে না, দিদি। তোমরা আজই চ'লে এস ; সব ব্যবস্থা হয়ে যা'বে। মন যখন খুঁত খুঁত করে, তখন তা'কে শান্তি দেওয়া ভাল।"

মাসীমা তাঁহার লোক দিলেন—সন্ধ্যার মধ্যেই সকলে তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন।

৯

মাসীমা ও মাসীমা'র বাড়ী প্রাচীনত্বের হিসাবে উভয়েই বিস্ময়কর। বাড়ীটি অতি বৃহৎ, গঙ্গার কূলে পোস্ত গাঁথিয়া বাড়ী গাঁথা হইয়াছিল—বর্ষার পর জল বাড়ীর প্রথম তলের প্রস্তর-রচিত প্রাচীরে আঘাত করে। বাড়ীটি তিন মহল—তাহাতে সাধারণ পরিবারের মত ছয় সাতটি পরিবারের স্থান-সঙ্কুলান হয়। বড় বড় উঠান, তাহাতে পালিত হরিণ—গৃহসংলগ্ন বাগান, তাহাতে ময়ূর, টিয়া পাখী প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। বাড়ীটি মিরাট অঞ্চলের কোন প্রসিদ্ধ ধনীর ছিল। সিপাহী-বিপ্লবের সময় তিনি ইংরাজের বিপক্ষে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। মাসীমা'র দাদা-শ্বশুর তখন ইংরাজের সেনাবিভাগের রসদ বিভাগে তাঁহার পিতার ঠিকাদারী কায করিতেছিলেন। সিপাহী-বিপ্লবের সময় তিনি প্রভূত অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নীলামে কমিশনারের কৃপায় তিনি অতি অল্পমূল্যে গৃহটি ও কিছু জমীদারী ক্রয় করেন এবং ক্রয় করিয়া জমীদারীর আয়ে গৃহসংস্কারের ও গৃহে প্রতিষ্ঠিত "সত্র"রক্ষার ব্যবস্থা করেন। দেশে তাঁহার বড় জমীদারী ও প্রাসাদোপম গৃহ ছিল ; জমীদারীর বার্ষিক আয় তখন প্রায় লক্ষ টাকা। তাঁহার দুই পুত্র ; মাসীমা'র শ্বশুরের এক পুত্র, খুড়শ্বশুরের ছয় পুত্র। মাসীমা'র পিতা কন্যার বিবাহ দিয়া "গৌরীদানের" ফল লাভ করিয়াছিলেন—আট বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, নয় বৎসরে তিনি বিধবা হয়েন। সে আজ ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা। শোকের প্রথম বেগ অপগত হইলে মাসীমা'র বিধবা শাশুড়ী কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি মাসীমা'র মা'কে বলিয়া পাঠাইলেন—"বেহাইনকে ভগবান্ অনেক অবলম্বন দিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করি, তাহারা চিরজীবী হউক ; আমার আর কেহ নাই—আমি বৌমাকে বুকে রাখিব—তিনিই আমার ছেলে, তিনিই আমার মেয়ে।" আর তিনি দেবরকে বলিলেন, "ঠাকুরপো, এই সম্পত্তিতে ভগবান্ আমার প্রয়োজন শেষ করিয়া দিয়াছেন। তবে যে কয় দিন বাঁচিতে হইবে, সে কয় দিন নিঃসম্বল থাকিলেও চলে না। সম্পত্তি তুমি ভোগ-দখল কর, যত দিন আমি আর বৌমা অথবা আমাদের এক জন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন মাসে আমাদের হাজার টাকা করিয়া দিও। আমি বৌমাকে লইয়া কাশীতে যাইয়া বাস করিব।"

তাহার পর এই দীর্ঘ ষাট বৎসর তিনি বধূকে বুকে করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ তাঁহার বয়স তিরনব্বই বৎসর, মাসীমা'র সত্তর। এই দীর্ঘকাল একের অন্য জনই অবলম্বন থাকায় তাঁহারা উভয়েই যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন—কাশীর লোকও এক জন বলিতে উভয়কে মনে করে। কাশীতে আসিবার পরেই শাশুড়ী বধূর সঙ্গে একসঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতে আরম্ভ করেন—উভয়ে একসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। সেই সবই ক্রমে উভয়ের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গৃহে পবিত্রতার প্রভাব—ধর্ম্মের পরিবেষ্টন। উভয়ের আচার-ব্যবহারে শুচিতা সপ্রকাশ। পূর্ব্বে উভয়ে একত্র গঙ্গাস্নানে ও দেবদর্শনে যাইতেন। এখন

মাসীমা আর শাশুড়ীকে বড় বাহির হইতে দেন না—তাই তাঁহার সকল দিন দেবদর্শনে যাওয়া হয় না। কিন্তু তাঁহারা কাশীতে যেরূপ পরিচিত, সকলেরই যেরূপ শ্রদ্ধার পাত্র, তাহাতে তাঁহারা কোন মন্দিরে গমন করিলে জনতা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয়। শাশুড়ীর দেহ জরাজনিত দৌর্ব্বল্যে দিন দিন অপটু হইয়া আসিতেছে। বধূর দীর্ঘ গৌর দেহ এখনও যষ্টির মত সরল ও উন্নত।

বৃহৎ গৃহের এক পার্শ্বে—যে দিকে গঙ্গা প্রবাহিতা সেই দিকে কয়টি ঘরে উভয়ে বাস করেন। একটি ঘরে উভয়ের শয়ন। আর একটিতে উভয়ের পূজা হয়। সে কক্ষে শাশুড়ীর বিগ্রহ—গোপাল, বধূর বিগ্রহ—রাধারমণ, আর তাহারই নিকটে মর্ম্মরের চৌকির উপর এক জোড়া খড়ম—ষাট বৎসরের চন্দনলেপে তাহা আস্তৃত—বধূ প্রতিদিন তাহার পূজা করিয়া থাকেন। তৃতীয় কক্ষে মাসীমা'র স্বামীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। যা পূর্ব্বে একবার পুত্রকে লইয়া কাশীতে আসিলে পুত্র ঐ কক্ষে থাকিতেন। সেই স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিয়া মা সেই কক্ষে পুত্রের ব্যবহৃত শয্যা, আসন, লেখনী, বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছেন। ঠাকুরঘরের মত সে ঘরও মাসীমা ব্যতীত আর কেহ পরিষ্কার করিতে পারেন না। মাসীমা প্রতিদিন সেই ঘরের প্রত্যেক দ্রব্য অঞ্চলে ঝাড়িয়া-মুছিয়া আবার যথাস্থানে রক্ষা করেন—যে যাঁহার জন্য এই নিত্য-সেবার ব্যবস্থা, তিনি এখনই আসিয়া সেই সেবা সার্থক ও সেবিকাকে ধন্য করিবেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতির পর বৈষ্ণবপদাবলী গান হয়। যদি কোন কীর্ত্তনীয়া কাশীতে আসিলে অন্ততঃ এক দিন এই ঘরে তাঁহার গান হয়। শাশুড়ী ও বধূ যে অর্থ পাইয়া থাকেন, তাহা দরিদ্রের দুঃখমোচনে, মন্দিরের সংস্কারে, নানা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ অর্থের সম্পূর্ণ সদ্ব্যয় হয়। কাশীর নিম্নশ্রেণীর লোকরা বলে, এই মাইজীরা—ঐ অহল্যাবাই আর রাণী ভবানী আবার অন্নপূর্ণার রাজত্বে কাশীতে আসিয়াছেন।

এই বাড়ীতে আসিয়া কুসুমকামিনীর কন্যাচতুষ্টয়ের ও বধূর কতটা নূতন অনুভূতি হইল। বিলাসের রাজ্য হইতে তাহারা ত্যাগের মন্দিরে প্রবেশ করিল, স্বার্থের দেশ হইতে যেন ত্যাগের ক্ষেত্রে আসিল। তথায় তাহারা আপনাদের বিলাস-প্রিয়তা ও স্বার্থসেবা যেন দর্পণে অতিরঞ্জিতভাবে দেখিতে পাইল এবং দেখিয়া লজ্জিত হইল। কিন্তু শাশুড়ীর ও বধূর—বিশেষ বধূর সরল—মানুষোচিত ব্যবহারে তাহাদের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। নাতিনীদের ও নাতবৌয়ের সঙ্গে মাসীমা'র ব্যবহারে রঙ্গব্যঙ্গের অভাব অনুভূত হইল না। প্রকৃত ধর্ম্ম মানুষকে মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া শুষ্ক আদর্শমাত্রে পরিণত করে না। আধ্যাত্মিকতার শুষ্ক কাষ্ঠ যে বিশ্বাসে পত্র-পুষ্প-পরিশোভিত সুন্দর হয়, সেই বিশ্বাসই মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করে।

শাশুড়ী ও বধূ অবসর পাইলেই বারান্দায় বসিয়া পতিত-পাবনী জাহ্নবীর প্রবাহ দেখিতেন। তখন তথায় সকলকে ডাকিয়া আনা হইত। কথায় কথায় মাসীমা পুরাণেতিহাসের কথা সকলকে শুনাইতেন—তাঁহার বলিবার রীতিতে সে সকল যেন সমধিক সরস ও চিত্তাকর্ষক হইত। আর বৈষ্ণব মহাজন-পদগুলি শাশুড়ী ও বধূ উভয়েরই কণ্ঠস্থ ছিল। সেগুলি তাঁহাদের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সমুজ্জ্বল হীরকের মত শোভা পাইত। যুবতীরা যৌবনের চাঞ্চল্য ভুলিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের—বিশেষ মাসীমা'র কথা শুনিত, আনন্দলাভ করিত, আর অজ্ঞাতে তাহাদের শিক্ষালাভ হইত।

দুই তিন দিনের মধ্যে মাসীমা'র দৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাহার মুখে বিষণ্ণভাব তাহার রূপে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিয়াছিল ; তাহার বাক্য সংযত, ভাব কুণ্ঠাব্যঞ্জক, কার্য্য সতর্কতার পরিচায়ক। মাসীমা এই সব লক্ষণ দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি এক দিন কুসুমকামিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার সেজ মেয়েটি যেন কেমন তত্ত্বছাড়া—ও বয়সে আর সকলে যেমন হাসি-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকে, ও তা' নয়। ওর মনে যেন কোন দুঃখ আছে—ও কেমন যেন ম্লান। তা ছাড়া, তুমি দেখি, অন্য সকলের শ্বশুরবাড়ীর কথা বল—তা'রাও বলে, ওর শ্বশুরবাড়ীর বা স্বামীর ত কোন কথাই শুনি নে! ব্যাপারটা কি ?"

মেয়ের দুঃখ কুসুমকামিনীর বুকে ভারের মতই চাপিয়া ছিল—কাশীতে আসিয়া তিনি কাহারও সঙ্গে সে কথার আলোচনা করিয়া ভার লঘু করিবার সুযোগও লাভ করেন নাই। মাসীমা'র এই কথায় তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিবার সুযোগ ঘটিল। তিনি আদ্যন্ত ঘটনাগুলি বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া মাসীমা বলিলেন, "কি দুঃখের কথা! এই বয়সে এমন দুঃখ শোক! জামাইয়ের কোন সন্ধানই পেলে না ?"

কুসুমকামিনী বলিলেন, "মাসীমা। হয় ত আবার বিয়ে করেছে—কোন বিদেশে গিয়েছে, আপনার জামাই বলতেন, ওর মত ছেলের পসার হ'বেই—যেখানে গিয়েছে, সেখানে হয় ত ডাক্তারী করছে।"

মাসীমা বলিলেন, "তুমি তা'র যে বর্ণনা দিলে, তা'তে আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না—সে আবার বিয়ে করেছে। যে ছেলে মতের জন্যে সব ত্যাগ ক'রে গ্রামে যেতে পারে, যে সব ত্যাগ করবার সময়ও মানুষের কল্যাণে সর্ব্বস্ব উৎসৃষ্ট করে, যা'র মনের বল এত যে, সে এমন ভাবে, সব ত্যাগ করেছে—সে বলী ; সে দুর্ব্বলের পথ অবলম্বন করবে না।"

মাসীমা'র মনে ভাবনা বাড়িতে লাগিল। তিনি সমস্ত জীবন পরের কল্যাণচিন্তা করিয়াছেন—কাহারও দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি নিজে সেই দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতেন। তিনি বলিলেন, "কি জানি, ঠাকুরের মনে কি আছে। তিনি বাথাহারী, কিন্তু অনেক সময় ব্যথা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন ; যা' দুর্লভ, তাকে তিনি সুলভ ক'রে তা'র মূল্য কমিয়ে দেন না।"

কুসুমকামিনীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মাসীমা, ওর দুঃখ আমার বুকের মধ্যে রাত্রি-দিন কাঁটার মত বিঁধছে। আমি যে কি করব, তা' ভেবে ঠিক করতে পারছি নে। পাছে কা'রও কোন কথায় ও কষ্ট পায়, সেই ভয়েই আমি সদা শঙ্কিত হয়ে থাকি। তা'র পরেই বা কি হ'বে ?" তাঁহার চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু পতিত হইল।

মাসীমা'র চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

সেই দিন হইতে মাসীমা'র স্নেহ জ্যোতির্ম্ময়ী অধিক পরিমাণে লাভ করিতে লাগিল। মাসীমাও তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

দুই দিন পরে এক দিন অপরাহ্ণে "সত্রের" কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিলেন, রাঢ়ের এক জন বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া অতিথি হইয়াছেন। মাসীমা'র শাশুড়ী ও মাসীমা পরদিন কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। কর্ম্মচারী বলিলেন, "তাঁ'রা কালই চ'লে যা'বেন। যদি অনুমতি করেন, আজ সন্ধ্যায় গাওনা হইতে পারে।" মাসীমা বলিলেন, "তবে ত আর বাহিরে সংবাদ দেওয়া যা'বে না!" কর্ম্মচারী বলিলেন, "না। ঠাকুরের দালানে গান হ'বে। বাটীর লোক শুনবেন।" সেই ব্যবস্থা হইল।

কীর্ত্তন শুনিবার সময় মাসীমা জ্যোতির্ম্ময়ীকে পার্শ্বে লইয়া বসিলেন। কীর্ত্তনের পালা তিনিই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর মানের কথায় কীর্ত্তনীয়া যখন গাহিতে লাগিলেন :—

"কাহে তু কলহ করি'
কান্তমুখ ত্যজলি ?"

তখন মাসীমা জ্যোতির্ম্ময়ীর অজ্ঞাতে তাহার ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাহার পর কীর্ত্তনীয়া যখন "আখরে" গাহিলেন—

"কান্ত সনে কলহ করে
কঠিন কুলকামিনী।"

তখন মাসীমা'র বোধ হইল, জ্যোতির্ম্ময়ী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তাঁহারও বুকের মধ্যটা কেমন করিয়া উঠিল।

কীর্ত্তন শেষ হইল। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। যে যাহার শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর নেত্রে নিদ্রার স্পর্শানুভব হইল না। তাহার মনের মধ্যে কেবল পদকর্ত্তার সেই কথা গুঞ্জরণ করিতে লাগিল :—

"কান্ত সনে কলহ করে,
কঠিন কুলকামিনী।"

শেষ রাত্রিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল—স্বপ্ন দেখিল, সে শ্বশুর-বাড়ীর পল্লীপথে যাইতেছে।

১০

মাসীমা'র মনে হইল, জ্যোতির্ম্ময়ীর একটা কাযের প্রয়োজন। যখন তাঁহার কাযের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে দেবতার সেবা শিখাইয়াছিলেন। তিনি তাহাতেই যে কায পাইয়াছেন, তাহাতে অবসর নাই। আর সেই কাযে তিনি যে শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। কিন্তু—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী যে পরিবারের পরিবেষ্টনে রহিয়াছে, তাহার মধ্যে তাহাকে ধর্ম্মের দিকে মনঃসংযোগ করিবার শিক্ষা কে দিবে ? তিনি বার বার মনে করিতে লাগিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী যেন স্বামীর ভালবাসায়—পারিবারিক জীবনের সার্থকতা লাভ করে।

কিন্তু যদি তাহা না হয় ? আর হইলেই বা কি ? ধর্ম্ম কি কেবল ত্যাগীর ? তাহা গৃহীরও ভূষণ—আশ্রয়—শান্তি—সান্ত্বনা।

মাসীমা তাঁহার শাশুড়ীর কাছে কোন কথা গোপন রাখিতেন না—এ বিষয়েও তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। মা সব শুনিলেন—একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি ওকে ধর্ম্মের কথা শুনাও, দেবতার সেবা করবার কথা বল। তা' হ'লেই বুঝতে পারবে, ওর মনের গতি কোন্ দিকে—প্রবৃত্তিমুখী কি নিবৃত্তিমুখী। সৎক্ষেত্রে প'ড়লে বীজ শস্য দান করে, যদি ও দিকে ওর মনের ঝোঁক থাকে, তবে ও তোমার উপদেশ গ্রহণ করবে—নইলে নয়।" তাহার পর তিনিও জ্যোতির্ম্ময়ীর জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন, "সাধ-আহ্লাদের বয়স। এ যে সব থেকেও নেই ! যেন 'পানীমে মীন পিয়াসী।' আহা !"

মাসীমা শাশুড়ীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিলেন ; পরদিন হইতে তিনি গঙ্গার উপর বারান্দায় বসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেবসেবার কথা গল্পচ্ছলে শুনাইতে লাগিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই এমন হইল যে, অন্য সকলে কোন স্থানে বেড়াইতে যাইবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়ীকে ডাকিলেও সে বলিতে আরম্ভ করিল, "তোমরা যাও, আমি দিদিমা'র কাছে থাকি !" শেষে মাসীমাই তাহাকে যাইতে বলিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী মাসীমা'র কাছে যাহা শুনিত, তাহার কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিত—মাসীমাও তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। পূজার সময় সে মাসীমাকে লক্ষ্য করিত—তাঁহার সেই সময়ের ভক্তিগদ্গদ ভাব তাহাকে মুগ্ধ করিত—তিনি যেন অনুভব করিতেন, তিনি দেবতার সম্মুখে অবস্থিত, দেবতার সেবা অক্ষুণ্ণভাবে সম্পন্ন করিলেই তিনি দিব্য আনন্দ লাভ করিতেন।

এক দিন সে মাসীমা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমা, আপনাদের দু' জনের দু' রকম ঠাকুর কেন ?"

মাসীমা বলিলেন, "ঠাকুর এক—যে যে রূপে ভালবাসে, সে সেই রূপে তাঁহার ধ্যানধারণা করে। যেমন কোন দু'জন মানুষের আকৃতি সমান হয় না, তেমনই দু'জন মানুষের প্রকৃতি এক রকম হয় না। সেই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অধিকারিভেদের ব্যবস্থা করেছেন। আর কোন ধর্ম্মে, শুনেছি, এমন সুব্যবস্থা নাই।"

"তা'র মানে কি ?"

"ঠাকুর নিজেই বলেছেন, 'যে যেমন ভাবে আমার উপাসনা করে, তা'কে আমি সেই ভাবেই অনুগৃহীত করি। মানুষ সকলেই আমার পথ অনুসরণ করে।' কিন্তু সকলের ভক্তি একরূপ নয়। তাই মনুষ্যচরিত্র বিচার ক'রে শাস্ত্রকাররা ভক্তির পাঁচ রস বা রতি-বিভাগ করেছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য। যাঁহারা সাধনার উচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছেন, সেই সনকাদি মুনিগণ শান্তভাবের অনুশীলন করেন—সকলে তা'র অধিকারী হ'তে পারে না ; সে ভাবের ক্রিয়া নাই। সক্রিয় ভক্তির প্রথম স্তর দাস্য—ভক্তমাত্রকেই, সাধকমাত্রকেই এ ভাব নিতে হয়। তা'র পর সখ্য—অর্জ্জুন প্রভৃতি সেই ভাবের ভক্ত। তা'র পর বাৎসল্য—সন্তানের প্রতি পিতামাতার, বিশেষ মাতার যে অনাবিল স্নেহ, তা'ই বাৎসল্য। আর সর্ব্বোপরি মাধুর্য্য—শ্রীবৃন্দাবনে গোপীরা এই ভক্তিতে বিভোর হয়ে যুগলরূপে রাধারমণকে ভজনা করেছিল। স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বাৎসল্য আর মাধুর্য্য রসেই ভক্তি ফুটে উঠে।"

"আপনারা দু' জনে কি দু' রূপে পূজা করেন ?"

"তা'ই করেছি। তা'র কারণ ছিল। মা যখন আপনাকে দেবতার পায় নিবেদন করেছিলেন, তখন তিনি পুত্রশোকাতুরা ; তাঁ'র মনে হয়েছিল, তিনি ঠাকুরকে পেয়েছিলেন পুত্ররূপে, সেই রূপে তিনি তাঁ'র হৃদয় পূর্ণ করেছিলেন। তা'ই তাঁ'র হৃদয়ে ভক্তির বাৎসল্য-রস স্বতঃই উদ্গত হয়েছিল। আর আমি—আমি ত বাৎসল্য রসের অনুভূতি পাই নি। আমি যা' পেয়েও পাই নি, তিনি আমাকে সেই রসের অধিকারী মনে ক'রে—রাধারমণরূপে তাঁ'র সেবা করতে দিয়েছিলেন। তা'ই তুমি দেখছ, আমরা দু' জন দু' রূপে ঠাকুরের পূজা করি। অধিকারিভেদে ভক্তির রস বা রতিভেদ হয়—ঠাকুরের রূপ-কল্পনাভেদ হয়। ঠাকুর এক বই দুই ন'ন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী যে সব বুঝিতে পারিল, তাহা নহে ; তবে তাহার মনে হইল, তাহার হৃদয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে আলোকপাত হইল—এ কেবল তরুণ-অরুণ-বিকাশ। সে ভাবিল, আপনি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবে, তাহার পর যদি কোথাও সংশয় অনুভূত হয়, মাসীমা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। মাসীমা'র ও তাহার মধ্যে সঙ্কোচের ভাব দূর হইয়া গিয়াছিল—গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার জানিবার এই

ইচ্ছা মাসীমা'কে প্রীত করিয়াছিল; কারণ, তিনি জানিতেন, সংশয় দূর না করিলে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "আর ঐ যে খড়ম আপনি পূজা করেন, ও কি দাদামশাইয়ের ?"

মাসীমা বলিলেন, "হাঁ।"

একটু কুণ্ঠিতভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু—দাদামশাইকে কি আপনার মনে পড়ে ?"

মাসীমা তাহার প্রশ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহার সংশয়ের মূল বুঝিলেন; বলিলেন, "মনে না পড়বার কথা; কিন্তু মনে পড়ে কি না, আজ ঠিক ক'রে বলা যায় না। কেন না—আজ যা' মনে পড়ে, তা' চাক্ষুষ দৃষ্টির ফল হয় ত নয়—কিন্তু তা'-ই আজ প্রত্যয়ে পরিণতি লাভ করেছে। দেখবারই যে দরকার সব সময় হয়, তা' নয়। মানুষ ভক্তির পথে এমন একটা স্থানে বা স্তরে উপনীত হ'তে পারে, যে স্থানে ধ্যানরূপ মানুষের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। যখন সে রূপ প্রতিভাত হয়, তখন আর মানুষের চাক্ষুষ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় না।"

সমস্ত দিন জ্যোতির্ম্ময়ী মাসীমা'র কথা ভাবিতে লাগিল। কি ভক্তি! তিনি নয় বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া এই ষাট বৎসর স্বামীর খড়ম পূজা করিয়াছেন—সেই চিহ্নটুকুকে দেবত্বের নিদর্শনে পরিণত করিয়াছেন; আর ধ্যানরূপে স্বামীকে দেখিয়াছেন—তাঁহাকে মনে পড়ে কি পড়ে না, তাহাও আজ স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই দীর্ঘ ষাট বৎসর—বালিকাবয়স হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তিনি ধ্যানেই কাটাইয়াছেন। ঐ যে পার্শ্বের ঘরে স্বামীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রতিদিন ঝাড়া মুছা সাজান—উহার মধ্যেও ভক্তির অভিব্যক্তি—উহার মধ্যেও স্বামীর অনুভূতি। তিনি যে মাধুর্য্যরসের কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত বটে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, তিনি সাধনার ফলে তাহাই লাভ করিয়াছেন,—অভাব পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ সাধনার ফলেই সাবিত্রী মৃত্যুর কবল হইতে স্বামীর জীবন অর্জ্জন করিয়া আপনার সাধ্বী সমুজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

আজ তাহার মনের মধ্যে একটা নূতন ভাবের অনুভূতি হইল—সে ত স্বামীকে পাইয়াছে, স্বামীর প্রেম আস্বাদন করিয়াছে, স্বামীর প্রকৃতি-পরিচয় পাইয়াছে, সে কি স্বামীকে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পাইতে পারে না? আজ কয় বৎসরের দূরত্বের ব্যবধানে তাহার কাছে স্বামীর কোন ত্রুটি আর অনুভূত হয় না, আর কয় দিন মাসীমা'র উপদেশে ও আদর্শে তাহার হৃদয় হইতে অকারণ অভিমান প্রক্ষালিত হইয়াছে—তাহার স্থানে শ্রদ্ধার প্রলেপ পড়িয়াছে। তাই আজ সে নূতন ভাবের ভাবুক। যখন অভিমান অপগত হয়, যখন প্রকৃত প্রেম মূর্ত্ত হয়, তখন অভাব আর থাকে না—তখন অবস্থার উপর জয়লাভ সহজসাধ্য হয়—তখন অন্তর হইতে উদ্গত আনন্দের প্রস্রবণধারায় হৃদয় পূর্ণ হয়। মাসীমা'র উপদেশে ও আদর্শে সে তাহাই বুঝিয়াছে। সে আদর্শ উচ্চ, কিন্তু তাহা ত অনধিগম্য হইতে পারে না! তাঁহার ব্যবহারে কোথাও দূরত্ব নাই—তাহা ত মানুষের ভাবেই ওতপ্রোত! তবে ?

সে দিন সন্ধ্যারতির পর সে যখন ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন তাহার মনে হইল, রাধারমণের মূর্ত্তির স্থানে এক বার সে যেন আর একটি মূর্ত্তি দেখিল, সে মূর্ত্তি তাহার পরিচিত। তাহার মনের মধ্যে কে জিজ্ঞাসা করিল—হে জীবন-দেবতা, আজ কি তবে তুমি সত্যই শূন্যকে পূর্ণ করিয়া দেখা দিলে ?

সে দিন পঞ্চমী—পরদিন পূজার ষষ্ঠী। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় নানা গৃহ হইতে সানাইয়ের বাজনা শুনা যাইতেছে। নবাগতে কাশী ভরিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার পর জ্যোতির্ম্ময়ী মাসীমা'কে বলিল, "কাল আমি আপনার সঙ্গে সকালে গঙ্গাস্নানে যা'ব—এসে ঠাকুরপূজার গোছ করব।"

মাসীমা বলিলেন, "না, দিদিমণি! তোমাদের ঘরের মধ্যে স্নান করা অভ্যেস—ঠাণ্ডা লাগলে অসুখ করবে,—তা'তে শরতের ঠাণ্ডা নতুন। কাল ষষ্ঠী, তোমার মা, যখন বেলা হ'লে স্নান করতে যা'বেন, তুমি তখন যা'বে। না হয় এসে বিকেলের গোছ ক'রে দিও।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আর কিছু বলিল না।

মাসীমা বলিলেন, "যা'ক, দিদিমণি, এক ভাবনায় নির্ভাবনা হ'লাম। মরবার আগে খবর দেব; তুমি এসে আমাদের ঠাকুর-সেবার ভার নিও।"

কুসুমকামিনী বলিলেন, "মাসীমা, সে ভাগ্যি কি মেয়ের হ'বে? তবু দেখ, তোমার কাছে থেকে ওর মনটা ধর্ম্মের দিকে গেছে।"

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন, "দেখবে, তুমি যা'বার আগে ওকে কি করি। ও বাঁশী শুনেছে—যে একবার বাঁশী শুনে, সে কি আর স্থির থাকতে পারে ?"

মাসীমা'র শাশুড়ী বলিলেন, "নাতজামাই ত কাল আসবেন? তিনি এসে শেষে না বলেন, আমরা তাঁর মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়েছি!"

"এখানে সে বলা চলবে না, মা। এ ত আর কলকাতা নয় যে তাঁদের কোট।"

"কাশীতে বুঝি তোমার কোট ?"—তিনি কুসুমকামিনীকে বলিলেন, "দিদি, এ কাশীতে তোমার মাসীমা সকলের পিসীমা। এখানে ওর কথা না শুনে, এমন কেউ নেই।"

শুইতে যাইবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ী মা'কে বলিল, "মা, কাল একটু সকাল সকাল স্নান কর্ত্তে যেতে হ'বে—বাবা এসে পৌঁছবার আগে; নইলে আমি দিদিমা'র ঠাকুরের কোন গোছ করতে পা'ব না। আস্‌তে আস্‌তে ঠাকুরের শয়ন হয়ে যা'বে।

১১

আশ্বিনের গঙ্গা—জল কূলে কূলে উঠিয়াছে, আর বাড়িতেছে না, কিন্তু কমা বুঝা যাইতেছে না, কেবল স্রোতের চাঞ্চল্য ও জলের আবিলতা হ্রাস হইয়াছে। যেন সুন্দরীর দেহে যৌবনের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে—রূপ ও লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে, এইবার প্রৌঢ়ত্বের আগমন হইবে, কেবল চাহনির চাঞ্চল্য ও ব্যবহারের চাপল্য মন্দীভূত হইয়াছে। কন্যাদিগকে ও পুত্র-বধূকে লইয়া কুসুমকামিনী গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। মাসীমা'র বাড়ীর কাছে যে ঘাট আছে, তাহার সোপানশ্রেণী সঙ্কীর্ণ ও একটু ক্রমোচ্চতাহীন; তাই অনভ্যস্তদিগের পক্ষে এ সময় সে ঘাটে স্নানে বিপদ ঘটিতে পারে। বিশেষ যে ঘাটে অধিক লোক "সরে" না, সে ঘাটে বর্ষার গতীতে সোপান অধিক পিচ্ছিল হয়। এই সকল কারণে তাঁহারা একটু দূরে বৃহত্তর ঘাটে যাইয়া স্নান করিতেন। মাজও তাহাই করিয়াছিলেন। কাশীর ঘাটে ঘাটে প্রথম জনতা সূর্য্যোদয়ের সময়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কাশী জাগিয়া উঠে; স্বচ্ছান্ধকারে আবৃত সঙ্কীর্ণ পথে বস্ত্রাবৃতদেহ নারীরা যেন প্রেতপুরীর অধিবাসিনীদিগের মত গঙ্গার দিকে অগ্রসর হয়েন। স্নান করিয়া নবোদিত—জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর দর্শন করিয়া পুণ্যকামীরা দেবদর্শনে গমন করেন। কাশীর ঘাটে দ্বিতীয় জনতা মধ্যাহ্নে—যখন কাশীর বহু কর্ম্মহীনের একলা গঙ্গার ঘাটে হয়। তখন পালোয়ানের দল গাত্রে মাটী মাখিয়া, ভৃত্যদল প্রভুর সেবা সারিয়া, শ্রমিকের দল অর্দ্ধ দিন অর্থার্জ্জনে কাটাইয়া স্নানার্থ সমাগত হয় এবং গাত্রে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে নানা গল্পে—শ্লীল-অশ্লীল নানারূপ রসিকতায়—উচ্চহাস্যে ঘাট মুখর করিয়া তুলে। মধ্যবর্ত্তী যে সময় ভীড় কম থাকে, সেই সময় কুসুমকামিনী আসিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও অধিক জলে নামিতে দিতেন না—একে কেহ সাঁতার জানে না, তাহাতে গঙ্গার স্রোতে টানও আছে।

মেয়েরা একসঙ্গেই ঘাটের সোপানে নামিতেছিল। সহসা একটি সোপানে পা পিছলাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী নিম্নস্থ সোপানে নামিয়া পড়িল এবং পলী-পিচ্ছিল সোপানে দাঁড়াইতে না পারায় দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ডুবিয়া গেল। কুসুমকামিনী দেখিলেন—দেখিয়া ভয়ে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাইলেন—কেবল "ওগো—ওগো"—বলিয়া ব্যস্ত হইয়া কাতরভাবে কূলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। আর মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঘাটে অধিক লোক ছিল না; যাঁহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে কয় জন তখন আহ্নিকে রত—ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নাই। বার দুই প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যাকুলা জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্ত দেখা গেল, তাহার পর—

এই ঘটনা ঘাটের উপর এক জন দেখিয়াছিলেন। তিনি কাশীর জনপ্রিয় ডাক্তার বাবু—বাঙ্গালী। তিনি আর এক জন লোকের সঙ্গে সেই পথে একটি গৃহে রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন। ঘটনা দেখিয়াই তিনি ব্যস্ত হইয়া খদ্দরের চাদর ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন; জুতা ও জামা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কুসুমকামিনী বা অন্য কেহ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই এই যুবক চিকিৎসক দ্রুতপদে চত্বর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহার জলের উপর আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে সময় এক মুহূর্ত্ত যেন এক ঘণ্টা বলিয়া বোধ হয়—উদ্বেগ সময়ে যেন দীর্ঘতার ভার সঞ্চার করিয়া তাহার গতি মন্দ করে। এক বার যুবকের মুখ স্রোতের উপর দেখা গেল—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তিনি তখনই আবার ডুব দিলেন। দ্বিতীয় বার যখন জলের উপর তাঁহার মুখ দেখা দিল, তখন তিনি সাঁতার দিয়া কূলের দিকে আসিতেছেন। যাহারা সন্তরণ-পটু বা সন্তরণ লক্ষ্য করিয়াছে, তাহারা তাঁহার মন্দগতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিত, তিনি কোন গুরুভার দ্রব্য

টানিয়া আনিতেছিলেন—এক হস্তে সন্তরণ করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর স্বজনগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতেও অধিক বিলম্ব হইল না।

অল্পসময়ের মধ্যেই যুবক কূলের কাছে আসিয়া একটি সোপানে দাঁড়াইলেন এবং দাঁড়াইয়া জল হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ টানিয়া তুলিয়া—দক্ষযজ্ঞে পতি-নিন্দায় গতপ্রাণা সতীর দেহ যে ভাবে স্কন্ধে ফেলিয়া মহাদেব পূর্ব্ব-মুখে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেইভাবে সেই দেহ লইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া চত্বরের উপর উপনীত হইলেন।

কুসুমকামিনীর দৃষ্টিতে শঙ্কা ও আনন্দ যেন মেঘ ও রৌদ্রের মত দেখা দিল। তিনি কন্যাদিগের দিকে চাহিলেন, কন্যারা মাতার দিকে চাহিল। বিস্ময়ে, শঙ্কায়, আনন্দে সকলেই নির্ব্বাক্।

কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া নরেশচন্দ্র বলিল, "আপনারা এক জন এখানে বসুন।"

কুসুমকামিনী চত্বরের উপর বসিলেন। তৎক্ষণে সেই স্থানে কতকগুলি লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আদেশে অভ্যস্ত কণ্ঠে নরেশচন্দ্র বলিল, "হাওয়া বন্ধ হ'বে, স'রে যাও।" লোক সরিয়া গেল। সে তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ কুসুমকামিনী যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহারই কাছে ঊর্দ্ধ-মুখ করিয়া স্থাপিত করিয়া তাহার দুই বাহু তুলিতে ও নামাইতে লাগিল। চিকিৎসকের সংস্কার এতক্ষণ তাহাকে যে দিকে দৃষ্টি দিতে দেয় নাই, এবার সে সে দিকে দৃষ্টি দিল—চমকিয়া উঠিল। এ যে—! তাহার শিক্ষিত বাহুও কাম্পত হইল।

জ্যোতির্ম্ময়ী ভয়ে জলের মধ্যে অল্পক্ষণেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল—অধিক জল তাহার উদরে প্রবিষ্ট হয় নাই। দুই এক ঝলক মাত্র জল তুলিয়াই সে চক্ষু মেলিবার চেষ্টা করিল—পারিল না। যেন প্রবল বর্ষণ-বাত্যায় দীর্ঘ রাত্রি জলে ডুবিয়া থাকিয়া অপগতবাত্যা প্রভাতে—ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের মধ্যে প্রকাশমান রবিকরে পদ্ম জলের উপর উঠিয়া দল-বিকাশের চেষ্টা করিল।

নরেশচন্দ্র আরও কয় বার তাহার বাহু উত্তোলিত ও নমিত করিল। তাহার মনে হইতেছিল—এত দীর্ঘ সময় লাগিতেছে কেন? তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী চাহিল। এবার চারি চক্ষুর দৃষ্টি মিলিল। তাহার পর জ্যোতির্ম্ময়ী চক্ষু মুদিল। সে কি কেবল লজ্জায়? নরেশচন্দ্র যখন তাহার বাহু ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মনে হইল—এত শীঘ্র শেষ হইয়া গেল? অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত এই যে স্পর্শ, ইহাতে যেন তাহার সমস্ত শরীরে অমৃতবিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইতেছিল। সে মনে করিল, এ কি সত্য—না, সে স্বপ্ন দেখিতেছিল; সহসা সুপ্তিভঙ্গে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল?

সে প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্ব্বেই নরেশচন্দ্রের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। নরেশচন্দ্র বলিল, "রাস্তার উপর আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। দেরী না ক'রে আপনারা চ'লে যান। গাড়ীতে একখানা মোটা গা'র কাপড় আছে, সেখানা দিয়ে ঢেকে নিয়ে যা'বেন। সমস্ত দিন শুইয়ে রাখতে হ'বে—ঢাকা দিয়ে রাখতে হ'বে, গরম দরকার। বিকেলের দিকে হয় ত একটু জ্বর হ'বে।"

তাহার সঙ্গে যে লোকটি ছিল, সে তাহাকে বলিল, "ড্রাইভারকে ব'লে দিন, ওঁদের নামিয়ে দিয়ে—বাড়ী থেকে আমার একখানা কাপড় নিয়ে আসে।"

এক দিকে কুসুমকামিনী আর এক দিকে মাতঙ্গিনী উভয়ে জ্যোতির্ম্ময়ীকে মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর চরণ ও সমস্ত দেহ কম্পিত হইতেছিল; সে জলে ডুবিবার পর অপ্রতর্কিত শঙ্কার ফলে কি অপ্রত্যাশিত আনন্দে—তাহা বলিতে পারি না।

নরেশচন্দ্র আদেশদানে অভ্যস্ত সেনাপতির মত আদেশ দিল এবং অভ্যস্ত সংযমে আপনার মনের চাঞ্চল্য দমিত করিল বটে, কিন্তু যেন তাহারও অজ্ঞাতে তাহার দৃষ্টি দুরায়মানা জ্যোতির্ম্ময়ীকে লক্ষ্য করিল।

কয় মিনিটের মধ্যে মোটর মাসীমা'র গৃহদ্বারে উপনীত হইল। তখন রণেশচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ভৃত্য তাঁহার সুটকেশ নামাইয়া লইতেছে। নামিবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ী ইচ্ছা করিয়াই গায়ের কাপড়খানা গাড়ীতে ফেলিয়া গেল না। তাহার ভ্রাতৃবধূ বলিলেন, "গা'র কাপড়-খানা?"—সে যেন সে কথা শুনিতেই পাইল না।

অপরাহ্ণে জ্যোতির্ম্ময়ীর ভ্রাতা নরেশচন্দ্রের গৃহে গমন করিল। নরেশচন্দ্র তখন রোগী দেখিতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর ভ্রাতা বলিল, "জ্যোতিঃর গাটা যেন একটু গরম বোধ হচ্ছে।"

নরেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "ও কিছু নয়—কোন ওষুধ দেবার দরকার নেই।"

"কিন্তু বাবা আর মা বড় ব্যস্ত হয়েছেন। এক বার দেখতে হ'বে।"

"দেখবার কোন দরকার নেই।"

"সে তাঁ'রা বুঝছেন না।"

দৃঢ়ভাবে নরেশচন্দ্র বলিল, "আমার যা'বার দরকার নেই।" স্বামীর পরাজয় ও ডাক্তারের জয় হইল।

১২

মাসীমা পূজা শেষ করিয়াছেন, এমন সময় জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া কুসুমকামিনী ফিরিয়া আসিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীকে তখনই শয্যায় শয়ন করান হইল এবং মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ সর্ব্বাগ্রে ঘোষণা করিতে লাগিল—"আজ কি বিপদই গিয়েছে!"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, কুসু?"

কুসুমকামিনী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি, মাসীমা, মেয়ে ডুবে গিয়েছিল।"

"ডুবে গিয়েছিল?"

"হাঁ, মাসীমা। বিশ্বনাথের দয়া, বাঁচালে জামাই!"

ব্যাপারটা রহস্যের মত শুনাইতে লাগিল।

রণেশচন্দ্রও সে-ই প্রথম সংবাদ পাইলেন।

তখন জ্যোতির্ম্ময়ীকে যে ঘরে শয়ন করান হইয়াছিল, সকলে সেই ঘরে আসিলেন। মাসীমা জ্যোতির্ম্ময়ীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার কেশরাশি সিক্ত দেখিয়া শুষ্ক তোয়ালে দিয়া মুছিয়া দিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর বড় দিদি ঘটনাটি বিবৃত করিয়া বলিলেন, "কি অঘটনঘটন!"

মাসীমা বলিলেন, "তোমরা যা' বললে, তা'তে আমার মনে হচ্ছে, এ নরেশ ডাক্তার ছাড়া আর কেউ নয়।"

কুসুমকামিনী স্বামীর উপস্থিতি হেতু মাসীমা'র ও তাঁহার শাশুড়ীর সম্মুখে মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়াছিলেন—মৃদুস্বরে বলিলেন, "জামাইয়ের ত সে-ই নাম।"

মাসীমা'র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সে যে আমার নাতি—আমার শ্বশুরবাড়ীর দূর-সম্পর্কেও বটে, আর কাশীতে আমি সকলের পিসীমা হিসেবে তা'র যে পিসীমা বলেও বটে। এমন ছেলে কি আর হ'বে! ঐ ত ক'রছর এসেছে—এরই মধ্যে কাশীতে ও যেন সর্ব্বেসর্ব্বা। টাকা যদি করতে চাইত, তবে টাকা রাখবার যায়গা পেত না। তা' নয়। যদি তেরটা রোগী দেখে, তবে বার টাকা আনে—গরীব-দুঃখীকে বিনা পয়সায় দেখে, তা'ও সকলের আগে, আবার দরকার বুঝলে ওষুধ-পথ্য আপনি দেয়। কাশীতে হিন্দু-মুসলমান ছেলের দল ত নরেশকে রাজা ক'রেই তুলেছে!"

তিনি দেখিলেন, মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার কথা শুনিতেছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "দিদি-মণি, অনেক সাধনা তোমার যে, অমন লোকের গলায় মালা দিয়েছিলে। মহাত্মা গন্ধীর আদর্শে যেন মেতে উঠেছে। এক বছরের কিছু বেশী হ'ল, কি ব্যাপারই ঘটেছিল! ছেলেদের উপর নরেশের প্রভুত্ব দেখে পুলিসের চোখ টাটাচ্ছিল—তা'রা ওকে জব্দ করবার ছল খুঁজছিল। এই সময় এক দিন স্বেচ্ছা-সেবকরা এক মহল্লা থেকে একটা ছেলেকে ধ'রে নিয়ে এল। ছেলেটা থাবার কিনবে ব'লে এক বুড়ীর একখানা থালা চুরী করেছিল। সে তা'কে তাড়া দিয়ে 'উঠ-বস' করিয়ে নিজে দু'টি টাকা দিয়ে ছেড়ে দিলে। বুড়ী তা'র থালা নিয়ে পরম আনন্দে চ'লে গেল। পুলিস সন্ধান পেয়ে চোরকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ওকে গ্রেপ্তার করলে। গ্রেপ্তারের সময় ও শুধু ছেলের দলকে ব'লে গেল—'সাবধান! অহিংসায় অবিচলিত থাকবে।' কাশী সহরে যেন ঝড়ের গুমট দেখা গেল! দেখতে দেখতে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল—কেবল সভা, কেবল পরামর্শ। তা'র পর সন্ধ্যার সময় এক জন ক'রে হিন্দু আর এক জন ক'রে মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক বেরিয়ে সব রাস্তায় হেঁকে গেল—'ডাক্তার বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। কাল সারা দিন হরতাল; বিকেলে প্রতিবাদ সভা। বন্দে মাতরম্।' তা'রা সব নরেশের শিষ্য—ছেলেদের দুধের, রোগীর পথ্যের, আর যা'রা না জেনে স্ত্রীলোক নিয়ে ষ্টেশনে এসে পড়বে তা'দের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে ফেললে। আমি নরেশের মা'কে আন্‌ব ব'লে গিয়ে দেখি, বাড়ীতে, বোধ হয়, পঞ্চাশ জন ভলানটিয়ার; তা'রা বললে, তা'রা 'ঠাকুরমার' কাছে থাকবে। আমি তা'কে ব'লে এলাম, দেখ, মা সত্যিই তোমাকে বলেন—

'একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।'

তা'র পরদিন হরতাল—সূর্য্যোদয়ে ব্রাহ্মণরা গঙ্গাস্নান ক'রে

তা'র কল্যাণ কামনা করলেন—তা'র জন্ম বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা হ'ল। আর তেমন হরতাল কাশীতে কখন হয় নি—সব বন্ধ; পুলিসের লোককেও ভলানটিয়ারদের কাছে ছাড় নিয়ে তবে ছেলেদের দুধ পেতে হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট তা'র প্রভাব বুঝলেন। বিকেলে সভা। সভায় লোক যেন ভেঙ্গে পড়ল। দেখা গেল, একটা সভায় কুলাবে না,তাই স্থানে স্থানে সভার আয়োজন হ'তে লাগল। এমন সময় দূরে একখানা মোটর গাড়ী দেখা গেল—তা'তে পুলিস। লোক মনে করলে, সভায় যা'রা এসেছে, পুলিস তা'দের গ্রেপ্তার করবে—সভা করতে দেবে না। গাড়ী নিকটে এলে দেখা গেল, তা'তে ব'সে—নরেশ। উপরওয়ালাদের আদেশে পুলিস তা'কে ছেড়ে দিল, রাখা সঙ্গত মনে করলে না। তখন সে কি উল্লাস! কাশীর রাস্তা-ঘাট 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে পূর্ণ হ'ল—দেওয়ালীর আলোক-সজ্জা হারিয়ে সহরে আলোক-সজ্জা হ'ল—জয়ন্ত জয়ী হয়ে ফিরে এল!"

মাসীমা'র কথা শেষ হইল। মাসীমা দেখিলেন—জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন না, রণেশচন্দ্র ও কুসুমকামিনী উভয়ের দৃষ্টিতেও প্রশংসা ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। আর জ্যোতির্ম্ময়ীর ভ্রাতা যে, নরেশচন্দ্রকে "ছোট গন্ধী" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল, সে-ও প্রশংসার প্রবাহবেগ প্রহত করিতে পারিল না।

মাসীমা জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন, "উমাকে যেমন অনেক তপস্যা ক'রে মহাদেব লাভ করতে হয়েছিল, তোমারও তেমনই এই ক' বছর তপস্যা গেল।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর নয়ন ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিল—সে আনন্দে, কি আশায়, কি শঙ্কায়—আমি কেমন করিয়া বলিব?

মাসীমা তাহা দেখিয়া একটু হাসিলেন। দীর্ঘকাল সাধনার ফলে তিনি মনকে এমন অবস্থায় গঠিত করিয়াছিলেন যে ভাবনা—হংসের পৃষ্ঠ হইতে জলের মত তাহার উপর পতিত হইলে পিছলাইয়া যাইত। তিনি বলিলেন, "কি দিদিমণি, ও কি?—

'রহু ধৈর্য্য
হম গচ্ছামি মথুরায়।'

কিন্তু জান ত—

'তুই কাঁদলে যাওয়া হ'বে না, রাই'!" তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইল।

মাসীমা কুসুমকামিনীকে বলিলেন, "কীর্ত্তন শুনতে এত ভালবাসে! সে মা'ও যেমন, ছেলেও তেমনই। সে দিন হুট ক'রে কীর্ত্তন হ'ল,খবর দিতে পারি নি। কিন্তু তা'র কাছে খবর পৌঁছে গেছে। আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে—বললে, 'দিদিমা আর আমাদের ভালবাসেন না।' গঙ্গার ঘাটে রোজই আমার সঙ্গে দেখা হয়। ঐ ভোরে মা'কে নিয়ে নিত্য গঙ্গাস্নানে আসে। কি সাঁতারই দেয়! এক এক দিন দেখে আমার ভয় হয়। বলে, সারা দিনে ফুরসৎ পায় না—তাই সকালে সাঁতার দিয়ে ব্যায়াম করে।"

মাসীমা'র শাশুড়ী বলিলেন, "চমৎকার ছেলে, অমন ছেলে আজকাল দেখা যায় না।"

তিনি মাসীমা'কে বলিলেন, "বৌমা, তুমি একবার তা'কে ডেকে পাঠাও।"

মাসীমা বলিলেন, "না, মা। অত সহজে তা'কে নিষ্কৃতি দেওয়া হ'বে না। খুব জব্দ ক'রে দেব, তার পর—"

শাশুড়ী হাসিলেন; কুসুমকামিনীকে বলিলেন, "দেখ, দিদি, তোমার মাসীর দুষ্টবুদ্ধি দেখ। এখনও যেন ছেলেমানুষটি।" তাঁহার কথায় কন্যার অধিক স্নেহে পালিতা পুত্রবধূর প্রতি তাহার অপরিসীম স্নেহ প্রকাশ পাইল।

মাসীমা বলিলেন, "মা, যেখানে বৃন্দাদূতীর কায করতে হ'বে, সেখানে তা'র মত ব্যবহারই করতে হ'বে, যে বিয়ের যে মন্তর।"

সকলেই হাসিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী ভাবিল, কেমন করিয়া মাসীমা মনের এই সরলতা, প্রফুল্লতা—রক্ষা করিয়াছেন! তিনি যেন সংসারে থাকিয়াও সংসারের নহেন; সংসারের আবিলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; তিনি অপনার পুণ্যবলে সৃষ্ট স্বতন্ত্র লোকে বাস করেন। যে ধর্ম্মকে তিনি শান্তির ও সান্ত্বনার আধার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—যে ধর্ম্মকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম কি অসাধারণ - কি বিস্ময়কর! সে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল—ভাবিল, তাঁহার উপদেশে কায করিতে পারিলে সে ধন্য হইবে- তাঁহার আশীর্ব্বাদই আজ তাহাকে ব্যর্থজীবনে সার্থকতার সন্ধান দিয়াছে—সার্থকতার দ্বারে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। দ্বার যদি মুক্ত হয়, তবে সে-ও তাঁহারই চেষ্টায়—তাঁহারই স্পর্শে। সে স্থির করিল, তাঁহার কথা দেবতার আদেশজ্ঞানে পালন করিবে।

মাসীমা বলিলেন, "এখন নাতনীর শাশুড়ী দুম ক'রে এসে না পড়ে।"

মাসীমা'র শাশুড়ী বলিলেন, "কেন? ভয় কি, মা?"

"সে যদি সন্ধান পায়, তা'র হারানিধি এখানে আছে, তবে তখনই এসে নিয়ে যা'বে।"

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি রাখতে পারবে না?"

"না, মা—আমরা মা মেয়েতে ঝগড়া করেও জিৎতে পারব না। তা'র কারণ, যা'র জন্য ঝগড়া করব, সে-ই তখন আমাদের বিপক্ষ হ'বে।"

"তাই বুঝি!"

"হাঁ, নাতনীকে লুকিয়ে রাখতে হ'বে।"

"ক' দিন রাখবে?"

"যে ক' দিন নরেশকে জব্দ করতে না পারি!"

সে দিন সমস্ত দিন জ্যোতির্ম্ময়ী যেন স্বপ্নলোকে অবস্থিতি করিল। কথা শুনিতে শুনিতে—সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। কুসুমকামিনী তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না; তাই, বোধ হয়, জ্বর হইয়াছে মনে করিয়া কয়বার তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, বার দুই থারমমিটারও দিলেন। তাহার পর তিনিই পুত্রকে নরেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। পুত্র আসিয়া যখন বলিল, নরেশচন্দ্র বলিয়াছে, তাহার আসিবার প্রয়োজন নাই, তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর বুকের মধ্যে যেন কেমন খচ করিয়া উঠিল। নরেশচন্দ্র আসিবে, সে আশা যে সে করিয়াছিল, তাহা নহে, তবুও—তবুও—যদি যাহা আশা করা যায় না, তাহাই হইত! তখনও সে নরেশচন্দ্রের গাত্র-বস্ত্রখানিতে দেহ আবৃত করিয়াছিল—সে-ও যেন তাহার কাছে অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছিল। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিন্তার মধ্যে তাহার কল্পনাসৃষ্ট মনোভাব আকাশে মেঘের মত নানা রূপ ধারণ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল—শারীরিক অবসাদে নহে—মানসিক চাঞ্চল্যজনিত অবসন্নভাবে। কুসুমকামিনী ভয় পাইলেন, বুঝি জ্বর ফুটিল; কিন্তু কপালে হাত দিয়া এবং থারমমিটার দিয়া জ্বরের কোন চিহ্নই পাইলেন না।

৯৩

পরদিন রোগী দেখিয়া নরেশচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আহারে বসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, একটি মেয়ে গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিল?" ড্রাইভার যখন নরেশচন্দ্রের জন্য কাপড় লইতে আসিয়াছিল, তখন সে মা'র জিজ্ঞাসায় এই সংবাদ দিয়া গিয়াছিল।

নরেশচন্দ্র অতি সংক্ষেপে বলিল, "হাঁ।"

কথাটা আর অগ্রসর হয়, তাহার ইচ্ছা ছিল না; কেন না, সে-ও এ বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইল না, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঙ্গালী?"

নরেশচন্দ্র আরার বলিল, "হাঁ।"

তাহার পর মা যাহা বলিলেন, তাহাতে নরেশচন্দ্র যেন চমকাইয়া উঠিল, "তা'রা পিসীমার বাড়ীতে আছে?"

"কে বল্‌লে?"

"বংশীলাল।"—বংশীলাল ড্রাইভার।

"আমি ত তা' জানি না।"

"তবে, বোধ হয়, সে ভুল করেছে।"

নরেশচন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল—দিদিমা'র বাড়ী! ঘটনার স্রোত কোন্ দিক্ হইতে আসিয়া কোন্ দিকে বহিতেছে? কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে?

আহারে তাহার বড় অমনোযোগ লক্ষিত হইল। মা বলিলেন, "আজ কি তোর ভাল ক্ষিদে নেই?"

নরেশচন্দ্র বলিল, "না। তা' কিছু নয়।"

মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোর মুখ-চোখ যেন কেমন দেখাচ্ছে! বোধ হয়, জলে ডুবে—সাঁতার দিয়ে—পরিশ্রম হয়েছে। একটু শুয়ে বিশ্রাম কর। আমি ব'লে দিচ্ছি, ৪টার আগে কেউ তো'কে না ডাকে।"

সমস্ত দিনের মধ্যে বিশ্রাম করা নরেশচন্দ্রের অভ্যাস ছিল না। তাই দুরন্ত শিশুদিগকে যেমন জোর করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয়, তাহার কোনরূপ অসুখ হইলে মা'কে তেমনই তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিতে হইত। তবে অসুখ তাহার বড় ছিল না। মধ্যাহ্নে সে সাহিত্যালোচনা করিত—আজকাল আঁবার তাহার নূতন সখ হইয়াছে, এই সময় সে হিন্দুদর্শনের আলোচনা করে। সে জন্য সে সংস্কৃত ব্যাকরণ-পাঠ শেষ করিয়াছে—সপ্তাহে তিন দিন পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া তাহাকে বেদান্ত পড়াইয়া যায়েন। আজ কিন্তু এই দুরন্ত ছেলেটি মা'র কথায় দ্বিরুক্তি করিল না। চাকর তাহার হাতে জল দিতে আসিলে মা বলিলেন, "মিছিরকে ব'লে দিস, চারটার আগে যেন তোর বাবুকে না ডাকে। ওর শরীরটা ভাল নেই।"

নরেশচন্দ্র তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরের প্রাচীরে যে চিত্র বিলম্বিত ছিল, ঘরে প্রবেশ করিলে তাহা সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সে চিত্র—জ্যোতির্ম্ময়ীর। কলিকাতায় অবস্থানকালে নরেশচন্দ্র তাহার পরিচিত কোন শিল্পীর বাড়ীতে রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিল এবং টাকা লয় নাই। কৃতজ্ঞ শিল্পী কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ীর এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। চিত্রখানি এমন মূলানুরূপ হইয়াছিল যে, যে উভয়কে দেখিয়াছিল, সে-ই প্রশংসা করিয়াছিল। কক্ষে প্রবেশ করিলে—সম্মুখে সেই চিত্র। চিত্রখানি নরেশচন্দ্র গ্রাম হইতে আসিবার সময় সঙ্গে আনিয়াছিল। এই চিত্রখানি সযত্নে রক্ষা করা যে একটু দৌর্ব্বল্যের নিদর্শন, তাহার সহিত যে তাহার ব্যবহারের সামঞ্জস্যসাধন করা কষ্টসাধ্য, তাহা নরেশচন্দ্র বুঝিত; কিন্তু বুঝিয়া আপনাকে বুঝাইত, রং যেমন রঞ্জকের হাতে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায়, ভালবাসাও তেমনই মানুষের হৃদয়ে তাহার চিহ্ন রাখিয়া যায়। তাহা মুছিয়া ফেলা যায় না। জ্যোতির্ম্ময়ীর উপর সে যত রাগই কেন করিয়া থাকুক না, তাহার ভালবাসা লুপ্ত করিবার ত কোন কারণই ঘটে নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী যদি অপরাধ করিয়া থাকে, সে ত তাহার জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে; তাহার হৃদয় হইতে সে সরিবে কেন? সে কোন অপরাধ করিয়াছে কি না—করিয়া থাকিলে তাহার গুরুত্ব কতটুকু, সে বিষয়েও ক্রমে নরেশচন্দ্রের সন্দেহ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীকে যখন তাহার ভ্রাতা পিত্রালয়ে লইয়া যায়, তখনই মা বলিয়াছিলেন—"ছেলেমানুষ, সে যদি একটা ভুলই ক'রে থাকে—তবে তুই তা'র স্বামী আর আমি তোর আর তা'র মা—আমরা তা'কে ক্ষমা করব না!" মা আজও তাহার সম্বন্ধে সেই ভাবই মনে পোষণ করিয়া আছেন—কোনরূপ সুযোগ পাইলেই তাহার কথা উত্থাপিত করেন; কিন্তু পুত্রের অমতে কোন দিন তিনি কায করেন নাই—এ ক্ষেত্রেও জিদ করিয়া করিতে সাহস করেন নাই।

জ্যোতির্ম্ময়ীর উপর সে যে রাগ করিয়াছিল, তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। তখন গ্রামের লোকের ব্যবহারে সে তাহাদের উপর যেমন বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য অসাধ্যসাধন করিতে অর্থ, যশ, সাফল্য সব ত্যাগ করিয়া আসায় আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় আপনার উপরও তেমনই বিরক্ত হইয়াছিল। সেই সময় বড়মানুষ শ্বশুরের দাসীর উদ্ধত ব্যবহার তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতেছিল, আর শ্যালকের ব্যবহারে তাহার ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার আশা ছিল, জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার দুঃখ বুঝিবে। কিন্তু সে বুঝে নাই—জ্যোতির্ম্ময়ী কিশোরী, সংসারজ্ঞান তাহার ছিল না, সে সে-ই প্রথম পিত্রালয়ের পরিচিত পরিবেষ্টনের বাহিরে আসিয়াছিল। তাহার পর গ্রামবাসীদিগের আলোচনা ও সমালোচনা তাহাকে গ্রামছাড়া করিয়াছিল। বড় দুঃখে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিল। কাযেই জ্যোতির্ম্ময়ীর উপর তাহার রাগ দূর হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। যখন এক দিকে জ্ঞান আর এক দিকে ভালবাসা সে রাগ মুছিয়া দিয়াছিল, তখন সে আর জ্যোতির্ম্ময়ীর অপরাধ খুঁজিয়া পায় নাই।

কিন্তু তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—লজ্জা; তাহার আপনার অসংযমে ও অসংযমজনিত ব্যবহারে লজ্জা, আর আজ সে সহসা—সব ভুলিয়া গিয়াছে জানিলে জ্যোতির্ম্ময়ী কি ভাবিবে ভাবিয়া লজ্জা। দিনের পর দিন গিয়াছে আর লজ্জা ঘনীভূত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। শেষে তাহা অলঙ্ঘ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে।

এই অবস্থায় মনের মধ্যে যে শূন্যতা অনুভূত হয়, তাহা হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্টায় সে রাজনীতির আবর্ত্তিত প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পরাধীন জাতির যে রাজনীতি অসার অনুকরণ মাত্র—যাহা ছলনা ব্যতীত আর কিছুই নহে—তাহা তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। তাই সে গঠনকার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল—অসহযোগ আন্দোলনের সেই অংশই তাহার ভাল লাগিত। সে কাযে সে কিরূপ অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা অল্পকালের মধ্যে কাঁশীতে জনগণের নিকট তাহার আদরে ও প্রভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কাযের উৎসে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহাই সে বিষয়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের একমাত্র কারণ।

আজ বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেশচন্দ্র প্রথমেই প্রাচীরে বিলম্বিত জ্যোতির্ম্ময়ীর চিত্রখানির দিকে চাহিল এবং কয় মিনিট চাহিয়া রহিল। চিত্রে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত, তাহার অধরে মৃদুহাস্য লাগিয়া আছে—চক্ষুতে আনন্দদীপ্তি। তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখে তাহার রূপের ঔজ্জ্বল্য ও তীব্রতা। আজ কয় বৎসর পরে নরেশচন্দ্র তাহাকে দেখিয়াছে। মুখে সে ঔজ্জ্বল্য নাই। আর সে যখন চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, তখন সে চক্ষুতে যে দৃষ্টি দেখা গিয়াছিল, তাহাতে চাঞ্চল্য বা

ঔজ্জ্বল্য ছিল না; তাহাতে বিষণ্ণ ভাব—তাহাকে দেখিয়া সে দৃষ্টি যেন অনুনয়-নম্রতায় বিগলিত হইয়াছিল।

নরেশচন্দ্র ভাবিল, ইহা সত্য, না—তাহার কল্পনা? হয় ত কল্পনা। কিন্তু সেই কল্পনায় সে আনন্দলাভ করিতেছিল।

অদৃষ্টের এ কি খেলা—এত দিন সে যাহাদিগের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দুই জনকে দুই দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিল—আজ কে আবার সেই দুই জনকে নিকটে আনিয়াছে! সে কি বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধসূত্র আবার সংযুক্ত করিয়াছে? নরেশচন্দ্র ভাবিল, সে সম্বন্ধসূত্র কি ছিন্ন হইয়াছিল? ধর্ম্মানুষ্ঠান যে বন্ধন মানুষকে বদ্ধ করে এবং ভালবাসা যে বন্ধন দৃঢ় করে, সে বন্ধন কি সহসা বিচ্ছিন্ন হয়?

এইরূপ নানা চিন্তা নরেশচন্দ্রকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সে ভাবিল—জ্যোতির্ম্ময়ী কি ভাবিয়াছে? জ্যোতির্ম্ময়ী যখন জানিয়াছে, সে-ই তাহাকে জল হইতে তুলিয়া তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ বক্ষের উপর ফেলিয়া কূলে আনিয়াছে; সে-ই তাহার দুই বাহু ধরিয়া উন্নত ও অবনত করিয়াছে; সে-ই তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছে—তখন সে কি মনে করিয়াছে? এ কি অঘটন সংঘটিত হইল?

বিশ্রাম লাভ করা হইল না; বেলা চারিটার সময় যখন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—রোগীরা আসিয়াছে, তখন সে যেন মুক্তি পাইল। সে যাইয়া রোগী দেখিতে লাগিল। সেই সময় তাহার শ্যালক তাহাকে ডাকিতে আসিল। সে যাইতে সাহস করিল না; কিন্তু শ্যালক চলিয়া যাইলেই তাহার মনে হইল, সে ভাল করিল, না মন্দ করিল? সে কি আপনা হইতে আগত সুযোগ হেলায় হারাইল? সে কি মঙ্গল-ঘট চূর্ণ করিয়া ফেলিল?

সেই চিন্তা তাহাকে বিশ্রাম দিল না। সেই চিন্তায় রাত্রিতে তাহার নিদ্রা হইল না।

মা'র রাত্রিতে দুই একবার যেন মনে হইয়াছিল, কে গার্হস্থ্যকক্ষে পাদচারণ করিতেছে। অন্য দিনের মত প্রভাতে উঠিয়া তিনি দেখিলেন, নরেশচন্দ্র তখনও স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। তাঁহার সাড়া পাইয়া সে ব্যস্ত হইয়া প্রস্তুত হইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্তিরে কি তোর ভাল ঘুম হয় নি?" নরেশচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "চল, মা, যাই।"

ঘাটে যাইয়া মা দেখিলেন, মাসীমা পূর্ব্বেই আসিয়াছেন স্নান প্রায় শেষ হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া নরেশচন্দ্র কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, যাহাকে সে জল হইতে তুলিয়াছিল, সে "পিসীমা'র" বাড়ীতে আছে। যদি তাহাই সত্য হয়? মা হয় ত দিদিমা'কে জিজ্ঞাসা করিবেন। দিদিমা কিন্তু কিছু বলিলেন না। তাঁহার মুখে একটু হাসি দেখা গেল বটে, কিন্তু তিনি সদানন্দ, তাঁহার হাসিতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

নরেশচন্দ্র অন্য দিনেরই মত সাঁতার দিতে গেল; কিন্তু অন্য দিনের মত দীর্ঘকাল সাঁতার দিল না। সে সাঁতার দিতে দিতে একটু দূরে যাইলেই মাসীমা তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনেছ, কাল নরেশ একটি মেয়েকে জল হ'তে তুলেছে?"

মা বলিলেন, "হাঁ পিসীমা। তা'রা না কি আপনার বাড়ীতে থাকে?"

"কে বললে?"

"ড্রাইভার।"

"তাই বটে। সে কে জান?"

"না।"

"তোমার সঙ্গে সে সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। নরেশকে কিছু বলো না।"

"আমি আজ আপনার বাড়ী যা'ব।"

"না। আমিই তোমার ওখানে যা'ব।"

"আচ্ছা।"

নরেশচন্দ্র সাঁতার দিতে দিতে লক্ষ্য করিল, উভয়ে কথা হইতেছে। সে সাঁতার শেষ করিয়া আসিবার পূর্ব্বেই মাসীমা উঠিয়া যাইলেন। নরেশচন্দ্র দেখিল, মা'র মুখে চিন্তার ভাব।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাসীমা প্রায় এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে গমন করিলেন। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন কুসুমকামিনী এবং তাঁহার কন্যারা ও পুত্রবধূরা গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসিয়া আছেন। মাসীমা আসিয়াই কুসুমকামিনীকে বলিলেন, "তোমার বেহান-বাড়ী থেকে আস্‌ছি।"

কুসুমকামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু কথা হ'ল?"

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন, "তা বল্‌ব কেন?"—জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম, নরেশ কেমন ক'রে ভুলে আছে। দেখলাম, ভুলেনি; তাই স্বর্ণসীতা গড়িয়ে রেখেছে।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মন কৌতূহলে পূর্ণ হইলেও সে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—দৃষ্টি নত করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীর বড় দিদি জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি, দিদিমা ?"

মাসীমা বলিলেন, "আর দু'দিন দেরী সয় না ? তা'র পরেই দেখবি। তখন বুঝবি, যা বলেছি, তা সত্যি কি না—জ্যোতি যে লোকের গলায় মালা দিয়েছে, অনেক সাধনা কর্‌লে তবে তা'কে পাওয়া যায়। এখন বিশ্বনাথের দয়ায় নাতিনী স্বামীর উপযুক্ত হ'ক—এই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি।"

কুসুমকামিনী বলিলেন, "মাসীমা, আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হ'বে। বোধ হয়, আপনার দ্বারাই বিশ্বনাথ আমার বুকের ব্যথা দূর ক'রে দেবেন।"

"মা, মানুষ কি কর্‌তে পারে ? করবার মালিক তিনি—তিনি যদি ইচ্ছা করেন, অসম্ভবও সম্ভব হয়। নরেশের মত ছেলে—যে প্রতিদিন কত লোকের আশীর্ব্বাদ লাভ করে, তা'র জীবন দুঃখময় হ'তে পারে না। সেটা তাঁ'র উদ্দেশ্য হ'বে কেন ?'

"মাসীমা, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

মাসীমা হাসিলেন—"ফুল-চন্দন ! এখন যে আগুন দেবারই সময় হয়েছে, মা !"

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। ঠাকুরের সন্ধ্যারতির জন্য মাসীমা চলিয়া যাইলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী ভাবিতে লাগিল, তিনি কি বলিয়া যাইলেন ? তাঁহার মুখে কেবলই নরেশচন্দ্রের প্রশংসা—সেই প্রশংসা তাহার অজ্ঞাতে তাহার কল্পনায় নরেশচন্দ্রের প্রতি তাহার ভালবাসায় ভক্তির ভাগ বর্দ্ধিত করিতেছিল।

১৪

পূজার অষ্টমী ও নবমী কাটিয়া গেল। দশমীর দিন কুসুমকামিনী প্রভৃতিকে বিসর্জ্জন দেখাইবার জন্য মাসীমা একখানি বড় বজরার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন ; সকলকে লইয়া তাহাতে গমন করিলেন। সে দিন বরুণাসঙ্গম হইতে অসিসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার বক্ষে কেবল নৌকা। নৌকায় লোক—আর কূল লোকে পূর্ণ। সর্ব্বত্র বর্ণের বৈচিত্র্য—নারীদিগের নানাবর্ণের সাটী ও ওড়না, পুরুষদিগের নানাবর্ণের পাগড়ী। নৌকায় প্রতিমা—আর নৌকা হইতে ও কূল হইতে সানাইয়ের করুণ সুর আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে—

"এই যে ছিল কোথায় গেল
কমলদলবাসিনী !"

আজ চারিদিনের মিলনানন্দের পর বিচ্ছেদের ব্যাকুল-বেদনা যেন সেই সুরে ধ্বনিত হইতেছিল। পরপারে রামনগরের হর্ম্ম্যমালার উপর অস্ত-রবির কিরণ যেন বর্ণের প্রলেপ দিয়াছে!

গোধূলির আলোকান্ধকারমিলন হইলেই প্রতিমানিরঞ্জন আরম্ভ হইল। মাসীমা বজরা হইতে গঙ্গার জল স্পর্শ করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে নৌকা ঘাটে ভিড়িল।

বাড়ীতে ফিরিয়া মাসীমা ঠাকুরের সন্ধ্যারতি শেষ করিলেন, তাহার পর কুসুমকামিনীকে বলিলেন, "মা, আমি চল্‌লাম। এর পর আর সে বাড়ীতে ঢুক্‌তে পার্‌ব না ; বোধ হয়, হাজার লোক তা'র সঙ্গে বিজয়ার দেখা কর্‌তে আসবে। তাই সে আজ মা'কে আর আমাকে প্রণাম কর্‌তে আস্‌তে পারে না—একাদশীর দিন মা'য় ছেলেয় আসে।"

মাসীমা জ্যোতির্ম্ময়ীকে ডাকিলেন, "চল, দিদিমণি, শাশুড়ীকে প্রণাম কর্‌তে যা'বে। আজ ক' দিন থেকে সে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, তোমায় দেখবার জন্য।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কোন কথা বলিল না। যে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল, দিদিমা যাহা বলিবেন, সে তাহাই করিবে। তবুও আজ তাঁহার আহ্বানে তাহার মনের কোণে একটু লজ্জা দেখা দিল, আর বুঝি তাহারও পশ্চাতে একটু অভিমান উঁকি দিতেছিল।

মাসীমা বলিলেন, "চল, দিদিমণি ! আজ বিজয়া—মিলনের দিন, মনের মধ্যে কোথাও অন্ধকার রাখতে নেই।"

কুসুমকামিনী বলিলেন, "জ্যোতি, আর দেরী করিস্ নে।"

মাসীমা দ্বারবান্ মিছিরকে লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে যাইতে বলিলেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া গঙ্গার কূলের পথে চলিলেন। একটু অগ্রসর হইয়া তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন—"দিদিমণি, গোবিন্দ দাসের একটি পদ আছে—

'যায়—যায়—যায় বিজয়-কুঞ্জে—
কুঞ্জরবরগামিনী।"

তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন—আকাশ জ্যোৎস্নায় আলোকিত। তিনি বলিলেন—

'গগনমণ্ডল অতি নিরমল
শরদ সুখদ যামিনী।'

মনও ঐ আকাশের মত 'অতি নিরমল' কর্‌তে হয়। তবে মিলন হয়।"

আর একটু অগ্রসর হইয়া তিনি দক্ষিণের পথ ধরিলেন এবং অল্প দূরে যাইয়া একটি মধ্যমায়তন পরিচ্ছন্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ তাঁহার একান্ত পরিচিত। তিনি পরিচিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বারান্দায় উঠিয়া ডাকিলেন, "কই গো, মেয়ে কই ?"

"এই যে, পিসীমা"—বলিয়া এক জন প্রৌঢ়া ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন এবং মাসীমা'কে প্রণাম করিয়া উঠিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "এস, মা আমার, লক্ষ্মী আমার—এস। এত দিন কি মা'কে ভুলে থাকতে হয় ? ঘর অন্ধকার ছিল—নরেশের মুখের দিকে চেয়ে আমার বুক ফেটে যেত।" তিনি মাসীমা'কে বলিলেন, "পিসীমা, আমি আর যেতে দেব না।"

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন, "নিয়ে যা'ব ব'লে ত নিয়ে আসিনি, মা !"

মা কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁহার অশ্রু আশীর্ব্বাদের মত বধূর মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। বধূর উচ্ছ্বসিত অশ্রুতে তাঁহার বক্ষ সিক্ত হইয়া গেল। মা-ই শান্ত হইয়া বধূর অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করছিলে ?"

মা বলিলেন, "মিষ্টি সাজিয়ে রাখছিলুম, এখনই সব বাসতে আরম্ভ হ'বে।"

মাসীমা মা'র সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া পার্শ্বের ঘরের দ্বারে আসিলেন—ঘরের মধ্যে স্তূপাকার মিষ্টান্ন সজ্জিত—আর সেই সব ছোট ছোট মৃৎপাত্রে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন।

মাসীমা বলিলেন, "নাতি কোথায় ?"

"বাড়ীতেই আছে"—বলিয়া মা ডাকিলেন, "নরেশ ?"

বসিবার ঘর হইতে নরেশচন্দ্র উত্তর দিল, "কি, মা ?"

"পিসীমা এসেছেন।"

"দিদিমা ?"

"হাঁ।"

"মিষ্টি ফাঁকি দেবার জন্য বুঝি নিজে এসে হাজির"—বলিয়া নরেশচন্দ্র আসিয়া মাসীমা'কে প্রণাম করিল।

তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "দাদা, চিরসুখী হও—লোকের উপকার কর।" তাহার পর বলিলেন, "মিষ্টি ত কাল বাড়ী গিয়ে খাবে। আজ তা'র চাইতে ভাল জিনিষ এনে বাড়ী বহে দিয়ে গেলাম।"

"কি, দিদিমা ?"

"রত্ন।"

"একেবারে রত্ন ?"

"হাঁ। যে রত্নের জন্য ষষ্ঠীর দিন জলে ডুবেছিলে।"

নরেশচন্দ্র মস্তক নত করিল।

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন, "কি, মুখে যে কুলুপ পড়ল ? আমাকে প্রণাম করলে, আমার নাতনীকে প্রণাম কর।"—তিনি পশ্চাতে শাশুড়ীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা অবগুণ্ঠনাবৃতাননা জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখাইলেন। তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর পা কাঁপিতেছিল—বুকের মধ্যে আন্দোলন হইতেছিল।

নরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে ফিরিয়া চলিল।

মাসীমা বলিলেন, "তুমি ভাবছ, তোমারই জয় হ'ল। না হয়, তা'ই হ'ল। কিন্তু জান না, আমরা পরাজিত হয়েই জয়ী হই। তা'তেই আমাদের জয়।"

মা জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন, "যাও, মা, নরেশকে প্রণাম ক'রে এস।"

মাসীমা বলিলেন, "স্বামীকে প্রণাম ক'রে এসে শাশুড়ীর সঙ্গে মিষ্টি গুছাবে।"—তিনি তাহাকে ধরিয়া নরেশচন্দ্রের বসিবার ঘরে লইয়া চলিলেন। সে তখন কাঁপিতেছিল—লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহার চরণ যেন চলিতেছিল না।

জ্যোতির্ম্ময়ীকে দ্বারের কাছে আনিয়া মাসীমা বলিলেন, "সাম্‌নে দেখ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী চাহিয়া দেখিল, কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত তাহারই প্রতিকৃতি। সেই প্রতিকৃতির মুখে মৃদুহাসি—সে যেন নিজেই নিজের লজ্জায় হাসিতেছে—অপ্রত্যাশিত স্বামি-সম্মিলনে হাসিতেছে।

জ্যোতির্ম্ময়ীকে ঘরের মধ্যে লইয়া যাইয়া মাসীমা নরেশচন্দ্রকে বলিলেন, "দাদা, আর স্বর্ণ-সীতা নিয়ে কাল কাটাতে হ'বে না। এখন তোমার আপন সীতা তুমি বুঝে নাও।"

মাসীমা বাহিরে আসিয়া মা'কে বলিলেন, "মেয়ে, আমি এখন চল্‌লাম। কাল সকালে যখন মা'কে প্রণাম কর্‌তে যা'বে, তখন নাতনীর কাপড়-চোপড় নিয়ে এস ; আজ আর কিছু পাঠাব না।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।



কালিদাস ও শূদ্রকের প্রাচীনত্ব-নিরূপণ

প্রায় সকল (ভবভূতি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি) প্রাচীন কবিরই প্রাচীনত্ব ও সময় নিরূপিত হইয়াছে; কেবল 'মৃচ্ছকটিক' প্রণেতা শূদ্রকের কখন্ বা কাহার রাজত্বকালে আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক সাহিত্যাচার্য্যেরই মত এই যে,শূদ্রকই ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি হইতে প্রাচীনতম কবি। ভূরি ভূরি যুক্তি ও তর্ক দ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বেশ্যা-বিবাহই তাঁহাদের নিকট প্রাচীনত্বের অকাট্য ও জলন্ত প্রমাণ। তাঁহারা বলিতেছেন, তদানীন্তন প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিলেই তৎকালের হাব-ভাব চাল-চলন সব জানিতে পারা যায়। গ্রন্থই প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির মুখস্বরূপ—ইহা যে অকাট্য যুক্তি, সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। সুধীগণ দেখাইতেছেন যে, ব্রাহ্মণের পুত্র শর্ব্বিলক বেশ্যা মদনিকাকে বিবাহ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"স্বস্তি ভবত্যৈ ! মদনিকে !
সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তামেষ শিরসা বন্দ্যতাং জনঃ।
যত্র তে দুর্ল্লভং প্রাপ্তং বধূশব্দাবগুণ্ঠনম্ ॥"

আরও দেখাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মণকুলতিলক চারুদত্ত বেশ্যা বসন্তসেনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রমাণ দশমাঙ্কে শর্ব্বিলক বলিতেছেন—

"আর্য্যে ! বসন্তসেনে !
পরিতুষ্টেন রাজা ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্যতি"

এই সব দেখিয়া অনুমিত হইতেছে যে, কবি শূদ্রকের কালে বেশ্যা-বিবাহের প্রচলন ছিল, কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবির গ্রন্থে এইরূপ গণিকাবিবাহের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত নাই; ইহা দ্বারাই স্থির করা যায়, অতি প্রাচীনকালে শূদ্রকের সময় এইরূপ বিবাহের প্রচলন ছিল, পরে তাহা কালিদাস প্রভৃতির সময় উঠিয়া যায়। এইরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, কালিদাস প্রভৃতি হইতে শূদ্রকই প্রাচীনতম কবি।

কিন্তু কালিদাসকৃত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাতে এমন অনেক শ্লোক আছে, যাহা হুবহু 'মৃচ্ছকটিকের' সঙ্গে মিলিয়া যায়। যথা 'দ্বাত্রিংশপুত্তলিকাতে'—

"জল্পন্তি সার্দ্ধমন্যে পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমাঃ।
হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং ন স্ত্রীণামেকতো রতিঃ ॥"

আবার এ দিকে 'মৃচ্ছকটিকে' শর্ব্বিলক-কথিত শ্লোক—

"স্ত্রিয়ো হি নাম চপলাঃ।
অন্যং মনুষ্যং হৃদয়েন কৃত্বা
অন্যং ততো দৃষ্টিভিরাহ্বয়ন্তি।
অন্যত্র মুঞ্চন্তি মদপ্রসেক-
মন্যং শরীরেণ চ কাময়ন্তে ॥"

যদিও উপর্য্যুক্ত শ্লোকটির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ভাষার সামঞ্জস্য নাই,তথাপি পূর্ব্বের শ্লোকের যে ভাব,এ শ্লোকেও ঠিক্ একই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এখানে বলা যাইতে পারে যে, মানবের মনের ভাব অনেক সময় এক দিক্ দিয়াই প্রবাহিত হয়। প্রমাণ, সেক্ষপীয়রের জীবনী—নাটকলেখায় নূতন ব্রতী হইয়া তাঁহার রচিত নাটক তিনি প্রথমে গভীর রাত্রিতে নিজের বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট পড়িয়া শুনাইতেন, সেই বৃদ্ধা যেখানে যেখানে আবেগে হাসিত কিংবা কাঁদিত, ঠিক সেই সেই স্থানে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের হাস্যের ও ক্রন্দনের ফোয়ারা ছুটিত। ইহা ছাড়াও, বিশ্ববিখ্যাত কালিদাসের 'শকুন্তলাতে' দুষ্মন্ত বলিতেছেন—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং
ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ
প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

এইরূপ উপমা মহাকবি সেক্ষপীয়রের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভাবের মিল দেখিয়াই কোন কবিকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু যখন ভাব ও ভাষা উভয়েরই একত্র সমাবেশ, তখন সেটা অবশ্য দূষণীয়। জগতে তিন প্রকার কবি আছেন—

কেহ ভাবাপহারক, কেহ ভাষাপহারক, কেহ বা ভাব ও ভাষা উভয়াপহারক। আজকাল কাব্যজগতে শেষোক্ত প্রকার কবিরই বহুল আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ই আধুনিক নাট্যকারগণের পথিপ্রদর্শক। তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ সকলে করিতেছেন। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কিন্তু কাহারও ধার ধারেন নাই। যদি চ তিনি প্রতীচ্যভাব আনিয়া প্রাচ্যভাবের সঙ্গে এক মহা-সম্মেলন সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অমূল্য ও অক্ষয় নাট্যপ্রতিভায় ঐশী শক্তি নিহিত ছিল। যাহার ভিতর প্রকৃত-সত্তা আছে, সে কখনও ভাব ও ভাষা উভয়তঃ অপহরণাপবাদে কলুষিত হয় না। আমরা দেখিতে পাই, কালিদাসের দ্বাত্রিংশপুত্তলিকাতে এমন অনেক ভাব ও শ্লোক আছে, যাহা অবিকল শূদ্রকপ্রণীত 'মৃচ্ছকটিকের' সঙ্গে মিলিয়া যায়। যেমন ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য-কথনের ভিতর—

"নার্য্যো হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতো-
র্বিশ্বাসয়ন্তি নরং ন তু বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ কুলশীলবতা সদৈব
নার্য্যঃ শ্মশানবটিকা ইব বর্জ্জনীয়াঃ ॥"

অপর 'মৃচ্ছকটিকে' শর্ব্বিলক-কথিত শ্লোক—

"এতা হসন্তি রুদন্তি চ বিত্তহেতো-
র্বিশ্বাসয়ন্তি পুরুষং ন তু বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ কুলশীলসমন্বিতেন
বেশ্যাঃ শ্মশানসুমনা ইব বর্জ্জনীয়াঃ ॥"

এতদ্ব্যতিরেকে 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাতে' এমন অনেক ভাব আছে, যাহা 'মৃচ্ছকটিকের' সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। তবে এই বলা যাইতে পারে যে, 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার' প্রায় শ্লোকই পুস্তকান্তর হইতে সংগৃহীত। ইহাও যে কতদূর সম্ভব, তাহা বলা যায় না; কারণ, 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাতে' সন্নিবেশিত শ্লোকগুলি যদি উদ্ধৃত বলিয়া নিরূপিত হয়, তবে উক্ত পুস্তকখানির ভিতর এমন কিছুই রহিল না, যাহা অধ্যয়নের যোগ্য। তবেই দেখা যাইতেছে যে, শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বা উদ্ধৃত নহে। এক্ষণে ইহাও ধারণা করা কঠিন হইবে না যে, 'মৃচ্ছকটিক'-প্রণেতা শূদ্রক অপেক্ষা কালিদাসই প্রাচীনতর। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শূদ্রকের সময়ে বেশ্যা-বিবাহের প্রচলন দেখিয়াই মনে করিতে হইবে যে, তিনি প্রাচীন, তাহার কোন অর্থ নাই; কারণ, বেশ্যা-বিবাহ কিংবা বেশ্যাকে কুলবধূ করা সমাজে নিতান্তই দৃষ্য, তাহা যে সময়েই হউক না কেন। প্রমাণ-'মৃচ্ছকটিকে' শূদ্রকই প্রদর্শন করিয়াছেন —বিচারকালে ধর্ম্মাধিকরণ দ্বারা—

"অপি ভবান্ বেশ্যানুরক্তঃ।"

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া চারুদত্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই অনুমিত হয়, বেশ্যানুরাগই ভাল নহে, বিবাহ যে অধিক দূষণীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুকবি যিনি—তিনিই সমাজের তৎকালীন অতি বিরল মারাত্মক দোষগুলির উল্লেখ করেন, কিন্তু যিনি সুকবি, তিনি ইহার ঠিক বিপরীত—বাছিয়া বাছিয়া তিনি সমাজের সারগুলি গ্রহণ করেন, আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন। (কবি ও ঐতিহাসিকের এইটুকুই পার্থক্য—ঐতিহাসিক ভাল মন্দ দুই-ই গ্রহণ করেন)।

যেখানেই কর্ত্তব্যের ত্রুটী ও বিধিরহিত চাঞ্চল্য, সেখানেই সুকবি লোকশিক্ষার জন্য "শাস্তির মাপকাঠি" ঠিকভাবে ধরিয়া রহিয়াছেন, এক চুলও এ-দিক্ ও-দিক্ হইবার যো নাই। যখনই কবি দেখিলেন, কণ্বমুনির বিনানুমতিতে দুষ্মন্তের নিকট গোপনে শকুন্তলার আত্মদান; যখনই দেখিলেন, অতিথিসৎকারে নিযুক্ত হইয়াও কর্ত্তব্যের অবহেলা, তখনই তিনি শাস্তির দণ্ড উত্তোলন করিলেন—একসঙ্গে অভিশাপ, প্রত্যাখ্যান ও বিরহ। দুষ্মন্তের অপরাধও সঙ্গীন দণ্ডে তুলিত হইল, রাজবিধি-লঙ্ঘন ও গুপ্ত-প্রণয়ের জন্য দীর্ঘ বিরহের বিধান হইল। পাপরাশি ধৌত হইয়া আবার তাঁহাদের মিলন—কি স্বর্গীয় সুষমাব্যাপ্ত—কি প্রাণস্পর্শী, কি মধুর! কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ—তিনি হংসের ন্যায়—

"সারস্তথা গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু,
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ ॥"

এই নীতি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাব্য লিখিয়াছেন—এই জন্যই আজ তিনি কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকিরণবালা কাব্যসাংখ্যতীর্থ, পুরাণশাস্ত্রী।

আত্মপ্রসারণ

শোন—শোন—হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—ভেরী অবিশ্রাম বাজিতেছে—তাঁহার বিজয়ভেরীর সুমঙ্গল ধ্বনি ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে, সুর-নর-যক্ষ-রক্ষ—সকলেই অবাক্—নির্ব্বাক্ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে। এই ধ্বনির আগমনে অন্য সকল ধ্বনিই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কি সুমিষ্ট সেই ধ্বনি! সুমিষ্ট ভেরীর সুগম্ভীর ধ্বনি নিস্তব্ধতাকে গম্ভীরতর ও গম্ভীরতর করিয়া তুলিতেছে।

ঐ ভেরীধ্বনি কেন? উহা কিসের বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে? জগদ্‌বাসী আর যে সহ্য করিতে পারিতেছে না—সংসারের ক্ষুদ্রতা, অধর্ম্ম, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া—সংসারের সকল পাপ-তাপ ভেদ করিয়া—ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য মানবের মহাপ্রাণ হইতে একটী আকুল প্রার্থনা সমুত্থিত হইতেছে; ঐ ভেরীধ্বনি তাহারই বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে। ঐ দেখ, মানবের চির-উন্নতিশীল আত্মা আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে—মহাশূন্যের শত স্তর ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—ভগবানের চরণস্পর্শ লাভ করিবার জন্য—তাঁহার চরণে আপনাকে বলিদান করিয়া মহাশূন্যকে পূর্ণ করিবার জন্য, ঐ ভেরীধ্বনি তাহারই বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে। ঐ ভেরীধ্বনিকে ডুবাইয়া একবার কোটি কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া বল—জয় ভগবানের জয়—জয় পুরুষোত্তমের জয়!

চারিদিকেই একটা কঠোর অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। সংসারে এ কি বিপরীত অবস্থা—লোক চাহিতেছে খাদ্য, তাহাকে দেওয়া হইতেছে উপলখণ্ড! লোক চাহিতেছে তৃপ্তি, তাহাকে দেওয়া হইতেছে অতৃপ্তির অগ্নিজ্বালা! লোক চাহিতেছে জীবন, তাহাকে দিতেছ মরণের ভীষণ দাহ; লোক চাহিতেছে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তোমরা দিতেছ ন্যায়ের নামে অন্যায়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম। মানবের প্রাণ চায় সুবিচার, তোমরা তাহাকে দিতে চাও বিচারের নামে অত্যাচার ও অবিচার!

ভুল করিও না। মানুষ কাষ্ঠ—পাষাণ নহে, মানুষ উন্নতিধর্ম্মা। মানুষের মূল এই সংসারে গভীর অন্তস্তলে নিহিত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ঐ ঊর্দ্ধে—ভগবানের স্বর্ণসিংহাসনের অভিমুখে, মহাদেবের যে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি জাগ্রত হইয়া মদনের কামানল ভস্ম করিয়া দিয়াছিল, মানবেরও সেই ঊর্দ্ধদৃষ্টি-ই স্বীয় তেজে ক্ষণেকের মধ্যে সংসারের অধর্ম্ম, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার সকলই দগ্ধ করিয়া দিবার জন্য, ভস্মীভূত করিবার জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। ইহা সত্য—ধ্রুব সত্য—মানুষের ঐ ঊর্দ্ধদৃষ্টির সম্মুখে

অসত্য ও অধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারিবে না, অবিচার ও অত্যাচার পরাভব স্বীকার করিবে। মানবের মহাপ্রাণের অন্তরে এতদিন ঋষি নরোত্তম নিদ্রিত থাকিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন; আজ সেই ঋষি নরোত্তম জাগ্রত হইয়া ভগবানের অপরাজিত বিজয়পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ ভেরীধ্বনি আজ তাহারই বিজয়-বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে।

অসীম গগনতল হইতে ঐ ভেরীর সবল ও সুমঙ্গল অনাহত ধ্বনি ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে—ধীরে ধীরে সংসারে নামিয়া আসিতেছে। ঐ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এই সুসম্বাদ সংসারে বিঘোষিত হইতেছে যে,—স্বর্গরাজ্যের ন্যায় ও ধর্ম্ম এই সংসারেও বিজয় লাভ করিবে—ন্যায় ও ধর্ম্মের সূত্রে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এক মহামিলন সাধিত হইবে।

মানুষ অজর, অমর। অমরণ-ধর্ম্মা ভগবান্ হইতে মানুষের জন্ম—অমৃত-পুরুষের সন্তান হইল মানুষ। মানবের জরা কোথায়—মৃত্যু কোথায়? মানুষ সুপ্ত থাকিতে পারে, মোহের ঘোরে ক্ষণকাল লুপ্তচৈতন্যের মত "বিঘোরে" পড়িয়া থাকিতে পারে; কিন্তু মানুষকে যাহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সত্য করিয়া বলেন যে, মানুষের জরা নাই—মৃত্যু নাই। সুপ্ত অবস্থায় অন্তরাত্মা বলসঞ্চয় করে—তাহার পরে সে নবভাবে জাগিয়া উঠে—নূতন তেজে গর্জ্জিয়া উঠে। তাহার সেই নবজাগ্রত তেজের সম্মুখে অনুচরবর্গের সহিত অধর্ম্ম ক্ষণেকেরও জন্য দাঁড়াইতে পারে না—সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অধর্ম্ম কোথায় যে পলায়ন করে, তাহা কেহ জানিতেও পারে না।

আসিয়াছে—সময় আসিয়াছে। তাই ভারতের মানুষ আজ দেখি, সকল দোষের আকর আলস্য ও ঘুমঘোর অঙ্গ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। ভারতবাসীর মহাপ্রাণে এতদিন যে ঋষি নরোত্তম ধ্যানস্থ ছিলেন, আজ তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাই আজ ধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে; তাই আজ ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অগ্নিময় স্পন্দন অনুভূত হইতেছে; তাই আজ আর খাদ্য চাহিলে কেহ সহজে উপলখণ্ড দিতে সাহস করিবে না, তৃপ্তি চাহিলে অতৃপ্তির দহনে জ্বলিতে হইবে না, জীবন চাহিলে মরণ পাইবে না।

ঋষি নরোত্তম আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সুপ্তিসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। প্রাচীন জীর্ণ হয়। গৃহের ছাদে অঙ্গনে, গৃহের মেঁজেতে দেওয়ালে—চারিদিকে বহু পুরাতন অশ্বত্থ বট প্রভৃতি রাশি রাশি মূল ও শাখা পত্র বিস্তার করিয়া সমস্ত গৃহটিকে জরা-জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—মূল গৃহটি উহাদের কল্যাণে অনেকটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। উপকথায় যেমন শুনা যায় যে, রাক্ষসরা রাক্ষসপুরীতে কোন রাজকন্যাকে ধরিয়া লইয়া গেলে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য সদা জাগ্রত প্রহরী নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ ঋষি নরোত্তমকে এই প্রাচীন অন্ধকার ও রুদ্ধ গৃহে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য জানি না কে দুইটি প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছিল—মায়া ও প্রথা। কোথায় কোন্ ফুটা দিয়া প্রভাতের নবীন আলোক ঋষির নয়নে নিপতিত হয়, কোথায় কোন্ অদৃশ্য গহ্বরের ভিতর দিয়া নবভাবের জীবনপ্রদ মলয় বায়ু আসিয়া ঋষির অন্তরে নবজীবনের স্পন্দন আনয়ন করে, তাহারই সন্ধানে ঐ দুইটি প্রহরী সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত—সন্ধান পাইলেই শতবিধ আগাছার শুষ্ক জীর্ণ শাখা-পত্র আনিয়া সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত।

কিন্তু সমস্ত গগনভুবন ভরিয়া যখন প্রভাতের নবীন আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, যখন দিকে দিকে নবভাবের মলয় বায়ু নূতন জীবনের সুমঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া চলিতেছে, তখন ঐ দুই বৃদ্ধ প্রহরী—মায়া ও প্রথার সাধ্য কি যে, তাহারা নবীন আলোকের বা জীবনপ্রদ মলয় বায়ুর প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ করে।

কি জানি, কি প্রকারে কোন্ ফুটার ভিতর দিয়া প্রভাতের একটি রেখা ঐ অন্ধকার গৃহের ভিতর প্রবেশ-লাভ করিয়া ঋষি নরোত্তমের নয়নে নিপতিত হইয়াছে; কি জানি, কোন্ ফাটের ভিতর দিয়া সুবিমল প্রভাতের মলয় বায়ু প্রবেশ করিয়া ঋষিবরের সুগঠিত দেহ স্পর্শ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জীবন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। ঐ দেখ—চাহিয়া দেখ—ঋষি নরোত্তম সুপ্তোত্থিত জলহস্তীর ন্যায় সিংহবিক্রমে জাগিয়া উঠিয়াছেন—মায়া ও প্রথা প্রহরিদ্বয়ের শত কৌশল, শত মায়াজাল, শত বাক্‌চাতুরী তাঁহাকে আঁধার ঘরের রুদ্ধ বাতাসে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

আজ ঋষি নরোত্তমের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সম্মুখে নূতন জগৎ খুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার সম্মুখে উন্নতির নিত্য নব দৃশ্য সমূহ প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে উন্নতির সুপ্রশস্ত রাজপথে চলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। ঋষি নরোত্তমের প্রেরণায় ভারতবাসী শ্রেয়ের পথ, মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া, শতাব্দী-পূর্ব্বে যে ভারতবাসী বিদেশীয়ের পদধূলি লাভেরও অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ সেই ভারতবাসী বিদেশের যেখানে যাইতেছে, সেই খানেই অতুল সম্মান অর্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিতেছে।

নব নব ভাবের নবীন আলোকের স্পর্শ লাভ করিয়া—এবং নবজাগরণের মদিরা পান করিয়া নবযুগের তরুণ যুবক আজ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে—ভারতবাসী আজ উদ্‌ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। নূতন আকাশে মুক্তিলাভ করিয়া—নূতন বাতাসের সোমরস পান করিয়া তরুণ ভারতবাসী আজ পুরাতন কোন কিছুর—প্রাচীনতার জীর্ণ প্রাচীরের বাধা—কিছুমাত্র সহ্য করিতে পারিতেছে না। স্বাধীনতার যে মদিরাপানে মত্ত হইয়া ফরাসীবিপ্লবের প্রারম্ভে ফরাসী জাতি প্যারিসের সর্ব্বপ্রধান কারাগার ভাঙ্গিতে ছুটিয়া গিয়াছিল, আজ তরুণ ভারতবাসীও সেই স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া পুরাতন যাহা কিছু, প্রাচীন নামধারী যাহা কিছু, সকলই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া প্রলয়সাধনের আস্বাদলাভের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতেছে—প্রলয়ের ধ্বংসলীলার অবসানে সংসারের সমস্ত অবিচার, অত্যাচার, সমস্ত অধর্ম্ম ও অন্যায়েরও বুঝি লীলাবসান হইবে।

কিন্তু না—জগতের ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করে না। পুরাতন যাহা কিছু সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমারই কর, অথবা নূতন একটা কিছু গড়, তাহাতে বেশী কিছু আসিবে না যাইবে না—তাহারই ফলে যে অধর্ম্ম ও অন্যায় ফুৎকারে অন্তর্হিত হইবে,

তাহা নহে। আসল কথা এই যে, প্রতি জনের আপনাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। অধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মকে যদি দাঁড় করাইতে হয়; সত্য, ন্যায়, প্রভৃতিকে যদি ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়; যদি ধরাধামে স্বর্গরাজ্য নামাইয়া আনিতে চাও, তবে আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোল। ইতিহাস এই কথাই ঘোষণা করে। পুরাতন আপনাকে জ্বালাইয়া দাও—ত্যাগের শ্মশানে দগ্ধ করিয়া এস—নিষ্কলঙ্ক সুবর্ণের পবিত্র আভা লইয়া শ্মশান হইতে ফিরিয়া আইস। প্রত্যেকে আপনাকে নূতন করিয়া গড়িলেই, সংসারে ধর্ম্মরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অটল হইবে, সংসার সোনার সংসার হইবে।

এখনকার সংসারের অর্থ—খুব নীচ স্বার্থের আবর্জ্জনা-সঞ্চয়ই এখনকার যা সংসারের অর্থ। আবর্জ্জনার পূতিগন্ধ-বাষ্পে আমার সংসার যে অসার হইয়া উঠিবে, সে দিকে দৃষ্টিই নাই। ঘরের ভিতর অঙ্গার-বাষ্প জমিয়াই যাইতেছে—তাহার ফলে বাঁচই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িব, সে দিকে দৃষ্টি নাই। বাহিরের অক্সিজেন গৃহের মধ্যে না আনিলে গৃহ যে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

কিন্তু ঐটুকুতেই এত—ঐটুকুই ভুলিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে—ভগবানের এমনই বিধান যে, স্বার্থ ও পরার্থে সমন্বয়মেশা করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার রাজ্যের অধিবাসী একা তুমি নও। কোটি কোটি মানব, অগণ্য জীব-জন্তু তাঁহার বিরাজ্যের অধিবাসী। কাযেই সকলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ, তোমার স্বার্থে সকলের স্বার্থ। সকলকে তোমার জন্য ভাবিতে হবে, তোমাকে সকলের জন্য ভাবিতে হইবে। পরের সুখে তোমাকে সুখী হইতে হইবে, তোমার সুখে অপরের সুখী হইতে হইবে; পরের দুঃখে তোমায় দুঃখী হইতে হইবে, তোমার দুঃখে অপরের দুঃখী হইতে হইবে।

এইটির অপর নাম আত্মপ্রসারণ। এই আত্মপ্রসারণই হইল সকল সত্যধর্ম্মের মূল। ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ—যাঁহারাই ধরিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন; তাঁহারাই আপনাকে ত্যাগের শ্মশানে দগ্ধ করিয়া অমৃত-সাগরে স্নান করিয়া নূতন মূর্ত্তিতে এই সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান্ যেমন বিশ্বের অণুপরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, আমাদেরও প্রত্যেককে সেইরূপ পরস্পরের মধ্যে অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। ইহাকেই সমবেদনা বলে—ইহার অতিরিক্ত সমবেদনা বলিয়া কিছুই নাই। এই সমবেদনার উপরেই ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন দাঁড়াইয়া আছে। ইহাই এই আত্মপ্রসারণই সত্যধর্ম্মের এক অঙ্গ।

ভগবান্‌কে তুমি ভালবাস? তুমি বলিতে চাও যে, তুমি সত্যধর্ম্মের অপর অঙ্গের সাধক? বলিও না—বলিতে পার না, যদি না তুমি আত্মপ্রসারণে যত্নবান্ হও। তাঁহাকে ভালবাসিলেই সকল বিষয়েই তাঁহাকে আদর্শ করিতে হইবে। কাযেই তাঁহারই আদর্শে আমাদিগকেও সকলের মধ্যে প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট হইতে হইবে—সকলের মধ্যে আত্মপ্রসারিত করিতে হইবে। তুমি আত্মপ্রসারণের সাধক হও, সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ভগবানের যথার্থ উপাসক হইয়া পড়িবে—ভগবৎপ্রীতিতে তুমি স্বতঃই ডুবিয়া থাকিবে।

এই সত্যই ঋষিরা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, "একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মানব অমৃত উপভোগ করে।" আমিও এই সত্য তোমাদিগকে দিলাম—তোমরা ইহা গৃহে গৃহে পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কর, যাহাতে প্রতি মানব ইহা অন্তরে গ্রহণ করে। এ সংস্কার, সে সংস্কার, এত বিভিন্ন সংস্কারের চেষ্টায় বৃথা ঘুরিতে হইবে না। আত্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সকল সংস্কার সুনিষ্পন্ন হইবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিহু নাচ

বিহু আসামীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। আসামীরা বৎসরের সমস্ত সংক্রান্তিকেই বিহু বলিয়া থাকে। কিন্তু 'পর্ব্ব বিহু' আমাদের বিষুব সংক্রান্তিতে। এই সময় তাহারা আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইয়া থাকে। প্রিয়জনকে নূতন বস্ত্র বা অন্য পোষাক উপহার দেয়। নৃত্য-গীত লইয়া খুব মাতামাতি করে এবং তখন গৃহস্থালীর কার্য্যাদিতে মন সামান্যই দিয়া থাকে। এই বিহু উপলক্ষে তাহাদের যে নৃত্য হয়, তাহা "বিহু নাচ"নামে পরিচিত।

আসামে প্রায় সর্ব্বত্রই নৃত্যের চর্চ্চা দেখা যায়। মণিপুরীরা তাহাদের নানা উৎসব উপলক্ষে নৃত্যকেও উৎসবের একটি অঙ্গ করিয়া লয়। শিলং সহর হইতে সাত আট মাইল দূরে "নংক্রিম্" নামে একটি স্থান আছে। সেই স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমভাগে একটি নৃত্যের চল আছে। সেই নৃত্যকে "নংক্রিম্ রাজবাড়ীর নাচ" বলে। মেয়েরা কিছুক্ষণ পরে পরেই পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতেছে এবং চক্ষু বুজিয়া সারি ধরিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলিতেছে। কে কত রকম পোষাক পরিতে পারে অর্থাৎ কাহার কত প্রস্থ পোষাক আছে এবং চক্ষু বুজিয়া কে কত আস্তে আস্তে চলিতে পারে, তাহার মধ্যেই না কি নৃত্যের বাহাদুরী। কেবল মেয়েরাই নৃত্য করে।

আসামীদের বিহু নাচ, চৈত্র-সংক্রান্তির দিন দশ পনর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং সংক্রান্তির পরও দিন দশ পনর চলিয়া থাকে। আসামীরা সংক্রান্তির দিন গোয়ালের সমস্ত গাই-গরুকে স্নান করায়। ইহাকে তাহারা "গাই-স্নান" বলে এবং ইহার পরেই যুবকরাও যুবতীদের ন্যায় দল বাঁধিয়া নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকে। বিহু নাচ কেবল যুবক-যুবতীদের ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য। ছেলেরা মোটে দিন চার পাঁচ নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে এবং তাহাতে ঘটাও কম; কাযেই আমোদ-প্রমোদের মাত্রাও সামান্য। মেয়েদের নাচটাই খুব জাঁকাল। বনজঙ্গলের ধারে বা মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তথায় দলে দলে মেয়েরা যাইয়া একত্র হয় এবং নাচিতে গাহিতে থাকে। ছেলেরা দর্শকরূপে পার্শ্বে দাঁড়ায়। সময় সময় তাহারা একটু দূরে বসিয়া গানের সাহায্যে মেয়েদের রূপের বর্ণনা করে বা মেয়েদের সহিত রসালাপ করে।

(গান ১) .

গাতে লগাই বিন্ধিছা
কামিজ বনিও উপরোৎ, পিন্ধিছা কোট,
আমাক্ মুহিবলৈ আহিছু ছেনাইতি
হেন্দুরের মারিছ ফোট।

(ইহার অর্থ মোটামুটি এই—তুমি কামিজ পরিয়াছ এবং তাহার উপরে কোট পরিয়াছ। তদুপরি, আমাকে মোহিত করিতে সিন্দুরের ফোঁটা দিয়াছ।)

(গান ২)

হেরা, মোর মরমের ময়না
উঠতে বহতে খাওতে লওতে
হদাই মনৎ পড়ে হুবার বেলা
হেরা মোর মরমের ময়না
তাম্বুলটি কাটিয়ে বোথা খানা রাখিয়ে
মুচকী হাই মারি হাতত্ দিলা ॥"
হেরা মোর·····
চৈত মাহর বিহুতে ডাক বাঙ্গলার কাখতে
কোমর হিলাই হিলাই নাচিছিলা "
হেরা মোর·····*

এই নাচের একটি নিয়ম আছে যে, বাড়ীর মেয়ে যে স্থানে নৃত্য করে, সেই স্থানে বাড়ীর অন্য কোনও পুরুষ কিম্বা মেয়ে উপস্থিত থাকিবে না।

চৈত্রমাসে যে কয় দিন নাচ হয়, তাহা সাধারণতঃ রাত্রিতে হয়। রাত্রি আটটা নয়টার সময় নাচ আরম্ভ হয় এবং অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে। নাচের স্থানে আলোকের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই। সামান্য একটা প্রদীপ থাকে এবং উহা অনেকটা কেরাসিনের "ডিবা" জাতীয়। বৈশাখমাসে অর্থাৎ সংক্রান্তির পরে যে, নাচ হয়, তাহা সাধারণতঃ দিনের বেলা হইয়া থাকে। বেলা ১২টা ১ টার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

যুবতী বা কিশোরীগণ প্রত্যেকেই "টকা" নামক এক প্রকার বাঁশের বাদ্যযন্ত্র লইয়া নাচের যায়গায় উপস্থিত হয়। এই "টকা" বাদ্য একটি ফাটান বাঁশের 'পাপ' ছাড়া আর কিছুই নয়। "পাপ্‌টি" নাড়িলেই "টকাটক্" শব্দ হইয়া থাকে। এই শব্দ হইতেই বোধহয় যন্ত্রের নাম "টকা" হইয়াছে।

নর্ত্তকীদের মধ্যে একলা এক জনও নাচিতে পারে; দুই জনও একসঙ্গে নাচে বা অধিকসংখ্যকও একসঙ্গে নাচিয়া থাকে। নর্ত্তকীরা হাত, পা ও কোমর নাড়িয়া নাচিতে ও গাহিতে থাকে এবং তাহাদের দলের যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা নর্ত্তনশীল নর্ত্তকীদের নাচের তালে তালে "টকা" বাজাইয়া থাকে। বিহু নাচে ভাল নীতিপূর্ণ এবং অশ্লীল, দুই রকম গানই গাওয়া হইয়া থাকে। শ্লীলতার ব্যাঘাত করে, এরূপ গানের পরিচয় উপরের গানটি হইতে কতক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। অতি অশ্লীল গানও বেশ গাওয়া হয়।

* হেরা—ওগো। বোথা—পানের বাটা।

(নীতিপূর্ণ গান)

চাই চাই বুলিবা বাত্,
দেহর ভিতরত্ আছে মাল বাম্
পিছলি পরিবি তাত্।

ইহার অর্থ না কি—দেখিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া চলিবা। এ জগৎ বিপৎসঙ্কুল। দেখিয়া বুঝিয়া না চলিলে বিপদে পড়িবা।

স্থান-বিশেষে নর্ত্তকীর সংখ্যা বেশী বা কম হইয়া থাকে। নাচের যায়গার নিকটে আসামী হিন্দু বস্তি বেশী থাকিলে নাচের আসর বেশ মস্‌গুল থাকে। শিবসাগর অঞ্চলে ডিব্রুটিংএ এবং ডিসাং ও ডিহিংএর পারে অনেক স্থানে বেশ বড় বড় আসর জমিয়া থাকে।

এই নাচটি নাকি অনেকটা শ্বেতাঙ্গদের "বল ড্যান্সের" মত। চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গরা এই নাচ খুব পছন্দ করে।

এই নাচ মেয়েদের স্বয়ম্বরা ও ছেলেদের স্বয়ংকনে হওয়ার একমাত্র সূত্র। কোন যুবক যদি কোন যুবতীর বা কোন যুবতী যদি কোন যুবকের প্রেমে আবদ্ধ হয়, তবে সেই যুবক-যুবতী-যুগল "বিহু উৎসবের" অপেক্ষায় থাকে। বিহু নাচ উপলক্ষে যুবতী কোন স্থানে নৃত্য করিতে যায় এবং যুবক দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত থাকে। তৎপরে সুযোগ বুঝিয়া উভয়ে কোথাও পলায়ন করে এবং গোপনে বাস করিতে থাকে। কিছু কাল এইভাবে বসবাস করিয়া তাহারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে এবং অভিভাবকদের নিকট নিজেদের বিবাহের কথা উত্থাপন করে। অভিভাবকরাও তাহাদের বিবাহব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি করে না; বরং বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া দেন। অবশ্য বিশেষ কোন কারণ থাকিলে অভিভাবকগণ সেই বিবাহে মত দেন না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই নাচ ও এই ভাবের বিবাহ সকল জাতীয় ও সকল শ্রেণীর আসামীদের (হিন্দু) মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল আর শিক্ষিতদের—এমন কি, সামান্য শিক্ষিতদের (অল্প লেখাপড়া-জানা) মধ্যেও এই নাচের প্রচলন নাই। অশিক্ষিত গ্রাম্যরাই এই নাচ লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে। শিক্ষিত লোকরা বিহু নাচকে হেয় কায বলিয়া মনে করে এবং সমাজের সুনামের অন্তরায় বলিয়া গণ্য করে।

শ্রীসুখদাচরণ চট্টোপাধ্যায় (বি, এ)।

পুরাতন বিচার-চিত্র

অনেক কাল আগের কথা,—প্রায় এগার শত বৎসর পূর্ব্বের। বিচার-চিত্রটিও আমাদের দেশের নহে—সুদূর ইরাণের। তখন সেখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব, আর্য্য ধর্ম্মের সঙ্গে 'ইসলাম' ধর্ম্মের সংঘর্ষ; এই বিচারদৃশ্যে তখনকার যুগের এই ধর্ম্মবিপ্লবের ছায়া, প্রচলিত বিচারনীতি, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রভৃতি সম্যক্ পরিদৃষ্ট হইবে। যাহাতে এই বিচার-চিত্র প্রকৃষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়, সে জন্য আমরা

প্রথমতঃ তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস, অভিযোক্তা, বিচারক ও উপস্থিত জনসম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব।

এই ইরাণ দেশে আর্য্য জাতির প্রথম অবতার, ভগবান্ জরথুষ্ট্রদেব তাঁহার সাগ্নিক 'মজদা' ধর্ম্ম প্রচার ও প্রচলন করেন। পারস্য ইতিহাসের 'সেসানিয়ান যুগ' অর্থাৎ ইসলামধর্ম্মী আরবদের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মহান্ গৌরবময় ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম ছিল। পরে আরবদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য রাজশক্তির পরাজয়ে দেশে প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ক্রমে খলিফা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রথম খলিফা আবু বেকর ৬৩২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে খলিফা পদে বৃত হয়েন। ইসলামধর্ম্ম দেশে নানা প্রকারে প্রচার করা হয়; প্রধানতঃ পশুবলের উপরই এই প্রচার-নীতির মূল ভিত্তি ছিল (১)। এমন কি, জোর করিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আনিয়া আর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দেশ হইতে ক্রয় করিয়া (২) সকলকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। তখন সারা দেশে মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির একান্ত দরকার; এ জন্য বহুবিবাহ প্রকৃষ্টরূপে সমর্থিত হয়, অন্যান্য অনেক নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।

আমাদের এই ঘটনা খলিফ অল্ মু'তাসিমের রাজত্বকালের। অভিযুক্ত আফসিন এক জন মহা পরাক্রান্ত ক্ষুদ্র রাজ্যাধিপতি এবং প্রথমতঃ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি ক্রমশঃ খলিফের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও এক জন বিশিষ্ট ও শক্তিশালী সৈন্যাধ্যক্ষরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মসংঘর্ষে তখন অনেক বিদ্রোহীর সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে বাবক ও তাঁহার ভাই আবদুল্লা অধিনায়ক ছিলেন। ইহারা কিছুতেই ইসলামধর্ম্মের প্রকৃষ্টতা মানিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজধর্ম্মগ্রহণে স্বীকৃত হয়েন নাই, পরন্তু তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্মরক্ষার্থ বিরাট সঙ্ঘ-সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্য্যতঃ আংশিক প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা উভয়েই ধৃত হইয়া খলিফের বিচারে চরমদণ্ড লাভ করেন। এই বীরদ্বয়ের কথা স্মরণ করিতে আমাদের অমর কবি রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা মনে পড়ে:—

* * মরিল না করি
একটি কাতর শব্দ;—
দর্শকজন, মৃদিল নয়ন,
সভা হ'ল নিস্তব্ধ!

এই বীরদ্বয়ের অবস্থাও তাহাই। ইহারা একটিমাত্র কাতর শব্দ না করিয়া বিরাট পাশবিক অত্যাচারের মুখে প্রাণত্যাগ করেন। জীবিতাবস্থাতে আবদুল্লার হস্ত ও পদ কর্ত্তন করা হয়। (৩) কিন্তু যে বীরপুরুষের সহায়তায় এই ভয়ঙ্কর ইসলাম-পরিপন্থী শস্ত্রকুশল ও শক্তিশালী বীরদ্বয়ের উচ্ছেদ সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার ভাগ্যলিপিও যে তাঁহাদের সঙ্গে একই সূত্রে আবদ্ধ ছিল, তাহা কে জানিত? মজদা-ধর্ম্মের পুরোহিতগণ মোবেদ (Mobed) অথবা ম্যাজি (Magi) বলিয়া অভিহিত হইত। তাহাদের এক জন এই বিচারব্যাপারে সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন। এই মোবেদ পরে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

বিচারকার্য্য সমাধা হইয়াছিল ৮৪০ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার সমসাময়িক লেখক (১) তেবরী (Tabri) র চিত্রই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য; আমরা তাঁহার লিখিত চিত্রটির হুবহু অনুসরণ করিব। আরও দুই জন লেখকের (২) লেখাতেও এই চিত্রটি পাওয়া যায়. কিন্তু তাহারা পরবর্ত্তী কালের লোক, তাহাদের চিত্রে অনেক অবান্তর ও রচিত কল্পনা আসিয়া পড়া স্বাভাবিক, কাযেই তাহাতে বিশেষ আস্থাস্থাপন সম্ভব হয় না; কিন্তু বিচারটির ব্যপদেশে সারা দেশে যে একটা প্রবল চাঞ্চল্য ও বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই সকল লেখকের লেখায় অতি পরিস্ফুট সন্দেহ নাই।

মনসুরের পৌত্র ও ইশার পুত্র হারুণ এই সভায় উপস্থিত ছিল, সে বলিতেছে:—(৩)

আমি মু'তিসিমের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আহমদ বিন আলী দাউদ, ইসাক বিন ইব্রাহিম ও মহম্মদ বিন আবদল মালিক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই যেন আফ্‌সিনের দণ্ডের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। আফসিনকে সভায় আনা হইল; তখন পর্য্যন্ত তাহাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় নাই। উপস্থিত জনসম্প্রদায়ের মধ্যে মহম্মদ বিন আবদল মালিক অভিযোক্তা হইলেন, আর তবরীস্থানের রাজা মজ্‌অর, মজদা-পুরোহিত, সুগধের অন্যতম অধিপতি উরকেশএর পুত্র মরজবন এবং সুগদিগের দুই জন লোক এই বিচারে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন।

মহম্মদ সেই লোক দুইটিকে ডাকিয়া তাহাদের কাপড় কেন ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন।

(1) Mohammedanism—Margoliouth p. 9.
(1) Mohammedanism—Margoliouth p. 9.
(1) Literary History of Persia Browne Vol. I p. 329-30.

(১) তেবরী—'তবরীস্থানে'র আমুল নগরীতে ৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তির ছাত্র ছিলেন। পরে বাগদাদে বসতি করেন। ইসলামধর্ম্মের নীতি, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ; তিনি তাঁহার যুগের বিষয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টতার রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। —Arabic Literature Gibb p. 56-57.

(২) ইবন্ অথির ও ইবন্ খলদুন। ইবন অথির (১১৬০-১২৩৪) জাতিতে আরব ছিলেন; তিনি আরবদেশীয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মধ্যে এক জন:—Arabic Literature P. 94-95.

ইবন খলদুন:—(১৩৩২-১৪০৬ খৃষ্টাব্দ) সে যুগের এক জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—নানারূপে তিনি বিখ্যাত:—Arabic Literature P. 112.

(৩) অনিসন্ধিৎসু পাঠক সংস্কৃতজ্ঞ রুসীয় পণ্ডিত এম, ইনোষ্ট্রেনজেভএর এ সম্বন্ধে গবেষণা দেখিতে পারেন।

প্রত্যুত্তরে তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল, সেখানে রক্তের চিহ্ন ও আঘাত-রেখা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহম্মদ তখন আফসিনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহাদিগকে চিন কি? এই ব্যাপার সম্পর্কে কোনও কিছু অবগত আছ কি? আফসিন উত্তর করিলেন, হাঁ, জানি বৈ কি? ইহাদের দুই জনকেই আমি চিনি। এই জন ত মৌজিন, আর অপর জন 'অশরুসনায়' একটি মসজেদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। আমি ইহাদের প্রত্যেককে এক এক সহস্র বেত্রাঘাত করিয়াছি; কারণ, আমার ও সুগধের রাজার সঙ্গে যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি সর্ত্ত ছিল যে, আমি প্রত্যেক লোককেই নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিতে দিব, কাহাকেও কোনরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনিতে পারিব না। কিন্তু এই লোক দুইটি 'অশরুসনায়' একটি ধর্ম্ম মন্দিরে জোর করিয়া প্রবেশ করিয়া সেখানকার বিগ্রহ-মূর্ত্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দেয়, পরে সেটিকে মসজেদে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদের এই অন্যায় অত্যাচার ও অনধিকার হস্তক্ষেপের জন্য আমি এই শাস্তিবিধান করিয়াছি।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার যে বইখানিকে তুমি মণিমুক্তায় সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছ, সেখানার নাম কি? ইহাতে কি খোদাতাল্লা সম্বন্ধে কোনও অন্যায় ও অবমাননাজনক কোনও কথার উল্লেখ আছে?

আফসিন উত্তর করিলেন, যে বইখানার কথা বলা হইতেছে, সেখানা আমি আমার পিতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে পারসিকদিগের আচার-নীতির কথা সন্নিবেশিত। আর যে অবমাননার কথা উল্লেখ হইতেছে, তাহাতে এই বলিতে চাই, আমি সেখানা হইতে শুধু আচার-ব্যবহারের বিষয়ই আহরণ করি, অন্য কোনও বিষয়ে আমার দৃষ্টি নাই। আমি ইহাকে মণিমুক্তায় খচিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু মুক্তাগুলির দরকার এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই বলিয়াই সেই অবস্থাতেই সেগুলি ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। আপনারা যেমন কলীলওয়া দিমন (১) ও মজদাক্ (২) গ্রন্থ আপনাদের গৃহে রক্ষা করেন, আমিও সেই প্রকারেই এখানা রক্ষা করিতেছি। আর আমার ধারণা যে, ইহাতে ইসলাম ধর্ম্মের কোনও হানি হইতে পারে না।

তাহার পর সেই মোবেদ অগ্রসর হইয়া আফসিনের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিল। সে বলিতে আরম্ভ করিল, আফসিন ফাঁস দিয়া মারা জন্তুর মাংস ভোজন করে। এ সম্পর্কে আমার নিকট বলিয়াছে যে, হত্যা করিয়া জীবজন্তুর মাংস খাওয়া অপেক্ষা এমন করিয়া খাওয়া ভাল, কারণ, ইহাতে টাটকা, তাজা জিনিষ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আফসিন প্রতি বুধবার একটি কৃষ্ণ-বর্ণের ছাগ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া, তাহার মাংস ভক্ষণ করে, আর এমন কি এক দিন এ কথাও বলিয়াছে, দেখুন ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি আমার অত্যন্ত ঘৃণা, কিন্তু তথাপি সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাদাম তৈল গ্রহণ করিয়াছি, উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছি, আরব দেশের পাদুকা ব্যবহার করিয়াছি—এক কথায় উহাদের সকল আচার-নীতিই প্রতিপালন করিয়াছি সত্য, কিন্তু নিজের দেহের কোন হানি করিতে দেই নাই; অধিক কি, আমার "সুন্নত" সংস্কার পর্য্যন্ত হয় নাই!

তাহার কথা শেষ হইল। ইহার পর আফসিন বলিলেন, প্রথমতঃ আমাকে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি কথা জানিতে দেওয়া হউক; ইহার স্বধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস আছে কি না।

এই ধর্ম্মযাজক পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কাযেই উত্তর হইল, না।

আফসিন বলিলেন, তবে যে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসই নাই, তাহার সাক্ষ্যপ্রদানের সার্থকতা কি!

তাহার পর মোবেদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা দেখুন, আমার আর আপনার বাড়ীর মধ্যে কি এমন একটি ছিদ্র আছে, যাহা দ্বারা আপনি আমার প্রতি কার্য্যবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পাবেন?

মোবেদ উত্তর করিল, না।

তবে আমিই কি আপনার নিকট আমার এই গোপনীয় কথা বলি নাই, আমিই কি আমার পারসিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কথা আপনাকে নিবেদন করি নাই; আমিই কি আমার এই স্বজাতি-প্রীতি ও জাতীয়তা-বোধের কথা আপনাকে জানাই নাই?

মোবেদ জানাইল, হাঁ, তাহা সত্য বটে।

আফসিন বলিলেন, তবেই দেখুন, আপনি প্রথমতঃ নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষা করেন নাই, আর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসহন্তার কায করিয়াছেন; নিজের কোনও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই।

মোবেদ নামিয়া আসিলেন আর তাহার স্থান পূর্ণ করিলেন, মরজবন। আফসিনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সে তাহাকে চিনে কি না; উত্তরে আফসিন চিনেন না বলিয়া জানাইলেন। মরজবনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি আফসিনকে চিনেন কি না। উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি আফসিনকে চিনি এবং এই ব্যক্তিই আফসিন।

ইনিই যে মরজবন, তাহা আফসিনকে বিজ্ঞাপিত করিয়া দেওয়া হইল। মরজবন আফসিনের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অরে হতভাগ্য নরঘাতক! তুই সত্য প্রকাশে বিচলিত ও চঞ্চল হইতেছিস কেন?

আফসিন বলিলেন, ওহে লম্বশ্মশ্রু! তুমিই বা কোন্ কথার উত্থাপন করিতেছ?

(১) এই পুস্তকখানি সেসানিয়ান যুগে মহামতি নসীরবান রাজার সময়ে তাঁহার মন্ত্রী (অথবা চিকিৎসক) ভারতবর্ষের সংস্কৃত পুস্তক হইতে পহ্লবীতে অনূদিত করেন। পরে ইবন্ মোকাআফা এই বইখানিকে আরব-সাহিত্যে স্থান দান করেন। এই পুস্তকখানি 'করটক ও দমনকের' অনুবাদ।

(২) ইহাও একখানা রস-রচনা। ইবন মোকোআফাই আরবীতে পরিবর্ত্তিত করেন। পূর্ব্বের পুস্তকখানার মত এ খানাও ইসলাম-ধর্ম্মীদের পক্ষে অনিষ্টকর বা নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই—সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

Browne's Literary History of Persia Vol. I foot note p. 332.

মরজবন জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজ্যের প্রজাগণ তোমাকে চিঠিপত্রে সম্বোধন করিতে কি কথা ব্যবহার করে?

আফসিন উত্তর করিলেন, যে সম্বোধন তাহারা আমার পিতা ও পিতামহকে করিত, ঠিক সেই সম্বোধনে।

সেটা কি তাহাই জানিতে চাই।

তাহা বলিব না।

অশ্রুসনার প্রজাগণ কি তোমাকে এই এই প্রকারে সম্বোধন করে না? আর এই কথার অর্থ কি আরবী ভাষায় অমুক দাস হইতে পরমেশ্বরের সমীপে হয় না? (১)

মহম্মদ এই কথার উত্থাপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি এই কথা সহ্য করে? আর সত্য কথা বলিতে—রাজার পক্ষে প্রজার কাছে, আমিই তোমার পরমেশ্বর, এই কথা বলা অপেক্ষা আল্লাকে আর কিরূপে বেশী অবমাননা করিতে পারা যায়?

আফসিন বলিলেন, কিন্তু ইহাই বংশানুক্রমে আমাদের পিতা, পিতামহের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এমন কি, আমিও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আচার-নীতি রক্ষা করিয়াছি। তাহার পর এখন আবার অন্যভাবে সম্বোধিত হইয়া প্রজাদের কাছে হীন হইতে ইচ্ছা করি নাই; ইহা করিলে আমি তাহাদের মান্য ও সহযোগিতা হারাইতাম, সন্দেহ নাই।

ইসাক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ধিক্ ধিক্ হায়দর! (২) তোমাকে ধিক্!

তাহার পর তবরীস্থানের রাজা মজথর গাত্রোত্থান করিলেন।

আফসিনকে জিজ্ঞাসা করা হইলে আফসিন উত্তর করিলেন, তিনি এ ব্যক্তিকে চিনেন না।

মজথর আফসিনকে চিনেন কি না, সে কথা জিজ্ঞাসা করা হইল।

ইহার পর ইনিই যে মজথর, তাহা আফসিনকে বলা হইল। বলা মাত্রই আফসিন বলিলেন, হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি।

তুমি কি কখনও মজথরের সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছ?

না।

তখন মজথরকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এ ব্যক্তি কি কখনও আপনার নিকট চিঠি পত্র দিয়াছে?

মজথর বলিলেন, "হাঁ, ইহার ভাই খাস্ আমার ভাই কোয়াহিয়রের নিকট এই মর্ম্মে চিঠি লিখিয়াছে যে, তাহাদের এই জ্যোতির্ম্ময় (১) ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকল্পে, তাহার নিজের, কোয়াহিয়রের, আর বাবকের সাহায্য ব্যতীত আর কাহারও সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।

এই স্থানেই বিচার-চিত্রের যবনিকাপতন! ব্যাঘ্রপুঙ্গবকে ঘোলাজলের কারণ দর্শাইতে কোনও যুগে কখনও চিন্তা করিতে হয় না!

তেবরী ইহার পর অনাহারে আফসিনের মৃত্যুদণ্ডের কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুর পর তাহার বাড়ী-ঘর সকল তাল্লাস করা হইয়াছে; সেই খোঁজাখুঁজিতে একখানা মজদা-ধর্ম্মের গ্রন্থ বাহির হইল, সেখানা আগাগোড়া মণি-মুক্তায় গাঁথা! (২)

এই বীরপুরুষকে অনাহারে তিলে তিলে কারাগৃহে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয়। ৮৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, পার্থিব সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া তাঁহার মুক্ত আত্মা অমরলোকে প্রস্থান করে। তাঁহার শবদেহকে ক্রশে বিদ্ধ করিয়া রাখা হয় ও পরে টাইগ্রীস নদীর জলে উহা পরিত্যক্ত হয়।

পারস্য দেশে যে ধর্ম্মের নামে কত অত্যাচার ও অনাচার আচরিত হইয়াছে, কত বীর পুরুষই যে বাধ্য হইয়া হয় পরধর্ম্ম-গ্রহণে তিলে তিলে আত্মহত্যা করিয়াছেন অথবা স্বধর্ম্মরক্ষার্থ অবহেলায় প্রাণদান করিয়াছেন, সে কথা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। পারস্যের ইতিহাসে এমন কাহিনীর সংখ্যা সমধিক; শিখদের মত—রাজপুতদের মত অনেকে ধর্ম্ম দেয় নাই—শত অত্যাচারে অটল রহিয়াছে। অনেকের ধারণা, ইরাণ মুসলমানের দেশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ইরাণীদের পূর্ব্বপুরুষ আর হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষ একই ছিলেন, তাহা মনে রাখা দরকার। আবেস্তা আমাদের বেদতুল্য—জরথুষ্ট্রদের আমাদের প্রথম অবতার। এই দুইটি ভ্রাতৃজাতি একই রূপে 'সেমিটিক' তরবারির নীচে বীভৎস অত্যাচারে প্রাণ নিবেদন করিয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচারে তরবারির ব্যবহার হইয়াছে কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

(১) তেবরী হইতে ইবন্ খলদুন এ ব্যাপারটাকে বেশী পরিস্ফুট করিয়াছেন। 'খোদয়' এই কথাটি ব্যবহৃত হইত; পারসী ভাষায় তাহার অর্থ, প্রভু আর ভগবান্ ও মহামান্য ব্যক্তিকে এই শব্দে সম্বোধন করা হইত। পহ্লবী ভাষায় 'খাহনামা'র আদিম নাম ছিল 'মোদয়নামা'।

(২) আফসিনকে সময়ে সময়ে হায়দর নামে অভিহিত করা হইত।

(১) ভগবান্ জরথুষ্ট্রদের প্রবর্ত্তিত সাগ্নিক, জ্যোতির্ম্ময় মজদাধর্ম্ম।

(২) এই গ্রন্থের নাম "জরাওয়া।" তাহার খুঁহে অনেকগুলি স্বর্ণখচিত বিগ্রহমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

Browne's Literary History of Persia Vol. I p. 336.



যুবক-জীবন

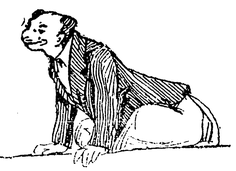

৬

যখন সমাজে গৌরীদানের প্রচলন ছিল, তখন দ্বাদশবর্ষীয় বীর বালক বাদল-ও রণক্ষেত্রে মুক্ত তরবারির সমক্ষে বক্ষো-বিস্তার ক'রে দাঁড়াতে সমর্থ হ'ত। বাদলের দল অন্তর্হিত হওয়ার পর, এই যামিনী-কামিনী-গোলাপ গোছের বরের আমলে অষ্টমবর্ষীয় কন্যার যে বিবাহ হয় না, তার জন্য আপশোষে মরবার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু মেয়ে চোদ্দয় পা দিলে-ই ছিঁচ্‌কে ঘরে একটু চট্‌কাভেঙ্গে ঘটকীর তল্লাস করতে হয় বই কি—শ্রীবিষ্ণু, ঘটকণ্ঠী অনেক দিন লোপ পেয়েছে, ঘটকীও যায় যায়; বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ আজ কাল হকারি থেকে ঘটকালি পর্য্যন্ত সকল কাযের ভার-ই বহন করছেন। ষোলোর কোলে উঠলে কলেজে পড়া কন্যার বিলাত-ফেরত পিতার গৃহলক্ষ্মী-ও হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের দিকে একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন; অথবা পঞ্চহাজারি ব্যারিষ্টার, কি দু-মোহরী ডাক্তার-পত্নী হ'লে কাঁচা শ্যামল-সিভিলিয়ানের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় 'ইংলিশম্যানের' এরাই-ভ্যাল-লিষ্টের উপর হপ্তায় একবার ক'রে চোখ বুলিয়ে যান।

আগেই বলেছি, পিসীমার প্রাণের ভিতর পৈতৃক পৈতা-গাছটার প্রভাব এখনও বেশ জাগ্রত আছে, সুতরাং ভ্রাতৃ-জায়াকে উদ্দেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু ভাবছ-টাবছ, কোথা-ও থেকে সম্বন্ধ-টম্বন্ধ আসছে?"

বৌ। তোমার দাদা বল্লেন, যিনি দু'টিকে সৎপাত্রের হাতে তুলে দিয়েছেন, বিভার বরাত তাঁরই হাতে। ওর 'হাকিম-মা'-ও বলেন যে, আপনারা বেশী তাড়াতাড়ি করবেন না; যাদের ভাগ্য ভাল, বিভার মতন বৌ তাদেরই ঘর আলো করতে যাবে।

ঠাকুরঝি। তা দেখেছি, মিসেস্ সোম——

বৌ। ঠাকুরঝি কি ঐ ব'লে তাঁকে ডাক না কি?

ঠাকুরঝি। না ভাই, প্রথম দু'দিন বলেছিলুম বটে, কিন্তু কি লক্ষ্মীমেয়ে তোমাদের এই মেজেষ্টারের স্ত্রীটি; আমায় বল্‌লেন, "বিভা আমায় মা বলে, আর আপনি আমায় এত পর করছেন?" তাই আমি এখন তাঁকে তৃপ্তি ব'লে ডাকি, আর তিনি আমায় বলেন, ঠাকুরঝি।

বৌ। বল্‌তে পারি নি ঠাকুরঝি, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী কত পুণ্যি ক'রে গেছেন, নইলে তোমার দাদার বরাতে এমন সব ভদ্র হাকিমের কাছে কায করবার সুবিধে কিসের জোরে হ'ল! যাই বলি, যাই কই না কেন, কেরাণী বৈ ত আর কিছু নয়, কিন্তু মহকুমা শুদ্ধ লোক ওঁকে ভয় করে না—মান্য করে—ভালবাসে; এ কেবল হাকিমরা নিজে খাতির করেন ব'লে ত?

ঠাকুরঝি। আর আমার দাদার শরীরে বুঝি কোনও গুণ নেই?

বৌ। আছে কি না আছে, তা আমি বল্‌তে যাব কেন?

ঠাকুরঝি। ঠিক ঠিক, তা'লে যে নিজের গুণেরই ব্যাখ্যা করা হবে। আমার বাপ-মা'র পুণ্যির কথা বল্‌ছিলে?, সত্যই তাই, নইলে তোমার মত লক্ষ্মীবৌ—

বৌ। ছাই—বিদ্যে ত "মহাভারতের কথা অমৃত-সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।" অবধি।

ঠাকুরঝি। হোক, আমার না হয় ছাত্রবৃত্তির ওপর আর দু' কেলাস। একেবারে অনুদ্ধপা আর কি! ভুলে যাচ্ছ কেন ভাই যে, আমাদের জন্ম সরস্বতী-গোত্রে, পাত্রস্থা হই লক্ষ্মী-পরিচয়ে। তার পর যা বল্‌ছিলুম, তৃপ্তির যত্নে আর তোমার শিক্ষায় বিভা যে ঘরকন্না করবার অনেক গুণ পেয়েছে, তা আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি: কিন্তু তোমার-আমার সেকেলে——

বৌ। ঠাকুরঝি-ও বুঝি এর মধ্যে সেকেলে হয়ে গেলে?

ঠাকুরঝি। হলুম বৈ কি ভাই, গিরিশ ঘোষ লিখেছিল, পড় নি, "তিন দশ পূর্ণ হয় অতীত যৌবন!" যাক্, তৃপ্তির স্বামী পাকা সিভিলিয়ান; উনি খদ্দর প'রে রাস্তায় বেরুলে-ও সাহেবী মান কমে না, বরং গৌরব বাড়ে; কিন্তু তোমার আমার ত তা নয়; লেফাফাখানা একটু দোরস্ত ক'রে রাখা চাই। এখানকার কলেজী ছেলের হাতে মেয়ে পড়লে সে সুধু রান্না খাইয়ে আর গলাবন্দ বুনে দিয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না; উপন্যাসের নায়িকার ছায়াটা জায়ায় দেখতে আজকালকার জামাইরা চান।

বৌ। কি বল আমায় করতে?

ঠাকুরঝি। ছেলেপুলে নেই বৌ, ঘরগুলো বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে; নে যাব আমি বিভাকে সঙ্গে ক'রে দিন কতকের জন্যে? উনি মধ্যে কৃষ্ণনগরে গেছলেন সাবজজী করতে। সেখানকার কলেজের অনেক সুখ্যাতি করছিলেন, গাত্র-ও একটা হয়ে যেতে পারে; আর শুনেছ ত এখনকার আমাদের চাল-চলন, তাতে——

বৌ। বুঝিছি ভাই, তুমি নিয়ে যাবে ভাই তোমার মেয়েকে, তাতে আমার কি আপত্তি হ'তে পারে? তবে তোমার দাদাও—ভাবছি, "হাকিম-বৌ" কি ওকে ছেড়ে দিতে রাজী হবেন?

ঠাকুরঝি। বড় বুদ্ধিমতী, বড় লক্ষ্মী ঐ বোসেদের ঘরের মেয়েটি, পড়েছে-ও তেমনই সোমেদের সংসারে। আমি সব কথা বুঝিয়ে বললে, আপত্তি করতে পারবেন না বোধ হয়। মনে ক'র না বৌ, যে, তৃপ্তির অমন মধুর স্নেহ থেকে বিভাকে তার পিসী বঞ্চিত করবে। বোধ হয়, কুষ্ঠেতে ফিরে গিয়েই ইনি সস্ত্রীক মিষ্টার সোমকে সেখানে যাবার জন্যে একবার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাবেন; সেই সময় তৃপ্তি বিভাকে দেখে-ও আস্‌তে পারবে। জজ-সাহেবের এঁর উপর যে রকম দু-নজর শুনলাম, তাতে ক'রে বোধ হয়, কুষ্ঠেতে গাধার বোঝা বইবার জন্য আমাদের বেশী দিন থাকতে হবে না।

৭

বিভাকে তার পিসীমা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার পর প্রায় ছয় দেড়েক কেটে গেছে। পিসীমার পালিশে বিভার অঙ্গ-শোভার অনেক উন্নতি হয়েছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। নিজের সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি শিষ্ট শান্ত ফুল্ল-চাঁপার কলিটিকে খাইয়ে-শুইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে নারী-প্রাণের সহজাত মাতৃবৃত্তির পরিতৃপ্তি-প্রয়াসে মনের আধখানা নিয়োজিত ক'রে দিলেন। ঠাকুরাণীর শরীরে অনেক গুণ, একটু-খানি মাত্র খাদ ছিল Vanity, ঠিক দর্পণ নয়; তবে মুখে একটু আপনাদের জাঁক না ক'রে তিনি থাকতে পারতেন না। রান্না-বান্না প্রভৃতি গৃহস্থালীর অনেক কায তিনি ভাল রকম-ই জানতেন, কায করবার বল-ও এক সময় যথেষ্ট ছিল; কিন্তু প্রয়োজনের জন্য পরিশ্রম করাটা তিনি উচ্চ জীবনের পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর ব'লে এদানী মনে করতেন। তাঁর স্বগতটা উক্তিতে পরিস্ফুট হ'লে এইরূপ দাঁড়াতো,—"দাদা কেরাণী, সুতরাং বৌ যে রাঁধবে, বাটনা বাটবে, হাতে ক'রে ঘর-দোর পরিষ্কার করবে, এ ত ধরা কথা, না করলে নিন্দা। মেজ বট্-ঠাকুর হাজার রোজগার করুন—এটর্ণী বই ত নয়, মেজ-দি না হয় মাঝে-মাঝে বামুনের সঙ্গে যোগাড় দেন বা নিজে দু'খানা লুচি ভাজেন কি মোহনভোগটা-আসটা তৈরী করেন, সেটা-ও তত বেমানান ঠেকে না; কিন্তু আমাদের ইনি হ'লেন একটা হাকিম; হুজুর ধর্ম্মাবতার এই সব ব'লে লোক ডাকে, কে জানে যে এক দিন উনি ফাঁসীর হুকুম দেওয়া জজ পর্য্যন্ত না হবেন, তবে—ওঁর স্ত্রী হয়ে যদি আমি বেড়ী ধ'রে হাঁড়ি নামাই বা রেকাব-গেলাস মাজতে বসি, তা'লে ওঁকে কতটা খাটো করা হয়।"

সোম সাহেবের সংসারে বিলাতী চাক্‌চিক্যের খাঁটি নমুনা দেখলে-ও হাকিম-মা'র জীবনের মাদকতাবিহীন সৌন্দর্য্যসুধা-দীপ্ত প্রফুল্লতা ও অনবসর কর্ম্মানন্দের উচ্ছ্বাস, বিভাকে তার গর্ভধারিণীর হরিদ্রা-লিপ্ত রন্ধন-পিন্ধন, গৃহিণী-গর্ব্বের জয়পতাকা ব'লে মনে করতেই শিখিয়েছিল। আপত-দৃষ্টিতে যে সমস্ত গৃহকর্ম্ম এখন অনেকে হীন ব'লে মনে করেন, অবলা-বান্ধব সংস্কারকরা যে সব কায "দাসীপনা" আখ্যায় কলঙ্কিত করেন, আত্মসম্মানের তেজোদীপ্তি সে-ই সব কায তৃপ্তির হাতে তুলে দিয়ে গৌরবান্বিত করেছিল। বাংলোর উত্তরদিকের বারান্দায় একখানি টুলের উপর ব'সে সকালে তৃপ্তি যখন ছুরি ধ'রে তর-কারীগুলি ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে সুন্দর সুন্দর খণ্ডে বিভক্ত ক'রে সামনের টেবলের উপরিস্থিত ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে রাখতেন, তখন উড়িষ্যাবাসী বৃদ্ধ পাচক প্রভঞ্জন ঠাকুর রান্নাঘরের রকে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে ভাবতো, এ মেয়েটি কেবল প্রভুপত্নী ব'লে মাতৃ-সম্বোধনের অধিকারিণী নন, "মা" বুঝি এই মূর্ত্তিতে-ই এ জগতে পূজিতা হন। আবার অপরাহ্ণে প্রসাধনক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার পর-ও যখন ঠিক সেই স্থানে সেই আসনে ব'সে পর-প্রভাতে পাকের প্রয়োজনীয় চাউল-দাইলগুলি একটি একটি ক'রে বাছতেন বা কোন কোন দিন ছানিত ইষ্টকচূর্ণের সাহায্যে খাগ্‌ড়াই কাঁসার রেকাব-গেলাসাদির বা বারাণসীর পিতলের শোভা ঝলমলিয়ে তুলতেন, তখন পরিচারক-পরিচারিকারা মনে করতো, আমাদের শ্রমকে

DOUBLE COLOUR PAGE

গৌরবান্বিত করবার জন্যই ইনি নিজের হাতে এই সব করেন, নইলে হুকুম করলেই ত হয়।

বঙ্কিম বাবু কোথায় এক যায়গায় লিখে গেছেন যে, যে বাড়ীতে ঝি নেই, সে বাড়ীতে ঝগড়া, আবর্জ্জনা আরও অনেক কি—কি যেন নেই; কিন্তু বঙ্গের সৌভাগ্যবশতঃ আজ যদি বঙ্কিম বাবু জীবিত থাকতেন, তবে তিনি জিতেন সোমকে ডেকে বলতেন,—"বাবা, তোর বাড়ীর ঐ পরিচ্ছন্ন, শান্ত, মৃদুভাষী, কার্য্যপটু তিনটি ঝির মধ্যে একটিকে আমায় দে, আমি না হয় মাইনেটা দুনো ক'রে দোবো।"

এই কুটীরবাসিনী ও সৌধ-শোভাকারিণী দু'টি মায়ের আদর্শ ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিভাবতীকে মার্জ্জিতরুচি বঙ্গ গৃহলক্ষ্মীর কমলাসনে উপবিষ্ট হওয়ার উপযুক্ত ক'রে তুলছিল। তাহার লজ্জায় আড়ষ্টতা ছিল না, প্রসাধন অষ্টাঙ্গবন্ধনে পরিণত হয় নি। সৌষ্ঠবটুকু গ'ড়ে তুলছিল স্বাস্থ্যজনিত জীবনীশক্তি; অকাল-যৌবনাগমে মুগ্ধার বাল্য-তারল্য ক্ষুব্ধ হ'তে পারে নি। জননীর পাকশালার পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলা তার অপরাজিতা-প্রতিম চক্ষুদুটিকে সূপ-শিল্পী কবিতার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে শিক্ষা দিয়েছিল, আবার তৃপ্তির বিরামকক্ষের দক্ষ-হস্তবিন্যস্ত অনাড়ম্বর শোভা তাকে বুঝিয়েছিল যে, গৃহসজ্জায় প্রাচুর্য্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

পিসীমা'র প্রসাদে অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যের সঙ্গে বিভার প্রথম পরিচয়। চিত্রকলার প্রেরণা যার প্রাণে নাই, সে সাজতে-ও জানে না, সাজাতে-ও জানে না। যেমন কতকগুলো রং যোগাড় করতে পারলেই আনাড়ীতে ছবি আঁকতে পারে না, ধারে কুনকে-দুই কথা পেলেই কাব্য লেখা তেমনই হয় না, রাশি খানেক আয়না, আলমারি, সোফা, সেটি, টিপয়, টেবল, পর্দ্দা, ক্রীন, গ্লাসওয়ার কিনে ফেলবার টাকা থাকলেই ঘর সাজানো হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রিয়তমা প্রফুল্ল—বাহুল্যে; প্রিয়তমের উল্লাস—প্রিয়া-অধরে হাসির বিকাশে।

প্রথম সপ্তাহটা স্নেহের, আদরের, উৎসব ও কর্ম্মের স্থলে নর্ম্মজীবন বিভার পক্ষে একটু অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। অহোরাত্রির মধ্যে পাঁচ-ছ'বার কাপড় বদলানো, মুখে সাবান ঘসা, চুল বুরুস করা, চা-কাফি খাওয়া, চাকর-চাকরাণীদের সঙ্গে হুকুম করা ছাড়া অন্য সম্পর্ক না রাখা ইত্যাদি আদপ-কাদয়ার বন্ধন মেয়েটির স্বভাবের সঙ্গে সহজে খাপ খাচ্ছিল না। এমন সময় বেচারি হাতে একটা কায পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেল!

জানকীনাথের মনে একটা আপশোষ ছিল যে, একজিকিউটিভ সার্ভিস-ভুক্ত হরগোবিন্দ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল, নবীন, যতীন্দ্র সিংহ, আরও কত জন, এমন কি, সেকেলে তর্কালঙ্কার মদনমোহন ডেপুটী পর্য্যন্ত কাব্য লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বার থেকে মাইকেল, হেমচন্দ্র, প্রভাতচন্দ্র, নরেশ গুপ্ত প্রভৃতি অমর কবি ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকগণ দেখা দিয়েছেন। ডাক্তারের মধ্যে সেকালে এক দুর্গাদাস কর বরিশালে ব'সে "স্বর্ণশৃঙ্খল" নাটক লিখেছিলেন, আর তারকনাথের "স্বর্ণলতা" তবু প্রফেসনের মানটা বজায় রেখেছে; কিন্তু সব-অর্ডিনেট জুডিশিয়াল সার্ভিস কি এতই রাবিশ যে, সে সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জন কবি বা ঔপন্যাসিকের নাম মনে আসে না; চুঁচুড়ার গোপাল ঘোষ মুন্সেফি করতেন অথচ কবিতাও লিখতেন বটে, তা সে দু' চারটা বঙ্কিমি-বঙ্গদর্শনের পুরাতন পাতার মধ্যে অজ্ঞাতবাসে আছে। আমার দ্বারা সার্ভিসের এই কলঙ্কমোচন কি হ'তে পারে না?

গৃহ-গণ্ডীর ঔজ্জ্বল্য, নথীর আজাড় ঠেলে জানকীনাথের বুকের ভিতর একটু কবিত্বের স্নিগ্ধ আলো প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস বলতেন, আমাতে আর চীনের সম্রাটে মিলে সভ্য জগতের তিন অংশ শাসিত করি, অথচ দু'জনেরই যথাসময়ে আহারের অবসর হয়। সময় বিভাগ ক'রে গুছিয়ে কায করতে শিখি না ব'লে আমরা বিরামের অবসর পাই না।

যাঁহাদের চক্ষুতে লক্ষ্য করবার শক্তি আছে, তাঁরা জানেন যে, মানুষের জীবনের গতির উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কত আধিপত্য; আপাতদৃষ্টিতে যে সব কারণ অতি সামান্য ব'লে বোধ হয়, সেই সব-ই সময়ে সময়ে মানব-চরিত্রকে এক বা অন্য ভাবে গঠিত ক'রে ফেলে। কোট-প্যাণ্ট পরলে আলস্য যেন ঝাঁ ক'রে স'রে প'ড়ে দেহের মধ্যস্থ চাঞ্চল্যকে জাগিয়ে দেয়, আবার মিহি ধুতির কোঁচা দুলুলে-ই একটা তাকিয়ার জন্য হাত বাড়াতে ইচ্ছা করে। স্নান ক'রে উঠে গরদের জোড়টা প'রে অতি বিলাসীর মনে-ও নিষিদ্ধ স্থানে যাবার লালসা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে। সদর দরজার পাশে যার বসবার ঘর, গাম্ভীর্য্যের মৌন-বহরটা তার খাটো হয়ে যায়,

দিবালোকের পরিমাণের তারতম্য-ও গৃহবাসীর প্রাণে রম্য বা তদ্বিপরীত ভাবের সৃষ্টি করে।

কুমিল্লার বাসার আমকাঠের তক্তা, আড়কাঠায় ঝুল, পিলসুজের কলঙ্ক ও আরশুলার আতঙ্ক জানকীনাথের যে প্রাণে কাঁটা-নটের গাছ গজিয়ে দিয়েছিল, কুণ্ঠিয়ার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের প্রভাব সেই প্রাণে-ই বেলফুল ফুটিয়ে দিলে। ডিক্রী-ডিসমিস আড়ডানো লেখনীকে রমণীয় উপন্যাস-প্রসবিনী করবার জন্য তিনি উৎসুক হলেন। একনিষ্ঠ ধ্যানে ভগবদ্দর্শনলাভ হয়, আর একটা প্লট মাথায় আসে না? তার পর ইতস্ততঃটা দাবিয়ে রেখে কাগজ-কলম নিয়ে বসলে-ই কোত্থেকে যেন ভাব-ভাষা এসে অক্ষরের হার গাঁথতে থাকে।

পত্নির এই মন্দঃ কবি-যশঃপ্রার্থী মানসিক শক্তি সাধ্বীকে চরিতার্থ করলে। তিনি মনে মনে বিলাতী বটঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে নেকটাই, হ্যাট, কৌচ, কেদারা, কার্টেন, বুকসেল্ফ, রিডিং ল্যাম্প, সেণ্ট-বটল প্রভৃতি যে সব নগরদেবতার আশীর্ব্বাদে স্বামীর হৃদয়ে কবি-প্রতিভা জেগে উঠেছে, তাঁদের সপ্রণাম স্মরণ করলেন, দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের যৌবন-পৌর্ণমাসী শেষে জ্যোৎস্না-হাসিকে প্রধানা পূজারিণী ব'লে ধন্য ধন্য উচ্চারণ করেছিলেন কি না, তা জানকীনাথের প্রাণের প্রতিধ্বনি-ই জানে।

সুপথ্যাদানে কল্পনা-রূপসীর পরিপুষ্টিসাধন-প্রয়াসে মুন্সেফ-কবি কলিকাতা থেকে খানকতক বাজারকাটতি কন্টিন্যাণ্ট্যাল নভেল ও তাজা তাজা বাঙ্গালা উপন্যাস আনিয়ে নিলেন; মৃগয়াহৃ-চায়ের পর বাঙ্গালা উপন্যাস প'ড়ে শোনাবার আরামপ্রদ ভার পেলে বিভা।

তৃপ্তির যত্নে বিভা ছবি-ছাপা হাল্‌কা হাল্‌কা ইংরাজী গল্প-টল্প একটু আধটু পড়তে পারতো; কিন্তু গ্যাব্রো-টাব্রো বোঝবার মত ইংরাজী শিক্ষা তার হয় নি। তা'তে কি, পিসেমশাইকে শোনাবার নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া নিষ্কর্ম্মা বিভা এখন বঙ্গভাষার ললিত চর্চ্চাতে-ই কর্ম্মব্রত অবলম্বন করলে।

বাস্তবজীবনের মাধুরী, কার্য্যপটুতার গৌরব, শ্রমের মহিমা বিভার মনে ক্রমে খর্ব্ব হয়ে দাঁড়ালো। মাতার হস্তে সম্পাদিত হ'তে দেখে সে যে সমস্ত কার্য্য ভাগ্যবতীর সম্পদ ব'লে মনে করতো, সেই সকল কার্য্য-ই এখন ঘর্ষিত বেতনভোগীদের হাতে প'ড়ে কুৎসিততা প্রাপ্ত হয়েছে দেখে করদক্ষতা মাত্র-ই তা'র চক্ষুতে ভদ্রতা-বিরোধী ক্লেশকর নিয়োগ-পালন বোধ হ'তে লাগল। পিসীমা'র বহুব্যয়সাধ্য সংসারে-ই শুধু অলস-বিলাসের এই উপাসনা লক্ষ্য করে নি; যে কতিপয় প্রতিবেশী কর্ম্মচারী ও ছোট ছোট উকীল-মোক্তারদিগের বাসায় সে পিসীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে, সেইখানেই দেখেছে, শ্রমের এই অবমাননা; গৃহকর্ত্রী অর্থে আদেশদাত্রী রাজ্ঞিকুসুম।

পিসেমশায়ের মুখে বিভা হামেশা শুনত যে, সাইকলজী ভাল ক'রে না পড়া থাকলে ভাল উপন্যাস কেউ লিখতে পারে না। যে বই পড়লে সাইকেল চড়তে শেখা যায়, তার নাম সাইকলজী, এটা সে সহজে-ই বুঝতে পারলে, কিন্তু সাইকেল চড়ার সঙ্গে উপন্যাসের সম্বন্ধটা যে কি, তা সে কোনমতে-ই ঠিক করতে পারলে না। পড়তে পড়তে হয় ত ক্রমে বুঝতে পারব ভেবে সে মাসখানেকের মধ্যে দেখলে যে, 'কঠিনা' 'চাতুরী' 'তৃষিনা' 'মেজো ঠাকুরঝি' 'নাপতে-বৌ' 'গৃহত্যাগিনী' 'বিধবা-বারাঙ্গনা' 'দেবর-দয়িতা' 'ভাসুর-ভাবিনী' প্রভৃতি কলায় কলায় বিকশিত সতী-সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যপূর্ণ স্বর্ণ-সাহিত্যের অভিসার-কুঞ্জে প্রবেশের জন্য বঙ্কিম-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাইকেলের সাহায্যে লজ্জার সীমা অতিক্রম ক'রে প্রেমের পর্দ্দার পারে প্রবেশ কত প্রয়োজনীয়।

পুরাতন ভূতের গল্পে আছে যে, কোন ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে একটা ভূতকে আপনার চাকর করেছিল; ভূত চাকরী নেবার সময় এক সর্ত্ত করে যে, তা'কে সর্ব্বদা কর্ম্ম দিতে হবে; যে দিন কায দিতে না পারবে, সেই দিন আমি তোমায় মেরে ফেলব। পঞ্চভূত-ও যখন শরীর নাম ধারণ ক'রে জীবনের চাকরী স্বীকার করে, সেই দিন চুক্তি-নামায় লিখিয়ে নেয় যে, আমায় রীতিমত কায করাতে হবে, যে দিন আমায় অলস বসিয়ে রাখবে, সেই দিন-ই আমি যমের পেয়াদা রোগকে তোমার কাছে ডেকে দেব।

"ক্ষিদে নেই" "মাথা টিপ-টিপ" "অম্বল" "বুকের কাছটা কেমন-কেমন" প্রভৃতি নীচের ক্লাশের পড়া সাঙ্গ ক'রে বিভা যে দিন প্রথম হিষ্টিরিয়ার একজামীন দিয়ে মহিলা-কলেজে প্রবেশের উপযুক্ত ম্যাট্রিক্ পাশ করলে, সে দিন পিসীমা একেবারে উৎকণ্ঠা আশঙ্কার আনন্দে বিভোর হয়ে পড়লেন।

চারিটার মধ্যেই কাছারী বন্ধ ক'রে জানকীনাথ যখন

বাসায় ফিরলেন, তখন দেখলেন, দু'খানা গাড়ী দ্বারস্থ, আর্দ্র-লোচনা বনিতা ব্যতিব্যস্ত, ডাক্তাররা করছেন ইতস্ততঃ, গৃহস্থ বায়ু ল্যাভেণ্ডার-গ্রস্ত, বিভার কেশরাশি অবিন্যস্ত, আর ক্যালকাটায় কেনা স্যালভোলেটাইলের শিশিটা কিশোরীর নাসিকা-সমীপস্থ।

জানকী সাহেবের য়্যারিষ্টোক্রেটিক সরঞ্জামের যেটুকু অনাটন ছিল, বিভার কল্যাণে সে-দিন তা পূর্ণ হয়ে গেল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে-ই গেজেট হ'ল যে, জানকী-নাথ সান্যাল নদীয়া সদরে য়্যাডিশনাল সাব-জজ হয়েছেন।

বিভাকে এখন তার মা'র কাছে পাঠান চলে না। সাহিত্যিক-রথারোহণ-ব্রতসাধনে তার মত ফুল্লচিত্তবতী এক-নিষ্ঠা উত্তরসাধিকা জানকীনাথ এখন কোথায় পাবেন, সুতরাং পিসীমা পত্র-বিনিময়ে ভ্রাতৃজায়ার সম্মতি আনিয়ে কৃষ্ণনগর যাত্রাকালে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সঙ্গে নিলেন; 'বেণী মুন্সীর' পাণ্ডু-লিপিখানি রেশমী রুমাল জড়িয়ে বিভা নিজের হাতবাক্সের মধ্যে রাখল।

সাইকলজির সঙ্গে ক্রাইসোনলজির বৈজ্ঞানিক-রস মিশিয়ে প্রণয়পূর্ণ বিবাহিত জীবনের নাগরদোলায় দু'টি নর-নারীর দোদুল্য আরোহণ অবরোহণ দেখাবার জন্য জানকী সাহেব 'বেণী মুন্সী' উপন্যাসখানি লিখতে আরম্ভ করেছেন। বেণীর পিতামহী সূতিকাগৃহে মাতৃহারা হন, যে স্ত্রীলোকটির স্তন্যপানে ঠাকুরমা'র খুকী-প্রাণ পুষ্টিলাভ করে, তার স্বামী বহুরূপীর ব্যব-সায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত; যে পুরুষ নিজের দেহের উপর জালিয়াতি করে, তার শোণিতস্থ Forgiphilus bacteria অর্থাৎ জাল-জীবাণু ফিজিওলজিক ক্রিয়ার দ্বারা পত্নীর স্তন্যে প্রবেশ করে ও পরে ধাত্রীমাতার দুগ্ধ-দোষ-পোষ্য শিশু-শরীরে সঞ্চারিত হয়ে ভবিষ্যতে পিতামহীপদপ্রাপ্তা শিশুকন্যার শিক্ষিত সচ্চরিত্র সুদর্শন যুবা পৌত্র বেণী মুন্সীকে জালিয়াত ক'রে ফেললে এবং পতিপ্রাণা উচ্চকার আমেরিকান সতীত্বের অপূর্ব্ব প্রভাবে পুলিস-পীড়িত মুন্সী-পতি ইত্যাদি ইত্যাদি রহস্যের জ্যোৎস্নায় উপন্যাস প্রোজ্জ্বল হবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

চৈতালি

বরষের শেষে হরষে ভরিয়া
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা ;—
শ্যাম-অঞ্চলা ধরণীর বুকে
ফুটেছে রজনীগন্ধা !
কাননে কাননে বিকশিছে ফুল,
আম্র-শাখেতে ধরেছে মুকুল,
মধুলোভে আসে ধেয়ে অলিকুল
গুঞ্জরি মহানন্দে ;—
পিক-বধূ আজি উঠি ঝঙ্কারি
কাহার চরণ বন্দে ?

গোপ-বধূগণে হোরি খেলে ওই
নীল শাটীপরা গগনে ;—
ক্রৌঞ্চমিথুন মিলন-আশায়
ব্যাকুল স্বপন বপনে !
নব-কিশলয়ে সজ্জিত আজি তরুবর,
বিরতি-হৃদয়ে হানিতেছে কে গো ফুলশর ?
দম্পতি-হিয়া কাঁপিয়া ফিরিছে থর থর
ভুলিয়া গিয়াছে লজ্জা ;—
দয়িতের পাশে দয়িতা-মিলন
সাজায়ে বাসক-সজ্জা !

নাচিছে আজিকে নটরাজ
তাণ্ডব তালে ঘন ঘন ;
কালবৈশাখী-গগনেতে দেয়া
করে গম্ভীর গরজন !
আসে পুনঃ দেশে হেসে দশভুজা,
সন্ন্যাসী করে চড়কের পূজা,
ভক্তের হৃদি উঠে দ্রুত নেচে
ঢক্কের তালে তালে !
গৈরিক প'রে এসেছে চৈত্র
জয়টিকা দিয়া ভালে !

উড়ায়ে রথের বিজয়-কেতন
নবীন আসিছে রঙ্গে ;—
বর্ষ-শেষের উৎসবে আজি
মিতালি প্রাচীন সঙ্গে !
মালাখানি দিয়ে নূতনের গলে,
কহিছে চৈত্র—'যাই সখা, চ'লে,
আসিব আবার বরষের শেষে
সাথে লয়ে আমি হর্ষ !'
উলু দাও সবে, শঙ্খ বাজাও
আসিছে নূতন বর্ষ !

শ্রীহরিপদ গুহ বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভারতী।

নব-সাহিত্যের আগমন

১

বহুকাল পূর্ব্বে আমি একটি হিন্দি গান শুনি, যার কথাগুলো আজও আমার মনে আছে—যদিচ সে গান একবার ছাড়া দু'বার শোনবার সৌভাগ্য আমার অদ্যাবধি হয় নি।

সে গানের প্রথম কথা কটি এই,—

"নয়ী আয়ী পুরানীকে দূর করো রে"।

গায়ক ছিলেন জাতে হিন্দুস্থানী এবং এতাদৃশ "তন্দুরস্ত" যে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে কুস্তিগির পালোয়ান ব'লে ভুল হ'ত, মনে হ'ত, ওস্তাদজি জীবনে ততটা গলা ভাঁজেন নি—যতটা ভেঁজে-ছেন মুগুর; এবং তিনি এতটা ফূর্ত্তি ক'রে এতটা তারস্বরে এমন ভাব বাৎলে অর্থাৎ ঘুসো পাকিয়ে—"দূর করো রে, দূর করো রে, দূর করো রে" এ কটি কথা এতবার আবৃত্তি করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তার স্বজাতীয় সঙ্গতী ডাইনে-বাঁয়াকে এমন নির্ম্মমভাবে পিটছিলেন যে, সে গান-বাজনা শুনে, হতভাগিনী পুরানীর প্রতি আমার বেজায় মায়া করছিল, যদিচ সেই সঙ্গে ব্যাপারটিতে মজাও লাগছিল।

"নয়ীর" অভ্যর্থনার জন্য ওস্তাদজি নানারকম ভাল ভাল বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাঁর ঘরে ছিল "সোনেকো থালিয়া" নিজে খাবার ও নয়ীকে খিলাবার জন্য; আর ছিল "সোনেকো গাড়ুয়া" আর তার অন্তরে "গঙ্গাজিকো পানি" নিজে পান করবার ও নয়ীকে "পিলাবার" জন্য; আর ছিল "সোনেকো খাঁটিয়া", পান-ভোজনান্তে নিজে শোবার ও "নয়ীকে" শোওয়াবার জন্য।

এ সব আয়োজনের কথা শুনে বুঝতে পারলুম না, ক্ষুধাতৃষ্ণা কার বেশী, "নয়ীর" না ওস্তাদজির। বোধ হয়, দুজনেরই সমান। তবে বুঝলুম যে, এ সঙ্গীতের প্রেরণা হচ্ছে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না।

সে যাই হোক, এই নব-দম্পতির আনন্দের কথা শুনে আমি নিরানন্দ হয়ে গেলুম—বেচারী পুরানীর দশা ভেবে। প্রথম বয়সে পরের দুঃখে কাতর হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভা-বিক। সহৃদয়তা জিনিষটেও একরকম যৌবন-সুলভ দোষ। মানুষের মন শক্ত হয় কালক্রমে—দর্শনের ফলে।

তার পর সংসারের সঙ্গে কারবার ক'রে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, "নয়ী" আসবার অথবা তাঁকে আন্‌বার কথা উঠলেই পালোয়ান-জাতীয় লোকরা এই ব'লে গোঁফে চাড়া দিয়ে গান ধরেন যে—"পুরানীকে দূর করো রে, দূর করো রে, দূর করো রে।" এঁরা যখন ভবিষ্যতের সঙ্গে ভালবাসায় প'ড়ে যান, তখন এঁরা বর্ত্তমানের প্রতি একেবারে নির্ম্মম হন, এবং তখন এঁরা জোর গলায় বলেন—কারও কোন কথা শুনতে পারি নে, কেন না—"মন-প্রাণ যাহা ছিল, দিয়ে ফেলেছি"—আগন্তুক "নয়ীকে"। বীর পুরুষের অর্থাৎ যে লোকের মস্তিষ্ক, muscleয়ে পরিণত হয়েছে, তাকে মানুষে ভক্তি না করুক, ভয় করতে বাধ্য। এই কারণে ভয়ে ভয়ে এই সত্যটা পাঁচ জনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মুখের ধমকে পুরানী দূর হয় না, অত সহজে, ও "কমলি নেহি ছোড়তা।" যে স্বত্বে পুরানী স্বত্ববান্, সে স্বত্বের চাইতে জবর স্বত্ব পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই, আর তার নাম দখলি-স্বত্ব। পুরা-নীকে দূর করবার মামুলি উপায় হচ্ছে নিজে তার কাছ থেকে দূর হওয়া—চুপি চুপি—সোরহাঙ্গাম ক'রে নয়।

২

এখন নয়ীর কথায় ফিরে আসা যাক্।

কিছু কাল থেকে ভারতবর্ষে পলিটিকাল, ইকনমিক, সামা-জিক ইত্যাদি বহুবিধ "নয়ী" আসছেন। তাই "দূর করো রে দূর করো রে" ধ্বনিতে দেশের আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এ খবর সবাই জানেন। কারণ, এ সব "নয়ী" আস্‌ছেন খবরের কাগজের প্রসাদে!

সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশে আর একটি "নয়ীর" আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হচ্ছে। এ সংবাদপত্রের "নয়ী" নয়, সাহিত্যের "নয়ী।" সরস্বতী না কি নতুন মূর্ত্তি ধ'রে বাঙলাদেশে অচিরে দেখা দেবেন। এ কথা শুনে আমি মহা উৎফুল্ল হয়েছি। কেন যে হয়েছি, বলছি।

ছেলেবেলায় একটি বৃদ্ধ বোষ্টম ভিখারীর মুখে একটি গান শুনি। সে গানের প্রসাদে আমি একটা মহা শিক্ষালাভ করেছি, কেন না, আমি হচ্ছি সেই জাতের লোক—যারা আর্টের অন্তরে শুধু ফিলজফির সাক্ষাৎ পায়, প্রাণের অন্তরে শুধু জড়ের রূপ দেখতে পায়।

বৃদ্ধ আমাদের সম্বোধন ক'রে ভাঙ্গা গলায় গান ধরলেন ;—

"না খেলে গাঁজা না খেলে গুলী
ভবে এসে করলে কি ?"

এ গান শুনে তখন বাল্যসুলভ চাপল্য বশতঃ হেসে উঠেছিলুম,—কারণ, তখন বুঝিনি, ও দুটি ভৌতিক পদার্থের আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। এখন বুঝছি যে, ও গান একটা মহা প্রশ্ন।—যারা ভবে এসে কি গাঁজা কি গুলী কোনরূপ নেশার বশীভূত হয়নি, তারা এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারে না, আর তারাই হচ্ছে বেশির ভাগ লোক।

চিত্রগুপ্তের খাতা শুধু কেরাণীর হাজরে বই নয়, অর্থাৎ তাতে দিনের পর দিন শুধুই present লেখা থাকে না, আমরা ভবে এসে কে কি করছি, তারও হিসেবও ও কেতাবে থাকে। শুধু এ পৃথিবীতে present থাকবার জন্য আমরা যে সব নিত্য কর্ম্ম করি—যথা অন্নধ্বংস ও বংশবৃদ্ধি, তার হিসেব—চিত্রগুপ্ত জানেন না। কারণ, তাঁর কথা হচ্ছে পৃথিবীতে কারও present থাকবার কোনও দরকার নেই—যদি না সে আরও কিছু উপরি কায করে। আর যার ঝোঁকে মানুষে এই বাজে কায করে, তার নাম নেশা।

এই নেশাখোরের দল আবার সবই এক নেশা করে না। কারও নেশা পলিটিকস্, কারও নেশা টাকা, কারও নেশা সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি। আমি এ সকল নেশাই এস্তমাল করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ও সব আমার ধাতে সইল না। এর কারণ, এদের কোনটা এতটা জলো যে, আমার মোটেই ধরে না, আর কোনটা বা এত মোটা যে, বেজায় ধরে, এত চেপে যে, তখন আর আমায় আমি থাকি নে। তাই আমি ভবে এসে খোস-মেজাজে কিছু ক'রে থাকি ত সে সাহিত্যরস পান, আর এ পানের ফলে যা হয়—তার নাম গোলাপী নেশা; সুতরাং আমাদের সাহিত্য-জগতে যে "নয়ী" সাকী আসছেন, নূতন পানপাত্র ভ'রে নতুন কাব্যরস নিয়ে, যে রসের অন্তরে গন্ধ থাকবে ছোট এলাচির, আর রঙ থাকবে জাফরাণের, এ সুসমাচার আমার কাছে মথি-লিখিত সুসমাচারের তুল্য। তবে সন্দেহ হয়, এ আনন্দ ত সেই জাতীয় আনন্দ নয়—যার বাঙলা নাম হচ্ছে "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ?"

৩

বঙ্গসরস্বতী যে "নয়ী"রূপে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তার প্রমাণই বা কি, পূর্ব্বলক্ষণই বা কি ?

"সম্ভবামি যুগে যুগে" এ হচ্ছে শুধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা নয়, ভগবতী সরস্বতীরও কথা। সরস্বতীও যুগে যুগে নব কলেবর ধারণ ক'রে নব বেশে ধরাধামে যে অবতীর্ণ হন, তা অবশ্য সকলেরই জানা আছে। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আগমনের তারিখ ও ঠিকানা ব'লে দেন নি, তখন উক্ত শ্রুতির উপর নির্ভর ক'রে এ ভরসা পাওয়া যায় না যে, সরস্বতী ১৩৩৫ সালের পয়লা বৈশাখ তারিখে হয় কলকাতায়, নয় ঢাকায় বৈশাখী ঝড়ের মত লোকের কাপড়-চোপড় উড়িয়ে হুহু শব্দে এসে পড়বেন। দৈববাণীর ধর্ম্মই এই যে, তা আশার কথা নয়, আকাশের কথা—ভাষায় যাকে বলে ফাঁকা আওয়াজ!

সুতরাং এখন নব সাহিত্যের আগমনের পূর্ব্বলক্ষণগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক্। শুনতে পাচ্ছি, নব-সাহিত্যের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে নব সমালোচনায়। যেমন রণবাদ্য শুনে বোঝা যায় যে, বিজয়ী সেনানী আসছেন। যখন তরুণের দল সুর ধরেছে—রবীন্দ্র-সাহিত্যকে "দূর করো রে, দূর করো রে, তখন "নয়ী" নির্ঘাত আসছে, বঙ্গদেশ রূপে আলো ক'রে।

এ কথা বিনা বাক্যে মেনে নেবার পক্ষে আমার মনে দুটি বাধা আছে।

যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কান-ফাটানো সমালোচনা করছেন, তাঁরা কি সবাই তরুণ ? আমি ত দেখতে পাই যে, যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তেড়ে শিং বাঁকাচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগ হচ্ছেন সেই জাতীয় সাহিত্যিক—যাঁরা শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেছেন। এ সমালোচনা আগন্তুক সাহিত্যের আগমনী নয়, তাঁদের স্ব-রচিত পূর্ব্ব-সাহিত্যের গুণকীর্ত্তন ও এক রকম সাহিত্যিক টনিকের বিজ্ঞাপন!

তার পর সাহিত্য-জগতের ইভলিউসনের ধারাই এই যে, আগে আসে সাহিত্য, তার পর তার সমালোচনা। আগে সমালোচনা দেখে তার লেজ ধ'রে সাহিত্য আসছে, এরূপ অনুমান করা তদ্রূপ,—আগে গাড়ী, তার টানে ঘোড়া পিছনে আসছে অনুমান করা যদ্রূপ।

তবে যদি কেউ বলেন যে, এই সমালোচনাই প্রমাণ যে, নব-সাহিত্যের সৃষ্টির ইচ্ছা তরুণদের মনে যখন জাগরূক হয়েছে, তখন তারা নব-সাহিত্য সৃষ্টি করবেই করবে—তা হ'লে বলি, নব-সাহিত্য নব ইচ্ছার হাতধরা নয়, কারণ, সাহিত্য-সৃষ্টি মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।

"বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই" ? এ আক্ষেপ কাব্যজগতে ইতঃপূর্ব্বে বহু বংশীধারীকে করতে হয়েছে এবং অতঃপরও করতে হবে এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা বেশী আক্ষিপ্ত, তাঁরা বাঁশী বাজল না দেখে, তাকে বাঁশ হিসেবে ব্যবহার করেন এবং বংশের উক্তরূপ ব্যবহারকেও অনেকে সমালোচনা ব'লে ভুল করেন। বলা বাহুল্য, এরূপ সমালোচনা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের অগ্রদূত নয়, বর্ত্তমান সাহিত্যের ভগ্নদূত।

৪

এই সব সমালোচনা প'ড়ে শুনে আমার মনে হয় যে, যাঁরা জোর গলায় নব-সাহিত্যকে আবাহন করেছেন, তাঁরা সব তরুণ পাঠক, 'তরুণ লেখক নয়, কারণ, যে যথার্থ লেখক, সে ত সাহিত্যসৃষ্টিই করছে, সে আবার আহ্বান করবে কাকে ? সাহিত্য ত বাইরের জিনিষ নয়, যাকে নানারূপ স্তব-স্তুতির দ্বারা ঘরে আনতে হবে। সাহিত্য-বস্তু নিজ শক্তিতে নিজের অন্তর থেকে গ'ড়ে তুলতে হয়। সাহিত্যের স্বরাজ্য কোনও দেশী-বিলেতি কমিশনের প্রসাদে পাওয়া যাবে না।

অপর পক্ষে যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে জন্মেছে শুধু পাঠক হবার জন্য,সে যদি লেখক হ'তে চায় ত তার সমালোচক হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। উদাহরণ স্বয়ং আমি। সমালোচক জানেন শুধু পূর্ব্ব-সাহিত্য, সুতরাং ভবিষ্যৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী চিরকাল ভবিষ্যদ্বাণীই রয়ে যাবে।

লেখকমাত্রেরই অন্তরে অবশ্য একটি ক'রে সমালোচক থাকেন, কিন্তু সে সমালোচকের আসল কায নিজের লেখার দোষ-গুণ বিচার করা, পরের লেখার দোষ-গুণ ধরা নয়! যাঁরা নিজে লিখতে পারেন না, তাঁরাই পরের লেখা কি রকম হওয়া উচিত, সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন। যে নিজে গাইতে পারে না, সেই তালে-বেতালে নৃত্য করে, আর সে ব্যাপারকে বলে সঙ্গীত।

সাহিত্যে যে আজকাল গণ্ডগোল হচ্ছে, তার আর একটি কারণ এই যে, অনেকে এমন কাব্য লেখেন, যে কাব্য হচ্ছে বর্ণচোরা সমালোচনা। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নীতির সংস্কার হচ্ছে যে গল্প-সাহিত্যের প্রাণ, তা আকারে কাব্য, কিন্তু আসলে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রবন্ধ মাত্র। তাই প্রবন্ধের সঙ্গে কাব্য ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফলে অনেক পাঠক এই ঘোলা জলকেই কাব্যরস ব'লে সানন্দে পান করেন। সম্ভবতঃ পাঠক উচ্চজাতীয় সাহিত্যই চান। কারণ, দেখতে পাই, বি-রাজকে স্বরাজ করবার, সারদাকে অন্নদা করবার, বিধবাকে সধবা করবার জন্য ব'কে ব'কে অনেকের মুখব্যথা হয়ে গিয়েছে। এই থেকে আমার মনে হয় যে, সমালোচকের দল যার আবাহন করছেন, তার নাম নব-সমাজ, নব-সাহিত্য নয়। অনেকে হয় ত মনে করেন যে, সমাজে ও সাহিত্যে কোনও প্রভেদ নেই। তবে বেশীর ভাগ লোক যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে দূর করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, এরূপ মনে করবার কোনও কারণ নেই। যে সম্প্রদায় নব-সমাজ, নব-রাজ্য গড়বার কাযে লেগেছেন অর্থাৎ যে সম্প্রদায় আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা, সে সম্প্রদায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অস্তিত্ব-বিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে সম্প্রদায় লেখকও নন, পাঠকও নন, তাঁরা শুধু বক্তা ওরফে কর্ম্মী। তাঁদের মুখে পুরানীকে দূর করবার প্রস্তাবটা হবে বিয়ের আগেই—divorceএর প্রস্তাবের মত।

আসল কথা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওরফে বঙ্গসাহিত্যের বিরুদ্ধে তথাকথিত বিদ্রোহ হচ্ছে, মনের বিরুদ্ধে ক্ষুধার বিদ্রোহ, বুকের বিরুদ্ধে পেটের বিদ্রোহ, এ অবশ্য সাহিত্যিক বিদ্রোহ নয়। কারণ, নব-সরস্বতী এলে সঙ্গে গোলাভরা ধান ও পেঁটরা-ভরা কাপড় আনবেন না। যিনি তা আনতে পারেন, তাঁর নাম লক্ষ্মী এবং এখন তিনি ঘরে ব'সে লক্ষ্মী মেয়ের মত চরকা ঘোরাচ্ছেন। সে যাই হোক্, সরস্বতীর বেনামীতে লক্ষ্মীকে ডেকে কোনও ফল নেই, ও ডাকে সরস্বতীও আসবেন না—লক্ষ্মীও নয়। উপবাসের পর উৎসব, শিবরাত্রির পর দোল আসে, শুধু পাঁজির জগতে, পুঁথির জগতে নয়।

৫

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, পুরোনো সাহিত্যিক বধ না করলে নব-সাহিত্য-সৃষ্টি করা যায় না, তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্য অমর, তা পুরোনোই হোক নতুনই হোক। যদি রবীন্দ্র-সাহিত্য না মলে নব-সাহিত্য না আসে, তা হ'লে নব-সাহিত্য আর আসবে না, কারণ, ও পুরোনো সাহিত্যের আর মার নেই। আর যদি কেউ বলেন যে, রবি অস্ত গেলেই শশীর

উদয় হবে, তা হ'লে তাঁদের কাছে একটা কথা নিবেদন করি। রবির আলো নিভে গেলেই যে রজনী হবে উতলা, তার কোনও সম্ভাবনা নেই। নব-সাহিত্য যে রূপ ধরেই আসুক, তা সাহিত্যই হবে, সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর তখন দেখা যাবে যে, এ নব-সাহিত্য সে সাহিত্য নয়, যার আগমন পাঁচ জনে প্রতীক্ষা করছেন। এ স্থলে একটা কথা ভরসা ক'রে বলা যায় যে, ভবিষ্যতের কাব্যশাস্ত্র কামশাস্ত্র হবে না, আর ভবিষ্যতের কামশাস্ত্রও কাব্যশাস্ত্র হবে না, কেন না, অতীতেও তা হয় নি, যদিচ একটিকে অপরটিতে রূপান্তর করবার বৃথা চেষ্টা অতীতেও করা হয়েছে। এটা সুখের বিষয়ই হোক আর দুঃখের বিষয়ই হোক, science চিরকাল scienceই থাকবে আর literature literature, যদিচ ভবিষ্যতের সাহিত্য বিজ্ঞান-পরিপুষ্ট হবে। বিজ্ঞানে পরিপুষ্ট হবে, অনুমান করছি এই কারণে যে, তা চিরকালই হয়ে এসেছে। সরস্বতী যে শুধু ত্রিকোণ পৃথিবীতেই বাস করতে পারেন, গোলাকার পৃথিবীতে পারেন না, এমন কথা বললে লোক হাসবে। বরং সত্য কথা এই যে, গোল পৃথিবীর ক্ষেত্রে সরস্বতীর পক্ষে ঢের উদার।

এ কারণ যাঁরা ভয় পান যে, নব-সাহিত্য অমৃত হবে না, হবে শুধু মদিরা, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, অমৃতেরও কি নেশা নেই, ও বস্তু কি হাল সভ্যতার কলের জল? আর সুরার ভিতরেও কি এক ফোঁটাও অমৃত নেই? আছে শুধু হলাহল—ভাষান্তরে আলকহল?

নব-সাহিত্য যদি সত্যই সুরা হয় ত আমি বলি "সোভান্ আল্লা।" কারণ, সে সুরায় আশা করি, আমাদের শোয়া সামাজিক মনকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে খাড়া ক'রে তুলতে পারবে। এই সাহিত্য-সুরা পান ক'রে যদি আমাদের সামাজিক মন দাঁড়িয়ে ওঠে, তা হ'লে তার বিশৃঙ্খল অঙ্গভঙ্গী দেখেও কেউ আবার তাকে শোয়াতে চাইবে না। মৃতের চাইতে মত্ত ঢের ভাল, কেন না, সে ধড়ফড়ে জীব।

তবে এ সুরা কোন্ জাতীয় সুরা হবে, তাই হচ্ছে ভাবনার বিষয়। লোকে বলে, গাঁজার ভেলসা নেই, কিন্তু সুরার দেদার জাতিভেদ আছে।

নব-সাহিত্য সুরা হোক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, তবে এ সাহিত্য-সুরা ধেনো না হলেই রক্ষে। কারণ, ধেনোর আর যতই ফয়দা থাকুক, তার গন্ধে ভূত পালায়, সে গন্ধ এত কড়া যে, গরম মসলা যোগেও তাকে নরম করবার যো নেই। বরং তাতে তাকে আরও চড়িয়ে দেওয়া হয়। রামপ্রসাদ বলেছেন, "সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই মা মা ব'লে।" কিন্তু ও বস্তু ধেনো হ'লে কাব্য-পিপাসু ভক্তরা তা মা মা ব'লে গলাধঃকরণ করতে পারবে না; সবাইকে বাবা বাবা ব'লে তা বমন ক'রে ফেলতে হবে।

নব-সাহিত্য আসছে কি না, সে হচ্ছে বাজে ভাবনা। নব-সাহিত্য এসেছে কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল জানবার কথা। আমার ধারণা, নব-সাহিত্য এসেছে কি না, তা তত দিন জানা যাবে না, যত দিন নব সমালোচনার জয়ঢাক না থামবে। ও বাদ্যি থামলেই কোথায় কার বাঁশী সুরে বাজছে, তা সকলেরই কর্ণগোচর হবে, অবশ্য তাদের—যাদের সুরের কান আছে। তরুণরা কে কি গান ধরেন, তাতে কিছু যায় আসে না, মোদ্দা কথা, তা বেসুরে না হলেই হ'ল। ধরুন, তাঁরা যদি পুরানীকে সম্বোধন ক'রে এই ব'লে তান ধরেন যে, "আমার হ'ল সুরু তোমার হ'ল সারা" তাতেও আমরা বাহবা দেব—যদি ঠিক ঠিক যায়গায় ঠিক ঠিক সুর লাগে, যথা—"আমার হ'ল সুরুতে" কড়ি, আর "তোমার হল সারাতে" কোমল, আর তাল যদি রুদ্রতাল না হয়। এ গান আমাদের সবারই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করবে। কারণ, আমরা সবাই জানি যে, সবারই শেষ হয়, অপর পক্ষে দু-চার জনের শুধু সুরে সুরু হয়।

বীরবল।



রুমা

ক্ষীণ অনুতপ্ত কণ্ঠে মুখরিত হইল, "মিস্ রায়।"

চকিতভাবে হাত হইতে জর-লেখা কাগজখানি টেবলের উপর নামাইয়া রুমা মুখ তুলিয়া কহিল, "কিছু বলছেন?" রুমার সুকুমার ভ্রূলতার নীচে আপনার অচপল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রবোধ কহিল, "হ্যাঁ, আমি তোমায় কিছু বলছি, রুমা।" প্রবোধের বিস্ফারিত নেত্রের পূর্ণদৃষ্টির মাঝে একটা আকুলতার ছায়া দেখিয়া রুমা বুকের মাঝে কেমন অসোয়াস্তি অনুভব করিল, কিন্তু মুখে তাহার একটি রেখাও ফুটিল না। পীড়িতের পার্শ্বে সেবার আসনখানি পাতিতে নারীর যতখানি আত্মদান, সংযম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রয়োজন, রুমার তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে রোগীর পার্শ্বে আসিয়া নতমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি বলুন!"

সহসা রুমার হাতখানি আপনার মুঠার মধ্যে ধরিয়া প্রবোধ কহিল, "আমায় মাপ কর রুমা, আমি অবিচার করেছি।"

চকিতে একবার রুমার সুন্দর মুখখানি মৃতের ন্যায় বর্ণহীন হইয়া গেল। বেশ শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, "অবিচার?" রুমার কোমল করপুটখানি তখনও প্রবোধের রোগশীর্ণ হাতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাহাতে একটা মৃদু চাপ দিয়া প্রবোধ আবেগভরে কহিল, "হ্যাঁ রুমা, অবিচার। শুধু তোমার উপর নয়, তোমার মত করুণাময়ী নার্শজাতিকে আমি চিরদিনই তীব্র শ্লেষ ক'রে এসেছি। কিন্তু তুমি সেবার মূর্ত্তি। তোমার দু'হাত-ভরা স্নেহের দান আজ আমায় মরণের বুক হ'তে ফিরিয়ে এনেছে। নূতন জীবন দিয়েছে, চোখে নূতন আলো দিয়েছে, বুকের মাঝে একটা অনুভূতি দিয়েছে।"

রোগদুর্ব্বল চিত্ত যে সর্ব্বদা কতখানি স্নেহদান ও গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া থাকে, তাহা এই সেবাকুশলী নারীর বিশেষ রকম জানা ছিল। সে ইহাও জানিত যে, এমন অবস্থায় মানুষের ভিতর হইতে এমন সব কথা বাহির হয়—সুস্থ অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব না মুখে—না মনে কোথাও হয় ত থাকে না।

স্বভাবকোমল কণ্ঠে রুমা কহিল, "এতে অপরাধ নেই, অভিযোগ নেই, এটা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। মানুষ ততক্ষণ তাকেই কালো বলে—যতক্ষণ না তার আলো আপনার চোখে অনুভব করতে পারে। বরঞ্চ আপনার কাছে আমার অভিযোগ এই যে, বাজে চিন্তাগুলোকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দিয়ে, আমাদের শাস্ত্রানুসারে চলছেন না কেন?"

রুমা আপনার বদ্ধ করখানিকে ধীরে মুক্ত করিয়া একান্ত স্নেহপরায়ণার মতই সযত্নে প্রবোধের ললাট হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুক্ষ রুক্ষ চুলগুলিকে মৃদু অঙ্গুলিসঞ্চালনে ধীরে সরাইয়া দিল।

প্রবোধের রোগমলিন মুখখানিতে একটা আনন্দের আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। বালকের মত মাথা নাড়িয়া সে কহিল, "আপনাদের বিধিবিধানের ত আমি একটিও অমর্য্যাদা করিনি। বরঞ্চ পদে পদে তাদের সর্ব্বদা মর্য্যাদা রক্ষা করতে নিজেকে তাদের হাতের খেলনা ক'রে তুলেছি।"

"তবে তাদের মর্য্যাদা রাখতে আর এক ডোজ্ ঘুমবার ঔষধটা খেয়ে ফেলুন।" রুমা ঔষধের শিশিটা দুইবার নাড়িয়া মেজর গ্লাসে ঢালিয়া কহিল,—"নিন্, খেয়ে ফেলুন—লক্ষ্মীর মতন।"

ঔষধের তিক্তস্বাদ দূর করিবার জন্য বেদানার দানাগুলি মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে প্রবোধ কহিল,—"তুচ্ছ টাকার বিনিময়ে এমন সজীব সেবা কোথা হ'তে আসে? আপনি যদি শুধু সেবার যন্ত্র, টাকা যদি সেই যন্ত্র চালাবার শক্তি, তবে তার মাঝে এমন প্রাণের একটা স্পন্দন পাই কোথা হ'তে মিস্ রায়? স্বীকার করি, মানুষ যন্ত্রের মূর্ত্তি গঠন করতে পারে; কিন্তু তাতে প্রাণ দিতে ত পারে না। তাতে দেবতার হাত চাই।"

রুমার কর্ণমূল ঈষৎ লোহিতাভ হইয়া উঠিল। গম্ভীর কণ্ঠে সে কহিল,—"আবার ঐ কথা! না, এবার আপনি আমার কাছে বকুনি খাবেন। একটু ঘুমবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।" রুমা নিপুণ হাতে প্রবোধের গাত্র-আবরণখানি ভাল করিয়া গুছাইয়া চাপা দিয়া দিল।

* * * *

"মিস্ রায় এবার বিদায় চাইছেন। তিনি বলছেন, তাঁর থাকবার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই।"

সম্মুখে খোলা সংবাদপত্রখানির উপর তেমনই ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই প্রবোধ কহিল,—"না থাকেন, তিনি ত যেতে পারেন।"

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে লতা কহিল,—"যে এতখানি সেবা ক'রে তোমায় ভাল ক'রে তুললে, তার উপর এই কথা? আমার মনে হয়, আর কিছু দিন—"

প্রবোধ মুখ তুলিয়া কহিল,—"স্বামিসেবা করতে তুমি যদি অসমর্থ হও ত আর কাউকে সে ভার দাও না, লতা। মিস্ রায়কে মিছি মিছি আটকে রেখে তার ক্ষতি করো না।"

অপ্রতিভ কণ্ঠে লতা কহিল,—"আমি কি এতই পোড়াকপালী যে, তোমার সেবায় অক্ষম হব? তবে নার্শ আনিয়েছিলাম—সে কারে প'ড়ে। এ ঘরে তোমার টাইফয়েড, ও ঘরে খোকার বসন্ত। সকলে বলজ্জন, ছেলে ছেড়ে নড়ো না। আর মিস্ রায়ের ত খুব সুখ্যাতি আছে। তাই তাঁকে

আনিয়েছিলাম। আপনার লোক ব'লে, পাঁচ জন আনাড়ীর হাতে তোমার সেবার ভার দিতে বিশ্বাস হলো না।"

"বেশ ত, তিনি তাঁর কর্ত্তব্য সুসম্পন্নই করেছেন, এইবার তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর।"

"তাঁর বিল পাঁচশ টাকা মাত্র! আমি হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম,—তিনি নিলেন না। বললেন,—'আমার প্রাপ্য গণ্ডার উপর আমি একটি আধলাও বেশী নিতে পারবো না। সেটা বোঝার মত আমাকে চাপ দিবে'।"

প্রিয়বস্তুর সঠিক সংবাদ জানিয়াও বালক যেমন সেই একই পরিচয় বার বার জিজ্ঞাসা করে, তেমনই করিয়া প্রবোধ কহিল,—"মিস্ রায় কি যেতে চাচ্ছেন?"

লতা কহিল,—"তবে বলছি কি? তিনিই ত যেতে চাচ্ছেন।"

"আজই?

"হ্যাঁ, আজই।"

"কৈ, আমায় ত কিছু বলেন নি!"

"না, তিনি বললেন—পাছে তুমি কোন রকম ব্যস্ত হও।"

সন্তর্পণে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধ কহিল,—"এই! তবে তুমি আমায় জানাচ্ছ যে?"

হাসির উচ্ছ্বাসে সমস্ত মুখখানি আরক্তিম করিয়া লতা কহিল, "আমি যে তোমায় না ব'লে থাকতে পারি না গো! যে যা বলুক।"

লতার কোলের উপর আপনার দুর্ব্বল হাতখানি শিথিল-ভাবে রাখিয়া প্রবোধ কহিল, "মিস্ রায় কি চ'লে গেছেন?"

"না, এখনও যান নি। খোকার জন্যে চকোলেট ও কি কতকগুলা খেলনা কিনতে গেছেন, দশটার সময় চ'লে যাবেন।"

"এখন কটা?"

"এই সাড়ে নটা। কি বলব, মিস্ রায়কে?"

"কি বলবে! বল না, আর একটু আমাকে সবল সুস্থ ক'রে দিয়ে যেতে। না! না! আমার নাম করো না। কিন্তু তুমি, তুমি কি পারবে! কচি ছেলের মা। আচ্ছা থাক, না, তাকে আর কোন প্রয়োজন নেই। যে যেতে চায়, তাকে বাধা দিও না।"

* * * *

প্রায় বৎসর ঘুরিয়া গেল মিস্ রুমা রায় প্রবোধ চৌধুরীর সুবৃহৎ প্রাসাদ হইতে বিদায় লইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক রোগীর পাশে কল্যাণময়ীর মত তাহাকে অনেক বার বসিয়া দুই হাত-ভরা সেবা ঢালিয়া দিতে হইয়াছে। নিদ্রাভরা গভীর রজনীতে শুধু তাহার চোখের কালো তারা দুইটি রোগীর বিবর্ণ মুখের উপর অনিমেষে চাহিয়া জাগিয়া থাকিয়াছে। পীড়িতের অসংলগ্ন প্রলাপবাণী শুনিতে শুনিতে তাহার কাণ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

এমনই করিয়া যখন রুমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়টা পীড়িতের পাশে পাশেই কাটিতেছিল, তখন এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা-বেলা রুমার নেপালী 'বয়'টা একটা পরিচিত নামের কার্ড তাহার সম্মুখে রাখিয়া জানাইল, "আগন্তুক সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

রুমা তাহাকে আনিবার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া চেয়ারের উপর একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

নেপালী বয়ের পশ্চাতে আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "নমস্কার মিস্ রায়।"

আসন ছাড়িয়া রুমা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া শিষ্টাচারসূচক মৃদু হাস্য করিয়া সে কহিল, "নমস্কার মিষ্টার চৌধুরী! আশা করি, সব ভাল। মিসেস্ চৌধুরী ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ, সবাই ভাল আছেন, মিস্ রায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! আপনি যার এত সেবা করেছিলেন, সে কেমন আছে, তার কুশলও কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না?"

মৃদু হাসিয়া রুমা কহিল, "যা সুস্পষ্ট চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, তা মিছে জিজ্ঞাসা করা মানে,—লোককে বিরক্ত করা,—অবশ্য আমার মনে হয়।"

"কি, তুমি দেখতে পাচ্ছ, রুমা! তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ! আমার ভাল-মন্দ সব কি বুঝতে পাচ্ছ?" প্রবোধের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

তেমনই স্বভাবমধুর কোমল কণ্ঠে রুমা কহিল, "আমি সর্ব্বজ্ঞ নই! আপনার ভাল-মন্দের খবরও কিছু রাখি না, রাখবার ইচ্ছাও নেই। তবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞ বটে, আমি আপনার শরীরের কথাই বলেছি, মিষ্টার চৌধুরী।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রবোধ কহিল, "শরীর! তা এটা ত আপনার হাতেই গ'ড়ে উঠেছে, মিস্ রায়! তাই আপনার কাযে এটাকে উৎসর্গ করব আমি সঙ্কল্প করেছি।"

"মিষ্টার চৌধুরী! আমি আপনার কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারলাম না। আর আমার সময় অতি অল্প।" রুমার কণ্ঠস্বরে এতটুকু কৌতুকের লেশ অবধি ফুটিল না।

উত্তেজিত কণ্ঠে প্রবোধ কহিল, "জানি রুমা, তোমার সময় অতি অল্প, অনেক মূল্যবান্। তোমার মন জলের মত ব্যাপ্ত; আকাশের মত নির্লিপ্ত। তাদের উপর দান ফেলা কিছু চলে না। কিন্তু এই জল আর এই আকাশ এরাই যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। রুমা, আমি একটুখানি সময় তোমার কাছে ভিক্ষা চাই; শুধু তুমি আমার গোটা কতক কথা শোন। রুমা, আমি তোমায় ভালবাসি! বড় ভালবাসি। আমার ছোট বোনটির মত ভালবাসি। আমি তোমার কাছে বড় ভায়ের দাবী প্রার্থনা করি।"

এত বড় মহৎ সম্বন্ধেও রুমার চোখে-মুখে একটা ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিল না; গভীর অন্তরতম প্রদেশে বুঝি এতটুকু আগ্রহের সাড়া দিল না। নম্রকণ্ঠে সে শুধু কহিল, "বলুন?"

"রুমা, আমি চাই আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, তা দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে অর্দ্ধেক তোমায় দিতে। তুমি মনে করো না, আমি তোমায় ভোগ কর্ত্তে দিচ্ছি ব'লে তোমায় অপমান কচ্ছি। আমি দিচ্ছি—তোমার মতন যারা পরার্থে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের যাতে উচ্চশিক্ষা ও ব্যবসার যাতে সুবিধা ও সম্প্রসারণ হয়, তারিই জন্যে। শুধু তোমার নেতৃত্বাধীনে থাকবে। নেবে রুমা, পবিত্রতার্থে এই মহৎ কার্য্যের গুরুভার?"

ধীর অবিচলিত কণ্ঠে রুমা কহিল, "আমায় মাপ করবেন, মিষ্টার চৌধুরী! আমি কোন গুরুভার নিতে পারব না।"

বিস্ময়ে—বিস্ফারিতনেত্রে কিছুক্ষণ রুমার শান্ত নির্ব্বিকার মুখের পানে চাহিয়া প্রবোধ কহিল, "আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম ছিল। লতা বলছিল যে, এ রকম মহৎ অনুষ্ঠানে তোমার অসম্মতি হ'তে পারে না।"

আপনার নীল-উৎপল নেত্রযুগল প্রবোধের আগ্রহ-সমুজ্জ্বল মুখের পানে স্থাপিত করিয়া রুমা শান্ত সহজ কণ্ঠে কহিল, "লতা কিছু ভুল বলেন নি। এই রকম একটা অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করতে আমার অনেক দিনের ইচ্ছে সঞ্চিত আছে। কিন্তু সে আপনাদের মত স্বনামধন্য ভাগ্যবানের সাহায্যে নয়। আমি তাদেরই দান দু'হাত ভ'রে নেব, যা'রা আমারই মত দুঃখী, আমারই মত সহায়হীনা নারী। যারা ধনবানের কৃপাকটাক্ষের জন্য লালায়িত নয়। নমস্কার মিষ্টার চৌধুরী! আজকের মত আমাদের কথা শেষ হ'ল বোধ হয়?"

* * * *

এক রাজার ছেলের সঙ্গে, এক গরীবের মেয়ের বিয়ের কথা স্থির হয়েছিল। কুলে-শীলে, ধনে, গণে, রাশে উভয়ের কোষ্ঠী-বিচারে এমন রাজযোটক মিল না কি প্রায় দেখা যায় না; গণিতরা এই কথাই না কি মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন। পাড়ার লোকরা গালে হাত দিলে। এক টুখানি গোলাপী রং, আর দুটো ভাসা চোখের এতই আদর যে, শেষে কি না রাজার ঘরে বামন হয়ে চাঁদে হাত! "মেয়েটি তার বাপের পাশে শুয়ে, মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে গভীর ঘুমের মাঝে সোনার স্বপনে ডুবে যেত। কত বড় বাড়ী! কত লোকজন! জাগ্রতে সে যে এর কিছুই দেখেনি, স্বপনে দেখা পেত। কিন্তু এই স্বপন যে শীঘ্রই তার কাছে সত্য হয়ে দা দেবে; আর সত্যটা যে সে দিন স্বপ্নের মাঝে আসন পাতবে, এই কথাটি ভেবে মেয়েটি আনন্দের দোলায় দোল খেত।

"এক দিন মেয়েটি যখন তার হাসিভরা মুখখানি নিয়ে বাপের কাছে কি একটা কথা বলতে প্রজাপতির মত চঞ্চলগতিতে ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, বাপটি তখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে! মেয়েটি আর তাকে জানাতে সাহস পেলে না। ধীরে ধীরে চলে গেল; মা মেয়েকে দেখে তার শুকনো মুখ আরও শুকনো ক'রে অন্য দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটি চুপি চুপি নিরেলায় এসে মাকে বসল,—কি হ'ল?

"হঠাৎ যে দিন মেয়েটি মায়ের কাছে শুনতে পেলে—তার সোনার স্বপন ভেঙ্গে গেছে। রাজপুত্র সাগরপারে বিদ্যাশিক্ষা করতে যাবে, আর সেই সাগরের কড়ি যে মেয়ের বাপ যোগাতে না পারবে, তার মেয়েকে রাজপুত্র তার বধূর আসনখানি দিবে না। এই তার পণ। এই কথাগুলা শোনার পরে মেয়েটি তার মাকে জড়িয়ে ধ'রে স্বপনের ঘোরে কেঁদে উঠেছিল।

"তার পর মেয়েটির নানা দেশ হ'তে সম্বন্ধ এসেছিল; কিন্তু তারাই যখন জানতে পাল্লে, এরা মেয়ে দেবে, কড়ি দেবে না, তখন একে একে সকলেই মুখ ঘুরিয়ে নিলে।"

এই অবধি পড়িয়া লতা কহিল—"আহা, মেয়েটি!"

আগ্রহভরে প্রবোধ কহিল,—"তার পর? তার পর কি হ'ল? ও না লতা।—এইখানেই কি শেষ হ'ল?"

"না, এটা প্রথম পরিচ্ছেদ। রুমাদেবী চমৎকার লেখেন।"

উৎসুক দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিয়া, প্রবোধ কহিল, রুমা দেবী? তার আর কিছু লেখা পড়েছ কি?"

"না, কখন কোন কাগজে এঁর নাম অবধি দেখিনি। এ মাসের বাণীতে এই এঁর প্রথম লেখা দেখছি। বুঝতে পাচ্ছ না, ইনি কে? আমাদের মিস্ রায় যে।"

লতা আবার পড়িতে লাগিল।

"তার পর অনেক দিন কেটে গেল। বালিকা এখন যুবতী হয়েছে; বিবাহে তার একটা প্রবল বিতৃষ্ণা এসেছে। কন্যাদায়-পীড়িত জনকের নিত্য পাত্রানুসন্ধানের ব্যর্থ চেষ্টার নিত্য আঘাতে মেয়েটি শেষে মরিয়া হয়ে উঠল।

"এক দিন সে তার ভুবনযোড়া লজ্জাকে মনের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সজোরে সরিয়ে দিয়ে বাপকে জানিয়ে দিলে,—পঙ্গুর মত পরের কাঁধে ভর দিয়ে কোন দিন সে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে না, এই তার কঠিন সঙ্কল্প।

"এত বড় অসীম স্পর্দ্ধার কথা শুনে বাপ তার বিরক্তির বদলে আনন্দিত হ'ল। স্বজনের নিন্দাবাদকে বহুদূরে ফেলে মেয়ের পাদুটিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্য সংস্কারের লোহার জুতাটা নিজে হাতে খুলে দিলে।

"বহু বছর বাদে মেয়েটি যখন সফলতার সিংহাসনে আসীন ছিল, তখন এই কৃতবিদ্য রাজপুত্র তার পূর্ণ অর্ঘ্য নিয়ে অতুল আনন্দে মেয়েটিকে জানাতে এল; তোমার পূজার আমি এক জন প্রচারক হব! তোমার শুভ ইচ্ছার চরণে আমার বদ্ধাঞ্জলি ঢেলে দেব, আমাকে তোমার সাথী কর।

"মেয়েটি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে।"

"গল্পটার নাম কি লতা?" প্রবোধ জিজ্ঞাসা করিল।

"বিজয়িনী।"—লতা কহিল,—"কি সুন্দর প্রাণস্পর্শী লিখেছে।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধ কহিল, "বুকের রক্ত দিয়ে যে মনের কথা লিখতে পারে; তার কথা অপরের বুকে ঘা মারে।"

* * * *

ধীরে ধীরে দুইটি বছর কাটিয়া গেল। রুমা তেমনই নিঃশব্দে আপনার নিত্য অনুষ্ঠানের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে; শুধু থাকিয়া থাকিয়া তাহার কুমারী-বক্ষের মাঝে ভাসিয়া উঠে, প্রবোধের সেই উন্নত সুশ্রী দেবোপম মূর্ত্তি! কানের কাছে বাজিতে থাকে সেই সতেজ বাণী—"নেবে রুমা এই মহৎ কার্য্যের গুরুভার!" এমনই একটা বিরাট ইচ্ছা তাহার মাঝেও ত চিরদিন জাগিয়া আছে; কিন্তু প্রকাশের পথ সে পায় নাই। প্রবোধ আসিয়াছিল সেই পথের দ্বার মুক্ত করিতে! রুমা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

প্রবোধ! প্রবোধ! রুমার স্বাধীন জীবনযাত্রার মুক্তপথে সে যেন একটা ছায়াতরুর মত আসিয়াছিল; দীর্ঘ পথ অতিক্রমের বিপুল ক্লান্তি যেন এই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া জুড়াইতে বলিয়াছিল। রুমা অসঙ্কোচে এই অযাচিত দানকে উপেক্ষা করিয়াছে। জীবনে সে কোন দিনই প্রবোধের কোন সাহায্য লইতে পারিবে না, ইহাই তাহার অমোঘ বিধিলিপি; কিন্তু অশান্ত চিত্তটা বুকের মাঝে—না থাক!

সকাল বেলার ছোট খাট কাযগুলি সারিয়া রুমা একবার সংবাদপত্রখানি হাতে তুলিয়া লইল। সহসা রুমার সাগ্রহ দৃষ্টি কতগুলি বড় বড় অক্ষরের উপরে পড়িল। সবিস্ময়ে সে পাঠ করিল—

মানুষের মাঝে দেবতা! সংসারের মাঝে সন্ন্যাসী! ভোগের মাঝে ত্যাগী! অমনই কতকগুলি বড় বড় বিশেষণের পর লেখা, "শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার চৌধুরী আই, সি, এস। ইনি আপনার ঠিক দুইলক্ষ টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তি দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করিলেন এবং বঙ্গমাতার এই কৃতী-সন্তান, সরকার-প্রদত্ত আপনার উচ্চপদ পরিত্যাগ করিয়া দেশমাতার সেবায় ও স্বরাজসাধনে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। জাতীয় নারী-বিদ্যালয় ইহার আর একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ। খদ্দর পরিধানে নগ্নপদে এই স্বনামধন্য কৃতবিদ্য ঐশ্বর্য্যের কোলে আজন্ম পালিত সন্তানকে সে দিন আমরা কলিকাতার রাজপথে মুক্তি-অন্বেষী সিদ্ধার্থের মত দেখিয়াছিলাম।"

প্রবোধ! প্রবোধ! আজ তুমি অভ্রভেদী হিমাদ্রির মত স্বর্ণমুকুট পরিয়া সগর্ব্বে সাধারণের মাঝে দাঁড়াইয়া স্বদেশকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছ! কিন্তু তোমার এই দয়ার উৎস সুদূর অতীতে অভাগিনী রুমার কপালে কেন এমন করিয়া রুদ্ধ হইয়াছিল! অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে রুমা এই কথাটাই বার বার আপনার মনে বলিতেছিল।

হঠাৎ রুমা মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার অশ্রুঝরা আঁখির মাঝ হইতে বিস্মিত দৃষ্টি দেখিল,—সম্মুখে তাহারই দ্বারা লাঞ্ছিত মূর্ত্তি মৃদুমন্দ হাসিতেছে!

রুমা কি একটা বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কোন স্বরই ফুটিল না। কলের পুতুলের মত সে শুধু অভ্যাস অনুসারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রবোধ কহিল,—"রুমা, আমি আবার এসেছি। আজ বোধ হয় তুমি বিজয়িনী হ'য়ে আমাকে ফেরাতে পারবে না।"

রুমা মাথা নত করিল।

প্রবোধ কহিল,—"জানি রুমা, তোমার বিজয়িনীর রাজপুত্রকে আমি চিনি। সেই রাজপুত্র আপনার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাদেরই নামে উৎসর্গ করেছে আপনার ধন-দৌলতের রাশি, যাদের কথায় রুমা দেবীর বুকখানি ভ'রে আছে।"

রুমা এইবার দর্পিতা সিংহীর মত মাথা তুলিয়া সতেজে বলিতে চাহিল,—"কেন এত করেছেন মিষ্টার চৌধুরী! আমি ত এর এক কণাও আপনার কাছে কোন দিন প্রার্থনা করিনি।" কিন্তু রুমার কণ্ঠস্বরে অনেক দিনের সঞ্চিত একটা ব্যথার করুণ সুর এমন স্বচ্ছভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, রুমা নিজেই থামিয়া গেল।

প্রবোধ অগ্রসর হইয়া রুমার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল,—"তুমি যদি আমার কাছে কিছু চাইতে রুমা,—তা হ'লে বোধ হয়, আমি এমন ক'রে নিজেকে উজাড় ক'রে পরকে বিলিয়ে দিতে পারতাম না। আমার প্রতিদানের পরিসমাপ্তি বোধ করি এইখানেই শেষ হয়ে যেত। তোমার প্রত্যাখ্যান আমাকে দশের মাঝে ছড়িয়ে দিলে! তোমার আহ্বান হয় ত আমাকে তোমার মাঝেই বন্দী করত।"

প্রবোধ থামিয়া আবার কহিল,—"রাজপুত্র সাগর—, কি! ও কি কর রুমা? পায়ে হাত কেন?"

মহা বিস্ময়ে প্রবোধ দুই পা পিছাইয়া গেল।

রুমা নত হইয়া প্রবোধের পাদমূলে বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের মাঝে কুমারী-প্রাণটা আঘাতের পর আঘাতে এত দিন মৃতের মত নিস্পন্দভাবে পড়িয়াছিল, আজ সে যেন সহসা প্রবোধের কণ্ঠের ঝঙ্কারে চেতন পাইয়া লজ্জালস আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। রুমা আপনার অশ্রু-ধৌত মুখখানি তুলিয়া তেমনই করুণ দৃষ্টিতে প্রবোধের পানে চাহিয়া কহিল,—"তোমার অনেক কাযের একটুখানি করবার অধিকার আমাকে দাও। আমি তাই দিয়ে আমার শূন্য পূর্ণ করব।"

রুমার হাতখানি ধরিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে প্রবোধ কহিল,—"অধিকার কাউকে ঢাক-ঢোল পিটে দিতে হয় না, রুমা। সে যে সকলের সামনে সারাক্ষণ দেয়, যে প্রাণ হ'তে ডাকে, তারই কাছে সে ছুটে যায়। আজ সে তোমার দরজায় এসেছে রুমা, তাকে ডেকে নাও তুমি।"

একটু থামিয়া প্রবোধ কহিল,—"কাল হয় ত জেলের লোহার কপাটের ডাকে আমাকে হাজির হ'তে হবে। লতা রইল, তুমি রইলে, আমার আরব্ধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেবার চেষ্টা কত্তে। চল্লুম রুমা—"

প্রবোধ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

রুমার অশ্রুসজল দৃষ্টি, যতক্ষণ প্রবোধকে দেখা গেল, তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা ভূমিতলে লুটাইয়া বাণবিদ্ধা বিহঙ্গীর মত আকুল যন্ত্রণায় অধীরা রুমা অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে কহিল,—"ওগো আরাধ্য, কেন এত বড় কঠিন বাঁধনে এ অযোগ্যাকে বাঁধলে? মরণের শেষ নিশ্বাস অবধি যে এ বাঁধন খুলবে না গো!"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।





দেশলাই-শিল্প

কোন্ প্রাগৈতিহাসিককালে মানব যে স্বেচ্ছায় অগ্ন্যুৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না, কিন্তু সেই সময় হইতেই অগ্নি ব্যতীত মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে অগ্নি উৎপাদনের জন্য অনেক বেগ পাইতে হইত; বিশেষ প্রকারের কাষ্ঠ অথবা প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে আগুন জ্বালা যাইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈদিক যুগে এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে গণিয়ারী অন্যতম, ইহার নামই অগ্নিমন্থ। সিকিম ও ভুটান অঞ্চলের অরণ্যবাসী জাতিসমূহ এখনও দুই জাতীয় গণিয়ারী কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালায়। কাষ্ঠ-সাহায্যে অগ্নি উৎপাদনের প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। তৎপরে রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত দেশলাইয়ের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত দেশলাই এখনকার মত ছিল না। একটি বাক্সে কেবল কাঠিগুলি থাকিত এবং উক্ত কাঠি এক খণ্ড শিরীষ কাগজের মধ্য দিয়া সজোরে টানিয়া লইলে অগ্নি উৎপাদিত হইত। একই বাক্সের ভিতর কাঠি ও উহার উপরিভাগে কাঠিপ্রজ্বালনক্ষম প্রলেপযুক্ত দেশলাই প্রথমতঃ সুইডেন দেশেই প্রস্তুত হয়। সুইডেন তখন দেশলাই-শিল্পের শীর্ষস্থান-অধিকার করে।

বর্ত্তমান অবস্থা

বর্ত্তমানকাল অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও দেশলাইয়ের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সুদূর পল্লীগ্রাম ও পার্ব্বত্যদেশ—কোন স্থানেই আর দেশলাইয়ের প্রচার হইতে বাকি নাই। গড়পড়তা প্রতি বৎসর অন্ততঃ এক কোটি টাকার দেশলাই এতদ্দেশে আমদানী হয়, তদ্ভিন্ন দেশীয় দেশলাইও আছে; তবুও অভাব মোচন হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে দেশ-মধ্যে দেশলাই প্রস্তুতের চেষ্টা প্রারব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ের অনেকগুলি ক্ষুদ্র কারখানা অভিজ্ঞতা, মূলধন, অথবা উৎসাহের অভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে। অধুনা তাহাদিগের স্থান সমশ্রেণীয় নূতন কারখানা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে কারখানা বলিতে পারা যায় না। এগুলি গৃহ-শিল্প হিসাবে পরিচালিত। কলিকাতায় ৭।৮টি বড় কারখানা আছে; সেগুলি সবই স্বদেশী কারবার নহে; তৎসমুদয়ের মধ্যে অধিকাংশেই বিদেশীয় প্রভাব অল্প-বিস্তর পরিমাণে রহিয়াছে। দেশীয় শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে শেষোক্ত অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কারখানা অধিক প্রয়োজনীয়; কারণ, এই সমুদয় অধিকসংখ্যক লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় এবং এই সকল কারখানাজাত দেশলাই গরীব লোকের অভাব মোচন করে।

বিদেশীয় প্রতিযোগিতা

১৯১৫-১৬ হইতে ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের আমদানীর হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ ব্যতীত কোন বৎসরে আমদানীর মূল্য ১ কোটি টাকার নীচে নামে নাই। পক্ষান্তরে, ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার দেশলাই ভারতে আসিয়াছিল, কিন্তু এত টাকার দেশলাইও ভারতের অভাবের এক-চতুর্থাংশ পূরণের উপযোগী নহে। এতদ্দেশের এইরূপ অবস্থা বিদেশীয় বণিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহারা যে প্রকারেই হউক,ভারতীয় উদীয়মান দেশলাই-শিল্প বিনষ্ট করিয়া বিদেশীয় দেশলাই চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যে সময় হইতে দেশীয় দেশলাই-শিল্প সম্বন্ধে রক্ষণনীতি অবলম্বিত হইয়াছে,সেই সময় হইতেই এতদ্দেশে বিদেশীয়গণ দেশলাই কারখানা স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অনেকে বোধ হয়, অবগত নহেন যে, Sweedish-American Match Combine নামক একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান আছে। উহার শাখা-প্রশাখা ক্রমশঃ জগতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন,—

"If the Sweedish Match Industry is to retain its leading position, it can not rely on the Sweedish factories, and for this the Sweedish Match Company decided a few years ago to go in for a programme of taking an interest in match factories abroad on a very large scale. We have in operation how in India two newly-built factories (Bombay and Calcutta), and we are building two new ones (Madras and Karachi) and we have acquired two established match factories in Colombo and Rangoon. It is not our intention to monopolise the Indian match trade and we have decided to seek the co-operation of prominent Indians in our Indian undertakings".

ইহার ভাবার্থ—যদি সুইডেনের দেশলাই-শিল্পকে ইহার সর্ব্বাগ্রগণ্য পদ বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে শুধু সুইডেনের কারখানাগুলির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সেই জন্য কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে Sweedish Match Company স্থির করিয়াছিল যে, সুইডেন ভিন্ন অন্যান্য দেশের দেশলাইর কারখানায় বহুলভাবে স্বার্থ অর্জ্জন করাও উহার কার্য্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে আমাদিগের দুইটি কারখানা চলিতেছে (বোম্বাই ও কলিকাতা); দুইটি নূতন কারখানা গঠিত হইতেছে (মান্দ্রাজ ও করাচী) এবং কলোম্বো

ও রেঙ্গুনে আমরা দুইটি চল্‌তি কারখানা ক্রয় করিয়া লইয়াছি। ভারতীয় দেশলাইর ব্যবসায় একচেটিয়া করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; আমাদিগের ভারতীয় কারবারসমূহে আমরা মান্যগণ্য ভারতবাসিগণের সহযোগিতা অন্বেষণ করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।

উক্ত উক্তির প্রথম ভাগ খুবই সত্য, কিন্তু শেষভাগে সভাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল ব্যবসাদারী চাল মাত্র। কিরূপভাবে ভারতবাসিগণের সহযোগিতা অন্বেষিত হইতেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় কারখানাসমূহকে বিদেশীয়গণ কিরূপভাবে পুষ্টি পাইবার সুযোগ দিতেছেন, তাহা জনৈক জর্ম্মণ দেশলাই-বিশেষজ্ঞ বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ ভারতে বহু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং ছোট-বড় অনেক কারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি বলেন যে, সদসৎ নানা উপায়ে পূর্ব্বোক্ত Combine অথবা Trust দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ তাহারা কিছুকাল ধরিয়া খুব কম মূল্যে দেশলাই বিক্রয় করিয়া স্থানীয় কারখানাসমূহের যথেষ্ট ক্ষতি করায়। তৎপরে ব্যবসায়ের অবস্থা মন্দ হইলে উহারা কারখানাওয়ালাগণের নিকট উচিত মূল্যে কারখানা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। অবশ্য ক্রয়ের অন্যতম সর্ত্ত থাকে যে, মালিক ভবিষ্যতে আর দেশলাইয়ের কারখানা খুলিতে পারিবে না। কারখানা একবার ক্রীত হইলে তাহা প্রায়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অনেক দেশেই Combine তাঁহাদের ক্রীত কারখানা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সুইডেনজাত দেশলাই কাটতির পথ সুগম করিয়াছে। যে স্থলে সমধিক লোকসান করাইয়াও কারখানাওয়ালাগণকে কারখানা বিক্রয়ে সম্মত করাইতে না পারে, সে স্থলে Combine অন্য উপায় অবলম্বন করে। দেশলাই-ব্যবসায়িগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, বোম্বাইয়ের Match Manufacturing Supply Co. দেশলাই প্রস্তুতের কল-কব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ ইত্যাদি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আনাইয়া দেন। Gorh. Arehu নামক ষ্টক্‌হলমের প্রসিদ্ধ কোম্পানীর এজেণ্টরূপে উক্ত Supply Co. কার্য্য করে। পূর্ব্বে ইহা বাস্তাবকই উচিত মূল্যে দেশলাই প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিত। এখন কিন্তু Gorh Arehu পূর্ব্বোক্ত Combine এর করতলগত হইয়াছে এবং Principal - এর ন্যায় Agentও Combine এর আজ্ঞাবাহী হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল যে Supply Co. অভাবনীয় সুলভ মূল্যে ও দীর্ঘকাল মিয়াদে টাকা শোধ করিবার সর্ত্তে দেশলাই প্রস্তুতের যাবতীয় মাল যোগাইয়া থাকে, তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে, কারখানাওয়ালাগণ ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িবে এবং হয় ত নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা দিতে পারিবে না। তখন Combine কারখানাগুলি হস্তগত করিবে। অনেকেই মনে করিবেন যে, এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার কায খুব কম লোকই করিবে, কিন্তু দীর্ঘ মিয়াদে মাল ও বিনা খরচে বিশেষজ্ঞের উপদেশ পাওয়া সামান্য প্রলোভন নহে। বিহার গবর্ণমেণ্টও এই ফাঁদে পা দিয়া পাটনায় একটি প্রদর্শন কারখানা খুলিতেছিলেন। পরে জানিতে পারিয়া সাবধান হইয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে কয়েকটি দেশলাইর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত কারখানাগুলি Combine এর অম্বরনাথে অবস্থিত কারখানা অপেক্ষা বৃহত্তর। Combine এর কারখানার ন্যায় এই কারখানাগুলিও সাইবিরিয়া হইতে কাঠ আনাইয়া কাঠি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদেও প্রতিযোগিতায় Combine ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেই জন্য কিছু দিবস পূর্ব্বে তাহারা একটি নূতন চা'ল চালিয়াছিল; তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিদেশ হইতে আনীত, দেশলাই প্রস্তুতে ব্যবহৃত কাষ্ঠের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিতে সরকারকে প্রণোদিত করা। সেরূপ হইলে ভারতীয় ও বিদেশীয়, উভয় শ্রেণীর কারখানাই বন্ধ করিতে হইত। তাহাতে Combine এর আপাততঃ ক্ষতি হইলেও পরে লাভের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সুখের বিষয় যে, অপরে Combine এর প্রকৃত মতলব না বুঝিতে পারিলেও বোম্বাইয়ের বিচক্ষণ ব্যবসায়িগণ ইহাতে ভুলেন নাই; তাঁহাদেরই প্রবল প্রতিবাদে এরূপ শুল্ক ধার্য্য হইতে পারে নাই।

যদিও Combine এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দেশলাই শিল্প ও ব্যবসায়কে করায়ত্ত করিতে পারে নাই, তবুও Combine এর যেরূপ শক্তি-সামর্থ্য, তাহাতে বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে। Combine এর মূলধন ১৫ কোটি টাকারও অধিক। ডাইরেক্টারগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী Rockfeller, Prior, McHugh প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই Combine যে জগতের দেশলাই ব্যবসায় একচেটিয়া করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালায় দেশলাই-শিল্প

দেশলাই প্রস্তুতক্ষেত্রে বিদেশীয় প্রতিযোগিতার আভাস কতক পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাওয়া যাইবে। এখন বাঙ্গালা দেশে আপাততঃ যে পদ্ধতিতে দেশলাই প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আলোচনাযোগ্য। আমরা ইতঃপূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে কয়েকটি দেশলাই কারখানা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছি। ১৯২১ ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ ও সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ইত্যাদি জিলায়ও কতিপয় কারখানা ডাক্তার নন্দীর কল অথবা সমশ্রেণীর Guillotine কল লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। এই সমুদয় কারখানায় দেবদারু, কদম্ব, শিমুল, ছাতিম প্রভৃতি দেশীয় কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লোপ পাইয়াছে; অবশিষ্টগুলি কুটীর-শিল্প হিসাবে দেশলাই প্রস্তুত করিতেছে। এই প্রকার ক্ষুদ্র কারখানায় কাঠ 'চেরা', কাঠি তৈয়ার ও কাটা স্থূল প্রথায়, সামান্য রকমের কল দ্বারা সম্পন্ন হয়, মশলা ও টিকিট লাগান ইত্যাদি কায ঠিকা মজুর দ্বারা হইয়া থাকে। উপযুক্তরূপে বিবর্ণ করিতে এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে মশলা লাগাইতে না পারায় এই সকল কারখানায় প্রস্তুত কাঠি সম্পূর্ণরূপে শৈত্যসহ (Damp-proof) হয় না, কিন্তু এ সমুদয় অসুবিধা সত্ত্বেও বাঙ্গালায় গৃহ-শিল্পরূপে দেশলাই প্রস্তুতের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল বলিয়া মনে হয় না।

সম্প্রতি বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের এঞ্জিনিয়ার মিঃ এস, সি, মিত্র

Tariff Board এ যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালার দেশলাই-শিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায়। প্রত্যহ তিন হাজার বাক্স দেশলাই প্রস্তুত করিতে পারে, এরূপ কারখানা বঙ্গদেশে ৭।৮টির অধিক নাই। এতদ্ভিন্ন মধ্যম রকমের কারখানাও কয়েকটি আছে। ফলতঃ বাঙ্গালার দেশলাই কারখানাসমূহকে মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—(১) যে সকল কারখানা Power সহযোগে Frame ও Box-filling কল লইয়া কার্য্য করে এবং (২) যেগুলির কার্য্য হস্ত দ্বারা সাধিত হয়। গড়পড়তায় উভয় শ্রেণীর কারখানাতেই দেশলাই প্রস্তুতের খরচ প্রায় একই পড়ে। অর্থাৎ গ্রোস প্রতি ১৵০ হইতে ১৷০; ইহার কারণ এই যে, বড় কারখানার কল ব্যবহারের জন্য এক দিকে মজুরী যেমন কম পড়ে, তেমনই কাঠির দর প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র কারখানা-স্বামিগণ বড় কারখানার পরিত্যক্ত কাঠি কিনিয়া লইয়া কার্য্য করে; তাহাতে কাঠির মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক দাঁড়ায়, কিন্তু তাহাদের সমস্ত কায হস্ত-পরিচালিত বলিয়া মজুরী খরচ অধিক পড়ে। ক্ষুদ্র কারখানার অস্তিত্ব অনেকটা বড় কারখানার উপর নির্ভর করে; কিন্তু কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া যদি এইরূপ কারখানা Frame-filling কল ক্রয় করে, তাহা হইলে স্বাধীনভাবে কার্য্য চালাইতে পারে। একটি জাপানী frame filling কলের দাম প্রায় সাত শত টাকা। চেষ্টা করিলে এরূপ কল দেশে প্রস্তুত করাও অসম্ভব নহে। ফলতঃ কারখানা যতই ক্ষুদ্র হউক, Frame filling কল না থাকিলে উহার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রোস প্রতি দেশলাইর উপর ১৷০ আমদানী শুল্ক আছে। অদূর-ভবিষ্যতে দেশলাই সম্বন্ধে কিরূপ রক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হইবে, তাহা এখন শুল্ক-বোর্ডের বিবেচনাধীন। কিন্তু আপাততঃ যে হারে আমদানী শুল্ক আছে, তাহাতেও ক্ষুদ্র কারখানা বিলাতী মূলধনে পুষ্ট বড় কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। যে সকল কাঠি লইয়া কলে কায করা চলে না, সেইরূপ কাঠি হইতে ক্ষুদ্র কারখানার দেশলাই প্রস্তুত করিয়া উহা অপকৃষ্ট শ্রেণীর। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের দেশে সুলভতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং ক্ষুদ্র কারখানার দেশলাই বৃহৎ কারখানার মাল অপেক্ষা ২।৩ আনা সুলভ। ক্ষুদ্র কারখানার পক্ষে উৎপাদনের খরচ আরও হ্রাস করা সম্ভবপর। যদি পাইকারী দরে কাঠি, বাক্স, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য আবশ্যক বস্তু সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্ষুদ্র কারখানাওয়ালাগণ উচিত মূল্যে দেশলাই প্রস্তুতের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম পায়েন, তাহা হইলে প্রতি গ্রোস উৎপাদনের খরচ বোধ হয় কি ১ টাকায়ও দাঁড়াইতে পারে।

মিঃ এস, সি, মিত্রের খুবই বিশ্বাস যে, সরকারী সাহায্য পাইলে কুটীর-শিল্প হিসাবে দেশলাই প্রস্তুত বঙ্গদেশে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি যে কয়েকটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষরূপে বিবেচনাযোগ্য;—(১) যে সমুদয় কারখানা প্রত্যহ তিন হাজার বাক্সের উপর দেশলাই প্রস্তুত করে, তাহাদের উপর Excise শুল্ক ধার্য্য করা; বিলাতী মূলধন দ্বারা পরিচালিত কারখানাগুলিই প্রধানতঃ এরূপ শুল্কের আমলে আসিবে; শুল্কের হার গ্রোস প্রতি চারি আনার অধিক হওয়া উচিত নহে;—(২) মূলধনের শিয়দংশ অথবা সাজ-সরঞ্জাম কিনিবার টাকা ঋণ দিয়া ক্ষুদ্র কারখানাগুলির সহায়তা করা; কো-অপারেটিভ বিভাগ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; পরে State Aid to Industries Bill পাশ হইলে আরও অধিক সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে।

বৃহৎ কারখান'-শিল্পরূপে দেশলাই প্রস্তুতের অনেক অন্তরায় আছে; তন্মধ্যে অনুল্লঙ্ঘ্য অন্তরায় বিদেশীয় প্রতিযোগিতা। বিদেশে বহুকাল ধরিয়া রাশি রাশি অর্থব্যয়ে যে সমুদয় বিরাট কারখানা সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহাদের মূলধন কোটি কোটি টাকা, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের সমকক্ষ হইবার আকাঙ্ক্ষা বাতুলতা মাত্র। অন্যদিকে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত বেকারের অভাব নাই এবং সমবায় প্রথাতেই হউক অথবা এককভাবেই হউক, অনেক ভদ্রলোক Frame-filling কল লইয়া দেশলাই কারখানা চালাইতে পারেন। এতদ্ভিন্ন দেশলাই প্রস্তুত কার্য্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—বাক্স ও কাঠি তৈয়ারী, মশলা লাগান, কাগজ মোড়া ইত্যাদি। স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় এইরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া কোন কেন্দ্রীয় কারখানায় কাঠি বাক্সবদ্ধ ও প্যাক করিয়া বাজারে প্রেরিত হইতে পারে। এরূপ শ্রমবিভাগে খরচ লাঘব হইবার সম্ভাবনাও আছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেশলাই শিল্পের সর্ব্বদিক্ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে; তবে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করা উচিত যে, Sweedish-American Match Combine এর জগতের দেশলাই ব্যবসায় একচেটিয়া করার চেষ্টা ভারতে ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক দেশলাই শিল্প স্থাপনের অনুকূল নহে। আমরা যদি গৃহশিল্প হিসাবে দেশলাই প্রস্তুত করিতে পারি এবং আপাততঃ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাল লইয়া সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলেই আমরা বিদেশীয় অথবা বিদেশীয় মূলধনপুষ্ট দেশীয় কারখানাগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিব। বিদেশের বৃহৎ কারখানা-শিল্পের অনুকরণ করিতে যাইলে দেশীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয় প্রকার কারখানারই উচ্ছেদসাধন অবশ্যম্ভাবী; Combine নানা উপায়ে দেশীয় দেশলাই শিল্পকে সেই পথেই লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেছে। এখন সাবধান হওয়া দরকার, যেন আমরা উহাদের হাতের ক্রীড়নক না হই।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

কুঁচিলা

প্রতিবাদ

গত পৌষের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় "কতিপয় প্রসিদ্ধ বিষবৃক্ষ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে 'কুঁচিলা' সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় যে, 'কুঁচিলা' ভারতের আদিম অধিবাসী, সুলভ ও বীর্য্যবান্ বৃক্ষ হইলেও প্রাচীন হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম নাই। কুঁচিলা বীজ হইতে প্রসিদ্ধ তীব্র বিষ Strychnine ও Brucine পাওয়া যায়।"

নিকুঞ্জ বাবুর এই উক্তির প্রতিবাদ করা উচিত মনে করি। প্রাচীন ভারত কুঁচিলার গুণাগুণ জানিতেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই বিভাগে বিভক্ত। চরক প্রভৃতি গ্রন্থ বৈদিক পথাবলম্বী, তান্ত্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রেই বিষঘটিত ঔষধাদি বিশেষরূপে প্রচলন হইয়াছে। বৈদিক চিকিৎসকরা তীক্ষ্ণবিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিতেন না, তান্ত্রিক যুগেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই জন্যই চরককৃত গ্রন্থে কুঁচিলা প্রয়োগ নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কুঁচিলার গুণাগুণ লিখিতেছে,—

"তিন্দুকো যস্ত কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ।
কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কালপীলুকঃ।
কাকেন্দুর্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ॥
কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকুল্লঘু।
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্॥"

ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে ইহার বিষত্ব অবিজ্ঞাত ছিল না। 'গাবকে'ও তিন্দুক বলা হয়, কিন্তু কুঁচিলার অপর নাম বিষ-তিন্দুক। বাতরক্ত অধিকারে বিশ্বেশ্বররসে (আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ) কুঁচিলার প্রয়োগ রহিয়াছে। নিম্নে উহার প্রস্তুত-প্রণালী দেওয়া হইল,—

"রসাদ্দশ বিষাৎ পঞ্চ গন্ধকাদ্দশ শোধিতাৎ।
তুত্থাদ্দশ পলাশস্য বীজেভ্যঃ পঞ্চ কারয়েৎ॥
ক্ষুদাশ্বমারধুস্তূরকরহাটকনীলিতঃ।
দশকং দশকং কুর্য্যাচ্ছোষয়িত্বা জটাত্বচঃ॥
দশকং দশকং দত্ত্বা কুচিলাদ্দশ নূতনাৎ।
ভল্লাতকাচ্চ দশকং চূর্ণয়িত্বা ভিষক্ ততঃ॥
সুদিনে চ বলিং দত্ত্বা বৈদ্যঃ পূজাপরায়ণঃ।
রক্তিকা-দ্বিতয়ং দদ্যাৎ সহতে যদি বা ত্রয়ম্॥
বাতরক্তং জ্বরং কুষ্ঠং খরস্পর্শমসৌখ্যদম্।
আজানুস্ফুটিতং হস্তি বিষজং বাস্থিনিঃস্থতম্॥
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
বিশ্বেশ্বরো রসো নাম বিশ্বনাথেন ভাষিতঃ॥"

ইহা ব্যতীত বৃদ্ধবিদ্যগণের অনেক তালিকা বহিতে ও বহু ঔষধে কুঁচিলার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক গ্রন্থ সকল প্রায়ই শিবোক্ত, নীলকণ্ঠ শিবই বিষ-ভক্ষণকারী মৃত্যুঞ্জয়। ঔষধার্থে যাবতীয় তীক্ষ্ণ বিষের প্রয়োগ যে সকল গ্রন্থে রহিয়াছে, সে সমস্তই শিবোক্ত বলিয়া পরিচিত।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান, কাব্যতীর্থ।

হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রে কুঁচিলার ব্যবহার

প্রতিবাদের উত্তর

প্রতিবাদের মর্ম্ম এই যে, প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকরা কুঁচিলার ব্যবহার অবগত ছিলেন ও চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতেন। এক্ষণে প্রথম আলোচ্য বিষয়—'প্রাচীন' বলিতে কি বুঝায়। হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রের তিন যুগ আছে বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়। ১৫০০ হইতে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন বৈদিক অথবা আর্য্য যুগ; তৎপরে বৌদ্ধ কিংবা মধ্যযুগ এবং তাহার পর আধুনিক যুগ। আমার প্রবন্ধে আমিও এইরূপ যুগ-বিভাগ প্রথা অনুসরণ করিয়াছি। প্রতিবাদক স্বয়ং বলিতেছেন যে, বৈদিক যুগে কুঁচিলার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাঁহার একটি উক্তির অর্থ স্পষ্ট নহে। তিনি লিখিতেছেন যে, "বৈদিক চিকিৎসকরা তীক্ষ্ণ বিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিতেন না।" ইহা দ্বারা তিনি কি বলিতে চাহেন যে, বৈদিক চিকিৎসকগণ কুঁচিলার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসার্থ কুঁচিলা ব্যবহার করিতেন না? যদি তাহাই হয়, তবে উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা উক্ত উক্তির সমর্থন করা আবশ্যক।

প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে যে কুঁচিলার ব্যবহার ছিল না, তাহা প্রতিবাদক স্বীকার করায় প্রতিবাদের কোন উত্তর আবশ্যক হইত না। কিন্তু কুঁচিলার ন্যায় বীর্য্যবান্ ও বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণের কতকটা জ্ঞান থাকা দরকার মনে করিয়া আরও দুই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। প্রতিবাদক "তিন্দুকো যস্ত" ইত্যাদি যে ৫টি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোন্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, লিখেন নাই, সুতরাং উহার কালবিচার করিবার উপায় নাই। তিন্দুক কপিলু, প্রভৃতি সাধারণ গাবের (Diospyros embryopteris) নামান্তর মাত্র; বিষ-তিন্দুকও অন্য জাতীয় গাবের নাম। সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে Diospyros montana উক্ত নামে অভিহিত হইত। ইহার রাসায়নিক গঠন অন্যান্য গাব হইতে পৃথক্ এবং ইহার যে বিষক্রিয়া আছে, তাহা মাছ মারিবার জন্য বিষ-তিন্দুক ফলের ব্যবহার হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ত্রিবাঙ্কুরে পার্ব্বত্যজাতিসমূহ এইরূপ অসদুদ্দেশ্যে বিষ-তিন্দুক প্রয়োগ করিয়া থাকে। আরও দেখা দরকার যে, কুঁচিলা-পত্রকে দীর্ঘ ও মেঘবর্ণ বলা যায় না; উহা অণ্ডাকৃতি, গাঢ় সবুজ এবং ১-১॥ × ৪ ইঞ্চ; পক্ষান্তরে নানাজাতীয় গাবের পত্র পরিণত বয়সে নীলাভ, গড়ে ২ × ৬ ইঃ, সূচ্যগ্র ও চাকচিক্যশালী (Roxburgh—Flora Indica)। উদ্ধৃতাংশে বিষ-তিন্দুকের যে গুণাবলী দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি কুঁচিলা অপেক্ষা গাবের পক্ষেই অধিকতর প্রযোজ্য। গাবে শতকরা ১২·৮ ভাগ পর্য্যন্তও কষায় পদার্থ পাওয়া যায় এবং অপক্ক অবস্থায় গাবের স্বাদ কটু। উক্ত কয় পংক্তিতে Strychnine এর তীব্র বিষ-ক্রিয়ার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

শার্ঙ্গধর বিষমুষ্টি নামে একটি ভেষজ দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উহাকেই কুঁচিলা বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ভাব-প্রকাশে দেখা যায় যে, বিষমুষ্টিফল ভক্ষ্য; কুঁচিলা ফল অভক্ষ্য; ইহাতে সামান্য মাত্রায় Strychnine আছে! দুই একটি আধুনিক কালের সঙ্কলিত গ্রন্থে কুঁচিলাকে কুরচিল্ল বলা হইয়াছে। কুরচিল্ল বোধ হয় 'কুকচিল্ল' অর্থাৎ কাঁকড়ার প্রতিসংজ্ঞার অপভ্রংশ। কুঁচিলার সহিত কাঁকড়ার পৃষ্ঠদেশের (Crapua) কতকটা সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কুঁচিলা-বীজ চিকিৎসার্থ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। য়ুরোপেও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিকদ্বয়, Pelletier ও Caventon, সর্ব্বপ্রথমে কুঁচিলা-বীজ হইতে Strychnine প্রাপ্ত হয়েন।

প্রতিবাদক মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ হইতে যে "বিশ্বেশ্বর-রস" প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অপ্রয়োজনীয়; কারণ, উক্ত গ্রন্থ আধুনিক এবং মধ্য ও আধুনিক যুগে যে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে কুঁচিলা স্থানলাভ করিয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করি নাই। বলা আবশ্যক যে, খুব কম তান্ত্রিক চিকিৎসাগ্রন্থের কাল নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শিব অথবা অন্য দেবদেবী কিংবা মুনি-ঋষির নাম করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করা পূর্ব্বে একটি প্রথামাত্র ছিল। উহাতে প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয় না। প্রতিবাদক মহাশয় ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত History of Hindu Medicine by Dr. Girindra Nath Mukherjee, B. A., M. D., F. A. S. B., নামক পুস্তকে পাইতে পারেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মধুমাসে

(১)

মূর্ত্তি ধরিয়া উঠেছে জাগিয়া
নিখিল প্রাণের স্পন্দ;—
মধুমাসে আজ গাহিছে কোয়েল,
বহিছে মলয় মন্দ!

(২)

নন্দন-বন নিন্দিত করি ধরণী
সুন্দর সাজে সেজেছে শ্যামলবরণী!
নব-কিশলয় পল্লবোপরি,
কুঞ্জ-বিটপী উঠিছে শিহরি,
ছুটে দিশি দিশি উন্মদ করি
আকুল কুসুম-গন্ধ;—
মধুমাসে আজ গাহিছে কোয়েল,
বহিছে মলয় মন্দ!

(৩)

বিহগ-কণ্ঠে এ কি রে মধুর সঙ্গীত!
বিরহি-হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে হয় কম্পিত!
গাহে চন্দনা বসন্ত-দূত,
করে বন্দনা পক্ষী অযুত—
গুঞ্জরি অলি পরাগ লিপ্ত
পান করে মকরন্দ,—
মধুমাসে আজ গাহিছে কোয়েল,
বহিছে মলয় মন্দ!

(৪)

চিত্ত আকুল আজিকে কাহার পরশে—
হৃদয় আমার পূর্ণ নিবিড় হরষে!
দূর হ'তে ছুটে আসিছে সমীর,
উচ্ছ্বাসে মাতি অবাধ-অধীর
অন্ধ আবেগে মূর্চ্ছিয়া পড়ে—
নাহি বাধা—নাহি বন্ধ,—
মধুমাসে আজ গাহিছে কোয়েল,
বহিছে মলয় মন্দ!

(৫)

ধরার অঙ্গ রঞ্জিত করি কিরণে,—
আসিয়াছে মধু মূর্ত্ত হরিত হিরণে!
গাহ রে বিহগ পঞ্চমে গান,
বহ রে সমীর মুক্ত পরাণ,—
বিশ্ব-সভায় উছল ধারায়
বহুক বিমলানন্দ!
মধুমাসে আজ গাহিছে কোয়েল
বহিছে মলয় মন্দ।

শ্রীহরিপদ গুহ বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভারতী।

সাহিত্যের মানহানির মামলার বিচার

বিচারপতি—

সাহিত্য-সম্রাট্ মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি, লিট্, ইত্যাদি।

জুরিগণ—

১। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (ফোরম্যান্),
২। রায় বাহাদুর শ্রীযুত জলধর সেন,
৩। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী,
৪। শ্রীযুত পি, চৌধুরী,
৫। শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাদী—

সরকার বাহাদুর।

প্রতিবাদী—

নব্য তন্ত্রের সাহিত্যিকবৃন্দ।

বেলা ১০টা, বিচার-গৃহে লোকারণ্য। তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্র। ছোট বড় মাঝারি অনেক সাহিত্যিক উকীলগণের পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট।

মোকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইলে দেখা গেল, সরকার পক্ষে কোন সাহিত্যিক উকীল উপস্থিত নাই। তখন বিচারপতি, শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, বেদান্তরত্নকে হাজির পাইয়া তাঁহাকে সরকার-পক্ষ সমর্থন করিবার আদেশ দিলেন।

প্রতিবাদিগণের পক্ষে বহু উকীল উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ, ডি, এল-কে সকলের অগ্রবর্ত্তী দেখা গেল। তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল।

জুরি-নির্ব্বাচনসময়ে প্রতিবাদী পক্ষের উকীল-প্রধান প্রথম তিন জন সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলেন,—

(১) শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক জন প্রবীণ মাসিকপত্র-সম্পাদক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তিমতে তিনি সাহিত্যিক নহেন। তিনি এক জন নিতান্ত নীরস, শুষ্ক, ব্রাহ্ম পিউরিট্যান (puritan), তিনি কেবল রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন, সুতরাং রস-সাহিত্যের বিচারে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

(২) রায় বাহাদুর শ্রীযুত জলধর সেন অবশ্য ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি বস্তাবন্দী করিয়া হাইড্রলিক প্রেস চাপ দিয়া নিংড়াইলেও তাহার মধ্য হইতে এক বিন্দু আদরস বাহির হইবে না; সুতরাং তিনিও রস-সাহিত্যের বিচারে অনুপযুক্ত।

(৩) শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী দীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গদেশের বাহিরে কাটাইয়া আসিয়াছেন, ইতোমধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যে যে বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তিনি তাহার খোঁজ রাখেন না। তিনি ভারতীতে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক বই পড়িবার সুযোগ পান নাই, পরে পড়িয়াছেন কি না, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোক, এ দেশে স্ত্রীজাতি জুরির বিচারে বসিবার অধিকার এ পর্য্যন্ত পান নাই।

উকীল-সরকারের কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিচারপতি এই সকল আপত্তি না-মঞ্জুর করিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, রস-সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে আজকাল অনেক স্ত্রীলোক আছেন, নব্য সাহিত্যিকগণের তৈয়ারি রস তাঁহাদের চিত্তে কিরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহা বিচারের জন্য ইঁহাকে জুরিতে রাখা একান্ত আবশ্যক।

অতঃপর উকীল-সরকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক চক্ষু বিচারপতির প্রতি ও অপর চক্ষু জুরিগণের দিকে ন্যস্ত করিয়া অতি ধীরে এইরূপে case open (মোকর্দ্দমা আরম্ভ) করিলেন :—

মি লর্ড (My Lord)—শ্রীবিষ্ণু—মাননীয় বিচারপতি ও জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আপনারা বোধ হয় জানেন, আমিও এক জন নিতান্ত নীরস লোক। আমি বাড়ীতে অবসরমত বেদান্তচর্চ্চা করি, রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া পরলোকতত্ত্বের গবেষণা করি, আর ভোরে উঠিয়া সেগুলি হজম করিবার জন্য হেদোর চারি ধারে সাত পাক ঘুরি। আমি আধুনিক বাঙ্গালা রস-সাহিত্যের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের কোন খোঁজ-খবর রাখি না। তবে মহামান্য সাহিত্য-সম্রাট্, যখন আমাকে দয়া করিয়া এই

মোকর্দ্দমায় সরকার-পক্ষ সমর্থনের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। মি লর্ড—শ্রীবিষ্ণু, মাননীয় বিচারপতি! আপনি বর্ত্তমান নব্য সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে যে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ আপনি যে "চার্জ্জ সিট" প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা আমার কায অতি সহজ হইয়াছে। মাননীয়া জুরি মহোদয়া ও জুরি মহোদয়গণ! আপনারা একটু মনোযোগ দিয়া শুনুন, আমি সেই অভিযোগপত্র পাঠ করিতেছি।—আধুনিক সাহিত্যে যৌন-মিলনের জীবধর্ম্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম্ম উভয়ের সীমানা বিভাগ নিয়ে এই মামলার উৎপত্তি হয়েছে। বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন, কিন্তু সে হইল বিজ্ঞানের কথা,—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।..... সাহিত্যে যৌন-মিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক্ থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক্ থেকে। অর্থাৎ যৌন-মিলনের মধ্যে যে দু'টি মহাল আছে, মানুষ তার কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্য কালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হ'লো বিচার্য্য।...আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌন-মিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চল্‌ছে, সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল; রেণেঁসেন যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চিরদিনের মত পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকতে পারে না। আমাদের দেশের ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এবং ঈশ্বর গুপ্তের পাঁঠার উপর কবিতা যাহা এক সময়ে নাগরিক মহলে যথেষ্ট আদর পেয়েছিল, আধুনিক শিষ্ট-সাহিত্যের বাজারে তাহা অচল হইয়া বটতলা অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়াছে। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রু এসেছে, সেটাকেও কেউ কেউ মনে করছেন, নিত্য পদার্থ; ভুল যান, যা নিত্য, তা' অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে, সেইটেই নিত্য; যে আভিজাত্য আছে—রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলবে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ। চিৎপুর রোডে হোলিখেলা বা বসন্ত উৎসবের নামে নির্লজ্জ মাতলামির বা পাগলামির ন্যায় পরস্পরকে মলিন করার উন্মত্ততা মনস্তত্ত্বের নামে বাঙ্গালা-সাহিত্যে এখন চলিতেছে। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মূল প্রেরণা, সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ-প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্ব্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত বলেই আপত্তি করব, অন্য ব'লে নয়।...সাহিত্য-রসের হোলিখেলায় কাদা মাখামাখির পক্ষসমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নাই কি? এ প্রশ্নটা অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দলের মাতলামি এবং মাদল-করতালের খচো-মচো ও চীৎকার যে সত্য বস্তু, তাহা প্রশ্ন করাই অনাবশ্যক। যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে, এটা সঙ্গীত কি না? মাধুর্য্যহীন এই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মান্‌তে হয়, তবে এই পালোয়ানির মত জাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এই পৌরুষ চিৎপুর রাস্তায়, অমরাপুরীর সাহিত্যকলায় নয়। আধুনিক সাহিত্যে যে হট্টগোল দেখা দিয়াছে, তাহা সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটের কল্যাণে। এই হট্টগোলই আধুনিক সাহিত্যের বাহাদুরী।"

অতএব সরকার পক্ষ হইতে আমি আধুনিক সাহিত্যের নামে নিম্নলিখিত অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি :—

আধুনিক সাহিত্য যৌন-মিলনের দৈহিকতা নিয়ে যে একটা মস্ত উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে, তাহার তিনটা ওজুহত দেওয়া হয়, যথা—(১) বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-নিবৃত্তি, (২) আর্টের কারচুপি (৩) সত্যের উদ্‌ঘাটন; আধুনিক সাহিত্যের এই বে-আব্রুতা বিদেশের আমদানী, এই নির্ব্বিচার নির্লজ্জতার সহিত নিত্য-সাহিত্য-রসের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা দ্বারা বাণীর মন্দির কলুষিত হইতেছে এবং কলালক্ষ্মী কলঙ্কিত হইতেছেন।

হে জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আমি এই অভিযোগ সমর্থনের জন্য প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি।

উকীল-সরকার আসন গ্রহণ করিলে প্রতিবাদিগণের উকীল-প্রধান তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জুরিদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া বুক টান করিয়া দুই পকেটে দুই হাত পুরিয়া চেয়ারের উপরে এক পা তুলিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আজ এ 'কী' শুনিলাম! এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! সাহিত্যক্ষেত্রে আমার এক জন বন্ধু আছেন, যাঁহার ন্যায় মূর্খ এ পৃথিবীতে আর একটি নাই, অথচ তিনি সেই মূর্খতার গর্ব্ব করিয়া থাকেন। "রসসৃষ্টি ও রসের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের বিধিদত্ত অধিকারে বঞ্চিত" সেই ব্যক্তিকে আমরা সাহিত্যের "স্যানিটারি ইনস্‌পেক্টার" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকি। কিন্তু উকীল-সরকার নব্যসাহিত্যিকদিগের বিষয়ে যে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, এ যে তাঁহারই কথা! বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন "ভাবগঙ্গার ভগীরথ", যাঁকে "নিত্য নূতন রসের পূজারী", "সাহিত্যের নূতন ধারার মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নবসাহিত্য এত দিন পূজা করিয়া আসিয়াছে" আজ তাঁহার মুখে এ 'কী' শুনিলাম! জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আমি কে, তাহা আপনারা জানেন কি? গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের ন্যায় আমি এক জন সাহিত্যরথী, আমি নব্যসাহিত্যিকগণের সেনাপতি। আমি যে দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছি, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সেই গুরুদেবের অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আমরা নব্যসাহিত্যিকগণ যাঁহাকে কাণ্ডারী করিয়া তরী ভাসাইয়াছিলাম, তিনিই কি না মাঝদরিয়ায় আসিয়া আমাদিগকে নৌকা হইতে ধাক্কা মারিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Throwing over board.

সরকার পক্ষ নবীন সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে বিদেশের আমদানী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য-সম্রাটের নিকট এ কথা লইয়া আমরা কটাক্ষলাভের আশা করি নাই। আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া থাকে, তাহা কোন্ জানালা দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—যদি সে আলো সত্য সত্যই আমার অন্তরের ভিতরকার মণিরত্ন উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। আমার অন্তর যে কত মণিরত্নে ভর্ত্তি, তাহা কে না জানে? আর কলা-রসের কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা আমি যেরূপ বুঝি, রবীন্দ্রনাথ ততটা কিরূপে বুঝিবেন? কারণ, ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রামপালই হইতেছে নানাবিধ সুস্বাদু কলার জন্মস্থান, আর আমার বাড়ী তাহার নিকটবর্ত্তী মৈমনসিংহ জেলায়। যাহা হউক, নূতন সাহিত্য-কলাকে বিদেশের আমদানী বলা রবীন্দ্রনাথের মুখে শোভা পায় না; কারণ, তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অনেকটারই উদ্দীপনা আসিয়াছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ হইতে। বিদেশী কবিতার রসাস্বাদে যাহারা অভ্যস্ত নয়, তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার রসাস্বাদই অসম্ভব। আবার সমগ্র ভাবে ইব্‌সেন্ ও মেটারলিঙ্কএর প্রভাব যে তাঁর লেখায় আসিয়াছে, বোধ হয়, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ তাহা অস্বীকার করিবেন না।

সরকার পক্ষ সাহিত্যের বে-আব্রুতা ও যৌন-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিষয়-নির্ণয় স্পষ্ট করিয়া করেন নাই। কোন্ গ্রন্থকারের কোন্ কোন্ পুস্তক তাঁহাদের লক্ষ্য, তাহা খোলসা করিয়া বলা উচিত ছিল। আবার আব্রুতা ও বে-আব্রুতার মধ্যে সীমারেখা কোথায়, তাহাও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালির" অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু; "ঘরে বাইরের" অনেকটা ত বটেই। শারীর ব্যাপারমাত্রেই অপাংক্তেয় নয়; কেন না, চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট্। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী" চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমা-রেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু এই পদবাচ্য হইতে পারে। সেই সীমারেখা কোথায়?

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের দুইটি দিক্ আছে—একটি পশুভাবে, আর একটি মানুষভাবে বা প্রেমের ভাবে। প্রথমটির প্রয়োজন যথেষ্ট আছে, তাহার সত্যতাও অবিসম্বাদিত, কিন্তু তাহা রস হিসাবে অনর্থক। শুধু প্রেম অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধের মানসিক স্বরূপটাই রস-বিচারে সার্থক হয় বা হইতে পারে। প্রেমের ভিতরে একটা আব্রু আছে, কাযেই সেই আব্রুটা ভেদ করিয়া যৌন মিলনের পশুভাবের আলোচনা সাহিত্যে নিত্যবস্তু হইতে পারে না। বাদী পক্ষের এই যুক্তির মধ্যে অনেকটা ফাঁক আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া কাব্য হিসাবে সার্থকতার অসার্থকতার নির্ণয় হয় না; দ্বিতীয়তঃ যৌন-সম্বন্ধের যে দিক্‌টা পশুধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যে রসের বিচারে চিরকালই অনর্থক, এ কথা ঠিক নহে। কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপন সার্থকতা খুঁজিয়াছে; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্ররচনায় সার্থকতা

লাভ করিয়াছে।···কাব্যের মধ্যে দেহের গন্ধ থাকিলেই তাহা কাব্যের নিত্য রসে বঞ্চিত হইবে, এ কথা যে সত্য নহে, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আছে। অথচ কেবল মাত্র যৌন-সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া পাঠকের চিত্তের বিরংসার উপর বাণিজ্য করা যে নিত্য অনিত্য কোনরূপ রসই নয়, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আসল কথা, এই দুইয়ের ভিতর সীমা-নির্দ্দেশ। সরকার পক্ষ সেই সীমারেখা কোথায় টানিতে চান, তাহা বুঝা যায় না।

বাদিপক্ষ এ বিষয়ে সাদা কথায় কোন যুক্তি না দিয়া কেবল অলঙ্কারের ছটায় আসল কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আসল কথা হইতেছে এই, রসরচনা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসের মধ্যে সীমা-নির্দ্দেশ কোন বাহ্য উপায়ে হইতে পারে না। নগ্ন নারীমূর্ত্তি মনোহর রসমূর্ত্তি হইতে পারে, আবার কদর্য্য অশ্লীলতাও হইতে পারে। এই দুয়ের ভেদ ভাবের ভেদ। যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায়, সেটা আবৃত হউক, অনাবৃত হউক, তাহা আর্ট; আর যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া দেয় না—দিতে চায়ও না, কেবল মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, তাহা আর্ট নহে। কি চিত্রে, কি গল্পে, কি কবিতায় আর্ট হিসাবে ভাল-মন্দের ইহা ছাড়া অন্য কোন মানে নাই। ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ, যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করেন, কিন্তু অরসিককে অন্য কোন বাহ্য লক্ষণ দিয়া বুঝাইবার উপায় নাই।

ইংলণ্ডের সাহিত্যে ভিক্টোরিয়া যুগে চারিদিকে সম্ভ্রম বাঁচাইয়া আব্রু রক্ষা করিয়া রস-রচনার আয়োজন হইয়াছিল। সে সীমালঙ্ঘন করিয়া ফরাসী ও পরে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকগণ সেই অপাংক্তেয় বিষয়গুলি হইতে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা ত কেহ অস্বীকার করিবেন না। বঙ্গ-সাহিত্যেও যে এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে, তাহা সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রদেশ শিষ্ট-সাহিত্যের বহির্ভূত ছিল, তার ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক রসসৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্য জন্মিয়াছে, যার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাহারা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোন রস উদ্বোধন করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সরকার পক্ষ যদি এই শ্রেণীর সকল বইকেই অনিত্য বলিয়া ভাসাইয়া দিতে চান, তবে তাঁদের এ নিষ্পত্তি চরম বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য হইব না। আমার সহযোগিগণের অনেক বই এই শ্রেণীর থাকিতে পারে, কিন্তু আমার একখানা বইও শারীর রসে ভরপুর হইয়াও নিত্য রসবর্জ্জিত নহে, এ কথা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। "ছোট সাহিত্য সম্রাট্" আমাকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহা আপনারা দেখিতে পারেন। আমার শেষ কথা এই, রাজনীতিক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যেও অটোক্রেসির যুগ চলিয়া গিয়াছে, এমন ডিমোক্রেসির যুগ। সম্রাটের কথাই যে আইন, ইহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। এখন প্রবল জনমতের দ্বারা সাহিত্যের নিত্যতা অনিত্যতার যাচাই হইবে। সরকার পক্ষ যাহাকে সাহিত্যের বাজারে হট্টগোল বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহা হট্টগোল নহে, তাহা ভোটের গোল। সাহিত্যগগনে এক চন্দ্রের (বঙ্কিম) অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রবির উদয় হইয়াছিল, রবিরও সেইরূপ দশা-বিপর্য্যয় আসন্নপ্রায়। ঐ দেখুন, শরতের পূর্ব্বাকাশে আর একটি চন্দ্রের প্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা নব্য সাহিত্যিকগণ তাঁহার অভিনন্দন করিয়া বলিতেছি:—

"The old order changes, yielding place to the new—
And God fulfills Himself in many ways."

বিবাদী পক্ষের উকীল-প্রধান এইরূপে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন উকীল-সরকার তাহার জবাব দেওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

মাননীয় বিচারপতি এবং জুরি মহোদয়া ও মহোদয়গণ! আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু তাঁহার এই গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা আমার কায অতি সহজ করিয়া দিয়াছেন। আমার আর প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক হইবে না। এই মোকর্দ্দমার যাহা বিচার্য্য বিষয়, তাহা তিনি নিজেই একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম কথা, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য যৌন-মিলনের দৈহিকতার চিত্র দ্বারা কলুষিত হইতেছে কি না? আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ হইতেছে—বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে এমন অনেক বই জন্মিয়াছে, যাহারা শারীর ব্যাপার নিয়া

খাঁটাখাঁটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সেবা করিয়াছে,—তবে তিনি নিজে সে দলের নহেন। সে কথা আমরা পরে বিবেচনা করিব। দ্বিতীয় কথা, এই সকল ভাব বিদেশ হইতে আমদানী কি না? তাহা ত তিনি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া যুগের পরবর্ত্তী য়ুরোপীয় সাহিত্যিকগণ সাহিত্যরচনায় আব্রু রক্ষা করেন নাই এবং সেই উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউ বঙ্গদেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তবে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন, আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া আমার হৃদয়ের মণিরত্ন উদ্ভাসিত করে, তাহা কোন্ জানালা দিয়া আসিল, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ কথা খুবই সত্য। বিদেশীয় ভাবমাত্রই দূষণীয় নহে, তবে তাহা আমাদের নিজের ধাতের সঙ্গে ও আভিজাত্যের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া চাই। বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিবার পরে সূর্য্যমুখী নিরুদ্দেশ হইলেন, ইহা আমাদের জাতির ধাতের সহিত খাপ খাওয়ান কঠিন, কিন্তু যদি কোন নায়িকা তাহার স্বামীর নির্য্যাতনে গৃহত্যাগ করিয়া রাগের ভরে থিয়েটারের ষ্টেজের উপর যাইয়া উপস্থিত হয়, তবে সে একেবারেই অগ্রাহ্য। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"idea পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা, ইহা ভাষা ও জাতির কল্যাণকর কি না।" বিলাতের আমদানী এই সকল উচ্ছৃঙ্খল ভাব যে আমাদের ভাষার ও জাতির কল্যাণকর নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই সকল পুস্তক প্রকৃত সাহিত্য-রস উদ্বোধন করে না। আপনারা সকলেই জানেন, "ন চ মুক্তা গজে গজে"—সকল জাতির মধ্যে যেমন মুক্তা জন্মে না, সকল গজের মাথায়ও মুক্তা জন্মে না। প্রকৃত সাহিত্য-রসসৃষ্টি একটি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। যাহা হউক, আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু, যে সকল পুস্তক নিষিদ্ধ স্থান হইতে রস সংগ্রহই করিয়াছে—(সে কি রস?) তাহার সবগুলিকেই অগ্রাহ্য করিতে চান না, বিশেষতঃ তাঁহার নিজের গুলিকে। কোন্ কোন্ গ্রন্থ অগ্রাহ্য, সে বিচারের ভার জুরিদিগের উপর, সরকার পক্ষ তাহার তালিকা দিতে চান না। তবে একটি কথা আমার সুবিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—নব্যদলের অনেক সাহিত্যিক থাকিতে তিনি কেন স্বয়ং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া এখানে দাঁড়াইয়াছেন? ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"conscience makes cowards of us"—অর্থাৎ ঠাকুর-ঘরে কে? কলা খাই না—তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটি প্রযোজ্য কি না? আবার কলা-রসজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা আছে সন্দেহ নাই, তাহা সেই রামপাখীর কলা সম্বন্ধে হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-কলা সম্বন্ধে কি না? তাঁহাদের ভাবী সাহিত্য-সম্রাট্ তাঁহাকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহাতে ত ইহার উল্লেখ নাই। সেই সার্টিফিকেট আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি,—"পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়াও স্মরণ হয় না।" যাহা হউক, এই সব ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা আমার না করাই উচিত ছিল; বিশেষতঃ আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু যখন নিজেকে এক জন আসামী বলিয়া মনে করেন, তখন সরকার পক্ষ হইতে আসামীর Character (চরিত্র) সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু নিজেই নিজের কথা উত্থাপন করিয়া আমাকে এ সব অপ্রিয় কথা বলিতে বাধ্য করিলেন।

সে যাহা হউক, যৌন ব্যাপার লইয়া রচিত গ্রন্থরাশির মধ্যে কোন্‌গুলি নিত্য সাহিত্য-রসপুষ্ট আর কোন্‌গুলি রাবিস, এ বিষয়েও আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু বিচারের পথে সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রস, রসনা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসের মধ্যে সীমা-নির্দ্দেশ কোনও বাহ্য উপায়ে হইতে পারে না। একটি নগ্ন নারীমূর্ত্তি মনোহর রসমূর্ত্তি হইতে পারে, আবার কদর্য্য অশ্লীলতাও হইতে পারে। যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায়—সেটা আবৃত হউক, অনাবৃত হউক, তাহা আর্ট; আর যাহা রসবোধে সাড়া না দিয়া পশুবৃত্তিকে জাগায়, তাহা আর্ট নহে। ইহাকেই যদি রস-বিচারের মূল সূত্র ধরিয়া লওয়া যায়, তবে এখানে বুঝিতে হইবে, "আমাদের" মানে কাহাদের? এক জন লম্পটের সূক্ষ্ম শিল্প-বিচারের অধিকার নাই; কারণ, নগ্নমূর্ত্তিমাত্রেই তাহার মনে পশুভাব জাগাইবে। আবার এক জন উচ্চাঙ্গের শিল্পী বা কবি যে চক্ষু দিয়া আর্টের বিচার করিবেন, এক জন সাধারণ লোক সুশিক্ষিত হইলেও তাঁহার সে চক্ষু নাই। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, —"সমস্তই নির্ভর করে লেখকের (অথবা বিচারকের) শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে।" আমাদের মাননীয় বিচারপতি আধুনিক সাহিত্যের অনেক বইকে 'prima facie' (প্রথম সৃষ্টিতে) রাবিস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিকে সরাসরি অগ্নিসাৎ করিবার আদেশ না দিয়া সূক্ষ্ম বিচারের জন্য এই জুরি আহ্বান করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, আদিরসের যে দুইটা দিক্ প্রেম ও কাম, তাহার মধ্যে প্রেম অবলম্বনে যদি খাঁটি স্থায়ী সাহিত্য রচিত হইতে পারে, তবে কাম অবলম্বনে তাহা হইবার বাধা কি? আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু বলেন, কিছু বাধা নাই। কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারেও আপন সার্থকতা খুঁজিয়াছে। শরৎবাবু বলিলেন,—ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক্। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রস্তর থাকে, অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়, ইহাই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের মত। শরৎ বাবু নিজেও না কি আলিঙ্গন ও চুম্বন তাঁহার বইয়ের মধ্যে দিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার উপন্যাসে আদিরসের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে কাম ও প্রেমের মধ্যে সীমানির্দ্দেশের কিরূপ চেষ্টা হইয়াছে, দেখা যাক্। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিয়া সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত কেবল॥"

যদি বলা যায়, কাম ও প্রেমের এই পার্থক্য-বিচার সমীচীন নহে; কারণ, কৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ দ্বারা প্রীতি দিতে যাইয়া গোপীদের কি সেই সঙ্গে সুখ হয় নাই? আর প্রেম ত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের ব্যাপার নহে। ইহার উত্তর এই,—ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সহিত বংশরক্ষা-ঘটিত পশুধর্ম্মের চর্চ্চা করেন নাই. তাঁহাদের কামের অর্থ অন্যরূপ (অশ্লীল গীত-গোবিন্দাদি কোন কোন গ্রন্থে শারীর-ব্যাপার-জনিত কামের চিত্র দেখা যায়,—সেগুলি গ্রন্থকারের শিক্ষা, সংস্কার ও রুচি বশতঃ হইয়াছে)। কৃষ্ণের প্রতি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সমর্পণই তাঁহাদের কাম। তাঁহাদের সেই অনুশীলনের ফলে তাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বময় দেখিতেন (যথা যথা আঁখি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরে)। আর কৃষ্ণ-প্রেম করিয়া তাঁহারা আত্মসুখ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"লোকধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্ম সেবা-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জাধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥

অর্থাৎ স্থূলদেহ ও তাহার আকাঙ্ক্ষা, সংসার-সুখ, লোক-ধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন—এক কথায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের নামই গোপীর প্রেম। কাম কেবল আত্মতৃপ্তিতেই সীমাবদ্ধ, প্রেমের ধর্ম্ম অসীম আত্মসম্প্রসারণ। কাম অল্পে পরিতুষ্ট, প্রেমের বিশালতা অনন্ত, গভীরতা অতলস্পর্শ। প্রেম অল্প তুষ্ট না হইয়া ভূমার স্পর্শে মহীয়ান্। ইহাই প্রেমের সৌন্দর্য্য। যে সাহিত্য প্রেমের এই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারে, তাহাই নিত্যরসে ভরপুর। এক জন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

"It is the very nature of beautiful things to suggest something more and higher; there is a certain infinity in all our best emotions . . . . . Great beauty always suggests infinity."

অর্থাৎ সুন্দর বস্তুর স্বভাবই এই যে, তাহা কিছু অতিরিক্ত ভাবের ব্যঞ্জনা করে। আমাদের সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর অনুভূতির মধ্যে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়।..... যাহা অত্যন্ত সুন্দর, তাহাই অনন্তের আভাস দেয়। শিশুর খেলার রাঙ্গা পুতুল তাহাকে আনন্দ দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আবার এক জন ভোজনবিলাসী বয়স্ক ব্যক্তি সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়া যে সুখ পায়, তাহাও ক্ষণিক, পেট ভরিয়া গেলে আর তাহাতে সুখ পায় না। এইরূপে এক জন ইন্দ্রিয়বিলাসীরও ইন্দ্রিয়সুখ অল্পক্ষণস্থায়ী। এই সকল অল্প পরিতৃপ্ত অনুভূতির মধ্যে অনন্তের আভাস নাই, সুতরাং ইহারা নিত্য সাহিত্য-রসের উপাদান হইতে পারে না। যে অনুভূতির মধ্যে অনন্তের আভাস আছে, কেবল তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের খনি এবং স্থায়ী সাহিত্য-সম্পদের উপাদান। এই জন্য Mathew Arnold বলিয়াছেন—"High seriousness is an essential characteris-

tic of really great literature."—বলা বাহুল্য, কামে তাহা নাই; সুতরাং কাম অবলম্বনে স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টি হইতে পারে না। আমি Winchesterএর আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি;—

"Literature depicts human life and character with some end in view; not merely for the sake of depicting them. And the end in view in the case of the forms of literature specially concerned in the discussion that is poetry and fiction, is to awaken emotion. But if the depiction of any phase of human life arouse only unpleasant, repulsive or degrading emotions, then such depiction is forbidden by the purpose of literature as well as by the laws of morality."

সরকার-পক্ষের উকীল এইরূপে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন বিচারপতি জুরিদিগের দিকে তাকাইয়া তাঁহার চার্জ্জ দিতে আরম্ভ করিলেন;—

আপনারা অবশ্য জানেন, জুরির বিচারে জজের কার্য্য হইতেছে—আইনের ব্যাখ্যা করা (to interprete the law) আর জুরিদের কার্য্য হইতেছে—মোকর্দ্দমার তত্ত্বনিরূপণ করা (to determine the facts) আপনারা উভয় পক্ষের সুবিজ্ঞ উকীলদের বক্তৃতা শুনিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনারা ইহা হইতে নিরপেক্ষভাবে তথ্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। প্রতিবাদি-পক্ষের সুবিজ্ঞ উকীল মোকর্দ্দমার বিচার্য্য বিষয় নিজেই অনেকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ইহা দ্বারা আপনাদের কায অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় হয়েছে, তা'তে আমি তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু শক্তির একটা নূতন স্ফূর্ত্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাবপূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলি বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশী থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে, অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলি হচ্ছে "রিয়ালিটীর কারি-পাউডার।" ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম। আপনারা এই দুই রকম পাউডারের ঝাঁজ দ্বারাই নবীন সাহিত্যের পরিচয় বুঝিতে সমর্থ হবেন। সাহিত্যে লালসা ইতঃপূর্ব্বে স্থান পায়নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু ও জিনিষটা সাহিত্যের পক্ষে বিপজ্জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণ হচ্ছে: ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধূলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতই সহজসাধ্য। অর্থাৎ ধূলোয় যার লুটোতে সঙ্কোচ নেই, তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়।···বড় একটা সাহিত্যের গুণ হচ্ছে অপূর্ব্বতা, অরিজিনালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান্ থাকে, তখন সে চিরন্তনকে নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। একেই বলে অরিজিনালিটি। যখনই সে আজগুবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ কাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিনাল হ'তে চেষ্টা করে, তখনই বোঝা যায়, শেষ দশায় এসেছে। রূপ যাদের ফুরিয়েছে, তাহাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য-ধারায় নৌকা চলাচল অত্যন্ত সেকেলে, হালের উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই, এটা তলিয়ে যাওয়ার রিয়েলিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। আপনারা সাহিত্যের পাকা জহুরী, আশা করি, আপনারা সহজেই এই সকল লক্ষণ দ্বারা অপ-সাহিত্যকে বাছিয়া বাহির করিতে পারিবেন। আপনারা উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়াছেন, আমারও মন্তব্য শুনিলেন, এখন আপনারা মন্ত্রণাগৃহে যাইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া আপনাদের ভারডিক্ট্ (virdict) আমাকে জ্ঞাপন করুন।

বিচারপতির বক্তব্য শেষ হইলে, জুরিগণ মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাঁহারা এজলাসে ফিরিয়া

আসিলে, বিচারপতি তাঁহাদের মুখপাত্র শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনারা সকলে একমত (unanimous) হইয়াছেন কি ?"

রামানন্দ বাবু তাঁহার দীর্ণ পক্ক শ্মশ্রু তর্জ্জনী দ্বারা ভেদ করিয়া বলিলেন,—

"মাননীয় বিচারপতি! আমরা একমত হইয়াছি, আবার হইও নাই।"

বিচারপতি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,—

"সে কেমন ? কথাটা খোলসা ক'রে বলুন।"

রামানন্দ বাবু বলিলেন—

"নব্যসাহিত্যিকগণের নাড়ী অত্যন্ত রসস্থ হওয়ায় সাহিত্যে ঘোর রুচিবিকার হইয়াছে, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। এখন ইহার চিকিৎসা কিরূপে হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। আমার মতে আদিরসকে একেবারে সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন করাই উচিত। জলধর বাবুও হুঁ বলিয়া সেই মতে সম্মতি দিয়াছেন। কিন্তু সুরসিক মিঃ চৌধুরী বলেন—উহুঁ,—তা' হ'তে পারে না। তা' হ'লে সাহিত্যই একেবারে মারা যাবে। এ যেন ছারপোকার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য ঘরে আগুন দেওয়া। নব্যলেখকদিগকে একটা ওয়ার্ণিং (ধমক) দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। প্রভাত বাবু বলিলেন—কেবল ওয়ার্ণিংয়ে চলিবে না, তাহাদিগের ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারা মতে জামিন মুচলিখা নিলেই ভাল হয়। অবশেষে শ্রীমতী সরলা দেবী বলিলেন,—আদিরসমাত্রেই ত দোষের নয়, মানসিক প্রেম সাহিত্যে আনিলে কোন দোষ নাই, বরং তাহার থাকাই উচিত। নচেৎ সাহিত্য স্ত্রীলোকের অপাঠ্য হইয়া উঠিবে। শারীর ব্যাপারটাই অশোভন, সেটাকে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। আমাদের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত আপনাকে জানাইলাম। এখন আপনি যাহা ভাল মনে করেন, সেইরূপ হুকুম দিন।"

অতঃপর বিচারপতি হুকুম দিলেন,—আদিরসের অন্তর্গত শারীর ব্যাপার অর্থাৎ কামকে তিন বৎসরের জন্য সাহিত্য হইতে বর্জ্জন করা হউক, অর্থাৎ কামের transportation for three years.

বিচারপতির রায় প্রকাশ হইলে সাধারণ লোক সকল ৩ বৎসরের দ্বীপান্তর বলিয়া কোলাহল করিতে করিতে বাহির হইল। নব্যসম্প্রদায়ের সাহিত্যের দল, বিশেষতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ নিতান্ত বিমর্ষভাবে আদালত-গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মন্তব্য করিলেন—"Othello's occupation is gone!"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

রাজবন্দী

গাথর ভাঙ', ঘানি টান', গুর্‌কি কোট,' বাগান সাজাও,
ছোবড়া পেঁজ', দড়ি পাকাও, সরকারকে সেলাম বাজাও!
ঘাড়-জাঙিয়া তক্‌তি গলে পশুর মত সদল বলে
ওঠ' বস' হুকুম শোন'—মানুষ তুমি ভুলে যাও;—
শিক্ষা আচার স্বভাব ব্যাভার এ সব চিরবিদায় দাও!

সাম্যের শ্রীক্ষেত্র এ যে মহাপুরী সমন্বয়ের,
মানুষ পশুর কারখানাতে হচ্ছে নাকি মানুষ তয়ের!
রাজদ্রোহী মিথ্যাবাদী চোর কি দস্যু অপরাধী
পকেট-কাটা জুয়ারী ও দেশভক্ত পণ্ডিতের
জেলখানার এ ন্যায়-বিচারে সমান দশা দণ্ডিতের!

যা'দের রক্ত চরণ কভু ছোঁয়নি মাটী নগ্ন হয়ে
জেল আজ হ'ল মহাতীর্থ তাঁদের পদধূলি ল'য়ে;
যবনিকা ছিঁড়ে প'ল কাঠের সেঁউতি সোনা হ'ল
লজ্জাবতী লতার মত সাজা নিজেই শিহরিল—
এই কারাতে আজ ভগবান্ আবার বুঝি জন্ম নিল!

জেলের থাবা ঘাড় ধরেছে, রক্ত কিন্তু দেয়নি ধরা
তাদের ধারা আস্‌চে ধেয়ে হ'তে মৃত্যু স্বয়ম্বরা।
সাবিত্রীর এ নিত্যপ্রাণের মৃত্যু কোথা সত্যবানের
দুঃখ সতীর কৈলাসে কি? বিশ্বাসী সিদ্ধার্থ—
মরণ-হারীর মরণ কোথা? ক্রুশেই তিনি কৃতার্থ।

চিরন্তন লজ্জা এ তাই সজ্জা হয়ে উঠল রে
কাঁটায় ঘেরা শিমুলগাছে রক্ত গোলাপ ফুটল রে।
শ্মশান হ'ল সুখের বাসর দীপ্তমরু প্রমোদ আসর
অপমানেই মানের মণি সগৌরবে দাঁড়াল রে
বন্ধনই আজ মুক্তির মান এমন ক'রে বাড়াল' রে!

দুঃখ কোথা? জ্বল্‌ছে মেঘে মাণিক হয়ে বরণ-ডালায়,
শক্তির নরসিংহ হাসে বসে' জেলের মরণ-শালায়।
জেলের ভীতি তাই তো আজি জেল-গীতিতে উঠ্‌চে বাজি
জেলের দীপক মূর্চ্ছি পড়ে ছায়ানটে কল্যাণে
বঙ্গের এই সেবক-বৃন্দ বন্দিগণের জয়গানে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।



ত্রিবেণী

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদে আতঙ্কিত ও ত্রস্তভাবে যাপন করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মহাদেবী একটুখানি অন্যমনস্ক হইবার জন্য সন্ধ্যারাণীর মহলে প্রবেশ করিলেন।

দুঃসংবাদ বাতাসে ভর দিয়া চলে, এই নির্জ্জনপ্রায় পরিত্যক্ত পুরীমধ্যেও ইহার প্রবেশ-পথে বাধা পড়ে নাই। সন্ধ্যা শীর্ণদেহে মলিন-বস্ত্রে রুক্ষ-কেশে সন্ধ্যাচ্ছায়ার প্রায় যেন মিলাইয়াই গিয়াছিল। আজ আবার তাহাকে যেন সমধিক শুষ্ক দেখাইতেছিল। নবজাত ক্ষুদ্র শিশুটিকে কোলে লইয়া সে উৎকর্ণ হইয়া মধ্যে মধ্যে দ্বারের পানেই চাহিয়া দেখিতেছিল, মনে মনে বোধ করি পট্ট-মহাদেবীরই প্রতীক্ষা সে করিতেছে। সে হেতু, নিজের জন্য তাহার আর মনের মধ্যে ইহলোকের ভয়-ভাবনা কোন-কিছুরই প্রবেশ-পথ ছিল না বটে, কিন্তু এই যে ক্ষুদ্র শিশু, ইহার জন্য আবার তাহাকে যে জগতের সম্পদ-বিপদের সকল সংবাদেই উৎকণ্ঠিত হইতে হয়। তাহার উপর দিদি যে বলিয়াছেন, এই শিশু এক দিন তাহার পিতার সাম্রাজ্য-বর্দ্ধনের প্রধানতম সহায়স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইবে! ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে হয় ত এ সকল স্বপ্নই বিফল হইয়া যাইবে। তাই এতদিনকার নিশ্চেষ্ট নিস্পৃহ অর্দ্ধচেতন সন্ধ্যা আজিকার এই আসন্ন বিপদের ভয়ে সহসা মূর্চ্ছাবসিত—জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। একদৃষ্টে কখনও সুপ্তি-সুখে প্রশান্ত, কখনও স্বপ্ন-সুখে সহাস্য, ফুল্ল কমল তুল্য সুন্দর কান্তি রাজ-শিশুটির মুখ পানে অপলক দৃষ্টি মেলিয়া শঙ্কা-ম্লানমুখে বসিয়াছিল।

মহাদেবী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

"খুকুটা কেমন আছে রে? সারাদিন আজ একটিবারও ওকে দেখতে আসতে পারিনি—"

"ওকে তুমি আর ভালবাস না—।"

"ঠিক বলেছিস্! তোকে বুঝি বাসি? নে, দে দেখি একবার কোলে নিই। বাঃ, কি মিষ্টি হাসছে দেখ! দেয়লা করছে ঘুমুতে ঘুমুতে! দেখ রাণি! এর মুখখানা ঠিক এর বাপের মত! না?"

"হবে।" বলিয়া সন্ধ্যা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

"দিদি!"

"কি রে?" মহাদেবী শিশুকে বুকে চাপিয়া চুমু খাইয়া গভীর স্নেহে নিজের অশান্ত চিত্তকে ঈষৎ প্রশান্ত করিয়া লইবার জন্য তাহারই প্রতি নিবিষ্ট হইলেন।

"দিদি!"

"বল্ না"—বলিয়া লজ্জাদেবী শিশুকে আদর করিতে লাগিলেন।

"শুনছি না কি প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে? তা হ'লে খোকার কি হবে দিদি? তারা যদি ওকে—" সন্ধ্যা শিহরিয়া উঠিয়া চুপ করিল।

লজ্জাদেবী শিশুকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কি একটা বলিতে গেলেন, এমন সময় মহল্লিকা ভীত ও বিস্ময়ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল, রাজাধিরাজ!

উভয় রমণীই এ সংবাদে সভয়ে ও সাশ্চর্য্যে চমকিয়া উঠিল। রাজাধিরাজ এইখানে! এই তাঁর চির-নিগৃহীত অনাদৃত নির্ব্বাসিত ভাইএর মন্দিরে—তাঁর পরিত্যক্ত অন্তঃপুরে! এ কি অসম্ভব-সম্ভব! কিসে আজ এ অঘটন ঘটাইল? না জানি, সে কত বড়ই দুর্দ্দৈব!

"মহাদেবি!"

"মহারাজাধিরাজ!"

"রাজকোষ আজ অর্থশূন্য—রাজান্তঃপুরেও কি আর—"

"বা—ব্বা!—বাব্বা!—"

রাজাধিরাজ তড়িৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় সহসা এই নব বসন্তে প্রথম কূজিত পাপিয়া-কণ্ঠের মতই অর্দ্ধস্ফুটবাক্ শিশুর প্রথমোচ্চারিত পিতৃ-সম্বোধনে সমস্ত দেহে-মনে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই চোখে পড়িল, একটি নবমল্লিকার অম্লান স্তবকতুল্য অপূর্ব্ব সুন্দর শিশু-কন্দর্প। মহাদেবীর অঙ্ক হইতে দুই বাহু বাড়াইয়া শিশু তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় আধ আধ কল-স্বরে তাঁহাকে ঐ সম্ভাষণ করিতেছে। তিনি চাহিয়া দেখিতেই লহর তুলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

এই অশ্রুত-পূর্ব্ব অজ্ঞাত সম্ভাষণে সহসা মহীপাল চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার বুকের মধ্যে—সর্ব্বশরীরের শিরাসমূহের মধ্যে, তাঁহার স্নায়ু-পেশীর মধ্যে তাঁহার শোণিতধারার ভিতরে ভিতরে একটা উৎকট তীব্র আনন্দের সুবিপুল শিহরণ তাঁহার সমস্ত দেহ-মনকে যেন নিমেষের মধ্যে প্লাবিত করিয়া দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গেল। তিনি যেন কোন অচ্ছেদ্য সম্মোহন-শক্তির প্রভাবে নিবদ্ধ হইয়াই নিজেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিশুর দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, এবং তাহার দিকে বাহুবাহু বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ক্ষুদ্র শিশু উচ্চ কলধ্বনিতে আনন্দ-রব করিয়া জ্যেষ্ঠতাতের সেই প্রসারিত বাহুমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং যেন চিরপরিচয়ের বিস্ময়হীন সুপ্রফুল্ল স্মিত-দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মহীপাল ধীরে ধীরে উহাকে নিজের শঙ্কাব্যাকুল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত বক্ষতলে চাপিয়া ধরিয়া মন্ত্রসম্মোহিতের মতই তাহাকে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

"মহাদেবি! রামপাল শিশু-বয়সে ঠিক এরই মত ছিল—"

তাঁহার কণ্ঠভেদ করিয়া আজ এই একান্ত অসময়ে—বড় অসময়েই সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস সেই বিতাড়িত অভাগার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিল।

মহাদেবীর দুই নেত্র উত্তপ্ত অশ্রু-নির্ঝরের সহসা আত্ম-প্রকাশচেষ্টায় জ্বালা করিয়া উঠিল, তিনি প্রাণপণে তাহাই রোধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যারাণী বিবশ হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজার আজ অনেক কথাই মনে পড়িল। এই দীনা মলিনা ভিখারিণীর মতই দুঃখিনী রাজবধূর প্রতি যে তাঁহার দিক হইতে কত বড় অবিচার ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে পড়িয়া তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিয়া তুলিল। তাহার পর যে কথা বাল্য হইতে বারেবারেই তাঁহার মনে হইয়াছে, সেই আজিকার সর্ব্বপ্রধান সমস্যার কথাটাই আবার এ সময়ে মনের অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতেছিল। রামপাল এ সময়ে থাকিলে হয় ত এ বিদ্রোহ-দমন কত সহজ হইত, সুরপাল মগধের মহাসামন্তপদে থাকিলে হয় ত এই ভীষণ অর্থাভাব ঘটিত না। মগধের রাজস্ব আজ বর্ষকাল ধরিয়া একটি কপর্দ্দকও পাওয়া যায় নাই। হয় ত তাঁহারই প্রকাণ্ড ভুলের এ পরিণাম। রামপাল সুরপাল তাঁহার শত্রু নহে। কিন্তু আজ কোথায় তাঁহারা? জীবিত না হত?

মহারাজ সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

"মহাদেবি!"

"রাজাধিরাজ!"

"অন্তঃপুরে কি আর কিছুই অবশেষ নেই? তবে কি উপায়ে—"

রাজাধিরাজের বাক্যসমাধা হইল না। সহসা অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত তিনি দেখিলেন, সেই অবগুণ্ঠনবতী রাজবধূ ধীরে ধীরে নিজের কণ্ঠ হইতে ব্যবহার-মলিন রত্নহার, হস্ত হইতে বাজুবন্ধ ও সুবর্ণ-কঙ্কণ মোচন করিয়া রাজার চরণতলের উদ্দেশ্যে স্থাপন করিল।

মহীপালদেব কশাহতবৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। "না না, মা! না,—মা! এ আমি নিতে পারবো না,—ওঃ সুগত!—"

মহীপালদেব দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুতাপ-দীর্ণ অন্তরেরও অন্তঃস্থল হইতে আর্ত্তধ্বনিতে যন্ত্রণার্ত্ত রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—"কোথায় তুমি রামপাল! সুরপাল! কোথায় আজ তোমরা? ভাই আমার! এ অসময়ে তোমরা কোথায়?"

মহাদেবী শিশুকে ফিরাইয়া দিয়া বিষণ্ণ ম্লানমুখে স্বামীর অনুসরণ করিলেন, আর সন্ধ্যা অঙ্কস্থিত রাজশিশুকে অশ্রু-ধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে বিদ্ধবক্ষ বিহঙ্গীর মতই গুমরিয়া গুমরিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল;—"রাজার এ অসময়ে, রাজ্যের এ বিপৎপাতে কোথায় রৈলে! তবে কি তুমি নেই?"

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

রুদ্র যখন তাঁহার তূর্য্যধ্বনি করিয়া মানুষকে ডাক দেন, তখন সে ডাকে সাড়া না দেবে, কে এমন বধির আছে? ঈশানের মৃত্যু-বিষাণ ঘোরবরে দিকে দিকে বাজিয়া উঠিতেছিল, আর

সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া দলে দলে পৌণ্ড্র-নাগরিক সেই সঘনে আহ্বানিত মৃত্যু-আহবে ঝাঁপ দিতে ছুটিয়া চলিতেছিল। মরণকে এমন করিয়া হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারা যায়, এমন কথা কি কোন দিনই ভাবিতে পারা গিয়াছে? অথচ সময় আসিতেই দেখা গেল, বিবাহ-সভার আনন্দোৎসবে যোগ দিতে তাহাদের যতটুকু বিলম্ব ঘটে, ইহাতে তাহাও হইল না। সবাই যেন এই ডাকের মত ডাকেরই জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল, যেমনই ডাক পড়িয়াছে, অমনই শুধু উঠিয়া আসা!

নিশ্চিন্ত সুষুপ্ত নগরবাসীর জীবন যেন সহসা মরণ-বিহারে মাতিয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। ভয় আর সঙ্কোচ এ দুইটাকেই যেন ইহারা ইহাদের মনের ভিতরের সীমা হইতে ঝাঁট দিয়া পুরাতন আবর্জ্জনার রাশির মতই বিদায় করিয়া বাহির করিল। "যুদ্ধং দেহি" এই শব্দটাই যেন ইহাদের সকলকারই মনের ভিতরের একটিমাত্র সম্মিলিত ভাষা! পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয় আকাশে বাতাসে প্রকৃতির প্রতি স্তরে স্তরেই যেন গন্ধিত, নন্দিত ও শব্দিত হইতেছিল,—

"যুদ্ধং দেহি।"

কৈবর্ত্ত নাগরিকপ্রধান দুই জনকার এক সঙ্গে রাজপক্ষ হইতে যে বিপৎপাত ঘটিয়া গেল, সেই দুইটি ঘটনাকে একই কারণ-সম্ভূত ধরিয়া লইয়া প্রায় সমুদয় কৈবর্ত্ত নাগরিক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি রাজভক্ত বরেন্দ্র-প্রজা এততেও রাজভক্তি বিস্মৃত হয় নাই। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কয়েক জন দেশমুখ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া রাজসাক্ষাৎকারের জন্য প্রাসাদদ্বারে আসিয়াছিল। রাজারই বিরুদ্ধে তাহারা রাজার কাছে বিচারপ্রত্যাশী।

ইহার পর রাজপ্রতিনিধিস্বরূপে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, মহা-প্রতীহার প্রভৃতি যখন সেই শতসংখ্যক নিরস্ত্র দেশমান্য বিচার-প্রার্থীকে সহস্র সৈন্যবেষ্টিত করিয়া বন্দী করিলেন এবং বিনা বিচারে একসঙ্গে সেই শত-শীর্ষ সৈনিকের তীক্ষ্ণধার কৃপাণতলে ডালি দেওয়া হইল, তখন আর কোন কিছুকেই কেহ মানিতে পারিল না। শোণিতগন্ধে রক্তপিপাসু জীব যেমন মাতিয়া উঠে, পৌণ্ড্র-নাগরিক তেমনই করিয়াই প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

রাজাধিরাজ ঈষৎ ভীত হইয়া বলিলেন, "আমার নৌ-বাহিনী ওদেরই হাতে, ওরাও যখন যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এখনও না হয় ওদের একটু শান্ত ক'রে দেখলে হ'ত না? দণ্ডমাধব! তোমার কি মত?"

দণ্ডমাধবের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মহাসন্ধিবিগ্রাহিক বলিয়া উঠিলেন, "মহাসেনাপতি কয়েকটা নাগরিক আর জন-কতক নাবিকের ভয়ে তাঁর রাজাকে তাঁর নগণ্য প্রজাদের কাছে পরাভব স্বীকার করতে বলবেন, এ ত আমরা কোন-মতেই মনে করতে পারিনে! কি বল হে দণ্ডমাধব! এ-ও কি সম্ভব হবে?"

মনের মধ্যে ঈষৎ সংশয় রাখিয়াই উপহাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে মহাসেনাপতি বাহ্য সাহসের সহিত উত্তর করিলেন,—"আমরা বেঁচে থাকতে মহারাজাধিরাজকে ঐ ক'টা ক্ষুদ্র প্রজাকে ভয় করতে হবে? এর চেয়ে মরণই ভাল!"

মহাপ্রতীহার, মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, মহামাণ্ডলিক সমস্বরে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, মহাসেনাপতি! এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! কৈবর্ত্তর কাছে হার স্বীকার করবে ক্ষত্রিয়! সহস্র বার মৃত্যু ভাল!"

ফলে যাহা ভাল, তাহাই ঘটিল। দণ্ডমাধব তাঁহার অর্দ্ধ বিদ্রোহী সেনাদল লইয়া প্রাণপণ শক্তিতে শত্রুপক্ষকে বাধা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ভীমের অধিনায়কতায় সমস্ত কৈবর্ত্ত, বাগ্দী এবং যথেষ্ট পরিমাণে অত্যাচারপিষ্ট সম্ভ্রান্ত নাগরিকও একত্র হইয়া একটা বিরাট বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। দিনে দিনে এই নবনির্ম্মিত বিপক্ষ সৈন্য বর্দ্ধিত-শক্তি হইয়া গ্রামের পর গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের তোরণদ্বার অবরোধ করিল। রাজপক্ষীয় নগরবাসী শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া আর নগরীর বাহিরে গমনা-গমন করিতে সমর্থ হইল না।

সারাদিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর কয়েক সহস্র সৈন্যের সহিত সেনাপতি দণ্ডমাধব ধরালিঙ্গন করিলেন; অবশিষ্ট রাজ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

পট্টমহাদেবী এ সংবাদের পর আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজাধিরাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "এখনও ক্ষান্ত হ'ন রাজাধিরাজ! এখনও কৈবর্ত্ত-নায়ককে ডাকিয়ে এনে ক্ষমা চেয়ে নিন। শুনেছি, ভীম ক্ষমাশীল, হয় ত সে ক্ষমা করতেও পারে। চলুন, আমরা তীর্থবাসে যাই, যুদ্ধ করলে পরাজয় যে সুনিশ্চিত, সে ত দেখতেই পাচ্ছেন!"

যুদ্ধে পরাজয় যে নিশ্চিত, রাজাধিরাজও তাহা বুঝিলেন,

কিন্তু কু-আশা এবং কু-পরামর্শ ইহারা তখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। মন্ত্রিদল বুঝাইতেছিল, দণ্ডমাধব মরিলেও রুদ্রদমন, বুদ্ধবন্ধু, সর্ব্বজিৎ আছে, ভয় পাইবার মত এমন কিছু ঘটে নাই। একমাত্র সেনানায়কের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কখন যুদ্ধ করে না। ধর্ম্মপাল প্রথম মহীপাল ইঁহাদেরও সেনাপতিরা অমর ছিল না।

রাজা কহিলেন, "তীর্থবাসের ইচ্ছা হয়ে থাকে, তুমি যেতে পার, আমার এখন তীর্থযাত্রার অবসর নেই। তোমার পরামর্শটি দেখি ভাল! আমি ত ভিক্ষুব্রত নেবো, রাজা হবেন কিনি শুনি? রামপাল না ভীমচন্দ্র? একেই বলে 'স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'!"

দ্বিতীয় যুদ্ধে মহাসন্ধিবিগ্রাহিকের পতনে এইবার যথার্থই ভীত হইয়া রাজাধিরাজ মহাদেবীর নিকটে ছুটিয়া আসিলেন, "সত্য সত্যই বুঝি আমাদের প্রব্রজ্যা নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই, মহাদেবি! একা রুদ্রদমন আর কত দিক্ রক্ষা করবে? শিক্ষিত সেনানায়ক যদি আর একটি মাত্রও পেতেম! কি হবে লজ্জা! কেউ ত আমার নেই। আঃ রামপাল! সুরপাল! মহাদেবি! তারা কি বেঁচে নেই? বেঁচে থেকেও কি তারা বরেন্দ্রীকে কৈবর্ত্তের হাতে পরাভূত হ'তে দিচ্ছে? ভাই হয়ে কি এত বড় প্রতিশোধ নেবে? না না, তা' পারবে না, হয় তারা ফিরে আসবে, না হয় তারা ম'রে গেছে।"

"রাজাধিরাজ!"

"বল, বল? আমার মন্ত্রী নেই, সেনাপতি নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই, না না, রুদ্র—রুদ্রদমন আছে, প্রাণপণ করছে, করবেও শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছে, আমার সৈন্যরা অনিচ্ছুক—অশিক্ষিত। দণ্ডমাধব ওদের ভাল ক'রে যুদ্ধ-শিক্ষাও দেয়নি, আর যুদ্ধও ত দেশে ছিল না, ব'সে ব'সে অলস হয়ে গেছে। ভাল সেনা-নায়ক না পেলে—"

"রাজাধিরাজ অমাত্যপুত্র বোধিদেবকে এ সময় কষ্টাগার থেকে উদ্ধার ক'রে যদি—"

"হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক! বোধিদেবকে কষ্টাগার থেকে উদ্ধার ক'রে যদি সেনাপতিত্ব দিই! ঠিক বলেছ মহাদেবি! বীর সে, চিরমঙ্গলাভিলাষী! কিন্তু এর পর এ সময়ে সে কি আর আমার পক্ষ হয়ে—অসম্ভব! এখন তাকে ছেড়ে দিলেই সে আমার বিপক্ষে দাঁড়াবে।"

মহাদেবী কহিলেন, "রাজাধিরাজ! বোধদেবের ছেলে বোধিদেব তাঁর শেষ রক্তবিন্দু থাকতে তা পালসম্রাটের জন্যই দান করবেন, এর চেয়ে আর সত্য হয় না! আপনি তাঁকে মুক্ত করিয়ে আনিয়ে দেখুন।"

মহীপালের হতাশাক্ষিপ্ত অন্তরও আজ এ কথা বিশ্বাস করিল! তাঁহার নিজের মনেও বোধিদেবের কথা উদিত হইয়াছিল। এই বোধিদেব এক দিন তাঁহাকে মনুষ্যত্বের—সত্যের পথে ফিরাইতে প্রাণপণ করিয়াছিল, তাহার ফলেই সে এই সুদীর্ঘকাল যমালয় সদৃশ যন্ত্রণাকর কষ্টাগারের অতিথি! রাজা বোধিদেবের মুক্তিপত্র সহিত দ্রুতগামী রাজপুরুষ প্রেরণ করিলেন!

একখানি নরকঙ্কালের মতই ছায়াবশেষ-মূর্ত্তি বোধিদেব আসিয়া রাজাধিরাজকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। তাঁহার ক্লেশশুষ্ক জীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাজাধিরাজের বক্ষে লজ্জার ব্যথা এবং নয়নে জল দেখা দিল।

"বোধিদেব! বড় বিপন্ন আমি, আমার সেনাপতি, মিত্রগণ, সৈন্যদল সবই প্রায় শেষ হয়েছে—বরেন্দ্রীও যায়, এ সময়ে আমায় রক্ষা করো, আমায় দয়া করো—"

বোধিদেব কষ্টাগার হইতে রাজপ্রাসাদে আসিবার সময়েই নগরীর ছন্নছাড়া দশা ও নাগরিকগণের ভীত ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করিয়াই আসিয়াছিলেন। পণ্যশালার সমুদয় ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ, দোকানগুলি রুদ্ধদ্বার। রাজপথচারী জনগণ কদাচিৎ পথ চলিতেছে। চিরশব্দায়মান যানবাহন ও পথচারী সহস্র সহস্র জন দ্বারা অধ্যুষিত রাজমার্গ জনহীন ও নিস্তব্ধ। কোন একটা ভয়াবহ ঘটনা যে ঘটিয়া গিয়াছে, অথবা ঘটিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, উহা অনুমান করিয়াই মহামাত্য-পুত্র প্রশ্নহীন নীরব বিস্ময়ে পথ অতিবাহন করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজবাক্যে এখন বর্দ্ধিত-বিস্ময় হইয়াও অদম্য কৌতূহলকে দমনে রাখিয়া ধীরবাক্যে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আমরা পুরুষানুক্রমে আপনার বংশের কল্যাণকামী মিত্র। আমার এ দেহে শোণিতবিন্দু প্রবাহিত থাকতে আপনি সকল অবস্থাতেই অন্ততঃ এক জনমাত্র মিত্রের সহায়তা লাভ করতে পারবেন, এ কথা নিশ্চিতরূপে জানবেন। বরেন্দ্রী কিসে বিপন্ন? প্রবলপ্রতাপ পাল-সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যোগ্যতা কার হয়েছে?"

রাজাধিরাজ এই উত্তরেই তাঁহার অন্তরের শেষ সংশয়কে

নিশ্চিন্তে বিলোপ পাইতে দিয়া ঈষৎ আশ্বাস-প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "আমার প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, সমস্ত নৌবল এদের হাতে, সেনাপতি দণ্ডমাধব বৃদ্ধ-বন্ধু যুদ্ধে হত, অভিজাতবৃন্দই প্রায় একে একে সমরশায়ী, একমাত্র মহাপ্রতীহার অবশিষ্ট অনিচ্ছুক সৈন্যদল সাজিয়ে প্রাণপণে তাদের বাধা দিচ্ছেন। জানি না, কতক্ষণ সমর্থ হবেন। এ সময় তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তুমি যে রকম দুর্ব্বল ও—"

বোধিদেব গভীর বিষাদের মধ্য হইতেও ক্ষীণ হাসি হাসিলেন, কহিলেন, "এ দুর্ব্বলতায় কোন ক্ষতি হবে না, রাজাধিরাজ! এখনও এ বাহু সহস্রের মুণ্ডপাতে সমর্থ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ প্রজাদ্রোহের নায়ক কে? রামপাল? কোথায় রামপাল?"

"কোথায় রামপাল? আমিও তোমায় এই প্রশ্নই করতে চাইছিলেম, বোধিদেব! যখন তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলে, সে কি তোমায় তার গম্যস্থানের কোন—"

"যখন তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেম! আমি ত তাকে মুক্তি দিইনি, রাজাধিরাজ! মাত্র মুক্তিদাতার হাতে আপনার কাছে পাওয়া আদেশপত্রটিই দিয়েছিলেম। দেখা তার সঙ্গে ত আমার হয়নি। আপনি কি সেই পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদই পাননি? এ বিপ্লব কি তবে রামপালের নেতৃত্বাধীনে নয়?"

রাজাধিরাজ কহিলেন, "না, এ বিদ্রোহের নায়ক প্রধানতঃ কৈবর্ত্ত দিব্যোক বা ভীম। কিন্তু কোথায় রৈল সুরপাল, রামপাল! যদি তারা এ সময় আসতো!"

বোধিদেব গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন, "নিশ্চয় তারা বেঁচে নেই। নতুবা বরেন্দ্রীর এই বিপদে—"

রাজাধিরাজ কহিলেন, "কিন্তু এ'ও ত হ'তে পারে, আমার প্রতি অভিমানে তারা আমার বিপদের সংবাদ জানতে পেরেও নির্লিপ্ততায় নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। আমার কাছে তারা কিসের ঋণে ঋণী যে, তাই শোধ করতে এই বিপদের অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দিতে আসবে! বোধিদেব! তোমার সে দিনের তিরস্কার আজ আমার দুই কানের কাছে অগ্নিবর্ষণ করছে! সে দিন যদি তোমার পরামর্শে চলতে পারতুম! আজ যদি রামপাল আমার সহায় থাকতো—"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! প্রভু! অতীত অপগত। কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনও আমাদের হাতে আছে। যদি কিছুমাত্র অবসর থাকে, আবার এই পাল-সাম্রাজ্যের স্খলিতপ্রায় শাসনদণ্ড, সাম্রাজ্যের এই চির দাসানুদাস প্রাণপণ শক্তি দিয়ে তুলে নিয়ে সাম্রাজ্যেশ্বরের হাতে দেবে। হয় ত রামপাল এখনও বেঁচে আছে, হয় ত এ বিপৎসংবাদ সে জানতে পারে নি। হয় ত এই মুহূর্ত্তে—"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! আর আমাদের রক্ষার কোন উপায়ই নেই। আমার শেষ সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়ে বিপক্ষপক্ষে যোগ দিয়েছে। আমার হতাবশিষ্ট রক্ষী-সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে একটির পর একটি ভূমিশয্যা গ্রহণ করছে, হয় ত এতক্ষণে তাদের আর দশটিও বাকি নেই। আমারও হয়ে এসেছে। যদি বাঁচতে চান, এই মুহূর্ত্তে গুপ্তদ্বারপথে বেরিয়ে পড়ুন, যান—যান, আর দেরি নয়। ওঃ! কি যন্ত্রণা—! পিঠের বুকের বড় বড় ক্ষত দিয়ে রক্ত ছুটছে! আর বেশীক্ষণ নয়! ও কি দাঁড়িয়ে আছেন! এখনও! তবে কি আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই? শীঘ্র পালান, শত্রুদল প্রাসাদ অধিকার ক'রে নিয়েছে।"

"রুদ্রদমন! রুদ্রদমন! চিরসুহৃৎ! প্রিয়বন্ধু! তুমিও চল্লে! আমার কেউ রইলো না! হা বুদ্ধ! এ কি করলে!—"

"না, কেউ রইলো না! কে থাকবে? আপনি নিজেই কি থাকবেন,—এমন নিশ্চেষ্ট থাকলে? আমার যে আর শক্তিবিন্দুও বাকি নেই। শুধু আপনার জন্যই কোনমতে মৃত্যুকে রোধ ক'রে এত দূরে ছুটে এসেছি। কে? অমাত্যপুত্র বোধিদেব না? ব্রাহ্মণ! তোমার হাতেই আমি পাল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে দিয়ে গেলুম! উঃ! আর হয় না!—আর পারি না। বিদায়—রাজাধিরাজ! বিদায়—বিদায়—বিদায় পৃথিবী—"

মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন তাঁহার একনিষ্ঠ প্রভুভক্ত জীবনের পরিসমাপ্তি করিলেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, নির্ব্বিচারে প্রভুধর্ম্ম ইনি আজীবনই পালন করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ ক্ষণেও ঐ একই চিন্তা—একই কর্ত্তব্যবোধ লইয়াই চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রাণহীন রক্তাপ্লুত শরীরের দিকে অশ্রুপ্লুত আর্ত্ত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া রাজাধিরাজ বিলাপপূর্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—

"রুদ্রদমন! তবে আমাকেও যেতে হবে। আর আমার কোন আশা নেই—"

বোধিদেব রাজার হাত ধরিলেন, "আশা এখনও সম্পূর্ণই আছে। কেন-আশা নেই মনে করছেন? আসুন, আপাততঃ আমরা প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে গুপ্তপথে তারাদেবীর মন্দিরে আশ্রয় নিই গে। তার পর আমি নিশ্চয়ই নাগরিকদের মন ফিরিয়ে তাদের আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারবো। কিন্তু এখানে আর দেরি ক'রে কায নেই রাজাধিরাজ!"

রাজাধিরাজ আবার নূতন আশায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। "পারবে বোধিদেব! তা' হয় ত তুমি পারতে পার। তোমার কথায় পাষাণ গ'লে যায়, তারা ত মানুষ। তবে তুমি মহাদেবী ও অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে এস, আমি এইখানে অপেক্ষায় রইলেম। গুপ্তপথ এরই সন্নিকটে।"

বোধিদেব দ্রুতপদে অন্তঃপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজাধিরাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মহাপ্রতীহারের প্রাণহীন শবদেহের নিকটে ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া দ্রুত ধারায় উষ্ণ অশ্রুর নির্ঝর বহিল। ধীরে ধীরে মৃদুস্পর্শে তাঁহার মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন ললাট স্পর্শ করিলেন। শোণিতসিক্ত বক্ষোবাস সাবধানে অপসৃত করিয়া নিশ্চল হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—

"হায় প্রিয়বন্ধু! প্রিয়তম সখা! আমার জন্য অসময়ে প্রাণ দিলে! উঃ, কি কালসাপিনীকেই তোমায় ধ'রে আনতে আদেশ দিয়েছিলেম রে! বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পালসাম্রাজ্য ছারখার হয়ে গেল।"

"এই দিকে ভীম!"—এই বলিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তীকে আহ্বান পূর্ব্বক সহসা সেই রাজকীয় কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল দিব্যোক, তাহার পশ্চাতে অসংখ্য বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল সহিত উন্মুক্ত তরবারিহস্তে ভীম।

মহীপাল দেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভীম নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিল। মহীপাল দুই পদ পিছাইয়া গিয়া ভীমের ভীম গম্ভীর মুখের দিকে চাহিলেন,—

"আমি যদি সিংহাসন ছেড়ে দিই? প্রব্রজ্যা নিয়ে চ'লে যাই?"

ভীমের হাতের অর্দ্ধোত্থিত—মুক্ত কৃপাণ মধ্য-পথেই নত হইয়া আসিল।

দিব্যোক ডাকিলেন,—"ভীম!"

"জ্যেঠামশাই?"

দিব্যোক কহিলেন, "গুরুমন্তর ভুলে যাচ্ছ না ত? মন্তর ভুল্লে সাধকেরও সঙ্গে সঙ্গে পতন।"

"ভুলিনি জ্যেঠামশাই! পালসাম্রাজ্যের উচ্ছেদ আমাদের মূলমন্ত্র। সম্রাটকে প্রাণভিক্ষা দিলেম—"

"জড় রেখে ডাল ছেঁটে দেওয়ার নাম উচ্ছেদ নয়। ভীম! মনে পড়ে মৃত্যুযাতনার আর্ত্তনাদে পাষাণ-কঠিন বিলাপ! মনে পড়ে মা'কে আমার কোন্ নির্ম্মম কাপুরুষ, কোন্ মনুষ্যাধম মহাপাপী তার সুখের সাধের গৌরবের পর্ণশালা থেকে জোর ক'রে টেনে এনে একা অসহায় নিষ্ঠুর মরণে মরতে দিয়ে এসেছিল! ক্ষমা! ক্ষমা করতে চাও তাকে? এ পাপের ক্ষমা আছে?"

ভীম স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কিন্তু প্রাণভিক্ষা চাওয়ার পর—"

"বৌমা কি এই পাষণ্ডের পায়ে ধ'রে মুক্তিভিক্ষা করে নি? এ কি তা তাকে দিয়েছিল?"

ভীমের দুই চোখ অগ্নিদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মহীপালদেব ততক্ষণে আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বারেক ঘৃণাপূর্ণ তাচ্ছীল্যভরে দিব্যোকের দিকে চাহিয়া দেখিয়া সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে ভীমকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"এই ঘরে এসে এক দিন যার ভিক্ষার আবেদনে পদাঘাত ক'রে যাকে শত্রুতার অনুপযুক্ত বোধেই শুধু দয়া ক'রে ফিরে যেতে দিয়েছি, সে যে আজকে আমায় আয়ত্তে পেয়েছে বলেই যে তার কাছে ভিক্ষা চাইতে যাবো, তা' স্বপ্নেও মনে করো না। ভিক্ষা চাওয়া কাদের অভ্যাস, তা' পৃথিবীর সব্বাই জানে। রাজা শেষ পর্য্যন্ত রাজাই থাকে। আমি তোমায় আদেশ করছি, তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে একলা বা একত্র অনেকে মিলেও ন্যায় বা অন্যায় সকল প্রকার যুদ্ধই করতে পারো। এই আমার তরবারি খুলেছি, এখন এসো, এইবার দু'জনের ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। বরেন্দ্রীর রাজলক্ষ্মী কা'কে চান।"

———

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

বাহিরের সমস্ত সংবাদ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানকার অবস্থা যে কি ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে, সে কথা আর বলিবার নহে। যুবতী, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, বালিকা—এমন কি, অবগোণ্ড শিশুর দলও সমবেত ক্রন্দনে যোগ দিয়া ঘরে ঘরে তুমুল আর্ত্তনাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। অন্তঃপুরিকা নারীগণের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর যাহারা, তাহারা প্রাসাদ ছাড়িয়া পলাইতেছিল, কিন্তু যাহাদের সে উপায় নাই, প্রকৃত বিপদ তাহাদেরই। ইহাদের মধ্যে এক জন বর্ষীয়সী তাঁহার দুইটি বিধবা যুবতী কন্যা ও পুত্রবধূকে স্বহস্তে দুই পাত্র তীব্র বিষ প্রস্তুত করাইয়া পান করিতে দিয়াছিলেন, খিড়কির পুরস্কিণীর মধ্যে কয়েকটি অভিজাতবংশীয়া সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ দণ্ড কয়েকের মধ্যেই ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল।

পট্টমহাদেবী সকলকেই যথাসাধ্য সাহস ও সান্ত্বনা দানে চেষ্টিত থাকিলেও তাঁহার নিজের মনের ভিতর আর বিন্দুমাত্র যেন বল-ভরসা কিছুই ছিল না। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষী ভীম ঝটিকার মতই গভীর উত্তরোল তাঁহার অন্তরের ভিতরটা হাহা শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। প্রতিশ্বাসে ভয়ার্ত্ত চিত্ত উর্দ্ধস্বরে উচ্চারণ করিতেছিল, "মা ভবানি! হে বিশ্বেশ্বর! রক্ষা কর।"

রক্ষার যে আর উপায়মাত্র বাকি নাই, তাহা তাঁহার বুঝিতে আর বাকিও ছিল না। সে জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই এই একটি বিষয়ে তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণের বিদ্রোহকে তিনি দমিত করিতে পারেন নাই—তাহা সন্ধ্যা ও তাহার শিশুর সম্বন্ধে। তারাদেবীর পুরোহিত আচার্য্য তারানাথের গণনায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। আচার্য্য বলিয়াছেন, এ দুই জনের বর্ত্তমান অতি ঘোর দুর্গ্রহ রাহুগ্রস্ত হইলেও ইহাদের সুদূর-ভবিষ্যৎ তেমনই পূর্ণোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা-সমাকীর্ণ! সে কি একবারেই মিথ্যা?—কৈ, তাঁহাদের ত এ কথা তিনি বলেন নাই? ভাগ্যাধীশ পাপযুক্ত হইয়া অষ্টমে অবস্থিত, ইহার ফলে সম্পূর্ণরূপেই পতন, ইহার বেশী কোন কথাই তো রাজার সম্বন্ধে বলিতে চাহিলেন না। তবে কেন ভালর সময়েতেই মিথ্যা হইবে? সন্ধ্যাকে তাহার শিশুটির সহিত কি কোনমতেই রক্ষা করা যায় না? কে তাহার রক্ষাভার লইবে? এমন বিশ্বাসী বন্ধু কে আছে? কাহার হাতে এই রূপসী যুবতী রাজবধূকে ভরসা করিয়া তুলিয়া দেওয়া যায়?

বোধিদেব আসিয়া দূর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! রাজার আদেশে আমি আপনাদের গুপ্তপথে বরেন্দ্রী ত্যাগ ক'রে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে নিয়ে যেতে এসেছি।"

পট্টমহাদেবীর বোধ হইল, স্বয়ং কৈলাসপতি তাঁহার আকুল আহ্বানে বিচলিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সন্ধ্যার মলিনতর ছায়ার মতই বিকীর্ণা ভীতা কম্পিতা অর্দ্ধচেতনাপ্রায় সন্ধ্যাকে তাহার শিশুর সহিত টানিয়া আনিয়া মহাদেবী তাহাকে বোধিদেবের পদপ্রান্তে স্থাপন করিলেন।

"ব্রাহ্মণ! আজ থেকে আপনি এর পিতা—এ আপনার মেয়ে, এই অনাথা ও অনাথের সব ভার আমি আপনার হাতে তুলে দিলেম। এর চেয়ে এ অবস্থায় ওদের জন্য আর আমার বেশী কিছুই করবার নেই।"

বোধিদেব রোরুদ্যমান শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "ইনি আমার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ, আমার গর্ভধারিণী জননী। যতক্ষণ এ দেহে জীবন থাকবে, এরা নিরাপদ। কিন্তু মা, আপনি—"

মহাদেবী কহিলেন, "বাবা! আমার কর্ত্তব্য যে আমার স্বামীর সঙ্গে জড়িত।"

বোধিদেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আমি এদের কোন নিরাপদ স্থানে রেখে তা হ'লে আবার এসে আপনাদের সংবাদ নেব। আপনি বরং ততক্ষণ রাজাধিরাজের কাছেই যান, তিনি আমায় আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছিলেন।"

সন্ধ্যা মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল! তাঁহার পা দুইখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। কোনমতেই সেখান হইতে যেন উঠিবে না। পাগলের মত কেবলই বলিতে লাগিল, "দিদি, আমায় নিজের হাতে একটু বিষ দাও, এমন ক'রে বিদায় দিও না।"

মহাদেবী তখন কাঁদিয়া বলিলেন, "ওরে, আমার জন্যে তোর একটু দয়া হয় না রে! আমায় তোরা কি মনে করেছিস বল ত? মানুষ কি নই?"

সহসা রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তুমুল রোলে ধ্বনিত হইল—

"শিব শিব ভবানী!" উপস্থিত তিন জনই চমকিয়া উঠিল।

মহাদেবী দেখিলেন, বিস্ফারিত বক্ষে ক্রূর সগর্ব্ব দৃষ্টিতে চাহিয়া দুই জন অপরিচিত দুর্ত্তমূর্ত্তি পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের এমন ভাবে তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে

দেখিয়া তিনি তাহাদের শত্রুপক্ষীয় বলিয়া বুঝিলেও অচঞ্চল, নির্ভীক ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কে তোমরা?"

সম্মুখবর্ত্তী স্থির রক্তনেত্রে তাঁহাকে দেখিতেছিল, তাহার পিছন হইতে অপর ব্যক্তি উত্তর করিল,—

"সে কি রে মাগী, মহারাজাধিরাজ দিব্যোকের সেনাপতি মহাবীর ভীমকে চিনিস নে?"

লজ্জাদেবী এই অপ্রত্যাশিত অবমাননায় কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়াই শান্ত গম্ভীর মুখে ভীমের তীব্র জ্বালাভরা জ্বলন্ত চোখের উপর দৃষ্টি স্থির করিলেন,—

"তুমিই ভীম? আমাদের উপরে ক্রুদ্ধ হবার তোমার সমুচিত কারণ আছে। যাই হোক, যা হয়ে গেছে, তা' আর ফিরবে না! পার ত আমার স্বামীকে কখন ক্ষমা করতেও চেষ্টা করো! জেনো, আজ থেকে চির-আবহমান কাল ধরেই আমার স্বর্গীয় পতির পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তোমারই ক্ষমার উপর নির্ভর ক'রে রইলো।"

এই শান্ত, স্নিগ্ধ, ধীর বাক্য ও অকুতোভয়, অচপল দৃষ্টি প্রতিহিংসা-লোলুপতায় উন্মত্তপ্রায় ভীমকে যেন সহসাই অপরিসীম বিস্ময়ের কশা তুলিয়া মারিল! এই তাহার মহাশত্রুর স্ত্রী? ইহারই উপর সে তাহার নির্য্যাতিতা নিপীড়িতা প্রাণাধিকার অকাল-শোচনীয় মরণের প্রকৃষ্ট প্রতিশোধ লইতে নিজের সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিতজ্ঞান সমস্তকেই জলাঞ্জলি দিয়া মাত্র চিরসুষুপ্ত রাক্ষসী প্রবৃত্তিকে বৃথা জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে চাহিতেছিল? তাহার পক্ষে চির-অপরিচিত, হেয়, ঘৃণ্য—অতি জঘন্য পাশব বৃত্তিগুলাকে সবলে আকৃষ্ট করিতে চাহিয়া নিজেকে নরকের দূতস্বরূপ প্রস্তুত করিবার বৃথা চেষ্টায় সে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। বিবেকের আকুল অনুনয়ে—এমন কি, গভীর আর্ত্তনাদে এক তিলও যে কর্ণপাত করে নাই, সে এই! এই ক্ষীণ জ্যোৎস্না লেখার মতই নম্র মধুর—আবার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মতই দীপ্ত তেজস্বিনী। ইহার চারি দিক্ দিয়া ইহারই প্রচণ্ড সতীতেজ, ইহারই অসীম শক্তিরাশি যেন ইহাকে অগ্নি-গোলকের জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া রাখিয়াছিল। সহসা ভীমের বোধ হইল, যেন এই সত্য ভামিনী অরাতিকুলপরিবেষ্টিতা অসহায়া রাজেন্দ্রাণী রূপে তাহারই চির-উপাস্যা ভবানীদেবী তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহার অতিবড় বিপদের মুহূর্ত্তেই তাহাকে চিরদিনের মত রক্ষা করিতে আসিয়াছেন!

ভীমের সহচর হরি অতি কর্কশ বিদ্রূপভরে উপহাসের হাসি হাসিয়া উঠিল,—

"মাগীটা ধূর্ত্ত কম নয়! তোর স্বামীকে ক্ষমা করার দফা যে শেষ ক'রে দিয়েই ভীমচন্দ্র এখন তোকে তাঁর পাটেশ্বরী করতে এসেছেন, তার খবর রাখিস্! তোর আগের বর এখন মাথা-কাটা কবন্ধ হয়ে মাটীর উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, এখন ভাল চাস্ ত সুড় সুড় ক'রে এই নতুন বরের পায়ে ধ'রে আশ্রয় চেয়ে নে,—"

মহাদেবীর স্থিরদৃষ্টিতলে ক্ষণেকের জন্য গভীরতর ব্যথার রেখা নিদারুণ হইয়া উঠিল। অপরিসীম যন্ত্রণার একটা উত্তাল তরঙ্গ তাঁহার বুকের মধ্য দিয়া স্রোতের মত বেগে বহিয়া গেল, তাহারই আঘাতে তাঁহার চোখে, মুখে, নাসিকাগ্রে গাঢ় তপ্ত শোণিত-লেখা সবেগে ফুটিয়া উঠিল। চক্ষুতে তপ্ত অশ্রুর একটা বাষ্পও হয় ত চকিতে দেখা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে সকলকেই একটি নিমেষের মধ্যে পরাভব করিয়া লইয়া, তাঁহার অপরাজিত ধৈর্য্য স্বস্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল।

ক্ষণমাত্র পরেই সেই পূর্ব্বের মত শান্ত ঔদার্য্যে আততায়ীর প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি ভয়লেশহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—

"এই কি তোমার মনের কথা, ভীম? তাই যদি হয়, তাও সাধারণ মানব-প্রকৃতির বহির্ভূত নয়!"

অননুভূত বিস্ময়ে ও ভক্তিতে ভীমের জ্বলন্ত কোপ সহসা কোথায় যেন লুপ্ত হইয়া গেল। এ কি আশ্চর্য্যপ্রকৃতি নারী! এত বড় বিপৎপাতকে তুচ্ছ করিয়া এমন অচপলা থাকিতে পারে, এমন কোন নারীর কথা কখনও কল্পনাও করিতে পারে না সে! সত্যই কি ইনিই মা ভবানী! প্রকাশ্যে সমুদয় রূঢ়তা বিসর্জ্জন দিয়া দীনভাবে সে উত্তর করিল,—

"মা! তুমি আমার মা!" আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। সহসা হিমালয়ের কঠিন কঠোর হিমশিলা গলাইয়া গঙ্গোত্রীর প্রবল ধারা যেন তাহার অন্তরের মধ্যে বেগে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার কণ্ঠ কেমন করিয়া সহসা অশ্রুগাঢ় হইয়া উঠিল।

আবার ক্ষণপরে আবেগপ্রগাঢ় গম্ভীরস্বরে সে কোন-মতে উচ্চারণ করিল,—

"মা! আমি তোমার অযোগ্য অভাগা পুত্র!" এই কথা বলিতে বলিতে সে নত হইয়া পট্টমহাদেবীর পায়ের কাছে লুণ্ঠিত-শিরে প্রণাম করিল। তাহার দুই চোখ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। ক্ষণপূর্ব্বের রুদ্রমূর্ত্তি বীরের সেই অশ্রুবিন্দু দুইটির যে কি মূল্য, তাহা মহাদেবীই বুঝিলেন। তাঁহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে মৃদুতর স্বরে উচ্চারিত হইল, "ধর্ম্মের দ্বারায় রক্ষিত হয়ো।"

ভীম তাহার মহাশত্রুর স্ত্রীর কাছে এই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশরীরে শিহরিত হইয়া উঠিল। পুনশ্চ তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক সে এবার তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া পদধূলি লইতে উদ্যত হইল, কহিল, "মা! অপরাধ নেবেন না, একটু পায়ের ধূলো নিতে চাই—"

লজ্জাদেবী একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, শান্তমধুরস্বরে কহিলেন, "ক্ষমা কর বাপ, যে হাত আমার স্বামি-হত্যা করেছে, সে হাত দিয়ে আমি এ পা দু'খানা ছুঁতে দিতে পারবো না। আমি তোমায় অমনিই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, যখন রাজলক্ষ্মী তোমায় নিজে বরণ ক'রে নিয়েছেন, তখন ন্যায়-ধর্ম্ম অটুট রেখে প্রজাপালন ক'রে তাদের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রো। আমায় এখন বিদায় দাও বাবা"

ভীম চমকিয়া উঠিল, "কোথায় যাবে মা! তুমি যে এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী! তুমি যেমন আছ, না, তার চেয়েও বেশী আমাদের মা হয়ে থাকতে হবে যে, মা! তোমায় ত আমি যেতে দেব না।"

এইবার মহাদেবীর কঠিন নেত্র অশ্রুসজল হইয়া আসিল। তিনি গাঢ়স্বরে কহিলেন, "এমন কথা বলো না, ভীম! তুমি যত বড়ই হও, আমার স্বামিহন্তা, তোমার আমি মা হ'লেও আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, আমার স্থান তাঁরই পায়ের তলায়, তা' সে যেখানেই হোক।"

শেষক্ষণে ভীম আসিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া বালকের মত—শিশুর মত কাঁদিল। যেখান দিয়া মহাদেবী চিতারোহণ করিলেন, সেখানকার মৃত্তিকা লইয়া সে মাথায় বুকে মাখিল। তাহার পর মন্ত্রাহুতিপ্রদত্ত লাজপুষ্প-বর্ষিত জ্বলন্ত চিতার মধ্য-বর্ত্তিনী, পতিপদ ক্রোড়ে লইয়া সমাসীনা, সেই চিরপ্রসন্না হাস্য-মুখী রাজেন্দ্রাণীর নিকটে উন্মত্তের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া সে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"মা! মা! যদি কিছু তোমার বলবার থাকে, আমায় ব'লে যাও। কারুর জন্যে কিছু করতে বলবে কি? কোন আদেশ? যত বড় কিম্বা যত ছোটই হোক! ব'লে যাও মা! কিছু বল।"

শান্ত মধুর স্বরে মহাদেবী সেই অগ্নিজ্বালার মধ্য হইতে কথা কহিয়া বলিলেন, "তোমার রাজ্যে সতীর অশ্রুজল যেন পতিত হয় না, এই আমার তোমার কাছে শেষ অনুরোধ।"

চীৎকার করিয়া ভীম উত্তর করিল, "মা আমার! তোমার আজ্ঞাপালনে আজ হ'তে এ দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করলেম, আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না, মা!"

শ্মশানবহ্নি ঘোররোলে গর্জ্জিয়া উঠিল।

প্রথম অংশ সমাপ্ত।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ভাল-মন্দ

যেখানে মিলন আছে সেথায় বিরহ
দুখ ছাড়া সুখ কোথা আছে অহরহ!

শত শত বিজ্ঞ নর যে সভায় রাজে
হস্তিসম কত মূর্খ তাহাদেরি মাঝে!

যেথানে প্রদীপ সেথা আছে ছায়া-আলো
কর্ম্মমাত্রে আছে ফল মন্দ আর ভালো!

যে মেঘেতে জল দেয় বজ্র আছে তায়
সর্ব্ববস্তু বিশ্বে ভরা আশা-নিরাশায়!

শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী।



প্রকৃত সহযোগিতা

জেনারল হার্টজগ বর্ত্তমানে দক্ষিণ-আফ্রিকা য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী। জাতিতে তিনি বুয়র। এই বুয়ররা প্রাচীন ওলন্দাজ উপনিবেশিকদিগের বংশধর। প্রাচীন ওলন্দাজরা অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ধর্ম্মভীরু খৃষ্টান (Puritan) বলিয়া খ্যাত। বুয়ররা এখনও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনেক দোষ-গুণের অধিকারী। তাহারা ধর্ম্মভীরু, সত্যপ্রিয় এবং স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি বলিয়া এখনও খ্যাত। জেনারল হার্টজগও আদর্শ বুয়র। তিনিও ধর্ম্মভীরু, সত্যবাদী এবং স্বাধীনতাপ্রিয়। ইংরাজের সহিত বুয়রদের মিতালী হইয়াছে এবং উহারই ফলে 'য়ুনিয়ন' গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব দক্ষিণ-আফ্রিকায় সম্ভবপর হইয়াছে, এ কথা সত্য। এই দুই জাতির পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতি না থাকিলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট দাঁড়াইতে পারে না, এ কথাও সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া জেনারল হার্টজগ ও তাঁহার ন্যায় সত্যবাদী বুয়র এক দিনের জন্য আপনাদিগের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক হইতে চাহেন নাই। তাঁহার মূলনীতি—অগ্রে স্বাধীনতা, তাহার পর সাম্রাজ্য। কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতীয় পতাকার আন্দোলন উপলক্ষে কি ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। জেনারল হার্টজগ তদুপলক্ষে বরং সাম্রাজ্যচ্যুত হইতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি জন্মভূমির স্বাধীনতার নিদর্শন জাতীয় পতাকার সম্মান ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি সে সময়ে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, ইহার জন্য যদি আবার নূতন করিয়া বুয়র যুদ্ধ ঘটাইতে হয় ও বুয়র জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জাতির আত্ম-সম্মানের পরিচায়ক জাতীয় পতাকার সম্মান য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বাগ্রে রাখিতে হইবে।

এই স্পষ্টবাদী স্বাধীনতাপ্রিয় বুয়র যোদ্ধা রাজনীতিক সম্প্রতি আর এক ঘটনা উপলক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার য়ুনিয়ন পার্লামেণ্ট সাম্রাজ্য বৈঠকের রিপোর্টের সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। সেই সময়ে সাম্রাজ্যের মধ্যস্থ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠিয়াছিল। জেনারল হার্টজগ সেই কথায় বলেন,—

"আমার রাজনীতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানি যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার যত প্রয়োজন হইয়াছে, এত আর কখনও অনুভূত হয় নাই; কিন্তু সেই সহযোগিতা দক্ষিণ-আফ্রিকা বা অন্যান্য স্বায়ত্ত-শাসিত রাষ্ট্র বৃটেনের সহিত রক্ষা করিতে পারে, যদি উহা পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যে সহযোগিতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে, এ কথা আমি বিলক্ষণ জানি। এই সহযোগিতা সরাইয়া লও, সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত খসিয়া পড়িবে। সহযোগিতা যে কেবল যুদ্ধকালেই রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে, অন্য সময়ে নাই, তাহা নহে, উহা সকল সময়েই প্রয়োজনীয়। যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নামে সাম্রাজ্য না করিয়া প্রকৃত সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে শান্তিকালেও যাহাতে সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীন জাতিগণের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা থাকে, তাহা করিতে হইবে। সেই সহযোগিতা কেবলমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগের উপর নির্ভর করে।"

এই স্পষ্টবাদী স্বাধীনতাপ্রিয় বুয়র রাজনীতিকের মুখে এত দিনে যে সহযোগিতা (co-operation) কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা হইল, ইহাতে কত লোক সন্তোষ লাভ করিল! আমাদের এই বিজিত অধীন দেশের লাট-বেলাটের মুখে প্রায়ই এক মার্কামারা সহযোগিতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; আমাদের ভাগ্যবিধাতা সাগর-পারের কর্ত্তাদের কাছেও আমাদের 'সহযোগিতার অভাব' সম্বন্ধে অনেক উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সহযোগিতার গূঢ় মর্ম্মার্থ এ যাবৎ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। জেনারল হার্টজগ এইবার তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পূর্ণ স্বাধীন সমান পর্য্যায়ভুক্ত জাতিদিগের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃত সহযোগিতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সহযোগিতা,—দুর্ব্বলে প্রবলে, অভিভাবকে নাবালকে, বিজিতে বিজেতায় সহযোগিতা অর্থে একের প্রভুত্ব ও অপরের আজ্ঞা-পালন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সহযোগিতা প্রকৃত সহযোগিতা নহে, এই মার্কামারা সহযোগিতা সহযোগিতার ভাণ মাত্র!

একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ভারতবাসী সাইমন কমিশন চাহে নাই এবং ভারতের ব্যবস্থাপরিষদ উহার সংস্রবে থাকিবে না ও ভারতের তহবিল হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে দিবে না বলিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সাগর-পারের সরকার কমিশন বসাইবেনই এবং ভারত হইতে উহার কতক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেনই বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। অথচ ভারতবাসী সহযোগিতা করিল না বলিয়া চীৎকার করাও হইতেছে! কেমন চমৎকার সহযোগিতা!

শান্তিপ্রিয় কে ?

কথা উঠিয়াছে, জগতে শান্তিপ্রিয় কে ? সাম্রাজ্যিক শক্তিপুঞ্জ একবাক্যে ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ হইতে বিরতি এবং যুদ্ধের অবসান করাই তাঁহাদের সকলের ইচ্ছা। ভাবগতিকে মনে হয়, যেন তাঁহারা 'সবাই ভাল', কেবল দুষ্ট বলশেভিক রাসিয়া ! উহারাই যেন জগতের শান্তি-ভঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বা প্রস্তুত হইতেছে।

কিন্তু মজা এই যে, সকল দিক্ একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যাঁহারা 'শান্তি শান্তি' রব তুলিয়া জগতের আসর গুলজার করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন, এমন বারুদস্তূপ সাজাইতেছেন, যে, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গই উহা দ্বারা জগৎ জ্বালাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। এই সকল শান্তির উকীল সাম্রাজ্যিক শক্তি অস্ত্রসংবরণের কত বৈঠক বসাইল, নৌশক্তি হ্রাস করিবার কত সলাপরামর্শ করিল, কোনটি কি এ যাবৎ সফল হইয়াছে ? সকলেরই ইচ্ছা, অপরে অস্ত্রসংবরণ করুক, আমি যেমনটি আছি, তেমনটি থাকি, না হইলে আমার রাজ্য নিরাপদ থাকে না। তাই সকল চেষ্টাই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে একবার যখন রাসিয়ার বলশেভিক প্রতিনিধি অস্ত্রসংহরণ বৈঠকে বলিয়াছিলেন, সকল শক্তিই একই সময়ে নিজ নিজ সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিন, তখন অন্যান্য শক্তি মনে মনে প্রমাদ গণিয়াছিল—কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল বলিয়াছিল। রাজ্য-লিপ্সা, বাণিজ্যের লোভ আর প্রভুত্বের লালসা যত দিন জগতে থাকিবে, তত দিন এ সব অস্ত্র বা বল সংহরণের বৈঠক বা প্রস্তাব প্রহসনই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং রাসিয়ার প্রস্তাব যে বাতুলের প্রস্তাব বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ?

তবে এখনও অস্ত্র ও বলসংহরণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয় নাই। জেনিভায় সেই সম্পর্কে বৈঠক বসাইবার আবার আয়োজন চলিতেছে। সেই বৈঠকে তুর্কী ও অন্যান্য শক্তির প্রতিনিধির সহিত বলশেভিক প্রতিনিধি লিট্‌ভিনফও উপস্থিত থাকিবেন। তিনি বৈঠকে রাসিয়ার অস্ত্র ও বলসংহরণের প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন বলিয়াও শুনা যাইতেছে। সে প্রস্তাব কিরূপ, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে তিনি রাসিয়ার পক্ষ হইতে এইটুকু স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে,—যখন অন্যান্য দেশ সশস্ত্র সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিতে সম্মত হইবে, তখন সোভিয়েট রাসিয়াও নিজের সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবে। এ বিষয়ে মার্কিণের পথিপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু, তিনিই প্রথমে যুদ্ধকে বে-আইনী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মার্কিণ সেক্রেটারী কেল্লগ তাঁহার দেশের পক্ষ হইতে যুদ্ধকে বে-আইনী করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুতরাং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, মার্কিণই সর্ব্বপ্রথমে পথ দেখাইয়া অস্ত্র ও বলসংহরণের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে যে কয়টি কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বৈঠকে উপস্থাপিত করিতেছি। এখন মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাবমত নিজের অস্ত্র ও বলসংহরণ করুন। তাঁহার সদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অপরাপর শক্তিও স্ব স্ব অস্ত্র সৈন্যবল সংহরণ করিবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টও সেই পন্থা অনুসরণ করিবে।"

পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে, এবারও দেখা গেল, সোভিয়েট রাসিয়া যুদ্ধের পক্ষপাতী নহে, বরং তাঁহারা শান্তিই কামনা করিতেছেন, না হইলে তাঁহাদের পক্ষ হইতে সমস্ত অস্ত্র ও বল সংহরণ করিয়া কেবল শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিস রাখিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় কেন ?

অপর পক্ষে যতদূর শুনা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, মার্কিণ, ইংরাজ প্রভৃতি শক্তি রাসিয়ার প্রস্তাব শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিয়াছেন। ইটালী ত স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, তিনি বাতুলের প্রস্তাবে সম্মত নহেন, তাঁহাকে ভূমধ্য-সাগরে প্রাধান্য রাখিতেই হইবে, জগতে ইটালীর জন্য একটু স্থান করিয়া লইতেই হইবে।

কেবল ইহাই নহে, ইংরাজ, ফরাসী ও ইটালী রাসিয়ানকে ত 'একঘরে' করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের আশ্রিত ক্ষুদ্র য়ুরোপীয় শক্তিগণকেও রাসিয়ার সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিতে সম্মত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র রাজ্যগণের মধ্যে রুমানিয়া, লিথুনিয়া, পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, জেকোশ্লাভিয়া প্রভৃতি সকলেই আছেন। এখন আবার জার্ম্মাণীকেও এই ঘেড়া জালে টানিবার আয়োজন হইতেছে। ইহাই কি যুদ্ধ অবসানের সদিচ্ছার নমুনা ?

যুদ্ধকে বে-আইনী করিবার চেষ্টার আরও নমুনা আছে। মুখে অস্ত্র ও বলসংহরণের কথা শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় শক্তিরা বিমান-বল বৃদ্ধি করিতেও ক্ষান্ত হইতেছেন না। সম্প্রতি বৃটিশ বিমানবাহিনীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"বিমানবলে আমরা ফরাসী, ইটালী ও রাসিয়া হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এখনকার যুগে এক কম্পানী বিমান-সেনা ২০ মিনিটে শত্রুবাহিনীর মধ্যে যে ধ্বংসসাধন করিতে পারে, বহু মাসব্যাপী যুদ্ধেও একটা আর্ম্মকোর (স্থলসৈন্য) তাহা করিতে পারে না।" অথচ এই ধ্বংসলীলা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কি পাল্লাপাল্লিই না চলিয়াছে ! ভবিষ্যতে যুদ্ধ বে-আইনী হওয়া দূরে থাকুক, যুদ্ধকে আরও ভয়ানক ধ্বংসের অস্ত্রে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছে। কাণ্ডেন রেজিনাল্ড বার্কেলে 'ডেলি মিরর' পত্রে লিখিয়াছেন যে, "ভবিষ্যতে উড়ো কল হইতে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইবে, উহা রাসায়নিক মিশ্রণ দ্রব্যে ও রোগবীজাণুতে পরিপূর্ণ থাকিবে। উহার সাহায্যে কেবল শত্রুপক্ষের সৈন্যগণকে আক্রমণ করা হইবে না, উহাদের বে-সামরিক লোকগণকেও আক্রমণ এবং ধ্বংস করা সহজ হইবে। সংক্রামক রোগের বীজাণু শত্রুর পানীয় ও আহার্য্যের আড্ডায় নিক্ষেপ করিয়া রোগবিস্তার দ্বারা শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করা হইবে। এইরূপে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, টাইফয়েড ইত্যাদি ছড়াইয়া শত্রুর সহর-পল্লী ধ্বংস করা সহজ হইবে। একবার সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে জগতের কোনও শক্তিই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

কি ভীষণ কথা ! যাহারা নির্দ্দোষ, নির্লিপ্ত, বে-সামরিক জনসাধারণের জন্য এইরূপ ভীষণ মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিতেছে এবং নিজ নিজ বিমান-বিভাগে উহার শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহারা শান্তিপ্রিয়, না একবারে অস্ত্র ও বলসংহরণ-প্রস্তাবকারী বলশেভিক রাসিয়া শান্তিপ্রিয় ?

জগতের গতি

কোনও সুরসিক লেখক বলিয়াছেন, জেনিভার জাতিসঙ্ঘের ও শান্তি বা অস্ত্র-সংহরণ বৈঠকের দ্বারা জগতের কোনও উপকার হউক বা না হউক, জেনিভার হোটেলওয়ালা, খবরের কাগজ-ওয়ালা এবং রণসম্ভার-প্রস্তুতকারীরা ইহা হইতে যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন হইতেছে, শান্তি-বৈঠক বসিতেছে, সলাপরামর্শ হইতেছে,—আবার সব তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে,—য়ুরোপ্ ও পৃথিবী যেমন চলিতেছে, ঠিক তেমনই চলিতেছে। কেবল এইটুকু বুঝা যাইতেছে, এই প্রহসন চলিতে চলিতে কোন্ দিন হঠাৎ কোথা হইতে সেরাজেভোর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আর এক স্ফুলিঙ্গ য়ুরোপের বা পৃথিবীর কোনও এক কোণে জ্বলিয়া উঠিবে, আর তাহাতে আবার জগৎ ছারখারে যাইবে। ফরাসী মন্ত্রী ক্লেমেনশো ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে যুদ্ধ এত গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা আর এখন সেনাপতিদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বর্ত্তমানে জগতে দিন দিন যুদ্ধের বিভীষিকা যেরূপ জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যুদ্ধ-নিবৃত্তির মত গুরু সমস্যা এখন আর জাতিসঙ্ঘের বা শান্তি-বৈঠকের প্রহসনের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

আসল কথা, য়ুরোপ রণক্ষেত্রের অভিমুখে আগুয়ান সশস্ত্র জাতিসমূহের একটি প্রকাণ্ড স্কন্ধাবারে পরিণত হইয়াছে। জগতের, বিশেষতঃ য়ুরোপ ও মার্কিণের নানা স্থানের সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিলেই জানা যায়, সকল জাতিই পরস্পর পরস্পরের প্রতি কিরূপ আস্থাহীন, কেহ কাহারও প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে না, সকলেই যেন পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। প্রতিবেশীর সাধুতায় বা মুখের কথায় বিশ্বাস করার দিন গত হইয়াছে। সকলেই স্বার্থান্ধ—স্বার্থ তাহাদিগকে সরলবিশ্বাসী হইতে দেয় না। সকলেই প্রতিশ্রুতি দিতে বিশেষ তৎপর, কিন্তু ভঙ্গ করিতেও মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করে না ; কারণ, স্বার্থ ও লালসা প্রতিশ্রুতিরক্ষার পথে প্রবল অন্তরায়। কাযেই মুখে সকলেই শান্তি শান্তি করিতেছে বটে, আপোষ-সভায় বসিয়া কিরূপে কতটা বল বা অস্ত্র হ্রাস করিবে, তাহার পরামর্শ আঁটিতেছে বটে, কিন্তু গোপনে সকলেই স্ব স্ব বলবৃদ্ধি করিতেছে, সকলেই স্ব স্ব রাজ্য ও বাণিজ্য-বৃদ্ধির পথ খোলসা করিবার অভিপ্রায়ে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রতীচ্য জগৎ এইভাবেই চলিতেছে।

একে একে প্রধান শক্তিগণের অবস্থার কথা আলোচনা করা যাউক। জগতের শক্তিশালী সাম্রাজ্যিক জাতিগণের মধ্যে এখন বৃটেনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সকলেই জানেন, পূর্ব্বে জার্ম্মাণী এই প্রাধান্যের অন্তরায় হইয়াছিল। বলে বা কৌশলে—যেরূপেই হউক, বৃটেন সেই অন্তরায় দূর করিয়াছে। এখন মার্কিণ আবার সেই প্রাধান্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজের সাম্রাজ্যিকতার মূলমন্ত্র,—জলে শ্রেষ্ঠত্ব। কি নৌ-বলে কি বাহুবলে ইংরাজ জগতে একচ্ছত্র সম্রাট থাকিবে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার কাহারও শক্তি থাকিবে না, ইহাই ইংরাজ রাজনীতিকগণের চরম লক্ষ্য। এই হেতু বহু প্রাচীন কাল হইতে ইংরাজ আপনা-আপনি নিয়ম বাঁধিয়া লইয়াছে যে, জগতে ইংরাজকে চিরদিন জগতের যে কোনও দুই শক্তির সমবেত নৌ-শক্তি অপেক্ষা আপনার নৌ-শক্তি অধিক রাখিতে হইবে-ই। কেন এরূপ করিতে হইবে, তাহার কারণ দেখাইয়া ইংরাজ বলে,—ইংরাজ দ্বীপবাসী, তাহার চারিদিক হইতে জলে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, পরন্তু দ্বীপবাসী বলিয়া তাহাকে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া নিজের উদরান্ন সংগ্রহ করিতে হয়, এ জন্য তাহাকে তাহার বাণিজ্যের জলপথও সর্ব্বদা নিরাপদ রাখিতে হয়। এই হেতু ইংরাজকে জলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি সঞ্চয় করিতে হইয়াছে এবং চিরদিন হইবে।

মার্কিণ নবীন গণতন্ত্রবাদী জাতি। মার্কিণ ইংরাজের এ কথায় আপত্তি করিয়া বলে, জগতে কাহারও একচ্ছত্র প্রাধান্য রাখিতে দেওয়া হইবে না। কি জলে, কি স্থলে, কি অন্তরীক্ষে, সকল শক্তির মধ্যে সমতা রক্ষা করা জগতের শান্তির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই হেতু মার্কিণ ইংরাজের নৌ-শক্তি-হ্রাসের প্রস্তাব করিয়াছে ; বলিয়াছে, ইংরাজকে মার্কিণ ও অন্যান্য শক্তির মত সমান নৌ-বল রাখিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, ইংরাজ এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে জগৎ হইতে তাহার সাম্রাজ্যের ও পরের উপর প্রভুত্বের অবসান হইবে। এই ইংরাজ-মার্কিণে মন-কসাকসির ফলে জগতে হলাহল উত্থিত হইবার সম্ভাবনা।

জার্ম্মাণী সবেমাত্র হাঁফ ছাড়িতেছে, এখনও তাহার সকল বন্ধন খসিয়া যায় নাই। সে অভিযোগ করিতেছে যে, তাহাকে তাহাদের প্রতিবেশীদিগের অনুরূপ সৈন্যবল রাখিতে না দেওয়ায়, তাহার প্রতিবেশীর অনুগ্রহ ও দয়ার মুখ চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে। জার্ম্মাণীর এই অসন্তোষকে ভিত্তি করিয়া মধ্য-য়ুরোপে হয় ত আবার দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে।

ফরাসী ও ইটালীর মন-কসাকসির কথা বহুবারই বলা হইয়াছে। ইটালীর মাসোলিনি বজ্রমুষ্টি দেখাইয়া বলিয়াছেন, ভূমধ্যসাগরে ইটালীকে রোমের নষ্ট-গৌরব উদ্ধার করিতেই হইবে, ইটালীকে জগতে (অর্থাৎ আফ্রিকায় এবং বলকানের দিকে) একটু স্থান করিয়া লইতেই হইবে। এক জন ফরাসী রাজনীতিক বলিয়াছেন,—মাসোলিনি প্রত্যেক ইটালীয়ান যুবকের হস্তে ছোরা দিয়া শিখাইতেছেন,—প্রতিবেশীকে ছোরা মারিবার জন্য প্রস্তুত হও, সে অবসর শীঘ্রই আসিতেছে। কাযেই ফরাসী ভালমানুষটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। কাযেই সে বলকানে ইটালীর বিপক্ষে একটি ব'ড়ের চাল দিয়াছে। মাসোলিনি আলবানিয়ার দিক লইয়া জুগো-শ্লাভিয়ার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র জুগো-শ্লাভিয়াকে চোখ

রাঙ্গাইয়াছেন। ফরাসী অমনই তাড়াতাড়ি জুগো-শ্লাভিয়াকে নিজ অঙ্কের আশ্রয় দিয়া মা ভৈঃ দিয়া বলিতেছেন,—"মা ভৈঃ মা ভৈঃ বেটা, তোরে আজ মারিবে কেটা ?"

সুতরাং ফরাসী মুখে যতই শান্তি শান্তি করুন, কাযে তিনি শক্তিবৃদ্ধি করিতেছেন। আজ তাঁহার স্থল ও বিমান-বল জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে শান্তিকামী, তাহার বলবৃদ্ধির জন্য এত আগ্রহ কেন ? অথচ তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, দেনার দায়ে ইংরাজ ও মার্কিণের নিকট চুল বিকাইয়া আছে, এ কথাও শুনা যায়। ফরাসী জার্ম্মাণীকে জব্দ রাখিবার জন্য জার্ম্মাণীর প্রতিবেশী পোলাণ্ড, লিথুনিয়া, জেকোশ্লাভিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহকে গোপনে সাহায্য দান করিয়া থাকেন বলিয়াও শুনা যায়।

এ দিকে বলশেভিক রাসিয়াকে 'একঘরে' করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ইংরাজ, ইটালীয়ান ও ফরাসী বহু পূর্ব্বেই করিয়াছে, এখন জার্ম্মাণরা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন জাতির সহিত উহাদের পদানুসরণ করিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। রাসিয়াও সে জন্য কাতর নহে, সে-ও সেই হেতু য়ুরোপ ছাড়িয়া এসিয়ার সহিত মিতালীর চেষ্টা করিতেছে। সে জাত্যভিমান ও শ্বেতচর্ম্মের অভিমান ভুলিয়া গিয়া এসিয়াবাসীকেও সমান বলিয়া ভাই বলিয়া (comrade) আলিঙ্গন করিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ জাতির অশ্বেত 'নেটিভ' জাতির প্রতি এমন ব্যবহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাই আজ তুর্কী, পারসিক, তাতার প্রভৃতি জাতি রাসিয়ার সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। হয় ত কোন দিন শুনা যাইবে, আফগান জাতিও হইবে। পূর্ব্বে চীন ত রাসিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেই। তবেই হইল, প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে শক্তি-পরীক্ষার একটা প্রবল কারণ উদ্ভূত হইল।



রেজা খাঁ পহ্লবী

জেকো-শ্লাভিয়ার বৈদেশিক সচিব মুসিয়ে বেনিস সে দিন এক ঘোষণাপত্রের মারফতে জগৎকে জানাইয়াছেন যে, জেনিভার প্যাক্ট অনুসারে যে চুক্তি হইয়াছে, উহার মারফতে জাতিসঙ্ঘ য়ুরোপে কোনওরূপ সংঘর্ষ-সংঘটন নিবারণ করিতে পারেন। ইহাতে অবস্থাভিজ্ঞ লোক হাসিয়া বলিতেছে,—"হায় রে প্যাক্ট, হায় রে চুক্তি! কাগজে এমন অনেক প্যাক্ট ও চুক্তি এ যাবৎ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ-যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে সংখ্যায় ৬৭ খানা আপোষ-সন্ধিপত্র বিদ্যমান ছিল, তাহার ফল কি হইয়াছিল ?"

বস্তুতঃ যাহারা প্যাক্টে স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহারা কি সর্ত্তমত সৈন্যবল হ্রাস করিয়াছে ? ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জগতে তাহাদের সৈন্যবল যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, বরং বিজ্ঞানের কল্যাণে মারণাস্ত্রের ভীষণতা আরও বাড়িয়াছে। তবে ? তবে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) কি হিসাবে সংঘর্ষ নিবারণে সমর্থ হইবে ?

ইংরাজ ও পারসিক

শা রেজা খাঁ পহ্লবী পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিবার পর হইতে পারস্যের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বতন রাজবংশের শেষ শাসকগণ বিলাসিতা ও ব্যসন দ্বারা দেশে একরূপ অরাজকতা আনয়ন করিয়াছিলেন। দরায়ুস ও শেরের সময় পারস্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পরের তাড়নার ভয়ে পারস্য সর্ব্বদা কম্পিতকলেবর হইত। রেজা খাঁ পারস্যকে এই অবস্থা হইতে কিরূপে উদ্ধার করিয়া প্রাচ্যের এক প্রবল স্বাধীন শক্তিরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় 'মাসিক বসুমতী'র পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছিল। রেজা খাঁ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার পর হইতে পারস্যে দস্যুভয় অন্তর্হিত হইয়াছে, বিদ্রোহী সর্দ্দাররা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, পারস্যের আর্থিক অবস্থা সুব্যবস্থার গুণে অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি উত্তরে রাসিয়া ও দক্ষিণে ইংরাজ—এই দুই শক্তির sphere of Influence অর্থাৎ প্রভাবান্তর্গত ভূখণ্ড সেই অন্যায় প্রভাব-মুক্ত হইয়াছে, এখন রাসিয়া ও ইংলণ্ড পারস্যকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে মুস্তাফা কামাল পাশার হস্তে তুর্কী সাম্রাজ্য যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, পারস্যও ধীরে ধীরে রেজা খাঁর হস্তে তেমনই ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।

প্রাচ্যের একটা প্রাচীন শক্তিশালী জাতির এই ভাবে পুনর্জ্জীবনলাভ হইতেছে, ইহা খুবই আনন্দের কথা। তুর্কী, পারস্য, চীন, জাপান, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ এই ভাবে যদি ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যিক শক্তিপুঞ্জের পৃথিবী-গ্রাসের লালসা ব্যাহত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতেই গোল বাধিয়াছে।

রেজা খাঁর হস্তে নব-গঠিত পারস্যরাজ্য যে মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে, তাহাতে প্রতীচ্যের প্রধান সাম্রাজ্যিক শক্তি বৃটেনের আতঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হইবারই কথা। পারস্যের এক দিকে বৃটেনের 'ম্যাণ্ডেটারী' রাজ্য ইরাক, অন্য দিকে বিজিত ভারতবর্ষ। বিশেষতঃ পারস্যের তৈলখনি সম্পর্কেও ইংরাজের স্বার্থ বিদ্যমান। কাযেই পারস্যোপসাগরে ইংরাজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার আগ্রহ ইংরাজের স্বতঃই হইতে পারে।

সম্প্রতি পারস্যোপসাগরে অবস্থিত বাহরিণ দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে ইংরাজ ও পারসিকে বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। কেবল পারস্য উপসাগরের দ্বীপ নহে, খাস পারস্যেও ইংরাজ তাঁহার ভারতযাত্রার পথে উড়ো কলের আড্ডা গাড়িবার সঙ্কল্পে পারস্যের রেজা খাঁর নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন বাধা বোধ হয় প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ জীবনে আর কোথাও প্রাপ্ত হয়েন

নাই। এই সূত্রেও উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। ইহার পরিণাম যাহাই হউক না, ইহাতে এইটুকু বেশ বুঝা গিয়াছে যে, পারস্যের শাহ রেজা খাঁ তাঁহার দেশকে ও দেশের স্বাধীনতাকে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন, দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য ইংরাজের মত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতিরও বিরাগভাজন হইতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

বাহরিণ দ্বীপপুঞ্জের একটা ইতিহাস আছে। বহু পূর্ব্বে দ্বীপগুলি পারস্যের শাহদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাহার পর পরবর্ত্তী শাহরা যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং যখন তাঁহাদের ভোগবিলাস ও যথেচ্ছাচারের জন্য সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা স্থানে বিদ্রোহ ও অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন অন্যান্য স্থানের ন্যায় দ্বীপগুলিও তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইয়া পড়ে। আরবের শেখরা দ্বীপগুলি অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু তাহার পরে পারস্য উপসাগরে জলদস্যুদিগের অত্যাচারে তথায় বসবাস করা বা বাণিজ্যাদি করা বিপজ্জনক হইয়া উঠে। অথচ বিস্তর ধনী বণিক ঐ দ্বীপপুঞ্জে মুক্তা-ব্যবসায় উপলক্ষে বসবাস করিত। শেখদিগের অনুরোধে ইংরাজ জলদস্যুদিগকে দমন করেন। কিন্তু তদবধি ইংরাজ পারস্য উপসাগরে এবং দ্বীপপুঞ্জের উপর একটা কর্ত্তৃত্বাধিকার হস্তগত করিয়া লয়েন। শেখরা তাঁহাদের আশ্রিত নরপতিরূপে দ্বীপ শাসন করিতে থাকেন। ইহা ইংরাজ পক্ষের কথা, কিন্তু রেজা খাঁ বলেন, শেখরা চিরদিন পারস্যের শাহদিগের অধীন নরপতিরূপে দ্বীপ শাসন করিয়া আসিয়াছেন। মধ্যে কিছুকাল শাহরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ কথা সত্য; তখন তাঁহাদের সার্ব্বভৌমত্ব অনেকে অস্বীকার করিয়াছিল, এ কথাও সত্য, কিন্তু এখন যেমন অন্যান্য শেখ ও সর্দ্দাররা (যেমন মহাম্মেরা প্রভৃতি) শাহদিগের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে, তেমনই বাহরিণের শেখরাও করিতে বাধ্য। বাহরিণে পারস্যের সার্ব্বভৌমত্ব লুপ্ত হয় নাই, ইংরাজ সেখানে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসেন কোন্ হিসাবে ?

এইরূপ ঘোর তর্ক উঠিয়াছে। রেজা খাঁ বাহরিণের অধিকারত্বের দাবী করিয়াছেন। ইংরাজ সে দাবী স্বীকার করিতে সম্মত হইতেছেন না। ফলে ইহা হইতে উভয় পক্ষে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে।

তাহার পর ইংরাজ বিলাতের সহিত তাঁহার ভারতসাম্রাজ্যের বিমান-সম্বন্ধ রক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহার ইরাক পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যে পারস্য ও সীস্তান বেলুচিস্থান ব্যবধান। বেলুচিস্থান ইংরাজের খাসের, সীস্তান মরুভূমি, সেখানেও বাধার কারণ নাই। বাকী পারস্যটুকু। ইংরাজ তাই পারস্যের রেজা খাঁর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, পারস্যের দক্ষিণ অংশ দিয়া তাঁহাদের উড়োকল উড়াইবার পথ দেওয়া হউক এবং স্থানে স্থানে আড্ডা স্থাপন করিতে দেওয়া হউক।

বলা বাহুল্য, রেজা খাঁ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। তিনি বোধ হয় দরজী ও উটের গল্পের সূচ হইয়া প্রবেশ করা ও ফাল হইয়া বাহির হওয়ার কথা স্মরণ করিয়া পিছাইয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরাজকে তাঁহার রাজ্যের আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইতে দিবেন না এবং রাজ্যের মধ্যে আড্ডা গাড়িতেও দিবেন না, এইরূপ জবাব দিয়াছেন। ইংরাজ একবারে অপমানে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ রেজা খাঁ তাঁহাকে এমন অপমান করিলেও সোভিয়েট রাসিয়া ও আফগানিস্থানের সহিত সন্ধি করিতে ইতস্ততঃ করে নাই—তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করে নাই,—এই অপমানেও ইংরাজ জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিয়াছেন। এ যাবৎ ক্ষুদ্র প্রাচ্যের ক্ষুদ্র রাজন্যরা তাঁহার মুখের কথা না পাইয়া কোন কিছু কায স্বাধীনভাবে করিতে সাহসী হয় নাই, আর আজ ? আফগান আমীর যথেচ্ছ যত্র-তত্র ভ্রমণ করিতে যায়েন, যাহার-তাহার সহিত সন্ধি করেন, রেজা খাঁ ইংরাজের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন,—কালে কালে এ সব হইল কি ? পৃথিবী কি উল্টাইয়া যাইতেছে ?

বৃটিশ সরকার পারস্য গভর্ণমেণ্টের সকাশে কয়টি সর্ত্ত পেশ করিয়াছিলেন। পারস্য সরকার তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠান,—

(১) পারস্য সরকারের বর্ত্তমান অবস্থা এমন নহে যে, এখন বৃটেনের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন।

(২) পারস্য-গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-পারস্যে ইংরাজ-সরকারকে উড়োকল আকাশে উড়াইয়া লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারেন না।

(৩) যত দিন ইরাক গভর্ণমেণ্ট পারস্যের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ না করেন, তত দিন পারস্য-গভর্ণমেণ্ট ইরাক-গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্বই স্বীকার করিবেন না।

(৪) শেখ কাজালকে কুসিস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ও সম্পত্তি উপভোগ করিতে দেওয়া হইবে কি না, তাহা পারস্য-গভর্ণমেণ্টের বিচারাধীন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, উহার সহিত বাহিরের কোনও শক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই; সুতরাং পারস্য-সরকার এ বিষয়ে ইংরাজের সহিত কোন বিচার আলোচনা করিতে সম্মত নহেন।

দেখুন একবার স্পর্দ্ধা! পারস্য স্বাধীন রাজ্য, তাহার নিকট কি ভাবে বৃটিশ-সরকার সর্ত্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এই সর্ত্তগুলি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পেশ করা হইয়াছিল। সর্ত্তগুলির কথা শুনিয়া কোন পারসিক সংবাদপত্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,—"ইংরাজ ধরাখানা সরাখানা মনে করে বোধ হয়, তাহা না হইলে স্বাধীন পারস্যকে এরূপ 'হুকুম' করে কোন্ সাহসে ? সর্ব্বত্র এইভাবে হুকুম করিয়া ও হুকুম তামিল করাইয়া তাহার বুক বলিয়া গিয়াছে বোধ হয়। না হইলে শাহের প্রজা শেখ কাজালকে তাহার জমীদারী ফিরাইয়া দিতে হইবে, শাহকে এরূপ হুকুম করিবার অধিকার কাহার আছে ? ইংরাজ সাম্রাজ্যগর্ব্বী, মনেও ভাবিতে পারেনা যে, তাহার হুকুম তামিল হইবে না। প্রাচ্যের মানচিত্রে তাহারা তাহাদের মরজিমত আমীর-ওমরা বা শেখের রাজ্য গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে—যেন দাবার ছকে বল সাজাইতেছে! তাহাদের হুকুমে এই সকল পুতুল নড়ে চড়ে। যদি দৈবক্রমে কোনও পুতুল ইংরাজের হুকুম অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার খেলাঘরের গদী হইতে নামাইয়া দেওয়া হয়, কাহাকেও বা দূরদেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। হজের রাজা হোসেন যখন নিজে হজ শাসন করিতে উদ্যত হয়েন, তখন ইংরাজ তাঁহাকে বন্দী করিয়া সাইপ্রাস দ্বীপে পাঠায়।

কিন্তু রেজা খাঁ খেলার পুতুল নহেন। যেমন বুনো ওল, তেমনই বাঘা কৈতুল। কাজার বংশীয় শাহদের আমলে যে সুবিধা ছিল, এখন আর তাহা নাই। যাহাতে পারস্যে বৃটিশ প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে। দক্ষিণ-পারস্যে কতকগুলি শেখ ও সর্দারকে স্বায়ত্ত-শাসনের লোভ দেখাইয়া ক্ষেপান হইয়াছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শেখ কাজাল বিদ্রোহী হয়; পরন্তু য়ামুত নামক পারসিক জাতিও বিদ্রোহ-ধ্বজা উড্ডীন করে এবং বোগদাদ হইতে সালার-উদ্দৌলা আসিয়া মহা গোলযোগ ও অশান্তি উপস্থিত করে। এ সকলের উদ্দেশ্য, পারস্য-সরকারকে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন করিয়া রাখা। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সময়ে যাঁহার হস্তে পারস্যের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি পুরুষ-সিংহ, তিনি অবলীলাক্রমে এই সকল চক্রান্ত-জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর সমগ্র পারস্যে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট বৈদেশিকের চালবাজী চলিবে না। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে হুকুম দেন যে, বিদ্রোহী শেখ কাজালকে তাহার জমীদারী ফিরাইয়া দিতে হইবে ও নূতন জমীদারী দিতে হইবে। রেজা খাঁ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া কাজালের দণ্ডবিধান করিয়াছেন।

রেজা খাঁর আরও অপরাধ আছে। তিনি রাসিয়ার বলশেভিক সরকারের সহিত সন্ধি করিয়াছেন, পরন্তু আফগান-আমীরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এ দিকে আর এক জন গাত্রদাহে দগ্ধ হইতেছে! কিন্তু উপায় কি? শক্তিমানের নিকট চোখ-রাঙ্গানি কোনও যুগে চলে নাই, এ যুগেও চলিবে না। রেজা খাঁ দীর্ঘজীবী হউন, পারস্যকে আবার তাহার পূর্ব্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত করুন, প্রাচীর মুখ উজ্জ্বল করুন, ইহা প্রাচ্যের লোকমাত্রেরই কামনা।

নরপতি আমানুল্লা

আফগানিস্থানের স্বাধীন নরপতি আমানুল্লা খাঁ ও তাঁহার মহিষী সুরিয়া (কেহ কেহ বলেন 'থুরাগা') প্রতীচ্যে প্রাচীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

রোম, প্যারিস, বার্লিন, লণ্ডন, যেখানেই তাঁহারা পদার্পণ করিতেছেন, সেই স্থানেই তাঁহাদের বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইতেছে। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার মহিষী, প্রিন্স অব ওয়েলস, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, বড় বড় সামরিক ও বে-সামরিক রাজপুরুষ, সকলেই এই রাজ-অতিথিকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। ইংরাজ-সরকারের এরূপ করিবার কথা। আফগান-রাজ ভারত-সরকারের প্রতিবেশী নরপতি—তাঁহার সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু ইটালী, ফরাসী বা জার্ম্মাণ-সরকার তাঁহাকে এরূপ বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিলেন কেন, ইহাই বিস্ময়জনক।

বার্লিনে তাঁহার অভ্যর্থনা কিরূপ বিরাট হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। আমীর আমানুল্লা বার্লিনে পদার্পণ করিবার পক্ষাধিক কাল পূর্ব্ব হইতে বার্লিন সাজাইবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল। রাজ-অতিথির বসবাসের জন্য উইলহেল্‌ম্ ষ্ট্রাসিতে প্রিন্স এলব্রেট (এলবার্ট) প্রাসাদটি প্রুসিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিক হেনরিচের নিকট ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। প্রাসাদটির সুসংস্কার করিতে ৬০ হাজার মার্ক মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাড়ীর ভাড়া ৪ দিনের জন্য ১ লক্ষ মার্ক। যে দিন আফগান-নরপতি বার্লিনে উপস্থিত হয়েন, সে দিন সমস্ত সরকারী কার্য্যালয়ে জার্ম্মাণ জাতীয়-পতাকার সহিত আফগান জাতীয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা হইতে এক বিশেষ রাজকীয় ট্রেণে তাঁহাকে অনুচরবর্গের সহিত বার্লিনে আনয়ন করা হয়, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ ও অন্যান্য জার্ম্মাণ রাজপুরুষ তাঁহাকে লেহার্টার ভানহফে অভ্যর্থনা করেন। আফগান-নরপতির জন্য ১৪ খানি মার্সিডিস মোটর কার দেওয়া হইয়াছিল। জার্ম্মাণ আমানুল্লাকে একখানি উড়োকল উপহার দিয়াছেন, ইটালী তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে একখানি 'আর্ম্মার্ড কার' উপহার দিয়াছিলেন, এখন ইংরাজ তাঁহাকে একখানি সাবমেরিণ বা ড্রেডনট উপহার দিলে সোনায় সোহাগা হয়।

এখন কথা, এসিয়ার এক কোণের ক্ষুদ্র আফগান রাজ্যের নরপতির এরূপ অভ্যর্থনা হইতেছে কেন? ইহার পূর্ব্বে অনেক এসিয়াবাসী নরপতি ত য়ুরোপ ভ্রমণে গিয়াছেন, তাঁহাদের ত এমন অভ্যর্থনা হয় নাই। কোনও ইংরাজ লেখক ইহার গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন,—

Germans are making all this fuss over Amanulla's visit to Berlin primarily with the intention of improving Ger-man-Afghan trade.

এইখানেই আসল কথা। আফগান আমীর বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া রাজ্য গড়িয়া তুলিতেছেন। উহাতে প্রতীচ্যের বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। আফগানিস্থানের প্রকৃতি-দত্ত ধন-সম্পদ এখনও ভূগর্ভে অথবা পর্ব্বতে কান্তারে নিহিত আছে। জার্ম্মাণরা কারিগরি জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। এ জন্য অচিরভবিষ্যতে আফগানরাজকে জার্ম্মাণীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণীর সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে আফগানিস্থানের উন্নতিও সম্ভবপর। এই হেতু জার্ম্মাণী আফগান আমীরের এইরূপ সম্বর্দ্ধনা করিতেছে।

আরও একটা বিশেষ কারণ এই যে, বর্ত্তমান জার্ম্মাণী অন্যান্য প্রতীচ্য শক্তির মত সাম্রাজ্যবাদী নহে। রাজ্য-বিস্তারের বা প্রভাব-বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাহার নাই। এই হেতু আফগান আমীর সহজেই জার্ম্মাণীর সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনে সম্মত হইবেন।

কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসী প্রভৃতি জাতিরাও আফগানিস্থানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে বিশেষ সমুৎসুক। পাছে জার্ম্মাণী আফগানিস্থানে একচেটিয়া প্রসার বৃদ্ধি করে, এই আশঙ্কায় তাহারাও আমীরের মনস্তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আফগান আমীর সুচতুর রাজনীতিক, তিনিও সহজে ধরা দিতেছেন না। এই ব্যাপার লইয়া অচিরভবিষ্যতে প্রাচ্যে আর এক সমস্যা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। ইংরাজ তাঁহার প্রতিবেশীর রাজ্যে অন্য কোনও প্রতীচ্য শক্তিকে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে সহজে দিবেন না। তখনই গোল উঠিবার কথা।

জেরুসালেম্

জেরুসালেম্ খৃষ্টানের পবিত্র তীর্থ। ইহা চতুর্দ্দশবার ধ্বংস হইয়াছিল, আবার সগৌরবে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মাতৃক্রোড়ে বসিয়া খৃষ্টান শিশু প্রথমেই জেরুসালেম নামের সহিত পরিচিত হইয়া থাকে। জেরুসালেম্ দুইটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড় দুইটি পূর্ব্বদিকে ঢালু—জেরুসালেমের পূর্ব্বভাগে সূর্য্যের উদয়াচল এবং দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি।

প্যালেষ্টাইনের রাজপথগুলি রাজধানীর অভিমুখে প্রসৃত। দক্ষিণের রাজপথ বিয়ারসেবা, হেব্রন্ এবং বেথেল্‌হেম্ হইতে বাহির হইয়া রাজধানীর দিকে চলিয়া গিয়াছে—জাফা তোরণে ইহাদের সম্মিলনস্থান। নাবলস্, নাজারেথ এবং দামাসকাস্ হইতে প্রশস্ত রাজপথ বাহির হইয়া প্রধানা নগরীর দামস্‌কাস্ তোরণে মিলিত হইয়াছে।

মিশর, জাফা অথবা হাইফা হইতে ট্রেণযোগে কোনও যাত্রী ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলেই ইংরাজী, আরবী এবং হিব্রু ভাষায় লিখিত ষ্টেশনের নাম দর্শকের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবে। মুসলমান, ইংরাজ ও ইহুদী তিন জাতির নিকট জেরুসালেম প্রিয় স্থান। প্রতি ষ্টেশনে যাত্রি-বহনের জন্য অশ্ববাহিত যান, জীন-রেকাব-মণ্ডিত গর্দ্দভ বা উষ্ট্র এবং মার্কিণ মোটর-গাড়ীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শনির দৃষ্টি বলিয়া একটা সংস্কার এখনও প্যালেষ্টাইনবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল। এ জন্য মোটর-চালিত গড়ীর চালনচক্রের গলদেশে নীল স্ফটিকের মালা দোদুল্যমান থাকে। প্রত্যেক অশ্ব, গর্দ্দভ অথবা উষ্ট্রের গলদেশেও এইরূপ মালা সুশোভিত। চালক অথবা বাহন দক্ষ হইলেও শনিদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

আট শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া এবং য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বীরপুরুষ এবং সাহসিকা সুন্দরীরা সারাসান্‌দিগের আক্রমণ হইতে তীর্থক্ষেত্র রক্ষার জন্য এই স্থানে সমবেত হইতেন। সে যুগের বীরত্বের কাহিনীতে য়ুরোপের-ইতিহাস পরিপূর্ণ।

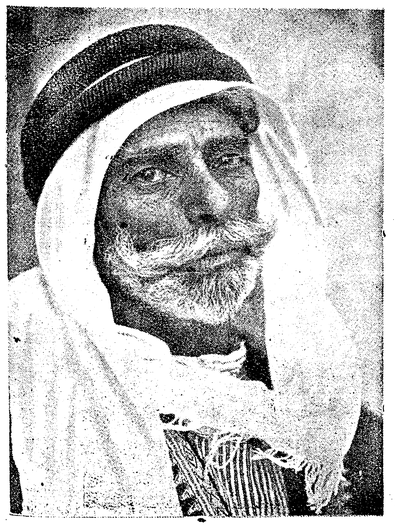

বেগানীর মুসলমান সর্দ্দার



বেথেলহেমের উচ্চবংশীয়া মুসলমান-মহিলা

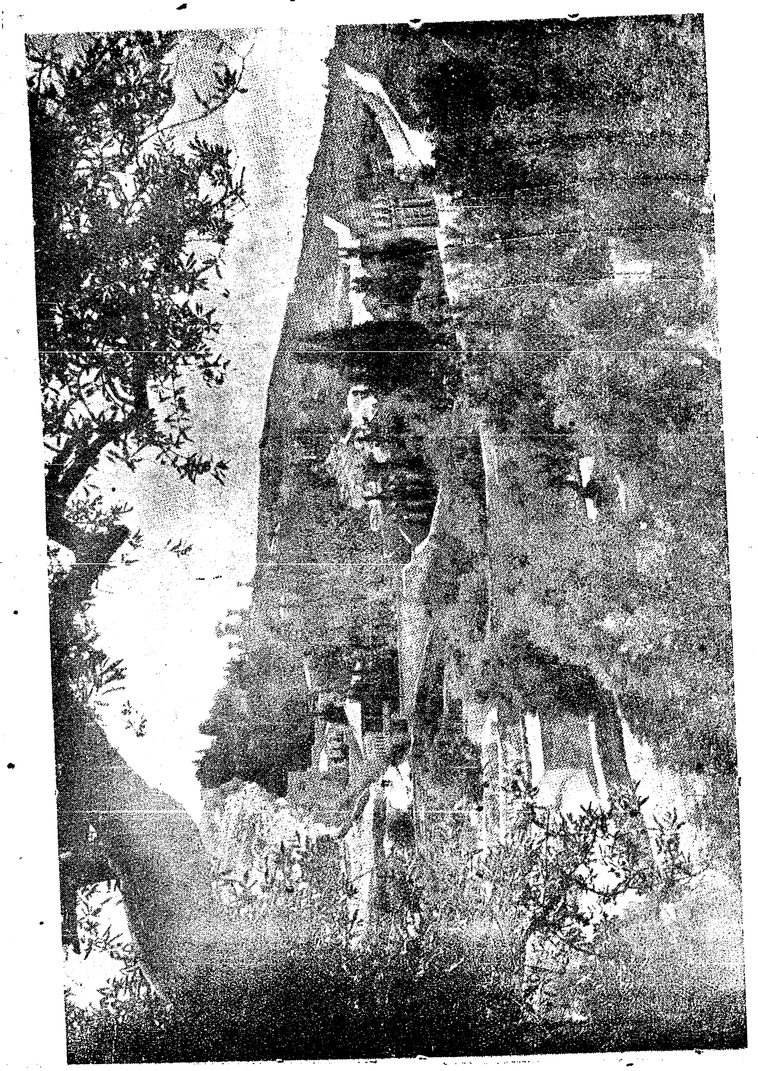

অলিভেটের পাদমূলে গেথ্‌সেমেন উদ্যান

জেরুসালেমের পুরাতন ও নূতন সহর পাশাপাশি অবস্থিত। জাফা তোরণকে আরবরা 'বন্ধুর তোরণ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কারণ, এই তোরণটি হেব্রনের দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত। হেব্রন্‌এ আব্রাহাম্ বাস করিতেন। জাফা তোরণের অনতিদূরে পাঁচটি গম্বুজবিশিষ্ট একটি দুর্গ বিদ্যমান। রোমকদিগের যুগে উহা প্রথম বিনির্ম্মিত হয়। উহার সংলগ্ন অট্টালিকা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত



জেরুসালেমের খৃষ্টান তরুণী

হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। দুর্গের পার্শ্ব দিয়া রাজপথ বিস্তৃত—প্রাচীরের একাংশ দিয়া পুরাতন সহরে প্রবেশ করা যায়।

দুর্গ-পরিখার অনতিদূরে জেরুসালেমের প্রসিদ্ধ ফলের বাজার। জাফার প্রসিদ্ধ কমলানেবু, হেব্রনের আঙ্গুর, বেথেলহেমের আখরোট, পিচফল, জেরিচোর কদলী এবং সিজারিয়ার সুবৃহৎ তরমুজ প্রভৃতি এই বাজারে বিক্রয়ার্থ নীত হইয়া থাকে। জেরুসালেমের ফুলকপী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সিলওয়াস উপত্যকাভূমিতে উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এমন বৃহদাকার ফুলকপী সর্ব্বত্র সুলভ নহে। শুধু আকারে বৃহৎ নহে, ইহার স্বাদ ও গন্ধও অতি অপূর্ব্ব বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।



জেরুসালেমের ফুলকপি-বিক্রেত্রী

সন্নিহিত গ্রাম হইতে দলে দলে নারীগণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারসহ বাজারে উপনীত হইয়া থাকে। তাহাদের অঙ্গে গাঢ় লোহিত এবং নীল বর্ণের পরিচ্ছদ



পারসিক ইহুদীভারবাহী

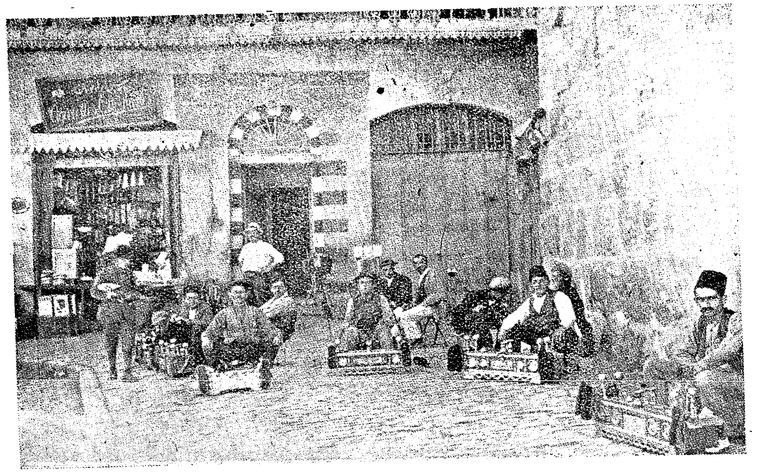

জেরুসালেমে মুচিগণ জুতায় কালি দিতেছে

এতদঞ্চলের নারী-সমাজে এই দুই প্রকার বর্ণের পরিচ্ছদের সমাদর অত্যধিক। তাহাদের মস্তকের উপর শ্বেত অবগুণ্ঠন —পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। অনেকের মস্তকে ফলপূর্ণ ঝুড়ি ছাড়াও পৃষ্ঠদেশে শিশু অবস্থান করিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দুগ্ধ, ডিম্ব, শাকসব্জী প্রভৃতি বিক্রয়ের পর নারীরা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহার পর তাহারা রাত্রির জন্য আহার্য্য রন্ধন করিয়া থাকে। পুরুষরা গৃহে থাকিয়া সমস্ত দিন অলস জীবন যাপন করে।

তোরণপার্শ্বে ইহুদী, আর্মেনিয়ান, মুসলমান এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আরব মুচিরা তাহাদিগের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বাক্স রাখিয়া উপবিষ্ট। প্রত্যেক বাক্স পিত্তলের কারুকার্য্যখোদিত এবং কাগজ নির্ম্মিত গোলাপ পুষ্পশোভিত হইয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহার জুতা বুরুস করাইবার প্রয়োজন, তিনি কোনও মুচির সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন। এক পাটি জুতা শেষ হইলে অপর পাটি লইয়া বুরুস করিতে আরম্ভ করে। তৎপূর্ব্বে তাহারা

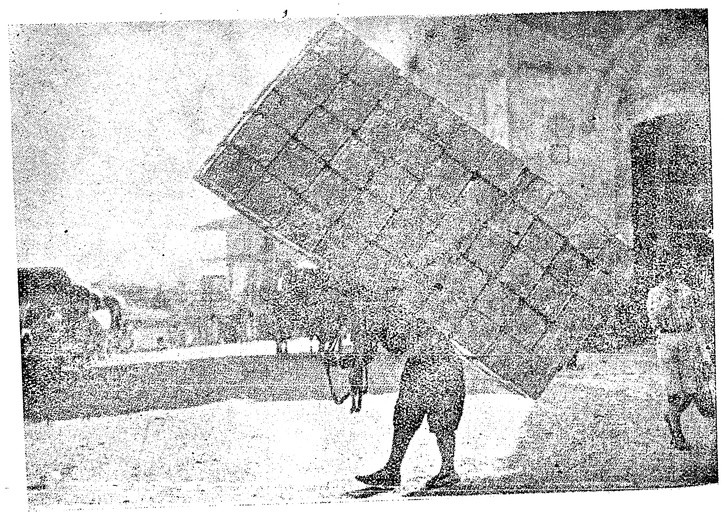

টিনের বোঝাবাহী কুলী



কাফিখানায় ধূমপান

ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা জানাইয়া দেয় যে, এক পাটি জুতার কায শেষ হইয়া গিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনের প্রত্যেক রাজপথে বিচিত্রদর্শন যানবাহন এবং পথচারীর সমাবেশ। মেষ ও ছাগলের দল ঘণ্টায় এক মাইল পথ চলে, পৃষ্ঠে বোঝা লইয়া উষ্ট্রযূথ ঘণ্টায় আড়াই মাইল গতিতে পথ অতিবাহিত করে। স্থানীয় শকটের গতি



অবগুণ্ঠনাবৃতা মুসলমান-রমণীগণ

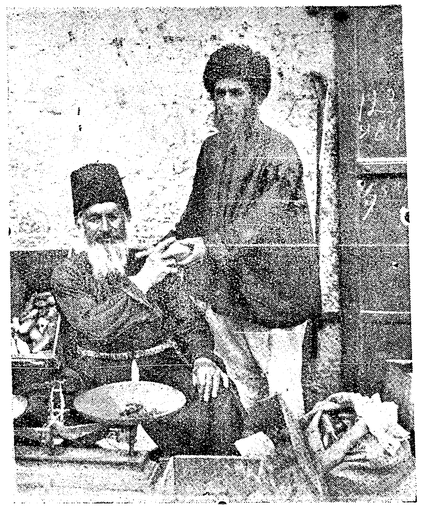

জেরুসালেমের ইহুদী

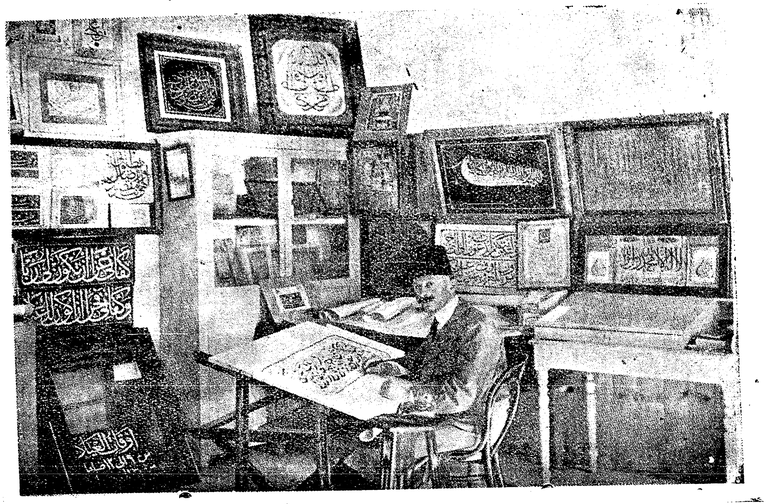

প্যালেষ্টাইনে মুসলমান শিল্পাগার



রাজপথে লিমনেড বিক্রেতা



ধর্ম্মযাজকের পদ-ধৌত-প্রথার উৎসব

ঘণ্টায় ৪ মাইল, আবার মোটরগাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় প্যালেষ্টাইনের পুলিস-প্রহরীকে অত্যন্ত সতর্কভাবে যান-বাহন ও পথ-চারীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। মোটর-গাড়ীর গতিশব্দ অথবা স্ত্রীপুংবিহীন শকটের ঘর্ঘর শব্দ মথিত করিয়া মেষ ও অজবৃন্দের গল-বিলম্বিত ঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতীচ্যের প্রভাব প্রাচ্যের ভাবধারাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারিলেও প্যালেষ্টাইনের নাগরিকগণ ক্রমশঃ প্রতীচ্য বেশভূষার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই দেশের মুসলমান ও ইহুদী মোটবাহীদিগের শারীরিক শক্তি সাধারণতঃ অত্যধিক। ইহারা ভারী বোঝা অনায়াসে বহন করিয়া থাকে। ৫ গ্যালন গ্যাসোলীন বোঝাই করিবার উপযুক্ত খালি ৫০টা টিন ইহারা পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া অনায়াসে পথ অতিবাহন করিয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপ সত্ত্বেও তাহারা পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম করে না। ইহাতে শুধু শারীরিক শক্তি নহে, বহন-কৌশলও পরিলক্ষিত হয়।

রাজপথে সোডা-লিমনেড লইয়া ফিরি-ওয়ালারা ঘুরিয়া থাকে। স্ব স্ব পানীয়ের প্রশংসাকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পিত্তলের পান-পাত্রগুলির ধ্বনি কি মধুর! মৃন্ময় অথবা কাচের আধারে পানীয় রক্ষিত থাকে, তাহার মুখের উপর এক এক খণ্ড বড় বরফ।

দামাস্‌কাস তোরণের কাছে বার্লি, গম প্রভৃতি শস্যের বাজার। বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐখানে শস্যের বাজার বসিয়া আসিতেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য মুখের কথায় স্থির হইয়া যায়; কিন্তু কখনও কেহ চুক্তিভঙ্গ করে না। গর্দ্দভ অথবা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শস্যসম্ভার বাহিত হইয়া বাজারে নীত হয়—এখানে মোটর-চালিত যানের প্রতিযোগিতা চলে না। মেজর এডওয়ার্ড কেথারাচ জেরুসালেমের ডেপুটী ডিষ্ট্রিক্ট-কমিশনার। তিনি পত্রান্তরে কোনও প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে একবার মোটরযান শস্যবহনের প্রতিযোগিতায় নামিয়াছিল; কিন্তু জেরুসালেমের শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদিগের সে প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

জেরুসালেমের নূতন অথবা পুরাতন সহরের প্রত্যেক গৃহস্থের ছাগল ও মেষ থাকে। অবশ্য সকলের ঘরে দলে দলে গৃহপালিত পশু নাই; কিন্তু এমন গৃহস্থ নাই—যাহার একটি ছাগল ও এক জোড়া ভেড়া নাই। এক জন প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ অথবা বালক প্রায় বিংশতি গৃহস্থের মেষাদি চরাই-বার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থ এ জন্য রাখা-লকে কিছু কিছু পারিশ্রমিক প্রদান করে। প্রত্যহ রাখালগণ মেষপাল লইয়া গোচারণ-ভূমিতে গমন করে এবং সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরাইয়া আনে।

প্যালেষ্টাইনে মেষপাল তাহাদের রাখালের অনুসরণ করে, ইহা প্রবাদবাক্য নহে। গ্রীষ্মের সায়াহ্নে—সূর্য্যাস্তের অব্য-বহিত পরে প্যালেষ্টাইনের পথে ধূলির ধ্বজা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, মেষপাল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, তাহাদের

ক্ষুদ্র ক্ষুরোত্থিত ধূলি ও পদ শব্দ সন্ধ্যার আকাশ মাধুর্য্যময় করিয়া তুলে। পরক্ষণে দেখা যায়, মেষপালক যষ্টি স্কন্ধে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, পশ্চাতে মেষপাল। কোন কোন রাখালের হস্তে বংশী—তাহা হইতে গ্রামে গ্রামে সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছে। অথবা কাহারও অঙ্কে সদ্যঃপ্রসূত মেষশাবক। জনাকীর্ণ হইলেও জেরুসালেমের প্রাচীরবেষ্টনের মধ্যে অসংখ্য মেষ অবস্থিতি করে।

বহুভাষাভাষী লোক স্মরণাতীতকাল হইতে জেরুসালেমে বাস করিতেছে। বিগত আদম সুমারীতে প্রকাশ পাইয়াছিল, জেরুসালেমে ২৯ প্রকার ভাষাভাষী লোক বিদ্যমান। কোন্ ভাষাভাষী কত লোক সে সময়ে জেরুসালেমে ছিল, তাহার একটি তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল :—

আ বি সি নী য়—৭২, আরব—২২,৩০৭, আর্ম্মেনীয়—২,৪৪২, বুলগেরীয়—২৯, সার্কেসিয়ান—৩, ডচ্—২, ইংরাজ—৯৮৬, ফরাসী—২৬১, জার্ম্মাণ—২৮১, জর্জ্জিয়ান্—৪, গ্রীক—৭৬০, বেদিয়া (জিপসি)—৭, হিব্রু—৩২, ৩৪১, ভারতীয়—৭৬৯, ইটালীয়—২০৯, ম্যাগিয়ার—৫৫, মাসটাসি—৪, পারসিক—১২২, পোলিস্—১০, পাষ্টো—৪, রুমানীয়—৩৬, রুস—৪০৭, সার্ভীয়—১৩, স্পানিয়ার্ড—১৭৫, সুদানী—৩৫, সুইডিস—১০, সিরিয়াস—৩৮, তুর্ক—১৯৮ এবং জেড্ডার—৯৯৯।

জেরুসালেমের প্রাচীন সহর প্রাচীরবেষ্টিত। রাজপথ গাড়ী অথবা মোটর-গাড়ীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। শুধু কয়েকটি রাজপথে তাহাদের গতিবিধির অনুমোদন আছে। কোন কোন পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, সে সকল পথে কোন প্রকার যান চলিতে পারে না। পথগুলি সমতল নহে—কোন কোন স্থানে সোপানাবলীর সমাবেশ আছে। পাহাড়ে উঠিবার যেরূপ সোপান, ঠিক সেই প্রকারের সিঁড়ি অধিকাংশ পথে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোনও উৎসবের সময় পথগুলি জনতায় পরিপূর্ণ হয়, গৃহের ছাদগুলি অসংখ্য নারী ও বালক-বালিকায় ভরিয়া যায়।

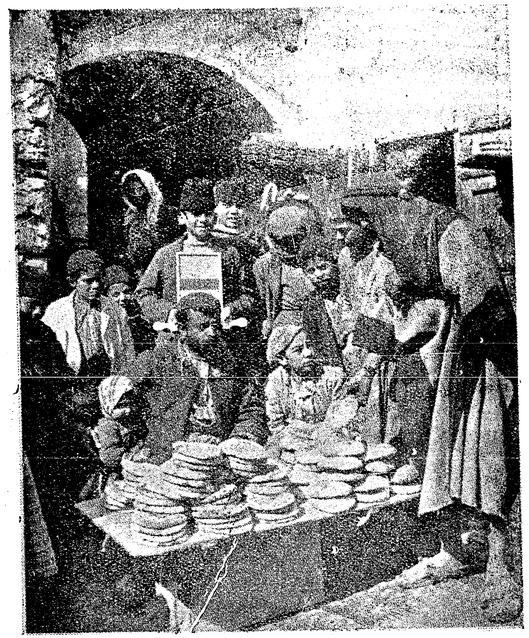

রুটীর দোকান

পুরাতন সহরের বাড়ীগুলি ঘন সংলগ্ন। বিগত ভূমিকম্পে ইহাদের অনেকগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতার তুলনায় প্যালেষ্টাইনের ক্ষতির পরিমাণ তেমন অধিক নহে।

ডেভিড ষ্ট্রীট বলিয়া যে রাজপথটি পরিচিত, তাহাকে সোপানশ্রেণী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সঙ্কীর্ণ পথে চলিবার সময় তীক্ষ্ণাগ্র যষ্টির সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। নহিলে পদস্খলনের সম্ভাবনা। পথটি অত্যন্ত পিচ্ছিল। এই পথে যখন বোঝাসহ গর্দ্দভসমূহ চলিতে থাকে, তখন পথচারীর পক্ষে পথাতিবাহন কষ্টকর হইয়া উঠে।

তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-মত জেরুসালেমে প্রচলিত থাকায়, স্ব স্ব ধর্ম্মাবলম্বীরা তিনটি বিভিন্ন দিনে বিশ্রাম করিয়া থাকে; কিন্তু নগরের এক দিনও বিশ্রামলাভ ঘটে না। সুতরাং

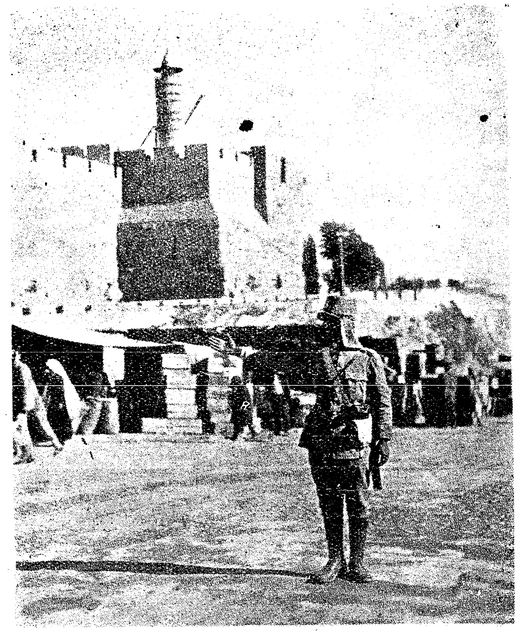

পুলিস-প্রহরী রাজপথে যানবাহন ও পথচারীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে

প্রত্যহই কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বীর দোকানগুলি পোলাই থাকে।

মুসলমান মহিলারা দুই প্রকার বহিরাবরণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। একটি আবরণ কটিদেশ হইতে বিলম্বিত হইয়া থাকে, অপরটি মস্তক ও স্কন্ধদেশকে আবৃত করিয়া রাখে। 'মান্দিল' বা অবগুণ্ঠন ললাট হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিলম্বিত, ইহাতে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত থাকে। এই অবগুণ্ঠন শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় বর্ণেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

দরিদ্র শ্রেণীর ইহুদী নারীরা এক প্রকার রুমাল মস্তকাবরণরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। উহার চারিপার্শ্ব লেস দিয়া সোনা। হঙ্গেরীয় ইহুদীগণ মখমলের 'দীর্ঘ আঙরাখা পরিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করে। তাহাদের মস্তকে টুপী—চূর্ণকুন্তলরাজি টুপীর ফাঁকে তাহাদের আননের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতে থাকে।

আরবদিগের পরিচ্ছদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পুরাতন, শততালিযুক্ত এবং মলিন হইলেও তাহাতে একটা মহিমা আছে। আরব-রমণীদিগের কেশরাজি কৃষ্ণবর্ণ। কাহারও কাহারও কেশ হেনা-রঞ্জিত। আরব-রমণীদিগের মুখ উল্কীর দ্বারা চিত্রিত। অন্যান্য মুসলমান-নারীদিগের ন্যায় ইহাদের আনন অবগুণ্ঠনাবৃত থাকে না।

প্যালেষ্টাইনের পল্লী-নারীরা কখনও মস্তক অনাবৃত রাখে না। কাহারও কাহারও শিরোদেশে অবগুণ্ঠনের নীচে এক-প্রকার টুপী থাকে, উহাতে ধাতুমুদ্রা ও অন্যবিধ অলঙ্কারের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই মুদ্রা ও অলঙ্কারসমন্বিত টুপীর ওজন প্রায় ৪ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

এতদঞ্চলের রৌপ্যকারগণ প্রায়ই ইহুদী। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া আরবদেশে গোঁড়া মুসলমান জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিয়াছিল। নানারূপে

প্রপীড়িত হইয়া ক্রমে তাহারা জর্দ্দান পার হইয়া জেরুসালেমে আসিয়া বসবাস করিতেছে। ইহাঁদের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য তেমন নাই।

প্যালেষ্টাইনে ঘানি ঘুরাইয়া তৈল নিষ্কাশিত হয়। হয়, উষ্ট্র অথবা অশ্বতরের চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া ঘানির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই ঘানি ভারতবর্ষের ঘানিগাছের মত নহে। একটি প্রস্তরখণ্ড অপর প্রস্তরখণ্ডের সহিত এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, ছিদ্রপথে বীজ ফেলিয়া দিলে তাহা পিষ্ট হইয়া তৈল নির্গত হয়। অনেকটা ভারতবর্ষের যাঁতার মত।

শনির দৃষ্টি হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্যালেষ্টাইনে ত্রিকোণাকার স্ফটিক বিক্রীত হয়। তাহার সঙ্গে নীলবর্ণের কাচের পুঁতি একটি কাষ্ঠফলকে বসাইয়া শিশুর অঙ্গে পরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

জুডীয় উচ্চভূমির উপর জেরুসালেম অবস্থিত বলিয়া এখানে চিরদিনই জলকষ্ট আছে। কিড্রন্ উপত্যকাভূমিতে মাত্র একটি নির্ঝর বিদ্যমান, ইহা হইতেই সহরের জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

নগরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, পূর্ব্বে ইহার জল-সরবরাহের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিবে না। চৌবাচ্চায় বর্ষার জল অনেকে ধরিয়া রাখিত। জেরুসালেমে সৈন্যসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রাচীন হেরোডিয়ান্ চৌবাচ্চার সংস্কারসাধন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে জল

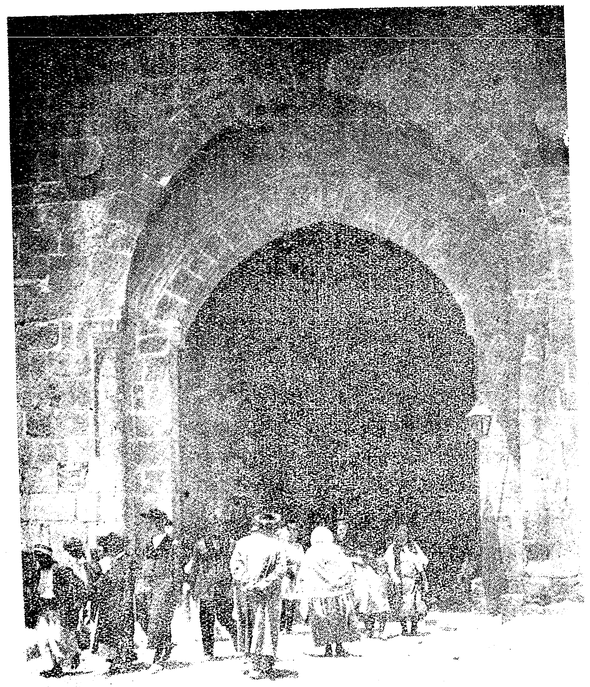

দামস্কসের তোরণ



ধর্ম্মমন্দির-প্রাঙ্গণে মুসলমান শোভাযাত্রা

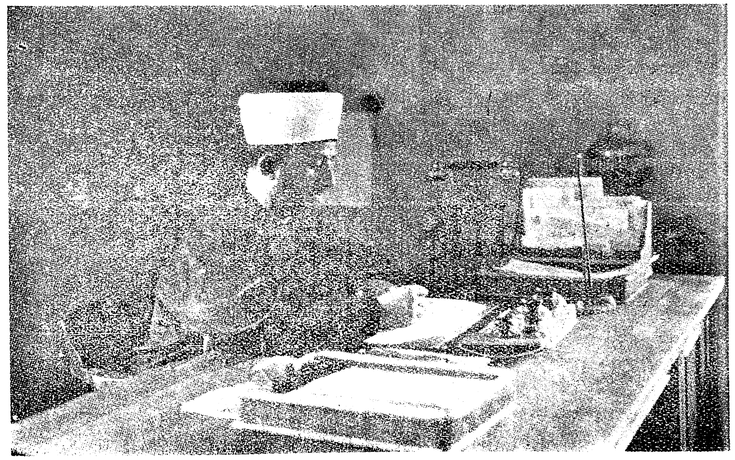

মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান নেতা হজ আমিন্ আল-হুসেনি

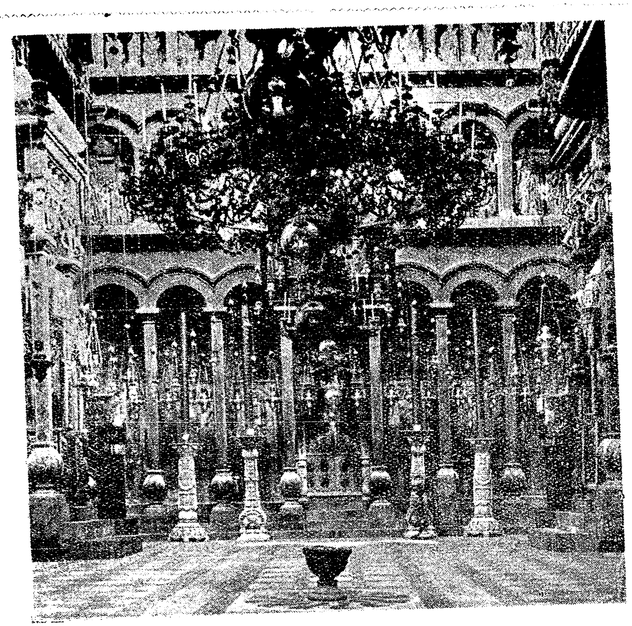

গ্রীক-ধর্ম্মমন্দিরের একাংশ

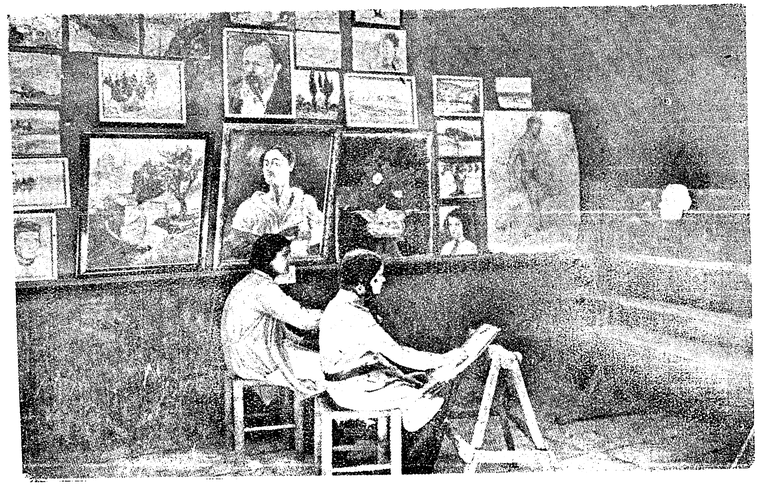

ইহুদী যুবক-শিল্পী

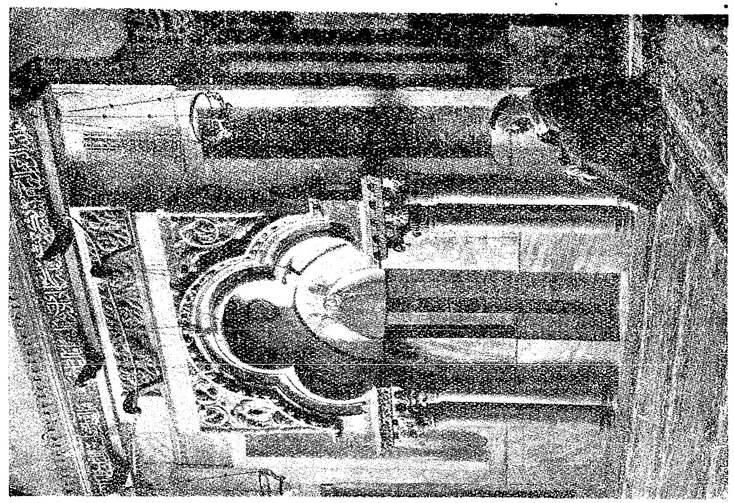

এল-আক্সার মস্‌জেদের একাংশ

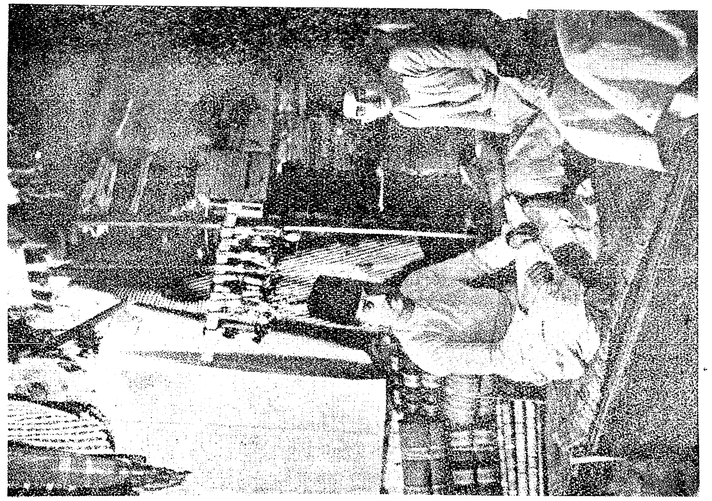

জেরুসালেমের দোকান

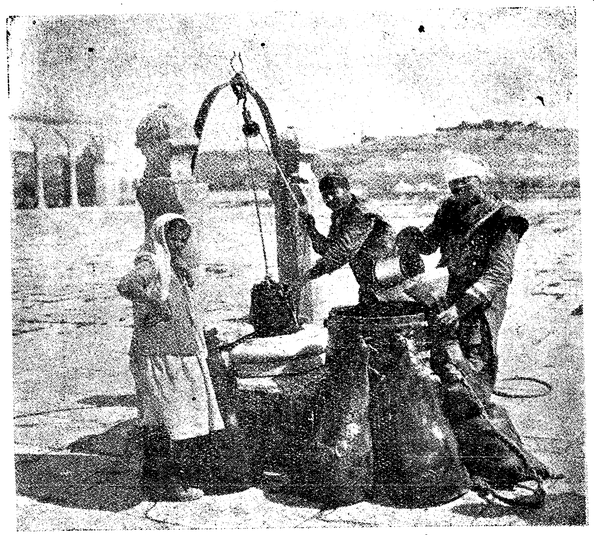

আচ্ছাদিত জলাশয় হইতে জল উত্তোলন

ভরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। অধুনা, আরও তিনটি প্রস্তরনির্ম্মিত পুষ্করিণী বেথেলহেমের কাছে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে ৪ কোটি গ্যালন জল রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর হস্তে এই সকল পুষ্করিণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত।

উল্লিখিত জলাশয়গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাস নির্ব্বাক্। কথিত আছে, রাজা সলোমানের সময় ঐ সকল পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়াছিল। জোসেফসের বর্ণনানুসারে সম্ভবতঃ পন্টিয়স্ পাইলেট উহাদের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন।

নির্ঝর হইতে উৎসারিত জলধারা পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণের ফলে এই সকল জলাশয়ে আসিয়া পড়িত। এখন ইংরাজ সেনাবিভাগের তত্ত্বাবধানে পম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বারিপাত কম হওয়ায় উল্লিখিত জলাশয়গুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু পরবৎসর পাঁচ দিন-ব্যাপী ধারাপাতে পুষ্করিণীগুলি কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়। রোমক যুগের পর এমন ভাবে পূর্ব্বে কখনও জলাশয়গুলি পরিপূর্ণ হয় নাই।

যে সকল নগরে মানুষ জলের প্রাচুর্য্য উপভোগ করিয়া থাকে, তাহারা বুঝিতে পারিবে না, জেরুসালেমে জলকষ্ট কিরূপ কঠোর।

জেরুসালেমে তিনটি বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের শাখা-উপশাখা বিদ্যমান। কিন্তু কাহারও উৎসবে বা ধর্ম্মব্যাপারে কেহ হস্তক্ষেপ করে না। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিগণের

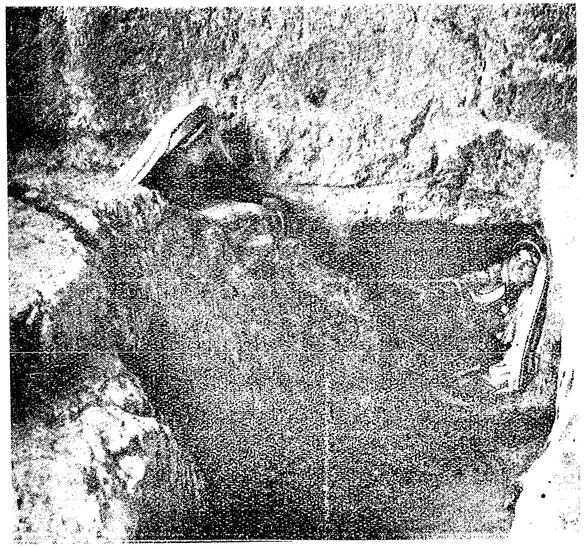

রাজ-সমাধির প্রবেশপথ—রাণী হেলেনা এইখানেই সমাহিতা আছেন

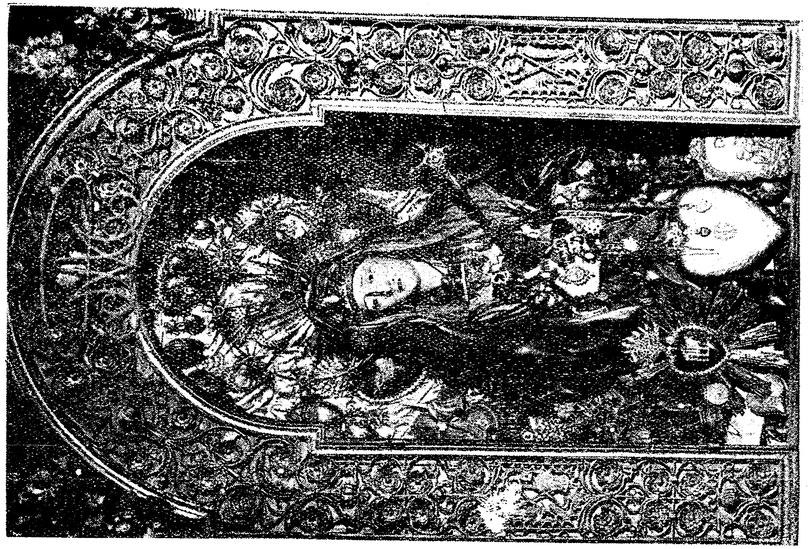

জেরুসালেমে মেরীর প্রতিমূর্ত্তি



উষ্ট্র দাদি চালিতেছে



সোপানাবলী-সমন্বিত রাজপথ

মধ্যে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, বোখারা, আরব এবং সুদানের লোক আছে; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক রহিয়াছে; তন্মধ্যে পোপের মতবাদপুষ্ট লোকেরও অভাব নাই; তার পর ইহুদীরা রহিয়াছে—তাহাদের মধ্যে কত বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের সমবায়। কিন্তু জেরুসালেমবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরের ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে; তাহারা সে বিষয়ে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্ম্মের উৎসবকালে আপনাদের চিরাচরিত প্রথা বিনা বিসম্বাদে প্রতিপালন করিয়া থাকে।

জর্দ্দানের উপত্যকাভূমিতে নেবিমুসায় ধর্ম্মপ্রচারক মোসেস্-এর সমাধি বিদ্যমান। মুসলমান তীর্থযাত্রিগণ প্রতি বৎসর তথায় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য গমন করিয়া থাকে। 'পতাকা-সমর্পণ'রূপ উৎসবব্যাপারের অনুষ্ঠানটি অতি চমৎকার। মন্দির-প্রাঙ্গণে যাত্রিগণ সমবেত হইবার পূর্ব্বে সবুজ রেশমের কারুকার্য্যখচিত, স্বর্ণাঙ্কিত পতাকা ডেপুটী ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনারের আপিসে নীত হয়। বেলা ৯টার সময় কর্ত্তৃপক্ষ পতাকাগুলি বাহকগণের হস্তে সমর্পণ করেন। কিম্বদন্তী অনুসারে যাহারা এই পতাকা বহনের অধিকার পাইয়া আসিয়াছে, তাহারাই উহা লইয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করে। পতাকা সমর্পণের পরই প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ ইমাম্ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলে পতাকাসহ শোভাযাত্রা দামাস্কাস্ তোরণের ভিতর দিয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

অপরাহ্ণকালে 'গ্রাণ্ড মুফতি' ধর্ম্মমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে নির্গত হইয়া সেণ্টষ্টিফেন তোরণের পথে আরবী-ঘোড়ায় চড়িয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। দেশবিদেশ হইতে যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী তীর্থ করিতে আসিয়া থাকে, তাহারা তাঁহাকে

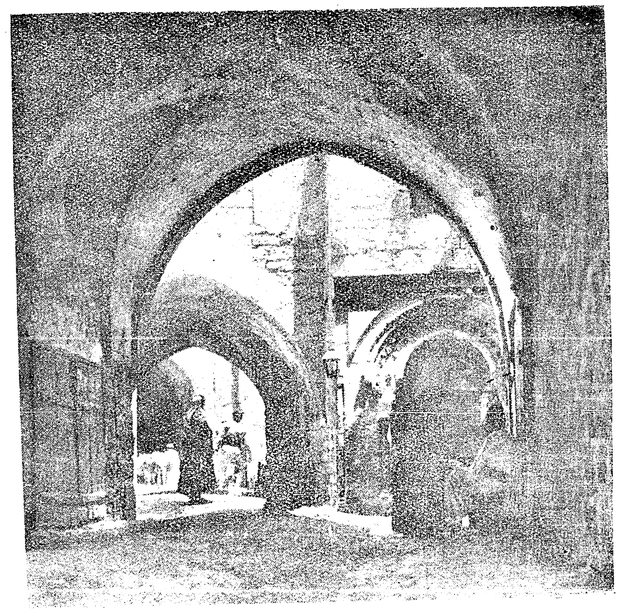

জেরুসালেমের এক উপাসনাগৃহ



খৃষ্টের সমাধির একাংশ

বেষ্টন করিয়া চলিতে থাকে। মেজর কিথ্ রোচ লিখিয়াছেন, "এই সময়ে ধর্ম্মমন্দির-প্রাঙ্গণে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, তাহাতে যে কোনও দর্শককে অভিভূত হইতেই হইবে। তাঁহার সম্মুখে পবিত্র মোরিয়া গিরি—শত শত ধর্ম্মমন্দিরের ভিত্তিভূমি। ৩ হাজার বৎসরের সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। এই তীর্থক্ষেত্রে কত অসংখ্য ভক্তের নিবেদিত অর্ঘ্যভার স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে!"

বাইবেলে এই তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। আব্রাহাম্ তদীয় পুত্রকে মোরিয়ায় আনিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই গিরি-শিরে ডেভিড মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করেন। খৃষ্ট-জন্মের ১ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র সলোমন এইখানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ৪ শত বৎসর পরে বাবিলোনীয়গণ উক্ত মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহুদীদিগকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে হেরড্ সলোমনের নির্ম্মিত মন্দির অপেক্ষা সুবৃহৎ ও কারুকার্য্যক্ষোদিত মন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। খৃষ্টের সময়কাল পর্য্যন্ত হেরড্-নির্ম্মিত মন্দির বিদ্যমান ছিল। তথায় খৃষ্টের জীবনের নানা ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ৭০ খৃষ্টাব্দে টাইটস্ জেরুসালেম অবরোধ করেন। তাঁহার সময়েই উক্ত মন্দির সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

উল্লিখিত ঘটনার ৬০ বৎসর পরে রোমের মূর্ত্তি-উপাসক সম্রাট হাড্রিয়ান উক্ত মন্দিরের সংলগ্ন সমুদয় স্থান লাঙ্গল দিয়া চষিয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, সমগ্র ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া তথায় লবণ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উল্লিখিত স্থানের প্রতি পাছে ইহুদীদিগের মনে কোনও প্রকার ভক্তির অবশেষ থাকে, এই জন্য হাড্রিয়ান তথায় জুপিটারের উদ্দেশে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার পূর্ব্বভাগে নিজের একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ২৭৭ খৃষ্টাব্দে উহারাও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বাইজান্তীয় সম্রাট জষ্টিনিয়ান্ পাহাড়ের উপর একটি খৃষ্টান ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানগণ জেরুসালেম অধিকার করে। নগর, প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা মন্দির-সংলগ্ন সমুদয় ক্ষেত্র প্রাচীর-বেষ্টনের অন্তর্গত করিয়া লয়। তাহারা পবিত্র পাহাড়ের উপর একটি মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন সন্নিবিষ্ট করে। মসজেদের চারিপার্শ্বে সারাসান-স্থাপত্য-সমন্বিত হর্ম্ম্যমালাও বিনির্ম্মিত হয়। সেই মস্‌জেদ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রাচ্য স্থপতিশিল্পের এই বিচিত্র নিদর্শন জগতের

গৌরবস্বরূপ। এমন সুদৃশ্য হর্ম্ম্য পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহস্থল। এই মসজেদ অষ্টভুজ আকারে গঠিত, ইহার ছাদ সমতল। ঠিক মধ্য স্থলে একটি সুন্দর গম্বুজ। উহার উচ্চতা ৯৮ ফুট। খলিফা আবদ্-এল্-মালেক্ উক্ত মসজেদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাকে ভ্রমক্রমে ওমরের মসজেদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ওমর নামক জনৈক খলিফা ছিলেন।

আরবী ভাষায় এই মস্‌জেদের নাম 'কুব্বেৎ এস্-সাখ্‌রা' বা পাহাড়ী গম্বুজ এবং 'হারাম এস্-সেরিফ্।' মুসলমানগণের বিশ্বাস, এইখান হইতে হজরৎ মহম্মদ তাঁহার মানব-মুখাকৃতি অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগে খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধৃগণ এই নগর অধিকার করিয়া প্রায় এক শত বৎসর তথায় খৃষ্টান শাসন প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত চিহ্নের পরিবর্ত্তে ক্রুশচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল। সালাদিন কর্ত্তৃক চালিত আরবগণ পুনরায় জেরুসালেম জয় করে। আবার অর্দ্ধচন্দ্র ক্রুশচিহ্নের পরিবর্ত্তে হর্ম্ম্যশিরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

জেরুসালেমে বর্ত্তমানে প্রত্যেক ধর্ম্ম-বিশ্বাসীর স্বতন্ত্র মন্দির বা মসজেদ আছে। ধর্ম্মমন্দিরগুলি যেখানে অবস্থিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে যীশুখৃষ্টের একটি সমাধি-মন্দির। অধিকাংশ গৃহই ১৮১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নির্ম্মিত নহে। অপরাংশে গোঁড়া বিশ্বাসীদিগের ধর্ম্মমন্দির সমূহ বিদ্যমান। দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত মন্দির এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রাত্রির যাত্রী

হে পথিক—অন্ধকারে যায় না কি দেখা
ক্ষীণালোক—রেখা ?
মেঘ-ফাঁকে তারকার আঁখি বুঝি জাগে—
তিমির-রাত্রির যাত্রি, তোর আঁখি-আগে ;
ও কি শুক-তারা ?—
নহে, নহে, ওরে মূঢ়, এখনই হ'লি আত্মহারা !
যাম-ঘোষ ঘোষিল না প্রহর-কাঁসর,
এখনও পূর্ব্বাকাশ হ'ল না ধূসর,
বিহঙ্গম-বৈতালিকগণ
মৌনবাক—নিদ্রা-নিমগন,
ধীরে, বন্ধু, ধীরে,—
হে দুর্গম পথচারি, দুর্দ্দিনের পিচ্ছিল তিমিরে
চল' সন্তর্পণে,
দৃঢ় পদার্পণে।
ধীরে. ধীরে,—ওরে শ্রান্ত, ধীরে,
এই দুঃখ-সমুদ্রের সঙ্গী-হীন শূন্য তীরে তীরে
চল' শান্ত, চল' ধীর,
চল' হে নির্ভীক,—
উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পান্থ হারায়ো না দিক !
চিত্তে শুধু রাখো আশা. রাখো দৃঢ় পণ,
এ দুর্য্যোগ নিত্য নহে, মিথ্যা এই নৈশ দুঃস্বপন,
এই দীর্ঘ তামসীর দূর পরপ্পারে,
এক দিন উত্তরিবে প্রভাতের দ্বারে
শরতের সমারোহে,—সুবর্ণ-উৎসবে,
বর্ষা-শেষ মেঘ-হীন
অ-মলিন আলোক-বিভবে
তোর যাত্রা, তোর দুঃখ সেই দিন হবে ধন্য হবে ;
সেই দিন অশ্রু-ধৌত ঐ তোর বুকের তলায়
যে সুখ-শেফালিরাশি ঝরিয়া ভরিবে চুপে ব্যথার ধূলায়,
সেই শুভ্র সুখে রচি' যুগল অঞ্জলি,
ভাগ্য-দেবতার পায় অর্ঘ্য তুই দিস্ এই বলি',—
"হে অ-দৃষ্ট, হে ভীষণ, নির্ম্মম, সুন্দর,
তব তরবারি মোর ফুল হয়ে ছেয়েছে অন্তর ;
দংশেছে আমারে সেই ফণী,—
মৃত্যুর মাঝারে গিয়া হরিয়াছ আমি তার মস্তকের অ-মৃতের মণি
ক্ষয় মোরে অক্ষয় করেছে, ভয় মোরে করেছে নির্ভয়,
হে রহস্য-রাজ্যের রাজন্,—হে অ-দৃষ্ট জয় ! তব জয় !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।



রূপসী পল্লীবাসিনী

(গল্প)

২

ডাক্তার হইয়া নানা লোকের পরামর্শে বিমল আজ এ-ডিস্‌পেন্সারী কাল ও-ডিস্‌পেন্সারী ঘুরিয়া পুরা একটা বছর কাটাইয়া দিল, কিন্তু অর্থাগমের কোনো সুবিধাই কোনো দিক্ দিয়া ঘটিয়া উঠিল না। বিরক্ত হইয়া একটা চাকুরীর সন্ধানে মেডিকেল কলেজে ছুটাছুটি করিয়া যখন সে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন সহসা বন্ধু প্রমথ আসিয়া কহিল,—ওহে বিমল, আমি একটা ডিস্‌পেন্সারী খুলেছি বালিগঞ্জে।

বিমল প্রমথর মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

প্রমথ কহিল,—তুমি ত এ-দিক্‌কার ডিস্‌পেন্সারিতে ঢের ঘুরলে, সুবিধাও কিছু হলো না,—তা, বালিগঞ্জে আমার ডিস্‌পেন্সারীতে দু'বেলা কিছু দিন বসে থাকো না !

বিমল কহিল,—আমি ত ডিস্‌পেন্সারীর নেশা কাটিয়ে চাকরির পিছনে ঘুরছি।

প্রমথ কহিল,—মানে, বালিগঞ্জটা একবার ভাখো হে··· ও-দিকে বিস্তর পয়সাওয়ালা লোকের বাস, ডাক্তারও কম,—তা ছাড়া ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীমের ফলে নতুন লোক্যালিটির সৃষ্টি হয়েছে—ও-দিক্‌টায় আশা বিলক্ষণ। তা ছাড়া তুমি বাঙ্গালী-পাড়ায় বসেছ এ্যাদ্দিন। তার কুফলও আছে বিস্তর। অর্থাৎ—আমরা ভাই, ফাঁকি দিয়ে যতটা কায যার কাছ থেকে আদায় করতে পারি, এই মন্ত্রের উপাসক কি না, কাযেই বাঙ্গালীপাড়ায় পয়সার দেখা পাওনি ! তা ছাড়া ও-ধারে চেনা-শোনা লোক—তাঁদের এমনি স্বভাব যে, পয়সা যতক্ষণ দিতে না হয়, ততক্ষণই আলাপ-ঘুটুস্বিতার দোহাই পেড়ে নতুন ডাক্তারের পিছনে ঘোরাফেরা করেন সব, পয়সা দেবার বেলায় অন্য ডাক্তারের দোরে ছোটেন···এই সব কারণেই ও-ধারে সুবিধা করতে পারোনি···তা, বালিগঞ্জে একবার···

বিমল হাসিয়া কহিল,—বেশ, যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন —এমনি তো বাজে ঘুরে মরছি, এ তবু বালিগঞ্জের হাওয়া খাওয়া যাবে।

প্রমথ কহিল,—তা হ'লে কাল থেকেই···কি বল ? শুভস্য শীঘ্রং···আমিও বিশেষ চেষ্টায় থাকবো···

বিমল কহিল—বহুৎ আচ্ছা !

নিমেষেই কথা পাকা হইয়া গেল। বিমল কহিল,—কাল সকাল থেকেই বসবো, তা হ'লে ঠিকানাটা ?

প্রমথ কহিল—৭ নম্বর পার্কার রোড, মানে, একদালিয়া রোডের গায়েই একেবারে, আর গড়িয়াহাট রোড থেকে পাঁচ মিনিটের পথ···ওখানটায় অনেক নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে···মস্ত কলোনি গড়ে উঠছে। আমার ডিস্‌পেন্সারীর নাম সবার্ব্বন মেডিকেল হল। কালই সকালে আসবো তা হ'লে ?

বিমল কহিল,—তুমিই তো বললে, শুভস্য শীঘ্রং। চাকরীর জন্য আর খোসামুদি করেও ঘুরতে পারছি না···simply abominable !

প্রমথ কহিল—বিজ্ঞাপনের ঘটা মোদ্দা একটু চাই···তা আমার ও আর্ট জানা আছে···আমি ও-দিকটা দেখবো···তুমি স্রেফ punctually হাজ্‌রে দিয়ে যেয়ো···ওষুধ বিক্রী হবে, তার কমিশন ভালো রকমই পাবে—আর ডিস্‌পেন্সারিটি বেশ বড় আর fit up করেছি একেবারে চমৎকার রকমে ! দেখে খুসী হবে।

প্রমথ বিদায় লইল। বিমল ভাবিল, বালিগঞ্জটা এবার দেখা যাক। লাগে তুক্, না লাগে তাক্ !

বিমলের বাপ অনেক পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর ছিল কাঠের কারবার। তাঁর মৃত্যুর পর কাঠের কারবার বেচিয়া দিয়া বিমল বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। ছোট পরিবার। বিধবা মা আর তরুণী পত্নী চারুপ্রতিভা—কাযেই

ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য দীর্ঘকাল পরখ করার অবসর ও সুযোগও তার অপরিসীম।

২

প্রমথর কথামত পরদিন সকালে মোটরে করিয়া বালিগঞ্জের ৭ নম্বর পার্কার রোডে বিমল হাজিরা দিল। প্রমথ তখন লোক ডাকাইয়া নেম্-প্লেটের মুশাবিদা করিতেছিল। বিমলকে দেখিয়া প্রমথ কহিল—লিখে দিচ্ছি, Specialist in diseases of the brain, female diseases and in treatment of infants. এই অবধি বলিয়া সে থামিল, তারপর একটু হাসিয়া পরক্ষণে কহিল,—বড় লোকের মাথার রোগটা প্রায়ই ধরে···আর বাড়ীর মেয়ে-ছেলের নানান্ উপসর্গও আছে, অর্থাৎ এই দুটো লাইনে অনেক কথাই বলা হলো। নয় কি?

বিমল হাসিল; হাসিয়া কহিল—একেবারে একটা বড় হাঁসপাতালের সব কটা ডিপার্টমেণ্ট খুলে দিলে···

প্রমথ কহিল—ওহে এই advertisementই হলো এ-কালের লক্ষ্মীর বাহন! ও পুরোনো কদর্য্য প্যাঁচাটার পেন্‌সন হ'য়ে গেছে!

বিমল কহিল—বেশ, ও-বারটায় আমার নজর দেবার প্রয়োজন নেই···আমার কাছে স্রেফ রোগী ধ'রে আনো।···

প্রমথ কহিল—উপস্থিত দু'জন হাজির রয়েছে। এক জন মিটার সাহেবের বাড়ীর দরোয়ান, আর একটি ফিশার সাহেবের মেমের আয়া।

বিমল কহিল—এদের নিয়েই গোড়াপত্তন!

প্রমথ কহিল—বড়লোকগুলো প্রথমটা নতুন ডাক্তারের হাতে নিজেদের সমর্পণ করতে একটু দ্বিধা বোধ করে··· প্রথমটা পরখ করে ঐ চাকর-দাসী দিয়ে···তা ভাই, ওরা advertising medium খুব ভালো। যদি দুটো মিষ্টি কথা কও, তা হলে ওরা গিয়ে বাড়ীতে মনিবের কাছে বলবে, ডাক্তারটি ভারী ভালো, বড় যত্ন নেন্। আর, এই কথাগুলো কালে ফলপ্রদ হয়। আমার দু-তিনটে দৃষ্টান্ত জানা আছে। ঐ চোরবাগানের নগেন বাবু·· দু-একটা বড় পরিবারে ঐ দাসী-চাকরদের চিকিৎসা থেকে সুরু করে ক্রমে তাঁদের বাড়ী একেবারে পুরা-দস্তুর তিনি দখল ক'রে বসেছেন। তাঁর আসন এমন কায়েমি যে, সেখানে কোনো বহিঃশত্রুর প্রবেশ একেবারে অসম্ভব! কথাটা বলিয়া প্রমথ আবার হাসিল।

বিমল কহিল—যাক্, তোমার ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে তুমি থাকো, আমি যাই দরোয়ান-মহারাজ আর আয়া দেবীকে দেখে তাঁদের দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করি গে···মিষ্টি কথা ত? তা এই সকালে প্রচুর সঞ্চিত আছে আমার প্রাণে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো···

প্রমথ কহিল,—ওষুধের দাম এদের বেলায় একটু কম করো, তবে রোগ তেমন না থাকলেও ওষুধ দিও। ওতে রোগীর মন প্রসন্ন থাকে, আর দাওয়াইখানারও প্রসন্নতা কাযেই অবশ্যম্ভাবী।

বিমল কহিল—সে শিক্ষা আমার হয়েছে হে···এক বছরে ওটা শিখেছি ভালো রকমই।

৩

দু'তিন মাসেই ফল পাওয়া গেল। বড় বাড়ীগুলার দাসী-চাকরকে অবলম্বন করিয়া ছেলেদের খোসপাঁচড়া ফোড়া প্রভৃতি দেখিবার অধিকার বিমলের মিলিতে লাগিল। তাহা হইতে বধূদের জ্বর, গৃহিণীর বাত, কর্ত্তার মাথা ঘোরা ও অগ্নিমান্দ্য···ঔষধগুলা ফলিয়া বালিগঞ্জ মহল্লায় বিমলের হাত-যশের একটা খ্যাতিও রটনা করিল। ছ'মাস পরে সাবেক ফোর্ডকার বেচিয়া নূতন ফীয়াট্ কিনিয়া বিমল বালিগঞ্জে আপনার পসার-প্রতিপত্তির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করিল না; এবং আরও ছ'মাস পরে এমন হইল যে, বিমল ভাবিল, বিডন ষ্ট্রীট ছাড়িয়া এইধারেই কোথাও একটা বাংলো ভাড়া করিয়া আস্তানা পাতিবে কি না!

অভিপ্রায় শুনিয়া প্রমথ কহিল—না, না, রোগীর এত কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়, বেশী সুলভ হওয়াটা ব্যবসার দিক দিয়ে ক্ষতিকর। মনে করলেই যে ডাক্তারকে হাতের নাগালে পাওয়া যায়, তার উপর রোগীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে দর ক'মে আসে···এ টেলিফোন ক'রে ডাক্তারকে আনতে হবে—তাঁর জন্য এই যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকা, এতে ফীটা আদায় হয় চটপট এবং সে ফীয়ের হার বর্দ্ধিত করাও সহজ হয়।

বিমল কহিল—বেশ, তা হ'লে এ-দিকে পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। তবে বাড়ী ফেরার সময়টা এমন অনির্দ্দিষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত রক্ত-রাঙা হয়ে ওঠে।···

প্রমথ কহিল—হীরা-মুক্তার অলঙ্কারে ওই বাড়তি রাঙা রঙটুকু শুভ্রোজ্জ্বল করে দাও···

বিমল কহিল—ঠিক বলেছো!···

আরো ছয় মাস কাটিয়া গেল। রোগীর সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে ফীয়ের হার বর্দ্ধিত করিয়াও তার মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল···

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে—বিমল গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বেয়ারা একখানা কার্ড লইয়া হাসিয়া উপস্থিত। কার্ডখানা হাতে লইয়া বিমল পড়িয়া দেখে, কার্ডখানায় বিশেষত্ব আছে—বাঙ্গলা হরফে নাম লেখা এবং নামটি এক বঙ্গ-মহিলার···কার্ডে লেখা আছে—

শ্রীমতী বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী

বিমল স্তম্ভিত! এই দিবা দ্বিপ্রহরে বিদ্যুজ্জ্যোতির আবির্ভাব! বালিগঞ্জে আসিয়া বড়-মানুষীর বহু মূর্ত্তির সঙ্গে তার পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু আজ যে-বেশে···

বেয়ারা কহিল,—ইনি দেখা করতে চান্ এখনই—জরুরী পরামর্শ আছে···

বিমল কহিল,—নিয়ে আয় এখানে।

বেয়ারা চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিল, তার সঙ্গে নব্য-কেতায় শাড়ী-পরা এক তন্বঙ্গী মহিলা। পরিপাটী স্নো, ফরসা রঙ, তার উপর পরণে চাঁপাফুল-রঙের ফুলদার সরু পাড়ের শাড়ী, সেই কাপড়েরই ব্লাউজ, পায় নীল ভেলভেটের নাগরা জুতা। বিমল সসম্ভ্রমে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁকে বসাইল।

শ্রীমতী বিদ্যুজ্জ্যোতি একটু চঞ্চল উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন—একটু বিপন্ন হয়ে আপনার কাছে এসেছি···

বিমলের মনে হইল, বলে, বিপন্ন হইয়াই মানুষ তার কাছে আসে···নহিলে প্রয়োজনই বা কি এখানে আসিবার? কিন্তু সে কথা মুখে ফুটিল না।

শ্রীমতী বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—অর্থাৎ আমার স্বামী··· তিনি পল্লীগ্রামের এক জমীদার—ভারী জোয়ান মানুষ, তাঁর নিউমোনিয়ার ব্যামো, ক'মাস দেশে চিকিৎসা হয়েছিল, তা কোনও ফল হলো না, এখানে তাঁকে নিয়ে এসেছি। আমরা আছি কালীপুরে ল্যান্সডাউন রোডে···

বিমল কহিল—আমায় যেতে হবে···?

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল! যাওয়া হবার উপায় নেই···কথাটা বলিয়া তিনি নিরুপায় হতাশভাবে খোলা জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

বিমল কহিল,—তা হ'লে···বলুন, কি করতে হবে?

বিদ্যুজ্জ্যোতি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—একটু বুঝে···মানে, তা হ'লে আপনাকে সব কথা বলতে হয়··· আপনার শোনবার সময় হবে?

বিমল কহিল—সময় আমার এই জন্যই ত···

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—ওঁর মাথার অসুখটা কি রকম, জানেন? সকলকে উনি সন্দেহের চক্ষে দেখেন···সকলে যেন ওঁর যথাসর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিচ্ছে, ঠকিয়ে নিচ্ছে, এমনি। ডাক্তার দেখালে বলবেন, বিষ খাওয়াবে বুঝি! ডাক্তারকে একেবারে মারতে উঠবেন! কাযেই আপনাকে নিয়ে যেতে পারছি না। এখানে তাঁকে আনতে চাই··· আপনি দেখে ব্যবস্থা করবেন। তাও তাঁকে জানতে দেওয়া হবে না যে, আপনি ওঁর চিকিৎসা করছেন! এমনি, বন্ধুভাবে। তার পর মাঝে মাঝে তিনি মানুষ চিনতে পারেন না—আমি কিছু খাবার তৈরী ক'রে দিতে গেলে পিছিয়ে যান—বলেন, আপনি কে? অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাকেও চিনতে পারেন না—কি এ ট্রাজেডি···বলুন ত··· আমি যেন জীবন্মৃত হয়ে আছি···আমার এক দণ্ড বাঁচবার সাধ নেই।—কথার শেষে বিদ্যুজ্জ্যোতির দুই চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

বিমল কহিল—বেশ, ও-বেলায় তাঁকে আনতে পারবেন?

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—কিন্তু ডিস্‌পেন্সারি ব'লে বুঝতে পারলে যদি গোল করেন? আমি মহাবিপদে পড়েছি, ডক্টর ব্যানার্জী···

বিমল কহিল—তা এক কায করা যেতে পারে···আমার ডিস্‌পেন্সারীর আর একটি দরজা আছে···ও দিকে···সেই দোর দিয়ে এনে আমার এই খাসকামরায় তাঁকে বসালে তিনি চট করে বুঝতে পারবেন না, যে, এটা ডিস্‌পেন্সারী···

বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী গলদশ্রুনেত্রে কহিলেন—ওঃ, তা যদি করেন, ডক্টর ব্যানার্জী, তা হ'লে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কি দুঃখে যে আমার দিন কাটছে···পয়সা-কড়ি, দাস-দাসী কিছু চাই নে আমি, আপনি দয়া ক'রে আমার স্বামীকে ভালো ক'রে দিন···

বিমল কহিল—বেশ, তাঁকে দেখি আগে···আপনি কেন

ব্যস্ত হচ্ছেন আগে থেকেই। আজই বিকেলে তাঁকে নিয়ে আসুন।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—আর একটু নিবেদন আছে···

বিমল কহিল—বলুন···

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—মানে, আপনি বিকেলে এখানে আসেন বেলা চারটেয় ?

বিমল কহিল—হাঁ।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—তখন অনেক রোগী থাকে—তা বেলা তিনটেয় যদি দয়া ক'রে দেখবার ব্যবস্থা করেন···

বিমল কহিল—তা বেশ, তাই হবে। আমি বেলা আড়াইটেয় এখানে এসে অপেক্ষা করবো, আপনি তাঁকে তিনটের সময় নিয়ে আসবেন।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—আঃ, আমায় কিনে রাখলেন, ডক্টর ব্যানার্জী···অশেষ ধন্যবাদ!···তা···আপাততঃ···এই টুকু—বলিয়া বিদ্যুজ্জ্যোতি তাঁর হাতের ব্যাগ খুলিয়া তাহা হইতে টাকা লইয়া বিমলের সামনে টেবলের উপর রাখিলেন—চৌত্রিশ টাকা·· টাকা রাখিয়া কহিলেন—এই ফীয়ে হবে ?

বিমল কহিল—আমি এখানে ফী নিই না···

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—না, এটা দয়া ক'রে নিতে হবে। না হলে বড় দুঃখিত হবো। আরও ষোল টাকা সে সময় দেবো···তার পর বরং চৌত্রিশ করেই নেবেন···পয়সা আছে আমার, কেন দেবো না ?···আপনার ত এই ব্যবসা···

বিমলের সমস্ত শিরায় শিরায় রক্ত চন্‌মন্ করিয়া উঠিল। ডিস্‌পেন্সারীতে বসিয়া একটা খেয়ালী রোগী দেখিয়া নগদ চৌত্রিশ টাকা! সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বিদ্যুজ্জ্যোতির পানে চাহিল, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী. ইনি ত বিদ্যুজ্জ্যোতি নন, স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী আজ তার দাওয়াইখানায় আসিয়া ঝাঁপি খুলিয়া ধরিয়াছেন!···

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—তা হ'লে এখন উঠি···অনেক বিরক্ত করলুম···মাপ করবেন—

বিমল কহিল—না, না, ও কি বলছেন···আমার বহু ধন্যবাদ···

বিদ্যুজ্জ্যোতি অধরকোণে হাসির মৃদু বিদ্যুৎ ফুটাইয়া কহিলেন—তা হ'লে নমস্কার···

বিমল কহিল—নমস্কার, নমস্কার!

বিদ্যুজ্জ্যোতি উঠিলেন, বিমল তাঁর সঙ্গে আসিয়া তাঁকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। পথে একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল, বিদ্যুজ্জ্যোতি ট্যাক্সিতে চড়িয়া বিমলের পানে চাহিয়া হাত তুলিয়া ছোট একটু নমস্কার করিলেন, মুখে হাসির সেই মৃদু বিদ্যুৎ···বিমলও নমস্কার করিয়া হাসিয়া সে-হাসির জ্যোতির জবাব দিল। তার পর ট্যাক্সি চলিয়া গেলে সে নিজের খাস-কামরায় আসিয়া প্রবেশ করিল।

এত বড় জমীদার মক্কেল আসিতেছে—পঞ্চাশ টাকা ফী! বেহারাকে কামরাটাকে দস্তর-মত গুছাইয়া রাখিতে উপদেশ দিয়া বিমল গাড়ীতে গিয়া উঠিল। ঘড়িতে তখন একটা বাজিয়া দশ মিনিট।

৪

তিনটা বাজিতে এখনো বারো মিনিট বাকী। বিমল খাসকামরায় বসিয়া খবরের কাগজ নাড়া-চাড়া করিতেছে, আর প্রতিক্ষণে জানালা দিয়া পথের যে-অংশটুকু দেখা যায়, সেই দিকে অধীরভাবে লক্ষ্য করিতেছে। আসিবে ত ?···কেন আসিবে না? নগদ চৌত্রিশ টাকা এমনি ত তাকে দান করিতে আসে নাই! আরও ষোল টাকা!···ইহার পর হইতে চৌত্রিশ টাকা···কেন ? না, ফী কমানো চলে না। ঐ পঞ্চাশই সে লইবে, রোগটা সহজ নয়, তা ছাড়া এক ঘণ্টা আগে দেখিতে হইবে, এ সময়টুকুর দাম আছে ত! এ সময়টুকুর মধ্যে সে কত পঞ্চাশ টাকা হয় সে রোজকার করিত।

বিমল হাসিল, হায় রে, পয়সা মানুষকে কি দুর্ব্বার লোভাতুর করিয়া তুলে! ঐ বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী যদি এক জন সামান্য লোক হইতেন! যদি এক পয়সাও না দিতেন, বেলা চারিটায় স্বামীকে লইয়া যদি আসিতেন·····তাহা হইলে বিমল এক পয়সাও প্রত্যাশা না করিয়া তাঁকে দেখিত তো! আর ইনি বিশেষ ভদ্রতা দেখাইয়া এত টাকা দিয়া গেলেন, বিমলের লোভ অমনি এমন প্রচণ্ড বাড়িয়া উঠিয়াছে! এই জন্যই বলে, যার যত পয়সা, তার তত বেশী পয়সার লোভ!

সে আবার ঘড়ির দিকে তাকাইল। তিনটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। তার উদ্বেগ ধরিল। খদ্দর পরা বাঙ্গালীর মেয়ে তাও তো চিরকাল পল্লীগ্রামে থাকেন!—তাঁর এমন সাহেবী punctuality! তবে চালচলন ভারী স্বচ্ছন্দ রকমের,—কোথাও আড়ষ্টভাব নাই। কি অবলীলাক্রমে এক অজানা

ডাক্তারের কাছে আসিয়া স্বামীর রোগের কথা জানাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নিলেন! অনেক পুরুষ মানুষেও এমন পারেন না—খাশা! উঠিয়া সে খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল··· ···ঐ যে একটা ট্যাক্সি··· ও-বেলার সেই ট্যাক্সিটাই না! সবুজ রং ·····সেই দাড়িওয়ালা শিখ ড্রাইভারটাই!·····

ট্যাক্সি থামিল বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী গাড়ী হইতে নামিলেন, গাড়ীতে আর এক জন আরোহী ছিলেন,—পুরুষ, সাহেবী পোষাক-পরা। তাঁকে কি বলিয়া ত্রস্তপদে আসিয়া বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী ডিস্‌পেন্সারীতে প্রবেশ করিলেন।

বিমল তাঁকে অভ্যর্থনা করিল। বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, কহিলেন—ওঁকে এনেছি। কিন্তু খুব সাবধান—কোনো লোক পাঠিয়ে ওঁকে আনাবেন। আর আমার সামনে কোনো কথা নয়·····তা হ'লে বিষম রাগে জ্বলে উঠবেন। বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবীর সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতেছিল—একটা উত্তেজনা·····বিপুল আবেগে চঞ্চলতার উচ্ছ্বাস!

বিমল তাঁকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল,—তাই হবে। আপনি উতলা হবেন না।

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—আপনার বাকি ষোল টাকা··· ···কিন্তু খুব হুঁশিয়ার—একেবারেই রোগের কথা পাড়বেন না, তা হ'লে কোন ফল হবে না, হয় তো—।

বিমল কহিল,—আমার সব মনে আছে·····

টাকাটা পকেটে পুরিয়া বিমল কহিল,—আপনি এই ঘরেই থাকবেন ?

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—না, না, ওঁকে অন্য ঘরে দেখবেন ?·····এই অবধি বলিয়া তিনি চারিধারে চাহিয়া আবার কহিলেন,—তার চেয়ে আমিই অন্য ঘরে যাই·····এই ঘরে ওঁকে দেখুন আপনি·····

বিমল কহিল—বেশ, তা হ'লে আপনাকে অন্য ঘরে রেখে আসি, চলুন।

বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবী উঠিলেন, বিমল তাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া অন্য ঘরে বসাইল, তার পর কহিল—এটা আমার ড্রেসিং রুম। আপনি এখানে বসুন। আমি ওঁকে ডাকিয়ে আনাই·····

বিদ্যুজ্জ্যোতি কহিলেন—এখনই··· ? আমার এমন ভয় করছে·····

বিমল হাসিয়া কহিল—কোনও ভয় নেই·····আপনি এই বই বা কাগজ পড়ুন·····

টেবলের উপর রাশীকৃত বই, খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল, বিমল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল; তার পর চলিয়া আসিল। ··· ···

সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোকটিকে আনিয়া খাসকামরায় বসানো হইল এবং বিমল বিজ্ঞের ভঙ্গীতে তাঁর সঙ্গে দেশের অবস্থা, স্বরাজ্য দলের গতি, মিনিষ্ট্রীর শক্তি এমনই নানা বিষয়ে আলোচনা সুরু করিয়া দিল। বহুক্ষণ এই সব আলোচনার পর বিমল কহিল—আপনার সঙ্গে লোকে ভারী চাতুরী সুরু করেছে, না? অনর্থক পয়সা-কড়ি ঠকিয়ে নেওয়া—চুরি·····?

ভদ্রলোক কহিলেন—না—সে দিকে আমি খুব হুঁসিয়ার আছি। তবে ছোটখাট ব্যাপার···তা দু একটা হয় বৈ কি মাঝে মাঝে।

বিমল কহিল—তা ত বটেই!···তা, এখানে কেমন দেখছেন সব ?

ভদ্রলোক বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিমল কহিল,—আপনার ছেলেপিলে কটি ?

ভদ্রলোক কহিলেন—একটি ছেলে, দুটি মেয়ে···

বিমল কহিল—তারা এখানেই আছে ?

ভদ্রলোক কহিলেন—না। এখানে আমি থাকি একা, ঐ ক্যালকাটা বোর্ডিংয়ে···একখানি কামরা নিয়ে। তারা দেশেই থাকে···

বিমল ভাবিল, এই যে, মাথার গোলমাল সুরু হইয়াছে! ···সে কহিল,—আপনার স্ত্রী শুধু আপনার সঙ্গে থাকেন ?

ভদ্রলোক,—না। তিনি সঙ্গে থাকবেন কি···

বিমল কহিল,—ভালো কথাই···তা, আপনি একবার ঐই কাগজটা পড়ুন তো···বলিয়া বিমল খবরের কাগজখানার একাংশ তাঁকে দেখাইল।

ভদ্রলোকের বিস্ময় সীমা ছাপাইয়া উঠিল। তিনি বিমলের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন, তার পর খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। একটা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক; সেটায় লেখা আছে—সে দিন গোয়ালন্দে একটা হাট পুড়িয়া গিয়াছে···লোক মারা যায় নাই, তবে পাট পুড়িয়াছে বিস্তর।

বেশ হইয়াছে, যেমন ধান ছাড়িয়া পাটের চাষ করা! ইহাকেই বলে, ভগবানের মার।

বিমল কহিল,—চেঁচিয়ে পড়ুন।

ভদ্রলোক কহিলেন,—এ কি বলছেন আপনি!···আমি আর দেরী করতে পারবো না মশায়—দোকানে ঢের কায প'ড়ে আছে।

বিমল হাসিল, কহিল,—দোকান!···অর্থাৎ আপনার কি চিন্তা সর্ব্বক্ষণ, বলুন ত···

ভদ্রলোক কহিলেন,—আপনার কথা বুঝতে পারছি না,—এতক্ষণ ত নানাকথা কইলেন, এখন এ কি এক পাট পোড়ার খবর পড়ালেন···মানে, আমরা ব্যবসাদার মানুষ, কায বুঝি···আমার পাওনাটা চুকিয়ে দিন; উঠে পড়ি···

বিমল আবার হাসিল; হাসিয়া কহিল,—পাওনা! কিসের পাওনা?

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—আপনি কি বলছেন? আপনি ত ডক্টর ব্যানার্জ্জী!

বিমল কহিল,—হাঁ।

ভদ্রলোক কহিলেন,—তবে, আপনার স্ত্রী এই মাত্র আমাদের ফার্ম্মে গিয়ে সেখান থেকে দুটো হীরের নেকলেশ, দুটো হীরের ব্রেশলেট আর এক ছড়া মুক্তার কলার নিয়ে এসেছেন, আপনার পছন্দমত একটা নেকলেশ, একটা ব্রেশলেট আর কলার ছড়া নেবেন এবং সেগুলোর দাম দেবেন, বলে—এই বিল···ভদ্রলোক কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিল দেখাইলেন···

এ তো সত্য বিলই···চৈতন্যলাল শেঠ কোম্পানীর বিল! প্রায় দশ হাজার টাকার বিল!

একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত বিমলের মনে ফুটিয়া উঠিল। সে বিলখানা লইয়া দেখিয়া কহিল,—আপনার নাম?

ভদ্রলোক কহিলেন,—আমার নাম চৈতন্যলাল শেঠ! এত টাকার মাল লোকজনের সঙ্গে দিতে পারিনে ব'লে নিজেই এসেছি···

বিমল কহিল,—এখনই যে স্ত্রীলোকটি এলেন···?

চৈতন্য শেঠ কহিল,—আপনার স্ত্রী ত···?

বিমল আকাশ হইতে পড়িল, কহিল,—আমার স্ত্রী?

চৈতন্য শেঠ কহিল,—আমাদের ওখানে আজ সকালে গেছলেন, তার পর আর এক দিন গেছলেন,—মাল দেখে বললেন, আমার স্বামী ডাক্তার বিমল বানার্জী, ৭ নম্বর পার্কার লেনে থাকেন, সেখানে যেতে হবে। মাল পছন্দ হলে সস্তা দাম চুকিয়ে দেবেন! তাঁর সময় কম, কাযেই আসা সম্ভব নয়···

চেয়ার ঠেলিয়া বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—বলেন কি?

চৈতন্য শেঠ কহিল—এই ত বিল দেখলেন।

বিমল কহিল—আর আমায় এসে বলেছেন, তাঁর স্বামীর মাথার ব্যামো, দেখতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে···পঞ্চাশ টাকা ফী আগাম দেছেন···আসুন, আসুন···এ তো আচ্ছা ফ্যাশাদ!

চৈতন্য শেঠকে লইয়া বিমল সেই কামরায় চলিল—যেখানে বিদ্যুজ্জ্যোতি দেবীকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বসাইয়া আসিয়াছিল···। কিন্তু কেহ নাই···কামরা খালি। সেই সঙ্গে, সর্ব্বনাশ! বিমলের সোনার ঘড়ি-চেন টেবলের উপর ছিল। সেটাও অন্তর্হিত!

বিমল হাঁকিল,—বেয়ারা···

বেয়ারা আসিল। বিমল কহিল—সেই মা-জী···?

বেয়ারা কহিল—ভক্তিবাবুর সঙ্গে কি কথা কইছিলেন···?

বিমল হাঁকিল—ভক্তি···

ভক্তি আসিল। কম্পাউণ্ডার। বিমল কহিল—সেই মহিলাটি?

ভক্তি কহিল—যিনি ট্যাক্সিতে এসেছিলেন···?

—হাঁ, হাঁ,···

ভক্তি কহিল—তিনি বাইরে গেলেন, বললেন, আগেকার কি একটা প্রেশক্রপশন ভুলে বাড়ীতে ফেলে এসেছেন, সেটা নিয়ে এখনি আসছেন···

বিমল চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কহিল,—আর এসেছেন!

চৈতন্য শেঠ কহিল—তা হ'লে?

বিমল কহিল—আপনি ঠকের পাল্লায় পড়েছেন! পুলিশ ডাকুন···ভক্তি, টেলিফোন করো—বালিগঞ্জ থানা···

চৈতন্য শেঠ বসিয়া পড়িল,—কহিল—উপায়?

বিমল কহিল—আমারও খুব লাভ! আমায় পঞ্চাশ টাকা দেছে, কিন্তু আড়াইশো টাকার ঘড়ি আর তিনশো টাকার চেন নিয়ে গেছে···

পুলিশকে টেলিফোন করা হইল, শীঘ্র আসুন, ভারী শক্ত কেশ···

বিমল চৈতন্য শেঠকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। চৈতন্য শেঠ কহিল,—তাই ত মশায়, অমন সুন্দরী, অমন বেশ,···খদ্দর পরা ভদ্র চেহারা, মিষ্টি কথা···সন্দেহের কোনো কথা মনে ওঠেনি···

বিমল কহিল,—আমারি কি ছাই হয়েছিল! তবে এমন রোগী আজ পর্য্যন্ত দেখিনি। রোগী বা রোগ দেখার আগে হাতে ফীয়ের টাকা দেয়···তাও এত বেশী ফী নিজে থেকে···না চাইতে···

বালিগঞ্জ থানা হইতে ইন্‌স্‌পেক্টর ললিত বাবু আসিলেন। সংবাদ শুনিয়া কহিলেন,—আর মশায়, একটা কেশ দিন গনের আগে হয়ে গেছে তুকারাম জহুরির ফার্ম্ম—তাদের ঠকিয়েছে এক ফ্রেঞ্চ ক্রপ শিল্কের শাড়ী-পরা বাঙ্গালীর মেয়ে জড়োয়া গহনা নিয়ে প্রায় বিশ হাজার টাকার—পুলিস গেজেটে খপরটা বেরিয়েছে দেখলুম···আচ্ছা এঁর চেহারা কেমন, বলুন ত···

বিমল আর চৈতন্য শেঠ দু'জনেই চেহারায় বর্ণনা দিয়াও কহিল,—সুন্দরী! বেশ সুন্দরী! আর কি ভদ্র ছাপ্ চেহারায়! নাম বিদ্যুজ্জোতি···তা বিদ্যুতের জ্যোতির মতই হবে।

ললিত বাবু হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—বিদ্যুতে জ্যোতি না হলে এমন electrify করতে পারে! তা, মোদ্দা, আমারো যতটা মনে পড়ছে, এমনই চেহারাই বটে!···

চৈতন্য শেঠ কহিল,—উপায়?

ললিত বাবু কহিলেন—নিরুপায়। থানায় কেশ্ ডায়রি করাবেন, চলুন···পুলিশ গেজেটে ছাপিয়ে দি···যদি বরাতে থাকে, আসামী কোনো দিন গ্রেপ্তার হয়···

চৈতন্য শেঠ কহিল—না হ'লে···

ললিত বাবু কহিলেন—ও গহনাগুলি জলে গেছে!···কাগজে ছেপে দিন।

চৈতন্য শেঠ কহিল—আমি পাঁচ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দেবো মশায়···বলেন কি, মেয়েমানুষের কাছে ঠকবো, পুরুষ-বাচ্ছা হয়ে···

ললিত বাবু হাসিয়া কহিলেন—সব বিষয়েই ত মেয়েমানুষের কাছে পুরুষ-বাচ্ছা ঠকেই আসছে চিরকাল, মশায়···সুন্দরী স্ত্রীলোক না হ'লে আপনিই কি অত বিশ্বাস করতেন আর কাকেও···না, ডাক্তার বাবুও অমন খাতির ক'রে বসাতেন আর কাকেও···!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

লঘুগুরু

গুর্খা আনো হুড়কো আনো যা করো খুনী,
সহ্য করো ছেলের দলের ছেলেমানুষী।
পারবে নাকো ছাড়তে হবে বনমানুষী চাল,
বাঁধন গড়ে নন্দনেরি করতে নাজেহাল।
'ভিনিগারে' বাগান সেচে আনন্দ প্রচুর,
ফলবে ডালে রাজভক্তির কাসুন্দী আমচুর।
ধোঁয়া দিয়ে খেপায়ো না যেমন আছে থাক,
নর্ম্মদারি উপলকূলে মধুকরের ঝাঁক।
ভূর্জ্জবনের হরিণ-শিশু করতেছে তাড়া,
দাঙড় শুধু বলবে উচিত ঠেঙ্গিয়ে মারা।
বিরাট হৃদয় একটা কি নাই নিরেট কি সব্‌ধার,
হাস্যমুখে সইবে যে এই প্রচণ্ড আবদার।
(কোমল বুকে পাতবে কে আর শ্রদ্ধারি আসন)
ইঙ্গিতেতে ফিরিয়ে দেবে সচঞ্চল মন।

অলক্ষ্যেতে লক্ষ হাতে পরাবে রাখী,
কোথায় তুমি হে আশুতোষ তোমারেই ডাকি।
বাঙ্গালা দেশে আর সে তেমন অগস্ত্য কোথা,
যেথা বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণী নোয়াবে মাথা।
কই কুশলী কুলপতি আদেশ যার শুনি,
অমঙ্গলের ঢেউ রোধিবে অযুত আরুণি।
জাতীয়তার আটকৌড়ির আনন্দ দিনে,
নেচেই থাকে নাচবে কে আর এই সে দল বিনে।
দণ্ড যদি হয়ই দিতে সয় নাক দেরী,
ইক্ষুদণ্ড দাও মহারাজ গোলাপী রেউরী।
গুরু তুমি গুরুই থেকো, হও কেন লঘু,
হে শঙ্খচিল্ সাজবে কেন তিতির কি বুঘু!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শ্রীচৈতন্য

(বৈষ্ণব মহাজনগণের পদানুসরণে)

তব—নয়নে বাদর ঝরে পুলকাঙ্কুরে ভরে
হেমতনু,—জাগে রসমঞ্জরীবৃন্দ,
স্বেদচ্ছলে মধুকণ ক্ষরে তায় অনুখন,
চরণপঙ্কে ফুটে রাতা অরবিন্দ।

শোভি সংসারমরু জাগিলে কল্পতরু,
ও ছায়ে শরণ নিল কলিকলুষার্ত্ত,
যেই ফল বিতরিলে তুলা নাই এ নিখিলে,
প্রেমসম নহে মিলে চারি পুরুষার্থ।

কল্পতরুর কাছে লভে বটে যেই যাচে,
না যাচিতে দাও তুমি না বিচারি যত্ন,
কল্পতরুর তলে না গেলে কি আশা ফলে ?
দ্বারে দ্বারে সেধে সেধে বিলাইলে রত্ন।

মায়াবাদী জ্ঞানী যত হলো সবে পদানত,
জ্ঞান-সুরা-ঘট ভাঙ্গি পিয়ে প্রেমদুগ্ধ,
কৃষ্ণ-সারের পায় কেশরী করুণা চায়
তরল আয়ত আঁখি পরসাদে মুগ্ধ।

'ঢল ঢল নিকষিত— হেমতনু-বিগলিত
লাবণি গড়ায়ে পড়ে অবনীর অঙ্গে,
চন্দন-ললাটিকা বিথারে ললাটে শিখা,
মদন মূরুছা পায় হাস্যতরঙ্গে।'

কীর্ত্তন-তাণ্ডব— বিলোল চরণে তব
সংঘাতে জাগে ভূমিজননীর হর্ষ,
'হরি হরি'—হুঙ্কৃতি উত্তাল সঙ্গীতি
গগন বিদারি করে গোলোকেরে স্পর্শ।

রসহ্রদে ডগমগ কনক-মরাল খগ,
ফুটালে পাখার বায়ে আঁখি-শতপত্র,
ফেলি পুঁথি বীণাখানি রসাবেশে বীণাপাণি,
নাচিল তোমার সাথে ত্যজি জ্ঞানসত্র।

তব হেম ব্রজকায়ে পুলকিত নীপছায়ে
রাস রসে বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য,
প্রকটিত শ্রীআননে ঢুলু ঢুলু দ্বিনয়নে
বিরহিণী শ্রীমতীর নিখিল চরিত্র।

ডুবে উৎকল রাঢ় আকুমারী একাকার
ভাসাল গৌড়ব্রজ তব প্রেমসিন্ধু,
নাচিলে লহরী 'পরি তা তা থৈ থৈ করি',
লক্ষধা বিম্বিত নদীয়ার ইন্দু।

খনে হাসি খল খল, খনে আঁখি ছল ছল,
রামধনু রচে মেঘ রৌদ্রের সঙ্গে,
শরৎ, মূরতি ধরি আসিলে কি অবতরি ?
শ্যাম-গৌরব মরি ফলিত মৃদঙ্গে।

করনখে রবি জ্বলে পদনখে শশী ঝলে,
নিশ্বাসে বিলসিত তুলসীর গন্ধ,
মহাভাবমোহে ভোর হ্লাদিনী রসের চোর,
মাধুরী-লতার গোরা চির-রসকন্দ।

নর্ত্তনী-কর্ষণে প্রেম-শ্রু-বর্ষণে—
শ্রীবাসের অঙ্গনে করিলে যা উপ্ত,
আজি তা' ভরেছে ধরা জাগরণী-ফুলে ভরা,
তার গুঞ্জনে জাগে যে যেখানে সুপ্ত।

তব লাবণির ভায় হেম মুকুরের ছায়
হেরে কবি লীলাময় যুগল শ্রীমূর্ত্তি।
হুঙ্কার-তাণ্ডবে "পুরুষ" বিকাশ লভে,
লীলায়িত ভঙ্গিতে "প্রকৃতির" স্ফূর্ত্তি।

তব পদপঙ্কজে দাদুরীরো মন মজে—
হেরি দুটি পাণি নাগকেশরের দণ্ড,
প্রেম-হ্রদে ঢলঢল দুটি নীল শতদল,
ভৃঙ্গ হইল তায় কত যে পাষণ্ড।

কৃষ্ণ-বিরহানল প্রাণ-দীপে প্রোজ্জ্বল
যে অনলে বিগলিত অযুত অনঙ্গ,
কলিকল্মষ পুড়ে' ধূলি হয়ে যায় উড়ে,—
ভকত-ভৃঙ্গ তায় হইল পতঙ্গ।

যে অনলে স্বেদজলে তনু নবনীত গলে
যে অনলে অরুণিত নয়নের প্রান্ত,
কলিযুগে যে অনলে হরিনাম-যাগ জ্বলে,
সে অনলে পুড়ে গেল তন্ত্র-বেদান্ত।

কেবা করে পথ-রোধ ? দিগ্বিজয়ের বোধ
চলে সাথে, জয়নাদ করে শতভুণ্ড।
আগে আগে দুলি দুলি হে বীর চলেছ তুলি
আজানুলম্বি বাহু—করিবর-শুণ্ড।

দেহে ধূলি বিভূষণ গলে দুলে সুশোভন,
নাম সূতে গাঁথা হরিগুণমণি-মাল্য।
হৃদজলে শশিলেখা— স্বেদজলে বলিরেখা,
রাজে যৌবনবনে ধ্রুব হয়ে বাল্য।

দিলে সারীশুকমুখে হরিনাম, কৌতুকে
ব্যাধেরে শুনায় সদা 'বলো রাধাকৃষ্ণ,'
পুরীপথে লতাতরু সিন্ধুর বেলামরু
নাম-সুধাধারা লাগি হইল সতৃষ্ণ।

ব্রজনাট অভিনয়ে এলে নট সুসময়ে
দম্ভদমন-লীলা করিলে আরম্ভ,
গঙ্গা, যমুনা হয়ে ভাবঘোরে যায় ব'য়ে
তীরে তার সব তরু শিহরি কদম্ব।

ধরণী বুকের পানে তোমা ঘন ঘন টানে,
সচকিতে শচীমার মমতার দৃষ্টি,
যেথা-সেথা ধূলি'পরে তনু আছাড়িয়া পড়ে
কমলশয্যা করে সেথা সেথা সৃষ্টি।

ভাবাবেশে গর-গর' কতবার পড়-পড়',
অবিরল দরদর ধারা বহে চক্ষে,
ধ্বস ধ্বস মার প্রাণ উৎসুক বেপমান,
মনে মনে বার বার ঠেকা দেয় বক্ষে।

নাচিতে নাচিতে হায় ঢ'লে পড়ো কার গায় ?
কার গলা ধ'রে কাঁদ ? অদ্ভুত দৃশ্য !
সঙ্কোচে লাজে ডরে ও যে নিজে পড়ে-পড়ে,
ও যে দীন চণ্ডাল হীন অস্পৃশ্য।

প্রেমাবেশে নেচে নেচে পতিতেরি কোল বেছে
ও তনু পতিত হয়—নহে কারো বশ্য,
বলে গেল "হায়, হায়, ব্রাহ্মণ-ব্যবসায় !"
নদীয়ার যত মূঢ় জাতিসর্ব্বস্ব।

মূকের জড়তা হরো শুকেরে মুখর করো,
মোহমূঢ় অন্ধের আঁখি কর ফুল্ল,
পঙ্গুরে দাও বল লঙ্ঘে সে হিমাচল,
কাক-পেচকেরে করো গরুড়ের তুল্য।

কোথা তুমি লুকাইবে ফাঁকি দিয়া মূঢ় জীবে ?
কোথায় পলায়ে প্রভু হবে নিঃসঙ্গ ?
নাহি যেথা নারীনর আসে যেথা বনচর
কীর্ত্তন করে সাথে ব্যাঘ্র কুরঙ্গ।

বিলাইলে হাটে মাঠে ছড়াইলে বাটে বাটে
নাম-নীলমাণিকের মালা করি ছিন্ন।
সঙ্গে তোমারি ছায়া ধরে ভকতের কায়া,
অঙ্গে তোমার মহাভাগবতচিহ্ন।

নাম ও নামীর মাঝে কোন' ভেদ নাহি রাজে
চিন্ময় নাম, নয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,
ভোগীর রসনাধামে জাগাইলে সেই নামে,
সেই নামব্রহ্মেরে দিলে রূপ বাহ্য।

রূঢ় জ্ঞানযোগিগণ ছিল যারা নিমগন
পুঁথিতে খুঁজিতে সেই সচ্চিদানন্দে,
লীলানন্দের সাড়া পেয়ে চঞ্চল তারা,
কি লিপি পাঠালে তুমি তুলসীর গন্ধে ?

শ্রীরূপের অন্তরে রসময় কন্দরে
প্রেমতরু-লতাবীজ করিলে যা উপ্ত,
হলো তাই ব্রজবন, পুন তায় সচেতন,
গোকুলের কেলিকল কুলায়-সুষুপ্ত।

যবন-জীবনজ.ল ভোগশৈবালদলে,
বিষয়পঙ্কে প্রভু ফুটালে যে পদ্ম
রাধাপদ-রজে গড়া আগাগোড়া মধুভরা
রসিক অলির আজো তাই চিরসদ্ম।

সনাতনে সখা জানি ধ্রুব সনাতনী বাণী
বলিলে যা কলিযুগে তাই গীতামন্ত্র,
তার বেশী কোন্ ধন আছে সার সনাতন ?
একাধারে তাই বেদসংহিতা তন্ত্র।

ভুলাইলে ধন জন কেলি কাম কাঞ্চন,
রচিলে মাধুরী দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা।
তাপসের জটা ভরি রসসঞ্চার করি
ভাসাইল 'গজপতি' তব প্রেম-গঙ্গা।

তোমার লীলার ব্রজ দিল যে পথের রজ
পারের পাটনী চায় তাহারি প্রাচুর্য্য,
জ্ঞান ধ্যান হোম জপ সাধনা কঠোর তপ
সব হ'তে বড় হলো সহজ মাধুর্য্য।

ধন মান জ্ঞান যশ, কে তোমা করিবে বশ ?
তোমার চরিত রীত বেদবোধগুহ্য।
কলা মূলা বেচে খায় শ্রীধর করুণা পায়,
অবাক তাপস যোগী—সেও সাধুপূজ্য।

পেয়ে নীল জলধারা হয়ে তুমি জ্ঞানহারা
ঝাঁপ দিয়াছিলে প্রভু হেরি শ্যামকান্তি,
হৃদয়-কালিমাহারি ঝরে মোর আঁখি-বারি
যমুনা বলিয়া এরে হবে না কি ভ্রান্তি ?

এ অধমে তারো তারো ডুবিতে কি বলো আরো ?
পতিত-পাবন নাম হবে কি অসত্য ?
কতটা পতিত হ'লে প্রভু তুমি নেবে কোলে ?
শ্মশানে চলিলে মিছে ঔষধ পথ্য।

ব্যবহার-রসে হায় দিন মোর জ'রে যায়
তব নাম রসনায় আসে না দিনান্তে,
শ্রীবাসের আঙিনার ধূলি কবে হবে সার'
নামামৃত-রসে কবে ডুবাবে এ ক্লান্তে ?

নিঃস্ব অকিঞ্চনে চড়াইলে সযতনে
ভাব-গজরাজে, প্রভু হ'াত ধ'রে তুল্লে।
ছয় ঘোড়া টানে রথ নিরাপদ নহে পথ,
সেই পথে প'ড়ে যেবা তারে কেন ভুল্লে ?

'তোমার চরণে স্বামি শরণ নিলাম আমি,'
এ কথা বলিলে লোকে বলিবেই ভণ্ড।
তুমি অশরণ জেনে তোমা পানে লও টেনে,
এর বেশী কি যাচিবে পামর পাষণ্ড ?*

শ্রীকালিদাস রায়।

---

* শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগৃহীত যে সকল মহাপুরুষের কথা কবিতায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে—তাঁহাদের নাম—

প্রকাশানন্দ (বৈদান্তিক মায়াবাদী), বাসুদেব সার্ব্বভৌম (বৈদান্তিক পণ্ডিত), মুরারি গুপ্ত (মহাজ্ঞানী, দাস্যরসের সাধক), শ্রীরূপ-সনাতন (যাবনিক ধর্ম্ম ও ধন-জন-পদ-গৌরব উৎসর্গ করিয়া প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন উদ্ধার করেন)। যবন হরিদাস। প্রতাপরুদ্র গজপতি (উড়িষ্যার রাজা), রামানন্দ রায় (তাঁহার প্রধান অমাত্য), নরোত্তম, রঘুনাথ (অগাধ বিষয়সম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রভুর অনুগামী হন)। শ্রীবাস (নদীয়ার পণ্ডিত—প্রভুকে ইনিই প্রথম চেনেন—ইঁহার আঙিনাই প্রভুর প্রেমোৎসবক্ষেত্র)। শ্রীধর (দরিদ্র—কলামূলা বেচিত), জগাই-মাধাই (দুর্দ্দান্ত মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণদ্বয়)।



লুৎফ-উল্লা

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘন হইয়া আসিয়াছে, দিল্লীর সহর-তলীতে ঘরে ঘরে ইরাণীর ভয়ে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, তখন নূতন সহরের দিল্লী-ফটকে একটা তুমুল কলরব উঠিল। যে দুই এক জন হতভাগ্য পথিক আশ্রয়ের অভাবে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে তখনও পথে বেড়াইতেছিল, তাহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, ফটকের পাহারার সিপাহী উন্মত্ত হইয়া "নূরবাঈ নূরবাঈ" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে অঞ্চলের অনেক মহল্লার অন্ধকার গৃহে দীপ জ্বলিয়া উঠিল, প্রত্যেক মহল্লা হইতে দুই দশ জন লোক মশাল হাতে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। এখন দিল্লীর কেল্লার দক্ষিণদিকে কেবল ইংরাজী আমলের ঘর-বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বে এই দিকে সোনেরী মস্‌জেদ হইতে সহরে দিল্লী-ফটক পর্য্যন্ত ঘন বসতি ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত পরাক্রান্ত ওমরাহরা এই মহল্লায় গৃহনির্ম্মাণ করিতেন। বাদশাহ শাহাজাহানের বিখ্যাত উজীর সাদুল্লা খাঁ, ইতিহাসবিশ্রুত পারস্যদেশীয় বিশ্বাসঘাতক আলীমর্দ্দন খাঁ, আওরঙ্গজেব বাদশাহের উজীর আসদ খাঁ প্রভৃতির প্রাসাদ এই মহল্লায় ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে ইংরাজ এই সমস্ত পুরাতন প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পল্টনের অফিসারদের "বাংলো" ও সিপাহীদের 'লাইন' তৈয়ারী করিয়াছেন।

অবস্থা অনুসারে কেহ বা ঘোড়ায়, অপরে পায়ে হাঁটিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। যাহাদের ক্ষমতা ছিল, তাহারাও ইরাণীর ভয়ে তঞ্জাম বা পাল্কী চড়িতে ভরসা করিল না। উচ্ছৃঙ্খল দিল্লীবাসীর নয়নের মণি নূরবাঈ ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া কেহ কেহ সাজিতে বসিয়া গেল, সুতরাং তাহাদের পথে বাহির হইতে বিলম্ব হইল। ক্রমে ক্রমে রাজপথে অসম্ভব ভিড় হইল, ইরাণী সওয়াররা মারিয়াও লোক সরাইতে পারিল না। নূরবাঈ একখানা রথে চড়িয়া আসিতেছিল, রথের মধ্যে সে নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়াছিল. সহস্র সহস্র মশালের উজ্জ্বল আলোকে তাহার শুভ্র মর্ম্মর-বিনিন্দিত বর্ণ ও মলিন ধূলি-ধূসরিত পরিচ্ছদ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। দিল্লীর উচ্ছৃঙ্খল যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছিল, কেহ বা ফুল অথবা আতরে ভিজান তুলা ছুড়িয়া মারিতেছিল। নূরবাঈ পূর্ব্বে যখন রূপার তঞ্জামে চড়িয়া দিল্লীর রাজপথে বাহির হইত, তখন সে হাসিমুখে শত সহস্র নায়কের প্রেম-সম্ভাষণ বা অভিবাদন গ্রহণ করিত এবং যথাযোগ্য উত্তর দিত, ফুল অথবা আতর পাইলে সেলাম করিত, কিন্তু আজ সে শত শত হিন্দু ও মুসলমান যুবার সম্ভাষণ নীরবে প্রত্যাখ্যান করিতেছে দেখিয়া সকলের মনে ধীরে ধীরে আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। এক জন বলিয়া উঠিল যে, হয় ত নূরবাঈয়ের কতল হইবে। কথাটা বিদ্যুদ্‌বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, দুই চারি জন প্রেমিক তখনই হায় হায় করিতে করিতে বুক চাপড়াইয়া, পোষাক ছিঁড়িয়া, পথের ধূলা মাথায় দিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে দুই চারি জন শোকের তৃষ্ণায় আকুল হইয়া মদের দোকানের পিছনের দরজা দিয়া মদের পিপায় আশ্রয় লইল। এখন যেখানে জুম্মা মস্‌জেদের প্রধান প্রবেশদ্বার, তাহারই সম্মুখে বাদশাহী প্রাসাদে লাহোর ফটকের অনতিদূরে রিসালা দাঁড়াইল। এক জন সওয়ার বাদশাহ মহম্মদ শাহ এবং তাহার বাদশাহ নাদীর শাহকে সংবাদ দিতে গেল। তখন দৈনিক মজলিস বসিয়াছে, নূরবাঈ প্রাসাদের নিকটে আসিবার বহুপূর্ব্বে তাহার আগমন-সংবাদ উভয় বাদশাহের নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কথাটা সকলে বিশ্বাস করে নাই। কেহ বলিল—এ আবার বাঙ্গালী জিনের যাদু, কেহ বলিল যে, নূরবাঈ আর কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়াছে, অনেকেই বিশ্বাস করিল না যে, নূরবাঈ ইচ্ছা করিয়া সিংহের বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। ইরাণী নাসক্‌চী কুর্ণিশ করিয়া এত্তালা দিল, মজলিসের গান-বাজ্‌না থামিয়া গেল, শাহান শাহের হুকুম হইল, নাসক্‌চী অভিবাদন করিয়া নূরবাঈকে আনিতে চলিয়া গেল।

সে দিন সন্ধ্যার পরের মজ্‌লিস যমুনাতীরে রঙ্গমহালে বসিয়াছিল। সহস্র আলোক-দীপ্ত শাহজাহানের শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত অমরপুরীতে কেতকী-শুভ্রবর্ণা মলিনবসনা নূরবাঈ যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অনেকেই তাহাকে চিনিতে পারিল না। যে নূরবাঈ এক দিন কোটি সুবর্ণের অধীশ্বরী ছিল, হীরক মণি-মরকতে আবৃত হইয়া যে দরবারে পদার্পণ করিত, বারাণসী ও আহমদাবাদের কিংখাব ব্যতীত যাহার পেশোয়াজ তৈয়ারী হইত না, সুদূর জাহাঙ্গীর নগরে ঢাকার বহুমূল্য মস্‌লীনে মুক্তার দানা বসাইয়া যাহার ওড়না প্রস্তুত হইত, সে আজ দরিদ্রা গুর্জ্জর-রমণীর মলিন ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে অনেকেরই বিলম্ব হইল।

নূরবাঈ তস্‌লীম করিল, শাহান শাহ নাদীর শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" উত্তর হইল, "শাহান শাহ, আমি সরকারের বাঁদী,—সহরের তওয়াইফ্, আমার নাম নূরবাঈ।"

"তুমি যে নূরবাঈ, তার প্রমাণ ?"

"শাহান শাহ, আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, আমার পয়সার সঙ্গে সমস্ত গিয়েছে, যায়নি কেবল গলার আওয়াজ।"

সেই মধুর নিক্কণ, স্তব্ধ হইয়া মজ্‌লীসের সমস্ত লোক সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল। যে কণ্ঠের ধ্বনিতে শাহজাহানের প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষ এক দিন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কানের পথে প্রবেশ করিয়া সকলের মনের সন্দেহ

দূর করিয়া দিল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাদীর শাহকে কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন; "শাহান-শা, এ নিশ্চয় নূরবাঈ।" নাদীর শাহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "প্রমাণ?" বৃদ্ধ চীন কিলিচ খাঁ-নিজাম-উল-মুল্ক অস্ফুটস্বরে নাদীর শাহকে কি বলিলেন। নসক্‌চী নূরবাঈকে অন্যত্র লইয়া গেল। হমামে বাঁদীরা আসিয়া তাহাকে স্নান করাইল, মৃত বাদশাহ মালিকা-উজ-জমানী বেগমের পোষাক ও অলঙ্কার আনিল। নূরবাঈ স্নান করিয়া পোষাক পরিল, কিন্তু অলঙ্কার প্রত্যাখ্যান করিল। একগাছি শুভ্র পুষ্পের মালা গলায় দিয়া নূরবাঈ যখন মজলীসে পদার্পণ করিল, তখন সমস্ত নর্ত্তকী ও বাদক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। আজ সে একাকিনী, তাহার সঙ্গে ওস্তাদ নাই, বাদক নাই, পানবরদার নাই, বাঁদী নাই। কিন্তু সেই মজলীসে উপস্থিত দুই শতের উপর ওস্তাদ শাহান শাহ নাদীর শাহকে তস্‌লীম করিয়া নূরবাঈয়ের সেবা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন নূরবাঈয়ের চোখে জল আসিল। এত দিন দিল্লীতে বাস করিয়া, এত কাল বাদশাহের দরবারে মুজ্‌রা করিয়া এত বড় সম্মান সে কোনও দিন পায় নাই। ওস্তাদদের ভিতর হইতে সে চারি জনকে বাছিয়া লইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই জনকে দিল্লীর কোনও ওস্তাদ চিনিতে পারিল না। মুজ্‌রা আরম্ভ হইল, যে কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে সে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার মোহিনী শক্তিতে বাদশাহ মহম্মদ শাহ আজ বন্দী, তাহা আবার নিজ মোহিনী-মদিরা ছুটাইয়া বর্ব্বর ইরাণী ও শিক্ষিত মোগল উভয়কেই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। একটা গান শেষ হইল। সুবর্ণপাত্রে পরিপূর্ণ আরক শাহান শাহ নাদীর শাহের আদেশে রত্ন-খচিত পাত্রে করিয়া বাদশাহ মহম্মদ শাহ স্বয়ং নূরবাঈয়ের সম্মুখে ধরিলেন। তীব্র মদিরা পানে নূরবাঈয়ের রক্ততীন গণ্ডে রক্তিম আভা আবার দেখা দিল, সুবর্ণের থালে থালে ফল ও মোরব্বা আসিল, নূরবাঈ দুই একটি মুখে দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

এইবার নাচ আরম্ভ হইল, গানের পর গান, নাচের পর নাচ, স্তব্ধ হইয়া ইরাণী ও মোগল, হিন্দু ও মুসলমান সভাসদ্‌গণ সেই অপরূপ অঙ্গভঙ্গী ও অপ্সরী-বিনিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীতসুধা মুগ্ধ হইয়া দেখিল ও শুনিল। অদূরে নকারাখানায় বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহীর রওশনচৌকীর অপূর্ব্ব বাদ্য আজ আর কেহ শুনিল না। প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর, তৃতীয় প্রহর কাটিয়া চতুর্থ প্রহরে যখন শুভ্র-মর্ম্মররাশির উপরে উষার শুভ্র আলোক শুভ্রতর হইয়া উঠিল, তখন শাহান শাহ—নাদীর শাহ বুঝিতে পারিলেন যে, রাত্রি শেষ হইয়াছে। পরিশ্রান্ত নূরবাঈকে বসিতে আদেশ করিয়া নাদীর শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূরবাঈ, এত মান, এত সম্ভ্রম, এত ধন-দৌলত ছেড়ে তুমি পালিয়েছিলে কেন?" নূরবাঈ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তস্‌লীম করিয়া বলিল, —"শাহান শা, ভয়ে!"

"কিসের ভয়, নূরবাঈ?"

"শাহান শা, আমার জন্য কাঁদবার কেউ নাই; প্রাণের ভয়ও আমার নাই।"

"তবে পালিয়েছিলে কেন?"

"প্রাণের ভয়ে নয়, শাহান শা, হিন্দুস্থান ছেড়ে ইরাণে যাবার ভয়ে!"

"ইরাণ কি এত খারাপ দেশ, নূরবাঈ?"

"বুলন্দপনা, যা চোখে দেখিনি, তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু আমার হিন্দুস্থানের সব মিঠা;—জল মিঠা, হাওয়া মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হয় ত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে জাঁহাপনা। কিন্তু সে মিঠা আমি চাহি না। আমি যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা, আমার কাছে এমন মিঠা আর কিছুই লাগবে না।"

"কি মনে ক'রে ফিরে এসেছ, নূরবাঈ?"

"জাঁহাপনা সাজা দেবেন।"

"কি সাজা আশা ক'রে এসেছ?"

"কতল ও গর্দ্দান।"

"সমস্ত মাফ্ নূরবাঈ, তুমি কস্‌বী হলেও আল্লার অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—জানোয়ার ভিন্ন তোমার অঙ্গে কেউ হাত দেবে না।"

"সমস্ত মাফ্?"

"সকল লোক, ধন-দৌলত সমেত মাফ্।"—উত্তর শুনিয়া নূরবাঈ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া পদ্মিনী তখনও পাহাড়গঞ্জের ছোট দোতালা বাড়ীটির বারান্দায় বসিয়া ছিল। লক্ষ্মী অনেক-ক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার পিতামহী সমস্ত রাত্রি ঢুলিয়া শেষ রাত্রিতে তাহারই পাশে শয়ন করিয়াছেন। যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহারা বিছানা-পত্র পাতিয়া দিয়া মধ্য-রাত্রিতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল। এখন তাহারা আসিয়া দেখিল যে, যেমনকার বিছানা, তেমনই পড়িয়া আছে, তাহাদের অতিথিরা বারান্দায়। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর দক্ষিণদিকের সহরতলীতে একটা আনন্দের রোল উঠিল, পাহাড়-গঞ্জ, জয়সিংহপুরা ও পাঁচকুয়া অঞ্চলে সকলেই সানন্দে বলিতে আরম্ভ করিল যে, শাহান শাহ নাদীর শাহ নূরবাঈয়ের নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহাকে মাপ করেন নাই, তাহার ও আনন্দরামের পলায়নে যে যে লিপ্ত ছিল, সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া পদ্মিনীর শুষ্ক মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার পিতামহী উঠিয়া বসিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য এবং গরু-কয়টির জন্য ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মী জাগিয়া উঠিয়া সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, বাবুজী কখন্ আসিবে?

বেলা বাড়িয়া উঠিলে লাল খেরুয়ার খোলে বাঁধা সারেঙ্গী স্কন্ধে ফেলিয়া দুই জন বয়স্ক মুসলমান সহরের আজমীর ফটক দিয়া বাহির হইয়া আসিল, ফটকের পাহারা তাহাদিগকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। মাঠে একটা বড় ইন্দারার পাশে বসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মুখের দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়িয়া, রং ধুইয়া ফেলিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন হিন্দু আনন্দরাম ও অপর মুসলমান আক্রম জমান খাঁ হইয়া দাঁড়াইল। পরচুলা ও ছাড়া কাপড় সারেঙ্গীর গেলাপের মধ্যে পুরিয়া তাহারা যখন পদ্মিনীদের

বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মহল্লার লোক চারিদিক হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। নূরবাঈয়ের অপূর্ব্ব নৃত্য-গীত, শাহান শাহের সন্তোষ এবং সকলের মুক্তির সংবাদ জানাইয়া অনেক কষ্টে তাহাদের হাত এড়াইয়া আনন্দরাম যখন বাড়ীতে ঢুকিতে গেল, তখন সে দেখিল যে, অবগুণ্ঠনমুক্তা পদ্মিনী লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তাহার জন্য নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পদ্মিনীকে দেখিয়া হঠাৎ লজ্জায় আনন্দরামের মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্মী তাহাকে কথা কহিতে দিল না। সে আনন্দরামকে উপরে যাইতে বলিল। উপরে গেলে লক্ষ্মীর পিতামহী তাহাকে গৃহস্থালী ও গরু কয়টির জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিল। বারান্দার পাশের ঘরে আক্রম জমান খাঁ তখন আলবোলায় মুখ দিয়াছেন। গৃহে ফেরা তখনও অসম্ভব এবং বিকালে সে গরু কয়টির সংবাদ লইয়া আসিবে বলিয়া বৃদ্ধাকে নিরস্ত করিয়া আনন্দরাম লক্ষ্মীকে লইয়া আক্রম জমানের নিকট গেল। দেখিতে দেখিতে গৃহস্বামী ও পদ্মিনী তাহাদের জন্য সরবৎ ও ফলমূল লইয়া আসিল। আক্রম জমান তখন ঘুমের ঘোরে অভিভূত। সরবৎ পাইয়া আলবোলা ছাড়িয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া আনন্দরাম যত শীঘ্র সম্ভব আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়িল।

তৃতীয় প্রহর বেলায় যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আনন্দরাম আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, পদ্মিনী তাহার শিয়রে বসিয়া একটা ছোট চামর লইয়া তাহার মুখের মাছি উড়াইতেছে। পদ্মিনীকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, এবং তাহার ভাব দেখিয়া ঘরের মধ্যে আর এক জন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে লক্ষ্মী, সে আর একটা ছোট চামর লইয়া আক্রম জমানের কাছে বসিয়াছিল। আনন্দরাম উঠিয়া বসিলে পদ্মিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, এইবারে ত আমরা বাড়ী যাব! তোমার চাকরদের আর গোলাপী দিদিকে আন্‌তে পাঠাও না!" পদ্মিনী একাকিনী তাহার কাছে আসিয়াছে মনে করিয়া আনন্দরাম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার লজ্জার ভাবটা এখনও কাটে নাই। সে হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু সরলা পদ্মিনী কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই, সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, আমাদের বাড়ী ফির্‌তে কত দেরী হবে?" আনন্দরাম সাহসে ভর করিয়া এইবার একটা উত্তর দিয়া ফেলিল। সে বলিল, "ইরাণীরা যত দিন এ অঞ্চলে আছে, তত দিন অভিভাবকহীনা স্ত্রীলোকের পক্ষে দিল্লীতে বাস করা অসম্ভব।" বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পদ্মিনী বলিল, "কেন বাবুজী? দাদী বলেছে, আমরা আর তোমাকে ছেড়ে থাক্‌বো না।" আবার বিষম লজ্জা আসিয়া আনন্দরামকে অভিভূত করিল, তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পদ্মিনী কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, খাঁসাহেব মুসলমান ব'লে কি আমাদের বাড়ীতে থাকবেন না? গোলাপী দিদি তু হিন্দু!" গোলাপী কোথায় যাইবে, আক্রম জমান কোথায় থাকিবেন, এ প্রশ্ন এত দিন আনন্দরামের মনে উদয় হয় নাই, কিন্তু সে যে দিন পদ্মিনীকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিল, এবং তাহার নব-যৌবনোদ্ভাসিত অনিন্দ্যসুন্দর দেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ঘোড়ায় উঠাইয়া লইয়াছিল, সেই দিন হইতে আনন্দরাম তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! স্বভাবতঃ আশ্রিত রক্ষকের প্রতি পদ্মিনী অতিশয় অনুরক্তা হইয়াছিল, কিন্তু আনন্দরামের মনে ভাবে ও প্রতিভাবে যে বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, পদ্মিনী সে কথা একবারেই ভাবে নাই। সে মনে করিয়াছিল যে, তাহারা আবার তাহাদের গৃহে ফিরিয়া যাইবে, ইরাণীরা দেশে ফিরিয়া যাইবে, দিল্লীতে আবার পূর্ব্বের মত সুখশান্তি ফিরিয়া আসিবে এবং বাবুজী যেমন তাহাদের বাড়ীতে থাকিত, চিরদিনই তেমন ভাবে থাকিবে। আনন্দরাম ভাবিত যে, সে বাঙ্গালী কায়স্থ, দেশে তাহার আত্মীয়স্বজন আছে, সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে; পদ্মিনী পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়াণী, বালবিধবা; পদ্মিনীকে সে কিছুতেই হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ করিতে পারে না, এবং অন্য মতে বিবাহ করিলে বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া গিয়া সমাজে বাস করিতে পারিবে না। অথচ সরলা রূপসী প্রেমময়ী পদ্মিনী তাহাকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে যে, তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব! পদ্মিনী এখন আবার তাহার মনে একটা নূতন কথার উদয় করিয়া দিল, বাঙ্গালা দেশে সুজাউদ্দীন খাঁ মৃত, অপরিণতবয়স্ক সর্‌ফরাজ খাঁ নবাব, মহম্মদ শাহের এমন শক্তি নাই যে, তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের এক জন শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তে আর এক জন নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালা দেশে ফিরিলে আক্রম জমানের মৃত্যু নিশ্চয়। আর গোলাপী!—হতভাগিনী বাল-বিধবা যৌবনে দ্বি-চারিণী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা, সে কোথায় যাইবে? আনন্দরামকে অন্যমনস্ক দেখিয়া পদ্মিনী বলিল, "বাবুজী, তোমার জন্য বাঙ্গালা খয়ের দিয়ে পাণ সেজে আনি।" পদ্মিনীর কথার আওয়াজে আনন্দরামের চমক ভাঙ্গিল, তাহার মন হইতে আক্রম জমান ও গোলাপীর কথা দূর হইয়া গিয়া পদ্মিনী তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিল, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুদ্‌বেগে শোণিত প্রবাহিত হইল, সহসা আনন্দরাম পদ্মিনীময় হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই পদ্মিনী ফিরিয়া আসিল। অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা, এত দিনের প্রবল তৃষ্ণা আনন্দরামকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, সে এমন ভাবে পদ্মিনীর মুখের দিকে চাহিল যে, সে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার হাতের পাণের ডিবা পড়িয়া গেল, কিন্তু পদ্মিনী পলাইল না, সে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া আনন্দরামের পাশে বসিয়া পাণ তুলিতে লাগিল। তখন তাহার শুভ্র সুন্দর মুখে পদ্মরাগের লীলা আনন্দরাম একমনে দেখিতে দেখিতে তাহার একখানি হাত তুলিয়া লইল। লজ্জায় অবনত হইয়া পদ্মিনী মুখ ফিরাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী হাসিয়া উঠিল। সে হাসির শব্দে আনন্দরামের চমক ভাঙ্গিল, সে-ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া বসিল, নিজের মনের অবস্থা গোপন করিবার জন্য আনন্দরাম ভাণ করিয়া লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মি, তুই হাস্‌লি কেন? খাঁ সাহেবের ঘুম যে ভেঙ্গে যাবে!" লক্ষ্মী আবার হাসিয়া উত্তর দিল, "দিদি যে কেমন ক'চ্ছে বাবুজী!" তাহার কথা শুনিয়া পদ্মিনী আরও জড়সড় হইয়া গেল; লক্ষ্মী আবার হাসিয়া উঠিল। সকল দিক্ সামলাইবার জন্য আনন্দরাম পদ্মিনীকে বলিল, "কৈ, পাণ এনেছ?" সর্ব্বাঙ্গের বস্ত্র টানিয়া, মাথার কাপড় আরও টানিয়া দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া

পদ্মিনী বলিল, "এই যে এনেছি, প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে তুলছি।" এই সময়ে আক্রম জমানের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ?" পদ্মিনী আনন্দ-রামের পায়ের কাছে পাণ ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। লক্ষ্মী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। খাঁ সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, বাবুজী ?" বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আনন্দরাম বলিল, "এখন কি উপায় সাহেবজাদা! আপনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা কোথায় যাই ? বাঙ্গালা দেশ এখন আপনার শত্রুপুরী, আমাদের বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতকগুলি সবাই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।" আক্রম জমানের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বাবুজী, যত দিন মদের নেশায় অচেতন থাক্‌তুম, তত দিন ভাববার ক্ষমতা ছিল না। বহিন নূরবাঈ আবার আমাকে মানুষ করেছে। যত দিন মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছি, তত দিন ধ'রে ভাবছি। আজ ভবিষ্যতের পথ স্থির করেছি।" সাগ্রহে আনন্দরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্থির করেছেন ?"

"স্থির করেছি যে, এই দেশেই থাকবো, বাঙ্গালাদেশে আর ফিরবো না।"

"আর সাহেবজাদা ?"

গোলাপীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো বাবুজী ? তার জন্য ভেবো না। আমি জানি যে, তুমি তাকে বড় বহিনের মত ভালবাসো। আমি গোলাপীকে নিকা করবো, তাকে কুলত্যাগ ক'রে আনিয়েছি বটে, কিন্তু এখন থেকে সে কুলবধূ।"

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া আনন্দরাম সাহেবজাদা আক্রম জমান খাঁর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার দুইটি হাত ধরিল, আক্রম জমান তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ থেকে এ সম্মান আর আমাকে দেখিও না, বাবুজী। তুমি বার বার আমার জীবন রক্ষা করেছো, আমাকে যদি মেহেরবানী ক'রে ভাই বল, তা হ'লেই চিরকৃতার্থ হব। তুমি দেশে ফিরে যাও, আল্লা তোমার উন্নতি করবেন।" আলিঙ্গন ছাড়াইয়া শুষ্কমুখে আনন্দরাম বলিল, "বাঙ্গালা দেশে আমারও স্থান নাই, সাহেবজাদা!" আক্রম জমান হাসিয়া বলিলেন, "তা অনেক দিন ধ'রেই বুঝেছি।" আনন্দরাম আবার লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন আক্রম জমান বলিলেন, "ভাই সাহেব! একবার নূরবাঈয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে, আর একবার হজরৎ-ই-আলা দীন পনাহ্ ফকীর লুৎফুল্লা শাহ সাহেবের দর্শন চাই।—বাবুজী, আমি গোলাপীর মুখে সমস্তই শুনেছি!" আনন্দরাম একটা কায পাইয়া বাঁচিল, সে বলিল, "চলুন, এখনই যাই; তবে পোষাকটা বদ্‌লাতে হবে!" [ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদায়-প্রার্থনা

তোমরা মোরে বিদায় দিও ভাই,
দিন-শেষের ক্লান্ত রবির মত!
কর্ম্মশেষে এখন ফিরে যাই,
ভুলিও মোর অক্ষমতা যত।
এই রজনীর মলিন চাঁদের আলো,
ঢাক্‌ল' আমার মলিন হিয়া-খান্।
কাট্‌ল' প্রাণের অনেকখানি কালো;
মিলন-মেলা হয় যে অবসান!
তোমরা মোরে বিদায় দিও ভাই,
নীরব গেহে আজকে ফিরে যাই!

শিউলি-ঝরা সান্ধ হ'ল আজ—
পাকা ধানের লহর খেলে মাঠে।
বিদায়-ব্যথা ভুলায় সকল কাজ;
দিবসগুলি হেলায় আজি কাটে।
চোখের চাওয়া বুকের কাঁটা হয়;
স্মৃতির ভারে শীর্ণ হ'ল প্রাণ।
কান্না উঠে সারা পরাণময়—
মিলন-মেলা হয় যে অবসান!
বাঁধন কাটি' আজকে সখা, তাই—
বিদায় দিও নীরব গেহে যাই!

সবাই চাহে অবজ্ঞারি ভরে
দরিদ্র এ হিয়ার বেদনায়।
তোমরা দিলে পাত্রখানি ভ'রে
পরম স্নেহে সরল করুণায়!
আনন্দ তাই উছলে' উঠি' বুকে,
জাগায় ধীরে সুখের মৃদু গান।
আজকে কেন ব্যথার কথা মুখে?
মিলন-মেলা হয় যে অবসান!
তাই ত সখা, ব্যথার গাথা গাই—
বন্ধু, আজি বিদায় দিও ভাই!

এমনি ক'রে সারাজীবন ধ'রে
তাপিতেরে দিও শীতল স্নেহ;
মোরে যেমন দিলে পরাণ ভ'রে
তৃপ্ত হ'ল সকল মন-দেহ।
বিদায়-দিনে ব্যথার স্মৃতিখানি
সকল ছাপি' রইবে চিরম্লান!
তোদের হাসি, তোদের প্রীতিবাণী
পূর্ণ করে শূন্য হিয়া-খান্।
আজকে তবু বিদায় দিও ভাই,
নীরব গেহে শূন্যমনে যাই!

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী।

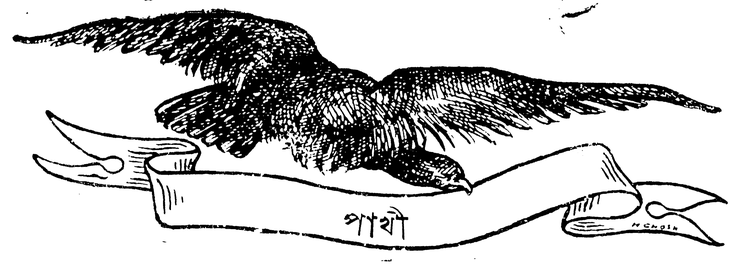

ফল-ফুলের উদ্যান রচনা করিতে গেলে প্রতিপদে কত বিঘ্ন, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভালরূপেই জানেন। বীজ-রোপণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষ ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া পর্য্যন্ত, প্রাকৃতিক উৎপাত ব্যতীত কীট-পতঙ্গাদির তীব্র আক্রমণ যে কি ভীষণ, তাহা প্রত্যেক উদ্যান-রচয়িতা অবগত আছেন। বৈজ্ঞানিক বলেন, এই সকল উৎপাত হইতে ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি পক্ষিকুল বৃক্ষ-লতা, ফল-পুষ্প, শাক সব্জী প্রভৃতি রক্ষা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে যাহারা চাষবাস করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে, সাধারণতঃ তাহারা নিরক্ষর। সুতরাং চাষের পক্ষে পক্ষীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

প্রতীচ্য জগৎ জ্ঞানবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। তথায় সকল বিষয়েই বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। আমেরিকায় এ জন্য সুবৃহৎ বিদ্যালয়, গবেষণাগার প্রভৃতিও আছে। তাঁহারা প্রতিদিন সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইতেছেন।

বৃক্ষের প্রধান শত্রু কীট-পতঙ্গ। এই কীট সকল এমনই বুদ্ধিজীবী যে, পাছে তাহাদের শত্রুরা তাহাদিগকে ধ্বংস করে, এ জন্য বৃক্ষত্বকের অন্তরালে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৃক্ষের রস ও মর্ম্ম ভক্ষণ করিতে থাকে।

বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টি-প্রণালীও বিচিত্র। এই কীট-পতঙ্গকে ধ্বংস করিবার জন্য পক্ষীরও সৃষ্টি। কাঠঠোকরা-জাতীয় পক্ষীরা বৃক্ষের ত্বক্ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ চঞ্চুর সাহায্যে সেই সকল কীটের সন্ধান পায় এবং মনের সুখে কীট ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং এই জাতীয় পাখী বৃক্ষের শত্রুও বটে, আবার পরম মিত্রও বটে; কিন্তু শত্রুতার তুলনায় তাহাদের মিত্রতার মূল্য অনেক অধিক।

কাঠঠোকরা ব্যতীত আরও বহু জাতীয় পক্ষী মানব-সমাজের হিতসাধন করিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে কাক অতি কুৎসিত পক্ষী বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাক মানবসমাজে স্বাস্থ্যরক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকে। যেখানে যত প্রকার পচা অথবা অপকারী পদার্থ দেখিতে পাইবে, কাকপক্ষী নির্বিচারে তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

মার্কিণ বৈজ্ঞানিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা করিতেছেন। আমাদের দেশে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ, যদি তাঁহারা আমাদের দেশের পক্ষিজাতির চরিত্র, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তাহা হইলে কৃষিজীবী ভারতবর্ষের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন।

মার্কিণদেশীয় কতিপয় পক্ষীর চিত্র সহ তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল।

ভেস্‌পার স্প্যারো বা চড়ুই পাখী:—

এই পাখীর দৈর্ঘ্য ৬ ইঞ্চি। ইহার পুচ্ছে শ্বেত চিহ্ন থাকায় এই জাতীয় অন্য পক্ষী হইতে ইহাদিগকে চিনিতে পারা সহজ।

দক্ষিণ-কানাডা হইতে ওরিগন্, আরিজোনা, টেক্‌সাস্ প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইহাদিগকে

DOUBLE COLOUR PAGE

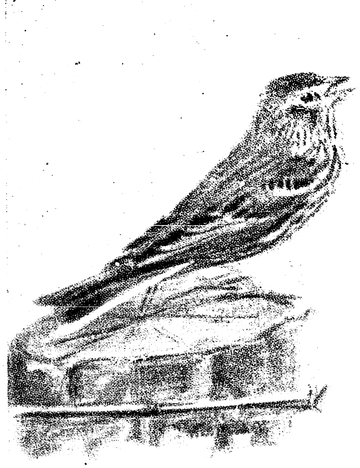







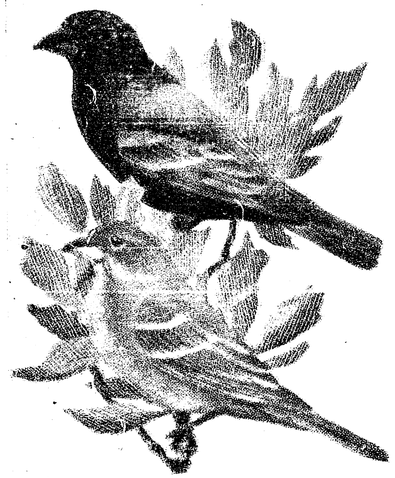





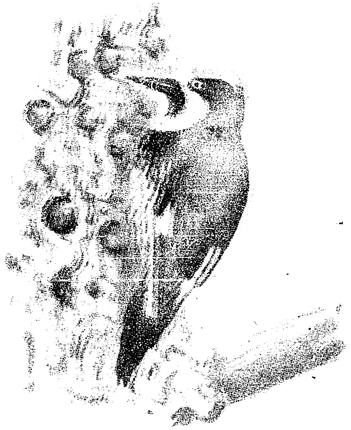

COLOUR ILLUSTRATION

দেখিতে পাওয়া যায়। মন আকৃষ্ট হইতে পারে, এমন কিছুই এই পাখীর দেহে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহারা উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রে প্রায়ই বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের কণ্ঠস্বর যেমন মধুর, তেমনই করুণ। এত করুণ যে, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। অপরাহ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের কণ্ঠ হইতে গীতধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। আর কোনও পাখী অপরাহ্ণে গান করে না।

শীতকালে ইহাদের ভোজ্য শুধু ফলমূল, শস্য। গ্রীষ্মকালে কিন্তু কীটপতঙ্গ ছাড়া ইহারা সাধারণতঃ অন্য কিছু ভক্ষণ করে না। তুলার শত্রু যে সকল কীটপতঙ্গ আছে, ভেস্পার স্প্যারো তাহাদের যম। এ জন্য আমেরিকার বহু চাষী এই জাতীয় পক্ষীকে অত্যন্ত ভালবাসে। প্রকৃতই কৃষকের ইহারা পরম বন্ধু।

নীল গ্রস্‌বিক্‌ঃ—

ইহার দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি। 'ইণ্ডিগো' পক্ষীও নীলবর্ণের, কিন্তু আকারে এত দীর্ঘ হয় না। দক্ষিণ-যুক্তরাজ্য, কালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস।

এই পাখীকে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ করা যায় না। ইহারা বড়ই লজ্জাশীল এবং আত্মগোপনপরায়ণ। ঝোপ-ঝাড়, কুঞ্জবন ইহাদের পরম প্রীতিপ্রদ স্থান। ইহাদের কণ্ঠোত্থিত কলধ্বনি অতিমৃদু এবং মধুর।

কীটপতঙ্গাদিই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। ফল ও শস্যও ইহারা উপেক্ষা করে না। তবে তাহার পরিমাণ কীটপতঙ্গাদির এক তৃতীয়াংশ।

কার্ডিনাল—

দৈর্ঘ্য সাড়ে ৮ ইঞ্চি। ইহার লোহিত দেহবর্ণ সহসা দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-ভাগে এবং টেক্‌সাস্ প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার দেহের ঔজ্জ্বল্য, সুঠাম আকৃতি, শীর্ষস্থ চূড়া যেমন মনোজ্ঞ, ইহার কণ্ঠস্বরও তেমনই সুস্পষ্ট ও মধুর। লীলায়িত দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং মনোরম ঝোপঝাড়ে, ইহারা কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উদ্যানে খাদ্যের সংস্থান ও গৃহে বাসস্থানের সুযোগ দিলে এই পাখী সহজেই মানুষের পরম মিত্ররূপে তাহার নিকটেই বসবাস করিবে।

কার্ডিনাল খাঁচায় পুষিয়া রাখিবার পাখী। আইন করিয়া এই পাখীকে বাঁচাইয়া রাখা হইতেছে। অধুনা এই পাখী সাধারণতঃ কেহ বিনা অনুমতিতে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারে না। পূর্ব্বে ইহার পালকে টুপীর শোভা সম্পাদিত হইত, তজ্জন্য অসংখ্য পাখী জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। এখন আর তাহা হইবার উপায় নাই।

কার্ডিনাল প্রধানতঃ উদ্ভিদ্‌ভোজী। কিন্তু কীটপতঙ্গাদিও ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। কোনও মার্কিণ পক্ষিতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, এই পাখী শস্যের যতটুকু অপকার করে, তাহার অন্ততঃ পঞ্চদশগুণ উপকার করিয়া থাকে।

কালিফোর্ণিয়া ফোয়েল ঃ—

এই পাখীর দৈর্ঘ্য সাড়ে নয় ইঞ্চি। ইহার মাথায় ঝুঁটি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এবং ওরিগণের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পাখী শিকারের যোগ্য। ইহারা যখন রৌদ্রালোকিত স্থানে ঝুঁটি আন্দোলিত করিতে করিতে বিচরণ করে, সে দৃশ্য অত্যন্ত নয়নাভিরাম।

ইহারা বৃক্ষের উপরিভাগে নীড় রচনা করে, ভূমিতলে নহে। বৃক্ষচূড়ায় অবস্থান করে বলিয়া শিকারীর গুলী হইতে ইহারা অনেক সময় আত্মরক্ষা করিতে পারে।

মাছরাঙ্গা—

এই পাখী সাধারণতঃ ১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম আলাস্কা এবং মধ্য-কানাডায় ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ কলম্বিয়া, নেব্রাসকা, ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, ওহিও, ভার্জ্জিনিয়া, কলম্বিয়া এবং গায়েনা প্রভৃতি স্থানে শীতকালে এই পাখী দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

মাছরাঙ্গার ডাক এমনই বিচিত্র যে, অন্য কোন পাখীর শব্দের সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। ইহার উড়িবার প্রণালী, মাছের পশ্চাতে ধাবিত হইবার ভঙ্গী—সবই বিচিত্র। ইহা কোনও পক্ষীর অনুকরণ করে না।

ইহার পক্ষী ভ্রাতারা জীবনধারণের জন্য কীট-পতঙ্গাদি ধরিয়া ধরিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই মাছরাঙ্গা পাখী অতি প্রাচীন কাল হইতেই আবিষ্কার করিয়াছিল যে, কীট-পতঙ্গ অপেক্ষা মৎস্য শিকার করা সহজসাধ্য। এ জন্য তাহারা ধীবরের স্থানই অধিকার করিয়া আসিতেছে। বৃক্ষের কোটরে বাস করার পরিবর্ত্তে মাছরাঙ্গা কোনও জলাশয় অথবা তটিনীর তীরবর্ত্তী বালুকার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যে জলাশয়ের ধারে মাছরাঙ্গার নীড় আছে, বুঝিতে হইবে, তথায় মৎস্যও প্রচুর।

রক্তশীর্ষ কাঠঠোকরা—

ইহার দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৯½ ইঞ্চি। দক্ষিণ-কানাডা হইতে উপসাগরের তীরভূমি পর্য্যন্ত, মধ্য-মণ্টানা, মধ্য-কলোরেডো এবং টেকসাসে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বভাবতঃ এই জাতীয় কাঠঠোকরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে ভালবাসিলেও ইহারা শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কোনও ঋতুরই অধীন নহে। যেখানে প্রচুর খাদ্য, কাঠঠোকরাও সেইখানে থাকিবে। ইহারা কীট-পতঙ্গ ভক্ষণ করিলেও ফল-মূলেরই বেশী পক্ষপাতী। যে কোনও শস্যের শীর্ষভাগ, আতা, আপেল প্রভৃতি ফল ইহাদের পরম প্রিয় বলিয়া কথিত আছে। আরণ্য পক্ষীর নীড়স্থিত ডিম্ব ইহারা নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়া ইহাদের নামে অপবাদ আছে। টেলিগ্রাফের থামগুলিও ইহারা নষ্ট করিয়া ফেলে। এই অপবাদ অযথার্থ নহে। প্রকৃতই কাঠঠোকরার দ্বারা এ সকল অনিষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তগুম্ফ ফ্লিকার—

এই পাখীর দৈর্ঘ্য ১২ হইতে ১৪ ইঞ্চি। ইহার গুম্ফ রক্তবর্ণ। বৃটিশ কলম্বিয়ার দক্ষিণ হইতে মেক্সিকো, ওরিগণ, ওয়াশিংটন এবং কালিফোর্ণিয়ার অনেক অঞ্চলে এই জাতীয় পক্ষীর বাস। ফ্লিকার প্রায় ১ শত ২৪ প্রকারের আছে। ইহাকে প্রত্যক্ষ করা সহজ নহে, সর্ব্বদাই পত্রান্তরালে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহার কাকলী শুনিয়াই মানুষ ইহার অবস্থান বুঝিতে পারে। ফ্লিকার বড়ই লাজুক, অনেকে ইহার মাংস খাইতে ভালবাসে, সে জন্য ইহারা সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। আত্মরক্ষা-নীতিই ইহাদিগকে লাজুক করিয়া তুলিয়াছে। কাঠঠোকরার জ্ঞাতি হইলেও ফ্লিকার পাখী স্বভাবে ও আকারে ভিন্ন। কাষ্ঠে ছিদ্র করিবার যদিও ইহাদের চঞ্চু উপযোগী নহে, তথাপি ইহারা ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অট্টালিকার পর্য্যাপ্ত ক্ষতি করিয়া থাকে। নানাজাতীয় উই, পিপীলিকা প্রভৃতি ইহাদের ভক্ষ্য। সাধারণতঃ ইহারা ঐ উপায়েই জীবনধারণ করিয়া থাকে।

কালিফোর্ণিয়া কাঠঠোকরা—

ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৯ ইঞ্চি। মসীকৃষ্ণ বর্ণের দ্বারা ইহাকে অন্য কাঠঠোকরা হইতে সহজে চিনিতে পারা যায়। ইহার ললাট শ্বেত, কণ্ঠে শুভ্র দাগ, উদর ও ডানায় শ্বেতচিহ্ন। ওরিগনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে কালিফোর্ণিয়া, আরিজোনা, নূতন মেক্সিকো, নিম্ন-কালিফোর্ণিয়া এবং কষ্টারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানে এই জাতীয় কাঠঠোকরা দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিফোর্ণিয়া কাঠঠোকরা অত্যন্ত ক্রীড়াচঞ্চল ও শব্দকারী পক্ষী। ওক-গাছেই সাধারণতঃ ইহারা বাস করে। ইহারা চপল শিশুর ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে তাড়া করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বইসে। কালিফোর্ণিয়ার বহু পল্লী-বিদ্যালয় গ্রীষ্মকালে বন্ধ থাকে। সেই সময় ইহারা বাতায়ন প্রভৃতি ছিদ্রবহুল করিয়া তুলে।

ফ্লিকার—

এই পাখী প্রায় ১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার ডানার নিম্নভাগ ও পুচ্ছ পীতাভ। যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বভাগ এবং কানাডা ও আলাস্কার অরণ্যবহুল স্থান ইহাদের বাস-ভূমি। শীতকালে ইহারা যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বভাগেই সাধারণতঃ অবস্থান করে।

অরণ্য অপেক্ষা উন্মুক্ত প্রান্তরেই ফ্লিকার বাস করিতে ভালবাসে। যে সকল স্থানে অসংখ্য বৃক্ষ আছে অথচ মধ্যে মধ্যে ফাঁকা যায়গা বিদ্যমান, সেইরূপ স্থানই

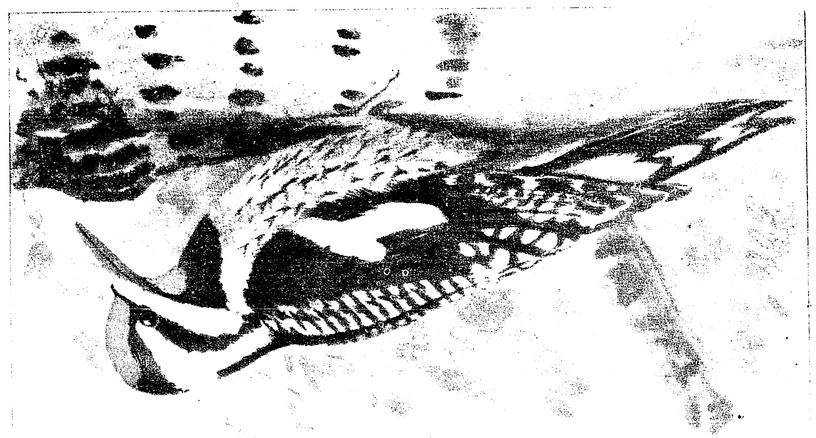

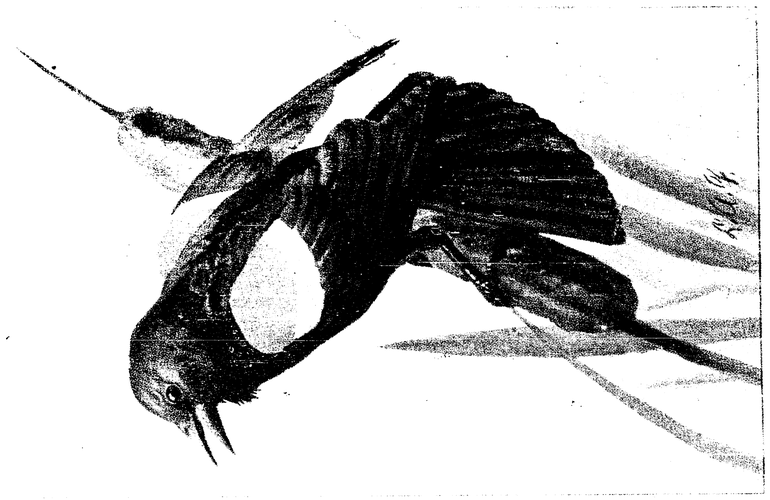

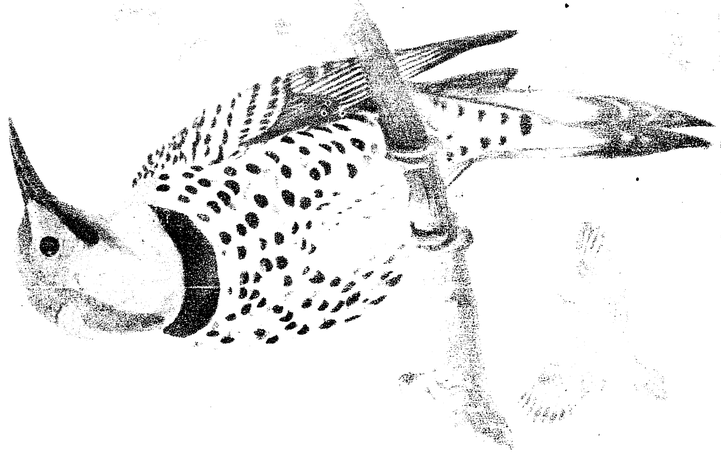



COLOUR ILLUSTRATION

ইহাদের কাছে প্রেয়। যে সকল বৃক্ষে ফাট ধরিয়াছে বা ফোকর আছে, সেইখানেই ইহারা নীড় রচনা করিয়া থাকে।

কীটপতঙ্গাদিই ইহাদের প্রধান উপজীব্য। ইহাদের পিপীলিকাপ্রীতি প্রসিদ্ধ। জনৈক পক্ষিবিদ ৬ শত ৮৪টি ফ্লিকার পক্ষীর পাকস্থলী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে ৫ শত ২৪টির মধ্যে শুধু পিপীলিকাই পাওয়া গিয়াছিল। একটি পাখীর পাকস্থলীতে ৫ হাজার, অপর দুইটির মধ্যে ৩ হাজার করিয়া পিপীলিকা ছিল। পিপীলিকার পরই আরণ্য-ফলের ইহারা ভক্ত।

পীতোদর স্যাপ্‌সকার—

দৈর্ঘ্যে ইহারা সাধারণতঃ সাড়ে ৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহাদের শীর্ষদেশ হইতে চঞ্চুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত গাঢ় রক্তবর্ণ। বক্ষোদেশ কৃষ্ণবর্ণ।

ইহারা শীতকালে যুক্তরাজ্যের সর্ব্বস্থানে এবং কষ্টারিকায় যাপন করে; অন্যান্য সময় কানাডার দক্ষিণাঞ্চল ও যুক্তরাজ্যের উত্তরভাগে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পীতোদর স্যাপ্‌সকার অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত এবং মিতভাষী। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে বুঝিতে পারিলেই সে দর্শক ও আপনার মধ্যে অন্ততঃ একটি বৃক্ষকেও ব্যবধান করিয়া লইবে।

এই পাখী বৃক্ষের পরম শত্রু। সর্ব্বক্ষণই কোন না কোন বৃক্ষ ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। চারা গাছ ইহার আক্রমণে অকালে নষ্ট হইয়া যায়। বন্যগাছের ফল ও বৃক্ষের ত্বকের অন্তরালস্থিত শস্য ইহার প্রধান খাদ্য। এই পাখী মানুষের বিশেষ কাযে লাগে না এবং যথেষ্ট অনিষ্টই ইহার দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে।

মেডো লার্ক—

ইহার দৈর্ঘ্য পৌনে এগার ইঞ্চি। যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ-কানাডা, মেক্সিকো, কষ্টারিকা প্রভৃতি স্থানে ইহাদের প্রাদুর্ভাব। তৃণশ্যামল ভূমি অথবা পাহাড়ের যে সকল স্থান তৃণগুল্মসমাচ্ছন্ন, নিকটে ঝরণা, উৎস অথবা জলাশয় থাকিলে, তথায় 'মেডো লার্ক' নীড় রচনা করিবে। দুই শ্রেণীর মেডো লার্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমভাগে যাহারা জন্ম-গ্রহণ করে, তাহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ, পরিষ্কার এবং অত্যন্ত মধুর। পূর্ব্বভাগে যে মেডো লার্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কণ্ঠরব তেমন উচ্চ ও মধুর নহে।

কোন কোন স্থানে এই জাতীয় পক্ষী শিকারীর গুলীতে নিহত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পাখী কীট-পতঙ্গ যে ভাবে ধ্বংস করিয়া থাকে, তাহাতে উহাকে শিকার করা অত্যন্ত দূষণীয়। যাহারা কৃষিজীবী, তাহারা মেডো লার্ককে কখনও ধ্বংস করিতে চাহিবে না।

বল উইভিল নামক কীট তূলার ভীষণ শত্রু। এক জাতীয় গুব্‌রে পোকা আছে, তাহারাও তূলার গাছ নষ্ট করিয়া থাকে। মেডো লার্ক এই সকল কীটপতঙ্গ বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করে। সুতরাং চাষীর পক্ষে মেডো লার্ক প্রয়োজনীয় পক্ষী।

রক্তপক্ষ কালোপাখী—

এই পাখী প্রায় সাড়ে নয় ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়া থাকে। মেক্সিকো ও উত্তর-আমেরিকা অঞ্চলে ইহা-দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মিসিসিপির তটভূমিতে রক্তপক্ষ কালোপাখী প্রায় নীড় রচনা করিয়া থাকে।

ইহারা কীটপতঙ্গ এবং ফল ও শস্য ভোজন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কীটপতঙ্গ শতকরা ২৭ ভাগ এবং ফল-শস্যাদি বাকি ৭৩ ভাগ। ইহারা অনেক সময় শস্যের প্রভূত অপকার করিয়া থাকে, কারণ, ইহারা শস্যবীজ অত্যন্ত ভালবাসে।

জলের উপরিভাগে প্রায় ১ ফুট উচ্চ কোনও লতাগুল্মের অন্তরালে ইহারা নীড় রচনা করিয়া থাকে এ জন্য জলাভূমি ব্যতীত ইহারা সাধারণতঃ অন্যত্র থাকে না।



প্রাচীন ভারতে নারীর সম্মান

হিন্দু-সমাজে নারীর সম্মান কিরূপ উচ্চ, বর্ত্তমান কালে তাহার আলোচনা করা অত্যন্ত বিড়ম্বনাজনক হইয়া পড়িয়াছে। তিনটি প্রবল কারণে এই বিড়ম্বনার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম কারণ, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজের অবনতি এবং হিন্দুর আদর্শ হইতে হিন্দুর মনোভাবের বিচ্যুতি। দ্বিতীয় কারণ, পাশ্চাত্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিরোধী এবং অনেকটা প্রতিকূল আদর্শের আমদানী; তৃতীয় কারণ, শিক্ষার অভাব এবং কু-শিক্ষার প্রভাব। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত জটিল।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। এক একটা সমাজ এক একটা আদর্শ লইয়াই গঠিত হইয়া থাকে। তাহার সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান যাহাতে সেই আদর্শ-লাভের সহায়তা করে, সেই ভাবেই পরিকল্পিত হয়। আদর্শের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া যে সমাজের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি রচিত না হয়, সে সমাজ কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। বিপ্লব দ্বারা বিনাশই সেই সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যাহাই বলুন না কেন, আমাদের ধারণা, প্রাচীন হিন্দু-সমাজ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং তাহার আদর্শের সহিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষ সঙ্গতি ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সমাজের আদর্শ লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার স্থান নাই। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ মনে করিতেন যে, আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনই মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কর্ম্ম দ্বারা সাত্ত্বিকভাবের উৎকর্ষসাধনই মানব-জীবনের প্রধান কার্য্য। যতদূর সম্ভব সাত্ত্বিক ভাবের উৎকর্ষসাধন করিয়া শেষে গুণাতীত হইতে পারিলেই মানুষ মুক্ত হইতে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই সাধনার ফল মানবদেহের সহিত বিলুপ্ত হয় না। কর্ম্মফল বা সাধনার ফল যেমন পরজন্মে মানুষকে উত্তম বা অধম গতি প্রদান করে, তেমনই অন্যদিকে মানুষের বংশধারাকে উন্নত বা অবনত করিয়া থাকে। আর্য্যগণ বৈদিক শক্তি বা কৌলিক শক্তিতে (Heridity) অতিশয় আস্থাবান্ ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা বীজের অর্থাৎ বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, যাহা আত্মার উন্নতির অবরোধক বা হানি-জনক, তাহাই পাপ। বংশধারায় পবিত্রতা-রক্ষাই তাঁহাদের মতে আত্মার কল্যাণসাধক; সুতরাং উহা পুণ্যকার্য্য। সেই জন্য তাঁহারা নারীজাতির সতীত্বের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহাদের মতে নারীজাতিই জগদম্বার মূর্ত্তি, সতী নারী সাক্ষাৎ ভগবতী। ভগবতীর স্তবে ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"

হে দেবি দুর্গে! এ জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে, তাহা তোমারই অংশ এবং এ জগতে যত নারী আছেন, তাহা তোমা-রই বিভিন্ন মূর্ত্তি। অর্থাৎ নারীমাত্রই বিশ্বজননীর প্রতিমূর্ত্তি।

সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, হিন্দুজাতি নারীজাতিকে সম্মান করিতে জানেন না, অথবা নারীজাতিকে কেবল দাসী বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ। তাঁহারা হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব কিছুই বুঝেন না। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, নারীমাত্রই পুরুষের পূজ্যা। এ সম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের মন দিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন :—

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।"

যাঁহারা বহু দিক হইতে কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, এরূপ পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর প্রভৃতি যেন তাঁহাদের সংসারের নারীদিগকে পূজা অর্থাৎ সম্মান করেন, এবং বস্ত্র, অলঙ্কার ও খাদ্যদানে সন্তুষ্ট রাখেন। সুতরাং পত্নী পতিরও পূজ্যা। ইহা মনুরই কথা। অপিচ—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।"

যে সংসারে নারী পূজিতা হইয়া থাকেন অর্থাৎ যথাযোগ্য সম্মান পাইয়া থাকেন, সে গৃহে দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন। পক্ষান্তরে, যে গৃহে নারীজাতির সম্যক্ সম্মান করা হয় না, সে গৃহে সমস্ত ক্রিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। তৎপরে মনু আবার বলিয়াছেন :—

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।"

যে গৃহে বা যে বংশে নারীজাতি নির্য্যাতিত হয়েন বা দুঃখ পায়েন, সে গৃহের বা বংশের অতি শীঘ্রই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; পক্ষান্তরে, যে বংশে নারীরা কোনরূপ মনঃকষ্ট ভোগ না করেন,

DOUBLE COLOUR PAGE

অর্থাৎ হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিয়া থাকেন, সে বংশ সকল সময়েই সমৃদ্ধিশালী হইতে থাকে।

মনু এইরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন। সকল কথা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল না। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন।—যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

"ভর্ত্তৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-জ্ঞাতি-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥"

অর্থাৎ কুলবধূর পতি, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতিবর্গ, শাশুড়ী, শ্বশুর, দেবর এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই ভূষণ, বসন এবং অশন অর্থাৎ খাদ্য প্রদান দ্বারা পূজা করিবেন। বউকাট্‌কী শাশুড়ী-দিগকে এই কথা বিশেষভাবে শুনাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুতরাং যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা নারীজাতিকে দাসী করিয়া রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হিন্দুরা নারীজাতিকে যেরূপ সম্মান করিয়া থাকেন, অন্য কোন দেশের কোন জাতি নারীজাতিকে সেরূপ সম্মান করেন না। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কিছু দিন পূর্ব্বে মিস্ মেয়ো নাম্নী জনৈক প্রগল্‌ভা মার্কিণী মহিলা ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণকালে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি সেই গ্রন্থখানি কেবল যে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগে পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের মর্ম্ম না বুঝিয়া নিজ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতবাসীদিগকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়া-ছেন। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া মার্কিণের এবং বৃটেনের অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি ভারত সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রতিকূল ধারণা করিয়া বসিতেছেন। ইহাতে ভারতবাসীর যে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এই মহিলাটি লিখিয়াছেন যে, ভারতের লোকরা পত্নীদিগকে কামকিঙ্করী মনে করে, এবং পত্নীরা পতিপূজা করিয়া থাকে। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমেরিকা-প্রবাসী কয়েক জন ভারত-বাসী এই কথায় লজ্জিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারতে পতিপূজা ইদানীং কমিয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহাদের অজ্ঞতাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদের জানা উচিত ছিল যে, ভারতে যে হিসাবে পতিপূজা প্রবর্ত্তিত আছে, সেই হিসাবে পত্নী-পূজা ও নারী-পূজাও প্রচলিত রহি-য়াছে। এ দেশে নারী মহাশক্তির মূর্ত্তি বলিয়াই সম্পূজিতা হইয়া থাকেন। এয়োসংক্রান্তির ব্রত, কুমারীপূজা, সধবাদিগকে ভোজন করান প্রভৃতি যে সকল ব্রত ও অনুষ্ঠান আছে, তাহাতে নারী-পূজার ব্যবস্থা আছে। দুর্গাপূজা এই চরাচর-বিশ্ব-প্রসবিনী আদ্যাশক্তির পূজা; উহাতে কুমারীপূজাও করা হইয়া থাকে। কারণ, নির্ম্মল-চরিত্রা নারী বিশ্বজননীরই মূর্ত্তিভেদ। ভারত-বাসীরা নারীদিগকে এই ভাবে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, উহা য়ুরোপীয়ানদিগের বুদ্ধির ও কল্পনার অগোচর। সে দোষ আমাদের হইতে পারে না। ইংলণ্ডের এক জন মনস্বী ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন যে, য়ুরোপ তাহা-দের চিন্তার ক্ষেত্র হইতে ঈশ্বরকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। তাহারা এখন সুবিধাবাদী হইয়া উঠিয়াছে। যে জাতি পিতা এবং মাতার কর্ত্তব্য পরিহার পূর্ব্বক প্রবৃত্তির প্রবাহে ভাসিতে চাহে এবং তাহার উপায়বিধান করিবার জন্য আপনাদের উদ্ভাবিনী প্রতি-ভার বিনিয়োগ করে, তাহারা হিন্দুর আদর্শ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে,এরূপ আশা করাই ঘোর বাতুলতা। কিন্তু আমাদের দেশের হিন্দুবংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ যে হিন্দুর আচার, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ নহেন, অথবা বুঝিবার চেষ্টা করেন না, ইহাই অতীব বিস্ময়ের এবং লজ্জার বিষয়। তাঁহারা যদি উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

বংশধারার পবিত্রতা এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই প্রাচীন আর্য্য-গণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা প্রাকৃতিক বিধানের অনেক রহস্যই অবগত ছিলেন। পিতৃগুণ যে সন্তানে সংক্রমিত হয়, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। কেবল যে দৈহিক সাদৃশ্য ও গুণ সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, পিতৃপিতামহের মানসিক গুণ ও শক্তি সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে, ইহা আর্য্য-গণ তাঁহাদের গভীর গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন। পিতৃপুরুষগণ বহু পুরুষ-পরম্পরায় যে ভাবের, যে আধ্যাত্মিক শক্তির সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে। উহা সন্তানে সুপ্ত থাকিলেও লুপ্ত হইবার নহে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ-সাধন করিয়া গিয়াছেন, আমার শুদ্ধ-শোণিতে তাহার প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকিয়াই যায়। অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাশসাধন সম্ভবে, এবং বহুকাল ধরিয়া অনুশীলনের অভাবে তাহা অত্যন্ত সুপ্ত এবং পরিণামে লুপ্ত হইয়া যায়। সেই জন্য তাঁহারা কৌলিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতীত্ব-ধর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নারীজাতির ব্যভিচার দ্বারা সেই কৌলিক শক্তির বিপর্য্যয় ঘটে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপীয়গণ এই কৌলিক শক্তির প্রভাব স্বীকার করিতেন না, এখন কেবল তাঁহারা বহু তথ্যের অনুসন্ধান দ্বারা উহা অনেকটা স্বীকার করিতেছেন। প্রাচীন ঋষিগণ নারী-জাতির একনিষ্ঠা ও পতিব্রতা-ধর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়া-ছেন। স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির মধ্যে এ বিষয়ে প্রকৃতিগত প্রভেদও সর্ব্বদেশে লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি সাধারণতঃ একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। প্রকৃতি দেবী স্ত্রীজাতিকে অধিক স্নেহ, মমতা, অধিকতর ভালবাসিবার শক্তি এবং অধিকতর রক্ষণশীল করিয়াছেন বলিয়া দাম্পত্যজীবনে তাঁহারা একনিষ্ঠ হইয়াই থাকেন। পুরুষের নারীর ন্যায় একনিষ্ঠা নাই। তাঁহাদের ভালবাসিবার শক্তি, দাম্পত্যপ্রেমের দৃঢ়তা নারীজাতি অপেক্ষা অল্প। পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতির কোমলভাব ও লজ্জা-শীলতা অত্যন্ত অধিক। প্রকৃতি তাঁহাদের উপর সন্তান-পালনের ভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের কৌম্য-লতা, দৃঢ়তা, ভালবাসিবার শক্তি, শুশ্রূষা করিবার শক্তি, ধর্ম্ম-ভাবের প্রাবল্য, দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠা অধিক মাত্রায় দিয়া-ছেন। প্রকৃতি নারীজাতিকে অকারণে সে গুণ দেন নাই। কোন নারী যদি তাঁহার সেই নারীজন-সুলভ গুণগ্রাম উপেক্ষা করিয়া কুপথে প্রধাবিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি পুরুষ অপেক্ষা অধিক

ভীষণ হইয়া উঠিয়া থাকেন। মিষ্টার জে লায়োনেল টেলার তাহার প্রণীত Aspects of Social Evolution নামক গ্রন্থে এই সকল কথারই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার এবং অন্যান্য মনস্বীর উক্তি তুলিয়া এই প্রবন্ধটি অধিক ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। তবে নারীজাতি যদি নারীজনোচিত গুণগ্রাম পরিহার করিয়া উৎপথ-প্রতিপন্না হয়, তাহা হইলে তাহারা যে কিরূপ ভীষণা হইয়া উঠে, তাহা আমরা উল্লিখিত মিষ্টার টেলারের গ্রন্থ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"A drunken woman is more irretrievably drunken than the man, the harlot more debased than the libertine, women in business drive harder bargains. May there not be many industrial fields where, because of the competitive struggle, because of the greater roughness, because of the physical hardship, it is better wiser, and fitter to keep them in the hands of men? Womanly qualities are too precious to be risked rashly; they are allied too closely with higher advances in social development to be thrown carelessly away by thoughtless or dishonest disregard for them."

ইহার ফলিতার্থ এইরূপ :—"মদ্যপানে আসক্ত নারীচরিত্র সংশোধন করা মাতাল পুরুষের চরিত্র সংশোধন করা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন, বেশ্যার নৈতিক চরিত্র লম্পট পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর হীন হইয়া থাকে; ব্যবসায়-কার্য্যে নারীরা অধিকতর লাভ করিয়া থাকে। অনেক শ্রমশিল্পের কায প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, কর্কশভাবের স্ফূরক এবং দৈহিক বলসাধ্য বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে কেবল পুরুষ নিয়োগ করা অধিকতর কল্যাণসাধক, অধিকতর সমীচীন এবং অধিকতর উপযুক্ত; উহা অবশ্য না হইলেই ভাল হইত। নারী-সুলভ গুণাবলী অত্যন্ত মূল্যবান্, উহা হঠকারিতার সহিত বিড়-ম্বিত করা সঙ্গত নহে। নারীজাতির যে স্বাভাবিক গুণগ্রাম আছে, তাহা উচ্চ অঙ্গের এবং সামাজিক উন্নতিসাধক গুণেরই অনুকূল; অবিমৃষ্যকারিতার ও অসাধুতার সহিত উপেক্ষা করিয়া উহা নষ্ট করা সঙ্গত নহে।" ইহা এক জন মনস্বী এবং সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজের কথা। কথাগুলি সত্য। যাঁহারা নারী-চরিত্র বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। অনেক নারীও এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে হয় ত এ কথা মানিবেন না। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের বিবরণ অনুসন্ধান করিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। দুশ্চরিত্রা নারী যত পতিহত্যা করে, দুশ্চরিত্র নর তত পত্নীহত্যা করে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় য়ুরোপীয় নরনারীর চরিত্র নানা কারণে পরিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে সময়েও ইংলণ্ডে দেখা গিয়াছিল যে, যুবকদিগের অপেক্ষা যুবতীদিগের অধঃপতন অধিক হইয়াছিল। সেই সময়ে বিলাতের 'নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী এণ্ড আফটার' পত্রে এডিথ সেলার্স নাম্নী জনৈক মহিলা স্পষ্টই এই অধঃপতনসংঘটন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"According to them (their own mothers) the change is more markedly for the worse among the girls than among the boys; and in this they are in some respects right, I am inclined to think, judging by what I myself have seen and heard."

ইহার মর্ম্মার্থ এই :—"যুবক-যুবতীদিগের জননীদিগের মতে যুবকদিগের অপেক্ষা যুবতীদিগের হীনতার দিকে অধিকতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল,—ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে। আমি যতদূর দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহাতে আমারও মনে হইতেছে, তাহাদের সিদ্ধান্ত কতকাংশে সত্য।" এই লেখিকা যতটা পারিয়াছেন, নারীদিগের পক্ষ টানিয়া লিখিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, নীতিপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধঃপতন অধিক হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যগণ এ কথা বিশ্বাস করিতেন. তাঁহারা কৌলিক শক্তিতেও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা নারীজাতিকে, জাতির জননীদিগকে অতি সাব-ধানে ও সন্তর্পণে রক্ষা করিতেন। ইহাতে নারীজাতির পুরুষ অপেক্ষা হীনতা সূচিত হয় না, বরং মহত্ত্বই সূচিত হইয়া থাকে। লাটিন ভাষায় একটি অতিপ্রাচীন প্রবচন আছে— corrptis optimi pessima উহার অর্থ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ বিকৃত হইলে উহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া উঠে। এই উক্তি যে ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অত্যন্ত হিতকর। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে জীবের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক যন্ত্রণা-লাঘবের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিকৃত হইলেই উহা নানারূপ মারণ-অস্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার দ্বারা মানব-জাতির অশেষ দুঃখ-বর্দ্ধনের কারণ হইয়া পড়ে। পুষ্প অতি সুন্দর জিনিষ। কিন্তু উহা বিকৃত হইলে পূতিগন্ধ বিস্তৃত করে এবং অশেষ পীড়ার কারণ হইয়া উঠে। সেই জন্য বাসি ফুলে দেবতার পূজা নিষিদ্ধ। টাটকা ফল যেমন মানবের আয়ুর্বর্দ্ধক, বিকৃত এবং পর্য্যুষিত ফল স্বাস্থ্যহানির প্রবল কারণ, সেইরূপ যে নারী সংসারে মাতৃস্বরূপিণী, যাঁহারা সংসারের পবিত্রতাসাধক, যাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত গৃহস্থ মানুষ ধর্ম্মকার্য্য করিতেও অধিকারী নহেন, সেই নারীচরিত্র বিকৃত হইলে সংসারের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, পুরু-ষের পক্ষে ঘোর অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। সেই জন্য শাস্ত্র-কার বলিয়াছেন,—

"পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমং সমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥" (দক্ষ ৪।১)

অর্থাৎ পত্নী গৃহাশ্রমের মূলীভূতা। ভার্য্যা যদি পতির বশবর্ত্তিনী এবং অনুগামিনী হয়েন,তাহা হইলে গৃহাশ্রমের মত মহা কল্যাণ-কর আশ্রম আর নাই। অপিচ—

"অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী॥" (ঐ ৪।৪)

অর্থাৎ যে স্ত্রী ভর্ত্তার অনুকূল আচরণ করে, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে না, গৃহকার্য্যে দক্ষা, সাধ্বী, প্রিয়ংবদা, আপনাকে কোন বিষয়ে প্রকট করিতে চাহে না, যে স্বামীর প্রতি অকপট

ভক্তিমতী, সেই নারী মানবী নহে, সে দেবী। পরে আবার বলিতেছেন :—

"অনুকূলকলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি।
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ॥" (দক্ষ ঐ ৫)

অর্থাৎ পত্নী যদি পতির অনুকূলা অর্থাৎ হিতকারিণী হয়েন, তাহা হইলে সেই স্বামীর ইহলোকেই স্বর্গ-সুখভোগ হইয়া থাকে,আর যে পতির পত্নী প্রতিকূলগামিনী, সেই পুরুষের সংসার নরকতুল্য যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। গৃহস্থাশ্রমকে শান্তিময় করিবার জন্য প্রাচীন মনীষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পারিবারিক শান্তি এবং বংশধারার পবিত্রতা এই দুইটি রক্ষা করিবার জন্য আর্য্যগণ কতকগুলি বিশেষ ব্যব া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য মনু বলিয়াছেন :—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" (মনু ৯।৩)

কুমারী অবস্থায় পিতা স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করিবেন, যৌবনকালে স্বামী-ই স্ত্রীজাতির রক্ষক আর বার্দ্ধক্য অবস্থায় পুত্রগণই উহাদিগকে রক্ষা করিবেন, স্ত্রীজাতি কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিবেন না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥" (যাজ্ঞ্য ১।৮৫)

স্ত্রীজাতিকে কন্যাকালে পিতা, বিবাহের পর ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধকালে পুত্রগণ রক্ষা করিবেন। যদি এই তিনের অভাব ঘটে, তাহা হইলে স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ রক্ষা করিবেন, স্ত্রীজাতি কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

ইহাতে আজকাল অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, আর্য্যগণ নারীজাতিকে তাঁহাদের একান্ত অধীন করিয়া রাখিতেন। এ কথা সত্য নহে। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে পুরুষদিগের ন্যায় কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। যে সকল কার্য্যে স্ত্রীজাতির স্বভাব কঠোর এবং পুরুষভাবাপন্ন হইয়া যায়, সে সকল কার্য্যে তাঁহারা নারীনিয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা নারীজাতির এবং পুরুষজাতির কর্ম্মক্ষেত্রের পার্থক্য করিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা স্বভাবতঃ দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, উপচিকীর্ষা, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল গুণে মণ্ডিতা, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সংসারের কঙ্কর-কঠোর, হৃদয়হীন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কার্য্যে নিয়োগ করিতে চাহিতেন না। অবশ্য স্ত্রীজাতির যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল, কিন্তু উহা নিতান্ত অভাবপক্ষে,—অর্থাৎ পুরুষের অভাব ঘটিলে। আপনাদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার জন্য স্ত্রীজাতি সংগ্রাম করিতে পারিতেন। তবে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে শুদ্ধান্তে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াই থাকিতেন, তাহা নহে। ক্ষত্রিয়রমণীরা রথাদি পরিচালনা করিতে পারিতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্জ্জুন যখন যদুকুল হইতে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন, তখন যদু-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত অর্জ্জুনের রথ চালাইয়াছিলেন স্বয়ং সুভদ্রা। এরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, মুদ্গল ঋষির পত্নী ইন্দ্রসেনা রথে আরোহণ করিয়া এক হাজার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং শত্রুপক্ষকে পরাজয় পূর্ব্বক ধেনুদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। উক্ত ১০ম মণ্ডলের ১০৮ সূক্ত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সরমা-নাম্নী জনৈক আর্য্যমহিলা তাঁহার গোধন উদ্ধার করিবার জন্য অত্যন্ত দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্য-মহিলাদিগকে নিতান্ত চেলির পুঁটলী করিয়া রাখা হইত না। রাজপুতানার রাণী দুর্গাবতীই যে কেবল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু অতি প্রাচীনকালেই হিন্দু নারীরা আবশ্যক হইলে যুদ্ধকার্য্য করিতেন। অর্জ্জুন নারী-রাজ্যের অধীশ্বরীকে যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনার কাহিনী ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর অবিদিত নহে। অথচ সকল মহিলাই যে যুদ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা নহে। পুরুষরাই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

যে দেশের বিবাহের মন্ত্রে বলা হইয়া থাকে :—

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব,
ননন্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।"

"হে বধু, তুমি তোমার শ্বশুরের নিকট রাজরাজেশ্বরীরূপিণী হও, তোমার শাশুড়ীর নিকট রাজরাজেশ্বরীরূপিণী হও, ননদদিগের নিকট রাজরাজেশ্বরী হইও, দেবরদিগের নিকট রাজরাজেশ্বরী হও।" ইহার অর্থ এই যে, চক্রবর্ত্তী সম্রাটের মহিষী যেমন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রতিপালন করেন,সহস্র সহস্র ব্যক্তির সুখ-দুঃখ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতীকার করিয়া থাকেন, তেমনই তুমিও পতিকুলে যাইয়া সকলের হিতকর কার্য্য করিবে, ইহাই উক্ত মন্ত্রের অর্থ। এই সূত্রের পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ;—

"হে বধু! তুমি বীর-প্রসবিনী হও। দেবতার প্রতি তোমার যেন অচলা ভক্তি থাকে। দাস-দাসী এবং পশুদিগের প্রতি তুমি সদয় ব্যবহার এবং তাহাদের কল্যাণকামনা করিও।"

সে দেশের নারী দাসী বা সেবিকা, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত জীব আর নাই। গৃহে যিনি রাজরাজেশ্বরী, তাঁহাকে দাসী যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যে নিতান্ত অজ্ঞ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রাচীনকালে নারীরা যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলিয়াছেন :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্ন-সমন্বিতা॥"

কন্যাকেও যত্ন সহকারে পালন করিতে হইবে, অতি যত্ন-সহকারে শিক্ষা দিতে হইবে এবং বিদ্বান্ ধনধান্য-সমন্বিত বরকে প্রদান করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মহানির্ব্বাণতন্ত্র আধুনিক। সুতরাং উহার একটা বচন হইতে প্রাচীনকালের নারীশিক্ষার

কথা সপ্রমাণ করা যায় না। যাঁহারা সে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র নিতান্ত আধুনিক নহে। আর যদি তর্কের অনুরোধে উহা আধুনিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে হেমাদ্রির প্রমাণ অবশ্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে। হেমাদ্রির বচন প্রামাণিক বলিয়া অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে। হেমাদ্রি বলিয়াছেন,—

"কুমারীং শিক্ষয়েৎ বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি॥
ততো বরায় বিদুষে দেয়া কন্যা মনীষিভিঃ।
এষ সনাতনঃ পন্থা ঋষিভিঃ পরিগীয়তে॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা কন্যামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

অর্থাৎ কুমারী বা অবিবাহিতা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে, ধর্ম্ম ও নীতিতে আস্থাবতী করিবে। অর্থাৎ যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবলা হয় এবং তাঁহারা সুনীতি অর্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে সেই বিদ্যা শিক্ষা দিবে। উঁহারা যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের দুই কুলেরই কল্যাণকর হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহা যেমন তাঁহাদের পিতৃকুলের কল্যাণকর হইয়া থাকে, সেইরূপ পতিকুলেরও হিতকর হইয়া থাকে। মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কন্যাদিগকে শিক্ষাদানান্তে সুপণ্ডিত পতির হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ঋষিরা ইহাকেই সনাতন পন্থা বলিয়া বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। যে কন্যা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্র জানে না, পতির মর্য্যাদা বা কি ভাবে পতিসেবা করিতে হয়, তাহা বুঝে না, সেই কন্যাকে পিতার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এখানে হেমাদ্রি একটা কথা বলিয়াছেন, তাহার দিকে আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। সে কথাটা এই—"এষ সনাতনঃ পন্থা ঋষিভিঃ পরিগীয়তে।" ইহাই সনাতন অর্থাৎ চিরাগত পথ বা ব্যবস্থা, ঋষিরা এই কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চিরকালই হিন্দু-সমাজে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিগণের মতে স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক।

এখন প্রশ্ন এই, স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ ছিল? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, স্ত্রীজাতিকে সংসারের কাযকর্ম্ম, সেবাকর্ম্ম ও সন্তানপালন শিক্ষাই দেওয়া হইত, অর্থাৎ তাহাদের মানসিক উন্নতিকর কোন শিক্ষাই দেওয়া হইত না। তাহারা দাসীর কার্য্যই শিখিতে পাইত। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা নিতান্তই মূর্খ। এই মূর্খতা-প্রচারের জন্য আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রথা এবং শ্বেতাঙ্গগণের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই বিশেষ দায়ী। এ দেশের প্রাচীন গ্রন্থগুলি বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই এই মূর্খতা দূরীভূত হয়। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুলভা-নাম্নী জনৈক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী মহারাজ জনককে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহারাজ জনক আধ্যাত্মিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বড় বড় ব্রহ্মবাদী মহর্ষিরা তাঁহার রাজসভা সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত করিয়া থাকিতেন। সেই রাজসভায় যে মহিলা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলাপ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান যে অনন্যসাধারণ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী এবং গার্গীর কথা সর্ব্বজনবিদিত। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তে অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা-নামধেয়া এক ব্রহ্মবাদিনী মহিলার কথা উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ১০ ম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্তে ঘোষা-নাম্নী এক স্ত্রীজনোচিত-গুণশালিনী ও সৌভাগ্যবতী কুমারীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মহর্ষি কাক্ষীবানের কন্যা। ইঁহার পতিকামনার কথা উক্ত সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। উহার দশম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যে সকল লোক আপনার পত্নীর প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল, এমন কি, পত্নীর জন্য রোদন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে এবং স্বীয় পত্নীকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করে এবং পুত্র-সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃলোকের যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত করে, তাহার পত্নীই পতিলাভে সুখিনী ও সৌভাগ্যবতী হইতে পারে।" সুতরাং ঘোষার জন্য সেইরূপ পতি চাই। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মবাদিনী গোধা, যমী, শ্রদ্ধা, লোপামুদ্রা, শাশ্বতী, শশীয়সী, সার্পরাজ্ঞী, বৃহস্পতির ভার্য্যা জুহু প্রভৃতি বহু ব্রহ্মবিদ্যাবতী আর্য্যমহিলার পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামচন্দ্র যখন বনে যাইবেন বলিয়া পিতার নিকট সত্যবদ্ধ হইয়া কৌশল্যার শুদ্ধান্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে,—

"কৌশল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা।
প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী।
সা ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতিস্ম তদা মন্ত্রবিৎ কৃতমঙ্গলা॥"
রামা, অযো, ২০।১৪-১৫।

রামচন্দ্র দেখিলেন যে, পুত্রহিতৈষিণী কৌশল্যাদেবী নিয়ত হইয়া রাত্রিযাপন পূর্ব্বক প্রভাতে ক্ষৌমবসন পরিয়া বিষ্ণুপূজা সমাপন করত ব্রতপরায়ণা হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। মূলে স্পষ্টই লেখা আছে যে, কৌশল্যা দেবী স্বয়ংই অগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বকালে, কেবল বৈদিককালে নহে, ত্রেতাযুগেও আর্য্য-মহিলারা স্বয়ং হোমাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন।

আবার হনুমান্ যখন সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি একটি শুভজলা নদী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন,—

"সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীঞ্চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী॥"

ইহার অর্থ—"সেই বরারোহা শ্যামলক্ষণান্বিতা জানকী সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় উপস্থিত মনে করিয়া সন্ধ্যাবন্দনের জন্য এই শুভজলা নদীতে আগমন করিবেন।" এই সন্ধ্যা তান্ত্রিক সন্ধ্যা না বৈদিক সন্ধ্যা? উপনয়ন-সংস্কার না হইলে বৈদিক সন্ধ্যা করিবার অধিকার জন্মে না। স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার নাই। কিন্তু বিবাহের পর উপনীত স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া তাঁহাদের বৈদিক সন্ধ্যা-বন্দনার অধিকার জন্মিত কি না, তাহাও বিবেচ্য।

ভট্টিকাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাম এবং লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে শবরীর আশ্রমে প্রবেশ করেন। শবরী মুঞ্জ-মেখলাধারিণী ব্রহ্মচারিণী। রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থ পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ত? দেবতাদিগের প্রীতির জন্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন ত? প্রাতঃকালে এবং সায়ংসন্ধ্যাকালে আচমনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন ত? অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করেন ত? ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বকালে নারীরা বৈদিক কার্য্য করিবার অধিকারিণী ছিলেন।

ভবভূতির উত্তরচরিতে দেখা যায় যে, আত্রেয়ী-নাম্নী এক বিদুষী মহিলা বাল্মীকির আশ্রম হইতে দণ্ডকারণ্যে নিগমান্ত-বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। বাসন্তীর প্রশ্নের উত্তরে আত্রেয়ী বলিয়াছিলেন:—

"অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥"

এই দণ্ডকারণ্যপ্রদেশে মহর্ষি অগস্ত্যপ্রমুখ অনেক উদ্গীথবিৎ মহর্ষি বাস করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে নিগমান্তবিদ্যা অর্থাৎ বেদান্তবিদ্যা (উপনিষদাদি) অধ্যয়নের জন্য আমি বাল্মীকির আশ্রম হইতে পর্য্যটন করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি। ইহাতে মনে হয় যে, প্রাচীনকালে নারীদিগের বেদে অধিকার ছিল। নতুবা আত্রেয়ী উদ্গীথবিৎ সামগানপারদর্শী ঋষিসেবিত স্থানে উপনিষদাদি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য গমন করিবেন কেন? কেহ কেহ হয় ত আপত্তি করিবেন যে, নাটকের উক্তি প্রামাণিক নহে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বাণভট্ট বা ভবভূতি কি অশাস্ত্রীয় কথা তাঁহাদের নাটকে লিখিতে পারেন?

আমাদের বিশ্বাস, পুরাকালে আর্য্য-নারীরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কতকগুলি যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন। বিবাহে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নারীরা দুই একটি বেদমন্ত্র এখনও পাঠ করেন। ফলে নারীরা যদি যোগ্যা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাও শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, পতির সহিত একত্র হোমাদিও করিতে পারিতেন। তবে সাধারণ স্ত্রীজাতি বেদাদি উচ্চারণ বা বৈদিক কার্য্য করিতেন না। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইলে পাপভাগী হইতে হয়, উচ্চারণের দোষে অর্থ বিপরীত হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের সহিত যখন মণ্ডন মিশ্রের বিচার হইয়াছিল, তখন মণ্ডন-পত্নী উভয়ভারতীই তাঁহাদের তর্কের মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের যে সময়ে জন্ম হইয়াছিল, সে সময়ে ভারতে বহু বিদুষী মহিলা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শুক্লা, ক্ষেমা, কাশী-সুন্দরী প্রভাবা, রুক্মাবতী, কুকীরাজকন্যা মালিনী প্রভৃতির নাম বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা বুদ্ধদেবের সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ পরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতে ভারতে যদি স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার সমকালে বা অল্পকাল পরে ভারতে এতগুলি শিক্ষিতা নারীর আবির্ভাব হইতে পারিত না। আসল কথা, পূর্ব্বকালে নারী-জাতিকে অশিক্ষিতা ও দাসী করিয়া রাখা হইত বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিব ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গনারী

হৃদয়ে চেতনা আশা
বলিতে নাহিক ভাষা
হায় হায় অভাগিনী বাঙ্গালীর মেয়ে!
সমুখে কত না কায
আগ্রহ অন্তর-মাঝ
বিষাদে মুছিয়া আঁখি থাক শুধু চেয়ে!
জান না কি তুমি নারী?
কেন কর বাড়াবাড়ি?
"দেশ" "দেশ" ক'য়ে কেন হয়েছ পাগল?
কায কি বসিয়া ঘরে
সংবাদ-পত্রিকা প'ড়ে
দেশ-বিদেশের কথা জানিয়া কি ফল?
রাঁধ বাড় আর খাও,
অবসরে ঘুম যাও,
অথবা কাটাও কাল তাস-কড়ি খেলে।
যা শিখেছ তাই খাসা
আর কেন কর আশা?
দৌড় ত দিয়েছে বিদ্যা দু-পাতা নভেলে।
ছেলে যায় পাঠশালে
পড়ে কি শুধুই খেলে
কি কায তোমার খুঁজে? দাও গে আহার।
আফিস হইতে বাবু
ফিরিবে হইয়া কাবু
তথাপি পুরুষ বলে এ ভার তাঁহার।
(তোমার) জ্ঞানের পিপাসা আছে
তাতে বড় বয়ে গেছে
পিপাসা সদাই লাগে মরুভূমিমাঝে।
জান না কি তুমি নারী?
কেন কর বাড়াবাড়ি?
তোমারে ঘিরিয়া যে গো দৃঢ় গণ্ডী আছে!

কুমারী সিন্ধুবালা আতর্থী।

স্বরলিপি

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দিরপ্রাঙ্গণে
ঐ তব এল আহ্বান।
চেয়ে দেখ মঙ্গল রাতি
জ্বালি দিল উৎসব বাতি,
স্তব্ধ এ সংসারপ্রান্তে
ধর তব বন্দনা গান।

কর্ম্মের কলরবক্লান্ত
কর তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত আসন দাও মেলে,
নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ
হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

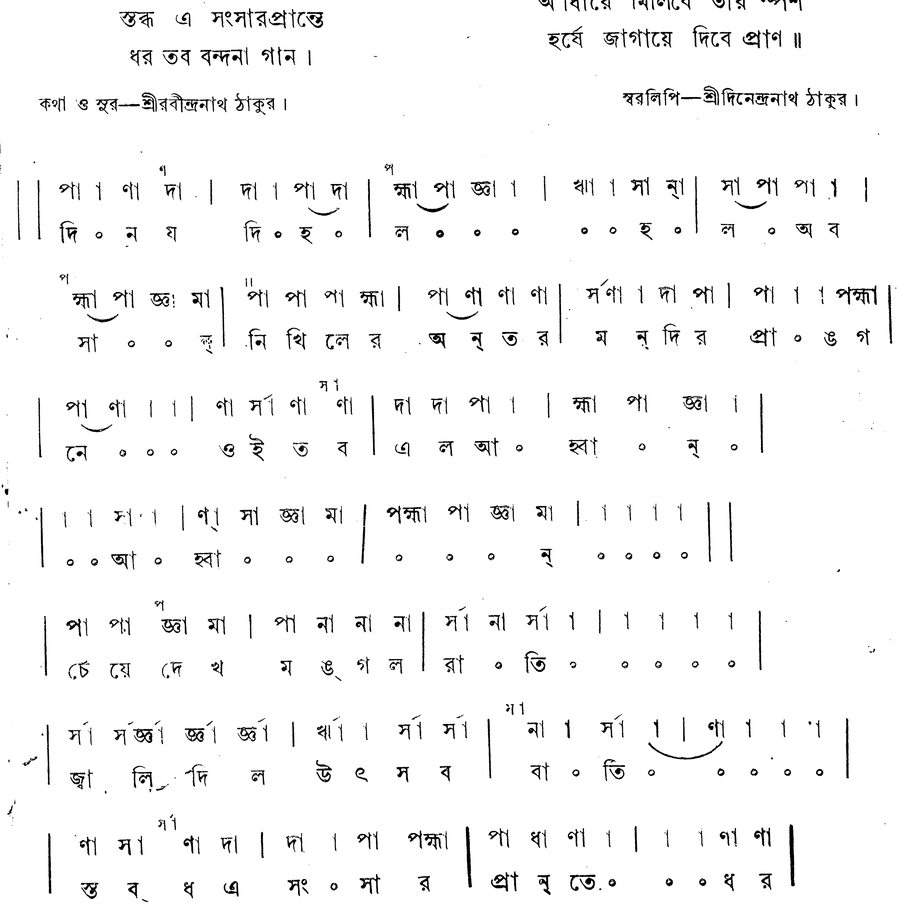

ণর্সা র্সা ণা ণা	দা । পা পা	পক্ষা পা জ্ঞা মা	পা । ণা ণা
ধ র ত ব	ব ন্ দ না	গা ০ ০ ন	ও ০ ই ত
ণ দা । পা দা	ক্ষপা । জ্ঞা ঋা	সা । । ।	। । । ।
ব ০ এ ০	ল ০ আ ০	হ্বা ০ ০ ০	০ ০ ০ ন্
ণ্ সা জ্ঞা মা	পক্ষা পা জ্ঞা মা		
আ ০ ০ ০	হ্বা ০ ০ ন্		
সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা	ঋা ঋা সা ন্া	সা রা জ্ঞা ।	। । মা পা
ক র্ মে র	ক ল র ব	ক্লা ন্ ত ০	০ ০ ০ ০
মপা পা মা জ্ঞা	জ্ঞা মা জ্ঞা জ্ঞা	ঋা । সা ।	। । । ।
ক র ত ব	অ ন্ ত র	শা ন্ ত ০	০ ০ ০ ০
পা । পা পক্ষা	পা জ্ঞা জ্ঞা মা	পা না না ।	র্সা । । ।
চি ০ ত্ত আ	স ন দা ও	মে ০ লে ০	০ ০ ০ ০
র্সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা	ঋা । র্সা র্সা	র্সা না । র্সা ।	
না ই য দি	দ র্ শ ন	পে ০ লে ০	
ণা । ণা ।	ণা র্সা র্সা ণা ণা	দা দা পা ক্ষা	পা ধা ণা । । । । ।
০ ০ আঁ ০	ধা ০ রে মি	লি বে তাঁ র্	স্প র্ শ ০ ০ ০ ০
ণা র্সা র্সা ণা ণা	দা দা পা পা	পক্ষা পা জ্ঞা মা	
হ র্ যে জা	গা য়ে দি বে	প্রা ০ ০ ণ	
পা । ণা ণা	দা । পা দা	ক্ষপা । জ্ঞা ঋা	সা । । । । । । । ।
ও ০ ই ত	ব ০ এ ০	ল ০ আ ০	হ্বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্
ণ্ সা জ্ঞা মা	পক্ষা পা জ্ঞা মা		
আ ০ ০ ০	হ্বা ০ ০ ০		

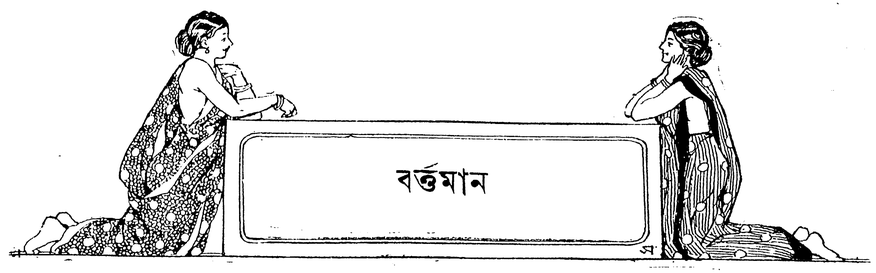

বর্ত্তমান

১

পিতৃমাতৃদত্ত একটা নাম তাহার অবশ্যই ছিল—বিদ্যালয়ে কলেজে সেই নাম লিখিত থাকিলেও তাহার সতীর্থ ও বন্ধুগণ তাহাকে 'বর্ত্তমান' বলিয়াই ডাকিত।

প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হইলেও, উদীয়মান কবি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক বলিয়া কতিপয় তরুণবয়স্ক বন্ধুর নিকট হইতে সে অধিকমাত্রায় করতালি লাভ করিত। তাহার ব্যবহারে বিনয়ের অভাব ছিল, এ কথা কেহ বলিতে পারিত না। তবে যখনই সে কোন মত প্রকাশ করিত, তাহাতে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিত। সে যখন উর্দ্ধপানে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কাব্য-মাধুর্য্য-রসসিক্ত ভাষায় প্রকাশ করিত, জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ আপনা হইতেই তাহার উন্মেষোন্মুখ প্রতিভার সঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার গুণমুগ্ধ, সমমতাবলম্বী বন্ধুগণ সে কথা অভ্রান্ত বেদবাক্যের মতই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। বিশ্বাসের আর একটা সঙ্গত কারণও ছিল। অতি কিশোরবয়সে সে কয়েকটি কবিতা ও গল্পচিত্র লিখিয়া কোনও সাময়িক পত্রে পাঠাইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া বালককে উৎসাহ দিবার জন্য তাহার উচ্ছৃঙ্খল, ভাব-বৈচিত্র্যবিহীন রচনা সুসংস্কৃত, সুমার্জ্জিত ও রস-মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, বালক লেখক উত্তরকালে সাহিত্য-রচনায় সংযম ও শক্তির পরিচয় দিতে পারিবে।

প্রশংসার ফেণিলোচ্ছ্বাস—মাদকতা প্রবীণের স্থৈর্য্যকেও বিচলিত করে। তরুণের চপল মনকে উদ্দাম করিয়া তুলিবে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়? কিশোর কবি, রচনায় মৌলিক প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিল। সেই সময়ে কোন কোন বিলাসী সাহিত্যিক প্রতীচ্যের পয়ঃপ্রণালী-নিঃসৃত বিবিধ পরিত্যক্ত পদার্থে বিচিত্র রূপ, রস ও গন্ধের পরিচয় পাইয়া নির্ব্বিচারে তাহার স্রোতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যের জাহ্নবী-ধারায় প্রবাহিত করিবার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন। কিশোর কবির কিশোর মন সেই রস-মদিরা পানে মত্ত হইয়া উঠিল; তাহার গন্ধে মন্দারের সৌরভ আছে অনুমান করিয়া সে উদাত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"চমৎকার!"

তা এমন অনেকেরই হয়। বাঙ্গালাদেশ বলিয়া নহে, মানব-সাধারণের মধ্যে গুনাকথার প্রতি প্রত্যয় বা আসক্তি অত্যধিক। বিশেষতঃ অনাবিল ছাত্রজীবনে ইহার প্রভাব অসাধারণ। স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া, যাচাই বা বিশ্লেষণ দ্বারা কোনও বিষয়ের মর্ম্ম অবগত হইবার অবকাশ কোথায়? সে পথে বিঘ্ন অসংখ্য, বাধা অনন্ত। অত হাঙ্গামা কে করে? অন্যের কথা শুনিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা অত্যন্ত সহজ—কোনও বালাই নাই।

বাঙ্গালার বাতাসে একটা ধ্বনি অনুরণিত হইতেছিল—যাহা সহজবোধ্য, অর্থযুক্ত ও হৃদ্য, তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। যাহার কোন মানে নাই, উদ্দেশ্য নাই, তাহাই অভিনব, সুন্দর, অনবদ্য এবং অমূল্য। কিশোর কবি এই অমূল্য তত্ত্বেরই ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চকণ্ঠে সে ঘোষণা করিল, "আমরা তরুণ, আমরা সবুজ! আমরা পুরাতন চাই না, নূতনকে অভিনন্দন করি!"

বাঙ্গালার আকাশে ঘূর্ণীবায়ুর মত কিশোর কবির বাণী খানিকটা আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া প্রধাবিত হইল। মেঘ সগর্জ্জনে ঝটিকা ও বৃষ্টির আগমন বিজ্ঞাপিত করে—আপনার অস্তিত্বকে প্রকাশমান করিয়া তুলে। কিশোর কবি কোনও সতীর্থ ও স্বমতাবলম্বী বন্ধুর সম্পাদিত, নবপ্রকাশিত সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠে এই অভিনববাণী ছন্দে গাঁথিয়া সবুজের উদ্দেশে

প্রেরণ করিল। 'ভাই হাততালি' দীর্ঘকালের জড়তা পরিহার করিয়া বিংশ শতাব্দীর ক্রোড়ে, বন্ধুজনের বাহুর আন্দোলনে জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু, বয়সে তরুণ হইলেও বাঙ্গালা-মায়ের অধিকাংশ সন্তানই এই আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিতে পারিল না। সে সুবুদ্ধি সহজে তাহাদের 'মগজে' গজাইয়া উঠিল না। পল্লী-মাতার স্নেহনিবিড় শ্যামল ক্রোড়ে লালিত হইয়া, জননী, ভগিনী প্রভৃতির পবিত্র স্নেহ-ভালবাসায় পালিত হইয়া, দেশের আবেষ্টনপুষ্ট ও ভাবধারায় স্নাত হইয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি এমনই অমার্জ্জিত রহিয়া গিয়াছিল যে, নূতনের এই মোহময়ী বাণী তাহাদের রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে প্রতিহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ক্ষুব্ধ কিশোর কবি তাহাতেও নিরুদ্যম হইল না। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—যাহা শ্রেয় ও প্রেয়, কে তাহাকে সহজে লাভ করিতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াও যাহাদের মূর্খতা দূরীভূত হয় না, তাহারা করুণার পাত্র। তাহাদের জন্য তরুণের জয়যাত্রার সঙ্গীত রচিত হয় নাই!

প্রকাশ সে বার আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাহার কিছু অনুরাগও ছিল। সে বলিল, "ভাই কবি, তোমার এ মাসের কবিতাটির অর্থ ঠিক বুঝতে পারি নি কিন্তু।"

মৃদু হাসিয়া কবি বলিল, "এটা ত আর পরীক্ষা-পাশ করা নয়, ভাই! এর জন্য দস্তরমত, কি বলে ইয়ে—"

বাধা দিয়া সুকুমার বলিল, "আচ্ছা 'ইয়ে' থাক্। কিন্তু মাইকেল, হেম, নবীন, বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ—সকলকেই বেশ বোঝা যায়, অথচ তোমার লেখার অর্থবোধ হয় না, এর মানে কি?"

সুকুমার বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে 'অনার্স' পাইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল।

ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কবি বলিল, "যাঁদের কথা বল্‌লে, তাঁরা এ যুগে অচল। মাইকেল থেকে বড়াল কবি পর্য্যন্ত সকলেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের লেখক বল্‌লেই হয়। এ যুগে রবীন্দ্রনাথেরও স্থান নেই, তা জান?"

রজনীকান্ত বাঙ্গালায় এম্-এ পাশ করিয়া আবার ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, "তাই না কি? সত্যি, এ সংবাদটি ত জানা ছিল না। তা হ'লে বঙ্কিমেরও এ যুগে ন স্থানং?"

"অবশ্যই। ও সব লোকের লেখা মান্ধাতার আমলে চল্‌ত। আমরা যে যুগের সৃষ্টি কর্‌ছি, তাতে ও সব লেখকের পচা রদ্দি মাল চল্‌বে না। সেকেলে লেখকদের মত ও ভাষা এখন অচল। আমাদের মতে—"

কবি সহসা থামিয়া গেল। তাহার মস্তকের দীর্ঘ কেশরাজি দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। ক্ষীণ, কৃশ দেহের দৈর্ঘ্য বালকত্বের সীমারেখা অতিক্রম করিলেও, শোভন পাঞ্জাবী দেহের স্থূলত্ব-প্রতিপাদনে হার মানিয়াছিল।

তাহাতে কিছু যায় আসে না। প্রথম যৌবনের তেজ ও শক্তি বক্ষ, বাহু, পদযুগল প্রভৃতিতে নাই বা বলিষ্ঠ পুরুষের লক্ষণ বিকাশিত করিয়া তুলিল? সুগন্ধী সাবানের ফেন-পুষ্পমার্জ্জিত লীলায়িত কেশরাজি যাহার শিরঃশোভা সম্পাদন করে, যৌবন কি তাহার ক্রীতদাস নহে? বাহু আর্ত্ত নরের সেবায়, ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা নারীর—মাতৃজাতির রক্ষায় নাই বা উদ্যত, আন্দোলিত হইল? হৃদয়বেলায় দুর্ব্বলের বেদনায় নাই বা সহানুভূতির উদ্বেল সমুদ্রতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল? তাহাতে বিংশশতাব্দীর কবির কোনও দুঃখ, ক্রোধ বা ক্ষোভ নাই। তাহার অপুষ্ট, ক্ষীণ, শীর্ণ-অঙ্গুলিচালিত লেখনীমুখে কাগজের পৃষ্ঠে রমণীর যে বন্দনাগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সৃষ্টির মনোবৃত্তি মুখর হইয়া উঠিবে না?

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—এই কিশোর কবির পাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভায় প্রকাশ, সুকুমার ও রজনীকান্ত নিশ্চয়ই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাস্যের যে তরঙ্গ লীলায়িত গতিতে বহিয়া গেল, সম্ভবতঃ তাহা বিস্ময়ানন্দের দ্যোতক!

"তোমার মতটা কি শুনি?"

"আমার শুধু নয়—এ আমাদের মত তরুণের, নবযুগের রচয়িতাদের অভিমত। আমরা কটা জিনিষ মানি না—ভূত, ভবিষ্যৎ, ভগবান্, ভালবাসা আর ভক্তি।"

কবির নয়নে কিসের জ্যোতিঃ ঝলমল করিয়া উঠিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। অন্ততঃ তাহার অরসিক সহচরগণ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

রজনীকান্ত ধীরে ধীরে বলিল, "তবে তোমরা কি মান, কবি?"

"বর্ত্তমান। আমরা শুধু বর্ত্তমানের উপাসক।"

সুকুমার বলিল, "আর ভয়?"

রজনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দূর মূর্খ, তুই থাম! জানিস্ নে, কথায় বলে, 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়!' ওরা ও সব অতিক্রম করেছে, নইলে কি হেন সিদ্ধিলাভ ঘটে? সত্যি, ভূত, ভবিষ্যৎ, ভালবাসা, ভক্তি, ভগবান্—ও সব কবি-কল্পনা! বর্ত্তমানটাই প্রত্যক্ষ। নাঃ, মৌলিকতা আছে। আচ্ছা ভাই, আজ থেকে তোমাকে আমরা বর্ত্তমান বলেই ডাক্‌ব।"

সুকুমার ও প্রকাশ তখন একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "জয়, বর্ত্তমানের জয়!"

তখন হইতেই কবি 'বর্ত্তমান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

২

'তব অবগুণ্ঠনখানি, খুলে ফেলেছিনু টানি।'—মিথ্যা কথা! তাহার শোভন শিরে সূক্ষ্ম বেণারসীর প্রান্ত ঝলমল করিতেছিল, অবগুণ্ঠন ছিল না।

'বর্ত্তমান' যে দৃষ্টিতে তরুণীর 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী' দেহ-লতিকার প্রতি পুনঃ পুনঃ নেত্রাঘাত করিতেছিল, তাহাতে বিস্ময় ও মুগ্ধতার সমাবেশ ত ছিলই, আর কোন্ ভাবধারা তাহার হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শুধু ভাবস্রষ্টাই বলিতে পারেন।

যবনিকা তখনও উঠে নাই। ঐক্যতানবাদন চলিতেছিল।

সাময়িক পত্রের লেখক হিসাবে এবং সম্পাদকের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়াও বটে, একটা 'বক্সে' সে আসন পাইয়াছিল। অন্য দুই জন বন্ধুসহ সম্পাদক বন্ধু তখনও আসেন নাই। ঠিক তাহারই পাশের 'বক্সে' ঐ তরুণী আসিয়া বসিয়াছে। সঙ্গে অভিভাবকও আছেন!

বর্ত্তমান চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষোভও যে হয় নাই, শপথ করিয়া তাহাও বলা চলে না।

রুমালে চশমা-জোড়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া কবি যথাস্থানে উহা সন্নিবিষ্ট করিল।

খঞ্জন আঁখিই বটে! দৃষ্টি এমন অমৃতবৃষ্টি করিতে পারে, তাহা ত জানা ছিল না!

কবি সোজা হইয়া বসিল।

হাঁ, ইহাকেই যথার্থ সুন্দরী বলে। মানসলোকে যে সৌন্দর্য্যরূপিণীর কল্পনা ফুটিয়া উঠে—মনোভৃঙ্গ লোলুপভাবে কল্পলোকের মাধুর্য্যমণ্ডিতা, সৌরভসুবাসিতা যে নবমল্লিকার প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, কবি আজ তাহাকে শরীরিণীরূপেই প্রত্যক্ষ করিতেছে।

কবি স্পন্দিত হৃদয়কে দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিল। দৃষ্টি কিন্তু আধারে অচল, অটল।

আয়ত, কৃষ্ণতার লোচনের উজ্জ্বল কটাক্ষ কি মর্ম্মভেদী! কবি ঐ দৃষ্টির তলে মরিতে পারিলেও সুখী।

দ্বিতীয় বার নূতন সুরে ঐক্যতানবাদন আরম্ভ হইল। রঙ্গালয় দর্শকে প্রায় পরিপূর্ণ।

চশমা! তোমাকে নমস্কার! তোমার আশ্রয়ে নিরাপদে যত্র তত্র দৃষ্টি নিক্ষেপের কি অখণ্ড সুযোগ! বিশেষতঃ তুমি যদি বর্ণময় হও, তাহা হইলে ত কথাই নাই!

কিন্তু বক্সের অভিভাবক এক জন পুরুষ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন না? হাঁ, ওখানে একাধিক পুরুষ আছে বটে; কিন্তু আর কাহারও মুখ দেখা যাইতেছে না। বৃদ্ধটি বড়ই বেরসিক। দেখিবার কি আর কিছু পদার্থ নাই? রঙ্গমঞ্চের যবনিকা ত দুলিতেছে। সে দিকে দ্রষ্টব্য ত অনেক কিছুই আছে। নাঃ, দৃষ্টি ফিরাইতে হইল। বৃদ্ধের কঠোর দৃষ্টি সহ্য করিয়া সুন্দরীর আননে তৃষিত নেত্রপাত সুবিধাজনক হইবে না।

ক্ষুণ্ণমনে কবি ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহাতেও নিপুণতা প্রকাশ পাইল বৈ কি! সে ত এত দিন বৃথা রস-চর্চ্চা করে নাই।

আরও পাঁচ মিনিট। ঐক্যতান বাদন থামিবে না?

"এই যে কবি! ওঁরা কেউ এলেন না বুঝি?"

বর্ত্তমান চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে স্বয়ং থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তা।

"নমস্কার, নমস্কার, আসুন।"

"তাই ত, একা আপনাকে বক্সে ব'সে বড় অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হবে দেখ্‌ছি।"

কবি মৃদু হাসিল। প্রাণের স্পর্শ তাহাতে ছিল কি?

"চলুন কবি, আপনাকে নীচের সাম্‌নের 'সিটে' দিয়ে আসি। সম্পাদক মশায় যদি আসেন, আপ[illegible] বস্‌বেন। এ বক্সটা আর এক দল ভাড়া দি[illegible] অসুবিধা কিছু হবে না। সাম্‌নের আসন [illegible] দেখতে পাবেন।"

কবি মনে মনে ম্যানেজারের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিতেছিল কি না, বুঝা গেল না! সে প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিল, "চলুন।"

"নিন্, পাণ খান। মিঠে পাণ; আপনি ত খুব ভালবাসেন?"

অলক্ষ্যে কবি একবার বক্সের অধিকারিণী সুন্দরীর দিকে চাহিল। দৃষ্টি মিলিয়া গেল। চোখ দুইটি হাসিতেছে না? কিন্তু—কিন্তু—

"চলুন, একটু তাড়াতাড়ি। এখনই অভিনয় আরম্ভ হবে। দেখুন, একটা ভাল সমালোচনা আপনার বন্ধুকে দিয়ে এবার বার করাবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

সম্মুখের আসনে কবিকে বসাইয়া কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন, "পাশে আরও ৩ খানা সিট খালি রৈল। তাঁরা এলে বস্‌তে পাবেন। এগুলো এখনও বিক্রী হয় নি। ভাল ক'রে বসুন। আচ্ছা, নমস্কার।"

ঢং করিয়া শব্দ হইল। যবনিকা উঠিয়া গেল। কবির ইচ্ছা হইল, একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বক্সের দিকে চাহে। কিন্তু প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী একটী মধুর গান গাহিতে গাহিতে তখনই আবির্ভূতা হইয়াছে; সুতরাং তাহার দৃষ্টি সেই দিকেই সন্নদ্ধ হইয়া রহিল।

কবি বায়স্কোপ ও থিয়েটারের অনুরক্ত ভক্ত। সে কোনও অভিনয় বাদ দিত না। তাহার মত রসজ্ঞ দর্শক বোধ হয় সংখ্যায় অতি কমই ছিল। বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সে পরিচিতও হইয়াছিল। তাহার কবি-খ্যাতি সে অঞ্চলে অপরিজ্ঞাত ছিল না।

অয়সকান্তি রূপ এবং রাসভনিন্দিত কণ্ঠ হইলেও কি সুন্দরী তরুণীর মধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে অপরাধ? যাহার দেহে রূপ ও যৌবনের চঞ্চল প্রবাহ আছে, চরণে চপল নৃত্যভঙ্গী এবং কণ্ঠে অপ্সরোনিন্দিত মাধুর্য্য ও অভিনয়-নৈপুণ্য বিদ্যমান, রসজ্ঞ কবি অবশ্যই তাহাদের গুণমুগ্ধ হইতে বাধ্য।

অভিনয়-মাধুর্য্যে মুগ্ধ কবি বর্ত্তমানের স্রোতোধারায় ভাসিয়া চলিল।

প্রতি অঙ্কে যখন যবনিকা নামিয়া আসিতেছিল, সেই সময় সে মুখ ফিরাইয়া বক্সের তরুণীর সন্ধানে দৃষ্টি ফিরাইতেছিল; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, সে আর একবারও সুন্দরীর মুখচন্দ্রমা দর্শনের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারিল না। সবিস্ময়ে সে দেখিল, যে 'বক্স'এ সে পূর্ব্বে বসিয়াছিল, তাহাতে কোন দর্শকই নাই। তবে?—

তাহার রোষবহ্নি মনের মধ্যে ধূমায়িত হইতে লাগিল। দগ্ধ করিবে কাহাকে? বন্ধুবর সম্পাদকও আসিলেন না। আচ্ছা, সমালোচনার কশা ত তাহারই হাতে।

শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে 'বক্সের' অধিকারিণীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আর একবার তাহার তৃষিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সুন্দরীর মুখে কি মধুর হাসি! ঐ যে! তরুণীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। ওঃ, দৃষ্টিতে কি মুগ্ধ ভাব, কটাক্ষে কি অগ্নিবৃষ্টি!

মুখ সরিয়া গেল।

কবি শিহরিয়া উঠিল। নাঃ—চেষ্টা সে ছাড়িবে কেন?

শেষ অঙ্কের পর যবনিকা নামিয়া আসিলে কবি তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে চলিল। ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। তোরণদ্বারে সে যখন পৌঁছিয়াছে, তখন দেখিল, একখানি মোটরে চারি জন আরোহী। তন্মধ্যে তাহার কল্পনালোকের রাণী উপবিষ্টা। মোটরের ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে সোফারের পার্শ্বোপবিষ্ট যুবকটি কে? তাহার মনে হইল, মুখখানি অপরিচিত নহে; কিন্তু—

তরুণীর হাস্য-চপল দৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। পুরুষটিকে চিনিবার পূর্ব্বেই মোটর বহুদূরে চলিয়া গেল।

৩

পার্কে—সরকারী ভ্রমণোদ্যানে তখন অপরাহ্ণের আলোক স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। অপর পার্শ্বের অত্যুচ্চ হর্ম্ম্যরাজির অন্তরালে চৈত্রের রবি আত্মগোপন করিয়াছে—আকাশে তাহার কুঙ্কুমরাগ। কবি ভাবিতেছিল, তাহারও হৃদয়াকাশের নীলিমায় এমনই বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মাধুর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠে নাই কি?

অনেক কষ্টে আজ সে তরুণীর বাসস্থান আবিষ্কার করিয়াছে। অভিনয়-দর্শনের রাত্রি ছাড়া আরও তিন বার সে সেই লোকমোহিনীর দেখা পাইয়াছিল। এক দিন বায়স্কোপে আর এক দিন সাগরনৃত্যের মিলনক্ষেত্রে, শেষবার—বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে, বাঙ্গালা এম্-এ ক্লাশের সম্মুখে।

কবি কোনও পরিচিত ছাত্র-সাহিত্যিকের সহিত তথায় দেখা করিতে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে সে সম্মুখে তরুণীকে দেখিতে পাইল। তাহার ললাট-শীর্ষস্থ কৃষ্ণ-কেশরাজির উপর সাড়ীর প্রান্ত আজও তেমনই ভাবে সংলগ্ন। প্রসন্ন আননে স্নিগ্ধ হাস্যরেখা—নয়নে যেন পরিচয়ের দীপ্তি।

সাহসের অভাব কোনও দিনই কবির ছিল না। সে ভঙ্গীভরে তরুণীকে যোড়করে নমস্কার জ্ঞাপন করিল। প্রতিদানে একটি ক্ষুদ্র নমস্কারলাভে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তরুণী দ্রুত অথচ শোভন গতিতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। দুই জন ছাত্র উপরে উঠিতেছিল, এক জন তাহাকে নমস্কার করিল। তাহা কবির দৃষ্টি এড়াইল না। অপর ছাত্র তাহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই চিনিস্ না কি? কে ভাই?"

তরুণী তখন নীচে নামিয়া গিয়াছে। উত্তর শুনিবার জন্য কবি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

প্রথম ছাত্রটি বলিল, "মিস্ রায়। আমাদের সঙ্গেই বাঙ্গালায় এম্-এ দিচ্ছেন।"

"তাই না কি? কার মেয়ে?"

"ব্যারিষ্টার মিঃ রায়, চিনিস্ না? আজকাল মস্ত ব্যারিষ্টার; বালীগঞ্জে থাকেন—"

ছাত্র দুইটি চলিয়া গেল। কবি পরের কথাগুলি আর শুনিতে পাইল না। প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করাও সে সঙ্গত মনে করিল না।

মিস্—কুমারী! হাঁ, ললাটে, সীমন্তে সিন্দূররেখা নাই, সুতরাং কুমারী। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে যাঁহারা, তাঁহারা ত সিন্দুর ব্যবহার করেন না! তবে মিস্, এই যা শুভ সংবাদ। যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, তাঁহারা কি মাথার উপর সাড়ী অমনভাবে রাখেন?

অত চিন্তার প্রয়োজন কি? মিস্ রায়, ব্যারিষ্টার রায়ের কন্যা—বালীগঞ্জে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না।

একবার নিজের দেহের প্রতি চাহিয়া কবি একটা ছোট-খাট নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তরুণী শুধু সুন্দরী নহে, উচ্চ-শিক্ষিতা—এম্-এ পড়িতেছে। এ দিকে সে এখন তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাহাতে কি আসে যায়? অবিলম্বে সেও গ্রাজুয়েট হইয়া বাহির হইবে। বয়স? তা দুই তিন বৎসরের পার্থক্য—মন্দ কি? তাহার ত এই তেইশ বৎসর চলিতেছে।

অর্থের দিক দিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না। পুলিসের উচ্চপদে পিতা দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তিও উপেক্ষণীয় নহে। অন্ততঃ দুই তিন পুরুষ পরের দাসত্ব না করিয়া শুধু কবিতা লিখিয়া, সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে।

বিশেষতঃ সে কবি। সাহিত্যিক মহলে, নবীন কবিদিগের মধ্যে সে সর্ব্বজনপরিচিত বলিয়া গৌরবের দাবী করিতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষার্থিনীর পক্ষে তাহার নাম ও কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং সে একবারে হতাশ হয় নাই।

বালীগঞ্জে পার্কের ধারে ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্টও সে অনুভব করে নাই।

সাহসিকতার জয়লাভ সর্ব্বত্র। সাহসী বীর ছাড়া সুন্দরীলাভের যোগ্যতা আর কাহারও নাই, এ কথা কাব্যে ও জীবনে সকল ক্ষেত্রেই সত্য।

এক বার ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হইবে না কি?

ঐ না মিঃ রায়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কাহারা বাগানের দিকে আসিতেছে? হাঁ, তিন জন তরুণীই বটে! মিস্ রায়ও ঐ ত—সকলের পশ্চাতে!

কবি এমন স্থানে দাঁড়াইল—যাহাতে তরুণীর দৃষ্টি তাহাকে এড়াইয়া যাইতে না পারে।

বাস্তবিক সে মিলটনের কোমসের সহিত একমত। সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার বস্তু নহে—উহার অবাধ প্রচলনই শোভন।

তরুণীত্রয় ধীর-মন্থর গতিতে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। কবি দেখিল, তাহার সাবধানতা সার্থক হইয়াছে। মিস্ রায় তাহার দিকে চাহিল, সে দৃষ্টিতে প্রথমতঃ বিস্ময়রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর বিম্বাধরে মৃদু হাস্যরেখার সহিত নয়নে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা কি পরিচয়ের আনন্দপ্রকাশ নহে?

কিন্তু কেহ দাঁড়াইল না। তিনটি তরুণী উদ্যানশোভা কাব্যের অপর পার্শ্বস্থ একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

আকাশের শেষ আলোকরেখা তখন পশ্চিমগগনপ্রান্তে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

কবি ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল।

চারিদিকে আলো জ্বালিয়া উঠিলে কবি অনিচ্ছা সত্ত্বে উদ্যান হইতে বাহির হইল। না,—আর তাহার প্রতীক্ষায় বিলম্ব করা শোভন হইবে না।

আকাশে মৃদু জ্যোৎস্না। সন্ধ্যার হিল্লোলিত বায়ুপ্রবাহে কাহার গানের মধুর শব্দ-তরঙ্গ বহিয়া আসিতেছে?

ক্ষীণ বেত্রদণ্ড আনমনে আন্দোলিত করিতে করিতে কবি মন্থরপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

পথের মোড়ের বাঁকে সহসা জনৈক পথিকের সহিত তাহার মৃদু সংঘর্ষ ঘটিয়া গেল। সে ব্যক্তি যেন একটু দ্রুত-পদেই আসিতেছিল।

"কে?—কবি বর্ত্তমান? অনেক কাল পরে দেখা! তুমি এ দিকে কি মনে ক'রে ভাই?"

"সুকুমার—তুমি?—তুমিই বা এ দিকে কি মনে ক'রে?"

"আরে, এ দিকে যে আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ী। কিন্তু তুমি এ অঞ্চলে?"

সুকুমারের হাস্য কবি কোনও দিন সহ্য করিতে পারিত না। মনে মনে সে এই লোকটাকে সর্ব্বদাই এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। কারণ, সুকুমারের কথায় শ্লেষ ও ঝাঁঝ এত বেশী মাত্রায় থাকিত যে, কবি বর্ত্তমান তাহা কখনও পরিপাক করিতে পারিত না।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কবি বলিল, "অনেক কাল তোমায় দেখিনি ভাই, এখন কি করা হচ্ছে, তাও জানিনে।"

"তা জান্‌বে কেন? কাব্যলোকবাসীরা মর্ত্ত্যের জীবের মধ্যে পুরুষদিগকেই বাদ দিয়ে রাখে। তা যাক্—আমি কিন্তু তোমার অনেক খবরই রাখি। আজকাল তোমার নাম সবুজ সাহিত্যিকদিগের মুখে মুখে ফেরে। বেশ, ভাল কথা।"

আবার সুকুমারের সুন্দর মুখে সেই শব্দহীন হাস্য। কবির চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে সুকুমারকে এড়াইতে পারিলেই বাঁচে।

ভা. "রাত হ'ল ভাই, আবার ট্রেণে যেতে হবে। তা হ'লে প্রতি

সময় সে মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা না করিয়াই কবি দ্রুতপদে অগ্রসর ছিল; কি

৪

এই সুন্দরী ধরণী আজ তাহার কাছে যেন রিক্তশ্রী বলিয়া প্রতিভাত হইল।

অপমান ও উপেক্ষার জ্বালা এত তীব্র? সে স্বনামধন্য কবি, সবুজদলের অন্যতম অগ্রণী! উপযাচক হইয়া নব-প্রকাশিত "মাতৃমঙ্গল" পত্রিকায় সে এমন চমৎকার কবিতা ও কলারসে পরিপূর্ণ গল্প পাঠাইয়া দিল, উপেক্ষিত হইবার জন্য?

মিথ্যা, হেয়, যুগসঞ্চিত অন্ধসংস্কারের নাগপাশ হইতে সকল রকমে মুক্ত করিবার উদ্দেশে, স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে সে যাহাদিগের জন্য প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিতেছে, বাস্তবজীবনের বিচিত্র রসানুভূতি উপভোগ করিবার সহস্র নগ্ন পন্থা, ভাব, ভাষা ও বিচিত্র ছন্দের মালা গাঁথিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, আজ তাহাদেরই এক জন—পত্রিকার বিদুষী সম্পাদিকা অবলীলাক্রমে সর্ব্বরসে ভরপুর সেই জাতীয় কবিতা ও গল্প 'অচল' বলিয়া ফেরত পাঠাইলেন!

কবি প্রবন্ধসংলগ্ন পত্রখানি আবার পাঠ করিল:—

"আমাদের নব-প্রকাশিত পত্রিকা বিশেষভাবে নারীপাঠ্য। আপনার ন্যায় প্রতিভাবান্ কবির গল্প বা কবিতার রস উপভোগ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। 'মাতৃমঙ্গলে' এ অমূল্য রচনার স্থান করিয়া উঠিতে পারিলাম না বলিয়া অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

নিবেদিকা—শ্রীমতী অমলা মুখোপাধ্যায়।"

নাঃ, এ দেশের, এ জাতির কোন আশা নাই!

ব্যর্থ রোষে কবির ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল হইতে বোধ হয় অগ্নি-বৃষ্টি হইতে লাগিল।

"কেমন আছ, ভাই?"

রজনীকান্তকে আসিতে দেখিয়া কবি তাহার উপেক্ষিত প্রবন্ধাদি তাড়াতাড়ি টেবলের ড্রয়ারজাত করিল।

রজনীকান্ত কলিকাতার কোনও কলেজে অধ্যাপকত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। উভয়ের মতের ঐক্য ছিল কি না, তাহা ঠিক প্রকাশ না পাইলেও রজনীকান্ত প্রায়ই কবির কাছে আসিত। উভয়েই এক অঞ্চলের একই গ্রামের অধিবাসী এবং স্বজাতি। রজনীকান্ত কলিকাতার অনেক বড় ও মাঝারী ঘরের সংবাদ রাখিত। সন্ধ্যার পর সে কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজী দৈনিকের সহকারী সম্পাদক ছিল।

কবি সহসা বলিয়া উঠিল, "মাতৃমঙ্গল কাগজের সম্পাদক অমলা মুখার্জ্জি মেয়েটি কে, জান?"

রজনীকান্তের চক্ষুযুগল একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার আননে কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না।

সে বলিল, "অমলা ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের মেয়ে, এম-এ পাশ! বালীগঞ্জে থাকেন।"

সহসা কেহ কবির পৃষ্ঠে যেন বেত্রাঘাত করিল। বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

রজনী তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই ত?

স্বল্পায়াসে আপনাকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া কবি বন্ধুর দিকে ফিরিয়া বসিল। সে বর্ত্তমানের উপাসক। যাহা অতীত বা অনাগত, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? তবু—

"ভাল কথা, তোমার মা সে দিন আমায় চিঠি লিখেছেন। তোমার বিয়ের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত! মেয়ে দেখবার জন্য আমায় বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছেন। কবির কি মত আছে? তা হ'লে চেষ্টা দেখি।"

বিবাহ?—সে ত একটা বন্ধন! তবে দোষ কি? কিছু দিন পূর্ব্বে সে ত এমনই একটা বন্ধনের সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিল; কিন্তু কে এক জন মুখোপাধ্যায় তাহার সে স্বপ্ন নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিল! যাক্—অতীত তাহার উপাস্য নহে!

তা মন্দ কি? সুন্দরী, শিক্ষিতা তরুণী হইলে তাহার আপত্তি নাই। তবে সে স্বয়ং কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিবাহ হইতে পারিবে।

রজনী বলিল যে, তাহারই কোন আত্মীয়ের ষোড়শী, সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা আছে। বর্ত্তমান যদি ইচ্ছা করে, তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারে।

কবি বলিল, "বেশ। কিন্তু তুমি আর আমি ছাড়া আর কারও যাবার দরকার নেই। তবে মনে রেখ, আমি বর্ত্তমানের ভক্ত। ভবিষ্যতের কোন আশা বা অতীতের কোন মোহ দিয়ে তুমি তাকে ভোলাতে পারবে না।"

রজনীকান্তের চক্ষুযুগল আবার অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "না, না, সে সব কোন আশঙ্কা নেই।"

৫

বাহিরের ঘরটি সুন্দররূপে সজ্জিত। অপরাহ্ণের আলো তখনও বিদায় লয় নাই।

কবি আজ প্রসাধন-পারিপাট্যের জয়টীকা পাইবার যোগ্য। সাধারণতঃ পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখিতে গেলেও আত্ম-পরিচয় গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করে; কিন্তু বর্ত্তমান সেরূপ অভিনয় করার পক্ষপাতী ছিল না। যাহা সত্য, মিথ্যার আশ্রয়ে তাহাকে লুকাইয়া রাখা সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিত। সুতরাং রজনীকান্তকে কোনও প্রকার লুকাচুরীর জন্য ব্যস্ত হইতে হয় নাই।

গৃহের মধ্যে দুই জন তরুণ তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কবিকে তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। বর্ত্তমান একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়মাত্রই তাহার কাছে বে-রসিক। এমন কোন আবর্জ্জনা এখানে নাই দেখিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইল। রজনীকান্তের বুদ্ধি আছে দেখিতেছি।

কবি, রজনীকান্তের বুদ্ধির আরও পরিচয় পাইল।

"ইনি আমাদের কবি বর্ত্তমান। নাম নিশ্চয় তোমরা শুনেছ। তরুণদলের—সবুজ যুগের ইনি এক জন শ্রেষ্ঠ নেতা।"

এক জন যুবক বলিল, "পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার মত স্বাধীনমতাবলম্বী কবির সঙ্গে পরিচিত হলুম।"

দ্বিতীয় যুবক গম্ভীরভাবে বলিল, "আমরা ওঁকে বর্ত্তমান না ব'লে মর্ত্তমান ব'লে ডাকি। কারণ, কলার মধ্যে মর্ত্তমান যেমন শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যকলা—সবুজ সাহিত্যকলায় উনি তেমনই মর্ত্তমান। যেমন গন্ধ, তেমনই স্বাদ।"

কবি যুবকযুগলের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। নয়নের দৃষ্টি, আননের রেখাপাত প্রভৃতির দ্বারা সে আপনাকে মানব-মনোবৃত্তির পরিমাণ করিতে দক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কবি ও কথা-সাহিত্যিকের সে শক্তি থাকা অত্যাবশ্যক।

না, উহাদের কথায় নিছক স্তুতি ও গুণগ্রাহিতার পরিচয়ই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

মিহি সুরে—খাম্বাজে ঝঙ্কার দিয়া কবি বলিল, "আপনারাও কবি না কি?"

"আজ্ঞে, সে সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমরা কাব্যের ভক্ত, রসগ্রাহী বল্‌তে পারেন।"

ইহাদের এখানে 'কালচার'—শিক্ষা আছে বটে!

ভিতরের দিকে পর্দ্দা সরাইয়া রজনীকান্ত কন্যাকে সভাস্থ করিল। কবি বুঝিল, পুরু পর্দ্দার অন্তরালে অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু—সম্ভবতঃ অধিকাংশই তরুণীর—সমবেত হইয়াছে।

আসনের উপর সে সোজা হইয়া বসিল। বাঃ! চেহারাটি ত চমৎকার! গাত্রবর্ণও নিন্দনীয় নহে। অন্ততঃ তাহার পার্শ্বে ইহাকে রাখিয়া কনকলতা বলিয়া কেহ বর্ণনা করিলে তাহা সত্যের গণ্ডী অতিক্রম করিবে না।

রজনীকান্ত মৃদু স্বরে বলিল, "কালা, বোবা কি না, পরীক্ষা করার অজুহতে মামুলী প্রথায় প্রশ্ন আরম্ভ ক'রে দাও।"

"আপনার নামটি কি বলুন ত?"

"কুমারী বীণা।"

কবি নয়ন মুদ্রিত করিয়া বুঝিতে চাহিল, কণ্ঠে বীণা বাজিতেছে কি না।

"লেখা-পড়ার কথা কিছু জিজ্ঞাসা কর, কবি?"

রজনীকান্ত টেবলের উপর হইতে একখানি বাঙ্গালা বহি লইয়া বীণার হাতে দিতে গেল। কবি বাধা দিয়া নিজের পকেট হইতে একখানি বাঁধান পুস্তক বাহির করিল। বইখানি তাহারই রচিত—একখানি গীতিকবিতার বই।

কবি একটি পাতা খুলিয়া কন্যার দিকে বইখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "পড়ুন ত এই যায়গাটা।"

রজনী বইখানা তরুণীর হাতে দিল।

ও কি? তাহার আনন সহসা এমন আরক্ত হইয়া উঠিল কেন? ললাটে স্বেদবিন্দু জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিয়াছে। তরুণীর হাত হইতে বইখানি ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

রজনীকান্ত বইখানি তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট পাতাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহারও গম্ভীর আননে একটা কালো রেখা তখন ফুটিয়া উঠিল। কবির কানে কানে সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তোমার 'কামায়নের রসতত্ত্ব' কোন কুমারীকে পড়তে দেওয়া ভাল হয়নি, কবি।"

অন্তঃপুরের পর্দ্দাটা ঈষৎ আন্দোলিত হইল—অন্তরালে দুই একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনিও যেন শুনা গেল।

এক জন যুবক বলিল, "বীণা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, সুতরাং লিখতে পড়্তে জানে।"

"আচ্ছা, হাতের লেখা। বেশ, আপনি কয়েক ছত্রে আপনার কোন প্রিয়জনকে একখানা চিঠি লিখুন ত।"

মোটরের বংশীধ্বনি নিকটে শ্রুত হইল। পর-মুহূর্ত্তে এক ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

এ কে? সুকুমার না?—কবি বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি কবিবর বর্ত্তমান! বীণাকে দেখতে আস্‌বে শুনেছিলুম। আমার আস্‌তে একটু দেরী হয়ে গেছে। ও কি? হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে যে? এখানে আমি কেন? আছে, আছে ভায়া, সম্পর্ক না থাক্‌লে কি আসি? সে সব পরে বল্‌ছি। এখন বীণা রাণীর কি পরীক্ষা হচ্ছে, শুনি?"

কবি মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া পূর্ব্ব-প্রশ্ন করিল।

সুকুমার হাসিয়া বলিল, "বন্ধু, বীণা খুব লিখতে পার্‌বে। প্রিয়জনকে কেমন ক'রে চিঠি লিখতে হয়, তা আজকালকার মেয়েরা বেশ জানে। বীণা, তুমি এক কায কর। একটা কবিতা লিখে হাতের লেখার নমুনা দেখিয়ে দাও।"

অন্দরের পর্দ্দাটা আর একবার দুলিয়া উঠিল।

"দেখ কবি, আমার কথা শোন! বীণা ভারী ভাল মেয়ে, বেশ রান্না করতে জানে।"

"আপনি চপ কাটলেট ভাঁজতে হয় কেমন ক'রে জানেন?"

ইদানীং কথা-সাহিত্যের জন্য কবি পাকপ্রণালী, কৃষিতত্ত্ব এবং কিছু কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ পড়িয়াছিল। তাহার মতে কথা-সাহিত্যিকের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা অত্যাবশ্যক।

অন্তঃপুরের দিকে বোধ হয় হাসির কলধ্বনি চাপিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টা হইতেছিল।

কবি এবার একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বোধ হয়। সে বলিয়া উঠিল, "আপনি হয় ত তা জানেন। কিন্তু বলুন ত, রান্নার সময় হঠাৎ যদি আপনার কাপড়ে আগুন ধ'রে যায়, তখন কি কর্‌বেন?"

প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক কি না, অথবা ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, গৃহমধ্যস্থ সকলের স্তম্ভিত ভাবে তাহা বুঝা গেল না।

অন্তঃপুরের পর্দ্দাটা এবার ভীষণভাবে আন্দোলিত হইল এবং চাপা গলার স্বর ছাপাইয়া তরুণকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"তা হোক্!"

পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে এক অপূর্ব্বসুন্দরী গজেন্দ্রগমনে প্রবেশ করিল। কবি বিস্ময়স্তম্ভিত ভাবে দেখিল, এই তরুণীই শ্রীমতী অমিয়া মুখোপাধ্যায়।

"নমস্কার বর্ত্তমান বাবু!—আপনার আসল নামটা ভুলে গেছি, কিছু মনে করবেন না। বীণা আমার মাসতুতো বোন্। শুনেছি, আপনি বর্ত্তমানের উপাসক; কিন্তু বীণাকে ভবিষ্যতের প্রশ্ন আপনি কেন করছেন, বুঝতে পারলুম না।"

কবি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তরুণীর বিলোল কটাক্ষের আঘাতে সে তখনই বসিয়া পড়িল।

সুকুমার দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "শোন বন্ধু, এঁর সঙ্গে তোমায় পরিচিত করিয়ে দেওয়া আমার কায—যদিও বুঝ্‌ছি, সে পরিচয় আগেই যে রকমে হোক তোমাদের হয়ে গেছে। উনি আমারই গৃহলক্ষ্মী। বিলেত যাবার আগে বাগ্‌দান হয়েছিল। আজ কয় সপ্তাহ হ'ল মাল্যদান হয়ে গেছে। তবে ভোজটা বাকি আছে, ক'দিন পরেই হবে।"

রজনীকান্ত মৃদু হাসিয়া বলিল, "উনি এখন তোমার কাছে অতীত, কবি। সুতরাং তোমার দুঃখ করবার কিছু নেই। আর ইনি—আমাদের বীণা, উনিও ভবিষ্যৎ। তাতেও তোমার ক্ষোভ হ'তে পারে না; কারণ, তুমি বর্ত্তমানের স্রোতেই ভেসে চলেছ। আমরা তোমার স্রোতের গতি ফিরবে আশা করেছিলুম, কিন্তু না, তোমার সম্বন্ধে আশা বড় কম দেখ্‌ছি।"

শ্রীমতী অমিয়া বলিয়া উঠিল, "রজনী-দা আমার মামাত ভাই, তা আপনি জানেন না বুঝি? থিয়েটারে—"

"আঃ, কি কর অমিয়া?"—সুকুমার নীরবে হাসিতে লাগিল।

কবি হাঁপাইয়া উঠিল। সে তখন পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়।

অমিয়া বলিল, "একটা কথা আপনাকে ব'লে রাখি, নারীকে জাগাবার জন্য আর যাই করুন, ও সব রাবিশ লিখ্‌বেন না। মেয়েরা এখনও এত অপদার্থ হয়ে যায়নি যে, অপনাদের উৎকট, দুর্গন্ধযুক্ত বিদেশী পচা মালের খরিদ্দার হবে!"

সুকুমার তেমনই ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও রকম মনোবৃত্তি নিয়ে যারা সবুজের জয়গান করে, কোনও ভদ্রলোক তাদের কন্যাদান করতেও সহজে রাজী হবেন না, সেটাও জেনে রাখ, ভাই!"

সেই নীরব হাসির জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বর্ত্তমান দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রজনী ডাকিল,—"ওহে, কিছু মিষ্টি মুখ—"

কবি তখন গৃহসীমা ছাড়িয়া রাজপথে। তাহার কানে তখন বাজিতেছিল—"ইহা অতীত, উহা ভবিষ্যৎ!"

বর্ত্তমানের কি স্থান নাই?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

চৈতী হাওয়ায়

চৈতী হাওয়ায় কার গৈরী নিশাস;—
অন্তরে সন্তরে কইবি কি আশ?
বল্ না লো! কেন ভালো আজ মনে হয়;
কার মুখ তোর বুক মাঝে জেগে রয়?
নিতি নাহি জাগে যার স্মৃতি মন মাঝ—
সে প্রিয়ের বার্ত্তা কি এল ভেসে আজ?
বহু দিন হ'ল লীন অতীত ছায়ায়,—
জাগ্‌ল কি ফাগ্ মেখে চৈতী মায়ায়?
গোপন স্বপন তোর অন্তর-লীন,
পরদার দ্বার রুধে' ছিল এত দিন;—
আচমকা চমকিত হ'ল উতরোল—
ক্ষ্যাপা চৈতীর খেয়ে ঘূর্ণীর দোল!
পরশন লাগি' অকারণ কার,—বল্,
থাকি' থাকি' আঁখি-পাত করে ছল্ ছল্।
কার কথা ব্যথা-ভরা চৈতী দোলায়,
মর্ম্মেতে মর্ম্মরি' উঠে বেদনায়?

দখিণায় সখি! এ কি বল্ জ্বালাতন,
অকারণ উচাটন কি কারণ মন?
ধরণী পাগল হ'ল চৈতী নিশায়;
ঘরণী বধূর চোখে নাহি নিদ হায়!
চৈতী এ ক্ষ্যাপাটারে মানা কর সই,
বড় যে জ্বালায়, ঘরে কেমনে লো রই?
ঘূর্ণীতে চূর্ণি' সে লাজ সম্ভ্রম—
অঞ্চল দেয় ফেলে—নাই লো সরম!
ক্ষ্যাপা চৈতীর বুকে লাগে নর্ত্তন;
নিদয় হৃদয় যে লো করে মন্থন!
ঘরছাড়া পথিকের পথহারা গান,—
বাতায়নে তুলে খণে ভুলে যাওয়া তান!
দূর দেশে সুর দেয় বাঁশী নিশি-দিন;
অন্তরে গুঞ্জরে তাই রিণিরিণ!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ ও প্রতীকারের উপায়

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, অতি প্রাচীনকালে সগর রাজা অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের তুরঙ্গ যখন নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া পূর্ব্বদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সেই যজ্ঞের অশ্ব আচম্বিতে অদৃশ্য হইয়া যায়। ষাট হাজার সগর-সন্তান সেই অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। তুরঙ্গমের সন্ধানে তাহারা বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া সাগরতীরে মহর্ষি কপিলের আশ্রমের সান্নিধ্যে অশ্বটি দেখিতে পায়। তাহারা কপিলকে সেই অশ্বের অপহারক বলিয়া তিরস্কার করে। সেই জন্য ক্রুদ্ধ কপিলের অভিসম্পাতে ৬০ হাজার সগর-সন্তান দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছিল। পরে সগরবংশীয় ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া কপিল-কোপ-দগ্ধ পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বিস্মৃত কাহিনীর কঙ্কাল এই-ভাবে ভারতের ইতিহাসে এবং পুরাণে রক্ষিত হইয়াছে। যে অতীত ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া এই পৌরাণিক আখ্যান যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ব্যাসমুখে বিবৃত হইয়া আসিতেছে, নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তাহা আজ এই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিত উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা উহার ভিতর হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশিত করিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া উহাকে কুসংস্কারের প্রচার-কর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগের রচিত গল্প বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি য়ুরোপ হইতে এক জন মনীষাসম্পন্ন মহাত্মা আসিয়া উহা হইতে এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মনস্বী য়ুরোপীয়ের নাম সার উইলিয়ম উইল-কক্স। ইনিই প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভগীরথ খাল কাটিয়া এই শ্মশানতুল্য বঙ্গদেশে নন্দনের সুষমা বিকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি যে শঙ্খধ্বনি করিয়া মর্ত্তে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি খাল কাটিয়া এ দেশে গঙ্গাদেবীকে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, পৌরাণিক আখ্যায়িকার সহিত এই তথ্যের কতদূর সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভবে।

মহর্ষি কপিল কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। দেবহূতির গর্ভে ইহার জন্ম। প্রজাপতি অর্থে প্রজাপালক। প্রজা শব্দের অর্থ লোক বা রাইয়ত এবং সন্তান বুঝায়। কর্দ্দম প্রজাপতি অর্থাৎ লোকপালক। সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় যে, কর্দ্দম হইতে শস্য উৎপাদিত হয় এবং সেই শস্য লোকদিগের জীবনরক্ষা করে। শুষ্ক মাটীতে শস্য জন্মে না; দেবহূতি শব্দে দেবতার আহ্বান বুঝায়। হূতি অর্থে আহ্বান। আবার এই কর্দ্দম হইতে ম্যালে-রিয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। বর্ষায় শুষ্ক মৃত্তিকা জলসিক্ত হইলে কর্দ্দম হয়। সেই জলসিক্ত ও জলবাধা মৃত্তিকা হইতে দেবতার আহ্বানে—অর্থাৎ বিধাতার বিধানে যে বিষময় বাষ্প এবং মশকাদি আবির্ভূত হয়, তাহাই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ। কপিল অর্থে পিঙ্গলবর্ণ। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে লোক পিঙ্গলবর্ণ বা ফ্যাকাসে (রক্তহীনতা জন্য) হয় বলিয়া ম্যালেরিয়ার নাম কপিল। সুতরাং পৌরাণিক আখ্যান হইতে এই তথ্য বুঝা গেল যে, সগররাজের যজ্ঞের অশ্ব অতি প্রাচীন যুগে যখন এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সেই অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত সগররাজার ষাট হাজার প্রজা (সন্ততি) ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। শেষে তাহারা সকলে মরিয়া যায়। এই প্রকার প্রতীকার্য্য ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যু অপমৃত্যু বলিয়া গণ্য। সুতরাং তাঁহাদের সদ্গতি হয় নাই মনে করিয়া ভগীরথ তাঁহা-দের উদ্ধারসাধনের জন্য তপস্যা বা সাধনা করেন। তিনি গঙ্গাদেবীকে অর্থাৎ সরিদ্বরা গঙ্গাকে এ দেশে আনিয়া অভিশপ্ত সগরসন্তানগণের উদ্ধারসাধন করেন। তিনি খাল কাটিয়াই গঙ্গা আনিয়াছিলেন। গঙ্গা আনিবার সময় পথে কয়েকটি বিঘ্নও ঘটিয়াছিল। সুহোত্র-রাজপুত্র জহ্নু গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলেন এবং পদ্মার শঙ্খনাদে গঙ্গা বিপথগামিনী হয়েন। জহ্নু শব্দের অর্থ—যে জগৎকে ত্যাগ করিয়াছে অর্থাৎ জগতের সহিত যে সম্পর্কশূন্য হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে। হা ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা। উহার উত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে নু প্রত্যয়ে জহ্নু শব্দ নিষ্পন্ন। তপস্বী জহ্নু অর্থে প্রতপ্ত মরুকান্তার। "ভগীরথের খাল কোন প্রতপ্ত মরুকান্তারে আসিয়া বিলীন হইয়া যায়; পরে ভগীরথ বহু চেষ্টায় উহার এক কোণ (কর্ণ) হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া আনেন। তিনি পদ্মার শঙ্খনাদে বিপথগামিনী হইয়া-ছিলেন, আর একটা বিশাল জলাশয়ে মিশিয়া পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়াছিলেন। ভগীরথের শঙ্খনাদে তিনি দক্ষিণমুখগামিনী অর্থাৎ ভগীরথ সেই বৃহৎ নদীর পশ্চিমদিক্ হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গাকে দক্ষিণদিকে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে লইয়া আইসেন। পশ্চিম এবং মধ্যবঙ্গে সেই ভাগীরথী হইতে বহু খাল খনিত হইয়াছিল। সেই খালগুলি গঙ্গাবারি দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল।

সর্ব্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন।

গঙ্গা শিব-বীর্য্যে অভিষিক্তা হইলে সমস্ত স্রোতস্বতী সেই বীর্য্যে পূর্ণা হইয়া গিয়াছিল। অগ্নি-পরিত্যক্ত সেই শিবতেজ হিরণ্যবর্ণ। সেই তেজের রক্ষাস্থান হিমবৎপার্শ্বে। গঙ্গা হইতে বহির্গত সেই তপ্ত জাম্বুনদপ্রভ, অর্থাৎ গলিত সুবর্ণের নদীর মত সেই তেজ বা তেজস্কর পদার্থ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

"নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।
সর্ব্বং পর্ব্বতসন্নদ্ধং সৌবর্ণমভবদ্বনম্॥" (আদি ৩৭ অধ্যায়)

গঙ্গাগর্ভে সেই তেজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই সেই তেজে পর্ব্বতের সন্নিহিত সমস্ত বনভূমি উহাতে অভিরঞ্জিত হইয়া সুবর্ণ-বর্ণ ধারণ করিল। এই শিববীর্য্যই গঙ্গার পাবনী শক্তি। ইহার প্রভাবেই পৃথিবী নানা ধাতুময়ী এবং জীবের জীবনীশক্তি-সংবর্দ্ধক শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই বর্ষায় গৈরিকবসনা ভাগীরথী জীব-জীবনদায়িনী পতিতপাবনীরূপে এই বঙ্গদেশকে শস্যশালিনী করিয়া থাকেন। সেই গৈরিক সলিল-প্রভাবে বঙ্গদেশ ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিল। সেই পুরাতনী কাহিনীর এখন বিকৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু আসল কথাটি এত কাল পরেও সেই কাহিনীটিতে অতি ক্ষীণ এবং বিপর্য্যস্তভাবে গর্ভিত রহিয়াছে। আজ সেই গলিত কাঞ্চনসন্নিভ গঙ্গাজলে বঞ্চিতা হইয়া বাঙ্গালার নদীগুলি শীর্ণা হইয়া পড়িয়াছে, ধরণী ঊষরা হইয়া উঠিয়াছেন, বঙ্গজনীর বক্ষে নানা ব্যাধি সন্তান-সংহারে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সার উইলিয়ম উইলকক্স সেই কথাই বলিয়াছেন।

সার উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়াছেন যে, প্রাচীন যুগের লোক যে অদ্ভুতকর্ম্মা অতিমানুষ ছিলেন, তাহা বাইবেলেই উক্ত আছে। মিশরের মেন্স, ব্যাবিলনের মেয়োডাচ এবং বাঙ্গালার ভগীরথ প্রকৃতই অদ্ভুতকর্ম্মা লোক ছিলেন। প্রাচীন যুগের কাহিনী-গুলি সর্ব্বদেশেই উপদেশাত্মক গল্প হিসাবে বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভৈরব, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, যমুনা, কপো-তাক্ষ, ভৈরব প্রভৃতি সমান্তরালভাবে কাটা খাল,—উহা কালে নদীতে পরিণত হইয়াছে। তিনি এ পর্য্যন্ত ঐগুলিকে নদী বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া উহা যে খনিত খাল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি ডাক্তার বেণ্টলীর সহিত একত্র গঙ্গাতীরবর্ত্তী গোলাঘাট হইতে ট্রেণে আসিতেছিলেন। তিনি আসিবার সময় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ৯।১০ মাইল ভূমি উৎকৃষ্ট হৈমন্তিক শস্যে আচ্ছন্ন। তাহার পর তাঁহারা একটি বাঁধ পার হইলেন; বাঁধের পরপারস্থ শস্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তথাকার শস্যগুলি যেন পঙ্গপালে চুষিয়া খাই-য়াছে। ডাক্তার বেণ্টলী ইহার উত্তরে বলেন যে, ঐ বাঁধগুলির জন্য ভাগীরথীর রক্তবর্ণ জল ঐ শস্যক্ষেত্রগুলিকে প্লাবিত করিতে পারে না, সেই জন্য তথাকার শস্যগুলির ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তখনই তিনি লক্ষ্য করিলেন, ঐ বাঁধগুলি ভেদ করিয়া মাঠে জল যাইবার পথ নাই। তখন তিনি মানসনেত্রে দেখিতে পাইলেন যে, ভগীরথ কম্বুনিনাদ করিতে করিতে গঙ্গাকে লইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতেছেন, এবং সেই নদীর বাঁধের মধ্যে মধ্যে শাখা-নদীর সৃষ্টি করিয়া বর্ষাজলের সহিত মঙ্গলকর শিববীর্য্যময় গঙ্গা-বারি সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালার মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতেছে, ভাগীরথীর ও তাহার শাখা-খালের তীরস্থিত উচ্চ স্থানগুলিতে কৃষকদল জনপদের সৃষ্টি করিতেছে। তিনি তখন কহিলেন, ঐ সকল লোক বাস্তবিক পৃথিবীতে অতিমানুষ ছিলেন। তাঁহারা গভীর ও প্রশস্ত খাল খনন করিয়া এই বিস্তীর্ণ দেশকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল লোক গ্রীক পুরাণ-কথিত টাইটানদিগের ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা ছিলেন। তাঁহাদের কার্য্য করি-বার অভিসন্ধিও টাইটানদিগের ন্যায় ছিল। তাহার পর তিনি ডাক্তার বেণ্টলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমরাও তাঁহাদের ন্যায় হইব। আমরাও আবার পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গকে স্বাস্থ্যে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিয়া তুলিব।" হায় সার উইলিয়ম! আজ এই নির্জ্জীব, সগরসন্তান-তুল্য মৃতকল্প, দীন এবং রোগজীর্ণ বাঙ্গালীর উদ্ধারের কথা চিন্তা করিবার কোন লোক কি এই পৃথিবীতে আছে? কে আজ এই নির্ব্বীর্য্য শবতুল্য বাঙ্গালীকে উদ্ধার করিবে? তাহাকে ত আমরা এই ধরাপৃষ্ঠে খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সার উইলিয়ম উইলকক্স বর্দ্ধমান অঞ্চলে কৃষকদিগকে ম্যালে-রিয়ায় জীর্ণ এবং রক্তহীন অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহারা চিরদিনই ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকে, কেবল যে বৎসর তাহারা দামোদরের বাঁধ লঙ্ঘন করিয়া বন্যা নামিয়াছিল, সেই বৎসর তাহারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। মিশরের নীলনদের জল উথলিয়া তীরদেশ সমস্ত প্লাবিত করে। সে দেশে বৃষ্টি হয় না। সেই জন্য তথায় নদের জল শস্যক্ষেত্রমধ্যে আবদ্ধ রাখিবার জন্য বাঁধের প্রয়োজন হয়, কিন্তু গঙ্গার বাঁধের প্রয়োজন নাই। যদি এখানে বাঁধ দিতেই হয়, তাহা হইলে সেই বাঁধের মধ্যে মধ্যে বহু অবকাশ রাখিয়া মাঠ-ঘাট প্লাবিত করিবার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মিশরে নদের জল শস্যক্ষেত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিতে হয়; সে জন্য তথায় বাঁধের প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গালায় গঙ্গার রক্তিম জল যাহাতে বর্ষাবারির সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র বিসর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উহা স্বল্পস্থানে নিবদ্ধ রাখা অত্যন্ত অন্যায়। গঙ্গা প্রভৃতি নদীর রক্তিম জল জমীর উর্ব্বরাশক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত করে; মেঘের জলের উর্ব্বরতা-সম্পাদক গুণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রক্তিম জল কেবল উর্ব্বরতা-সম্পাদক নহে, উহা ম্যালেরিয়া-নাশক। নীল নদের এই রক্তবর্ণ জলের জন্য মিশরে ম্যালেরিয়ার তাদৃশ প্রকোপ হইতে পারে না। তাহার উপর তথায় প্রায় সকল জমীতেই বীজকোষ-প্রসূ পশু-খাদ্য উৎপন্ন করা হয়, সেই ফসল ম্যালেরিয়া-বাহী মশকদিগের জীবনের সন্ধিক্ষণে পুষ্পিত হইয়া উঠে। এই প্রকারে মিশর দেশ ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিস্তার পাই-য়াছে। বীজকোষ-প্রসূ ফসল বায়ুমণ্ডল হইতে সার গ্রহণ করিয়া জমীতে তাহা অর্পণ করে। ঐ শিম্বিজাতীয় ফসল মিশরের গো-মহিষ প্রভৃতি খায়; সেই জন্য তাহারা বলশালী হইয়া থাকে। এই জন্য মিশরের বর্ত্তমান উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। মিশরে ৫৫ লক্ষ একর অর্থাৎ ১ কোটি ৬৫ লক্ষ বিঘা জমীতে চাষ হইয়া থাকে। সে জন্য মিশরবাসীরা ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ভূমির বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকে। তথায় এক একর বা তিন বিঘা জমীর বার্ষিক খাজনা ২০ পাউণ্ড; ঐ পরিমাণ জমীর মূল্য ৪ শত পাউণ্ড। অর্থাৎ তথায় জমীর বিঘা করা বার্ষিক খাজনা প্রায় ১ শত টাকা আর মূল্য প্রায় ২ হাজার টাকা। ইহার তুলনায় মধ্যবঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

কিন্তু বাঙ্গালার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা চিরকাল ছিল না। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বার্ণিয়ার ভারতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"দুই বার বঙ্গদেশ পর্য্যটন করিয়া আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদেশ মিশর দেশ অপেক্ষা সমৃদ্ধি-শালী। বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলা, রেশম, চাউল, চিনি ও মাখম বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এ দেশের লোক আপনাদের খাদ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে গম, তরিতরকারী, ডাইল, কলাই, মোরগ, হাঁস প্রভৃতি উৎপাদন করে। এ রাজ্যে অসংখ্যদল শূকর, মেষ, ছাগল প্রভৃতি আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক অসীম খাল গঙ্গা হইতে বহু পরিশ্রমে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের এবং নৌ-চালনের জন্য খনিত হইয়াছে। ভারত-বাসীরা গঙ্গাজলকেই পৃথিবীর সকল জল অপেক্ষা অধিক পবিত্র মনে করিয়া থাকে।" সুতরাং বার্ণিয়ার ইহার অধিকাংশকেই

কাটা খাল মনে করিয়াছিলেন। বার্ণিয়ারের পরবর্ত্তী য়ুরোপীয় লেখকগণও তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালার সুখ-সমৃদ্ধির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আজ মধ্যবঙ্গের কি দশা উপস্থিত! শত শত মাইল বিস্তীর্ণ খাল বা নদী অসাবধানতার ফলে মজিয়া গিয়াছে; এই অনবধানতার দোষ ভগবানের উপর ন্যস্ত করা হইতেছে। খালকে নদী বলা হইয়াছে। সরকার এই জন্য বহু কমিশন বসাইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে কেবল বিলাপ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার ড্রেণেজ কমিটীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার একটি নমুনা দিয়াছেন। যথা, "এই অঞ্চলে কতকগুলি বড় বড় নদী ছিল, তাহা মজিয়া গিয়াছে।..... এই নদীগুলি মজিয়া গিয়াছে, আর এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায় নাই।.....লোকে বলে যে, সরকার এই বিষয়ে উদাসীন.....আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না; আমাদের মনে হয়, এই নদীগুলির জন্য অর্থব্যয় করিলে সেই অর্থ অপব্যয়িত হইবে।..... এই নদীগুলিকে সজীব করিয়া তোলা মানুষের শক্তির অতীত।" সার উইলিয়ম বলিয়াছেন যে, এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া কায করিলে মিশর আজ শ্বাপদগর্জ্জন-নিনাদিত এবং বাত্যাতাড়িত ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইত। বাঙ্গালা বৃষ্টির জল পায় বলিয়া তাহা হয় নাই। কমিশন মিষ্টার জে ফার্গুসনের উক্তি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই, সার উইলকক্স তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

অতঃপর সার উইলিয়ম বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ স্থলে তাঁহার সমস্ত কথার আলোচনা অসম্ভব। তিনি বলিয়াছেন, যখন বঙ্গদেশ বন্যার লোহিত জল প্রাপ্ত হইত, তখন বাঙ্গালার সুখসম্পদ ছিল, তখন বাঙ্গালার জমীতে কেবল উর্ব্বরতা-ক্ষরকারী শস্য উৎপাদন করিলেও কোন ক্ষতি হইত না। তখন বাঙ্গালায় মৎস্য ছিল, শস্যে পোষণীশক্তি অধিক ছিল। জলাভাবে ও ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালাদেশ উজাড় হইয়া যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালার গরুর আর হল-কর্ষণের শক্তি নাই। লোহিত বন্যাজলে বঞ্চিত হইয়াই বাঙ্গালার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। মিশরে যদি লোহিত জলের অভাব ঘটে, তাহা হইলে লোক উহাকে ঐ দেশের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বিপদ বলিয়া মনে করে। মিশরের যেখানেই জল পাওয়া যায়, সেইখানেই তরুলতা-গুল্ম নধর শ্যাম কান্তিতে শোভমান লক্ষিত হইয়া থাকে। মধ্য-বাঙ্গালায় ৬০ লক্ষ একর অর্থাৎ ১ কোটি ৮০ লক্ষ বিঘা চাষের জমী আছে, ঐ স্থান সম্পূর্ণ সমতল; এখানে প্রায় ১০ লক্ষ একর বা ৩০ লক্ষ বিঘা ফলের বাগান আছে। বন্যার লোহিত জল পাইলে উহা অতি সুন্দর হইয়া উঠে। তিনি বলেন, এই কার্য্য সহজসাধ্য। মার্কিণের মিসিসিপি নদীর ব্যবস্থা অপেক্ষা ইহার ব্যবস্থা করা কঠিন নহে।

সার উইলিয়ম বলিয়াছেন যে, বন্যার জলের অভাবেই বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে। বন্যার লোহিত জল, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যে জলকে শিববীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া গিয়াছেন, সেই জল যদি বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করে, তাহা হইলেই জমীর উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পায়। লোহিত বন্যাজলেই উর্ব্বরা-শক্তি নিহিত আছে। বাঁধ দিয়া এই পবিত্র মঙ্গলকর জলের প্রবাহ বন্ধ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। তিনি দামোদরের বাঁধকে সয়তানের শৃঙ্খল বলিয়াছেন। আমরাও অধিকাংশ বাঁধকে সয়তানের শৃঙ্খল মনে করি। তিনি দামোদরের বাঁধ একবারে দূরীভূত করিয়া দিতে বলেন। বাঁধের জন্যই মেদিনীপুরের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই বাঁধগুলির ফলে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের ক্ষতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, যশোহর, বর্দ্ধমানের অধিকাংশ এবং ২৪ পরগণার উত্তরাংশ (হাওড়া থানা। তদপেক্ষা অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। যমুনা নদীর উভয় তীর বিস্তীর্ণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বন্যা বন্ধ হইয়া যাওয়াতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

এ জন্য সার উইলিয়ম তিন পক্ষকে দোষী ও দায়ী করিয়াছেন। প্রথম এবং প্রধান দায়ী সরকার। তিনি বলিয়াছেন:—

"I noted that the Government of India never identified itself with the people of India, it acted as though it had no duties and no obligations to poverty-stricken people who were often poor owing to the ignorance of the Government itself."

ইহার স্থূল মর্ম্ম এইরূপ:—"আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভারত সরকার কখনই এ দেশের লোকের সহিত আপনাদিগকে সমস্বার্থে স্বার্থবান্ মনে করেন নাই। তাঁহারা যে ভারে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, এই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জনসাধারণের সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য বা বাধ্যবাধকতা নাই। অথচ সরকারের অজ্ঞতার ফলে অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্যপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে।"

তিনি দ্বিতীয়তঃ দায়ী করিয়াছেন এ দেশের জমীদারবর্গকে। আমাদের বিশ্বাস, সরকার যদি দেশের হাজা-মজা নদীগুলির পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, এবং জমীদারদিগকে তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে জমীদারগণ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না।

তিনি এজন্য তৃতীয়তঃ দায়ী করিয়াছেন পোর্ট ট্রাষ্টকে। পোর্ট ট্রাষ্ট যদি বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্য পরিচালনা ও নদীর শীর্ষদেশ-রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে গঙ্গা এরূপ ভাবে হাজিয়া মজিয়া যায় না।

এই দুর্ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গালায় কিরূপ লোকক্ষয় হইয়াছে, সার উইলিয়ম উইলকক্স তাহারও সামান্য হিসাব দিয়াছেন। বন্যার জলপ্লাবন রোধের ফলে বর্দ্ধমান জিলায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; হুগলী জিলায় ২০ বৎসরে শতকরা ৫০ জন লোক মরিয়াছে। এখন কি হইতেছে, তাহা যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার ডাক্তার বেণ্টলী-প্রণীত Malaria and Agriculture নামক পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সরকারপক্ষ কিন্তু জলাঙ্গী, গোরাই, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলিকে খনিত খাল বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সরকারপক্ষ হইতে মিষ্টার টমসন বলেন, ঐগুলি স্বাভাবিক নদী —খাল নহে। তিনি আড়িয়ালখালকেও নদী বলিতে চাহেন।

কিন্তু উহা এখনও আড়িয়ালের খাল বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মিষ্টার টমসনের উক্তির প্রত্যুত্তরে সার উইলিয়ম বলিয়াছেন যে, রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে ভাগীরথী নদীকে খাল বলাই হইয়াছে। ভগীরথ গঙ্গাপ্রবাহকে সংযত করিবার জন্য জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা এই দুইটি খাল কাটাইয়াছিলেন। মিষ্টার টমসন বলেন, পূর্ব্বে পদ্মার খাত অন্য পথে ছিল। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন ব্যাপার হইতে গঙ্গাকে যেন আদৌ খনিত খাল বলিয়া মনে হয়।

সরকার যে 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল' খনন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সার উইলিয়ম উইলকক্স তাহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। এই খাল কাটিতে ২৩ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। খালটি ৩০ কিম্বা ৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ৪ শত ফুট প্রশস্ত হইবে। ইনি বিশেষজ্ঞ হিসাবেই বলিয়াছেন যে, এই খাল কাটা হইলে বড় বিষম ভুল করা হইবে এবং ২৪ পরগণায় স্বাস্থ্য একবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। ম্যালেরিয়ায় দেশ প্লাবিত হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালার হাজা-মজা নদী বা খালগুলিকে সংস্কার করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিলে দেশের সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিবে। ইহাই সার উইলিয়মের মত।

ইহার পর ইনি বলিয়াছেন যে, প্রচুর পরিমাণে লোহিতাভ বন্যার জল যাহাতে বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পশ্চিম এবং মধ্য-বঙ্গের ঘাট-মাঠ প্লাবিত করিতে পারে, দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির এবং ম্যালেরিয়া-নাশের জন্য তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইনি বলিয়াছেন যে, টাঙ্গোরু এবং গোদাবরী সেচের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, প্রথম কার্য্যারম্ভের সময় ম্যালেরিয়ার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে সত্য, কিন্তু শিম্বিজাতীয় পশুখাদ্য উৎপাদন করিলে তাহাও হইবে না। ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, এই প্রাথমিক ম্যালেরিয়াবৃদ্ধি স্বল্পকালস্থায়ী হইবে।

ইনি অতঃপর বলিয়াছেন যে, সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম এবং মধ্য-বঙ্গই এক কালে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই অঞ্চলই সর্ব্বাপেক্ষা দারিদ্র্য ও ব্যাধি-বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্য সকল অঞ্চলে ইংরাজ জাতি গর্ব্বভরে বলিতে পারেন, "চারিদিকে নেত্রপাত কর, তাহা হইলে আমাদের কীর্ত্তিমঞ্চ দেখিতে পাইবে।" এখানে আমরা সে কথা বলিতে পারি না। বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতের রাজকোষে কোটি কোটি টাকা যোগাইয়াছে, কিন্তু এই সময়ে এই দুইটি অনুপ্রদেশ দারিদ্র্য এবং ব্যাধির লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই অঞ্চলের মধ্যেই দেড় শত বৎসর কাল সরকারের মূল অবস্থান স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালার প্রবচন আছে যে, "প্রদীপের নিম্নেই অন্ধকার গাঢ়তম" সে প্রবাদবাক্য এই স্থানেই সার্থক হইয়াছে।

বাঙ্গালী জাতি সাহচর্য্য দ্বারাই এক সময়ে এই বঙ্গভূমিকে স্বর্ণপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ষার প্রচুর বারিপাতের জন্য বাঙ্গালাদেশের অবস্থার কথা বিশেষ ভাবে বুঝা যায় নাই; মোগল রাজত্বের ভগ্ন দশায় উহাতে অত্যন্ত গোল ঘটে, সেই জন্য ইংরাজ বণিক ও নাবিকরা উহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহারা প্রকৃত কার্য্য দর্শনই করেন নাই। ইংরাজরা ঐগুলিকে নৌচালনোপযোগী নদী মনে করিয়াই যত গোল বাধাইয়াছেন এবং ভুল করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ পরিকল্পিত হইলেও উহার ফলে সাহচর্য্য করিবার মনোভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সেচের ও জল-নিকাশের ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালার এই খালগুলিকে আবার কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। মধ্যে এবং পশ্চিম-বঙ্গে সর্ব্বসাকল্যে ১ কোটি একর বা ৩ কোটি বিঘার কিছু অধিক জমীতে সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে; তন্মধ্যে ৬০ লক্ষ একর বা কিঞ্চিদধিক ১ কোটি ৮০ লক্ষ বিঘা মধ্য-বঙ্গেই অবস্থিত। এই অঞ্চলই পাটের রপ্তানী শুল্কের আয় ন্যায়তঃ পাইবার অধিকারী। পাটের রপ্তানী শুল্ক মূলধন বলিয়াই গণ্য; কারণ, পাট জমীর উর্ব্বরা-শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে, সুতরাং উহার শুল্কজাত সমস্ত অর্থই বাঙ্গালায় থাকা যুক্তিসঙ্গত। এই শুল্কজাত অর্থের শতকরা ১০ টাকা লোক্যাল বোর্ডগুলির হস্তে প্রদান করিতে হইবে। তাঁহারা ঐ টাকা বীজকোষপ্রসূ গবাদির খাদ্য উৎপন্ন করিবার কৃষিক্ষেত্র পাম্প করিয়া জল সরবরাহ করিবার জন্য ব্যয় করিবেন। এই প্রকার পশু-খাদ্য গো-মহিষাদি পশুর বলবৃদ্ধি করিবে এবং ম্যালেরিয়াকে প্রতিহত করিবে।

ইহাই সার উইলিয়ম উইলকক্সের উক্তির সার মর্ম্ম। আমরা তাঁহার প্রায় সকল কথার সমর্থন করি। তবে আমার বিশ্বাস, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ দেশে সাহচর্য্যের অভাব ঘটে নাই, প্রজাস্বত্ব আইনই জমীদার এবং প্রজার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই আইন উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছে বলিয়াই ইহা উভয় পক্ষেরই অহিতকর হইয়াছে। বিদ্যাধরী সম্বন্ধে ইনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধে বলা হইল না। এই সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। সার উইলিয়ম এক জন বিশ্ববিশ্রুত বিশেষজ্ঞ। তাঁহার কথা সকলের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



মোটর-বাহিত শ্লেজগাড়ী

মিচিগানের জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী এক প্রকার শ্লেজগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার গতি বিমানপোতের মত দ্রুত। এই গাড়ীতে মোটর সংলগ্ন আছে এবং দেখিতে অনেকটা বিমান-পোতের মত। গাড়ীখানি দীর্ঘে ১৫ ফুট। ছয় জন আরোহী গদি-আঁটা আসনে পরম আরামে ইহাতে বসিতে পারে।

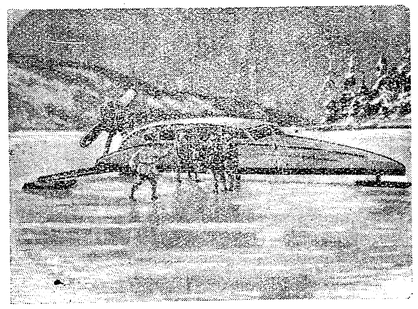

বিমানপোতাকৃতি শ্লেজগাড়ী

গাড়ী থামাইতে হইলে লোহার কাঁটা-সংলগ্ন একখানি চরণ গাড়ীর তলদেশ হইতে নির্গত হইয়া বরফের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; অমনই গাড়ী গতিহীন হয়। ঢালকের পার্শ্বেই এই লিভার-যুক্ত যন্ত্রটি অবস্থিত। অনুকূল বাতাসে এই শ্লেজগাড়ী ঘণ্টায় দেড় শত মাইল অতিক্রম করিয়া থাকে।

লেলিনের মস্তিষ্ক-পরীক্ষা

মস্কো নগরে মস্তিষ্ক-পরীক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। মানবের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুপেশীর অবস্থান সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞগণ মানুষের মস্তকাদি লইয়া গবেষণা করিয়া থাকেন। এইখানে এক প্রকার অপূর্ব্ব যন্ত্র আছে—যদ্দ্বারা মস্তিষ্ককে পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহার পর মোমের সাহায্যে এই অংশগুলির অবিকল ছাপ গৃহীত হয়। মস্তিষ্কের এই প্রতিলিপিকে ২৫ হইতে ৩০ হাজার সূক্ষ্ম খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অণু-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ উহা পরীক্ষা করিতে থাকেন। লেলিনের মস্তিষ্ককে এই ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। গবেষকগণ রাসিয়ার অন্যান্য মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিবেন, ইহাও স্থির হইয়াছে। লেলিনের মস্তিষ্ক-পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার মানসিক শক্তি অসাধারণ ছিল।

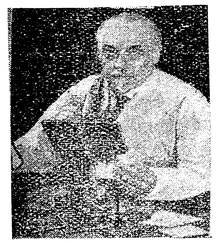

মস্তিষ্ক-পরীক্ষার যন্ত্র

অতিকায় অট্টালিকা

আমেরিকা গগনস্পর্শী বিরাট অট্টালিকার দেশ। তথায় অসংখ্য অতিকায় অট্টালিকা আছে। কিন্তু সম্প্রতি বোষ্টন নগরে যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার মত গগনস্পর্শী

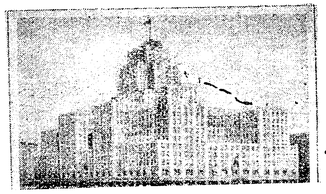

অতিকায় অট্টালিকা

বিরাট অট্টালিকা আর নাই। উহা ১৩ লক্ষ বর্গ-ফুট জমীর উপর অবস্থিত। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা উহা নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইবে। জমীর উপর হইতে উহা প্রায় ২৫তলা উচ্চ হইবে। এই সুবৃহৎ অট্টালিকায় ২০ হাজার শ্রমজীবী ব্যতীত এক সহস্র অন্যান্য ব্যক্তির বাসের ব্যবস্থা হইতেছে।

কেশ শুকাইবার যন্ত্র

প্যারীনগরীতে কোনও বৈজ্ঞানিক শিল্পী এক প্রকার মস্তকা-বরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আর্দ্র কেশ শুকাইয়া ফেলা



কেশ শুকাইবার মস্তকাবরণ

যায়। মাথার কেশকে কুঞ্চিত করিয়া আর্দ্রাবস্থায় ইহা ধারণ করিলে কেশবিন্যাসের কোনও অনিষ্ট হয় না, অথচ কেশজাল আপনা হইতে শুষ্ক হইয়া যায়।

চক্র-চালিত যানে পুস্তকের দোকান

কালিফোর্ণিয়ার জনৈক পুস্তক-বিক্রেতা একখানি মোটর-চালিত গাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে পুস্তকের দোকান স্থাপন করিয়াছেন। এই গাড়ীতে বিক্রেতা সস্ত্রীক বাস করিয়া

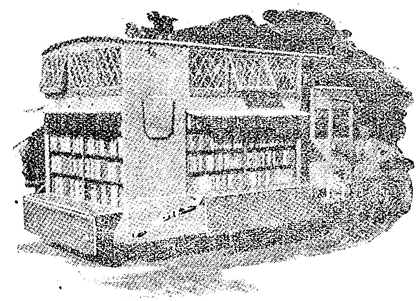

মোটর যানের উপর পুস্তকের দোকান

থাকেন। শয়নাগার প্রভৃতি গৃহস্থের বাসোপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই ইহাতে আছে। ৬ মাসের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার সহ এই পুস্তক-বিক্রেতা নানা স্থানে তাঁহার দোকান-গাড়ী লইয়া গিয়া থাকেন।

বিচিত্রদর্শন নৌকা

প্যারী নগরীতে সম্প্রতি এক প্রকার নৌকা দেখা দিয়াছে, উহার আকৃতি অনেকটা মোটরগাড়ীর মত। নৌকার দুইপার্শ্বে

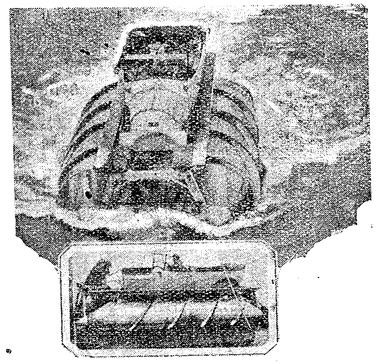

বিচিত্র নৌকা

দুইটি টর্পেডোর আকারের নল আছে। নৌকার সংলগ্ন মোটর সাহায্যে উহা জলের মধ্যে ঘণ্টায় ১২ মাইল গতিতে চলিতে থাকে। মোটর-সাহায্যে উভয় পার্শ্বস্থ টর্পেডো আকারের নল-যুগল জলের মধ্যে আবর্ত্তিত হয় এবং বারিরাশি ভেদ করিয়া চলে। এই নৌকার জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

অপূর্ব্ব মুদ্রাধার

সম্প্রতি আমেরিকার মহিলাদিগের জন্য এক প্রকার মুদ্রাধার বাজারে বাহির হইয়াছে; ইহা দেখিতে সুদৃশ্য এবং ক্ষুদ্র।



অপূর্ব্ব মুদ্রাধার

ইহার মধ্যে মুদ্রা এবং চুরুটিকা রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। মুদ্রাধারের এক দিকে রেশমী বন্ধনী, অপর দিকে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের এই মুদ্রাধার বাজারে পাওয়া যায়।

অভিনব মোটরগাড়ী

ইংলণ্ডে অধুনা এক প্রকার মোটরগাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার মধ্যে প্রবেশদ্বার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। চালকের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া এই গাড়ীতে উপবেশন করিতে হয়। এইরূপ

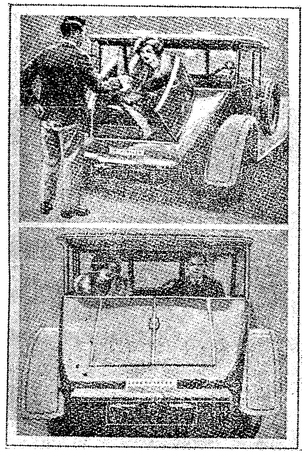

অভিনব মোটরগাড়ী

গাড়ীতে চড়িয়া আরোহী সকল দর্শনীয় পদার্থ দেখিতে পান—দৃষ্টিপথে কোন বাধা থাকে না।

দ্রুতগামী নৌকা

জনৈক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এক প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করিতেছেন। উহা একই সময়ে জল ও বাতাস উভয়ের সাহায্যে চালিত হইবে। এই নৌকাতে উদ্ভাবনকারী 'এনোপ্লেনের' ন্যায় ডানা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে নৌকার গতি বাড়িবে এবং সম্ভবতঃ ঘণ্টায় এক শত মাইল চলিতে পারিবে। এই নৌকা পরিচালনের ব্যয় না কি খুব কমই পড়িবে—অন্ততঃ আবিষ্কারক এইরূপ আশা করিতেছেন।



দ্রুতগামী নৌকা

আবর্জ্জনা-পরিষ্কারক যন্ত্র

জার্ম্মাণীতে অধুনা রাজপথের আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য এক প্রকার ব্রুস ব্যবহৃত হইতেছে। এই ব্রুস আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়া একটি আধারে উহা জমা করিয়া ফেলে। সমগ্র যন্ত্রটি এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, এক জন লোক উহা পরিচালনা করিতে পারে। সাধারণ ব্রুসের দ্বারা যতটুকু স্থান পরিষ্কৃত হয়, ইহা দ্বারা তাহার তিন গুণ স্থান সেই সময়ের মধ্যে সুপরিষ্কৃত হইয়া থাকে।



আবর্জ্জনা-পরিষ্কারক যন্ত্র

অশ্রু-অর্ঘ্য

গীষ্পতি কাব্যতীর্থ

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে,জনপ্রিয় তেজস্বী বক্তা সাহিত্যিক গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় 'কলেরা রোগে গত ১৫ই চৈত্র বুধবার অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। বারাণসী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি কায়স্থদিগের সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর যখন বাঙ্গালায় প্রবলভাবে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল,তখন তিনি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকারিরূপে বাঙ্গালার প্রায় সকল জিলাতেই বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি ঐকান্তিকভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে, কাব্যে-



গীষ্পতি কাব্যতীর্থ

ব্যাকরণে,সংস্কৃত নাট্যের অভিনয়ে ও অভিনয়শিক্ষা প্রদানে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎপ্রতিষ্ঠায় তিনি স্বর্গীয় পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। গীষ্পতি কাব্যতীর্থের নিবাস খুলনা জিলার শ্রীপুর গ্রামে। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন রায় চৌধুরী জমীদার ও মুন্সেফ ছিলেন—তিনি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বদেশভক্ত ও পরোপকারী ছিলেন; আড়ম্বরহীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। হিন্দুদিগের স্বার্থও সদাচার রক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন। তিনি কিছু দিন 'হাওড়া-হিতৈষী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই সময় পুলিসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখায় তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইয়াছিল। আমরা এই নিদারুণ শোকে তাঁহার বিধবা পত্নী ও সন্তানগণকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

হরিপদ ঘোষ

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়তম ভক্ত কালীপদ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র—জনপ্রিয় বাঙ্গালী কর্ম্মী—ব্যবসায়ী বরেন্দ্রনাথ ঘোষের ভ্রাতা—শ্যামপুকুরনিবাসী ৺তারাপদ ঘোষের সুযোগ্য পুত্র বন্ধুবর হরিপদ ঘোষ ১লা ফাল্গুন সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। কাগজের ব্যবসায়ে হরিপদ বাবু জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।



হরিপদ ঘোষ

প্রথম-যৌবনে প্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী জন ডিকিনসন কোম্পানীর আফিসে তিনি কার্য্য করিতেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের বিখ্যাত ইউনিয়ান পেপার মিলের কলিকাতা এজেন্সী জি, লোচন কোম্পানীর আফিস প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতে তিনি 'সাহেবের' সহযোগিরূপে এই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য—প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদম্য উদ্যমে—অক্লান্ত পরিশ্রমে—প্রাণপাত চেষ্টায় জি, লোচন কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত

DOUBLE COLOUR PAGE

হইয়াছে। সূচনার দিন হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই কারবারের উন্নতির জন্য তিনি আত্মশক্তি পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেশী মিলের কাগজ বিক্রয়ের জন্য শেষজীবনে তিনি চীনাবাজারে 'ঘোষ পেপার হাউস' নামে একটি দোকান খুলিয়াছিলেন। তাঁহার মত সদা হাস্য-প্রফুল্ল—সহৃদয় বন্ধুর অকালমৃত্যুতে আমরা সত্যই বড় ব্যথিত হইয়াছি।

ললিতকুমার মিত্র

স্বনামধন্য মোহনলাল মিত্রের বংশপ্রদীপ, দেশাত্মবোধৈকপ্রাণ দেশমাতৃকার প্রিয়সেবক প্রিয়দর্শন বন্ধু ললিতকুমার মিত্র গত ২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ললিতকুমার জ্যেষ্ঠতাতের অঙ্কের যষ্টি ও পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ললিতকুমার বিনয়ের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একসঙ্গে নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকার্য্যে ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার বাসপল্লীতেই নহে, পরন্তু কলিকাতার সকল অঞ্চলেই তিনি সকল সদনুষ্ঠানে সোৎসাহে যোগদান করিতেন। তিনি একবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং যে ভাবে নাগরিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। তিনি যখন কাউন্সিলার ছিলেন, তখন ঝাড়ুদারদিগের ধর্ম্মঘট হইলে তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সঙ্গে লইয়া পল্লীর আবর্জ্জনা দূর করিতে অগ্রসর হইয়া পল্লীবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতার আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বার দুর্ব্বদাই মুক্ত থাকিত এবং কেহ কোন অভাব-অভিযোগের সংবাদ লইয়া যাইলে ললিতকুমার স্বভাবসিদ্ধ উদারতাবশে তাহার প্রতীকারে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে গর্ব্ব বা অবিনয় ছিল না এবং এই অল্পবয়সে তিনি যেরূপ কায করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহার শুভার্থীদিগের সেই আশা অপূর্ণ রাখিয়া, তাঁহাদিগের হৃদয়ে দারুণ বেদনা প্রদান করিয়া—অনতিক্রান্ত যৌবনে, আমাদের পরম প্রীতিভাজন ললিতকুমার লোকান্তরিত হইলেন। সব গেল—রহিল তাঁহার কর্ম্মের আদর্শ—আর রহিল, তাঁহার স্বজনগণের ও শুভার্থীদিগের হৃদয়ে তাঁহার শোকবিজড়িত স্মৃতির বেদনা।



ললিতকুমার মিত্র

কলিকাতায় মুসলমান দাঙ্গার সময়—প্রতিমা-ভঙ্গের আতঙ্কে যখন সহরবাসী সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, সেই সময় বাসন্তী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার অগ্রণী হইয়া পিস্তল হস্তে যুবক ললিতকুমার সংসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন—পুলিসের ভরসায় নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কাউন্সিলার নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে তিনি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া বিজয়ী পক্ষকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তিনি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিনিময়ে বিজয়ানন্দে উন্মত্ত দল তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া গালি দিয়া—সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির করিয়া—বল হরি হরি বোল ধ্বনি করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিলেও তিনি স্বদেশসেবায় বিচলিত হন নাই। কলিকাতা করপোরেশন যখন অগ্রিম ট্যাক্স আদায়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া করদাতৃসম্প্রদায়কে নূতন উপায়ে বিব্রত করিবার চেষ্টায় বৈঠক বসাইয়াছিলেন—প্রধানতঃ ললিতকুমারের চেষ্টাতেই তাঁহাদের সে আয়োজন সে বারের মত ক্ষান্ত হইয়াছিল। করপোরেশন বিল্ডিং কমিটীর সদস্য হইয়া তিনি কলিকাতাবাসী বহুব্যক্তির গৃহ-সমস্যার সমাধান করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই নবজীবনের আশার আলো ভাগ্যদোষে অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। রহিল কেবল হতাশার দীর্ঘশ্বাস—বেদনার বৃশ্চিকদংশনের জ্বালাময়ী স্মৃতি।

ললিতকুমারের বিয়োগে আমরা প্রিয়জন-বিয়োগ-বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, কন্যা, পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার উপযুক্ত ভাষা ত খুঁজিয়া পাই না—এ শোক সান্ত্বনার অতীত। স্বদেশবাসী তাঁহার মত উৎসাহী-কর্ম্মী—স্বদেশহিতে আত্ম-নিবেদিতপ্রাণ যুবকের অভাব বহু দিন উপলব্ধি করিবে।

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৬ই চৈত্র সোমবার রাত্রিকালে প্রসিদ্ধ শিক্ষক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত গঙ্গাধর বাবুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ১২৫২ সালে গঙ্গাধর বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান। তাঁহার পিতা পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ন্যায়রত্নের যশঃ তৎকালে বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত ছিল; তিনি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না।

তিনি তীর্থপর্য্যটনে গমন করিলে গঙ্গাধর বাবুর জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য তাঁহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। গঙ্গাধর বাবু যে সময়ের লোক, সে সময় অনেকে হিন্দুর আচার-ব্যবহারে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষাফলে গঙ্গাধর বাবু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আচারনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করা হয়, তথায় সুর-তরঙ্গিণীতীরে তাঁহার দেহান্ত হয়।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পর্য্যন্ত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পাঠ্যদশায় ও তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইয়া ব্যাঁটরা হইতে হাঁটিয়া আসিয়া গঙ্গা পার হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন।



গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি প্রথমে ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশনারী কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য আরম্ভ করেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই য়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের সহিত মতের অনৈক্য হওয়ায় সে কায ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে 'নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল' নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই "নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল" এখনও সুপরিচালিত হইতেছে। তিনি আহার ও বাসস্থান দিয়া অনেকগুলি দরিদ্র ছাত্রকে বিশেষ যত্নে নিজে পড়াইতেন।

গঙ্গাধর বাবু শিক্ষক হিসাবে ও পাঠ্য পুস্তককার বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার দিনে অনেকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে গঙ্গাধর বাবুর কৃত কার্য্যের কথা অবগত নহেন। দেখিতে দেখিতে অনেক দিন গত হইল। সরকারী আইনের জন্য দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তখন 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। সরকারী আইনের প্রতিবাদকল্পে তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে বিলাতে পার্লামেণ্টে গ্ল্যাডষ্টোন্ সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'সোমপ্রকাশের' প্রকাশ বন্ধ হইলে গঙ্গাধর বাবু সেই ভাবে 'নব-বিভাকর প্রকাশ করিলেন। 'সোমপ্রকাশ' সোমবারে প্রকাশিত হইত। তাহার চন্দ্রোদয় অর্থও হইতে পারে। সেই অর্থ লইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সোমপ্রকাশের' ললাটে কালিদাসের নিম্নলিখিত সুমধুর শ্লোক অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন :—

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ,
সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

'সোমপ্রকাশের" স্থানে গঙ্গাধর বাবু যখন 'নব-বিভাকর' প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাহার ললাটে কালিদাসেরই একটি শ্লোক অঙ্কিত করিয়া দিলেন :—

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীণা-
মাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু॥"

যাঁহারা রসিক, তাঁহারা বুঝিবেন, এই শ্লোকের সার্থকতা অসাধারণ, কারণ তখন সত্যসত্যই দশান্তর ঘটিতেছিল। তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিশেষ যোগ্যতা সহকারে 'নব-বিভাকর' পরিচালিত করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর বাবু ও গিরিজাভূষণ বাবু উভয়েই সে সময়ের প্রসিদ্ধ ইংরাজীনবিশ। উভয়ে একযোগে বাঙ্গালার সংবাদপত্র পরিচালিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের মতাবলম্বী ছিলেন :—

"ইংরাজী লেখক, ইংরাজী বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখনও খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিনস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

আজ যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র দেশে সমাদৃত, তাঁহারা তাহার পথিপ্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গাধর বাবু খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত আপনার ঘরে বিদ্যুতের বাতি বা পাখা ব্যবহার করেন নাই। তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন এবং বিলাসবর্জ্জিত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি যেমন আদর্শস্থানীয় ছিলেন—সামাজিক বাঙ্গালী হিসাবেও তিনি তেমনই ছিলেন।—তাঁহার মত মিষ্টভাষী, পরোপকারী, স্বদেশহিতৈষী, তেজস্বী ব্রাহ্মণ অধুনা বিরল। শেষ জীবনে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

পরলোকে সাক্ষিগোপাল বড়াল

গত ৮ই চৈত্র বুধবার কলিকাতার এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী সাক্ষিগোপাল বড়াল পরলোকগমন করিয়াছেন।

কলিকাতার কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বাজারে প্রসাদদাস বড়াল ব্রাদার্শের নাম সর্ব্বজনবিদিত। প্রসাদদাস বাবুর পর তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সাক্ষিগোপাল বড়াল মহাশয় দীর্ঘ ৪৬ বৎসরকাল অসাধারণ দক্ষতা সহকারে এই কারবার পরিচালনা করিতেছিলেন। সাক্ষিবাবু ১২৭০ সালে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কার্ত্তিকচন্দ্র বড়াল। সাক্ষিবাবু হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন—গণিতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পিতৃবিয়োগের পর তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পিতার প্রতিষ্ঠিত কারবারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তিনি হুগলীতে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কয়েকটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন সদানুষ্ঠানে গুপ্তদানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ধর্ম্মালোচনা ও কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বণিক-সমাজে তাঁহার সাধু এবং কর্ম্মঠ বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ অবহিত ছিলেন—তিনি সুবর্ণবণিক সভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। স্বগ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত অর্থ দিয়া গিয়াছেন। তিনি জমীদার-সভার সদস্য ছিলেন এবং বঙ্গীয় বণিক্-সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বহু দিন তাহার অবৈতনিক ধনরক্ষকের কায করিয়াছিলেন। তিনি বণিক-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। সাক্ষিবাবু সদাচারী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও সামাজিক লোক ছিলেন। তাঁহার মত ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এ দেশে অধিক নাই। তিনি ২ বৎসর অসুস্থাবস্থায় অতিবাহিত করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে সুবর্ণবর্ণিক সম্প্রদায় একজন গুণবান্ কর্ম্মী ব্যবসায়ী নেতা হইতে বঞ্চিত হইলেন।



সাক্ষিগোপাল বড়াল

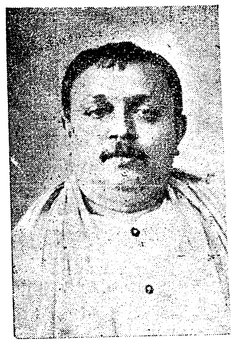

ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী

ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী

প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত ডাঃ পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম, এ, বি,এল, পি, এচ, ডি, বিগত ২১শে মাঘ শনিবারের নিশাবসানে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পশুপতিনাথ বয়সে নবীন হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান যেমন উন্নত ছিল, হৃদয় তেমনই বিনীত ছিল। তিনি প্রতিভাশালী, সরলস্বভাব, ধর্ম্মনিষ্ঠ, আচারবান্, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং উদার ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার বিয়োগে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

১২৯১ খৃষ্টাব্দে হরিনাভি গ্রামে পণ্ডিতবংশে পশুপতিনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পণ্ডিত শ্যামানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাঠশালা হইতে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া পশুপতিনাথ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। তদবধি তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। প্রবেশিকা এবং ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় তিনি জুনিয়ার এবং সিনিয়র বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার এবং জুবিলী পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি এবং প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পদক লাভ করেন। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এম, এ, পরীক্ষায় বৈদিক বিভাগে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পরবৎসর তিনি মীমাংসা এবং স্মৃতি বিভাগে কেবলমাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেন নাই; পরন্তু অন্য সকল বিভাগের মধ্যেই তিনি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করেন। তিনি ঐ বৎসর পোষ্ট গ্রাজুয়েট পদক এবং পুরস্কার, হেমচন্দ্র গোস্বামী পদক ও সোনামণি পুরস্কার লাভ করেন। দুইবার তাঁহাকে সরকারী বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন বলিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কেবল ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন না, জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক এবং ওলন্দাজ ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ইদানীং তিনি জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রেও ডাক্তার পশুপতিনাথ বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি বঙ্গবাসী কলেজের

অধ্যাপকতা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ খুলিলে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে সংস্কৃত বিভাগে গ্রহণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন।

তিনি কাশিমবাজারের মহারাজার পলিটেক্‌নিক্ ইনষ্টিটিউট, টাউন স্কুল, পার্ক ইনষ্টিটিউসন, কলিকাতা সংস্কৃত পরিষৎ প্রভৃতি বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার অব-ফিলসফি এবং বারাণসীর ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল তাঁহাকে 'বিদ্যাসুধাকর' উপাধি দান করেন।

অনেকগুলি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সায়না-চার্য্যের ভাষ্যসংগ্রহ, পূর্ব্ব-মীমাংসার অনুক্রমণিকা প্রভৃতি লিখিয়া তিনি ডাক্তার অব ফিলসফি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'জার্ম্মাণ রীডার' 'ইজি ফ্রেঞ্চ রীডার', সায়নের ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকা (মায় টিকা) ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ প্রতিশাখার ভূমিকা এবং সংস্কৃত ভাষ্য প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বের একটি সমালোচনা এবং ভাষ্যসহ এক সংস্করণ বাহির করিতেছিলেন এবং জার্ম্মাণ অধ্যাপক জিম্মায়ের ভারত সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ করিতেছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধা জননী আজিও জীবিতা। তাঁহার স্বজনগণের শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

দ্বারকানাথ ঘোষ

আর এক জন স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সুবিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতা—দোয়ারকিন এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী দ্বারকানাথ ঘোষ গত ১৯শে ফাল্গুন পরিণতবয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। দরিদ্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে পিতৃহারা হইয়া আত্মশক্তিবলে তিনি কলিকাতার ব্যবসায়িসম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পর ইংরাজের যাদ্যযন্ত্রের দোকানে সামান্য বেতনে চাকরী করিয়া সংসারপ্রতিপালন করিয়াও তিনি অবসর-সময়ে গৃহে শিক্ষালাভে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঘোষ কোম্পানী নামে বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়, মেরামত ও আমদানীর দোকান স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দোয়ারকিন এণ্ড সন্স নামে প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দ্বারকা বাবু ভারতে প্রথম বক্স হারমোনিয়াম প্রস্তুত করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অকাণ্ড চেষ্টায় বক্স হারমোনিয়াম সর্ব্ববিধ ত্রুটিশূন্য হইয়া—পূর্ণ উন্নতি লাভ করে। সে সময়ে ফ্রান্সে প্রস্তুত একমাত্র বুসনের হারমোনিয়ামই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভারতের আবহাওয়ায় তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইত না—সঙ্গীতানুরাগিগণ তাহার নানা জটিলতা ও বেলোর দীর্ঘ প্রসারের জন্য নানা অসুবিধা ভোগ করিতেন।



দ্বারকানাথ ঘোষ

দ্বারকানাথের যত্নে ও উদ্যমে বক্স হারমোনিয়ামের সৌন্দর্য্যের—সুবিধার—স্থায়িত্বের—পর্দ্দার—সুররঙ্গের—বেলোর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত বক্স হারমোনিয়াম অতি অল্পদিনেই ভারতে ও বিদেশে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া সঙ্গীত-প্রিয় সম্প্রদায়ের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল। আজকাল ভারতবাসীর গৃহে গৃহে যে সুলভ মূল্যের বক্স হারমোনিয়ামের সুরলহরী তরঙ্গায়িত, তাহার মূলে দ্বারকানাথের সাধনা। বক্স হারমোনিয়ামরূপে তাঁহার আবিষ্কার—প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে হারমোনিয়াম-শিল্পে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন—৭৪ বৎসর তিনি বাদ্যযন্ত্র-ব্যবসায়ে একনিষ্ঠ হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়া বিপুল বিত্ত অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ব্যারিষ্টার, এক জন ডাক্তার, দুই জন প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র-ব্যবসায়ী। তাঁহার স্মৃতির সম্মানের জন্য কলিকাতার সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের দোকান তাঁহার মৃত্যুর দিন বন্ধ হইয়াছিল।

রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'স্বভাবের পথে' মাসিকপত্রের সম্পাদক বাঙ্গালায় "জল-চিকিৎসার" প্রবর্ত্তক—স্বভাব-চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ তিনখানি গ্রন্থপ্রণেতা—'স্বভাব-চিকিৎসার' সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিকপত্রের প্রচারক, ছোট আদালতের উকীল রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনসংবাদে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি প্রকৃতির সাহায্যে কেবল জলপান ও স্নান দ্বারা রোগচিকিৎসা-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণার ফলে ও প্রচারপ্রভাবে বহুলোক উপকৃত হইয়াছেন। এই বিজ্ঞান প্রচার—প্রবর্ত্তন কার্য্যে তিনি এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, অসুস্থ শরীরেও নিখিল ভারত স্বভাব-চিকিৎসা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য মাদ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। সভাপতিরূপে বক্তৃতা করিবার ২ দিন পরেই তিনি লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে স্বভাব-চিকিৎসাকে জীবনের সাধনা জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই জল-চিকিৎসা ব্যতীত অন্যবিধ ঔষধ সেবনে তিনি কোনমতেই সম্মত হন নাই।



রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহিলার পুণ্যস্মৃতি

নাড়াজোল-রাজকন্যা প্রমোদাসুন্দরী মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র নিয়োগীকে পুরুষদের অগোচরে মহিলাদের গঙ্গাস্নানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সাধ্বীর শেষ অনুরোধ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে তাঁহার স্বামী বাগবাজারে গঙ্গার ঘাট ও চাঁদনী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। কলিকাতা পোর্টকমিশনারের কর্ত্তৃপক্ষগণ সভা করিয়া প্রমোদাসুন্দরীর মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন ও ঘাট উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রমোদাসুন্দরী সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মপ্রাণা নিষ্ঠাবতী আদর্শ হিন্দু নারী ছিলেন। তিনি নানা তীর্থ ও পদব্রজে বদরিকাশ্রম ভ্রমণ করিয়াছিলেন।



প্রমোদাসুন্দরী

নীলিমা বসু

মাসিক বসুমতীর অন্যতম সম্পাদক—সৎসাহিত্যের সেবক—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর প্রাণসমা প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা নীলিমা রায় অকালে জীবনাহুতি দিয়া আমাদের শোকার্ত্ত করিয়াছেন। আশার বালারুণরাগে জীবন-মুকুল প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর নিয়তির নির্ম্মম বিধানে আশা-লতিকা ছিন্নমূল হইয়া শুষ্ক হইয়া গেল! অকালে স্ত্রী-বিয়োগের পর সত্যেন্দ্রকুমার দীর্ঘকাল যে চারুলতার মূলে স্নেহবারি সেচন করিয়া সযতনে পরিবর্দ্ধিত করিয়া কত আশায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মুকুলিতা প্রসূনিতা লতিকা ফলভারে অবনত হইয়া শোভায় সুষমায় সংসার-কাননে হাসির রাশি বিকশিত করিতেছিল, ভাগ্যের কঠোর নির্দ্দেশে তাহা শ্মশানের বিড়ম্বনায় পরিণত হইল। এই সে দিন—গত অগ্রহায়ণ মাসে সত্যেন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠ জামাতা—নীলিমার স্বামী চণ্ডীচরণ শিক্ষায়—স্বদেশসেবার উৎসাহে জীবনের বিকাশ-আনন্দে আত্মবিস্মৃত, আশায় উৎফুল্ল—বর্ষীয়ান ব্যক্তির শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গে সদলে সানন্দে স্নান করিতে গিয়া গঙ্গার চোরাখাদে নিমজ্জিত হইয়া সহসা লোকান্তরে গমন করিলেন। সে শোকের দাব-দাহ নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে নূতন ইন্ধনে সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল। সাধ্বী সতী বৈধব্যের তীব্র জ্বালা—পরলোকে বাঞ্ছিতের মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করিতে পারিলেন না—স্বামীর সুহৃগমনে রোগযন্ত্রণার অবসান করিলেন। একাধারে পিতৃ-মাতৃস্নেহ সেবা যত্নের উৎস সে মর্ম্মব্যথার উপশম করিতে পারিল না—শিশু-সন্তানগণের স্নেহ-মমতা গুণবতী সতীর প্রাণকে দেহে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। সাধের সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। সব অবসান হইয়া গেল—রহিল কেবল স্মৃতির তীব্র জ্বালা—শিশুগণের মা মা ধ্বনির হাহাকার—আদর্শের গৌরব-মহিমা। এ শোকে সান্ত্বনার ভাষা নাই—এ ব্যথায় আমরা নিজেরাই ব্যথিত।

শকুন্তলা দেবী

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বরিশালের জমীদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শকুন্তলা দেবী গত ৬ই চৈত্র সোমবারে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। তিনি প্রায় ২ বৎসর রোগ ভোগ করিতেছিলেন। প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু মাতৃহৃদয়ে দারুণ বেদনা প্রদান করে। সে শোক তাঁহার পক্ষে 'দুঃসহ' হইয়াছিল। তিনি প্রিয়ভাষিণী ছিলেন ও নিজ ব্যবহারে পরকেও আপনার করিতে জানিতেন। দেবকুমার বাবুকে তাঁহার এই দারুণ শোকে আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।



মাতাল

বাড়ী আসিতেছিলাম; ফটকের কাছে জলের কলের সম্মুখে দেখিলাম, একটা ভীড় জমিয়াছে। এক জন লোক, সম্ভবতঃ মাতাল, কল হইতে জল লইয়া তাহার হাতের খালি ব্রাণ্ডির বোতলটিই পূর্ণ করিয়া সেই জল পান করিতেছিল। সমবেত জনতা তাহার বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছিল—বিদ্রূপ করিতেছিল।

ব্যাপারটা দেখিয়া আমার পক্ষেও হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইল। কিন্তু বেচারার প্রতি একটা সহানুভূতির আবেগও অনুভব করিলাম। জনতার হাস্য-বিদ্রূপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে আমি বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিলাম; সযত্নে তাহাকে বসাইয়া বলিলাম—"দাদা ভাল হুইস্কি আছে, একটু পরশ ক'রে দেখ্‌বে?"

কৃতজ্ঞতায় মাতালের চক্ষু-যুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাতের বোতলটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"আপনার বড় দয়া!"

আমার আদেশে বয় আসিয়া মাতালের জন্য 'পেগ' তৈয়ার করিয়া দিল। যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে সে বেচারা আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া নিমেষে আধার শূন্য করিয়া ফেলিল। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "ব্রাণ্ডির বোতলে কলের জল পান ক'রে লোক হাসাচ্ছিলে কেন? ও থেকে কি আনন্দ পাচ্ছিলে?

মাতাল বলিল, "মশায়, এখন ত আর তা করছি না! নেশা না হ'লে আমি থাকতে পারি না। হুইস্কি কিম্বা ব্রাণ্ডি পেলে আমি মদের বোতলে কলের জল পুরে খেতে যাব কেন? যে আসল জিনিষ যখন ভাগ্যে জোটে না, তখন বাধ্য হয়ে আসল জিনিষের বোতলে নকল জিনিষ পুরে সেইটেকেই আসল জিনিষ কল্পনা ক'রে পান করি। সাধ ত তাতে মেটে না; তবু খেয়ালটাকে অনেকখানি ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল কিম্বা নকল কিছুই না পেলে আমার ত প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, মশায়! এখন আসল জিনিষ পেয়েছি, এখন আর নকল জিনিষ খেয়ে লোক হাসাতে যাচ্ছি না! আসলটা না পেলেই ও সব করতে হয়!"

মাতালের কথা শুনিয়া আমার নয়নের সম্মুখ হইতে যবনিকা সরিয়া গেল—তাহার অন্তরাল হইতে চিরন্তন সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই মাতালের মত একটা না একটা নেশা না হইলে আমাদেরও ত চলে না! তা সে নেশা ধর্ম্মেরই হউক আর স্বদেশিকতারই হউক কিম্বা বিশ্বপ্রেমেরই হউক!

এক নেশার সরাব যখন ফুরাইয়া যায়, তখন তাহার খালি পাত্রটিতে জল ভরিয়া তাহাই পান করিয়া আমরা আমাদের মনকে প্রবোধ দিই! আমাদের কাণ্ড দেখিয়া দুনিয়া তখন হাসিতে থাকে!

পরে কোন সহৃদয় লোক আসিয়া নূতন নেশার পাত্র আমাদের সম্মুখে ধারণ করেন। পুরাতন পাত্রকে তখন দূরে ফেলিয়া আমরা আমাদের নূতন নেশায় মস্‌গুল হই। লোকের হাসি তখন থামিয়া যায়। মাতালের ভয়ে যে যাহার পথ দেখে!

পেগটা নিঃশেষে পান করিয়া মাতালের মনে বেশ একটু স্ফূর্ত্তি জন্মিল। প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"কি ভাবছেন, মশায়? আপনিও একটু খান, নেশা না হ'লে কি মানুষ বাঁচে?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে মস্ত একটা সত্যের আজ সন্ধান পেলুম। নাও, আর এক পেগ খেয়ে আমায় আপ্যায়িত কর!"

এম, ওয়াজেদ আলি, বি এ, (কেণ্টাব) বার-এট ল।



সতীর পতি

(উপন্যাস)

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হীরালালের কৌশল।

সপ্তাহ পরে বিপিন বাবু মফঃস্বলে জমীদারী পরিদর্শনান্তে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া হীরালালের সেই মারাত্মক চিঠিখানি পড়িলেন,—সুরবালাকে ডাকিয়া আনিয়া সে চিঠি দেখানোর কথাও স্ত্রীর নিকট শুনিলেন। হীরালালের উপর তাঁহার বড়ই রাগ হইল। তিনি মুখখানা গম্ভীর করিয়া, গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সুহাস বলিল, "আমি ও চিঠি খুলেছি ব'লে, সুরো দিদিকে দেখিয়েছি ব'লে তুমি কি আমার উপর রাগ করলে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "না, তোমার উপর রাগ করিনি। তুমি চিঠি খুলেছিলে ব'লে রাগ করবো কেন ? তুমি আমি কি ভিন্ন ? তবে তাড়াতাড়ি হীরুদার স্ত্রীকে ডেকে আনিয়ে তাঁকে ও চিঠি না দেখালেই ভাল হ'ত বোধ হয়। আমি ফিরে এলে, দু'জনে পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যেত। সে যাক্, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আর আপশোষ ক'রে ফল কি ?—তোমার উপর রাগও করিনি সে জন্যে। রেগেছি আমি হীরুদার উপর। চিঠিতে যে লিখেছে—আমি অতি নরাধম পাষণ্ড—ওটা তার বিনয় নয়,—বাস্তবিকই সে তাই। বুড়ো মা এখনও বেঁচে,—স্ত্রী, কন্যা, ঘর-সংসার সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে,—ছি ছি ছি—এ ত নিতান্ত হৃদয়হীন পশুর মত কায হয়েছে !"

সুহাস বলিল, "তুমি যে তখন বলেছিলে,—না, হীরুদা সে রকম ছেলেই নয়—হীরুদা তোমার কেমন সতী, দেখলে ত !"

বিপিন বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, তাহার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা দেখলাম ত —মানুষকে বিশ্বাস করবার যো নেই ! যাক্, চুলোয় যাক্ !"

সুহাস বলিল, "সে না হয় চুলোতেই গেল। তার বুড়ো মা, স্ত্রী, কন্যার উপায় হবে কি ? আচ্ছা, হীরুদা বোধ হয় চাকরী-বাকরি ছেড়ে দিয়েই পালিয়েছে ?"

বিপিন বাবু পার্শ্বস্থ টেবল হইতে হীরালালের পত্রখানি লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "এই ত লিখেছে, রেবতীকে লইয়া আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতেছি। সুতরাং চাকরী যে তার আর নেই, সেটা ঠিক। তারও নেই, রেবতীরও নেই।"

সুহাস বলিল, "ওগো দেখ, আমার মনে হচ্ছে, তাদের কুকীর্ত্তির কথা জান্‌তে পেরে তাদের দু'জনকেই হয় ত তাড়িয়ে দিয়েছে—তারা ইচ্ছে ক'রে চাকরী ছেড়ে যায়নি।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "নাঃ—তা সম্ভবপর নয়। তাদের কুকীর্ত্তি কুকীর্ত্তির জন্যে থিয়েটারওয়ালাদের ভারী ত মাথাব্যথা কি না ! অভিনেত্রীরা সতী সাবিত্রী ত আর নয়। ঘরে যে যাই করুক, থিয়েটারওয়ালাদের কি বয়ে গেছে। চাকরী ছেড়েই তারা পালিয়ে থাক্‌বে।"

সুহাস বলিল, "তা যদি বল, তবে তাদের চাকরি ছেড়ে পালাবারই বা কি দরকার ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সেইটিই ত আমার বুদ্ধিতে আসছে না। কোনও কারণ অবশ্যই আছে—যা আমি এখন অনুমান করতে পারছিনে। হয় ত এমন কেউ আছে, যার দ্বারা, কলকাতার ব'সে ওদের প্রেমচর্চ্চার বিঘ্ন হ'তে পারে। কিন্তু আমি ত রেবতীর সঙ্গে কিছু দিন মিশেছি—সে রকম কোনও খবরও আমি পাইনি কিন্তু।"

সুহাস বলিল, "কেন, সেই যে কে এক মুসলমান গুণ্ডার কথা তুমি আমায় বলেছিলে। সে-ই ত'রে নিয়ে যাওয়াতেই ত হীরুদার সঙ্গে রেবতীর পরিচয়। তার পর এক দিন রেবতী অ্যাক্ট করছিল, সেই গুণ্ডা তাকে ফুলের তোড়া ফেলে দিয়েছিল, চিঠি লিখেছিল, তোমাতে হীরুদাতে তাকে নিয়ে পালিয়ে হোটেলে ব'সে ছিলে—"

বিপিন বাবু বলিলেন,—"হ'তে পারে করিম গুণ্ডা এসে আবার উপদ্রব সুরু করেছিল,—তারই ভয়ে ওরা দু'জনে পালিয়েছে।"

সুহাস কহিল, "তা হ'লে তাদের সন্ধান পাবার উপায় কি ? সুরো দিদি বলেছিল, তুমি যদি কলকাতায় গিয়ে একবার খোঁজখবর নাও—"

বিপিন বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কলকাতায় গিয়ে কার কাছেই বা খোঁজ-খবর নেব বল ? রেবতীর বাড়ী অবশ্য আমি চিনি। সেখানে গিয়ে হয় ত দেখ্‌বে তালা বন্ধ। চাকরী ছেড়ে দিয়ে তারা যখন পালিয়েছে, থিয়েটরের লোকরা কিছু তাদের খবর বলতে পারবে না। বিশেষ, করিম গুণ্ডার ভয়ে কিংবা অন্য কোনও কারণে যদি তাদের কলকাতা ছাড়তে হয়ে থাকে, তা হ'লে, নিজেদের ঠিকানা কখনই তারা রেখে যায় নি। আর, আমি যাই-ই বা কি ক'রে ? মফঃস্বলের কায-কর্ম্ম এখনও আমার সারা হয়নি—হপ্তা-খানেক পরে আবার আমায় বেরুতে হবে, সে ত তোমায় আগেই বলছি।"

পরদিন অপরাহ্ণকালে, চুণিকে সঙ্গে লইয়া সুরবালা আসিয়া সুহাসনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। স্বামীর সহিত সুহাসের এ বিষয়ে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সুহাস সমস্তই সুরবালার কাছে বলিল।

শুনিয়া, সুরবালা কিয়ৎক্ষণ নতনেত্রে বসিয়া রহিল। তাহার পর ছল-ছল চক্ষু দুটি সখীর পানে তুলিয়া বলিল, "তা হ'লে এখন উপায় ?"

সুহাস বলিল, "উপায় ত কিছুই দেখছিনে, দিদি ! উনি বলছিলেন, তারা এ ভাবে লুকিয়ে কত কাল কাটাবে ? মাগীর কিছু টাকা আছে বোধ হয়, তারই উপর নির্ভর ক'রে বোধ হয় তারা পালিয়েছে। সেই টাকা ফুরুলেই, পেটের জ্বালায় আবার তারা কলকাতায় ফিরে কোনও থিয়েটরে ঢুক্‌বে—তখন তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় লইয়া সুরবালা গৃহে ফিরিল। এত দিন সে এ ব্যাপার বাড়ীর কাহারও নিকট আভাসেও প্রকাশ করে নাই। আজ রাত্রিতে আর থাকিতে পারিল না—শয়ন করিয়া, ছোট কাকীমার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল।

ছোট-গিন্নী পরদিন হীরালালের জননী বড়-গিন্নীর নিকটেও গোপনে কথাটা বলিলেন।

ঠাকুর-দেবতার উদ্দেশে মাথা খোঁড়া এবং অশ্রু মোচন ভিন্ন, এই অসহায়া স্ত্রীলোকগণের আর কিছুই করিবার উপায় রহিল না।

সংসারের খরচপত্র যথাসাধ্য কমাইয়া দেওয়া হইল। খুক্‌ষীর জন্য পূর্ব্বে এক পোয়া করিয়া দুধ লওয়া হইত—তার পিতার চাকরী হওয়ার পর হইতে আধসের লওয়া হইতেছিল, আবার উহা এক পোয়ায় নামিল।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিল, বিপিন বাবু হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যাবেলা আসিয়া ডাকিলেন—"খুড়ীমা'রা কি করছেন ?"

বিপিন বাবুকে দেখিয়া সকলের মনে হঠাৎ আশার সঞ্চার হইল—তবে কি হীরালালের কোনও সংবাদ আসিয়াছে ?

বড়-গিন্নী বিপিন বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। বিপিন বাবু বলিলেন, "এখন আর বস্‌বো না খুড়ীমা—হীরুদাদা টাকা পাঠিয়েছে—এই নাও।"—বলিয়া একখানি রেজিষ্টারি খাম পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে দুইখানি দশ টাকার এবং একখানি পাঁচ টাকার নোট টানিয়া, বড়-গিন্নীর হাতে দিলেন।

বড়-গিন্নী বলিলেন, "হীরু কোথা থেকে এ টাকা পাঠালে, বাবা ? কোথা আছে সে ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "টাকাটা কলকাতার একটা ব্যাঙ্ক থেকে রেজিষ্টারি হয়ে এসেছে। হীরুদা যে কোথায় আছে, তা জানবার কোনও উপায় নেই। নোটের সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে যে চিঠি আজ এসেছে, তাও আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।" —বলিয়া বিপিন বাবু চিঠিখানি বাহির করিলেন।

বড়-গিন্নী বলিলেন, "ওতে কি লেখা আছে, বাবা ?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এতে এইমাত্র লেখা আছে যে, তাদের কোনও মক্কেলের অনুরোধে, বাবু হীরালাল বসুর মা'র জন্যে তারা চিঠির মধ্যে ২৫৲ টাকা পাঠাচ্ছে।—মক্কেল কি, বুঝতে পারেন নি বোধ হয় ? ঐ ব্যাঙ্কে যারা টাকা-কড়ি জমা রাখে, তারাই হ'ল ব্যাঙ্কের মক্কেল আর কি ! কিন্তু মক্কেলটি যে কে, সে নামটি প্রকাশ করছে না। প্রকাশ করা নিশ্চয় নিষেধ আছে,—তাই প্রকাশ করেনি।"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "তা হ'লে বাবা, টাকা কে পাঠালে, তা ত কিছুই নির্ণয় হ'ল না !"

"আর কে আপনাকে টাকা পাঠাবে খুড়ীমা ? আর কেউ যদি পাঠাতো, তা হ'লে সে ত নিজেই মণি-অর্ডার করতো।

ব্যাঙ্কের মারফতে, নাম প্রকাশে নিষেধ ক'রে পাঠাবে কেন?"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "কি জানি বাবা, আমরা মুখ্যু মেয়েমানুষ, অত-শত কি আর বুঝতে পারি? আচ্ছা, তা হ'লে হীরু প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?"

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "নইলে টাকা পাঠাবে কে, খুড়ীমা!—সে বেঁচেও আছে, ভালও আছে—তবে পাছে আমরা জানতে পারি, সে কোথায় আছে, আর গিয়ে তাকে ধ'রে আনি, তাই এই কৌশলটি অবলম্বন করেছে বৈ ত নয়!"

আরও এক মাস অতীত হইল, আবার সেই ব্যাঙ্কের মারফতে, বিপিন বাবুর নিকট সেই ভাবে টাকা আসিল।

ইহার দশ দিন পরেই দার্জ্জিলিঙ হইতে হীরালালের সেই টেলিগ্রাম—"বাটীর কুশলের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি। সকলে কেমন আছে, অবিলম্বে তারযোগে জানাইবে।"

এই টেলিগ্রাম পাইয়া বিপিন বাবু অন্তঃপুরে তখনই গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, কি বখশিস্ দেবে, দাও। তোমার সুরোদিদির পলাতক স্বামীটির সন্ধান এনেছি!"

রহস্যালাপ শেষ করিয়া, বিপিন বাবু স্ত্রীকে টেলিগ্রামের বিষয় জানাইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করি বল দেখি? হীরুদার মাকে গিয়ে খবরটা ব'লে আস্‌বো?"

সুহাস বলিল, "তাড়াতাড়ি কি? হীরুদা ভাল আছে, মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছে—এখন আর তাঁদের তেমন দুশ্চিন্তা ত নেই। এখন তোমার দাদাটিকে উদ্ধার করবার কি উপায় করবে, তাই ভেবে স্থির কর। সুরোদিদি তখন বলেছিল, ঠিকানাটা জানতে পারলে, ওঁরা সব সেখানে গিয়ে, কাঁদাকাটি ক'রে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করতেন। দার্জ্জিলিঙ ত কাছে পিঠে নয়, ওঁদের সেই দূরদেশে নিয়েই বা যাবে কে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "সে বিষয় তুমিই তোমার সুরো-দিদির সঙ্গে পরামর্শ কর না কেন? হীরুর শ্বশুরবাড়ী থেকে তার শালা-টালা কেউ যদি আসে, ওঁদের নিয়ে যায়।—বাইরে এখন আমার অনেক কায প'ড়ে রয়েছে—আমি এখন চল্লাম। তুমি বরঞ্চ তোমার সুরোদিদিকে সন্ধ্যার পর ডেকে পাঠিও, তাকে একখানা চিঠি লিখে দাও—আমি কাউকে দিয়ে চিঠিখানা ওঁদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো এখন। কি বল?"

"আচ্ছা, বেশ। আমি চিঠি লিখে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তুমি ব্যবস্থা ক'রো।"

বিপিন বাবু উঠিলেন। পাণের ডিবা খুলিয়া সুহাস তাঁহার সম্মুখে ধরিল, তিনি উহা হইতে দুইটা পাণ লইয়া মুখে পুরিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙ যাত্রার পরামর্শ

রাত্রিতে আহারাদির পর শয়নকক্ষে একখানি সোফায় বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে বিপিন বাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, কি পরামর্শ হ'ল তোমাদের?"

সুহাস বলিল, "পরামর্শ আর হ'ল ছাই। ছুঁড়ী ত কেঁদেই ভাসাতে লাগলো। বল্লে, সে কি ক'রে হবে ভাই? আমার দাদারা কি মানুষ!—তারা যে এসে আমায় দার্জ্জিলিঙে নিয়ে যাবে, তার কোনও আশা নেই!"

"তবে?—তোমার সুরোদিদি তা হ'লে নিজের স্বামীটিকে রেবতীর পাদপদ্মেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত না কি?"

সুহাস বলিল, "তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। তাই কি কোনও মেয়েমানুষ কখনও পারে?"

"তা হ'লে?"

"সে আমায় অনেক ক'রে হাতযোড় ক'রে ব'লে গেছে,—'ঠাকুরপো যদি গিয়ে তাকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারেন, তবেই হয়, নইলে আমার পোড়া কপাল ত জন্মের মতই পুড়েছে'।"

"আমি যাব হীরুদাকে উদ্ধার করতে?"

"তাই সে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে ব'লে গেছে।"

"তুমি কি বল্লে?"

"আমি আর কি বলবো?—আমি বল্লাম, এ-সময় ওঁর অনেক কায, দেখি ওনাকে ব'লে।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তোমার কি মত?"

"আমার আর মতামত কি? তুমি যদি সময় করতে পার—হীরুদাকে উদ্ধার ক'রে আনতে পার, তা হ'লে তোমার পুণ্য হয়, নইলে ত ওরা ভেসেই গেছে।"

বিপিন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, তারা দুটিতে, কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় সুখে

রয়েছে, আমি সেই কপোতটিকে যদি ধ'রে নিয়ে আসি, তা হ'লে কপোতী আমায় অভিশাপ দেবে না কি?—ও কাযে আমার পুণ্য হবে, না পাপ হবে, তাই ত বুঝতে পারছি নে।"

সুহাস বলিল, "ঝাঁটা মার তোমার কপোতীর মাথায়। আপাগী সর্ব্বনাশী!—খড়দার মা গোঁসাই গোনা ক'রে তোমায় অভিশাপ দেবেন! তার অভিশাপে তোমার কিছুই হবে না। সে কপোতী, অন্য কপোত খুঁজে নিক্ গে যাক্,—কপোতের দুঃখ কি তার!"

স্ত্রীর উষ্মা দেখিয়া বিপিন বাবু হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "তা, আমি সেখানে যেতে পারি, চেষ্টাও দেখতে পারি। অবশ্য এখনই নয়, কায-কর্ম্মগুলো সেরে নিতে এখনও আমার ১০।১৫ দিন লাগতে পারে। কিন্তু আমি গেলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? সে ত ছেলে-মানুষটি নয় যে, তার গালে একটা চড় মেরে কান ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে তাকে টেনে নিয়ে আস্‌বো! সে যদি না আসে?"

সুহাস বলিল, "তোমার সঙ্গে তার এত দিনের বন্ধুত্ব, এত খাতির করে তোমার সে, তোমার কথা কি ঠেলতে পারবে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "তার স্ত্রীর সঙ্গে, আমার চেয়ে কি তার কম বন্ধুত্ব?—আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, দেখবো আমি চেষ্টা ক'রে। তবে সহজে তার ঘাড় থেকে পেত্নী যে নামাতে পারবো, তা ত বোধ হয় না।"

কথাবার্ত্তা তখনকার মত এই পর্য্যন্তই হইল। কিন্তু চিন্তাটা বিপিন বাবুর মন হইতে তিরোহিত হইল না। কি উপায়ে বন্ধুকে তিনি উদ্ধার করিয়া আনিতে পারেন, ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

চাকরী বাকরি ছাড়িয়া উহারা ডুব মারিল—রেবতীর কত টাকাই বা আছে কে জানে!—কত দিন উহারা বসিয়া খাইতে পারিবে? রেবতী মানুষটি ত বিলক্ষণ রকম সৌখীন—তাহার খরচপত্র ত বড় কম নয়। কিন্তু সে যাই হোক, হীরুদাদারই বা প্রবৃত্তি কি রকম? রেবতীর অন্নদাস হইয়া জীবন যাপন করিতে তার আত্মসম্মানে কি বাধিল না?—সে পূর্ব্বে ত এমন ছিল না। এ সম্বন্ধে হীরু ত চিরদিনই খুব খাঁটী ছিল। বিপিন বাবুর মনে পড়িল,—কখনও তাঁহার নিকট হইতে যদি দুইটা টাকাও সে লইত,—সাহায্যস্বরূপ লইতে কিছুতেই রাজী হইত না,—ঋণ বলিয়া লইত এবং তাহা পরিশোধ করিতেও ভুগিত না। সেই হীরু—ছি ছি!—রেবতীর অন্নে উদর পূরণ করিতে, রেবতীর বস্ত্র পরিধান করিয়া বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইতে কেমন করিয়া তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে? গত দুই মাস যে ২৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাও বোধ হয় রেবতীরই দান! কয়টা ব্যাঙ্কে হীরালালের একাউণ্ট আছে, তাহা ত বিপিন বাবুর অবিদিত নাই,—রেবতীর ব্যাঙ্ক হইতেই ও টাকা ত রেজে-ষ্টারি হইয়া আসে!

সুরবালা মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর আসিয়া সুহাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বিপিন বাবু যে দিন দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করি-বেন, তাহার পূর্ব্বদিন বিকালে হীরালালের জননী নাতিনীকে কোলে করিয়া সুহাসের নিকট আসিলেন এবং বিপিনের সহিত একবার সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন!

সুহাস, ঝি পাঠাইয়া স্বামীকে ডাকাইয়া আনিল। বিপিন বাবু আসিলে, সে কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হীরালালের জননী সাশ্রুনয়নে বিপিন বাবুকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি যে তোমার গরীব খুড়ীমা'র এই উপকারটি করতে রাজি হয়েছ, তোমায় বাবা কি ব'লে আর আশীর্ব্বাদ করবো! তুমি চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও,—এই রকম ধর্ম্মে মতি তোমার যেন চিরদিন থাকে, বাবা। যেমন ক'রে হোক্, তুমি আমার হীরুকে ফিরিয়ে আন, বাবা!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ত করবো আমি, খুড়ীমা! কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হব, তা বল্‌তে পারিনে! হীরুদা ত ছেলেমানুষটি নয়—"

বড়-গিন্নী অশ্রু মুছিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "যদি সে মাগীকে সে একেবারে পরিত্যাগ করতে রাজি না-ও হয়,—তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একবার বাড়ী এনে ফেল, বাবা। যদি তেমন তেমন দেখ—দেখ যে, সে একেবারেই বেঁকে বসেছে, তা হ'লে তাকে এই রকম বোলো যে,—বেশ ত! একটা সখ হয়েছে তোমার, —সেটা তোমায় ছাড়তে ত বলছি নে! কিন্তু তাই ব'লে কি তোমার বুড়ো মাকে, তোমার স্ত্রীকে, সন্তানকে ভাসিয়ে দিতে হবে?—চল, একবার বাড়ী চল দিন-কয়েকের জন্যে, তাদের দেখা দিয়ে এস, তারা যে তোমার জন্যে ভেবে ভেবে মরতে বসেছে। এখন বাড়ী চল, দিন-কতক সেখানে থেকে, আবার

তখন ফিরে এস। পুরুষমানুষ, একটা কায ক'রে ফেলেছ, তাতে আর হয়েছে কি ?—যাতে ঘর-বা'র দুই বজায় থাকে,—সাপও মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে—তাই করাই ত বুদ্ধিমানের কায। সকলেই ত কিছু আর শুকদেব গোঁসাই নয়—কত পুরুষমানুষের ত ও-রকম দোষ থাকে, তাই ব'লে তারা কি স্ত্রী-সন্তানকে ভাসিয়ে দেয় ?—এই রকম সব কথা ব'লে—আর যা যা বল্লে ভাল হয়, তুমি বাবা আমার চেয়ে বেশীই জান, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ আর কি জানি বল !—ব'লে কয়ে, তুতিয়ে পাতিয়ে তুমি তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আন, বাবা !"

যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, এই আশ্বাস দিয়া বিপিন বাবু বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

রজনীতে আহারান্তে সোফায় বসিয়া স্ত্রীর সহিতও বিপিন বাবুর এই প্রসঙ্গে আলোচনা হইতেছিল। সুহাস আজ বড়ই ম্রিয়মাণ। আজ তার মুখে হাসি নাই, চক্ষু মাঝে মাঝে ছল-ছল করিয়া উঠিতেছে।

বিপিন বাবু স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার মনটি এমন ভার ভার কেন, হাঁস ?"

সুহাস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি কাল চ'লে যাবে, কত দিন দু'জনে দেখা হবে না,—তাই বোধ হয়।"

"কিন্তু আমি ত বেশী দিন থাকবো না—বড় জোর ১০।১৫ দিন। আগেও ত এ রকম বাইরে গেছি—আরও বেশী দিন বাইরে থাকতে হয়েছে, কিন্তু তোমার মনটি ত এমন ভার ভাব কখনও দেখিনি।"

সুহাস বলিল, "সত্যিই,—আজ আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে।"

"এবার এত মন খারাপ হবার কি বিশেষ কোনও কারণ ঘটেছে ?"

সুহাস বলিল, "আমার পোড়া মনের কথা ছেড়ে দাও।"

"কেন, পোড়া মন কেন বলছ ?"—বলিয়া বিপিন বাবু স্ত্রীর চিবুক হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে আদর করিলেন।

সুহাস কিছুক্ষণ নীরব রহিল। বিপিন বাবু বলিলেন, "কি ভাবছ তুমি, আমায় বলবে না ?"

সুহাস বলিল, "বলবো ?"

"বল। আমার মনের কোনও ভাব তোমার কাছে কিংবা তোমার মনের কোন ভাব আমার কাছে কি গোপন থাকা উচিত ?"

কথাটি কিন্তু বলিয়াই বিপিন বাবুর বুকের ভিতরটা যেন ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সেবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া রেবতী-ঘটিত সকল কথাই ত তিনি স্ত্রীর নিকট বলিয়াছিলেন, কিন্তু রেবতীর সাহচর্য্য যে সাময়িক ভাবে তাঁহার একটু মিষ্ট লাগিয়াছিল, সে কথা ত তিনি প্রকাশ করেন নাই। একটুখানি মোহ—খুব পাতলা, খুব ফিকা—অপরাধ ঠিক নয়, অপরাধের একটু ছায়ামাত্র—কোন্ কালে সে সব চুকিয়া-বুকিয়াও গিয়াছে—কিন্তু, তবু ত সে-টুকু ইচ্ছাপূর্ব্বকই গোপন করিয়া গিয়াছিলেন।

সুহাস বলিল, "আমার কি মনে হচ্ছে জান ? আমার মনে হচ্ছে—তুমি হীরুদাদাকে যে গর্ত্ত থেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ—তুমি নিজেই যদি সে গর্ত্তে প'ড়ে যাও ? তারা সব হ'ল, কি ব'লে গিয়ে—কি ছাই-পাঁশ ! তারা ডাকিনী—মায়াবিনী—কত মায়া জানে। তাই ভয় হয়।"

বিপিন বাবু অনুভব করিলেন, স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনিয়া আশঙ্কাটা খুব অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধে, তাঁহার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠাই উচিত—কিন্তু তিনি হাসিতে ত পারিলেন না ! কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তুমি যদি যথার্থ পতিব্রতা হও,—তা হ'লে কোনও ডাকিনীই তোমার স্বামীকে হজম করতে পারবে না !"

সুহাস বলিল, "আমি যথার্থ যে পতিব্রতা, এ গর্ব্বটুকু আমার মনে ত আছে ! আমি ত তোমা ভিন্ন—"

সুহাস আর বলিতে পারিল না। বিপিন বাবু হাসিয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।



হিন্দু সমাজের স্বাধীনতা-নাশ

বাল্য-বিবাহ-নিষিদ্ধ আইন প্রস্তাবের খসড়া সিলেক্ট কমিটী অতি সত্বর পাশ করিয়া দিয়া ইহার তীব্র প্রয়োজনের প্রয়োজন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আইনের সদস্ত প্রভাবে বাল্য-বিবাহের উচ্ছেদসাধন হইয়া যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলেই যেন লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে বীরপুত্রের উদ্ভব হইয়া ভারতে স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া দিতে বিলম্বের অবকাশ হইবে না ! দেশে প্রাচীন ধর্ম্ম-সংস্কারের উচ্ছেদ সংসাধিত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় প্রভাব আরও প্রসারিত হইবে—এমন একটা নূতন কিছু হইবার শুভ-সুযোগ দেখিয়া নূতনত্বের মোহমুগ্ধ দল আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়াছেন। দেশে আর্য্য গৌরবের প্রাচীন মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া তাহার স্থানে নবনির্ম্মিত বিলাস-হর্ম্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহার বিপুল আনন্দের উদ্দাম উচ্ছ্বাস কি পাশ্চাত্য-শিক্ষাসভ্যতার অন্ধ-উপাসকরা সংগোপন করিতে পারেন ?

ইংরাজ অসিবলে অথবা বিনা যুদ্ধে বাণিজ্য-বিস্তারের কৌশলে—ষড়যন্ত্রের হলাহলে ভারত অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীর ব্যক্তিগত—সমাজগত—ধর্ম্মগত স্বাধীনতার উপর এখনও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রক্লামেশন প্রচার করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মে—সমাজ-সংস্কারে ইংরাজরাজ হস্তক্ষেপ করিবেন না,—হিন্দুর ধর্ম্মগত—সমাজগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এই আশ্বাস-বাণী প্রচার করিয়া বিপ্লবের পর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কালস্রোতে—নানা বিপ্লবে আর্য্য হিন্দুর সব গিয়াছে—কিন্তু আর্য্যগৌরবের অভ্রভেদী হিমালয় ঋষিব্রাহ্মণের অমর অবদান সাহিত্য আছে—সেই সাহিত্যের অক্ষয় আধারে হিন্দুর ধর্ম্ম—সমাজ-সংস্কার—শাস্ত্র অবিনশ্বর—কালজয়ী—গৌরব মহিমা-দীপ্ত হিন্দু সভ্যতা-সাধনার জলন্ত সাক্ষী আজও বিরাজিত। ইংরাজের কঠোর শাসন—সে কালজয়ী সাহিত্যের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া—পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার দিগ্বিজয়ী প্রভাব আরও প্রসারিত করিয়া ভারতবাসী হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারের সম্যক্ বিনাশ-সংসাধন করিতে পারে নাই। তাই আজও হিন্দুধর্ম্মের তথা হিন্দুজাতির অবসান হয় নাই। জগতের জ্ঞানভাণ্ডার আর্য্য হিন্দুর গৌরব-মহিমা-উচ্ছ্বসিত জ্ঞানরত্নাকরের নিকট চিরঋণী—আজও সেই রত্নাকর হইতে জ্ঞান-ত্যাগ-সাধনা-শিক্ষা আহরণের জন্য ব্যস্ত। ত্যাগ-মন্ত্র-দীপ্ত ব্রাহ্মণের ব্যবস্থায় আজও হিন্দুর সমাজ—ধর্ম্ম-সংস্কার সুনিয়ন্ত্রিত—সুপরিচালিত—চির-স্বাধীন—সে ব্রাহ্মণ্য-গৌরব ধ্বংসের জন্য পরতন্ত্রের অন্ধ উপাসকগণের শত প্রচেষ্টা-সাধনাতেও ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সংস্কার আজও নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পায় নাই—পাশ্চাত্য-শিক্ষার উপাসকগণের এ মনোদুঃখ রাখিবার স্থান কোথায় ?

যে ত্রিকালদর্শী মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানে সর্ব্বকাল-শুভকর সমাজনিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় হিন্দুসমাজ চিরস্বাধীন—সমাজের কোন ব্যবস্থার জন্য রাজদ্বারে কোন প্রয়োজনে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন তাহার নাই—কোন দিন হইবে না—যে বাঙ্গালার গৌরবগর্ব্বচূড়া রঘুনন্দনের স্মৃতির চিরজ্যোতিঃ বিরস্থান্ ব্যবস্থায় হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কার চিরদিন অক্ষুণ্ণ—চিরপূজ্য—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই নিকট চিরসমাদৃত—তাহার উচ্ছেদ করিয়া আইনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সাহায্যে সমাজ-শাসন—ধর্ম্ম-সংস্কার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইলে হিন্দুধর্ম্মের আর রক্ষা নাই ! কিন্তু ব্যারিষ্টার-উকীলের সংখ্যা দেশে এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা দেশের ও দশের হিতসাধনে স্বয়ংসিদ্ধ নেতা সাজিয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, নূতন নূতন আইনের প্রবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন বিরোধের—নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব না করিলে তাঁহারা কিসের আশায় ইংরাজের আদালতের শোভাবর্দ্ধন করিয়া, অর্থরাশি অর্জ্জন করিয়া, দেশের মহা উপকার-সাধনে আত্মত্যাগের অলৌকিক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন ? হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল এত কঠোর যে, তথায় ডাইভোর্স কেসেরও সুযোগ নাই—বিবাহ রেজেষ্টারী হইয়া ইংরাজের শাসন-যন্ত্র-পরিচালনের বিরাট ব্যয় শোষণের জন্য রেজেষ্টারী ষ্ট্যাম্প ও 'ফি'তে কথঞ্চিৎ অর্থাগমেরও সুবিধা নাই। এত কোটি হিন্দুর অধ্যুষিত ভারতে কয়টি বড় সামাজিক মামলা ইংরাজের আদালতে উপস্থিত হইয়া কোর্টফি ষ্ট্যাম্পে বিচার-বিভাগ পোষণ করে ? আইনবলে ধনী ব্যক্তি পরলোকগত হইলে উইলের প্রবেট ও এডমিনিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটরূপে তাঁহার উপার্জ্জিত কিয়দংশ ধনসম্পত্তি শাসনযন্ত্র-সঞ্চালনের ব্যয়ের জন্য গৃহীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু বিবাহের বরপণে—নানা ব্যয়ে যে হিন্দু সমাজে অজস্র অর্থের আদান-প্রদান হইয়া থাকে, আজও তাহার কিছুমাত্র অংশ আইনবলে রাজকোষে আমানত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অতএব আইন চাই—আইনের সাহায্যে শাসনযন্ত্রের বিরাট ব্যয়নির্ব্বাহের অর্থের আমদানী ক্রমে ক্রমে সম্ভব হইতে পারে। বিরোধের সৃষ্টি হইয়া মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উকীল-ব্যারিষ্টাররা দেশের উপকারে আরও মনঃসংযোগ প্রদানের অবকাশ পাইতে পারিবেন। হিন্দুর সকল সামাজিক ব্যবস্থা-বিধান ও ধর্ম্ম-সংস্কারের মূলে আইনের সাহায্যের যে ক্রমে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িবে, তাহার প্রাথমিক সূচনা বাল্য-বিবাহ আইন। স্বয়ংসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক—হিন্দুহিতৈষী মিষ্টার হরবিলাস সর্দ্দা সেই জন্য হিন্দুর বাল্য-বিবাহের কুসংস্কার আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাল্যবিবাহ আইনের খসড়া প্রণয়ন

করিয়াছেন, কাউন্সিলেও তাহা সমাদরে গৃহীত হইয়াছে—সিলেক্ট কমিটীও সত্বর তাহা পাশ করিয়া প্রয়োজনের তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে দেশে এলাচের জুলায় নিরীহ ব্যক্তি ধনীর চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে—তাহার জন্য আইনের কোন প্রয়োজনই উপলব্ধি হয় না—সেই দেশে এমন তৎপরতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই!

বাল্য-বিবাহের ফলে দেশের অধোগতি হইতেছে—দুর্ব্বল সন্তানের আবির্ভাব হইতেছে—এমন ধারণা আমাদের নাই। এই বাল্য-বিবাহের ফলেই বাঙ্গালার গৌরব প্রতাপাদিত্য, মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী উদ্ভূত হইয়া মোগল-প্রতাপ চূর্ণ করিয়াছিলেন,—যে রাজপুতবীরত্বের গৌরব-গাথায় ভারতের ইতিহাস মুখরিত, সেই রাজপুত বীররাও বাল্য-বিবাহ-উদ্ভূত সন্তান। বাল্য-বিবাহ দুর্ব্বল জাতি সৃষ্টি করে—বালিকা স্ত্রীর স্বাস্থ্যনাশ করিয়া যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব করে, এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নাই; ইতিহাস তাহার সাক্ষী। য়ুরোপে যুবতী-বিবাহের দেশেও কি যক্ষ্মা-রোগের অভাব আছে? দুর্ব্বল সন্তানের অসময়ে ক্রমাগত আগমনে স্ত্রীর স্বাস্থ্যনাশের কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব—সংযমের অত্যন্তাভাব।

শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালার বিরাট খাদ্য-ভাণ্ডার রপ্তানীর প্রভাবে নিঃশেষিত—কৃষি-শিল্পজীবী বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষার আপাত-মধুর প্রলোভনে চাকরী সম্বল করিয়াছে বা চাকরীর উমেদারীই জীবনের সাধনা জ্ঞান করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিলাসের নানা উপকরণ সংগ্রহের ব্যয়ে তাহাদের অর্থ যত নিঃশেষিত—পরিবারের পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ব্যয় তত অধিক নহে। জল-খাবারের পয়সা সিগারেট চা-পানে ব্যয়িত হইতেছে।

হিন্দুর যে শাস্ত্রে বাল্য-বিবাহের বিধান আছে—সেই শাস্ত্রেই সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষাবর্জ্জিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সে অনৈতিক শিক্ষার সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা সম্ভব নহে,—তাই সংযমশিক্ষার অভাবে দুর্ব্বল জাতি শক্তি-প্রতিভা-হীন! উদরান্নের কাঙ্গাল—বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে মদনানন্দ মোদক ফেরি হয়—বৎসর বৎসর দুর্ব্বল সন্তান-দলের আগমনে পারিবারিক জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়া জাতিকে অস্থিমজ্জাহীন জীবন্মৃত করিয়া ফেলিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব-বিস্তারের ফলই এই—সুখের আপাতমধুর ব্যবস্থা। হিন্দুর বিবাহ কেবল আত্ম-সুখের ইন্দ্রিয়বিলাসতৃপ্তির জন্য নহে—ইহলোকের পরলোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের—জীবন শান্তিময় করিবার—সংসার আশ্রমে পরিণত করিবার শ্রেয়ঃ ও প্রেয় উপায়।—কিন্তু ইংরাজের নারী-সম্মান—আত্মসুখপর্ব্বস্ব জ্ঞান ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতা আদর্শের অনুকরণ আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

বাল্য-বিবাহ হইতে যৌবন-বিবাহের ফল আরও বিষম হইয়া পড়িবে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাহীন পাশের ফাঁসে আর অর্থরাশি আকর্ষণ করা যায় না বটে, কিন্তু পাশের রঙ্গের গোলাম এখনও বিবাহের বাজারে মূল্যবান্! পরীক্ষা-সেতু উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনেক বরকর্ত্তা পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থার্জ্জন করিয়া থাকেন। ফলে পাঠ্যজীবনেই ২।৪টি সন্তানের জনক হইয়া যুবক সংসারে প্রথম প্রবেশের সূচনাতেই চক্ষুতে অন্ধকার দেখেন। তাঁহার উদ্যম, অধ্যবসায়, সাধনা সংসারের তাপে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। যুবতী-বিবাহে এ বিভ্রাট আরও বাড়িবে—"তার পরেতেই পুত্র-কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা।" ইংরাজের বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ আইন সে গতির প্রতিরোধ করিতে পারিবে কি? এই দুর্ব্বহ-জীবন-বিড়ম্বনা নীরবে জয় করিয়া কয়জন উৎসাহী যুবকের জীবন সাফল্যের গৌরবমণ্ডিত হইতে পারে?

হিন্দু সমাজনিয়ন্তা মনীষিগণের ব্যবস্থায় বিবাহে কোর্টসিপ ছিল না—প্রেমের পূর্ব্বরাগের অবসর ছিল না—জনক অভিভাবকের নির্ব্বাচিত বালিকা বধূ স্বামীর খেলার সাথী হইয়া সংসারের গৃহিণীর স্নেহমমতা শিক্ষা আদর্শে আত্মজীবন সুগঠনের সুযোগ লাভ করিয়া—স্বামীর সংসারের সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইয়া স্বামীর জীবন সার্থক করিত—স্বামীর কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনা প্রদান করিত—তাঁহার ত্যাগে সংসার সুখের নন্দনে পরিণত হইত। হিন্দুর সে সৌভাগ্যের দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন হিন্দুর বিবাহ—ইংরাজের অনুকরণে কেবল আত্মসুখের প্রসাদন—সংসারে গৃহবিচ্ছেদসৃষ্টির—সূচনামাত্র। যৌবন-বিবাহে এই গৃহবিরোধ আরও সত্বর উদ্ভব হইয়া ইংরাজের আইনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে—প্রেমের অবকাশ—কোর্টসিপের সুবিকাশের নূতন সুযোগ আসিবে!

হিন্দুর যে শাস্ত্রে গৌরীদানের ব্যবস্থা আছে—সেই শাস্ত্রেই উপযুক্ত মনোমত পাত্র না পাইলে কুমারী কন্যার আজীবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনের বিধানও ত আছে। পরন্তু দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে স্বামি-স্ত্রীর যৌন সম্মিলন সম্ভবপর ছিল না, বধূ শ্বশুরালয়েও কন্যার মত লালিত-পালিত হইত। প্রাপ্তযৌবনা হইয়াও বধূর একান্তে স্বামিসাক্ষাৎকার নিতান্তই দুর্লভ ছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবারে গুরুজনের শাসনাধীনে সংযমশিক্ষার রীতিমত অবসর ও সুযোগ ছিল। তবে হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কার যাঁহারা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুদারত্ব কোথায় আত্মপ্রকাশ করিল? পাশ্চাত্য-শিক্ষাগর্ব্বিত সম্ভ্রান্ত সমাজ ত বহু দিন হইতেই যৌবন-বিবাহ দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ত মনুর শাসনকে বহু দিনই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন—তবে আবার নূতন করিয়া আইনে শৃঙ্খলিত করিবার প্রয়োজন কোথায়? নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত সমাজে যেমন বালিকা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত আছে, তেমনই বিধবা-বিবাহ—পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থাও আছে—তাহাদের জন্যও ত এ আইনের কোন প্রয়োজন নাই—তবে কি জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলে এ আইনরূপ কুঠারাঘাত করা হইতেছে? কেবল যদি মামলার সৃষ্টি করিবার জন্যই এ বিধান বিধিবদ্ধ হয়, তবে সে অবশ্য অন্য কথা!

নূতন নূতন আইন সৃষ্টির নানা বিধানে নিত্য নূতন বিরোধের উদ্ভব করিয়া মতভেদে বিচ্ছিন্ন ভারতে আবার যাঁহারা নূতন সামাজিক সমস্যার উদ্ভবের জন্য—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে হিন্দুসমাজ সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া পরম শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাকে বিব্রত করিতে চাহেন, তবে আমরা কোনমতেই তাঁহাদের সে প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারি না—কোনদিনই পারিব না। ত্রিকালদর্শী ঋষি-প্রবর্ত্তিত হিন্দু-সমাজের পরম কল্যাণকারী এই সনাতন ব্যবস্থা ইংরাজের আইনে চূর্ণ করিবার

জোহান জোফানি কলিকাতায় আগমনের পর লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। তথায় ৩।৪ বৎসর থাকিয়া আগরা হইয়া পুনরায় কলিকাতায় আইসেন এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে থাকেন। তাঁহার লক্ষ্ণৌ অবস্থিতিকালেই তিনি লক্ষ্ণৌএ তথাকার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ দেশীয় ও বিদেশীয়ের প্রতিকৃতি আছে। মূল চিত্রখানি খুব সম্ভব এখনও লক্ষ্ণৌএ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চিত্র তিনি যাহা ভারতবর্ষে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দরবারে

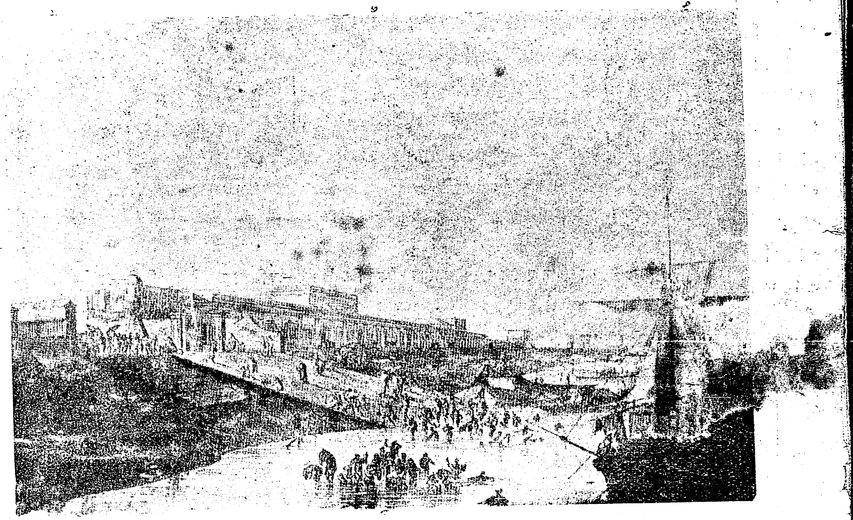

পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ — শিল্পী—ড্যানিয়েল্

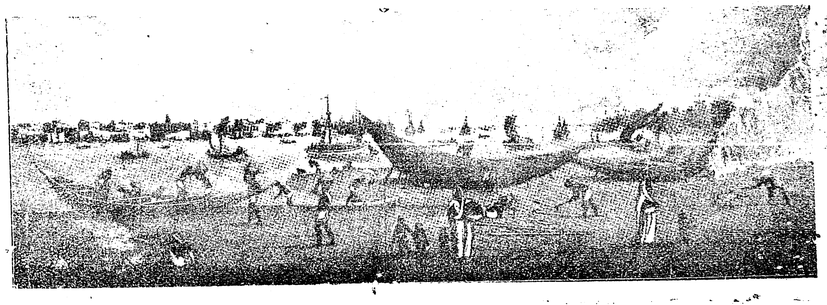

হাওড়া হইতে কলিকাতার দৃশ্য — শিল্পী—মোফাত

মোরগের লড়াই-সংক্রান্ত একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। ইহার মধ্যে নবাব আসফুদ্দৌলা, জেনারেল ক্লড মার্টিন্, এডওয়ার্ড হুইলার, কাপ্তেন মরডণ্ট প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি জন হাইদার বেগ খাঁর দৌত্য। ইহার মধ্যে ১ শতেরও উপর প্রতিকৃতি আছে। তাঁহার অঙ্কিত কোন নৈসর্গিক চিত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। মনুষ্য প্র

MISSING PAGES